বর্ধন • সেন • ভক্ত

সারদা বুক হাউস

# ভারতীয় সংবিধান

## প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে** গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা** প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবন্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি।**"

# ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার

## (ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

### ১। সাম্যের অধিকার ঃ

- ★ আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
- ★ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- ★ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- ★ অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

### ২। স্বাধীনতার অধিকার ঃ

- ★ বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- ★ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- ★ সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ★ ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ★ ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ।
- ★ যে-কোনো জীবিকা, পেশার বা ব্যাবসা-বাণিজ্য করার অধিকার।
- ★ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

### ৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ঃ

- ★ কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
- ★ চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

* সকল শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫। সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঃ

* স্বতন্ত্র ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতিগত সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ।
* ধর্ম, ভাষা, জাতি, বর্ণগত কারণে শিক্ষালয়ে ভরতির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
* ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পছন্দমতো শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হবে না।

৬। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ

* মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে-প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Writ) জারি করতে পারবে; হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus ), ম্যান্ডামাস ( Mandamus ), সারশিয়োরী ( Certiorari ), প্রহিবিশান (Prohibition) ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

# মৌলিক কর্তব্য

## (ভারতীয় সংবিধান, ধারা ৫১এ)

১। সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।

২। মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।

৪। আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

৫। ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন ।

৬। দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।

৭। অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।

৮। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।

৯। সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।

১০। জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারে , জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা।

১১। পিতামাতা/ অভিভাবকের দায়িত্ব ৬ - ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

(10+2), ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য

# জীববিদ্যা

## [দ্বাদশ শ্রেণি]

## • দ্বিতীয় খণ্ড •


**অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বর্ধন,** এম. এস-সি.

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, শারীরবিদ্যা বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি।

প্রাক্তন অধ্যাপক, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

**অধ্যাপক সুবীর সেন,** এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি।

প্রাক্তন পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো, অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স, বুডাপেষ্ট, হাঙ্গেরি।

**অধ্যাপক রাজীব কুমার ভক্ত,** এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি.

রিডার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ এবং বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা। প্রাক্তন অধ্যাপক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, ২৪ পরগনা (উত্তর)

প্রাক্তন ভিজিটিং সায়েনটিস্ট, ব্রাউন ইউনিভারসিটি, আমেরিকা।


সারদা বুক হাউস

১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশিকা ঃ
চন্দ্রাবলী রায়
**সারদা বুক হাউস**
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩





প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, ২০০৭
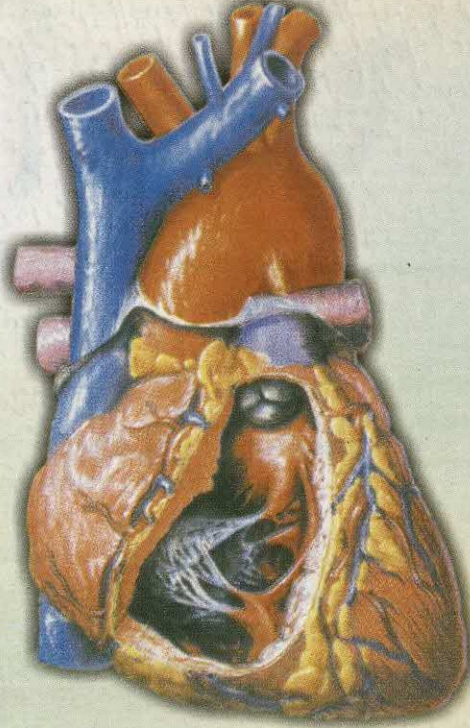


মূল্য ঃ দুই শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

বাঁধাই ঃ মা তারা

গ্রন্থন ঃ
লেজার টাইপ সেটার
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
সি. বি. অফসেট
২৪এ, বাগমারি রোড
কলকাতা- ৭০০ ০৫৪
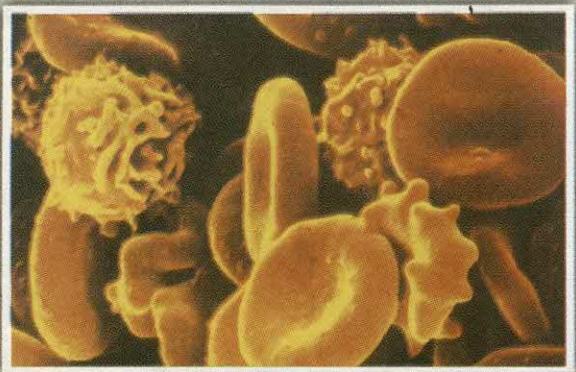
# বইটির বৈশিষ্ট্য

- জীববিদ্যার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। জীববিদ্যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা ও অভিভাবকদের কাছ থেকে বহু চিঠি ও মতামত পেয়েছি। বইটির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। তাই অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বাদশ শ্রেণির (২য় খণ্ড) বইটির বিষয়বস্তু সরল ও সাবলীল ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি।
- পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স, (10 + 2) ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বইটি লেখা হয়েছে।
- নতুন বইটিতে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার প্রতিটি বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিসহ তথ্যসমৃদ্ধ, সরল ও সাবলীল ভাষায় পরিবেশিত করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কিছু নমুনা প্রশ্ন ও তার উত্তর এবং নতুন ধরনের অনুশীলনী সংযোজন এই বই-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- বইটির শেষে বিষয়সূচি (Subject Index) সংযোজিত হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা যে-কোনো বিষয় সহজে খুঁজে নিতে পারে।

আমরা আশা রাখি ছাত্রছাত্রীদের কাছে সঠিক ও উন্নতমানের জ্ঞান লাভের জন্য প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডও বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। পরিশেষে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিকশিক্ষিকাদের বইটি ভালো লাগলে ও উপকারে এলে পরবর্তী সংস্করণে আরও সুন্দরভাবে সংযোজন করার প্রেরণা পাব।

গ্রন্থকারত্রয়

# ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
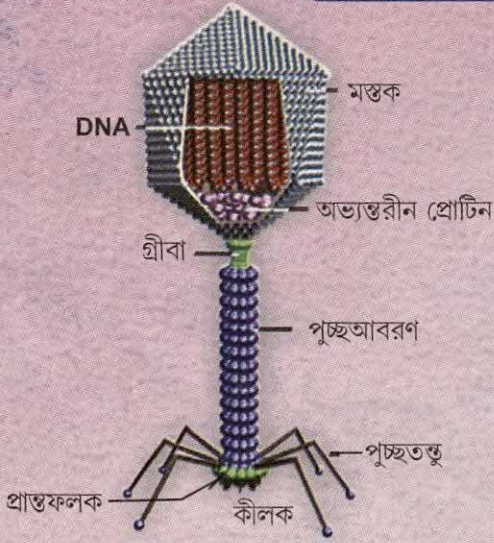
ব্যাকটেরিওফাজ ( *Bcteriophage* )
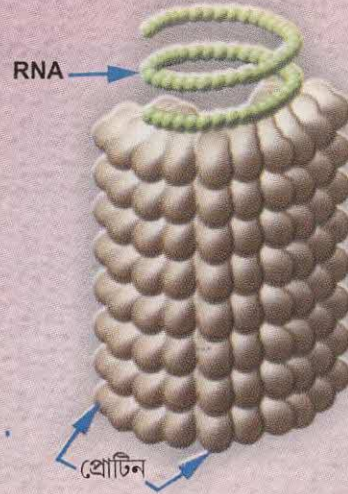
টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ( *Tobacco Mosaic Virus* )
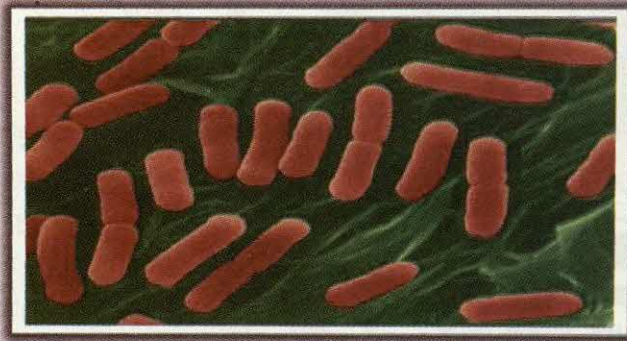
এসচিরিচিয়া কোলাই ( *Escherichia coli* )
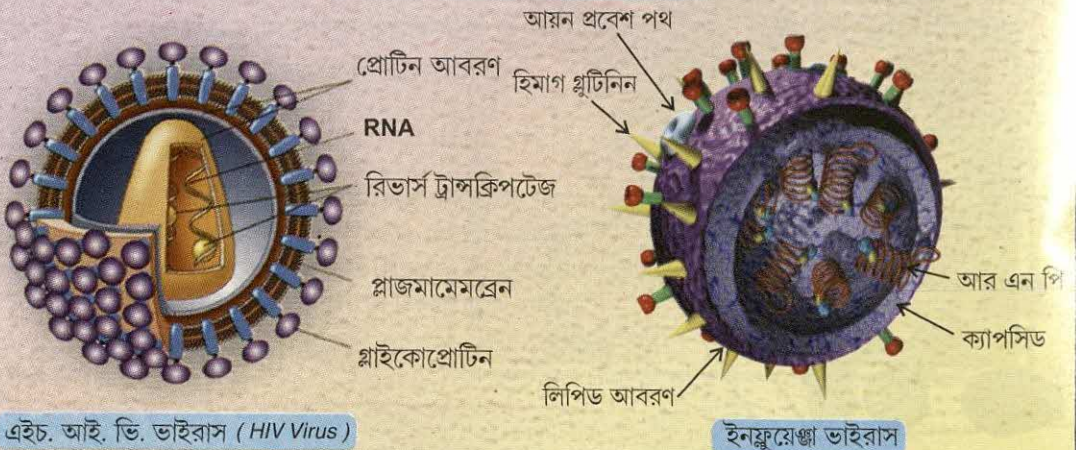
এইচ. আই. ভি. ভাইরাস ( *HIV Virus* )

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

# শৈবাল ও ছত্রাক
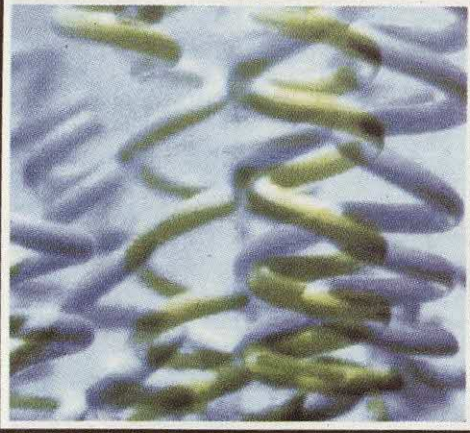
স্পাইরুলিনা ম্যাক্সিমা
( *Spirulina maxima* )

অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেস্‌ট্রিস
( *Agaricus campestris* )

মরচেল্লা এসকুলেন্টা
( *Morchella esculanta* )

পালিপোরাস অস্‌ট্রিফরমিস্‌
( *Polyporus ostreiformis* )

# ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা

অ্যান্থোসেরস ইরেকটাস
*( Anthoceros erectus )*

পোগোনেটাম অ্যালোডিস
*( Pogonatum aloides )*

ড্রায়োপটেরিস র‍্যামোসা
*( Dryopteris ramosa )*

মার্সিলিয়া মাইনিউটা
*( Marsilea minuta )*

# ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperm)

সাইকাস রুমফি
*( Cycas rumphii )*

পাইনের স্ত্রীকোন
*( Female cone of Pinus )*

# সপুষ্পক উদ্ভিদ

হিবিসকাস-রোজা সাইনেনসিস
*(Hibiscus-rosa sinensis)*

রাউওলফিয়া সার্পেন্টিনা
*(Rauvolfia serpantina)*

করকোরাস অলিটোরিয়াস
*(Corchorus olitorius )*

কলচিকাম লুটিয়াম
*(Colchicum luteum)*

ওরাইজা সেটাইভা
*(Oryza sativa)*

অ্যানোফিলিস মশকী

এডিস মশকী

কিউলেক্স মশকী
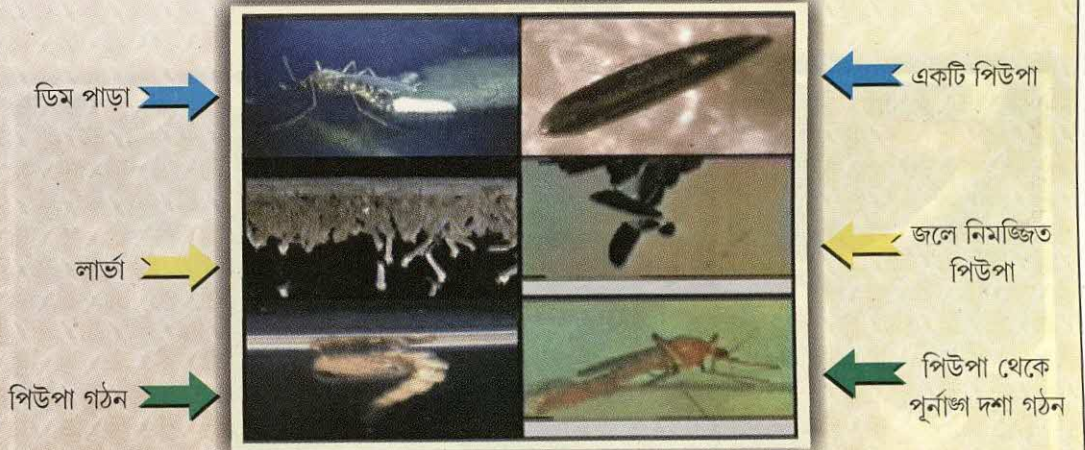
মশার জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা

## মৌমাছিপালন ও মধু সংগ্রহ

মকরন্দ সংগ্রহ

কুঠুরীতে মধু সঞ্চয়

মধু নিষ্কাশন

মধু সংরক্ষণ

মৌবাক্সে মৌমাছিপালন

# মুরগির ব্রিড ও মুরগিপালন

ব্লাক অস্ট্রালপ

প্লাইমাউথ রক

একটি মোরগ

একটি পোলট্রির অংশ

## মানুষের লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা

নিউট্রোফিল

নিউট্রোফিল
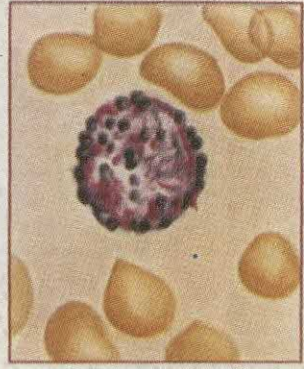
বেসোফিল
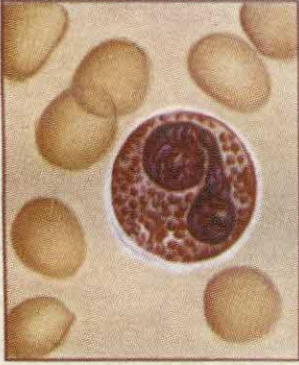
ইওসিনোফিল

ইওসিনোফিল
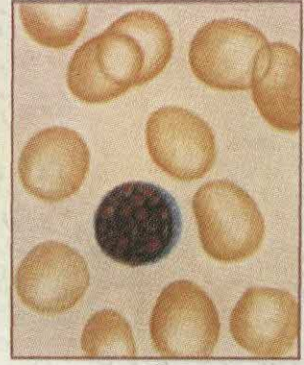
ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট
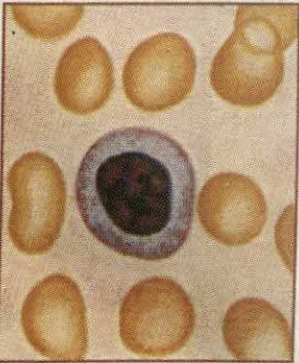
বৃহৎ লিম্ফোসাইট

মনোসাইট
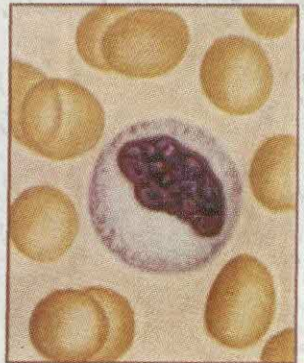
মনোসাইট

পূর্তিদশা — অধিক রক্ত প্রবেশের ফলে অলিন্দের অভ্যন্তরীণ চাপ অধিক হয় এবং নিলয়ের প্রসারণের ফলে নিলয়-মধ্যস্থ চাপে হ্রাস হয়, ফলে রক্ত, অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত করে সজোরে নিলয়ে প্রবেশ করে।
অলিন্দের সংকোচন (প্রারম্ভিক ঘটনা)- সংকোচনে অলিন্দের অবশিষ্ট রক্ত নিলয়ের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করে (অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা)। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা উন্মুক্ত হয় এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ থাকে।
অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা
অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা
নিলয়
অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা
অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা
নিলয়
অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা
0.01 সে.
সমদৈর্ঘ্য সংকোচন কাল
0.05 সে.
মন্থর পূর্তিদশা
0.167 সে.
প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা
0.113 সে.
সমদৈর্ঘ্য পেশিপ্রসারণ কাল
0.08 সে.
0.04 সে.
শৈথিল্য সূচনা দশা
নিক্ষেপণ কাল
0.25 সে.
অলিন্দের সংকোচন
নিলয়ের সংকোচন
সমদৈর্ঘ্য প্রসারণ কাল নিলয়ের সব কপাটিকা বন্ধ অবস্থায় নিলয় ফাঁপা রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে প্রসারিত হলেও দৈর্ঘ্য সমান থাকে। অলিন্দের প্রসারণ এবং এতে রক্তের পূরণ চলতে থাকে।
অলিন্দের প্রসারণ এবং নিলয়ের সমদৈর্ঘ্য সংকোচন কাল — একই সঙ্গে আরম্ভ হয়। নিলয়ের সব কপাটিকা বন্ধ থাকায় নিলয় রক্তপূর্ণ রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও নিলয়ের পেশির দৈর্ঘ্য সমান থাকে এবং অলিন্দের রক্তের পূরণ ঘটে।
ফুসফুসীয় শিরা
উত্তরা মহাশিরা
অলিন্দ
অধরা মহাশিরা
নিলয়
মহাধমনিতে
ফুসফুসীয় শিরা
নিক্ষেপণ কাল-সমদৈর্ঘ্য সংকোচনে নিলয় মধ্যস্থ চাপবৃদ্ধির ফলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে রক্তকে নিলয় থেকে সজোরে ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনিতে নিক্ষিপ্ত করে।
নিলয়
অলিন্দ
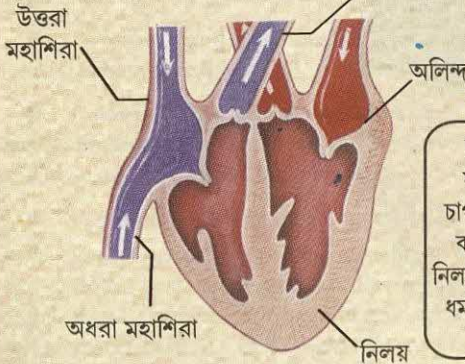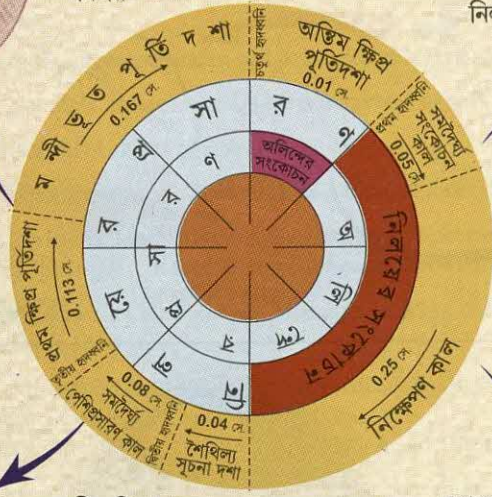
# জননাঙ্গ ও জনন প্রক্রিয়া

পুং জননাঙ্গ

স্ত্রী জননাঙ্গ

শুক্রাণু

ডিম্বাণু

ভ্রূণ
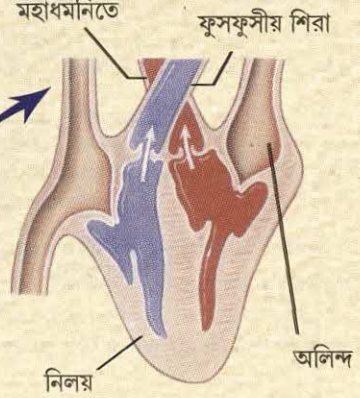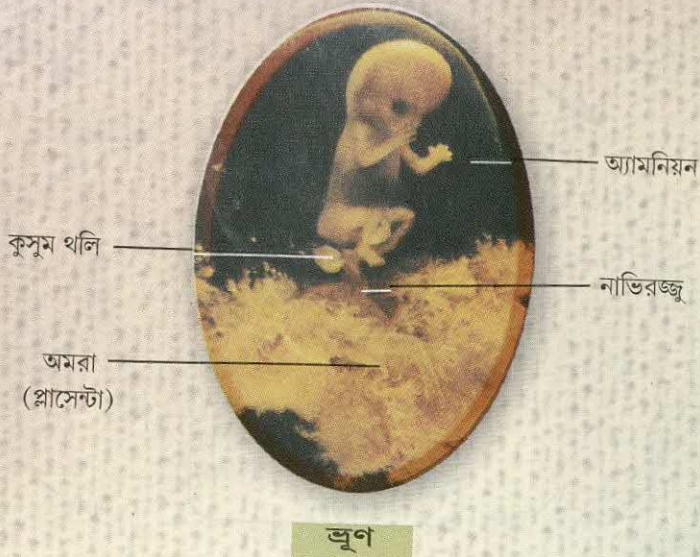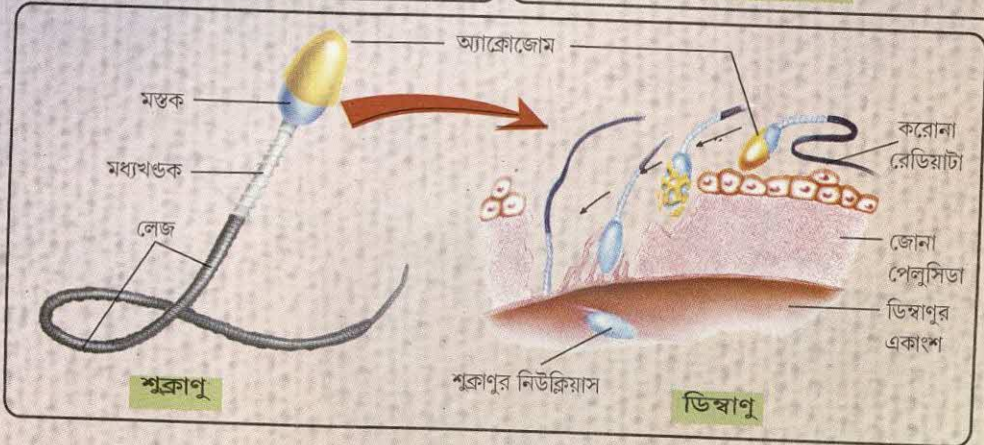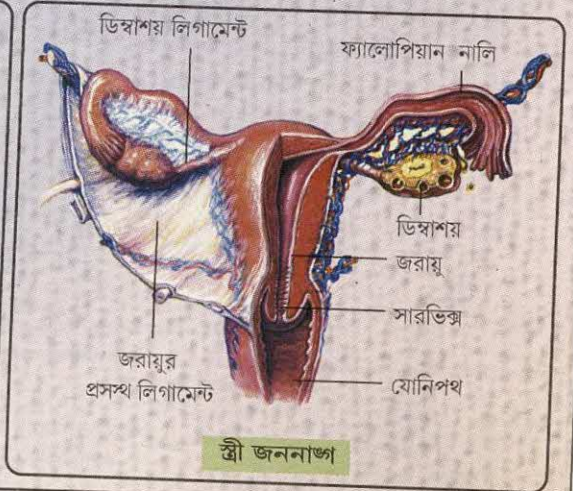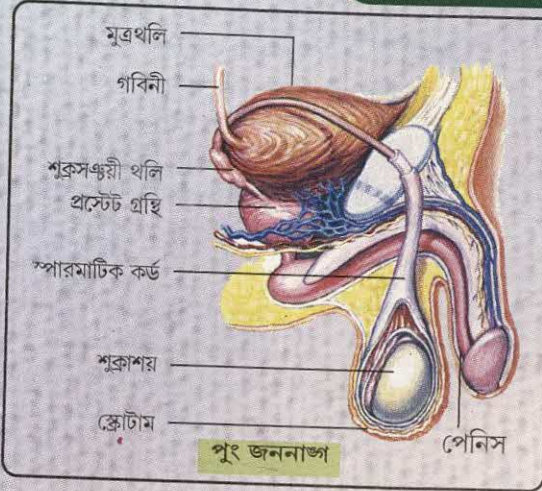
## ◎ JOINT ENTRANCE SYLLABUS FOR BIOLOGICAL SCIENCES ◎

**[CONDUCTED BY WEST BENGAL BOARD OF EXAMINATION FOR ADMISSION TO ENGINEERING, MEDICAL AND TECHNOLOGICAL DEGREE COLLEGES**

- **Unit of Life :** Definition of life. Cell as the basic unit of life. Cell theory, Prokaryotic and Eukaryotic cell-structure and differences.

- **Ultrastructure and functions of cellular components :** Cell wall, Plasma membrane, Plastid, Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, Mitochondria, Ribosomes, Lysosomes, Nucleus, Centrosomes, Cilia, Flagella.

- **Microscopy :** Components and principles of Simple and Compound Microscope.

- **Electron Microscope :** Basic functional principles.

- **Physical and chemical principles involved in maintenance of life processes :** Diffusion, Osmosis, Absorption, Osmoregulation.

- **Biomolecules :** Classification and structural properties of carbohydrates, lipids, aminoacids, proteins and nucleic acids.

**Carbohydrates :** Monosaccharides, digosaccharides, and polysaccharides (starch, glycogen, cellulose).

**Proteins :** Simple (albumins, globulins, collagen) and conjugated proteins (only examples).

**Nucleic acids :** Structure of DNA, RNA, types of RNA.

**Enzymes :** Definition & properties, Examples ; Mechanism of Action, Allosterism and Regulation.

- **Chromosomes and Cell Division :** Morphology of chromosomes ; Euchromatin and Heterochromatin. Nucleic acid as genetic material (Examples : Bacterial Transformation and Viral Transduction).

**Brief idea of Polytene chromosomes :** Cell cycle and phases (excluding control mechanism). Characters of Malignant cell ; Process & significance of Meiosis.

**Genetics :** Laws of Heredity : (Monohybrid and dihybrid crosses ; Mendel's laws). Back cross, Test cross, Linkage, Crossing over, Sex linked inheritance—Colour blindness. Haemophilia.
Mutation—Definition and Types ; Replication of DNA, Transcription and Translation (Brief idea).

- **Origin, Evolution and Diversity of Life :** Haldane and Oparin's concept on origin of life. Modern concept of Natural selection, Biological Species concept. Human evolution - an outline.

- **Taxonomy and Classification :** Definition ; Importance of Taxonomy, Binomial Nomenclature, Law of Priority (Homonym & Synonym).

- **Concept of Biodiversity :** Definition of Biodiversity ; Genetic diversity ; Species diversity and Ecosystem diversity. Five kingdom classification (only distinct characters). Salient features of major animal phyla with common examples, classification of Chordates (up to Sub Class) with distinctive characters only.

- **Population Biology :** Concept of population growth (logistic and exponential) and population control.

- **Ecosystem :** Concept of ecosystem and Biosphere, Wetland. Brief idea of Ecological pyramids, Energy flow, Biogeochemical cycle (concept only). Environmental pollution : Air, water and noise pollution—sources effects and probable control strategies ; Biomagnification and Bioaccumulation. Cause of Dyslexia, Minamata and *Etai etai* diseases. Green house effect, BOD, COD, Acid rain and Ozone hole.

- **Virus and Bacteria :** Morphological characteristics of Bacteriophage (T2), Plant virus (TMV) ; Animal virus (influenza), Bacterial cell (*E. coli*) Staining : Gram staining for bacteria.

- **Biotechnological application of microbes :** (a) Agricultural—*Rhizobium* and other Nitrogen fixing bacteria, Biofertilizers and Bio-pesticides ; (b) Industrial—Production of curd ; tanning and brewery ; synthesis of antibiotics, vitamin. (c) Cloning of microbial genes.

- **Tissue and tissue system :** (a) **Plant Tissues**—Meristematic and permanent (types with characterization and function). (b) **Animal Tissue**—outline classification and examples.

- **Functions of life :** Photosynthesis—Major photosynthetic pigments, outline concept of light and dark reaction phases, basic idea of bacterial photosynthesis, $C_2$, $C_3$, $C_4$ pathways, CAM (in brief), photorespiration.

Respiratory system—(a) Definition of respiration, Mechanisms of glycolysis, Krebs cycle (Flow chart only ; calculation for ATP, $CO_2$ & $H_2O$) ; Outline idea of Electron Transport system, Relationships of photosynthesis and respiration. (b) Respiratory system in human : Respiratory tract, Mechanism of breathing, Role of intercostals muscles and diaphragm ; Significance of physiological and anatomical dead space.

Tidal volume, inspiratory and expiratory reserve volumes, residual volume, vital capacity. Composition of inspired, expired and alveolar air. Common respiratory diseases - definition and causes - Asthma, Tuberculosis, Hypoxia, Anoxia, Apnoea, Dyspnoea.

- **Cardiovascular system & Blood :**

(a) **Anatomy of Heart**—junctional tissues of the heart ; origin and propagation of cardiac impulse. Histological structures of arteries, veins and capillaries. Cardiac cycle—Atrial and ventricular events only ; cardiac cycle time, Heart sound. Cardiac output—definition, Stroke and Minutes volume.

(b) **Blood pressure**—factors controlling & measurement. Blood—Composition and functions of blood. Blood coagulation and anticoagulants, Blood group and Rh factor, Blood Transfusion, Lymph and tissue fluid formation and functions, Portal circulation.

- **Nutrition and Digestive system :** Basic constituents of food and their nutritional significance. Vitamins—dietary sources, functions and deficiency symptoms of water and fat soluble vitamins. Structure and functions of the alimentary canal and the digestive glands. Functions of the digestive juices (saliva, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice), Biles. Digestion and absorption of carbohydrates, lipids and proteins. Diseases—Peptic and Gastric ulcers, Gastritis, fasting and obesity.

(c) **Metabolism :** Definition ; B. M. R.—Controlling factors ; elementary idea of metabolic pathways ; glycogenesis, glycogenolysis, gluconeogenesis, Oxidation of fatty acids, Ketone body formation and its significance. Deamination, Transamination and Decarboxylation of aminoacids (definition only).

- **Excretory system :** Histology and function of the nephron (brief idea) Normal and abnormal constituents of urine.

- **Nervous and Muscular system :** Brief outline of human brain structure.

**Cranial nerves :** Distribution and Function. Spinal cord - Structure and major functions, Reflex arc (types) and reflex action : Conditional and unconditional Reflexes.

**Autonomic :** sympathetic and parasympathetic (definition only) nervous system.

**Synapse :** Structure and mechanism of synaptic transmission.

Different types of muscles and their structure, properties of muscles—(i) Excitability (ii) Contractility (iii) All or none law (iv) Refractory period (v) Summation of stimuli (vi) Tetanus (vii) Rigor mortis ; Machanism of muscle contraction.

- **Endocrine system and animal hormones :** Definition of endocrine glands and hormones, functions of hormones released from (i) pituitary (ii) thyroid (iii) pancreas (iv) adrenal (v) gastrointestinal gland, An outline mechanism of action of protein & steroid hormones.

  Causes and symptoms of Acromegaly, Diabetis insipidus, Diabetis mellitus, Goiter, Cushing's disease.

- **Growth, Reproduction and Ageing :**

  **A. In Plants :** Different parts of a typical flower (China rose). Types of flower ; regular and irregular, actinomorphic, zygomorphic. Aestivation in Musaceae & Malvaceae. Floral formula : Definition, symbols used in floral formulae in Musaceae (e.g. Banana) and Malvaceae (e.g. China rose) ; Pollination—Definition, self and cross pollination ; Merits and demerits of self and cross pollination. Fertilization—Process of double fertilization. Dispersal of fruits and seeds—Types with examples. Phases and factors of Growth, Differences between growth and development, Abscission senescence, ageing and growth of seeding and the role of gibberellic acid.

  **B. In Animals :** Primary and secondary sex organs and secondary sex characters - Testis - Histology, Functions of Testosterone. Spermatogenesis (outline). Ovary - Histology : Functions of estrogen and progesterone; Oogenesis (outline); structure of mature Graafian follicle. Menstrual cycle (brief idea). Fertilization and Implantation.

- **Immunology :** A brief idea of antigen and antibody. Elementary knowledge of inherited, acquired, humoral, cell mediated immunity. Active and passive immunity. Prevention of AIDS and Hepatitis B.

- **Medical, Agricultural and Economic Zoology :**

  **A.** Outline idea of diseases, their causative organism, mode of infection, symptoms and preventive measures of :

  (i) Malaria

  (ii) Filariasis

  (iii) Ascariasis

  Distinguishing features of *Culex, Anopheles* and *Aedes*

  Life cycle and comparative study of *Culex* and *Anopheles.*

  Causative agents of encephalitis and kalaazar and control of their vectors.

  **B.** Characteristic features of major and minor carps and examples of exotic carps. Mechanism of induced breeding —hypophysation.

  Composite culture of carps, common diseases of carp—Gillrot, fin rot and Dropsy.

  Definition of pest, Damage symptoms and control of *Scirpophaga incertulus* and *Leptocorisa acuta.*

  **C.** Poultry - Types of poultry birds ; high yielding varieties of poultry birds. Species of honey bees in India and different castes in a colony. Composition and used of honey.

  Chemical composition of silk, types of silk and silk worms.

  Life cycles of mulberry silk worm. Structure of silk gland.

  Symptoms of Flacherie, Muscardine, Grassarie and Pebrine.

- **Application of Biology :** Pesticides and Biological Pest Control - Benefit and hazards, Basic principles of *ex situ* and *in situ* conservation. Red Data Book. Green Data Book.

  Role of phytohormones in horticulture and agriculture.

  Hybridization in plants - Definition and techniques.

  Idea about plant cell and tissue culture - Micropropagation.

  Principles and application of transgenic plants and animal. Test tube baby.

  <u>Biomedical engineering :</u>

  Application - ECG & EEG

  Imaging - USG, CT Scan, X-ray, MRI

  Therapeutic - Pacemaker, Dialyzer.

# ○ সূ ✧ চি ✧ প ✧ ত্র ○

## ❁ উদ্ভিদবিদ্যা [BOTANY] ❁

## ❁ প্রাণীবিদ্যা [ZOOLOGY] ❁

## ❂ শারীরবিদ্যা [PHYSIOLOGY] ❂

উদ্ভিদবিদ্যা
BOTANY

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# অবতরণিকা
# [ INTRODUCTION ]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় পরিবেশের চারপাশে সবসময় নানা রকম অসংখ্য উদ্ভিদ দেখা যায়। আনুমানিক হিসাবে আজ পর্যন্ত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা প্রায় 3,71,745টি উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ ও নামকরণ করতে পেরেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিজ্ঞানীরা, উদ্ভিদ জগতের বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস আরম্ভ করেন। আবার অনেকের মতে খ্রিস্টপূর্ব 3,000 শতাব্দীতে 'ঋগ্বেদ', 'অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস প্রথম আরম্ভ হয়।

যুগের প্রবাহে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্যের অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার পরিধি ও উদ্দেশ্যের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক যুকে অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস বহুদিন থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখা থেকে তথ্য নিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদ্ভিদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বংশধারা, জৈব রাসায়নিক গঠন, কোশ ও ভ্রূণ তত্ত্ব ইত্যাদি সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে প্রজাতির পরিচয় জানা ও অন্যান্য উদ্ভিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করা হল আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য।

## ➤ উদ্ভিদবিদ্যা কী ? (What is Botany ?) ঃ

'বটানি' (Botany) শব্দটি গ্রিক শব্দ, *Botane* থেকে উদ্ভব হয়েছে। *Botane* শব্দটির অর্থ উদ্ভিদ (Plant)। যে বিজ্ঞান পাঠ করলে উদ্ভিদের বিষয়ে সম্যক পরিচয় ও জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে **উদ্ভিদবিদ্যা** বা **উদ্ভিদ বিজ্ঞান** বলে।

## ➤ উদ্ভিদবিদ্যার গুরুত্ব (Importance of Botany) ঃ

পৃথিবীর প্রাণীকুল জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রধানত সবুজ উদ্ভিদকুলের উপর নির্ভরশীল, কারণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তির একাংশ মাত্র স্থৈতিক শক্তি হিসাবে সবুজ উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যে আবদ্ধ হয়; এই শক্তি পরবর্তী পর্যায়ে জীবকুলের বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ও জৈবিক কাজে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন সমতা বজায় রেখে পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখে।

জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি, যেমন—খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও আশ্রয়ের উপাদানগুলি প্রধানত উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। তা ছাড়া কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি হল ভূগর্ভে সঞ্চিত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদজাত শক্তি। সভ্যতার অন্যতম পরিপোষক কাগজও উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়।

# ▲ উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Plant kingdom)

পৃথিবীর সব রকমের উদ্ভিদকে একসঙ্গে **উদ্ভিদ জগৎ** (Plant Kingdom) বলে। আকৃতি ও গঠনগত পার্থক্য থাকায় বিজ্ঞানীরা এই উদ্ভিদ জগৎকে সঠিকভাবে জানার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এবং উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। সাধারণত উদ্ভিদ বলতে আমরা যেসব উদ্ভিদকে বুঝি তাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে এবং পরিণত অবস্থায় এরা ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে; কিন্তু এমন অসংখ্য উদ্ভিদের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে না এবং ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে না। তাই সাধারণভাবে উদ্ভিদ জগৎকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**অপুষ্পক** ও **সপুষ্পক উদ্ভিদ**।

## ➤ A. অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogams) ঃ

যেসব উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ হয় না তাদের **অপুষ্পক উদ্ভিদ** বলে। এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদদেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এদের তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

শৈবাল

অসিলেটোরিয়া ভলভক্স ক্ল্যামাইডোমোনাস স্পাইরোগাইরা

চিত্র 1 ঃ কয়েকটি সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ-শৈবাল।

**1. থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গদেহী** (Thallophyta) ঃ যেসব উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত নয়, তাদের **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ** বলা হয়। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদদেহকে **থ্যালাস** বলে। এদের দেহ চ্যাপটা এবং জননাঙ্গ এককোশি। এই শ্রেণির উদ্ভিদকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

(i) **শৈবাল বা অ্যালগি** (*Algae* একবচনে—**অ্যালগা**—*Alga*)— সাধারণভাবে এদের শ্যাওলা বা শৈবাল বলে। এই প্রকার সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের কোশে সবুজ ক্লোরোফিল থাকে। তাই এরা স্বভোজী। **উদাহরণ**—*ক্ল্যামাইডোমোনাস* (*Chlamydomonas*), *ভলভক্স* (*Volvox*), *স্পাইরোগাইরা* (*Spirogyra*) প্রভৃতি।

(ii) **ছত্রাক বা ফানজি** (***Fungi*** একবচনে—**ফান্‌গাস্‌, *Fungus***)—এই শ্রেণির সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদকে ছত্রাক বলা হয়। এরা ক্লোরোফিলবিহীন এবং পরভোজী। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মৃতজীবী এবং কয়েকটি পরজীবী। **উদাহরণ**—*মিউকর* (*Mucor*), *ঈস্ট* (*Yeast*), *পেনিসিলিয়াম* (*Penicillium*) ইত্যাদি।

চিত্র 2 ঃ কয়েকটি সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ-ছত্রাক।

## • লাইকেন (Lichen) •

একপ্রকার সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ গোষ্ঠী। যাদের দেহ একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক উভয় প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত এবং পরস্পরের সহযোগিতায় পুষ্টি লাভ করে বেঁচে থাকে। এই সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ লাইকেন নামে পরিচিত। উদাহরণ— *উসনিয়া*।

**2. ব্রায়োফাইটা বা মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ** (Bryophyta) **:** এই বিভাগের উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে সাধারণত মস জাতীয় উদ্ভিদ বলে। এরা শেওলা, ছত্রাক প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে কিছুটা উন্নত অপুষ্প উদ্ভিদ। তাছাড়া এদের জননঅঙ্গ বহুকোশী এবং ভ্রূণ গঠিত হয়। দেহে কোনো সংবহন কলা থাকে না। উদ্ভিদদেহ সমাঙ্গদেহী অথবা কাণ্ড ও পাতা নিয়ে গঠিত হয়। মূলের পরিবর্তে মূলের মতো **রাইজয়েড** (Rhizoid) থাকে। এদের ক্লোরোফিল থাকায় স্বভোজী। **উদাহরণ**—*রিকসিয়া* (*Riccia*), *ম্যরক্যানসিয়া* (*Marchantia*), *পোগোনেটাম* (*Pogonatum*) প্রভৃতি।
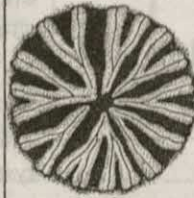
চিত্র 3 : কয়েকটি ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ।

চিত্র 4 : কয়েকটি টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ।

**3. টেরিডোফাইটা বা ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ** (Pteridophyta) **:** এই বিভাগের উদ্ভিদগোষ্ঠীকে ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ বলা হয়। উদ্ভিদদেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে, জননাঙ্গ বহুকোশী ও ভ্রূণ নিয়ে গঠিত হয়। তা ছাড়া এদের দেহে সংবহন কলা থাকে। দেহে সবুজ ক্লোরোফিল থাকার জন্য এরা স্বভোজী। **উদাহরণ**—*লাইকোপোডিয়াম* (*Lycopodium*), *সেলাজিনেলা* (*Selaginella*), *ড্রায়োপ্‌টেরিস* (*Dryopteris*) ইত্যাদি।

➤ **B. সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogams) :** যেসব উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ গঠিত হয় তাদের **সপুষ্পক উদ্ভিদ** বলে। এরা অপুষ্পক উদ্ভিদ অপেক্ষা সর্বতোভাবে উন্নত। উদ্ভিদদেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত এবং সব অঙ্গই সংবহন কলা নিয়ে গঠিত। ফলের উৎপত্তি অনুসারে সপুষ্পক উদ্ভিদকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

**1. ব্যক্তবীজী বা জিমনোস্পার্মস (Gymnosperms)**— এই উদ্ভিদগোষ্ঠী সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে অনুন্নত। এদের ফল গঠিত না হওয়ায় বীজগুলি আবৃত থাকে না। অর্থাৎ বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় স্ত্রীরেণুপত্র অর্থাৎ গর্ভপত্রের উপর অবস্থান করে। উদাহরণ— *সাইকাস* (*Cycas*), *পাইনাস* (*Pinus*), *নিটাম* (*Gnetum*) প্রভৃতি।

চিত্র 5 : ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ।

**2. গুপ্তবীজী বা অ্যান্‌জিওস্পার্মস্ (Angiosperms)**—এই প্রকার উদ্ভিদ সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের হয়। এদের ফল গঠিত হওয়ায়

বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। বীজের বীজপত্রের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

চিত্র 6 : গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।

(i) **একবীজপত্রী** (Monocotyledonous) — যেসব উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাদের একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**—ধান, গম, ভুট্টা, কলা, নারকেল প্রভৃতি।

(ii) **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledonous) — যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে তাদের **দ্বিবীজপত্রী** উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**—আম, জাম, কাঁঠাল, ছোলা, মটর প্রভৃতি।

উদ্ভিদগোষ্ঠীকে পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন এককে বিভক্ত করা হয়। উদ্ভিদজগতের বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক (Natural system) শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

## ❁ উদ্ভিদজগতের বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাস ❁

### ▲ I. ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিস্ফুরণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস (Classification according to Origin and Development) :

অনেক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিস্ফুরণের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগৎকে দুটি উপসর্গে (Sub-division) বিভক্ত করেন, যেমন— **থ্যালোফাইটা** (Thallophyta) ও **এমব্রিওফাইটা** (Embryophyta)। এই শ্রেণিবিন্যাসে অ্যালগি, ফানজাই এবং ব্যাকটেরিয়াকে থ্যালোফাইটার অন্তর্ভুক্ত করেন, কারণ এদের **ভ্রূণ** (Embryo) গঠিত হয় না। এমব্রিওফাইটা উপসর্গের সব উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হয় কিন্তু সংবহন কলা থাকে না। তাই সংবহন কলার উপর নির্ভর করে এমব্রিওফাইটাকে দুটি পর্বে (Phylum) বিভক্ত করা হয়, যেমন— **ব্রায়োফাইটা** (Bryophyta) ও **ট্রাকিওফাইটা** (Tracheophyta)। ব্রায়োফাইটা পর্বের উদ্ভিদের সংবহন কলা থাকে না। আবার ট্রাকিওফাইটা পর্বের উদ্ভিদের সংবহন কলা থাকে।

এই ট্রাকিওফাইটাকে তিনটি শ্রেণিতে (class) বিভক্ত করা হয়,

চিত্র 7 : উদ্ভিদ জগতের শ্রেণিবিন্যাসের চিত্ররূপ।

যেমন—টেরিডোফাইটা (Pteridophyta), **জিমনোস্পার্মস্** (Gymnosperms) ও **অ্যানজিওস্পার্মস্** (Angiosperms)। টেরিডোফাইটার কোনো বীজ নেই এবং অন্যান্য দুটি শ্রেণির উদ্ভিদ বীজ গঠন করে। যথারীতি **জিমনোস্পার্মস্** হল ব্যক্তবীজী এবং **অ্যানজিওস্পার্মস্** গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। অ্যানজিওস্পার্মস্‌কে আবার **একবীজপত্রী** (Monocotyledons) ও **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledons) উদ্ভিদ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়।

## ▲ II. কোশসংস্থান অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification according to Cytological Basis) :

আধুনিক বিজ্ঞানী **স্টেনিয়ার** (Stanier), **নিয়েল** (Niel, 1962) ও **রাউন্ড** (Round, 1965) প্রভৃতি কোশবিজ্ঞানীরা (Cytologists) কোশসংস্থান অনুযায়ী সব জীবদের প্রধান দুটি জগতে বিভক্ত করেন, যেমন—**প্রোটোবায়োটা** (Protobiota) বা **অকোশীয় জীব** (Acellular organisms) ও **সাইটোবায়োটা** (Cytobiota) বা **কোশীয় জীব** (Cellular organisms)।

➤ 1. **প্রোটোবায়োটা (Protobiota)** : এরা অকোশীয় জীব গোষ্ঠী। এদের দেহ সাইটোপ্লাজমবিহীন এবং কোনো নির্দিষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত নয়, যেমন— ভাইরাস (Virus)।

➤ 2. **সাইটোবায়োটা (Cytobiota)** : এসব জীব গোষ্ঠীর দেহ সাইটোপ্লাজম যুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত। আবার নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের দুটি উপজগতে বিভক্ত করা হয়, যেমন —

● (a) **উপজগৎ (Subkingdom)—প্রোক্যারিয়টা** (Prokaryota) : এই উপজগতের জীবদের দেহকোশে আদর্শ বা সংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। এদের কোশপ্রাচীরে মিউকোপেপটাইড (mucopeptide) ও মুরামিক অ্যাসিড থাকে। কোশে প্লাস্টিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবডি, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলি কোশে থাকে না। এই উপজগতকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়, যেমন —

(i) **পর্ব —1. সাইজোমাইকোফাইটা (Phylum**—Schizomycophyta) : সরলতম ও ক্ষুদ্র জীব নিয়ে এই পর্বটি গঠিত।

বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। বীজের বীজপত্রের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

চিত্র 6 ঃ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।

(i) **একবীজপত্রী** (Monocotyledonous) — যেসব উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাদের একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**—ধান, গম, ভুট্টা, কলা, নারকেল প্রভৃতি।

(ii) **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledonous) — যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে তাদের **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ**—আম, জাম, কাঁঠাল, ছোলা, মটর প্রভৃতি।

উদ্ভিদগোষ্ঠীকে পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন এককে বিভক্ত করা হয়। উদ্ভিদজগতের বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক (Natural system) শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

## ❁ উদ্ভিদজগতের বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাস ❁

### ▲ I. ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিস্ফুরণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস (Classification according to Origin and Development) ঃ

অনেক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিস্ফুরণের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগৎকে দুটি উপসর্গে (Sub-division) বিভক্ত করেন, যেমন— **থ্যালোফাইটা** (Thallophyta) ও **এমব্রিওফাইটা** (Embryophyta)। এই শ্রেণিবিন্যাসে অ্যালগি, ফানজাই এবং ব্যাকটেরিয়াকে থ্যালোফাইটার অন্তর্ভুক্ত করেন, কারণ এদের **ভ্রূণ** (Embryo) গঠিত হয় না। এমব্রিওফাইটা উপসর্গের সব উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হয় কিন্তু সংবহন কলা থাকে না। তাই সংবহন কলার উপর নির্ভর করে এমব্রিওফাইটাকে দুটি পর্বে (Phylum) বিভক্ত করা হয়, যেমন— **ব্রায়োফাইটা** (Bryophyta) ও **ট্রাকিওফাইটা** (Tracheophyta)। ব্রায়োফাইটা পর্বের উদ্ভিদের সংবহন কলা থাকে না। আবার ট্রাকিওফাইটা পর্বের উদ্ভিদের সংবহন কলা থাকে।

এই ট্রাকিওফাইটাকে তিনটি **শ্রেণিতে** (class) বিভক্ত করা হয়,

চিত্র 7 ঃ উদ্ভিদ জগতের শ্রেণিবিন্যাসের চিত্ররূপ।

যেমন—টেরিডোফাইটা (Pteridophyta), জিমনোস্পার্মস্ (Gymnosperms) ও অ্যান্‌জিওস্পার্মস্ (Angiosperms)। টেরিডোফাইটার কোনো বীজ নেই এবং অন্যান্য দুটি শ্রেণির উদ্ভিদ বীজ গঠন করে। যথারীতি জিমনোস্পার্মস্ হল ব্যক্তবীজী এবং অ্যানজিওস্পার্মস্ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। অ্যানজিওস্পার্মস্‌কে আবার একবীজপত্রী (Monocotyledons) ও দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledons) উদ্ভিদ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়।

## ▲ II. কোশসংস্থান অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification according to Cytological Basis) :

আধুনিক বিজ্ঞানী স্টেনিয়ার (Stanier), নিয়েল (Niel, 1962) ও রাউন্ড (Round, 1965) প্রভৃতি কোশবিজ্ঞানীরা (Cytologists) কোশসংস্থান অনুযায়ী সব জীবদের প্রধান দুটি জগতে বিভক্ত করেন, যেমন—প্রোটোবায়োটা (Protobiota) বা অকোশীয় জীব (Acellular organisms) ও সাইটোবায়োটা (Cytobiota) বা কোশীয় জীব (Cellular organisms)।

➤ 1. **প্রোটোবায়োটা (Protobiota)** : এরা অকোশীয় জীব গোষ্ঠী। এদের দেহ সাইটোপ্লাজমবিহীন এবং কোনো নির্দিষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত নয়, যেমন— **ভাইরাস** (Virus)।

➤ 2. **সাইটোবায়োটা (Cytobiota)** : এসব জীব গোষ্ঠীর দেহ সাইটোপ্লাজম যুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত। আবার নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের দুটি উপজগতে বিভক্ত করা হয়, যেমন —

● (a) **উপজগৎ (Subkingdom)—প্রোক্যারিয়টা** (Prokaryota) : এই উপজগতের জীবদের দেহকোশে আদর্শ বা সংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। এদের কোশপ্রাচীরে মিউকোপেপটাইড (mucopeptide) ও মুরামিক অ্যাসিড থাকে। কোশে প্লাস্টিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবডি, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলি কোশে থাকে না। এই উপজগতকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়, যেমন —

(i) **পর্ব —1. সাইজোমাইকোফাইটা (Phylum**—Schizomycophyta) : সরলতম ও ক্ষুদ্র জীব নিয়ে এই পর্বটি গঠিত।

কোশদেহে সুগঠিত প্রাচীর দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস ও কোশস্থ অঙ্গাণু থাকে না বলে প্রোক্যারিওটিক প্রকৃতির হয়। **উদাহরণ**—ব্যাকটেরিয়া।

(ii) **পর্ব**—2. **সায়ানোফাইটা (Phylum**—Cyanophyta) ঃ প্রাচীন ও আদিম শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এই পর্ব গঠিত। কোশদেহের গঠন সরল প্রকৃতির এবং প্রোক্যারিওটিক। কোশের মধ্যভাগে নিউক্লীয় পদার্থ অর্থাৎ DNA ও RNA সমন্বিত ক্রোমেটিন দানা থাকে। **উদাহরণ**—*গ্লিওক্যাপসা* (*Gloeocapsa*), *অসিলেটোরিয়া* (*Oscillatoria*), *নস্টক* (*Nostoc*) প্রভৃতি নীলাভ সবুজ শৈবাল।

(b) **উপজগৎ (Subkingdom)—ইউক্যারিওটা** (Eukaryota) ঃ এই উপজগতের জীব গোষ্ঠীর কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত এবং কোশে আদর্শ বা সংগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। তা ছাড়া প্লাস্টিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবডি, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলি কোশে থাকে। এই উপজগতে শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, জিমনোস্পার্ম, অ্যান্‌জিওস্পার্ম ও প্রাণীদের একসঙ্গে রাখা হয়েছে।

## ▲ III. পুষ্টির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plant kingdom on the basis of Nutrition) ঃ

পুষ্টির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদজগৎকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—**স্বভোজী** (Autophytes) এবং **পরভোজী** (Heterophytes) উদ্ভিদ। স্বভোজী উদ্ভিদগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের খাদ্যসংশ্লেষ করে পুষ্টিলাভ করে। উদাহরণ—শৈবাল, মস্, ফার্ন, আম, জাম, কাঁঠাল, ধান, গম প্রভৃতি। পরভোজী উদ্ভিদ গোষ্ঠী নিজেদের খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে না এবং পুষ্টির জন্য অন্য কোনো জীবের উপর অথবা মৃত জৈব বস্তুর উপর নির্ভর করে। পরভোজী পুষ্টিকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—**মৃতজীবী, পরজীবী, মিথোজীবী, পতঙ্গভুক** উদ্ভিদ।
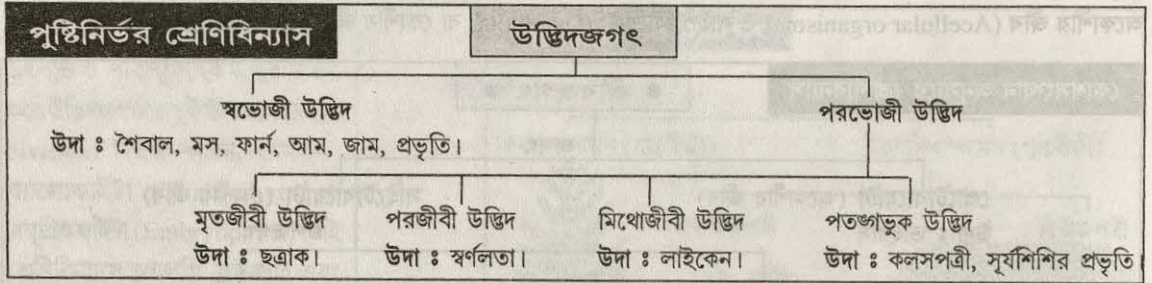
(i) **মৃতজীবী উদ্ভিদ** (Saprophytic plants)—এই জাতীয় উদ্ভিদ কোনো মৃত উদ্ভিদদেহ বা প্রাণীদেহ অথবা অন্য কোনো জৈব বস্তুর উপর জন্মায় এবং ওইসব বস্তু থেকে পুষ্টিরস সংগ্রহ করে পুষ্টি লাভ করে। **উদাহরণ**—ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রধানত পূর্ণ মৃতজীবী, গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে মনোট্রোপা (*Monotropa*) এবং নিওটিয়া (*Neottia*), এপিপোগোন (*Epipogon*) প্রভৃতি অর্কিড মৃতজীবী।

(ii) **পরজীবী উদ্ভিদ** (Parasitic plants)—যে সব উদ্ভিদ অন্য কোনো পোষক উদ্ভিদের উপর জন্মায় এবং সেখান থেকে পুষ্টিরস সংগ্রহ করে পুষ্টিলাভ করে। **উদাহরণ**—স্বর্ণলতা, র‍্যাফ্লেশিয়া প্রভৃতি।

(iii) **মিথোজীবী উদ্ভিদ** (Symbiotic plants)—অনেক সময় দুটি ভিন্ন উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য পরস্পরের সাহচর্যে বেঁচে থাকে। এদের মিথোজীবী উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**—লাইকেন (ছত্রাক ও শৈবালের সাহচর্যে বেঁচে থাকে।) লাইকেনের ক্ষেত্রে শৈবাল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে ছত্রাককে দেয় এবং ছত্রাক এর পরিবর্তে পরিবেশ থেকে জল ও অজৈব উপাদান শৈবালকে সরবরাহ করে। শিম্বক জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে (Root nodules) বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া (Rhizobium) এবং ওই উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(iv) **পতঙ্গভুক উদ্ভিদ** (Insectivorous plants)—এই উদ্ভিদ গোষ্ঠী সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে, কিন্তু প্রোটিন খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে না বলে পতঙ্গ শিকার করে পতঙ্গের দেহ থেকে তরল প্রোটিন শোষণ করে পুষ্টিলাভ করে। **উদাহরণ**—সূর্যশিশির, জলঝাঁঝি, কলসপত্রী প্রভৃতি উদ্ভিদ।

## ▲ IV. জীবজগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস (Modern Classification of Living organism) ঃ

আধুনিক দুটি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল—

1. **হোয়াইটেকার** (R. H. Whittaker, 1969) জীবজগতকে মোট পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত করেন, যেমন—**মোনেরা** (Monera), **প্রটিষ্টা** (Protista), **মাইসেটি** (Mycetae), **প্ল্যানটি** (Plantae) এবং **অ্যানিমিলিয়া** (Animilia)। পঞ্চরাজ্যরীতি অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া এবং সাইনোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) মোনেরা রাজ্যভুক্ত করা হয়েছে, কারণ এরা প্রোক্যারিয়ট। প্রটিষ্টা রাজ্যে এককোশী ইউক্যারিয়টদের রাখা হয়েছে, যেমন—প্রোটোজোয়া ও এককোশী শৈবাল। মাইসেটি রাজ্যে অসবুজ ছত্রাক নিয়ে গঠিত। অবশিষ্ট দুটি রাজ্য প্ল্যানটি ও অ্যানিমেলিয়াতে যথাক্রমে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের রাখা হয়েছে। ভাইরাসের জড় এবং সজীব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য এই পঞ্চরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আজকাল পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হোয়াইটেকারের শ্রেণিবিন্যাসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
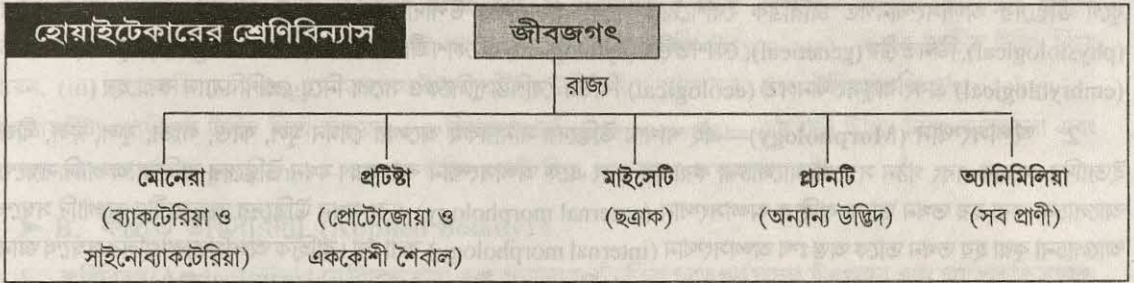
2. **স্টেনিয়ার** এবং **ভ্যান নিয়েল** (Stainer and Van Niel, 1962) এবং **রাউন্ড** (Round, 1965) জীবকে কোশসংস্থান অনুযায়ী দুটি জগতে বিভক্ত করেন— (i) **জগৎ-I ঃ অকোশীয় জীব বা প্রোটোবায়োটা** (Acellular organism or Protobiota)—এসব জীবদের দেহ কোনো সুনির্দিষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত হয় না। উদাহরণ—**ভাইরাস** (Virus)।
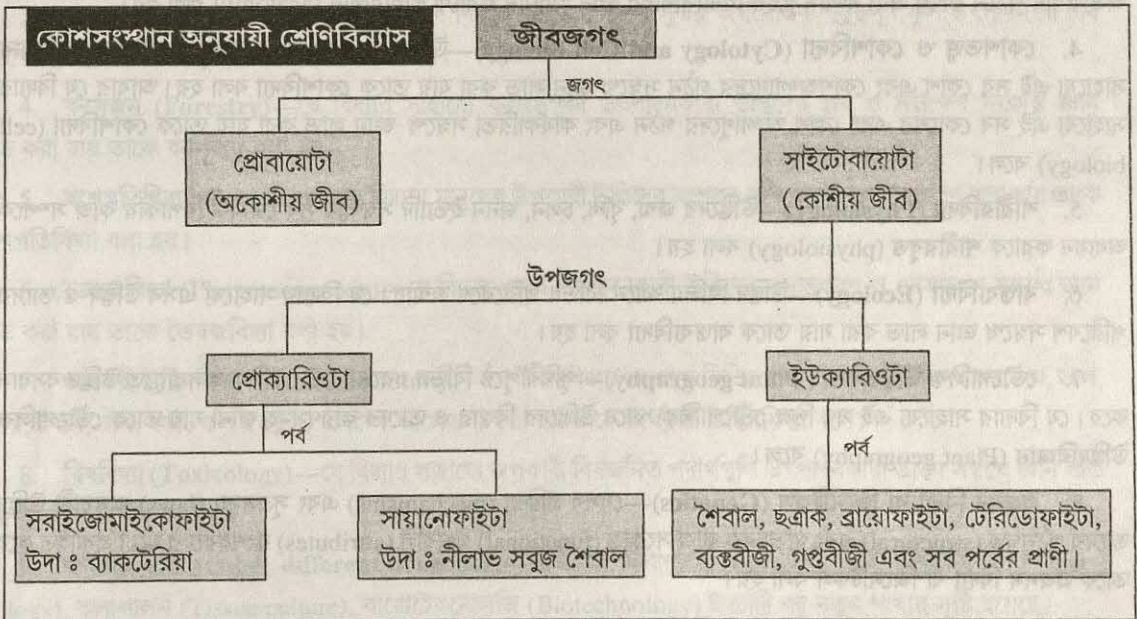
## ▲ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Branches of Botanical science) :

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত সব রকম তথ্য আলোচনা বা পরীক্ষানিরীক্ষা করে বিশ্লেষণ করা হল **উদ্ভিদবিদ্যা বা উদ্ভিদ বিজ্ঞান**। অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখার মতো উদ্ভিদ বিজ্ঞানকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**বিশুদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যা** (Pure Botany) এবং **ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা** (Applied Botany)।

### ➤ A. বিশুদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যা (Pure Botany) :

উদ্ভিদ সংক্রান্ত সব তথ্য ও তত্ত্ব এই বিভাগের অন্তর্গত। উদ্ভিদের নাম, শ্রেণিবিন্যাস, আকৃতি, বাসস্থান, জীবনচক্র ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য বিশুদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োজন। এই শাখাকে আবার নিম্নলিখিত অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত করা যায়, যেমন—

1. **উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস বিধি (Plant taxonomy)**—এই বিভাগটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের সবচেয়ে পুরানো। এই শাখা অধ্যয়ন করলে সনাক্তকরণ (identification), নামকরণ (nomenclature) এবং শ্রেণিবিন্যাস (classification) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। বহু আগে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে করা হত। আধুনিক যুগে উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রাসায়নিক উপাদান (chemical constituents), শারীরবৃত্তীয় (physiological), জিনতত্ত্বীয় (genetical), কোশতত্ত্বীয় (cytological) বা কোশ জীববিদ্যাগত (cell biological), ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যাগত (embryological) এবং বাস্তুসংস্থানগত (ecological) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

2. **অঙ্গসংস্থান (Morphology)**—এই শাখায় উদ্ভিদের নানারকম অঙ্গের যেমন মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদির আকার এবং গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং একে **অঙ্গসংস্থান** বলা হয়। যখন উদ্ভিদের বাহ্যিক অঙ্গাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তখন তাকে বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান (external morphology) এবং যখন উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তখন তাকে অন্তঃস্থ অঙ্গসংস্থান (internal morphology) বলা হয়। বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে সাধারণত কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অংশগুলিকে জানার জন্য অণুবীক্ষণ (microscope) যন্ত্রের প্রয়োজন।

3. **কলাতত্ত্ব ও শারীরস্থান (Histology and Anatomy)**—উদ্ভিদের যে-কোনো অঙ্গের গঠনকারী কলা (tissue) ও কোশগুচ্ছের (group of cells) সম্বন্ধে অধ্যয়ন করাকে **কলাস্থান** (histology) বলে। আবার উদ্ভিদদেহের যে-কোনো অঙ্গের অভ্যন্তরীণ গঠনে কোশ এবং কলাসমূহের বিন্যাসবিধির জ্ঞান অধ্যয়ন করাকে শারীরস্থান (anatomy) বলা হয়।

4. **কোশতত্ত্ব ও কোশবিদ্যা (Cytology and Cell Biology)**—উদ্ভিদদেহ অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত। যে বিদ্যার সাহায্যে এই সব কোশ এবং কোশঅঙ্গাণুদের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে **কোশবিদ্যা** বলা হয়। আবার যে বিদ্যার সাহায্যে এই সব কোশের এবং কোশ অঙ্গাণুদের গঠন এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে **কোশবিদ্যা** (cell biology) বলে।

5. **শারীরবিদ্যা (Physiology)**—উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, চলন, জনন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সব জৈবিক বিপাকীয় কাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন করাকে **শারীরবৃত্ত** (physiology) বলা হয়।

6. **বাস্তব্যবিদ্যা (Ecology)**—উদ্ভিদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশে জন্মায়। যে বিদ্যার সাহায্যে এসব উদ্ভিদ ও তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে **বাস্তব্যবিদ্যা** বলা হয়।

7. **ভৌগোলিক উদ্ভিদবিদ্যা ( Plant geography)**—পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক জলবায়ুতে উদ্ভিদ বসবাস করে। যে বিদ্যার সাহায্যে এই সব ভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে উদ্ভিদের বিস্তার ও তাদের কারণসমূহ জানা যায় তাকে **ভৌগোলিক উদ্ভিদবিজ্ঞান** (Plant geography) বলে।

8. **প্রজনন বিদ্যা বা জিনেটিকস (Genetics)**—যেসব প্রক্রিয়া (mechanisms) এবং সূত্রসমূহ (laws) অনুযায়ী উদ্ভিদ তাদের গঠনগত (structural) এবং স্বাভাবিক কাজ সংক্রান্ত (functional) গুণাবলি (attributes) বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত করে তাকে **প্রজনন বিদ্যা বা জিনেটিকস** বলা হয়।

9. **প্রত্নোদ্ভিদবিদ্যা বা প্যালিওবোটানি (Palaeobotany)** ঃ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির তলায় থেকে যেসব উদ্ভিদ এখন জীবাশ্মে (fossil) পরিণত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে যে বিদ্যার সাহায্যে জ্ঞান লাভকরা যায় তাকে **প্রত্নোদ্ভিদবিদ্যা বা প্যালিওবোটানি** বলে।

10. **জৈব অভিব্যক্তি (Organic Evolution)**—বর্তমানে আমরা যেসব উদ্ভিদ দেখতে পাই, এরা কিন্তু চিরকালই এমন ছিল না। মন্থর এবং সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী এদের পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সব বিষয়ে নানা রকম তত্ত্ব (theory) এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি (evidence) দিয়ে আলোচনা করেছেন। একে **জৈব অভিব্যক্তি** (organic evolution) বলা হয়।

11. **রোগবিদ্যা (Pathology)**—যে বিদ্যার সাহায্যে উপকারী ফসলের এবং বনজ সম্পদ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের নানা রকম রোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে রোগবিদ্যা বলে।

12. **রেণুবিদ্যা (Palynology)**—যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে উদ্ভিদের নানা রকম রেণু সম্পর্কে তথ্য এবং তাদের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে জানা যায় তাকে রেণুবিদ্যা বলে।

13. **উদ্ভিদবিদ্যার অন্যান্য শাখা (Other branches of Botany)**—উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি হল—(i) **ফাইকোলজি** (Phycology)— শৈবাল সংক্রান্ত আলোচনা, (ii) **মাইকোলজি** (Mycology)—ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যয়ন, (iii) **ব্রায়োলজি** (Bryology)—ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা, (iv) **টেরিডোলজি** (Pteridology)—টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যয়ন, (v) **জিমনোস্পার্ম** (Gymnosperm)—ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা এবং (vi) **অ্যানজিওস্পার্ম** (Angiosperm)—সপুষ্পক উদ্ভিদ গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা ও অধ্যয়ন করা।

## ➤ B. ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা (Applied Botany) ঃ

1. **কৃষিবিদ্যা (Agriculture)** ঃ যে বিদ্যায় খাদ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল উৎপাদন এবং চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে **কৃষিবিদ্যা** বলা হয়।

2. **উদ্যানবিদ্যা (Horticulture)**—যে বিদ্যা নানারকম পরিবেশের উপযোগী বাগান নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং বাগানের ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে জানা যায় তাকে **উদ্যানবিদ্যা** (Horticulture) বলে।

3. **পুষ্পোৎপাদনবিদ্যা (Floriculture)**—যে বিদ্যায় উদ্ভিদের সুন্দর সুন্দর অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ফুল উৎপাদন বা চাষ সম্বন্ধে জানা যায় তাকে **পুষ্পোৎপাদনবিদ্যা** বলা হয়।

4. **বনসৃজন (Forestry)**—যে বিদ্যার সাহায্যে বনজসম্পদ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চাষ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে **বনসৃজন** বলা হয়।

5. **বংশগতিবিদ্যা (Genetics)**—যে বিদ্যায় মানুষের উপকারী উদ্ভিদের বংশধর বৃদ্ধি করার জ্ঞান আহরণ করা যায় তাকে **বংশগতিবিদ্যা** বলা হয়।

6. **ভেষজবিদ্যা (Pharmacognosy)**—যে বিদ্যায় ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সনাক্তকরণ ও ভেষজগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে ভেষজবিদ্যা বলা হয়।

7. **অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা (Economic botany)**—যে উদ্ভিদবিজ্ঞানের শাখা বিভিন্ন প্রকার অর্থকরী উদ্ভিদ (ধান, গম, ডাল, তুলো, রবার, বাঁশ, কাঠ, ফল ইত্যাদি) প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় তাকে **অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা** বলে।

8. **বিষবিদ্যা (Toxicology)**—যে বিদ্যার সাহায্যে অপকারী বিষজনিত পদার্থগুলি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে **বিষবিদ্যা** বলে।

9. **অন্যান্য শাখা (Other different branches)**—আজকাল জীবাণুতত্ত্ব (Bacteriology), অণুজীববিদ্যা (Microbiology), কলাপালন (Tissue culture), বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) ইত্যাদি বহু নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

• অধ্যায়ের বিষয়সূচি :

**•• ভাইরাস ••**



**•• ব্যাকটেরিয়া ••**



# ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
# [ VIRUS AND BACTERIA ]

## ভূমিকা (Introduction) :

• **ভাইরাস :** 'ভাইরাস' ল্যাটিন শব্দটির প্রকৃত অর্থ বিষ। এরা অকোশীয় এবং জীবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। ভাইরাসকে পূর্ণাঙ্গ জীব বলতেও দ্বিধা হয়, কারণ এদের জড় পদার্থের ন্যায় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাই এরা প্রকৃত জীবও নয়, জড়ও নয়। প্রকৃতপক্ষে ভাইরাস কোশ দিয়ে গঠিত নয়, কারণ এদের সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস কিছুই নেই। জীবের মতো শ্বসন ও পরিপাক প্রক্রিয়া নেই, কিন্তু সজীব বস্তুর মতো নিউক্লিয়াসের উপাদানে গঠিত এবং প্রজনন ক্ষমতা আছে। এরা প্রকৃতই রোগ সৃষ্টিকারী **জৈব অণু** / ভাইরাস ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকেও ক্ষুদ্র বলে এদের ম্যাক্রোফিল্টারেশন পদ্ধতিতেও পৃথক করা যায় না।

• **ব্যাকটেরিয়া :** ব্যাকটেরিয়া হল একপ্রকার আণুবীক্ষণিক, এককোশী কোশপ্রাচীর যুক্ত জীবাণু। এরা মাইক্রোব বা জার্ম নামে পরিচিত। ব্যাকটেরিয়া জীবদের মধ্যে সরলতর এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় বৈশিষ্ট্য বহন করে। বিজ্ঞানীরা এদের প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র জীবাণুগোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্যগুলি বেশির ভাগই উদ্ভিদ গোষ্ঠীর অনুগামী। এরা প্রধানত পরজীবী। এদের প্রকৃত নিউক্লিয়াস নেই। আধুনিক বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটিস্টা (Protista) নামে একটি পৃথক জগতের জীব বলে গণ্য করেন। এককোশী ছত্রাক ইষ্ট (Yeast) এবং আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়ার সঙ্গে মিল থাকায় ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটিস্টা বলে। পৃথিবীর প্রায় সব রকম পরিবেশে এদের পাওয়া যায়।

# ○ ভাইরাস (VIRUS) ○

## ○ আবিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Discovery and short History) :

1. **বিজ্ঞানী ক্যারোলাস ক্লুসিয়াস** (Carolus Clausius, 1576)— প্রথমে টিউলিপ ফুলের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু যে ভাইরাস তা ধারণা করেন।
2. **জীবাণু বিজ্ঞানী ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার** (Dr. Edward Jenner, 1796)— ভাইরাস জনিত বসন্ত রোগের কারণ সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।
3. **জীবাণু বিশারদ লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur, 1880) ও **রবার্ট কক্** (Robert Kock, 1876)—এরা জানতে পারেন যে, কতকগুলি রোগ, যেমন — হাম, বসন্ত, মামস্, জলাতঙ্ক প্রভৃতি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ব্যাকটেরিয়া নয়।
4. **উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এডলফ্ মেয়ার** (Adolf Mayer, 1886)— তামাক পাতার মোজেইক রোগ বর্ণনা করেন। তিনি দেখলেন যে, রোগাক্রান্ত পাতার রস নীরোগ উদ্ভিদে লাগালেই উদ্ভিদটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।
5. **রুশ জীবাণুবিদ দিমিত্রি আইভেনভস্কি** (Dmitri Iwanowski, 1892)— মোজেইক আক্রান্ত তামাক পাতার রস পরিস্রুত করে দেখলেন যে পরিস্রুত এই রসই রোগ সংক্রমণ করছে এবং বুঝতে পারলেন যে সংক্রমিত জীবাণু ব্যাকটেরিয়া নয় এবং এই জীবাণু অতি সূক্ষ্ম কোনো বস্তু বিশেষ।
6. **ডাচ বিজ্ঞানী মারিটিনাস উইলেম বাইজারিঙ্ক** (Maritinus Willem Beijerinck, 1896)— একই ভাবে পরীক্ষা করে এই সংক্রামক তরল পদার্থকে ভাইরাস বলে অভিহিত করেন।
7. **বুইস্ট** (Buist, 1887), **গুয়ারনিয়েরি** (Guarnieri, 1892) এবং **পাশ্চেন** (Paschen, **1906**)— আলাদাভাবে বসন্তের গুটি সংলগ্ন কোশ থেকে বসন্ত রোগের জীবাণু ভাইরাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
8. **নেগ্রী** (Negri, 1903) ও **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** (Karl Landsteiner, 1909)—জলাতঙ্ক ও পোলিও রোগের জীবাণু ভাইরাস বলে অনুমান করেছিলেন।
9. **এফ. ডব্লু. টুর্ট** (F. W. Twort, 1915)— প্রথম পরিস্রাব্য ভাইরাস দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কথা জানান এবং **ডি হেরেলী** (De Herelle, 1916) ওই সব ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে **ব্যাকটেরিওফাজ** (Bacteriophage) নাম দেন।
10. **ডব্লু. এন. টাকাহাসি** (W. N. Takahashi, 1933) এবং **টি. ই. র‍্যালিন্স** (T. E. Rawlins)— তামাক পাতার মোজেইক রোগের ভাইরাসের আকৃতি সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হন।
11. **মার্কিন জীবাণুবিদ ডব্লু. এম. স্ট্যানলী** (W. M. Stanley, 1935)— সর্বপ্রথম টোবাকো মোজেইক ভাইরাসকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং পরিস্রুত করে কেলাসিত (Crystalised) করেন।
12. **এন. ডব্লু. পেরী** (N. W. Pirie), **এফ. সি. বডেন** (F. C. Bawden, 1936) ও তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ—এরা প্রমাণ করেন টোবাকো মোজেইক ভাইরাস (TMV) নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন নিয়ে গঠিত।
13. **এম. ডেলব্রুক** (M. Delbruk, 1939)— ধারণা করেছিলেন ভাইরাস প্রকরণ (Variety) তৈরি পরিব্যক্তির ফলে ঘটে।
14. **সোফারম্যান ও মরিস** (Sofferman and Marris, 1951)— সাইনোফাজ আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন।
15. **লিন্ডম্যান** (Lindmann, 1957)—পোলিওর টিকা আবিষ্কার করেছিলেন।
16. **ব্রেনার** (Brenner, 1959)—$T_2$ ভাইরাসের গঠন আবিষ্কার করেন।
17. **ডাইনার ও রেমার** (Diener and Raymer, 1967)—ভাইরয়েড আবিষ্কার করেন।
18. **গটলিব** (Gottlieb, 1981)—AIDS ভাইরাস (HIV) আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন।

## ❂ 1.1. ভাইরাসের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য ❂ (Definition and Characteristics of Virus)

❖ (a) **ভাইরাসের সংজ্ঞা (Definition of Virus) ঃ** ভাইরাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, যেমন—

1. **অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার কোশবিহীন রোগসৃষ্টিকারী পূর্ণপরজীবী জৈব অণু যারা শুধুমাত্র সজীব পোষক জীবকোশে প্রজনন ক্ষমতা পেয়ে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম ও পোষক কোশের বাইরে জড় বস্তুর মতো অবস্থান করে তাদের ভাইরাস বলে।**

2. **অন্তত পক্ষে 200 mμ (মিলিমাইক্রন)-এর কম আয়তন বিশিষ্ট নির্দিষ্ট পোষক কোশে পূর্ণ পরজীবী হিসাবে বসবাসকারী রোগ জীবাণুই ভাইরাস।**

3. **প্রোটিন খোলক ও DNA বা RNA দিয়ে গঠিত সূক্ষ্ম রোগসৃষ্টিকারী পূর্ণপরজীবী অকোশীয় জীব যারা শুধুই পোষক জীব কোশে বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম কিন্তু কোশের বাইরে জড়ের মতো আচরণ করে তাদের ভাইরাস বলা হয়।**

➤ (b) **ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Salient Features of Virus) ঃ**

(i) ভাইরাস জড় ও জীবের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক বিশেষ ধরনের বস্তু।

(ii) ভাইরাসের দেহে সাইটোপ্লাজম, কোশ প্রাচীর বা কোশপর্দা নেই বলে অকোশীয়। তাছাড়া এরা রোগসৃষ্টিকারী ও পরজীবী।

(iii) ভাইরাস দেহ নিউক্লীয় প্রোটিন দিয়ে গঠিত। দেহে DNA বা RNA যে-কোনো এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

(iv) এদের জীবনচক্রে অন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় দশা নামে দুটি দশা দেখা যায়। বহিঃকোশীয় দশায় ভাইরাস জড়ের মতো আচরণ করে এবং অন্তঃকোশীয় দশায় অর্থাৎ পোষক-দেহে এরা সজীব পদার্থের মতো থাকে এবং পোষকের উৎসেচক ও অন্য বস্তুর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে।

(v) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না।

(vi) যে সব ব্যাকটেরিয়া মাইক্রো-পরিস্রুত (Microfilter) ছিদ্রের (সূক্ষ্ম ছিদ্রের) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না, ভাইরাস সেই ছিদ্র সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

(vii) ভাইরাস উচ্চ আণবিক ভরসম্পন্ন এবং এদের অভিযোজন ও প্রকরণ (Variation) ক্ষমতা অসাধারণ।

(viii) ভাইরাস দেহে কোনো বিপাকীয় কাজ দেখা যায় না।

(ix) ভাইরাসের উপর সূর্যালোকের কোনো প্রভাব নেই।

(x) এই ক্ষুদ্র কণা উদ্ভিদ, প্রাণী ও ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করতে সক্ষম।

(xi) বীজঘ্ন (Antibiotics) এদের ধ্বংস করতে পারে না।

(xii) ভাইরাস পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী।

➤ (c) **ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্য (Non Living Characters of Virus) ঃ** ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) দেহে কোনো সাইটোপ্লাজম, কোশপ্রাচীর বা কোশপর্দা নেই।

(ii) রাসায়নিক বস্তুর মতো কেলাসিত করা যায়।

(iii) চলন, শ্বসন, বিপাক রেচন ইত্যাদি প্রক্রিয়া নেই।

(iv) পোষক-দেহের বাইরে জড় পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয়ভাবে বহুদিন থাকতে পারে।

(v) পরিবেশের পরিবর্তনে বা বাইরের কোনো উদ্দীপকে সাড়া দেয় না।

(vi) জননের সময় এদের বৃদ্ধি ও দ্বি-বিভাজন হয় না।

(vii) কৃত্রিম অনুশীলন পাত্রেও এদের বৃদ্ধি ঘটে না।

(viii) স্বেচ্ছায় চলনশক্তি নেই এবং স্থান পরিবর্তনে অক্ষম।

➤ (d) **ভাইরাসের সজীব বৈশিষ্ট্য (Living Characters of Virus) ঃ** ভাইরাসের সজীব বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) দেহ সজীব বস্তুর মতো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) দিয়ে গঠিত।

(ii) সজীব পোষক কোশে বংশ বিস্তার করতে পারে।
(iii) উত্তেজনায় সাড়া দেয়।
(iv) দেহে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ঘটে।
(v) সম্পূর্ণ পরজীবী ও সংক্রমণযোগ্য।
(vi) লাইসোজাইম জাতীয় উৎসেচক নিঃসৃত করে, যা উচ্চ শ্রেণির প্রাণীদেহে দেখা যায়।

**◘ ভাইরাসকে অকোশীয় বলার কারণ (Reasons for considering Virus Acellular) :**

ভাইরাস স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে পারে না এবং এদের কোনো বৃদ্ধি নেই। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের এবং সাইটোপ্লাজম, কোশপ্রাচীর বা কোশপর্দা নেই। তাছাড়া কোশস্থ অঙ্গাণু ও উৎসেচক দেখা যায় না এবং বিপাকীয় কাজও নেই। এই সব কারণের জন্য ভাইরাসকে **অকোশীয়** বলা হয়।

**◘ ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বস্তু বলার কারণ (Reasons for considering Virus as Intermediate between living and Non living) :**

ভাইরাসের জীবনচক্রে অন্তঃকোশীয় (intracellular) ও বহিঃকোশীয় (extracellular) দশা নামে দুটি দশা দেখা যায়। অন্তঃকোশীয় দশায় অর্থাৎ পোষক-দেহে এরা সজীব পদার্থের মতো থাকে এবং উৎসেচক ও অন্য বস্তুর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। বহিঃকোশীয় দশায় ভাইরাস জড়ের মতো আচরণ করে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বস্তু বলা হয়।

## ◎ 1.2. ভাইরাসের উৎপত্তি (Origin of Virus) ◎

ভাইরাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ো জটিল। তবে অন্যান্য জীবের মতো মুখ্য উপাদান নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে ভাইরাস গঠিত বলে ধারণা করা হয় জৈব অভিব্যক্তির নির্দিষ্ট পথেই এদের উৎপত্তি ঘটেছে। ভাইরাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদগুলি নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

(i) **পরজীবী মতবাদ**—ভাইরাস এক সময়ে কোশযুক্ত জীব ছিল, কিন্তু নিছক পরজীবীতার জন্য তাদের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত আকৃতি লাভ করে।

(ii) **অকোশীয় মতবাদ**—সজীব কোশের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন কোনো পথে ভাইরাস অকোশীয় কোনো বস্তু থেকে তৈরি হয়েছে।

(iii) **প্রজনন বস্তু মতবাদ**—ভাইরাস কোশের প্রজনন বস্তুর (Genetic material) খণ্ডাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভাজন ক্ষমতা লাভ করে। তাদের দ্রুত বিভাজনের ফলে কোশ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে। এর ফলে ভাইরাস কোশের বাইরে চলে আসে।

আধুনিক জীব বিজ্ঞানীরা মনে করেন রাসায়নিক বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে নিউক্লীয় প্রোটিন থেকে উৎপত্তি ঘটে **প্রোটোভাইরাস** এবং তার থেকে তৈরি হয় ভাইরাস।

নিউক্লীয় প্রোটিন ⟶ প্রোটোভাইরাস ⟶ ভাইরাস।

## ◎ 1.3. ভাইরাসের অবস্থিতি, আয়তন ও আকৃতি ◎ (Occurrence, Size and Shape of Virus)

➤ (a) **ভাইরাসের অবস্থান (Occurrence of Virus) :** এই প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি মাটি, জল, বাতাস সর্বত্রই বিরাজ করে। মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জীবের প্রধানত পৌষ্টিকনালিতে এরা বসবাস করে রোগসৃষ্টি করে। নানাপ্রকার খাদ্য ও পানীয়, যেমন — দুধ, ফল, বিভিন্ন শাকসবজিতেও এরা থাকে। ভাইরাস রোগাক্রান্ত জীবের মল, মূত্র, থুতু প্রভৃতিতেও থাকে।

➤ (b) **ভাইরাসের আয়তন (Size of Virus) :** ভাইরাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও আলট্রা আণুবীক্ষণিক জীব। উচ্চ বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও এদের ভালোভাবে দেখা যায় না। শুধুমাত্র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আয়তন ও

আকৃতি জানা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাসের গড় ব্যাস 10–30 মিলিমাইক্রন (m$\mu$) বা ন্যানোমিটার (nm)। প্রধানত গবাদি পশুর মুখগহ্বর ও পায়ের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস **ক্ষুদ্রতম (রাইনোভাইরাস)**। এদের আয়তন 10 ন্যানোমিটার (nm)। সবচেয়ে বড়ো ভাইরাস হল **আলুর X রোগের ভাইরাস**। এদের আয়তন 500 nm × 10 nm। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের আয়তন হল—**বসন্ত ভাইরাস** (300–400 nm), **হার্পিস ভাইরাস** (133–233 nm), **জলাতঙ্ক ভাইরাস** (125 nm), **ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস** (80–100 nm), **পোলিও ভাইরাস** (28–30 nm) ইত্যাদি।

চিত্র 1.1 ঃ ভাইরাসের বিভিন্ন আকৃতি ও গঠন বিন্যাস।

➤ **(c) ভাইরাসের আকৃতি (Shape of Virus)** ঃ আকৃতি অনুসারে ভাইরাসকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) **গোলাকার** (Spherical)—এই ভাইরাসগুলি অনেকটা গোলাকার এবং খুবই ক্ষুদ্র। এদের ব্যাস 12-15 ন্যানোমিটার (nm)। উদাহরণ—পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস।

(ii) **দণ্ডাকার** (Rod Shaped)—এদের আকৃতি দণ্ডের মতো। এই ভাইরাস লম্বায় প্রায় 300 nm এবং চওড়ায় 15 nm। উদাহরণ—**তামাক পাতার মোজেইক ভাইরাস ও আলুর ব্লাইট রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস**।

(iii) **ডিম্বাকার** (Ovoid)—কতকগুলি ভাইরাস দেখতে ডিম্বাকার। উদাহরণ—**মাম্পস সৃষ্টিকারী ভাইরাস**।

(iv) **ঘনক্ষেত্রাকার** (Cuboidal)—এই ভাইরাসগুলি দেখতে ঘনকের মতো। এদের আয়তন 200-300 nm। উদাহরণ—**হারপিস, ক্যানারীপক্স ও বসন্ত রোগের ভাইরাস (ভ্যাকসিনিয়া ও ভ্যারিওলা)** প্রভৃতি।

(v) **শুক্রাণু বা ব্যাঙাচি আকার** (Spermatozoa shaped or larva shaped)—এই ভাইরাসগুলি দেহ, মস্তক ও লেজে বিভক্ত। দেখতে অনেকটা শুক্রাণু বা ব্যাঙাচির মতো। উদাহরণ—**ব্যাকটেরিওফাজ**।

1. সবচেয়ে ছোটো ভাইরাস—**Rinovirus** (10 nm)
2. সবচেয়ে বড়ো ভাইরাস—**Potato X Virus** (500 nm × 10 nm)

## ✪ 1.4. ভাইরাসের গঠন (Structure of Virus) ✪

প্রত্যেকটি ভাইরাস কণাকে **ভিরিয়ন** (Virion) বলা হয়। ভাইরাসের দেহে প্রধানত দুটি অংশ থাকে। দেহের বাইরের আবরণকে **ক্যাপসিড** (Capsid) এবং দেহের ভেতরের অংশকে **নিউক্লিওয়েড** (Nucleoid) বা **ভাইরাস জিনোম** (Virus genome) বলে।

● 1. **ক্যাপসিড**—ভাইরাসের দেহের বাইরের প্রোটিন আবরণীকে ক্যাপসিড বলে।

এই প্রোটিন আবরণী এক ধরনের অসংখ্য **ক্যাপসোমিয়ার** নামে প্রোটিন উপ-একক (Protein sub-unit) দিয়ে গঠিত

হয়। কোনো কোনো ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাইরের দিকে এক প্রকার বিশেষ **মোড়ক** (Envelop) বা আবরণ থাকে। এর একককে **পেলপোমিয়ার** (Pelpomere) বলে। এই প্রকার ভাইরাসকে **লিপোভাইরাস** বলে।

মোড়কটি ভাইরাসের প্রোটিন ও পোষক কোশের লিপিড নিয়ে গঠিত হয়। ভাইরাসের আবরণ প্রোটিন দিয়ে গঠিত হলেও বিভিন্ন ভাইরাসে প্রোটিন ছাড়া কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, বায়োটিন, রিবো ফ্লাভিন, কপার প্রভৃতি থাকে। ক্যাপসিডে নানাপ্রকার উৎসেচক, যেমন—RNA ও DNA– পলিমারেজ (উদ্ভিদ ও প্রাণী ভাইরাসে), লাইসোজাইম (ব্যাকটেরিওফাজে), নিউরামিনিডেজ (ইনফুয়েঞ্জা ভাইরাসে) প্রভৃতি থাকে।

**ক্যাপসিডের কাজ** : (i) ভাইরাস জিনোমকে রক্ষা করা। (ii) বংশ বিস্তারের সময় ক্যাপসিড অংশ পোষক দেহের বাইরে পরিত্যাগ করে। (iii) উপযুক্ত উৎসেচকযুক্ত হওয়াতে পোষক কোশে নিউক্লিক অ্যাসিড অনুপ্রবেশে সাহায্য করতে পারে।
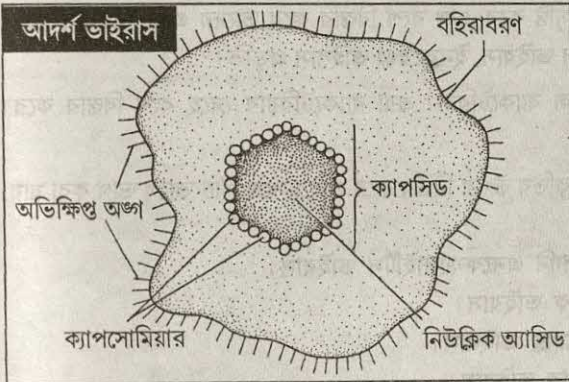
চিত্র 1.2 : আদর্শ ভাইরাসের অন্তর্গঠন।

**• ক্যাপসিড বিহীন ভাইরাস •**
**(Virus without Capsid)**

অনেকগুলি ভাইরাসে ক্যাপসিড বা বাইরের আবরণ থাকে না। শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) থাকে। এই প্রকার ক্যাপসিড বিহীন ভাইরাসকে **ভাইরয়েড** (Viroid) বলে। উদাহরণ—পোটাটো স্পিন্ডিল টিউবার ভাইরয়েড (Potato Spindle Tuber Viroid বা PSTV) এবং ক্রিসেনথিমাম স্টান্ট ভাইরয়েড (Chrysanthemum Stunt Viroid) প্রভৃতি।

● 2. **নিউক্লিওয়েড বা ভাইরাস জিনোম—ক্যাপসিডের ভেতরের অংশকে নিউক্লিওয়েড বলে।**

এটি নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। তাই একে **ভাইরাস জিনোম** বলা হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্যাপসিডকে একত্রে **নিউক্লিওক্যাপসিড** (Nucleocapsid) বলে। প্রত্যেকটি ভাইরাসে শুধু এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ RNA বা DNA থাকে।

উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA থাকে। ব্যতিক্রম শুধু ফুলকপির মোজেইক রোগের ভাইরাস, এতে DNA থাকে। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসে DNA থাকে। প্রাণী ভাইরাসে প্রধানত DNA থাকলেও কতকগুলিতে RNA-ও পাওয়া যায়। বসন্ত ভাইরাসে DNA এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পোলিও ভাইরাসে RNA দেখা যায়। প্রধানত ভাইরাসের RNA একতন্ত্রী (যেমন—TMV)। কয়েকটি ভাইরাসে RNA দ্বিতন্ত্রী (যেমন—রিওভাইরাস)। অধিকাংশ ভাইরাসে DNA দ্বিতন্ত্রী। **কলিফাজ fd-তে DNA একতন্ত্রী** দেখা যায়।

প্রায় সব ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড রৈখিক (Linear) ভাবে সাজানো থাকলেও কয়েকটিতে ব্যতিক্রম থাকে, যেমন—**সিনিয়ান ভাইরাসে** DNA চক্রাকার। **লেমডা ভাইরাসে** DNA রৈখিক হলেও পোষক কোশে যাওয়ার পর গোলাকার হয়। **সিথিয়ন ভাইরাস** 40-এতে DNA চক্রাকার ভাবে সাজানো থাকে।

**নিউক্লিওয়েডের কাজ** : (i) রোগ সংক্রমণ করা। (ii) সংক্রমণের সময় এই অংশ পোষক দেহে যায়। (iii) নতুন ভাইরাস-কণা গঠন করে।

**• ভাইরাসের বাইরে প্রোটিনের আবরণের তাৎপর্য •**

1. প্রোটিন আবরণ ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের রক্ষাকারী মোড়ক।
2. এটি অ্যান্টিজেন গুণসম্পন্ন হওয়াতে ভাইরাসকে নির্দিষ্ট পোষকের সঙ্গে আবদ্ধ করতে সাহায্য করে।
3. এটি উপযুক্ত উৎসেচক যুক্ত হওয়ায় পোষক কোশে নিউক্লিক অ্যাসিড ঢুকতে সাহায্য করে।
4. ফাজ-ভাইরাসের পুচ্ছ অংশের আবরণীর সংকোচী গুণ রয়েছে। সম্ভবত এই অংশে ATP থাকে।

## ✪ 1.5. ভাইরাসের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Virus) ✪

প্রধানত পোষক নির্বাচন, আকৃতি, রাসায়নিক গঠন ও রোগসংক্রমণ ক্ষমতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ভাইরাসের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস নীচে দেওয়া হল।

● 1. **পোষক নির্বাচন (Host selection)** ঃ পোষকের উপর নির্ভর করে ভাইরাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) **উদ্ভিদ ভাইরাস**—যে সব ভাইরাস উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং বংশ বিস্তার করে তাদের **উদ্ভিদ ভাইরাস** বলে। **উদাহরণ— টোবাকো মোজেইক ভাইরাস, বিন মোজেইক ভাইরাস, আলুর এক্স ভাইরাস** প্রভৃতি।

(ii) **প্রাণী ভাইরাস**—যে সব ভাইরাস প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং বংশ বিস্তার করে তাদের **প্রাণী ভাইরাস** বলে। **উদাহরণ—পোলিও ভাইরাস, হাম ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস** প্রভৃতি।

(iii) **ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস**—এই ভাইরাসের পোষক হল ব্যাকটেরিয়া। এরা ব্যাকটেরিয়ার দেহে বংশ বিস্তার করে। **উদাহরণ—ফাজ-ভাইরাস বা ব্যাকটেরিওফাজ**।

● 2. **ভাইরাসের আকৃতি (Shape of viruses)** ঃ আকৃতির উপর নির্ভর করে ভাইরাসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) গোলাকার ভাইরাসের উদাহরণ—**পোলিও ও জাপানি এনকেফালাইটিস ভাইরাস**।
(ii) দণ্ডাকার ভাইরাসের উদাহরণ—**টোবাকো মোজেইক ভাইরাস**।
(iii) ডিম্বাকার ভাইরাসের উদাহরণ—**মাম্পস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস**।
(iv) ঘনক্ষেত্রকাকার ভাইরাসের উদাহরণ—**বসন্ত রোগের ভাইরাস**।
(v) শুক্রাণু বা ব্যাঙাচি আকারের ভাইরাসের উদাহরণ—**ব্যাকটেরিওফাজ**।

● 3. **নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতি (Nature of Nucleic acid)** : নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভাইরাস দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যেমন—

(i) ডিঅক্সিভাইরাস—DNA-যুক্ত বেশির ভাগ প্রাণী ভাইরাস।
(ii) রাইবোভাইরাস—RNA-যুক্ত বেশির ভাগ উদ্ভিদ ভাইরাস।

● **ভাইরাসের শ্রেণিবিভাগের ছক (Chart for Classification of Viruses)** ঃ

●● ভাইরাস ●●

| পোষক নির্বাচন অনুসারে | আকৃতি অনুসারে | নিউক্লিক অ্যাসিডের পার্থক্য অনুসারে | জনন অনুসারে |
|---|---|---|---|
| (i) উদ্ভিদ | (i) গোলাকার | (i) DNA যুক্ত ভাইরাস | (i) লাইটিক ভাইরাস |
| (ii) প্রাণী | (ii) দণ্ডাকার | (ii) RNA যুক্ত ভাইরাস | (ii) লাইসোজেনিক ভাইরাস |
| (iii) ব্যাকটেরিয়া | (iii) ডিম্বাকার | (iii) DNA ও RNA যুক্ত ভাইরাস | |
| | (iv) ঘনকাকার | | |
| | (v) শুক্রাণু বা | | |
| | (vi) ব্যাঙাচিকৃতি | | |

এই শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে ভাইরাস একটি পর্ব (Phylum)। এই পর্ব দুটি উপপর্বে (Sub-phylum), দুটি উপপর্বকে 5টি শ্রেণিতে (Class) এবং শ্রেণিগুলিকে ৪টি বর্গে (order) এবং বর্গগুলিকে 21টি গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গোত্র কতকগুলি গণ (Genus) এবং প্রতিটি গণ আবার কতকগুলি প্রজাতি (Species) নিয়ে গঠিত।

## • ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতি •

**○ DNA ভাইরাস ঃ**

1. উদ্ভিদ ভাইরাস—ফুলকপি মোজেইক ভাইরাস
2. প্রাণী ভাইরাস—বসন্ত ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, এনকেফালাইটিস ভাইরাস।
3. ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস—লামডাফাজ ও ব্যাকটেরিওফাজ।

**○ RNA ভাইরাস ঃ**

1. উদ্ভিদ ভাইরাস—টোবাকো মোজেইক, বিন মোজেইক, পি মোজেইক ভাইরাস।
2. প্রাণী ভাইরাস—পোলিও ভাইরাস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

**○ DNA ও RNA উভয় যুক্ত ভাইরাস ঃ**

লিউকো ভাইরাসে প্রজননিক বস্তু RNA, কিন্তু পোষকের দেহকোশে প্রবেশ করার পর প্রজননিক বস্তু DNA-তে রূপান্তরিত হয়।

**• উদ্ভিদ ও প্রাণী ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Plant virus and Animal virus) ঃ**

| উদ্ভিদ ভাইরাস | প্রাণী ভাইরাস |
|---|---|
| 1. দেহের বাইরের আবরণ হল ক্যাপসিড। | 1. দেহ আবরণ ক্যাপসিডের বাইরে পেলপোমিয়ার নামে আরও একটি আবরণী স্তর থাকে। |
| 2. এদের নিউক্লিক অ্যাসিড প্রধানত RNA। | 2. এদের নিউক্লিক অ্যাসিড প্রধানত DNA। |
| 3. RNA একতন্ত্রী ও রৈখিক হয়। | 3. DNA দ্বিতন্ত্রী, চক্রাকার বা রৈখিক হয়। |
| 4. এরা পত্ররন্ধ্র বা ক্ষতস্থান দিয়ে পোষক কোশে যায়। | 4. এরা ক্ষত সৃষ্টি করে পোষক কোশে যায়। |

## ❂ 1.6. প্রাণী ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Virus) ❂

### ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস Influenza virus—*Myxovirus influenza*

❖ **(a) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংজ্ঞা (Definition of Influenza virus) ঃ যে বিশেষ ভাইরাসের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সংক্রমণ ঘটে তাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বলে।**

➤ **(b) প্রাণী (ইনফ্লুয়েঞ্জা) ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Animal (Influenza) virus] ঃ**

এই ভাইরাসের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য হল—

1. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দেখতে অনেকটা গোলাকার এবং দেহের বাইরের প্রোটিন আবরণীকে **ক্যাপসিড** বলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ক্যাসপিডের প্রোটিনের সঙ্গে শর্করাজাতীয় পদার্থ ও স্নেহপদার্থ সজ্জিত থাকে। এই আবরণী এক ধরনের অসংখ্য ক্যাপসোমিয়ার নামে **প্রোটিন উপএকক** (Protein subunit) দিয়ে গঠিত হয়।

চিত্র 1.3 ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

2. ক্যাপসিডের বাইরের দিকে এক বিশেষ **মোড়ক** (Envelop) বা আবরণ থাকে। এর একককে **পেলপোমিয়ার** (Pelpomere) বলে। মোড়কটি ভাইরাসের প্রোটিন ও পোষক কোশের লিপিড নিয়ে গঠিত হয়।

3. ক্যাপসিডের ভিতরের অংশকে **নিউক্লিওয়েড** বলে। এটি নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত হয়। তাই একে **জিনোম** বলে। নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্যাপসিডকে একসঙ্গে **নিউক্লিওক্যাপসিড** (Nucleocapsid) বলে। এই ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড হল RNA।

4. বহিরাবরণের বাইরে চারদিকে অভিক্ষিপ্ত অঙ্গ বা স্পাইক (Spike) থাকে।
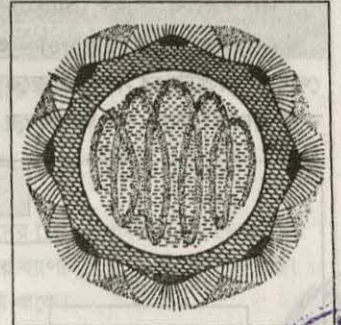
## ◎ 1.7. ব্যাকটেরিওফাজ $T_2$ (Bacteriophage $T_2$) ◎

❖ (a) সংজ্ঞা (Definition) ঃ যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে তাদের ব্যাকটেরিওফাজ বা ফাজভাইরাস (Phage Virus) বলে।

বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি (d'Herelle) 1917 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যাকটেরিওফাজ নামকরণ করেন। এরা সুনির্দিষ্ট প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। ব্যাকটেরিওফাজ দেখতে ব্যাঙাচির মতো। এদের T টাইপফাজও বলে, যেমন—$T_2$, $T_4$ ভাইরাস ইত্যাদি। T জাতীয় ফাজ লম্বায় 65-200 μm এবং চওড়ায় 50-70 μm হয়।

➤ (b) **ব্যাকটেরিওফাজের গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Characteristic fearure of Bacteriophage) ঃ** এদের দেহ চারটি অংশ নিয়ে গঠিত— **মস্তক, গ্রীবা, পুচ্ছ ও প্রান্তফলক**।
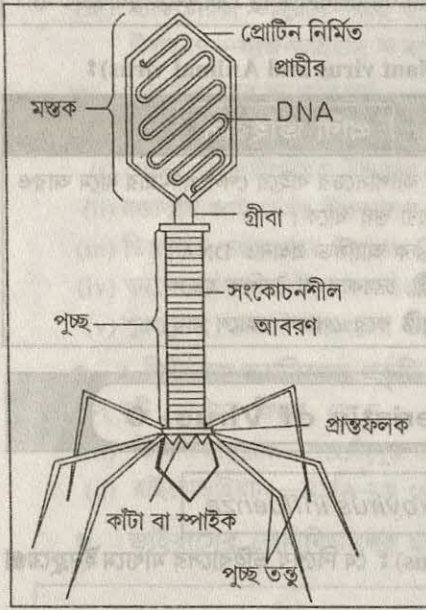
চিত্র 1.4 ঃ ব্যাকটেরিওফাজের দেহের গঠন।

1. **মস্তক** (Head)—মস্তকটি ষড়ভুজাকার হয়। মস্তক প্রাচীরে দুটি প্রোটিন স্তর থাকে। এই অংশটি লম্বায় 95 nm ও চওড়ায় 65 nm। মস্তকের ফাঁপা অংশের মধ্যে 0·05 nm লম্বা একটি দ্বিতন্ত্রী DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে।

2. **গ্রীবা** (Neck)—মস্তকের নীচে ছোটো নলাকার অংশ ও চাকতির মতো কলার নিয়ে গ্রীবা গঠিত হয়। গ্রীবা নলটি উপরের দিকে মস্তক ছিদ্রের মধ্যে এবং নীচের দিকে পুচ্ছাংশের ছিদ্রের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। চাকতির মতো **কলার** (Collar) পুচ্ছের উপরের দিকে আবদ্ধ হয়।

3. **লেজ বা পুচ্ছ** (Tail)—গ্রীবার নীচের দিকে নলের মতো অংশকে পুচ্ছ বলে। পুচ্ছ নলের দুটি অংশ থাকে। মাঝখানের সরু নলের মতো অংশকে মধ্যনল বা কোর (Core) বলা হয়। এই মধ্যনলের বাইরে প্রোটিন দিয়ে তৈরি সংকোচনশীল আবরণ থাকে। একে **পুচ্ছ আবরণী** বলা হয়। পুচ্ছ অংশটি লম্বায় প্রায় 95 nm।

4. **প্রান্ত খণ্ড** (End plate)—এই অংশটি পুচ্ছের নীচে থাকে। প্রান্তখণ্ড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—

(i) **প্রান্ত ফলক** (End plate)—পুচ্ছের নীচে একটি ষড়বাহুযুক্ত **প্রান্তফলক** থাকে। প্রান্তফলকের কেন্দ্রে একটি ছিদ্র দেখা যায়। একে প্রান্তফলক ছিদ্র বলে।

(ii) **কাঁটা বা স্পাইক** (Spike)—প্রান্তফলকের নীচের দিকের ছয় কোণে 6টি ত্রিভুজাকার ছোটো কাঁটা অবস্থান করে।

(iii) **পুচ্ছতন্তু** (Tail fibre)— প্রত্যেকটি কাঁটার সঙ্গে একটি লম্বা পুচ্ছতন্তু যুক্ত থাকে। পুচ্ছতন্তুর সাহায্যে ব্যাকটেরিওফাজ পোষক দেহপ্রাচীরের সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পুচ্ছতন্তু লম্বায় প্রায় 150 nm হয়। পুচ্ছতন্তুর সাহায্যে ফাজ ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবদ্ধ হয়।

## 1.8. টোবাকো মোজেইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus–TMV)

❖ (a) **টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের সংজ্ঞা (Definition of Tobacco Mosaic Virus) :** যে ভাইরাসের আক্রমণে তামাকগাছে মোজেইক রোগের সৃষ্টি হয় তাকে টোবাকো মোজেইক ভাইরাস বলে।

➤ (b) **টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের গঠন (Structure of TMV) :**

আমেরিকার রসায়নবিদ স্ট্যানলি (Stanley) প্রথম টোবাকো মোজেইক ভাইরাস পৃথক ও পরিস্রুত করে কেলাস তৈরি করতে পেরেছিলেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে এই ভাইরাসের কেলাসে নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) ও প্রোটিনের সন্ধান পেয়েছিলেন। ওই ভাইরাসের কয়েকটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল।

চিত্র 1.5 : (A) ভাইরাস আক্রান্ত তামাক পাতা, (B) টোবাকো মোজেইক ভাইরাস, (C) টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের ইলেকট্রন আণুবীক্ষণীক গঠন, (D) টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের প্রস্থচ্ছেদ, (E) একটি টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের গঠনের চিত্ররূপ।

1. এই সূক্ষ্ম ভাইরাস দেখতে লম্বা দণ্ডের মতো (দৈর্ঘ্যে 300 nm এবং ব্যাস 18 nm পর্যন্ত)।

2. ভাইরাস দণ্ডের প্রোটিন আবরণী বা ক্যাপসিড 2000-2130টি প্রোটিন উপএকক নিয়ে গঠিত হয়। এদের **ক্যাপসোমিয়ার** (Capsomere) বলে। ক্যাপসোমিয়ারগুলি বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো একটি নল গঠন করে। ক্যাপসোমিয়ারগুলি এইভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে একটি ফাঁপা নল গঠন করে। নলের ফাঁপা অংশকে **মজ্জা** (Core) অংশ বলে।

3. একতন্ত্রী RNA ক্যাপসিডের মধ্যে স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে RNA ক্যাপসোমিয়ার দিয়ে গঠিত প্রোটিন নলের খাঁজে খাঁজে ঢুকে পড়ে।

4. প্রত্যেকটি ক্যাপসোমিয়ারে প্রায় 158টি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

5. এই ভাইরাস দেহে 95% প্রোটিন ও 5% নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

● **টোবাকো মোজেইক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিওফাজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Tobaco Mosaic Virus and Bacteriophage) :**

| টোবাকো মোজেইক ভাইরাস | ব্যাকটেরিওফাজ |
|---|---|
| 1. আকৃতি লম্বা দণ্ডের মতো। | 1. আকৃতি ছোটো ব্যাঙাচির মতো। |
| 2. নিউক্লিক অ্যাসিড RNA থাকে। | 2. নিউক্লিক অ্যাসিড DNA থাকে। |
| 3. ভাইরাস দণ্ডের প্রোটিন আবরণী বা ক্যাপসিড 2000-2130টি প্রোটিন উপ-একক (ক্যাপসোমিয়ার) নিয়ে গঠিত। | 3. দেহ মস্তক, গ্রীবা, পুচ্ছ ও প্রান্তফলক নিয়ে গঠিত। |
| 4. জননের সময় পোষক কোশে সম্পূর্ণ ভাইরাস ঢোকে। | 4. জননের সময় ভাইরাসের DNA পোষকের কোশে ঢোকে। |
| 5. পোষক কোশের মধ্যে ক্যাপসিড ও RNA আলাদা হয়। | 5. পোষক কোশের বাইরে ক্যাপসিড ও DNA আলাদা হয়। |
| 6. এদের প্রোফাজ অবস্থা দেখা যায় না। | 6. এদের প্রোফাজ অবস্থা থাকে। |
| 7. পোষক কোশ বিদারিত হয় না। | 7. পোষক কোশ বিদারিত হয়। |
| 8. স্পর্শ করলে সংক্রামিত হয়। | 8. বাহকের সাহায্যে সংক্রামিত হয়। |

## ▲ অন্যান্য কয়েকটি ভাইরাস (A few other Viruses) ঃ

1. **সাইনোফাজ (Cynophage) ঃ নীলাভ সবুজ শৈবালকে যে ভাইরাস আক্রমণ করে, তাকে সায়ানোফাজ (Cyanophage) বলে।** এদের প্রজননিক বস্তু হল DNA। **সোফারম্যান ও মরিস** (Shafferman and Maris, 1951), *লিঙ্গাবিয়া (Lyngbya), ফরমিডিয়াম (Phormidium) পেক্টোনিমা (Plectonema)* প্রভৃতি নীলাভ সবুজ শৈবালে প্রথমে এক বিশেষ ধরনের ভাইরাসের সন্ধান পান। এই ভাইরাসের নামকরণ করা হয় LPP–1 ভাইরাস। পরে এর নাম দেওয়া হয় সাইনোফাজ। এর আকৃতি অনেকটা ব্যাকটেরিওফাজের মতো এবং লেজটি ছুঁচোলো। মাথায় দ্বিতন্ত্রী DNA থাকে। জীবনচক্র ব্যাকটেরিওফাজের মতো।

2. **মাইকোফাজ (Mycophage) ঃ ছত্রাককে যে ভাইরাস আক্রমণ করে তাদের মাইকোফাজ বলে।** বিজ্ঞানী **সিনডেন** (Sinden, 1957) মাইকোফাজ আবিষ্কার করেন। প্রধানত ঈস্ট, পেনিসিলিয়াম, ব্যাঙের ছাতা (অ্যাগারিকাস) প্রভৃতি ছত্রাকে এই ভাইরাস থাকে। এরা বহুভুজাকৃতি বা গোলাকার হয়। ভাইরাসে একটি দ্বিতন্ত্রী RNA থাকে। এরা ছত্রাকের নানা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

3. **হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno-deficiency Virus)** ঃ HIV ভাইরাসের মাধ্যমে এড্‌স রোগ সংক্রামিত হয়। এই রোগকে উনবিংশ শতাব্দীর অভিশাপ বলা হয়। 1981 সালে আমেরিকায় প্রথম এই নামটি স্বীকৃতি লাভ করে। এড্‌সের পুরো নাম **অ্যাকোয়ারড ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম** (Aquired Immuno-deficiency Syndrome)। সারা বিশ্বে এই রোগ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। HIV কেবলমাত্র মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। এড্‌স হল দেহের প্রতিরক্ষা হ্রাসকারী ব্যাধি।

(a) **গঠন (Structure) ঃ** এই ভাইরাসটি হল **রেট্রোভাইরাস** এবং এর দেহের মধ্যে একতন্ত্রী RNA প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। RNA-এর সঙ্গে রিভার্স **ট্রান্সক্রিপটেজ** নামে একপ্রকার উৎসেচক থাকে যা RNA-কে DNA তৈরিতে সাহায্য করে। RNA-এর বাইরে প্রোটিন আবরণী থাকে। প্রোটিন আবরণীর বাইরে পুরু খোলক বা এনভেলপ থাকে। খোলককে বেষ্টন করে যথাক্রমে অন্তঃআবরক ও পর্দা থাকে। এই স্তর অ্যান্টিজেন ও গ্লাইকোজেন বটিকাযুক্ত হয়।
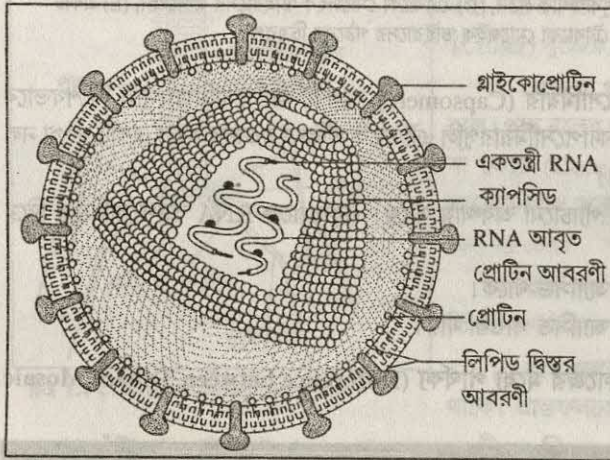
চিত্র 1.6 ঃ HIV ভাইরাসের গঠন।

(b) **সংক্রামিত হওয়ার পদ্ধতি (Transmission of Diseases) ঃ**

আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, শুক্র এবং যৌনি নিঃসরণের মধ্যে প্রচুর এড্‌স ভাইরাস থাকে। সুস্থ মানুষের দেহে ভাইরাস প্রবেশ করার পর লিম্ফোসাইট কোশে যায় এবং কোশগুলিকে ধ্বংস করে। এরপর আবার নতুন লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করে। এইভাবে সব লিম্ফোসাইট কোশগুলি ধ্বংস হয়। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং রোগী অন্য জীবাণুর আক্রমণে মারা যায়। এড্‌স ভাইরাস নিম্নলিখিত উপায়ে সঞ্চারিত হয়, যেমন — (i) রোগীর সঙ্গে অবাধ যৌনসংসর্গ। (ii) দূষিত রক্ত গ্রহণ বা দান করা। (iii) আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। (iv) সেলুনে অপরিশোধিত ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কাটা। (v) উলকি, কান বেঁধানো ও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা। (vi) রোগাক্রান্ত মায়ের দেহ থেকে গর্ভস্থসন্তানের দেহে সংক্রমণ।

(c) **এড্‌স রোগের লক্ষণ (Symptoms of AIDS)** ঃ বাইরে থেকে দেখে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে বোঝার কোনো উপায় নেই। রক্ত পরীক্ষা করলে রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। নিম্নলিখিত শারীরিক উপসর্গগুলি দেখা যায়, যেমন— (i) একটানা অনেকদিন ঘুসঘুসে জ্বর, ঘুমের সময় অতিরিক্ত ঘাম, (ii) পেট খারাপ বা উদরাময়, (iii) অনবরত কাশি, (iv) মুখের ভিতর সাদাসাদা ছোপ, (v) ওজন হ্রাস প্রভৃতি।

(d) **সংক্রমণ না ঘটার অবস্থাগুলি (Conditions for not Transmitting the Diseases) :** স্বাভাবিক মেলামেশায় এড্‌স ভাইরাস সংক্রমণের কোনো আশঙ্কা থাকে না। এ ছাড়া (i) একই বাড়ীতে বাস করা, (ii) করমর্দন করা, (iii) রোগীর হাঁচি, কাশির সংস্পর্শে আসা, (iv) একই সঙ্গে ভোজন, (v) একই সঙ্গে পড়াশুনা করা ইত্যাদি।

(e) **নিয়ন্ত্রণের উপায় (Prevention methods) :** এড্‌স রোগের কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন, যেমন—(i) নিরাপদ যৌন সংস্পর্শ, (ii) রক্ত গ্রহণ বা দানের সময় পরিশোধিত বা নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করা, (iii) সেলুনে নতুন ব্লেডে দাড়ি কাটা এবং (iv) ব্যাধি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা ও সচেতন থাকা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ন্যাশনাল এড্‌স কন্ট্রোল অরগ্যানাইজেশন (National AIDS Control Organisation) নামে একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থার কাজ হল জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা।

## ◎ 1.9. ভাইরাসের জনন (Reproduction of Virus) ◎

ভাইরাসের জনন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পোষক কোশের মধ্যে ঘটে। স্বাধীনভাবে দেহ গঠন ও বিপাকীয় কাজ পরিচালনা করার মতো কোনো উৎসেচক ভাইরাসের দেহে থাকে না। তাই ভাইরাস পোষক দেহে ঢোকার পর কোশ বিভাজন না করে নিজ নিজ আকৃতির **প্রতিরূপ** (Replica) গঠন করে বংশ বৃদ্ধি করে। পোষক কোশে প্রবেশ করার পদ্ধতি ভাইরাসের উদ্ভিদ, প্রাণী ও ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। **উদ্ভিদ ভাইরাস** বাহক বা ভেক্টরের (সাধারণত পতঙ্গ) সাহায্যে পোষকদেহে প্রবেশ করে। **প্রাণী ভাইরাস** প্রথম পোষক কোশ আবরণীতে **আবদ্ধ** হয় (Adsorption) ও পরে **ফ্যাগোসাইটোসিস** (Phagocytosis) পদ্ধতিতে কোশে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী ভাইরাসে সম্পূর্ণ নিউক্লিক অ্যাসিড অংশ পোষক কোশে প্রবেশ করে।

*Escherichia coli* (*এসচিরিচিয়া কোলাই*) ব্যাকটেরিয়ার দেহে ফাজ ভাইরাস কীভাবে জনন প্রক্রিয়া শেষ করে তার সঠিক বিবরণ থেকে দেখা যায় এদের জীবন চক্র দু'রকমের হয়, যেমন—**লাইটিক চক্র** এবং **লাইসোজেনিক চক্র**।

### ◻ 1. লাইটিক চক্র (Lytic cycle) :

❖ **লাইটিক চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Lytic cycle) : নির্দিষ্ট ফাজভাইরাস ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমণের পর নানাপ্রকার দশা অতিক্রম করে অপত্য ফাজ গঠন এবং পোষক কোশকে বিনষ্ট করে নির্গত হওয়ার পদ্ধতিকে লাইটিক চক্র বলে।**

T-সিরিজভুক্ত ফাজভাইরাস আক্রমণের পর পোষক ব্যাকটেরিয়া কোশে ধারাবাহিক 5টি দশা **(আক্রমণ দশা, সুপ্ত দশা, অঙ্গ উৎপাদন দশা, অঙ্গ একত্রীকরণ দশা ও মুক্তি দশা)** ঘটে অপত্য অসংখ্য ভাইরাস গঠিত হয়। এই ভাইরাসকে **লাইটিক ভাইরাস** (Lytic Virus) বলে। ভাইরাসের এই ধরনের জীবনচক্রকে **লাইটিক চক্র** বলা হয়। **উদাহরণ**— $T_4$ ফাজ।

ভাইরাসের এইপ্রকার জনন প্রক্রিয়াকে মোট 5টি দশায় বিভক্ত করা হয়, যেমন—

(i) **আক্রমণ দশা**—ফাজভাইরাস প্রথমে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে। এর পর ফাজভাইরাস পুচ্ছতন্তু ও কাঁটার অগ্রপ্রান্ত দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোশের সঙ্গে আবদ্ধ হয়। এর পর পুচ্ছ আবরণীর সংকোচন ঘটে, ফলে পুচ্ছের
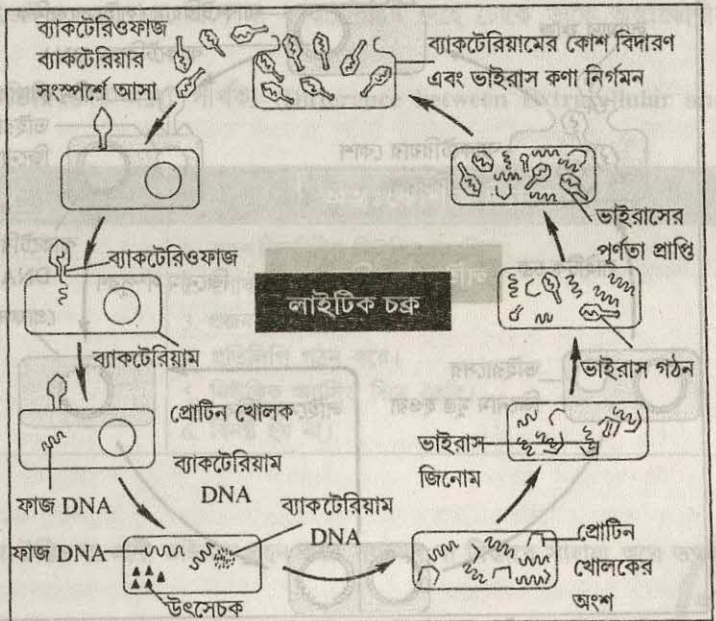
চিত্র 1.7 : ভাইরাসের লাইটিক চক্র।

মধ্যনলটির নীচের অংশ প্রান্তফলকের মাঝের ছিদ্র দিয়ে ব্যাকটেরিয়া কোশের প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। প্রান্তফলক লাইসোজাইম উৎসেচক নিঃসরণ করে এই কাজের সহায়তা করে।

মস্তকের DNA পুচ্ছের মধ্যনল দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোশে ঢোকে। এই সময় ফাজভাইরাসের প্রোটিন আবরণী পোষক কোশের অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া কোশের বাইরে থেকে যায় ও পরে সেটি নষ্ট হয়।

(ii) **সুপ্ত দশা**—ব্যাকটেরিয়া কোশে ঢোকার পর ফাজ DNA-এর একটি বিশেষ জিনের প্রভাবে পোষক ব্যাকটেরিয়া একটি বিশেষ প্রোটিনের সংশ্লেষ ঘটায় যা পোষকের DNA-কে বিশ্লিষ্ট করে। এই সময় কিন্তু ফাজের DNA কোনোভাবেই বিশ্লিষ্ট হয় না। এর পর ফাজভাইরাস পোষকের সব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বন্ধ করে নিজের প্রয়োজনীয় উৎসেচক সংশ্লেষ করে। পোষকের সব প্রক্রিয়া বন্ধ হয় বলে এই দশাকে সুপ্ত দশা বলা হয়।

(iii) **অঙ্গ উৎপাদন দশা**—এই দশায় ফাজ DNA অংশটি নিজস্ব প্রতিলিপি গঠনের ছাঁচ হিসেবে কাজ করে। পোষক ব্যাকটেরিয়ার বিশ্লিষ্ট DNA-এর নিউক্লিওটাইডগুলি দিয়ে ফাজের DNA অণু গঠিত হতে থাকে।

(iv) **অঙ্গ একত্রীকরণ দশা**—প্রত্যেকটি নতুন DNA অণুর চারপাশে প্রোটিন আবরণী অর্থাৎ ক্যাপসিড গঠিত হয়। পোষকের রাইবোজোম অংশে ক্যাপসিড প্রোটিনের সংশ্লেষ ঘটে। এর পর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অসংখ্য ভাইরাস কণা তৈরি হয়।

(v) **মুক্তি দশা**—শেষ দশায় ফাজ DNA-এর একটি জিনের প্রভাবে পোষক কোশে **লাইসোজাইম** নামে একটি উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এই উৎসেচক ব্যাকটেরিয়া কোশের প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে। অভিস্রবণ চাপের প্রভাবে পোষক কোশ স্ফীত হয় এবং পরে ফেটে গিয়ে অপত্য ভাইরাসগুলি বেরিয়ে আসে। পোষক কোশের বিদারণকে **লাইসিস** (Lysis) বলা হয়। ভাইরাসগুলি মুক্তি পেয়ে আবার নতুন কোনো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে জনন প্রক্রিয়ার দশাগুলি শেষ হতে 20-30 মিনিট সময়ের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে প্রায় 200টি অপত্য ফাজ ভাইরাস বেরিয়ে আসে।

## ◘ 2. লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic cycle) ঃ

❖ **লাইসোজেনিক চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Lysogenic cycle) ঃ ল্যামডা ফাজ এসচিরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করলে ফাজের DNA ব্যাকটেরিয়া DNA-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন জিনোমটি বারবার বিভাজিত হয়ে অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে লাইসোজেনিক চক্র বলে।**
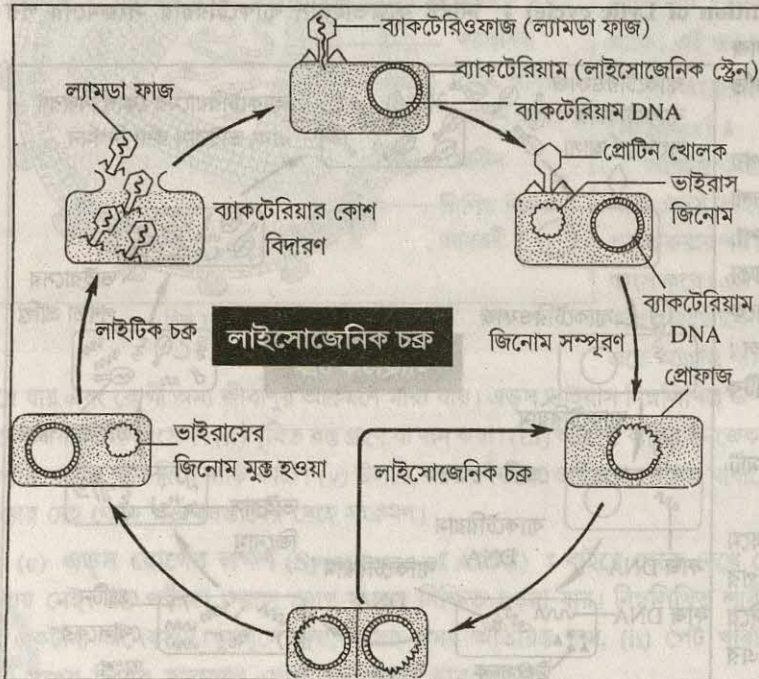
চিত্র 1.8 ঃ ল্যামডা ফাজের লাইসোজেনিক চক্র।

এসচিরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়াকে ল্যামডা ফাজ (λ-phage) আক্রমণ করে এবং ভাইরাসের পুচ্ছতন্তু ও কাঁটার অগ্রপ্রান্ত দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোশের সঙ্গে সংলগ্ন হয়। লাইটিকচক্রের মতো একই ভাবে DNA ব্যাকটেরিয়ার কোশে প্রবেশ করে। এর পর ভাইরাসের DNA ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। একে **প্রোফাজ** (Prophage) বলে। এর পর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মিলিত নতুন জিনোমটি বারবার বিভাজিত হয়ে অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধি করতে থাকলে

অপত্য ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের সঙ্গে ভাইরাসের জিনোম সংযুক্ত থাকে। এদের **টেমপারেট ফাজ** (Temperate phage) বলে। এই জীবন-চক্রকে **লাইসোজেনিক চক্র** বলা হয়।

প্রোফাজ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিছুদিন পর হঠাৎ ভাইরাসের DNA পোষকের DNA থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সাইটোপ্লাজমে যুক্ত হয়ে আবার লাইটিক চক্রে ফিরে আসে অর্থাৎ আবার পোষকের দেহে অসংখ্য অপত্য গঠন করে ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর বিদীর্ণ করে বা লাইসিস প্রক্রিয়ায় মুক্তি পেয়ে আবার নতুন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে।

● **লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Lytic and Lysogenic cycle) ঃ**

| লাইটিক চক্র | লাইসোজেনিক চক্র |
|---|---|
| 1. ফাজ DNA পোষক কোশের প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে। | 1. ফাজ DNA পোষক কোশের প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে না। |
| 2. লাইট্রিক চক্রে প্রোফেজ গঠিত হয় না। | 2. লাইসোজেনিক চক্রে প্রোফেজ গঠিত হয়। |
| 3. পোষক কোশ বিনষ্ট হয়। | 3. পোষক কোশ বিনষ্ট হয় না। |
| 4. অপত্য ফাজ পোষক কোশ থেকে মুক্ত হয়। | 4. অপত্য ফাজ পোষক কোশ থেকে মুক্ত হয় না। |
| 5. এই চক্রে T-সিরিজভুক্ত অর্থাৎ $T_4$, $T_2$ প্রভৃতি ফাজ ভাইরাসে দেখা যায়। | 5. এই চক্রে লামডা ($\lambda$) ফাজ দেখা যায়। |

➤ **বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন এবং অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন কাকে বলে ? (What are Extracellular and Intracellular virion ?) ঃ**

(a) **বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন ঃ** ফাজ ভাইরাস প্রথমে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে এবং পুচ্ছতন্তু ও কাঁটার অগ্রপ্রান্ত দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোশের সঙ্গে আবদ্ধ হয়। এর পর ফাজ-ভাইরাসের পুচ্ছের প্রান্তফলক থেকে লাইসোজাইম উৎসেচকের সহায়তায় ছিদ্র তৈরি করে DNA ব্যাকটেরিয়ার দেহে যায় এবং ভাইরাসের দেহ আবরণী পোষক কোশের বাইরে থেকে যায় এবং পরে সেটি বিনষ্ট হয়। একে **বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন** বলে।

(b) **অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন ঃ** ফাজ-ভাইরাসের DNA অংশ যা ব্যাকটেরিয়ার দেহে ঢোকে তাকে **অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন** বলে।

● **বহিঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয় ভিরিয়নের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Extracellular and Intracellular virion) ঃ**

| বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন | অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন |
|---|---|
| 1. নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বিত ক্যাপসিড। | 1. ক্যাপসিডবিহীন নিউক্লিক অ্যাসিড। |
| 2. পোষক কোশে প্রবেশ করে না। | 2. পোষক কোশে প্রবেশ করে। |
| 3. প্রজননিক বস্তু নয়। | 3. প্রজননিক বস্তু। |
| 4. প্রতিলিপি গঠন করে না। | 4. প্রতিলিপি গঠন করে। |
| 5. প্রোটিন দিয়ে তৈরি। | 5. নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। |
| 6. বিনষ্ট হয়। | 6. বিনষ্ট হয় না। |

➤ **ভেক্টর (Vector) ঃ**

❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণী ভাইরাস বহন করে সংক্রমণ বা বিস্তারে সাহায্য করে তাদের ভেক্টর (Vector) বলা হয়।**

সহজভাবে বলতে গেলে পরজীবী বহনকারী জীবকে ভেক্টর বলে।

### • ভাইরাস সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য •

1. **বহিঃকোষীয় ভিরিয়ন**—ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবদ্ধ ভিরিয়নকে বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন বলে।
2. **অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন**—পোষকের কোশে অবস্থিত ভাইরাস নিউক্লীয় অ্যাসিডকে অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন বলে।
3. **লাইসিস**—অপত্য গঠনের পর ব্যাকটেরিয়া কোশের বিদারণকে লাইসিস বলা হয়।
4. **অঙ্গজ ফাজ**—যে ব্যাকটেরিওফাজ লাইসিস ঘটায় তাকে অঙ্গজ ফাজ বলে।
5. **ইনটারফেরন**—এটি এক প্রকার প্রোটিন যা একটি অক্ষত সম্পূর্ণ কোশে ভাইরাসের আক্রমণের ফলে উৎপন্ন হয়।
6. **ইক্লিপ্‌স দশা**—ভাইরাস পোষক কোশে ঢোকার পর কিছু সময় নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে ইক্লিপ্‌স দশা বলে।
7. **প্রোফাজ**—ভাইরাসের DNA পোষক কোশে ঢোকার পর পোষকের DNA-এর সঙ্গে মিলিত হয়। পোষকের DNA-এর সঙ্গে ভাইরাসের DNA-এর একত্রীভূত অবস্থাকে প্রোফাজ বলে। উদাহরণ—ই. কোলাই *(E. Coli)* ব্যাকটেরিয়াকে লামডা ফাজ আক্রমণ করলে প্রোফাজ অবস্থা দেখা যায়।
8. **উপকারী ভাইরাস**—ব্যাকটেরিওফাজ ও মাইকোফাজ।
9. **দুটি ভাইরাসের নাম যেখানে DNA ও RNA উভয়ে থাকে**—লিউকো ভাইরাস এবং রাউস সারকোমা ভাইরাস।
10. **বাইনাল গঠনযুক্ত একটি ভাইরাস**—ব্যাকটেরিওফাজ—$T_2$, $T_4$, $T_6$
11. **AID রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস দায়ী**—HIV
12. **HIV ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড**—RNA
13. **স্যাটেলাইট ভাইরাস**—যে সব ভাইরাস অন্য ভাইরাসের সাহায্যে পোষক কোশে ঢোকে তাকে স্যাটেলাইট ভাইরাস বলে। উদাহরণ—AAV

## ❂ 1.10. ভাইরাস রোগ (Viral diseases) ❂

প্রায় তিনশোর বেশি উদ্ভিদ ভাইরাস আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে প্রভৃতি ক্ষতিসাধন করছে। তামাক, কলা, পেঁপে, আপেল প্রভৃতি শস্য ভাইরাস আক্রমণে রোগাক্রান্ত হচ্ছে। উদ্ভিদ ভাইরাসের মতো প্রাণী ভাইরাসও বিভিন্ন উপকারী প্রাণী এমনকি মানুষের নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করছে। এদের মধ্যে মানুষের বসন্ত, হাম, মামস্‌ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন রোগ-সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী ভাইরাসের তালিকা দেওয়া হল।

- **উদ্ভিদ ও প্রাণীর কয়েকটি ভাইরাসের নাম, আক্রান্ত অঙ্গ ও রোগের নাম ঃ**

| ভাইরাসের নাম | আক্রান্ত অঙ্গ | রোগের নাম |
|---|---|---|
| **• উদ্ভিদ ভাইরাস (Plant virus) •** | | |
| 1. টোবাকো মোজেইক ভাইরাস (Tobacco mosaic virus) | তামাক পাতা | টোবাকো মোজেইক |
| 2. টম্যাটো বুসি ভাইরাস (Tomato bushy virus) | টম্যাটো পাতা | লিফকার্ল |
| 3. বিন মোজেইক ভাইরাস (Bean mosaic virus) | শিম পাতা | বিন মোজেইক |
| 4. পি-মোজেইক ভাইরাস (Pea mosaic virus) | মটর পাতা | পি-মোজেইক |
| 5. পেপাইয়া মোজেইক ভাইরাস (Papaya mosaic virus) | পেঁপে পাতা | পেপাইয়া মোজেইক |
| 6. লেটুস মোজেইক ভাইরাস (Lettuce mosaic virus) | লেটুস পাতা | লেটুস মোজেইক |
| 7. স্টার ক্রাক ভাইরাস (Star crack virus) | আপেল ও নাসপাতি | স্টার ক্রাক |
| 8. বাঞ্চি টপ ভাইরাস (Bunchy top virus) | কলাগাছের শীর্ষভাগ | বাঞ্চি-টপ |

| ভাইরাসের নাম | আক্রান্ত অঙ্গ | রোগের নাম |
|---|---|---|
| ● প্রাণী ভাইরাস (Animal virus) ● | | |
| 1. পোলিওমায়েলিটিস (Poliomyelitis sp.) | স্নায়ুতন্ত্র | পোলিও |
| 2. মিসলস ভাইরাস (Measles virus) | চামড়া | হাম |
| 3. মাম্পস্ ভাইরাস (Mumps virus) | গাল ও গলা | মাম্পস্ |
| 4. রেবিস ভাইরাস (Rabies virus) | মানুষের দেহ | জলাতঙ্ক |
| 5. ভেরিসেলা ভাইরাস (Varicella virus) | মানুষের চামড়া | বসন্ত |
| 6. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus) | মানুষের দেহ | ইনফ্লুয়েঞ্জা |
| 7. লিউকোমিয়া ভাইরাস (Leucomia virus) | মানুষের রক্ত | রক্তে ক্যান্সার |
| 8. এনকেফালাইটিস ভাইরাস (Encephalitis virus) | মস্তিষ্ক | এনকেফালাইটিস |

## ◎ 1.11. ভাইরাসঘটিত কয়েকটি রোগের লক্ষণ ◎ (Symptoms of some Viral Diseases)

### ➤ A. মানুষের ভাইরাসজনিত রোগ (Human viral diseases) ঃ

1. **হাম** (Measles)—প্রধানত শিশুদের রোগ। মিসিলস ভাইরাসের সাহায্যে দেহ ত্বক আক্রান্ত হয়। তীব্র আক্রমণে শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মৃত্যুর হার নিতান্ত কম নয়।
2. **মাম্পস** (Mumps)—মাম্পস্ ভাইরাস আক্রমণে গাল-গলা ফুলে ওঠে ও লালাগ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রদাহ সৃষ্টি করে।
3. **বসন্ত** (Small Pox)—প্রায় সব বয়সের মানুষ ভ্যারিসেলা ভাইরাসের আক্রমণে বসন্তরোগে ভোগে। এই রোগ চর্মে হয়। নিরাময়ের পর চর্মে দাগ ও অন্ধত্ব হতে পারে। টিকা আবিষ্কারের পূর্বে এই রোগে নিয়তই মৃত্যু ঘটত। বর্তমানে এই রোগ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা গিয়াছে বলা যায়।
4. **পোলিও** (Poliomyelitis)—প্রধানত শিশুরোগ। Polio ভাইরাস প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে, ফলে মস্তিষ্ক ও দেহের পেশিগুলি অবশ হয়ে পক্ষাঘাত ঘটায়। টিকা প্রয়োগে এই রোগও আংশিকভাবে ঘটছে।
5. **এনকেফালাইটিস** (Encephalitis)—মস্তিষ্কের প্রদাহ সৃষ্টিকারী ভাইরাস রোগ। বর্তমানে এ রোগের সংক্রমণ বাড়ছে এবং মৃত্যুও ঘটছে।
6. **ইনফ্লুয়েঞ্জা** (Influenza)—সব বয়সের মানুষের প্রধানত সর্দি, হাঁচি, কাশি প্রভৃতি লক্ষণ এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-ঘটিত রোগে প্রকাশ পায়।

### ➤ B. প্রাণীর ভাইরাসজনিত রোগ (Animal viral diseases) ঃ

1. **পা ও মুখের রোগ** (Mouth & foot diseases)—প্রধানত গবাদি পশুর রোগ। পশুখাদ্য, জল ও বিচালির মাধ্যমে বিস্তার ঘটে ও তীব্র সংক্রমণে পশুর মৃত্যু ঘটে। রোগের ফলে হৃৎপিণ্ড ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষতি হয়।
2. **গো-বসন্ত** (Cow pox)—এই রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুর মৃত্যুর হার যথেষ্ট।
3. **জলাতঙ্ক** (Hydrophobia)—র‍্যাবিস্ ভাইরাসের আক্রমণে প্রধানত কুকুর, বেড়াল এমনকি কখনো-কখনো মানুষেরও মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কুকুর, বেড়াল কামড়ালেই ডাক্তারের পরামর্শে টিকা নেওয়া একান্তভাবেই কাম্য।

### ➤ C. উদ্ভিদের ভাইরাসজনিত রোগ (Plant viral diseases) ঃ

1. **ক্লোরোসিস** (Chlorosis)—একপ্রকার ভাইরাস রোগের লক্ষণ। সাধারণত পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে হলুদ ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেয়। তামাক পাতার মোজেইক রোগ এই প্রকার।
2. **নেক্রোসিস** (Necrosis)—ভাইরাস রোগের লক্ষণ হিসাবে উদ্ভিদে ক্ষত দেখা দেয় এবং গাছটি চুপসে মরে যায়।
3. **কার্লিং**(Curling)—এই রোগঘটিত উদ্ভিদের পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়। তামাক পাতার লিফকার্ল উল্লেখযোগ্য রোগ।

## ✪ 1.12. ভাইরাসজনিত রোগের সঞ্চারণ ✪ (Transmission of Viral diseases)

সাধারণত ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ প্রভৃতিতে বিস্তারলাভ করে বহুরকম সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। কোনো জীবের মাধ্যমে রোগ ছড়ালে জীবটিকে **বাহক বা ভেক্টর** (vector) বলা হয়, যেমন— মশা, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি। উদ্ভিদক্ষেত্রে দেখা যায় কতকগুলি উদ্ভিদ একই প্রকার ভাইরাসের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়। একটি দেহকোশ আক্রান্ত হলে ওই উদ্ভিদের প্রতিটি কোশই আক্রান্ত হয়ে উদ্ভিদটি সম্পূর্ণভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তা থেকে ক্রমাগত ভাইরাস অন্য উদ্ভিদে রোগ ছড়ায়।

কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রাণীরা ভাইরাস দ্বারা রোগাক্রান্ত হলে ওই প্রাণীতে এক প্রকার অ্যান্টিবডি (Antibody) তৈরি হওয়ায় ওই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। কীভাবে ভাইরাস রোগ বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চারিত হয় তার বর্ণনা দেওয়া হল —

### ➤ A. উদ্ভিদদেহে ভাইরাস রোগ সঞ্চারণ (Transmission of Viral diseases in Plants) ঃ

(i) **যান্ত্রিক উপায়ে**—ভাইরাস আক্রান্ত উদ্ভিদের পরিচর্যাকারীর পোশাক পরিচ্ছদ ও পরিচর্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সঙ্গে কোনোক্রমে সুস্থ উদ্ভিদের সংস্পর্শ হলেই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে।

(ii) **মৃত্তিকার সাহায্যে**—গমের মোজেইক রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসের মতো অনেক ভাইরাসই মৃত্তিকার সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। প্রধানত এরা মূলের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে।

(iii) **বীজের সাহায্যে**—সাধারণত উদ্ভিদের ফুল ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বীজে সংক্রামিত হয় এবং বীজ থেকে অন্যত্র সংক্রামিত হয়।

(iv) **অঙ্গজ জননের মাধ্যমে**—আক্রান্ত উদ্ভিদের সব অঙ্গই ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ায় অঙ্গজ জননের ফলে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হলেও এতে রোগ সংক্রমণ ঘটে। এইভাবে কলম, বুলবিল, মুকুল, মৃদ্গত কাণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে ভাইরাস অঙ্গজ জননের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

(v) **কীটপতঙ্গের সাহায্যে**—বিভিন্ন প্রকারের কীটপতঙ্গ দিয়ে উদ্ভিদে ভাইরাস সংক্রামিত হয়। সাধারণত যারা উদ্ভিদের রস শোষণ করে তাদের দ্বারাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

(vi) **পরজীবী উদ্ভিদ দ্বারা**—স্বর্ণলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এরা চোষকমূল দিয়ে ভাইরাস আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে।

(vii) পরাগরেণু দিয়ে ভাইরাস সংক্রামিত হয়।

### ➤ B. প্রাণীদেহে ভাইরাসের বিস্তার (Transmission of Viral diseases in Animals) ঃ

(i) **স্পর্শের মাধ্যমে**—কাশি, হাঁচি, চুম্বন কিংবা কথা বলার সময় ভাইরাস আক্রান্ত দেহ থেকে সংক্রামিত হয়।

(ii) **বায়ুর সাহায্যে**—প্রাণীদের দেহে বেশির ভাগই বায়ুর সাহায্যে সংক্রামিত হয়। বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম প্রভৃতি প্রধানত বায়ুর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

(iii) **খাদ্য ও জলের মাধ্যমে**—পোলিও, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের ভাইরাস খাদ্য ও জলের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

(iv) **কীট-পতঙ্গের সাহায্যে**—অধিকাংশ ভাইরাসই কীট-পতঙ্গের সাহায্যে বিস্তারিত হয়। যেমন, মশা মারাত্মক ভাইরাস রোগ এনকেফালাইটিস্ ও ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

(v) **গবাদি পশুর সাহায্যে**—গৃহপালিত পশু, যেমন—ছাগল, গোরু, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির ভাইরাস-ঘটিত রোগ সংক্রমণ প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। তাই ভাইরাস রোগ দ্রুত জীবদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

## ❂ 1.13. ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ❂ (Prevention and Control of Viral diseases)

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়—

➤ (a) **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে (In Plants) ঃ**

(i) রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ অঙ্গ ধ্বংস বা জ্বালিয়ে দেওয়া।
(ii) রোগ প্রতিরোধী প্রজাতির বীজ রোপন করা।
(iii) রোগমুক্ত বীজ বা উদ্ভিদ অঙ্গ চাষের জন্য ব্যবহার করা।
(iv) কীটনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার করে উদ্ভিদকে পতঙ্গ মুক্ত করা।
(v) পৃথকীকরণ পদ্ধতি (Quarantine) অবলম্বন করা।
(vi) তাপ বা X-ray প্রয়োগ করে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করা।
(vii) কৃষিকার্যের সাজসরঞ্জামগুলি ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা।

➤ (b) **প্রাণীর ক্ষেত্রে (In Animals) ঃ**

(i) রোগ প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা।
(ii) হাঁচি, কাশির সময় মুখে রুমাল চাপা দেওয়া।
(iii) পৃথকীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
(iv) গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া।
(v) জল ও খাদ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা।

**রোগ প্রতিরোধে ব্যাকটেরিওফাজের ভূমিকা (Role of Bacteriophase for control of Viral diseases) ঃ** ব্যাকটেরিয়া-ঘটিত আমাশয়, টাইফয়েড, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে ব্যাকটেরিয়া-ধ্বংসী ফাজ রোগ প্রতিরোধক ওষুধ হিসাবে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এরা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ করে।

## ❂ 1.14. ভাইরাসের গুরুত্ব (Importance of Virus) ❂

মানুষ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নানারকম রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু হিসাবে ভাইরাসের গুরুত্ব অপরিসীম। জিন সংক্রান্ত গবেষণায় ও ভাইরাস নানা ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল **'ভাইরোলজি'** (Virology) একটি জীব বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা। ভাইরাস নানাভাবে আমাদের উপকারে আসে, যেমন—

1. **শিল্পে**—রোগ প্রতিরোধক টিকা বা ভ্যাকসিন উৎপাদন শিল্পে ভাইরাসের অবদান অপরিসীম। গুটি বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, হাম, মাম্পস, এনকেফালাইটিস প্রভৃতি রোগের টিকা তৈরিতে ভাইরাসের বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল ভাইরাস থেকে বহু রোগ প্রতিরোধী ওষুধ তৈরি করার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।
2. **অভিব্যক্তিতে**—জড় ও জীবের উভয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়ায় ভাইরাস জড় ও জীবজগতের সংযোগ রক্ষা করছে। এদের সাহায্যে জীবের সৃষ্টি, অভিব্যক্তি ও তার ক্রমবিকাশের গতিপথ নির্ধারণ করা গিয়েছে।
3. **জৈবিক নিয়ন্ত্রণে**—বিশেষ ভাইরাস ব্যবহার করে ফসলের পক্ষে বহু ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমন করা গিয়েছে।
4. **রোগ নিরাময়ে**—ব্যাকটেরিওফাজ রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে রোগ নিরাময় করে।
5. **গবেষণায়**—(i) পরীক্ষামূলক গবেষণায় ভাইরোলজি **আণবিক জীব বিজ্ঞানে** (Molecular Biology) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কতকগুলি ভাইরাস ব্যবহার করে উন্নতমানের উদ্ভিদ ও জিনের ত্রুটি সংশোধন করে বংশগত রোগ নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। (ii) জিন সংক্রান্ত গবেষণায় ভাইরাসের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। (iii) যে জিনের প্রভাবে পোষককোশে ক্যানসারের লক্ষণ দেখা যায় তাকে **অনকোজিন** বলে। অনকোজিন কোশ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে এবং অনিয়ন্ত্রিত কোশ বিভাজনের জন্য ক্যানসার রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে ক্যানসার রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাইরাসের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

● কোশযুক্ত জীব ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cellular organism and Virus) :

| কোশযুক্ত জীব | ভাইরাস |
|---|---|
| 1. দেহ কোশীয় সংগঠন যুক্ত এবং সাইটোপ্লাজম থাকে। | 1. দেহকোশীয় সংগঠন যুক্ত নয় এবং সাইটোপ্লাজম থাকে না। |
| 2. নিউক্লিয়াস থাকে। | 2. নিউক্লিয়াস থাকে না। |
| 3. ক্রোমোজোম থাকে। | 3. শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। |
| 4. RNA ও DNA উভয় নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। | 4. RNA অথবা DNA একটি মাত্র থাকে। |
| 5. প্রায় সব জৈব উপাদানগুলি থাকে। | 5. জৈব উপাদানের মধ্যে শুধু প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। |
| 6. পূর্বতন কোশ থেকে গঠিত জৈব উপাদানের অংশ দিয়ে নূতন কোশ গঠিত হয়। | 6. ভাইরাস শুধুমাত্র তার বংশাণুর উপাদান দিয়ে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে। |
| 7. কোশের সব বস্তুর সংশ্লেষের ফলে বৃদ্ধি ঘটে। | 7. নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন অংশের পৃথক সংশ্লেষ ও সংগঠনের সাহায্যে ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে। |
| 8. কোশ থেকে অপত্য কোশ উৎপন্ন হয়। | 8. পোষক দেহের বাইরে ভাইরাস থেকে নতুন ভাইরাস গঠিত হয় না। |
| 9. স্বভোজী ও পরভোজী। | 9. পরভোজী এবং সব সময় রোগসৃষ্টিকারী। |
| 10. কোশযুক্ত জীব সব সময়েই সজীব। | 10. পোষক কোশের বাইরে ভাইরাস জড় বস্তুর মতো অবস্থান করে। |

## ❁ ব্যাকটেরিয়া (BACTERIA) ❁

### ✪ আবিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Discovery and Short History) ঃ

1. প্রায় 300 বছর আগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক, ওলন্দাজ বিজ্ঞানী **লিউয়েন হক** (Leeuwen Hock, 1676) সর্বপ্রথম জীবাণু আবিষ্কারের ঘটনা জানান। নিজের হাতে তৈরি অত্যন্ত সরল এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু জল পরীক্ষার সময় কতকগুলি অতিক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি এই জীবাণুর বর্ণনা দেন ও নামকরণ করেন, **"অতিক্ষুদ্র দণ্ডাকৃতি প্রাণী"**।
2. বিজ্ঞানী **এহরেনবার্গ** (Ehrenberg, 1828) **ব্যাকটেরিয়া** নামকরণ করেন।
3. ফরাসি বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur, 1864) ও **রবার্ট কক** (Robert Kock, 1863) প্রমাণ করেন যে, যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি রোগ ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ঘটে।
4. ফরাসি চিকিৎসক **স্যাডিলট** (Sedillot)—ব্যাকটেরিয়াকে অণুজীব বা মাইক্রোবস নাম দেন।
5. **জিন্ডার ও লেজার-বার্গ** (Zinder and Lederberg 1952)—ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন।
6. বিজ্ঞানী **এফ. জে. কন** (F. J. Cohn, 1854)— ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন।
7. **মারি** (Mary, 1968)—ব্যাকটেরিয়াকে প্রোক্যারিটার অন্তর্ভুক্ত করেন।

আজ পর্যন্ত প্রায় 2,500 রকম ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ ও এদের বিবরণ লিপিবন্ধ করা হয়েছে। আজকাল বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখাকে **ব্যাকটেরিওলজি** (Bacteriology) বলা হয়। এই শাখা অধ্যয়ন করলে ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যায়।

## ✪ 1.15. ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ✪ (Definition and Characteristic of Bacteria)

❖ (a) **ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা** : ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, যেমন—

**1. সরল এককোশী আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম আণুবীক্ষণিক জীব, যারা সর্বত্র বিরাজমান তাদের ব্যাকটেরিয়া বলে।**

**2. মাইক্রোব নামে পরিচিত সর্বত্র বিরাজমান সরলতম এককোশী আণুবীক্ষণিক কোশপ্রাচীর যুক্ত জীবকে ব্যাকটেরিয়া বলা হয়।**

➤ (b) **ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Bacteria) :**

(i) ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র এককোশী আণুবীক্ষণিক জীব।

(ii) এদের দেহে নির্দিষ্ট কোশপ্রাচীর থাকে। আবার কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরের বাইরে একটি পিচ্ছিল স্তর থাকে।

(iii) কোশে নিউক্লিয়াস থাকে না। শুধু একটি প্যাঁচানো DNA তন্তু থাকে। একে ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম বলে। এই প্রকার অনুন্নত নিউক্লিয়াসকে **আদি** বা **প্রোক্যারিওটিক** নিউক্লিয়াস বলে।

(iv) ব্যাকটেরিয়ায় মাইটোকনড্রিয়া এবং ভ্যাকুওল থাকে না, কিন্তু মেসোজোম ও 70S রাইবোজোম থাকে।

(v) সাধারণত কোশে ক্লোরোফিল থাকে না। তাই এরা পরজীবী, মৃতজীবী বা মিথোজীবী। সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়াতে ব্যাকটেরিও-ক্লোরোফিল থাকে। তাই এরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। উদাহরণ— **ক্লোরোবিয়াম** *(Chlorobium)*

(vi) ব্যাকটেরিয়ায় শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটে। অবাত ও সবাত উভয় প্রক্রিয়া দেখা গেলেও বেশির ভাগ ব্যাকটেরিয়াতে অবাত-শ্বসন প্রক্রিয়া চলে। শ্বসন প্রক্রিয়া সাইটোপ্লাজমীয় পর্দা ও কোশ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নিঃসৃত এক প্রকার উৎসেচকের সহায়তায় ঘটে।

(vii) ব্যাকটেরিয়ার কোশ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় না। এরা প্রধানত অ্যামাইটোসিস প্রথায় বিভক্ত হয়।

(viii) এরা প্রধানত কোশ বিভাজন ও রেণুর (Spore) সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে। বিশেষ ধরনের যৌন জনন বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াতে দেখা যায়।

**চিত্র 1.9 :** একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়া কোশের গঠন।

(ix) বহু ব্যাকটেরিয়া পরজীবী হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে এবং আবার বহু ব্যাকটেরিয়া আছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপকার সাধন করে।

(x) ব্যাকটেরিয়া মাটি থেকে জৈব বস্তু অপসারণ এবং মাটির নাইট্রোজেন সংযোজন ঘটায়। এরা মাটির উর্বরতা রক্ষা করে। মাটি থেকে জৈব বস্তু অপসারণ এবং মাটির নাইট্রোজেন সংযোজন করে।

(xi) কোহল তৈরি করতে এবং নানা প্রকার বীজঘ্ন (antibiotic) ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

### ✪ ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য (Some facts related to Bacteria) :

**1. ব্যাকটেরিয়াকে আদি জীব বা প্রোক্যারিওটিক বলার কারণ (Reasons for considering Bacteria as Primitive Organism or Prokaryotic) :**

(i) ব্যাকটেরিয়াতে নিউক্লিয়াস নেই। (ii) কোশীয় অঙ্গাণু দেখা যায় না। (iii) রাইবোজোম 70S প্রকৃতির হয়। (iv) সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। (v) কোশ বিভাজন অ্যামাইটোসিস প্রথায় ঘটে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন দেখা যায় না।

2. **ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলার কারণ (Reasons for considering Bacteria as Plants) ঃ**

(i) ব্যাকটেরিয়াতে উদ্ভিদের মতো কোশপ্রাচীর আছে।
(ii) ফোটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের মতো ক্লোরোফিল দিয়ে খাদ্যসংশ্লেষ করে।
(iii) উদ্ভিদের মতো অঙ্গজ জনন পদ্ধতি দেখা যায়।
(iv) উদ্ভিদের মতো ভিটামিন সংশ্লেষ করতে পারে।
(v) ব্যাপন ও অভিস্রবণ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের মতো খাদ্য গ্রহণ করে।
(vi) অজৈব নাইট্রোজেন থেকে ব্যাকটেরিয়ার কোশ সব রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করতে পারে।
(vii) কিছু ব্যাকটেরিয়া বায়বীয় নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করতে পারে।

3. **ব্যাকটেরিয়াই জৈব বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—এরূপ মনে হওয়ার কারণ (Reasons for Considering Bacteria as the most primitive Organism in Organic Evolution) ঃ**

(i) প্রায় 50 কোটি বছর আগে আরকিওজয়িক যুগে ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব হয়েছিল।
(ii) এদের প্রকৃত নিউক্লিয়াস নেই।
(iii) এদের রাইবোজোম 70S প্রকৃতির হয়।
(iv) এদের লাইসোজোম নেই।
(v) জনন প্রক্রিয়া প্রাচীন ধরনের।
(vi) প্রায় সব জায়গাতেই এদের দেখা যায়।
(vii) অনেক ব্যাকটেরিয়া $O_2$ ছাড়া বাঁচতে পারে।
(viii) বহু ব্যাকটেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেনকে স্থিতিকরণ করতে পারে।

এই সব কারণের জন্য জৈব বিবর্তনে ব্যাকটেরিয়া প্রাচীন।

4. **জীবজগতে ব্যাকটেরিয়ার স্থান (Position of Bacteria in Living Organism) ঃ**

কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ফ্লাজেলার সাহায্যে চলতে পারে বলে অনেকে এদের প্রাণীগোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। কিন্তু কন্ (Cohn) ব্যাকটেরিয়ার নির্দিষ্ট কোশপ্রাচীর, নীলাভ সবুজ শৈবালের সঙ্গে প্রকৃতিগত ও অন্তর্গঠনে মিল থাকায়, এদের উদ্ভিদগোষ্ঠী বলে মনে করেন। অন্য গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা এদের **আদি জীবগোষ্ঠীর** (Protista) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **ডি বেরী (de Barry)** ব্যাকটেরিয়াকে **সমাঙ্গদেহী** উদ্ভিদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করেন। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়াকে **আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত জীব** (Prokaryota organism) গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

## ❂ 1.16. ব্যাকটেরিয়ার অবস্থান, প্রকারভেদ, আয়তন ও গঠন ❂ (Occurrence, Types, Size and Structure of Bacteria)

➤ (a) **ব্যাকটেরিয়ার অবস্থান (Occurrence of Bacteria) ঃ** ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অর্থাৎ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে দেখা যায়। সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে সমুদ্রের অতল গভীরে, উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে ঠান্ডা বরফাবৃত জায়গায়ও ব্যাকটেরিয়া থাকে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, বস্ত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে, মানুষের মুখগহ্বর, শ্বাসনালি, অন্ত্র প্রভৃতিতেও ব্যাকটেরিয়া দেখা যায়। $-190^{\circ}C$ থেকে $75^{\circ}C$ পর্যন্ত উষ্ণতা ব্যাকটেরিয়া সহ্য করতে পারে। সাধারণত এরা প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে মৃতজীবী বা পরজীবী হিসেবে অবস্থান করে। সুগভীর নলকূপে ও প্রবল বৃষ্টির জলে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় না।

কতকগুলি ব্যাকটেরিয়ার বাসস্থান নীচে দেওয়া হল।

1. **মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া**—*নাইট্রোসোমোনাস* (*Nitrosomonas*), *নাইট্রোব্যাকটার* (*Nitrobacter*), *অ্যাজোটোব্যাকটার* (*Azobacter*), *রাইজোবিয়াম* (*Rhizobium*) প্রভৃতি।
2. **জলে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া**—*সালমোনেলা টাইফোসা* (*Salmonella typhosa*), *ক্লসট্রিডিয়াম টিটানি* (*Clostridium tetani*), *ভিব্রিও কমা* (*Vibrio comma*) প্রভৃতি।

3. **বাতাসে বিচরণকারী ব্যাকটেরিয়া**—*ব্যাসিলাস সাবটিলিস* (*Bacillus subtillis*), *ক্লসট্রিডিয়ামের* কয়েকটি প্রজাতি (Some species of *Clostridium*), *সারসিনা লুটিয়া* (*Sarcina lutea*) প্রভৃতি।
4. **দুধে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া**—*ল্যাকটোব্যাসিলাস* (*Lactobacillus*), *স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস* (*Streptococcus lactis*), *এসচিরিচিয়া কোলাই* (*Escherichia coli*), *অ্যারোব্যাকটার অ্যারোজেনস* (*Aerobacter aerogens*) ইত্যাদি।
5. **মাংস ও ডিমে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া**—*প্রোটিয়াস* (*Proteus*), *সিউডোমোনাস* (*Pseudomonas*) প্রজাতি প্রভৃতি।
6. **মানুষের দেহে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া**—*সালমোনেলা টাইফি* (*Salmonella typhi*) *ভিব্রিও কলেরি* (*Vibrio cholerae*), *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* (*Mycobacterium tuberculosis*) ইত্যাদি।
7. **উদ্ভিদদেহে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া**—*জ্যান্থোমোনাস সাইট্রি* (*Xanthomonas citri*), *জ্যান্থোমোনাস ওরাইজি* (*Xanthomonus oryzae*), *করিনিব্যাকটেরিয়াম সেপিডোনিকাম* (*Corynebacterium sepidonicum*) প্রভৃতি।

➤ (b) **ব্যাকটেরিয়ার আয়তন (Size of Bacteria)** ঃ ব্যাকটেরিয়া জীবের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। সর্বাপেক্ষা ছোটো ব্যাকটেরিয়া মানুষের শ্বাসনালিতে রোগ সৃষ্টি করে। এর নাম ডায়ালিস্টার নিউমোসিন্টেস (*Dialister pneumosintes*), এরা লম্বায় 0·15 μm। সবচেয়ে বড়ো ব্যাকটেরিয়া হল ব্যাসিলাস বুটসচিল্লি (*Bacillus butschilli*) এরা লম্বায় 80 μm পর্যন্ত হতে পারে। দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া চওড়ায় 0·2 – 3 μm এবং লম্বায় 0·3 – 10 μm পর্যন্ত হয়। সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়া লম্বায় প্রায় 500 μm পর্যন্ত হতে পারে। স্পাইরিলাম জাতীয় ব্যাকটেরিয়া চওড়ায় 2 – 3 μm এবং লম্বায় 10 – 15 μm পর্যন্ত হয়। সাধারণত রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার ব্যাস 0·2 – 10 μm পর্যন্ত হয়।

**● ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ●**

1. ব্যাকটেরিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন—এহরেনবার্গ (Ehrenberg, 1828)।
2. ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া—*Dialister pneumosintes* (0·15 μm লম্বা)
3. সবচেয়ে বড়ো ব্যাকটেরিয়া—(*Bacillus butschilli* (80 μm লম্বা)
4. **বহুরূপতা** (Pleomorphism)—পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য অনেক সময় ব্যাকটেরিয়ার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। একে বহুরূপতা বলে।

## ✪ 1.17. আদর্শ ব্যাকটেরিয়া কোশের (ই. *কোলাই*) গঠন এবং জনন ✪ (Structure of Typical Bacterial cell (*E. Coli*) and Reproduction)

### ▲ A. *এসচিরিচিয়া কোলাই*-এর গঠন (Structure of *Escherichia coli*) ঃ

এসচিরিচিয়া কোলাই এক প্রকার পরিচিত **গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া**। এরা মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে। এদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ স্ট্রেনস্ (strains) মারাত্মক ধরনের উদরাময় রোগ ঘটিয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে। এসচিরিচিয়া কোলাই-এর দেহকে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়, যেমন—**দেহআবরক** (Outer covering) ও **প্রোটোপ্লাস্ট** (Protoplast)।

➤ 1. **দেহ আবরক (Outer covering)** ঃ দেহকোশের বাইরের আবরক তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

(a) **স্লাইম স্তর বা ক্যাপসুল** (Slime layer or capsule)—কোশপ্রাচীরের বাইরে পুরু ও পিচ্ছিল পদার্থ দিয়ে তৈরি আবরণকে **স্লাইম স্তর** বলে। কোশ নিঃসৃত পদার্থ দিয়ে এই স্তর গঠিত হয়। এই স্লাইম স্তর শক্ত হয়ে প্রতিকূল পরিবেশে ক্যাপসুল গঠিত হয়। প্রধানত পলিস্যাকারাইড ও পলিপেপটাইড দিয়ে এই স্তর গঠিত। ● **কাজ**—কোশকে রক্ষা করা হল স্লাইম স্তরের প্রধান কাজ।

(b) **কোশ প্রাচীর** (Cell wall)—*ই. কোলাই* একপ্রকার গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা এবং ত্রিস্তর বিশিষ্ট। কোশপ্রাচীরের বাইরে সাইটোপ্লাজমীয় পর্দার নীচে প্রধানত লিপোপলিস্যাকার‍্যাইড ও ফসফোলিপিড থাকে। অন্তস্তরের কোশপ্রাচীরের মূল উপাদান হল 5-10% **পেপটাইডোগ্লাইকেন** (Peptidoglycan)। এতে কোনো সেলুলোজ থাকে না। পেপটাইডোগ্লাইকেন এক প্রকার জটিল জৈব পদার্থ। এটি দুরকম অ্যামাইনো শর্করা (Amino

sugar) ও কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। দুপ্রকার অ্যামাইনো শর্করা হল **এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিন** (N-acetyl glucosamine) এবং **এন-অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড** (N-acetyl muramic acid)। এরা পর্যায়ক্রমিকভবে (Alternately) গ্লুকোসাইডিক বন্ধনী (Glucosidic bond) দিয়ে পর পর যুক্ত হয়ে **গ্লাইকেন তন্তু** (Glycan strand) গঠন করে। এই গ্লাইকেন তন্তুর প্রতিটি এন-অ্যাসিটাইলমিউরামিক অ্যাসিডের সঙ্গে চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেমন—**এল-অ্যালানিন** (L.alanine), **ডি-গ্লুটামিক অ্যাসিড** (D-glutamic acid), **মেসো-ডাইঅ্যামাইনোপিমেলিক অ্যাসিড** (Meso-diaminopimelic acid) এবং **ডি-অ্যালানিন** (D-alanine) পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে পর পর যুক্ত থাকে। কোশ প্রাচীরে একাধিক গ্লাইকেন তন্তু পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে।

কোশ প্রাচীরের পেপটাইডোগ্লাইকেন এবং বাইরের সাইটোপ্লাজমীয় পর্দার মধ্যবর্তী স্থানে **পেরিপ্লাজমিক অঞ্চল** থাকে। এতে অনেকগুলি উৎসেচক ও বিপাকীয় বস্তু জমা হয়ে **পেরিপ্লাজম** গঠন করে। ই. কোলাই-এর কোশপ্রাচীর গ্রাম রঞ্জকে রঞ্জিত হয় না।
● **কাজ**—1. কোশপ্রাচীর কোশের নির্দিষ্ট আকার গঠনে সহায়তা করে। 2. ব্যাকটেরিয়াকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। 3. কোশপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে দ্রবণগুলি সহজে সাইটোপ্লাজমীয় পর্দায় পৌঁছাতে পারে।

(c) **কোশপর্দা** (Cell membrane)— কোশপ্রাচীরের ভেতরে সাইটোপ্লাজমের চারদিকে সূক্ষ্ম, সক্রিয় একটি অর্ধভেদ্য পর্দা থাকে। একে **কোশপর্দা বা সাইটোপ্লাজমীয় পর্দা** বলা হয়। ফসফোলিপিড, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড ইত্যাদি দিয়ে এই পর্দা গঠিত হয়। ● **কাজ**—কোশের ভিতরে ও বাইরে দ্রবীভূত পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে ও বিভিন্ন প্রকার জৈব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

➤ 2. **প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast)** : কোশপর্দা বা সাইটোপ্লাজমীয় পর্দার ভেতরের সব অংশকে **প্রোটোপ্লাস্ট** বলে। প্রোটোপ্লাস্ট সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লীয় বস্তু নিয়ে গঠিত।

চিত্র 1.10 : এসচিরিচিয়া কোলাই-এর গঠন।

(a) **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)— নিউক্লীয় বস্তু ছাড়া অবশিষ্ট জেলির মতো অর্ধতরল, অর্ধস্বচ্ছ, সমসত্ত্ব দানাদার অংশটিকে সাইটোপ্লাজম বলা হয়। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও খনিজ লবণ থাকে। সাইটোপ্লাজমে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে, যেমন— (i) রাইবোজোম সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকার দানা যা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত এবং 70S প্রকৃতির। ● **কাজ**—প্রোটিন সংশ্লেষ এদের প্রধান কাজ।

(ii) **মেসোজোম** (Mesosome)—এই সাইটোপ্লাজমীয় পর্দাটি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রসারিত হয়ে ফাঁসের মতো বা কুণ্ডলীকৃত আকৃতির হয়। ● **কাজ**—কোশ বিভাজনের সময় বিভেদ প্রাচীর গঠন করা, DNA এবং প্রতিলিপি গঠনে সহায়তা করা, শ্বসনে সাহায্য করা ও বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশগ্রহণ প্রভৃতি এদের প্রধান কাজ।

চিত্র 1.11 : মেসোজোমের গঠন।

(iii) **গহ্বর** (Vacuole)—সাইটোপ্লাজমে এক বা একাধিক ও বিভিন্ন আকৃতির গহ্বর থাকে। ● **কাজ**—এতে খাদ্য ও গ্যাস সঞ্চিত থাকে।

(iv) **সঞ্চিত বস্তু** (Storage Product)—সাইটোপ্লাজমে জমানো পদার্থ হল সঞ্চিত বস্তু, যেমন—শ্বেতসার, লিপিড, প্রোটিন, গ্লাইকোজেন ভলিউটিন দানা, সালফার, ভিটামিন প্রভৃতি।

(b) **নিউক্লীয় বস্তু** (Nuclear material) : নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয় আবরণী, নিউক্লীয় জালিকা ও নিউক্লিওলাস থাকে না। তাই একে **নিউক্লিওয়েড** বলে। আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশে ক্রোমোজোম বলতে যা বোঝায় ব্যাকটেরিয়ার কোশে ঠিক সেই রকম ক্রোমোজোম থাকে না। আদর্শ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের DNA-এর সঙ্গে হিসটোন (Histone) প্রোটিন যুক্ত থাকে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার আদি নিউক্লিয়াসের DNA তে কোনো হিসটোন প্রোটিন থাকে না। তাই ব্যাকটেরিয়ার নগ্ন DNA-কে **জেনোফোর**

বলে। প্রতিটি জেনোফোরে কতকগুলি প্রোটিন (RNA পলিমারেজ) অণু দিয়ে ঘেরা একটি কেন্দ্রীয় মজ্জা থাকে। এসব প্রোটিন অণুতে কুণ্ডলীকৃত ফাঁসের মতো 12-80 টির মতো DNA যুক্ত থাকে। ● **কাজ**—কোশের বিভাজন ঘটানো, পরিব্যক্তি (Mutation) এবং বংশ পরম্পরায় সঞ্চারণ হল এর প্রধান কাজ।

➤ 3. **পিলি (Pili)** ঃ কোশ প্রাচীরের বাইরের দিকে ক্ষুদ্র সুতোর মতো অসংখ্য উপাঙ্গ দেখা যায়। এদের পিলি বলে। পিলি দুরকমের হয়, যেমন—**অঙ্গজ পিলি ও যৌন পিলি**। ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রায় 100-400 পিলি থাকে। এরা পিলিন প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ● **কাজ**—অঙ্গাজ পিলি পোষক কোশের গায়ে আবন্ধ হতে এবং যৌন পিলি যৌন জননের সময় দুটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে।

চিত্র 1.12 ঃ পিলির গঠন।

চিত্র 1.13 ঃ ফ্ল্যাজেলামের গঠন।

➤ 4. **ফ্ল্যাজেলা (Flagella)** ঃ কোশদেহে স্ট্রেনস্ অনুযায়ী এক বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে যা গমনে সাহায্য করে।

প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের তিনটি অংশ থাকে, যেমন—**ভিত্তিদেহ** (Basal body), **হুক** (Hook) এবং **সূত্র** (Filament)। ভিত্তিদেহ কোশ আবরণীর অভ্যন্তরে আবন্ধ থাকে। ভিত্তিদেহে চারটি বিভিন্ন দূরত্বে রিং (Ring) থাকে। হুকের নীচের অংশ কোশ প্রাচীরের মধ্যে থাকে এবং সূত্রটি কোশের বাইরে থাকে। ● **কাজ**—ফ্ল্যাজেলা ব্যাকটেরিয়ার গমনে সাহায্য করে।

## ▲ B. ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria) ঃ

ব্যাকটেরিয়া সাধারণত তিন ভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে, যেমন—**অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন এবং যৌন জনন**।

➤ **1. অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)** ঃ অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া অঙ্গজ জননের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে। সাধারণত দু'রকমের অঙ্গজ জনন দেখা যায়।

(i) **বিভাজন** (Fission)—বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যাকটেরিয়ার প্রধান অঙ্গজ জনন পদ্ধতি। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার বিভাজন প্রক্রিয়াটি **দ্বিবিভাজন**। প্রক্রিয়ার শুরুতেই মাতৃকোশটি কিছুটা লম্বা হয় এবং কোশপ্রাচীরের মাঝে একটি সংকোচন দেখা যায়। মাতৃকোশের জিনোমের (DNA) প্রতিলিপি (Replication) গঠিত হয়। DNA-এর প্রতিলিপি গঠনের সময়, গোল আকৃতির জিনোম বিভাজিত হয়ে দুটি গোলাকার DNA গঠন করে। এর পর খাঁজ বা সংকুচিত অংশটি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষে মাতৃকোশটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়া 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অনুকূল অবস্থায় প্রতিটি অপত্য কোশ একইভাবে বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে।
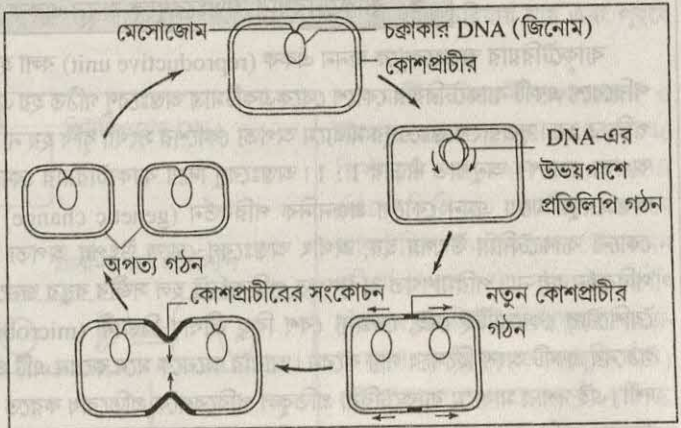
চিত্র 1.14 ঃ *ই.. কোলির* দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়া।

(ii) **মুকুলোদ্গম** (Budding) —কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া এই পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে কোশপ্রাচীরের যে-কোনো একদিকে মুকুলের মতো বেড়ে যায়। মাতৃ নিউক্লিয়াসের একটি খণ্ডাংশ ও প্রোটোপ্লাস্টের একটি অংশ মুকুলের মধ্যে যায়। মুকুলটি আস্তে আস্তে বড়ো হয় এবং পরে মাতৃকোশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। **উদাহরণ**— *রোডোসিউডোমোনাস*।

**2. অযৌন জনন (Asexual reproduction) :** বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন প্রক্রিয়া ব্যাকটেরিয়াতে দেখা যায়।

(i) **অ্যারথোস্পোর গঠন**—কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া ছত্রাকের মতো অনুসূত্র গঠন করে। এই অনুসূত্রগুলির শীর্ষে লম্বা দণ্ডের মতো অ্যারথোস্পোর গঠিত হয়ে অনুসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ব্যাকটেরিয়া গঠন করে। **উদাহরণ**—*Actinomycetes (অ্যাকটিনোমাইসিটিস)*।

অন্তঃরেণু বা এন্ডোস্পোর

চিত্র 1.15 : অন্তঃরেণুর গঠন।

(ii) **অন্তঃরেণু** (Endospore) — বহু ব্যাকটেরিয়াতে প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার দেহকোশে একটি করে পুরু প্রাচীরযুক্ত রেণু গঠিত হয়। যে ব্যাকটেরিয়া কোশ অন্তঃরেণু গঠন করে সেই কোশকে **স্পোরানজিয়াম** বলে। অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া কোশ ফেটে অন্তঃরেণু বেরিয়ে আসে এবং নতুন ব্যাকটেরিয়া গঠন করে। 100°C তাপেও অন্তঃরেণুর জীবনী শক্তি অটুট থাকে। **উদাহরণ**—*Clostridium (ক্লসট্রিডিয়াম), Spirillum (স্পাইরিলাম)* প্রভৃতি।
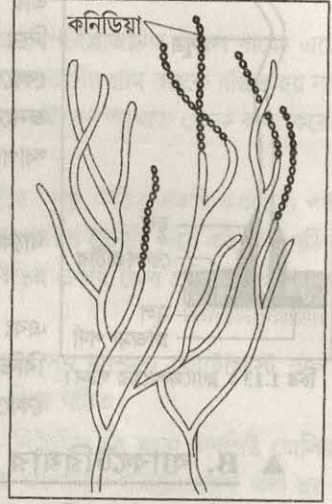
(iii) **কনিডিয়া** (Conidia)—কতকগুলি ব্যাকটেরিয়ার দেহ সূত্রাকার ও শাখাযুক্ত। এদের কনিডিয়ার মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে। এই ব্যাকটেরিয়ার দেহে কতকগুলি বিশেষ শাখা (কনিডিওফোর) গঠিত হয়। এই শাখার শীর্ষে কতকগুলি গোলাকার কনিডিয়া উৎপন্ন হয়। এরা পরপর শৃঙ্খলাকারে যুক্ত থাকে। পরে কনিডিয়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুকূল পরিবেশে প্রত্যেকটি অপত্য ব্যাকটেরিয়া গঠন করে। **উদাহরণ**—*Streptomyces (স্ট্রেপটোমাইসিস)*।

চিত্র 1.16 : কনিডিয়ার গঠনের চিত্ররূপ।

(iv) **সিস্ট** (Cysts)—কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে কোশের চারপাশে পুরু প্রাচীর গঠন করে। এই অবস্থাকে সিস্ট বলে। অনুকূল পরিবেশে সিস্ট অঙ্কুরিত হয়ে নতুন ব্যাকটেরিয়া গঠিত হয়। **উদাহরণ**—*Azotobacter (অ্যাজোটোব্যাক্টর)*।

### • ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃরেণুকে জনন একক না বলার কারণ •

ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃরেণুকে জনন একক (reproductive unit) বলা হবে কিনা এ-বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। প্রতিকূল পরিবেশে একটি ব্যাকটেরিয়ার কোশে থেকেএকটিমাত্র অন্তঃরেণু গঠিত হয় এবং অনুকূল পরিবেশে এটি একটি ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়। সুতরাং অন্তঃরেণুর মাধ্যমে অপত্য কোশের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ মাতৃকোশ এবং অন্তঃরেণু থেকে উৎপন্ন অপত্য কোশের অনুপাত দাঁড়ায় 1 : 1। অন্তঃরেণু দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোশের সংখ্যা কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আবার অন্তঃরেণুর মধ্যে এমন কোনো প্রজননিক পরিবর্তন (genetic change) ঘটে না যার জন্য নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ অন্তঃরেণু থেকে উৎপন্ন অপত্য ব্যাকটেরিয়ার কোনো গুণগত (qualitative) পরিবর্তন হয় না। পরিমাণগত বা গুণগত পরিবর্তনই হল সজীব বস্তুর জননের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু অন্তঃরেণুর এই বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই নেই, সেজন্য বেশ কিছু জীবাণু বিজ্ঞানী (microbiologist) অন্তঃরেণুকে ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গজ গঠনের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করেন। আবার অনেকে মনে করেন এটি প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ দশা। এই দশার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। অন্তঃরেণুর প্রাচীর অঙ্গজ কোশের তুলনায় বেশি পুরু। তাছাড়া অন্তঃরেণুর প্রাচীরে ডাইপিকোলিনিক অ্যাসিড (Di-picolinic acid) ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) অতিরিক্ত যৌগ হিসেবে থাকায়, অন্তঃরেণু প্রতিকূল পরিবেশেও সজীবতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

**3. যৌন জনন (Sexual reproduction) :** 1940 খ্রিস্টাব্দের আগে আমাদের ধারণা ছিল ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু পরে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন অর্থাৎ প্রজননিক বস্তুর আদানপ্রদান তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, যেমন—**রূপান্তরভবন, সংযুক্তি** এবং **ট্রান্সডাকশন**।

### 1. রূপান্তরভবন বা ট্রান্সফরমেশন (Transformation) ঃ

❖ **রূপান্তরভবনের সংজ্ঞা (Definition of Transformation) ঃ কোনো ব্যাকটেরিয়ার DNA যখন অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া কোশের মধ্যে যায় এবং ওই DNA অংশটি কোশের জিনোমের মধ্যে প্রতিস্থাপন হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয় তখন এই ঘটনাকে রূপান্তরভবন বলে।**

ইংরেজ বিজ্ঞানী **ফ্রেডরিক গ্রিফিথ** (Frederick Griffith) প্রথম এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি *Diplococcus pneumoniae (ডিপলোকক্কাস নিউমোনি)* নামে ব্যাকটেরিয়ায় এই ঘটনা প্রথম লক্ষ করেন। এই ডিপলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দু'রকমের হয়। একধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোশের চারদিকে **মোটা স্তর বা ক্যাপসুল** থাকে। এরা মারাত্মক নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে। অন্য ধরনের ব্যাকটেরিয়াতে মোটা ক্যাপসুল থাকে না এবং এরা রোগ সৃষ্টি করে না অর্থাৎ ক্ষতিকারক নয়। ক্যাপসুলযুক্ত মৃত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার DNA সংগৃহীত করে, জীবিত ক্যাপসুলবিহীন ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে দেখা যায়, এই DNA ক্যাপসুলবিহীন ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে এবং কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত ব্যাকটেরিয়ার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল—(a) মোটা স্তর বা ক্যাপসুল গঠন। (b) রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন।
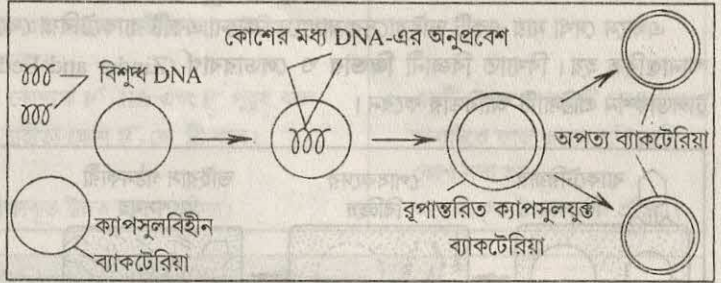
চিত্র 1.17 ঃ রেখাচিত্রে ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরভবন বা ট্রান্সফরমেশন।

**অ্যাভেরী** (Avery), **ম্যাকলিওড** (Macleod), **ম্যাককার্টি** (McCarty) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা 1944 খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, DNA-ই রূপান্তরভবনের প্রধান উপাদান।

### 2. সংযুক্তি (Conjugation) ঃ

❖ **সংযুক্তির সংজ্ঞা (Definition of Conjugation) ঃ দাতা পুরুষ ব্যাকটেরিয়া ও স্ত্রী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যৌন জননের সময় দাতা পুরুষ ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর অপত্য প্রতিলিপি মিলন নালি দিয়ে স্ত্রী ব্যাকটেরিয়ায় যায় এবং পুরুষে রূপান্তরিত করে তাকে সংযুক্তি বলে।**
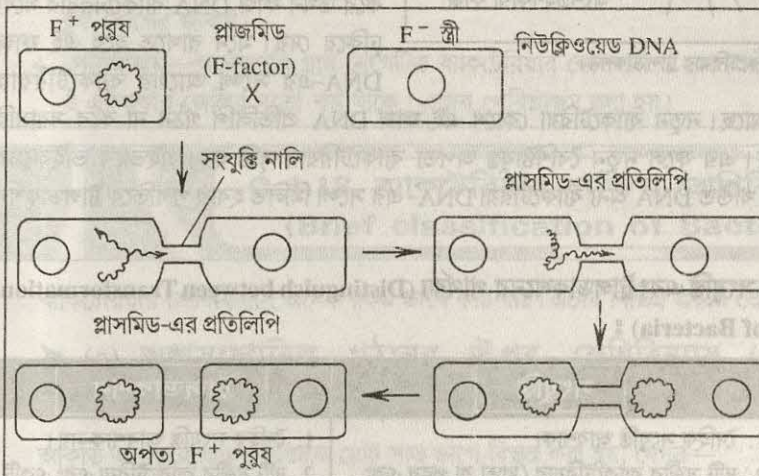
চিত্র 1.18 ঃ রেখাচিত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংযুক্তি বা কনজুগেশন।

মার্কিন বিজ্ঞানী **লেডারবার্গ ও টটাম** (Lederberg and Tatum) 1946 খ্রিস্টাব্দে *Escherichia coli (এশ্চেরিচিয়া কোলি)* নামে ব্যাকটেরিয়াতে এই ধরনের যৌন জনন প্রক্রিয়া দেখতে পান। দু'ধরনের অর্থাৎ দু'প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত *E. Coli*-র মধ্যে **সমমিলন** ও **সংযুক্তি** ঘটে। যৌন-জননে অংশগ্রহণকারী দুটি *E. Coli*-র একটিকে দাতা এবং অন্যটিকে গ্রহীতা বলা হয়।

দাতা ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিওয়েড DNA ছাড়া সাইটোপ্লাজমে একটি বিশেষ ধরনের প্লাজমিড DNA থাকে। একে উর্বরতা সম্পন্ন বা F-ফ্যাক্টর বলে। এই দাতা ব্যাকটেরিয়াকে $F^+$ পুরুষ ব্যাকটেরিয়া বলে। গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোনো প্লাজমিড DNA থাকে না। এই জন্যে একে $F^-$ স্ত্রী ব্যাকটেরিয়া বলে।

দাতা ও গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সংযুক্তির সময় উভয় ব্যাকটেরিয়ার কোশের মধ্যে একটি সংযুক্তি নালি গঠিত হয়। দাতা ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড DNA প্রতিলিপি গঠন করে এবং অপত্য প্রতিলিপি মিলন নালি দিয়ে গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়াতে যায়। কিছুক্ষণ পরে কোশ দুটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং গ্রহীতা বা স্ত্রী ব্যাকটেরিয়া $F^+$ পুরুষে রূপান্তরিত হয়।

## ● 3. ট্রান্সডাকশন (Transduction) ঃ

❖ **ট্রান্সডাকশনের সংজ্ঞা (Definition of Transduction) ঃ ভাইরাসের সাহায্যে একটি ব্যাকটেরিয়ার আংশিক বা খণ্ডিত DNA অন্য ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে মিলিত হবার পদ্ধতিকে ট্রান্সডাকশন বলে।**

এখানে দেখা যায় একটি ভাইরাসের মাধ্যমে কোনো একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে জেনেটিক পদার্থ অন্য একটি ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী **জিন্ডার ও লেডারবার্গ** (Zinder and Lederberg) 1952 খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়া কোশে ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।
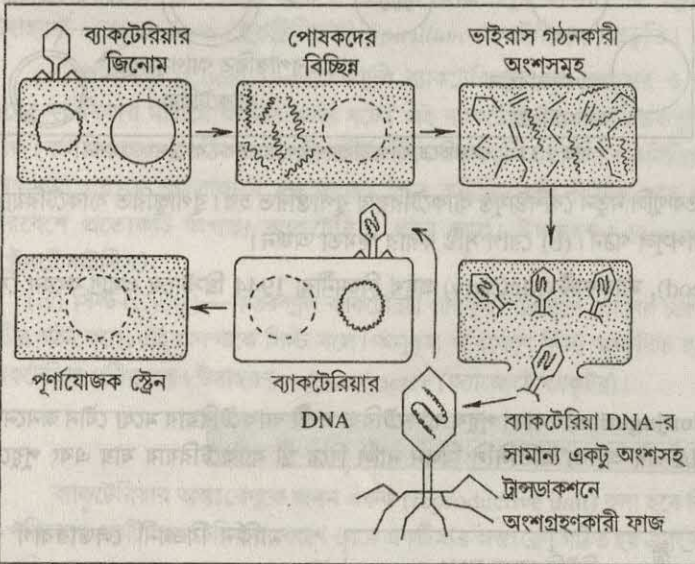
চিত্র 1.19 ঃ রেখাচিত্রে ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সডাকশন।

এই পদ্ধতিতে দুটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রজননিক বস্তুর (DNA) আদান-প্রদান ঘটার সময় দৈহিক সংযুক্তি ঘটে না। প্রজননিক বস্তুর আদানপ্রদান ফাজ ভাইরাসের সহায়তায় ঘটে। একটি ফাজ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোশকে আক্রমণ করে এবং ফাজ DNA ব্যাকটেরিয়া কোশে যায়। ফাজ DNA বহু প্রতিলিপি গঠন করে। এই সময় আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়ার DNA কতকগুলি খণ্ডে ভেঙে যায়। এর পর যখন ভাইরাসের উপাদানগুলি যুক্ত হয়ে অপত্য ফাজ গঠিত হয়, তখন ব্যাকটেরিয়া DNA-এর খণ্ডাংশ ফাজের DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ফাজ যখন আবার নতুন অন্য ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে তখন ফাজ DNA ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে এই ফাজ DNA-এর সঙ্গে আগের ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর খণ্ডাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। নতুন ব্যাকটেরিয়া কোশে এই ফাজ DNA প্রতিলিপি গঠন না করে সরাসরি ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপত্য ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভাইরাসের সাহায্যে একটি ব্যাকটেরিয়ার আংশিক বা খণ্ডিত DNA অন্য ব্যাকটেরিয়া DNA- এর সঙ্গে মিলিত হবার পদ্ধতিকে ট্রান্সডাকশন বলা হয়।

## ● ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরভবন, সংযুক্তি এবং ট্রান্সডাকশনের পার্থক্য (Distinguish between Transformation, Conjugation and Transduction of Bacteria) ঃ

| রূপান্তরভবন | সংযুক্তি | ট্রান্সডাকশন |
|---|---|---|
| 1. দৈহিক সংযুক্তি আবশ্যক নয়। | 1. দৈহিক সংযুক্তি আবশ্যক। | 1. দৈহিক সংযুক্তি আবশ্যক নয়। |
| 2. একটি সজীব ব্যাকটেরিয়া এবং একটি মৃত বা জীবিত ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে পরিস্রুত DNA-এর মধ্যে এই প্রক্রিয়া ঘটে। | 2. দুটি সজীব ব্যাকটেরিয়ার (দাতা বা পুরুষ এবং গ্রহীতা বা স্ত্রী) মধ্যে এই প্রক্রিয়া ঘটে। | 2. দুটি সজীব ব্যাকটেরিয়া এবং একটি ব্যাকটেরিওফাজ মাধ্যম প্রয়োজন। |

| রূপান্তরভবন | সংযুক্তি | ট্রান্সডাকশন |
|---|---|---|
| 3. সজীব ব্যাকটেরিয়া পরিস্রুত DNA শোষণ করে। | 3. স্ত্রী (গ্রহীতা) এবং পুরুষ (দাতা) ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পুরুষ ব্যাকটেরিয়ার যৌন পিলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটায় এবং একটি সংযুক্তি নালি-পথ সৃষ্টি হয়। এই নালিপথে পুরুষ ব্যাকটেরিয়ার দেহস্থ বিশেষ প্লাজমিড DNA-এর প্রতিলিপি এবং কোনো কোনো সময় পুরুষ ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর খণ্ডাংশ গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে। | 3. ফাজের সাহায্যে বাহিত একটি ব্যাকটেরিয়ার আংশিক DNA অন্য ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে মিলিত হয়। |
| 4. রূপান্তরিত হতে পারে এমন কোশকে উপযুক্ত (Competent) কোশ বলে। | 4. দাতা কোশকে $F^+$, Hfr এবং $F'$ পুরুষ বলে এবং গ্রহীতা কোশ $F^-$-কে স্ত্রী বলে। | 4. একটি কোশকে সংবেদী কোশ এবং অন্যটিকে ফাজ জননে প্রতিরোধী কোশ বলা হয়। |
| 5. অনুন্নত জনন প্রক্রিয়া বলা যায়। | 5. অপেক্ষাকৃত উন্নত জনন প্রক্রিয়া। | 5. অপেক্ষাকৃত উন্নত জনন প্রক্রিয়া। |

### ● ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য ●

1. **প্লাসমিড**—ব্যাকটেরিয়া কোশে একটি দ্বিতন্ত্রী বংশগতি DNA থাকে। এটি ছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত দ্বিতন্ত্রী চক্রাকার DNA ব্যাকটেরিয়ার কোশের সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়। এই DNAটি নিজেই বিভাজিত হতে পারে। এটি ব্যাকটেরিয়া কোশে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। বংশগতি বস্তু থেকে আলাদা এই আনুষঙ্গিক DNA-কে প্লাসমিড বলা হয়। প্লাসমিড বিভিন্ন প্রকারের হয়। এরা নানা প্রকার কাজ করে, যেমন—(i) যৌন পিলি তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। (ii) বীজঘ্ন (Antibiotic) প্রতিরোধে অংশ নেয়। (iii) আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্লাসমিডের সাহায্যে অন্য প্রজাতি ব্যাকটেরিয়ার DNA প্লাসমিডের সঙ্গে যুক্ত করে রিকম্বিনান্ট DNA তৈরি করছে।
2. **এপিজোম**—ব্যাকটেরিয়া কোশে যে অতিরিক্ত দ্বিতন্ত্রী চক্রাকার DNA অপর ব্যাকটেরিয়া কোশের বংশগতি DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বার বার বিভাজিত হয় তাকে এপিজোম বলে।
3. **মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি কী?**
   কুষ্ঠ রোগের জীবাণু।
4. **পেরিপ্লাজম**—অনেকগুলি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপর্দা ও কোশপ্রাচীরের মধ্য ভাগে অনেকগুলি উৎসেচক ও একপ্রকার জেলির মতো বস্তু থাকে। এদের পেরিপ্লাজম বলা হয়।

## ✪ 1.18. ব্যাকটেরিয়ার সংক্ষিপ্ত শ্রেণিবিন্যাস ✪ (Brief classification of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস অনেক রকম ভাবে করা যায়। এদের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

### ➤ (a) অঙ্গসংস্থানিক গঠনের উপর শ্রেণিবিন্যাস (Classification on the basis of Morphology) :

আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে মোট সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

**1. গোলাকার বা কক্কাস** (Coccus)— **অতি ক্ষুদ্র গোলাকার বা ডিম্বাকার এককোশী ব্যাকটেরিয়াকে কক্কাস, বহুবচনে কক্কি (Cocci) বলা হয়।** অবস্থান অনুযায়ী কক্কাস বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন— (i) কক্কাসগুলি এককভাবে থাকলে তাদের **মাইক্রোকক্কাস** (Micrococcus) বলে। উদাহরণ—*Micrococcus flavus* (*মাইক্রোকক্কাস ফ্ল্যাভাস*)। (ii) দুটি গোলাকার

ব্যাকটেরিয়া একসঙ্গে অবস্থান করলে তাদের *Diplococcus* (*ডিপ্লোকক্কাস*) বলা হয়। উদাহরণ—*Diplococcus pneumoniae* (*ডিপ্লোকক্কাস নিউমোনি*)। (iii) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে, তাদের Streptococcus (*স্ট্রেপটোকক্কাস*) বলে। উদাহরণ—*Streptococcus pyrogens* (*স্ট্রেপটোকক্কাস পাইরোজেনস*)। (iv) কতকগুলি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একত্রে আঙুর গুচ্ছের মতো অবস্থান করলে তাদের Staphylococcus (*স্ট্যাফাইলোকক্কাস*) বলা হয়। উদাহরণ—*Staphylococcus aureus*(*স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস*)। (v) অনেক সময় 6টি বা 16টি বা ততোধিক গোলাকার ব্যাকটেরিয়া ক্ষেত্রাকার ভাবে সাজানো থাকে। এদের **সারসিনি** (Sarcinae) বলে। **উদাহরণ**—*Saricinae maxima* (*সারসিনা ম্যাক্সিমা*)।
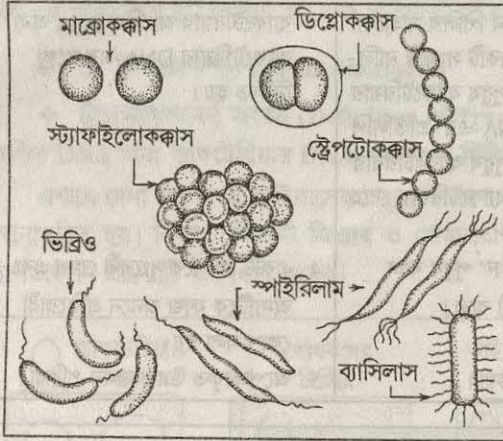
চিত্র 1.20 ঃ বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া।

**2. দণ্ডাকার** (Bacillus)—এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোশগুলি বেলনাকার অথবা দণ্ডের মতো লম্বা হয়। এদের একটি বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। **উদাহরণ**—(i) টাইফয়েড রোগের ব্যাকটেরিয়াম—*Salmonella typhi* (*সালমোনেলা টাইফি*), (ii) যক্ষ্মারোগের ব্যাকটেরিয়াম—*Mycobacterium tuberculosis* (*মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস*), (iii) ধনুষ্টংকার রোগের ব্যাকটেরিয়াম *Clostridium tetani* (*ক্লসট্রিডিয়াম টেটানি*) প্রভৃতি। ব্যাসিলি বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন *Monobacilli* (*মনোব্যাসিলি*)—একক, *Diplobacilli*(*ডিপ্লোব্যাসিলি*)—জোড়া, *Streptobacilli* (*স্ট্রেপটোব্যাসিলি*)—একাধিক ব্যাসিলি প্রান্ত দ্বারা যুক্ত, *Palisade* (*প্যালিসেড*)—একাধিক ব্যাসিলি লম্বা বরাবর সমান্তরালে সাজানো।

**3. সর্পিলাকার** (Spirillum)—**আকৃতিতে সর্পিলাকার বা ছিপি খোলার স্ক্রুর মতো দেখতে ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম** বলে। এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোশদেহ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত বা ফ্ল্যাজেলাবিহীন হতে পারে। **উদাহরণ**—*Spirillum undulum* (*স্পাইরিলা আনডুলাম*)।

**4. ভিব্রিও** (Vibrio)— **'কমা' চিহ্নের মতো দেখতে ব্যাকটেরিয়াকে** *ভিব্রিও* (Vibrio) **বলে**। **উদাহরণ**—কলেরা রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া *Vibrio cholerae* (*ভিব্রিও কলেরি*)।

**5. সূত্রাকার** (Filamentous)—বহু ব্যাকটেরিয়ার দেহ সুতোর মতো হয়। দেখতে অনেকটা ছত্রাকের অণুসূত্রের মতো। **উদাহরণ**—*Beggiatoa alba* (*ব্যাগিয়োটা অ্যালবা*)।

**6. বৃন্ত আকৃতির** (Stalked)—অনেক ব্যাকটেরিয়ার বৃন্ত থাকে। **উদাহরণ**—*কলোব্যাক্টর* (*Caulobacter*)।

**7. কোরকের আকৃতি**—কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি কোরকের মতো হয়। **উদাহরণ**—*Rhodomicrobium* (*রোডোমাক্রোবিয়াম*)।

## ➤ (b) পুষ্টির ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস (Classification of the basis of Nutrition) ঃ

ব্যাকটেরিয়া প্রধানত **পরভোজী** (heterotropic)। আবার অনেকগুলি ব্যাকটেরিয়া আছে যারা **স্বভোজী** (autotropic)। যেমন—**পরভোজী ও স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া।**

**1. পরভোজী (Heterotropic)** ঃ পরভোজী ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের জন্য জীবিত ও মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভর করে। পুষ্টির উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(a) **মেটাট্রফিক** (Metatrophic)—জীবের তৈরি খাদ্যবস্তু বা মৃত জীবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে যেসব ব্যাকটেরিয়া জীবন ধারণ করে তাদের **মেটাট্রফিক ব্যাকটেরিয়া** বলে। এদের **মৃতজীবী** ব্যাকটেরিয়াও বলে। এরা সম্পূর্ণ মৃতজীবী বা আংশিক মৃতজীবী হতে পারে। **উদাহরণ**—সম্পূর্ণ মৃতজীবী—*Clostridium butyricum* (*ক্লসট্রিডিয়াম বিউটিরিকাম*) ; আংশিক মৃতজীবী—*Vibrio cholerae* (*ভিব্রিও কলেরি*)।

(b) **প্যারাট্রফিক** (Paratrophic)—যেসব ব্যাকটেরিয়া পোষকদেহ থেকে পাচিত খাদ্য শোষণ করে তাদের প্যারাট্রফিক ব্যাকটেরিয়া বলে। **উদাহরণ**—সম্পূর্ণ পরজীবী—*Niseria gonorrhoeae* (*নিসেরিয়া গনোরি*) এবং আংশিক পরজীবী—*Staphylococcus aureus* (*স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস*)। পরভোজী ব্যাকটেরিয়া নিম্নলিখিত প্রকারেরও হতে পারে, যেমন—

(i) **ফোটোহেটারোট্রফিক** (Photoheterotropic)—যেসব ব্যাকটেরিয়া সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাদের **ফোটোহেটারোট্রফিক** বলা হয়। **উদাহরণ**—*Rhodospirillum* (*রোডোস্পাইরিলাম*)।

(ii) **কোমোহেটারোট্রফিক** (Chomoheterotropic)—যেসব ব্যাকটেরিয়া জৈব বস্তু থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাদের **কোমোহেটারোট্রফিক** বলা হয়। **উদাহরণ**—*E. Coli* (*ই. কোলাই*)।

**2. স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া (Autotrophic)** ঃ স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) এবং **রাসায়নিক সংশ্লেষের** (Chemosynthesis) প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে।

(a) **সালোকসংশ্লেষকারী** (Photosynthetic)—এজাতীয় ব্যাকটেরিয়াকে *Photoautotrophic* (*ফোটোঅটোট্রফিক*) ব্যাকটিরিয়াও বলা হয়। ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষে কোনো অক্সিজেন তৈরি হয় না এবং এদের শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজনও হয় না। তাই এদের **অবায়ুজীবী** (Anaerobes) বলে। এদের দেহে *Bacterio chlorophyll* (*ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল*) বা *Chlorobium chlorophyll* (*ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল*) থাকে। **উদাহরণ**—*Chlorobium limicola* (*ক্লোরোবিয়াম লিমিকোলা*), *Rhodospirilum rubrum* (*রোডোস্পাইরিলাম রুব্রাম*) প্রভৃতি।

(b) **রাসায়নিক সংশ্লেষকারী** (Chemosynthetic)—এসব ব্যাকটেরিয়া খাদ্য তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি নাইট্রোজেন, লৌহ ঘটিত যৌগ ও সালফার জারণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। *Nitrosomonas (নাইট্রোসোমোনাস)* ও *Nitrobactor (নাইট্রোব্যাকটর)* নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক যৌগের (অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইটস ও নাইট্রেটস) জারণের মাধ্যমে পায়। এই শক্তি এবং $CO_2$ সহযোগে এরা প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ সংশ্লেষ করে। সালফার ব্যাকটেরিয়া (থায়োব্যাসিলাস) বিভিন্ন সালফারযুক্ত যৌগকে (সালফার, সালফাইডস, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি) জারিত করে। আয়রন ব্যাকটেরিয়া লৌহ যৌগকে জারিত করে এবং নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে জারিত করতে সক্ষম। এই সব ব্যাকটেরিয়াকে *Chomoautotrophs (কেমোঅটোট্রফস)* বলে।

### ➤ (c) রঞ্জক গ্রহণের উপর শ্রেণিবিন্যাস (Classification on the basis of staining batharviour) ঃ

**খ্রিস্টিয়ান গ্রাম** (Christian Gram) 1884 খ্রিস্টাব্দে রঞ্জক বা স্টেন (Stain) ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়াকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। ক্রিস্টাল ভায়োলেট ও আয়োডিন দিয়ে তৈরি **গ্রাম স্টেন** (Gram Stain) ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়াকে পৃথক করা যায়। তার নামানুসারে ব্যাকটেরিয়ার দুটি ভাগের একটিকে গ্রাম-পজিটিভ ও অন্যটিকে গ্রাম-নেগেটিভ বলা হয়।

**1. গ্রাম-পজিটিভ (Gram positive)**—যেসব ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর ক্রিস্টাল ভায়োলেট জাতীয় ক্ষারীয় রঞ্জক ও আয়োডিন দিয়ে সহজেই রঞ্জিত করা হয় এবং কোহল বা অ্যাসিটোন দিয়ে এই রঞ্জক মুক্ত করা যায় না তাদেরকে **গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া** বলে। **উদাহরণ**—*Bacillus subtilis (ব্যাসিলাস সাবটিলিস)*, ইত্যাদি।

**2. গ্রাম-নেগেটিভ (Gram negative)**—যেসব ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় রঞ্জক করার পরে কোহল বা অ্যাসিটোন দিয়ে তাকে রঞ্জক মুক্ত করা যায় তাদের **গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া** বলে। **উদাহরণ**—*Salmonella* (*সালমোনেল্লা*) প্রভৃতি। তাছাড়া গ্রামনেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপর্দা ও প্রাচীরের মধ্যে উৎসেচক ও বিপাকীয় বস্তু জমা হয়ে একটি জেলির মতো বস্তু তৈরি হয় তকে **পেরিপ্লাজম** বলে।
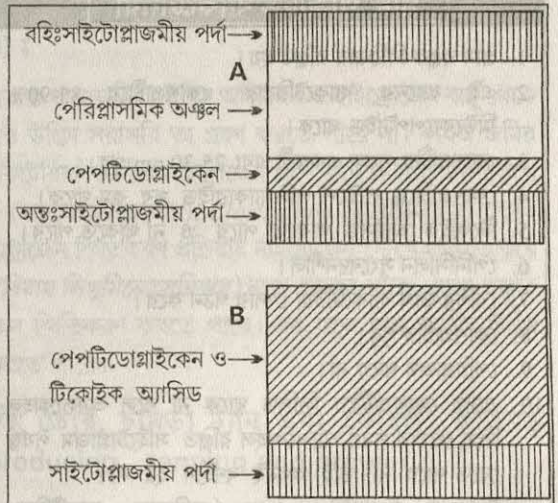
চিত্র 1.21 ঃ A. গ্রাম নেগেটিভ এবং B. গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর।

● **গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gram-Positive and Gram-Negative bacteria) ঃ**

| গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া | গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া |
|---|---|
| 1. গ্রাম রঞ্জক বিক্রিয়ায় রঞ্জিত হয়। | 1. গ্রাম রঞ্জক বিক্রিয়াতে রঞ্জিত হয় না। |
| 2. এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরে 85-90% মিউকোপেপটাইড থাকে। | 2. এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরে 10-20% মিউকোপেপটাইড থাকে। |
| 3. কোশপ্রাচীর সরল একস্তরী এবং 25-30 nm পুরু। | 3. কোশপ্রাচীর জটিল ত্রিস্তরী এবং 10-15 nm পুরু। |
| 4. কোশপ্রাচীরে লাইপো পলিস্যাকারাইড খুব কম থাকে। | 4. কোশপ্রাচীরে লাইপোপলিস্যাকারাইড বেশি থাকে। |
| 5. টিকোইক অ্যাসিড় থাকতে পারে ও না থাকতে পারে। | 5. টিকোইক অ্যাসিড থাকে না। |
| 6. পেনিসিলিন সংবেদনশীল। | 6. পেনিসিলিন সংবেদনশীল নয়। |
| 7. বেশির ভাগ ব্যাকটেরিয়া স্পোর গঠন করে। | 7. এরা সাধারণ স্পোর গঠন করে না। |
| 8. কোশপ্রাচীর পুরু। | 8. কোশপ্রাচীর অপেক্ষাকৃত কম পুরু। |
| 9. পেরিপ্লাজম থাকে না। | 9. পেরিপ্লাজম থাকে। |
| 10. এদের কোশপ্রাচীরে লিপিড থাকে না বলে অ্যালকোহল দিয়ে ধোয়ার সময় অ্যালকোহল রঞ্জিত সাইটোপ্লাজম পর্যন্ত যেতে পারে না। তাই কখনই বর্ণহীন হয় না। উদাহরণ—*Bacillus subtilis (বেসিলাস সাবটিলিস), Lactobacillus lacti (ল্যাকটোবেসিলাস ল্যাকটি)* প্রভৃতি। | 10. কোশপ্রাচীরে লিপিড থাকে বলে অ্যালকোহল খুব সহজে কোশের ভেতরে যায় এবং রঞ্জক পদার্থ অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশে কোশের বাইরে চলে আসে, ফলে কোশ বর্ণহীন হয়। উদাহরণ—*Salmonella typhi (সালমোনেল্লা টাইফি), Escherichia coli) (এসচিরিচিয়া কোলি)* প্রভৃতি। |

### ➤ (d) তাপমাত্রার তারতম্যের উপর শ্রেণিবিন্যাস (Classification on the basis of Thermal sensibility) ঃ

তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— (i) **শৈত্যপ্রেমী ব্যাকটেরিয়া** (Psychrophilic bacteria)— যেসব ব্যাকটেরিয়া 0°–190°C তাপমাত্রায় বাস করে তাদের **শৈত্যপ্রেমী ব্যাকটেরিয়া** বলে। উদাহরণ— *সিউডোমোনাস*। (ii) **তাপপ্রেমী ব্যাকটেরিয়া** (Thermophilic bacteria)— যেসব ব্যাকটেরিয়া উচ্চ তাপমাত্রায় (70°C) বেঁচে থাকে তাদের **তাপপ্রেমী ব্যাকটেরিয়া** বলে। উদাহরণ— *ব্যাসিলাস লাইকেনোফরসিস*। (iii) **মেসোফিলিক ব্যাকটেরিয়া** (Mesophilic bacteria)—সাধারণ তাপমাত্রায় (40°C-25-40°C) বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়াকে **মেসোফিলিক ব্যাকটেরিয়া** বলে। উদাহরণ—*এসচেরিসিয়া কোলাই*।

চিত্র 1.22 : ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা—মনোট্রিকাস, লোফোট্রিকাস, অ্যাম্ফিট্রিকাস এবং পেরিট্রিকাস এবং অ্যাট্রিকাস।

### ➤ (e) ফ্ল্যাজেলার উপর শ্রেণিবিন্যাস (Classification on the basis of Flagella) ঃ

ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলার উপস্থিতি, অবস্থান ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়াকে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়—(i) **মনোট্রিকাস**—ব্যাকটেরিয়ার এক মেরুতে একটিমাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে। উদাহরণ—*Vibrio* (*ভিব্রিও*)। (ii) **লোফোট্রিকাস**—ব্যাকটেরিয়ার এক মেরুতে একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। উদাহরণ—*Pseudomonas* (সিউডোমোনাস)। (iii) **অ্যাম্ফিট্রিকাস**—ব্যাকটেরিয়ার দুই মেরুতে এক বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। উদাহরণ—*Spirillum* (স্পাইরিলাম)। (iv) **পেরিট্রিকাস**—কোশের চারদিকে বহু ফ্ল্যাজেলা থাকে। উদাহরণ—*Bacillus* (ব্যাসিলাস)। (v) **অ্যাট্রিকাস**—ব্যাকটেরিয়ায় কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না। উদাহরণ—*Diptheria (ডিপথেরিয়া)*।

## ◎ 1.19. ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজনীয়তা (Utility of Bacteria) ◎

### ➤ (a) কৃষিকার্যে—*রাইজোবিয়াম* এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ব্যাকটেরিয়া (Agriculture—*Rhizobium* and other nitrogen fixing Bacteria) ঃ

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বায়ু থেকে সরাসরি গ্রহণ করে। কিন্তু বাতাসে 78% নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ সরাসরি তা গ্রহণ করতে পারে না। কৃষিজ জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া বায়বীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। একে **নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ** বলে। *Azotobacter (অ্যাজোটোব্যাক্টর)*, *Clostridium (ক্লসট্রিডিয়াম)* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া মাটিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করে এবং বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে জমির উর্বরতা বাড়ায়। *Rhizobium leguminosarium (রাইজোবিয়াম লিগুমিনোসেরিয়াম)* নামে প্রজাতি মটর, ছোলা প্রভৃতি শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে মিথোজীবী হিসাবে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করতে পারে। এর ফলে শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ পরোক্ষভাবে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কৃষিজ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে পারে।

### ➤ (b) বাণিজ্যিক—উপকারী ব্যাকটেরিয়া—দই তৈরি, চামড়া ট্যান এবং কোহল জাতবস্তু (Commercial—Beneficial bacteria for Curd producing, tanning and brewery) ঃ

(i) **দই তৈরি**—*Lactobacillus lacti (ল্যাক্টোব্যাসিলাস ল্যাকটি)*, *Streptococcus lactis (স্ট্রেপ্টোকক্কাস ল্যাকটিস)* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া দুধকে দইতে পরিণত করে। পনির, ছানা, মাখন, ঘি প্রভৃতি এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে তৈরি করা হয়।

(ii) **চামড়া ট্যান**—কাঁচা চামড়া ট্যান বা পাকা করার জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হলেও আজও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। ব্যাকটেরিয়া ফ্যাট ও অন্যান্য কলার পচন ঘটায় এবং চামড়া ট্যান হয়।

(iii) **কোহলজাত বস্তু**—*Clostridium acetobutilicum (ক্লস্ট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম)* নামে ব্যাকটেরিয়া বিউটাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন প্রভৃতি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

### ➤ (c) ওষুধ—অ্যান্টিবায়োটিক এবং ভিটামিন সংশ্লেষ (Medicine—Antibiotic and Vitamin synthesis) :

(i) **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন**—অনেকগুলি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া যায়। *Streptomyces griseus (স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস)* থেকে *স্ট্রেপটোমাইসিন* ও *অ্যাক্টিডিন*, *Streptomyces vernecuelae (স্ট্রেপটোমাইসেস ভানিকিউল)* থেকে *ক্লোরোমাইসেটিন এবং S. aureofciens (স্ট্রেপটোমাইসেস অরিফ্যাসিয়েন্স)* থেকে *টেট্রাসাইক্লিন, S. rimosus (স্ট্রেপটোমাইসেস রিমোসাস)* প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত ওষুধগুলি পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের নাম, উৎস ও প্রয়োগ উল্লেখ করা হল।

● **সাধারণ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক বা বীজঘ্নের নাম, উৎস ও প্রয়োগ (A List of some common Antibiotics, their sources and their application) :**

| অ্যান্টিবায়োটিক | উৎস | প্রয়োগ |
|---|---|---|
| 1. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) | *Streptomyces griseus* (স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস) | গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া; যক্ষ্মা, টুলারেমিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মেনিনজাইটিস, রক্ত-আমাশয় প্রভৃতি। |
| 2. অ্যাক্টিডিন (Actidine) | " | ছত্রাকঘটিত উদ্ভিদরোগ। |
| 3. ক্লোরোমাইসেটিন (Chloromycetin) | *S. vernecuelae* (স্ট্রেপটোমাইসেস ভানিকিউলি) | গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া; টাইফয়েড, রিকেট রোগ প্রভৃতি। |
| 4. টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) | *S. aurefaciens* (স্ট্রেপটোমাইসেস অরিফ্যাসিয়েন্স) | গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া; রিকেট রোগ। |
| 5. টেরামাইসিন (Terramycin) | *S. rimosus* (স্ট্রেপটোমাইসেস রিমোসাস) | গ্রাম- পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। |
| 6. এরিথ্রোমাইসিন (Erythromycin) | *S. erythreus* (স্ট্রেপটোমাইসেস এরিথ্রিয়াস) | গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া; হুপিং কাশি ও ডিপথেরিয়া। |
| 7. নিওমাইসিন (Neomycin) | *S. fradiae* (স্ট্রেপটোমাইসেস ফ্রাডিই) | গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ও যক্ষ্মা রোগ। |
| 8. অ্যাম্ফোমাইসিন (Amphomycin) | *S. carus* (স্ট্রেপটোমাইসেস ক্যারাস) | গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। |

(ii) **ভিটামিন উৎপাদন**—*Clastridium acitobutalicum (ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবুটাইলিকাম)* নামে ব্যাকটেরিয়া $B_2$ (রাইবোফ্লাভিন), *Streptococcus limolyticus (স্ট্রেপটোকক্কাস লিমোলাইটিকাস)* ভিটামিন K এবং *Gluconobacter (গ্লুকোনোব্যাকটার)* ভিটামিন C সংশ্লেষ করে।

### ➤ (d) ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Bacteria) :

জীবজগতে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নীচে কতকগুলি ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্থাৎ উপকারিতা এবং অপকারিতা আলোচনা করা হল।

● (a) **ব্যাকটেরিয়ার উপকারী ভূমিকা** (Beneficial role of Bacteria) :

1. **উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা**—কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া মৃত জীবদেহের পচনক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের দেহাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্য তৈরি করতে পারে।

2. **জমির উর্বরতা বৃদ্ধি— রাইজোবিয়াম** *(Rhizobium)*, **ক্লসট্রিডিয়াম** *(Clostridium)*, **অ্যাজোটোব্যাক্টর** *(Azotobactor)* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (Netrogenation) পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ক্লসট্রিডিয়াম ও অ্যাজোটোব্যাক্টর মাটিতে বসবাস করে এবং স্বাধীনজীবী রাইজোবিয়াম মটর, ছোলা প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে (Nodule) বাস করে। এই মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে মিশিয়ে উর্বরতা বাড়ায়।

3. **সালফার ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা—থিওব্যাসিলাস** *(Thiobacillus)* নামে সালফার ব্যাকটেরিয়া $H_2S$ থেকে $H_2SO_4$ প্রস্তুত করে। এই $H_2SO_4$ মাটির মধ্যে সালফেটে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদ তা গ্রহণ করে।

4. **ভিনিগার উৎপাদন—অ্যাসিটোব্যাক্টর অ্যাসিটি** *(Acetobacter aceti)* কোহলকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত করে ভিনিগার প্রস্তুতিতে সহায়তা করে।

5. **কাগজ শিল্পে—কাগজ শিল্পে ব্যাসিলাস সাবটিলিস** *(Bacillus subtilis)* নামে ব্যাকটেরিয়া কার্বোহাইড্রেট জাতীয় বস্তু থেকে পেকটিন উৎপন্ন করে।

6. **পাট শিল্পে—ক্লসট্রিডিয়াম বিউট্রিকাম** *(Clostridium butyricum)* নামে ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী। এরা জলে পাটগাছের পেকটিক পদার্থকে ভেঙে তন্তু নিষ্কাশনে সহায়তা করে।

7. **চা ও তামাক শিল্পে—ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম** *(Bacillus megatharium)* ব্যাকটেরিয়া চা ও তামাক সুগন্ধিকরণে ব্যবহার করা হয়।

8. **ভিনিগার প্রস্তুতে**— কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া শর্করা জাতীয় দ্রবণে কোহল সন্ধান ঘটিয়ে ভিনিগার প্রস্তুতে সহায়তা করে। উদাহরণ—অ্যাসিটোব্যাক্টার (Acetobecter)।

9. **পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে**— সাধারণত বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ, যেমন— মৃত জীবজন্তু, আবর্জনা, গাছের পাতা, কাপড়, চামড়া, কাগজ জাতীয় পদার্থ, মল-মূত্র, ছাই প্রভৃতি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। এ সব পদার্থকে নানারকম ব্যাকটেরিয়া বিশ্লেষিত করে পরিবেশ দূষণমুক্ত করে। এই সব বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার উৎপাদন করা যায়। জৈব সারের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট ও অনুখাদ্য থাকে — যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

10. **জীবদেহে মিথোজীবী হিসাবে— ই. কোলি** *(E. coli)*, ব্যাসিলাস কোলি *(B. coli)* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। এসেরিকিয়া কোলাই ভিটামিন $B_{12}$ সংশ্লেষ করে। ব্যাসিলাস কোলাই খাদ্য পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। তৃণভোজী প্রাণীর পরিপাকনালিতে ট্রাইকোডরমা কোনিগী *(Trichoderma conigi)* ব্যাকটেরিয়া সেলুলেজ উৎসেচক উৎপন্ন করে সেলুলোজ পরিপাকে সাহায্য করে।

11. **জামাকাপড়ের দাগ তুলতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা**—ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি প্রোটিয়েজ উৎসেচক জামাকাপড়ের দাগ তুলতে ব্যবহার করা হয়।

12. **প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে**—মিথেন গ্যাস মিথেনোব্যাসিলাস *(Methano-bacillus)* ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন হয়। এরা গোবর, পুকুর ও জলার মৃত জৈব পদার্থে উৎপন্ন হয়।

13. **পতঙ্গের জৈবিক নিয়ন্ত্রণে—ব্যাসিলাস** জাতীয় ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকারক পতঙ্গের লার্ভাগুলিকে ধ্বংস করে। একে **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ** (Biological Control) বলা হয়। উদাহরণ—*Bacillus thuringensis*।

● (b) **ব্যাকটেরিয়ার অপকারী ভূমিকা** (Harmful role of Bacteria) :

1. **রোগসৃষ্টি**—(i) মানুষের দেহে নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগ ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে দেখা দেয়। (ii) উদ্ভিদের বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়, যেমন—কুমড়ো গাছে **উইল্ট** (wilt), লেবু জাতীয় গাছে **ক্যাঙ্কার** (Canker), আলুর **রিংরট** (Ringrot), টম্যাটোর **ক্যাঙ্কার**, ধান ও সীমের **লেট ব্লাইট** (Late blight) প্রভৃতি। (iii) অন্যান্য প্রাণীর রোগও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়। যেমন—গবাদি পশুর যক্ষ্মা, ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স, ছাগল ও ভেড়ার কলেরা প্রভৃতি।

2. **খাদ্যের বিষাক্তকরণ**— স্ট্যাফাইলোকক্কাস *(Staphylococcus)*, ক্লস্ট্রিডিয়াম *(Clostridium)* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে টক্সিন ক্ষরণ করে শাকসবজি, দুধ, ফুল ও নানারকম খাবার নষ্ট করে।

3. **জমির উর্বরতা হ্রাসে**—ভেজা মাটিতে সিউডোমোনাস, মাইক্রোকক্কাস নামে এক বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থাকে। এরা মাটির নাইট্রোজেন বায়ুতে মুক্ত করে মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।

● ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bacteria and Virus) ঃ

| ভাইরাস | ব্যাকটেরিয়া |
|---|---|
| 1. জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বস্তু। | 1. সজীব বস্তু। |
| 2. এদের দেহ অকোশীয়; সাইটোপ্লাজম, কোশ প্রাচীর বা কোশ পর্দা থাকে না। শুধুমাত্র দেহ আবরক ক্যাপসিড থাকে। | 2. দেহকোশীয়; সাইটোপ্লাজম, কোশ পর্দা, কোশ প্রাচীর, রাইবোজোম, ল্যামিলি, মেসোজোম প্রভৃতি থাকে। |
| 3. সম্পূর্ণ পরজীবী। | 3. পরজীবী, মৃতজীবী বা স্বভোজী। |
| 4. পোষক কোশের বাইরে জড়ের মতো আচরণ করে এবং পোষক কোশের ভেতরে সজীব বস্তুর লক্ষণ প্রকাশ পায়। | 4. পরজীবী ব্যাকটেরিয়া পোষক কোশের বাইরে ও ভেতরে সব সময় সজীব। |
| 5. পোষক কোশের ভেতরে কেবলমাত্র প্রজননক্ষম। | 5. পোষক কোশের বাইরে ও ভেতরে প্রজননক্ষম। |
| 6. কোশপ্রাচীর নেই। | 6. কোশপ্রাচীর থাকে। |
| 7. প্রজননিক বস্তু DNA অথবা RNA থাকে। | 7. প্রজননিক বস্তু সবসময়ে DNA, কিন্তু সেই সঙ্গে সাইটোপ্লাজমে অপ্রজননিক RNA থাকে। |
| 8. নিউক্লিয়াস নেই। | 8. নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়। |
| 9. দেহবস্তু সংশ্লেষ ও একত্রীকরণের ফলে জনন ঘটে। | 9. অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন জনন প্রক্রিয়া দেখা যায়। |
| 10. ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক জীব। | 10. আণুবীক্ষণিক জীব। |

● ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগের তালিকা (List of some diseases caused by Bacteria) ঃ

| মানুষের রোগ | ব্যাকটেরিয়ার নাম |
|---|---|
| 1. টাইফয়েড—(Typhoid) | *Salmonella typhi* |
| 2. কলেরা—(Cholera) | *Vibrio cholerae* |
| 3. টিটেনাস—(Tetanus) | *Clostridium titani* |
| 4. যক্ষ্মা—(Tuberculosis) | *Mycobacterium tuberculosis* |
| 5. কুষ্ঠ—(Leprosy) | *Mycobacterium leprae* |
| 6. ডিপথেরিয়া—(Diptheria) | *Corynibacterium diptheriae* |
| 7. নিউমোনিয়া—(Pneumonia) | *Diplococcus pneumoniae* |
| 8. প্লেগ—(Plague) | *Pasteurella pestis* |
| 9. জন্ডিস—(Jaundice) | *Leptospira cetero-haemorrhagiae* |
| 10. ডাইরিয়া—(Diarrhoea) | *Bacillus coli* |
| 11. ডিসেন্ট্রি—(Dysentery) | *Bacillus dysentrae* অথবা *Shigella dysentrae* |
| 12. হুপিং কফ—(Whooping Cough) | *Bordetella pertusis* |
| 13. সিফিলিস—(Syphilis) | *Treponema pallidum* |
| 14. গনোরিয়া—(Gonorrhoea) | *Neissera gonorrhae* |
| **উদ্ভিদ রোগ** | **ব্যাকটেরিয়ার নাম** |
| 1. লেবুর ক্যান্কর—(Citrus Canker) | *Xanthomonas citri* |
| 2. ধানপাতার ধ্বসা—(Blight of Paddy) | *Xanthomonas oryzae* |
| 3. মটর গাছের ধ্বসা—(Blight of Pae) | *Xanthomonas phaseoli* |
| 4. আলুর স্ক্যাব্—(Scab of Potato) | *Streptomyces scabias* |
| 5. আলুর রিংরট—(Ring rot of Potato) | *Corynebacterium sepidonicum* |
| 6. কুমড়ার উইল্ট—(Wilt of Cucurbita) | *Bacillus trysifeus* |
| 7. টম্যাটোর উইল্ট—(Wilt of tomato) | *Pseudomonas solanacearum* |
| 8. আমের পচন—(Soft rot of Mango) | *Bacterium cartovorus* |
| 9. আঁখের লাল দাগ—(Red stripe of Sugarcane) | *Pseudomonas rubrilineans* |

### ❂ খাদ্য বিষাক্তকরণ (Food Poisoning) :

ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন (toxin) মাছ, মাংস, শাকসবজি, রান্না খাবার দূষিত করে। এসব খাবার মানুষ খেলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। খাদ্য বিষাক্তকরণের জন্য—*Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Micrococcus pyogenes* প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**● ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও জীব কোশের মধ্যে প্রধান পার্থক্যসমূহ (Difference between Virus, Bacteria and Animal cell) :**

| ভাইরাস | ব্যাকটেরিয়া | জীবকোশ (আদর্শ) |
|---|---|---|
| 1. জড় ও সজীব অবস্থায় থাকে। (পোষক কোশের বাইরে জড় ও ভিতরে সজীব) | 1. সব সময়েই সজীব (পোষক কোশের বাইরে | 1. সবসময়ে সজীব। |
| 2. অকোশীয় জীব। | 2. কোশীয় জীব। | 2. কোশীয় উপাদানে তৈরি। |
| 3. সাইটোপ্লাজম নেই। | 3. সাইটোপ্লাজম আছে। | 3. জীবিত কোশে সাইটোপ্লাজম আছে। |
| 4. নিউক্লিয়াস নেই। | 4. আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত। | 4. প্রকৃত নিউক্লিয়াস আছে। |
| 5. বংশগতি বস্তু DNA বা RNA। | 5. নিউক্লীয় বস্তু দ্বিতন্ত্রী DNA। | 5. RNA, DNA উভয়ই থাকে। |
| 6. ক্রোমোজোম নেই। | 6. ক্রোমোজোম থাকে। | 6. ক্রোমোজোম থাকে। |
| 7. কোশ আবরণী নেই। শুধুমাত্র খোলক থাকে। | 7. কোশ আবরণী থাকে। | 7. কোশ আবরণী থাকে। |
| 8. সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু নেই। | 8. সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু থাকে। | 8. সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু থাকে। |
| 9. দেহবস্তু সংশ্লেষ ও এর একত্রীকরণের মাধ্যমে জনন হয়। | 9. বিভাজন, অযৌন ও যৌন প্রক্রিয়ায় জনন হয়। | 9. অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন প্রক্রিয়ায় জনন হয়। |
| 10. পূর্ণ পরজীবী। | 10. পরজীবী, মৃতজীবী ও স্বভোজী। | 10. পরজীবী মৃতজীবী ও স্বভোজী। |
| 11. কৃত্রিম অনুশীলন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয় না। | 11. কৃত্রিম অনুশীলন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটে। | 11. কৃত্রিম অনুশীলন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটে। |

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

### ● ভাইরাস (Virus) ●

1. **মাইক্রোব কাকে বলে?**
● মাইক্রোব হল আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র জীব। উদাহরণ—ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি।

2. **ভাইরাস কী আদি কোশ না আদর্শ কোশ?**
● আদি কোশ।

3. **ক্যাপসিড কী?**
● ভাইরাসের দেহের বাইরের প্রোটিন আবরণীকে ক্যাপসিড বলে।

4. **ক্যাপসোমিয়ার কাকে বলে?**
● ক্যাপসিডের একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে।

5. **একটি ক্যাপসিডবিহীন ভাইরাসের নাম লেখো।**
● পোটাটো স্পিন্ডল টিউবার ভাইরাস (Potato spindle tuber virus)।

**6. ভাইরাস কী ধরনের পরজীবী?**
- সম্পূর্ণ পরজীবী।

**7. ভিরিয়ন ও ভেক্টর কী?**
- একটি ভাইরাস দেহ, যা পোষকদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে, তাকে **ভিরিয়ন** বলে। আবার যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণী ভাইরাস বহন করে সংক্রমণ বা বিস্তারে সাহায্য করে তাদের **ভেক্টর** বলে। সহজভাবে বলতে গেলে পরজীবী বহনকারী জীবকে **ভেক্টর** বলা হয়।

**8. ভাইরয়েড কাকে বলে?**
- ক্যাপসিড বিহীন ভাইরাসকে ভাইরয়েড বলে। উদাহরণ—Potato spindle tuber viroid।

**9. কোন্ ভাইরাসে DNA একতন্ত্রী?**
- কলিফাজ fd ভাইরাসে DNA একতন্ত্রী।

**10. কোন্ ভাইরাসে RNA দ্বিতন্ত্রী?**
- রিওভাইরাসে RNA দ্বিতন্ত্রী।

**11. কয়েকটি জলবাহিত ভাইরাস রোগের নাম লেখো।**
- বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি।

**12. দুটি বায়ুবাহিত ভাইরাস রোগের নাম লেখো।**
- মাম্পস্, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি।

**13. উদ্ভিদের দুটি ভাইরাস ঘটিত রোগের নাম উল্লেখ করো।**
- টোবাকো মোজেইক ও বিন মোজেইক।

**14. লিপোভাইরাস কাকে বলে?**
- কোনো কোনো ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাইরের দিকেও এক বিশেষ মোড়ক বা স্তর থাকে। এই মোড়ক লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এই জাতীয় ভাইরাসকে **লিপোভাইরাস** বলে।
  উদাহরণ—বসন্ত ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস।

**15. ইন্টারফেরন কী?**
- ভাইরাসের সংক্রমণের প্রভাবে কোশ নিঃসৃত যে পদার্থ ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাকে **ইন্টারফেরন** বলে। ইন্টারফেরন টিকার মতো জীবাণু ধ্বংস করে না, কোশকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। বর্তমানে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কোশের বাইরে ইন্টারফেরন তৈরি করা যচ্ছে। এই ইন্টারফেরন টিকার মতো ব্যবহার করা যায়। **ইনট্রন** এক প্রকার ইন্টারফেরন যা লিউকোমিয়া রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়।

**16. বাইনিয়েল গঠনযুক্ত ভাইরাসের নাম লেখো।**
- ব্যাকটেরিওফাজ—T2 / T4 / T6।

**17. একটি ভাইরাসের নাম করো যেখানে DNA ও RNA উভয়েই বর্তমান।**
- লিউকো-ভাইরাস এবং রাউস সারকোমা ভাইরাসে প্রজনন বস্তু RNA কিন্তু পোষকের কোশে প্রবেশের পর তা থেকে DNA তৈরি হয়।

**18. DNA যুক্ত উদ্ভিদ ভাইরাসের নাম লেখো।**
- ফুলকপির মোজেইক ভাইরাস।

**19. একটি DNA যুক্ত প্রাণী ভাইরাসের নাম উল্লেখ করো।**
- মাম্পস ভাইরাস

**20. RNA যুক্ত একটি উদ্ভিদ ভাইরাসের নাম লেখো।**
- টোবাকো মোজেইক ভাইরাস।

**21. RNA যুক্ত একটি প্রাণী ভাইরাসের নাম লেখো।**

● পোলিও ভাইরাস।

**22. সাইনোফাজ কী?**

● নীলাভ সবুজ শৈবালকে যে ভাইরাস আক্রমণ করে, তাকে **সায়ানোফাজ** (Cynophage) বলে। এদের প্রজননিক বস্তু হল DNA।

**23. মাইকোফাজ কাকে বলে?**

● ছত্রাককে আক্রমণকারী ভাইরাসকে **মাইকোফাজ** (Mycophage) বলে। এদের প্রজননিক বস্তু হল RNA।

**24. AIDS রোগের জন্য কোন্ ভাইরাস দায়ী?**

● AIDS রোগের জন্য হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno deficiency Virus) দায়ী। সংক্ষিপ্ত নাম—HIV

**25. AIDS ভাইরাসের কী ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে?**

● AIDS ভাইরাসে RNA থাকে৷

**26. *E. Coli* ব্যাকটেরিয়া যখন ব্যাকটেরিওফাজের সংস্পর্শে আসে তখন কী কী ঘটনা ঘটে? এই ঘটনা প্রবাহের বাক্য চিত্র আঁকো।**

● **অ্যাডজরপশন** (Adsorption) → **পেনিট্রেশন** (Penetration) → **এক্লিপস্** (Eclipse) → **ম্যাচুরেশন** (Maturation) → **লাইসিস** (Lysis)।

**27. ভিরুলেন্ট দশা কী?**

● ব্যাকটেরিওফাজের DNA ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার পর অল্পসময়ের মধ্যে অগণিত প্রতিলিপি গঠন করতে আরম্ভ করে। ভাইরাসের এই বিশেষ দশাকে ভিরুলেন্ট দশা বলা হয়।

**28. ভাইরাস জিনোম কাকে বলে?**

● ভাইরাসের প্রজননিক বস্তুকে (নিউক্লিক অ্যাসিড) ভাইরাস জিনোম বলে।

**29. একটি উপকারী ভাইরাসের নাম লেখো।**

● ব্যাকটেরিওফাজ (অপকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।)

**30. ভাইরাস কেন উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে?**

● ভাইরাসে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর মতো নিউক্লীয় বস্তুতে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থিয়ামিন ও সাইটোসিন প্রভৃতি চারটি নাইট্রোজেনজনিত যৌগ থাকে। তাই তারা সহজেই উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

**31. রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন কী?**

● সাধারণ অবস্থায় DNA থেকে m-RNA গঠিত হয়, কিন্তু রেটরো-ভাইরাসে m-RNA থেকে DNA তৈরি হয়। তাই একে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন বলে।

**32. ভাইরাস ও প্লাস্মিডের মধ্যে পার্থক্য কী?**

| ভাইরাস | প্লাস্মিড |
|---|---|
| 1. প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সংযোগে গঠিত অকোশীয় সূক্ষ্মকণা হল ভাইরাস। | 1. কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া কোশের নিউক্লিওয়েডের চক্রাকার DNA ছাড়াও সাইটোপ্লাজমে স্বাধীনভাবে বিভাজনক্ষম আরও একটি DNA থাকে, একে প্লাস্মিড বলে। |
| 2. ক্যাপসিড থাকে। | 2. ক্যাপসিড থাকে না। |
| 3. ভাইরাসের দেহে DNA অথবা RNA থাকে। | 3. প্লাস্মিডে সব সময় DNA থাকে। |

33. বর্তমান কালে প্লাস্‌মিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুটি কারণ লেখো।

- বর্তমানে প্লাস্‌মিড নিয়ে পরীক্ষার দুটি কারণ হল—(i) প্লাস্‌মিড DNA প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জিন বহন করে এবং টক্সিন তৈরি করে। যা বহু ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করে দেয়। (ii) প্লাস্‌মিডকে জিনের বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা হয়।

34. স্যাটেলাইট ভাইরাস কাকে বলে?

- যে ভাইরাস অন্য কোনো ভাইরাসের সাহায্যে পোষক কোশে প্রবেশ করে তাকে স্যাটেলাইট ভাইরাস বলে।

## • ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) •

1. ব্যাকটেরিয়া কোশপ্রাচীরের দুটি উপাদানের নাম যা উদ্ভিদ কোশে নেই।

- টিকোইক অ্যাসিড ও মুরামিক অ্যাসিড।

2. অ্যাকট্রেরিয়া কোন্ অংশ দিয়ে শ্বসন প্রক্রিয়া চালায়?

- মেসোজোম।

3. ব্যাকটেরিয়া কোশ কী প্রকারের হয়?

- প্রোক্যারিয়টিক।

4. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াসকে কী বলে?

- নিউক্লীয়য়েড

5. পরজীবী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Neisseria gonorrhoeae*

6. মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ দাও।

- *Chlorobium limicola*।

7. বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Corynebacterium diphtheriae*

8. কয়েকটি নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Rhizobium legaminosum, Pseudomonas radicicola*

9. একটি উপকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Escherichia coli*

10. একটি স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Chlorobium limicola*

11. একটি পরভোজী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- Salmonella typhi

12. রাসায়নিক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া

- *Thiobacillus denitrifications*

13. ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।

- *Dialister pneumosintes*

14. বৃহত্তম ব্যাকটেরিয়ার নাম কী?

- *Bacillus butschilli*

15. **জৈব অ্যাসিড উৎপন্নকারী দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- অ্যাসিটিক অ্যাসিড—Acetobacter aceti
  বিউটারিক অ্যাসিড—Clostridium butyricum

16. **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- স্ট্রেপ্টোমাইসিন—Streptomyces griseus, ব্যাসিটাসি—Bacillus subtalis,
  ট্রাইকোমাইসিন—Streptomyces aurefaciens, এরিথ্রোমাইসিন—Streptomyces erythreus প্রভৃতি।

17. **ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্টের নিউক্লিয়াসের পার্থক্য করো।**

| ব্যাকটেরিয়া | ঈস্ট |
|---|---|
| 1. নিউক্লিয়াস প্রোক্যারিওটিক প্রকৃতির।<br>2. নিউক্লিয়াসে শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। | 1. নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক প্রকৃতির।<br>2. নিউক্লিয়াসে পর্দা, নিউক্লীওলাস, নিউক্লীয়প্লাজম ও ক্রোমাটিন থাকে। এতে ক্রোমোজোম থাকে। |

18. **মাংসে লবণ মাখিয়ে রাখলে বহুদিন অবধি তা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মুক্ত থাকে কেন?**

- মাংসে লবণ মাখিয়ে রাখলে মাংস তা শুষে নেয় এবং কোশগুলির মধ্যে একটি অতিসারক মাধ্যম তৈরি হয়, এর ফলে বহুদিন পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

19. **শিম্বকজাতীয় উদ্ভিদের অর্বুদ কীভাবে গঠিত হয়?**

- শিম্বক জাতীয় উদ্ভিদের মূলে মাটি থেকে রাইজোবিয়াম নামে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেই স্থানে দ্রুত কোশ বিভাজন করে এবং অর্বুদ গঠন করে। দেখা যায় অর্বুদের ভিতর **লেগ হিমোগ্লোবিন** নামে রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয় যা নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকের অক্সিজেন সরিয়ে নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সাহায্য করে।

20. **মাইক্রো অ্যারোফিলিক ব্যাকটেরিয়া কী?**

- যে সব ব্যাকটেরিয়া অল্প পরিমাণ মুক্ত অক্সিজেনে বংশবৃদ্ধি করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাদের মাইক্রো অ্যারোফিলিক ব্যাকটেরিয়া বলে।

21. **ব্যাকটেরিওসিন কী?**

- ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় টক্সিনকে ব্যাকটেরিওসিন বলা হয়।

22. **উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- *Xanthomonas citri* (লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ), *Xanthomonas oryzae* (ধান পাতার ধ্বসা রোগ)।

23. **প্রাণীর রোগ সৃষ্টিকারী কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ দাও।**

- টাইফয়েড—*Salmonella typhi*, টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার—*Clostridium tetani*, খাদ্যের জন্য বিষক্রিয়া—*Clostridium botulimum*, সিফিলিস—*Treponema pallidum*, প্লেগ—*Pasteurella pestis*, কলেরা—Vibrio cholerae, যক্ষ্মা—*Mycobacterium tuberculosis*।

24. **একটি গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- *Lactobacillus lacti.*

25. **একটি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- *Mycobacterium tuberculosis.*

26. **স্পাইনি কী?**

- কিছু গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত ছোটো নলাকার অংশ যা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে তাদের স্পাইনি বলে।

27. **পিলি কাকে বলে?**

- ব্যাকটেরিয়া দেহে অতি সূক্ষ্ম ফ্ল্যাজেলার মতো দেখতে অংশকে পিলি বলে। এর ব্যাস 3-6 nm। পিলিন প্রোটিন দিয়ে পিলি গঠিত হয়। সাধারণত যৌন জননের সময় দুটি ব্যাকটেরিয়া পিলির সাহায্যে আবদ্ধ হয়।

28. **প্লাসমিড ও এপিজোমের মধ্যে পার্থক্য কী?**

- অনেকগুলি ব্যাকটেরিয়ার কোশে DNA ছাড়া অপর একটি চক্রাকার DNA থাকে। এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম। একে প্লাসমিড বলে।
  ব্যাকটেরিয়ার কোশের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA-এর সঙ্গে যখন অপর চক্রাকার DNA অংশ যুক্ত থাকে তাকে এপিজোম বলে।

29. **ব্যাকটেরিয়াতে কি কোনো প্রকার যৌনতা দেখা যায়?**

- ব্যাকটেরিয়ায় গ্যামেট বা যৌন নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে যৌন জনন ঘটে না। যৌন জননের জন্য জিনগত পুনঃসংযুক্তির কয়েকটি প্রক্রিয়া দেখা যায়। একে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন বলে, যেমন—সংযুক্তি, রূপান্তর ও ট্রান্সডাকশান।

30. **ব্যাকটেরিয়াতে কোন্ কোন্ অঙ্গাণু থাকে না ?**

- মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অঙ্গাণু ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে থাকে না।

31. **পাস্তুরাইজেশন কাকে বলে ?**

- নির্দিষ্ট সময় ধরে মৃদু তাপ প্রয়োগ করে কোনো তরল খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য থেকে সংক্রামক জীবাণু মুক্ত করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে **পাস্তুরাইজেশন** বলে। ডেয়ারি, মদ ও বিয়ার শিল্পে এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। লুইস পাস্তুর এই প্রক্রিয়া প্রথম আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে পাস্তুরাইজেশন নাম দেওয়া হয়েছে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

#### ● ভাইরাস (Virus) ●

1. ভাইরাস কী আদি কোশ না আদর্শ কোশ ?
2. ভাইরাসের অভিধানিক অর্থ কী ?
3. ভাইরাস কথাটি কে প্রবর্তন করেন ?
4. সবচেয়ে বড়ো ভাইরাসের নাম কী ?
5. সবচেয়ে ছোটো ভাইরাসের নাম লেখো।
6. ব্যাঙাচির মতো দেখতে ভাইরাসকে কী বলা হয় ?
7. সংক্রমণযোগ্য একটি ভাইরাস কণাকে কী বলে ?
8. যার মাধ্যমে ভাইরাস পোষক কোশে পৌঁছায় তাকে কী বলে?
9. প্রোটিন দিয়ে তৈরি ব্যাকটেরিয়ার খোলককে কী বলে ?
10. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে কী বলা হয় ?
11. যে ভাইরাস ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করে তাকে কী ভাইরাস বলে ?
12. RNA যুক্ত ভাইরাসকে কী বলা হয় ?
13. বসন্তরোগের টিকা কে আবিষ্কার করেন ?
14. কে তামাক পাতার মোজেইক রোগের বর্ণনা করেন ?
15. এইডস্ ভাইরাস HIV কে আবিষ্কার করেন ?
16. একটি লাইটিক ভাইরাসের নাম লেখো।
17. একটি লাইসোজেনিক ভাইরাসের নাম লেখো।
18. কোন্ ভাইরাসে DNA একতন্ত্রী ?
19. কোন্ ভাইরাসে RNA দ্বিতন্ত্রী ?
20. দুটি জলবাহিত রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসের নাম লেখো।
21. DNA যুক্ত উদ্ভিদ ভাইরাসের নাম কী ?
22. এইডস্ ভাইরাসে কী ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে?
23. বাইনিয়েল গঠনযুক্ত একটি ভাইরাসের নাম লেখো।
24. RNA যুক্ত একটি প্রাণী ভাইরাসের নাম কী ?

#### ● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

25. ব্যাকটেরিয়া শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন ?
26. সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়ার নাম কী ?
27. সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
28. গ্রাম রঞ্জকে রঞ্জিত হয় একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
29. ইশ্চেরিশিয়া কোলি কী ধরনের ব্যাকটেরিয়া ?
30. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লীয় বস্তুকে কী বলে ?
31. একটি মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
32. একটি নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কী ?

33. ব্যাকটেরিয়ায় কী কী ধরনের যৌনতা দেখা যায় ?
34. একটি উপকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
35. একটি রোগজীবাণু ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
36. দুটি বীজধর ওষুধের নাম করো।
37. ব্যাকটেরিয়া কোন্ অংশ দিয়ে শ্বসন প্রক্রিয়া চালায় ?
38. জৈব অ্যাসিড উৎপাদনকারী একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
39. একটি রাইবোভাইরাসের উদাহরণ দাও।
40. ফ্রেডরিক গ্রিফিত কী আবিষ্কার করেন ?
41. ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়াটি প্রথম কে দেখান ?
42. তরুণ গ্রহণের ওপর ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস কে করেন ?
43. একটি তাপপ্রেমী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
44. মেসোফিলিক ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ দাও।

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

### • ভাইরাস (Virus) •

1. ভাইরাস প্রথম নামকরণ করেন—মেয়ার ☐ / ক্লুসিয়াস ☐ / বাইজারিঙ্ক ☐ / ডাকটি ☐।
2. কোন্ ভাইরাসের ক্যাপসিডে প্রোটিনের সঙ্গে শর্করাজাতীয় পদার্থ ও স্নেহপদার্থ সঞ্চিত থাকে—ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ☐ / ভ্যারিওলা ভাইরাস ☐ / মাম্পস ভাইরাস ☐ / এইডস্ ভাইরাস ☐।
3. তামাক পাতার মোজেইক রোগের নামকরণ করেন—রবার্ট কক ☐ / সক্রেলিন্সার ☐ / ডি. হেরেল ☐ / এডল্ফ মেয়ার ☐।
4. ভাইরাস বলতে বোঝায়—আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত জীব ☐ / নিউক্লিয়াসযুক্ত জীব ☐ / অকোশীয় জীব ☐ / কোনোটি সঠিক নয় ☐।
5. ভাইরাস যে বাহকের মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে তাকে বলে—সংযেত ভাইরাস ☐ / সায়ানোফাজ ☐ / ভেক্টর ☐ / ভিরিয়ন ☐।
6. ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করায়—নিউক্লীয় ক্যাপসিড ☐ / ডি. এন. এ. ☐ / ক্যাপসিড ☐ / পুচ্ছতন্তু ☐।
7. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভাইরাসের মাধ্যমে ঘটে—আমাশয় ☐ / এনকেফেলাইটিস ☐ / প্লেগ ☐ / প্যারাটাইফয়েড ☐।
8. নাইট্রোজেন স্থিতিকরণকারী ব্যাকটেরিয়া হল—অ্যাজোটোব্যাকটর ☐ / স্ট্যাফাইলোকক্কাস ☐ / ব্যাসিলাস ☐ / সিউডোমোনাস ☐।
9. উদ্ভিদের একটি DNA যুক্ত ভাইরাস হল—টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ☐ / সিউকো ভাইরাস ☐ / ফুলকপি মোজেইক ভাইরাস ☐ / আলুর এক্স ভাইরাস ☐ ।
10. অপত্য গঠনের পর ব্যাকটেরিয়া কোশের বিদারণকে বলা হয়—ইন্টারফেরণ ☐ / প্রোফাজ ☐ / বাইনাল গঠনযুক্ত ভাইরাস ☐ / লাইসিস ☐।

### • ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) •

11. ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন—লুইপাস্তুর ☐ / এফ. জে. কন. ☐ / রবার্ট কক ☐ / এন্টনি ভি লেউ ☐।
12. এককোশী গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একত্রিতভাবে ঘনক্ষেত্রাকারে থাকলে তাদের বলে—স্ট্যাফাইলোকক্কাস ☐ / সারসিনি ☐ / টেট্রাকক্কাস ☐ / স্ট্রেপটোকক্কাস ☐।
13. কোন্ ব্যাকটেরিয়ার ফ্লাজেলাগুলি যদি কোশের চারপাশে বেষ্টন করে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়াকে বলে—অ্যাট্রিকাস ☐ / লোফোট্রিকাস ☐ / পেরিট্রিকাস ☐ / অ্যাম্ফিট্রিকাস ☐।
14. মানুষের একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ হল—হার্পিস ☐ / প্লেগ ☐ / পোলিও ☐ / এইডস্ ☐।
15. ভাইরাসে DNA ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে—ভিরিয়ন ☐ / প্রোফাজ ☐ / নিউক্লীয়ড ☐ / জিনোম ☐।
16. যেসব ব্যাকটেরিয়া পোশক দেহ থেকে পাচিত খাদ্য শোষণ করে তাদের বলে—প্যারাট্রফিক ☐ / ফোটোহেটেরোট্রফিক ☐ / মেটাট্রফিক ☐ / কেমোহেটেরোট্রফিক ☐।
17. 'কমা' চিহ্নের মতো দেখতে ব্যাকটেরিয়াকে বলে—ভিব্রিও ☐ / স্পাইরিলাম ☐ / দণ্ডাকার ☐ / গুচ্ছ আকার ☐।
18. ভিটামিন $B_2$ উৎপাদনকারী একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম—ল্যাক্টোব্যাসিলাস ল্যাকটি ☐ / ক্লস্ট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম ☐ / স্ট্রেপটোমাইসেস এরিথ্রোগ্রিসেন্স ☐ / স্ট্রেপটোকক্কাস লিকোলাইটিকাস ☐ / স্ট্রেপটোমাইসেস এরিথ্রিয়াস ☐।
19. ব্যাকটেরিয়ার যৌনজনন (প্রজননিক বস্তুর আদান প্রদান) কে আবিষ্কার করেন—লেডারবার্গ ☐ / এফ. জেকব ☐ / ই. উলম্যান ☐ / এহরেনবার্গ ☐।
20. ব্যাকটেরিয়ার কোশ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হল—প্রোটিন ☐/ পলিস্যাকারাইড ☐/ মিউকোপেপটাইড ☐ / লিপিড ☐।
21. একটি পূর্ণ পরজীবী ব্যাকটেরিয়া হল—ভিব্রিও কোলেরি ☐ / নিসেরিয়া গনোরি ☐ / রোডোস্পাইরিলাম রুব্রাম ☐ / ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

### ● ভাইরাস (Virus) ●

1. সাইটোপ্লাজম বিহীন কোশ ——— নামে পরিচিত।
2. RNA যুক্ত ভাইরাসকে ——— বলে।
3. ভাইরাস প্রোটিন আবরণীর একককে ——— বলা হয়।
4. পোটাটো স্পিন্ডিল টিউবার ভাইরাসকে ——— বলে।
5. দণ্ডাকার ভাইরাসের উদাহরণ হল ———।
6. একটি উপকারী ভাইরাস হল ———।
7. ——— ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে বলে।
8. RNA দ্বিতন্ত্রী ভাইরাস হল ———।
9. একটি DNA যুক্ত উদ্ভিদ ভাইরাসের নাম ———।
10. ভাইরাসের বংশগতি বস্তু হল ———।
11. *Lactobacillus lacti* একটি গ্রাম ——— ভাইরাস।
12. কতগুলি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোশপর্দা ও কোশপ্রাচীরের মাঝখানে এক ধরনের জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে ——— বলে।
13. বাইনাল গঠনযুক্ত একটি ভাইরাসের উদাহরণ হল ———।
14. প্রজনন ক্ষমতা ও ——— ভাইরাসের সজীবতার লক্ষণ।
15. ব্যাকটেরিয়া কোশে নতুন অপত্য সৃষ্টির পর পোষক ব্যাকটেরিয়াটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রক্রিয়াটিকে ——— বলে।

### ● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

16. যেসব ব্যাকটেরিয়া গ্রাম রঞ্জককে রঞ্জিত হয় না তাদের ——— ব্যাকটেরিয়া বলে।
17. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াসকে ——— বলা হয়।
18. মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ হল ———।
19. নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়া হল ———।
20. ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন আবিষ্কার করেন ———।
21. জিন্ডার ও লেজার বার্গ 1952 খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়ার ——— আবিষ্কার করেছিলেন।
22. Chlorobium sp. হল একপ্রকার ——— ব্যাকটেরিয়া।
23. ছত্রাক ধ্বংসকারী ব্যাকটেরিয়াকে ——— বলে।
24. সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাকটেরিয়া ——— লম্বায় 80μm পর্যন্ত হয়।
25. 'কমা' চিহ্নের মতো ব্যাকটেরিয়াকে ——— বলে।
26. ফ্লাজেলাগুলি কোশকে বেষ্টন করে থাকলে তাকে ——— ব্যাকটেরিয়া বলে।
27. ব্যাকটেরিয়া কোশে জেনোফোর ছাড়াও অপর DNA অণুকে ——— বলে।
28. পিলিন প্রোটিন ——— থাকে।
29. ভিটামিন K উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হল ———।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

### ● ভাইরাস (Virus) ●

1. TMV ভাইরাসের গঠন আবিষ্কার করেন ———
   (a) ডি. হেরেল (b) টাকাহাসি ও রলিন্স (c) লুইপাস্তুর ও জেনার (d) রবার্ট কক্‌।
2. যেসব ভাইরাস অন্য ভাইরাসের সাহায্যে পোষক কোশে ঢোকে তাদের বলে ———
   (a) স্যাটেলাইট ভাইরাস (b) HIV ভাইরাস (c) প্রোফাজ (d) রাউস সারকোমা ভাইরাস।
3. একটি নিষ্ক্রিয়, অপ্রজননিক প্রোটিন দিয়ে গঠিত বহিরাবরণকে ——— বলে।
   (a) ক্যাপসোমিয়ার (b) নিউক্লিক অ্যাসিড (c) ক্যাপসিড (d) ভিরিয়ন।
4. প্রাণী কোশের ক্ষেত্রে ভিরিয়ন পোষক কোশের সঙ্গে আবদ্ধ হলে, ——— প্রক্রিয়ায় নিউক্লীয়-ক্যাপসিড কোশের মধ্যে প্রবেশ করে।
   (a) ব্যাপন (b) শোষণ (c) আত্তীকরণ (d) ফ্যাগোসাইটোসিস।
5. ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিডকে ——— বলা হয়।
   (a) DNA (b) RNA (c) ইনটারফেরন (d) নিউক্লীওয়েড।

### ● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

6. অল্পসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া কোশে ——— থাকায় এরা স্বভোজী।
   (a) প্রোটিন (b) শর্করা (c) ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল (d) RNA
7. জননের সময় দুটি ব্যাকটেরিয়া সূক্ষ্ম সুতোর মতো ——— দিয়ে সংযুক্ত হয়।
   (a) ফ্ল্যাজেলা (b) ক্যাপসিড (c) পুচ্ছতন্তু (d) পিলি।
8. উদ্ভিদের মধ্যে পেপটাইডোগ্লাইকেন শুধুমাত্র ——— পাওয়া যায়।
   (a) ছত্রাকে (b) ব্রায়োফাইটায় (c) নীলাভ সবুজ শৈবালে (d) পাইনের ছালে।
9. ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে একটি রাইবোজোম দুটি অসম অধঃএকক নিয়ে গঠিত এবং দুটি অধঃএককের অধঃক্ষেপন গুনাঙ্ক (Sedimentation coefficient) যথাক্রমে 50S এবং ———।
   (a) 40S (b) 30S (c) 80S (d) 10S।
10. ব্যাকটেরিয়ার DNA কোশপর্দার ——— সঙ্গে আবদ্ধ থাকে।
    (a) ক্যাপসিডের (b) হিস্টোন প্রোটিনের (c) গ্যাস থলির (d) মেসোজোমের।

### E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

**● ভাইরাস (Virus) ●**

1. ভাইরাসের অকোশীয় দেহ প্রোটিন দিয়ে তৈরি আবরক এবং এর ভেতরে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।
2. মুক্ত অবস্থায় ভাইরাসের বিপাক ও শ্বসন প্রক্রিয়া দেখা যায়।
3. তামাক গাছের মোজেইক ভাইরাসের ক্যাপসিডে প্রায় 2,200টি ক্যাপসোমিয়ার প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো ঘনভাবে সজ্জিত থাকে।
4. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুপ্রবেশ এবং একটি পোষক কোশ থেকে অন্য পোষক কোশের বিদারণের পূর্ব অবস্থাকে গ্রাস দশা বলে।
5. ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর সঙ্গে যুক্ত ফাজ DNA-এর অংশকে প্রোফাজ বলে।

**● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●**

6. প্রায় দুই শতাব্দী পরে, 1854 খ্রিস্টাব্দে এফ. জে. কন্ (F. J. Cohn) নিউয়েনহুকের আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক সজীব বস্তুকে ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন।
7. সব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত গোলাকার হয়।
8. ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরের মূল উপাদান পেপটাইডোগ্লাইকেন।
9. ব্যাকটেরিয়াকে কৃত্রিম অনুশীলন দ্রবণে (Artificial nutrient solution) কালচার করা যায় না।
10. *Nitrobacter sp.* অ্যামোনিফিকেশান করতে সক্ষম।
11. ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন অংশ একটি বৃত্তাকার দ্বিতন্ত্রী DNA তন্তু নিয়ে গঠিত। একে **ক্রোমোজোম** বলে।
12. ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমের যে অংশে DNA তন্তু অবস্থান করে তাকে **থাইলাকয়েড** বলে।
13. স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ার দেহরঞ্জককে ফাইকোবিলিন বলে।
14. কুষ্ঠ রোগের জীবাণু হল মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি।
15. টিকোইক অ্যাসিড ও মুরামিক অ্যাসিড শুধু ব্যাকটেরিয়ার কোশ প্রাচীরে পাওয়া যায়, কিন্তু উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে পাওয়া যায় না।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

**(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)**

**● ভাইরাস (Virus) ●**

1. ভাইরাসের দুটি জড় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
2. ভাইরাসে দুটি সজীব বৈশিষ্ট্য লেখো।
3. ভিরিয়ন কাকে বলে ?
4. ভেক্টর কী ?
5. ভাইরাসকে অকোশীয় বলে কেন ?
6. দুটি ভাইরাসের নাম লেখো যেখানে DNA এবং RNA উভয়ে বর্তমান।
7. অনকোজেনিক ভাইরাস কাকে বলে ?
8. স্যাটেলাইট ভাইরাস কী ?
9. লাইটি চক্র কী ?
10. লাইসোজেনক চক্র কাকে বলে ?
11. প্রোফাজ কী ?
12. সুপ্ত দশা কাকে বলা হয় ?
13. গ্রাস দশা কাকে বলে ?
14. ভাইরাস ঘটিত দুটি উদ্ভিদ ও দুটি মানুষের রোগের নাম লেখো।
15. বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন কী ?
16. ভিরিয়ন ও ভেক্টর কী ?
17. ভাইরাস কোথায় পাওয়া যায় ?
18. সাইনোফাজ কী ?
19. ক্যাপসোমিয়ার কী ?
20. ভাইরাসের দুটি গুরুত্ব লেখো।

**● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●**

21. ক্যাপসুলের কাজ কী ?
22. মেসোজোম কী ?
23. অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিন উৎপাদনকারী দুটি ব্যাকটেরিয়ার বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
24. ব্যাকটেরিওসিন কী ?
25. পিলি কী ?
26. পেরিপ্লাজম ককে বলে ?
27. শৈত্যপ্রেমী ও তাপপ্রেমী ব্যাকটেরিয়া কী ?
28. পেরিট্রিকাস কী ? উদাহরণ দাও।
29. গ্রামপজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে ?
30. মেটাট্রফিক ব্যাকটেরিয়া কী ?
31. ট্রান্সডাকশন কাকে বলে ?
32. রূপান্তর-ভবন কাকে বলা হয় ?
33. সংযুক্তি কাকে বলে ?
34. অন্তঃরেণু কী ?
35. ফ্ল্যাজেলার কাজ কী কী ?
36. পিলির কাজ উল্লেখ করো।
37. ব্যাকটেরিয়ার কেশপ্রাচীরের কাজ কী ?
38. কোন্ কোন্ ব্যাকটেরিয়া জমির উর্বরতা বাড়ায় ?
39. দই ও কোহালজাতীয় বস্তু উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।
40. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম ও বীজঘ্নের নাম লেখো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

● ভাইরাস (Virus) ●

1. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
2. ভাইরাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
3. ব্যাকটেরিওফাজের গঠন বর্ণনা করো।
4. ভাইরাসে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
5. HIV ভাইরাসে সংক্রমণ পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।
6. ভাইরাস জিনোমের বিবরণ দাও।
7. ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বস্তু বলে কেন?
8. ভাইরাসের জড় ও সজীব বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
9. ভাইরাসের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
10. HIV ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি লেখো।

● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

11. ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীরের গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
12. পিলির গঠন ও কাজ উল্লেখ করো।
13. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লীয় বস্তুর বর্ণনা দাও।
14. অঁন্তঃরেণু গঠন ও কাজের বর্ণনা দাও।
15. সংযুক্তি কী ? সংক্ষেপে লেখো।
16. প্লাসমিড কী ? এর কাজ উল্লেখ করো।
17. জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা উল্লেখ করো।
18. লাইটিক দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
19. ব্যাকটেরিয়াকে কেন প্রোক্যারিয়ট বলা হয় ?
20. প্লিওমরফিজম কী ? উদাহরণ দাও।

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

● ভাইরাস (Virus) ●

1. ভাইরাস ও কোশযুক্ত জীব; 2. ভাইরাস ও ভিরিয়ন; 3. ক্যাপসোমিয়ার ও পেলপোমিয়ার; 4. TMV ও ব্যাকটেরিওফাজ; 5. উদ্ভিদ ভাইরাস প্রাণী ভাইরাস; 6. অন্তঃকোশীয় ভিরিয়ন ও বহিঃকোশীয় ভিরিয়ন; 7. ভিরিয়ন ও ভেক্টর; 8. লাইটিক ভাইরাস ও লাইসোজেনিক ভাইরাস।

● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

9. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া; 10. গ্রাম নেগেটিভ ও গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া; 11. ব্যাকটেরিয়া ও উদ্ভিদ কোশ; 12. পিলি ও ফ্ল্যাজেলা; 3. মেসোজোম ও এপিজোম; 14. ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন; 15. বাইনারিফিশান ও বাডিং; 16. মনোট্রিকেটস ও পেরিট্রিকেটস।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

● ভাইরাস (Virus) ●

1. ব্যাকটেরিওফাজ, 2. সাইনোফাজ, 3. ক্যাপসিড, 4. ক্যাপসোমিয়ার, 5. পেলপোমিয়ার, 6. নিউক্লিয়েড, 7. ভিরিয়ন, 8. ভেক্টর, 9. গ্রাস শা, 10. সুপ্ত দশা, 11. বিদারণ, 12. লাইটিক চক্র, 13. TMV, 14. ব্যাকটেরিওফাজ, 15. প্রোফাজ।

● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

16. প্লাসমিড, 17. এপিজোম, 18. মেসোজোম, 19. ক্যাপসুল, 20. ফ্ল্যাজেলা, 21. পেপটাইডোগ্লাইকন, 22. পিলি, 23. এন্ডোস্পোর, 4. ট্রান্সডাকশন, 25. রূপান্তরভবন, 26. কনিডিয়া, 27. দ্বিবিভাজন, 28. জেনোফোর, 29. প্লাসমিড, 30. সংযুক্তি।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

● ভাইরাস (Virus) ●

1. (a) ভাইরাসের সংজ্ঞা দাও। (b) ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
2. ব্যাকটেরিওফাজের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করো।
3. E. Coli ব্যাকটেরিয়ার চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
4. চিত্রসহ টোবাকো মোজেইক ভাইরাসের গঠন বর্ণনা করো।
5. (a) ভাইরাসের প্রকৃতি কী ? (b) ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো।
6. (a) ভাইরাসকে অকোশীয় বলার কারণ কী ? (b) কতগুলি অপকারী ভাইরাসের নাম করো। (c) T.M.V. ভাইরাসের গঠন বর্ণনা করো।
7. লাইটিক ও লাইসোজেনিক চক্রের বিবরণ দাও।

## ● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

8. (a) ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা লেখো। (b) ব্যাকটেরিয়া র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
9. ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি ও প্রকার সম্বন্ধে লেখো।
10. ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গজ ও অযৌন জনন কী কী ভাবে ঘটে সংক্ষেপে লেখো।
11. পুষ্টি অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়াকে কীভাবে বিভক্ত করা যায় ? প্রত্যেক ক্ষেত্রে উদহরণ দাও।
12. (a) এন্ডোস্পোর কী ? (b) চিত্র সহযোগে এন্ডোস্পোরের গঠন বর্ণনা করো। (c) ব্যাকটেরিয়ার এন্ডোস্পোরকে জননস্পোর বলা যায় কি ?
13. (a) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ কী ? (b) দুটি নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো। মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা উল্লেখ করো।
14. (a) ব্যাকটেরিয়ায় কি কোনো প্রকার যৌনতা দেখা যায় ? (b) ব্যাকটেরিয়ার যৌনজনন সম্পর্কে আলোচনা করো।

**B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the diagram) ঃ**

## ● ভাইরাস (Virus) ●

1. ব্যাকটেরিওফাজ; 2. T.M.V. 3. লাইটিক চক্র; 4. লাইসোজেনিক চক্র।

## ● ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ●

5. E. Coli ব্যাকটেরিয়া; 6. এন্ডোস্পোর; 7. ট্রান্সডাকশন; 8. সংযুক্তি; 9. দ্বিবিভাজন; 10. বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আকার; 11. ফ্ল্যাজেলা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া।

## অধ্যায়ের বিষয়সূচি :

**●● কলা ●●**



**●● কলাতন্ত্র ●●**



# কলা এবং কলাতন্ত্র
# [ TISSUE AND TISSUE SYSTEM ]

## ভূমিকা (Introduction) :

● **কলা** : প্রত্যেকটি জীবের একটিমাত্র কোশ নিয়ে জীবনের সূত্রপাত ঘটে। এই কোশটি অনেকবার বিভাজিত হয়ে বহুকোশী জীব গঠন করে। বহুকোশী জীব বিচিত্র আকৃতির অসংখ্য কোশ নিয়ে তৈরি। এদের কাজও বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রতিটি বহুকোশ জীব একটিমাত্র ভ্রূণাণু কোশ থেকে উৎপন্ন হয়; পরবর্তীকালে ওই কোশ বহুবার বিভাজিত হয়ে বহু কোশ গঠন করে। বিবর্তন ও অভিযোজনের উপর নির্ভর করে জীবদেহে কোশের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায় এবং জটিল যান্ত্রিক ও জৈবিক কাজ পরিচালনার জন্য এদের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশেষে কোশগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হয়। জীবন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন কোশগোষ্ঠী শ্রমবিভাগ অনুসারে শ্বসন, চলন, পুষ্টি, বৃদ্ধি, জনন, আত্মরক্ষা প্রভৃতি জৈবিক ও যান্ত্রিক কাজগুলি পরিচালনা করে; এই ধরনের কোশগোষ্ঠীকে **কলা** বলে। যদিও প্রত্যেকটি কলার গঠন ও কাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটি কলা অন্য কলার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

● **কলাতন্ত্র** : ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের দেহের অন্তর্গঠন অসংখ্য কোশগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয়। এসব কোশগোষ্ঠীর কাজ একই রকম হয় না। একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোশসমষ্টি যখন একই কাজ করে তখন সেই কোশসমষ্টিকে **কলা** বলে। আবার কতকগুলি কলার সমষ্টি সংগঠিত হয়ে একই কাজ করলে তাকে **কলাতন্ত্র** বলা হয়। সুতরাং কোশসমষ্টি হল কলা এবং কলাসমষ্টি হল কলাতন্ত্র।

## ✪ কলা (TISSUE) ✪

❖ (a) **কলার সংজ্ঞা (Definition of tissue) :** উৎপত্তিগতভাবে এক এবং কার্যগতভাবে অভিন্ন এমন সম ও বিষম আকৃতির কোশসমষ্টিকে কলা বলা হয়।

● **কোশ ও কলার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cell and Tissue) :**

| কোশ | কলা |
|---|---|
| 1. বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে কোশ গঠিত হয়। | 1. সম ও বিষম আকৃতির কোশ মিলিত হয়ে কলা গঠিত হয়। |
| 2. কোশ হল জীবদেহের গঠনগত একক। | 2. কলা হল জীবদেহ সংগঠনের একটি একক মাত্র। |

## ✪ 2.1. উদ্ভিদ কলা (Plant Tissue) ✪

◘ (b) **উদ্ভিদ কলার প্রকারভেদ (Types of Plant Tissue) :** পরিস্ফুরণের দশা, কাজ, অবস্থান, উৎপত্তি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ কলার শ্রেণিবিভাগ করা যায়। উৎপত্তি অনুসারে উদ্ভিদ কলাকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— (A) **ভাজক কলা** (Meristematic tissue) এবং (B) **স্থায়ী কলা** (Permanent tissue)।

যে কলার কোশগুলি বিভাজিত হয়ে নতুন কোশ উৎপন্ন করে তাদের **ভাজক কলা** বলে। উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশে এদের দেখা যায়। অন্যদিকে বিভাজনে অক্ষম পরিণত কোশসমষ্টিকে **স্থায়ী কলা** বলে।
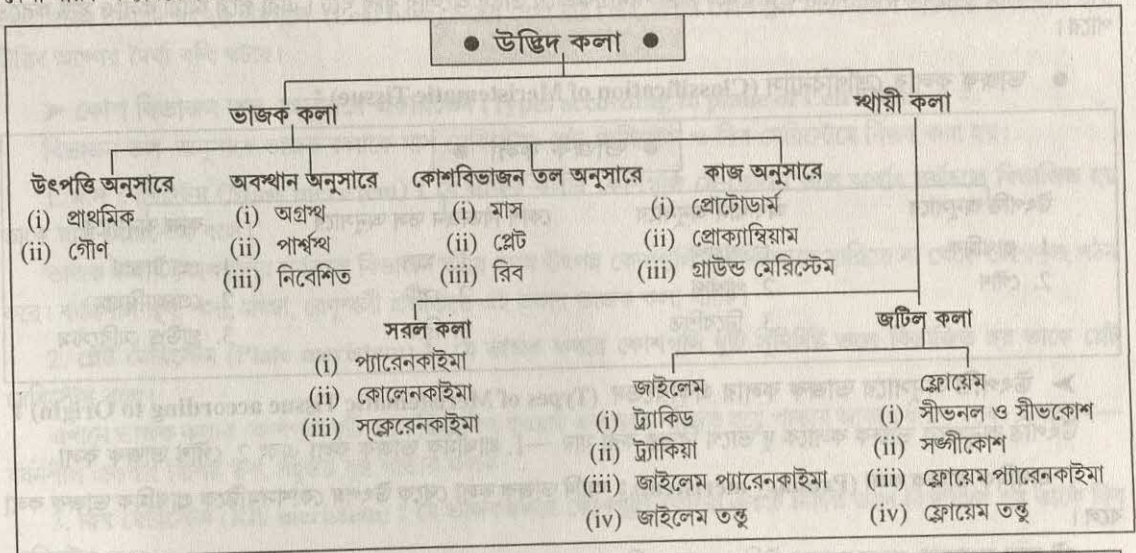
## ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা | Meristematic and Permanent Tissue

### ▲ A. ভাজক কলা—সংজ্ঞা, গঠনগত বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও কাজ (Meristematic Tissue—Definition, Characterization, Occurrence and Functions) :

❖ (a) **ভাজক কলার সংজ্ঞা (Definition of Meristematic tissue) :** যে কলার অপরিণত কোশগুলি বিভাজিত হয়ে নতুন অপত্য কোশ গঠন করে তাদের ভাজক কলা বলে।

■ (b) **গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural features)** : ভাজক কলাকে মেরিস্টেম (Meristem)-ও বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (i) কোশগুলি বিভাজিত হতে পারে। (ii) কোশগুলির আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার ও বহুভুজাকার হয়। (iii) কোশপ্রাচীর পাতলা। (iv) কোশগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় কোশান্তর রন্ধ্র থাকে না। (v) প্রতিটি কোশে বড়ো ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। (vi) কোশে সাধারণত কোনো কোশগহ্বর বা 'ভ্যাকুওল' থাকে না। (vii) প্রতিটি কোশ সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। (viii) প্লাসটিড প্রোপ্লাসটিড (Proplastid) অবস্থায় থাকে। (ix) কোশে সঞ্চিত খাদ্য বা রেচন পদার্থ থাকে না।
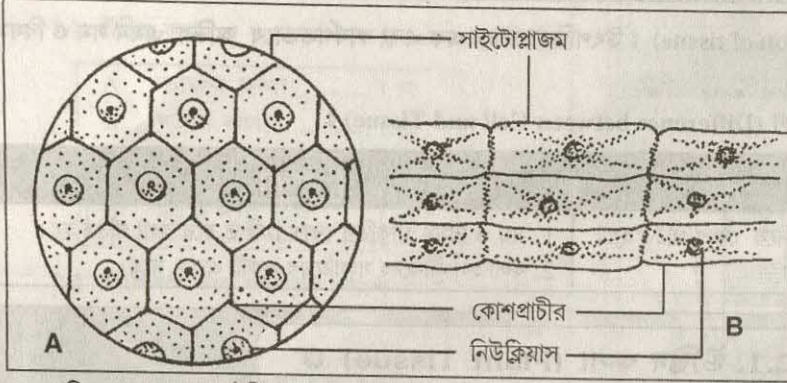
চিত্র 2.1 : A. বর্ধনশীল অংশের ভাজক কলার কোশ, B. ক্যাম্বিয়ামের ভাজক কলা।

■ (c) **অবস্থান (Occurrence)** : ভাজক কলা উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলে বিশেষত কাণ্ড, শাখা ও মূলের শীর্ষে থাকে। পাতা ও ফুলের কুঁড়িতেও ভাজক কলা দেখা যায়। ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম নামে ভাজক কলা থাকে।

■ (d) **কাজ (Functions)** : ভাজক কলার কোশগুলি ক্রমাগত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে নতুন অপত্য কোশ তৈরি করে। সুতরাং কোশের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে বলে সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে। এরা পরে স্থায়ী কলাও সৃষ্টি করতে পারে।

● **ভাজক কলার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Meristematic Tissue)** :

**● ভাজক কলা ●**

| উৎপত্তি অনুসারে | অবস্থান অনুসারে | কোশ বিভাজন তল অনুসারে | কাজ অনুসারে |
|---|---|---|---|
| 1. প্রাথমিক | 1. অগ্রস্থ | 1. মাস | 1. প্রোটোডার্ম |
| 2. গৌণ | 2. পার্শ্বস্থ | 2. প্লেট | 2. প্রোক্যাম্বিয়াম |
| | 3. নিবেশিত | 3. রিব | 3. গ্রাউন্ড মেরিস্টেম |

➤ **উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলার প্রকারভেদ (Types of Meristematic Tissue according to Origin)** :

উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় —1. **প্রাথমিক ভাজক কলা** এবং 2. **গৌণ ভাজক কলা**

1. **প্রাথমিক ভাজক কলা (Primary meristem)** : **আদি ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন কোশসমষ্টিকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলে।**

এই কলা ভ্রূণাবস্থা থেকে আমৃত্যু উদ্ভিদের দেহে বিভাজনক্ষম থাকে। প্রাথমিক ভাজক কলা উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও বিভিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগে থাকে।

2. **গৌণ ভাজক কলা (Secondary meristem)** : **স্থায়ী কলা থেকে উৎপন্ন ভাজক কলাকে গৌণ ভাজক কলা বলা হয়।** প্রাথমিক কলা বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে স্থায়ী কলায় পরিণত হয়। প্রয়োজনে স্থায়ী কলাও পুনরায় বিভাজন ক্ষমতা ফিরে পায় এবং ভাজক কলার মতোই নতুন অপত্য কোশ সৃষ্টি করতে থাকে। এরাই হল **গৌণ ভাজক কলা**। **নিবেশিত ভাজক কলা** (Intercalary meristematic tissue), **ফেলোজেন বা কর্ক ক্যাম্বিয়াম** (Phellogen or Cork Cambium), **ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** (Interfascicular Cambium) প্রভৃতি হল গৌণ ভাজক কলা।

➤ **অবস্থান অনুসারে ভাজক কলার প্রকারভেদ (Types of Meristematic Tissue according to Position) :**

অবস্থান অনুসারে ভাজক কলা তিন প্রকার—অগ্রস্থ ভাজক কলা, নিবেশিত ভাজক কলা এবং পার্শ্বস্থ ভাজক কলা।

1. **অগ্রস্থ ভাজক কলা (Apical meristem) : যে ভাজক কলা বর্ধনশীল উদ্ভিদ অঙ্গের অগ্রভাগে বা শীর্ষে অবস্থান করে তাদের অগ্রস্থ ভাজক কলা বলে।**

উদ্ভিদ অঙ্গের যে স্থানে কোশ বিভাজন ঘটে সেই অংশে যেমন পাতা, কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে এইধরনের ভাজক কলা দেখা যায়। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এই কলার কোশগুলি বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায়।

2. **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা (Lateral meristem) : বর্ধনশীল উদ্ভিদ অঙ্গের পাশে বা পরিধিতে অবস্থানকারী ভাজক কলাকে পার্শ্বস্থ ভাজক কলা বলে।**

পার্শ্বস্থ ভাজক কলা মূল ও কাণ্ডের পরিধিতে লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোশগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের প্রস্থ বা পরিধির বৃদ্ধি ঘটে। **ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** (Fascicular Cambium) হল পার্শ্বস্থ ভাজক কলা।

চিত্র : 2.2 : ভাজক কলার অবস্থানের চিত্ররূপ।

3. **নিবেশিত ভাজক কলা (Intercalary meristem) : বর্ধনশীল উদ্ভিদ অঙ্গের দুটি স্থায়ী কলাস্তরের মধ্যে অবস্থানকারী ভাজক কলাকে নিবেশিত ভাজক কলা বলা হয়।**

উদ্ভিদের স্থায়ী কলার মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে এই কলা দেখা যায়। এদের উৎপত্তি প্রধানত স্থায়ী কলা থেকেই ঘটে। ওই স্থায়ী কোশগুলি বিভাজন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং ভাজক কলা হিসাবে কাজ করে। বাঁশ, দূর্বা প্রভৃতি উদ্ভিদের পর্ব মধ্যে ও পাইন, ইকুইজিটাম ইত্যাদি গাছের পত্রমূলে (Leaf base) এদের দেখা যায়। এই কলার কোশগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়।
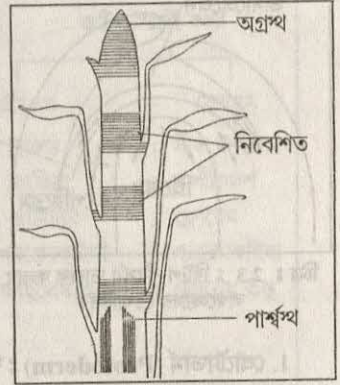
➤ **কোশ বিভাজন তল অনুসারে প্রকারভেদ (Types according to plane of Cell division) :**

বিভাজন তল অনুসারে ভাজক কলাকে মাস মেরিস্টেম, প্লেট মেরিস্টেম ও রিব মেরিস্টেমে বিভক্ত করা হয়।

1. **মাস মেরিস্টেম (Mass meristem) : যে ভাজক কলার কোশগুলি যে-কোনো তলে অর্থাৎ সর্বতলে বিভাজিত হয় তাকে মাস মেরিস্টেম বলে।**

ভাজক কলার কোশগুলির সর্বতলে বিভাজন ঘটায় প্রথম উৎপন্ন কোশগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সারিতে না থেকে কোশগুচ্ছ গঠন করে। বর্ধনশীল ভ্রূণ, শস্য, মজ্জা, রেণুস্থলী প্রভৃতিতে এই প্রকার ভাজক কলা থাকে।

2. **প্লেট মেরিস্টেম (Plate meristem) : যে ভাজক কলার কোশগুলি দুটি সুনির্দিষ্ট তলে বিভাজিত হয় তাকে প্লেট মেরিস্টেম বলে।**

এখানে ভাজক কলার কোশগুলি দুটি তলে বিভাজিত হওয়ায় এক স্তরে সজ্জিত হয়ে পাতার আকার ধারণ করে। **উদাহরণ**—বর্ধনশীল একস্তর বিশিষ্ট ত্বক, বহুস্তর যুক্ত পাতার ফলক।

3. **রিব মেরিস্টেম (Rib meristem) : যে ভাজককলার কোশগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট তলে বিভাজিত হয় তাকে রিব মেরিস্টেম বলে।**

এক্ষেত্রে ভাজক কলার কোশগুলি একটি তলে বিভাজিত হবার ফলে এক সারিতে সাজানো থাকে। **উদাহরণ** — বর্ধনশীল বহিঃস্তর (Cortex), মজ্জা (Pith) প্রভৃতি।

➤ **কাজ অনুসারে ভাজক কলার প্রকারভেদ (Types according to function) :**

কাজ অনুসারে ভাজক কলাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(a) বিজ্ঞানী **হ্যান্সস্টেইন** (Hanstein, 1870) হিস্টোজেন তত্ত্বে অগ্রস্থ ভাজক কলাকে কাজ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন— **ডার্মাটোজেন, পেরিব্লেম ও প্লিরোম।**

1. ডার্মাটোজেন (Dermatogen) : উদ্ভিদ অঙ্গের পরিধির দিকে যে স্তর থেকে বহিস্ত্বক গঠিত হয় তাকে ডার্মাটোজেন বলে।

চিত্র : 2.3 : বিটপ-শীর্ষের ভাজক কলার লম্বচ্ছেদের রেখাচিত্র।

এই কলার কোশগুলি অরীয়ভাবে বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের ত্বক গঠন করে।

2. পেরিব্লেম (Periblem) : **শীর্ষ ভাজক কলার মধ্যাংশের যে কোশস্তর থেকে বহিস্ত্বক, অধস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক গঠিত হয় তাকে পেরিব্লেম বলে।**

এই কলা অধস্ত্বক, অন্তস্ত্বক ও বহিস্ত্বক, মজ্জা ও মজ্জার রশ্মি গঠন করে।

3. প্লিরোম (Plerome) : **অগ্রস্থ ভাজক কলার যে অংশ থেকে স্টিলি বা কেন্দ্রস্তম্ভ গঠিত হয় তাকে প্লিরোম বলা হয়।** এই কলার স্তর থেকে কেন্দ্র-স্তম্ভ গঠিত হয়।

(b) বিজ্ঞানী **হ্যাবারল্যান্ডট** (Haverlandt, 1914) অগ্রস্থ ভাজক কলাকে কাজ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন— **প্রোটোডার্ম, প্রোক্যাম্বিয়াম ও গ্রাউন্ড মেরিস্টেম।**

1. প্রোটোডার্ম (Protoderm) : **শীর্ষ ভাজক কলার যে অংশ বহিস্ত্বক গঠন করে তাকে প্রোটোডার্ম বলা হয়।** এই কলার কোশগুলি দুটি তলে অরীয়ভাবে বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের ত্বক গঠন করে।

2. প্রোক্যাম্বিয়াম (Procambium) : **অগ্রস্থ ভাজক কলার যে অংশ শিরাত্বক কলা গঠন করে তাকে প্রোক্যাম্বিয়াম বলে।** এই কলার স্তর স্টিলি বা কেন্দ্রস্তম্ভ গঠন করে। এই কলার কোশগুলি সূচালো ও লম্বাটে। এই কোশস্তর স্টিলি বা কেন্দ্রস্তম্ভ গঠন করে।

3. গ্রাউন্ড মেরিস্টেম (Ground meristem) : **অগ্রস্থ ভাজক কলার যে কোশস্তর বহিঃস্তর ও মজ্জা গঠন করে তাকে গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বলে।** উদ্ভিদ অঙ্গের বহিস্ত্বক, মজ্জা ও মজ্জাংশু এই কলা দিয়ে গঠিত হয়।
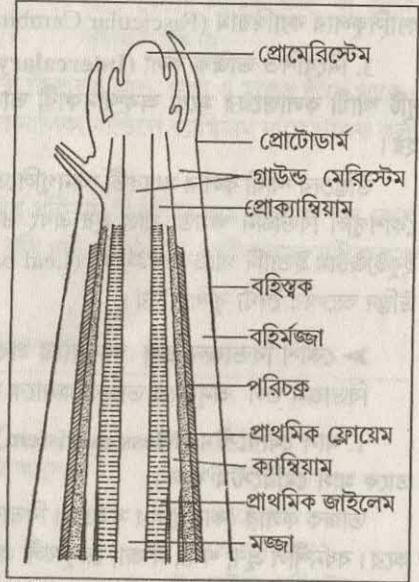
চিত্র : 2.4 : কাজ অনুসারে বিভিন্ন রকমের ভাজক কলার বিন্যাসের চিত্ররূপ।

● ফেলোজেন এবং প্রোক্যাম্বিয়াম কাকে বলে ? ●

1. বহিস্ত্বরের যে গৌণ ভাজক কলা স্তর থেকে কর্ক তৈরি হয় তাকে **ফেলোজেন** বলে।

2. ভাজক কলার যে স্তর থেকে নালিকা বান্ডিল গঠিত হয় তাকে **প্রোক্যাম্বিয়াম** বলে।

## ▲ B. স্থায়ীকলা—সংজ্ঞা, গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণিবিন্যাস (Permanent Tissue—Definition, Characterization, Function and Classification) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাবিহীন পরিণত কলাকে স্থায়ী কলা বলে।**

➤ (b) **গঠনগত বৈশিষ্ট্য ( Structural features )** : (i) কোশগুলির বিভাজন ক্ষমতা নেই। (ii) কোশগুলি জীবিত বা মৃত। (iii) কোশগুলির নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে। কোশগুলি সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার হয়। (iv) কোশপ্রাচীর পাতলা বা স্থূল। (v) কোশগুলির আকৃতি বড়ো ও কোশের সাইটোপ্লাজমে কোশগহ্বর থাকে। (vi) কোশগুচ্ছের মধ্যে কোশান্তর রন্ধ্র দেখা যায়।

➤ (c) **শ্রেণিবিন্যাস ( Classification )** : স্থায়ী কলাকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— (i) সরল স্থায়ী কলা ও (ii) জটিল স্থায়ী কলা। পরের পৃষ্ঠায় ছকের সাহায্যে স্থায়ী কলার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হল।

● **ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার পার্থক্য (Difference between Meristematic and Permanent tissue) :**

| ভাজক কলা | স্থায়ী কলা |
|---|---|
| 1. কোশগুলি বিভাজনে সক্ষম। | 1. কোশগুলি বিভাজনে অক্ষম। |
| 2. কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে অর্থাৎ বর্ধনশীল অঞ্চলে থাকে। | 2. কাণ্ড ও মূলের বহিঃস্তরে এবং কেন্দ্রের স্তম্ভে দেখা যায়। |
| 3. কোশগুলি সজীব এবং অপরিণত হয়। | 3. কোশগুলি মৃত এবং পরিণত হয়। |
| 4. কোশগুলির কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। | 4. কোশগুলির নির্দিষ্ট আকার আছে। |
| 5. কোশপ্রাচীর সাধারণত পাতলা এবং অলঙ্করণবিহীন হয়। | 5. কোশপ্রাচীর পুরু এবং অলঙ্করণযুক্ত হয়। |
| 6. কোশান্তর রন্ধ্র দেখা যায় না। | 6. কোশান্তর রন্ধ্র দেখা যায়। কিন্তু স্ক্লেরেনকাইমা কলায় কোশান্তর রন্ধ্রে থাকে না। |
| 7. কোশগুলিতে কোশগহ্বর থাকে না। | 7. কোশগুলিতে কোশগহ্বর থাকে। |
| 8. ভাজক কলা ভ্রূণ অবস্থা থেকে দেখা যায়। | 8. ভ্রূণ অবস্থায় স্থায়ী কলা থাকে না। |
| 9. উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো এই কলার প্রধান কাজ। | 9. খাদ্য তৈরি, সংবহন ও সঞ্চয় — এই কলার প্রধান কাজ। তা ছাড়া উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দান করে। |

## ▲ I. সরল স্থায়ী কলা (Simple Permanent tissue)

**➤ সরল স্থায়ী কলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Simple Permanent Tissue) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে স্থায়ী কলা একই আকারের কোশগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় এবং একই কাজ করে তাকে সরল স্থায়ী কলা বলা হয়।

(b) **প্রকারভেদ (Types) :** কোশের আকৃতি অনুযায়ী সরল স্থায়ী কলা তিন প্রকারের হয়, যেমন—প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।

### ◘ A. প্যারেনকাইমা (Parenchyma) :

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition) :** যে সরল স্থায়ী কলার সজীব কোশগুলির কোশপ্রাচীর পাতলা, সেলুলোজ দিয়ে গঠিত এবং কোশগুলি গোলাকার বা ডিম্বাকার বা বহুভুজাকার ও কোশান্তর রন্ধ্রযুক্ত তাকে প্যারেনকাইমা বলে।
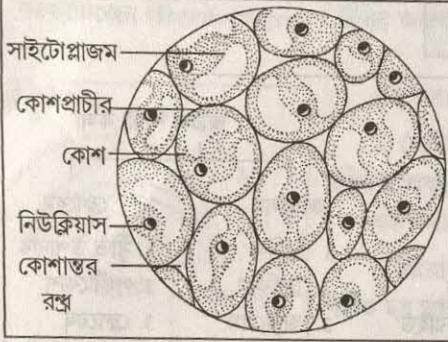
চিত্র 2.5 ঃ প্রস্থচ্ছেদে প্যারেনকাইমা কলার গঠন।

2. গঠন (Structure) ঃ (i) কোশগুলি সজীব। (ii) কোশপ্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত ও পাতলা। (iii) কোশে প্রচুর পরিমাণ সাইটোপ্লাজম থাকে। (iv) সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। (v) কোশগুলির মধ্যে কোশগহ্বর ও প্লাসটিডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। (vi) বিশেষ কোনো কোনো জায়গায় এই কলার কোশে ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। এইপ্রকার কলাকে **ক্লোরেনকাইমা** (Chlorenchyma) বলে। (vii) অনেক জলজ উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা কোশগুলির মধ্যে বায়ুগহ্বর থাকে। এই কলাকে **এরেনকাইমা** (Aerenchyma) বলে। সাধারণত কচুরিপানা, শালুক প্রভৃতি উদ্ভিদের পর্ণবৃন্তে এরেনকাইমা থাকে। (viii) অনেকগুলি বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোশ বিভিন্ন প্রকার তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ (ট্যানিন, তেল, ক্যালশিয়াম অক্সালেট দানা ইত্যাদি) সঞ্চয় করে। এদের **ইডিওব্লাস্ট** (Idioblast) বলে।

**● কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারেনকাইমা কলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ●**

1. **ক্লোরেনকাইমা**— উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গের ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমাকে **ক্লোরেনকাইমা** বলে। পাতার মেসোফিল কলা, সবুজ কাণ্ড ও কাণ্ডের ত্বকে পাওয়া যায়। এই কলা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে।
2. **এরেনকাইমা**— আকৃতিতে বড়ো ও কোশান্তর রন্ধ্রবিশিষ্ট বায়ুগহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমাকে **এরেনকাইমা** বলে। শালুক, কচুরিপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রবৃন্তে এই কলা দেখা যায়।
3. **ইডিওব্লাস্ট**— যেসব প্যারেনকাইমা কলার কোশগুলিতে বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হয় সেই কোশগুলিকে **ইডিওব্লাস্ট** বলে। বটপাতার ফলকে ও কচুপাতার বৃন্তের প্যারেনকাইমা কোশগুলিতে খনিজ কেলাস এবং অন্যান্য উদ্ভিদে ট্যানিন, তেল প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে।
4. **প্রোসেনকাইমা** — লম্বা, সূচালো প্রান্ত ও স্থূলপ্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা হল **প্রোসেনকাইমা।**
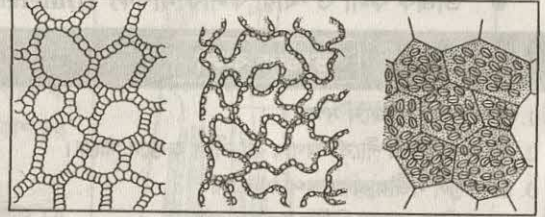
3. **অবস্থান (Occurrence)** ঃ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতির নরম অংশে প্যারেনকাইমা দেখা যায়।

4. **কাজ (Function)** ঃ (i) মূল, কাণ্ড ও পাতার ত্বকে এই কলা থাকে এবং ভিতরের অংশগুলিকে রক্ষা করে। (ii) উদ্ভিদের দেহ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। (iii) ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা (ক্লোরেনকাইমা) খাদ্য তৈরি করে। (iv) জল ও খাদ্য পরিবহন করে। (v) মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল ও বীজে খাদ্য সঞ্চয় করতে পারে। এদের সঞ্চয়ী প্যারেনকাইমাও বলে। (vi) বায়ু-গহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমা (এরেনকাইমা) উদ্ভিদকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। (vii) উদ্ভিদের ক্ষতস্থান নিরাময়ে এদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (viii) এই কলা খাদ্য সংবহনের (জাইলেম প্যারেনকাইমা) কাজ করে। (ix) জল সঞ্চিত করে রাখা ও ক্ষরণে অংশ গ্রহণ করা প্রভৃতি হল এদের প্রধান কাজ।

চিত্র 2.6 ঃ কোলেনকাইমা ঃ (A) প্রস্থচ্ছেদ, (B) লম্বচ্ছেদ।

### ◘ B. কোলেনকাইমা (Collenchyma) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ **অসমভাবে স্থূল কোশপ্রাচীরযুক্ত সজীব সরল কলাকে কোলেনকাইমা বলে।**

2. **গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural features)** ঃ কোলেনকাইমার গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল— (i) কোশগুলির কোশপ্রাচীর স্থূল হয়।

(ii) কোশগুলি গোলাকার, বহুভুজাকার অথবা বেলনাকার হয়। (iii) কোশপ্রাচীরে সেলুলোজ ও পেকটিন থাকে। (iv) কোশান্তর রন্ধ্র থাকে না বা থাকলেও খুব ছোটো আকৃতির হয়। (v) প্রত্যেকটি কোশে প্রচুর পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। (vi) অনেক সময় ক্লোরোফিল থাকে। (vii) কোশপ্রাচীরের কোণে কিউটিন, সুবেরিন, পেকটিন, লিগনিন প্রভৃতি জমা হয়ে স্থূল হয়। (viii) কোশগুলি সবসময় জীবিত। (ix) আসলে প্যারেনকাইমা কোশগুলি স্থূল ও পরিবর্তিত হয়ে কোলেনকাইমা গঠন করে।

3. **অবস্থান (Occurrence)** ঃ উদ্ভিদ কাণ্ডে, পত্রবৃন্তে, মধ্যশিরায়, পুষ্পদণ্ডে ও কাণ্ডের অধস্ত্বকে (Hypodermis) কোলেনকাইমা থাকে।একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতায় কোলেনকাইমা দেখা যায় না।

4. **প্রকারভেদ (Types)** ঃ কোশপ্রাচীরের গঠনের দিক থেকে কোলেনকাইমা তিন প্রকারের হয়, যেমন— (i) **কৌণিক** (ii) **স্তরীভূত** ও (iii) **কূপাকৃতি**।

চিত্র 2.7 ঃ প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার কোলেনকাইমা।

(i) **কৌণিক** (Angular)— কোলেনকাইমা কোশের কোণগুলি স্থূল। কোশগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং কোশান্তর রন্ধ্র থাকে না। **উদাহরণ** — কুমড়ো, লাউ, ধুতুরা, ডুমুর ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডের কোলেনকাইমা।

(ii) **স্তরীভূত** (Lamellar or plate)— কোলেনকাইমা কোশগুলি খুবই ঘনসন্নিবিষ্ট এবং কোশান্তর রন্ধ্রবিহীন হয়। স্থূলীভবন পৃষ্ঠ প্রাচীরে সমান্তরালভাবে কয়েকটি স্তরে থাকে। **উদাহরণ**—ঘেঁটু, র‍্যামনাস জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের কোলেনকাইমা।

(iii) **কূপাকৃতি** (Lacunate)— কোলেনকাইমা কোশগুলির কোশান্তররন্ধ্র বেশ বড়ো এবং সংলগ্ন অংশ স্থূল। **উদাহরণ**— আকন্দের পত্রবৃন্ত, ভুঁই তুলসী প্রভৃতি উদ্ভিদের কোলেনকাইমা।

5. **কাজ ( Functions )** ঃ (i) উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা জোগায়। (ii) এই কলায় স্থিতিস্থাপকতা আছে বলে কাণ্ড সহজে ভাঙে না। (iii) এই কলার কোশগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। (iv) এরা অনেক সময় খাদ্য সঞ্চয়ও করে।

## ◘ C. স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) ঃ
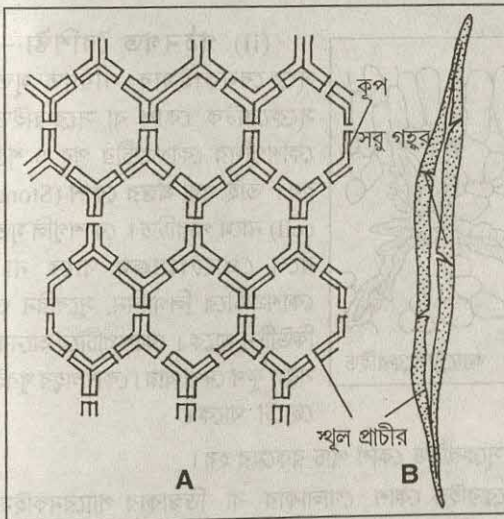
চিত্র 2.8 ঃ A-প্রস্থচ্ছেদে স্ক্লেরেনকাইমা, B-স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু।

❖1. **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ **সমভাবে স্থূল কোশপ্রাচীরযুক্ত প্রধানত মৃত সরল কলাকে স্ক্লেরেনকাইমা বলা হয়।**

2. **গঠনগত বৈশিষ্ট্য ( Structural features )** ঃ

(i) কোশগুলির প্রাচীর লিগনিনযুক্ত, স্থূল ও শক্ত।

(ii) কোশগুলির প্রোটোপ্লাজম ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে কোশগুলি মৃত।

(iii) মাঝে মাঝে প্রাচীর এত স্থূল হয় যে, কোশগহ্বর খুব ছোটো দেখায়।

(iv) কোশপ্রাচীরে নানা রকম অলঙ্করণ দেখা যায়।

(v) অনেক সময় কোশপ্রাচীরে ছোটো ছোটো ছিদ্র বা কূপ থাকে।

3. **অবস্থান ( Occurrence )** ঃ উদ্ভিদ অঙ্গের অধস্ত্বক, বান্ডিলসীদ্, পরিচক্র, আদিকলা প্রভৃতি স্থানে থাকে।

4. **কাজ ( Function )** ঃ উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা দান করে।

5. **প্রকারভেদ (Types)** ঃ স্ক্লেরেনকাইমা প্রধানত দু'প্রকারের হয়, যেমন— স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু ও স্ক্লেরাইড।

● (a) **স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু (Sclerenchyma fibre) ঃ**

❖ (i) **সংজ্ঞা — যে কোশগুলি সরু ও লম্বাটে হয়ে দুই প্রান্ত ছুঁচালো হয় এবং প্রস্থচ্ছেদে এদের বহুভুজাকৃতি কোশের মতো দেখায় তাদের স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু বলে।**

(ii) **গঠনগত বৈশিষ্ট্য**— স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর কোশগুলি সরু, লম্বা ও ছুঁচালো। এদের কোশপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত ও পুরু। কোশগুলির কোশপ্রাচীরে সরল ও সপাড় কূপ থাকে। কোশের গহ্বর খুব ছোটো। অপরিণত তন্তু কোশগুলির মধ্যে প্রোটোপ্লাস্ট থাকে, কিন্তু পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোপ্লাস্ট বিনষ্ট হয়। তাই কোশগুলি মৃত। প্রস্থচ্ছেদে প্রতিটি কোশকে ষড়ভুজাকৃতি দেখায়। জাইলেমের পাশের স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে **কাষ্ঠল তন্তু বা উড ফাইবার** (Wood fibre) ও ফ্লোয়েমের পাশের স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে **বাস্ট তন্তু** (Bast fibre) বলে।

(iii) **অবস্থান (Occurrence)**— কাণ্ডের বহিস্ত্বক, অধস্ত্বক, পরিচক্র প্রভৃতি অঞ্চলে এই কলা দেখা যায়। অনেক সময় ভ্যাস্কুলার বান্ডিলের সঙ্গেও এই কলা থাকে।

(iv) **কাজ (Function)**— উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের দৃঢ়তা দান করা হল এর প্রধান কাজ।

**● কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদজাত তন্তু (Some important Plant Fibres) ●**

1. **বহিঃজাইলেম তন্তু** (Extra xylary fibre) ঃ যেসব তন্তু জাইলেমের বাইরে থাকে তাদের বহিঃজাইলেম তন্তু বলে। উদাহরণ— বহিঃস্তর তন্তু, ত্বকীয় তন্তু প্রভৃতি।
2. **বহিঃস্তর তন্তু** (Cortical fibre) ঃ যেসব তন্তু কাণ্ডের বহিঃস্তরে থাকে তাদের বহিঃস্তর তন্তু বলে। উদাহরণ— অধঃত্বক।
3. **ত্বকীয় তন্তু** (Surface fibre) ঃ যেসব তন্তু উদ্ভিদ অঙ্গের ত্বকে থাকে তাদের ত্বকীয় তন্তু বলে। উদাহরণ— নারকেলের তন্তু।
4. **পেরিনালিকা বান্ডিল তন্তু** (Perivascular fibre) ঃ যেসব তন্তু অন্তস্ত্বকের কাছে থাকে তাদের পরিনালিকা বান্ডিল তন্তু বলা হয়। উদাহরণ— পরিচক্র তন্তু।

● (b) **স্ক্লেরাইড (Sclereid) ঃ**

❖ (i) **সংজ্ঞা— যেসব সরল কলার কোশগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা তারার মতো এবং কোশপ্রাচীর স্থূল ও কোশ গহ্বর খুব ছোটো তাদের স্ক্লেরাইড বলে।**

চিত্র 2.9 ঃ স্ক্লেরাইডের প্রকারভেদ।

(ii) **গঠনগত বৈশিষ্ট্য**— স্ক্লেরেনকাইমার পরিণত মৃত স্ক্লেরেটিক কোশ বা স্ক্লেরাইড কোশগুলির কোশপ্রাচীর পুরু ও শক্ত হয়। তাই এরা **প্রস্তর কোশ** (Stone cell) নামে পরিচিত। কোশগুলি মৃত বলে প্রোটোপ্লাজম থাকে না। কোশপ্রাচীরে লিগানিন, সুবেরিন ও কিউটিন থাকে। কোশপ্রাচীরে অনেক সরল কূপ দেখা যায়। কোশগহ্বর খুবই ছোটো থাকে।

(iii) **বিভিন্ন প্রকার স্ক্লেরাইড ঃ** আকার ও আকৃতি অনুসারে স্ক্লেরাইড কোশ পাঁচ রকমের হয়।

1. **ব্রাকিস্ক্লেরাইড (Brachy-sclereid)**— এই ধরনের স্ক্লেরাইড কোশ গোলাকার বা ডিম্বাকার প্যারেনকাইমা কোশের মতো সমব্যাস যুক্ত হয়। সাধারণত উদ্ভিদদেহের নরম কোশগুলিতে অর্থাৎ বহিস্ত্বক এবং মজ্জায় এদের দেখা যায়।

উদাহরণ—পেয়ারা ও আপেলের স্ক্লেরেনকাইমায় এই কোশ থাকে। তামাক গাছের কাণ্ডের মজ্জায়ও এ ধরনের স্ক্লেরাইড কোশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

2. **ম্যাক্রোসক্লেরাইড (Macro-sclereid)**—এই কোশগুলির আকৃতি অনেকটা স্তম্ভের বা দণ্ডের মতো। অনেক কোশ এক সঙ্গে ঘনভাবে পাতার প্যালিসেড কোশের মতো সাজানো থাকে। উদাহরণ—ছোলা, মটর, মুগ ইত্যাদি বীজের ত্বকে দেখতে পাওয়া যায়।

3. **অ্যাস্ট্রোস্ক্লেরাইড (Astro-sclereid)**—এই ধরনের কোশগুলি তারা বা মাকড়সার মতো দেখতে এবং অসমভাবে শাখান্বিত হয়। উদাহরণ—চা, পদ্ম, শালুক প্রভৃতি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় দেখা যায়।

4. **ওস্টিওস্ক্লেরাইড (Osteo-sclereid)**—কোশগুলি দেখতে অনেকটা লম্বা হাড়ের মতো এবং দু'দিকের প্রান্ত ফাঁপা। সাধারণত ম্যাক্রোস্ক্লেরাইডের সঙ্গে থাকে। উদাহরণ—সাধারণত মটর, হাকিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় দেখা যায়।

5. **ট্রাইকোস্ক্লেরাইড (Tricho-sclereid)**—এই কোশগুলিকে অনেকে ওস্টিওস্ক্লেরাইডের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কোশগুলি লম্বা, শাখান্বিত ও প্রাচীরযুক্ত হয়। উদাহরণ—জলজ শালুক গাছের পত্রবৃন্তের কোশগুলির কোশান্তর অংশে এবং জলপাই গাছের পাতায় দেখা যায়।

(iv) **অবস্থান**—স্ক্লেরাইড পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের ত্বকে থাকে। তা ছাড়া পাতা ও বিভিন্ন বীজে এদের দেখা যায়।

(v) **কাজ**—স্ক্লেরাইড উদ্ভিদে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করে।

**• স্টোন সেল বা প্রস্তর কোশ (Stone cell) •**

স্থূল কোশপ্রাচীরযুক্ত পাথরের মতো শক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কোশকে **স্টোন সেল** বা **প্রস্তর কোশ** বলে। এই কোশগুলির কোশপ্রাচীর লিগনিন, সুবেরিন ও কিউটিনযুক্ত। পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি ফলে; মটর, মুগ প্রভৃতি ডালের বীজত্বকে; পদ্ম, শালুক, চা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড ও পাতায় এই বিশেষ কোশ দেখা যায়।

**• প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma) ঃ**

| প্যারেনকাইমা | কোলেনকাইমা | স্ক্লেরেনকাইমা |
|---|---|---|
| 1. সজীব সরল কলা। | 1. সজীব সরল কলা। | 1. মৃত সরল কলা। |
| 2. কোশপ্রাচীরগুলি পাতলা। | 2. কোশপ্রাচীর অসমভাবে অপেক্ষাকৃত স্থূল। | 2. কোশপ্রাচীর সমভাবে বেশি মাত্রায় স্থূল। |
| 3. কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। | 3. কোশের কোণগুলি পেকটিন, লিগনিন, সুবেরিন দিয়ে স্থূল হয়। | 3. কোশপ্রাচীর সেলুলোজ ও লিগনিন দিয়ে তৈরি এবং কূপ থাকে। |
| 4. কোশান্তর রন্ধ্র থাকে। | 4. কোশান্তর রন্ধ্র থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। | 4. কোশান্তর রন্ধ্র থাকে না। |
| 5. কোশগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার ও বহুভুজাকার হয়। | 5. কোশগুলি সাধারণত বহুভুজাকার হয়। | 5. কোশগুলি লম্বাটে বা গোলাকার অথবা তারার মতো হয়। |
| 6. কোশ প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। | 6. কোশে প্রোটোপ্লাজম কম থাকে। | 6. কোশে প্রোটোপ্লাজম থাকে না। |
| 7. কোশে নিউক্লিয়াস থাকে। | 7. কোশে নিউক্লিয়াস থাকে। | 7. কোশে নিউক্লিয়াস থাকে না। |
| 8. কোশে কোশগহ্বর থাকে। | 8. কোশে কোশগহ্বর থাকে। | 8. কোশে কোশগহ্বর থাকে না। |
| 9. কাণ্ড, মূল ও পাতার নরম অংশে থাকে। | 9. পাতার বোঁটায়, মধ্যশিরায় ও কাণ্ডে থাকে। | 9. কাণ্ডে, নালিকা বান্ডিলে, পেয়ারা, আপেল ও নাসপাতি প্রভৃতি ফলে থাকে। |
| 10. খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য পরিবহন করে। | 10. উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা, খাদ্য তৈরি (ক্লোরোপ্লাস্ট থাকলে) ও খাদ্য সঞ্চয় করে। | 10. উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা দান করা হল এর প্রধান কাজ। |

● স্ক্লেরেনকাইমা ও স্ক্লেরাইডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Sclerenchyma and Sclereid) :

| স্ক্লেরেনকাইমা | স্ক্লেরাইড |
|---|---|
| 1. কোশপ্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে। কোশগুলি লম্বা, সূচালো এবং কোশপ্রাচীর পুরু হয়। | 1. কোশগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অথবা সারিবদ্ধভাবে থাকে। কোশগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার, তারা অথবা হাড়ের আকৃতির হয়। |
| 2. ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন হয়। | 2. প্যারেনকাইমা কলা থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 3. কোশপ্রাচীরে কূপের সংখ্যা খুব কম। | 3. কোশপ্রাচীরে কূপের সংখ্যা বেশি। |
| 4. কোশপ্রাচীরের কূপগুলি সরল ও সপাড়। | 4. কোশপ্রাচীরের কূপগুলি সরল, সপাড় ও শাখাযুক্ত হয়। |
| 5. বর্জ্য বস্তু জমা থাকে। | 5. বর্জ্য বস্তু জমা থাকে না। |
| 6. পরিণত অবস্থায় কোশপ্রাচীর নষ্ট হয় না। | 6. পরিণত অবস্থায় কোশপ্রাচীর বিনষ্ট হয়। |
| 7. উদ্ভিদের প্রায় সব জায়গায় এদের দেখা যায়। | 7. বিভিন্ন পাতায়, ফলে ও বীজের প্যারেনকাইমা কলা ছড়ানো অবস্থায় থাকে। |

## ▲ II. জটিল স্থায়ী কলা (Complex Permanent tissue)

### ➤ জটিল স্থায়ী কলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Different types of Complex Permanent tissue) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : **গঠন ও আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও একই রকম কাজে লিপ্ত এবং একই উৎস থেকে গঠিত এমন কোশ সমষ্টিকে জটিল স্থায়ী কলা (Complex permanent tissue) বলে।**

এই জাতীয় কলায় নানা আকৃতির কোশ থাকে এবং এরা একই কাজ করে। উদ্ভিদে দু'রকম জটিল কলা দেখা যায়, যেমন— **জাইলেম ও ফ্লোয়েম**। এরা একসঙ্গে বা আলাদাভাবে নালিকা বান্ডিল গঠন করে বলে এদের **ভাস্কুলার কলা** (Vascular tissue)-ও বলা হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে জল ও খাদ্য চলাচল করে বলে এদের **সংবহন কলা** (Conduction tissue)-ও বলা হয়।

(b) **বিভিন্ন প্রকার জটিল কলা (Types of Complex tissue)** : জাইলেম ও ফ্লোয়েম—এই দু'প্রকার জটিল কলা প্রধানত উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদদেহে পাওয়া যায়। এদের প্রধান উপাদানগুলি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

এই জাতীয় জটিল কলায় নানা আকৃতির কোশ থাকে এবং এরা একই কাজ করে। উদ্ভিদে দু-রকম জটিল কলা দেখা যায়, যেমন— **জাইলেম ও ফ্লোয়েম**। এরা একসঙ্গে বা আলাদাভাবে নালিকা বান্ডিল গঠন করে বলে এদের **ভাস্কুলার কলা (Vascular tissue)** -ও বলা হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে জল ও খাদ্য চলাচল করে বলে এদের **সংবহন কলা** (Conduction tissue)-ও বলা হয়।

### ◘ A. জাইলেম (Xylem) :

### ➤ জাইলেমের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও কাজ (Definition, Origin and Functions of Xylem) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : **যে জটিল স্থায়ী কলার সাহায্যে মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদদেহে পরিবাহিত হয় তাকে জাইলেম কলা বলে।**

(b) **উৎপত্তি (Origin) ঃ প্রাথমিক জাইলেম** (Primary xylem) আদি ভাজক কলার প্রোক্যাম্বিয়াম অংশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং **গৌণ বৃদ্ধির** (Secondary growth) সময় ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম কলা থেকে গৌণ জাইলেম (Secondary xylem) কলা সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক জাইলেমের প্রথম দিকের গঠিত ট্রাকিয়ার কোশগুলির ব্যাস ছোটো এবং শেষের দিকের কোশগুলির ব্যাস বড়ো। ছোটো ব্যাসের কোশগুলিকে **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) ও বড়ো ব্যাসের কোশগুলিকে **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলে।

(c) **কাজ ( Function )** ঃ সামগ্রিকভাবে জাইলেম কলা উদ্ভিদ অঙ্গে দৃঢ়তা দান, জল ও খনিজ লবণ সংবহন এবং সময় সময় জল, খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করে।

### ➤ বিভিন্ন প্রকার জাইলেম কোশ (Different types of Xylem cells) ঃ

জাইলেম কলা চার প্রকার কোশ নিয়ে গঠিত হয়, যেমন— **ট্রাকিড** (Tracheid), **ট্র্যাকিয়া** (Trachea) বা **জাইলেম বাহিকা** (Vessel), **জাইলেম তন্তু** (Xylem fibre) এবং **জাইলেম প্যারেনকাইমা** (Xylem parenchyma)।

#### ● 1. ট্রাকিড (Tracheid) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা—জাইলেম কলার অপেক্ষাকৃত চওড়া, কোশকক্ষযুক্ত, লম্বা, মৃত ও সপাড় কূপযুক্ত কোশকে ট্রাকিড বলে।**

(b) **গঠন**—এই জাতীয় কোশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন—(i) কোশগুলি লম্বা, কোশমধ্যস্থ গহ্বর বেশ বড়ো এবং প্রান্ত ভাগ ভোঁতা। (ii) কোশপ্রাচীরে লিগনিন জমে অসমানভাবে স্থূল হয়। (iii) কোশগুলি কাণ্ড ও মূলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে এবং একটি কোশের উপর অন্যটি পরপর সাজানো থাকে। (iv) কোশপ্রাচীরে সরল ও সপাড় কূপ দেখা যায়। (v) বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালকাকার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্থূলীকরণ সৃষ্টি হয়। (vi) পরিণত কোশগুলি প্রোটোপ্লাজমবিহীন ও মৃত।

(c) **অবস্থান**— প্রধানত ফার্ন, সব রকম ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও মূলে এই কোশ দেখা যায়।

(d) **কাজ**— (i) এই প্রকার কোশগুলির সাহায্যে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত জল উদ্ভিদের পাতায় পরিবাহিত হয়। (ii) তা ছাড়া উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দান করে।
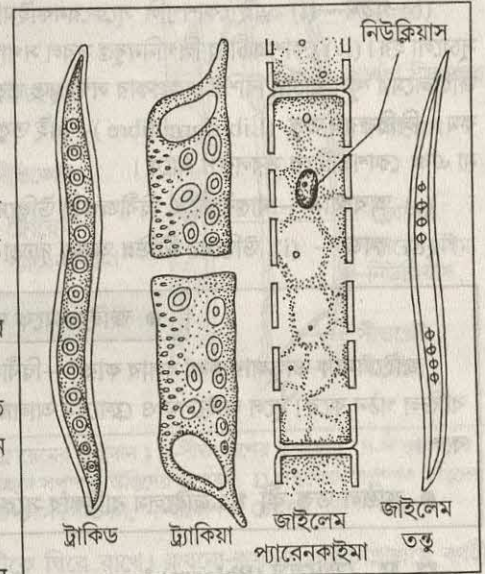
চিত্র 2.10 ঃ বিভিন্ন প্রকার জাইলেম কলা।

#### ● 2. ট্র্যাকিয়া (Trachea) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা— জাইলেম কলার যে কোশগুলির প্রান্ত প্রাচীরবিহীন নলাকার মৃত কোশকে ট্র্যাকিয়া বলে।**

(b) **গঠন**—(i) অপরিণত অবস্থায় একসারি বেলনাকার প্রোক্যাম্বিয়াম কোশ থেকে ট্র্যাকিয়া গঠিত হয়। (ii) পরিণত কোশগুলি লম্বা, নলাকার ও প্রান্ত প্রাচীর আংশিক বা সম্পূর্ণ লুপ্ত। (iii) এরা প্রোটোপ্লাজমবিহীন মৃত কোশ (iv) পার্শ্বপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত ও স্থূল। স্থূলীকরণ বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালকাকার ও কূপযুক্ত হয়। (v) কোশপ্রাচীরের যে অংশে ছিদ্র থাকে, তাকে **ছিদ্র প্লেট** (Perforation plate) বলে। (vi) ট্র্যাকিয়া বা ভেসেল সরু বা মোটা ব্যাসের হয়। ছোটো ব্যাসের ট্র্যাকিয়াকে **প্রোটোজাইলেম** (Protoxylem) ও বড়ো ব্যাসের ট্র্যাকিয়াকে **মেটাজাইলেম** (Metaxylem) বলে।

(c) **অবস্থান**—গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেমে এই কলা দেখা যায়। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে একমাত্র নিটামে এই কলা থাকে।

(d) **কাজ**—(i) মূলের সাহায্যে মাটি থেকে ধাতব পদার্থ মেশানো জল শোষণ করে বাহিকাগুলি দিয়ে পাতায় পাঠায়। (ii) উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে ড্রিমিস (*Drimys*), ডিজনারিয়া (*Degenaria*) এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদ ড্রাসিনা (Dracaena), ইয়াক্কা (Yucca) ছাড়া সব গুপ্তজীবী উদ্ভিদে ট্র্যাকিয়া থাকে।

● 3. **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem Parenchyma) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা— জাইলেম কলার যে কোশগুলি সজীব পাতলা ও কূপযুক্ত তাদের জাইলেম প্যারেনকাইমা বলে।**

(b) **গঠন** — (i) কোশগুলি লম্বা ও সজীব হয়। (ii) কোশপ্রাচীর লিগনিনবিহীন বা লিগনিনযুক্ত হয়। লিগনিনযুক্ত কোশগুলিতে কূপ দেখা যায়। (iii) কোশপ্রাচীর সাধারণত পাতলা। (iv) গৌণ জাইলেম প্যারেনকাইমার কোশগুলি কখনও উল্লম্বভাবে (**অক্ষীয় প্যারেনকাইমা**— Axial parenchyma ), আবার কখনও অনুভূমিকভাবে ( **অরীয় বা রশ্মি প্যারেনকাইমা**— Radial or Ray parenchyma ) বিন্যস্ত হতে দেখা যায়। (v) কোশগুলিতে স্নেহপদার্থ, শ্বেতসার অথবা ট্যানিন প্রভৃতি জমা হয়।

(c) **অবস্থান**— কিছু ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ছাড়া ( যেমন—পাইনাস ) সব রকম ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেমে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

(d) **কাজ**— (i) জল মিশ্রিত ধাতব লবণ সংবহন করে। (ii) খাদ্য সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে। (iii) উদ্ভিদের দৃঢ়তা দান করে।

● 4. **জাইলেম তন্তু ( Xylem fibre ) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা— জাইলেম কলার স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠল তন্তু বলে।**

(b) **গঠন**—(i) এই কোশগুলি স্ক্লেরেনকাইমা কোশ দিয়ে গঠিত হয়। (ii) কোশগুলি মৃত। (iii) কোশগুলি লম্বা ও সুচালো হয়। (iv) কোশপ্রাচীরে লিগনিনযুক্ত সরল সপাড় কূপ থাকে। এরা দু'প্রকারের হয়, যেমন **তন্তু ট্র্যাকিড** (Fibre tracheid) জাইলেমের স্থূল প্রাচীর বিশিষ্ট একপ্রকার লম্বা মৃত তন্তু দেখা যায়, এদের **তন্তু ট্র্যাকিড** বলে। তন্তুগুলির সপাড় কূপের গভীরতা কম। **লিব্রিফরম তন্তু** (Libriform fibre )—এই তন্তুগুলি সরু ও লম্বা, অতিরিক্ত স্থূল হওয়ায় কোশ কক্ষ (Lumen) প্রায় থাকে না এবং কোশপ্রাচীরে সরলকূপ থাকে।

(c) **অবস্থান**— ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের জাইলেমের অন্য কোশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(d) **কাজ**— (i) উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে দৃঢ়তা প্রদান করে। (ii) খাদ্য ও রেচনজাত পদার্থ সঞ্চয় করে।

**● জাইলেমকে ভাস্কুলার কলা বলা হয় কেন ? ●**

**জাইলেমকে ভাস্কুলার কলা বলার কারণ**—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে জাইলেম প্রধানত ফ্লোয়েমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাস্কুলার বান্ডিল গঠন করে। মূলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদা আলাদা ভাবে সাজানো থাকে। এই কারণে জাইলেমকে ভাস্কুলার কলা বলে।

● **কাষ্ঠল তন্তু কী ?** : জাইলেম বাহিকার স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে কাষ্ঠল তন্তু বলে।

## ◘ B. ফ্লোয়েম (Phloem) :

### ➤ ফ্লোয়েমের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, প্রকারভেদ ও কাজ (Definition, Origin, Types and Functions of Phloem) :

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition) : উদ্ভিদদেহে খাদ্যসংবহনকারী জটিল স্থায়ী কলাকে ফ্লোয়েম কলা বলে।**

জাইলেমের মতো ফ্লোয়েম স্থায়ী সজীব ও মৃত কলার সমন্বয়ে গঠিত। ভ্যাস্কুলার বান্ডিল গঠনে ফ্লোয়েম জাইলেমের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। ফ্লোয়েমের কোশগুলি বিভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন গঠনযুক্ত হয়।

2. **উৎপত্তি (Origin)** : জাইলেমের মতো ফ্লোয়েম কলাকেও দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**প্রাথমিক ফ্লোয়েম** (Primary phloem) এবং **গৌণ ফ্লোয়েম** (Secondary phloem)। আদি ভাজক কলার প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে প্রাথমিক জাইলেম এবং ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম কলা থেকে গৌণ ফ্লোয়েম গঠিত হয়। প্রাথমিক ফ্লোয়েমের যেসব উপাদান প্রথমে পরিণতি লাভ করে তাদের **প্রোটোফ্লোয়েম** (Protophloem) এবং যেসব উপাদান পরে বা দেরিতে পরিণতি লাভ করে তাদের **মেটাফ্লোয়েম** (Metaphloem) বলে।

3. **প্রকারভেদ (Types)** ঃ চারপ্রকার কোশ নিয়ে ফ্লোয়েম কলা গঠিত, যেমন **সীভকোশ**, **সীভনল সঙ্গীকোশ** ও **ফ্লোয়েম তন্তু**।

4. **কাজ (Function)** ঃ সামগ্রিকভাবে ফ্লোয়েম কলা পাতায় তৈরি খাদ্য বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

## ➤ বিভিন্ন প্রকার ফ্লোয়েম কোশ (Different types of Phloem cell) ঃ

### (a) সীভকোশ (Sieve cell) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা** (Definition)— **ফ্লোয়েম কলার সীভপ্লেটবিহীন লম্বা কোশগুলিকে সীভকোশ বলে।**

2. **গঠন** (Structure)— অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত প্রান্তযুক্ত লম্বা কোশ। কোশপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। কোশমধ্যস্থ ভ্যাকুওলের চারিদিকে পাতলা স্তরের প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ থাকে।

কোশপ্রাচীরে কতকগুলি ছিদ্র একসঙ্গে সংগঠিত হয়ে সীভক্ষেত্র ( Sieve area ) গঠন করে; ছিদ্রগুলিকে **সীভছিদ্র** ( Sieve pore ) বলা হয়। এতে সীভপ্লেট থাকে না।

3. **অবস্থান** (Occurrence)—ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম-এ থাকে।

4. **কাজ** (Function)— খাদ্য পরিবহন ও সঞ্চয় করা এর প্রধান কাজ।

### (b) সীভনল (Sieve tube) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা** (Definition)—**ফ্লোয়েম কলার নিউক্লিয়াসবিহীন নলাকার সজীব কোশগুলিকে সীভনল বলে।**

চিত্র 2.11 ঃ ফ্লোয়েমের উপাদান ঃ A-সীভকোশের প্রস্থচ্ছেদ, B-সীভকোশের লম্বচ্ছেদ, C-প্রস্থচ্ছেদে সপুষ্পক উদ্ভিদের ফ্লোয়েম, D-লম্বচ্ছেদে সপুষ্পক উদ্ভিদের ফ্লোয়েমের উপাদান (সীভনল, সঙ্গীকোশ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা)।

2. **গঠন** (Structure)—ফ্লোয়েমের অন্যতম প্রধান কোশ। অপেক্ষাকৃত চওড়া, লম্বা লম্বা সেলুলোজ নির্মিত পাতলা কোশপ্রাচীরযুক্ত কোশ একটির উপর একটি নলের মতো সাজানো থাকে। **এরা জীবিত হলেও নিউক্লিয়াসবিহীন** এবং মধ্যভাগে একটি বড়ো গহ্বর থাকায় সাধারণত পাতলা প্রোটোপ্লাজম স্তর গহ্বরটিকে ঘিরে রাখে। কখনো-কখনো সাইটোপ্লাজমে বর্ণহীন প্লাসটিড ও শ্বেতসার দানা দেখা যায়। প্রস্থচ্ছেদে দুটি কোশের মধ্যবর্তী প্রস্থপ্রাচীরে চালুনির মতো **ছিদ্র** (Sieve) দেখা যায়। ছিদ্রযুক্ত প্রাচীরকে **সীভপ্লেট** (Sieve plate) বা **চালনিচ্ছদা** বলে। সীভপ্লেট কতকগুলি পৃথক ছিদ্রগোষ্ঠী বা সীভক্ষেত্র (Sieve area) নিয়ে গঠিত হতে পারে। ছিদ্রপথে সীভনলগুলি সাইটোপ্লাজম সূত্র দিয়ে অপর কোশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। প্রধানত শীতকালে সীভ্প্লেটের ছিদ্রগুলির মুখে **ক্যালোজ** (Callose) নামে একপ্রকার বর্ণহীন, উজ্জ্বল কার্বোহাইড্রেট জমে ছিপির মতো ছিদ্রপথ বন্ধ করে। সীভ্প্লেটের উপর এই ক্যালোজ পর্দাকেই **ক্যালাস প্যাড** (Callus pad) বলে। বসন্তকালে সাধারণত এরা দ্রবীভূত হয়ে ছিদ্রপথগুলিকে পুনরায় উন্মুক্ত করে।

3. **অবস্থান** (Occurrence)— সব রকম সপুষ্পক ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় এদের পাওয়া যায়।

4. **কাজ** (Function)—প্রধানত উদ্ভিদ-অঙ্গে খাদ্য পরিবহন করাই এদের অন্যতম কাজ; কখনো-কখনো খাদ্য সঞ্চয়ও করে।

### (c) সঙ্গীকোশ (Companion cell) :

❖ 1. সংজ্ঞা (Definition)—**ফ্লোয়েম কলার সীভনল সংলগ্ন প্রোটোপ্লাজমযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশকে সঙ্গীকোশ বলে।**

2. **গঠন** (Structure)— কোশগুলি লম্বা, সরু, ঘন সাইটোপ্লাজমপূর্ণ, বড়ো নিউক্লিয়াসযুক্ত ও সেলুলোজ নির্মিত পাতলা কোশপ্রাচীরযুক্ত সজীব ও বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোশ। এরা সীভনল সংলগ্ন এবং লম্বায় সমান কিংবা ছোটো হতে পারে; সীভনল অপেক্ষা সরু হয়। সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে। প্রস্থচ্ছেদে কোশগুলিকে প্রায় ত্রিভুজাকৃতি দেখায়।

3. **অবস্থান** (Occurrence)— প্রধানত প্রায় সব গুপ্তবীজী উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

4. **কাজ** (Function)— সঠিকভাবে জানতে না পারলেও এর সম্ভবত কোনো পৃথক কাজ নেই; অর্থাৎ সীভনলকে খাদ্য পরিবহনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে।

### (d) ফ্লোয়েম তন্তু (Phloem fibre) :

❖ 1. সংজ্ঞা (Definition)—**ফ্লোয়েম কলার অন্তর্গত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে ফ্লোয়েম তন্তু বা বাষ্টতন্তু বলা হয়।**

2. **গঠন** (Structure)—এদের দেখতে লম্বা ও সরু, প্রান্ত দুটি সূচালো হয়। লিগনিন দিয়ে কোশপ্রাচীর সমভাবে স্থূলীভবনের ফলে কোশগহ্বরে প্রোটোপ্লাজম প্রায় থাকেই না এবং কোশগুলি মৃত হয়ে যায়। কোশপ্রাচীর সরল কূপযুক্ত হয়।

3. **অবস্থান** (Occurrence)—একমাত্র গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় থাকে।

4. **কাজ** (Function)—প্রধানত উদ্ভিদের কোমল অঙ্গে দৃঢ়তা দান করে।

### (e) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchyma) :

❖ 1. সংজ্ঞা (Definition)—**সঙ্গীকোশ ছাড়া ফ্লোয়েম কলার অন্তর্গত সাধারণ প্যারেনকাইমা কোশকে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা বলে।**

2. **গঠন** (Structure)— কোশগুলি লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত কিছুটা চওড়া হয়। এরা অক্ষীয় কিংবা অরীয়ভাবে বিন্যস্ত থাকে। কোশগহ্বরে সাইটোপ্লাজম ও স্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। সাধারণত সাইটোপ্লাজমে শ্বেতসার এবং বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ যেমন রজন, ট্যানিন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

3. **অবস্থান** (Occurrence)— অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম তন্তু থাকে।

4. **কাজ** (Function)— খাদ্যসঞ্চয় ও খাদ্যপরিবহনে সাহায্য করে।

### ● কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ●

1. **পাট কোন্ ধরনের তন্তু ?** —গৌণ ফ্লোয়েম বা বাস্ট তন্তু।
2. **নিউক্লিয়াসবিহীন দুটি উদ্ভিদ কোশের নাম**—সীভনল ও ফ্লোয়েম তন্তু।
3. **ক্যালাস ও ক্যালাস প্যাড**—ক্যালাস একধরনের কার্বোহাইড্রেট। বসন্তকালে সীভপ্লেটের ছিদ্রগুলি খোলা থাকে, কিন্তু শীতকালে ছিদ্রগুলিতে কার্বোহাইড্রেটের আস্তরণ পড়ে এবং ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরকে ক্যালাস প্যাড বলে। পরবর্তী বসন্ত ঋতুতে ছিদ্রপথ আগের মতো খুলে যায় অর্থাৎ ক্যালোজ দ্রবীভূত হয়ে ছিদ্রপথ উন্মুক্ত হয়।
4. **সীভপ্লেট**—ফ্লোয়েমের সীভনল কোশগুলি লম্বাটে ও নলাকার। পরস্পর যুক্ত কোশগুলির প্রস্থপ্রাচীর চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত। এ ধরনের ছিদ্রযুক্ত প্রস্থ প্রাচীরকে সীভপ্লেট বলে।

### ● সরল ও জটিল কলার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Simple and Complex tissue) :

| সরল কলা | জটিল কলা |
|---|---|
| 1. কোশগুলি একই প্রকার। | 1. কোশগুলি বিভিন্ন প্রকার। |
| 2. নালিকা বান্ডিল গঠন করে না। | 2. নালিকা বান্ডিল গঠন করে। |
| 3. স্থূলীকরণ কম ও সরল প্রকৃতির। | 3. স্থূলীকরণ বেশি ও জটিল প্রকৃতির। |
| 4. যান্ত্রিক কার্যে কম সহায়তা করে। | 4. যান্ত্রিক কার্যে বেশি সহায়তা করে। |
| 5. প্রধানত খাদ্যসংশ্লেষ ও খাদ্য সঞ্চয় করে। | 5. প্রধানত খাদ্যসঞ্চয় ও খাদ্য সংবহন করে। |

● ভাজক কলা ও স্থায়ী কলার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Meristematic and Permanent tissue) :

| ভাজক কলা | স্থায়ী কলা |
|---|---|
| 1. কোশগুলি অপরিণত। | 1. কোশগুলি পরিণত। |
| 2. কোশগুলি বিভাজনক্ষম। | 2. কোশগুলির বিভাজন ক্ষমতা নেই। |
| 3. কোশগুলির কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। | 3. কোশগুলির নির্দিষ্ট আকার আছে। |
| 4. বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। | 4. বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না। |
| 5. ভাজক কলা অন্য কোনো কলা থেকে উৎপন্ন হয় না। | 5. স্থায়ী কলা ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 6. ভ্রূণ অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—এই কলা উদ্ভিদ-অঙ্গে থাকে। | 6. ভ্রূণ অবস্থায় এই কলা থাকে না। |
| 7. কোশগুলি সজীব। | 7. কোশগুলি সজীব অথবা মৃত। |
| 8. উদ্ভিদ-অঙ্গের বর্ধনশীল অংশে (মূল, কাণ্ড ও পত্রের শীর্ষে) থাকে। | 8. উদ্ভিদ-অঙ্গের বর্ধনশীল অংশে থাকে না। |
| 9. বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জৈবনিক কার্যে সহায়তা করে না। | 9. খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সঞ্চয়, সংবহন ও পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক কাজে সহায়তা করে। |

● জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Xylem and Phloem) :

| জাইলেম | ফ্লোয়েম |
|---|---|
| 1. ট্রাকিড, ট্র্যাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠল তন্তু দিয়ে গঠিত। | 1. সীভকোশ, সীভনল, সঙ্গীকোশ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু দিয়ে গঠিত। |
| 2. জাইলেমে প্যারেনকাইমা ছাড়া সব কোশই মৃত। | 2. বাষ্ট তন্তু ছাড়া সব কোশই জীবিত। |
| 3. জল ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ প্রধানত ঊর্ধ্বমুখী সংবহন করে। | 3. খাদ্য নিম্নমুখী ও ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন করে। |
| 4. খনিজ লবণ মিশ্রিত জল মূল রোম দিয়ে শোষিত হয়ে জাইলেম কলা দিয়ে পাতায় যায়। | 4. সালোকসংশ্লেষে যে শর্করা জাতীয় খাদ্য পাতায় তৈরি হয় তা ফ্লোয়েম কলা দিয়ে উদ্ভিদ-অঙ্গে পরিবাহিত হয়। |

● ট্রাকিড ও ট্র্যাকিয়ার মধ্যে তুলনা (Comparison between Tracheid and Trachea) :

| ট্রাকিড | ট্র্যাকিয়া |
|---|---|
| 1. কোশগুলি লম্বা ও দুই প্রান্ত সূচালো। | 1. কোশগুলি নলাকার বলে দুই প্রান্ত সূচালো হয় না। |
| 2. কোশকক্ষ ছোটো। | 2. কোশকক্ষ বড়ো। |
| 3. কোশপ্রাচীর পুরু ও কূপযুক্ত। | 3. কোশপ্রাচীর পুরু ও অসংখ্য কূপযুক্ত। |
| 4. জলসংবহন ও দৃঢ়তা দান করে। | 4. জল ও খাদ্য পরিবহন সঞ্চয় করে। |
| 5. কোশগুলি প্রান্তপ্রাচীরযুক্ত। | 5. কোশগুলি প্রান্তপ্রাচীরবিহীন। |
| 6. সব সংবহন কলাযুক্ত উদ্ভিদে পাওয়া যায়। | 6. কেবলমাত্র সপুষ্পক উদ্ভিদে পাওয়া যায়। |

● ট্র্যাকিয়া ও সীভনলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Trachea and Sieve tube) :

| ট্র্যাকিয়া | সীভনল |
|---|---|
| 1. মৃত কোশ নিয়ে গঠিত। | 1. সজীব কোশ নিয়ে গঠিত। |
| 2. সীভপ্লেট নেই। | 2. সীভপ্লেট আছে। |
| 3. কোশপ্রাচীর স্থূল। | 3. কোশপ্রাচীর পাতলা। |
| 4. কোশপ্রাচীরে কূপ থাকে। | 4. কোশপ্রাচীরে কূপ নেই। |
| 5. কোনো সহযোগী কোশ নেই। | 5. সহযোগী সঙ্গীকোশ থাকে। |
| 6. জল ও লবণ সংবহন করে। | 6. খাদ্য ও জল সংবহন করে। |
| 7. সংবহন একমুখী সমাধা করে। | 7. উভয়মুখী সংবহন সমাধা করে। |

● জাইলেম তন্তু ও ফ্লোয়েম তন্তুর পার্থক্য (Distinguish between Xylem fibre and Phloem fibre) ঃ

| জাইলেম তন্তু | ফ্লোয়েম তন্তু |
|---|---|
| 1. এটি জাইলেমের অন্যতম উপাদান। | 1. এটি ফ্লোয়েমের অন্যতম উপাদান। |
| 2. জাইলেম তন্তু জাইলেমের একমাত্র মৃত কলা নয়। | 2. ফ্লোয়েম তন্তু ফ্লোয়েমের একমাত্র মৃতকলা। |

## ۞ 2.2. ক্যাম্বিয়াম এবং গৌণবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা ۞ (Concept of Cambium and Secondary growth)

### ▲ ক্যাম্বিয়াম সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Cambium) ঃ

❖ (a) **ক্যাম্বিয়ামের সংজ্ঞা (Definition of Cambium) ঃ উদ্ভিদ অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত যে পার্শ্বীয় ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে গৌণ কলা গঠন করে উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটায় তাকে ক্যাম্বিয়াম বলে।**

(b) **ক্যাম্বিয়ামের প্রকারভেদ (Different types of Cambium)** ঃ ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রোক্যাম্বিয়ামের কতগুলি কোশ জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে ভাজক হিসাবে থাকে এবং ক্যাম্বিয়াম গঠন করে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রোক্যাম্বিয়ামের সব কোশই জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে বলে ক্যাম্বিয়াম গঠিত হয় না। ক্যাম্বিয়াম কলার কোশগুলি আয়তাকার, প্রাচীর পাতলা, কোশগহ্বরযুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। এই কলার কোশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা উদ্ভিদ অক্ষের (Axis) সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিভাজিত হয়। ক্যাম্বিয়াম দু'রকমের হয়, যেমন—**ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম ও কর্ক ক্যাম্বিয়াম।**

1. **ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম (Vascular cambium) ঃ নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী অংশে যে ক্যাম্বিয়াম থাকে তাকে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম বলে।** এই প্রকার ক্যাম্বিয়াম আবার দু'প্রকারের হয়।
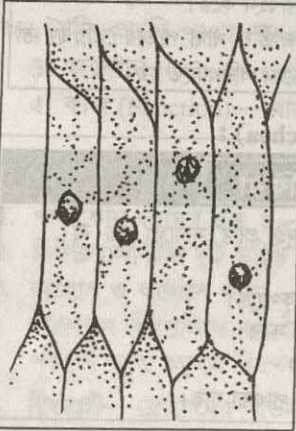
চিত্র 2.12 ঃ ক্যাম্বিয়াম কোশের লম্বচ্ছেদের চিত্ররূপ।

(i) **অন্তঃফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** (Intra-fascicular cambium)—ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী ক্যাম্বিয়ামকে **অন্তঃফ্যাসিকুলার** ক্যাম্বিয়াম বলা হয়।

**কাজ**— এই ক্যাম্বিয়াম একই স্থানে থাকে এবং সময়মতো বিভাজিত হয়ে নালিকা বান্ডিলের ভিতরের দিকে **গৌণ জাইলেম** এবং বাইরের দিকে **গৌণ ফ্লোয়েম** সৃষ্টি করে।

(ii) **আন্তঃফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** (Inter-fascicular cambium)— দুটি নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী অংশে যে ক্যাম্বিয়াম থাকে তাকে **আন্তঃফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** বলা হয়। এই ক্যাম্বিয়াম মজ্জাংশু (Medullary ray) থেকে উৎপন্ন হয়। এই জন্য এরা **গৌণ ভাজক কলা।**

**কাজ**—উদ্ভিদ কান্ডের গৌণ বৃদ্ধির সময় আন্তঃফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম কলাগুলি বিভাজিত হয়ে অন্তঃফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যাম্বিয়াম রিং গঠন করে।

2. **কর্ক ক্যাম্বিয়াম বা ফেলোজেন (Cork cambium or phellogen)**— গৌণ বৃদ্ধির সময় বহিঃস্টিলীয় অঞ্চলে কর্ক **ক্যাম্বিয়াম** গঠিত হয়। তাই একেও গৌণ ভাজক কলা বলা হয়।

**কাজ**—কর্ক ক্যাম্বিয়াম ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে বাইরের দিকে **ফেলেম** (Phellem) এবং ভিতরের দিকে **ফেলোডার্ম** (Phelloderm) গঠন করে।
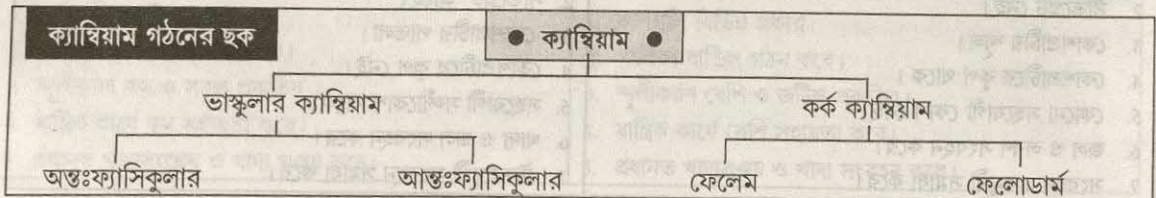
(c) **গঠন (Structure)** ঃ ক্যাম্বিয়াম দু'রকম কোশ নিয়ে গঠিত হয়, যেমন—**ফিউজিফর্ম ইনিসিয়াল** ও **রে ইনিসিয়াল**।

চিত্র 2.13 ঃ ক্যাম্বিয়ামের চিত্ররূপ।

1. **ফিউজিফর্ম ইনিসিয়াল (Fusiform initial)**— এই কোশগুলি উভয় দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মাকুর মতো (Spindle shaped) হয়। তাই এদের **মূলকাকার** কোশও বলে। এই কোশগুলি জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে। ক্যাম্বিয়ামের এই কোশগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। সজ্জা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ক্যাম্বিয়াম দু'রকমের হয়, যেমন—স্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম ও অস্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম।
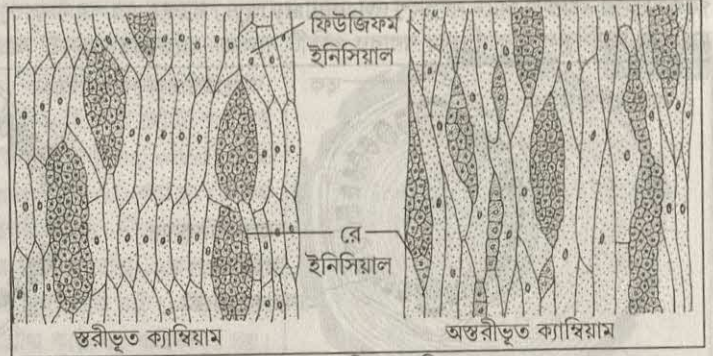
(i) **স্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম** (Storied or stratified)— ফিউজিফর্ম ইনিসিয়ালগুলি অনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকলে তাকে **স্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম** বলে।

চিত্র 2.14 ঃ A-ফিউজিফর্ম ইনিসিয়াল এবং B-রে ইনিসিয়াল

(ii) **অস্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম** (Non-storied or non-stratified)—ফিউজিফর্ম ইনিসিয়ালগুলি এলোমেলোভাবে সজ্জিত হলে অর্থাৎ অনুভূমিক স্তরে সজ্জিত না থাকলে তাকে **অস্তরীভূত ক্যাম্বিয়াম** বলা হয়।

2. **রে ইনিসিয়াল (Ray initial)**— এই ক্যাম্বিয়াম কলাগুলি ছোটো এবং সমব্যাসযুক্ত। এইগুলি থেকে রশ্মি কোশ উৎপন্ন হয় যা পরবর্তী সময়ে অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে।

(d) **ক্যাম্বিয়ামের কাজ (Function of Cambium)** ঃ (i) উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটায়। (ii) জোড় কলম গঠনে **স্টক** (stock) ও **সিয়নকে** ক্যাম্বিয়াম বিভাজিত হয়ে জুড়ে দিতে সাহায্য করে। (iii) উদ্ভিদ কাণ্ডের কোনো স্থান কেটে গেলে ক্যাম্বিয়াম কোশবিভাজিত হয়ে ক্ষতস্থান জুড়ে দিতেও সাহায্য করে।

## ➤ উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Secondary growth in plants) ঃ

❖ **গৌণ বৃদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Secondary growth) ঃ প্রাথমিক বৃদ্ধির পর গৌণ কলা গঠিত হয়ে উদ্ভিদের ব্যাস মোটা বা স্থূল হওয়ার পদ্ধতিকে গৌণ বৃদ্ধি বলে।**

উদ্ভিদ কলার প্রাথমিক বৃদ্ধির পর গৌণ কলা গঠিত হয় এবং ব্যাসে বাড়ে। বেশির ভাগ ব্যক্তবীজী, দ্বিবীজপত্রী এবং কয়েকটি একবীজপত্রী (ড্রাসিনা = *Dracaena*) উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডে গৌণ বৃদ্ধি দেখা যায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণবৃদ্ধি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। **অন্তঃস্টেলীয়** (intrastelar) ও **বহিঃস্টিলীয়** (extrastelar) অঞ্চলের গৌণ কলা (Secondary tissue) ক্যাম্বিয়ামের বিভাজনের ফলে গঠিত হয় এবং ক্রমশ স্থূল হয়। ক্যাম্বিয়াম কোশ স্তরের বিভাজনের জন্য নতুন গৌণ কলা উৎপন্ন হওয়াকে **গৌণ বৃদ্ধি** (Secondary growth) বলে।

## ➤ দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in Dicotyledonous and Monocotyledonous plants) ঃ

### ◘ A. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in Dicotyledonous stem) ঃ

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি দুটি পর্যায়ে ঘটে, যেমন—অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চলের গৌণ বৃদ্ধি ও বহিঃস্টিলীয় অঞ্চলের গৌণ বৃদ্ধি।

● 1. **অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চলের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in Intrastelar region)** ঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে।

(i) **ক্যাম্বিয়াম বলয় বা রিং গঠন** (Formation of Cambium ring)— দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে নালিকা বান্ডিলগুলি বলয়াকারে বা রিং-এ সজ্জিত থাকে। এই সময় নালিকা বান্ডিলের **ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** খণ্ডকগুলি অসম্পূর্ণ বলয়ে সজ্জিত

থাকে। অর্থাৎ শুধুমাত্র নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম থাকে। বলয় সম্পূর্ণ না হওয়ার প্রধান কারণ হল নালিকা বান্ডিলগুলির মধ্যবর্তী স্থানে মজ্জাংশু (Medullary rays) থাকে। এর পর মজ্জাংশু গঠনকারী কিছু প্যারেনকাইমা কোশ বিভাজিত হয় এবং ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম বরাবর প্রতিটি নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী স্থানে **ইন্টার-ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** গঠিত হয়।

গৌণ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়
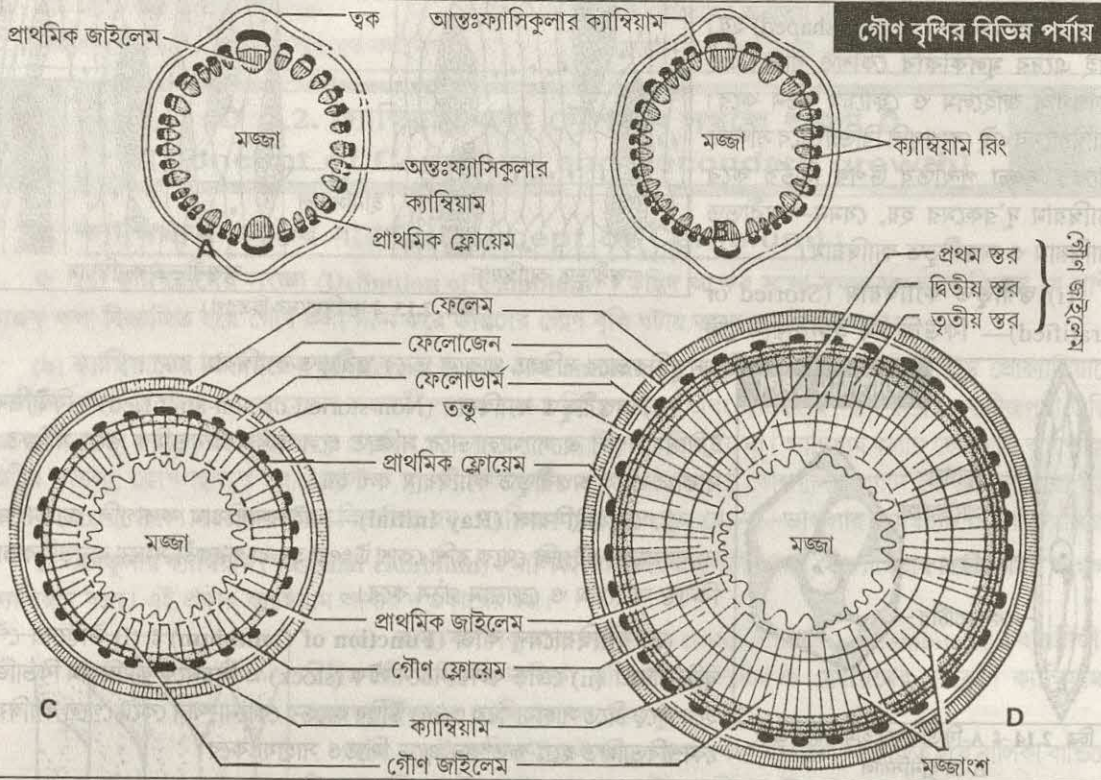
চিত্র 2.15 : A—D দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি : A-প্রাথমিক কলা, B-ক্যাম্বিয়াম রিং-এর গঠন, C-গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েমের উৎপত্তি এবং D-গৌণ বৃদ্ধি হওয়া একটি কান্ডের প্রস্থচ্ছেদ।
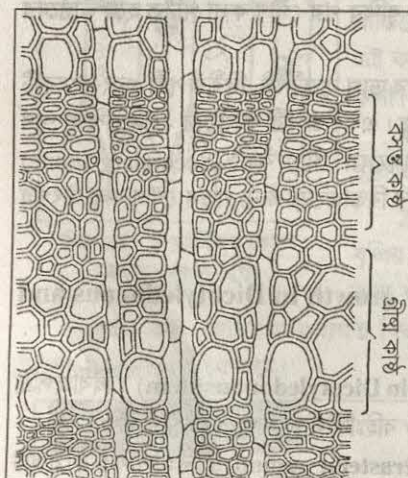
চিত্র 2.16 : প্রস্থচ্ছেদে বসন্ত কাষ্ঠ ও গ্রীষ্ম কাষ্ঠ।

নতুন গঠিত ইন্টার-ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম উভয় প্রান্তে বেড়ে দু-দিকে ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে **ক্যাম্বিয়াম বলয় বা রিং** গঠিত হয়।

(ii) **গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েমের উৎপত্তি** (Formation of Secondary Xylem and Phloem)— ক্যাম্বিয়াম বিভাজিত হয়ে ক্যাম্বিয়াম বলয়ের উভয় পাশে নতুন কোশ উৎপন্ন করে। ক্যাম্বিয়াম বলয়ের ভিতরের দিকে উৎপন্ন নতুন কোশগুলি **গৌণ জাইলেম** (Secondary xylem) এবং বাইরের দিকের নতুন উৎপন্ন কোশগুলি ক্রমশ **গৌণ ফ্লোয়েম কলা** (Secondary Phloem) গঠন করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদে জাইলেম অংশ ফ্লোয়েম অপেক্ষা বেশি পরিমাণে গঠিত হয়।

(iii) **গৌণ মজ্জাংশুর উৎপত্তি** (Formation of Secondary medullary rays)—ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ও ইন্টার ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েম গঠন করতে থাকে। এই কারণে সেই সময় মজ্জা ও বহির্মজ্জার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মজ্জাংশুর কিছুই থাকে না। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ইন্টার-ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম কিছু সরু ও লম্বা প্যারেনকাইমা কোশ গঠন করে। এই কোশগুলি ক্রমে **গৌণ মজ্জাংশুতে** পরিণত হয় এবং গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে মজ্জা ও বহির্মজ্জার মধ্যে নতুনভাবে সংযোগ স্থাপন করে।

(iv) **বর্ষবলয় গঠন** (Formation of Annual ring)— বসন্তকালে যে সময়ে উদ্ভিদের মুকুল ও কচি পাতা উৎপন্ন হয় এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বেশি পরিমাণে হয়, তখন মাটি থেকে প্রচুর রস মূলরোম দিয়ে সরবরাহ হয়। এই সময় উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বেশি। সেই জন্য ক্যাম্বিয়াম বিভাজিত হয়ে যেসব বাহিকা গঠন করে, তারা বড়ো ব্যাসযুক্ত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি হার কমে যায়, তখন ক্যাম্বিয়ামের কার্যতৎপরতাও ক্রমশ কমে যায়। এই সময় ছোটো ব্যাসযুক্ত বাহিকা গঠিত হয়। প্রথমে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **বসন্ত কাষ্ঠ** (Spring wood) এবং পরবর্তীকালে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **গ্রীষ্ম কাষ্ঠ** (Summmer wood) বলা হয়। এদের কোশের আকৃতি, গঠন ও সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির হয়। শীতকালে শীতল আবহাওয়া ও কম উষ্ণতার জন্য ক্যাম্বিয়ামের কর্মতৎপরতা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আবার বসন্তকাল এলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই কারণে পর্যায়ক্রমে বসন্ত কাষ্ঠ প্রশস্ত বাহিকাযুক্ত এবং গ্রীষ্ম কাষ্ঠ সরু বাহিকাযুক্ত হয়। বসন্ত কাষ্ঠ ও গ্রীষ্ম কাষ্ঠ উভয়ে মিলে **প্রতি বছরের বৃদ্ধিকে বোঝায়**। এই জন্য একটি উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রথচ্ছেদ করলে কতকগুলি বলয় দেখা যায়। এই বলয়গুলিকে **বর্ষবলয়** (Annual ring) বলে। বছরের পর বছর বলয় গঠিত হয় এবং এদের সংখ্যা গণনা করে একটি উদ্ভিদের বয়স নির্ধারণ করা যায়।

**চিত্র 2.17** ঃ একটি পরিণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রথচ্ছেদে বর্ষবলয়ের চিত্ররূপ।

তবে সব উদ্ভিদে সুস্পষ্ট বলয় গঠিত হয় না। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যেখানে আবহাওয়ার পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট সেই সব জায়গার **চিরহরিৎ** (Evergreen) ও **পর্ণমোচী** (Deciduous) উদ্ভিদে সুস্পষ্ট বলয় দেখা যায়।

● **2. বহিঃস্টিলীয় অঞ্চলের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in extrastelar region) ঃ**

(a) **পেরিডার্ম গঠন** (Formation of Periderm)— অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চলে ক্রমাগত গৌণ কলা গঠিত হবার ফলে কাণ্ডের ভিতরের অংশ স্থূল হয় এবং ভিতর থেকে একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রতিরোধ করার জন্য এবং বহির্মজ্জা ও বহিস্ত্বককে রক্ষা করার জন্য বহিঃস্টিলীয় অঞ্চলে গৌণ বৃদ্ধি ঘটে। বহির্মজ্জার যে-কোনো সজীব কোশস্তর **ফেলোজেন** বা কর্ক ক্যাম্বিয়াম নামে গৌণ ভাজক কলায় পরিণত হয়। এই ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে বাইরের দিকে **কর্ক** বা **ফেলেম** (Phellem) এবং ভিতরের দিকে **ফেলোডার্ম** (Phelloderm) গঠন করে। ফেলেমের কোশগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত হয়। এরা সুবারিন যুক্ত এবং মৃত। ফেলোডার্মের কোশগুলি ক্লোরোপ্লাস্টপূর্ণ এবং সজীব প্যারেনকাইমা কোশ দিয়ে গঠিত। ফেলেম, ফেলোজেন ও ফেলোডার্মকে একসঙ্গে **পেরিডার্ম** (Periderm) বলে।
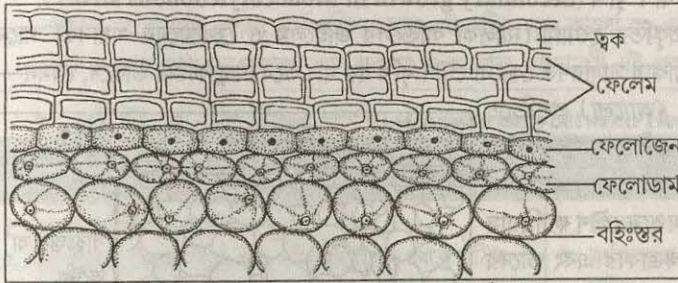
**চিত্র 2.18** ঃ প্রথচ্ছেদে পেরিডার্মের গঠন।

● **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় (Different phases of Secondary growth in Dicot stem) ঃ**

(b) **বল্কল ও লেন্টিসেল গঠন** (Formation of Bark and Lenticel) :

(i) **বল্কল** (Bark)—কাণ্ডের বাইরের দিকে ত্বকের জায়গা প্রথমে পেরিডার্ম দখল করে ও পেরিডার্মের স্থান পরে বল্কল দখল করে। ফেলোজেন-এর বাইরের দিকে কর্ককোশগুলি সুবানিনযুক্ত হয়ে মৃতকোশে পরিণত হয়। এরা বাইরে জীবিত কোশের স্তরগুলিতে খাদ্য ও জল সরবরাহ করতে পারে না। ফলে ওই কোশগুলিও মৃতকোশে পরিণত হয়। এরা ক্রমশ শুষ্ক সুবানিন যুক্ত হয়ে অবস্থান করে। ফেলোজেনের বাইরে কর্কসহ মৃত কলাকে **বল্কল** বা **ছাল** (Bark) বলে। এরা উদ্ভিদকে তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে। বল্কল সুবারিনযুক্ত বাতাবকাশবিহীন হওয়ায় বাষ্পমোচনের হার কমাতে পারে এবং পরজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

চিত্র 2.19 : লেন্টিসেলের গঠন।

(ii) **লেন্টিসেল** (Lenticel)—নতুন নতুন ফেলোজেন স্তর উৎপন্ন হওয়ার ফলে একই ভাবে কর্ক বা ফেলেম ও ফেলোডার্ম যথাক্রমে বাইরের দিকে ও ভিতরের দিকে সৃষ্টি হতে থাকে। বহিস্ত্বকের নীচে ফেলেম উৎপন্ন হওয়ার ফলে পত্ররন্ধ্রের মধ্যে গ্যাস বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই অসুবিধা দূর করার জন্য পত্ররন্ধ্রের নীচে ফেলোজেন ফেলেম গঠন না করে অসংখ্য অসংলগ্ন আলগাভাবে বিন্যস্ত প্যারেনকাইমা কোশ গঠন করে। এদের **পরিপূরক কোশ** (Complimentary) বলে। অসংখ্য পরিপূরক কোশের চাপে একসময়ে বহিস্ত্বক ছিঁড়ে যায়। **বহিস্ত্বক, পরিপূরক কোশ, ফেলোজেন, ফেলোডার্ম** দিয়ে গঠিত এই বিশেষ রন্ধ্র পথকে **লেন্টিসেল** বলে। লেন্টিসেল উদ্ভিদের বল্কলের উপর ক্ষত চিহ্নের মতো দেখায়। তা ছাড়া অনেক প্রজাতির মূল ও ফলের উপরও লেন্টিসেল দেখা যায়। লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে।

### ◘ B. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in Monocotyledonous stem) :

একবীজপত্রী উদ্ভিদে নালিকা বান্ডিল বন্ধ প্রকৃতির হওয়ায় (নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম না থাকা) এবং বলয়াকারে বিন্যস্ত না থাকায় সাধারণত কোনো গৌণ বৃদ্ধি হয় না। তবে কিছু কাষ্ঠল উদ্ভিদে, যেমন—*Dracaena (ড্রাসিনা)*, *Yucca (ইউক্কা)*, *Aloe (অ্যালো)* প্রভৃতিতে গৌণ বৃদ্ধি দেখা যায়। এসব উদ্ভিদের কাণ্ডের ত্বকের নীচে প্যারেনকাইমা অঞ্চল থাকে। একে **বহিঃস্তর** (Cortex) বলা হয়। বহিঃস্তরের একেবারে নীচের সারির প্যারেনকাইমা কোশস্তর বিভাজনক্ষম হয়ে **গৌণ ক্যাম্বিয়াম** গঠন করে। গৌণ ক্যাম্বিয়াম কোশগুলি আয়তক্ষেত্রাকার এবং তাদের প্রান্তগুলি সূচালো। এরা বাইরের দিকে ফ্লোয়েম কলা গঠন না করে প্যারেনকাইমা কলা উৎপন্ন করে যা বহিঃস্তর বা কর্টেক্সের প্যারেনকইমা কলা থেকে পৃথক করা যায় না। ভেতরের দিকে এরা জাইলেম গঠন না করে **যোজক কলা** গঠন করে। যোজক কলার কোশ বিভাজিত ও রূপান্তরিত হয়ে মাঝে মাঝে গোলাকার **লেপটোসেন্টিক নালিকা বান্ডিল** (কেন্দ্রে জাইলেম ও চারপাশে ফ্লোয়েম) গঠন করে। সব নালিকা বান্ডিলগুলি যোজক কলার মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। তবে দেখা যায় প্রাথমিক নালিকা বান্ডিলের চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা কলার আবরণ গঠিত হয়। এই সব উদ্ভিদে পেরিডাম গঠিত হয় না। বহিঃস্তরের নীচে প্যারেনকাইমা কোশগুলি পৃষ্ঠসমান্তরাল বা পেরিক্লিনাল (Periclinal) পদ্ধতিতে বিভাজিত ও সুবেরিনযুক্ত হয়ে **কর্ক** গঠন করে। ফেলোজেন ছাড়াই উৎপন্ন হয় বলে এই প্রকার কর্ক কোশকে **স্তরীভূত কর্ক** (Storied cork) বলে।

চিত্র 2.20 : একবীজপত্রী উদ্ভিদের (ড্রাসিনা) গৌণ বৃদ্ধি।

**● জেনে রাখো ●**

1. **বর্ষবলয় কী ?**
- এক বছরে বা একটি বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন বৃদ্ধি বলয়কে **বর্ষবলয়** বলে।

2. **ভ্রান্ত বর্ষবলয় কী ?**
- অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবং রোগাক্রমণের জন্য বর্ষবলয় গঠন অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে। কিছুদিন পর আবার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এই সময় গৌণ কাষ্ঠের একটি অতিরিক্ত বৃদ্ধিস্তর গঠিত হয়। একে **ভ্রান্ত বর্ষবলয়** বলে।

3. **আর্লি উড ও লেট উড কী ?**
- বর্ষবলয়ে দুটি পৃথক প্রকৃতির কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। আগে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **আর্লি উড** এবং পরে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **লেট উড** বলে। **বসন্তকালে** আর্লি উড এবং **গ্রীষ্মকালে** লেট উড গঠিত হয়। তাই আর্লি উড **বসন্ত কাষ্ঠ** (Spring wood) এবং লেট উড **গ্রীষ্ম কাষ্ঠ** (Summer wood) নামে পরিচিত।

4. **ডিফিউজ পোরাস (Diffuse porous) ও রিং পোরাস কাষ্ঠ কী ?**
- বর্ষবলয়ে ট্রাকিয়া বা ভেসেলগুলি সমভাবে ছড়িয়ে থাকলে এবং তাদের ব্যাস মোটামুটি সমান হলে তাকে **ডিফিউজ পোরাস কাষ্ঠ** বলা হয়। অন্যদিকে অসমান ব্যাসের ট্রাকিয়া বা ভেসেলগুলি যদি কাষ্ঠের প্রস্থচ্ছেদে বলয়াকারে সজ্জিত থাকে তাকে **রিং পোরাস** কাষ্ঠ বলে।

5. **স্যাপ উড (Sap wood) কী ?**
- সদ্যোজাত গৌণ জাইলেমের সাহায্যে বর্ষবলয়ের বাইরের দিকে গঠিত হালকা রং-এর এবং যার মধ্য দিয়ে রস পরিবহন, খাদ্য সঞ্চয় প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ চলে তাকে **স্যাপ উড বা অ্যালবারনম** (Alburnum) বলে।

6. **হার্ট উড (Heart wood) কাকে বলে ?**
- পুরানো বর্ষবলয়ের মধ্যভাগের গৌণকাষ্ঠের পরিবহন ক্ষমতা লোপ পায় এবং কোশগুলিতে ট্যানিন ও অন্যান্য পদার্থ জমতে থাকে এবং কালো বর্ণে পরিণত হয়। এই কঠিন, মৃত, কালো রং-এর গৌণ কাষ্ঠকে **হার্ট উড বা ডুরামেন** বলে। এই কাষ্ঠ অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী এই প্রকার কাষ্ঠ থেকে তৈরি হয়।

● **হার্ট উড ও স্যাপ উডের পার্থক্য (Comparison between Heart wood and Sap wood) :**

| হার্ট উড | স্যাপ উড |
|---|---|
| 1. রং কালো বা গাঢ় প্রকৃতির। | 1. রং হালকা প্রকৃতির। |
| 2. বর্ষবলয়ের কেন্দ্রে থাকে এবং গৌণ জাইলেম থেকে গঠিত হয়। | 2. বর্ষবলয়ের বাইরের দিকে থাকে এবং গৌণ জাইলেম থেকে গঠিত। |
| 3. দৃঢ় মজবুত ও টেকসই। | 3. মজবুত ও টেকসই নয়। |
| 4. মৃত জাইলেম উপাদান দিয়ে গঠিত। | 4. মৃত জাইলেম উপাদান ও সজীব প্যারেনকাইমা নিয়ে গঠিত। |
| 5. নিরেট যান্ত্রিক স্তম্ভক যা উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দান করে। | 5. রস সংবহন ও খাদ্য সঞ্চয় করে। |
| 6. কোশে ট্যানিন, রজন, গঁদ প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। | 6. কোনো পদার্থ সঞ্চিত হয় না। |

## ❂ কলাতন্ত্র (TISSUE SYSTEM) ❂

### ❂ 2.3. কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ❂ (Definition and Types of Tissue system)

❖ (a) **কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Tissue system) :** সংগঠিতভাবে একই ধরনের কাজে লিপ্ত একই বা বিভিন্ন প্রকৃতির কলার সমষ্টিকে কলাতন্ত্র বলে।

(b) **বল্কল ও লেন্টিসেল গঠন** (Formation of Bark and Lenticel) :

(i) **বল্কল** (Bark)—কাণ্ডের বাইরের দিকে ত্বকের জায়গা প্রথমে পেরিডার্ম দখল করে ও পেরিডার্মের স্থান পরে বল্কল দখল করে। ফেলোজেন-এর বাইরের দিকে কর্ককোশগুলি সুবানিনযুক্ত হয়ে মৃতকোশে পরিণত হয়। এরা বাইরে জীবিত কোশের স্তরগুলিতে খাদ্য ও জল সরবরাহ করতে পারে না। ফলে ওই কোশগুলিও মৃতকোশে পরিণত হয়। এরা ক্রমশ শুষ্ক সুবানিন যুক্ত হয়ে অবস্থান করে। ফেলোজেনের বাইরে কর্কসহ মৃত কলাকে **বল্কল** বা **ছাল** (Bark) বলে। এরা উদ্ভিদকে তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে। বল্কল সুবারিনযুক্ত বাতাবকাশবিহীন হওয়ায় বাষ্পমোচনের হার কমাতে পারে এবং পরজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

চিত্র 2.19 : লেন্টিসেলের গঠন।

(ii) **লেন্টিসেল** (Lenticel)—নতুন নতুন ফেলোজেন স্তর উৎপন্ন হওয়ার ফলে একই ভাবে কর্ক বা ফেলেম ও ফেলোডার্ম যথাক্রমে বাইরের দিকে ও ভিতরের দিকে সৃষ্টি হতে থাকে। বহিস্ত্বকের নীচে ফেলেম উৎপন্ন হওয়ার ফলে পত্ররন্ধ্রের মধ্যে গ্যাস বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই অসুবিধা দূর করার জন্য পত্ররন্ধ্রের নীচে ফেলোজেন ফেলেম গঠন না করে অসংখ্য অসংলগ্ন আলগাভাবে বিন্যস্ত প্যারেনকাইমা কোশ গঠন করে। এদের **পরিপূরক কোশ** (Complimentary) বলে। অসংখ্য পরিপূরক কোশের চাপে একসময়ে বহিস্ত্বক ছিঁড়ে যায়। **বহিস্ত্বক, পরিপূরক কোশ, ফেলোজেন, ফেলোডার্ম** দিয়ে গঠিত এই বিশেষ রন্ধ্র পথকে **লেন্টিসেল** বলে। লেন্টিসেল উদ্ভিদের বল্কলের উপর ক্ষত চিহ্নের মতো দেখায়। তা ছাড়া অনেক প্রজাতির মূল ও ফলের উপরও লেন্টিসেল দেখা যায়। লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে।

## ◘ B. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth in Monocotyledonous stem) :

একবীজপত্রী উদ্ভিদে নালিকা বান্ডিল বন্ধ প্রকৃতির হওয়ায় (নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম না থাকা) এবং বলয়াকারে বিন্যস্ত না থাকায় সাধারণত কোনো গৌণ বৃদ্ধি হয় না। তবে কিছু কাষ্ঠল উদ্ভিদে, যেমন—*Dracaena (ড্রাসিনা)*, *Yucca (ইউক্কা)*, *Aloe (অ্যালো)* প্রভৃতিতে গৌণ বৃদ্ধি দেখা যায়। এসব উদ্ভিদের কাণ্ডের ত্বকের নীচে প্যারেনকাইমা অঞ্চল থাকে। একে **বহিঃস্তর** (Cortex) বলা হয়। বহিঃস্তরের একেবারে নীচের সারির প্যারেনকাইমা কোশস্তর বিভাজনক্ষম হয়ে **গৌণ ক্যাম্বিয়াম** গঠন করে। গৌণ ক্যাম্বিয়াম কোশগুলি আয়তক্ষেত্রাকার এবং তাদের প্রান্তগুলি সূচালো। এরা বাইরের দিকে ফ্লোয়েম কলা গঠন না করে প্যারেনকাইমা কলা উৎপন্ন করে যা বহিঃস্তর বা কর্টেক্সের প্যারেনকইমা কলা থেকে পৃথক করা যায় না। ভেতরের দিকে এরা জাইলেম গঠন না করে **যোজক কলা** গঠন করে। যোজক কলার কোশ বিভাজিত ও রূপান্তরিত হয়ে মাঝে মাঝে গোলাকার **লেপটোসেন্টিক নালিকা বান্ডিল** (কেন্দ্রে জাইলেম ও চারপাশে ফ্লোয়েম) গঠন করে। সব নালিকা বান্ডিলগুলি যোজক কলার মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। তবে দেখা যায় প্রাথমিক নালিকা বান্ডিলের চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা কলার আবরণ গঠিত হয়। এই সব উদ্ভিদে পেরিডাম গঠিত হয় না। বহিঃস্তরের নীচে প্যারেনকাইমা কোশগুলি পৃষ্ঠসমান্তরাল বা পেরিক্লিনাল (Periclinal) পদ্ধতিতে বিভাজিত ও সুবেরিনযুক্ত হয়ে **কর্ক** গঠন করে। ফেলোজেন ছাড়াই উৎপন্ন হয় বলে এই প্রকার কর্ক কোশকে **স্তরীভূত কর্ক** (Storied cork) বলে।

চিত্র 2.20 : একবীজপত্রী উদ্ভিদের (ড্রাসিনা) গৌণ বৃদ্ধি।

**• জেনে রাখো •**

1. **বর্ষবলয় কী ?**
- এক বছরে বা একটি বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন বৃদ্ধি বলয়কে **বর্ষবলয়** বলে।

2. **ভ্রান্ত বর্ষবলয় কী ?**
- অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবং রোগাক্রমণের জন্য বর্ষবলয় গঠন অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে। কিছুদিন পর আবার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এই সময় গৌণ কাষ্ঠের একটি অতিরিক্ত বৃদ্ধিস্তর গঠিত হয়। একে **ভ্রান্ত বর্ষবলয়** বলে।

3. **আর্লি উড ও লেট উড কী ?**
- বর্ষবলয়ে দুটি পৃথক প্রকৃতির কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। আগে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **আর্লি উড** এবং পরে উৎপন্ন কাষ্ঠকে **লেট উড** বলে। **বসন্তকালে** আর্লি উড এবং **গ্রীষ্মকালে** লেট উড গঠিত হয়। তাই আর্লি উড **বসন্ত কাষ্ঠ** (Spring wood) এবং লেট উড **গ্রীষ্ম কাষ্ঠ** (Summer wood) নামে পরিচিত।

4. **ডিফিউজ পোরাস (Diffuse porous) ও রিং পোরাস কাষ্ঠ কী ?**
- বর্ষবলয়ে ট্রাকিয়া বা ভেসেলগুলি সমভাবে ছড়িয়ে থাকলে এবং তাদের ব্যাস মোটামুটি সমান হলে তাকে **ডিফিউজ পোরাস কাষ্ঠ** বলা হয়। অন্যদিকে অসমান ব্যাসের ট্রাকিয়া বা ভেসেলগুলি যদি কাষ্ঠের প্রস্থচ্ছেদে বলয়াকারে সজ্জিত থাকে তাকে **রিং পোরাস** কাষ্ঠ বলে।

5. **স্যাপ উড (Sap wood) কী ?**
- সদ্যোজাত গৌণ জাইলেমের সাহায্যে বর্ষবলয়ের বাইরের দিকে গঠিত হালকা রং-এর এবং যার মধ্য দিয়ে রস পরিবহন, খাদ্য সঞ্চয় প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ চলে তাকে **স্যাপ উড বা অ্যালবারনম** (Alburnum) বলে।

6. **হার্ট উড (Heart wood) কাকে বলে ?**
- পুরানো বর্ষবলয়ের মধ্যভাগের গৌণকাষ্ঠের পরিবহন ক্ষমতা লোপ পায় এবং কোশগুলিতে ট্যানিন ও অন্যান্য পদার্থ জমতে থাকে এবং কালো বর্ণে পরিণত হয়। এই কঠিন, মৃত, কালো রং-এর গৌণ কাষ্ঠকে **হার্ট উড বা ডুরামেন** বলে। এই কাষ্ঠ অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী এই প্রকার কাষ্ঠ থেকে তৈরি হয়।

• **হার্ট উড ও স্যাপ উডের পার্থক্য (Comparison between Heart wood and Sap wood) ঃ**

| হার্ট উড | স্যাপ উড |
|---|---|
| 1. রং কালো বা গাঢ় প্রকৃতির। | 1. রং হালকা প্রকৃতির। |
| 2. বর্ষবলয়ের কেন্দ্রে থাকে এবং গৌণ জাইলেম থেকে গঠিত হয়। | 2. বর্ষবলয়ের বাইরের দিকে থাকে এবং গৌণ জাইলেম থেকে গঠিত। |
| 3. দৃঢ় মজবুত ও টেকসই। | 3. মজবুত ও টেকসই নয়। |
| 4. মৃত জাইলেম উপাদান দিয়ে গঠিত। | 4. মৃত জাইলেম উপাদান ও সজীব প্যারেনকাইমা নিয়ে গঠিত। |
| 5. নিরেট যান্ত্রিক স্তম্ভক যা উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দান করে। | 5. রস সংবহন ও খাদ্য সঞ্চয় করে। |
| 6. কোশে ট্যানিন, রজন, গঁদ প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। | 6. কোনো পদার্থ সঞ্চিত হয় না। |

# ❁ কলাতন্ত্র (TISSUE SYSTEM) ❁

## ✪ 2.3. কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ✪ (Definition and Types of Tissue system)

❖ (a) **কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Tissue system) ঃ সংগঠিতভাবে একই ধরনের কাজে লিপ্ত একই বা বিভিন্ন প্রকৃতির কলার সমষ্টিকে কলাতন্ত্র বলে।**

◘ (b) **কলাতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Tissue system) :** বিজ্ঞানী স্যাক্স (1875) সপুষ্পক উদ্ভিদের কার্যক্ষমতা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের কলাতন্ত্রকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন—1. **ত্বক কলাতন্ত্র** 2. **আদি কলাতন্ত্র** 3. **সংবহন কলাতন্ত্র**—এই তিন প্রকার কলাতন্ত্র উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার গঠনে বিভিন্ন বৈচিত্র্য আনে এবং সুনির্দিষ্ট কাজ করে।

## ▲ 1. ত্বক কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, গড়ন এবং বিভিন্ন অংশ (Definition, Origin, Structure and different parts of Epidermal tissue system)

❖ (a) **ত্বক কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of epidermal tissue system) : যে কলাতন্ত্র উদ্ভিদের প্রাথমিক গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের সবরকম অঙ্গের আবরণী গঠন করে তাকে ত্বক কলাতন্ত্র বলে।**

(b) **উৎপত্তি (Origin) :** প্রধানত অগ্রস্থ ভাজক কলার **বহিঃস্তর** (**প্রোটোডার্ম**—Protoderm) থেকে উৎপন্ন হয়।

(c) **গঠন (Structure) :** ত্বক কলাতন্ত্র মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতির বহিস্ত্বক (Epidermis) ও এর উপবৃদ্ধি (outgrowth) এবং বিভিন্ন প্রকার রন্ধ্র নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উদ্ভিদের একস্তর বিশিষ্ট বহিস্ত্বকের আকৃতি এবং কার্যগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ত্বক সাধারণত একস্তর বিশিষ্ট হয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুস্তর যুক্তও হতে পারে। বহুস্তরযুক্ত ত্বককে **বহুযোজী ত্বক** (Multiple epidermis) বলে। **উদাহরণ**—বটপাতার ও অর্কিড মূলের ত্বক।

(d) **ত্বক কলাতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (Different components of Epidermal tissue system) :**

➤ **A. বহিস্ত্বক (Epidermis) :**

বহিস্ত্বক সাধারণত পরিবর্তিত প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে গঠিত হয়। কোশগুলির আকৃতি গোলাকার বা নলাকার হয়। কোশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং কোশান্তর রন্ধ্র(Intercellular space) বিহীন। প্রাথমিক অবস্থায় ত্বক কোশগুলিতে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে, কিন্তু পরে এগুলি বিলুপ্ত হয়।

চিত্র 2.21 : বিভিন্ন প্রকার ত্বকের কোশ।

প্রতিটি ত্বককোশের প্রাচীর পাতলা এবং কোশের মধ্যে গহ্বর (Vacuole) এবং প্রোটোপ্লাজমের একটি পাতলা স্তর (Primordial utricle) কোশপ্রাচীরের চারদিকে সংলগ্ন থাকে। কোশে বর্ণহীন **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplast) দেখা যায়। জলজ ও ছায়াচ্ছন্ন স্থানে জন্মায় এমন উদ্ভিদের ত্বককোশে **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplast) থাকে। ত্বককোশে মিউসিলেজ, ট্যানিন, বিভিন্ন প্রকার কেলাস (Crystals) ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে। ত্বককোশের বহিঃপ্রাচীর এবং অরীয় প্রাচীর (Radial wall) অন্তঃপ্রাচীর অপেক্ষা স্থূল। একবীজপত্রী উদ্ভিদ ত্বকের কোশগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। ফুলের পাপড়ি ও ফলের ত্বককোশে অ্যান্থোসায়ানিন নামে রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়।

ত্বককোশ প্রাচীরে কিউটিন জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে **কিউটিকল্** আস্তরণ (Cuticle) গঠন করে। কিউটিকলের ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে না। কিউটিকল ছাড়া সেলুলোজ, লিগনিন, সুবেরিন, মোম প্রভৃতি পদার্থ জমে ত্বকের কিউটিকল মসৃণ ও অমসৃণ হতে পারে। সাধারণত মূল ও জলজ উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের ত্বকে কোশপ্রাচীরে কোনো স্থূলীকরণ দেখা যায় না। কিন্তু স্থলজ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতায় নানা প্রকার স্থূলীকরণ দেখা যায়। ত্বককোশের আকার ও আয়তন প্রজাতি অনুসারে তারতম্য লক্ষ করা যায়। পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল ছাড়া ত্বক অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে।

মূল, কাণ্ড ও পাতার ত্বকে অনেক সময় রোম থাকে। কাণ্ডের রোম সবসময় বহু কোশী এবং মূলের রোম এককোশী। কাণ্ড ও পাতার ত্বকে যেসব রন্ধ্র থাকে তাদের **পত্ররন্ধ্র** (Stomata) বলে।

নীচে কয়েকটি উদ্ভিদের বিশেষ ধরনের ত্বককোশের তারতম্য দেখানো হল—

(i) ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের পাতার ত্বকে খর্ব ত্বককোশ (Short cells) এবং দীর্ঘ ত্বককোশ (Long cell) থাকে। খর্ব কোশগুলিতে **সিলিকা** (Silica) থাকলে **সিলিকা কোশ** (Silica cell) এবং জৈব পদার্থ থাকলে **কর্ক কোশ** (Cork cell) বলে। (ii) সরষে জাতীয় উদ্ভিদের ত্বকে থলের মতো ক্ষরণ কোশ থাকে। এই কোশগুলিতে**মাইরোসিন** (Myrosin) উৎসেচক থাকে বলে **মাইরোসিন কোশ** (Myrosin cell) নামে পরিচিত। (iii) রবার, বট প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় কতকগুলি বড়ো কোশ থাকে। এদের **লিথোসিস্ট** (Lithocyst) বলা হয়। লিথোসিস্ট কোশে বর্জিত অজৈব লবণ আঙুরের থোকার মতো কেলাস গঠন করে। এদের **সিস্টোলিথ** (Cystolith) বলে।

### ◎ বহিস্ত্বকের কাজ (Function of Epidermis) ঃ

**ত্বকের প্রধান কাজগুলি হল**—(i) আঘাত, তাপ, শৈত্য প্রভৃতি থেকে ভিতরের কলাগুলিকে রক্ষা করা। (ii) ত্বককোশ জলসঞ্চয়, ক্ষরণ, শোষণ প্রভৃতি কাজ করে। (iii) সবুজ ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত ত্বক কোশে সালোকসংশ্লেষ ঘটে। (iv) কিউটিন, লিগনিন, মোম প্রভৃতি যুক্তত্বক বাষ্পমোচনে বাধার সৃষ্টি করে। এতে জলের অপচয় কমে। (v) ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য প্রাণীর প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে উদ্ভিদ অঙ্গকে রক্ষা করে।

## ➤ B. মূলরোম ও কাণ্ডরোম (Root hairs and Stem hairs) ঃ

বহিস্ত্বকের কোশ থেকে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতায় নানা প্রকার এককোশী ও বহুকোশী উপবৃদ্ধি দেখা যায়, এদের **ট্রাইকোম** (Trichome) বলে। নীচে মূল ও কাণ্ডের রোম (Hair) নিয়ে আলোচনা করা হল।

● 1. **মূলরোম (Root hairs)**— মূলের ত্বককোশের বাইরের প্রাচীর নলের মতো বেড়ে মূলরোম গঠন করে। এদের মূলের মূলরোম অঞ্চলে দেখা যায়। এককোশী মূলরোম ক্ষণস্থায়ী। মূলরোম কোশগুলির মধ্যে গহ্বরযুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট থাকে এবং নিউক্লিয়াস রোমের শীর্ষে যায়। এর সাহায্যে উদ্ভিদ জল ও খনিজ লবণ মাটি থেকে শোষণ করে।

● 2. **কাণ্ডরোম (Stem hairs)**— কাণ্ডের রোম সাধারণত বহুকোশী হয়। এরা কাণ্ডের বহিস্ত্বক থেকে গঠিত হয়। রোমগুলি অশাখ বা শাখান্বিত, গ্রন্থিযুক্ত বা গ্রন্থিবিহীন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হয়। কাণ্ড রোম আত্মরক্ষার কাজ করে এবং গ্রন্থিরোম উৎসেচক নিঃসরণ করে।

চিত্র 2.22 ঃ বিভিন্ন প্রকার বহিস্ত্বকীয় রোম।

(a) **রোম (Hair)** ঃ নীচে কয়েক প্রকার কাণ্ডরোমের উদাহরণ দেওয়া হল।

(i) *Lentana (লেন্টানা)* উদ্ভিদের কাণ্ডের রোমগুলি লম্বা এবং পাকানো বলে কাণ্ডের উপরিভাগ উলের মতো মসৃণ দেখায়।

(ii) কার্পাস তুলা, টম্যাটো, সূর্যমুখী প্রভৃতি উদ্ভিদ কাণ্ডে লম্বা বহুকোশী রোম থাকে।

(iii) *Platanus (প্লেটেনাস)* নামে উদ্ভিদের রোম শাখাপ্রশাখাযুক্ত।

(iv) *Althaea (অ্যালথিয়া)* উদ্ভিদের কাণ্ডে তারার মতো রোম দেখা যায়।

(v) *Olea (বেলফুলে)* থালার মতো রোম থাকে।

(vi) *Disracus (ডিস্‌রেকাসে)* T আকৃতির রোম কাণ্ডে আবৃত হয়ে থাকে।

(b) **দংশক রোম (Stinging hair)** ঃ এগুলি বহুকোশী গ্রন্থিময় রোম। এদের **দংশক রোম** বলে। দংশক রোমের নীচের দিকে পরের কোশটি লম্বা এবং বিষাক্ত রসে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাণীকোশের সংস্পর্শে এলে কোশের সূচালো ডগা বেঁধে ভেঙে যায়। এর ফলে বিষাক্ত রস প্রাণীদেহে প্রবেশ করে। **উদাহরণ**—বিছুটি, আলকুশি প্রভৃতি।

● **কাণ্ডরোম ও মূলরোমের পার্থক্য (Difference between Stem hair and Root hair) ঃ**

| কাণ্ডরোম | মূলরোম |
|---|---|
| 1. কাণ্ডরোম কাণ্ডের ত্বককোশ থেকে গঠিত হয়। | 1. মূলরোম মূলের ত্বককোশ থেকে গঠিত হয়। |
| 2. কাণ্ডরোম সবসময় বহুকোশী। | 2. মূলরোম সব সময় এককোশী। |
| 3. কাণ্ডের ত্বকে থাকে। | 3. মূলরোম অঞ্চলে থাকে। |
| 4. প্রধান কাজ হল প্রতিরক্ষা। | 4. প্রধান কাজ হল খনিজ লবণ মিশ্রিত জলশোষণ। |

➤ **C. পত্ররন্ধ্র (Stomata) ঃ**

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition) ঃ উদ্ভিদের পাতা ও কচি কাণ্ডের ত্বকে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রগুলিকে পত্ররন্ধ্র বলে।**

2. **গঠন (Structure)** ঃ অপরিণত কাণ্ড ও পাতার ত্বকে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক পত্ররন্ধ্র থকে। প্রতিটি পত্ররন্ধ্রে একটি রন্ধ্র এবং দুটি পরস্পর আংশিকভাবে যুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার বা বৃক্কাকৃতির **রক্ষীকোশ** (Guard Cell) থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের রক্ষীকোশ **ডম্বরু বা ডাম্বেল** (Dumbel) আকৃতির হয়। অনেক ক্ষেত্রে রক্ষীকোশ দুটিতে ত্বককোশ বেষ্টন করে থাকে। এই ত্বককোশগুলিকে **আনুষঙ্গিক কোশ** (Subsidiary cells) বলে। প্রতিটি পত্ররন্ধ্রের ঠিক নীচে একটি **বায়ুগহ্বর** (Air Chamber) দেখা যায়। রক্ষীকোশগুলিতে ঘন সাইটোপ্লাজম, একটি নিউক্লিয়াস, ঘন সইটোপ্লাজম, এন্ডোপ্লাজমীয় জালক, মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। এতে স্টার্চ দানাও সঞ্চিত হয়। রক্ষীকোশ দুটি সমানভাবে স্থূল হয় না। প্রধানত ছিদ্র সংলগ্ন কোশপ্রাচীর স্থূল ও দৃঢ় হয়, কিন্তু অন্যান্য কোশপ্রাচীরের অংশগুলি পাতলা থাকে। পত্ররন্ধ্র সাধারণত ত্বককোশের (Epidermal cell) সমউচ্চতায় অবস্থান করে। অনেক উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে **নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র** (Sunken stomata) থাকে। উদহরণ—করবী (*Nerium indicum*)। রক্ষীকোশ দুটির মধ্যবর্তী স্থানের ছিদ্রটি হল রন্ধ্র—যা ক্রমশ নীচের দিকে বড়ো পত্ররন্ধ্র গহ্বরে মিশে যায়।

চিত্র 2.23 ঃ পত্ররন্ধ্রের গঠন—A- পৃষ্ঠ দৃশ্য এবং B-ছেদ দৃশ্য।

3. **বিস্তৃতি (Distribution)** ঃ মূলের বহিস্ত্বকে কোনো পত্ররন্ধ্র থাকে না। সবুজপাতায় সবচেয়ে বেশি পত্ররন্ধ্র থাকে। **বিষমপৃষ্ঠ পত্রের** (Dorsiventral leaf) শুধুমাত্র নিম্নপৃষ্ঠে এবং **সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের** (Isobilateral leaf) উভয়পৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র দেখা যায়। জলে ভাসমান বা অর্ধনিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতার উপরিপৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র থাকে কিন্তু জলে নিমজ্জিত সবুজ উদ্ভিদের দেহে পত্ররন্ধ্র থাকে না, অনেক সময় থাকলেও পত্ররন্ধ্রগুলি নিষ্ক্রিয় হয়। জঙ্গল-উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র ত্বকের গভীরে অবস্থান করে। এই ধরনের পত্ররন্ধ্রকে **নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র** (Sunken Stomata) বলা হয়।

4. **পত্ররন্ধ্রের প্রকারভেদ (Types of Stomata)** ঃ রক্ষীকোশ ও আনুষঙ্গিক কোশের সংখ্যা ও বিন্যাসরীতির তারতম্য অনুসারে পত্ররন্ধ্র নানা প্রকারের হয়। মেটকাফ ও চক (Metcaffe and Chalk, 1950) সব দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করেন।

(i) **র‍্যানানকিউলেসিয়াস টাইপ** (Ranunculaceous type) বা **অ্যানোমোসাইটিক** (Anomocytic)— এই প্রকার পত্ররন্ধ্রগুলি কতকগুলি কোশ দিয়ে পরিবৃত থাকে যা অন্যান্য ত্বক কোশ (Epidermal cell) থেকে পৃথক করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনো আনুষঙ্গিক কোশ থাকে না। উদাহরণ—র‍্যানানকিউলেসি (Ranunculaceae) ও ক্যাপারিডিয়েসি (Capparidaceae) গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতিতে দেখা যায়। কয়েকটি উদ্ভিদ, যেমন—*Ranunculus sceleratus* (Ranunculaceae), *Cleome viscosa* (Capparidaceae)

(ii) **ক্রুসিফেরাস টাইপ** (Cruciferous type) বা **অ্যানাইসোসাইটিক** (Anisocytic) —এই প্রকার পত্ররন্ধ্র তিনটি আনুষঙ্গিক কোশ দিয়ে ঘেরা থাকে। তিনটি কোশের মধ্যে একটির আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোটো। **উদাহরণ**—ক্রুসিফেরি (Cruciferae), সোলানেসি (Solanaceae) গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতি। কয়েকটি প্রজাতির নাম হল—*Brassica nigra* (Curcifera), *Solanum tuberosum* (Solanaceae)।

(iii) **রুবিয়েসিয়াস টাইপ** (Rubiaceous type) বা **প্যারাসাইটিক** (Paracytic)— এইক্ষেত্রে দুটি আনুষঙ্গিক কোশ পত্ররন্ধ্রকে ঘিরে রাখে। পত্ররন্ধ্রের লম্ব অক্ষ বরাবর উভয় দিকে সমান্তরালভাবে দুটি আনুষঙ্গিক কোশ থাকে। উদাহরণ—রুবিয়েসি (Rubiaceae), ম্যাগনোলিয়েসি (Magnoliaceae) গোত্রের উদ্ভিদ। কয়েকটি প্রজাতির নাম হল—*Ixora coccinea* (Rubiaceae), *Magnolia grandiflora* (Magnoliaceae)।
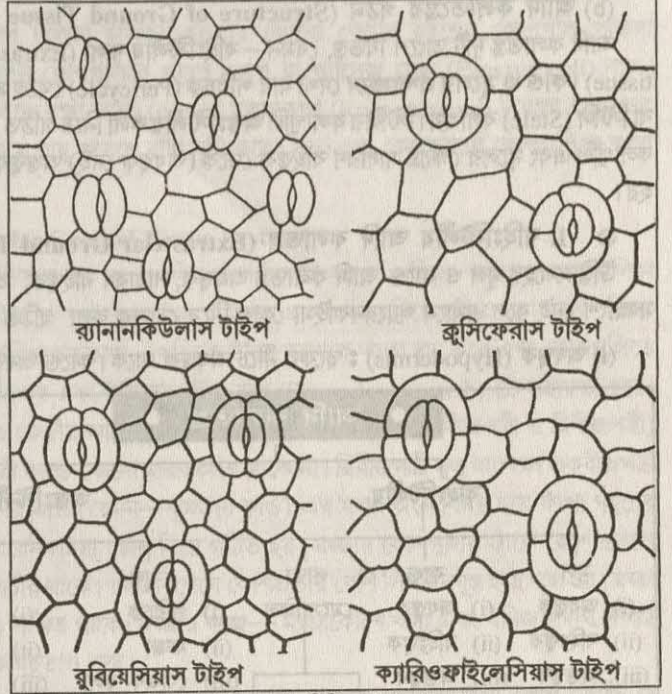
চিত্র 2.24 : বিভিন্ন প্রকার পত্ররন্ধ্র।

(iv) **ক্যারিওফাইলেসিয়াস টাইপ** (Caryophyllaceous type) বা **ডায়াসাইটিক** (Diacytic)—এই প্রকার পত্ররন্ধ্রে দুটি আনুষঙ্গিক কোশ ঘিরে রাখে। এদের সাধারণ প্রাচীর রক্ষীকোশের লম্ব অক্ষের সঙ্গে সমকোণে বিন্যস্ত থাকে। **উদাহরণ**—ক্যারিওফাইলেসি (Caryophyllaceae) ও অ্যাকানথেসি (Acanthaceae) গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতি। কয়েকটি প্রজাতির নাম হল—*Dianthus chinensis* (Caryophyllaceae), *Adhatoda vasica* (Acanthaceae)।

5. **পত্ররন্ধ্রের কাজ (Function of Stomata) :** পত্ররন্ধ্র উদ্ভিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর প্রধান কাজগুলি হল—

(i) পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহ এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। শ্বসনের সময় এই রন্ধ্রের মাধ্যমে অক্সিজেন গৃহীত এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্জিত হয়।

(ii) সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত এবং অক্সিজেন নির্গত হয়।

(iii) পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোশে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে।

(iv) বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্র দিয়ে ত্যাগ করে।

## ▲ 2. আদি কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং গঠন (Definition and Structure of Ground Tissue System)

উদ্ভিদ অঙ্গের বেশির ভাগ অংশ আদি কলাতন্ত্রের অন্তর্গত। আদি কলাতন্ত্র কাণ্ড ও মূলে ত্বকের নীচ থেকে শুরু করে অন্তস্ত্বক—এমনকি পরিচক্র, মজ্জারশ্মি এবং কেন্দ্রস্থ মজ্জা পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণত এরা প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে গঠিত হয়। তবে অনেক সময় স্বল্প পরিমাণ কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা কোশ ও আদি কলাতন্ত্রে থাকে। উদ্ভিদের পাতার উর্ধ্ব ও নিম্ন বহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সংবহন কলা ছাড়া বাকি সব অংশে এই কলাতন্ত্র দেখা যায়। পাতার আদি কলাকে **মেসোফিল কলা** (Mesophyll tissue) বলে। আবার অনেক পাতায় মেসোফিল কলা **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma) ও **প্যালিসেড প্যারেনকাইমায়** (Palisade parenchyma) বিভক্ত।

❖ (a) **আদি কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ground Tissue System) :** **উদ্ভিদদেহের ত্বক কলাতন্ত্র ও সংবহন কলাতন্ত্র ছাড়া অবশিষ্ট সব কলাসমষ্টিকে একসঙ্গে আদি কলাতন্ত্র বলে।**

(b) **আদি কলাতন্ত্রের গঠন (Structure of Ground Tissue System) :**
আদি কলাতন্ত্র দুটি অংশে বিভক্ত, যেমন—**বহিঃস্টিলীয় কলা** (Extrastelar tissue) এবং **অন্তঃস্টিলীয় কলা** (Intrastelar tissue)। **কাণ্ড ও মূলের প্রস্থচ্ছেদে** দেখা যায় **পরিচক্র** (Pericycle) থেকে **মজ্জা** (Pith) পর্যন্ত একটি অঞ্চল থাকে, একে কেন্দ্রস্তম্ভ বা **স্টিলি** (Stele) বলা হয়। স্টিলির কলাগুলি **অন্তঃস্টিলীয় কলা** নিয়ে গঠিত। কাণ্ডের ক্ষেত্রে অধস্ত্বক থেকে অন্তস্ত্বক পর্যন্ত অংশের কলাগুলি এবং মূলের ক্ষেত্রে সাধারণ বহিস্ত্বক থেকে (অধস্ত্বক নেই) অন্তস্ত্বক পর্যন্ত অঞ্চলের কলাগুলিকে **বহিঃস্টিলীয়** কলা বলা হয়।

● **1. বহিঃস্টিলীয় আদি কলাতন্ত্র (Extrastelar Ground Tissue System) :**
উদ্ভিদদেহের মূল ও কাণ্ডে আদি কলাতন্ত্র অধস্ত্বক, সাধারণ বহিস্ত্বক, অন্তস্ত্বক, পরিচক্র, মজ্জা ও মজ্জাংশতে থাকে। মূলে মজ্জাংশ নেই বলে এখানে প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে যোজক কলা গঠিত হয়।

(i) **অধস্ত্বক** (Hypodermis) **:** ত্বকের নীচে অধস্ত্বক থাকে। কাণ্ডে অধস্ত্বক থাকে কিন্তু মূলে অধস্ত্বক থাকে না। তবে কোনো কোনো মূলের ত্বকের নীচে এক বা একাধিক স্তর বিশিষ্ট **এক্সোডারমিস** (Exodermis) থাকে। বহু উদ্ভিদবিদ এই এক্সোডারমিসকে মূলের অধস্ত্বক বলে অভিহিত করেন। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের অধস্ত্বক কোলেনকাইমা এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের অধস্ত্বক স্ক্লেরেনকাইমা নিয়ে গঠিত হয়। **অধস্ত্বকের কাজ**—(i) উদ্ভিদ অঙ্গের অধস্ত্বক উদ্ভিদকে রক্ষা (Protection) করে। (ii) উদ্ভিদকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা (Mechanical support) দান করে।

(ii) **সাধারণ বহিঃস্ত্বক** (General cortex) **:** একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ মূলের ত্বকের নীচ থেকে অন্তস্ত্বক পর্যন্ত এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের অধস্ত্বক থেকে অন্তস্ত্বক বা শ্বেতসার আবরণী (Starch sheath) পর্যন্ত আন্তঃকোশান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমার যে কোশস্তরে বিন্যস্ত থাকে, তা হল সাধারণ বহিস্ত্বক। ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ বহিস্ত্বকের প্যারেনকাইমা কোশগুলি ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত হতে পারে।

**সাধারণ বহিস্ত্বকের কাজ (Function of general cortex)**—(i) সাধারণ বহিস্ত্বকের কোশগুলি খাদ্য সঞ্চয় এবং খাদ্য প্রস্তুতিতে সহায়তা করে। (ii) এছাড়া এই কোশস্তর জল সংবহন এবং আত্মরক্ষার কাজে সহায়তা করে।

(iii) **অন্তস্ত্বক** (Endodermis) **:** অন্তস্ত্বক বহিঃস্টিলীয় কলাগুলিকে অন্তঃস্টিলীয় কলাগুলি থেকে পৃথক করে রাখে। অন্তস্ত্বক একস্তরযুক্ত কোশ নিয়ে গঠিত। এই স্তরটি পিপাকৃতি প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে গঠিত। কোশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এদের মধ্যে কোশান্তর রন্ধ্র থাকে না। অন্তস্ত্বকের কোশগুলির প্রস্থ এবং পার্শ্ব প্রাচীরে সুবেরিন বা লিগনিনযুক্ত ফিতার মতো

চিত্র 2.25 : A-অন্তস্ত্বক কোশ ও ক্যাস্‌পেরিয়ান ফিতা, B-ওই প্রস্থচ্ছেদ, C-ওই লম্বচ্ছেদ এবং D-অন্তস্ত্বক কোশ ও পারণ কোশ।

স্থূল স্তর থাকে। একে **ক্যাসপেরিয়ান ফিতা** (Casparian strips) বলে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তস্ত্বকে ক্যাসপেরিয়ান ফিতা থাকে না। এদের অন্তস্ত্বকে শ্বেতসার দানা সঞ্চিত থাকায় একে **শ্বেতসার আবরণী** (Starch sheath)-ও বলা হয়। অনেক সময় একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের অন্তস্ত্বকের কোশগুলির স্থূলতা অসমান হওয়ায় কোনো কোনো অংশের কোশগুলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট হয়। অন্তস্ত্বকের এই পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট কোশগুলিকে **পারণ কোশ** বা **প্যাসেজ সেল** (Passage cell) বলে। **অন্তস্ত্বকের কাজ**—(i) অন্তস্ত্বক অন্তঃস্টিলীয় কলাগুলিকে রক্ষা করে। (ii) এরা **মূলজ চাপ** (Root pressure) নিয়ন্ত্রণ করে এবং **বায়ু বাঁধ** (Air dam) হিসাবে কাজ করে এবং জাইলেমে বায়ু প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। (iii) এরা কেন্দ্রস্তম্ভের কোশগুলিকে জলে সম্পৃক্ত করে রাখে।

● **2. অন্তঃস্টিলীয় আদি কলাতন্ত্র (Intrastelar Ground Tissue System) ঃ**

(i) **পরিচক্র** (Pericycle) ঃ পরিচক্র অন্তস্ত্বকের ভিতরে এক বা একাধিক স্তরে বিন্যস্ত থাকে। পরিচক্র অন্তস্ত্বক এবং নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। পরিচক্র প্যারেনকাইমা বা স্ক্লেরেনকাইমা বা উভয় প্রকার কলা নিয়ে গঠিত হয়। মূলে পরিচক্র দেখা যায়, কিন্তু কাণ্ডে সাধারণত পরিচক্র থাকে না। **পরিচক্রের কাজ**—পরিচক্র উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা দান করে এবং কোশগুলিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই স্তর থেকে মূলের শাখা নির্গত হয় এবং উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth)-তে সহায়তা করে।

(ii) **মজ্জা** (Pith) ঃ নালিকা বান্ডিল দিয়ে বেষ্টিত কেন্দ্রীয় আদিকলাকে মজ্জা বলে। মজ্জা মূল (একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী) এবং কাণ্ডে (দ্বিবীজপত্রী) দেখা যায়। কিন্তু একবীজপত্রী কাণ্ডে কোনো মজ্জা অংশ থাকে না। দ্বিবীজপত্রী মূল অপেক্ষা একবীজপত্রী মূলে বিস্তৃত মজ্জা অংশ থাকে। কোনো কোনো উদ্ভিদের কাণ্ড (যেমন—কুমড়ার কাণ্ড)-এর মজ্জা অংশ বিনষ্ট হয়ে ফাঁপা গহ্বরের সৃষ্টি করে। মজ্জা অংশ গোলাকার বা বেলনাকার প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে গঠিত হয়। মজ্জার কোশগুলির ফাঁকে কোশান্তররন্ধ্র থাকে। কোশগুলিতে সেলুলোজ নির্মিত খুব পাতলা প্রাচীর থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে কোশপ্রাচীর বেশি লিগনিনযুক্ত হয়ে স্থূল হয়। মজ্জা কোশে শ্বেতসার দানা, খনিজ কেলাস, ট্যানিন প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। **মজ্জার কাজ**— মজ্জাকোশে খাদ্য এবং খনিজ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মজ্জা উদ্ভিদকে যান্ত্রিক দৃঢ়তাও দেয়।

(iii) **মজ্জা রশ্মি** (Medullary rays) ঃ নালিকা বান্ডিলগুলির মধ্যভাগে লম্বাটে ধরনের প্যারেনকাইমা কোশ নির্মিত যে আদিকলার অংশ বিস্তৃত থাকে তাকে মজ্জা রশ্মি বলে। মজ্জা রশ্মি বহিঃস্তর এবং মজ্জার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। **মজ্জা রশ্মির কাজ**— মজ্জা রশ্মির কোশগুলিতে খাদ্য এবং জল সঞ্চিত থাকে। তা ছাড়া সংবহন এবং গৌণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

● **পাতার আদি কলা (Ground tissue of leaves) ঃ**

পাতার উপর ও নীচের পৃষ্ঠের ত্বকদ্বয়ের মাঝের কলাগুলি (নালিকা বান্ডিল বাদে) আদি কলাতন্ত্রের অন্তর্গত। এরা ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কলার সমন্বয়ে গঠিত এবং **মেসোফিল কলা** (Mesophyll) নামে পরিচিত। বিষমপৃষ্ঠ পাতায় দু'রকমের মেসোফিল কলা দেখা যায়, যেমন—**প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma) ও **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা**। প্যালিসেড প্যারেনকাইমার কোশগুলির আকার লম্বা এবং উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত এবং স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার কোশগুলি সাধারণত গোলাকার বা ডিম্বাকার। এদের কোশান্তর রন্ধ্রও থাকে। সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতায় (Isobilateral leaf) মেসোফিল কলা শুধুমাত্র স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা নিয়ে গঠিত হয়। **কাজ**— সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া, গ্যাসের আদানপ্রদান, বাষ্পমোচন ও খাদ্য সঞ্চয় মেসোফিল কলার প্রধান কাজ।

## ▲ 3. সংবহন কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও গঠন (Definition, Origin and Structure of Vascular Tissue System)

সংবহন কলাতন্ত্র জটিল স্থায়ী কলা জাইলেম ও ফ্লোয়েম নিয়ে গঠিত হয়। এই কলাতন্ত্রের প্রধান কাজ হল উদ্ভিদদেহে সংবহন। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একসঙ্গে নালিকা বান্ডিল গঠন করে। এই কারণে সংবহন কলাতন্ত্র প্রধানত কতকগুলি নালিকা বান্ডিলের সমষ্টিমাত্র। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী অংশে ক্যাম্বিয়াম (Cambium) নামে একপ্রকার ভাজক কলা থাকে। নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী অংশে ক্যাম্বিয়াম থাকলে **মুক্ত নালিকা বান্ডিল** (Open vascular bundle) এবং না থাকলে তাকে **বদ্ধ নালিকা বান্ডিল** (Closed vascular bundle) বলে।
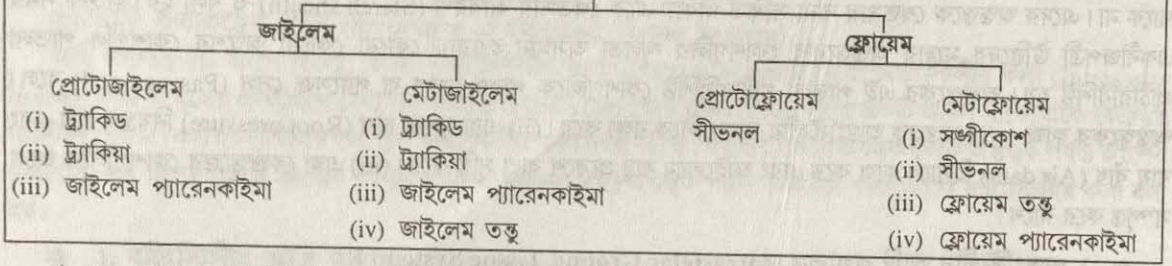
❖ (a) **সংবহন কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Vascular Tissue System) :** যে কলাতন্ত্র জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামে জটিল স্থায়ী কলা নিয়ে গঠিত এবং উদ্ভিদের সংবহনে অংশগ্রহণ করে তাদের সংবহন কলাতন্ত্র বলে।

(b) **উৎপত্তি (Origin) :** ভাজক কলার প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে নালিকা বান্ডিল গঠিত হয়।

(c) **গঠন (Structure) :** নালিকা বান্ডিলে তিন প্রকার কলা থাকে, যেমন—**জাইলেম, ফ্লোয়েম ও ক্যাম্বিয়াম।**

## ➤ I. জাইলেম (Xylem) :

(a) **জাইলেমের গঠন (Structure of Xylem) :** আগে জটিল স্থায়ী কলাতে বলা হয়েছে **জাইলেম** চার প্রকার কোশ নিয়ে গঠিত হয়—**ট্র্যাকিড, ট্র্যাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা** এবং **জাইলেম তন্তু**। জাইলেম দু'রকমের, যেমন—**প্রোটোজাইলেম** এবং **মেটাজাইলেম**। জাইলেমের যে অংশ প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে প্রথমে তৈরি হয় তাকে **প্রোটোজাইলেম** বলে। জাইলেমের যে অংশ পরে তৈরি হয় তাকে **মেটাজাইলেম** বলা হয়। নীচে প্রোটোজাইলেম এবং মেটাজাইলেমের গঠন আলোচনা করা হল।

● 1. **প্রোটোজাইলেম (Protoxylem) :** উদ্ভিদের জাইলেম কলাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম। উদ্ভিদের প্রথম উৎপন্ন ছোটো গহ্বরযুক্ত জাইলেম বাহিকাগুলিকে **প্রোটোজাইলেম** বলে। এদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল—

(i) প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে বিভেদিত হয়ে প্রোটোজাইলেম কোশগুলি গঠিত হয়।

(ii) প্রোটোজাইলেম ট্র্যাকিড, ট্র্যাকিয়া ও জাইলেম প্যারেনকাইমা নিয়ে গঠিত। এদের কোনো জাইলেম তন্তু থাকে না।

(iii) কোশগুলি সরু ও লম্বা। কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।

(iv) কোশপ্রাচীরে লিগনিন জমা হয়ে বলয়াকার, সর্পিলাকার বা সোপানাকার স্থূলীকরণ গঠন করে।

(v) ভুট্টা-জাতীয় একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রোটোজাইলেম কলা বিনষ্ট হয়ে একটি গহ্বর তৈরি করে। একে **প্রোটোজাইলেম গহ্বর** (Protoxylem Cavity) বলে।

● **বিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী প্রোটোজাইলেম তিন প্রকারের হয়,** যেমন—

(i) **এক্সার্ক জাইলেম**— জাইলেম উদ্ভিদ অক্ষের কেন্দ্রের দিকে থাকে। প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে সজ্জিত হলে তাকে **এক্সার্ক জাইলেম** (Exarch xylem) বলে। **উদাহরণ**—মূল।
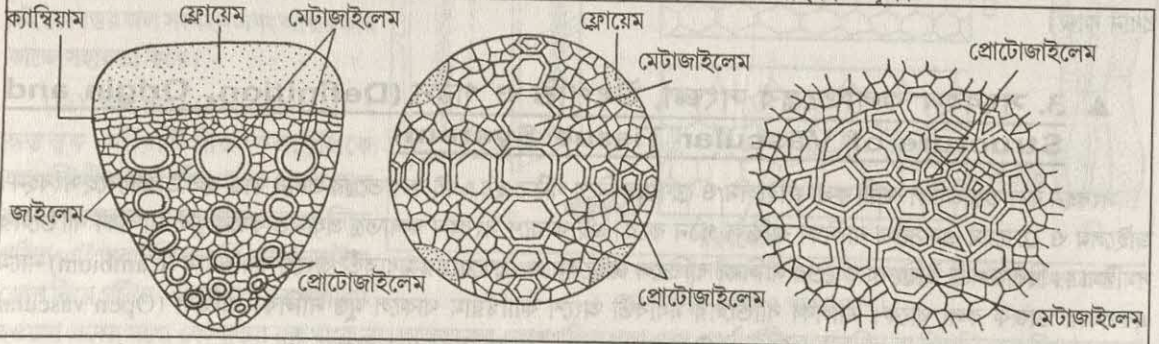
চিত্র 2.26 : প্রোটোজাইলেমের বিন্যাস— A-এক্সার্ক, B-এন্ডার্ক, C-মেসার্ক।

(ii) **এন্ডার্ক জাইলেম**—প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে এবং মেটাজাইলেম পরিধির দিকে সজ্জিত হলে, তাকে **এন্ডার্ক জাইলেম** (Endarch xylem) বলে। **উদাহরণ**—কাণ্ড।

(iii) **মেসার্ক জাইলেম**—মধ্যভাগে প্রোটোজাইলেম এবং মেটাজাইলেম প্রোটোজাইলেমকে আবৃত করে বিন্যস্ত হলে তাকে **মেসার্ক জাইলেম** (Measarch xylem) বলা হয়। **উদাহরণ**—পাতা।

● 2. **মেটাজাইলেম (Metaxylem)** : উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটার পরে উৎপন্ন বড়ো গহ্বরে যুক্ত জাইলেম বাহিকাগুলিকে **মেটাজাইলেম** বলে। এই কোশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

(i) প্রোক্যাম্বিয়াম কোশ থেকে গঠিত হয়।

(ii) মেটাজাইলেম ট্র্যাকিড, ট্র্যাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু নিয়ে গঠিত।

(iii) কোশপ্রাচীরে জালিকাকার, সোপানাকার কূপাঙ্কিত স্থূলীকরণ দেখা যায়।

(iv) জাইলেম প্যারেনকাইমা, ট্র্যাকিড ও ট্র্যাকিয়ার সঙ্গে অরীয়ভাবে বিন্যস্ত থাকে।

(a) **জাইলেমের কাজ (Function of Xylem)** : জাইলেমের ট্র্যাকিড ও ট্র্যাকিয়া উদ্ভিদ-অঙ্গে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় সংবহন করে। তা ছাড়া উদ্ভিদ-অঙ্গকে দৃঢ়তা দান করে।

● **প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেমের পার্থক্য (Difference between Protoxylem & Metaxylem)** :

| প্রোটোজাইলেম | মেটাজাইলেম |
|---|---|
| 1. প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে প্রথম উৎপন্ন হয়। | 1. প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে পরে উৎপন্ন হয়। |
| 2. এরা ছোটো গহ্বরযুক্ত জাইলেম বাহিকা। | 2. এরা বড়ো গহ্বরযুক্ত জাইলেম বাহিকা। |
| 3. ট্র্যাকিড, ট্র্যাকিয়া ও জাইলেম প্যারেনকাইমা নিয়ে গঠিত। | 3. ট্র্যাকিড, ট্র্যাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু নিয়ে গঠিত। |
| 4. কাণ্ডের কেন্দ্রের দিকে সজ্জিত থাকে। | 4. মূলের কেন্দ্রের দিকে সজ্জিত থাকে। |
| 5. কোশপ্রাচীরের স্থূলীকরণ সাধারণত বলয়াকার বা সর্পিলাকার। | 5. কোশপ্রাচীরের স্থূলীকরণ জালিকাকার, সোপানাকার অথবা কূপাঙ্কিত। |

## ➤ II. ফ্লোয়েম (Phloem) :

● (a) **ফ্লোয়েমের গঠন (Structure of Phloem)** : জাইলেমের মতো প্রথমে গঠিত ফ্লোয়েমকে প্রোটোফ্লোয়েম (Protophloem) এবং পরে গঠিত ফ্লোয়েমকে মেটাফ্লোয়েম (Metaphloem) বলা হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম কলা চার রকমের হয়, যেমন—সঙ্গীকোশ, সীভনল, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু। একবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম কলা শুধু সীভনল ও সঙ্গীকোশ নিয়ে গঠিত হয়।

(i) **প্রোটোফ্লোয়েম (Protophloem)** : উদ্ভিদের প্রথম গঠিত ফ্লোয়েমকে **প্রোটোফ্লোয়েম** বলে। এই কোশগুলি প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে গঠিত হয়। কোশগুলি লম্বা, সরু এবং কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। প্রোটোফ্লোয়েম সাধারণত সীভনল নিয়ে গঠিত হয়। সঙ্গীকোশ সব উদ্ভিদের প্রোটোফ্লোয়েমে দেখা যায় না।

(ii) **মেটাফ্লোয়েম (Metaphloem)** : উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পর প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে **মেটাফ্লোয়েম** গঠিত হয়। এই কোশগুলি আকৃতিতে প্রোটোফ্লোয়েমের চেয়ে বড়ো এবং জটিল। মেটাফ্লোয়েম সীভনল, সঙ্গীকোশ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে গঠিত হয়। তবে ফ্লোয়েম তন্তু সব সময় থাকে না।

● (b) **ফ্লোয়েমের কাজ (Function of Phloem)** : খাদ্য পরিবহন করা ফ্লোয়েমের প্রধান কাজ।

● প্রোটোফ্লোয়েম এবং মেটাফ্লোয়েমের পার্থক্য (Difference between Protophloem & Metaphloem) :

| প্রোটোফ্লোয়েম | মেটাফ্লোয়েম |
|---|---|
| 1. প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে প্রথমে তৈরি হয়। | 1. প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে পরে তৈরি হয়। |
| 2. সাধারণত সীভনল নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু অনেক সময় সঙ্গী কোশ দেখা যায়। | 2. কোশগুলি সীভনল, সঙ্গীকোশ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে গঠিত। ফ্লোয়েম তন্তু সব সময় থাকে না। |
| 3. সীভনলের ব্যাস সরু। | 3. সীভনলের ব্যাস বড়ো। |
| 4. গৌণ-বৃদ্ধির সময় বিনষ্ট হয়। | 4. গৌণ বৃদ্ধির সময় বিনষ্ট হয় না এবং অপরিবর্তিত থাকে। |

## ➤ III. ক্যাম্বিয়াম (Cambium) :

● (a) **ক্যাম্বিয়ামের গঠন (Structure of Cambium) :** বিভাজনক্ষম এক বা একাধিক কোশস্তর বিশিষ্ট সজীব কোশের সমন্বয়ে গঠিত একপ্রকার পার্শ্বীয় ভাজক কলাকে ক্যাম্বিয়াম বলে। দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী প্রোক্যাম্বিয়াম ভাজককলা হিসাবে অপরিবর্তিত থাকে এবং ক্যাম্বিয়াম গঠন করে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে সব প্রোক্যাম্বিয়াম কোশ জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেখানে আলাদা ক্যাম্বিয়াম থাকে না। ক্যাম্বিয়ামকে একধরনের ভাজক কলা বলা যায়। এই কলার কোশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা উদ্ভিদ অঙ্গের অক্ষের (Axis) সমান্তরালে বিভাজিত হয়। নালিকা বান্ডিলের ক্যাম্বিয়াম কলা দু'রকম কোশ নিয়ে গঠিত হয়, যেমন—(i) ফিউসিফর্ম ইনিসিয়াল (Fusiform initial)—লম্বা ও সূচালো প্রান্তযুক্ত কোশ এবং (ii) রে-ইনিসিয়াল (Ray initial)—গোলাকার কোশ।

● (b) **ক্যাম্বিয়ামের কাজ (Function of Cambium) :** নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী ক্যাম্বিয়াম (ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম) উভয় দিকে নতুন কোশ উৎপন্ন করে। ক্যাম্বিয়ামের কোশগুলি বিভাজিত হয়ে বাইরের দিকে ফ্লোয়েম এবং ভিতরের দিকে জাইলেম কলা গঠন করে। তা ছাড়া ক্যাম্বিয়ামের সাহায্যে উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে। ফেলোজেন অর্থাৎ কর্ক ক্যাম্বিয়ামের কোশগুলি বিভাজিত হয়ে বাইরের দিকে ফেলেম এবং ভিতরের দিকে ফেলোডার্ম গঠন করে। উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ কেটে গেলে বা ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হলে ক্যাম্বিয়াম কোশ বিভাজিত হয়ে সে স্থান ভরাট করতে সহায়তা করে।

## ▲ নালিকা বান্ডিল (Vascular bundle) :

● (a) **নালিকা বান্ডিলের গঠন (Structure of Vascular bundle) : সংবহন কলাতন্ত্রের একক হল নালিকা বান্ডিল**। প্রত্যেকটি নালিকা বান্ডিল প্রধানত জটিল কলা জাইলেম, ফ্লোয়েম ও ক্যাম্বিয়াম নিয়ে গঠিত হয়। অনেক সময় নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম থাকে না।

● (b) **নালিকা বান্ডিলের প্রকারভেদ (Types of Vascular bundle)**—নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম নানা পদ্ধতিতে সাজানো থাকে। এই সাজানোর পদ্ধতি অনুসারে নালিকা বান্ডিলকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়—**সংযুক্ত ও অরীয়**।
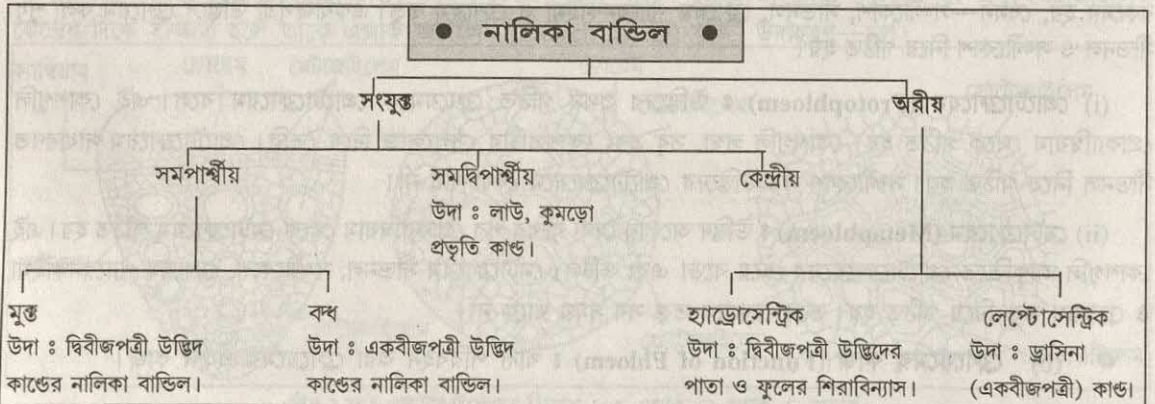
(a) **সংযুক্ত নালিকা বান্ডিল (Conjoint Vascular bundle) :** যেসব নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম এক সঙ্গে থাকে তাদের **সংযুক্ত নালিকা বান্ডিল** বলে। **উদাহরণ—পাতা ও কাণ্ড।** সংযুক্ত নালিকা বান্ডিলকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) **সমপার্শ্বীয়** (Collateral)—এই ধরনের বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম পাশাপাশি থাকে। জাইলেম কলা থাকে কাণ্ডের ভিতরের দিকে, অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে এবং ফ্লোয়েম কলা থাকে বাইরের দিকে। **উদাহরণ—সূর্যমুখী, ভুট্টা** প্রভৃতি। সমপার্শ্বীয় বান্ডিলে যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম থাকে, তখন তাকে **মুক্ত সমপার্শ্বীয়** (Open collateral) বলে। যেমন—**পাইন, সূর্যমুখী** প্রভৃতি। আবার যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না, তখন তাকে **বন্ধ সমপার্শ্বীয়** (Closed collateral) বলে। যেমন—ভুট্টা জাতীয় উদ্ভিদ। এখানে বলা যায়, মুক্ত সমপার্শ্বীয় বান্ডিল দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ কাণ্ডে পাওয়া যায়। বন্ধ সমপার্শ্বীয় বান্ডিল একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় দেখা যায়।

(ii) **সমদ্বিপার্শ্বীয়** (Bicollateral)—সমদ্বিপার্শ্বীয় বান্ডিলের মাঝখানে জাইলেম এবং উভয় পাশে প্রথমে ক্যাম্বিয়াম ও পরে ফ্লোয়েম থাকে অর্থাৎ জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যে উভয় পাশে দুই স্তর ক্যাম্বিয়াম অবস্থান করে। **উদাহরণ—কুমড়োর কাণ্ড।**

(iii) **কেন্দ্রীয়** (Centric)— যে নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা একটি অন্যটিকে বেষ্টন করে রাখে তাকে **কেন্দ্রীয় নালিকা বান্ডিল** বলে। যখন জাইলেমকে ঘিরে ফ্লোয়েম থাকে, তখন তাকে **হ্যাড্রোসেন্ট্রিক** (Hadrocentric) বলে। **উদাহরণ—** ফার্ন। আবার যখন ফ্লোয়েমকে বেষ্টন করে জাইলেম থাকে, তখন তাকে **লেপ্টোসেন্ট্রিক** (Leptocentric) বলে। **উদাহরণ**—ড্রাসিনা।
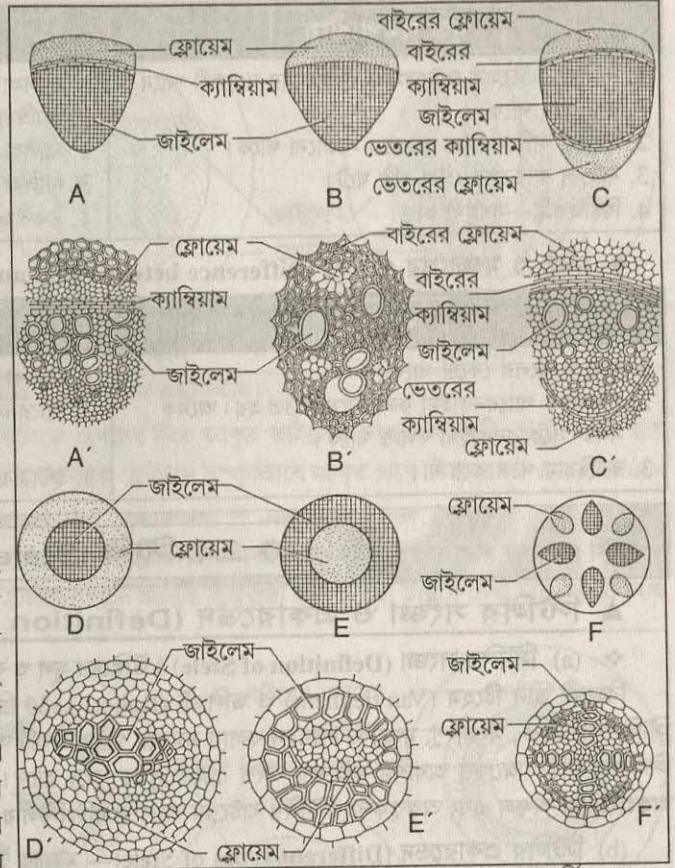


চিত্র 2.27 : প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার নালিকা বান্ডিল (A-A´) মুক্ত সমপার্শ্বীয়, (B-B´) বন্ধ সমপার্শ্বীয়, (C-C´) সমদ্বিপার্শ্বীয়, (D-D´) হ্যাড্রোসেন্ট্রিক, (E-E´) লেপ্টোসেন্ট্রিক, (F-F´) অরীয়।

(b) **অরীয় নালিকা বান্ডিল (Radial Vascular bundle) :** যেসব নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম এক সঙ্গে গুচ্ছ বেঁধে থাকে না তাকে **অরীয় নালিকা বান্ডিল** বলে। এই ধরনের নালিকা বান্ডিলে অক্ষীয় ব্যাসার্ধে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদা আলাদা ভাবে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। **উদাহরণ** — এই জাতীয় নালিকা বান্ডিল মূলে দেখা যায়।

● **মূল ও কাণ্ডের নালিকা বান্ডিলের পার্থক্য (Difference between Vascular bundle of Root and Stem) :**

| মূলের নালিকা বান্ডিল | কাণ্ডের নালিকা বান্ডিল |
|---|---|
| 1. মূলের নালিকা বান্ডিল অরীয়ভাবে বিন্যস্ত হয়। | 1. কাণ্ডের নালিকা বান্ডিল সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় হয়। |
| 2. নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা পাশাপাশি থাকে না। | 2. নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম পাশাপাশি থাকে। |
| 3. জাইলেম এক্সার্ক। | 3. জাইলেম এন্ডার্ক। |
| 4. ক্যাম্বিয়াম থাকে না। | 4. দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে থাকে, কিন্তু একবীজপত্রী কাণ্ডে থাকে না। |

● **মুক্ত ও বদ্ধ সমপার্শ্বীয় নালিকা বান্ডিলগুলির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Open and Closed colateral vascular bundles) :**

| মুক্ত সমপার্শ্বীয় | বদ্ধ সমপার্শ্বীয় |
|---|---|
| 1. নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম থাকে। | 1. নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম থাকে না। |
| 2. নালিকা বান্ডিল বলয় আকারে সাজানো থাকে। | 2. নালিকা বান্ডিল আদিকলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো থাকে। |
| 3. নালিকা বান্ডিলের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে। | 3. নালিকা বান্ডিলের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না। |
| 4. দ্বিবীজপত্রী—সূর্যমুখী কাণ্ড। | 4. একবীজপত্রী—ভুট্টা কাণ্ড। |

● **মজ্জা ও মজ্জাংশুর পার্থক্য (Difference between Pith and Medullary rays) :**

| মজ্জা | মজ্জাংশু |
|---|---|
| 1. কাণ্ড ও মূলের কেন্দ্রে থাকে। | 1. নালিকা বান্ডিলের মধ্যভাগে থাকে। |
| 2. সাধারণত প্যারেনকাইমা কলা নিয়ে গঠিত হয়। অনেক সময় স্ক্লেরেনকাইমা কলাও থাকে। | 2. প্যারেনকাইমা কলা নিয়ে গঠিত হয়। |
| 3. ক্যাম্বিয়াম গঠন করে না। | 3. ইন্টার ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম গঠন করতে পারে। |

## ❂ 2.4. স্টিলি (Stele) ❂

### ▲ স্টিলির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Stele)

❖ (a) **স্টিলির সংজ্ঞা (Definition of Stele) : উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের পরিচক্র আবৃত কেন্দ্রাংশকে স্টিলি বলে।** বিজ্ঞানী **ভান টিহেম** (Van tieghem) ও **ডলিওট** (Duliot) 1886 খ্রিস্টাব্দে প্রথম **স্টিলি** শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা স্টিলিকে পরিচক্র, মজ্জাংশু, মজ্জা ও সংবহন কলার সমন্বয়ে গঠিত একটি অঙ্গসংস্থানগত **একক** বলে বর্ণনা করেন। **অন্তস্ত্বক** স্টিলিকে উদ্ভিদ অক্ষের অবশিষ্ট বাইরের অংশ থেকে পৃথক করে রাখে। অন্তস্ত্বক দিয়ে আবৃত স্টিলির অভ্যন্তর অংশকে **অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চল** এবং অন্তস্ত্বকসহ স্টিলির বাইরের অংশকে **বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল** বলে।

(b) **স্টিলির প্রকারভেদ (Different types of Stele)**— মজ্জার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে **স্মিথ** (Smith), **এসাউ** (Esau), **ফান** (Fahn) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা স্টিলিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন— **প্রোটোস্টিলি** (Protostele) ও **সাইফনোস্টিলি** (Siphonostele)।
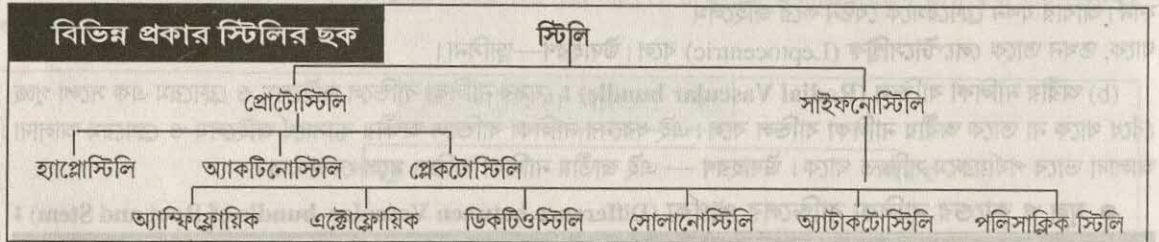
● 1. **প্রোটোস্টিলি (Protostele)— মজ্জাবিহীন জাইলেম ও ফ্লোয়েম নিয়ে গঠিত স্টিলি হল প্রোটোস্টিলি।** প্রোটোস্টিলির কেন্দ্রে জাইলেম থাকে এবং জাইলেমকে ফ্লোয়েম সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে রাখে। এই জাতীয় স্টিলি সব থেকে সরল এবং আদি প্রকৃতির। অনেকগুলি টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে এবং কয়েকটি জলজ গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এই ধরনের স্টিলি দেখা যায়। জাইলেমের গঠন অনুসারে প্রোটোস্টিলি চার প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **হ্যাপ্লোস্টিলি (Haplostele)**— এই প্রকার স্টিলিতে কেন্দ্রীয় মসৃণ ও গোলাকার জাইলেম স্তম্ভকে ফ্লোয়েম আবৃত করে রাখে। **উদাহরণ**—*Lycopodium cernuum* (*লাইকোপোডিয়াম সারনিউয়াম*)।

(ii) **অ্যাকটিনোস্টিলি (Actinostele)**—এইক্ষেত্রে ফ্লোয়েম দিয়ে আবৃত কেন্দ্রীয় জাইলেম স্তম্ভ তারাকৃতির (Stellale) হয়। **উদাহরণ**—*Lycopodium phlegmaria* (*লাইকোপোডিয়াম ফ্লেগমেরিয়া*)।
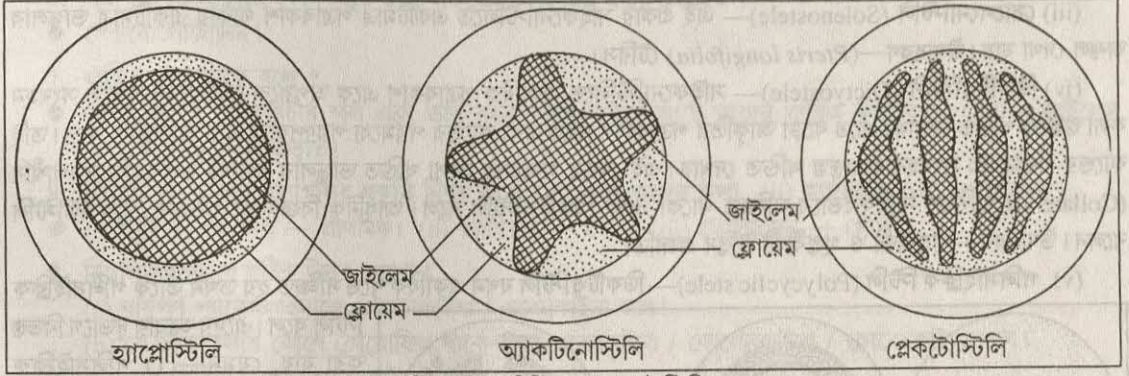
চিত্র 2.28 : বিভিন্ন প্রকার প্রোটোস্টিলি।

(iii) **প্লেকটোস্টিলি (Plectostele)**— এই স্টিলিতে ফ্লোয়েম দিয়ে আবৃত জাইলেম অংশটি কয়েকটি প্লেটে খণ্ডিত হয়ে পাশাপাশি সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি জাইলেম খণ্ডক ফ্লোয়েমে সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখে। **উদাহরণ**—*Lycopodium volubile* (*লাইকোপোডিয়াম ভলুবিলি*)।

● 2. **সাইফনোস্টিলি (Siphonostele) : কেন্দ্রস্থলে প্যারেনকাইমা কলা দিয়ে গঠিত বেলনাকার মজ্জাযুক্ত স্টিলিকে সাইফনোস্টিলি বলা হয়**। এই ধরনের স্টিলি উন্নত টেরিডোফাইটা প্রজাতি, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে দেখা যায়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার বিন্যাসের উপর নির্ভর করে সাইফন বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **এক্টোফ্লোয়িক সাইফনোস্টিলি** (Ectophloic siphonostele)—এই প্রকার স্টিলিতে জাইলেম স্তম্ভকের বাইরে ফ্লোয়েম স্তম্ভক বলয় আকারে পরিবৃত থাকে। তা ছাড়া জাইলেম স্তম্ভকের মধ্যভাগে মজ্জা থাকে। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী কাণ্ড (*Helianthes annuus*)।

(ii) **অ্যাম্ফিফ্লোয়িক সাইফনোস্টিলি** (Amphiphloic siphonostele)— এইক্ষেত্রে জাইলেম স্তম্ভকের উভয় দিকে অর্থাৎ বাইরে ও ভিতরে ফ্লোয়েম স্তম্ভক বলয়াকারে আবৃত থাকে। **উদাহরণ** — *Marsilea minuta* (*মার্সেলিয়া*)।
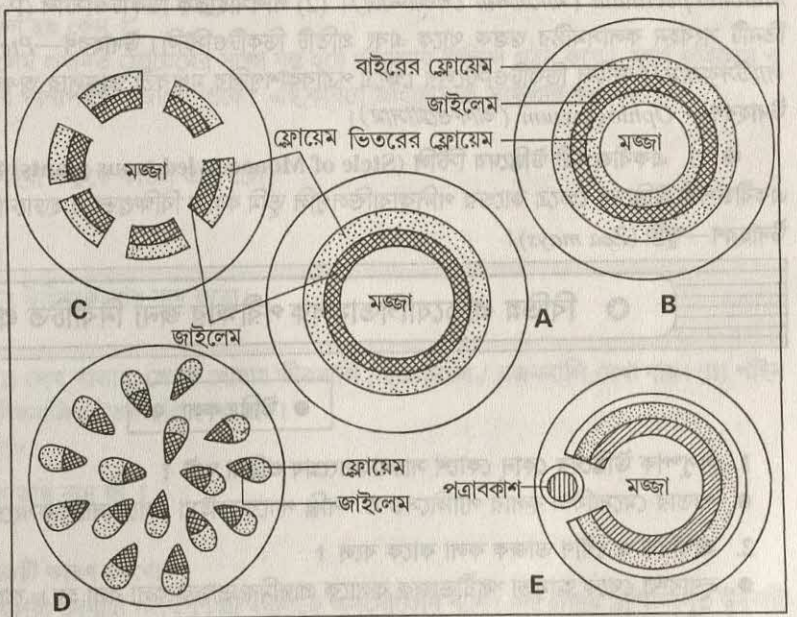
চিত্র 2.29 : বিভিন্নপ্রকার সাইফনোস্টিলি—A. এক্টোফ্লোয়িক সাইফনোস্টিলি, B. অ্যাম্ফিফ্লোয়িক সাইফনোস্টিলি,

সরলতম সাইফনোস্টিলিতে কোনো পত্রাবকাশ (Leaf gap) থাকে না। **উদাহরণ**—*Lycopodium* (*লাইকোপোডিয়াম*)। আবার অনেকগুলি উদ্ভিদের সাইফনোস্টিলিতে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত পত্রাবকাশ পরস্পরকে অতিক্রমণ (Overlapping) করে না। পত্রাবকাশগুলি একটি অপরটির

থেকে দূরে অবস্থান করার জন্য সংবহন কলাস্তম্ভ অবিচ্ছিন্ন একটি বলয়ে সজ্জিত থাকে। আবার সাইফনোস্টিলি অন্যান্য উন্নতমানের উদ্ভিদে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত পত্রাবকাশ পরস্পরকে অতিক্রম করে এবং সংবহন কলাস্তম্ভ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত হয়।

(iii) **সোলেনোস্টিলি** (Solenostele)— এই প্রকার সাইফনোস্টিলিতে একটিমাত্র পত্রাবকাশ থাকায় একটিমাত্র ভাস্কুলার অঞ্চল দেখা যায়। **উদাহরণ**—(*Pteris longifolia*) টেরিস।

(iv) **ডিকটিওস্টিলি** (Dictyostele)— সাইফনোস্টিলিতে একাধিক পত্রাবকাশ একে অপরকে অতিক্রমণ করলে সংবহন কলা স্তম্ভকে খণ্ডিত দেখায়। এতে বড়ো আকৃতির পত্রাবকাশ থাকে এবং কান্ডের পর্বমধ্যে পরস্পরকে এরা অতিক্রমণ করে। তাই কান্ডের পর্বমধ্যের সংবহন কলাস্তম্ভ খণ্ডিত দেখায়। এই ক্ষেত্রে মজ্জাসহ ফাঁপা খণ্ডিত ভাস্কুলার বলয়টি কতকগুলি সমপার্শ্বীয় (Collateral) বান্ডিলে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। একে **ডিকটিওস্টিলি** বলে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেকে একে **ইউস্টিলি** বলেন। উদাহরণ—ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ প্রজাতি।

(v) **পলিসাইক্লিক স্টিলি** (Polycyclic stele)— **ডিকটিওস্টিলি যখন একাধিক বৃত্তে সজ্জিত হয় তখন তাকে পলিসাইক্লিক স্টিলি বলে**। এদের আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—(1) **পলিসাইক্লিক সোলেনোস্টিলি** (Polycyclic solenostele)— এইক্ষেত্রে দুটি **এককেন্দ্রিক** (Concentric) সংবহন কলাস্তম্ভ থাকে। স্তম্ভগুলির মধ্যে বহিঃস্তম্ভটি ডিকটিওস্টিলি এবং অন্তঃস্তম্ভটি সাইফনোস্টিলি। **উদাহরণ**—*Matonia pectinata (ম্যাটোনিয়া পেক্‌টিনাটা)*। (2) **পলিসাইক্লিক ডিক্‌টিওস্টিলি** (Polycyclic dictyostele)— এইক্ষেত্রে তিনটি সংবহন কলাসমষ্টির স্তম্ভক থাকে এবং প্রতিটি ডিক্‌টিওস্টিলি। **উদাহরণ**—*Pteridium latiusculum (টেরিডিয়াম ল্যাটিসকুলাম)*। জটিল ডিকটিওস্টিলের ক্ষেত্রে পত্রাবকাশগুলির মধ্যবর্তী ভাস্কুলার অঞ্চলকে **মেরিস্টিলি** (Meristele) বলে। **উদাহরণ**— *Ophioglossum (অফিওগ্লোসাম)*।

**চিত্র 2.30** ঃ বিভিন্ন প্রকার স্টিলি—A-পলিস্টিলি, B-পলিসাইক্লিক সোলানোস্টিলি এবং C-পলিসাইক্লিক ডিকটিওস্টিলি।

3. **একবীজপত্রী উদ্ভিদের স্টিলি (Stele of Monocotyledonous plants)** ঃ **অ্যাটাক্‌টোস্টিলি** (Atactostele)— একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কান্ডের পলিকাবান্ডিলগুলি ভূমি কলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। একে **অ্যাটাক্‌টোস্টিলি** বলে। **উদাহরণ**—ভুট্টা (*Zea mays*)।

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর

### • উদ্ভিদ কলা •

**1. সপুষ্পক উদ্ভিদের কোন্ কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে ?**

- পাতার মেসোফিল কলার প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে।

**2. প্রাথমিক ও গৌণ ভাজক কলা কাকে বলে ?**

- ভ্রূণাবস্থা থেকে আমৃত্যু স্থায়ীভাজক কলাকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলা হয়। স্থায়ী কলা থেকে গঠিত ভাজক কলাকে গৌণ ভাজক কলা বলে।

**3. ক্লোরেনকাইমা কাকে বলে ?**

- ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশসমষ্টিকে ক্লোরেনকাইমা বলে।

**4. এরেনকাইমা কী ?**

- বাতাসপূর্ণ ও কোশান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমাকে এরেনকাইমা বলা হয়।

**5. প্রস্তর কোশ বা স্টোন সেল কী ?**

● কোশপ্রাচীরযুক্ত ডিম্বাকৃতি ও শক্ত স্ক্লেরাইড কোশকে প্রস্তর কোশ বলে।

**6. পরাগরেণুর প্রাকারে কোন্ বস্তুর উপস্থিতিতে তা সহজেই প্রস্তরীভূত হয় ?**

● স্পোরোপোলেনিন।

**7. যান্ত্রিক কলা কাকে বলে ?**

● যেসব কলার কোশপ্রাচীর স্থূল এবং ভার বহন করার ক্ষমতা আছে তাদের যান্ত্রিক কলা বলে, যেমন—জাইলেম, ফ্লোয়েম, স্ক্লেরাইড প্রভৃতি।

**8. নিম্নলিখিত ভাজক কলাগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করো : (i) আদি ভাজক কলা, (ii) ক্যাম্বিয়াম, (iii) ফেলোজেন।**

● (i) আদি ভাজক কলা — প্রাথমিক। (ii) ক্যাম্বিয়াম — গৌণ, (iii) ফেলোজেন — গৌণ।

**9. নিম্নলিখিতগুলির সঠিক উত্তর লেখো :**

(a) বায়ুপূর্ণ প্যারেনকাইমাকে ক্লোরেনকাইমা / এরেনকাইমা বলে।

(b) যে উদ্ভিদকলার কোশে ক্লোরোফিল থাকে তাকে এরেনকাইমা / কোলেনকাইমা / ক্লোরেনকাইমা বলে।

● (a) এরেনকাইমা। (b) ক্লোরেনকাইমা।

**10. স্ক্লেরাইড কী ?**

● যেসব কলা স্থূল, গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা তারার মতো কোশের সমন্বয়ে গঠিত এবং কোশপ্রাচীর স্থূল ও কোশগহ্বর খুব ছোটো হয় তাদের স্ক্লেরাইড বলে।

**11. স্ক্লেরাইড কয় প্রকারের হয় ? উদাহরণ দাও।**

● স্ক্লেরাইড চার রকমের হয়, যেমন — 1. **ব্রাকিস্ক্লেরাইড** — আপেল ও পেয়ারা, 2. **ম্যাক্রোস্ক্লেরাইড** — ছোলা ও মটরের বীজত্বক, 3. **ওস্টিওস্ক্লেরাইড** — মটর পাতা এবং 4. **ট্রাইকোস্ক্লেরাইড** — শালুক পাতার বৃন্ত।

**12. জাইলেমকে ভাস্কুলার কলা বলা হয় কেন ?**

● দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে জাইলেম প্রধানত ফ্লোয়েমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাস্কুলার বান্ডিল গঠন করে। মূলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদা আলাদা ভাবে পাশাপাশি সাজানো থাকে। এই কারণে জাইলেমকে **ভাস্কুলার কলা** বলে।

**13. কাষ্ঠল তন্তু কী ?**

● জাইলেম বাহিকার স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে **কাষ্ঠল তন্তু** বলে।

**14. পাট কোন্ ধরনের তন্তু ?**

● গৌণ ফ্লোয়েম বা বাস্ট তন্তু।

**15. নিউক্লিয়াসবিহীন একটি সজীব উদ্ভিদকোশের নাম করো।**

● সীভনল।

**16. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো। (i) লেবু পাতায়, লেবুর খোসায় ক্ষীরনালি / তৈলনালি / রজননালি দেখা যায়। (ii) পাইন গাছের কাণ্ডে রজননালি / ক্ষীরনালি / তৈলনালি দেখা যায়।**

● (i) তৈলনালি। (ii) রজন নালি।

**17. যে কলায় রবার সঞ্চিত থাকে তার নাম কী ?**

● ক্ষীরনালি।

**18. ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ হওয়ার একটি কারণ লেখো।**

● উদ্ভিদের ফুলে সুমিষ্ট গন্ধ সৃষ্টিকারী উদ্‌বায়ী পদার্থপূর্ণ গ্রন্থিগুলিকে **অসমোফোর** বলে। এই প্রকার গ্রন্থিনিঃসৃত উদ্‌বায়ী তেল জাতীয় পদার্থের নিঃসরণের জন্য ফুল থেকে সুমিষ্ট গন্ধ নির্গত হয়।

## ● কলাতন্ত্র ●

**19. ত্বক ভাজক কলার কোন্ অংশ থেকে উৎপন্ন হয়?**

● প্রোটোডার্ম।

**20. বহুযোজী বহিস্ত্বক থাকে এমন একটি উদাহরণ দাও।**

● অর্কিড মূল।

**21. পিলিফেরাস স্তর কাকে বলে?**

● মূলের পাতলা কোশস্তরকে পিলিফেরাস স্তর বলে।

**22. সিলিকা কোশ কাকে বলে?**

● ঘাসের পাতার উর্ধ্বত্বকে লম্বাটে সিলিকাযুক্ত কোশকে সিলিকা কোশ বলে।

**23. বুলিফর্ম কোশ কী?**

● ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের উর্ধ্ব পত্রত্বকে কতকগুলি বড়ো ও স্ফীত কোশকে বুলিফর্ম কোশ বলে। কোশগুলির কোশগহ্বর বড়ো এবং জলধারণ ক্ষমতা প্রচুর।

**24. মাইরোসিন কোশ বলতে কী বোঝো?**

● সরষে জাতীয় উদ্ভিদের ত্বকে কতকগুলি থলের মতো ক্ষরণকোশ দেখা যায়। এই কোশগুলিতে মাইরোসিন উৎসেচক থাকে বলে মাইরোসিন কোশ বলে।

**25. কোন্ রন্ধ্রের মাধ্যমে নিস্রাবণ ঘটে?**

● জলরন্ধ্র বা হাইডাথোর্ড।

**26. বায়ুগহ্বর কাকে বলা হয়?**

● পত্ররন্ধ্রের নীচে যে গহ্বরের মতো ফাঁকা অংশ থাকে তাকে বায়ুগহ্বর বা শ্বাসগহ্বর বলে।

**27. জলথলি বা জলধারণ কোশ কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায়?**

● *Mesembryanthemum crystallinum* (বরফ উদ্ভিদ)।

**28. বড়ো ব্যাসযুক্ত জাইলেম বাহিকাকে কী বলা হয়?**

● মেটাজাইলেম।

**29. সরু ব্যাসযুক্ত জাইলেম বাহিকাকে কী বলে?**

● প্রোটোজাইলেম।

**30. প্রোটোজাইলেম মজ্জাভিমুখী হলে তাকে কী বলে?**

● এন্ডার্ক।

**31. প্রোটোজাইলেম বহিস্ত্বকাভিমুখী হলে তাকে কী বলা হয়?**

● এক্সার্ক।

**32. ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়ার কী?**

● নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যবর্তী ক্যাম্বিয়াম কোশস্তরকে ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম বলে।

**33. ইন্টার ফ্যাসিকুর ক্যাম্বিয়াম কাকে বলে?**

● পরপর সাজানো নালিকা বান্ডিলগুলির মধ্যবর্তী ক্যাম্বিয়ামকে ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম বলে।

**34. নালিকা বান্ডিল কাকে বলে?**

● জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলাকে একসঙ্গে নালিকা বান্ডিল বলে।

**35. ক্যাম্বিয়ামবিহীন নালিকা বান্ডিলকে কী বলে?**

● বন্ধ বান্ডিল।

**36. ক্যাম্বিয়ামযুক্ত নালিকা বান্ডিলকে কী বলা হয়?**

● মুক্ত বান্ডিল।

**37. এপিথেম কী?**

● জলরন্ধ্রের ছিদ্রপথে কোশান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা কলাকে এপিথেম বলা হয়।

**38. ভাসকুলার কলাতন্ত্র কাকে বলে?**

- যে কলাতন্ত্র সংবহনের সঙ্গে যুক্ত তাকে ভাসকুলার কলা-তন্ত্র বলে।

**39. অরীয় নালিকা বান্ডিল কী?**

- যেখানে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদাভাবে পরপর একটি আবর্তে পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে তাকে অরীয় নালিকা বান্ডিল বলা হয়। উদাহরণ—মূল

**40. এপিডার্মিস ও এন্ডোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য কী কী?**

- এপিডার্মিস একেবারে বাইরের স্তর এবং এন্ডোডার্মিস স্টিলিকে ঘিরে থাকা স্তর। এপিডার্মিস কোশ স্তরের বাইরে কৃত্তিকাবরণী থাকে। এন্ডোডার্মিসের কোশপ্রাচীরে অনেক সময় ক্যাস্পারিয়ান পট্টি থাকে।

**41. ক্যাম্বিয়াম কী?**

- বিভাজনক্ষম এক বা একাধিক কোশস্তর বিশিষ্ট সজীব কোশের সমন্বয়ে গঠিত একপ্রকার পার্শ্বীয় ভাজক কলাকে ক্যাম্বিয়াম বলে।

**42. বিভিন্ন সমকেন্দ্রীয় নালিকা বান্ডিলের নাম করো।**

- লেপ্টোসেন্ট্রিক ও হ্যাড্রোসেন্ট্রিক।

**43. এক্সোডার্মিস কাকে বলে?**

- পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ রাস্নার (*Vanda roxburghii*) মূলের বহিস্ত্বক ও ভেলামেনের মধ্যবর্তী সুবেরিন কোশপ্রাচীরযুক্ত কোশস্তর হল এক্সোডার্মিস।

**44. ভেলামেন কী?**

- রাস্নার মূলের বাইরের চারপাশে মৃতকোশস্তরকে ভেলামেন বলা হয়। এর কাজ হল বাতাস থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করা।

**45. কোন্ ধরনের উদ্ভিদের পাতায় কোশরন্ধ্র থাকে না?**

- জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদে।

**46. পাতার অধস্ত্বকে যেসব পত্ররন্ধ্র থাকে তার নাম কী?**

- নিবেশিত পত্ররন্ধ্র।

**47. জলরন্ধ্র কাকে বলে?**

- বিশেষ কতকগুলি পাতায় কতকগুলি রক্ষীকোশ বিহীন ছিদ্র থাকে। এতে রক্ষীকোশ থাকে না এবং সব সময় উন্মুক্ত থাকে। শীতকালে এই ছিদ্রপথে জল নির্গত হয়। একে জলরন্ধ্র বলে। উদাহরণ— ট্রপিওলাম।

**48. ট্রাইকোম কাকে বলে?**

- ত্বকীয় উপবৃদ্ধিকে একসঙ্গে ট্রাইকোম বলা হয়।

**49. ক্যাস্‌পেরিয়ান ফিতা বা পট্টি কাকে বলে?**

- মূলের অন্তস্ত্বকের কোশগুলি চক্রের মতো কেন্দ্রস্তম্ভকে আবৃত করে রাখে। প্রত্যেকটি কোশ প্রাকারের চারদিকে সুবারিন ও লিগনিন জমে একটি আস্তরণ গঠন করে। এই সুবারিন ও লিগনিন বেষ্টিত বা ফিতের মতো পট্টিকে ক্যাস্‌পেরিয়ান ফিতা বা পট্টি বলা হয়। বিজ্ঞানী **ক্যাসপেরির** (1865) নামানুসারে এই নাম দেওয়া হয়েছে। মূলরোম দিয়ে শোষিত জল বহিঃস্তর থেকে অন্তস্ত্বকের ভেতর দিয়ে কেন্দ্রস্তম্ভে ঢোকার সময় জলের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা এর প্রধান কাজ।

**50. পারণ কোশ কী?**

- মূলের অন্তস্ত্বকের কোশগুলির প্রাচীর স্থূল, কিউটিন ও সুবারিনের আস্তরণে গঠিত ক্যাসপেরিয়ান পট্টিও থাকে। কিন্তু দেখা যায় প্রোটোজাইলেম কলার বিপরীত দিকের কোশগুলির ভেতরের তলের প্রাকার স্থূল হয় না। এই কোশগুলিকে **পারণ কোশ** বলে। মূলরোম থেকে শোষিত জল বহিঃস্তর থেকে পারণ কোশ দিয়ে কেন্দ্র স্তম্ভের জাইলেম নালিকায় প্রবেশ করে।

**51. শ্বেতসার আবরণী বা স্টার্চ সীদ কাকে বলে?**

- দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের অন্তস্ত্বকের কোশগুলিতে ক্যাসপেরিয়ান পট্টি থাকে না। এই কোশগুলিতে শ্বেতসার দানা জমা থাকে বলে অন্তস্ত্বক না বলে এদের শ্বেতসার আবরণী বলা হয়।

**52. কোন্ ধরনের পাতায়, কেবল নিম্ন বহিস্ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে?**

- দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ পাতার নিম্ন বহিস্ত্বকে।

**53. পাটের তন্তুগুলি কী ধরনের তন্তু?**

- গৌণ ফ্লোয়েম বা বাস্ট তন্তু।

**54. জাইলেম কী কী কলা নিয়ে গঠিত?**

- ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু।

**55. জাইলেমের মৃত কলাগুলির নাম কী?**

- ট্রাকিড, ট্রাকিয়া ও জাইলেম তন্তু।

**56. জাইলেমের জীবিত কোশের নাম কী?**

- জাইলেম প্যারেনকাইমা।

**57. ফ্লোয়েমের কলাগুলির নাম লেখো।**

- সীভনল, সঙ্গীকোশ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা, ফ্লোয়েম তন্তু।

**58. ফ্লোয়েমের জীবিত কোশগুলির নাম কী কী?**

- ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও সঙ্গীকোশ।

**59. ফ্লোয়েমের মৃত কোশগুলির নাম কী কী?**

- সীভনল ও সীভকোশ।

**60. উদ্ভিদের একটি নিউক্লিয়াসবিহীন কোশের নাম লেখো।**

- সীভনল।

**61. সমপার্শ্বীয় নালিকা বান্ডিল কাকে বলে?**

- যে নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে সমপার্শ্বীয় নালিকা বান্ডিল বলে।

**62. মূলরোমের কাজ কী?**

- জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ শোষণ করা।

**63. মেসোফিল কলা কাকে বলে?**

- পাতার উর্ধ্ব ও নিম্ন ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ক্লোরোফিলযুক্ত প্যারেনকাইমা কলাকে মেসোফিল বলে।

**64. মজ্জারশ্মি কী?**

- দুটি নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী স্থানের প্যারেনকাইমা কোশস্তরকে মজ্জারশ্মি বলে।

**65. উদ্ভিদের তিনটি উপবৃদ্ধির নাম করো।**

- (i) এককোশী ও বহুকোশী রোম (ii) জলধারণ কোশ ও (iii) শল্ক।

**66. বান্ডিল টুপি কাকে বলে?**

- অনেকগুলি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের নালিকা বান্ডিলের উপরে 3-4 স্তর স্ক্লেরেনকাইমা কোশ টুপির মতো সাজানো থাকে। একে বান্ডিল টুপি বলে।

**67. মূলকোশ এককোশী না বহুকোশী?**

- মূলরোম বহুকোশী।

**68. ছোলার মূল এবং কচুর মূলের নালিকা বান্ডিলের পার্থক্য কী কী?**

ছোলা ও কচু মূলের নালিকা বান্ডিল অরীয়ভাবে বিন্যস্ত হয়। ছোলা মূলে 4টি নালিকা বান্ডিল ও কচুমূলে 6টির বেশি নালিকা বান্ডিল থাকে।

**69. সংযুক্ত নালিকা বান্ডিল ও অরীয় নালিকা বান্ডিলের পার্থক্য কী?**

- সংযুক্ত নালিকা বান্ডিলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম পরস্পর পাশাপাশি সাজানো থাকে। বাইরের দিকে ফ্লোয়েম ও ভেতরের দিকে জাইলেম থাকে।

অরীয় নালিকা বান্ডিলের জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদাভাবে অক্ষীয় ব্যাসার্ধে পর্যায়ক্রমে থাকে।

**70. প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কাকে বলে?**

- পাতার আদিকলাতন্ত্রে মেসোফিল কলা থাকে। মেসোফিল কলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা। বিষমপৃষ্ঠ পাতার ঊর্ধ্ববহিস্ত্বকের নীচে লম্বা লম্বা কোশগুলিকে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা বলে। প্যালিসেড প্যারেনকাইমার নীচে গোলাকার বা ডিম্বাকার প্যারেনকাইমা কোশগুলিকে স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা বলে। উভয় কলায় প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল থাকে। সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার মেসোফিল কলা শুধু স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কোশ নিয়ে গঠিত।

**71. সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা কাকে বলে?**

- সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতাগুলি উদ্ভিদ অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে এবং ফলকের উভয় পৃষ্ঠ সমান ভাবে সূর্যালোক পায়। তাই উভয়পৃষ্ঠ সমান সবুজ দেখায়। উদাহরণ—ভুট্টা পাতা।

**72. বিষমপৃষ্ঠ পাতা কাকে বলে?**

- যে উদ্ভিদের পাতা কাণ্ড বা শাখা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমির সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে থাকে এবং সূর্যালোক খাড়াভাবে উপরের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ পাতার উপরের পৃষ্ঠ নীচের তুলনায় বেশি আলো পায়। এর ফলে উপরের পৃষ্ঠ নীচের তুলনায় বেশি সবুজ দেখায়। দুদিকের পৃষ্ঠের এমন বৈষম্য হয় বলে এ ধরনের পাতাকে বিষমপৃষ্ঠ পাতা বলে।

**73. কোন্ উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠনে প্রোটোজাইলেম গহ্বর দেখা যায়?**

- ভুট্টা গাছের কাণ্ডে।

**74. বিষমপৃষ্ঠ পাতার কোন্ ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে?**

- নিম্নত্বকে।

**75. সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার কোথায় পত্ররন্ধ্র দেখা যায়?**

- পাতার নিম্ন ও ঊর্ধ্ব উভয় ত্বককোশে।

**76. মটর মূলে কি কোনো মজ্জা থাকে?**

- মজ্জা থাকে না, পরিবর্তে সেখানে মেটাজাইলেম থাকে।

**77. অন্তস্ত্বকের ভিতরের কোশস্তরকে কী বলে?**

- পরিচক্র।

**78. উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি কোন্ কোশ বিভাজনের ফলে ঘটে?**

- ক্যাম্বিয়াম কোশ বিভাজনের ফলে ঘটে।

**79. অ্যাম্ফিফ্লোয়িক সাইফোনস্টিলি কী ?**

- যে মজ্জাযুক্ত স্টিলির জাইলেমের বাইরে ও ভিতরে ফ্লোয়েম থাকে তাকে অ্যাম্ফিফ্লোয়িক সাইফোনস্টিলি বলে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer of the following questions in one word) :**

1. উৎপত্তিগতভাবে এক এবং কার্যগতভাবে অভিন্ন সম ও বিষম আকৃতির কোশসমষ্টিকে কী বলে ?
2. যে কলার কোশগুলি বিভাজনক্ষম তাকে কী কলা বলা হয় ?
3. ভাজক কলা কোথায় থাকে ?
4. আদি ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন কোশ সমষ্টিকে কী বলে ?
5. স্থায়ী কলা থেকে উৎপন্ন ভাজক কলাকে কী বলা হয় ?
6. স্থায়ী কলায় শুধুমাত্র একপ্রকার কোশ থাকলে তাকে কী বলা হবে ?
7. স্থায়ী কলা বিভিন্ন রকম কোশ নিয়ে গঠিত হলে তাকে কী কলা বলে ?
8. যে প্যারেনকাইমা কোশে ক্লোরোফিল থাকে তাকে কী বলা হয় ?
9. যেসব প্যারেনকাইমা কলার কোশান্তর রন্ধ্রে বাতাস পূর্ণ থাকে তাকে কী বলে ?
10. মূলরোম দিয়ে জল শোষিত হবার পর যে কলার মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে জল সংবাহিত হয় তাকে কী বলা হয় ?
11. পাতা খাদ্য তৈরি হবার পর কোন্ কলার সাহায্যে উদ্ভিদদেহে খাদ্য পরিবাহিত হয় ?
12. ফ্লোয়েমের কোন্ কোশ মৃত ?
13. ত্বক কলাতন্ত্রের কাজ কী ?
14. বহুযোজী বহিস্ত্বক কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায় ?
15. মূলের ত্বককে কী বলে ?
16. করবী পত্রে কী ধরনের পত্ররন্ধ্র দেখা যায় ?
17. নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম থাকলে তাকে কী বলে ?
18. নালিকা বান্ডিলে ক্যাম্বিয়াম না থাকলে তাকে কী বলা হয় ?
19. অন্তস্ত্বক দিয়ে ঘেরা কেন্দ্রীয় কলাতন্ত্রকে কী বলে ?
20. অন্তস্ত্বকের কোশপ্রাচীরের পট্টিকে কী বলা হয় ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) :**

1. মূলের ত্বককোশকে বলে—এপিডার্মিস ☐ / এপিব্লেমা ☐ / এন্ডোডারমিস ☐ / এক্সোডারমিস ☐।
2. অশ্বত্থ পাতার স্ফীত ত্বক কোশে আঙুরের গুচ্ছের মতো ক্যালসিয়াম কার্বনেট কেলাসকে বলে—ক্লোরাইড ☐ / লিথোসিস্ট ☐ / সিস্টোলিথ ☐ / র‍্যাফাইড ☐।
3. কোনো কলাস্তর না থাকলে নালিকা বান্ডিলের গৌণবৃদ্ধি ঘটে না। জাইলেম ☐ / ফ্লোয়েম ☐ / ক্যাম্বিয়াম ☐ / সীভকোশ ☐।
4. মূলের নালিকা বান্ডিলের সজ্জাক্রমকে বলে— সমপার্শ্বীয় ☐ / সমদ্বিপার্শ্বীয় ☐ / কেন্দ্রীয় ☐ / অরীয় ☐।
5. কেন্দ্রস্থ ফ্লোয়েমকে জাইলেম পরিবেষ্টন করে অবস্থান করলে নালিকা বান্ডিলকে বলে—কনসেন্ট্রিক ☐ / লেপটোসেন্ট্রিক ☐ / হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ☐ / এক্সেন্ট্রিক ☐।
6. নিম্নলিখিতের মধ্যে কোন্‌টিকে শ্বেতসার স্তর বলে—এপিডার্মিস ☐ / হাইপোডারমিস ☐ / এক্সোডারমিস ☐ / এন্ডোডারমিস ☐।
7. ক্যাস্পারিয়ান পট্টি কোথায় থাকে—বহিঃস্ত্বক ☐ / বহিঃস্তর ☐ / অন্তস্ত্বক ☐ / অধস্ত্বক ☐।
8. পারণকোশ কোথায় থাকে—বহিস্ত্বক ☐ / ক্যাম্বিয়াম ☐ / অন্তস্ত্বক ☐ / অধস্ত্বক ☐।
9. মজ্জা কোথায় পাওয়া যায়—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে ☐ / একবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে ☐ / দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ পত্রে ☐ / একবীজপত্রী উদ্ভিদ পত্রে ☐।
10. ভেলামেন কোন্ উদ্ভিদ মূলে থাকে—ছোলা ☐ / মটর ☐ / কচু ☐ / রাস্না ☐।
11. মূল বা কাণ্ডের অগ্রে যে ভাজক কলা থাকে তাকে বলে—প্রাথমিক ভাজক কলা ☐ / আদি ভাজক কলা ☐ / গৌণ ভাজক কলা ☐ / নিবেশিত ভাজক কলা ☐।
12. কাণ্ডের পরিধির বৃদ্ধির জন্য দায়ী—অগ্রস্থ ভাজক কলা ☐ / মূল ভাজক কলা ☐ / নিবেশিত ভাজক কলা ☐ / পার্শ্বস্থ ভাজক কলা ☐।
13. যে কলায় কোশপ্রাচীর পাতলা হয় তাকে বলে—কোলেনকাইমা ☐ / স্ক্লেরেনকাইমা ☐ / প্যারেনকাইমা ☐ / স্ক্লেরাইড ☐।
14. প্রান্ত প্রাচীরে ছিদ্র থাকে এমন কোশের নাম—স্ক্লেরাইড ☐ / ট্রাকাইড ☐ / ট্রাকিয়া ☐ / স্ক্লেরেনকাইমা ☐।
15. যে উদ্ভিদকোশে সাইটোপ্লাজম থাকে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না তা হল—ট্র্যাকিড ☐ / ট্রাকিয়া ☐ / স্ক্লেরাইড ☐ / সীভনল ☐।
16. সঙ্গীকোশ কোন্ কোশের সঙ্গে থাকে—স্ক্লেরেনকাইমা ☐ / ট্র্যাকিড ☐ / ট্রাকিয়া ☐ / সীভনল ☐।

### C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. অনেকগুলি কলা একসঙ্গে থেকে একই ধরনের কাজ করলে তাকে ——— বলে।
2. একটির বেশি কোশস্তর যুক্ত বহিস্ত্বককে ——— বহিস্ত্বক বলা হয়।
3. কিউটিনের আস্তরণকে ——— বলে।
4. ——— মূলের মূলরোমযুক্ত বহিস্ত্বক।
5. পত্ররন্ধ্রছিদ্রকে ঘিরে দু'পাশে অবস্থিত বৃক্কাকৃতি কোশদ্বয়কে ——— বলে।
6. পত্ররন্ধ্রের নীচে থাকা বাতাবকাশকে ——— বলা হয়।
7. সরু ব্যাসযুক্ত এবং প্রথমে তৈরি জাইলেমকে ——— বলে।
8. ——— নালিকা বান্ডিলের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাম্বিয়াম থাকে না।
9. ——— বান্ডিলে ফ্লোয়েমকে ঘিরে জাইলেম থাকে।
10. আকৃতিতে বড়ো ও কোশান্তর রন্ধ্র বায়ুগহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমাকে ——— বলে।
11. সমভাবে স্থূল কোশপ্রাচীরযুক্ত প্রধানত মৃত সরল কলাকে ——— বলা হয়।
12. ——— কোশস্তর স্থূল কোশ প্রাচীর এবং কোশ পাথরের মতো শক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কলা নিয়ে গঠিত।
13. জাইলেম কলার যে কোশগুলি প্রান্ত প্রাচীরবিহীন, নলাকার এবং মৃত তাদের বলে ———।
14. ফ্লোয়েম কলার নিউক্লিয়াসবিহীন নলাকার সজীব কোশগুলিকে ——— বলা হয়।
15. স্টিলিতে নালিকা বান্ডিল ও অন্তস্ত্বকের মধ্যবর্তী কোশস্তরকে ——— বলে।

### D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. উদ্ভিদদেহের গঠনগত একক হল ———। (a) কোশ (b) কলা (c) ভ্রূণাণু (d) সস্য।
2. যে কলার অপরিণত কোশগুলি বিভাজিত হয়ে নতুন অপত্য কোশ গঠন করে তাদের বলে ———। (a) স্থায়ী কলা (b) জটিল কলা (c) ভাজক কলা (d) প্যারেনকাইমা।
3. যেসব প্যারেনকাইমা কলার কোশগুলিতে বর্জ্যপদার্থ সঞ্চিত হয় তাদের ——— বলা হয়। (a) সরল কূপ (b) ইডিওব্লাস্ট (c) স্ক্লেরাইড (d) বাস্টতন্তু।
4. ব্রাকিস্ক্লেরাইডের উদাহরণ হল ———। (a) পেয়ারা ও নাসপাতি (b) ছোলা ও মটরের বীজত্বক (c) চা ও শালুকের পাতা (d) শালুকের বৃন্ত।
5. পাট হল ——— তন্তু। (a) জাইলেম তন্তু (b) বাস্টতন্তু (c) অক্ষীয় তন্তু (d) তন্তু ট্রাকিড।
6. ক্যালাস একপ্রকার ———। (a) ফ্যাট (b) শর্করা (c) অ্যাসিড (d) কার্বোহাইড্রেট।
7. কাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি করে ——— কলা। (a) অগ্রস্থ ভাজক (b) নিবেশিত ভাজক (c) পার্শ্বস্থ ভাজক।
8. অন্তস্ত্বকের ভেতরের কলাস্তরকে ——— বলে। (a) স্টিলি (b) মেসোফিল (c) আদিকলা (d) পরিচক্র।
9. পাতার ——— কলা সালোকসংশ্লেষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। (a) বাস্কুলার (b) মেসোফিল (c) ত্বক।
10. যেখানে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদাভাবে পরপর একান্তরভাবে একটি আবর্তে সাজানো থাকে তাকে ——— বলে। (a) বদ্ধ সমপার্শ্বীয় নালিকা বান্ডিল (b) মুক্ত সমপার্শ্বীয় নালিকা বান্ডিল (c) অরীয় নালিকা বান্ডিল (d) এক্সার্ক।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. কলা কাকে বলে ?
2. ভাজক কলা কী ?
3. মূল ভাজক কলা কী ?
4. প্রাথমিক ভাজক কলা কাকে বলে ?
5. গৌণ ভাজক কলা কী ?
6. অগ্রস্থ ভাজক কলা কী ?
7. নিবেশিত ভাজক কলা কাদের বলে ?
8. পার্শ্বস্থ ভাজক কলা কী ?
9. প্রোটোডার্ম কী ?
10. প্রোক্যাম্বিয়াম কী ?
11. গ্রাউন্ড মেরিস্টেম কী ?
12. স্থায়ী কলা কী ?
13. স্ক্লেরেনকাইমা কী জাতীয় কলা ?
14. এরেনকাইমা কী ?
15. কোলেনকাইমা কয় প্রকার ?
16. স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু কী ?
17. প্রস্তর কোশ কাদের বলে ?
18. নালিকা বান্ডিল কী ?
19. প্রোটোজাইলেম কী ?
20. মেটাজাইলেম কাকে বলে ?
21. জাইলেম প্যারেনকাইমার বৈশিষ্ট্য কী ?
22. লিব্রিফরম তন্তু কী ?
23. ট্রাকিড তন্তু কারা ?
24. ক্যালাস প্যাড কী ?
25. অ্যালবিউমিন কোশ কী ?
26. বহুযোজী বহিস্ত্বক কাকে বলে ?
27. পিলিফেরাস স্তর কাকে বলে ?
28. বুলিফর্ম কোশ কী ?

29. লিথোসিস্ট কী ?
30. পত্ররন্ধ্র কী ?
31. জলরন্ধ্র কাকে বলে ?
32. ট্রাইকোম কী ?
33. প্রোটোজাইলেম কাকে বলে ?
34. মেটাজাইলেম কী ?
35. কেন্দ্রীয় নালিকা বান্ডিল কী ?
36. মেসোফিল কী ?
37. এক্সোডারমিস কাকে বলে ?
38. অন্তস্ত্বক কী ?
39. ক্যাস্পারিয়ান পট্টি কাকে বলে ?
40. মজ্জারশ্মি কী ?
41. রোমবহিঃস্তর কী ?
42. ভেলামেন কী ?
43. বান্ডিল টুপি কী ?
44. বান্ডিল আবরণী কী ?
45. প্রোটোজাইলেম গহ্বর কী ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :

1. ভাজক কলা সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
2. উৎপত্তি অনুযায়ী ভাজক কলার বর্ণনা করো।
3. অবস্থান অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণিবিভাগ করো।
4. কার্য অনুযায়ী ভাজক কলা কয় প্রকার ? তদের সম্বন্ধে আলোচনা করো।
5. কোশ বিভাজন তল অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণিবিভাগ করো।
6. স্থায়ী কলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
7. প্যারেনকাইমা কলার গঠন বর্ণনা করো।
8. কোলেনকাইমা কলার গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
9. স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
10. স্ক্লেরাইড কোশের গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
11. ট্রাকিডের গঠন, অবস্থিতি ও কার্য বর্ণনা করো।
12. ট্রাকিয়ার গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
13. সীভকোশের গঠন, অবস্থিতি ও কার্য আলোচনা করো।
14. সীভনলের গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
15. সঙ্গীকোশের গঠন, অবস্থিতি এবং কার্য সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
16. জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার পার্থক্য নির্দেশ করো।
17. রজননালি কী ? তার গঠন ও কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।
18. ক্ষীরনালি সম্বন্ধে যা জানো লেখো ।
19. হাইডাথোড্স কী ? তার গঠন, অবস্থিতি এবং কার্যের বিবরণ দাও।
20. পত্ররন্ধ্রের গঠনের বর্ণনা দাও।
21. বহিস্ত্বক উপবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করো।
22. প্রাথমিক জাইলেমের আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করো।
23. ক্যাম্বিয়ামের আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করো।
24. নালিকা বান্ডিলের গঠন ও প্রকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
25. অধস্ত্বকের গঠন বর্ণনা করো।
26. মেসোফিল কাকে বলে ? মেসোফিল কলার বর্ণনা করো।
27. অন্তস্ত্বকের গঠন বর্ণনা করো।
28. পরিচক্র কাকে বলে ? তার গঠন বর্ণনা করো।
29. মজ্জার আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করো।
30. ছোলা বা মটর মূলের স্টিলির বর্ণনা করো।
31. কচুমূলের ও ছোলামূলের স্টিলির গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করো।
32. সূর্যমুখী এবং কুমড়ো কাণ্ডের নালিকা বান্ডিলের গঠন সম্বন্ধে তুলনামূলক বিবরণ দাও।
33. সূর্যমুখী ও ভুট্টার নালিকা বান্ডিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
34. আমপাতার মেসোফিল কলার গঠন বর্ণনা করো।
35. বাঁশপাতার মেসোফিল কলার গঠন বর্ণনা করো।
36. আম ও বাঁশপাতার মেসোফিল অংশের তুলনামূলক আলোচনা করো।

### B. সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো (Write short notes) :

1. প্রোটোডার্ম, 2. বহুযোজী বহিস্ত্বক, 3. এপিব্লেমা, 4. পত্ররন্ধ্র 5. রক্ষীকোশ, 6. ক্যাম্বিয়াম, 7. প্রোটোস্টিলি, 8. সাইফোনোস্টিলি, 9. এন্ডার্ক নালিকা বান্ডিল, 10. মেসার্কনালিকা বান্ডিল, 11. বন্ধনালিকা বান্ডিল, 12. অধস্ত্বক, 13. সমপার্শ্বীয়নালিকা বান্ডিল, 14. মজ্জারশ্মি, 15. পেরিডার্ম।

### C. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. ভাজক কলা বর্ধনশীল অঙ্গে থাকে। ☐
2. যে কলার কোশগুলি বিভাজনে অক্ষম তাকে স্থায়ীকলা বলে। ☐
3. জাইলেম তন্তুকে বাস্ট তন্তু বলে। ☐
4. ফ্লোয়েম তন্তু একমাত্র জীবিত কোশ। ☐
5. মূল কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ভাজক কলাকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলে। ☐
6. যে ভাজক কলা থেকে ত্বক উৎপন্ন হয় তাকে প্রোক্যাম্বিয়াম বলে। ☐
7. স্থায়ী কলা পরিবর্তিত হয়ে যে ভাজককলা গঠিত হয় তাকে আদি ভাজক কলা বলে। ☐

8. ক্লোরোফিলযুক্ত প্যারেনকাইমা কলাকে কোলেনকাইমা বলে।
9. প্রান্তপ্রাচীরবিহীন মৃত কোশকে ট্র্যাকিড বলে।
10. সঙ্গীকোশের অপর নাম জলরন্ধ্র।
11. কূপযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশ ফ্লোয়েমে থাকে।
12. শুকনো বহুকোশী চ্যাপটা ত্বকীয় উপবৃদ্ধিকে শল্ক বলে।

### D. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. কোশ ও কলা। 2. ভাজক কলা ও স্থায়ী কলা। 3. প্রাথমিক ভাজক কলা ও গৌণ ভাজক কলা। 4. নিবেশিত ভাজক কলা ও পার্শ্বস্থ ভাজক কলা। 5. প্রোটোডার্ম ও প্রোক্যাম্বিয়াম। 6. মাস মেরিস্টেম ও প্লেট মেরিস্টেম। 7. সরল কলা ও জটিল কলা। 8. প্যারেনকাইমা ও কোলেনকাইমা। 9. স্ক্লেরেনকাইমা ও কোলেনকাইমা। 10. স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু ও স্ক্লেরাইড। 11. জাইলেম ও ফ্লোয়েম। 12. ট্র্যাকিড ও ট্রাকিয়া। 13. প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম। 14. লিব্রিফর্ম তন্তু ও ট্র্যাকিড তন্তু। 15. সীভকোশ ও সীভনল। 16. সঙ্গীকোশ ও অ্যালবিউমিনাস কোশ। 17. ট্র্যাকাইড ও ফাইবার ট্র্যাকাইড। 18. সীভছিদ্র ও সীভক্ষেত্র। 19. ক্যালাস ও ক্যালাস প্যাড। 20. কিউটিন ও কিউটিকল্। 21. এপিডার্মিস ও এপিব্লেমা। 22. লিথোসিস্ট ও সিস্টোলিথ। 23. মূলরোম ও কাণ্ড রোম। 24. প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম। 25. এন্ডার্ক ও এক্সার্ক জাইলেম। 26. বন্ধ ও মুক্ত নালিকা বান্ডিল। 27. হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ও লেপ্টোসেন্ট্রিক। 28. অধস্ত্বক ও অধঃস্তর। 29. বহিঃস্তর ও বহিস্ত্বক।

## ◢ IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) কলা কাকে বলে ? (b) ওই উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম কলার শ্রেণিবিভাগ করো।
2. (a) ভাজক কলা কাকে বলে ? (b) কীভাবে এদের শ্রেণিবিভাগ করা হয় তা আলোচনা করো।
3. অবস্থান এবং কার্য অনুযায়ী ভাজক কলার বিভিন্ন শ্রেণি সম্বন্ধে আলোচনা করো।
4. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে যেসব ভাজক কলা পাওয়া যায় তাদের গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
5. উৎপত্তি এবং কোশবিভাজন অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণিবিভাগ করো। প্রতিটি শ্রেণির অবস্থিতি, গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
6. (a) স্থায়ী কলা কাকে বলে ? (b) স্থায়ী কলার শ্রেণিবিভাগ করো।
7. বিভিন্ন প্রকার প্যারেনকাইমা কলার গঠন, অবস্থিতি এবং কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।
8. (a) জটিল কলা কাকে বলে ? (b) তাদের গঠন, অবস্থিতি ও কার্য বর্ণনা করো।
9. স্ক্লেরেনকাইমা কলার গঠন, অবস্থিতি এবং কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।
10. (a) ক্যাম্বিয়াম কী ? (b) এদের কাজ উল্লেখ করো।
11. জাইলেম কলার গঠন ও কার্য আলোচনা করো।
12. ফ্লোয়েম কলার অবস্থিতি, গঠন এবং কার্যের বিশদ বিবরণ দাও।
13. ভাজক কলার সঙ্গে স্থায়ী কলার পার্থক্য নিরূপণ করো। উদ্ভিদদেহে সংবহনে অংশগ্রহণকারী কলাগুলির নাম লেখো। প্যারেনকাইমা কলার গঠন ও কার্য বর্ণনা করো।
14. (a) কলাতন্ত্র কী ? (b) কলাতন্ত্রকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ? (c) ত্বককলাতন্ত্র সম্বন্ধে নিবন্ধ লেখো।
15. (a) পত্ররন্ধ্র কী ? (b) পত্ররন্ধ্রের আকৃতি, অবস্থান ও কার্য সম্বন্ধে বিবরণ লেখো।
16. সংবহন কলাতন্ত্র সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
17. (a) নালিকা বান্ডিল কী ? (b) চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার নালিকা বান্ডিল সম্বন্ধে আলোচনা করো।
18. আদি কলাতন্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখো।

---

## অধ্যায়ের বিষয়সূচি :



# উদ্ভিদের আকৃতি এবং কাজ
# [ FORMS AND FUNCTION OF PLANTS ]

## ভূমিকা (Introduction) :

গুপ্তবীজী উদ্ভিদ বা অ্যানজিওস্পার্ম (Angiosperm : গ্রিক— *Angios* = আধার, case; *sperma* = বীজ, Seed) হল সর্বোন্নত সপুষ্পক উদ্ভিদগোষ্ঠী। এই উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে এদের **গুপ্তবীজী** বলে। পৃথিবীর নানা প্রকার বৈচিত্র্যময় পরিবেশে এরা জন্মায়। তাই এদের অঙ্গগুলি পরিবেশ অনুযায়ী অভিযোজিত হয়। এদের স্বাধীন ও স্বাবলম্বী রেণুধর উদ্ভিদদেহকে কয়েকটি সুস্পষ্ট অঙ্গে বিভক্ত করা যায়, যেমন— মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল। গুল্ম, বীরুৎ, বৃক্ষ, পরাশ্রয়ী এবং পরজীবী জাতীয় নানা রকমের উদ্ভিদ নিয়ে গুপ্তবীজী উদ্ভিদগোষ্ঠী গঠিত। সাধারণত এই উদ্ভিদের অঙ্গগুলিকে দুটি তন্ত্রে বিভক্ত করা হয়—**মূলতন্ত্র** এবং **বিটপতন্ত্র**। উদ্ভিদের মূলতন্ত্রটি মাটির নীচে থাকে এবং মূলের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। অপরদিকে বিটপতন্ত্র মাটির উপরে থাকে এবং প্রথম অবস্থায় কাণ্ড ও তার শাখাপ্রশাখা এবং পাতা নিয়ে গঠিত হয়। পরিণত বিটপ অংশে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— **একবীজপত্রী** (একটি বীজপত্র) এবং **দ্বিবীজপত্রী** (দুটি বীজপত্র)। বীজের মধ্যে উদ্ভিদের ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজ মধ্যস্থ ভ্রূণের একটি অক্ষ থাকে। এই অক্ষকে **ভ্রূণাক্ষ** বলে। ভ্রূণাক্ষের নীচের অংশকে **ভ্রূণমূল** এবং উপরের অংশকে **ভ্রূণমুকুল** বলা হয়। ভ্রূণমূল বেড়ে **মূল** এবং ভ্রূণমুকুল বেড়ে **কাণ্ডে** পরিণত হয়।

# মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও কাজ (MORPHOLOGICAL FEATURES AND FUNCTIONS OF ROOT, STEM, LEAF AND FLOWER)

## 3.1. মূল (Root)

ভ্রূণাক্ষের নিম্নগামী অংশ হল **ভ্রূণমূল** (Radicle)। ভ্রূণমূল পরিণত হয়ে প্রধান **মূলতন্ত্র** (Root System) গঠন করে। মূল মাটিতে প্রবেশ করে উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে এবং মাটির রস শোষণ করে। অনেক সময় মূলকে অন্য শারীরবৃত্তীয় ও যান্ত্রিক কাজ করতে হয়, যেমন—অঙ্গজ জনন, খাদ্যসঞ্চয় প্রভৃতি। বহু উদ্ভিদের মূল সম্পূর্ণভাবে মাটির উপরে জন্মায় (বটের ঝুরি, অর্কিডের বায়বীয় মূল প্রভৃতি)। কোনো কোনো জলজ উদ্ভিদে কোনো মূল থাকে না। আবার অনেকগুলি পরজীবী উদ্ভিদ শুধু মূল নিয়ে গঠিত। উদাহরণ— মনোট্রপা (*Monotropa uniflora*)।

### ▲ মূলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং কাজ (Definition, Characteristic, Types and Functions of Root) :

❖ (a) **মূলের সংজ্ঞা (Definition of Root) :** **ভ্রূণমূল থেকে গঠিত নিম্নাভিমুখী, মুকুল, পর্ব ও পর্বমধ্য, বর্ণবিহীন অঙ্গ যা উদ্ভিদদেহকে মাটিতে আবদ্ধ রাখে এবং জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ শোষণ করে তাকে মূল বলে।**

➤ (b) **মূলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Root) :**

1. মূল সবসময় আলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ অভিকর্ষবলের দিকে বাড়ে। তাই একে **অনুকূল অভিকর্ষী** (Positively geotrophic) বলা হয়। আবার আলোর বিপরীতে চলে বলে **আলোক প্রতিকূলবর্তী** (Negatively Phototropic)-ও বলে।
2. মূল বর্ণহীন, কারণ ক্লোরোফিল থাকে না।
3. পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না। তাই পর্ব থেকে পাতা ও ফুল উৎপন্ন হয় না।
4. মূলের পর্বে অঙ্গজ মুকুল (Bud) গঠিত হয় না
5. মূল ও শাখামূলের শীর্ষে **মূলত্র** (Root cap) বা **মূলজেব** (Root pocket) নামে আবরণী থাকে।
6. মূলের শাখাগুলির উৎপত্তি অন্তর্জনিষ্ণুভাবে (Endogenous) অর্থাৎ মূলের ভেতরের কলাস্তর (পরিচক্র) থেকে উৎপন্ন হয়।
7. পার্শ্বীয় শাখামূলগুলি অগ্রোন্মুখভাবে (Acropetally) অর্থাৎ নীচ থেকে উপরের দিকে পরপর উৎপন্ন হয়।
8. মূলরোমগুলি এককোশী ও বহির্জনিষ্ণু (Exogenous) অর্থাৎ মূলের বাইরের কোশস্তর (এপিব্লেমা) থেকে তৈরি হয়।

**• প্রয়োজনীয় তথ্য •**

1. **জলঝাঁঝি** (*Utricularia stellaris*), **উলফিয়া** (*Wolffia arrhiza*) প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে মূল থাকে না।
2. **র‍্যাফ্লেসিয়া** (*Rafflasia arnoldi*), **অরসিউথোবিয়াম** (*Arceuthobium minutissimum*) প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদের দেহ শুধু মূল দিয়ে গঠিত।
3. **রাঙাআলু** (*Ipomoea batatus*) ও **পটল** (*Trichosanthes dioica*) মূলজ মুকুল জন্মায়।

➤ (c) **মূলের প্রকারভেদ (Types of Root) :** মূল প্রধানত দু'রকমের হয়, যেমন—**প্রকৃত বা স্থানিক মূল** (True root) এবং **অস্থানিক মূল** (Adventitious root)।
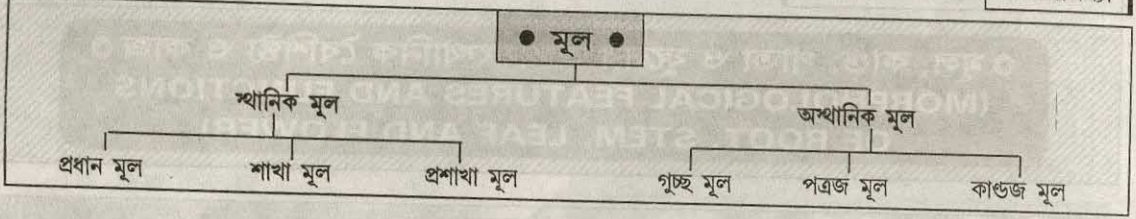
1. **স্থানিক মূল (True root)—ভ্রূণমূল থেকে গঠিত মূলকেই স্থানিক মূল বলে।** বীজের ভ্রূণ থেকে বেড়ে ভ্রূণমূল উৎপন্ন হয়। এই ভ্রূণমূল মাটির নীচে যায় এবং আরও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে **প্রাথমিক মূল (Primary root)** গঠন করে। পরে এই মূল ক্রমশ বেড়ে একটি লম্বা ও দৃঢ় মূল গঠন করে। একে **প্রধান মূল** (Tap root) বলা হয়। এই প্রধান মূল থেকে চারিদিকে তির্যকভাবে অপেক্ষাকৃত সরু সরু **শাখামূল** (Secondary root) এবং শাখামূল থেকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য **প্রশাখামূল** (Tertiary root) উৎপন্ন হয়। এইভাবে প্রধান মূলটি বেড়ে, লম্বা ও শাখাপ্রশাখাযুক্ত প্রধান মূলতন্ত্র (Tap root system) গঠন করে। প্রধানমূল থেকে প্রধান মূলতন্ত্র গঠিত হয় বলে একে **স্থানিক** বা **প্রকৃত মূল** বলা হয়। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এই প্রকার মূলতন্ত্র দেখা যায়। উদাহরণ—আম (*Mangifera indica*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), মটর (*Pisum sativum*) প্রভৃতি।
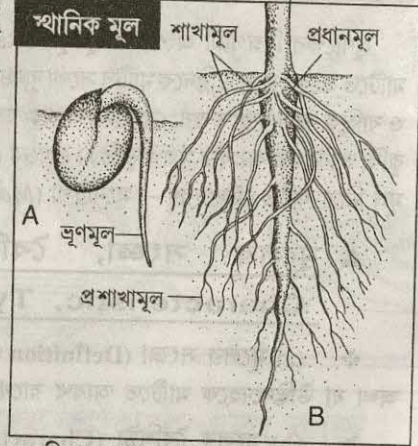
চিত্র 3.1 : (A)-ভ্রূণমূল এবং (B)-প্রধান মূলতন্ত্র।

2. **অস্থানিক মূল (Adventitious root)—ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে উদ্ভিদের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে যে মূল উৎপন্ন হয় তাকে অস্থানিক মূল বলে এবং এইপ্রকার মূলতন্ত্রকে অস্থানিক মূলতন্ত্র** (adventitious root system) **বলা হয়।** স্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী অস্থানিক মূল বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—
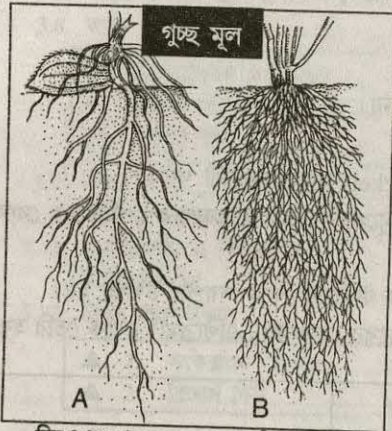
চিত্র 3.2 : ধানের— (A)-প্রাথমিক মূল এবং (B)-গুচ্ছমূল।

(i) **গুচ্ছ মূল (Fibrous root)**—প্রধান মূল মাটিতে ঢোকার পর কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলের সংযোগস্থল থেকে অসংখ্য সরু সরু অস্থায়ী মূল বেরিয়ে এসে মূলের মতো কাজ করতে থাকে। এদের **সেমিনাল মূল** (Seminal root) বলে। সেমিনাল মূল কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে কাণ্ডের গোড়া থেকে ছোটো ছোটো মূল গুচ্ছাকারে জন্মায়। এদের **গুচ্ছমূল** বলে। এই ধরনের মূল একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। **উদাহরণ**—ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), ভুট্টা (*Zea mays*) প্রভৃতি।

(ii) **পত্রজ মূল (Foliar root)—পাতা থেকে মূল সৃষ্টি হলে তাকে পত্রজ মূল বলে।** কয়েকটি উদ্ভিদের পাতা কিছুদিন মাটির সংস্পর্শে থাকলে পাতার কিনারা থেকে মূল বেরিয়ে আসে তা হল **পত্রজ বা পত্রাশ্রয়ী মূল** (Foliar root)। এই জাতীয় মূল বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়। **উদাহরণ**—পাথরকুচি (*Bryophyllum calycinatum*)।

চিত্র 3.3 : পাথরকুচির পত্রজমূল।

(iii) **কাণ্ডজ মূল (Cauline)—কাণ্ড থেকে উৎপন্ন মূলকে কাণ্ডজ মূল** (Cauline root) **বলে।** বটগাছের (*Ficus benghalensis*) কাণ্ড থেকে মূল সৃষ্টি হয়ে মাটির দিকে নেমে আসে। একে **স্তম্ভমূল** (Prop root) বলে। তা ছাড়া কেয়া (*Pandanus tectorius*)

ও গজপিপুল (*Scindapsus officinalis*) কাণ্ড থেকেও মূল উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ভুট্টা (*Zea mays*), আখ (*Saccharum officinarum*), গোলাপ (*Rosa centifolia*), জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), গাঁদা (*Tagetes patula*) প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড মাটিতে পুঁতে দিলে কিছুদিনের মধ্যে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়।

● **স্থানিক (প্রকৃত) ও অস্থানিক মূলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between True root and Adventitious root) :**

| স্থানিক (প্রকৃত) মূল | অস্থানিক মূল |
|---|---|
| 1. ভ্রূণমূল থেকে স্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। | 1. ভ্রূণমূল ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ, যেমন—কাণ্ড বা পাতা থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। |
| 2. প্রাথমিক মূল বেড়ে শাখাপ্রশাখাযুক্ত প্রধান মূল গঠন করে। | 2. অস্থানিক মূল সাধারণত নরম ও শাখাহীন। |
| 3. প্রধান মূল, শাখা মূল ও প্রশাখা মূল নিয়ে প্রধান মূলতন্ত্র গঠিত হয়। | 3. অস্থানিক মূলতন্ত্রে স্থানিক মূলের মতো প্রধান মূল, শাখা মূল ও প্রশাখা মূল থাকে না। |
| 4. স্থানিক মূল মাটি থেকে রস শোষণ, খাদ্যসঞ্চয়, দৃঢ়তা দান প্রভৃতি কাজ করে। | 4. অস্থানিক মূল মাটি থেকে রস শোষণ, খাদ্য সঞ্চয়, শ্বসন, জনন প্রভৃতি কাজ করে। |
| 5. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। | 5. একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। |

## • সেমিনাল মূল •

গুচ্ছমূল সৃষ্টি হবার আগে এই মূল জন্মায়। ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলের সংযোগস্থান থেকে অসংখ্য সরু সরু অস্থায়ী মূল বেরিয়ে এসে মূলের মতো কাজ করে। এদের সেমিনাল মূল বলে। সেমিনাল মূল কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলে কাণ্ডের গোড়া থেকে গুচ্ছমূল গঠিত হয়। উদাহরণ—ধান (*Oryza sativa*)।

□ **আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ (Parts of Typical Root and their Function) :** একটি আদর্শ মূল ও তার শাখাপ্রশাখাকে নিম্নলিখিত পাঁচটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা অংশে বিভক্ত করা হয়।

● **আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশের ছক (Different parts of a typical Root) :**

চিত্র 3.4 : (A)-বহুযোজী মূল (কেয়া) এবং (B)-মূলজেব (পানা) চিত্ররূপ।
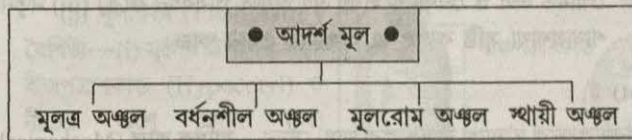
1. **মূলত্র অঞ্চল (Root cap region) :** প্রধান মূল ও তার শাখা-প্রশাখাগুলির সরু ও নরম মূলের শীর্ষে একটি টুপির মতো যে অংশ দিয়ে ঢাকা থাকে তাকে **মূলত্র** (Root cap) বলে এবং এই অঞ্চলকে **মূলত্র অঞ্চল** বলা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে মূলত্র বহুস্তরবিশিষ্ট হয়। একে **বহুযোজী মূলত্র** (Multiple root cap) বলে। উদাহরণ— কেয়াগাছ (*Pandanus*)। জলজ উদ্ভিদে, যেমন—কচুরিপানা (*Eichhornia*), ক্ষুদিপানা (*Lemna*) ইত্যাদির মূলের আগায় মূলত্র না থেকে পাতলা চোঙার মতো আবরণ থাকে। একে **মূলজেব বা মূলাধার** (Root pocket) বলে। **কাজ**—(i) মূলত্র মূলের নরম ডগাটিকে মাটির ঘষা থেকে বাঁচায়। (ii) মূলত্র কোশ থেকে একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় আঠালো পদার্থ নিঃসৃত
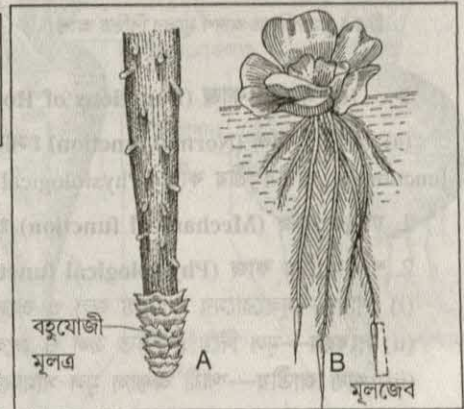
হয়। এই অঞ্চল পিচ্ছিল বলে মূল সহজে মাটির ভিতরে ঢুকতে পারে। (iii) জলজ উদ্ভিদে মূলজেবও মূলকে আঘাত থেকে বাঁচায়। মূলজেব থাকায় পোকামাকড় ও জীবাণু থেকে অনেক সময় মূল রক্ষা পায়।

2. **কোশ বিভাজন অঞ্চল (Region of cell division)** ঃ মূলত্র অঞ্চলের ঠিক উপরে কিছুটা যে নরম অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় তাকে **কোশ বিভাজন অঞ্চল** বলে। এই অঞ্চলের কোশগুলি দ্রুত বাড়ে। **কাজ**—(i) মূলের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায়। (ii) মূলত্রের ক্ষয়পূরণ করাও এই অঞ্চলের কাজ।

3. **বর্ধনশীল অঞ্চল (Region of elongation)** ঃ কোশ বিভাজন অঞ্চলের ঠিক উপরে যে অঞ্চলের খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি দেখা যায় তাকে **বর্ধিষ্ণু বা বর্ধনশীল অঞ্চল** (Growing region) বলে। ভাজক কলা দিয়ে গঠিত বলে এই অংশে খুব তাড়াতাড়ি কোশ বিভাজন ঘটতে থাকে। **কাজ**—মূলের বৃদ্ধি ঘটানো বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের প্রধান কাজ।
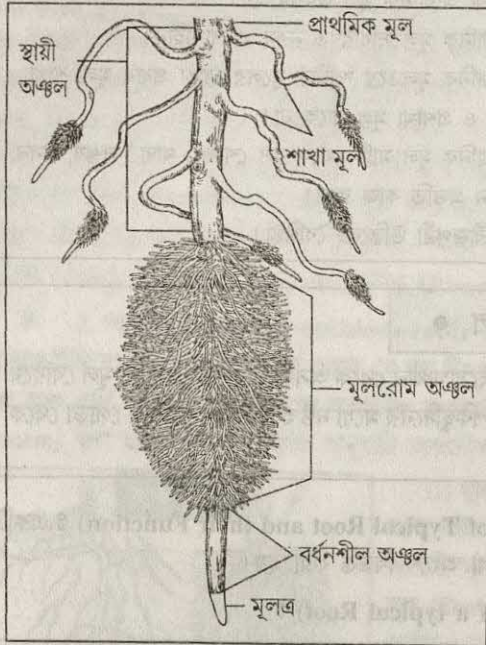
চিত্র 3.5 ঃ পরিণত আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ।

4. **মূলরোম অঞ্চল (Root hair region)** ঃ বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের উপরে যে অঞ্চল থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র সুতোর মতো রোম উৎপন্ন হয় তাকে **মূলরোম অঞ্চল** (Root hair region) বলে। মূলরোমগুলি এককোশী এবং ক্ষণস্থায়ী। পেছনের মূলরোম নষ্ট হলে সামনের দিকে নতুন মূলরোম উৎপন্ন হয়। মূল বহিস্ত্বকের কোশগুলি থেকে বহির্জনিষ্ণুভাবে (Exogenously) গঠিত হয়। এই অঞ্চলকে **রোমবহ অঞ্চল** (Piliferous region)-ও বলা হয়। **কাজ**—(i) মূলকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখতে সাহায্য করে। (ii) মাটি থেকে জল ও জৈবনিক লবণ শোষণ করে।

5. **স্থায়ী অঞ্চল (Parmanent region)** ঃ মূলরোমের পরবর্তী উপরের অংশ যেখানে শাখাপ্রশাখা কাণ্ডের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে **স্থায়ী অঞ্চল** বলে। এই অঞ্চল স্থায়ী, কারণ এই অঞ্চলের কোশগুলির বিভাজন ক্ষমতা না থাকায় আর বাড়ে না। এই অংশে প্রধান মূল থেকে **শাখা মূল** (Secondary root) আর শাখা মূল থেকে **প্রশাখা মূল** (Tertiary root) উৎপন্ন হয়। **কাজ**—(i) শাখাপ্রশাখা মূল উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে শক্তভাবে আবদ্ধ রাখে। (ii) মূলরোম দিয়ে শোষিত জল ও জৈবনিক লবণ এই অঞ্চল পরিবহন করে। (iii) নতুন শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করাও এ অঞ্চলের প্রধান কাজ।

➤ (d) **মূলের কাজ (Functions of Root)** ঃ

(a) **সাধারণ কাজ (Normal function)** ঃ সাধারণ কাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—**যান্ত্রিক কাজ** (Mechanical function) ও **শারীরবৃত্তীয় কাজ** (Physiological function)।

1. **যান্ত্রিক কাজ (Mechanical function)** ঃ মূল ও তার শাখাপ্রশাখা উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে।

2. **শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological function)** ঃ

(i) **শোষণ**—মূলরোমের সাহায্যে জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ মাটি থেকে শোষণ করে।

(ii) **সংবহন**—মূল দিয়ে শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ কাণ্ড ও শাখায় যায়।

(iii) **খাদ্য জাতীয়**—স্থায়ী অঞ্চলে মূল সামান্য পরিমাণ খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

(b) **বিশেষ কাজ (Special function)** ঃ মূলের বিশেষ কাজগুলি পরিবর্তিত মূলের সাহায্যে ঘটে। এই কাজগুলি হল—

(i) উদ্ভিদের ঠেসমূল কাণ্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—কেয়া (*Pandanus tectorius*)।

(ii) চোষক মূল দিয়ে পরজীবী উদ্ভিদ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শোষণ করে। **উদাহরণ**—স্বর্ণলতা (*Cuscuta reflexa*)।

(iii) লবণাম্বু উদ্ভিদ শ্বাসমূল গঠন করে শ্বসনের কাজ চালায়। **উদাহরণ**—গরান (*Ceriops roxburghiana*), সুন্দরী (*Heritiera minor*)।

(iv) সবুজ মূল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। **উদাহরণ**—গুলঞ্চ (*Tinospora cordifolia*), পানিফল (*Trapa bispinosa*)।

(v) উদ্ভিদের পর্ব থেকে সৃষ্ট আরোহীমূল অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে উপরে উঠতে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—পান (*Piper betle*), গজপিপুল (*Scindapsus officinalis*)।

(vi) অর্কিড জাতীয় পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের দৃঢ়সংলগ্নী মূল (Clinging root) আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—রাস্না (*Vanda roxburghii*)

(vii) স্তম্ভমূল কাণ্ডের শাখাপ্রশাখার ভার বহন করে। উদাহরণ—বট (*Fieus benghalensis*)।

(viii) সংকোচীমূল উদ্ভিদের বায়বীয় অংশকে উল্লম্বভাবে অবস্থানে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—কলাবতী (*Canna indica*), পেঁয়াজ (*Allium cepa*)।

(c) **অঙ্গজ জননের কাজ (Function of Vegetative reproduction) :** অনেকগুলি উদ্ভিদের অস্থানিক মূল থেকে মুকুল গঠিত হয়। মুকুলগুলি জননে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—পটল (*Trichosanthes dioica*), শিশু (*Dalbergia sissoo*)।

## ▲ মূলের পরিবর্তন (Modification of Roots)

খাদ্য সঞ্চয়, শারীরবৃত্তীয় ও যান্ত্রিক কাজে মূলের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। মূলের পরিবর্তন সাধারণত বিভিন্ন কাজ করার জন্য ঘটে। নীচে মূলের কাজ ও মূলের আকৃতির পরিবর্তন দেখানো হল।

### ➤ I. পরিবর্তিত স্থানিক মূল (Modification of True Root )

#### A. প্রকৃত সঞ্চয়ী মূল বা ভাণ্ডার মূল (Storage Tap Root) :

❖ **সংজ্ঞা : যেসব প্রধান মূল ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য পরিবর্তিত ও স্থূল হয়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে তাদের ভাণ্ডার মূল (Storage root) বলে।**

খাদ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ সব জায়গায় সমান না হওয়ার জন্য এদের আকৃতিরও তারতম্য দেখা যায়। আকৃতি অনুসারে **ভাণ্ডার মূল** বিভিন্ন প্রকারের হয়।

**1. পরিবর্তিত প্রধান মূল (Modification of Tap root) :**

(a) **মূলাকার (Fusiform) :** **বৈশিষ্ট্য**—(i) মূলের উপরের দিকে বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyl) ও নীচের অংশ প্রধান মূল। (ii) মূলটির মাঝের অংশে খাদ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি এবং দুই প্রান্তে কম বলে মধ্যবর্তী অংশ স্ফীত এবং ক্রমশ উভয় প্রান্ত সরু হয়ে মাকুর আকৃতির হয়। (iii) স্ফীত মূলটির চারপাশ থেকে শাখামূল উৎপন্ন হয়। (iv) মূলের রং সাদা বা লাল হয়।

**উদাহরণ**—মুলো (*Raphanus sativus*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চয় রাখা।
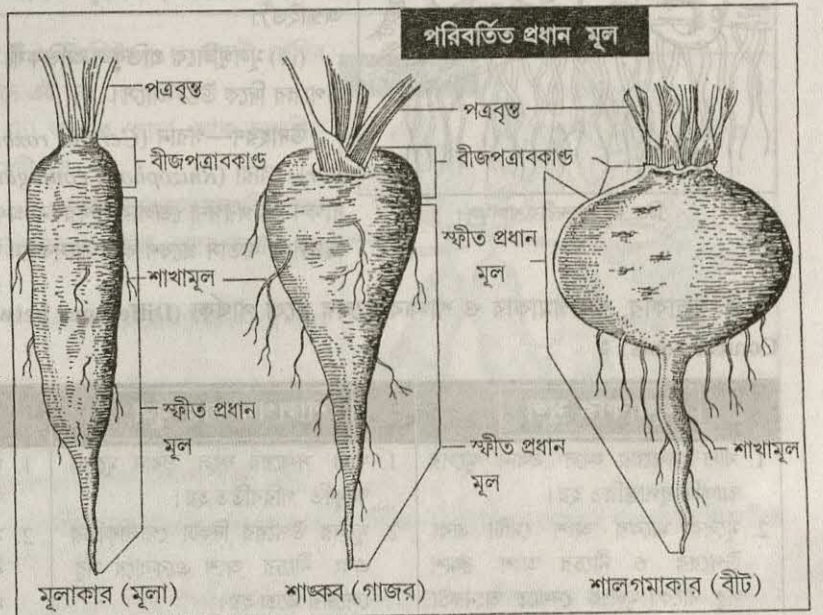
চিত্র 3.6 : পরিবর্তিত সঞ্চিত মূল।

(b) **শালগমাকার** (Napiform) :

**বৈশিষ্ট্য** — (i) মূলের বেশির ভাগ অংশ খাদ্য সঞ্চয় করে ফুলে গোলাকার হয়। কিন্তু নীচের দিকে হঠাৎ সরু হয়ে লেজের আকার ধারণ করে। এই সরু অংশে খাদ্য সঞ্চিত হয় না। (ii) গোলাকার অংশের উপরে হল বীজপত্রাবকাণ্ড ও নীচের অংশ হল প্রধান মূল। (iii) গোলাকার মূলের নীচের দিকে ও সরু অংশে অসংখ্য শাখামূল থাকে।

**উদাহরণ**—বীট (*Beta vulgaris*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চিত রাখা।

(c) **শাঙ্কব** (Conical) :

**বৈশিষ্ট্য** — (i) এই ধরনের মূলের উপরের দিক মোটা ও নীচের দিক ক্রমশ সরু হয়ে শাঙ্কব আকার ধারণ করে। এই মূলের উপরের দিকে খাদ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হয়। (ii) মূলের উপরের দিকে বীজপত্রাবকাণ্ড ও নীচের অংশে প্রধান মূল থাকে। (iii) মূলের চারপাশে কিছু শাখামূল গঠিত হয়। (iv) মূলের রঙ কাঁচা-হলুদের মতো বা গাঢ় বর্ণের হয়।

**উদাহরণ** — গাজর (*Daucus carota*)। **কাজ** — খাদ্য সঞ্চয় করা।

## ➤ II. পরিবর্তিত শাখা মূল (Modified Branched Root) :

(a) **শ্বাসমূল (Respiratory root) : ❖ সংজ্ঞা (Definition) : সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে যে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় তাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophytic plant) বলে।**

চিত্র 3.7 : সুন্দরীর শ্বাসমূল।

এই অঞ্চলে মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকায় অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য এদের শ্বাসমূল গঠিত হয়।

(b) **বৈশিষ্ট্য**— (i) মাটির নীচে কিছু **শাখামূল** শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধের জন্য মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে। এই মূলগুলিকে **নিউম্যাটোফোর** (Pneumatophores) বলে।

(ii) মূলগুলির শীর্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এদের **শ্বাসছিদ্র** (Breathing pore) বলে।

(iii) এই ছিদ্রপথে বায়ুর আদানপ্রদান চলে (অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড)।

(iv) মূলগুলিকে **প্রতিকূল অভিকর্ষী** বলা যায়। কারণ মাটির নীচে না গিয়ে উপরের দিকে উঠে আসে।

**উদাহরণ**—গরান (*Ceriops roxburghiana*), সুন্দরী (*Heritiera minor*), বোরা (*Rhizophora conjugata*) প্রভৃতি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে এসব উদ্ভিদ দেখা যায়। **কাজ**—ছিদ্রপথে বাতাস প্রবেশ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

● **মূলাকার, শালগমাকার ও শাঙ্কব মূলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Fusiform, Nepiform and Conical roots) :**

| মূলাকার মূল | শালগমাকার মূল | শাঙ্কব মূল |
|---|---|---|
| 1. খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের আকৃতি রূপান্তরিত হয়। | 1. খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। | 1. খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। |
| 2. মূলের মাঝের অংশ মোটা এবং উপরের ও নীচের অংশ ক্রমশ সরু থাকে। মূলকে দেখতে অনেকটা মাকুর মতো হয়। | 2. মূলের উপরের দিকটা গোলাকৃতির এবং নীচের অংশ একেবারে সরু লেজের মতো হয়। | 2. মূলের উপরের অংশ বেশ স্ফীত এবং নীচের দিক শঙ্কুর (Cone) আকৃতি ধারণ করে। |

| মূলাকার মূল | শালগমাকার মূল | শাঙ্কব মূল |
|---|---|---|
| 3. মূলের শীর্ষে বীজপত্রাবকাণ্ড ও নীচের অংশে প্রধান মূল থাকে। | 3. গোলাকার অংশের উপরিভাগে বীজ-পত্রাবকাণ্ড ও নীচের অংশে প্রধান মূল থাকে। | 3. মূলের উপরিভাগে বীজপত্রাবকাণ্ড ও নীচের অংশে প্রধান মূল থাকে। |
| 4. প্রধান মূল থেকে শাখামূল সৃষ্টি হয়। | 4. গোলাকার ও সরু লেজের মতো অংশ থেকে শাখামূল উৎপন্ন হয়। | 4. শাঙ্কব মূলের চারদিকে শাখামূল সৃষ্টি হয়। |
| 5. মূলের রং সাদা বা লাল। উদাহরণ—**মুলো**। | 5. মূলের রং লাল বা সাদা। উদাহরণ--**বীট ও শালগম**। | 5. মূলের রং কাঁচা হলুদের মতো। উদাহরণ— **গাজর**। |
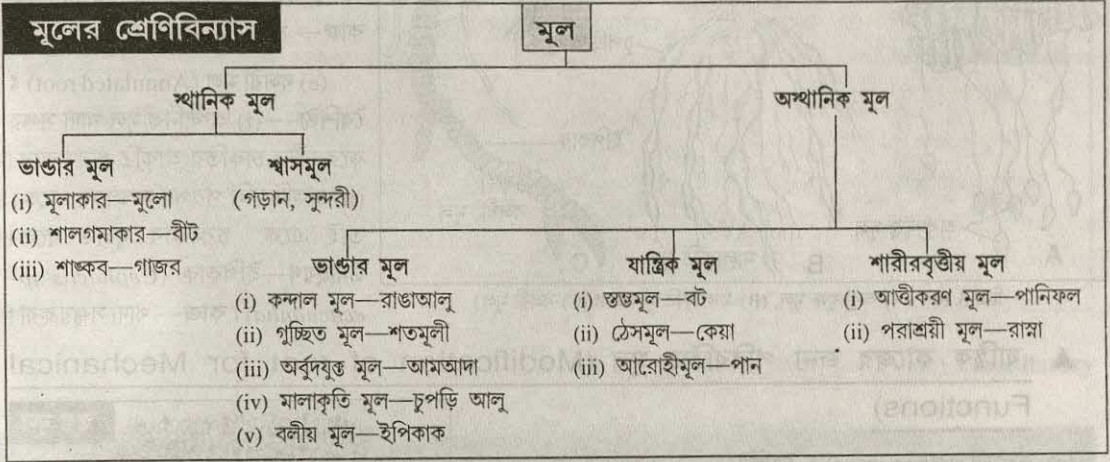
## ▲ খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য অস্থানিক মূলের (ভাণ্ডার মূল) পরিবর্তন

(a) **কন্দাল মূল** (Tuberous root) **ঃ বৈশিষ্ট্য**— (i) ব্রততী শ্রেণির উদ্ভিদে এই মূল দেখা যায়।
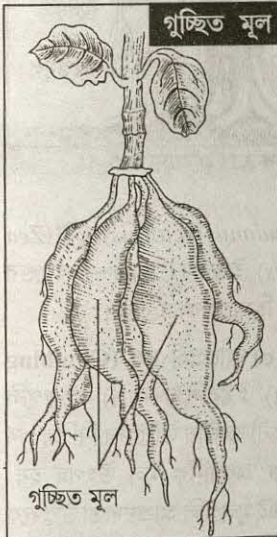
(ii) কাণ্ডের গোড়া থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়।

(iii) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য মূলগুলি কন্দের মতো স্ফীত হয় বলে এদের **কন্দাল মূল** বলে।

(iv) এদের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না।

**উদাহরণ**—রাঙাআলু (*Ipomoea batatus*), শাখআলু (*Pachyrhizus angulatus*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চয় করা।

চিত্র 3.8 ঃ রাঙাআলুর কন্দাল মূল।

চিত্র 3.9 ঃ ডালিয়ার গুচ্ছিত মূল।

(b) **গুচ্ছিত মূল** (Fasciculated root) **ঃ বৈশিষ্ট্য**—(i) কাণ্ডের গোড়ায় গুচ্ছাকারে অস্থানিক মূল গঠিত হয়।

(ii) মূলগুলি খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হয়। তাই এদের গুচ্ছিত মূল বলা হয়। **উদাহরণ**—শতমূলী (*Asparagus racemosus*), ডালিয়া (*Dahlia sp.*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।

(c) **অর্বুদযুক্ত মূল** (Nodulose root) **ঃ বৈশিষ্ট্য**— (i) কাণ্ডের পর্ব থেকে সরু সরু অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। (ii) মূলগুলির অগ্রপ্রান্ত স্ফীত হয়ে গোলাকার অর্বুদের মতো আকৃতি ধারণ করে। **উদাহরণ**—আমআদা (*Curcuma amada*)। **কাজ**— খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।
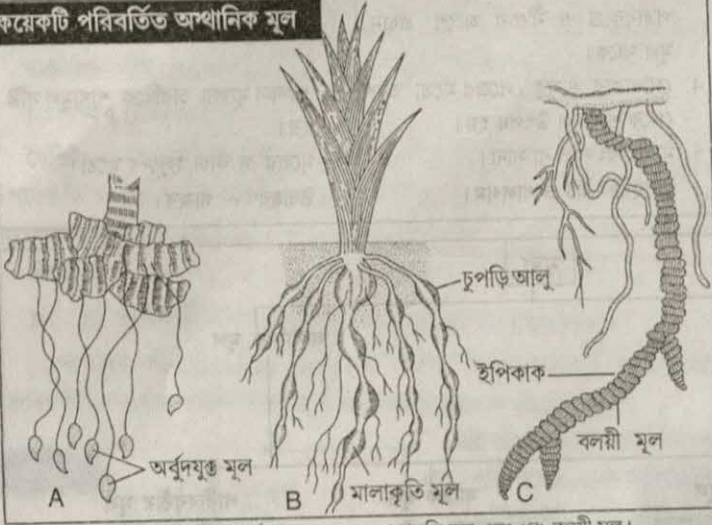
চিত্র 3.10 ঃ (A)-অর্বুদযুক্ত মূল, (B)-মালাকৃতি মূল এবং (C)-বলয়ী মূল।

(d) **মালাকৃতি মূল** (Moniliform root) **ঃ বৈশিষ্ট্য**— (i) অস্থানিক সরু মূলগুলি খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পর্যায়ক্রমে স্ফীত ও সংকুচিত হয়। (ii) মূলগুলিকে মটরের মালার মতো দেখায়। **উদাহরণ** — চুপড়ি আলু (*Dioscorea alata*)। **কাজ**— খাদ্য সঞ্চয় করা।

(e) **বলয়ী মূল** (Annulated root) **ঃ বৈশিষ্ট্য**— (i) অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত চাকতির আকৃতি ধারণ করে। (ii) চাকতিগুলি পরপর সাজানো থাকে। তাই একে চক্রাকার মূলও বলে। **উদাহরণ**—ইপিকাক (*Cephaelis ipecacuanha*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চয় করা।

## ▲ যান্ত্রিক কাজের জন্য পরিবর্তিত মূল (Modification of root for Mechanical Functions)

(a) **স্তম্ভমূল (Prop root) ঃ বৈশিষ্ট্য**—(i) অস্থানিক মূল কাণ্ডের শাখাপ্রশাখা থেকে গঠিত হয়ে খাড়াভাবে নীচের দিকে নামে এবং মাটিতে প্রবেশ করে। মূলগুলি আস্তে আস্তে বেড়ে স্থূল হয়ে স্তম্ভের আকার ধারণ করে বলে এদের **স্তম্ভমূল** বলে। (ii) মূলগুলি উদ্ভিদের বিশাল শাখাপ্রশাখার ভার বহন করে। **উদাহরণ**—বট (*Ficus benghal-ensis*)। **কাজ**—বিটপ অংশের ভার বহন করা।

চিত্র 3.11 ঃ বটের স্তম্ভমূল।

(b) **ঠেসমূল (Stilt root) ঃ বৈশিষ্ট্য**—(i) এই প্রকার অস্থানিক মূল কাণ্ডের পর্ব থেকে তির্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে। (ii) মূলগুলি উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ডকে ঠেস দিয়ে খাড়াভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে। **উদাহরণ**—কেয়া (*Pandanus tectorius*), ভুট্টা (*Zea mays*) ইত্যাদি। **কাজ**— কাণ্ডের ঠেস হিসাবে কাজ করা।
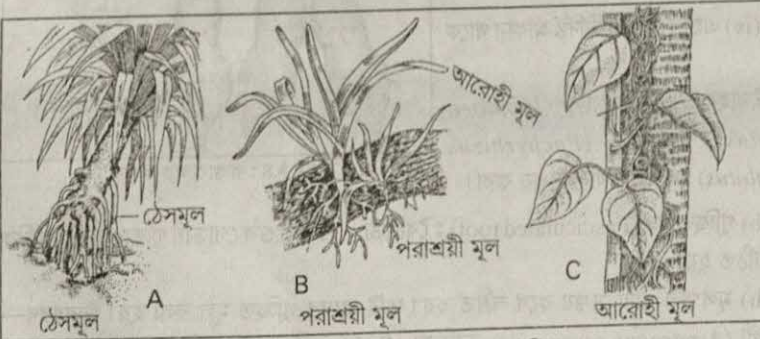
চিত্র 3.12 ঃ (A)-কেয়া, (B)-রাস্না, (C)-গজপিপুল।

(c) **আরোহী মূল (Climbing root) ঃ বৈশিষ্ট্য**— (i) কতকগুলি রোহিনী জাতীয় উদ্ভিদের বিভিন্ন পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। (ii) এই মূলগুলি আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে আঁকড়ে ধরে এবং দুর্বল কাণ্ডকে

উপরের দিকে উঠতে বিশেষ সাহায্য করে। আরোহণে সাহায্য করে বলে এদের **আরোহী মূল** বলা হয়। **উদাহরণ**—পান (*Piper betle*), গজপিপুল (*Scindapsus officinalis*) ইত্যাদি। **কাজ**— আরোহণে সাহায্য করা।

## ▲ শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য অস্থানিক মূলের পরিবর্তন (Modification of adventitious root for Physiological functions)

(a) **পরাশ্রয়ী মূল (Epiphytic root) ঃ** **বৈশিষ্ট্য**— (i) অনেকগুলি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে ঝুলতে থাকে। (ii) এই মূলগুলির গায়ে একরকম নরম কলার বহিরাবরণী গঠিত হয়। একে **ভেলামেন** (Velamen) বলা হয়। ভেলামেনের ব্লটিং পেপারের মতো তরল পদার্থ শোষণের ক্ষমতা থাকে। **উদাহরণ** —রাস্না (*Vanda roxburghii*)। **কাজ**— এই ভেলামেনের সাহায্যে বায়বীয় বা পরাশ্রয়ী মূল বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

(b) **আত্তীকরণ মূল (Assimilatory root) ঃ** **বৈশিষ্ট্য**—(i) অনেকগুলি রোহিণী জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্ব থেকে সরু, লম্বা, সবুজ বায়বীয় মূল নির্গত হয়। (ii) মূলগুলিতে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। অঙ্গার আত্তীকরণে সক্ষম বলে এই মূলকে **আত্তীকরণ মূল** বলে। **উদাহরণ**— পানিফল (*Trapa bispinosa*) ও গুলঞ্চ (*Tinospora cordifolia*) প্রভৃতি। **কাজ**— খাদ্য তৈরি করা।
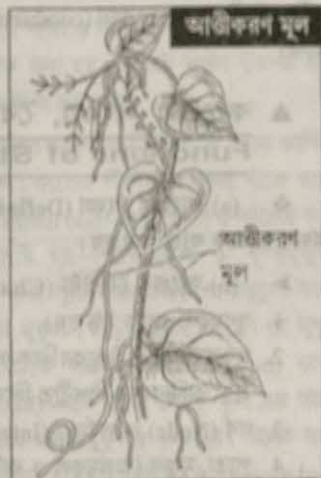
চিত্র 3.13 : গুলঞ্চ।

### ● পরাশ্রয়ী মূল ও আত্তীকরণ মূলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Epiphytic root and Assimilatory root) ঃ

| পরাশ্রয়ী মূল | আত্তীকরণ মূল |
|---|---|
| 1. পরাশ্রয়ী বায়বীয় মূল। | 1. স্থলজ বা জলজ বায়বীয় মূল। |
| 2. মূলের শীর্ষে ভেলামেন নামে কোশ আবরণী থাকে। | 2. ভেলামেন থাকে না। |
| 3. ক্লোরোফিল না থাকার জন্য সালোকসংশ্লেষে অক্ষম। | 3. ক্লোরোফিল থাকার জন্য সালোকসংশ্লেষে সক্ষম। |
| 4. প্রধান কাজ হল বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করা। | 4. প্রধান কাজ হল সালোকসংশ্লেষ বা অঙ্গার আত্তীকরণ। |
| 5. উদাহরণ—রাস্না (*Vanda roxburghii*) | 5. উদাহরণ—গুলঞ্চ (*Tinospora cordifolia*) |

### ● স্তম্ভমূল ও ঠেসমূলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Prop root and Still root) ঃ

| স্তম্ভমূল | ঠেসমূল |
|---|---|
| 1. কাণ্ডের শাখাপ্রশাখার পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। | 1. দুর্বল কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। |
| 2. লম্বভাবে মাটিতে নামে এবং কিছুদিনের মধ্যে স্ফীত হয়। | 2. তির্যকভাবে মাটিতে নামে কিন্তু স্ফীত হয় না। |
| 3. উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখার ভার বহন করে। | 3. কাণ্ডের প্রয়োজনীয় ভার বহন করে। |
| 4. বড়ো শাখাগুলিকে দৃঢ়তা দান করে। | 4. কাণ্ডকে ঠেস দিয়ে রাখতে বিশেষ সাহায্য করে। |
| 5. উদাহরণ—বট (*Ficus benghalensis*) | 5. উদাহরণ—কেয়া (*Pandanus tectorius*) |

## ✪ 3.2. কাণ্ড(Stem) ✪

ভ্রূণমুকুল থেকে গঠিত উদ্ভিদের মাটির উপরের প্রধান অক্ষকে কাণ্ড বলা হয়। এটি শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। কাণ্ডের আকার ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন ক্ষুদিপানার কাণ্ড খুব ছোটো ; লাউ, কুমড়া প্রভৃতির কাণ্ড খুব সরু ও নরম—

এরা লতিয়ে চলে; অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড শাখাপ্রশাখাযুক্ত খুব মোটা, লম্বা এবং গুঁড়িসহ দৃঢ় প্রকৃতির হয়। নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা, শুষ্ক, কাষ্ঠল ও শাখাহীন। অধিকাংশ উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির উপর খাড়াভাবে থাকে। শাখা-প্রশাখাসহ পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি নিয়ে উদ্ভিদের মাটির উপরের বায়ব অংশ গঠিত হয়। এরা উদ্ভিদের **বিটপতন্ত্র** (shoot system) গঠন করে। শাখাপ্রশাখা প্রভৃতির ভার বহন করা কাণ্ডের অন্যতম প্রধান যান্ত্রিক কাজ। পাতায় জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ সংবহন (conduction) এবং বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিবহন (transportation) কাণ্ডের অন্যতম প্রধান জৈবনিক কাজ।

## ▲ কাণ্ডের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও কাজ (Definition, Characteristics and Functions of Stem)

❖ (a) **কাণ্ডের সংজ্ঞা (Definition of stem) ঃ ভ্রূণ মুকুল থেকে গঠিত মাটির উপরের আলোক অনুকূলবর্তী বিটপের প্রধান অক্ষকে কাণ্ড বলা হয়।**

➤ (b) **কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Stem) ঃ**

1. ভ্রূণমুকুল থেকে সৃষ্ট হয়।
2. সব সময় মাটির উপরের দিকে বাড়ে অর্থাৎ আলোকাভিমুখী (Positively phototropic)। তাই একে **আলোক অনুকূলবর্তী** এবং অভিকর্ষের বিপরীত দিকে যায় বলে একে **প্রতিকূল অভিকর্ষী** (Negatively geotropic) বলে।
3. পর্ব (Node) ও পর্বমধ্য (Internode) থাকে।
4. পাতা, মুকুল (অগ্রমুকুল ও কাক্ষিক), ফুল ও ফল ধারণ করে।
5. শাখাপ্রশাখাগুলি **বহির্জনিষ্ণু** (Exogenous) অর্থাৎ বাইরের ত্বক কলা থেকে উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া শাখাগুলি অগ্রোন্মুখভাবে (Acropetally) গঠিত হয়।
6. সাধারণত কাণ্ডের নরম অংশের রং সবুজ কিন্তু নীচের দিকের অংশ ধূসর বর্ণের হয়।
7. কাণ্ড মসৃণ হতে পারে, তবে অনেক সময় কাণ্ডে বহুকোশী রোম (Multicellular hair) থাকে। রোম থাকলে কাণ্ডকে অমসৃণ বলা হয়।

➤ (c) **কাণ্ডের কাজ (Functions of Stem) ঃ**

1. **যান্ত্রিক কাজ ঃ (Mechanical Functions) :** (i) কাণ্ড শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল সৃষ্টি ও ধারণ করে। (ii) পাতাগুলি শাখাপ্রশাখার উপর সাজানো থাকে এবং আলো বাতাসের দিকে প্রসারিত হয়। (iii) কাণ্ড শাখাপ্রশাখা ও পাতাগুলির ভার বহন করে।

2. **জৈবনিক কাজ (Physiological Functions) ঃ** (i) মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে যে রস শোষিত হয় তা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ও পাতায় সংবাহিত (Conduction) হয়। (ii) কাণ্ড ও পাতার সবুজ অংশ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। (iii) পাতায় তৈরি খাদ্য (ফ্লোয়েমের মাধ্যমে) বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহন করে। (iv) উদ্‌বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

3. **বিশেষ কাজ (Special Functions) ঃ** (i) গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে অনেক উদ্ভিদের মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে যায়। কিন্তু মাটির নীচের কাণ্ড সতেজ থাকে। পরে অনুকূল পরিবেশে আবার মাটির উপর নতুন বিটপ অংশ সৃষ্টি করে। একে **প্রতিকূল জীবিতা** বলে। (ii) অর্ধবায়ব ও অন্যান্য কাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জনন দেখা যায়। (iii) কণ্টক, রোহিণী ও শাখা কণ্টক আত্মরক্ষায় সহায়তা করে। (iv) আকর্ষ, রোহিণী ও শাখা আকর্ষ জাতীয় উদ্ভিদ অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বাড়ে। (v) অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় কাণ্ড থেকে অপত্য উদ্ভিদ জন্মায়। উদাহরণ— কচুরিপানা (*Eichhornia*)।

### ◘ একটি আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ (Different parts of a Typical Stem) ঃ

একটি আদর্শ কাণ্ড ভ্রূণমুকুল থেকে গঠিত হয়ে সবসময় মাটির উপরের দিকে অর্থাৎ আলোর দিকে যায়। একে **আলোক অনুকূলবর্তী** (Positively Phototropic) বলে। আদর্শ কাণ্ড সাধারণত লম্বা এবং এর পরিধি গোলাকার হয়।

একটি আদর্শ কাণ্ডে সাধারণত নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে, যেমন—

(i) **পর্ব** (Node) — কাণ্ডের গায়ে প্রায় সমান দূরত্বে কতকগুলি গাঁট থাকে, এদের **পর্ব** বলা হয়। বহু গাছের গাঁট বা পর্ব অনেকটা ফোলা থাকে। উদাহরণ— বাঁশ। **কাজ** — শাখা, কুঁড়ি, পাতা, ফুল, ফল সৃষ্টি করা।

(ii) **পর্বমধ্য** (Internode) — দুটি পর্বের মাঝের অংশকে **পর্বমধ্য** বলা হয়। এখানে কোনো শাখা, পাতা ও ফুল থাকে না। **কাজ**—কাণ্ডকে খাড়াভাবে রাখতে সাহায্য করে।

(iii) **পাতা** (Leaf) — পর্ব থেকে উৎপন্ন সবুজ বর্ণের চ্যাপটা প্রসারিত অংশকে পাতা বলা হয়। প্রত্যেকটি পর্বে একটি দুটি বা বেশি পাতা থাকে। **কাজ**—খাদ্য তৈরি করে।
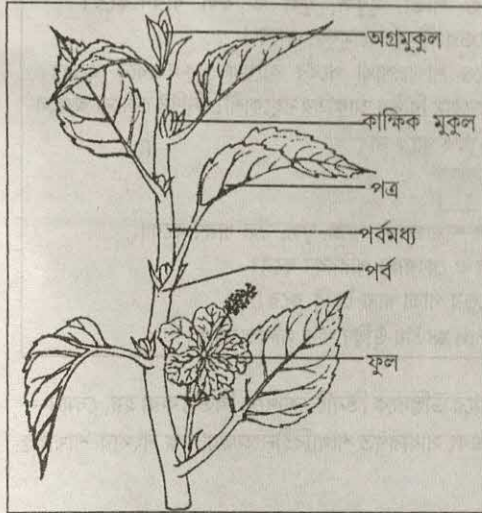
চিত্র 3.14 ঃ একটি আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ।

(iv) **কক্ষ** (Axil) — পর্বে পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে যে সূক্ষ্ম কোণের সৃষ্টি হয়, তাকে **কক্ষ** বলা হয়। এখানে মুকুল উৎপন্ন হয়। **কাজ**—শাখা-প্রশাখা, ফুল, ফল ধারণ করে।

(v) **মুকুল** (Bud) — পাতার কক্ষে যে মুকুল থাকে তাকে **কাক্ষিক মুকুল** (Axillary bud) বলে। কাণ্ডের শীর্ষে যে মুকুল থাকে তাকে **অগ্রমুকুল** বা **শীর্ষমুকুল** (Terminal bud) বলে। পাতা ও কাণ্ডের কক্ষে দু'প্রকার কাক্ষিক মুকুল সৃষ্টি হয়—**শাখামুকুল** ও **পুষ্পমুকুল**। (i) **শাখামুকুল**—যে মুকুল শাখা সৃষ্টি করে তাকে শাখামুকুল বলে। শাখামুকুল একপ্রকার **অঙ্গজ মুকুল** (Vegetative bud)। যে মুকুল থেকে পাতা গঠিত হয় তাকে **পত্রমুকুল** (Leaf bud) বলে। (ii) **পুষ্পমুকুল** (Flower bud)—যে মুকুল থেকে ফুল হয় তাকে **পুষ্পমুকুল** বলে। পুষ্পমুকুলকে **জনন মুকুলও** বলা হয়। অনেক সময় একটির বেশি মুকুল কক্ষে জন্মায়। এদের **উপমুকুল** (Accessory bud) বলে। **উদাহরণ**—দুরন্ত (*Duranta*), ছাতিম (*Alstonia*)। **কাজ**—কাণ্ডকে লম্বায় বাড়ায় ও জনন অঙ্গ উৎপন্ন করে।

● (a) **কাণ্ডের শাখাবিন্যাস (Branching of stem)** — কাণ্ডের শাখা যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজানো থাকে তাকে শাখাবিন্যাস বলে। শাখাবিন্যাস দু'ভাবে হয়—পার্শ্বীয় ও দ্ব্যগ্র বা দ্বিশীর্ষক শাখা। ভ্রূণমুকুল থেকে গঠিত উদ্ভিদের মাটির উপরের অক্ষ হল কাণ্ড। কাণ্ডের পত্রকক্ষ থেকে তির্যকভাবে উৎপন্ন ও কাণ্ডের মতো গঠনযুক্ত অংশগুলিকে **শাখা** এবং শাখা থেকে একইভাবে নির্গত অংশকে **প্রশাখা** বলে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদ শাখাবিহীন হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ শাখাপ্রশাখা গঠন করে।

**কাজ** — শাখাপ্রশাখাগুলি ফুল ও ফল ধারণ করে।

● **মূল ও কাণ্ডের প্রধান পার্থক্য (Main Difference between Root and Stem) ঃ**

| মূল | কাণ্ড |
|---|---|
| (a) উৎপত্তি অনুসারে | |
| 1. সাধারণত ভ্রূণমূল (Radical) থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. ভ্রূণমুকুল (Plumule) থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 2. ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদ-অঙ্গের অন্যান্য স্থানে অস্থানিক মূল জন্মায়। | 2. ভ্রূণমুকুল ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ থেকে কাণ্ড গঠিত হয় না। |
| 3. মূলের শাখাপ্রশাখা অন্তর্জনিষ্ণু (endogenous) ভাবে উৎপন্ন হয়। | 3. কাণ্ডের শাখাপ্রশাখা বহির্জনিষ্ণু (exogenous) ভাবে উৎপন্ন হয়। |
| (b) প্রকৃতি অনুসারে | |
| 4. মূল সাধারণত ভূনিম্নস্থ অঙ্গ। | 4. কাণ্ড সাধারণত উর্ধ্বগামী এবং বায়বীয় অঙ্গ। |
| 5. মূল আলো প্রতিকূলবর্তী ও অভিকর্ষ অনুকূলবর্তী। | 5. কাণ্ড সাধারণত আলোক অনুকূলবর্তী ও অভিকর্ষ প্রতিকূলবর্তী। |
| 6. প্রধানত মূল বর্ণহীন হয়। | 6. কাণ্ড সবুজ বর্ণের হয়। |

| মূল | কাণ্ড |
|---|---|
| (c) বহিরাকৃতি অনুসারে | |
| 7. মূলে পর্ব, পর্বমধ্য থাকে না। | 7. কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য থাকে। |
| 8. মূলে প্রধানত মুকুল, পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। | 8. কাণ্ড পাতা, মুকুল, ফুল ও ফল ধারণ করে। |
| 9. মূলের শীর্ষে মূলত্র থাকে। | 9. কাণ্ডের শীর্ষে অগ্রমুকুল থাকে। |
| 10. মূলে শাখাপ্রশাখা বিক্ষিপ্তভাবে জন্মায়। | 10. কাণ্ডে শাখাপ্রশাখা পর্বের কাক্ষিক মুকুল থেকে জন্মায়। |
| 11. মূলরোম এককোশী, ত্বককোশের সরাসরি সম্প্রসারণের ফলে মূলরোম গঠিত হয়। | 11. কাণ্ডরোম বিভিন্ন আকৃতির বহুকোশী; নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না। |
| (d) কাজ অনুসারে | |
| 12. উদ্ভিদকে মাটিতে আবদ্ধ রাখে। | 12. কাণ্ড শাখাপ্রশাখা পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে। |
| 13. জল ও জলে দ্রবণীয় লবণ শোষণ করে। | 13. জল ও কোশরস পরিবহন করে। |
| 14. খাদ্য তৈরি করে না। | 14. কাণ্ডের পাতা খাদ্য তৈরি করে। |
| 15. খাদ্য সঞ্চিত রাখে। | 15. জঙ্গল জাতীয় উদ্ভিদ খাদ্য সঞ্চিত রাখে। |

● (b) **কাণ্ডের প্রকৃতি (Nature of Stem) :** কাণ্ডের প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

1. **বীরুৎ (Herb) :** যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড খুব নরম, আকারে ছোটো এবং সাধারণত শাখাবিহীন অথবা স্বল্প সংখ্যক শাখাযুক্ত হয় তাদের **বীরুৎ** বলে। এরা জলজ বা স্থলজ উদ্ভিদ হতে পারে।

জীবনের স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদকে চারভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—

(i) **ক্ষণজীবী** (Ephemerals) — যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় তাদের **ক্ষণজীবী** বলে। **উদাহরণ**—ব্যালানাইটিস্ (*Balanites aegyptica*)।

(ii) **একবর্ষজীবী** (Annuals) — যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র একটিমাত্র ঋতুতে শেষ হয় অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হবার পর একটি ঋতুর মধ্যে ফুল, ফল সৃষ্টি করে জীবনকাল শেষ হয়। তাদের **একবর্ষজীবী উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ**—সরষে (*Brassica nigra*), ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*) প্রভৃতি।

চিত্র 3.15 : কাণ্ডের প্রকৃতি।

(iii) **দ্বিবর্ষজীবী** (Biennials) — যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র শেষ হতে দুটি ঋতুর প্রয়োজন অর্থাৎ প্রথম ঋতুতে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় ঋতুতে ফুল, ফল ধারণ করে জীবন কাল শেষ হয়। এদের দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**—মুলো (*Raphanus sativus*), গাজর (*Daucas carota*) প্রভৃতি।
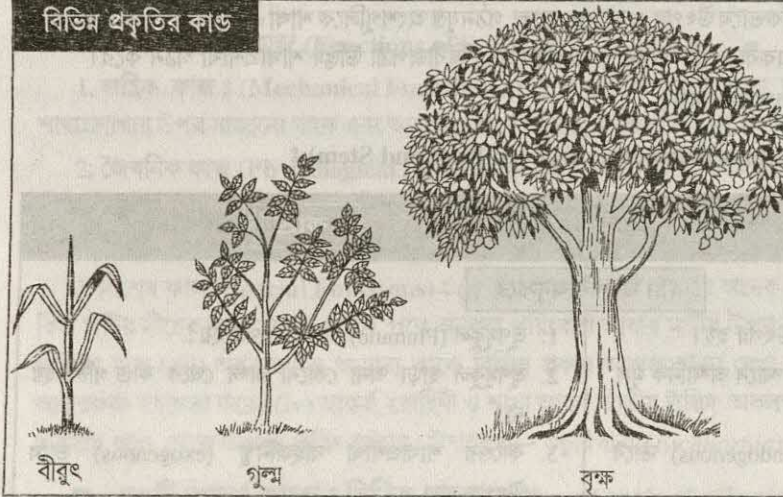
(iv) **বহুবর্ষজীবী** (Perennials)—যেসব বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের জীবনচক্র শেষ হতে দুটির বেশি ঋতুর প্রয়োজন তাদের **বহুবর্ষজীবী** বলে। **উদাহরণ**—আদা (*Zingiber officinale*), হলুদ (*Curcuma domestica*), কলা (*Musa sapiantum*) প্রভৃতি।

2. **গুল্ম (Shrub)** — যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড কাষ্ঠল কিন্তু গুঁড়িহীন এবং মাটির সামান্য উপরে শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করে, তাদের **গুল্ম** (Shrub) বলে। **উদাহরণ**— জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), নয়নতারা (*Vinca rosea*), আকন্দ (*Calotropis procera*) প্রভৃতি।

3. **বৃক্ষ (Tree)**— যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা, কাষ্ঠল ও গুঁড়িযুক্ত তাদের **বৃক্ষ** (Trees) বলা হয়। **উদাহরণ**—আম (*Mangifera indica*), বট (*Ficus benghalensis*), নারকেল (*Cocos nucifera*), তাল (*Borassus flabellifer*) প্রভৃতি।

### (c) কাণ্ডের প্রকার (Kinds of Stem) :

বীজের ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণমুকুল থেকে সব কাণ্ডের উৎপত্তি হলেও যে কাণ্ড স্বাভাবিক কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে তাদের **সাধারণ কাণ্ড** বলে। কাণ্ড সাধারণত শক্ত ও দৃঢ় হয়। এর ফলে উদ্ভিদ মাটিতে ঋজুভাবে দাঁড়াতে পারে। আবার অনেকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড দুর্বল বলে মাটিতে ঋজুভাবে দাঁড়াতে পারে না। তাই কাণ্ডকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— **সবল কাণ্ড** (Strong stem) ও **দুর্বল কাণ্ড** (Weak Stem)।

চিত্র 3.16 : বিভিন্ন প্রকৃতির কাণ্ড।

**A. সবল কাণ্ড (Strong Stem) :** বেশির ভাগ বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ সবল কাণ্ড বিশিষ্ট হয়। শাখাবিন্যাসের প্রকৃতির উপর সবল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদের গঠন ও আকার সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নীচে সবল কাণ্ডের বিভিন্ন প্রকার গঠন ও আকার আলোচনা করা হল।

(i) **পিরামিডাকার** (Excurrent) —এই ধরনের উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ডের শীর্ষে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। প্রধান কাণ্ড থেকে অনিয়ত বিন্যাস পদ্ধতিতে শাখা গঠিত হয় অর্থাৎ নীচের দিকের শাখাগুলি উপরের শাখার চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত। শাখাবিন্যাসের এই বিশেষ পদ্ধতির জন্য উদ্ভিদকে অনেকটা পিরামিডাকার দেখায়। উদাহরণ—পাইন (*Pinus longifolia*), দেবদারু (*Polyalthia longifolia*) প্রভৃতি।

চিত্র 3.17 : ভৌম পুষ্পদণ্ড।

(ii) **গম্বুজাকার** (Deliquescent) — এই ধরনের উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ডের শীর্ষের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এর ফলে নিয়ত শাখাবিন্যাস পদ্ধতিতে শাখাগুলি সাজানো হয় অর্থাৎ উপরের শাখাগুলি নীচের শাখার চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত। উদ্ভিদকে অনেকটা গম্বুজের মতো দেখায়। উদাহরণ — আম (*Mangifera indica*), বট (*Ficus benghalensis*) প্রভৃতি।

(iii) **অশাখ কাণ্ড** (Caudex) — এসব উদ্ভিদের কাণ্ড স্তম্ভাকার কাষ্ঠল, লম্বা ও শাখাবিহীন এবং কাণ্ড শীর্ষের ঘনপর্বগুলিতে একগুচ্ছ পাতা মুকুটের মতো সাজানো থাকে। তাই তাদের **অশাখ কাণ্ড** বলে। উদাহরণ — নারকেল (*Cocos nucifera*), তাল (*Borassus flabellifer*) প্রভৃতি।

(iv) **তৃণকাণ্ড** (Culm) — যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড গ্রন্থিল (Joints), শাখাবিহীন তাদের তৃণকাণ্ড বলে। উদাহরণ — বাঁশ (*Bambusa*), ধান (*Oryza*) প্রভৃতি বিভিন্ন ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ।

(v) **ভৌম পুষ্পদণ্ড** (Scape) — কতকগুলি একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নীচে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের কোনো কাণ্ড নেই মনে হয়। তাই এদের **নিষ্কাণ্ড উদ্ভিদ** বলে। কাণ্ড থেকে যে পাতা উৎপন্ন হয় সেগুলি বছরের সবসময় মাটির উপরে দেখা যায়। উপযুক্ত ঋতুতে মাটির নীচের কাণ্ড থেকে একটি অশাখ বিটপ অংশ পাতাগুলির মধ্যভাগ দিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে এবং ফুল ধারণ করে। এই বিটপকে **ভৌম পুষ্পদণ্ড** বলে। উদাহরণ—রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*), পেঁয়াজ (*Allium cepa*)।

● **অশাখ কাণ্ড ও তৃণকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Caudex and Culm) :**

| অশাখ কাণ্ড | তৃণকাণ্ড |
|---|---|
| 1. কাষ্ঠল ও শাখাবিহীন। | 1. কাষ্ঠল বা দুর্বল শাখাযুক্ত বা শাখাহীন। |
| 2. পর্ব ও পর্বমধ্য নিরেট। | 2. গ্রন্থিল ও সাধারণত পর্ব নিরেট পর্বমধ্য ফাঁপা। |
| 3. কাণ্ডাগ্রে পাতা মুকুটের মতো সাজানো থাকে। | 3. নীচের অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সব জায়গায় পাতা সজ্জিত থাকে। |
| 4. উদাহরণ—তাল, সুপারি ইত্যাদি। | 4. উদাহরণ— বাঁশ, ধান প্রভৃতি। |

**B. দুর্বল কাণ্ড (Weak Stem) :** যে সব উদ্ভিদের কাণ্ড সবল না হওয়ায় মাটির উপরে খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না তাদের দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ বলে। এদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(a) **ব্রততী** (Creepers) ও (b) **রোহিণী** (Climbers)।

চিত্র 3.18 : ব্রততী।

(a) **ব্রততী (Creepers) :** যে সব দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ মাটির উপর অনুভূমিকভাবে (Horizontally) অবস্থান করে তাদের **ব্রততী** বলে। ব্রততী তিন প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **শয়ান** (Prostrate or procumbent)—এ ধরনের উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির উপরে সম্পূর্ণভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে এবং এর পর্ব থেকে কোনো অস্থানিক মূল নির্গত হয় না। **উদাহরণ**—পুঁইশাক (*Basella rubra*)।

(ii) **উর্ধ্বাগ্র** (Decumbent) — এইসব উদ্ভিদের কাণ্ডের শীর্ষভাগ মাটির সংস্পর্শে না থেকে কিছুটা উপরে উঠে থাকে এবং এদের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয় না। **উদাহরণ**—বাসন্তী (*Lindenbergia indica*)।

(iii) **লতানো** (Creeping) — এই জাতীয় কাণ্ড সম্পূর্ণভাবে মাটিকে স্পর্শ করে অবস্থান করে ও অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে এই কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। **উদাহরণ**—দূর্বা (*Cynodon dactylon*)।

(b) **রোহিণী (Climbers) :** যে সব দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ মাটির সংস্পর্শে না থেকে কোনো অবলম্বনকে জড়িয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করে তাদের **রোহিণী** বলে। আরোহণের রীতি এবং আরোহণ অঙ্গের প্রকৃতির ভিত্তিতে এদের নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) **বল্লি** (Stem climbers)—যে সব উদ্ভিদ কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজেদের সরু ও নরম কাণ্ডের সাহায্যে অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে ওঠে তাদের
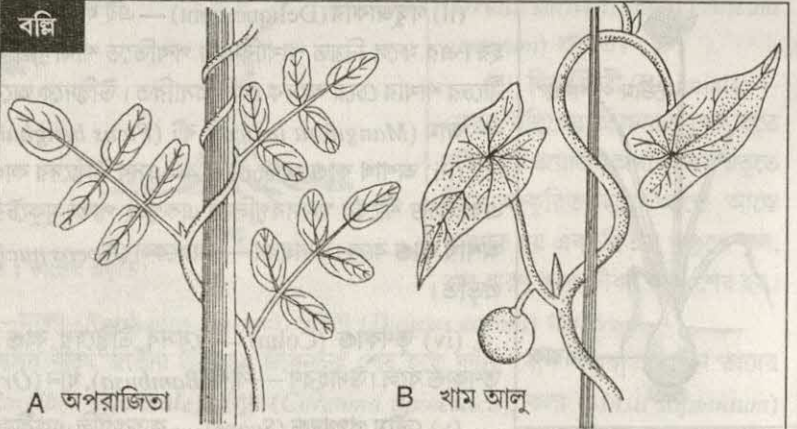
চিত্র 3.19 : রোহিণী (বল্লি)— (A)-দক্ষিণাবর্ত বল্লি ও (B)-বামাবর্ত বল্লি।

বল্লি বা বল্লিজাতীয় উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*)। যে বল্লি জাতীয় উদ্ভিদ অবলম্বনকে বাম দিক থেকে ডানদিকে বেষ্টন করে উপরে ওঠে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে আবর্তিত হয় সেইদিকে) তাকে **দক্ষিণাবর্ত** (Dextrose) **বল্লি** বলে। **উদাহরণ** — শিম (*Dolichos lablab*)। যে বল্লি জাতীয় উদ্ভিদ অবলম্বনকে জড়িয়ে ডান দিক থেকে বামদিকে আবর্তিত হয় (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) তাদের **বামাবর্ত** (Sinistrorse) **বল্লি** বলে। **উদাহরণ**—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*), তরুলতা (*Ipomoea quamoclit*) প্রভৃতি।

(ii) **কাষ্ঠল লতা** (Lianes)—এই জাতীয় রোহিণীর কাণ্ড কাষ্ঠল ও লম্বা হয়। এরা বড়ো বৃক্ষকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে আলোর সন্ধানে অনেক উঁচুতে ওঠে। **উদাহরণ**—মাধবীলতা (*Hiptage madhablata*), রেঙুন লতা (*Quisqualis indica*) প্রভৃতি।

(iii) **অঙ্গরোহিণী** (Organ climbers)—এই ধরনের রোহিণী বিভিন্ন সাহায্যকারী অঙ্গের সাহায্য নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করে। সাহায্যকারী অঙ্গের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়।

1. **আকর্ষ রোহিণী** (Tendril climbers) — এদের আরোহণের অঙ্গকে আকর্ষ বলে। আকর্ষ এক প্রকারের সরু পত্রশূন্য অঙ্গ। এরা খুবই অনুভূতিসম্পন্ন হয় এবং কোনো আশ্রয়দাতার সংস্পর্শে এলে তাকে স্প্রীং-এর মতো পেঁচিয়ে ধরে। এইরূপ উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে আকর্ষে পরিণত হয়। যেমন—ঝুমকোলতার (*Passiflora foetida*) কাক্ষিক মুকুল, হাড়জোড়ার (*Vitis quadrangularis*) অগ্রমুকুল, ছাগলবটির (*Clematis gouriana*) পত্রবৃন্ত, বিশালাঙুলীর ফলকাগ্র, মটরের (*Pisum sativum*) শীর্ষপত্রক, কুমারিকার (*Smilex zeylanica*) উপপত্র, কুমড়োর (*Cucurbita maxima*) শাখা ইত্যাদি।
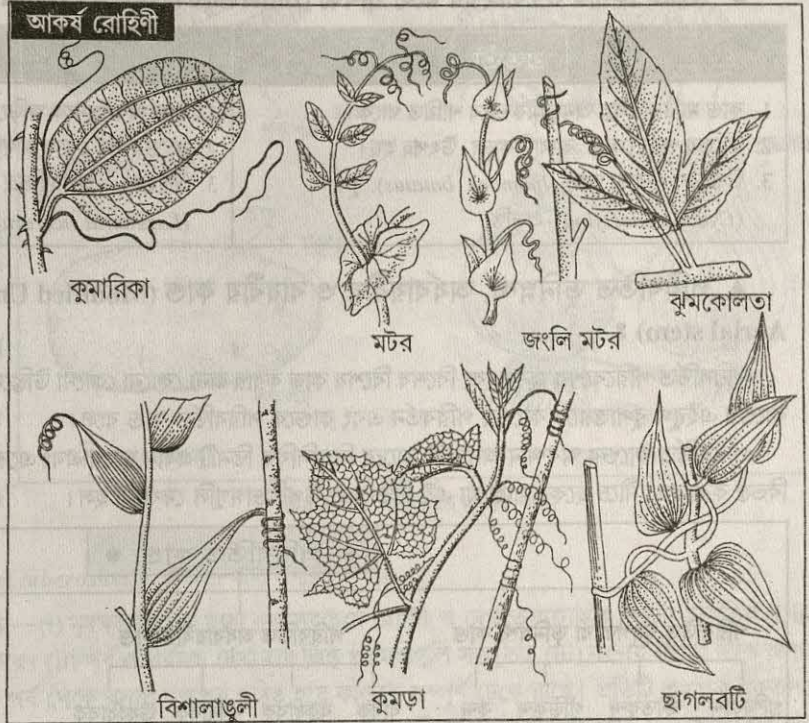
চিত্র 3.20 : বিভিন্ন প্রকার আকর্ষ রোহিণী।

2. **অঙ্কুশ রোহিণী** (Hook climber) — এই ধরনের উদ্ভিদের ফুলের বৃন্ত থেকে অঙ্কুশের মতো একপ্রকার অঙ্গ উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**— কাঁঠালিচাঁপা (*Artabotrys uncinatus*)

3. **কণ্টক রোহিণী** (Thorn climbers or Scramblers)—এই প্রকার উদ্ভিদের আরোহণের অঙ্গ হল কন্টক। এরা আশ্রয়দাতার দেহে কণ্টকগুলি বিদ্ধ করে উর্ধ্বে
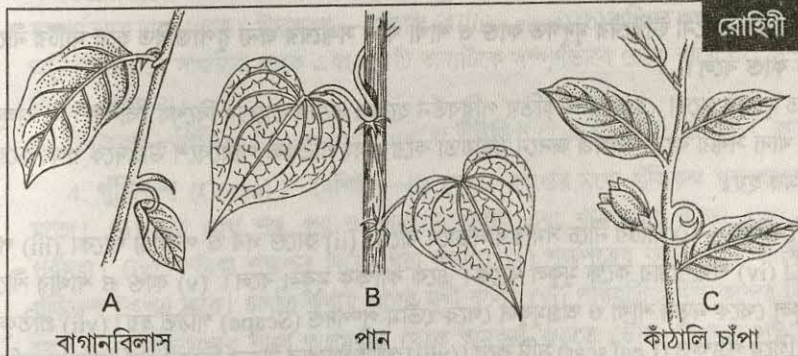
চিত্র 3.21 : (A) কণ্টক রোহিণী, (B) মূল রোহিণী এবং (C) অঙ্কুশ রোহিনী।

আরোহণ করে। **উদাহরণ**—বেতের (*Calamus rotang*) পত্রকন্টক, বাগানবিলাসের (*Baugainvillea spectabilis*) শাখা-কন্টক, গোলাপের (*Rosa centifolia*) ত্বক-কন্টক, কুলের (*Zizyphus mauritiana*) উপপত্র-কন্টক ইত্যাদি।

4. **মূলরোহিণী** (Root climbers)— এই প্রকারের রোহিণী কাণ্ডের পর্ব থেকে নির্গত অস্থানিক মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতাকে আঁকড়ে ধরে উপরে ওঠে। **উদাহরণ**— পান (*Pipiper betal*), গজপিপুল (*Scindupsus officinalis*) ইত্যাদি।

5. **অ্যাড্‌হেসিভ রোহিণী** (Adhesive climbers)—এই উদ্ভিদের অস্থানিক মূলে সৃষ্ট একপ্রকারের আঠালো চাক্‌তি বা হ্যাপ্টেরার (Haptera) সাহায্যে উপরে আরোহণ করে। **উদাহরণ**—আইভি লতা।

● **ব্রততী ক্রিপার ও রোহিণীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Creeper and Climber) ঃ**

| ব্রততী | রোহিণী |
|---|---|
| 1. কাণ্ড মাটির উপর অনুভূমিকভাবে শায়িত থাকে। | 1. কাণ্ড অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে ওঠে। |
| 2. কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিকমূল উৎপন্ন হয়। | 2. কাণ্ডের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় না। |
| 3. উদাহরণ—রাঙা আলু (*Ipomoea batatus*), দূর্বা (*Cynodon dectylon*) প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*), লাউ (*Lagenaria sicerara*) প্রভৃতি। |

## ▲ পরিবর্তিত ভূনিম্নস্থ, অর্ধবায়বীয় ও বায়বীয় কাণ্ড (Modified Underground, subaerial and Aerial stem) ঃ

পরিবর্তিত পরিবেশের জন্য এবং বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য কোনো কোনো উদ্ভিদের কাণ্ডের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। কাণ্ডের এইরূপ রূপান্তরকে কাণ্ডের পরিবর্তন এবং কাণ্ডকে পরিবর্তিত কাণ্ড বলে।

পরিবর্তিত কাণ্ডের অবস্থান অনুযায়ী তাদের নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ভাগে এবং এদের প্রত্যেকটিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। নীচে ছকের সাহায্যে এই বিভাগ ও উপবিভাগগুলি দেখানো হল।
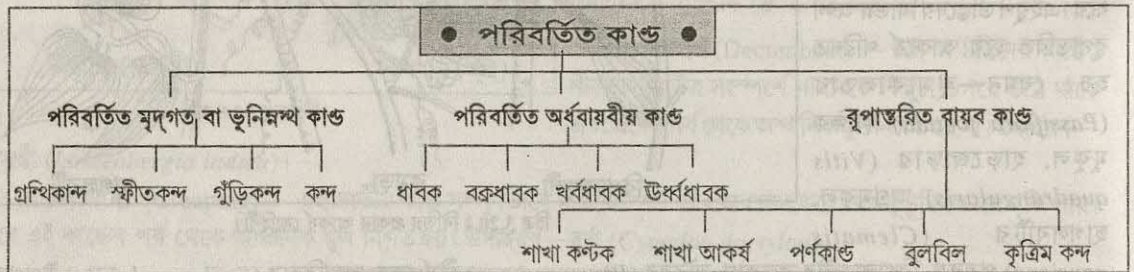
### ➤ (a) পরিবর্তিত মৃদ্‌গত বা ভূনিম্নস্থ কাণ্ড (Modified Underground Stem) ঃ

❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কোনো কোনো উদ্ভিদের মৃদ্‌গত কাণ্ড ও শাখা খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য রূপান্তরিত হয়ে মাটির নীচে থাকে, তাদের ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড বলে।**

অনেক সময় কাণ্ডগুলিকে স্ফীত মূলের মতো দেখায়। আকৃতির পরিবর্তন হলেও এদের কাণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। কাণ্ডগুলি ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, অঙ্গজ জননে সহায়তা করে এবং প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদকে রক্ষা করে। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড সাধারণত চার রকমের হয়।

1. **গ্রন্থিকন্দ (Rhizome) ঃ বৈশিষ্ট্য**—(i) মাটির নীচে সমান্তরালভাবে বাড়ে। (ii) কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। (iii) পর্ব থেকে শল্কপত্র (scale) উৎপন্ন হয়। (iv) শল্কপত্রের কক্ষে মুকুল থাকে। একে কাক্ষিক মুকুল বলে। (v) কাণ্ড ও শাখার শীর্ষে অগ্রমুকুল জন্মায়। (vi) কাক্ষিক মুকুল থেকে নতুন শাখা ও অগ্রমুকুল থেকে ভৌম পুষ্পদণ্ড (Scape) গঠিত হয়। (vii) প্রতিকূল অবস্থায় পুরোনো শাখাগুলি শুকিয়ে গিয়ে পত্রক্ষত (Leaf scar) সৃষ্টি করে। (viii) স্ফীত কাণ্ডের নীচের দিকের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়।

**উদাহরণ**—আদা (*Zingiber officinale*), হলুদ (*Curcuma domestica*) প্রভৃতি। মান কচুর (*Alocasia indica*) ক্ষেত্রে মাটির নীচের কাণ্ড মোটা হয়ে খাড়াভাবে অবস্থান করে। এর কোনো শাখা হয় না। একে **মূলাকার কাণ্ড** (*Root stock*) বলে। **কাজ** ঃ খাদ্য সঞ্চয় করা।

2. **স্ফীতকন্দ (Tuber)** ঃ **বৈশিষ্ট্য**—(i) আলু গাছের কাণ্ড মাটির নীচে সরু সরু শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন করে সমান্তরালভাবে বাড়ে। এই সরু কাণ্ডগুলির শীর্ষ পরে অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চিত হয়ে স্ফীত ও গোলাকার হয়। একেই **স্ফীতকন্দ** বলে। (ii) এদের স্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য দেখা যায়। (iii) পর্ব থেকে শল্কপত্র উৎপন্ন হয়। (iv) এদের কাক্ষিক ও অগ্রমুকুল থাকে। প্রত্যেকটি পর্বের কক্ষ কতকটা ছোটো গর্তের মতো। কাক্ষিক মুকুল সহ গর্তটিকে **চোখ** (eye) বলে। এই চোখ থেকে অনুকূল পরিবেশে কাক্ষিক মুকুলের সাহায্যে নতুন উদ্ভিদ গঠিত হয়। (v) স্ফীতকন্দে কোনো মূল থাকে না।
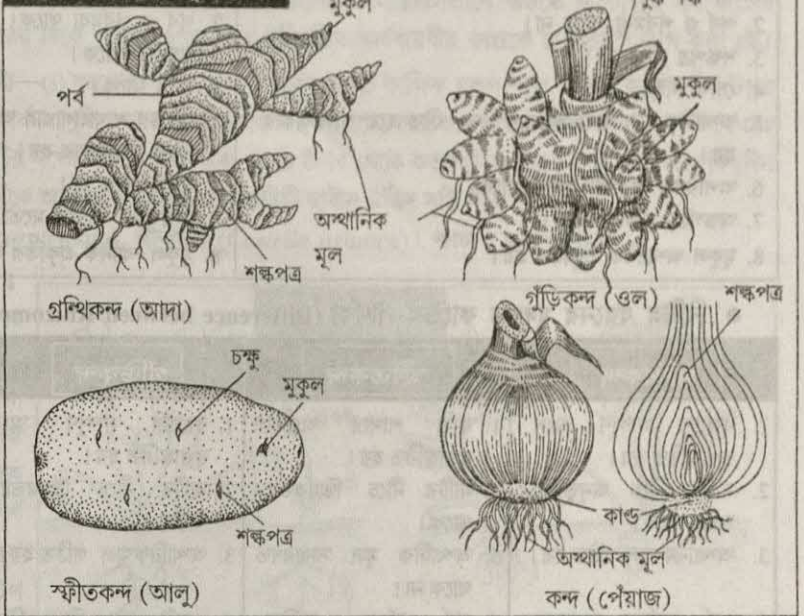
চিত্র 3.22 ঃ পরিবর্তিত মৃদ্‌গত কাণ্ড।

**উদাহরণ**—আলু (*Solanum tuberosum*)। **কাজ**—খাদ্য সঞ্চয়।

3. **কন্দ (Bulb)** ঃ **বৈশিষ্ট্য**—(i) মৃদ্‌গত কাণ্ডের মধ্যে কন্দ সবচেয়ে ছোটো ও দেখতে অনেকটা ছোটো চাকতির (Disc) মতো এবং লম্বভাবে অবস্থান করে। (ii) পর্ব ও পর্বমধ্য দেখা যায় কিন্তু পর্বমধ্যগুলি সংকুচিত (iii) কন্দের নীচের দিকে অসংখ্য অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। (iv) পর্ব থেকে রসাল শল্কপত্র গঠিত হয়ে কাণ্ডকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে। প্রতিটি শল্কপত্র প্রকৃতপক্ষে পত্রমূল (Leaf base)। (v) কাণ্ডের কেন্দ্রে অগ্রমুকুল এবং শল্কপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল উৎপন্ন হয়। (vi) অগ্রমুকুল ভৌম পুষ্পদণ্ড (Scape) ও কাক্ষিক মুকুল অপত্য কন্দ (Daughter bulb) সৃষ্টি করে।

কন্দকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ (a) **পুতিত কন্দ** বা **বেষ্টিত কন্দ** (Tunicated bulb)— রসাল শল্কপত্রগুলি কন্দের সমকেন্দ্রীয়ভাবে একটি অন্যটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বেষ্টন করে অবস্থান করে। শল্কপত্রগুলি আবার একটি শুষ্ক ঝিল্লির সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ঢাকা থাকে। **উদাহরণ**—**পেঁয়াজ** (*Allium cepa*) (b) **শল্কিত কন্দ** (Scaly bulb)—এই ধরনের কন্দের শল্কপত্রগুলি অনিয়মিতভাবে সাজানো থাকে এবং একটি অন্যটিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখে না। সম্পূর্ণ কন্দকে ঢেকে রাখার মতো কোনো ঝিল্লিও থাকে না।

**উদাহরণ**—**লিলি** (*Lilium candidum*) ও **টিউলিপ** (*Tulipa gesneriana*)। **কাজ**— খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা।

4. **গুঁড়িকন্দ (Corm)** ঃ **বৈশিষ্ট্য**—(i) মৃদ্‌গত কাণ্ডের মধ্যে গুঁড়িকন্দ খুব বড়ো এবং দেখতে অনেকটা গাছের গুঁড়ির মতো। (ii) এরা বেশ শক্ত, পুরু ও প্রায় গোলাকার এবং খাড়াভাবে বাড়ে। (iii) প্রকৃতপক্ষে গুঁড়িকন্দ একটি পরিবর্তিত পর্বমধ্য। (iv) পর্বমধ্য শুষ্কপত্র দিয়ে ঘেরা থাকে। (v) শল্কপত্রের কক্ষ থেকে কাক্ষিক মুকুল সৃষ্ট হয়। এই মুকুল অপত্য গুঁড়িকন্দ উৎপন্ন করে। চলতি কথায় এদের মুখী বলে। (vi) পরিবর্তিত গুঁড়ি কন্দের বিভিন্ন স্থান থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। (vii) গুঁড়িকন্দের শীর্ষে অগ্রমুকুল থেকে অনুকূল ঋতুতে ভৌম পুষ্পদণ্ড সৃষ্ট হয়।

**উদাহরণ**—**ওল** (*Amorphophallus campanulatus*)। **কাজ** ঃ খাদ্য সঞ্চয় করা।

● কন্দাল মূল ও স্ফীতকন্দের পার্থক্য (Difference between Tuberous root and Tuber) ঃ

| কন্দাল মূল | স্ফীতকন্দ |
|---|---|
| 1. পরিবর্তিত অস্থানিক মূল। | 1. পরিবর্তিত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। |
| 2. পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না। | 2. পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। |
| 3. শল্কপত্র থাকে না। | 3. শল্কপত্র থাকে। |
| 4. চোখ নেই। | 4. চোখ থাকে। |
| 5. অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হয়ে শাঙ্কবাকার হয়। | 5. কাণ্ডের শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য ফুলে গিয়ে গোলাকার হয়। |
| 6. অপরিণত অবস্থায় মূলত্র থাকে। | 6. মূলত্র থাকে না। |
| 7. অন্তর্গঠন মূলের মতো। | 7. অন্তর্গঠন কাণ্ডের মতো। |
| 8. মুকুল অস্থানিক প্রকৃতির হয়। | 8. মুকুল স্থানিক প্রকৃতির হয়। |

● বিভিন্ন ধরনের মৃদ্গত কাণ্ডের পার্থক্য (Difference between Rhizome, Tuber, Corm and Bulb) ঃ

| গ্রন্থিকন্দ | স্ফীতকন্দ | গুঁড়িকন্দ | কন্দ |
|---|---|---|---|
| 1. কাণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ রূপান্তরিত হয়। | 1. কাণ্ড শাখার অগ্রভাগ রূপান্তরিত হয়। | 1. কাণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ রূপান্তরিত হয়। | 1. কাণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ রূপান্তরিত হয়। |
| 2. মাটির নীচে অনুভূমিক ভাবে থাকে। | 2. মাটির নীচে তির্যকভাবে থাকে। | 2. মাটির নীচে উল্লম্বভাবে থাকে। | 2. মাটির নীচে উল্লম্বভাবে থাকে। |
| 3. অস্থানিক মূল গঠিত হয়। | 3. অস্থানিক মূল সাধারণত থাকে না। | 3. অস্থানিক মূল গঠিত হয়। | 3. কাণ্ডের নীচের দিকে অস্থানিক মূল গুচ্ছাকারে থাকে। |
| 4. পর্ব, পর্বমধ্য, অগ্রমুকুল ও কাক্ষিক মুকুল থাকে। | 4. পর্ব, পর্বমধ্য ও কাক্ষিক মুকুল থাকে। | 4. একটি পর্বমধ্য নিয়ে গঠিত। | 4. অগ্রমুকুল ও কাক্ষিক মুকুল থাকে। পর্ব ও পর্বমধ্য সংকুচিত বলে সুস্পষ্ট নয়। |
| 5. শল্কপত্র শুকনো। | 5. শল্কপত্র শুকনো। | 5. শল্কপত্র শুকনো। | 5. শল্কপত্র রসাল। |
| 6. বিশেষ ঋতুতে ভৌম পুষ্পদণ্ড গঠিত হয়। | 6. ভৌম পুষ্পদণ্ড থাকে না। | 6. বিশেষ ঋতুতে ভৌম পুষ্পদণ্ড গঠিত হয়। | 6. বিশেষ ঋতুতে ভৌম পুষ্পদণ্ড গঠন করে। |
| 7. স্ফীত লম্বা ও শাখাপ্রশাখা যুক্ত। | 7. স্ফীত গোলাকার বা ডিম্বাকার। | 7. গোলাকার স্ফীত ও গুটি যুক্ত। | 7. নীচের দিকে চ্যাপটা ও উপরের দিক ক্রমশ সরু অর্থাৎ অনেকটা ফ্লাস্কের মতো। |
| 8. কাণ্ডে খাদ্য জমা হয়। | 8. কাণ্ডে খাদ্য জমা থাকে। | 8. কাণ্ডে খাদ্য জমা হয়। | 8. শল্কপত্রে খাদ্য জমা থাকে। |
| 9. উদাহরণ—আদা (*Zingiber*)। | 9. উদাহরণ—আলু (*Solanum*)। | 9. উদাহরণ—ওল (*Amorphophallus*)। | 9. উদাহরণ—পেঁয়াজ (*Allium*)। |

● ভূনিম্নস্থ কাণ্ড ও মূলের পার্থক্য (Difference between Underground Stem and Main Root) ঃ

| ভূনিম্নস্থ কাণ্ড | প্রধান মূল |
|---|---|
| 1. মাটির নীচে সমান্তরাল বা অনুভূমিকভাবে থাকে। | 1. মাটির নীচে অনুভূমিকভাবে থাকে। |
| 2. পর্ব ও পর্বমধ্যে থাকে। | 2. পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না। |
| 3. কাক্ষিক ও অগ্রমুকুল থাকে। | 3. কাক্ষিক ও অগ্রমুকুল থাকে না। |
| 4. অগ্রে মূলত্র থাকে না। | 4. অগ্রে মূলত্র থাকে। |
| 5. শল্কপত্র থাকে। | 5. শল্কপত্র থাকে না। |
| 6. অস্থানিক মূল গঠন করে। | 6. অস্থানিক মূল থাকে না। |
| 7. মূলরোম থাকে না। | 7. মূলরোম থাকে। |

➤ (b) **পরিবর্তিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড (Modified Subaerial Stem) :**

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : কতগুলি অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বিশেষ কাজ করার জন্য রূপান্তরিত হয় তাকে পরিবর্তিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বলে।**

অর্ধবায়বীয় কাণ্ড মাটির বা জলের উপরে বা মাটির সামান্য নীচ দিয়ে সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। এই সব কাণ্ডের নীচের দিকে অস্থানিক মূল ও উপরের দিকে শাখা উৎপন্ন হয়। পরিবর্তিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ডকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **ধাবক (Runner) :** বৈশিষ্ট্য—(i) কাণ্ডের নীচের দিকের পর্বের একটি কাক্ষিক মুকুল শাখা উৎপন্ন করে মাটির উপর সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। (ii) পর্বমধ্যগুলি লম্বা ও বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে বলে এদের **ধাবক** বলে। (iii) পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়ে ধাবককে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে এবং পর্বের উপর থেকে কতকগুলি পাতা উৎপন্ন হয়। (iv) কিছুদিন পর পর্বমধ্যগুলি নষ্ট হয়ে প্রতিটি পর্বকে আলাদা করে দেয় এবং প্রতিটি স্বাধীন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

**উদাহরণ—আমরুল** (*Oxalis corniculata*), **থানকুনি** (*Centella asiatica*)। **কাজ :** অঙ্গজ জনন।

2. **বক্রধাবক (Stolon) :** **বৈশিষ্ট্য**— (i) এদের একপ্রকার বিশেষ ধরনের ধাবক বলা যায়। কাণ্ডের নীচের দিকের পর্বের কাক্ষিক মুকুল শাখা উৎপন্ন করে এবং এই শাখা অত্যন্ত সরু বলে পর্বমধ্যগুলি ধনুর মতো বেঁকে যায়। শুধুমাত্র পর্বগুলি মাটিকে স্পর্শ করে। (ii) পর্বের নীচের দিকে অস্থানিক মূল এবং উপর দিকে বিটপ সৃষ্টি হয়। (iii) কিছুদিন পর পর্বমধ্যগুলি নষ্ট হয়ে প্রতিটি পর্বকে আলাদা করে দেয় এবং প্রতিটি নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

**উদাহরণ—মেন্থা** (*Fragaria vesca*)। **কাজ :** অঙ্গজ জনন।

3. **খর্বধাবক (Offset) :** **বৈশিষ্ট্য**— (i) সাধারণত খর্ব ধাবক জলজ উদ্ভিদে দেখা যায়। এরা ধাবকের মতো কিন্তু পর্বমধ্যগুলি ছোটো ও মোটা হওয়ায় কাণ্ডকে খর্বাকৃতি দেখায়।

চিত্র 3.23 : কয়েকটি পরিবর্তিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড।

(ii) পর্বের নীচের দিকে অস্থানিক মূল ও উপরের দিকে পাতা উৎপন্ন হয়।

**উদাহরণ—পানা** (*Pistia stratiotes*), **কচুরিপানা** (*Eichhornia crassipes*) প্রভৃতি। **কাজ :** অঙ্গজ জনন।

4. **ঊর্ধ্বধাবক (Sucker) :** বৈশিষ্ট্য—(i) কাণ্ডের মাটির নীচের অংশে কাক্ষিক মুকুল জন্মায় এবং ওই মুকুল থেকে শাখা উৎপন্ন হয়ে মাটির ভেতরে তির্যকভাবে কিছুদূর অগ্রসর হয়। (ii) পরে মাটি ভেদ করে এই শাখা উপরের দিকে উঠে আসে। (iii) এই শাখার পর্ব থেকে অসংখ্য অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় এবং শীর্ষে স্বাভাবিক পাতা সৃষ্টি করে।

**উদাহরণ—চন্দ্রমল্লিকা** (*Chrysanthemum coronarium*), **মেন্থা** (*Mentha spicata*), **মুথা ঘাস** (*Cyperus rotundus*)। **কাজ :** অঙ্গজ জনন।

● অর্ধবায়ব কাণ্ডগুলির পার্থক্য (Difference of different Subaerial stem) :

| ধাবক | খর্ব ধাবক | বক্র ধাবক | উর্ধ্ব ধাবক |
|---|---|---|---|
| 1. কাণ্ডের নীচের দিকে পত্র-কক্ষের কাক্ষিক মুকুল থেকে গঠিত হয়। | 1. খর্বাকৃতি কাণ্ডের পত্র কক্ষের কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. পার্শ্বমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল থেকে গঠিত হয়। |
| 2. কাণ্ডটি সরু এবং পর্বমধ্য লম্বা হয়। | 2. কাণ্ডটি খর্বাকৃতি, পর্বমধ্যগুলি হ্রস্ব ও স্থূল হয়। | 2. কাণ্ড ও শাখাগুলি অত্যন্ত সরু বলে পর্বমধ্যগুলি ধনুর মতো বেঁকে যায়। শুধুমাত্র পর্বগুলি মাটি স্পর্শ করে। | 2. কাণ্ড মাটির নীচে কিছুদূর অনুভূমিকভাবে বাড়ার পর শেষে মাটি ভেদ করে উপর উঠে আসে এবং বায়ব বিটপ গঠন করে। |
| 3. উদাহরণ—আমরুল, থানকুনি প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ—কচুরিপানা, বড়ো পানা ইত্যাদি। | 3. উদাহরণ—মেন্থা, স্ট্রবেরি প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ—মুথা ঘাস, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি। |

## ➤ (c) পরিবর্তিত বায়বীয় কাণ্ড (Modified Aerial stem) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব উদ্ভিদের বায়বীয় কাণ্ড বিশেষ কাজের জন্য আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় এবং কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে তাদের পরিবর্তিত বায়বীয় কাণ্ড বলে।**

এসব উদ্ভিদ কাণ্ডের বাইরের আকৃতি দেখে এদের কাণ্ড বলে চেনা যায় না। আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটলেও তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখে। এদের **পরিবর্তিত বায়বীয় কাণ্ড** বলা হয়। এদের অবস্থান, উৎপত্তি ও অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করে তবে কাণ্ড বলে চিহ্নিত করা যায়। রূপান্তরিত কাণ্ডকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়।

চিত্র 3.24 : শাখা কন্টক (দুরন্ত)।

1. **শাখাকন্টক (Thorn) : বৈশিষ্ট্য**—(i) অনেক উদ্ভিদের পর্বের কাক্ষিক মুকুল শাখা, পাতা ও পুষ্প উৎপন্ন না করে কন্টকে রূপান্তরিত হয়। এদের **শাখা-কন্টক** বলে। (ii) অনেক সময় শাখা-কন্টক থেকে পাতা ও ফুল সৃষ্টি হয়। (iii) এরা সরল বা শাখান্বিত হয়। **উদাহরণ—দুরন্ত** (*Duranta repens*), **বেল** (*Aegle mermalos*)। **কাজ :** আত্মরক্ষা শাখাকন্টকের প্রধান কাজ।

2. **শাখা আকর্ষ (Stem tendrill) : বৈশিষ্ট্য**—(i) দুর্বল কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল অনেক সময় সরু প্যাঁচানো তারের মতো অঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এদের **শাখা আকর্ষ** বলে। (ii) শাখা আকর্ষ সরল বা শাখান্বিত হয়। **উদাহরণ—ঝুমকোলতা** (*Passiflora foetida*), **হাতজোড়া** (*Vitis quadrangularis*) ইত্যাদি। **কাজ :** শাখা আকর্ষ কোনো অবলম্বনকে ধরে দুর্বল কাণ্ডকে আরোহণ করতে সাহায্য করে।

3. **পর্ণকাণ্ড (Phylloclade) : বৈশিষ্ট্য**—(i) এরা একধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড। সাধারণত জাঙ্গাল (Xerophyte) উদ্ভিদে দেখা যায়। (ii) উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার মতো চ্যাপটা হয়ে যায় এবং সবুজ বর্ণ ধারণ করে। (iii) পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয় ও বাষ্পমোচন রোধ করে। (iv) কাণ্ডে পর্ব

চিত্র 3.25 : কয়েকটি পরিবর্তিত বায়বীয় কাণ্ড।

ও পর্বমধ্য থাকে। (v) পর্ণকাণ্ডে পর্ব থেকে মুকুল ও শাখা উৎপন্ন হয়। (vi) পর্ণকাণ্ড একটি মাত্র পর্বমধ্যযুক্ত হলে তাকে **একক পর্ণকাণ্ড বা ক্ল্যাডোড** (Cladode) বলে। **উদাহরণ—পর্ণকাণ্ড**—ফণীমনসা (*Opuntia dillenei*), **একক পর্ণকাণ্ড**—শতমূলী (*Asparagus racemosus*)। **কাজ ঃ** এই ধরনের উদ্ভিদে কাণ্ড সবুজ হওয়ায় পাতার মতো সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে।

4. **বুলবিল (Bulbil) ঃ বৈশিষ্ট্য**—(i) কতকগুলি উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল শাখায় পরিণত না হয়ে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং ফেঁপে গোলাকার হয়। এই বৃপান্তরিত কাক্ষিক মুকুলকে **বুলবিল** বলে। (ii) পরে বুলবিল মাটিতে পড়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। **উদাহরণ**—গ্লোবা (*Globba bulbifera*), **চুপড়ি আলু** (*Dioscorea alata*)। **কাজ ঃ** অঙ্গজ জনন, প্রতিকূল জীবিতা, খাদ্য সঞ্চয় প্রভৃতি প্রধান কাজ।

চিত্র 3.26 ঃ বুলবিল, পর্ব ও পর্বমধ্যযুক্ত পুষ্পাক্ষ।

5. **পুষ্পাক্ষ (Thalamus) ঃ** বৈশিষ্ট্য—(i) ফুলের বিভিন্ন স্তবক যে অক্ষের উপর সাজানো থাকে তাকে **পুষ্পাক্ষ** বলে। (ii) পুষ্পাক্ষে সাধারণ কাণ্ডের মতো পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। কিন্তু পর্ব ও পর্বমধ্যগুলি এত কাছাকাছি থাকে যে তাদের আলাদা করে দেখা যায় না। **উদাহরণ**—শ্বেত হুড়হুড়ে (*Gynandropsis pentaphylla*) গাছের পুষ্পাক্ষে পর্ব ও পর্বমধ্য পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। **কাজ ঃ** ফুলের বিভিন্ন স্তবককে আবদ্ধ করা।

● **পর্ণকাণ্ড ও ক্ল্যাডোডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Phylloclade and Cladode) ঃ**

| পর্ণকাণ্ড | ক্ল্যাডোড |
|---|---|
| 1. একাধিক পর্বমধ্য নিয়ে বৃপান্তরিত কাণ্ডকে **পর্ণকাণ্ড** বলে। | 1. একটি মাত্র পর্বমধ্যযুক্ত বৃপান্তরিত কাণ্ডকে ক্ল্যাডোড বা একক পর্ণকাণ্ড বলে। |
| 2. কাণ্ড রসাল, চ্যাপটা ও সবুজ বর্ণের হয়। | 2. কাণ্ড বা শাখা ছোটো, চ্যাপটা, সবুজ এবং পাতার মতো হয়। |
| 3. পাতাগুলি কাঁটায় বৃপান্তরিত হয়। | 3. পাতা থাকে না। |
| 4. চ্যাপটা কাণ্ডের পর্ব থেকে মুকুল ও ফুল উৎপন্ন হয়। | 4. ক্ল্যাডোড থেকে কোনো মুকুল বা ফুল উৎপন্ন হয় না। |
| 5. উদাহরণ—ফণীমনসা। | 5. উদাহরণ—শতমূলী। |

## ◎ 3.3. পাতা (Leaf) ◎

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পাতা হল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টি আকর্ষী অঙ্গ। পাতা, কাণ্ড ও তার শাখাপ্রশাখার পর্ব থেকে পার্শ্বীয় অঙ্গ হিসাবে উৎপন্ন হয়। এরা সাধারণ সবুজ বর্ণের, চ্যাপটা, প্রসারিত ও সীমিত বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। পাতায় ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। তা ছাড়া বাষ্পমোচন, শ্বসন, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পাতায় ঘটে। সুতরাং পাতা হল উদ্ভিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

## ▲ পাতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, আদর্শ পাতার বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ ও কাজ (Definition, Characteristics, Different parts of a Typical Kinds of leaves and Functions)

❖ (a) **পাতার সংজ্ঞা (Definition of leaf) :** **কাণ্ড ও তার শাখাপ্রশাখার পর্ব থেকে নির্গত পার্শ্বীয়, প্রসারিত, চ্যাপটা, বহির্জনিষ্ণু, সীমিত বৃদ্ধিসম্পন্ন, পাতলা সবুজ বর্ণের অঙ্গকে পাতা বলে।**

➤ (b) **পাতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Leaf) :**

1. কাণ্ড বা শাখার পর্ব থেকে উৎপন্ন পার্শ্বীয় অঙ্গ।
2. সবুজ, চ্যাপটা ও প্রসারিত। প্রধান তিনটি অংশ হল—পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক।
3. ক্লোরোফিল থাকার জন্য সবুজ বর্ণের হয়।
4. বেশি আলো গ্রহণ করার জন্য গঠন, অবস্থান ও সজ্জাবিন্যাস নানা প্রকারের হয়।
5. কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা থেকে বহির্জনিষ্ণুভাবে (Exogenously) উৎপন্ন হয়।
6. বৃদ্ধি সবসময় সীমিত।
7. পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে।

➤ (c) **আদর্শ পাতার বিভিন্ন অংশ (Different parts of a typical leaf) :**

একটি আদর্শ পাতায় তিনটি প্রধান অংশ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—**পত্রমূল** (Leaf base), **বৃন্ত** (Petiole) এবং **ফলক** (Lamina)। অনেকগুলি উদ্ভিদের পাতায় **উপপত্র** (Stipule) থাকে।

1. **পত্রমূল** (Leaf base)—**পাতার যে অংশ কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে পত্রমূল (Leaf base) বলা হয়।** বিভিন্ন উদ্ভিদে পত্রমূলের তারতম্য দেখা যায়। আম, অপরাজিতা প্রভৃতি পাতার পত্রমূল স্ফীত হয়। এই ধরনের পত্রমূলকে **উপাধান** (Pulvinus) বলে। করবী পাতার পত্রমূল ছোটো। আবার নারকেল, তাল, সুপারি গাছে প্রসারিত পত্রমূল কাণ্ডকে অর্ধেক বেষ্টন করে রাখে। একে **অর্ধ কাণ্ডবেষ্টক** (Semi amplexicaul) **পত্রমূল** বলা হয়। অনেক উদ্ভিদে পত্রমূল প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কাণ্ডকে বেষ্টন করে। এই পত্রমূলকে **কাণ্ডবেষ্টক পত্রমূল** (Sheathing leaf base) বলা হয়। উদাহরণ—কলা, ধান প্রভৃতি। **কাজ**—পাতাকে পর্বের সঙ্গে শক্ত করে আবদ্ধ রাখা।
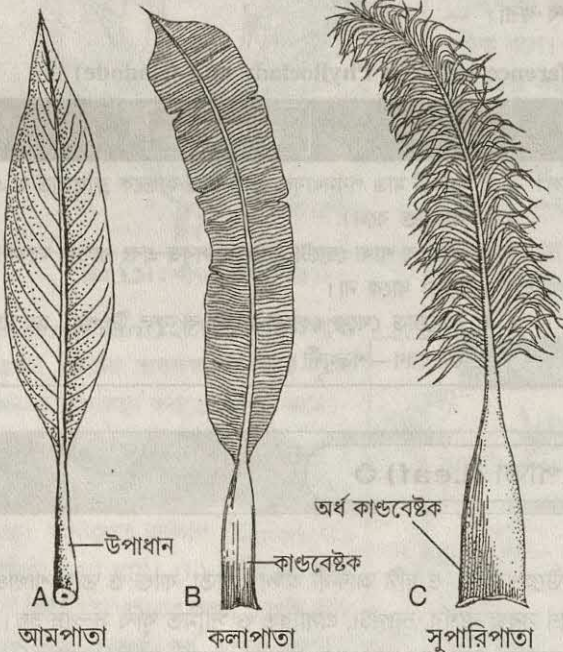
চিত্র 3.27 : পত্রমূলের গঠনগত বৈচিত্র্য : (A)-উপাধান , (B)-কাণ্ডবেষ্টক এবং (C)-অর্ধ কাণ্ডবেষ্টক ।

2. **উপপত্র** (Stipule)—**পত্রমূলে সবুজ বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির পাতার মতো ক্ষুদ্র অংশকে উপপত্র বলে।** জবা (*Hibiscus*) গাছের প্রত্যেকটি পাতার পত্রমূলের দু'পাশে দুটি সরু সবুজ বর্ণের উপপত্র থাকে। যেসব পাতায় উপপত্র থাকে তাদের **সোপপত্রিক** (Stipulate) বলা হয়। উদাহরণ—জবা, মটর, গোলাপ। উপপত্রবিহীন পাতাকে **অনুপপত্রিক** (Exstipulate) বলে। উদাহরণ—আম, কাঁঠাল। **কাজ** — (i) পাতাকে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখে। (ii) কাক্ষিক মুকুলকে রক্ষা করে।

3. **বৃন্ত** (Petiole)—**পত্রমূল ও ফলকের মধ্যবর্তী**

**অংশকে বৃন্ত বলে।** কাণ্ড বৃন্তের সাহায্যে খাদ্য ফলকে পাঠায়। অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের ক্ষেত্রে পত্রমূল ও ফলকের মধ্যে বৃন্ত থাকে না। যেমন—শিয়ালকাঁটা। বৃন্ত থাকলে পাতাকে **সবৃন্তক** (Petiolate), আর না থাকলে **অবৃন্তক** (Sessile) বলা হয়। পদ্ম ও শালুকের গোল পাতার পেছনের অংশের মাঝখানে লম্বা বৃন্ত থাকে। এই ধরনের পাতাকে **ছত্রবন্ধ** (Peltate) পাতা বলে। কচুরিপানায় বৃন্ত স্ফীত, ফাঁপা ও বায়ুপূর্ণ থাকায় জলে ভাসতে পারে। অনেকসময় পত্রবৃন্ত প্রসারিত, চ্যাপটা ও সবুজ বর্ণের হয়, একে **পর্ণবৃন্ত** (Phyllode) বলে। উদাহরণ—আকাশমণি (*Acacia auriculoformis*)। **কাজ** — (i) ফলকের ভার বহন করে। (ii) শাখাপ্রশাখা থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পাতায় পাঠায়। (iii) পাতায় তৈরি খাবার শাখাপ্রশাখায় বৃন্ত দিয়ে চলাচল করে।
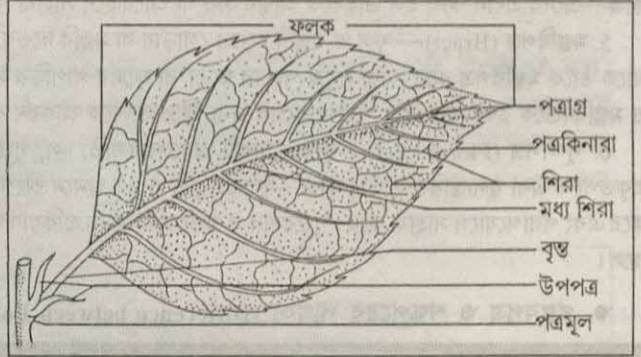
চিত্র 3.28 : একটি আদর্শ পাতার বিভিন্ন অংশ।

4. **ফলক** (Lamina)—**বৃন্তের শীর্ষে চ্যাপটা সবুজ রঙের প্রসারিত অংশকে ফলক বলে।** ফলকের শীর্ষকে **পত্রাগ্র** (Leaf apex) বলা হয়। ফলকের দু'পাশের কিনারাকে **পত্রকিনারা** (Leaf margin) বলা হয়। উপরের ও নীচের তলকে **পত্রপৃষ্ঠ** (Leaf surface) বলে। মাঝের মোটা শিরাকে **মধ্যশিরা** (Mid rib) বলা হয়। মধ্যশিরার দু'পাশে পত্রকিনারা পর্যন্ত কতকগুলি শিরা-উপশিরা দেখা যায়। পত্র ফলকের শিরা-উপশিরারবিন্যাস **শিরাবিন্যাস** (Venation) নামে পরিচিত। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় **জালিকাকার শিরাবিন্যাস** (Reticulate ventation) ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** (Parallel ventation) দেখা যায়।

ফলককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— (i) **বিষমপৃষ্ঠ** (Dorsiventral)— দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলকের দুটি তল বা পৃষ্ঠ থাকে। ফলকগুলি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে থাকে। এর ফলে পাতার উপরের তলে সূর্যালোক পায় কিন্তু নীচের তল আলোর আড়ালে থাকে। তাই উপর তল গাঢ় সবুজ ও নীচের তল হালকা সবুজ বর্ণের হয়। এ ধরনের পাতাকে **বিষমপৃষ্ঠ পাতা** বলা হয়। উদাহরণ—আম, জাম ইত্যাদি। (ii) **সমাঙ্কপৃষ্ঠ** (Isobilateral)—যেসব উদ্ভিদের পাতাগুলি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রায় তির্যকভাবে থাকে এবং উভয় তল সমানভাবে আলো পায় ও দুটি তলই প্রায় একপ্রকার অর্থাৎ আলাদা করে দুটি তলকে চেনা যায় না তাদের **সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা** বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে এই ধরনের পাতা দেখা যায়। উদাহরণ—ধান, ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি। **কাজ**— (i) খাদ্য তৈরি করে। (ii) শিরা-উপশিরা জল ও খাদ্য সংবহন করে। (iii) পাতায় পত্ররন্ধ্র থাকায় গ্যাসের আদানপ্রদান ঘটে। (iv) বাষ্পমোচনের সময় অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পরিত্যাগ করে।

যেসব পাতায় তিনটি প্রধান অংশ (পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক) থাকে তাদের **সম্পূর্ণ পাতা** (Complete leaf) বলে। এই তিনটি অংশের যে-কোনো একটি অংশ না থাকলে তাদের **অসম্পূর্ণ পাতা** (Incomplete leaf) বলা হয়।

➤ (d) **পাতার প্রকারভেদ (Kinds of Leaf) :**

পাতার অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পাতাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

1. **পল্লবপত্র** (Foliage leaf) — চ্যাপটা ও সবুজবর্ণের সাধারণ পাতাকে **পল্লবপত্র** বলে। **কাজ** — এই পাতার সাধারণ কাজ হল সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পমোচন ও শ্বসন প্রক্রিয়া সমাধা করা।

2. **বীজপত্র** (Cotyledonary leaf) — সপুষ্পক উদ্ভিদের ভ্রূণমধ্যস্থ পাতাকে **বীজপত্র** বলে। এরা খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত ও রসালো হয়। উদাহরণ—মটর, ছোলা, তেঁতুল প্রভৃতি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজপত্র পাতলা হয়। উদাহরণ—রেড়ি। **কাজ** — বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় ভ্রূণাক্ষকে খাদ্য সরবরাহ করা হল বীজপত্রের প্রধান কাজ।

3. **শল্কপত্র** (Scale leaf) — কাণ্ডের পর্ব থেকে নির্গত আঁশের মতো, ছোটো, অবৃন্তক শুষ্ক পাতাকে **শল্কপত্র** বলে। এদের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। আদা, ওল প্রভৃতি মৃদ্‌গত কাণ্ডে এবং ঝাউ, শতমূলী প্রভৃতি বায়বীয় কাণ্ডে সবুজ শল্কপত্র দেখা যায়। শল্কপত্রে খাদ্য সঞ্চিত হলে রসাল হয় (উদাহরণ—পিঁয়াজ ও রসুন)। **কাজ**—কাক্ষিক মুকুলকে আবৃত রাখা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাদ্য সঞ্চয় করা শল্কপত্রের প্রধান কাজ।

4. **প্রাথমিকপত্র** (**প্রোফিল্‌স—** Prophylls)— কাণ্ড বা তার শাখায় প্রথম কয়েকটি পাতা পল্লবপত্রে পরিণত না হয়ে যদি কণ্টক বা আকর্ষে পরিণত হয় তাদের **প্রাথমিক পত্র** বলে। উদাহরণ—বেল গাছের কণ্টক, লেবু গাছের কণ্টক, কুমড়োর আকর্ষ ইত্যাদি। **কাজ**—এদের প্রধান কাজ হল উদ্ভিদকে আত্মরক্ষায় বা আরোহণে সাহায্য করা।

5. **মঞ্জরিপত্র** (Bract)— ফুল ও মঞ্জরি দণ্ডের গোড়ায় বা মঞ্জরি দণ্ডের পর্বে যেসব ক্ষুদ্র, সরু সবুজ বা অন্যান্য বর্ণের পাতা থাকে তাকে **মঞ্জরিপত্র** বলে। এরা সবুজ পাতার মতো বা ফুলের পাপড়ির মতো বিভিন্ন বর্ণের হয়। **কাজ**—মুকুল অবস্থায় ফুল ও মঞ্জরিদণ্ডকে রক্ষা করা এবং পরাগযোগের জন্য কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করা এদের প্রধান কাজ।

6. **পুষ্পপত্র** (Floral Leaf)—ফুলের চারটি স্তবকের (বৃতি, দল, পুংকেশর, গর্ভকেশর) প্রতিটি অংশকে **পুষ্পপত্র** বলে। প্রকৃতপক্ষে এরা রূপান্তরিত পাতা। **কাজ**—ফুলের বৃতি ও দল জননে অংশগ্রহণ করে না। এরা পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে রক্ষা করে এবং পরাগযোগে সাহায্য করে। পুংকেশর ও গর্ভকেশর জনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এদের **স্পোরোফিল** (Sporophyll) বলে।

● **পল্লবপত্র ও শল্কপত্রের পার্থক্য (Difference between Foliage and Scale leaf) ঃ**

| পল্লবপত্র | শল্কপত্র |
|---|---|
| 1. স্বাভাবিক আকৃতির ও সবুজ বর্ণের পত্র। | 1. সংক্ষিপ্ত, ঝিল্লির মতো পাতলা এবং বাদামি বর্ণের পাতা (ব্যতিক্রম—কাঁঠাল)। |
| 2. সবৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে। | 2. সবসময় অবৃন্তক। |
| 3. সব পত্র বায়বীয় হয়। | 3. বায়বীয় বা মৃদ্‌গত হয়। |
| 4. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। | 4. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। |

➤ (e) **পাতার কাজ (Functions of Leaf) ঃ**

পাতার কাজকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়—

1. **সাধারণ কাজ (General functions)**— পাতার সাধারণ কাজগুলি হল—

(i) **বাষ্পমোচন** (Transpiration)—বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জল পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে নির্গত করে।

(ii) **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis)—পাতা হল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান। সূর্যালোকের প্রভাবে ক্লোরোফিলের সহায়তায় শোষিত জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষ করে।

(iii) **শ্বাসকার্য** (Respiration)—উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্র দিয়ে শ্বসনের জন্য বায়ু থেকে অক্সিজেন শোষণ করে এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড পত্ররন্ধ্র পথে পরিবেশে মুক্ত হয়।

(iv) **সংবহন** (Conduction)—পাতার শিরাগুলিতে সংবহন কলা থাকে। মূল থেকে শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ কাণ্ড দিয়ে পাতার বৃন্ত হয়ে ফলকে যায়। ফলকে তৈরি খাদ্য শিরা দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে সরবরাহ হয়।

2. **পাতার বিশেষ কাজ (Special functions)**—অনেক উদ্ভিদের পাতা নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়ে বিশেষ কাজ করে। বিশেষ কাজগুলি হল—

(i) **আত্মরক্ষা**—শিয়ালকাঁটার পত্রকিনারা, খেজুর পাতার অগ্র শীর্ষ প্রভৃতি কণ্টকে রূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষা করে। এছাড়া গোলাপ, বেগুন, বেত প্রভৃতি উদ্ভিদদেহের কাঁটা আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।

(ii) **বাষ্পমোচন রোধ**—ফণীমনসা ও অন্যান্য জঙ্গল উদ্ভিদের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে বাষ্পমোচনের হার কমায়।

(iii) **খাদ্য সঞ্চয়**—পাথরকুচি, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি পাতায় খাদ্য সঞ্চিত থাকে। আবার পেঁয়াজের শল্কপত্র, পুঁই প্রভৃতিও জল ও খাদ্য সঞ্চয় করে রসালো হয়।

(iv) **আরোহণ**—মটরের পত্রক, উলটচণ্ডালের ফলকের অগ্রভাগ, খেসারির সম্পূর্ণ পাতা প্রভৃতি আকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের আরোহণে সহায়তা করে।

(v) **বংশবৃদ্ধি**—পাথরকুচি পাতা পত্রাশ্রয়ী মুকুলের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে।

(vi) **জলসঞ্চয়**—ডিস্‌কিডিয়ার পাতা কলসে রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখে।

(vii) **পতঙ্গ শিকারের ফাঁদ** — সূর্যশিশির, কলসপত্রী, জলঝাঁঝি প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা রূপান্তরিত হয়ে কীটপতঙ্গ শিকার করে নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান সংগ্রহ করে।

## ▲ পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy) :

❖ **সংজ্ঞা : উদ্ভিদে যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পাতাগুলি কাণ্ড বা শাখার পর্বে সাজানো থাকে তাকে পত্রবিন্যাস বলে।** সব পাতা প্রয়োজনীয় সূর্যালোক পেয়ে জৈবনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারার জন্য পত্রবিন্যাস ব্যবস্থা। কাণ্ডের পর্বে পাতাগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যাসিত না হলে একে অপরকে ছায়াবৃত করত অর্থাৎ সব পাতা সমানভাবে সূর্যালোক পেত না। পত্রবিন্যাসকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(i) **সর্পিল** (Alternate), (ii) **অভিমুখ** (Opposite) এবং (iii) **আবর্ত** (Whorled)।
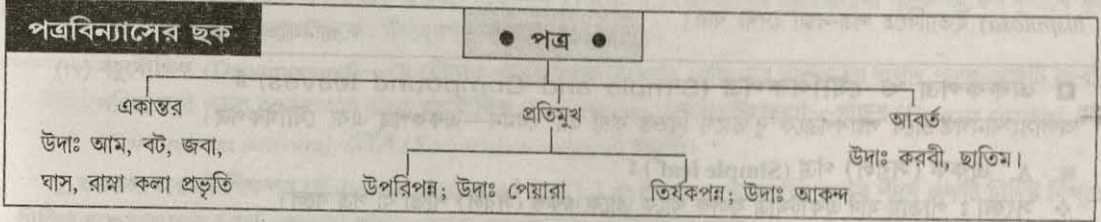
(i) **সর্পিল বা একান্তর পত্রবিন্যাস** (Alternate) — এই বিন্যাস পদ্ধতিতে কাণ্ড বা শাখার প্রত্যেকটি পর্ব থেকে একটি করে পাতা উৎপন্ন হয়ে কাণ্ডের চারদিকে সর্পিল ভাবে সাজানো থাকে। আবার প্রত্যেকটি পর্বে একটি করে পাতা উৎপন্ন হয়ে পাতাগুলি কাণ্ড বা শাখার উপর একে অন্যের সঙ্গে একান্তরভাবে সাজানো থাকে বলে একে **একান্তর পত্রবিন্যাসও** বলা হয়। **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*)।

(ii) **প্রতিমুখ পত্রবিন্যাস** (Opposite) — এখানে কাণ্ড বা শাখার প্রত্যেকটি পর্বে দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী পাতা উৎপন্ন হয়। এই পত্রবিন্যাসকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(a) **প্রতিমুখ উপরিপন্ন** (Superposed)—প্রত্যেকটি পর্বের প্রতিমুখ পাতা জোড়া উপরের ও নীচের পর্বের পাতাগুলির সঙ্গে একই তলে সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। **উদাহরণ**—পেয়ারা (*Psidium guajava*), মাধবীলতা (*Hiptage benghalensis*) প্রভৃতি। (খ) **প্রতিমুখ তির্যকপন্ন** (Decussate)—প্রত্যেকটি পর্বের প্রতিমুখ পাতা জোড়ার ঠিক উপরের ও নীচের পর্বের পাতাগুলির সঙ্গে এক সমকোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। **উদাহরণ**—আকন্দ (*Calotropis procera*)।

চিত্র 3.29 : বিভিন্নপ্রকার পত্রবিন্যাস।

(iii) **আবর্ত পত্রবিন্যাস** (Whorled or Verticillate)—কাণ্ড বা শাখার প্রত্যেকটি পর্বে তিনটি বা তিনের বেশি পাতা আবর্তাকারে সাজানো থাকে। **উদাহরণ**— করবী (*Nerium indicum*), ছাতিম (*Alstonia scholaris*) প্রভৃতি।

## পাতার মজেক (Leaf mosaic)

পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যালোক পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় জন্মায় এমন কয়েকটি উদ্ভিদের পাতাগুলি সাধারণ পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy) অনুসরণ না করে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে যে নক্সার সৃষ্টি করে তাকে **পাতার নক্সা বা পাতার মজেক** বলে। সাধারণত বিভিন্ন পাতার বৃন্ত অংশের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয় বলে এইরূপ পত্রবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। মুক্তাঝুরি (*Acalypha indica*), পানিফল (*Trapa bispinosa*) ইত্যাদিতে পত্র-নক্সা দেখা যায়।
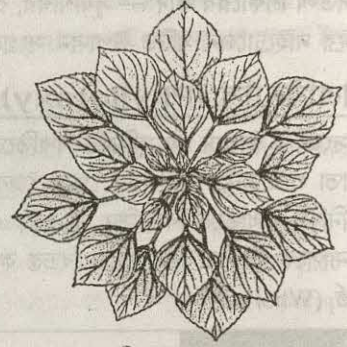
পানিফলের পত্র-নক্সা

## একক পত্র ও যৌগিকপত্র (Simple and Compound leaves) ঃ

অঙ্গসংস্থানগতভাবে পল্লবপত্রকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**এককপত্র** এবং **যৌগিকপত্র**।

### A. একক (সরল) পত্র (Simple leaf) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ পাতায় যদি একটিমাত্র ফলক থাকে তাকে একক (সরল) পাতা বা পত্র বলে।**

একক পত্র ফলকের কিনারা সম্পূর্ণ অখণ্ডিত বা খণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু খণ্ডিত ফলকের কিনারা কখনও মধ্যশিরা বা বৃন্ত স্পর্শ করে না। একক পত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। **উদাহরণ—(i) অখণ্ডিত এককপত্র**—আম (*Mangifera indica*), করবী (*Nerium indicum*), বট (*Ficus benghalensis*) প্রভৃতি।

(ii) **খণ্ডিত এককপত্র**— চন্দ্রমল্লিকা, মুলো (*Raphanus sativus*), সরষে (*Brassica nigra*) প্রভৃতি।

### B. যৌগিকপত্র (Compound Leaf) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ পাতার ফলক যদি গভীরভাবে খণ্ডিত হয়ে মধ্যশিরাকে স্পর্শ করে আলাদা আলাদা খণ্ডে বিভক্ত হয় তাদের যৌগিকপত্র** (Compound leaf) **বলে**।

প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ দেখতে ছোটো পাতার মতো হয়। আকৃতিতে ছোটো বলে এদের **পত্রক** (Leaflet) বলা হয়। একটি যৌগিকপত্রে কমপক্ষে দুটি বা তার অনেক বেশি পত্রক থাকে। মধ্যশিরাকে **পত্রক-অক্ষ** (Rachis) বলে। অক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে না। যৌগিকপত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(1) পক্ষল যৌগিকপত্র এবং (2) করতলাকার যৌগিকপত্র।

**1. পক্ষল যৌগিকপত্র (Pinnate Compound leaf) ঃ ❖ সংজ্ঞা ঃ পত্রক-অক্ষের দু'পাশে পত্রকগুলি পাখির পালকের মতো সাজানো হলে, তাকে পক্ষল যৌগিকপত্র বলা হয়।**

পক্ষল যৌগিকপত্র বিভিন্ন প্রকার, যেমন—

(i) **একপক্ষল** (Unipinnate)—যে যৌগিক পত্রের ফলক একবার মাত্র খণ্ডিত হয়, তাকে **একপক্ষল** বলে। এখানে পত্রাক্ষ মাত্র একটি এবং এর দু'পাশে পত্রকগুলি পাখির পালকের মতো

চিত্র 3.30 ঃ পক্ষল যৌগিকপত্র।

সাজানো থাকে। একপক্ষল যৌগিক পত্রকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— (a) **সচূড় পক্ষল** (Imparipinnate)—যৌগিকপত্রের শীর্ষে একটি পত্রক থাকলে তাকে **সচূড় পক্ষল** বলা হয়। উদাহরণ—গোলাপ *(Rosa centifolia)*, অপরাজিতা *(Clitoria turnatea)* প্রভৃতি। (b) **অচূড় পক্ষল** (Paripinnate)—অনেক সময় যৌগিকপত্রের শীর্ষে দুটি পত্রক অর্থাৎ এক জোড়া পত্রক থাকে। একে **অচূড় পক্ষল** বলে। উদাহরণ—তেঁতুল *(Tamarindus indica)*, কালকাসুন্দে *(Cassia sophera)* প্রভৃতি।

(ii) **দ্বিপক্ষল** (Bipinnate)—যে যৌগিকপত্রের ফলকটি দুবার খণ্ডিত হয়, ফলে পত্রক-অক্ষটির পাশ থেকে শাখা পত্রক-অক্ষ (Secondary axis) উৎপন্ন হয় তাকে দ্বিপক্ষল বলে। শাখা পত্রক-অক্ষের দু পাশে ক্ষুদ্র পত্রকগুলি যুক্ত থাকে। **উদাহরণ**—লজ্জাবতী *(Mimosa pudica)*, বাবলা *(Acacia arabica)* প্রভৃতি।

(iii) **ত্রিপক্ষল** (Tripinnate) — এই ধরনের যৌগিকপত্রের ফলক তিনবার খণ্ডিত হয়, ফলে পত্রক-অক্ষ থেকে শাখা পত্রক অক্ষ এবং শাখা পত্রক অক্ষ থেকে প্রশাখা পত্রক অক্ষ (Tertiary axis) উৎপন্ন হয়। প্রশাখা পত্রক-অক্ষের দুপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রকগুলি সাজানো থাকে। **উদাহরণ**—সজনে *(Moringa)*।

(iv) **বহুযৌগিক** (Decompound)—যে যৌগিক পত্রের ফলক তিনেরও বেশি বার খণ্ডিত হয় অর্থাৎ পত্রক-অক্ষটি বহুবার খণ্ডিত হয়ে পত্রক বহন করলে তাকে **বহুযৌগিক** (Decompound) বলে। **উদাহরণ**—গাজর *(Daucas carota)*, ধনে *(Coriandrum sativum)*, মৌরি *(Foeniculum vulgare)* প্রভৃতি।

2. **করতলাকার যৌগিকপত্র (Palmate compound leaf) ঃ ❖ সংজ্ঞা ঃ পত্রকগুলি বৃন্তের শীর্ষে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়ে আঙুলের মতো সাজানো থাকলে তাকে করতলাকার যৌগিকপত্র বলে।**

করতলাকার যৌগিক পত্রের ক্ষেত্রে পত্রকের সংখ্যা অনুসারে এদের নামকরণ করা হয়।

(i) **একফলক** (Unifoliate)—করতলাকার যৌগিকপত্রের বৃন্তের শীর্ষে একটিমাত্র পত্রক থাকলে তাকে **একফলক** বলে। উদাহরণ—লেবু (Citrus), বাতাবি (Citrus maxima), কমলা প্রভৃতি।

(ii) **দ্বিফলক** (Bipinnate)—বৃন্তের শীর্ষে দুটি পত্রক একই বিন্দুতে মিলিত হলে, তাকে **দ্বিফলক** বলা হয়। উদাহরণ—হিঙ্গন *(Balanities aegyptica)*।
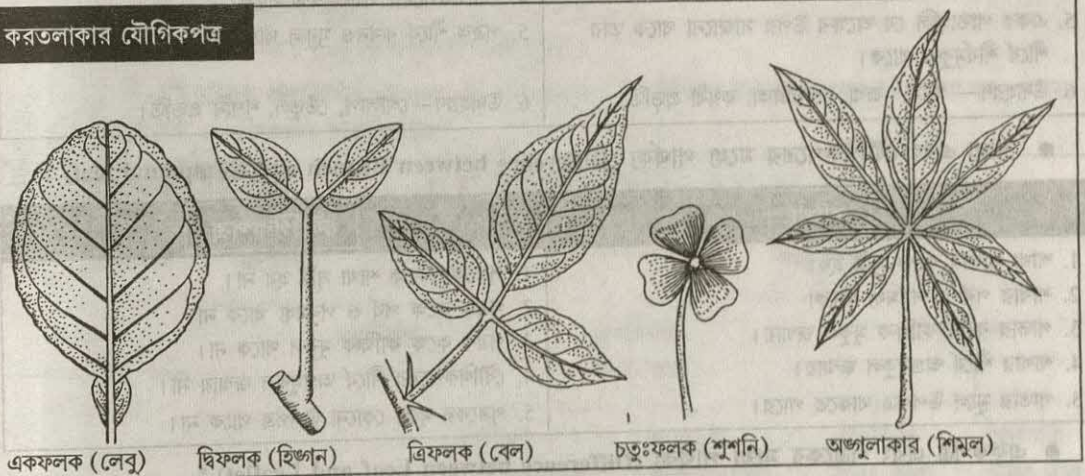
চিত্র 3.31 ঃ করতলাকার যৌগিকপত্র।

(iii) **ত্রিফলক** (Trifoliate) — বৃন্তের শীর্ষে একটি বিন্দুতে তিনটি পত্রক মিলিত হলে তাকে **ত্রিফলক** বলে। উদাহরণ—আমরুল *(Oxalis corniculata)*, বেল *(Aegle mermalos)* প্রভৃতি।

(iv) **চতুঃফলক** (Quadrifoliate) — বৃন্তের শীর্ষে একটি বিন্দুতে চারটি পত্রক মিলিত হলে তাকে **চতুঃফলক** বলা হয়। উদাহরণ—শুশনি *(Marsilea quadifolia)*।

(v) **অঙ্গুলাকার** (Digitate) — বৃন্তের শীর্ষে একটি বিন্দুতে চারটির বেশি পত্রক মিলিত হলে তাকে **অঙ্গুলাকার** বলে। উদাহরণ—শিমুল *(Bombax ceiba)*, শ্বেত হুড়হুড়ে *(Gyrandropsis pentaphylla)* প্রভৃতি।

## ❂ বিভিন্ন পাতার ছক (Chart of different type of Leaves) :
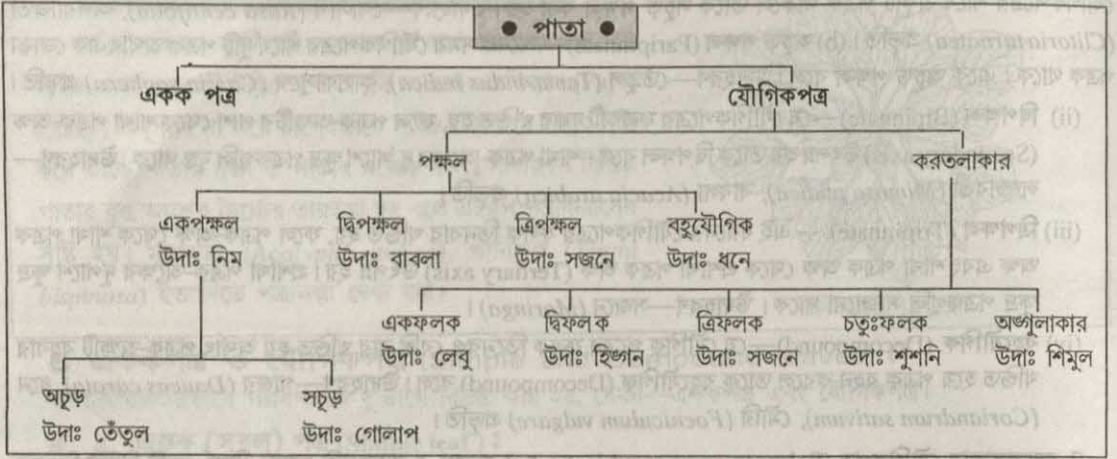
## ● একক ও যৌগিকপত্রের পার্থক্য (Difference between Simple leaf and Compound leaf) :

| একক (সরল) পত্র | যৌগিকপত্র |
|---|---|
| 1. একটি অখণ্ড বা আংশিক খণ্ডিত ফলক নিয়ে গঠিত। | 1. একাধিক পত্রক নিয়ে গঠিত। |
| 2. এককপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। | 2. পত্রকের কক্ষে কোনো কাক্ষিক মুকুল থাকে না। |
| 3. পত্রমূলে উপপত্র থাকতে পারে। | 3. পত্রকের মূলে কখনও উপপত্র থাকে না। |
| 4. ফলকে মধ্যশিরা থাকে। | 4. যৌগিকপত্রের পত্রক-অক্ষ থাকে। |
| 5. একক পাতাগুলি যে অক্ষের উপর সাজানো থাকে তার শীর্ষে শীর্ষমুকুল থাকে। | 5. পত্রক শীর্ষে কখনও মুকুল থাকে না। |
| 6. উদাহরণ— আম, জবা, চন্দ্রমল্লিকা, করবী প্রভৃতি। | 6. উদাহরণ—গোলাপ, তেঁতুল, শুশনি প্রভৃতি। |

## ● শাখা এবং যৌগিকপত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Branch and Compound leaf) :

| শাখা | যৌগিকপত্র |
|---|---|
| 1. শাখা পাতার কক্ষে সৃষ্টি হয়। | 1. পত্রকের কক্ষে শাখা সৃষ্টি হয় না। |
| 2. শাখার পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। | 2. পত্রক কক্ষে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না। |
| 3. পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল জন্মায়। | 3. পত্রক কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে না। |
| 4. শাখার শীর্ষে অগ্রমুকুল জন্মায়। | 4. যৌগিকপত্রের শীর্ষে অগ্রমুকুল জন্মায় না। |
| 5. পাতার মূলে উপপত্র থাকতে পারে। | 5. পত্রকের মূলে কোনো উপপত্র থাকে না। |

## ● এককপত্র এবং পত্রকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Leaf and Leaflet) :

| এককপত্র | পত্রক |
|---|---|
| 1. তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। | 1. দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। |
| 2. শাখার পর্বে থাকে। | 2. পত্রকাক্ষের শীর্ষে অথবা পাশে থাকে। |
| 3. কাক্ষিক মুকুল থাকে। | 3. কাক্ষিক মুকুল থাকে না। |
| 4. উপপত্র থাকে। | 4. উপপত্র থাকে না। |
| 5. কক্ষে শাখা বহন করে। | 5. কক্ষে শাখা বহন করে না। |

## ✪ হোমোফাইলি ও হেটারোফাইলি (Homophylly and Heterophylly) :

(a) হোমোফাইলি (Homophylly) : ❖ সংজ্ঞা : উদ্ভিদ কাণ্ডে ও শাখাপ্রশাখায় যেসব পাতা উৎপন্ন হয় তাদের আকৃতি একরকম হলে সেই পাতাগুলিকে হোমোফাইলি বলে।

বেশির ভাগ উদ্ভিদ প্রজাতির পাতা একরকম আকৃতির হয়। পাতার আকৃতি দেখে উদ্ভিদকে অনেক সময় সহজে চেনা যায়। উদাহরণ—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophylla*), ধান (*Oryza sativa*) ইত্যাদি।

(b) হেটারোফাইলি (Heterophylly) : ❖ সংজ্ঞা : যেসব অর্ধনিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদে দু'রকমের পাতা উৎপন্ন হয় সেই পাতাগুলিকে হেটারোফাইলি বলে।

অনেকগুলি জলজ উদ্ভিদে জলের নীচের পাতাগুলি খাঁজকাটা অথবা সরু হয়। জলের উপরের পাতাগুলির আকৃতি একই রকম থাকে। জলের নীচের পাতাগুলি জল থেকে অক্সিজেন শোষণ করে। তাই পাতাগুলি ক্রমাগত খণ্ডিত অথবা সরু হয়ে শোষণের স্থান বৃদ্ধি করে। উদাহরণ— *লিমনোফাইলা* (*Limnophila heterophylla*)।
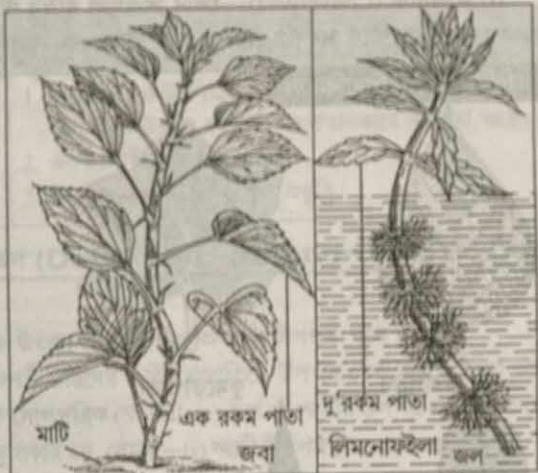
চিত্র 3.32 : (A)-হোমোফাইলি এবং (B)-হেটারোফাইলি।

## ▲ শিরাবিন্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Different types of Venation) :

❖ (a) শিরাবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Venation)—যে পদ্ধতিতে শিরা ও উপশিরাগুলি ফলকের উপর সাজানো থাকে তাকে শিরাবিন্যাস বলে।

সংবহন ও যান্ত্রিক কলা নিয়ে শিরা-উপশিরাগুলি গঠিত হয়।

➤ (b) শিরাবিন্যাসের প্রকারভেদ (Types of Venation)—শিরাবিন্যাস প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—জালিকা শিরাবিন্যাস ও সমান্তরাল শিরাবিন্যাস।
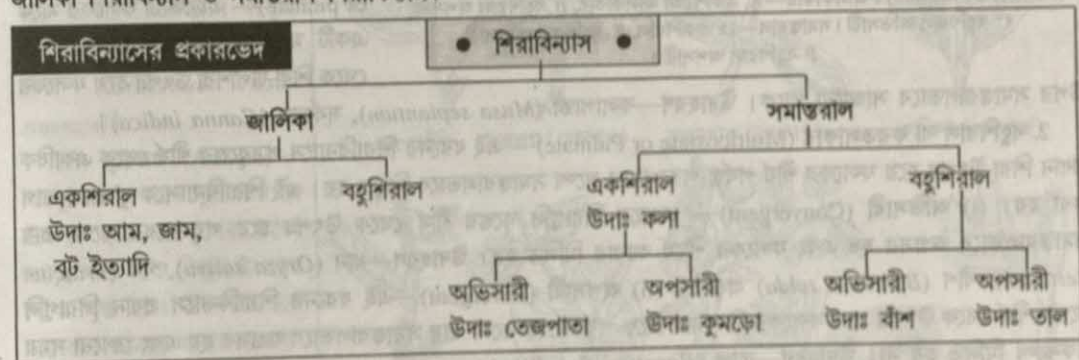
### ● I. জালিকা শিরাবিন্যাস (Reticulate Venation) :

❖ সংজ্ঞা : যে শিরাবিন্যাসে ফলকের শিরা-উপশিরাগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং জালিকার সৃষ্টি করে, তাকে জালিকা শিরাবিন্যাস বলে।

জালিকা শিরাবিন্যাস দু'প্রকারের—(1) একশিরাল ও (2) বহুশিরাল।

1. একশিরাল জালকাকার (Unicostate reticulate)—এই ক্ষেত্রে ফলকের মাঝে একটি মধ্যশিরা থাকে এবং শিরা-উপশিরাগুলি এর দু'পাশে সজ্জিত থেকে জালকের সৃষ্টি করে। উদাহরণ—আম, বট, পেয়ারা প্রভৃতি।

2. **বহুশিরাল জালকাকার (Multicostate reticulate)**—এই ধরনের শিরাবিন্যাসে একাধিক প্রধান শিরা বৃন্তের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে করতলের মতো সাজানো থাকে। বহুশিরাল শিরাবিন্যাসকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—

(i) **অভিসারী** (Convergent)—প্রধান শিরাগুলি বৃন্তের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছুদূর আলাদাভাবে অগ্রসর হবার পর আবার ফলকের শীর্ষে সবগুলি মিলিত হয়। **উদাহরণ**—কুল (*Zizyphus*), তেজপাতা (*Cinnamomum*) ইত্যাদি।
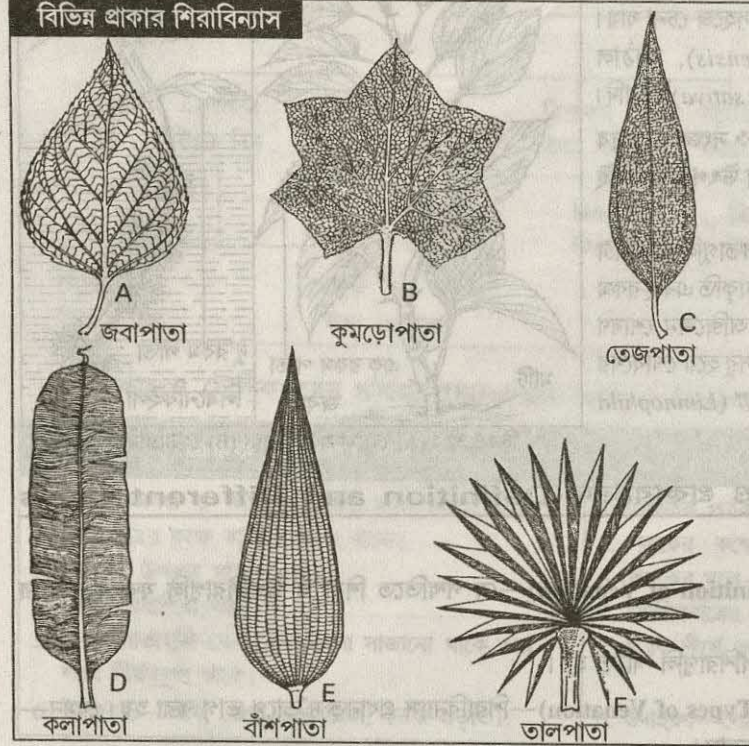
চিত্র 3.33 : শিরাবিন্যাস : **জালকাকার**—A. একশিরাল জালকাকার, B. বহুশিরাল অপসারী, C. বহুশিরাল অভিসারী। **সমান্তরাল**—D. একশিরাল, E. বহুশিরাল অভিসারী, F. বহুশিরাল অপসারী।

(ii) **অপসারী** (Divergent)—এখানে শিরাগুলি বৃন্তের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে ফলকের কিনারার দিকে অগ্রসর হয় এবং কখনও সবগুলি একজায়গায় মিলিত হয় না। শিরাগুলি ফলকের মধ্যে হাতের আঙুলের মতো ছড়িয়ে থাকে। **উদাহরণ**—কুমড়ো (*Cucurbita*), পেঁপে (*Carica*) প্রভৃতি।

### II. সমান্তরাল শিরাবিন্যাস (Parallel Venation) :

❖ **সংজ্ঞা : যে শিরাবিন্যাসে শিরা ও উপশিরাগুলি ফলকের প্রধান শিরাগুলি থেকে উৎপন্ন হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে, তাকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলে।**

সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দু'রকমের হয়, যেমন—

1. **একশিরাল বা পক্ষল** (Unicostate or pinnate)— এইক্ষেত্রে ফলকের মাঝে একটি মধ্যশিরা থাকে এবং ওই শিরা থেকে শিরা-উপশিরা উৎপন্ন হয়ে ফলকের উপর সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। **উদাহরণ**—কলাপাতা (*Musa sepiantum*), সর্বজয়া (*Canna indica*)।

2. **বহুশিরাল বা করতলাকার** (Multicostate or Palmate)— এই ধরনের শিরাবিন্যাসে পত্রবৃন্তের শীর্ষ থেকে একাধিক প্রধান শিরা উৎপন্ন হয়ে ফলকের শীর্ষ পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হয়। এই শিরাবিন্যাসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। (i) **অভিসারী** (Convergent)— এখানে শিরাগুলি বৃন্তের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় এবং ফলকের শীর্ষে আবার মিলিত হয়। **উদাহরণ**—ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), বাঁশ (*Bambusa tulda*) প্রভৃতি। (ii) **অপসারী** (Divergent)—এই ধরনের শিরাবিন্যাসে প্রধান শিরাগুলি বৃন্তের শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়ে ফলকের কিনারার দিকে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় এবং কোনো সময় একসঙ্গে মিলিত হয় না। **উদাহরণ**—তাল (*Borassus flabellifer*)।

### • মনে রাখার বিষয় •

1. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সমান্তরাল শিরাবিন্যাস — সুলতান চাঁপা (*Calophyllum inophyllum*)।
2. একবীজপত্রী উদ্ভিদের জালকাকার শিরাবিন্যাস — কচু (*Colocasia esculanta*)।

● **জালিকা শিরাবিন্যাস ও সমান্তরাল শিরাবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য (Distinguish between Reticulate venation and Parallel venation) :**

| জালিকা শিরাবিন্যাস | সমান্তরাল শিরাবিন্যাস |
|---|---|
| 1. ফলকের শিরা-উপশিরাগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জালিকার সৃষ্টি করে। | 1. ফলকের শিরা-উপশিরাগুলি ফলকের মাঝের বা প্রধান শিরাগুলি থেকে উৎপন্ন হয় এবং সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। |
| 2. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। | 2. একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। |
| 3. উদাহরণ—আম, জাম, বট প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ—কলা, তাল, বাঁশ প্রভৃতি। |

## ▲ উপপত্রের সংজ্ঞা, কাজ ও প্রকারভেদ (Definition, function and Types of Stipule) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : পাতার পত্রমূল থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র পার্শ্বীয় অঙ্গকে উপপত্র বলে।**

সব উদ্ভিদের পত্রমূলে উপপত্র থাকে না। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নির্দিষ্ট প্রজাতিতে উপপত্র দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপপত্র সবুজ বর্ণের হয়। যে পাতায় উপপত্র থাকে তাকে **সোপপত্রিক** (Stipulate) এবং যে পাতায় উপপত্র থাকে না তাকে **অনুপপত্রিক** (Exstipulate) বলে। স্থায়িত্ব অনুসারে উপপত্র দু'প্রকার হয়, যেমন—(i) **স্থায়ী উপপত্র** (Persistent stipule)—পাতা যত দিন কাণ্ডের পর্বে যুক্ত থাকে ততদিন উপপত্রও পাতার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং (ii) **পাতি উপপত্র** (Deciduous stipule)—পত্রফলক গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উপপত্র পত্রমূল থেকে ঝরে পড়ে।

➤ (b) **কাজ (Function) :** প্রথম অবস্থায় পত্রমূলককে রক্ষা করে এবং সবুজ হওয়ার জন্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

➤ (c) **উপপত্রের প্রকারভেদ (Different types of stipule) :** আকার ও অবস্থান অনুসারে উপপত্রকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

(i) **মুক্ত পার্শ্বীয়** (Free lateral)—পত্রমূলের দু'পাশে দুটি সরু আলাদা আলাদা সবুজ উপপত্র উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*)।

(ii) **বৃন্তলগ্ন** (Adnate)—পত্রমূলের দু'পাশে দুটি উপপত্র উৎপন্ন হয়ে পত্রমূলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং কিছুটা উপরের দিকে মুক্ত হয়। উপপত্রদ্বয়কে অনেকটা ডানার মতো দেখায়। **উদাহরণ**—গোলাপ (*Rosa centifolia*)।

চিত্র 3.34 : উপপত্রের প্রকারভেদ।

(iii) **বৃন্তমধ্যক** (Interpetiolar) — দুটি অভিমুখ বা বিপরীতমুখী পাতার পত্রমূল থেকে উৎপন্ন হয়ে বৃন্ত দুটির মাঝে থাকে। **উদাহরণ**—রঙ্গন (*Ixora coccinea*)।

(iv) **কাক্ষিক** (Intrapetiolar) — উপপত্র দুটি যুক্ত হয়ে পাতার কক্ষে একটি উপপত্রের মতো থাকে। **উদাহরণ**—গন্ধরাজ (*Gardenia*)।

(v) **কাণ্ডবেষ্টক** (Ochreate) — দুটি উপপত্র একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ফাঁপা নলের মতো আকৃতি ধারণ করে উপরের পর্বমধ্যের কিছুটা অংশ ঢেকে রাখে। **উদাহরণ**—পানিমরিচ *(Polygonum hydropiper)*।

❂ **পরিবর্তিত উপপত্র (Modified stipules) :** অনেক উদ্ভিদের পাতার উপপত্র পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এদের **পরিবর্তিত উপপত্র** বলে। উপপত্রের নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন—

(i) **মুকুলাবরণ শল্ক** (Bud scale) — শল্কের মতো মুকুলাবরণ শীর্ষ মুকুলকে ঢেকে রাখে। **উদাহরণ**—বট *(Ficus benghalensis)*, কাঁঠাল *(Artocarpus heterophylla)* প্রভৃতি।

(ii) **কন্টকাকার** (Spinous) — পত্রমূলের উপপত্র দুটি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। **উদাহরণ**—কুল *(Zizyphus)*, বাবলা *(Acacia arabica)*। আত্মরক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

(iii) **আকর্ষীভূত** (Tendrillar) — উপপত্র দুটি সরু প্যাঁচানো আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। **উদাহরণ**—কুমারিকা *(Smilax zeylanica)*। এই আকর্ষ উদ্ভিদকে আরোহণে সাহায্য করে।

(iv) **ফলকাকার** (Foliaceous) — উপপত্র দুটি যুক্ত হয়ে সাধারণ পাতার ফলকের আকার ধারণ করে। এর আকৃতি খুব বড়ো হয় এবং উপপত্র পাতার কাজ করে। **উদাহরণ**—মটর *(Pisum sativum)*।

**• জানার বিষয় •**

1. **উপাধান** (Pulvinus) : পত্রমূল স্ফীত হলে তাকে উপাধান বলে। **উদাহরণ**—আম *(Mangifera indica)*
2. **অ্যামপ্লেক্সিক্‌ল** (Amplexicaul) : পত্রমূল কাণ্ডকে আবৃত করে রাখলে অ্যামপ্লেক্সিক্‌ল বলে। **উদাহরণ**—গম *(Triticum aestivum)*।
3. **অ্যানাইসোফাইলি** (Anisophylly) : একই পর্ব থেকে গঠিত বিপরীতমুখী দুটি পাতার আকৃতি অসমান হলে তাকে **অ্যানাইসোফাইলি** বলে। **উদাহরণ** — *(Goldfusia glumerata)*
4. **হেটারোফাইলি** (Heterophylly) : জলজ উদ্ভিদে অনেক সময় দু'রকম আকৃতির পাতা থাকে, যেমন—জলের উপরের পাতাগুলি একক পত্র এবং জলের নীচের পাতাগুলি খাঁজ কাটা ও সরু। একে **হেটারোফাইলি** বলে। **উদাহরণ**— *(Limnophylla heterophylla)*
5. **স্টিপেল বা উপপত্রক** (Stipel) : পক্ষল যৌগিক পত্রের পত্রকের কক্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্র উপপত্রের মতো অঙ্গ থাকে। তাদের **স্টিপেল** বলে। অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে এগুলি পত্রকের রূপান্তর। **উদাহরণ**—শিম *(Dolichos lablab)*।
6. **এপিপোজিয়াম** (Epipogium) : মূল বিহীন সপুষ্পক উদ্ভিদকে এপিপোজিয়াম বলে। **উদাহরণ**—ক্ষুদিপানা *(Wolffia arhiza)*।

## ❂ 3.4. ফুল (Flower) ❂

সপুষ্পক উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষক অঙ্গ হল ফুল। জনন প্রক্রিয়ায় ও বংশ বিস্তারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। শাখাপ্রশাখার **অগ্রমুকুল** (Terminal bud) বা **কাক্ষিক মুকুল** (Axillary bud) থেকে ফুল সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ ধরনের মুকুলকে **পুষ্পমুকুল** (Floral bud) বলে। ফুল এককভাবে অথবা একসঙ্গে একটি বিশেষ শাখা বা শাখান্বিত দণ্ডের উপর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজানো থাকে। একে **মঞ্জরিদণ্ড** (Rachis) বলে। পুষ্পের নির্দিষ্ট বিন্যাস রীতিকে **পুষ্পবিন্যাস** (Inflorescence) বলে। ফুলে বৃন্ত থাকলে তাকে **সবৃন্তক** (Pedicellate) ফুল এবং বৃন্ত না থাকলে **অবৃন্তক** (Sessile) ফুল বলা হয়। অনেক ফুলে মঞ্জরিদণ্ড লম্বা না হয়ে চ্যাপটা আকৃতির হয়। একে **পুষ্পাধার** (Receptacle) বলে। সূর্যমুখী ফুলের পুষ্পাধারে অনেকগুলি ফুল একসঙ্গে থাকে। অনেক সময় একে একটি ফুল বলে মনে হয়। অনেকগুলি ফুলে মঞ্জরিদণ্ডের যেখানে ফুল

উৎপন্ন হয় তার কক্ষে ক্ষুদ্র পাতার **মতো এক বা একাধিক অংশ** থাকে। এদের **মঞ্জরিপত্র** (Bract) বলে। আবার অনেক ফুলে মঞ্জরিপত্রের উপরে আরও ক্ষুদ্র এক বা একাধিক ক্ষুদ্র পাতার মতো অংশ থাকে। এদের **মঞ্জরিপত্রিকা** (Bracteoles) বলে।

ফুল হল প্রকৃতপক্ষে বিটপের রূপান্তরিত অঙ্গ যা উদ্ভিদের জনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং এর থেকে ফল ও বীজ গঠিত হয়। তাই ফুলকে জনন বিটপ (Reproductive shoot) বলে।

❖ **ফুলের সংজ্ঞা (Definition of Flower) : জননের জন্য পরিবর্তিত সীমিত বৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ফল ও বীজসৃষ্টিকারী বিটপকে পুষ্প বা ফুল বলে।**

**● ফুলের কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য ●**

1. ফুল হল উদ্ভিদের অস্থায়ী অঙ্গ এবং **রূপান্তরিত বিটপ**।
2. ফুলের বৃদ্ধি **সীমিত**।
3. বৃতি ও দলমণ্ডল জননে অংশগ্রহণ করে না বলে এদের **সাহায্যকারী বা আনুষঙ্গিক স্তবক** বলে।
4. বৃতি ফলের সঙ্গে লেগে থাকলে তাকে **স্থায়ী বৃতি** বলে। উদাহরণ—বেগুন, লংকা, পেয়ারা প্রভৃতি। অনেকসময় বৃতি ফুলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে এবং ফলকে আবৃত করে রাখে। এইপ্রকার বৃতিকে **বৃদ্ধিশীল বৃতি** বলে। উদাহরণ— চালতা।
5. পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক জননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বলে এদের **অপরিহার্য বা জনন স্তবক** বলে।
6. ফুলের গর্ভাশয় নিষেকের পর ফল এবং ডিম্বক বীজ গঠন করে।
7. সাধারণত কাণ্ড শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনেক সময় ফুল উদ্ভিদের মূল থেকে গঠিত হয়, যেমন— কাঁঠাল।
8. অনেক ফুলে অপরিহার্য স্তবক (পুংকেশর ও গর্ভকেশর) থাকে না তাদের **বন্ধ্যা ফুল** বলে।
9. ফুলে আনুষঙ্গিক স্তবক (বৃতি ও দলমণ্ডল) না থাকলে তাকে **নগ্নপুষ্প** বলে।
10. একই উদ্ভিদে পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প এবং উভলিঙ্গ পুষ্প জন্মালে তাকে **মিশ্রবাসী উদ্ভিদ** বলে, যেমন—আম।

## ▲ আদর্শ ফুলের সংজ্ঞা এবং তার বিভিন্ন অংশ (Definition of typical flower and its different parts)

❖ (a) **আদর্শ ফুলের (জবা ফুলের) সংজ্ঞা (Definition of a typical flower) : জবা ফুলে পুষ্পাক্ষের উপর বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক—এই চারটি স্তবক সাজানো থাকে বলে একে আদর্শ ফুল বা সম্পূর্ণ ফুল বলে।**

➤ (b) **আদর্শ ফুলের (জবা ফুলের) বিভিন্ন অংশ [Different parts of typical flower (China rose)] :**
জবা একটি আদর্শ, সমাঙ্গ এবং উভলিঙ্গ ফুল। এই জবা ফুলের অংশগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

1. **বৃন্ত** (Pedical) : জবা ফুলের নীচের দিকে সরু লম্বা সবুজ বর্ণের বৃন্ত থাকে। এই বৃন্তের উপরে পুষ্পাক্ষ যুক্ত থাকে। তাই জবাকে **সবৃন্তক ফুল** (Pedicellate flower) বলা হয়। **কাজ**—বৃন্ত হল ফুল ও কাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অঙ্গ।

2. **পুষ্পাক্ষ** (Thalamus) : বৃন্তের শীর্ষে পুষ্পস্তবকগুলি যে অংশে সাজানো থাকে তাকে **পুষ্পাক্ষ** বলে। জবা ফুলে একটি পুষ্পাক্ষ থাকে। এতে কাণ্ডের মতো পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে কিন্তু খুব কাছাকাছি ঘনভাবে থাকে বলে বোঝা যায় না। এই ফুলের পুষ্পাক্ষটি উত্তল হয়। **কাজ**— পুষ্পাক্ষের পর্বগুলিতে বিভিন্ন স্তবক ধারণ করা হল পুষ্পাক্ষের প্রধান কাজ।

3. **বৃতি** (Calyx) : ফুলের প্রথম স্তবককে বৃতি বলে। এই স্তবক ছোটো ছোটো সরু পাতার মতো সবুজ অংশ নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি ছোটো অংশকে **বৃত্যংশ** (Sepal) বলে। জবা ফুলে পাঁচটি বৃত্যংশ পরস্পর যুক্ত হয়ে নলাকার বৃতি গঠন করে। বৃত্যংশগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে বলে এদের **যুক্তবৃতি** (Gamosepalous) বলা হয়। **কাজ**—(i) বৃতি ফুলের অন্য অংশগুলিকে বৃষ্টি, তাপ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। (ii) এরা সবুজ বলে পাতার মতো খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়।

4. **দলমণ্ডল** (Corolla) : বৃতির ভিতরের স্তবককে দলমণ্ডল বলে। জবা ফুলে উজ্জ্বল লাল বর্ণের পাঁচটি **দলাংশ বা পাপড়ি** (Petal) দলমণ্ডল গঠন করে। দলাংশগুলি আলাদা আলাদা ভাবে থাকে বলে একে **বিযুক্তদল বা মুক্তদল** (Polypetalous) বলা

হয়। **কাজ**— (i) দলমণ্ডল ফুলের ভিতরের স্তবকগুলিকে (পুং স্তবক ও স্ত্রীস্তবক) রক্ষা করে। (ii) তাছাড়া ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (iii) উজ্জ্বল লাল বর্ণের জন্য পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, ফলে পরাগসংযোগে সাহায্য করে।
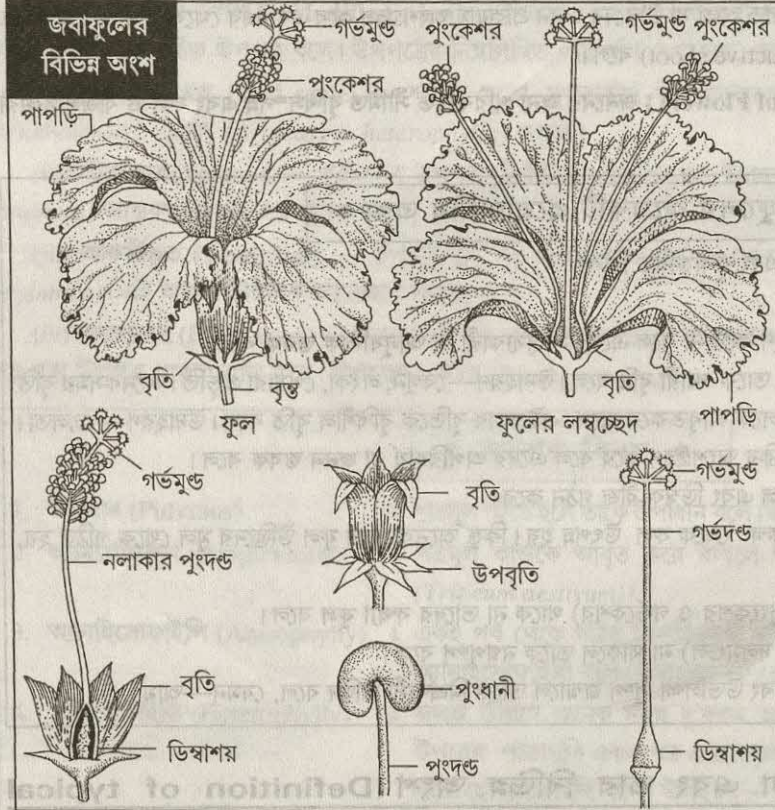
চিত্র 3.35 : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ।

5. **পুংস্তবক** (Androecium) : দলমণ্ডলের পরবর্তী স্তবককে **পুংস্তবক** বলে। এই স্তবকের প্রত্যেকটির অংশকে **পুংকেশর** (Stamen) বলা হয়। জবায় অনেকগুলি পুংকেশরের দণ্ডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি গুচ্ছ গঠন করে। একে **একগুচ্ছ** (Monadelphous) বলা হয়। এরা একটি নল গঠন করে গর্ভদণ্ডকে ঘিরে রাখে। একটি পুংকেশরের দুটি অংশ থাকে—(i) নীচের দিকের সরু লম্বা দণ্ডের মতো অংশকে **পুংদণ্ড** (Filament) বলা হয়। (ii) পুংদণ্ডের শীর্ষে ফাঁপা থলির মতো অংশের নাম **পরাগধানী** (Anther)। সাধারণত বেশির ভাগ ফুলে দুটি পরাগধানী দেখা যায়। কিন্তু জবা ফুলে একটি পরাগধানী থাকে। পরাগধানী বৃক্কাকৃতির হয়। এর মধ্যে অসংখ্য হলুদ বর্ণের পরাগরেণু (Pollen) উৎপন্ন হয়। **কাজ**—(i) পরাগধানী রেণু উৎপন্ন করে। (ii) পরাগরেণু পুংজনন কোশ গঠন ও নিষেক প্রক্রিয়া সমাধা করে।

6. **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium) : ফুলের সবচেয়ে ভিতরের স্তবক অর্থাৎ চতুর্থ স্তবককে **স্ত্রীস্তবক** বলে। এই স্তবক ফুলের স্ত্রীজনন অঙ্গ। স্তবকের সব অংশগুলিকে একসঙ্গে **গর্ভপত্র** (Carpel) বলা হয়। স্ত্রী স্তবকের বা গর্ভকেশরের তিনটি অংশ — (i) নীচের স্ফীত অংশের নাম **ডিম্বাশয়** (Ovary)। ডিম্বাশয়ের মধ্যে একাধিক **ডিম্বক** (Ovule) থাকে (ii) ডিম্বাশয়ের শীর্ষে অবস্থিত দণ্ডের মতো অংশকে **গর্ভদণ্ড** (Style) বলে। (iii) গর্ভদণ্ডের শীর্ষে অবস্থিত ফাঁপা গোলাকার অংশ **গর্ভমুণ্ড** (Stigma) নামে পরিচিত। জবায় পাঁচটি **গর্ভপত্র** একসঙ্গে যুক্ত থাকে বলে তাদের **যুক্ত গর্ভপত্রী** (Syncarpous Gynoecium) বলে। ডিম্বাশয় অধিগর্ভ (superior) অর্থাৎ স্ত্রীস্তবক পুষ্পাক্ষের শীর্ষে অবস্থান করে এবং ফুলে বৃতি, দল, পুংস্তবক নীচের দিকে সাজানো থাকে। ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায় এবং প্রতিটি প্রকোষ্ঠে (সাধারণত জবাতে) দুটি করে ডিম্বক থাকে। এদের অমরাবিন্যাস **অক্ষীয়** (Axile) বলে। গর্ভদণ্ড পাঁচটি একসঙ্গে যুক্ত থাকে। **গর্ভমুণ্ড** পাঁচটি মুক্ত, গোলাকার এবং রোমশ। **কাজ**—স্ত্রীস্তবকের কাজ হল (i) জননে অংশগ্রহণ করা। (ii) ডিম্বকের মধ্যে ভ্রূণস্থলীতে ডিম্বাণু (Egg) থাকে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর ডিম্বক বীজে ও ডিম্বাশয় ফলে পরিণত করা।

## ▲ ফুল একটি রূপান্তরিত বিটপ (Flower is a Modified shoot) :

'ফুল একটি পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত বিটপ' এই উক্তিটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জার্মান দার্শনিক **উল্ফ গ্যাং ভন গেটে** (Wolf Gang Von Goethe)। আপাতদৃষ্টিতে ফুলের সঙ্গে বিটপের সাদৃশ্য সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু উৎপত্তি, অঙ্গ সংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্গঠনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ করা যায় ফুল ও বিটপের গঠন একই প্রকার। বহু দিন ধরে অভিব্যক্তির ফলে বিটপ ফুলে রূপান্তরিত হয়েছে। ফুল একটি রূপান্তরিত বিটপ, এই মতবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

### ◻ পুষ্পাক্ষের প্রকৃতি কাণ্ডের অনুরূপ (Nature of thalamus similar to stem) ঃ

(i) পুষ্পাক্ষকে একটি ক্ষুদ্র কাণ্ড বলা যায়। এতে কাণ্ডের মতো পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। এরা এত কাছাকাছি সজ্জিত থাকে যে সহজে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। পুষ্পপত্রগুলি পুষ্পাক্ষের পর্বে পর পর ঘনভাবে সাজানো থাকে। চাঁপা (*Michelia champaca*), কাঁঠালি চাঁপা (*Magnolia grandiflora*) প্রভৃতি উদ্ভিদের পুষ্পাক্ষ কাণ্ডের মতো লম্বা হয় এবং এদের পর্বে মুক্তগর্ভপত্রগুলি সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকে।

চিত্র 3.36 ঃ পুষ্পাক্ষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

(ii) ঝুমকো লতা (*Passiflora foetida*) ফুলে পুষ্পাক্ষ যথেষ্ট লম্বা। তাই এর মধ্যবর্তী পর্ব ও পর্বমধ্যগুলি অনেকটা লম্বা হয়। বৃতি ও দলমণ্ডলের মধ্যবর্তী পর্বমধ্যকে **অ্যান্থোফোর** (Anthophore) বলে। শ্বেত হুড়হুড়ে (*Gynandropsis pentaphylla*) ফুলে পাপড়ি ও পুংকেশরের মধ্যবর্তী লম্বা পর্বমধ্যকে **অ্যানড্রোফোর** (Androphore), পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মধ্যবর্তী পর্বমধ্যকে **গাইনোফোর** (Gynophore) বলে। **অ্যান্থোফোর, অ্যানড্রোফোর** ও **গাইনোফোরের** আকৃতি দেখে বলা যায় এরা কাণ্ডের রূপান্তর মাত্র।

(iii) পুষ্পাক্ষের শীর্ষে স্ত্রীস্তবকের অবস্থানের জন্য পুষ্পাক্ষের বৃদ্ধি সীমিত হয়। কিন্তু অনেকগুলি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুষ্পাক্ষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে স্ত্রীস্তবকের উপরে পত্রসমন্বিত শাখা সৃষ্টি হয়। এই প্রকার বিটপ জংলি গোলাপ ফুলে (*Rosa canina*) ও নাসপাতির ফলের (*Pyrus communis*) উপরের দিকে অনেক সময় দেখা যায়। একে **মনোস্ট্রাস** (Monostrous) গঠন বলে।

### ◻ পুষ্পপত্রের প্রকৃতি পত্রের অনুরূপ (Nature of floral whorls similar to leaves) ঃ

চিত্র 3.37 ঃ মুসাণ্ডার পাতার মতো উজ্জ্বল বর্ণের বৃত্যাংশসহ ফুল।

(iv) ফুলের পুষ্পাক্ষের পর্বে পুষ্পপত্রের (বৃত্যংশ, দলাংশ ইত্যাদি) বিন্যাস অনেকটা পত্রবিন্যাসের মতো হয়। ফুলের পুষ্পপত্রের বিন্যাস সর্পিল বা আবর্ত। পত্রবিন্যাস ও সর্পিল বা আবর্তাকার হয়। তা ছাড়া পুষ্পপত্রের মুকুলপত্রবিন্যাস (aestivation) এবং বিটপে কচি পাতার বিন্যাস (vernation) মোটামুটি এক ধরনের হয়।

(v) বৃত্যংশ ও পাপড়িতে পাতার মতো শিরাবিন্যাস (venation) ও পত্ররন্ধ্র (stomata) থাকে।

(vi) অনেকগুলি উদ্ভিদে, যেমন—পদ্ম (*Nelumbo nucifera*), শালুক (*Nymphaea stellata*), ডিজেনেরিয়া (*Degeneria*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলের পুংদণ্ডের (Filament) আকৃতি স্ফীত এবং ফলকের মতো হয়। তাই মনে করা হয় পাতা রূপান্তরিত হয়ে এই ধরনের পুংকেশর গঠিত হয়েছে।

(vii) গোলাপ ও পঞ্চমুখী জবার পুংকেশর পাপড়িতে রূপান্তরিত হয় বলে এদের পাপড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। তা ছাড়া সর্বজয়া (*Canna indica*), দুলাল চাঁপা (*Hedychium coronarium*) প্রভৃতি ফুলে একটিমাত্র পুংকেশর উর্বর। বাকি পুংকেশরগুলি পাপড়িতে রূপান্তরিত হয়।

চিত্র 3.38 ঃ পিওনিয়া উদ্ভিদের পাতা থেকে ফুলের স্তবক গঠনের পর্যায়ক্রমিক চিত্র।

(viii) সবুজ গোলাপে (*Rosa chinensis var viridiflora*) বৃত্যংশ পাতার মতো এবং পাপড়ি ও পাতার মতো সবুজ বর্ণের হয়। মুসাণ্ডা উদ্ভিদের

(*Mussaenda frondosa*) ফুলে পাঁচটি বৃত্যংশের মধ্যে যে-কোনো একটি বৃত্যংশ পাপড়ির মতো এবং রং সাদা। মুসান্ডা ফিলিপিকা (*Mussaenda philippica*) ফুলে পাঁচটি বৃত্যংশ পাপড়ির মতো এবং ঘন লাল বর্ণের হয়।

চিত্র 3.39 : ড্রিমিসের

(ix) পিওনিয়া (*Paeonia officinalis*) উদ্ভিদে পত্র থেকে বৃত্যংশ এবং বৃত্যংশ থেকে পাপড়ি গঠনের মাঝামাঝি অবস্থাগুলি সহজে দেখা যায়।

(x) মটর ফুলের ডিম্বাশয়ের গঠন অনেকটা ভাঁজ করা, শিরাযুক্ত সবুজ পাতার মতো হয়। মনে করা হয় সবুজ পাতা রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাশয় গঠিত হয়েছে। জিনিয়া ফুলের (*Zinnia bipinnata*) ফুলের গর্ভপত্র বৃত্যংশের মতন। সর্বজয়া (*Canna indica*) ফুলের গর্ভদণ্ড পাপড়ির মতো চ্যাপটা ও রঙিন।

(xi) ড্রিমিস্ (*Drymis*), ডিজেনেরিয়া (*Degeneria*) প্রভৃতি প্রাচীন উদ্ভিদের গর্ভাশয়ে গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড থাকে না। এদের ক্ষেত্রে গর্ভাশয়ের উপরের দিকে চিরুনির দাঁতের মতো **ক্রেস্ট** (Chrest) গঠিত। ক্রেস্ট পুংরেণু গ্রহণ করে। এসব গর্ভাশয় অনেকটা দেখতে পাতার মতো হয়। মনে করা হয় পাতা মুড়ে গর্ভাশয়ের উৎপত্তি হয়েছে।

(xii) পদ্মফুলে (*Nelumbo nucifera*) বৃত্যংশ থেকে গর্ভাশয় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বৃত্যংশ সবুজ এবং ক্রমশ দলাংশ এবং দলাংশ থেকে পুংকেশর এবং পুংকেশর থেকে গর্ভকেশর গঠিত হয়েছে। এদের মাঝামাঝি অবস্থাগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সুতরাং বৃত্যংশ থেকে ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে।

চিত্র 3.40 : পদ্মফুলে বৃত্যংশ থেকে গর্ভকেশরের ক্রমরূপান্তর।

চিত্র 3.41 : গ্লোবার বুলবিল গঠন।

● **পুষ্প মুকুলের অঙ্গজ মুকুলে রূপান্তর (Transformation of flower bud to vegetative bud) :**

(xiii) গ্লোবা (*Globba bulbifera*), অ্যাগেভ (*Agave americana*), পেঁয়াজ (*Allium cepa*) প্রভৃতি উদ্ভিদে পুষ্পমুকুল (Flower bud) **বুলবিল** (Bulbil) নামে অঙ্গজ মুকুলে রূপান্তরিত হয়। বুলবিল মাটিতে পড়ে অনুকূল পরিবেশে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

উপরের যুক্তি ও প্রমাণ থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়, ফুল প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবর্তিত বিটপ। তা ছাড়া বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইম্‌স (Eames, 1960) বহু উদ্ভিদের সংবহন কলার গঠন, বিভিন্ন ফুলে এর গঠন বিন্যাস ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করে বলেছেন ফুল হল প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত বিটপ।

● **বৃতি ও দলমণ্ডলের পার্থক্য (Difference between Calyx and Corolla) :**

| বৃতি | দলমণ্ডল |
|---|---|
| 1. ফুলের বাইরে থেকে প্রথম স্তবক। | 1. ফুলের বাইরে থেকে দ্বিতীয় স্তবক। |
| 2. সাধারণত সবুজ। | 2. সাধারণত সাদা বা রঙিন। |
| 3. মসৃণ বা রোমযুক্ত। | 3. রোম থাকে না। |
| 4. পত্ররন্ধ্র থাকে। | 4. পত্ররন্ধ্র থাকে না। |
| 5. বৃতির প্রত্যেকটি অংশকে বৃত্যংশ বলে। | 5. দলমণ্ডলের প্রত্যেক অংশকে দলাংশ বলে। |

| বৃতি | দলমণ্ডল |
|---|---|
| 6. বৃত্যংশকে বৃন্ত ও ফলকে বিভক্ত করা যায় না। | 6. দলাংশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৃন্ত ও ফলকে বিভক্ত করা যায়। |
| 7. গন্ধবিহীন। | 7. গন্ধবিহীন বা সুগন্ধযুক্ত হয়। |
| 8. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। | 8. খাদ্য তৈরি করতে পারে না। |
| 9. পরাগযোগে সাহায্য করে না। | 9. অনেকসময় পরাগযোগে সাহায্য করে। |
| 10. ভিতরের স্তবককে রক্ষা ও অনেক সময় বীজ বিস্তারে সাহায্য করে। | 10. ভিতরের স্তবকগুলিকে রক্ষা ও পরাগযোগে সাহায্য করে, কিন্তু বীজ বিস্তারে সাহায্য করে না। |

● **পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Ardoecium and Gynoecium) :**

| পুংস্তবক | স্ত্রীস্তবক |
|---|---|
| 1. বাইরের দিক থেকে ফুলের তৃতীয় স্তবক। | 1. বাইরের দিক থেকে ফুলের চতুর্থ বা শেষ স্তবক। |
| 2. ফুলের পুংলিঙ্গধর অংশ। | 2. ফুলের স্ত্রীলিঙ্গধর অংশ। |
| 3. প্রত্যেকটি অংশকে পুংকেশর বলে। | 3. প্রত্যেকটি অংশকে গর্ভকেশর বলে। |
| 4. প্রত্যেকটি পুংকেশর পুংদণ্ড, যোজক ও পরাগধানী নিয়ে গঠিত। | 4. গর্ভকেশরের তিনটি অংশ—ডিম্বাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড। |
| 5. পুংধানীতে পুংরেণু উৎপন্ন হয়। | 5. ডিম্বাশয়ে ডিম্বক গঠিত হয়। |
| 6. নিষেকের পর পুংকেশর শুকিয়ে যায়। | 6. নিষেকের পর গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। |
| 7. পরাগ মিলন ও নিষেকে অংশগ্রহণ করে। | 7. নিষেকে অংশগ্রহণ করে এবং ফল ও বীজ গঠন করে। |

## ● পুষ্পপুট (Perianth) ●

বৃতি ও দলমণ্ডলকে সাহায্যকারী স্তবক বলে। বেশির ভাগ ফুলে বৃতি ও দলমণ্ডল স্তবক দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আকৃতির হয়। বৃতি সবুজ বর্ণের এবং দলমণ্ডল বিভিন্ন বর্ণের। কতকগুলি ফুলে বৃতি ও দলমণ্ডল স্তবক দুটির পরিবর্তে একটি স্তবক থাকে। একে **পুষ্পপুট** (Perianth) বলা হয়। পুষ্পপুটের প্রতিটি খণ্ডাংশকে **টেপাল** (Tepal) বলে। টেপালগুলি বৃতির মতো সবুজ বা দলের মতো রঙিন হতে পারে।

**উদাহরণ**—(i) **বৃতির মতো পুষ্পপুট**—নারকেল, আমলকী, সুপারি প্রভৃতি। (ii) **দলের মতো পুষ্পপুট**—রাস্না, কলাবতী, রজনীগন্ধা, লিলি ইত্যাদি।
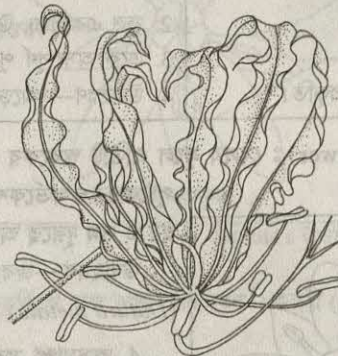
উলটচণ্ডাল

লিলি

➤ **ফুলের প্রকারভেদ (Types of flower) :**

1. **সম্পূর্ণ ফুল (Complete Flower) : যে ফুলে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক এই চারটি অংশ থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলা হয়।**

(b) **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), করবী (*Nerium indicum*), ধুতরো (*Datura metale*), অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*) প্রভৃতি।

2. **অসম্পূর্ণ ফুল (Incomplete flower) :** যে ফুলে চারটি স্তবকের মধ্যে কোনো একটি স্তবক না থাকলে তাকে অসম্পূর্ণ (Incomplete) ফুল বলে।
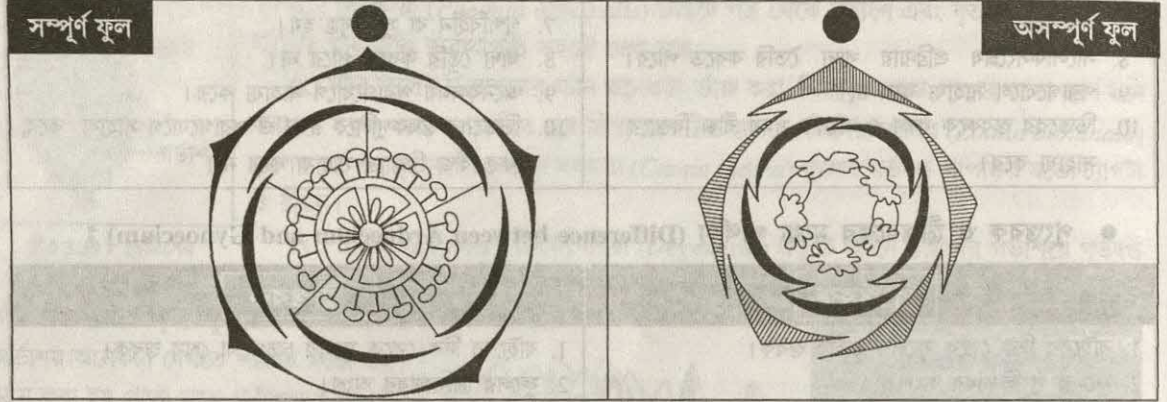
চিত্র 3.42 : সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুলের পুষ্পসংকেত।

(b) **উদাহরণ**—কুমড়ো (*Cucurbita mexima*) গাছে দু'রকমের ফুল দেখা যায়, যেমন—পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প। পুংপুষ্পে বৃতি, দলমণ্ডল ও পুংস্তবক থাকে, কিন্তু স্ত্রীস্তবক নেই। আবার স্ত্রীপুষ্পে বৃতি, দলমণ্ডল ও স্ত্রীস্তবক থাকে, কিন্তু পুংস্তবক থাকে না। রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*) ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক থাকলেও বৃতি ও দলমণ্ডলের পরিবর্তে পুষ্পপুট থাকে। সুতরাং কুমড়ো, রজনীগন্ধা উভয়ে **অসম্পূর্ণ ফুল**।

● **সম্পূর্ণ ফুল ও অসম্পূর্ণ ফুলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Complete and Incomplete flower) :**

| সম্পূর্ণ ফুল | অসম্পূর্ণ ফুল |
|---|---|
| 1. ফুলে চারটি স্তবক (বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক) থাকে। | 1. ফুলে চারটি স্তবকের মধ্যে এক বা একাধিক স্তবক থাকে না। |
| 2. সব সময় ফুল উভলিঙ্গ। | 2. ফুল একলিঙ্গ, উভলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ হতে পারে। |
| 3. একে আদর্শ পুষ্প বলে। | 3. একে অসম্পূর্ণ পুষ্প বলে। |
| 4. উদাহরণ—জবা, করবী, অপরাজিতা প্রভৃতি। | 4. উদাহরণ—কুমড়ো, লাউ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি। |

3. **সমাঙ্গ ফুল (Actinomorphic Flower) :** যেসব ফুলে প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি সমান অর্থাৎ বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর ও গর্ভকেশর পরস্পর আকৃতিগতভাবে একই ধরনের হয় ও সম দূরত্বে অবস্থান করে তাকে সমাঙ্গ ফুল বলে।

**উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), ধুতরো (*Datura metale*) প্রভৃতি।

চিত্র 3.43 : (A)-বহুপ্রতিসম এবং (B)-একপ্রতিসম।

4. **অসমাঙ্গ ফুল (Zygomorphic Flower) :** যেসব ফুলে এক বা একাধিক স্তবকের অংশগুলি অসমান ও সমান দূরত্বে অবস্থান করে না তাদের অসমাঙ্গ ফুল বলে।

**উদাহরণ** — কলাবতী (*Canna indica*), রাস্না (*Vanda roxburghii*), মটর (*Pisum sativum*), অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*) প্রভৃতি।

5. **বহুপ্রতিসম ফুল (Actinomorphic flower) :** কোনো ফুলকে যদি যে-কোনো উল্লম্বতলে কাটলে দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায় তাকে বহুপ্রতিসম ফুল বলে।

**উদাহরণ** — জবা, ধুতরো প্রভৃতি।

6. **একপ্রতিসম ফুল (Zygomorphic flower) :** কোনো ফুলকে যদি একটি বিশেষ উল্লম্বতলে কাটলে দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায়, তাকে একপ্রতিসম ফুল বলে। উদাহরণ — অপরাজিতা, বক প্রভৃতি।

- **সমাঙ্গ ও অসমাঙ্গ ফুলের পার্থক্য (Difference between Regular flower and Irregular flower) :**

| সমাঙ্গ ফুল | অসমাঙ্গ ফুল |
|---|---|
| 1. ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি পরস্পর আকৃতিগতভাবে সমান। | 1. ফুলের প্রতিটি স্তবকের বা একাধিক স্তবকের অংশগুলি অসমান। |
| 2. ফুলগুলি বহুপ্রতিসম। | 2. ফুলগুলি একপ্রতিসম। |
| 3. উদাহরণ — জবা, নয়নতারা, করবী প্রভৃতি ফুল। | 3. উদাহরণ — বক, অপরাজিতা, মটর প্রভৃতি ফুল। |

7. **আবর্ত, অনাবর্ত ও অর্ধআবর্ত ফুল (Cyclic, Acyclic and Hemicyclic flower) :**

(i) **আবর্ত (Cyclic flower)— পুষ্পাক্ষের প্রতিটি পর্বে পুষ্পপত্রগুলি অর্থাৎ বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর ও গর্ভকেশর চক্রাকারে পরপর সাজানো থাকলে তাকে আবর্ত পুষ্প বা ফুল বলে।** উদাহরণ—জবা, সরষে প্রভৃতি।

(ii) **অনাবর্ত (Acyclic flower)—পুষ্পাক্ষের প্রতিটি পর্বে পুষ্পপত্রগুলি সর্পিলভাবে সাজানো হলে তাকে অনাবর্ত ফুল বলে।** উদাহরণ—চাঁপা, দুলে চাঁপা প্রভৃতি।

(iii) **অর্ধআবর্ত (Hemicyclic)—পুষ্পাক্ষের পর্বে কতকগুলি পুষ্পপত্র সর্পিলভাবে এবং কতগুলি আবর্তভাবে সাজানো হলে তাদের অর্ধআবর্ত পুষ্প বলে।** উদাহরণ—গোলাপ, শালুক প্রভৃতি।

8. **একলিঙ্গ ফুল (Unisexual flower) :** যেসব ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের মধ্যে যে-কোনো একটি থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল বলে। উদাহরণ—কুমড়ো (*Cucurbia mexima*), পেঁপে (*Carica papaya*) প্রভৃতি। যেসব ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের মধ্যে পুংস্তবক থাকে না তাদের **স্ত্রীপুষ্প** (Female flower) এবং যাদের স্ত্রীস্তবক থাকে না তাদের **পুংপুষ্প** (Male flower) বলে। আবার অনেকগুলি ফুলে বন্ধ্যা পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক থাকে তাদের **ক্লীবফুল** (Neuter flower) বলে। উদাহরণ—কচু।
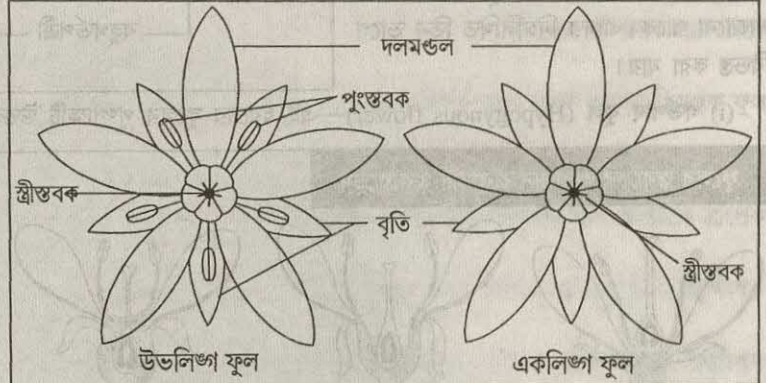
চিত্র 3.44 : উভলিঙ্গ ও একলিঙ্গ ফুল

9. **উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower) :** যেসব ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক উভয়ে উপস্থিত থাকে তাদের উভলিঙ্গ ফুল বলে। উদাহরণ—করবী (*Nerium indicum*), অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*) প্রভৃতি।

10. **সহবাসী উদ্ভিদ (Monoecious plant) :** যেসব উদ্ভিদে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প পৃথকভাবে জন্মায় তাদের সহবাসী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—কুমড়ো (*Cucurbita mexima*)।

11. **ভিন্নবাসী উদ্ভিদ (Dioecious plant) :** একই প্রজাতির যদি কোনো উদ্ভিদে পুংপুষ্প এবং অপর একটি উদ্ভিদে স্ত্রীপুষ্প জন্মায় তাকে ভিন্নবাসী বলা হয়। উদাহরণ—পটল (*Trichosanthes dioica*), তাল (*Borassus flabellifer*), পেঁপে (*Carica papaya*) প্রভৃতি।

12. **মিশ্রবাসী (Poygamous plant) :** একই উদ্ভিদে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এবং উভলিঙ্গ পুষ্প জন্মালে তাকে মিশ্রবাসী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—আম (*Mangifera indica*)।

13. **যুক্তগর্ভপত্রী ও মুক্তগর্ভপত্রী (Syncarpous and Apocarpous Ovary) ঃ** একাধিক গর্ভপত্রযুক্ত স্ত্রীস্তবককে দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—মুক্তগর্ভপত্রী ও যুক্তগর্ভপত্রী।

চিত্র 3.45 ঃ মুক্তগর্ভপত্রী ও যুক্তগর্ভপত্রী।

(i) **মুক্তগর্ভপত্রী** (Apocarpous) — **গর্ভপত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে পুষ্পাক্ষের উপর সাজানো থাকলে তাকে মুক্তগর্ভপত্রী বলে। উদাহরণ**—চাঁপা (*Michelia champaca*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) প্রভৃতি।

(ii) **যুক্তগর্ভপত্রী** (Syncarpous) —**গর্ভপত্রগুলি পুষ্পাক্ষের উপর পরস্পর যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভপত্রী বলে। উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa sinensis*), করবী (*Nerium indicum*) প্রভৃতি।

14. **গর্ভপাদ, গর্ভকটি ও গর্ভশীর্ষ ফুল (Hypogynous, Perigynous and Epigynous flower) ঃ** ফুলের বিভিন্ন স্তবকগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে পুষ্পাক্ষের উপর সাজানো থাকে। এদের নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।
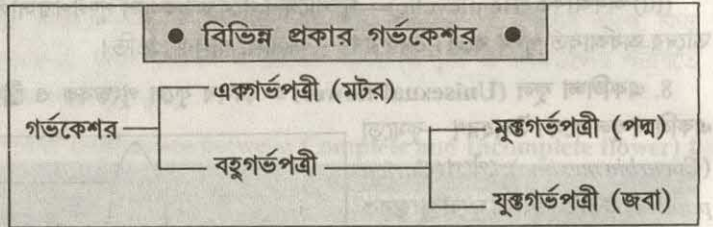
(i) **গর্ভপাদ ফুল** (Hypogynous flower)—এই ধরনের ফুলের পুষ্পাক্ষটি উত্তল বা শাঙ্কব আকৃতির এবং স্ত্রীস্তবক পুষ্পাক্ষের শীর্ষে অবস্থান করে। এই ফুলের পুংস্তবক, দল ও বৃতি পরপর নীচের দিকে সাজানো থাকে। এই ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের স্থান সবচেয়ে উপরে (Superior)। এই ধরনের ডিম্বাশয়কে **অধিগর্ভ** (Superior) এবং ফুলকে **গর্ভপাদ ফুল** বলে। **উদাহরণ**—সরষে, জবা, করবী প্রভৃতি।

চিত্র 3.46 ঃ পুষ্পাক্ষের উপর ফুলের স্তবকগুলির অবস্থানের প্রকারভেদ।

(ii) **গর্ভকটি ফুল** (Perigynous flower)—এই ধরনের ফুলের পুষ্পাক্ষটি সাধারণত অবতল অথবা পেয়ালাকার হয়। ডিম্বাশয়টি পুষ্পাক্ষের মাঝখানে থাকে এবং পুষ্পাক্ষের উঁচু কিনারায় ফুলের স্তবকগুলি পরপর সাজানো থাকে। এইক্ষেত্রে ডিম্বাশয়টিকে **অর্ধ-অধিগর্ভ** (Half superior) বলা হয়। **উদাহরণ**—গোলাপ, অতসী প্রভৃতি।

(iii) **গর্ভশীর্ষ ফুল** (Epigynous flower)—এই ফুলের পুষ্পাক্ষটি অবতল (Concave) এবং প্রান্তদেশ উপরের দিকে প্রসারিত হয়। অবতলাকার পুষ্পাক্ষের মাঝে ডিম্বাশয় অবস্থান করে। বৃত্যংশ, দলমণ্ডল ও পুংস্তবক পরপর ডিম্বাশয়ের উপর সাজানো থাকে। এখানে ডিম্বাশয়টিকে **অধোগর্ভ** (Inferior) এবং ফুলকে গর্ভশীর্ষ বলা হয়। **উদাহরণ**—কুমড়ো, সূর্যমুখী প্রভৃতি।

● **গর্ভপাদ, গর্ভকটি এবং গর্ভশীর্ষের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Hypogynous, Perigynous and Epigynous flower) :**

| গর্ভপাদ | গর্ভকটি | গর্ভশীর্ষ |
|---|---|---|
| 1. পুষ্পাক্ষ শাঙ্কব বা উত্তল প্রকৃতির হয়। | 1. পুষ্পাক্ষ সমতল বা সামান্য অবতল প্রকৃতির হয়। | 1. পুষ্পাক্ষ অবতল ও পেয়ালাকার হয়। |
| 2. গর্ভপত্র পুষ্পাক্ষের শীর্ষে অর্থাৎ অন্যান্য স্তবকের উপরে সাজানো থাকে। | 2. গর্ভপত্র পুষ্পাক্ষের উপর অন্যান্য স্তবকের নীচে বা প্রায় একই তলে সাজানো থাকে। | 2. গর্ভপত্র পুষ্পাক্ষের নীচে অর্থাৎ অন্যান্য স্তবকের একেবারে নীচে সাজানো থাকে। |
| 3. এই ফুলে ডিম্বাশয় অধিগর্ভ। | 3. এই ফুলে ডিম্বাশয় অর্ধ অধিগর্ভ। | 3. এই ফুলে ডিম্বাশয় অধোগর্ভ। |
| 4. উদা : জবা, করবী, ধুতরো প্রভৃতি। | 4. উদা : বকফুল, অপরাজিতা প্রভৃতি। | 4. উদা : কুমড়ো, রঙ্গন, সূর্যমুখী প্রভৃতি। |

15. **মঞ্জরিপত্রক ও অমঞ্জরিপত্রক ফুল (Bracteate and Ebracteate Flower) :**

(i) **মঞ্জরিপত্রক ফুল** (Bracteate) : যেসব ফুলের গোড়ায় অর্থাৎ বৃতির নীচে **মঞ্জরিপত্র** (Bract) থাকে তাদের **মঞ্জরিপত্রক ফুল** বলে। **উদাহরণ**—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*)।

(ii) **অমঞ্জরিপত্রক ফুল** (Elracteate flower) : যেসব ফুলের বৃতির নীচে মঞ্জরিপত্র থাকে না তাদের **অমঞ্জরিপত্রক ফুল** বলে। **উদাহরণ**—আম (*Mangifera indica*)।

16. **অকঞ্চুক, এককঞ্চুক, দ্বিকঞ্চুক ফুল (Achlamydeous, Monochlamydeous and Dichlamydeous flower) :**

(i) **অকঞ্চুক ফুল** (Achlamydeous flower)—যেসব ফুলে বৃতি বা দলমণ্ডলের স্তবক থাকে না তাদের **অকঞ্চুক ফুল** বলে। **উদাহরণ**—উইলো (*Salix tetrasperma*)।

(ii) **এককঞ্চুক ফুল** (Monochlamydeous flower)—যেসব ফুলে বৃতি অথবা দলমণ্ডল যে-কোনো একটি স্তবক থাকে তাকে **এককঞ্চুক ফুল** বলে। **উদাহরণ**—রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*)।

(iii) **দ্বিকঞ্চুক ফুল** (Dichlamydeous flower)—যেসব ফুলে বৃতি ও দলমণ্ডল উভয় স্তবক থাকে তাদের **দ্বিকঞ্চুক ফুল** বলে। **উদাহরণ**—সরষে (*Brassica nigra*)।

17. **ত্র্যংশক, চতুর্থংশক ও পঞ্চাংশক ফুল (Trimerous, Tetramerous and Pentamerous flower) :**

(i) **ত্র্যংশক ফুল** (Trimerous flower)—ফুলের প্রতিটি স্তবকের সংখ্যা তিন বা তিনের গুণিতক হলে ফুলটিকে ত্র্যংশক (Trimerous) বলে। **উদাহরণ**—পেঁয়াজ (*Allium cepa*)।

(ii) **চতুর্থংশক ফুল** (Tetramerous flower)—ফুলের প্রতিটি স্তবকের সংখ্যা চার বা চারের গুণিতক হলে **চতুর্থংশক** (Tetramerous) ফুল বলে। **উদাহরণ**—সরষে (*Brassica nigra*)।

(iii) **পঞ্চাংশক ফুল** (Pentamerous flower)—ফুলের প্রতিটি স্তবকের সংখ্যা পাঁচ বা পাঁচের গুণিতক হলে **পঞ্চাংশক** (Pentamerous) ফুল বলে। **উদাহরণ**—ধুতরা (*Datura metale*)।

## ▲ পুষ্পপত্রবিন্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Different types of Aestivation)

❖ (a) **পুষ্পপত্রবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Aestivation )**—মুকুল অবস্থায় ফুলের বৃত্যংশ ও দলাংশ অথবা পুষ্পপুটের টেপালগুলির বিশেষ পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে সাজানোর রীতিকে **পুষ্পপত্রবিন্যাস** বলা হয়।

➤ (b) **পুষ্পপত্রবিন্যাসের প্রকারভেদ (Different types of aestivation) :**

(i) **ভালভেট বা প্রান্তস্পর্শী** (Valvate) — এই ধরনের পুষ্পপত্রবিন্যাসে মুকুলের বৃত্যংশ বা দলাংশগুলি পরস্পর স্পর্শ করে অথবা পাশাপাশি থাকে। কোনো অবস্থায় একে অন্যকে আবৃত করে না। **উদাহরণ**—জবা ফুলের বৃতি।

(ii) **টুইস্টেড** (Twisted)—এই পুষ্পপত্রবিন্যাসে মুকুলের বৃত্যংশ বা দলাংশের প্রান্তগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, প্রত্যেকের একপ্রান্ত একটির সাহায্যে ঢাকা থাকে এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে পরের একটিকে আবৃত করে। এই বিন্যাসকে **টুইস্টেড** বলে। **উদাহরণ**—জবা ফুলের পাপড়ি।

(iii) **ইমব্রিকেট** (Imbricate) — এই বিন্যাস পদ্ধতিতে বৃত্যংশ ও দলাংশগুলির একটির দু'প্রান্ত সম্পূর্ণ ভিতরে, অন্য একটির দু'প্রান্ত সম্পূর্ণ বাইরে এবং বাকিগুলি টুইস্টেডের মতো সাজানো থাকে। **উদাহরণ**— কালকাসুন্দা ফুলের পাপড়ি।
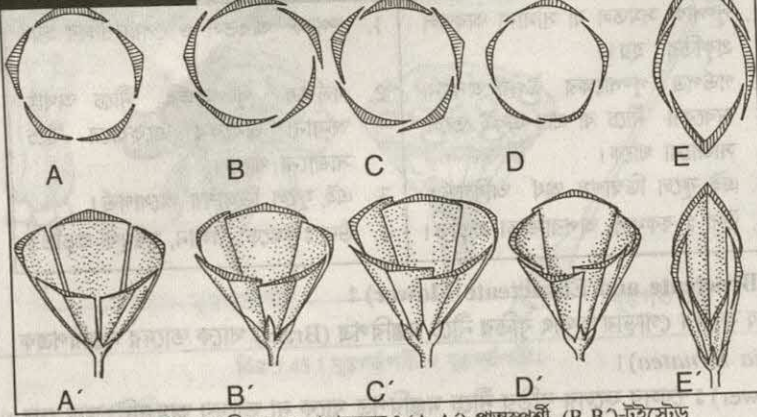
চিত্র 3.47 : পুষ্পপত্রবিন্যাসের প্রকারভেদ : (A-A′)-প্রান্তস্পর্শী, (B-B′)-টুইস্টেড, (C-C′)-ইমব্রিকেট, (D-D′)-কুইনকানশিয়াল এবং (E-E′)-ভক্সিলারি।

(iv) **কুইনকানশিয়াল** (Quincuncial)— পুষ্পমুকুলের দুটি বৃত্যংশ বা দলাংশ সম্পূর্ণ ভেতরে ও দুটি সম্পূর্ণ বাইরে এবং অন্যটি টুইস্টেডের মতো সাজানো থাকে। **উদাহরণ**—আকন্দ ফুলের বৃত্যংশ।

(v) **ভেক্সিলারি** (Vexillary) — এই ধরনের পুষ্পপত্রবিন্যাস শুধু কতকগুলি ফুলের দলাংশে দেখা যায়। এই বিন্যাস যেসব ফুলে দেখা যায় তাদের পাঁচটি পাপড়ি থাকে। সবচেয়ে বড়ো দলটিকে **ধ্বজা** (Standard) বলে। ধ্বজার পক্ষ (Wing) নামে দুটি দলাংশকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখে। আবার পক্ষ দুটি নৌকা আকৃতির তরীদল (Keel) দুটিকে কিছুটা আবৃত করে রাখে। **উদাহরণ**— অপরাজিতা ও মটর ফুলের দলাংশ।

## A. ফুলের সমসংযোগ (Cohesion of Flower) :

ফুলের বিভিন্ন স্তবক নিজেদের মধ্যে যুক্ত থাকলে তাদের **সমসংযোগ (Cohesion)** বলে। নীচে ফুলের বিভিন্ন স্তবকের সমসংযোগ দেখানো হল।

1. **বৃত্যংশের সমসংযোগ (Cohesion of sepals)** : জবা (*Hibiscus-rosa sinensis*) ও বকফুলের (*Sesbenia grandiflora*) বৃত্যংশ পাঁচটি পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকে। একে বৃত্যংশের সমসংযোগ বলে।

2. **দলাংশের সমসংযোগ (Cohesion of petals)** : নয়নতারা (*Vinca rosea*) ও ধুতরো (*Datura metale*) ফুলে দলাংশ পাঁচটি। এরা পরস্পর যুক্ত হয়ে সমসংযোগ স্তবক গঠন করে।

চিত্র 3.48 : পুংকেশরের সমসংযোগ।

3. **পুংকেশরের সমসংযোগ (Cohesion of Stamens)** :
(a) পুংকেশরের পুংদণ্ডগুলি যুক্ত থাকলে তাকে **অ্যাডেলফি (Adelphy)** বলা হয়। অ্যাডেলফি তিন প্রকারের হয়।
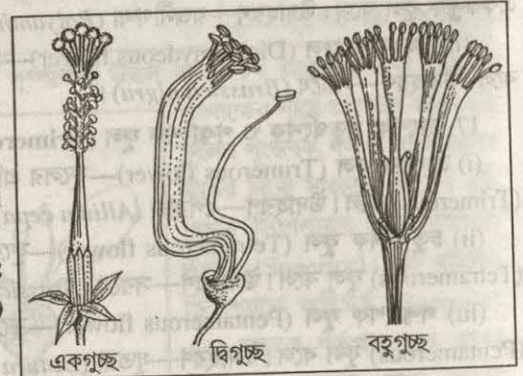
(i) **একগুচ্ছ** (Monadelphous)—কোনো ফুলের পুংদণ্ডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি গুচ্ছ গঠন করলে তাকে **একগুচ্ছ** বলা হয়। **উদাহরণ** — জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*)।

(ii) **দ্বিগুচ্ছ** (Diadelphous)—কোনো ফুলের পুংদণ্ডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে দুটি গুচ্ছ গঠন করলে তাকে **দ্বিগুচ্ছ** বলা হয়। **উদাহরণ**—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*), বকফুল (*Sesbania grandiflora*) প্রভৃতি।

(iii) **বহুগুচ্ছ** (Polyadelphous)—ফুলের পুংদণ্ডগুলি যুক্ত হয়ে অনেকগুলি গুচ্ছ গঠন করলে তাকে **বহুগুচ্ছ** বলে। **উদাহরণ**—শিমুল (*Bombax Cieba*), রেড়ি (*Ricinus communis*) ইত্যাদি।

চিত্র 3.49 : পরাগধানীর সমসংযোগ।

4. **পরাগধানীর সমসংযোগ (Cohesion of anthers)** : পরাগধানীর সংযোগকে **যুক্তপরাগধানী** (Syngenesious) বলে। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*),

গাঁদা (*Tagetes patula*) প্রভৃতি। কুমড়োতে (*Cucurbita mexima*) পুংধানী ও পুংদণ্ড পরস্পর যুক্ত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। একে **যুক্তপুংকেশর** (Synandrous stamen) বলে।

## B. ফুলের অসমসংযোগ (Adhesion of Flower) ঃ

ফুলের এক স্তবক অন্য স্তবকের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে **অসমসংযোগ** (Adhesion) বলা হয়। নীচে বিভিন্ন প্রকার অসমসংযোগ আলোচনা করা হল।

1. **দলমণ্ডলের সঙ্গে পুংকেশরের সংযোগ (Adhesion of Petals with Stamens)**—ফুলের পুংকেশরগুলি দলমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে **দললগ্ন পুংকেশর** (Epipetalous stamens) বলে। **উদাহরণ**— নয়নতারা (*Vinca*), ধুতরো (*Datura*) প্রভৃতি।

2. **পুষ্পপুটের সঙ্গে পুংকেশরের সংযোগ (Adhesion of perianth with stamens)**—ফুলের পুংকেশরগুলি যখন পুষ্পপুটের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে **পুষ্পপুটলগ্ন পুংকেশর** (Epiphyllous stamen) বলা হয়। **উদাহরণ**—রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*)।

3. **পুংকেশরের সঙ্গে গর্ভকেশরের সংযোগ (Stamens united with Gynoecium)**—পুংকেশর যখন স্ত্রীস্তবকের গর্ভকেশরের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে **গ্যাইন্যানড্রাস স্ট্যামেন বা যৌবিৎপুষ্ক (Gynandrous stamen)** বলে। **উদাহরণ**—আকন্দ (*Calotropis procera*), রাস্না (*Vanda roxbunghii*) প্রভৃতি।

# ▲ অমরাবিন্যাস (Placentation)

গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ করলে দেখা যায় এক বা একাধিক গর্ভপত্রযুক্ত হয়ে গর্ভাশয় গঠিত হয়। গর্ভপত্রের দুটি কিনারা থাকে। এই কিনারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠ গঠন করে। গর্ভপত্রের দুটি কিনারা যেখানে যুক্ত হয় তাকে **অঙ্কীয় সন্ধি** (Ventral suture) বলে। এই সন্ধি বা সংযোগে প্যারেনকাইমা কলার সঙ্গে ডিম্বকগুলি যুক্ত থাকে। এই প্যারেনকাইমা কলাকে **অমরা (Placenta)** বলে। অঙ্কীয় সন্ধির উল্টো দিকের সন্ধিকে **পৃষ্ঠসন্ধি** (Dorsal Suture) বলে। এই সন্ধিতে কোনো অমরা থাকে না।

চিত্র 3.50 ঃ অমরাবিন্যাসের প্রকারভেদ।

❖ (a) **অমরাবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Placentation) ঃ** ডিম্বাশয়ের সঙ্গে ডিম্বক ধারণকারী অমরার সজ্জারীতিকে অমরাবিন্যাস বলা হয়।

➤ (b) **অমরাবিন্যাসের প্রকারভেদ (Types of Placentation) ঃ** অমরাবিন্যাস বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন—

1. **প্রান্তীয় (Marginal)**—এই ধরনের অমরাবিন্যাসে ডিম্বাশয়টি একটি গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হয়। গর্ভপত্রের **অঙ্কীয় সন্ধিতে** (Ventral suture) অমরা উৎপন্ন হয় বলে একে প্রান্তীয় (Marginal) **অমরাবিন্যাস** বলে। অমরায় পরপর কয়েকটি ডিম্বক যুক্ত থাকে। **উদাহরণ** — মটর (*Pisum sativum*), শিম (*Dolichos lablab*) ইত্যাদি।

2. **বহুপ্রান্তীয়** (Parietal)—ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ করলে, একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ দেখা যায় এবং ভিতরে তিনটি অমরা থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই ডিম্বাশয়টি তিনটি গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি অমরা দুটি গর্ভপত্রের সংযোগ প্রাচীর উৎপন্ন করে। একে **বহু প্রান্তীয়** (Parietal) **অমরাবিন্যাস** বলে। প্রত্যেকটি অমরার সঙ্গে বহু ডিম্বক যুক্ত থাকে। **উদাহরণ**—কুমড়ো (*Cucurbita mexima*), সরষে (*Brassica nigra*) প্রভৃতি।

3. **অক্ষীয়** (Axile)— ডিম্বাশয়ে একাধিক গর্ভপত্র যুক্ত হয়ে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ গঠন করে। গর্ভপত্রের কিনারা ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এই সংযোগের সময় যুক্ত ডিম্বাশয়টি মাঝে একটি মধ্য অক্ষ (Central axis) গঠন করে। এই মধ্য অক্ষেই অমরা উৎপন্ন হয় এবং প্রজাতি অনুসারে প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকে। একে **অক্ষীয়** (Axile) **অমরাবিন্যাস** বলে। **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus*), লেবু (*Citrus*), ধুতরো (*Datura*), কলা (*Musa*) প্রভৃতি।

4. **মুক্তমধ্য** (Free central)—অক্ষীয় অমরাবিন্যাসের প্রকোষ্ঠগুলির বিভেদপ্রাচীর নষ্ট হয়ে গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। মধ্য অক্ষের চারদিকে অমরা সাজানো থাকে। একে **মুক্তমধ্য অমরাবিন্যাস** বলে। **উদাহরণ**—পিঙ্ক (*Dianthus*), নুনিয়া (*Portulaca*) প্রভৃতি।

5. **গাত্রীয়** (Superficial)—ডিম্বাশয় বহু প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বহুগর্ভপত্র যুক্ত হয়ে এই ডিম্বাশয় গঠন করে। ডিম্বাশয়ের বিভেদ প্রাচীরের গায়ে অমরা সৃষ্টি হয়। একে **গাত্রীয় অমরাবিন্যাস** বলা হয়। ডিম্বাশয়ের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ বহুডিম্বক অমরার সঙ্গে যুক্ত থাকে। **উদাহরণ**—শালুক (*Nymphaea*), শিয়ালকাঁটা (*Argemone*) ইত্যাদি।

6. **মূলীয়** (Basal)—ডিম্বাশয়ে একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে। দুটি গর্ভপত্র দিয়ে এই ডিম্বাশয় গঠিত হয়। গর্ভাশয়ের নীচের দিকে অর্থাৎ পুষ্পাক্ষ থেকে অমরা উৎপন্ন হয়। একে **মূলীয় অমরাবিন্যাস** বলে। অমরাতে একটি ডিম্বক যুক্ত থাকে। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী (*Helianthus*), গাঁদা (*Tagetes*) প্রভৃতি।
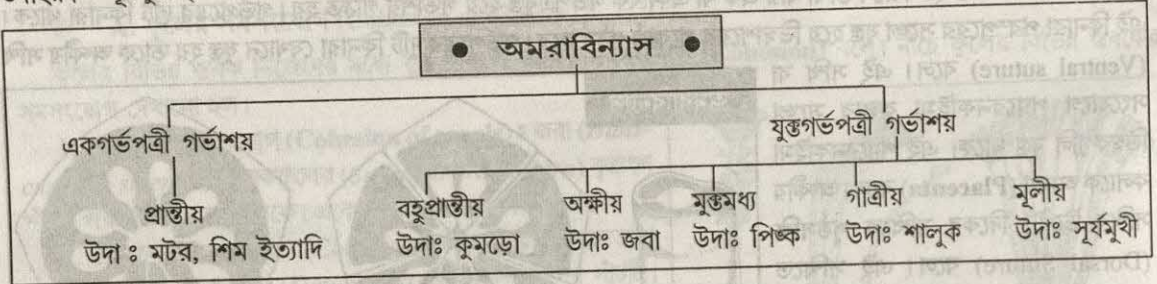
### • মালভেসি (জবা) ও মুসেসি (কলাফুল) গোত্রের অমরাবিন্যাস (Placentation of Malvaceae—China rose and Musaceae—Musa)

অমরাবিন্যাস বিভিন্ন রকমের হয়। তার মধ্যে **মালভেসি** (Malvaceae) ও **মুসেসি** (Musaceae) গোত্রে **অক্ষীয় অমরা বিন্যাস** (Axile placentation) দেখা যায়।
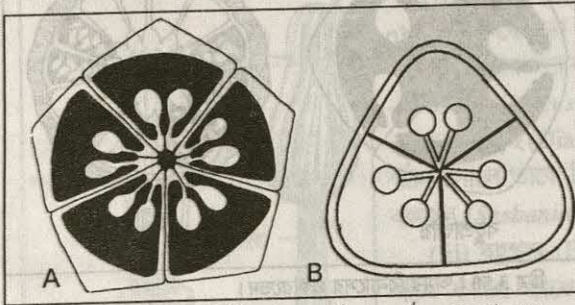
**চিত্র 3.51 :** অক্ষীয় অমরাবিন্যাস—A-পাঁচ প্রকোষ্ঠযুক্ত (জবা) এবং B-তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত (কলা)।

(i) **মালভেসি গোত্রের জবার অমরাবিন্যাস**— এক্ষেত্রে গর্ভাশয়ের গর্ভপত্রের কিনারা ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে পরস্পর যুক্ত হয়ে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ গঠন করে এবং এই সংযোগের সময় যুক্ত ডিম্বাশয়টির মাঝে একটি মধ্য অক্ষ গঠন করে (Central axis) এবং অক্ষীয় সন্ধির ভিতরের দিকে অমরা উৎপন্ন হয়। একে **অক্ষীয় অমরাবিন্যাস** বলে। **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sincusis*)।

(ii) **মুসেসি গোত্রের কলাফুলের অমরাবিন্যাস**—এক্ষেত্রে গর্ভাশয়ে তিনটি গর্ভপত্র যুক্ত হয়ে গর্ভপত্রের কিনারা ভাঁজ হয়ে পরস্পর যুক্ত হয় এবং তিনটি প্রকোষ্ঠ গঠন করে। এখানেও কেন্দ্রীয় অক্ষের অক্ষীয় সন্ধির ভিতরের দিকে অমরা উৎপন্ন হয়। এটিও **অক্ষীয় অমরাবিন্যাস**। **উদাহরণ**—কলা (*Musa paradisica*)।

## পুষ্পসংকেত Floral formula

❖ (a) **পুষ্পসংকেতের সংজ্ঞা (Definition of Floral formula) :** **সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে ফুলের গঠনের বিবরণ দেওয়াকে পুষ্পসংকেত বা ফ্লোরেল ফরমুলা বলা হয়।**

➤ (b) **পুষ্পসংকেতে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন (Symbols used in Floral formula) :** ফুলের প্রকৃত গঠন সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কতকগুলি **সাংকেতিক চিহ্ন** (Symbol) আমরা ব্যবহার করি। নীচে পুষ্পসংকেতের সাংকেতিক চিহ্নগুলি দেওয়া হল।

1. ব্রাস্ট বা মঞ্জরিপত্র (Bract) = **Br.**
2. ব্রাক্টিওল বা মঞ্জরিপত্রিকা (Bracteol) = **Brl.**
3. বহুপ্রতিসম (Actinomorphic) = ⊕
4. একপ্রতিসম (Zygomorphic) = ·|·
5. উভলিঙ্গ (Bisexul) = ⚥
6. পুংপুষ্প (Male flower) = ♂
7. স্ত্রীপুষ্প (Female flower) = ♀
8. উপবৃতি (Epicalyx) = **Epik**
9. বৃতি (Calyx) = **K**
10. পাপড়ি বা দলমন্ডল (Corolla) = **C**
11. পুষ্পপুট (Perianth) = **P**
12. পুংস্তবক (Androceium) = **A**
13. স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) = **G**

পুষ্পসংকেত লেখার সময় প্রতিটি স্তবকের সাংকেতিক চিহ্ন লিখে অংশগুলির সংখ্যা ডান পাশে নীচে বসাতে হয়। স্তবকের অংশগুলি পরস্পর যুক্ত থাকলে সংখ্যাটিকে বন্ধনীর ( ) মধ্যে এবং মুক্ত থাকলে বন্ধনী ছাড়াই লিখতে হয়। পাশাপাশি দুটি স্তবক যুক্ত থাকলে (Adhesion) সাংকেতিক চিহ্নের উপরে রেখা বা লাইন দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। পাপড়ি বা দলের সঙ্গে পুংকেশর যুক্ত থাকলে অর্থাৎ দললগ্ন পুংকেশর (Epipetalous) হলে $\overline{CA}$ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। একইভাবে পুংকেশর ও গর্ভকেশর যুক্ত থাকলে সাংকেতিক চিহ্ন ও রেখা হবে $\overline{AG}$ ।

গর্ভকেশরে গর্ভপত্রের সংখ্যা সাংকেতিক চিহ্নের নীচে দেখাতে হয়। গর্ভপত্র পরস্পর যুক্ত থাকলে (Syncarpous) সংখ্যায় বন্ধনী বসাতে হয়। গর্ভপত্র মুক্ত (Apocarpous) থাকলে বন্ধনী ছাড়া সংখ্যা লিখতে হবে, যেমন—যুক্তগর্ভপত্রীর ক্ষেত্রে $G_{(5)}$ এবং মুক্ত গর্ভপত্রীর ক্ষেত্রে শুধু $G_5$ ইত্যাদি।

তা ছাড়া পুষ্পাক্ষের উপর গর্ভপত্রের অবস্থান এবং তার সঙ্গে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশর প্রভৃতির আপেক্ষিক অবস্থান (গর্ভপাদ, গর্ভকটি ও গর্ভশীর্ষ) সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, যেমন—

(i) গর্ভপাদ = $\underline{G}$ , (ii) গর্ভকটি = G– বা এবং (iii) গর্ভশীর্ষ = $\overline{G}$ । বৃত্যংশ, দলাংশ, পুষ্পপুট, পুংকেশর প্রভৃতি একাধিক আবর্তে সাজানো থাকলে সাংকেতিক চিহ্নের নীচে দেখানো সংখ্যাকে আবর্তের সংখ্যা অনুযায়ী ভেঙে লিখতে হয়, যেমন— $K_{2+2}$, $P_{3+3}$, $A_{2+2}$, $A_{(9)+1}$ ইত্যাদি।

➤ (c) **জবা ও কলাফুলের পুষ্পসংকেতের ব্যাখ্যা (Floral formula of China rose and *Musa*) :** নীচে জবা ও কলাফুলের পুষ্পসংকেতের ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

1. **জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*) :** গোত্র—মালভেসি (Malvaceae)—**Br. Epik.** ⊕ ⚥ $K_{(5)}\ C_{(5)}\ A_{(\infty)}\ \underline{G_{(5)}}$

● **ব্যাখ্যা**—জবা ফুলে **পত্রমঞ্জরি** ও **উপবৃতি** থাকে। ফুলের সবকটি স্তবক থাকার জন্য ফুলটি **সম্পূর্ণ**, বহুপ্রতিসম, উভলিঙ্গ ও গর্ভপাদ।

ফুলের বৃত্যংশ 5টি যুক্ত এবং দলাংশ 5টি পরস্পর যুক্ত।

পুংকেশর অনেকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে **একটি গুচ্ছ** (Monadelphous) তৈরি করে এবং দলমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

গর্ভপত্র 5টি, যুক্ত এবং ডিম্বাশয় **গর্ভপাদ**।

2. **কলা (*Musa paradisiaca*) :** গোত্র—মুসেসি (Musaceae)— **Br.** ·|· ⚥ $P_{(3+2)+1}\ A_{3+2}\ \overline{G_{(3)}}$

● **ব্যাখ্যা**—কলাফুলে পুষ্পমঞ্জরিযুক্ত, একপ্রতিসম, উভলিঙ্গ এবং গর্ভশীর্ষ।

ফুলে পুষ্পপুট 6টি, বাইরের আবর্তে তিনটি এবং ভিতরের আবর্তে 3টি থাকে। বাইরের আবর্তের তিনটি পুষ্পপুটের ভেতরে দুটি ভিতরের পুষ্পপুট সংলগ্ন থাকে এবং একটি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকে। পুংকেশরের 6টি দুটি আবর্তে থাকার কথা। বাইরের আবর্তে 3টি পুংকেশর থাকে এবং ভিতরের আবর্তের 3টির মধ্যে একটি অবলুপ্ত হয় বলে দুটি দেখা যায়। গর্ভপত্র 3টি যুক্ত এবং ডিম্বাশয় গর্ভশীর্ষ।

## ▲ পুষ্পচিত্র (Floral diagram)

❖ (a) **পুষ্পচিত্রের সংজ্ঞা (Definition of floral diagram) ঃ মাতৃঅক্ষের সঙ্গে অবস্থানগত সম্পর্ক নির্ণয় করে প্রস্থচ্ছেদে ফুলের বা মুকুলের বিভিন্ন স্তবকগুলির সজ্জারীতির চিত্ররূপকে পুষ্পচিত্র বলে।**

➤ (b) **পুষ্পচিত্রের বিভিন্ন তথ্য (Different facts of Floral diagram) ঃ**

(i) **মাতৃঅক্ষ** (Mother axis)—মাতৃঅক্ষ হল এমন একটি অক্ষ (কাণ্ড বা শাখাপ্রশাখা অথবা পুষ্পদণ্ড) যার উপর ফুল জন্মায়। মাতৃঅক্ষের দিকে যে পৃষ্ঠ থাকে তাকে পেছনের দিক বা **পসটিরিয়ার সাইড** (Posterior side) এবং যে দিকটি তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ মাতৃঅক্ষের বিপরীতে থাকে তাকে সামনের দিক বা **অ্যান্টিরিয়ার সাইড** (Anterior side) বলে। একক ফুল যখন কাণ্ড বা শাখার শীর্ষে জন্মায় তখন ফুলের সব দিক মাতৃঅক্ষের সঙ্গে সমতা বজায় রাখে। একক ফুল কাণ্ড বা শাখার কক্ষে জন্মালে যে দিকটা কাণ্ডের দিকে থাকে তাকে **পেছনের দিক** এবং যে দিকটি ফুলধারক পাতার দিকে থাকে তাকে **সামনের দিক** বলা হয়। মাতৃঅক্ষকে একটি গোলাকার ক্ষুদ্র বিন্দু বা বৃত্তের আকৃতিতে আঁকা হয়। পুষ্পচিত্র আঁকার সময় প্রথমে গোল একটি চক্র এঁকে মাতৃঅক্ষ দেখানো উচিত।

**চিত্র 3.52 ঃ একটি পুষ্পচিত্র।**

(ii) **পুষ্পপত্রমঞ্জরি বা পুষ্পপত্রমঞ্জরিপত্রিকা** (Bracts and Bracteoles)—অনেক ফুলেই মঞ্জরিপত্র থাকে। সেক্ষেত্রে মাতৃঅক্ষের উলটোদিকে একটি চাপের আকৃতিকে মঞ্জরিপত্র আঁকা হয়। মঞ্জরিপত্রিকাগুলি পুষ্পচিত্রের বাইরে অবস্থান অনুযায়ী পাশে দেখানো হয়।

(iii) **বৃতি ও দল** (Calyx and Coralla)— বৃত্যংশের এবং দলাংশের সংখ্যা গুণে মাতৃঅক্ষের সঙ্গে অবস্থানগত সম্পর্ক ও মুকুলপত্রবিন্যাস (Aestivation) অনুযায়ী একে অপরকে ঢেকে রাখছে কিনা এঁকে দেখাতে হয়। মনে রাখতে হবে বৃত্যংশ ও দলাংশের সংখ্যা গুণে চাপের সাহায্যে আঁকতে হয়। প্রথমে বৃত্যংশগুলি এবং এর ভিতরে দলাংশগুলি দেখাতে হয়। বৃত্যংশ ও দলাংশ যদি পরস্পর পৃথক বা মুক্ত থাকে চাপগুলি মুক্ত রাখতে হয়। আবার এরা যদি পরস্পর যুক্ত থাকে, তাহলে চাপগুলির কিনারা জুড়ে দিতে হয়। বৃত্যংশ বা দলাংশ একান্তর ভাবে অবস্থান করলে তাও চিত্রে দেখাতে হয়।

(iv) **পুংকেশর** (Androecium)— পুংকেশরের সংখ্যা প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এবং সেগুলি এক বা একাধিক গুচ্ছে আছে কিনা দেখতে হবে। সাধারণত পুংকেশরগুলি এক স্তবকে বা দুটি স্তবকে বা সর্পিলভাবে সজ্জিত থাকলে তা পুষ্পচিত্রে দেখানো যায়। পরাগধানী যদি দ্বিকোশী হয় তবে দুটি বৃক্কাকৃতির মতো এঁকে দেখানো হয়। যদি এককোশী হয় তবে একটি বৃক্কাকৃতি চিত্রিত করা হয়। যদি পুংকেশরগুলি পৃথকভাবে থাকে, তাদের সেভাবে দেখানো হয়। পুংকেশরগুলি পরস্পর যুক্ত থাকলে তাদের সরু রেখার সাহায্যে জুড়ে দেখানো হয়। পুংকেশরগুলি দলাংশের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের সংযোগও দেখাতে হয়।

(v) **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium)— পুংকেশর আঁকার পর গর্ভকেশরকে পরীক্ষা করতে হয়। স্ত্রীস্তবক পুষ্পচিত্রের ঠিক কেন্দ্রে থাকে। মুক্তগর্ভপত্রী হলে সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি পৃথক বৃত্ত আঁকতে হয়। যুক্তগর্ভপত্রী হলে তার সংখ্যা অনুযায়ী যুক্তভাবে যথাযথ চিত্ররূপ দিতে হয়। এজন্য ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ করে গর্ভপত্রের সংখ্যা, গর্ভাশয়ের প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি প্রকোষ্ঠে ডিম্বকের অবস্থান, মধুগ্রন্থি ইত্যাদি দেখানো একান্ত প্রয়োজন।

### ▲ জবা ও কলাফুলের পুষ্পচিত্র (Floral diagram of *Hibiscus rosa-sinensis and Musa paradisiaca*) ঃ

**1. জবা ফুলের পুষ্পচিত্র** (Floral diagram of *Hibiscus rosa-sinensis*) ঃ

● **ব্যাখ্যা (Explanation)** ঃ (i) **ফুল** (Flower)—বৃন্তযুক্ত, একক, শীর্ষীয় বা কাক্ষিক, উভলিঙ্গ এবং সমাঙ্গ।

(ii) **বৃতি** (Calyx)— বৃত্যংশ 5টি, যুক্ত এবং মুকুল পত্রবিন্যাস ভালভেট (Valvate)।

(iii) **পাপড়ি** (Corolla)— দলাংশ 5টি, মুক্ত এবং টুইস্টেড।

(iv) **পুংকেশর** (Androecium)— পুংকেশর অসংখ্য ও একগুচ্ছ; পুংদণ্ড পরস্পর যুক্ত হয়ে গর্ভদণ্ডকে ঘিরে একটি নল গঠন করে। নলটি পাপড়ির সঙ্গে নীচের দিকে যুক্ত থাকে অর্থাৎ দললগ্ন। পরাগধানী একপ্রকোষ্ঠী এবং বৃক্কাকার।

(v) **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium)— গর্ভপত্র 5টি, যুক্ত; ডিম্বাশয় গর্ভপাদ 5 প্রকোষ্ঠযুক্ত, প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুটি ডিম্বক থাকে। অমরাবিন্যাস অক্ষীয়। গর্ভদণ্ড 5টি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। গর্ভমুণ্ড 5টি, মুক্ত এবং রোমশ।
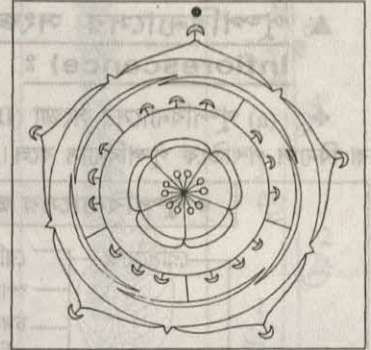
চিত্র 3.53 ঃ জবার পুষ্পচিত্র।

**2. কলাফুলের পুষ্পচিত্র** (Floral diagram of *Musa parasdisiaca*) ঃ

● **ব্যাখ্যা (Explanation)** ঃ (i) **ফুল** (Flower)— ফুল মঞ্জরিপত্র যুক্ত, অসমাঙ্গ ও উভলিঙ্গ।
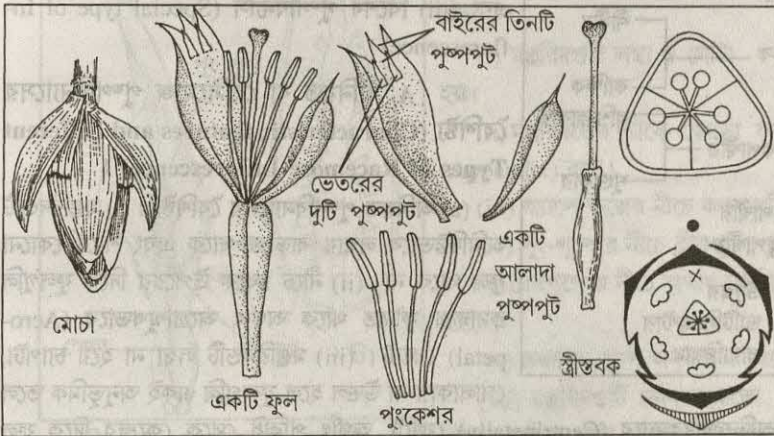
চিত্র 3.54 ঃ কলাফুলের বিভিন্ন অংশ ও পুষ্পচিত্র।

(ii) **পুষ্পপুট** (Perianth)— পুষ্পপুট 6টি, দুটি আবর্তে তিনটি করে (3 + 3) বিন্যস্ত। বাইরের আবর্তের 3টি পুষ্পপুট থাকে এবং ভিতরের আবর্তের 3টি পুষ্পপুটের মধ্যে দুটি বাইরের আবর্তের পুষ্পপুটের ভিতরের দিকে যুক্ত এবং একটি পৃথকভাবে থাকে।

(iii) **পুংস্তবক** (Androecium)— পুংকেশর 6টি থাকার কথা এবং দুটি আবর্তে বিন্যস্ত। বাইরের স্তবকের 3টি পুংকেশর উর্বর। ভিতরের স্তবকের দুটি উর্বর এবং একটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত; পরাগধানী দুপ্রকোষ্ঠী।

(iv) **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium)— গর্ভপত্র 3টি, যুক্ত; ডিম্বাশয়, গর্ভশীর্ষ 3টি প্রকোষ্ঠযুক্ত, প্রতিটি প্রকোষ্ঠে কয়েকটি ডিম্বক থাকে; অমরাবিন্যাস অক্ষীয়; গর্ভদণ্ড 1টি, সরল, গর্ভমুণ্ড ত্রিখণ্ডিত।

## ❂ 3.5. পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence) ❂

পুষ্পমুকুল বেড়ে ফুল গঠন করে। অনেক সপুষ্পক উদ্ভিদ কাণ্ডের শীর্ষে বা কক্ষে একটি করে ফুল উৎপন্ন হয়, যেমন—জবা, ধুতরো প্রভৃতি। বেশির ভাগ উদ্ভিদে একটি ডাঁটির উপরে সুনির্দিষ্ট নিয়মে ফুল উৎপন্ন হয়। এই ডাঁটি বা অক্ষটিকে **মঞ্জরিদণ্ড** (Rachis) বলে। আবার কতকগুলি উদ্ভিদে মঞ্জরিদণ্ড লম্বা না হয়ে চ্যাপটা থালার মতো অথবা উত্তল কাপের আকৃতির হয়, একে **পুষ্পাধার** (Receptacle) বলে। অনেক সময় মঞ্জরিদণ্ডে প্রতিটি ফুল এক বা একাধিক ক্ষুদ্র পত্রাকৃতি অংশের কক্ষে জন্মায়। এদের **মঞ্জরিপত্র** (Bract) বলা হয়। মঞ্জরিপত্রের আকার ও বর্ণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বহু উদ্ভিদে মঞ্জরিপত্র ও ফুলের বৃতির মাঝখানে ক্ষুদ্র পাতার মতো বা শল্কের মতো অঙ্গ গঠিত হয়, এদের **মঞ্জরিপত্রিকা**

(Bracteole) বলে। এমন বহু প্রজাতির ফুল আছে যাদের মঞ্জরিপত্র ও মঞ্জরিপত্রিকা উভয় অঙ্গই থাকে। উদাহরণ—**বাসক, কুলেখাড়া** প্রভৃতি। যেসব ফুলে বৃন্ত থাকে তাদের **সবৃন্তক** (Pedicillate) এবং যাদের বৃন্ত থাকে না তাদের **অবৃন্তক** (Sessile) বলা হয়।

## ▲ পুষ্পবিন্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Inflorescence) :

❖ (a) **পুষ্পবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Inflorescence) :** মঞ্জরিদণ্ড বা পুষ্পাধারের উপর পুষ্পের সজ্জা বা বিন্যাস পদ্ধতিকে পুষ্পবিন্যাস বলে।
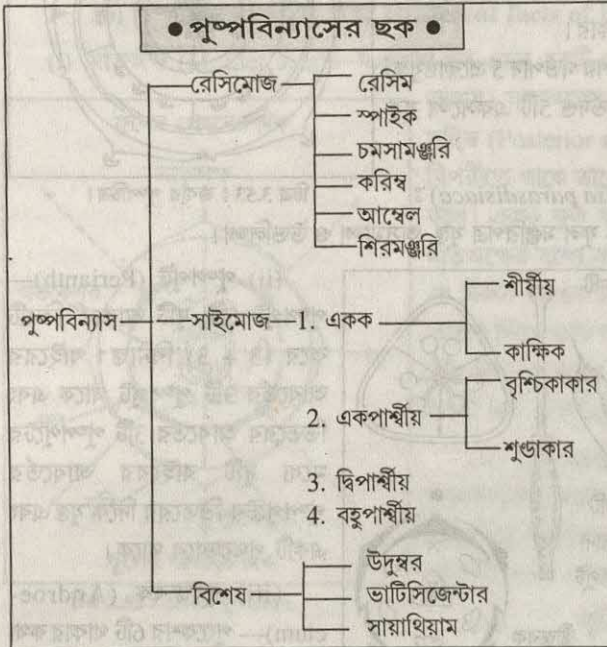
➤ (b) **পুষ্পবিন্যাসের প্রকারভেদ (Different types of Inflorescence) :** মঞ্জরিদণ্ডে ফুলের সজ্জা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পুষ্পবিন্যাসকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(i) **অনিয়ত বা রেসিমোজ পুষ্পবিন্যাস** (Racemose Inflorescence) (ii) **নিয়ত বা সাইমোজ পুষ্পবিন্যাস** (Cymose Inflorescence) এবং (iii) **বিশেষ পুষ্পবিন্যাস** (Special type of Inflorescence)।

### A. অনিয়ত বা রেসিমোজ পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristic features and Different Types of Racemose Inflorescence) :

(a) **অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য :** (i) মঞ্জরিদণ্ডটি অনির্দিষ্টভাবে লম্বায় বাড়তে থাকে এবং শীর্ষে কোনো ফুল থাকে না। (ii) নীচে থেকে উপরের দিকে ফুলগুলি ক্রমান্বয়ে ফুটতে থাকে অর্থাৎ **অগ্রোন্মুখভাবে** (Acropetal) ফোটে। (iii) মঞ্জরিদণ্ডটি লম্বা না হয়ে চ্যাপটা, গোলাকার বা উত্তল হলে ফুলগুলি একই অনুভূমিক তলে বৃত্তাকারে সাজানো থাকে। ফুলগুলি অভিকেন্দ্রিকভাবে (Centripetally) ফোটে, অর্থাৎ পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে ফুল ফুটতে থাকে। (iv) প্রজাতি অনুসারে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ফুলগুলি বৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে।

(b) **বিভিন্ন প্রকার অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস (Different types of Racemose Inflorescence) :** নীচে কয়েক প্রকার অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস আলোচনা করা হল।

1. **রেসিম** (Raceme) **: দীর্ঘ মঞ্জরিদণ্ডযুক্ত অগ্রোন্মুখভাবে সাজানো সবৃন্তক পুষ্পযুক্ত পুষ্পবিন্যাসকে রেসিম বলে।** রেসিমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) মঞ্জরিদণ্ডটি লম্বা এবং অশাখ। (ii) ফুলগুলি সবৃন্তক। (iii) ফুলগুলি মঞ্জরিদণ্ডের উপর অগ্রোন্মুখভাবে ফোটে। **উদাহরণ**—মুলো (*Raphanus sativus*), সরষে (*Brassica nigra*)।
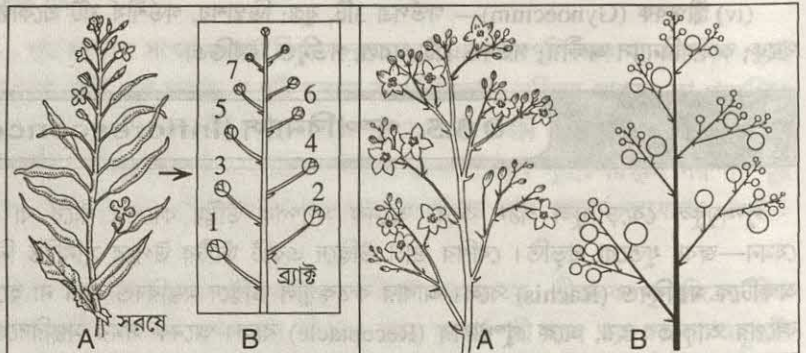
চিত্র 3.55 : A-রেসিম এবং B-রৈখিক চিত্র।

চিত্র 3.56 : পুষ্পবিন্যাস A-যৌগিক রেসিম (আম), B-রৈখিক চিত্র।

শাখান্বিত মঞ্জরিদণ্ডবিশিষ্ট রেসিমকে **যৌগিক রেসিম** বা **প্যানিকল** (Compound Raceme or Panicle) বলে। **উদাহরণ** — আম (*Mangifera indica*)।

2. **স্পাইক (Spike) ঃ দীর্ঘ মঞ্জরিদণ্ডযুক্ত অগ্রোন্মুখভাবে সাজানো অবৃন্তক পুষ্পযুক্ত পুষ্পবিন্যাসকে স্পাইক বলে।** স্পাইকের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) মঞ্জরিদণ্ডটি লম্বা ও অশাখ।

(ii) ফুলগুলি অবৃন্তক।

(iii) প্রত্যেকটি ফুলের মঞ্জরিপত্র আছে।

(iv) ফুলগুলি অগ্রোন্মুখভাবে ফোটে। **উদাহরণ**—আপাং (*Aerva aspera*)।

চিত্র 3.57 ঃ A-স্পাইক (আপাং) এবং B-রৈখিক চিত্র।

3. **চমসামঞ্জরি (Spadix) ঃ পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরিদণ্ড দীর্ঘ, স্ফীত ও রসালো হলে এবং একলিঙ্গ ফুলগুলি অগ্রোন্মুখভাবে মঞ্জরিদণ্ডে বিন্যস্ত হলে ও একটি চমসা দিয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক আবৃত থাকলে তাকে চমসামঞ্জরি বলে।** বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) মঞ্জরিদণ্ডটি লম্বা ও মোটা হয়।

(ii)মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে কোনো ফুল থাকে না। এই অংশকে **অ্যাপেন্ডিক্স** (Appendix) বলে।

(iii) অ্যাপেন্ডিক্সের নীচে কতকগুলি পুং-পুষ্প সাজানো থাকে।

(iv) পুং-পুষ্পের নীচে ক্লীবপুষ্প (Neuter flower) থাকে।

(v)ক্লীবপুষ্পের নীচে অর্থাৎ মঞ্জরিদণ্ডের নীচের দিকে স্ত্রী-পুষ্পগুলি সাজানো থাকে।

(vi) সবরকম পুষ্প অবৃন্তক ও অগ্রোন্মুখভাবে ফোটে।

(vii) মঞ্জরিদণ্ডটি নৌকার মতো আকৃতির রঙিন মঞ্জরি আবরণী বা চমসা দিয়ে আংশিক ঢাকা থাকে। **উদাহরণ**—কচু (*Colocasia esculenta*)।

চিত্র 3.58 ঃ A-চমসামঞ্জরি (কচু) এবং B-রৈখিক চিত্র।

4. **করিম্ব (Corymb) ঃ পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডটি ছোটো এবং পুষ্পবৃন্তগুলি নীচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ ছোটো হতে থাকলে এবং সব ফুলগুলি মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে একই সমতলে অবস্থান করলে তাকে করিম্ব বলে।** বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) মঞ্জরিদণ্ড লম্বা হলেও রেসিম থেকে ছোটো হয়।

(ii) ফুলগুলি অগ্রোন্মুখভাবে সাজানো।

(iii) নীচের দিকের ফুলগুলির বৃন্ত লম্বা কিন্তু উপরের দিকের ফুলগুলির বৃন্ত ক্রমশ ছোটো হয়। এর ফলে ফুলগুলি প্রায় একই সমতলে থাকে। **উদাহরণ**—কালকাসুন্দে (*Cassia sophera*)।
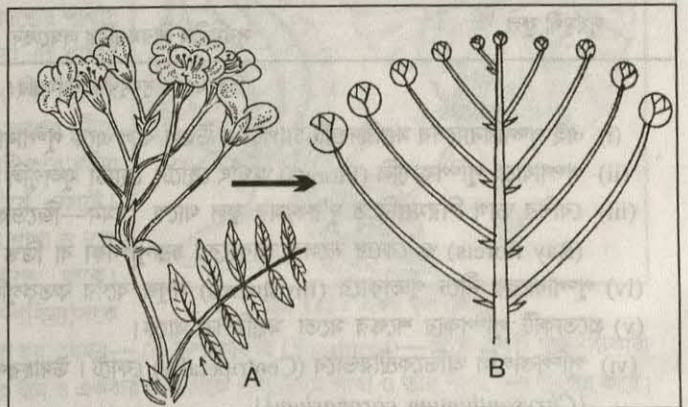
চিত্র 3.59 ঃ A-করিম্ব (কালকাসুন্দে) এবং B-রৈখিক চিত্র।

5. **আম্বেল (Umbel) ঃ পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডটি ক্ষুদ্র গোলকাকৃতি ধারণ করলে এবং বৃন্তযুক্ত পুষ্পগুলি অভিকেন্দ্রিক অনুক্রমে সাজানো থাকলে এবং নীচের দিকে গুচ্ছাকারে মঞ্জরিপত্র সজ্জিত হলে তাকে আম্বেল বলে।** বৈশিষ্ট্যগুলি হল—
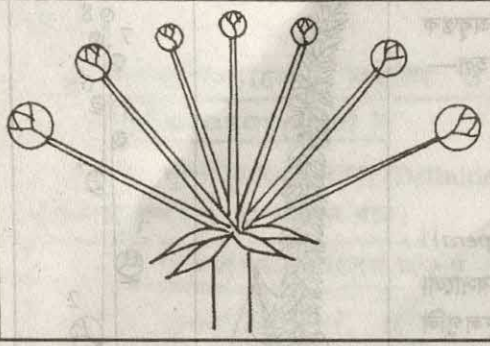
(i) মঞ্জরিদণ্ড খুব ছোটো হয়ে একটা ছোটো বিন্দুর মতো দেখায়।

(ii) ফুলগুলির লম্বা বৃন্ত থাকে।

(iii) মঞ্জরিদণ্ড চাপা হওয়ায় ফুলগুলি মঞ্জরিদণ্ডের অগ্রবিন্দু থেকে জন্মায় বলে মনে হয়।

(iv) ফুলগুলি অভিকেন্দ্রিকভাবে সাজানো থাকে।

(v) মঞ্জরিদণ্ডের নীচের দিকে অর্থাৎ ফুলগুলির বৃন্তের সঙ্গে গুচ্ছাকারে মঞ্জরিপত্র থাকে।

(vi) পরিণত পুষ্পবিন্যাস খোলা ছাতার মতো দেখায়। **উদাহরণ**—থানকুনি (*Centella asiatica*)।

চিত্র **3.60** ঃ আম্বেলের রৈখিক চিত্র (থানকুনি)।

6. **শিরমঞ্জরি (Capitulum) ঃ পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ড চ্যাপটা ও প্রসারিত হয়ে পুষ্পাধারে পরিণত হলে এবং পুষ্পাধারে অসংখ্য অবৃন্তক পুষ্পিকা অভিকেন্দ্রিকভাবে সজ্জিত থাকলে এবং পুষ্পাধারের নীচের দিকে গুচ্ছাকারে মঞ্জরিপত্র থাকলে তাকে শিরমঞ্জরি বলে** । বৈশিষ্ট্যগুলি হল—
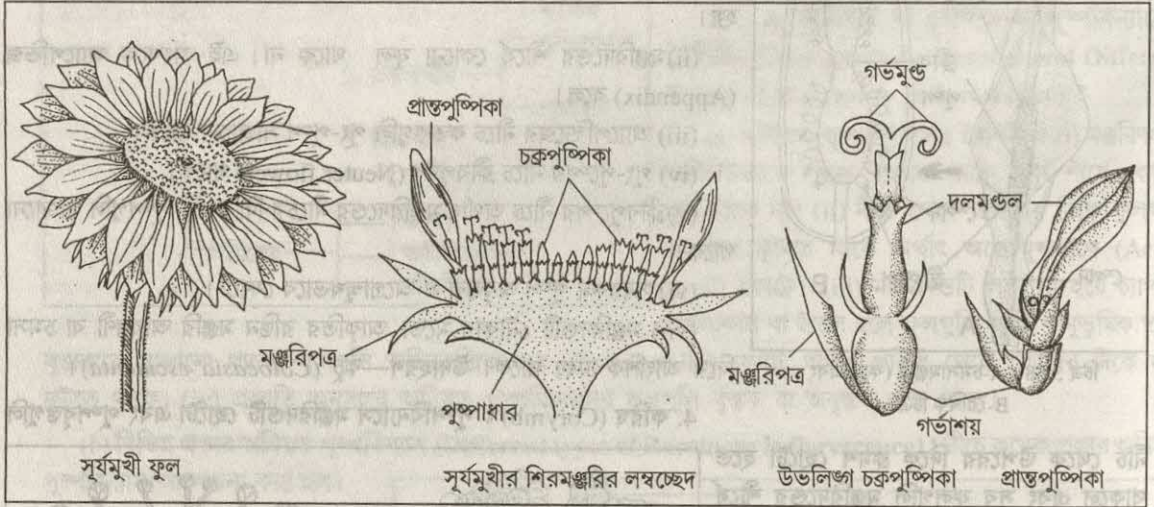
চিত্র **3.61** ঃ সূর্যমুখীর শিরমঞ্জরি।

(i) এই পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরিদণ্ডটি চ্যাপটা ও উত্তল বলে একে **পুষ্পাধার** (Receptacle) বলে।

(ii) পুষ্পাধারে পুষ্পিকাগুলি (Florets) অর্থাৎ ছোটো ছোটো ফুলগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে।

(iii) বেশির ভাগ শিরমঞ্জরিতে দু'রকমের ফুল থাকে, যেমন—জিভের মতো আকারের **প্রান্তপুষ্পিকা** বা **রে ফ্লোরেট** (Ray florets) ও কেন্দ্রে নলের আকারের **চক্রপুষ্পিকা** বা **ডিস্ক ফ্লোরেট** (Disc florets)।

(iv) পুষ্পাধারের নীচে গুচ্ছাকারে (Involucres) সবুজ বর্ণের কতকগুলি মঞ্জরিপত্র থাকে।

(v) প্রত্যেকটি পুষ্পিকায় শল্কের মতো মঞ্জরিপত্র থাকে।

(vi) পুষ্পিকাগুলি অভিকেন্দ্রীয়ভাবে (Centripetally) ফোটে। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*), চন্দ্রমল্লিকা (*Chrysanthimum coronarium*)।

## B. নিয়ত বা সাইমোজ পুষ্পবিন্যাস (Definite or Cymose Inflorescence) :

যে পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে প্রথম ফুল জন্মানোর পর মঞ্জরিদণ্ড আর বাড়ে না এবং পরের ফুলগুলি নিম্নোন্মুখভাবে (Basipetal) ফোটে তাকে নিয়ত **পুষ্পবিন্যাস** বলে। এই পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষের ফুলটি সবচেয়ে বড়ো এবং নীচের ফুলটি সবচেয়ে ছোটো।

### ⊙ নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রকার সাইমোজ পুষ্পবিন্যাস (Characteristic features and Different types of cymose Inflorescence) :

(a) **নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য**— (i) মঞ্জরিদণ্ডের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট এবং শীর্ষে একটি ফুল প্রথমে উৎপন্ন হয়।
(ii) মঞ্জরিদণ্ডে ফুলগুলি উপর থেকে নীচের দিকে ক্রমান্বয়ে ফুটতে থাকে অর্থাৎ **নিম্নোন্মুখভাবে** ফোটে।
(iii) অনেক প্রজাতিতে মঞ্জরিদণ্ড লম্বা না হয়ে পুষ্পাধার সৃষ্টি করে এবং ফুলগুলি **অপকেন্দ্রিকভাবে** ফোটে।

### • অনিয়ত ও নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের পার্থক্য : (Difference between Racemose and Cymose Inflorenscences) :

| অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস | নিয়ত পুষ্পবিন্যাস |
|---|---|
| 1. মঞ্জরিদণ্ডের বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট। | 1. মঞ্জরিদণ্ডের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট। |
| 2. মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে ফুল থাকে না। | 2. মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে প্রথম ফুল সৃষ্টি হয়। |
| 3. লম্বা মঞ্জরিদণ্ডে ফুলগুলি অগ্রোন্মুখভাবে এবং চ্যাপটা ও গোলাকার পুষ্পাধারে অভিকেন্দ্রিকভাবে ফোটে। | 3. লম্বা মঞ্জরিদণ্ডে ফুলগুলি নিম্নোন্মুখভাবে এবং পুষ্পাধার গঠিত হলে অপকেন্দ্রিকভাবে ফোটে। |
| 4. মঞ্জরিদণ্ডে ফুলের সংখ্যা বেশি এবং ফুলগুলি খুব তাড়াতাড়ি পর পর ফোটে। | 4. মঞ্জরিদণ্ডে ফুলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং অনেক দেরিতে ফুলগুলি পর পর ফোটে। |
| 5. মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষ অংশ নষ্ট হলে মঞ্জরিদণ্ড আর বাড়ে না। | 5. মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষ অংশ বা শীর্ষপুষ্প নষ্ট হলে শুধুমাত্র একটি ফুল নষ্ট হয়। নীচের দিকের ফুলগুলি পরপর ফোটে। |

(b) **বিভিন্ন প্রকার সাইমোজ পুষ্পবিন্যাস (Different types of cymose Inflorescence) :**

1. **একক** (Solitary) — এই জাতীয় পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে একটিমাত্র ফুল উৎপন্ন হয়। এই একক ফুল কাণ্ডের শীর্ষে অথবা পত্রকক্ষে উৎপন্ন হতে পারে। **উদাহরণ**—জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*)।

চিত্র 3.62 : একক ফুল (জবা)

2. **একপার্শ্বীয়** (Uniparous cyme) — এখানে মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে প্রথম ফুল উৎপন্ন হয়। শীর্ষ ফুলের নীচে মঞ্জরিদণ্ডের পার্শ্বীয় শাখা সৃষ্টি হয় এবং এই শাখার শীর্ষে একটি ফুল ফোটে। এবার আবার দ্বিতীয় ফুলের নীচে আরেকটি শাখা সৃষ্টি করে তৃতীয় ফুলটি তার শীর্ষে ফোটে। এইভাবে পরপর শাখা ও তার শীর্ষে ফুল ফুটতে থাকে। একপার্শ্বীয় পুষ্পবিন্যাসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— (i) **বৃশ্চিকাকার** (Scorpioid)—শীর্ষে একটি ফুলসৃষ্টিকারী মঞ্জরিদণ্ড একবার বাম ও একবার ডান দিকে পর্যায়ক্রমে শাখা ও তার শীর্ষে ফুল উৎপন্ন করে। **উদাহরণ**— হাতিশুঁড় (*Heliotropium indicum*), (ii) **শুণ্ডাকার** (Helicoid)— শীর্ষে
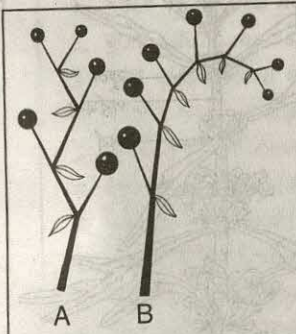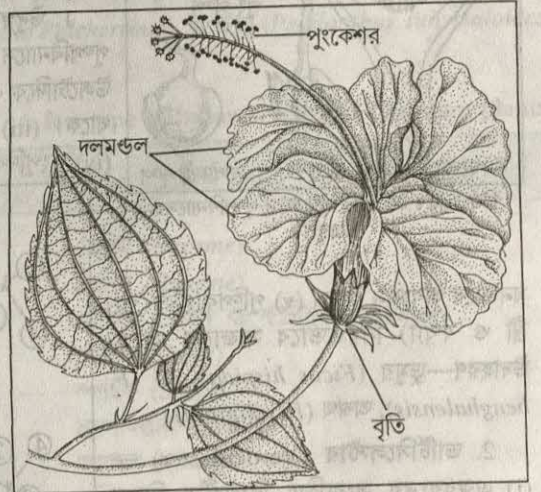
চিত্র 3.63 : (A)-বৃশ্চিকাকার এবং (B)-শুণ্ডাকার পুষ্পবিন্যাস।

একটি ফুলসৃষ্টিকারী মঞ্জরিদণ্ড শুধু একদিকে পর পর শাখা উৎপন্ন করে এবং তার শীর্ষে ফুল সৃষ্ট হয়। **উদাহরণ**— হ্যামেলিয়া (*Hamelia patens*)।
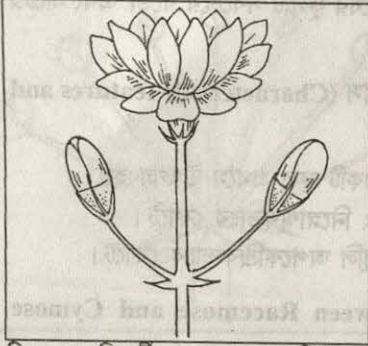
চিত্র 3.64 ঃ দ্বিপার্শ্বীয় (বেলফুল) পুষ্পবিন্যাস।

3. **দ্বিপার্শ্বীয়** (Biparous cyme)— মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে প্রথম ফুল উৎপন্ন হবার পর মঞ্জরিদণ্ডের নীচে একই জায়গায় দুটি শাখা বিপরীত দিকে উৎপন্ন হয় এবং তাদের শীর্ষে ফুল ফোটে। **উদাহরণ**—বেল (*Jasminum*), শিউলি (*Nyctanthes*)।

4. **বহুপার্শ্বীয়** (Multiparous cyme)— মঞ্জরিদণ্ডের শীর্ষে ফুল উৎপন্ন হবার পর মঞ্জরিদণ্ডের নীচে একই জায়গায় দুটির বেশি শাখা সৃষ্টি হয় এবং তাদের মাথায় ফুল ফোটে। **উদাহরণ**— আকন্দ (*Calotropis procera*)।
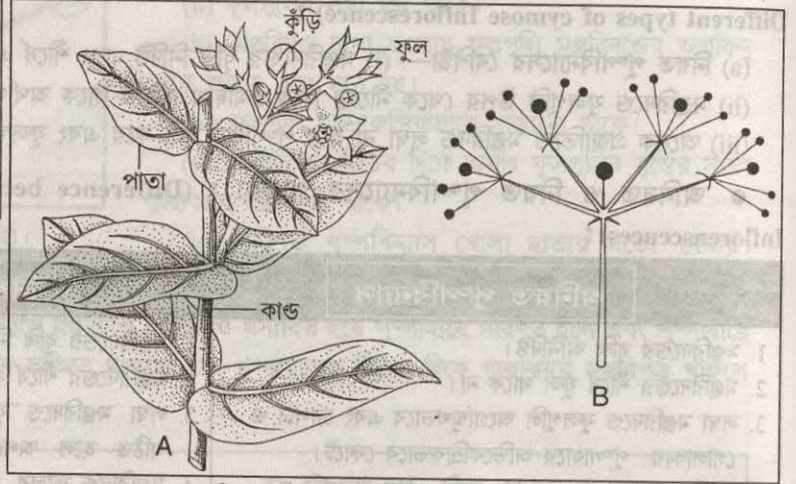
চিত্র 3.65 ঃ (A-B) বহুপার্শ্বীয় (আকন্দ) পুষ্পবিন্যাস।

চিত্র 3.66 ঃ উদম্বরের লম্বচ্ছেদে পুষ্পবিন্যাসের চিত্ররূপ।

## C. বিশেষ পুষ্পবিন্যাস (Special types of Inflorescence) ঃ

এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসের গঠন বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ আলাদা। এদের নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের রূপান্তর বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার বিশেষ পুষ্পবিন্যাসের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

1. **উদুম্বর বা হাইপ্যানথোডিয়াম** (Hypanthodium)—(i) এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পাধার মোটা গোলাকার ও ফাঁপা হয়। (ii) পুষ্পাধারের বোঁটার উলটোদিকে একটি ছোটো রন্ধ্র (Pore) থাকে। রন্ধ্রটির মুখ শল্কপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। (iii) রন্ধ্রটির নীচের দিকে কতকগুলি পুং-পুষ্পিকা সাজানো থাকে। (iv) পুংপুষ্পিকাগুলির নীচের দিকে কতকগুলি স্ত্রীপুষ্পিকা ও বন্ধ্যা স্ত্রী-পুষ্পিকা ঘনভাবে অবস্থান করে। (v) পুষ্পিকাগুলি (পুং, স্ত্রী ও বন্ধ্যা) নিয়তভাবে সাজানো থাকে। **উদাহরণ**—ডুমুর (*Ficus hispida*), বট (*F. benghalensis*), অশ্বত্থ (*F. religiosa*)।

2. **ভার্টিসিলেস্টার** (Verticillaster) —(i) একধরনের সংকুচিত দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাস বলা যায়। (ii) চোকা কাণ্ডের অভিমুখ পাতা দুটির কক্ষে পুষ্পবিন্যাস গঠিত হয়। (iii) প্রত্যেকটি পাতার কক্ষে একটি ছোটো
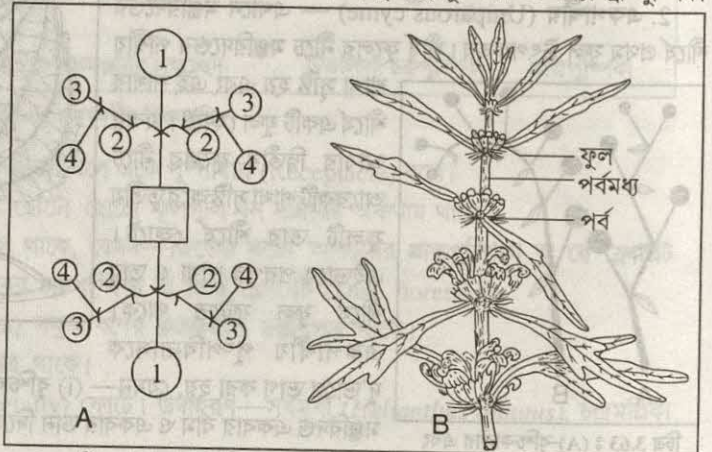
চিত্র 3.67 ঃ (A)-রক্তদ্রোণের ভার্টিসিলেস্টার, (B)-পুষ্পবিন্যাসের রেখাচিত্র।

মঞ্জরিদণ্ডের উপর একটি দ্বিপার্শ্বীয় পুষ্পবিন্যাস গঠিত হয়। (iv) পার্শ্বীয় অক্ষ দুটির ফুলের নীচে তিনটি বা চারটি ফুল নিয়ে বৃশ্চিকাকার নিয়ত পুষ্পবিন্যাস গঠিত হয়। (v) প্রত্যেকটি ফুলের মঞ্জরিপত্র থাকে। (vi) ফুলগুলির বৃন্ত খুব ছোটো হওয়ার ফলে মনে হয় পাতার কক্ষে গুচ্ছাকারে ফুলগুলি সাজানো রয়েছে। **উদাহরণ**—রক্তদ্রোণ (*Leonurus sibiricus*)

3. **সায়াথিয়াম** (Cyathium) — (i) এখানে মঞ্জরিদণ্ডটি চ্যাপটা ও প্রসারিত হয়ে উত্তল পুষ্পাধার গঠন করে। (ii) সাধারণত পাঁচটি মঞ্জরিপত্র আবরণী যুক্ত হয়ে পুষ্পিকাগুলিকে ঢেকে রাখে। (iii) মঞ্জরিপত্র আরবণীর বাইরের দিকে গ্রন্থি দেখা যায়। (iv) পুষ্পাধারের কেন্দ্রে একটি নগ্ন স্ত্রীপুষ্পিকা (গর্ভকেশরের মতো) থাকে। (v) স্ত্রীপুষ্পিকার মঞ্জরিপত্র থাকে এবং পুষ্পবৃন্ত ও পুষ্পাধারের অংশের মাঝখানে গাঁট (Articulation zone) থাকে। (vi) নগ্ন পুংপুষ্পিকাগুলি স্ত্রীপুষ্পিকার চারদিকে বৃশ্চিকাকারে
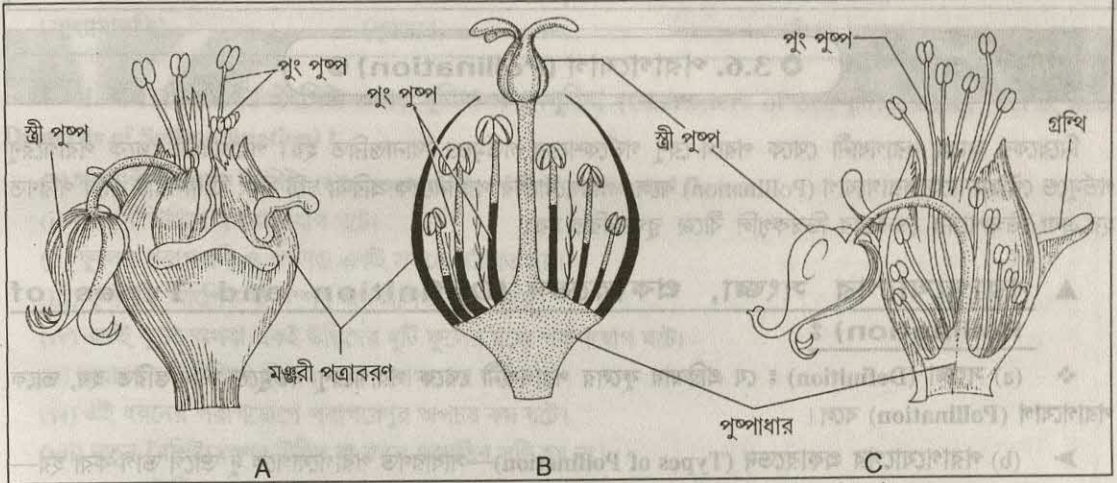
চিত্র 3.68 : সায়াসিয়াম—(A)-লালপাতার সায়ামিয়াম, (B-C)-পুষ্পবিন্যাসের অভ্যন্তরীণ গঠন।

সাজানো থাকে। প্রত্যেকটি পুংপুষ্পিকারও মঞ্জরিপত্র থাকে এবং পুং-পুষ্পিকার বৃন্ত ও পুষ্পাধারের অংশের মাঝে ছোটো গাঁট (Articulation zone) আছে। **উদাহরণ**—লালপাতা (*Poinsettia Pulcherrima*), রাংচিতা (*Pedilanthus tithymaloides*) ইত্যাদি।

### ◎ কয়েকটি পরিচিত সাধারণ উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস (A few type of Inflorescences of Common plants)

| উদ্ভিদের নাম | পুষ্পবিন্যাসের প্রকৃতি |
|---|---|
| 1. সরষে (*Brassica nigra*) | রেসিম (*Raceme*) |
| 2. মুলো (*Raphanus sativus*) | রেসিম (*Raceme*) |
| 3. আম (*Mangifera indica*) | যৌগিক রেসিম বা প্যানিক্‌ল (*Panicle*) |
| 4. আপাং, (*Aerva aspera*) | স্পাইক (*Spike*) |
| 5. রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*) | স্পাইক (*Spike*) |
| 6. কচু (*Colocasia esculanta*) | চমসামঞ্জরি (*Spadix*) |
| 7. থানকুনি (*Centralla asiatica*) | আম্বেল (*Umbel*) |
| 8. কালকাসুন্দে (*Cassia sophera*) | করিম্ব (*Corymb*) |
| 9. সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*) | শিরমঞ্জরি (*Capitulum*) |
| 10. জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*) | একক নিয়ত (*Solitary*) |
| 11. হাতিশুঁড় (*Heliotropium indiemu*) | একপার্শ্বীয় নিয়ত বৃশ্চিকাকার (*Scorpioid*) |

| উদ্ভিদের নাম | পুষ্পবিন্যাসের প্রকৃতি |
|---|---|
| 12. হ্যামেলিয়া (*Hemalia patens*) | একপার্শ্বীয় নিয়ত শুণ্ডাকার (*Helicoid*) |
| 13. জুঁই (*Jasminum auriculatum*) | দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত (*Biparous cyme*) |
| 14. আকন্দ (*Calotropis procera*) | বহুপার্শ্বীয় নিয়ত (*Multiparous cyme*) |
| 15. ডুমুর (*Ficus hispida*) | হাইপ্যানথোডিয়াম (*Hypanthodium*) |
| 16. রক্তদ্রোণ (*Leonurus sibiricus*) | ভার্টিসিলেস্টার (*Verticellaster*) |
| 17. লালপাতা (*Poinsettia pulcherrima*) | সায়াথিয়াম (*Cyathium*) |

## 3.6. পরাগযোগ (Pollination)

নিষেকের আগে পরাগধানী থেকে পরাগ-রেণু গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পৌঁছানোকে পরাগযোগ (Pollination) বলে। পরাগযোগের পর নিষেক প্রক্রিয়া ঘটে এবং ডিম্বাশয়টি ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বাশয়ের ভেতরের ডিম্বকগুলি বীজে রূপান্তরিত হয়।

### ▲ পরাগযোগের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (Definition and Types of Pollination) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়, তাকে পরাগযোগ (Pollination) বলে।**

➤ (b) **পরাগযোগের প্রকারভেদ (Types of Pollination)**—সাধারণত পরাগযোগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(i) **স্বপরাগযোগ** (Self-pollination) ও (ii) **ইতর বা বিপরীত পরাগযোগ** (Cross pollination)।
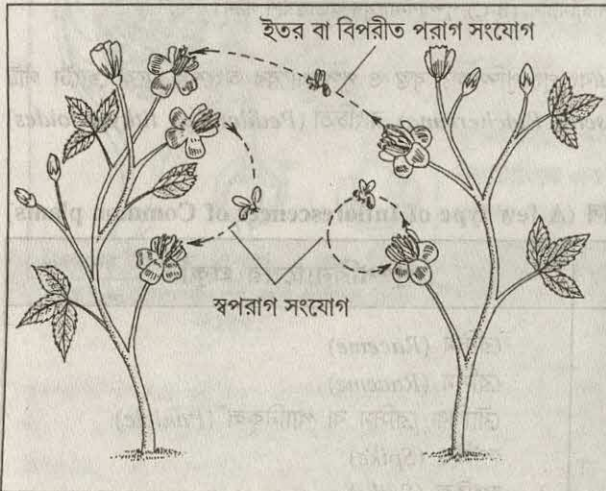
চিত্র 3.69 : পরাগযোগের চিত্ররূপ।

(i) **স্বপরাগযোগ** (Self-pollination)—কোনো ফুলের পরাগধানী থেকে উৎপন্ন পরাগ সেই ফুলের বা সেই গাছের অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরকে স্বপরাগযোগ বলে। **উদাহরণ**—দোপাটি (*Impatiens belsamina*), সন্ধ্যামালতি (*Mirabilis jalapa*), রঙ্গন (*Ixora coccinea*), কুমড়ো (*Cucurbita maxima*) প্রভৃতি। স্বপরাগযোগ উভলিঙ্গ ফুলেই ঘটে। কিন্তু বহুসংখ্যক উভলিঙ্গ ফুলে নানা কারণে ইতর পরাগযোগ ঘটে। **উদাহরণ**—রাস্না (*Vanda roxburghii*)।

(ii) **ইতর বা বিপরীত পরাগযোগ** (Cross pollination) — কোনো ফুলের পরাগধানী থেকে উৎপন্ন পরাগ একই প্রজাতির অন্য কোনো গাছে উৎপন্ন ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরকে **ইতর** বা **বিপরীত পরাগযোগ** বলে। ইতর পরাগযোগে দুটি আলাদা উদ্ভিদের প্রয়োজন। **একলিঙ্গ** (Dioecious) উদ্ভিদের ফুলগুলির মধ্যে ইতর পরাগযোগ সম্পন্ন হয়। **উদাহরণ**—তাল (*Borassus flabellifer*), পেঁপে (*Carica papaya*) প্রভৃতি। ইতর পরাগযোগ সাধারণত একই প্রজাতির মধ্যে ঘটে। কিন্তু অনেক সময় এই পরাগযোগ দুটি আলাদা প্রজাতির মধ্যেও ঘটতে পারে। এর ফলে পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগযোগকে **জিটোনোগ্যামি** (Geitonogamy) বলে। জিটোনোগ্যামি স্বপরাগযোগের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের জিনগত বৈশিষ্ট্য একই রকম। **উদাহরণ** — কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি। নীচে পরাগযোগের ছক দেওয়া হল—
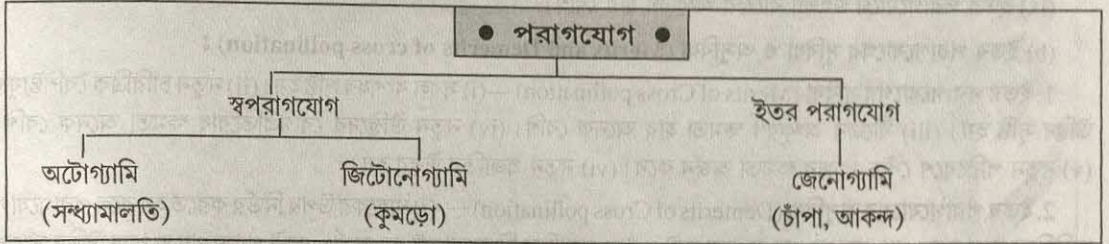
**I. স্বপরাগযোগের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা ও অসুবিধা (Characters of Self-pollination, Merits and Demerits of Self-pollination) :**

**(a) স্বপরাগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Self-pollinated flower) :**

(i) সহবাসী উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ ঘটে।

(ii) ফুলের পরাগধানী ও গর্ভদণ্ড একই সময়ে পরিণত হয়।

(iii) ফুলগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুন্মীলিত হতে পারে।

(iv) একই ফুলে অথবা একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে।

(v) সাধারণত উভলিঙ্গ ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে।

(vi) এই ধরনের পরাগযোগে পরাগরেণুর অপচয় কম ঘটে।

(vii) নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় না।

(viii) নতুন উদ্ভিদে ক্রমশ গুণগতমান কমতে থাকে।

(ix) স্বপরাগযোগে উৎপন্ন বীজের অঙ্কুরণ হার কম বলা যায়।

**(b) স্বপরাগীফুলের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Self-pollination) :**

1. **স্বপরাগযোগের সুবিধা** (Merits of Self-pollination)—(i) কোনো বাহকের প্রয়োজন সাধারণত হয় না। (ii) পরাগযোগের নিশ্চয়তা অনেক বেশি। (iii) পরাগরেণু নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। (iv) মিশ্রিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ প্রজাতির বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। (v) ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ সহজেই তৈরি করা যায়।

2. **স্বপরাগযোগের অসুবিধা** (Demerits of Self-pollination) — (i) স্বপরাগযোগে উৎপন্ন ফলের বীজ থেকে যে অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তা দুর্বল প্রকৃতির হয়। (ii) বীজের অঙ্কুরণের হার কম। (iii) নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ গঠিত হয় না। (iv) ক্রমশ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

**II. ইতর পরাগযোগের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Characteristic of Cross Pollination, Merits and Demerits) :**

**(a) ইতর পরাগযোগী ফুলের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of cross pollinated flower) :**

(i) ভিন্নবাসী উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ ঘটে।

(ii) ফুলের পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড একই সময়ে পরিণত হয় না।

(iii) ফুলগুলি সাধারণত উন্মীলিত বা প্রস্ফুটিত হয়।

(iv) একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে অথবা দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে।

(v) একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে।

(vi) রেণুর অপচয় অনেক বেশি মাত্রায় হয়।

(vii) নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

(viii) নতুন প্রজাতিতে ক্রমশ গুণগতমান বাড়তে থাকে।

(ix) ইতর পরাগযোগে উৎপন্ন বীজের অঙ্কুরণ হার বেশি।

(b) **ইতর পরাগযোগের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of cross pollination) ঃ**

1. **ইতর পরাগযোগের সুবিধা** (Merits of Cross pollination) —(i) সবল বংশধর সৃষ্টি হয়। (ii) নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। (iii) বীজের অঙ্কুরণ ক্ষমতা হার অনেক বেশি। (iv) নতুন উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। (v) নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। (vi) নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

2. **ইতর পরাগযোগের অসুবিধা** (Demerits of Cross pollination) — (i) বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় বলে পরাগযোগ অনিশ্চিত বলা যায়। (ii) পরাগরেণুর অপচয় ঘটে। (iii) প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় অর্থাৎ একই গুণসম্পন্ন অপত্য উদ্ভিদ সংগ্রহ করা যায় না। (iv) বাহকের অভাবে অনেক সময় বংশ বিস্তারে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

- **স্বপরাগযোগ ও বিপরীত পরাগযোগের পার্থক্য (Difference between Self and Cross pollinations) ঃ**

| স্বপরাগযোগ | বিপরীত পরাগযোগ |
|---|---|
| 1. সহবাসী উদ্ভিদে স্বপরাগযোগ ঘটে। | 1. ভিন্নবাসী উদ্ভিদে বিপরীত পরাগযোগ ঘটে। |
| 2. ফুলের পরাগধানী ও গর্ভদণ্ড একই সময়ে পরিণত হয়। | 2. ফুলের পরাগধানী ও গর্ভদণ্ড একই সময়ে পরিণত হয় না। |
| 3. ফুলগুলি আংশিক অথবা অনুন্মীলিত অবস্থায় থাকে। | 3. ফুলগুলি উন্মীলিত বা প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে। |
| 4. একই ফুলে অথবা একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে। | 4. একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে অথবা দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে। |
| 5. সাধারণত ফুলগুলি উভলিঙ্গ হয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় একই উদ্ভিদে উৎপন্ন দুটি একলিঙ্গ ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটে (কুমড়ো)। | 5. সাধারণত ফুলগুলি একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ হয়। |
| 6. পরাগরেণু অপচয় কম হয়। | 6. পরাগরেণু অপচয় বেশি মাত্রায় ঘটে। |
| 7. অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত প্রক্রিয়া বলা যায়। | 7. অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত প্রক্রিয়া বলা যায়। |
| 8. নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় না এবং প্রজাতির ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে। | 8. নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ অথবা নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়। |
| 9. স্বপরাগযোগে উৎপন্ন বীজের অঙ্কুরণ হার কম। | 9. বিপরীত পরাগযোগে উৎপন্ন বীজের অঙ্কুরণ হার বেশি। |
| 10. বিবর্তনে এই উদ্ভিদের কোনো ভূমিকা নেই। | 10. বিবর্তনে এই উদ্ভিদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। |
| 11. উদা ঃ শিয়ালকাঁটা, সরষে, মুলো, কুমড়ো প্রভৃতি। | 11. উদা ঃ সূর্যমুখী, চাঁপা, আতা, আকন্দ, ঘেঁটু, রক্তদ্রোণ প্রভৃতি। |

## ▲ পরাগযোগের বাহক (Agents of Pollination) ঃ

পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বের হবার পর গর্ভমুণ্ডে নিজেই স্থানান্তরিত হতে পারে না। পরাগযোগের জন্য বিশেষ বাহকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। প্রধানত ইতর পরাগযোগের জন্য বাহকের প্রয়োজন। অনেক সময় স্বপরাগযোগ বাহকের সাহায্যে ঘটে। ইতর পরাগযোগের প্রধান বাহকগুলি হল — **বায়ু** (Wind), **জল** (Water) ও **প্রাণী** (Animal)। প্রাণীর মধ্যে প্রধান বাহকগুলি হল—**পতঙ্গ** (Insect), **পাখি** (Bird) ও **শম্বুক** (Snail)। বাহকের বিভিন্নতার জন্য ফুলের ও রেণুর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে। নীচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং পরাগযোগের পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল।

### ➤ 1. বায়ুপরাগী (Anemophily) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ যেসব ফুলের পরাগরেণুকে বায়ু বহন করে পরাগযোগ ঘটায় তাকে বায়ুপরাগী ফুল বলে।**

- **বায়ুপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য (Characters of Anemophilous flower) ঃ**

(i) বেশির ভাগ প্রজাতিতে লম্বা মঞ্জরিদণ্ডের উপর ফুলগুলি ঘনভাবে সজ্জিত থাকে।

(ii) ফুলগুলি খুব ছোটো, বর্ণহীন ও অনুজ্জ্বল হয়।

(iii ফুলগুলি গন্ধবিহীন হয়।

(iv) প্রত্যেকটি পরাগধানীতে অসংখ্য পরাগ উৎপন্ন হয়।

(v) ফুলে কোনো মকরন্দ গ্রন্থি থাকে না।

(vi) পরাগরেণুগুলি বায়ুতে ভেসে থাকার জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও হালকা হয়।

(vii) পুংকেশর ও গর্ভকেশর দলাংশ দিয়ে ঢাকা বা আবৃত থাকে না।

(viii) গর্ভমুণ্ড রোমযুক্ত চওড়া অথবা শাখান্বিত হয়। এর ফলে পরাগরেণুকে গর্ভমুণ্ড সহজে ধরে রাখতে পারে। উদাহরণ — ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), ভুট্টা (*Zea mays*) প্রভৃতি।
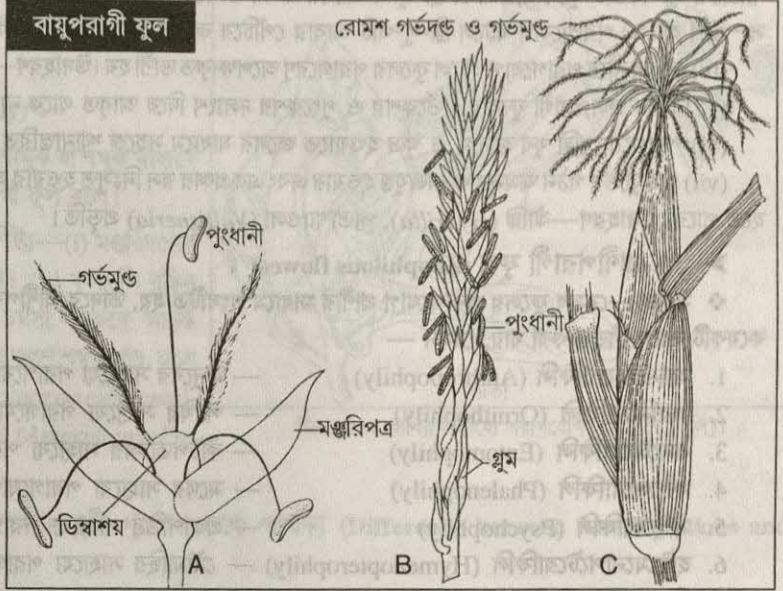
চিত্র 3.70 : বায়ুপরাগী ফুল—(A)-ঘাসের ফুল, (B)-ভুট্টার পুংপুষ্প এবং (C)-ভুট্টার স্ত্রীপুষ্প।

### ➤ 2. জলপরাগী (Hydrophily) :

❖ সংজ্ঞা—**জলের মাধ্যমে যে ফুল পরাগযোগ ঘটায় সেই ফুলকে জলপরাগী ফুল বলে।** জলে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের শুধু জলের মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটে। জলের উপরে অথবা নীচে পরাগযোগ হতে পারে।
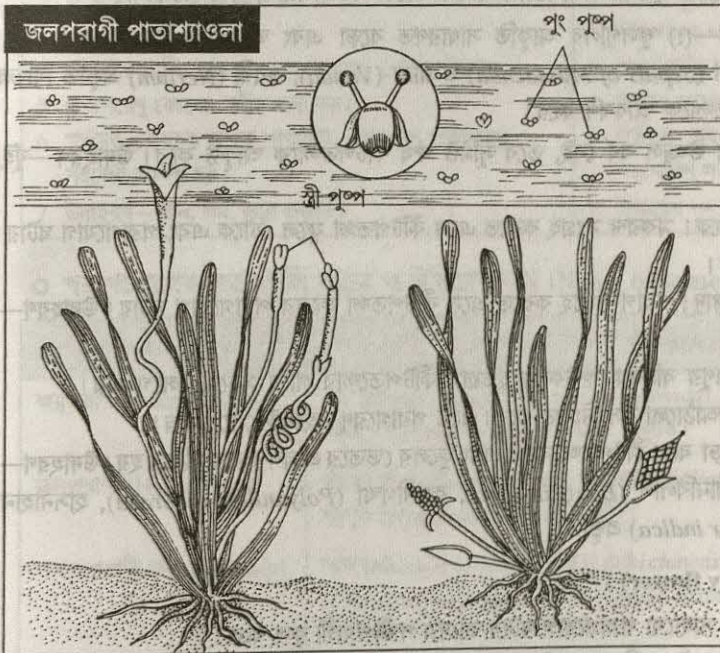
চিত্র 3.71 : জলপরাগী (পাতাশ্যাওলা)।

#### ● জলপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য (Characters of Hydrophilous flower) :

(i) ফুলগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, হালকা ও অনুজ্জ্বল হয়।

(ii) রেণুগুলির বাইরের ত্বকে মোম জাতীয় পদার্থের আস্তরণ থাকে।

(iii) রেণুগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিবেশের জলের সমান বলে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। **উদাহরণ**—ঝাঁঝি (*Hydrilla*), পাতাশ্যাওলা (*Vallisneria*) ইত্যাদি। পাতাশ্যাওলার ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় জলের মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটে। এই ফুল একলিঙ্গ (Unisexual)। পুংপুষ্প পরিণত অবস্থায় উদ্ভিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। এই অবস্থায় পরাগধানী ফেটে পরাগরেণু বের হয়। স্ত্রীপুষ্পগুলির পুষ্পদণ্ড খুব লম্বা এবং স্প্রিং-

এর মতো প্যাঁচানো থাকে। সম্পূর্ণ স্ত্রী-ফুলটি জলের নীচে প্রায় মূলের কাছে অবস্থান করে। পরাগযোগের সময় স্প্রিং-এর মতো প্যাঁচানো পুষ্পদণ্ডটি খুলে যায় এবং স্ত্রী-পুষ্প জলের উপর ভাসতে থাকে। এই অবস্থায় পরাগরেণু জলের সাহায্যে গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে। পরাগযোগ ঘটলে স্ত্রী-পুষ্পটি আবার পেঁচিয়ে জলের নীচে আগের অবস্থায় চলে যায়।

(iv) জলের নীচে পরাগযোগ ঘটলে ফুলের পরাগরেণু অপেক্ষাকৃত ভারী হয়। **উদাহরণ**—সেরাটোফাইলাম (*Ceratophyllum*)।

(v) বিভিন্ন জলপরাগী ফুলের গর্ভকেশর ও পুংকেশর দলাংশ দিয়ে আবৃত থাকে না।

(vi) পরাগরেণুগুলি খুব হালকা ও ক্ষুদ্র হওয়াতে জলের মাধ্যমে সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে।

(vii) গর্ভমুণ্ডের গঠন অমসৃণ ও খাজযুক্ত হওয়ায় এবং একপ্রকার রস নিঃসৃত হওয়ার ফলে পরাগরেণু সহজেই গর্ভমুণ্ডে আবদ্ধ হতে পারে। **উদাহরণ**—ঝাঁঝি (*Hydrilla*), পাতাশ্যাওলা (*Vallisneria*) প্রভৃতি।

### ➤ 3. প্রাণীপরাগী ফুল (Zoophilous flower) :

❖ **সংজ্ঞা—যেসব ফুলের পরাগযোগ প্রাণীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তাদরে প্রাণীপরাগী ফুল বলা হয়।** প্রাণীপরাগী ফুলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন —

1. **অ্যানথ্রোপোফিলি** (Anthropophily) — মানুষের সাহায্যে পরাগযোগ।
2. **অরনিথোফিলি** (Ornithophily) — পাখির সাহায্যে পরাগযোগ।
3. **এনটোমোফিলি** (Entomophily) — কীটপতঙ্গের সাহায্যে পরাগযোগ।
4. **ফ্যালেনোফিলি** (Phalenophily) — মথের সাহায্যে পরাগযোগ।
5. **সাইকোফিলি** (Psychophily) — প্রজাপতির সাহায্যে পরাগযোগ।
6. **হাইমেনোপটেরোফিলি** (Hymenopterophily) — মৌমাছির সাহায্যে পরাগযোগ।
7. **চিরোপটেরোফিলি** (Cheiropterophily) — বাদুড়ের সাহায্যে পরাগযোগ।
8. **ম্যালাকোফিলি** (Malacophily) — শামুকের সাহায্যে পরাগযোগ।

### ● নীচে কয়েকটি প্রাণীপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল :

**1. পতঙ্গপরাগী ফুল (Entomophilous flower) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা : কীটপতঙ্গের সাহায্যে ফুলের পরাগযোগ ঘটলে তাকে পতঙ্গপরাগী ফুল বলে।**

(b) **পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য**—(i) ফুলগুলির আকৃতি সাধারণত বড়ো এবং অংশগুলি উজ্জ্বল বর্ণের হয়। বাগানবিলাসের মঞ্জরিপত্র, মুসাণ্ডার বৃত্যংশ (*Sepals of Mussaenda*) ও রাস্না (*Vanda*), করবী (*Nerium*) প্রভৃতি বিভিন্ন ফুলের দলাংশ উজ্জ্বল বর্ণের হয়ে কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করে।

(ii) রাতে ফোটে এমন অনেক ফুলের উজ্জ্বল বর্ণ নেই, তবে সুমিষ্ট গন্ধ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। **উদাহরণ**—যুঁই, রজনীগন্ধা, হাসনাহানা প্রভৃতি।

(iii) কতকগুলি ফুলে মকরন্দ গ্রন্থি থাকে। মকরন্দ সংগ্রহ করতে এসে কীটপতঙ্গ ফুলে ঢোকে এবং পরাগযোগ ঘটায়। **উদাহরণ**—সালভিয়া, অ্যান্টিরিনাম প্রভৃতি।

(iv) বহু ফুলের পরাগরেণু মিষ্টি ও সুস্বাদু। পরাগ সংগ্রহ করতে এসে কীটপতঙ্গ ফুলের পরাগযোগ ঘটায়। **উদাহরণ**—পদ্ম, শালুক প্রভৃতি।

(v) পতঙ্গপরাগী বহু ফুলের পরাগরেণুর বহিস্ত্বক কণ্টকযুক্ত হওয়ায় কীটপতঙ্গের গায়ে সহজে লেগে যায়।

(vi) অনেক ফুলের গর্ভমুণ্ড অমসৃণ ও আঠালো রস নিঃসৃত করে। এতে পরাগরেণু সহজেই লেগে যায়।

(vii) বহু ফুলের পুষ্পপুট আকৃতিতে বড়ো বলে কীটপতঙ্গ বসার এবং ফুলের ভেতরে প্রবেশ করার সুবিধে হয়। **উদাহরণ**—বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড (*Orchids*), বাগানবিলাস (*Baugainvillea*), রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*), হাসনাহানা (*Cestrum nocturnum*), আম (*Mangifer indica*) প্রভৃতি।

**2. পক্ষীপরাগী ফুল (Oronithophily flower) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা : যেসব ফুল পাখির সাহায্যে পরাগযোগ ঘটায় তাদের পক্ষীপরাগী ফুল বলে।**

(b) **পক্ষীপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য**—(i) এই জাতীয় ফুলগুলি আকারে বড়ো ও উজ্জ্বল বর্ণের হয়। (ii) ফুলে মধুগ্রন্থি থাকায়

পাখি মধু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার সময় পরাগযোগ ঘটায়। (iii) কতকগুলি ফুলের পুষ্পাক্ষ ও পরাগধানী পাখি খায়। এর ফলে পরাগযোগ ঘটে। উদাহরণ—পলাস (*Butea monosperma*), মাদার (*Erythrina indica*), শিমুল (*Bombax cieba*) প্রভৃতি।

চিত্র 3.72 : পাখির সাহায্যে পরাগযোগ (অরনিথোফিলি)।

**3. শম্বুকপরাগী (Malacophily) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে সব ফুল শামুক বা শম্বুক মাধ্যমে পরাগযোগ ঘটায় তাদের শম্বুকপরাগী ফুল বলে।**

(b) **শম্বুকপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য**—(i) মঞ্জরিদণ্ডের উপর ফুলগুলি ঘনভাবে সজ্জিত হয়। (ii) ফুলগুলি রঙিন চমসা (spathe) দিয়ে ঢাকা থাকে। চমসা শম্বুককে আকৃষ্ট করে। (iii) মঞ্জরিদণ্ড ও ফুলের বিভিন্ন অংশ শম্বুক খায়, ফলে পরাগযোগ ঘটে। **উদাহরণ**—কচু (*Colocasia esculanta*), মানকচু (*Colocosia indica*), ওল (*Amorphophallus campanulatus*)।

● **বায়ুপরাগী পুষ্প ও পতঙ্গপরাগী পুষ্পের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Anemophilous and Entomophilous flowers) :**

| বায়ুপরাগী পুষ্প | পতঙ্গপরাগী পুষ্প |
|---|---|
| 1. ফুলগুলি খুব ছোটো, বর্ণহীন ও অনুজ্জ্বল। | 1. সাধারণত ফুলগুলির আকৃতি বড়ো এবং উজ্জ্বল বর্ণের। |
| 2. ফুলে গন্ধ থাকে না। | 2. রাতে যেসব ফুল ফোটে তাদের সুমিষ্ট গন্ধ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে (রজনীগন্ধা, হাসনাহানা)। |
| 3. ফুলে মধুগ্রন্থি থাকে না। | 3. অনেক ফুলে মধুগ্রন্থি থাকে। ফুলে মধু সংগ্রহ করতে এসে কীটপতঙ্গ পরাগযোগ ঘটায়। |
| 4. পরাগরেণুগুলি হালকা বলে বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। | 4. পরাগগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী এবং বাতাসে ভাসে না। |
| 5. পরাগরেণু কোনো প্রাণীর খাদ্য নয়। | 5. অনেক ফুলের পরাগরেণু কীটপতঙ্গের খাদ্য। |
| 6. গর্ভমুণ্ড রোমযুক্ত অথবা শাখান্বিত, এর ফলে পরাগরেণু সহজেই আবদ্ধ হয়। | 6. গর্ভমুণ্ড অমসৃণ ও আঠালো রস নিঃসৃত করে। এর ফলে পরাগরেণু সহজেই আবদ্ধ হয়। |
| 7. উদাহরণ—ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি। | 7. উদাহরণ — বাগানবিলাস, রজনীগন্ধা, হাসনাহানা প্রভৃতি। |

**✪ পরাগযোগের কতকগুলি বাহক ও উদ্ভিদের নাম (Name of some agents of Pollination in Plants) ✪**

| বাহক | উদ্ভিদের নাম |
|---|---|
| বায়ুপরাগী (Anemophily) | ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), ভুট্টা (*Zea mays*), নারকেল (*Cocos nucifera*), আখ (*Saccharum officinarum*) প্রভৃতি। |
| জলপরাগী (Hydrophily) | ঝাঁঝি (*Hydrilla verticillata*), পাতাশ্যাওলা (*Vallisnaria spiralis*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*), শালুক (*Nymphaca stellata*) প্রভৃতি। |
| পতঙ্গপরাগী (Entomophily) | আম (*Mangifera indica*), লিচু (*Litchi chinensis*), আকন্দ (*Calotropis procera*), হাসনাহানা (*Cestrum nocturnum*), রাস্না (*Vanda roxburghii*), রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*) প্রভৃতি। |

| বাহক | উদ্ভিদের নাম |
|---|---|
| পক্ষীপরাগী (Ornithophily) | শিমুল (*Bombax cieba*), পলাশ (*Butea monosperma*), মাদার (*Erythrina indica*) প্রভৃতি। |
| শম্বুক বা শামুক পরাগী (Malacophily) | কচু (*Colocasia esculanta*), মানকচু (*Colocasia indica*), ওল (*Amorphophallous companulatus*) প্রভৃতি। |

## 3.7. উদ্ভিদের নিষেক (Fertilization in Plants)

❖ (a) **নিষেকের সংজ্ঞা (Definition of fertilization) : পুংজনন কোশ ও স্ত্রীজনন কোশের মিলনকে নিষেক বলা হয়।**

➤ (b) **সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া** (Process of Fertilization in flowering plant) : (i) সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন বা নিষেক প্রক্রিয়া উন্নত মানের। দেখা যায় পুংকেশরের **পরাগধানীর** (Anther) মধ্যে অসংখ্য **পরাগ** গঠিত হয়। পরাগগুলি গোলাকার এবং দুটি প্রাচীরে আবদ্ধ। বাইরের মোটা প্রাচীরকে **বহিস্ত্বক** ও ভিতরের প্রাচীরকে **অন্তস্ত্বক** বলে। স্ত্রীজননাঙ্গের নীচের স্ফীত ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক থাকে। প্রতিটি ডিম্বক দুটি আবরণী বা ডিম্বকত্বক দিয়ে আবৃত থাকে। ডিম্বকত্বক দুটো যে অংশে যুক্ত থাকে তাকে **ডিম্বকরন্ধ্র** বলে। ডিম্বক মধ্যস্থ কলাকে **ভ্রূণ পোষক** কলা বলে। এর মধ্যে 4টি নিউক্লিয়াসযুক্ত ভ্রূণস্থলী গঠিত হয়। পরাগযোগ নিষেকের অনেক আগেই ঘটে। প্রত্যেকটি পরাগের প্রথমে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। এই নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে একটিকে **নালিকা নিউক্লিয়াস** (Tube nucleus) এবং অপরটিকে **জনন নিউক্লিয়াস** (Generative nucleus) বলা হয়। বেশির ভাগ উদ্ভিদে পরাগ গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হবার আগে জনন নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে দুটি পুং-গ্যামেট সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় পরাগ গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **পরাগযোগ** বলে।

**চিত্র 3.73 :** পুংজনন কোশের উৎপত্তি— (A)-পরাগরেণু, (B)-পরাগনালি ও নালিকা নিউক্লিয়াসের গঠন, (C)-পুংজনন কোশ গঠন।

(ii) গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরের পর পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়ে **পরাগনালিকা** (Pollen tube) গঠন করে। এই নালিকা গর্ভমুণ্ড, গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় ভেদ করে ডিম্বকের ভ্রূণস্থলীতে পৌঁছায়। নিষেকের আগেই **ভ্রূণস্থলীর** (Embryo sac) উভয় প্রান্তে তিনটি করে মোট ছয়টি **হ্যাপ্লয়েড (n) কোশ** এবং মধ্যভাগে **নির্ণীত নিউক্লিয়াস** (Definitive nucleus) নামে একটি ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস থাকে। এটি দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে গঠিত। এই ছয়টি হ্যাপ্লয়েড কোশের মধ্যে ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের তিনটিকে একসঙ্গে **গর্ভযন্ত্র** (Egg apparatus) বলে। গর্ভযন্ত্রের মধ্যভাগের কোশটিকে **ডিম্বাণু** (Egg) ও পাশের কোশ দুটিকে **সহকারী কোশ** (Synergids) বলা হয়। ডিম্বকমূলের দিকে তিনটি হ্যাপ্লয়েড কোশকে **প্রতিপাদ কোশ** (Chalazal cells) বলে।

**চিত্র 3.74 :** ভ্রূণস্থলীর গঠন।

(iii) অগ্রনালির সামনের দিকে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় নালিকা নিউক্লিয়াস ও পেছনে দুটি জনন নিউক্লিয়াস থাকে। এই অবস্থায় পরাগনালি ভ্রূণস্থলীতে যায় এবং পরাগনালির
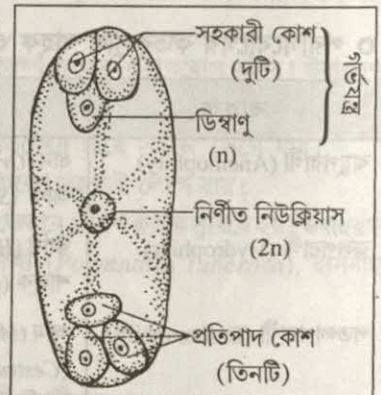
অগ্রভাগ ফেটে জনন নিউক্লিয়াস দুটি বের হয়। একটি জনন নিউক্লিয়াস **ডিম্বাণুর** (Egg) সঙ্গে মিলিত হয়ে **ভ্রূণাণু** বা **জাইগোট** (Zygote) সৃষ্টি করে। এই মিলনকে **নিষেক** বলে।

(iv) দ্বিতীয় জনন নিউক্লিয়াস মধ্যভাগে অবস্থিত নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) **সস্য নিউক্লিয়াস** (Endosperm nucleus) গঠন করে। এইভাবে দুটি জনন নিউক্লিয়াসের দুবার নিষেক হবার পদ্ধতিকে **দ্বি-নিষেক** (Double fertilization) বলে। নিষেকের পর ভ্রূণাণু আস্তে আস্তে বিভাজিত হয়ে **ভ্রূণে** (Embryo), সস্য নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে **সস্যে** ও ডিম্বক **বীজে** এবং গর্ভাশয় **ফলে** রূপান্তরিত হয়।

**চিত্র 3.75** : সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়া।

● **দ্বি-নিষেক (Double fertilization)** : পরাগনালি ভ্রূণথলীতে প্রবেশ করার পর পরাগনালির অগ্রভাগ ফেটে জনন নিউক্লিয়াস দুটি নির্গত হয়। একটি জনন নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর (Egg) সঙ্গে মিলিত হয়ে জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় জনন নিউক্লিয়াস মধ্যভাগে অবস্থিত নির্ণীত নিউক্লিয়াস বা ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য নিউক্লিয়াস (Endosperm nucleus) গঠন করে। এইভাবে গর্ভাশয়ে একই সঙ্গে দুটি নিষেক ঘটবার পদ্ধতিকে **দ্বিনিষেক** (Double fertilization) বলে। সব সপুষ্পক উদ্ভিদে দ্বিনিষেক ঘটে।

➤ **নিষেক প্রক্রিয়ার সুবিধা এবং অসুবিধা (Merits and Demerits of Fertilization) :**

1. **নিষেক প্রক্রিয়ার সুবিধা**—(i) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের সময় মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোশবিভাজিত হয়। এইরূপ বিভাজনে ক্রশিংওভারের সময় ক্রোমোটিড খণ্ডের আদানপ্রদানের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রোমোজমের চরিত্রগত গুণের পুনর্বিন্যাস ঘটে। (ii) এই জননের ভিন্ন ভিন্ন বংশগত গুণসম্পন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। এর ফলে অপত্য জীবে উন্নতমানের চরিত্রগত লক্ষণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে এবং জীবে বৈচিত্র্য দেখা যায়। (iii) জীবের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ে ও অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

2. **নিষেক প্রক্রিয়ার অসুবিধা** — (i) দুটি বিপরীত লিঙ্গযুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। (ii) স্ত্রী ও পুংগ্যামেটের মিলনে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে মিলনের অভাবে অনেক অসুবিধা দেখা যায়।

## 3.8. ফল (Fruit)

নিষেকের পর ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি এবং ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই সময় বেশির ভাগ ফুলের বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে ঝড়ে পরে। দেখা যায় ডিম্বাশয়টি ফলে এবং ডিম্বাশয়ের এক বা একাধিক ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

### ▲ ফলের সংজ্ঞা, প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফল, পারথেনোকার্পিক ফল ও প্রকৃত ফলের গঠন (Definition, True and False Fruit, Parthenocarpic Fruit and Structure of typical Fruit) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিণত বীজপূর্ণ ডিম্বাশয়কে ফল বলে।

➤ (b) **প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফল (True and False Fruit) :**

1. **প্রকৃত ফল** (True Fruit) : যেসব ফুলে শুধুমাত্র ডিম্বাশয়টি ফল গঠন করে তাদের **প্রকৃত ফল** বলে। ফুলের অন্য কোনো অংশ প্রকৃত ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। **উদাহরণ**—আম, পেঁপে, শশা প্রভৃতি।

2. **অপ্রকৃত ফল** (False fruit) : যেসব ফুলে ডিম্বাশয় ছাড়া অন্যান্য অংশ, যেমন—পুষ্পাক্ষ, বৃতি, দণ্ডমণ্ডল প্রভৃতি ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের **অপ্রকৃত ফল** বলে। তা ছাড়া অনেক সময় পুষ্পমঞ্জরিও ফল গঠন করে। **উদাহরণ**—আপেলের পুষ্পাক্ষ, চালতার বৃতি, কাঁঠাল ও আনারসের পুষ্পমঞ্জরি ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

● **প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফলের পার্থক্য (Difference between True and False fruits) :**

| প্রকৃত ফল | অপ্রকৃত ফল |
|---|---|
| 1. ফুলের শুধুমাত্র গর্ভাশয় ফল গঠন করে। | 1. ফুলের গর্ভাশয় ছাড়া অন্যান্য অংশ, যেমন—পুষ্পাক্ষ, বৃতি, দলমণ্ডল ইত্যাদিও ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় পুষ্পমঞ্জরিও ফলে রূপান্তরিত হয়। |
| 2. গর্ভশয় বৃতি, পুষ্পাক্ষ বা মঞ্জরি পত্রাবরণী দিয়ে আবৃত থাকে না। | 2. গর্ভাশয় বৃতি, পুষ্পাক্ষ বা মঞ্জরি পত্রাবরণী দিয়ে আবৃত থাকে। |
| 3. সাধারণত ফলত্বক ভক্ষিত অংশ। | 3. সাধারণত বৃতি, পুষ্পাক্ষ বা মঞ্জরি পত্রাবরণী ভক্ষিত অংশ। |
| 4. **উদাহরণ**—আম, কলা, পেঁপে প্রভৃতি। | 4. **উদাহরণ**— চালতা, আপেল, আনারস প্রভৃতি। |

➤ (c) **পারথেনোকার্পিক ফল (Parthenocarpic Fruit) :** যে ফলের ডিম্বাশয় নিষিক্ত না হয়ে ফল গঠন করে তাকে **পারথেনোকার্পিক ফল** বলে। পরিবেশে কখনো-কখনো আমরা স্বাভাবিক ভাবে পারথেনোকার্পিক (Parthenocarpic) ফল দেখতে পাই। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীরা হরমোন NAA (নেপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড), IBA (ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড) প্রয়োগ করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে এই প্রকার ফল সৃষ্টি করেন। পারথেনোকার্পিক ফলে কোনো বীজ হয় না। **উদাহরণ**—কলা (*Musa*), পেঁপে (*Carica*), আঙুর (*Vitis*), বেগুন (*Solanum*), লেবু (*Citrus*) প্রভৃতি।

চিত্র 3.76 : একটি আদর্শ ফলের লম্বচ্ছেদ।

➤ (d) **একটি প্রকৃত ফলের গঠন (Structure of a Typical Fruit) :** একটি প্রকৃত ফল চারটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন— (i) **বহিস্ত্বক** (Epicarp)— বাইরের পাতলা আবরণকে **বহিস্ত্বক** বলে। সাধারণত কাঁচা অবস্থায় এর রং সবুজ থাকে কিন্তু পাকলে হলদে বা লালচে নানা ধরনের হয়। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাশয়ের প্রাচীর ফলের বহিস্ত্বক বা খোসা গঠন করে। (ii) **মধ্যত্বক** (Mesocarp)— বহিস্ত্বকের পরের অংশ হল মধ্যত্বক। এই অংশ তন্তুময় ও রসাল হয়। (iii) **অন্তত্বক** (Endocarp)— এটি ফলের কাষ্ঠল অংশ যা মধ্যত্বকের নীচে থাকে এবং বীজকে ঢেকে রাখে। (iv) **বীজ** (Seed)— একটি ফলে এক বা একাধিক বীজ থাকে। ডিম্বাশয়ের ডিম্বকগুলি বীজে পরিণত হয়। বীজত্বক ফলত্বকের সঙ্গে শক্ত করে লেগে থাকে। আবার অনেক সময় বীজত্বক ও ফলত্বক সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকে।

● **স্বাভাবিক ও পারথেনোকার্পিক ফলের পার্থক্য (Difference between Normal Fruit and Parthenocarpic Fruit) :**

| স্বাভাবিক ফল | পারথেনোকার্পিক ফল |
|---|---|
| 1. নিষেকের পর ফল গঠিত হয়। | 1. নিষেক ছাড়া ফল গঠিত হয়। |
| 2. পরিণত ও পুষ্টবীজ থাকে। | 2. বীজ থাকে না। |
| 3. বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। | 3. বীজ থাকে না বলে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় না। |

### ➤ ফলের প্রকারভেদ (Different types of Fruit) ঃ

ফলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

1. **সরল বা একক ফল (Simple fruit)** ঃ **একটি ফুলের ডিম্বাশয় থেকে সহকারী অঙ্গসহ অথবা সহকারী অঙ্গ ছাড়া একটি ফল গঠিত হলে তাকে সরল বা একক ফল বলে।** **উদাহরণ**—আম, জাম, টম্যাটো, ছোলা, ধান, গম, লিচু ইত্যাদি। সরল ফল রসালো অথবা শুকনো হয়। শুকনো ফলকে **নীরস** (Dry) **ফল** বলে। **উদাহরণ**— ধান, গম ইত্যাদি। রসালো ফলকে **সরস** (Fleshy) **ফল** বলা হয়। **উদাহরণ**— আম, জাম, আপেল, শশা ইত্যাদি।

2. **গুচ্ছিত ফল (Aggregate fruit)** ঃ **একটি ফুলের বহু মুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে গঠিত হয়ে একটি অক্ষের উপর গুচ্ছাকারে ফলগুলি সজ্জিত হলে তাকে গুচ্ছিত ফল বলে।** গুচ্ছিত ফলের এক একটি এককে **ফ্রুট্‌লেট** (Fruitlet) বলে এবং ফলের গুচ্ছকে একসঙ্গে **ইটারিও** (Etario) বলা হয়।

3. **যৌগিক ফল (Composite or Multiple fruit)** ঃ **সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি ফল গঠন করলে তাকে যৌগিক ফল বলে।** এই ফলের ক্ষেত্রে পুষ্পবিন্যাসের সব অংশ অর্থাৎ ফুল ও মঞ্জরিদণ্ড ও অন্যান্য অংশ একত্রে একটি ফল গঠন করে। **উদাহরণ**—আনারস, কাঁঠাল, ডুমুর প্রভৃতি।
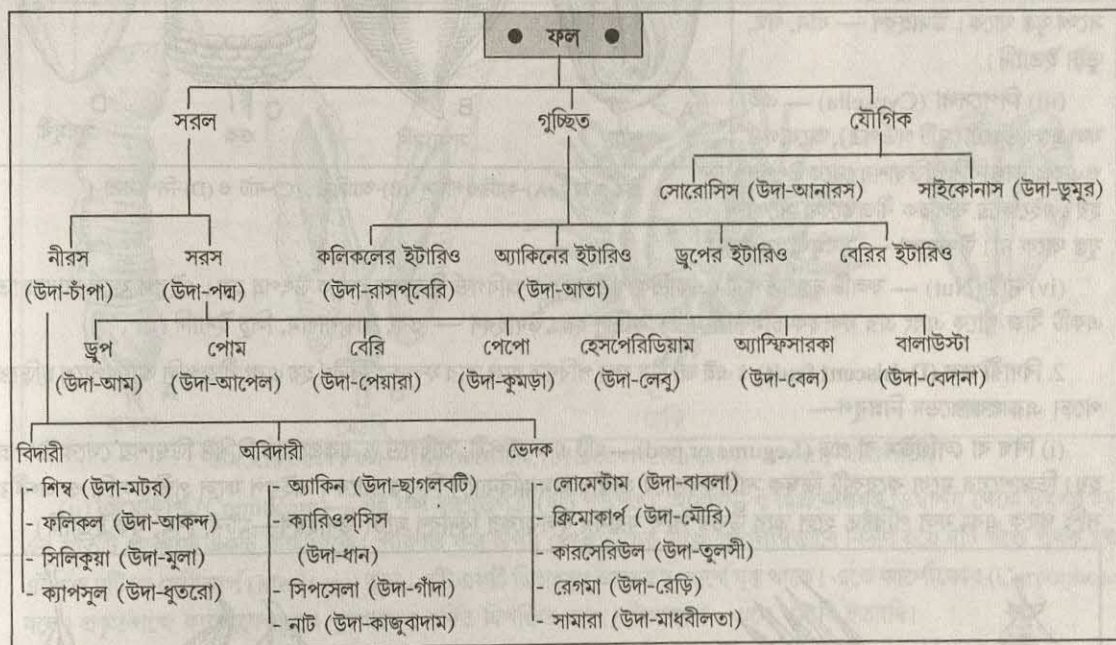
### • সরল, গুচ্ছিত ও যৌগিক ফলের পার্থক্য (Difference among simple, aggregate and multiple fruits) ঃ

| সরল ফল | গুচ্ছিত ফল | যৌগিক ফল |
|---|---|---|
| 1. এইক্ষেত্রে পুষ্পের একগর্ভপত্রী কিংবা যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরের ডিম্বাশয় থেকে একটিমাত্র ফল গঠিত হয়। | 1. এইক্ষেত্রে একাধিক ও আকারে ক্ষুদ্র ফল একটিমাত্র পুষ্পের মুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরের পৃথক পৃথক ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়ে পুষ্পাধারের উপর ও গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। | 1. এইক্ষেত্রে পুষ্পসহ সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরিটি একটিমাত্র ফলে রূপান্তরিত হয়। |
| 2. এই জাতীয় ফল শুষ্ক বা রসালো হয়। | 2. এই জাতীয় ফল শুষ্ক বা রসালো হয়। | 2. এই জাতীয় ফল সব সময় রসালো হয়। |

## ▲ I. সরল ফলের প্রকারভেদ (Different Types of Simple Fruit) ঃ

ফলত্বকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সরল ফলকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

**A. নীরস ফল (Dry fruit)** ঃ নীরস ফলের ফলত্বক শুষ্ক, ঝিল্লিময় এবং চামড়ার মতো বা কাষ্ঠল হয়। এইরূপ ফলের বিদারণের (Dehiscence) পদ্ধতি অনুসারে তাদের আবার তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়—1. **অবিদারী**, 2. **বিদারী** এবং 3. **ভেদক**।

1. **অবিদারী ফল (Indehiscent fruit)** ঃ এই প্রকারের ফলের ফলত্বক কখনোই বিদীর্ণ হয় না এবং এতে কেবলমাত্র একটি বীজ থাকে। অবিদারী ফল আবার চার প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **অ্যাকিন** (Achene) — ফলটি একটি বীজ সমন্বিত ছোটো দানার আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এইরূপ ফল একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ও একপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এই ফলে ফলত্বক ও বীজত্বক পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। **উদাহরণ** — কালোজিরা, ছাগলবটি, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি।

(ii) **ক্যারিওপ্‌সিস** (Caryopsis)— এই ফল অ্যাকিনের অনুরূপ, তবে এইক্ষেত্রে ফলত্বক ও বীজত্বক সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। **উদাহরণ** — ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

(iii) **সিপ্‌সেলা** (Cypsella) — এই ফল যুক্তগর্ভপত্রী (দুটি গর্ভপত্র), অধোগর্ভ ও একপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এইক্ষেত্রে ফলত্বক বীজত্বকের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। **উদাহরণ** — সূর্যমুখী ও গাঁদা।

চিত্র 3.77 ঃ (A)-ক্যারিওপসিস্ (B)-অ্যাকিন , (C)-নাট ও (D)-সিপ্‌সেলা ।

(iv) **নাট** (Nut) — ফলটি যুক্তগর্ভপত্রী (একাধিক গর্ভপত্র) ও অধিগর্ভ ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এইরূপ ফলে সাধারণত একটি বীজ থাকে এবং এর ফলত্বক চামড়ার মতো কাষ্ঠল হয়। **উদাহরণ** — ওক, কাজুবাদাম, লিচু ইদ্যাদি।

2. **বিদারী ফল (Dehiscent fruit)** ঃ এই জাতীয় ফল পরিণত হলে তার ফলত্বক বিদীর্ণ হয় এবং বীজগুলি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ—

(i) **শিম্ব বা লেগিউম বা পড** (Legume or pod)—এটি একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ও একপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়ের মধ্যে কয়েকটি ডিম্বক সারিবদ্ধভাবে প্রান্তীয় অমরাবিন্যাসে বিন্যস্ত থাকে। এইরূপ ফলে পৃষ্ঠীয় সন্ধি ও অঙ্কীয় সন্ধি থাকে এবং ফল পরিণত হলে তার উভয় সন্ধি বরাবর ফলত্বকের বিদারণ ঘটে। **উদাহরণ**—মটর, শিম, বক ইত্যাদি।
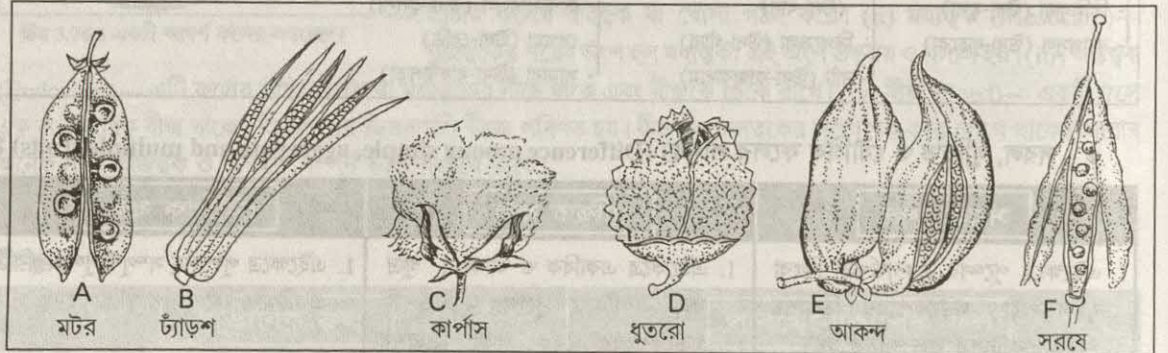
চিত্র 3.78 ঃ বিদারী ফল—(A)-লেগিউম , (B-D)-ক্যাপসুল, (E)-ফলিক্‌ল এবং (F)-সিলিকুয়া ।

(ii) **ফলিকল** (Follicle)— এই প্রকারের ফল যুক্তগর্ভপত্রী (দুটি গর্ভপত্র), অধিগর্ভ ও একপ্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। ফল পরিণত হলে তা কেবলমাত্র অঙ্কীয় সন্ধি বরাবর বিদীর্ণ হয়। **উদাহরণ**—আকন্দ।

(iii) **সিলিকুয়া** (Siliqua)—এই ফল যুক্তগর্ভপত্রী (দুইটি গর্ভপত্র), অধিগর্ভ ও দুইপ্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয়টি প্রথমে একপ্রকোষ্ঠ যুক্ত থাকে এবং পরে অপ্রকৃত প্রাচীর বা রেপ্লাম (Replum) দিয়ে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়। পরিণত ফল নীচের দিক থেকে উপরদিকে লম্বালম্বিভাবে বিদারিত হয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং বীজগুলি রেপলামের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। **উদাহরণ**—মুলো, সরিষা ইত্যাদি।

(iv) **ক্যাপসুল** (Capsule)—এই প্রকারের ফল যুক্তগর্ভপত্রী (একাধিক গর্ভপত্র), অধিগর্ভ ও একাধিক প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। পরিণত ফলের ফলত্বক গর্ভপত্রের সংযোগস্থানে বরাবর বহু অংশে বিদীর্ণ হয়। **উদাহরণ**—ঢ্যাঁড়শ, ধুতরো ইত্যাদি।

3. **ভেদক ফল (Scizocarpic fruit)** ঃ পরিণত অবস্থায় এইরূপ ফলের ফলত্বক বহু খণ্ডাংশে বিদীর্ণ হয় এবং প্রতিটি খণ্ডাংশে একটি করে বীজ থাকে। এদের প্রকারভেদ নিম্নরূপ—

(i) **লোমেনটাম** (Lomentum)—এই ফল একগর্ভপত্রী ও অধিগর্ভ ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। পরিণত ফলের ফলত্বক অনুপ্রস্থে কয়েকটি খণ্ডে বিদীর্ণ হয় এবং এক একটি বিদীর্ণ অংশ ফল থেকে আলাদা আলাদা ভাবে খসে পড়ে। এইরূপ প্রতিটি খণ্ডে একটি করে বীজ থাকে। **উদাহরণ**—বাবলা, লজ্জাবতী ইত্যাদি।
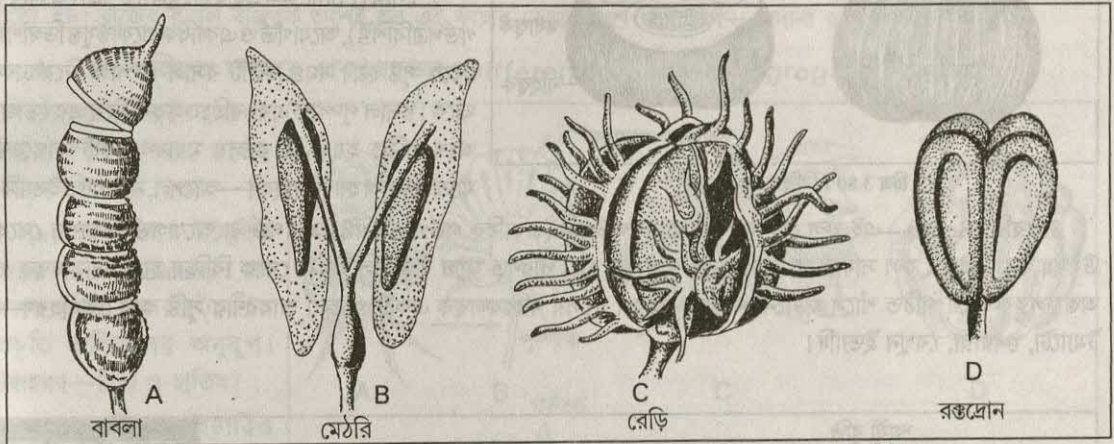
চিত্র 3.79 ঃ ভেদক ফল— (A)-লোমেনটাম, (B)-ক্রিমোকার্প, (C)-রেগমা এবং (D)-কারসেরিউল।

(ii) **ক্রিমোকার্প** (Cremocarp)— এই ফল যুক্তগর্ভপত্রী (দুটি গর্ভপত্র), অধোগর্ভ ও দ্বিপ্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এর প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি বীজ থাকে। পরিণত ফল উপর থেকে নীচের দিকে লম্বালম্বিভাবে বিদীর্ণ হয়ে দুটি খণ্ডে পৃথক হয়। এই খণ্ড দুটিকে **মেরিকার্প** (Mericarp) বলে। এটি একটি দ্বিবাহুযুক্ত অক্ষের দু-পার্শ্বে যুক্ত থাকে। একে **কার্পোফোর** (Carpophore) বলে। প্রকৃতপক্ষে কার্পোফোর হল পুষ্পাক্ষের বর্ধিত দ্বিখণ্ডিত অংশ। **উদাহরণ**—ধনে, মৌরি ইত্যাদি।

(iii) **কারসেরিউল** (Carcerule)— এই ফল যুক্তগর্ভপত্রী (দুটি গর্ভপত্র), অধিগর্ভ ও চারিটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। পরিণত ফলের ফলত্বক চারটি খণ্ডে বিদীর্ণ হয় এবং এদের প্রতিটি খণ্ডে একটি করে বীজ থাকে। **উদাহরণ**—তুলসী, রক্তদ্রোন ইত্যাদি।

(iv) **রেগমা** (Regma) — এই ফল যুক্তগর্ভপত্রী (তিনটি বা পাঁচটি গর্ভপত্র), অধিগর্ভ ও তিনটি বা পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। পরিণত ফল ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠ সংখ্যার সমান সংখ্যক খণ্ডে বিদীর্ণ হয় এবং প্রতিটিতে একটি করে বীজ থাকে। **উদাহরণ** — রেড়ি, জিরানিয়াম (Geranium) ইত্যাদি।

(v) **সামারা** (Samara)— এটি যুক্তগর্ভপত্রী (একাধিক গর্ভপত্র), অধিগর্ভ এবং একাধিক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এর ফলত্বক প্রসারিত হয়ে পক্ষের আকার ধারণ করে। **উদাহরণ**— মাধবীলতা, খাম-আলু ইত্যাদি।

(vi) **সামারয়েড** (Samaroid)— এটি সামারা জাতীয় ফল। তবে এই ক্ষেত্রে ফলের পক্ষগুলি ফলত্বক থেকে গঠিত না হয়ে স্থায়ী বৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**— শাল।

**B. সরস ফল (Fleshy fruit) :** এই জাতীয় ফলের ফলত্বক পুরু ও রসাল হয় এবং পরিণত অবস্থাতেও এদের ফলত্বক বিদীর্ণ হয় না। ফলের প্রকারভেদ নিম্নরূপ—

চিত্র 3.80 : বিভিন্ন প্রকার ড্রুপ।

1. **ড্রুপ (Drupe)** — এই ফল একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ও সাধারণত একপ্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট হয়। সাধারণত এই ফল একবীজ যুক্ত হয় এবং এর ফলত্বকটি তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে। এর অন্তফলত্বক কঠিন ও কাষ্ঠল হয়। **উদাহরণ**—আম। কোনো কোনো ড্রুপের মধ্যফলত্বক তন্তুময় হয়। একে **তন্তুময় ড্রুপ** বলে। **উদাহরণ**—সুপারি (তন্তুময় অংশ নীরস)। আবার কোনো কোনো ড্রুপ তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট হয় এবং এর প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে বীজ থাকে। **উদাহরণ**—তাল।

2. **পোম (Pome)**— এই ফলে যুক্তগর্ভপত্রী (একাধিক গর্ভপত্রবিশিষ্ট), অধোগর্ভ ও একাধিক প্রকোষ্ঠযুক্ত ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট হয়। সমগ্র ফলটি রসাল পুষ্পাক্ষ দিয়ে ঢাকা থাকে। রসাল পুষ্পাক্ষ এবং বহিঃফলত্বক দিয়ে এর ভোজ্য অংশ গঠিত হয়। এই ফলের মধ্যফলত্বকটি কাগজের মতো পাতলা হয়। **উদাহরণ**—আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি।

3. **বেরি (Berry)**—এই ফল একগর্ভপত্রী বা যুক্তগর্ভপত্রী (একাধিক গর্ভপত্রবিশিষ্ট) অধিগর্ভ বা অধোগর্ভ ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এইরূপ ফল সাধারণত বহুবীজযুক্ত ও রসাল হয়। পরিণত ফলে বীজগুলি অমরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যফলত্বক ও অন্তফলত্বক দিয়ে গঠিত শাঁসে ছড়ানো থাকে। এইরূপ ফলের বহিঃফলত্বক একটি পাতলা আবরণীর সৃষ্টি করে। **উদাহরণ**—টম্যাটো, পেয়ারা, বেগুন ইত্যাদি।
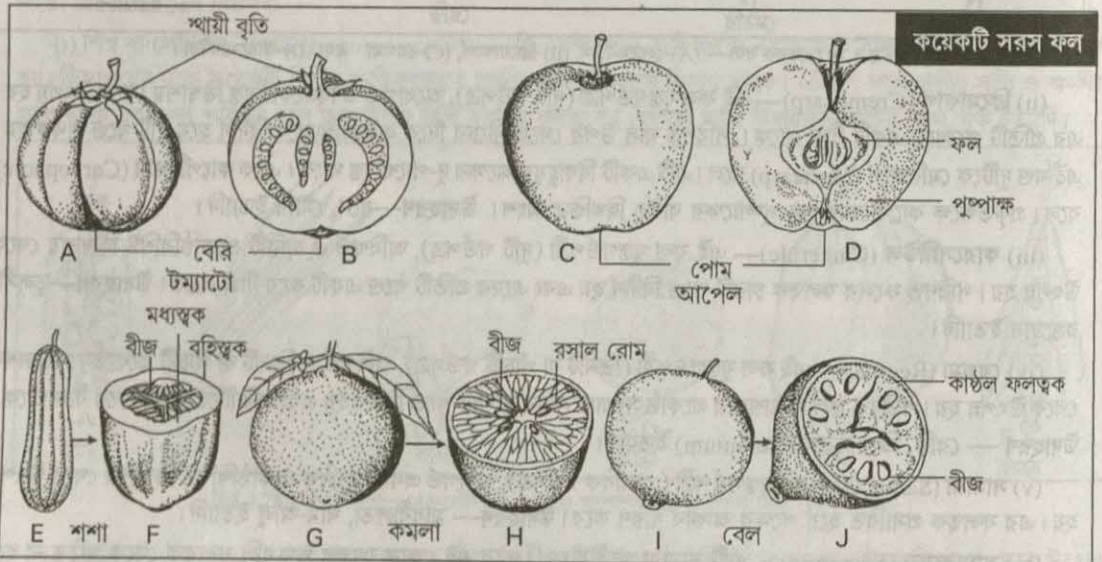
চিত্র 3.81 : সরস ফল— (A-B)-বেরি (টম্যাটো), (C-D)-পোম, (E-F)-পেপে, (G-H)-হেসপেরিডিয়াম এবং (I-J)-অ্যাম্ফিসারকা।

4. **পেপো (Pepo)**—এই ফল বেরির মতো যুক্তগর্ভপত্রী (কয়েকটি গর্ভপত্র বিশিষ্ট) ও অধোগর্ভ ডিম্বাশয় থেকে গঠিত হয়। পরিণত ফলের বহিঃফলত্বক সামান্য স্থূল হয়, তবে বীজসমূহ অমরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। **উদাহরণ**—কুমড়া, শশা ইত্যাদি।

5. **হেসপেরিডিয়াম** (Hesperidium)—ফলটি যুক্তগর্ভপত্রী (বহুগর্ভপত্রবিশিষ্ট), অধিগর্ভ ও অক্ষীয় অমরাবিন্যাসযুক্ত এবং বহুপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। এইরূপ ফলের বহিঃফলত্বক এবং মধ্যফলত্বক যুক্ত হয়ে একটি চামড়ার আবরণ গঠন করে। অন্তঃফলত্বক থেকে নির্গত এককোশী রসাল রোম হল এই প্রকার ফলের ভোজ্য অংশ। **উদাহরণ**—লেবু, কমলালেবু ইত্যাদি।

6. **অ্যাম্ফিসারকা** (Amphisarca)—ফলটি যুক্তগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ও বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে গঠিত হয়। এইরূপ ফলের বহিঃফলত্বক কাষ্ঠল হয় এবং অন্তঃফলত্বক ও অমরার কিছু অংশ নিয়ে ফলের ভোজ্য অংশ গঠিত হয়। **উদাহরণ**—বেল, কয়েতবেল।

7. **বালাউস্টা** (Balausta)—ফলটি যুক্তগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ও বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয় থেকে গঠিত হয়। ফলের বহিঃফলত্বক চামড়ার মতো দৃঢ় হয়। পুরু মধ্যফলত্বকটি বহিঃফলত্বকের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অন্তঃফলত্বকটি পাতলা কাগজের মতো হয়। বীজের রসাল বীজত্বক অংশই হল এই ফলের ভোজ্য অংশ। **উদাহরণ**—বেদানা ও ডালিম।

### ▲ II. গুচ্ছিত ফলের প্রকারভেদ (Different types of Aggregate Fruit) :

ফ্রুটলেটের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গুচ্ছিত ফলের নামকরণ করা হয়, যেমন—

(a) **ফলিকলের ইটারিও (Etaerio of follicles) :** এই প্রকার গুচ্ছিত ফলের ফ্রুট্‌লেটের প্রকৃতি ফলিকলের অনুরূপ। **উদাহরণ**—চাঁপা ও ছাতিম।

(b) **অ্যাকিনের ইটারিও (Etaerio of achenes)**—ফ্রুট্‌লেটের প্রকৃতি অ্যাকিনের অনুরূপ। **উদাহরণ**—ছাগলবটি, গোলাপ, পদ্ম ইত্যাদি।

(c) **ড্রুপের ইটারিও (Etaerio of drupes) :** ফ্রুট্‌লেটের প্রকৃতি ড্রুপের অনুরূপ। **উদাহরণ**—রাসপবেরি।

চিত্র 3.82 : (A-B)-ড্রুপের ইটারিও, (C-D)-বেরির ইটারিও, (E-G)-অ্যাকিনের ইটারিও, (H-I)-ফলিকলের ইটারিও।

(d) **বেরির ইটারিও (Etaerio of berries) :** ফ্রুট্‌লেটের প্রকৃতি বেরির অনুরূপ। **উদাহরণ**—আতা।

### ▲ III. যৌগিক ফল (Multiple fruits) :

সমগ্র পুষ্পমঞ্জরিটি একটিমাত্র ফলে পরিণত হলে তাদের **যৌগিক ফল** বলে।

**প্রকারভেদ (Types) :** যৌগিক ফল দু'প্রকারের হয়—(a) **সাইকোনাস** (Syconus) এবং (b) **সোরোসিস** (Sorosis)।

(a) **সাইকোনাস** ঃ এই ফল **হাইপ্যানথোডিয়াম** (Hypanthodium) বা **উদুম্বর** জাতীয় সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি থেকে সৃষ্ট হয়। পুষ্পাধারটি (Receptacle) মাংসল, রসাল ও পেয়ালার আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং এর ভেতর স্ত্রী পুষ্পগুলি থেকে ছোটো ছোটো অ্যাকিন জাতীয় ফলের সৃষ্টি হয়। এই ফলের পুষ্পাধারটি হল ফলের ভোজ্য অংশ। **উদাহরণ**—ডুমুর, বট প্রভৃতি।
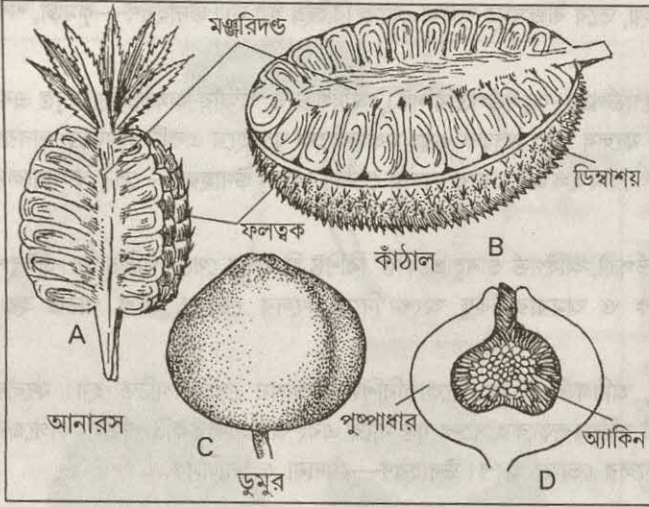
চিত্র 3.83 ঃ (A-B)-সোরোসিস, (C-D)-সাইকোনাস।

(b) **সোরোসিস** ঃ পুষ্পমঞ্জরির পুষ্পগুলির সব পুষ্পস্তবক মঞ্জরিদন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে এইরূপ ফল গঠন করে। আনারসের প্রতিটি চোখ অংশ এক একটি পুষ্প থেকে গঠিত। এই ফলের রসাল মঞ্জরিপত্র ও পুষ্পপুটই হল ভোজ্য অংশ। কাঁঠালের ক্ষেত্রে গর্ভপত্রের শীর্ষাংশ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে তার ফলত্বক গঠন করে। এর রসাল ডিম্বাশয়গুলিই হল ভোজ্য অংশ। **উদাহরণ**—আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি।

## 3.9. বীজ (Seed)

বীজ প্রধাণত ভ্রূণ, বীজত্বক ও সস্য (বীজের খাদ্য) নিয়ে গঠিত হয়। গুপ্তবীজ (Angiosperm) উদ্ভিদে বীজ ফলের ভিতরে থাকে। তাই একে **গুপ্তবীজ** বলে। **উদাহরণ**—আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি। ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) উদ্ভিদে ফল হয় না। তাই বীজগুলি স্ত্রীরেণুপত্রের উপর গঠিত হয়। বীজ ফলের মধ্যে আবদ্ধ না থাকার জন্য একে **নগ্নবীজ** (Naked seed) বলে। **উদাহরণ**—পাইনাস, সাইকাস প্রভৃতি।

### ▲ বীজের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Seed) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ফলত্বক দিয়ে আবৃত বা অনাবৃত পরিণত ও পরিবর্তিত নিষিক্ত ডিম্বককে বীজ বলে।**

➤ (b) **প্রকারভেদ (Types)** ঃ বীজপত্রের সংখ্যা ও সস্যের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে বীজকে বিভক্ত করা হয়।

1. **বীজপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী** ঃ বীজপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী বীজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—একবীজপত্রী, দ্বিবীজপত্রী এবং বহুবীজপত্রী বীজ।

(i) **একবীজপত্রী বীজ** (Monocotyledonous seed)—যেসব উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাকে একবীজপত্রী বীজ বলে। **উদাহরণ**—ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), ভুট্টা (*Zea mays*), নারকেল (*Cocos nucifera*) প্রভৃতি।

(ii) **দ্বিবীজপত্রী বীজ** (Dicotyledonous seed)—যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে তাকে **দ্বিবীজপত্রী** বীজ বলে। **উদাহরণ**—ছোলা (*Cicer arietinum*), মটর (*Pisum sativum*), রেড়ি (*Ricinus communis*) ইত্যাদি।

(iii) **বহুবীজপত্রী বীজ** (Polycotyledonous seed)—যেসব উদ্ভিদের বীজে দুটির বেশি বীজপত্র থাকে তাদের **বহুবীজপত্রী** বীজ বলে। **উদাহরণ**—সাইকাস (*Cycas rumphii*), পাইনাস (*Pinus longifolia*) প্রভৃতি।

2. **সঞ্চিত খাদ্যের অবস্থান অনুযায়ী** ঃ সঞ্চিত খাদ্যের অবস্থান অনুযায়ী বীজ দুই প্রকার—

(i) **সস্যল বীজ** (Albuminous seed)—যেসব বীজে সস্য (ভ্রূণের খাদ্য) বীজপত্রের ভেতর না থেকে আলাদাভাবে থাকে তাকে **সস্যল বীজ** বলে। **উদাহরণ—দ্বিবীজপত্রী বীজ**—রেড়ি (*Riccinus communis*), শালুক (*Nymphaea Stellata*), পাট (*Corchorus capsularis*) প্রভৃতি। **একবীজপত্রী বীজ**—ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*), ভুট্টা (*Zea mays*) প্রভৃতি।

(ii) **অসস্যল বীজ** (Exalbuminous seed)—যেসব উদ্ভিদের বীজে সস্য বীজপত্রের ভেতরেই থাকে, তাকে **অসস্যল বীজ** বলা হয়। এই বীজের বীজপত্র পুরু ও ভারী হয়। **উদাহরণ—দ্বিবীজপত্রী বীজ**—ছোলা (*Cicer arietinum*), মটর (*Pisum sativum*) প্রভৃতি। **একবীজপত্রী বীজ**—কচু (*Colocasia esculanta*), পাতাশ্যাওলা (*Vallisneria spiralis*), অ্যালিমা (*Alisma plantago*) প্রভৃতি।
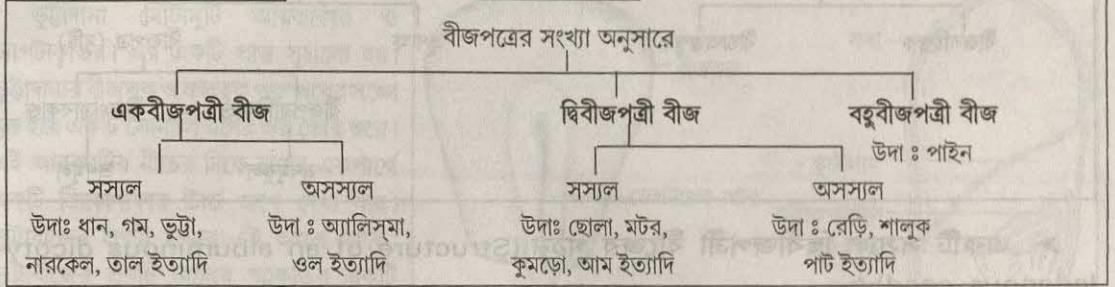
● **সস্যল ও অসস্যল বীজের পার্থক্য (Difference between endospermic and non-endospermic seeds) ঃ**

| সস্যল বীজ | অসস্যল বীজ |
|---|---|
| 1. বীজে সস্য থাকে। | 1. বীজে সস্য থাকে না। |
| 2. বীজপত্র পাতলা হয়। | 2. বীজপত্র পুরু হয়। |
| 3. বীজপত্র হালকা হয়। | 3. বীজপত্র ভারী হয়। |
| 4. সস্য বীজপত্রকে আবৃত রাখে। | 4. সস্য বীজপত্রকে আবৃত রাখে না। |

## ➤ একটি অসস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন (Structure of an exalbuminous dicotyledonous seed) ঃ

একটি অসস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের উদাহরণ হল ছোলা। এই বীজের একপ্রান্ত স্ফীত ও অপর প্রান্ত সূচালো হয়। ছোলাবীজকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়—**বীজত্বক** (Seed coat) ও **অন্তর্বীজ বা শাঁস** (Kernal)। বীজত্বককে আবার দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়—(i) বীজের বাইরের বাদামি বর্ণের স্থূল আবরণটিকে **বীজবহিস্ত্বক** (Testa) এবং (ii) এর নীচের পাতলা আবরণটিকে **বীজঅন্তস্ত্বক** (Tegmen) বলা হয়। বীজের সূচালো অংশের বীজত্বকে যে সামান্য অবতল ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় তাকে **ডিম্বকনাভি** (Hilum) বলে। এই স্থানটি দিয়ে গর্ভাশয়ে বীজ অমরার সঙ্গে যুক্ত থাকে। জলসিক্ত বীজে সামান্য চাপ দিলে ডিম্বকনাভির কাছের যে ছিদ্রপথের মাধ্যমে বীজের ভিতর থেকে জল বাইরে আসে তাকে **ডিম্বকরন্ধ্র**(Micropyle) বলা হয়। বীজের মাঝ বরাবর একটি লম্বা দাগ থাকে, একে **স্ট্রফিওল** (Strophiole) বলে।

চিত্র 3.84 ঃ ছোলাবীজের গঠন।

বীজের বীজত্বক অপসারণ করলে যে অংশ পড়ে থাকে তাকে **অন্তর্বীজ** (Kernel) বলে। দ্বিবীজপত্রী বীজের অন্তর্বীজটি হল এর ভ্রূণ। অন্তর্বীজে মৃদু চাপ দিলে এটি দুটি স্থূল ও শাঁসালো খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই স্ফীত খণ্ড দুটি হল বীজের **বীজপত্র**। বীজপত্র দুটির মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র বক্র দণ্ড থাকে, একে **ভ্রূণাক্ষ** (Embryoaxis) বলে। বীজপত্র দুটি ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে অনেকটা কবজার মতো আটকানো থাকে। ভ্রূণাক্ষের শীর্ষাংশকে **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) এবং এর বিপরীত প্রান্তকে **ভ্রূণমূল** (Radicle) বলা হয়।

ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে বীজপত্রের সংযোগস্থানকে **পর্বস্থান** (Nodal zone) বলা হয়। ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান থেকে ভ্রূণমুকুল পর্যন্ত অংশকে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** (Epicotyl) এবং ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান থেকে ভ্রূণমূল পর্যন্ত অংশকে **বীজপত্রাবকাণ্ড** (Hypocotyl) বলা হয়।
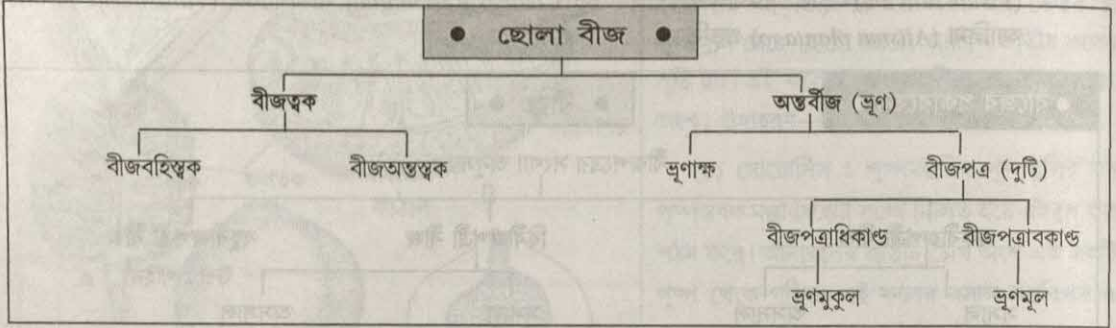
### ➤ একটি সস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন (Structure of an albuminous dicotyledonous seed) :

রেড়ির বীজ হল একটি সস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের উদাহরণ। রেড়ির বীজ প্রায় আয়তাকার (Oblong) ও চ্যাপটাকৃতির হয়। এর বীজত্বক কেবলমাত্র বীজবহিস্ত্বক নিয়ে গঠিত এবং এটি বেশ শক্ত ও চিত্রবিচিত্র হয়। বীজের একপ্রান্ত চওড়া ও অপরপ্রান্ত কিছুটা সরু হয়। সরু অংশে সাদা স্পঞ্জের মতো একটি গোলাকার কোমল অংশ থাকে। একে **ক্যারাঙ্কল** (Caruncle) বলে। এটি ডিম্বকনাভি (Hilum) ও ডিম্বকরন্ধ্রকে (Micropyle) আবৃত করে রাখে। বীজের বীজবহিস্ত্বককে উন্মুক্ত করলে যে পাতলা ও স্বচ্ছ আবরণ দেখা যায় তাকে **সস্যাবরণী** বা **পরিভ্রূণ** (Perisperm) বলা হয়। অনেকের মতে এটি হল বীজের বীজ অন্তস্ত্বক। বীজবহিস্ত্বকের লম্বা দাগটিকে **রাফে** (Raphe) বলে।
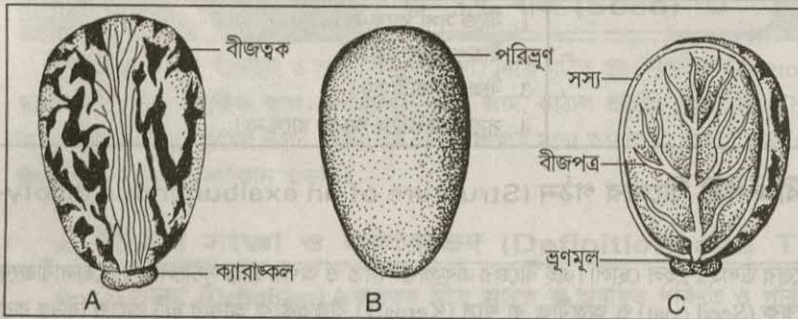
চিত্র 3.85 : (A-C) দ্বিবীজপত্রী সস্যল বীজের গঠন (রেড়ি)।

পরিভ্রূণকে অপসারণ করলে বীজের **অন্তর্বীজ** (Kernel) অংশ উন্মুক্ত হয়। অন্তর্বীজ সস্য ও ভ্রূণ নিয়ে গঠিত। এই বীজের সস্য অংশ স্থূল এবং তা ভ্রূণকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে রাখে। দুটি বীজপত্র ও একটি ক্ষুদ্র ভ্রূণাক্ষ দিয়ে বীজের ভ্রূণ অংশটি গঠিত। বীজপত্র দুটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তাতে শিরা-উপশিরা রয়েছে। সস্যের উপরে এর সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। ভ্রূণাক্ষের শীর্ষাংশকে **ভ্রূণমুকুল** (Pulmule) বলে।

● **নীচের ছকের সাহায্যে রেড়ি বীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হল :**
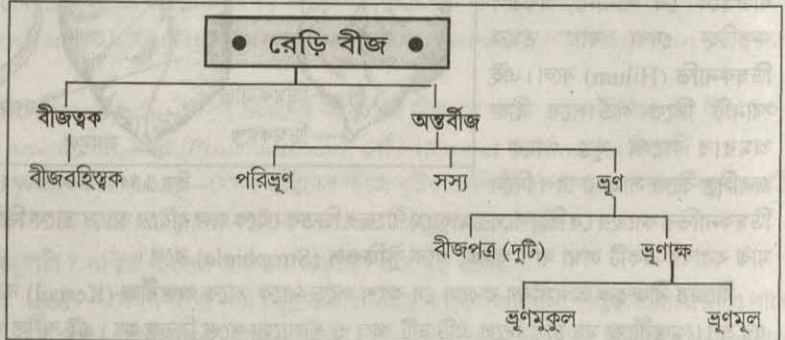
বীজটির ভ্রূণমুকুল অংশ অতি ক্ষুদ্র ও তা বীজপত্র দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকে। ভ্রূণাক্ষের সর্বনিম্ন অংশটি হল ভ্রূণমূল (Radicle)। রেড়ির বীজের ভ্রূণাক্ষটি অতিক্ষুদ্র হওয়ায় এর বীজপত্রাধিকাণ্ড ও বীজপত্রাবকাণ্ড অংশ তেমন স্পষ্ট নয়।

➤ **একটি সস্যল একবীজপত্রী বীজের গঠন** (Structure of an albuminous monocotyledonous seed) :

ভুট্টা বীজ হল একটি সস্যল একবীজপত্রী বীজের উদাহরণ। বীজ হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে একটি একবীজপত্রী ফল। একে সাধারণত ভুট্টা দানা (Maize grain) বলা হয়।

ভুট্টাদানা মোটামুটি আয়তাকার ও চ্যাপটাকৃতির। এর একটি প্রান্ত সূচালো হয়। ভুট্টাদানার বীজত্বক ও ফলত্বক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সোনালি বর্ণের স্তর তৈরি করে। এই আবরণটির নীচের দিকে দানার একপার্শ্বে একটি ত্রিকোণাকার উচ্চ অংশ দেখা যায়। ভুট্টাবীজের ভ্রূণটি দানার এই অংশে থাকে। ভুট্টাবীজের ভ্রূণটি ঢালের আকৃতির একটি বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষ নিয়ে গঠিত। ভুট্টা দানার বীজপত্রকে **স্কুটেলাম** (Scutellum) বলা হয়। ভ্রূণাক্ষের শীর্ষাংশকে **ভ্রূণমুকুল** (Plumule) ও

চিত্র 3.86 : (A)-ভুট্টা বীজের গঠন, (B)-ভুট্টা বীজের লম্বচ্ছেদ।

তার বিপরীত অংশকে **ভ্রূণমূল** (Radicle) বলে। ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে বীজপত্রটির সংযোগস্থানকে পর্বস্থান বলা হয়। ভ্রূণমুকুল থেকে পর্বস্থান পর্যন্ত ভ্রূণাক্ষের অংশকে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** (Epicotyl) এবং ভ্রূণমূল থেকে পর্বস্থান পর্যন্ত ভ্রূণাক্ষের অংশকে **বীজপত্রাবকাণ্ড** (Hypocotyl) বলা হয়। ভুট্টা দানার ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল পৃথক পৃথক আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে। এদের যথাক্রমে **ভ্রূণমুকুলাবরণী** (Coleoptile) ও **ভ্রূণমূলাবরণী** (Coleorhiza) বলে।

ভুট্টাদানার খোসা (বীজত্বক ও ফলত্বক একসঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অংশটি গঠন করে) ছাড়িয়ে নিয়ে যে অংশ পড়ে থাকে তা হল এই বীজের অন্তর্বীজ অংশ। এটি ভ্রূণ ও সস্য নামে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। অন্তর্বীজের প্রধান অংশে **সস্য** (Endosperm) নিয়ে গঠিত হয়। এই বীজের সস্য একটি সুস্পষ্ট এপিথেলিয়াম স্তর দিয়ে ভ্রূণ থেকে পৃথক থাকে।
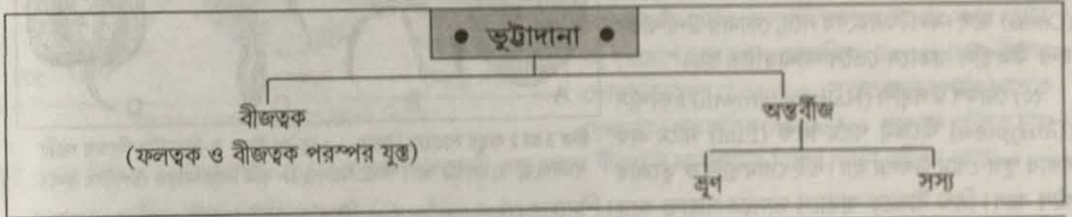
## 3.10. বীজ ও ফলের বিস্তার (Dispersal of fruits and seeds)

❖ **বীজ ও ফল বিস্তারের সংজ্ঞা (Definition of Dispersal of fruits and seeds) : বীজ বা ফল জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে বীজ ফলের বিস্তার বলা হয়।**

উদ্ভিদের ফল ও বীজ বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত হওয়া একটি আবশ্যকীয় পদ্ধতি। যদি জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে সব বীজ বা ফলগুলি পড়ে সীমিত স্থানে জমা হয়ে অঙ্কুরিত হত তবে খাদ্য, বায়ু, জল এবং আলো পর্যাপ্ত না পাওয়ার জন্য চারা গাছগুলি দুর্বল হয়ে পড়ত। দুর্বল চারাগুলির সবগুলি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকত না। সুতরাং বীজগুলি বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত হলে বেশি সংখ্যক গাছ সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সেই জন্য সব উদ্ভিদ চারিদিকে বিস্তার লাভ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু নানা প্রকার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বাধার জন্য উদ্ভিদের এই প্রচেষ্টা কিছুটা ব্যাহত হয়। বিস্তারের এ-সব বাধা অতিক্রম করবার জন্য উদ্ভিদের বীজ ও ফলের নানা প্রকার অভিযোজন লক্ষ করা যায়।

উদ্ভিদের বীজ ও ফলের কোনো গমন অঙ্গ নেই। এই জন্য তাদের বিস্তারের জন্য কোনো-না-কোনো বাহকের প্রয়োজন। সেই জন্য বায়ু, জল এমনকি জীবজন্তু ফল ও বীজ বিস্তারে বাহকের কাজ করে। ফল ও বীজের বিস্তারে মানুষের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বায়ু, জল ও জীবজন্তুর সাহায্যে কীভাবে ফল বীজ বিস্তারিত হয় তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

### ➤ A. বায়ুর সাহায্যে বিস্তার (Dispersal by wind) :

বায়ুর সাহায্যে যেসব ফল ও বীজের বিস্তার ঘটে সেগুলি খুব হালকা প্রকৃতির হয়। এই ধরনের ফল ও বীজ বাতাসে ভাসতে ভাসতে বহু দূরে চলে যায়। বাতাসে ভাসবার জন্য এসব ফল ও বীজের রোম অথবা পক্ষ থাকে।

চিত্র 3.87 : বায়ুর সাহায্যে বীজের বিস্তার।

1. **অর্কিডের** বীজ খুব ক্ষুদ্র এবং 250টি বীজের ওজন মাত্র এক গ্রাম। **সিঙ্কোনার** বীজ ক্ষুদ্র ও পক্ষল। এই সব বীজ সহজে বাতাসে ভাসতে পারে বলে বহুদূরে বিস্তৃত হয়।

2. **প্যারাসুট গঠন (Parachute mechanism)** : অনেক উদ্ভিদের ফলে ও বীজে রোম থাকার জন্য ফল ও বীজ প্যারাসুটের মতো বাতাসে ভাসতে পারে। এই ধরনের ফল ও বীজ বাতাসে ভাসতে ভাসতে বহুদূরে চলে যায়। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—
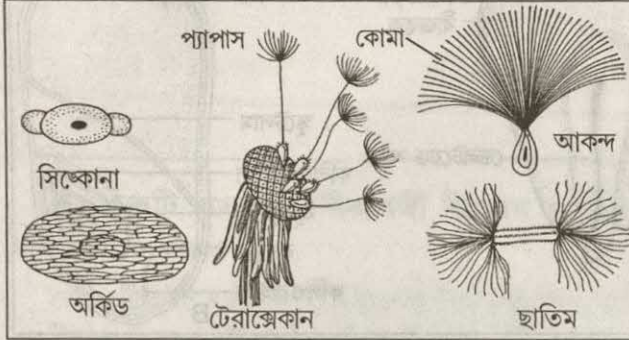
(a) **প্যাপাস** (Pappus) : অনেকগুলি প্রজাতির স্থায়ী বৃত্যংশগুলি পরিবর্তিত হয়ে রোমের মতো সরু **প্যাপাস** গঠন করে। পরিণত ফলের উপরের দিকে প্যাপাস থেকে ফলকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। *টেরাক্সেকাম* (*Taraxacum*), *সূর্যমুখী* (*Helianthus*), *কেশুত* (*Ecliptra*), *ভারনোনিয়া* (*Vernonia*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলগুলি এইভাবে প্যাম্পাসের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। শীতকালে বনে-জঙ্গলে এই ধরনের ফল বাতাসে ভাসতে দেখা যায়।

(b) **কোমা** (Coma) : আকন্দ (*Calotropis*) বীজের এক প্রান্তে এবং ছাতিম বীজের (*Alstonia*) দু'প্রান্তে গুচ্ছাকারে রোম উৎপন্ন হয়। গুচ্ছাকার রোমকে **কোমা** (Coma) বলে। ফল বিদারণের পরে, কোমার উপস্থিতির জন্য বীজগুলি বাতাসে ভেসে স্থানান্তরিত হয়।

চিত্র 3.88 : বায়ুর সাহায্যে বিস্তার—A-তুলো বীজ, B-ক্লিমেটিস বীজের স্থায়ী গর্ভদণ্ড, C-ছাগলবটি ফলে স্থায়ী গর্ভদণ্ড, D-বৃতি দিয়ে আবৃত টেপারির ফল।

(c) **রোমশ উপবৃদ্ধি** (Hairy outgrowth) : কার্পাস (*Gossypium*) বীজের গায়ে **লিন্ট** (Lint) নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র রোম উৎপন্ন হয়। এই রোমগুলিকে **তুলোর আঁশ** বলে। লিন্ট বীজকে বাতাসে ভাসতে সাহায্য করে। শিমুলের (*Bombax ceiba*) বীজেও একই প্রকার রোম দেখা যায়।

(d) **স্থায়ী গর্ভদণ্ড** (Persistent style) : ছাগলবটি (*Naravelia sylanicas*), ক্লিমেটিস (*Clematis*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলে রোমযুক্ত স্থায়ী গর্ভদণ্ড ফলকে বাতাসে ভাসতে সাহায্য করে।
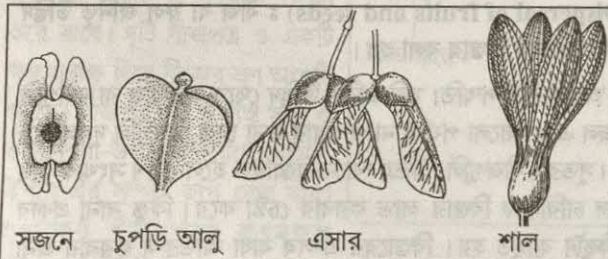
চিত্র 3.89 : বায়ুর সাহায্যে বিস্তারে ফল ও বীজের পক্ষল উপবৃদ্ধি।

(e) **বেলুনের ন্যায় গঠন** (Balloon like structure) : টেপারি (*Physalis minima*) ও শিবকুল গাছের (*Cardiospermum halicacabum*) ফল বায়ুপূর্ণ স্থায়ী বৃতির সাহায্যে বাতাসে ভেসে নানা স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

3. **পক্ষ (Wings)** : কয়েক ধরনের বীজ ও ফলে পক্ষ (wings) থাকবার জন্য ওই জাতীয় বীজ ও ফল বাতাসে ভেসে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। সজনের (*Moringa*

*pterigosperma*) পক্ষল বীজ বাতাসে ভাসতে পারে। অরকজাইলাম (*Oroxylum indicum*) বীজের পক্ষ বেশ বড়ো আকৃতির হয়।

মাধবীলতা (*Hiptage madhablata*), এসার (*Acer*), খামালু (*Dioscorea*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফল ও পক্ষযুক্ত হয়। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রেও ফল বাতাসে ভাসতে পারে।

শালের (*Shorea robusta*) ফলের বৃত্যংশ পক্ষল আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে ফলের বিস্তারে সহায়তা করে।

4. **সেন্সার মেকানিজম (Censer mechanism) বা সীমিত বীজ বিস্তার প্রক্রিয়া ঃ** *শেয়ালকাঁটা* (*Argemone mexicana*), *পোস্ত* (*Papaver somniferum*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্যাপসুল জাতীয় ফলের উপরের দিকে কয়েকটি ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। বাতাসে ক্যাপসুল দুলে ওঠবার সময় প্রতিবারে অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র বীজ বাইরে বেরিয়ে আসে। বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে বীজ বিস্তারিত হয়। ফলের আকৃতির সঙ্গে ধূপদানির গঠনের মিল থাকায়, এই ধরনের বিস্তারকে **সেন্সার মেকানিজম** বলে।

চিত্র 3.90 ঃ পোস্ত গাছের ফল।

5. **অস্ট্রেলিয়ার ঘাস** (***Spinifex squarrosus***) ঃ একটি জাঙ্গল জাতীয় উদ্ভিদ (Xerophytic plant), মরুভূমির বালিতে জন্মায়। পরিণত কাঁটাযুক্ত গাছটির ডালপালা, ফল প্রভৃতি একসঙ্গে গোলাকার আকৃতি গঠন করে। পরিণত হলে গোলাকার কাঁটাযুক্ত অংশটি বাতাসের বেগের জন্য বালির উপরে গড়িয়ে যাওয়ার সময় বীজগুলি মাটিতে ছড়িয়ে যায়।

*সালসোলা কালি* (*Salsola-kali*) নামে লবণাম্বু উদ্ভিদ (Halophyte) সমুদ্রোপকূলে লোনা জায়গায় জন্মায়। পরিণত উদ্ভিদের শাখাগুলি বক্র হয়ে একসঙ্গে গোলাকার আকৃতির হয়। বায়ুবেগে বীজসহ বিচ্ছিন্ন শাখা বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়ার সময় বীজের বিস্তার ঘটে।
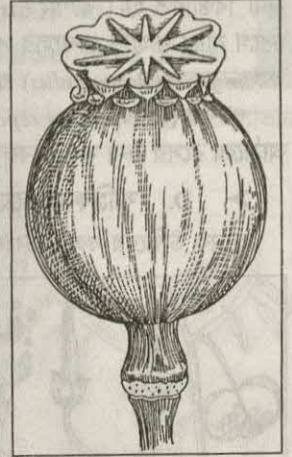
### ➤ B. জলের সাহায্যে বিস্তার (Dispersal by water) ঃ

সমুদ্রতীর অথবা জলাশয়ের ধারে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের বীজ অনেক ক্ষেত্রে জলের সাহায্যে বিস্তারিত হয়। নারকেল (*Cocos nucifera*), সুপারি (*Areca catechu*), গোল পাতা (*Nipa fruticans*) প্রভৃতি উদ্ভিদের তন্তুময় ফল জলে ভাসে। ফলের অভ্যন্তরীণ ত্বক (এন্ডোকার্প) কঠিন হওয়ার জন্য ভিতরে জল ঢুকতে পারে না। তাই ভ্রূণের কোনো ক্ষতি হয় না। ফলগুলি ভাসতে ভাসতে সমুদ্র স্রোতে বহু দূরদেশে চলে যায়। **সেচেলিস** (Seychelles) দ্বীপের জোড়া নারকেল (*Lodoicea*) সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত ভাসতে দেখা যায়। পদ্মফুলের (*Nelumbo*) পুষ্পাক্ষ পরিণত হলে বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলাশয়ে ভেসে বেড়ায়। পুষ্পাক্ষটি পচে গেলে বীজগুলি জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
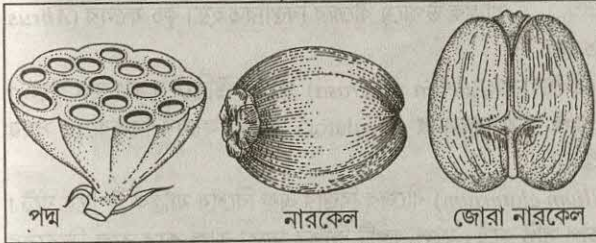
চিত্র 3.91 ঃ জলের সাহায্যে বীজের বিস্তার।

### ➤ C. প্রাণীর সাহায্যে বিস্তার (Dispersal by Animals) ঃ

যেসব ফলের বর্ণ উজ্জ্বল তারা পাখিকে আকৃষ্ট করে। পাখিরা এসব ফল খাওয়ার পরে অনেক ক্ষেত্রে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতা নষ্ট হয় না। এই সব বীজ বিষ্ঠার সঙ্গে মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হয়। এইভাবে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি উদ্ভিদ পাখির সাহায্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিস্তারিত হয়। তা ছাড়া পুরানো বাড়ির দেওয়ালে, ছাদে অথবা অন্য গাছের শাখায় এই ধরনের গাছের জন্ম পাখির সাহায্যে বীজের বিস্তারের ফলে ঘটে।

বিভিন্ন পশু, যেমন—বানর, হনুমান, শিয়াল প্রভৃতি জন্তু ফল খাওয়ার পরে বিভিন্ন স্থানে বীজ ফেলে দেয়। এই সব বীজ থেকেও আবার নতুন গাছ উৎপন্ন হয়।

চিত্র 3.92 ঃ প্রাণীর সাহায্যে বীজ ও ফলের বিস্তার।

অনেক ফলে ও বীজে কণ্টক, অঙ্কুশ অথবা তীক্ষ্ণ রোম থাকে। এসব বীজ বা ফল জীবজন্তুর দেহের সংস্পর্শে এলে গায়ে লেগে যায় এবং পরে মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হয়। চোরকাঁটার (*Andropogon aciculatus*) স্থায়ী বৃতি ও রোমের মতন শক্ত গর্ভমুণ্ড সহজে জীবজন্তুর গায়ে ও মানুষের কাপড়ে লেগে যায়। *এরিসটিডা* (*Aristida*) নামে এক রকমের ঘাসের ফলে শক্ত বাঁকানো রোম পশুর সাহায্যে বিস্তারিত হয়। বনওকরার (*Xanthium*) ফলে অঙ্কুশ এবং *বাঘনখ* (*Martynia diandra*) ফলের বাঁকানো নখের মতন গর্ভমুণ্ড সহজে জীবজন্তুর গায়ে লেগে যায়। জীবজন্তুর দেহ থেকে ফলগুলি বিভিন্ন স্থানে ঝরে পড়বার জন্য বিস্তারিত হয়। *আপাং* (*aspera*) গাছের ফল, পুষ্পপত্র ও মঞ্জরিপত্রে কণ্টকের জন্য চোরকাঁটার মতো জীবজন্তুর গায় লেগে যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের পরিচিত *বাইডেন্স* (*Bidens*) উদ্ভিদে প্যাপাস অঙ্কুশে পরিণত হয়। *অ্যানিমোন* (*Anemone*), *র‍্যানানকুলাস* (*Ranunculus*) প্রভৃতি উদ্ভিদে গর্ভমুণ্ডের আকৃতি অঙ্কুশের মতন হয়।

*পুনর্ণবা* (*Boerhaavia repens*), *ইউরেনা* (*Urena lobata*) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলে একপ্রকার আঠালো রস উৎপন্ন হয়। আঠালো রসের জন্য ফল জীবজন্তু ও মানুষের গায়ে লেগে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

### ➤ D. যান্ত্রিক উপায়ে বিস্তার (Mechanical Dispersal) ঃ

অনেক উদ্ভিদের ফল ফাটবার পরে বীজগুলি উদ্ভিদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদারণ যথেষ্ট শক্তি সহকারে হয় বলে বীজগুলি অনেকটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ধরনের ফলকে **বিস্ফোরক ফল** (explosive fruit) বলা হয়। কখনো-কখনো ফলে বিদারণ হয় সশব্দে, যেমন—*অ্যানটান্ডা* (*Entanda*), *পাহাড়ি কাঞ্চন* (*Bauhinia vahlii*) প্রভৃতি উদ্ভিদে। *দোপাটি* (*Impatiens balsamina*) ফল পাকলে কোনো বস্তুর স্পর্শে ফেটে যায়। বীজগুলি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে ফলের অংশগুলি গুটিয়ে যায়। আমরুলেও (*Oxalis corniculata*) অনুরূপভাবে যান্ত্রিক উপায়ে বীজের বিস্তারিত হয়। কুচ ফলের (*Abrus plecatorious*) ফলত্বক শুকিয়ে বিভিন্ন দিকে বীজ বিস্তারিত হয়।
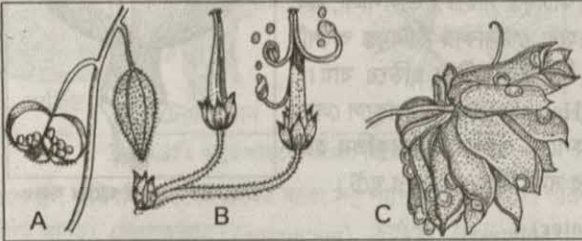
চিত্র 3.93 ঃ যান্ত্রিক উপায়ে বীজের বিস্তার—A-দোপাটি, B-আমরুল এবং C-কুচ।

কালমেঘ (*Andrographis paniculata*), *রুয়েলিয়া টিউবারোসা* (*Ruellia tuberosa*) প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রত্যেক বীজের তলায় একটি করে চ্যাপটা বাঁকানো **রেটিনাকুলা** (retinacula) বা **জ্যাকুলেটর** (jaculator) থাকে। ফলের বিদারণের সময় জ্যাকুলেটর সোজা হয়ে যাওয়ার ফলে বীজগুলি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কুমড়োর মতো গাছের (*Ecbollium elaterium*) বীজের বিস্তার এক বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে ঘটে। পরিণত ফলের ভিতরের অংশ নরম শাঁসে পরিণত হয় ও চাপ সৃষ্টি করে। ফলে বৃন্তটি ছিপির মতো কাজ করে বলে ভিতরের অংশ বেরিয়ে আসতে পারে না। পরিণত ফল বৃন্তচ্যুত হওয়ার পরে বীজসহ ফলের ভিতরের অংশ ছিদ্র দিয়ে 15-20 ফুট দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

### ➤ E. মানুষের সাহায্যে বিস্তার (Dispersal by Man) ঃ

মানুষ তার প্রয়োজনে উদ্ভিদের ফল ও বীজ দূর দূরান্তরে নিয়ে যায়। অনেক সময় মানুষ তার অজান্তে জামাকাপড় ও জিনিসপত্রের সঙ্গে ফল ও বীজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের মধ্যে আলু, টম্যাটো, রাঙাআলু, ভুট্টা, তামাক, সিঙ্কোনা প্রভৃতি আমেরিকার উদ্ভিদ। স্পেন দেশের মানুষ সম্ভবত এই সব উদ্ভিদ ইউরোপে নিয়ে যায় এবং পরে এগুলি ভারতবর্ষে আসে। এই সব উদ্ভিদ ছাড়াও বহু জংলি গাছের বীজ প্রয়োজনীয় গাছের সঙ্গে
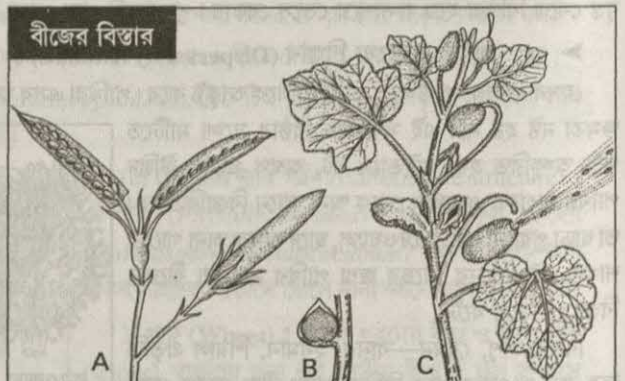
চিত্র 3.94 ঃ বীজের বিস্তার—A-রুয়েলিয়া, B-রুয়েলিয়া বীজের নীচে রেটিনাকুলা এবং C-ভূমধ্যসাগরীয় কুমড়ো।

আমাদের দেশে এসেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্রোটন (*Croton bonplandianum*), শিয়ালকাঁটা (*Argemone mexicana*), কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), সর্পগন্ধা (*Rauvolfia sperpentina*) প্রভৃতি।

বিভিন্ন রকম ফুলের গাছ, যেমন—কোলকে (*Thevetia peruviana*), জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*), গাঁদা (*Tagetes patula*), জিনিয়া (*Zinnia elegans*) ইত্যাদি বহু ফুল মানুষের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

## ○ 3.11. একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বর্ণনা ○ (Description of Monocot and Dicot plants Rice and Pea)

আগেই বলা হয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদ সব থেকে উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ গোষ্ঠী। পরিণত উদ্ভিদদেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত হয়। এই উদ্ভিদে ফলই বীজের আধার অর্থাৎ বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী এদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**একবীজপত্রী** এবং **দ্বিবীজপত্রী**। **একবীজপত্রী** উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র (Cotyledon) থাকে। **উদাহরণ**—ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি। **দ্বিবীজপত্রী** উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। **উদাহরণ**—আম, জাম, মটর, ছোলা ইত্যাদি। নীচে একবীজপত্রী ধান এবং দ্বিবীজপত্রী মটর গাছের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

চিত্র 3.95 : ধানগাছের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

### ➤ 1. ধান গাছের বর্ণনা (Description of Rice plant) :

(a) **ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম :** *অরাইজা স্যাটিভা* (*Oryza sativa*) (b) **গোত্র ও উদ্ভিদ গোষ্ঠী :** ধান হল পোয়েসী (Poaceae) গোত্রের সপুষ্পক বর্ষজীবী এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

(c) **বর্ণনা (Description) :** 1. **স্বভাব :** একবর্ষজীবী, বীরুৎ। 2. **মূল :** কাণ্ডের গোড়ায় অস্থানিক গুচ্ছমূল গঠিত হয়। 3. **কাণ্ড :** বেলনাকার, পর্ব ও পর্বমধ্যযুক্ত, পর্বমধ্য ফাঁপা এবং পর্ব নিরেট এবং স্ফীত। 4. **পাতা :** একক, একান্তরভাবে বিন্যস্ত, সরল, কাণ্ডবেষ্টকযুক্ত, রেখাকার (Linear), সমান্তরাল শিরাবিন্যাসযুক্ত এবং রোমশ।

5. **পুষ্পবিন্যাস** (Inflorescence) **: অনুমঞ্জরি** (spikelet)। এই পুষ্পবিন্যাসে অনুমঞ্জরিগুলি বিভিন্ন ভ্যারাইটি অনুসারে স্পাইক, রেসিম বা প্যানিকল-এ বিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি অনুমঞ্জরি শুকনো, শক্ত মঞ্জরিপত্র নিয়ে গঠিত। এদের **গ্লুম বা বর্ম** (Glume) বলে। একটি অনুমঞ্জরিতে 3টি গ্লুম বা **মঞ্জরিপত্র** ও একটি **মঞ্জরিপত্রিকা** (bracteole) থাকে। অনুমঞ্জরির প্রথম 2টি গ্লুমের কক্ষে কোনো ফুল থাকে না। তাই এদের **শূন্য বর্ম বা অপুষ্পক গ্লুম** (empty glume) বলে। অপুষ্পক গ্লুমদ্বয়ের উপরে একপাশে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি গ্লুম থাকে যার কক্ষে ফুল গঠিত হয়। একে **লেমা বা সপুষ্পক বর্ম** (Lemma) বলে। লেমার বিপরীত দিকে 2-শিরাবিশিষ্ট একটি মঞ্জরিপত্রিকা থাকে। একে **পেলিয়া বা শক্ত বর্ম** (Palea) বলা হয়।

6. **পুষ্প** (Flower) **:** বৃন্তক অথবা অবৃন্তক, অসমাঙ্গ ও উভলিঙ্গ। লেমা ও পেলিয়া একসঙ্গে ফুলকে আবৃত করে রাখে।

7. **পুষ্পপুট** (Perianth) **:** লেমা ও পেলিয়ার উপরে 2টি, শল্কপত্রের মতো, গোলাকার, ক্রিম বর্ণের **লডিকিউল** (Lodicule) থাকে। এরাই প্রকৃতপক্ষে **পুষ্পপুট**।

8. **পুংস্তবক** (Androecium) পুংকেশর 6টি, দুটি আবর্তে 3টি করে (3 + 3) বিন্যস্ত থাকে; পুংদণ্ড লম্বা, পরাগধানী দু'প্রকোষ্ঠযুক্ত এবং সর্বমুখ (Versatile)।

9. **স্ত্রীস্তবক** (Gynoceium) ঃ গর্ভপত্র 1টি, গর্ভাশয় অধিগর্ভ, এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রকোষ্ঠে একটি ডিম্বক থাকে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড 2টি এবং উভয়ে পক্ষল।

10. **ফল** (Fruit) ঃ ক্যারিওপসিস্।

11. **বীজ** (Seed) ঃ ফলত্বক ও বীজত্বক একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ত্বক গঠন করে। চালের উপরের বাদামি আবরণীই হল ত্বক। ত্বকের নীচে **অন্তর্বীজ** অংশ (karnel) থাকে। এটি **সস্য** (endosperm) ও **ভ্রূণ** (embryo) নিয়ে গঠিত। ধানের অন্তর্বীজের অধিকাংশ অংশই সস্য দিয়ে পূর্ণ এবং এর মধ্যে খাদ্য হিসাবে শ্বেতসার জমা থাকে। ভ্রূণ খুবই ক্ষুদ্র এবং সস্যের নিম্নাংশের খাঁজে থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে সস্যের সঙ্গে সংযুক্ত পাতলা পর্দার ন্যায় একটিমাত্র **বীজপত্র** (cotyledon—obe) থাকে, তাকে **স্কুটেলাম** (Scutellum) বলে। ভ্রূণাক্ষের (embryo axis) উপরের দিকে **ভ্রূণমুকুল** (plumule) **ভ্রূণমুকুলাবরণী** (coleoptile) দিয়ে এবং নীচের দিকে **ভ্রূণমূল** (radical), **ভ্রূণমুকুলাবরণী** (coleorhiza) দিয়ে আবৃত থাকে। বীজপত্র ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল দিয়ে যুক্ত থাকে।

## ➤ মটর গাছের (দ্বিবীজপত্রী) বর্ণনা [Description of Pea (Dicot) Plant] ঃ

মটর সপুষ্পক, গুপ্তবীজী, দ্বিবীজপত্রী এবং বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ **লেগুমিনোসি** (Leguminosae) গোত্রের, **প্যাপিলিওনেসি** (Papilionaceae) উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম *পাইসাম স্যাটাইভাম* (*Pisum sativum*)।

1. **মূল** ঃ প্রধান মূলতন্ত্র (Tap root system), শাখামূল (secondary), প্রশাখা মূল (tertiary) নিয়ে গঠিত। মূল ও শাখাপ্রশাখা মূলের শীর্ষে মূলত্র (Root cap) থাকে। মূলে রাইজোবিয়াম নামে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের জন্য একপ্রকার অর্বুদ (nodule) সৃষ্টি করে।
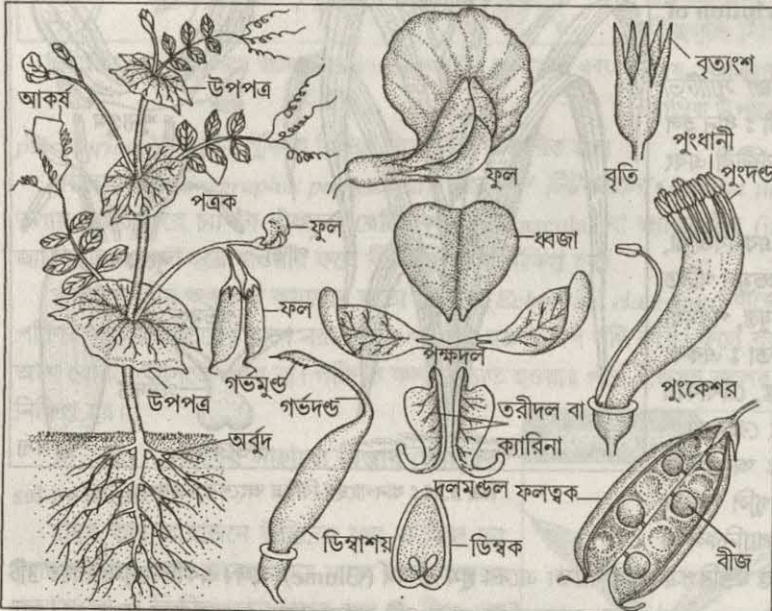
চিত্র 3.96 ঃ মটর গাছ এবং ফুল ও ফলের বিভিন্ন অংশ।

2. **কাণ্ড** ঃ সবুজ, দুর্বল, লতানো বীরুৎশ্রেণির, শাখাপ্রশাখাযুক্ত; নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্য থাকে।

3. **পত্র** ঃ যৌগিক পত্র — সচূড় পক্ষল; উপপত্রদ্বয় (stipule) যুক্ত ও ফলকাকার (foliaceous)। শীর্ষের পত্রকগুলি (leaflets) **আকর্ষে** (tendril) রূপান্তরিত হয়। পত্রবিন্যাস একান্তর এবং পত্রকগুলির শিরাবিন্যাস জালকাকার।

4. **পুষ্পবিন্যাস** ঃ রেসিম (raceme)।

5. **পুষ্প** ঃ বৃন্তক, উভলিঙ্গ, অসমাঙ্গ, সম্পূর্ণ ও গর্ভকটি (Perigynous)।

6. **বৃতি** ঃ বৃত্যংশ 5টি, অসমাঙ্গ, যুক্তবৃত্যংশ, বর্ণ সবুজ, সম্মুখ বৃত্যংশটি বড়ো। মুকুলপত্র বিন্যাস ভালভেট।

7. **দলমণ্ডল**—দলাংশ 5টি, অসমাঙ্গ, মুক্তদলী, প্রজাপতিসম ধ্বজা, পক্ষদল 2টি এবং তরীদল 2টি, ধ্বজা সব চাইতে বড়ো, বাইরের দিকে অবস্থিত, নীচে পক্ষদল লম্বা প্রসারিত, তরীদল বাঁকানো নৌকার মতো, মুকুলপত্র বিন্যাস ধ্বজক (Vaxillary)।

8. **পুংস্তবক** ঃ পুংকেশর মোট 10টি, দ্বিগুচ্ছ (diadelphous)— একত্রে 9টি ও 1টি আলাদা পরাগধানী দ্বিকোশীয় ও পাদলগ্ন।

9. **স্ত্রীস্তবক** ঃ গর্ভপত্র—1টি, গর্ভাশয় অধিগর্ভ এবং একপ্রকোষ্ঠযুক্ত (placentation), অমরাবিন্যাস প্রান্তীয়; গর্ভমুণ্ড পক্ষল।

10. **ফল** ঃ শুষ্ক, বিদারী একক—শিম্ব বা লেগিউম। ফলত্বক উভয় **সন্ধি বরাবর** (dorsal and ventral suture) বিদীর্ণ হয়।

11. **বীজ** ঃ গোলাকার, সামান্য বাদামি, বহিস্ত্বক (testa) মসৃণ ও অপেক্ষাকৃত মোটা, অন্তস্ত্বক (tegmen) দেখা যায় না। বহিস্ত্বকের অপেক্ষাকৃত খাঁজ অংশে স্পষ্ট কালো দাগ থাকে—একে **ডিম্বকনাভি** (hilu) বলে। ডিম্বকনাভির একটু দূরেই একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে—একে **ডিম্বকরন্ধ্র** (micropyle) বলা হয়। বহিস্ত্বকের নীচে অন্তর্বীজ (karnel) অংশে দুটি মাংসল, মোটা, বিভক্ত বীজপত্র থাকে। এটি ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল গঠন করে।

## ✪ 3.12. উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা (Plant Breeding) ✪

ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজ শুধু ভারতের নয়—সারা পৃথিবীর একটা বিরাট সমস্যা বলা যায়। এর ফলে খাদ্যের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে বাসস্থান, শহর নির্মাণ ও কলকারখানা সম্প্রসারণের জন্য ফসলি জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাই দিন দিন খাদ্যসমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল উন্নতমানের ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদের উদ্ভাবন করা। উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার ও জৈব প্রযুক্তির সহায়তায় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অর্থকরী উদ্ভিদের উন্নতি ঘটাতে পারলে বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। তাই আজ উদ্ভিদ প্রজননবিদদের প্রধান লক্ষ্য হল দুটি নির্বাচিত উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটিয়ে উন্নত গুণসম্পন্ন অপত্য সৃষ্টি করা। আজকাল পৃথিবীর সব দেশে কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের উৎপাদন বাড়ার মূলে রয়েছে উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যা। তাই উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এই শাখার গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়।

❖ (a) **উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Plant breeding) ঃ উন্নতমানের নতুন নতুন খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য অর্থকরী উদ্ভিদের উদ্ভাবন এবং উদ্ভিদগুলির বংশানুক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটানোর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা বলে।**

➤ (b) **উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ (Objective and Aims of plant breeding)** ঃ উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল—

(i) **ফলন বাড়ানো** (Higher yield)— শস্য, তন্তু, তেল, ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের ফলন বাড়ানোর জন্য উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করা উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য।

(ii) **গুণগত মান উন্নয়ন** (Improved quality)—উন্নত গুণগত মানের উদ্ভিদ সৃষ্টি করার জন্য প্রজনন বিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফল, বীজ, দানা শস্য ইত্যাদির আকৃতি, গঠন, স্বাদ, খাদ্যগুণ, রং ইত্যাদির উন্নতি সাধন করা হল গুণগতমান উন্নয়ন। প্রজনন বিদ্যা অনুসরণ করে বিভিন্ন ফলের খাদ্যগুণ, আখের শর্করার পরিমাণ ও ডালের প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি করা হচ্ছে। তা ছাড়া তুলোর তন্তু সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ করা, পাট গাছের তন্তুর জন্য কাণ্ডকে লম্বায় বাড়ানো হচ্ছে।

(iii) **রোগপ্রতিরোধ** (Resistance to diseases)—রোগ প্রতিরোধক্ষম উন্নত জাত উদ্ভাবন করা উদ্ভিদ প্রজননবিদদের একটি প্রধান কাজ বলা যায়। আজকাল রোগ প্রতিরোধক ভ্যারাইটি (প্রকরণ) সৃষ্টি করে চাষ করার ফলে ফলনের একটা বিরাট অংশ নানারকম রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এটা একমাত্র উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এ নিয়ে দেশে বিদেশে বহু গবেষণার কাজ চলছে।

(iv) **প্রাকৃতিক বিরূপতা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি** (Increase of power to combat environmental odds)— নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন—বন্যা, খরা, ঝড় বাতাস, তুষারপাত প্রভৃতি বিরূপতা সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ভিদ উদ্ভাবন করা উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলা যায়। আজকাল বহু নতুন বিরূপতা সহ্য করতে পারে এমন প্রকরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(v) **কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ** (Resistance to insect Pests)— ফসলের একটা বিরাট অংশ কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রতিবছর বিনষ্ট হয়। আধুনিক প্রজনন বিদ্যা প্রয়োগ করে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(vi) **মাটির অম্লীয় ও ক্ষারীয় অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি** (Increase of power of endurance of acidity and alkalinity of the soil)— মাটিতে অধিক মাত্রায় অম্লীয় ও ক্ষারীয় অবস্থায় থাকলে ফসল চাষ ব্যাহত হয়। উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার সাহায্যে বেশি মাত্রায় অম্লীয় ও ক্ষারীয় অবস্থা সহ্য করার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(vii) **উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রকৃতির পরিবর্তন** (Change of growth habit of Plant)— প্রয়োজন হলে বিভিন্ন উদ্ভিদের **দীর্ঘতা** (Tallness) বা **খর্বতা** (Dwarfness) প্রজননবিদ্যা প্রয়োগ করে পরিবর্তন করা যায়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ধান, গম ইত্যাদি

ফসলের খর্ব কাণ্ডকে দীর্ঘ করা হচ্ছে। আবার দীর্ঘ কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদকে ঝড়বাতাসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য খর্ব আকৃতির করা হচ্ছে। এর ফলে উদ্ভিদ নিজস্ব পরিবেশে সহজে বেঁচে থাকছে এবং ফসলের ক্ষতি কম হচ্ছে।

(viii) **নানা প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজিত হবার ক্ষমতা বাড়ানো** (Increase in the power of adaptability to different environmental conditions)— পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। উদ্ভিদ তার নিজস্ব পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে। কিন্তু একটি উদ্ভিদকে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে নিয়ে এলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁচানো যায় না। আজকাল উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যা প্রয়োগ করে নতুন প্রকরণ তৈরি করা হচ্ছে যারা ভিন্ন পরিবেশেও নতুন জলবায়ু সহ্য করে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

## ▲ 1. সংকরায়ণ কৌশল (Hybridization technique) ঃ

❖ (a) **সংকরায়ণের সংজ্ঞা (Definition of Hybridization) ঃ দুই বা ততোধিক ভিন্ন জিনোটাইপযুক্ত দুটি উদ্ভিদের প্রণোদিত জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির পদ্ধতিকে সংকরায়ণ বলে।**

➤ (b) **বিভিন্ন প্রকার সংকরায়ণ (Different Types of Hybridization) ঃ** সংকরায়ণ পদ্ধতিতে নির্বাচিত উদ্ভিদ একই বা ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত অথবা ভিন্ন গণভুক্ত হতে পারে। জনিতৃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে সংকরায়ণকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

(i) **অন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ** (Intra-specific hybridization)—একই প্রজাতিভুক্ত দুটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়।

(ii) **আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ** (Intra-specific hybridization)—একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়।

(iii) **অন্তঃপ্রকার সংকরায়ণ** (Intra-varietal hybridization)—একই প্রজাতিভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রকারের ভ্যারাইটির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়।

(iv) **অন্তঃগণীয় সংকরায়ণ** (Intra generic hybridization)—দুটি একই গণভুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়।

(v) **আন্তঃগণীয় সংকরায়ণ** (Intra generic hybridization)—দুটি ভিন্ন গণভুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো।

(vi) **ইনট্রোগেসিভ সংকরায়ণ** (Introgressive hybridization)—এই প্রকার সংকরায়ণ নিজে থেকে ঘটে। একটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অন্য প্রজাতিতে প্রতিস্থাপিত হয়। মোট ছয় প্রকার সংকরায়ণ পদ্ধতির মধ্যে অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ বেশি মাত্রায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

➤ (c) **সংকরায়ণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য (Aim of hybridization)**—(i) একই প্রজাতির দুটি উদ্ভিদের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণমানের সমন্বয় ঘটানো। (ii) প্রকরণের মাত্রা বাড়ানো। (iii) সবল সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা।

➤ (d) **সংকরায়ণ পদ্ধতি (Methods of hybridization)** ঃ উদ্ভিদ-প্রজননবিদদের একটি উদ্দেশ্য হল দুটি নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে উন্নতমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপত্য বংশধর সৃষ্টি করা। সংকরায়ণ একটি প্রয়োজিক (Technical) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিটির বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল—(i) **জনিতৃ নির্বাচন** (Selection of parents), (ii) **জনিতৃ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ** (Collection of information about parents), (iii) **পুরুষত্বহীনকরণ** (Emasculation), (iv) **ব্যাগিং অর্থাৎ থলি দিয়ে আবৃতকরণ** (Bagging), (v) **পরাগযোগ** (Pollination), (vi) **ট্যাগিং বা চিহ্নিতকরণ** (Tagging) এবং (vii) **সংকর বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ** (Hybrid seed collection and storing)।

1. **জনিতৃর নির্বাচন** (Selection of Parents)— সংকরায়ণের জন্য উপযুক্ত **জনিতৃ** (Parents) নির্বাচন হল প্রথমিক কাজ অর্থাৎ যে দুটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাদের প্রথমে নির্বাচন করতে হয়। এই দুটি উদ্ভিদে সবরকম (মাতা ও পিতা) আকাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত স্থানীয় উদ্ভিদ থেকে মাতা-পিতা নির্বাচন করা হয়, কারণ এই উদ্ভিদগুলি পরিবেশের উপযোগী। অবশ্য স্থানীয় উদ্ভিদ সংকরায়ণের জন্য বিবেচিত না হলে অন্য জায়গা থেকে উদ্ভিদ আনার প্রয়োজন হয়। আনিত উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটিয়ে সংকর ঘটানোর আগে চাষ করে ওই পরিবেশে উপযুক্ত কিনা যাচাই করে দেখে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মাতা ও পিতা যে দুটি উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয় তাদের ফুল একই সময়ে ফোটা একান্ত প্রয়োজন।

2. **জনিতৃ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ** (Collection of information about parents)— সংকরায়ণ পদ্ধতির সাফল্যের জন্য জনিতৃ ফুল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা একান্ত প্রয়োজন।

(i) ফুল ফোটার সঠিক সময়, (ii) পুংকেশর ও গর্ভকেশর পরিণত হবার সময়, (iii) পুংরেণু সক্রিয় থাকার ক্ষমতা, (iv) সতেজ ও সুস্থ বীজ উৎপাদক ফুল নির্বাচন।

3. **পুরুষত্বহীনকরণ** (Emasculation)—**যে উদ্ভিদকে মাতা হিসাবে ব্যবহার করা হয় তার পরাগধানী পরিণত হওয়ার আগে পুংকেশর কেটে বাদ দেওয়ার পদ্ধতিকে পুরুষত্বহীনকরণ বলে।** একলিঙ্গ ফুলে পুরুষত্বহীন করার প্রয়োজন হয় না। উভলিঙ্গ ফুলে পরাগধানী বাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নানা উপায়ে পুরুষত্বহীনকরণ করা হয়। তবে তা নির্ভর করে ফুলের আকৃতি, প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ইত্যাদির উপর। পরাগধানীর সম্পূর্ণভাবে পরিণত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

(i) **কাঁচি বা ফরসেপের সাহায্যে পুরুষত্বহীনকরণ (Scissor or Forceps method Emasculation)**—যেসব ফুলের আকার বড়ো তাদের পরাগধানী পরিণত হওয়ার আগে ফরসেপ বা কাঁচির সাহায্যে পুংকেশর বাদ দিতে হয়। সাধারণত তুলো, গম প্রভৃতি উদ্ভিদে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(ii) **উষ্ণ বা ঠান্ডা জল বা অ্যালকোহলের সাহায্যে পুরুষত্বহীনকরণ (Hot or cold water, or Alcohol Emasculation)**— ছোটো ফুলধারণকারী উদ্ভিদে সম্পূর্ণ মঞ্জরি সময় ধরে (1—10 মিনিট) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (46–53°C) উষ্ণ জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে পরাগধানী পরিণত হতে পারে না। অন্য কোনো কোনো উদ্ভিদে ঠান্ডা জল বা অ্যালকোহল নির্দিষ্ট সময় ধরে ব্যবহার করে ইমাসকিউলেশন করা যায়। ধান, বাজরা ইত্যাদি শস্যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(iii) **সাকসান পদ্ধতির সাহায্যে পুরুষত্বহীনকরণ (Suction method emasculation)**—ফুলের আকার খুব ছোটো হলে সাকসান পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। এইক্ষেত্রে ফুল ফোটার অল্প সময় আগে বা অল্প পরে ফরসেপের সাহায্যে পাপড়িগুলি সরিয়ে পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড উন্মুক্ত করতে হয়। এরপর শোষক যন্ত্রের সাহায্যে পরাগধানী বের করে আনা হয়।

(iv) **হরমোন ও রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে পুরুষত্বহীনকরণ** (Emasculation by hormones anc chemical substances)— বহু হরমোন (IAA, IBA, 2, 4-D, GA ইত্যাদি), ম্যালিক হাইড্রাজাইড, জিঙ্ক মিথাইল আরসিনেট, ইথেফন্, মেনডক্ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে পুরুষত্বহীনকরণ অথবা পুংবন্ধ্যাত্ব ঘটানো সম্ভব। এসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ধান, গম, সরষে, যব, জোয়ার, বালির ক্ষেত্রে ইথেফন (Ethaphon) বেশি ব্যবহৃত হয়।

3. **থলি দিয়ে আবদ্ধকরণের নিয়ম (Bagging)**—পুংফুল এবং স্ত্রীফুল ব্যাগ দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ঢাকা হয়। এর ফলে পুংফুল বাইরের কোনো পরাগরেণু দিয়ে দূষিত হয় না এবং স্ত্রীফুলে অবাঞ্ছিত বিপরীত পরাগযোগ ঘটতে পারে না। সংকর করার জন্য যে পুংফুল আগে থেকে ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল তার পরাগরেণু ব্যবহার করা হয়। সংকরায়ণ করার পরও বীজ উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীফুলকে ব্যাগ দিয়ে আবৃত রাখতে হয়। পরাগযোগের পর পুংফুলকে আর ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় না। সাধারণত কাগজ, প্লাস্টিক, পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।

চিত্র 3.97 : ব্যাগিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি।

4. **ট্যাগিং (Tagging)**—থলি (bag) দিয়ে আবদ্ধকরণের পরই পুরুষত্বহীন ফুলকে ট্যাগ বা লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন আকারের ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত 3 cm ব্যাসার্ধের গোলাকার ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। ট্যাগে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা হয়। (i) উভলিঙ্গ ফুলের পুরুষত্বহীনকরণের তারিখ (ii) পরাগযোগ ঘটানোর তারিখ (iii) পুং ও স্ত্রী জনিতৃ উদ্ভিদের নাম। অনেক সময় পুরো নাম না লিখে A স্ত্রী এবং B পুংজনিতৃ লেখা যায়।

5. **পরাগযোগ (Pollination)**—নির্বাচিত উদ্ভিদ দুটির (মাতা ও পিতা) মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিপরীত পরাগযোগ ঘটানো হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে পরাগ সংগ্রহ করে পুংস্তবক বিহীন ফুলের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করতে হয়।

6. **সংকর বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Hybrid seed Collection and Storing)**—সংকরায়ণের কিছুদিন পরে উৎপন্ন ফলগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এরপর বীজগুলি শুকিয়ে নিয়ে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যাতে বীজগুলিতে পোকা না লাগে। পৃথক পৃথক সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন বীজগুলি আলাদাভাবে রেখে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। পরের বছর বীজগুলি মাটিতে পুঁতলে এর থেকে $F_1$ প্রজন্মের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

● **সংকর উদ্ভিদ নির্বাচন পদ্ধতি (Post hybridization selection Procedure)**—প্রথম প্রজন্ম ($F_1$) ও পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি নানা পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে **বংশবিবরণগত পদ্ধতি** (Pedigree method) ও **পরিমাণগত পদ্ধতি** (Bulk method) নীচে আলোচনা করা হল।

⊙ (a) **বংশানুক্রমিক পদ্ধতি (Pedigree method)**—স্বপরাগী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর। 1972 খ্রিস্টাব্দে **লাভ** (Love) এই নির্বাচন পদ্ধতির বিবরণ প্রকাশ করেন। প্রথম প্রজন্ম থেকে অর্থাৎ $F_1$ প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি থেকে উৎকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ নির্বাচন করা হয়। এই উদ্ভিদগুলি থেকে আলাদা আলাদাভাবে বীজ সংগ্রহ করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ($F_2$ জনুর) উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য পৃথক পৃথক সারিতে পোঁতা হয়। এরপর $F_2$ উদ্ভিদগুলি থেকে উৎকৃষ্টমানের উদ্ভিদ নির্বাচন করা হয় এবং প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজগুলি আলাদা আলাদা সারিতে পুঁতে $F_3$ জনুর উদ্ভিদ উৎপাদন করা হয়। $F_3$ জনুর উদ্ভিদগুলিকে একই পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় এবং $F_4$ ও $F_5$ জনুর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়। $F_6$ জনু বা প্রজন্মের উদ্ভিদগুলি বিশুদ্ধ ও সমসত্ব (Homozygous) প্রকৃতির হয়। এইভাবে নির্বাচিত উন্নতমানের উদ্ভিদগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ করে একত্রিত করা হয় এবং এক একটি ভ্যারাইটি তৈরি করা হয়। একইভাবে সৃষ্ট ভ্যারাইটিগুলি (প্রকরণ) চাষ করে এর উপযোগিতা যাচাই করা হয়। উৎকৃষ্ট ভ্যারাইটির উদ্ভিদ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে উন্নতমানের ভ্যারাইটি উৎপাদন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন (10-13 বছর)।

● **বংশানুক্রমিক পদ্ধতির গুণ** (**Merits of Pedigree method**) ঃ

(i) রোগ প্রতিরোধ, উচ্চতা, বীজ পরিণত হওয়ার সময়, উৎপাদন হার ও উৎকর্ষ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী।

(ii) অন্যান্য পদ্ধতি থেকে কম সময়ে নতুন ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করা যায়।

(iii) এই পদ্ধতি অনুসরণের প্রথম পর্যায়ে জনিতৃ ও তার বংশধরদের দৃশ্যমান কোনো দুর্বলতা ও দোষ থাকলে সেগুলিকে পরিহার করা যায়।

● **বংশানুক্রমিক পদ্ধতির দোষ** (**Demerits of Pedigree method**) ঃ

(i) নির্ভুল বংশানুক্রমিক তথ্য রাখার জন্য মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

(ii) অসংখ্য বংশধরদের থেকে সঠিক নির্বাচন শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

(iii) প্রজননবিদদের দক্ষতার উপর এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

⊙ (b) **পরিমাণগত বা বাল্ক পদ্ধতি (Bulk method)**—**নিলসন-এলি** (Nilsson-Ehle) 1908 খ্রিস্টাব্দে এই পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন। এই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত বীজগুলি পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয় না। এগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে চাষ করা হয়। $F_2$ জনুর বীজগুলি একসঙ্গে পুঁতে দিলে $F_3$ জনুর উদ্ভিদগুলি পাওয়া যায়। $F_3$ জনু বা প্রজন্ম থেকে নির্বাচিত উদ্ভিদ থেকে বীজ সংগ্রহ করে একসঙ্গে মিশিয়ে চাষ করা হয়। $F_6$ জনু পর্যন্ত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং পৃথকভাবে চাষ করা হয়। এরপর এদের উপযোগিতা বা উৎকর্ষতা যাচাই করা এবং কয়েক প্রজন্ম পরে উৎকৃষ্ট ভ্যারাইটি চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতি উন্নত ভ্যারাইটির উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে অনেক বেশি সময়ের (7-30 বছর) প্রয়োজন।

● **পরিমাণগত পদ্ধতির গুণ** (**Merits of Bulk method**) ঃ

(i) এই পদ্ধতি সরল, সুবিধজনক এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় বহুল।

(ii) এখানে উন্নতমানের বৈশিষ্ট্যের পৃথক হবার সুযোগ বেশি।

(iii) কোনো প্রজন্মে জিনের ও জিনোটাইপের পরিবর্তনের উপর লক্ষ রাখার কাজে এই পদ্ধতি উপযোগী।

● **পরিমাণগত পদ্ধতির দোষ (Demerits of Bulk method) :**

(i) নতুন ভ্যারাইটি সৃষ্টিতে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন।

(ii) প্রজননবিদদের দক্ষতা ও বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করার সুযোগ কম।

● **বংশ বিবরণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য (Comparison between Pedigree and Bulk Methods) :**

| বংশ বিবরণগত পদ্ধতি | পরিমাণগত পদ্ধতি |
|---|---|
| 1. জটিল, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি। | 1. সহজ, স্বল্প শ্রম ও ব্যয়ে কার্যকর পদ্ধতি। |
| 2. $F_2$ ও পরবর্তী জনু থেকে পৃথক পৃথকভাবে উদ্ভিদ নির্বাচিত হয় এবং পরে সেগুলি থেকে উৎপন্ন বংশধরদেরও পৃথক পৃথকভাবে পালন করা হয়। | 2. $F_2$ ও পরবর্তী জনু থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলিকে একসঙ্গে পালন করা হয়। |
| 3. নির্বাচিত উদ্ভিদগুলি ও তাদের অপত্য উদ্ভিদগুলির বংশধারার বিবরণ নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। | 3. এই পদ্ধতিতে কোনো বংশধারাগত বিবরণ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। |
| 4. নতুন প্রকরণ তৈরি করতে এবং চাষের ছাড়পত্র দিতে 14-15 বছর সময়ের প্রয়োজন। | 4. নতুন প্রকরণ বা ভ্যারাইটি তৈরি করতে এবং চাষের ছাড়পত্র দিতে আরও সময়ের প্রয়োজন। |
| 5. বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। | 5. স্বল্প প্রচলিত পদ্ধতি। |

## ▲ 2. ব্রিডার্স কিট (Breeder's Kit) :

❖ **ব্রিডার্স কিটের সংজ্ঞা (Definition of Breeder's Kit) : প্রজনন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার জন্য প্রজননবিদেরা যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন সেগুলিকে একসঙ্গে একটি ব্যাগে রাখা হয়, তাকে ব্রিডার্স কিট বলে।**

চিত্র 3.98 : ব্রিডার্স কিটের কয়েকটি যন্ত্রপাতি।

● সংকরায়ণ পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রজননবিদরা কয়েকটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। নীচে যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করা হল।

| যন্ত্রপাতির নাম | ব্যবহার |
|---|---|
| 1. কাঁচি (Scissor) | 1. ফুলের ক্ষতি না করে অপ্রয়োজনীয় অংশ অপসারণ করা হল কাঁচির কাজ। |
| 2. সূচ (Needles) | 2. ছোটো কুঁড়িগুলোকে পুরুযত্বহীনকরণের সময় খোলার জন্য সূচের প্রয়োজন হয়। |

| যন্ত্রপাতির নাম | ব্যবহার |
|---|---|
| 3. চিমটে (Forceps) | 3. নির্বাচিত উভলিঙ্গ ফুল থেকে চিমটে দিয়ে পরাগধানীগুলি সরানো হয়। |
| 4. ব্রাশ বা তুলি (Brush) | 4. অনেক সময় পরাগধানী থেকে পরাগরেণু সংগ্রহের জন্য ব্রাশের প্রয়োজন হয়। |
| 5. অ্যালকোহল (Alcohol) | 5. কাঁচি, সূচ, চিমটে, ব্রাশ প্রভৃতি নির্বীজকরণের (Sterilization) জন্য অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। |
| 6. ব্যাগ (Bag) বা মসলিন ও অয়েল পেপার (Moslin or oil paper) | 6. নির্বাচিত ফুলগুলি পুরুষত্বহীনকরণের পর ঢাকার জন্য ব্যাগ বা মসলিন বা অয়েল পেপার প্রয়োজন হয়। |
| 7. মিটার টেপ (Meter tape) | 7. জনিতৃ নির্বাচনের সময় তাদের উচ্চতা মাপার জন্য টেপের বিশেষ প্রয়োজন হয়। |
| 8. হাতলেন্স (Hand lens) | 8. ক্ষুদ্র ফুলের পুরুষত্বহীনকরণের সময় অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। |
| 9. ট্যাগ (Tag) | 9. সংকরায়ণের পর ফুলগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। |
| 10. সুতো (Thread) | 10. নির্বাচিত ফুলগুলির পুরুষত্বহীনকরণ ও পরাগায়ণের পর অয়েল বা মসলিন পেপার বা ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য চিহ্নিতকরণের জন্য সুতো ব্যবহার করা হয়। |
| 11. ফিল্ড ডায়েরি (Field diary) | 11. সংকরায়ণ পদ্ধতি শেষ হওয়ার পর, ক্রসের সংখ্যা, তারিখ, জনিত্রের নাম ইত্যাদি ডায়েরিতে লেখা হয়। |
| 12. মোম, স্পিরিট ল্যাম্প ও মোগলানোর পাত্র (Spirit lamp and container for melted wax) | 12. চিহ্নিতকরণের জন্য কাগজের ট্যাগগুলিকে মোমের প্রলেপ বা কোটিং দেওয়ার প্রয়োজন হয়। |

## ✪ 3.13. মাইক্রোপ্রোপাগেশন বা অণুবিস্তার (Micropropagation) ✪

(a) **মাইক্রোপ্রোপাগেশনের সংজ্ঞা (Definition of Micropropagation) ঃ যে প্রক্রিয়ায় কলা বা কোশ পালন করে কৃত্রিমভাবে বেশি সংখ্যক নতুন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায় তাকে অণুবিস্তার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলা হয়।**
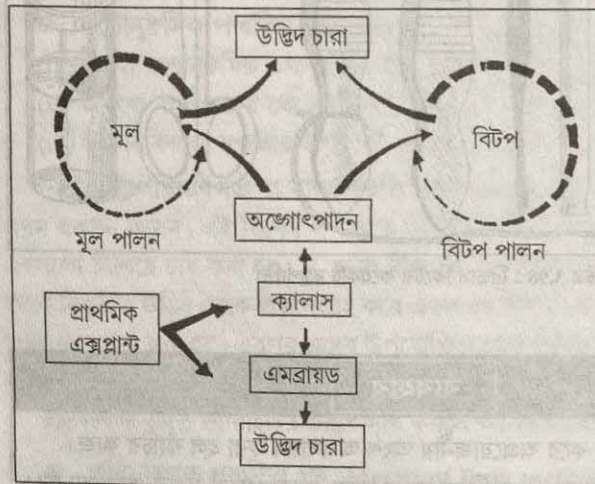
মাইক্রোপ্রোপাগেশনের পদ্ধতির লেখচিত্র।

অঙ্গজ জনন ও কলমের মাধ্যমে উদ্ভিদের পালন পদ্ধতি বহুদিন ধরে চলে আসছে। তবে এই সাধারণ পালন পদ্ধতি সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। কলাপালন পদ্ধতি সব উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অণুবিস্তার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলার কারণ হল—এই কৃত্রিম কলা পালন প্রক্রিয়ায় অতি ক্ষুদ্রতম বা অণু পরিমাণ কলা বা কোশসমষ্টি ব্যবহার করা হয়। 1960 সালে বিজ্ঞানী **মোরেল** (Morel) *Cymbidium* নামে অর্কিডের বিটপের অণু পরিমান কলা পোষণ করে প্রথমে একটি গোলাকার মূলযুক্ত অঙ্গ তৈরি করেন। একে **প্রোটোকরম্** (Protocorm) বলা হয়েছিল। প্রোটকরম্‌গুলি নতুন কালচার মিডিয়ামে বা অন্য পোষণ মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে খুব অল্পসময়ের মধ্যে অসংখ্য চারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রক্রিয়াতে উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে কোনো

বিশেষ ঋতুর উপর নির্ভর করতে হয় না। এর ফলে বছরের যে-কোনো সময় প্রচুর সংখ্যায় উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা যায়। সব চারার জিনগত বৈশিষ্ট্যের কোনো ভিন্নতা থাকে না (Genetically identical)। এই কারণে মাইক্রোপ্রোপাগেশন গুরুত্ব লাভ করেছে।

➤ (b) মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি **(Process of Micropropagation)** ঃ

উদ্ভিদের যে কোনো অংশ থেকে কোশ সংগ্রহ করে পুষ্টির মাধ্যমে কালচার করা হয়। কোশগুলি বিভাজিত হয়ে কোশসমষ্টি গঠন করে। একে **ক্যালাস** (Callus) বলে। উদ্ভিদ কোশের **টোটিপোটেন্ট** (Totipotent) বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ক্যালাস থেকে অঙ্গোৎপাদনের (বিটপ বা মূল বা পাতা উৎপন্ন হওয়া) মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ গঠিত হয়। ক্যালাস থেকে মূল উৎপন্ন হওয়াকে **রাইজোজেনেসিস** (Rhizogenesis) এবং বিটপ উৎপন্ন হওয়াকে **কলোজেনেসিস** (Caulogenesis) বলে।

চিত্র 3.99 ঃ মাইক্রোপ্রোপাগেশান প্রক্রিয়ায় একটি পর্ব থেকে গঠিত সম্পূর্ণ উদ্ভিদ

➤ (c) **মাইক্রোপ্রোপাগেশনে ব্যবহৃত উদ্ভিদ অঙ্গ (Plant parts used in Micropropagation)** ঃ

সাধারণত কাক্ষিক মুকুল, অস্থানিক মূল, পর্ব ও কোশীয় ভ্রূণ পালনের মাধ্যমে অণুবিস্তার ঘটে। অণুবিস্তারের জন্য জীবাণুমুক্ত পোষক মাধ্যম ও উপযুক্ত তাপমাত্রার প্রয়োজন।
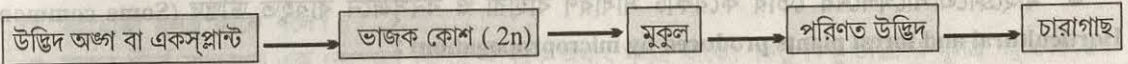
➤ (d) **মাইক্রোপ্রোপাগেশনের গুরুত্ব (Importance of Micropropagation)** ঃ আজকাল উদ্যান চর্চায়, কৃষি ও অরণ্য বৃক্ষের বংশবৃদ্ধিতে মাক্রোপ্রোপাগেশন খুবই প্রয়োজনীয়। নীচে মাক্রোপ্রোপাগেশনের গুরুত্বগুলি আলোচিত হল।

1. খুব কম জায়গায় অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়।
2. চারা গাছের জিনগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা থাকে না।
3. চারা তৈরি করতে কম সময়ের প্রয়োজন।
4. কোনো ঋতুর উপর নির্ভর করতে হয় না। বছরের যে-কোনো সময় চারা তৈরি করা যায়।
5. যেসব উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হতে অনেকদিন সময়ের প্রয়োজন অর্থাৎ দীর্ঘ সুপ্ত অবস্থা, সেসব উদ্ভিদের অল্প সময়ে বংশ বিস্তার করানো যায়।
6. একসঙ্গে অনেক রোগমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি করা যায়।
7. প্রয়োজনীয় সংকর **উদ্ভিদ বন্ধ্যা** (Sterile) হলে, তার বংশ বিস্তার করানো যায়।
8. বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা অতি সহজে বাড়ানো যায়।
9. মূল্যবান জার্মপ্লাজমকে (কলা ও বীজ যা ভবিষ্যতে উদ্ভিদ উৎপাদনে সমর্থ) **ক্রায়োজেনিক** পদ্ধতিতে (তরল নাইট্রোজেনে – 190°C তাপে রাখা) সংরক্ষণ করা যায়।
10. লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

## ◻ কৃত্রিম বীজ (Artificial seed) ঃ

আমেরিকার **টি. মুরাসেজ** (T. Murashige) 1977 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়াম সিম্পোজিয়ামে প্রথম কৃত্রিম বীজ সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করেন। অঙ্গজ কলাকে কৃত্রিম উপায়ে পুষ্টির মাধ্যমে পালন করে যে **এমব্রয়েড** (নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টিকারী কোশগুচ্ছ) গঠিত হয়

তাকে নিয়ে জিলাটিন পদার্থের আবরণে আবৃত করে কৃত্রিম বীজ তৈরি করা যায়। সাধারণ বীজের মতো একে মাটিতে পুঁতে জল দিলে জিলাটিন আবরণ গলে যায় এবং এমব্রায়ডটি থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম বীজ তৈরির পর্যায়গুলি নীচে দেওয়া হল।
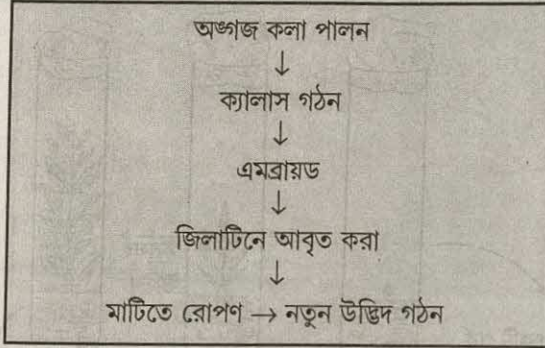
এমব্রায়ডের বাইরে যে জিলাটিনের আবরণ ব্যবহার করা হয় তাতে **সোডিয়াম অ্যালজিনেট** (Sodium alginate) অথবা **সোডিয়াম অ্যালজিনেট ও জিলাটিনের মিশ্রণ** অথবা **ক্যারাজেনিন** (Carragenin) ও গাম ব্যবহার করা হয়। এই আবরণের মধ্যে **মাইকোরাইজা** (Mycorrhiza) ছত্রাক, পতঙ্গনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক রাসায়নিকও দেওয়া থাকে।

কৃত্রিম বীজ থেকে বহু নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এদের মধ্যে নানা প্রকার অর্কিড, ভুট্টা, ধান, তুলো, সরষে, কলা, আনারস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● **কৃত্রিম বীজের বৈশিষ্ট্য (Importance of Artificial seed) ঃ** (i) যে-কোনো ঋতুতে বপন করা যায়, (ii) বীজের মতো সুপ্তদশা থাকে না। (iii) কৃত্রিম বীজ এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। (iv) অল্প সময়ে অণুপরিমান কলার মাধ্যমে অনেকগুলি নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। (v) সব কৃত্রিম বীজই জিনগতভাবে একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হয়।

● **মাইক্রোপ্রোপাগেশনের তৈরি কয়েকটি সাধারণ বাহারী ও বনসৃজনে ব্যবহৃত উদ্ভিদ (Some common Horticultural and forest plants produced by micropropogation) ঃ**

নিম্নলিখিত বৃক্ষ প্রজাতিগুলি মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতিতে বিশেষ সাফল্য পাওয়া গেছে।

| | |
|---|---|
| 1. *Acacia nilotica*—ববলা | 8. *Ficus religiosa*—অশ্বত্থ |
| 2. *Albizia lebbeck*—সিরিষ | 9. *Morus alba*—তুঁত |
| 3. *Albizia procera*—সাদা সিরিষ | 10. *Shorea robusta*—শাল |
| 4. *Azodirachta indica*—নিম | 11. *Tectona grandis*—সেগুন |
| 5. *Bauhinia purpurea*—কাঞ্চন | 12. *Cedrus deodara*—সিড্রাস |
| 6. *Butea monosperma*—পলাশ | 13. *Cryptomeria japonica*—ক্রিপটোমেরিয়া |
| 7. *Dendrocalmus strictus*—বাঁশ | 14. *Picea smithiana*—পিসিয়া |

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

### ●● মূল ●●

**1. প্রকৃত মূল কাকে বলে?**

● ভ্রূণমূল বেড়ে শাখাপ্রশাখা নিয়ে যে মূল গঠিত হয় তাকে প্রকৃত মূল বলে।

**2. অস্থানিক মূল কী?**

● ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদের যে-কোনো স্থান থেকে মূল গঠিত হলে তাকে অস্থানিক মূল বলে।

**3. মূলের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য কী কী?**

● (i) আলোর বিপরীতে বাড়ে।
(ii) ক্লোরোফিল থাকে না।
(iii) পর্ব, পর্বমধ্য, পত্র ও মুকুল থাকে না।

**4. সেমিনাল মূল কী?**

● ভ্রূণমুকুলের গোড়ায় কতকগুলি অস্থায়ী সরু মূল উৎপন্ন হয়। এরা মূলের মতো কাজ করে। মূলগুলি কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায় এবং কাণ্ডের গোড়ায় গুচ্ছ মূল গঠিত হয়। এই অস্থায়ী সরু মূলকে **সেমিনাল মূল** বলে।

**5. মূলের কোন্ অংশ মাটি থেকে জল শোষণ করে?**

● মূলরোম।

**6. কোন্ উদ্ভিদে মূলত্রের পরিবর্তে মূল জেব বা মূল পকেট দেখা যায়?**

● জলজ সপুষ্পক উদ্ভিদে। উদাহরণ— কুচুরিপানা (*Eichhorinia crassipes*)।

**7. ক্যারোটিন রঞ্জক পদার্থ কোন্ মূলে পাওয়া যায়?**

● গাজর (*Daucus carota*)।

**8. কোন্ উদ্ভিদে মূল থাকে না?**

● অ্যালড্রোভেণ্ডা (*Aldrovanda vasiculosa*)।

**9. কোন্ উদ্ভিদ শুধু মূল দিয়ে গঠিত?**

● র‍্যাফ্লেসিয়া (*Rafflesia arnoldi*)।

**10. কোন্ মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে?**

● গুলঞ্চ (*Tirospora cordifolia*)।

**11. বহুযোজী মূলত্র কাকে বলে?**

● মূলের শীর্ষে সাধারণত এক কোশস্তর বিশিষ্ট আবরক অর্থাৎ মূলত্র থাকে। কিন্তু কিছু উদ্ভিদের মূলত্র বহু কোশস্তর যুক্ত আবরক গঠন করে। এই ধরনের মূলত্রকে **বহুযোজী মূলত্র** বলে। উদাহরণ—কেয়া (*Pandanus faciculata*)।

**12. মৃতজীবী মূল কাকে বলে?**

● অনেকগুলি উদ্ভিদের মূলে মিথোজীবী ছত্রাক বাস করে এবং অণুসূত্র নিয়ে একটি আবরণী গঠন করে। ছত্রাক মাটি থেকে জৈব পদার্থ শোষণ করে নিজের ও আশ্রয়দাতার পুষ্টি যোগায়। এর ফলে আশ্রয়দাতা ও ছত্রাক উভয়ে পরস্পর উপকৃত হয়। সেই মূলকে মৃতজীবী মূল বলে। উদাহরণ—পাইন (*Pinus longifolia*), মনোট্রোপা (*Monotropa uniflora*)।

**13. শ্বাসমূল কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায়?**

● লবণাম্বু উদ্ভিদে। উদাহরণ—গরান (*Ceriops roxburgiana*), সুন্দরী (*Heritiera minor*)।

**14. জলজ উদ্ভিদ কোন্ মূলের সাহায্যে ভাসমান থাকে?**

● ভাসমান মূল। উদাহরণ—কেশধাম (*Jussaea repens*)।

**15. কন্দাল মূল কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায়?**

● রাঙা আলু (*Ipomoea batatus*)।

**16. পত্রাশ্রয়ী মূল কী?**

● পাতার কিনারা থেকে যে অস্থানিক মূল নির্গত হয় তাকে পত্রাশ্রয়ী মূল বলে। উদাহরণ—পাথরকুচি।

**17. যেসব উদ্ভিদে নিম্নলিখিতগুলি পাওয়া যায় তাদের নাম লেখো ঃ**

● শ্বাসমূল, পরাশ্রয়ী মূল ও গুচ্ছমূল।
শ্বাসমূল—সুন্দরী (*Heritiera minor*), পরাশ্রয়ী—রাস্না (*Vanda roxburghii*), গুচ্ছমূল—ধান (*Oryza sativa*)।

**18. একটি পরজীবী মূলযুক্ত উদ্ভিদের উদাহরণ দাও।**

- র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডি (*Rafflesia arnoldi*)।

**19. একটি উদ্ভিদের নাম লেখো, যা স্বাভাবিক জীবন শুরু করে পরাশ্রয়ী হয়ে যায়।**

- স্কিনড্যাপসাস অফিসিনাসিস (*Scindapsus officinasis*)।

**20. মূলের সাহায্যে কোন্ উদ্ভিদ বংশ বিস্তার করে?**

- রাঙা আলু (*Ipomoea batatus*)।

**21. মূলত্রের কাজ কী কী?**

- মূলের শীর্ষ অংশকে রক্ষা করা এবং মূলকে মাটিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করা।

**22. একটি উদ্ভিদের নাম করো যাতে ঠেসমূল ও শ্বাসমূল দুটোই থাকে।**

- বোয়া (*Rhizophora mucronata*)।

**23. বীট গাছের মূলকে কী বলা হয়? এর রঞ্জক পদার্থের নাম কী?**

- মূলের নাম ন্যাপিফর্ম (Napiform)। রঞ্জক পদার্থের নাম—বিটাসায়ানিন।

**24. কন্টক মূল কাকে বলে?**

- পাম জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের গোড়ার অস্থানিক মূল কাঁটার মতো হয়। একে কন্টক মূল বলে। উদাহরণ—ইরিআরটিয়া (*Iriartea acanthoriza*)।

**25. কাণ্ডজ মূল কী?**

- যে অস্থানিক মূল কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় তাকে **কাণ্ডজ মূল** বলে। উদাহরণ—বট।

**26. চোষক মূল কাকে বলে?**

- যে অস্থানিক মূল পরজীবী উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় প্রবেশ করিয়ে খাদ্য শোষণ করে তাদের চোষক মূল বলে। উদাহরণ— স্বর্ণলতা (*Cuscuta reflexa*)।

**27. মূল ও কাণ্ডের প্রধান দুটি পার্থক্য লেখো।**

- মূল ভ্রূণ মূল থেকে উৎপন্ন হয়। এতে পর্ব, পর্বমধ্য, পত্র ও মুকুল থাকে না। কাণ্ড ভ্রূণ মুকুল থেকে গঠিত হয়। এতে পর্ব, পর্বমধ্য, পত্র ও মুকুল থাকে।

## ●● কাণ্ড ●●

**1. কাণ্ডের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?**

- (i) ভ্রূণমুকুল থেকে গঠিত হয়ে মাটির উপরের দিকে যায় অর্থাৎ আলোক অনুকূলবর্তী।
  (ii) কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে।
  (iii) কাণ্ডে মুকুল (অগ্রমুকুল ও কাক্ষিক মুকুল), পাতা, ফুল ও ফল জন্মায়।

**2. মুকুল কাকে বলে?**

- ক্ষুদ্রাকার, অবিকশিত ও ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপকে মুকুল বলে। মুকুলের মধ্যে কাণ্ডের মতো পর্ব, পর্বমধ্য ও পাতা সংকুচিত অবস্থায় থাকে।

**3. সর্ববৃহৎ মুকুল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

- যে মুকুল আকৃতিতে সবচেয়ে বড়ো হয় তাকে সর্ববৃহৎ মুকুল বলে।
  উদাহরণ—বাঁধাকপি (Brassica)

**4. নিম্নলিখিতগুলি কোন্ প্রকার মুকুলের পরিবর্তন এবং প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।** (i) শাখা কন্টক, (ii) আকর্ষ, (iii) মঞ্জরি আকর্ষ (iv) বুলবিল।

- (a) **শাখা কন্টক**—অঙ্গজ মুকুল। উদাহরণ—বেল (*Aegle mermelos*), দুরন্ত (*Duranta repens*)।

(b) **আকর্ষ**—অঙ্গজ মুকুল। উদাহরণ—ঝুমকোলতা (*Passiflora foelida*)।

(c) **মঞ্জরি আকর্ষ**—জনন মুকুল। উদাহরণ—অনন্ত লতা (*Antigonon leptopus*)।

(d) **বুলবিল**—জনন মুকুল। উদাহরণ—কন্দপুষ্প (*Dioscorea alata*)।

**5. ক্ষণজীবী উদ্ভিদ কাকে বলে?**

● যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র খুবই সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ জীবনচক্র মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয় তাদের **ক্ষণজীবী উদ্ভিদ** বলে। উদাহরণ—(*Balanites aegyptica*)।

**6. একবর্ষজীবী উদ্ভিদ কাকে বলে?**

● যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র একটিমাত্র ঋতুতে শেষ হয় তাদের একবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—সরষে (*Brassica nigra*)।

**7. দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ কাকে বলে?**

● যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র শেষ হতে দুটি ঋতুর প্রয়োজন তাদের দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলা হয়। উদাহরণ—মুলো—(*Raphanus sativus*)।

**8. বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ কী?**

● যেসব উদ্ভিদের জীবনচক্র শেষ হতে দুটির বেশি ঋতুর প্রয়োজন তাদের বহুবর্ষজীবী বলে। উদাহরণ—আদা (*Zingiber officinale*)।

**9. একটি পিরামিডাকার উদ্ভিদের উদাহরণ দাও।**

● পাইন (*Pinus longifolia*)।

**10. গম্বুজাকার একটি উদ্ভিদের নাম লেখো।**

● উদাহরণ—আম (*Mangifera indica*)।

**11. অশাখ কাণ্ড কাকে বলে?**

● যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড স্তম্ভাকার কাষ্ঠাল, লম্বা ও শাখাবিহীন এবং কাণ্ড শীর্ষে একগুচ্ছ পাতা মুকুটের মতো সাজানো থাকে তাদের অশাখ কাণ্ড বলে। উদাহরণ—নারকেল (*Cosos nucifera*)।

**12. তৃণকাণ্ড কাকে বলা হয়?**

● যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড গ্রন্থিল, শাখাবিহীন তাদের তৃণকাণ্ড বলে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদে দেখা যায়। উদাহরণ—ধান (*Oryza sativa*), বাঁশ (*Bambusa*) প্রভৃতি।

**13. ভৌম পুষ্পদণ্ড কী?**

● কতকগুলি একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড (মৃদ্‌গত কাণ্ড) মাটির নীচে থাকে। এই মৃদ্‌গত কাণ্ড থেকে অনুকূল ঋতুতে একটি অশাখ বিটপ অংশ পাতাগুলির মধ্যভাগ দিয়ে মাটির উপরে উঠে আসে এবং ফুল ধারণ করে। এই বিটপকে ভৌম পুষ্পদণ্ড বলে। উদাহরণ—রজনীগন্ধা (*Polyanthes tuberosa*), পেঁয়াজ (*Allium cepa*)।

**14. ব্রততী কাকে বলে?**

● যেসব উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড মাটির উপর অনুভূমিকভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে এবং পর্ব থেকে অস্থানিক মূল গঠিত হয়, তাদের ব্রততী বলে। উদাহরণ—দূর্বাঘাস (*Cynodon dectylon*)।

**15. রোহিণী জাতীয় উদ্ভিদ বলতে কী বোঝো?**

● যেসব দুর্বল কাণ্ডের উদ্ভিদ মাটি না ছুঁয়ে অবলম্বনকে জড়িয়ে বাড়ে এবং উপরের দিকে ওঠে তাদের রোহিণী বলে। উদাহরণ—সীম (*Dolichos lablab*)।

**16. বল্লি কী?**

● যেসব উদ্ভিদের দুর্বল সরু কাণ্ড থাকে এবং এই কাণ্ডের সাহায্যে কোনো অবলম্বনকে পেঁচিয়ে উপরে ওঠে এবং বাড়ে, তাদের বল্লি বলা হয়। উদাহরণ—অপরাজিতা (*Clitoria turnatea*)।

**17. গোল আলুর অঙ্গসংস্থানগত প্রকৃতি কী?**

- মৃদ্গত স্ফীতকন্দ।

**18. আলু, আদা, ওল, পেঁয়াজ মাটির নীচে থাকে, তবুও এদের মূল না বলে কাণ্ড বলে কেন?**

- এরা ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড কারণ—(i) এদের সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্যে থাকে। (ii) পর্বে কাক্ষিক মুকুল ও শল্কপত্র থাকে। (iii) কাণ্ড ও শাখার শীর্ষে অগ্রমুকুল থাকে। (iv) পর্ব থেকে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। (v) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য এরা বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয় মাত্র। (vi) এদের মূলত্র এবং মূলরোম থাকে না। এইসব কারণে এদের কাণ্ড বলা হয়।

**19. গোল আলু ও মিষ্টি আলুর পার্থক্য কী?**

- গোল আলু হল ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড। এর শল্কপত্র, পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। মিষ্টি আলু হল রূপান্তরিত মূল। এর শল্কপত্র, পর্ব ও পর্বমধ্য নেই।

**20. আলুর চোখ কী?**

- আলুর চোখ হল গর্তের মতো স্থানের শল্কপত্রযুক্ত কাক্ষিক মুকুল। প্রকৃতপক্ষে এটি রূপান্তরিত কাণ্ডের পর্ব।

**21. মুখী কাকে বলে?**

- গুঁড়িকন্দের শল্কপত্রের কক্ষ থেকে কাক্ষিক মুকুল উৎপন্ন হয়। এই মুকুল থেকে অপত্য গুঁড়িকন্দ গঠিত হয়। চলতি কথায় এদের মুখী বলে।

**22. ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের কাজ কী কী?**

- (i) ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয়। (ii) প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদকে জীবিত রাখা। (iii) অঙ্গজ জননের ফলে অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করা।

**23. একটি বেষ্টিত কন্দের উদাহরণ দাও।**

- পেঁয়াজ (*Allium cepa*)।

**24. একটি শল্কিত কন্দের উদাহরণ দাও।**

- লিলি (*Lilium candidum*)।

**25. মূলাকার কাণ্ড বা রুট স্টক কী?**

- অনেকগুলি উদ্ভিদের শাখাবিহীন গ্রন্থিকন্দ উল্লম্ব ভাবে বাড়ে এবং কিছুটা অংশ মাটির উপরে থাকে। একে মূলাকার কাণ্ড বলে। উদাহরণ—মানকচু (*Alocasia indica*)।

**26. টিউবার বা স্ফীতকন্দে কী মূল থাকে?**

- স্ফীত কন্দে মূল থাকে না।

**27. শাখাকণ্টক যে কাণ্ডের রূপান্তর কীভাবে বুঝবে?**

- শাখাকণ্টক কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল থেকে গঠিত হয়। অনেক সময় কণ্টক পাতা ধারণ করে।

**28. ফাইলোক্ল্যাড ও ক্ল্যাডোডের পার্থক্য দেখাও।**

- ফাইলোক্ল্যাড হল কাণ্ডের রূপান্তর। এতে একাধিক পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। এরা সবুজ এবং পাতার মতো চ্যাপটা হয়। উদাহরণ—ফণীমনসা (*Opuntia*)। ক্ল্যাডোড হল প্রধান কাণ্ডের শাখা এবং একটি পর্বমধ্য নিয়ে গঠিত। এরা সূচাকার ও সবুজ। উদাহরণ—শতমূলী (*Asparagus*)।

**29. নিম্নলিখিতগুলির একটি করে উদাহরণ দাও, এদের মধ্যে কার নালিকা বান্ডিল থাকে—ত্বককণ্টক, পত্রকণ্টক ও শাখাকণ্টক।**

- **ত্বককণ্টক**—গোলাপ (*Rosa Centifolia*)।
  **পত্রকণ্টক**—ফণীমনসা (*Opentia dellini*)।
  **শাখাকণ্টক**—দুরন্ত (*Duranta repens*)।
  শাখাকণ্টকে সবসময় নালিকা বান্ডিল থাকে।

**30. পুষ্পাক্ষ কী?**

● যে অক্ষের উপর ফুলের বিভিন্ন স্তবকগুলি সজ্জিত থাকে তাকে পুষ্পাক্ষ বলে। পুষ্পাক্ষ একটি রূপান্তরিত কাণ্ড। উদাহরণ—সূর্যমুখী (*Helianthees annuus*)।

**31. মূল, অঙ্কুশ ও আকর্ষ রোহিণীর একটি করে উদাহরণ দাও।**

● মূল রোহিণী—গজপিপুল (*Scindapsus officinalis*)।
অঙ্কুশ রোহিণী—কাঁঠালি চাঁপা (*Artabotrys uncinatus*)।
উলটচণ্ডাল—উলট চণ্ডাল (*Gloriosa superba*)।

**32. যে উদ্ভিদে নিম্নলিখিতগুলি দেখা যায় তাদের নাম লেখো : পর্ণকাণ্ড, একক পর্ণকাণ্ড, ধাবক, বক্রধাবক, খর্বধাবক ও ঊর্ধ্বধাবক।**

● পর্ণকাণ্ড—ফণীমনসা (*Opuntia dillenii*)।
একক পর্ণকাণ্ড—শতমূলী (*Asparagus racemosn*)।
ধাবক—আমরুল (*Oxalis corniculata*)।
বক্রধাবক—মেন্থা (*Fragaria vesca*)।
খর্বধাবক—কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*)।
ঊর্ধ্বধাবক—চন্দ্রমল্লিকা (*Chryanthemum cororarium*)।

**33. একটি মুকুলাবরণের উদাহরণ দাও।**

● বট (*Ficus benghalensis*)।

**34. অস্থানিক মুকুলের একটি করে উদাহরণ দাও।**

● কাণ্ডজ মুকুল—দুরন্ত (*Duranta repens*)।

**35. একটি ক্ষুদ্রতম দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নাম লেখো যার কোনো কাণ্ড নেই।**

● আর্সিথোবিয়াম মাইনুটিসিমাম (*Arceuthobium minutissium*)।

**36. মুকুলকে সংকুচিত বিটপ বলে কেন?**

● মুকুল বেড়ে বিটপ গঠন করে বলে একে সংকুচিত বিটপ বলে।

**37. একটি উদ্ভিদের নাম লেখো, যা স্বাভাবিক ভাবে জীবন শুরু করে, পরে পরাশ্রয়ী হয়ে যায়।**

● গজপিপুল (*Scindapsus officinalis*)।

**38. কোন্ উদ্ভিদের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়?**

● ফণীমনসা (*Opentia dillenii*)।

**39. কচুরিপানা কী কারণে তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করে?**

● কচুরিপানা খর্বধাবকের সাহায্যে অঙ্গজ জননে সক্ষম। তাই কচুরিপানা অনুকূল পরিবেশে তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করে।

**40. মেকিকন্দ কাকে বলে?**

● অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের নীচের দিকের এক বা একাধিক পর্বমধ্য জল সঞ্চয় করার ফলে স্ফীত কন্দের মতো আকারের দেখায়। এদের মেকিকন্দ বলে। উদাহরণ—রাস্না (*Vanda roxburghii*)।

**41. বুলবিল কাকে বলে?**

● অনেকগুলি উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল শাখায় পরিণত না হয়ে স্ফীত গোলাকার হয়। এদের বুলবিল বলে। এতে প্রচুর খাদ্য সাঞ্চিত থাকে। মাটির সংস্পর্শে এসে এরা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। উদাহরণ—কন্দ পুষ্প (*Globba bulbifera*)।

## ●● পাতা ●●

**1. পর্ণপত্র কাকে বলে ?**
- যে পাতা সবুজ এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে তাদের পর্ণপত্র বলে।

**2. উপাধান কী ?**
- পত্রমূল স্ফীত হলে তাকে উপাধান বলে। উদাহরণ—আম।

**3. কাণ্ডবেষ্টক কাকে বলে ?**
- অনেক উদ্ভিদে পত্রমূল প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাণ্ডকে বেষ্টন করে। এইপ্রকার পত্রমূলকে কাণ্ডবেষ্টক পত্রমূল বলে। উদাহরণ—ধান, কলা প্রভৃতি।

**4. উপপত্র কী ?**
- পত্রমূলের দু'পাশে ছোটো পাতার মতো অংশকে উপপত্র বলা হয়।

**5. বিভিন্ন অঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে আকর্ষে বূপান্তরিত হয় এমন তিনটি উদাহরণ দাও।**
- (i) শাখা আকর্ষ—হাড়জোড়া। (ii) পত্রকর্ষ—জংলি মটর। (iii) উপপত্রাকর্ষ—কুমারিকা।

**6. ঝুমকোলতা, কুমারিকা ও মটর গাছের আকর্ষের মধ্যে পার্থক্য কী ?**
- (i) ঝুমকোলতা—শাখাকর্ষ, (ii) কুমারিকা—উপপত্র, (iii) মটর গাছ—শীর্ষপত্রক।

**7. একটি সরলপত্রকে কী কী ভাগে যৌগিকপত্র থেকে আলাদা করা যায় ?**
- সরল পত্রে একটি ফল থাকে এবং যৌগিকপত্রে একাধিক পত্রক থাকে।

**8. পত্রবিহীন একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নাম লেখো।**
- ক্ষুদিপানা।

**9. একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় জালকাকার শিরাবিন্যাস এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাসের উদাহরণ দাও।**
- একবীজপত্রী জালকাকার—কচু।
  দ্বিবীজপত্রী সমান্তরাল—সুলতান চাঁপা।

**10. কোন্ উদ্ভিদের পর্ণপত্র বৃক্কাকার হয় ?**
- থানকুনি।

**11. মটর গাছে কী ধরনের উপপত্র দেখা যায় ?**
- ফলকাকার।

**12. কণ্টকাকার উপপত্র কোথায় দেখা যায় ?**
- কুল, বাবলা।

**13. কোন্ জলজ উদ্ভিদের যৌগিকপত্রের পত্রকগুলি থলিতে পরিণত হয় ?**
- জল ঝাঁঝি।

**14. উদাহরণসহ পত্রের আরোহণ ও আত্মরক্ষার জন্য বূপান্তরগুলি উল্লেখ করো।**
- (ক) **পত্রের আরোহণের জন্য বূপান্তর**—খেসারির ফলক, মটরের পক্ষল যৌগিকপত্রের শীর্ষ পত্রক, উলটচণ্ডালের পাতার শীর্ষ এবং ছাগলবটির বৃন্ত আকর্ষে বূপান্তরিত হয়।
  (খ) **পত্রের আত্মরক্ষার জন্য বূপান্তর** — শিয়ালকাঁটা ফলক কিনারা, খেজুর পাতার অগ্রভাগ ও ফণীমনসার সম্পূর্ণ ফলক কণ্টকে বূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।

- **উদ্ভিদের আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করো।**
  কতকগুলি উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে আত্মরক্ষা করে, যেমন—
  (i) **শাখাকণ্টক**— দুরন্ত, বেল, বাগানবিলাস প্রভৃতি উদ্ভিদে কাক্ষিক মুকুল কাঁটায় বূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষার কাজ করে।

(ii) **পত্রকন্টক** — ফণীমনসা, খেজুর, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি উদ্ভিদে পাতা, পাতার শীর্ষ, পাতার কিনারা যথাক্রমে কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

(iii) **গাত্রকন্টক** — বেগুন, গোলাপ, বেত, শিমুল প্রভৃতি উদ্ভিদ দেহের কাঁটা আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।

(iv) **দংশক রোম** —বিচুটি (*Urtica urens*), আলকুশী প্রভৃতি উদ্ভিদের রোমের গোড়ায় ফরমিক অ্যাসিডের থলি থাকে। কোনো প্রাণীর দেহ এই সব উদ্ভিদের সংস্পর্শে এলে রোমের আগা ভেঙে যায় এবং ফরমিক অ্যাসিড জীবদেহে ঢুকে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে বিনষ্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

(v) **গ্রন্থিরোম** — ভ্যারেন্ডা, হুড়হুড়ে প্রভৃতি উদ্ভিদের রোমে আঠাল পদার্থ থাকে। প্রাণীরা এই সব উদ্ভিদ সহজে খায় না।

(vi) **গন্ধ** — ঘেঁটু, তুলসী প্রভৃতি উদ্ভিদে গন্ধ থাকায় জীবজন্তু এই সব উদ্ভিদ খায় না। সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

(vii) **স্বাদ** — থানকুনি, নিম ও আদা জাতীয় উদ্ভিদ স্বাদ বিহীন বা তেতো হওয়ায় জীবজন্তুরা খায় না।

(viii) **বর্জ্য পদার্থ** — বিভিন্ন কচু-জাতীয় উদ্ভিদে র‍্যাফাইড-জাতীয় বর্জ্য পদার্থ জমা থাকায় জীবজন্তুরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না।

(ix) **অনুকৃতি** —অ্যারিসিমা উদ্ভিদের চমসা বা স্পেদ সাপের ফণার মতো দেখতে হয়। এর ফলে প্রাণীরা সাপ বলে ভুল করে এবং উদ্ভিদটি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

(x) **সহকৃতি** —আম, লিচু প্রভৃতি উদ্ভিদ পিঁপড়েকে তাদের দেহে আশ্রয় দেয়। এরা জীবজন্তুকে আক্রমণ করে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

## ●● ফুল ●●

**1. ফুল কাকে বলে ?**

● জননের জন্য পরিবর্তিত সীমিত বৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ফল ও বীজ সৃষ্টিকারী বিটপকে **পুষ্প** বা **ফুল** বলে।

**2. একটি আদর্শ ফুল বা সম্পূর্ণ পুষ্প কাকে বলে ?**

● যেসব ফুলের পুষ্পাক্ষের উপর বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক—এই চারটি স্তবক সাজানো থাকে তাকে **আদর্শ** বা **সম্পূর্ণ ফুল** বলে। উদাহরণ—জবা, সরষে প্রভৃতি।

**3. একলিঙ্গ ফুল কাকে বলে ?**

● যে ফুলে অপরিহার্য স্তবক অর্থাৎ পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবক যে-কোনো একটি থাকে তাকে **একলিঙ্গ ফুল** বলে। উদাহরণ—কুমড়ো, লাউ, পেঁপে প্রভৃতি।

**4. উভলিঙ্গ ফুল কাকে বলা হয় ?**

● যেসব ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই থাকে তাদের উভলিঙ্গ ফুল বলে। উদাহরণ—জবা, বক, অপরাজিতা, করবী প্রভৃতি।

**5. সমাঙ্গ ও অসমাঙ্গ পুষ্প কাকে বলে ?**

● ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি অর্থাৎ বৃত্যংশ, দলাংশ, পুংকেশর ও গর্ভকেশর পরস্পর আকৃতিগতভাবে সমান হলে এবং সমান দূরত্বে অবস্থান করলে সেই ফুলকে **সমাঙ্গ ফুল** বলে। উদাহরণ—জবা, করবী ইত্যাদি। আবার অনেক ফুলের প্রতিটি স্তবকের বা এক বা একাধিক স্তবকের অংশগুলি অসমান হয় এবং সমান দূরত্বে অবস্থান করে না তাদের **অসমাঙ্গ ফুল** বলে। উদাহরণ—বক, অপরাজিতা প্রভৃতি।

**6. বহুপ্রতিসম পুষ্প কী ?**

● যে ফুলকে যে-কোনো উলম্বতলে কাটলে দুটো সমান অংশে ভাগ করা যায় তাকে **বহুপ্রতিসম ফুল** বলে। উদাহরণ—জবা, সরষে, করবী প্রভৃতি।

**7. একপ্রতিসম পুষ্প কাকে বলে ?**

● যেসব ফুলকে একটিমাত্র বিশেষ উলম্বতলে কাটলে দুটো সমান অংশে ভাগ করা যায় তাদের একপ্রতিসম পুষ্প বলে। উদাহরণ—বক, অপরাজিতা ইত্যাদি।

**8. পুষ্পপুট কী ?**

● ফুলে আনুষঙ্গিক স্তবক অর্থাৎ বৃতি ও দলমণ্ডলের মধ্যে যে-কোনো একটি থাকলে তাকে পুষ্পপুট বলে। উদাহরণ—রজনীগন্ধা।

**9. সহবাসী উদ্ভিদ কাকে বলে ?**

● পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প একই উদ্ভিদে জন্মালে তাকে **সহবাসী উদ্ভিদ** বলে। উদাহরণ—লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি।

**10. ভিন্নবাসী উদ্ভিদ কী ?**

● পুংপুষ্প এবং স্ত্রীপুষ্প আলাদা আলাদা উদ্ভিদে জন্মালে তাকে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—পটল, তাল, পেঁপে ইত্যাদি।

**11. মিশ্রবাসী কাকে বলা হয় ?**

● একই উদ্ভিদে পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প ও উভলিঙ্গ ফুল জন্মালে তাকে মিশ্রবাসী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ—আম।

**12. গর্ভপাদ এবং গর্ভশীর্ষ পুষ্প বলতে কী বোঝো ?**

● যে পুষ্পে পুষ্পাক্ষের শীর্ষে ডিম্বাশয় থাকে এবং অন্যান্য স্তবক পর্যায়ক্রমে নীচে সাজানো থাকে তাকে **গর্ভপাদ পুষ্প** বলে। উদাহরণ—জবা, বক ইত্যাদি।

যে পুষ্পে পুষ্পাক্ষ ডিম্বাশয়কে আবৃত করে রাখে এবং অন্যান্য স্তবক পুষ্পাক্ষের শীর্ষে থাকে তাকে গর্ভশীর্ষ পুষ্প বলে। উদাহরণ—কুমড়ো, সূর্যমুখী প্রভৃতি।

**13. যুক্তপরাগধানী বলতে কী বোঝো ?**

● ফুলের পুংকেশরগুলির পরাগধানী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং পুংদণ্ডগুলি আলাদা বা মুক্ত থাকলে একে **যুক্ত পরাগধানী** বলে। উদাহরণ—সূর্যমুখী।

**14. যুক্তপুংক্ষ কী ?**

● যেসব ফুলের পুংস্তবকের পুংকেশরগুলির পুংদণ্ড ও পরাগধানী পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে **যুক্তপুংক্ষ** বলে। উদাহরণ—কুমড়ো।

**15. যোষিৎপুংক্ষ কাকে বলে ?**

● ফুলের পুংকেশরগুলি আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশরের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে **যোষিৎপুংক্ষ** বলে। উদাহরণ—আকন্দ, রাম্না প্রভৃতি।

**16. যুক্তগর্ভপত্রী ও মুক্তগর্ভপত্রী কী ?**

● পুষ্পাক্ষের উপর গর্ভপত্রগুলি পরস্পর যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভপত্রী বলে। উদাহরণ—জবা, করবী, বেগুন প্রভৃতি। পুষ্পাক্ষের উপর গর্ভপত্রগুলি প্রত্যেকে আলাদা ভাবে থাকলে তাকে মুক্তগর্ভপত্রী বলে। উদাহরণ—পদ্ম, চাঁপা প্রভৃতি।

**17. ফুলের বিভিন্ন অংশে রঞ্জক পদার্থের তিনটি রাসায়নিক শ্রেণির নাম করো।**

● (i) ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল, (ii) এ্যান্থোসায়ানিন এবং (iii) ক্লোরোফিল।

## ●● পুষ্পবিন্যাস ●●

**1. পুষ্পবিন্যাস কাকে বলে ?**

● মঞ্জরিদণ্ড বা পুষ্পাধারের উপর পুষ্পের সুনির্দিষ্ট বিন্যাস রীতিকে পুষ্পবিন্যাস বলে।

**2. পুষ্পাধার কী ?**

● অনেকগুলি প্রজাতিতে মঞ্জরিদণ্ড লম্বা না হয়ে চ্যাপটা থালার মতো অথবা উত্তল কাপের আকৃতির হয়, একে পুষ্পাধার বলে। উদাহরণ—সূর্যমুখী।

**3. মঞ্জরিপত্র কাকে বলা হয় ?**

● অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে মঞ্জরিদণ্ডে প্রতিটি ফুল ক্ষুদ্র পাতার মতো অংশের কক্ষে জন্মায়। এদের **মঞ্জরিপত্র** বলে। উদাহরণ—বাসক।

**4. মঞ্জরিপত্রিকা কী ?**

● অনেক সময় মঞ্জরিপত্র ও ফুলের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র সরু পাতার মতো বা শল্কের মতো অঙ্গ সৃষ্টি হয়; এদের মঞ্জরিপত্রিকা বলে। উদাহরণ—কুলেখাড়া।

**5. একটি ফুলের নাম করো যেখানে মঞ্জরিপত্র ও মঞ্জরিপত্রিকা উভয়ে থাকে।**

● বাসক, কুলেখাড়া প্রভৃতি।

**6. পুষ্পবিন্যাস কত রকমের হয় ?**

● পুষ্পবিন্যাসকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(i) অনিয়ত বা রেসিমোজ পুষ্পবিন্যাস, (ii) নিয়ত বা সাইমোজ পুষ্পবিন্যাস এবং (iii) বিশেষ পুষ্পবিন্যাস।

**7. মুণ্ডক পুষ্পবিন্যাস কোন্ উদ্ভিদে পাওয়া যায় ?**

● সূর্যমুখী।

**8. রেসিম পুষ্পবিন্যাসের একটি উদাহরণ দাও।**

● সরষে।

**9. স্পাইক পুষ্পবিন্যাসের একটি উদাহরণ দাও।**

● আপাং।

**10. বিশেষ পুষ্পবিন্যাসগুলির একটি করে উদাহরণ দাও।**

● বিশেষ পুষ্পবিন্যাসের উদাহরণ—

(i) উদুম্বর — বট, অশ্বত্থ, ডুমুর প্রভৃতি।

(ii) ভার্টিসিলেস্টার — রক্তদ্রোণ।

(iii) সায়াথিয়াম — লাল পাতা।

**11. কচু, বট, ধনে, সরষে ও ধানে কী জাতীয় পুষ্পবিন্যাস দেখা যায় ?**

● (i) কচু — চমসামঞ্জরি

(ii) বট — উদুম্বর

(iii) ধনে — যৌগিক আম্বেল

(iv) সরষে — রেসিম

(v) ধান — স্পাইকলেট

## •• পরাগযোগ ••

**1. পরাগরেণুর প্রাচীর কী দিয়ে গঠিত ?**

● সেলুলোজ ও পেকটিন থাকে। তা ছাড়া বাইরে মোমের আস্তরণ থাকে।

**2. জীবাশ্ম-তৈরির সময় পুংরেণু প্রাচীরের কোন্ রাসায়নিক উপাদানের জন্য ধ্বংস থেকে রেণুকে রক্ষা করে ?**

● স্পোরোপলিলিন নামে রাসায়নিক উপাদান।

**3. অটোগ্যামি বা স্বপরাগযোগ কাকে বলে ?**

● একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পরাগযোগ ঘটালে তাকে অটোগ্যামি বা স্বপরাগযোগ বলে। উদাহরণ—দোপাটি, সন্ধ্যামালতি প্রভৃতি।

**4. জিটেনোগ্যামি বা সহপরাগযোগ কী ?**

● একই গাছের দুটি পৃথক ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে সহপরাগযোগ বলে। উদাহরণ—কুমড়ো।

**5. ইতর পরাগযোগ কাকে বলে ?**

● একই প্রজাতির দুটি পৃথক গাছের ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে ইতর পরাগযোগ বলে। উদাহরণ—পেঁপে।

**6. বিষম পরিণতি কী ?**

● একটি ফুলে পরাগধানী ও গর্ভাশয় ভিন্ন সময়ে পরিণত হলে, তাকে বিষম পরিণতি বা ডাইকোগ্যামি বলে।

**7. বাতাসের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে কী বলে ?**

● বায়ুপরাগী।

**8. পতঙ্গপরাগী বা এন্টোমোফিলি কাকে বলে ?**

● পতঙ্গের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে পতঙ্গপরাগী বলে।

**9. পাখির সাহায্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে কী বলে ?**

● অরনিথোফিলি।

**10. পিঁপড়েপরাগী একটি ফুলের নাম লেখো।**

● ডুমুর।

**11. ধান ও মটর গাছের ফুলের পরাগযোগের বাহকদের নাম করো।**

● ধান — ইতর পরাগযোগ (বায়ুপরাগী)।
মটর — ইতর পরাগযোগ (পতঙ্গপরাগী)।

**12. ক্লিস্টোগ্যামি কাকে বলে ?**

● যে ফুল ফোটে না, পুংকেশর ও গর্ভকেশর আবৃত বা বন্ধ থাকে তাকে ক্লিস্টোগ্যামি বলে।

**13. জলপরাগী একটি ফুলের উদাহরণ দাও।**

● পাতাশ্যাওলা, হাইড্রিলা।

**14. স্বপরাগযোগের একটি সুবিধা ও একটি ত্রুটি লেখো।**

● **সুবিধা**—বাহকের প্রয়োজন হয় না।
**ত্রুটি**—নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয় না।

**15. ইতর পরাগযোগের একটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লেখো।**

● **সুবিধা**—নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে।
**অসুবিধা**—বাহকের প্রয়োজন হয় বলে সব সময় পরাগযোগ ঘটে না।

## ●● ফল ও বীজ ●●

### ফল ঃ

**1. নিম্নলিখিত ফলগুলি কী জাতীয় ফল উল্লেখ করো ঃ (i) মটর, (ii) তাল, (iii) আনারস, (iv) আতা, (v) ধান, (vi) গম, (vii) আম, (viii) কাঁঠাল (ix) টম্যাটো ও (x) নোনা।**

● **কী জাতীয় ফল—**

| ফল | জাতি | ফল | জাতি |
|---|---|---|---|
| মটর | সরল শুষ্ক বিদারী | গম | সরল শুষ্ক অবিদারী |
| তাল | সরল রসাল | আম | সরল রসাল ফল |
| আনারস | যৌগিক ফল | কাঁঠাল | যৌগিক ফল |
| আতা | গুচ্ছিত ফল | টম্যাটো | সরল রসাল ফল |
| ধান | সরল শুষ্ক অবিদারী | নোনা | গুচ্ছিত ফল |

**2. বিদারী ফল কাকে বলে?**

● যেসব ফলের ফলত্বক পরিণত হলে আপনা থেকেই ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে তাদের **বিদারী ফল** বলে। **উদাহরণ**—মটর (*Pisum sativum*), আকন্দ (*Calotropis procera*)।

**3. (a) গর্ভকেশর ছাড়া ফুলের অন্য কোনো অংশ ফলের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম কী? (b) এই ধরনের একটি ফলের উদাহরণ ও অতিরিক্ত অঙ্গটির নাম বলো।**

● (a) গর্ভকেশর ছাড়া ফুলের অন্য অংশ ফলের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই ফলকে **অপ্রকৃত ফল** (False fruit) বলে।

(b) একটি অপকৃত ফলের উদাহরণ হল চালতা *(Dillenia india)*। এই ফলের অতিরিক্ত অঙ্গটি হল বৃতি (Calyx)।

**4. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত এবং কোন্‌টি অপ্রকৃত উল্লেখ করো ঃ নোনা, আপেল, আনারস, পদ্ম, ধান, গম, মটর, কাঁঠাল, গোলাপ, আতা, সরষে, আম, শশা, লেবু, ডুমুর।**

● **প্রকৃত এবং অপকৃত ফলের নামকরণ—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| নোনা | অপ্রকৃত ফল | গোলাপ | অপ্রকৃত ফল |
| আপেল | অপ্রকৃত ফল | আতা | অপ্রকৃত ফল |
| আনারস | অপ্রকৃত ফল | সরষে | প্রকৃত ফল |
| পদ্ম | অপ্রকৃত ফল | আম | প্রকৃত ফল |
| ধান | প্রকৃত ফল | শশা | প্রকৃত ফল |
| গম | প্রকৃত ফল | লেবু | প্রকৃত ফল |
| মটর | প্রকৃত ফল | ডুমুর | অপ্রকৃত ফল |
| কাঁঠাল | অপ্রকৃত ফল | | |

**5. দুটি কৃত্রিম ফলের উদাহরণ দাও।**

● (i) আপেল (*Malus sylvestris*) ও (ii) নাসপাতি (*Pyrus communis*)।

**6. পার্থেনোকার্পি বলতে কী বোঝায়?**

● নিষেক প্রক্রিয়া ছাড়া বীজবিহীন ফল গঠিত হলে তাকে পার্থেনোকার্পি বলে। **উদাহরণ**— কলা (*Musa paradisiaca*), আঙুর (*Vitis vinifera*)।

**7. চিত্রের সাহায্যে একটি একক ফলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করো।**

● আম একটি আদর্শ একক ফল। এই ফলের চারটি অংশ দেখা যায়, যেমন—(i) **বহিস্ত্বক ঃ** বাইরের আবরণী বা খোসাকে **বহিস্ত্বক** বলে। (ii) **মধ্যস্ত্বক ঃ** খোসা বা আবরণীর পরবর্তী তন্তুময় রসাল অংশকে **মধ্যস্ত্বক** বলা হয়। (iii) **অন্তস্ত্বক ঃ** মধ্যস্ত্বকের নীচে কাষ্ঠাল অংশকে **অন্তস্ত্বক** বলে। এই আবরণ বীজকে ঢেকে রাখে। (iv) **বীজ ঃ** একটি ফলে একটি বীজ থাকে। বীজত্বক ফলত্বকের সঙ্গে শক্ত ভাবে লেগে থাকে। বীজের দুটি বীজপত্র দেখা যায়।

**8. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ কাঁঠালের ফল।**

● কাঁঠাল একধরনের যৌগিক ফল। এই ফলকে **সরোসিস** (Sorosis) বলা হয়। স্পাইক পুষ্পবিন্যাসের সব ফুলগুলি মিলিত হয়ে একটি ফল গঠন করে। যে ফুলগুলি থেকে এই ধরনের ফল হয় তাদের মঞ্জরিপত্র, পুষ্পপুট ও গর্ভপত্র রসাল হয় এবং পুষ্পবিন্যাসের অক্ষটিও ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে। এই ফলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গর্ভপত্রগুলির শীর্ষভাগ পরস্পর যুক্ত হয়ে কাঁটার মতো ফলত্বক গঠন করে।

**9. নিম্নলিখিত ফলগুলির খাবারযোগ্য অংশগুলির নাম উল্লেখ করো ঃ (i) কমলালেবু, (ii) আম, (iii) বেদানা, (iv) কাজুবাদাম, (v) লিচু এবং (vi) চালতা।**

● (i) **কমলালেবু**—এন্ডোকার্পের রসালো রোম, (ii) **আম**—মধ্যস্ত্বক বা মেসোকার্প, (iii) **বেদানা**—রসালো বীজত্বক বা টেস্টা, (iv) **কাজুবাদাম**—বীজপত্র, (v) **লিচু**—রসালো এরিল এবং (vi) **চালতা**—স্থায়ী রসালো বৃতি।

**10. কোথায় বীজত্বক থেকে ফলত্বক সম্পূর্ণ আলাদা?**

● **বীজত্বক ও ফলত্বক আলাদা এমন ফল**—নিরস বা শুকনো অবিদারী ফলের মধ্যে সিপ্‌সেলাতে বীজত্বক ও ফলত্বক সম্পূর্ণ আলাদা। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*)।

**11. পার্থক্য দেখাও ঃ**

**(ক) মটর ও ধান গাছের ফল (খ) গুচ্ছিত ও যৌগিক ফল**

● **(ক) মটর ও ধানের পার্থক্য ঃ**

| মটর | ধান |
|---|---|
| 1. শুষ্ক বিদারী সরল ফল। | 1. শুষ্ক অবিদারী সরল ফল। |
| 2. মটরের ফলকে লেগিউম বলে। | 2. ধানের ফলকে ক্যারিয়পসিস বলে। |

**(খ) গুচ্ছিত ফল এবং যৌগিক ফলের পার্থক্য ঃ**

| গুচ্ছিত ফল | যৌগিক ফল |
|---|---|
| 1. একটি ফুলের পৃথক পৃথক মুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফলকে গুচ্ছিত ফল বলে। | 1. এই ফলে পুষ্পমঞ্জরি ফলে রূপান্তরিত হয়। |
| 2. প্রতিটি গর্ভপত্র থেকে একটি করে ফল গঠিত হয় এবং গুচ্ছাকারে থাকে। | 2. মঞ্জরিদণ্ড ও মঞ্জরিপত্র পুষ্পপুট স্ত্রীস্তবক প্রভৃতি প্রায় সব অংশ রূপান্তরিত হয়ে একটি ফল গঠন করে। |
| 3. এই জাতীয় ফল শুষ্ক বা রসাল প্রকৃতির হয়। | 3. এই জাতীয় ফল সবসময় রসাল প্রকৃতির হয়। |
| 4. উদাহরণ—আতা, নোনা, পদ্ম প্রভৃতি। | 4. উদাহরণ—কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি। |

## বীজ ঃ

**1. বীজ কাকে বলে ?**

● নিষিক্ত পরিবর্তিত ডিম্বককে বীজ বলে।

**2. সস্যল বীজ কী ?**

● যেসব বীজে বীজপত্র ও সস্য পৃথক থাকে তাদের সস্যল বীজ বলে। এসব বীজে বীজপত্রে সস্য থাকে না বলে বীজপত্র পাতলা হয়। উদাহরণ—একবীজপত্রী—ধান, গম ইত্যাদি। দ্বিবীজপত্রী—রেড়ি প্রভৃতি।

**3. অসস্য বীজ কাকে বলে ?**

● যেসব বীজে সস্য বীজ পত্রের মধ্যে থাকে, তাদের অসস্যল বীজ বলে। বীজপত্রের ভেতর সস্য থাকে বলে এদের বীজপত্র পুরু হয়। উদাহরণ—একবীজপত্রী—কচু। দ্বিবীজপত্রী— মটর, ছোলা ইত্যাদি।

**4. একটি নগ্নবীজের উদাহরণ দাও।**

● পাইন।

**5. বীজপত্রাবকাণ্ড কাকে বলে ?**

● বীজের ভ্রূণাক্ষের পর্বসন্ধি ও ভ্রূণমূলের মধ্যবর্তী অংশকে বীজপত্রাবকাণ্ড বলা হয়।

**6. বীজ তৈরি হওয়া ও অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যবর্তী সময়কে কী বলা হয় ?**

● সুপ্তদশা।

**7. বীজ ও ফলের মধ্যে কী পার্থক্য দেখা যায় ?**

● নিষেকের পর ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।

**8. বীজত্বক ছাড়া বীজের বাকি অংশকে কী বলা হয় ?**

● অন্তর্বীজ বা কারনেল।

**9. বীজত্বক কোথা থেকে তৈরি হয় ?**

● ডিম্বক-ত্বক থেকে বীজত্বক গঠিত হয়।

**10. বীজের সুপ্তদশা কী ?**

- বীজ গঠিত হবার পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সব রকম বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ শর্তের সংস্পর্শে এলেও অঙ্কুরিত হয় না। এই মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট সময়কে বীজের সুপ্তদশা বলে। বীজ অনুযায়ী সুপ্তদশার তারতম্য দেখা যায়।

**11. কোন্ বীজে ফলত্বক ও বীজত্বক সম্পূর্ণ আলাদা ?**

- নিরস বা শুকনো অবিদারী ফলের মধ্যে সিপ্‌মেলাতে বীজত্বক ও ফলত্বক সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরণ—সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*)।

**12. কোন্ বীজে ফলত্বক ও বীজত্বক সম্পূর্ণ যুক্ত ?**

- নিরস বা শুকনো অবিদারী ফলের মধ্যে ক্যারিওপসিসে বীজত্ব ও ফলত্বক যুক্ত থাকে। উদাহরণ—ধান (*Oryza sativa*)।

**13. দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ বীজের আকৃতিগত পার্থক্য কী কী ?**

- দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ বীজের পার্থক্য হল—

| দ্বিবীজপত্রী | একবীজপত্রী |
|---|---|
| 1. দুটি বীজপত্র থাকে।<br>2. ফলত্বক ও বীজত্বক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্ত থাকে না।<br>3. বীজপত্র স্থূল হয়। | 1. একটি বীজপত্র থাকে।<br>2. ফলত্বক ও বীজত্বক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্ত থাকে।<br>3. বীজপত্র অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। |

**14. বংশবৃদ্ধিতে স্পোর অপেক্ষা বীজের কী কী সুবিধা থাকে ?**

- নিম্নলিখিতগুলি বংশবৃদ্ধিতে স্পোর অপেক্ষা বীজের সুবিধা—
  (i) বীজে সস্য থাকে বলে অনেকদিন বেঁচে থাকে। যা স্পোর পারে না।
  (ii) বীজত্বক প্রতিকূল পরিবেশে বীজকে বাঁচিয়ে রাখে। স্পোর সাধারণত প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচে না।
  (iii) বীজের ভ্রূণাক্ষ অঙ্কুরোদ্‌গমে সহায়তা করে। স্পোরে নেই।

**15. ফল ও বীজের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায় ?**

- ফল ও বীজের মধ্যে পার্থক্য হল—

| বীজ | ফল |
|---|---|
| 1. নিষিক্ত ডিম্বাশয় যা বীজ ধারণ করে তাকে ফল বলা হয়।<br>2. আদর্শ ফলত্বককে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়, যেমন—বহিস্ত্বক, মধ্যস্ত্বক এবং অন্তস্ত্বক।<br>3. ফলগঠন গুপ্তবীজী উদ্ভিদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। | 1. নিষিক্ত ডিম্বককে বীজ বলে।<br>2. বীজ সাধারণত ভ্রূণ, বীজত্বক এবং কোনো কোনো সময় পৃথক সস্য নিয়ে গঠিত।<br>3. বীজগঠন গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। |

## বীজ ও ফলের বিস্তার ঃ

**1. কোমা কী ?**

- বীজের একপ্রান্তে অথবা উভয় প্রান্তে গুচ্ছাকারে রোম থাকে। এদের কোমা বলে। আকন্দ বীজের একপ্রান্তে এবং ছাতিম বীজের উভয় প্রান্তে কোমা উৎপন্ন হয়।

**2. প্যাপাস কাকে বলে ?**

- অনেকগুলি প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃত্যংশগুলি রূপান্তরিত হয়ে সরু রোমের মতো আকৃতির হয়। এদের প্যাপাস বলে। সূর্যমুখী, কেশুত প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে প্যাপাস দেখা যায়। প্যাপাস ফলের সঙ্গে লেগে থাকে এবং বাতাসের সাহায্যে বিস্তারিত হয়।

**3. জলের সাহায্যে বিস্তারিত হয় এমন দুটি উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।**

1. নারকেল (*Cocos nucifera*); 2. পদ্ম (*Nellumbo nucifera*)

**4. ভূমধ্যসাগরীয় কুমড়ো কী ?**

● ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কুমড়োর মতো একটি উদ্ভিদ দেখা যায় এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো *Ecbollium elaterium*। এতে যান্ত্রিক উপায়ে বীজের বিস্তার ঘটে।

## ●● উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা ●●

**1. উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার উদ্দেশ্য কী ?**

● দুটি নির্বাচিত উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটিয়ে পছন্দমতো উন্নত গুণসম্পন্ন ভ্যারাইটি সৃষ্টি করাই উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য।

**2. অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ বলতে কী বোঝো ?**

● **অন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ**—দুটি একই প্রজাতিভুক্ত দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো।

**আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ**—একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো।

**3. ব্রিডার্স কিট কী ?**

● উদ্ভিদ প্রজননবিদেরা যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন তা একসঙ্গে একটি ব্যাগে রাখা হয়, তাকে ব্রিডার্স কিট বলে।

**4. ইমাসকুলেশ কাকে বলে ?**

● যে বিশেষ পদ্ধতিতে উভলিঙ্গ ফুলের পরাগযোগের আগে পরিণত পুংকেশরগুলিকে অপসারণ করা হয় তাকে ইমাসকুলেশন বলা হয়।

**5. বাল্ক মেথড প্রথমে কে চালু করেন ?**

● নিলসন-এলি (Nilsson-Ehle) 1908 খ্রিস্টাব্দে এই পদ্ধতি চালু করেন।

## ●● অণুবিস্তার ও মাইক্রোপ্রোপাগেশন কী ? ●●

**1. অনুবিস্তার কাকে বলে ?**

● যে প্রক্রিয়ায় কৃত্রিমভাবে কলা বা কোশ পোষণ করে নতুন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায় তাকে অণুবিস্তার বলে।

**2. ক্যালাস কী ?**

● উদ্ভিদের যে-কোনো অংশ থেকে কোশ সংগ্রহ করে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করলে কোশ বিভাজিত হয়ে কোশসমষ্টি গঠন করে। একে ক্যালাস বলে।

**3. রাইজোজেনেসিস কী ?**

● ক্যালাস থেকে মূল উৎপন্ন হওয়াকে রাইজোজেনেসিস বলা হয়।

**4. কলোজেনেসিস কাকে বলে ?**

● ক্যালাস থেকে বিটপ উৎপন্ন হওয়াকে কলোজেনেসিস বলে।

**5. কৃত্রিম বীজের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।**

● (i) যে-কোনো ঋতুতে বপন করা যায়।

(ii) বীজের মতো সুপ্ত দশা থাকে না, তাই অল্প সময়ে অসংখ্য অপত্য সৃষ্টি করা যায়।

**6. কৃত্রিম বীজ প্রথম কে আবিষ্কার করেন ?**

● বিজ্ঞানী টি. মুরাসেজ (1977) প্রথম কৃত্রিম বীজ সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করেন।

## ০ অনুশীলনী ০

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer of the following questions in one word) :

1. ভ্রূণাক্ষের নিম্নগামী অংশকে কী বলে ?
2. মূলের শীর্ষের আবরণীকে কী বলা হয় ?
3. পত্রজ মূল কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায় ?
4. বহুযোজী মূল কোন্ উদ্ভিদে পাওয়া যায় ?
5. জলজ উদ্ভিদে মূলের শীর্ষে কী থাকে ?
6. ভেলামেন কোন্ উদ্ভিদ মূলে পাওয়া যায় ?
7. কাণ্ডের প্রথম পর্ব থেকে নির্গত গুচ্ছাকারে নির্গত মূলকে কী বলে ?
8. একটি উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো যেখানে প্রধান মূল খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য রূপান্তরিত হয়।
9. মাটির উপরে অবস্থিত উদ্ভিদের বায়ব অংশকে কী বলে ?
10. পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে যে মুকুল তৈরি হয় তাকে কী বলা হয় ?
11. কাণ্ডের কোন্ অংশ থেকে পত্র নির্গত হয় ?
12. পর্ণকাণ্ড কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায় ?
13. একবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রমূল কাণ্ডকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে থাকলে তাকে কী বলা হবে ?
14. একটি উদ্ভিদে দু'রকমের পাতা থাকলে তাকে কী বলা হয় ?
15. পত্রবিহীন একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নাম লেখো।
16. পত্রমূলের দু'পাশে ছোটো পাতার মতো উপবৃদ্ধিকে কী বলে ?
17. সম্পূর্ণ ফুলে কয়টি স্তবক থাকে ?
18. অসম্পূর্ণ ফুলে একটি অপরিহার্য স্তবক না থাকলে তাকে কী ফুল বলা হয় ?
19. যে ফুলে দুটি অপরিহার্য স্তবক থাকে তাকে কী বলে ?
20. যে ফুলে স্তবকগুলির অংশ সমান হয় তাকে কী বলা হয় ?
21. স্ত্রী পুষ্প ও পুংপুষ্প আলাদা উদ্ভিদে জন্মালে তাকে কী বলে ?
22. একটি গর্ভশীর্ষ পুষ্পের নাম লেখো।
23. পুষ্পাধার লম্বা ও পর্ব ও পর্বমধ্য সুস্পষ্ট দেখা যায় কোন্ উদ্ভিদে ?
24. প্রান্তপুষ্পিকা কোন্ ফুলে থাকে ?
25. সায়াথিয়াম পুষ্পবিন্যাস কোন্ উদ্ভিদে দেখা যায় ?
26. ডুমুরের পুষ্পবিন্যাসের নাম লেখো।
27. একটি জলপরাগী ফুলের নাম লেখো।
28. দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে কী বলে ?
29. প্রাণীপরাগী ফুলকে কী বলে ?
30. কোন্ উদ্ভিদে পরাগযোগ বাদুড়ের মাধ্যমে ঘটে ?
31. ধান গাছে কী ধরনের পরাগযোগ দেখা যায় ?
32. পিঁপড়েপরাগী একটি ফুলের নাম লেখো।
33. একটি অপ্রকৃত ফলের নাম লেখো।
34. একটি ফলের নাম করো যেখানে ফলত্বক ও বীজত্বক যুক্ত থাকে।
35. কারনেল কী ?
36. দ্বিনিষেক কোন্ উদ্ভিদ গোষ্ঠীতে দেখা যায় ?
37. বহুবীজপত্রী বীজের একটি উদাহরণ দাও।
38. আপেলের কোন্ অংশ খাওয়া হয় ?
39. ধানের কোন্ অংশ আমরা খাই ?
40. প্যাপাস কোন্ ফুলে থাকে ?
41. কোমার কাজ কী ?
42. বিস্ফোরক একটি ফলের নাম কী ?
43. ধানের ফলকে কী বলে ?
44. কলা ফুলের পুষ্পসংকেত লেখো।
45. একই গণভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানোকে কী বলে ?
46. প্রজনন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি একটি ব্যাগে রাখা হয় তাকে কী বলে ?
47. একবীজপত্রী উদ্ভিদে সস্যের সঙ্গে সংযুক্ত পাতলা পর্দার ন্যায় একটি বীজপত্র থাকে তাকে কী বলা হয় ?
48. কোন্ উদ্ভিদের শীর্ষের পত্রক আকর্ষে রূপান্তরিত হয় ?
49. কোন্ প্রক্রিয়ায় দ্রুত রোগমুক্ত উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়?
50. মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতিতে সাধারণত উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অঙ্গ ব্যবহার করা হয় ?

#### B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) :

1. বীজের যে অংশ বর্ধিত হয়ে মূল গঠিত হয় তাকে বলে স্থানিক মূল □ / প্রাথমিক মূল □ / ভ্রূণমূল □ / প্রকৃত মূল □।
2. যে উদ্ভিদে মূল হয় না তা হল মটর □ / পান □ / ঝাঁঝি □ / পানিফল □।
3. ভ্রূণমূল বৃদ্ধি পেয়ে যে মূল গঠন করে তাকে বলে অস্থানিক মূল □ / প্রশাখা মূল □ / প্রাথমিক মূল □ / গুচ্ছমূল □।
4. গুচ্ছমূল একটি প্রকৃত মূল □ / স্থানিক মূল □ / অস্থানিক মূল □ / প্রধান মূল □।
5. লমণাম্বু উদ্ভিদে মাটি ভেদ করে যে সকল শাখামূল উপরে উঠে আসে তাদের বলে—স্তম্ভমূল □ / আরোহী মূল □ / শ্বাসমূল □ / ঠেসমূল □।
6. রাস্নায় যে মূলগুলি উদ্ভিদকে আশ্রয়দাতার সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে তার নাম—পরাশ্রয়ী মূল □ / সংকোচী মূল □ / দৃঢ়সংলগ্নী মূল □ / আরোহী মূল □।
7. নিম্নলিখিত মূলের কোন্‌টি ভাণ্ডার মূল—ঠেসমূল □ / সংকোচী মূল □ / কন্দাল মূল □ / আধিমূল □।

8. ভ্রূণমুকুল বর্ধিত হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তা হল—মূল ☐ / কাণ্ড ☐ / বিটপ ☐ / শাখা ☐।
9. যে মুকুল কাণ্ডের অগ্রে থাকে তাকে বলে—শাখামুকুল ☐ / অস্থানিক মুকুল ☐ / উপমুকুল ☐ / শীর্ষমুকুল ☐।
10. কোমল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদকে বলে—বৃক্ষ ☐ / গুল্ম ☐ / বীরুৎ ☐ / তৃণকাণ্ড ☐।
11. গ্রন্থিযুক্ত কাণ্ডকে বলে—পর্ণকাণ্ড ☐ / বল্লি ☐ / তৃণকাণ্ড ☐ / ব্রততী ☐।
12. বুলবিল একটি রূপান্তরিত পত্র ☐ / কাণ্ড ☐ / মুকুল ☐ / মূল ☐।
13. পুষ্পাক্ষ একটি রূপান্তরিত পত্রবৃন্ত ☐ / পত্র ☐ / মুকুল ☐ / কাণ্ড ☐।
14. ভ্রূণমধ্যস্থ পত্রকে বলে—পল্লব ☐ / বীজপত্র ☐ / শল্কপত্র ☐ / মঞ্জরিপত্র ☐।
15. যেসব পত্রের কক্ষে পুষ্প উৎপন্ন হয় তা হল—পুষ্পপত্র ☐ / মঞ্জরিপত্র ☐ / পর্ণরাজি ☐ / প্রাথমিক পত্র ☐।
16. পত্রমূলের দুই পাশে অবস্থিত পত্রাকৃতি অংশকে বলে—পত্রমূল ☐ / শল্কপত্র ☐ / উপপত্র ☐ / পত্রক ☐।
17. জবার উপপত্র—বৃন্তলগ্ন ☐ / বৃন্তমধ্যক ☐ / মুক্তপার্শ্বীয় ☐ / কাণ্ডবেষ্টক ☐।
18. পত্রবৃন্ত ফলকাকৃতি হলে তাকে বলে স্ফীত বৃন্ত ☐ / সপক্ষল বৃন্ত ☐ / পর্ণবৃন্ত ☐ / পত্রবৃন্ত ☐।
19. পদ্মের পুষ্পাক্ষের আকৃতি—অবতলাকার ☐ / লাটিমের মতো ☐ / সূত্রাকার শাঙ্কব ☐।
20. সপুষ্পক উদ্ভিদের ডিম্বকের ভ্রূণস্থলীতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ৬ ☐ / ৪ ☐ / ৮ ☐ / ১০ ☐।
21. যে পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরিদণ্ডশীর্ষে মুকুল থাকে এবং পুষ্পগুলি সবৃন্তক তাকে বলে—স্পাইক ☐ / নিয়ত ☐ / রেসিম ☐ / স্প্যাডিক্স ☐।
22. যে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পবৃন্ত অসমদীর্ঘ হয়—রেসিম ☐ / কোরিম্ব ☐ / আম্বেল ☐ / স্পাইক ☐।
23. স্ফীত মঞ্জরিঅক্ষযুক্ত রেসিমোজ পুষ্পবিন্যাস—রেসিম ☐ / স্পাইক ☐ / স্প্যাডিক্স ☐ / স্পাইকলেট ☐।
24. একপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসকে বলে—স্করপয়েড ☐ / হেলিকয়েড ☐ / বাইপেরাস ☐ / মালটিপেরাস ☐।
25. দুটি পৃথক উদ্ভিদে অবস্থিত পুষ্পের মধ্যে পরাগযোগ ঘটলে তাকে—স্ব ☐ / ইতর ☐ / নিষেক ☐ বলে।
26. স্ব পরাগযোগ ঘটে—একলিঙ্গ ☐ / দ্বিলিঙ্গ ☐ / বন্ধ্যা ☐ পুষ্পে।
27. পতঙ্গপরাগীতে ফুল হয়—বর্ণহীন ☐ / বর্ণযুক্ত ☐ / হালকা পরাগরেণু যুক্ত ☐।
28. কোন্‌টি অন্তর্বীজের অংশ নয়—পেরিস্পার্ম ☐ / এন্ডোস্পার্ম ☐ / কটিলিডন ☐ / টেস্টা ☐।
29. যে অংশটি ভ্রূণে থাকে না—পর্বসন্ধি ☐ / বীজপত্র ☐ / পেরিস্পার্ম ☐।
30. একবীজপত্রী বীজের বীজপত্রের অপর নাম—পেরিস্পার্ম ☐ / এন্ডোস্পার্ম ☐ / স্কুটেলাম ☐ / নোডালজোন ☐।
31. জবা ফুলের মুকুল পত্রবিন্যাসকে বলে—ভলভেট ☐ / টুইস্টেড ☐ / ইম্বিকেট ☐ / ভেক্সিলারি ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. মূল উদ্ভিদের ——— অভিকর্ষী অঙ্গ।
2. মূলের অগ্রভাগে ——— থাকে।
3. ভ্রূণমূল বর্ধিত হয়ে ——— মূল গঠন করে।
4. ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদদেহের অন্য স্থান থেকে যে মূল নির্গত হয় তাকে ——— বলে।
5. গুচ্ছমূল একটি ——— মূল।
6. জলজ উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগে ——— থাকে।
7. পরাশ্রয়ী মূলের বহিরাবরণকে ——— বলে।
8. যেসব মূলে অস্থানিক মুকুল গঠিত হয় তাদেরকে ——— বলে।
9. যেসব মূল খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হয় তাদের ——— মূল বলে।
10. কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা ও পাতা নিয়ে গঠিত উদ্ভিদের উপরের অংশকে ——— বলে।
11. কাণ্ড একটি ——— অভিকর্ষী অঙ্গ ।
12. কাণ্ডের যে অংশ থেকে পাতা উৎপন্ন হয় তা হল ———।
13. যে উদ্ভিদের জীবনচক্র এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় তাকে ——— বলে।
14. আলু একটি পরিবর্তিত ———।
15. শতমূলির রূপান্তরিত কাণ্ডকে ——— বলে।
16. কাক্ষিক মুকুল রূপান্তরিত হয়ে স্ফীত ও গোলাকার হলে তাকে ——— বলে।
17. পুষ্পাক্ষ একটি ——— কাণ্ড।
18. সপুষ্পক উদ্ভিদের ভ্রূণমধ্যস্থ পত্রকে ——— বলে।
19. যেসব ক্ষুদ্র পত্রের কক্ষে ফুল উৎপন্ন হয় তাদের ——— বলে।
20. আমজাতীয় পত্রের স্ফীত পত্রমূলকে ——— বলে।
21. উপপত্র না থাকলে পাতাকে ——— বলে।
22. পাতার উভয় তল সমান হলে পত্রকে ——— পত্র বলে।
23. পত্রবৃন্ত ফলকের আকার ধারণ করলে তাকে ——— বলে।
24. কাণ্ড বা শাখার উপর যে পদ্ধতিতে পাতাগুলি সজ্জিত থাকে তাকে বলে ———।
25. পত্রফলকে শিরা এবং উপশিরার সজ্জাক্রমকে ——— বলে।
26. যে শাখার উপর ফুলগুলি সাজানো থাকে তাকে ——— বলে।
27. যে সংহত অক্ষের উপর পুষ্পস্তবকগুলি সজ্জিত থাকে তাকে ——— বলে।
28. পুষ্পের বাইরের স্তবককে ——— বলে।
29. পুংকেশরকে ——— বলে।
30. পুষ্পের বাইরের স্তবকদ্বয়কে ——— স্তবক বলে।
31. পুংকেশরগুলি গর্ভপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই অবস্থাকে বলে ———।

32. ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠ ডিম্বকযুক্ত অমরার সজ্জারীতিকে ——— বলে।
33. পুষ্পসমন্বিত বিশেষ অক্ষকে ——— বলে।
34. পুষ্পমঞ্জরির পুষ্পধারক অক্ষকে ——— বলে।
35. যৌগ পুষ্পবিন্যাসের প্রধান অক্ষ হল ———।
36. সূর্যমুখীতে মঞ্জরি অক্ষটিকে ——— বলে।
37. ——— ফুলে উপবৃতি থাকে।
38. মঞ্জরিদণ্ড শীর্ষ পুষ্পযুক্ত রেসিমকে ——— বলে।
39. অবৃন্তক পুষ্পযুক্ত রেসিমকে ——— বলে।
40. ডুমুরে ——— পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।
41. রক্তদ্রোণের পুষ্পবিন্যাসকে ——— বলে।
42. পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণু স্থানান্তরকে ——— বলে।
43. স্বপরাগযোগ সব সময়ই ——— পুষ্পে ঘটে।
44. ইতর পরাগযোগ সম সময়ই ——— পুষ্পে ঘটে।
45. ডিম্বাশয় ছাড়াও ফুলের অন্যান্য অংশ রূপান্তরিত হয়ে যে ফল গঠিত হয় তাকে ——— ফলে বলে।
46. ধান একটি ——— জাতীয় ফল।
47. পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর স্থানান্তরকে ——— বলে।
48. ধান গাছের পুষ্পবিন্যাস ——— জাতীয়।
49. ধান গাছের পুষ্পপুটকে ——— বলে।
50. মটর ফুলের দলমণ্ডলের সর্ববৃহৎ পাপড়িকে ——— বলে।
51. মটরের পুংস্তবকে ——— পুংকেশর থাকে।
52. মটর একটি ——— বীজপত্রী ফল।

## D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. বীজমধ্যস্থ ভ্রূণমুকুল বর্ধিত হয়ে মূল গঠন করে।
2. মূল উদ্ভিদের আরোহী অঙ্গ।
3. মূলের শাখাসমূহ বহির্জনিষ্ণু হয়।
4. মূলরোম বহুকোশী এবং বহির্জনিষ্ণু হয়।
5. ভ্রূণমূল বর্ধিত হয়ে গৌণমূল গঠন করে।
6. অস্থানিক মূল ভ্রূণমূল থেকে গঠিত হয়।
7. যে পত্রের কক্ষে পুষ্প উৎপন্ন হয় তা হল পুষ্পপত্র।
8. উপপত্র না থাকলে পত্রকে সোপপত্রিক বলে।
9. পত্রবৃন্ত ফলকের নিম্ন পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে পত্রকে সবৃন্তক পত্র বলে।
10. যে পত্রের ফলকের তলদ্বয় ভিন্ন হয় তাকে সমাঙ্গপৃষ্ঠ পত্র বলে।
11. পত্রকের বৃন্ত সংলগ্ন পত্রাকৃতি অংশকে উপপত্র বলে।
12. বৃন্ত ফলকের আকার ধারণ করলে তাকে স্ফীত বৃন্ত বলে।
13. বীজমধ্যস্থ ভ্রূণমূল বর্ধিত হয়ে কাণ্ড গঠন করে।
14. কাণ্ড আলোক প্রতিকূলবর্তী অংশ।
15. কাণ্ডের শাখা অন্তর্জনিষ্ণু।
16. পুষ্পমুকুল এক জাতীয় অঙ্গজ মুকুল।
17. আদা একটি পরিবর্তিত মূল।
18. ফণীমনসা উদ্ভিদের কাণ্ডটিকে বলে ক্ল্যাডোড।
19. বুলবিল একটি পরিবর্তিত শাখা।
20. অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস মঞ্জরিদণ্ড শীর্ষ পুষ্পযুক্ত হয়।
21. স্পাইকে সবৃন্তক পুষ্প থাকে।
22. স্প্যাডিক্স পুষ্পগুলি সম্পূর্ণ হয়।
23. একপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসকে বৃশ্চিকাকার বলে।
24. শিরমঞ্জরিতে একই প্রকার পুষ্প থাকে।
25. লালপাতায় পুষ্প সুদৃশ্য হয়।
26. উদুম্বর একটি পুষ্পবিন্যাস দ্বারা গঠিত।
27. স্বপরাগযোগ একলিঙ্গ পুষ্পে ঘটে।
28. ইতরপরাগযোগ দ্বিলিঙ্গ পুষ্পে ঘটে।
29. অ্যানিমোফিলি কথার অর্থ পতঙ্গপরাগী।
30. এন্টোমোফিলি কথার অর্থ বায়ুপরাগী।
31. বায়ুপরাগী পুষ্পের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।
32. পতঙ্গপরাগী পুষ্পের বর্ণ হালকা হয়।
33. পুষ্প যে অক্ষের উপর সজ্জিত থাকে তা হল পুষ্পাক্ষ।

34. পুষ্প স্তবকগুলি যে অক্ষের ওপর সাজানো থাকে তাকে মঞ্জরিদণ্ড বলে।
35. পুষ্পের অপরিহার্য স্তবক বৃতি ও দলমণ্ডল।
36. পুষ্পাক্ষের শীর্ষে ডিম্বাশয় অবস্থান করলে ডিম্বাশয়কে অধোগর্ভ ডিম্বাশয় বলে।
37. পুংকেশরগুলি নিজেদের মধ্যে মুক্ত থাকলে তাকে অসমসংযোগ বলে।
38. যে বৃন্তের সাহায্যে ডিম্বক অমরার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে বলে ডিম্বকমূল।
39. ডিম্বাশয় রূপান্তরিত হয়ে অপ্রকৃত ফল গঠিত হয়।
40. একটি ফুলে একগর্ভপত্রী বা যুক্তগর্ভপত্রী একটিমাত্র ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন ফলকে বলে গুচ্ছিত ফল।
41. সমগ্র পুষ্পমঞ্জরি একটিমাত্র ফলে পরিণত হলে তাকে গুচ্ছিত ফল বলে।
42. ধানের পত্রমূল ও ফলক সংযোগে উৎপন্ন শক্ত রোমশ অংশকে লডিকিউল বলে।

## II. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. বীজের কোন্ অংশ মূল গঠন করে? 2. কোন্ উদ্ভিদে মূল থাকে না ? 3. কোন্ উদ্ভিদদেহ শুধু মূল দিয়ে গঠিত ? 4. প্রকৃত মূল কাকে বলে ? 5. অস্থানিক মূল কী ? 6. প্রধান মূল কী ? 7. গুচ্ছমূল কী ? 8. পত্রাশয়ী মূলের উদাহরণ দাও। 9. মূলত্র কী ? 10. বহুযোজী মূলত্র কী ? 11. মূলজেব কী ? 12. অনিয়ত শাখাবিন্যাস কাকে বলে ? 13. শাখাকন্টক কী ? 14. পর্ণকাণ্ড কী ? 15. বুলবিল কাকে বলে ? 16. শ্বাসচিত্র কোথায় থাকে ? 17. সেমিনেল মূল কী ? 18. কাণ্ডজ মূল কী ? 19. কাণ্ডবেষ্টক কী ? 20. সমাঙ্গ ফুল কী ? 21. একটি ভালকেট পুষ্পপত্রবিন্যাস কাকে বলে ? 22. পুষ্পপুট কী ? 23. স্পাইক পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখো। 24. স্বপরাগযোগের সুবিধা উল্লেখ করো। 25. অসমাঙ্গ ফুল কী ? 26. জলপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? 27. অপ্রকৃত ফল কাকে বলে ? 28. পারথেনোকার্পিক ফল কী ? 29. সস্যাল বীজ কী ? 30. বীজের সুপ্তদশা কাকে বলে ? 31. বীজের সংজ্ঞা লেখো। 32. আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ণ কাকে বলে ? 33. পুরুষত্বহীনকরণ কী ? 34. ট্যাগিং কাকে বলে ? 35. থলি দিয়ে আবদ্ধকরণের নিয়ম কী ? 36. কাঁচি ও চিমটে কেন ব্যবহার করা হয় ? 37. মাইক্রোপ্রোপাগেশন কী ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :

1. মূলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। 2. মূলের প্রকারভেদ সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 3. আদর্শ মূলে বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা করো। 4. মূলের সাধারণ কাজ আলোচনা করো। 5. খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত প্রকৃত মূল সম্বন্ধে লেখো। 6. শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পরিবর্তিত অস্থানিক মূল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। 7. কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। 8. আদর্শ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করো। 9. শাখাবিন্যাস কী ? শাখাবিন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। 10. কাণ্ডের প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করো। 11. কাণ্ডের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করো। 12. দ্বিপক্ষল যৌগিক পাতা কী ? 13. ত্রিফল ও অঙ্গুলাকার বলতে কী বোঝো ? 14. হেটেরোফাইলি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। 15. মুক্তপার্শ্বীয় উপপত্র কী ? উদাহরণ দাও। 16. সমাঙ্গ ও অসমাঙ্গ ফুল কাকে বলে ? 17. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল কী ? 18. গর্ভপাত ও গর্ভকটি ফুল বলতে কী বোঝো ? 19. ফুলের সমসংযোগ ব্যাখ্যা করো। 20. জবা ও কলার অমরাবিন্যাস কেমন হয় ? বুঝিয়ে দাও। 21. চমসামঞ্জরি কাকে বলে ? 22. শিরমঞ্জরি পুষ্পবিন্যাস আলোচনা করো। 23. উদুম্বর পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? 24. ইতর পরাগযোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী ? 25. বায়ুপরাগী ও পক্ষীপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 26. একটি প্রকৃত ফলের অংশগুলির বিবরণ দাও। 27. একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 28. পাট ফুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 29. উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার গুরুত্ব উল্লেখ করো। 30. সংকরায়ণ পদ্ধতি প্রয়োগের পর্যায়গুলি লেখো। 31. প্রজননবিদেরা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন তাদের নাম উল্লেখ করো। 32. কৃত্রিম বীজ কাকে বলে ?

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ভ্রূণমূল ও অধিমূল। 2. প্রাথমিক ও প্রধান মূল। 3. স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূল। 4. শাখামূল ও প্রশাখামূল। 5. মূলত্র ও মূলজেব। 6. কাণ্ড ও বিটপ। 7. কাক্ষিক ও শীর্ষ মুকুল। 8. নিয়ত ও অনিয়ত শাখাবিন্যাস। 9. গুল্ম ও বৃক্ষ। 10. ধাবক ও বক্রধাবক। 11. উর্ধ্বা ধাবক ও খর্বধাবক। 12. পর্ণকাণ্ড ও পর্ণকন্টক। 13. একক পত্র ও পত্রক। 14. একক পত্র ও যৌগিক পত্র। 15. পর্ণকন্টক ও শাখা কন্টক। 16. সমাঙ্গ ফুল ও অসমাঙ্গ ফুল। 17. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল। 18. গর্ভপাদ ও গর্ভশীর্ষ। 19. অনিয়ত ও নিয়ত পুষ্পবিন্যাস। 20. বায়ুপরাগী ও পতঙ্গপরাগী ফুল। 21. প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফল। 22. গুচ্ছিত ফল ও যৌগিক ফল। 23. সস্যাল ও অস্যাল বীজ। 24. বীজ ও ফল। 25. বংশ বিবরণগত পদ্ধতি। 26. পরিমাণগত পদ্ধতি।

### C. সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো (Write short notes) :

1. ভ্রূণমূল, 2. প্রকৃত মূল, 3. বহুযোজী মূলত্র, 4. রোমবহ অঞ্চল, 5. শ্বাসমূল, 6. স্তম্ভমূল, 7. ভাণ্ডার মূল, 8. কন্দাল মূল, 9. দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, 10. গ্রন্থিকন্দ, 11. স্ফীতকন্দ, 12. শাখাকন্টক, 13. পর্ণকাণ্ড, 14. শ্বেতহুড়হুড়ের পুষ্পাক্ষ, 15. পত্রমূল, 16. বিষমপৃষ্ঠ পাতা, 17. সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতা, 18. হেটারোফিলি, 19. বহুযৌগিক পত্র, 20. পর্ণবৃন্ত, 21. পুষ্পপুট, 22. বহুগুচ্ছ, 23. সহবাসী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদ, 24. প্রান্তপুষ্পিকা ও চক্রপুষ্পিকা, 25. সায়াথিয়াম, 26. রেসিম, 27. ইতর পরাগযোগ, 28. অপ্রকৃত ফল, 29. পেরিস্পার্ম, 30. পুরুষত্বহীনকরণ, 31. ট্যাগিং, 32. মাইক্রোপ্রোপাগেশনের গুরুত্ব।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) মূলের অঙ্গসংস্থানিক প্রকৃতি কী ? (b) প্রধান মূলের অংশগুলির নাম ও তাদের কাজ উল্লেখ করো।
2. চিত্রসহ মূলাকার, শ্বাসমূল ও পরাশ্রয়ী মূলের বিবরণ দাও।
3. চিত্র ও উদাহরণ সহযোগে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার শিরাবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করো।
4. (a) একক ও যৌগিকপত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করো। (b) পাতার সাধারণ কাজ উল্লেখ করো।
5. (a) শাখাবিন্যাস কাকে বলে ? (b) পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাসের বিবরণ দাও।
6. (a) ফুল কাকে বলে ? (b) একটি জবা ফুলের চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা দাও। প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ করো।
7. (a) পুষ্পবিন্যাস কাকে বলে ? (b) নিয়ত ও অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের পার্থক্য লেখো।
8. (a) পরাগযোগ কাকে বলে ? (b) স্বপরাগযোগ এবং বিপরীত পরাগযোগ কাকে বলে ?
9. (a) ফলের সংজ্ঞা দাও। (b) প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফল কাকে বলে ? (c) চিত্রসহ একটি প্রকৃত ফলের গঠন বর্ণনা করো।
10. (a) বীজের সংজ্ঞা লেখো। (b) একটি সস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন বর্ণনা করো।
11. ধান গাছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
12. (a) উদ্ভিদের প্রজননবিদ্যার প্রয়োজন কেন ? (b) উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করো।
13. (a) সংকরায়ণের সংজ্ঞা লেখো। (b) সংকরায়ণ কত প্রকারের হয় ?
14. সংকরায়ণ কৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করো।
15. (a) ব্রিডার্স কিট কাকে বলে ? (b) সংকরায়ণের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাদের নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করো।
16. (a) মাইক্রোপ্রোপাগেশন কাকে বলে ? (b) মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি আলোচনা করো।

### B. নিম্নলিখিতগুলির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো (Draw the lebell diagram of the followings) :

1. চিত্র অঙ্কন করে মূলের বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
2. একটি গ্রন্থিকন্দ অঙ্কন করে চিহ্নিত করো।
3. একটি মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র ও একটি ত্রিপক্ষল পাতার চিত্র অঙ্কন করো।
4. চিত্রের সাহায্যে ভালবেট ও টুইস্টেড পুষ্পপত্রবিন্যাস দেখাও।
5. রেসিম ও স্পাইক পুষ্পবিন্যাসের চিহ্নিত চিত্র আঁকো;
6. পাটফুলের বিভিন্ন অংশগুলির চিহ্নিত চিত্র আঁকো।
7. কলা ও জবার অক্ষীয় অমরাবিন্যাস দেখাও।
8. একটি আদর্শ ফলের চিহ্নিত চিত্র আঁকো।

---

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# সালোকসংশ্লেষ
# [ PHOTOSYNTHESIS ]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

সবুজ উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া হল সালোক-সংশ্লেষ। পৃথিবীর সব জীবের অর্থাৎ এককোশী জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সবারই অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল। সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ ব্যাকটেরিয়া শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করার সময় একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসাবে খাদ্যবস্তুর মধ্যে সঞ্চিত রাখে। এই প্রক্রিয়া **সালোকসংশ্লেষ** নামে পরিচিত। জীবের বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া, যেমন— চলন, গমন, শ্বসন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্যই হল জীবদেহের শক্তির উৎস। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদকুল জীবজগতকে সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে শক্তি জোগায়।

1898 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **বার্নেস** (Barnes) প্রথম **সালোকসংশ্লেষ** বা **ফোটোসিন্থেসিস** (Photosynthesis) শব্দটি ব্যবহার করেন। দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে ফোটোসিন্থেসিস্ শব্দটি গঠিত হয়েছে। এই শব্দ দুটি হল—**ফোটোস** (Photos) অর্থাৎ আলো এবং **সিন্থেসিস** (Synthesis) অর্থাৎ সংশ্লেষ। আবার সালোকসংশ্লেষ কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় **'সালোক'** কথাটির অর্থ হল আলোকের উপস্থিতি এবং **সংশ্লেষ** কথাটির অর্থ কোনো কিছু উৎপাদিত হওয়া। এখানে আলোর সাহায্যে শর্করা সংশ্লেষিত হয় বলে, প্রক্রিয়াটি **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) নামে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

## 4.1. সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা, আবিষ্কার সম্বন্ধীয় ইতিহাস, সালোকসংশ্লেষকারী জীব, প্রক্রিয়ার স্থান (Definition of Photosynthesis, History of Discovery, Photosynthetic organism and Site of Photosynthesis)

❖ (a) **সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা (Definition of Photosynthesis) :**

1. **যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জীবকোশের ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে যার ফলে জলের হাইড্রোজেনের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিজারণ ঘটে ও শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন উপজাত পদার্থ হিসাবে পরিবেশে নির্গত হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।**

2. **যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সবুজ জীবকোশে, আলোর উপস্থিতিতে, পরিবেশ থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের বিক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্যের সংশ্লেষ ঘটে এবং গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন উদ্ভূত হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।**

◻ (b) **সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস (Landmarks in the History of Discovery for Photosynthesis) :**

320 খ্রিস্টপূর্ব : গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) ও **থিয়োফ্রাস্টাসের** (Theophrastus) ধারণা ছিল উদ্ভিদ মাটি থেকে সরাসরি জৈব এবং অজৈব পদার্থ শোষণ করে।

1648 খ্রিস্টাব্দে : বিজ্ঞানী **জে. বি. ভন্. হেলমন্ট** (J. B. Van Helmont) উইলো গাছের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখান যে উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য জলের মৌলিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

1699 খ্রিস্টাব্দে : বিজ্ঞানী **উডওয়ার্ড** (Woodward) জল ও মাটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান যে মাটির জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

1727 খ্রিস্টাব্দে : **স্টিফেন হেলস** (Stephen Hales) উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বাতাস ও সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

1772 খ্রিস্টাব্দে : **যোসেফ প্রিস্টলি** (Joseph Priestly) পরীক্ষা করে দেখান উদ্ভিদ অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম।

1782 খ্রিস্টাব্দে : **জাঁ সেনেবিয়ের** (Jean Senebier) প্রমাণ করেন উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে।

1804 খ্রিস্টাব্দে : **নিকোলাস দ্য সস্যুর** (Nicholas de Saussure) বলেন জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

1837 খ্রিস্টাব্দে : **ডুট্রোচেট** (Dutrochet) প্রমাণ করেন সালোকসংশ্লেষে উদ্ভিদের ক্লোরোফিলযুক্ত অঙ্গের প্রয়োজন।

1840 খ্রিস্টাব্দে : **লাবিগ** (Liebig) দেখান উদ্ভিদের কার্বনের উৎস হল বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড।

1845 খ্রিস্টাব্দে : **ভন মেয়ার** (Von Mayer) প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসাবে উদ্ভিদের খাদ্যে আবদ্ধ হয়।

1862 খ্রিস্টাব্দে : **জুলিয়াস স্যাকস্** (Julius Sachs) দেখান সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের উৎপন্ন খাদ্য হল শর্করা।

1864 খ্রিস্টাব্দে : **টি. বি. বসিঙ্গল্ট** (T. B. Boussingault) উপলব্ধি করেন যে উদ্ভিদ যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে সমপরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে নির্গত করে।

1905 খ্রিস্টাব্দে : **এফ. ব্ল্যাকম্যান** (F. Blackman) প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে ঘটে, যেমন—আলোক বিক্রিয়া ও অন্ধকার বিক্রিয়া।

1939 খ্রিস্টাব্দে : **রবার্ট হিল** (Robert Hill) দেখান আলো ও উপযুক্ত হাইড্রোজেন গ্রাহকের উপস্থিতিতে জল থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজন হয় না।

1941 খ্রিস্টাব্দে : **সামুয়েল রুবেন** (Samuel Ruben) ও **মার্টিন কামেন** (Martin Kamen) তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন ($^{18}O$) দিয়ে তৈরি জলের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন জল থেকে আসে।

1954 খ্রিস্টাব্দে : **আরনন, অ্যালেন ও হোয়াটলে** (Arnon, Allen and Whatley) প্রমাণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে।

1954 খ্রিস্টাব্দে : **বেনসন** (Benson) ও **কেলভিন** (Calvin) কেলভিন চক্রটি আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় PGA (ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড) হল প্রথম জৈব যৌগ।

1957 খ্রিস্টাব্দে : **আর. ইমারসন** (R. Emerson) ইমারসন প্রভাব (Emmerson effect) আবিষ্কার করেন এবং দু'রকমের ফোটোসিস্টেমের বা রঞ্জক তন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন, যেমন—PS-I ও PS-II (প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র)।

### ◘ (c) সালোকসংশ্লেষকারী জীব (Photosynthetic organism) :

1. **সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদ** (Photosynthetic Plants) : কয়েক প্রকার ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ যাদের সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ থাকে, তারাই সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম।

(i) **সালোকসংশ্লেষকারী মূল** — গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল, পটলের মূল, অর্কিডের বায়বীয় মূল।

(ii) **সালোকসংশ্লেষকারী কাণ্ড**— ফণীমনসা, বাজবরণ ও অন্যান্য উদ্ভিদের সবুজ কাণ্ড।

2. **সালোকসংশ্লেষকারী প্রাণী (Photosynthetic Animals)** : যদিও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সবুজ উদ্ভিদে ঘটে, তবুও কয়েকটি এককোশী প্রাণী, যেমন— *ইউগ্লিনা* (*Euglena*) এবং *ক্রাইস্যামিবা* (*Crysamoeba*) প্রভৃতিতে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য তৈরি হয়।

চিত্র 4.1 : সালোকসংশ্লেষকারী কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী— (A) অর্কিড (রাস্না), (B) ফণীমনসা, (C) ক্রাইস্যামিবা ও (D) ইউগ্লিনা।

● **সালোকসংশ্লেষে অক্ষম উদ্ভিদ (Plants unable to photosynthesis)** : যেসব উদ্ভিদে ক্লোরোফিল থাকে না তারা সালোকসংশ্লেষে অক্ষম। ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদে ক্লোরোফিল বা সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ না থাকার জন্য সালোকসংশ্লেষ ঘটে না। উদাহরণ— মিউকর (*Mucor*), ঈস্ট (*Yeast*) প্রভৃতি।

### • সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয় •

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | সালোকসংশ্লেষের অঙ্গ | — | পাতা |
| 2. | সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান | — | প্রধানত পাতার মেসোফিল কলা |
| 3. | সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক | — | ক্লোরোফিল |
| 4. | সালোকসংশ্লেষকারী একক | — | কোয়ান্টাজোম |
| 5. | সালোকসংশেষকারী প্রাণী | — | ক্রাইস্যামিবা ও ইউগ্লিনা |
| 6. | সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া | — | রোডোসিউডোমোনাস ও রোডোস্পাইরিলাম |
| 7. | সালোকসংশ্লেষকারী কাণ্ড | — | ফণীমনসা |
| 8. | সালোকসংশ্লেষকারী মূল | — | গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল |

**(d) উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার স্থান (Site for Photosynthesis in Plants) :**

উদ্ভিদের সব কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না। সবুজ পাতার মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্ট হল সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান। উদ্ভিদের পাতা ছাড়া কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পুষ্পাক্ষ, পর্ণকাণ্ড ও সবুজ কাঁচা ফলের ত্বকেও সালোকসংশ্লেষ হয়। তা ছাড়া সবুজ ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে সব দেহকোশই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

## 4.2. প্রধান সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ (Major Photosynthetic Pigments)

উদ্ভিদে প্রধানত তিন রকমের রঞ্জকপদার্থ থাকে, যেমন— ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড ও ফাইকোবাইলিন ও অ্যান্থোসায়ানিন। এর মধ্যে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন এবং ফাইকোবিলিন হল সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ। সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক কণাগুলির মধ্যে ক্লোরোফিল $a$ হল প্রধান। অন্যান্য রঞ্জক কণাগুলি হল সালোকসংশ্লেষের সাহায্যকারী রঞ্জক কণা।
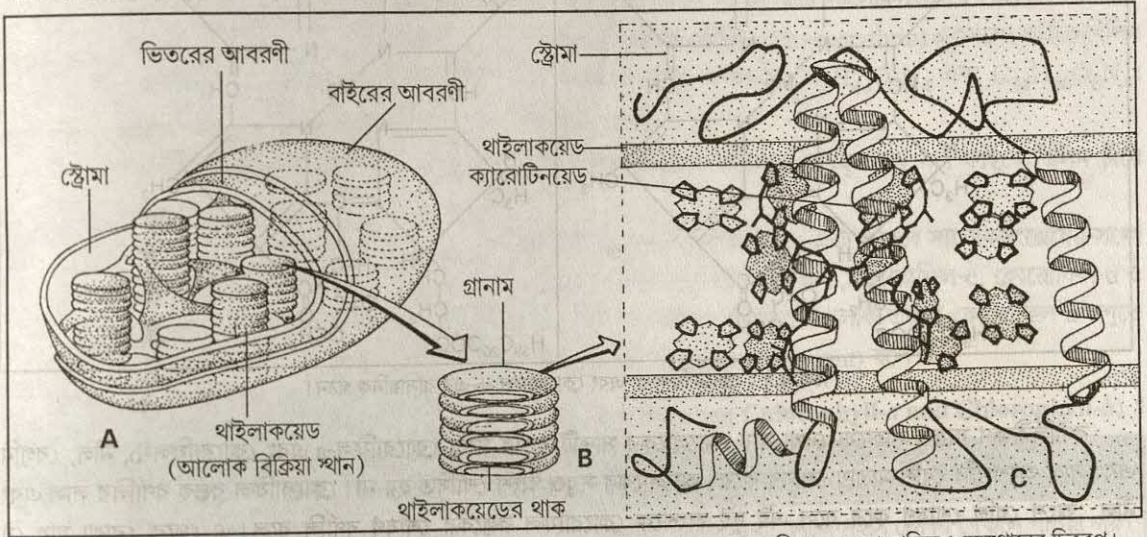
চিত্র 4.2 : A-ক্লোরোপ্লাস্ট, B-গ্রানাম এবং থাইলাকয়েড, C-থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে ক্লোরোফিল-a ও ক্লোরোফিল-b অবস্থানের চিত্ররূপ।

### 1. ক্লোরোফিল (Chlorophyll) :

(a) **অবস্থান (Location)**—উন্নত সবুজ উদ্ভিদকোশের ক্লোরোপ্লাস্টে সঞ্চিত ক্লোরোফিল হল সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ। 1818 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী পেলেসিয়ার (Palletier) উদ্ভিদের সবুজ রঞ্জক পদার্থটির নাম দিয়েছিলেন ক্লোরোফিল। প্রধানত পাতার মেসোফিল কলার কোশে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে একধরনের অঙ্গাণু থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড পর্দার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে। **পূর্বের কোয়ানটাজোম মতবাদ এখন বিজ্ঞানীরা বর্জন করেছেন।**

(b) **প্রকারভেদ (Types)**—ক্লোরোফিল অণুর গঠন অনুসারে ক্লোরোফিল পাঁচ প্রকারের হয়। উন্নত সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—b, বাদামি শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—c, লাল

**সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জকগুলির রাসায়নিক সংকেত**

| রঞ্জক | সংকেত |
|---|---|
| ক্লোরোফিল–$a$ | — $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ |
| ক্লোরোফিল–$b$ | — $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ |
| ক্লোরোফিল–$c$ | — $C_{35}H_{32}O_5N_4Mg$ |
| ক্লোরোফিল–$d$ | — $C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$ |
| ক্যারোটিন | — $C_{40}H_{56}$ |
| জ্যান্থোফিল | — $C_{40}H_{56}O_2$ |
| ব্যাকটেরীও ক্লোরোফিল | — $C_{55}H_{74}O_6N_4Mg$ |
| ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল | — $C_{55}H_{72}O_6N_4Mg$ |
| ফাইকোসায়ানিন | — $C_{34}H_{44}O_8N_4$ |
| ফাইকোএরিথ্রিন | — $C_{34}H_{46}O_8N_4$ |

শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—d থাকে। জ্যান্থোফাইসিতে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—e থাকে। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ায় ব্যাকটেরীয় ক্লোরোফিল, ব্যাকটেরীয় ভিরিডিন অর্থাৎ ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল থাকে।

(c) **রাসায়নিক গঠন (Chemical structure)**—রাসায়নিক গঠন অনুসারে ক্লোরোফিল কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N) ও ম্যাগনেশিয়াম (Mg) নিয়ে গঠিত। ক্লোরোফিলের রাসায়নিক গঠনে দেখা যায় এটি পরফাইরিন (Porphyrin) যৌগ। এই পরফাইরিন চারটি পাইরল (Pyrrole) বলয় বৃত্তাকারে পরস্পর যুক্ত হয়। কেন্দ্রে একটি ম্যাগনেসিয়াম ($Mg^{++}$) আয়ন থাকে। একটি ফাইটল জাতীয় শৃঙ্খল চতুর্থ পাইরল বলয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্লোরোফিল-a তে দ্বিতীয় পাইরো পাইরল বলয়ে $CH_3$ গ্রুপ থাকে এবং ক্লোরোফিল-b তে ই স্থানে CHO গ্রুপ থাকে।
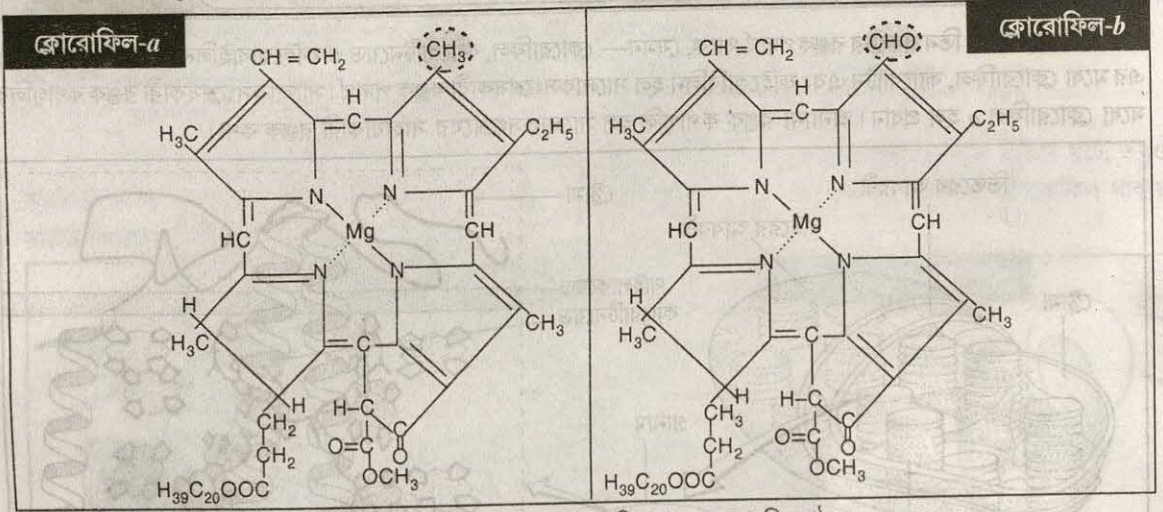
চিত্র 4.3 : ক্লোরোফিল-*a* এবং ক্লোরোফিল -*b*-এর রাসায়নিক গঠন।

বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, আলোকের সাতটি বর্ণের মধ্যে ক্লোরোফিল-a এবং ক্লোরোফিল-b, নীল, বেগুনি এবং লাল অংশগুলি বেশি মাত্রায় শোষণ করে। আলোকের সবুজ অংশ শোষিত হয় না। ক্লোরোফিল রঞ্জক বর্ণালির লাল এবং নীল অংশ বেশি শোষণ করে বলে এই দুই অংশকে ক্লোরোফিল রঞ্জকের **শোষণ বর্ণালি** বলে। এ থেকে বোঝা যায় যে সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিল প্রধান রঞ্জক হিসাবে কাজ করে। ক্লোরোফিল-*a* অণু 410 nm এবং 660 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত আলো এবং ক্লোরোফিল-*b* অণু 452 nm এবং 642 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর আলো শোষণ করতে পারে। ক্লোরোফিল-*b* থেকে ক্লোরোফিল-*a* বেশি আলো শোষণ করে। আবার ক্লোরোফল-*b* এর নীল আলো শোষণ করার ক্ষমতা ক্লোরোফিল-*a* থেকে বেশি।

**● ক্লোরোসিস কী ? (What is Chlorosis ?) ●**

উদ্ভিদের পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয়। লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল সংশ্লেষে বিশেষ প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে যে-কোনো একটির অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষ ঘটে না। একে **ক্লোরোসিস** বলে।

**● অ্যালবিনো উদ্ভিদ কী ? (What is Albino plant ?) ●**

ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হওয়ার জন্য উদ্ভিদকোশের ক্রোমোজোমে বিশেষ জিনের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই জিনের অভাবে উদ্ভিদে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না। ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদকে **অ্যালবিনো উদ্ভিদ** বলে।

## 2. ক্যারোটিনয়েডস্ (Carotenoids) :

**অবস্থান (Location)**—ক্যারোটিনয়েডস লাল, হলুদ, কমলা, বাদামি বর্ণের হয় এবং ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিলের সঙ্গে

মিশ্রিত থাকে। এই রঞ্জক পদার্থ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রঞ্জিত অংশে দেখা যায়। এদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—কমলা রঙের **ক্যারোটিন** (Carotene) এবং হলুদ রঙের **জ্যান্থোফিল** (Xanthophyll)। ক্যারোটিনের রাসায়নিক সংকেত $C_{40}H_{56}$। ক্যারোটিন বিভিন্ন প্রকারের হয়। এদের মধ্যে α ক্যারোটিন ও β ক্যারোটিন হল প্রধান। অক্সিজিনেটেড ক্যারোটিনকে **জ্যান্থোফিল** বলা হয়। এর রাসায়নিক সংকেত $C_{40}H_{56}O_2$। শৈবালে অন্তত কুড়ি প্রকার জ্যান্থোফিল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে **ফিউকোজ্যানথিন, ভায়োলাজ্যানথিন** বিশেষ পরিচিত।

**কাজ (Function)**—ক্যারোটিনয়েড দৃশ্যমান আলোকের 400nm এবং 500nm অংশ বেশি শোষণ করে। সালোকসংশ্লেষে ক্যারোটিনয়েড দুভাবে অংশগ্রহণ করে। আলোক ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্যারোটিনয়েড ক্লোরোফিলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ আলোক জারণ (Photo-oxidation) থেকে রক্ষা করে। তা ছাড়া ক্যারোটিনয়েড আলোক তরঙ্গ শোষণ করে তা ক্লোরোফিল-a অণুতে পাঠায়।

### 3. ফাইকোবিলিন (Phycobillin) ঃ

**অবস্থান (Location)**—নীলাভ সবুজ ও লাল শৈবালে ফাইকোবিলিন থাকে। এটি সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ। নীল বর্ণের **ফাইকোসায়ানিন** (Phycocyanin) এবং লাল বর্ণের **ফাইকোএরিথ্রিন** (Phycoerythrin) একসঙ্গে ফাইকোবিলিন নামে পরিচিত। **ফাইকোসায়ানিন ও ফাইকোএরিথ্রিনের** রাসায়নিক সংকেত যথাক্রমে $C_{34}H_{44}O_8N_4$ এবং $C_{34}H_{46}O_8N_4$। ফাইকোবিলিন দৃশ্যমান আলোকের 550—615 nm অংশ শোষণ করে।

**কাজ (Function)**—এদের শোষিত আলোক সরাসরি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় না। ফাইকোবিলিন দিয়ে শোষিত আলোক তরঙ্গ ক্লোরোফিল-a অণুতে পৌঁছায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য সব কয়টি রঞ্জক পদার্থ আলোক শোষণ করলেও ক্লোরোফিল-a প্রত্যক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের সঙ্গে জড়িত। তাই একে মুখ্য বা প্রধান **রঞ্জক কণা** (Primary pigment) বলা হয়। ক্লোরোফিল-b, ক্লোরোফিল-c, ক্লোরোফিল-d ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থগুলি সরাসরি সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে না। তাদের শোষিত আলোক তরঙ্গ ক্লোরোফিল-a অণুতে স্থানান্তরিত হয়। তাই এসব রঞ্জক পদার্থগুলিকে **সহকারী রঞ্জক পদার্থ** (Accessory pigment) বলে।

- **ক্লোরোফিল-*a* ও ক্লোরোফিল-*b* এর পার্থক্য (Difference between Chlorophyll-*a* and Chlorophyll-*b*) ঃ**

| ক্লোরোফিল-*a* | ক্লোরোফিল-*b* |
|---|---|
| 1. সব সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদে পাওয়া যায় (ব্যতিক্রম—ব্যাকটেরিয়া)। | 1. উন্নত উদ্ভিদে এবং ক্লোরোফাইসি শ্রেণির শৈবালে পাওয়া যায়। |
| 2. বর্ণ নীলাভ সবুজ। | 2. বর্ণ হালকা সবুজ। |
| 3. আনবিক ওজন হল 893। | 3. আনবিক ওজন হল 907। |
| 4. পেট্রোলিয়াম ইথারে দ্রাব্য। | 4. মিথাইল অ্যালকোহলে দ্রাব্য। |
| 5. রাসায়নিক সংকেত—$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$। | 5. রাসায়নিক সংকেত—$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$। |
| 6. লাল বর্ণালিতে বেশি সক্রিয়। | 6. নীল-বেগুনি বর্ণালিতে বেশি সক্রিয়। |
| 7. এইপ্রকার ক্লোরোফিল স্বাধীনভাবে সালোকসংশ্লেষে সক্ষম। | 7. এইপ্রকার ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল-*a* এর অনুপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। আলোক শোষণ করে আলোক-শক্তিকে ক্লোরোফিল-*a* তে স্থানান্তরিত করে। |

- **উদ্ভিদের রঞ্জক পদার্থের নাম ও উৎস (Name of Pigments in plants and source) ঃ**

| রঞ্জকপদার্থের নাম | রঞ্জকপদার্থের উৎস |
|---|---|
| 1. ক্লোরোফিল-এ (Chlorophyll-a) | 1. উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদের সবুজ অংশ এবং সবুজ শৈবালে ক্লোরোফিল-এ থাকে। |
| 2. ক্লোরোফিল-বি (Chlorophyll-b) | 2. উন্নত উদ্ভিদের সবুজ অংশ এবং সবুজ শৈবালে থাকে। |

| রঞ্জকপদার্থের নাম | রঞ্জকপদার্থের উৎস |
|---|---|
| 3. ক্লোরোফিল-সি (Chlorophyll-c) | 3. এই রঞ্জকটি বাদামি শৈবালে ক্লোরোফিল-এ-র সঙ্গে থাকে। |
| 4. ক্লোরোফিল-ডি (Chlorophyll-d) | 4. এই রঞ্জক পদার্থটি লোহিত শৈবালে ক্লোরোফিল-এ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। |
| 5. ক্লোরোফিল-ই (Chlorophyll-e) | 5. হলুদ শৈবাল দেখা যায়। |
| 6. ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল (Bacterio chlorophyll) | 6. নীল-বেগুনি সালফার ব্যাকটেরিয়াতে থাকে। |
| 7. ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল (Chlorobium chlorophyll) বা ব্যাকটেরিও ভিরিডিন (Bacterio viridin) | 7. সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়াতে এই প্রকার রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়। |
| 8. ফাইকোসায়ানিন (Phycocyanin) | 8. নীলাভ সবুজ শৈবালে এই রঞ্জকটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। |
| 9. ক্যারোটিন (Carotin) | 9. উন্নত উদ্ভিদ ও শৈবাল থাকে। |
| 10. জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) | 10. উন্নত উদ্ভিদ ও শৈবাল পাওয়া যায়। |

## 4.3. সালোকসংশ্লেষের প্রধান উপাদানসমূহ (Components of Photosynthesis)

### 1. আলো (Light) :

(i) **উৎস**— সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আলো জোগায়। এই শক্তির প্রধান উৎস হল **সূর্যালোক**। উপযুক্ত পরিমাণে কৃত্রিম আলোতে অর্থাৎ বিজলি আলোতেও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিজলি আলোকের শক্তি সূর্যালোকের শক্তি অপেক্ষা অনেক কম। রঞ্জক পদার্থগুলি দৃশ্যমান সাদা আলোর (Visible white light) সাতটি রঙের মধ্যে নীল, বেগুনি ও লাল রঙ শোষণ করে। তবে দেখা যায় এই আলোক বর্ণালির লাল ও নীল অংশেই সালোকসংশ্লেষ কার্যকর। সূর্য রশ্মি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য কণিকা নিয়ে গঠিত। এদের **ফোটন** (Photon) বলে। ফোটনে আবদ্ধ শক্তিকে **কোয়ান্টাম** (Quantum) বলা হয়। সূর্যরশ্মির ফোটনকে শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু উত্তেজিত হয় ও সক্রিয় ক্লোরোফিলে পরিণত হয়।
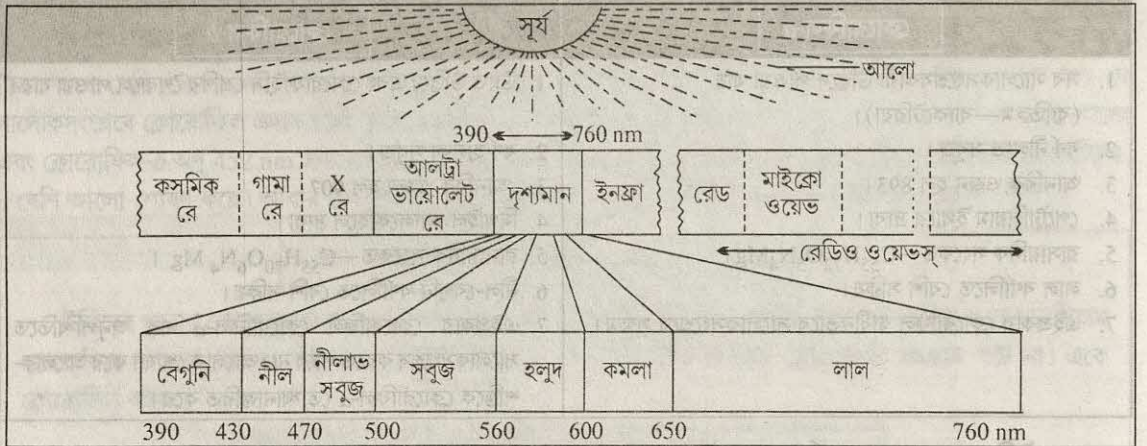
চিত্র 4.4 : সৌররশ্মির আলোক বর্ণালি।

(ii) **সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের ভূমিকা**—আলো সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় দুটি প্রধান ভূমিকা পালন করে, যেমন—আলো শোষণের পর উত্তেজিত ক্লোরোফিল জলকে $H_2O \rightarrow 2H^+ + 2e + \frac{1}{2}O_2$ আয়নে বিশ্লিষ্ট করতে সাহায্য করে এবং ফোটোসিন্থেটিক ফস্‌ফোরাইলেশন প্রক্রিয়া ঘটায়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের শোষিত আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) অণুর মধ্যে অস্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়। ATP অণুর মধ্যে আবদ্ধ রাসায়নিক শক্তি সালোকসংশ্লেষের জন্য শক্তি জোগায় এবং শর্করা-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তি রূপে অবস্থান করে। এই সৌরশক্তিই

ADP ও Pi (অজৈব ফসফেট)-কে যুক্ত করে ATP -তে পরিণত করতে সাহায্য করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফসফেট যৌগ তৈরির প্রক্রিয়াকে **ফোটোসিন্থেটিক ফস্‌ফোরাইলেশন** (Photosynthetic phosphorylation) বলে।

(iii) **সালোকসংশ্লেষীয় বর্ণালি**—390 nm – 760 nm দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য সালোকসংশ্লেষের জন্য উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন দৃশ্যমান এই আলোক রশ্মি বিভিন্ন বর্ণরশ্মি সহযোগে গঠিত। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম লাল আলো, ( 650 –760 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য)। নীল ও নীলাভ সবুজ (450— 500 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) আলোকেও বেশি সালোকসংশ্লেষ ঘটে; দৃশ্যমান বর্ণালির এই অংশকেই **সালোকসংশ্লেষীয় বর্ণালি** বলে। তবে **সবুজ আলোকে একেবারেই সালোকসংশ্লেষ** হয় না।

(iv) **সালোকসংশ্লেষে সৌরশক্তি ব্যবহার**—যে-কোনো সবুজ পাতায় আপতিত সৌরশক্তির 83% পাতায় শোষিত হয়, 12% প্রতিফলিত হয় এবং 5% প্রতিসরিত হয়। পাতায় শোষিত মোট সৌরশক্তির মাত্র 0·5 – 3·5% ক্লোরোফিল শোষণ করে।

### 2. জল (Water) :

স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। আবার জলজ উদ্ভিদকুল নিমজ্জিত দেহাংশ দিয়ে জল শোষণ করে। জল স্থলজ উদ্ভিদের জাইলেম বাহিকায় যায় এবং এরপর জাইলেম বাহিকার ভেতর দিয়ে পাতার শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে পত্রফলকের মেসোফিল কলার অন্তঃকোশীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোশের ভেতরে যায় এবং পরে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষে এক অণু গ্লুকোজ উৎপাদন করার জন্য 12 অণু জলের প্রয়োজন।

(i) **উৎস**—স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে মাটির কৈশিক জল শোষণ করে। জলজ উদ্ভিদ জলাশয় থেকে জল শোষণ করে। অনেকগুলি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বাতাসের জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

(ii) **সালোকসংশ্লেষে জলের ভূমিকা**—সালোকসংশ্লেষে জল নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করে, যেমন—(i) সূর্যালোকের প্রভাবে সক্রিয় ক্লোরোফিল জলকে $H^+$ ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করে এবং জলের ইলেকট্রন সক্রিয় ক্লোরোফিল গ্রহণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষে বিজারিত $NADPH + H^+$-এর ইলেকট্রনের উৎস হল জল। (ii) অক্সিজেন উৎপাদন করে। (iii) NADP-কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ গঠনে সাহায্য করে। $NADPH + H^+$ থেকে জলের হাইড্রোজেন অংশ উৎপন্ন শর্করার উপাদান হিসাবে আবদ্ধ হয়।

### 3. কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) :

স্থলজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র দিয়ে পাতার ভেতরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে অন্তঃকোশীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে আবার ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মেসোফিল কলার কোশে যায়। পত্ররন্ধ্র ছাড়া কিউটিকলের মধ্য দিয়েও $CO_2$ গ্যাস পাতায় পৌঁছাতে পারে। কিউটিকলের মধ্যে ঢোকার পর কিউটিকুলীয় পদার্থে $CO_2$ দ্রবীভূত হয় এবং ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পাতার কোশের ভেতরে প্রবেশ করে। সম্পূর্ণ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত $CO_2$ সমস্ত দেহে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ করে। **উদাহরণ**—*হাইড্রিলা* (*Hydrilla*), *ভ্যালিসনেরিয়া* (*Vallisneria*) প্রভৃতি। আবার অনেকগুলি জলজ উদ্ভিদ যাদের উপরের
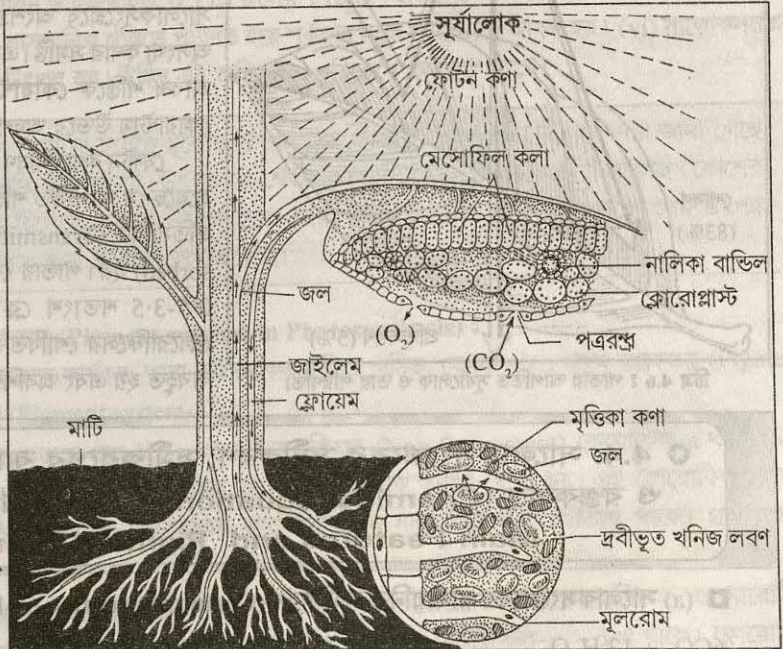
চিত্র 4.5 : সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয় উপাদান ও তাদের উৎস।

অংশ জলে ভাসে, যেমন — পদ্ম (*Nelumbo nucifera*), শালুক (*Nymphaea stellata*), কচুরি পানা (*Eichhornia crassipes*) প্রভৃতি স্থলজ উদ্ভিদের মতো পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে এবং কিউটিকলের সাহায্যে $CO_2$ শোষণ করে।

(i) **উৎস**—স্থলজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে $CO_2$ গ্যাস শোষণ করে। জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত থাকা $CO_2$ শোষণ করে।

(ii) **সালোকসংশ্লেষে $CO_2$-এর ভূমিকা** — পাতার কোশের জলের সঙ্গে $CO_2$ মিশে কার্বনিক অ্যাসিড (Carbonic acid) তৈরি করে। $H_2O + CO_2 \longrightarrow H_2CO_3$ ( কার্বনিক অ্যাসিড )

সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বনিক অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। এই $CO_2$ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয় এবং এর কার্বন অংশটি উৎপন্ন শর্করা উপাদান হিসাবে আবন্ধ হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় 1 অণু গ্লুকোজ উৎপন্নের জন্য 6 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজন হয়।

### 4. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ (Photosynthetic Pigments) :

সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থগুলি সম্বন্ধে আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

### 5. অন্যান্য উপাদান (Other Components) :

ADP (অ্যাডিনোসিন ডাই-ফসফেট), NADP (নিকোটিনামাইড অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট), Pi (অজৈব ফসফেট) ফসফেটযুক্ত শর্করা, বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক, ইলেকট্রন বাহক প্রভৃতি সালোক সংশ্লেষে বিশেষ প্রয়োজন। (i) **উৎস** — এইসব উপাদানগুলি ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। (ii) **সালোকসংশ্লেষে উপাদানগুলির ভূমিকা** — সালোকসংশ্লেষের আলোক ও অন্ধকার দশার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় এই উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

### ➤ সূর্যালোক ও সালোকসংশ্লেষের সম্বন্ধ (Relation between sunlight and photosynthesis) :
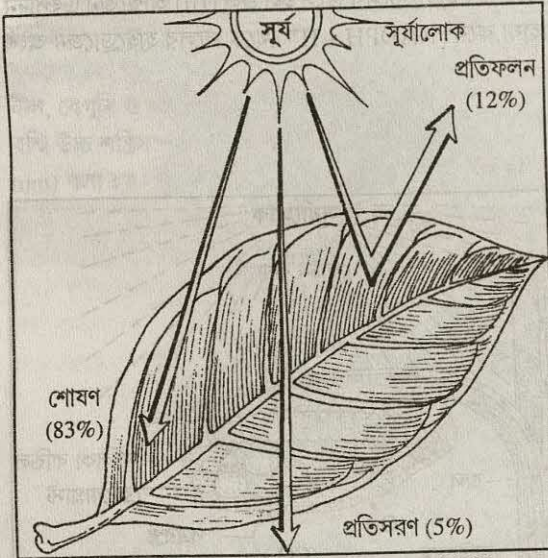
চিত্র 4.6 : পাতায় আপতিত সূর্যালোক ও তার পরিণতি।

সূর্যালোক হল সৌরশক্তির প্রধান উৎস। সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুর পারমাণবিক রূপান্তরের সময় উৎপন্ন শক্তি মহাকাশ ভেদ করে চুম্বকীয় বিচ্ছুরিত শক্তি হিসাবে সামান্য পরিমাণ পৃথিবীতে আসে। এই বিচ্ছুরিত শক্তির দৃশ্যমান অংশ (390—760 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। চুম্বকীয় বিচ্ছুরিত শক্তি হল অসংখ্য কণার সমষ্টি। এদের **ফোটন** (Photon) বলা হয়। ফোটনে আবন্ধ শক্তিকে **কোয়ান্টাম** (Quantam) বলা হয়। ফোটন বা কোয়ান্টাম উভয়ে অদৃশ্য।

ফোটন কণা শোষণ করে ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয়। প্রমাণিত হয়েছে যে আপতিত শক্তির 12% প্রতিফলিত (Reflected), 5% প্রতিসারিত (Transmitted) এবং 83% পাতায় শোষিত (Absorbed) হয়। পাতায় শোষিত সৌরশক্তির মোট পরিমাণের মাত্র 0·5-3·5 শতাংশ ক্লোরোফিলের সাহায্যে শোষিত হয়। ক্লোরোফিলের শোষিত সৌরশক্তির মাত্র 1-2% সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশের নানা ভাবে অপচয় ঘটে।

## ◎ 4.4. সালোকসংশ্লেষের সমীকরণ, সমীকরণের ব্যাখ্যা, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও রঞ্জকতন্ত্র (Chemical equation, Explanation of Equation, Main Features and Pigment system) ◎

**(a) সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation of Photosynthesis) :**

$$6CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$
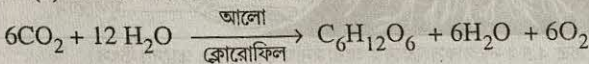
■ (b) **সালোকসংশ্লেষের সমীকরণের ব্যাখ্যা (Explanation of the equation of Photosynthesis) :** (i) 6 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড, 12 অণু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1 অণু গ্লুকোজ, 6 অণু অক্সিজেন গ্যাস এবং 6 অণু জল উৎপন্ন করে। কারণ শুধু জল থেকে অক্সিজেন নির্গত হয়। (ii) সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে। (iii) গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। (iv) সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি আলোক শক্তি ব্যবহার করে ঘটে। (v) সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিল সাহায্য করে। (vi) সালোকসংশ্লেষ- জাত পদার্থ হল গ্লুকোজ এবং উপজাত পদার্থ হল জল ও অক্সিজেন। (vii) পরিবেশের $CO_2$-এর কার্বন গ্লুকোজে আবদ্ধ হয়।

চিত্র 4.7 : সালোকসংশ্লেষের ঘটনাস্থল। A-পাতার প্রস্থচ্ছেদ, B-একটি প্যালিসেড কোশের বিবর্ধিত চিত্র।

■ (c) **সালোকসংশ্লেষের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of Photosynthesis) :**

(i) সালোকসংশ্লেষ সবুজ উদ্ভিদ ও রঞ্জকযুক্ত ব্যাকটেরিয়াতে ঘটে। তা ছাড়া কয়েকটি এককোশী সবুজ প্রাণীতেও হয়। (ii) এটি একটি উপচিতিমূলক (Anabolic) জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। (iii) ক্লোরোফিল সৌরশক্তিকে শোষণ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। (iv) এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) জলের ($H_2O$) হাইড্রোজেন ($H^+$) ও ATP দিয়ে বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি করে। (v) সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে শর্করার মধ্যে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়। (vi) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা ও অক্সিজেন ($O_2$) উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ এই অক্সিজেন পরিবেশে পরিত্যাগ করে।

> সালোকসংশ্লেষের সমীকরণে দেখানো হয়েছে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে সালোকসংশ্লেষে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ গ্লুকোজ নয়। উৎপন্ন হয় শ্বেতসার (প্লাস্টিডের স্ট্রোমায়) অথবা সুক্রোজ (কোশের সাইটোপ্লাজমে) তবে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে গ্লুকোজ উৎপন্ন হতে পারে। প্রচলিত ধারণা সালোকসংশ্লেষে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ গ্লুকোজ। আলোচনার সুবিধার জন্য গ্লুকোজ লেখা হয়েছে।

■ (d) **সালোকসংশ্লেষে রঞ্জকতন্ত্র (Pigment systems in Photosynthesis) :**

যে সব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষে কার্যকর, তারা দুটি **রঞ্জকতন্ত্র** নিয়ে গঠিত, যেমন— (i) **প্রথম রঞ্জকতন্ত্র** (Pigment system–I) ও (ii) **দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র** (Pigment system–II)।

(i) **প্রথম রঞ্জকতন্ত্র** — প্রথম রঞ্জকতন্ত্রে প্রায় 300 – 400 টি অপ্রতিপ্রভ (Non-fluorescent) ক্লোরোফিল–a থাকে। এই ক্লোরোফিল–a-র সর্বাপেক্ষা বেশি আলোক শোষণের ক্ষমতা 700 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে হয়। এই ক্লোরোফিল P-700 নামে পরিচিত। এই রঞ্জকতন্ত্রে সাইটোক্রোম–b, ফেরিডক্সিন, প্লাস্টোসায়ানিন নামে ইলেকট্রন গ্রহীতাও থাকে। গ্রাণা পর্দার বাইরের দিকে এই রঞ্জকতন্ত্র থাকে।

(ii) **দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র** — দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র 100 টি প্রতিপ্রভ (Fluorescent) ক্লোরোফিল–a, ক্লোরোফিল-b, ও ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল প্রভৃতি সহকারী রঞ্জক পদার্থ নিয়ে গঠিত। অনেক সময় উদ্ভিদ অনুসারে ক্লোরোফিল–c, – d-ও থাকে। ক্লোরোফিল

680 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এই রঞ্জকতন্ত্রে সক্রিয় হয় এবং P680 নামে পরিচিত। এই রঞ্জকতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়। ক্লোরোফিল ও অন্যান্য সহকারী রঞ্জকপদার্থ ছাড়া প্লাস্টোকুইনন, প্লাস্টোসায়ানিন এবং সাইটোক্রোম–$b_6$ এর অন্তর্গত।

## ◎ 4.5. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার আলোক ও অন্ধকার দশার প্রাথমিক ধারণা ◎ (Outline concept of Light and Dark reaction phases)

প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষ একটি জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে সালোকসংশ্লেষ সামগ্রিকভাবে **একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া** (Oxidation-reduction process)। **আলোক দশায় জল জারিত হওয়ার ফলে অক্সিজেন মুক্ত হয় এবং অন্ধকার দশায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হওয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) উৎপন্ন হয়।** সামগ্রিক রাসায়নিক সমীকরণে জানা যায় যে ক্লোরোফিল আলোক শক্তি শোষণ করে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। যদি (12) অণু জল ও (6) অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাহলে মাত্র এক (1) অণু শর্করা (কার্বোহাইড্রেট), ছয় (6) অণু জল ও ছয় (6) অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে। ক্রমপর্যায়ে বহু উৎসেচকের (enzymes) সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার মধ্যবর্তী অস্থায়ী জৈবযৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই জটিল প্রক্রিয়াটি সমাধা হয়। প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল। ক্লোরোফিল শক্তি রূপান্তরের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শক্তি জোগায় সূর্যালোক।

➤ **সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reactions) :** সালোকসংশ্লেষ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রিয়া ঘটলেও এটি প্রধানত দুটি প্রধান দশায় ঘটে। 1905 খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যান** (Blackman) এই দুটি বিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দেন। এ দুটি হল— **আলোক দশা** (Light phase) বা **লাইট রিঅ্যাকশন** (Light reaction) এবং **অন্ধকার দশা** (Dark phase) বা **ডার্ক রিঅ্যাকশন** (Dark reaction)। এই অন্ধকার দশাকে **কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন** (Chemical reaction) কিংবা বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যানের** নামানুসারে **ব্ল্যাকম্যান রিঅ্যাকশন** (Blackman's reaction) বলা হয়। অনেকে অন্ধকার দশাকে **আলোক নিরপেক্ষ** দশাও বলেন। আলোক দশাকে আবার **আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়াও** (Photochemical reaction) বলে।

**• সালোকসংশ্লেষের প্রধান ও সাহায্যকারী উপাদান •**

- **সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদান**—$CO_2$, ক্লোরোফিল, সূর্যালোক / উপযুক্ত কৃত্রিম আলোক ও জল। এদের মধ্যে $CO_2$ ও জল কাঁচামাল (Raw material) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী উপাদান**—ADP, NADP, আলোকদশার বিভিন্ন ইলেকট্রনবাহক (প্লাস্টোকাইনিন, সাইটোক্রোম, প্লাস্টোসায়ানিন, ফেরেডক্সিন প্রভৃতি), RuBP ও বিভিন্ন উৎসেচক।

## ▲ A. আলোক বিক্রিয়া দশা (Light Reaction Phase)

আলোক দশা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টের **গ্রাণা** (Grana) অংশে সম্পন্ন হয়। এই আলোক দশায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে দিনের বেলায় পাতার ওপর সূর্যালোক পড়লে পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোকের ফোটোন কণা শোষণ করে উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়। একে **ক্লোরোফিলের সক্রিয়তা** বলে। উত্তেজিত ক্লোরোফিল নির্দিষ্ট ইলেকট্রন গ্রাহকের সান্নিধ্যে এলে ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে আয়নিত হয় ও একটি তীব্র জারকে পরিণত হয়। এই অবস্থায় **জলের জারণ ঘটে**। জল বিশ্লিষ্ট হয়ে $H^+$ আয়ন, ইলেকট্রন ($e^-$) ও অক্সিজেন ($O_2$) উৎপন্ন করে। এই ইলেকট্রন আয়নিত ক্লোরোফিলকে প্রশমিত করে। নির্গত $H^+$ আয়ন থাইলাকয়েডের গহ্বরের ভিতরে এক প্রোটনমোটিভ বল সৃষ্টি করে এই পরিস্থিতিতে ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) যুক্ত হয়ে ATP তৈরি হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে ক্লোরোফিল থেকে নির্গত ইলেকট্রন $NADP^+$-এর কাছে আসে এবং ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অঞ্চলে বেশি ঘনত্বের $H^+$-এর সাহচর্যে $NADP + H^+$ ($NADP^+ + 2e^- + 2H^+ = NADPH + H^+$) উৎপন্ন করে। ATP উৎপন্ন হওয়ার অর্থ আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর। $NADPH + H^+$ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ একটি বিজারক পদার্থের সৃষ্টি হয় যা অন্ধকার দশায় বিক্রিয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যায় এই আলোকদশায় জল, ক্লোরোফিল, আলোক NADP, ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) প্রয়োজন এবং ফলস্বরূপ ATP, NAPDH+$H^+$ ও $O_2$ উৎপন্ন হয়। এই আলোক বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত কয়েকটি অন্তর্বর্তী ধাপে সম্পন্ন হয় ঃ

● **1. ক্লোরোফিলের আলোক শোষণ ও সক্রিয়তা (Absorption of light energy and its activation) ঃ** এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এতে ক্লোরোফিল, জল ও আলোক অংশগ্রহণ করে এবং $O_2$ মুক্ত হয়। এছাড়াও এই বিক্রিয়ায় ADP, অজৈব ফসফেট (Pi) ও NADP প্রয়োজন।

(a) **ক্লোরোফিলের ফোটোন কণিকা শোষণ** (Absorption of Photon by chlorophyll)—সূর্যালোক শক্তিবাহী ফোটোন কণার সমন্বয়ে গঠিত। উন্নত উদ্ভিদে ক্লোরোফিল দুটি পর্যায়ে (প্রথম রঞ্জকতন্ত্র ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র) ফোটোন কণা শোষণ করে এবং উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়। একে **ক্লোরোফিলের সক্রিয়তা** বলে। ক্লোরোফিলের উত্তেজিত পরমাণু ট্রিপলেট দশায় থাকলে (স্থিতি = $10^{-3}$ সেকেন্ড) আলোক বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই ট্রিপলেট দশায় থাকার সময় নিকটবর্তী কোনো ইলেকট্রন গ্রাহক পেলে উত্তেজিত ক্লোরোফিল থেকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত হয়। দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PSII) থেকে নির্গত ইলেকট্রন বিভিন্ন জৈব বাহকের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সময় কিছুটা শক্তি পরিত্যাগ করে নিম্নশক্তিস্তরে ফিরে আসে। এর মধ্যে প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PSI) থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার কারণে ওই ক্লোরোফিল আয়নিত হওয়ায় দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র থেকে আগত ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং প্রশমিত হয়।

(b) **জলের আলোক বিশ্লেষণ বা ফোটোলিসিস (Photolysis of water)**—দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রের (PSII) আয়নিত ক্লোরোফিল তীব্র জারকধর্মী। এই আয়নিত ক্লোরোফিলের ইলেকট্রন চাহিদা পূর্ণ করার তাগিদে জলের আলোক জারণ বিশ্লেষণ ঘটে। জল ($H_2O$) বিশ্লিষ্ট হয়ে $H^+$ আয়ন, ইলেকট্রন ও অক্সিজেন অণু সৃষ্টি করে।

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$$
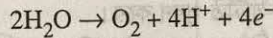
সূর্যালোকের সহায়তায় জলের এই বিশ্লেষণকে **ফোটোলিসিস** বলে। আলোক বিশ্লেষণে বা জারণে ম্যাঙ্গানিজ ও $D_1$ প্রোটিন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **2. উপজাত পদার্থ হিসাবে অক্সিজেন নির্গমন (Evolution of Oxygen as by products) ঃ** একটি আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী (S—State mechanism) জল থেকে অক্সিজেন নির্গমন অত্যন্ত জটিল। এসময় দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রে থাকা OEC (Oxygen Evolving Complex) সক্রিয় হয়। অক্সিজেন নির্গমন পদ্ধতিটি সরলীকৃত চিত্ররূপ পাশে দেওয়া হল।

জলের আলোক জারণে অক্সিজেন নির্গমন পদ্ধতি চারটি পর্যায়ে ঘটে। বেসেল কক এই পদ্ধতিকে S-দশা প্রণালী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অক্সিজেন ইভলভিং কমপ্লেক্সের মধ্যে (OEC) থাকা পাঁচটি ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ S দশা ($S_0, S_1, S_2, S_3, S_4$) থাকে। $S_0$ আয়নিত দশা নয়। কিন্তু প্রতিটি দশাভিত্তিক পরিবর্তনে ফোটোন কণা গৃহীত হয় ($S_0 \rightarrow S_1$, $S_1 \rightarrow S_2$, $S_2 \rightarrow S_3$, $S_3 \rightarrow S_4$) এবং $S_4$ চারটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়। প্রতিটি পরিবর্তনে একটি করে ইলেকট্রন ($e^-$) নির্গত হয়; সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের সময় দুই অণু জল জারিত হয়ে এক অণু $O_2$ উৎপন্ন করে এবং চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আবার $S_0$ দশায় ফিরে আসে।
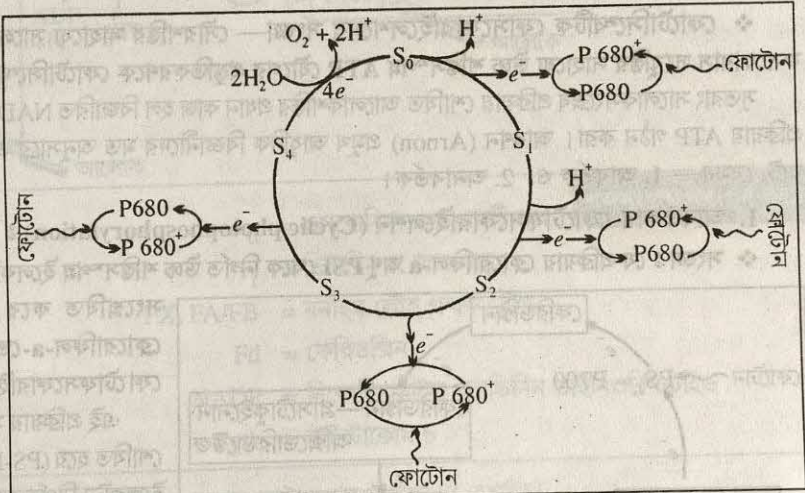
চিত্র 4.8 ঃ অক্সিজেন নির্গমন সংক্রান্ত বেসেলককের (1970) ঘড়ির চিত্ররূপ।

● **3. বিজারিত গ্রাহক NADPH+$H^+$-এর উৎপাদন (Formation of reduced $H_2$ acceptor NADPH+$H^+$) ঃ** উত্তেজিত ক্লোরোফিল-a অণু থেকে উচ্চশক্তি যুক্ত ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন বাহকের (ফেরিডক্সিন, ফ্লেভোপ্রোটিন

প্রভৃতি) মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। ওই ইলেকট্রন গ্রহণ করে NADP (প্রান্তীয় গ্রাহক) শক্তিযুক্ত $NADP^-$-তে পরিণত হয়। $NADP^-$-এর মধ্যে আলোকশক্তি ইলেকট্রন শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়। এরপর $NADP^-$ বিশ্লিষ্ট জলের $H^+$-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে $NADPH+H^+$ গঠন করে।

**সমীকরণ** — $NADP + 2e^- + 2(H^+) \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} NADPH + H^+$
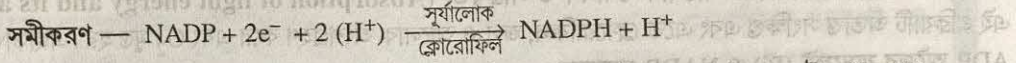
4. **সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর বা ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন বা ATP উৎপাদন (Conversion of Solar energy to chemical energy or Photosynthetic phosphorylation or Production of ATP) ঃ**

এই সব বিক্রিয়ার পর্যায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে ঘটতে দেখা যায়—

**হিল ও ব্যান্ডেল** (Hill and Bandel, 1960) নানারকম পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে সবুজ উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে দুটি গোষ্ঠীতে সজ্জিত থাকে। এদের নাম হল—**প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS-I)** ও **দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-II)**।

(i) **প্রথম রঞ্জক তন্ত্র বা Pigment system I** (PS-I)— PSI ফোটোন কণিকা শোষণে সক্রিয় বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ক্লোরোফিল অণু থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন (High energy electron) কণা ($e^-$) ছিটকে বাইরে নির্গত হয়।

(ii) এই উচ্চশক্তিযুক্ত ইলেকট্রন কণাটি NADP-কে বিজারিত করে; ফলে PSI একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়। ওই ঘাটতি পূরণের জন্য **দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র** বা **Pigment system II** (PS-II) ফোটোন শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং এর থেকে একটি ইলেকট্রন ছিটকে ($e^-$) আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি জৈব ইলেকট্রন বাহকের (Carrier) মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত করে নিষ্ক্রিয় বা নিস্তেজ অবস্থায় আবার PS-I-এর ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে। জল বিশ্লিষ্ট হওয়ার পর ইলেকট্রন দিয়ে PS-II-এর ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে।

(iii) এই প্রক্রিয়া চলার সময় ইলেকট্রনগুলি শক্তি মুক্ত করে। এই শক্তি, কোশমধ্যস্থ ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট) এবং অজৈব ফসফেট (Pi) গ্রহণ করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP-তে (অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট) পরিণত হয়।

**সমীকরণ** — $ADP + Pi \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলোক}} ATP$
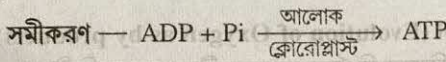
এর মাধ্যমে সূর্যের শক্তি সমন্বিত ইলেকট্রন শক্তি ATP অণুতে আবদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রকার বিবর্তনের সময় শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে ATP অণুতে সঞ্চিত হয়।

❖ **ফোটোসিন্থেটিক ফোসফোরাইলেশনের সংজ্ঞা— সৌরশক্তির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে ADP-র সঙ্গে ফসফোরাস সংযুক্তির সাহায্যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP যৌগের প্রস্তুতিকরণকে ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন বলা হয়।**

সুতরাং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শোষিত আলোকশক্তির প্রধান কাজ হল বিজারিত $NADPH+H^+$ ও ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ATP গঠন করা। **আরণন** (Arnon) প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত অনুসারে এই ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া দুভাবে ঘটে, যেমন— 1. **আবর্তক** ও 2. **অনাবর্তক**।

**1. আবর্তকার ফোটোফসফোরাইলেশন (Cyclic photophosphorylation) ঃ**

❖ **সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল-a অণু PSI থেকে নির্গত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের সাহায্যে ATP সংশ্লেষিত করে নিস্তেজ হয়ে চক্রাকারে আবার ক্লোরোফিল-a-তে ফিরে আসে তাকে আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন বলে।**
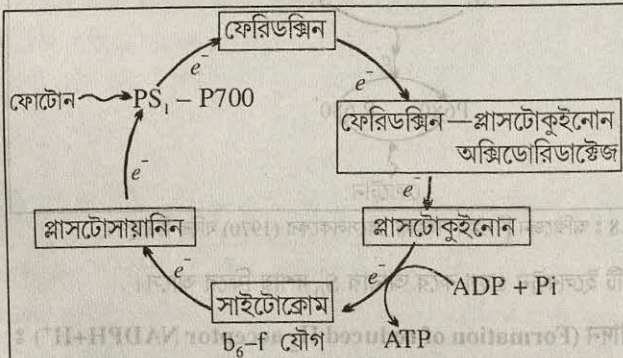
চিত্র 4.9 ঃ আবর্তাকার বা চক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন।

এই প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক ক্লোরোফিল অণুর সাহায্যে শোষিত হয়ে (PS-I) উত্তেজিত হয় এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত করে। এই ইলেকট্রন কতকগুলি বাহকের (ফেরিডক্সিন, ফেরিডক্সিন—প্লাসটোকুইনোন অক্সিডোরিডাক্টেজ, প্লাসটোকুইনন, সাইটোক্রোম $b_6$-f যৌগ, প্লাস্টোসায়ানিন ইত্যাদি) মাধ্যমে বাহিত হয়ে চক্রাকারে আবার PSI-এ ($P_{700}$) ফিরে আসে ও সঙ্গে সঙ্গে $OH^-$ মূলক গঠিত হয়। ইলেকট্রন বাহিত শক্তি

ক্রমশ কমে আসে এবং কেমিঅসমোটিক পদ্ধতিতে (প্রোটোনমোটিভ বল) ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) যুক্ত হয়ে ATP গঠন করে। এই প্রক্রিয়ায় NADPH + $H^+$ তৈরি হয় না এবং জল প্রয়োজন না হওয়ায় অক্সিজেন ($O_2$) উৎপন্ন হয় না।

### 2. অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন ও Z রেখাচিত্র (Non-cyclic Photophosphorylation and Z scheme) :

❖ **সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ায় PS-I তন্ত্রের ক্লোরোফিল-a থেকে নির্গত উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন জৈব বাহকের সাহায্যে প্রান্তগ্রাহক $NADP^+$-এর সঙ্গে মিলিত হয় এবং ক্লোরোফিল-a অণুর শূন্যস্থান PS-II তন্ত্রের ক্লোরোফিল থেকে নির্গত ইলেকট্রনের সাহায্যে পূর্ণ হয় এবং পথে ATP তৈরি হয় তাকে অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন বলে।**

এই প্রক্রিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-I এবং PS-II)—উভয়ের সাহায্যে ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন। প্রক্রিয়ার শেষে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP ও বিজারিত NADPH + $H^+$ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রের ক্লোরোফিল-a অণু সূর্যালোক শোষণ করায় ক্লোরোফিল অণু থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এই সময় জলের আলোক বিশ্লেষণ ঘটে ও ইলেকট্রন নির্গত হয়। ওই ইলেকট্রন এসে ক্লোরোফিল (PS-II) অণুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এদিকে ক্লোরোফিল অণু (PS-II) থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন প্লাস্টোকুইনন (Plastoquinon), সাইটোক্রোম $b_6$-f যৌগ ও প্লাস্টোসায়ানিন বাহক দিয়ে প্রথম রঞ্জকতন্ত্রের (PS-I) ক্লোরোফিলে যুক্ত হয়। ইলেকট্রন প্রবাহিত হবার সময় একটি ধাপে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP অণু গঠিত হয়।
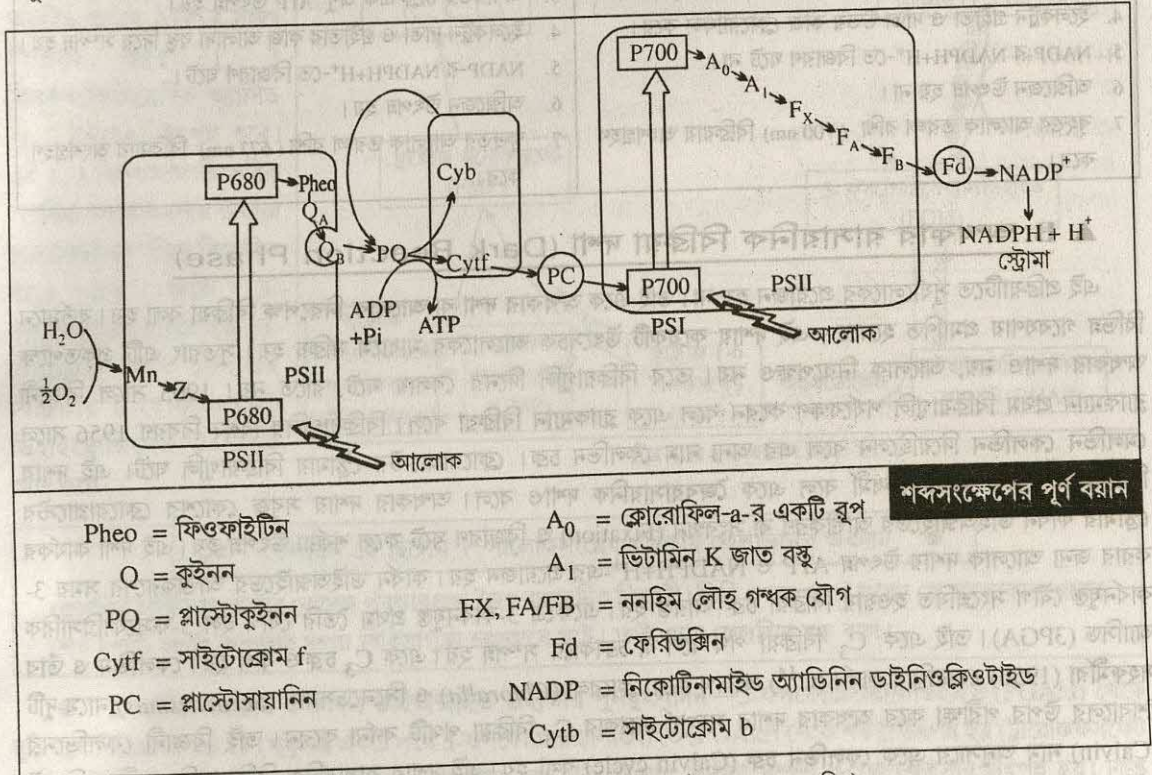
চিত্র 4.10 : অনাবর্ত বা অচক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন (Z রেখাচিত্র)।

এর পর প্রথম রঞ্জকতন্ত্রের (PS–I) ক্লোরোফিল থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনকে NADP গ্রহণ করে ও জল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে আসা $H^+$ আয়ন $NADP^+$ সঙ্গে যুক্ত হয়ে NADPH+$H^+$ গঠন করে।

আলোক দশার সামগ্রিক বিক্রিয়া— $2H_2O + 2NADP + 2ADP + 2Pi \longrightarrow 2\,ATP + 2NADPH{+}H^+ + O_2$
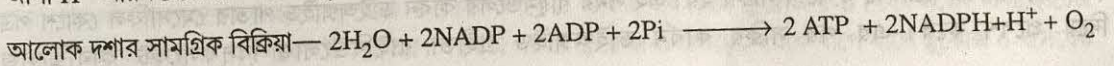
➤ **আলোক দশার তাৎপর্য (Significance of light phase) :**

নিম্নলিখিতগুলি আলোক দশার তাৎপর্য, যেমন—

(i) আলোক শক্তি ক্লোরোফিল শোষণ করে এবং ওই আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(ii) এই দশায় আলোক জলের বিশ্লেষণ ঘটায়, ফলে $O_2$ উৎপন্ন হয়।

(iii) আলোক দশায় উৎপন্ন $NADPH+H^+$ ও ATP অন্ধকার দশা আরম্ভ করতে ও $CO_2$-এর বিজারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

● **আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনের পার্থক্য : (Difference between Cyclic and Non-cyclic Photophosphorylation) :**

| আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন | অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন |
| --- | --- |
| 1. প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS-I) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে। | 1. প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-I ও PS-II) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। |
| 2. জলের প্রয়োজন হয় না। | 2. জল ছাড়া এই প্রক্রিয়া চলে না। |
| 3. একবারের আবর্তক চক্রে দু' অণু ATP উৎপন্ন হয়। | 3. অনাবর্তক চক্রে এক অণু ATP উৎপন্ন হয়। |
| 4. ইলেকট্রন গ্রহীতা ও দাতা উভয় কাজ ক্লোরোফিল করে। | 4. ইলেকট্রন দাতা ও গ্রহীতার কাজ আলাদা বস্তু দিয়ে সম্পন্ন হয়। |
| 5. NADP-র $NADPH+H^+$-তে বিজারণ ঘটে না। | 5. NADP-র $NADPH+H^+$-তে বিজারণ ঘটে। |
| 6. অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না। | 6. অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। |
| 7. বৃহত্তর আলোক তরঙ্গ রশ্মি (700 nm) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। | 7. ক্ষুদ্রতর আলোক তরঙ্গ রশ্মি (673 nm) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। |

## ▲ B. অন্ধকার রাসায়নিক বিক্রিয়া দশা (Dark Reaction Phase)

এই প্রক্রিয়াটিতে সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না। তাই একে **অন্ধকার দশা বা আলোক নিরপেক্ষ বিক্রিয়া** বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—এই দশায় কয়েকটি উৎসেচক আলোকের মাধ্যমে সক্রিয় হয়। সুতরাং এটি প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার দশাও নয়, আলোক নিরপেক্ষও নয়। তবে বিক্রিয়াগুলি দিনের বেলায় ঘটে, রাতে নয়। 1905 সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান প্রথম বিক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করেন বলে একে **ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া** বলে। বিক্রিয়াগুলির বিশদ বিবরণ 1956 সালে **মেলভিন কেলভিন** দিয়েছিলেন বলে এর অন্য নাম কেলভিন চক্র। ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় বিক্রিয়াগুলি ঘটে। এই দশার বিক্রিয়াগুলি জৈব রাসায়নিকধর্মী বলে একে **জৈবরাসায়নিক দশাও** বলে। অন্ধকার দশায় সবুজ কোশের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ বা সংবন্ধন (Fixation) ও বিজারণ ঘটে ফলে শর্করা উৎপন্ন হয়। এই দশা কার্যকর করার জন্য আলোক দশায় উৎপন্ন ATP ও $NADPH+H^+$-এর প্রয়োজন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণের সময় 3-কার্বনযুক্ত যৌগ সংশ্লেষিত হওয়ায় বিক্রিয়া চক্র আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে 3-কার্বনযুক্ত প্রথম তৈরি যৌগ হল 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA)। তাই একে $C_3$ বিক্রিয়া পথ বলে যা চক্রাকারে সম্পন্ন হয়। একে **$C_3$ চক্র**ও বলা হয়। **কেলভিন ও তাঁর সহকর্মীরা** (1956) তেজস্ক্রিয় কার্বন ($C^{14}$) প্রয়োগ করে ক্লোরেলা (*Chloralla*) ও সিনেডেসমাস (*Scenedesmus*) নামে দুটি শৈবালের উপর পরীক্ষা করে অন্ধকার দশার সম্পূর্ণ চক্রাকার $C_3$ বিক্রিয়া পথটি বর্ণনা করেন। তাই বিজ্ঞানী কেলভিনের (Calvin) নাম অনুসারে একে **কেলভিন চক্র** (Calvin cycle) বলা হয়। এই দশার রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে নীচে তিনটে পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

● **1. নির্দিষ্ট গ্রহীতা দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংবন্ধন**—ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রহীতা রাইবিউলোজ মনোফসফেট (RuMP) প্রথমে আলোক দশায় উৎপন্ন ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে রাইবিউলোজ-1-5-বিস্‌ফসফেট (RuBP) পরিণত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়। এই সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার মেসোফিল কোশে পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এর পর সক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা রাইবিউলোজ বিস্‌ফস্‌ফেট কার্বক্সিলেজ—

অক্সিজেনেজ (RUBISCO) উৎসেচকের সাহায্যে যুক্ত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংবন্ধনের পর একটি অস্থায়ী 6-কার্বনযুক্ত যৌগ **বিস্‌ফসফো কার্বক্সিঅ্যারাবিনিটল** (BPCA) উৎপন্ন হয়। এই অস্থায়ী যৌগটি জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড** সৃষ্টি করে। এই 3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড হল অন্ধকার দশায় উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ (First stable compound)।

● **2. সংবন্ধনে উৎপন্ন ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিডের বিজারণ**—3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড প্রথমে ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1, 3 বিস্‌ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড (1, 3 BPGA) উৎপন্ন করে। এই 1, 3 বিস্‌ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড আলোকদশায় উৎপন্ন NADPH+$H^+$ দিয়ে বিজারিত হয়। এর ফলে 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (3-PGAlD) তৈরি হয়। এই বিক্রিয়ায় ট্রায়োজফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক কাজ করে।
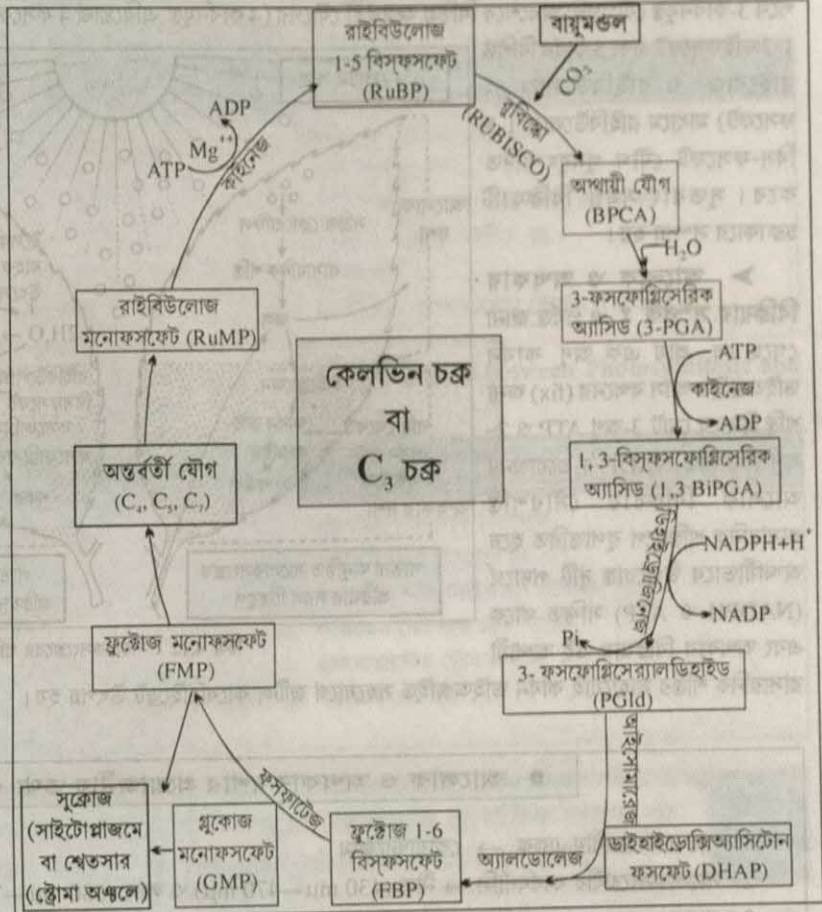
চিত্র 4.11 : কেলভিন চক্র।

● **কেলভিন কে ছিলেন ? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কেলভিনের অবদান** ●

**কেলভিন** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক বিজ্ঞানী। তিনি প্রথমে প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষের শেষ দশাটি অর্থাৎ অন্ধকার দশায় বিক্রিয়াগুলি চক্রাকারে ঘটে। তাই একে **কেলভিন চক্র** বলে।

● **3. শর্করা সংশ্লেষ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতার পুনরুৎপাদন**—3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (PGAld) থেকে দুটি পথে বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। শুধুমাত্র একটি পথে 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (PGAld) থেকে শর্করা উৎপন্ন হয়। ট্রায়োজফসফেট (3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড / ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট) স্ট্রোমায় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করলে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টের পর্দা অতিক্রম করে সাইটোসলে নির্গত হলে সুক্রোজ উৎপাদিত হয়। সালোকসংশ্লেষে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয় না (আধুনিক মতবাদ)। 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ট্রায়োজফসফেট আইসোমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট (DHAP) রূপান্তরিত হয়। এর পর এক অণু ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ও এক অণু ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট যুক্ত হয়ে অ্যালডোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ 1-6 বিসফসফেটে উৎপন্ন হয়। এই ফ্রুক্টোজ 1-6 বিসফসফেট ফসফোটেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট উৎপন্ন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রুক্টোজ-6 ফসফেট থেকে ধাপে ধাপে গ্লুকোজ 6-ফসফেট

ও সুক্রোজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় এই চক্রাকার পদ্ধতিতে শর্করা তৈরি করে। আবার অন্য পথে 3-কার্বনযুক্ত যৌগগুলি অবশেষে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগের (4 কার্বনযুক্ত এরিথ্রোজ 4 ফসফেট, 7 কার্বনযুক্ত সেডোহেপটুলোজ 1-7 ডাইফস্ফেট এবং 5 কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ ও রাইবিউলোজ 5-ফসফেট) মাধ্যমে রাইবিউলোজ 1-5 বিস-ফসফেট যৌগ পুনরুৎপাদিত করে। সুতরাং সমগ্র বিক্রিয়াটি চক্রাকারে সম্পন্ন হয়।

চিত্র 4.12 : সালোকসংশ্লেষের প্রক্রিয়া।

➤ **আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়ার সম্পর্ক :** এ পর্যন্ত জানা গেছে যে, প্রায় এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বন্ধনের (fix) জন্য শক্তি হিসাবে মোট 3-অণু ATP ও 2-অণু বিজারিত NADP-র প্রয়োজন। আলোক বিক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়ে অস্থায়ীভাবে উপরোক্ত দুটি পদার্থে (NADPH ও ATP) সঞ্চিত থাকে এবং অন্ধকার বিক্রিয়ায় ওই অস্থায়ী রাসায়নিক শক্তির সাহায্যেই কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে জটিল কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়।

**● আলোক ও অন্ধকার দশার প্রয়োজনীয় তথ্য ●**

1. সালোকসংশ্লেষীয় একক → কোয়ান্টাজোম
2. সালোকসংশ্লেষীয় কার্যবর্ণালি → নীল (430 mμ—470 mμ) ও লাল (680 mμ—700 mμ)
3. প্রধান রঞ্জক → ক্লোরোফিল ($P_{680}$ ও $P_{700}$)
4. সহকারী রঞ্জক → ক্লোরোফিল b, c, d, e, ক্যারোটিনয়েডস, ফাইকোসায়ানিন, ফাইকোএরিথ্রিন ইত্যাদি
5. উপজাত বস্তু → $O_2$, $H_2O$
6. আলোক দশার স্থান ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণা অংশে
7. আলোক দশায় প্রয়োজনীয় উপাদান → সূর্যালোক, জল, ক্লোরোফিল, $NADP^+$, ADP, বিভিন্ন ইলেকট্রনবাহক, অজৈব ফসফেট ইত্যাদি
8. উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস → শোষিত জল
9. আলোক দশায় প্রাপ্ত → ATP, $NADPH + H^+$, $O_2$
10. অন্ধকার দশার স্থান → ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায়
11. অন্ধকার দশায় প্রাপ্ত → শর্করা (শ্বেতসার অথবা সুক্রোজ), RuBP পুনরুৎপাদন, ADP, $NADP^+$
12. 6 অণু $CO_2$ গৃহীত হলে কেলভিন চক্রে প্রয়োজনীয় ATP এবং $NADPH + H^+$-এর সংখ্যা → 18 অণু ATP; 12 অণু $NADPH + H^+$

● **আলোক বিক্রিয়া ও অন্ধকার বিক্রিয়ার পার্থক্য (Difference between Light reaction and Dark reaction) ঃ**

| আলোক বিক্রিয়া | অন্ধকার বিক্রিয়া |
|---|---|
| 1. সূর্যালোকের প্রয়োজন। | 1. সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না। |
| 2. অক্সিজেন নির্গত হয়। | 2. $CO_2$ শোষিত হয়। |
| 3. ATP উৎপন্ন হয়। | 3. ATP-র প্রয়োজন হয় এবং শর্করা উৎপন্ন হয়। |
| 4. NADP বিজারিত হয়। | 4. বিজারিত NADP জারিত হয়। |
| 5. জলের বিশ্লেষণ ঘটে। | 5. এইরূপ ঘটে না। |
| 6. এই বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণায় সম্পন্ন হয়। | 6. এই বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয়। |

● **সালোকসংশ্লেষ ও অঙ্গার আত্তীকরণের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Photosynthesis and Carbon Assimilation) ঃ**

| সালোকসংশ্লেষ | অঙ্গার আত্তীকরণ |
|---|---|
| 1. এই প্রক্রিয়া আলোকের উপর নির্ভর করে। | 1. এই প্রক্রিয়া আলোক নিরপেক্ষ। |
| 2. ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয়। | 2. ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় না। |
| 3. শক্তির রূপান্তর ঘটে। | 3. রূপান্তরিত শক্তি আত্তীকরণে প্রয়োজন হয়। |
| 4. অক্সিজেন বের হয়। | 4. অক্সিজেন বের নাও হতে পারে। |
| 5. ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণা ও স্ট্রোমাতে ঘটে। | 5. ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় ঘটে। |
| 6. প্রথম ধাপে ATP, NADPH+$H^+$ ও $O_2$ ও পরবর্তী বা দ্বিতীয় ধাপে সুক্রোজ বা শ্বেতসার উৎপন্ন হয়। | 6. শর্করা উৎপন্ন হয়। |

## ◎ 4.6. ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা ◎ (Basic idea of Bacterial Photosynthesis)

সবুজ উদ্ভিদ ছাড়াও যেসব ব্যাকটেরিয়াতে রঞ্জক পদার্থ থাকে, তারাও সংলোকসংশ্লেষ করতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলির দেহকোশের মধ্যে *ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল* (Bacteriochlorophyll), *ব্যাকটেরিওভিরিডিন* (Bacteriovireidin) নামে রঞ্জক পদার্থ থাকে। এদের **সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া** (Photosynthetic bacteria) বলা হয়।

সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়াকে তাদের রং ও যেখানে থাকে তার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(i) **সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া** (Green Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**— *ক্লোরোবিয়াম* (*Chlorobium*) ও *ক্লোরোসিউডোমোনাস* (*Chloroseudomonas*)।

(ii) **বেগুনি-লাল সালফার ব্যাকটেরিয়া** (Purple Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**—*ক্রোম্যাটিয়াম* (*Chromatium*) ও *থায়োস্পাইরিলাম* (*Thiospirillum*)।

(iii) **সালফারবিহীন ব্যাকটেরিয়া** (Non-Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**—*রোডো-স্পাইরিল্যাম* (*Rhodospirillum*) ও *রোডো-সিউডোমোনাস* (*Rhodoseudomonas*)।

সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া ও বেগুনি-লাল সালফার ব্যাকটেরিয়া যথাক্রমে ব্যাকটেরিওভিরিডিন ও ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল-জাতীয় সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জকপদার্থ থাকে।

ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোশের ক্রোমাটোফোরের সাহায্যে অনুঘটিত (Catalyzed) ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাব্য পর্যায়ক্রম চিত্রে দেখানো হল (চিত্র 4.13 )। ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল দিয়ে আলোকে ফোটোন কণা শোষিত হওয়ার পর ইলেকট্রন নির্গত হয়ে ফেরেডক্সিনে পৌঁছায়। ফেরেডক্সিন আবার একটি ফ্লাভোপ্রোটিনের (FMN) মাধ্যমে NADকে ইলেকট্রন দান করে এবং NAD-র আলোক বিজারণ ঘটায়। ফেরেডক্সিন ও ফ্ল্যাভোপ্রোটিন উভয়ে ইউবিকুইননে ইলেকট্রন সংযোগ করতে সক্ষম হয়। সাক্‌সিনেট বা ফিউমারেট (জৈব মাধ্যম) ইউবিকুইননকে ইলেকট্রন দান করতে পারে বা ইউবিকুইনন জৈব মাধ্যমগুলিকে বিজারিত করে অথবা **রোডোস্পাইরিলাম হিমিপ্রোটিনে** (RHP) ইলেকট্রন স্থানান্তরিত করে।
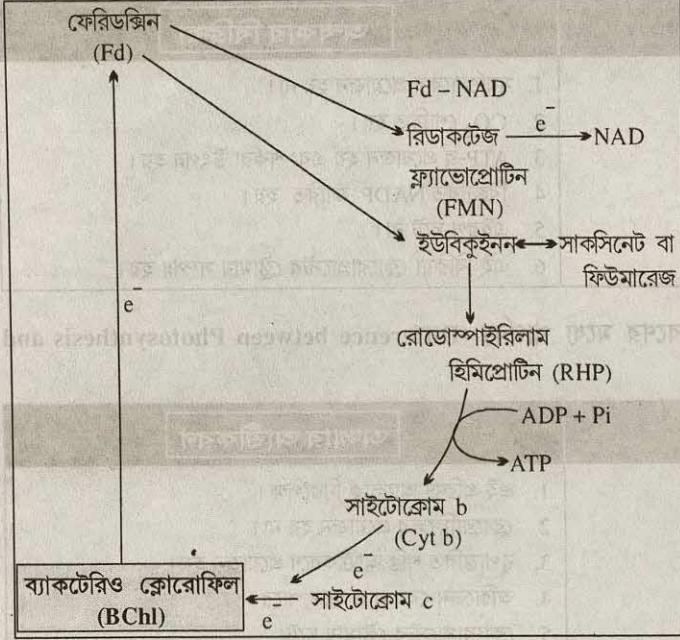
চিত্র 4.13 ঃ সালোকসংশ্লেষীয় ব্যাকটেরিয়ার ইলেকট্রন স্থানান্তরকরণের চিত্ররূপ।

ইলেকট্রন স্থানান্তরিতকরণের পরবর্তী পর্যায়ে সাইটোক্রোম b ও c অংশগ্রহণ করে। ব্যাকটেরিয়া ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ফোটোফসফোরাইলেশন। ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোটোফোরে এই বিক্রিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন ফ্রেঙ্কেল (Frenkel—1954)। ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষে ফোটোফসফোরাইলেশনই হল প্রধান আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া। ব্যাকটেরিয়ার সলোকসংশ্লেষে অক্সিজেন নির্গত হয় না। তাই বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন ব্যাকটেরিয়ায় অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটি ঘটে না। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে অক্সিজেন নির্গমন ছাড়াই ব্যাকটেরিয়া অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়। এই পরিক্রমণে ইলেকট্রন একমুখীভাবে পরপর এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, যেমন—থায়োসালফেট, $H_2S$, জৈব অ্যাসিডসমূহ, DPIP—অ্যাসকরবেট হয়ে NADতে পৌঁছায়। NAD এই ক্ষেত্রে
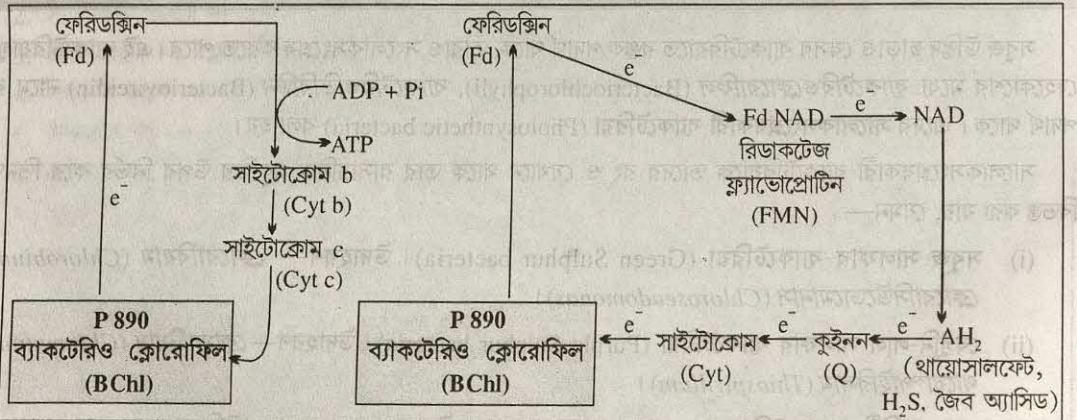
চিত্র 4.14 ঃ ব্যাকটেরিয়ার আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনের চিত্ররূপ।

ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে (লাসাভা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, 1961)। এইভাবে সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া ATPকে শক্তি হিসেবে সংশ্লেষ করে এবং NADPH ও $CO_2$-এর আবদ্ধকরণে বিজারকের ভূমিকা নেয়। চিত্রে আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন চক্রে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া দেখানো হল।

● **ব্যাকটেরীয় সালোকসংশ্লেষ ও উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের পার্থক্য (Difference between Bacterial photosynthesis and Plant Photosynthesis) :**

| ব্যাকটেরীয় সালোকসংশ্লেষ | উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ |
|---|---|
| 1. রঞ্জক পদার্থ ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল, ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল, ব্যাকটেরিওভিরিডিন থাকে। | 1. রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড ও ফাইকোবাইলিন থাকে। |
| 2. অঙ্গাণু হল ক্রোমোটোফোর যার মধ্যে রঞ্জক পদার্থ থাকে। | 2. অঙ্গাণু হল ক্লোরোপ্লাস্ট যার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে। |
| 3. দুটি রঞ্জকতন্ত্র কাজ করে। | 3. একটি রঞ্জকতন্ত্র কাজ করে। |
| 4. অক্সিজেন তৈরি হয় না। | 4. অক্সিজেন তৈরি হয়। |
| 5. হাইড্রোজেন দাতা হল জল। | 5. হাইড্রোজেন দাতা হল হাইড্রোজেন সালফাইড। |
| 6. আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন হল প্রধান। | 6. অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন হল প্রধান। |

## ◎ 4.7. $C_2$, $C_3$, $C_4$ বিক্রিয়াপথ ও CAM ◎
## ($C_2$, $C_3$, $C_4$ Reaction pathways and CAM)

❖ **$C_2$ বিক্রিয়াপথের সংজ্ঞা (Definition of $C_2$ reaction pathways) : যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াপথ ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবিউলোজ 1, 5 বিস্‌ফসফেট থেকে দুই কার্বনযুক্ত যৌগ গ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয় তাকে $C_2$ বিক্রিয়াপথ বলে।**

### ➤ 1. $C_2$ বিক্রিয়াপথ ($C_2$ Reaction Pathway) :

প্রধানত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সবুজ কোশে বিশেষ অবস্থায় (উচ্চ আলোর তীব্রতা, বেশি অক্সিজেন, কম কার্বন ডাইঅক্সাইড ও উচ্চ তাপমাত্রা) বিশেষ ধরনের শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটে তাকে **আলোক শ্বসন** বা **ফোটোরেসপিরেশন** (Photorespiration) বলে। এই ফোটোরেসপিরেশন বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে আরম্ভ হয়ে পারক্সিজোম, মাইটোকনড্রিয়া হয়ে আবার পারক্সিজোমের মধ্য দিয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে শেষ হয়।

বিশেষ অবস্থায় ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবিউলোজ বিসফসফেট মুখ্য উৎসেচক রাইবিউলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (RuBisCO)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর ফলে 3-কার্বন যুক্ত যৌগ—ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ও 2-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এর পর 2-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বিক্রিয়াগুলি প্রথমে ক্লোরোপ্লাস্ট, এর পর পারক্সিজোম এবং শেষে মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে। ওই বিক্রিয়াপথটি শেষে মাইটোকনড্রিয়া থেকে পারক্সিজোম হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে শেষ হয়। এই প্রক্রিয়াকে **আলোকশ্বসন** বা **ফোটোরেসপিরেশন** বলে। এই ফোটোরেসপিরেশন বিক্রিয়াপথটি 2-কার্বনযুক্ত যৌগ (ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড) থেকে আরম্ভ হয় বলে একে $C_2$ বিক্রিয়াপথ বলা হয়। এই বিক্রিয়ার ফলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের শর্করা উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়াটি এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করা হয়েছে।
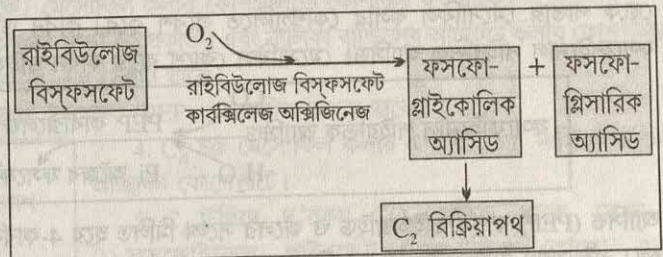
চিত্র 4.15 : $C_2$ বিক্রিয়াপথ।

### ➤ 2. $C_3$ বিক্রিয়াপথ ($C_3$ Reaction Pathway) :

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় সবুজ উদ্ভিদ কোশের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ ঘটে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একে **অন্ধকার বিক্রিয়া** (Dark reaction) বলে।

❖ **$C_3$ বিক্রিয়াপথের সংজ্ঞা (Definition of $C_3$ Reaction path) : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় $CO_2$-এর আত্তীকরণের সময় যে বিক্রিয়াপথ 3-কার্বনযুক্ত স্থায়ী যৌগ তৈরির মাধ্যমে আরম্ভ হয়, সেই বিক্রিয়াপথকে $C_3$ পথ বলে।**

এই বিক্রিয়ায় 3-কার্বনযুক্ত প্রথম তৈরি স্থায়ী যৌগ হল 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA)। এই $C_3$ বিক্রিয়া পথটি চক্রাকারে সম্পন্ন হয় এবং সম্পূর্ণ বিক্রিয়া পথটি সম্পন্ন হওয়ার সময় একদিকে শর্করা (গ্লুকোজ, শ্বেতসার ইত্যাদি) সংশ্লেষিত হয় এবং অপর দিকে কার্বন ডাইঅক্সাইডগ্রহীতা পুনরায় উৎপন্ন হয়। এই সমগ্র $C_3$ বিক্রিয়াপথটি কেলভিন ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন। তাই সমগ্র চক্রাকার $C_3$ বিক্রিয়াপথটিকে **কেলভিন চক্র** বলা হয়। এই $C_3$ বিক্রিয়া সব সবুজ উদ্ভিদে ঘটে। প্রায় সব দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এই $C_3$ বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষ করে বলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকে $C_3$ উদ্ভিদ বলা হয়। **$C_3$ বিক্রিয়াপথ**—আগে এই অধ্যায়ে অন্ধকার দশায় ছকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

### ➤ 3. $C_4$ বিক্রিয়াপথ ($C_4$ Reaction Pathway) :

প্রথমে সকলের ধারণা ছিল সালোকসংশ্লেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংবন্ধন (Fixation) সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেলভিন চক্রের মাধ্যমে ঘটে। কিন্তু 1965 খ্রিস্টাব্দে **কর্টসচক, হ্যার্ট ও বুর** (Kortschak, Hart and Burr) আখ গাছে তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ($^{14}CO_2$) প্রয়োগ করে প্রমাণ করেন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় প্রথমে ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের সাহায্যে $CO_2$ গৃহীত হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণের ফলে 4-কার্বনযুক্ত যৌগ অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ম্যালিক ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। এই বিক্রিয়াপথকে **হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্র** বলে। বর্তমানে প্রায় 900 প্রজাতির উদ্ভিদের কোশে এই চক্র দেখা যায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ একবীজপত্রী এবং কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। একবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে যেমন—প্যানিকাম, মুথা, জোয়ার, ভুট্টা এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে নোটে, অ্যাট্রিপ্লেক্স প্রভৃতি সচরাচর দেখা যায়। $C_4$ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হল নালিকাবান্ডিলকে বেষ্টিত করে একটি ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত আবরণী কোশের স্তর থাকে। এই বিশেষ অঙ্গকে **ক্রান্জ অঙ্গসংস্থান** বলে।

❖ (a) **হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের বা $C_4$ চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Hatch and Slack cycle or $C_4$ Cycle) : যে প্রক্রিয়ায় সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশায় ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়, 4-কার্বনযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে তাকে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বলে।**

◘ (b) **হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের বিক্রিয়া চক্র (Reactions of Hatch and Slack cycle) :**

1. **মেসোফিল কলার কোশে ক্লোরোপ্লাস্টের বিক্রিয়া**—দেখা যায় উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলায় $C_4$ চক্র এবং নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদনের (Bundle sheath) কোশে $C_3$ চক্র সংঘটিত হয়। চক্রাকার বিক্রিয়ার প্রথমে $CO_2$ বায়ুমণ্ডল থেকে পাতার মেসোফিল কলার কোশগুলিতে প্রবেশ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রথম গ্রহীতা হল 3-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড। মেসোফিল কোশে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করার পর ফসফোইনোল পাইরুভিক

$$\text{ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড} + CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{PEP কার্বক্সিলেজ}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + \text{Pi অজৈব ফসফেট}$$
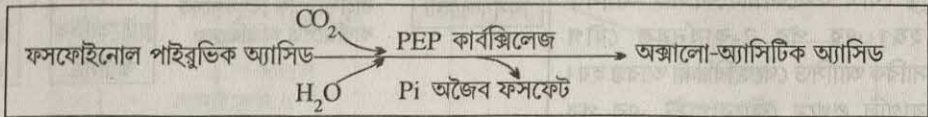
অ্যাসিড (PEP) কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 4-কার্বনযুক্ত অ্যাসিড—অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড গঠিত হয়। এই সময় ফসফোইনোল কার্বক্সিলেজ উৎসেচক কাজ করে। অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$C_4$ যুক্ত অ্যাসিড অর্থাৎ ম্যালিক অ্যাসিড-এর পর নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।

2. **নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে বিক্রিয়া :** (i) নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে ম্যালিক অ্যাসিডের জারণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের অপসারণ (ডিকার্বক্সিলেশন) ঘটে এবং ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP \xrightarrow{\text{ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + NADPH + H^+ + CO_2$$
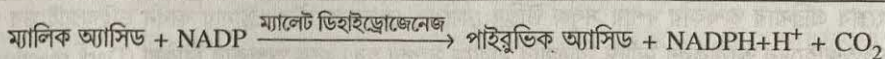
(ii) এই পাইরুভিক অ্যাসিড যা ম্যালিক অ্যাসিড জারিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তা আবার ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং $CO_2$ গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে।

(iii) এর পর উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের কেলভিন চক্রের ক্লোরোপ্লাস্টে থাকা রাইবিউলোজ বাইফস্‌ফেট দ্বারা গৃহীত হয় এবং চক্রাকার বিক্রিয়া আরম্ভ হয়।

চিত্র 4.16 : $C_4$ চক্র বিক্রিয়া।

■ (c) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের গুরুত্ব (Significance of Hatch and Slack cycle) :

1. $C_4$ উদ্ভিদের পাতায় 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড সংবন্ধনের জন্য 5 অণু ATP এবং 2 $NADPH+H^+$ প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যায় চক্রে মোট 30 অণু ATP এবং 12 অণু $NADPH+H^+$ প্রয়োজন 1 অণু গ্লুকোজ সংশ্লেষে। 2. $C_4$ উদ্ভিদ খুব কম ঘনত্বের কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু থেকে শোষণ করতে পারে যা $C_3$ উদ্ভিদ পারে না। 3. এই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার অনেক বেশি হয়। 4. $C_4$ উদ্ভিদের ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। 5. এসব উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার $C_3$ উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশি।
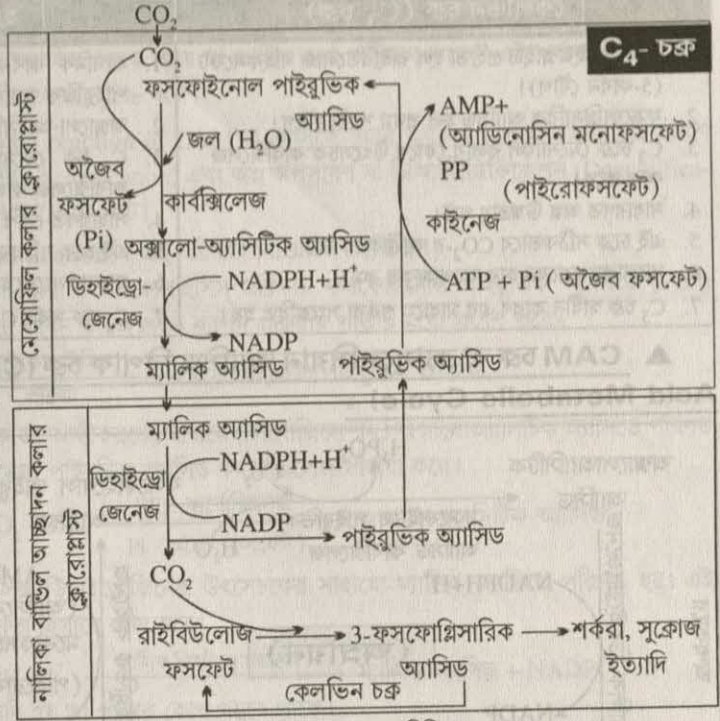
➤ $C_4$ উদ্ভিদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural features of $C_4$ plants) :

1. $C_4$ উদ্ভিদের পাতার নালিকা বান্ডিলে আচ্ছাদন কলার কোশে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদন কলার বাইরে 1-3 স্তর মেসোফিল কলা আবৃত থাকে। মেসোফিল কলার কোশগুলিতে কোশান্তর রন্ধ্র থাকে।

2. $C_4$ উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলাগুলির আকৃতি স্বাভাবিক প্রকৃতির এবং নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদন কলার কোশগুলির আকৃতি অনেক বড়ো এবং ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রাণা থাকে না। শুধু স্টোমা থাকে।

3. ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বক্সিলেজ উৎসেচক (PEP) মেসোফিল কলায় থাকে।

চিত্র 4.17 : একটি আদর্শ $C_4$ উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ।

4. $C_4$ চক্র মেসোফিল কলায় এবং $C_3$ চক্র নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশে ঘটে।

5. $C_4$ উদ্ভিদে দু'রকম $CO_2$ গ্রহীতা থাকে, যেমন—(i) ফসফোইনোল পাইরুভেট (মেসোফিল কোশে) এবং (ii) রাইবিউলোজ বিস্‌ফসফেট নালিকা বান্ডিল কোশে।

6. এই উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী যৌগ হল অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

7. $C_4$ উদ্ভিদ গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়।

8. এই উদ্ভিদের ফোটোরেসপিরেশন হয় না।

9. বেশি উষ্ণতায় এবং বেশি আলোয় $C_4$ উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বেশি হয় (30° – 40°C)।

10. অক্সিজেনের প্রভাবে $C_4$ চক্রের বিক্রিয়া বন্ধ হয় না।

- **কেলভিন চক্র ($C_3$ চক্র) এবং হ্যাচ-স্ল্যাক চক্রের ($C_4$ চক্র) পার্থক্য (Difference between Calvin cycle — $C_3$ cycle and Hatch-slack cycle—$C_4$ cycle) :**

| কেলভিন চক্র ($C_3$ চক্র) | হ্যাচ-স্ল্যাক চক্র ($C_4$ চক্র) |
|---|---|
| 1. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা হল রাইবিউলোজ বাইফসফেট (5-কার্বন যৌগ)। | 1. প্রাথমিক কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা হল ফসফোফেনল পাইরুভিক অ্যাসিড (3 কার্বন যৌগ)। |
| 2. ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হল প্রথম স্থায়ী যৌগ। | 2. অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড হল প্রথম স্থায়ী যৌগ। |
| 3. $C_3$ চক্রে মেসোফিল কলার কোশে উৎসেচক কার্বক্সিলেজ কাজ করে। | 3. $C_4$ চক্র মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্টে উৎসেচক PEP কার্বক্সিলেজ কাজ করে। |
| 4. সাধারণত অল্প উষ্ণতায় ঘটে। | 4. সাধারণত বেশি উষ্ণতা ও বেশি আলোকে ঘটে। |
| 5. এই চক্রে সঠিকভাবে $CO_2$-র আত্তীকরণ ঘটে। | 5. এই চক্রে সঠিকভাবে $CO_2$-এর আত্তীকরণ ঘটে না। |
| 6. সালোকসংশ্লেষের হার অপেক্ষাকৃত কম। | 6. সালোকসংশ্লেষের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। |
| 7. $C_3$ চক্র স্বাধীন কারণ এর মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষিত হয়। | 7. $C_4$ চক্র সর্বদা $C_3$ চক্রের উপর নির্ভরশীল শর্করা সংশ্লেষের জন্য। |

## ▲ CAM চক্র বা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক চক্র (CAM cycle — Crassulacean Acid Metabolic Cycle) :
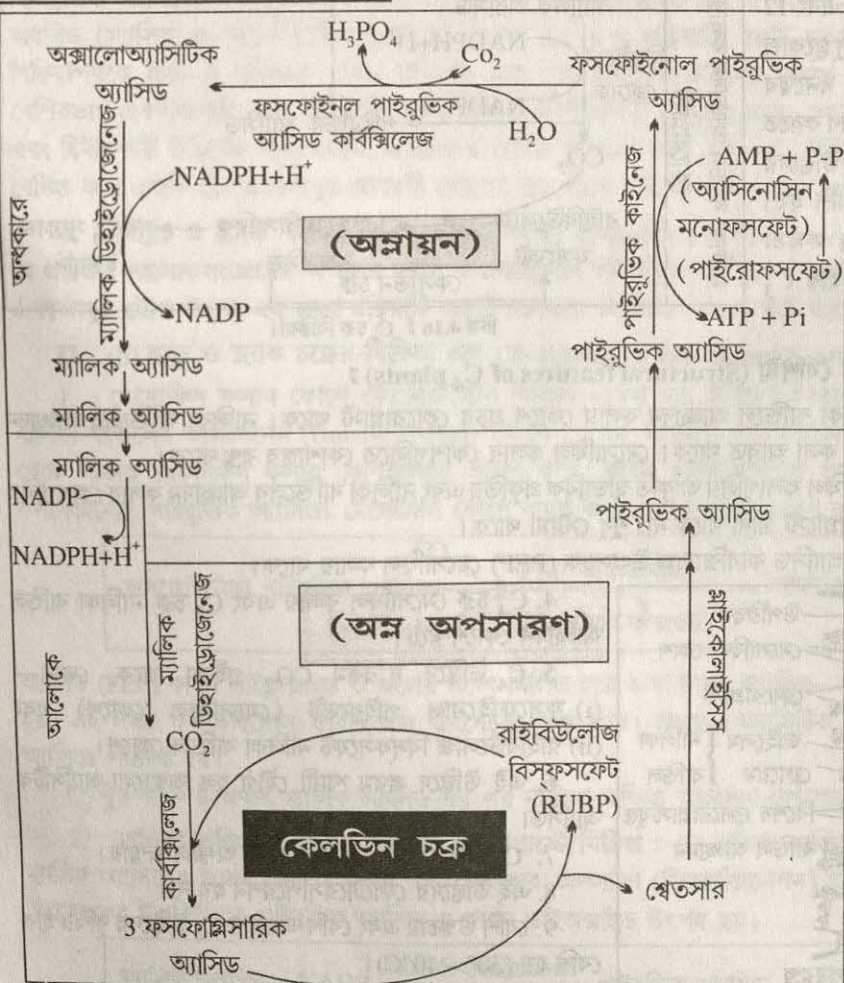
চিত্র 4.18 : CAM চক্র বা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড চক্র।

CAM বিপাক প্রক্রিয়া রসাল জাঙ্গল (Succulent) উদ্ভিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 1804 খ্রিস্টাব্দে **ডি সসুর** (de Saussure) বলেন প্রথম বট (*Ficus benghalensis*) গাছে রাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি এবং দিনে এর পরিমাণ কমে যায়। এর পর ক্র্যাসুলেসি (*Crassulaceae*) ও কেক্টেসি (*Cactaceae*) গোত্রের বহু রসাল জাঙ্গল উদ্ভিদে, যেমন—ব্রায়োফাইলাম (*Bryophyllum*), ক্র্যাসুলা (*Crassula*), ক্যালানচো (*Kalanchoe*), সিডাম (*Sedum*) প্রভৃতি উদ্ভিদে অ্যাসিডের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। তা ছাড়া অর্কিড (Orchid), আনারস (*Annanus*) প্রভৃতি উদ্ভিদেও দেখা যায়। রাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াকে **অন্ধকার অ্যাসিডিফিকেশন** (Dark acidification) এবং দিনে অর্থাৎ আলোকের উপস্থিতিতে অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যাওয়াকে **আলোক**

**ডিঅ্যাসিডিফিকেশন** (Light deacidification) বলে। দিনে ও রাতে জৈব অ্যাসিডের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে **ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক** বলে। যেসব উদ্ভিদে এই চক্র দেখা যায় তাদের CAM উদ্ভিদ বলা হয়।

❖ (a) **CAM চক্রের সংজ্ঞা (Definition of CAM cycle) ঃ যে প্রক্রিয়ায় রসাল উদ্ভিদের অন্ধকারে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে এবং আলোকের উপস্থিতিতে অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে বা জারিত হয়ে পরিমাণ কমে—এই পর্যায়ক্রমিক বিপাক চক্রকে ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক চক্র বা CAM cycle বলে।**

◘ (b) **CAM চক্রের বিক্রিয়া (Cyclic reaction of CAM)** ঃ ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক প্রক্রিয়া দুটি অংশে বিভক্ত, যেমন— **অম্লায়ন বা অ্যাসিডিফিকেশন** (Acidification) এবং **অম্ল অপসারণ বা ডিঅ্যাসিডিফিকেশন** (Deacidification)। অম্লায়ন অন্ধকারে এবং অম্লঅপসারণ আলোকে ঘটে।

(1) **অম্লায়ন বা অ্যাসিডিফিকেশন (Acidification)** ঃ এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি হল—

(i) উদ্ভিদের সঞ্চিত শ্বেতসার (Carbohydrate) গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় **ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে** (PEP) পরিণত হয়। রাতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পাতার মধ্যে প্রবেশ করে।

$$\text{শ্বেতসার} \xrightarrow[\text{প্রক্রিয়া}]{\text{গ্লাইকোলাইসিস}} \text{ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড}$$
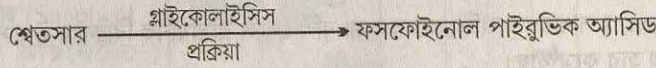
(ii) ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বন আত্তীকরণের মাধ্যমে (কার্বোক্সিলেশান) অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার সময় উৎসেচক ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বোক্সিলেজ সাহায্য করে।

$$\text{ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড} + CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{Pi (অজৈব ফসফেট)}]{\text{PEP কার্বোক্সিলেজ}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড}$$
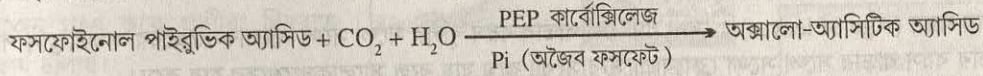
(iii) অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড ম্যালিক ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় $NADPH+H^+$ হাইড্রোজেন (H) দাতা হিসাবে কাজ করে।

$$\text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + NADPH+H^+ \xrightarrow{\text{ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP^+$$

রাতে অম্লায়নে যে ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয় তা পাতার কোশ গহ্বরে থাকে।
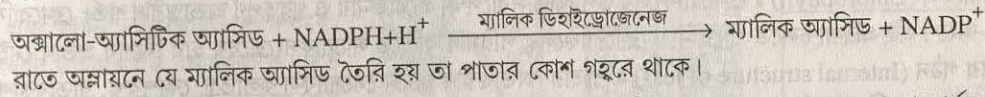
(2) **অম্ল অপসারণ বা ডিঅ্যাসিডিফিকেশন (Deacidification)** ঃ দিনে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকায় কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার কোশে প্রবেশ করতে পারে না এবং রাতে উৎপন্ন অ্যাসিডগুলি বিভিন্ন বিপাক কাজে ব্যবহৃত হয়।

আলোকের অভাবে রাতে সংশ্লেষিত ম্যালিক অ্যাসিড ভেঙে যায় বা জারিত হয়, ফলে পাইরুভিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ও $NADPH+H^+$ উৎপন্ন হয়। এই সময় ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচক কাজ করে।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP \xrightarrow{\text{ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + NADPH+H^+ + CO_2$$
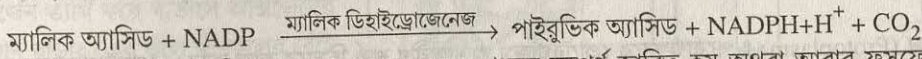
পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হবার পর ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জারিত হয় অথবা আবার ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে রাতে $CO_2$ গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে। কিন্তু পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি এখনো জানা যায়নি। যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আলোক অম্ল অপসারণের সময় নির্গত হয় তা রাইবিউলোজ ডাইফসফেট (RuDP) গ্রহণ করে কেলভিন চক্রের বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষিত হয়।

## ◎ 4.8. সালোকসংশ্লেষের বিভিন্ন শর্ত (Factors of Photosynthesis) ◎

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কতকগুলি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তের উপর নির্ভরশীল।

### ➤ A. বাহ্যিক শর্ত (External factors) ঃ

1. **আলোক** (Light) ঃ অন্যান্য শর্তগুলি স্বাভাবিক থাকলে সালোকসংশ্লেষের হার আলোকের তীব্রতা, **প্রকৃতি ও স্থিতিকালের** উপর নির্ভর করে। আলোকের তীব্রতা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে এবং অতি তীব্রতায় প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়; কারণ প্রধানত অতি তীব্রতায় বাষ্পমোচনের হার বাড়ার ফলে মেসোফিল কোশগুলিতে জলের অভাব দেখা দেয়। আলোকের দৃশ্যমান বর্ণালির (Visible spectrum) সাতটি রঙের মধ্যে লাল অংশে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষ ঘটে। এরপর

নীল অংশের স্থান। সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আলোকের স্থিতিকাল বাড়ার সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হার নির্ভর করে।

2. **কার্বন ডাইঅক্সাইড** (Carbondioxide) : অন্যান্য শর্তগুলি স্বাভাবিক থাকলে এবং বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 0·03 ভাগ বৃদ্ধি পেলে সংশ্লেষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হলে প্রোটোপ্লাজম বিষাক্ত হয়ে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়। এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ শর্ত।

3. **জল** (Water) : এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উদ্ভিদের জলঅঙ্গার খাদ্য মেসোফিল কোশে উৎপন্ন হয়। এই কোশগুলিকে সজীব রাখার জন্যও জলের প্রয়োজন। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের অভাব ঘটলে পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণকারী রক্ষীকোশ ও ক্লোরোপ্লাস্টের কর্মক্ষমতা কমে গিয়ে প্রক্রিয়াটি বিঘ্নিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে মূলরোম দিয়ে শোষিত জলের শতকরা মাত্র 1 ভাগ এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এটি একটি প্রত্যক্ষ শর্ত।

4. **উষ্ণতা** (Temperature) : অন্যান্য শর্তগুলি স্বাভাবিক থাকলে সাধারণত নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা হিসাবে উত্তাপের মাত্রা 20°C থেকে 35°C মধ্যে থাকলে প্রক্রিয়াটি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। আবার বেশি তাপমাত্রায় অংশগ্রহণকারী উৎসেচকগুলি বিনষ্ট হওয়ায় প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়।

5. **অক্সিজেন** (Oxygen) : সাধারণত অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎসেচকগুলির কর্মক্ষমতা কমে যায় বলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়।

6. **রাসায়নিক পদার্থ** (Chemicals) : বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যেমন— হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষের হার কমে।

7. **পাতার বয়স** (Age of leaves) : দেখা যায় যে, পাতার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে পাতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা কমে যায় বলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে।

➤ **B. অভ্যন্তরীণ শর্ত (Internal Factors) :**

1. **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) : ক্লোরোফিলের উপস্থিতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ শর্ত। ক্লোরোফিল ছাড়া কোনো অংশে এই প্রক্রিয়া চলতে পারে না। ক্লোরোফিলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সালোকসংশ্লেষের হার বিশেষ প্রভাব নেই।

2. **পাতার গঠন** (Internal structure of leaf) : পাতার অভ্যন্তরীণ গঠনে মেসোফিল কলাতন্ত্র, কোশরন্ধ্র, বাতাবকাশ ও রক্ষীকোশ প্রভৃতির সামগ্রিক কর্মক্ষমতার উপর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কোশরন্ধ্রের ব্যাসের উপরে এই প্রক্রিয়ার হারের তারতম্য ঘটে।

3. **সালোকসংশ্লেষীয় পদার্থের সঞ্চয়** (Accumulation of photosynthetic product) : সালোকসংশ্লেষজাত পদার্থ প্রধানত শ্বেতসার মেসোফিল কলায় জমে গেলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়। এই পদার্থের অন্যত্র দ্রুত পরিবহনের ফলে এই প্রক্রিয়ার হার বাড়ে।

4. **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) : পরোক্ষভাবে প্রোটোপ্লাজম অভ্যন্তরীণ শর্ত হিসাবে কাজ করে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সালোকসংশ্লেষকারী উৎসেচকগুলি থাকে। তাই প্রোটোপ্লাজম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

5. **উৎসেচক** (Enzymes) : বিভিন্ন উৎসেচকের অংশগ্রহণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। উৎসেচক সরবরাহ কমলে সালোকসংশ্লেষের হার অনেক কমে যায়।

## ▲ সালোকসংশ্লেষের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Importance or Significance of Photosynthesis) :

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য নীচে আলোচনা করা হল।

1. **খাদ্য সংশ্লেষ** (Food synthesis) — সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় $CO_2$, $H_2O$, আলো ও ক্লোরোফিল থেকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই কার্বোহাইড্রেট থেকে শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয়। এসব খাদ্যের সামান্য অংশ উদ্ভিদ জৈবনিক কাজে ব্যয় করে এবং বাকি অংশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে জমা রাখে। প্রত্যেকটি প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। খাদ্য ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না।

2. **শক্তির রূপান্তর ও সঞ্চয়** (Transformation and Storage of Energy) — সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শোষণ করার পর রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং কার্বোহাইড্রেট অণুতে আবদ্ধ করে। খাদ্যে সঞ্চিত সৌরশক্তি প্রকৃতপক্ষে **স্থৈতিক শক্তি**

(Potential energy)। প্রাণীরা এই খাদ্য গ্রহণ করার পর কোশের মধ্যে জারণ প্রক্রিয়ায় স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তাপশক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই উৎপন্ন শক্তি জীবের বৃদ্ধি, চলন, সংবহন ও নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজ চালাতে পারে।

**3. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা** (Maintenance of $O_2$ and $CO_2$ balance) — জীব বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে। প্রতিটি জীবকোশে দিনরাত শ্বসন চলে। জীব সবসময় অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং জীবকুলকে বাঁচিয়ে রাখে।

**4. অক্সিজেনের সরবরাহ** (Supply of $O_2$) — শ্বসনের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন। সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রাণীরা দিনরাত শ্বাসকার্য চালায়।

**5. বায়ুশোধন** (Purification of air) — শ্বসনের সময় জীবকুল অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করতে পারত। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে ক্ষতিকারক কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে দূষিত বায়ুমণ্ডলের পরিশোধন করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়। এর ফলে জীবকুলের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়।

চিত্র 4.19 : সালোকসংশ্লেষের যাবতীয় জৈব প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস।

**6. জ্বালানির উৎস** (Source of fuel) — শিল্পে কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি যা কিছু ব্যবহৃত হয় সেগুলির উৎস হল উদ্ভিদ। তাপ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় অধিকাংশ উদ্ভিদ জ্বালানির মাধ্যমে। পেট্রোল এবং কয়লার সঞ্চিত সৌরশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই একমাত্র সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াই শক্তির রূপান্তর ও খাদ্যে শক্তি সঞ্চিত করতে পারে।

**7. মানব সভ্যতায় সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis and human civilization) — সালোকসংশ্লেষের উপর মানবসভ্যতার অগ্রগতি অনেকটা নির্ভরশীল। তুলো, রেয়ন, সেলোফেন কাগজ, প্লাস্টিক, রবার প্রভৃতি পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষজাত উপাদান। বিভিন্ন প্রকার উপক্ষার কুইনাইন, মরফিন, রেসারপিন ইত্যাদি ওষুধ আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। কাঠ, কয়লা পেট্রোল প্রভৃতির জ্বালানির মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে, তা হল বহু বছর আগে উদ্ভিদদেহে সংরক্ষিত সৌরশক্তি। সুতরাং সালোকসংশ্লেষের উপর জীবকুল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

## ❂ 4.9. আলোকশ্বসন (Photorespiration) ❂

### ▲ আলোকশ্বসনের সংজ্ঞা, আলোকশ্বসনকারী উদ্ভিদ, স্থান, প্রক্রিয়া এবং তাৎপর্য (Definition, Plants of photorespiration, Site, Process and Significance of Photorespiration)

ফোটোরেসপিরেশন বা আলোকশ্বসন একটি বিশেষ শ্বসন প্রক্রিয়া যা সবুজ উদ্ভিদে আলোক ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে। বিজ্ঞানী ক্রোটকোভ ও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীরা (Krotkov etal., 1963) সবুজ উদ্ভিদের পাতায় গ্যাসীয় আদান প্রদান পরীক্ষা করার সময় লক্ষ করেন যে সবুজ উদ্ভিদ বেশি পরিমাণ অক্সিজেন ও আলোকের উপস্থিতিতে সাধারণ শ্বসনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ $CO_2$ উৎপন্ন করে। ক্রোটকোভ এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করেন **ফোটোরেসপিরেশন**।

❖ (a) **আলোক শ্বসনের সংজ্ঞা (Definition of Photorespiration) :** **যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ কোশে আলোক ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শ্বসনের হার স্বাভাবিকের তুলনায় বাড়ে এবং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় তাকে আলোকশ্বসন বলে।**

◻ (b) **আলোকশ্বসনকারী উদ্ভিদ (Plants of Photorespiration) :** তামাক (*Nicotiana*), মুগ (*Phaseolus*), মটর (*Psium*), পিটুনিয়া (*Petunia*), তুলো (*Grossypium*), লংকা (*Capsicum*), ধান (*Oryza*), সয়াবিন (*Glycine*), সূর্যমুখী (*Helianthus*) প্রভৃতি সপুষ্পক সবুজ উদ্ভিদের কোশে এবং কারা (*Chara*), নাইটেলা (*Nitella*) প্রভৃতি শৈবালে আলোকশ্বসন দেখা যায়। বর্তমানে জানা গেছে গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে এই শ্বসন ঘটে। সাধারণভাবে বলা যায় $C_3$ সব উদ্ভিদে আলোকশ্বসন দেখা যায়।

◻ (c) **আলোকশ্বসনের স্থান (Site of Photorespiration) :** **ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়া** নামে কোশীয় অঙ্গাণুগুলির মাধ্যমে আলোকশ্বসন ঘটে।

(i) **শ্বসন বস্তু :** সদ্য উৎপন্ন গ্লাইকোলেট বা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড।

(ii) **মুখ্য উৎপাদিত যৌগ :** গ্লাইকোলেট। এছাড়া গ্লাইসিন ও সেরিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড।

(iii) **$C_2$ চক্র বলার কারণ :** উৎপাদিত গ্লাইকোলেট হল 2 কার্বন যৌগ।

◻ (d) **আলোকশ্বসন প্রক্রিয়া (Process of Photorespiration) :** আগেই বলা হয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়া আলোক শ্বসনের স্থান। কোশে এই তিনটি অঙ্গাণু একসঙ্গে কাছাকাছি থাকে। পারক্সিজোম ক্লোরোপ্লাস্ট সংলগ্ন ক্ষুদ্র গোলাকার অঙ্গাণু। কেলভিন চক্রের ফসফেটযুক্ত হেক্সোজ থেকে 2-কার্বন বিশিষ্ট ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড (Phosphoglycolic acid) তৈরি হয়। ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড ফসফোটেজ উৎসেচকের প্রভাবে গ্লাইকোলিক অ্যাসিডে (Glycolic acid—$CH_3OHCOOH$) পরিণত হয়। গ্লাইকোলিক অ্যাসিড হল আলোক শ্বসনের প্রথম উপাদান। সালোকসংশ্লেষের সময় আলোর তীব্রতা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণের উপর গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন নির্ভর করে। এই সময় বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 1%-এর কম থাকে।

● 1. **ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Formation of Phosphogycolic acid) :**

ক্লোরোপ্লাস্টে **রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট** কার্বোক্সিলেজ উৎসেচক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে রাইবুলোজ 1, 5 বিস্‌ফসফেটকে 3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড এবং 2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডে ভেঙে দেয়। সদ্য উৎপন্ন গ্লাইকোলিক অ্যাসিড আলোক শ্বসনের শ্বসন বস্তু হিসেবে কাজ করে এবং ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে পেরক্সিজোমে যায়।

$$\text{রাইবুলোজ 1, 5-বিস্‌ফসফেট} + O_2 \xrightarrow[\text{অক্সিজিনেজ}]{\text{রাইবুলোজ বিস্‌ফসফেট}} \text{3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA)} + \text{2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড।}$$
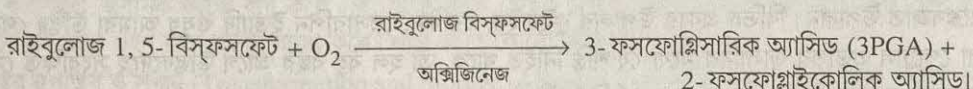
● **2. 2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের রূপান্তর এবং গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Conversion of 2-Phosphoglycolic Acid and Formation of Glycolic Acid) :**

ক্লোরোপ্লাস্টে **2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও জল ফসফাটেজ উৎসেচকের** সাহায্যে ডিপফোরাইলেশন বিক্রিয়ায় (ফসফোরিক অ্যাসিড বিয়োগ) গ্লাইকোলিক অ্যাসিড (গ্লাইকোলেট) ও ফসফোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$$\text{2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightarrow{\text{ফসফাটেজ}} \text{গ্লাইকোলিক অ্যাসিড} + \text{ফসফোরিক অ্যাসিড}$$
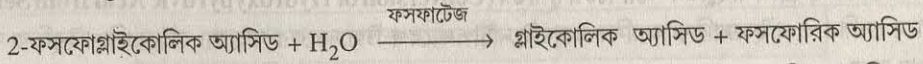
● **3. গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Formation of Glyoxylic Acid) : গ্লাইকোলিক অ্যাসিড** ও অক্সিজেন পেরক্সিজোমে গ্লাইকোলেট অক্সিডেজ উৎসেচকের প্রভাবে জারিত হয়ে গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়।

$$\text{গ্লাইকোলিক অ্যাসিড} + O_2 \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{গ্লাইকোলেট অক্সিডেজ}} \text{গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড} + \text{হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড } (H_2O_2)$$
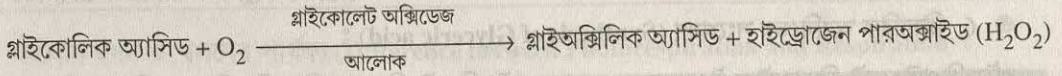
এরপর কেটালেজ উৎসেচকের সহায়তায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিশ্লিষ্ট হয়ে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$
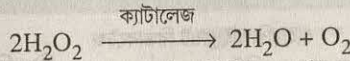
● **4. গ্লাইসিনের সংশ্লেষণ (Synthesis of Glycine) :** গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড গ্লুটামেট-গ্লাইঅক্সিলেট অ্যামিনোট্রান্সফারেজ উৎসেচকের সহায়তায় গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড গ্লাইসিনে পরিণত হয়। গ্লাইসিন পরে কোশের সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে মাইটোকনড্রিয়াতে যায়।

$$\text{গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড} \xrightarrow{\text{গ্লুটামেট-গ্লাইঅক্সিলেট অ্যামিনোট্রান্সফারেজ}} \text{গ্লাইসিন}$$
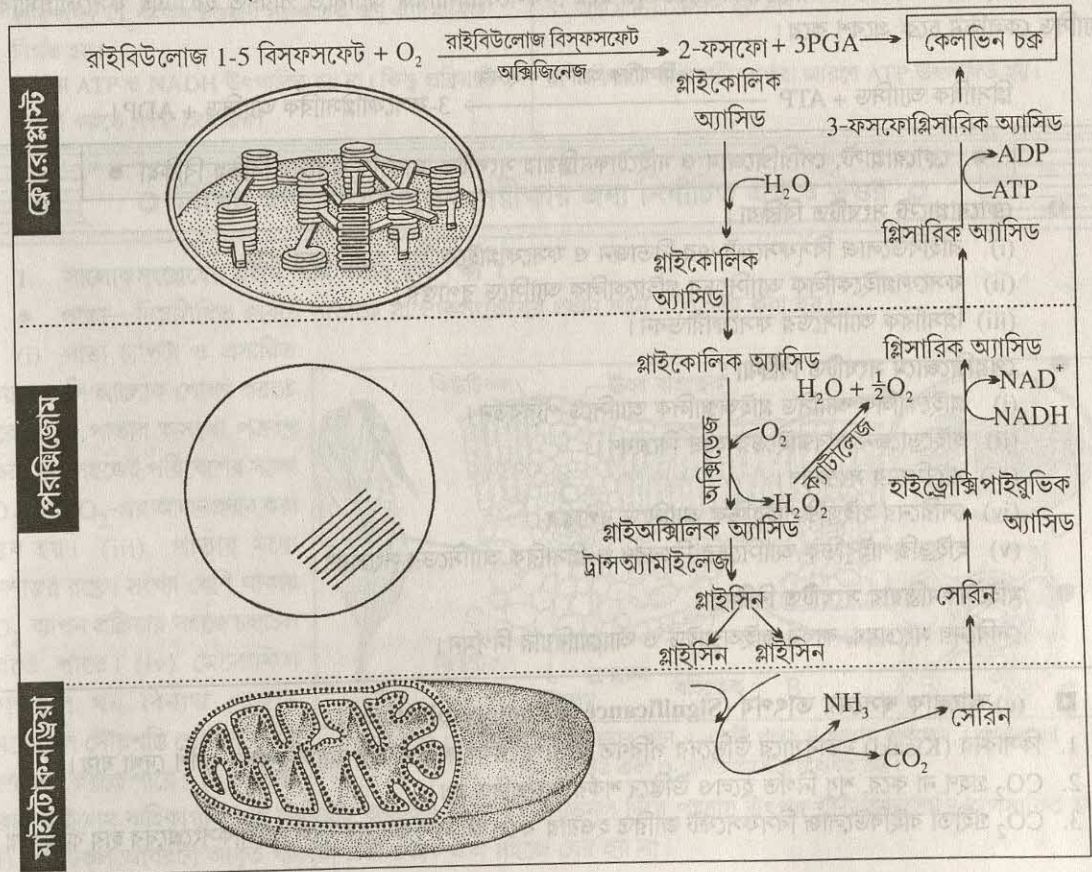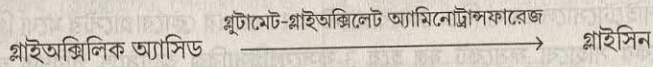
মাইটোকনড্রিয়াতে 2 অণু গ্লাইসিন যুক্ত হয়ে এক অণু সেরিন (Serine) নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সময় 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) ও সামান্য অ্যামোনিয়া ($NH_3$) নির্গত হয়। সেরিন এরপর আবার পেরক্সিজোমে যায়।

2 অণু গ্লাইসিন ⟶ 1 অণু সেরিন + 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড + $NH_3$
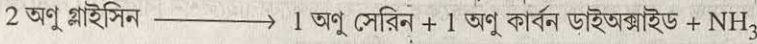
● 5. **সেরিন থেকে হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিডের রূপান্তর (Conversion of Hydroxypyruvic Acid from Serine) ঃ**

পেরক্সিজোমে সেরিন ও গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড **অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ** উৎসেচকের সাহায্যে হাইড্রোক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড ও গ্লাইসিন উৎপন্ন করে।

সেরিন + গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড —(অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ)⟶ হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড + গ্লাইসিন।
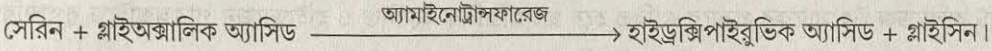
● 6. **গ্লিসারিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ (Synthesis of Glyceric acid) ঃ**

**হাইড্রক্সিপাইরুভেট রিডাকটেজ** উৎসেচকের সাহায্যে হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড গ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় $NADH + H^+$ জারিত হয়।

হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড —(হাইড্রক্সিপাইরুভেট রিডাকটেজ; $NADH + H^+$ ⟶ $NAD^+$)⟶ গ্লিসারিক অ্যাসিড
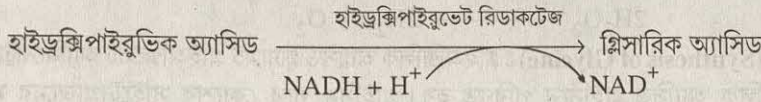
● 7. **গ্লিসারিক অ্যাসিডের ফসফোরীভবন (Phosphorylation of Glyceric Acid) ঃ**

এই গ্লিসারিক অ্যাসিড সাইটোসোলের মধ্য দিয়ে কোরোপ্লাস্টে যায়। এরপর ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে গ্লিসারিক অ্যাসিড **গ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ** উৎসেচকের সাহায্যে ফসফেট যুক্ত হয়ে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কেলভিন চক্রে প্রবেশ করে।

গ্লিসারিক অ্যাসিড + ATP —(গ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ)⟶ 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP।
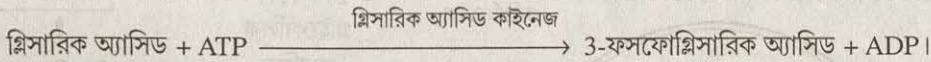
**● ক্লোরোপ্লাস্ট, পেরিক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়ায় সংঘটিত আলোক শ্বসনের বিভিন্ন বিক্রিয়া ●**

● **ক্লোরোপ্লাস্টে সংঘটিত বিক্রিয়া ঃ**

(i) রাইবিউলোজ বিস্‌ফসফেট-এর বিভাজন ও ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের গঠন।

(ii) ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের গ্লাইকোলিক অ্যাসিডে রূপান্তর।

(iii) গ্লিসারিক অ্যাসিডের ফসফোরীভবন।

● **পেরক্সিজোমে সংঘটিত বিক্রিয়া ঃ**

(i) গ্লাইকোলিক অ্যাসিড গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিডে পরিবর্তন।

(ii) হাইড্রোজেন পারক্সাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ।

(iii) গ্লাইসিনের সংশ্লেষণ।

(iv) সেরিনের হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তর।

(v) হাইড্রক্সিপাইরুভিক অ্যাসিডের বিজারণ ও গ্লিসারিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ।

● **মাইটোকনড্রিয়ায় সংঘটিত বিক্রিয়া ঃ**

সেরিনের সংশ্লেষণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার নির্গমন।

□ **(c) আলোক শ্বসনের তাৎপর্য (Significance of Photorespiration) ঃ**

1. কিসাকীর (Kisaki) মতানুসারে উদ্ভিদের পরিণত পাতা অপেক্ষা কচি পাতায় আলোকশ্বসন বেশি দেখা যায়।
2. $CO_2$ গ্রহণ না করে, শুধু নির্গত হলেও উদ্ভিদে শর্করা সংশ্লেষিত হয়।
3. $CO_2$ গ্রহীতা রাইবিউলোজ বিসফসফেট জারিত হওয়ার ফলে আলোকশ্বসনের ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়।

4. আলোকশ্বসনে $CO_2$ নির্গত হওয়ায় ক্লোরোপ্লাস্টে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস না পেয়ে সমতা বজায় থাকে।

5. এই বিক্রিয়া পথে বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যা প্রোটিন সংশ্লেষে ব্যবহৃত হতে পারে।

6. তীব্র আলোকের উপস্থিতিতে এবং আন্তঃকোশীয় $CO_2$ কম ঘনত্বের কারণে সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গের যে ক্ষতি হতে পারত এই প্রক্রিয়া তার থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে (Kozaki and Takeba 1996)।

**● আলোকশ্বসন শ্বসন প্রক্রিয়া কিন্তু প্রকৃত শ্বসন নয় কেন ? ●**

এই প্রক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙে $CO_2$ নির্গত হয় ও অক্সিজেন গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোনো ATP উৎপাদিত হয় না বলে প্রকৃত শ্বসন বলা যায় না।

**● আলোকশ্বসন ও শ্বসনের পার্থক্য (Difference between Photorespiration and Respiration) :**

| আলোক শ্বসন | শ্বসন |
|---|---|
| 1. আলোক নির্ভর প্রক্রিয়া। | 1. আলোক নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া। |
| 2. সবুজ উদ্ভিদ কোশে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং প্রধানত $C_3$ জাতীয় উদ্ভিদে ঘটে। | 2. সব উদ্ভিদে এবং সব জীবিত কোশে প্রক্রিয়াটি ঘটে। |
| 3. কেলভিন চক্রের উপর নির্ভরশীল। | 3. কেলভিন চক্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। |
| 4. প্রক্রিয়াটির জন্য সাইটোপ্লাজম, ক্লোরোপ্লাস্ট, পেরক্সিজোম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজন। | 4. প্রক্রিয়াটির জন্য সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজন। |
| 5. প্রতি অণু $CO_2$ নির্গত হওয়ার সঙ্গে এক অণু অ্যামোনিয়া নির্গত হয়। | 5. অ্যামোনিয়া নির্গত হয় না। |
| 6. কোনো ATP ও NADH উৎপাদিত হয় না। কিন্তু প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে ATP প্রয়োজন। | 6. প্রক্রিয়াটি শক্তিমোচী। শর্করা জারণে ATP উৎপাদিত হয়। |

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান বলার কারণ কী ?**

● **পাতা**—নিম্নলিখিত কারণে পাতাকে সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান বলে গণ্য করা হয়।

(i) পাতা চ্যাপটা ও প্রসারিত হওয়ায় বেশি আলোক শোষণ করতে পারে। (ii) পাতার অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকায় খুব সহজেই পরিবেশের সঙ্গে $CO_2$ এবং $O_2$-এর আদানপ্রদান করা সম্ভব হয়। (iii) পাতার মধ্যে কোশান্তর রন্ধ্রের সংখ্যা বেশি থাকায় $CO_2$ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সহজে চলাচল করতে পারে। (iv) মেসোফিল কোশগুলি ঘন বিন্যস্ত থাকায় ক্লোরোফিল সৌরশক্তি শোষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। (v) পাতার শিরার জাইলেম বাহিকাগুলি জল সরবরাহ অব্যাহত রাখে এবং সীভনল দিয়ে পাতায় উৎপন্ন খাদ্য তাড়াতাড়ি অপসারিত হয়। (vi) কিউটিক্‌ল আবরণে আবৃত থাকায় পাতা থেকে জল সহজে বের হয় না।
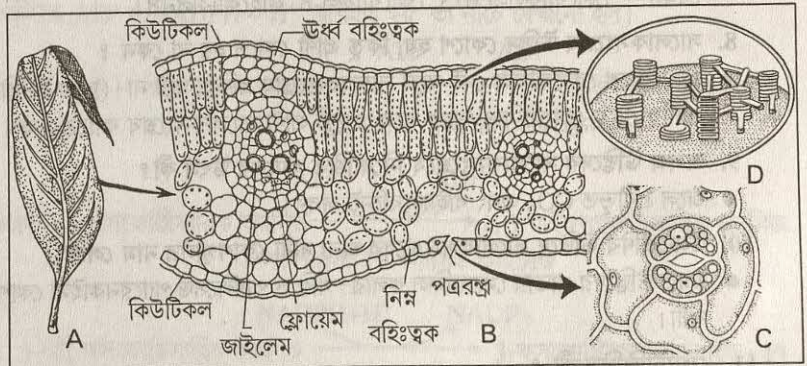
চিত্র 4.20 : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার স্থান A-একটি পাতা, B-পাতার প্রস্থচ্ছেদ, C-পত্ররন্ধ্রের বিবর্ধিত চিত্র এবং D-ক্লোরোপ্লাস্টের বিবর্ধিত চিত্র।

**2. সালোকসংশ্লেষকে একটি উপচিতিমূলক প্রক্রিয়া বলে কেন?**

- যে বিপাক প্রক্রিয়ায় সরল যৌগ জটিল যৌগে পরিণত হয় ও জীবদেহের শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায়, তাকে **উপচিতি** বা **অ্যানাবলিজম** বলে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে গৃহীত জল ও $CO_2$-এর মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে জৈব যৌগ—শর্করা (সুক্রোজ ও শ্বেতসার) উৎপন্ন হয়। এর ফলে উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন (dry weight) বাড়ে। তাই সালোকসংশ্লেষ হল একটি উপচিতিমূলক প্রক্রিয়া।

**3. সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন ?**

- সালোকসংশ্লেষের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিদ প্রধানত বায়ুমণ্ডল থেকে পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। জলজ উদ্ভিদও জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়াতে শোষণ করতে পারে। সালোকসংশ্লেষে এক অণু গ্লুকোজ তৈরির জন্য 6 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াতে বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বন বা অঙ্গার নিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় অর্থাৎ কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই শর্করা-জাতীয় খাদ্য কোশের প্রোটোপ্লাজম অংশে জমা হয়। তাই এই পদ্ধতিকে **অঙ্গার আত্তীকরণ** (Carbon assimilation) বলে।

**4. সালোকসংশ্লেষকে একটি জারণ-বিজারণ মূলক প্রক্রিয়া বলে কেন ?**

- এই প্রক্রিয়ায় জল জারিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি করে। তাই সালোকসংশ্লেকে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

**5. রাত্রে সালোকসংশ্লেষ হয় না কিন্তু কৃত্রিম আলোকে সালোকসংশ্লেষ হয় কী ?**

- (i) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার প্রধান উৎস হল সূর্যালোক। সূর্যালোকের ফোটোন কণা কোশের ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলের বিশ্লেষণ এবং ফোটোফসফোরাইলেশ বিক্রিয়া ঘটে। সুতরাং সূর্যালোকের অভাবে রাত্রে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া হয় না। (ii) কৃত্রিম আলোকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলতে পারে।

**6. দৃষ্টিগোচর বর্ণালি ব্যতিরেকে হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকে সালোকসংশ্লেষ সম্ভব নয় কেন ?**

- দৃষ্টিগোচর বর্ণালি ব্যতিরেকে হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক কণা (আলট্রা ভায়োলেট) রঞ্জককণাগুলিকে শোষণ করতে পারে না, ফলে এই সব আলোকে সালোকসংশ্লেষ ঘটে না।

**7. প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকধারায় কোন্ কোন্ রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান ?**

- প্রথম রঞ্জক ধারায় অর্থাৎ PS-I এ নিম্নলিখিত রঞ্জককণাগুলি থাকে, যেমন—ক্লোরোফিল-a 700, ক্লোরোফিল-a 683, সামান্য পরিমাণ ক্যারোটিনয়েডস। দ্বিতীয় রঞ্জক ধারায় অর্থাৎ PS-II-তে নিম্নলিখিত রঞ্জককণাগুলি থাকে, যেমন— ক্লোরোফিল-a 673, ক্লোরোফিল-b, ফাইকোবিলিনস।

**8. সালোকসংশ্লেষ উদ্ভিদ কোশে হয়, কিন্তু প্রাণী কোশে হয় না কেন ?**

- প্রাণীকোশে ক্লোরোফিল নেই বলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না। (তবে ইউগ্লিনা ও ক্লাইস্ অ্যামিবা নামে এককোশী প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল থাকে বলে এ দুটি প্রাণী সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম।)

**9. জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে নিয়োজিত গ্যাসের উৎস কী?**

- জলে দ্রবীভূত $CO_2$ এবং বাইকার্বোনেট লবণ।

**10. উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী কোশগুলির নাম লেখো।**

- উন্নত উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলার স্পঞ্জি ও প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোশগুলি সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রধানত দায়ী।

**11. ফোটোলিসিস কী ?**

- সূর্যালোকের সহায়তায় সক্রিয় ক্লোরোফিল দ্বারা জলের আয়নীকরণ প্রক্রিয়াকে ফোটোলিসিস (Photolysis ) বলে।

**12. হিল বিক্রিয়া কাকে বলে ?**

- রবার্ট হিল (Rabert Hill) 1939 খ্রিস্টাব্দে একটি সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছিলেন ক্লোরোপ্লাস্ট ও জলের মিশ্রণে

যদি লৌহযুক্ত লবণ (পটাশিয়াম পেরিক অক্সালেট) দেওয়া হয় এবং মিশ্রণটি আলোকশক্তি দিয়ে উত্তেজিত করা হয়, তবে ওই লৌহযুক্ত লবণটি বিজারিত হবে এবং পটাশিয়াম ফেরাস অক্সালেট উৎপন্ন হয় এবং উপজাত বস্তু হিসেবে $O_2$-এর মুক্তি ঘটবে।

$$2A + 2H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2AH_2 + O_2 \text{ (হিল বিকারক)}$$
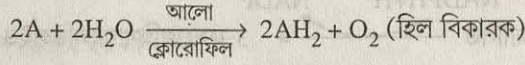
($A$ = পটাশিয়াম ফেরিক অক্সালেট এবং $AH_2$ = পটাসিয়াম ফেরাস অক্সালেট)।

এই পরীরক্ষাটিকে হিল বিক্রিয়া বলে। পরে সেভেরোওচোয়া প্রমাণ করেন সজীব সবুজ কোশে এই হিল বিকারকটি $NADP^+$।

**13. হিল বিকারক কোনগুলি ?**

- বিজ্ঞানী রবার্ট হিল 'হিল বিক্রিয়া' পরীক্ষার জন্য যেসব রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করেছিলেন তাদের হিল বিকারক বলে, যেমন— **কুইনোন, পটাশিয়াম, ফেরিক অক্সালেট** প্রভৃতি।

**14. রবার্ট হিল কী পরীক্ষা করেছিলেন ?**

- রবার্ট হিল একটি সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় একটি বিজারিত যৌগ উৎপন্ন হয়। তিনি এটিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখান এবং এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে **হিল বিক্রিয়া** (Hill reaction) বলা হয়।

সবুজ পাতা থেকে ক্লোরোফিল নিষ্কাশনের পর ভাসমান তরল বা সাসপেনশন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্রহীতা (যেমন কুইনোন বা পটাশিয়াম ফেরিক অক্সালেট A) মেশানো হয়। এই মিশ্রণে আলো প্রয়োগ করলে হাইড্রোজেন গ্রাহক বিজারিত হয়ে পটাশিয়াম ফেরাস অক্সালেটে পরিণত হয় এবং তার ফলে অক্সিজেন নির্গত হয়।

$$2H_2O + 2A \longrightarrow 2AH_2 + O_2\uparrow$$
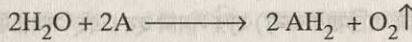
রুবেন, র‍্যানডল ও ক্যামেন (1947) রবিন হিলের পরীক্ষা সমর্থন করে। তারা (ভারী অক্সিজেন) ব্যবহার করে ক্লোরেলা নামে সবুজ শৈবালের সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন জল থেকে নির্গত হয়।

**15. আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলি অন্ধকার বিক্রিয়ায় ব্যবহারের বিভিন্ন ধাপগুলি উল্লেখ করো।**

- সালোকসংশ্লেষের আলোকদশায় উৎপন্ন যৌগগুলি হল ATP, $NADPH + H^+$ ও অক্সিজেন ($O_2$)। এই তিন প্রকার উৎপন্ন যৌগের মধ্যে অন্ধকার দশায় ATP ও $NADPH + H^+$ ব্যবহৃত হয়। অক্সিজেন সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় না। অন্ধকার দশার যে ধাপগুলিতে ATP ও $NADPH + H^+$ ব্যবহৃত হয় তা নীচে দেখানো হল।

(i) **কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতার সক্রিয়করণ**— রাইবুলোজ মনোফসফেট $\xrightarrow[\text{রাইবুলোজ মনোফসফোকাইনেজ}]{\text{ATP} \rightarrow \text{ADP}}$ রাইবুলোজ বাই ফসফেট

(ii) **প্রথম স্থায়ী যৌগের সক্রিয়করণ**—3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightarrow[\text{3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ}]{\text{ATP} \rightarrow \text{ADP}}$ 1, 3-বাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

(iii) **স্থায়ী যৌগের বিজারণ**—1, 3-বাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightarrow[\text{গ্লিসারেট ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADPH+H^+ \rightarrow NADP}$ 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড+ Pi

**16. কেলভিন চক্রের কোন্ পর্যায়ে বিজারণ প্রক্রিয়াটি ঘটে ?**

- কেলভিন চক্রের প্রকৃত বিজারণ বিক্রিয়াটি যখন ঘটে তখন 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA) আলোক দশায়

উৎপন্ন $NADPH_2$ দিয়ে বিজারিত হয় এবং 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (PGAld) তৈরি করে। এখানে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক কাজ করে।
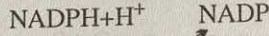
$$\text{1, 3-বাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড} \xrightarrow{NADPH+H^+ \quad NADP} \text{3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড} + Pi$$

**17. রেডড্রপ প্রভাব কী ?**

- স্বাভাবিকভাবে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলতে হলে ক্লোরোপ্লাস্টের দুরকম রঞ্জকতন্ত্র অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-I এবং PS-II) মিলিতভাবে কাজ করে। এই দুই রঞ্জকতন্ত্র একই সঙ্গে অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনে ATP ও $NADPH + H^+$ তৈরি করে। আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন চলতে হলে সূর্যের নীল ও লাল রশ্মিগুলির প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানী ইমারশান (Emersion) প্রমাণ করেছেন যে যদি শুধুমাত্র দীর্ঘতরঙ্গযুক্ত লাল রশ্মি পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে প্রয়োগ করা হয় তবে শুধু মাত্র আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন চলতে পারে। এর ফলে $NADPH + H^+$ তৈরি হয় না। $NADPH + H^+$ অন্ধকার বিক্রিয়ার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ যার অভাবে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায়। একেই রেডড্রপ বলা হয়।

**18. ক্ষয়পূরণ বিন্দু বা কমপেনসেশান পয়েন্ট কাকে বলে ?**

- সালোকসংশ্লেষের হার আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষের হার সব সময় এক থাকে না, কম-বেশি হয়। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার কিছু পরিমাণ শ্বসনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট খাদ্য কোশে সঞ্চিত থাকে। দিনে যে সময়ে সালোকসংশ্লেষের হার কম তখন খাদ্য কম তৈরি হয় এবং সেই খাদ্য আবার শ্বসনে নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং যে পরিমাণ আলোক রশ্মিতে সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে উৎপন্ন খাদ্য সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয় সেই অবস্থাকে **কমপেনসেশান পয়েন্ট** (Compensation point) বলে। এই সময় উদ্ভিদের $CO_2$ গ্রহণ (সালোকসংশ্লেষের জন্য) এবং $CO_2$ বর্জনের (শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য) হার সমান হয়। এই সময় উদ্ভিদ $CO_2$ গ্রহণ ও বর্জন করে না।

**19. সালোকসংশ্লেষের হার বলতে কী বোঝো ?**

- কোনো উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কী গতিতে চলছে তা বোঝানোর জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন $O_2$-এর পরিমাণ নির্ধারণ করে **সালোকসংশ্লেষের হার** নির্ণয় করা যায়।

$$\text{সালোকসংশ্লেষের হার} = \frac{\text{বর্জিত } O_2}{\text{সময়}}$$

**20. উদ্ভিদের কোথায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে ?**

- উদ্ভিদদেহের সব কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না। সবুজ পাতার মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্ট হল সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান। সবুজ কোশে যেখানে ক্লোরোফিল থাকে, সেখানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে। উদ্ভিদের পাতা ছাড়া কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পুষ্পাক্ষ, পর্ণকাণ্ড ও সবুজ কাঁচা ফলের ত্বকেও সালোকসংশ্লেষ হয়।

**21. কোন্ আলোয় সালোকসংশ্লেষ হয়?**

- সালোকসংশ্লেষ সূর্যালোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দৃষ্টিগোচর বর্ণালির 380-760 nm-এ ঘটে।

**22. রাত্রে সালোকসংশ্লেষ হয় না কেন ?**

- সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার প্রধান উৎস হল সূর্যালোক। সূর্যালোকের ফোটন কণা ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলের বিশ্লেষণ এবং ফোটোফসফোরাইলেশন বিক্রিয়া ঘটে। সুতরাং সূর্যালোকের অভাবে রাত্রে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না।

**23. উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী কোশগুলির নাম বলো।**

- উন্নত উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলার স্পঞ্জিও প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোশগুলি সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রধানত দায়ী।

**24. কোন্ উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে ?**

- পটল গাছের মূল , পানিফল গাছের মূল, গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল ও রাসনা গাছের সবুজ বায়বীয় মূলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে।

**25. উদ্ভিদের মূলে সালোকসংশ্লেষ হয় না কেন ?**

- উদ্ভিদমূলে ক্লোরোফিল থাকে না। তাছাড়া মূল মাটির নীচে থাকার জন্য সূর্যালোক পায় না। তাই উদ্ভিদ মূলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না।

**26. সালোকসংশ্লেষ উদ্ভিদকোশে হয়, কিন্তু প্রাণী কোশে হয় না কেন ?**

- প্রাণীদেহে ক্লোরোফিল নেই বলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না। তবে ইউগ্লিনা ও ক্রাইস্যামিবা নামে এককোশী প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল থাকে বলে এ দুটি প্রাণী সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম।

**27. দুটি প্রাণীর নাম করো যাদের দেহে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দেখা যায়।**

- কয়েকটি এককোশী প্রাণী ইউগ্লিনা এবং ক্রাইস্যামিবা-তে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে।

**28. ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল অণুগুলি সঞ্চিত থাকে ?**

- ক্লোরোপ্লাস্টিড অঙ্গাণুর গ্রাণার থাইলাকয়েডের কোয়ান্টোজোম দানার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে।

**29. সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী রঞ্জক পদার্থগুলির কাজ কী ?**

- ক্লোরোফিল-a হল সালোকসংশ্লেষের কার্যকর রঞ্জক পদার্থ। তাই একে প্রধান রঞ্জক পদার্থ বলে। অবশিষ্ট রঞ্জক পদার্থগুলি, যেমন — ক্লোরোফিল- b, c, d, e জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিন সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এরা শোষিত আলোককে ক্লোরোফিল-a-তে পৌঁছে দেয়। তাই এদের **সহকারী রঞ্জক** পদার্থ বলে।

**30. ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল কী ? কোথায় পাওয়া যায় ?**

- এক রকম বিশেষ সবুজ ক্লোরোফিল যা ক্লোরোবিয়াম নামে ব্যাকটেরিয়াতে পাওয়া যায়।

**31. ক্যারোটিনয়েডেস্‌র কাজ কী কী ?**

- (i) ক্যারোটিনয়েড সালোকসংশ্লেষের জন্য আলোক শোষণ করে। (ii) বিভিন্ন উদ্ভিদ রঞ্জককে (ক্লোরোফিল) আলোর জারণ থেকে রক্ষা করে। (iii) কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের ফটোট্যাকটিক চলনে বিশেষ সাহায্য করে।

**32. ক্লোরোফিল -a অণুর এমপিরিক্যাল ফর্মূলা দাও।**

- ক্লোরোফিল -a অণুর এমপিরিক্যাল ফর্মূলা (রাসায়নিক সংকেত) $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$

**33. ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম যে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন তার একটি করে কারণ নির্দেশ করো।**

- ফসফরাস যৌগ হিসেবে কাজ করে। এই যৌগগুলি হল ATP, GTP, NADP। এরা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

  ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল গঠনের একটি বিশেষ উপাদান। তা ছাড়া ম্যাগনেসিয়াম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সক্রিয় করে এবং কার্বোহাইড্রেট বিপাক, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ, প্রোটিন সংশ্লেষ ও কোশের মধ্যচ্ছদা গঠন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

**34. (ক) ফোটোন কী ? (খ) এর কাজ কী ?**

- (ক) সূর্যালোক থেকে আগত আলোকরশ্মির ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কণাকে ফোটোন (Photon) বলে, যা ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে।

  (খ) এই ফোটোন কণা অর্থাৎ সৌরশক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয়।

**35. সূর্যালোকের কোন্ কোন্ বর্ণালি সালোকসংশ্লেষের পক্ষে বেশি কার্যকর ?**

- বর্ণালি-বীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় যে 390 nm থেকে 760 nm আলোক তরঙ্গ সালোকসংশ্লেষের পক্ষে কার্যকর। ক্লোরোফিল-a এবং ক্লোরোফিল-b আলোকের 7টি রঙের মধ্যে লাল (610 - 700 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এবং নীল (400-510 nm) রং বেশি শোষণ করে এবং সালোকসংশ্লেষের পক্ষে বেশি কার্যকরী যা ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে।

**36. নিম্নলিখিতগুলির সম্পূর্ণ নাম লেখো : (ক) RuDP, (খ) PGAld, (গ) NADP এবং (ঘ) ATP**

- (ক) RuDP = রাইবিউলোজ বিস্-ফসফেট।
  (খ) PGAld = ফস্‌ফোগ্লিসার্যালডিহাইড।
  (গ) NADP = নিকোটিনামাইড অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট।
  (ঘ) ATP = অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট।

**37. (ক) সালোকসংশ্লেষে ইলেকট্রন পরিবহন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কী কী? (খ) এর শেষ উৎপন্ন দ্রব্যগুলির নাম লেখো।**

- (ক) সালোকসংশ্লেষে ইলেকট্রন পরিবহনে প্রয়োজনীয় উপাদান হল কুইনন, প্লাস্টোকুইনন, সাইটোক্রোম-b, সাইটোক্রোম-f, প্লাস্টোসায়ানিন, ফেরিডক্সিন প্রভৃতি।
  (খ) শেষ উৎপন্ন দ্রব্য : ATP, NADPH + $H^+$ এবং $O_2$

**38. সালোকসংশ্লেষের আলোক দশার তাৎপর্য কী ?**

- (i) আলোক শক্তি ক্লোরোফিল শোষণ করে এবং ওই আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (ii) এই দশায় আলোক জলের বিশ্লেষণ ঘটায়, ফলে $O_2$ উৎপন্ন হয়। (iii) আলোক দশায় উৎপন্ন NADPH + $H^+$ ও ATP অন্ধকার দশা আরম্ভ করার জন্য এবং $CO_2$-এর বিজারণের কাজে ব্যবহার হয়।

**39. NADP-র সঙ্গে জীব বিজ্ঞানের কী যোগ তা সংক্ষেপে লেখো।**

- **জীব বিজ্ঞানে NADP** — নিকোটিনামাইড অ্যাডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট অর্থাৎ NADP হল একটি সহ-উৎসেচক যা সালোকসংশ্লেষের আলোকদশায় হাইড্রোজেন-বাহক হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া ফ্যাটি অ্যাসিড, কেলভিন চক্র, কোলেস্টেরল প্রভৃতি সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এই যৌগটি ডিহাইড্রোজিনেজ এবং রিডাকটেজ উৎসেচকের সহ-উৎসেচকের কাজ করে। তাছাড়া NADP মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতর জারণ প্রক্রিয়ায় ATP সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।

**40. দৃষ্টিগোচর বর্ণালি ব্যতিরেকে হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকে সালোকসংশ্লেষ সম্ভব নয় কেন ? প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকধারায় কোন্ কোন্ রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান ? কেলভিন চক্রের কোন্ পর্যায়ে প্রকৃত বিজারণ বিক্রিয়াটি ঘটে ?**

- (ক) হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকে সালোকসংশ্লেষ না হবার কারণ — দৃষ্টিগোচর বর্ণালি ব্যতিরেকে হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট (আলট্রাভায়োলেট) আলোক কণা রঞ্জক কণাগুলিকে শোষণ করতে পারে না, ফলে এই সব আলোকে সালোকসংশ্লেষ ঘটে না।
  (খ) **রঞ্জকপদার্থ : প্রথম রঞ্জক ধারায় অর্থাৎ PS-I**-তে নিম্নলিখিত রঞ্জক কণাগুলি থাকে। যেমন —ক্লোরোফিল-a 700 ক্লোরোফিল-a 683, সামান্য পরিমাণ ক্যারোটিনয়েডস। **দ্বিতীয় রঞ্জক ধারায় অর্থাৎ PS-II**-তে নিম্নলিখিত রঞ্জক কণাগুলি থাকে। যেমন —ক্লোরোফিল-a 673, ক্লোরোফিল-b, ফাইকোবিলিনস।
  (গ) কেলভিন চক্রের প্রকৃত বিজারণ বিক্রিয়াটি ঘটে যখন 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA) আলোক দশায় উৎপন্ন NADPH + $H^+$ দিয়ে বিজারিত হয় এবং 3-ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড (PGAld) তৈরি করে। এখানে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক কাজ করে।

$$\text{3- PGA} + \text{NADPH}_2 \xrightarrow{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}} \text{3 PGAld} + \text{NADP}$$
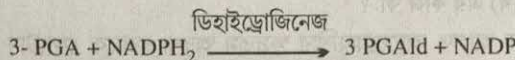
**41. সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য একটি জৈব এনজাইম ও একটি কো-এনজাইমের নাম লেখো।**

- সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য একটি জৈব এনজাইম হল অ্যালডোলেজ এবং একটি কো-এনজাইম হল NADP।

**42. হিল বিকারক কী ? কীভাবে প্রমাণ করবে জলই সালোকসংশ্লেষের উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস ?**

- (ক) রবিন হিল পরীক্ষার জন্য যে সব যৌগ ব্যবহার করেন তাদের হিল বিকারক বলে, যেমন— কুইনোন, পটাশিয়াম, ফেরিকঅক্সালেট প্রভৃতি।

(খ) **রবার্ট হিল** (Robert Hill, 1939) একটি সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় একটি বিজারিত যৌগ উৎপন্ন হয়। তিনি এটিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখান এবং এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে **হিল বিক্রিয়া** বলা হয়।

সবুজ পাতা থেকে ক্লোরোফিল নিষ্কাশনের পর ভাসমান তরল বা সাসপেনশন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্রহীতা A (পটাসিয়াম ফেরিক অক্সালেট) মেশানো হয়। এই মিশ্রণে আলো প্রয়োগ করলে অক্সিজেনের উদ্ভব ঘটে। এই থেকে হিল প্রমাণ করেন যে, গ্রহীতা A জলের হাইড্রোজেন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং তার ফলে অক্সিজেন নির্গত হয়।

$$2H_2O + 2A \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} 2AH_2 + O_2$$
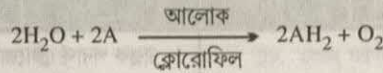
**43. সালোকসংশ্লেষে জারক ও বিজারক পদার্থগুলি কী কী ?**

- (i) জারক পদার্থ $CO_2$ এবং (ii) বিজারক পদার্থ $H_2O$।

**44. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন কখন হয় ?**

- সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দিনের আলোকে ঘটে এবং শ্বসন প্রক্রিয়া দিনে ও রাতে অর্থাৎ সব সময়ে চলে।

**45. (ক) সোলারাইজেশন কাকে বলে ? (খ) উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।**

- (ক) আলোক নির্ভর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং উদ্ভিদ ক্লোরোপ্লাস্টের সবুজ রং নষ্ট হয়ে যাওয়াকে সোলারাইজেশন বলে।

(খ) **উদাহরণ** — সহজ পরীক্ষায় দেখা যায় **পাইসিয়া এঞ্জেলম্যান্নি** (*Picea engelmannii*) নামে একধরনের ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ছায়াতে জন্মায়। এই উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হবার পর যদি সরাসরি সূর্যালোকে স্থানান্তরিত করা হয়, দেখা যাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে পাতাও বিবর্ণ হবে। এরপর অল্পদিনের মধ্যে সোলারাইজেশনের জন্য উদ্ভিদটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

**46. উদ্ভিদের কোন্ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘাটতি এবং কোন প্রক্রিয়ায় তার পূরণ হয় ?**

- যথাক্রমে সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন।

**47. রাসায়নিক সংশ্লেষকারী এবং সালোকসংশ্লেষকারী দুটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো।**

- (ক) **রাসায়নিক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া** : (i) থায়োব্যাসিলাস, (ii) নাইট্রোসোমোনাস।

(খ) **সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া** : (i) ক্লোরোবিয়াম, (ii) ক্রোমোসিয়াম।

**48. অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেন তৈরি করে কী ? কারণ দেখাও।**

- অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন তৈরি করে না। তার প্রধান কারণগুলি হল — (i) জলের পরিবর্তে এরা $H_2S$ থেকে $H_2$ নির্গত করে। (ii) এদের PS তন্ত্র থাকে না। (iii) এদের কোশে সালফার জমা হয়।

**49. নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকরণের ক্ষেত্রে স্থিতিকরণ বলতে কী বোঝো?**

- বাতাসের নাইট্রোজেন, জটিল নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগে পরিণত হওয়াকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়া বলে। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সবুজ উদ্ভিদ শর্করায় পরিণত করার প্রক্রিয়াকে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকরণ বলে।

**50. নিম্নলিখিত বক্তব্যটি সঠিক না ভুল বলো : জলমগ্ন উদ্ভিদ বাতাস থেকে তার প্রয়োজনীয় $CO_2$ পায়।**

- বক্তব্যটি ভুল, কারণ জলমগ্ন উদ্ভিদ জল থেকে $CO_2$ পায়।

**51. নিম্নলিখিত বক্তব্যটি সঠিক না ভুল বলো : সালোকসংশ্লেষে জলের বিজারণ ঘটে।**

- বক্তব্যটি ভুল, কারণ সালোকসংশ্লেষে জলের জারণ ঘটে।

**52. ATP-তে কতগুলি শক্তি বন্ধনী আছে ? ATP আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে ADP ও অজৈব ফসফেট উৎপন্ন হলে মুক্ত শক্তির পরিমাণ উল্লেখ করো। উপরের বিক্রিয়াটি এক্সারগণিক না এন্ডারগণিক ? উদ্ভিদের শরীরে কখন ATP উৎপন্ন হয় ?**

- (ক) ATP-তে দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন শক্তিবন্ধনী থাকে। মুক্তশক্তির পরিমাণ 7·3 KCal।

  (খ) বিক্রিয়াটি এক্সারগণিক,

  (গ) সালোকসংশ্লেষের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া, শ্বসন, গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবচক্র ও প্রান্তীয় শ্বসনে ATP উৎপন্ন হয়।

**53. জীবাণু এবং উচ্চবর্ণের উদ্ভিদের ফোটোসিস্টেম -II (Photosystem-II)-এর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কী ?**

- (ক) জীবাণু ও উচ্চবর্ণের উদ্ভিদের ফোটোসিস্টেম -II-এর পার্থক্য —

| জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া | উচ্চবর্ণের উদ্ভিদ |
|---|---|
| 1. রঞ্জক পদার্থ ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল। | 1. রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড। |
| 2. অঙ্গাণু ক্রোমোটোফোর। | 2. অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্ট। |
| 3. অক্সিজেন তৈরি হয় না। | 3. অক্সিজেন তৈরি হয়। |
| 4. হাইড্রোজেন দাতা হাইড্রোজেন সালফাইড। | 4. হাইড্রোজেন দাতা জল। |

**54. ব্যাকটেরিয়ায় কি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে ? যদি না থাকে তাহলে রঞ্জক পদার্থ কোথায় থাকে ?**

- ব্যাকটেরিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। রঞ্জক পদার্থ ভেসিকলে (Vesicle)-এ থাকে। এই ভেসিকলগুলিকে **ক্রোমোটোফোর** বলে।

**55. ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থগুলির নাম লেখো।**

- (i) ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল (নীলাভ লোহিত সালফার ও সালফার বিহীন ব্যাকটেরিয়া) ও (ii) ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল (সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া)।

**56. $C_2$ বিক্রিয়া পথ কাকে বলে ?**

- যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পথ ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবিউলোজ 1, 5 বিসফসফেট থেকে কার্বনযুক্ত যৌগ গ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তাকে $C_2$ বিক্রিয়াপথ বলে।

**57. $C_4$ চক্র প্রথমে কে আবিষ্কার করেন ?**

- হ্যাচ ও স্ল্যাক প্রথমে (1966) $C_4$ চক্র আবিষ্কার করেন।

**58. $C_4$ চক্র সম্পন্ন হয় এমন তিনটি উদ্ভিদের নাম লেখো।**

- দুর্বা ঘাস (*Cynodon dactylon*), আখ (*Saccharum officinarum*) এবং ভুট্টা (*Zea mays*)।

**59. $C_4$ চক্রের সংজ্ঞা লেখো।**

- যে প্রক্রিয়ায় সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশায় ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়, 4-কার্বনযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে তাকে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা $C_4$ চক্র বলে।

**60. ক্রানস্ (Kranz) উদ্ভিদ কাকে বলে ?**

- একবীজপত্রী উদ্ভিদগুলিতে $C_4$ বিক্রিয়া মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে। $CO_2$ এর আত্তীকরণের প্রথম 4 কার্বন যৌগ উৎপন্ন হয় বলে এদের ক্রান্স উদ্ভিদ বা $C_4$ উদ্ভিদ বলে।

**61. CAM কী ?**

- যে প্রক্রিয়ায় বিশেষ কতগুলি রসালো উদ্ভিদের (ক্রাসুলেসি ও অন্যান্য) জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রাতে ম্যালিক অ্যাসিড উৎপাদনের মাধ্যমে অঙ্গার আত্তীকরণ ঘটে তাকে CAM বলে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. ফোটোসিন্থেসিস শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন ?
2. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন শর্করা অণুতে উপস্থিত $O_2$-এর উৎস কী ?
3. সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ কী ?
4. সালোকসংশ্লেষ কখন হয় ?
5. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোন্ গ্যাস নির্গত হয় ?
6. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস কী ?
7. কোন্ প্রকার উদ্ভিদ কলায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় ?
8. সালোকসংশ্লেষ কী জাতীয় প্রক্রিয়া—অপচিতি না উপচিতি ?
9. সালোকসংশ্লেষে অক্ষম একটি উদ্ভিদের নাম লেখো।
10. সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গাণু কী ?
11. সালোকসংশ্লেষের সময় সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কী গ্রহণ করে?
12. জীবমণ্ডলে শক্তির উৎস কী ?
13. নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় $CO_2$ কোথা থেকে পায় ?
14. সালোকসংশ্লেষে তৈরি সরল শ্বেতসারটির নাম লেখো।
15. কোন্ মৌলটি সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে যৌগরূপে সরাসরি গ্রহণ করে ?
16. কোন্ প্রকার জীব সালোকসংশ্লেষ করতে অক্ষম ?
17. কোন্ ধরনের উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না ?
18. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গ কোন্‌টি ?
19. একটি উদ্ভিদের নাম করো যার মূলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া হয়।
20. হিল বিকারক কী কী ?
21. বর্ণালীর কোন্ রং-এ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ভালোভাবে চলে?
22. সূর্যালোকে যে সূক্ষ্ম কণা থাকে তার নাম কী ?
23. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জৈব অনুঘটক কে ?
24. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কয়টি দশা ও কী কী ?
25. সালোকসংশ্লেষের কোন্ দশায় সূর্যালোক প্রয়োজন ?
26. NADP-র পুরো নাম কী ?
27. ATP-র পুরো নাম লেখো।
28. NADP-র সম্পূর্ণ নাম কী ?
29. RuDP-র পুরো নাম কী ?
30. PGA কী ?
31. বায়ুমণ্ডলে $CO_2$-এর শতকরা পরিমাণ কত ?
32. গ্লুকোজের রাসায়নিক সংকেত লেখো।
33. ফোটোলিসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন $H^+$ আয়ন কার সঙ্গে যুক্ত হয়?
34. সালোকসংশ্লেষীয় কার্য প্রণালি কী ?
35. সালোকসংশ্লেষের কোন্ দশায় $CO_2$ বিজারিত হয় ?
36. সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী দুটি কো-এনজাইমের নাম কী ?
37. সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষ হয় এমন একটি উদ্ভিদের নাম কী ?
38. ক্লোরোফিলযুক্ত দুটি প্রাণীর নাম করো।
39. কোন্ জাতীয় খাদ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1?
40. জীবকে বেঁচে থাকতে হলে কোন্ কোন্ উপাদানগুলি একান্ত প্রয়োজন ?
41. স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে কোন্ অঙ্গ দিয়ে জল শোষণ করে ?
42. শ্বেতসারের মৌলিক উপাদানগুলির নাম কী ?
43. গাছের কোন্ প্রক্রিয়ায় বাবয়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘাটতি এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় তার পূরণ হয় ?
44. কোন্ বিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করেন যে সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন উৎপাদন করে ?
45. $O_2$ শোষণ করে এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্যের নাম কী ?
46. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম যৌগের নাম কী ?
47. দুটি $C_4$ উদ্ভিদের নাম লেখো।
48. সালোকসংশ্লেষে আলোকবিক্রিয়ার স্থান কোথায় ?
49. সালোকসংশ্লেষ প্রতিরোধক একটি পদার্থের নাম কী ?
50. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার উপযুক্ত উষ্ণতা কত ?
51. PQ বলতে কী বোঝো ?
52. সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী দুটি ভিটামিনের নাম লেখো।
53. সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী একটি এনজাইম ও একটি কো-এনজাইমের নাম উল্লেখ করো।
54. pi-এর সম্পূর্ণ অর্থ কী ?
55. কোন্ উদ্ভিদের মূলে সালোকসংশ্লেষ ঘটে ?
56. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেনের উৎস কী ?
57. আলোকদশায় উৎপন্ন বস্তুগুলি কী কী ?
58. এক গ্রাম অণু গ্লুকোজে আবদ্ধ স্থৈতিকশক্তির পরিমাণ কত ?
59. ক্লোরোফিলের ধাতব মৌলের নাম করো।
60. PSII তন্ত্রে কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক শোষিত হয় ?
61. কত পরিমাণ সৌরশক্তি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয় ?
62. দুটি ইলেকট্রন বাহকের নাম করো।
63. ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল কী ?
64. একটি $C_4$ উদ্ভিদের নাম করো।

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put tick mark (✓) on correct answer) :**

1. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে—দিনে ☐ / রাতে ☐ / সবসময় ☐।
2. সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন গ্লুকোজ অণুর অক্সিজেন উৎস হল—$H_2O$ ☐ / $CO_2$ ☐ / $NO_2$ ☐ / $SO_2$ ☐।

3. নীচের কোন্‌টি একটি কোশের ক্ষেত্রে অঙ্গাণু নয় ?—মাইটোকনড্রিয়া □ / ক্লোরোফিল □ / নিউক্লিয়াস □।
4. সূর্যালোকের ফোটন কণা উত্তেজিত করে—ক্লোরোফিলকে □ / ভিটামিনকে □ / জলকে □ / অক্সিজেনকে □।
5. সালোকসংশ্লেষ একটি—অপচিতি প্রক্রিয়া □ / উপচিতি প্রক্রিয়া □ / অপচিতি ও উপচিতিমূলক প্রক্রিয়া □।
6. অন্ধকার দশায় তৈরি হয়—গ্লুকোজ □ / জল □ / কার্বন ডাইঅক্সাইড □।
7. গ্লুকোজকে শ্বেতসারে পরিণত করতে সাহায্য করে—পটাশিয়াম □ / ম্যাগনেশিয়াম □ / ক্যালশিয়াম □।
8. সবুজ উদ্ভিদকে বলে—প্রথম শ্রেণির খাদক □ / গৌণ খাদক □ / প্রগৌণ খাদক □ / উৎপাদক □।
9. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম যৌগ—RuDP □ / ATP □ / $NADPH_2$ □ / PGA □।
10. সালোকসংশ্লেষ প্রতিরোধক পদার্থ হল—$CO_2$ □ / ইথার □ / আলো □ / জল □।
11. গ্লুকোজে আবদ্ধ কার্বনের উৎস হল—কার্বন মনোঅক্সাইড □ / কার্বন ডাইঅক্সাইড □ / কার্বনিক অ্যাসিড □ / কার্বন ডাইসালফাইড □।
12. সালোকসংশ্লেষের আদর্শ স্থান হল—কাঁচা ফলের ত্বক □ / ফুলের বৃতি □ / উদ্ভিদের সবুজ কাণ্ড □ / পাতা □।
13. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস হল—জল □ / কার্বন ডাইঅক্সাইড □ / গ্লুকোজ □ / নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড □।
14. ফোটোলাইসিসে উৎপন্ন হয়—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আয়ন □ / হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন □ / হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন □ / হাইড্রোজেন ও জল □।
15. সালোকসংশ্লেষ একটি—রাসায়নিক বিক্রিয়া □ / আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া □ / উভয়ই □ / কোনোটাই না □।
16. সালোকসংশ্লেষ ঘটে—কাণ্ডে □ / পাতায় □ / মূলে □ / সবুজ অঙ্গে □।
17. সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গাণু—লিউকোপ্লাস্ট □ / ক্রোমোপ্লাস্ট □ / ক্লোরোপ্লাস্ট □ / অ্যামাইলোপ্লাস্ট □।
18. আপতিত সৌরশক্তির যে অংশ সালোকসংশ্লেষে ব্যয় হয় তার শতকরা হিসাব—10 □ / 20 □ / 30 □ / 1 □ / 2 □।
19. সালোকসংশ্লেষে কার্যকরী রঞ্জক—ক্লোরোফিল □ / ক্যারোটিন □ / জ্যান্থোফিল □ / ফাইকোবিলিন □।
20. অঙ্গার আত্তীকরণে প্রয়োজনীয় গ্রাহক যৌগটি—NADP □ / ATP □ / PGA □ / RuDP □।
21. বর্ণহীন ব্যাকটেরিয়ার জৈব খাদ্য সংশ্লেষ প্রক্রিয়া—সালোকসংশ্লেষ □ / ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ □ / রাসায়নিক সংশ্লেষ □ / কার্বন আত্তীকরণ □।
22. যে বিজ্ঞানী কার্বনগ্রাহী যৌগ আবিষ্কার করেন তার নাম—হিল □ / ব্ল্যাকম্যান □ / বুবেন □ / কেলভিন □।
23. সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত একটি সন্ধানী মৌল হল—$N^{15}$ □ / $P^{32}$ □ / $H^3$ □ / $O^{18}$ □।
24. ATP-তে কতগুলি উচ্চশক্তি সম্পন্ন বন্ড থাকে ?— 1টি □ / 2টি □ / 3টি □ / 4টি □।
25. আলোক শ্বসন প্রক্রিয়া কার বৈশিষ্ট্য ?— $C_3$ □ / $C_4$ □ / CAM □ / সব কটির □।
26. কোথায় $NADP^+$ বিজারিত হয়ে NADPH হয় ?—PSI □ / PSII □ / কেলভিন চক্র □ / অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন □।
27. $C_4$ উদ্ভিদে গ্রাহক হল—OAA □ / PEP □ / RuDP □ / PGA □।
28. উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ হলে কোন্ গ্যাস লুপ্ত হয় ?—$CO_2$ □ / $N_2$ □ / $O_2$ □ / $NH_3$ □।
29. সাইটোক্রোম হল—$O_2$ গ্রাহক □ / হাইড্রোজেন গ্রাহক □ / ইলেকট্রন গ্রাহক □ / জল গ্রাহক □।
30. আলোকশ্বসনের প্রথম উৎপন্ন বস্তু হল—ফসফোগ্লাইকোলেট □ / গ্লাইকোলেট □ / গ্লাইসিন □ / কোনোটিই নয় □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ——— জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়।
2. সবুজ উদ্ভিদে ——— হয়।
3. বিজ্ঞানী ——— সর্বপ্রথম ফোটোসিন্থেসিস শব্দটি ব্যবহার করেন।
4. সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদের সঞ্চয় অঙ্গে ——— রূপ খাদ্য জমা হয়।
5. সূর্যালোকের ——— কণা শোষণ করে।
6. ——— কে এনার্জি কারেন্সি বলে।
7. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ——— দশায় জলের জারণ ঘটে।
8. অন্ধকার দশায় $CO_2$-এর ——— ঘটে।
9. হিল বিক্রিয়াতে যেসব যৌগ হাইড্রোজেন গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে তাদের ——— ——— বলে।
10. সালোকসংশ্লেষের ——— দশায় জল বিশ্লেষিত হয়।
11. ——— খাদ্য তৈরির কারখানা বলা হয়।
12. সালোকসংশ্লেষ ——— মূলক প্রক্রিয়া।
13. ক্লোরোফিলবিহীন একটি উদ্ভিদের নাম হল ———।
14. ——— হল গ্লুকোজের রাসায়নিক সংকেত।
15. সালোকসংশ্লেষে জৈব অনুঘটক হল ———।
16. একটি ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত প্রাণীর উদাহরণ ———।
17. ছত্রাকে ——— না থাকায় সালোকসংশ্লেষ হয় না।
18. সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে পরিবেশে অক্সিজেন ও ——— এর সমতা বজায় থাকে।
19. সালোকসংশ্লেষের একটি অভ্যন্তরীণ উপাদান হল ———।
20. সালোকসংশ্লেষে অক্ষম একটি উদ্ভিদ হল ———।
21. সালোকসংশ্লেষ সৌরশক্তি ———তে পরিবর্তিত হয়।
22. ক্লোরোপ্লাস্টের অংশে আলোক বিক্রিয়া ঘটে।
23. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক ———।
24. আলোক বিক্রিয়ার অপর নাম ——— বিক্রিয়া।
25. হিল বিকারক ———।
26. কোশস্থ জৈব যৌগে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অঙ্গীভূত হওয়াকে ——— বলে।
27. যে চক্রের মাধ্যমে RuDP সৃষ্টি হয় তাকে ——— চক্র বলে।

28. ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষে ——— নির্গত হয় না।
29. অবর্ণ ব্যাকটেরিয়ার জৈববস্তু সংশ্লেষকে ——— বলে।
30. ATP সংশ্লেষের উপাদান হল ———।
31. আবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনে উৎপন্ন হয় ———।
32. আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গঠিত হয় ——— ——— ———।
33. ——— প্রথম বলেন যে সালোকসংশ্লেষে ইলেকট্রন দাতা হল জল।
34. অঙ্গার আত্তীকরণের গ্রাহক যৌগ হল ———।
35. ——— ——— কলায় সব চেয়ে বেশি শ্বেতসার তৈরি হয়।
36. একটি $NADH_2$ জারিত হয়ে ——— অণু ATP গঠন করে।
37. জলে দ্রবণীয় রঞ্জক হল ———।
38. ——— হল ATP উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া।
39. সালোকসংশ্লেষ দ্রুততম হয় ——— ———।
40. সালোকসংশ্লেষের জন্য একটি অপরিহার্য এনজাইম হল ———।
41. $CO_2$ স্থিতিকরণে $C_4$ উদ্ভিদে প্রথম উপজাত ———।

### D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. যে প্রক্রিয়ার উদ্ভিদ কার্বন অঙ্গীভূত করে তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে। ☐
2. সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গাণুকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। ☐
3. আপতিত সৌরশক্তি 10 শতাংশ সালোকসংশ্লেষে ব্যয় হয়। ☐
4. সালোকসংশ্লেষী কার্য বর্ণালি 500-600 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। ☐
5. সালোকসংশ্লেষী রঙ্গক ক্যারোটিন। ☐
6. যে বিক্রিয়ার জল বিশ্লিষ্ট হয় তাকে ব্ল্যাকম্যানের বিক্রিয়া বলে। ☐
7. যে বিক্রিয়ায় কার্বন অঙ্গীভূত হয় তা হল হিল বিক্রিয়া। ☐
8. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডগ্রাহী যৌগ হল NADP। ☐
9. সালোকসংশ্লেষ প্রথম গঠিত স্থায়ী যৌগ PGALD। ☐
10. বর্ণহীন ব্যাকটেরিয়ার জৈববস্তু সংশ্লেষ পদ্ধতিকে সালোকসংশ্লেষ বলে। ☐
11. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন বস্তু শর্করা, অক্সিজেন, জল ও শক্তিধর যৌগ। ☐
12. সালোকসংশ্লেষে জল বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্লাসমোলাইসিস বলে। ☐
13. সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ হল NADP। ☐
14. ATP সংশ্লেষের সময় ইলেকট্রন যায় সাইটোক্রোমের মাধ্যমে। ☐
15. আলোকশ্বসন প্রক্রিয়া $C_4$ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

### নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. (a) সালোকসংশ্লেষ কী ? (b) সালোকসংশ্লেষ কোথায় হয় ? 2. সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য একটি জৈব এনজাইম ও একটি কো-এনজাইমের নাম উল্লেখ করো। 3. ক্লোরোফিলের উপাদানগুলি কী কী ? 4. হিল বিক্রিয়া কী ? 5. সালোকসংশ্লেষের কয়টি দশা ? কী কী ? 6. সালোকসংশ্লেষের প্রথম জৈব যৌগ কী ? 7. ক্লোরোফিল কণা কী ? 8. ফোটনকণা বলতে কী বোঝো ? 9. গ্লুকোজ-সঞ্চিত সৌরশক্তির রূপ কী ও পরিমাণ কত ? 10. সালোকসংশ্লেষে উপজাত পদার্থ কী কী ? 11. সূর্যালোকের ভূমিকা সালোকসংশ্লেষে কীরূপে সাধিত হয় ? 12. একটি $3^{-C}$ যৌগের নাম করো। 13. সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের ভূমিকা কী ? 14. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন ? 15. ফসফোরাইলেশন বলতে কী বোঝো ? এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের নাম করো। 16. PSI বলতে কী বোঝো ? 17. PSII বলতে কী বোঝো ? 18. সালোকসংশ্লেষীয় কর্মক্ষণ বর্ণালি বলতে কী বোঝো ? 19. সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গ বলতে কী বোঝো ? 20. সৌরশক্তি কীভাবে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ? 21. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থের বিষয় যা জানো লেখো। 22. ফোটন কী ? 23. লোহিত বিচ্যুতি কী ? 24. জেড প্রকল্প কাকে বলে ? 25. ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া কী ? 26. কেলভিন চক্র কী ? 27. ফোটোলিসিস কী ? 28. $C_2$ বিক্রিয়াপথ কাকে বলা হয় ? 29. হ্যাচ স্ল্যাক্ চক্র কী ? 30. ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড চক্র কাকে বলে ? 31. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকে $C_3$ সালোকসংশ্লেষ বলে কেন ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions): (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

1. সালোকসংশ্লেষে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎস ও ভূমিকা উল্লেখ করো।
2. সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী রঞ্জক পদার্থগুলির কাজ কী ?
3. সালোকসংশ্লেষের জন্য পাতার অভিযোজনগুলি উল্লেখ করো।
4. সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়া ছকের মাধ্যমে দেখাও।

5. অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনের বিবরণ দাও।
6. অন্ধকার দশার প্রধান বিক্রিয়াগুলি ছকের মাধ্যমে দেখাও।
7. সবুজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে "সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ" বলতে কী বোঝো ?
8. আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলি অন্ধকার বিক্রিয়ার কোন্ কোন্ ধাপে ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করো।
9. হিল বিকারক কোন্‌গুলি ? কীভাবে প্রমাণ করবে জলই সালোকসংশ্লেষের উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস ?
10. রেডড্রপ প্রভাব কাকে বলে ?
11. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য কী ?
12. সালোকসংশ্লেষে দুটি রঞ্জক তন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করো।
13. $C_4$ পথের সঙ্গে আলোকশ্বসনের সম্পর্ক নির্ণয় করো।
14. ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ সংক্ষেপে লেখো।
15. CAM-এর অর্থ কী ? এই চক্র ছকের মাধ্যমে দেখাও।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. (a) সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে ? (b) সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় প্রধান রঞ্জক পদার্থগুলি কী কী ?
2. (a) প্রধান ও সহকারী রঞ্জক পদার্থ কাকে বলে ? (b) ক্লোরোফিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
3. (a) সালোকসংশ্লেষের আলোক ও অন্ধকার দশা কী ? (b) আলোক দশায় সর্বশেষ উৎপন্ন দ্রব্য কী ? (c) ফটোসিস্টেম I ও II দ্বারা অণুঘটিত প্রধান বিক্রিয়াগুলি বুঝিয়ে দাও।
4. (a) ফোটোফসফোরাইলেশন কী ? (b) এটি কোন্ জীবনক্রিয়ায় এবং কোন্ দশায় ঘটে ? (c) উক্ত বিক্রিয়ার তাৎপর্য কী ?
5. সালোকসংশ্লেষে আলোক দশার তাৎপর্য উল্লেখ করো।
6. (a) সালোকসংশ্লেষের উপাদানগুলির নাম করো। (b) এদের উৎস দেখাও। (c) এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের ভূমিকা কী ?
7. সালোকসংশ্লেষের আঁধার দশাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
8. (a) সালোকসংশ্লেষের হিল বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া বলতে কী বোঝো ? (b) ওই দুই বিজ্ঞানী তাঁদের সিদ্ধান্তে কীভাবে উপনীত হয়েছিলেন ?
9. একটি স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষের বিক্রিয়াগুলির বিষয়ে লেখো।
10. স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া কী সালোকসংশ্লেষকালে উপজাত পদার্থরূপে অক্সিজেন নির্গত করে? কারণ দেখাও।
11. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
12. (a) সালোকসংশ্লেষে উপজাত অক্সিজেনের উৎস কী ? (b) আবর্ত ও অনাবর্ত ফসফোরাইলেশনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
13. $C_2$ বিক্রিয়াপথ কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখো।
14. (a) $C_4$ বিক্রিয়াপথ কী? (b) চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
15. উদ্ভিদের প্রধান রঞ্জক পদার্থের নাম ও উৎসগুলি উল্লেখ করো।
16. (a) কোয়ান্টাজোমের সংজ্ঞা দাও। (b) আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া কী ?
17. (a) সালোকসংশ্লেষকে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলে কেন ? (b) এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্টের ভূমিকা আলোচনা করো।
18. (a) CAM কাকে বলে ? (b) CAM চক্রের বিবরণ দাও।

### B. পার্থক্য লেখো (Distinguish between) :

1. আলোকদশা ও অন্ধকার দশা। 2. PSI ও PSII তন্ত্র। 3. সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষ। 4. রাসায়নিক শক্তি ও সৌরশক্তি। 5. সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গ ও সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গাণু। 6. আবর্তন ও অনাবর্তক ফস্‌ফোরাইলেশন। 7. হিল বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া। 8. কোয়ান্টা ও কোয়ান্টাজোম। 9. ADP ও ATP। 10. ক্লোরোফিল a ও b। 11. ক্লোরোফিল ও ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল। 12. $C_3$ পথ ও $C_4$ পথ। 13. ব্যাকটেরিও সালোকসংশ্লেষ ও উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ। 14. আলোকশ্বসন ও শ্বসন।

### C. টীকা লেখো (Write short notes) :

1. ফোটোলিসিস। 2. ক্লোরোফিল। 3. অঙ্গার আত্তীকরণ। 4. অন্ধকার দশা। 5. আলোকদশা। 6. হিল বিক্রিয়া। 7. PSI। 8. PSII। 9. রাসায়নিক সংশ্লেষ। 10. কেলভিন চক্র। 11. ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া। 12. কোয়ান্টাজোম। 13. সালোকসংশ্লেষকারী একক। 14. সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ। 15. ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন। 16. আলোকশ্বসন। 17. $C_3$ উদ্ভিদ। 18. $C_4$ উদ্ভিদ। 19. ব্যাকটেরিও সালোকসংশ্লেষ। 20. হ্যাচ স্ল্যাক চক্র।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# বৃদ্ধি, রূপান্তর ও বয়ঃপ্রাপ্তি
# [GROWTH, METAMORPHOSIS AND AGEING]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

● **বৃদ্ধি** ঃ বৃদ্ধি সজীব বস্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শারীরবৃত্তীয় কারণে উপচিতি অপচিতির চেয়ে বেশি হলে দেহজ বস্তুর সংযোজন ঘটে। এইভাবে জীবের দেহের আয়তন স্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে। সাধারণত একটি এককোশী ভ্রূণ অবস্থা থেকে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়ে পরিণত জীব গঠিত হয়। এককোশী জীবের ক্ষেত্রে জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষের জন্য নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং কোশের আয়তন বেড়ে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বহুকোশী জীবের ক্ষেত্রে কোশবিভাজন ও কোশের আয়তন বেড়ে সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়।

● **রূপান্তর** ঃ যৌন জননে অংশগ্রহণকারী প্রাণীদের জাইগোট গঠনের মাধ্যমে জীবন শুরু হয়। জাইগোট উপর্যুপরি বহুবার মাইটোসিস্ পদ্ধতির সাহায্যে বিভাজিত হতে থাকে এবং ভ্রূণ দশার সৃষ্টি হয়। এই ভ্রূণ দশার পরিস্ফুরণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঘটে ফলে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত হয়। প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণে ভ্রূণ দশা থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত হয়। যেমন—স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি, কিন্তু পরোক্ষ পরিস্ফুরণে প্রাণীর ডিম থেকে একটি মধ্যবর্তী প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীনজীবী দশার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনকারী এই দশার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন বা রূপান্তরের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহ গঠিত হয়।

● **বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তি** ঃ প্রতিটি জীব জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বার্ধক্যপ্রাপ্তি লাভ করে এবং অবশেষে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের যে শাখায় বার্ধক্য, জরা ও তার পরিণতি সম্বন্ধে আলোচিত হয় তাকে **গেরেন্টোলজি** বলে। আপাতদৃষ্টিতে **বার্ধক্যপ্রাপ্তি** ও **বয়ঃপ্রাপ্তি** দুটো কথা একই রকমের মনে হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

## ❂ 5.1. বৃদ্ধি (Growth) ❂

### ▲ বৃদ্ধির সংজ্ঞা, প্রকৃতি, স্থান, বৃদ্ধির হার, ফলাফল, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব (Definition, Nature, Site, Rate, Events, Types, Importance of Growth)

❖ (a) **বৃদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Growth) :** জীবকোশের প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষণের ফলে জীবদেহে যে প্রক্রিয়ায় আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বাড়ে তাকে বৃদ্ধি বলে।

● **বৃদ্ধির পদ্ধতি (Process of growth) :** বৃদ্ধি প্রধানত তিনভাবে ঘটে, যেমন—

(i) **অক্সেনটিক বৃদ্ধি** (Auxentic growth)—প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু সংশ্লেষিত হওয়ার ফলে কোশের আয়তনের বৃদ্ধিকে **অক্সেনটিক বৃদ্ধি** বলা হয়।

চিত্র : 5.1 : ভাজক কলার অবস্থানের চিত্ররূপ।

(ii) **মাল্টিপ্লিকেটিভ বৃদ্ধি** (Multiplicative growth)—কোশ বিভাজিত হয়ে কোশের সংখ্যা বাড়ে এবং এর ফলে জীবের বৃদ্ধি ঘটে। একে **মাল্টিপ্লিকেটিভ বৃদ্ধি** বলে।

(iii) **অ্যাক্রেশনারি বৃদ্ধি** (Accretionary growth)—যোগকলার ধাত্র, তন্তু প্রভৃতিতে সঞ্চয়ের ফলে যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে **অ্যাক্রেশনারি বৃদ্ধি** বলা হয়।

◘ (b) **বৃদ্ধির প্রকৃতি (Nature of growth) :**

প্রাণীর বৃদ্ধির সময়কাল নির্ধারিত (Determinate) এবং সব স্থানেই একই সঙ্গে ঘটে; আজীবন বৃদ্ধি চলে না— নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু উদ্ভিদদেহে এই বৃদ্ধি **অনির্ধারিত** (Indeterminate), কারণ এই বৃদ্ধি আজীবন চলে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে (মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ, পত্রমূলে) ঘটে। বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদদেহে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভাজক কলার বিভাজন, অপত্য কোশের রূপান্তর ও পরিবর্তনের ফলেই এই নতুন অঙ্গের সূচনা হয়।

◘ (c) **বৃদ্ধির স্থান (Site of growth) :**

1. **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে**—এককোশী উদ্ভিদে কোশটির ধীরে ধীরে আয়তন বেড়ে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বহুকোশী ও উন্নত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি সব স্থানে সমান ভাবে হয় না। সাধারণত বৃদ্ধি কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে, পত্রবৃন্তে এবং কুঁড়িতে সীমাবদ্ধ থাকে। এসব বৃদ্ধি অঞ্চলগুলিতে **মেরিস্টেম** (Meristem) বা **ভাজককলা** থাকে। ভাজককলার কোশগুলি স্বাভাবিকভাবে ক্রমাগত বিভাজিত হয় এবং কোশের সংখ্যা বাড়ে এবং পরিণত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সৃষ্টি করে।

● **উন্নত উদ্ভিদের বৃদ্ধি (Growth in higher plants) :** উন্নত উদ্ভিদের বৃদ্ধির তিনটি পর্যায় থাকে, যেমন—

1. **ভ্রূণের বৃদ্ধি** (Development of embryo)— নিষেকের পর ভ্রূণাণু বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। বীজের বীজপত্রে বা সস্যে সঞ্চিত খাদ্য সংগ্রহ করে ভ্রূণ পরিণত হয় এবং ভ্রূণমূল, ভ্রূণাক্ষ ও ভ্রূণমুকুল গঠন করে।

2. **অঙ্কুরোদ্গম** (Germination)— জল, অক্সিজেন, উষ্ণতা, হরমোন (জিব্বারেলিন) ইত্যাদির প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছে রূপান্তরিত হয়।

3. **চারা গাছের বৃদ্ধি** (Growth of seedling)— অনুকূল পরিবেশে চারাগাছের কোশগুলি বিভাজিত হয়ে আয়তনে বাড়ে এবং নির্দিষ্ট কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে। এর পর চারাগাছটি পরিণত হয়।

2. **প্রাণীদের ক্ষেত্রে**—নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বাঙ্গব্যাপী বৃদ্ধি চলে। উদ্ভিদের ন্যায় কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে না। ভ্রূণের পরিস্ফুরণে প্রাণীদেহের অঙ্গগুলি সংযোজিত হয় অর্থাৎ জন্মানোর পরই সব অঙ্গগুলি প্রাণীদেহে থাকে, কোনো নূতন অঙ্গের সৃষ্টি হয় না। কোশ বিভাজন ও কোশের আয়তন বেড়ে প্রাণীদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে।

### ◘ (d) বৃদ্ধির হার (Rate of growth) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত জীবদেহের বৃদ্ধির মাত্রাকে বৃদ্ধির হার বলে।**

জীবের বৃদ্ধি সারা জীবন সমান হারে হয় না। জীবের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বৃদ্ধির হারের তারতম্য দেখা যায়। বৃদ্ধিকে সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**বিলম্বকাল বা ল্যাগ দশা, মুখ্য বৃদ্ধিকাল বা লগ দশা, হ্রাসকাল** এবং **স্থির দশা।**

চিত্র 5.2 ঃ বৃদ্ধির হার (সিগময়েড কার্ভ)।

প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধির শুরুতে বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। বৃদ্ধির এই প্রাথমিক পর্যায়কে **বিলম্বকাল বা ল্যাগ দশা** (Lag phase) বলে। বিলম্বকালের পর থেকে বৃদ্ধি দ্রুত হারে সম্পন্ন হয়। একে **মুখ্য বৃদ্ধি কাল বা লগ দশা** (Log phase) বলে। এই বৃদ্ধিতে প্রাণীদেহের সব কলা ও অঙ্গ অংশগ্রহণ করে। উদ্ভিদের মতো শুধুমাত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গের বৃদ্ধি হয় না। প্রাণীদেহের সব অঙ্গের বৃদ্ধি হতে থাকে। তবে সব অঙ্গের বৃদ্ধি একই হারে হয় না। কোনো কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে আবার কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছানোর সময় মাথা অপেক্ষা ধড়, হাত ও পা দ্রুত গতিতে বাড়ে। এর পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। একে **হ্রাস দশা** (Decelerating phase) বলা হয়। সব শেষে বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই দশাকে **স্থির দশা বা স্থিতিশীল দশা** (Stationary phase) বলে। এই দশায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত ধ্রুবক থাকে। বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী বৃদ্ধির হার ও সময়ের অনুপাত নির্ভর লেখচিত্র (Graph) তৈরি করলে সেটি ইংরেজি বর্ণ 'S'-এর মতো দেখায়। বৃদ্ধির এই ধরনের লেখচিত্রকে **সিগময়েড কার্ভ** (Sigmoid curve) বলে। 5.2 নং চিত্রে সিগময়েড কার্ভ দেখো।
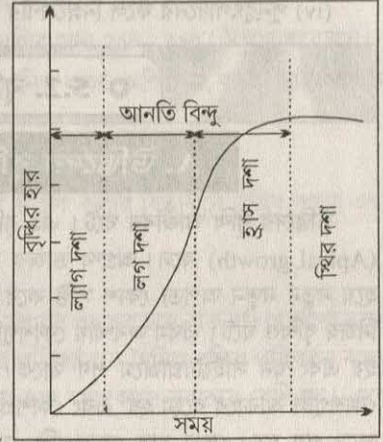
### ◘ (e) বৃদ্ধির কয়েকটি ফলাফল (Some results of Growth) ঃ

1. একটি কোশ থেকে **কোশবিভাজনের মাধ্যমে** জীবদেহে অনেকগুলি কোশের সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেহের আকার ও আয়তন বেড়ে যায়।

2. কোশ বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য কোশগুলি **নানা প্রকার কলা গঠন করে** এবং দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে।

3. কোশে **উপচিতিমূলক বিপাকীয় ক্রিয়া** সম্পন্ন হলে, প্রোটোপ্লাজমের ভর ও আয়তন বাড়ে, ফলে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে।

4. কোশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার **নির্জীব বস্তু সঞ্চিত হয়**। যেমন উদ্ভিদকোশে—কোশপ্রাচীরে **লিগনিন, সুবেরিন, কিউটিন** প্রভৃতি জমে কোশের আয়তনকে বাড়ায়। তা ছাড়া কোশে প্রোটিন, লিপিড বা ফ্যাট সঞ্চিত হয়ে কোশের আয়তন ও ওজন বাড়তে থাকে। প্রাণীর অস্থি কলায়— **ক্যালসিয়াম, ফসফরাস** প্রভৃতি সঞ্চিত হয় ফলে অস্থির আকার, আয়তন ও ওজন বাড়ে।

সুতরাং জীব কোশে নানা প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয়ে জীব দেহ বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ বলা যায়।

### ◘ (f) বৃদ্ধির প্রকারভেদ (Different types of Growth) ঃ

প্রকৃতি অনুসারে জীবের বৃদ্ধি সাধারণত তিন প্রকার, যেমন—(i) **অঙ্গজ বৃদ্ধি**, (ii) **পুনরুৎপাদনকারী বৃদ্ধি** এবং (iii) **জননগত বৃদ্ধি**।

1. **অঙ্গজ বৃদ্ধি** (Vegetative growth)— যে প্রক্রিয়ায় কোশবিভাজন, কলাগঠন, কোশীয় সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে, এককোশী জাইগোট বেড়ে বহুকোশী পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ গঠন করে যাতে জীবদেহের আকার, আয়তন ও ওজন বাড়ে তাকে **অঙ্গজ বৃদ্ধি** বলে।
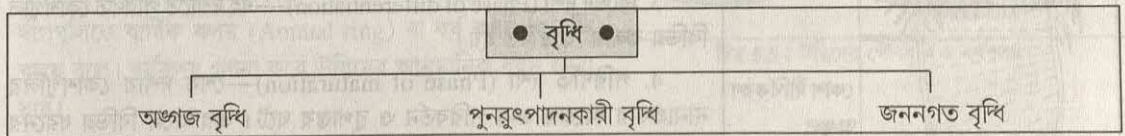
2. **পুনরুৎপাদনকারী বৃদ্ধি** (Growth of regeneration)— যে বৃদ্ধিতে জীবদেহের ক্ষতস্থান নিরাময় হয়ে জীব স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে আসে, তাকে **পুনরুৎপাদনকারী বৃদ্ধি** বলে।

3. **জননগত বৃদ্ধি** (Reproductive growth)—জীবদেহের জনন অঙ্গগুলির পূর্ণতা ও সক্রিয়তা লাভের জন্য যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে **জননগত বৃদ্ধি** বলে। উদাহরণ—উদ্ভিদের পুংস্তবক, স্ত্রীস্তবক এবং প্রাণীর শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি।

■ (g) **বৃদ্ধির কয়েকটি গুরুত্ব (Some importance of growth) :**

(i) বৃদ্ধির ফলে জীবের দৈহিক ও জৈবিক পরিপূর্ণতা আসে।
(ii) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীব বংশবিস্তারের সুযোগ লাভ করে।
(iii) বৃদ্ধির ফলে পরিণত হয়ে জীব প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে।
(iv) পুনরুৎপাদনের ফলে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বংশবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।

## 5.2. বৃদ্ধির দশা (Phases of Growth)

### A. উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশা — Phases of growth in Plants

উদ্ভিদের বৃদ্ধি আজীবন ঘটে। এই বৃদ্ধি সাধারণত মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে সীমাবদ্ধ। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **অগ্রস্থ বৃদ্ধি** (Apical growth) বলে। অগ্রস্থ ভাজক কলা বারবার বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন অপত্য কোশ সৃষ্টি করে। এই নতুন কোশগুলির নিজস্ব বৃদ্ধিও ঘটে। প্রথম অবস্থায় কোশগুলির কোশপ্রাচীর পাতলা হয় এবং ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এর পর আস্তে আস্তে কোশগুলি আকারে বড়ো হয় এবং কোশপ্রাচীরে নানা প্রকার পদার্থ জমে পুরু হয়। দেখা যায় কোশগুলি যে হারে বাড়ে, কোশের প্রোটোপ্লাজম সেই হারে বাড়ে না। উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **কোশ গহ্বরের** আবির্ভাব ঘটে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি তিনটি দশায় দেখা যায়, যেমন—1. কোশ বিভাজন দশা, 2. কোশ দীর্ঘিকরণ দশা এবং 3. পরিণতি দশা।
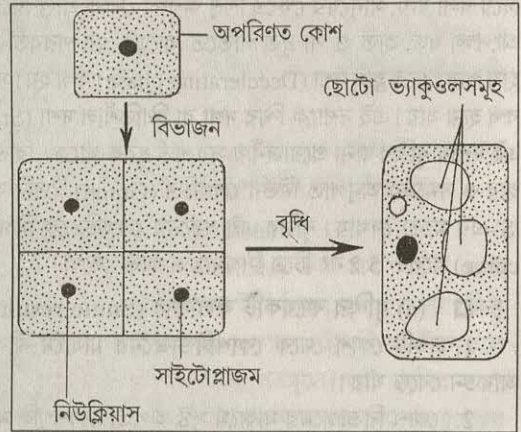
চিত্র 5.3 : উদ্ভিদকোশের বিভাজন ও বৃদ্ধির চিত্ররূপ। বৃদ্ধির সাথে সাথে কোশের ভ্যাকুওলের আবির্ভাব ঘটে।

1. **কোশ বিভাজন দশা** (Phase of cell division)— এই দশায় ভাজক কলার কোশগুলি দ্রুত বিভক্ত হতে থাকে এবং বহু অপত্য কোশ সৃষ্টি হয়। সাধারণত মাইটোটিক কোশ বিভাজনের ফলে এই ধরনের বৃদ্ধি হয়। জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডের শীর্ষের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দশা দেখা যায়। এর ফলে নূতন কোশের সৃষ্টি হয়।
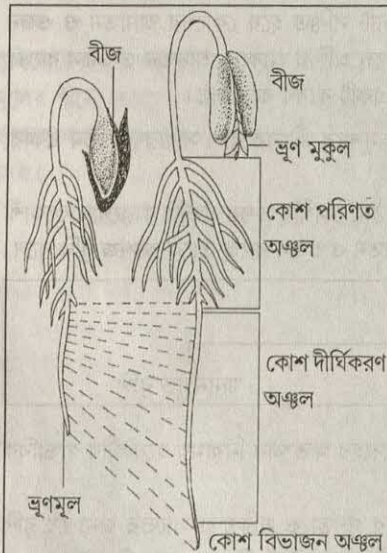
চিত্র 5.4 : অঙ্কুরিত বীজের মূলের বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়।

2. **দীর্ঘিকরণ দশা** (Phase of cell elongation)—এই দশায় অপত্য কোশগুলির আয়তন বাড়ে এবং প্রসারিত হয়, কোশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুওল বা গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্যাকুওলে কোশরস থাকে যা কোশের রসস্ফীতি চাপ বাড়তে সাহায্য করে। এতে কোশের আয়তন আরও বাড়ে। এই অঞ্চলে উদ্ভিদের সক্রিয় বৃদ্ধি ঘটে এবং উদ্ভিদ লম্বায় বাড়ে।

3. **বিভেদ দশা** (Phase of differentiation)—এই দশাতে পরিণত কোশগুলি বিভিন্ন কলায় বিভেদিত হয়।

4. **পরিণতি দশা** (Phase of maturation)—শেষ দশায় কোশগুলির নানাপ্রকার কাজের জন্য পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের কলা, অঙ্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে দেহের আয়তন বাড়ে। এই দশায় কোশগুলি পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত হয়ে স্থায়ী অবস্থায় আসে।

সাধারণত উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশাগুলিতে ঘটা সামগ্রিক বৃদ্ধিকে **প্রাথমিক বৃদ্ধি** (Primary growth) বলা হয়। কিন্তু বিশেষভাবে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর কিছু কিছু পরিণত কলা, যেমন—ক্যাম্বিয়াম কলা (Cambium)

পুনর্বিভাজন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে (ক্যাম্বিয়াম) বিভাজিত হয়। এর ফলে উদ্ভিদ প্রস্থে বাড়ে। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **গৌণ বৃদ্ধি** (Secondary growth) বলে। প্রাথমিক ও গৌণবৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের **অঙ্গজ বৃদ্ধি** (Vegetative growth) হয়। অঙ্গজ বৃদ্ধির পর উদ্ভিদের **জনন বৃদ্ধি** (Reproductive growth) আরম্ভ হয়। এতে প্রথমে পুষ্পমুকুল এবং পরে ফুল ও ফল গঠিত হয়।

### ➤ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য (Some Facts about Plant growth) ঃ

1. **উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ঃ** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য $25^0 - 35^0C$ উষ্ণতা প্রয়োজন।

2. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ ঃ** উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য খনিজ লবণ, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হরমোন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন।

3. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোশ ঃ** ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

4. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির স্থান ঃ** কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে। অগ্রস্থ ভাজক কলার বিভাজনে উদ্ভিদ লম্বায় এবং পার্শ্বস্থ ভাজক কলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পাশে বাড়ে।

5. **উদ্ভিদের দৈনিক বৃদ্ধির পরিবর্তন ও বৃদ্ধির ঋতুগত পরিবর্তন ঃ**

(i) **দৈনিক বৃদ্ধির পরিবর্তন**—উদ্ভিদের দিনে বৃদ্ধি খুব কম হয়। বৃদ্ধি সাধারণত সন্ধ্যার পর শুরু হয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং ভোরে সবচেয়ে বেশি হয়। প্রত্যেক 24 ঘণ্টার বৃদ্ধির এই ধরনের পরিবর্তনকে **দৈনিক বৃদ্ধির পরিবর্তন** বলে।

(ii) **বৃদ্ধির ঋতুগত পরিবর্তন** — শীতকালে বেশির ভাগ উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয় এবং বসন্তকালে সবচেয়ে বেশি হয়। একে **বৃদ্ধির ঋতুগত পরিবর্তন** বলে।

6. **বৃদ্ধির প্রকৃতি ঃ**

(i) **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি (Regenerative growth) ঃ** উদ্ভিদের জীবন দশায় কোনো অঙ্গের ক্ষতি হলে বা অঙ্গহানি ঘটলে কোশ বিভাজনের মাধ্যমে তা পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় বহু উদ্ভিদে শুধু মাত্র মূল সজীব থাকলে অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদের বিটপ অংশ আবার গঠিত হয়। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি** বলে।

(ii) **অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth) ঃ** উদ্ভিদের জনন অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধিকে **অঙ্গজ বৃদ্ধি** বলে।

(iii) **জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth) ঃ** উদ্ভিদ অঙ্গে পুষ্পমুকুল সৃষ্টি এবং পরে ফুল ও ফল গঠনের সময় যে বৃদ্ধি হয়, তাকে **জনন বৃদ্ধি** বলে।

7. **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অক্সিজেনের ভূমিকা ঃ** উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্য জারিত হয়। শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রতিটি কোশে অক্সিজেন সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। এজন্য জীবের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য বলা যায়।

8. **বৃদ্ধি বলয় ঃ** বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে কতকগুলি সমকেন্দ্রীয় বলয়াকার স্তর দেখা যায়। উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির ফলে জাইলেমের কাষ্ঠল উপাদানগুলি সাধারণত প্রতি বসন্ত বা গ্রীষ্ম ঋতুতে বলয়াকারে জমা হয়। প্রস্থচ্ছেদ চক্রাকার ওই দাগগুলিকে **বার্ষিক বলয়** (Annual ring) বা **বর্ষ বলয়** বা **বৃদ্ধি বলয়** বলে। বর্ষবলয় গণনা করে উদ্ভিদের আনুমানিক বয়স জানা যায়।
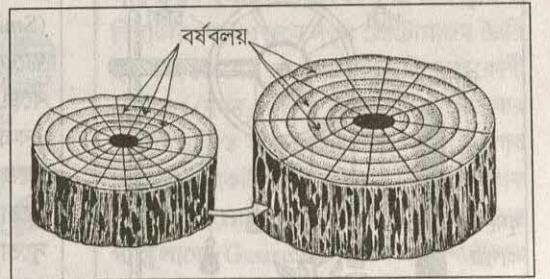
চিত্র 5.5 ঃ উদ্ভিদের গৌণবৃদ্ধি ও বর্ষবলয়।

### ➤ উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Plant growth) ঃ

পাতা, কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি নীচে বর্ণনা করা হল।

1. **সাধারণ স্কেলের সাহায্যে** (By common ordinary scale) ঃ সাধারণ স্কেলের সাহায্যে বৃদ্ধির পরিমাপ করা হল সহজ পদ্ধতি। কোনো অঙ্গের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য মেপে নির্দিষ্ট সময় পর দৈর্ঘ্য মাপলে বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যায়।

2. **আনুভূমিক তল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে** (By horizontal microscope) ঃ আনুভূমিক তল মাইক্রোস্কোপটি একটি স্কেলাঙ্কিত খাড়া দণ্ডের উপর ওঠা-নামা করে। যন্ত্রটির সাহায্যে একটি গাছের বর্ধনশীল কাণ্ড শীর্ষে ফোকাস করে স্কেলে নির্দেশিত স্থানটি চিহ্নিত করতে হয়। কিছু সময় পর পর কাণ্ডশীর্ষ পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করলে ক্রমশ দূরত্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রথম চিহ্নিত স্থান ও পরবর্তী চিহ্নিত স্থানগুলির দূরত্ব পর পর মাপলে বৃদ্ধির হার জানা সম্ভব হয়।

চিত্র 5.6 ঃ আনুভূমিক তল মাইক্রোস্কোপ।

3. **আর্ক ইন্ডিকেটারের সাহায্যে** (By Arc indicator) ঃ এই যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদ কাণ্ডের বৃদ্ধির হার পরিমাপ করা হয়।

(i) **আর্ক ইন্ডিকেটারের বর্ণনা**— ত্রিভুজাকৃতি একটি কাঠের ফ্রেমের একদিকের আর্ক বরাবর স্কেল আঁকা থাকে। অন্যদিকে দুই বাহুর মিলনস্থলে খাঁজযুক্ত ঘূর্ণায়মান চাকার সঙ্গে একটি নির্দেশক কাঁটা যুক্ত থাকে। নির্দেশকটি ওই স্কেলে নিজের অবস্থান নির্দেশ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কাণ্ডের বৃদ্ধির হার মাপার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়।

(ii) **উপকরণ ও পরীক্ষা**—দ্রুত বর্ধিত একটি গাছের কাণ্ডশীর্ষে টোন সুতো দিয়ে বেঁধে সুতোটি চাকার খাঁজে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সুতোর অপর প্রান্ত এমন একটি উপযুক্ত ওজন বেঁধে দেওয়া হল যাতে সুতোটি টানটান থাকে, কিন্তু কাণ্ডশীর্ষ ছিঁড়ে না যায়। এই অবস্থায় নির্দেশক কাঁটার অবস্থান লক্ষ করে পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে 12 ঘণ্টা রেখে দেওয়া হল।

(iii) **পর্যবেক্ষণ**— পরীক্ষার শুরুতে কাঁটাটি যেখানে থাকে, কয়েক ঘণ্টা পর সেখান থেকে সরে সেটি নীচের দিকে নেমে যায়।

(iv) **সিদ্ধান্ত** — নির্দেশক কাঁটার প্রথম ও শেষ অবস্থানের অর্থাৎ 12 ঘণ্টা পর বৃদ্ধির হার নির্দেশ করে।

চিত্র 5.7 ঃ আর্ক ইন্ডিকেটার।
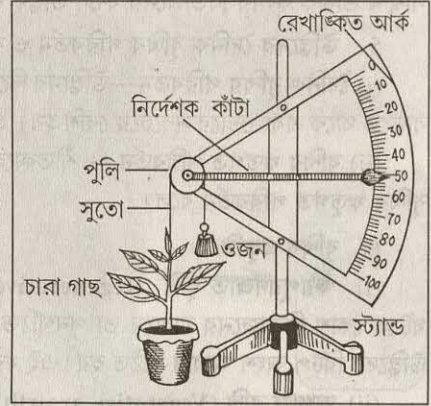
4. **অক্সানোমিটারের সাহায্যে** (By Auxanometer) ঃ অক্সানোমিটার আর্ক ইন্ডিকেটারের পরিবর্তিত ও উন্নতরূপ বলা যায়। যন্ত্রটির একদিকে ঘূর্ণায়মান ড্রামে ঝুল মাখানো (ধূমায়িত) কালো কাগজ (Smoked paper) জড়ানো থাকে এবং অন্যদিকে দুটি চাকা বা পুলি থাকে। চাকা দুটির মধ্যে একটি বড়ো ও অন্যটি ছোটো। ছোটো চাকাটি বড়ো চাকার কেন্দ্রীয় অক্ষে যুক্ত। ছোটো চাকার খাঁজে ঝোলানো সুতোর একপ্রান্তে কাণ্ডশীর্ষ বেঁধে অপরপ্রান্তে এমন একটি ওজন ঝোলানো হয় যাতে সুতোটি টানটান থাকে। একইভাবে বড়ো চাকার উপর দিয়ে ঝোলানো সুতোর দু'প্রান্তে দুটি সমান ওজন ঝোলানো হয়। ড্রামের দিকে ঝুলন্ত ওই সুতোর সঙ্গে একটি নির্দেশক সূচক বা কাঁটা এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ঝুল মাখানো কালো কাগজে দাগ কাটতে পারে। বৃদ্ধি মাপার সময় ড্রামটিকে নির্দিষ্ট গতিতে ঘোরানো হয়।

কাণ্ডশীর্ষ যেমন যেমন বাড়ে ছোটো ও বড়ো চাকাটি তেমন তেমন ডানদিকে ঘুরে যায়। ফলে নির্দেশক কাঁটা কালো কাগজে ঊর্ধ্বমুখী দাগ কাটতে থাকে। পরীক্ষার শুরুতে নির্দেশক কাঁটার দাগ এবং প্রতি ঘণ্টায় নির্দেশক কাঁটায় দেখানো দূরত্ব থেকে ঘণ্টা পিছু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার পরিমাপ করা যায়।

চিত্র 5.8 ঃ অক্সানোমিটার।

5. **স্পেস-মার্কার সাহায্যে** (By Space-marker) ঃ এই যন্ত্রটির সাহায্যে মূল বা পাতার অসম বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায়।

(i) **যন্ত্রের বর্ণনা**—যন্ত্রটি দেখতে কাঁচির মতো। এর দুটি হাতলের বিপরীত প্রান্তে দুটি চাকতি লাগানো থাকে। চাকতি দুটিতে ছক-কাগজের মতো বর্গাকার উঁচু-নীচু দাগ কাটা থাকে। চাকতি দুটির উপরে কালো কালি লাগিয়ে তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান মূল বা কচি পাতা ঢুকিয়ে দেবার পর হাতলে হালকা চাপ দিলে মূল বা পাতার উপর সমান দূরত্বে দাগ পড়তে থাকে।

(ii) **উপকরণ ও পরীক্ষা**—একটি স্পেস-মার্কার যন্ত্র, একটি বড়োমুখ বোতল, বোতলের মুখের মাপ মতো রবারের ছিপি যাতে ছিদ্র করা থাকে, ছিদ্রের মাপ মতো একটি কাচনল, অঙ্কুরিত ছোলা বীজ (বা টবে লাগানো গাছের কচি পাতা), আলপিন।

অঙ্কুরিত ছোলা মূলের আগা থেকে কয়েক মিলিমিটার উপরে (পাতার ক্ষেত্রে আগার দিকে) স্পেস-মার্কারের সাহায্যে দাগ দেওয়া হল। দাগ দেওয়ার পর বীজটিকে একটি আলপিনের সাহায্যে ছিপির নীচের অংশে আটকে দেওয়া হল। বোতলের মধ্যে অল্প জল রেখে বীজসহ ছিপিটি বোতলের মুখে এমনভাবে রেখে দেওয়া হল যাতে অঙ্কুরিত বীজটি বোতলের নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এবার কাচের নলটিকে ছিপির ছিদ্র দিয়ে এমনভাবে ঢোকানো হল যাতে নলটির একপ্রান্ত বোতলের বাইরে এবং অপর প্রান্ত বোতলের ভিতরে থাকে। এই অবস্থায় বোতলটিকে কয়েকদিন রাখা হল।

**চিত্র 5.9 :** স্পেস-মার্কার।

(iii) **পর্যবেক্ষণ**—কয়েকদিন পর দেখা যায়, মূলের (বা পাতার) কালো দাগগুলি অনেকটা দূরে সরে গেছে।

(iv) **সিদ্ধান্ত**—মূলের (বা পাতার) বর্ধনশীল অঞ্চল দ্রুত বর্ধিত হওয়ার জন্য দাগগুলি দূরে সরে যায়।
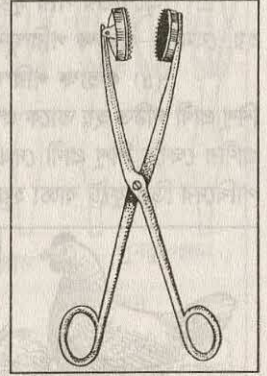
## B. প্রাণীর বৃদ্ধি দশা Phases of Growth in Animals

উদ্ভিদের মতো প্রাণীর বৃদ্ধিতেও কোশবিভাজন, কোশের আয়তন বৃদ্ধি ও পরিণতি— এই তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে **বৃদ্ধির সঙ্গে পরিস্ফুরণও** ঘটে।

➤ **প্রাণীদের পরিস্ফুরণ দশা :** নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি এখানে দেখা যায়—

1. **ভ্রূণজ পরিস্ফুরণ (Phases of Embryonic development)**—প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট গঠিত হয়। **জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হবার সময় যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে পরিস্ফুরণ বলা হয়।** এককোশী প্রাণীতে বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজের ফলে নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং কোশের আয়তন বাড়ে। কিন্তু বহুকোশী প্রাণীতে (যেমন—ব্যাং) ভ্রূণাণু বা জাইগোট বার বার বিভাজিত হয়ে **মরুলা** গঠন করে। মরুলার কোশগুলি একটি ফাঁপা একস্তর বিশিষ্ট গোলক বা **ব্লাস্টুলা** (Blastula) এবং এর পর ত্রিস্তরযুক্ত **গ্যাস্ট্রুলাতে** (Gastrula) পরিণত হয়। গ্যাস্ট্রুলার কোশগুলির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও বৃদ্ধির ফলে **ভ্রূণ** গঠিত হয়। সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে ত্রিস্তরযুক্ত গ্যাস্ট্রুলা থেকে কোশ বিভাজিত হয়ে **পূর্ণাঙ্গ** অবস্থায় পরিণত হয়। বহুকোশী প্রাণীতে এই ত্রিস্তরযুক্ত গ্যাস্ট্রুলা (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) পরিস্ফুরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র উৎপন্ন করে।

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 20 দিন

**চিত্র 5.10 :** কুনো ব্যাঙের ভ্রূণজ বৃদ্ধির ক্রমপর্যায় দশা। A. জাইগোট, B-E ব্লাস্টুলা গঠন, F-G গ্যাস্ট্রুলা গঠন, H. ভ্রূণ, I. ব্যাঙাচি এবং J. পূর্ণাঙ্গ ব্যাং।

জাইগোট ⇒ মরুলা ⇒ ব্লাস্টুলা ⇒ গ্যাস্ট্রুলা ⇒ ভ্রূণ ⇒ পূর্ণাঙ্গ

হাইড্রা, তারামাছ ও অন্যান্য মাছ ও জলজ প্রাণীর ভ্রূণের বৃদ্ধি জলে ঘটে। সরীসৃপ, পাখি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভ্রূণের বৃদ্ধি স্থলে ঘটে এবং ডিমের খোলক ফেটে বাচ্চা বের হয়। মানুষ অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণের পরিস্ফুরণ ঘটে।

2. **ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ (Phases of Post-embryonic development)**— প্রাণী জগতে ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ দু'রকমের হয়, যেমন—**প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণ**।

(a) **প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ** (Direct development)—**যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ থেকে কোনো অন্তর্বর্তী দশা ছাড়া সরাসরি শিশু প্রাণী গঠিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ বলে**। প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণে লার্ভা দশা থাকে না। সরীসৃপ, পাখি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশু প্রাণী দেখতে পরিণত প্রাণীর মতো হয় এবং ক্রমশ এটি বেড়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিবর্তিত হয়। সরীসৃপ ও পাখিদের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মা শাবক প্রসব করে।
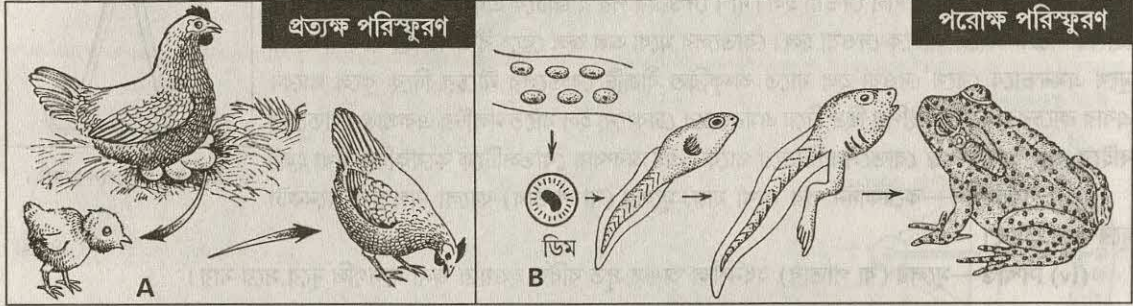
চিত্র 5.11 : A-প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ও B-পরোক্ষ পরিস্ফুরণ।

(b) **পরোক্ষ পরিস্ফুরণ** (Indirect development)— **যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ যখন স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী লার্ভা দশা অতিক্রম করে ক্রমশ রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তখন তাকে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ বলে**। উভচর (ব্যাং, স্যালাম্যান্ডার), পতঙ্গ (মশা, মাছি, প্রজাপতি) প্রভৃতি প্রাণীদের ভ্রূণ থেকে লার্ভা গঠিত হয়। লার্ভাটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় না। কিন্তু এরা স্বাবলম্বী। এই স্বাবলম্বী দশাকে **লার্ভা** (Larva) বলে। ব্যাঙের লার্ভাকে **ব্যাঙাচি** (Tadpole), প্রজাপতির লার্ভাকে **ক্যাটারপিলার** (Caterpillar), আরশোলার অপরিণত দশাকে **নিম্ফ** (Nymph) বলে। অপরিণত দশার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। লার্ভার পরিবর্তনকে **রূপান্তর** (Metamorphosis) বলে।
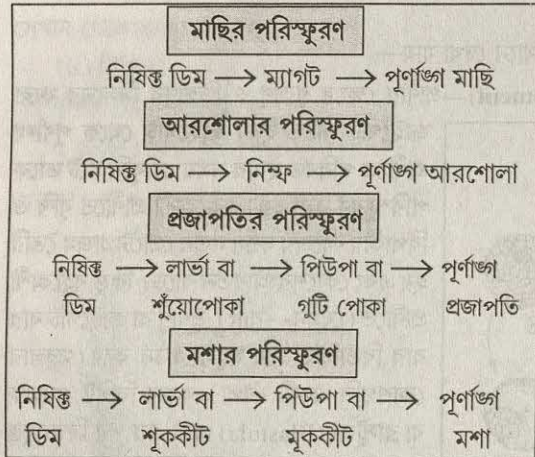
3. **শিশু প্রাণীর বৃদ্ধি (Growth of young animal) :** জন্মের পর শিশু প্রাণীর দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে ও পরিশেষে পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়স সীমা পর্যন্ত বিভিন্ন অনুপাতে বর্ধিত হয়। মাছ, টিকটিকি জাতীয় কিছু সংখ্যক প্রাণী ছাড়া অন্য সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরিণত বা পূর্ণাঙ্গ দশায় আসার পর আর বৃদ্ধি হয় না। **মানব শিশুর বৃদ্ধি**—মানুষের প্রাথমিক বৃদ্ধি মাতৃ জরায়ুতে ঘটে। শিশু অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সময় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটলেও এদের সব অঙ্গের বৃদ্ধি সমান অনুপাতে ঘটে না, যেমন—ধড়, হাত ও পা-এর যে হারে বৃদ্ধি হয় সেই অনুপাতে মাথার বৃদ্ধি ঘটে না। মানুষেরও ভ্রূণাবস্থায় বৃদ্ধি মায়ের জরায়ুতে হয়। এই অবস্থায় ও জন্মের পর শিশুর বৃদ্ধি দ্রুত হারে চলতে থাকে। পূর্ণতা প্রাপ্তির পর আর কোনো বৃদ্ধি হয় না। মানুষের বৃদ্ধি অন্যান্য উন্নত শ্রেণির প্রাণীর মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

4. **ক্ষয় পূরণজাত বৃদ্ধি (Regenerative growth) :** (i) **কয়েকটি প্রাণী**—দেহের কোনো অংশের ক্ষয়ক্ষতি অথবা দেহ খন্ডিত হলে কোশ বিভাজনের মাধ্যমে সেই অংশ পুনর্গঠিত হয়; এই প্রক্রিয়া পুনরুৎপাদন নামে পরিচিত। স্পঞ্জ, হাইড্রা,

প্লানেরিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহের কোনো অংশের ক্ষয়ক্ষতি হলে কোশবিভাজন পদ্ধতিতে সেই অংশ পুনরায় সৃষ্টি হয়। টিকটিকির লেজ আঘাতজনিত কারণে বিনষ্ট হলে পুনরায় সেই অংশ গঠিত হয়। হাইড্রা, প্লানেরিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহকে খণ্ডিত করলে প্রতিটি খণ্ডক থেকে নতুন প্রাণী সৃষ্টি হয়। পুনরুৎপাদন ক্ষমতা প্রধানত নিম্নস্তরের কিছু প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(ii) **কয়েকটি উদ্ভিদ**—উদ্ভিদের জীবনকালে কোনো অঙ্গাদির ক্ষতি হলে তা কোশ বিভাজনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে শুধু মূল সজীব থাকলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটি নতুন করে তৈরি হয়। উদাহরণ—পেরিডার্ম (Periderm), লেন্টিসেল (Lenticel) প্রভৃতির গঠন ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধির ফলে হয়।

চিত্র 5.12 : A. প্রাণীদের পুনরুৎপত্তি দেখানো হয়েছে : এদের কাণ্ডকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করলে প্রতিটি খণ্ডিত অংশ পুনরুৎপত্তির ফলে সম্পূর্ণ প্রাণীতে পরিণত হয়। হাইড্রার অগ্রপ্রান্ত ও পশ্চাৎপ্রান্ত কেটে দিলে বিনষ্ট অঙ্গের পুনরুৎপত্তি ঘটে। প্লানেরিয়াকে লম্বালম্বিভাবে ছেদ করলেও দুটি প্লানেরিয়ার পুনরুৎপত্তি ঘটে।

1. **লার্ভা (Larva)** : প্রাণীর প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণের সময় মশা, মাছি, প্রজাপতি, ব্যাং প্রভৃতির ভ্রূণ থেকে যে অপত্যের সৃষ্টি হয় তা আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো নয়, কিন্তু স্বাবলম্বী সেই প্রকার শিশু প্রাণীকে **লার্ভা** (Larva) বলে। **উদাহরণ**—(i) ব্যাঙের লার্ভা—ব্যাঙাচি (Tadpole) এবং (ii) প্রজাপতির লার্ভা—শুঁয়াপোকা (Caterpillar)।
2. **পিউপা (Pupa)** : লার্ভার পরবর্তী দশা আবরণ দিয়ে ঘেরা এবং নিশ্চলভাবে জীবন-যাপন করে তাকে **পিউপা** বলে।
3. **নিম্ফ (Nymph)** : ভ্রূণের পরবর্তী যে দশা পূর্ণাঙ্গ সদৃশ হয় তাকে **নিম্ফ** বলে।

## ✪ 5.3. বৃদ্ধির শর্তাবলি (Factors of Growth) ✪

### ➤ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির বাহ্যিক শর্তাবলি (External factors for growth of Plants and Animals) :

1. **জল (Water)** : উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। জল প্রোটোপ্লাজমকে নির্দিষ্ট মাত্রায় তরল অবস্থায় রাখে। জলের অভাবে প্রোটোপ্লাজমের কাজ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজে জলের প্রয়োজন। রসস্ফীতি চাপের জন্যও জলের প্রয়োজন হয়। কোশ বিভাজনের আগে কোশের রসস্ফীতি চাপ বেড়ে যায়—তাই কোশ আকারে বাড়ে। জল খাদ্যের উপাদান, উৎপন্ন খাদ্য ও বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থগুলিকে পরিবহন করে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়ও জল প্রয়োজন। এছাড়া জল অঙ্কুরোদ্‌গমের আগে উৎসেচককে সক্রিয় করে।

2. **উষ্ণতা (তাপমাত্রা—Temperature)** : জীবদেহের জৈব রাসায়নিক কাজ স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য $25^0C$ - $35^0C$ উষ্ণতা সবচেয়ে উপযুক্ত। এই উষ্ণতায় বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী উৎসেচকগুলি খুব সক্রিয় থাকে। সাধারণত $4^0C$-এর কম এবং $50^0C$-র বেশি উষ্ণতায় উৎসেচকের কাজ ব্যাহত হয়, ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তা ছাড়া $50^0C$ এর বেশি উষ্ণতায় প্রোটোপ্লাজমের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। উষ্ণশোণিত প্রাণীদের (স্তন্যপায়ী, পাখি) দেহের উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে, ফলে পরিবেশের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এরা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু অনুষ্ণশোণিত প্রাণীদের (মাছ, উভচর, সরীসৃপ) দেহের উষ্ণতার পরিবর্তন পরিবেশের উষ্ণতার পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়। তাই শীতকালে পরিবেশের উষ্ণতা কমলে এই সব প্রাণীর বৃদ্ধি বন্ধ থাকে এবং গরমকালে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি চলতে থাকে।

3. **আলো (Light)** : (i) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে**—সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করার জন্য আলোর প্রয়োজন। আলোর তীব্রতা কোশ বিভাজনকে প্রভাবিত করে। আলোর তীব্রতার প্রকারভেদ এবং স্থিতিকাল উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সূর্যের লাল ও নীল রশ্মি উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সূর্যমুখী, টম্যাটো প্রভৃতি যেসব গাছ আলো ছাড়া ভালোভাবে বাড়ে না, তাদের **আলোকপ্রেমী** (Photophilic) উদ্ভিদ বলে। আবার, গোলাপ ইত্যাদি যেসব গাছ আলো ও ছায়া উভয় অবস্থায় বাড়ে, তাদের **আলোক নিরপেক্ষ** (Photoneutral) উদ্ভিদ বলা হয়। ফার্ন, মস্, কচু প্রভৃতি যেসব গাছ কম আলো অর্থাৎ ছায়ায় ভালোভাবে বাড়ে, তাদের **আলোকবিমুখী** (Photophobic) উদ্ভিদ বলে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম আলোকের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

(ii) **প্রাণীর বৃদ্ধিতে**—আলোর সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। সূর্যালোকে প্রাণীর ত্বক ভিটামিন-D সংশ্লেষ করতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে প্রাণীদের অস্থিবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

4. **বায়ু (Air)** : (a) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে**—বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন বিশেষভাবে প্রয়োজন। (i) **অক্সিজেন**—এটি শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্য জারিত করে শক্তি জোগায়। এই শক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ পরিচালিত হয়। (ii) **কার্বন ডাইঅক্সাইড**—উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন। বায়ু থেকে উদ্ভিদ $CO_2$ নেয়। (iii) **নাইট্রোজেন**—বায়ুর নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়ায় মাটিতে জমা হয়। এতে মাটির উর্বরতা বাড়ে। বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

(b) **প্রাণীর বৃদ্ধিতে**—**অক্সিজেন** বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে কারণ অক্সিজেনের প্রভাবে জীবকোশের সঞ্চিত খাদ্য জারিত হয় এবং শক্তি মুক্ত করে। এই শক্তি বিভিন্ন সংশ্লেষমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

**➤ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি (Internal factors for growth of Plants and Animals) :**

5. **খাদ্য (Food)** : উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য খাদ্য বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। জীবদেহে নানা প্রকার জীবন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। উদ্ভিদ বীজের ভিতর সঞ্চিত খাদ্য থেকে প্রাথমিক বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে পাতা ও মূল সৃষ্টির পর উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ, প্রোটিন সংশ্লেষ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন রকম খাদ্য তৈরি করে এবং এই সব খাদ্য থেকে পুষ্টি লাভ করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

প্রাণীরা ভ্রূণ অবস্থায় জাইগোটের কুসুম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ অমরার (Placenta) সাহায্যে মাতৃদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে এই প্রাণীরা বাইরের পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, তৈল, ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ প্রয়োজন হয়।

6. **হরমোন (Hormones)** : (i) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে**—অক্সিন, জিব্বারেলিন ও সাইটোকাইনিন প্রভৃতি হরমোনগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অক্সিন উদ্ভিদদেহে কোশ বিভাজন, কোশের আয়তন বৃদ্ধি, অঙ্গজ ও পুষ্পমুকুলের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া অক্সিনের প্রভাবে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। **জিব্বারেলিন** বীজের সুপ্ত অবস্থা থেকে অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করে। **সাইটোকাইনিন** কোশ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে। সম্ভবত অক্সিন ও জিব্বারেলিন উভয়ই ফুলের গঠনে সহায়তা করে।

(ii) **প্রাণীদের বৃদ্ধিতে**— হরমোনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাণীর বৃদ্ধি প্রধানত পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **সোমাটোট্রপিক হরমোন** এবং থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন** হরমোনের সাহায্যে প্রভাবিত হয়। গোনাড থেকে উৎপন্ন যৌন হরমোনও বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। পতঙ্গের বৃদ্ধি ও রূপান্তর **এক্ডাইসোন** (Ecdysone) হরমোনের সাহায্যে ঘটে।

7. **উৎসেচক (Enzymes)** : জীবের সব রকম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (যেমন বৃদ্ধি) উৎসেচক নিয়ন্ত্রণ করে।

8. **ক্ষত (Wound)**—জীবদেহে কোনো অংশ ক্ষত হলে সেই স্থানে কোশের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

**● উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পার্থক্য (Difference between Plant and Animal Growth) :**

| উদ্ভিদের বৃদ্ধি | প্রাণীর বৃদ্ধি |
|---|---|
| 1. উদ্ভিদের আজীবন (মৃত্যু পর্যন্ত) বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট। | 1. প্রাণীদের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট, সাধারণত আজীবন ঘটে না। |
| 2. উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর গৌণ বৃদ্ধি ঘটে। | 2. প্রাণীদের কোনো গৌণ বৃদ্ধি নেই। |
| 3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সমগ্র দেহে না হয়ে বিশেষ বিশেষ অংশে ঘটে। | 3. সমগ্র দেহে বৃদ্ধি ঘটে। |
| 4. বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে ভাজককলার সাহায্যে বৃদ্ধি ঘটে। | 4. প্রাণীদেহে কোনো বিশেষভাবে চিহ্নিত বর্ধিষ্ণু অঞ্চল নেই এবং ভাজককলা থাকে না। প্রাণীর বৃদ্ধি দেহের সব কলায় ঘটে। |

| উদ্ভিদের বৃদ্ধি | প্রাণীর বৃদ্ধি |
|---|---|
| 5. উদ্ভিদের বৃদ্ধির মধ্যে সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা দেখা যায় না। | 5. প্রাণীর বৃদ্ধি সুসামঞ্জস্যভাবে ঘটে। |
| 6. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সমভাবে সকল অঙ্গে দেখা যায় না। | 6. প্রাণীর বৃদ্ধি সমভাবে সর্বাঙ্গে ঘটে। |
| 7. উচ্চতর উদ্ভিদে বৃদ্ধিজনিত—বার্ষিক বলয় (Annual ring) গঠিত হয়। | 7. প্রাণীদেহে বৃদ্ধির এই ধরনের কোনো নিদর্শন দেখা যায় না। |

## 5.4. জীবের পরিস্ফুরণ (Development of Organism)

এককোশী ও বহুকোশী জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে। এককোশী জীবের বৃদ্ধি একটি কোশের আয়তন বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বহুকোশী জীবের কোশ বিভাজন এবং অপত্য কোশের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইসব অপত্য কোশ থেকে ক্রমশ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। বৃদ্ধির যে পর্যায়ে একটি কোশ থেকে মাইটোটিক বিভাজন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহুকোশী জীবের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে তাকে **পরিস্ফুরণ** বলা হয়।

- **বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Growth and Development) ঃ**

| বৃদ্ধি | পরিস্ফুরণ |
|---|---|
| 1. এই প্রক্রিয়ায় কোশের বা দেহের সামগ্রিক আয়তন বাড়ে, কোনো ভ্রূণ সৃষ্টি হয় না। | 1. এই প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম্বাণু বিভিন্ন দশার ভ্রূণ গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। |
| 2. জীবের জীবন ইতিহাসের যে-কোনো দশায় বৃদ্ধি ঘটে। | 2. জীবের জীবনচক্রের শুধুমাত্র ভ্রূণ দশাগুলির পরিস্ফুরণ ঘটে। |
| 3. বৃদ্ধির জন্য পরিস্ফুরণের প্রয়োজন হয় না। | 3. পরিস্ফুরণের জন্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। |
| 4. এই প্রক্রিয়ায় কোশের গুণগত কোনো পরিবর্তন হয় না। | 4. এই প্রক্রিয়ায় কোশের গুণগত পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে। |
| 5. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-কোনো সময় বৃদ্ধি ঘটতে পারে। | 5. জীবনচক্রে শুধুমাত্র ভ্রূণদশাগুলি গঠনের সময় পরিস্ফুরণ ঘটে। |

➤ **মানুষের বৃদ্ধি এবং পরিস্ফুরণ (Growth and development in Human) ঃ**

মানুষের প্রাথমিক বৃদ্ধি অর্থাৎ নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের রূপান্তর মায়ের ফ্যালোপিয়ান নালি (ডিম্বনালি) এবং জরায়ুতে ঘটে। জরায়ুতে ভ্রূণের বৃদ্ধি হতে 280 দিন সময় লাগে। জন্মের পর শিশুর বৃদ্ধি মায়ের দেহের বাইরে ঘটে।

(a) **গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বৃদ্ধি**—ভ্রূণাবস্থায় ভ্রূণের দেহের সব অংশে একই ভাবে ঘটে না, যেমন—

(i) ভ্রূণের দু'মাস পর্যন্ত অন্যান্য অংশ থেকে মাথার অংশটি বেশি বাড়ে। মাথার অংশটি দেহের অর্ধেক থাকে।
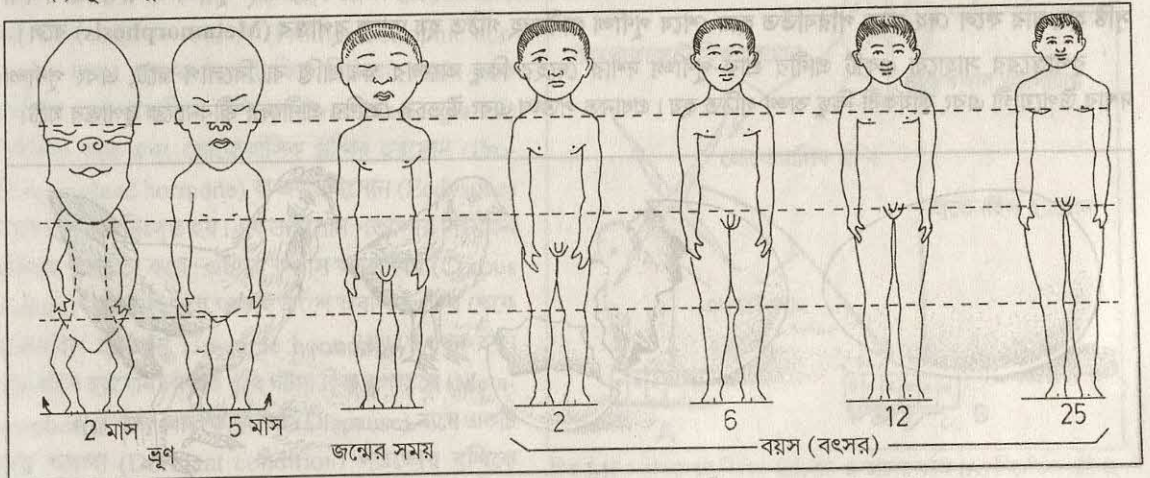
চিত্র 5.13 ঃ মানুষের ভ্রূণ অবস্থায় ও পরবর্তীকালে আকৃতি ও বিভিন্ন অঙ্গের আনুপাতিক বৃদ্ধি।

(ii) ভ্রূণের দু'মাস অবস্থায় পা-দুটি সব থেকে ছোটো থাকে। এর পরেই হাত-পায়ের বৃদ্ধি অধিক হয়। মাথার বৃদ্ধি কমে যায়।

(b) **জন্মের পর**—শিশুর দেহ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত হয়। এই সময় মানুষের বৃদ্ধি অন্যান্য প্রাণীদের মতো ঘটে, যেমন—দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পায়েরও বৃদ্ধি ঘটে। এভাবে দেহের বাইরে এবং ভেতরের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি চলতে থাকে। মানুষের বৃদ্ধি প্রায় 22 বছর পর্যন্ত হয়, পরে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। জীবের বৃদ্ধি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ঘটনা যা বিভিন্ন কারণসমূহ, যেমন— বংশগতি, পুষ্টি, হরমোন ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন সময় মানুষের বৃদ্ধির হার একই রকমের হয় না। দেহের বৃদ্ধি সব থেকে বেশি হয় ভ্রূণ অবস্থার 9 মাসে এবং বয়ঃসন্ধিকালের (12-16 বছর) সময়। দেহের বৃদ্ধির হার কম হয় 4-12 বছর এবং বয়ঃসন্ধিকালের পরবর্তী সময় (18-22 বছর)। এর পর মানুষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। দেহ বৃদ্ধির জন্য জিন, পুষ্টি, হরমোন ইত্যাদি দায়ী।

- **জন্মের পর মানুষের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাব (Role of Hormones in Post-natal Human Growth) ঃ**

| সময় | বয়স | হরমোন | বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| 1. শিশু অবস্থায় | 4 থেকে 10-12 বছর | থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইমিন, অগ্র | মন্থর হারে বৃদ্ধি ঘটে। |
| 2. বাড়ন্ত শিশু | 12-14 বছর | পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে STH ও থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন ক্ষরিত হয়। | মাঝারি ধরনের বৃদ্ধি ঘটে। |
| 3. বয়ঃসন্ধিকাল | 14-18 বছর | শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন ও ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরিত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন। | বৃদ্ধির হার বাড়ে এবং এই সময় দেহে মুখ্য ও গৌণ যৌন গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে। |
| 4. বয়ঃসন্ধিকালের পর | 22-23 বছর | STH হরমোন দেহে কাজ করতে পারে না। যৌন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। | বৃদ্ধির হার বন্ধ হয়। |

## 5.5. রূপান্তর (Metamorphosis)

### ▲ রূপান্তরের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Definition and Types of Metamorphosis)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রাণীর জীবনচক্রে যে প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ অন্তর্বর্তী, প্রাক্ পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীনজীবী দশা সৃষ্টি হয়, যার ফলে দেহ গঠন পরিবর্তিত হয়ে শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীদেহ গঠিত হয় তাকে রূপান্তর (Metamorphosis) বলে।**

রূপান্তরের সাহায্যে একটি প্রাণীর প্রাক-পূর্ণাঙ্গ দশার দেহের কিছু অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলোপ ঘটে, এবং পূর্ণাঙ্গ দশার উপযোগী এবং কার্যকরী কিছু অঙ্গ গঠিত হয়। প্রধানত পতঙ্গ এবং উভচর শ্রেণির প্রাণীদের জীবনচক্রে রূপান্তর ঘটে।
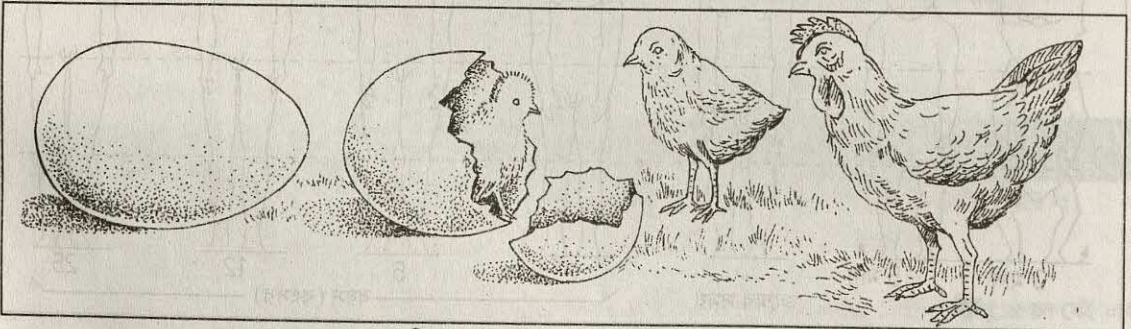
চিত্র 5.14 ঃ মুরগির প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ।

■ (b) **রূপান্তরের প্রকারভেদ (Types of Metamorphosis) :** প্রাণীর জীবনচক্রে প্রধানত দু'ধরনের রূপান্তর ঘটে, যেমন— অসম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ রূপান্তর।

1. **অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete Metamorphosis) : সংজ্ঞা—যে ধরনের রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ (Pre-adult), স্বাধীনজীবী (Free living) দশা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে।**

অসম্পূর্ণ রূপান্তরে প্রাক্ পূর্ণাঙ্গ দশাটিকে নিম্ফ (Nymph) বলে। নিম্ফ খোলস ত্যাগ (Moulting) করে এবং কয়েকটি দশা বা ইনস্টার (Inster) গঠনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে কোনো লার্ভা ও পিউপা (Pupa) দশার সৃষ্টি হয় না এবং প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশাটি সবসময় স্বাধীনজীবী ও খাদক অবস্থায় থাকে। যে সমস্ত প্রাণীদের জীবনচক্রে অসম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে তাদের **হেমিমেটাবোলাস** (Hemimetabolous) প্রাণী বলে। **উদাহরণ**—আরশোলা, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল ইত্যাদি।

2. **সম্পূর্ণ রূপান্তর (Complete Metamorphosis) : সংজ্ঞা—যে ধরনের রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীনজীবী দশা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় না তাকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে।**

সম্পূর্ণ রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশাটিকে লার্ভা বা ক্যাটারপিলার (Caterpillar) বা ম্যাগট (Maggot) বলে। লার্ভা দশা কয়েকবার খোলস ত্যাগ (Moulting) করে এবং দেহ গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে **পিউপা** (Pupa) দশায় পরিণত হয়। পিউপা দশাতে প্রাণীটি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। এই সময় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহগঠনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হয় এবং পরিশেষে পিউপার খোলস কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত প্রাণীদের জীবনচক্রে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে তাদের **হোলোমেটাবোলাস** (Holometabolous) প্রাণী বলে। **উদাহরণ**— প্রজাপতি, মথ, মাছি, মশা ইত্যাদি।

## ➤ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় হরমোনের ভূমিকা (Role of Hormones in Metamorphosis) :

প্রাণীর জীবনচক্রের রূপান্তরে হরমোনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। বিশেষ করে ক্রাসটেসিয়ান (Crustaceans) এবং পতঙ্গের (Insects) মোল্টিং বা খোলস ত্যাগের সময় এই সব হরমোনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

### ● পতঙ্গের রূপান্তর (Metamorphosis of Insect) :

পতঙ্গের নিউরোসিক্রেটারি কোশ থেকে নিঃসৃত নিউরোহরমোনসমূহ প্রধানত নির্মোচন (Moulting) ও বৃদ্ধি (Growth)-কে নিয়ন্ত্রণ করে (চিত্র 5.15)। মস্তিষ্কের নিউরোসিক্রেটারি কোশ-নিঃসৃত হরমোনটি অ্যাক্সনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে **কর্পাস কার্ডিয়াকাম** (Corpus cardiacum) নামক অংশে পৌঁছায় ও এই স্থান থেকে এটি **প্রোথোরাকোট্রোফিক হরমোন** (Prothoracotrophic hormone) বলে। প্রোথোরাকোট্রোফিক নিউরোহরমোন বক্ষে অবস্থিত **প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে** (Prothoracic glands) উদ্দীপিত করে এবং প্রোথোরাসিক গ্রন্থির হরমোন (Prothoracic gland hormone) বা **এক্ডাইসোন** (Ecdysone) নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এক্ডাইসোন পতঙ্গের নির্মোচন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। এছাড়া **কর্পাস অ্যালাটাম** (Corpus allatum) নামে মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile hormone) উৎপন্ন হয়। জুভেনাইল হরমোন লার্ভার বৃদ্ধি ঘটায় কিন্তু **রূপান্তরে** (Metamorphosis) বাধা দেয়। **ডায়াপজ** (Diapause) নামে একটি ঘুমন্ত অবস্থা (Dormant condition) **পতঙ্গের বৃদ্ধিকে** নিয়ন্ত্রিত করে। উপরোক্ত হরমোনসমূহ সামগ্রিকভাবে
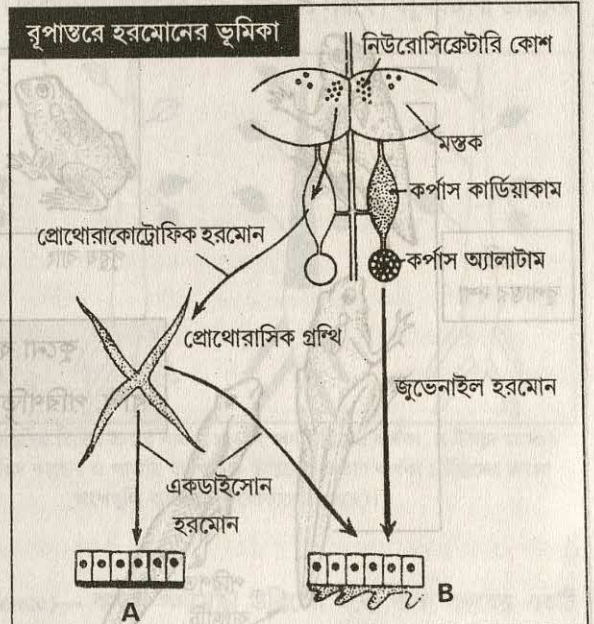
চিত্র 5.15 : পতঙ্গের বিভিন্ন হরমোন ও তাদের কাজ (A) নির্মোচন প্রক্রিয়া, (B) লার্ভার বৃদ্ধি ও রূপান্তর।

পতঙ্গের জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটায়। পতঙ্গের যৌন জনন প্রক্রিয়াতে হরমোনের কার্যাবলির প্রভাব দেখা যায়।
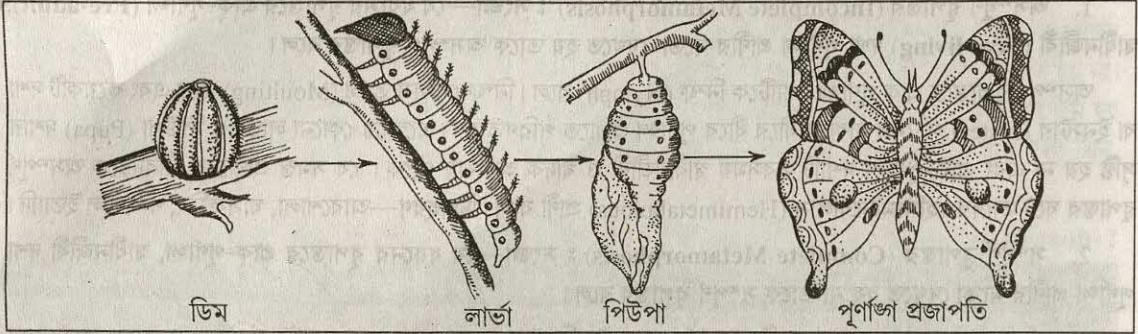
চিত্র 5.16 : প্রজাপতির পরোক্ষ পরিস্ফুরণের চিত্ররূপ।

## ▲ ব্যাঙের জীবনচক্রে রূপান্তর (Metamorphosis in the life cycle of Frog) :

ব্যাঙের জীবনচক্রে ডিম থেকে লার্ভা বা ব্যাঙাচি (Tadpole) সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচি স্বাধীনজীবী একটি অপরিণত দশা। ব্যাঙাচির পরিস্ফুটন তিনটি দশায় ঘটে, যেমন—

শুক্রাণু
ডিম্বাণু
নিষিক্ত ডিম্বাণু
ব্যাঙের বৃদ্ধি দশা
ব্যাঙের ভ্রূণের পরিস্ফুরণ দশা
পুরুষ ব্যাং
স্ত্রী ব্যাং
ব্যাঙাচির রূপান্তর দশা
কুনো ব্যাং
বৃদ্ধি, পরিণতি, রূপান্তর
ব্যাঙাচির পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা
পরিণত ব্যাঙাচি
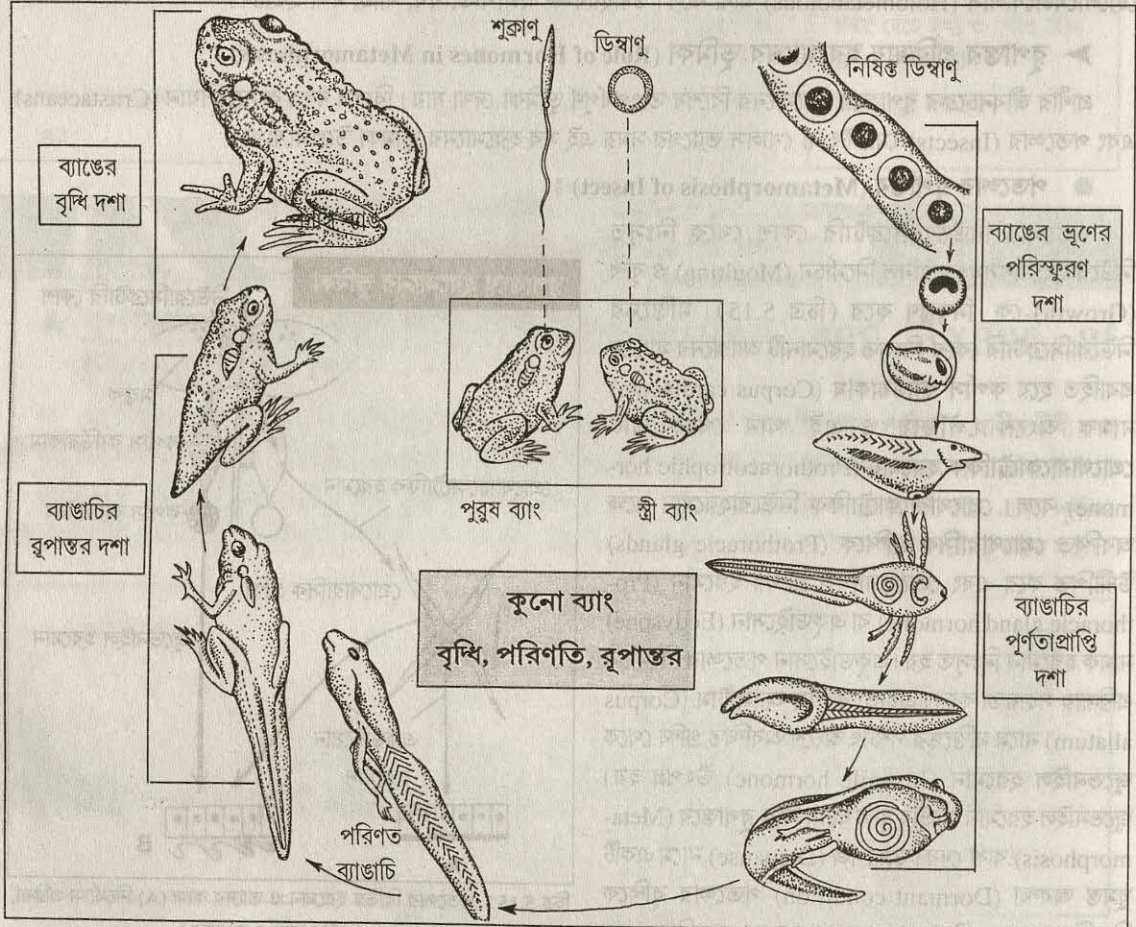
চিত্র 5.17 : কুনো ব্যাং—তার জীবনচক্রের বৃদ্ধি, পরিণতি এবং দশাগুলির চিত্ররূপ।

(i) **প্রিমেটামরফোসিস্** (Premetamorphosis)— এই সময় ব্যাঙাচির দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) **প্রোমেটামরফোসিস্** (Prometamorphosis)—এই সময় ব্যাঙাচির পশ্চাৎপদ গঠিত হয়।

(iii) **মেটামরফিক ক্লাইম্যাক্স** (Metamorphic climax)—এই সময় ব্যাঙাচি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাং সৃষ্টি হয়। এই দশায় অগ্রপদ গঠিত হয়, ঠোঁট বিনষ্ট হয় মুখছিদ্র প্রশস্ত হয় এবং লেজ অপসারিত হয় বা সংকুচিত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন হরমোন** (Thyroxine hormone) ব্যাঙাচির রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

## 5.6. বার্ধক্যপ্রাপ্তি (Senescence)

❖ **বার্ধক্যপ্রাপ্তির সংজ্ঞা (Definition of Senescence) ঃ জীবদেহের পরিণত অবস্থা থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে অবনতিজনিত পরিবর্তন ঘটে ও জীবনকাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাকে বার্ধক্যপ্রাপ্তি বলে।**

### A. উদ্ভিদের বার্ধক্য Senescence in Plants

একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল গঠন করে পরিণত হয়। এরপর ক্রমশ বার্ধক্য আসে। বার্ধক্য দশাতে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যু ঘটে। পরিণত দশা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালকে **বার্ধক্য দশা** বলে।

◘ (a) **উদ্ভিদের বার্ধক্যপ্রাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণ ও পরিবর্তন (Different symptoms and changes of senescence) ঃ**

সব উদ্ভিদের বার্ধক্য একরকমভাবে আসে না। তাই এদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

1. **সম্পূর্ণ উদ্ভিদের বার্ধক্য** (Senescence of whole plant)— যেসব উদ্ভিদ জীবনে একবার ফুল ও ফল ধারণ করে মরে যায় তাদের বার্ধক্য সমগ্র উদ্ভিদে একই সঙ্গে আসে। ফল পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আয়ুও শেষ হয়। উদাহরণ—একবর্ষজীবী উদ্ভিদ, যেমন—ধান, গম, ছোলা, সয়াবীন ইত্যাদি। দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদের মধ্যে মুলো ও সরষে। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মধ্যে বাঁশ, অ্যাগেভ প্রভৃতি।

2. **উদ্ভিদ অঙ্গের বার্ধক্য** (Senescence of Plant organ)—যেসব উদ্ভিদে বহুবার ফুল ফল হয় তাদের মৃত্যু ফুল ফলের সঙ্গে জড়িত নয়। এদের কোনো অঙ্গ, যেমন—কাণ্ড, পাতা, ফল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নষ্ট হতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে সমগ্র উদ্ভিদের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। অঙ্গের বার্ধক্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।
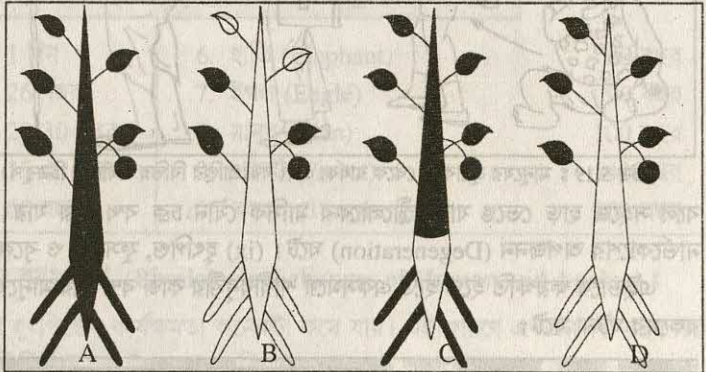
চিত্র 5.18 ঃ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বার্ধক্য ঃ A-সম্পূর্ণ উদ্ভিদের বার্ধক্য, B-উদ্ভিদ অঙ্গের বার্ধক্য, C-উদ্ভিদ কাণ্ডের ও পাতার বার্ধক্য, D-উদ্ভিদের পাতার বার্ধক্য (উদ্ভিদের কালো অংশগুলি বার্ধক্যপ্রাপ্ত বোঝানো হয়েছে)।

(i) **কাণ্ডের বার্ধক্য** (Senescence of Stem)— কোনো কোনো বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদে মাটির উপরের অংশ প্রতিবছর মরে যায় কিন্তু নীচের অংশ জীবিত থাকে। একে **কাণ্ডের বার্ধক্য** বলে। উদাহরণ—গ্লেডিওলাস, কলা প্রভৃতি।

(ii) **যুগপৎ পত্র-বার্ধক্য** (Simultaneous leaf Senescence)— কাষ্ঠল পর্ণমোচী উদ্ভিদের মধ্যে পাতা বছরের একটি ঋতুতে ঝরে যায়। এই পাতা ঝরে বা অন্যান্য অঙ্গ খসে পড়াকে **যুগপৎ বার্ধক্য** বলে। উদাহরণ—আপেল, ওক প্রভৃতি।

(iii) **ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন বা ধারাবাহিক বার্ধক্য** (Sequential Senescence)— এই প্রকার বার্ধক্যে পরিণত পাতাগুলি ঝড়ে

পড়ে। এসব উদ্ভিদের পাতার জীবন পরিসর সীমিত—সেই কারণে বৃক্ষগুলি লম্বায় বাড়ে এবং নীচের দিকের পাতাগুলি ঝড়ে যায়। একই ভাবে নতুন পাতা জন্মায় এবং পুরানো পাতা খসে পড়ে। উদাহরণ—শিশু, শাল প্রভৃতি।

■ (b) **উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও বার্ধক্য (Physiological changes and Senescence in Plants) ঃ** বার্ধক্য হল উদ্ভিদের সব অঙ্গের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় অত্যধিক পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তনগুলি হল—(i) কোশের আকৃতি হ্রাস পায় এবং কোশপর্দায় আবদ্ধ অঙ্গাণুগুলির (রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাসমিক জালিকা, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি) কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়। (ii) সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়, শর্করার পরিমাণ হ্রাস পায়, তাছাড়া শ্বসনের হার কমে যায়। (iii) ক্লোরোফিল তৈরি হয় না ও অ্যান্থোসায়ানিনের সঞ্চয় বেড়ে যায়। (iv) প্রোটিন কম তৈরি হয়। (v) পাতা ঝরে পড়ার আগে পুষ্টিদ্রব্যগুলি কাণ্ডে সঞ্চারিত হয়। (vi) ক্রোমাটিন বস্তুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। (vii) উদ্ভিদের আত্তীকরণ ক্ষমতা (Assimilative power), প্রোটিন, RNA, DNA-এর উপচিতি প্রক্রিয়ার হ্রাস ঘটে।

## B. প্রাণীর বার্ধক্য Senescence in Animals

প্রাণীর ক্ষেত্রে মুখ্য বৃদ্ধিকাল অতিক্রম করে বিরতিকাল (Stationary) আসে। এরপর থেকে ক্রমশ বার্ধক্য আসে। বার্ধক্য থেকে দেহের ক্ষয়জনিত পরিবর্তন ঘটে ও শেষে মৃত্যু হয়। এখানে হাজার হাজার প্রাণীর বার্ধক্য আলোচনা না করে মানুষের বার্ধক্য আলোচনা করা হল। মানুষের বার্ধক্য আরম্ভ হয় সাধারণত 40 বছর বয়সের পর। বার্ধক্য দশায় পরিবেশের একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। মানুষের বার্ধক্যের লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হল—
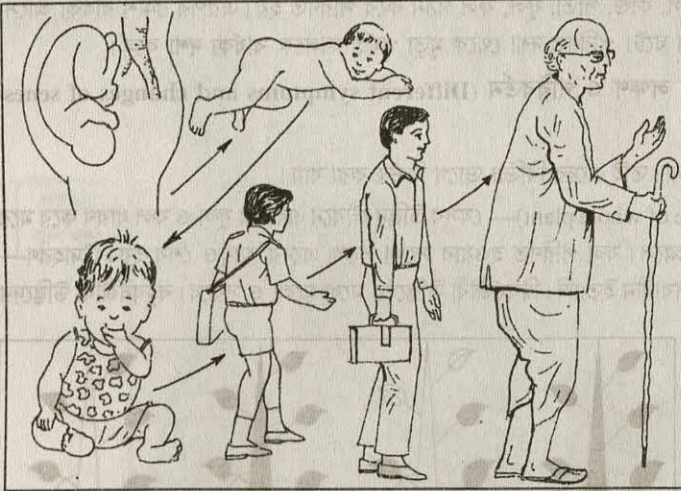
চিত্র 5.19 ঃ মানুষের ভ্রূণাবস্থা থেকে বার্ধক্য এবং বয়ঃপ্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্ররূপ।

(i) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চুল পাকে। (ii) চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে আসে ফলে কম এবং অল্প আলোতে পড়াশুনো করতে পারে না। (iii) শ্রবণ ক্ষমতা কমে যায়। (iv) জিভের স্বাদকুঁড়িগুলির সংবেদনশীলতা ক্রমশ নষ্ট হয়ে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। (v) ঘ্রাণ ক্ষমতা কমে আসে। (vi) পেশির কোশের পরিবর্তন ঘটে। পেশি কোশগুলির স্থিতিস্থাপকতাও নষ্ট হয়, এর ফলে পেশি শিথিল হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অস্থির ক্যালসিয়াম নষ্ট হয় বলে সহজে হাড় ভেঙে যায়। স্ত্রীলোকের মাসিক যৌন চক্র বন্ধ হয়ে যায়। (vii) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। মস্তিষ্কের নার্ভকোশের অপজনন (Degeneration) ঘটে। (ix) হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও বৃক্কের কাজ ও ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়।

এইভাবে ক্ষয়ক্ষতি হতে হতে একসময়ে শারীরবৃত্তীয় কাজ বন্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটে।

## 5.7. বয়ঃপ্রাপ্তি (Ageing)

জীবের জীবনের পূর্ণাঙ্গ দশা থেকে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে **বয়ঃপ্রাপ্তি** বলে। এর সঙ্গে মৃত্যু জড়িত নয়। সব জীবই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্রমশ বৃদ্ধ হতে থাকে। তবে কেন বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে তা এখনো সঠিক ভাবে জানা যায়নি। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া।

**● গেরেন্টোলজি (Gerentology) ●**

বিজ্ঞানের যে শাখা অধ্যয়ন করলে বয়ঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যায় তাকে গেরেন্টোলজি বলে।

❖ **বয়ঃপ্রাপ্তির সংজ্ঞা (Definition of Ageing) :** যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কোশ, কলা ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কার্যাবলির ক্রমশ অবনতির ফলে যে পরিবর্তন আসে তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বলে।

## A. উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তি Ageing of Plants

বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণীর সব অঙ্গের একই সঙ্গে অবনতি ঘটতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটা, জনন ও বীজের পরিণতির পর সব অঙ্গ একসঙ্গে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় না অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তি একসঙ্গে হয় না। উদ্ভিদের বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তনগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(i) বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান লক্ষণ—পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ফলে পাতাগুলি হলুদ হয়ে যায়।

(ii) পাতার ক্লোরোপ্লাস্টিডের গ্রাণার পর্দার বিনষ্ট হয় এবং রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা প্রভৃতি কোশের অঙ্গাণুগুলির কাজ ব্যাহত হয়। অবশেষে মাইটোকনড্রিয়ার সক্রিয়তা নষ্ট হয়।

(iii) উদ্ভিদ কোশের বিপাকীয় কাজ সঠিকভাবে ঘটে না।

(iv) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি হ্রাস পায়।

(v) প্রোটিনের পরিমাণ কমতে থাকে। তা ছাড়া প্রোটিন, RNA ও DNA-এর উপচিতি প্রক্রিয়ার হ্রাস ঘটে।

(vi) পরবর্তী পর্যায়ে অনেকগুলি অঙ্গের কোশবিভাজন প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় ও DNA অণু বিনষ্ট হয়।

(vii) পরিশেষে উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা শুকিয়ে যায় এবং ফুল, ফল প্রভৃতির ধারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়।

## B. প্রাণীর বয়ঃপ্রাপ্তি Ageing of Animals

প্রাণীর মধ্যে বিশেষ করে মানুষের বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণগুলি সহজেই লক্ষ করা যায়। মানুষের বার্ধক্য দশার সঙ্গে অঙ্গসংস্থানগত, শারীরবৃত্তীয়, কোশীয় ও অকোশীয় সব কিছুর রূপান্তর ঘটে। নীচে বার্ধক্যজনিত শারীরিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হল।

**• কয়েকটি জীবের জীবনকাল (Life span of a few organisms) •**

| জীব | জীবনকাল | জীব | জীবনকাল |
|---|---|---|---|
| 1. মে ফ্লাই (May fly) | 1 দিন | 6. হাতি (Elephant) | 80 বছর |
| 2. বাঁদর (Monkey) | 26 বছর | 7. ইগল (Eagle) | 90 বছর |
| 3. কুকুর (Dog) | 20-30 বছর | 8. মানুষ (Man) | 100 বছর |
| 4. বিড়াল (Cat) | 35-40 বছর | 9. প্যারট (Parrot) | 140 বছর |
| 5. ঘোড়া (Horse) | 60 বছর | 10. কচ্ছপ (Tortoise) | 200 বছর |

### • মানুষের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও বয়ঃপ্রাপ্তি (Physiological changes of Human and Ageing) :

1. **হৃৎপিণ্ড**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা অনেকটা কমে যায়। এই কারণে একজন 70 বছর বয়স্ক মানুষ স্বাভাবিক 25 বছর মানুষের তুলনায় প্রতিমিনিটে হার্দ উৎপাদের পরিমাণ প্রায় 30% শতাংশ কম হয়।

2. **রক্তবাহ**— বয়স্ক মানুষের রক্তনালির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় বলে, রক্তের চাপ বাড়ে।

3. **রক্ত**— (i) অধিকাংশ অস্থি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হলুদ মজ্জায় পূর্ণ হয়ে যায় বলে সক্রিয় লোহিত মজ্জার অভাবে RBC-এর উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণে রক্তের পরিমাণ (Blood volume) কমে যায়। (ii) RBC-এর পরিমাণ কম হয় বলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণে হ্রাস ঘটে। (iii) রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম হওয়ায় রক্তে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ ($O_2$-Uptake) কম হয়। 20-25 বছর বয়সে দেহের সম্পূর্ণ রক্ত প্রতিমিনিটে প্রায় 4 লিটার অক্সিজেন বহন করে কিন্তু 75 বছর বয়সের মানুষের এই পরিমাণ কমে গিয়ে প্রায় 1·4 লিটার হয়। (iv) রক্তে লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যায়, ফলে অনক্রম্যতা ক্ষমতা (Immunity power) কমে যায়। এই কারণে সামান্য সংক্রমণে দেহে সহজেই রোগ সৃষ্টি হয়।

4. **ফুসফুস**— বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসে বায়ু ধারণ ক্ষমতা প্রায় 44 শতাংশ কমে যায়। ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা এবং এই কারণে বিভিন্ন কলাকোশে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়।

5. **বৃক্ক**— বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় নেফ্রনের সংখ্যা কমে যায় ফলে মূত্র উৎপাদন এবং মূত্রের রেচনের পরিমাণ ব্যাহত হয়। এছাড়া নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস এবং বৃক্ক নালিকার কার্য ক্ষমতা হ্রাস ঘটে ফলে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন গ্লাইকোসুরিয়া, ইউরেমিয়া ইত্যাদি ঘটে।

6. **পরিপাক তন্ত্র**— বৃদ্ধ বয়সে (i) জিভে স্বাদ কোরক (Taste buds)-এর সংখ্যা প্রায় স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ কমে যায়। (ii) পাচক রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এছাড়া পাচক রসের বিভিন্ন এনজাইমের পরিমাণ কমে যায়। (iii) এনজাইমের অভাবে দেহে পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই সব কারণের জন্য ক্ষুধামান্দ্য, খাদ্য গ্রহণে অনীহা, হজমে গণ্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস-অম্বল ইত্যাদি হয়।

7. **ত্বক**— বৃদ্ধ বয়সে দেহকোশের সক্রিয়তা হ্রাস হওয়ায় এই সব কোশের জল ধারণ ক্ষমতা (Retention of water) কমে যায়। এই কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং কুঁচকে যায়।

8. **পেশি**— পেশিতন্তু এবং স্নায়ু পেশির সংযোগস্থলের জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে পেশিকলার অপজনন (Degeneration) ঘটে। এর ফলে পেশিটান, পেশির সংকোচন ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায়।

9. **অস্থি**— বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিগুলি ক্ষণভঙ্গুর হয় ফলে সহজেই ভাঙার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ অস্থিতে অজৈব পদার্থের সঞ্চয় ঘটে। এছাড়া অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হতে শুরু করে। এর ফলেও অস্থি ক্ষণভঙ্গুর ও নরম হয়। শিরদাঁড়া বেঁকে যায় ফলে বৃদ্ধ বয়সে অনেকে কুঁজো হয়ে যায়।

10. **স্নায়ুতন্ত্র**—বয়স্কলোকের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোশ বা নিউরোনের সংখ্যা কমে যায়। ফলে মস্তিষ্কের ওজন প্রায় 56 শতাংশ কমে যায়। ভুলে যাওয়া, স্মৃতি শক্তির অবনতি অর্থাৎ মনে না রাখা (Memory loss) ইত্যাদি ঘটে। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগের (Nerve impulse) পরিবহনের গতি প্রায় 85% কমে যায়।
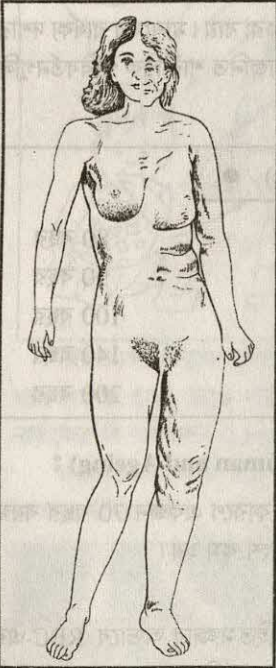
চিত্র 5.20 : তুলনামূলক চিত্র—চিত্রের বাঁ দিকের অংশটি একজন 30 বছর বয়স্কা স্ত্রীলোকের এবং ডান দিকের অংশটি এক জন 75 বছর বয়স্ক বৃদ্ধার কয়েকটি অঙ্গ সংস্থানগত পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

11. **চোখ, কান, নাক ও জিভ**— (i) চোখের অভিযোজন (Accommodation) ক্ষমতা কমে যায় ফলে খালি চোখে বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না। (ii) শ্রবণ ক্ষমতা কমে যায় ফলে স্বাভাবিক কথোপকথন শুনতে অসুবিধা হয়। (iii) নাকে নাসিকা ঝিল্লির সক্রিয়তা কমে যায়। (iv) জিভে স্বাদ-কোরক নষ্ট হয়ে যায় বলে খাদ্যবস্তুর স্বাভাবিক স্বাদের অনুভূতি ব্যাহত হয়।

➤ **বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের পরিবর্তন (Cellular changes due to Ageing) :**

1. **প্লাজমামেমব্রেন**—বার্ধক্য কোশের প্লাজমামেমব্রেনের ভেদ্যতা কমে যায়। মেমব্রেনের ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের ফলে এই ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটে।

2. **মাইটোকনড্রিয়া**—পুরাতন কোশের মাইটোকনড্রিয়ার অপজনন (Degeneration) ঘটে ফলে কার্বোহাইড্রেট বিপাক প্রধানত (ক্রেবস চক্র) কমে যায়।

3. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম**—বয়ঃবৃদ্ধির ফলে কোশের সাইটোপ্লাজমে দানাদার (অমসৃণ রাইবোজোমযুক্ত) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সংখ্যা কমে যায়। রাইবোজোমের অভাবে দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়।

4. **নিউক্লিয়াস**—নিউক্লিয়াসটি কুঁচকে আকৃতিতে ছোটো হয়। কারণ নিউক্লিয়াস থেকে জল-বিয়োজন ঘটে, ফলে ক্রোমাটিন সূত্রগুলি ঘনীভূত হয়। এই প্রকার নিউক্লিয়াসকে পিক্নোটিক নিউক্লিয়াস (Pyknotic nucleus) বলে। এই কারণে DNA-এর রেপ্লিকেশন কমে যায়।

5. **রঞ্জক পদার্থের সঞ্চয়**—বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ রঞ্জক পদার্থের

অর্থাৎ লাইপোফুসিন (Lipofuscin), হরিদ্রাভ রঞ্জক সঞ্চয় ঘটে। কারও কারও মতে বার্ধক্য কোশে ক্যালসিয়াম, বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ, অন্যান্য নিষ্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি সঞ্চিত হয়।

6. **DNA এবং RNA**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকোশের ক্রোমোজোমের ত্রুটি (Chromosomal aberration) এবং gene mutation-এর ফলে DNA এবং RNA গঠনের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে কোশে এনজাইমের সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়।

- **একজন সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক (30 বছর) ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (100%) হলে তার তুলনায় বয়ঃপ্রাপ্তি (75 বছর) ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া কমে কতটা হচ্ছে তার একটি তালিকা ঃ**

| দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন | কমে যায় | দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন | কমে যায় |
|---|---|---|---|
| 1. দেহের ওজন | 12% | 8. বৃক্কে গ্লোমেরুলাসের সংখ্যা | 44% |
| 2. মস্তিষ্কের ওজন | 56% | 9. গ্লোমেরুলাসে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার হার | 31% |
| 3. মস্তিষ্কে রক্ত সংবহন | 20% | 10. সুষুম্না স্নায়ুতে অ্যাক্সনের সংখ্যা | 37% |
| 4. বিশ্রামরত অবস্থায় হার্দ উৎপাদন | 30% | 11. নার্ভ আবেগের পরিবহনে গতির হার | 10% |
| 5. রক্তের স্বাভাবিক pH ফিরে আসার গতির হার | 83% | 12. জিভে স্বাদ-কোরকের সংখ্যা | 64% |
| 6. ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব | 44% | 13. হাতে মুঠোর বল (Strength of hand grip) | 45% |
| 7. পেশি সঞ্চয়ের সময় সর্বাধিক $O_2$ গ্রহণের পরিমাণ | 60% | | |

➤ **বয়ঃপ্রাপ্তির তত্ত্ব (Theory of Ageing)**—বার্ধক্য সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। নীচে সংক্ষেপে তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হল।

1. **ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তত্ত্ব** (Wear and Tear theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে কোশের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বার্ধক্য আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মৃত্যু ঘটে। এই তত্ত্ব এখন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ নতুন নতুন কোশ পুরানো কোশের স্থান দখল করে। তা ছাড়া DNA তন্ত্র বিনষ্ট হলে সেখানে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।

2. **অস্বাভাবিক দেহকোশ তত্ত্ব** (Abnormal body cell theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে দেহে কতকগুলি অস্বাভাবিক কোশ গঠিত হয়। এর ফলে বার্ধক্য দেখা দেয়। দেহের লক্ষ লক্ষ কোশের মধ্যে যেগুলি মৃত কোশে পরিণত হয়, তাদের জায়গায় সেই গুণসম্পন্ন কোশ গঠিত হয় না। কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় এবং পরে এরা অস্বাভাবিক কোশে পরিণত হয়।

3. **দেহকোশের পরিব্যক্তি তত্ত্ব** (Somatic mutation theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে দেহকোশে জিন পরিব্যক্তি সঞ্চয়ের ফলে কলা ও কোশের কার্য ক্ষমতার পরিবর্তন হয় ও হ্রাস পায়। দেহকোশে পরিব্যক্তি ঘটানোর জন্য কতকগুলি দূত (Agent) আছে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসে। অর্থাৎ কোশের আয়ু কমে যায়।

4. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তত্ত্ব** (Immunity theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে বার্ধক্য আসে কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। মাঝ বয়সে (12-14 বছর) **থাইমাস গ্রন্থির** (Thymus gland) বৃদ্ধি ও অবলুপ্তির জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

5. **মৃত্যুজিন তত্ত্ব** (Death genes' theory)—বংশগতির ধারার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে মৃত্যু আসে। তার কারণ কোশের DNA অণুর মধ্যে মৃত্যুর বার্তা বাহিত হয়। জেনেটিক ক্লক্‌ই (Genetic clock) নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু ঘটায়।

6. **বার্ধক্যের আণবিক তত্ত্ব** (Molecular basis of Ageing)—এই তত্ত্ব অনুসারে বার্ধক্যের প্রধান কারণ হল জীবদেহে জিনের আন্তঃক্রিয়ার ফলশ্রুতি। বংশগতির বাহক জিন ও পরিবেশের প্রভাবে, DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে জিনের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলি ব্যাহত হয়। অতঃপর বার্ধক্য এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

● **বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তির পার্থক্য (Difference between Senescene and Ageing) ঃ**

| বার্ধক্যপ্রাপ্তি | বয়ঃপ্রাপ্তি |
|---|---|
| 1. জীবের যে প্রক্রিয়াটি জন্ম থেকে শুরু হয়ে জীবনে শেষ অবধি ঘটতে থাকে ফলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বার্ধক্য-প্রাপ্তি বলে। | 1. জীব পরিণতি লাভ করার পর জীবনের শেষের দিকে যে সব পরিবর্তন মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমশ ঘটে ফলে দেহে যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বলে। |
| 2. বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া, যেমন— অপচিতি বা উপচিতি প্রক্রিয়ার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির জন্য দেহে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। | 2. বিপাক ক্রিয়ার শুধু অপচিতি প্রক্রিয়ার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। |
| 3. বার্ধক্য প্রাপ্তি মানেই বার্ধক্য নয়, কারণ একটি শিশু বার্ধক্য প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। | 3. বার্ধক্য প্রাপ্তির শেষভাগেই বয়ঃপ্রাপ্তি আসে। |

## ✪ 5.8. মোচন বা ঝরে পড়া বা অ্যাবসিসান (Abscission) ✪

পরিণত উদ্ভিদে নির্দিষ্ট সময়ে অনেকগুলি অঙ্গের মোচন হয়। নিম্নশ্রেণির সংবহনকলাযুক্ত উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ খসে পড়ে না। এদের অঙ্গগুলি পরিণত ও পরিপক্ক হলে শুকিয়ে যায় বা মরে যায়। কিন্তু উচ্চশ্রেণির সংবহন কলাযুক্ত উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলির মোচন হয়, যেমন—বাক্‌ল্, পাতা, ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং ফল।

❖ (a) **মোচনের সংজ্ঞা (Definition of Abscission) ঃ নির্দিষ্ট সময়ে পরিণত উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় অঙ্গ মোচন বা পরিত্যাগ করে তাকে খসে পড়া বা মোচন বলে।**

◘ (b) **উদ্ভিদের পত্রমোচন প্রক্রিয়া (Mechanism of Leaf Abscission) ঃ** পরিণত অবস্থায় উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল ও অন্যান্য অঙ্গের মোচন ঘটে। পত্রমোচন (Leaf fall) ব্যক্তবীজী ও কাষ্ঠল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পর্ণমোচী উদ্ভিদে শীতকালের প্রারম্ভে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। চিরহরিৎ উদ্ভিদের পাতা খসে পড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট ঋতু নেই। এদের পাতা যে-কোনো ঋতুতে খসে পড়তে পারে। পাতা খসে পড়ার আগে পত্রমূলের (Leaf base) গোড়ায় কতকগুলি অভ্যন্তরীণ গঠনগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই লক্ষণগুলি হল—

চিত্র 5.21 ঃ পত্র ও ফল মোচনের চিত্ররূপ।

(i) পত্রমূলে পত্রমোচনের আগে মোচনস্তর গঠিত (Abscission layer) হয়। এই সময় পাতা পরিণত হয় এবং ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তা ছাড়া উদ্ভিদের বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি ও পাতায় সঞ্চারিত হয়। পাতা খসে পড়ার সময় উদ্ভিদ বর্জ্য পদার্থগুলিও ত্যাগ করে।

(ii) একক পত্রযুক্ত উদ্ভিদে মোচনস্তর পত্রমূলের গোড়ায় গঠিত হয়। কিন্তু যৌগিক পত্রের বেলায় পত্র অক্ষের গোড়ায় অথবা পত্রকের নীচে এই স্তর গঠন করে।

(iii) এরপর মোচনস্তর একটি সুস্পষ্ট **বিভেদস্তর** (Separation layer) গঠন করে। এই বিভেদ স্তর পাতা খসে পড়ার প্রধান কারণ বলা যায়।

(iv) মোচনস্তর পাতার সব থেকে দুর্বল স্থান। এই অঞ্চলের নালিকাবান্ডিলের পরিধি অনেকটা কম থাকে। এই স্তরে স্ক্লেরেনকাইমা ও কোলেনকাইমা থাকে না। কোনো কোনো কোশে সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব বাড়ে। মোচনস্তরের কোশগুলি উপরের ও নীচের দিকের অন্যান্য কোশ থেকে আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কোশগুলির আকার ছোটো এবং এতে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চদানা থাকে। মোচনস্তরের নীচের দিকে নালিকাবান্ডিলের জাইলেম বাহিকাগুলির (Treachea or Vessel) গহ্বর **টাইলোসিস** (Tylosis) গঠন করে বন্ধ হয়ে যায়। টাইলোসিস হল বাহিকা সংলগ্ন সজীব কোশে বেলুনের মতো উপবৃদ্ধি। এতে নলের মতো বাহিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় পাতার রসস্ফীতি রক্ষা করার জন্য গৌণ কলাগুলির মাধ্যমে সংবহন অব্যাহত থাকে।

(v) পাতা খসে পড়ার আগে কোশগুলির মধ্যপর্দা ও বাইরের কোশ প্রাচীর স্ফীত হয় এবং কোশপ্রাচীরে পেকটিক অ্যাসিড নামে একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট পেকটিনে পরিবর্তিত হয়ে কোশপ্রাচীরকে নরম করে। তাছাড়া মোচনস্তরে অক্সিন হরমোনের হ্রাস ঘটে।

(vi) অবশেষে সংবহন কলার কোশ দিয়ে পাতাটি কাণ্ডের সঙ্গে সাময়িকভাবে লেগে থাকে। মোচনস্তরের কোশগুলি বিচ্ছিন্ন হলে পাতা বৃন্তের গোড়া থেকে বায়ুপ্রবাহে বা পাতার ভারে খসে পড়ে।
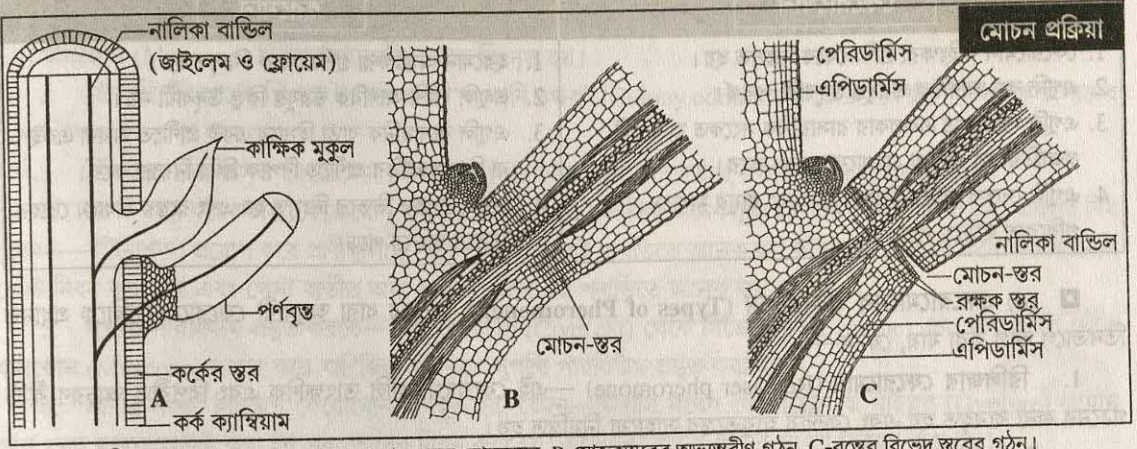
চিত্র 5.22 : পাতার যোজকস্তর : A-পত্রবৃন্তের যোজকস্তর, B-যোজকস্তরের অভ্যন্তরীণ গঠন, C-বৃন্তের বিভেদ স্তরের গঠন।

(vii) পাতা খসে পড়ার পর একটি ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয়। এই উন্মুক্ত ক্ষতস্থানটি ক্রমশ শুকিয়ে যায় অথবা ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে একপ্রকার কোশ উৎপন্ন করে। এই কোশগুলিকে **ফেলোজেন** বা **কর্কক্যাম্বিয়াম** বলে। ভাজক কলা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে বাইরের দিকে **কর্ক** বা **ফেলেম** (Phellem) এবং ভিতরের দিকে **ফেলোডার্ম** (Phelloderm) গঠন করে। **ফেলেম, ফেলোজেন** ও **ফেলোডার্মকে** এক সঙ্গে **পেরিডার্ম** (Periderm) বলে। চিহ্নিত ক্ষতের বাহিকাগুলি মিউসিলেজ বা গঁদ দিয়ে আবৃত হয় এবং পরে ওই স্থানে লিগনিন ও সুবেরিন জমা হয়। ফুল ও ফলের ক্ষেত্রে একইভাবে মোচনস্তর গঠিত হয়ে মোচন ঘটে।

## 5.9. ফেরোমোন (Pheromone)

### ▲ ফেরোমোনের সংজ্ঞা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং কাজ (Definition, General characters, Types and Functions of Pheromone)

বিভিন্ন কারণে প্রাণীরা তাদের নিজেদের প্রজাতি প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর জন্য তারা নানারকম সংকেত বা পন্থার সাহায্য নেয়। এই যোগাযোগ রক্ষার সাহায্যে প্রাণীরা কোনো খাদক প্রাণীর উপস্থিতির সংকেত পাঠায় বা খাদ্যভাণ্ডারের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় বা বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে পূর্বরাগের যৌন আবেদনে আকৃষ্ট করে, অথবা তাদের বসবাসের সীমানা নির্দেশ করে, ইত্যাদি। এই সব আচরণের জন্য প্রাণীরা একপ্রকার **উদ্‌বায়ী রাসায়নিক পদার্থ** বা **সংকেত** (Signal) সৃষ্টি করে যার সাহায্যে একই প্রজাতির অন্য প্রাণীরা বিশেষ আচরণ প্রদর্শন করে। ফেরোমোন হল এই ধরনের একটি রাসায়নিক সংকেত (Chemical signal) যার সাহায্যে একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণী নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যোগাযোগ রক্ষা করে।

❖ (a) **ফেরোমোনের সংজ্ঞা (Definition of Pheromone) :**

**যে উদ্‌বায়ী স্বল্প নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে একই প্রজাতির প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিশেষ আচরণ দেখায়, সেই রাসায়নিক পদার্থকে ফেরোমোন বলে।**

◘ (b) **ফেরোমোনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characters of Pheromone) :**

1. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এবং এই নিঃসরণ হরমোনের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।
2. রাসায়নিক সংকেত হিসাবে একই প্রজাতির প্রাণীদের ভিতরে বার্তা বহন করে।
3. সাধারণত একই প্রজাতির প্রাণীদের উপর ক্রিয়াশীল হয় এবং খুবই অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়।
4. সাধারণত কম আণবিক ভরযুক্ত এবং খুবই উদ্‌বায়ী।
5. ফেরোমোনকে **এক্টোহরমোনও** (Ectohormone) বলে।

● **ফেরোমোন ও হরমোনের ভিতর পার্থক্য (Difference between Pheromone and Hormone) :**

| ফেরোমোন | হরমোন |
|---|---|
| 1. ফেরোমোন বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। | 1. হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। |
| 2. এগুলি কম আণবিক ভরযুক্ত উদ্‌বায়ী পদার্থ। | 2. এগুলি বেশি আণবিক ভরযুক্ত কিন্তু উদ্‌বায়ী নয়। |
| 3. এগুলি সাধারণত একপ্রকার রাসায়নিক সংকেত যা একটি প্রজাতির সব প্রাণীরা যোগাযোগ রক্ষা করে। | 3. এগুলি রাসায়নিক বার্তা হিসাবে একই প্রাণীতে অথবা একই বা ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীতে বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। |
| 4. এগুলি দেহের বাইরে নিঃসৃত হয় এবং বায়ুর মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। | 4. এগুলি দেহের ভিতরে নিঃসৃত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। |

◻ (d) **ফেরোমোনের প্রকারভেদ (Types of Pheromone) :** কাজের ধারা অনুযায়ী ফেরোমোনগুলিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

1. **রিলিজার ফেরোমোন** (Releaser pheromone) —এই ফেরোমোনগুলি তাৎক্ষণিক এবং বিপরীত আচরণ রীতি গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।

**উদাহরণ**—(i) **পুরুষ ইঁদুরের** মূত্রে উপস্থিত রিলিজার ফেরোমোন **স্ত্রী ইঁদুরকে** আকর্ষণ করে। (ii) **পিঁপড়ে** তাদের উদর অংশ থেকে ফরমিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে যা বিপদ সংকেত ফেরোমোন হিসাবে কাজ করে। (iii) **পোল ক্যাট** (Pole cat), **অ্যান্টিলোপ** (Antelope) ইত্যাদি প্রাণী কোনো কারণে ভয় পেলে স্যাক্রাল অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রন্থি থেকে ফেরোমোন নিঃসৃত করে। এই ফেরোমোনের বিপদসংকেত বার্তা অন্য প্রাণীরা পেলে তারা সচেতন হয় এবং স্থান পরিত্যাগ করে।

2. **প্রাইমার ফেরোমোন** (Primer pheromone) —যে ফেরোমোনগুলি গ্রহণ করে প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা বা দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবর্তিত হয় বা ক্রিয়াশীল থাকে তাদের প্রাইমার ফেরোমোন বলে।

**উদাহরণ**—(i) **মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা** ইত্যাদি প্রাণীরা একধরনের প্রাইমার ফেরোমোন উৎপন্ন করে যার সাহায্যে এরা নিজস্ব কলোনির সত্তা বজায় রাখে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) রানি মৌমাছি **কুইন বস্তু** (Queen substance) নামে একপ্রকার ফেরোমোন নিঃসরণ করে যার সাহায্যে স্ত্রী মৌমাছি বন্ধ্যা হয় এবং শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত হয়। (iii) উইপোকার দেহ থেকে সৃষ্ট **সামাজিক ফেরোমোন** (Social pheromone) তাদের কলোনি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

3. **ইমপ্রিন্টিং ফেরোমোন** (Imprinting pheromone) —যে ফেরোমোনগুলি পরিস্ফুরণের একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় কার্যশীল হয় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর স্থায়ী আচরণগত পরিবর্তন ঘটায় তাদের ইমপ্রিন্টিং ফেরোমোন বলে।

**উদাহরণ**—বিভিন্ন প্রকার **ইঁদুরের** এই ফেরোমোন সৃষ্টি হয়।

**● অন্যান্য ফেরোমোন ●**

আজ পর্যন্ত যে যে ধরনের ফেরোমোনের কথা জানতে পারা গেছে তাদের মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

1. **সেক্স-অ্যাট্রাকটেন্ট ফেরোমোন**—এটি হল যৌনতা উদ্দীপক ফেরোমোন, যেমন—ডিসপারলুর, ব্যানিমল ইত্যাদি।
2. **মার্কার ফেরোমোন**—এটি অঞ্চল চিহ্নিতকারী ফেরোমোন, যেমন—পিঁপড়েদের পাভানে গ্রন্থির গন্ধপদার্থ।
3. **অ্যালার্ম ফেরোমোন**—এটি হল বিপৎসংকেত ফেরোমোন, যেমন—পিঁপড়ের ক্ষেত্রে ডেনড্রোলাসিন, সিট্রোনিলাল।
4. **মেটামরফোসিস ফেরোমোন**—রানি মৌমাছির দেহনিঃসৃত পদার্থ—যা কর্মী বা শ্রমিক মৌমাছিতে রূপান্তর ঘটায়।
5. **ম্যাচুরেশন ফেরোমোন**—পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন। এই প্রকার ফেরোমোন শিশু পঙ্গপালের নিম্ফ অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার জন্য পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপালের দেহ থেকে নির্গত হয়।
6. **অরগানাইজেশন বা কালেকটিভ অ্যাকশন ফেরোমোন**—ঝাঁক বাধা, একত্রে শত্রুকে আক্রমণ করা, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি সামাজিক কাজের নির্দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ফেরোমোন।

■ (e) **ফেরোমোনের কাজ (Functions of pheromone) :**

1. ফেরোমোন যৌন আকর্ষণকারী বস্তু হিসাবে কাজ করে। যেমন—(i) স্ত্রী রেশমমথ "**বম্বিকল**" (bombykol) ফেরোমোন তৈরি করে যার সাহায্যে পুরুষ মথ আকৃষ্ট হয়। (ii) **সিভেটোন** (Civetone)—বন বেড়ালের পায়ুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। (iii) **মাসকোন** (Muscone) হরিণের পায়ুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।

2. মৌমাছি, উইপোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি প্রাণী "**কলোনি ওডর**" (Colony odour) গন্ধ তৈরি করে কলোনি সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

3. পিঁপড়ের দেহনিঃসৃত ফেরোমোন পিঁপড়ের যাতায়াতের পথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সাহায্য করে।

4. পেস্ট দমন করার জন্য ফেরোমোন ব্যবহার করে কোনো প্রজাতির অনেকগুলি প্রাণীকে একত্রিত করা হয়। এরপর বিষ (যেমন—কীটনাশক) প্রয়োগ করে প্রাণীগুলিকে নিধন করা হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক কম কীটনাশক ব্যবহার করে অনেক বেশি পেস্ট নিধন করা যায় এবং পেস্ট ব্যতীত অন্য প্রাণীর বিনাশ এই পদ্ধতিতে অনেক কম হয়।

5. সুগন্ধি পারফিউম প্রস্তুত করতে—সিভেট বিড়াল (Civet cat) থেকে **সিভেটোন** (Civetone) এবং মাস্ক হরিণ থেকে **মাসকোন** (Muscone) সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুগন্ধি পারফিউম প্রস্তুত করা হয়।

6. প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ফেরোমোন ব্যবহৃত হয়, যেমন—জিপসি মথের ফেরোমোন বা গাইপ্লুর (Gyplure) প্রয়োগ করে পুরুষ মথকে আকৃষ্ট করা হয় এবং তাদের নিধন করা হয়। এইভাবে কোনো প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

**● কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ফেরোমোন ও তার প্রয়োগ (Synthetic Pheromone and its application) ●**

বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে ফেরোমোন উৎপাদন করেছেন। এই ফেরোমোনগুলি পতঙ্গ পেস্ট দমনে এবং মথ, বিট্‌ল প্রভৃতি পতঙ্গ প্রাণীদের আকর্ষণ করে তাদের ফাঁদে ধরতে সাহায্য করে।

## ◎ 5.10. চারাগাছের বৃদ্ধি ও জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ভূমিকা ◎ (Growth of Seedlings and the role of Gibberellic acid)

➤ **অঙ্কুরোদ্গম ও চারা গাছের বৃদ্ধি (Germination and Growth of Seedling) :**

পরিবেশ থেকে আলো, বাতাস, উষ্ণতা, জল ও অক্সিজেন প্রভৃতি প্রয়োজনমতো পেলে বীজ অঙ্কুরিত হয়। **বীজের সুপ্ত অবস্থা কাটিয়ে ভ্রূণের বৃদ্ধিকে অঙ্কুরোদ্গম বলে।** প্রথমে **ইমবাইবিশন** (Imbibition) প্রক্রিয়ায় বীজ জল শোষণ করে স্ফীত হয়। এর ফলে বীজত্বক ফেটে যায়। জল পেয়ে বীজকোশের প্রোটোপ্লাজমে শারীরবৃত্তীয় কাজ আরম্ভ করে। এই সময় শ্বসনের হার বেড়ে যায় এবং উৎসেচক ক্ষরিত হয়ে সঞ্চিত খাদ্যের বিপাক ক্রিয়া চালাতে থাকে। সঞ্চিত খাদ্য জলে দ্রবীভূত হয়ে বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyle), বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyle), ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূলে (Radical) যায়। খাদ্য পেরিস্পার্ম (Perisperm) থেকে সস্যে (Endosperm), সস্য থেকে বীজপত্রে (Cotyledon) এবং বীজপত্র থেকে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে যায়। সাধারণত অঙ্কুরোদ্গমের সময় DNA সংশ্লেষ ও কোশ বিভাজন আরম্ভ হয়। অঙ্কুরোদ্গমের কয়েক ঘণ্টা পরে RNA তৈরি হতে শুরু করে। এছাড়া কোশের বৃদ্ধি, কোশবিভাজন, প্রোটিন ও বিভিন্ন কোশ গঠনকারী বস্তু, যেমন—শর্করা, স্নেহপদার্থ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অজৈব ফসফেট ইত্যাদির তৈরি, হরমোন সংশ্লেষ প্রভৃতি কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে ঘটে। এর ফলে অঙ্কুরিত বীজ ক্রমশ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং চারা গাছে পরিণত হয়। অঙ্গজ বৃদ্ধির ফলে মূল, কাণ্ড পাতা ও জনন বৃদ্ধির ফলে ফুল ও ফল গঠিত হয়। এইভাবে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে চারা গাছ পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে **অঙ্গসংস্থানিক** এবং **রাসায়নিক পরিবর্তনের** মাধ্যমে বীজ চারা গাছে পরিণত হয়।

➤ **জিব্বারেলিনের পরিচয়—যেসব জৈব পদার্থ উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন হয়ে ওই উদ্ভিদদেহে সক্রিয়ভাবে জৈবনিক কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে এবং বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উদ্ভিদ হরমোন বলে।** সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ হরমোনকে **ফাইটোহরমোন** (Phytohormone) বলে। **জিব্বারেলিন উদ্ভিদের একপ্রকার বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন।** জিব্বারেলা ফুজিকুরই (*Gibberella fujikuroi*) নামে ছত্রাকের আক্রমণে ধান গাছ খুব লম্বা হবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জাপানি

বিজ্ঞানী **কুরোসওয়া** (Kurosawa, 1928) ছত্রাকটির নির্যাস পরীক্ষা করে দেখেন যে এই নির্যাসটির মধ্যে এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ আছে যা ধানগাছকে লম্বা করে। 1935 সালে **ইয়াবুটা** (Yabuta) এই রাসায়নিক পদার্থটিকে কেলাসিত করে নামকরণ করেন **জিব্বারেলিন**। জিব্বারেলিন বর্ণহীন এবং অম্লধর্মী। আজ পর্যন্ত 57টির বেশি বিভিন্ন জিব্বারেলিন আবিষ্কৃত হয়েছে। GA
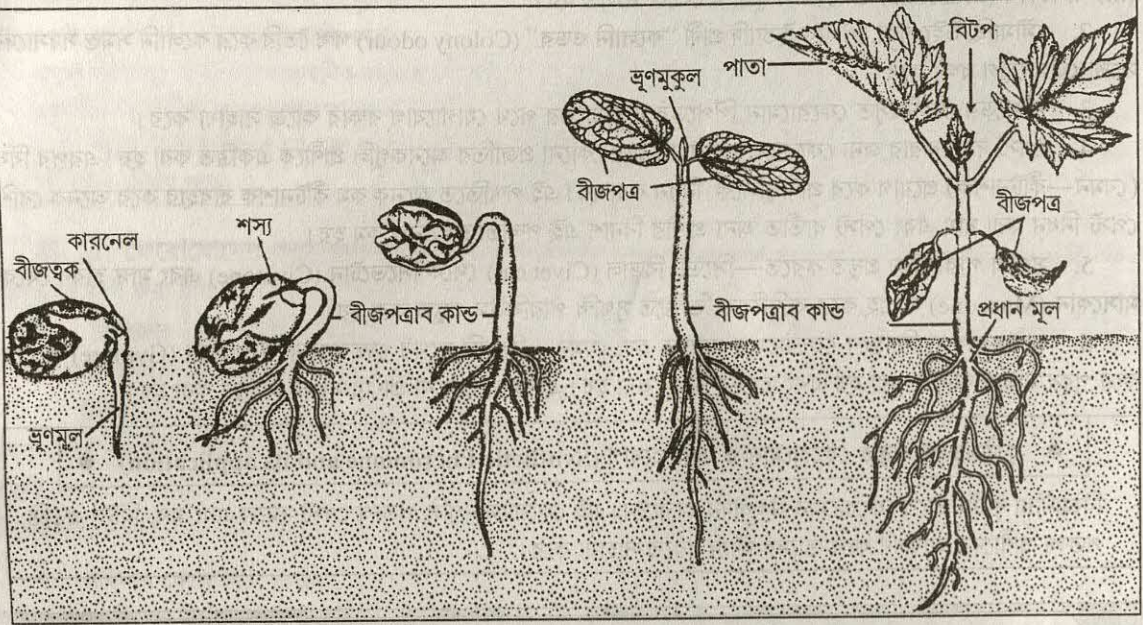
**চিত্র 5.23 :** রেড়ি বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের চিত্র।

সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে জিব্বারেলিনকে প্রকাশ করা হয়। GA যৌগগুলির আবিষ্কারের ক্রমানুসারে $GA_1$, $GA_2$, $GA_3$, $GA_4$ ....... ইত্যাদিভাবে নামকরণ করা হয়। জিব্বারেলিন সংগ্রহ করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি **জিব্বারেলিক অ্যাসিড** (Gibberallic acid)। জিব্বারেলিনগুলির মধ্যে $GA_3$ প্রায় সব উদ্ভিদদেহে থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটি যৌগ।

◆ **চারাগাছের বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ভূমিকা (Role of Gibberellic acid for the growth of seeding) :**

উদ্ভিদের বীজ সস্যল এবং অসস্যল হয়। সস্যল বীজের বীজপত্রে খাদ্য জমা থাকে না। সস্য পৃথকভাবে বীজের মধ্যে থাকে। অসস্যল বীজের বীজপত্রে খাদ্য জমা থাকে। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় বীজে সঞ্চিত প্রোটিন, ফ্যাট, শ্বেতসার এবং অন্যান্য পলিস্যাকারাইডস আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে প্রথমে ভ্রূণ ও পরে বর্ধনশীল চারাগাছে পুষ্টির জন্য স্থানান্তরিত হয়। বীজ অঙ্কুরোদ্‌গমের প্রথম ধাপে আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচকগুলি সক্রিয় হয় ও সংশ্লেষিত হয়। উৎসেচক বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিন অ্যাসিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একাধিক তন্ডুল শস্যের সস্যে শ্বেতসার থাকে। এর চারদিকে অ্যালুরোন স্তর নামে কোশস্তরের আবরণ দেখা যায়। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় এই সব কোশে **হাইড্রোলেজ** উৎসেচকের পরিমাণ বাড়ে। শ্বেতসার ভাঙতে প্রয়োজনীয় **β-অ্যামাইলেজ** উৎসেচক বীজে সঞ্চিত থাকে। অঙ্কুরোদ্‌গমের পর **α-অ্যামাইলেজ** ও **প্রোটিয়েজ** উৎসেচক দুটির উপস্থিতি দেখা যায়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে বীজের ভ্রূণকে অপসারণ করলে অ্যামাইলেজ তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভ্রূণকে অপসারণ করে জিব্বেরেলিন প্রয়োগ করলে অ্যামাইলেজ উৎপাদন অব্যাহত থাকে। সুতরাং জিব্বেরেলিন এইসব কোশে α-অ্যামাইলেজ উৎসেচক উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। সাধারণ অবস্থায়, বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় এবং চারাগাছ বৃদ্ধিতে ভ্রূণ থেকে প্রাকৃতিক জিব্বারেলিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়ে সস্যের খাদ্য পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় α-অ্যামাইলেজ তৈরি করে।

একাধিক **ফোটোব্লাসটিক বীজ** (যেসব বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমে আলোক প্রয়োজন) ও অন্যান্য কিছু বীজে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে সুপ্তাবস্থা ভাঙে। এর ফলে তাদের অঙ্কুরোদ্‌গমও বৃদ্ধি ঘটে। জিব্বারেলিন সাধারণভাবে কোশপর্দার উপর ক্রিয়া করলেও অঙ্কুরোদ্‌গমে তাদের সঠিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আজও সম্পূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি।

(1) কোশ বিভাজনে ও কোশের আয়তন বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিক অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের অথবা উদ্ভিদ অঙ্গের লম্বালম্বি বৃদ্ধি ঘটে। (i) গমের চারা গাছের উপর $\gamma$-রশ্মি প্রয়োগ করলে কোশ বিভাজন বন্ধ হয়, জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেখানে আবার লম্বায় বৃদ্ধি ঘটে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড আবার অনেক ক্ষেত্রে কোশ বিভাজনও ঘটিয়ে থাকে। (ii) পিঁয়াজ মূলের শীর্ষ অংশ যদি জিব্বারেলিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে শীর্ষের কোশগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে লম্বায় বাড়ে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে জিব্বারেলিক অ্যাসিড চারা গাছের কোশ বিভাজন ও প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়।

(2) চারা গাছে এই হরমোন প্রয়োগ করলে কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(3) জিব্বারেলিন কাণ্ডের বৃদ্ধি ছাড়াও পাতার আয়তন বাড়ায়। অনেকসময় বাইরে থেকে স্প্রে করলে ফুল ও ফলের আয়তন বাড়ে।

(4) দীর্ঘ দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদে এই হরমোন প্রয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যে ফুল ফোটে।

(5) বীজহীন ফল উৎপাদনেও জিব্বারেলিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

(6) তা ছাড়া ফুলের লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটানো, ফলের আকার বড়ো করাতেও এই হরমোন কাজ করে।

জিব্বারেলিনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলা যায়, যদিও এই হরমোন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। তবুও, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে কৃষিক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

## ◎ 5.11. আলোকপর্যায়বৃত্তির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব ◎ (Definition, Explanation, Characteristic Responses and Importance of Photoperiodism)

শিশু উদ্ভিদ আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে পরিণত হলে যথাসময়ে ফুল ধারণ করে। প্রত্যেক উদ্ভিদের ফুল ফোটার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি অর্থাৎ মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির বৃদ্ধি হলে বিটপের শীর্ষে আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় বহু জটিল পরিবর্তন ঘটে। এর পর উদ্ভিদে জনন অঙ্গ অর্থাৎ ফুলের কুঁড়ি গঠিত হয়। কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের কাণ্ডের শাখা-প্রশাখার শীর্ষে বা কক্ষে একটি করে ফুল ফোটে। বেশিরভাগ উদ্ভিদ গুচ্ছাকারে (পুষ্পবিন্যাস) ফুল ধারণ করে। এই ভাবে উদ্ভিদের অঙ্গজ দশা থেকে জনন দশায় পৌঁছোনোর জন্য পরিবেশের অনেকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তগুলির মধ্যে আলোকের গুণাগুণ, তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও উষ্ণতা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফুল গঠনের জন্য বহুলাংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শর্তগুলি ফুলের গঠন ও ফুল ফোটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফুল ফোটার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে জানতে হলে এই শর্তগুলি সম্বন্ধে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।
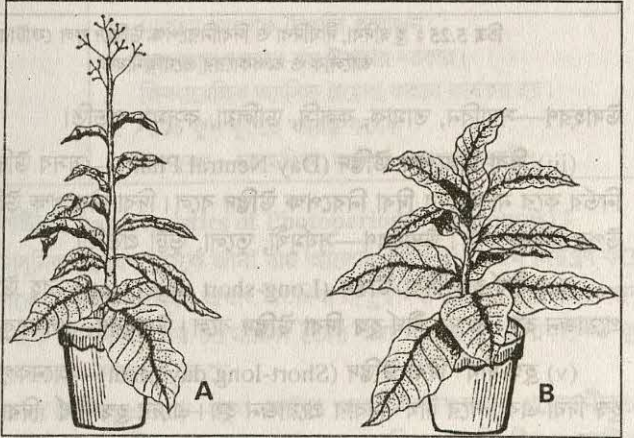
চিত্র 5.24 ঃ মেরিল্যান্ড ম্যামথ তামাক গাছ ঃ A-হ্রস্বদিবায় বড়ো হওয়া উদ্ভিদ; B-দীর্ঘদিবায় বড়ো হওয়া উদ্ভিদ।

❖ (a) **আলোকপর্যায়বৃত্তির সংজ্ঞা (Definition of Photoperiodism) ঃ যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে ফুল ফোটানোর জন্য আলোকের স্থায়ীভাবে প্রভাব বা দিবা দৈর্ঘ্যের প্রভাব প্রয়োজন তাকে আলোকপর্যায়বৃত্তি বলে।**

■ (b) **আলোকপর্যায়বৃত্তির ব্যাখ্যা (Explanation of Photoperiodism) ঃ**

আমাদের ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বহুদেশে গ্রীষ্ম ও শীতে দিবা দৈর্ঘ্যের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশে

গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছে ফুল আসে এবং শীতকালে ডালিয়া, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি গাছে ফুল ফোটে। সুতরাং দেখা যায় দিবাদৈর্ঘ্যের উপর ফুল ফোটার প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।

1920 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানী **গার্নার ও অ্যালার্ড** (Garner and Allard) ফুল ফোটার ক্ষেত্রে আলোকপর্যায় বৃত্তির ভূমিকা প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা **মেরিল্যান্ড ম্যামথ** (Maryland Mammoth) নামে একজাতীয় তামাক (*Nicotiana tabacum*) ও **বাইলক্সি** (Biloxi) নামে সয়াবিনের (*Glycine max*) উপর পরীক্ষা করে দেখান যে এই উদ্ভিদ-দুটির গ্রীষ্মকালে অঙ্গজ বৃদ্ধি হলেও শীতকাল ছাড়া ফুল আসে না। এর পর তারা গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদ দুটির দিবা দৈর্ঘ্য হ্রাস করে অথবা শীতকালে দিবা দৈর্ঘ্য কৃত্রিম আলোকে বাড়িয়ে দেখেন ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন তামাক উদ্ভিদ অন্ততপক্ষে 12 ঘন্টা সূর্যালোক না পেলে ফুল ফোটে না। বহু পরীক্ষার পর তাঁরা প্রমাণ করেন দিবাদৈর্ঘ্যের তারতম্য হল ফুল ফোটার প্রধান নিয়ন্ত্রক।

➤ **দিবাদৈর্ঘ্যের স্থায়িত্ব অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Plants on the basis of the length of Photoperiod)** ঃ আলোকের তারতম্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—
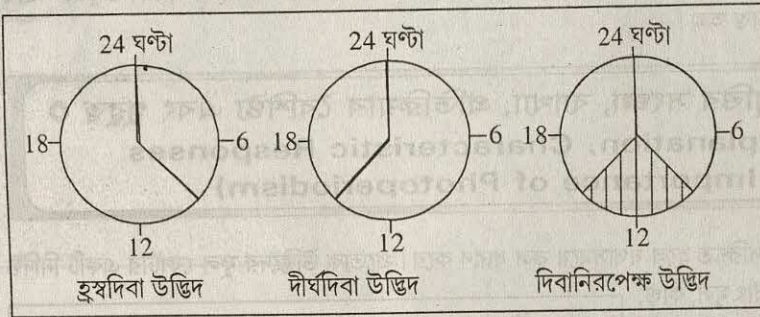
**চিত্র 5.25** ঃ হ্রস্বদিবা, দীর্ঘদিবা ও দিবানিরপেক্ষ উদ্ভিদে ফুল ফোটার জন্য আলোক ও অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা।

(i) **দীর্ঘদিবা উদ্ভিদ** (Long day plant)—যেসব উদ্ভিদে দিবা-দৈর্ঘ বৃদ্ধি করায় ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে (12 ঘণ্টার বেশি) তাদের **দীর্ঘদিবা উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ**—গম, বার্লি, মুলো, মটর প্রভৃতি।

(ii) **হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ** (Short day plant)—যেসব উদ্ভিদে দিবা দৈর্ঘ্য হ্রাস করায় (12 ঘন্টার কম) ফুল ফোটে তাদের **হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ** বলা হয়। **উদাহরণ**—সয়াবিন, তামাক, কলসি, ডালিয়া, কস্‌মস্ প্রভৃতি।

(iii) **দিবা-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ** (Day Neutral Plant)—যেসব উদ্ভিদের ফুল ফোটা দীর্ঘদিবা বা হ্রস্বদিবালোক প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না তাদের **দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ** বলে। দিবা-নিরপেক্ষ উদ্ভিদের ফুল ফোটা উদ্ভিদের বয়স, পর্বের সংখ্যা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। **উদাহরণ**—সূর্যমুখী, তুলো, ভুট্টা প্রভৃতি।

(iv) **দীর্ঘ-হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ** (Long-short day plant)—বহু উদ্ভিদ আছে যাদের প্রথমে দীর্ঘদিবা এবং পরে হ্রস্বদিবার প্রয়োজন হয়। এদের **দীর্ঘ-হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ**—পাথরকুচি, হাসনাহানা ইত্যাদি।

(v) **হ্রস্ব-দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ** (Short-long day plant)—অনেকগুলি উদ্ভিদের বেলায় দেখা যায় ফুল ফোটার জন্য প্রথমে হ্রস্ব দিবা এবং পরে দীর্ঘ দিবার প্রয়োজন হয়। এদের **হ্রস্ব-দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ** বলা হয়। **উদাহরণ**—ক্যাম্পানুলা, ট্রাইফোলিয়াম প্রভৃতি।

(vi) **দিবা-দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ** (Critical day-length)—কোনো একটি উদ্ভিদ ফুল ফোটোনোর জন্য যে ন্যূনতম দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয় তাকে সেই উদ্ভিদের **দিবা-দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ** (Critical day length) বলে। তামাক (*Nicotiana tabacum*) ও বনওকড়া (*Xanthium strumarium*) উভয়ে হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ। তামাক 12 ঘণ্টা এবং বনওকড়া 15·5 ঘণ্টা দিবা দৈর্ঘ্য না পেলে ফুল ফোটে না। তাই দেখা যাচ্ছে তামাকের ক্ষেত্রে 12 ঘণ্টা ও বনওকড়ার ক্ষেত্রে 15·5 ঘন্টা হল **দিবা-দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ**।

(vii) **অন্ধকার দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ** (Critical dark period)— অনেকগুলি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটার জন্য যে ন্যূনতম অন্ধকার দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয় তাকে **অন্ধকার-দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ** বলা হয়। সয়াবিনের (*Glycine max*) অন্ধকার দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ 10 ঘণ্টা।

● **কয়েকটি দীর্ঘদিবা, হ্রস্বদিবা ও দিবানিরপেক্ষ উদ্ভিদের নাম (A few Long day, Short day and Day neutral plants) ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| **দীর্ঘদিবা উদ্ভিদ** (Long day plants) | 1. গম (*Triticum aestivum*)<br>2. ভুট্টা (*Zea mays*)<br>3. যব (*Avena sativa*)<br>4. রাই (*Secale creale*)<br>5. বীট (*Beta vulgaris*) | 6. মটর (*Pisum sativum*)<br>7. মুলো (*Raphanus sativus*)<br>8. আফিং (*Papaver somniferum*)<br>9. পিপারমেন্ট (*Mentha piperita*)<br>10. স্পাইন্যাক (*Spinacia oleracea*) |
| **হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ** (Short day plant) | 1. চন্দ্রমল্লিকা (*Chrysanthemum morifolium*)<br>2. ডালিয়া (*Dalia sp.*)<br>3. তামাক (*Nicotiana tabacum*)<br>4. সয়াবিন (*Glycine max var. biloxi*)<br>5. কফি (*Coffea arabica*) | 6. আখ (*Saccharum officinarum*)<br>7. কস্‌মস্ (*Cosmos bipinata*)<br>8. লাল পাতা (*Euphobia pulcherrima*)<br>9. পাট (*Corchorus sativa*)<br>10. আলু (*Solanum tuberosum*) |
| **দিবানিরপেক্ষ উদ্ভিদ** (Day Neutral plants) | 1. টম্যাটো (*Lycopersicum esculantum*)<br>2. শশা (*Cucumis sativa*) | 3. সন্ধ্যামালতী (*Miribilis jalapa*)<br>4. নারকেল (*Cocos nucifera*) |

● **দীর্ঘদিবা এবং হ্রস্বদিবা উদ্ভিদের পার্থক্য (Difference between Long day and Short day plants) ঃ**

| দীর্ঘদিবা | হ্রস্বদিবা |
|---|---|
| 1. দীর্ঘদিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। | 1. হ্রস্বদিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। |
| 2. হ্রস্ব অন্ধকার দৈর্ঘ্য প্রয়োজনীয়। | 2. দীর্ঘ অন্ধকার দৈর্ঘ্য প্রয়োজনীয়। |
| 3. ন্যূনতম অন্ধকার দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। | 3. ন্যূনতম আলোক দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। |
| 4. তুলনামূলকভাবে বেশি উষ্ণতার দরকার। | 4. তুলনামূলক ভাবে কম উষ্ণতার দরকার। |
| 5. জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে কার্যকর হয় না। | 5. জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে কার্যকর হয়। |
| 6. গ্রীষ্মে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। | 6. শীতে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। |
| 7. উদাহরণ—গম, ভুট্টা, বীট ইত্যাদি। | 7. উদাহরণ—চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, তামাক ইত্যাদি। |

### ◘ (c) আলোকপর্যায়বৃত্তির প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Photoperiodic Responses) ঃ

1. **জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ** (Genetic control)—আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় আলোকপর্যায় বৃত্তি জিন নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে যে-কোনো প্রকার অর্থাৎ দীর্ঘদিবা বা হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব। লাক্‌নো ন্যাশানাল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এক বিশেষ ধরনের চন্দ্রমল্লিকা তৈরি করা হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফুল ফোটে। আরও কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের ওপরও গবেষণা চলছে।

2. **অন্ধকার দশার প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Dark period)—ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম হ্যামনার ও বনারের (Hamner and Bonner, 1938) পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায়। জ্যান্থিয়াম উদ্ভিদটি হল একটি হ্রস্ব দিবা দৈর্ঘ্য উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদটি 16 ঘণ্টা অন্ধকারে এবং 8 ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখলে ফুল ফোটে। আবার একই উদ্ভিদকে 16 ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার সময় অল্প সময়ের জন্য আলোতে এনে আবার অন্ধকারে রাখলে ফুল ফোটে না। অন্য পরীক্ষায় দেখা গেছে গাছটিকে 16 ঘণ্টা অন্ধকারে রেখে 8 ঘণ্টা আলোকে রাখার সময় কিছুক্ষণ অন্ধকারে নিয়ে আবার আলোকে নিয়ে এলে ফুল ফোটে। কোনো উদ্ভিদকে যদি 24 ঘণ্টা আলোকে রেখে দেওয়া যায় দেখা যাবে উদ্ভিদে কোনো ফুল হবে না। তাই সহজে বোঝা যায় ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশা ও আলোক দশা বিশেষ প্রয়োজন।

3. **আলোক দশার প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Light period)— পরজীবী ও মৃতজীবী উদ্ভিদও আলো ছাড়া ফুল হয় না। তাছাড়া ছত্রাককে অন্ধকারে রেখে দিলে তাদের জনন অঙ্গ গঠিত হয় না। ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশার প্রয়োজন হলেও আলোকদশার প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়েছে। ফুলের গঠন ও সংখ্যা নির্ধারণে আলোকের প্রভাব প্রয়োজনীয়।

4. **আলোকপর্যায়িক উদ্দীপনা বা ফোটোপিরিয়ডীয় আবেশ** (Photoperiodic induction)— দীর্ঘদিবা বা হ্রস্বদিবা, উভয় প্রকার উদ্ভিদ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় মাত্রা আলোক পেলে ফুল ফোটার ক্ষমতা লাভ করে। এর পর প্রতিকূল আলোক দৈর্ঘ্যে রাখলে ফুল ফুটতে থাকে। এই উদ্ভিদকে আর আলোকে রাখার প্রয়োজন হয় না। একে **আলোকপর্যায়িক উদ্দীপক** বা **ফোটোপিরিয়ডিক আবেশ** বলে। 1940 খ্রিস্টাব্দে **হ্যামার** (Hammer) বলেন, আলোকপর্যায়িক উদ্দীপনা বলতে একটি চক্র বোঝায় (24 ঘণ্টায়) যাতে স্বল্প দিবাদৈর্ঘ্যের স্থায়িত্ব ও স্বল্প আলোকের তীব্রতার সঙ্গো স্বল্প অন্ধকার কালের স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন।
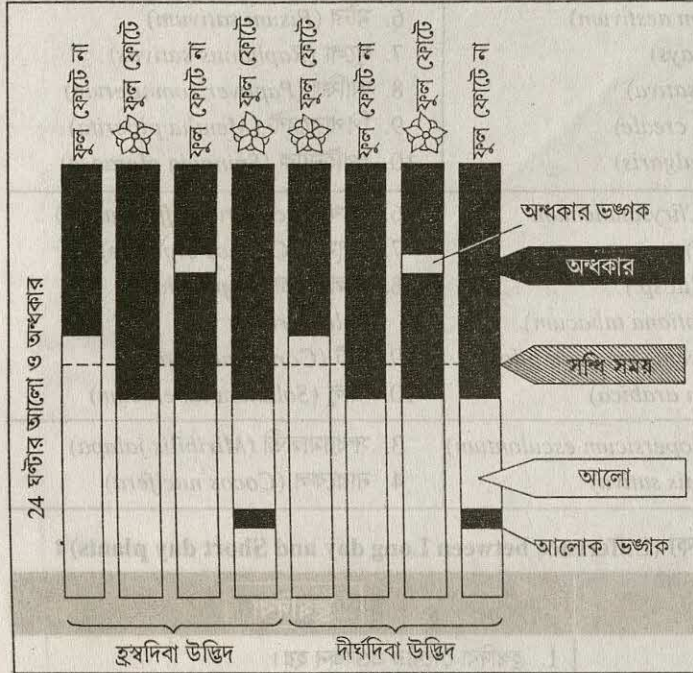
**চিত্র 5.26 :** ফুল ফোটার জন্য হ্রস্বদিবা ও দীর্ঘদিবা উদ্ভিদের অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা।

5.**তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুরুত্ব** (Importance of wavelength)— বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক প্রয়োগ করে দেখা গেছে ফুল গঠনের জন্য লাল রশ্মি (640—660 nm) অন্যান্য রশ্মির তুলনায় বেশি কার্যকর। সুদূর লাল আলোক (Far red—730 nm) রশ্মি অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্গজ গঠন ও ফুল ফোটা শুরু করানোর জন্য লাল ও সুদূর লাল রশ্মি উভয়ে কার্যকর।

6.**পুষ্পারম্ভে ফাইটোক্রোম ও ফ্লোরিজেনের ভূমিকা (Role of Phytochrome and Florigen in flowering) :**

(i) **ফাইটোক্রোম**— আমেরিকার বিজ্ঞানীরা 1960 সালে ফাইটোক্রোম পৃথক করতে সক্ষম হন। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ ছাড়াও নিম্নশ্রেণির বহু উদ্ভিদে ফাইটোক্রোমের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। পুষ্প উদ্দীপক ফাইটোক্রোম একপ্রকার **রঞ্জক পদার্থ** এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত অর্থাৎ **ক্রোমোপ্রোটিন**। এই পদার্থ Pr-ফাইটোক্রোম ও Pfr-ফাইটোক্রোম নামে পরস্পর পরিবর্তনশীল রঞ্জক পদার্থ হিসাবে থাকে। তা ছাড়া Pr ফাইটোক্রোম লাল আলোক এবং Pfr ফাইটোক্রোম সুদূর লাল আলোক শোষণক্ষম। প্রকৃতপক্ষে এর অনুপাতের উপর ফুল ফোটা ও গঠনের তারতম্য হয়। হ্যান্স মোর (Hans Mohr, 1966) মনে করেন ফাইটোক্রোমের পরিমাণ কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনের সক্রিয়তা বাড়ায়। তিনি মনে করেন ফাইটোক্রোম বিশেষ RNA, প্রোটিন ও উৎসেচক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। ফাইটোক্রোম ফুল ফোটার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

প্রথম আলোকের প্রভাবে উদ্ভিদে ফাইটোক্রোম Pfr-এর পরিমাণ বাড়ে এবং দীর্ঘ অন্ধকারে ফাইটোক্রোম Pfr, ফাইটোক্রোম Pr-এ পরিবর্তিত হয়।

(ii) **ফ্লোরিজেন**—উদ্ভিদে পুষ্প উদ্দীপক হরমোন ফ্লোরিজেনের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সবাই একমত, তবে এই হরমোন নিষ্কাশিত করা সম্ভব হয়নি। ফ্লোরিজেন পাতায় তৈরি হয়ে প্রান্তীয় ও কাক্ষিক মুকুলে স্থানান্তরিত হয় এবং ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। 1936 খ্রিস্টাব্দে **চাইলাখান** (Chailachyan) এই হরমোনের নামকরণ করেন **ফ্লোরিজেন**। পাতা হল আলোকপর্যাবৃত্তির প্রাথমিক অঙ্গ এবং এতে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে ফ্লোরিজেন সংশ্লেষিত হয়। ফ্লোরিজেন অগ্রস্থ ভাজক কলায় সঞ্চিত থাকে এবং অঙ্গজ কোশকে ফুল উৎপাদনকারী কোশে পরিণত করতে সাহায্য করে। **হডসন ও হ্যামনার** (Hodson and Hamner) 1970 সালে জ্যান্থিয়ামের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখান জ্যান্থিয়াম (Xanthium) থেকে নির্যাসিত রস অন্য উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে ফুল ফুটানো যায়।

লাল আলোক
(660 nm)
Pr ⇄ Pfr
সুদূর লাল আলোক
(730 nm)
অন্ধকারে পরিবর্তন

একইভাবে লেম্না (Lemna) নামে জলজ সপুষ্পক উদ্ভিদে নির্যাস প্রয়োগ করেও অন্য উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন ফ্লোরিজেন একক ভাবে কাজ করে না। তাদের মতে **অ্যান্থেসিন, জিব্বেরেলিন** এবং **ফ্লোরিজেন** সমতা ফুল

ফোটাতে সাহায্য করে। এছাড়া লোহা, ক্যালসিয়াম ও খনিজ লবণ প্রভৃতিও ফুল গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফুল ফোটা নিয়ে নানা রকম মত প্রচলিত আছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন পাতায় ফাইটোক্রোম নামে এক বিশেষ রঞ্জককণা লাল ও দূরবর্তী লাল আলো শোষণ করতে পারে। বর্থইউক ও হেনড্রিক্স (Borthwick and Hendricks) 1956 খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন ফাইটোক্রোমের দুটি রূপান্তরযোগ্য প্রকৃতি আছে, যেমন Pr ও Pfr। দিনের বেলায় Pr ফাইটোক্রোম লাল আলো শোষণ করে Pfr ফাইটোক্রোমে পরিণত হয় এবং Pfr ফাইটোক্রোম অন্ধকারে দূরবর্তী আলো শোষণ করে এবং আবার Pr-এ রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক 24 ঘণ্টায় আলো ও অন্ধকারের আবর্তন ঘটে চলেছে। এই আবর্তনে Pr ও Pfr ফাইটোক্রোমের পারস্পরিক আন্তঃপরিবর্তনশীল (interconversion)। এর ফলে পুষ্প উদ্দীপক ফ্লোরিজেন সংশ্লেষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে Pr ও Pfr-এর অনুপাতের উপর পুষ্প উদ্দীপক সৃষ্টি নির্ভর করে। পরে পুষ্প উদ্দীপক ফ্লোরিজেন পাতা থেকে শীর্ষীয় ও কাক্ষিক মুকুলে যায় এবং পুষ্প গঠনে সহায়তা করে।
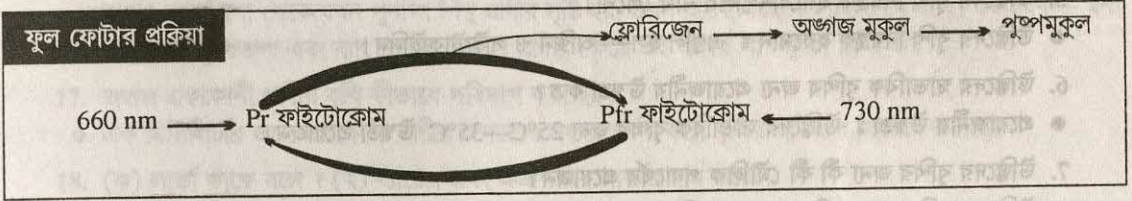
- **আলোকপর্যায়বৃত্তির গুরুত্ব (Importance of Photoperiodism) :**
  1. ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত ফসল ফলানো যায়।
  2. সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় আলোক পর্যায়বৃত্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
  3. দিবা-দৈর্ঘ্যের কৃত্রিম হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধির হার এবং ফুল ফোটানোর সময়কাল নিয়ন্ত্রণ করে পর্যাপ্ত ফল উৎপাদন সম্ভব।
  4. একবর্ষজীবী কিছু উদ্ভিদকে বছরে দুবার ফুল ফোটাতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকাল ফুল ফোটাতে বাধ্য করা যায়।
  5. উদ্ভিদের অঙ্গজ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়।
  6. দিবা-দৈর্ঘ্যের নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সময়ে ফুল ফুটতে অভ্যস্ত করে একই প্রজাতির বিভিন্ন ভ্যারাইটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ফোটাতে বাধ্য করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন ভ্যারাইটির ফুলের মধ্যে পরনিষেক ঘটানো সম্ভব হয় এবং উন্নতমানের ফসল উৎপাদন করা যায়।
  7. আলুর ক্ষেত্রে দিবাদৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটিয়ে স্ফীতকন্দ এবং পেঁয়াজের ক্ষেত্রে কন্দ বেশি সংখ্যক সৃষ্টি করা যায়।
  8. প্রতিকূল পরিবেশে জন্মাতে অক্ষম উদ্ভিদকে নিজস্ব পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আরোপ করা যায়। এতে নতুন পরিবেশে উদ্ভিদের বিস্তার ও স্থায়িত্বের পথ সুগম হয়।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. বৃদ্ধি কাকে বলে?**

- যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বাড়ে তাকে **বৃদ্ধি** বলে।

**2. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির শর্তাবলি লেখো।**

- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কতকগুলি প্রভাবকের উপর নির্ভর করে। এই প্রভাবকগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— **বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ**। এছাড়া **বিশেষ প্রভাবকেরও** প্রয়োজন।

  1. **বাহ্যিক শর্তাবলি**— (i) অক্সিজেন, (ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড, (iii) উষ্ণতা, (iv) আলো ও (v) মাটি।
  2. **অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি**— (i) খাদ্য, (ii) হরমোন, (iii) জল, (iv) খনিজ লবণ (v) ভিটামিন এবং উৎসেচক।
  3. **বিশেষ প্রভাবক**— (i) পরিবেশ ও (ii) বংশগতি।

**3. বৃদ্ধির তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখো।**

- **বৃদ্ধির তাৎপর্য**—(i) বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবের দৈহিক ও জৈবিক পরিপূর্ণতা আসে। (ii) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীব বংশবিস্তারের সুযোগ লাভ করে। (iii) বৃদ্ধির ফলে পরিণত হয়ে জীব প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। (iv) পুনরুৎপাদনের ফলে নিম্নশ্রেণির প্রাণী বংশবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।

**4. নিয়ত ও অনিয়ত বৃদ্ধি বলতে কী বোঝো?**

- (i) **নিয়ত বৃদ্ধি**—উদ্ভিদের যেসব অঙ্গের বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঘটে, তাকে নিয়ত বৃদ্ধি বলে। উদাহরণ—উদ্ভিদের জনন অঙ্গের ( পুং-স্তবক ও স্ত্রী-স্তবক ) বৃদ্ধি। (ii) **অনিয়ত বৃদ্ধি**—উদ্ভিদের যে অঙ্গের বৃদ্ধি আমৃত্যু চলতে থাকে, তাকে অনিয়ত বৃদ্ধি বলে। উদাহরণ— উদ্ভিদের অঙ্গজ অংশের বৃদ্ধি আমৃত্যু চলতে থাকে।

**5. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোনগুলির নাম লেখো।**

- **উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন :** এগুলি হল— অক্সিন ও সাইটোকাইনিন।

**6. উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা কত?**

- **প্রয়োজনীয় উষ্ণতা :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য 25°C—35°C উষ্ণতা প্রয়োজন।

**7. উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কী কী মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন?**

- উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য খনিজ লবণ , অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হরমোন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন।

**8. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোন্ কোশবিভাজনের জন্য ঘটে?**

- ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

**9. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোথায় কোথায় হয়?**

- কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে। অগ্রস্থ ভাজক কলার বিভাজনে উদ্ভিদ লম্বায় এবং পার্শ্বস্থ ভাজক কলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পাশে বাড়ে।

**10. উদ্ভিদের বৃদ্ধির দশাগুলি কী কী?**

- উদ্ভিদের বৃদ্ধির দশাকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন— (i) **কোশ বিভাজন দশা**— এই দশায় প্রত্যেকটি কোশ একাধিকবার বিভাজিত হয়ে অসংখ্য অপত্য কোশ সৃষ্টি করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোশ বিভাজন ঘটে। (ii) **কোশ দীর্ঘিকরণ দশা**— এই দশায় প্রত্যেকটি নবগঠিত কোশ আয়তনে বেড়ে পূর্ণ আকৃতি লাভ করে। (iii) **বিভেদ দশা**— এই দশায় পরিণত কোশগুলি বিভিন্ন কলায় বিভক্ত হয়। (iv) **পরিণত দশা**— এই দশায় কোশগুলি বিভিন্ন কলায় বিভেদিত হয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হয়।

**11. উদাহরণসহ সীমিত বৃদ্ধি ও অসীমিত বৃদ্ধির অর্থ বিবৃত করো।**

- (ক) **সীমিত বৃদ্ধি :** জীবদেহে যে বৃদ্ধি সীমিত বা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে তাকে **সীমিত বা নির্ধারিত বৃদ্ধি** বলে। **উদাহরণ**—(i) প্রাণীদের বৃদ্ধি সীমিত এবং সাধারণত মৃত্যুর অনেক আগে বন্ধ হয়ে যায়। (ii) উদ্ভিদের পুষ্পমুকুল ও পুষ্পের বৃদ্ধি সীমিত বলা যায়।

  (খ) **অসীমিত বৃদ্ধি :** জীবদেহে যে বৃদ্ধি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে তাকে **অনির্ধারিত বা অসীমিত বৃদ্ধি বলে। উদাহরণ**— বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের আমৃত্যু কম-বেশি অঙ্গজ বৃদ্ধি হয়।

**12. উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?**

- **স্পেস মার্কার** যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি মাপা হয়।

**13. বীজের সুপ্তদশা কী?**

- **বীজের সুপ্তদশা :** বীজ পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয় না। একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। বিভিন্ন বীজে নিষ্ক্রিয় থাকার সময় সীমার তারতম্য ঘটে। একে বীজের সুপ্ত অবস্থা বলে। বৃদ্ধি প্রতিরোধক হরমোন, বীজত্বকে স্থূলত্ব ও বিপাকীয় কাজের স্থিতাবস্থাই বীজের সুপ্তদশার প্রধান কারণ।

**14. প্রাণীর বৃদ্ধির শর্তগুলি কী কী?**

● উদ্ভিদের বৃদ্ধির মতো প্রাণীর বৃদ্ধিতে তাপ, অক্সিজেন, পুষ্টি, জল, উৎসেচক, হরমোন প্রভৃতি ছাড়াও ভিটামিন প্রয়োজন। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃদ্ধিতে অনেকগুলি বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন, যেমন—থাইরক্সিন, ইস্ট্রোজেন (স্ত্রী প্রাণীদের), টেস্টোস্টেরোন (পুরুষ প্রাণীদের) প্রভৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

**15. পরিস্ফুরণ কী?**

● যে পদ্ধতিতে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা ভ্রূণাণু ( ভ্রূণ ) পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয় তাকে **পরিস্ফুরণ** বলে।

**16. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ এবং পরোক্ষ পরিস্ফুরণ কাকে বলে?**

● 1. **প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ঃ** ভ্রূণ থেকে সরাসরি অপরিণত পূর্ণাঙ্গ শিশু প্রাণী সৃষ্টি হলে তাকে **প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ** বলে। **উদাহরণ**— মানুষ, গিরগিটি, গিনিপিগ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি। 2. **পরোক্ষ পরিস্ফুরণ**— ভ্রূণ থেকে মধ্যবর্তী পর্যায় অর্থাৎ লার্ভা দশা থেকে যখন পূর্ণাঙ্গ শিশু প্রাণীর সৃষ্টি হয়, তখন তাকে **পরোক্ষ পরিস্ফুরণ** বলে। **উদাহরণ**— মশা, মাছি জাতীয় পতঙ্গ এবং ব্যাং জাতীয় উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রকার পরিস্ফুরণ দেখা যায়।

**17. জলজ এককোশী প্রাণীর বৃদ্ধি কীভাবে পরিমাপ করা হয়?**

● এক মিলিলিটার জলে এককোশী প্রাণীর অপত্যের সংখ্যা গণনা করে বৃদ্ধির পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়।

**18. (ক) লার্ভা কাকে বলে ? (খ) ব্যাঙের এবং প্রজাপতির লার্ভার নাম করো।**

● (ক) **লার্ভা ঃ** প্রাণীর প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণকালে মশা, মাছি, প্রজাপতি, ব্যাং প্রভৃতির ভ্রূণ থেকে যে অপত্যের সৃষ্টি হয়, তা আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো নয়, কিন্তু স্বাবলম্বী হয়। এই প্রকার স্বাবলম্বী অথচ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সঙ্গে আকৃতিগত অমিল **শিশু প্রাণী লার্ভা** ( Larva ) নামে পরিচিত।

(খ) **লার্ভার নাম ঃ** (i) ব্যাঙের লার্ভা— **ব্যাঙাচি** ( Tadpole ) এবং (ii) প্রজাপতির লার্ভা— **শুঁয়াপোকা**।

**19. রূপান্তর বা মেটামরফোসিস কাকে বলে?**

● **রূপান্তর ঃ** প্রাণীর লার্ভা দশা থেকে নানা ধরনের কলার বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে রূপান্তর বলে। **উদাহরণ**— পতঙ্গ ( মশা , মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি ) ও উভচর প্রাণী ( ব্যাং)।

**20. অসম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে?**

● **অসম্পূর্ণ রূপান্তর ঃ** যেসব পতঙ্গের রূপান্তরে পিউপা দশা থাকে না তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলা হয়। **উদাহরণ**— আরশোলা, গঙ্গাফড়িং ইত্যাদি।

**21. প্রতিকূল রূপান্তর কাকে বলে ?**

● **প্রতিকূল রূপান্তর ঃ** রূপান্তরের সময় যদি পূর্ণাঙ্গ দশা, লার্ভা দশা থেকে অনুন্নত হয় তখন তাকে প্রতিকূল রূপান্তর বলা হয়। **উদাহরণ**— অ্যাসিডিয়া প্রাণীর লার্ভা দশায় নোটোকর্ড ও লেজ থাকে। পরিণত প্রাণীতে ওই অঙ্গ দুটি থাকে না।

**22. পিডোজেনেসিস কী?**

● কতকগুলি লার্ভা যৌন জননের ফলে অপত্য লার্ভা তৈরি করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **পিডোজেনেসিস** বলে।

**23. পুনরুৎপাদন কাকে বলে ?**

● দেহের কোনো অংশের ক্ষয়ক্ষতি পরিপূরণ ও নিবারণের ক্ষমতাকে **পুনরুৎপাদন** বলা হয়। কতকগুলি প্রাণী, যেমন— স্পঞ্জ, হাইড্রা প্রভৃতির দেহের কোনো অংশ নষ্ট হলে কোশ বিভাজন প্রক্রিয়ায় সেই অংশ আবার গঠিত হয়। হাইড্রাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললে প্রতিটি খণ্ড থেকে পুনরুৎপাদন পদ্ধতিতে নতুন হাইড্রা গঠিত হয়।

**24. বার্ধক্যপ্রাপ্তি বলতে কী বোঝো ?**

● জীবদেহের পরিণত অবস্থা থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে অবনতিজনিত পরিবর্তন ঘটে ও জীবকাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাকে বার্ধক্যপ্রাপ্তি বলে।

**25. উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণগুলি কী কী ?**

● উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণগুলি হল—(i) কোশের আকৃতি হ্রাস পাওয়া এবং কোশ অঙ্গাণুগুলির কর্মক্ষমতা

কমে যাওয়া। (ii) সালোকসংশ্লেষের হার কমে যাওয়া এবং শর্করার পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। (iii) ক্লোরোফিল তৈরি হয় না ও অ্যান্থোসায়ানিনের সঞ্চয় বেড়ে যাওয়া। (iv) প্রোটিন কম তৈরি হওয়া। (v) পাতা ঝরে পড়ার আগে পুষ্টিদ্রব্যগুলির কাণ্ডে সঞ্চারিত হওয়া। (vi) ক্রোমাটিন বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটা। (vii) আত্তীকরণ ক্ষমতা, প্রোটিন, RNA, DNA-এর উপচিতিকর পদ্ধতির হ্রাস ঘটা।

**26. গেরেন্টোলজি কী ?**

- বয়ঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচিত বিজ্ঞানের শাখাকে গেরেন্টোলজি বলে।

**27. বয়ঃপ্রাপ্তির সংজ্ঞা লেখো।**

- যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কোশ, কলা ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কার্যাবলির ক্রমশ অবনতির ফলে যে পরিবর্তন আসে তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বলে।

**28. বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের কী কী পরিবর্তন ঘটে ?**

- বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের পরিবর্তনগুলি—(i) প্লাজমামেমব্রেনের ভেদ্যতা কমে যায়। (ii) মাইটোকনড্রিয়ার অপজননের ফলে শর্করা উৎপাদন কমে যায়। (iii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সংখ্যা কমে যায়। রাইবোজোমের অভাবে প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যাহত হয় (iv) নিউক্লিয়াস কুঁচকে ছোটো হয়। কারণ নিউক্লিয়াস থেকে জলের বিয়োজন ঘটে। (v) কোশের মধ্যে প্রচুর রঞ্জক পদার্থের সঞ্চয় ঘটে। (vi) DNA ও RNA গঠনের পরিবর্তন ঘটে।

**29. মোচন কাকে বলে ?**

- পরিণত উদ্ভিদে যে প্রক্রিয়ায় পাতা, ফুল ও ফল দেহ থেকে খসে পড়ে বা পরিত্যাগ করে তাকে মোচন বলে।

**30. মোচনে কোন্ কোন্ হরমোন অংশগ্রহণ করে ?**

- অ্যারসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন।

**31. মোচনের সময় বিভেদস্তর কোথায় গঠিত হয় ?**

- পত্র অক্ষের গোড়ায় অথবা নীচে যোজকস্তরে বিভেদস্তর গঠিত হয়।

**32. ফেরোমোন কী ?**

- যে উদ্‌বায়ী রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে একই প্রজাতির প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও তথ্য আদান-প্রদান করে তাকে **ফেরোমোন** বলে।

**33. ফেরোমোনের কাজ কী কী ?**

- ফেরোমোনের কাজ হল—(i) নিজস্ব প্রজাতিদের চিহ্নিত করা। (ii) যৌন আচরণের প্রকাশ ঘটানো। (iii) পিতা-মাতার যত্নে উদ্‌বুদ্ধ করা। (iv) সংগ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং আত্মসমর্পণ করা। (v) অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। (vi) সীমানা নির্দেশ করা ইত্যাদি।

**34. অনিয়ত বৃদ্ধি কাকে বলে ?**

- উদ্ভিদের বৃদ্ধি সারা জীবন ধরে চলে। একে **অনিয়ত বৃদ্ধি** বলে।

**35. নিয়ত বৃদ্ধি কী ?**

- জনন অঙ্গের বৃদ্ধি সীমিত। জনন অঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটার পর বৃদ্ধি বন্ধ হয়। একে **নিয়ত বৃদ্ধি** বলা হয়।

**36. ফাইটোহরমোন কী ?**

- উদ্ভিদের হরমোনকে **ফাইটোহরমোন** বলে। উদাহরণ—জিব্বারেলিক অ্যাসিড।

**37. জিব্বারেলিক অ্যাসিড কী কী কাজ করে ?**

- জিব্বারেলিক অ্যাসিড নিম্নলিখিত কাজগুলি করে, যেমন— (i) বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ত্বরান্বিত করা। (ii) মূল ও কাণ্ডের লম্বায় বৃদ্ধি ঘটানো। (iii) ক্যাম্বিয়ামের কোশ বিভাজন। (iv) কাক্ষিক মুকুলের সংখ্যা বাড়ানো। (v) কাণ্ড ও পাতার আয়তন বাড়ানো। (vi) ফুল ফোটানো। (vii) পার্থেনোকার্পিক ফল গঠন করা। (viii) ফুলের লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটানো ও ফলের আকার বাড়ানো।

**38. দিবা-দৈর্ঘ্য সন্ধিক্ষণ কাকে বলে ?**

● উদ্ভিদে ফুল ফোটানোর জন্য যে ন্যূনতম দিবা-দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয় তাকে উদ্ভিদের দিবা-দৈর্ঘ্য সন্ধি বলে।

**39. আলোক পর্যায়বৃত্তির দুটি প্রধান গুরুত্ব উল্লেখ করো।**

● (i) আলোক পর্যায়বৃত্তির ফলে ফুল তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে চাষের সময় কমানো ও ফসলের উন্নতি ঘটানো হয়।

(ii) একবীজপত্রী উদ্ভিদকে বছরে দুবার ফুল ফোটাতে এবং অনেক সময় অনির্দিষ্টকাল ফুল ফোটাতে বাধ্য করা যায়।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions)ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word)ঃ**

#### ●● উদ্ভিদের বৃদ্ধি ●●

1. জীবের আকৃতি, আয়তন ও শুষ্ক ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলে ?
2. কোন্ জীবের বৃদ্ধি সীমিত ?
3. কোন্ জীবের বৃদ্ধি আমরণ চলে ?
4. বৃদ্ধির দুটি বাহ্যিক শর্ত লেখো।
5. উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি অভ্যন্তরীণ শর্তের নাম লেখো।
6. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোন্ কলার সাহায্যে ঘটে ?
7. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোথায় ঘটে ?
8. উদ্ভিদের একটি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোনের নাম কী ?
9. বৃদ্ধি আরম্ভ হওয়া থেকে বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কে কী বলা হয় ?
10. উদ্ভিদের একটি গৌণ ভাজক কলার নাম লেখো।
11. উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার কখন বেশি হয়—দিনে না রাতে ?
12. উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার একটি যন্ত্রের নাম লেখো।
13. উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি বাহ্যিক ও একটি অভ্যন্তরীণ শর্তের নাম করো।
14. উপচিতির হার অপচিতির হার থেকে বেশি হলে কী ঘটে ?
15. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণের একটি উদাহরণ দাও।
16. একটি আলোকপ্রেমী উদ্ভিদের নাম করো।
17. আলোক নিরপেক্ষ একটি উদ্ভিদের নাম লেখো।
18. ফার্ন ও মস্ জাতীয় উদ্ভিদ আলোকপ্রেমী না আলোক বিমুখী ?
19. জিব্বারেলিনের উৎস কী ?
20. একটি দীর্ঘদিবা এবং একটি হ্রস্বদিবা উদ্ভিদের নাম লেখো।

#### ●● প্রাণীর বৃদ্ধি ●●

21. নিষিক্ত ডিম্বাণুকে কী বলে ?
22. জাইগোট বারবার বিভাজিত হয়ে যে একগুচ্ছ কোশযুক্ত ভ্রূণ গঠন করে তাকে কী বলে ?
23. ফাঁপা একস্তর কোশযুক্ত ভ্রূণকে কী বলে ?
24. ত্রিস্তর কোশযুক্ত ভ্রূণকে কী বলে ?
25. গ্যাসট্রুলার কয়টি কোশস্তর থাকে ?
26. যে পরিস্ফুরণে অন্তর্বর্তী দশা সৃষ্টি হয় না তাকে কী বলে ?
27. যে পরিস্ফুরণে স্বাধীনজীবী অন্তর্বর্তী দশা সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে ?
28. আরশোলার অপরিণত স্বাধীন দশাকে কী বলে ?
29. পরোক্ষ পরিস্ফুরণের একটি উদাহরণ দাও।
30. পাখির পরিস্ফুরণ কোন্ ধরনের ?
31. দেহের কোনো অংশ নষ্ট হলে কোন্ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই অংশ পুনরায় গঠিত হয় ?
32. কোন্ পদ্ধতির মাধ্যমে হাইড্রার দেহাংশ থেকে সমগ্র প্রাণী সৃষ্টি হয় ?
33. প্রাণীর পরিস্ফুরণে পূর্ণাঙ্গ সদৃশ, স্বাধীনজীবী, অন্তর্বর্তী দশাকে কী বলে ?
34. শুঁয়োপোকার লার্ভার পরে কোন্ দশা সৃষ্টি হয় ?
35. কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুঁয়োপোকার লার্ভা পিউপাতে পরিণত হয় ?
36. কোন্ তাপমাত্রায় সবথেকে ভালো বৃদ্ধি ঘটে ?
37. সূর্যালোকে প্রাণীর ত্বক কোন্ ভিটামিন সংগ্রহ করে ?
38. কোন্ ভিটামিনের অভাবে প্রাণীদের অস্থিবৃদ্ধি ব্যাহত হয় ?
39. কোন্ হরমোন প্রাণীর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ?
40. পতঙ্গের রূপান্তর কোন্ হরমোনের নিয়ন্ত্রণে ঘটে ?
41. ফেরোমোন কোন্ ধরনের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় ?
42. ফেরোমোনকে অন্য কথায় কী বলে ?
43. রানি মৌমাছি নিঃসৃত কোন্ বস্তু স্ত্রীমৌমাছিকে বন্ধ্যা শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত করে ?
44. বম্বিকল ফেরোমোন কার দেহ থেকে নিঃসৃত হয় ?
45. হরিণের পায়ুগ্রন্থি থেকে কোন্ ফেরোমোন নিঃসৃত হয় ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put tick mark (✓) on correct answer) :**

1. যে প্রক্রিয়ায় জীবের আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বাড়ে তাকে বলে—(a) অপচিতি ☐ / (b) উপচিতি ☐ /(c) বৃদ্ধি ☐ / (d) অঙ্গ সৃষ্টি ☐।
2. বৃদ্ধির যে পর্যায়ে একটি কোশ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত বহুকোশী জীবের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয়—(a) বৃদ্ধি ☐ / (b) পরিস্ফুরণ ☐ / (c) ধনাত্মক বৃদ্ধি ☐ / (d) কোনোটি নয় ☐।
3. উপচিতি অপচিতির থেকে বেশি হলে কোশের শুষ্ক ওজন বাড়ে, একেই বলে—(a) বৃদ্ধির প্রকৃতি ☐ / (b) নিয়ত বৃদ্ধি ☐ / (c) অনিয়ত বৃদ্ধি ☐ / (d) ধনাত্মক বৃদ্ধি ☐।
4. অপচিতি উপচিতি থেকে বেশি হলে কোশের শুষ্ক ওজন কমে যায় এবং একে বলা হয়—(a) ধনাত্মক বৃদ্ধি ☐ / (b) ঋণাত্মক বৃদ্ধি ☐ / (c) নিয়ত বৃদ্ধি ☐ / (d) অনিয়ত বৃদ্ধি ☐।
5. একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদের নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ও ফল ধরে মরে যাওয়া হল—(a) ঋণাত্মক বৃদ্ধি ☐ / (b) ধনাত্মক বৃদ্ধি ☐ / (c) নিয়ত বৃদ্ধি ☐ / (d) অনিয়ত বৃদ্ধি ☐।
6. শিশু উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধির কয়টি পর্যায় বা দশা থাকে—(a) তিনটি ☐ / (b) দুটি ☐ / (c) চারটি ☐ / (d) পাঁচটি ☐।
7. উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোন্ দশায় কোশপ্রাচীরে নতুন সেলুলোজ অণু জমা হয়ে কোশ প্রাচীর পুরু হয় ?—(a) পরিণতি দশায় ☐ / (b) দীর্ঘিকরণ দশায় ☐ / (c) কোশবিভাজন দশায় ☐ / (d) কলাতন্ত্র গঠনের সময় ☐।
8. বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে জল শোষণের সময়কে কী বলে ?—(a) মুখ্য বৃদ্ধিকাল ☐ / (b) হ্রাস কাল ☐ / (c) স্থির কাল ☐ /(d) বিলম্ব কাল।
9. বিলম্ব কালের পরের বৃদ্ধি অতিদ্রুত ঘটে এবং বৃদ্ধি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই দশাকে বলা হয়—(a) হ্রাস কাল ☐ / (b) অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি ☐ / (c) স্থির দশা ☐ / (d) মুখ্য বৃদ্ধিকাল ☐।
10. কোনো জীবের বৃদ্ধিকাল নিয়ে একটি লেখচিত্র আঁকলে তা ইংরেজি এস (S) মতো হলে তাকে বলা হয়—(a) বৃদ্ধি কার্ভ ☐ / (b) সিগময়েড কার্ভ ☐ / (c) পরিস্ফুরণ ☐ / (d) কোনোটি নয় ☐।
11. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে—(a) ত্বকীয় কলার সাহায্যে ☐ / (b) ভাজক কলার সাহায্যে ☐ / (c) স্থায়ী কলার সাহায্যে ☐ / (d) সরল স্থায়ী কলার সাহায্যে।
12. যে বৃদ্ধিতে কোশের আয়তন বাড়ে, সংখ্যা বাড়ে না তাকে বলে—(a) মনোপ্লিকেটিভ ☐ / (b) অক্সেন্টিক ☐ / (c) অ্যাক্রিশনারি ☐ / (d) মাল্টিপ্লিকেটিভ ☐।
13. মুখ্যবৃদ্ধিকালের পর যে দশায় বৃদ্ধি ক্রমশ কমতে থাকে তাকে কী বলে ? (a) বিলম্বকাল ☐ / (b) মুখ্যবৃদ্ধিকাল ☐ / (c) হ্রাসকাল ☐ / (d) স্থিরকাল ☐।
14. যে দশায় বৃদ্ধি কমে না কিন্তু স্থির অবস্থায় থাকে এবং এর পর জড়ত্ব প্রাপ্তি হয় তাকে কী বলে ? (a) বিলম্বকাল ☐ / (b) হ্রাসকাল ☐ / (c) মুখ্যবৃদ্ধিকাল ☐ / (d) স্থির কাল ☐।
15. প্রাথমিক ভাজক কলার কোশের বিভাজনের ফলে যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলা হয়—(a) প্রাথমিক বৃদ্ধি ☐ / (b) ভ্রূণজ বৃদ্ধি ☐ / (c) গৌণ বৃদ্ধি ☐ / (d) কোনোটি নয় ☐।
16. গৌণ ভাজক কলা কোশের বিভাজনে যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলে—(a) প্রাথমিক বৃদ্ধি ☐ / (b) অঙ্গজ বৃদ্ধি ☐ / (c) গৌণ বৃদ্ধি ☐ / (d) ভ্রূণজ বৃদ্ধি ☐।
17. উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার কখন বেশি থাকে ? (a) সকালে ☐ / (b) দুপুরে ☐ / (c) রাতে ☐ / (d) ভোরে ☐।
18. উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্রকে বলা হয়—(a) আর্ক ইন্ডিকেটার ☐ / (b) স্পিগমোমেনোমিটার ☐ / (c) গ্রোথ মিটার ☐ / (d) হিমোমিটার ☐।
19. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে কোন্ হরমোন? (a) থাইরক্সিন ☐ / (b) STH ☐ / (c) অক্সিন ☐ / (d) সাইটোকাইনিন ☐।
20. উদ্ভিদের মূল কাণ্ডের শীর্ষে থাকে—(a) ভাজক কলা ☐ / (b) ক্যাম্বিয়াম ☐ / (c) প্যারেনকাইমা ☐ / (d) কোলেনকাইমা ☐।
21. উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে তাপ প্রয়োজন হয় তা হল—(a) 10—15°C ☐ / (b) 4—10°C ☐ / (c) 0—70°C ☐ / (d) 25—30°C ☐।
22. উদ্ভিদের প্রস্থে বাড়াকে বলে—(a) প্রাথমিক বৃদ্ধি ☐ / (b) অঙ্গজ বৃদ্ধি ☐ / (c) গৌণ বৃদ্ধি ☐ / (d) কোনোটি নয় ☐।
23. ফাঁপা একস্তর কোশ বিশিষ্ট ভ্রূণকে—(a) মরুলা ☐ / (b) গ্যাস্টুলা ☐ / (c) ব্লাস্টুলা ☐ / (d) প্লানুলা ☐ বলে।
24. তিনটি কোশস্তর বিশিষ্ট ভ্রূণকে—(a) ব্লাস্টুলা ☐ / (b) মরুলা ☐ / (c) গ্যাস্টুলা ☐ / (d) প্লানুলা ☐ বলে।
25. পতঙ্গের জীবনচক্রে রূপান্তর যে হরমোনের সক্রিয়ার ফলে ঘটে তা হল—(a) অক্সিন ☐ / (b) থাইরক্সিন ☐ / (c) একডাইসোন ☐।

26. বম্বিকল ফেরোমোন সৃষ্টিকারী প্রাণীর নাম—(a) পিঁপড়ে □ / (b) উইপোকা □ / (c) বন বেড়াল □ / (d) স্ত্রীরেশম মথ □।
27. মাসকোন ফেরোমোন সৃষ্টিকারী প্রাণীর নাম—(a) সিভেট বিড়াল □ / (b) রেশম মথ □ / (c) হরিণ □ / (d) উইপোকা □।
28. কোশ বিভাজিত হয়ে প্রথমে একটি ফাঁপা একস্তর বিশিষ্ট গোলক গঠন করে এবং একে বলে—(a) লার্ভা □ / (b) ব্লাস্টুলা □ / (c) গ্যাস্ট্রুলা □ / (d) এক্টোডার্ম □।
29. যে পরিস্ফুরণে শিশু প্রাণী, কোনো অন্তর্বর্তী দশা ছাড়াই সরাসরি পরিণত হয় তাকে বলে—(a) প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ □ / (b) পরোক্ষ পরিস্ফুরণ □ / (c) অনুকূল রূপান্তর □ / (d) প্রতিকূল রূপান্তর □।
30. নিম্ফ হল—(a) ব্যাঙাচির লার্ভা □ / (b) প্রজাপতির লার্ভা □ / (c) মাছির লার্ভা □ / (d) আরশোলার লার্ভা □।
31. যে রূপান্তরে পিউপা দশা দেখা যায় না তাকে কী বলে ? (a) অনুকূল রূপান্তর □ / (b) প্রতিকূল রূপান্তর □ / (c) অসম্পূর্ণ রূপান্তর □ / (d) সম্পূর্ণ রূপান্তর □।
32. রূপান্তরবিহীন একটি প্রাণীর নাম হল—(a) গঙ্গা ফড়িং □ / (b) স্প্রিং টেইল □ / (c) আরশোলা □ / (d) প্রজাপতি □।
33. যে লার্ভা যৌনজননের মাধ্যমে অপত্য লার্ভা তৈরি করে তাকে বলে—(a) নিওটেনি □ / (b) পুনরুৎপাদন □ / (c) পরিস্ফুরণ □ / (d) প্লানুলা □।
34. পুনরুৎপাদনের একটি উদাহরণ হল—(a) সাপ □ / (b) সাগর কুসুম □ / (c) মাছ □ / (d) টিকটিকি □।
35. অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি অপত্য সৃষ্টির পদ্ধতিকে বলে—(a) পিডোজেনেসিস □ / (b) পার্থেনোজেনেসিস □ / (c) পার্থেনোকার্পি □ / (d) রূপান্তরহীন □।
36. নীচের কোন্‌টি পতঙ্গের লার্ভা নয়—(a) নিম্ফ □ / (b) ম্যাগট □ / (c) প্লানুলা □ / (d) ব্যাঙাচি □।
37. লার্ভা দশার স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে কোন্ হরমোনের প্রয়োজন? (a) জুভেনাইল হরমোন □ / (b) নিউরোহরমোন □ / (c) একডাইসন □ / (d) কোনোটিই সঠিক নয় □।
38. অসম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায়—(a) মশা □ / (b) গঙ্গাফড়িং □ / (c) ব্যাং □ / (d) শুঁয়োপোকা □।

## C. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

### ●● উদ্ভিদের বৃদ্ধি ●●

1. যে প্রক্রিয়ায় জীবের আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বেড়ে যায় তাকে পরিস্ফুরণ বলে। □
2. বৃদ্ধির প্রথম অবস্থাকে মুখ্য বৃদ্ধিকাল বলে। □
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি চারটি দশায় বিভক্ত। □
4. যেসব অঙ্গ আজীবন বেড়ে চলে তাদের বৃদ্ধিকে নির্দিষ্ট বৃদ্ধি বলে। □
5. ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির একটি তত্ত্ব। □
6. ফেলোজেনের অপর নাম হল কর্কক্যাম্বিয়াম। □
7. পত্রমূলে মোচনের আগে যোজকস্তর গঠিত হয়। □
8. যেসব বীজের অঙ্কুরোদ্গমে আলোর প্রয়োজন তাদের ফোটোব্লাসটিক বীজ বলে। □
9. দীর্ঘদিবা উদ্ভিদের একটি উদাহরণ হল চন্দ্রমল্লিকা। □
10. বয়ঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচিত বিজ্ঞানকে গেরেন্টোলজি বলে। □

### ●● প্রাণীর বৃদ্ধি ●●

11. দ্বিস্তর কোশবিশিষ্ট ভ্রূণকে মরুলা বলে। □
12. উভচর প্রাণীতে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ দেখা যায়। □
13. ত্রিস্তর কোশবিশিষ্ট ভ্রূণকে গ্যাস্ট্রুলা বলে। □
14. প্রজাপতির অপরিণত দশাকে নিম্ফ বলে। □
15. ঘাসফড়িংকে হেমিমেটাবোলাস প্রাণী বলে। □
16. আরশোলাকে হলোমেটাবোলাস প্রাণী বলে। □
17. পতঙ্গের করপাস অ্যালাটাম থেকে জুভেনাইল হরমোন ক্ষরিত হয়। □
18. প্লানেরিয়ার দেহখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ দেহ গঠনকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি বলে। □
19. ব্যাঙের জীবনচক্রে রূপান্তরের সময় মেটামরফিক ক্লাইম্যাক্স দশায় অগ্রপদ গঠিত হয়। □
20. অ্যাডরিনালিন হরমোন ব্যাঙাচির রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। □
21. বনবেড়ালের পায়ুগ্রন্থি থেকে সিভেটোন ফেরোমোন নিঃসৃত হয়। □

**D. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :**

1. ——— বৃদ্ধি প্রক্রিয়া দেখা যায়।
2. ——— আমরণ বৃদ্ধি প্রক্রিয়া চলে।
3. উদ্ভিদের ——— কলার বৃদ্ধি ঘটে।
4. বৃদ্ধির আরম্ভ হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ———।
5. ——— বৃদ্ধি সমস্ত দেহ দিয়ে ঘটে।
6. বৃদ্ধির লেখচিত্রকে ——— কার্ভ বলা হয়।
7. ——— হল একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র।
8. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম হল ———।
9. উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি বাহ্যিক শর্ত হল ———।
10. উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি অভ্যন্তরীণ শর্ত হল ———।
11. বীজের ——— ও ——— অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
12. ভ্রূণসৃষ্টির পর থেকে শিশুপ্রাণী সৃষ্টি পদ্ধতিকে ——— বৃদ্ধি বলে।
13. যে পদ্ধতিতে নষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয় তাকে বলে ———।
14. প্রাণীর পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত বৃদ্ধি পোষক হরমোনের নাম হল ———।
15. মানুষের ত্বক আলোর সাহায্যে যে ভিটামিন দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা হল ভিটামিন ———।
16. পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের মাধ্যমে ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর আবির্ভাবকে ——— পরিস্ফুরণ বলে।
17. ভ্রূণ থেকে সরাসরি অপরিণত শিশুপ্রাণী গঠিত হলে তাকে ——— পরিস্ফুরণ বলে।
18. উদ্ভিদের বৃদ্ধি অসম এবং প্রাণীর বৃদ্ধি ——— হয়।
19. জীবদেহের পরিণত অবস্থা থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে অবণজির্ণিত পরিবর্তন ঘটে ও জীবন কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাকে ——— বলে।
20. বয়ঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচিত বিজ্ঞানের শাখাকে ——— বলে।
21. জাইগোট ——— পদ্ধতির সাহায্যে বিভাজিত হয়।
22. তিনটি কোশস্তর বিশিষ্ট ভ্রূণকে ——— বলে।
23. অন্তর্বর্তী দশা ছাড়া প্রাণীর পরিস্ফুরণকে ——— বলে।
24. পতঙ্গের নির্মোচন বা মোল্টিং-এ সাহায্যকারী হরমোনটি হল ———।
25. আরশোলার প্রাক্ পূর্ণাঙ্গ দশাকে ——— বলে।
26. জুভেনাইল হরমোন ——— থেকে নিঃসৃত হয়।
27. রিলিজার ফেরোমোন পুরুষ ইঁদুরের ——— থাকে।
28. উইপোকার দেহ থেকে ——— ফেরোমোন সৃষ্টি হয়।
29. বনবেড়ালের পায়ুগ্রন্থি থেকে ——— ফেরোমোন নিঃসৃত হয়।
30. মাসকোন ——— পায়ুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :
(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

**নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :**

1. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কী কী শর্তাবলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? 2. উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশাগুলির নাম লেখো। 3. পরিণতি দশা কী? 4. প্রাণীর বৃদ্ধি দশাগুলির নাম লেখো। 5. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ কাকে বলে? 6. পরোক্ষ পরিস্ফুরণ কী? উদাহরণ দাও। 7. অসম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে? 8. সম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে? 9. রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করো। 10. বার্ধক্য কাকে বলে? 11. উদ্ভিদের অঙ্গজ বার্ধক্য কী কী? 12. উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণগুলি লেখো। 13. মানুষের বার্ধক্যের লক্ষণগুলি কী কী? 14. বয়ঃপ্রাপ্তি কাকে বলে? 15. উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো। 16. মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে পরিপাকতন্ত্র, অস্থি ও ত্বকের কী কী পরিবর্তন ঘটে? 17. বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করো। 18. মোচন বা অ্যাবসিসান কী? 19. ফেরোমোনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 20. ফেরোমোনের কাজ উল্লেখ করো। 21. জিব্বারেলিক অ্যাসিডের প্রধান কাজগুলি লেখো। 22. আলোক পর্যায়বৃত্তি কী? 23. ফাইটোক্রোম কী? 24. ফ্লোরিজেন কাজ উল্লেখ করো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :**

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধির শর্তগুলি লেখো।
2. বৃদ্ধির তাৎপর্য উল্লেখ করো।
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধির দশাগুলি সংক্ষেপে লেখো।
4. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণ কী?
5. উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণগুলি লেখো।
6. বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের কী কী পরিবর্তন ঘটে?
7. ফেরোমোন কী? এর কাজগুলি উল্লেখ করো।
8. জিব্বারেলিক অ্যাসিড কী কী কাজ করে?
9. আলোক পর্যায়বৃত্তির প্রধান গুরুত্বগুলি উল্লেখ করো।
10. ফেরোমোনের শ্রেণিবিন্যাস করো।
11. বয়ঃপ্রাপ্তিতে মানুষের দেহের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি লেখো।
12. রূপান্তর কী? রূপান্তরের প্রকারভেদ সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

**B. নিম্নলিখিতগুলির পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :**

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও প্রাণীর বৃদ্ধি। 2. বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ। 3. বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তি। 4. ফেরোমোন ও হরমোন। 5. দীর্ঘদিবা ও হ্রস্বদিবা।

**C. টীকা লেখো (Write short notes on) :**

1. কোশবিভাজন দশা 2. পরিণতি দশা 3. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ 4. পরোক্ষ পরিস্ফুরণ 5. পুনরুৎপাদন 6. উদ্ভিদের বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য 7. প্রাণীর বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য 8. অসম্পূর্ণ রূপান্তর 9. সম্পূর্ণ রূপান্তর 10. উদ্ভিদের বার্ধক্য প্রাপ্তির লক্ষণ ও পরিবর্তন 11. বয়ঃপ্রাপ্তি 12. উদ্ভিদের পত্রমোচন 13. ফেরোমোনের বৈশিষ্ট্য 14. দীর্ঘদিবা ও হ্রস্বদিবা উদ্ভিদ 15. ফ্লোরিজেন।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :**

1. (a) বৃদ্ধি কাকে বলে? (b) উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশার বিবরণ দাও।
2. প্রাণীর বৃদ্ধি দশাগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
3. (a) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কী কী শর্তাবলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? (b) প্রত্যেকটি শর্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
4. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে লেখো।
5. মুখ্যবৃদ্ধিকাল কাকে বলে? সংক্ষেপে আলোচনা করো।
6. রূপান্তর কাকে বলে? অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বোঝো ?
7. রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করো।
8. (a) বার্ধক্য কাকে বলে? (b) উদ্ভিদে বার্ধক্য প্রাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণ ও পরিবর্তন উল্লেখ করো।
9. প্রাণীর বার্ধক্য প্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো।
10. (a) বয়ঃপ্রাপ্তি কাকে বলে? (b) উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো।
11. মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে লেখো।
12. (a) মোচন বা ঝরে পড়া কাকে বলা হয়? (b) উদ্ভিদের পত্র মোচন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও।
13. (a) ফেরোমোন কাকে বলে? (b) ফেরোমোন ও হরমোনের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায়?
14. বিভিন্ন প্রকার ফেরোমোনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
15. চারাগাছের বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ভূমিকা আলোচনা করো।
16. (a) ফোটোপিরিয়ডিজম বা আলোকপর্যায়বৃত্তি কাকে বলে? (b) হ্রস্বদিবা ও দীর্ঘদিবা উদ্ভিদের আলোক ও অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করো।
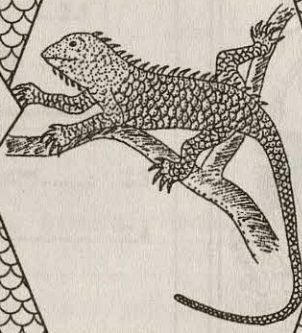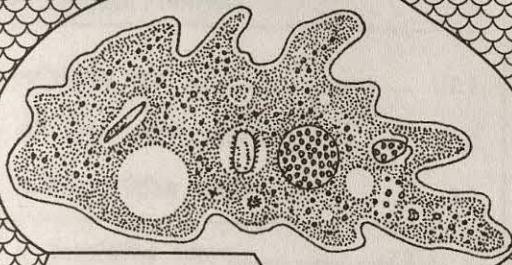
প্রাণীবিদ্যা
ZOOLOGY

## ● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ
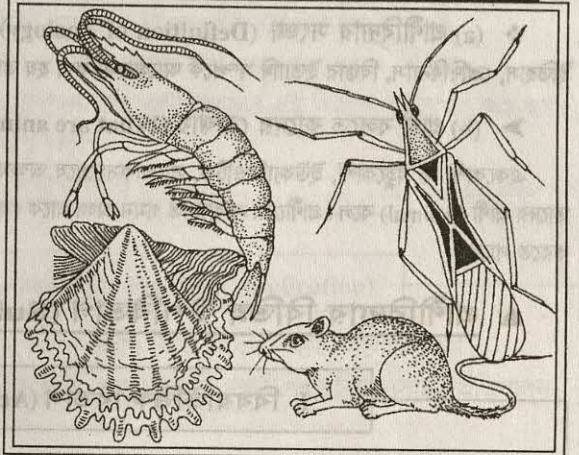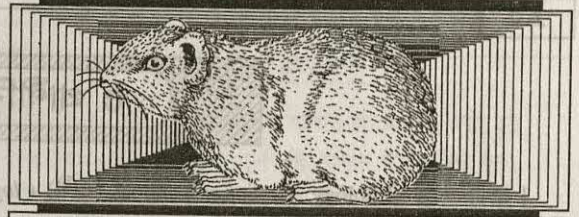


# অবতরণিকা
# [ INTRODUCTION ]

### ➧ ভূমিকা (Introduction) ঃ

এই পৃথিবীতে বিশাল জীবগোষ্ঠী বসবাস করে। জীবগোষ্ঠীকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়; যেমন—উদ্ভিদ ও প্রাণী। প্রতিটি জীব তাদের নিজস্ব বাসস্থানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। আপাতভাবে কোনো জীব অপকারী হলেও পরিবেশে তার নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে যা মানুষের কাছে অজ্ঞাত এবং এই জীবটি প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেলেই আমরা তার গুরুত্ব বুঝতে পারব। সুতরাং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে **জীববৈচিত্র্য** বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আলোচিত **প্রাণীবিদ্যা** হল জীববিদ্যার একটি শাখা। প্রাণীর দেহ এককোশী বা বহুকোশী হতে পারে এবং বহুকোশী প্রাণীর দেহ সরল বা জটিল প্রকারের হতে পারে। সাধারণভাবে প্রাণী বলতে পরভোজী পুষ্টিসম্পন্ন ইউক্যারিওটিক কোশযুক্ত জীবদের বোঝায়। বিভিন্নপ্রকার প্রাণী পৃথিবীর প্রাণীবৈচিত্র্য গঠন করে। প্রাণীদের দেহগঠন বিভিন্ন প্রকার এবং প্রতিটি প্রাণী প্রকৃতিতে তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। কোনো প্রাণী পরজীবী হিসাবে এবং কোনো প্রাণী পোষক হিসাবে অবস্থান করে। এছাড়া কোনো প্রাণী অপর প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে, কোনো প্রাণী মানুষের খাদ্যবস্তু উৎপাদন করে, আবার কোনো প্রাণী থেকে আমরা পোষাক তৈরির তন্তু পাই। এইভাবে **চিকিৎসা প্রাণীবিদ্যা, অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা, অ্যাকোয়াকালচার, কৃষিপ্রাণীবিদ্যা** ইত্যাদি বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। অপকারী প্রাণীর মধ্যে কিছু প্রাণী **পেস্ট** (pest) হিসাবে মানুষের ফসল উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। কাজ যাই হোক না কেন, প্রতিটি প্রাণীর দেহগঠন, জীবনবৃত্তান্ত, অন্য প্রাণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন এবং তবেই প্রাণীটিকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব।

# ○ প্রাণীবিদ্যা ○

[ প্রাণীবিদ্যা — Zoology : Gr. *zoion* = animal, (প্রাণী) + *logos* = study (পাঠ বা বিদ্যা) ]

❖ (a) **প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Zoology) ঃ জীববিদ্যার যে শাখায় প্রাণীর দেহগঠন, কাজ, আচরণ, জীবন ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস, বিস্তার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে প্রাণীবিদ্যা বলে।**

➤ (b) **প্রাণী বলতে কাদের বোঝায় (What are animals ) ?**

এককোশী বা বহুকোশী, ইউক্যারিওটিক, সালোকসংশ্লেষে অক্ষম, পরভোজী পুষ্টিসম্পন্ন জীব, যাদের কোশে কোশপ্রাচীর থাকে না তাদের **প্রাণী** (Animal) বলে। প্রাণীদের সাধারণত গমন অঙ্গ থাকে (ব্যতিক্রম—স্পঞ্জ, প্রবাল ইত্যাদি) যার সাহায্যে প্রাণীরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

## ▲ প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন উপবিভাগ (Subdivisions of Zoology) ঃ

### I. বিষয়ভিত্তিক বিভাগ (According to subject matter)

(a) **মরফোলজি** (Morphology)— প্রাণীদের বাহ্যিক আকার, আকৃতি ও গঠন সংক্রান্ত আলোচনা এই শাখায় করা হয়।

(b) **অ্যানাটমি** (Anatomy)— প্রাণী-ব্যবচ্ছেদের পরে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গের গঠন যা খালিচোখে দেখা যায় সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়।

(c) **হিস্টোলজি** (Histology)— অঙ্গগুলির বিভিন্ন কলার আণুবীক্ষণিক গঠন সম্পর্কে এই শাখায় আলোচিত হয়।

(d) **সাইটোলজি** (Cytology)— কোশ এবং তার বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ নিয়ে এই শাখায় আলোচিত হয়।

(e) **শারীরবিদ্যা** (Physiology)— প্রাণীদেহের নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে এখানে আলোচিত হয়।

(f) **ট্যাক্সোনমি** (Taxonomy)— প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসের রীতিনীতি ও তার প্রয়োগ, সনাক্তকরণ ইত্যাদি যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে ট্যাক্সোনমি বলে।

(g) **অনালগ্রন্থিবিদ্যা** (Endocrinology)— অনালগ্রন্থির গঠন, কাজ ও হরমোনের কার্যপ্রণালী এই বিভাগে আলোচিত হয়।

(h) **ভ্রূণবিদ্যা** (Embryology)— এই শাখায় প্রাণীর ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ গঠন ও পরিস্ফুটন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(i) **বাস্তুবিদ্যা** (Ecology)— প্রাণীর পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই শাখায় আলোচনা করা হয়।

(j) **সুপ্রজননবিদ্যা** (Genetics)— জীবের বৈশিষ্ট্যগুলির বংশানুক্রমে সঞ্চারণ প্রক্রিয়া, নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তির প্রক্রিয়া ইত্যাদি এই শাখায় আলোচিত হয়।

(k) **অভিব্যক্তি** (Evolution)— এই পৃথিবীতে প্রতিটি জীবের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া এই শাখায় আলোচিত হয়।

(l) **প্যালিঅন্টোলজি** (Palaeontology)— জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণের সাহায্যে প্রাণীর অতীত জীবন বা রূপ সম্পর্কে আলোচনা এই শাখায় করা হয়।

(m) **প্রাণীভূগোল** (Zoogeography)—পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রাণীর বিস্তার সম্পর্কে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে প্রাণীভূগোল বলে।

(n) **পরজীবীবিদ্যা** (Parasitology)—পরজীবী প্রাণীদের বাসস্থান, জীবনচক্র, রোগ সৃষ্টি, রোগ নিরাময় ইত্যাদি এই শাখায় আলোচিত হয়।

### II. প্রাণীগোষ্ঠীভিত্তিক বিভাগ (According to Animal group)

(a) **প্রোটোজুওলজি** (Protozoology)—এককোশী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া সম্পর্কে এই শাখায় আলোচনা করা হয়।
(b) **হেলমিন্থোলজি** (Helminthology)—বিভিন্ন কৃমির বাসস্থান, জীবনচক্র ইত্যাদি এই শাখায় আলোচিত হয়।
(c) **এন্টোমোলজি** (Entomology)—কীটপতঙ্গ সম্পর্কে প্রাণীবিদ্যার বিভাগ।
(d) **ম্যালাকোলজি** (Malacology)—শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি কম্বোজ প্রাণী সম্পর্কীয় জীববিজ্ঞান।
(e) **মৎস্যবিজ্ঞান** (Ichthyology)—প্রাণীবিজ্ঞানের এই বিভাগে মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।
(f) **হারপেটোলজি** (Herpetology)—উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীদের নিয়ে প্রাণীবিজ্ঞানের এই বিভাগে আলোচনা করা হয়।
(g) **পক্ষীবিদ্যা** (Ornithology)—পাখি বিষয়ক প্রাণীবিদ্যার বিভাগ।
(h) **ম্যামালজি** (Mammalogy)—স্তন্যপায়ী প্রাণী বিষয়ক প্রাণীবিদ্যার বিভাগ।

### III. প্রয়োগভিত্তিক বিভাগ (According to Practical Application)

(a) **অ্যাকোয়াকালচার** (Aquaculture)—মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর উন্নত চাষের পদ্ধতি আলোচিত হয়।
(b) **গবাদি পশু প্রতিপালন** (Animal husbandry)—গোরু, মোষ, ভেড়া ইত্যাদি গবাদি পশুর বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন-বিদ্যা।
(c) **শূকর চাষ** (Piggery)—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শূকর প্রতিপালন বিদ্যা।
(d) **মৌমাছিপালন** (Apiculture)—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন পদ্ধতি।
(e) **রেশম চাষ** (Sericulture)—রেশমমথ প্রতিপালন ও রেশম উৎপাদন এই বিভাগে আলোচিত হয়।
(f) **লাক্ষা চাষ** (Lac culture)—লাক্ষাকীটের বিজ্ঞানসম্মত চাষ ও লাক্ষা উৎপাদন সম্বন্ধে এই বিভাগে আলোচিত হয়।
(g) **মুক্তা চাষ** (Pearl culture)—প্রাণীবিদ্যার এই শাখায় মুক্তা ঝিনুকের বিজ্ঞানসম্মত চাষ ও মুক্তা উৎপাদন পদ্ধতি আলোচিত হয়।

উপরে লিখিত বিষয়ভিত্তিক, প্রাণীগোষ্ঠীভিত্তিক এবং অর্থকরী প্রাণীপ্রয়োগভিত্তিক বিভিন্ন বিভাগ ছাড়া প্রাণীবিদ্যা তথা জীববিদ্যার সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিতবিদ্যার সংযোগে **আন্তঃবিষয়ক** (Inter disciplinary) বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে।

### IV. আন্তঃবিষয়ভিত্তিক বিভাগ (According to Interdisciplinary Subjects)

(a) **বায়োফিজিক্স** (Biophysics) ঃ এই বিভাগে জীববিদ্যায় পঠিত সাংগঠনিক ও কার্যাবলি পর্যবেক্ষণের পদার্থবিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়।
(b) **বায়োকেমিস্ট্রি** (Biochemistry) ঃ এই বিভাগে জীববিদ্যায় পঠিত বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক গঠন ও ঘটনাবলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়।
(c) **বায়োমেট্রি** (Biometry) ঃ এই বিভাগে জীববিদ্যায় পঠিত ফলাফল ভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্তের গাণিতিক সম্ভাবনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।
(d) **বায়োটেক্‌নোলজি** (Biotechnology) ঃ এই বিভাগে জীববিদ্যার রীতিনীতি ও অত্যাধুনিক জ্ঞান ফলিত-জীববিদ্যায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে মানবকল্যাণভিত্তিক উন্নততর পরিষেবা যেমন—**জিন থেরাপি** (Gene therapy), **ক্লোনিং** (Cloning), **ট্রান্সজিন প্রযুক্তি** (Transgene technology), **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** (Genetic engineering) ইত্যাদির সাহায্যে সুস্থ, সবল মানবজাতি গঠন সম্ভব হয়।

## ▲ জৈবিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তর বা ধাপ (Different levels of Biological Organization) :

একটি জীবমণ্ডল বিভিন্ন প্রকার জীবসম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হয় যা বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের উপাদান হিসাবে থাকে। আবার একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক প্রকার জনসমষ্টি (Population) থাকে। এইভাবে ধাপে ধাপে একটি বড়ো একক অনেকগুলি ছোটো একক নিয়ে গঠিত হয় এবং সবশেষে অবিভাজ্য একক হিসাবে পরমাণুর অস্তিত্ব দেখা যায়।

নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করা যায়।
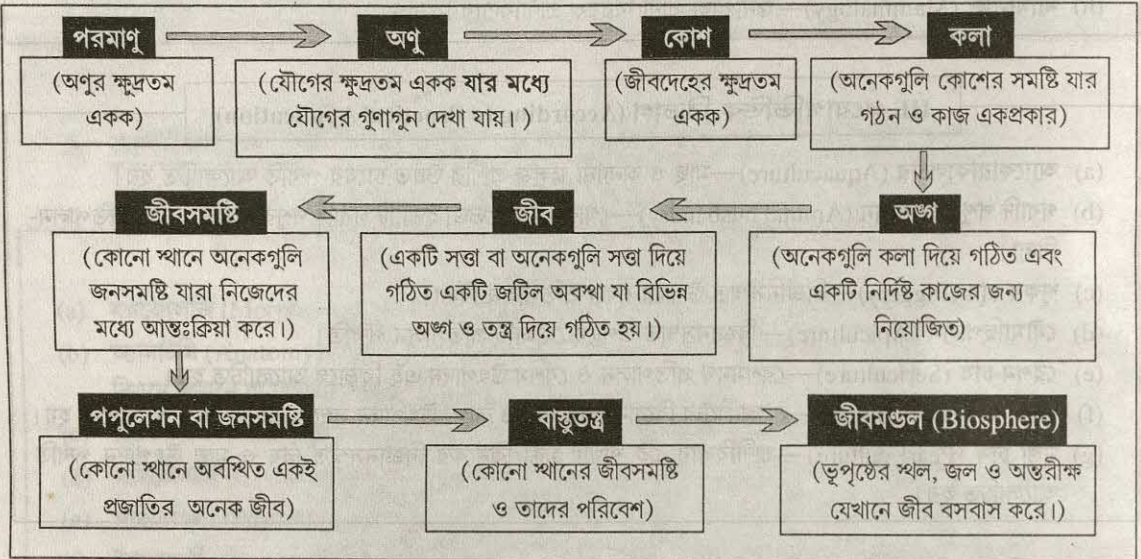
## ▲ প্রাণীবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Importance of study of Zoology) :

পরভোজী জীব হিসাবে জীবমণ্ডলে প্রাণীর উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে জৈবশক্তিতে রূপান্তরিত করে ও তারা সেই শক্তি নিজেদের দেহে সঞ্চয় করে রাখে। উদ্ভিদ সঞ্চিত এই শক্তি প্রাণীরা গ্রহণ করে এবং পরিশেষে তাদের দেহ বিয়োজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যভাণ্ডার গঠিত হয়। এইভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্কে অবস্থান করে। প্রাণীবিদ্যা পাঠের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় এবং বাস্তুতন্ত্রে তার ভূমিকা ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা সম্ভব।

মানুষ হল সর্বোচ্চ শ্রেণির প্রাণী। পরিবেশে মানুষকে ঘিরে বহু প্রাণী একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবন্ধ থাকে। মানবজাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য ফলিত-প্রাণীবিদ্যার উন্নতিসাধন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আণবিক পর্যায়ে আধুনিকীকরণ, প্রাণীসম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার ও উৎপাদন একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগগুলি সঠিকভাবে এবং সবিস্তারে অধ্যয়ন করলে প্রাণীজ সম্পদের উন্নতিসাধন ও মানব সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। সুতরাং প্রাণীবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই আবশ্যক।

# প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস
# [ CLASSIFICATION OF ANIMAL KINGDOM ]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

বিভিন্ন ধরনের জীব এই পৃথিবীতে বসবাস করে। এইসব জীবের দেহগঠন, আচার আচরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ বা ভিন্নতার ফলে জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য একটি বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে যার প্রতিটি জীব প্রকৃতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এর ফলে প্রাকৃতিক স্থিরাবস্থা বা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। মানুষ এই জীববৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন মেটায়। মানুষ তার প্রয়োজনে উপকারী জীবের লালনপালন করছে এবং অপকারী জীবের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করছে। প্রকৃতিতে জীবসম্প্রদায়গুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং একটি জীবকে সঠিকভাবে জানতে হলে সমস্ত জীব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও জীবজগতের সদস্যদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়; যেমন—সকলের দেহ কোশ দিয়ে তৈরি এবং কোশগুলি একই মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে জীবগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। একমাত্র শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির মাধ্যমেই জীবগুলির সঠিক পরিচয় ও জীবজগতে তাদের বিবর্তনগত অবস্থান জানা সম্ভব। প্রাণীবৈচিত্র্য পৃথিবীর একটি বিশাল সম্পদ। প্রাণীজগতকে উপযুক্তভাবে জানতে হলে তার শ্রেণিবিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং শ্রেণিবিন্যাসের ফলেই কোনো একটি প্রাণীর জীবজগতে অবস্থান, সনাক্তকরণ, অপর প্রাণীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও বিবর্তনের একটি ইতিহাস পাওয়া যায়।

## ▲ প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom) :

❖ (a) **প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of Animal Classification) : প্রাণীজগতের বিভিন্ন জীবের মধ্যে সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর ভিত্তি করে প্রাণীকুলের বিভিন্ন সদস্যদের যে পদ্ধতির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় তাকে প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস বলে।**

◘ (b) **প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা (Few Definitions used in Animal Classification) :**

1. **ট্যাক্সোনোমি ( Taxonomy;** Greek, *Taxis* = arrangement, বিন্যাস; *nomos* = law, রীতি)—বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসের রীতিনীতি ও তার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয় তাকে **ট্যাক্সোনোমি** বলে।

2. **ট্যাক্সন (Taxon; pl. Taxa)**—শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট একক ( যেমন—কর্ডাটা, ম্যামেলিয়া, প্রাইমেট ইত্যাদি) যা ছোটো বা বড়ো গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের নিয়ে গঠিত হয় তাকে **ট্যাক্সন** বলে। ট্যাক্সন বলতে নির্দিষ্ট প্রাণী গোষ্ঠী বোঝায়।

● **ট্যাক্সন ও ক্যাটিগোরির উদাহরণ (Example of Taxon and Category) :**

| ট্যাক্সন | ক্যাটিগোরি |
|---|---|
| রাজ্য (Kingdom) | অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) |
| পর্ব (Phylum) | কর্ডাটা (Chordata) |
| শ্রেণি (Class) | ম্যামেলিয়া (Mammalia) |
| বর্গ (Order) | প্রাইমেট (Primate) |
| গোত্র (Family) | হোমিনিডি (Hominidae) |
| গণ (Genus) | *Homo* ( *হোমো* ) |
| প্রজাতি (Species) | *Homo sapiens* ( *হোমো স্যাপিয়েন্স*) |

3. **ক্যাটিগোরি (Category)**—শ্রেণিবিন্যাসের যে নির্দিষ্ট ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীব অবস্থান করে তাকে **ক্যাটিগোরি** বলে। শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপে ছোটো, বড়ো বিভিন্ন ক্যাটিগোরি বর্তমান। যেমন—পর্ব, শ্রেণি, বর্গ ইত্যাদি। এখানে পর্ব বড়ো ক্যাটিগোরি এবং বর্গ ছোটো ক্যাটিগোরি। ক্যাটিগোরি বলতে কোনো প্রাণী বোঝায় না, একটি ধাপের নাম বোঝায়। যেমন, **শ্রেণি—ম্যামেলিয়া,** কথা থেকে **'শ্রেণি'** শব্দটি **ক্যাটিগোরি** এবং **'ম্যামেলিয়া'** শব্দটি **ট্যাক্সন।**

## ▲ হায়ারারকি (Hierarchy) :

ট্যাক্সোনোমির বিভিন্ন ধাপ বা ক্যাটিগোরিকে একসঙ্গে একটি **হায়ারারকি** (Hierarchy) বলে। হায়ারারকি দুটি ভাগে বিভক্ত, যেমন—(a) লিনিয়ান হায়ারারকি ও (b) আধুনিক হায়ারারকি।

● (a) **লিনিয়ান হায়ারারকি** (Linnaean Hierarchy)—বিজ্ঞানী **লিনিয়াস** (Linnaeus, 1778) শ্রেণিবিন্যাসে শুধুমাত্র পাঁচটি ধাপ বা ক্যাটিগোরি প্রবর্তন করেন। এগুলিকে **লিনিয়ান হায়ারারকি** (Linnaean Hierarchy) বলে। এগুলি হল— **রাজ্য** ( Kingdom), **শ্রেণি** (Class), **বর্গ** (Order), **গণ** (Genus) ও **প্রজাতি** (Species) ।

পরে বিজ্ঞানীরা শ্রেণিবিন্যাসে সাতটি ক্যাটিগোরি প্রবর্তন করেন, এগুলি হল—
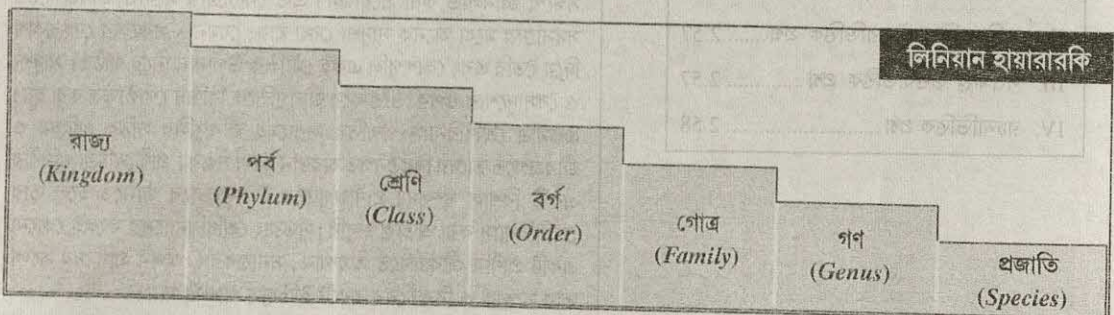
**(b) আধুনিক হায়ারারকি** (Modern Hierarchy)—পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson, 1945) বিভিন্ন ক্যাটিগোরি নামের আগে অধি (super) এবং পরে উপ (sub), ইত্যাদি যুক্ত করে মোট একুশটি ধাপ সৃষ্টি করেন এবং প্রাণীগুলিকে বিন্যস্ত করেন।

**স্বীকৃত আধুনিক 21টি ক্যাটিগোরিগুলি হল (Accepted 21 Modern Categories) ঃ**

## ▲ প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কয়েকটি তথ্য (Some useful facts about classification of animals)

**➤ A. সমতা (Symmetry) ঃ** প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গাসজ্জা যখন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে থাকে সেইরূপ অঙ্গ-সজ্জাকে **সমতা** বলে। প্রাণীদেহের এই সমতা বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকারে ঘটে, যেমন —

1. **অসাম্য** (Asymmetrical) ঃ প্রাণীদেহের দুই অর্ধাংশ যখন ভিন্নরূপ হয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট তলে (Plane) প্রাণীটিকে ছেদ করলে যখন দুটি অংশের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, সেইরূপ প্রাণীদেহকে **অসাম্য দেহ** বলে। **উদাহরণ**—প্রোটোজোয়া গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী, শামুক ইত্যাদি।

2. **দ্বিপার্শ্ব প্রতিসম** (Bilateral Symmetry) ঃ যে প্রতিসাম্য অবস্থায় দেহ একটি তল (Plane) দিয়ে বিভক্ত করে ডান ও বাম দিকে দুটি সমান অংশ পাওয়া যায় তাকে **দ্বিপার্শ্ব প্রতিসম** বলে। **উদাহরণ**—পতঙ্গ, মাছ, ব্যাং, পাখি, মানুষ ইত্যাদি।

3. **অরীয় প্রতিসম** (Radial Symmetry) ঃ যে প্রতিসাম্য অবস্থায় দেহকে অরীয় তলে বিভক্ত করে অনেকগুলি সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যাসার্ধের (Radius) অংশ পাওয়া যায় তাকে **অরীয় প্রতিসম** বলে। **উদাহরণ**—সাগর কুসুম, তারামাছ ইত্যাদি।

4. **দ্বি-অরীয় প্রতিসম** (Biradial Symmetry) ঃ যে প্রতিসাম্য অবস্থায় দেহ দ্বিপার্শ্ব এবং অরীয়ভাবে প্রতিসম হয় তাকে **দ্বি-অরীয় প্রতিসম** বলে। **উদাহরণ**—বেরো, হর্মিফোরা ইত্যাদি।

**➤ B. সিলোম (Coelom) ঃ** প্রাণীদেহে অবস্থিত যে গৌণ দেহগহ্বর মেসোডার্ম কোশ দিয়ে আবৃত থাকে তাকে **সিলোম** বলে। সিলোমের উপস্থিতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার প্রাণী পাওয়া যায়, যেমন—

1. **সিলোমেটা** (Coelomata) ঃ যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীর এবং পৌষ্টিকনালির মাঝে প্রকৃত গৌণ দেহগহ্বর বা সিলোম থাকে অর্থাৎ দেহগহ্বরটি মেসোডার্ম কোশ দিয়ে ভিতরের গাত্রে আবৃত থাকে সেইরূপ প্রাণীদের **সিলোমেটা** বলে। **উদাহরণ**— কেঁচো, জোঁক, মানুষ ইত্যাদি।

2. **আসিলোমেটা** (Acoelomata) ঃ যেসব প্রাণীদের সিলোম বা দেহগহ্বর থাকে না তাদের **আসিলোমেটা** বলে। **উদাহরণ**— স্পঞ্জ, সাগর কুসুম, প্রবাল ইত্যাদি।

3. **সিউডোসিলোমেটা** (Pseudocoelomata) : যেসব প্রাণীদের প্রকৃত দেহগহ্বর থাকে না, দেহত্বক ও আন্তরযন্ত্রের মধ্যস্থলের গহ্বরটি একপ্রকার তরলপদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই গহ্বরটি মেসোডার্ম কোশ দিয়ে আবৃত থাকে না, সেই প্রাণীদের **সিউডোসিলোমেটা** বলে। **উদাহরণ**—নিমাটোডা, রটিফার ইত্যাদি।

➤ **C. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য (Aim of Classification) :** পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য একটি বিশাল সম্পদ। মানুষের প্রয়োজনে এই বিশাল সম্পদকে টিকিয়ে রাখা একান্ত জরুরি। এর জন্য প্রতিটি জীবের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে একটি জীব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্যগুলি হল—

(1) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জীবগুলিকে একটি গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।

(2) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জীবগুলিকে পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।

(3) একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একটি আদর্শ নমুনাজীবের দেহগঠন, শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ, জীবনচক্র ইত্যাদি বিশদভাবে জানা থাকলে সেই গোষ্ঠীর অন্য সব জীবের জৈবিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

(4) বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবের সরল থেকে জটিল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে জীবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিবর্তনগত একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

**• প্রজাতি—শ্রেণিবিন্যাসের একক (Species—The Unit of Classification) •**

❖ **প্রজাতির সংজ্ঞা (Definition of Species) : একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম-আকার ও আকৃতিবিশিষ্ট, গোষ্ঠীভুক্ত যেসব জীব নিজেদের মধ্যে জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু এরূপ একটি গোষ্ঠীর কোনো জীব অন্য কোনো গোষ্ঠীর কোনো জীবের সঙ্গে জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না, সেই গোষ্ঠীর জীবগুলিকে একটি প্রজাতি বলে।**

## ✪ 1.1. জীবজগতের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Animal Kingdom) ✪

ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে সমগ্র জীবজগৎ গঠিত হয়। পৃথিবীর প্রাণীসম্পদ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রাণীসম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্তভাবে জরুরি। নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রতিটি প্রাণী একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং প্রাণীগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। এজন্য প্রতিটি প্রাণী সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞানলাভ একান্ত আবশ্যক। বৈচিত্র্যতায় ভরা সমস্ত প্রাণী সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে হলে সেগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। সাদৃশ্যমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণীকে একটি গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়; আবার বৈশিষ্ট্যের বৈশাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে একগোষ্ঠী প্রাণীকে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে পৃথক করা হয়। একমাত্র শ্রেণিবিন্যাসের ফলেই কোনো একটি প্রাণীর জীবজগতে অবস্থান, সানন্তকরণ, নাম, অপর প্রাণীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও বিবর্তনের একটি ইতিহাস জানা যায়।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে জীববিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী সমগ্র জীবজগতকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়, যেমন—উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণীরাজ্য। এরপর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের ফলে বিজ্ঞানীরা এককোশী জীবের গঠন বৈচিত্র্য আবিষ্কার করলেন এবং বহুকোশী জীবের গঠনের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ধারণ করলেন। এর ফলস্পরূপ হেকেল (Haeckel, 1880) এককোশী, আণুবীক্ষণিক জীবদের জন্য পৃথক রাজ্য— **প্রোটিস্টা** (Protista) সৃষ্টি করেন।

**হোয়াইটেকার** (1969) জীবজগতকে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত করেন। তিনি জীবকোশের প্রকার (প্রোক্যারিওটিক বা ইউক্যারিওটিক) এবং জীবের পুষ্টির প্রকৃতি অনুযায়ী সমগ্র জীবজগতকে পাঁচটি রাজ্য, যেমন—মোনেরা, প্রোটিস্টা, ফানজাই, প্লান্টি ও অ্যানিম্যালিয়াতে বিভক্ত করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা; যেমন—মারগুলিস ও স্বোয়ার্জ (Margulis and Schwartz, 1982), লেভিন (Levine, 1980) মেগলিস্ ও স্রাম (Meglitsch & Schram, 1991) হোয়াইটেকারের মতবাদ সমর্থন করেন।

● **হোয়াইটেকারের মতবাদ অনুযায়ী জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Living World according to Whittaker) ঃ**
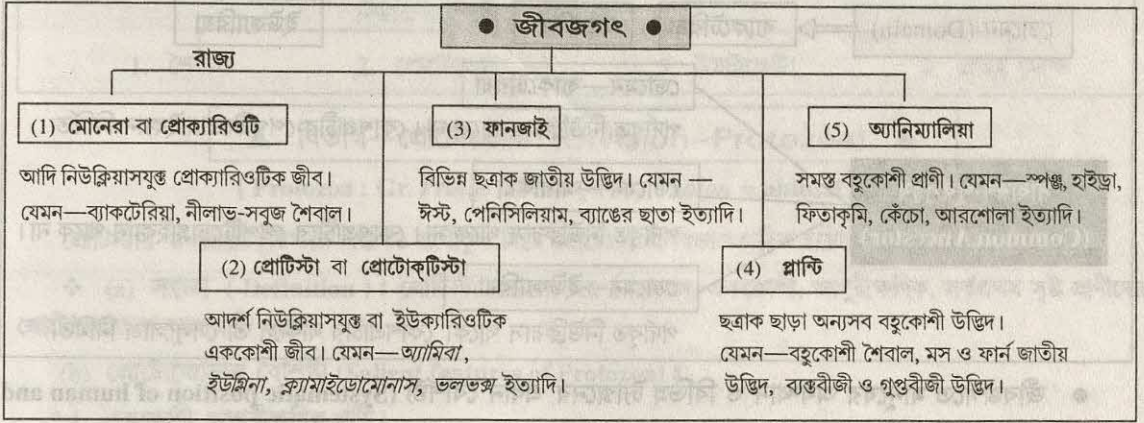
● **জীবজগতের পাঁচটি রাজ্যের বিবর্তনগত সম্পর্ক নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় —**
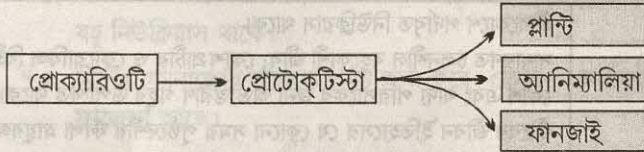
## ● প্রোটোজোয়া, প্যারাজোয়া ও মেটাজোয়া ●

1. **প্রোটোজোয়া ঃ** প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্গত এককোশী প্রাণীদের **প্রোটোজোয়া** বলে, যেমন— অ্যামিবা।
2. **প্যারাজোয়া ঃ** অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের অন্তর্গত যে বহুকোশী অনুন্নত শ্রেণির প্রাণীদের দেহে নির্দিষ্ট কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র সৃষ্টি হয় না তাদের **প্যারাজোয়া** বলে। যেমন— স্পঞ্জ।
3. **মেটাজোয়া ঃ** অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের অন্তর্গত যেসব বহুকোশী উন্নত শ্রেণির প্রাণীদের দেহে কলাতন্ত্র, অঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের **মেটাজোয়া** বলে, যেমন— হাইড্রা, কেঁচো, আরশোলা, ব্যাং ইত্যাদি।

● **আণবিক তথ্যের ভিত্তিতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস—জীবজগতের তিনটি ডোমেন প্রণালী (Classification of organisms on the basis of molecular data—Three Domain system in organisms) ঃ**

আণবিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র জীবজগৎকে তিনটি ডোমেন (Domain)-এ বিভক্ত করা হয়, যেমন—ব্যাকটেরিয়া (Bacteria), আরকিয়া (Archaea) ও ইউক্যারিয়া (Eukarya)। প্রোক্যারিওটদের প্রথম দুটি ডোমেনে বিভক্ত করা হয় এবং ইউক্যারিয়া ডোমেনের মধ্যে প্রোটিস্টা, ফানজাই, প্লান্টি ও অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
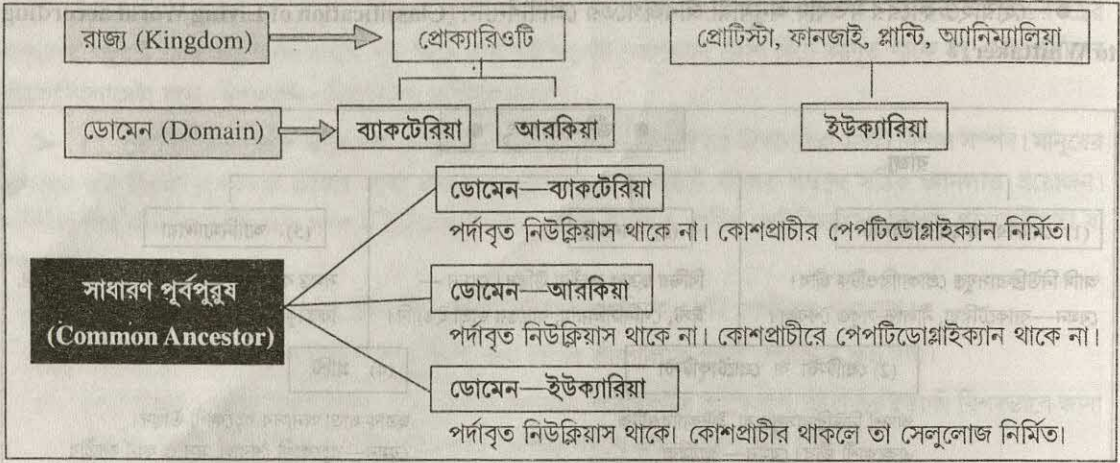
● **জীবজগতে মানুষের অবস্থান ও বিভিন্ন ট্যাক্সনের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Systematic position of human and the salient features of each Taxon) ঃ**

| ক্যাটিগোরি | ট্যাক্সন | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| 1. ডোমেন (Domain) | ইউক্যারিয়া (Eukarya) | জীবকোশে পর্দাবৃত নিউক্লিয়াস থাকে। |
| 2. রাজ্য (Kingdom) | অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) | সাধারণত চলনশীল বহুকোশী জীব; কোশপ্রাচীর ও ক্লোরোফিল বিহীন কোশ এবং খাদ্য পরিপাকের জন্য অভ্যন্তরীণ গহ্বর উপস্থিত থাকে। |
| 3. পর্ব (Phylum) | কর্ডাটা (Chordata) | জীবের জীবন ইতিহাসের যে কোনো সময় পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, নোটোকর্ড, গলবিলীয় ছিদ্র ও পায়ুপরবর্তী লেজ উপস্থিত থাকে। |
| 4. শ্রেণি (Class) | ম্যামেলিয়া (Mammalia) | স্তনগ্রন্থি, লোম, কর্ণছত্র এবং ঘর্ম ও তৈল গ্রন্থি উপস্থিত থাকে। |
| 5. বর্গ (Order) | প্রাইমেট (Primate) | উন্নত মস্তিষ্ক; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পৃথক থাকে এবং নখর, খুর, শিং থাকে না। |
| 6. গোত্র (Family) | হোমিনিডি (Hominidae) | দ্বিপদ গমন ও উল্লম্বভাবে অবস্থিত ঋজু দেহ। |
| 7. গণ (Genus) | *Homo* (*হোমো*) | উন্নত মস্তিষ্ক, যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য উপযুক্ত হাতের গঠন। |
| 8. প্রজাতি (Species) | *Homo sapiens* (*হোমো স্যাপিয়েন্স*) | সামনের হাত দুটি ছোটো হয়; কথা বলা, কলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সৃষ্টি করা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। |

## ✪ 1.2. প্রতিটি পর্বের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস ✪ (Classification of each Phylum with Salient features and Example)

প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, **প্রোটিস্টা** রাজ্যে এককোশী প্রাণী এবং **অ্যানিম্যালিয়া** রাজ্যে বহুকোশী প্রাণী রয়েছে। এই দুটি রাজ্যের শ্রেণিবিন্যাসের আলোচনা এখানে করা হল।

### ▲ A. রাজ্য —প্রোটিস্টা বা প্রোটোকটিস্টা (Kingdom—Protista or Protoctista) ঃ

রাজ্য প্রোটিস্টা সরল, এককোশী আদি ইউক্যারিওটিক জীব নিয়ে গঠিত। রাজ্য প্রোটিস্টাকে ছক অনুযায়ী চারটি বিভাগ বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে প্রোটোজোয়া গোষ্ঠীর জীবেরা প্রাণীর অন্তর্গত এবং এদের **আদ্যপ্রাণী** বলে। পূর্বে প্রোটোজোয়াকে পর্বের মর্যাদা দেওয়া হত, কিন্তু এখন প্রোটোজোয়া বিভাগের মধ্যে তিনটি পর্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

* হোয়াইটেকার, মারগুলিস ও স্কোয়ার্জ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস :
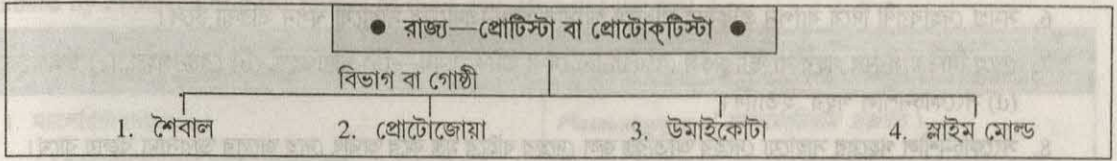
## ▲ বিভাগ—প্রোটোজোয়া (Division–Protozoa) ▲

[ **Protozoa : Gr. *Protos* = First (প্রথম) + *zoion* = animal (প্রাণী)** ]

প্রোটিস্টার বা প্রোটোক্‌টিস্টার অন্তর্গত প্রাণীকুল নিয়ে প্রোটোজোয়া বিভাগ গঠিত হয়েছে।

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) :** প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্গত সরল, এককোশী, আণুবীক্ষণিক, সর্বপ্রথম সৃষ্ট প্রাণীদের প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী বলে।

(b) **প্রোটোজোয়ার বৈশিষ্ট্য (Salient features of Protozoa) :**

* 1. **এককোশী, আণুবীক্ষণিক** প্রাণী।
* 2. দ্বি-বিভাজন অথবা বহু বিভাজন পদ্ধতিতে শুধুমাত্র অযৌন জনন সম্পন্ন করে।
3. সাধারণত এককোশী দেহে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। ব্যতিক্রম— *প্যারামিসিয়ামের* দুটি নিউক্লিয়াস এবং *ওপালিনাতে* বহু নিউক্লিয়াস থাকে।
* 4. বিশেষ গমনাঙ্গের সাহায্যে গমন কাজ করে। যেমন— অ্যামিবার **ক্ষণপদ**, প্যারামিসিয়ামের **সিলিয়া** এবং ইউগ্লিনার **ফ্লাজেলা** আছে।

চিত্র 1.1 : প্রোটোজোয়া বিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

5. শুধুমাত্র অন্তঃকোশীয় পরিপাক পদ্ধতি দেখা যায়।

6. সমগ্র দেহাবরণী দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় আদানপ্রদানের সাহায্যে শ্বসন প্রক্রিয়া চলে।

* 7. দেহে বিভিন্ন প্রকার **গহ্বর বা ভ্যাকুওল** (Vacuole) দেখা যায়। যেমন—(a) খাদ্যগহ্বর, (b) রেচনগহ্বর, (c) জলগহ্বর, (d) সংকোচনশীল গহ্বর ইত্যাদি।

8. **সংকোচনশীল গহ্বরের** সাহায্যে দেহের অতিরিক্ত জল দেহের বাইরে মুক্ত করে অর্থাৎ দেহে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।

9. প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কোশ অঙ্গাণু সৃষ্টি করে।

10. দেহ গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা কোনো ক্ষেত্রে অনিয়তাকার।

11. বিভিন্ন প্রকারের পরভোজী প্রাণী।

**• জানা প্রয়োজন •**

**জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাতিন ভাষা নির্ভর, সেজন্য সর্বক্ষেত্রে ওই নাম লাতিন ভাষাতে ইংরেজি হরফে লেখা বাধ্যতামূলক। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য নামগুলি বন্ধনীর মধ্যে বাংলায় দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সব পরীক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত নাম অবশ্যই ইংরেজিতে লিখবে। বাংলায় লেখা ঠিক নয়।**

(c) **প্রোটোজোয়ার উদাহরণ (Examples of Protozoa) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. অ্যামিবা | *Amoeba proteus* (*অ্যামিবা প্রোটিয়াস*) |
| 2. প্যারামিসিয়াম | *Paramecium caudatum* (*প্যারামিসিয়াম কডেটাম্*) |
| 3. ইউগ্লিনা | *Euglena viridis* (*ইউগ্লিনা ভিরিডিস*) |
| 4. প্লাজমোডিয়াম | *Plasmodium vivax* (*প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স*) |
| 5. এন্টামিবা | *Entamoeba histolytica* (*এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা*) |
| 6. মনোসিস্টিস | *Monocystis agilis* (*মনোসিস্টিস অ্যাজাইলিস*) |
| 7. ট্রাইপ্যানোসোমা | *Trypanosoma cruzi* (*ট্রাইপ্যানোসোমা ক্রুজি*) |
| 8. জিয়ার্ডিয়া | *Giardia intestinalis* (*জিয়ার্ডিয়া ইন্টেস্টিন্যালিস্*) |

(d) **প্রোটোজোয়ার শ্রেণিবিভাগের ছক (Chart for Classification of Protozoa) :**

**প্রোটোজোয়া**

1. পর্ব—**রাইজোপোডা** (ক্ষণপদযুক্ত এককোশী প্রাণী) যেমন—*অ্যামিবা*

2. পর্ব—**সিলিওফোরা** (সিলিয়াযুক্ত এককোশী প্রাণী) যেমন—*প্যারামিসিয়াম*

3. পর্ব—**এপিকমপ্লেক্সা** (পরজীবী এককোশী প্রাণী) যেমন—*প্লাজমোডিয়াম*
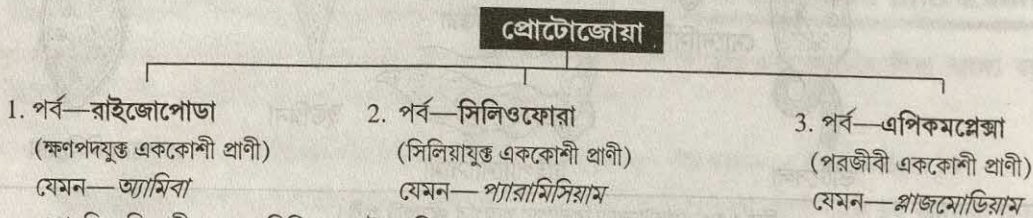
[ আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্যারামিসিয়ামের ইংরেজি বানান *Paramecium* লেখেন। ]

● **মানুষের প্রোটোজোয়াঘটিত কয়েকটি রোগ ও রোগসৃষ্টিকারী জীবের নাম (Some diseases of human caused by Protozoa and the names of their causative organisms) ঃ**

| রোগের নাম | রোগসৃষ্টিকারী প্রাটোজোয়ার নাম |
|---|---|
| 1. ম্যালেরিয়া (Malaria) | *Plasmodium sp.* (প্লাজমোডিয়াম প্রজাতি) |
| (a) সাবটার্শিয়ান বা বিনাইন ম্যালেরিয়া | *Plasmodium falciparum* (প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম) |
| (b) বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া | *Plasmodium vivax* (প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স) |
| (c) কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া | *Plasmodium malariae* (প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি) |
| (d) ওভেল টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া | *Plasmodium ovale* (প্লাজমোডিয়াম ওভেল) |
| 2. উদরাময় (Diarrhoea) | *Giardia intestinales* (জিয়ার্দিয়া ইনটেস্টিনেলিস) |
| 3. অ্যামিবা ঘটিত আমাশয় (Amoebic Dysentry) | *Entamoeba histolytica* (এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা) |
| 4. কালা জ্বর (Black Fever) বা লিশম্যানিয়েসিস (Leishmaniasis) | *Leishmania donovani* (লিশম্যানিয়া ডোনোভানি) |
| 5. আফ্রিকার স্লিপিং সিকনেস বা ট্রাইপ্যানোসোমিয়েসিস (Trypanosomiasis) | *Trypanosoma brucei* (ট্রাইপ্যানোসোমা ব্রুসি) |
| 6. সিলিয়েট ঘটিত আমাশয় (Ciliate Dysentry) | *Balantidium coli* (ব্যালান্টিডিয়াম কোলি) |
| 7. স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের রোগ বা ট্রাইকোমোনিয়েসিস্ (Trichomoniasis) | *Trichomonas vaginalis* (ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনেলিস) |

● **প্রোটোজোয়া ও মেটাজোয়ার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Protozoa and Metazoa) ঃ**

| প্রোটোজোয়া | মেটাজোয়া |
|---|---|
| যেসব প্রাণীর দেহ একটিমাত্র কোশ নিয়ে গঠিত হয় তাদের **এককোশী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া** (Protozoa) বলে। একটিমাত্র কোশই ওই প্রাণীর যাবতীয় জৈবিক কাজগুলি সম্পন্ন করে। **উদাহরণ** — অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, এন্টামিবা ইত্যাদি। | যেসব প্রাণীর দেহ একাধিক কোশ নিয়ে গঠিত তাদের **বহুকোশী প্রাণী বা মেটাজোয়া** (Metazoa) বলে। এদের দেহের বিভিন্ন কোশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। **উদাহরণ**— হাইড্রা, জেলিফিস, কেঁচো, আরশোলা, তারামাছ ইত্যাদি। |

### ▲ B. রাজ্য—অ্যানিম্যালিয়া (Kingdom–Animalia) ঃ

সমস্ত বহুকোশী সরল ও জটিল প্রাণী নিয়ে এই রাজ্য গঠিত হয়। এই প্রাণীদের প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন— অকর্ডাটা ও কর্ডাটা। পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata) ছাড়া অন্যসকল **অকর্ডাটা** (Nonchordatas) প্রাণীদের **ন'টি প্রধান পর্বে** (Phylum) **বিভক্ত** করা হয়েছে অর্থাৎ, **রাজ্য অ্যানিম্যালিয়া দশটি পর্বে বিভক্ত হয়।**

● **রাজ্য—অ্যানিম্যালিয়ার অন্তর্গত প্রধান পর্বগুলি নিম্নরূপ ঃ**

1. পর্ব—**পরিফেরা**। উদাহরণ—স্পঞ্জ।
2. পর্ব—**নিডারিয়া**। উদাহরণ—হাইড্রা।
3. পর্ব—**টিনোফোরা**। উদাহরণ—বেরো।
4. পর্ব—**প্লাটিহেলমিনথিস্**। উদাহরণ — ফিতাকৃমি।
5. পর্ব—**নিমাটোডা**। উদাহরণ—গোলকৃমি।
6. পর্ব—**অ্যানিলিডা**। উদাহরণ—কেঁচো।
7. পর্ব—**আর্থ্রোপোডা**। উদাহরণ—মাছি।
8. পর্ব—**মোলাস্কা**। উদাহরণ—শামুক।
9. পর্ব—**একাইনোডারমাটা**। উদাহরণ—তারামাছ।
10. পর্ব—**কর্ডাটা**। উদাহরণ—মাছ, ব্যাং ইত্যাদি।

## ▲ পর্ব—পরিফেরা (Phylum—Porifera : *Porus* = pore (ছিদ্র) + *ferre* = to bear (বহন করে)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ দেহে অসংখ্য ছিদ্র ও নালিকাতন্ত্রযুক্ত দ্বিস্তর কোশ বিশিষ্ট প্রাণীদের পরিফেরা বলে।**

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) ঃ**

*1. দেহে অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। এদের **অস্টিয়া** (Ostia) বলে।

*2. দেহের একপ্রান্তে একটি বড়ো ছিদ্র থাকে। একে **অস্কুলাম** (Osculum) বলে।

*3. দেহের ভিতরে একটি **নালিকাতন্ত্র** (Canal System) থাকে যা অস্টিয়া ও অসকুলামকে সংযুক্ত করে এবং খাদ্য গ্রহণ, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে।

*4. **ডিপ্লোব্লাসটিক** প্রাণী অর্থাৎ দেহ দুটি কোশস্তর দিয়ে তৈরি, যেমন— বাইরের স্তর পিনাকোডার্ম (Pinacoderm) ও ভিতরের স্তর কোয়ানোডার্ম (Choanoderm)। এই দুটি কোশস্তরের মাঝে অকোশীয় **মেসেনকাইম** (Mesenchyme) ধাত্র দেখা যায়।

5. কাঁটার মতো আণুবীক্ষণিক **স্পিকিউল** (Spicule) অথবা প্রোটিন জাতীয় **স্পঞ্জিন** তন্তু দিয়ে কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।

*6. **কোয়ানোসাইট** (Choanocyte), **অ্যামিবোসাইট** (Amoebocyte), **পিনাকোসাইট** (Pinacocyte), **পোরোসাইট** (Porocyte) ইত্যাদি কোশ দিয়ে দেহ তৈরি হয়।
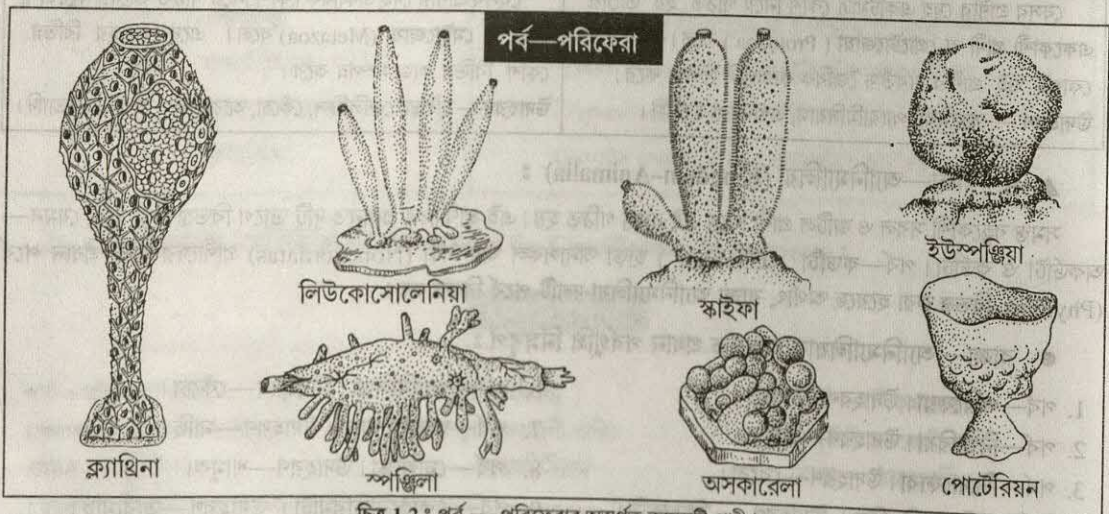
চিত্র 1.2 ঃ পর্ব — পরিফেরার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

*7. ভিতরের কোশস্তরে কোয়ানোসাইট দিয়ে আবৃত গহ্বরকে **স্পঞ্জোসিল** (Spongocoel) বলে।
8. দেহে কোনো বিশেষ কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র দেখা যায় না।
9. এরা চলাফেরা করতে পারে না, জলে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে।
10. যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে জনন কাজ করতে পারে।
11. পুনরুজ্জীবন ক্ষমতা প্রচুর।
12. উভলিঙ্গ প্রাণী।
13. প্রধানত অসাম্য দেহ।
14. কোরক উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে।
15. দেহে মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র থাকে না।
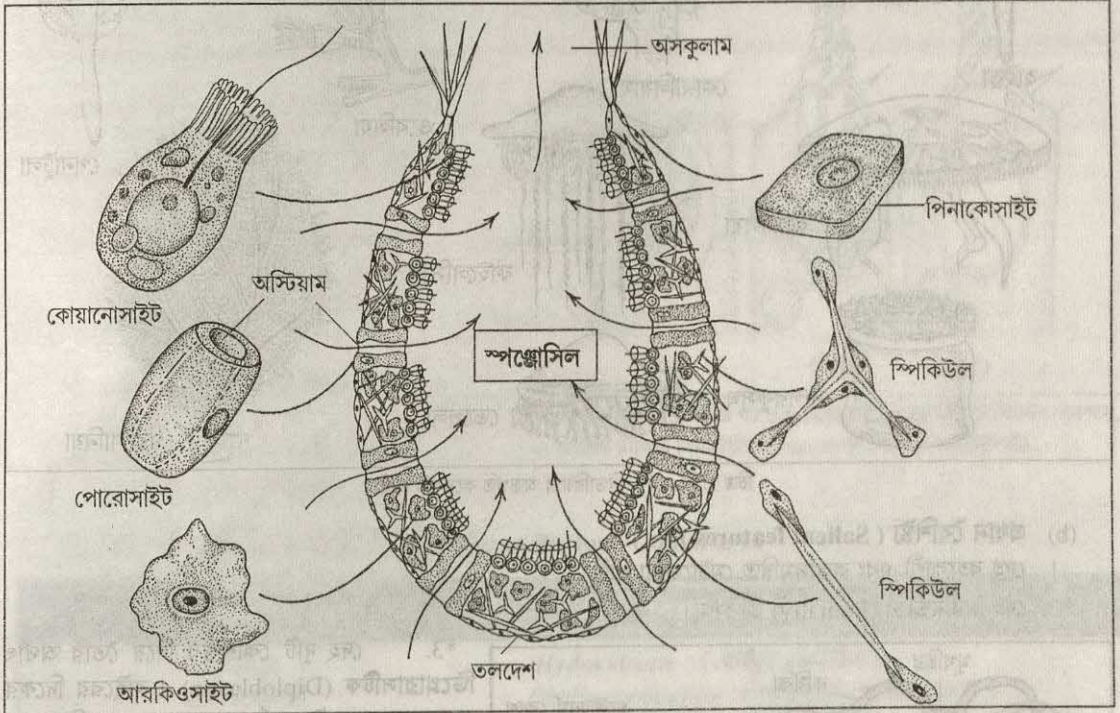
চিত্র 1.3 : স্পঞ্জের দেহের প্রস্থচ্ছেদ ও বিভিন্ন কোশের অবস্থান।

(c) **পর্ব—পরিফেরার উদাহরণ (Examples of Phylum— Porifera) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. স্পঞ্জিলা | *Spongilla lacustris* (*স্পঞ্জিলা ল্যাকিউস্ট্রিস*) |
| 2. সাইকন | *Scypha (=Sycon) gilatinosum* (*স্কাইফা জিলেটিনোসাম*) |
| 3. ইউপ্লেক্টেলা | *Euplectella aspergillum* (*ইউপ্লেক্টেলা অ্যাসপারজিলাম*) |
| 4. নেপচুনের কাপ | *Poterion neptuni* (*পোটেরিয়ন নেপচুনি*) |
| 5. ইউস্পঞ্জিয়া | *Euspongia officinalis* (*ইউস্পঞ্জিয়া অফিসিনেলিস্*) |
| 6. ঘোড়ার স্পঞ্জ | *Hyppospongia sp.* (*হিপ্পোস্পঞ্জিয়া প্রজাতি*) |

## ▲ পর্ব—নিডারিয়া [Phylum–Cnidaria : *Gr. Knide* = **nettle** (দংশন রোম) ]

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) : যে প্রাণীর দ্বিস্তর কোশযুক্ত দেহ, একটি ছিদ্র ও একটি গহ্বর এবং নিডোব্লাস্ট কোশ থাকে তাদের নিডারিয়া বলে।**



চিত্র 1.3 : পর্ব—নিডারিয়ার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য ( Salient features ) :**

1. দেহ বহুকোশী এবং কলাসমন্বিত মেটাজোয়া প্রাণী।

*2. দেহ অরীয়ভাবে (Radially) প্রতিসম।
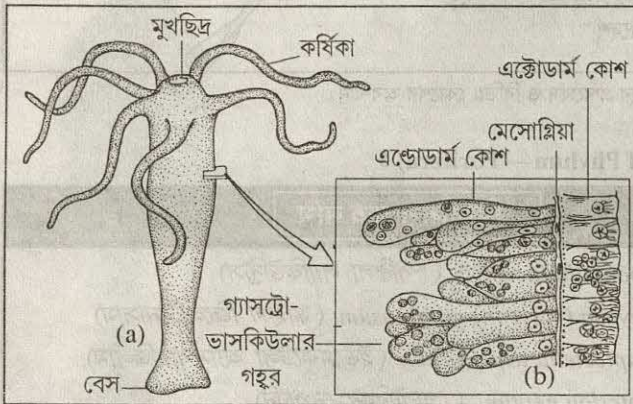
চিত্র 1.4 : (a) একটি সম্পূর্ণ হাইড্রা এবং (b) হাইড্রার দেহত্বকের প্রস্থচ্ছেদ।

*3. দেহ দুটি কোশস্তর দিয়ে তৈরি অর্থাৎ **ডিপ্লোব্লাসটিক** (Diploblastic) । বাইরের দিকের কোশস্তরকে **এক্টোডার্ম** (Ectoderm) ও ভিতরের কোশস্তরকে **এন্ডোডার্ম** (Endoderm) বলে এবং এই দুটি কোশস্তরের মাঝে জেলির মতো অকোশীয় **মেসোগ্লিয়া** (Mesoglea) নামে ধাত্র বা পদার্থ থাকে।

*4. দেহে **একটিমাত্র ছিদ্র** থাকে যাকে মুখছিদ্র বলে এবং যা মুখ ও পায়ু উভয়ের কাজ করে।

*5. দেহের ভিতরে একটিমাত্র গহ্বর থাকে যাকে **গ্যাসট্রোভাসকিউলার গহ্বর** (Gastrovascular cavity) বলে এবং যা মুখছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে মুক্ত হয়।

*6. মুখছিদ্রকে ঘিরে অনেকগুলি কর্ষিকা থাকে। কর্ষিকাগুলিতে **নিডোব্লাস্ট** (Cnidoblast) নামে বিশেষ ধরনের কোশ থাকে যার মধ্যে **নিমাটোসিস্ট** (Nematocyst) নামের একপ্রকার চাবুকের মতো অঙ্গাণু থাকে। খাদ্য গ্রহণ ও আত্মরক্ষার কাজে নিমাটোসিস্ট ব্যবহৃত হয়।

7. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীগুলি পলিপ দশা অথবা মেডুসা দশাতে দেখা যায়।
8. কোনো কোনো প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার পলিপ ও মেডুসা জয়েড (Zooid) সমন্বিত **পলিমরফিজম্** (Polymorphism) দেখা যায় এবং এখানে জনুক্রম বা **মেটাজেনেসিস্** (Metagenesis) পরিলক্ষিত হয়।
9. কোরক গঠনের সাহায্যে অযৌন জনন এবং গ্যামেট গঠন ও তাদের মিলনের সাহায্যে যৌন জনন সম্পাদন করে।
10. **আসিলোমেট** (Acoelomate) প্রাণী, অর্থাৎ দেহ গহ্বর বা সিলোম এখানে অনুপস্থিত।
11. কিছু স্নায়ুকোশ এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মে জাল বিস্তার করে থাকে।
12. পরিপাক অন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় উভয় প্রকারের হয়।
13. শ্বসনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত।
14. কোরক গঠনের সাহায্যে অযৌন জনন এবং গ্যামেট গঠন ও তাদের মিলনের সাহায্যে যৌন জনন সম্পাদন করে।
15. জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত **প্লানুলা লার্ভা** (Planula larva) দেখা যায়।
16. জলজ প্রাণী—বেশীর ভাগই সামুদ্রিক, কয়েকটি স্বাদুজলে থাকে।
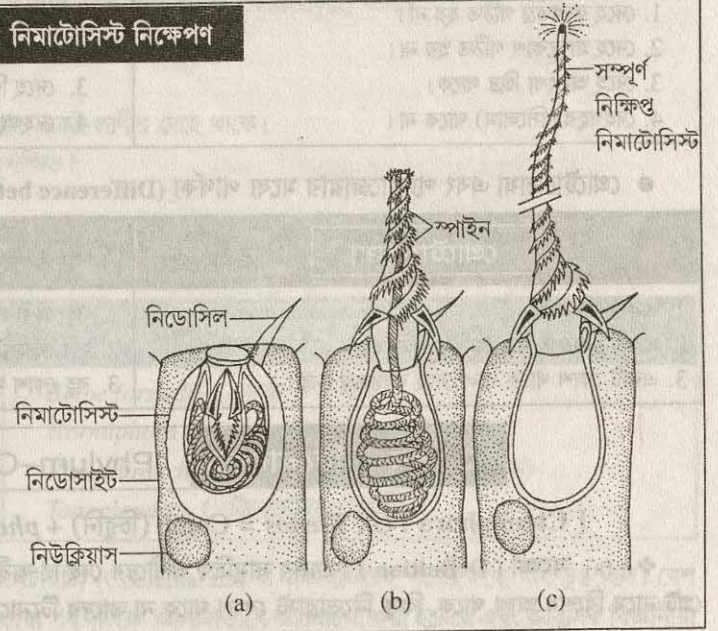
চিত্র 1.5 : নিমাটোসিস্ট নিক্ষেপের বিভিন্ন ধাপ। (a) কোশের ভিতরে নিমাটোসিস্টের অবস্থান, (b) আংশিক নিক্ষিপ্ত নিমাটোসিস্ট, (c) সম্পূর্ণ নিক্ষিপ্ত নিমাটোসিস্ট।

(c) **পর্ব—নিডারিয়ার উদাহরণ ( Examples of Phylum–Cnidaria ) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. হাইড্রা | *Hydra viridis* ( *হাইড্রা ভিরিডিস* ) |
| 2. ওবেলিয়া | *Obelia geniculata* ( *ওবেলিয়া জেনিকিউলেটা* ) |
| 3. জেলিফিস | *Aurelia aurita* ( *অরেলিয়া অরিটা* ) |
| 4. সাগরকুসুম | *Metridium senil* ( *মেট্রিডিয়াম সেনিল* ) |
| 5. প্রবাল বা কোরাল | *Corallium rubrum* ( *কোরেলিয়াম রুব্রাম* ) |
| 6. ফাইসেলিয়া | *Physalia sp.* ( *ফাইসেলিয়া প্রজাতি* ) |

● **ডিপ্লোব্লাস্টিক ও ট্রিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Diploblastic and Triploblastic Animals) :**

| ডিপ্লোব্লাস্টিক | ট্রিপ্লোব্লাস্টিক |
|---|---|
| 1. যেসব প্রাণীদের দেহ এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম নামে দুটি কলাস্তর দিয়ে গঠিত হয় তাদের **দ্বিস্তরবিশিষ্ট বা ডিপ্লোব্লাস্টিক** প্রাণী বলে। | 1. যেসব প্রাণীদের দেহ এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম নিয়ে গঠিত হয় তাদের **ত্রিস্তরবিশিষ্ট বা ট্রিপ্লোব্লাস্টিক** প্রাণী বলে। |
| 2. উদাহরণ— হাইড্রা, ওবেলিয়া, পরপিটা, প্রভৃতি। | 2. উদাহরণ— টিনিয়া সোলিয়াম, ফেরেটিমা প্রভৃতি। |

● প্যারাজোয়া এবং এন্টারোজোয়ার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Parazoa and Enterozoa) :

| প্যারাজোয়া | এন্টারোজোয়া |
|---|---|
| 1. দেহে কলাতন্ত্র গঠিত হয় না। | 1. দেহে কলাতন্ত্র গঠিত হয়। |
| 2. দেহে স্নায়ুকোশ গঠিত হয় না। | 2. দেহে স্নায়ুকোশ গঠিত হয়। |
| 3. দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। | 3. দেহে ছিদ্রের উপস্থিতি দেখা যায় না। |
| 4. দেহগহ্বর (সিলোম) থাকে না। | 4. দেহগহ্বর (সিলোম) থাকে। |

● প্রোটোজোয়া এবং প্যারাজোয়ার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Protozoa and Parazoa) :

| প্রোটোজোয়া | প্যারাজোয়া |
|---|---|
| 1. এককোশী প্রাণী। | 1. বহুকোশী প্রাণী। |
| 2. একটি কোশেই সব জৈবিক কাজ হয়। | 2. সব কোশেই জৈবিক কাজ হয়। |
| 3. একটি কোশ থাকে বলে দেহে কলাতন্ত্র নেই। | 3. বহু কোশ থাকে কিন্তু দেহে কলাতন্ত্র গঠিত হয় না। |

## ❁ পর্ব—টিনোফেরা Phylum–Ctenophora ❁

**[ Ctenophora : *Gr. Ktenos* = Comb (চিরুনি) + *phoros* = to bear (ধারণ করা) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) :** যেসব সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহ দ্বি-অরীয়ভাবে প্রতিসম ও দ্বিস্তর কোশযুক্ত এবং চিরুনি প্লেট নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, কিন্তু নিডোব্লাস্ট কোশ থাকে না তাদের টিনোফোরা বলে।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

*1. দেহ স্বচ্ছ, চ্যাপটা ফিতের মতো বা বোতলের মতো এবং দ্বি-অরীয়ভাবে প্রতিসম (Biradially symmetrical) ।

*2. চিরুনির মতো সিলিয়াযুক্ত, সমদূরত্বে অবস্থিত আটটি **সিলিয়ারি প্লেট** (Ciliary plate) বা **কম্ব প্লেট** (Comb plate) থাকে যার সাহায্যে এরা গমন করে।

*3. কর্ষিকায় **কলোব্লাস্ট** (Colloblast) বা **ল্যাসো কোশ** (Lasso cell) নামে একপ্রকার বিশেষ আঠালো কোশ থাকে যার সাহায্যে প্রাণী খাদ্য সংগ্রহ করে।
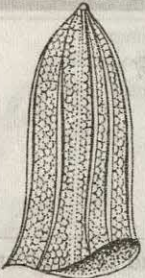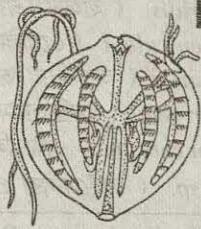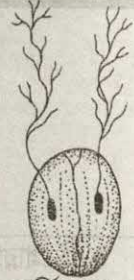
চিত্র 1.6 : পর্ব—টিনোফোরার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

4. সমস্ত প্রাণীই সামুদ্রিক এবং এরা কখনও কলোনি গঠন করে না।

*5. দেহ দুটি প্রধান কোশস্তর দিয়ে গঠিত যেমন—এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম এবং এদের মধ্যস্থলে পেশিকোশ ও অ্যামিবোসাইট কোশ সমৃদ্ধ ধাত্র **মেসেনকাইম** (Mesenchyme) থাকে। সুতরাং **টিনোফোরাকে ত্রিস্তরীয় কোশযুক্ত** (Tribloblastic) প্রাণী বলা যেতে পারে।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

6. সিলোম থাকে না।
7. মুখছিদ্র, গলবিল ও শাখাপ্রশাখাযুক্ত পাকস্থলী বর্তমান।
8. দেহের দুটি মেরু অর্থাৎ দুটি প্রান্ত আছে—ওরাল (Oral) বা মুখ প্রান্ত এবং অ্যাবোরাল (Aboral) বা প্রতিমুখ প্রান্ত।
9. অ্যাবোরাল প্রান্তে একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে এবং একে **স্টাটোসিস্ট** (Statocyst) বলে।
10. পলিপ দশা থাকে না, শুধুমাত্র মেডুসা দশা উপস্থিত থাকে।
11. স্নায়ুতন্ত্র অসংগঠিত।
12. উভলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই প্রাণীর দেহে থাকে।
13. কঙ্কালতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত।
14. জীবনচক্রে জনুক্রম দেখা যায় না।

**(c) পর্ব—টিনোফোরার উদাহরণ ( Examples of Phylum–Ctenophora ) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. বেরো | *Beroe forskalii* ( *বেরো ফর্সকালি* ) |
| 2. হর্মিফোরা | *Hormiphora plumosa* ( *হর্মিফোরা প্লুমোসা* ) |
| 3. প্লুরোব্রাঙ্কিয়া | *Pleurobranchia pileus* ( *প্লুরোব্রাঙ্কিয়া পিলিয়াস্* ) |
| 4. টোনোপ্লানা | *Tonoplana sp.* ( *টোনোপ্লানা প্রজাতি* ) |

পূর্বে নিডারিয়া ও টিনোফোরা পর্ব দুটি **সিলেনটারাটা** (Coelentarata) বা একনালিদেহ পর্বের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত ছিল। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের জন্য **নিডারিয়া** ও **টিনোফোরা** পর্ব দুটিকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানীরা এটি সমর্থন করেছেন।

**● নিডারিয়া ও টিনোফোরার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cnidaria and Ctenophora)**

| নিডারিয়া | টিনোফোরা |
|---|---|
| 1. দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম। | 1. দেহ দ্বি-অরীয়ভাবে প্রতিসম। |
| 2. দেহে **নিডোব্লাস্ট কোশ** থাকে। | 2. দেহে নিডোব্লাস্ট কোশ থাকে না। |
| 3. কম্ব প্লেট বা সিলিয়ারি প্লেট থাকে না। | 3. আটটি **কম্ব প্লেট** বা সিলিয়ারি প্লেট থাকে। |
| 4. দেহের দুটি কোশস্তরের মাঝের স্তরটি হল অকোশীয় মেসোগ্লিয়া। | 4. দেহের দুটি কোশস্তরের মাঝের স্তরটি হল কোশযুক্ত মেসেনকাইম। |
| 5. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী পলিপ অথবা মেডুসা দশায় পাওয়া যায়। | 5. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী কেবলমাত্র মেডুসা দশায় পাওয়া যায়। |

**□ নিডারিয়া ও টিনোফোরার সাদৃশ্য (Similarities found in Cnidaria and Ctenophora) ঃ**

1. প্রধানত দ্বিস্তর কোশবিশিষ্ট প্রাণী যেখানে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোশ উপস্থিত থাকে।
2. দেহে সিলোম বা গৌণ দেহ গহ্বর থাকে না।
3. এই দুটি গোষ্ঠীতে অন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় পাচন ঘটে।
4. কোনো অঙ্গ বা তন্ত্রের গঠন দেখা যায় না, তবে বিশেষ কোশ বিশেষ কাজ করে।
5. এই প্রাণীদের গোনাড এন্ডোডার্ম কোশ স্তর থেকে উৎপত্তি লাভ করে।
6. উভয় গোষ্ঠীর প্রাণীর মধ্যেই কর্ষিকা থাকে।
7. উভয় গোষ্ঠীর প্রাণী একনালি দেহযুক্ত প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

● সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Coelom and Coelenteron) ঃ

| সিলোম | সিলেন্টেরন |
|---|---|
| 1. সিলোম হল মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিক-নালির মধ্যবর্তী গহ্বর। এই গহ্বর মেসোডার্ম কোশ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। | 1. সিলেন্টেরন হল একনালিদেহী বা নিডারিয়া প্রাণীদের এন্ডোডার্ম পরিবেষ্টিত একমাত্র গহ্বর বা নালি। (সিলেন্টেরন কথাটি এখন ব্যবহার করা হয় না।) |
| 2. **উদাহরণ**—অ্যানিলিডা পর্ব থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে এই রকম গহ্বর থাকে। | 2. **উদাহরণ**— হাইড্রা, সাগরকুসুম ইত্যাদি প্রাণীদের দেহে এই গহ্বর থাকে। |

## ❂ পর্ব—প্লাটিহেল্‌মিন্‌থিস Phylum–Platyhelminthes ❂

**[ Platyhelminthes : Gr. *Platys* = flat, (চ্যাপটা) + *helmins* = worms, (কৃমি) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ** যেসব প্রাণীদের দেহ উপর-নীচ চ্যাপটা ত্রিস্তর কোশযুক্ত, দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম এবং দেহগহ্বরহীন তাদের প্লাটিহেলমিনথিস্ বলে।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) ঃ**

*1. দেহ অখণ্ডিত, চ্যাপটা, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।

*2. **ত্রিস্তর** কোশ বিশিষ্ট দেহ (Triploblastic) — এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম যুক্ত।

3. দেহ গহ্বর বা সিলোম থাকে না।

*4. দেহটি পত্রাকার, ফলকাকার অথবা ফিতার মতো দেখতে।

5. বেশিরভাগ প্রাণী পরজীবী এবং বিশেষভাবে অভিযোজিত।

6. দেহের সামনের দিকে মুখ থাকে এবং মুখের চারিদিকে চোষক অঙ্গ থাকে।

*7. দেহ **সিনসিটিয়াল** পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে।

8. পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

চিত্র 1.7 ঃ পর্ব—প্লাটিহেল্‌মিন্‌থিসের অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

9. শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।

10. রেচন অঙ্গ প্রোটোনেফ্রিডিয়াম এবং এখানে প্রচুর **ফ্লেম সেল** (Flame cell) বা **শিখা কোশ** থাকে।

11. সব সদস্যই উভলিঙ্গ প্রাণী।

12. স্নায়ুতন্ত্র মইয়ের মতো।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

13. অযৌন ও যৌন জনন পদ্ধতিতে জননকর্ম করে।
14. জীবনচক্র একটি অথবা দুটি পোষকের মধ্যে ঘটে এবং একাধিক লার্ভা দশা যুক্ত।

(c) **পর্ব—প্লাটিহেলমিনথিসের উদাহরণ (Examples of Phylum— Platyhelminthes) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ফিতাকৃমি | *Taenia solium* ( *টিনিয়া সোলিয়াম* ) |
| 2. যকৃৎ কৃমি | *Fasciola hepatica* ( *ফ্যাসিওলা হেপাটিকা* ) |
| 3. কুকুরের ফিতাকৃমি | *Echinococcus granulosus* ( *একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস* ) |
| 4. প্লানেরিয়া | *Planaria sp.* ( *প্লানেরিয়া প্রজাতি* ) |

## ❂ পর্ব—নিমাটোডা Phylum–Nematoda ❂

**[ Nematoda : Gr. *Nematos* = thread, (সূত্র) + *eidos* = form, (আকৃতি) ]**

[ পূর্বের নাম—নিমাট্‌হেলমিনথিস্ (Nemathelminthes) বা অ্যাসকেলমিনথিন্ (Aschelminthes) ]

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ যেসব প্রাণীদের দেহ অখণ্ডিত, ত্রিস্তর কোশযুক্ত, দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম নলাকার ও ছদ্ম দেহগহ্বর যুক্ত তাদের নিমাটোডা বলে।**

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য ( Salient features ) ঃ**

*1. দেহ **নলাকার** বা সুতার মতো, অখণ্ডিত, দু প্রান্ত ছুঁচোলো।
*2. দেহ **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম** (Bilaterally symmetrical) এবং শক্ত কিউটিক্‌ল দিয়ে ঢাকা থাকে।
*3. দেহগহ্বরকে **সিউডোসিলোম** (Pseudocoelom) বা ছদ্ম দেহগহ্বর বলে।
*4. দেহ **ত্রিস্তর** কোশ বিশিষ্ট (Triploblastic) অর্থাৎ এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম যুক্ত।
5. অন্ত্র সরল প্রকৃতির এবং পায়ুছিদ্র বর্তমান।
6. শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
7. কয়েকটি রেচননালি দিয়ে রেচনতন্ত্র গঠিত হয়।
8. একটি নার্ভরিং বা স্নায়ু অঙ্গুরি অন্ত্রকে ঘিরে থাকে এবং এখান থেকে স্নায়ু সামনের দিকে ও পিছনের দিকে সরবরাহ হয়।
9. একলিঙ্গ প্রাণী — যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায়।
10. শুধুমাত্র যৌন জনন ঘটে, অযৌন জনন ঘটে না।

চিত্র 1.8 ঃ পর্ব- নিমাটোডার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(c) **পর্ব—নিমাটোডার উদাহরণ (Examples of Phylum— Nematoda)** :

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. গোলকৃমি | *Ascaris lumbricoides* (অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস) |
| 2. হুককৃমি | *Ancylostoma duodenale* (অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ড্যুওডিনেলি) |
| 3. গোদ কৃমি | *Wuchereria bancrofti* (উচেরেরিয়া ব্যাঙ্কক্রফ্‌টি) |
| 4. লোয়া কৃমি | *Loa loa* (লোয়া লোয়া) |

● **চ্যাপটাকৃমি ও গোলকৃমির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Flat worm and Round worm)** :

| চ্যাপটাকৃমি (প্লাটিহেলমিন্‌থিস) | গোলকৃমি (নিমাটোডা) |
|---|---|
| 1. দেহ পাতার মতো উপর-নীচে চ্যাপটা হয়। | 1. দেহ লম্বা, সরু, গোলাকার ও দুটি প্রান্ত ছুঁচোলো হয়। |
| 2. দেহে গহ্বর বা সিলোম থাকে না। | 2. প্রকৃত সিলোম না থাকলেও ছদ্ম বা সিউডোসিলোম থাকে। |
| 3. দেহ খণ্ডিত বা অখণ্ডিত হয়। | 3. দেহ খণ্ডিত হয়। |
| 4. পৌষ্টিকতন্ত্র ও পায়ু থাকে না। | 4. পৌষ্টিকতন্ত্র ও পায়ুছিদ্র থাকে। |
| 5. ফ্লেমকোশ দিয়ে রেচন কাজ সম্পন্ন হয়। | 5. একজোড়া পার্শ্বনালি দিয়ে রেচন কাজ সম্পন্ন হয়। |
| 6. এরা সাধারণত উভলিঙ্গ হয়। | 6. এরা একলিঙ্গ হয়। |

## ❂ পর্ব—অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরিমাল Phylum—Annelida ❂

**[Annelida : Gr. *Annellus* = Ring, (অঙ্গুরী)]**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : **যে সব প্রাণীদের দেহ নলাকার, ছোটো ছোটো আংটির মতো খণ্ড দিয়ে গঠিত, ত্রিস্তর কোশযুক্ত এবং প্রকৃত দেহগহ্বরযুক্ত তাদের অ্যানিলিডা বলে।**

**চিত্র 1.9** : পর্ব—অ্যানিলিডার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features)** :

*1. দেহ অনেকগুলি আংটির মতো খণ্ড নিয়ে গঠিত এবং এগুলিকে **মেটামিয়ার** (Metamere) বা **সোমাইট** (Somite) বলে।

2. দেহ **ত্রিস্তর** কোশযুক্ত (Triploblastic) অর্থাৎ এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম দিয়ে গঠিত; এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।

*3. বহিস্ত্বক **কিউটিকল্** (Cuticle) আবরণীযুক্ত।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

*4. মেসোডার্ম কোশ আবৃত প্রকৃত সিলোম বা দেহ গহ্বর বর্তমান যা সেপ্টাম বা পর্দা দিয়ে খণ্ডিত থাকে।

*5. রেচন অঙ্গ হল **নেফ্রিডিয়া** (Nephridia) যা প্রায় প্রতি খণ্ডে থাকে।

6. গমন অঙ্গ সিটা (Seta) বা প্যারাপোডিয়া (Parapodia) বা দেহ পেশি।

7. দেহ লম্বাকৃতি ; মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র দেহের দু'প্রান্তে উপস্থিত থাকে।

8. উন্নত ও বন্ধ রক্তসংবহনতন্ত্র। রক্তরসে **হিমোগ্লোবিন** বা **এরিথ্রোক্রুওরিন** (Erythrocruorin) থাকে—তাই রক্তের রং লাল।

9. সাধারণত সম্পূর্ণ ত্বক দিয়ে শ্বাসকার্য চালায় তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুলকা দিয়ে শ্বসন ক্রিয়া চলে।

চিত্র 1.10 ঃ অ্যানিলিডার মেটামেয়ারে উপস্থিত অঙ্গসমূহ।

10. অন্ত্র পরিবেষ্টিত নার্ভ রিং ও অঙ্কীয় স্নায়ু রজ্জু দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়।

11. অধিকাংশ প্রাণী উভলিঙ্গ, কয়েকটি প্রাণী একলিঙ্গ।

(c) **পর্ব—অ্যানিলিডার উদাহরণ ( Examples of Phylum— Annelida ) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. কেঁচো | *Pheretima posthuma* ( *ফেরেটিমা পস্‌থুমা* ) |
| 2. জোঁক | *Hirudinaria granulosa* ( *হিরুডিনেরিয়া গ্র্যানুলোসা* ) |
| 3. নেরিস | *Nereis virens* ( *নেরিস ভাইরেনস্‌* ) |
| 4. সমুদ্র মূষিক | *Aphrodite australis* ( *অ্যাফ্রোডাইট অস্ট্রালিস্‌* ) |
| 5. কিটোপটেরাস | *Chaetopterus sp* ( *কিটোপটেরাস প্রজাতি* ) |
| 6. টেরেবেলা | *Terebella sp* ( *টেরেবেলা প্রজাতি* ) |

● **পর্ব—নিডারিয়া ও পর্ব—অ্যানিলিডার পার্থক্য (Difference between Phylum-Cnidaria and Phylum-Annelida) ঃ**

| নিডারিয়া | অ্যানিলিডা |
|---|---|
| 1. দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম। | 1. দেহ দ্বি-পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। |
| 2. ডিপ্লোব্লাসটিক প্রাণী অর্থাৎ দেহ এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মযুক্ত। | 2 ট্রিপ্লোব্লাসটিক প্রাণী অর্থাৎ দেহ এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোশস্তর দিয়ে তৈরি। |
| 3. নিমাটোসিস্টযুক্ত নিডোব্লাস্ট কোশ বর্তমান। | 3. নিডোব্লাস্ট কোশ থাকে না। |
| 4. দেহে আংটির মতো খণ্ডক থাকে না। | 4. দেহে অনেকগুলি আংটির মতো খণ্ড আছে। |

## ❂ পর্ব—আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদ  Phylum–Arthropoda ❂

**[ Arthropoda : Gr. *Arthron* = Joint (সন্ধি) + *podos* = leg (পদ) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ যে সব প্রাণীদের সন্ধিল উপাঙ্গ, কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল থাকে এবং যাদের দেহ মেটামেরিক খণ্ডযুক্ত ও দ্বিপার্শীয়ভাবে প্রতিসম তাদের আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদ বলে।**

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য ( Salient features ) ঃ**

*1. দেহের প্রতি খণ্ডে একজোড়া করে **সন্ধিল উপাঙ্গ** (Jointed appendages) আছে।

চিত্র 1.11 ঃ একটি সন্ধিপদ প্রাণীর (চিংড়ি) সংবহনতন্ত্র।

*2. দেহ ত্রিস্তর কোশযুক্ত, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং **মেটামেরিক** (Metameric) **খণ্ডযুক্ত**।

*3. বহিঃকঙ্কাল **কাইটিনযুক্ত** (Chitinous) কিউটিকল দিয়ে তৈরি।

4. পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ; মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র দেহের দু'প্রান্তে থাকে।

*5. দেহগহ্বরকে **হিমোসিল** (Hemocoel) বলে।

6. পৃষ্ঠদেশে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনি নিয়ে মুক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত হয়।

7. ফুলকা, বুক গিল (Book gill), বুক লাঙ (Book lung), শ্বাসনালি (Trachea) ইত্যাদি শ্বসন অঙ্গের কাজ করে।

8. ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubule), গ্রিন গ্রন্থি (Green gland), কক্সাল গ্রন্থি (Coxal gland) ইত্যাদি রেচন যন্ত্রের কাজ করে।

চিত্র 1.12 ঃ সন্ধিপদের মুক্তসংবহনতন্ত্র।

9. স্নায়ুতন্ত্র উন্নত ধরনের — মস্তিষ্ক ও একজোড়া নিরেট স্নায়ু রজ্জু, বক্ষ ও উদর গ্যাংলিয়া নিয়ে গঠিত হয়।

10. সাধারণত একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায়।

11. পুঞ্জাক্ষি বা সরলাক্ষি থাকে।
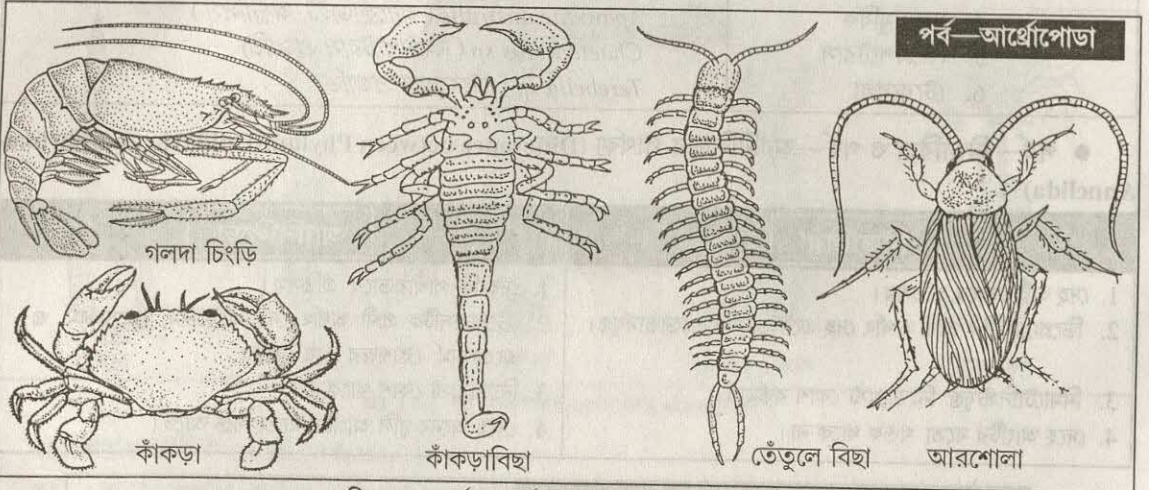
চিত্র 1.13 ঃ পর্ব—আর্থ্রোপোডার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

(c) **পর্ব—আর্থ্রোপোডার উদাহরণ ( Examples of Phylum— Arthropoda ) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. আরশোলা | *Periplaneta americana* ( *পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা* ) |
| 2. মাছি | *Musca domestica* ( *মাসকা ডোমেস্টিকা* ) |

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 3. কিউলেক্স মশা | *Culex fatigans* (*কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যানস্*) |
| 4. গলদা চিংড়ি | *Macrobrachium rosenbergii* (*ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবার্গি*) |
| 5. কাঁকড়া | *Cancer sp* (*ক্যানসার প্রজাতি*) |
| 6. কাঁকড়া বিছা | *Buthus sp* (*বুথাস প্রজাতি*) |
| 7. তেঁতুলে বিছা | *Scolopendra sp* (*স্কোলোপেন্ড্রা প্রজাতি*) |

● **পর্ব—অ্যানিলিডা ও পর্ব—আর্থ্রোপোডার পার্থক্য (Difference between Phylum–Annelida and Phylum–Arthropoda) :**

| অ্যানিলিডা | আর্থ্রোপোডা |
|---|---|
| 1. দেহ খণ্ডকগুলি দেহের বাইরের দিকে আংটির মতো এবং ভিতরে পর্দা দিয়ে সুস্পষ্টভাবে পৃথক থাকে। | 1. দেহ খণ্ডকগুলি আংটির মতো নয়। বহিঃকঙ্কালের মাধ্যমে খণ্ডকগুলি চেনা যায়, কিন্তু ভিতরে পর্দা থাকে না। |
| 2. বহিঃকঙ্কাল নেই এবং দেহের বহিরাবরণ কিউটিক্‌ল নির্মিত। | 2. কাইটিন নির্মিত শক্ত বহিঃকঙ্কাল থাকে। |
| 3. পা বা দেহ উপাঙ্গগুলি সন্ধিল নয়। | 3. দেহ উপাঙ্গগুলি সন্ধিল প্রকৃতির। |
| 4. হিমোসিল থাকে না। | 4. হিমোসিল থাকে। |
| 5. প্রাণীর দেহে বন্ধ সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। | 5. প্রাণীর দেহে মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। |
| 6. দেহকে বিভাজিত করা যায় না। | 6. দেহ মস্তক, বক্ষ, উদর অথবা শিরোবক্ষ ও উদরে বিভক্ত। |
| 7. সাধারণত ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। | 7. নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ আছে, যেমন— ফুলকা, বুক গিল, বুক লাং, ট্রাকিয়া ইত্যাদি। |
| 8. এদের রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়াম। | 8. এদের রেচন অঙ্গ ম্যালপিজিয়ান নালিকা, গ্রিন গ্রন্থি, কক্সাল গ্রন্থি ইত্যাদি। |
| 9. এরা সাধারণত উভলিঙ্গ। | 9. এরা প্রধানত একলিঙ্গ প্রাণী। |

● **সিলোমাটা ও সিউডোসিলোমাটার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Coelomata and Pseudocoelomata) :**

| সিলোমাটা | সিউডোসিলোমাটা |
|---|---|
| 1. প্রাণীদেহ গহ্বরযুক্ত বা সিলোমযুক্ত হয়। | 1. প্রাণীদেহে প্রকৃত সিলোম থাকে না। এর পরিবর্তে ছদ্ম সিলোম (Pseudocoelom) থাকে। |
| 2. সিলোম মেসোডার্ম কোশ দিয়ে আবৃত থাকে। | 2. ছদ্ম সিলোম মেসোডার্ম কোশ দিয়ে আবৃত থাকে না। |
| 3. উদাহরণ—অ্যানিলিডা থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত সব প্রাণী। | 3. উদাহরণ— নিমাটোডা পর্বভুক্ত প্রাণী (গোলকৃমি)। |

## ❂ পর্ব—মোলাস্কা বা কম্বোজ Phylum–Mollusca ❂

**[ Mollusca : Gr. *Mollis* = Soft (নরম) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যেসব প্রাণীদের দেহ নরম ও অখণ্ডিত, বহিঃকঙ্কাল ক্যালশিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি এবং যাদের দেহে ম্যান্টল পর্দার আবরণ থাকে তাদের মোলাস্কা বলে।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

*1. দেহ **নরম ও অখণ্ডিত**।

*2. দেহের বহিঃকঙ্কাল বা খোলক (Shell) ক্যালশিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। কয়েকটি প্রাণীতে (যেমন—অক্টোপাস, সিপিয়া ইত্যাদি) খোলক দেহের ভিতরে থাকে।

*3. খোলকের ভিতরের দিকে **ম্যান্টল** (Mantle) পর্দা থাকে যা প্রাণীর সমগ্র ভিসার‍্যাল মাস (Visceral mass) বা অন্তর পিণ্ডকে আবৃত করে রাখে।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।
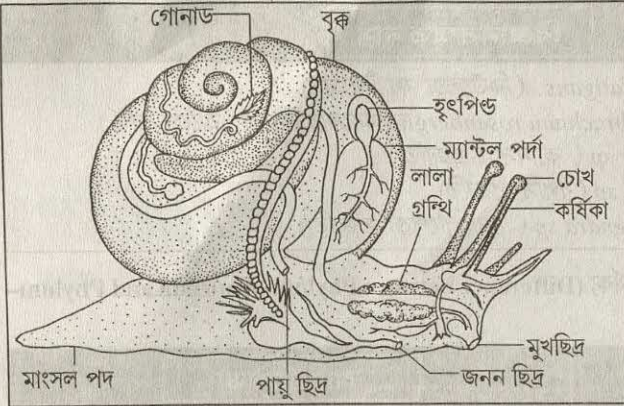
চিত্র 1.15 : একটি শামুকের দেহে অভ্যন্তরিন অঙ্গাসমূহ ( খোলক বাদ আছে)।

*4. সুস্পষ্ট মাথা ও মাংসল চ্যাপটা পা উপস্থিত।
5. দেহ অপ্রতিসম বা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।
6. জলজ শ্বসনঅঙ্গ ফুলকা বা টিনিডিয়াম (Ctenidium) ও স্থলজ শ্বসনঅঙ্গ ফুসফুসীয় থলি।
7. বৃক্ক বা বজানাসের অঙ্গ (Organ of Bojanus) রেচনের কাজ করে।
8. বেশির ভাগ প্রাণী একলিঙ্গ, কয়েকটি উভলিঙ্গ।
9. বহিঃনিষেক বা অন্তঃনিষেক ঘটে।
10. জীবনচক্রে ট্রোকোফোর (Trochophore) বা ভেলিজার (Veliger) লার্ভা দেখা যায়।

চিত্র 1.14 : পর্ব—মোলাস্কার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

(c) **পর্ব—মোলাস্কার উদাহরণ ( Examples of Phylum— Mollusca ) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. জলজ শামুক | *Pila globosa* ( *পাইলা গ্লোবোসা* ) |
| 2. স্থলজ শামুক | *Achatina fulica* ( *অ্যাকাটিনা ফুলিকা* ) |
| 3. ঝিনুক | *Lamellidens marginalis* ( *ল্যামেলিডেনস্ মারজিনেলিস্* ) |
| 4. অক্টোপাস | *Octopus lentus* ( *অক্টোপাস লেন্টাস্* ) |
| 5. মুক্তা ঝিনুক | *Pinctada vulgaris* ( *পিঙ্কটাডা ভালগারিস* ) |
| 6. নটিলাস | *Nautilus sp.* ( *নটিলাস প্রজাতি* ) |

## ❂ পর্ব—একাইনোডারমাটা বা কণ্টকত্বক Phylum—Echinodermata ❂

**[ Echinodermata : Gr. *Echinos* = hedgehog, (কাঁটাযুক্ত প্রাণী) + *derma* = skin (ত্বক) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যেসব প্রাণীর দেহের ত্বকে কাঁটা বা অসিকল্ থাকে এবং যাদের দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম ও যাদের জল সংবহনতন্ত্র থাকে তাদের একাইনোডারমাটা বলে।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) ঃ**

*1. দেহের ত্বকে চুন দিয়ে তৈরি কাঁটা বা **অসিকল্** (Ossicle) থাকে।

*2. দেহ **অরীয়ভাবে প্রতিসম** এবং পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত (Pentamerous radial symmetry)।

*3. দেহে বিভিন্ন প্রকার নালির সাহায্যে **জল সংবহন তন্ত্র** (Water vascular system) বর্তমান।

*4. ত্রিস্তর কোশ বিশিষ্ট দেহ (Triploblastic) **ওরাল** (Oral) এবং **অ্যাবোরাল** (Aboral) তলে বিভেদিত।
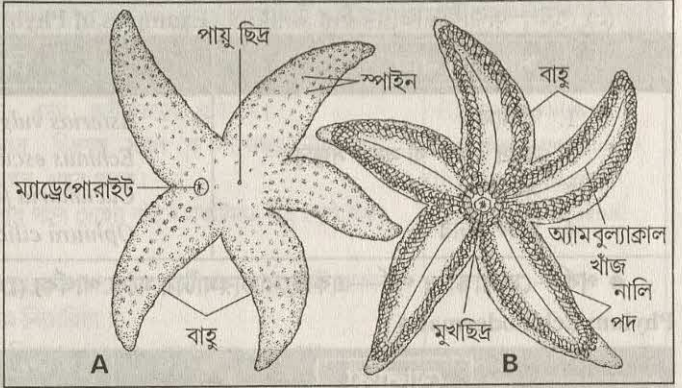
চিত্র 1.16 ঃ (A) একটি তারামাছের অ্যাবোরাল তল এবং (B) ওরাল তল।
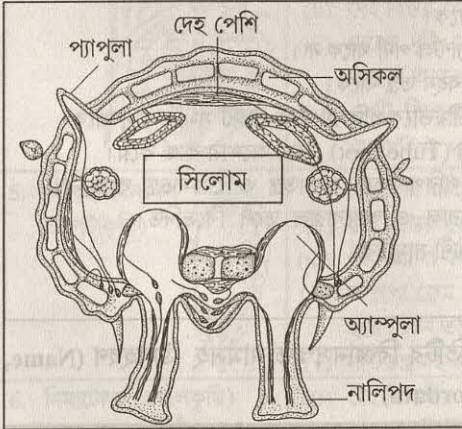
চিত্র 1.17 ঃ তারামাছের একটি বাহুর প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

*5. দেহের পাঁচটি বাহুর ওরাল তলে পাঁচটি **অ্যাম্বুল্যাক্রাল** (Ambulacral) **গ্রুভ** বা খাঁজ থাকে।

*6. অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজের দু'দিকে সারিবদ্ধভাবে **নালিপদ** (Tube foot) থাকে যা প্রাণীর গমন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

7. নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ ও রেচন অঙ্গ থাকে না।

8. দেহগহ্বর থেকে পাতলা থলির মতো প্রবর্ধিত অঙ্গ বা **প্যাপুলি** (Papulae ) শ্বসন অঙ্গের কাজ করে।

9. স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদ অঙ্গ প্রাচীন ধরনের ও অনুন্নত।

10. প্রধানত একলিঙ্গ প্রাণী।

11. যৌন জনন পদ্ধতিতে জননক্রিয়া ঘটে।

12. সাধারণত বহিঃনিষেক দেখা যায়।

13. সিলিয়াযুক্ত বিভিন্ন প্রকার লার্ভা দশা পাওয়া যায় যেমন—বাইপিনারিয়া, ব্রাকিওলারিয়া, ডলিওলারিয়া ইত্যাদি।

14. এই পর্বের সমস্ত প্রাণীই সামুদ্রিক।

চিত্র 1.18 ঃ পর্ব—একাইনোডারমাটার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।
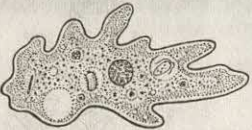
(c) পর্ব—একাইনোডারমাটার উদাহরণ (Examples of Phylum—Echinodermata) :
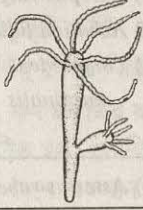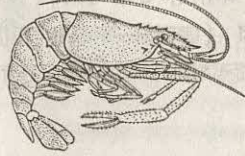
| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. তারামাছ | *Asterias vulgaris* ( *অ্যাস্‌টেরিয়াস ভালগারিস্‌* ) |
| 2. সমুদ্র কেক বা সমুদ্র সজারু | *Echinus esculentus* ( *ইকাইনাস এস্‌কুলেন্টাস্‌* ) |
| 3. সমুদ্রশশা | *Cucumaria frondosa* ( *কুকুমেরিয়া ফ্রনডোসা* ) |
| 4. ব্রিটল স্টার | *Ophiura ciliaris* ( *ওফিউরা সিলিয়ারিস* ) |
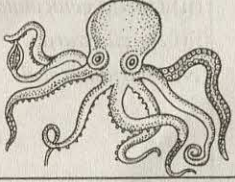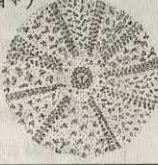
● **পর্ব—মোলাস্কা ও পর্ব—একাইনোডারমাটার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Phylum Mollusca and Phylum Echinodermata) :**

| মোলাস্কা | একাইনোডারমাটা |
|---|---|
| 1. চুন দিয়ে তৈরি বহিঃকঙ্কাল বা খোলক থাকে। | 1. বহিঃকঙ্কাল থাকে না। তবে চুন দিয়ে তৈরি কাঁটা বা অসিকল্ ত্বকে থাকে। |
| 2. দেহে ম্যান্টল পর্দার আবরণ থাকে। | 2. দেহে ম্যান্টল পর্দা থাকে না। |
| 3. জল সংবহন তন্ত্র থাকে না। | 3. জল সংবহন তন্ত্র থাকে। |
| 4. দেহ অপ্রতিসম বা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। | 4. দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম এবং পাঁচটি সমান ভাগ থাকে। |
| 5. চলন অঙ্গ হল মাংসল পদ। | 5. নালিপদ (Tube foot) চলন অঙ্গের কাজ করে। |
| 6. নির্দিষ্ট পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র থাকে। | 6. নির্দিষ্ট পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র থাকে না। |
| 7. দেহে ওরাল ও অ্যাবোরাল তল থাকে না। | 7. দেহ ওরাল ও অ্যাবোরাল তলে বিভেদিত। |
| 8. স্থল, স্বাদুজল, নোনাজল, বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণীরা অবস্থান করে। | 8. সমস্ত প্রাণী সামুদ্রিক। |

● **অকর্ডাটা অন্তর্ভুক্ত পর্বগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিটির বিজ্ঞানসম্মত নামসহ উদাহরণ (Name, Characters and Examples of Main Phyla belong to Non-Chordata) :**

| পর্বের নাম (বা বিভাগ) | প্রধান বৈশিষ্ট্য | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|
| **1. প্রোটোজোয়া** (আদ্য প্রাণী) | (i) আণুবীক্ষণিক এককোশী কোশপ্রাচীরবিহীন আদি প্রাণী।<br>(ii) দেহ লম্বাটে, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা থালার মতো হয়।<br>(iii) ক্ষণপদ, ফ্ল্যাজেলা অথবা সিলিয়া গমনাঙ্গ হিসেবে কাজ করে।<br>(iv) এদের একটি বা দুটি (যেমন—প্যারমেসিয়াম) আবার কোনো কোনো প্রাণীর দেহে বহু নিউক্লিয়াস (যেমন—ওপালিনা থাকে।)<br>(v) দেহে সংকোচনশীল গহ্বর থাকে। | (i) *Amoeba proteus*<br>(ii) *Euglena viridis*<br>(iii) *Paramecium caudatum*<br>(iv) *Entamoeba histolytica* |
| **2. পরিফেরা** (ছিদ্রাল | (i) দেহের কোশগুলি দুটি স্তরে বিন্যাস থাকে। এদের মাঝে মেসেনকাইম নামে জেলির মতো পদার্থ থাকে।<br>(ii) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অস্টিয়া নামে বহু ছিদ্র ছাড়া এদের দেহের মুক্ত প্রান্তে অসকিউলাম নামে একটি বড়ো আকারের ছিদ্র আছে।<br>(iii) দেহের ভিতরে নালিকা তন্ত্র আছে।<br>(iv) দেহে কায়ানোসাইট কোশ দিয়ে ঘেরা একাধিক গহ্বর বা স্পঞ্জোসিল আছে। | (i) *Scypha gilatinosum*<br>(ii) *Spongilla lacustris*<br>(iii) *Euplectella aspergillum*<br>(iv) *Poterion neptuni* |

| পর্বের নাম (বা বিভাগ) | প্রধান বৈশিষ্ট্য | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|
| 3. নিডারিয়া (একনালিদেহী প্রাণী) | (i) দেহ দ্বিস্তরীয় এবং অরীয়ভাবে প্রতিসম।<br>(ii) দেহে একটিমাত্র ছিদ্রযুক্ত সরল বা শাখাযুক্ত নালি বা গ্যাস্ট্রোভাসকুলার গহ্বর থাকে।<br>(iii) গ্যাস্ট্রোভাসকুলার গহ্বর দেহের বাইরে একটিমাত্র ছিদ্র (মুখ ছিদ্র) দিয়ে মুক্ত।<br>(iv) দেহ ত্বকের নিডোব্লাস্ট কোশে নিমাটোসিস্ট আছে। (এই কারণে এই পর্বের নাম নিডারিয়া)।<br>(v) জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত প্ল্যানুলা লার্ভা দশা দেখা যায়। | (i) *Hydra vulgaris*<br>(ii) *Obelia geniculata*<br>(iii) *Aurelia aurita*<br>(iv) *Metridium senil.* |
| 4. টিনোফোরা (চিরুনিপ্লেটযুক্ত প্রাণী) | (i) নরম জীবদেহের প্রাণী যাদের দেহে কম্ব প্লেট বা চিরুনিপ্লেট থাকে। এদের কম্ব জেলি বলে।<br>(ii) দেহ দ্বিস্তর কোশযুক্ত সিলোমবিহীন প্রাণী।<br>(iii) দেহের দুটি মেরু অর্থাৎ দুটি প্রান্ত আছে—ওরাল (মুখছিদ্র) প্রান্ত ও অ্যাবোরাল (পায়ু) প্রান্ত।<br>(iv) একটি বিশেষভাবে গঠিত অ্যাবোরাল তলে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা স্টাটোসিস্ট থাকে। | (i) *Beroe forskalii*<br>(ii) *Hormiphora plumosa*<br>(iii) *Pleurobranchia pileus*<br>(iii) *Tonoplana sp.* |
| 5. প্লাটিহেলমিন্থিস্ (চ্যাপটাকৃমি) | (i) দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, উপর-নীচ চ্যাপটাদেহ।<br>(ii) দেহ ত্রিস্তর কোশযুক্ত কিন্তু দেহগহ্বর বা সিলোম থাকে না।<br>(iii) পত্রাকার বা ফলকাকার দেহ, অগ্রাংশে মুখছিদ্র ও চোষক **থাকে**।<br>(iv) অসংখ্য ফ্লেম কোশ শাখাপ্রশাখাযুক্ত রেচননালির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রেচন তন্ত্র তৈরি করে।<br>(v) নার্ভতন্ত্র মই-এর আকৃতি যুক্ত হয়। | (i) *Dugesia tigrina*<br>(ii) *Taenia solium*<br>(iii) *Fasciola hepatica*<br>(iv) *Echinococcus granulosus* |
| 6. নিমাটোডা (গোলকৃমি) | (i) দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, নলাকৃতি, অখণ্ডিত ও দুপ্রান্ত ছুঁচোলো।<br>(ii) দেহগহ্বরটি সিউডোসিলোম যুক্ত (অর্থাৎ ছদ্ম দেহগহ্বরযুক্ত)।<br>(iii) দেহ শক্ত কিউটিকল দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(iv) একজোড়া পার্শ্বীয় রেচননালি দিয়ে রেচন তন্ত্র গঠিত।<br>(v) এক লিঙ্গ প্রাণী, যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায়। | (i) *Ascaris lumbricoides*<br>(ii) *Wuchereria bancrofti*<br>(iii) *Nector americanus*<br>(iv) *Ancylostoma duodenale* |
| 7. অ্যানিলিডা (অঙ্গুরিমাল) | (i) দেহ দ্বিপার্শীয় প্রতিসম।<br>(ii) দেহ অসংখ্য আংটির মতো খণ্ডক বা সোমাইট বা মেটামিয়ার নিয়ে গঠিত।<br>(iii) দেহের প্রতি খণ্ডকে সিটা নামে একজোড়া চলন অঙ্গ থাকে।<br>(iv) দেহের প্রতিটি খণ্ডকে অন্তত এক জোড়া করে নেফ্রিডিয়া রেচনতন্ত্র তৈরি করে।<br>(v) গমনাঙ্গ হল সিটা বা প্যারাপোডিয়া। | (i) *Pheretima posthuma*<br>(ii) *Hirudinaria granulosa*<br>(iii) *Neanthes dumerilli*<br>(iv) *Aphrodite australis* |
| 8. আর্থ্রোপোডা (সন্ধিপদী) | (i) দেহে সন্ধিল উপাঙ্গ আছে।<br>(ii) দেহ কাইটিন নামে শক্ত বহিঃকঙ্কাল দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(iii) দেহে হিমোসিল নামে দেহগহ্বর থাকে।<br>(iv) পায়ু ও মুখছিদ্র দেহের বিপরীত প্রান্তে থাকে এবং পৌষ্টিক নালিটি সম্পূর্ণ।<br>(v) এদের সংবহনতন্ত্র মুক্ত প্রকৃতির। | (i) *Macrobrachium rosenbergi*<br>(ii) *Anopheles stephensi*<br>(iii) *Bombyx mori*<br>(iv) *Periplaneta americana* |

| পর্বের নাম (বা বিভাগ) | প্রধান বৈশিষ্ট্য | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|
| 9. মোলাস্কা (কম্বোজ) | (i) দেহ নরম, অখণ্ডিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্ত খোলক দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(ii) দেহের আন্তরযন্ত্রটি ম্যান্টল নামে পেশিময় পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(iii) দেহের অঙ্কদেশে থালার মতো মাংসল পা আছে।<br>(iv) একটি, দুটি বা চারটি বৃক্ক রেচন তন্ত্র গঠন করে। | (i) *Pila globosa*<br>(ii) *Octopus vulgaris*<br>(iii) *Achatina fulica*<br>(iv) *Lamellidens marginalis* |
| 10. একাইনোডারমাটা (কন্টকত্বক) | (i) দেহের বাইরের অংশ চুন দিয়ে তৈরি কাঁটা ও অসিকল দিয়ে আচ্ছাদিত।<br>(ii) দেহে উন্নত জলসংবহনতন্ত্র এই পর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।<br>(iii) নালি-পদ আছে যা চলনে ও খাদ্যগ্রহণে অংশগ্রহণ করে।<br>(iv) দেহ ওরাল এবং আবোরাল তলে বিভেদিত।<br>(v) প্যাপুলি হল এদের শ্বসনে সাহায্যকারী অঙ্গ। | (i) *Asterias rubens*<br>(ii) *Cucumaria frondosa*<br>(iii) *Ophiura ciliaris*<br>(iv) *Echinus esculentus* |

## ❂ 1.3. পর্ব—কর্ডাটা [(Phylum — Chordata, Gr. *chorda* = string (দড়ি)] ❂

### ▲ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসহ কর্ডাটার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Chordata with characteristics and examples)

❖ (a) **কর্ডাটার সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে সমস্ত প্রাণীদের পূর্ণাঙ্গ বা ভ্রূণ অবস্থায় অর্থাৎ জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় নোটোকর্ড (Notochord), পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, গলবিলীয় ছিদ্র, পায়ু-পরবর্তী লেজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকে তাদের কর্ডাটা ( Chordata ) বলে।**

◻ (b) **কর্ডাটা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics of Phylum Chordata ) ঃ**

* 1. **নোটোকর্ড** (Notochord) ঃ এটি একটি সরু রডের মতো বা দণ্ডের মতো নিরেট ও স্থিতিস্থাপক অঙ্গ যা স্নায়ুরজ্জুর ঠিক নীচে অবস্থান করে এবং দেহকে ঋজুতা বা দৃঢ়তা প্রদান করে। কর্ডাটা পর্বের সমস্ত প্রাণীর জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় নোটোকর্ডের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। **নোটোকর্ড কথাটি থেকে কর্ডাটা** (Chordata) **নামকরণ করা হয়েছে।**

মেরুদণ্ডী পর্বের প্রাণীদের নোটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ দশায় মেরুদণ্ডের একটি প্রধান অংশ সেন্ট্রামে (Centrum) রূপান্তরিত হয়।

* 2. **গলবিলীয় ছিদ্র** (Pharygeal slit) ঃ মুখছিদ্রের ঠিক পরে অন্ননালির অংশকে গলবিল (pharynx) বলে। কর্ডাটা পর্বের সমস্ত প্রাণীতে জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় এই গলবিলে কয়েকটি ছিদ্র গঠিত হয়। এই ছিদ্রগুলিকে গলবিলীয় ছিদ্র (Pharyngeal slit) বলে।
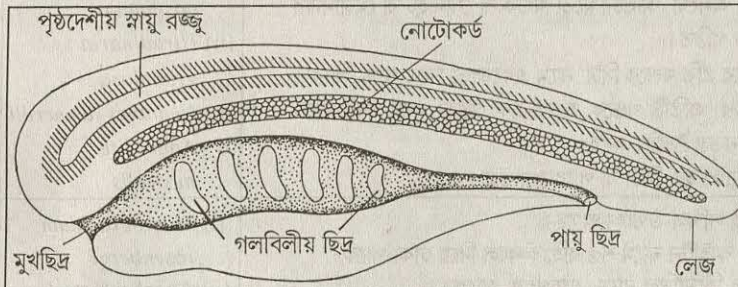
চিত্র 1.19 ঃ একটি আদর্শ কর্ডাটা প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

কোনো কোনো কর্ডাটা প্রাণীর (যেমন— মাছ) এই ছিদ্রের দুদিকে ফুলকা থাকে। অন্যান্য উচ্চ শ্রেণির কর্ডাটা প্রাণীদের (যেমন—উভচর, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী) গলবিলীয় ছিদ্র ভ্রূণ অবস্থায় দেখা যায় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দশায় এটি অবলুপ্ত হয়।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

*3. **পৃষ্ঠদেশীয়, ফাঁপা, নলাকৃতি স্নায়ুরজ্জু** (Dorsal, hollow, tubular nerve cord) : সমস্ত কর্ডাটা প্রাণীদের পৃষ্ঠদেশ বরাবর ফাঁপা, নলাকৃতি স্নায়ুরজ্জু এক্টোডার্ম স্তর থেকে গঠিত হয়। এই স্নায়ুরজ্জুর ভিতরের গহ্বরকে **নিউরোসিল** (Neurocoel) বলে এবং এখানে একপ্রকার তরল পদার্থ উপস্থিত থাকে।

*4. **পায়ু-পশ্চাৎ লেজ** (Post-anal tail) : পায়ুর পশ্চাৎবর্তী অঞ্চলে প্রবর্ধিত দেহাংশকে লেজ বলে। লেজের ভিতর দেহের পেশিখণ্ড ও নোটোকর্ডের বর্ধিত অংশ থাকে। সমস্ত কর্ডাটা প্রাণীদের জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় লেজ গঠিত হয়।

মেরুদণ্ডী কর্ডাটা প্রাণীদের ভিতর কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ দশায় লেজ সক্রিয়ভাবে গমনে সহায়তা করে (যেমন— মাছ), কিছু ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে থাকে (যেমন — মানুষের কক্সিক্স) কিংবা লেজটি বিনষ্ট হয় (যেমন— ব্যাং)।

5. **বন্ধ প্রকৃতির রক্তসংবহন তন্ত্র** (Closed Circulatory system) : হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও রক্তজালক নিয়ে রক্তসংবহন তন্ত্র গঠিত হয়। লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে শ্বাসরঞ্জক হিমোগ্লোবিন থাকে। সংকোচন-প্রসারণশীল হৃৎপিণ্ড দেহের অঙ্কীয় দেশে অবস্থান করে।

6. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।

7. ত্রিস্তরীয় (Triploblastic) কোশ থেকে সমগ্র দেহ গঠিত হয়।

8. সিলোম উপস্থিত এবং এখানে বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র থাকে।

9. দেহের অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ সুস্পষ্ট।

10. একলিঙ্গ প্রাণী এবং শুধুমাত্র যৌন জনন পদ্ধতি ঘটে।

### ◘ (c) কর্ডাটা পর্বের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Phylum-Chordata) :

বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে কর্ডাটা পর্বের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই গ্রন্থে **জে. জেড. ইয়ং (J. Z. Young, 1981)** প্রণীত **Life of Vertebrates, 3rd edition, Oxford University Press,** গ্রন্থের শ্রেণিবিন্যাস রীতি অনুসরণ করা হল।

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের চারটি উপপর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন —

(1) **হেমিকর্ডাটা** (Hemichordata) বা **অ্যাডেলোকর্ডাটা** (Adelochordata), (2) **ইউরোকর্ডাটা** (Urochordata) বা **টিউনিকেটা** (Tunicata), (3) **সেফালোকর্ডাটা** (Cephalochordata) বা **আক্রেনিয়া** (Acrania) (4) **ভার্টিব্রেটা** (Vertebrata) বা **ক্রেনিয়েটা** (Craniata)।

**● প্রোটোকর্ডেটস্ ●**

হেমিকর্ডাটা, ইউরোকর্ডাটা ও সেফালোকর্ডাটা — এই তিন গোষ্ঠীর কর্ডেট প্রাণীদের দেহ সংগঠন সরল প্রকৃতির এবং অন্যান্য কর্ডেটদের থেকে আলাদা। তাই বিজ্ঞানীরা এদের একটি গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেন ও নাম দেন **প্রোটোকর্ডেট (Protochordate)**। প্রোটোকর্ডেটদের অবস্থান মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যবর্তী স্থানে।

### ● নোটোকর্ড এবং নার্ভকর্ডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between nerve cord and notochord) :

| নোটোকর্ড | নার্ভকর্ড |
|---|---|
| 1. নোটোকর্ড কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদেহের নিরেট ও দণ্ডাকার অংশ। | 1. নার্ভকর্ড কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহের ফাঁপা ও নলাকার অংশ। |
| 2. গহ্বরযুক্ত চ্যাপটা কোশ নিয়ে গঠিত। | 2. নিউরোন নিয়ে গঠিত। |
| 3. এটি কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহের পৃষ্ঠদেশের স্থিতিস্থাপক দণ্ড। | 3. এটি নোটোকর্ডযুক্ত প্রাণীর পৃষ্ঠদেশে এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ বিশেষ। |
| 4. এর থেকে মেরুদণ্ড সৃষ্টি হয়। | 4. এর থেকে নার্ভ সৃষ্টি হয়। |
| 5. দেহের অক্ষীয় ভার বহন করে। | 5. দেহের নার্ভ আবেগ পরিবহন করে। |

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

● কর্ডাটা পর্বের শ্রেণিবিন্যাসের ছক (Chart of classification of Phylum–Chordata) ঃ

## ▲ উপপর্ব 1. হেমিকর্ডাটা বা অ্যাডেলোকর্ডাটা (Hemichordata or Adelochordata) ঃ

[ Subphylum—Hemichordata : Gr. *Hemi* = half (অর্ধ) + chordata = কর্ডাটা ]

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যেসব কর্ডাটা প্রাণীর দেহ প্রোবোসিস্ কলার ও দেহকাণ্ডে বিভক্ত এবং যাদের নোটোকর্ড থাকে না তাদের হেমিকর্ডাটা বলে।**

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

1. সামুদ্রিক প্রাণী, সাধারণত সমুদ্রতটে গর্তে বসবাস করে।
*2. নরম, অনমনীয় ও **কঙ্কাল বর্জিত** দেহ।
*3. দেহ তিনটি ভাগে বিভক্ত — **প্রোবোসিস্** (Proboscis), **কলার** (Collar) ও **দেহকাণ্ড** (Trunk)।
4. নোটোকর্ড অনুপস্থিত।
*5. **গলবিলীয় ছিদ্র** (Pharyngeal slit) উপস্থিত।
*6. পৃষ্ঠদেশীয় **স্নায়ুরজ্জু** প্রধানত নিরেট (Solid) প্রকৃতির, তবে কোনো কোনো প্রজাতিতে এটি নলাকৃতি।
7. পায়ু-পরবর্তী লেজ অনুপস্থিত।
8. জীবনচক্রে **টরনেরিয়া** (Tornaria) লার্ভা দেখা যায়।

**চিত্র 1.20 ঃ** হেমিকর্ডাটা উপপর্বের কয়েকটি প্রাণী।

● **উপপর্ব— হেমিকর্ডাটাকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়,** যেমন —

● **শ্রেণি–1. এন্টেরোপনিউস্টা (Enteropneusta) ঃ**

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

*1. সামুদ্রিক প্রাণী, অ্যাকর্ণ কীট নামে পরিচিত।
2. মিউকাস-আবৃত গর্তের মধ্যে এরা বসবাস করে।
*3. দেহের তিনটি অংশ—**প্রোবোসিস, কলার ও দেহকাণ্ড**।
*4. 'U' আকৃতির অনেকগুলি গলবিলীয় ছিদ্র থাকে।
*5. মুখের সামনে উপবৃদ্ধি রূপে **স্টোমোকর্ড** দেখা যায়।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(b) **শ্রেণি—এন্টেরোপনিউস্টার উদাহরণ**—(Examples of Enteropneusta)

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ব্যালানোগ্লসাস্ | *Balanoglossus gigas* (*ব্যালানোগ্লসাস গিগাস্*) |
| 2. স্যাকোগ্লসাস্ | *Saccoglossus kowalevskii* (*স্যাকোগ্লসাস কোয়ালেভস্কি*) |

● **শ্রেণি–2. টেরোব্রাঙ্কিয়া (Pterobranchia) ঃ**

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ** 1. সামুদ্রিক, স্থানু (Sedentary) প্রাণী। *2. দেহ কতকগুলি জয়েড (Zooid) দিয়ে গঠিত হয় এবং জয়েডগুলি উপনিবেশ (Colony) তৈরি করে। 3. প্রতিটি জয়েডে প্রোবোসিস, কলার ও দেহকাণ্ড থাকে। 4. মাত্র একজোড়া গলবিলীয় ছিদ্র উপস্থিত। 5. অন্ত্র 'U' আকৃতির।

(b) **শ্রেণি—টেরোব্রাঙ্কিয়ার উদাহরণ** (Examples of Pterobranchia)—

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. সেফালোডিসকাস | *Cephalodiscus sp.* ( *সেফালোডিস্‌কাস্ প্রজাতি* ) |
| 2. র‍্যাবডোপ্লিউরা | *Rhabdopleura sp.* ( *র‍্যাবডোপ্লিউরা প্রজাতি* ) |

**• জানার বিষয় •**

পূর্বের বিজ্ঞানীরা হেমিকর্ডাটা প্রাণীদের মুখের সামনের একটি উপবৃদ্ধিকে নোটোকর্ড বলে মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা প্রকৃত নোটোকর্ডের কোশের সঙ্গে ওই উপবৃদ্ধির কোশের কোনো মিল পাননি। তাই তাঁরা ওই উপবৃদ্ধিকে **স্টোমোকর্ড** (Stomochord) বলে অভিহিত করেন এবং **হেমিকর্ডাটা** নাম বদলে **স্টোমোকর্ডাটা** (Stomochordata) নামকরণ করেন।

◎ **হেমিকর্ডাটা নামকরণ ঃ** হেমিকর্ডাটা গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে শুধুমাত্র গলবিলীয় ছিদ্র ও নার্ভকর্ড উপস্থিত থাকে; কিন্তু নোটোকর্ড ও লেজ থাকে না। সুতরাং এই প্রাণীদের মধ্যে কর্ডাটা পর্বের অর্ধেক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে বলে এদের **হেমিকর্ডাটা** (Hemichordata) বলা হয়।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী হেমিকর্ডাটাকে অকর্ডাটা হিসেবে গণ্য করেন এবং অকর্ডাটার ভিতর একটি পৃথক পর্ব অর্থাৎ পর্ব—হেমিকর্ডাটা সৃষ্টি করেন।

## ▲ উপপর্ব 2. ইউরোকর্ডাটা বা টিউনিকেটা (Urochordata or Tunicata) ঃ

[ Urochordata : Gr. *Oura* = tail (লেজ) + chordata (কর্ডাটা) ]

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ যে সব কর্ডাটা প্রাণীর দেহ স্বচ্ছ পর্দা বা টিউনিক দিয়ে আবৃত থাকে এবং যাদের লার্ভা দশায় লেজের মধ্যে নোটোকর্ড থাকে তাদের ইউরোকর্ডাটা বলে।**

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য ( General Characteristics ) ঃ**

*1. দেহস্বচ্ছ পর্দা বা **টিউনিক (Tunic)** বা **টেস্ট (Test)** দিয়ে আবৃত থাকে। তাই এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের টিউনিকেটা (Tunicata) বলে।

*2. শুধুমাত্র লার্ভা দশায় লেজের মধ্যে নোটোকর্ড থাকে বলে এই প্রাণীদের **ইউরোকর্ডাটা** (Urochordata) বলে।

*3. গলবিলে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এবং এদের **স্টিগমাটা** (Stigmata) বলে।

*4. পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু জীবনের যে-কোনো দশায় উপস্থিত থাকে।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

*5. পায়ু-পরবর্তী লেজ জীবনের যে-কোনো দশায় (সাধারণত লার্ভা দশায়) উপস্থিত থাকে।

*6. গলবিল অঞ্চলকে ঘিরে পর্দাবৃত কক্ষকে **এট্রিয়াম** (Atrium) বলে।

- **উপপর্ব—ইউরোকর্ডাটাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—**

**শ্রেণী— 1. অ্যাসিডিয়েসিয়া (Ascidiacea) ঃ**

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

1. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী চলনে অক্ষম অর্থাৎ স্থাণু।

*2. এককভাবে অথবা উপনিবেশ গঠন করে সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করে।

*3. লার্ভার **রেট্রোগ্রেসিভ রূপান্তর** (Retrogressive metamorphosis) ঘটে। অর্থাৎ কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন— নোটোকর্ড, নার্ভকর্ড, লেজ ইত্যাদি) লার্ভা দশায় সুগঠিত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দশায় বিলুপ্ত হয়।

*4. গলবিল অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।

(b) **শ্রেণি–অ্যাসিডিয়েসিয়ার উদাহরণ (Examples of class Ascidiacea) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. অ্যাসিডিয়া | *Ascidia mentula* ( *অ্যাসিডিয়া মেন্টুলা* ) |

**শ্রেণি—2. থ্যালিয়েসিয়া (Thaliacea) ঃ**

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

1. স্বাধীনভাবে সমুদ্র জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

*2. কয়েকটি গলবিলীয় ছিদ্র থাকে।

*3 টিউনিক আবরণীটি স্বচ্ছ ও পাতলা।

*4 দেহপেশিগুলি বলয়াকারে সজ্জিত থাকে।

(b) **থ্যালিয়েসিয়ার উদাহরণ (Examples of Thaliacea) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ডলিওলাম | *Doliolum rarum* ( *ডলিওলাম রেরাম* ) |
| 2. সালপা | *Salpa maxima* ( *সালপা ম্যাক্সিমা* ) |

**শ্রেণি – 3. লার্ভাসিয়া (Larvacea or Appendicularia) ঃ**

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

*1. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে লার্ভার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—তাই এদের **লার্ভাসিয়া** বলে এবং প্রাণীর এই রূপকে **নিওটেনাস** (Neotenous) রূপ বলে।

2. উন্নত খাদ্য সংগ্রহ যন্ত্র (Food collecting organ) বর্তমান।

3. ভাসমান এবং সন্তরণশীল প্রাণী।

*4. উন্নত ধরনের নোটোকর্ড ও নার্ভকর্ড পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পাওয়া যায়।

*5. লম্বা লেজ উপস্থিত।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(b) **শ্রেণি লার্ভাসিয়ার উদাহরণ (Examples of class Larvacea) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ওইকোপ্লুরা | *Oikopleura albicans* (ওইকোপ্লুরা অ্যালবিকানস্) |
| 2. অ্যাপেন্ডিকিউলারিয়া | *Appendicularia sp* ( অ্যাপেন্ডিকিউলারিয়া প্রজাতি ) |

চিত্র 1.21 : উপপর্ব ইউরোকর্ডাটার অন্তর্গত কার্যকরী প্রাণী।

## ▲ উপপর্ব 3. সেফালোকর্ডাটা বা অ্যাক্রেনিয়া (Cephalochordata or Acrania) :

[ Cephalochordata : Gr. *Kephale* = head (মস্তক) + chordata (কর্ডাটা) ]

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যেসব কর্ডাটা প্রাণীর দেহে নোটোকর্ড মাথা পর্যন্ত প্রসারিত তাদের সেফালোকর্ডাটা বলে।

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) :**

*1. **নোটোকর্ড সুগঠিত** এবং মাথা পর্যন্ত প্রসারিত। এজন্য এই প্রাণীদের সেফালোকর্ডাটা বলে।

*2. **পৃষ্ঠদেশীয় নলাকার স্নায়ুরজ্জু** বর্তমান।

*3. **গলবিল অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।**

*4. **পায়ু-পরবর্তী লেজ** উপস্থিত।

চিত্র 1.22 : উপপর্ব—সেফালোকর্ডাটার অন্তর্গত প্রাণী অ্যাম্ফিওক্যাক্স।

*5. দেহ বর্শার ফলার মতো দু'দিক সরু।

6. স্বাধীন সঞ্চরণশীল অথবা বালির মধ্যে গর্তে বাস করে।

*7. গলবিলের অঙ্কদেশে **এন্ডোস্টাইল** (Endostyle) আছে।

8. 'V' আকৃতির দেহপেশি বা **মায়োটোম** (Myotome) দেহের দু'দিকে থাকে।

9. মুখছিদ্রের চারপাশে **সিরি** (Cirri) ও **ভেলাম** (Velum) থাকে।

10. পৃষ্ঠপাখনা অখণ্ডিত এবং লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

11. **এট্রিয়াম** (Atrium) এট্রিওপোরে মুক্ত হয়।
12. নেফ্রিডিয়া রেচন অঙ্গের কাজ করে।

(c) **উপপর্ব সেফালোকর্ডাটার উদাহরণ** (**Examples of Cephalochordata**) ঃ

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. অ্যাম্ফিওক্সাস্ | *Branchiostoma lanceolatum* (*ব্রাঙ্কিওস্টোমা ল্যানসিওলেটাম*) |
| 2. অ্যাসিমেট্রন | *Asymmetron sp.* (*আসিমেট্রন প্রজাতি*) |

## ▲ মেরুদণ্ডী প্রাণী Vertebrates ▲

## ◎ 1.4. মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস ◎ (Classification of Vertebrata with characteristics and examples)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যেসব কর্ডাটা প্রাণীর দেহে অস্থি দিয়ে তৈরি মেরুদণ্ড ও করোটি থাকে তাদের ভার্টিব্রেটা বা মেরুদণ্ডী বলে।**

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** (**General Characteristics**) ঃ

*1. অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র রূপে মেরুদণ্ড দেহের পৃষ্ঠদেশ বরাবর থাকে এবং **মেরুদণ্ড** ছোটো ছোটো কশেরুকা দিয়ে তৈরি হয়।
*2. সুগঠিত ক্রেনিয়াম বা **করোটি** বর্তমান।
*3. পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত **ফাঁপা, নলাকার স্নায়ুরজ্জু** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে।
*4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অগ্রভাগকে **মস্তিষ্ক** বলে (যা করোটি দিয়ে আবৃত থাকে) এবং পশ্চাৎভাগকে **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal cord) বলে যা কশেরুকা দিয়ে আবৃত থাকে।
*5. দু'জোড়া **যুগ্ম গমন অঙ্গ** বর্তমান।
6. বদ্ধসংবহন তন্ত্র এবং পেশিবহুল হৃৎপিণ্ড আছে।
7. মস্তক সুগঠিত এবং এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে চোখ, কান ও নাক উপস্থিত থাকে।
8. রেচন অঙ্গ হিসাবে বৃক্ক থাকে।

### ● চতুষ্পদ বা টেট্রাপড (Tetrapod) ●

চার পাযুক্ত অথবা চার পাযুক্ত পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত কিন্তু বর্তমানে পা-হীন (যেমন — সাপ, পা-হীন সরীসৃপ ও উভচর, ফ্লিপারযুক্ত সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী ইত্যাদি) প্রাণীদের একত্রে **চতুষ্পদ বা টেট্রাপড** (Tetrapod) বলে। উদাহরণ— সমস্ত উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী।

### ● অ্যামনিওটা ও অ্যানঅ্যামনিওটা ●

ভ্রূণে অ্যামনিয়ন (Amnion) নামে একটি বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি বা পর্দা গঠনের উপর ভিত্তি করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যেমন—

**1. অ্যামনিওটা (Amniota)** ঃ যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণে অ্যামনিয়ন (Amnion) গঠিত হয় তাদের **অ্যামনিওটা** বলে। যেমন— সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী।

**2. অ্যানঅ্যামনিওটা (Anamniota)** ঃ যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণে অ্যামনিয়ন (Amnion) গঠিত হয় না তাদের **অ্যানঅ্যামনিওটা** বলে। যেমন— মাছ ও উভচর।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

● **কর্ডাটা ও অকর্ডাটার পার্থক্য (Difference between Chordata and Non-chordata) :**

| কর্ডাটা | অকর্ডাটা |
|---|---|
| 1. **নোটোকর্ড :** জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় এটি উপস্থিত থাকে। | 1. এটি কখনও উপস্থিত থাকে না। |
| 2. **নার্ভকর্ড :** দেহের পৃষ্ঠদেশে ফাঁপা নলাকার একটিমাত্র স্নায়ুরজ্জু থাকে। | 2. দেহের অঙ্কদেশে একজোড়া নিরেট স্নায়ুরজ্জু থাকে। |
| 3. **গলবিলীয় ছিদ্র :** জীবনচক্রের যে-কোনো দশায় এটি উপস্থিত থাকে। | 3. কোনো অবস্থাতেই এটি উপস্থিত থাকে না। |
| 4. **লেজ :** পায়ু-পরবর্তী লেজ বর্তমান। | 4. প্রকৃত লেজ থাকে না। |
| 5. **হৃৎপিণ্ড :** পৌষ্টিকনালির অঙ্কদেশে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। | 5. পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। |
| 6. **সংবহনতন্ত্র :** সর্বদাই সকল প্রাণীতে বন্ধ প্রকৃতির। | 6. সব প্রাণীতে থাকে না। যখন উপস্থিত থাকে তা প্রধানত মুক্ত প্রকৃতির (ব্যতিক্রম কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি)। |
| 7. **হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র :** উপস্থিত। | 7. অনুপস্থিত। |
| 8. দেহ বহুকোশী ও ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। | 8. দেহ এককোশী বা বহুকোশী এবং বহুকোশী হলে ডিপ্লোব্লাস্টিক অথবা ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। |

● **মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীর পার্থক্য (Difference between Vertebrata and Invertebrata) :**

| অমেরুদণ্ডী | মেরুদণ্ডী |
|---|---|
| 1. **মেরুদণ্ড :** উপস্থিত থাকে না—তাই দেহ নমনীয়। | 1. প্রধান অক্ষ বরাবর পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত থাকে—দেহের দৃঢ়তা বা ঋজুতা প্রদান করে। |
| 2. **অন্তঃকঙ্কাল :** এদের অন্তঃকঙ্কাল তন্ত্র বলতে কিছু পাওয়া যায় না। | 2. অস্থি অথবা তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি সুগঠিত অন্তঃকঙ্কাল তন্ত্র থাকে। |
| 3. **করোটি ও কশেরুকা :** অনুপস্থিত। | 3. করোটি ও কশেরুকা উপস্থিত। |
| 4. **স্নায়ুতন্ত্র :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত নয়। | 4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রটি সুগঠিত মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। |
| 5. **হৃৎপিণ্ড :** নিম্নশ্রেণিতে অনুপস্থিত; উচ্চশ্রেণিতে উপস্থিত এবং সর্বদাই পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে থাকে। | 5. সর্বদাই পৌষ্টিকনালির অঙ্কদেশে উপস্থিত থাকে। |
| 6. **রক্তসংবহন তন্ত্র :** উপস্থিত থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুক্ত প্রকৃতির। | 6. সর্বদাই উপস্থিত থাকে এবং বন্ধ প্রকৃতির। |
| 7. **হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র :** অনুপস্থিত। | 7. উপস্থিত। |
| 8. **রক্তরঞ্জক :** উপস্থিত থাকলে তা রক্তরসে থাকে। | 8. সর্বদা লোহিত রক্ত কণিকাতে (RBC) রক্তরঞ্জক থাকে। |

● **অ্যাগনাথা ও ন্যাথোস্টোমাটার পার্থক্য (Difference between Agnatha and Gnathostomata) :**

| অ্যাগনাথা | ন্যাথোস্টোমাটা |
|---|---|
| 1. চোয়াল অনুপস্থিত। | 1. উপরের ও নীচের চোয়াল উপস্থিত। |
| 2. মুখছিদ্র সর্বদাই গোলাকার এবং চোষক প্রকৃতির অথবা কর্ষিকাযুক্ত। | 2. মুখছিদ্র সাধারণত লম্বাটে এবং চোষকহীন অথবা কর্ষিকাহীন। |
| 3. এদের কঙ্কালতন্ত্র তরুণাস্থি নির্মিত। | 3. এদের কঙ্কালতন্ত্র প্রধানত অস্থিনির্মিত (ব্যতিক্রম—কনড্রিকথিস্ মাছ)। |
| 4. যুগ্ম উপাঙ্গ থাকে না। | 4. যুগ্ম উপাঙ্গ উপস্থিত। |
| 5. একটিমাত্র নাসারন্ধ্র উপস্থিত। **উদাহরণ :** ল্যামপ্রে *(Petromyzon marinus)*. | 5. দুটি নাসারন্ধ্র থাকে। **উদাহরণ :** রুইমাছ *(Labeo rohita)*. |

▲ **বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী (Different types of Vertebrates) :**

চোয়ালের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যেমন—অধিশ্রেণি—অ্যাগনাথা ও অধিশ্রেণি—ন্যাথোস্টোমাটা।

## ➤ A. অধিশ্রেণি — অ্যাগ্‌নাথা বা আনাথা (Agnatha) : [ Agnatha : Gr. *Gnathos* = Jaw (চোয়াল) ]

❖ সংজ্ঞা : যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মুখের চারিদিকে চোয়াল থাকে না তাদের অ্যাগনাথা বা আনাথা (**Agnatha = Jawless, চোয়ালহীন**) বলে। যেমন— ল্যামপ্রে (Lamprey) ও হ্যাগফিস (Hagfish)।

### ○ শ্রেণি—সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata) ○

(a) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics) :**

*1. এদের মুখছিদ্র গোলাকার, তাই এদের **সাইক্লোস্টোমাটা** (Cyclostomata) বলে।

*2. এদের কঙ্কালতন্ত্র তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি হয়।

*3. এদের একটিমাত্র বহিঃনাসারন্ধ্র (Nostril) থাকে।
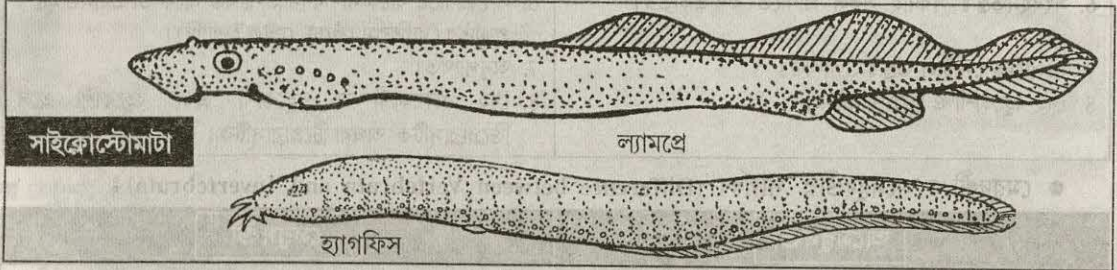
**চিত্র 1.15 :** শ্রেণি সাইক্লোস্টোমাটার অন্তর্গত দুটি প্রাণী।

(b) **শ্রেণি—সাইক্লোস্টোমাটার উদাহরণ (Examples of Class-Cyclostomata) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ল্যামপ্রে | *Petromyzon marinus* (*পেট্রোমাইজন মেরিনাস*) |
| 2. হ্যাগফিস | *Myxine glutinosa* (*মিক্সিন গ্লুটিনোসা*) |

## ➤ B. অধিশ্রেণি— ন্যাথোস্টোমাটা (Gnathostomata) :

[ Gnathostomata : Gr. *Gnathos* = Jaw (চোয়াল) ]

*1. এইসব প্রাণীদের মুখছিদ্র উপরের চোয়াল ও নীচের চোয়াল দিয়ে পরিবৃত থাকে।

*2. এদের কঙ্কালতন্ত্র সাধারণত অস্থি দিয়ে তৈরি হয়।

*3. এদের দুটি বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে।

উদাহরণ— মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী।

## ▲ অধিশ্রেণি—ন্যাথোস্টোমাটা (Superclass—Gnathostomata)

অধিশ্রেণি—ন্যাথোস্টোমাটাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—কনড্রিকথিস, অসটিকথিস, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী। এগুলি নীচে বর্ণনা করা হল।

### ✪ শ্রেণি–1. ইলাস্‌মোব্রাঙ্কি বা কনড্রিকথিস ✪
### Elasmobranchii or Chondrichthyes

[ **Chondrichthyes : Gr. *Chondros* = Cartilage (তরুণাস্থি)** ]

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : চোয়ালযুক্ত যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি নির্মিত, দেহত্বকে প্লাকয়েড আঁশ থাকে ও মুখছিদ্র অঙ্কীয়তলে থাকে তাদের কনড্রিকথিস বলে।**

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য ( General Characteristics ) :**

*1. অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি নির্মিত।

*2. দেহত্বকে ক্ষুদ্রাকার আণুবীক্ষণিক **প্লাকয়েড** (Placoid) আঁশ থাকে।

*3. মুখছিদ্র অঙ্কীয় তলে থাকে।

চিত্র 1.16 : অধিশ্রেণি—ন্যাথোস্টোমাটার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

*4. অপারক্যুলাম বা কানকো থাকে না, ফলে **ফুলকাগুলি** উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।

*5. পাখনা রশ্মি তরুণাস্থি নির্মিত।

*6. পটকা অনুপস্থিত।

*7. লেজ হেট্যারোসারক্যাল (Heterocercal) ধরনের।

8. যুগ্ম ও অযুগ্ম পাখনা দেখা যায়।

(c) **শ্রেণি—কনড্রিকথিসের উদাহরণ (Examples of Class—Chondrichthyes) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. হাঙর | *Scoliodon laticaudus* ( *স্কোলিওডন ল্যাটিকডাস* ) |
| 2. ইলেকট্রিক মাছ | *Torpedo torpedo* ( *টর্পেডো টর্পেডো* ) |
| 3. হাতুড়ি মাথা হাঙর | *Sphyrna sp.* ( *স্ফিরনা প্রজাতি* ) |
| 4. শংকর মাছ | *Trygon sp.* ( *ট্রাইগন প্রজাতি* ) |
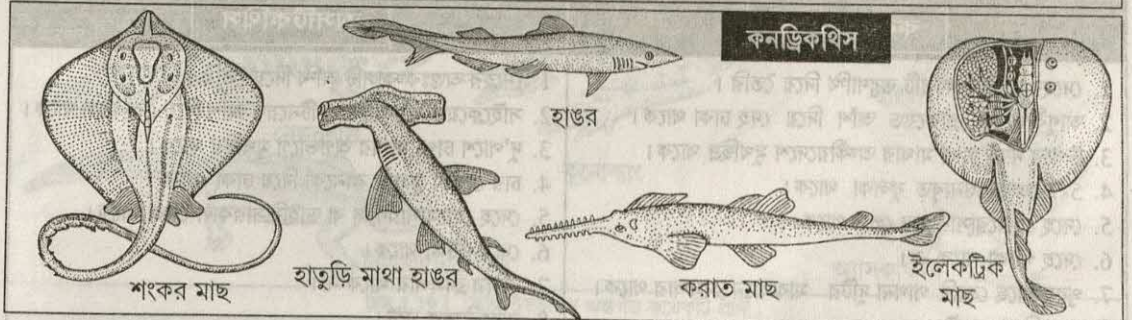
চিত্র 1.17 : শ্রেণি-কনড্রিক্থিসের কয়েকটি উদাহরণ।

## ✪ শ্রেণি–2. টেলিওস্টোমি বা অসটিকথিস Teleostomi or Osteichthyes ✪

[ **Osteichthyes : Gr.** ***Osteon*** **= bone (অস্থি)** ]

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল অস্থি নির্মিত, ফুলকাগুলি কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে, মুখছিদ্র সামনের দিকে থাকে এবং যুগ্ম ও অযুগ্ম পাখনা অস্থি নির্মিত তাদের অসটিকথিস বলে।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

*1. অন্তঃকঙ্কাল অস্থি নির্মিত।
*2. সাধারণত সাইক্লয়েড, টিনয়েড বা গ্যানয়েড আঁশ থাকে।
*3. মুখছিদ্র মাথার সামনের দিকে থাকে।
*4. ফুলকাগুলি কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে।
*5. পাখনা রশ্মি অস্থি নির্মিত।
*6. পটকা উপস্থিত।
7. হোমোসারক্যাল বা ডাইফিসারক্যাল লেজ বর্তমান।
8. যুগ্ম ও অযুগ্ম পাখনা উপস্থিত।
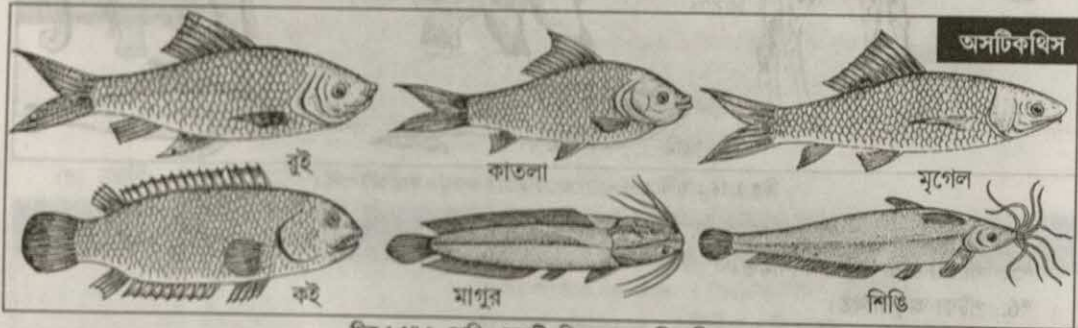
চিত্র 1.18 : শ্রেণি—অসটিকথিসের কয়েকটি প্রাণী।

(c) **শ্রেণি—অসটিকথিসের উদাহরণ (Examples of Class—Osteichthyes) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. রুইমাছ | *Labeo rohita* (লেবিও রোহিটা) |
| 2. কাতলা মাছ | *Catla catla* (কাটলা কাটলা) |
| 3. কইমাছ | *Anabas testudineus* (অ্যানাবাস টেস্টুডিনিয়াস) |
| 4. মাগুর মাছ | *Clarias batrachus* (ক্লারিয়াস ব্যাট্রাকাস) |

● **কনড্রিকথিস ও অসটিকথিসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Chondrichthyes and Osteichthyes) :**

| কনড্রিকথিস | অসটিকথিস |
|---|---|
| 1. দেহের অন্তঃকঙ্কালটি তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। | 1. দেহের অন্তঃকঙ্কালটি অস্থি দিয়ে তৈরি। |
| 2. আণুবীক্ষণিক প্লাকয়েড আঁশ দিয়ে দেহ ঢাকা থাকে। | 2. সাইক্লয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড আঁশ দিয়ে দেহ ঢাকা থাকে। |
| 3. উপরে নীচে চাপা মাথার অঙ্কীয়দেশে মুখছিদ্র থাকে। | 3. দু'পাশে চাপা মাথার অগ্রভাগে মুখছিদ্র থাকে। |
| 4. 5-7 জোড়া অনাবৃত ফুলকা থাকে। | 4. চার জোড়া ফুলকা কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। |
| 5. দেহে হেটারোসারকাল লেজ থাকে। | 5. দেহে হোমোসারকাল বা ডাইফিসারকাল লেজ থাকে। |
| 6. দেহে পটকা থাকে না। | 6. দেহে পটকা থাকে। |
| 7. পুরুষ মাছে শ্রোণি পাখনা দুটির মাঝখানে ক্লাসপার থাকে। | 7. এদের ক্লাসপার থাকে না। |
| 8. অন্তঃনিষেক ঘটে। | 8. বহিঃনিষেক ঘটে। |

● ক্যাটফিস ও ডগফিসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cat fish and Dog fish) :

| ক্যাটফিস | ডগফিস |
|---|---|
| 1. অস্থিবিশিষ্ট মাছ। | 1. তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছ। |
| 2. মুখছিদ্রকে ঘিরে কয়েকটি বার্ব থাকে। | 2. বার্ব থাকে না। |
| 3. পুচ্ছপাখনা সমান প্রকৃতির। | 3. পুচ্ছ পাখনা অসমান প্রকৃতির। |
| 4. কানকো থাকে। উদাহরণ—মাগুর, শিঙি প্রভৃতি | 4. কানকো থাকে না। উদাহরণ— হাঙর। |

## ✪ শ্রেণি—3. উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া Amphibia ✪

[ Amphibia : Gr. *Amphi* = both (উভয়) + *bios* = life (জীবন) ]

❖ (a) সংজ্ঞা ( Definition ) : যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর ত্বক বহিঃকঙ্কালহীন এবং যাদের লার্ভা দশা জলে সম্পন্ন হয় তাদের উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া বলে।

(b) সাধারণ বৈশিষ্ট্য ( General Characteristics ) :

*1. পরিণত দশায় এরা প্রাথমিকভাবে স্থলচর হলেও অপরিণত লার্ভা দশায় এরা জলে জীবনচক্র সম্পন্ন করে—তাই এদের উভচর বলে।

*2. গ্রন্থিযুক্ত, ভেজা, আঁশহীন নগ্ন ত্বক থাকে।

*3. লার্ভা দশায় বহিঃফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

4. পূর্ণাঙ্গ দশায় ফুসফুস, ত্বক ও মুখের ভিতরে মিউকাস ঝিল্লির সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

*5. হৃৎপিণ্ডের তিনটি প্রকোষ্ঠ—দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়।

*6. **এক্টোথারমিক** (Ectothermic) বা **পয়কিলোথারমিক** (Poikilothermic) বা শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। অর্থাৎ এদের দেহের তাপমাত্রা বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর অর্থ, পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এদের দেহের তাপমাত্রা বাড়ে ও পরিবেশের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে এদের দেহের তাপমাত্রা কমে যায়।

7. মাথার দু'দিকে দুটি কানের পর্দা বা **টিমপ্যানাম** (Tympanum) থাকে।

*8. দু'জোড়া পা গমনাঙ্গের কাজ করে (জিমনোফিওনা ব্যতীত) এবং অগ্রপদে চারটি আঙুল ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি আঙুল থাকে। আঙুলগুলিতে নখ থাকে না। (ব্যতিক্রম—নখযুক্ত ব্যাং—*Xenopus sp.*)।

চিত্র 1.19 : শ্রেণি-উভচরের অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

9. ভ্রূণে অ্যামনিয়ন (Amnion) পর্দা গঠিত হয় না — তাই এরা অ্যানঅ্যামনিওটিক (Anamniotic)।
10. এরা ডিম পাড়ে (Oviparous) এবং বহিঃনিষেক ঘটে।
11. দেহ মস্তক ও ধড় দুটি অংশে বিভেদিত। গলা থাকে না।
12. দশ জোড়া করোটি স্নায়ু বর্তমান।

(c) শ্রেণি—উভচরের উদাহরণ (Examples of Class—Amphibia) ঃ

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. কুনোব্যাং | *Bufo melanostictus* (*বিউফো মেলানোসটিকটাস*) |
| 2. স্যালাম্যানডার | *Ambystoma tigrinum* (*অ্যাম্বিস্টোমা টাইগ্রিনাম*) |
| 3. সোনাব্যাং | *Rana tigerina* (*রানা টাইগারিনা*) |
| 4. ইকথিওফিস | *Ichthyophis glutinosa.* (*ইকথিওফিস গ্লুটিনোসা*) |

## ❂ শ্রেণি– 4. সরীসৃপ বা রেপ্টিলিয়া Reptilia ❂

**[ Reptilia : L. *Reptilis* = to creep (হামাগুড়ি দেওয়া) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ যে সব মেরুদণ্ডী স্থলচর প্রাণীর ত্বক শুষ্ক ও এপিডারমিস নির্মিত বহিঃকঙ্কাল আবৃত এবং যাদের সামনের ও পিছনের পায়ে পাঁচটি করে নখযুক্ত আঙুল থাকে তাদের রেপ্টিলিয়া বলে।

(b) **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features)** ঃ

*1. **শুষ্কত্বকযুক্ত** দেহ এপিডারম্যাল আঁশ বা প্লেট দিয়ে থাকে।
*2. দু'জোড়া পা প্রধান গমন অঙ্গের কাজ করে।
*3. প্রতিটি পায়ে **পাঁচটি নখযুক্ত আঙুল** থাকে।
*4. হৃৎপিণ্ডে প্রধান তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে—দুটি অলিন্দ ও একটি আংশিক বিভাজিত নিলয়। (ব্যতিক্রম—কুমিরের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠযুক্ত—দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়।)
5. সম্পূর্ণরূপে **স্থলচর চতুষ্পদ** প্রাণী।
*6. **এক্টোথারমিক** (Ectothermic) বা **পয়কিলোথারমিক** (Poikilothermic) বা শীতলরক্ত বিশিষ্ট (Cold blooded) প্রাণী। অর্থাৎ এদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রার দ্বারা।
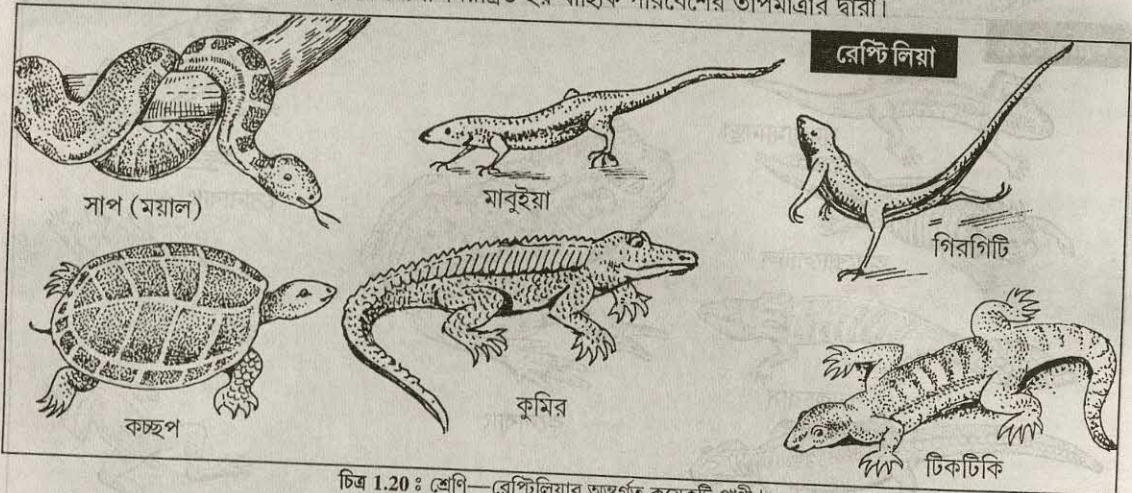
চিত্র 1.20 ঃ শ্রেণি—রেপ্টিলিয়ার অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

7. মাথার দু'দিকে দুটি **কানের পর্দা** (Tympanic membrane) থাকে (ব্যতিক্রম—সাপ)

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

8. **নিকটিটেটিং পর্দা** (Nictitating membrane) বা তৃতীয় নেত্রপল্লব থাকে।
9. করোটিতে একটিমাত্র অক্সিপিট্যাল কনডাইল (Occipital condyle) থাকে।
10. বারো জোড়া করোটি স্নায়ু বর্তমান।
11. শ্বসনক্রিয়া শুধুমাত্র ফুসফুস দিয়ে ঘটে।
12. এরা ডিম পাড়ে অর্থাৎ ওভিপ্যারাস (Oviparous), কিন্তু কোনো প্রাণী ওভোভিভিপ্যারাস (Ovoviviparous) অর্থাৎ তাদের ডিম দেহের ভিতরে থাকে এবং সেখানেই ভ্রূণদশা অতিবাহিত হয়। রূপান্তর (Metamorphosis) হয় না।
13. এরা **অ্যামনিওটিক** (Amniotic) অর্থাৎ ভ্রূণে অ্যামনিয়ন (Amnion) পর্দা সৃষ্টি হয়।
14. এদের সঙ্গম অঙ্গ বা পেনিস (Penis) আছে এবং অন্তঃনিষেক ঘটে (ব্যতিক্রম—স্ফেনোডন)।

(c) **শ্রেণি—রেপটিলিয়ার উদাহরণ (Examples of Class—Reptilia) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. গিরগিটি | *Calotes versicolor* (*ক্যালোটিস ভারসিকলার*) |
| 2. টিকটিকি | *Hemidactylus fluviviridis* (*হেমিডাক্টাইলাস ফ্লুভিভিরিডিস*) |
| 3. গোখরো | *Naja naja* (*নাজা নাজা*) |
| 4. উড়ন্ত টিকটিকি | *Draco volans* (*ড্রাকো ভোলানস্*) |

● **উভচর ও সরীসৃপের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Amphibia and Reptilia) ঃ**

| উভচর | সরীসৃপ |
|---|---|
| 1. এই প্রাণীরা প্রাথমিক স্থলচর হলেও জীবনচক্রের লার্ভা বা ব্যাঙাচি দশা জলে কাটায়; তাই এদের উভচর বলে। | 1. জীবনচক্রের ভ্রূণ দশা ডাঙায় ডিমের মধ্যে কাটায়; তাই এরা সম্পূর্ণরূপে স্থলচর। |
| 2. দেহত্বক বহিঃকঙ্কালহীন, নগ্ন। | 2. দেহত্বক আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। |
| 3. জলে ডিম পাড়ে। | 3. ডাঙায় ডিম পাড়ে। |
| 4. অ্যামনিয়ন পর্দা গঠিত হয় না, তাই এরা অ্যানঅ্যামনিওটা | 4. অ্যামনিয়ন পর্দা গঠিত হয় বলে এরা অ্যামনিওট। |
| 5. নিলয় কোনোভাবেই বিভাজিত হয় না। | 5. নিলয় আংশিক বিভাজিত। |
| 6. পায়ের আঙুলে কোনোভাবেই নখ থাকে না। | 6. পায়ের আঙুলে নখ থাকে। |

## ❂ শ্রেণি–5. পক্ষী বা অ্যাভিস Avis ❂

**[ Avis : L. *Avis* = bird (পাখি) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে, সামনের পা দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয় এবং যাদের চোয়ালে দাঁত থাকে না তাদের অ্যাভিস বা পক্ষী বলে।**

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics) ঃ**

*1. দেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে।
*2. চোয়ালে **দাঁত থাকে না**—মুখছিদ্র চঞ্চু দিয়ে আবৃত থাকে।
*3. সামনের পা দুটি **ডানায়** রূপান্তরিত হয়।
4. দেহাকৃতি **মাকুর মতো** অর্থাৎ সামনে ও পিছনে ছুঁচোলো।
*5. অস্থিগুলি হালকা, **স্পঞ্জি** ও **বায়ুপূর্ণ**।
*6. **এন্ডোথারমিক** (Endothermic) বা **হোমিওথারমিক** (Homeothermic) অথবা **উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট প্রাণী** (Warm blooded)। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহের তাপমাত্রা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে।

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

7. দেহত্বক শুষ্ক ও গ্রন্থিহীন (ব্যতিক্রম—ইউরোপাইজিয়্যাল গ্রন্থি)।
8. উড়বার জন্য উড্ডয়ন পেশি উপস্থিত।
*9. স্টারনামটি পরিবর্তিত হয়ে চ্যাপটা **কীল** (Keel) অস্থিতে পরিণত হয়। এটি উড্ডয়ন পেশির উৎপত্তিস্থল হিসেবে কাজ করে।
*10. হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত— দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়।
*11. শুধুমাত্র **দক্ষিণ সিস্টেমিক আর্চ** (Right systemic arch) বর্তমান।
12. **মূত্রথলি ও মলাশয়** অনুপস্থিত।
13. ভ্রূণে অ্যামনিয়ন গঠিত হয়, তাই এরা **অ্যামনিওটিক** (Amniotic)।
*14. **বায়ুথলি** (Air sac) শ্বসনে সহায়তা করে।
*15. এদের স্বরযন্ত্রকে **সাইরিংক্স** (Syrinx) বলে।
16. এদের বারো জোড়া **করোটি স্নায়ু** আছে।
17. করোটিতে একটিমাত্র **অক্সিপিট্যাল কনডাইল** (Occipital condyle) এবং কশেরুকাগুলির সেন্ট্রাম **হেটারোসিলাস** (Heterocoelous) প্রকৃতির।
18. এরা ডিম পাড়ে বলে এদের **অণ্ডজ বা ওভিপেরাস** (Oviparous) বলে।
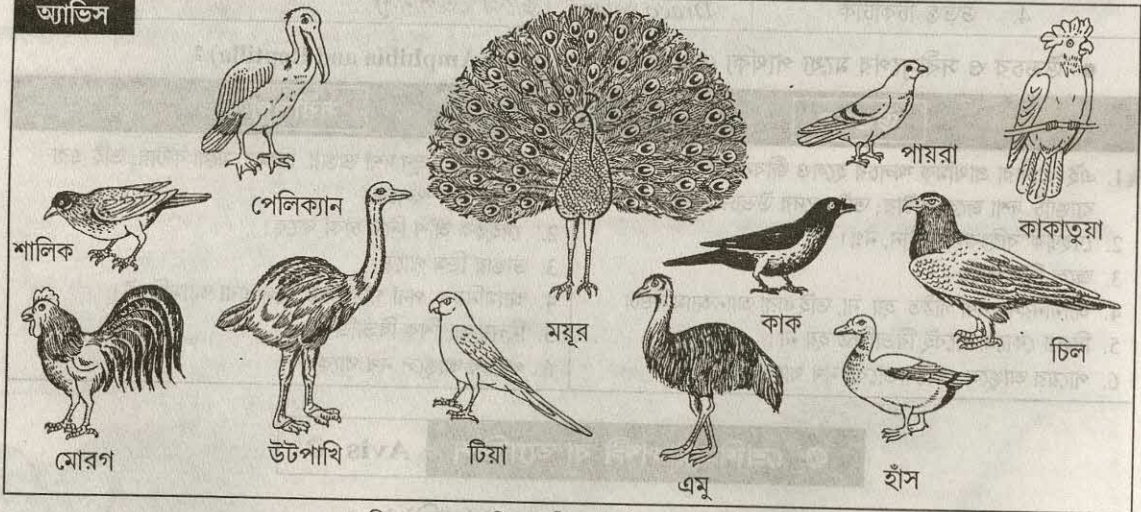
চিত্র 1.21 : শ্রেণি—পক্ষীর অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

(c) **শ্রেণি—অ্যাভিসের উদাহরণ (Examples of Class—Aves) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ময়ূর | *Pavo cristatus* ( *প্যাভো ক্রিস্টাটাস*) |
| 2. পায়রা | *Columba livia* (*কলাম্বা লিভিয়া*) |
| 3. চড়াই | *Passer domesticus* ( *প্যাসার ডোমেস্টিকাস*) |
| 4. কাক | *Corvus splendens* ( *করভাস্ স্প্লেনডেনস্*) |
| 5. মুরগি | *Gallus gallus* ( *গ্যালাস গ্যালাস*) |
| 6. হাঁস | *Anser anser* (*অ্যানসার অ্যানসার*) |

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

● **পাখি ও সরীসৃপের পার্থক্য (Difference between Bird and Reptile) ঃ**

| সরীসৃপ | পাখি |
|---|---|
| 1. এরা চারপায়ে হাঁটে (ব্যতিক্রম — সাপ) | 1. এরা দু'পায়ে হাঁটে। |
| 2. এদের **ডানা** থাকে না। | 2. এদের সামনের পা দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। |
| 3. এদের দেহ **আঁশ** দিয়ে আবৃত থাকে। | 3. এদের দেহ **পালক** দিয়ে আবৃত থাকে। |
| 4. এদের হৃৎপিণ্ড প্রধানত তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত। নিলয়টি অসম্পূর্ণভাবে বিভাজিত। (ব্যতিক্রম—কুমিরের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠযুক্ত।) | 4. এদের **হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠযুক্ত** দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়। |
| 5. **এক্টোথার্মিক** ( Ectothermic ) বা পয়কিলোথার্মিক (Poikilothermic) প্রাণী। | 5. **এন্ডোথারমিক** ( Endothermic ) বা হোমিওথার্মিক (Homeothermic) প্রাণী। |
| 6. কীল অস্থি, বায়ুথলি অনুপস্থিত। | 6. কীল অস্থি, বায়ুথলি থাকে। |

### ● র‍্যাটিটি ও ক্যারিনেটি ●

বেশির ভাগ পাখি উড়তে পারে, অর্থাৎ এরা খেচর। অর্থাৎ এইসব পাখিদের আকাশে ওড়বার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—ময়ূর, পায়রা, চড়াই, কাক, চিল ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকটি পাখি উড়তে পারে না। এই পাখিদের খেচর অভিযোজনের জন্য দেহের কোনো অঙ্গ পরিবর্তিত হয়নি। যেমন—উটপাখি, এমু, রিয়া, কিউই ইত্যাদি। স্থলে দৌড়াবার জন্য এদের পা দুটি অত্যন্ত সুগঠিত। যেসব পাখি উড়তে পারে তাদের **ক্যারিনেটি (Carinatae)** বা **উড়োপাখি** এবং যারা উড়তে পারে না তাদের **র‍্যাটিটি (Ratitae)** বা **দৌড়পাখি** বলে।

● **ক্যারিনেটি ও র‍্যাটিটি পাখিদের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Ratitae and Carinatae) ঃ**

| ক্যারিনেটি | র‍্যাটিটি |
|---|---|
| 1. এই পাখিগুলি উড়তে পারে, কিন্তু দ্রুত দৌড়তে পারে না। | 1. এরা উড়তে পারে না কিন্তু দ্রুত দৌড়তে পারে। |
| 2. এদের বুকের কাছে কীল অস্থি (Keel bone ) আছে। | 2. এদের কিল অস্থি নেই। |
| 3. পালকের **বারবিউল** ( Barbule )-গুলিতে হুক থাকে, ফলে **বার্ব ( Barb )**-গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। | 3. পালকের বারবিউলগুলিতে হুক থাকে না, ফলে বার্বগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে। |
| 4. এদের **উড্ডয়ন পেশি** ( Flight muscle) অনেক সুগঠিত। | 4. এদের উড্ডয়ন পেশি ক্ষয়প্রাপ্ত অথবা অনুপস্থিত। |
| 5. এদের **বায়ুথলি** ( Air sac ) সুগঠিত। | 5. এদের বায়ুথলি অনুপস্থিত বা অনুন্নত। |
| 6. এদের ডানা দুটি খুবই সুগঠিত। | 6. এদের ডানা দুটি খুবই ছোটো এবং ওড়ার কাজে লাগে না। |
| 7. এদের লেজে পুচ্ছ পালক সুগঠিত। | 7. এদের পুচ্ছ পালক অনুপস্থিত। |
| **উদাহরণ**— ময়ূর, কাক, শালিক, চড়াই ইত্যাদি। | **উদাহরণ**— উটপাখি, এমু, কিউই, রিয়া পেঙ্গুইন ইত্যাদি। |

## ▲ স্তন্যপায়ী প্রাণী Mammalia ▲

## ❂ 1.5. বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসহ স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস ❂
## (Classification of Mammalia with characters and examples)

### ❂ শ্রেণি–6. স্তন্যপায়ী বা ম্যামেলিয়া Mammalia ❂

**[L. *Mammalis* = breast (স্তন) ]**

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ** যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্তনগ্রন্থি থাকে, দেহ লোম দিয়ে আবৃত ও বহিঃকর্ণ বা পিনা থাকে তাদের **স্তন্যপায়ী** বা **ম্যামেলিয়া ( Mammalia )** বলে।

(b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য ( General Characteristics ) ঃ**

*1. **Mammae** অর্থাৎ **Breast** বা স্তনগ্রন্থি এই প্রাণীদের থাকে বলে এদের **স্তন্যপায়ী** (Mammal) বলে।

*2. দেহ **লোম** দিয়ে আবৃত থাকে।

*3. বহিঃকর্ণ বা **পিনা** (Pinna) বা **কর্ণছত্র** উপস্থিত।

*4. ত্বকে **ঘর্মগ্রন্থি** (Sweat gland) এবং **তৈলগ্রন্থি** (Sebaceous gland) বর্তমান।

*5. বক্ষ গহ্বর ও উদর গহ্বর **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) পর্দা দিয়ে বিভাজিত থাকে।

*6. **হৃৎপিণ্ড** চার প্রকোষ্ঠযুক্ত—দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়।

*7. **শুধুমাত্র বাম সিস্টেমিক মহাধমনি** (Left systemic aorta) বর্তমান।

8. **এন্ডোথারমিক** (Endothermic) বা **হোমিওথারমিক** (Homeothermic) বা **উষ্ণরক্ত** বিশিষ্ট (Warm blooded) প্রাণী।

*9. পরিণত অবস্থায় লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন। (ব্যতিক্রম—উট)।

*10. **গ্রীবা** বা গলার অঞ্চলে **সাতটি কশেরুকা** থাকে।

11. করোটিতে দুটি অক্সিপিটাল কনডাইল থাকে।

*12. মধ্য কর্ণে তিনটি অস্থি—**মেলিয়াস, ইনকাস্ ও স্টেপিস্** থাকে।

13. বারো জোড়া করোটি স্নায়ু থাকে।

চিত্র 1.22 : শ্রেণি—স্তন্যপায়ীর অন্তর্গত কয়েকটি প্রাণী।

*14. কশেরুকার সেন্ট্রাম **আসিলাস** (Acoelous) ধরনের অর্থাৎ কোনো গহ্বর থাকে না।

15. এদের ডিম কুসুমহীন (Alecithal) ও ভ্রূণের পরিস্ফুটন জরায়ুতে ঘটে বলে এরা **জরায়ুজ** (Viviparous) এবং এরা শাবক প্রসব করে। (ব্যতিক্রম—প্রোটোথেরিয়া : হংসচঞ্চু ও একিড়না)

*16. ভ্রূণ **অমরার** (Placenta) সাহায্যে মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। (ব্যতিক্রম—প্রোটোথেরিয়া : হংসচঞ্চু ও একিড়না)।

*17. দাঁত **থিকোডন্ট** (Thecodont) ধরনের অর্থাৎ দাঁত চোয়ালে প্রোথিত থাকে, **হেটারোডন্ট** (Heterodont) অর্থাৎ দাঁত বিভিন্ন প্রকারের যেমন—ইনসাইজার (Incisor), ক্যানাইন (Canine), প্রি-মোলার (Pre-molar) ও মোলার (Molar), এবং **ডাইফিওডন্ট** (Diphyodont) অর্থাৎ দাঁত দু'বার গঠিত হয়—প্রথমবার **দুধে দাঁত** (Milk teeth) এবং পরে **স্থায়ী দাঁত** (Permanent teeth)।

18. স্নায়ুতন্ত্র উন্নত ধরনের। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এবং সেরিবেলাম বৃহৎ আকৃতির।

19. সর্বদা অন্তঃনিষেক ঘটে এবং পেনিস সুগঠিত।

---

* চিহ্নিতগুলি প্রধান সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

(c) **শ্রেণি—স্তন্যপায়ীর উদাহরণ (Examples of Class—Mammalia) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. মানুষ | *Homo sapiens* (হোমো স্যাপিয়েন্স্) |
| 2. গোরু | *Bos indicus* (বস ইন্ডিকাস) |
| 3. গিনিপিগ | *Cavia porcellus* (কেভিয়া পোর্সিলাস) |
| 4. বাঘ | *Panthera tigris* (প্যান্থেরা টাইগ্রিস) |
| 5. ইঁদুর | *Bandicota bengalensis* (ব্যান্ডিকোটা বেঙ্গালেনসিস) |

## ❂ শ্রেণি—স্তন্যপায়ীর শ্রেণিবিন্যাস Classification of Class—Mammalia ❂

প্লাসেন্টা বা অমরা গঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণি স্তন্যপায়ীকে তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**প্রোটোথেরিয়া, মেটাথেরিয়া ও ইউথেরিয়া।**
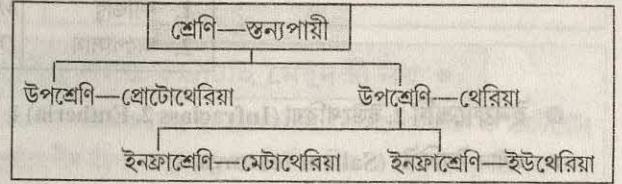
### ▲ উপশ্রেণি 1. প্রোটোথেরিয়া (Subclass 1. Prototheria) :

● **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

1. এই প্রাণীরা ডিম পাড়ে অর্থাৎ **অন্ডজ** (Oviparous) কিন্তু বাচ্চা প্রসব করে না।
2. এদের স্তনগ্রন্থি আছে কিন্তু **স্তনবৃন্ত** (Teats) থাকে না।
3. দাঁত নেই এবং **চঞ্চু** বর্তমান।
4. দেহে **অবসারণী** (Cloaca) দেখা যায়।
5. অমরা গঠিত হয় না।
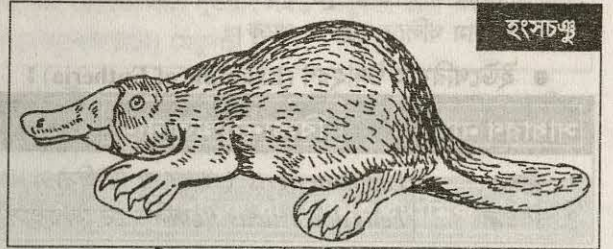
চিত্র 1.23 : প্রোটোথেরিয়ার উদাহরণ

● **উপশ্রেণি প্রোটোথেরিয়ার উদাহরণ (Examples of Subclass Prototheria) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. হংসচঞ্চু | *Ornithorhynchus anatinus* (অরনিথোরিঙ্কাস অ্যানাটিনাস) |
| 2. পিপিলিকাভুক | *Echidna sp.* (একিডনা প্রজাতি) |

### ▲ উপশ্রেণি 2. থেরিয়া (Subclass 2. Theria) :

● **প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

1. নিপলসহ স্তনগ্রন্থি বর্তমান।
2. এই প্রাণীদের বহিঃকর্ণ উপস্থিত।
3. এদের সুগঠিত দাঁত দেখা যায়।
4. উদরের শেষভাগে স্ক্রোটাম থলিতে শুক্রাশয় উপস্থিত।
5. এই প্রাণীদের ডিম্বনালি যোনিতে মুক্ত হয়।
6. এই প্রাণীরা শাবক প্রসব করে।

উপশ্রেণি থেরিয়াকে দুটি ইনফ্রাশ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যেমন—মেটাথেরিয়া ও ইউথেরিয়া।

চিত্র 1.24 : মেটাথেরিয়ার উদাহরণ

## ইনফ্রাশ্রেণি 1. মেটাথেরিয়া (Infraclass 1. Metatheria) :

**প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

1. অপরিণত শাবক প্রসব করে।
2. স্ত্রী প্রাণীর উদরের অঙ্কীয়দেশে স্তনগ্রন্থি আবৃত করে **মারসুপিয়াম** (Marsupium) নামে থলির মধ্যে অপরিণত শাবক আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্রমশ পরিণত হয়।
3. **কুসুমথলিজাত অমরা** (Yolk sac placenta) উপস্থিত থাকে।

**মেটাথেরিয়ার উদাহরণ (Examples of Metatheria) :**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. ক্যাঙারু | *Macropus sp.* (*ম্যাক্রোপাস প্রজাতি*) |
| 2. অপোসাম | *Didelphis virginianus* (*ডাইডেলফিস ভারজিনিয়ানাস*) |

## ইনফ্রাশ্রেণি 2. ইউথেরিয়া (Infraclass 2. Eutheria) :

**প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient features) :**

1. উন্নত প্রকারের **অমরা** গঠিত হয়।
2. নিপল্ সহ **স্তনগ্রন্থি** উন্নত প্রকারের।
3. সরাসরি পরিণত ও **পুষ্ট শাবক** প্রসব করে।
4. স্ক্রোটাম থলিতে শুক্রাশয় থাকে।

চিত্র 1.25 : ইউথেরিয়ার উদাহরণ।

**ইউথেরিয়ার উদাহরণ (Example of Eutheria) :**
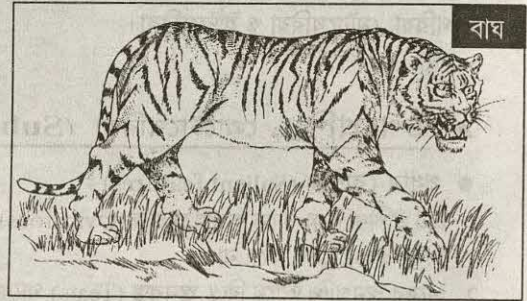
| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. বাঘ | *Panthera tigris* (*প্যান্থেরা টাইগ্রিস*) |
| 2. বিড়াল | *Felis domesticus* (*ফেলিস ডোমেস্টিকাস*) |

**প্রোটোথেরিয়া মেটাথেরিয়া ও ইউথেরিয়ার পার্থক্য (Difference between Prototheria, Metatheria and Eutheria) :**

| প্রোটোথেরিয়া | মেটাথেরিয়া | ইউথেরিয়া |
|---|---|---|
| 1. অন্তজ (Oviparous) প্রাণী, অর্থাৎ এরা ডিম পাড়ে, বাচ্চা প্রসব করে না। | 1. জরায়ুজ (Viviparous) প্রাণী, অর্থাৎ এরা বাচ্চা প্রসব করে, ডিম পাড়ে না। | 1. জরায়ুজ প্রাণী, অর্থাৎ এরা বাচ্চা প্রসব করে। |
| 2. অমরা বা প্লাসেন্টা গঠিত হয় না। | 2. অমরা (Placenta) অনুন্নত ধরনের। | 2. অমরা উন্নত ধরনের। |
| 3. ডিম থেকে পরিণত শাবক সৃষ্টি হয়। | 3. মাতৃগর্ভ থেকে অপরিণত শাবক গঠিত হয়। | 3. মাতৃগর্ভ থেকে পরিণত শাবক গঠিত হয়। |
| 4. শুক্রাশয় স্ক্রোটামে থাকে না, উদরগহ্বরে থাকে। | 4. শুক্রাশয় স্ক্রোটামে উপস্থিত থাকে। | 4. শুক্রাশয় স্ক্রোটামে উপস্থিত থাকে। |
| 5. মারসুপিয়াল থলি বা মারসুপিয়াম (Marsupium) থাকে না। | 5. মারসুপিয়াম থলিতে অপরিণত শাবক লালিত হয়। | 5. মারসুপিয়াম থাকে না। |
| 6. বহিঃকর্ণ অনুপস্থিত। | 6. বহিঃকর্ণ উপস্থিত। | 6. বহিঃকর্ণ উপস্থিত। |
| 7. স্তনগ্রন্থি অনুন্নত এবং এখানে স্তনবৃন্ত থাকে না। | 7. স্তনগ্রন্থি উন্নত এবং স্তনবৃন্ত থাকে। | 7. স্তনগ্রন্থি উন্নত এবং স্তনবৃন্ত যুক্ত। |
| 8. ক্লোয়াকা বা অবসারণী দেখা যায়। | 8. ক্লোয়াকা (Cloaca) বা অবসারণী দেখা যায় না। | 8. ক্লোয়াকা অনুপস্থিত। |

● **পাখি ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bird and Mammal) :**

| পাখি | স্তন্যপায়ী |
|---|---|
| 1. এদের দেহ **পালক** দিয়ে ঢাকা থাকে। | 1. এদের দেহ লোম দিয়ে ঢাকা থাকে। |
| 2. এদের সামনের দুটি পা দুটি **ডানায়** রূপান্তরিত হয়েছে। | 2. এদের সামনের পা কখনও ডানায় রূপান্তরিত হয় না। |
| 3. **স্তনগ্রন্থি** থাকে না। | 3. **স্তনগ্রন্থি** থাকে। |
| 4. **বহিঃকর্ণ** অনুপস্থিত। | 4. **বহিঃকর্ণ** উপস্থিত। |
| 5. **লোহিত রক্তকণিকা** নিউক্লিয়াসযুক্ত। | 5. **লোহিত রক্তকণিকা** নিউক্লিয়াসবিহীন। (ব্যতিক্রম—উট) |
| 6. **মধ্যচ্ছদা** পর্দা অনুপস্থিত। | 6. বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে **মধ্যচ্ছদা** পর্দা থাকে। |
| 7. শুধুমাত্র **ডান সিস্টেমিক মহাধমনি** থাকে। | 7. শুধুমাত্র **বাম সিস্টেমিক মহাধমনি** থাকে। |
| 8. করোটিতে একটিমাত্র **অক্সিপিটাল কনডাইল** (Occipital condyle) থাকে। | 8. করোটিতে দুটি **অক্সিপিটাল কনডাইল** থাকে। |

**● সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী কর্ডাটা কিন্তু সমস্ত কর্ডাটাই মেরুদণ্ডী নয় ●**

পর্ব-কর্ডাটাকে চারটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— হেমিকর্ডাটা, ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা ও ভার্টিব্রেটা (মেরুদণ্ডী)। পর্ব-কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য, যেমন— নোটোকর্ড, পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, গলবিলীয় ছিদ্র ও লেজ মেরুদণ্ডীসহ অন্য সব উপপর্বের প্রাণীদের আছে। সুতরাং ভার্টিব্রেটা বা মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সকলেই কর্ডাটা। অপরদিকে, যেসব কর্ডাটা প্রাণীর করোটি ও মেরুদণ্ড আছে তাদের ভার্টিব্রেটা বা মেরুদণ্ডী বলে। অন্যান্য কর্ডাটা যেমন—হেমিকর্ডাটা, ইউরোকর্ডাটা ও সেফালোকর্ডাটাভুক্ত প্রাণীদের মেরুদণ্ড ও করোটি নেই। তাই এরা মেরুদণ্ডী নয়। সুতরাং সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী কর্ডাটা পর্বভুক্ত কিন্তু সমস্ত কর্ডাটা (যেমন—হেমিকর্ডাটা, ইউরোকর্ডাটা ও সেফালোকর্ডাটা) মেরুদণ্ডী নয়।
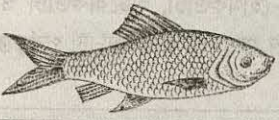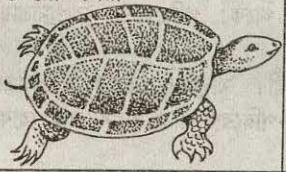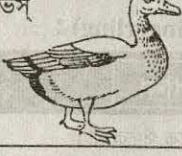
● **এক্টোথারমিক (পয়কিলোথারমিক বা অনুষ্ণশোণিত) প্রাণী এবং এন্ডোথারমিক (হোমিওথারমিক বা উষ্ণশোণিত) প্রাণীর পার্থক্য (Difference between Ectothermic and Endothermic animals) :**

| এক্টোথারমিক বা পয়কিলোথারমিক প্রাণী | এন্ডোথারমিক বা হোমিওথারমিক প্রাণী |
|---|---|
| 1. এই ধরনের প্রাণীদেহের তাপমাত্রা বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। | 1. এই ধরনের প্রাণীদেহের তাপমাত্রা দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। |
| 2. দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে ওঠা-নামা করে। | 2. দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। পরিবেশের তাপমাত্রায় প্রভাবিত হয় না। |
| 3. উদাহরণ— মাছ, ব্যাং, সরীসৃপ। জলের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বেশি হয়। তাই মাছের দেহের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বেশি হয়, কিন্তু শীতকালে কমে যায়। | 3. উদাহরণ—পাখি, স্তন্যপায়ী। মানুষের দেহের তাপমাত্রা সর্বদাই 98·5°F থাকে—পরিবেশ শীত, গরম যাই হোক না কেন। |

● **ব্যাঙাচি এবং চারাপোনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Tadpole and Fingerling) :**

| ব্যাঙাচি | চারাপোনা |
|---|---|
| 1. দেহের অগ্রভাগে অ্যাডেসিভ ডিস্ক বা চোষক থাকে। | 1. দেহের অগ্রভাগে ডিস্ক বা চোষক থাকে না। |
| 2. মুখছিদ্র মাথার অঙ্কীয় ভাগে থাকে। | 2. মুখছিদ্র মাথার অগ্রপ্রান্তে থাকে। |
| 3. কানকো থাকে না। | 3. কানকো আছে। |
| 4. জোড়া পাখনা থাকে না। পাখনা রশ্মিবিশিষ্ট নয়। | 4. জোড়া পাখনা থাকে। পাখনা রশ্মিবিশিষ্ট। |
| 5. মাথার দু'পাশে বহিঃফুলকা থাকে। | 5. বহিঃফুলকা থাকে না। |
| 6. দেহে আঁশ নেই। | 6. দেহে আঁশ আছে। |

## 1.6. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণি, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ (Important characteristics and example of different Classes of Vertebrate)

| শ্রেণি | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|
| 1. সাইক্লোস্টোমাটা | (i) গোলাকার এবং চোষকযুক্ত মুখছিদ্র কর্ষিকা দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(ii) সংখ্যায় একটি নাসারন্ধ্র।<br>(iii) দেহ লম্বা, গোলাকার, লেজ চ্যাপটা।<br>(iv) অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি নির্মিত। | (i) ল্যামপ্রে (*Petromyzon marinus*)<br>(ii) হ্যাগফিস (*Myxine glutinosa*) |
| 2. কনড্রিকথিস (ইলাসমোব্রাঙ্কি) | (i) তরুণাস্থিময় অন্তঃকঙ্কাল এবং নোটোকর্ড আছে।<br>(ii) আণুবীক্ষণিক প্লাকয়েড আঁশ দিয়ে দেহ ঢাকা।<br>(iii) লেজ হেটারোসারকাল।<br>(iv) মুখছিদ্র মাথার অঙ্কীয় দিকে থাকে। | (i) হাঙর (*Scoliodon laticaudus*)<br>(ii) ইলেকট্রিক মাছ (*Torpedo torpedo*) |
| 3. অসটিকথিস (টিলিয়স্টমি) | (i) দেহ বড়ো বড়ো সাইক্লয়েড বা টিনয়েড আঁশ দিয়ে ঢাকা।<br>(ii) অস্থিময় অন্তঃকঙ্কাল থাকে।<br>(iii) কানকো এবং পটকা থাকে।<br>(iv) মুখছিদ্র মাথার অগ্রভাগে থাকে। | (i) রুই মাছ (*Labeo rohita*)<br>(ii) কাতলা মাছ (*Catla catla*) |
| 4. অ্যাম্ফিবিয়া | (i) আর্দ্র ও গ্রন্থিময় ত্বক এবং বহিঃকঙ্কাল বিহীন।<br>(ii) অপরিণত অবস্থায় (অর্থাৎ ব্যাঙাচি) জলে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মুখ্য স্থলচর প্রাণী হিসেবে দেখা যায়।<br>(iii) হৃৎপিণ্ড দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় নিয়ে গঠিত।<br>(iv) দেহ মাথা ও দেহকাণ্ড নিয়ে গঠিত। | (i) কুনোব্যাঙ (*Bufo melanostictus*)<br>(ii) সোনাব্যাঙ (*Rana tigerina*) |
| 5. রেপ্টিলিয়া | (i) দেহ শুকনো চামড়া ও এপিডারমাল আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(ii) অবসারণী ছিদ্র আড়াআড়িভাবে থাকে।<br>(iii) হৃৎপিণ্ড দু'টি অলিন্দ এবং একটি অর্ধবিভক্ত নিলয় নিয়ে গঠিত।<br>(iv) অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুল থাকে। | (i) গিরগিটি (*Calotes versicolor*)<br>(ii) কেউটে সাপ (*Naja naja*) |
| 6. অ্যাভিস্ | (i) দেহ পালক দিয়ে ঢাকা।<br>(ii) অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত।<br>(iii) চোয়াল দাঁতবিহীন ও মস্তকের অগ্রভাগ চঞ্চুতে রূপান্তরিত।<br>(iv) ফুসফুসে অতিরিক্ত বায়ুথলি যুক্ত থাকে। | (i) পায়রা (*Columba livia*)<br>(ii) ময়ূর (*Pavo cristatus*) |
| 7. ম্যামেলিয়া | (i) দেহ লোম দিয়ে ঢাকা থাকে।<br>(ii) কর্ণছত্র (পিনা) থাকে।<br>(iii) মধ্যচ্ছদা ও স্তনগ্রন্থি আছে।<br>(iv) দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয় নিয়ে হৃৎপিণ্ড গঠিত।<br>(v) 12 জোড়া করোটি স্নায়ু আছে। | (i) গিনিপিগ (*Cavia porcellus*)<br>(ii) মানুষ (*Homo sapiens*) |

## ▲ ফিস্-নামধারী বিভিন্ন প্রাণীর পরিচয় (Informations about some animals known ordinarily as fish) :

| প্রাণীদের নাম | পর্ব | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| 1. ক্যাট ফিস্ (মাগুর ও শিঙি) | কর্ডাটা | (i) ত্বক আঁশবিহীন হয়। (ii) বার্বের উপস্থিতি দেখা যায়। |
| 2. ক্যাটল ফিস্ (সিপিয়া,ললিগো) | মোলাস্কা | (i) দেহের ভিতরে খোলস থাকে। (ii) দেহ শিল্ড আকৃতিবিশিষ্ট হয়। |
| 3. জেলি ফিস্ (অরেলিয়া) | নিডারিয়া | (i) জেলির মতো স্বচ্ছ দেহ। (ii) দেখতে অনেকটা খোলা ছাতার মতো। |
| 4. ক্রে-ফিস্ (চিংড়িসদৃশ পতঙ্গ) | আরথ্রোপোডা | (i) ক্যারাপেস, রস্ট্রাম ও সন্ধিল উপাঙ্গ থাকে। (ii) দেহ কাইটিন নির্গত বহিঃকঙ্কাল দিয়ে ঢাকা। |
| 5. সিলভার ফিস্ (ডানাবিহীন পতঙ্গ) | আরথ্রোপোডা | (i) দেহ রুপালি রঙের হয়। (ii) দেহ ছোটো, লম্বাটে, মসৃণ ও চকচকে হয়। |
| 6. স্টার ফিস্ (তারা মাছ) | একাইনোডারমাটা | (i) দেহ পাঁচ বাহুযুক্ত তারার মতো। (ii) ত্বকে কাঁটার মতো অসিকল্ থাকে। |
| 7. হ্যাগ ফিস্ ( চোয়ালহীন্ সাইক্লোস্টোমাটা ) | কর্ডাটা | (i) মুখ চোয়াল দিয়ে আবৃত নয়; গোলাকার চোষক অঙ্গ দিয়ে আবৃত। (ii) একটিমাত্র নাসারন্ধ্র থাকে এবং জোড় পাখনা থাকে না। |
| 8. ডগ ফিস্ (শিকারি মাছ) | কর্ডাটা | (i) তরুণাস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল থাকে। (ii) মুখছিদ্র মাথার অঙ্কদেশে থাকে এবং কানকো থাকে না। |

## ▲ সি-নামধারী কয়েকটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম ও তাদের পর্ব (Name of some marine animals and their respective phyle) :

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | পর্ব |
|---|---|---|
| 1. সি-পেন ( সমুদ্র-কলম ) | *Pennatula* sp ( পেনাটুলা ) | নিডারিয়া |
| 2. সি-অ্যানিমোন ( সাগর-কুসুম ) | *Metridium* sp ( মেট্রিডিয়াম ) | নিডারিয়া |
| 3. সি-ফার ( সমুদ্র-লোম ) | *Obelia* sp ( ওবেলিয়া ) | নিডারিয়া |
| 4. সি-ফ্যান ( সমুদ্র-পাখা ) | *Gorgonia* sp ( গরগোনিয়া ) | নিডারিয়া |
| 5. সি-সেল ( সমুদ্র-জাহাজ বা নৌকার পাল ) | *Vellela* sp ( ভেলেলা ) | নিডারিয়া |
| 6. সি-হেয়ার ( সমুদ্র-খরগোস) | *Aplysia* sp ( অ্যাপ্লাইসিয়া ) | মোলাস্কা |
| 7. সি-মাউস ( সমুদ্র-মূষিক) | *Aphrodite* sp ( অ্যাফ্রোডাইট ) | অ্যানিলিডা |
| 8. সি-লিলি ( সমুদ্র-লিলি ) | *Metacrinus* sp ( মেটাক্রিনাস্ ) | একাইনোডারমাটা |
| 9. সি-হর্স ( সমুদ্র-ঘোটক ) | *Hippocampus* sp ( হিপ্পোক্যাম্পাস্ ) | কর্ডাটা |
| 10. সি-কাউ ( সমুদ্র-গোরু ) | *Mantee* sp ( ম্যান্টি) | কর্ডাটা |
| 11. সি-ফেদার ( সমুদ্র-পালক ) | *Antedon* sp ( অ্যান্টেডন ) | একাইনোডারমাটা |
| 12. সি-কোরাল ( সমুদ্র-প্রবাল ) | *Corallium* sp ( কোরালিয়াম ) | নিডারিয়া |
| 13. সি-অ্যারো (সমুদ্র-তীর) | *Loligo* sp ( ললিগো) | মোলাস্কা |
| 14. সি-কিউকুম্বার ( সমুদ্র-শশা ) | *Holothuria* sp ( হোলোথুরিয়া ) | একাইনোডারমাটা |
| 15. সি-ওয়াস্প্ ( সমুদ্র-বোলতা ) | *Charybdaea* sp ( ক্যারিবডিয়া ) | নিডারিয়া |

## ○ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ○

1. কোন্ পর্বভুক্ত সব প্রাণীই আণুবীক্ষণিক হয় ?
- প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত সব প্রাণীই আণুবীক্ষণিক।

2. (ক) কোশবিহীন প্রাণী কাদের বলা হয় ?
(খ) এই নামের যথার্থতার স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- (ক) প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের কোশবিহীন প্রাণী বলে। উদাহরণ— অ্যামিবা।
(খ) কারণ— একটিমাত্র কোশই প্রাণীর সব বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

3. (ক) চিংড়ি কি মাছ ? (খ) তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- (ক) চিংড়ি— মাছ নয়।
(খ) চিংড়ি মাছ নয়—এর স্বপক্ষে যুক্তি— (i) চিংড়ির মাছের মতো রশ্মিবিশিষ্ট পাখনা থাকে না। (ii) এটি সন্ধিপদ প্রাণী, কারণ এর উপাঙ্গগুলি যুক্ত থাকে (iii) এর পুঞ্জাক্ষি দেখা যায়।

4. একটি স্বাধীনজীবী ও একটি পরজীবী প্রোটোজোয়ার নাম করো।
- (ক) স্বাধীনজীবী প্রোটোজোয়া— অ্যামিবা
(খ) পরজীবী প্রোটোজোয়া— এন্টামিবা

5. (ক) কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহগাত্র অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ? (খ) ওই প্রাণীদের দেহে অবস্থিত ফ্ল্যাজেলাযুক্ত বিশেষ ধরনের কোশের নাম কী ?
- (ক) ছিদ্রযুক্ত প্রাণী— ছিদ্রাল প্রাণী বা পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহগাত্র বহু ছিদ্রযুক্ত হয়।
(খ) বিশেষ ধরনের কোশ— ছিদ্রাল প্রাণীর দেহে কোয়ানোসাইট নামে ফ্ল্যাজেলাযুক্ত বিশেষ ধরনের কোশ থাকে।

6. প্যারাগ্যাস্ট্রিক গহ্বর কী ?
- প্যারাগ্যাস্ট্রিক গহ্বর— ছিদ্রাল প্রাণীদের দেহে যে নলাকার গহ্বর থাকে তাকে প্যারাগ্যাস্ট্রিক গহ্বর (Paragastric cavity) বলে।

7. গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর কাকে বলে ?
- গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর— নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে যে গহ্বর থাকে তাকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেনটেরন (Coelenteron) বলে।

8. দেহগহ্বর বা সিলোম কী ?
- সিলোম— উন্নত শ্রেণির প্রাণীর মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন যে গহ্বরে আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গগুলি অবস্থান করে তাকে দেহগহ্বর বা সিলোম (Coelom) বলে।

9. সিউডোসিল কী ?
- সিউডোসিল—গোলকৃমি পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে প্রকৃত দেহগহ্বর থাকে না। এদের দেহগহ্বরকে সিউডোসিল (Pseudocoel) বলে।

10. (ক) হিমোসিল কাকে বলে ? (খ) কোন্ প্রাণীর দেহে এটি থাকে ?
- (ক) হিমোসিল— যখন প্রাণীর দেহগহ্বর অর্থাৎ সিলোমটি রক্তপূর্ণ হয়ে থাকে তখন তাকে হিমোসিল (Haemocoel) বলা হয়।
(খ) অবস্থান— সন্ধিপদী পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে এটি থাকে।

11. বহুরূপতা বা পলিমরফিজম বলতে কী বোঝো ?
- বহুরূপতা—কাজের ভিত্তিতে কোনো প্রাণীর দেহে বিভিন্ন অঙ্গজ অংশের (জুয়েড) উপস্থিতিকে বহুরূপতা বা পলিমরফিজম বলে। উদাহরণ— ওবিলিয়ার দেহে বহুরূপতা দেখা যায়।

**12. ক্যানাল সিস্টেম ও ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম কাকে বলে ?**

● (ক) **ক্যানাল সিস্টেম**—যেসব নালিকার মাধ্যমে স্পঞ্জের দেহে জল সংবহন হয় তাদের একত্রে নালিকাতন্ত্র বা ক্যানাল সিস্টেম বলে। এই সংবাহিত জলের মাধ্যমে প্রাণী $O_2$ এবং খাদ্য গ্রহণ করে।

(খ) **ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম**—একাইনোডারমাটা পর্বের প্রাণীদের জল সংবহনে অংশগ্রহণকারী নালিকা দিয়ে যে তন্ত্র তৈরি হয় এবং যা দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সমাধা করে তাকে **ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম বা জলসংবহন তন্ত্র** বলে।

**13. অস্টিয়া ও অসকিউলাম কাকে বলে ?**

● (ক) **অস্টিয়া**—স্পঞ্জের দেহের বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ছিদ্র দিয়ে দেহে জল ঢোকে তাদের অস্টিয়া বলে।

(খ) **অসকিউলাম**—স্পঞ্জের প্রতিটি শাখা দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত যে বড়ো ছিদ্র দিয়ে জল দেহের বাইরে বের হয়ে যায় তাকে অসকিউলাম বলে।

**14. একটি স্বাধীনজীবী এবং মানবদেহে একটি অন্তঃপরজীবী চ্যাপটা কৃমির নাম করো।**

● (ক) **স্বাধীনজীবী চ্যাপটা কৃমি**— প্ল্যানেরিয়া।

(খ) **অন্তঃপরজীবী চ্যাপটা কৃমি**— *টিনিয়া সোলিয়াম*।

**15. স্পঞ্জকে ছিদ্রাল প্রাণী, হাইড্রাকে নিডারিয়া, বেরোকে টিনোফোরা, কেঁচোকে অঙ্গুরিমাল, চিংড়িকে আর্থ্রোপোডা, ললিগোকে মোলাস্কা এবং তারামাছকে কন্টকত্বক পর্বের বলা হয় কেন ?**

● (ক) স্পঞ্জের দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে বলে এটি ছিদ্রাল পর্বের অন্তর্ভুক্ত। (খ) হাইড্রার দেহে নিডোব্লাস্ট কোশে নিমাটোসিস্ট থাকে বলে একে নিডারিয়া পর্বের প্রাণী বলা হয়। (গ) বেরোর দেহে সমদূরত্বে আটটি চিরুনির মতো প্লেট (কুম্বপ্লেট) থাকে বলে এটিকে টিনোফোরা পর্বের প্রাণী বলা হয়। (ঘ) কেঁচোর দেহে অসংখ্য আংটির মতো খণ্ডক বা মেটামিয়ার দিয়ে গঠিত বলে এটিকে অঙ্গুরিমাল পর্বের প্রাণী বলা হয়। (ঙ) চিংড়ির উপাঙ্গগুলি (পদগুলি) সন্ধিল, তাই এটিকে সন্ধিপদী প্রাণী বলা হয়। (চ) ললিগোর দেহ নরম ও অখণ্ডিত বলে এটিকে মোলাস্কা পর্বের প্রাণী বলা হয়। (ছ) তারামাছের বাইরের অংশে চুন দিয়ে তৈরি কাঁটা ও অসিকল দিয়ে আচ্ছাদিত বলে এটিকে কন্টকত্বক পর্বের প্রাণী বলা হয়।

**16. (ক) মোলাস্কা পর্বভুক্ত যেসব প্রাণীদের দেহের বাইরে ও ভেতরে খোলক থাকে তাদের নাম করো।**
**(খ) এদের গমন অঙ্গের নাম কী ?**

● (ক) (i) শামুক—(*Pila*), স্থলজ শামুক (*Achantina*)—এই দুটি মোলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ শক্ত খোলক দিয়ে ঢাকা। (ii) কাটল ফিশ্ (*Sepia*), স্কুইড (*Loligo*)—এই দুটি মোলাস্কা পর্বের প্রাণীর দেহের ভেতরে খোলক থাকে।

(খ) **গমন অঙ্গ**—মোলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণীদের অঙ্কীয় মাংসল পদ (Ventral muscular foot) হল গমন অঙ্গ।

**17. খোলসবিহীন একটি কম্বোজ প্রাণীর নাম করো।**

● খোলসবিহীন কম্বোজ প্রাণীর নাম—ডরিস (Doris)।

**18. নালি পদ বা টিউব ফুট (Tube foot) ও চিরুনি প্লেট বা কুম্ব প্লেট (Comb plate) কী ?**

● (ক) **নালি পদ বা টিউব ফুট**—এটি একাইনোডারমাটা (কন্টকত্বক) পর্বের প্রাণীদের গমনাঙ্গ। উদাহরণ—তারা মাছ।

(খ) **চিরুনি প্লেট বা কুম্ব প্লেট**—এটি টিনোফোরা পর্বের প্রাণীদের গমনাঙ্গ। উদাহরণ—বেরো, হর্মিফোরা ইত্যাদি।

**19. ক্ষণপদ, ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়ার সাহায্যে গমন করে এমন একটি করে আদ্যপ্রাণীর নাম করো।**

● আদ্যপ্রাণীর নাম ও তাদের গমনাঙ্গ—(i) ক্ষণপদ—অ্যামিবা। (ii) ফ্ল্যাজেলা—ইউগ্লিনা। (iii) সিলিয়া—প্যারামেসিয়াম।

**20. তারামাছ মাছ নয় কেন ?**

● তারামাছের দেহে মাছের বৈশিষ্ট্য যেমন রশ্মিবিশিষ্ট জোড় পাখনা, ভেনাস হৃৎপিণ্ড না থাকায় তারামাছ মাছ নয়।

**21. জেলিফিশ কী ?**

● জেলিফিশ—এটি একটি সামুদ্রিক প্রাণী। একে দেখতে থলথলে সরার মতো। জেলিফিশ্ নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণী।

22. (ক) ল্যাং ফিশ কী ? (খ) এর বৈশিষ্ট্য লেখো।

• (ক) ল্যাং ফিশ— ফুসফুসধারী মাছ।

(খ) বৈশিষ্ট্য— (i) এটি মৎস্য ও উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। (ii) এদের পটকা ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়। (iii) দেহ সাইক্লয়েড আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। (iv) পৃষ্ঠ, পায়ু এবং পুচ্ছ পাখনা সংযুক্ত থাকে। বক্ষপাখনা ও শ্রোণিপাখনা দুটিকে সাধারণত পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এরা গমনে সাহায্য করে।

23. মাছের আঁশ কত প্রকার ?

• মাছের আঁশের প্রকারভেদ— মাছের আঁশ চার প্রকার হয়, যেমন— (i) প্ল্যাকয়েড (হাঙর), (ii) সাইক্লয়েড (কাতলা, রুই) (iii) টিনয়েড ( ভেটকি ) এবং (iv) গ্যানয়েড (পলিপটেরাস নামে মাছে থাকে )।

24. সরীসৃপের আঁশের সঙ্গে মাছের আঁশের কী পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ করো।

• পার্থক্য— (i) মাছের আঁশ ত্বকের ডারমিস স্তর থেকে উৎপন্ন হয়। তাই একে ডারমাল আঁশ বলে। এই প্রকার আঁশ নির্মোচিত হয় না।

(ii) সরীসৃপের আঁশ ত্বকের এপিডারমিস স্তর থেকে উৎপন্ন হয়। তাই একে এপিডারমিল আঁশ বলে। এই প্রকার আঁশ নির্মোচিত হয়।

25. দুটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম লেখো যারা ডিম পাড়ে।

• অণ্ডজ প্রাণী— ডিম পাড়ে এমন দুটি প্রাণীর নাম হল— (i) প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু এবং (ii) পিপীলিকাভুক।

26. চারটি দৌড় পাখির উদাহরণ দাও।

• দৌড় পাখির নাম— (i) রিয়া, (ii) কিউই, (iii) এমু, (iv) উটপাখি।

27. নিম্নলিখিতগুলির উৎপত্তিস্থল এবং কার্য উল্লেখ করো : (ক) কোয়ানোসাইট, (খ) নিমাটোসিস্ট এবং (গ) প্যারাপোডিয়া।

• (ক) কোয়ানোসাইট— পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীদের ( স্পঞ্জ ) দেহে যে বিশেষ ধরনের ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোশ থাকে তাদের কোয়ানোসাইট বলে।

কাজ— (i) এদের বিচলনে জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। (ii) এই বিশেষ অংশ জল থেকে খাদ্য সংগ্রহে প্রাণীটিকে সাহায্য করে।

(খ) নিমাটোসিস্ট— নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের ( হাইড্রা ) বহিস্তরকে ( এক্টোডার্মে ) নিডোব্লাস্ট নামে দংশক কোশে চাবুকের মতো অংশকে নিমাটোসিস্ট বলে।

কাজ— এই অংশ আত্মরক্ষা, শিকার ধরা এবং গমন কাজে ব্যবহৃত হয়।

(গ) প্যারাপোডিয়া— অ্যানিলিডা পর্বভুক্ত প্রাণী নেরিসের দেহে থাকে।

কাজ— গমনাঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির এককথায় উত্তর দাও (Answer of the following questions in one word) :**

1. দ্বিপদ নামকরণ প্রথায় দ্বিতীয় ব্যবহৃত নামটিকে কী বলে ?
2. কোন্ জীবগোষ্ঠী প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ?
3. ম্যাড্রিপোরাইট প্লেট কোন্ প্রাণীর দেহে থাকে ?
4. কোয়ানোসাইট কোশ কোন্ পর্বের প্রাণীদের দেহে পাওয়া যায় ?
5. নিডোব্লাস্ট কোশ আছে এমন একটি প্রাণীর নাম লেখো।
6. ফিতাকৃমি প্রাণী কোন্ পর্বের অন্তর্ভুক্ত ?
7. সন্ধিযুক্ত পা আছে এমন একটি প্রাণীর নাম লেখো।
8. চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কী বলে ?
9. পাখির কোন্ দিকের সিস্টেমিক মহাধমনি থাকে ?
10. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গ্রীবায় কটি কশেরুকা থাকে ?
11. শ্রেণিবিন্যাসের একককে কী বলে ?
12. এককোশী, আণুবীক্ষণিক জীবদের কোন্ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ?
13. প্যারামিসিয়ামের গমন অঙ্গের নাম কী ?
14. স্পঞ্জের দেহে দুটি কোশস্তরের মধ্যবর্তী অকোশীয় স্তরকে কী বলে ?

12. ফ্লাজেলাযুক্ত প্রোটোজোয়ার উদাহরণ হল ———।
13. স্পঞ্জের কঙ্কালতন্ত্র ——— দিয়ে গঠিত হয়।
14. ——— প্রাণীতে মেটাজেনেসিস্ দেখা যায়।
15. সিলোম থাকে না এমন একটি প্রাণীর উদাহরণ হল ———।
16. ——— প্রাণীর দেহ প্রোবেসিস্, কলার ও দেহকাণ্ডে বিভক্ত।
17. রেট্রোগ্রেসিভ মেটামরফোসিস্ (Retrogressive metamorphosis) ——— প্রাণীতে দেখা যায়।
18. চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডীদের ——— বলে।
19. কনড্রিকথিস জাতীয় মাছের দেহে ——— আঁশ থাকে।
20. নগ্ন ত্বক ——— শ্রেণির প্রাণীতে পাওয়া যায়।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. দ্বিপদ নামকরণ প্রথায় দ্বিতীয় নামটিকে ——— বলে। (i) প্রজাতি, (ii) গণ, (iii) গোত্র, (iv) জাতি।
2. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গ্রীবা অঞ্চলে কশেরুকার সংখ্যা হল ———। (i) পাঁচ, (ii) সাত, (iii) নয়, (iv) বারো।
3. যেসব প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের ——— বলে। (i) স্তন্যপায়ী, (ii) জরায়ুজ, (iii) উভচর, (iv) অণ্ডজ।
4. ভেনাস হৃৎপিণ্ড ——— জাতীয় প্রাণীদের দেহে থাকে। (i) উভচর, (ii) মৎস, (iii) পাখি, (iv) স্তন্যপায়ী।
5. জলসংবহনতন্ত্র ——— শ্রেণির প্রাণীদের দেহে থাকে। (i) পরিফেরা, (ii) নিডারিয়া, (iii) মোলাস্কা, (iv) একাইনোডারমাটা।
6. স্তন্যপায়ী প্রাণীর কশেরুকা সেন্ট্রাম ——— প্রকারের। (i) প্রোসিলাস, (ii) হেটারোসিলাস, (iii) অ্যাম্ফিসিলাস, (iv) আসিলাস।
7. স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁত চোয়ালে প্রোথিত থাকে, তাই এই প্রকার দাঁতকে ——— বলে। (i) অ্যাক্রোডন্ট, (ii) প্লুরোডন্ট, (iii) থেকোডন্ট, (iv) হিপসোডন্ট।
8. পেঙ্গুইন ——— শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। (i) স্তন্যপায়ী, (ii) সরীসৃপ, (iii) অ্যভিস, (iv) উভচর।
9. কচ্ছপ ——— শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। (i) উভচর, (ii) সরীসৃপ, (iii) স্তন্যপায়ী, (iv) কনড্রিকথিস।
10. হাইড্রার দেহের বর্জ্যপদার্থ যে ছিদ্রপথে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় তা হল ———।
(i) এট্রিওপোর, (ii) নেফ্রিডিওপোর, (iii) মুখছিদ্র, (iv) অসকুলাম।

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. নালিকাতন্ত্র একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে থাকে।
2. প্রবাল নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণী।
3. অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের অঙ্কীয়, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
4. ম্যালপিজিয়াননালিকা কেঁচোর দেহে উপস্থিত থাকে।
5. শামুকের বহিঃকঙ্কাল কাইটিন নির্মিত।
6. জলে ও স্থলে বসবাস করে বলে কুনো ব্যাং উভচর শ্রেণির।
7. হাঙরের দেহে পটকা থাকে না।
8. সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীদের বহিঃকঙ্কাল এপিডারমিস নির্মিত।
9. প্রোটোথেরিয়ার অমরা অনুন্নত ধরনের।
10. পাখির স্বরযন্ত্রের নাম হল ল্যারিংক্স।
11. ডিম পাড়ে এমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম ক্যাঙারু।
12. প্যারামিসিয়ামের গমন অঙ্গের নাম হল সিলিয়া।
13. সংকোচনশীল গহ্বরের সাহায্যে অ্যামিবা জনন ক্রিয়া করে।
14. ওবেলিয়া একটি ট্রিপ্লোব্লাসটিক প্রাণী।
15. স্পঞ্জোসিল হাইড্রার দেহে পাওয়া যায়।
16. নিডোব্লাস্ট কোশ টিনোফোরার দেহে থাকে।
17. ফিতাকৃমি ত্রিস্তর কোশ বিশিষ্ট প্রাণী।
18. গোলকৃমির দেহে ছদ্মসিলোম দেখা যায়।
19. শ্রেণি অ্যানিলিডার অন্তর্গত প্রাণীদের দেহ অখণ্ডিত।
20. মাকড়সা একপ্রকার সন্ধিপদ প্রাণী।
21. ললিগোর বহিঃকঙ্কাল দেহের বহিরাবরণে থাকে।
22. মোলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ নরম ও অখণ্ডিত।
23. কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের পৃষ্ঠদেশীয়, নিরেট, নলাকার স্নায়ুরজ্জু আছে।

24. স্নায়ুরজ্জুর অঙ্কীয়দেশে নোটোকর্ড থাকে।
25. অ্যাম্ফিঅক্সাসের দেহে স্টোমোকর্ড থাকে।
26. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহে অ্যামনিয়ন থাকলে তাকে অ্যামনিওটা বলে।
27. সাইক্লোস্টোমাটার কঙ্কালতন্ত্র অস্থি নির্মিত।
28. শংকর মাছের ত্বকে আণুবীক্ষণিক প্লাকয়েড আঁশ থাকে।
29. হাঙরের লেজটি হোমোসারক্যাল প্রকারের।
30. ক্যাটফিসের মুখছিদ্রের চারপাশে বার্ব থাকে।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. কোন্ পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহ একটি কোশের সমন্বয়ে গঠিত ? বহুকোশী প্রাণীকে কী বলে ?
2. স্পঞ্জিলা ও হাইড্রা কোন্ পর্বের অন্তর্গত ?
3. কোন্ প্রধান পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক ? এদের একটি পর্ব বৈশিষ্ট্য লেখো।
4. ডিপ্লোব্লাসটিক প্রাণী বলতে কী বোঝো ? উদাহরণ দাও।
5. আরথ্রোপোডা নামকরণের যৌক্তিকতা লেখো।
6. গৃহমাছি ও মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম ও কোন্ পর্বের অন্তর্গত বলো।
7. সরীসৃপ শ্রেণির পদবিহীন দুটি প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখো।
8. কোন্ অঙ্গের সহায়তায় পাখি শব্দ করে ? এটি দেহের কোন্ অংশে থাকে।
9. কোন্ শ্রেণির প্রাণীদের কর্ণছত্র থাকে ? মেটাথেরিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
10. ডিম পাড়ে এমন দুটি স্তন্যপায়ীর নাম বলো।
11. তারামাছ ও চিংড়িমাছ কি মাছ ? যুক্তি দাও।
12. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য কী লেখো।
13. প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্গত জীবদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
14. সংকোচনশীল গহ্বর কোথায় থাকে ? এর কাজ লেখো।
15. অসকুলাম কোথায় থাকে ? এর কাজ লেখো।
16. প্রোটোজোয়া ও প্যারাজোয়ার পার্থক্য লেখো।
17. পর্ব টিনোফোরার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
18. নিমাটোডার দেহগহ্বরকে সিউডোসিলোম বলে কেন ?
19. উভচর প্রাণীর ত্বকের বৈশিষ্ট্য লেখো।
20. সরীসৃপ প্রাণীদের এক্টোথারমিক বলে কেন ?
21. সরীসৃপ প্রাণীদের দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য লেখো।
22. অ্যাভিস শ্রেণির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো।
23. অ্যাভিস শ্রেণির প্রাণীদের এন্ডোথারমিক বলে কেন ?
24. কীল অস্থির অবস্থান কোথায় ? এর কাজ লেখো।
25. স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুটি অস্থি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য লেখো।
26. প্রোটোথেরিয়ার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো।
27. মারসুপিয়াম কোন্ প্রাণীর থাকে ? এর কাজ লেখো।
28. ক্যাটফিস ও ডগফিসের একটি করে উদাহরণ দাও।
29. স্পঞ্জোসিল কোথায় থাকে ? এর কাজ কী ?
30. জলসংবহন তন্ত্রের কাজগুলি লেখো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :

1. প্রজাতির সংজ্ঞা দাও। 2. প্রোটোজোয়ার চারটি সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লেখো। 3. স্পঞ্জকে পরিফেরা পর্বের অন্তর্ভুক্তির কারণ নির্দেশ করো। 4. নিডেরিয়া ও টেনোফোরার বৈশিষ্ট্য লেখো। 5. কেঁচোকে কেন পর্ব অঙ্গুরিমালের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে? 6. আরশোলার পর্ব বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। 7. কনড্রিকথিস ও অসটিকথিসের বৈশিষ্ট্য লেখো। 8. টিকটিকির শ্রেণি বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করো। 9. বাদুড় কেন পাখি নয়—যুক্তি দিয়ে বোঝাও। 10. তিমি কেন মাছ নয়—যুক্তি দিয়ে বোঝাও। 11. হংসচঞ্চু কেন স্তন্যপায়ী—যুক্তি দিয়ে বোঝাও। 12. মেটাথেরিয়া ও ইউথেরিয়ার বৈশিষ্ট্য লেখো। 13. ওভেলিয়া ও কেঁচোর পর্ববৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 14. শামুক ও তারামাছের পর্ববৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। 15. তারামাছ কেন মাছ নয় যুক্তিসহ লেখো।

### B. টীকা লেখো (Write short notes) :

1. প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস
2. সংকোচনশীল গহ্বর
3. নালিকাতন্ত্র
4. নিডোব্লাস্ট কোশ
5. নালিপদ
6. নোটোকর্ড
7. হেমিকর্ডাটা
8. অ্যামনিওটা
9. অ্যাগনাথা
10. এক্টোথারমি
11. র‍্যাটিটি
12. মেটাথেরিয়া
13. মধ্যচ্ছদা
14. এন্ডোথারমি
15. প্রজাতি
16. লিনিয়ান হায়ারারকি
17. গ্যাসট্রোভাসকিউলার গহ্বর
18. টিনোফারা
19. গলবিলীয় ছিদ্র
20. বদ্ধসংবহন
21. পায়ু-পশ্চাৎ লেজ
22. সাইক্লোস্টোমাটা
23. ইউরোকর্ডাটা
24. প্রোটোকর্ডেটস্
25. কর্ডাটার স্নায়ুরজ্জু

### C. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ট্যাক্সন ও ক্যাটিগোরি; 2. প্রোটোজোয়া ও মেটাজোয়া; 3. ডিপ্লোব্লাসটিক ও ট্রিপ্লোব্লাসটিক প্রাণী; 4. সিলোম ও সিলেন্টেরণ; 5. চ্যাপটা কৃমি ও গোল কৃমি; 6. নিডারিয়া ও অ্যানিলিডা; 7. সিলোমেটা ও সিউডোসিলোমেটা; 8. নোটোকর্ড ও নার্ভকর্ড; 9. আগনাথা ও ন্যাথোস্টোমাটা; 10. কনড্রিকথিস ও অসটিকৃথিস; 11. ক্যাটিফিস ও ডগফিস; 12. সরীসৃপ ও পাখি; 13. মেটাথেরিয়া ও ইউথেরিয়া; 14. ব্যাঙাচি ও চারাপোনা; 15. এক্টোথারমি ও এন্ডোথারমি।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

1. নন-কর্ডেট বলতে কী বোঝো ? নন-কর্ডেট অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান পর্বগুলি সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।
2. এককোশি ও বহুকোশি প্রাণী বলতে কী বোঝো ? প্রোটোজোয়া ও পরিফেরা পর্ব দুটির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। প্রত্যেকটি পর্বের দুটি করে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
3. শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে ? শ্রেণিবিন্যাসে প্লাটিহেলমিন্থিস্ ও নিমাটোডা পর্ব দুটি সম্বন্ধে যা জানো উদাহরণসহ আলোচনা করো।
4. পর্ব কাকে বলে ? আরথ্রোপোডা পর্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসহ পর্বটি বর্ণনা করো।
5. শ্রেণিবিভাগের একক কী ? মোলাস্কা ও অ্যানিলিডা পর্ব দুটির উদাহরণসহ আলোচনা করো।
6. আটটি অমেরুদণ্ডী পর্বের নাম লেখো ও প্রত্যেকটি পর্বের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
7. অ্যানিলিডা ও আরথ্রোপোডা পর্ব দুটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এবং প্রতিটি পর্বের দুটি করে উদাহরণ দাও।
8. প্রোটোজোয়া এবং মোলাস্কা পর্ব দুটির তিনটি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। প্রতিটি পর্বের একটি করে উদাহরণ দাও (বিজ্ঞানসম্মত নামসহ)।
9. নন-কর্ডাটাভুক্ত প্রধান প্রধান পর্বের গুরুত্ব বিষয়ে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।
10. নিডেরিয়া ও টিনোফোরা কাকে বলে ? উদাহরণ সহ পর্ব দুটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
11. অঙ্গুরিমাল ও একাইনোডারমাটা পর্বের চারটি করে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো এবং দুটি উদাহরণ দাও।
12. কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। প্রোটোকর্ডাটা বিষয়ে যা জানো লেখো।
13. মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে ? 'সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেট প্রাণীরা মেরুদণ্ডী নহে'— উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ করো।
14. ন্যাথোস্টোমাটা বলতে কী বোঝো ? কনড্রিকথিস ও অসটিকথিস শ্রেণি দুটির তুলনামূলক আলোচনা করো।
15. রেপটিলিয়া ও অ্যাভিস—এই শ্রেণিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। প্রত্যেকটি শ্রেণির দুটি উদাহরণ দাও।
16. কর্ডাটা পর্বের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। উপপর্ব পর্যন্ত কর্ডাটা পর্বের শ্রেণিবিভাগ করো এবং প্রতিটি উপপর্বের একটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো এবং উদাহরণ দাও।
17. কর্ডাটা পর্বের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। এই পর্বের অন্তর্গত উপপর্বগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ লেখো।
18. একটি ছকের মাধ্যমে ননকর্ডাটা ও কর্ডাটার তুলনামূলক আলোচনা করো।
19. মোলাস্কা ও আরথ্রোপোডা পর্ব দুটির তিনটি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো। প্রতি পর্বের দু টি করে বিজ্ঞানসম্মত নামসহ উদাহরণ দাও।
20. রেপটিলিয়া ও অ্যাভিস শ্রেণি দুটির তিনটি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো। প্রত্যেকটি শ্রেণির দুটি করে বিজ্ঞানসম্মত নামসহ উদাহরণ দাও।

---

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ঃ গিনিপিগ
# [ FEATURES OF MAMMAL : GUINEA-PIG ]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতানুসারে পৃথিবী সৃষ্টির আদিকালে কোনো জীবের অস্তিত্ব ছিল না। অজৈব উপাদান থেকে জৈব উপাদানের সৃষ্টি হয় এবং সরল জীব থেকে ধাপে ধাপে জটিল থেকে জটিলতর জীবের উথ্যান ঘটে। পরিশেষে একটি বিশাল জীবমণ্ডলের উদ্ভব ঘটে যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাই।

এককোশী প্রোটোজোয়ার অন্তর্গত প্রাণীদের সর্বপ্রথম সৃষ্ট প্রাণী বা আদ্যপ্রাণী বলা হয়। এইসব প্রাণী থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন ধারায় ও ধাপে জটিল ও জটিলতর প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনের শেষধাপে সৃষ্ট স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণীদের উৎকৃষ্টতম প্রাণী বলা হয়। কারণ—এই প্রাণীদের দেহ সংগঠন অত্যন্ত জটিল ও অন্যপ্রকার প্রাণীদের থেকে অনেক উন্নত। সরীসৃপ প্রাণীদের একটি গোষ্ঠী থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। **গিনিপিগ** পর্ব-কর্ডাটার অন্তর্গত স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণী। স্তন্যপায়ীর মডেল বা আদর্শ স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসাবে এই প্রাণীর গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রাণীর সমস্ত তন্ত্র, অঙ্গ ইত্যাদির গঠন ও কাজ জানলে আমরা প্রায় সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ সম্বন্ধে জানতে পারব। এ ছাড়া, গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্যও গিনিপিগের প্রয়োজন হয়। সুতরাং গিনিপিগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

## ◘ প্রাণীজগতে গিনিপিগের অবস্থান (Systematic position of Guinea-pig in Animal kingdom) :

পর্ব (Phylum)— Chordata (কর্ডাটা)

উপপর্ব (Subphylum)— Vertebrata (ভার্টিব্রাটা)

অধিশ্রেণি (Superclass) — Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা)

শ্রেণি (Class) — Mammalia (স্তন্যপায়ী বা ম্যামেলিয়া)

উপশ্রেণি (Subclass) — Theria (থেরিয়া)

ইনফ্রাশ্রেণি (Infraclass) — Eutheria (ইউথেরিয়া)

বর্গ (Order) — Rodentia (রোডেনসিয়া)

উপবর্গ(Suborder)— Hystricomorpha (হিস্ট্রিকোমরফা)

গোত্র (Family) — Cavidae (কেভিডি)

গণ (Genus) — *Cavia* (*কেভিয়া*)

প্রজাতি(Species)— *porcellus* (*পোরসেলাস*)

● **গিনিপিগের বৈজ্ঞানিক নাম :** *Cavia porcellus* (*কেভিয়া পোরসেলাস*)

## ◘ গিনিপিগের স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and habitat of Guinea-pig) :

গিনিপিগ গৃহপালিত অথবা বন্য, শাকাশী, ভীরু প্রকৃতির চতুষ্পদ প্রাণী। এরা দিনের বেলায় সক্রিয় থাকে। দিনে ও রাত্রে দু'বার এরা মলত্যাগ করে। রাতে বর্জিত নরম ও ঝিল্লি মেশানো মল এরা খায় এবং এদের এই ধর্মকে **কপ্রোফেগি** (Coprophagy) বলা হয়। এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের পাওয়া যায়। সাধারণত নরম ঘাস, পাতা, ফলমূলযুক্ত স্থানে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বনের মধ্যে এরা মাটিতে গর্ত করে তার নীচে বাস করে।

# ◎ 2.1. গিনিপিগের বহিরাকৃতি ◎ (External Features of Guinea-pig)

পূর্ণবয়স্ক একটি গিনিপিগের দৈর্ঘ্য প্রায় 20 cm বা 8 ইঞ্চি। দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। সারা দেহ নরম ও ঘন লোম দিয়ে ঢাকা থাকে। লোমগুলি বিভিন্ন রং-এর হয় যেমন—কালো, সাদা, ধূসর, হলুদ, বাদামি ইত্যাদি। এদের লেজ থাকে না। সমগ্র দেহকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যেমন— **মস্তক** বা মাথা, **গ্রীবা** বা গলা ও **দেহকাণ্ড** বা ধড়।
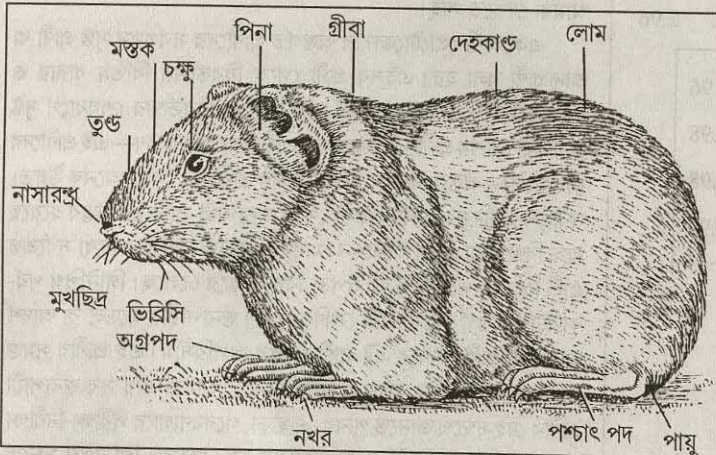
চিত্র 2.1 : গিনিপিগের বহিরাকৃতির গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)।

### ➤ 1. মস্তক (Head) :

গিনিপিগের মাথা ত্রিকোণাকার এবং সামনের দিকে **তুণ্ডে** (Snout) শেষ হয়। তুণ্ডে লোম থাকে না এবং তুণ্ডের একেবারে অগ্রভাগে একজোড়া **বহিঃ নাসারন্ধ্র** (External nares) থাকে। নাসারন্ধ্রের চারদিকে অনেকগুলি শক্ত ও সংবেদনশীল লোম বা গোঁফ আছে, এদের **ভিব্রিসি** (Vibrissae) বলে। ভিব্রিসি স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। বহিঃনাসারন্ধ্রের অঙ্কীয় দেশে **মুখছিদ্র** (Mouth) আছে। মুখছিদ্রটি উপরের ও নীচের **ঠোঁট** দিয়ে ঘেরা থাকে। উপরের ঠোঁটের মাঝখানে **ফিলট্রাম** (Philtrum) বলে একটা কাটা অংশ আছে

যেখান দিয়ে উপরের চোয়ালের দু'টি **কৃন্তক** (Incisor) দাঁত দেখা যায়। মাথার দু'পাশে দু'টি গোলাকার চোখ (Eye) থাকে। চোখের **উপরের ও নীচের পাতা বা নেত্রপল্লব** (Eye lid) সঞ্চারণশীল এবং এগুলি চোখ দুটিকে সুরক্ষিত করে। এদের তৃতীয় নেত্র পল্লব বা **নিকৃটিটেটিং পর্দা** (Nictitating membrane) ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গ হিসাবে থাকে। দু'টি চোখের পিছনে মাথার দু'পাশে দু'টি **বহিঃকর্ণ** বা **কর্ণছত্র** (Pinna) থাকে। গিনিপিগ বহিঃকর্ণটিকে নাড়াচাড়া করতে পারে। বহিঃকর্ণের ভিতরের ছিদ্রটিকে **কর্ণকুহর** (Auditory meatus) বলে।

➤ **2. গ্রীবা বা গলা (Neck)** ঃ মাথার পরবর্তী ক্ষুদ্র অংশ যা গিনিপিগের মাথা ও দেহকাণ্ডকে সংযুক্ত করে তাকে গ্রীবা বলে। গ্রীবা নমনীয় হওয়ার ফলে গিনিপিগ মাথাটি নিজের ইচ্ছেমত নাড়াতে পারে।

➤ **3. দেহকাণ্ড বা ধড় (Trunk)** ঃ গিনিপিগের গলার পিছনের এই অংশটি আকারে বেশ বড়ো এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতি। গিনিপিগের দেহকাণ্ড দু'টি অংশে বিভেদিত, যেমন—**বক্ষ** (Thorax) ও **উদর** (Abdomen)। বক্ষদেশটি **বক্ষপঞ্জর** (Rib) ও **স্টারনাম** (Sternum) দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু উদর দেশে এই প্রকার কোনো অস্থি নেই। উদরদেশের অঙ্কীয়তলে একজোড়া **স্তনগ্রন্থি** (Mammary gland) থাকে। প্রতিটি স্তনগ্রন্থি বাইরের দিকে দেহের উপরিতলে একটি **স্তনবৃন্ত** (Nipple) বা **টিট্** (Teat)-এর সাহায্যে মুক্ত হয়। পুরুষ গিনিপিগের স্তনগ্রন্থি নিষ্ক্রিয় ও স্তনবৃন্ত ক্ষুদ্রাকার। দেহকাণ্ডের একেবারে পিছনের দিকে একটি **পায়ুছিদ্র** (Anus) থাকে। পায়ুছিদ্রের নীচে একটি **মূত্র-জনন ছিদ্র** (Urinogenital aperture) আছে। এই ছিদ্রপথে মূত্র ও জনন পদার্থ নির্গত হয়। পায়ুছিদ্র ও মূত্র-জনন ছিদ্রের মাঝে **পেরিনিয়ামে** (Perinium) অবস্থিত **পেরিনিয়াল গ্রন্থি** (Perinial gland) থাকে। এই গ্রন্থির নিঃসরণ গিনিপিগের দেহের বিশেষ গন্ধের জন্য দায়ী। পুরুষ গিনিপিগের জননছিদ্র **শিশ্ন** বা **পেনিসের** (Penis) অগ্রভাগে থাকে। পেনিস হল গিনিপিগের মাংসল জননাঙ্গ যেটি **প্রিপিউস** (Prepuce) নামের একটি চামড়ার আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে। পুরুষ গিনিপিগের জননাঙ্গ বা পেনিসের গোড়ার কাছে একটি **স্ক্রোটাম** (Scrotum) থলি থাকে যেখানে দু'টি **শুক্রাশয়** অবস্থান করে। স্ত্রী গিনিপিগের জননছিদ্রে **লেবিয়া** (Labia), **ক্লাইটোরিস** (Clitoris) এবং **যোনি ছিদ্র** (Vaginal orifice) থাকে। **লেবিয়া** হল একটি মোটা চামড়ার ভাঁজ ও ক্লাইটোরিস হল ক্ষুদ্র মাংসল দণ্ডাকার অংশ। ক্লাইটোরিসের নীচে **মূত্রছিদ্র** এবং তার নীচে **যোনি ছিদ্র** থাকে।
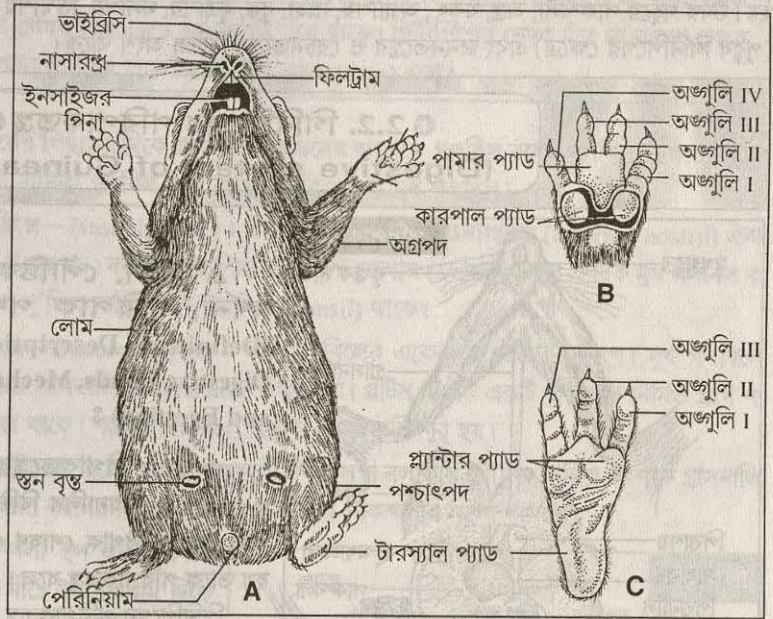
চিত্র 2.2 ঃ গিনিপিগের বহিরাকৃতি— A-অঙ্কীয় দেশ, B-অগ্রপদতল, C-পশ্চাৎ পদতল।

● **পা বা লিম্ব (Limb)** ঃ গিনিপিগের দেহকাণ্ডে দু'জোড়া পা আছে। দেহকাণ্ডের সামনের দিকে এক জোড়া **সামনের পা** বা **অগ্রপদ** (Fore limb) এবং পিছনের দিকে একজোড়া **পেছনের পা** বা **পশ্চাৎপদ** (Hind limb) থাকে। পশ্চাৎপদের তুলনায় অগ্রপদ ছোটো। অগ্রপদের বিভিন্ন অংশগুলি হল—**বাহু** (Arm), **পুরোবাহু** (Forearm) ও **পদতল** (Foot) এবং পশ্চাৎপদের অংশগুলি হল **উরু** (Thigh), **জংঘা** (Leg) ও **পদতল** (Foot)। প্রতি অগ্রপদে চারটি এবং প্রতি পশ্চাৎপদে তিনটি আঙুল আছে। সব আঙুলের অগ্রভাগে **নখর** থাকে। গিনিপিগের পদতলে কোনো লোম থাকে না। অগ্র পদতলে **পামার প্যাড** (Palmer pad) ও **কারপাল প্যাড** (Carpal pad) এবং পশ্চাৎ পদতলে **প্ল্যান্টার প্যাড** (Planter pad) ও **টারস্যাল প্যাড** (Tarsal pad) দেখা যায়।

## ▲ দেহ গহ্বর (Body cavity or Coelom)

❖ (a) **দেহগহ্বরের সংজ্ঞা (Definition of Body cavity or Coelom) : গিনিপিগের বক্ষ ও উদর অংশে অবস্থিত যে কুঠুরিতে বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র উপস্থিত থাকে তাকে দেহ গহ্বর বা সিলোম বলে।**

বক্ষ অঞ্চলের গহ্বরকে **বক্ষ গহ্বর** (Thoracic cavity) এবং উদর অঞ্চলের গহ্বরকে **উদর গহ্বর** (Abdominal cavity) বলে। এই দু'টি গহ্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) পর্দা গহ্বর দু'টিকে পৃথক করে রেখেছে।

(b) **দেহগহ্বরের বিভাজন অংশ (Division of Body cavity) :**

1. **বক্ষ-গহ্বর**—বক্ষগহ্বরের পৃষ্ঠদেশে **মেরুদণ্ড**, দু'পাশে **পর্শুকা** বা **পঞ্জরাস্থি** এবং অঙ্কীয় দেশে **স্টারনাম** থাকে। বক্ষ গহ্বরের দু'দিকে দু'টি ফুসফুস এবং মধ্যস্থলে একটি হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। ফুসফুসের চারিদিকে **প্লুরা পর্দা** (Pleura) এবং হৃৎপিণ্ডকে **পেরিকার্ডিয়াম পর্দা** বেস্টন করে সুরক্ষিত করে। এগুলি ছাড়া এই গহ্বরে গ্রাসনালি ও শ্বাসনালি থাকে।

2. **উদর গহ্বর** — উদর গহ্বরটি **পেরিটোনিয়াম** (Peritoneum) পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। এই পর্দা থেকে **মেসেন্ট্রি পর্দা** সৃষ্টি হয়। উদর গহ্বরে পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লিহা, বৃক্ক, মূত্রাশয়, মলাশয়, ডিম্বাশয় (স্ত্রী গিনিপিগের ক্ষেত্রে) অথবা শুক্রাশয় (পুরুষ গিনিপিগের ক্ষেত্রে) এবং জননতন্ত্রের ও রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থাকে।

# ❂ 2.2. গিনিপিগের পরিপাকতন্ত্র ❂ (Digestive system of Guinea-pig)

চিত্র 2.3 : পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন।
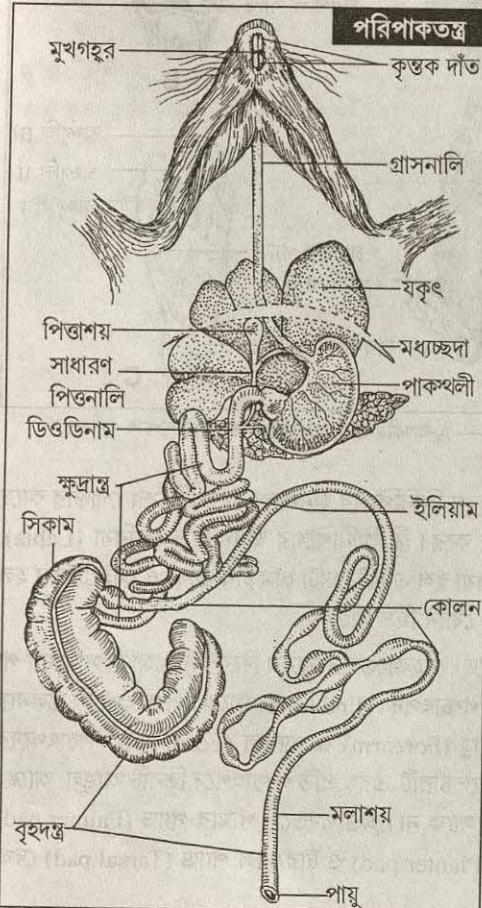
### ▲ সংজ্ঞা, পৌষ্টিক নালি ও পরিপাক গ্রন্থির বর্ণনা, পরিপাক পদ্ধতি, শোষণ ও বহিষ্করণ (Definition, Description of Alimentary canal and Digestive glands, Mechanism of Digestion, Absorption and Egestion) :

❖ (a) **পরিপাকতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Digestive system) : অন্ননালির বিভিন্ন অংশ ও পাচনগ্রন্থি সমন্বিত যে তন্ত্র খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ ও অপাচ্য অংশ বহিষ্করণের কাজে নিযুক্ত হয় তাকে পরিপাকতন্ত্র বলে।**

গিনিপিগের পরিপাকতন্ত্র সাধারণভাবে **পৌষ্টিক নালি** ও **পরিপাক গ্রন্থি** সমন্বয়ে গঠিত।

➤ (b) **পৌষ্টিক নালির বর্ণনা ( Description of Alimentary canal) : ❖ যে বিশেষ নালি মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্রকে সংযুক্ত করেছে তাকেই পৌষ্টিক নালি বলে।** বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজের জন্য পৌষ্টিক নালির গঠনগত পরিবর্তন হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ—

1. **মুখ** (Mouth) — তুণ্ডের অগ্রভাগে ও নাসারন্ধ্রের নীচে মুখছিদ্র দিয়ে পৌষ্টিকনালি আরম্ভ হয়। মুখছিদ্র একটি অনুপ্রস্থ ছিদ্র যা উপরোষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ দিয়ে আবদ্ধ থাকে। উপরোষ্ঠের মধ্যভাগ কাটা বা চেরা, একে **ফলট্রাম** বলে।

2. **মুখ গহ্বর** (Buccal cavity)—**মুখছিদ্রের পরের প্রশস্ত অংশকে মুখগহ্বর বলে।** মুখগহ্বরের উপরের অংশকে **তালু** (Palate) বলে। তালুর সম্মুখভাগে অস্থি থাকে এবং এই অংশকে **শক্ত তালু** (Hard palate) বলে, কিন্তু পিছনের দিকে তালুতে কোনো অস্থি না থাকায় এটিকে

**নরম তালু** (Soft palate) বলে। মুখগহ্বরের মেঝেতে মাংসল, সঞ্চারণশীল **জিভ** থাকে যার সম্মুখ অংশটি মুক্ত। (a) জিভ বা জিহ্বা (Tongue)—জিভের উপরতলে বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য **প্যাপিলা** (Papilla) এবং **স্বাদকোরক** (Taste bud) থাকে। (b) দাঁত বা দন্ত (Teeth)—মুখগহ্বরের উপরে ও নীচে যথাক্রমে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল থাকে। দুটি চোয়ালেই একসারি বিভিন্ন প্রকার দাঁত থাকে। দাঁতগুলির বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারের ঃ— (i) **হেটোরোডন্ট** (Heterodont)—অর্থাৎ গিনিপিগের বিভিন্ন প্রকার দাঁত থাকে, যেমন—**কৃন্তক** (Incisor), **পুরঃপেষক** (Premolar) এবং **পেষক** (Molar)। (ii) **থেকোডন্ট** (Thecodont)— অর্থাৎ দাঁতগুলি চোয়ালের গর্তে প্রোথিত থাকে। (iii) **ডাইফিওডন্ট** (Diphyodont)—অর্থাৎ গিনিপিগের দু'বার দাঁত জন্মায়, প্রথমবারের দাঁতকে বলে **দুধে দাঁত** (Milk teeth) এবং পরে দুধে দাঁত পড়ে সেই স্থানে **স্থায়ী দাঁত** জন্মায়।

**• গিনিপিগের দন্ত সংকেত ঃ $I\frac{1}{1}$; $C\frac{0}{0}$ ; $PM\frac{1}{1}$; $M\frac{3}{3}$ •**

**ব্যাখ্যা ঃ** প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে একটি করে **কৃন্তক** (Incisor = I) থাকে, **ছেদক** (Canine = C) থাকে না, **পুরঃপেষক** (Premolar = PM) একটি করে এবং **পেষক** (Molar = M) তিনটি করে থাকে। গিনিপিগের ছেদক দাঁত না থাকায় কৃন্তক ও পুরঃপেষকের মাঝে একটি ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয় যাকে **ডায়াস্টেমা** (Diastema) বলে।

3. **গলবিল** (Pharynx)— **মুখবিবরের পিছনের দিকে গ্রাসনালির সামনের অংশকে গলবিল বলে।** গলবিল বা ফ্যারিংক্সের দু'টি অংশ, যেমন—ন্যাসো ফ্যারিংক্স বা নাসিকা গলবিল এবং বাক্কো ফ্যারিংক্স বা মুখ গলবিল।

(i) **নাসিকা গলবিল (ন্যাসো ফ্যারিংক্স—Nasopharynx) ঃ** এখানে একজোড়া **অন্তঃনাসারন্ধ্র** (Internal nostril) এবং **ইউস্টেচিয়ান নালি** (Eustachian tube) উন্মুক্ত হয়। নরম তালুর পিছনের অংশে **ভেলাম** (Velum) নামে প্রবর্ধক মুখ গলবিল বা বাক্কো ফ্যারিংক্সকে পৃথক করে। ভেলামের দু'দিকে লসিকাগ্রন্থি **টনসিল** (Tonsil) থাকে।

(ii) **মুখ গলবিল (বাক্কো ফ্যারিংক্স—Buccopharynx) ঃ** এটি গলবিলের একেবারে ভিতরের অংশ। মুখ গলবিলে জিভের পিছনে **গ্লটিস** (Glottis) নামে ছিদ্র শ্বাসনালিতে (Trachea) উন্মুক্ত হয়। গ্লটিস ছিদ্রটি একটি তরুণাস্থি নির্মিত প্লাগ বা ঢাকনা **এপিগ্লটিস** (Epiglottis) দিয়ে ঢাকা থাকে। **গালেট** (Gullet) ছিদ্রপথে গ্রাসনালি শুরু হয়।

4. **গ্রাসনালি** (Oesophagus)—**গলবিলের গালেট থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত লম্বা নলাকার পৌষ্টিক নালির অংশকে গ্রাসনালি বলে।** গ্রাসনালি বক্ষদেশের মধ্য অঙ্কীয়রেখা বরাবর গিয়ে মধ্যচ্ছদা ভেদ করে পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত হয়।

5. **পাকস্থলী** (Stomach) —**পাকস্থলী হল একটি পেশি নির্মিত গ্রন্থিময় থলি বিশেষ যা মধ্যচ্ছদার নীচে উদরের বাম দিকে থাকে।** পাকস্থলীর তিনটি অংশ; যেমন—(i) **কার্ডিয়াক অংশ** (Cardiac part)—এই অংশে গ্রাসনালি যুক্ত হয়। (ii) **ফান্ডাস অংশ** (Fundus part)—এই অংশটি পাকস্থলীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং স্ফীত। (iii) **পাইলোরিক অংশ** (Pyloric part)— এই অংশটি পাকস্থলীর সবচেয়ে শেষ অঞ্চল এবং এখানে ক্ষুদ্রান্ত্র যুক্ত হয়।
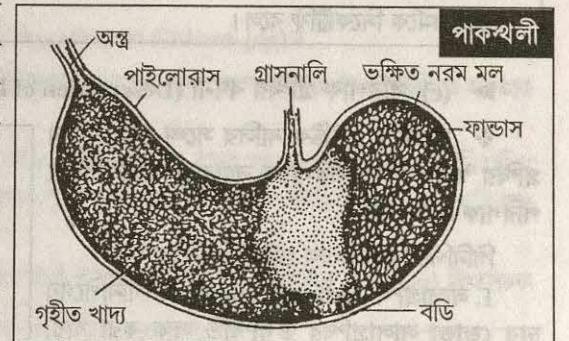
**চিত্র 2.4 ঃ** পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

পাইলোরিক অঞ্চল ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলে চক্রাকার পেশি যুক্ত পাইলোরিক কপাটিকা বা **পাইলোরিক স্ফিংটার** (Pyloric sphincter) থাকে যা পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে খাদ্যের যাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। পাকস্থলীর ভিতরের দিকে অবতল খাঁজকে **ক্ষুদ্রতর বক্রতা** (Lesser curvature) এবং বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো অবতল খাঁজকে **বৃহত্তর বক্রতা** (Greater curvature) বলে। পাকস্থলীর অন্তঃস্থগাত্রে অসংখ্য **পাকস্থলীয় গ্রন্থি** (Gastric glands) থাকে যা পাচক রস নিঃসরণ করে।

6. **অন্ত্র** (Intestine) — **পাকস্থলীর পরবর্তী অংশে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ নলাকার অঞ্চলকে অন্ত্র** বলে। অন্ত্র প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত — ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র।

(a) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine) ঃ অন্ত্রের এই অংশটি পাকস্থলী থেকে সিকাম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত ; যেমন, (i) **ডিওডিনাম** (Duodenum) —এটি নলাকার 'U' আকৃতির এবং এর এক প্রান্ত পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অপরপ্রান্ত ইলিয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ডিওডিনামে সাধারণ পিত্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি মুক্ত হয়। (ii) **ইলিয়াম** (Ileum) — এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের কুণ্ডলীকৃত অংশ ও কোলনে গিয়ে শেষ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অসংখ্য ছোটো ছোটো আঙুলের মতো প্রবর্ধক বা ভাঁজ থাকে। এদের **ভিলাই** (Villi ; একবচনে Villus) বলে। ভিলাইগুলির গোড়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের মধ্যে **আন্ত্রিক গ্রন্থি** এবং মিউকাস স্তরে **ব্রুনারের গ্রন্থি** (Brunner's gland) থাকে। এই সব গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পড়ে। ইলিয়াম ও কোলনের সংযোগস্থলে **ইলিও-কোলিক কপাটিকা** (Ileocolic valve) থাকে। ইলিয়ামের কুণ্ডলীকৃত নালি **মেসেনটেরি** (Mesentery) পর্দার সঙ্গে যুক্ত থাকে। মেসেনটেরি ধমনি ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইতে প্রবেশ করে এবং পোর্টাল শিরার মাধ্যমে পাচিত খাদ্যরস শোষিত হয়।

চিত্র 2.5 ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের একটি ভিলাই-এর অন্তর্গঠন।

(b) **বৃহদন্ত্র** (Large intestine) ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মোটা এই অংশটি **কোলন** (Colon) ও **মলাশয়** (Rectum) নিয়ে গঠিত। কোলন অংশটি প্যাঁচানো এবং খাঁজযুক্ত; অপরদিকে মলাশয় অঞ্চলটি খাঁজহীন সোজা। ইলিয়াম ও কোলনের সংযোগস্থলে একটি বেশ বড়ো, বাঁকানো, বন্ধ থলি থাকে। একে **সিকাম** (Caecum) বলে। মলাশয়টি **পায়ুছিদ্রের** (Anus) মাধ্যমে দেহের বাইরে মুক্ত হয়।

### ● কপ্রোফেগি বা সিকোট্রফি (Coprophagy or Caecotrophy) ●

গিনিপিগ দিনে ও রাত্রে মল ত্যাগ করে। দিনে বর্জিত মল অনেক শক্ত হয়। কিন্তু রাতে বর্জিত মল অনেক নরম হয় এবং এতে সিকাম নিঃসৃত মিউকাস মিশ্রিত থাকে। এই প্রকার রাতের মল গিনিপিগ ভক্ষণ করে এবং এখান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। নিজের মল ভক্ষণ করার এই বিশেষ ধর্মকে **কপ্রোফেগি** বলে এবং সিকাম বর্জিত এই মল থেকে পুষ্টি গ্রহণ করার ধর্মকে **সিকোট্রফি** বলে।

### ➤ (c) পরিপাক গ্রন্থির বর্ণনা (Description of Digestive glands) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ পৌষ্টিক নালির সঙ্গে যুক্ত যে সব গ্রন্থির ক্ষরণ খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের পরিপাক গ্রন্থি বলে।**

গিনিপিগের পরিপাক গ্রন্থিগুলি নিম্নরূপ ঃ

**1. লালাগ্রন্থি (Salivary gland)** ঃ গিনিপিগের চার জোড়া লালাগ্রন্থির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেমন—(i) **প্যারোটিড গ্রন্থি** (Parotid gland)। নীচের চোয়ালের এক কোণে প্যারোটিড লালাগ্রন্থি অবস্থিত। (ii) **সাবম্যাক্সিলারী** (Sub-maxillary)—মুখবিবরের মেঝেতে এগুলি থাকে। (iii) **সাবলিঙ্গুয়াল** (Sub-lingual)—জিভের নীচে এই লালাগ্রন্থিগুলি থাকে। (iv) **ইনফ্রা-অরবিট্যাল** (Infraorbital)—অক্ষি কোটরের নীচে এই লালাগ্রন্থিগুলি থাকে।

চিত্র 2.6 ঃ গিনিপিগের বিভিন্ন লালাগ্রন্থির অবস্থান।

**কাজ**—লালাগ্রন্থিগুলি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। লালা বা **স্যালাইভা** (Saliva) খাদ্যকে নরম করে ফলে খাদ্য সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। লালাতে উপস্থিত **টায়ালিন** (Ptyalin) উৎসেচক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে **মলটোজে** (Maltose) পরিণত করে।

2. **যকৃৎ (Liver)** ঃ গিনিপিগের যকৃৎ সবচেয়ে বড়ো পরিপাক গ্রন্থি। এটি মধ্যচ্ছদার নীচে ও পাকস্থলীর উপরে থাকে। গিনিপিগের যকৃৎ পাঁচটি লোব বা খণ্ড নিয়ে গঠিত হয় এবং **ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টের** (Falciform ligament) সাহায্যে মধ্যচ্ছদার সঙ্গে যুক্ত। যকৃৎ থেকে ক্ষরিত রসকে **পিত্ত** (Bile) বলে। ছোটো ছোটো নালির মাধ্যমে যকৃৎ থেকে পিত্ত **পিত্তথলিতে** (Gall bladder) সাময়িক ভাবে সঞ্চিত হয়। যকৃৎ থেকে সৃষ্ট **যকৃৎনালি** ও পিত্তাশয় বা পিত্তথলি থেকে সৃষ্ট **পিত্তনালি** একত্রিত হয়ে **সাধারণ পিত্তনালি** গঠন করে এবং তা ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে মুক্ত হয়।

**কাজ**—যকৃৎ থেকে ক্ষরিত পিত্তরসে কোনো উৎসেচক থাকে না। ক্ষারধর্মী পিত্ত স্নেহজাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশন** (Emulsification) পদ্ধতির মাধ্যমে পরিপাক এবং শোষণে সহায়তা করে।

3. **অগ্ন্যাশয় (Pancreas)** ঃ গিনিপিগের অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ডিওডিনামের দুটি বাহুর মধ্যে থাকে। এটি অনিয়তাকার, অনেকটা পাতার মতো এবং লম্বাটে, হালকা গোলাপি রং-এর। অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি (Pancreatic duct) অগ্ন্যাশয় রস বহন করে ডিওডিনামে মুক্ত করে।

**কাজ**—অগ্ন্যাশয় রসে উপস্থিত উৎসেচক, যেমন— অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন এবং লাইপেজ যথাক্রমে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য আর্দ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভেঙে দেয়।

4. **পাকস্থলীয় গ্রন্থি (Gastric gland)** ঃ পাকস্থলীর মিউকাস ও সাবমিউকাস স্তরে অসংখ্য পাচনগ্রন্থি আছে। এগুলি **গ্যাসট্রিক রস** (Gastric juice) ক্ষরণ করে।

**কাজ**—গ্যাসট্রিক রসের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক পেপসিন, ইত্যাদি থাকে।

5. **আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal gland)** ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের মাঝে অসংখ্য আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাস্তরে **ব্রুনারের গ্রন্থি** (Brunner's gland) থাকে।

**কাজ**—এই গ্রন্থিগুলি থেকে যথাক্রমে **আন্ত্রিক রস** এবং **শ্লেষ্মা** নিঃসৃত হয়। আন্ত্রিক রসে উপস্থিত অ্যামাইলেজ, মলটেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ ইত্যাদি উৎসেচক বিভিন্ন রকমের শর্করাকে বিশ্লেষণ করে। ইরেপসিন প্রোটিনকে ভাঙে এবং লাইপেজ উৎসেচক স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে দেয়।

### ➤ (d) গিনিপিগের পরিপাক পদ্ধতি (Mechanism of digestion in Guinea-pig) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ জটিল জৈব খাদ্যবস্তু পাচক রসের উৎসেচকের সহায়তায় ভেঙে সরল, শোষণযোগ্য খাদ্যে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে পরিপাক বলে।**

জন্মগ্রহণের পরে গিনিপিগ কিছুদিন মাতৃদুগ্ধ পান করে। এর পরে গিনিপিগ ঘাস, লতা পাতা, ফলমূল ইত্যাদি নিরামিষ (শাকাহারী) খাদ্য দাঁতে কেটে ও চিবিয়ে ভক্ষণ করে। এই সময় খাদ্যের সঙ্গে লালারস মিশে যায়। গিনিপিগের খাদ্য পরিপাক মুখগহ্বর থেকে শুরু করে অন্ত্র পর্যন্ত চলে।

(i) **মুখগহ্বরে পরিপাক** (Digestion in mouth cavity)—মুখগহ্বরে লালারসে উপস্থিত **টায়ালিন** (Ptyalin) উৎসেচক শ্বেতসার খাদ্যকে ভেঙে মলটোজে রূপান্তরিত করে।

(ii) **পাকস্থলীতে পরিপাক** (Digestion in stomach)—পাকস্থলীতে HCl এর উপস্থিতিতে আম্লিক পরিবেশে **পেপসিন** (Pepsin) উৎসেচক প্রোটিনকে পেপটোনে (Peptone) পরিণত করে। এছাড়া **রেনিন** নামে উৎসেচক দুগ্ধপ্রোটিন কেসিনোজেনকে **কেসিন** (Casein) বা ছানায় পরিণত করে। পাকস্থলীতে আংশিক পাচিত এই খাদ্যবস্তুকে **পাকমণ্ড** (Chyme) বলা হয়।

অগ্ন্যাশয় রসের ক্রিয়া

(iii) **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক** (Digestion in Small Intestine) ঃ পাকস্থলী থেকে পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে আসার পর বিভিন্ন প্রকার পাচক রসের সঙ্গে, যেমন— যকৃৎ নিঃসৃত **পিত্তরস**, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি নিঃসৃত **অগ্ন্যাশয় রস** এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **আন্ত্রিক রসের** সঙ্গে মিশ্রিত হয়। পিত্তরসে কোনো উৎসেচক নেই, তবে পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যের পরিপাকে কিছুটা সাহায্য করে। অগ্ন্যাশয় রসে **অ্যামাইলেজ** নামে শক্তিশালী শ্বেতসার পরিপাককারী উৎসেচক, **ট্রিপসিন** ও কাইমোট্রিপসিন নামে প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক এবং লাইপেজ নামে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি উপরিলিখিতভাবে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করে।

আন্ত্রিক রসের ক্রিয়া
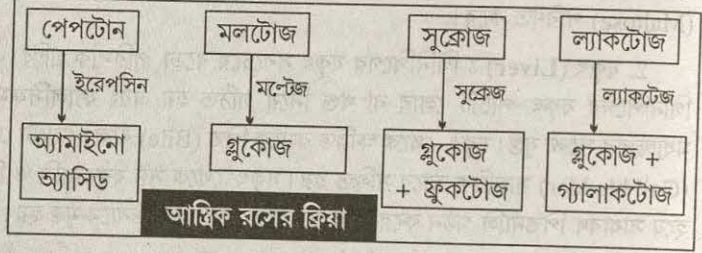
আন্ত্রিক রসে সামান্য পরিমাণ **ইরেপসিন**, (প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক), **মলটেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ** ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি উপরিউল্লিখিত খাদ্যবস্তুর উপরে কাজ করে।

● **গিনিপিগের খাদ্যনালির বিভিন্ন অংশে পরিপাক ক্রিয়ার সারাংশ (Summary of Digestion in different parts of alimentary canal of Guinea-pig)**

| অন্ননালির অংশ | পরিপাক গ্রন্থি | উৎসেচক | মাধ্যম | খাদ্য | উৎপন্ন পদার্থ |
|---|---|---|---|---|---|
| মুখগহ্বর | লালাগ্রন্থি | টায়ালিন (অ্যামাইলেজ) | ঈষৎ ক্ষারীয় | শ্বেতসার | মলটোজ |
| পাকস্থলী | পাকগ্রন্থি | (i) পেপসিন<br>(ii) রেনিন | আম্লিক<br>আম্লিক | (i) প্রোটিন<br>(ii) কেসিনোজেন (দুগ্ধ প্রোটিন) | (i) পেপটোন<br>(ii) কেসিন (ছানা) |
| ক্ষুদ্রান্ত্র | যকৃৎ | কোনো উৎসেচক নেই। সোডিয়ামের তিনটি পিত্তলবণ Na-বাইকার্বনেট, Na-গ্লাইকোলেট ও Na- টারকোলেট ফ্যাট ইমালসিফাই করে। | ক্ষারীয় | (i) ফ্যাট | (i) অবদ্রব (ইমালসিফাইড) ফ্যাট |
| | অগ্ন্যাশয় | (i) ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন<br>(ii) অ্যামাইলেজ<br>(iii) লাইপেজ | প্রশম | (i) পেপটোন<br>(ii) শ্বেতসার<br>(iii) ফ্যাট | (i) পেপটাইড<br>(ii) মলটোজ<br>(iii) ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |
| | আন্ত্রিক গ্রন্থি | (i) ইরেপসিন<br>(ii) অ্যামাইলেজ<br>(iii) মলটেজ<br>(iv) সুক্রেজ<br>(v) ল্যাকটেজ<br>(vi) লাইপেজ | ক্ষারীয়<br>ক্ষারীয়<br>ক্ষারীয়<br>ক্ষারীয়<br>ক্ষারীয়<br>ক্ষারীয় | (i) পেপটাইড<br>(ii) শ্বেতসার<br>(iii) মলটোজ<br>(iv) সুক্রোজ<br>(v) ল্যাকটোজ<br>(vi) ফ্যাট | (i) অ্যামাইনো অ্যাসিড<br>(ii) মলটোজ<br>(iii) গ্লুকোজ<br>(iv) গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ<br>(v) গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ<br>(vi) ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসেরল |

➤ (e) **শোষণ (Absorption)** ঃ পরিপাকের পরে শোষণ যোগ্য খাদ্যবস্তু যেমন— গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসেরল ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তর্গাত্রে আঙুলের মতো ভাঁজ **ভিলাই** (Villi)-এর সাহায্যে

শোষিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল লসিকাবাহে প্রেরিত হয় এবং অন্য বস্তুগুলি হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্রের (Hepatic Portal system) মাধ্যমে যকৃতে যায়। তারপর এগুলি যকৃৎ থেকে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দেহের সর্বত্র সরবরাহ হয়।

➤ (f) **বহিষ্করণ (Egestion) ঃ** অপাচিত, অশোষিত খাদ্যবস্তু প্রথমে মলাশয়ে আসে এবং অবশেষে পায়ুছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে মুক্ত হয়।

## 2.3. গিনিপিগের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system of Guinea-pig)

### ▲ সংজ্ঞা, শ্বসনতন্ত্রের গঠন এবং শ্বসন পদ্ধতি( Definition, Structure of Respiratory System and Mechanism of Respiration) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ** শ্বসন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী অঙ্গাগুলি নাসারন্ধ্র, গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, ব্রঙ্কাই একত্রিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) বলে।

গিনিপিগ স্থলচর প্রাণী, তাই এদের শ্বসন পদ্ধতি বায়বীয় প্রকৃতির এবং এদের শ্বাসযন্ত্র একজোড়া ফুসফুস নিয়ে গঠিত হয়। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে (Alveoli) গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে অর্থাৎ এখানে অক্সিজেন শোষিত হয় ও কার্বন ডাই অক্সাইড বিমুক্ত হয়। সুতরাং পরিবেশ থেকে বায়ু একটি নির্দিষ্ট পথে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে পৌঁছায়।
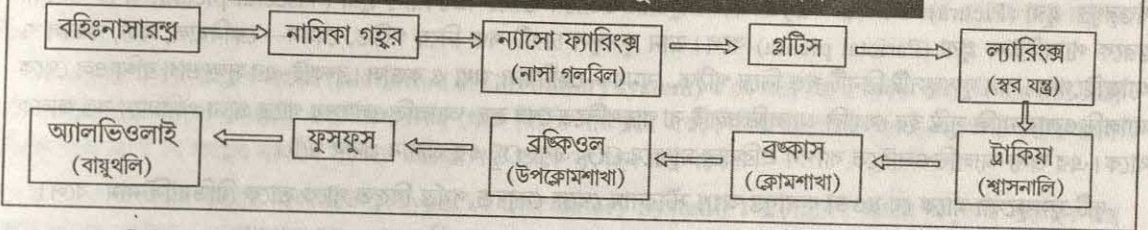
➤ (b) **গিনিপিগের শ্বসনতন্ত্রের গঠন ( Structure of Respiratory System of Guinea-pig ) ঃ**

নিম্নবর্ণিত অঙ্গগুলি নিয়ে গিনিপিগের শ্বসনতন্ত্র গঠিত হয়।

1. **বহিঃনাসারন্ধ্র** (External nares) — তুন্ডের (Snout) একেবারে সামনে একজোড়া বহিঃনাসারন্ধ্র আছে। এর মাধ্যমে গিনিপিগ বায়ুমণ্ডলের বায়ু গ্রহণ করে নাসিকা গহ্বরে পাঠায়।

2. **নাসিকা গহ্বর** (Nasal cavities) — প্রতিটি বহিঃনাসারন্ধ্র থেকে একটি নাসিকা গহ্বর সৃষ্টি হয়। মোট দু'টি নাসিকা গহ্বর পাশাপাশি অবস্থান করে এবং এগুলি একটি নাসিকা পর্দা (Nasal septum) দিয়ে পৃথক করা থাকে।

3. **অন্তঃনাসারন্ধ্র** (Internal nares) — বহিঃনাসারন্ধ্রের বিপরীত দিকে নাসিকা গহ্বর দু'টি পৃথক ছিদ্রপথে মুখগহ্বরে তালুর পিছনের দিকে মুক্ত হয়। এই ছিদ্র দুটিকে অন্তঃনাসারন্ধ্র বলে।

4. **ন্যাসোফ্যারিংক্স** (Nasopharynx) — গলবিলের যে অঞ্চলে অন্তঃনাসারন্ধ্র মুক্ত হয় তাকে ন্যাসোফ্যারিংক্স বলে।

5. **গ্লটিস** (Glottis) — মুখগহ্বরের পিছনের দিকে যে ছিদ্রপথে বায়ু শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে তাকে গ্লটিস বলে। গ্লটিসের উপরে তরুণাস্থি নির্মিত ঢাকনাকে **এপিগ্লটিস** ( Epiglottis) বলে।
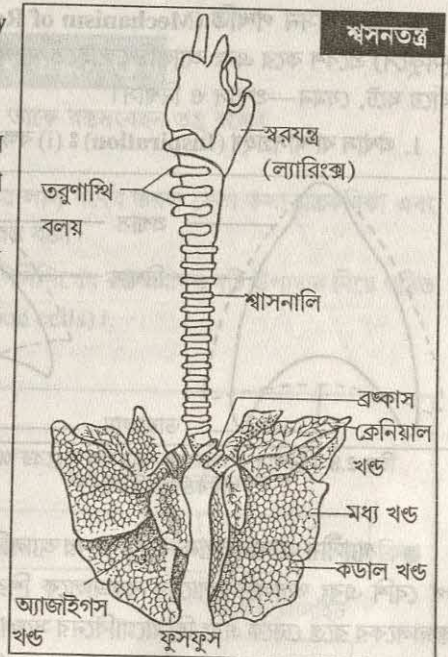
চিত্র 2.7 ঃ গিনিপিগের শ্বসনতন্ত্র।

6. **স্বরযন্ত্র** (**ল্যারিংক্স**—Larynx)— গ্লটিসের ঠিক নীচে ও শ্বাসনালির উপরে চারটি তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি একটি প্রকোষ্ঠ থাকে, একে ল্যারিংক্স বা স্বরকুঠুরি বা স্বরযন্ত্র বলে। তরুণাস্থিগুলি হল— (i) একটি **থাইরয়েড তরুণাস্থি** (Thyroid cartilage)— এটি স্বরযন্ত্রের অঙ্কীয় ও পৃষ্ঠদেশ গঠন করে, (ii) এক জোড়া **অ্যারিটিনয়েড তরুণাস্থি** (Arytenoid cartilage)— যা স্বরযন্ত্রের পৃষ্ঠদেশ গঠন করে এবং (iii) একটি **ক্রিকয়েড তরুণাস্থি** (Cricoid cartilage)— যা ল্যারিংক্সের পিছনের অংশ গঠন করে। ল্যারিংক্সের গহ্বরে বা কক্ষে এক জোড়া **ফাইব্রো-ইলাস্টিক-লিগামেন্ট** (Fibro-elastic ligament) বা **স্বররজ্জু** বা **ভোকাল কর্ড** (Vocal cord) থাকে। ভোকাল কর্ডের উপর দিয়ে গ্লটিস ছিদ্র পথে বায়ু নিষ্ক্রমণের সময় ভোকাল কর্ডের কম্পনের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি হয়। ভোকাল কর্ড দু'টির মাঝের স্থানকে **রিমা গ্লটিস্** (Rima glottis) বলে।

7. **শ্বাসনালি** (**ট্রাকিয়া**—Trachea) **: ল্যারিংক্সের পরবর্তী অংশ লম্বা নালির মতো। একে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি বলে।** 35–40 টি অসম্পূর্ণ 'C' আকৃতির তরুণাস্থি বলয় বা রিং অনুপ্রস্থভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে ট্রাকিয়া গঠন করে। তরুণাস্থি রিংগুলি পৃষ্ঠদেশে অসম্পূর্ণ। ট্রাকিয়া ল্যারিংক্স থেকে সৃষ্টি হয় এবং গলার মধ্যে গ্রাসনালির অঙ্কীয়দেশ বরাবর গিয়ে বক্ষ গহ্বরে শেষ হয়। ট্রাকিয়া বক্ষ গহ্বরে বিভক্ত হয়ে দুটি **ক্লোমশাখা** (**ব্রঙ্কাই**—Bronchi) গঠন করে।

8. **উপক্লোমশাখা** (**ব্রঙ্কাই**—Bronchi, একবচনে— ব্রঙ্কাস্) **:** ট্রাকিয়া বিভক্ত হওয়ার পরে দু'টি ব্রঙ্কাই দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ব্রঙ্কাইকে **প্রাইমারি ব্রঙ্কাই** বলে। ফুসফসের মধ্যে প্রাইমারি ব্রঙ্কাই পুনঃপুন বিভাজিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে **সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাই** ও **টারশিয়ারি ব্রঙ্কাই** এবং পরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম **ব্রঙ্কিওল** (Bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওলগুলি ফুসফুসের **বায়ুথলিতে** (**অ্যালভিওলাইতে**—Alveoli) শেষ হয়।

9. **ফুসফুস** (Lungs) **: দু'টি ব্রঙ্কাসের সঙ্গে যুক্ত দু'টি ফুসফুস বক্ষগহ্বরে অবস্থান করে।** ফুসফুস দু'টি স্পঞ্জের মতো এবং দ্বিস্তরযুক্ত **প্লুরা** (Pleura) পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। প্লুরার ভিতরের স্তরকে **ভিসেরাল প্লুরা** (Visceral pleura) এবং বাইরের স্তরকে **প্যারাইটাল প্লুরা** (Parietal pleura) বলে। ডান ফুসফুস চারটি খণ্ড নিয়ে গঠিত, যেমন—**ক্রেনিয়াল, মধ্য, কডাল** ও **অ্যাজাইগোস**। বাম ফুসফুসটি তিনটি খণ্ড নিয়ে গঠিত, যেমন—**ক্রেনিয়াল, মধ্য** ও **কডাল**। ব্রঙ্কাই-এর সূক্ষ্মভাগ ব্রঙ্কিওল থেকে **অ্যালভিওলার নালি** সৃষ্টি হয় যেগুলি অ্যালভিওলাই বা বায়ুথলিতে শেষ হয়। অ্যালভিওলাসের গাত্রে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জালক থাকে। এর জন্য অ্যলভিওলাইতে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে $CO_2$ এবং $O_2$ এর আদান প্রদান ঘটে।

দুটি ফুসফুসের মাঝে যে চওড়া কলাযুক্ত অংশ স্টারনাম থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে **মিডিয়াস্টিনাম** বলে।

➤ (c) **শ্বসন পদ্ধতি (Mechanism of Respiration) :** শ্বসন পদ্ধতির সাহায্যে বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু শ্বসন অঙ্গে (ফুসফুসে) প্রবেশ করে এবং অ্যালভিওলাইতে গ্যাসীয় আদানপ্রদানের পরে বায়ু শ্বসনতন্ত্র থেকে বেরিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে ঘটে, যেমন—প্রশ্বাস ও নিশ্বাস।

1. **প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) :** (i) বক্ষ- দেশে পর্শুকার (Rib) মধ্যস্থলে অবস্থিত **ইন্টারকস্টাল পেশির** (Intercostal muscle) সংকোচন ঘটে, ফলে বক্ষপঞ্জরগুলি উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগহ্বরটি আয়তনে বাড়ে। (ii) একই সঙ্গে মধ্যচ্ছদা পর্দার সংকোচন ঘটে, ফলে মধ্যচ্ছদাটি উদরের দিকে এগিয়ে যায় ফলে বক্ষগহ্বরটি দৈর্ঘ্যে প্রসারিত হয়। (iii) বক্ষগহ্বরের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস দু'টির প্রসারণ ঘটে। এর ফলে ফুসফুসের ভিতরে বায়ুর চাপ কমে যায়। এই বায়ু চাপের সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য বায়ুমণ্ডলের বায়ু নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাসনালির মাধ্যমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে প্রবেশ করে।
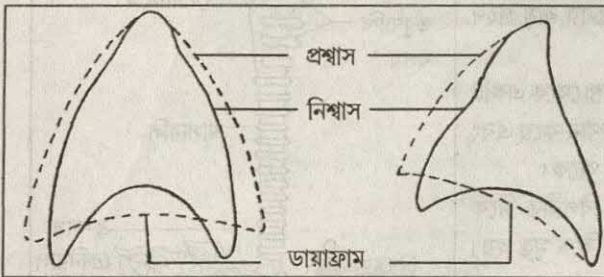
চিত্র 2.8 : নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সময় বক্ষ গহ্বরের অবস্থান ও পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

● **গ্যাসীয় আদানপ্রদান**—ফুসফুসের অ্যালভিওলাসগুলি রক্তজালকে আবৃত থাকে। অ্যালভিওলাসের বায়ুতে অক্সিজেনের চাপ বেশি এবং অ্যালভিওলাসের রক্তজালকে শিরা রক্তে অক্সিজেনের চাপ কম হওয়ায় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তজালকের রক্তে ঢোকে এবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে। একইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত- জালকের শিরা রক্ত থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে বায়ু থলিতে মুক্ত হয়। এভাবে শিরা রক্ত ধমনি রক্তে পরিণত হয়।

2. **নিশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ (Expiration) :** নিশ্বাস প্রক্রিয়াটি অনেকটা পরোক্ষভাবে চলে। ইন্টারকস্টাল পেশি ও মধ্যচ্ছদার পেশি শিথিল হয় এবং সংকোচনের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এর ফলে বক্ষপঞ্জর ও মধ্যচ্ছদা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং বক্ষগহ্বরটির আয়তন কমে যায়। বক্ষ পঞ্জর ও মধ্যচ্ছদা ফুসফুসের উপর চাপ দেয়, ফলে ফুসফুসের বায়ু শ্বাসনালি ও বহিঃনাসারন্ধ্রের মাধ্যমে শ্বসনতন্ত্রের বাইরে মুক্ত হয়। এভাবেই নিশ্বাসের কাজ চলে।
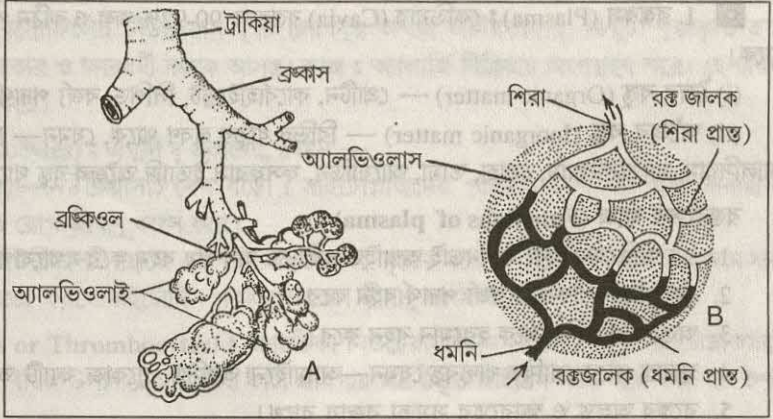
চিত্র 2.9 : A-শ্বাসনালি, ব্রঙ্কাস, অ্যালভিওলাই এবং B-অ্যালভিওলাই আবৃত রক্ত জালকের চিত্ররূপ।

## ❂ 2.4. গিনিপিগের সংবহন তন্ত্র ❂ (Circulatory system of Guinea-pig)

▲ **সংবহন তন্ত্রের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Definition and Types of Circulatory System) :**

❖ **(a) সংবহন তন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Circulatory system) :** যে প্রক্রিয়ায় শোষিত খাদ্য, বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ, অক্সিজেন, হরমোন ইত্যাদি পদার্থ উৎসস্থল থেকে নির্দিষ্ট গতিপথে এবং নির্দিষ্ট মাধ্যমে কার্যকরী অঙ্গে পৌঁছায় তাকে সংবহন বলে এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে সংবহন প্রক্রিয়া ঘটে তাকে সংবহন তন্ত্র বলে।

➤ **(b) সংবহন তন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Circulatory System) :** সংবহনের মাধ্যম অনুযায়ী সংবহন তন্ত্র দু'ধরনের হয়, যেমন— রক্তসংবহন তন্ত্র এবং লসিকাসংবহন তন্ত্র।

### ❂ রক্তসংবহন তন্ত্র (Blood vascular system) ❂

❖ **সংজ্ঞা (Definition) :** যে সংবহন তন্ত্র রক্তের সাহায্যে সম্পন্ন হয় তাকে রক্তসংবহন তন্ত্র বলে।
সংবহন তন্ত্র ধমনি, শিরা, হৃৎপিণ্ড ও রক্তজালক নিয়ে গঠিত হয়।

❂ **রক্ত (Blood) :** ❖ **(a) সংজ্ঞা :** যে বিশেষ ধরণের সামান্য ক্ষারীয় লাল বর্ণের তরল যোগ কলা রক্তকণিকা এবং রক্তরস নিয়ে গঠিত এবং রক্তবাহ ও হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তাকে রক্ত বলে।

➤ **রক্তের বিভিন্ন উপাদান (Different components of Blood) :** গিনিপিগের রক্ত প্রধানত দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়, যেমন— **রক্তরস বা প্লাজমা** (Plasma) এবং **রক্তকোশ বা রক্তকণিকা** (Blood cells)।

● **গিনিপিগের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের ছক :**
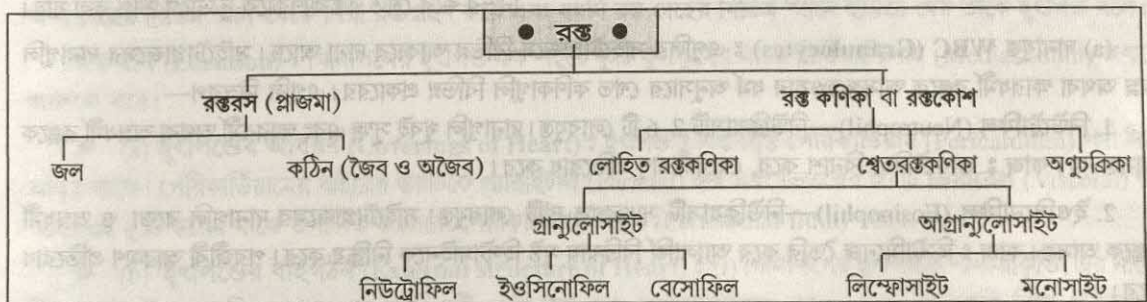
**1. রক্তরস** (Plasma) **:** কেভিয়ার (Cavia) রক্তরসে 90-92% জল ও কঠিন পদার্থ এবং 8–10% জৈব ও অজৈব বস্তু থাকে।

(i) **জৈব বস্তু** (Organic matter) — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, বর্জ্য পদার্থ, ক্ষরণ পদার্থ ইত্যাদি।

(ii) **অজৈব বস্তু** (Inorganic matter) — বিভিন্ন ধাতুর লবণ থাকে, যেমন— NaCl, $NaHCO_3$, এছাড়া পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, তামা, আয়োডিন, ফসফরাস ইত্যাদি অজৈব বস্তু থাকে।

**রক্তরসের কাজ (Functions of plasma) :**

1. রক্ত অক্সিজেন এবং কার্বনডাই অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় বহন করে যথাযোগ্য স্থানে নিয়ে যায়।
2. কোশের বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ বহন করে।
3. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে হরমোন বহন করে।
4. ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত খাদ্যবস্তু যেমন—অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি দেহের সর্বত্র বহন করে।
5. রক্তের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সমতা বজায় রাখে।
6. রক্তরস দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
7. রক্তরস রক্তের জলীয় বাতাবরণ এবং অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখে।
8. রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকাকে ভাসমান অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে।

**2. রক্ত কণিকা** (Blood cells) **:** গিনিপিগে তিন প্রকার রক্ত কণিকা থাকে, যেমন— **লোহিত রক্তকণিকা** (RBC), **শ্বেত রক্তকণিকা** (WBC) এবং **অণুচক্রিকা** (Platelets)।

**I. লোহিত রক্ত কণিকা (Red blood corpuscles or RBC or Erythrocytes) :** পরিণত লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। এগুলি গোলাকার দ্বি-অবতল এবং এখানে লৌহ ঘটিত শ্বাসরঞ্জক **হিমোগ্লোবিন** থাকে।

**চিত্র 2.10 :** গিনিপিগের লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার চিত্ররূপ।

**RBC-র কাজ**—(i) ফুসফুস ও কলার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যথাক্রমে অক্সিহিমোগ্লোবিন ও কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন যৌগ হিসাবে পরিবহন করে।

(ii) রক্তের আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখে।

(iii) রক্তরসের গাঢ়ত্ব বজায় রাখে।

○ কুনোব্যাঙের RBC ডিম্বাকার, নিউক্লিয়াস যুক্ত।

**II. শ্বেত রক্ত কণিকা (White blood corpuscles or WBC or Leukocytes) :** WBCগুলি আকারে RBC-র তুলনায় অনেক বড়ো এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে শ্বেত রক্ত কণিকাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়।

(a) **দানাযুক্ত WBC (Granulocytes) :** এগুলির সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আকারে দানা আছে। সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি অম্ল অথবা ক্ষারধর্মী রঞ্জককে আসক্ত হওয়ার ধর্ম অনুসারে শ্বেত কণিকাগুলি বিভিন্ন প্রকারের। এগুলি নিম্নরূপ—

1. **নিউট্রোফিল** (Neutrophil)—নিউক্লিয়াসটি 2–6 টি লোবযুক্ত। দানাগুলি খুবই সূক্ষ্ম এবং ক্ষারধর্মী অথবা অম্লধর্মী রঞ্জকে আসক্ত নয়। **কাজ :** ব্যাকটেরিয়া বিনাশ করে, রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে।

2. **ইওসিনোফিল** (Eosinophil)—নিউক্লিয়াসটি সাধারণত দু'টি লোবযুক্ত। সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি বড়ো ও অম্লধর্মী রঞ্জকে আসক্ত। **কাজ :** হিস্টামিনেজ তৈরি করে অ্যালার্জি বিক্রিয়ায় সৃষ্ট হিস্টামাইনকে নিষ্ক্রিয় করে। পরজীবী আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

3. **বেসোফিল** (Basophil)—বেসোফিলের নিউক্লিয়াস দু'টি লোবযুক্ত অথবা অনিয়তাকার, কিছুটা বৃক্কাকৃতি হয়। সাইটোপ্লাজমের দানাগুলি বড়ো, গোলাকার ও ক্ষারধর্মী রঞ্জকে আসক্ত। **কাজ** ঃ অ্যালার্জি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। হেপারিন, হিস্টামাইন ও সেরোটোনিন উৎপাদন করে।

(b) **দানাবিহীন WBC** (Agranulocytes) ঃ এগুলি দু প্রকারের, যেমন —

1. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte)—নিউক্লিয়াসটি বেশ বড়ো। সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বেশ কম এবং দানাহীন। **কাজ** ঃ অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে বহিরাগত রোগ জীবাণু ধ্বংস করে।

2. **মনোসাইট** (Monocyte) — নিউক্লিয়াসটি ছোটো এবং ডিমের মতো বা বৃক্কের মতো দেখতে হয়। সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে না। **কাজ** ঃ এগুলি অ্যামিবার মতো ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে।

● **III. অণুচক্রিকা (Platelets or Thrombocytes)** ঃ অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন ছোটো ছোটো সাইটোপ্লাজমযুক্ত কোশাংশ বিশেষ। **কাজ** ঃ রক্ত তঞ্চনের বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে কাটা জায়গায় অদ্রবীভূত **ফাইব্রিন** গঠন করে এবং রক্ত তঞ্চন ঘটায়।

➤ **সামগ্রিকভাবে রক্তের কাজের সারাংশ (Summary of functions of blood)** ঃ

(i) **অক্সিজেন পরিবহন**—রক্ত ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বিভিন্ন কলাকোশে প্রেরণ করে।
(ii) **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন** — সমস্ত কোশ থেকে সৃষ্ট বিপাকজাত কার্বন ডাই অক্সাইড ফুসফুসে নিয়ে যায়।
(iii) **খাদ্য বস্তু পরিবহন**—অন্ত্রে শোষিত খাদ্যবস্তু প্রতি কোশে সরবরাহ করে।
(iv) **বর্জ্য পদার্থ পরিবহন**—বিপাক জাত নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ কোশ থেকে রেচন অঙ্গে নিয়ে যায়।
(v) **হরমোন পরিবহন**—অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের সঠিক স্থানে প্রেরণ করে।
(vi) **pH নিয়ন্ত্রণ**—কোশের নির্দিষ্ট pH এর সমতা নিয়ন্ত্রণ করে।
(vii) **দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ**—গিনিপিগ উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট বা এন্ডোথারমিক (Endothermic) প্রাণী। সুতরাং দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে রক্তের ভূমিকা অপরিসীম।
(viii) **জলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ**—কোশের মধ্যে জলীয় উপাদানের সমতা নিয়ন্ত্রণ করে।
(ix) **রক্তক্ষয় নিবারণ**—রক্ত তঞ্চনের সাহায্যে ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষয় নিবারণ করে।
(x) **জীবাণু ধ্বংস**—লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি সৃষ্টির সাহায্যে বহিরাগত জীবাণু ধ্বংস করে।
(xi) **অ্যালার্জি প্রতিরোধ**—ইওসিনোফিল হিস্টামিনেজ সৃষ্টির সাহায্যে অ্যালার্জি জনিত সৃষ্ট হিস্টামাইন নিষ্ক্রিয় করে।
(xii) **অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ**—রক্তরস অভিস্রবণ জনিত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

## ✪ 2.5. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের গঠন ও হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্ত চলাচল ✪ (Anatomy of heart and flow of blood through heart of Guinea-pig)

### ▲ গিনিপিগের হৃৎপিণ্ড (Heart of Guinea-pig)

❖ **হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা (Definition of Heart) ঃ রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত যে পেশিময় পাম্পের মতো অঙ্গ দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে শিরা রক্ত গ্রহণ করে এবং ধমনি রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে।**

**অবস্থান (Location)** ঃ গিনিপিগের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে দু'টি ফুসফুসের মাঝে **মিডিয়াস্টিনাম** (Mediastinum) অঞ্চলে অবস্থান করে।

➤ (a) **হৃৎপিণ্ডের আবরণ (Coverings of Heart)** ঃ হৃৎপিণ্ডটি দ্বিস্তরযুক্ত **পেরিকার্ডিয়াম** (Pericardium) পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের স্তরটিকে **প্যারাইটাল** (Parietal) স্তর এবং ভিতরের স্তরটি **ভিসারেল** (Visceral) স্তর বলে। এই দু'টি স্তরের মাঝে উপস্থিত তরলকে **পেরিকার্ডিয়াল তরল** (Pericardial fluid) বলে।

➤ (b) **হৃৎপিণ্ডের বর্হিগঠন** (External structure of Heart) ঃ (i) গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডটি শাঙ্কবাকৃতি; এর নীচের দিক সরু ও উপরের দিক প্রশস্ত। (ii) হৃৎপিণ্ডটি পেশিবহুল এবং **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium) পেশি দিয়ে গঠিত হয়।

(iii) হৃৎপিণ্ডের অন্তরগাত্রটি একটি পাতলা **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium) স্তর দিয়ে গঠিত। (iv) গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ আছে— দ'টি অলিন্দ ও দ'টি নিলয়। (v) হৃৎপিণ্ডের বাইরের দিকে কয়েকটি খাঁজ বা **সালকাস** (Sulcus) আছে। যেমন—একটি **করোনারি সালকাস** ও দু'টি **ইন্টারভেন্ট্রিকিউলার সালসি**।
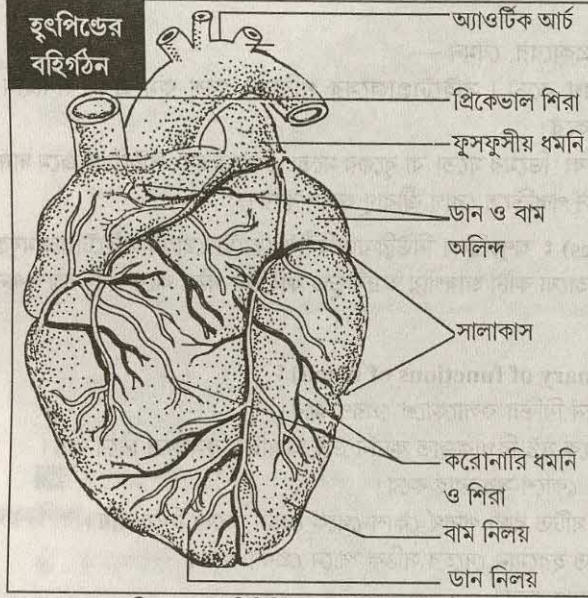
চিত্র 2.10 : গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের বহির্গঠন।

➤ **(c) হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন (Internal structure of Heart) :**

(i) ডান ও বাম অলিন্দের মাঝের পর্দাকে **আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীর** (Interauricular septum) বলে। এই পর্দাটি এমনভাবে অলিন্দকে ভাগ করে যে ডান অলিন্দ বাম অলিন্দের চেয়ে কিছুটা বড়ো হয়।

(ii) অলিন্দ দু'টির প্রাচীর পাতলা হয়। আন্তঃঅলিন্দ সেপ্টামের মাঝে একটি খাঁজ আছে, এটিকে **ফসা ওভালিস** (Fossa ovalis) বলে।

(iii) ডান নিলয় ও বাম নিলয় দু'টির মধ্যে একটি **আন্তঃনিলয় প্রাচীর** (Inter ventricular septum) থাকে। নিলয় দু'টির প্রাচীর-গাত্র অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।

(iv) নিলয়ের অন্তঃস্থ প্রাচীর থেকে আঙুলের মতো পেশির যে প্রবর্ধক নিলয়ের মধ্যে থাকে তাকে **কলামনি কারনি** (Columnae carneae) বা **ট্রাবেকিউলি কারনি** (Trabeculae carneae) বলে।

(v) কলামনি কারনি থেকে সৃষ্টি হয়ে টেন্ডনের মতো যে তন্তুময় পেশিরজ্জু অলিন্দনিলয় কপাটিকার সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে **কর্ডি টেনডিনি** (Chordae tendineae) বলে।

(vi) ডান অলিন্দে প্রি-কেভাল মহাশিরা ও পোস্ট-কেভাল মহাশিরা মুক্ত হয়। তেমনি বাম অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা মুক্ত হয়।

(vii) ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় মহাধমনি (Pulmonary aorta) এবং বাম নিলয় থেকে সিস্টেমিক মহাধমনি (Systemic aorta) উৎপন্ন হয়।
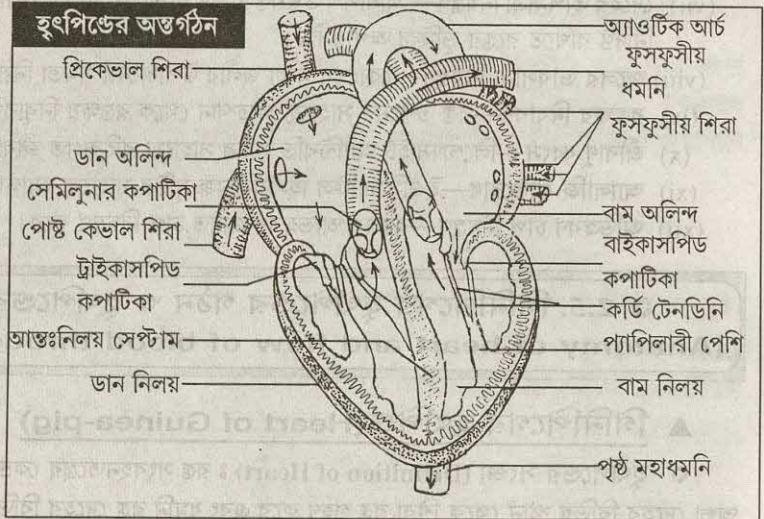
চিত্র 2.11 : গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহের পথের চিত্ররূপ।

● **হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ভাল্‌ভ (Different Valves of Heart) :**

(viii) ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথে **ট্রাইকাস্‌পিড বা ত্রিপত্র কপার্টিকা** (Tricuspid valve) থাকে। তেমনি বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে **বাইকাসপিড বা দ্বিপত্র কপাটিকা** (Bicuspid valves) বা **মিট্রাল ভালভ্‌** (Mitral valve) থাকে। এই কপাটিকাগুলি নিলয়ে অবস্থিত **কর্ডি-টেনডিনি** তন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এগুলি একমুখী অর্থাৎ রক্তকে অলিন্দ থেকে নিলয়ে যেতে দেয় কিন্তু নিলয় থেকে অলিন্দে যেতে দেয় না।

(ix) ডান নিলয়ের সঙ্গে ফুসফুসীয় ধমনির সংযোগস্থলে তিনটি **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** (Semilunar valve) এবং বাম নিলয়ের সঙ্গে সিস্টেমিক মহাধমনির সংযোগস্থলে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। এই কপাটিকাগুলি নিলয় থেকে রক্তকে মহাধমনির মধ্যে যেতে দেয় কিন্তু মহাধমনির রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে দেয় না।

**➤ (d) গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া (Mechanism blood flow through Heart of Guinea-pig) ঃ**

(i) হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক **সংকোচন** বা **সিস্টোল** (Systole) ও **প্রসারণ** বা **ডায়াস্টোল** (Diastole) ঘটার ফলে ফুসফুস ও সমগ্র দেহে রক্ত-সংবহন সংঘটিত হয়। (ii) দুটি অলিন্দের (বাম ও ডান) সংকোচন একই সঙ্গে শুরু হয়, ফলে রক্ত বাম ও ডান অলিন্দ থেকে যথাক্রমে বাম ও ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয়গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হলেও অলিন্দের দিকে রক্ত ফিরে আসতে পারে না, কারণ, দ্বি-পত্র ও ত্রি-পত্র কপাটিকা রক্তের পশ্চাৎ গতিকে বাধা দেয়। (iii) অলিন্দের সংকোচনের পরেই দু'টি নিলয়ের সংকোচন শুরু হয় এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে (Aorta) ও ডান নিলয় থেকে ফুস্‌ফুসীয় ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় মহাধমনি অথবা ফুস্‌ফুসীয় ধমনি থেকে রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না, কারণ এদের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা রক্তপ্রবাহের পশ্চাৎ গতি ঘটতে দেয় না। (iv) মহাশিরাগুলির মাধ্যমে কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত (শিরা রক্ত) ডান অলিন্দে ফিরে আসে। এই রক্ত ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে এসে ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে আসে। ফুসফুসে রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হয়ে ফুস্‌ফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে ফিরে আসে। এইভাবে **পালমোনারী বা ফুস্‌ফুসীয় সংবহন** (Pulmonary circulation) সম্পন্ন হয়। (v) বাম অলিন্দ থেকে বেশি অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে এবং মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত দেহের কলাগুলিতে এসে আবার অক্সিজেনবিহীন হয় ও অবশেষে মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। এইভাবে **সিস্টেমিক সংবহন** (Systemic circulation) সংঘটিত হয়।
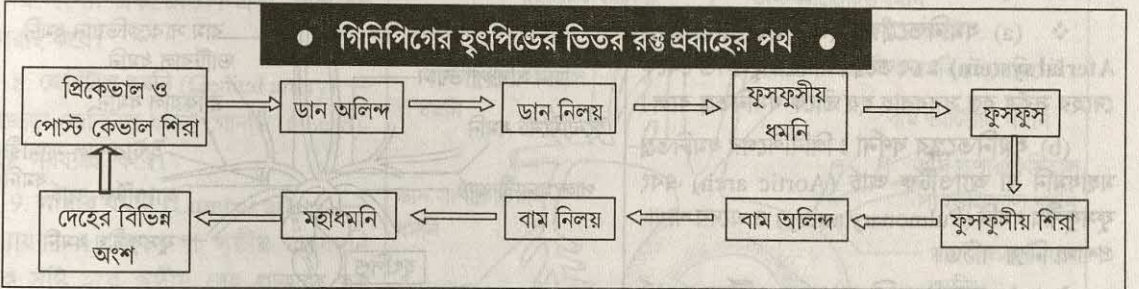
## ▲ গিনিপিগের রক্তবাহ (Blood vessels of Guinea-pig)

যে সকল নালিপথ দিয়ে রক্ত দেহে প্রবাহিত হয় তাদের **রক্তবাহ** (রক্তনালি) বলে। এগুলি প্রধানত দু'ধরনের হয়, যেমন— ধমনি ও শিরা। ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম একস্তর কোশযুক্ত রক্তবাহ থাকে, এদের **রক্তজালক** বলে।

1. **ধমনি (Artery) ঃ ❖ সংজ্ঞা— যেসব রক্তবাহ হৃৎপিণ্ডের নিলয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে রক্তজালকে শেষ হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত প্রেরণ করে তাদের ধমনি বলে।**

ধমনিগুলি শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত নিয়ে যায়। সমস্ত ধমনি একত্রিত হয়ে **ধমনিতন্ত্র** (Arterial system) গঠন করে। ধমনির সূক্ষ্ম ভাগকে **উপধমনি** বা **আর্টারিওল** (Arteriole) বলে। গিনিপিগের ফুসফুসীয় ধমনি ছাড়া অন্য সব ধমনি বেশি অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত (ধমনি রক্ত) বহন করে। ধমনির প্রাকার তিনটি স্তর যুক্ত এবং পুরু।

2. **শিরা (Vein) ঃ ❖ সংজ্ঞা— যেসব রক্তবাহ দেহের বিভিন্ন কলায় উপস্থিত রক্ত জালক থেকে উৎপন্ন হয় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্তকে অলিন্দে নিয়ে আসে তাদের শিরা বলে।**

শিরার সূক্ষ্ম শাখাকে **উপশিরা** বা **ভেনিউল** (Venule) বলে। উপশিরাগুলি যুক্ত হয়ে শিরা এবং শিরাগুলি যুক্ত হয়ে প্রধান শিরা গঠন করে। দেহের সমস্ত শিরা একত্রিত হয়ে **শিরাতন্ত্র** (Venous system) গঠন করে। গিনিপিগের ফুসফুসীয় শিরা ছাড়া অন্য সব শিরা কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত (শিরা রক্ত) বহন করে। শিরার প্রাকার তিনটি স্তর যুক্ত এবং পাতলা।

3. রক্ত জালক (Blood capillary) : ❖ সংজ্ঞা— ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা যুক্ত একস্তর কোশ দিয়ে তৈরি রক্তবাহকে রক্তজালক বলে।

চিত্র 2.12 : A—ধমনি, B—শিরা ও C—রক্তজালকের কলাস্থানিক (আণুবীক্ষণিক) গঠন।

ধমনি রক্ত জালকে শেষ হয় এবং শিরা রক্তজালক থেকে সৃষ্টি হয়। রক্ত জালকের দু'টি অংশ— (i) ধমনির দিকের অর্ধাংশকে **আর্টারিয়াল জালক** (Arterial capillary) এবং (ii) শিরার দিকের অর্ধাংশকে **ভেনাস জালক** (Venous capillary) বলে। রক্ত জালক শুধুমাত্র একটি আবরণী কোশস্তর বা **এন্ডোথেলিয়াম** (Endothelium) কোশস্তর দিয়ে তৈরি হয়। এই কারণে জালকের মাধ্যমে সহজে ব্যাপন প্রক্রিয়া চলে।

## 2.6. গিনিপিগের ধমনিতন্ত্র (Arterial system of Guinea-pig)

### ▲ গিনিপিগের ধমনিতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description of Arterial system of Guinea-pig) :

❖ (a) **ধমনিতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Aterial system) : যে তন্ত্রের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ হয় তাকে ধমনিতন্ত্র বলে।**

(b) **ধমনিতন্ত্রের বর্ণনা :** গিনিপিগের ধমনিতন্ত্র **মহাধমনি** বা **অ্যাওর্টিক আর্চ** (Aortic arch) এবং **ফুসফুসীয় ধমনি** (Pulmonary artery) ও এদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত।

### ➤ A. মহাধমনি বা অ্যাওর্টিক আর্চ (Aortic arch) :

গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে কেবলমাত্র বাম অ্যাওর্টিক আর্চ উৎপন্ন হয়। এই অ্যাওর্টিক আর্চটি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে ওর পৃষ্ঠদেশে ধনুকের মতো বেঁকে দেহের পৃষ্ঠদেশ বরাবর পিছনের দিকে বিস্তারিত হয়েছে। নীচে অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন ধমনিগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

1. **করোনারি ধমনি** (Coronary artery) — অ্যাওর্টিক আর্চের মূলদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে এই ধমনি জোড়া হৃৎপেশিতে রক্ত সরবরাহ করে।

2. **ইনোমিনেট ধমনি** (Innominate artery) — এটি অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন হয়ে ডান **সাবক্লেভিয়ান ধমনি** (Right subclavian artery) এবং **ডান ও বাম সাধারণ ক্যারোটিড ধমনিতে** (Right and left common carotid artery) বিভক্ত হয়।
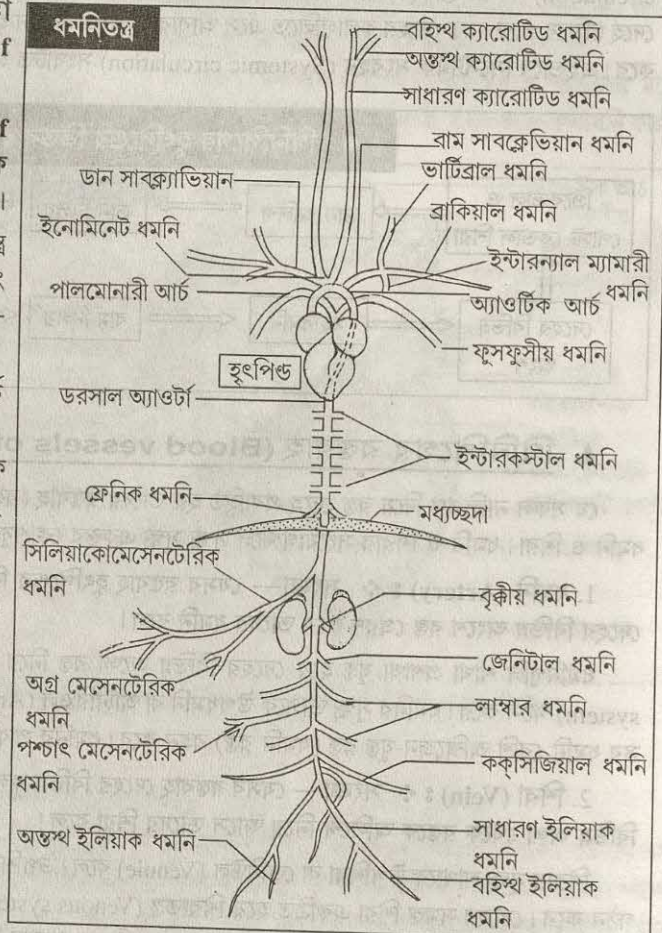
চিত্র 2.13 : গিনিপিগের ধমনিতন্ত্র।

(i) **ডান সাবক্লেভিয়ান** (Right subclavian) : এটি তিনটি শাখায় বিভক্ত, যেমন — **ভার্টিব্রাল ধমনি** (Vertebral artery) মেরুদণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে, **ইন্টারন্যাল ম্যামারী** (Internal mammary) দুগ্ধগ্রন্থিসহ দেহের অঙ্কীয় প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে এবং **ব্র্যাকিয়াল** (Brachial) ধমনি ডান অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে।

(ii) **ডান এবং বাম সাধারণ ক্যারোটিড ধমনি** (Right and left common carotid) : প্রতিটি ডান এবং বাম সাধারণ ক্যারোটিড ধমনি দেহের সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে স্বরযন্ত্রের কাছে **বহিস্থ** (External) এবং **অন্তস্থ** (Internal) ক্যারোটিডে বিভক্ত হয়েছে। বহিস্থ ক্যারোটিড মাথার উপরিতলে এবং অন্তস্থ ক্যারোটিড মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে।

3. **বাম সাবক্লেভিয়ান** (Left subclavian)— এটি সরাসরি অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন হয়। এর শাখাগুলি ডান সাবক্লেভিয়ান ধমনির অনুরূপ।

4. **ইন্টারকস্টাল ধমনি** (Intercostal artery) — বক্ষদেশে পৃষ্ঠীয় মহাধমনি (Dorsal aorta) থেকে 5-6 জোড়া ইন্টারকস্টাল ধমনি সৃষ্টি হয়ে বক্ষ প্রাচীরে এবং ইন্টারকস্টাল পেশিতে রক্ত সরবরাহ করে।

5. **ফ্রেনিক ধমনি** (Phrenic artery) — ফ্রেনিক ধমনি সংখ্যায় একজোড়া এবং এগুলি মধ্যচ্ছদায় রক্ত সরবরাহ করে।

6. **সিলিয়াকো মেসেনটেরিক ধমনি** (Coeliaco-mesenteric artery) : মধ্যচ্ছদার ঠিক পিছনে পৃষ্ঠীয় মহাধমনি থেকে এই ধমনিটির উৎপত্তি হয়েছে। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত, যেমন—(i) **সিলিয়াক ধমনি** (Coeliac artery) : যকৃৎ, পাকস্থলী এবং প্লিহাতে রক্ত সরবরাহ করে। (ii) **সম্মুখস্থ মেসেনটেরিক ধমনি** (Anterior mesenteric artery) : ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় এবং ধারণ ঝিল্লিতে (Mesentery) রক্ত সরবরাহ করে।

7. **বৃক্কীয় ধমনি** (Renal artery) — বৃক্কীয় ধমনির সংখ্যা একজোড়া। এরা বৃক্কে রক্ত সরবরাহ করে।

8. **জেনিটাল ধমনি** (Genital artery) — একজোড়া জেনিটাল ধমনি গোনাড (Gonad)-এ রক্ত সরবরাহ করে।

9. **লাম্বার ধমনি** (Lumbar artery) — সংখ্যায় 3–4 জোড়া যা পৃষ্ঠীয় মহাধমনি থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠীয় দেহ প্রাকারে রক্ত সরবরাহ করে।

10. **পশ্চাৎ মেসেনটেরিক ধমনি** (Posterior mesenteric artery) — এটি প্রথম এবং দ্বিতীয় লাম্বার ধমনির মাঝখান থেকে বের হয়ে বৃহদন্ত্র এবং ধারণ ঝিল্লিতে রক্ত সরবরাহ করে।

চিত্র 2.14 : গিনিপিগের অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন ধমনিসমূহ।

11. **কক্সিজিয়াল ধমনি** (Coccygeal artery)—এই ধমনি পৃষ্ঠীয় মহাধমনির পিছনের দিক থেকে সৃষ্টি হয়ে মেরুদণ্ডের স্যাক্রাল এবং কক্সিজিয়াল অংশে রক্ত সরবরাহ করে।

12. **সাধারণ ইলিয়াক ধমনি** (Common iliac artery) : পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনিটি গিনিপিগের দেহকাণ্ডের পিছনের অংশে দুটি সাধারণ ইলিয়াক ধমনিতে বিভক্ত হয়। আবার প্রতিটি সাধারণ ইলিয়াক ধমনি বহিস্থ (External) এবং অন্তস্থ (Internal) ইলিয়াক ধমনিতে বিভক্ত হয়। বহিস্থ ইলিয়াক বা **ফিমোরাল ধমনি** (Femoral artery) পিছনের পায়ে রক্ত সরবরাহ করে। অন্তস্থ ইলিয়াক ধমনি মূত্রথলি এবং জননতন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।
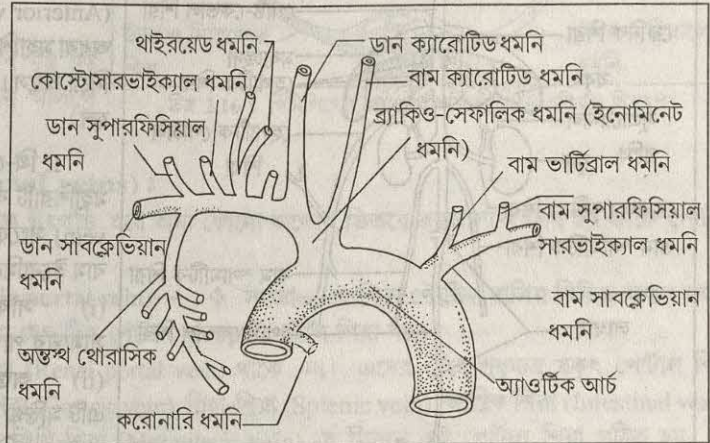
## ➤ B. ফুসফুসীয় ধমনি (Pulmonary artery) :

ডান নিলয় থেকে সৃষ্টি হয়ে যে ধমনি ডান ও বাম অংশে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ডান ফুসফুস ও বাম ফুসফুসে কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত সরবরাহ করে তাকে **ফুসফুসীয় ধমনি** বলে।

## ❂ 2.7. গিনিপিগের শিরাতন্ত্র (Venous system of Guinea-pig) ❂

### ▲ গিনিপিগের শিরাতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description of Venous system of Guinea-pig) ঃ

❖ (a) **শিরাতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Venous system)** ঃ যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে তাকে শিরাতন্ত্র বলে।

চিত্র 2.15 ঃ গিনিপিগের শিরাতন্ত্র।

(b) **শিরাতন্ত্রের বর্ণনা** ঃ গিনিপিগের শিরাতন্ত্র **সিস্টেমিক শিরা** (Systemic veins), **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary veins), এবং **পোর্টাল শিরা** (Portal vein) নিয়ে গঠিত। নীচে এই শিরাগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল।

### ➤ A. সিস্টেমিক শিরা (Systemic veins) ঃ

যে শিরা রক্তজালক থেকে সৃষ্টি হয়ে হৃৎপিণ্ডে কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আনে তাকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। দুটি মহাশিরা, যেমন—**প্রি-কেভাল** (Pre caval) বা **উত্তরা মহাশিরা** (Anterior vena cava) এবং **পোষ্ট কেভাল** (Post caval) **অধরা মহাশিরা** (Posterior vena cava) রক্তকে ডান অলিন্দে নিয়ে আসে। এই দুটি মহাশিরার বিস্তারিত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

1. **প্রি-কেভাল (Pre-caval)**— প্রি-কেভাল বা উত্তরা মহাশিরাটি বাম এবং ডান **ইনোমিনেট শিরার** (Innominate vein) সংযোগে গঠিত হয়। পাঁচটি শিরার মিলনে ডান বা বাম ইনোমিনেট শিরা গঠিত হয়, যেমন—

(i) **সাবক্লেভিয়ান শিরা** (Subclavian vein)—এই শিরা সামনের পা থেকে রক্ত বহন করে আনে।

(ii) **অন্তস্থ জুগুলার শিরা** (Internal jugular vein)—এটি মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বহন করে আনে।

(iii) **বহিস্থ জুগুলার শিরা** (External jugular vein)—এই শিরা মস্তিষ্কের উপরের দিক থেকে এবং মুখমণ্ডল থেকে রক্ত বহন করে।

(iv) **সম্মুখস্থ ইন্টারকস্টাল শিরা** (Anterior intercostal vein)— এই শিরা ইন্টারকস্টাল পেশি থেকে রক্ত বহন করে।

(v) **অন্তস্থ ম্যামারি শিরা** (Internal mammary vein)— এই শিরা অঙ্কীয় দেহপ্রাচীর থেকে রক্ত বহন করে আনে।

এছাড়া **অ্যাজাইগোস শিরা** (Azygos vein) এবং **করোনারি শিরা** (Coronary vein) প্রি-কেভাল শিরার সাথে মিলিত হয়। অ্যাজাইগোস শিরা বক্ষ প্রাচীরের পিঠের দিক থেকে এবং করোনারি শিরা হৃৎপেশি থেকে শিরা রক্ত বহন করে আনে।

2. **পোষ্ট কেভাল (Post caval)**—এই মহাশিরাটি গিনিপিগের দেহকাণ্ডের পিছনের দিক থেকে সৃষ্টি হয়। দুটি পিছনের পা থেকে সৃষ্ট দুটি সাধারণ **ইলিয়াক শিরা** (Iliac veins) মিলিত হয়ে অধরা মহাশিরা তৈরি করে। **বহিস্থ ইলিয়াক শিরা** (External iliac vein) এবং **অন্তস্থ ইলিয়াক শিরা** (Internal iliac vein) সংযোগে সাধারণ ইলিয়াক শিরার সৃষ্টি হয়। অধরা মহাশিরাটি মেরুদণ্ডের অঙ্কীয়দেশ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং যকৃৎ ও মধ্যচ্ছদা ভেদ করে শেষে ডান অলিন্দে মুক্ত হয়। অধরা মহাশিরার সঙ্গে নিম্নলিখিত শিরাগুলি মিলিত হয়।

(i) **কক্সিজিয়াল শিরা** (Coccygeal vein)—এই শিরাটি মেরুদণ্ডের কক্সিজিয়াল এবং স্যাক্রাল অঞ্চল থেকে রক্ত বহন করে অধরা মহাশিরায় পাঠায়।

(ii) **লাম্বার শিরা** (Lumbar veins)—তিন জোড়া লাম্বার শিরা পৃষ্ঠীয় দেহ প্রাচীর থেকে কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে আনে।

(iii) **জেনিটাল শিরা** (Genital vein)—সংখ্যায় এক জোড়া যা গোনাড থেকে রক্ত বহন করে আনে।

(iv) **বৃক্কীয় বা রেনাল শিরা** (Renal veins)—সংখ্যায় এক জোড়া যা বৃক্ক থেকে রক্ত বহন করে আনে।

(v) **যকৃৎ শিরা বা হেপাটিক শিরা** (Hepatic veins)—সংখ্যায় একজোড়া হেপাটিক শিরা যকৃৎ থেকে রক্ত বহন করে অধরা মহাশিরায় আনে।

(vi) **ফ্রেনিক শিরা** (Phrenic veins)— ফ্রেনিক শিরা মধ্যচ্ছদা থেকে রক্ত বহন করে আনে।

চিত্র 2.16 : গিনিপিগের প্রধান অঙ্গে রক্তসংবহন প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ।

## ➤ B. ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary vein) :

প্রতিটি ফুসফুস থেকে বেশি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত (ধমনি রক্ত) ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে আসে।

## ➤ C. পোর্টাল শিরা (Portal veins) :

❖ **সংজ্ঞা—যে শিরা রক্তজালক থেকে উৎপত্তি হয়ে অন্য কোনো অঙ্গের ভিতরে রক্তজালকে শেষ হয় তাকে পোর্টাল শিরা বলে।**

**1. হেপাটিক পোর্টাল শিরা (Hepatic portal vein)— ❖ সংজ্ঞা—যে শিরা পৌষ্টিক নালির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে যকৃতে জালকে শেষ হয় তাকে হেপাটিক পোর্টাল বা যকৃৎ পোর্টাল শিরা বলে।**

গিনিপিগের দেহে বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা (Renal portal vein) থাকে না। এদের দেহে শুধুমাত্র **যকৃৎ পোর্টাল শিরা** (Hepatic portal vein) থাকে। **পাকস্থলীশিরা** (Gastric vein), **প্লিহা-শিরা** (Splenic vein), **আন্ত্রিক শিরা** (Intestinal vein), **অগ্ন্যাশয়-শিরা** (Pancreatic vein), **ধারণ ঝিল্লি-শিরা** (Mesenteric vein) -র মিলনে এই পোর্টাল শিরা গঠিত হয়। এই পোর্টাল শিরাটি যকৃতের মধ্যে প্রবেশ করে রক্তজালকে ভাগ হয়ে যায়। পরে যকৃৎ-শিরা দিয়ে যকৃৎ থেকে রক্ত অধরা মহাশিরায় চলে আসে।

**2. হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেমের কাজ (Functions of Hepatic portal system)**— ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে শোষিত খাদ্যবস্তু হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্রের সাহায্যে যকৃতে বাহিত হয়। শোষিত খাদ্য গ্লুকোজের বিপাকের ফলে সৃষ্ট গ্লাইকোজেন যকৃতের কোশে সঞ্চিত থাকে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে গ্লুকাগন (Glucagon) হরমোনের সক্রিয়তায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** প্রক্রিয়ায় ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের সমতা ফিরে আসে।

### ● অন্যান্য পোর্টাল শিরা (Other Portal veins) ●

1. **রেনাল পোর্টাল শিরা** (Renal portal vein)—এই শিরা দেহের পিছনের অংশ থেকে জালকের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে বৃক্কের মধ্যে জালকে শেষ হয়। **উদাহরণ**—মাছ ও উভচর শ্রেণির প্রাণীদের দেহে এটি খুবই উন্নত ধরনের সরীসৃপ ও পক্ষী শ্রেণির প্রাণীদের এই শিরা খুবই অনুন্নত এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এটি অনুপস্থিত থাকে।
2. **হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল শিরা** (Hypophyseal protal vein)—এই শিরা মস্তিষ্কের হাইপোফাইসিয়াল অঞ্চল থেকে রক্তজালকের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে অগ্রপিটুইটারি গ্রন্থিতে রক্তজালকে শেষ হয়। **উদাহরণ**—মানুষ।

● পোর্টাল শিরা ও সিস্টেমিক শিরার পার্থক্য (Difference between Portal vein and Systemic vein) :

| সিস্টেমিক শিরা | পোর্টাল শিরা |
|---|---|
| 1. এই শিরা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তকে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে নিয়ে যায়। ফলে দ্বিতীয়বার জালক গঠন করে না। | 1. এই শিরা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে না গিয়ে দেহের অন্য কোনো অঙ্গে গিয়ে দ্বিতীয়বার রক্ত জালক গঠন করে। |
| 2. দেহের সর্বত্র এই প্রকার শিরা থাকে। | 2. এই প্রকার শিরা গিনিপিগের যকৃতে, ব্যাঙের বৃক্কে ইত্যাদিতে থাকে। |
| 3. হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার সময় এটি অন্য শিরার সঙ্গে মিলিত হতে পারে কিন্তু শাখা-শিরাতে বিভক্ত হয় না। | 3. হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার সময় অন্য শিরার সঙ্গে মিলিত হতে পারে, আবার শাখাশিরায় বিভক্ত হতে পারে। |

● ধমনি ও শিরার পার্থক্য (Difference between Artery and Vein) :

| ধমনি | শিরা |
|---|---|
| 1. ধমনি হৃৎপিণ্ডের নিলয় থেকে শুরু হয় এবং রক্তজালকে শেষ হয়। | 1. শিরা রক্তজাল থেকে উৎপত্তি লাভ করে হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে শেষ হয়। |
| 2. রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সব অংশে প্রেরণ করে। | 2. দেহের সব অংশ থেকে রক্তকে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। |
| 3. তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি, কিন্তু মাঝের স্থিতিস্থাপক তন্তু ও অরেখ পেশিযুক্ত স্তরটি পুরু। | 3. তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি এবং মাঝের স্থিতিস্থাপক তন্তু ও পেশিযুক্ত স্তরটি পাতলা। |
| 4. ধমনির অন্তর্গাত্রে কপাটিকা থাকে না। | 4. শিরার অন্তর্গাত্রে একমুখী কপাটিকা থাকে। |
| 5. সাধারণত বেশি অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে (ব্যতিক্রম— ফুসফুসীয় ধমনি)। | 5. সাধারণত কম অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করে (ব্যতিক্রম—ফুসফুসীয় শিরা)। |
| 6. স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে বলে রক্তশূন্য হলেও চুপসে যায় না। | 6. স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে না বলে রক্তশূন্য হলে চুপসে যায়। |
| 7. দেহের গভীরে উপস্থিত থাকে। | 7. দেহের বাইরের দিকে উপস্থিত থাকে। |

## 2.8. গিনিপিগের রেচনতন্ত্র (Excretory system of Guinea-pig)

### ▲ রেচনতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description of Excretory System) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ দেহের বাইরে মুক্ত করে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।

➤ (b) **রেচনতন্ত্রের বর্ণনা (Description of Excretory System) :** গিনিপিগের রেচনতন্ত্র একজোড়া মেটানেফ্রিকবৃক্ক, একজোড়া গবিনী, মূত্রস্থলী এবং মূত্র নালি নিয়ে গঠিত হয়। এছাড়া ঘর্মগ্রন্থি, সিবেসিয়াস গ্রন্থি ও ফুসফুস রেচন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

1. **বৃক্ক** (Kidney) : বৃক্ক সংখ্যায় দুটি এবং শিম বীজের মতো দেখতে হয়। প্রতিটি বৃক্কের একপাশে একটি খাঁজ থাকে। একে **হাইলাস** (Hilus) বলা হয়। এই অংশে রেনাল ধমনি বৃক্কে প্রবেশ করে এবং রেনাল শিরা বৃক্ক থেকে নির্গত হয়। বৃক্কের দুটি অংশ—**কর্টেক্স** (Cortex) এবং **মেডালা** (Medulla)। বৃক্ক প্রধানত অসংখ্য **নেফ্রন**

চিত্র 2.17 : বৃক্কের লম্বচ্ছেদে দেখা বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

(Nephron) **নামে একক** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি নেফ্রন (i) **ম্যালপিজিয়ান করপাসল** অর্থাৎ **গ্লোমেরুলাস** (Glomerulus) ও **বাওম্যানস ক্যাপসিউল** (Bowman's capsule) এবং (ii) **বৃক্কীয় নালিকা** (Renal tubule) সমন্বয়ে গঠিত হয়। বৃক্কীয় নালিকাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে **সংগ্রাহক নালিকা** (Collecting tubule) গঠন করে। সংগ্রাহক নালিকাগুলি গবিনীতে মুক্ত হয়।

চিত্র 2.18 : গিনিপিগের রেচনতন্ত্র।

2. **গবিনী** (Ureter) : দুটি গবিনী বৃক্কের হাইলাস অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। এগুলি পিছনের দিকে অগ্রসর হয়ে মূত্রস্থলীর (Urinary bladder) সঙ্গে যুক্ত হয়।

3. **মূত্রস্থলী** (Urinary bladder) : এটি উদর-গহ্বরের পিছনে অঙ্কীয় দেশে থাকে। মূত্রস্থলী মূত্রনালির (Urethra) সঙ্গে যুক্ত হয়। পুরুষ গিনিপিগের ক্ষেত্রে জনন নালি মূত্র নালির সঙ্গে যুক্ত হয়। সেইজন্য পুরুষ গিনিপিগের মূত্র নালিকে **রেচন-জনন নালি** (Urinogenital duct) এবং মূত্রছিদ্রকে **রেচন-জনন ছিদ্র** (Urinogenital aperture) বলা হয়। পুরুষের মূত্রনালি **শিশ্নের** (Penis) মাধ্যমে মূত্রছিদ্রে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু স্ত্রী গিনিপিগের ক্ষেত্রে মূত্রছিদ্র ও জননছিদ্র পৃথক থাকে।

চিত্র 2.19. : একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

● **নেফ্রন (Nephron) :**

❖ **সংজ্ঞা (Definition)—**

**বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে।**

প্রতিটি নেফ্রন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত; যেমন—**ম্যালপিজিয়ান করপাসল** এবং **বৃক্কীয় নালিকা**।

(a) **ম্যালপিজিয়ান করপাসল (Malpighian corpuscle) :** চওড়া ফাঁপা কাপের মতো বাওম্যানস্ ক্যাপসুল এবং গ্লোমেরিউলাস নামে রক্তজালক গুচ্ছ নিয়ে ম্যালপিজিয়ান করপাসল গঠিত হয়। বাওম্যানস্ ক্যাপসুলের কাপের মধ্যে গ্লোমেরিউলাস অবস্থান করে। **কাজ**—ম্যালপিজিয়ান করপাসল বৃক্কের ফিল্টার যন্ত্র হিসাবে রক্তের দূষিত পদার্থগুলি পরিস্রুত করে।

(b) **বৃক্কীয় নালিকা (Renal tubule) :** একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি নিয়ে বৃক্কীয় নালিকা গঠিত হয়। বৃক্কীয় নালিকাকে চারটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যেমন—**নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Proximal convoluted tubule), **হেনলির লুপ** (Loop of Henle), **দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Distal convoluted tubule) এবং **সংগ্রাহক নালিকা** (Collecting duct) । **কাজ**—রেচন পদার্থ বহন করা, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রাথমিক পরিস্রুত (Primary filtrate) থেকে শোষণ করে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

## ◎ 2.9. গিনিপিগের জননতন্ত্র (Reproductive system of Guinea-pig) ◎

▲ **জননতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description of Reproductive System) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী যৌন জননের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে তাকে জননতন্ত্র বলে।**

➤ (b) **জননতন্ত্রের বর্ণনা ( Description of Reproductive System ) :** গিনিপিগ একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ এদের পুরুষদেহ ও স্ত্রীদেহ আলাদা। এদের পুংজননতন্ত্র পুরুষ প্রাণীতে এবং স্ত্রীজননতন্ত্র স্ত্রী প্রাণীতে উপস্থিত থাকে।

## ◻ A. পুরুষ গিনিপিগের জননতন্ত্র (Reproductive system of male Guinea-pig) ঃ

পুরুষ গিনিপিগের জননতন্ত্রটি শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস, শুক্রনালি, মূত্রনালি, পেনিস এবং অতিরিক্ত গ্রন্থিসমূহ নিয়ে গঠিত। নীচে এই অঙ্গগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল।

চিত্র 2.20 ঃ গুবারনাকুলাম

1. **শুক্রাশয়** (Testis)—পুরুষ গিনিপিগের দেহে একজোড়া শুক্রাশয় থাকে। অপরিণত বয়সে শুক্রাশয় দুটি উদর-গহ্বরের মধ্যে থাকে। কিন্তু পরিণত বয়সে শুক্রাশয় দুটি নেমে আসে এবং **স্ক্রোটাম** (Scrotum) নামে থলির মধ্যে অবস্থান করে। **ইঙ্গুইন্যাল ক্যানাল** (Inguinal canal) নামে একটি নালি দিয়ে স্ক্রোটামটি উদরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। **গুবারনাকুলাম** (Gubernaculum) নামের রজ্জুর সাহায্যে শুক্রাশয় স্ক্রোটামের মধ্যে প্রলম্বিত থাকে।

2. **শুক্রনালি** (Vas deferens) —প্রতিটি শুক্রাশয় থেকে একটি শুক্রনালির সৃষ্টি হয়। এই শুক্রনালি পিছনের দিকে অগ্রসর হয়ে ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়।

3. **এপিডিডাইমিস** (Epididymis)—শুক্রনালির প্রথম অংশ কুন্ডলী পাকিয়ে যে অংশ গঠন করে তাকে **এপিডিডাইমিস** বলে।

4. **শুক্রথলি** (Seminal vesicle)—এগুলি সংখ্যায় একজোড়া, নলাকৃতি ও মূত্রথলীর উপরে অবস্থান করে এবং এক ধরনের সাদা রস নিঃসরণ করে।

চিত্র 2.21 ঃ গিনিপিগের পুং জননতন্ত্র।

5. **মূত্রনালি** (Urethra) —পুরুষ গিনিপিগের শুক্রনালি মূত্রনালির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শুক্রাণু মূত্রনালির মাধ্যমে বাহিত হয়।

6. **পেনিস** (Penis) —এটি পেশিবহুল অঙ্গ। এর মাধ্যমে মূত্রনালি বাইরে উন্মুক্ত হয়। **প্রিপিউস** (Prepuse) নামের পাতলা পর্দার সাহায্যে পেনিস আবৃত থাকে। দুইস্তর বিশিষ্ট **করপোরা ক্যাভারনোসা** (Corpora cavernosa) এবং একস্তর বিশিষ্ট **করপোরা স্পঞ্জিওসাম** (Corpora spongiosum) নামের রক্তজালক সমৃদ্ধ কলাস্তর দিয়ে পেনিস গঠিত হয়।

7. **মূত্র-জনন ছিদ্র** (Urinogenital aperture) — পুরুষ গিনিপিগের মূত্র ছিদ্র এবং জননছিদ্র একই অর্থাৎ একই ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ থেকে মূত্র এবং শুক্রাণু নির্গত হয়।

8. **সহকারি গ্রন্থিসমূহ** (Accessory glands) ঃ পুরুষ গিনিপিগের জননতন্ত্রে নিম্নলিখিত সহকারি গ্রন্থিসমূহ যুক্ত থাকে —(i) **প্রস্টেট গ্রন্থি** (Prostate gland)—এই গ্রন্থি শুক্রথলির মূলদেশে অবস্থিত হয়ে মূত্র নালিতে উন্মুক্ত হয়। (ii) **কাউপার-এর গ্রন্থি** (Cowper's gland) বা **বালবো ইউরেথ্রাল গ্রন্থি** (Bulbo-urethral gland)—এগুলি একজোড়া, ছোটো এবং মূত্রনালি ও শিশ্নের সংযোগস্থলে অবস্থিত হয়ে মূত্রনালিতে উন্মুক্ত হয়।(iii) **কোয়াগুলেটিং গ্রন্থি** (Coagulating gland)—এগুলি একজোড়া পিরামিড আকৃতির গ্রন্থি। শুক্রথলির গোড়ায় থাকে এবং নালিপথে মূত্রনালি বা ইউরেথ্রায় মুক্ত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরিত রস শুক্রথলির ক্ষরিত রসকে তঞ্চিত করে, ফলে **ভ্যাজাইন্যাল প্লাগ** (Vaginal Plug) গঠিত হয়।

● **ইউরেটার (গবিনী) ও ইউরেথ্রার (মূত্রনালি) পার্থক্য (Difference between Ureter and Urethra) ঃ**

| ইউরেটার (গবিনী) | ইউরেথ্রা (মূত্রনালি) |
|---|---|
| 1. বৃক্কের হাইলাস অংশ থেকে যে নালি বের হয়ে মূত্রথলিতে মুক্ত হয়, তাকে ইউরেটার বা গবিনী বলে। | 1. মূত্রথলি থেকে যে নালিপথটি বের হয়ে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয় তাকে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালি বলে। |

| ইউরেটার (গবিনী) | ইউরেথ্রা (মূত্রনালি) |
|---|---|
| 2. ইউরেটার সংখ্যায় দুটি। | 2. ইউরেথ্রা সংখ্যায় একটি। |
| 3. এর নালিপথে কোনো পেশিবলয় বা স্ফিঙ্কটার নেই। | 3. মূত্রনালিতে স্ফিঙ্কটার থাকে। |
| 4. ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে স্থানান্তরিত হয়। | 4. ইউরেথ্রার মাধ্যমে মূত্র মূত্রথলি থেকে দেহের বাইরে বের হয়। |

### ◘ B. স্ত্রী গিনিপিগের জননতন্ত্র (Reproductive system of female Guinea-pig) ঃ

স্ত্রী গিনিপিগের জননতন্ত্রটি ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, জরায়ু, যোনি এবং ভালভা নিয়ে গঠিত হয়। নীচে উপরোক্ত অঙ্গগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

1. **ডিম্বাশয়** (Ovary)—দুটি ডিম্বাকৃতি ডিম্বাশয় স্ত্রী গিনিপিগের বৃক্কের পিছনে থাকে। ডিম্বাশয়ের মধ্যে **গ্র্যাফিয়ান ফলিকল** (Graafian follicle) নামের অসংখ্য থলির মতো কোশসমষ্টি থাকে। **ডিম্বাণু** (Ovum) গ্রাফিয়াল ফলিকল-এর ভিতরে অবস্থান করে।

2. **ডিম্বনালি** (Oviduct)— স্ত্রী গিনিপিগের দেহে দুটি ডিম্বনালি থাকে। প্রতিটি ডিম্বনালি তিনটি অংশে বিভক্ত; যেমন—ডিম্বচুঙ্গি, ফ্যালোপিয়ান নালি এবং জরায়ু।

(i) **ডিম্বচুঙ্গি** (Oviducal funnel) ঃ ডিম্বনালির অগ্রভাগ চুঙ্গির মতো দেখতে হয়। একে **ডিম্বচুঙ্গি** বলে। পরিণত ডিম্বাণু গ্র্যাফিয়ান ফলিকল থেকে বেরিয়ে এসে ডিম্বচুঙ্গিতে প্রবেশ করে। (ii) **ফ্যালোপিয়ান নালি** (Fallopian tube) ঃ ডিম্বনালির সরু এবং প্যাঁচানো অংশকে **ফ্যালোপিয়ান নালি** বলে।



চিত্র 2.22 ঃ গিনিপিগের স্ত্রী-জননতন্ত্র।

3. **জরায়ু** (Uterus)—ডিম্বনালির পিছনের দিকে স্ফীত পেশিবহুল অংশকে **জরায়ু** বলে। জরায়ু সংখ্যায় দুটি। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের পরিস্ফুরণ ক্রিয়া ঘটে।

4. **যোনি** (Vagina)—দু'টি জরায়ু মিলিত হয়ে যে নালি গঠন করে তাকে **যোনি** বলে।

5. **ভালভা** (Valva)—ভালভা স্ত্রী গিনিপিগের বহির্জননাঙ্গ যা ক্লাইটোরিস্ (Clitoris), যোনিছিদ্র ও লেবিয়া নিয়ে গঠিত। (i) যোনি যে পথে দেহের বাইরে মুক্ত হয় তাকে **যোনিছিদ্র** বলে। (ii) যোনিছিদ্রের উপরে মাংসল, দণ্ডাকার অংশকে **ক্লাইটোরিস** বলে। পুরুষের শিশ্ন ও স্ত্রী প্রাণীর ক্লাইটোরিস উৎপত্তিগতভাবে সমান। (iii) যে দু'টি চামড়ার ভাঁজ যোনিছিদ্রকে বেষ্টন করে থাকে তাকে **লেবিয়া** বলে।

◙ **স্তনগ্রন্থি** (Mammary gland) ঃ এটি জননতন্ত্রের কোনো অংশ নয় কিন্তু স্ত্রী গিনিপিগের বিশেষ অঙ্গ। একজোড়া স্তনগ্রন্থি উদরের শেষ অংশে মধ্যরেখার দু পাশে থাকে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্তনগ্রন্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বাচ্চা প্রসবের পরে স্তনগ্রন্থি থেকে দুধ নিঃসরণ হয়। পুরুষ গিনিপিগের স্তনগ্রন্থি নিষ্ক্রিয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় (Rudimentary) থাকে।

## ✪ 2.10. গিনিপিগের স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system of Guinea-pig) ✪

### ▲ স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা (Definition and Descriptions of Different Divisions of Nervous System) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition)** ঃ **যে তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সমন্বয় সাধন করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র ( Nervous System ) বলে।**

(b) **স্নায়ুতন্ত্রের বর্ণনা ( Description of Nervous System ) ঃ** গিনিপিগের স্নায়ুতন্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। ভাগ তিনটি যথাক্রমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system), প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system) এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system)।

## ➤ A. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) ঃ

❖ (i) **সংজ্ঞা ঃ** যে স্নায়ুতন্ত্র দেহের প্রধান অক্ষবরাবর অবস্থান করে এবং দেহের সমস্ত অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)** বলে।

(ii) **প্রকারভেদ ঃ** গিনিপিগের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র **মস্তিষ্ক** ( Brain ) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** ( Spinal cord ) নিয়ে গঠিত হয়।

### ● I. মস্তিষ্ক (Brain) ঃ

করোটির মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান অংশকে মস্তিষ্ক বলে। গিনিপিগের মস্তিষ্ক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত হয়। এগুলি হল — (a) পুরোমস্তিষ্ক বা প্রোসেনকেফালন, (b) মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনকেফালন, এবং (c) পরাঙমস্তিষ্ক বা রম্বেনকেফালন। এগুলির বিভিন্ন ভাগ নিম্নরূপ—
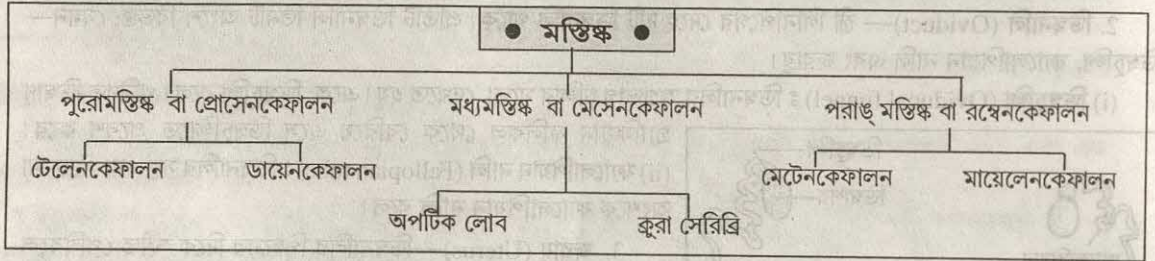
(a) **প্রোসেনকেফালন (Prosencephalon) বা পুরোমস্তিষ্ক ( Fore brain ) ঃ** দুটি অংশ নিয়ে পুরোমস্তিষ্ক গঠিত হয়। সামনের দিকের অংশকে **টেলেনকেফালন** এবং পিছনের দিকের অংশকে **ডায়েনকেফালন** বলে।

1. **টেলেনকেফালন** (Telencephalon) ঃ গিনিপিগের মস্তিষ্কের এই অংশে, একেবারে অগ্রভাগে একজোড়া **অলফ্যাক্টরি লোব** (Olfactory lobe) এবং তারপরে একজোড়া **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebral hemisphere) বা **সেরিব্রাম** ( Cerebrum ) থাকে।

চিত্র 2.42 ঃ গিনিপিগের মস্তিষ্কের বহির্গঠন (পৃষ্ঠদেশ)।

(i) **অলফ্যাকটরি লোব** (Olfactory lobe) ঃ এগুলি দেখতে অনেকটা গদার মতো এবং মস্তিষ্কের সর্বপ্রথম অংশ। **কাজ ঃ** গিনিপিগের ঘ্রাণ অনুভূতি গ্রহণ করে এবং বিশ্লেষণ করে।

(ii) **সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (Cerebral hemisphere) **বা সেরিব্রাম ঃ** এগুলি মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ। গুরুমস্তিষ্ক দুটির মাঝখানে গভীর খাঁজকে **মধ্য ফাটল** (Median fissure) বলে। প্রতিটি গুরুমস্তিষ্ক চারটি লোব নিয়ে গঠিত হয়। যেমন— **ফ্রন্টাল** ( Frontal), **প্যারাইট্যাল** (Parietal), **টেম্পোর‍্যাল** (Temporal) এবং **অক্সিপিটাল** (Occipital)। গুরুমস্তিষ্কের অঙ্কীয় ও পার্শ্বতলের পুরুস্তরকে **করপাস স্ট্রায়াটাম** (Corpus striatum)। গুরুমস্তিষ্কের দুটি লোব অনুপ্রস্থ স্নায়ু দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই স্নায়ুসূত্রকে করপাস ক্যালোসাম (Corpus callosum) বলে।

**কাজ**—গিনিপিগের বুদ্ধি, স্মৃতি, কর্মক্ষমতা, সচেতনতা ইত্যাদি গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে।

2. **ডায়েনকেফালন** (Diencephalon) **:** গুরুমস্তিষ্ক ও মধ্যমস্তিষ্কের মাঝে ছোটো অংশকে ডায়েনকেফালন বলে। ডায়েনকেফালনের অঙ্কীয় তলকে **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) বলা হয়। হাইপোথ্যালামাস অংশে **অপটিক কায়াজমা** (Optic chiasma) ও **পিটুইটারি অঙ্গ** (Pituitary body) দেখা যায়। ডায়ানকেফালনের পৃষ্ঠতলে **পিনিয়াল বডি** (Pineal body) এবং **সম্মুখস্থ কোরয়েড প্লেক্সাস** (Anterior choroid plexus) নামে একটি ভাঁজ থাকে।

**কাজ**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের তাপমাত্রা, বেদনা, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এই অংশ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির যোগসূত্র রক্ষা করে।

**চিত্র 2.24 :** গিনিপিগের মস্তিষ্কের বহির্গঠন (অঙ্কীয়দেশ)।

**(b) মেসেনকেফালন (Mesencephalon) বা মধ্যমস্তিষ্ক (Mid brain) :** পুরোমস্তিষ্ক ও পরাঙমস্তিষ্কের মাঝে ক্ষুদ্র অংশটিকে মেসেনকেফালন বা মধ্যমস্তিষ্ক বলে। মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে চারটি লোব বা লতির মতো অংশ থাকে। এগুলিকে **অপটিক লোব** (Optic lobe) বা **করপোরা কোয়াড্রিজেমিনা** (Corpora quadrigemina) বলে। এর মধ্যে সামনের দিকে অবস্থিত দু'টি লোবকে একত্রে **সুপিরিয়র কলিকিউলি** (Superior Colliculi) এবং পিছনের দিকে অবস্থিত লোবদুটিকে একত্রে **ইনফিরিয়র কলিকিউলি** (Inferior Colliculi) বলে। মেসেনকেফালনের অঙ্কীয়দেশে দুই গুচ্ছ নার্ভতন্তুকে **ক্রুরা সেরিব্রি** (Crura cerebri) বলে। এগুলি পুরোমস্তিষ্ক ও পরাঙমস্তিষ্ককে সংযুক্ত রাখে।

**কাজ**—সুপিরিয়র কলিকিউলি দর্শন অনুভূতি অনুযায়ী এবং ইনফিরিয়র কলিকিউলি শ্রবণ অনুভূতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

**(c) রম্বেনকেফালন (Rhombencephalon) বা পরাঙমস্তিষ্ক (Hind brain)** মস্তিষ্কের এই শেষ অংশটি দুইভাগে বিভক্ত। সামনের অংশকে মেটেনকেফালন (Metencephalon) এবং পিছনের অংশকে মায়েলেনকেফালন (Myelencephalon) বলে। এগুলি নিম্নরূপ—

(i) **মেটেনকেফালন** (Metencephalon) **:** এর অপর নাম **সেরিবেলাম** (Cerebellum) বা লঘুমস্তিষ্ক। সেরিবেলামের মাঝের অংশকে **ভারমিস** (Vermis) বলে। ভারমিসের দু দিকের খণ্ডগুলিকে **পার্শ্বখণ্ড** (Lateral lobes) বলে এবং পার্শ্বখণ্ডের দু পাশের খণ্ডগুলিকে **ফ্লোকিউলাস্** (Flocculus) বলে। সমগ্র সেরিবেলামে অনেকগুলি ভাঁজ থাকে। সেরিবেলামের অঙ্কীয় দেশে এক ধরনের সংযোজক নার্ভতন্তু, **পনস্ ভ্যারোলি** (Pons varolli) থাকে যা লঘুমস্তিষ্কের অংশগুলিকে সংযুক্ত রাখে।

**কাজ**—মেটেনকেফালন বা সেরিবেলাম প্রাণীদেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দায়ী।

(ii) **মায়েলেনকেফালন** ( Myelencephalon ) **:** এটি মস্তিষ্কের সর্বশেষ অংশ এবং এই অংশকে **মেডালা অবলংগাটা** (Medulla oblongata) বা **সুষুম্নাশীর্ষক** বলে। এই অংশটি সামনের দিকে চওড়া কিন্তু পিছনের দিক ক্রমশ সরু হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর পৃষ্ঠদেশে স্নায়ুহীন, রক্তজালক-সমৃদ্ধ অঞ্চলকে **পশ্চাৎ কোরয়েড প্লেক্সাস্** (Posterior choroid plexus) বলে।

**কাজ**—শ্বাসকার্য জনিত চলন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

1. **মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণ (Coverings of brain and Spinal Cord)** **:** মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড পরপর তিনটি স্তর দিয়ে ঘেরা থাকে। সবচেয়ে বাইরের স্তরকে **ডুরা ম্যাটার** (Dura mater), মধ্যবর্তী স্তরকে **অ্যারাকনয়েড** (Arachnoid),

এবং সবচেয়ে ভিতরের স্তরকে **প্যায়া ম্যাটার** (Pia mater) বলে। উপরোক্ত তিনটি স্তরকে একত্রে **মেনিনজেস** (Meninges) বলে।

2. **মস্তিষ্কের গহ্বর** ( Cavities or Ventricles of brain ) ঃ গিনিপিগের মস্তিষ্কটি ফাঁপা এবং অনেকগুলি গহ্বরযুক্ত। এই গহ্বরগুলিকে **মস্তিষ্কের নিলয়** (Ventricles of brain) বলে।

গিনিপিগের মস্তিষ্কে চারিটি গহ্বর বা **নিলয়** (Ventricle) থাকে। গুরু মস্তিষ্ক দুটির মধ্যে যে দুটি নিলয় থাকে তাদের **পার্শ্বীয় নিলয়** (Lateral ventricles) বলে। ডায়েনসেফালনের অভ্যন্তরে **তৃতীয় নিলয়** (Third ventricle) থাকে। দুইটি পার্শ্বীয় নিলয় এবং তৃতীয় নিলয় যে ছিদ্র পথে সংযুক্ত থাকে তাকে **ফোরামেন অব মনরো** (Foramen of Monro) বলে। সুযুম্নাশীর্ষকের ভিতরে **চতুর্থ নিলয়** (Fourth ventricle) থাকে। **সিলভিয়াসের নালির** (Aqueduct of Sylvius) সাহায্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ নিলয় যুক্ত থাকে। সুযুম্নাকাণ্ডের ভিতরে অবস্থিত **নিউরোসিল** (Neurocoel) এর সাহায্যে চতুর্থ নিলয় যুক্ত থাকে। মস্তিষ্ক এবং সুযুম্নাকাণ্ডের গহ্বরগুলি **মস্তিষ্ক-সুযুম্না রস** (Cerebrospinal fluid) দিয়ে পূর্ণ থাকে। মস্তিষ্ক থেকে **করোটি স্নায়ুর** (Cranial nerves) উৎপত্তি হয়।

চিত্র 2.25 ঃ গিনিপিগের মস্তিষ্কের গহ্বরের চিত্ররূপ।

## II. সুযুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) ঃ

সুযুম্নাকাণ্ড সুযুম্নাশীর্ষকের শেষ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত নিউরাল ক্যানেলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সুযুম্নাকাণ্ডের ভিতরে যে নালি থাকে তাহাকে **নিউরোসিল** (Neurocoel) বলে। সুযুম্নাকাণ্ডের শেষভাগ ক্রমশ সরু হয়ে **কোনাস টারমিনালিস** (Conus terminalis) নামে শঙ্কু আকৃতি বিশিষ্ট অংশ গঠন করে। কোনাস টারমিনালিস থেকে **ফাইলাম টারমিনেল** (Filum terminale) গঠিত হয়। সুযুম্নাকাণ্ড থেকে **সুযুম্না স্নায়ু** (Spinal nerves) উৎপন্ন হয়।

## ➤ B. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous system) ঃ

এই স্নায়ুতন্ত্র করোটি স্নায়ু ও সুযুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।

### 1. করোটি স্নায়ু (Cranial nerve) ঃ

মস্তিষ্কদণ্ড থেকে উৎপন্ন স্নায়ুকে করোটি স্নায়ু বলে।

● **গিনিপিগের 12 জোড়া করোটি স্নায়ুগুলির নাম, প্রকৃতি, উৎপত্তিস্থল, গন্তব্যস্থান এবং কাজ ঃ**

| ক্রমিক সংখ্যা | স্নায়ুর নাম ও প্রকৃতি | উৎপত্তিস্থল | গন্তব্যস্থান | কাজ |
|---|---|---|---|---|
| I | অলফ্যাকটরি (সংজ্ঞাবহ) | নাকের শ্লেষ্মাঝিল্লি | অলফ্যাকটরি লোব | ঘ্রাণের অনুভূতি বহন করে। |
| II | অপ্‌টিক (সংজ্ঞাবহ) | চোখের রেটিনা | অপটিক লোব | দর্শনের অনুভূতি বহন করে। |

| ক্রমিক সংখ্যা | স্নায়ুর নাম ও প্রকৃতি | উৎপত্তিস্থল | গন্তব্যস্থান | কাজ |
|---|---|---|---|---|
| III | অকিউলোমোটর (চেষ্টীয়) | মধ্যমস্তিষ্ক | চোখের পেশি ও চোখের পাতার পেশি | চক্ষুগোলকের সঞ্চালন তারারন্ধ্রের সংকোচন। |
| IV | ট্রোক্লিয়ার (চেষ্টীয়) | মধ্যমস্তিষ্ক | চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি | চক্ষুগোলকের সঞ্চালনে সাহায্য করে। |
| V | ট্রাইজেমিনাল (মিশ্র) | (i) চেষ্টীয়-সুষুম্না শীর্ষক | (i) চোখ, উপর ও নীচের চোয়াল | (i) মুখমণ্ডলের সংবেদনশীলতা, জিভ ও খাদ্যবস্তু চর্বণের জন্য দায়ী পেশির সঞ্চালন করে। |
| | | (ii) সংজ্ঞাবহ- চর্বণ পেশি, চোখ, মুখ, মাড়ি, দাঁত, নাক ইত্যাদি। | (ii) মধ্যমস্তিষ্ক | (ii) ওই সব অঙ্গ থেকে অনুভূতি বহন করে। |
| VI | অ্যাবডুসেন্স (চেষ্টীয়) | সুষুম্নাশীর্ষক | চোখের বহিঃরেকটাস পেশি। | চক্ষু গোলকের পার্শ্ব সঞ্চালনে সাহায্য করে। |
| VII | ফেসিয়াল (মিশ্র) | (i) চেষ্টীয়-সুষুম্না শীর্ষক | (i) অশ্রুগ্রন্থি, মুখগহ্বরের ছাদ ও মেঝে, নীচের চোয়াল | (i) স্বাদ গ্রহণ, নীচের চোয়ালের সঞ্চালন, লালাক্ষরণ এবং অশ্রু-ক্ষরণ। |
| | | (ii) সংজ্ঞাবহ—তালু ও জিভের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ প্রভৃতি। | (ii) সুষুম্নাশীর্ষক | (ii) স্বাদ অনুভূতি বহন করে। |
| VIII | অডিটরি ( সংজ্ঞাবহ ) | অন্তঃকর্ণ | সুষুম্নাশীর্ষক | শ্রবণ এবং দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। |
| IX | গ্লসোফ্যারিনজিয়াল (মিশ্র ) | (i) চেষ্টীয়—সুষুম্না শীর্ষক | (i) মুখগহ্বরের নীচের তল এবং জিভ | (i) স্বাদ গ্রহণ, গলাধঃকরণ এবং লালাক্ষরণ। |
| | | (ii) সংজ্ঞাবহ—জিভের শেষ এক-তৃতীয়াংশ। | (ii) সুষুম্নাশীর্ষক | (ii) সাধারণ স্বাদ অনুভূতি বহন করে। |
| X | ভেগাস ( মিশ্র ) | (i) চেষ্টীয়-সুষুম্না শীর্ষক | (i) স্বরকুঠুরি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্র | (i) স্বরকুঠুরি, হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশির সঞ্চালন করে। |
| | | (ii) সংজ্ঞাবহ—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ট্রাকিয়া, পাকস্থলী, পিত্তাশয় ইত্যাদি। | (ii) সুষুম্নাশীর্ষক | (ii) বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সংজ্ঞাবহ অনুভূতি বহন করে। |
| XI | স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (চেষ্টীয়) | সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্বদেশ | গলার পেশি | গলার পেশির সঞ্চালনে অংশ নেয়। |
| XII | হাইপোগ্লোসাল (চেষ্টীয়) | সুষুম্নাশীর্ষক | জিভের পেশি | জিভের সঞ্চালনে সাহায্য করে। |

● **2. সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) : সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন স্নায়ুকে সুষুম্না স্নায়ু বলে।** গিনিপিগের সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা 32 জোড়া। এগুলি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এই স্নায়ুগুলি **পৃষ্ঠীয় মূল** (Dorsal root) এবং **অঙ্কীয় মূল** (Ventral root)–এর সাহায্যে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। সুষুম্না স্নায়ুর পৃষ্ঠীয় মূল এবং অঙ্কীয় মূল যথাক্রমে সংজ্ঞাবহ এবং চেষ্টীয় প্রকৃতির হয়। গ্রিবার চারটি এবং বক্ষের একটি সুষুম্না স্নায়ু মিলিত হয়ে **ব্রাকিয়াল জালক বা প্লেক্সাস** (Brachial plexus) গঠন করে। এই জালকের স্নায়ুগুলি অগ্রপদে প্রবেশ করে। অপর দিকে শেষ প্রান্তের দুটি লাম্বার স্নায়ু এবং স্যাক্রাল স্নায়ুগুলি মিলিত হয়ে **সায়াটিক জালক বা প্লেক্সাস** (Sciatic plexus) গঠন করে। এই জালকের স্নায়ুগুলি পশ্চাৎ পদে প্রবেশ করে।
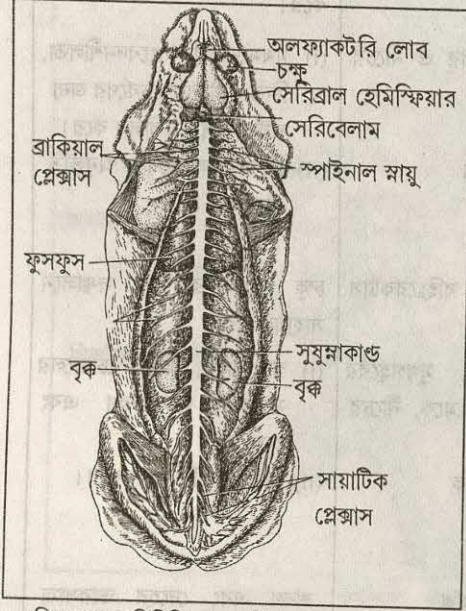
চিত্র 2.26 : গিনিপিগের পার্শ্বীয় স্নায়ুতন্ত্রের চিত্ররূপ।

□ **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system) :**

দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রের ( যেমন— হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি) কাজের নিয়ন্ত্রণ গিনিপিগের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ এদের কাজের ওপর কোনো ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ নাই। এই সব অঙ্গের কাজ স্নায়ুতন্ত্রের যে বিশেষ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। এই স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকেন্দ্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ অংশে অবস্থান করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি বিভাগ—**স্বতন্ত্র বা সিমপ্যাথেটিক তন্ত্র** (Sympathetic system) এবং **পরাস্বতন্ত্র বা প্যারাসিমপ্যাথেটিক তন্ত্র** (Parasymapthetic system)। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে সব আন্তরযন্ত্রেই উভয় তন্ত্রের স্নায়ু বিস্তৃত হয় এবং বহুক্ষেত্রে এদের একটির কাজ অপরটির বিপরীত। যেমন স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়, রক্তচাপ বাড়ে, তারারন্ধ্রের প্রসারণ ঘটে, মূত্রস্থলী প্রসারিত হয় ইত্যাদি। অপরদিকে পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস পায়, রক্তচাপ কমে, তারারন্ধ্র সংকুচিত হয়, মূত্রস্থলী সংকুচিত হয় ইত্যাদি।

## ❂ 2.11. গিনিপিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense Organs of Guinea-pig) ❂

▲ **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description of Sense organs) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা : প্রাণীদেহের যে অঙ্গ পরিবেশের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনে সক্রিয় হয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু-স্পন্দন (Nerve impulse) সৃষ্টি করে তাকে সংবেদন অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organs) বলে।**

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহক (Receptor) এবং কিছু সংখ্যক রক্ষাকারী বা আলম্বন কোশ সহযোগে গঠিত এক বিশেষ প্রকারের অঙ্গ। গিনিপিগসহ সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদাহরণ।

➤ (b) **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণনা :** নীচে গিনিপিগের **চোখ** এবং **কানের** বর্ণনা দেওয়া হল।

● **I. গিনিপিগের চোখের গঠন (Structure of the Eye of Guinea-pig) :**

গিনিপিগের করোটির (Skull) দুটি অক্ষিকোটরে (Eye orbit) চক্ষু পেশির সাহায্যে দুটি চোখ বসানো থাকে। এর চোখ দুটি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত হয়।

(i) **নেত্র পল্লব বা চোখের পাতা** (Eyelid) — উপরের এবং নীচের নেত্রপল্লব দিয়ে গিনিপিগের চোখ দুটি আবৃত থাকে। নেত্রপল্লব, ধূলাবালি, তীব্র আলোক, জল এবং বাতাস থেকে চোখকে রক্ষা করে।

(ii) **নেত্রবর্ত্ম কলা** বা **কন্‌জাংকটিভা** (Conjunctiva) — নেত্র পল্লবের ভিতরে এবং অক্ষিগোলকের সামনে কর্ণিয়ার উপর এপিথেলিয়াল কোশের একটি স্বচ্ছ আবরণ থাকে। এই আবরণকে নেত্রবর্ত্ম কলা বা **নেত্রবর্ত্মঝিল্লি** বলে। ধুলাবালি থেকে এটি চোখকে রক্ষা করে।

(iii) **অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থি** (Lacrymal gland) — এই গ্রন্থি উপরের নেত্রপল্লবের ভিতরের দিকে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত অশ্রু অক্ষিগোলককে (Eye ball) আর্দ্র রাখে।

(iv) **শ্বেতমণ্ডল** (Sclera) — অক্ষিগোলকটি তিনটি স্তরে বেষ্টিত। এর বাহিরের স্তরটিকে **শ্বেতমণ্ডল** বা **স্ক্লেরা** বলে। চক্ষুপেশিগুলি এই শ্বেতমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অক্ষিগোলকের শ্বেতমণ্ডলের সম্মুখভাগের $\frac{1}{6}$ অংশ স্বচ্ছ থাকে। এই অংশকে **কর্ণিয়া** বলে।

চিত্র 2.27 ঃ গিনিপিগের চোখের গঠন।

(v) **কৃষ্ণমণ্ডল বা কোরয়েড** (Choroid) ঃ অক্ষিগোলকের মধ্য স্তরকে কৃষ্ণমণ্ডল বলে। এই স্তরে মেলানিন রঞ্জক পদার্থ থাকে। কৃষ্ণমণ্ডল অস্বচ্ছ এবং এতে প্রচুর রক্ত জালক থাকে।

(vi) অক্ষিগোলকের ভিতরের নার্ভীয় স্তরকে **অক্ষিপট** (Retina) বলে। অক্ষিপটে দু'ধরনের কোশ থাকে। এই কোশগুলিকে যথাক্রমে **রড কোশ** (Rod cell) এবং **কোন্ কোশ** (Cone cell) বলে।

### ● চোখের আলোক সংবেদী গ্রাহক ●

রড কোশগুলি লম্বাটে এবং এতে **রোডপ্‌সিন** নামে প্রোটিন থাকে। এই কোশগুলি মৃদু আলোক সংবেদী। কোন্ কোশগুলি মোচাকৃতি। এতে **আয়োডপ্‌সিন** নামের প্রোটিন থাকে। কোন্ কোশগুলি উজ্জ্বল আলোক সংবেদী। অক্ষিপটের যে বিন্দুতে চক্ষুস্নায়ু (Optic nerve) যুক্ত থাকে তাকে **অন্ধবিন্দু** (Blind spot) বলে। **অন্ধবিন্দুতে** কোনো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না। কারণ ওই বিন্দুতে কোনো রড কোশ এবং কোন্ কোশ থাকে না। অক্ষিপটে বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

(vii) **সিলিয়ারি বডি** (Ciliary body) ঃ কৃষ্ণমণ্ডলের (Choroid) একটি অংশ লেন্সের চারিদিকে পুরু হয়ে সিলিয়ারি বডির সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে যুক্ত সিলিয়ারি পেশির সংকোচন এবং প্রসারণে লেন্সের বক্রতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সিলিয়ারি বডি থেকে কনীনিকা (Iris) সৃষ্টি হয়। কনীনিকার কেন্দ্রে তারারন্ধ্র (Pupil) নামে ছিদ্র থাকে।

(viii) **লেন্স** (Lens) ঃ প্রোটিনজাত স্বচ্ছ তন্তু দিয়ে লেন্সটি গঠিত হয়। সাস্‌পেনসরি লিগামেন্ট লেন্সকে ধরে রাখে। সাস্‌পেনসরি লিগামেন্টের অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি কর্ণিয়ার পিছনে অবস্থান করে।

(ix) **অ্যান্টেরিয়র চেম্বার** (Anterior chamber) বা **অগ্রপ্রকোষ্ঠ** এবং **পোস্টেরিয়র চেম্বার** (Posterior chamber) বা **পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ** : লেন্সের অগ্রভাগে যে প্রকোষ্ঠ থাকে তা **অ্যাকোয়াস হিউমার** (Aquous humor) নামে তরল রস দিয়ে পূর্ণ থাকে। কনীনিকা একে আবার দুটি গহ্বরে বিভক্ত করে। কনীনিকার সামনের ভাগটিকে **অগ্র-প্রকোষ্ঠ** ও যেটি কনীনিকার পশ্চাতে অবস্থিত সেটিকে **পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ** বলে। লেন্সের পিছনে যে বৃহৎ প্রকোষ্ঠ থাকে তা **ভিট্রিয়াস হিউমার** (Vitreous humor) নামে গাঢ় তরল রস দিয়ে পূর্ণ থাকে। এই তরল দুটির জন্যই অক্ষিগোলকের সঠিক আকৃতি বজায় থাকে।

## ● II. গিনিপিগের কানের গঠন (Structure of the Ear of Guinea-pig) :

গিনিপিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের নাম কান। এদের কান তিনটি অংশে বিভেদিত। যথা— **বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ**।

1. **বহিঃকর্ণ** (External ear) : কর্ণছত্র (Pinna), বহিঃশ্রবণ নালিকা (External auditory meatus) এবং কর্ণপটহ (Tympanic membrane) নিয়ে গিনিপিগের বহিঃকর্ণ গঠিত হয়। নলাকৃতি বহিঃকর্ণ মস্তকের পাশে উন্মুক্ত স্থান থেকে আরম্ভ করে কর্ণপটহে শেষ হয়। কর্ণপটহ একটি পাতলা গম্বুজাকৃতি পর্দাবিশেষ এবং কর্ণছত্র তরুণাস্থি দিয়ে নির্মিত।

2. **মধ্যকর্ণ** (Middle ear) : মধ্যকর্ণ খুবই সংক্ষিপ্ত। এতে **ম্যালিয়াস** (Malleus), **ইনকাস** (Incus) এবং **স্টেপিস** (Stapes) নামে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি থাকে। **ইউস্টেচিয়ান নালি** (Eustachian canal) কর্ণের এই অংশের সঙ্গে মুখ গহ্বরের সংযোগ রক্ষা করে কর্ণপটহের উভয় পাশের বায়ু চাপের ভারসাম্য বজায় রাখে।
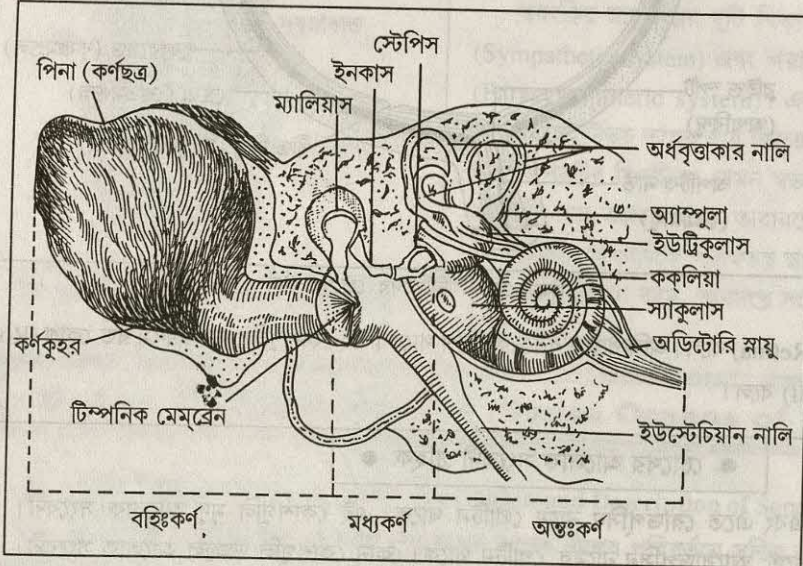
চিত্র 2.29 : গিনিপিগের কানের গঠন।

3. **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear) : কর্ণের এই অংশটি সর্বাপেক্ষা জটিল। এতে শামুকের খোলার মতো পাকানো **ককলিয়া** (Cochlea) থাকে। ককলিয়া এন্ডোলিম্ফ এবং পেরিলিম্ফ নামে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এর মধ্যে শব্দ তরঙ্গের প্রকৃত গ্রাহীযন্ত্র **কর্টির অঙ্গ** (Organ of Corti) একটি ঝিল্লির উপর বিন্যস্ত থাকে। এই ঝিল্লিকে **ব্যাসিলার ঝিল্লি** (Basilar membrane) বলে। এ ছাড়া দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি অন্তঃকর্ণে থাকে। ককলিয়ার সহিত সংবেদী **শ্রবণ স্নায়ু** (Auditory nerve) যুক্ত থাকে। কর্টির অঙ্গে শব্দ তরঙ্গ সংবেদী **হেয়ার কোশ** (Hair cell) থাকে। শব্দ তরঙ্গ কর্ণপটহ থেকে মধ্যকর্ণের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের কটির অঙ্গে হেয়ার কোশকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে হেয়ার কোশের কম্পন হয় এবং এই সংবেদ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে যায় এবং শ্রবণের কাজ হয়।

# ❂ 2.12. গিনিপিগের কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal system of Guinea-pig) ❂

## ▲ কঙ্কালতন্ত্রের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and types of Skeletal System) :

❖ (a) **কঙ্কালতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Skeletal System)** : **যে তন্ত্র প্রাণীর বিভিন্ন অংশকে এবং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ ঋজু হয়, তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।**

➤ (b) **কঙ্কালতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Skeletal System)** ঃ প্রাণীর কঙ্কালতন্ত্র দু' প্রকারের ঃ

◻ **A. বহিঃকঙ্কালতন্ত্র (Exo-skeletal system)** — যা দেহের উপরিভাগে থাকে এবং মৃত। যেমন—লোম, নখ।

◻ **B. অন্তঃকঙ্কালতন্ত্র (End-oskeletal system)** ঃ যা দেহের ভিতরের অংশে থাকে এবং জীবিত। যেমন—অস্থি ও তরুণাস্থি। এখানে গিনিপিগের কঙ্কালতন্ত্র বলতে অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রটি বর্ণনা করা হল।
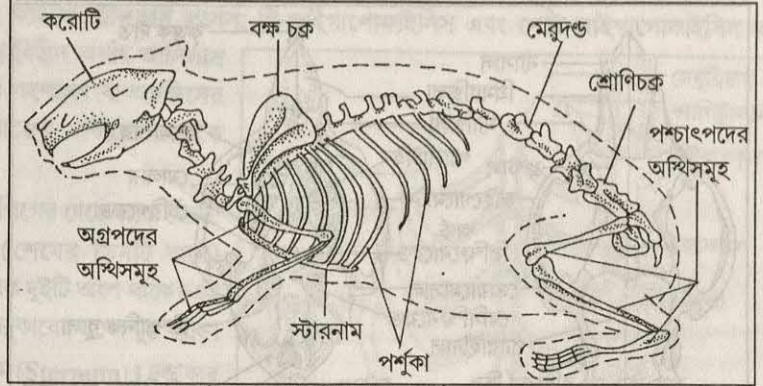
**চিত্র 2.30** ঃ গিনিপিগের সম্পূর্ণ অন্তঃকঙ্কালতন্ত্র।

গিনিপিগের কঙ্কালতন্ত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত যথা— **অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র** (Axial skeletal system) এবং **উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র** (Appendicular skeletal system)।
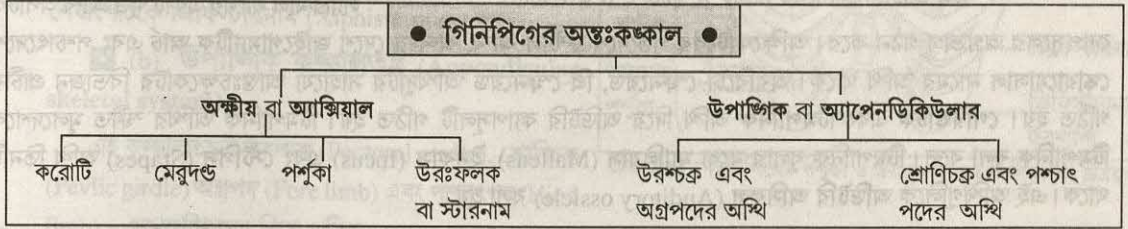
◼ (a) **অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র (Axial skeletal system)** ঃ এই কঙ্কালতন্ত্রটি **করোটি** (Skull), **মেরুদণ্ড** (Vertebral column), **পর্শুকা** (Ribs) এবং **উরঃফলক** (Sternum) নিয়ে গঠিত।

● **1. করোটি (Skull)** ঃ করোটি ক্রেনিয়াম, ইন্দ্রিয় ক্যাপসুল এবং ভিসেরাল কঙ্কাল নিয়ে গঠিত হয়। নীচে এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।
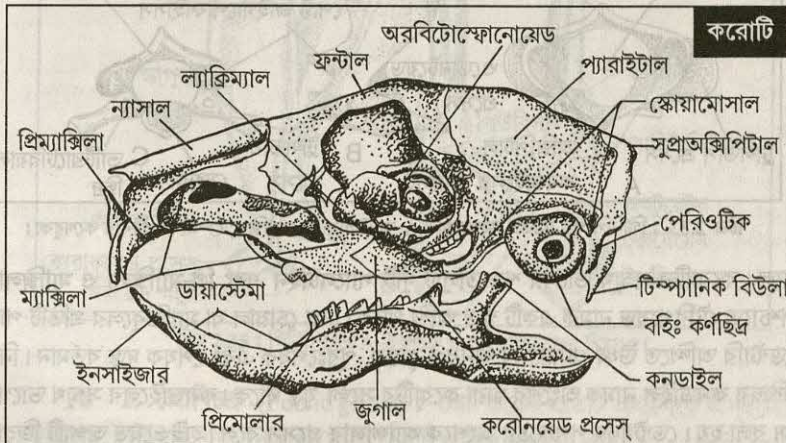
**চিত্র 2.31** ঃ গিনিপিগের করোটি ও নিম্নচোয়াল।

(i) **ক্রেনিয়াম** (Cranium) ঃ এর অপর নাম **ব্রেন বক্স** (Brain box)। **অক্সিপিটাল, প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল, স্ফেনয়েড ও স্কোয়ামোসাল অস্থি** নিয়ে ক্রেনিয়াম গঠিত। ক্রেনিয়ামে চার প্রকারের অক্সিপিটাল অস্থি থাকে। এইগুলি যথাক্রমে **সুপ্রা অক্সিপিটাল, এক্সঅক্সিপিটাল, পারঅক্সিপিটাল** এবং **বেসিঅক্সিপিটাল**। এই অস্থিগুলি করোটির পিছনের অংশে অবস্থিত **ফোরামেন ম্যাগনাম** এর চারদিকে অবস্থিত। ফোরামেন ম্যাগনামের নিম্নাংশে **অক্সিপিটাল কনডাইল** নামের দুটি কঠিন প্রবর্ধক বর্তমান। এই অক্সিপিটাল কনডাইল দুটির সঙ্গে **অ্যাটলাস** (Atlas) অর্থাৎ প্রথম **কশেরুকা** যুক্ত থাকে। একজোড়া **প্যারাইটাল অস্থি** (Parietal bone) সুপ্রা-অক্সিপিটালের সামনে থাকে এবং ক্রেনিয়ামের ছাদ গঠন করে। একজোড়া **ফ্রন্টাল অস্থি** ক্রেনিয়ামের সামনের দিকে ছাদ গঠন করে। বেসিঅক্সিপিটাল,

বেসিস্ফেনয়েড এবং **প্রিস্ফেনয়েড** দিয়ে করোটির মেঝে গঠিত হয়। **স্কোয়ামোসাল, অ্যালিস্ফেনয়ড** এবং **অরবিটোস্ফেনয়েড** নামের অস্থি করোটির পার্শ্বীয় প্রাচীর গঠন করে।
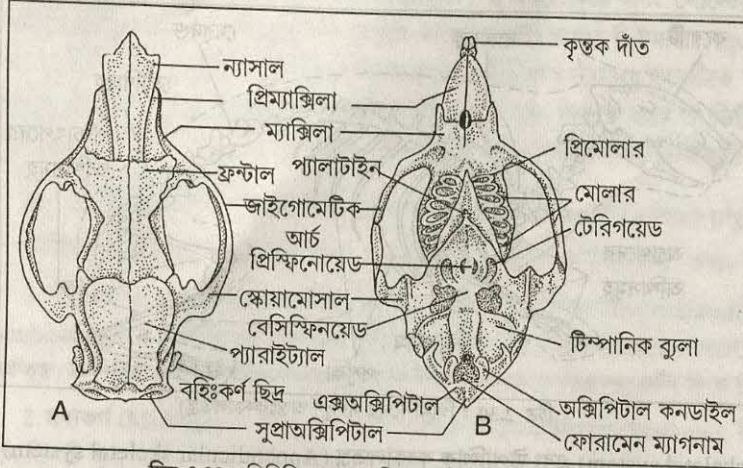
চিত্র 2.32 : গিনিপিগের করোটি A-পৃষ্ঠদেশ, B-অঙ্কীয়দেশ।

(ii) **ইন্দ্রিয় ক্যাপসুল (Sensory Capsule) :** গিনিপিগের করোটিতে তিন প্রকারের ইন্দ্রিয় ক্যাপসুল দেখা যায়। এগুলি হল **ন্যাসাল ক্যাপসুল, অপটিক ক্যাপসুল** এবং **অটিক বা অডিটরি ক্যাপসুল। প্রিম্যাক্সিলা, ম্যাক্সিলা** এবং ন্যাসাল অস্থি দিয়ে ন্যাসাল ক্যাপসুল গঠিত হয়। ন্যাসাল ক্যাপসুলের মেঝেতে **ভোমার** অস্থি এবং শীর্ষভাগে **মেসেথময়েড** তরুণাস্থি থাকে। তরুণাস্থিটি নাসারন্ধ্র দুটিকে পৃথক করে। **ল্যাক্রিমাল** নামের একটি ক্ষুদ্র অস্থি অপটিক ক্যাপসুলের অগ্রভাগ গঠন করে। **অক্ষিকোটরের** পৃষ্ঠদেশে ফ্রন্টাল অস্থি, অঙ্কীয় দেশে **জাইগোম্যাটিক আর্চ** এবং পশ্চাৎদেশে **স্কোয়ামোসাল** নামের অস্থি থাকে। **অরবিটো-স্ফেনয়েড, প্রি-স্ফেনয়েড** অস্থিদুটির সাহায্যে আন্তঃচক্ষুকোটর বিভাজন প্রাচীর গঠিত হয়। **পেরিওটিক** এবং **টিমপানিক** অস্থি দিয়ে অডিটরি ক্যাপসুলটি গঠিত হয়। টিমপানিক অস্থির স্ফীত মূলদেশকে **টিমপানিক বুলা** বলে। টিমপানিক বুলার মধ্যে **ম্যালিয়াস** (Malleus), **ইনকাস** (Incus) এবং **স্টেপিস** (Stapes) অস্থি তিনটি থাকে। এই অস্থিগুলিকে **অডিটরি অসিক্‌ল** (Auditory ossicle) বলা হয়।

(iii) **ভিসেরাল কঙ্কাল (Visceral skeleton) : ঊর্ধ্ব চোয়াল, নিম্ন চোয়াল ও হাইওয়েড অঙ্গ** নিয়ে ভিসেরাল কঙ্কালটি গঠিত। প্রতি দিকের ঊর্ধ্ব চোয়ালটি **প্রি-ম্যাক্সিলা, ম্যাক্সিলা** এবং **জুগাল** নামক তিনটি অস্থির সাহায্যে গঠিত হয়। জুগাল অস্থি তার পিছনে অবস্থিত স্কোয়ামোসাল অস্থির সঙ্গে মিলিত হয়ে **জাইগোম্যাটিক আর্চ** গঠন করে। ঊর্ধ্ব চোয়ালের প্রতি পার্শ্বের প্রি-ম্যাক্সিলাতে একটি **কৃন্তক** এবং ম্যাক্সিলাতে একটি **পুরঃপেষক** এবং তিনটি **পেষক** দন্ত থাকে। ঊর্ধ্ব চোয়ালে অবস্থিত কৃন্তক এবং পুরঃপেষকের মধ্যবর্তী দন্তবিহীন অংশকে **ডায়াস্টেমা** (Diastema) বলে। করোটির সম্মুখ ভাগের শক্ত তালুটি দুটি **প্যালেটাইন** এবং **প্রি-ম্যাক্সিলা** ও **ম্যাক্সিলার** সাহায্যে গঠিত হয়। প্যালেটাইনের পশ্চাতে **টেরিগয়েড** নামক একটি ক্ষুদ্র অস্থি থাকে। নিম্ন চোয়াল বা ম্যান্ডিবুলের প্রতিটি পার্শ্ব একটি **ডেন্টারি** অস্থি দিয়ে গঠিত। ডেন্টারি অস্থিতে ঊর্ধ্ব চোয়ালের অনুরূপ কৃন্তক, পুরঃপেষক এবং পেষক দন্ত বর্তমান। নিম্ন চোয়ালের উভয় পার্শ্বের ডেন্টারি অস্থিদ্বয় **কনডাইল** নামক অংশের দ্বারা করোটির সঙ্গে যুক্ত থাকে। কনডাইলের সম্মুখ ভাগের বাঁকানো অংশকে **কোরোনয়েড প্রসেস** বলা হয়। ডেন্টারির পশ্চাতের অংশকে **অ্যাঙ্গুলার প্রসেস** বলে। হাইওয়েড অঙ্গটি জিহ্বার নিম্নাংশে অবস্থিত থেকে জিহ্বার ভার বহন করে।

চিত্র 2.33 : গিনিপিগের বিভিন্ন কশেরুকা : A-অ্যাটলাস, B-অ্যাক্সিস, C-আদর্শ গ্রীবার কশেরুকা।

● **2. মেরুদণ্ড (Vertebral Column) :** গিনিপিগের মেরুদণ্ডটি 37 টি কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত হয়। এদের মেরুদণ্ডে পাঁচ ধরনের কশেরুকার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এইগুলি যথাক্রমে **সারভাইক্যাল, থোরাসিক, লাম্বার, স্যাক্রাল** এবং **কডাল**। সারভাইক্যাল থোরাসিক, লাম্বার, স্যাক্রাল এবং কডাল কশেরুকার সংখ্যা যথাক্রমে সাতটি, বারোটি, সাতটি, চারিটি, সাতটি।

মেরুদণ্ডের প্রথম এবং দ্বিতীয় কশেরুকাকে যথাক্রমে **অ্যাটলাস** এবং **অ্যাক্সিস** বলে। একটি আদর্শ কশেরুকায় **সেন্ট্রাম, নিউর‍্যাল আর্চ, নিউর‍্যাল স্পাইন, নিউর‍্যাল ক্যানাল, ট্রান্সভার্স প্রসেস, প্রি-জাইগাপোফাইসিস** এবং **পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস** থাকে। গিনিপিগের কশেরুকা সেন্ট্রাম গহ্বর বিহীন অর্থাৎ **অ্যাসিলাস** (Acoelous) প্রকৃতির হয়। দ্বিতীয় কশেরুকা বা অ্যাক্সিসের অঙ্কীয়দেশের সেন্ট্রামের অগ্রপ্রান্তের প্রবর্ধক অংশকে **ওডোনটয়েড প্রসেস** বলা হয়।

● **3. পর্শুকা (Ribs) :** গিনিপিগের দেহে বারো জোড়া পর্শুকা থাকে। প্রতিটি পর্শুকায় (শেষের তিনটি বাদে) ক্যাপিটুলাম এবং টিউবারকুলাম নামক দুইটি অংশ থাকে। এই অংশ দুইটির সাহায্যে পর্শুকাগুলি কশেরুকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

● **4. উরঃফলক বা স্টারনাম (Sternum) :** দণ্ডাকার উরঃফলকটি বক্ষের মধ্যরেখা বরাবর স্থানে অবস্থিত। এটি কয়েকটি স্টার্নিব্রা (Sternebra) খণ্ডক নিয়ে গঠিত হয়। এর শেষাংশটিকে **জিফিস্টারনাম** (Xiphisternum) বলে।

**চিত্র 2.34 :** গিনিপিগের পর্শুকা ও উরঃফলকের (অঙ্কীয়দেশ) চিত্ররূপ।

### (b) উপাঙ্গিক কঙ্কালতন্ত্র (Appendicular skeletal system) :

এই কঙ্কালতন্ত্রটি **উরশ্চক্র** (Pectoral girdle), **শ্রোণিচক্র** (Pevlic girdle) **অগ্রপদ** (Fore limb) এবং **পশ্চাৎপদ** (Hind limb) - এর অস্থিসমূহ নিয়ে গঠিত।

● **1. উরশ্চক্র** (Pectoral girdle) **:** গিনিপিগের উরশ্চক্রটি দুটি অর্ধাংশে বিভেদিত। প্রতিটি অর্ধাংশ **স্ক্যাপুলা** এবং **ক্ল্যাভিকল** অস্থির সাহায্যে গঠিত হয়। ত্রিকোণাকৃতি স্ক্যাপুলার অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত **গ্লিনয়েড গহ্বরের** মধ্যে হিউমেরাসের মাথা আটকে থাকে। গ্লিনয়েড গহ্বরের সন্নিকটে **কোরাকয়েড প্রসেস** বর্তমান। স্ক্যাপুলার পশ্চাৎ প্রান্তে তরুণাস্থি নির্মিত **সুপ্রাস্ক্যাপুলা** (Suprascapula) থাকে। এর বাইরের তলে একটি **স্পাইন** (Spine) বর্তমান। স্পাইনের অগ্র প্রান্তকে **অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস** (Acromian process) এবং এর নিম্নপ্রান্তের প্রবর্ধককে **মেটাক্রোমিয়ন প্রসেস** (Metacromian process) বলে।
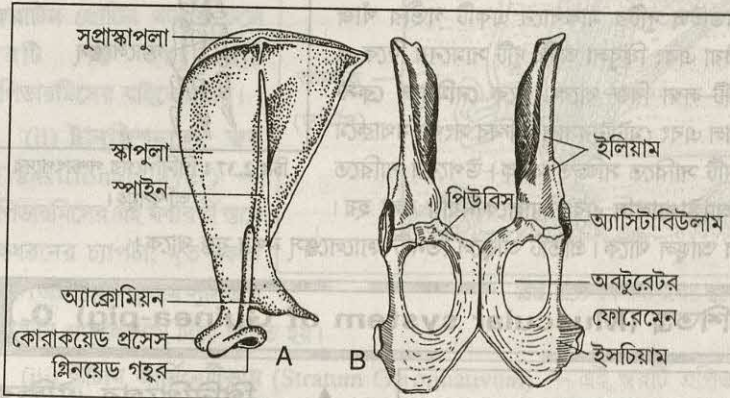
**চিত্র 2.35 :** গিনিপিগের A-উরশ্চক্র ও B-শ্রোণিচক্রের চিত্ররূপ।

● **2. শ্রোণিচক্র** (Pelvic girdle) **:** শ্রোণিচক্রের প্রতিটি অর্ধাংশকে অস্ইনোমিনেটাম বলা হয়। এই অস্-ইনোমিনেটাম **ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম** এবং **পিউবিস** নামে তিনটি অস্থির সাহায্যে গঠিত হয়। শ্রোণিচক্রের দুটি অর্ধাংশ পিউবিস অস্থির সাহায্যে যুক্ত থাকে। পিউবিস এবং ইশ্চিয়াম অস্থির মধ্যবর্তী স্থলে যে ফাঁকা স্থান থাকে তাকে **অবটিউরেটর ফোরামেন** বলে। ইশ্চিয়াম এবং পিউবিসের সংযোগে **অ্যাসিটাবুলাম** নামে যে গহ্বর থাকে তার ভিতরে পশ্চাৎপদের ফিমারের মাথা অবস্থান করে।

● **3. অগ্রপদের অস্থি** (Bones of forelimb) **: হিউমেরাস, রেডিয়াস ও আলনা, কারপাল** (Carpals), **মেটাকারপাল** (Metacarpals) এবং **ফ্যালেঞ্জেস** (Phalanges) নামে অস্থিগুলি নিয়ে অগ্রপদের কঙ্কালতন্ত্র গঠিত। হিউমেরাসের সামনের
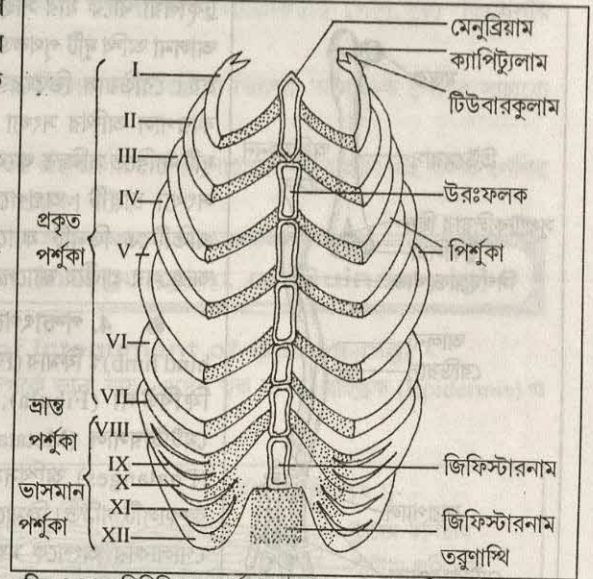
দিকে একটি খাঁজ থাকে। একে **বাইসিপিটাল গ্রুভ** বলে। হিউমেরাসের মস্তক অংশে **গ্রেটার টিউবারোসিটি** এবং **লেসার টিউবারোসিটি** বর্তমান। হিউমেরাসের পার্শ্বদেশে যে উঁচু অঞ্চল থাকে তাকে **ডেল্টয়েড রিজ** (Deltoid ridge) বলে। হিউমেরাসের শেষ প্রান্তে **ট্রক্লিয়া** থাকে যার সাহায্যে এটি পুরোবাহুর অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। **রেডিয়াস** এবং **আলনা** অস্থি দুটি পৃথকভাবে পাশাপাশি থাকে। আলনার চেয়ে রেডিয়াস আকারে ছোটো হয়। রেডিয়াস ভিতরের দিকে অবস্থান করে। কারপাল অস্থির সংখ্যা সাতটি। এই অস্থিগুলি দুটি সারিতে সজ্জিত থাকে। মেটাকারপাল অস্থির সংখ্যা চারটি। অগ্রপদের চারটি আঙুলের প্রতিটিতে তিনটি ফ্যালেঞ্জেস্ থাকে। প্রতিটি আঙুলের প্রান্তীয় ফ্যালেঞ্জেস নখযুক্ত হয়।

চিত্র 2.36 : গিনিপিগের অগ্রপদের অস্থিসমূহ।

● **4. পশ্চাৎপদের অস্থি** (Bones of hind limb) **: ফিমার** (Femur), **টিবিয়া** (Tibia), **ফিবিউলা** (Fibula), **টারসাল** (Tarsal), **মেটাটারসাল** (Metatarsal) এবং **ফ্যালেঞ্জেস** (Phalanges) অস্থিসমূহ নিয়ে পশ্চাৎপদের কঙ্কালটি গঠিত। ফিমারের সামনের দিকে স্ফীত গোলাকার অংশকে **মস্তক** (Head) বলে। এর মস্তকের নীচে **গ্রেটার ট্রোকান্টার, লেসার ট্রোকান্টার** (Lesser trochanter) এবং **তৃতীয় ট্রোকান্টার** নামের তিনটি চওড়া অংশ থাকে। ফিমারের শেষ প্রান্তে দুটি কনডাইল থাকে। কনডাইল দুটির মাঝখানে একটি গভীর খাঁজ থাকে। একে **প্যাটেলার গ্রুভ** বলা হয়। টিবিয়া এবং ফিবুলা অস্থি দুটি সামনের দিকে ও পিছনের দিকে যুক্ত থাকে। টিবিয়াতে একটি লম্বা রিজ থাকে। একে **নেমিয়াল ক্রেস্ট** (Cnemial crest) বলে। পশ্চাৎপদে টারসাল এবং মেটাটারসাল অস্থির সংখ্যা যথাক্রমে ছটি এবং তিনটি। টারসাল অস্থিগুলি তিনটি সারিতে সজ্জিত থাকে। উপরের সারিতে অবস্থিত দুটি টারসাল অস্থিকে যথাক্রমে **অ্যাস্ট্রাগ্যালাস** এবং **ক্যালকেনিয়াম** বলা হয়। গিনিপিগের প্রতিটি পশ্চাৎপদে তিনটি করে আঙুল থাকে। প্রতিটি আঙুলে তিনটি ফ্যালেঞ্জেস্ নখর যুক্ত থাকে।

চিত্র 2.37 : গিনিপিগের পশ্চাৎপদের অস্থিসমূহ।

## ○ 2.13. গিনিপিগের পেশিতন্ত্র (Muscular system of Guinea-pig) ○

চিত্র 2.38 : গিনিপিগের পেশিতন্ত্রের চিত্ররূপ।

### ▲ গিনিপিগের ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক এবং হৃৎপেশি (Voluntary, Involuntary and Cardiac muscles of Guinea-pig) :

● (a) **ঐচ্ছিক পেশি** (**Voluntary muscle**) **:** গিনিপিগের চলন-গমনে প্রধানত ঐচ্ছিক পেশি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ঐচ্ছিক

পেশিকে কঙ্কাল পেশি বলা হয় কারণ এগুলি অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। গিনিপিগের অঙ্গ সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী কতকগুলি প্রধান পেশির নাম নীচে উল্লেখ করা হল।

(i) **ফ্লেক্সর পেশি**, (ii) **এক্সটেনসর পেশি**, (iii) **অ্যাবডাকটার পেশি**, (iv) **অ্যাডাকটার পেশি**, (v) **ডিপ্রেসার পেশি**, (vi) **লিভেটার পেশি**, (vii) **রোটেটর পেশি** প্রভৃতি।

● (b) **অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle)** : গিনিপিগের আন্তরযন্ত্র বা ভিসেরা অনৈচ্ছিক পেশির সাহায্যে গঠিত।

● (c) **হৃৎপেশি (Cardiac muscle)** : গিনিপিগের হৃৎপিণ্ড এই প্রকার পেশির সাহায্যে গঠিত হয়। এই প্রকার পেশির সঙ্কোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে।

## ◎ 2.14. গিনিপিগের চর্ম বা ত্বক (Skin or Integument of Guinea-pig) ◎

### ▲ গিনিপিগের ত্বকের গঠন (Structure of Integument of Guinea-pig) :

গিনিপিগের ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে ত্বকের গঠন সম্পর্কে জানা যায়। এদের ত্বক বা চর্ম **বহিস্ত্বক** (Epidermis) ও **অন্তস্ত্বক** (Dermis) স্তরগুলি দিয়ে গঠিত হয়।

**➤ A. বহিস্ত্বক** : বহিঃস্তক **এক্টোডার্ম** (Ectoderm) স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এখানে তিনটি ভিন্ন স্তর দেখা যায়। যেমন— (i) **স্ট্রাটাম কর্নিয়াম** (Stratum Corneum) — মৃত কোশ দিয়ে তৈরি এই স্তরে **কেরাটিন** প্রোটিন থাকার ফলে স্তরটি শক্ত হয়। এটি এপিডারমিসের বাইরের স্তর।

চিত্র 2.39 : গিনিপিগের ত্বকের অন্তর্গঠন।

(ii) **ট্রান্‌জিশন্যাল স্তর** (Transitional layer) — এপিডারমিসের এই মধ্যবর্তী স্তরে একধরনের চ্যাপটা, মৃত কোশ থাকে। এই স্তরটি স্ট্রাটাম লুসিডাম ও স্ট্রাটাম গ্রানুলোসাম দিয়ে গঠিত হয়।

(iii) **স্ট্রাটাম জার্মিনেটিভাম** (Stratum Germinativum) — এই স্তরটি এপিডারমিসের সব থেকে ভিতরের স্তর এবং এখানে জীবিত **পলিহেড্রাল কোশ** (Polyhedral cell) থাকে। এই কোশগুলি থেকে এপিডারমিসের উপরের স্তরগুলি সৃষ্টি হয়।
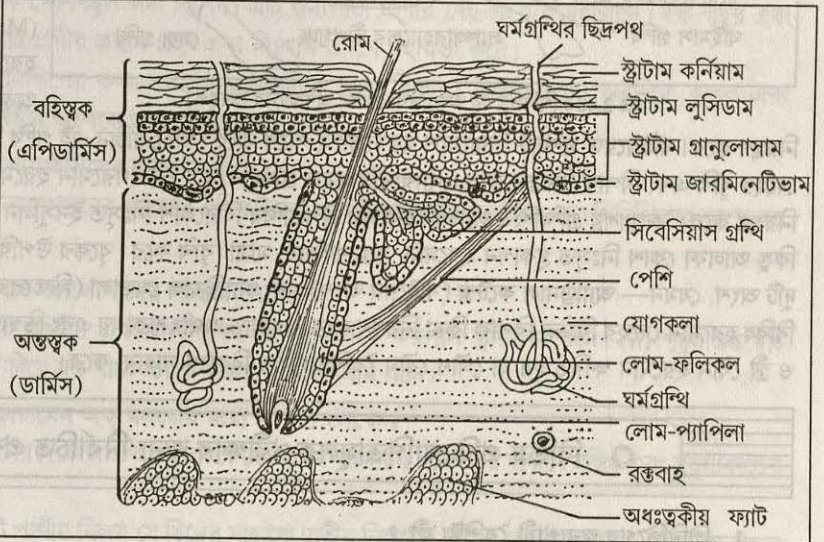
**➤ B. অন্তস্ত্বক** : এটি মেসোডার্ম কোশ থেকে সৃষ্টি হয়। এই স্তরটি **যোজক কলা** (Connective tissue), **রক্তবাহ নালি** (Blood vessel) এবং **স্নায়ু** (Nerve) সমন্বয়ে গঠিত। এই স্তরে **হেয়ার ফলিকল্** (Hair follicle), **সিবেসিয়াস গ্রন্থি** (Sebaceous gland), **ঘর্ম গ্রন্থি** (Sweat gland) এবং **স্তন গ্রন্থি** (Mammary gland) উপস্থিত থাকে। হেয়ার ফলিকল্ থেকে রোম উৎপন্ন হয়, সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ **সিবাম** (Sebum) ক্ষরিত হয় এবং ঘর্ম গ্রন্থি থেকে ঘাম নিঃসরণ হয়। সিবেসিয়াস গ্রন্থি হেয়ার ফলিকল্-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং লোমের গোড়ায় মুক্ত হয়। ঘর্মগ্রন্থি এক প্রকার প্যাঁচানো নলাকৃতি গ্রন্থি এবং এগুলি পৃথক নালির সাহায্যে ত্বকের বাইরে মুক্ত হয়।

## 2.15. গিনিপিগের অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine system of Guinea-pig)

### ▲ গিনিপিগের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Short description of Endocrine system of Guinea-pig) :

গিনিপিগের দেহে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ নিয়ে যে তন্ত্রের সৃষ্টি হয় তাকে **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র** বলে। এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে হরমোন ক্ষরিত হয়। গিনিপিগের দেহে অবস্থিত প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি হল **পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, অন্তঃক্ষরা অগ্ন্যাশয়ের ল্যাঙ্গার হ্যান্সের দ্বীপগ্রন্থি, গোনাড (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়)। গুরুমস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থিটিকে প্রভুগ্রন্থি** (Master gland) বলে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলি (ট্রপিক হরমোন) অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। **থাইরয়েড গ্রন্থিটি** গ্রীবাদেশে স্বরযন্ত্রের দু পাশে থাকে। থাইরোক্সিন এই গ্রন্থি নিঃসৃত প্রধান হরমোন। এই হরমোন দেহের বৃদ্ধি এবং বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** নিঃসৃত প্যারাথরমোন হরমোন ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিস্থিত **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপগ্রন্থির** বিটাকোশ নিঃসৃত ইনসুলিন হরমোন রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। কিন্তু আলফা কোশ নিঃসৃত গ্লুকাগন হরমোন রক্ত-শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি করে। বৃক্কের উপরিভাগে অবস্থিত **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিটির** দুটি অংশ যেমন— **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** (বাইরের অংশ) এবং **অ্যাড্রিনাল মেডালা** (ভিতরের অংশ)। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স নিঃসৃত বিবিধ হরমোন দেহের বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। গোনাড অর্থাৎ শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় থেকে যথাক্রমে-পুংযৌন হরমোন ও স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরিত হয় যা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশে সাহায্য করে।

চিত্র 2.40 : গিনিপিগের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থানের চিত্ররূপ।

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর

**1. গিনিপিগের স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্য কী ?**

● গিনিপিগের প্রধান স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) সমগ্রদেহ **লোমে** (Hair) আবৃত থাকে। (ii) বক্ষে **স্তন গ্রন্থি** বর্তমান, শাবকেরা মাতৃদুগ্ধ পান করে। (iii) সরাসরি শাবক প্রসব করে অর্থাৎ **জরায়ুজ** (Viviparous)। (iv) **বহিঃকর্ণ** বর্তমান।

**2. গিপিনিগের শাকাহারী বৈশিষ্ট্য লেখো।**

● গিনিপিগের শাকাহারী বৈশিষ্ট্য এইরূপ— (i) তৃণজাতীয় খাদ্য কেটে খাওয়ার জন্য এদের চোয়ালে অবস্থিত দু জোড়া চিজেল আকৃতির লম্বা, ধারালো এবং বাঁকানো কৃন্তক দাঁত থাকে। (ii) এদের ছেদক দাঁত থাকে না। (iii) এদের ঊর্ধ্ব চোয়ালের কৃন্তক দাঁত এবং পুরঃপেষক দাঁতের মাঝে ডায়াস্টেমা নামে ফাঁকা অংশ থাকে। (iv) পৌষ্টিক নালির ইলিয়াম এর কোলনের সংযোগস্থলে বৃহৎ থলির মতো সিকাম বর্তমান।

**3. কপ্রোফেগি এবং সিকোট্রফি কী ?**

● দিনের বেলায় গিনিপিগ শক্ত ও শুষ্ক মল ত্যাগ করে, কিন্তু রাত্রিবেলায় এরা শ্লেষ্মা মিশ্রিত নরম মল ত্যাগ করে। গিনিপিগ প্রয়োজনে রাত্রিকালীন এই নরম মলকে খাদ্যরূপে পুনরায় গলাধঃকরণ করে। এই বিশেষ স্বভাবের জন্য

গিনিপিগকে **কপ্রোফ্যাগাস** প্রাণী বলা হয়। এইরূপে খাদ্য হতে সর্বাধিক মাত্রায় পুষ্টিরস শোষণ করার পদ্ধতিকে **কপ্রোফেগি** বা **সিউডোরুমিনেশন** বা **রিফেকশন** বলে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গিনিপিগ একই খাদ্য বস্তুকে দু'বার গ্রহণ করে। — প্রথম পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্যরূপে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্লেষ্মা মিশ্রিত নরম মল রূপে। সিকাম থেকে নরম মল গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করে বলে গিনিপিগের এই বিশেষ ধর্মকে **সিকোট্রফি** (Caecotrophy) বলে।

**4. গ্লটিস এবং গালেটের পার্থক্য কী ?**

● গিনিপিগের মুখগহ্বরের তলদেশে যে ছিদ্রটি থাকে তাকে **শ্বাসছিদ্র বা গ্লটিস** বলে। এটি শ্বাসনালির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ওই একইস্থানে গ্লটিসের পিছনে অপেক্ষাকৃত একটি বড়ো ছিদ্র থাকে, একে **গালেট** বলে। **গালেট** গ্রাসনালির সঙ্গে যুক্ত হয়। গ্লটিসের মধ্যে বায়ু চলাচল করে কিন্তু গালেটের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণ ঘটে।

**5. ফসা ওভালিস এবং ফোরামেন ওভেল কী ?**

● গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের আন্তঃঅলিন্দ সেপ্টামের মধ্যস্থলে যে খাঁজ থাকে তাকে **ফসা ওভালিস** বলে। ভ্রূণাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ওই স্থানে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ছিদ্রটিকে **ফোরামেন ওভেল** বলে। ভ্রূণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে এই ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

**6. ডায়াফ্রাম এবং ডায়াস্টেমার মধ্যে পার্থক্য কী ?**

● (i) **ডায়াফ্রাম**— স্থিতিস্থাপক পেশিবহুল পর্দা বিশেষ। এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ-গহ্বরকে দুইভাগে (বক্ষ-গহ্বর এবং উদর-গহ্বর) বিভক্ত করে। এটি প্রাণীর প্রশ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগে সহায়তা করে।

(ii) **ডায়াস্টেমা**— এটি গিনিপিগের কঙ্কালতন্ত্রস্থিত করোটির অংশ বিশেষ। ঊর্ধ্বচোয়ালে অবস্থিত কৃন্তক এবং পুরঃপেষকের মধ্যবর্তী দন্তবিহীন অংশকে **ডায়াস্টেমা** বলে।

**7. এপিফাইসিস এবং জাইগোপোফাইসিসের অবস্থান কী ?**

● (i) গিনিপিগের মস্তিষ্কে ডায়েনসেফালনের পৃষ্ঠতলে এপিফাইসিস বা **পিনিয়াল বডি** অবস্থিত, (ii) গিনিপিগের কশেরুকায় জাইগাপোফাইসিস অবস্থিত।

**8. করপাস স্ট্রায়াটাম এবং করপাস ক্যালোসামের পার্থক্য লেখো ঃ**

● (i) গিনিপিগের গুরু মস্তিষ্কের অঙ্কীয় এবং পার্শ্বীয় তলের পুরু স্তরকে করপাস স্ট্রায়াটাম বলে। (ii) গুরুমস্তিষ্ক দুটি গোলার্ধ যে অনুপ্রস্থ স্নায়ুসূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে তাকে **করপাস ক্যালোসাম** বলে।

**9. ফোরামেন ম্যাগনাম এবং ফোরামেন অফ্ মনরোর মধ্যে পার্থক্য লেখো ঃ**

● (i) গিনিপিগের করোটির পিছনের দিকে অবস্থিত ছিদ্রটিকে **ফোরামেন ম্যাগনাম** বলে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগ ঘটে।

(ii) গিনিপিগের মস্তিষ্কের দুটি পার্শ্বীয় নিলয় যে ছিদ্রের সাহায্যে তৃতীয় নিলয়ের সহিত যুক্ত থাকে তাকে **ফোরামেন অফ্ মনরো** বলে।

**10. অবস্থান ও কার্য উল্লেখ করো ঃ (ক) অরগ্যান অফ কর্টি, (খ) ফোভিয়া সেন্ট্রালিস, (গ) অমরা, (ঘ) হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু, (ঙ) গুবারনাকুলাম।**

● (ক) **অরগ্যান অফ কর্টি** — অন্তঃকর্ণের ককলিয়া অংশের অভ্যন্তরে ও ব্যাসিলার পর্দার উপরে **অরগ্যান অফ কর্টি** অবস্থিত। এটি শব্দানুভূতির গ্রাহক।

(খ) **ফোভিয়া সেন্ট্রালিস**—এটি অক্ষিগোলকের অক্ষিপটের অক্ষবিন্দুর কাছে 'কোন্' (Cone) কোশের প্রাধান্যযুক্ত সামান্য অবতল অংশ। এর সাহায্যে বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন সম্ভব হয়।

(গ) **অমরা**—এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাতার জরায়ু গাত্রের অংশ এবং ভ্রূণের কলাসমষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্ট অঙ্গ। এর মাধ্যমে ভ্রূণের পুষ্টি, শ্বসন ও রেচন ঘটে। এছাড়া অমরা একটি উল্লেখযোগ্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিরূপে কাজ করে।

(ঘ) **হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু**—দ্বাদশ করোটি স্নায়ু হল হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু। এটি জিহ্বার বিচলন নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঙ) **গুবারনাকুলাম**—পুরুষ গিনিপিগের শুক্রাশয় ছোটো দড়ির মতো অংশ দিয়ে স্ক্রোটামের মধ্যে ঝুলে থাকে। এই দড়ি বা রজ্জুর মতো অংশকে **গুবারনাকুলাম** বলে। সুতরাং এই অংশের দ্বারা শুক্রাশয় স্ক্রোটামের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

**11. গিনিপিগের সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা বলো।**

● 1. গিনিপিগের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা—(i) হৃৎ-স্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে, (ii) তারারন্ধ্রকে প্রসারিত করে, (iii) অশ্রু নিঃসরণে সহায়তা করে, (iv) পাকস্থলী এবং অন্ত্রের সংকোচন মন্দীভূত করে, (v) ফুসফুসে ক্লোমশাখার আয়তন বৃদ্ধি করে, (vi) ধমনির সংকোচনে সহায়তা করে এবং (vii) মূত্রাশয়ের সংকোচনে বাধা দেয়।

2. **গিনিপিগের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা**—(i) হৃৎস্পন্দনের হার কমায়, (ii) তারারন্ধ্রকে ছোটো করে, (iii) অশ্রু নিঃসরণে বাধা দেয়, (iv) পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ক্রমসংকোচন বৃদ্ধি করে, (v) ফুসফুসের ক্লোমশাখার আয়তন কমায়, (vi) ধমনির প্রসারণে সহায়তা করে এবং (vii) মূত্রাশয়ের সংকোচনে সহায়তা করে।

**12. ইউরেটার এবং ইউরেথ্রার পার্থক্য কী ?**

● দুটি বৃক্কের হাইলাস অংশ থেকে যে দুটি নালি বের হয়ে মূত্রথলির সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের **ইউরেটার** বা **গবিনী** বলে। মূত্রথলি হতে যে নালিপথের মাধ্যমে মূত্র দেহের বাহিরে নির্গত হয় তাকে **ইউরেথ্রা** বা **মূত্রনালি** বলে। এটি মূত্রছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। গবিনীর মাধ্যমে মূত্র মূত্রথলিতে আসে। মূত্রনালির মাধ্যমে মূত্র ও শুক্রাণু (পুং) বাহিত হয়ে মূত্রছিদ্র দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

**13. সিস্টেমিক শিরা এবং পোর্টাল শিরার পার্থক্য লেখো।**

● যে শিরা ক্যাপিলারি থেকে উৎপন্ন হয়ে কম অক্সিজেন যুক্ত রক্তকে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে নিয়ে যায় তাকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। এই রক্ত বাহের এক প্রান্তে জালক থাকে।

যে শিরা ক্যাপিলারি থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তকে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে না দিয়ে এসে দেহের অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে পুনরায় ক্যাপিলারি সৃষ্টি করে তাকে **পোর্টাল শিরা** বলে। এই রক্তবাহের দুই প্রান্তে জালক থাকে।

**14. গিনিপিগের চারটি বহিরাকৃতিগত অভিযোজন লেখো।**

● (i) দেহ লোমে আবৃত। (ii) সুগঠিত, ধারালো কৃন্তক দন্ত বর্তমান কিন্তু ছেদক দন্ত অনুপস্থিত। (iii) সচল কর্ণছত্র বর্তমান। (iv) অগ্রপদ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ লম্বা হয়।

**15. গিনিপিগের ত্বকগ্রন্থির এবং তা থেকে নিঃসৃত দ্রব্যগুলির নাম লেখো।**

● গিনিপিগের ত্বকে দু'প্রকারের গ্রন্থি থাকে, যেমন— **সিবেসিয়াস গ্রন্থি** এবং **ঘর্মগ্রন্থি**। সিবেসিয়াস গ্রন্থি নিঃসৃত পদার্থকে **সিবাম** বলে। এটি এক প্রকারের তৈলাক্ত পদার্থ এবং এর সাহায্যেই গিনিপিগের লোম তৈলাক্ত ও মসৃণ থাকে। ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত তরলকে **ঘর্ম** বা **স্বেদ** বলে। এটি এক প্রকারের জলীয় তরল। এখানে উপস্থিত বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে জল, সোডিয়াম, সামান্য ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদিই প্রধান। এছাড়া গিনিপিগের ত্বকে সিবেসিয়াস গ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে পেরিনিয়াল গ্রন্থি ও স্তনগ্রন্থি গঠন করে। পেরিনিয়াল গ্রন্থি গন্ধ যুক্ত পদার্থ এবং স্তনগ্রন্থি স্ত্রী প্রাণীর স্তনে দুধ নিঃসরণ করে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer of the following questions in one word) :**

1. গিনিপিগ কোন্ পর্বের অন্তর্গত একটি প্রাণী ?
2. গিনিপিগের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
3. গিনিপিগ নিজের মল ভক্ষণ করে এবং এই ধর্মকে কী বলে ?
4. গিনিপিগের তৃতীয় নেত্রপল্লবের নাম কী ?
5. গিনিপিগের কয় জোড়া লালাগ্রন্থি আছে ?
6. গিনিপিগের স্বরযন্ত্রের নাম কী ?
7. গিনিপিগের ফুসফুসের কয়টি খণ্ড থাকে ?
8. গিনিপিগের সিস্টেমিক মহাধমনি কোন্ দিকে থাকে ?
9. গিনিপিগের বৃক্কের উপরে অবস্থিত গ্রন্থিটির নাম কী ?
10. গিনিপিগের যকৃত শিরা কোথা থেকে উৎপত্তিলাভ করে ?
11. গিনিপিগের গোঁফকে কী বলে ?
12. গিনিপিগের ক'টি ছেদক দাঁত আছে ?

13. গিনিপিগের উপরের চোয়ালে ক'টি কৃন্তক দাঁত আছে ?
14. গিনিপিগের শুক্রাশয় কোথায় অবস্থান করে ?
15. গিনিপিগের পামার প্যাড কোথায় থাকে ?
16. গিনিপিগের প্লান্টার প্যাড কোথায় থাকে ?
17. গিনিপিগের বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে কোন্ পর্দা থাকে ?
18. গিনিপিগের দাঁত দুবার জন্মায়; এই বৈশিষ্ট্যকে কী বলে ?
19. গিনিপিগের বিভিন্ন প্রকার দাঁত থাকার বৈশিষ্ট্যকে কী বলে ?
20. শ্বাসনালি কোন্ ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয় ?
21. গিনিপিগের পাকস্থলীর মধ্যাংশকে কী বলে ?
22. ইলিয়াম ও কোলনের সংযোগস্থলকে কী বলে ?
23. ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে আঙুলের মতো প্রবর্ধককে কী বলে ?
24. সাবলিঙ্গুয়াল লালাগ্রন্থি কোথায় অবস্থান করে ?
25. লালারসে উপস্থিত উৎসেচকের নাম কী ?
26. রেনিন উৎসেচক কোন্ খাদ্যের উপর ক্রিয়া করে ?
27. গ্লটিসের উপরে যে ঢাকনা থাকে তাকে কী বলে ?
28. পর্শুকার মধ্যস্থলে কোন্ পেশি থাকে ?
29. হৃৎপিণ্ডকে কোন্ পর্দা আবৃত করে থাকে ?
30. বৃক্কের ভিতরের অংশকে কী বলে ?

## B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) :

1. গিনিপিগের সর্বমোট দুটি ☐ / চারটি ☐ / ছয়টি ☐ / আটটি ☐ কৃন্তক দাঁত আছে।
2. গিনিপিগের লালাতে পেপসিন ☐ / ট্রিপিসন ☐ / টায়ালিন ☐ / লাইপেজ ☐ উৎসেচক আছে।
3. গিনিপিগের সর্বমোট দাঁতের সংখ্যা 20 ☐ / 24 ☐ / 28 ☐ / 30 ☐।
4. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডে দুটি ☐ / তিনটি ☐ / চারটি ☐ / পাঁচটি ☐ প্রকোষ্ঠ থাকে।
5. গিনিপিগের শুক্রাশয় বক্ষে ☐ / উদরের পৃষ্ঠ দেশে ☐ / স্ক্রোটামে ☐ / উদরের গহ্বরে ☐ / অবস্থান করে।
6. গিনিপিগের রক্তজালকের কোশস্তরকে এপিথেলিয়াম ☐ / এন্ডোথেলিয়াম ☐ / এক্টোডারম্যাল ☐ / এন্ডোডারম্যাল ☐ স্তর বলে।
7. গিনিপিগের দাঁতগুলি থেকোডন্ট ☐ / হোমোডন্ট ☐ / প্লুরোডন্ট ☐ / অ্যাক্রোডন্ট ☐ প্রকারের।
8. গিনিপিগের মধ্যচ্ছদা বক্ষের ওপরে ☐ / উদর অঞ্চলে ☐ / শ্রোণি অঞ্চলে ☐ / বক্ষগহ্বরে ও উদর গহ্বরের মাঝে ☐ অবস্থান করে।
9. গিনিপিগের পিত্ত ক্ষরণকারী গ্রন্থি হল অগ্ন্যাশয় ☐ / যকৃৎ ☐ / লালাগ্রন্থি ☐ / পাকস্থলীয় গ্রন্থি ☐ ।
10. গিনিপিগের ওপরের ঠোঁটের কাটা অংশকে ডায়াস্টেমা ☐ / ফিলট্রাম ☐ / গলবিলীয় খাঁজ ☐ / নাসিকা খাঁজ ☐ বলে।
11. গিনিপিগের ছেদক দাঁতের সংখ্যা—2টি ☐ / 4টি ☐ / 8টি ☐ / শূন্য ☐।
12. গিনিপিগের অগ্রপদে আঙুলের সংখ্যা—2টি ☐ / 3টি ☐ / 4টি ☐ / 5টি ☐।
13. ফুসফুসের আবরণ পর্দার নাম—পেরিকার্ডিয়াম ☐ / পেরিটোনিয়াম ☐ / প্লুরা ☐ / মেনিঞ্জেস ☐।
14. গিনিপিগের লালাগ্রন্থির সংখ্যা—একজোড়া ☐ / দুই জোড়া ☐ / তিন জোড়া ☐ / চার জোড়া ☐।
15. পরিপাকের ফলে ল্যাকটোজ খাদ্য ভেঙে পরিনত হয়—গ্লুকোজ ও সুক্রোজ ☐ / গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ☐ / সুক্রোজ ও গ্যালাকটোজ ☐ / গ্লুকোজ ও মল্টোজ ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. গিনিপিগ ——— শ্রেণির অন্তর্গত একটি প্রাণী।
2. গিনিপিগের সর্বাধিক লম্বা দাঁতটিকে ——— বলে।
3. গিনিপিগের যকৃতে ——— খণ্ড দেখা যায়।
4. গিনিপিগের গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির অবস্থান হল ———।
5. মলটেজ উৎসেচক ——— এর উপরে ক্রিয়া করে।
6. ইরেপসিন উৎসেচক ——— এর উপরে ক্রিয়া করে।
7. মুখগহ্বরের ভিতরে শ্বাসনালির প্রবেশ পথকে ——— বলে।
8. গিনিপিগের স্বরযন্ত্রকে ——— বলে।
9. ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান প্রদান ——— তে ঘটে।
10. ——— ধমনি শিরারক্ত বহন করে।
11. গিনিপিগের যকৃত-ক্ষরিত পদার্থটির নাম ———।
12. গিনিপিগের আন্ত্রিক গ্রন্থি নিসৃত মলটেজ উৎসেচক ——— কে পরিপাক করে।
13. সুক্রোজ পরিপাকের ফলে ——— ও ——— উৎপন্ন হয়।
14. পেপসিন উৎসেচক প্রোটিনকে ভেঙে ——— উৎপন্ন করে।
15. হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ——— ধমনি সৃষ্টি হয়।

## D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. গিনিপিগের বিজ্ঞানসম্মত নাম কেভিয়া পোর্সেলাস। ☐
2. গিনিপিগের দন্ত সংকেত হল—$I\frac{1}{1}$; $C\frac{0}{0}$; $PM\frac{1}{1}$; $M\frac{3}{3}$ ☐
3. গিনিপিগের দাঁতগুলি ডাইফিওডোন্ট প্রকারের। ☐
4. অ্যামাইলেজ উৎসেচক প্রোটিনকে পেপটাইডে পরিণত করে। ☐
5. ল্যাকটেজ উৎসেচক ক্ষারীয় মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়। ☐
6. গ্লটিসের ওপরে অস্থিনির্মিত এপিগ্লটিস থাকে। ☐
7. ফুসফুসের আবরণী স্তরকে পেরিকার্ডিয়াম বলে। ☐
8. একস্তর বিশিষ্ট কোশ দিয়ে রক্তজালক গঠিত হয়। ☐
9. ইন্টারকস্টাল ধমনি বৃক্কে রক্তসরবরাহ করে। ☐

10. হেপাটিক পোর্টাল শিরা যকৃতে উৎপত্তিলাভ করে মহাশিরায় শেষ হয়।
11. ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথে মিট্রাল কপাটিকা থাকে।
12. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে সিস্টোল বলে।
13. রক্তজালক থেকে শিরা উৎপত্তিলাভ করে।
14. করোনারি ধমনি হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকে রক্ত নিয়ে আসে।
15. বৃক্কের বাইরের দিকের অংশকে কর্টেক্স বলে।
16. কোয়াগুলেটিং গ্রন্থি গিনিপিগের পুরুষ জননতন্ত্রে থাকে।
17. বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থি গিনিপিগের স্ত্রীজননতন্ত্রে থাকে।
18. ফ্যালোপিয়ান নালির পরবর্তী অংশকে যোনি বলে।
19. স্ত্রীগিনিপিগের পায়ু ছিদ্রের কাছে ক্লাইটোরিস থাকে।
20. গিনিপিগের গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

## II. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. গিনিপিগ কোন্ পর্ব ও শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণী ?
2. গিনিপিগের উপরের ঠোঁটের কাটা অংশকে কী বলে ? ভাইব্রিসি কোথায় থাকে ?
3. গিনিপিগের লালাতে উপস্থিত উৎসেচকের নাম কী এবং এর কাজ কী ?
4. ভিলাই কোথায় পাওয়া যায় ? এর কাজ কী ?
5. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে ? কী কী ?
6. রক্তজালকের কোশস্তরকে কী বলে ? ধমনিতে কয়টি কোশস্তর থাকে ?
7. যে শিরার দুই প্রান্তে জালক থাকে তাকে কী বলে ? এর কাজ কী ?
8. রেচনতন্ত্রের একককে কী বলে ? এখানে কী কী অংশ থাকে ?
9. গিনিপিগের শুক্রাশয় দু'টি কোথায় অবস্থান করে ? এর কাজ কী ?
10. গিনিপিগের ল্যারিংক্সের অবস্থান ও কাজ বলো।
11. গিনিপিগের পেরিনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান ও কাজ লেখো।
12. গিনিপিগের ইউস্টেচিয়ান নালি কোথায় থাকে ও কাজ কী ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (Answer the following questions) :

1. প্রাণীজগতে গিনিপিগের স্থান নির্ণয় করো।
2. গিনিপিগ উষ্ণশোণিত প্রাণী বলতে কী বোঝো ?
3. ডায়াস্টেমা কাকে বলে ?
4. দন্ত সংকেত বলতে কী বোঝো ?
5. নাসিকা-গলবিল বলতে কী বোঝো ?
6. মধ্যচ্ছদা কী ? এর কাজ কী ?
7. গিনিপিগের পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করো।
8. গিনিপিগের লালাগ্রন্থিসমূহের নাম লেখো।
9. পিত্ত কী ও এর কাজ লেখো।
10. অ্যালভিওলাস কাকে বলে ? এর কাজ লেখো।
11. এপিডিডাইমিস কাকে বলে ?
12. ফ্যালোপিয়ান নালি কী ?
13. গিনিপিগের শ্বসন অঙ্গে বায়ুচলাচলের পথ শব্দচিত্রের মাধ্যমে লেখো।
14. গিনিপিগের রক্তের কাজগুলি লেখো।

### B. টীকা লেখো (Write short notes) :

1. গিনিপিগের পাকস্থলী, 2. কপ্রোফেগি, 3. গিনিপিগের লালা গ্রন্থি, 4. গিনিপিগের ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক, 5. গিনিপিগের খাদ্য শোষণ, 6. ল্যারিংক্স, 7. গিনিপিগের প্রশ্বাস গ্রহণ, 8. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন, 9. গিনিপিগের হেপাটিক পোর্টাল শিরা, 10. ম্যালপিজিয়ান করপাসল।

### C. পার্থক্য লেখো (Distinguish between the followings) :

1. নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, 2. শিরা ও ধমনি, 3. RBC ও WBC, 4. ফুসফুসীয় শিরা ও ফুসফুসীয় ধমনি, 5. বাম ও ডান নিলয়, 6. বাম ও ডান অলিন্দ, 7. সাধারণ শিরা ও পোর্টাল শিরা, 8. ইউরেটার ও ইউরেথ্রা, 9. মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড, 10. বক্ষচক্র ও শ্রোণিচক্র, 11. গ্লটিস ও গালেট, 12. ডায়াফ্রাম ও ডায়াস্টেমা।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

1. গিনিপিগের বহিরাকৃতি বিষয়ে যা জানো লেখো।
2. পৌষ্টিক তন্ত্রের প্রধান অংশ কী কী ? পৌষ্টিক নালির ধারাবাহিক অংশসমূহের কাজসহ আলোচনা করো।
3. পৌষ্টিক তন্ত্রের পরিপাক গ্রন্থিসমূহের নাম উল্লেখ করো। উক্ত গ্রন্থিসমূহের বর্ণনা দাও।
4. গিনিপিগের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে খাদ্য যাওয়ার সময় কী কী ঘটে তা সংক্ষেপে লেখো।
5. পরিপাকের সহায়ক পাচক রসসমূহের নাম লেখো। পরিপাকে পাচক রসসমূহের ভূমিকা বিষয়ে যা জানো লেখো।
6. গিনিপিগের শ্বসন তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে যা জানো বর্ণনা করো।
7. চিত্রসহ গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের বর্ণনা দাও।
8. একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বর্ণনা করো।
9. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের গঠন ও তার মধ্যে রক্তসংবহন চিহ্নিত চিত্রসহযোগে বর্ণনা করো।
10. গিনিপিগের হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠনের চিত্র আঁকো ও তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তসংবহন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
11. ধমনিতন্ত্র কাকে বলে ? গিনিপিগের ধমনিতন্ত্র বিষয়ে যা জানো লেখো।
12. রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ কী ? গিনিপিগের রেচন তন্ত্র বিষয়ে যা জানো সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
13. গিনিপিগের পুংজননতন্ত্র চিত্রসহ বর্ণনা করো।
14. গিনিপিগের চিত্রসহ স্ত্রী-জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও।

---

## • অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



**• মশা •**



# চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

# [ OUTLINE KNOWLEDGE OF MEDICAL ZOOLOGY ]

### ভূমিকা (Introduction) ঃ

বিভিন্ন কারণে মানুষের রোগ সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, আদ্যপ্রাণী, বিভিন্ন প্রকার হেলমিন্থ ও সন্ধিপদী প্রাণী রোগ সৃষ্টির কারণ হিসাবে সরাসরি দায়ী। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী পরজীবী হিসাবে মানুষের দেহে বসবাস করে ও মানুষের দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। এইসব প্রাণী মানুষের কোশ ও কলার ক্ষতিসাধন করে নানারকমের রোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার রোগ নিরাময়ের উপায় জানতে হলে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা প্রাণীর জীবনচক্র, তাদের স্বভাব ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। এছাড়া কিছু রোগ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে। এইসব রোগে আক্রান্ত মানুষের কাছ থেকে কিছু বাহক প্রাণী (Vector) সুস্থ মানুষের দেহে রোগজীবাণু সঞ্চারিত করে এবং এর ফলে সুস্থ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে ; যেমন—মশা, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী রোগ বিস্তারে বাহক প্রাণী হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং রোগজীবাণু-বাহক প্রাণীদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে জরুরি। এইসব বাহক প্রাণীদের দমন করতে হলে এদের সঠিকভাবে সনাক্তকরণ করা ও এদের জীবনচক্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

## ✪ 3.1. চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যা (Medical Zoology) ✪

বিভিন্ন প্রকার উপকারী ও অপকারী প্রাণীদের সঙ্গে মানুষ বসবাস করে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপকারী প্রাণীদের একটি অংশ মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে অথবা রোগের সংক্রমণ ঘটায়; যেমন—ম্যালেরিয়া (Malaria) রোগ সৃষ্টিকারী আদ্যপ্রাণী *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স* (*Plasmodium vivax*), আফ্রিকান স্লিপিং সিক্‌নেস্ (African sleeping sickness) রোগ সৃষ্টিকারী আদ্যপ্রাণী *ট্রাইপ্যানোসোমা* (*Trypanosoma*), টিনিয়েসিস্ (Taeniasis) রোগসৃষ্টিকারী ফিতাকৃমি (*Taenia solium*), অ্যাসকেরিয়েসিস্ (Ascariasis) রোগ সৃষ্টিকারী সাধারণ গোলকৃমি (*Ascaris lumbricoides*), ফাইলেরিয়া (Filaria) রোগ সৃষ্টিকারী গোলকৃমি (*Wuchereria bancrofti*) ইত্যাদি। এছাড়া মশা, মাছি, ইঁদুর, শূকর, কুকুর ইত্যাদি প্রাণী **বাহক** (Carrier), **ভেক্টর** (Vector) অথবা **অন্তর্বর্তী পোষক** (Intermediate host) হিসাবে বিভিন্ন রোগ বিস্তার করে অথবা রোগ সঞ্চারণ করে। এই সব প্রাণীঘটিত রোগ এবং এর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রাণীবিদ্যার যে শাখা গড়ে উঠেছে তাকে **চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যা** বলে।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition of Medical Zoology) ঃ প্রাণীবিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণী, রোগ সংক্রমণকারী প্রাণী এবং মানুষের দেহে বসবাসকারী পরজীবী প্রাণীদের সম্বন্ধে জানা যায় এবং এই সব রোগের লক্ষণ, ক্ষতির প্রকৃতি ও রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যা বলে।**

➤ (b) **চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য (Some Informations about Medical Zoology) ঃ**

● 1. **পরজীবিতা (Parasitism)** ঃ দুটি প্রজাতির জীবগুলির মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্কের ফলে একটি জীব অপর একটি জীবের ক্ষতিসাধন করে এবং অপর জীবের উপরে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য নির্ভর করে বেঁচে থাকে, সেই বিশেষ সম্পর্ক বা সহাবস্থানকে **পরজীবিতা** বলে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ক্ষতিকারক জীবটিকে **পরজীবী** বলে এবং দ্বিতীয় জীব যা পরজীবীকে পুষ্টি ও আশ্রয় প্রদান করে, তাকে **পোষক** বলে। পরজীবী পোষকের দেহে যান্ত্রিক ক্ষত সৃষ্টি করে।

● 2. **পরজীবী (Parasite) ঃ ❖ সংজ্ঞা—যেসব জীব অন্য জীবের উপর খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দানকারী জীবের দৈহিক ক্ষতিসাধন করে তাদের পরজীবী বলে।**

**উদাহরণ**—*প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স* (*Plasmodium vivax*) মানুষের রক্তে বসবাস করে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে, *উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফ্‌টি* (*Wuchereria bancrofti*) মানুষের লসিকাতন্ত্রে উপস্থিত থেকে ফাইলেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে ইত্যাদি।

### ▲ বিভিন্ন প্রকার পরজীবী (Different types of Parasite) ঃ

(i) **বহিঃপরজীবী** (Ectoparasite) ঃ যেসব পরজীবী পোষকের দেহের বহিরাবরণে বসবাস করে তাদের বহিঃপরজীবী বলে। যেমন—উকুন মানুষের বহিঃপরজীবী।

(ii) **অন্তঃপরজীবী** (Endoparasite) ঃ যেসব পরজীবী পোষকের দেহের ভেতরে বসবাস করে তাদের অন্তঃপরজীবী বলে। যেমন—ফিতাকৃমি মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী অন্তঃপরজীবী।

(iii) **অবলিগেট পরজীবী** (Obligate parasite) ঃ পরজীবী সম্পর্ক ছাড়া যেসব পরজীবী জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে না তাদের অবলিগেট পরজীবী বলে। বেশিরভাগ পরজীবী অবলিগেট পরজীবী।

(iv) **ফ্যাকালটেটিভ পরজীবী** (Facultative parasite) ঃ যেসব প্রাণী সাধারণভাবে পরজীবী নয় কিন্তু হঠাৎ কোনো কারণে দেহের ক্ষত বা কোনো ছিদ্রপথে পোষকের দেহে প্রবেশ করে এবং দেহের ক্ষতিসাধন করে তাদের ফ্যাকালটেটিভ পরজীবী বলে।

(v) **আকস্মিক বা আপতিক পরজীবী** (Accidental parasite) ঃ যেসব পরজীবী তাদের স্বাভাবিক পোষক ছাড়া অন্য পোষকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে পরজীবিতা দেখায় তাদের আকস্মিক পরজীবী বলে।

(vi) **চিরস্থায়ী পরজীবী** (Permanent parasite) ঃ যেসব পরজীবীর পূর্ণাঙ্গ দশা সম্পূর্ণরূপে পোষকের দেহে দেখা যায়, তাদের চিরস্থায়ী পরজীবী বলে। যেমন—ফিতাকৃমি, গোলকৃমি ইত্যাদি।

(vii) **অস্থায়ী পরজীবী** (Temporary parasite) ঃ যেসব পরজীবী পোষকের দেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং তারপর চলে যায় তাদের অস্থায়ী পরজীবী বলে। যেমন—মশা, ছারপোকা ইত্যাদি।

3. **পোষক (Host)** ঃ ❖ সংজ্ঞা—যেসব প্রাণীর দেহে পরজীবী আশ্রয় গ্রহণ করে ও পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং যেখানে পরজীবী প্রাণীর জীবনচক্র আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হয় তাদের পোষক বলে।

**পোষকের প্রকারভেদ** ঃ পোষক প্রাণী দুই প্রকার, যেমন—(i) নির্দিষ্ট পোষক ও (ii) অন্তর্বর্তী পোষক।

(i) **নির্দিষ্ট পোষক** (Definitive host) বা **মুখ্য পোষক** (Primary host)— যেসব পোষক প্রাণীর দেহে পরজীবীর যৌন জনন সম্পন্ন হয় তাদের **নির্দিষ্ট পোষক** বা **মুখ্য পোষক** বলে। **উদাহরণ**—পরজীবী *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের* যৌন জনন অ্যানোফিলিস্ মশকির দেহে ঘটে, তাই এই মশকি হল **নির্দিষ্ট পোষক**।

(ii) **অন্তর্বর্তী পোষক** (Intermediate host) বা **গৌণ পোষক** (Secondary host)— যেসব পোষকের দেহে পরজীবী প্রাণীর জীবনচক্রের কোনো দশা অতিবাহিত হয় কিন্তু যৌন জনন সম্পন্ন হয় না তাদের **অন্তর্বর্তী পোষক** বা **গৌণ পোষক** বলে। **উদাহরণ**—পরজীবী *প্লাজমোডিয়ামের* জীবনচক্রের অনেক দশা মানুষের দেহে দেখা যায়, কিন্তু এখানে যৌন জনন সম্পন্ন হয় না বলে মানুষ হল *প্লাজমোডিয়ামের* অন্তর্বর্তী পোষক।

● **পোষক ও পরজীবীর পার্থক্য (Difference between Host and Parasite)** ঃ

| পোষক | পরজীবী |
|---|---|
| 1. পরজীবীর তুলনায় পোষক বৃহদাকার প্রাণী। | 1. পোষকের তুলনায় পরজীবী ক্ষুদ্রাকার প্রাণী। |
| 2. পরজীবী প্রাণীকে পোষক আশ্রয় ও পুষ্টি দান করে। | 2. পোষক প্রাণীর কাছ থেকে পরজীবী আশ্রয় ও পুষ্টি গ্রহণ করে। |
| 3. পরজীবীর দ্বারা পোষক সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। | 3. পোষকের কাছ থেকে পরজীবী সর্বদাই উপকৃত হয়। |

● **নির্দিষ্ট পোষক ও অন্তর্বর্তী পোষকের পার্থক্য (Difference between Definitive Host and Intermediate Host)** ঃ

| নির্দিষ্ট পোষক | অন্তর্বর্তী পোষক |
|---|---|
| 1. পরজীবী প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ দশা বা যৌনদশা বহন করে। | 1. পরজীবী প্রাণীর লার্ভা দশা বা অন্তর্বর্তী দশা বহন করে। |
| 2. এই পোষকের দেহে যৌন জনন ঘটে। | 2. এই পোষকের দেহে যৌন জনন ঘটে না। |

4. **প্যারাসাইটয়েড (Parasitoid)** ঃ যেসব প্রাণীর অপরিণত দশা পোষকের দেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং পরিশেষে পোষকটিকে মেরে ফেলে তাদের **প্যারাসাইটয়েড** বলে। **উদাহরণ**—বোলতা ও বিভিন্ন প্রকার মাছির লার্ভা দশা অপর পতঙ্গের দেহে বসবাস করে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

5. **প্যারাটেনিক বা পরিবহন পোষক (Paratenic or Transport host)** ঃ যে পোষকের দেহে পরজীবীর কোনো পরিস্ফুরণ ঘটে না এবং অন্য পোষককে সংক্রমণ করার জন্য পরজীবী বেঁচে থাকে, তাকে **প্যারাটেনিক** বা **পরিবহন পোষক** বলে। প্যারাটেনিক পোষক প্রাথমিক ও গৌণ পোষকের মধ্যে সেতু বন্ধন করে। **উদাহরণ**—একধরনের কৃমি-পরজীবীর প্যারাটেনিক পোষক হিসাবে ছুঁচো, প্রাথমিক পোষক (পেঁচা) ও গৌণ পোষকের (পতঙ্গ) মাঝে অবস্থান করে।

6. **মজুত পোষক (Reservoir host)** ঃ যে পোষক প্রাণীর দেহে পরজীবী বসবাস করে এবং যেখান থেকে পরজীবী মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তাকে মজুত পোষক বলে। **উদাহরণ**—*ট্রাইকিনেলা* (*Trichinella*) পরজীবীর মজুত পোষক হল—ইঁদুর। *লিশম্যানিয়ার* (*Leishmania*) মজুত পোষক হল—কুকুর।

7. **অতিপরজীবিতা (Hyperparasitism)** ঃ যে অবস্থায় একটি পরজীবী প্রাণীর দেহে অপর একটি পরজীবী বসবাস করে, তাকে **অতিপরজীবিতা** বলে। **উদাহরণ**—*প্লাজমোডিয়াম* পরজীবী মশার (অস্থায়ী পরজীবী) দেহে বসবাস করে।

● 8. **জুনোসিস্ (Zoonosis)** ঃ যেসব রোগ রোগসৃষ্টিকারী কোনো জীবাণুর সাহায্যে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয় তাকে জুনোসিস্ বলে। জুনোসিস্ দু-প্রকারের হতে পারে, যেমন—

(i) **জুঅ্যানথ্রোপোনোসিস্** (Zooanthroponosis)—এক্ষেত্রে কোনো প্রাণীদেহ থেকে মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ হয়।

(ii) **অ্যানথ্রোপোজুনোসিস্** (Anthropozoonosis)—এক্ষেত্রে মানুষের দেহ থেকে অন্য কোনো প্রাণীর দেহে রোগ সংক্রমণ হয়।

## ▲ বাহক ও ভেক্টর (Carrier and Vector) ঃ

(a) **বাহক (Carrier)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা—যেসব প্রাণী দেহের উপাঙ্গ ও বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গে রোগজীবাণু বহন করে রোগের বিস্তার ও সংক্রমণে সাহায্য করে কিন্তু পরজীবীর জীবনচক্রের কোনো দশা এদের দেহের ভিতরে অতিবাহিতহয় না, তাদের বাহক বলে।**

বাহককে অনেক সময় **যান্ত্রিক ভেক্টর** (Mechanical vector) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

**উদাহরণ**—মাছি, আরশোলা, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অংশ দিয়ে আদ্যপ্রাণী, ব্যাকটেরিয়া ও হেলমিন্থের আণুবীক্ষণিক দশা বহন করে রোগ বিস্তার করে বলে এইসব প্রাণীকে **বাহক বা যান্ত্রিক ভেক্টর** বলে।

(b) **ভেক্টর (Vector)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা—যেসব প্রাণী পরজীবীর রোগজীবাণু বহন করে রোগ বিস্তার করে এবং যাদের দেহে পরজীবীর জীবনচক্রের কোনো দশা অতিবাহিত হয়, তাদের ভেক্টর (Vector) বলে।**

**উদাহরণ**—ম্যালেরিয়া রোগের ভেক্টর হিসাবে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশাকে চিহ্নিত করা হয়, কারণ—এই মশকির দেহে ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণু প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রের অনেক দশা সংঘটিত হয় এবং এই মশকি ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।

● **ভেক্টরের প্রকারভেদ** ঃ ভেক্টর দুই প্রকারের, যেমন—যান্ত্রিক ভেক্টর এবং জৈবিক ভেক্টর।

(i) **যান্ত্রিক ভেক্টর (Mechanical vector)— যেসব বাহক বাহ্যিক অঙ্গের সাহায্যে বিভিন্ন রোগ বিস্তার করে তাদের যান্ত্রিক ভেক্টর বলে।** যান্ত্রিক ভেক্টরের দেহে কোনো পরিবর্তন হয় না এবং পরজীবীর জীবনচক্রের কোনো দশা এদের দেহের ভিতরে অতিবাহিত হয় না। **উদাহরণ**—মাছি, আরশোলা ইত্যাদি। এদের সাধারণভাবে **বাহকপ্রাণী**ও বলা হয়।

(ii) **জৈবিক ভেক্টর (Biological vector)—যেসব প্রাণীর দেহের ভিতরে পরজীবীর জীবনচক্রের কোনো দশা অতিবাহিত হয় বা দশার রূপান্তর ঘটে ফলে প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাদের জৈবিক ভেক্টর বলে।** উদাহরণ—অ্যানোফিলিস্ মশকি ম্যালেরিয়া রোগের জৈবিক ভেক্টর।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বাহককে **যান্ত্রিক ভেক্টর** ও সমস্ত ভেক্টরকে **জৈবিক ভেক্টর** বলে।

● **যান্ত্রিক ভেক্টর ও জৈবিক ভেক্টরের পার্থক্য (Difference between Mechanical vector and Biological vector)** ঃ

| যান্ত্রিক ভেক্টর | জৈবিক ভেক্টর |
|---|---|
| 1. শুধুমাত্র বাহ্যিক অঙ্গের সাহায্যে রোগ বিস্তার করে। দেহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ কোশে বা কলায় পরজীবী অবস্থান করে না। | 1. রোগবিস্তারের জন্য বাহ্যিক অঙ্গের প্রয়োজন হয়; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ কোশে বা কলায় পরজীবী অবস্থান করে। |
| 2. এখানে পরজীবীর জীবন চক্রের কোনো অংশ অতিবাহিত হয় না এবং যান্ত্রিক ভেক্টরের কোনো ক্ষতি হয় না।<br>উদাহরণ ঃ মাছি, আরশোলা। | 2. এখানে পরজীবীর জীবনচক্রের একটি অংশ অতিবাহিত হয় এবং জৈবিক ভেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।<br>উদাহরণ ঃ মশা। |

## ◎ 3.2. কয়েকটি রোগের সংক্ষিপ্ত ধারণা ◎ (Outline idea of some diseases)

বিভিন্ন পরজীবী প্রাণী মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। পরবর্তী অংশে মানুষের ম্যালেরিয়া (Malaria), ফাইলেরিয়া (Filaria), অ্যাসকেরিয়েসিস্ (Ascariasis) এবং টিনিয়েসিস্ (Taeniasis) রোগসৃষ্টিকারী জীব, এইসব রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন উপায় বা পথ, রোগের বিভিন্ন লক্ষণ ও রোগ দমনের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

### ম্যালেরিয়া Malaria

পৃথিবীর 102টি দেশে একসঙ্গে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে ম্যালেরিয়া পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মহামারী রোগ হিসাবে মানুষের জীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিছু দেশ যেমন—আমেরিকাতে অন্তর্দেশীয় ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ করা হয়েছে। বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় 489 মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়। বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী ম্যালেরিয়ার অদমনীয় চরিত্রের জন্য দায়ী হল—(1) ম্যালেরিয়া রোগজীবাণুর ঔষধ প্রতিরোধী হওয়া, এবং (2) ম্যালেরিয়া জীবাণু বাহক পতঙ্গের কীটনাশক প্রতিরোধী হওয়া। পৃথিবীর প্রায় 1472 মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়াপ্রবণ দেশে বসবাস করে। এভাবেই ম্যালেরিয়া অন্যতম প্রধান মহামারী রোগ হিসাবে মানুষের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিয়েছে।

➤ **ম্যালেরিয়া গবেষণার ইতিহাস (History of Malaria research) ঃ**

1. **ল্যাভেরণ** (1880) সর্বপ্রথম মানুষের তাজা রক্তে অরঞ্জিত অবস্থায় ম্যালেরিয়া পরজীবী আবিষ্কার করেন।
2. **গলগি** (1885) কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া পরজীবীর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যবেক্ষণ করেন।
3. **রোমানোস্কি** (1891) ম্যালেরিয়া পরজীবীকে রঞ্জিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
4. **রোনাল্ড রস** (1893) পাখির ম্যালেরিয়া পরজীবীর মশকী চক্র আবিষ্কার করেন। কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে তাঁর গবেষণাগারে এই কাজ তিনি করেন এবং এর স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
5. **বিগনামি** (1893) মানুষের ম্যালেরিয়া পরজীবীর মশকী চক্র আবিষ্কার করেন।
6. **প্যাট্রিক ম্যানসন্** (1900) মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ তত্ত্ব প্রমাণ করেন।
7. **শর্ট** (1948) ম্যালেরিয়া পরজীবীর প্রি-এরিথ্রোসাইটিক দশা আবিষ্কার করেন।

➤ **ম্যালেরিয়ার ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Distribution of Malaria) ঃ**

ভৌগোলিক 40°S থেকে 60°N পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত দেশে ম্যালেরিয়া পরজীবী পাওয়া যায়। সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান (Tropical) দেশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্বমোট চারটি প্রজাতির মধ্যে *Plasmodium malariae* সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলে দেখা যায়, *P. vivax* টেম্পারেট (Temparate) অঞ্চলে দেখা যায় এবং *P. ovale* প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে নাইজিরিয়া ও ফিলিপাইনস্-এ দেখা যায়। *P. falciparum* প্রজাতি ট্রপিক্যাল ও টেম্পারেট অঞ্চলের দেশে পাওয়া যায়।

➤ **ম্যালেরিয়া পরজীবীর বাসস্থান (Habitat of Malarial parasite) ঃ**

মানুষের দেহে প্রবেশের পর ম্যালেরিয়া পরজীবী বিভিন্ন অঙ্গে ও কলায় অবস্থান করে ও পরিস্ফুরণ ঘটে। এই পরজীবী প্রথমে যকৃতের প্যারেনকাইমা কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরপর লোহিত রক্ত কণিকাতে কিছু দশা অতিবাহিত করে প্লাজমোডিয়াম রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। রক্তপানের সঙ্গে অ্যানোফিলিস মশকীর দেহে পরজীবী স্থানান্তরিত হয় এবং মশকীর অন্ত্রে বিভিন্ন দশার পরিস্ফুরণ ঘটে।

➤ **ম্যালেরিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Outline idea of Malaria) ঃ** ম্যালেরিয়া মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধনকারী একটি সুপরিচিত মারাত্মক মহামারী রোগ। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রোগ ভারতবর্ষে খুবই ভয়ংকর আকার ধারণ করে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

1753 খ্রিস্টাব্দে এই রোগটির নাম ম্যালেরিয়া দেওয়া হয়। **ম্যালেরিয়া কথাটি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে—*malus* =** bad, অর্থাৎ **খারাপ**; এবং ***aeris*** = air, অর্থাৎ **বায়ু**। সুতরাং, ম্যালেরিয়া কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল **''খারাপ বায়ু''**। ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে, ম্যালেরিয়া কোনো খারাপ বা দূষিত বায়ুর জন্য ঘটে। কারণ এই রোগ দূষিত বায়ুর মতো অতি দ্রুতবেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়ানক মহামারীর আকার ধারণ করে।

➤ **ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী জীব (Causative organism of Malaria) ঃ** ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী প্রাণীটি হল একটি অন্তঃকোশীয় পরজীবী আদ্যপ্রাণী যা *প্লাজমোডিয়াম* (***Plasmodium***) গণের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষের যকৃৎকোশে ও লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থান করে।

● **প্রাণীজগতে প্লাজমোডিয়ামের অবস্থান (Systematic position of *Plasmodium*) ঃ**

**পর্ব** (Phylum) — Protozoa (প্রোটোজোয়া)

**শ্রেণি** (Class) — Sporozoa (স্পোরোজোয়া)

**বর্গ** (Order) — Haemosporidia (হিমোস্পোরিডিয়া)

**গণ** (Genus) — *Plasmodium* ( *প্লাসমোডিয়াম* )
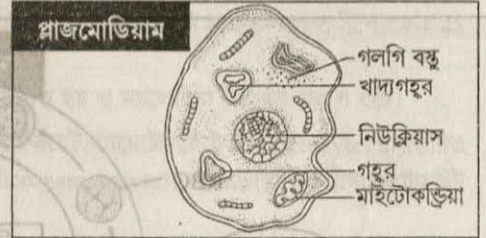
**● প্লাজমোডিয়াম গণের অন্তর্গত চারটি প্রজাতি ও মানুষের বিভিন্ন প্রকার ম্যালেরিয়া রোগ ●**

| প্রজাতি | রোগ |
|---|---|
| (i) *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম* (*Plasmodium falciparum*) | — মানুষের সবচেয়ে ভয়ংকর **সাবটার্শিয়ান** (Subtertian) ম্যালেরিয়া বা **ম্যালিগন্যান্ট** (Malignant) ম্যালেরিয়া বা **পারনিসিয়াস** (Pernicious) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। |
| (ii) *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স* (*Plasmodium vivax*) | — মানুষের **বিনাইন টার্শিয়ান** (Benign Tertian) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। |
| (iii) *প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি* (*Plasmodium malariae*) | — মানুষের **কোয়ার্টান** (Quartan) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। |
| (iv) *প্লাজমোডিয়াম ওভেল* (*Plasmodium ovale*) | — মানুষের **ওভেল টার্শিয়ান** ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। |

ভারতবর্ষে প্রায় 70% ম্যালেরিয়া *P. vivax*-এর জন্য হয়, 25-30% ম্যালেরিয়া *P. falciparum*-এর জন্য এবং প্রায় 1% ম্যালেরিয়া *P. malarie*-র জন্য ঘটে। *P. ovale* ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না।

## ▲ প্লাজমোডিয়ামের সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র (Life cycle of *Plasmodium vivax* in brief) ঃ

দুটি ভিন্ন পোষকের দেহে *প্লাজমোডিয়াম* অন্তঃপরজীবী রূপে বাস করে।

**I. মানুষের দেহে ঃ** এই পরজীবী মানুষের যকৃৎকোশে ও লোহিত রক্তকণিকাতে বসবাস করে এবং অযৌন জনন সাইজোগনি (**Schizogony**)-র সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। এর জন্য মানুষকে **অন্তর্বর্তী পোষক** বলে।

**II. অ্যানোফিলিস মশকির দেহে ঃ** মানুষের দেহে সৃষ্ট যৌন জননের দুটি রূপ যেমন **পুরুষ** ও **স্ত্রী গ্যামেটোসাইট** (Male and Female gametocyte) অ্যানোফিলিস মশকির দেহে আসে এবং যৌন জননে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে স্পোরোজয়েট (Sporozoite) সৃষ্টি হয়, যেগুলি মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। মশকির দেহে যৌন জনন সম্পন্ন হয় বলে অ্যানোফিলিস মশকিকে **নির্দিষ্ট পোষক** (Definitive host) বা **প্রাথমিক পোষক** (Primary host) বলে।

➤ **A. মনুষ্য চক্র বা মানুষের দেহে চক্র (Cycle in human body)—অযৌন চক্র (Asexual cycle) :**

অ্যানোফিলিস মশকির কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে মশার লালাগ্রন্থিতে অবস্থিত স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের রক্তে আসে এবং মানুষের দেহের জীবনচক্র শুরু হয়। এই চক্রকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(a) **প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** (Pre-erythrocytic Schizogony) : এই দশায় মশকির দেহ থেকে স্পোরোজয়েট দশাগুলি মানুষের রক্তে আসে এবং রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছায়। যকৃতে প্যারেনকাইমা কোশের ভিতর **সাইজোগনি (Schizogony)** নামে বহুবিভাজন (অযৌন জনন) পদ্ধতির ফলে একটি **সাইজন্ট (Schizont)** থেকে 10,000–12,000 **মেরোজয়েট** (Merozoite) বা **ক্রিপ্টোমেরোজয়েট** (Crypto-merozoite) সৃষ্টি হয়। *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স*-এ ৪ দিন, *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এ 6 দিন, *প্লাজমোডিয়াম ওভেল*-এ 9 দিন এই চক্র চলে। মেরোজয়েট (Merozoite)-গুলি রক্তপ্রবাহে এসে RBC-কে আক্রমণ করে।
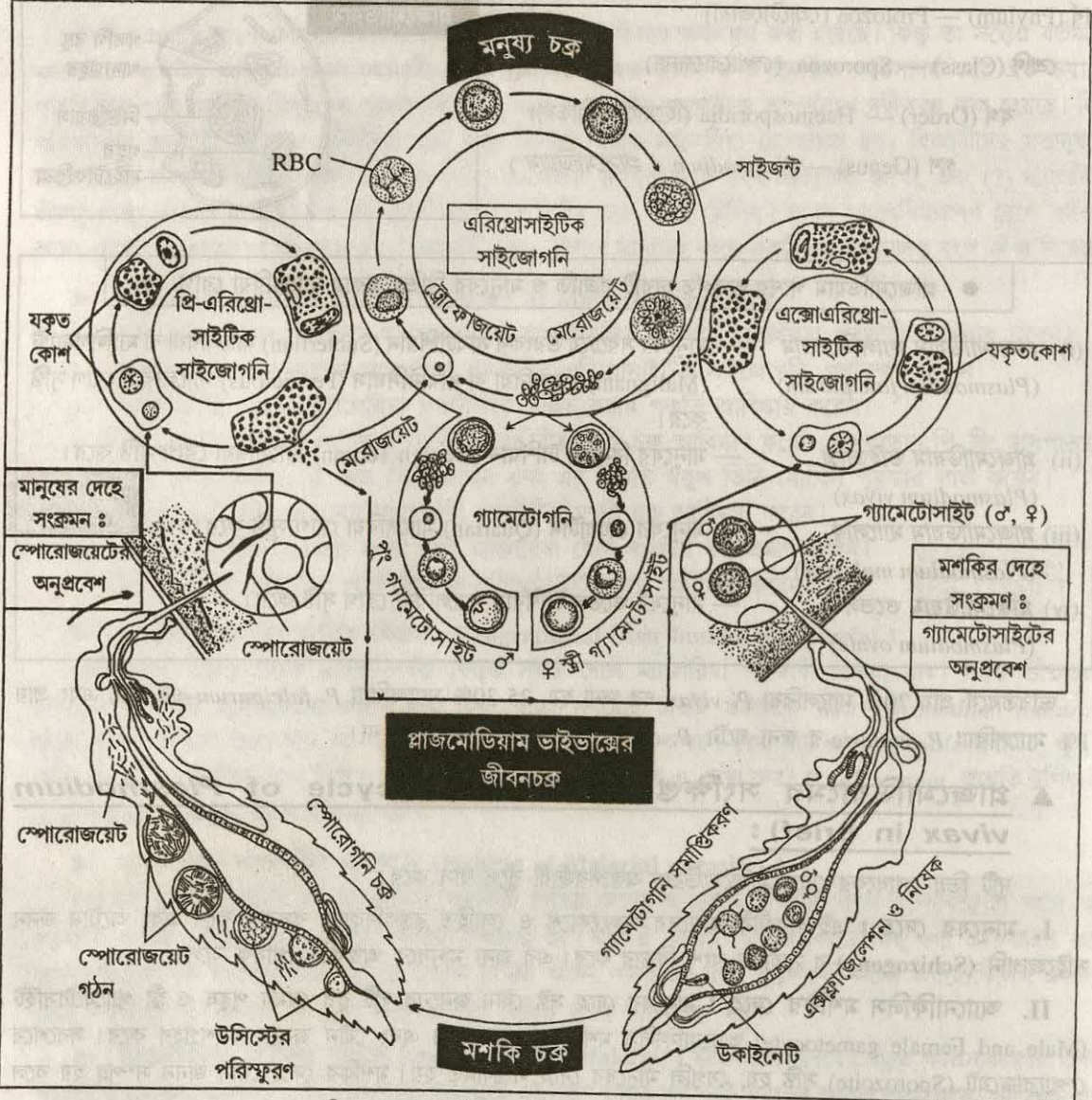
চিত্র 3.1 : প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্সের জীবনচক্র।

(b) **এরিথ্রোসাইটিক্ সাইজোগনি** (Erythrocytic Schizogony) :

(i) যকৃৎকোশ থেকে ছোটো মেরোজয়েটগুলি RBC-র মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং **ট্রোফোজয়েট** (Trophozoite) দশায় পরিণত হয়।

(ii) এই সময় ট্রোফোজয়েটের দেহে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয় ফলে RBC-টি একটি বড়ো গহ্বরযুক্ত রিং বা আংটির মতো দেখায় এবং এই দশাকে **সিগনেট রিং** (Signet ring) বলে।

(iii) এর পর ট্রোফোজয়েটটি **সাইজন্ট** (Schizont) দশায় রূপান্তরিত হয় যার মধ্যে বহু বিভাজন পদ্ধতিতে (Schizogony) সৃষ্ট মেরোজয়েটগুলি অবস্থান করে।

(iv) রোগ সংক্রমণের 12 দিন পরে *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স*-এ, 10 দিন পরে *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এ প্রথম মেরোজয়েট দেখা যায়।

(v) প্রত্যেক এরিথ্রোসাইটিক চক্র *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স*, *প্লাজমোডিয়াম ওভেল* ও *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এ 48 ঘণ্টা ধরে এবং *প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি*-তে 72 ঘণ্টা ধরে চলে।

(vi) এরিথ্রোসাইটিক চক্রে পরজীবীর বহুবিভাজনের ফলে RBC ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রকাশ ঘটে।

(c) **গ্যামেটোগনি** (Gametogony) : লোহিত রক্তকণিকায় সৃষ্ট কিছু মেরোজয়েট **গ্যামেটোসাইটে** (Gametocyte) রূপান্তরিত হয়। ছোটো গ্যামেটোসাইটকে **পুংগ্যামেটোসাইট বা মাইক্রোগ্যামেটোসাইট**(Microgametocyte) এবং বড়োগুলিকে **স্ত্রীগ্যামেটোসাইট বা ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট** (Macrogametocyte) বলে।
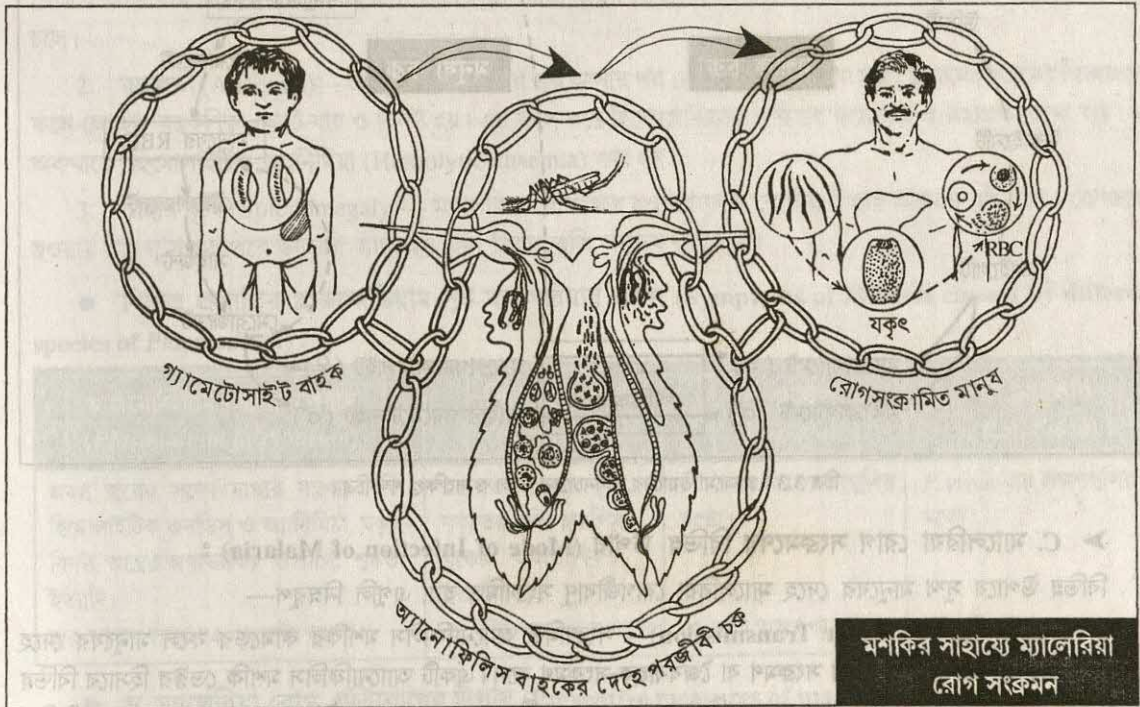
চিত্র 3.2 : রোগাক্রান্ত মানুষের দেহ থেকে ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু মশকির সাহায্যে সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রমণের চিত্ররূপ।

(d) **এক্সোএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি** (Exoerythrocytic schizogony) : এই দশায় যকৃৎকোশ থেকে মুক্ত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলি পুনরায় যকৃৎকোশকে আক্রমণ করে সাইজোগনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুবিভাজিত হয়। *প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি*-তে এই চক্র দেখা যায়।

➤ **B. মশকি চক্র বা মশকির দেহে চক্র (Cycle in Mosquito)—যৌন চক্র (Sexual Cycle) :**

(i) অ্যানোফিলিস মশকির খাদ্যরূপে রক্তের সঙ্গে **পুং ও স্ত্রী গ্যামেটোসাইট** মানুষের দেহ থেকে মশকির দেহে যায়।

(ii) একটি ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট থেকে একটি **ম্যাক্রোগ্যামেট** এবং একটি মাইক্রোগ্যামেটোসাইট থেকে **এক্সফ্লাজেলেশন** (Exflagellation) পদ্ধতির মাধ্যমে 5-8টি **মাইক্রোগ্যামেট** সৃষ্টি হয়।

(iii) একটি মাইক্রোগ্যামেট (Microgamete) ও একটি ম্যাক্রোগ্যামেটের (Macrogamete) মিলনে **জাইগোট** (zygote) উৎপন্ন হয়।

(iv) জাইগোট লম্বাটে হয়ে **উকাইনেটি** (Ookinete) দশা গঠন করে। এরপর উকাইনেটি মশকির পাকস্থলী-প্রাচীর ভেদ করে পরবর্তী দশা **উসিস্ট** (Oocyst) গঠন করে।

(v) উসিস্টের ভিতরে নিউক্লিয়াসটি বহুবিভাজন পদ্ধতির মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে কয়েকশত নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস তার সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমকে নিয়ে একটি **স্পোরোজয়েট** (Sporozoite) সৃষ্টি হয় এবং এগুলি দেখতে লম্বাটে ও সরু। স্পোরোজোয়েটগুলি মশকির লালাগ্রন্থির নালিতে জমা হয় এবং মশার দংশনের সময় মানুষের দেহে সংক্রামিত হওয়ার প্রতিক্ষায় থাকে। এভাবে মশকি চক্র শেষ হয়।
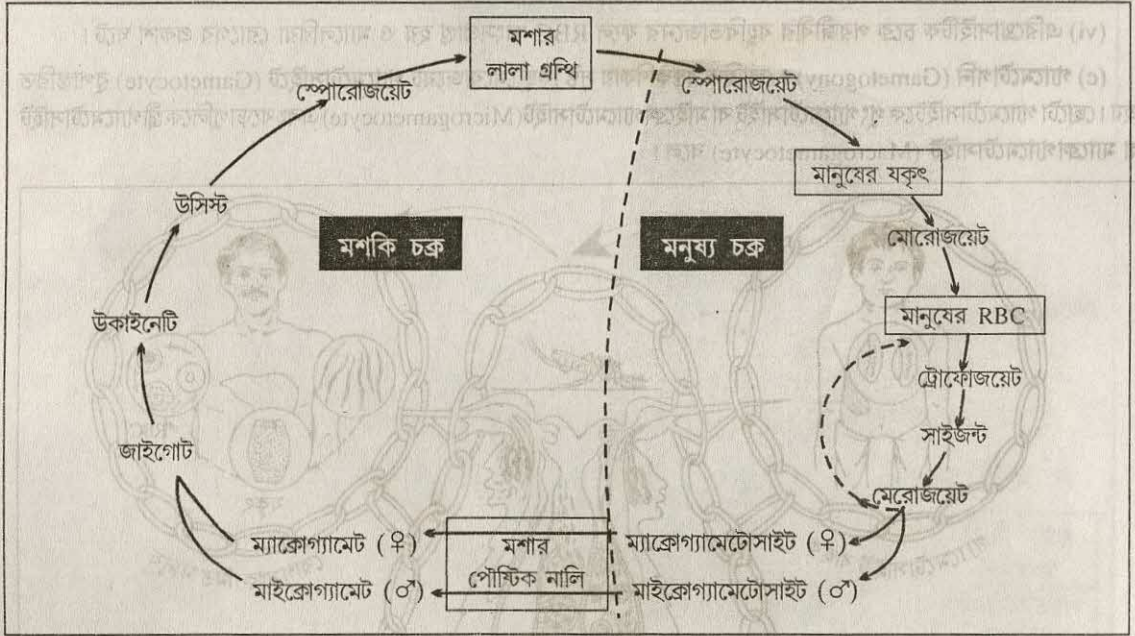
চিত্র 3.3 : প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রের সরল ও সংক্ষিপ্ত শব্দ চিত্র।

## ➤ C. ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন উপায় (Mode of Infection of Malaria) :

বিভিন্ন উপায়ে সুস্থ মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়, এগুলি নিম্নরূপ—

1. **ভেক্টর সংক্রমণ (Vector Transmission)**— সংক্রামিত অ্যানোফিলিস মশকির কামড়ের ফলে মানুষের দেহে প্লাজমোডিয়ামের সংক্রমণকে **ভেক্টর সংক্রমণ** বা **জৈববাহক-সংক্রমণ** বলে। একটি অ্যানোফিলিস মশকি ভেক্টর হিসাবে বিভিন্ন মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে। এখানে প্লাজমোডিয়ামের সংক্রমণ দশাটির নাম **"স্পোরোজয়েট"** (Sporozoite) যা অ্যানোফিলিস মশকির পৌষ্টিকনালির প্রাচীরে পরিস্ফুরণ লাভ করে লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। মশকির দংশনের সময় স্পোরোজয়েটগুলি মশকির লালার সঙ্গে মানুষের রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মেশে এবং মানুষকে সংক্রামিত করে।

2. **প্রত্যক্ষ সংক্রমণ** (Direct Transmission)— সুস্থ মানুষের কোনো ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহে যখন সরাসরি সুস্থ মানুষের রক্তে প্লাজমোডিয়াম জীবাণু সংক্রামিত হয় তাকে **প্রত্যক্ষ সংক্রমণ** বলে। এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রোগীর **"ট্রোফোজয়েট"** (Trophozoite) দশা (এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির অযৌন দশা) সুস্থ মানুষের রক্তে সংক্রামিত হয় বলে এই প্রকার সংক্রমণকে **ট্রোফোজয়েট-আবিষ্ট ম্যালেরিয়া** (Trophozoite-induced malaria) বলে।

3. **জন্মগত সংক্রমণ** (Congenital Transmission)— ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের দেহে অমরা-জনিত কোনো ত্রুটির ফলে সদ্যোজাত শিশুর দেহে ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণকে **জন্মগত সংক্রমণ** বলে। সাধারণভাবে মায়ের **অমরার** (Placenta) মাধ্যমে কোনো প্রোটোজোয়া বা ব্যাকটেরিয়া মায়ের দেহ থেকে ভ্রূণের দেহে যেতে পারে না, কিন্তু অমরার কলা বিনষ্ট হলে মায়ের দেহ থেকে ভ্রূণের দেহে প্লাজমোডিয়ামের জীবাণু সংক্রামিত হয় এবং সদ্যোজাত শিশু ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়।

### ➤ D. ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ (Symptoms of Malaria) ঃ

ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে **ফেব্রাইল পারক্সিজম** (Febrile paroxysm), **রক্তাল্পতা** (Anaemia) এবং **প্লিহার বৃদ্ধি** (Splenomegaly) দেখা যায়।

1. **ফেব্রাইল পারক্সিজম্** (Febrile peroxysm)— ম্যালেরিয়া রোগীর প্রবল জ্বরের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গকে এককথায় **ফেব্রাইল পারক্সিজম্** বলে। এই সময় রোগীর জ্বরের সঙ্গে দেহের যন্ত্রণা ও খিঁচুনি দেখা যায়। প্রতিটি পারক্সিজমের তিনটি দশা থাকে, যেমন—1. **শীত দশা** (Cold stage)— এই সময় রোগীর মাথার যন্ত্রণা, বমিবমি ভাব ও কাঁপুনি দিয়ে শীত ভাব দেখা যায়। দেহের তাপমাত্রা 39-41°C-এ থাকে এবং নাড়ির গতি দ্রুত হয়। এই দশা $\frac{1}{4}$ - 1 ঘণ্টা চলে। 2. **উত্তাপ দশা** (Hot stage)— এই সময় রোগী দেহে জ্বালাভাব অনুভব করে এবং জামাকাপড় খুলে দেয়, দেহত্বক উত্তপ্ত হয়, মাথার যন্ত্রণা প্রবল হয়, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। এই দশা 2-6 ঘণ্টা ধরে চলে। 3. **ঘর্ম দশা** (Sweating stage)— এই সময় রোগীর প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে জ্বর কমে যায় এবং দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয় এবং নাড়ির গতিও ক্ষীণ হয়। এই দশা 2-3 ঘণ্টা ধরে চলে।

2. **রক্তাল্পতা** (Anaemia)— উপর্যুপরি কয়েকবার জ্বর আসার পর লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে প্লাজমোডিয়ামের বিভাজনের ফলে লোহিত রক্তকণিকা ফেটে যায় ও বিনষ্ট হয়। এর ফলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় ও রক্তাল্পতা দেখা যায়। এই অবস্থাকে **হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া** (Hemolytic anaemia) বলা হয়।

3. **প্লিহার বৃদ্ধি** (Splenomegaly)— ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে রোগীর প্লিহার আয়তন বৃদ্ধি পায়। রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে উদরের ব্যাথা হয় এবং প্লিহার বৃদ্ধি অনুভব করা যায়।

● **বিভিন্ন প্রজাতির প্লাজমোডিয়াম সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার লক্ষণ (Symptoms of Malaria caused by different species of *Plasmodium*) ঃ**

| প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (*Plasmodium falciparum*) | পি. ভাইভ্যাক্স (*P. vivax*) | পি. ওভেল (*P. ovale*) | পি. ম্যালেরি (*P. malarie*) |
|---|---|---|---|
| প্রবল জ্বরের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, বমি, হিমোলাইটিক জনডিস্ ও অ্যানিমিয়া, যকৃৎ-বিনষ্ট, অন্ত্রের অস্বাভাবিক উপসর্গ, শুষ্কতা ইত্যাদি। | রক্তাল্পতা, প্লিহার বৃদ্ধি, যকৃতের বৃদ্ধি, হারপিস, বৃক্কের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। | *P. vivax*-এর লক্ষণগুলির মতো। | *P. vivax*-এর লক্ষণগুলির মতো। |
| জ্বর আসার সময় 24-48 ঘণ্টা অন্তর। | 48 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে। | 48 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে। | 72 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে। |

### ➤ E. ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় (Preventive measures of malarial disease) ঃ

বিভিন্ন উপায়ে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যায়, এগুলি হল—

(i) মশকির দংশনের হাত থেকে বাঁচার জন্য মশারি ব্যবহার করা এবং মশা বিতাড়ক ম্যাট (Mat) ও ক্রিম ব্যবহার করা। (ii) মশা প্রজননের স্থান, যেমন—নর্দমা, ডোবা, নালা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা ও বাড়িতে কোনো জায়গায় বেশিদিন জল জমিয়ে না রাখা। (iii) বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা। (iv) পুরুষ মশাকে কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজকরণ (Sterilization) করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া। (v) যে জলাশয়ে মশার লার্ভা জন্মায় সেখানে লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ চাষ করে মশার জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control) করা। (vi) ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীকে ক্লোরোকুইন, অ্যামোডায়াকুইন, কুইনাইন ইত্যাদি ঔষধ দেওয়া।

(vii) ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন (Vaccine) দিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা। (viii) সুস্থ মানুষকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ঔষধ দিয়ে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করা।
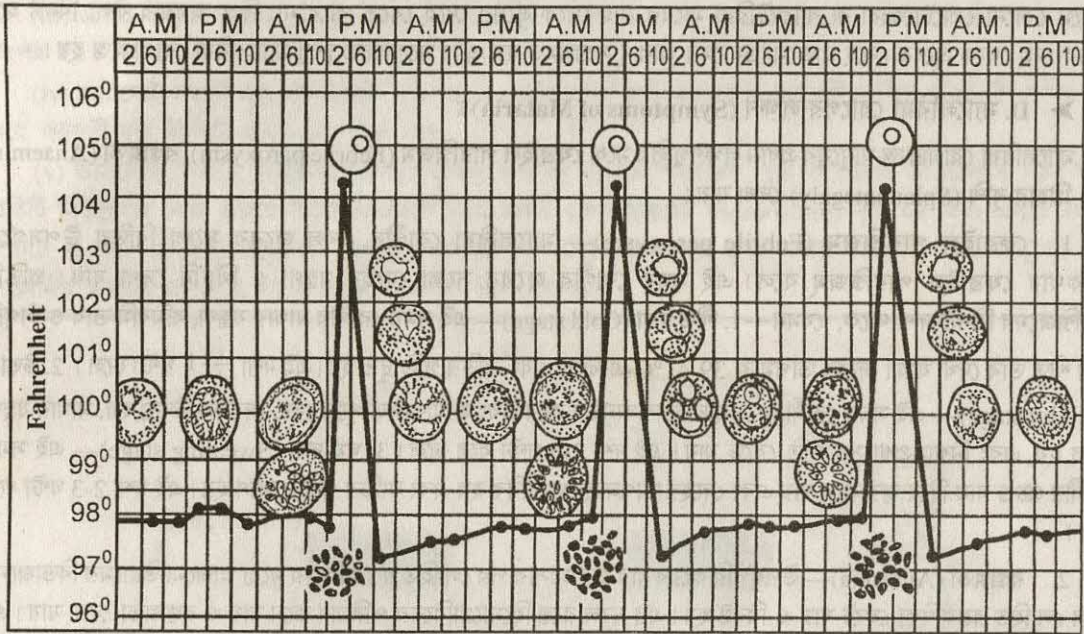
চিত্র 3.4 : *P. vivax*-এর 48 ঘণ্টা অন্তর জ্বরের টার্শিয়ান সময়কাল।

A.M P.M A.M P.M A.M P.M A.M P.M A.M P.M A.M P.M A.M P.M
2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10
106⁰
105⁰
104⁰
103⁰
102⁰
101⁰
100⁰
99⁰
98⁰
97⁰
Fahrenheit
CAPILLARY OF INTERNAL ORGAN
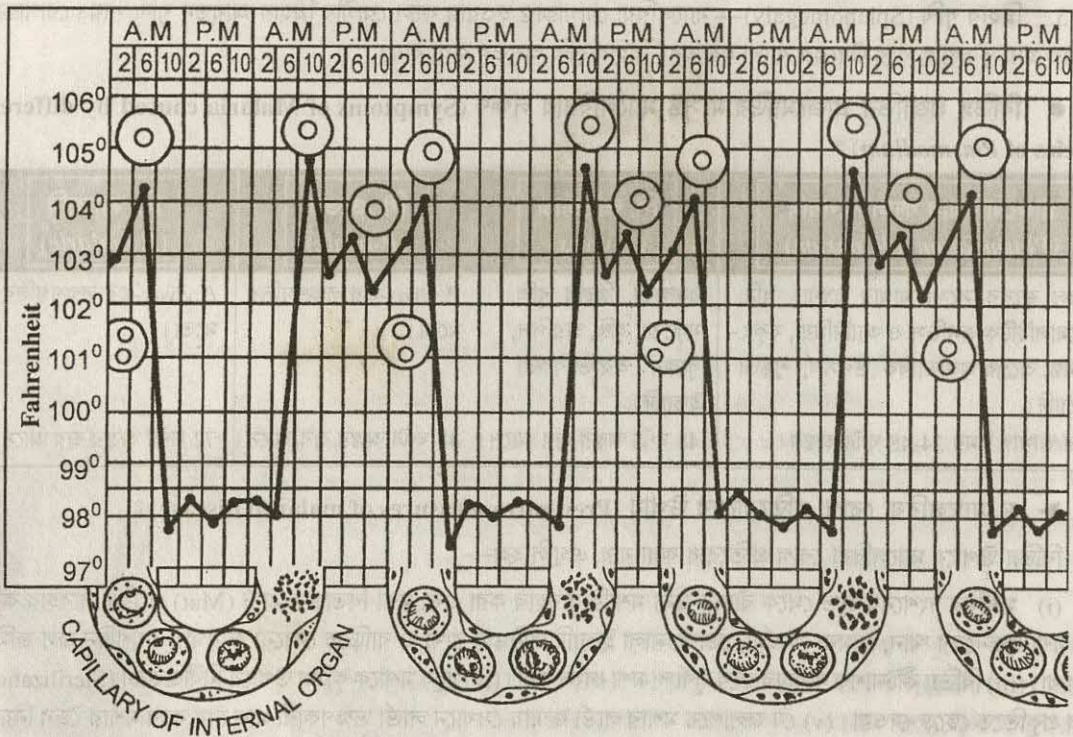
চিত্র 3.5 : ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার 48 ঘণ্টা অন্তর টার্শিয়ান সময়কাল। উল্লেখ্য এই ম্যালেরিয়ায় প্রায় 24 ঘণ্টা অন্তর ধরে প্রবল জ্বর থাকে।
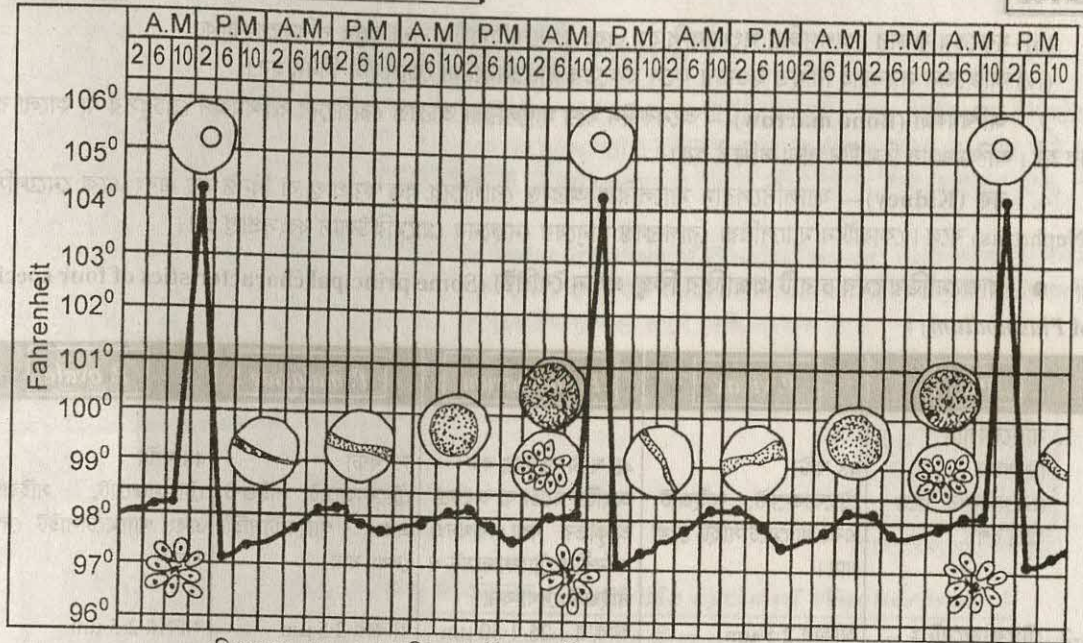
চিত্র 3.6 : *P. malarie* ঘটিত কোয়ার্টান ম্যালেরিয়ার 72 ঘণ্টা অন্তর জ্বরের সময়কাল।

## ➤ F. ম্যালেরিয়া রোগের সুপ্তাবস্থা (Incubation Period of Malaria) :

মানুষের দেহে পরজীবী অনুপ্রবেশের পরে রোগের লক্ষণ প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়কালকে **রোগের সুপ্তাবস্থা** বলে। *P. vivax, P. ovale* ও *P. falciparum* ঘটিত ম্যালেরিয়ার সুপ্তাবস্থা 10-14 দিন এবং *P. malarie* ঘটিত ম্যালেরিয়ার সুপ্তাবস্থা 18 দিন থেকে 6 সপ্তাহ।

- **ম্যালেরিয়ার প্যাথোলজি সংক্রান্ত প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of Malarial pathology) :**

1. বিভিন্ন অঙ্গে রঞ্জক পদার্থ **হিমাটিন** (Hematin) সঞ্চিত হয় এবং এগুলি ধূসর বা কালো রং ধারণ করে। রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল (Reticulo endothelial) তন্ত্রের কোশে এই রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়।
2. রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের কোশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং এখানে হিমাটিন, টক্সিন ইত্যাদি পদার্থ সঞ্চিত হয়।
3. দেহের আন্তরযন্ত্রের রক্তজালকে পরজীবী অবস্থান করে, ফলে রক্তপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়।
4. রক্তজালকে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে রক্তক্ষরণ ঘটে (উদাহরণ—ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া)।
5. দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত হলে অঙ্গগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
6. দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অনাক্রম্যতার ঘাটতির (Immunosuppression) ফলে অঙ্গগুলি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

- **ম্যালেরিয়ার ফলে বিভিন্ন অঙ্গে প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন (Pathological changes in various organs) :**

1. **প্লিহা (Spleen)**— প্লিহা ম্যালেরিয়া পরজীবীকে রক্ত থেকে পরিস্রুত করে। এর ফলে প্লিহার কাজ বেড়ে যায় এবং প্লিহার নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়—

(i) প্লিহার আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং একে **স্প্লেনোমেগালি** (Splenomegaly) বলে।
(ii) প্লিহার বর্ণ স্লেট-ধূসর বা কালো রং-এর হয়।
(iii) প্লিহার সাইনুসয়েড কোশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
(iv) প্লিহার কোশে **হিমাটিন ও হিমোসিডেরিন** (Hematin and Hemosiderin) রঞ্জক প্রচুর পরিমাণে থাকে।

2. **যকৃৎ (Liver)**—(i) পরজীবী রক্তজালকে প্রচুর পরিমাণে থাকার ফলে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যকৃতের রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল কোশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এর ফলে যকৃতের আয়তন বেড়ে যায়।

(ii) যকৃতের বর্ণ কালচে-চকোলেট বা কালো হয়।

(iii) যকৃতের কুফার কোশগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং এখানে হিমাটিন দানা প্রচুর পরিমাণে থাকে।

(iv) অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোশগুলি বিনষ্ট হয়।

3. **অস্থিমজ্জা (Bone marrow)**— অনেকদিন ধরে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের অস্থিমজ্জা স্লেটধূসর বা কালো রং-এর হয়। অস্থিমজ্জায় হিমাটিন দানা সঞ্চিত হয়।

4. **বৃক্ক (Kidney)**— ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের বৃক্ক ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিনষ্ট হয় এবং একে নেফ্রোসিস (Nephrosis) বলে। কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের নেফ্রনের গ্লোমেরিউলাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

- **প্লাজমোডিয়ামের চারটি প্রজাতির কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য (Some principal characteristics of four species of *Plasmodium*) ঃ**

| দশা | *P. vivax* | *P. falciparum* | *P. malariae* | *P. ovale* |
|---|---|---|---|---|
| **1. সাইজোগনি** | | | | |
| (i) সময় | 48 ঘন্টা | 48 ঘন্টা বা তার কম। | 72 ঘন্টা | 48 ঘন্টা |
| (ii) মানুষের রক্তে প্রাপ্ত দশা | ট্রোফোজয়েট, সাইজন্ট এবং গ্যামেটোসাইট দেখা যায়। | আংটির মতো বা অর্ধচন্দ্র আকৃতির দশা। কখনও বর্ধনশীল ট্রোফোজয়েট ও সাইজন্ট দেখা যায়। | ট্রোফোজয়েট, সাইজন্ট এবং গ্যামেটোসাইট দেখা যায়। | ট্রোফোজয়েট, সাইজন্ট এবং গ্যামেটোসাইট দেখা যায়। |
| **2. ট্রোফোজয়েট ঃ** (বলয় বা আংটি দশা) | আকার 2·5 μm | আকার 1·25-1·50 μm | আকার 2·5 μm | আকার 2·5 μm |
| **3. সাইজন্ট ঃ** (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) | আকার 9-10 μm | আকার 4·5-5·0 μm | আকার 6·5-7·0 μm | আকার 6·2 μm |
| **4. মেরোজয়েট ঃ** | 12-24টি গুচ্ছাকারে একসঙ্গে অবস্থান করে | 18-24টি গুচ্ছাকারে অবস্থান করে | 6-12টি একসঙ্গে অবস্থান করে | 6-12টি একসঙ্গে অবস্থান করে |
| **5. হিমোজয়েন ঃ** | হলদে বাদামি রং-এর | কালচে বাদামি রং-এর | কালচে বাদামি রং-এর | কালচে হলুদ বাদামি রং-এর |
| **6. মাইক্রোগ্যামেটো-সাইট** | গোলাকার বা ডিম্বাকার | অর্ধচন্দ্রাকৃতি | গোলাকার বা ডিম্বাকার | গোলাকার বা ডিম্বাকার |
| **7. ম্যাক্রোগ্যামেটো-সাইট** | গোলাকার বা ডিম্বাকার | অর্ধচন্দ্রাকৃতি | গোলাকার বা ডিম্বাকার | গোলাকার বা ডিম্বাকার |
| **8. প্রি-এরিথ্রোসাইটিক চক্রের মেয়াদ** | 8 দিন | $5\frac{1}{2}$-6 দিন | 13 দিন | 9 দিন |
| **9. রোগ সৃষ্টির সময়কাল** | 11-13 দিন | 9-10 দিন | 18 দিন—6 সপ্তাহ | 10-14 দিন |
| **10. সাইজোগনির সময়কাল** | 48 ঘন্টা | 36-48 ঘন্টা | 72 ঘন্টা | প্রায় 48 ঘন্টা |
| **11. মশার দেহে পরিস্ফুরণের সময়কাল** | 10 দিন (25°C-30°C) তাপমাত্রায় | 10-12 দিন (27°C তাপমাত্রায়) | 25—28 দিন (22°C-24°C) তাপমাত্রায় | 14 দিন (27°C তাপমাত্রায়) |
| **12. ম্যালেরিয়া রোগ** | বিনাইন টার্শিয়ান বা ভাইভাক্স ম্যালেরিয়া | ম্যালিগন্যান্ট টার্শিয়ান বা ফ্যালসিপেরাম বা পারনিসিয়াস ম্যালেরিয়া | কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া | ওভেল টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া |
| **13. জ্বর আসার সময়কাল** | প্রতি 48 ঘন্টা অন্তর | প্রতি 24-48 ঘন্টা অন্তর | প্রতি 72 ঘন্টা অন্তর | প্রতি 48 ঘন্টা অন্তর |

# ফাইলেরিয়া Filaria

➤ (a) **ফাইলেরিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Outline idea of Filaria) ঃ** কিউলেক্স মশকি দ্বারা বাহিত হয়ে নিমাটোড (Nematode) পরজীবী **উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি** (*Wuchereria bancrofti*) মানুষের দেহে সংক্রমণের ফলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে **ফাইলেরিয়া** (Filaria) বা **গোদ** বা **এলিফ্যান্টিয়াসিস্** (Elephantiasis) বলে। এই রোগের ফলে মানুষের হাত, পা, স্তনগ্রন্থি, অন্ডকোশ ইত্যাদি স্ফীত হয়।

➤ (b) **ফাইলেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causative organism of Filarial Disease) ঃ** এলিফ্যানটিয়াসিস বা ফাইলেরিয়ার রোগ জীবাণু হল একপ্রকার গোলকৃমি। **উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি** (*Wuchereria bancrofti*) মানুষের লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। এরা পোষকের হাত, পা, স্তনগ্রন্থি ও অণ্ডকোশে বেশি বসবাস করে।

● **প্রাণীজগতে উচেরেরিয়ার অবস্থান (Systematic position of *Wuchereria bancrofti*) ঃ**

**পর্ব** (Phylum)—নিমাটোডা (Nematoda)

**গণ** (Genus)—*Wuchereria*

**প্রজাতি** (Species)—*bancrofti*

উচেরেরিয়া বা গোদ কৃমি

## ▲ উচেরেরিয়া বা গোদকৃমির সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র (Brief life cycle of *Wuchereria*) ঃ

● **উচেরেরিয়ার পোষক (Host of *Wuchereria*)**— গোদ কৃমির জীবনচক্র দুটি পোষকের দেহে সম্পূর্ণ হয়। মানুষ হল মুখ্য পোষক বা নির্দিষ্ট পোষক এবং কিউলেক্স মশকি হল গৌণ বা অন্তর্বর্তী পোষক।



চিত্র 3.7 ঃ উচেরেরিয়ার জীবনচক্র।

(i) গোদকৃমির ভ্রূণ বা **মাইক্রোফাইলেরি** (Microfilariae) মানুষের লসিকা তন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায়। ভ্রূণগুলি এরপর প্রান্তীয় সংবহনে চলে আসে ও কিউলেক্স মশকি মানুষের রক্ত পান করার সময় রক্তের সঙ্গে মশকির পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এ সময় মাইক্রোফাইলেরি 124–250mm লম্বা ও 10–17mm চওড়া হয়।

(ii) **মশকির দেহে পরিবর্তন ঃ** মশকির পাকস্থলীতে পৌঁছে 3-7 দিনে মাইক্রোফাইলেরিয়া একবার খোলস ত্যাগ করে এবং **দ্বিতীয় দশার লার্ভায়** পরিণত হয়।

10-11 দিনে মাইক্রোফাইলেরিয়া সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে খোলস ত্যাগ করে **তৃতীয় দশার লার্ভা** সৃষ্টি করে। এটি 1,500–2,000mm লম্বা ও 18–23mm চওড়া এবং এটি মশকির মুখউপাঙ্গ প্রোবেসিসের আবরণীর মধ্যে মানুষকে সংক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে।

(iii) **মনুষ্যদেহে প্রবেশ ঃ** কিউলেক্স মশকির রক্তপানের সময় তৃতীয় দশার মাইক্রোফাইলেরিয়া লার্ভা মশকির মুখউপাঙ্গের মাধ্যমে ক্ষতস্থানে নীত হয়। এর পর ক্ষতস্থানের চামড়া ভেদ করে লসিকাবাহের মাধ্যমে মাইক্রোফাইলেরিয়া কুঁচকি, বগল, অন্ডকোশ ইত্যাদি স্থানে পৌঁছে প্রায় 5-18 মাস পরে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়।

নিষেকের পরে স্ত্রী প্রাণীর ডিম থেকে লার্ভা নির্গত হয় এবং এই লার্ভাকে **মাইক্রোফাইলেরিয়া** লার্ভা বলে। মানুষের দেহ থেকে এই লার্ভা মশকির রক্তপানের সময় মশকির দেহে সংক্রমিত হয় এবং এইভাবে জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়।
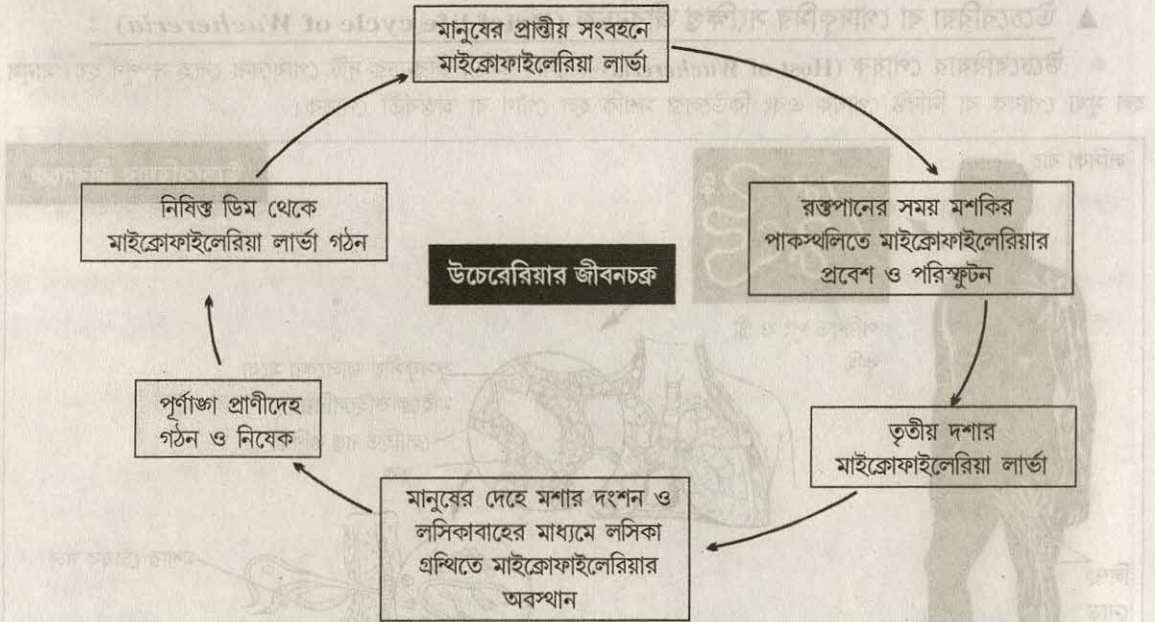
চিত্র 3.8 ঃ উচেরেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রের সরল ও সংক্ষিপ্ত শব্দচিত্র।

➤ (c) **ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of infection of filaria) ঃ** মানুষের দেহে উচেরেরিয়া সংক্রমণকারী দশাটি হল **মাইক্রোফাইলেরিয়া দশা**। কিউলেক্স মশকি মানুষের রক্ত পান করার সময় মশকির লালাগ্রন্থি থেকে কিছু মাইক্রোফাইলেরিয়া লার্ভা মানুষের ত্বকে ক্ষত স্থানের পাশে নির্গত হয়। এই লার্ভা ক্ষতস্থান দিয়ে মানুষের চামড়া ভেদ করে সংবহন তন্ত্রে আসে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন লসিকাগ্রন্থিতে এই লার্ভা আশ্রয় গ্রহণ করে পরিণত প্রাণীতে পরিণত হয়।

➤ (d) **ফাইলেরিয়া রোগের লক্ষণ (Symptoms of filaria) ঃ** ফাইলেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির লসিকাগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, স্ক্রোটাম, হাত ও পা স্ফীত হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ব্যক্তির পা দুটির অসমান স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়। মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গের উপরের অংশগুলিতে লসিকা সংবহনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। লসিকা রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে না পারায় লসিকাবাহ ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠে। একে **গোদ** বা **এলিফ্যানটিয়াসিস** (Elephantiasis) বলে।

➤ (e) **ফাইলেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় (Preventive measures of filaria)** : বিভিন্ন প্রতিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করে ফাইলেরিয়া রোগ দমন করা যায়, এগুলি নিম্নরূপ—

(i) বেগন স্প্রে বা অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা।

(ii) মশার প্রজননক্ষেত্রে তেল বা কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে মশার লার্ভা নিধন করা ও জলাশয় পরিষ্কার রাখা।

(iii) মশারি ব্যবহার করে ও মশা বিতাড়ক ম্যাট (Mat) ও ক্রিম ব্যবহার করে ফাইলেরিয়া রোগ দমন করা।

(iv) পুরুষ কিউলেক্স মশাকে কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজকরণ করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া।

(v) যে জলাশয়ে মশার লার্ভা জন্মায় সেখানে লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ চাষ করে মশার জৈব নিয়ন্ত্রণ করা।

(vi) নির্দিষ্ট ঔষধের প্রয়োগে ফাইলেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা করা।

চিত্র 3.9 : ফাইলেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ।

❖ **সুপ্তাবস্থার সংজ্ঞা (Definition of Incubation period) : পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রোগজীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়কালকে রোগের সুপ্তাবস্থা বলে।**

সুপ্তাবস্থার পরেই রোগজীবাণু দ্রুতগতিতে বিভাজিত হতে থাকে এবং পোষকের দেহের ক্ষতিসাধন করে।

**ফাইলেরিয়া রোগের সুপ্তাবস্থা** প্রায় $1\text{-}1\frac{1}{2}$ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে উচেরেরিয়ার তৃতীয় দশার লার্ভা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় যা যৌনজননে অংশগ্রহণ করে। এরপর স্ত্রী পরজীবী মাইক্রোফাইলেরিয়া লার্ভা উৎপাদন করে যেগুলি রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে মানুষের প্রান্তীয় রক্তে (Peripheral blood) দেখা যায়।

➤ (g) **উচেরেরিয়ার প্যাথোজেনেসিস্ (Pathogenesis of *Wuchereria*)** :

1. জীবিত অথবা মৃত পূর্ণাঙ্গ উচেরেরিয়া ঘটিত রোগকে **উচেরেরিয়েসিস** (Wuchereriasis) বা **ব্যাংক্রফ্টের ফাইলেরিয়েসিস** (Bancroft's Filariasis) বলে।

2. রক্তসংবহনে প্রাপ্ত জীবিত মাইক্রোফাইলেরিয়া লসিকাতন্ত্র ছাড়াও বৃক্ক, যকৃৎ এবং প্লিহার যে ক্ষতিসাধন করে তাকে এককথায় **অকাল্ট ফাইলেরিয়েসিস** (Occult Filariasis) বলে।

3. সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী ও পরিস্ফুটনরত লার্ভা মানুষের দেহে লসিকাতন্ত্রে যে প্রদাহজনিত (Inflammatory) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে **লিম্ফ্যানজাইটিস্** (Lymphangitis) বলে যা **ক্লাসিক্যাল ফাইলেরিয়েসিস** (Classical Filariasis)-এর একটি লক্ষণ।

● **ক্লাসিক্যাল ফাইলেরিয়েসিস ও অকাল্ট ফাইলেরিয়েসিসের পার্থক্য (Difference between Classical and Occult Filariasis)** :

| ক্লাসিক্যাল ফাইলেরিয়েসিস | অকাল্ট ফাইলেরিয়েসিস |
|---|---|
| 1. পূর্ণাঙ্গ দশা এবং পরিস্ফুটনশীল লার্ভার দ্বারা এই রোগ ঘটে। | 1. শুধুমাত্র মাইক্রোফাইলেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ ঘটে। |

| ক্লাসিক্যাল ফাইলেরিয়েসিস | অকাল্ট ফাইলেরিয়েসিস |
|---|---|
| 2. দেহের বিভিন্ন প্রান্তীয় অঙ্গল ফুলে প্রদাহ সৃষ্টি হয় ও ক্ষত দেখা যায়। | 2. ইওসিনোফিলের পরিমান খুব বেড়ে যায়। |
| 3. শুধুমাত্র লসিকাতন্ত্র অর্থাৎ লসিকাবাহ ও লসিকাগ্রন্থি আক্রান্ত হয়। | 3. লসিকাতন্ত্র, ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃৎ ও প্লিহা আক্রান্ত হয়। |
| 4. মাইক্রোফাইলেরিয়া রক্তে পাওয়া যায়। | 4. আক্রান্ত কলায় মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু রক্তে পাওয়া যায় না। |

➤ (h) **ফাইলেরিয়ার চিকিৎসা (Treatment of Filaria) :** ফাইলেরিয়ার চিকিৎসা তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **পরিণত প্রাণী** দমন করার জন্য—Mel. W (বা Mel. B) একটি আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

(ii) **মাইক্রোফাইলেরি** দমন করতে—ডাইইথাইলকার্বামাজাইন (হেট্রাজান) প্রয়োগ করা হয়।

(iii) আক্রমণকারী লার্ভা ও অপরিণত পূর্ণাঙ্গ দশা দমন করতে—প্যারামেলামিনিল ফেনিল স্টিবোনেট প্রয়োগ করা হয়।

## অ্যাসকেরিয়েসিস্ Ascariasis

➤ (a) **অ্যাসকেরিয়েসিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Outline idea of Ascariasis) :** পূর্ণাঙ্গ নিমাটোড পরজীবী *অ্যাসকারিস্ লুম্ব্রিকয়ডিস* (*Ascaris lumbricoides*) মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাসকালে বমি বমি ভাব, উদরে যন্ত্রণা, কাশি ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে রোগ সৃষ্টি করে তাকে অ্যাসকেরিয়েসিস্ বলে। এই পূর্ণাঙ্গ পরজীবী প্রাণী কোনো কোনো সময় মানুষের মলের সঙ্গে অথবা বমির মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই পরজীবী মানুষের আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি করে এবং কখনওবা অন্ত্র ফুটো করে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে (Peritonial cavity) এসে পৌঁছায়।
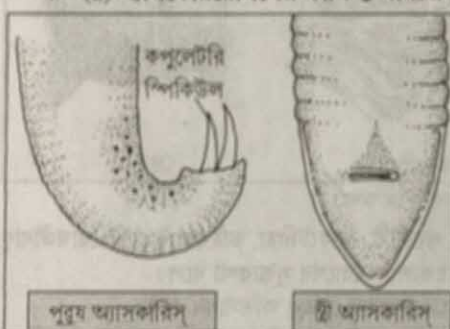
চিত্র 3.10 : পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিসের পশ্চাৎ অংশ।

➤ (b) **অ্যাসকেরিয়েসিসের রোগসংক্রমণকারী জীব (Causative organism of Ascariasis) :** অ্যাসকেরিয়েসিস রোগ সংক্রমণকারী জীবটি হল একপ্রকার নিমাটোড পরজীবী *অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস* (*Ascaris lumbricoides*)। এই পরজীবী প্রাণীর **ভৌগোলিক বিস্তার** সারা পৃথিবীব্যাপী এবং এটি মানুষের **ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে**। মানুষের দেহে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর আয়ুষ্কাল প্রায় তিন বৎসর।

- **প্রাণীজগতে অ্যাসকারিসের স্থান :**

  **পর্ব** (Phylum) — নিমাটোডা (Nematoda)

  **গণ** (Genus) — *Ascaris* (*অ্যাসকারিস*)

  **প্রজাতি** (Species) — *lumbricoides* (*লুম্ব্রিকয়ডিস*)

- **পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিসের বহির্গঠন (External Features of Ascaris) :**

1. কেঁচোর মতো দেখতে এই নিমাটোড পরজীবি হাল্কা বাদামি বা গোলাপি রং-এর হয়।
2. দেহ নলাকৃতি ও দেহের দুদিক সরু।
3. দেহের একপ্রান্তে মুখছিদ্র থাকে এবং মুখছিদ্রের চারিদিকে সুক্ষ্ম দাঁতযুক্ত তিনটি ওষ্ঠ থাকে।
4. দেহের মধ্যে একপ্রকার উত্তেজক রসের পরিপাক ও জননে অংশগ্রহণকারী অঙ্গগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই রসে অ্যাসকারণ (Ascaron) বা অ্যাসকারেজ (Ascarase) নামে একপ্রকার উত্তেজক পদার্থ থাকে যার ক্রিয়ার ফলে মানুষের অ্যালার্জির উপসর্গ দেখা যায়।
5. পুরুষ অ্যাসকারিস (15-25 সেমি লম্বা × 3-4 মিমি. ব্যাসযুক্ত) স্ত্রী অ্যাসকারিসের (25-40 সেমি. লম্বা × 5 মিমি. ব্যাসযুক্ত) তুলনায় ছোটো।
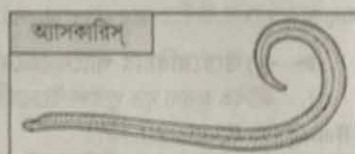
6. পুরুষ অ্যাসকারিসের দেহের পশ্চাৎ অংশে বাঁকানো থাকে কিন্তু স্ত্রী অ্যাসকারিসের দেহের পশ্চাৎ অংশে সোজা থাকে।
7. পুরুষ অ্যাসকারিসের অবসারণীর কাছে একজোড়া **কপুলেটরি স্পিকিউল** (Copulatory spicule) থাকে যা স্ত্রী প্রাণীর থাকে না।

- **পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিসের তুলনা (Difference between Male and Female Ascaris) :**

| পুরুষ অ্যাসকারিস | স্ত্রী অ্যাসকারিস |
|---|---|
| 1. স্ত্রী প্রাণীর তুলনায় দেহটি ছোটো, 15-25 সেমি লম্বা × 3-4 মিমি ব্যাসযুক্ত। | 1. পুরুষ প্রাণীর তুলনায় দেহটি বড়ো, 25-40 সেমি, লম্বা × 5 মিমি ব্যাসযুক্ত। |
| 2. একজোড়া কপুলেটরি স্পিকিউল থাকে। | 2. কপুলেটরি স্পিকিউল নেই। |
| 3. দেহের পশ্চাৎভাগ বাঁকানো। | 3. দেহের পশ্চাৎভাগ সোজা। |

## ▲ অ্যাসকারিসের সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র (Brief Life cycle of *Ascaris*) :

- **পোষক**—অ্যাসকারিসের একমাত্র নির্দিষ্ট পোষক হল মানুষ এবং এর কোনো অন্তর্বর্তী পোষক নেই। নিষেকের পরে মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে একটি স্ত্রী অ্যাসকারিস্ দিনে প্রায় 2,00,000 ডিম পাড়ে। এই নিষিক্ত ডিমগুলি মানুষের মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং বাহ্যিক পরিবেশে তাদের বিভিন্ন দশায় নিম্নলিখিত উপায়ে পরিস্ফুরণ ঘটে।

- **অ্যাসকারিসের জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা (Different stages of Life cycle of *Ascaris*) :**

অ্যাসকারিসের জীবনচক্র মোট ছয়টি দশায় সমাপ্ত হয়। দশাগুলি এইরূপ—

1. **প্রথম দশা—মলের সঙ্গে নিষিক্ত ডিমের নিষ্ক্রমণ**—অ্যাসকারিসের নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি মানুষের মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সদ্য নির্গত ডিম মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে না। মাটিতে এই ডিমগুলির পরিস্ফুরণ ঘটে এবং তারপর এই ডিমগুলির দ্বারা মানুষ সংক্রমিত হয়।

2. **দ্বিতীয় দশা—মাটিতে ডিমের পরিস্ফুরণ**—ডিমগুলি মাটিতে নির্গত হওয়ার 10-40 দিন পরে নিষিক্ত ডিমের মধ্যে **"র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা"** (Rhabditiform larva) সৃষ্টি হয় এবং এই ধরনের ডিম মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে।

3. **তৃতীয় দশা—গলাধঃকরণের মাধ্যমে সংক্রমণ ও লার্ভার মুক্তি**—কাঁচা
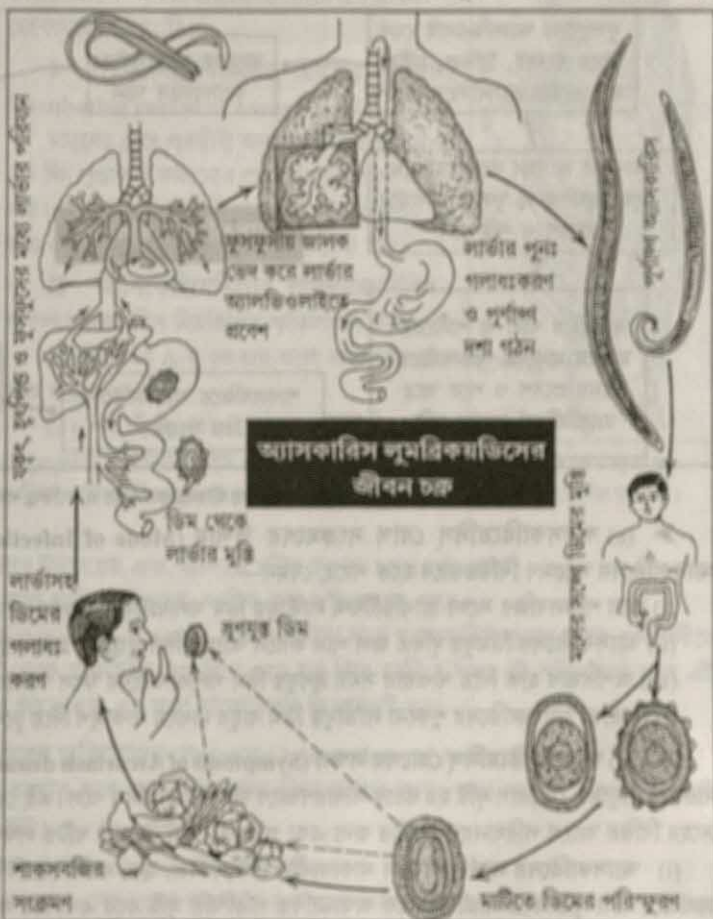
চিত্র 3.11 : অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিসের জীবন চক্র।

শাকসবজি, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদির সঙ্গে র‍্যাবডিটিফিম লার্ভাযুক্ত ডিম মানুষের দেহে প্রবেশ করে ও মানুষকে সংক্রামিত করে। ডিওডিনামে এসে আন্ত্রিক রসের ক্রিয়ায় ডিমের খোলস দুর্বল হয় এবং র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা ডিম থেকে মুক্ত হয়।

4. **চতুর্থ দশা—ফুসফুসের মধ্যে লার্ভার পরিযান**—সদ্যমুক্ত লার্ভাগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লি ভেদ করে পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। যকৃতে 2-3 দিন থাকার পর লার্ভাগুলি ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় হয়ে ফুসফুসীয় মহাধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুসে লার্ভাগুলি প্রায় দশ দিন অবস্থান করে এবং এই সময়কালে তারা দুবার খোলস বদলায় এবং বড়ো আকার ধারণ করে। পরিশেষে লার্ভাগুলি ফুসফুসীয় জালক ভেদ করে বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাইতে এসে পড়ে।

5. **পঞ্চম দশা—পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে লার্ভার পুনঃপ্রবেশ**—এই দশায় লার্ভাগুলি বায়ুথলি থেকে হামাগুড়ি (Crawling) দিয়ে ব্রংকাই, ট্রাকিয়া হয়ে গ্লটিস ছিদ্রপথের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালির মধ্যে প্রবেশ করে। এই সময় লার্ভাগুলি গ্রাসনালি ও পাকস্থলী হয়ে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে। এখানে আসার পরে সংক্রমণের 25তম ও 29তম দিনের মধ্যে লার্ভাগুলি একবার খোলস বদলায় এবং পরিণত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।

6. **ষষ্ঠ দশা—পরিণত অ্যাসকারিসের যৌনতা প্রাপ্তি ও ডিম নির্গমন**—সংক্রমণের দু'মাস পরে, পরিণত অ্যাসকারিসের যৌনতাপ্রাপ্তি ও নিষেকের পর, পরিণত স্ত্রী অ্যাসকারিস মলের মধ্যে নিষিক্ত ডিম ত্যাগ করে এবং ডিমগুলি মানুষের মলের সঙ্গে দেহের বাইরে আসে ও জীবনচক্র পুনরায় আবর্তিত হয়।
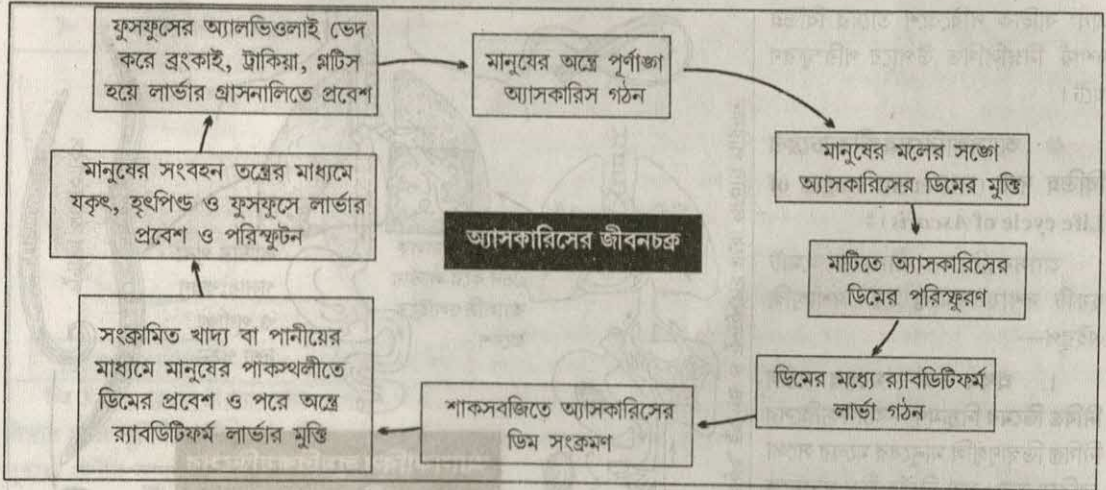
চিত্র 3.12 : অ্যাসকারিসের জীবনচক্রের সরল ও সংক্ষিপ্ত শব্দচিত্র।

➤ (c) **অ্যাসকারিয়েসিস্ রোগ সংক্রমণের উপায় (Mode of Infection of Ascariasis)** : মানুষের দেহে অ্যাসকারিসের সংক্রমণ বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন—

(i) কাঁচা শাকসবজির সঙ্গে র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভাযুক্ত ডিম গলাধঃকরণের ফলে অ্যাসকারিস সংক্রমণ হয়।

(ii) অ্যাসকারিসের ডিমযুক্ত দূষিত জল পান করলে অ্যাসকারিস সংক্রমণ হতে পারে।

(iii) অপরিষ্কার হাত দিয়ে খাওয়ার সময় ভ্রূণযুক্ত ডিম গলাধঃকরণের ফলে অ্যাসকারিস সংক্রমণ হতে পারে।

(iv) এছাড়া অ্যাসকারিসের শুকনো লার্ভাযুক্ত ডিম বায়ুর মাধ্যমে নাক-মুখ দিয়ে ঢুকে অ্যাসকারিসের সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

➤ (d) **অ্যাসকেরিয়েসিস্ রোগের লক্ষণ (Symptoms of Ascariasis disease)** : *অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস*পরজীবীর আক্রমণে মানুষের যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণভাবে অ্যাসকেরিয়েসিস বলে। এই রোগের লক্ষণগুলি প্রধানত দুভাবে ঘটে—দেহের বিভিন্ন অংশে পরিযানরত লার্ভার জন্য এবং পরিণত পরজীবী প্রাণী ঘটিত লক্ষণ।

(i) **অ্যাসকারিসের লার্ভা** ফুসফুসে থাকাকালীন নিউমোনিয়া, জ্বর, কাশি ইত্যাদি দেখা যায়। মস্তিষ্কে, সুষুম্নাকাণ্ডে ও বৃক্কে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে লার্ভাগুলি এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মাথাব্যাথা, মূত্র প্রস্তুতে বাধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

(ii) **পরিণত অ্যাসকারিসের প্রভাবে** মানুষের ভিটামিন A-র অভাব হয়, অপুষ্টিজনিত রোগ, বমি বমি ভাব দেখা যায়। এছাড়া এদের জন্য অ্যাপেনডিসাইটিস্, বাধাজনিত জনডিস্ (Obstructive jaundice), আন্ত্রিক রোধ, শ্বাসরোধ ইত্যাদি লক্ষণও দেখা যায়।

চিত্র 3.13 : *অ্যাসকারিস* ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করছে।

➤ **(e) অ্যাসকেরিয়েসিস্ রোগ প্রতিরোধের উপায় (Preventive measures of Ascariasis) :** মানুষের দেহে অ্যাসকারিস সংক্রমণ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়গুলি হল—(i) মানুষের মল সঠিক স্থানে ফেলা উচিত যাতে ওই মল মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে না মেশে। (ii) খাদ্য গ্রহণের আগে হাত দুটি ভালো করে পরিষ্কার করা উচিত। (iii) স্কুল পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন বিষয় ভালো করে শেখানো প্রয়োজন। (iv) শাকসবজি উপযুক্তভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া উচিত। (v) অ্যাসকারিস আক্রান্ত মানুষকে উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে রোগ নির্মূল করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঔষধগুলি হল—টেট্রামিজোল, পিপারাজাইন লবণ, ডাইইথাইল কার্বামাজাইন, থায়াবেন্ডাজোল, মেবেন্ডাজোল ইত্যাদি।

➤ **(f) অ্যাসকেরিয়েসিস্ রোগের সুপ্তাবস্থা (Incubation period of Ascariasis) :**

মানুষের দেহে পরজীবী অনুপ্রবেশের পরে প্রায় 60 -75 দিন সুপ্তাবস্থা কাটানোর পরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পরজীবী ডিম পাড়তে শুরু করে এবং অ্যাসকেরিয়েসিসের লক্ষণ দেখা যায়।

চিত্র 3.14 : ক্ষুদ্রান্ত্রে *অ্যাসকারিসের* অবস্থান।

## ◘ অ্যাসকেরিয়েসিসের প্যাথোজেনেসিস :

পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস নিম্নলিখিত ক্ষতিসাধান করে—

(1) ভিটামিন A-র স্বল্পতার ফলে রাতকানা রোগ হতে পারে।

(2) পরজীবী দেহ থেকে অ্যান্টিট্রিপটিক (Antitryptic) এবং অ্যান্টিপেপটিক (Antipeptic) অ্যান্টিএনজাইম (Antienzyme) সৃষ্টি হয় যা পরজীবীকে পাকস্থলী ও অন্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া প্রতিরোধী করে তোলে। এর ফলে অপুষ্টি দেখা যায়।

(3) অ্যাসকারিসের দেহ রসের প্রভাবে টাইফয়েড এবং অ্যালার্জি ঘটিত অনেক রোগ হতে পারে।

(4) বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস তাল পাকিয়ে শিশুদের আন্ত্রিক বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

(5) **এক্টোপিক অ্যাসকেরিয়েসিস্** (Ectopic Ascariasis)— কোনো কোনো সময় অ্যাসকারিস ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পাকস্থলীতে আসে। এর পর বমির মাধ্যমে পাকস্থলী থেকে গ্রাসনালির মধ্য দিয়ে এসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই পরিযানের সময় এই পরজীবী ফুসফুসীয় শ্বাসনালির মধ্যে চলে আসে এবং এর ফলে সাফোকেশন বা শ্বাসকষ্ট হয়।

## ◘ পরজীবিতার জন্য অ্যাসকারিসের অভিযোজন (Parasitic Adaptations of Ascaris) :

পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে এবং যৌন জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অন্ত্রে বসবাস করার জন্য তাই অ্যাসকারিসের বিভিন্ন অভিযোজন দেখা যায়।

### ● A. অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptation) :

1. দেহ অখণ্ডিত, গোলাকার ও নলাকার এবং মুখের অগ্রভাগে হুক থাকে যার সাহায্যে এরা অন্ত্রের প্রাচীরে আটকে থাকতে পারে।

2. দেহত্বক মসৃণ ও দেহ নলাকার হওয়ার ফলে খাদ্যপ্রবাহের সঙ্গে ঘর্ষণ এড়িয়ে এরা অন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতে পারে।
3. গমনের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে এদের কোনো গমনাঙ্গ থাকে না।
4. মানুষের আন্ত্রিক রসের পরিপাক ক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অ্যাসকারিসের দেহ শক্ত কিউটিকল দিয়ে আবৃত থাকে।

- B. **শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন** (Physiological adaptations) :

1. অন্ত্রের মধ্যে পাচিত বা অর্ধপাচিত খাদ্য ভাণ্ডারের মধ্যে বসবাস করার জন্য অ্যাসকারিস এই খাদ্য গ্রহণ করে, এদের পরিপাকতন্ত্র খুবই অনুন্নত।
2. অক্সিজেন বিহীন পরিবেশে এরা বসবাস করে বলে এদের অবাত শ্বসন দেখা যায়।
3. অ্যাসকারিসের রেচনতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র অনুন্নত ধরনের।
4. এদের সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
5. অন্ত্রে উৎসেচকযুক্ত পরিবেশে বসবাস করার জন্য এরা অ্যান্টিএনজাইম (Antienzyme) ক্ষরণ করে।

## টিনিয়েসিস্ Taeniasis

➤ (a) **টিনিয়েসিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Outline idea of Taeniasis)** : মানুষের দেহে সেস্টোড (Cestode) ফিতাকৃমি *টিনিয়া সোলিয়াম* (*Taenia solium*) বা গবাদি পশুর দেহে *টিনিয়া স্যাজিনাটা* (*Taenia saginata*) আক্রান্ত হলে উদরের অস্বস্তি, দীর্ঘকাল স্থায়ী অজীর্ণ উপসর্গসহ যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে **টিনিয়েসিস্** (Taeniasis) বলে।

➤ (b) **টিনিয়েসিস্ রোগসৃষ্টিকারী জীব (Causative organisms of Taeniasis)** : টিনিয়া গণের অন্তর্গত দুটি প্রজাতি, যেমন—*টিনিয়া সোলিয়াম* (*Taenia solium*) ও *টিনিয়া স্যাজিনাটা* (*Taenia saginata*) টিনিয়েসিস্ রোগ সৃষ্টি করে।

- **প্রাণীজগতে টিনিয়ার স্থান (Systematic position of Taenia)** :

**পর্ব** (Phylum)— **প্লাটিহেলমিনথিস** (Platyhelminthes)
**শ্রেণি** (Class)— সেস্টোডা (Cestoda)
**বর্গ** (Order)— টিনিওইডিয়া (Taenioidea)
**গোত্র** (Family) — টিনিডি (Taenidae)
**গণ** (Genus) — *Taenia* (*টিনিয়া*)
**প্রজাতি**-1. *Taenia solium* (*টিনিয়া সোলিয়াম*)
**প্রজাতি**-2. *Taenia saginata* (*টিনিয়া স্যাজিনাটা*)
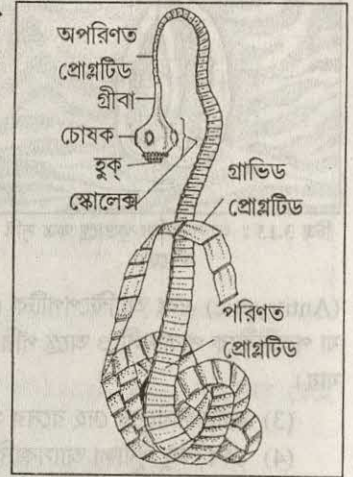
**চিত্র 3.15** : টিনিয়ার পূর্ণাঙ্গদেহের গঠন।

- *টিনিয়া সোলিয়াম* (*Taenia solium*)— সাধারণভাবে এই ফিতাকৃমিকে **শূকরের ফিতাকৃমি** বলে, কারণ সংক্রামিত শূকরের মাংস খেয়ে মানুষ এই ফিতাকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

- *টিনিয়া স্যাজিনাটা* (*Taenia saginata*)— সাধারণভাবে এই ফিতাকৃমিকে **গবাদি পশুর ফিতাকৃমি** বলে, কারণ সংক্রামিত গোরু বা মোষের মাংশ খেয়ে মানুষ এই ফিতাকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

দুটি প্রজাতি ফিতাকৃমির দেহ চ্যাপটা ও দেখতে ফিতের মতো এবং দেহ প্রধান তিনভাগে বিভক্ত যেমন— (i) চোষক অঙ্গ ও হুকযুক্ত রস্টেলাম সহ মস্তক, (ii) গ্রীবা, ও (iii) স্ট্রোবিলা যা অপরিণত, পরিণত ও গ্রাভিড প্রোগ্লটিডযুক্ত। গ্রাভিড প্রোগ্লটিডগুলি ডিম দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে এবং এগুলি মাঝে মাঝে মূলদেহ থেকে খুলে মলের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

## ফিতাকৃমি Tapeworm

ফিতাকৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাসকারী একপ্রকার অন্তঃপরজীবী প্রাণী। পুষ্টি ও বাসস্থানের জন্য এরা অন্য প্রাণীর (পোষক প্রাণী) উপর নির্ভর করে বলে এরা **পরজীবী** (Parasite) এবং এরা পোষকের দেহের মধ্যে বাস করে বলে এদের **অন্তঃপরজীবী** (Endoparasite) বলে। এদের দেহ রিবন্ বা ফিতার (Tape) মতো দেখতে বলে এদের ফিতাকৃমি বলে। শূকরের মাধ্যমে মানুষের দেহে এই অন্তঃপরজীবী সংক্রামিত হয় বলে এদের শূকরের ফিতাকৃমি বলে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের বিস্তার লক্ষ করা যায়। পরিণত টিনিয়ার **গড় আয়ু 25 বৎসর**।

➤ (a) **টিনিয়ার স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and Habitat of *Taenia*)** ঃ পরিণত ফিতাকৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর অন্তঃপরজীবী রূপে বসবাস করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস ঝিল্লিতে এরা চোষক অঙ্গের (Sucker) সাহায্যে আটকে থাকে এবং এখানে খাদ্যরস শোষণ করে। এদের ভ্রূণ দশা শূকর ও গবাদি পশুর ঐচ্ছিক পেশিতে পাওয়া যায়। গবাদি পশু ও শূকরের মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ না করে খেলে মানুষের ফিতাকৃমি সংক্রমণের প্রবণতা বেড়ে যায়।

চিত্র 3.16 ঃ A- টিনিয়া সোলিয়ামের স্কোলেক্সের বিবর্ধিত চিত্র। B-স্কোলেক্সের উপরিতলের বিবর্ধিত অংশের চিত্র।

➤ (b) **টিনিয়ার গঠন (Structure of *Taenia*)** ঃ ফিতাকৃমির দেহ উপর-নীচ চ্যাপটা ফিতের মতো এবং 2–3 মিটার লম্বা। দেহের রং অস্বচ্ছ-সাদা। টিনিয়ার দেহ তিনটি অংশে বিভেদিত, যেমন— (1) স্কোলেক্স বা মস্তক, (2) গ্রীবা এবং (3) স্ট্রোবাইলা।

**1. স্কোলেক্স বা মস্তক (Scolex or Head)** — ফিতাকৃমির দেহের একপ্রান্ত আলপিনের মাথার মতো গোলাকার। এই গোলাকার অংশটিকে স্কোলেক্স বা মস্তক বলে। স্কোলেক্সের ব্যাস প্রায় 1·0 mm এবং এখানে চারটি অরীয় পেশিযুক্ত গোলাকার **সাকার বা চোষক অঙ্গ** (Sucker) আছে। স্কোলেক্সের একেবারে প্রান্তভাগে গোলাকার চাকতির মতো স্থানটিকে **রস্টেলাম** (Rostellum) বলে। রস্টেলাম অংশে দুটি সারিতে মোট 22–32 টি **হুক** (Hook) আছে। চোষক ও হুকগুলি মানুষের অন্ত্রের প্রাচীরে আটকে থাকতে সাহায্য করে এবং অন্ত্রের মিউকাস পর্দা বিনষ্ট করে।

চিত্র 3.17 ঃ টিনিয়া সোলিয়ামের অপরিণত, পরিণত এবং গ্র্যাভিড প্রোগ্লটিডের চিত্ররূপ।

**2. গ্রীবা (Neck)** — স্কোলেক্সের ঠিক পরে সরু অখণ্ডিত অংশকে গ্রীবা বলে। গ্রীবার দৈর্ঘ্য প্রায় 5–10 mm । গ্রীবা লম্বালম্বিভাবে পিছনের দিকে বাডিং পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন খণ্ড বা **প্রোগ্লটিড** (Proglottid) উৎপাদন করে। প্রতিদিন প্রায় 7–8 টি প্রোগ্লটিড সৃষ্টি হয়।

**3. স্ট্রোবাইলা (Strobila)** — গ্রীবার পিছনে প্রায় 800–900 টি প্রোগ্লটিড সমন্বয়ে স্ট্রোবাইলা গঠিত হয়। ফিতাকৃমির দেহে তিন প্রকার প্রোগ্লটিড থাকে, যেমন— অপরিণত, পরিণত এবং গ্রাভিড।

(a) **অপরিণত প্রোগ্লটিড** (Immature proglottid) ঃ এগুলি প্রায় 200 টির মতো এবং গ্রীবার কাছে থাকে। গ্রীবার থেকে এগুলি চওড়ায় বড়ো এবং এখানে কোনো জননঅঙ্গ থাকে না।

(b) **পরিণত প্রোগ্লটিড** (Mature proglottid) ঃ এগুলি দেহের মাঝখানে থাকে এবং সংখ্যায় প্রায় 650 টি। এখানে পুরুষ ও স্ত্রী জননঅঙ্গ থাকে।

## একটি পরিণত প্রোগ্লটিডের গঠন (Structure of a mature proglottid) ঃ

1. প্রোগ্লটিডের বহিরাবরণ শক্ত কিউটিকল দিয়ে তৈরি যা দেহকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করে।
2. কিউটিকল্‌-এর ভিতরের দিকে চক্রাকার ও অনুদৈর্ঘ্য পেশি থাকে।
3. পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রী জননতন্ত্র সুগঠিত।
4. পুং জননতন্ত্র শুক্রাশয়, শুক্রনালি ও শিশ্ন নিয়ে গঠিত।
5. স্ত্রী জননতন্ত্রে ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, সাধারণ ডিম্বনালি, উটাইপ, জরায়ু, শুক্রাধার ও যোনি থাকে।
6. প্রোগ্লটিডের দু'দিকে পার্শ্বীয় স্নায়ু এবং অঙ্কীয়দেশে একজোড়া অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু থাকে।
7. প্রতিটি খণ্ডের দুপাশে দুটি অনুদৈর্ঘ্য রেচননালি থাকে।
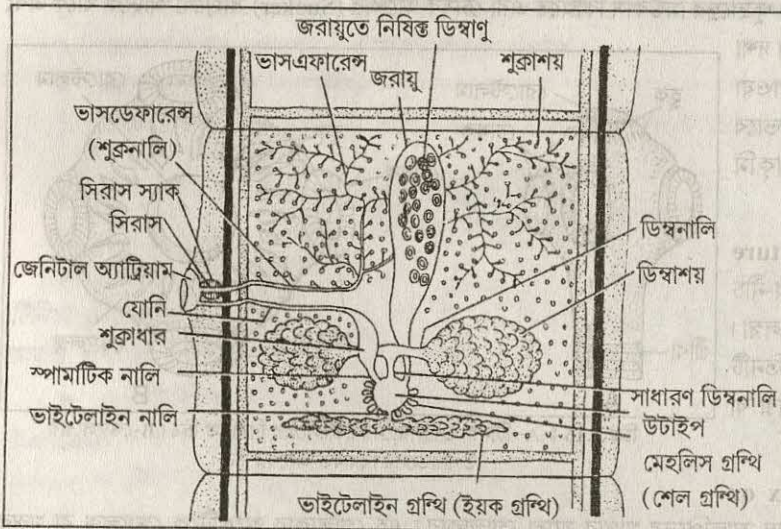
চিত্র 3.18 ঃ টিনিয়ার জনন অঙ্গসহ একটি পরিণত প্রোগ্লটিডের গঠন।

8. স্ত্রী ও পুরুষের জনননালি দু'টি একপাশে জেনিটাল **এট্রিয়াম** নামে থলির মতো অংশে উন্মুক্ত হয় এবং অবশেষে এট্রিয়াম জননছিদ্রের সাহায্যে বাইরে মুক্ত হয়।

**(c) গ্র্যাভিড প্রোগ্লটিড (Gravid proglottid) ঃ** এগুলি দেহের সবচেয়ে চওড়া প্রোগ্লটিড এবং দেহের শেষ প্রান্তে থাকে। এদের দৈর্ঘ্য 10–12 mm এবং প্রস্থ 5–6 mm হয়। গ্র্যাভিড প্রোগ্লটিড খণ্ডগুলিতে শুধুমাত্র জরায়ু বিস্তার লাভ করে এবং জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু এবং ভ্রূণ পরিপূর্ণ থাকে। 5–6 টি গ্র্যাভিড প্রোগ্লটিড শিকলের আকারে মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মলের সঙ্গে বাইরে মুক্ত হয়।

### টিনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র (Brief Life cycle of *Taenia*)

1. টিনিয়ার **নির্দিষ্ট পোষক হল মানুষ** এবং এর **অন্তর্বর্তী পোষক হল শূকর ও গবাদি পশু** (গোরু, মোষ)।
2. টিনিয়ার জীবনচক্র মানুষ ও অপর একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সমাপ্ত হয় বলে একে **সাইক্লোজুনোসিস** (Cyclozoonosis) বলে।
3. পরিণত পরজীবী প্রাণী মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। এই সময় নিষিক্ত ডিমসহ পরিণত প্রোগ্লটিডগুলি দেহ থেকে খুলে মলের সঙ্গে নির্গত হয় এবং ঘাস বা শাকসবজি কলুষিত করে।
4. শূকর বা গবাদি পশু খাদ্য গ্রহণের সময় টিনিয়ার ডিম খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। অন্তর্বর্তী পোষকের অন্ত্রে এইবার টিনিয়ার ডিমের পরিস্ফুরণ ঘটে ও **সিস্টিসারকাস** দশা সৃষ্টি হয়। সিস্টিসারকাস শূকরের মাংসপেশিতে অবস্থান করলে তাকে **সিস্টিসারকাস সেলুলোজি** (Cysticercus cellulosae) বলে এবং সিস্টিসারকাস গবাদিপশুর পেশিতে অবস্থান করলে তাকে **সিস্টিসারকাস বোভিস** (Cysticercus bovis) বলে।
5. সিস্টিসারকাস সেলুলোজি যুক্ত শূকরের মাংসকে **মিজলি পর্ক** (Measly pork) এবং সিস্টিসারকাস বোভিস যুক্ত গবাদিপশুর মাংসকে **মিজলি বিফ** (Measly beaf) বলে। উপযুক্তভাবে সিদ্ধ না করা মিজলি পর্ক বা মিজলি বিফ্‌ খেলে মানুষের টিনিয়া সংক্রমণ হয়।
6. মানুষের পৌষ্টিকনালিতে সিস্টিসারকাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ টিনিয়া প্রাণীতে পরিণত হয়।

➤ (c) **টিনিয়ার জননতন্ত্র (Reproductive system of *Taenia*)** ঃ ফিতাকৃমির পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রী জননতন্ত্র একই প্রাণীতে উপস্থিত থাকে বলে এদের **উভলিঙ্গ** বা হারমাফ্রোডাইট (Hermaphrodite) বলে। এদের পুং জননতন্ত্র প্রথম 200 খণ্ডকের পরে সর্বপ্রথম গঠিত হয় বলে এদের **প্রোট্যানড্রাস** (Protandrous) বলে। 300 - 650 খণ্ডকে পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র উভয়ই থাকে। গ্রাভিড (Gravid) খণ্ডগুলিতে শুধুমাত্র ডিম পূর্ণ থাকে এবং জননতন্ত্র বিনষ্ট হয়।

## A. পুং জননতন্ত্র (Male reproductive system) ঃ
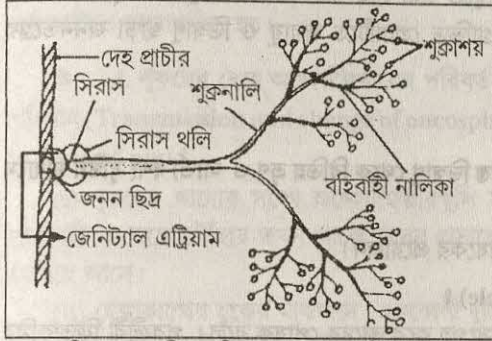
চিত্র 3.19 ঃ ফিতাকৃমির পুংজননতন্ত্রের চিত্ররূপ।

ফিতাকৃমির পুংজননতন্ত্রে নিম্নলিখিত অঙ্গ থাকে। যেমন—

(i) **শুক্রাশয়** (Testis) ঃ একটি পরিণত প্রোগ্লটিডের পৃষ্ঠদেশে 150–200 টি ছোটো ছোটো গোলাকার শুক্রাশয় থাকে। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু উৎপাদিত হয়।

(ii) **শুক্রনালি** (Vas deferens) ঃ প্রতিটি শুক্রাশয় থেকে একটি বহির্বাহী নালিকা বের হয় এবং এগুলি মিলিত হয়ে একটি বড়ো নালি গঠন করে। একে শুক্রনালি বলে।

(iii) **সিরাস বা শিশ্ন** (Cirrus or Penis) ঃ শুক্রনালি **সিরাস** বা **শিশ্ন** বা **পেনিস** নামে প্রবিষ্টকরণ অঙ্গের মাধ্যমে পুং জননছিদ্রের সাহায্যে বাইরে উন্মুক্ত হয়। পেশি দিয়ে ঢাকা সিরাসের প্রান্তকে **সিরাস থলি** (Cirrus sac) বলে। এটি প্রোগ্লটিডের পার্শ্বদেশে অবস্থিত **জেনিট্যাল এট্রিয়ামে** (Genital atrium) উন্মুক্ত হয় এবং এট্রিয়াম জনন ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে মুক্ত হয়।

## B. স্ত্রী জননতন্ত্র (Female reproductive system) ঃ

টিনিয়ার স্ত্রী জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশ দিয়ে তৈরি হয়। যেমন—

(i) **ডিম্বাশয়** (Ovary) ঃ প্রোগ্লটিডের পিছনের দিকে দুটি অসমান ও বহু শাখাযুক্ত ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপাদিত হয়।

(ii) **ডিম্বনালি** (Oviduct) ঃ প্রতিটি ডিম্বাশয়ের প্রতি খণ্ডক থেকে নির্গত নালিগুলি মিলিত হয়ে একটি ডিম্বনালি সৃষ্টি করে। দুদিকের দু'টি ডিম্বনালি মিলিত হয়ে একটি সাধারণ ডিম্বনালি গঠন করে।

(iii) **উটাইপ** (Ootype) ঃ সাধারণ ডিম্বনালি নীচের দিকে একটি গোলাকার প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়, একে উটাইপ বলে।

(iv) **ভাইটেলাইন গ্রন্থি** (Vitelline gland) ঃ উটাইপের নীচের দিকে ছোটো ছোটো খণ্ডকযুক্ত ভাইটেলাইন গ্রন্থি থাকে। ভাইটেলাইন গ্রন্থিনালির সাহায্যে এটি উটাইপে মুক্ত হয়। কুসুম উৎপাদন করা এই গ্রন্থির কাজ।

চিত্র 3.20 ঃ টিনিয়ার স্ত্রী জননতন্ত্রের চিত্ররূপ।

(v) **শেল গ্রন্থি বা মেহলির গ্রন্থি** (Shell gland or Mehli's gland) ঃ শেলগ্রন্থি উটাইপকে ঘিরে থাকে এবং এই গ্রন্থিনিঃসৃত রস নালিকার মাধ্যমে উটাইপে মুক্ত হয়। শেল গ্রন্থির রস ডিম্বকের খোলক সৃষ্টি করে।

(vi) **যোনি** (Vagina) ঃ স্ত্রী জননছিদ্রের ভিতরে যে নালিকা দেখা যায় তাকে যোনি বলে।

(vii) **শুক্রাধার** (Seminal vesicle) ঃ যোনির পিছনের অংশ বা ভিতরের অংশ স্ফীত হয়ে শুক্রাধার সৃষ্টি করে।

(viii) **জরায়ু** (Uterus) ঃ উটাইপ থেকে একটি নালিকা প্রোগ্লটিডের সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে স্ফীত হয়ে বেলুনের আকার ধারণ করে। একে জরায়ু বলে।

➤ (d) **টিনিয়ার নিষেক (Fertilization of *Taenia*)** ঃ সাধারণত ফিতাকৃমির স্বনিষেক (Self fertilization) দেখা যায়। এক্ষেত্রে এরা সিরাসটিকে যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে শুক্র নির্গত করে। শুক্রাণুগুলি প্রথমে শুক্রাধারে সঞ্চিত থাকে পরে ডিম্বনালিতে গিয়ে ডিম্বাণু নিষিক্ত করে। মাঝে মাঝে এরা ইতর নিষেকের সাহায্যে ডিম্বাণু নিষিক্ত করে। এই প্রক্রিয়া একই প্রাণীর বিভিন্ন প্রোগ্লটিড খণ্ডের মধ্যে অথবা একই পোষকের অন্ত্রে অবস্থিত ভিন্ন প্রাণীর প্রোগ্লটিড দুটির ভিতর ঘটে।

নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ভাইটেলাইন গ্রন্থির কুসুম কোশের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে শেলগ্রন্থির নিঃসরণের সাহায্যে আবৃত ডিম্বাণুটিকে **ক্যাপসুল** (Capsule) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি এইভাবে সৃষ্টি হয়ে জরায়ুতে জমা হতে থাকে এবং জরায়ু ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে সমগ্র প্রোগ্লটিড ডিম্বাণুপূর্ণ জরায়ুতে রূপান্তরিত হয়। গ্রাভিড প্রোগ্লটিডে জরায়ু ও ডিম্বাণু ছাড়া জননতন্ত্রের অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত হয়।

➤ (e) **টিনিয়ার জীবনচক্র (Life cycle of *Taenia*)** ঃ

❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে চক্রের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে বিভিন্ন ভ্রূণ ও লার্ভা দশা সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত হয় তাকে জীবনচক্র বলে।**

পরজীবী প্রাণীর জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে অন্য প্রজাতির প্রাণী-পোষকের প্রয়োজন।

● **1. জীবনচক্রে পোষকের ভূমিকা (Role of host in life cycle) ঃ**

যেসব প্রাণীর দেহে পরজীবী বাস করে এবং সেই দেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাদের **পোষক** বলে। পরজীবী ফিতাকৃমির জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে দু'টি ভিন্ন পোষকের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেহে পূর্ণাঙ্গ কৃমি পাওয়া যায় বলে মানুষকে **মুখ্য পোষক** (Primary host) অথবা **নির্দিষ্ট পোষক** (Definitive host) বলে। অপর দিকে শূকরের ও গবাদি পশুর দেহে ফিতাকৃমির লার্ভা দশা পাওয়া যায় বলে শূকর ও গবাদিপশুকে **গৌণ পোষক** (Secondary host) বা **অন্তর্বর্তী পোষক** (Intermediate host) বলে।

চিত্র 3.21 ঃ টিনিয়া সোলিয়ামের জীবনচক্রে বিভিন্ন দশার চিত্ররূপ।

● **2. অঙ্কোস্ফিয়ার গঠন (Formation of Oncosphere) ঃ**

(i) জরায়ুতে থাকাকালীন অবস্থায় নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটের বিভাজন শুরু হয়। জাইগোটের প্রথম মাইটোসিস বিভাজনের ফলে একটি বড়ো কোশ বা **মেগামিয়ার** (Megamere) এবং একটি ছোটো কোশ বা **ভ্রূণকোশ** সৃষ্টি হয়।

(ii) ভ্রূণকোশের ক্রমাগত বিভাজনের ফলে **মরুলা, ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলা** দশার পরে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। মেগামিয়ার কোশের বিভাজনের সাহায্যে ভ্রূণের চারিদিকে কাইটিন জাতীয় আবরণ **এমব্রায়োফোর** (Embryophore) সৃষ্টি হয়।

(iii) ফিতাকৃমির ভ্রূণের পিছনের দিকে একপ্রান্তে কাইটিন দিয়ে তৈরি ছ'টি হুক সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ভ্রূণকে **হেক্সাকান্থ লার্ভা** (Hexacanth larva ; *Hexa* = six, বা ছয়, *canthus* = spines, বা কাঁটা) বলে।

(iv) ডিম্বাণু, খোলক, এমব্রায়োফোর এবং হেক্সাকান্থকে একত্রে **অঙ্কোস্ফিয়ার** (Oncosphere) বলে। অঙ্কোস্ফিয়ার পর্যন্ত পরিস্ফুটন প্রোগ্লটিডের মধ্যে ঘটে এবং এই দশা অন্তর্বর্তী পোষক শূকরের দেহে সংক্রমণ হলে তবেই পরবর্তী পর্যায়ে ভ্রূণের পরিস্ফুটন ঘটে।

**3. অন্তর্বর্তী পোষকের (শূকরের) দেহে অঙ্কোস্ফিয়ারের স্থানান্তরণ (Transmission of Oncosphere into intermediate host, pig) :** অঙ্কোস্ফিয়ারপূর্ণ গ্রাভিড প্রোগ্লটিড (Gravid proglottid) মানুষের মলের সঙ্গে দেহের বাইরে আসে এবং শূকরের খাদ্য যেমন আবর্জনা, ঘাস ইত্যাদিকে সংক্রামিত করে। সংক্রামিত খাদ্যগ্রহণের সময় শূকর টিনিয়ার অঙ্কোস্ফিয়ার গ্রহণ করে যেগুলি শূকরের পাকস্থলীতে স্থানান্তরিত হয়।

চিত্র 3.22 : মানুষের মলের সঙ্গে গ্রাভিড প্রোগ্লটিড।

**4. শূকরের দেহে অঙ্কোস্ফিয়ারের পরিবর্তন ও পরিযান (Transmission and change of oncosphere in body of pig) :**

(i) শূকরের খাদ্যের সঙ্গে অঙ্কোস্ফিয়ারগুলি যখন পাকস্থলী ও অন্ত্রে পৌঁছায় তখন পাচক রসের প্রভাবে ডিম্বাণু খোলক ও এমব্রায়োফোর দ্রবীভূত হয় এবং হেক্সাকান্থ ভ্রূণটি বেরিয়ে আসে।

(ii) হেক্সাকান্থের হুকের মাঝখানে এককোশী দুটি **পেনিট্রেশন গ্রন্থি** (Penetration gland) থাকে। এই গ্রন্থির ক্ষরণের সাহায্যে ভ্রূণগুলি পৌষ্টিকনালির প্রাচীর বিনষ্ট করে এবং প্রাচীর ভেদ করে শিরার রক্তনালিতে প্রবেশ করে।

চিত্র 3.23 : মানুষ ও শূকর পোষকের দেহে *টিনিয়াসোলিয়ামের* জীবনচক্রের বিভিন্ন দশার আবর্তন।

(iii) হেক্সাকান্থ ভ্রূণগুলি এরপর হৃৎপিণ্ডে আসে এবং ধমনির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে ঐচ্ছিক পেশিতে যায়।

(iv) পেশিতে পৌঁছে হেক্সাকান্থের হুকগুলি বিনষ্ট হয় এবং ভ্রূণটির মাঝখানে জলীয় পদার্থ পূর্ণ হয়। ভ্রূণের এই অবস্থা থলির মতো দেখতে হয় বলে একে **ব্লাডার-ওয়ার্ম দশা** (Bladder worm stage) বা **সিস্টিসারকাস** (Cysticercus) দশা বলে। এই দশাটির চারিদিকে **সিস্ট** (Cyst) গঠিত হয়।

(v) ব্লাডার বা সিস্টের একপ্রান্ত **ইনভ্যাজিনেশন** (Invagination) পদ্ধতির মাধ্যমে ভিতরে ঢুকে যায় এবং এই অংশ থেকে রস্টেলাম, হুক ও সাকার সৃষ্টি হয়। এই অংশকে **প্রোস্কোলেক্স** (Proscolex) বলে।

(vi) এই সময় প্রোস্কোলেক্স ও ব্লাডারসহ ভ্রূণটিকে ফিতাকৃমির **সিস্টিসারকাস সেলুলোজি** (Cysticercus cellulosae) বলে।

(vii) সিস্টিসারকাসগুলি বর্ণহীন, প্রায় ডিম্বাকার এবং লম্বায় 6–18 mm হয়। যে শূকরের মাংসে সিস্টিসারকাস থাকে তাকে **মিজলি পর্ক** (Measly pork) বলে। ফিতাকৃমির সিস্টিসারকাস দশা মানবদেহের সংক্রামণকারী দশা হিসাবে চিহ্নিত হয়। শূকরের দেহে এগুলি 8 মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

চিত্র 2.24 : মিজলি পর্কের চিত্ররূপ : শূকরের পেশিতে সিস্টিসারকাস সেলুলোজি।

(viii) সিস্টিসারকাস গবাদি পশুর পেশিতে অবস্থান করলে তাকে **সিস্টিসারকাস বোভিস** (Cysticercus bovis) বলে এবং সিস্টিসারকাস বোভিস যুক্ত গবাদিপশুর মাংসকে **মিজলি বিফ** (Measly beef) বলে।

**5. টিনিয়া সংক্রমণের উপায় (Mode of Infection of Taenia) :**

(i) মিজলি পর্ক ভালোভাবে সিদ্ধ করে না খেলে শূকরের মাংসের সঙ্গে সিস্টিসারকাস মানুষের পাকস্থলীতে পৌঁছায় এবং এখানে পাচকরসে ব্লাডারটি পাচিত হয়।

(ii) এরপর প্রোস্কোলেক্সটি **ইভ্যাজিনেশন** (Evagination) পদ্ধতির সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে আসে। এখন প্রোস্কোলেক্সটি পরিপূর্ণ স্কোলেক্সে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে স্কোলেক্সের গলা থেকে কুঁড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে অসংখ্য প্রোগ্লটিড সৃষ্টি হয়।

(iii) 2–3 মাসের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সাকারের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে আটকে জীবন যাপন করে। এইভাবে ফিতাকৃমির জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়।

চিত্র 2.25 : টিনিয়ার জীবনচক্রের সরল ও সংক্ষিপ্ত শব্দচিত্র।

**বিভিন্ন প্রকার ফিতাকৃমি (Different types of Tape worm) :**

| ফিতাকৃমির নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | নির্দিষ্ট পোষক | অন্তর্বর্তী পোষক |
|---|---|---|---|
| (1) পর্ক টেপওয়ার্ম | *Taenia solium* | মানুষ | শূকর |
| (2) বিফ টেপওয়ার্ম | *Taenia saginata* | মানুষ | গোরু |
| (3) ডগ টেপওয়ার্ম | *Echinococcus granulosus* | কুকুর | মানুষ |
| (4) ফিস টেপওয়ার্ম | *Diphyllobothrium latum* | মানুষ | মাছ |

**ফিতাকৃমি আক্রমণের ফলে মানুষের দেহে প্রতিক্রিয়া (Pathogenic effect of Tapeworm in man) :**

মানুষের অন্ত্রে ফিতাকৃমি অবস্থান করে, ফলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে এককথায় **টিনিয়েসিস** (Taeniasis) বলে। এই রোগের লক্ষণগুলি নিম্নরূপ :

1. অন্ত্রে খাদ্য চলাচলে বাধা দেয়, ফলে অন্ত্রে ব্যথা সৃষ্টি করে।
2. ক্রমাগত বদহজম ও অপুষ্টি দেখা দেয়।
3. ক্রমাগত রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।
4. বমি-বমি ভাব সৃষ্টি হয়।

5. উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।
6. স্নায়বিক দৌর্বল্য ও এপিলেপ্সি (Epilepsy) হতে পারে।
7. ব্লাডারওয়ার্ম সিস্ট গঠন করে চোখ, মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডে অবস্থান করে নানা রকম স্নায়বিক রোগ সৃষ্টি করে।
8. হাইপারটেনশন ও হাইড্রোসেফালাস (Hydrocephalous) দেখা যায়।

● *টিনিয়া সোলিয়াম* ও *টিনিয়া স্যাজিনেটার* পার্থক্য ( **Difference between *Taenia solium* and *T. saginata*** ) ঃ

| *টিনিয়া সোলিয়াম* | *টিনিয়া স্যাজিনেটা* |
|---|---|
| 1. দেহের দৈর্ঘ্য 2–3 মিটার। | 1. দেহের দৈর্ঘ্য 5–10 মিটার। |
| 2. স্কোলেক্স বড়ো হয়। | 2. স্কোলেক্স ছোটো হয়। |
| 3. স্কোলেক্সের অগ্রপ্রান্তে রস্টেলাম ও হুক থাকে। | 3. স্কোলেক্সের অগ্রপ্রান্তে রস্টেলাম ও হুক থাকে না। |
| 4. 800–1000 টি প্রোগ্লটিড থাকে। | 4. 1000–2000 টি প্রোগ্লটিড থাকে। |
| 5. ডিম্বাশয়ে দুটি লোবের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত লোব থাকে। | 5. এখানে অতিরিক্ত লোব থাকে না। |
| 6. শূকর হল এর গৌণ পোষক। | 6. গোরু বা মোষ এর গৌণ পোষক। |

➤ (f) **টিনিয়েসিস্ রোগ প্রতিরোধের উপায় (Preventive measures of Taeniasis)** ঃ মানুষের দেহে টিনিয়েসিস্ রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি হল—(i) শূকরের মাংস বা গবাদিপশুর মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া উচিত। (ii) মানুষের মল উপযুক্ত স্থানে ফেলা উচিত যাতে করে এই মল ঘাস বা শাকসবজিকে কলুষিত করতে না পারে। (iii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পালন করা উচিত। (iv) শূকর ও গবাদিপশুকে মল কলুষিত খাদ্য বস্তু খেতে না দেওয়া উচিত। (v) বধ্য ভূমিতে গিয়ে মাংসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা উচিত। (vi) আক্রান্ত মানুষকে উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে রোগ নির্মূল করা উচিত। সাধারণ ব্যবহৃত ঔষধগুলি হল—মেপাক্রাইন, ডাইক্লোরোফেন ইত্যাদি।

## ▲ পরজীবিতার জন্য ফিতাকৃমির অভিযোজন (Parasitic adaptations of Tapeworm) ঃ

অন্ত্রে বসবাস করে অন্তঃপরজীবী জীবনযাপনের জন্য টিনিয়ার দেহের নানারকম পরিবর্তন হয়েছে। কিছু অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং কিছু অঙ্গ সুগঠিত হয়েছে। সমস্ত অভিযোজনকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন।

● **1. অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptations)** ঃ

(i) অল্প জায়গায় বাস করার জন্য দেহ ফিতের মতো সরু ও চ্যাপটা।
(ii) চলনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে।
(iii) মুখ, পায়ু ও পৌষ্টিকনালি অনুপস্থিত।
(iv) অন্ত্রের প্রাচীরে আটকে থাকার জন্য চোষক অঙ্গ ও হুক সুগঠিত।
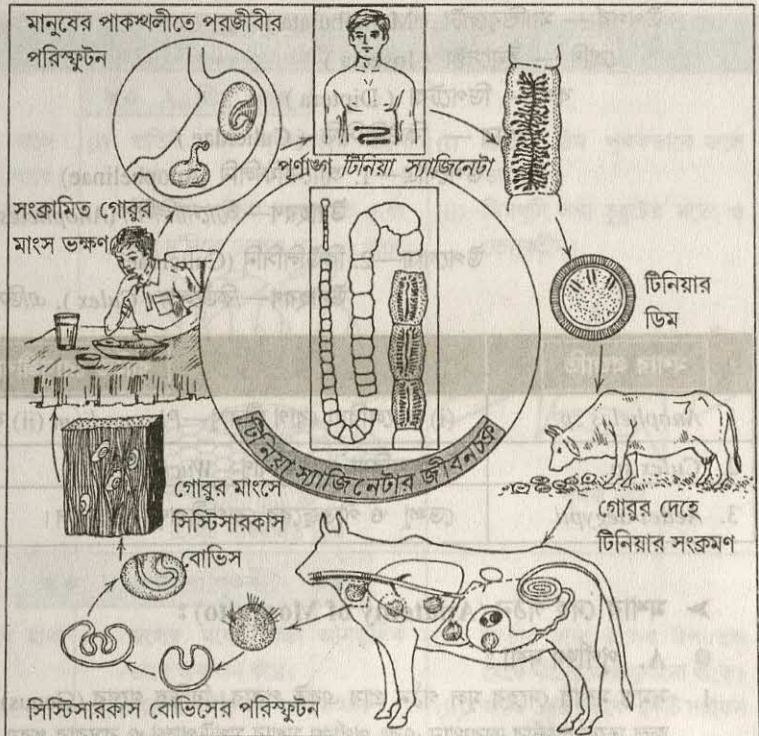
চিত্র 3.26 ঃ মানুষ ও গোরুর দেহে *টিনিয়া স্যাজিনেটার* জীবনচক্রের চিত্ররূপ।

(v) মানুষের পৌষ্টিক নালিতে উৎসেচকের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য দেহাবরণ কিউটিকল্ দিয়ে তৈরি।
(vi) সুগঠিত জননতন্ত্র, উভলিঙ্গ এবং স্বনিষেক জনিত সুবিধা।
(vii) অনুন্নত স্নায়ুতন্ত্র এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুপস্থিত।
(viii) উভলিঙ্গ এবং জননতন্ত্র উন্নত মানের।

- **2. শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptations) ঃ**

(i) টিনিয়ার দেহে শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত, তাই টিনিয়া অবাত শ্বসন সম্পন্ন করে।
(ii) পোষকের অন্ত্রে উপস্থিত পাচকরসকে প্রশমিত করার জন্য এদের দেহ থেকে **অ্যান্টিএনজাইম** নিঃসৃত হয়।
(iii) পোষকের দেহের মিউকাস এদের দেহকে আবৃত করে ও রক্ষা করে।
(iv) সুস্থভাবে বাঁচার জন্য পরজীবীর দেহের আস্রাবণিক চাপ পোষকের দেহের আস্রাবণিক চাপের সমান থাকে।
(v) পোষকের দেহে pH-এর তারতম্য ফিতাকৃমি সহ্য করতে পারে।
(vi) ফিতাকৃমির দেহে শক্তি যোগানকারী গ্লাইকোজেন ও লিপিড বেশি পরিমাণে থাকে ।

## মশা Mosquito

সন্ধিপদ পর্বের ইনসেক্টা (Insecta) বা পতঙ্গ শ্রেণির ডিপটেরা (Diptera) বর্গের অন্তর্গত প্রাণী হল মশা। মানুষের দেহে বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণে মশার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রধানত তিনটি প্রজাতির মশা রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; এগুলি হল—অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও এডিস্ মশা।

- **প্রাণীজগতে মশার স্থান (Position of Mosquito in Animal Kingdom) ঃ**

পর্ব — সন্ধিপদ (Arthropoda)
উপপর্ব — ম্যান্ডিবুলেটা (Mandibulata)
শ্রেণি — ইনসেক্টা (Insecta)
বর্গ — ডিপটেরা (Diptera)
গোত্র — কিউলিসিডি (Culicidae)
উপগোত্র—1. অ্যানোফিলিনি (Anophelinae)
**উদাহরণ**—*অ্যানোফিলিস (Anopheles)*
উপগোত্র—2. কিউলিসিনি (Culicinae)
**উদাহরণ**—*কিউলেক্স (Culex)*, *এডিস (Aedes)*

| মশার প্রজাতি | বাহিত রোগজীবাণু |
|---|---|
| 1. *Anopheles sp.* | (i) ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণু—*Plasmodium* (ii) ফাইলেরিয়া রোগজীবাণু—*Wuchereria* |
| 2. *Culex sp.* | ফাইলেরিয়া রোগজীবাণু—*Wuchereria* |
| 3. *Aedes aegypti* | ডেঙ্গু ও পীতজ্বরের রোগজীবাণু—ভাইরাস। |

### ➤ মশার দেহ গঠন (Anatomy of Mosquito) ঃ

- **A. পূর্ণাঙ্গ দশা ঃ**

1. সমস্ত মশার দেহের মূল গঠন প্রায় একই প্রকার। বিভিন্ন গণের (Genus) মশার মধ্যে ডিমের অবস্থা ও বহির্গঠন, জল তলে লার্ভার অবস্থান এবং পূর্ণাঙ্গ মশার মুখউপাঙ্গ ও বসবার ধরন বিভিন্ন প্রকার হয়।

2. পূর্ণাঙ্গ মশকি প্রায় 5 mm লম্বা হয়, মেসোথোরাক্স থেকে একজোড়া **ডানা** ও মেটাথোরাক্স থেকে একজোড়া **হলটেয়ার** (Haltare) সৃষ্টি হয়।
3. মাথার সামনের দিকে দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝে একটি **প্রোবোসিস** (Proboscis) থাকে যা রক্ত চোষার কাজে লাগে।
4. মাথার সামনের দিকে দুটি **অ্যান্টেনা** থাকে। পুরুষ মশার অ্যান্টেনা ব্রাসের মতো দেখতে হয়। স্ত্রী মশার অ্যান্টেনা সরু সূঁচালো।
5. এছাড়া একজোড়া **ম্যাক্সিলারি পাল্প** (Maxillary palp) মাথার সামনের দিকে থাকে এবং এটি দেখে বিভিন্ন প্রকার মশা সনাক্ত করা যায়।
6. দশটি খণ্ডক নিয়ে উদর গঠিত হয় এবং উদরের শেষভাগে স্ত্রীদের অ্যানাল সারসি ও পুরুষের ক্লাসপার থাকে।
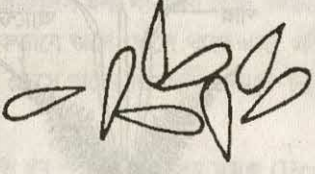
**B. লার্ভা দশা ঃ**
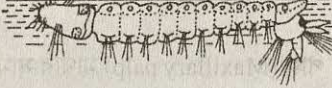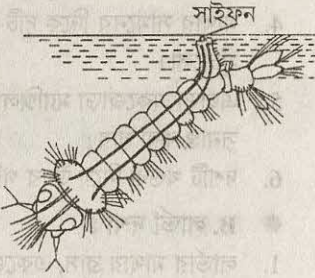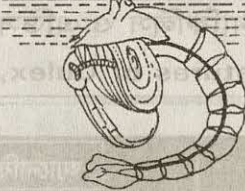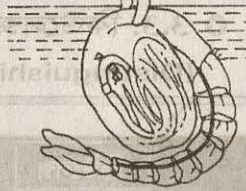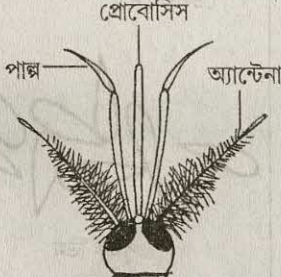
1. লার্ভার মাথায় ব্রাস, একজোড়া অ্যান্টেনা একটি পুঞ্জাক্ষি থাকে।
2. লার্ভার বক্ষ অঞ্চলটি বেশ চওড়া এবং উদর অঞ্চল লম্বা হয়।
3. উদরের প্রান্তভাগে শ্বাসনল বা **সাইফন** (Siphon), **পায়ুফুলকা** (Anal gill) ও **ব্রাশ** ( Brush ) থাকে।
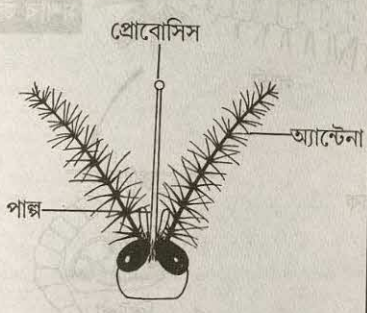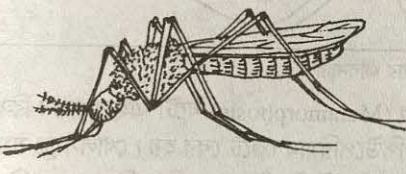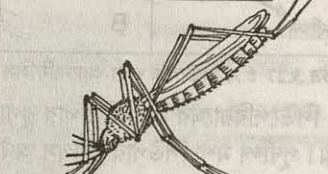
**C. পিউপা দশা ঃ**

1. পিউপা কমার (,) মতো দেখতে একটি দশা যা খাদ্য গ্রহণ করে না।
2. এখানে একটি **শ্বাস-ট্রাম্পেট** (Breathing Trumpet) থাকে যা সেফালোথোরাক্স থেকে সৃষ্টি হয়।

## 3.3. কিউলেক্স, অ্যানোফিলিস ও এডিস মশার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য (Distinguishing features of Culex, Anopheles and Aedes)

| কিউলেক্স | অ্যানোফিলিস | এডিস |
|---|---|---|
| | **A. ডিম** | |
| (i) ডিমগুলি গুচ্ছাকারে র‍্যাফ্টের মতো জলে ভাসে এবং প্রতিটি গুচ্ছে 100—250 ডিম থাকে।<br>(ii) ডিমগুলির প্রান্তদেশে ভেলক (Float) থাকে না।<br>গুচ্ছাকার ডিম<br>পৃথক ডিম | (i) প্রতিটি ডিম পৃথকভাবে জলে ভাসে।<br>(ii) ডিমগুলি নৌকা আকৃতির এবং এর দু'দিকে ভেলক (Float) থাকে।<br>ভেলক<br>একটি পরিবর্ধিত ডিম | (i) প্রতিটি ডিম পৃথকভাবে জলে ভাসে।<br>(ii) ডিমগুলি লম্বা চুরুটের মতো ও ভেলকহীন।<br>পৃথক ডিম |
| | **B. লার্ভা বা শূককীট** | |
| (i) জলের উপর তল থেকে লার্ভার মাথা জলের নীচে ডুবানো থাকে।<br>(ii) অষ্টম উদর খণ্ডকে একটি সাইফন নল দেখা যায়। | (i) জলের মধ্যে লার্ভা আনুভূমিক ভাবে অবস্থান করে।<br>(ii) কোনো সাইফন নল দেখা যায় না। | (i) লার্ভার মাথা জলের উপরতল থেকে নীচের দিকে ডুবানো থাকে।<br>(ii) অষ্টম উদর খণ্ডকে একটি সাইফন নল থাকে। |

| কিউলেক্স | অ্যানোফিলিস | এডিস |
|---|---|---|
| (iii) পামেট লোম (Palmate hair) অনুপস্থিত। | (iii) উদরখণ্ডকে পামেট লোম দেখা যায়। | (iii) পামেট লোম অনুপস্থিত। |
| সাইফন | | সাইফন |
| **●● C. পিউপা বা মূককীট ●●** | | |
| (i) কমার (,) মতো দেখতে হয়।<br>(ii) সাইফন নলটি লম্বা ও সরু। | (i) কমার (,) মতো দেখতে হয়।<br>(ii) সাইফন নলটি মোটা ও ছোটো। | (i) কমার (,) মতো দেখতে হয়।<br>(ii) সাইফন নলটি লম্বা ও সরু। |
| **●● D. পূর্ণাঙ্গ ●●** | | |
| (i) কোনো স্থানে বসার সময় তলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বসে। | (i) কোনো স্থানে বসার সময় তলের সঙ্গে প্রায় 45° কোণ সৃষ্টি করে। | (i) কোনো স্থানে বসার সময় তলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বসে। |
| <br><br>পুরুষ কিউলেক্স মশার মস্তক উপাঙ্গ | <br><br>পুরুষ অ্যানোফিলিস মশার মস্তক উপাঙ্গ | <br><br>পুরুষ এডিস মশার মস্তক উপাঙ্গ |
| (ii) এদের ডানায় কোনো দাগ থাকে না।<br>(iii) স্ত্রী মশার মস্তক উপাঙ্গে বেশ ছোটো পাল্প থাকে। | (ii) এদের ডানায় কালো দাগ থাকে।<br>(iii) স্ত্রী মশার পাল্প লম্বাকৃতি ও প্রোবেসিসের সমান। পুরুষ মশার পাল্পের সামনের অংশ চওড়া। | (ii) ডানায় কোনো দাগ থাকে না।<br>(iii) স্ত্রী মশার পাল্প প্রোবেসিসের থেকে অনেক ছাটো এবং পাল্পের কোনো অংশ চওড়া হয় না। |

| কিউলেক্স | অ্যানোফিলিস | এডিস |
|---|---|---|
| (iv) উদরে কোনো সাদা-কালো ডোরা (Band) থাকে না। | (iv) উদরে সাদা-কালো ডোরা থাকে না। | (iv) উদরে সুস্পষ্ট সাদা-কালো ডোরা থাকে এবং এইজন্য এদের **বাঘ মশা** (Tiger mosquito) বলে। |



## ◎ 3.4. কিউলেক্স এবং অ্যানোফিলিস মশার জীবনচক্রের তুলনামূলক আলোচনা ◎ (Life Cycle and comparative study of Culex and Anopheles of mosquito)

➤ **মশার জীবনচক্র (Life cycle of Mosquito)** ঃ চারটি দশার মাধ্যমে মশার জীবনচক্র সম্পন্ন হয়। এগুলি হল— ডিম, লার্ভা (বা শূককীট), পিউপা (বা মূককীট) ও পূর্ণাঙ্গ (বা সমঙ্গা)।

1. **ডিম (Egg)** ঃ মশা পরিষ্কার জলে বা আবদ্ধ অপরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। অ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার জলে, কিউলেক্স ও এডিস মশা আবদ্ধ অপরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। **অ্যানোফিলিস** মশার ডিমগুলি এককভাবে জলে ভেসে থাকে এবং প্রতিটি ডিমে বায়ুপূর্ণ **ভেলক** (Raft) থাকে। কিন্তু **কিউলেক্স** মশার ডিমগুলি একত্রে দলবন্ধ হয়ে ভেসে থাকে। ডিমগুলি দেখতে চুরুটের মতো নব্ (Knob) যুক্ত হয়।

2. **শূককীট (Larva)** ঃ 2-5 দিনের মধ্যে মশার ডিম ফুটে শূককীট বা লার্ভা নির্গত হয়। শূককীটের দেহ **মস্তক** (Head), **বক্ষ** (Thorax) এবং **উদরে** (Abdomen) বিভক্ত হয়। শূককীটের মস্তকে একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye), একজোড়া **শৃঙ্গ বা অ্যান্টেনা** (Antenna), একজোড়া **চোয়াল বা ম্যান্ডিব্‌ল** (Mandible) এবং একজোড়া **ভোজন বুরুশ** (Feeding brush) থাকে। শূককীটের উদরটি দশটি খণ্ডকে বিভেদিত এবং প্রতিটি উদর খণ্ডকের পার্শ্বদেশে একগুচ্ছ কূর্চ (Bristles) থাকে। **অ্যানোফিলিসের** শূককীট জলের উপরিতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। কিন্তু **কিউলেক্সের** শূককীট জলের উপরিতলের সঙ্গে 45° কোণ করে অবস্থান করে। কিউলেক্স লার্ভার **সাইফনটি** বড়ো হয়, কিন্তু অ্যানোফিলিস লার্ভার সাইফন ছোটো।

3. **মূককীট বা পুত্তলি বা পিউপা (Pupa)** ঃ মশার পরিণত শূককীটগুলি মূককীট দশায় পরিবর্তিত হয়। পিউপা '' বা কমা চিহ্নের মতো দেখতে হয়। পিউপার দেহটি **পিউপেরিয়াম** (Puparium) নামের আবরণে ঢাকা থাকে। পিউপার দেহে সাইফন

থাকে। অ্যানোফিলিসের পিউপার সাইফনটি ক্ষুদ্র কিন্তু **কিউলেক্স** বা এডিস মশার পিউপার সাইফনটি অপেক্ষাকৃত লম্বা। এদের পিউপায় মুখছিদ্র থাকে না। ফলে এই দশায় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মশার পিউপা দশার স্থায়িত্ব 2-3 দিন হয়।
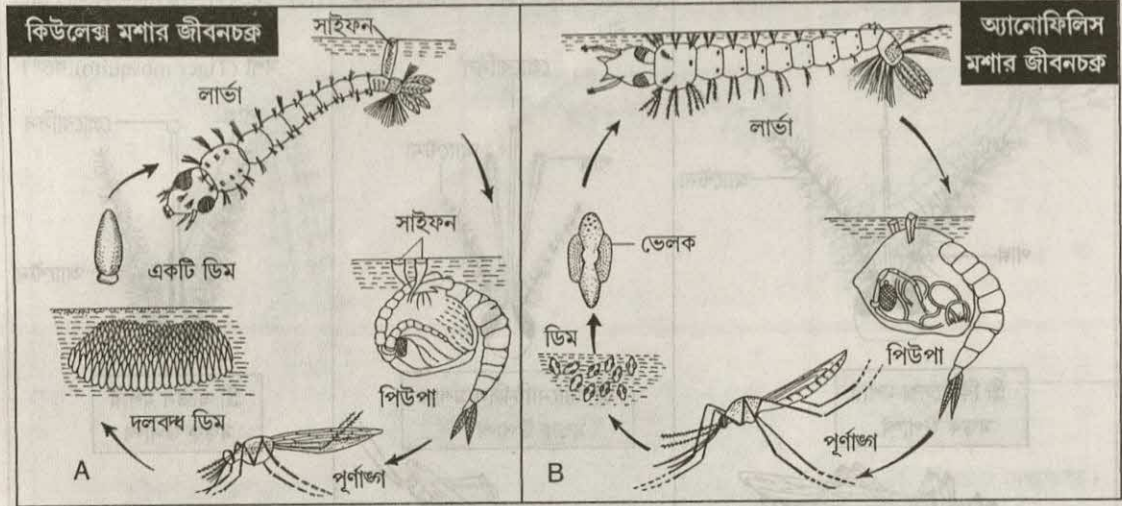
চিত্র 3.27 : A-কিউলেক্স ও B-অ্যানোফিলিস মশার জীবনচক্র।

4. **পূর্ণাঙ্গ বা সমঙ্গ (Imago) :** পিউপেরিয়ামের মধ্যে পিউপার রূপান্তর (Metamorphosis) ঘটে। এই রূপান্তর ক্রিয়ায় পিউপা পূর্ণাঙ্গ বা সমঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ মশা পিউপার খোলস অর্থাৎ পিউপেরিয়াম কেটে বের হয়। খোলসমুক্ত সমঙ্গ মশা কোনো স্থানে বসে নিজের ডানা শুকায় এবং পরে উড়ে যায়। পূর্ণাঙ্গ মশার দেহটি তিনটি অংশে বিভেদিত। অংশ তিনটি যথাক্রমে মস্তক, বক্ষ এবং উদর। মস্তকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, একজোড়া অ্যান্টেনা, মুখ-উপাঙ্গ এবং প্রোবোসিস (Proboscis) থাকে। এদের বক্ষের পৃষ্ঠদেশে একজোড়া ডানা এবং অঙ্কীয় দেশে তিনজোড়া উপাঙ্গ থাকে। পূর্ণাঙ্গ **অ্যানোফিলিস** মশা তলের সঙ্গে তির্যকভাবে কিন্তু **কিউলেক্স** ও **এডিস** মশা তলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। **অ্যানোফিলিস** ও **এডিস** মশার ডানায় সাদা কালো দাগ থাকে, কিন্তু কিউলেক্সের ডানায় সাদা কালো দাগ থাকে না।

## ✪ 3.5. মশা নিয়ন্ত্রণের উপায় (Control measures of mosquito) ✪

মশককুল বিভিন্ন রোগজীবাণুর প্রধান বাহক এবং বিভিন্ন প্রকার মশকির দংশনে মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার রোগের সংক্রমণ ঘটে। সুতরাং মশককুলকে ধ্বংস করতে পারলে মনুষ্য সমাজ বিভিন্ন প্রকার রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন না করে বিভিন্ন পদ্ধতি একসঙ্গে অবলম্বন করা প্রয়োজন। মশা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল—**মশার লার্ভা প্রতিরোধী উপায়, পূর্ণাঙ্গ মশা প্রতিরোধী উপায়, মশার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।**

### ➤ 1. মশার লার্ভা প্রতিরোধী উপায় :

(i) **পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ**—মশা সাধারণত কোনো সঞ্চয়ীপাত্রে, নালা-নর্দমায় বা বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে ও এখানেই লার্ভা জন্মায়। সুতরাং বাড়িতে কোনো পাত্রে দীর্ঘক্ষণ জমা জল রাখা উচিত নয়। এছাড়া নালানর্দমার জল কোনো কারণে যেন আটকে না যায় তা দেখতে হবে। অর্থাৎ নালানর্দমা বা বদ্ধ জলাশয় পরিষ্কার রাখতে হবে।

(ii) **রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ**—নালানর্দমায় যেখানে মশার লার্ভা জন্মায় সেখানে লার্ভা ধ্বংসকারী রাসায়নিক বা তেল, যেমন—খনিজ তেল, প্যারিস গ্রিন ও অন্যান্য লার্ভা ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে উৎসমূলে লার্ভা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(iii) **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ**—বিভিন্ন প্রকার ছোটো মাছ, যেমন—গাম্বুসিয়া, গোল্ডফিশ, লেবিস্টার ইত্যাদি মশার লার্ভা ভক্ষণ করে লার্ভা ধ্বংস করে। সুতরাং এইসব মাছ নর্দমায় অথবা বদ্ধ জলাশয়ে যেখানে মশার লার্ভা জন্মায় সেখানে চাষ করে মশা ধ্বংস করা যায়। **জীব প্রয়োগ করে মশা নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।**

➤ **2. পূর্ণাঙ্গ মশা প্রতিরোধী উপায় ঃ**

(i) **রেসিড্যুয়েল কীটনাশক প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ ঃ** ঘরবাড়ির বিভিন্ন স্থানে রেসিডুয়াল কীটনাশক, যেমন—ম্যালাথিওন, প্রোপোক্সার ইত্যাদি স্প্রে করে মশা নিধন করা যায়।

(ii) **পরিবেশে কীটনাশক স্প্রে করে নিয়ন্ত্রণ ঃ** কিছু কীটনাশক, যেমন—পাইরেথ্রাম, ফেনিট্রোথায়োন ইত্যাদি পরিবেশে অর্থাৎ বাতাসে স্প্রে করে মশা নিধন করা যায়।

(iii) **জিনগত নিয়ন্ত্রণ ঃ** বিভিন্ন উপায়ে মশার জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—পুরুষ মশার বন্ধ্যাকরণ, রোগজীবাণু প্রতিরোধী জিন মশার দেহে স্থাপন, ক্রোমোজোমের ট্রান্সলোকেশন ঘটিয়ে মশার জিনগত পরিবর্তন করা ইত্যাদি।

➤ **3. মশার দংশন থেকে আত্মরক্ষা ঃ**

(i) **মশারি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ঃ** রাত্রিকালে নিয়মিত মশারি টাঙিয়ে ঘুমোনো আবশ্যক।

(ii) **মশা প্রতিরোধী জাল ব্যবহার ঃ** দরজা ও জানালায় মশা প্রতিরোধী জাল লাগালে বাড়িতে মশা ঢুকতে পারে না।

(iii) **মশা বিকর্ষণকারী (Repellent) রাসায়নিক ব্যবহার ঃ** ক্রিম, ধোঁয়া বা কোনো উদ্‌বায়ী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করলে মানুষের দেহ থেকে মশা দূরে থাকে। এই পদার্থগুলি হল—ডায়ামিথাইল টল্যুমাইড, ইন্ডালোন, ডাইমিথাইল থ্যালেট, প্রলেথ্রিন ইত্যাদি।

## ✪ 3.6. কয়েকটি মশাবাহিত রোগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ✪ (Comment on some Mosquito borne Diseases)

### ▲ A. এনকেফালাইটিস (Encephalitis) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ভাইরাস ঘটিত যে রোগ ঘোড়া বা গৃহপালিত কোনো পশুদেহ থেকে মশা দিয়ে বাহিত হয়ে প্রধানত মানুষের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে, ফলে প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায় তাকে এনকেফালাইটিস বলে।**

(b) **এনকেফালাইটিসের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causative organism of encephalitis diseases) ঃ**

(i) ওয়েস্টার্ন ইকুয়াইন এনকেফালাইটিস্ ভাইরাস (WEE ভাইরাস)

(ii) ইস্টার্ন ইকুয়াইন এনকেফালাইটিস্ ভাইরাস (EEE ভাইরাস)

(iii) সেন্ট লুই এনকেফালাইটিস্ ভাইরাস (SLE ভাইরাস)

এছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এনকেফালাইটিস রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসটির নাম হল—জাপানি B-ভাইরাস।

(c) **এনকেফালাইটিস সংক্রমণ (Mode of infection of Encephalitis) ঃ**

সাধারণত এনকেফালাইটিস্ ভাইরাস ঘোড়া বা কোনো বৃহদাকার গৃহপালিত পশুর দেহে বাস করে। এইসব প্রাণীর দেহ থেকে কিউলেক্স বা এডিস মশকি এই রোগজীবাণু মানুষের দেহে সংক্রামিত করে।

(d) **এনকেফালাইটিসের লক্ষণ (Symptoms of Encephalitis) ঃ**

1. এই রোগের ফলে মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়।
2. এর ফলে প্রবল জ্বর, মাথাব্যাথা, ঘুমঘুম ভাব, বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।
3. আক্রান্ত হওয়ার তিনদিন পরে রোগীর দেহের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় এবং রোগী অচৈতন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে 'কোমা' (Coma) দশায় উপনীত হয়।

(e) **রোগ প্রতিরোধ (Prevention of disease) ঃ**

1. মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিধন।
2. গৃহপালিত পশুরা যাতে আক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
3. মানুষের বাসস্থান পশুর বাসস্থানের অনেক দূরে করতে হবে।
4. ভাইরাস প্রতিরোধী ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

### ▲ B. মেনিন্‌জাইটিস (Meningitis) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : মস্তিষ্কের আবরণী বা মেনিনজেস (Meninges) অঞ্চলে জীবাণু সংক্রামিত যে রোগ হওয়ার ফলে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের প্রদাহ হয় এবং রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাকে মেনিনজাইটিস বলে।**

(b) **রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু :** মেনিনজাইটিস্ রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস হতে পারে।

(i) **ব্যাকটেরিয়া**—*নিসেরিয়া মেনিঞ্জাইটিডিস্* (*Neisseria meningitidis*) এবং *স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি* (*Streptococcus pneumoniae*)।

(ii) **ভাইরাস**—*হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস* (*Herpes simplex virus*—HSV), আরবোভাইরাস (Arbovirus), এন্‌টেরো ভাইরাস (Enterovirus)।

(c) **রোগের লক্ষণ :** 1. এই রোগ হলে মানুষের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণী মেনিনজেস-এর প্রদাহ হয়। 2. এর ফলে প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, বমি হয় ও ঘাড় বা গ্রীবা শক্ত হয়ে যায়। 3. কয়েকদিনের মধ্যে রোগী 'কোমা' অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

(d) **রোগ সংক্রমণ (Mode of infection of disease) :** ব্যাকটেরিয়া ও ভাসরাস ঘটিত এই রোগ সাধারণত বায়ু, জল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। কোনো কোনো মশার দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়।

(e) **রোগ প্রতিরোধ (Prevention of disease) :** জল ও খাদ্যবস্তু যাতে দূষিত না হয় তার জন্য কাশি, হাঁচি, মলমূত্র ত্যাগ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করা উচিত। মশা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

### ▲ C. স্লিপিং সিক্‌নেস বা ট্রাইপ্যানোসোমিয়েসিস্ রোগ (Sleeping sickness or Trypanosomiasis disease) :

চিত্র 3.28 : একটি ট্রাইপ্যানোজোমা পরজীবীর বহির্গঠনের চিত্ররূপ।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে যখন একপ্রকার ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী পরজীবী *ট্রাইপ্যানোসোমা* আক্রমণ করে তখনই যে রোগসৃষ্টি হয় তাকে স্লিপিং সিক্‌নেস বা ট্রাইপ্যানোসোমিয়েসিস্ রোগ বলে।**

(b) **পোষক (Host) :** এই পরজীবীর জীবনচক্র দুটি ভিন্ন পোষকের দেহে সমাপ্ত হয়, যেমন—(i) **মেরুদণ্ডী পোষক** (মুখ্য বা নির্দিষ্ট পোষক) হল মানুষ, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু। (ii) **অমেরুদণ্ডী পোষক** (গৌণ পোষক) হল একপ্রকার পতঙ্গ—সেট্‌সি মাছি (Tsetse fly) যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল—*গ্লসিনা প্যালপালিস* (*Glossina palpalis*), *জি. টাকিনয়েডস্* (*G. tachinoides*), *জি. প্যালিডিপস্* (*G. pallidipes*) ইত্যাদি।

চিত্র 3.29 : মানুষের রক্ত থেকে সেটসি মাছি ট্রাইপ্যানোসোমা জীবাণু গ্রহণ করছে।

চিত্র 3.30 : মানুষ ও মশার দেহে *T. brucei*-এর বিভিন্ন দশা।

(c) **রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causative organism) :** এই রোগ-সৃষ্টিকারী ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্য প্রাণী জীবাণুর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল—*ট্রাইপ্যানোসোমা ব্রুসি গ্যাম্বিয়েনসি* (*Trypanosoma brucei gambiense*) এবং *ট্রাইপ্যানোসোমা ব্রুসি রোডেসিয়েনসি* (*Trypanosoma brucei rhodesiense*) নামে দুটি উপপ্রজাতি।

(d) **রোগ সংক্রমণ (Mode of Infection)** ঃ এই পরজীবী মানুষের রক্তে বসবাস করে এবং সেট্‌সি মাছির মাধ্যমে আক্রান্ত মানুষের কাছ থেকে সুস্থ মানুষকে সংক্রামিত করে। এছাড়া সেট্‌সি মাছি (*Glossina*) এক মেরুদণ্ডী পোষক থেকে অন্য পোষকে এই পরজীবীকেস্থানান্তরিত করে।

(e) **রোগের লক্ষণ** ঃ এই রোগের লক্ষণ হিসাবে লসিকা গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং জ্বর হয়। এই সঙ্গে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে পরজীবী প্রাণী স্নায়ুতন্ত্রকেআক্রমণ করলে মানুষ ঘুমন্ত দশা প্রাপ্ত হয় এবং পেশির কম্পন চলতে থাকে। রক্তাল্পতা, এডিমা, চোখে জল জমা, জ্বর ইত্যাদি দেখা যায়। পরজীবী সংক্রমণের 15 দিনের মধ্যে ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ইত্যাদি প্রাণীগুলি অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গযুক্ত হয় এবং পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হয় ও প্রাণীটি মারা যায়। মানুষ ট্রাইপ্যানোসোমা আক্রান্ত হলে সংক্রমণ স্থলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। পরজীবী প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে লিম্ফ নোডগুলি ফুলে যায়। যখন *T. b. gambiense* কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে মানুষ তখন মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়। এর ফলে জিভ হাত ও ঘাড়ের কম্পন হয় এবং অবশেষে পক্ষাঘাত হয় ও ঘুম বেড়ে যায়। রোগী খেতে খেতে বা দাঁড়িয়ে থাকাকালীন ঘুমিয়ে পড়ে। সবশেষে কোমা ও মৃত্যু ঘটে।

(f) **রোগ প্রতিরোধ (Prevention of disease)** ঃ 1. নেট ব্যবহার করে সেটসি মাছি প্রতিরোধ করা উচিত। 2. সেটসি মাছির প্রজনন স্থল করা প্রয়োজন। 3. রোগ প্রতিরোধী ঔষধ, যেমন—ট্রাইপারসামাইড, আর্সেনিক্যাল, সুরামাইন ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

● *ট্রাইপ্যানোসোমার* জীবনচক্র (**Life cycle of *Trypanosoma***) ঃ

1. *ট্রাইপ্যানোসোমার* মেটাসাইক্লিক দশা (Metacyclic stage) হল মানুষকে সংক্রমণকারী দশা। সেটসি মাছি দংশনের সঙ্গে এই দশা মানুষের রক্তে প্রবেশ করে।

চিত্র 3.31 ঃ ট্রাইপ্যানোসোমা পরজীবীর জীবনচক্র।

2. মেটাসাইক্লিক দশা এর পরে শ্লেনডার দশা (Slender form) ও অন্তর্বর্তীকালীন দশা (Internediate form) পেরিয়ে ছোটো স্ট্যাম্পি দশায় (Short stumpy form) পরিণত হয়। এই দশা সেটসি মাছির দেহে সংক্রমিত হয়।

3. সেটসি মাছির মধ্যান্ত্রে স্টাম্পি দশাটি ট্রাইপোম্যাস্টিগোট দশায় পরিণত হয় এবং এর পরে লালাগ্রন্থিতে গিয়ে এপিম্যাস্টিগোট (epimastigote) ও মেটাসাইক্লিক (Metacyclic) দশায় পরিণত হয়।

● **ট্রাইপ্যানোসোমিয়েসিস্-এর রোগনিরূপণ বা প্যাথোলজি (Pathology of Trypanosomiasis) ঃ** ট্রাইপ্যানোসোমা মেরুদণ্ডী প্রাণী পোষকের রক্তে, লসিকা বাহতে, প্লিহায় ও সেরিব্রোপাইন্যাল তরলে বসবাস করে। এরা রক্তকোশে প্রবেশ করে না কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজক কলায় অবস্থান করে। এই পরজীবী পোষকের লসিকা বাহে এবং মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

## ▲ D. কালা জ্বর বা ভিসেরাল লিশম্যানিয়েসিস্ (Kala-azar or Visceral Leishmaniasis) ঃ
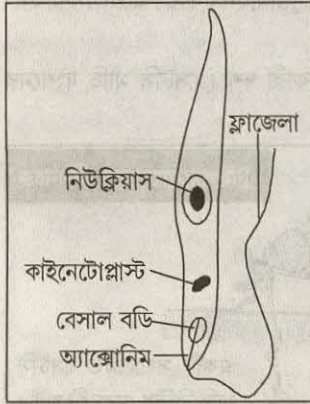
চিত্র 3.32 ঃ একটি লিসম্যানিয়া পরজীবীর বহির্গঠনের চিত্ররূপ।

কালা জ্বর (Kala-azar) কথাটি দুটি ভারতীয় শব্দ থেকে এসেছে, যেমন—কালা (Kala) অর্থাৎ **কালো** এবং আজার (azar) অর্থাৎ **জ্বর**। এই রোগের নাম কালাজ্বর দেওয়া হয়েছে কারণ, এই রোগ হলে রোগীর দেহত্বক কালো হয়ে যায়। অন্য দিক থেকে কালা শব্দের অর্থ 'মারণাত্মক' এবং কালাজ্বর তাই একটি ভয়ংকর মারণাত্মক রোগ হিসাবে গণ্য হয়।

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে মারণাত্মক ভয়ংকর রোগ *লিশম্যানিয়া ডোনোভানি* নামে ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে ঘটে এবং প্রবল জ্বরসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায় তাকে কালাজ্বর বা ভিসেরাল লিশম্যানিয়েসিস্ বলে।**

(b) **রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু** ঃ ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী (Flagellate protozoa) অন্তঃকোশীয় পরজীবী *লিশম্যানিয়া ডোনোভানি* (*Leishmania donovani*) মানুষের কালাজ্বর রোগ সৃষ্টি করে। *লিশম্যানিয়া* (*Leishmania*) মানুষের এন্ডোথেলিয়াম তন্ত্রে বাস করে। কুকুর লিশম্যানিয়ার ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। *ফ্লেবোটোমাস* (*Phlebotomus*) নামে একপ্রকার রক্তচোষক মাছি (Sand fly) এই রোগ জীবাণুর বাহক হিসাবে কাজ করে এবং এরা রোগাক্রান্ত মানুষের দেহ থেকে রোগজীবাণু সুস্থ মানুষের দেহে ছড়িয়ে দেয়।

● **লিশম্যানিয়ার জীবনচক্র (Life cycle of *Leishmania*) ঃ**

1. লিশম্যানিয়ার জীবনচক্রে দুটি দশা দেখা যায়। (a) আম্যাস্টিগোট (Amastigote) দশা মানুষের দেহে থাকে। (b) প্রোম্যাস্টিগোট (Promastigote) দশা বালিমাছি (Sand fly)-তে দেখা যায়।

2. আম্যাস্টিগোট দশা মানুষের রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের কোশে বসবাস করে এবং বহুবার দ্বিবিভাজন সম্পন্ন করে। এর ফলে যখন একটি কোশে 50-200টি পরজীবী সৃষ্টি হয় তখন পোষকের কোশটি ফেটে যায় এবং নতুন কোশ আক্রান্ত হয়।

3. কিছু মুক্ত আম্যাস্টিগোট দশা রক্তপ্রবাহে চলে আসে এবং রক্তের নিউট্রোফিল ও মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় এদের গ্রাস করে ফেলে। রক্ত চোষক পতঙ্গ রক্তপান করার সময় এই আম্যাস্টিগোট দশাগুলি গ্রহণ করে।

4. কোনো কোনো বালি মাছিতে আম্যাস্টিগোট দশা প্রোম্যাস্টিগোট দশায় পরিণত হয় যা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অসংখ্য পরজীবী গঠন করে। পরজীবীগুলি বালিমাছির গলবিল বা মুখগহ্বরের কাছে সমবেত হয়।

5. বালি মাছি এই অবস্থায় মানুষকে দংশন করলে লিশম্যানিয়া পরজীবী মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়।

● **লিশম্যানিয়ার প্যাথোজেনেসিটি (Pathogenecity of *Leishmania*) ঃ**

1. লিশম্যানিয়া সংক্রমণের সাধারণত 3-6 মাসের মধ্যে রোগীর জ্বর আসে, প্লিহার আয়তন বেড়ে যায়, যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগীর ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং দানাযুক্ত হয়। আফ্রিকার লিশম্যানিয়া রোগীদের ত্বকে ওয়ার্ট (Wart) দেখা যায়। লিশম্যানিয়া রোগ প্রবল হলে আমাশয়, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে যক্ষ্মা, ও অন্যান্য রোগ হয়।

(c) **রোগের লক্ষণ ঃ** প্রথম দিকে রোগীর অল্প জ্বর হয় এবং পরে প্রবল জ্বরের সঙ্গে রক্তাল্পতা, যকৃৎ ও প্লিহার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উদর স্ফীত হয়, বমি হয় এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে।
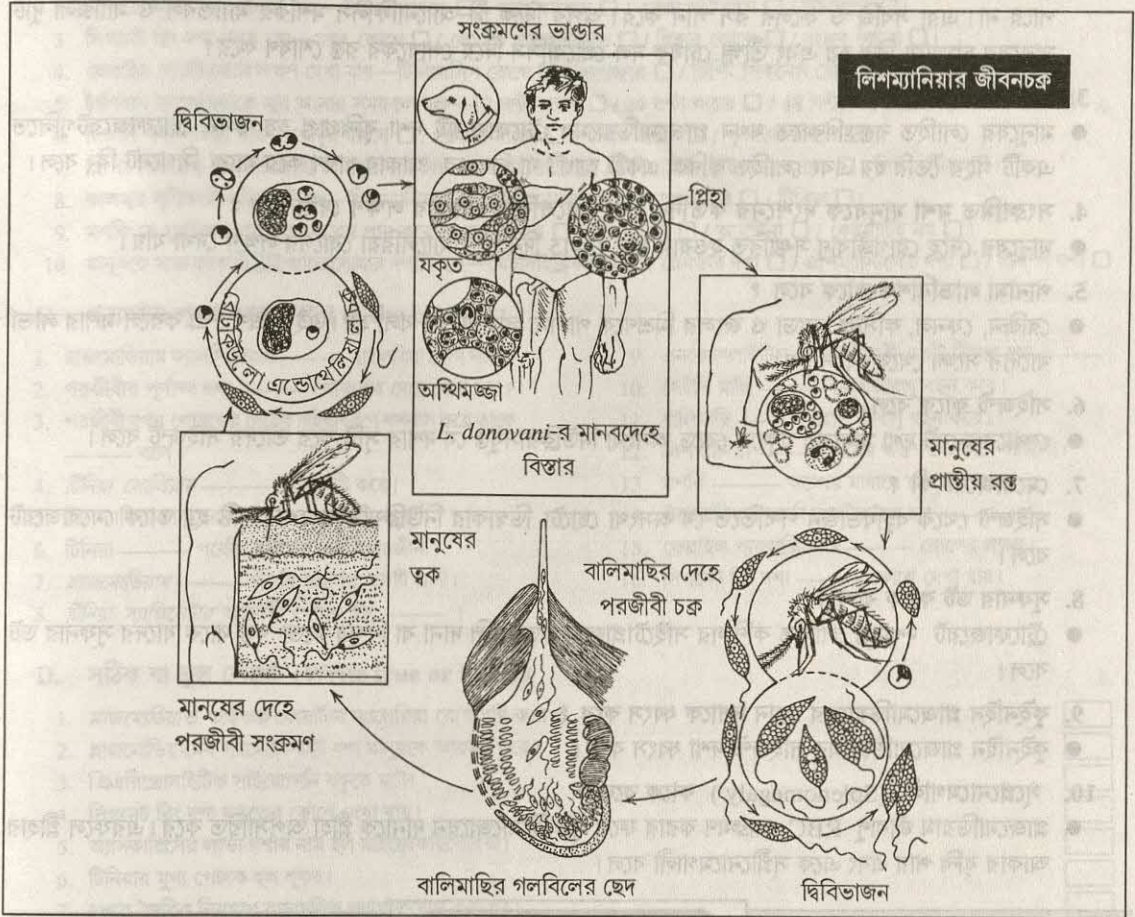
চিত্র 3.33 ঃ মানুষের দেহে ও বালিমাছিতে *L. donovani*-র বিভিন্ন দশার পরিস্ফুরণ।

## ● ডেঙ্গু রোগ ও তার লক্ষণ ●

ভাইরাসঘটিত যে রোগের জীবাণু এডিস মশা দ্বারা বাহিত হয়ে মানুষের জ্বর, মাথা ও পেশির যন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ ঘটায় তাকে **ডেঙ্গু রোগ** বলে। বিভিন্ন প্রকার **আরবোভাইরাস** (Arbovirus) এই রোগ সৃষ্টি করে। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত মানুষের প্রবল জ্বরের সঙ্গে মাথা, পেশি ও অস্থি সন্ধিতে যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। ত্বকে র‍্যাশ বেরোয়।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু মানুষের দেহে কোথায় পাওয়া যায় ?**

● ফাইলেরিয়া রোগ জীবাণু অর্থাৎ *উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি* মানুষের লসিকা নালি ও লসিকা গ্রন্থিতে পাওয়া যায়।

**2. একটি পুরুষ ও স্ত্রী অ্যানেফিলিস মশার খাদ্যাভাসের পার্থক্য কী ?**

● পুরুষ মশকের ম্যাক্সিলারি পাল্পের শেষাংশ ভোঁতা গদার মতো এবং ম্যান্ডিবল না থাকায় পোষকের রক্ত শোষণ করতে পারে না। এরা সবজি ও ফলের রস পান করে। অপর দিকে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশকির ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা দুটি মানুষের চামড়ায় বিন্ধ হয় এবং তীক্ষ্ম চোষক নল প্রোবোসিস দিয়ে পোষকের রক্ত শোষণ করে।

**3. সিগনেট রিং কী ?**

● মানুষের লোহিত রক্তকণিকাতে যখন প্লাজমোডিয়ামের ট্রোফোজয়েই দশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ট্রোফোজয়েটগুলিতে একটি গহ্বর তৈরি হয় এবং লোহিত কণিকা একটি আংটি বা রিং এর আকার ধারণ করে যাকে সিগনেট রিং বলে।

**4. সংক্রামিত মশা মানুষকে দংশনের কতদিন পরে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দেয় ঃ**

● মানুষের দেহে রোগজীবাণু সঞ্চারিত হওয়ার প্রায় 12–15 দিন পরে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

**5. পানামা লার্ভানাশক কাকে বলে ?**

● রেজিন, ফেনল, কস্টিক সোডা ও জলের মিশ্রণকে পানামা লার্ভানাশক বলা হয়। এই মিশ্রণ স্প্রে করলে মশার লার্ভা খাদ্যের সঙ্গে খেয়ে ধ্বংস হয়।

**6. সাইজন্ট কাকে বলে ?**

● স্পোরোজয়েট দশা মানুষের যকৃতে বেড়ে অসংখ্য নিউক্লিয়াসযুক্ত যে দশার সৃষ্টি করে তাদের সাইজন্ট বলে।

**7. মেরোজয়েট কী ?**

● সাইজন্ট থেকে বহুবিভাজন পদ্ধতিতে যে অসংখ্য ছোটো ডিম্বাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত দশার সৃষ্টি হয় তাকে মেরোজয়েট বলে।

**8. সুফনার ডট কাকে বলে ?**

● ট্রোফোজয়েট দশাযুক্ত লোহিত কণিকার সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি দানা বা বিন্দুর মতো বস্তু থাকে যাদের সুফনার ডট বলে।

**9. কুইনাইন প্লাজমোডিয়ামের কোন দশাকে ধ্বংস করে ?**

● কুইনাইন প্লাজমোডিয়ামের সাইজন্ট দশা ধ্বংস করে।

**10. স্প্লেনোমেগালী (Splenomegaly) কাকে বলে ?**

● প্লাজমোডিয়াম জীবাণু RBC আক্রমণ করার ফলে সৃষ্ট হিমোজোয়েন দানাকে প্লীহা অপসারিত করে। এরফলে প্লীহার আকার বৃদ্ধি পায় এবং একে স্প্লীনোমেগালী বলে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer of the following questions in one word) ঃ**

1. পরজীবীর পূর্ণাঙ্গ দশা কোন্ পোষকের দেহে দেখা যায় ?
2. পরজীবীর অপরিণত দশা কোন্ পোষকের দেহে দেখা যায় ?
3. যেসব প্রাণী পরজীবীর রোগজীবাণু বহন করে তাদের কী বলে ?
4. প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম কোন্ রোগ সৃষ্টি করে ?
5. টার্শিয়ান ম্যালেরিয়ায় সাধারণত কত ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে ?
6. কোয়ার্টান ম্যালেরিয়ায় সাধারণত কত ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে ?
7. প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি মানুষের কী রোগ সৃষ্টি করে ?
8. প্লাজমোডিয়ামের কোন্ দশা মানুষের যকৃৎ কোশকে আক্রমণ করে ?
9. প্লাজমোডিয়ামের কোন্ দশা অ্যানোফিলিস মশকিকে আক্রমণ করে ?
10. ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের রক্তে কোন্ রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায় ?
11. উচেরেরিয়া পরজীবী কোন্ রোগ সৃষ্টি করে ?
12. উচেরেরিয়া পরজীবীর লার্ভা দশাটির নাম কী ?
13. অ্যাসকারিস্ পরজীবীর আক্রমণে মানুষের কোন্ রোগ সৃষ্টি হয় ?
14. পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস মানুষের কোথায় অবস্থান করে ?
15. সিস্টিসারকাস সেলুলোজি কোথায় পাওয়া যায় ?
16. সিস্টিসারকাস বোভিস কোথায় পাওয়া যায় ?
17. কোন্ পরজীবীর ব্লাডার ওয়ার্ম সৃষ্টি হয় ?
18. কোন্ মশার ডিমে ভেলক থাকে ?
19. এনকেফালাইটিস রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম লেখো।
20. ট্রাইপ্যানোজোমা পরজীবীর বাহক প্রাণীর নাম কী ?
21. কালাজ্বরসৃষ্টিকারী রোগজীবাণুর নাম লেখো।

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) :**

1. ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুটির নাম হল—*P. vivax* □ / *P. faciparum* □ / *P. ovale* □ / *P. malarie* □
2. স্পোরোজয়েট দশা পাওয়া যায়—উচেরেরিয়াতে □ / অ্যাসকারিসে □ / প্লাজমোডিয়ামে □ / টিনিয়াতে □।
3. সিগনেট রিং দশা দেখা যায়—যকৃৎ কোশে □ / লোহিত রক্ত কণিকাতে □ / প্লিহার কোশে □ / বৃক্কের কোশে □।
4. ফেব্রাইল পারক্সিজোম লক্ষণ দেখা যায়—টিনিয়েসিস রোগে □ / কালাজ্বরে □ / স্লিপিং সিকনেস রোগে □ / ম্যালেরিয়া রোগে □।
5. টার্শিয়ান ম্যালেরিয়াতে জ্বর আসার সময়কল হল—12 ঘণ্টা অন্তর □ / 24 ঘণ্টা অন্তর □ / 48 ঘণ্টা অন্তর □ / 72 ঘণ্টা অন্তর □।
6. মিজলি পর্ক পাওয়া যায়—গোবুর মাংসে □ / ভেড়ার মাংসে □ / গাধার মাংসে □ / শূকরের মাংসে □।
7. স্লিপিং সিকনেস রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম হল—প্লাজমোডিয়াম □ / টিনিয়া □ / ট্রাইপ্যানোসোমা □ / লিশম্যানিয়া □।
8. কালজ্বর সৃষ্টিকারী জীবাণুটি হল—লিশম্যানিয়া □ / ট্রাইপ্যানোসোমা □ / অ্যাসকারিস □ / টিনিয়া □।
9. মশকি যে মুখউপাঙ্গের সাহায্যে রক্ত পান করে তা হল—পাল্প □ / প্রোবোসিস্ □ / অ্যান্টেনা □ / কোনোটিই নয় □।
10. মানুষকে সংক্রমণকারী ট্রাইপ্যানোসোমার দশাটি হল—মেটাসাইক্লিক দশা □ / স্লেনডার দশা □ / এপিম্যাস্টিগোট দশা □ / স্টাম্পি দশা □

**C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :**

1. প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম ——— ম্যালেরিয়া রোগ ঘটায়।
2. পরজীবীর পূর্ণাঙ্গ দশা ——— পোষকের দেহে দেখা যায়।
3. পরজীবী যখন পোষকের দেহের বহিরাবরণে বসবাস করে তাকে ——— বলে।
4. *টিনিয়া সোলিয়াম* ——— রোগ সৃষ্টি করে।
5. লিশম্যানিয়া মানুষের ——— রোগ সৃষ্টি করে।
6. টিনিয়া ——— পর্বের অন্তর্গত একটি পরজীবী।
7. *প্লাজমোডিয়াম* ——— পর্বের অন্তর্গত একটি প্রাণী।
8. *টিনিয়া স্যাজিনেটার* অন্তর্বর্তী পোষক হল ———।
9. এনকেফালাইটিস্ রোগসৃষ্টিকারী একটি জীবাণু হল ———।
10. সেটসি মাছি ——— রোগজীবাণু বহন করে।
11. বালিমাছি ——— রোগ জীবাণু বহন করে।
12. লিশম্যানিয়া ——— পর্বের অন্তর্গত একটি পরজীবী।
13. মশকি ——— অঙ্গের মাধ্যমে রক্ত পান করে।
14. উচেরেরিয়ার লার্ভা দশাটির নাম হল ———।
15. ফেব্রাইল পারঅক্সিজোম ——— রোগের লক্ষণ।
16. সিগনেট রিং দশা ——— কোশে দেখা যায়।

**D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :**

1. *প্লাজমোডিয়াভ ভাইভক্স* কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। □
2. প্লাজমোডিয়ামের গ্যামেটোসাইট দশা মানুষকে আক্রমণ করে। □
3. প্রিএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি যকৃতে ঘটে। □
4. সিগনেট রিং দশা যকৃতের কোশে দেখা যায়। □
5. অ্যাসকারিসের লার্ভা দশার নাম হল মাইক্রোফাইলেরিয়া। □
6. টিনিয়ার মুখ্য পোষক হল শূকর। □
7. মশার জৈবিক নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। □
8. কালাজ্বরের রোগজীবাণুর নাম হল ট্রাইপ্যানোসোমা। □
9. একধরনের ব্যাকটেরিয়া এনকেফালাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। □
11. বালিমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই ট্রাইপ্যানোসোমা রোগজীবাণু বহন করে। □

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম কোন্ রোগ সৃষ্টি করে ? এই রোগের লক্ষ্মণ কী ?
2. ফাইলেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো। এটি কোন্ পর্বের অন্তর্গত প্রাণী ?
3. সাধারণ গোলকৃমি কোন্ রোগ সৃষ্টি করে ? এই রোগের লক্ষ্মণ কী ?
4. এনকেফালাইটিস রোগসৃষ্টিকারী একটি জীবাণুর নাম লেখো। এই রোগের ফলে কী ঘটে ?
5. মেনিন্জাইটিস্ রোগসৃষ্টিকারী একটি জীবাণুর নাম লেখো। এই রোগের ফলে কী ঘটে ?
6. ফেব্রাইল পারক্সিজোম কী ?
7. মাইক্রোফাইলেরিয়া লার্ভার তাৎপর্য কী ?
8. কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া কী ?
9. অংকোস্ফিয়ার কী ?
10. অ্যাসকারিয়েসিসের লক্ষণগুলি লেখো।

11. সেটসি মাছির ভূমিকা বলো।
12. উচেরেরিয়ার সংক্রমণ পদ্ধতি লেখো।
13. সিস্টিসারকাস বোভিস কী ? এর তাৎপর্য লেখো।
14. স্লিপিং সিকনেস রোগের লক্ষণগুলি লেখো।
15. লিশম্যানিয়েসিস রোগের ফলে কী ঘটে ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।
2. পরজীবী ও পোষক কাকে বলে ?
3. ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো ও তার পর্বের নাম লেখো।
4. স্প্লিনোমেগালি (Splenomegaly) কাকে বলে ?
5. ফাইলেরিয়া রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
6. টিনিয়েসিস রোগের লক্ষণগুলি লেখো।
7. কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশার ডিমের বৈশিষ্ট্য লেখো।

### B. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. সিস্টিসারকাস সেলুলোজি; 2. ফেব্রাইল পারক্সিজোম; 3. মাইক্রোফাইব্রিল; 4. কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া; 5. ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া; 6. স্লিপিং সিকনেস; 7. মেনিঞ্জাইটিস; 8. কালাজ্বর; 9. ট্রাইপ্যানোসোমিয়েসিস; 10. টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া।

### C. পার্থক্য লেখো (Distinguish between the following) :

1. ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া; 2. কোয়ার্টান ও টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া; 3. কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশা; 4. মিজলি পর্ক ও মিজলি বিফ, 5. উত্তাপ দশা ও ঘর্ম দশা; 6. ক্লাসিক্যাল ও অকাল্ট ফাইলেরিয়েসিস্; 7. পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিস; 8. কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশার ডিম।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করো এবং এই রোগ দমনের বিভিন্ন উপায় লিপিবদ্ধ করো।
2. ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রমণ প্রক্রিয়া, রোগের লক্ষণ এবং এই রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি লেখো।
3. অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের লক্ষণ এবং এই রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় লিপিবদ্ধ করো।
4. টিনিয়েসিস্ রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন পথ ও এই রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি লেখো।
5. কিউলেক্স মশার জীবনবৃত্তান্ত চিত্রসহ বর্ণনা করো।
6. এনকেফালাইটিস, স্লিপিং সিকনেস ও কালাজ্বর রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

### B. নিম্নলিখিতগুলির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো (Draw the lebel diagram of the following) :

1. প্লাজমোডিয়ামের মনুষ্যচক্র অঙ্কন করে সব দশাগুলি চিহ্নিত করো।
2. টিনিয়া সোলিয়ামের জীবনচক্র অঙ্কন করে সব দশাগুলি চিহ্নিত করো।
3. অ্যাসকারিসের জীবনচক্র অঙ্কন করে সব দশাগুলি চিহ্নিত করো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি :



# কৃষি-প্রাণীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

## [ OUTLINE IDEA ABOUT AGRICULTURAL ZOOLOGY ]

### ➧ ভূমিকা (Introduction) :

আদিম যুগের মানুষের বন্য স্বভাব ছিল। তারা বনের ফল মূল, পশু ও পাখির কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত। কোনো স্থানের খাদ্য শেষ হয়ে গেলে অন্য স্থানে খাদ্য অন্বেষণে চলে যেত। এভাবে যাযাবর বৃত্তি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মানুষ ক্রমশ আগুনের আবিষ্কার করে তাকে ব্যবহার করতে শিখল এবং তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করার প্রবণতা দেখা দিল। এই সময় থেকে মানুষ তার খাদ্যশস্য ও খাদ্যপ্রাণীর উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে করে ক্রমশ উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে চাহিদামত উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করল। এভাবে বন্য মানুষ ক্রমশ সভ্য, গৃহী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষে পরিণত হ'ল।

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ (যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, বিভিন্ন প্রকার ডাল, সবজি ইত্যাদি) এবং মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদনকারী প্রাণী (যেমন—রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছ, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণী) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিপালন ও অধিকতর উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ করে তার অধিকতর চাহিদা পূরণ করেছে। উপরে লিখিত সমস্ত প্রাণী সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তাকেই **কৃষি-প্রাণীবিদ্যা** (Agricultural Zoology) বলা হয়। কৃষিতে উন্নতি করতে হলে কৃষিপ্রাণীবিদ্যার সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী।

## ✪ 4.1. কৃষি প্রাণীবিদ্যা (Agricultural Zoology) ✪

❖ **কৃষি-প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Agricultural Zoology) : বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীজ খাদ্যসম্ভারের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, প্রতিপালন, উৎকৃষ্ট মান বজায় রাখার চেষ্টা এবং ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের ক্ষতিকারক প্রাণী-পেস্ট (Pest) নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে কৃষি-প্রাণীবিদ্যা বলে।**

প্রাণীজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য কিছু প্রাণীর চাষ করা হয়, যেমন—মাছ, হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু, রেশমকীট, মৌমাছি, লাক্ষাকীট ইত্যাদি। আবার উদ্ভিদজাত শস্য উৎপাদনে ও সংরক্ষণে অন্তরায় প্রাণী যেমন—মাজরা পোকা, গন্ধি পোকা, লেদা পোকা, সিটোফিলাস এবং ইঁদুর ইত্যাদির দমন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। কৃষি-প্রাণীবিদ্যার এইসব বিষয়ের মধ্যে **মৎস্যচাষ** (Pisciculture) ও **ধানের কয়েকটি ক্ষতিকর পেস্ট** সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

## ✪ 4.2. অ্যাকোয়াকালচার—ফিশারি (Aquaculture—Fishery) ✪

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জলজ পরিবেশ মানুষের কাছে এক বিশাল সম্পদ। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী জলে বসবাস করে। এর মধ্যে বেশি কিছু জলজ জীব মানুষের কাছে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদরূপে দেখা দিয়েছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে এইসব জীবের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন করছে এবং এর ফলে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জলজ জীবের প্রতিপালনকেই এককথায় **অ্যাকোয়াকালচার** বলা যায়।

❖ **অ্যাকোয়াকালচারের সংজ্ঞা (Definition of Aquaculture) : যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিপালন, উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও সুব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাকোয়াকালচার বলে।**

অ্যাকোয়াকালচারের সামগ্রিক অর্থ হল জলজ উদ্ভিদ, যেমন—শৈবাল, ফাইটোপ্লাঙ্কটন ইত্যাদি এবং জলজ প্রাণী, যেমন—চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, মুক্তা ঝিনুক, মাছ, ব্যাং, কচ্ছপ, কুমির, হাঁস, তিমি, শীল ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন।

অ্যাকোয়াকালচারের মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালনকে **ফিশারি (Fishery) বলে**। আবার ফিশারির মধ্যে শুধু মাছের প্রতিপালনকে **মৎস্যচাষ বা পিসিকালচার (Pisciculture) বলে**।

❖ **ফিশারির সংজ্ঞা (Definition of Fishery) : যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ, বাণিজ্যিক মূল্যযুক্ত জলজ প্রাণীর প্রতিপালন, বৃদ্ধি, শিকার বা আহরণ এবং সংরক্ষণ করা হয় তাকে ফিশারি বলে।**

❖ **মৎস্যচাষের সংজ্ঞা (Definition of Pisciculture. Gr, *Pisces* = মৎস্য; Culture = চাষ) : যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছের প্রতিপালন, উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ দমন ইত্যাদি করা হয় তাকে মৎস্যচাষ বলে।**

সুতরাং সামগ্রিক অর্থে ফিশারি (Fishery) একটি বৃহৎ বিষয় যার মধ্যে মাছ, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণীর চাষ অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে পোনা মাছের বিভিন্ন প্রকার চাষ বিষয়ে আমাদের আলোচনা এখানে সীমাবদ্ধ রাখব।

❖ **পোনামাছের চাষের সংজ্ঞা (Definition of Carp culture) : রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা ইত্যাদি কার্প জাতীয় মাছের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রোগ দমন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে একত্রে পোনামাছের চাষ বলে।**

❖ **ম্যারিকালচারের সংজ্ঞা (Definition of Mariculture) : সমুদ্রে বসবাসকারী, বিভিন্ন জীব যেমন—খাদ্য ঝিনুক, মুক্তা ঝিনুক, লবস্টার, কাঁকড়া, ঈল, সার্ডিন , সামুদ্রিক স্পঞ্জ, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণী ও কিছু উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিপালনকে ম্যারিকালচার বলে।**

### ▲ কার্পের সংজ্ঞা ও কার্পের প্রকারভেদ (Definition and Types of Carp):

❖ (a) **কার্পের সংজ্ঞা (Definition of Carp) : স্বাদুজলে বসবাসকারী অস্থি বিশিষ্ট যে মাছের মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসঅঙ্গ ও চোয়ালে দাঁত থাকে না এবং দেহগহ্বরে পটকা থাকে তাদের কার্প বলে।**

**উদাহরণ**—শ্রেণি অস্টিকথিস্ (Osteichthyes) ও বর্গ সাইপ্রিনিফরমিস (Cypriniformes) এর অন্তর্গত সমস্ত মাছই কার্প (Carp) জাতীয়।

(b) **কার্পের প্রকারভেদ (Types of Carp) :** কার্প প্রধানত দু'প্রকারের (বড়ো বা ছোটো আকার অনুযায়ী), যেমন— মেজর কার্প ও মাইনর কার্প।

➤ **মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition of Major Carp and Minor Carp with example) :**

1. **মেজর কার্প** (Major Carp) **: যে কার্পের আকার বৃহৎ হয় এবং যাদের বৃদ্ধিহার বেশি তাদের মেজর কার্প বলে। উদাহরণ**— রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি। এই মাছগুলি বড়ো জলাশয়, খাল, বিল, বড়ো পুকুর ও নদীতে বসবাস করে।

**চিত্র 4.1 :** কয়েকটি ভারতীয় মেজর কার্প।

2. **মাইনর কার্প** (Minor Carp) **: যে কার্পের আকার ছোটো হয় এবং যাদের বৃদ্ধিহার অনেক কম তাদের মাইনর কার্প বা ছোটো কার্প বলে। উদাহরণ**—সরল পুঁটি, বাটা, সাধারণ পুঁটি ইত্যাদি। এই মাছগুলিও বড়ো জলাশয়ে ও খাল, বিলে পাওয়া যায়।

● **কয়েকটি মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের সাধারণ নাম ও বিজ্ঞানসম্মত নাম (Common name and Scientific name of some Carps) :**

| মেজর কার্প (Major carp) | | মাইনর কার্প (Minor carp) | |
|---|---|---|---|
| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
| (i) রুই | *Labeo rohita* (*লেবিও রোহিটা*) | (i) বাটা | *Labeo bata* (*লেবিও বাটা*) |
| (ii) কাতলা | *Catla catla* (*কাটলা কাটলা*) | (ii) সরল পুঁটি | *Puntius sarana* (*পুঁটিয়াস সারানা*) |
| (iii) মৃগেল | *Cirrhinus mrigala* (*সিরহিনাস মৃগালা*) | (iii) সাধারণ পুঁটি | *Puntius ticto* (*পুঁটিয়াস টিকটো*) |
| (iv) কালবোস | *Labeo calbasu* (*লেবিও কালবাসু*) | | |

● **মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের তুলনা (Comparison between Major carp and Minor carp)**

| মেজর কার্প | মাইনর কার্প |
|---|---|
| 1. এই মাছ বৃহদাকার এবং লম্বায় এগুলি প্রায় 1·0 মিটার হয়। | 1. এই মাছ আকারে অনেক ছোটো এবং লম্বায় এগুলি প্রায় 6-15 সেমি হয়। |
| 2. দেহের বৃদ্ধিহার অনেক বেশি। | 2. মেজর কার্পের তুলনায় এদের দেহের বৃদ্ধিহার অনেক কম। |
| 3. উদাহরণ—রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছ। | 3. উদাহরণ—বাটা, পুঁটি, সরপুঁটি ইত্যাদি মাছ। |

## ▲ দেশি ও বিদেশি মাছের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা ও তাদের উদাহরণ (Brief idea about Endemic and Exotic fish with example)

### ◎ দেশি মাছ (Endemic fish) :

❖ (a) **সংজ্ঞা** : যে সব মাছের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ তাদের এন্ডেমিক বা দেশি মাছ বলে।

(b) **উদাহরণ**—রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।

প্রয়োজনের তুলনায় দেশি মাছের উৎপাদন অপ্রতুল হওয়ার জন্য চীন, জাপান ইত্যাদি দেশ থেকে কিছু মাছ ভারতবর্ষে চাষ করা হয়। এই সব বিদেশি মাছের বৃদ্ধিহার দেশি মাছের তুলনায় অনেক বেশি এবং অনেক সহজে এদের চাষ করা যায়।

চিত্র 4.2 : কয়েকটি বিদেশি মেজর কার্প।

### ◎ বিদেশি মাছ (Exotic fish) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—যেসব মাছের আদি বাসস্থান বিদেশে, কিন্তু এখন ভারতবর্ষে তাদের চাষ করা হয় সেইসব মাছকে বিদেশি মাছ বলে।**

(b) উদাহরণ—সাইপ্রিনাস কার্প, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প ইত্যাদি।
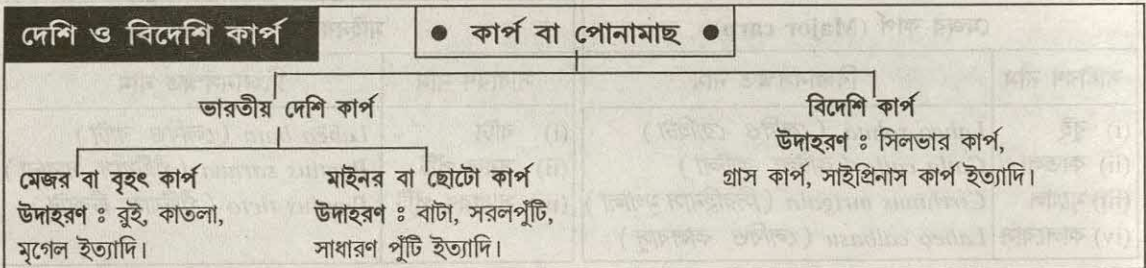
### ➤ ভারতীয় চারটি মেজর কার্পের বাসস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Habitat and characteristics of four Indian Major Carps) :

| কার্পের নাম | বাসস্থান | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| 1. রুই মাছ | এরা বড়ো পুকুর, খাল, বিল, নদী ইত্যাদির স্বাদু জলে বসবাস করে এবং এরা জলের মধ্যতলে অবস্থান করে বলে এদের **কলাম ফিডার** (Column feeder) বলে। | (i) দেহের দু'দিক সরু, মাথাটি ত্রিকোণাকার, মুখছিদ্রটি মাথার সামনের দিকে থাকে।<br>(ii) মুখছিদ্রের কাছে বারবেল থাকে।<br>(iii) পুচ্ছ পাখনা সমান দু'ভাগে বিভক্ত।<br>(iv) দেহের রং কালচে রুপালি বা লালচে। |

| কার্পের নাম | বাসস্থান | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| 2. কাতলা মাছ | এই মাছ বড়ো পুকুর, খাল, বিল, নদী ইত্যাদির স্বাদুজলে বসবাস করে এবং এরা জলের উপর তলের কাছে থাকে বলে এদের **সারফেস ফিডার** (Surface feeder) বলে। | (i) দেহ বেশ চওড়া, মাথাটি বেশ বড়ো এবং মুখছিদ্রটিও বেশ বড়ো ও উপরের দিকে খোলা। (ii) বারবেল থাকে না। (iii) পুচ্ছ পাখনা সমানভাবে দ্বি-বিভক্ত। (iv) দেহের রং রুপালি। |
| 3. মৃগেল মাছ | রুই বা কাতলার মতো একই রকম জলাশয়ে এরা বসবাস করে। এরা জলের একেবারে নীচের তলে অবস্থান করে বলে এদের **বটম ফিডার** (Bottom feeder) বলে। | (i) দেহ নলাকৃতি সরু, মাথাটি ছোটো ও ত্রিকোণাকার, মুখছিদ্রটি ছোটো ও নীচের দিকে খোলা। (ii) বারবেলগুলি খুব ছোটো। (iii) পুচ্ছ পাখনা সমানভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। (iv) দেহের রং রুপালি। |
| 4. কালবোস মাছ | রুই বা কাতলার মতো একই রকম জলাশয়ে এরা বসবাস করে। এরা জলের একেবারে নীচের তলে কাদা ও পাঁকের কাছে অবস্থান করে বলে এদেরও **বটম ফিডার** (Bottom feeder) বলে। | (i) দেহ কাতলার মতো চওড়া কিন্তু মাথাটি ছোটো। মুখছিদ্রটি মাথার নীচের দিকে মুক্ত হয়। (ii) বারবেলগুলি বড়ো ও স্পষ্ট। (iii) পুচ্ছ পাখনা সমানভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। (iv) দেহের রং কালো বা ধূসর। |

● **কয়েকটি বিদেশি কার্প জাতীয় মাছ (Some Exotic Carps) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | বাসস্থান |
|---|---|---|
| (i) সিলভার কার্প | *Hypophthalmicthys molitrix* (*হাইপোপথ্যালমিকথিস মলিট্রিক্স*) | চীন |
| (ii) আমেরিকান রুই বা সাইপ্রিনাস | *Cyprinus carpio* (*সাইপ্রিনাস কার্পিও*) | চীন, উঃপূঃ এশিয়া |
| (iii) গ্রাস কার্প বা ঘেসো রুই | *Ctenopharyngodon idellus* (*টেনোফ্যারিংগোডন ইডেলাস*) | চীন |
| (iv) তেলাপিয়া | *Oreochromis mossambica* (*ওরিয়োক্রোমিস মোজাম্বিকা*) | আফ্রিকা |

## ◎ জিওল মাছ (Jeol fish) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ যে সব মাছের বায়বীয় শ্বসনের উপযুক্ত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে এবং যারা স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে বায়বীয় পরিবেশে বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে পারে তাদের প্রধানত জিওল মাছ (Jeol fish) বলে।** এইসব মাছ প্রধানত ছোটো জলাশয়ে ও কচুরিপানাযুক্ত ডোবা বা পুকুরে জন্মায়। এখানে কয়েকটি জিওল মাছের সাধারণ নাম ও বিজ্ঞানসম্মত নাম দেওয়া হ'ল—

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|---|
| (i) কই | *Anabas testudineus* | (iv) শোল | *Channa striatus* |
| (ii) মাগুর | *Clarias batrachus* | (v) ল্যাটা | *Channa punctatus* |
| (iii) শিঙি | *Heteropneustis fossilis* | (vi) চিতল | *Notopterus chitala* |

## ▲ বিভিন্ন প্রকার জলে বসবাসকারী বিভিন্ন মাছ (Different types of fishes living in various types of water

জলের মধ্যে লবণের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে জলকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (1) মিস্টি জল বা স্বাদু জল, (2) আধা-নোনা জল বা ব্রাকিশ জল ও (3) নোনা বা লবণাক্ত জল।

1. **স্বাদু জল বা মিষ্টি জল (Fresh water)** ঃ এই জল নদী, খাল, বিল, পুকুর, লেক ইত্যাদি জলাশয়ে পাওয়া যায়। এই জলে লবণের পরিমাণ প্রতি লিটারে 0·5 গ্রামের কম থাকে।
2. **আধা নোনা বা ঈষৎ লবণাক্ত জল (Brakish water)** ঃ এই জলে স্বাদু জলের চেয়ে বেশি কিন্তু নোনা জলের চেয়ে কম পরিমাণ লবণ থাকে। নদী ও সমুদ্রের সংযোগস্থল অর্থাৎ মোহানাতে এই জল পাওয়া যায়।
3. **নোনা জল বা লবণাক্ত জল (Saline water)** ঃ এই জলে প্রতি লিটারে প্রায় 35 গ্রাম পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকে। সমস্ত সমুদ্রের জল নোনা জল বা লবণাক্ত জল।

(a) **নদীতে বসবাসকারী কিছু মাছ (Some fishes living in river)** ঃ

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|---|
| 1. চিতল | *Notopterus chitala* | 3. বোয়াল | *Wallago attu* |
| 2. ফলুই | *Notopterus notopterus* | 4. ইলিশ | *Hilsa ilisha* |

(b) **নদীর মোহানা বা খাঁড়ি ও ভেড়িতে বসবাসকারী কিছু মাছ (Some fishes living in estuary or in "Bheri")** ঃ

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|---|
| 1. পার্শে | *Mugil parsia* | 3. ভাঙন | *Mugil tade* |
| 2. ভেটকি | *Lates calcarifer* | 4. তপসে | *Polynemus sp.* |

(c) **সমুদ্রে বসবাসকারী কিছু মাছ (Some fishes living in sea)** ঃ

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম | সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|---|
| 1. ম্যাকারেল | *Rastrelliger kunagurta* | 3. নেহারি | *Herpodon nehereus* |
| 2. পমফ্রেট (রুপালি) | *Pampus argenteus* | 4. সার্ডিন | *Sardinella longiceps* |

## ✪ খাঁড়ি ও ভেড়ি (Estuary and Bheri) ঃ

(a) **খাঁড়ি বা নদী-মোহানা (Estuary)** ঃ নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে এবং যেখানে জোয়ার ভাঁটার মাধ্যমে নদীর জল ও সমুদ্রের জল মিশ্রিত হয় সেইরূপ স্থানকে **খাঁড়ি** (Estuary) বলে। এখানকার জল অর্ধলবণাক্ত।

(b) **ভেড়ি (Bheri)** ঃ যে বিশাল জলাধারের আয়তন প্রায় 200 একর এবং গভীরতা 1·8 – 2·0 মিটার তাকে ভেড়ি বলে। ভেড়ি দু'ধরনের— (i) **স্বাদুজলের ভেড়ি ঃ** এখানে রুই, কাতলা, মৃগেল, কই ,মাগুর, শিঙি ইত্যাদি মাছের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা হয়। (ii) **অল্প নোনা জলের ভেড়ি ঃ** এখানে অল্প লবণযুক্ত জল থাকে এবং এখানে ট্যাংরা, ভেটকি, পার্শে, ভাঙন, আড় ইত্যাদি মাছের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা হয়।

### ● স্বাদু জলের প্রকারভেদ (Types of fresh water) ●

স্বাদু জল দু'প্রকার ( স্রোতের উপস্থিতি অনুযায়ী ) ঃ

(i) **বদ্ধ জল** (Lotic water) ঃ যে সব জলাশয়ে জল একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় না বা জলস্রোত দেখা যায় না সেই জলাশয়ের জলকে **বদ্ধ জল** বলে। যেমন—পুকুর, ডোবা, ঝিল, লেক ইত্যাদির জল হল বদ্ধ জল।

(ii) **স্রোতযুক্ত জল** ( Lentic water ) ঃ যে সব জলাশয়ে জল একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ জলের স্রোত সর্বদা পরিলক্ষিত হয় সেই জলকে **স্রোতযুক্ত জল** বলে। যেমন— নদী, খাল ইত্যাদি জলাশয়ে স্রোতযুক্ত জল পাওয়া যায়।

## ◎ 4.3. মৎস্য চাষের বিভিন্ন বিভাগ ◎ (Different types of Pisciculture)

মাছের বাসস্থান, মাছ সংগ্রহ ও চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে মাছ চাষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি নিম্নরূপ।
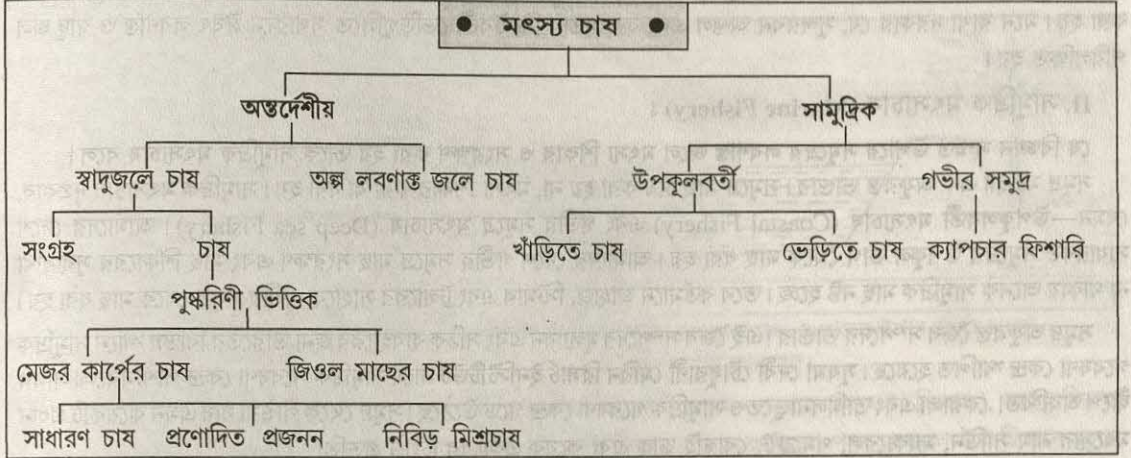
### I. অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (Inland Fishery) ঃ

যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাদু জল ও ঈষৎ লবণাক্ত জলে মাছের প্রজনন, প্রতিপালন, বৃদ্ধি, শিকার বা আহরণ এবং সংরক্ষণ করা হয় তাকে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ বলে। অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ দু'ভাগে বিভক্ত যেমন—স্বাদু জলে মৎস্যচাষ এবং অল্প লবণাক্ত জলে মৎস্যচাষ।

(a) **স্বাদুজলে মৎস্যচাষ (Fresh water Fishery)** ঃ নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতির স্বাদুজলে মাছের প্রজনন, প্রতিপালন, বৃদ্ধি, আহরণ ও সংরক্ষণ করবার বৈজ্ঞানিক উপায়কে স্বাদু জলে মৎস্যচাষ বলে।

এই শ্রেণির মৎস্যচাষ আবার তিন প্রকার, যেমন—**নদীতে মৎস্যচাষ, হ্রদ ও বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্যচাষ** এবং **পুকুরে মৎস্যচাষ**।

(i) **নদীতে মৎস্যচাষ** (Riverine Fishery)— স্বাদু জলের এই প্রাকৃতিক জলাধারে সাধারণত মাছের চাষ করা হয় না। এখান থেকে মাছ সংগ্রহ বা আহরণ করা হয়। বর্ষাকালে ভারতবর্ষের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্মা, কাবেরী, সিন্ধু প্রভৃতি নদ-নদী থেকে মাছের ডিম এবং ডিম পোনা সংগ্রহ করা হয়। মাছ চাষীভাইরা এই ডিম বা ডিমপোনা সংগ্রহ করে নিজ নিজ নির্দিষ্ট পুকুরে মাছের চাষ করে। তা-ছাড়া নদীগুলি থেকে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, বাটা প্রভৃতি কার্প বা পোনামাছ ও ইলিশ, চিতল, ফলুই, ট্যাংরা, বোয়াল প্রভৃতি মাছ ধরে সরাসরি বাজারে বিক্রি করা হয়।

(ii) **হ্রদ ও বৃহদাকার জলাশয়ে মৎস্যচাষ** (Fishery in Lake and big reservoir)—এই ধরনের বড়ো জলাধারে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি পোনা বা কার্প জাতীয় মাছ দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে।

(iii) **পুষ্করিণীতে মৎস্যচাষ** (Pond Fishery)— পুকুরে পোনা বা কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা হয়। পুকুরে মৎস্যচাষ সাধারণত স্বল্প উৎপাদনের ভিত্তিতে বা পর্যাপ্ত উৎপাদনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ছোটো পুকুর বা ডোবা থেকে কই, শিঙি, মাগুর, শোল, শাল, ল্যাটা প্রভৃতি জিওল মাছও সংগ্রহ করা হয়।

(b) **ঈষৎ লবণাক্ত জলে মৎস্যচাষ (Brackish water Fishery)** ঃ খুব লবণাক্ত নয় এমন অল্প লবণাক্ত জলে মৎস্যচাষকে ঈষৎ লবণাক্ত জলে মৎস্যচাষ বলে। এই মৎস্যচাষ দুভাগে বিভক্ত, যেমন—**খাঁড়িতে মৎস্যচাষ** এবং **ভেড়িতে মৎস্যচাষ**।

(i) **খাঁড়িতে মৎস্যচাষ** (Fishery in Estuary) ঃ নদী যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় সেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত জল এবং নদীর স্বাদু জলের মিশ্রণ ঘটে। ফলে ওই স্থানে প্রায় এক মাইল অঞ্চলের জল ঈষৎ লবণাক্ত হয়। এই অঞ্চলকে **খাঁড়ি** বলে। খাঁড়ি

থেকে সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়, যেমন—ভেটকি, ট্যাংরা, পার্সে, তপ্‌সে, ভাঙন, আড়, ইলিশ, বিভিন্ন জাতের চিংড়ি প্রভৃতি। উল্লেখ করা যায় খাঁড়িতে সাধারণত মাছের চাষ করা হয় না। নদীর এই উজান অঞ্চল থেকে মাছ ধরা হয়।

(ii) **ভেড়িতে মৎস্যচাষ** (Fishery in Bheri)ঃ সুন্দরবন বা কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রায় 200 একরের মতো আয়তন বিশিষ্ট যে ঈষৎ লবণাক্ত জলাধারগুলি দেখতে পাওয়া যায় তাদের ভেড়ি বলে। প্রকৃতপক্ষে ভেড়ি হল বিশাল সঞ্চয়ী পুকুর। এই জলাধারগুলিতে জলের গভীরতা প্রায় 6'-7' ফুট। উল্লেখ করা যায় যে এই জলাধারগুলিতে মাছ চাষ করা হয় এবং মাছ সংরক্ষিত করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, সুন্দরবন অঞ্চল এবং কলকাতার নিকটবর্তী ভেড়িগুলিতে যথাক্রমে ঈষৎ লবণাক্ত ও স্বাদু জল পরিলক্ষিত হয়।

**II. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Marine Fishery) ঃ**

**যে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে মৎস্য শিকার ও সংরক্ষণ করা হয় তাকে সামুদ্রিক মৎস্যচাষ বলে।**

সমুদ্র মাছের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। সমুদ্রে মাছ চাষ করা হয় না, মৎস্য শিকার করা বা ধরা হয়। সামুদ্রিক মৎস্যচাষ দুপ্রকার, যেমন—**উপকূলবর্তী মৎস্যচাষ** (Coastal Fishery) এবং **গভীর সমুদ্রে মৎস্যচাষ** (Deep sea Fishery)। আমাদের দেশে সাধারণত সমুদ্রের উপকূল ভাগ থেকে মাছ ধরা হয়। আমাদের দেশে গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ এবং মাছ শিকারের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক সামুদ্রিক মাছ নষ্ট হচ্ছে। তবে বর্তমানে জাহাজ, স্টিমার এবং ট্রলারের সাহায্যে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়।

সমুদ্র অফুরন্ত জৈব সম্পদের ভাণ্ডার। এই জৈব সম্পদের মূল্যায়ন এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। **সুষমা দেবী চৌধুরাণী মেরিন রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট** নামে সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে সাগর দ্বীপে অবস্থিত। কেরালা এবং তামিলনাড়ুতেও সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সমুদ্র থেকে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি প্রধান মৎস্যের নাম সার্ডিন, ম্যাকারেল, পমফ্রেট, বোম্বাই ডাক এবং কয়েক প্রকারের চিংড়ি প্রভৃতি।

**● কালচার ফিশারি ও ক্যাপচার ফিশারি (Culture and Capture fishery) ●**

1. **কালচার ফিশারি ঃ** অন্তর্দেশীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জলাশয়ে স্বাদু বা কম লবণাক্ত জলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা হয়। এই রকম জলাশয় পরিষ্কার করে সার ও প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়। এই মাছ চাষকে **কালচার ফিশারি** (Culture fishery) বলা হয়।

2. **ক্যাপচার ফিশারি ঃ** মাছচাষ ও পরিচর্যা ছাড়াই সমুদ্র থেকে মাছ ধরে বাজারজাত করাকে **ক্যাপচার ফিশারি** (Capture fishery) বলে।

## ❂ 4.4. প্রধান কার্পচাষ পদ্ধতি ❂ (Process of Major Carp culture)

উপরে বর্ণিত সব রকমের মাছ চাষের মধ্যে এখানে শুধুমাত্র মেজর কার্প কালচার বা বড়ো পোনামাছের চাষ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হল। এই মাছ চাষ প্রধানত তিন প্রকারে করা হয়, যেমন— **প্রথাগত প্রাচীন পদ্ধতিতে মাছচাষ,** (Traditional carp culture), **প্রণোদিত প্রজনন** (Induced breeding), **যৌগ মিশ্র মাছচাষ** (Composite mixed fish culture)

### ▲ প্রথাগত প্রাচীন পদ্ধতিতে মাছচাষ (Traditional, Old Technique of Carp Culture) ঃ

এই পদ্ধতি স্বল্প পরিসরে বা বৃহৎ পরিসরে করা যেতে পারে। এগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

**A. স্বল্প উৎপাদনক্ষম পুকুরে মাছ চাষ (Carp culture in small-scale pond) ঃ**

এই প্রকার চাষের মুখ্য বিষয়গুলি নীচে আলোচনা করা হল।

(a) **একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য**—যে প্রকার মাটির পর্যাপ্ত জলধারণ ক্ষমতা, সেই মাটিই পুকুরের পক্ষে উপযুক্ত। কাদা-মাটিতে (Clay-soil) পুকুর খনন করা উচিত। পুকুরে যাতে সারা বৎসর ধরে জল সরবরাহ থাকতে পারে, তার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আবার বন্যায় বা বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে পুকুর ডুবে যাওয়া রোধ করার জন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হওয়াও দরকার। পুকুরের জল স্বল্প ক্ষারীয় (pH 7.5-8.0) হওয়া প্রয়োজন। পুকুরের আকার প্রায় 40,000 ঘনফুট হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ

সাধারণভাবে দৈর্ঘ্য-100 ফুট, প্রস্থ-50 ফুট ও গভীরতা 6-8 ফুট হওয়া দরকার। পুকুরের যেদিকে জল বের হওয়ার বা জল প্রবেশ করার নালা থাকে, সেদিকে পুকুরের গভীরতা বেশি হওয়া দরকার। পুকুরের পাড় জমির উপরিতল থেকে 4-5 ফুট উঁচু হলে ভালো হয়। আবার পুকুরের চারদিকের পাড় ঘাসের চাপড়া দিয়ে আবৃত রাখতে হবে। এই ঘাসের চাপড়া মাটি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

(b) **পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার পূর্ব-প্রস্তুতি**— পুকুরের মাটি আম্লিক প্রকৃতির হলে পুকুরের মাটিতে চুন মেশাতে হবে। সাধারণত পুকুরের তলার মাটিতে একর প্রতি 90 থেকে 120 কেজি চুন মেশালে সুফল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট তারের জাল দ্বারা পুকুরে জল প্রবেশ পথ বা নির্গমন-পথ বন্ধ করে রাখতে হবে। এর ফলে ডিমপোনা পুকুর থেকে বাইরে যেতে বা অন্য কোনো মাছ ঢুকতে পারবে না। এর পর পুকুরে উপযুক্ত পরিমাণ জল দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে পুকুরে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর-সার অথবা পচাই সার (Compost manure) সাধারণত প্রতি একরে 4 টন হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই সার প্রয়োগের পর ক্রমপর্যায়ে রাসায়নিক সার, যেমন—সুপার ফস্‌ফেট (সিঙ্গল), অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও সোডিয়াম নাইট্রেট এর মিশ্রণ প্রতি একর জমিতে 25 কেজি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। পুকুরের জলে সার-হিসাবে মহুয়া খইল প্রয়োগ করার পর অন্তত তিন সপ্তাহকাল পুকুরের জলে মাছ ছাড়া নিষিদ্ধ, কেননা মহুয়া খইল ও জলের মিশ্রণের বিষাক্ততা দুই সপ্তাহ বর্তমান থাকে। পুকুরে সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল মাছের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আণুবীক্ষণিক ও ক্ষুদ্র জীবগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এইবার পুকুরের জলের ক্ষারীয়ভাব পরীক্ষা করে ও মাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য-জীবের পর্যাপ্ততা পর্যবেক্ষণ করে ডিমপোনা ছাড়া উচিত।
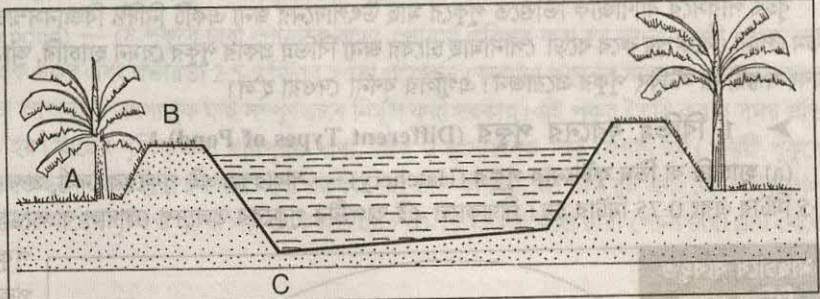
চিত্র 4.3 : একটি আদর্শ পুকুরের নকসা : A-কলা গাছ, B-পাড়ের উপরে ঘাসের চাপড়া, C-পুকুরের গভীরতম প্রান্ত।

(c) **একই (পোনা) পুকুরে বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ**—কাতলা, মৃগেল, রুই, সাইপ্রিনাস প্রভৃতি মাছকে একত্রে একই পুকুরে চাষ করা যেতে পারে। সাধারণত প্রথম বছরে কাতলা মাছ 15"—18", মৃগেল মাছ 12"—14", রুই মাছ 14"—16", সাইপ্রিনাস মাছ 10"—12" পর্যন্ত বাড়তে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন ফিশারি কেন্দ্রগুলি থেকে এই সব মাছের ডিমপোনা সহজেই পাওয়া যায়। সাধারণত এক একর জমির পুকুরে 2"—3" আকারের চারাপোনা সংখ্যায় 1,500 থেকে 2,000 পর্যন্ত পালন করা যেতে পারে। কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছ একত্রে চাষ করলে তাদের সংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে 1 : 1 : 2 হওয়া উচিত। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যবর্তীকাল পুকুরে চারাপোনা মজুত করার পক্ষে উপযুক্ত সময়। চারাপোনা স্থানান্তরকালে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন, কেননা, কোনো মাছের ক্ষত স্থান সৃষ্টি হলে ক্ষত অংশে ছত্রাক জাতীয় রোগের উদ্ভব হবে এবং এই রোগে অবশেষে মাছ মারা যায়। স্থানান্তরের পূর্বে চারাপোনাগুলিকে "হাপা"-তে সংগ্রহ করে রেখে স্থানান্তরণের জন্য অভ্যস্ত করানো উচিত। এইভাবে অভ্যস্ত চারাপোনাকে বড়ো টিনের আধারে রেখে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। স্থানান্তরকালে আধারের জল সতর্কতার সঙ্গে আলোড়ন করা প্রয়োজন, কেননা, তার ফলে জলে অক্সিজেনের অভাব হবে না। অধিক দূরবর্তীস্থানে চারাপোনা স্থানান্তর করতে হলে অক্সিজেনপূর্ণ বিশেষ আধারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

(d) **মাছচাষে কিছু আবশ্যকীয় বিষয়**—(i) পুকুরের মাছের **খাদ্যের** যাতে অভাব না হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পচাই সার বা গোবর সার বার বার প্রয়োগ করা দরকার। (ii) মাছের বাস করার ও ঘোরাফেরা করার জন্য যাতে **স্থান সংকুলান** হয়, সেই কারণে পুকুরে জলজ আগাছা (weeds), পানা প্রভৃতি সংস্কার করা প্রয়োজন। পুকুরের জলের উপরিতলে নানান জলজ উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে জন্মালে মাছের বৃদ্ধির হারও কমে যায়। জল যাতে দূষিত না হয়, সেই দিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আবার জলের **অক্সিজেন** পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক এবং এর জন্য জলের উপরিতলে আলোড়ন ও প্রতি সপ্তাহে একবার করে পুকুরের মোট জলের প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ ভালো জল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা দরকার। (iii) মাছ বিভিন্ন বহিঃপরজীবীর দ্বারা, ফুলকা পচা (Gill rot) ও পাখনা পচা (Fin rot) প্রভৃতি **রোগের** দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। মাছের এই সব রোগও দূর করা প্রয়োজন। (iv) **মাছ ধরার**

জন্য পুকুরের সব জল বের করানো যেতে পারে অথবা টানা-জাল ও ছোঁড়া জাল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। (v) পুকুরের পাড়ে **কলা ও পেঁপে গাছ** লাগানো যেতে পারে এবং এইসব গাছের ফসলে লাভবান হওয়া ব্যতীত গ্রীষ্মকালে গাছের স্বল্প ছায়ারও উপযোগিতা আছে। অন্যান্য গাছ পাড়ে লাগালে তাদের পাতা জলে পড়ে পচতে পারে ও জল দূষিত হতে পারে। তাই পুকুরের পাড়ে কলা ও পেঁপে গাছ লাগানো বিজ্ঞানসম্মত।

**B. বেশী উৎপাদনক্ষম পুকুরে মাছচাষ (Carp culture in large scale pond) :**

বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুকুরে মাছ উৎপাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাছচাষ করতে হবে। ডিম পোনা থেকে শুরু করে বড়ো পোনামাছ চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকার পুকুর যেমন **হ্যাচারি, আঁতুড় বা নার্সারি, পালন বা রিয়ারিং** এবং **সঞ্চয়ী বা স্টকিং** পুকুর প্রয়োজন। এগুলির বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

**➤ 1. বিভিন্ন ধরনের পুকুর (Different Types of Pond) :**

(a) **হ্যাচারি বা ডিম ফুটানোর পুকুর** (Hatchery) — সাধারণত এই পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা যথাক্রমে 3 মিটার, 1·5 মিটার এবং 0·75 মিটার হয়। গ্রীষ্মকালে এই অগভীর পুকুরের তলদেশ কোদাল বা লাঙল দিয়ে কুপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পুকুরের আগাছাগুলি মরে যায়। পুকুরের জলকে ঈষৎ ক্ষারীয় প্রকৃতির করার জন্য চুন প্রয়োগ করা দরকার। বর্ষার প্রারম্ভে নদী থেকে ডিম বা ডিমপোনা (Spawn) সংগ্রহ করে এই পুকুরে ফেলা হয়। ডিম ফেলার 18—24 ঘণ্টার মধ্যেই ডিম থেকে ডিমপোনা বের হয়। 2-3 দিনের মধ্যেই হ্যাচারি থেকে ডিমপোনা তুলে আঁতুড় পুকুর বা ধাত্রী পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।
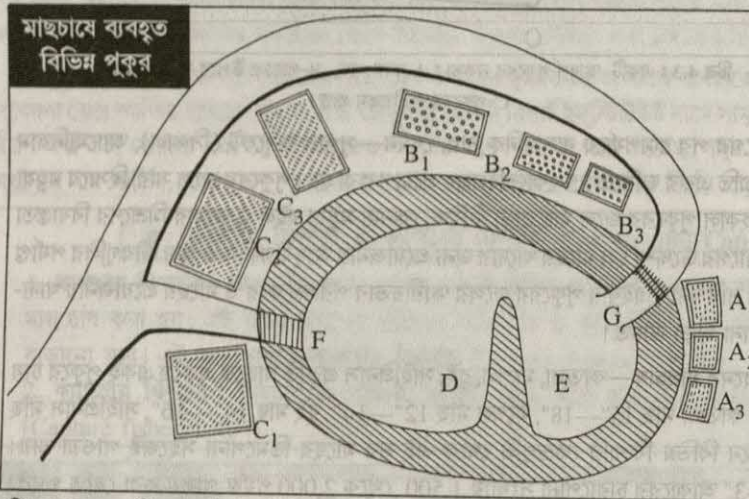
**চিত্র 4.4 :** বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার পুকুর ও অন্যান্য ব্যবস্থার নক্সাচিত্র : $A_1$, $A_2$, $A_3$—ডিম ফোটানোর পুকুর, $B_1$, $B_2$, $B_3$—আঁতুর পুকুর, $C_1$, $C_2$, $C_3$—পালন পুকুর, D-E—সঞ্চয়ী পুকুর, F—জল প্রবেশের পথ, G—জল বেরোনোর নালি।

(b) **আঁতুড় পুকুর বা ধাত্রী পুকুর** (Nursery tank)— মাছ চাষের সময় **ডিম-পোনা** থেকে **ধানী পোনায়** পরিণত করার জন্য যে পুকুর তৈরি করা হয় তাকে **আঁতুড় পুকুর** (Nursery pond) বলে। সাধারণত আঁতুড় পুকুর লম্বায় 18-22 মিটার, চওড়ায় 10-12 মিটার এবং গভীরতা 1·8-2·0 মিটার হয়। গ্রীষ্মকালে আঁতুড় পুকুর শুকিয়ে নিয়ে প্রথমে আগাছা পরিষ্কার করার নিয়ম। এরপর তলার মাটি ভালো করে কুপিয়ে কয়েকদিন শুকিয়ে নেওয়ার পর মাটির সঙ্গে চুন মিশিয়ে বিভিন্ন জীবাণু ও পোকা মাকড় বিনষ্ট করতে হয়। অনেকে এই মাটিতে ধঞ্চে চাষ করে বর্ষার আগে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। যেসব আঁতুড় পুকুরে জল থাকে সে সব পুকুরে ডিম পোনা ছাড়ার আগে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি 30-40 কে. জি. চুন দিতে হয়। 3-4 দিন পর পরিমাণ মতো মহুয়া খোল প্রয়োগ করে মৎস্যভুক মাছ মেরে ফেলতে হবে। 15-20 দিন পর এই খোল সারের কাজ করে। ডিম-পোনা ছাড়ার 15-20 দিন আগে জলাশয়ে বিঘা প্রতি 600-700 কে.জি. গোবর সার ছড়াতে হয়। এর কিছুদিন পর অ্যামোনিয়াম সালফেট (বিঘা প্রতি 10-20 কে.জি.) এবং সুপার ফসফেট (6-8 কে.জি) প্রয়োগ করে পুকুরের উর্বরতা বাড়িয়ে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন ভালোভাবে জন্মাবার সুযোগ করে দিতে হয়। ডিম পোনা ছাড়ার একদিন অর্থাৎ 24 ঘণ্টা আগে তেল সাবান মিশিয়ে অথবা কেরোসিন তেল জলাশয়ে মিশিয়ে কীট-পতঙ্গ নষ্ট করতে হবে। এরপরে আঁতুড় পুকুরে বিঘা প্রতি 3-4 লক্ষ ডিম পোনা ছাড়ার নিয়ম। ডিম-পোনা ছাড়ার 5 দিন পরে মাঝে মাঝে 5 মি.মি. ফাঁসের জাল টানা প্রয়োজন। নিয়মিত পরিপূরক খাদ্য দিলে 15 দিনের মধ্যে ডিম-পোনা **ধানী পোনায়** (Fry) পরিণত হয়। এরপর ধানী পোনাকে পালন পুকুরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

(c) **পালন পুকুর** (Rearing pond) — যে পুকুরে ধানী পোনাকে পালন করে চারা পোনায় পরিণত করা হয় তাকে পালন পুকুর (Rearing pond) বলে। এই পুকুর লম্বায় 20-25 মিটার; চওড়ায় 15-18 মিটার এবং গভীরতা 1·8—2·5 মিটার হয়। আঁতুড় পুকুরের মতো একইভাবে পালন পুকুর তৈরি করতে হয়, পুকুর তৈরি হবার পর বিঘা প্রতি 30-40 হাজার ধানী পোনা ছাড়া হয়। প্রথম মাসে ধানী পোনার ওজনের সমান পরিপূরক খাদ্য দিতে হয় এবং তার সঙ্গে গোবর সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট প্রভৃতি সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োজনমত চুনও জলে দেওয়া প্রয়োজন।

(d) **সঞ্চয়ী পুকুর** (Stocking pond) — যে পুকুরে চারা পোনাকে বড়ো পোনায় পরিণত করা হয় তাকে **সঞ্চয়ী পুকুর** বলা হয়। সঞ্চয়ী পুকুরের আয়তন প্রায় এক একর এবং গভীরতা 2·5-3 মিটার হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য পুকুরের মতো সঞ্চয়ী পুকুরেরও সময়মত পরিচর্যা করা হয়। তাছাড়া আগাছা ও মৎস্যভুক মাছ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা দরকার। এই পুকুর তৈরি করার সময় প্রতি বিঘা 40 কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাছের বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক খাদ্য, জৈব ও রাসায়নিক সার দেওয়া হয়। সঞ্চয়ী পুকুরে বিঘা প্রতি 1000টি চারা পোনা ছাড়তে হয়। নতুন চারা পোনার মধ্যে শতকরা 30 ভাগ কাতলা, 40 ভাগ রুই এবং 30 ভাগ মৃগেল থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। 10-12 মাসের মধ্যে চারা পোনা 900 গ্রাম থেকে এক কেজি ওজন হয়।

### ➤ 2. মাছচাষ পদ্ধতি (Method of Fish Culture) :

(a) **ডিম ও ডিমপোনা সংগ্রহ (Collection of egg and spawn)**— মাছচাষে সুফল পেতে হলে উন্নত জাতের ডিম ও ডিম পোনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি পোনা বা কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন কাল হল বর্ষা ঋতু। এরা নদীর অগভীর জলে এবং নদী সংলগ্ন প্লাবিত অগভীর জলাশয়ে ডিম পাড়ে। নদী সংলগ্ন অগভীর জলাশয়কে পোনা মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বলে। এরা সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। প্রথাগত পদ্ধতিতে ডিমপোনা নদী থেকে সংগ্রহ করা হয়।

(b) **নদী থেকে ডিম ও ডিমপোনা সংগ্রহ (Collection of eggs and spawn from river)** : হ্রদ, পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতি জলাধারে কার্পজাতীয় মাছগুলি পাওয়া গেলেও এরা নদীর স্রোতযুক্ত জলে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। বর্ষাকালে নদী এবং নদী সংলগ্ন অগভীর জলাশয়গুলি প্লাবিত হয়। পরিণত রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি কার্পজাতীয় মাছগুলি নদীর স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে নদী সংলগ্ন অগভীর জলাশয়ে প্রবেশ করে। নদী সংলগ্ন অগভীর জলাশয়গুলি পোনা মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। এই প্রজননক্ষেত্রে বর্ষার নূতন জলে পরিণত পুরুষ এবং স্ত্রী মাছগুলির মধ্যে যৌন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মাছগুলি জলের মধ্যে দ্রুত ছুটাছুটি করতে থাকে। এই সময় পরিণত স্ত্রী এবং পুরুষ পোনা মাছের দেহ থেকে যথাক্রমে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু বের হয়। জলের মধ্যে শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি ভারী বলে জল তলের নীচে চলে যায়। উল্লেখ করা যায় যে 24 ঘণ্টার মধ্যে এদের নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ডিমপোনা বের হয়। মাছ চাষীরা পোনা মাছের এই প্রজনন ক্ষেত্র থেকে মিহি জালের সাহায্যে ডিম এবং ডিমপোনা সংগ্রহ করে। বড়ো বড়ো হাঁড়িতে করে এই ডিম ও ডিম পোনাকে পুষ্করিণীর জলে ফেলা হয়।
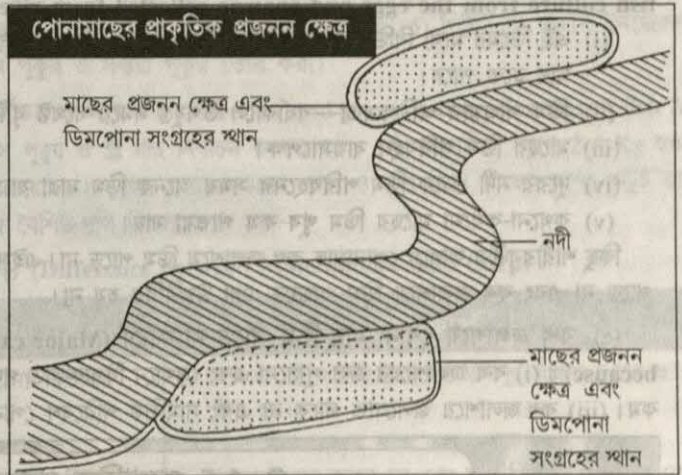
চিত্র 4.5 : নদী সংলগ্ন স্থানে পোনা মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের নক্সা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, ধুলিয়ান অঞ্চলে, মালদহ জেলার মাণিকচক অঞ্চলের নদী থেকে ডিম ও ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়। বড়ো বড়ো হাঁড়িতে করে এই ডিম ও ডিম পোনাকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সুবর্ণরেখা নদী ও কংসাবতী নদী থেকেও ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়।

(c) **ডিমপোনা প্রতিপালন (Rearing of Spawn)**—নদী থেকে ডিম-পোনা সংগ্রহ করার পর আঁতুড় পুকুর বা নার্সারি পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। কার্প জাতীয় মাছের ডিমগুলি ভারী ধরনের। সদ্য পরিত্যক্ত ডিমগুলি নরম থাকে এবং 6-8 ঘণ্টার মধ্যে শক্ত হয়ে যায়। ডিমগুলিকে পাত্রের সাহায্যে হ্যাচিং হাপায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ছড়িয়ে দিতে হয়। সেখানে 18-24 ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে ডিমপোনা বা স্পন (Spawn) বেরিয়ে আসে। 2-3 দিনের মধ্যে ডিমপোনাগুলিকে আঁতুড় পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। আঁতুড় পুকুর তৈরি হওয়ার 7-8 দিনের মধ্যে ডিমপোনাগুলিকে এখানে ছাড়তে হয়। তা না হলে পুকুরের খাদ্যকণা কমে যায়। একটি আদর্শ আঁতুড় পুকুরের দৈর্ঘ্য 18-22 মিটার, প্রস্থ 10-12 মিটার এবং গভীরতা 1·8-2·0 মিটার। আঁতুড় পুকুরে বিঘা প্রতি 3-4 লক্ষ ডিম পোনা ছাড়া যায়। ডিম পোনা ছাড়ার 5 দিন পর 5 মি.মি. ফাঁসের জাল টানা এবং নিয়মিত সার ও পরিপূরক খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ডিম-পোনাগুলি 15 দিনের মধ্যে 20-25 মিলিমিটার লম্বা হলে ধানী পোনায় (Fingerling) পরিণত হয়। এরপর ধানী পোনাকে পালন পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

পালন পুকুরে ধানী পোনাকে তিন মাস পালন করা হয়। পালন পুকুরের দৈর্ঘ্য 20-25 মিটার, প্রস্থ 15-18 মিটার এবং গভীরতা 1·8-2·5 মিটার। পালন পুকুরে ধানী পোনা যখন 8-13 সে.মি. লম্বা হয় তখন তাদের **চারা পোনা** বলা হয়। প্রয়োজনমত গোবর সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট প্রভৃতি সার এই পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়।

এরপর চারা পোনাগুলিকে পালন পুকুর থেকে তুলে সঞ্চয়ী পুকুরে পালন করতে হয়। আগাছা এবং মৎস্যভুক মাছ থেকে সঞ্চয়ী পুকুরকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এই পুকুর তৈরি করার সময় বিঘা প্রতি 40 কেজি এবং প্রতি মাসে 5 কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক খাদ্য, জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য দেখা প্রয়োজন। এই পুকুরে চারা পোনাগুলি ক্রমশ বড়ো পোনা মাছে পরিণত হতে থাকে। মাছ বিক্রির উপযোগী হলে মাছ ধরে বাজারে পাঠানো হয়।

মাছ চাষের সময় কতগুলি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন, যেমন—(i) পুকুর আগাছা মুক্ত রাখা। (ii) পুকুরে মাছের খাবার সরবরাহ করা। (iii) পুকুরে মাঝে মাঝে জাল টানা। (iv) পুকুরের খাদক মাছ নির্মূল করা। (v) চুন প্রয়োগ করে জলের অম্লতা দূর করা।

(d) **নদী থেকে ডিম ও ডিমপোনা সংগ্রহ করে প্রথাগত মাছ চাষের অসুবিধা (Disadvantages of traditional fish culture from the eggs and spawns collected from river) ঃ**

(i) এই ডিমের মধ্যে বিভিন্ন মাছের **ডিমের মিশ্রণ** ঘটে। এই মাছগুলি অর্থকরী মাছ না হতে পারে এবং এগুলি শিকারি মাছ হতে পারে।
(ii) **ডিম পাওয়ার অনিশ্চয়তা**—বর্ষাকালে উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি না হলে মাছ নদীতে ডিম পাড়ে না।
(iii) মাছের ডিম **পরিবহন** ব্যয়সাপেক্ষ।
(iv) দূরের নদী থেকে ডিম **পরিবহনের সময়** অনেক ডিম মারা যায়।
(v) কখনো-কখনো মাছের **ডিম খুব কম পাওয়া** যায়।

কিছু শারীরবৃত্তীয় কারণে পোনামাছ বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। এইসব মাছ নদীর পরিবেশ ব্যতীত বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না এবং বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়তে এরা উজ্জীবিত হয় না।

(e) **বন্ধ জলাশয়ে পোনা মাছ ডিম পাড়ে না কারণ (Major carp does not lay eggs in confined water, because) ঃ** (i) বন্ধ জলাশয়ের জল পুরানো এবং সেখানে বিপাকজাত পদার্থ থাকে। (ii) এখানে $O_2$-এর পরিমাণ অনেক কম। (iii) বন্ধ জলাশয়ে জলস্রোত থাকে না এবং সামগ্রিক পরিবেশ পোনা মাছকে ডিম পাড়তে উজ্জীবিত করে না।

## ✪ 4.5. প্রণোদিত প্রজনন ✪ (Induced Breeding or, Hypophysation)

পোনামাছ বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশে নদী থেকে ডিম বা ডিমপোনা সংগ্রহ করাই রীতি ছিল, কিন্তু মানুষ গবেষণা করে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যার সাহায্যে পোনামাছকে বন্ধ জলাশয়ে অর্থাৎ পুকুরে ডিমপাড়তে উদ্দীপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিকে **আবিষ্ট বা প্রণোদিত প্রজনন** (Induced breeding) বলে।

❖ (a) **প্রণোদিত প্রজননের সংজ্ঞা (Definition of Induced Breeding) ঃ** যে পদ্ধতিতে পিটুইটারি গ্রন্থির

নির্যাস ইনজেক্‌শনের সাহায্যে পোনা মাছকে বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করতে উদ্দীপ্ত করা হয় সেই পদ্ধতিকে প্রণোদিত প্রজনন বলে। পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাসকে সাধারণভাবে পিটুইটারি হরমোন বলে যার মধ্যে **FSH (ফলিকল্ সিম্যুলেটিং হরমোন)** এবং **LH (লিউটিনাইজিং হরমোন)** প্রধান ভূমিকা পালন করে।

(b) **প্রণোদিত প্রজননের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Induced breeding) ঃ** (i) বদ্ধ জলাশয়ে পোনামাছ ডিম পাড়ে না এবং (ii) নদী থেকে ডিমপোনা সংগ্রহের অসুবিধা—এই দুটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মাছের সবচেয়ে আধুনিক প্রজনন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে যে-কোনো পোনামাছকে পৃথকভাবে পিটুইটারি হরমোন ইনজেক্‌শনের সাহায্যে বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়তে এবং প্রজনন করতে প্রণোদিত করা হয় বা বাধ্য করা হয়।

(c) **প্রণোদিত প্রজননের নীতি (Principle of Induced Breeding) ঃ** হাইপোফাইসিস্ (Hypophysis) বা পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস পুরুষ ও স্ত্রী গোনাড শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় পরিণত হতে এবং জননে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাসে FSH হরমোনের প্রভাবে গোনাড পূর্ণতাপ্রাপ্তি লাভ করে এবং LH হরমোনের প্রভাবে ইস্ট্রোজেন তৈরি হয়। এর পর ইস্ট্রোজেন (Estrogen) ও LH এর প্রভাবে গ্যামেটগুলি গোনাড থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। বদ্ধ জলাশয়ে পিটুইটারি হরমোনের প্রভাবে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ঘটে। প্রক্রিয়া নিম্নরূপে ঘটে—
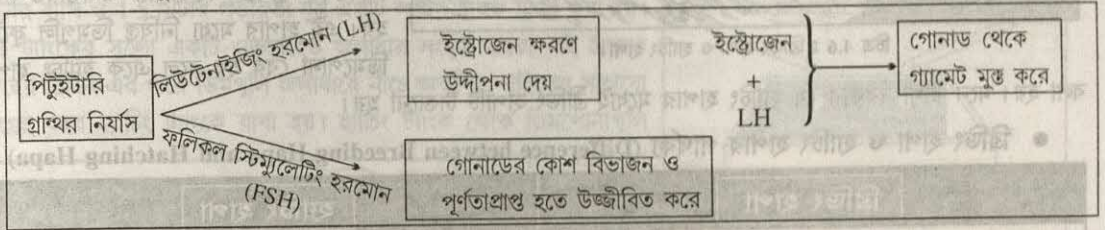
## ▲ প্রণোদিত প্রজনন বা হাইপোফাইসেসন পদ্ধতি (Method of Induced Breeding or Hypophysation)

প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় উপাদান ও সরঞ্জামগুলি হল—(1) পরিণত পুরুষ ও স্ত্রী মাছ, (2) ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপা, (3) পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, (4) পিটুইটারি নির্যাস প্রস্তুত, (5) পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকশন দেওয়ার সরঞ্জাম, (6) আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর ও সঞ্চয়ী পুকুর তৈরি করা।

➤ 1. **পরিণত, প্রজননক্ষম মাছ নির্বাচন ও সংরক্ষণ (Selection and preservation of matured fish for reproduction) ঃ** সুস্বাস্থ্যযুক্ত, দ্রুতবর্ধনশীল পুরুষ ও স্ত্রী মাছ নির্বাচন করতে হবে। এই মাছগুলির ওজন 2-4 Kg হওয়া প্রয়োজন এবং এগুলি সঞ্চয়ী পুকুরে রাখা প্রয়োজন। পুকুরে প্রয়োজনমতো খাদ্য ও সার দিয়ে মাছের স্বাস্থ্য অটুট রাখা আবশ্যক। স্ত্রীমাছ ও পুরুষমাছ সনাক্ত করার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নপ্রকারের হয়—

● **পুরুষ ও স্ত্রী পোনা মাছের পার্থক্য (Difference between Male and Female Carp) ঃ**

| পুরুষ কার্প | স্ত্রী কার্প |
|---|---|
| 1. বর্ষাকালে পুরুষ কার্পের উদর-দেশের কোনো পরিবর্তন হয় না। | 1. বর্ষাকালে স্ত্রী কার্পের উদরদেশ ডিমপূর্ণ থাকায় চওড়া ও স্ফীত হয়। |
| 2. বক্ষ পাখনার উপরের দিকে বেশ খসখসে থাকে। | 2. বক্ষ পাখনা আগের মতো মসৃণ থাকে। |
| 3. পায়ুস্থানে চাপ দিলে শুক্ররসের সঙ্গে শুক্রাণু বেরিয়ে আসে। | 3. পায়ুস্থান লাল রঙের হয় এবং চাপ দিলে প্রথমে ডিম বের হয় এবং বেশি চাপ দিলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়। |

➤ 2. **হাপা প্রস্তুত করা (Preparation of Hapa) ঃ** পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য নাইলনের জাল বা পাতলা মার্কিন কাপড় দিয়ে উলটানো মশারির মতো যে আধার তৈরি করা হয় তাকে **হাপা** বলে। তবে জলের মধ্যে হাপা টাঙানো হয় মশারির ঠিক উলটোভাবে। অর্থাৎ হাপার চাঁদোয়াটি জলের মধ্যে থাকে। পুকুরের এক পাশে এক কোমর জলে চারটি খুঁটি চার কোণে বেঁধে হাপা টাঙানো হয়। হাপা দু'ধরনের হয়—ব্রিডিং হাপা এবং হ্যাচিং হাপা।

চিত্র 4.6 : ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপা।

(i) ব্রিডিং হাপা (Breeding Hapa) : প্রজননক্ষম স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে পিটুইটারি ইনজেকশন দেওয়ার পর এই হাপায় রাখা হয়। এই হাপায় মাছের প্রজনন ক্রিয়া ঘটে বলে একে ব্রিডিং হাপা বলা হয়। এই হাপাটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে 3 মিটার, $1\frac{1}{2}$ মিটার এবং 1 মিটার করা হয়। হাপার নিম্নাংশ $\frac{1}{2}$ মিটার জলের তলায় থাকে।
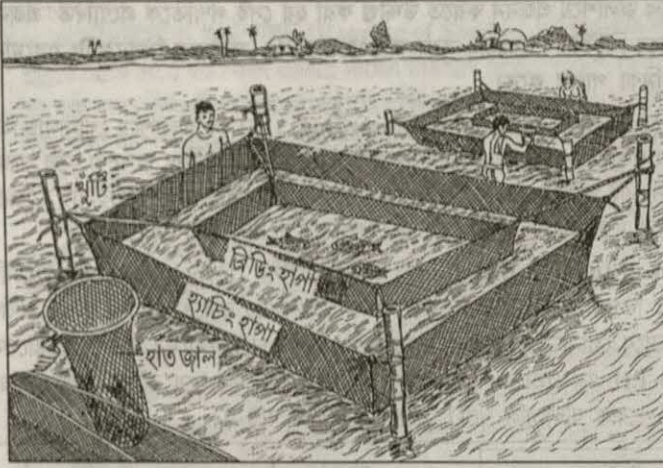
(ii) হ্যাচিং হাপা (Hatching Hapa) : এই হাপার আয়তন $3\frac{1}{2}$ মিটার × $1\frac{1}{2}$ মিটার × 1 মিটার হয়। ব্রিডিং হাপা থেকে পোনা মাছের নিষিক্ত ডিমগুলিকে এই হাপায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই হাপার মধ্যে নিষিক্ত ডিমগুলি ফুটে ডিমপোনা বের হয় বলে একে হ্যাচিং হাপা বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে হ্যাচিং হাপার মধ্যেই ব্রীডিং হাপাটি টাঙানো হয়।

- **ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপার পার্থক্য (Difference between Breeding Hapa and Hatching Hapa) :**

| ব্রিডিং হাপা | হ্যাচিং হাপা |
|---|---|
| 1. এই হাপাতে পুরুষ ও স্ত্রী মাছ প্রজননক্রিয়া করে। | 1. এই হাপায় নিষিক্ত ডিম থেকে ডিম পোনা সৃষ্টি হয়। |
| 2. ঘন বুননের জাল বা কাপড় ব্যবহার করা হয়। | 2. হালকা বুননের জাল ব্যবহার করা হয়। |
| 3. আকারে হ্যাচিং হাপার চেয়ে বড়ো হয়। | 3. আকারে ব্রিডিং হাপার চেয়ে ছোটো হয়। |

- **হ্যাচারি ও তার প্রকারভেদ (Hatchery and its types) :**

❖ **হ্যাচারির সংজ্ঞা : প্রনোদিত প্রজননের সাহায্যে ডিম সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক জলাশয়ে বা কৃত্রিম উপায়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে স্থানে ডিমপোনা উৎপাদন করা হয় তাকে হ্যাচারি বলে।**

হ্যাচারি প্রধানত তিন প্রকারের হয়, যেমন—

(a) **হাপা হ্যাচারি (Hapa Hatchery)**—প্রাকৃতিক জলাশয়ে উলটানো মশারির মতো যে হাপাতে ডিম থেকে ডিমপোনা উৎপাদন করা হয় তাকে **হাপা হ্যাচারি** বা **হ্যাচিং হাপা** বলে। এখানে দুটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ভিতরের প্রকোষ্ঠটি (1·75 × ·75 × ·5 মিটার) নাইলনের জাল দিয়ে তৈরি। এখানে ডিম ছাড়া হয়। এই জাল দিয়ে ডিম বেরোতে পারে না। কিন্তু ডিমপোনা বেরিয়ে বাইরের হাপাতে চলে আসে। বাইরের প্রকোষ্ঠ (2 × 1 × 1 মিটার) মার্কিন কাপড়ের তৈরি।

(b) **গ্লাসজার হ্যাচারি (Glassjar Hatchery)**— কাঁচের তৈরি যে যন্ত্রের মধ্যে ডিম রেখে তা থেকে ডিমপোনা সৃষ্টি করা যায় তাকে **গ্লাসজার হ্যাচারি** বলে। এই
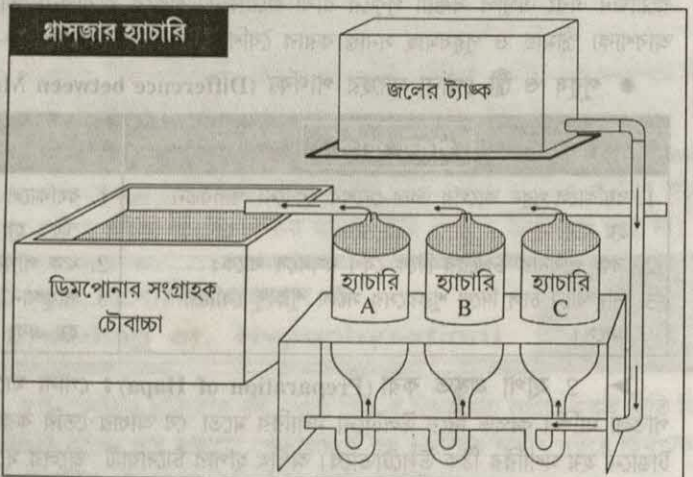
চিত্র 4.7 : গ্লাসজার হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের নক্সা।

জারগুলিতে প্রায় 6.5 লিটার করে জল ধরে। জারের নীচের অংশ সরু হয় এবং এখানে জলের পাইপলাইন সংযুক্ত করা হয়। জল জারে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। জারের উপরের অংশের সঙ্গে একটি খোলা পাইপ এমনভাবে যুক্ত করা থাকে যে জার থেকে জল খোলা পাইপে পড়ে। খোলা পাইপের জল একটি চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে। প্রতিটি জারে প্রায় 5000 ডিম নেওয়া হয় এবং জারের নীচ থেকে উপরের দিকে জল প্রবাহের সৃষ্টি করা হয়। ডিম ফুটে ডিমপোনা বেরিয়ে আসে এবং এই ডিম পোনা খোলা পাইপ দিয়ে বেরিয়ে চৌবাচ্চায় সংগৃহীত হয়।

চিত্র 4.8 : চাইনিজ সারকুলার হ্যাচারির নক্সা।

(c) **চাইনিজ হ্যাচারি (Chinese Hatchery) :** চীন দেশে এই প্রকার হ্যাচারির প্রচলন হয়। স্বাভাবিক পরিবেশে ব্রিডিং হাপা তৈরি বা তার পরিকাঠামো কোনো স্থানে না থাকলে কৃত্রিম উপায়ে এই হ্যাচারিতে মাছের ব্রিডিং ও স্পনিং প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে করা যায়। এই হ্যাচারিতে প্রায় 8 মিটার ব্যাস ও 1·5 মিটার গভীরতা যুক্ত একটি স্পনিং ট্যাংক তৈরি করা হয়। এই ট্যাংকের সঙ্গে একটি ওভারহেড জলাধার সংযুক্ত থাকে। এই ট্যাংকে মাছের ব্রিডিং-এর পরে ডিমগুলি জলাধারে নীচে অবস্থিত পাইপের সাহায্যে সংগ্রহ করে হ্যাচিং ট্যাংকে রাখা হয়। হ্যাচিং ট্যাংক থেকে ডিমপোনাগুলি পাইপের সাহায্যে একটি চৌবাচ্চায় এসে সংগৃহীত হয়।
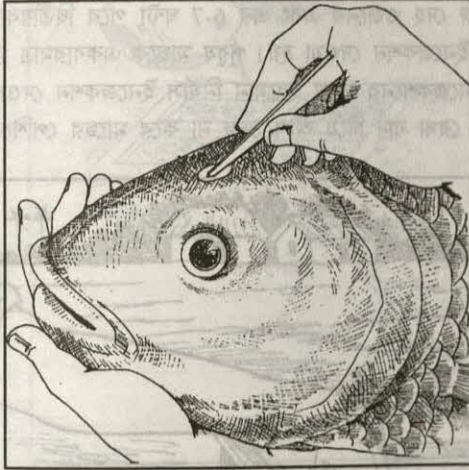
চিত্র 4.9 : মাছের মাথা থেকে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ।

➤ 3. **পোনা মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ (Collection and preservation of pituitary gland of carp) :** বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাজারে বিক্রির জন্য যে বড়ো বড়ো রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি পোনা মাছ আসে তাদের মাথা ব্যবচ্ছেদ করে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এই পিটুইটারি গ্রন্থিগুলিকে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল (Absolute alcohol)-এ সংরক্ষণ করা হয়। 24 ঘন্টা পর অ্যালকোহল বদল করে পিটুইটারি গ্রন্থি সংরক্ষণের কালো শিশিটির মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ করা হয়। এরপর এই শিশিটিকে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়।
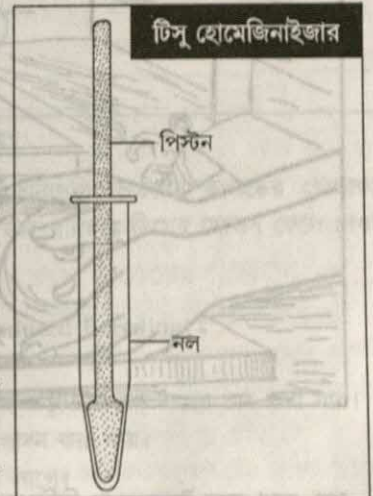
চিত্র 4.10 : যন্ত্রের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থি পেষণকরার পদ্ধতির চিত্ররূপ।

➤ 4. **পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে পিটুইটারি নির্যাস্ প্রস্তুত (Preparation of Pituitary extract from pituitary gland) :**

(i) **হোমোজিনাইজেশন** (Homogenization)—পিটুইটারি গ্রন্থিগুলিকে অ্যালকোহল থেকে বের করে ফিলটার কাগজের উপর দু'এক মিনিট রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর গ্রন্থিগুলিকে একটি টিসু **হোমোজিনাইজার** (Tissue homogenizer) যন্ত্রে নিয়ে সামান্য পরিমাণ (0·3%) সাধারণ লবণের দ্রবণ সহযোগে ভাল করে পেষণ করে গ্রন্থির কোশগুলিকে পৃথক করা হয়।
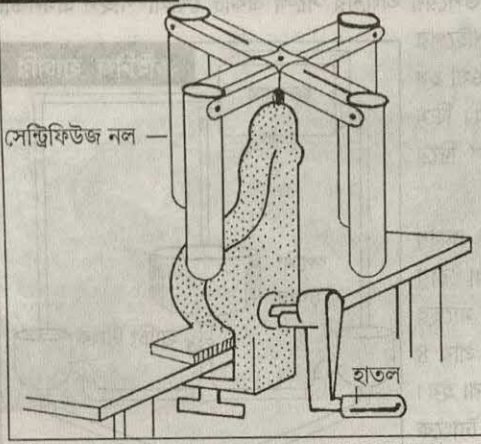
চিত্র 4.11 ঃ সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সাহায্যে পিটুইটারি নির্যাস প্রস্তুতকরণ।

(ii) **সেন্ট্রিফিউগেশন** (Centrifugation)—পেষণ করা পিটুইটারি গ্রন্থি একটি সেন্ট্রিফিউজ নলে নিয়ে **সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের** মধ্যে 5 মিনিটের জন্য 200 RPM এ (Revolutions per minute) ঘোরানো হয়। এর ফলে নলের উপরের অংশে পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া যায়। এই দ্রবণটি সযত্নে সংগ্রহ করা হয় এবং এটিকে **পিটুইটারি হরমোন** বা **নির্যাস্** বলে।

➤ **5. প্রজননের জন্য পুরুষ মাছ ও স্ত্রী মাছের সংখ্যা বা সেট নির্ধারণ (Selection of male and female sets of fish for breeding) ঃ**

প্রতি প্রজনন সেটে একটি স্ত্রী মাছ ও দু'টি পুরুষ মাছ রাখা হয়। কারণ একটি স্ত্রী মাছের সমস্ত ডিম নিষিক্ত করতে হলে দু'টি পুরুষ মাছের শুক্রাণু প্রয়োজন। তবে বর্তমানে দু'টি স্ত্রী মাছের সঙ্গে তিনটি পুরুষমাছ রাখলে নিষেক প্রক্রিয়া 100% হয় এবং অর্থকরীও হয়।

➤ **6. পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকশন পদ্ধতি (Method of injection of pituitary extract) ঃ** স্ত্রী মাছকে দুবার ইনজেকশন দেওয়া হয়। প্রথমবার 2-3 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দেহ ওজনের এবং এর 6-7 ঘন্টা পরে দ্বিতীয়বার 5-8 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দেহ ওজনের হিসাবে পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকশন দেওয়া হয়। পুরুষ মাছকে একবারমাত্র 2-3 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দেহের ওজন হিসাবে স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ইনজেকশনের সময় হরমোন নির্যাস ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই মাছগুলিকে পৃষ্ঠপাখনা ও পুচ্ছ পাখনার মাঝে স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা বাদ দিয়ে আঁশ ভেদ না করে মাছের পেশিতে
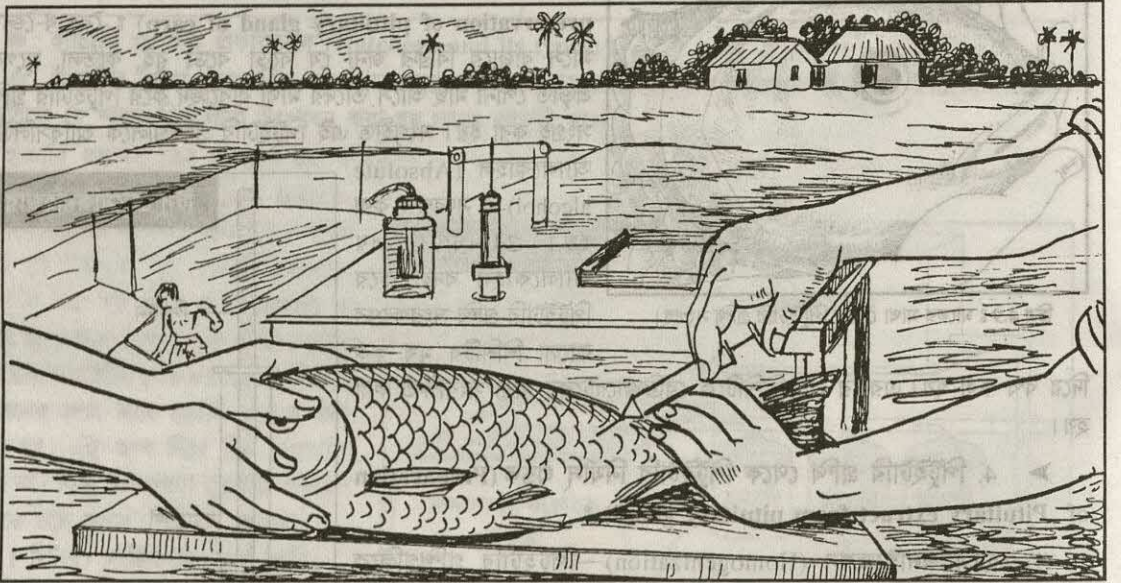
চিত্র 4.12 ঃ পিটুইটারি নির্জাস ইনজেকশন।

60° কোণ করে ইনজেকশন সিরিঞ্জের সাহায্যে ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং তারপর মাছগুলিকে ব্রিডিং হাপায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্ত্রী মাছের দ্বিতীয়বার ইনজেকশনের 5-6 ঘণ্টা পরে স্ত্রীমাছ ডিম্বাণু নির্গত করতে থাকে এবং পুরুষমাছ শুক্ররস নির্গত করে। ডিম্বাণুগুলি শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত হয় এবং এর 4-5 ঘণ্টা পরে নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি ব্রিডিং হাপা থেকে হ্যাচিং হাপাতে স্থানান্তরিত করা হয়। হ্যাচিং হাপাতে দুটি কাপড়ের সেট থাকে।
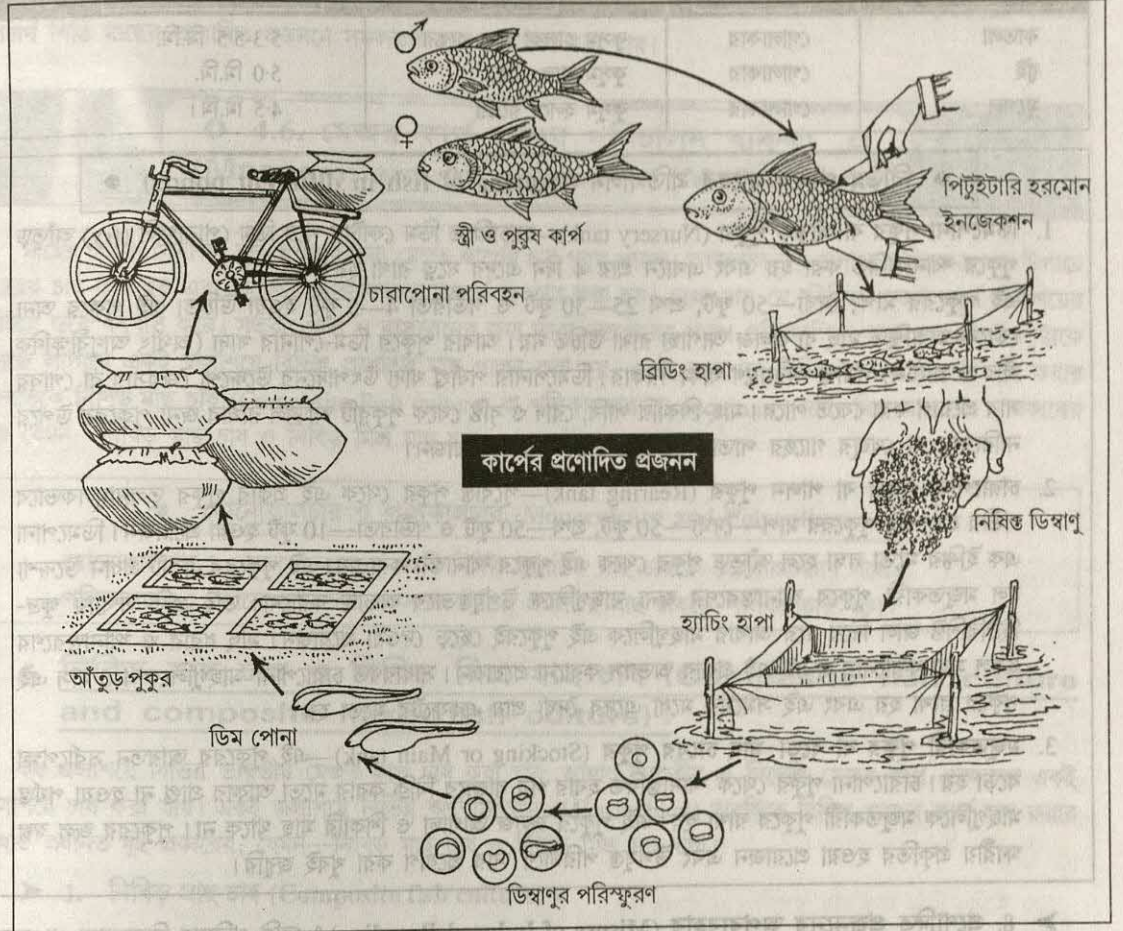
চিত্র 4.13 ঃ প্রণোদিত প্রজননের সামগ্রিক চিত্ররূপ।

16-18 ঘণ্টা পরে ডিম থেকে **ডিমপোনা** (Spawn) সৃষ্টি হয়। ডিমপোনাগুলি ভিতরের কাপড়ের গোলাকার ছিদ্রপথে বেরিয়ে বাইরের ঘনবুননের হাপায় আসে। এরপর উপরের হাপাতে জমা পরিত্যক্ত ডিমের খোলস ফেলে দেওয়া হয়।

➤ **7. প্রণোদিত বা আবিষ্ট প্রজননের সুবিধা (Advantages of Induced Breeding) ঃ**

(i) এই পদ্ধতিতে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা ডিমপোনা বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয়।

(ii) পুকুরে অতি সহজেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি পোনা মাছের চাষ করা যায়।

(iii) এই পদ্ধতিতে বৎসরে দুবার মাছের প্রজনন ঘটিয়ে প্রচুর মাছ উৎপাদন করা যায়।

(iv) এই পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য অতি অল্প পরিমাণ পরিবহন খরচ লাগে।

(v) এই পদ্ধতিতে উন্নতজাতের পোনামাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে দ্রুত বৃদ্ধিকারী সংকর জাতীয় পোনা মাছের উৎপাদন করা যায়।

● **কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছের ডিমের মধ্যে পার্থক্য ( Comparison of the eggs of Catla, Rohu and Mrigale ) :**

| পোনার নাম | আকার | বর্ণ | ডিমের গড় ব্যাস |
|---|---|---|---|
| কাতলা | গোলাকার | কুসুম হালকা লাল রঙের | 5·3-5·5 মি.মি. |
| রুই | গোলাকার | কুসুম লাল রঙের | 5·0 মি.মি. |
| মৃগেল | গোলাকার | কুসুম হলদে রঙের | 4·5 মি.মি। |

● **বিভিন্ন পুকুরে মাছের প্রতিপালন (Rearing of fish in different ponds)** ●

1. **ডিমপোনা পুকুর বা আঁতুড় পুকুর** (Nursery tank)—হ্যাচারিতে ডিম ফোটার পরে ডিম পোনাগুলি (fry) আঁতুড় পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে প্রায় 4 দিন এদের যত্নে রাখা হয়।
এই পুকুরের মাপ; দৈর্ঘ্য—50 ফুট, প্রস্থ 25—30 ফুট ও গভীরতা 4—5 ফুট হওয়া উচিত। এই পুকুরে অন্য কোনো অবাঞ্ছিত মাছ বা জলজ আগাছা রাখা উচিত নয়। আবার পুকুরে ডিম-পোনার খাদ্য (অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক জীব ও প্লাংটন) পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা দরকার। ডিমপোনার পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জৈবসার বা গোবর সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাছ-শিকারি পাখি, রোদ ও বৃষ্টি থেকে পুকুরটি আড়াল রাখার জন্য পুকুরের উপরে নারিকেল বা খেজুর গাছের পাতার তৈয়ারি ছাউনি থাকা প্রয়োজন।
2. **চারাপোনা পুকুর বা পালন পুকুর** (Rearing tank)—পূর্বোক্ত পুকুর থেকে এই প্রকার পুকুর তুলনামূলকভাবে গভীর হয়। এই পুকুরের মাপ—দৈর্ঘ্য—50 ফুট, প্রস্থ—50 ফুট ও গভীরতা—10 ফুট হওয়া প্রয়োজন। ডিমপোনা এক ইঞ্চির মতো লম্বা হলে আঁতুড় পুকুর থেকে এই পুকুরে স্থানান্তর করা হয়। এই পুকুরের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল মজুতকারী পুকুরে স্থানান্তরণের জন্য মাছগুলিকে উপযুক্তভাবে অভ্যস্ত করানো। তাই প্রতি সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র-ছিদ্রবিশিষ্ট জাল দিয়ে ধরে আবার মাছগুলিকে এই পুকুরেই ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। মাছ ধরার ও স্থানান্তরণের ধকল সহ্য করানোর জন্যই এই প্রকার অভ্যাস করানো প্রয়োজন। সাধারণত চারাপোনা মাছগুলিকে 4-6 মাস এই পুকুরে রাখা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে এদের দৈর্ঘ্য প্রায় একফুটের মতো হয়।
3. **মজুতকারী পুকুর বা বড়ো মাছ চাষের পুকুর** (Stocking or Main tank)—এই পুকুরের আয়তন সর্বাপেক্ষা বড়ো হয়। চারাপোনা পুকুর থেকে স্থানান্তরিত হবার পর বাজারে বিক্রি করার মতো আকার প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাছগুলিকে মজুতকারী পুকুরে রাখা হয়। এই পুকুরে জলজ আগাছা ও শিকারি মাছ থাকে না। পুকুরের জল স্বল্প ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়া প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা খুবই জরুরি।

➤ 8. **প্রণোদিত প্রজননের অপব্যবহার (Misuse of Induced Breeding) :** বেশি পরিমাণ ডিমপোনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অসৎ লোকেরা অল্প বয়সের মাছে পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকশন করে। এর ফলে এইসব মাছ থেকে যে সব ডিম এবং ডিম থেকে ডিমপোনা নির্গত হয় এবং পরবর্তীকালে যে পোনা তৈরি হয় সেগুলির বৃদ্ধির হার অনেক কম হয়। এইরূপ নিষিক্ত ডিমের মৃত্যুহার (Mortality) বেড়ে যায় এবং ডিম ও পোনা মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়।

● **পিটুইটারি হরমোনের বিকল্প কৃত্রিম হরমোনসমূহ (Hormones alternatives to Pituitary Hormone) :**

প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত পিটুইটারি হরমোনের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা পিটুইটারি হরমোনের বিকল্প খুঁজতে লাগলেন। এর ফলস্বরূপ মানুষের কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (HCG), লিউটেনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন (LHRH) গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (GnRH) ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

1. **মানুষের কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (Human Chorionic Gonadotropin = HCG) :** গর্ভবতী মহিলার অমরা থেকে এই হরমোন ক্ষরিত হয় এবং মূত্রের মাধ্যমে এটি নির্গত হয়। পিটুইটারি হরমোনের পরিবর্তে এই হরমোন ব্যবহার করা যেতে পারে। পিটুইটারি হরমোনের সঙ্গে HCG ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। শিঙি, মাগুর ইত্যাদি মাছের প্রণোদিত প্রজননে এই হরমোন প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করা গেছে।

2. **লিউটেনাইজিং হরমোন নির্গমনকারী হরমোন (LHRH) এবং গোনাডোট্রপিন নির্গমনকারী হরমোন (GnRH) :** মাছের প্রণোদিত প্রজননে এই হরমোনগুলি পিটুইটারি হরমোন নির্যাসের সঙ্গে ব্যবহার করে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

3. **স্টেরয়ডাল হরমোন (Steroidal hormones) :** ডেসক্সিকর্টিকোস্টেরোন অ্যাসিটেট (Desoxycorticosterone acetate) বা DOCA, 11-ডেসক্সিকর্টিকোস্টেরোন, 21-ডেসক্সিকর্টিসল, হাইড্রোকর্টিসন, কর্টিসন ইত্যাদি স্টেরয়েড জাতীয় পদার্থ শিঙি মাছের প্রণোদিত প্রজননে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়।

## 4.6. মেজর কার্প চাষের পরিচালন ব্যবস্থা (Management of culture of Major carp)

মাছের চাহিদা দৈনন্দিন বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মেজর কার্পের চাষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আজকাল বন্ধ জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের চাষ করা হয় এবং এক্ষেত্রে জলসম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। দেখা যায় যে, বিভিন্ন মেজর কার্প জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে। সুতরাং খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে একই জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পালন করা হয়। একই জলাশয়ে বিভিন্ন মেজর কার্পের চাষ করার পদ্ধতিকে **নিবিড় মাছ চাষ** (Composite Fish culture) বা **পলিকালচার** (Polyculture) বলে। মিশ্র মাছ চাষ দু'প্রকারের হয় যেমন—নিবিড় মাছ চাষ ও নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ।

**• মোনোকালচার ও পলিকালচার (Monoculture and Polyculture) •**

**মোনোকালচার :** কোনো জলাশয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ চাষকে মোনোকালচার বলে।

**পলিকালচার :** কোনো জলাশয়ে একসঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষকে পলিকালচার বলে।

### ▲ নিবিড় মাছ চাষ ও নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ (Composite fish culture and composite mixed fish culture) :

বন্ধ জলাশয়ে বিভিন্ন ভারতীয় মেজর কার্প চাষ করা যায়, আবার ভারতীয় ও বিদেশি মেজর কার্প একসঙ্গে একই জলাশয়ে চাষ করা যায়। একই জলাশয়ে বিভিন্ন অণুবাসস্থানে (Microhabitat) অবস্থিত বিভিন্ন মেজর কার্প চাষ করার পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকারের; যেমন—নিবিড় মাছ চাষ ও নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ।

#### ➤ 1. নিবিড় মাছ চাষ (Composite fish culture) :

❖ (a) **নিবিড় মাছ চাষের সংজ্ঞা (Definition of Composite fish culture)— যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভারতীয় মেজর কার্প একই জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়া চাষ করা হয় তাকে নিবিড় মাছ চাষ বলে।**

(b) **নিবিড় মাছ চাষের নীতি (Principles of composite fish culture) :** নিবিড় মাছ চাষের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(1) মাছগুলি খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। (2) মাছগুলি একে অন্যের কোনো ক্ষতি করে না। (3) মাছগুলি একে অন্যের বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন—গ্রাস কার্প পুকুরের ঘাস খেয়ে পুকুর পরিষ্কার রাখে এবং এর ফলে অন্য মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

**• নিবিড় মাছ চাষে হেক্টরপ্রতি বিভিন্ন মাছের চারাপোনার সংখ্যা :**

| কাতলা | রুই | মৃগেল | মোট |
|---|---|---|---|
| 1200 | 900 | 1500 | 3600 |

(c) **নিবিড় মাছ চাষের পদ্ধতি (Method of composite fish culture) :** শুধুমাত্র ভারতীয় মেজর কার্প নিয়ে

নিবিড় মাছ চাষ করা যায়। এই চাষে কাতলা ঃ রুই ঃ মৃগেল মাছ 4 : 3 : 5 অনুপাতে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। হেক্টর প্রতি মোট 3600 চারাপোনা ছাড়া হলে বছরে 30 কুইন্টাল মাছ পাওয়া যায়।
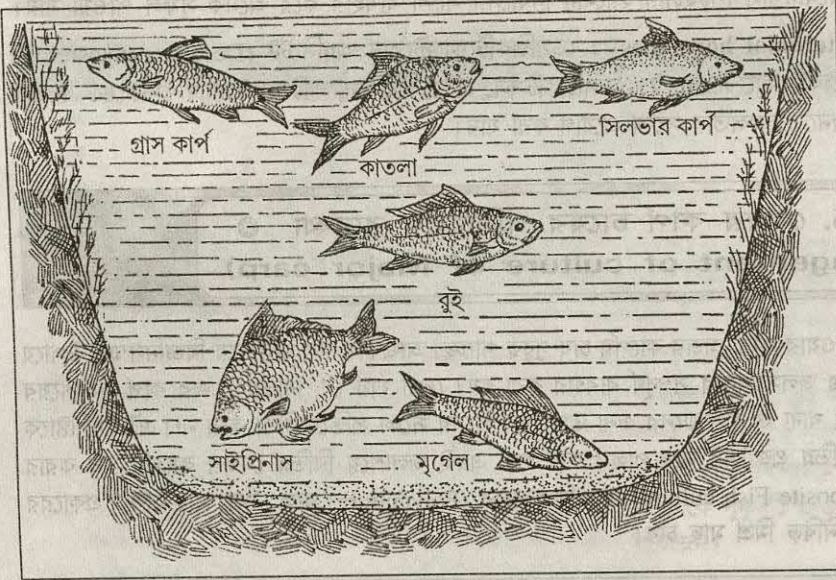
চিত্র 4.13 ঃ মাছের যৌগ মিশ্রচাষের চিত্ররূপ।

### ➤ 2. নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ (Composite mixed Fish culture) ঃ

❖ (a) **নিবিড় মিশ্র মাছ চাষের সংজ্ঞা (Definition of Composite mixed fish culture) ঃ** যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ও বিদেশি মেজর কার্পজাতীয় মাছ একসঙ্গে একই জলাশয়ের বিভিন্ন তলে এবং বিভিন্ন অণু-বাসস্থানে উপস্থিত থেকে একসঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভর করে না বা প্রতিযোগিতা করে না সেই পদ্ধতিকে নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ বলে।

(b) **নিবিড় মিশ্র মাছ চাষের নীতি (Principles of composite mixed fish culture) ঃ** একটি প্রজাতির মাছ অপর প্রজাতির সঙ্গে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করে না। এর ফলে একই জলাশয়ে উপস্থিত বিভিন্ন মাছের একটি সুস্থির বসবাস রীতি গড়ে ওঠে।

(c) **নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি (Method of composite mixed fish culture) ঃ** একই পুকুরে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি কার্পের প্রতিপালন করা হয়। প্রত্যেক প্রজাতি-মাছের খাদ্য গ্রহণের স্থান ভিন্ন হয় এবং খাদ্যের প্রকৃতিও ভিন্ন। এগুলি নিম্নরূপ—

| পূর্ণাঙ্গ প্রজাতি | খাদ্য প্রকৃতি | খাদ্য গ্রহণের স্থান |
|---|---|---|
| কাতলা | সর্বভুক | জলাশয়ের উপরতলে থাকে। |
| কালবোস | শাকাশী | জলাশয়ের নীচের তলে থাকে। |
| মৃগেল | সর্বভুক | জলাশয়ের নীচের তলে থাকে। |
| রুই | শাকাশী | জলাশয়ের মধ্যস্তরে খাদ্য সংগ্রহ করে। |
| সিলভার কার্প | শাকাশী | জলাশয়ের উপরের তলদেশে থাকে। |
| গ্রাস কার্প | শাকাশী | জলাশয়ের মধ্যস্তরে থাকে। |
| সাইপ্রিনাস | শাকাশী | জলাশয়ের নীচের তলে বসবাস করে। |

● **নিবিড় মিশ্রচাষে জলাশয়ে দেশি বিদেশি মাছের স্তরভিত্তিক অবস্থান এবং তাদের অনুপাত (Habitat and ratio of fish used in composite mixed culture) ঃ**

| স্তর | দেশি মাছ | বিদেশি মাছ | অনুপাত |
|---|---|---|---|
| উপরের স্তর | কাতলা—100 | সিলভার কার্প—200 | 1:2 |
| মাঝের স্তর | রুই—300 | গ্রাস কার্প—100 | 3:1 |
| নীচের স্তর | মৃগেল—150 | সাইপ্রিনাস কার্প—150 | 1:1 |

## 4.7. মাছের সাধারণ রোগ (Common diseases of carp)

### ▲ ফুলকা পচন, পাখনা বা লেজ পচন ও ড্রপসি (Gill rot, Fin and Tail rot and Dropsy) :

বিভিন্ন জীবাণু ঘটিত নানা রকমের রোগ পোনামাছের দেখা যায়, যেমন—ফুলকা পচন, পাখনা ও লেজ পচন, উদরী ইত্যাদি। এইসব রোগ থেকে পোনামাছকে রক্ষা করতে হলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে সনাক্ত করতে হবে এবং এইসঙ্গে রোগের লক্ষণ ও উপযুক্ত রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই রোগগুলির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

চিত্র 4.15 : মাছের ফুলকা পচন রোগ।

➤ 1. **ফুলকা পচন (Gill rot)**—এই রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটি এক প্রকার ছত্রাক যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল—*Branchiomyces sanguinis* (*ব্রাঙ্কিওমাইসিস স্যাঙ্গুইনিস*)।

● **লক্ষণ (Symptoms)**—আক্রান্ত মাছের ফুলকায় লাল রঙের ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং ফুলকা দেহ থেকে খসে পড়ে।

● **নিয়ন্ত্রণ** (Control)—প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত মাছকে 3—5% লবণ গোলা জলে 5 মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয় অথবা 2% পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটযুক্ত দ্রবণে মাছকে 2 মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

চিত্র 4.16 : মাছের পাখনা ও লেজ পচন রোগ।

➤ 2. **পাখনা ও লেজ পচন (Fin and Tail rot)**—এই রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু হল এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া।

● **লক্ষণ (Symptoms)**—প্রাথমিকভাবে এই রোগের শুরুতে পুচ্ছ পাখনা ও অন্যান্য পাখনার প্রান্তে সাদা দাগ সৃষ্টি হয় এবং পরে পাখনাগুলি পচনের ফলে বিনষ্ট হয়।

● **নিয়ন্ত্রণ (Control)**—আক্রান্ত মাছকে 0·5% কপার সালফেট দ্রবণে 1—2 মিনিট রেখে তারপর পুকুরে ছেড়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া লঘু ফেনক্সিথেল দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে একবার ডুবিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

চিত্র 4.17 : মাছের উদরী বা ড্রপসি রোগ।

➤ 3. **উদরী বা ড্রপসি (Dropsy)**—এই রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটি হল এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল—*Aeromonas punctata* (*এরোমোনাস পাঙ্কটাটা*)।

● **লক্ষণ (Symptoms)**—এই রোগে আক্রান্ত মাছের দেহগহ্বরে হলুদ বা বাদামি বর্ণের জলীয় পদার্থ জমে যায় ও সারা দেহ ফুলে ওঠে।

● **নিয়ন্ত্রণ (Control)**— রোগাক্রান্ত মাছকে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রবণে ডুবিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিলে কিছুটা উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সম্পূর্ণ প্রতিকারের কোনো উপায় নেই।
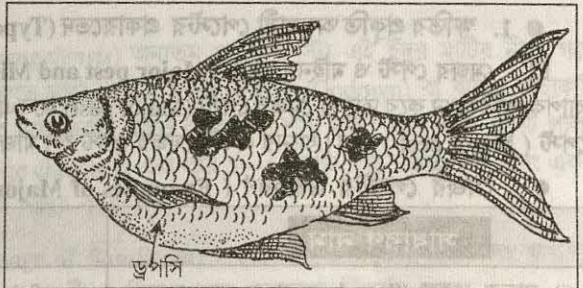
| রোগের নাম (রোগ সৃষ্টিকারী জীব) | লক্ষণ | প্রতিকার |
|---|---|---|
| 1. ফুলকা পচন (Gill rot) (*Branchiomyces sanguinis*— রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক ) | ফুলকায় লাল ক্ষত দেখা দেয় ও ফুলকা খসে পড়ে। | প্রাথমিক আক্রান্ত অবস্থায় মাছকে কিছুক্ষণ 3-5% লবণ জলে 5 মিনিট ডুবিয়ে রাখা অথবা 2% পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট জলে দিয়ে 2 মিনিট ডুবিয়ে রেখে আবার জলে ছেড়ে দিতে হয়। |
| 2. পাখনা ও লেজ পচন (Fin or Tail rot) ( ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ) | পাখনার কিনারায় প্রথমে সাদা দাগ হয় এবং পরে পাখনা ও লেজ পচে যায়। | 0·5% কপার সালফেট দ্রবণে অথবা লঘু ফেনোক্সিথল দ্রবণে একবার 1–2 মিনিট রেখে মাছকে জলে ছেড়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। |
| 3. ড্রপসি বা উদরী ( Dropsy) (*Aeromonas sp.* হল ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ) | দেহগহ্বরে জল জমে সারা দেহ ফুলে যায়। | খাবার দেওয়া বন্ধ করা এবং পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে রাখা। প্রতিকারের সম্ভাবনা কম। |

## ❂ 4.8. পেস্ট ও তার পরিচালন ব্যবস্থা ❂ (Pest and their management)

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে উদ্ভিদ সম্পদ থেকে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে প্রধান খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু কিছু প্রাণী এই কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এরা ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ বা মজুত ফসল বিনষ্ট করে। এর ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং মানুষের সুখসুবিধা ব্যাহত হয়। সাধারণভাবে মানুষের ক্ষতিকারক এইসব প্রাণীদের **পেস্ট** বলা হয়। কোনো জীব যখন মানুষের কাছে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করে তখনই ওই জীব পেস্টে পরিগণিত হয়। **যে পদ্ধতিতে পেস্টের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ফসলের ক্ষতির হার কম করা হয় তাকেই পেস্টের পরিচালন** (Pest management) **বলে।**

### ▲ পেস্টের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Definition and Types of Pest) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ** যে সব জীব ( প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতি) **প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফসলের ক্ষতি করে মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্য, লাভ ও সমৃদ্ধি ব্যাহত করে তাদের পেস্ট বলে।**

**উদাহরণ**—মাজরা পোকা, পামরি পোকা, ইঁদুর ইত্যাদি।

➤ (b) **পেস্টের প্রকারভেদ (Types of Pest) ঃ**

ক্ষতির তারতম্য, খাদ্যের প্রকৃতি এবং প্রাণী প্রকৃতি অনুযায়ী পেস্ট বিভিন্ন প্রকারের হয়। এখানে এগুলি আলোচনা করা হল।

● **1. ক্ষতির প্রকৃতি অনুযায়ী পেস্টের প্রকারভেদ (Types of Pest according to the nature of damage) ঃ**

☐ **মেজর পেস্ট ও মাইনর পেস্ট (Major pest and Minor pest) ঃ** প্রাণীবিদ্যার আলোচনায় যে সব প্রাণী ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে তাদের **মেজর পেস্ট** (Major pest) বলে এবং যে সব প্রাণী ফসলের কম ক্ষতিসাধন করে তাদের **মাইনর পেস্ট** ( Minor pest ) বলে। ধানের একটি মেজর পেস্ট হল মাজরা পোকা এবং একটি মাইনর পেস্ট হল চুঙ্গি পোকা।

● **মেজর পেস্টের উদাহরণ ( Examples of Major Pest ) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| (i) মাজরা পোকা (Stem borer ) | *Scirpophaga incertulas* (সিরপোফেগা ইনসারটুলাস ) (পূর্বের নাম— *Tryporyza incertulas*) |
| (ii) গন্ধি পোকা (Rice bug ) | *Leptocorisa varicornis* (লেপ্টোকরাইজা ভেরিকরনিস্ ) |
| (iii) পামরি পোকা (Rice hispa) | *Dicladispa armigera* (ডাইক্লাডিস্পা আরমিজেরা ) |

● **মাইনর পেস্টের উদাহরণ ( Examples of Minor Pest )** :

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| (i) চুঙ্গি পোকা (Paddy caseworm) | *Nymphula depunctalis* (নিমফুলা ডেপাঙ্কটেলিস্ ) |
| (ii) ধানের ফড়িং (Paddy Grasshopper) | *Hieroglyphus banian* (হাইএরোগ্লিফাস্ বেনিয়ান ) |
| (iii) পাতা-মোড়া পোকা (Leaf roller) | *Cnaphalocrosis medinalis* (ন্যাফালোক্রোসিস্ মেডিন্যালিস্ ) |

● **মেজর ও মাইনর পেস্টের পার্থক্য ( Difference between Major and Minor pest )** :

| মেজর পেস্ট | মাইনর পেস্ট |
|---|---|
| 1. বেশি ক্ষতি করে। | 1. কম ক্ষতি করে। |
| 2. সংখ্যায় অনেক বেশি। | 2. সংখ্যায় অনেক কম। |
| 3. এরা প্রধানত মোনোফ্যাগাস। | 3. এরা প্রধানত পলিফ্যাগাস। |
| 4. **উদাহরণ**— মাজরা পোকা, গন্ধি পোকা, পামরি পোকা প্রভৃতি। | 4. **উদাহরণ**— চুঙ্গি পোকা, শ্যামা পোকা, পাতা মোড়া পোকা প্রভৃতি। |

● **2. খাদ্যগ্রহণের প্রকৃতি অনুযায়ী পেস্টের প্রকারভেদ (Types of pest on the basis of nature of food habit)** : খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি অনুযায়ী পেস্টকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—**মোনোফ্যাগাস, অলিগোফ্যাগাস ও পলিফ্যাগাস পেস্ট (Monophagous Oligophagous and Polyphagous pest)** ।

(i) **মোনোফ্যাগাস পেস্ট**—যে সব পেস্ট কেবল একটিমাত্র প্রজাতির গাছের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্য কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ খায় না তাদের **মোনোফ্যাগাস** বা **একভোজী পেস্ট** বলে। **উদাহরণ**—মাজরা পোকা (কেবল ধান গাছে জীবনচক্র সম্পন্ন করে)।

(ii) **অলিগোফ্যাগাস পেস্ট**—যে সব পেস্ট জীবনধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট গোত্রের (family) সমস্ত গাছের উপর নির্ভর করে, তাদের **অলিগোফ্যাগাস পেস্ট** বলে। **উদাহরণ**—কপির শুঁয়োপোকা।

(iii) **পলিফ্যাগাস পেস্ট**—যে সব পেস্ট জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক গাছের উপর নির্ভর করে তাদের **পলিফ্যাগাস পেস্ট** বলে। **উদাহরণ**—গন্ধি পোকা ( এরা ধান ও অন্য গাছের রস এবং বিভিন্ন অংশ খায়)।

● **3. প্রাণী পেস্টের প্রকারভেদ (Types of Animal Pest)** :
বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী-পেস্ট হতে পারে, যেমন—ইঁদুর (স্তন্যপায়ী), মাজরা পোকা (পতঙ্গ) ইত্যাদি।

## ▲ (a) স্তন্যপায়ী (ইঁদুর) পেস্ট : *ব্যান্ডিকোটা বেঙ্গালেনসিস্* ও তার ক্ষতির প্রকৃতি (Mammalian pest—*Bandicota bengalensis*—its nature of damage) :

স্তন্যপায়ী পেস্টের মধ্যে **ধেড়ে ইঁদুর** (*Bandicota bengalensis*) অন্যতম প্রধান পেস্ট। এই ইঁদুর মাটির নীচে গর্তে বসবাস করে এবং এরা নিশাচর প্রাণী। ধেড়ে ইঁদুর সাধারণত মাঠে শস্যের মজুত ভাণ্ডার (Godown) বা বাড়ির কাছাকাছি প্রায় 1—1·5 মিটার গভীর গর্তে বসবাস করে। এই গর্তের মধ্যে একটি মজুত কক্ষে এরা শস্য মজুত করে এবং একটি পালন কক্ষে শাবক ইঁদুর পালন করে। একটি **মজুত কক্ষে** (Storage chamber) এরা প্রায় 5—6 কেজি শস্য মজুত করে এবং একটি **পালন কক্ষে** (Brood chamber) প্রায় 5—14 টি শাবক পালন করে।

● ***ব্যান্ডিকোটার*** **ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage of *Bandicota*)** : ধেড়ে ইঁদুর মানুষের সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন জনসম্পদ বিনষ্ট করে এবং মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি ও বিস্তার করে জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে।

(i) **খাদ্যশস্যের বিনষ্টিকরণ**—এই জাতের ইঁদুর ভারতবর্ষে প্রায় 45 মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য প্রতি বছরে বিনষ্ট করে। এই ইঁদুর শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মূল উৎপাটিত করে অথবা শস্য মজুত ভাণ্ডার থেকে ধান, গম, ডাল ইত্যাদি শস্য বিনষ্ট করে।

(ii) **নদীর বাঁধ ও মাটির বাড়ির ক্ষতি**—নদীর বাঁধে এরা গর্ত করে বাঁধটিকে দুর্বল করে দেয়, ফলে বাঁধ ভেঙে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া এরা কাঁচামাটির ঘরবাড়ি গর্ত করে ক্ষতি করে।
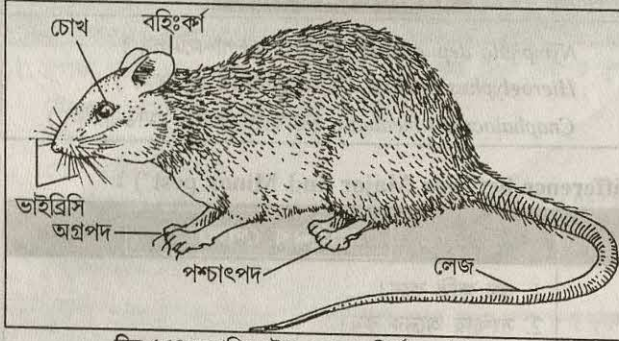
চিত্র 4.18 ঃ ব্যান্ডিকোটার দেহের বহির্গঠনের চিত্ররূপ।

(iii) **গৃহস্থালি সামগ্রীর বিনষ্টিকরণ**—ঘরের মধ্যে ঢুকে এরা দামি বই, কাগজ, কাঠের আসবাবপত্র, ধাতব সরঞ্জাম ইত্যাদি বিনষ্ট করে।

(iv) **রোগ সৃষ্টি ও রোগ বিস্তারে সাহায্য করে**—ধেড়ে ইঁদুর প্রায় 35টি বিভিন্ন রোগ বহন করে রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। এরা মানুষের খাদ্যদ্রব্যে মুখ দিয়ে রোগজীবাণু সংক্রমণ ও বিস্তার করে। প্রধান রোগগুলির নাম হল—ইঁদুর সংক্রামিত জ্বর, লেপ্টোস্পাইরোসিস্ (Leptospirosis), স্যালমোনেল্লোসিস্ (Salmonellosis), টাইফয়েড, প্লেগ ইত্যাদি।
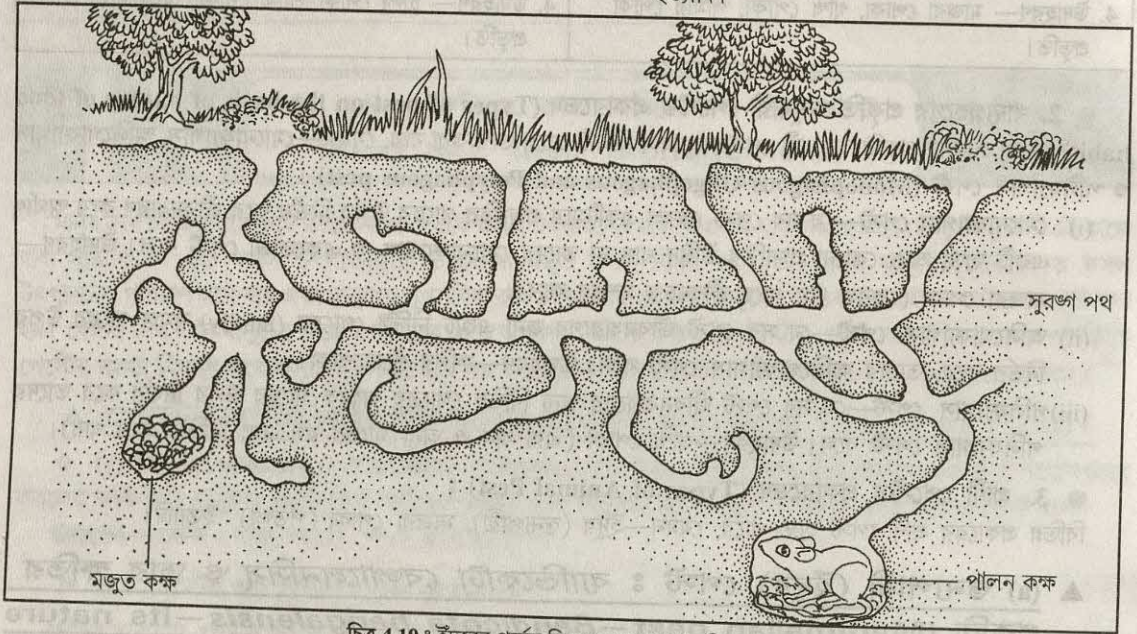
চিত্র 4.19 ঃ ইঁদুরের গর্তের ভিতরে সুড়ঙ্গপথের চিত্ররূপ।

● **ব্যান্ডিকোটা দমন পদ্ধতি (Control measures of Bandicota)** ঃ নানারকম পদ্ধতিতে ধেড়ে ইঁদুর দমন করা যায়, যেমন—

1. **ইঁদুর নিধন**—ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে বা ইঁদুরের গর্তে জল অথবা ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত জল ঢেলে ইঁদুরকে গর্ত থেকে বের করে নিধন করা যায়।

2. **ফাঁদ ব্যবহার**—বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করে জীবন্ত বা মৃত ইঁদুর ধরা যায়। ফাঁদের ভিতর আকর্ষণীয় টোপ দিয়ে ইঁদুরকে আকৃষ্ট করা হয়।

3. **বিষাক্ত পদার্থ বা বিষ প্রয়োগ**—আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড, বেরিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ আকর্ষণীয় টোপের সঙ্গে ব্যবহার করে ইঁদুর বিনাশ করা যায়। এছাড়া গর্তের মধ্যে **ধূপন পদার্থ**, যেমন—মিথাইল ব্রোমাইড, অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, ক্লোরোপিকরিন ইত্যাদি ব্যবহার করে ইঁদুর নিধন করা যায়।

4. **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ**—(i) পুরুষ ইঁদুরকে নির্বীজ করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দিলে ইঁদুরের সংখ্যা হ্রাস পায়। (ii) ইঁদুরের পরজীবী বা ইঁদুরের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (র‍্যাট ভাইরাস) প্রয়োগ করে ইঁদুর দমন করা যায়। (iii) বেজী, পেঁচা, বিড়াল

ইত্যাদি শিকারী প্রাণীর সাহায্যে প্রাকৃতিকভাবে ইঁদুর দমন করা যায়। (iv) শস্যক্ষেত্রে **ফসল আবর্তন** (Crop rotation) করে মাঝে মাঝে বেশি অর্থকরী শস্য (Cash crop) চাষ না করে অন্য প্রকার রবিশস্যের চাষ করে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

## ▲ (b) পতঙ্গ পেস্ট (Insect pest) :

বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ পেস্ট হিসাবে মানুষের প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে। এর মধ্যে ধানের ক্ষতিকারক অন্যতম পতঙ্গ পেস্টগুলি হল—মাজরা পোকা, গন্ধি পোকা ও পামরি পোকা ইত্যাদি।

## 1. মাজরা পোকা Stem Borer— *Scirpophaga incertulas*

[বর্তমানে *Tryporyza* গণের নতুন নাম হল *Scirpophaga*]

● **মাজরা পোকার প্রাণীজগতে স্থান, জীবনচক্র, ক্ষতির প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (Systematic position, Life cycle, Nature of damage and Control measures of Stem Borer) :**

(a) **প্রাণীজগতে স্থান (Systematic position) :**

পর্ব (Phylum)—সন্ধিপদী (Arthropoda)
উপপর্ব (Subphylum)—ম্যান্ডিবিউলেটা (Mandibulata)
শ্রেণি (Class)—ইনসেক্টা (Insecta)
উপশ্রেণি (Subclass)—টেরিগোটা (Pterygota)
বর্গ (Order)—লেপিডোপটেরা (Lepidoptera)
গণ (Genus)—*Scirpophaga* [ **পূর্বে নাম ছিল *Tryporyza*** ]
প্রজাতি (Species)—*incertulas*

স্ত্রী মথ পুরুষ মথ
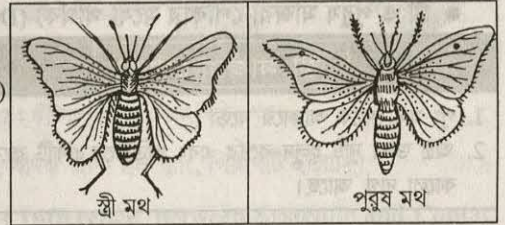
(b) **মাজরা পোকার জীবনচক্র (Life cycle of Stem borer) :**

মাজরা পোকার জীবনচক্রে চারটি দশা দেখা যায়, যেমন—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ।

(i) **ডিম**—পুরুষ ও স্ত্রী মথের যৌন মিলনের পরে স্ত্রীমথ ধান গাছের পাতায় 80-150টি ডিম পাড়ে। 5-10 দিন পরে ডিম ফুটে লার্ভা বা শুককীট বেরিয়ে আসে।

(ii) **লার্ভা**—লার্ভাগুলির গায়ে ছোটো ছোটো রোম বা শুঁয়া থাকে বলে এদের শুঁয়াপোকা (Caterpillar) বলে। প্রথম অবস্থায় এরা ধানগাছের কচি পাতা খায়। এরপর কাণ্ডের কোনো অংশে ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে অভ্যন্তরীণ কলা খেয়ে বাড়তে থাকে। পরিণত লার্ভা প্রায় 2 সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং 16–27 দিনের মধ্যে লার্ভা পিউপায় রূপান্তরিত
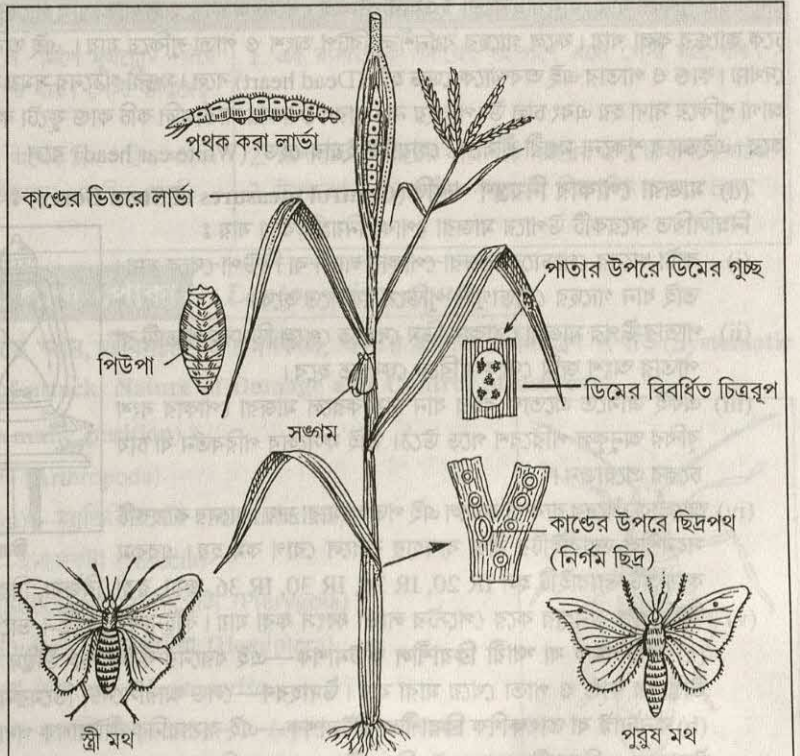
চিত্র 4.20 : মাজরা পোকার জীবন চক্রের চিত্ররূপ।
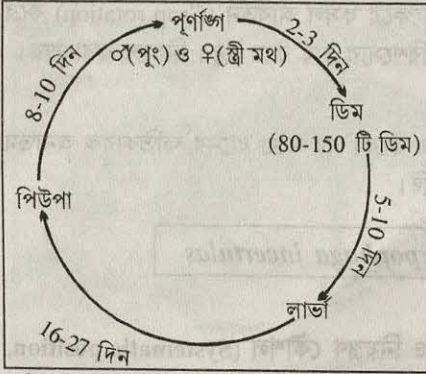
চিত্র 4.21 ঃ মাজরা পোকার বিভিন্ন দশার সময়কাল।

হয়। পরিণত লার্ভা জলতলের একটু উপরের কাণ্ডে একটি **নির্গম ছিদ্র** (**Emergence hole**) তৈরি করে।

(iii) **পিউপা**—পরিণত লার্ভার মুখ নিঃসৃত লালারসের সুতো দিয়ে আবরণী বা গুটি (Cocoon) তৈরি করে এবং এই গুটির মধ্যে পিউপা অবস্থান করে।

(iv) **পূর্ণাঙ্গ**—পিউপা অবস্থায় 8-10 দিন কাটানোর পর পিউপা পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয় এবং পিউপার আবরণী কেটে বেরিয়ে আসে। এরপর লার্ভা কাণ্ডের গায়ে যে **নির্গম ছিদ্র** তৈরি করেছিল সেই ছিদ্র দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দশা বাইরে চলে আসে। মাজরা পোকার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে 31-50 দিন সময় লাগে।

● **স্ত্রী ও পুরুষ মাজরা পোকার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Male and Female Stem borer) ঃ**

| স্ত্রী মাজরা পোকা | পুরুষ মাজরা পোকা |
|---|---|
| 1. পুং মথ থেকে আকারে বড়ো। | 1. স্ত্রীমথ থেকে আকারে ছোটো। |
| 2. অগ্র ডানা দুটি হলুদ বর্ণের এবং প্রতিটিতে একটি করে কালো দাগ আছে। | 2. অগ্র ডানা দুটি হলুদ বর্ণের এবং প্রতিটির কালো দাগ অস্পষ্ট। |

(c) **মাজরা পোকার ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage done by stem borer) ঃ**

মাজরা পোকা ধানগাছের একটি মেজর পেস্ট। ধানগাছে লার্ভা দশাই হল ক্ষতিকারক দশা। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ ধানগাছটি শুকিয়ে যায়। ধানগাছ বড়ো হওয়ার পর এই পেস্টে আক্রান্ত হলে লার্ভাগুলি গাছের নীচে নরম কাণ্ডের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাণ্ডের কলা খায়। ফলে গাছের বর্ধনশীল বিটপ অংশ ও পাতা শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় সারা মাঠ শুকনো খড়ের মতো দেখায়। কাণ্ড ও পাতার এই অবস্থাকে **ডেড হার্ট** (Dead heart) বলে। মঞ্জরী গঠনের সময় মাজরা পোকা আক্রমণ করলে মঞ্জরীর আগা শুকিয়ে সাদা হয় এবং চাল উৎপন্ন হয় না। কারণ পোকার লার্ভাগুলি কচি কাণ্ড ফুটো করে আগার দিকে যায় এবং কলা ভক্ষণ করে। এইভাবে শুকনো মঞ্জরী শীর্ষকে **'হোয়াইট ইয়ার হেড'** (White ear head) বলে।

(d) **মাজরা পোকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures of Stem Borer) ঃ**

নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

(i) কাটা ধানের গোড়াতে মাজরা পোকার লার্ভা বা পিউপা থেকে যায়। তাই ধান গাছের গোড়াগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(ii) পাতার উপর মাজরা পোকার ডিম দেখতে পেলে ডিমসহ পাতাটি বা পাতার অংশ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

(iii) একই জমিতে প্রত্যেক বছর ধান চাষ করলে মাজরা পোকার বংশ বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে। তাই ফসলের পরিবর্তন বা চাষ চক্রের প্রয়োজন।

চিত্র 4.22 ঃ আলোকফাঁদের চিত্ররূপ।

(iv) আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করলে এই পতঙ্গ মারা যায়। ধানের কয়েকটি সহনশীল ভ্যারাইটির বীজ ব্যবহার করলে রোগ কম হয়। এরকম কয়েকটি ভ্যারাইটি হল IR 20, IR 26, IR 30, IR 36, জয়া, রত্না, বিজয়া, বিক্রম ইত্যাদি।

(v) কীটনাশক ব্যবহার করে পেস্টের লার্ভা ধ্বংস করা যায়। কীটনাশককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—

(a) **সিস্টেমিক বা স্থায়ী ক্রিয়াশীল কীটনাশক**—এই ধরনের কীটনাশক উদ্ভিদ কলার ভেতরে সক্রিয় থাকে। পেস্ট উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা খেয়ে মারা যায়। **উদাহরণ**—লেড আরসিনেট, ডিমেক্রন, এনড্রিন প্রভৃতি।

(b) **কনট্যাক্ট বা তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীল কীটনাশক**—এই রাসায়নিক কীটনাশক পদার্থের সংস্পর্শে এলে পেস্ট মারা যায়। **উদাহরণ**—নিকোটিন সালফেট, নিকোটিন দ্রবণ প্রভৃতি।
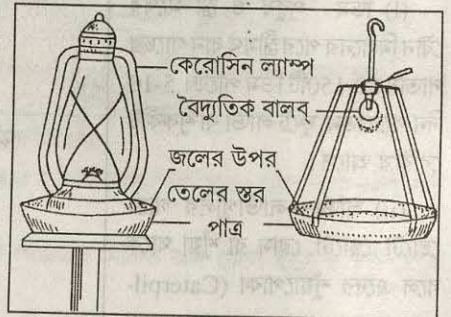
(c) **ধূমন বা ফিউমিগেশন কীটনাশক**—কয়েক প্রকার কীটনাশক পদার্থের ধোঁয়া পতঙ্গের মৃত্যু ঘটায়। **উদাহরণ**—মিথাইল, ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড প্রভৃতি।

(vi) পেস্টের প্রকোপ বেশি হলে 5% BHC. (benzene hexachloride) পাউডার স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

(vii) আজকাল কৃষিবিজ্ঞানীরা **জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ** (Biological control) করছেন। প্রাকৃতিক খাদক প্রাণী ও শত্রুর সাহায্যে বিভিন্ন পতঙ্গকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা যায়। মাজরা পোকার প্রাকৃতিক শত্রুরা হল কয়েক প্রজাতির বোলতা এবং খাদক প্রাণী হল ব্যাং, গিরগিটি ইত্যাদি।

চিত্র 4.22 ঃ কীটনাশক স্প্রে করার বিভিন্ন যন্ত্র।

● **সিস্টেমিক কীটনাশক ও কনট্যাক্ট কীটনাশকের পার্থক্য ( Difference between Systemic and Contact Insecticides )** ঃ

| সিস্টেমিক কীটনাশক | কনট্যাক্ট কীটনাশক |
|---|---|
| 1. এই রাসায়নিক পদার্থগুলি জলে মিশে মূলরোম দিয়ে গাছের কাণ্ড ও পাতার কোশগুলিতে যায়। পেস্ট উদ্ভিদের কাণ্ড বা পাতা খেয়ে মারা যায়। | 1. এই রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এলে পেস্ট মরে যায়। |
| 2. গাছের ভেতরে রাসায়নিক পদার্থ অনেক দিন সক্রিয় থাকে। | 2. রাসায়নিক পদার্থের কাজ অল্প সময়ের জন্য ক্রিয়াশীল থাকে। |
| 3. **উদাহরণ**—লেড আরসিনেট, ডিমেক্রন, এনড্রিন প্রভৃতি কীটনাশক। | 3. **উদাহরণ**— নিকোটিন সালফেট, নিকোটিন দ্রবণ, BHC প্রভৃতি। |

## 2. গন্ধি পোকা *Leptocorisa acuta*

● **গন্ধি পোকার প্রাণীজগতে স্থান, জীবনচক্র, আক্রমণকাল, ক্ষতির প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Systematic position, Life cycle, Period of attack, Nature of Damage and Control measures)** ঃ

(a) **প্রাণীজগতে স্থান (Systematic position)** ঃ

পর্ব (Phylum)—সন্ধিপদী (Arthropoda)
উপপর্ব (Subphylum)—ম্যান্ডিবিউলেটা (Mandibulata)
শ্রেণি (Class)—ইনসেক্টা (Insecta)
উপশ্রেণি (Subclass)—টেরিগোটা (Pterygota)
বর্গ (Order)—হেমিপ্টেরা (Hemiptera)
গণ (Genus)—*Leptocorisa*
প্রজাতি (Species)—1. *Leptocorisa acuta*
2. *Leptocorisa varicornis*
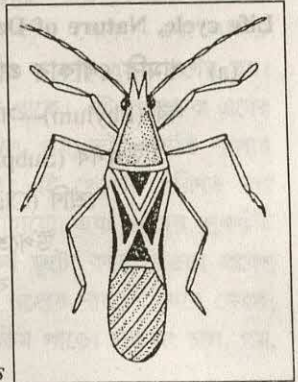
○ গন্ধিপোকা ধানগাছের একটি মেজর পেস্ট। এদের দেহ থেকে একটি বিশেষ ধরনের খারাপ গন্ধ নির্গত হয় বলে একে গন্ধিপোকা বলে।

(b) **গন্ধিপোকার জীবনচক্র (Life cycle of *Leptocorisa*) :**
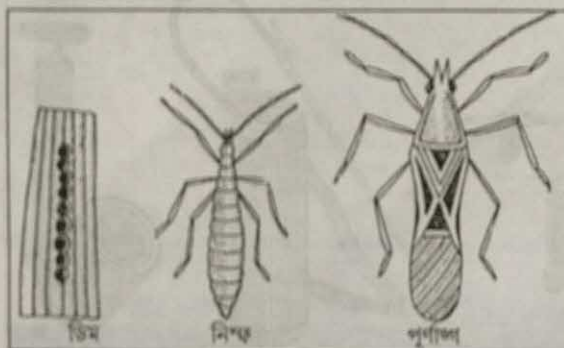
চিত্র 4.23 : গন্ধিপোকার জীবনচক্রের বিভিন্ন দশার চিত্ররূপ।

গন্ধি পোকার জীবনচক্র—তিনটি দশায় বিভক্ত করা যায়, যেমন—ডিম, নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ গন্ধিপোকা ধানগাছের পাতায় প্রায় 10-12টি সারিতে প্রায় 200টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি আঠালো পদার্থ দিয়ে ধানগাছের পাতার উপরের দিকে মধ্যশিরায় আটকে থাকে। ডিম থেকে 5-7 দিনের মধ্যে **নিম্ফ** (Nymph) বের হয়। নিম্ফগুলি ডানাবিহীন, আকারে ছোটো এবং এদের জনন অঙ্গ থাকে না। হালকা সবুজ বর্ণের নিম্ফগুলি প্রায় দুদিন ধরে পাতার রস খায়। তারপর এরা কচি ধানের শীর্ষে ওঠে এবং শীর্ষের সাদা রস বা দুধ পান করে। নিম্ফ 5 বার খোলস ছেড়ে 15-21 দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ 2-3 সেন্টিমিটার লম্বা হয়। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গগুলি সকালে ও সন্ধ্যায় সক্রিয় থাকে এবং ধানের বর্ধিষ্ণু শীর্ষের ক্রমান্বয়ে ক্ষতি করতে থাকে।

(c) **গন্ধিপোকার আক্রমণ কাল (Period of attack of *Leptocorisa*) :** ধানগাছে জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে গন্ধিপোকার আক্রমণ দেখা যায়। ধান গাছের শিষের কচি ধানে দুধ আসার সময়ই হল গন্ধিপোকার আক্রমণের মুখ্যকাল।

(d) **গন্ধিপোকার ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of Damage done by *Leptocorisa*) :** পূর্ণাঙ্গ গন্ধিপোকা এবং নিম্ফগুলি ধানের শিষ থেকে সাদা রস চুষে খায়। এর ফলে ধানের শিষের ক্ষতি হয় এবং ধানের মধ্যে শস্যদানা বা চাল হয় না।

(e) **গন্ধিপোকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures of *Leptocorisa*) :** (i) ধান কাটার পর জমির আগাছাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (ii) ছোটো ছোটো জালের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ ও নিম্ফ দশা সংগ্রহ করে নষ্ট করা। (iii) আলোক ফাঁদ তৈরি করেও এদের মারা যায়। (iv) এই পতঙ্গ আক্রান্ত জমিতে (BHC 10%) ছড়িয়ে এদের বিভিন্ন দশা সহজেই ধ্বংস করা যায়। (v) ডিমযুক্ত পাতাগুলি নির্মূল করা। (vi) গন্ধি পোকার প্রাকৃতিক শত্রু হল এক প্রকার বীটল (*Cicindela sexpunctata*)। এদের সাহায্যে গন্ধিপোকা দমন করা যায়।

## 3. পামরি পোকা *Dicladispa armigera*

● **পামরি পোকার প্রাণীজগতে স্থান, জীবনচক্র, ক্ষতির প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Systematic position, Life cycle, Nature of Damage and Control measures of Rice hispa) :**

(a) **পামরি পোকার প্রাণীজগতে স্থান (Systematic position of Rice hispa) :**

পর্ব (Phylum)—সন্ধিপদী (Arthropoda)
উপপর্ব (Subphylum)—ম্যান্ডিবিউলেটা (Mandibulata)
শ্রেণি (Class)—ইনসেক্টা (Insecta)
উপশ্রেণি (Subclass)—টেরিগোটা (Pterygota)
বর্গ (Order)—কোলিওপ্টেরা (Coleoptera)
গণ (Genus)—*Dicladispa* ( ডাইক্লাডিসপা )
প্রজাতি (Species)—*armigera* ( আরমিজেরা )

○ **পামরি পোকা সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্গত পতঙ্গশ্রেণির কোলিওপটেরা বর্গের প্রাণী**। এরা এক ধরনের গুবরে পোকা। এরাও ধানের মেজর পেস্ট। এদের পূর্ণাঙ্গ দেহ শক্ত, নীলাভ কালো বর্ণের হয়। এদের দেহত্বক সূক্ষ কাঁটাযুক্ত।

চিত্র 4.25 ঃ পামরি পোকার বহির্গঠন (পূর্ণাঙ্গ দশা)।

(b) **পামরি পোকার জীবনচক্র (Life history of *Rice hispa*)** ঃ পামরি পোকার জীবনচক্রকে চারটি দশায় বিভক্ত করা যায়, যেমন—ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীপতঙ্গ ধান গাছের পাতার উপর 50-60 টি ডিম পাড়ে। ডিম 4-5 দিন পর ফুটে হালকা হলুদ রঙের লার্ভা হয়। এরা পাতার কলার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে 7-12 দিন ধরে পাতার কলা খেয়ে প্রায় 6 মিলিমিটারের মতো লম্বা হয়। এরপর ক্রমে লার্ভা পিউপাতে রূপান্তরিত হয়। পিউপা দেখতে চ্যাপটা এবং বাদামি রঙের। এরা 4-5 দিন পরে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ দেখতে অনেকটা কালচে নীল রঙের। এদের উপরের পাখা দুটি বেশ শক্ত এবং সারা দেহে সূক্ষ্ম কাঁটা থাকে। পতঙ্গটির জীবনকাল মাত্র 15-16 দিন স্থায়ী হয়।
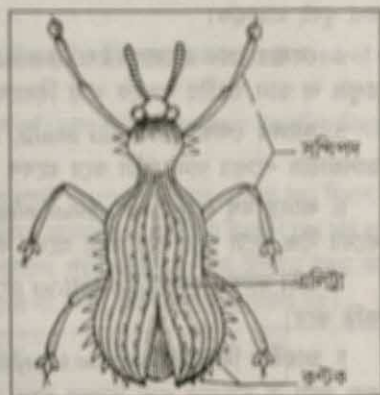
(c) **পামরি পোকার ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage done by Rice hispa)** ঃ লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ উভয় দশা ধানের পক্ষে ক্ষতিকারক। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ পাতার সবুজ ক্লোরোফিল খায়। লার্ভা অবস্থায় পাতার মেসোফিল কলা খায়। আক্রমণের শুরুতে পাতার দৈর্ঘ্য বরাবর ডোরা দাগ দেখা যায়। লার্ভা পাতার বহিত্বকের ঝিল্লির মধ্যে ছিদ্র করে ঢুকে যায় এবং সাদা দাগের সৃষ্টি করে। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত অংশগুলি ক্রমে শুকিয়ে খড়ের মতো হয়ে যায়।

(d) **পামরি পোকার দমন পদ্ধতি (Control measures of Rice hispa)** ঃ (i) ডিমসহ পাতাগুলি ছিঁড়ে নষ্ট করতে হবে। (ii) আক্রান্ত ক্ষেতে BHC (10%) ছড়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। (iii) লিনডেন বা ডিমেক্রন জলে গুলে জমিতে স্প্রে করলে লার্ভা দশা নষ্ট হয়। (iv) ধান কাটার পর আগাছা পুড়িয়ে দিলে পামরি পোকার আক্রমণ অনেকটা কমে যায়।

## ▲ গুদামজাত শস্যের ক্ষতিকারক কয়েকটি জীব (Some organisms causing damage to the stored grain) ঃ

ধান, চাল, গম, ছোলা, মুগ, মুসুর, তৈলবীজ, শুষ্ক ফল, মসলা প্রভৃতি গুদামজাত শস্য বিনষ্টকারী পেস্ট কয়েক প্রকার জীবাণু, ছত্রাক, কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতি। এদের দ্বারা শস্যের ক্ষতির প্রকৃতি নীচে আলোচিত হ'ল।

1. **খাপরা পোকা** (*Trogoderma granarium*) —এরা এক প্রকার বিট্‌ল পোকা। শূককীট দশায় এরা চাল, ডাল জাতীয় শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে। এরা শস্যের উপরিস্তর খেয়ে ফেলে। সাদা-ধূসর রং-এর এই শূককীটগুলির সমগ্র দেহে লাল-ধূসর বর্ণের কূর্চ থাকে।
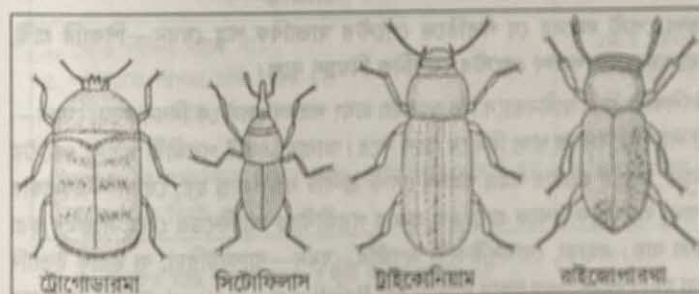
চিত্র 4.26 ঃ গুদামজাত শস্যের কয়েকটি পেস্টের পূর্ণাঙ্গ দশা।

2. **ধানের উইভিল পোকা** (*Sitophilus oryzae*)—এরাও একপ্রকার বিট্‌ল পোকা। এরা লালচে ধূসর বর্ণের বা শুধু ধূসর বর্ণের হয়। এদের তুণ্ড থাকে। এই পোকা বা এদের শূককীট চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের ক্ষতি করে। এই পোকার পরিণত দশা তুণ্ডের সাহায্যে এবং এদের শূককীট চালের দানা ফুটো করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং শস্যের সারাংশ খেয়ে ফেলে। ফলে চালের ভিতরে ফাঁপা গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরের মধ্যে মা উইভিল পোকা আবার ডিম পাড়ে। সুতরাং চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের এরা প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

3. **রাস্ট-রেড ময়দার পোকা** (*Tribolium castaneum*)—এরাও এক ধরনের বিট্‌ল পোকা। লালচে ধূসর বর্ণের এই পোকা তণ্ডুল জাতীয় শস্য, আটা, ময়দা, ডাল, শুষ্ক ফল, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এদের শূককীট দশা খুবই মারাত্মক।

4. **লেসার গ্রেন বোরার** (*Rhizopertha dominica*)—এই পোকাগুলি কালো ধূসর বর্ণের হয়। এদের শূককীট দশা তণ্ডুল বা ডাল জাতীয় শস্যকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে শস্যের ধ্বংস করে।

5. **ডালের পোকা** (*Bruchus analis, Laria affinis*)—এরা একধরনের বিট্‌ল পোকা। এই পোকার শূককীট দশা ডালজাতীয় শস্যের দানা ফুটো করে প্রবেশ করে এবং দানার সারাংশ খেয়ে ফেলে।

6. **ধানের মথ** (*Corcyra cephalonica*)—এই ধরনের কালো বর্ণের মথ গুদামজাত ধানের প্রভূত ক্ষতি করে। এরা ধানের বীজ ফুটো করে তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ধানের সারাংশ খেয়ে ফেলে। এদের শূককীট দশা মারাত্মক।

7. **আটা ময়দার পোকা** (*Latheticus oryzae*)—হালকা হলুদ বর্ণের এই পোকাগুলি গুদামজাত আটা, ময়দা খেয়ে প্রচুর ক্ষতি করে।

8. **ভারতীয় মিল কীট** (*Plodia interpunctella*)—এই ধরনের পোকা দলা পাকানো আটা বা ময়দার মধ্যে বাস করে এবং আটা বা ময়দাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের শূককীট দশা প্রচুর পরিমাণে আটা, ময়দা ধ্বংস করে।

## ▲ পতঙ্গ পেস্টের জৈব নিয়ন্ত্রণের সংক্ষিপ্ত ধারণা (Outline idea of Biological control of Insect pest) ঃ

বিভিন্ন পতঙ্গ পেস্ট ফসল উৎপাদনে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এই সমস্ত পেস্টের দমন করা একান্ত জরুরি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেস্ট দমন করা যায়, যেমন—যান্ত্রিক পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি, জৈব দমন পদ্ধতি ইত্যাদি। এইসব পদ্ধতির মধ্যে রাসায়নিক দমন পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকরী হওয়ায় চাষিরা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে পেস্টের আক্রমণ থেকে তাদের ফসল রক্ষা করে। কিন্তু রাসায়নিক কীটনাশকের স্থায়ী বিষক্রিয়ার প্রভাব থাকায় এগুলি ফসলের মধ্যে থেকে যায়। এই ফসল মানুষ ভক্ষণ করলে মানুষের নানান রোগ সৃষ্টি হয় এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন বা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাসায়নিক কীটনাশকের প্রধান বিকল্প হিসাবে **জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ** (Biological control) পদ্ধতির ব্যবহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বিভিন্ন প্রকার আধুনিক পেস্ট দমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিগুলি প্রধানত আনবিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং এখানে **জিনগত কারিগরিবিদ্যার** (Genetic engineering) নীতি ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত শস্য গ্রহণে মানুষের শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না।

### ➤ 1. পতঙ্গ পেস্টের জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Biological control of Insect pest) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— পতঙ্গ পেস্ট দমনের যে পদ্ধতিতে পেস্টের স্বাভাবিক শত্রু যেমন—শিকারি প্রাণী, পরজীবী ও রোগসৃষ্টিকারী জীব ব্যবহার করা হয় তাকে পতঙ্গ পেস্টের জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ বলে।**

(b) **ব্যাখ্যা (Explanation)**— একটি শিকারি প্রাণী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং পতঙ্গ পেস্টকে নিধন করে, যেমন—বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাং, গিরগিটি ইত্যাদি প্রাণী পতঙ্গ পেস্টকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আবার, একটি পরজীবী পতঙ্গ পেস্টের দেহকে আক্রমণ করে এবং পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন হওয়ার সময় পতঙ্গ পেস্ট প্রাণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যেমন—একপ্রকার অ্যাফিড্ (Aphid) পতঙ্গ পেস্ট বিনাশের জন্য আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত এক প্রকার পরজীবীকে অ্যাফিডের দেহে সংক্রমণ করা হয়। এর ফলে অ্যাফিডের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া, রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব, যেমন—ব্যাকটেরিয়া, বা ছত্রাক ইত্যাদি সংক্রমণের সাহায্যে পতঙ্গ পেস্টের নিধন করা হয়; যেমন—এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া Bacillus thuringiensis নামের একপ্রকার জীব উদ্ভিদ দেহে সংক্রমণ করলে ওই ব্যাকটেরিয়া একপ্রকার টক্সিক পদার্থ (Toxic substance) উৎপাদন করে যা উদ্ভিদ দেহের কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু কোনো পতঙ্গ পেস্ট ওই উদ্ভিদের কোনো অংশ ভক্ষণ করলে টক্সিক পদার্থের প্রভাবে পেস্টের মৃত্যু ঘটে।

এছাড়া কালচারাল পদ্ধতি অবলম্বন করে পেস্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—**শস্য আবর্তন** (Crop rotation), **জমি কর্ষণ**, শস্য উদ্ভিদের পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করা, প্রাকৃতিক শত্রু লাগানো ইত্যাদি পদ্ধতিগুলিকেও এককথায় জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

➤ **2. গাম্বুশিয়া, প্যানচাক্স, তেলাপিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে মশার জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ (Biological control of mosquito by *Gambusia, Panchax*, Tilapia etc) :**

মানুষের বিভিন্ন রোগজীবাণুর বাহক হিসাবে মশার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে মশককুল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রধানত দুটি উপায়ে মশার জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—(1) মশার লার্ভা বিনাশ, (2) মশার পূর্ণাঙ্গ দশা বিনাশ।

মশার লার্ভা বিনাশের জন্য যে জলাধারে মশা জন্মগ্রহণ করে সেখানে গাম্বুশিয়া, প্যানচাক্স, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ চাষ করা হয়। এই মাছগুলি মাংসাশী হওয়ায় এরা মশার লার্ভা বিনাশ করে। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মশাকে কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যা করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই বন্ধ্যা মশাগুলি পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারে না, ফলে মশার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

### ● সুসংহত পেস্ট-পরিচালন পদ্ধতি (Integrated Pest Management or IPM) ●

ব্যাপকভাবে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে উপকারী পতঙ্গ, মাছ, ব্যাং, সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি মারা যায় এবং মানুষের দেহে রাসায়নিক পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, জৈব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে পেস্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে **সুসংহত পেস্ট-পরিচালন পদ্ধতি** বলে।

❖ **সংজ্ঞা (Definition)— পেস্ট দমনের যে পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের সঙ্গে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, জৈব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকে সুসংহত পেস্ট-পরিচালন পদ্ধতি বলে।**

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. মৎস্য চাষ ক্ষেত্র বা মীনক্ষেত্র কী ?**

● যে সব জলাশয়ে মাছ সংগ্রহ ও পালন করা হয় তাকে মৎস্যচাষ ক্ষেত্র বা মীনক্ষেত্র বলে।

**2. ব্যাঙাচি ও চারাপোনার পার্থক্য কী ?**

| ব্যাঙাচি | চারাপোনা |
|---|---|
| 1. জোড় পাখনা থাকে না।<br>2. পাখনাতে পাখনা রশ্মি থাকে না।<br>3. বহিঃফুলকা থাকে যা রূপান্তরের সময় অবলুপ্ত হয়।<br>4. রূপান্তরের প্রথমদিকে পশ্চাৎপদ ও শেষে অগ্রপদ সৃষ্টি হয় এবং লেজ বিনষ্ট হয়। | 1. জোড় পাখনা থাকে।<br>2. পাখনাতে পাখনা রশ্মি থাকে।<br>3. বহিঃফুলকা অনুপস্থিত; কিন্তু অন্তঃফুলকা উপস্থিত যা আজীবন কর্মক্ষম থাকে।<br>4. রূপান্তর হয় না এবং অগ্র ও পশ্চাৎপদ সৃষ্টি হয় না। |

**3. সংকর মাছ কাকে বলে ? দুটি উদাহরণ দাও।**

● নিকট সম্পর্কযুক্ত দু'টি ভিন্ন প্রজাতির মাছের যৌন মিলনে যে মাছ সৃষ্টি হয় তাকে সংকর মাছ (Hybrid fish) বলে।

**উদাহরণ :** (i) পুরুষ রুই × স্ত্রী কালবোস = রুই-কালবোস

(ii) পুরুষ কাতলা × স্ত্রী কালবোস = কাতলা-কালবোস

**4. মাছের যৌগ মিশ্রচাষ বলতে কী বোঝো ?**

● একই পুকুরে দেশীকার্প (রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি) জাতীয় মাছে সঙ্গে বিদেশী কার্প (সিলভার কার্প, সাইপ্রিনাস, গ্রাস কার্প ইত্যাদি) জাতীয় মাছের চাষ করার পদ্ধতিকে যৌগ মিশ্রচাষ বলে। এই চাষের ফলে জলাশয়ের সব স্তরের বাসস্থান ও খাদ্যের সদ্ব্যবহার করা যায়।

**5. লীন ফিস ও ফ্যাস ফিস কাদের বলে ?**

● যে সব মাছে 2% অপেক্ষা কম ফ্যাট থাকে তাদের লীন ফিস এবং যে সব মাছে 2% এর বেশী ফ্যাট থাকে তাদের ফ্যাট ফিস বলে।

**6. (ক) মাছের শত্রু কাদের বলে ? (খ) এদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?**

● (ক) জলাশয়ে যে সব উদ্ভিদ (ঝাঁঝি জাতীয়) ও প্রাণী (কাঠি পোকা, তাঁত পোকা, জল ফড়িং, জল বিছে, জল কাঁকড়া ইত্যাদি) মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের মাছের শত্রু বলে। তাছাড়া মৎস্যভূক মাছ (শোল, শাল, বোয়াল ইত্যাদি) ও ডাঙায় বসবাসকারী (উদবেড়াল, মাছরাঙা, জলঢোঁড়া ইত্যাদি) প্রাণীগুলিকে ও মাছের শত্রু বলা হয়।

(খ) নিয়ন্ত্রণের উপায় ঃ (i) ঝাঁঝিজাতীয় উদ্ভিদ জলাশয় থেকে তুলে ফেলা অথবা তুঁতে বা আর্সেনিক প্রয়োগ করে দমন করা। (ii) জলে তেল-সাবানের মিশ্রণ প্রয়োগকরে পোকামাকড় জাল দিয়ে তুলে ফেলা। (iii) মহুয়ার খোল প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ নির্মূল করা।

**7. একটি ছত্রাক ও একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত মাছের রোগের নাম করো।**

● (i) একটি ছত্রাক ঘটিত মাছের রোগের নাম হল ফুলকা পচন রোগ।

(ii) একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত মাছের রোগের নাম হল পাখনা পচন রোগ।

**8. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ করতে হলে যে পুকুরগুলি প্রয়োজন তাদের নাম লেখো।**

● বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছচাষ করতে হলে চারটি পুকুরের প্রয়োজন। যেমন— (i) হ্যাচারী, (ii) আঁতুড় পুকুর বা নাসরী পুকুর, (iii) পালন পুকুর, ও (iv) সঞ্চয়ী পুকুর।

**9. ধানের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পেস্টের বৈজ্ঞানিক নাম কী ?**

● ধানের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পেস্টের বৈজ্ঞানিক নাম হল *Scirpophaga* ( = *Tryporyza*) *incertulus* বা মাজরা পোকা।

**10. ডেড হার্ট কাকে বলে ?**

● মাজরা পোকার লার্ভাগুলি ধানের কাণ্ডের ভিতরে নরম কলা ভক্ষণ করে বড়ো হয়। এরফলে ধানের বর্ধনশীল বীটপ অংশ ও পাতা শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় ধানগাছগুলিকে শুকনো খড়ের মতো দেখায়। কাণ্ড ও পাতার এই অবস্থাকে ডেড হার্ট বলে।

**11. হোয়াইট ইয়ার হেড কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।**

● ধানগাছের মঞ্জরী গঠনের সময় মাজরা পোকা বা স্টেম বোরার দ্বারা আক্রান্ত হলে মঞ্জরীর শীর্ষদেশ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায় এবং ধানের ভিতরে চাল উৎপন্ন হয় না; কারণ মাজরা পোকার লার্ভা ধানগাছের কাণ্ড ফুটো করে ভিতরের কলা খেয়ে নেয়। এর ফলে সৃষ্ট শুকনো মঞ্জরীশীর্ষকে হোয়াইট ইয়ার হেড বলে।

**12. পুষা বিন কী ?**

● বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি পেস্ট প্রতিরোধক শস্যদানার গুদামকে পুসা বিন (Pusa bin) বলে।

**13. নির্গম ছিদ্র কাকে বলে ? এর তাৎপর্য কী ?**

● মাজরা পোকার লার্ভা ধানগাছের কাণ্ডের ভিতরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার আগে কাণ্ডের নীচের দিকে, জলতলের একটু উপরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে যাতে ওই ছিদ্রপথে পূর্ণাঙ্গমথ কাণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ছিদ্রটিকে **নির্গম ছিদ্র** (Emergence hole) বলে।

**তাৎপর্য ঃ** পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা ধানগাছের কাণ্ডের ভিতর থেকে বাইরে আসার জন্য এই নির্গম ছিদ্রের প্রয়োজন। কারণ পূর্ণাঙ্গ মথের মুখউপাঙ্গ ধানগাছের কাণ্ড কেটে বেরিয়ে আসার উপযুক্ত নয়। তাই প্রকৃতির নিয়মেই পূর্ণাঙ্গ দশার জন্য লার্ভা এই নির্গম ছিদ্র তৈরি করে।

## ০ অনুশীলনী ০

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির এককথায় উত্তর দাও (Answer the following questions in one word) :

1. মাছ, চিংড়ি, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি জলজ প্রাণীর প্রতিপালনকে কী বলে ?
2. স্বাদুজলে বসবাসকারী যে মাছের চোয়ালে দাঁত থাকে না ও দেহগহ্বরে পটকা থাকে না তাকে কী বলে ?
3. যে কার্পের বৃদ্ধিহার কম তাকে কী বলে ?
4. যে মাছের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষে নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে চাষ করা হয়, তাকে কী বলে ?
5. *Oreochromis* কোন্ মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম ?
6. স্বাদু জলে লবনের পরিমান কত থাকে ?
7. লবনাক্ত জলে লবনের পরিমান কত থাকে ?
8. কোন্ প্রকার জলে পার্সে মাছের চাষ করা হয় ?
9. প্রবহমান বা সদাস্রোতযুক্ত জলকে কী বলে ?
10. স্থির বা স্রোতহীন জলকে কী বলে ?
11. সমুদ্রে মাছ ধরার পদ্ধতি কোন্ ফিশারির অন্তর্গত ?
12. যে হাপাতে ডিম ফোটোনো হয় তাকে কী বলে ?
13. পিটুইটারি হরমোনের একটি বিকল্প বলো ?
14. ডিম পোনা থেকে কোন্ দশা সৃষ্টি হয় ?
15. পিটুইটারি নির্জাসে কোন্ হরমোন থাকে ?
16. মাজরা পোকার বিজ্ঞানসম্মত নাম কী ?
17. একটি মাইনর পেস্টের উদাহরণ দাও।
18. ইঁদুরের গর্তে কোন্ কক্ষে শাবক থাকে ?
19. একটি পলিফেগাস পেস্টের উদাহরণ দাও।
20. একটি মোনোফেগাস পেস্টের উদাহরণ দাও।

#### B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) :

1. কার্পজাতীয় মাছের দেহে পটকা থাকে ☐ / মাথায় আঁশ থাকে ☐ / পটকা থাকে না ☐ / চোয়ালে দাঁত থাকে ☐।
2. বুইমাছ হল একপ্রকার মাইনর কার্প ☐ / বিদেশী মাছ ☐ / মেজর কার্প ☐ / তরুনাস্থি বিশিষ্ট মাছ ☐।
3. সিলভারকার্প হল একপ্রকার দেশি মাছ ☐ / বিদেশি মাছ ☐ / তরুনাস্থি বিশিষ্ট মাছ ☐ / মাইনর কার্প ☐।
4. যে হাপাতে ডিম থেকে ডিমপোনা নির্গত হয় তাকে—ব্রিডিং হাপা ☐ / হ্যাচিং হাপা ☐ / পালন পুকুর ☐ / মজুত পুকুর ☐ বলে।
5. পিটুইটারি হরমোনের একটি বিকল্প হল—LH ☐ / FSH ☐ / GH ☐ / HCG ☐।
6. মাছের ফুলকা পচনের জন্য দায়ী জীবাণুটি হল—ব্যাকটেরিয়া ☐ / ছত্রাক ☐ / ভাইরাস ☐ / আদ্যপ্রাণী ☐।
7. মাছের প্রণোদিত প্রজননের জন্য থাইরয়েড ☐ / যকৃৎ ☐ / অগ্নাশয় ☐ / পিটুইটারি ☐ গ্রন্থি প্রয়োজন হয়।
8. গ্রাসকার্প জলাশয়ের নিম্নস্তরে ☐ / উপর তলে ☐ / মধ্যতলে ☐ / সবস্তরে ☐ / বসবাস করে।
9. পামরি পোকা ধানগাছের কাণ্ডের ☐ / পাতার ☐ / মূলের ☐ / ফুলের ☐ ক্ষতি করে।
10. মাজরাপোকা ধানগাছের ☐ / গম গাছের ☐ / কপি গাছের ☐ / মটর গাছের ☐ ক্ষতি করে।

#### C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. চিংড়ি, কাঁকড়া, মন্তাঝিনুক, মাছ ইত্যাদি প্রতিপালনকে ——— বলে।
2. বাটামাছ হল একটি ——— কার্পের উদাহরণ।
3. পিটুইটারি নির্জাস প্রয়োগ করে মাছচাষকে ——— বলে।
4. ধানীপোকা যে পুকুরে পালন করা হয় তাকে ——— পুকুর বলে।
5. ডিমপোনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ——— পোনায় পরিণত হয়।
6. চারাপোনা ——— পুকুরে পালন করা হয়।
7. রুই, কাতলা, ও মৃগেল মাছ একই পুকুরে চাষ করাকে ——— মাছ চাষ বলে।
8. দেশি ও বিদেশি মাছ একই পুকুরে পালন করাকে ——— মাছ চাষ বলে।
9. উদরি বা ড্রপসি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটি হল একপ্রকার ———।
10. একটি মোনোফেগাস পেস্টের উদাহরণ হল ———।
11. একটি পলিফেগাস পেস্টের উদাহরণ হল ———।
12. যে মাছের দেহগহ্বরে পটকা থাকে তাকে ——— বলে।
13. সরল পুঁটি একটি ——— কার্পের উদাহরণ।
14. প্রজননকালে স্ত্রীমাছের উদরদেশ ——— হয়।
15. কাতলামাছ জলাশয়ের ——— তলে বসবাস করে।

#### D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. রুইমাছের দেহগহ্বরে পটকা থাকে না। ☐
2. গ্রাসকার্প একটি দেশি মাছ। ☐

3. বাটামাছ একপ্রকার মাইনর কার্প। ☐
4. কালবোস মাছ জলাশয়ে উপরের তলে বসবাস করে। ☐
5. সমুদ্রে শুধুমাত্র ক্যাপচার ফিশারি সম্ভব। ☐
6. পিটুইটারি হরমোন প্রয়োগ করলে মাছ বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। ☐
7. মাছের প্রজনন যে হাপাতে ঘটে তাকে হ্যাচিং হাপা বলে। ☐
8. পিটুইটারি নির্জাসে থাইরয়েড হরমোন থাকে। ☐
9. একই পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছচাষকে মোনোকালচার বলে। ☐
10. পিটুইটারি হরমোনের একটি বিকল্প হল HCG। ☐
11. গন্ধিপোকা এক প্রকার মাইনর পেস্ট। ☐
12. পুঁটিমাছ একপ্রকার মেজর কার্প। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

### নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. কাতলা ও কালবোস মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম কী ?
2. দুটি মাইনর কার্পের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
3. মাছের পিটুইটারি নির্জাসে উপস্থিত হরমোন দুটির নাম কী ?
4. মৃগেল ও কাতলামাছ জলাশয়ের কোন্ তলে অবস্থান করে ?
5. মাজরাপোকা ও পামরি পোকার বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
6. গন্ধিপোকা কীভাবে ধানগাছের ক্ষতি করে ?
7. পলিফেগাস পেস্ট কাদের বলে ?
8. পলিকালচার কী ?
9. হাপা কাকে বলে ?
10. গ্রাসকার্প ও সাইপ্রিনাস কার্পের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :

1. কৃষি প্রাণীবিদ্যা কাকে বলে ?
2. মৎস্য চাষের সংজ্ঞা দাও।
3. মেজর ও মাইনর পেস্ট কাকে বলে ?
4. প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির মূল নীতি কী ?
5. কোন্ নীতির উপর মাছের মিশ্রচাষ করা হয় ?
6. পেস্টের সংজ্ঞা দাও।
7. পতঙ্গ পেস্টের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝো ?
8. বন্ধজলাশয়ে পোনামাছ কেন ডিম পাড়ে না ?
9. পিটুইটারি নির্জাসে উপস্থিত হরমোনগুলির কাজ লেখো।
10. ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপার বর্ণনা দাও।

### B. পার্থক্য নিরূপন করো (Distinguish between) :

1. ফিসারি ও পিসসিকালচার। 2. মেজর কার্প ও মাইনর কার্প। 3. পুরুষ কার্প ও স্ত্রী কার্প। 4. ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপা। 5. মাছের ফুলকা পচন ও পাখনা পচন। 6. মেজর পেস্ট ও মাইনর পেস্ট। 7. মোনোফেগাস ও অলিগোফেগাস পেস্ট। 8. স্ত্রী ও পুরুষ মাজরা পোকা। 9. সিস্টেমিক ও কনটাক্ট কীটনাশক। 10. রাসায়নিক কীটনাশক ও জৈবনিক নিয়ন্ত্রণ।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

1. মাছের প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
2. নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতির নীতি ও ব্যবস্থা বর্ণনা করো।
3. পেস্ট কাকে বলে ? একটি স্তন্যপায়ী পেস্টের ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করো।
4. মাজরা পোকার ক্ষতির প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
5. পামরি পোকার ক্ষতির প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
6. প্রথাগত ও প্রাচীন মাছ চাষের অসুবিধাগুলি লেখো। প্রণোদিত প্রজননের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো।
7. মেজর পেস্ট কাকে বলে ? একটি মেজর পেস্টের জীবনচক্র সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
8. ধেড়ে ইঁদুর, মাজরাপোকা ও গন্ধিপোকার ক্ষতির প্রকৃতি লেখো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি :



# অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

# [ OUTLINE IDEA ABOUT ECONOMIC ZOOLOGY ]

## ভূমিকা (Introduction) :

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান—এই তিনটি প্রাথমিক চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও পদ্ধতিগত উন্নতিসাধনের সাহায্যে সেই চাহিদা পুরণ করেছে। মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরভোজী ও পরনির্ভরশীল প্রাণী। মানুষের জীবনযাত্রাকে ঘিরে যে সব প্রাণী রয়েছে তাদের মুলত দুভাগে ভাগ করা যায়— (1) **উপকারী প্রাণী**, যেমন—গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, চিংড়ি, ঝিনুক, মৌমাছি, রেশম মথ, লাক্ষা পতঙ্গ ইত্যাদি; (2) **অপকারী প্রাণী**, যেমন—ফসল ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ, মশা, মাছি, ইঁদুর, উইপোকা ইত্যাদি। মানুষ একদিকে যেমন উপকারী প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত পালনের সাহায্যে মাছ, মাংস, দুধ, মধু, রেশম, লাক্ষা ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে তেমন অন্যদিকে এই দ্রব্যগুলির উৎপাদনে অন্তরায় অপকারী প্রাণীদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দমন ও বিনাশের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। প্রাণীবিজ্ঞানের যে শাখায় এইসব উপকারী ও অপকারী প্রাণীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় সেই শাখাকে **অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা** বলে; কারণ মানুষের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এইসব প্রাণীর ভূমিকা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

## ◎ 5.1. অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা (Economic Zoology) ◎

### ▲ অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা ও অর্থকরী প্রাণীর সংজ্ঞা এবং অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যার কয়েকটি শাখা (Definition of Economic Zoology and Economic Animal and Some branches of Economic Zoology) :

❖ (a) 1. **অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Economic Zoology) ঃ প্রাণীবিজ্ঞানের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীজ সম্পদ সৃষ্টিকারী উপকারী প্রাণীদের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিকারক প্রাণীদের দমন ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচিত হয় সেই শাখাকে অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা (Economic Zoology) বলে।**

❖ 2. **অর্থকরী প্রাণীর সংজ্ঞা (Definition of Economic Animal) ঃ যেসব প্রাণী মানুষের প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সম্পদ সৃষ্টি করে এবং যেসব প্রাণীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে ও যার থেকে মানুষ কিংবা দেশ অর্থ উপার্জন করে তাদের অর্থকরী প্রাণী বা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বলে।**

বিভিন্ন অর্থকরী প্রাণীর নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন করা হয় এবং উৎপাদিত সামগ্রী মানুষ তার প্রয়োজনে কাজে লাগায়। এইভাবে এক একটি অর্থকরী প্রাণীকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যার শাখা গড়ে উঠেছে। এগুলি নিম্নরূপ—

(b) **অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যার কয়েকটি শাখা (Some Branches of Economic Zoology) ঃ**

1. **পশুপালন** (Animal husbandry)— গৃহপালিত পশু, যেমন— গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পালন করে তার থেকে প্রধানত দুধ ও মাংসের চাহিদা যে পদ্ধতিতে পূরণ করা হয় তাকে **পশুপালন** বলে। এছাড়া এই পশুদের চামড়া, শিং ও হাড় দিয়ে নানারকম ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। শীতবস্ত্র তৈরি করতে ভেড়ার লোম বা পশম কাজে লাগে।
2. **রেশমচাষ** (Sericulture)— যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের সিল্কমথ প্রতিপালন করে তার থেকে তুঁতসিল্ক, মুগাসিল্ক, তসরসিল্ক, এরিসিল্ক উৎপাদন করা হয় তাকে **রেশমচাষ** বলে।
3. **মৎস্যচাষ** (Pisciculture)— বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন প্রকারের মাছ নানান পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং এর সাহায্যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্যের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখে তাকে **মৎস্য চাষ** বলে।
4. **পোলট্রি** (Poultry)— যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের হাঁস ও মুরগির বিজ্ঞানসম্মত পালনের মাধ্যমে তার থেকে ডিম ও মাংস সংগ্রহ করা হয় তাকে **পোলট্রি** বলে।
5. **মৌমাছিচাষ** (Apiculture)— যে পদ্ধতিতে একটি বিশেষ প্রজাতির মৌমাছি পালন করা হয় এবং যার থেকে মধু ও মোম পাওয়া যায় তাকে **মৌমাছিচাষ** বলে।
6. **লাক্ষাচাষ** (Lacculture)— যে পদ্ধতিতে কুসুম, পলাশ ইত্যাদি গাছের ডালে লাক্ষা পতঙ্গ প্রতিপালন করে তার থেকে গালা বা লাক্ষা (Lac) সংগ্রহ করা হয় তাকে **লাক্ষাচাষ** বলে।
7. **মুক্তাচাষ** (Pearl culture)— যে পদ্ধতিতে মুক্তা ঝিনুকের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপলন করা হয় এবং অলংকারের উপকরণ হিসাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয় তাকে **মুক্তাচাষ** বলে।
8. **চিংড়ি চাষ** (Prawn culture)— যেপদ্ধতিতে অর্থনৈতিক লাভজনক উপায়ে বাগদা, গলদা ইত্যাদি চিংড়ি পালন করা হয় তাকে **চিংড়ি চাষ** বলে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন চিংড়ি চাষ খুবই লাভজনক।

এছাড়া আরও অনেক প্রাণী থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়। যেমন—সামুদ্রিক প্রবাল থেকে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে রত্ন জোগান দেওয়া হয়; সাপের বিষ থেকে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়; কুমিরের চামড়া থেকে ব্যাগ তৈরি করা হয় এবং স্পঞ্জ থেকে পরিষ্কার করার সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়।

# ◎ 5.2. পোলট্রি (Poultry) ◎

মানুষের খাদ্য তালিকায় মাংস ও ডিম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন যুগে পাখি ও বন্যপ্রাণী শিকার করে মানুষ তার এই চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু সভ্যতার সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। বিপুল জনবিস্ফোরণের ফলে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের চাহিদা আরও বেড়েছে। এইসব সমস্যার সমাধানে অধিকতর ডিম ও মাংস উৎপাদন করার প্রয়াসে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হাঁস-মুরগি পালন বা পোলট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ভারতবর্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ▲ পোলট্রির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, প্রাণীজগতে পোলট্রি পাখির স্থান এবং পোলট্রির বিভিন্ন ব্রিড (Definition and Types of Poultry, Systematic position of Poultry Bird and Different Breeds) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব পাখি প্রতিপালন করে মানুষ ডিম ও মাংস উৎপাদনের সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে সেইসব পাখি প্রতিপালনকে পোলট্রি (Poultry) বলে।**

➤ (b) **পোলট্রি পাখির প্রকারভেদ (Types of Poultry birds) :**
পোলট্রির পাখি বলতে মুরগি, টার্কি, হাঁস, পাতিহাঁস, পায়রা, উটপাখি, ময়ূর, ফেজেন্ট, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রিস্টীয় মিশনারিরা প্রথম পোলট্রি সম্বন্ধে উৎসাহ দেখান। এর পরে ধীরে ধীরে পোলট্রি জনপ্রিয় হতে থাকে এবং বর্তমানে এটি একটি অর্থকরী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

➤ (c) **প্রাণীজগতে পোলট্রি পাখির স্থান (Systematic position of Poultry birds in Animal Kingdom) :**

পর্ব—কর্ডাটা (Chordata)
উপপর্ব—মেরুদন্ডী (Vertebrata)
শ্রেণি—অ্যাভিস (Aves)
উপশ্রেণি—নিও র্নিথিস (Neornithes)
বর্গ–1. গ্যালিফর্মস্ (Galliforms)
উদাহরণ—টার্কি, জাপানি কোয়েল, ফেজেন্ট, মুরগি, ময়ূর।
বর্গ–2. আনসারিফর্মস (Ansariforms)
উদাহরণ—পাতিহাঁস, হাঁস।
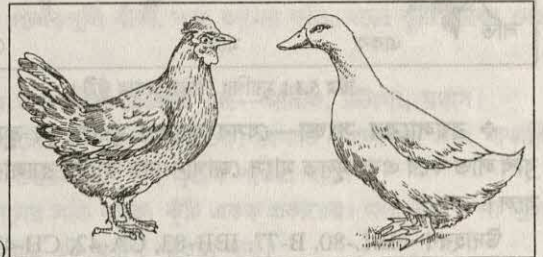
● **পোলট্রি পাখির সাধারণ ও বিজ্ঞানসম্মত নাম (Common and Scientific names of Poultry birds)**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| 1. টার্কি | 1. *Meleagris gallopavo* (*মেলিয়াগ্রিস গ্যালোপাভো*) |
| 2. জাপানি কোয়েল | 2. *Coturnix japonica* (*কটুরনিক্স জাপোনিকা*) |
| 3. ফেজেন্ট | 3. *Phasians colchicus* (*ফেজিয়ান কলচিকাস*) |
| 4. ময়ূর | 4. *Pavo cristatus* (*প্যাভো ক্রিস্টাটাস*) |
| 5. রাজহাঁস | 5. *Anser anser* (*অ্যানসার অ্যানসার*) |
| 6. পাতিহাঁস | 6. *Anas platyrhynchos* (*অ্যানাস প্লাটিরিঙ্কোস*) |
| 7. মুরগি | 7. *Gallus domesticus* (*গ্যালাস ডোমেস্টিকাস*) |

➤ (d) **পোলট্রির বিভিন্ন ব্রিড (Duifferent breeds of Poultry) :** বিভিন্ন পোলট্রি পাখির মধ্যে মুরগির চাষ খুবই সফলভাবে করা হচ্ছে। এজন্য পরবর্তী অংশে মুরগি চাষ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

**1. বুনো মুরগির বিভিন্ন ব্রিড (Different breeds of wild fowl) :** অনুমান করা হয় যে আধুনিক মুরগি বিভিন্ন বুনো মুরগি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। বুনো মুরগির বিভিন্ন প্রজাতি নিম্নরূপ—

(i) **লাল জংলি মুরগি**—*Gallus gallus* (*গ্যালাস গ্যালাস*),

(ii) **সিংহলি জংলি মুরগি**—*Gallus lafayetti* (*গ্যালাস ল্যাফায়েটি*),

(iii) **ধূসর জংলি মুরগি**—*Gallus sonneratti* (*গ্যালাস সোনারাটি*),

(iv) **জাভা জংলি মুরগি**—*Gallus varias* (*গ্যালাস ভেরিয়াস*)।

বিজ্ঞানীদের মতে, খুব সম্ভবত *Gallus gallus* প্রজাতি থেকে অন্য সব প্রজাতির মুরগির উদ্ভব হয়েছে। উপরোক্ত চারটি প্রজাতির মুরগি পরস্পরের মধ্যে জননক্রিয়া করতে পারে। এই মুরগিদের গৃহপালিত করে এবং পরীক্ষামূলক সংকরায়ণ ঘটিয়ে বিভিন্ন উন্নতমানের ও অর্থকরী দিক থেকে সুবিধাজনক কয়েকটি জাতের মুরগি সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি দেশি মুরগি যেখানে বছরে 60টি ডিম পাড়ে, সেখানে সংকর জাতের মুরগি বছরে 260টি ডিম উৎপাদন করে। সংকর জাতের মুরগির দেহের বৃদ্ধিও দেশি মুরগির চেয়ে অনেক বেশি, অর্থাৎ এগুলি অনেক বেশি মাংস উৎপন্ন করে।

**2. অধিক উৎপাদনকারী পোলট্রি পাখি (মুরগি) (High yielding varieties of poultry birds) :** বিভিন্ন দেশি জাতের মুরগির মধ্যে সংকরায়ণ করে বেশি উৎপাদনকারী সংকর জাতের মুরগি সৃষ্টি করা হয়েছে যারা বেশি ডিম ও মাংস উৎপন্ন করে এবং এদের যথাক্রমে **লেয়ার** ও **ব্রয়লার** বলে।

চিত্র 5.1 : মুরগির বিভিন্ন প্রকার ঝুঁটি।

❖ **লেয়ারের সংজ্ঞা—বেশি ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাতকে লেয়ার বলে।**

**উদাহরণ**—ILI-80, HH-260, BH-78, My-chix ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় পক্ষী গবেষণাকেন্দ্র থেকে সৃষ্ট)। এছাড়া ভারতীয় কৃষিগবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত জাতগুলি হল—ILM-90, ILR-90 ইত্যাদি। এই সব মুরগি বছরে প্রায় 260টি ডিম পাড়ে।
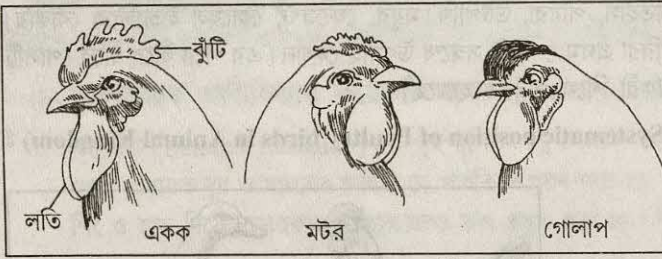
❖ **ব্রয়লারের সংজ্ঞা—যেসব জাতের মুরগি খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং মূলত মাংস জোগান দেয় তাদের ব্রয়লার বলে।**

**উদাহরণ**—IBL-80, B-77, IBB-83, CA-42, CH-47 ইত্যাদি সংকর জাতের ব্রিড।

**3. বিভিন্ন দেশে সৃষ্ট অধিক উৎপাদনকারী বিভিন্ন ব্রিডের মুরগি (Different high yielding breeds of fowl originated from different countries) :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুরগির জাত উৎপত্তি লাভ করেছে। এই জাতগুলি হল—

● (a) **আমেরিকান ব্রিড** (American breeds) : এর উল্লেখযোগ্য জাতগুলি হল—রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার।

(i) **রোড আইল্যান্ড রেড** (Rhode Island Red)—এদের পালক গাঢ় লাল, খয়েরী লাল বা তামাটে লাল বর্ণের হয়। কানের লতি লাল বা ফিকে হলুদ বর্ণের। একক বা গোলাপ ঝুঁটি থাকে। এদের ত্বক ও পা হলুদ বর্ণের হয়। মাংসল দেহ; বুক ও পেট চওড়া।

চিত্র 5.2 : মুরগির বিভিন্ন ব্রিড।

(ii) **প্লাইমাউথ রক** (Plymouth Rock)— এদের পালক ধূসর এবং সাদা কালো দাগ যুক্ত। কানের লতি লাল বর্ণের, ঝুঁটি একক প্রকৃতির। ত্বক হলুদ বর্ণের। দেহ লম্বাটে ও বক্ষদেশ চওড়া।

(iii) **নিউ হ্যাম্পশায়ার** (New Hampshire)— পালক তামাটে বা বাদামি বর্ণের হয়। লেজের বড়ো পালকগুলি কালো হয়। একক ঝুঁটিযুক্ত। ত্বক ও পা হলুদ বর্ণের। দেহ আকারে বড়ো।

● (b) **ইংলিশ ব্রিড** (English breeds) ঃ প্রধান ব্রিডগুলি হল—(i) সাসেক্স, (ii) অস্ট্রালপ, (iii) অরপিংটন ইত্যাদি।

(i) **সাসেক্স** (Succex)— হালকা লাল ছিটযুক্ত পালক। দেহ লম্বাটে এবং বক্ষ প্রসস্ত।

(ii) **অস্ট্রালপ** (Australop)— উজ্জ্বল সবুজ আভাযুক্ত পালক। কানের লতি ছোটো ও বাদামি বর্ণের। ত্বক সাদা রং-এর। ঝুঁটি একক প্রকৃতির। দেহ লম্বাটে।

(iii) **অরপিংটন** (Orpington)—পালক সাদা বা ফিকে হলুদ হয়। ঝুঁটি একক প্রকৃতির। দেহ গোলাকার। 4-5 kg ওজনের হয়।

● (c) **এশিয়ার ব্রিড** (Asiatic breeds) ঃ এশিয়ার প্রধান ব্রিডগুলি হল—(i) ব্রামা, (ii) কোচিন প্রভৃতি।

(i) **ব্রামা** (Brahma)—ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে এদের উৎপত্তি বলে এদের ব্রামা ব্রিড বলে। এদের ত্বক হলুদ রং-এর এবং কানের লতি লাল। এদের ঝুঁটি মটর প্রকারের। দেহ বড়ো ও 4-5 কেজি ওজনের।

(ii) **কোচিন** (Cochin)—ভারতবর্ষের কোচিন অঞ্চলে এদের উৎপত্তি বলে এদের কোচিন ব্রিড বলে। এদের লেজের পালক সূঁচালো ও ঝুঁটি একক প্রকার। দেহ অত্যন্ত স্থূল।

● (d) **ভূমধ্যসাগরীয় ব্রিড** (Mediterranean breeds) ঃ এখানে প্রধান ব্রিডগুলি হল—(i) লেগহর্ন, ও (ii) মিনর্কা।

(i) **লেগহর্ণ** (Leghorn)—ইতালির লেগহর্ণ নামে জায়গায় এদের উৎপত্তি হয়। এদের ত্বক, পা ও ঠোঁট হলুদ রং-এর হয়। ঝুঁটি একক প্রকার ও লাল রং-এর। দেহ ত্রিভুজাকৃতি—পৃষ্ঠদেশ চওড়া ও লেজের দিক সরু।

(ii) **মিনর্কা** (Minorca)— স্পেন দেশের মিনর্কা অঞ্চলে এই ব্রিডের উৎপত্তি হয় বলে এদের মিনর্কা বলে। এদের ত্বক সাদা এবং ঠোঁট ও আঙুল কালো বর্ণের হয়। লেজের পালকগুলি বাঁকা, সাদা কানের লতি, বড়ো ঝুঁটি থাকে। দেহ বলবান ও বড়ো।

● (e) **ভারতীয় ব্রিড** (Indian breeds) ঃ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ব্রিড্গুলি হল—আসীল, চিটাগং, ঘঘাস।

(i) **আসীল** (Aseel)— এদের কানের লতি ও লেজ ছোটো। ঝুঁটি মটর প্রকৃতির। দেখতে গোলাকার এবং মাঝারি আকারের মুরগি। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে এই মুরগি পাওয়া যায়।

(ii) **চিটাগাং** (Chittagong)—সোনলী পালক ও হলুদ কানের লতি থাকে। ঝুঁটি একক প্রকারের। গলা দীর্ঘ ও পা গুলি লম্বা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ও ভারতবর্ষের আসামে এই মুরগি পাওয়া যায়।

(iii) **ঘঘাস** (Ghagus)—এদের পালক লাল বা বাদামি-কালো বা ধূসর বর্ণের হয়। কানের লতি ছোটো হয়। একক মটর ঝুঁটি থাকে। চেহারা বড়োসড়ো ও বলিষ্ঠ হয়। কর্ণাটক ও দাক্ষিণাত্যে এই মুরগি পাওয়া যায়।
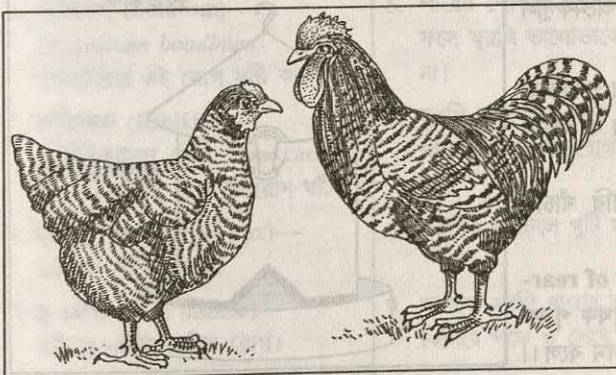
4. মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী বিভিন্ন ব্রিড **(Types of breeds on the basis of meat and egg production)** ঃ মুরগির কিছু ব্রিড বেশি ডিম উৎপাদন করে, আবার কিছু ব্রিড বেশি মাংস উৎপাদন করে। ডিম ও মাংস উৎপাদন করা ধর্মের ভিত্তিতে তিন প্রকারের ব্রিড পাওয়া যায়, যেমন—

(a) **লেইং ব্রিড** (Laying breed)—যে ব্রিডগুলি বেশি ডিম উৎপাদন করে, তাদের **লেইং ব্রিড** বা ডিম উৎপাদনকারী ব্রিড বলে। **উদাহরণ—লেগ হর্ন** (Leghorn), বছরে প্রায় 220টি ডিম পাড়ে।

চিত্র 5.3 ঃ বেয়ার্ড প্লাইমাউথ রক ব্রিড।

(b) **টেবিল ব্রিড** (Table breed)—যে ব্রিডগুলি বেশি মাংস উৎপন্ন করে, তাদের **টেবিল ব্রিড** বা **মাংস উৎপাদনকারী ব্রিড** (Meat breed) বলে। **উদাহরণ**—আসীল, ব্রামা, চিটাগং ও কোচিন ব্রিড।
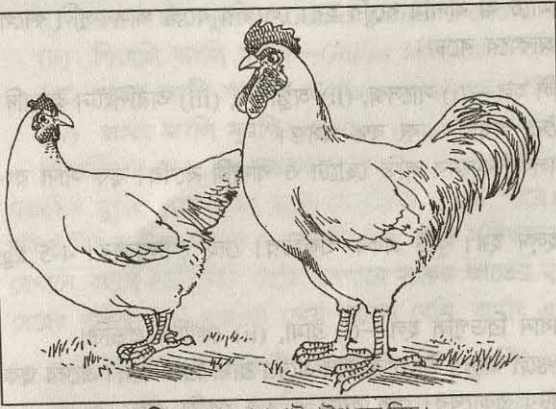
চিত্র 5.4 : সাদা প্লাইমাউথ রক ব্রিড।

(c) **ডুয়াল ব্রিড** (Dual breed)—যে কয়েকটি ব্রিডের মুরগি ডিম ও মাংস উভয়ই বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করে, তাদের **ডুয়াল ব্রিড** বলে। **উদাহরণ**—রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাইথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার।

**5. ডিম তা দেওয়ার ধর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন ব্রিডের মুরগি (Different breeds of fowl on the basis of their brooding property) :**

(a) **সিটার ব্রিড** (Sitter breed)—যে সব ব্রিডের মুরগি ডিমে বসে বা তা দেয় তাদের সিটার ব্রিড বলে। **উদাহরণ**—ব্রামা, আসীল, অ্যাস্টালপ, প্লাউমাউথ রক।

(b) **নন্-সিটার ব্রিড** (Non-sitter breed)—যেসব ব্রিডের মুরগি ডিমে বসে না অর্থাৎ ডিমে তা দেয় না তাদের নন্ সিটার ব্রিড বলে। **উদাহরণ**—লেগহর্ন, মিনর্কা ইত্যাদি।

## ▲ মুরগি চাষ পদ্ধতি (Method of Fowl farming or Rearing) :

প্রধানত চার প্রকার পদ্ধতিতে মুরগির চাষ করা যায়, এগুলি নিম্নরূপ—

● 1. **স্বাধীন বা ব্যাপক পদ্ধতি (Free range or Extensive system)**—এই পদ্ধতিতে মুরগি খোলা জায়গায় ছাড়া থাকে এবং মুরগি প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে। এই পদ্ধতি অনেক প্রাচীন। বড়ো বাগানে প্রায় 2000-3000 মুরগি এইভাবে পালন করা যায়। প্রাকৃকি খাদ্য খেয়ে মুরগিরা বড়ো হয় এবং কৃত্রিম খাদ্য এদের প্রয়োজন হয় না। খোলা জায়গায় থাকে বলে বুনো জন্তুর দ্বারা এদের প্রাণনাশ হতে পারে।

● 2. **অর্ধস্বাধীন পদ্ধতি (Semi-intensive system)**—এই পদ্ধতিতে মুরগিকে বড়ো একটা জায়গায় ঘিরে তার মধ্যে প্রতিপালন করা হয়। প্রায় 2-3 বিঘা জমি তারজালি দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে 200-300 মুরগি প্রাকৃতিক পরিবেশে পালন করা হয়। মাঝে মাঝে মাটিতে চুন মিশিয়ে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং নতুন মাটি দিয়ে পুরাতন মাটি পুনস্থাপন করা হয়।

● 3. **ফোল্ডিং একক পদ্ধতি (Folding unit system)**—যে পদ্ধতিতে মুরগি চাষের উপযুক্ত খোলা জায়গার আবর্তন করা হয়, তাকে ফোল্ডিং একক পদ্ধতি বলে। এখানে পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় পালাবদল করে মুরগি পালন করা হয়।

● 4. **নিবিড় পদ্ধতি (Intensive system)**—যে পদ্ধতিতে মুরগিকে খোলা জায়গায় পালন না করে গৃহবন্দি অবস্থায় বা খাঁচার মধ্যে পালন করা হয় তাকে নিবিড় পদ্ধতি বলে।

নিবিড় পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকারের, যেমন—ব্যাটারি খাঁচায় প্রতিপালন পদ্ধতি ও ডিপ লিটার পদ্ধতি।

(a) **ব্যাটারি খাঁচায় প্রতিপালন (Battery system of rearing)**—❖ **সংজ্ঞা—যে এই পদ্ধতিতে প্রতিটি মুরগিকে পৃথক পৃথক খাঁচায় প্রতিপালন করা হয় তাকে ব্যাটারি খাঁচায় প্রতিপালন বলে।।** খাঁচার মাপ 14" × 16" × 17" রাখা হয়।
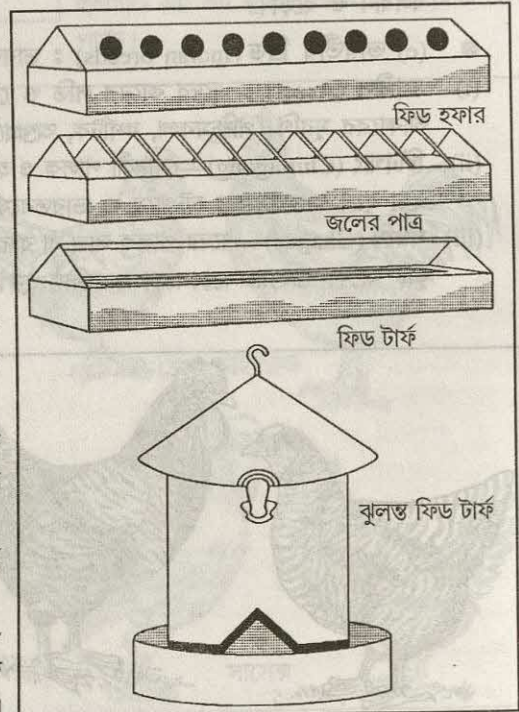
চিত্র 5.5 : পোলট্রিতে ব্যবহৃত খাদ্য ও জলের পাত্র।

(b) **ডিপ্ লিটার পদ্ধতি** (Deep litter system)—❖ **সংজ্ঞা—যে পদ্ধতিতে একটি বড়ো মাপের খাঁচার মধ্যে খড়, কাঠের গুঁড়ো, শুকনো পাতা ইত্যাদি দিয়ে 8–12 ইঞ্চি পুরু মেঝে তৈরি করে প্রায় 250টি মুরগি একসঙ্গে একটি খাঁচায় প্রতিপালন করা হয়, তাকে ডিপ লিটার পদ্ধতি বলে।**

এই পদ্ধতিতে একটি বিশাল মাপের খাঁচায় প্রায় 250টি মুরগি একসঙ্গে প্রতিপালন করা হয়। প্রতিটি মুরগির জন্য প্রায় 5 বর্গফুট জায়গা ধরা হয়। কাঠের গুঁড়ো, খড়, শুকনো পাতা, চুন ইত্যাদির সাহায্যে 8–12 ইঞ্চি পুরু ঘরের মেঝে প্রস্তুত করা হয় এবং এটি সর্বদা শুকনো রাখা হয়। মুরগি পালন করার এইরূপ মেঝেকে **লিটার** (Litter) বলে। কিছুদিন অন্তর লিটার বদল করে নতুন মেঝে তৈরি করা হয়। মুরগির মলমুত্রযুক্ত পুরাতন লিটার গাছের সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

● **পোলট্রির রোগ, রোগের লক্ষণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Diseases of Poultry, their Symptoms and Control measures) ঃ**

| রোগ ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু | লক্ষণ | রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় |
|---|---|---|
| 1. **বহিঃপরজীবী ঘটিত** রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু—যেমন—<br>(i) এঁটুলি–*Argus percicus*<br>(ii) উকুন–*Menacanthus sp*<br>(iii) মাইট–*Ornithonyssus sp* | 1. মুরগি খুবই অস্থির হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের পালক দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলে। | 1. বহিঃপরজীবী মারার জন্য বিশেষ ধরনের পাউডার ব্যবহার করা উচিত। |
| 2. **কক্সিডিওসিস্** (Coccidiocis)—*Eimeria* ধরনের আদ্যপ্রাণী এই রোগ সৃষ্টি করে। | 2. মুরগি খেতে চায় না, এদের ওজন কমে যায় এবং এদের পালকগুলি অমসৃণ ও নোংরা হয়ে যায়। | 2. খাবারের সঙ্গে বাইফুরান জাতীয় ওষুধ খাইয়ে এই রোগ দমন করা যায়। |
| 3. **অ্যাসপারজিলোসিস্**—*Aspergillus fumigatus* ধরনের ছত্রাক এই রোগ সৃষ্টি করে। | 3. মুরগির ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং মুরগি ঝিমিয়ে থাকে। | 3. এই রোগের বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত মুরগিকে পৃথক জায়গায় রাখা হয়। |
| 4. **পুলোরাম** (Pullorum)—*Salmonella pullorum* নামে বিশেষ ব্যাকটেরিয়া এই রোগ সৃষ্টি করে। | 4. শাবক মুরগি ঝিমিয়ে পড়ে, পালক-গুলি অমসৃণ হয়, অবসারণী ছিদ্রের কাছে মল জমে থাকে। | 4. পালন ঘর জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন এবং আক্রান্ত মুরগিকে পৃথক জায়গায় রাখা আবশ্যক। |
| 5. **যক্ষ্মা রোগ**—*Mycobacterium avium* ব্যাকটেরিয়া এই রোগ সৃষ্টি করে। | 5. পেশির ক্ষয় হয় এবং পাগুলি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, এরা সবুজ বা হলুদ মল পরিত্যাগ করে। | 5. আক্রান্ত মুরগিকে পৃথক করে ধ্বংস করা প্রয়োজন। |
| 6. **বটুলিজম্** (Botulism)—*Clostridium botulinum* ব্যাকটেরিয়া এই রোগ সৃষ্টি করে। | 6. পায়ের পেশিতে পক্ষাঘাত রোগ হয়, ফলে মুরগি ভালোভাবে হাঁটতে পারে না। | 6. আক্রান্ত মুরগি আলাদা করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। |
| 7. **রাণিক্ষেত** (Ranikhet)—বা **নিউক্যাসল রোগ** (New castle disease)—এই রোগ ভাইরাস ঘটিত। | 7. মুরগি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঝিমিয়ে থাকে। এদের শ্বাসরোগ ও পক্ষাঘাত হয়। | 7. উপযুক্ত ভ্যাক্সিন বা টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। |
| 8. **মুরগির বসন্ত** (Fowl Pox)—ভাইরাস ঘটিত রোগ। | 8. মুরগির ওয়াট্‌লে গুটি সৃষ্টি হয়। | 8. বসন্তের টিকা দেওয়া প্রয়োজন। |
| 9. **ফ্লু-রোগ** (Flue disease)—এটি ফ্লু-ভাইরাসঘটিত রোগ। | 9. আক্রান্ত মুরগি খাওয়া বন্ধ করে দেয় ঝিমিয়ে পড়ে ও শেষে মারা যায়। | 9. এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত মুরগিকে পৃথক করে মেরে ফেলা উচিত। |

## ▲ হাঁস—বিভিন্ন ব্রিড, প্রতিপালন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার (Duck—Different breeds, Rearing methods, Diseases, Symptoms and their control measures) :

হাঁস একটি জলজ পাখি। মানুষ হাঁসকে গৃহপালিত করে বিভিন্ন ব্রিড উৎপন্ন করেছে। এইসব উন্নতমানের ব্রিড থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ডিম ও মাংস পাওয়া যায়। বন্য মাল্লার্ড (Mullard) হাঁস (*Anas boschas*) থেকে আধুনিক গৃহপালিত সমস্ত হাঁসের উৎপত্তি হয়েছে। গৃহপালিত হাঁসের বৈজ্ঞানিক নাম হল—*Anas platyrhynchos*। পুরুষ হাঁসকে **ড্রেক** (Drake), স্ত্রী হাঁসকে **ডাক্** (Duck) ও হাঁসের বাচ্চাকে **ডাকলিং** (Duckling) বলে।

### ➤ (a) হাঁসের বিভিন্ন ব্রিড (Different breeds of duck) :

● (a) **ডিম উৎপাদনকারী ব্রিড (Egg type ducks)**—এই ব্রিডগুলি বেশি ডিম উৎপাদন করে, উদাহরণ—খাকি ক্যাম্পবেল, ভারতীয় রানার, বালি, অরপিংটন, নাগেশ্বরি ইত্যাদি।

1. **খাকি ক্যাম্পবেল** (Khaki Campbell)—ভারতীয় রানার ব্রিড ও ইউরোপের মালার্ড বা রুয়েন ব্রিডের সংকরায়নের ফলে এই ব্রিড সৃষ্টি হয়। পুরুষ হাঁসের পৃষ্ঠদেশ ও লেজের পালকগুলি কালচে সবুজ বর্ণের এবং অন্যান্য অংশের পালকগুলি খাকি রং-এর হয়। স্ত্রী হাঁসের মাথা ও গলার পালকগুলি হালকা বাদামি এবং বাকী পালকগুলি খাকি বর্ণের হয়। এদের চঞ্চু ও পা বাদামি বর্ণের হয়। স্ত্রী হাঁসের লেজের পালকগুলি সোজা থাকে এবং পুরুষ হাঁসের লেজের পালক বাঁকানো হয়।



চিত্র 5.6 : বিভিন্ন ব্রিডের হাঁস।

2. **ভারতীয় রানার** (Indian Runner)—এদের মাথা উঁচু ও গ্রীবা সোজা থাকে। দেহটি উল্লম্বভাবে সোজা থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুতগামি ব্রিড। এদের পালকের রং বিভিন্ন হয় এবং তা অনুযায়ী এই ব্রিড তিন প্রকার, যেমন—
   (i) **সাদা রানার**—সাদা পালক বিশিষ্ট, হলুদ বর্ণের ঠোঁট, পা ও আঙুল কমলা বর্ণের হয়।
   (ii) **পাংশুটে রানার**—এদের গলার পালকগুলি সাদা কিন্তু পিঠ ও কাঁধের পালকগুলি পাংশুটে বর্ণের হয়।
   (iii) **পেনসিল্ড রানার**—এই ব্রিডের পিঠের পালকগুলি পাংশুটে বর্ণের এবং অন্যান্য অংশে পালকের প্রান্তভাগে পাংশুটে ছোপ থাকে।

● (b) **মাংস উৎপাদনকারী ব্রিড (Meat type ducks)** : এই ব্রিডগুলি বেশি মাংস উৎপাদন করে, উদাহরণ—সাদা পেকিন, মাসকোভী, আইলেসবারি ইত্যাদি।

1. **সাদা পেকিন** (White Pekin)—এই ব্রিডের উৎপত্তি চীন দেশে। এদের পালক সাদা রং-এর এবং ঠোঁট ও পা কমলা-হলুদ বর্ণের হয়। এরা দ্রুতহারে বৃদ্ধিলাভ করে এবং এদের মাংস সুস্বাদু।
2. **মাসকোভী** (Muscovy)—এরা তৃণভোজী এবং এদের আকার বেশ বড়ো হয়। এরা খুব জোরে উড়তে পারে। এদের গড় ওজন—পুরুষ 4.5 কেজি, স্ত্রী 3.0 কেজি। এদের দেহে নীলচে-কালো এবং সাদা পালক থাকে।
3. **আইলেসবারি** (Aylesbury)—এই ব্রিড ইংলন্ডের বাকিংহাম অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এদের পালক সাদা, পা কমলা বর্ণের ও ছোটো হয়। এদের মাংস নরম ও সুস্বাদু।

● (c) **সৌখিন ব্রিড (Ornamental breed)** : এইসব হাঁসের দেহগঠন সুন্দর হওয়ায় এদের সৌখিন ব্রিড হিসাবে পালন করা হয়। উদাহরণ—ক্রেস্টেড সাদা ব্রিড, ম্যালার্ড ইত্যাদি।

(b) **হাঁস প্রতিপালন পদ্ধতি (Rearing method of Duck)**—হাঁসের ডিম থেকে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে শাবক উৎপাদন করে তাদের কৃত্রিম গৃহে প্রতিপালন করা হয়। দিনের বেলায় হাঁসেরা যাতে জলাশয়ে কিছুক্ষণ থাকতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। পালন ঘরের মেঝেতে কুচো খড় দেওয়া হয় এবং দেওয়াল লোহার জাল দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়।

(c) **হাঁসের বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা (Different diseases of duck, their symptoms and control measures) :**

| রোগ ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু | লক্ষণ | রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় |
|---|---|---|
| **1. ভাইরাস ঘটিত রোগ—** | | |
| (i) **হ্যাসের প্লেগ** | ডানাগুলি ঝুলে পড়ে। জলের মতো হলদে-সবুজ মল নির্গত হয়। | নির্দিষ্ট বয়সে (4 সপ্তাহ) নির্দিষ্ট টীকা প্রদান করা প্রয়োজন। |
| (ii) **রাণীক্ষেত বা নিউক্যাসেল্ রোগ** | খাওয়ার অনিচ্ছ হয়, পাতলা সবুজ মল পরিত্যাগ করে, শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। | একদিনের বাচ্চা হাঁসকে রাণীক্ষেতের টীকা দেওয়া প্রয়োজন। |
| (iii) **ভইরাল হেপাটাইটিস্** | ডানাগুলি ঝুলে পড়ে এবং দেহে পক্ষা-ঘাতের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। | রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়া দরকার। |
| **2. ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ** | | |
| (i) **কলেরা** | খাওয়ার অনিচ্ছা, ঘন ঘন পাতলা মল বর্জন, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। | উপযুক্ত সময়ে টীকা দেওয়া দরকার। বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফোনামাইড ঔষধ প্রয়োগে রোগের নিয়ন্ত্রন করা যায়। |
| (ii) **বটুলিজম্ রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু** *Clostridium botulinum* | অমসৃণ পালক, ডানা ঝুলে পড়ে, গলার ও পায়ের পেশি দুর্বল হয়। | বিশেষ প্রতিরোধক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। আক্রান্ত হাঁসকে পৃথক পরা প্রয়োজন। |
| (iii) **স্যালমোনেলোসিস্ রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণু** *Salmonella sp.* | খাওয়ার অনিচ্ছা, ডানা ঝুলে পড়ে, পাতলা, জলীয় মল ত্যাগ, শ্বাসকষ্ট হয়। | পেনিসিলিন ও ফোরাজলাডিন প্রয়োগে সুস্থ হতে পারে। |
| **3. ছত্রাক ঘটিত রোগ—** অ্যাফ্লাটক্সিকোসিস্ রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু—*Aspergillus flavous* | খাওয়ার অনিচ্ছা, দুর্বলতা, ঘুঁড়িয়ে হাঁটা, পালক নির্মোচন। | টাটকা খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং বাসি পচা খাবার না দেওয়া উচিত। |

## ❂ 5.3. চিংড়ি চাষ (Prawn Culture) ❂

খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুস্বাদু ও সহজ প্রতিপালনযোগ্য চিংড়ি মানুষের আমিষ খাদ্য তালিকায় একটি বিশেষ স্থান করে আছে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও দেশের আভ্যন্তরিন চাহিদা মেটাতে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির চাষ করা হচ্ছে। একটি অত্যন্ত আদরণীয়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে চিংড়ির স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

### ▲ চিংড়ি চাষের সংজ্ঞা, পিনিড ও ননপিনিড চিংড়ির পার্থক্য (Definition of Prawn culture, Difference between Penaeid and Non-Penaeid prawn) :

❖ **চিংড়ি চাষের সংজ্ঞা (Definition of Prawn culture) : যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে আর্থিক লাভজনক উপায়ে চিংড়ির চাষ করা হয় তাকে চিংড়ি চাষ বলে।**

পর্ব—সন্ধিপদ ও শ্রেণি—ক্রাস্টেশিয়ার অন্তর্গত এবং উপশ্রেণি—ম্যালাকাসস্টাকা ও বর্গ—ডেকাপোডার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী হল চিংড়ি। সামুদ্রিক লবণাক্ত জল, মোহানার অল্প লবণাক্ত জল ও নদী, পুকুর, লেক ইত্যাদির স্বাদুজলে বিভিন্ন প্রকার

চিংড়ি বসবাস করে। বৃহদাকার চিংড়িকে লবস্টার বা গলদা চিংড়ি বা **প্যালিমনিড্** (Palaemonid) চিংড়ি এবং ছোটো আকারের চিংড়িকে **পিনিড্** (Penaeid) চিংড়ি বলে।

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পিনিড্ ও নন্-পিনিড বা প্যালিমনিড চিংড়িকে পৃথক করা যায়। এই পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—

● **পিনিড চিংড়ি ও নন-পিনিড বা প্যালিমনিড চিংড়ির পার্থক্য (Difference between Penaeid and Non-penaeid prawn) ঃ**

| পিনিড চিংড়ি | নন-পিনিড বা প্যালিমনিড চিংড়ি |
|---|---|
| 1. প্রথম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটের (Chelate) মতো বা অগ্রভাগ সাঁড়াশির মতো চেরা। | 1. শুধুমাত্র প্রথম দুটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেট প্রকারের। |
| 2. দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের প্লুরা খোলক শুধুমাত্র তৃতীয় উদর খণ্ডকের খোলককে আচ্ছাদিত (Overlap) করে। | 2. দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের প্লুরা খোলক প্রথম ও তৃতীয় উদর খণ্ডকের খোলকগুলিকে আচ্ছাদিত করে। |
| 3. স্ত্রী চিংড়ি একটি করে ডিম জলে নিক্ষেপ করে। উদাহরণ—*Penaeus monodon* (বাগদা চিংড়ি) *P. indicus, P. esculantus* | 3. স্ত্রী চিংড়ি গুচ্ছাকারে ডিম জলে নিক্ষেপ করে। উদাহরণ—*Macrobrachium rosenbergii* (গলদা চিংড়ি, *M. malcolmsonii.* |

● **বিভিন্ন প্রকার চিংড়ির সাধারণ নাম ও বিজ্ঞানসম্মত নাম (Common names and Scientific names of different prawn) ঃ**

| সাধারণ নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|
| ● লবণাক্ত জলে বসবাসকারী চিংড়ি ঃ | |
| 1. বাগদা চিংড়ি | *Penaeus monodon* |
| 2. চাপড়া চিংড়ি | *Penaeus indicus* |
| 3. চামনে চিংড়ি | *Metapenaeus brevicornis* |
| 4. হন্যে চিংড়ি | *Metapenaeus monoceros* |

## বাগদা চিংড়ি বা বাঘ চিংড়ি  Bagda or Tiger prawn

### ▲ বাগদা চিংড়ির বিস্তার এবং চাষ পদ্ধতি (Distribution and Culture of Tiger prawn) ঃ
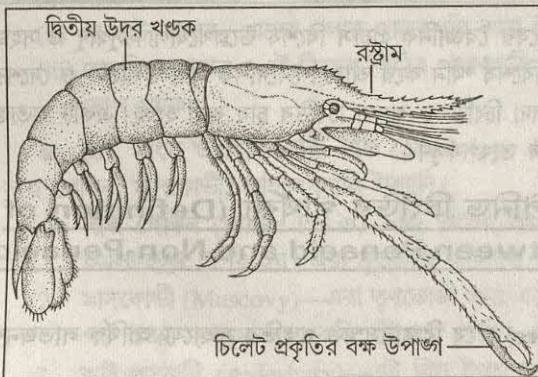
চিত্র 5.7 ঃ গলদা চিংড়ি (একটি ননপিনিড চিংড়ি)।

*পিনিয়াস মনোডনের* (*Penaeus monodon*) উদর খণ্ডকে কালো কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে বলে একে **বাঘ চিংড়ি** (Tiger prawn) বলে। এই চিংড়ির শিরোবক্ষ বা কেফালোথোরাক্স (Cephalothorax) অংশটি ছোটো এবং এর বৃদ্ধি হার অনেক বেশি হওয়ার জন্য আর্থিক দিক থেকে এই চিংড়ি চাষ খুবই লাভজনক। *পিনিয়াস মনোডন* সাধারণভাবে **বাগদা চিংড়ি**
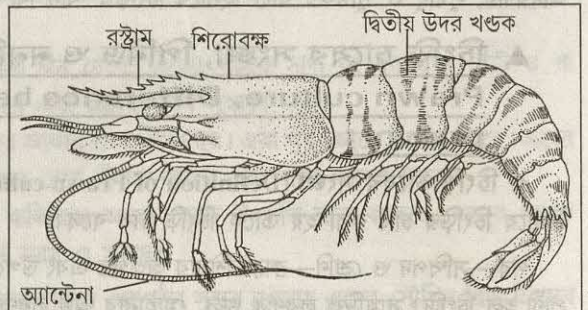
চিত্র 5.8 ঃ বাগদা চিংড়ি (একটি পিনিড চিংড়ি)।

নামে বাজারে পরিচিত। বর্তমানে এই চিংড়ির চাষ খুব লাভজনক হওয়াতে অনেক প্রাইভেট কোম্পানিও এই চিংড়ি চাষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

(a) **বাগদা চিংড়ির বিস্তার (Distribution of Tiger prawn)**—*পিনিয়াস মনোডন* দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ জাপান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই চিংড়ি প্রধানত পূর্ব উপকূলের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা অঞ্চলে এবং পশ্চিম উপকূলের সর্বত্র পাওয়া যায়।

(b) **বাগদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি (Method of Tiger Prawn culture)** : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়, যেমন—ব্যাপক বা প্রচলিত পদ্ধতি, অর্ধ নিবিড় পদ্ধতি ও নিবিড় পদ্ধতি।

➤ **A. ব্যাপক পদ্ধতি বা প্রচলিত প্রাকৃতিক পদ্ধতি (Extensive method or Traditional natural method) :**

1. প্রাকৃতিক জোয়ারভাটার উপর নির্ভর করে এই পদ্ধতির চিংড়ি চাষ হয় বলে একে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতি দীর্ঘদিনের প্রচলিত পদ্ধতি। মোহানার নিকটবর্তী নীচু ধান জমিতে জোয়ারের সময় চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের চারা জলের সঙ্গে চলে আসে। জল নির্গমনের সময় চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের চারা নির্দিষ্ট জাল ব্যবহার করে আটকানো হয়। পরে এইসব চারাগুলিকে প্রতিপালন করে নির্দিষ্ট সময়ের পরে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় জাল দিয়ে ধরে বাজারজাত করা হয়। এই সব পদ্ধতি পশ্চিমবাংলা, কেরালা, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় অনুসরণ করা হয়।
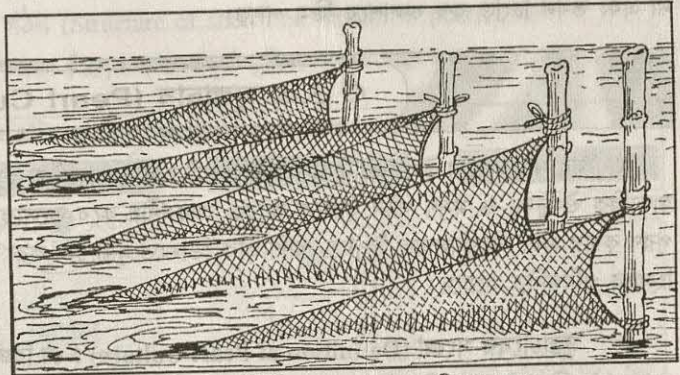
চিত্র 5.9 : চিংড়ি ধরার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ জাল।

2. উন্নতমানের প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষের আগে পুকুর শুকিয়ে সেখানে মহুয়া খোল ব্যবহার করে চিংড়ির শত্রু প্রাণীদের বিনাশ করা হয়। এর পর জোয়ারের জল এই জমিতে প্রবেশ করানো হয়। জোয়ারের জলের সঙ্গে **চিংড়ির চারা বা মিন** সহ বিভিন্ন জাতের চারা মাছ জমিতে প্রবেশ করে। ধান জমির মাঝখানে একটি নীচু জায়গায় চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রতিপালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে প্রচলিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চিংড়ি চাষকে **ভাসাবাধা** (Bhasabadha) চাষ বলে। ধান জমি সংলগ্ন নীচুস্থানটির চারিদিকে বাঁধ দেওয়া হয় এবং স্লুইশ গেটের (Sluice gate) মাধ্যমে জোয়ারের জল প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রায় 8–10 মাস পালন করার পরে চিংড়িকে জাল দিয়ে ধরে বাজারজাত করা হয়।
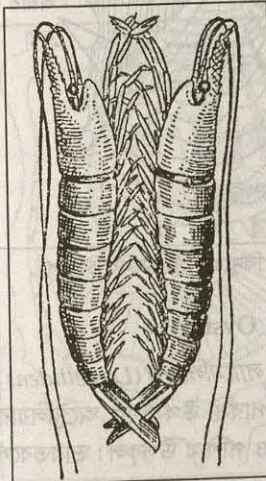
চিত্র 5.10 : চিংড়ির প্রজনন।

➤ **B. অর্ধ-নিবিড় পদ্ধতি (Semi-intensive method) :** এই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে উন্নত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। প্রথমে জলাশয়ে চিংড়ির শত্রু বিনাশ করা হয়। এর জন্য পুকুরের মাটি শুকিয়ে মহুয়ার খোল ব্যবহার করা হয়। তারপর পুকুরের জলের মান চিংড়ি চাষ উপযোগী করে বাজার থেকে পাওয়া **চিংড়ির চারা বা মিন** পুকুরে ছাড়া হয়। পুকুরে চিংড়ির খাদ্য প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, গোবরসার, পোলট্রি সার ইত্যাদি ব্যবহার করে পুকুরের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হয়। 4–5 মাস পরে চিংড়ি উপযুক্ত আকারের হলে তা বাজারজাত করা হয়।

➤ **C. নিবিড় পদ্ধতি (Intensive method) :** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জলের জৈব ও অজৈব উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতিকে নিবিড় পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে জলের পরিবেশ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ব্লোয়ার (Blower) বা বায়ুসঞ্চালক যন্ত্রের মাধ্যমে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখা হয়। এছাড়া জলের তাপমাত্রা pH ইত্যাদি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

জলাশয় প্রস্তুত হলে পরিণত পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি (একটি পুরুষ ও দুটি স্ত্রী চিংড়ি অনুপাতে)

জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিষেকের পরে উপযুক্ত সময়ে চিংড়ি পুকুরে ডিম ছেড়ে দেয় এবং এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়িকে পৃথক পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ডিম থেকে চিংড়ির প্রাক্‌লার্ভা দশা (Pre-larval stage) নির্গত হয় যেগুলি খাদ্যরূপে মুখ্যত ফাইটোপ্লাঙ্কটন গ্রহণ করে। এরপর এই লার্ভা স্থির দশা পেরিয়ে উত্তর লার্ভা দশায় (Post larval stage) পরিণত হয়। এ সময় এদের আমিষ খাদ্য দেওয়া হয়। চিংড়ির চারা এরপর কিছুটা বড়ো হলে এদের উৎপাদন পুকুরে (Production pond) স্থানান্তরিত করা হয়। এই পুকুরে একটি জল প্রবেশের পথ ও একটি জল নির্গমনের পথ থাকে।

➤ **চিংড়ির প্রণোদিত প্রজনন (Induced breeding of prawn)**—প্রজননে ব্যবহৃত চিংড়ির একটি বা দুটি চক্ষুবৃন্ত (Eye stalk) কেটে দিলে চিংড়ির খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় এবং তারা জলাশয়ে ডিম পাড়তে প্রণোদিত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, চিংড়ির চক্ষুবৃন্তের কোশ থেকে এক প্রকার **গোনাড ইনহিবিটরি হরমোন** (Gonad inhibitory hormone বা GIH) নিঃসৃত হয় যা ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টিতে বাধা দেয়। চক্ষুবৃন্ত কেটে বাদ দিলে হরমোন জনিত এই বাধা থাকে না এবং তখন চিংড়ি বন্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে।

## ◎ 5.4. মুক্তাচাষ (Pearl Culture) ◎

মানুষের সাজসজ্জার উপকরণ হিসাবে মুক্তা একটি অতীব আদরণীয় রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে মুক্তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণ গঠন মুক্তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এসব কারণে বাজারে মুক্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তা চাষ করা হয়। ভারতবর্ষে মুক্তাচাষ এখন একটি বিশেষ শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

❖ **মুক্তাচাষের সংজ্ঞা (Definition of Pearl Culture) ঃ যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে আর্থিক লাভজনক ভাবে স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা ঝিনুকের ভিতরে গঠিত মুক্তা আহরণ করে বাজারজাত করা হয় তাকে মুক্তাচাষ বলে।**

মুক্তাচাষের ফলে উৎপাদিত বস্তুটি হল **মুক্তা**। যে ঝিনুকের দেহে মুক্তা গঠিত হয় তাকে **মুক্তা ঝিনুক** (Pearl Oyster) বলে।

● **মুক্তা ঝিনুকের প্রাণীজগতে স্থান (Systematic position of Pearl Oyster) ঃ**

পর্ব—মোলাস্কা (Mollusca)
শ্রেণি—বাইভালভিয়া (Bivalvia)
বর্গ—ল্যামেলিব্রাঙ্কিয়া (Lamellibranchia)
গণ—পিঙ্কটাডা (Pinctada)
**প্রজাতি**— 1. *Pinctada fucata*
2. *Pinctada vulgaris*
3. *Pinctada martensi*
4. *Pinctada maxima*
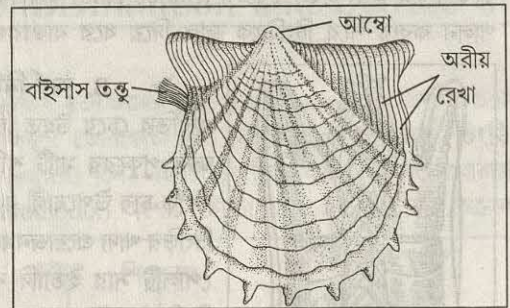
চিত্র 5.11 ঃ একটি মুক্তা ঝিনুকের বহির্গঠনের চিত্ররূপ।

● **মুক্তা ঝিনুকের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution of Pearl Oyster) ঃ**

বেশির ভাগ মুক্তা ঝিনুক সমুদ্রে বসবাস করে, তবে স্বাদু জলে বসবাসকারী কিছু ঝিনুক যেমন *ল্যামেলিডেন্স* (*Lamellidens*) ও *অ্যানোডোন্টা* (*Anodonta*) মুক্তা উৎপাদন করতে পারে। মুক্তাচাষের প্রধান স্থানগুলি হল—পারস্য উপসাগর, অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, পানামা উপসাগর, মানার উপসাগর (শ্রীলঙ্কা) ও ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল। ভারতবর্ষে মুক্তাচাষের প্রধান স্থানগুলি হল—মানার ও কচ্ছ উপসাগর, বরোদা ও টুটিকোরিন।

## ▲ মুক্তার সংজ্ঞা ও মুক্তা গঠন পদ্ধতি (Definition of Pearl and Mechanism of Pearl formation) :

❖ (a) **মুক্তার সংজ্ঞা (Definition of Pearl) : মুক্তা ঝিনুকের দেহে ম্যান্টল ও খোলকের মাঝে অবস্থিত কোনো বিজাতীয় বস্তুর চারিদিকে ন্যাকার গ্রন্থি (Nacre gland) ক্ষরিত পদার্থ জমাট বেঁধে যে কঠিন ও চকচকে বস্তু গঠিত হয় তাকে মুক্তা বলে।**

● **মুক্তা ঝিনুকের রাসায়নিক গঠন** (Chemical composition of Pearl)—রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে মুক্তা বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত হয়, যেমন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম কার্বনেট | = 88–90% | জল | = 2·4% |
| কঙ্কিওলিন ($C_{30}H_{48}N_2O_{11}$) | = 3·8–5·9% | অন্যান্য পদার্থ | = 0·1–0·8% |

● **মুক্তা ঝিনুকের খোলক ও ম্যান্টলের গঠন** (Structure of shell and mantle of pearl oyster) :

মুক্তাঝিনুকের খোলক ও ম্যান্টলের গঠন মুক্তা গঠনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(1) **খোলক** (Shell)—খোলকের বাইরের স্তরকে **পেরিস্ট্রাকাম** (Peristracum) মধ্যবর্তী স্তরকে **প্রিজম্যাটিক স্তর** (Prismatic layer) এবং ভিতরের স্তরকে **ন্যাক্রিয়াস** (Nacreous) স্তর বলে। ন্যাক্রিয়াস স্তরটি ম্যান্টল পর্দা সংলগ্ন থাকে এবং এটি মুক্তা গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বলে একে **মাদার অফ পার্ল** (Mother of Pearl) বলে।
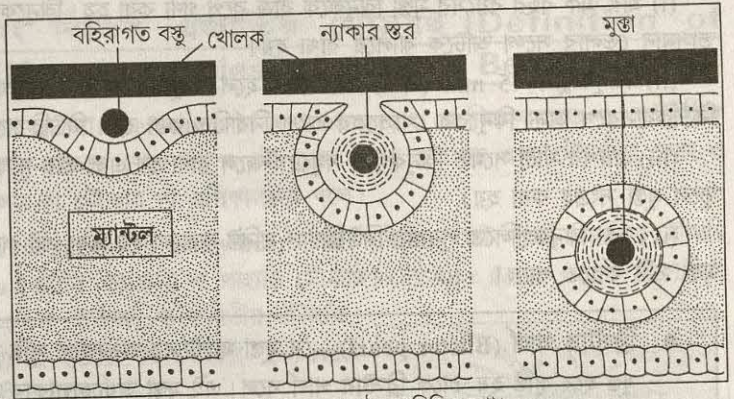
চিত্র 5.12 : মুক্তা গঠনের বিভিন্ন দশা।

(2) **ম্যান্টল** (Mantle)—ম্যান্টল তিনটি কোশস্তর নিয়ে গঠিত হয়। বাইরের স্তরটি স্তম্ভাকার আবরণীকোশ দিয়ে তৈরি এবং এখানে **ন্যাকার** (Nacre) ক্ষরণকারী বিশেষ গ্রন্থিকোশ বা **ন্যাকার কোশ** থাকে। ম্যান্টলের মধ্যবর্তী স্তরে যোজক কলা এবং অন্তর্বর্তী স্তরে সিলিয়াযুক্ত আবরণীকোশ থাকে।

➤ (b) **মুক্তা গঠন পদ্ধতি (Mechanism of Pearl formation)**—(1) মুক্তা ঝিনুকের ম্যান্টল পর্দায় অবস্থিত ন্যাকার গ্রন্থি কোশ নিঃসৃত **ন্যাকার** (Nacre) রস থেকে মুক্তা তৈরি হয়। (2) কোনো বিজাতীয় বস্তু, যেমন—বালিকণা, ক্ষুদ্র লার্ভা ইত্যাদি যখন মুক্তা ঝিনুকের খোলক ও ম্যান্টলের মাঝখানে বাইরে থেকে প্রবেশ করে, ম্যান্টলের কোশগুলি উত্তেজিত হয় ও বস্তুটিকে ঘিরে একটি থলি গঠন করে (3) এরপর ম্যান্টলের এপিথেলিয়ামে অবস্থিত ন্যাকার গ্রন্থি কোশ থেকে ন্যাকার রস বস্তুটির চারিদিকে নিঃসৃত হয় এবং পরবর্তীকালে এই রস কঠিন আকার ধারণ করে মুক্তায় পরিণত হয়। (4) মুক্তার কেন্দ্রে অবস্থিত বহিরাগত বস্তুটিকে **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) বলে।
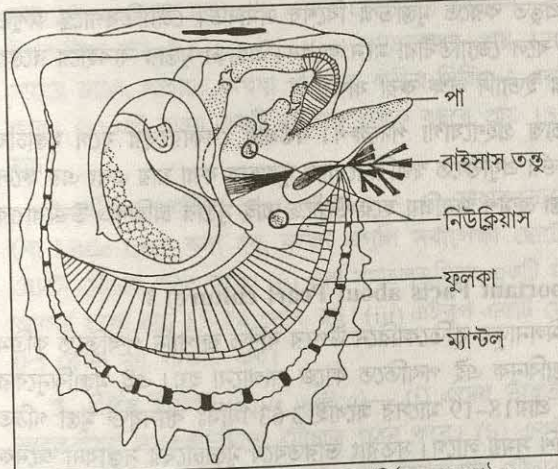
চিত্র 5.13 : একটি মুক্তাঝিনুকের খোলকবর্জিত দেহের গঠন।

● **মুক্তাচাষের কৌশল** (Technique of Pearl Culture) : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তার আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছে। তাই অধিকতর মুক্তা সংগ্রহের জন্য **পার্লফিসারি** (Pearl

fishery) গড়ে উঠেছে। পার্লফিসারি বা মুক্তাচাষকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(1) **মুক্তা সংগ্রহ** ও (2) **কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তা চাষ।**

1. **মুক্তা সংগ্রহ** (Collection of Pearl)—এই পদ্ধতি ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের গভীরে ডুবুরি নামিয়ে মুক্তাঝিনুক সংগ্রহ করা হয়। এরপর মুক্তা ঝিনুকগুলি কেটে তার ভিতর থেকে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। সব মুক্তা ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না, তাই অনেক মুক্তা ঝিনুক অকারণে বিনষ্ট হয়। এইভাবে সংগৃহীত মুক্তা সাধারণত গোলাকার হয় এবং এগুলি বেশি মূল্যবান।

2. **কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তাচাষ** (Pearl culture by artificial method) ঃ জাপানে সর্বপ্রথম কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তাচাষ শুরু হয়। **কোকিচি মিকিমোটো** (Kokichi Mikimoto, 1858) মুক্তাচাষ সম্বন্ধে প্রথমে উৎসাহ দেখান, তাই **মিকিমোটোকে মুক্তাশিল্পের জনক** (Father of Pearl industry) **বলা হয়**। জাপানের বিজ্ঞানী **মিসাকি** (Misaki) সর্বপ্রথম কৃত্রিম পদ্ধতিতে গোলাকার মুক্তা সৃষ্টি করেন।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তাচাষ পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে ঘটে, এগুলি নিম্নরূপ—

(i) প্রায় এক বছর বয়সের মুক্তা ঝিনুককে বীজ রূপে গণ্য করা হয়। ঝিনুকের এই বীজগুলি খাঁচার মধ্যে রেখে সমুদ্রজলে ভাসমান ভেলার সঙ্গে আটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

(ii) ঝিনুকগুলি 45 mm (প্রস্থ) আকারের হলে এগুলির মধ্যে বহিরাগত বস্তু বা নিউক্লিয়াস প্রবিষ্ট করানো হয়। নিউক্লিয়াসরূপে অন্য ঝিনুকের খোলকের অংশ নির্বাচিত করা হয়। নিউক্লিয়াসের ব্যাস সাধারণত 2–7 mm হয়।

(iii) এরপর খাঁচা সমেত ঝিনুকগুলি সমুদ্রের জলে রাখা হয় এবং প্রায় দু'বছর পরে সমুদ্রের জল থেকে মুক্তা ঝিনুকগুলি তুলে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়।

(iv) মুক্তা ঝিনুকগুলিতে পুনরায় নিউক্লিয়াস প্রবিষ্ট করানো হয় এবং এই পদ্ধতিতে দুই থেকে তিনবার একই মুক্তা ঝিনুক মুক্তা সৃষ্টি করতে পারে।

- **ব্লিস্টার পার্ল (Blister pearl)—যে মুক্তা ম্যান্টলের অভ্যন্তরে সৃষ্টি না হয়ে খোলকের ভিতরের স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় তাকে ব্লিস্টার পার্ল বলে। এই মুক্তা অর্ধকোলাকার হয় এবং একে খোলক থেকে কেটে বের করা হয়।**

## ▲ মুক্তাচাষের গুরুত্ব (Importance of Pearl Culture) ঃ

1. **মুক্তার নানাবিধ ব্যবহার ঃ** মুক্তার জন্য মুক্তাচাষের গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তা একটি অত্যন্ত আদরণীয় বস্তু। গহনা শিল্পে মুক্তার ব্যবহার আভিজাত্যের প্রতীক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধ প্রস্তুত করতে মুক্তাভস্ম বিশেষ সমাদৃত। জ্যোতিষশাস্ত্রে অশুভ দৈবশক্তিকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে মুক্তা ধারণ অপরিহার্য বলে জ্যোতিষীরা মনে করেন। এছাড়া মুক্তার ব্যবহারে রক্তের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আমাশা নিবারণ, শিশুর বহুমূত্র ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

2. **অর্থকরী শিল্প ঃ** অর্থকরী শিল্প হিসাবে মুক্তাচাষ অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ। বর্তমান বেকারত্বের যুগে মুক্তাচাষ মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনে একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। স্বনির্ভর প্রযুক্তিতে স্বল্পবিনিয়োগে মুক্তাচাষ করা যায় এবং এর ফলে বেকার মানুষ আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে পারে। যেহেতু মুক্তা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাই মুক্তার চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং মুক্তা শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

### ➤ মুক্তাচাষ সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Two Important Facts about Pearl culture) ঃ

1. **ভারতবর্ষে মুক্তাচাষ** (Pearl culture in India)—তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে উপরে বর্ণিত জাপানি পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তাচাষ করা হয়। *Pinctada vulgaris* প্রজাতির মুক্তাঝিনুক এই পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হয়। এই মুক্তাঝিনুকের দেহে যান্ত্রিক উপায়ে নিউক্লিয়াস প্রবিষ্ট করানো হয়। এর পর প্রায়18–19 মাসের মধ্যেই 3·63 মিমিঃ ব্যাসযুক্ত মুক্তা গঠিত হয়। জাপানে একই আকারের মুক্তা পেতে হলে দু'বছরেরও বেশি সময় লাগে। সুতরাং ভারতবর্ষে মুক্তাচাষের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল।

2. **স্বাদুজলে মুক্তাচাষ** (Pearl culture in fresh water) : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তাচাষ সমুদ্রে করা হয়, কিন্তু কিছু স্বাদুজলের ঝিনুক মুক্তা উৎপাদন করতে পারে। ভারতবর্ষের এই ধরনের ঝিনুকের প্রজাতিগুলি হল—

(1) *Lamellidens marginalis*, (2) *L. corrianus*, (3) *L. corrugata* ইত্যাদি।

এই মুক্তার গুণমান উন্নত নয় বলে এই বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা বেশিদূর পর্যন্ত হয়নি।

## ◎ 5.5. মৌমাছি প্রতিপালন (Apiculture) ◎

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অপরিহার্য বস্তু হিসাবে মধু একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকে মধুর উৎকর্ষতা ও ব্যবহার মানুষের কাছে অপরিসীম। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৌচাক ভেঙে মধু আহরণ করার পুরাতন রীতি ছেড়ে মানুষ নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করার উপায় বের করল। কালক্রমে মধুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের উদ্দেশ্যে **মৌমাছি প্রতিপালন** বা **এপিকালচার** (Apiculture) এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে।

### ▲ মৌচাষের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি (Definition of Apiculture and Different species of Honey Bee) :

❖ (a) **মৌমাছি পালন বা মৌ-চাষের সংজ্ঞা (Definition of Apiculture) : যে বিজ্ঞানসম্মত ও অর্থনৈতিক লাভজনক উপায়ে মৌমাছি লালন-পালন করে মৌচাক থেকে মধু ও মৌ-মোম সংগ্রহ করা হয় এবং মৌমাছির রোগ ও শত্রু প্রতিরোধ করা হয় তাকে মৌমাছি পালন বা মৌ-চাষ বা এপিকালচার বলে।**

(b) **বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি (Different species of honey bee)** : সারা পৃথিবীতে মোট পাঁচটি প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়, এগুলি হল : (i) *Apis dorsata* (*এপিস ডরসাটা*) বা পাহাড়ি মৌমাছি। (ii) *Apis florea* (*এপিস ফ্লোরিয়া*) বা ক্ষুদে মৌমাছি। (iii) *Apis indica* (*এপিস ইন্ডিকা*) বা ভারতীয় মৌমাছি। (iv) *Apis mellifica* (*এপিস মেলিফিকা*) বা ইউরোপের মৌমাছি। (v) *Apis adamsoni* (*এপিস অ্যাডামসোনি*) বা আফ্রিকার মৌমাছি।

এই প্রজাতিগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রজাতি অর্থাৎ *Apis dorsata*, *A. florea* ও *A. indica* ভারতবর্ষে পাওয়া যায় এবং এগুলির বর্ণনা করা হল–

**1. এপিস ডরসাটা** (*Apis dorsata*) — (i) সাধারণত এদের পাহাড়ি মৌমাছি (Rock bee) বা বোম্বারা (Bombara) বলে। (ii) এগুলি সর্বাপেক্ষা বড়ো আকারের, প্রায় 20 mm লম্বা হয়। (iii) এদের মৌচাকের আয়তন—প্রস্থে 1·5–2·1 মি. এবং উপর-নীচে প্রায় 0·6-1·2 মি.। (iv) সমুদ্রজলের প্রায় 1200 মি. উপরে কোনো গাছের ডালে, পাহাড়ে অথবা পরিত্যক্ত বাড়ির সিলিং-এ এরা একটি মাত্র চাক গঠন করে। (v) এই রকম একটি মৌচাক থেকে বছরে প্রায় 15 কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

**2. এপিস ফ্লোরিয়া** (*Apis florea*)— (i) সাধারণভাবে এদের ক্ষুদে মৌমাছি (বা Little bee) বলা হয়, কারণ এগুলি সর্বাপেক্ষা ছোটো আকারের এবং এরা ছোটো মৌচাক গঠন করে। (ii) এরা সমতলভূমিতে একটি মাত্র চাক গঠন করে যার আকার প্রস্থে প্রায় 15–24 সেমি. হয়। (iii) এইরূপ একটি মৌচাক থেকে বছরে প্রায় 0·5 কেজি মধু পাওয়া যায়।

**3. এপিস ইন্ডিকা** (*Apis indica*)— (i) এদের ভারতীয় মৌমাছি বলে। এরা ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে মৌচাক গঠন করে। (ii) একটি অন্ধকার ও সুরক্ষিত স্থানে একটি কলোনি একসঙ্গে 8–10টি সমান্তরাল মৌচাক একসঙ্গে গঠন করে।
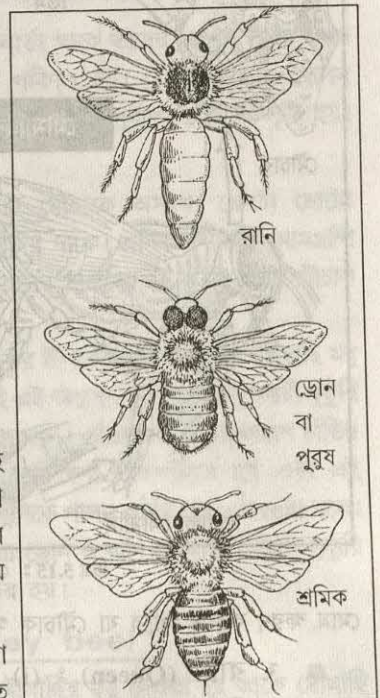
চিত্র 5.14 : মৌমাছির বিভিন্ন জাত।

(iii) মৌচাক গঠনের স্থান হিসাবে সাধারণত এরা কোনো গুহা, গাছের ভিতরে ফাঁপা কোঠর, পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে অথবা কোনো অন্ধকার পরিবেশ এরা পছন্দ করে। (iv) শুধুমাত্র এই প্রজাতির মৌমাছিকে গৃহপালিত (Domestication) করা যায় এবং কৃত্রিম বাক্সে এদের পালন করা হয়। (v) এইরূপ একটি মৌচাক থেকে বছরে প্রায় 3–5 কেজি মধু পাওয়া যায়।

## ▲ বিভিন্ন জাতের মৌমাছি (Caste of Honey bee) :

মৌমাছি একটি **সমাজবদ্ধ প্রাণী**। গ্রীষ্মকালে প্রজনন ঋতুতে একটি মৌচাকে প্রায় 32–50 হাজার মৌমাছি থাকে। এই মৌমাছিগুলির মধ্যে তিন জাতের মৌমাছি পাওয়া যায়। যেমন—**পুরুষ বা ড্রোন, শ্রমিক ও রানি**। শ্রমবিভাজন হওয়ার জন্য এই তিনটি জাত (Caste) নিজস্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং এজন্য মৌমাছিকে একপ্রকার **সামাজিক পতঙ্গ** (Social Insect) বলে। একই প্রজাতির একটি কলোনিতে বিভিন্ন রূপের মৌমাছি থাকে বলে মৌমাছির প্রজাতিগুলিকে **পলিমরফিক** (Polymorphic) **প্রজাতি** বলে।

### ➤ পুরুষ, শ্রমিক ও রানিমৌমাছির বর্ণনা (Description of Drone, Worker and Queen) :

● **1. পুরুষ বা ড্রোন** (Drone) : (i) অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে অপুংজনি (Parthenogenesis) প্রক্রিয়ায় পুরুষ সৃষ্টি হয়। এজন্য এগুলি হ্যাপ্লয়েড মৌমাছি। (ii) এগুলি শ্রমিকের তুলনায় বড়ো কিন্তু রানির চেয়ে আকারে ছোটো। (iii) এরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, অপরদিকে শ্রমিকের সঞ্চিত খাদ্য এরা ভক্ষণ করে। (iv) এদের হুল থাকে না এবং রানির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াই এদের একমাত্র কাজ। (v) একটি মৌচাকে প্রায় 200–300টি পুরুষ মৌমাছি থাকে।

● **2. শ্রমিক** (Worker) : (i) ডিপ্লয়েড, বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছিকে শ্রমিক মৌমাছি বলে। (ii) এরা কলোনির সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু সংখ্যায় সর্বাধিক। (iii) **শ্রমিক মৌমাছির কাজ**—ফুল থেকে **নেক্টার** (Nectar) বা **মকরন্দ** সংগ্রহ করে মধুরূপে তাকে মৌচাকের প্রকোষ্ঠে সঞ্চয় করা, অপরিণত মৌমাছির লার্ভাকে খাওয়ানো ও অন্যান্য পরিচর্যা করা, মৌপ্রকোষ্ঠ ও মৌচাক গঠন করা, মৌচাক পরিষ্কার রাখা, শত্রুর আক্রমণ থেকে মৌচাক সুরক্ষিত রাখা, মৌচাকের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা, ইত্যাদি। (iv) এদের উদরের শেষ খণ্ডকের শীর্ষে একটি **হুল** (Sting) থাকে যা একটি **বিষথলির** (Poison sac) সঙ্গে যুক্ত। কোনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে এরা শত্রুর গায়ে হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। কিন্তু এই সময় হুলটি দেহ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় বলে শ্রমিক মৌমাছির মৃত্যু হয়। (v) শ্রমিক মৌমাছির শেষ চারটি উদরখণ্ডকে এক জোড়া **মোম গ্রন্থি** (Wax gland) অবস্থান করে এবং এগুলি মোম ক্ষরণ করতে পারে যা মৌচাক গঠনে অংশ নেয়।
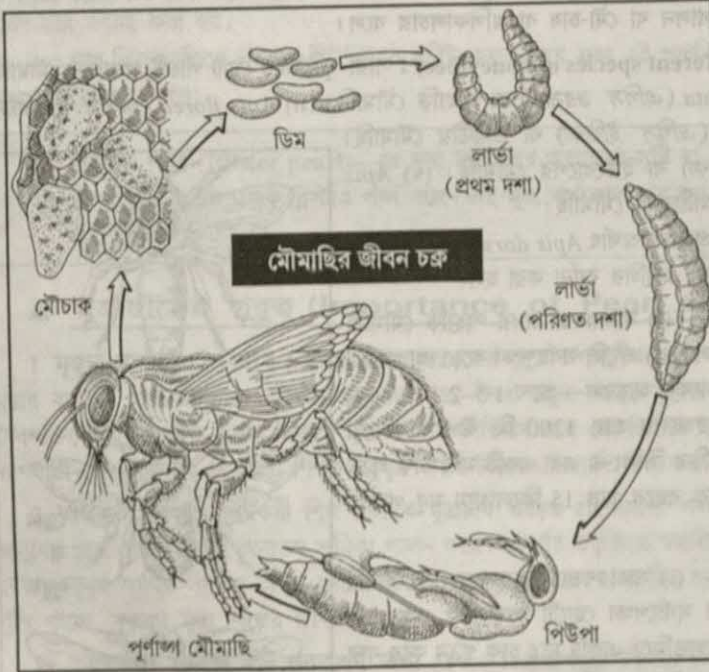


চিত্র 5.15 : মৌমাছির জীবন চক্র।

● **3. রানি** (Queen) : (i) ডিপ্লয়েড, প্রজননে সক্ষম স্ত্রী মৌমাছিকে রানি মৌমাছি বলে। (ii) একটি মৌচাকে একটিমাত্র রানি থাকে। (iii) পুরুষ ও শ্রমিকের তুলনায় রানির আকার বড়ো হয়। (iv) এদের পা খুবই শক্তিশালী

এবং উদর অংশটি বেশ লম্বা। (v) এদের উদরের শেষভাগে একটি বাঁকানো হুল থাকে যা এরা শুধুমাত্র অপর একটি রানি মৌমাছির উপর প্রয়োগ করে। (vi) **রানির কাজ**—রানি প্রতিদিন প্রায় 1000–2000টি নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম্বাণু উৎপন্ন করে।

## ❑ মৌমাছির জীবন চক্র (Life cycle of honey bee) :

মৌমাছির জীবন চক্রে ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ দশা দেখা যায়।

**1. পূর্ণাঙ্গ দশা**—(i) একটি মৌচাকে একটি রানি, কয়েকশত পুরুষ এবং অসংখ্য শ্রমিক মৌমাছি থাকে। (2) রানি কয়েকশত পুরুষ মৌমাছিকে আকর্ষণ করে মৌচাক থেকে **বৈবাহিক উড্ডয়নে** (Nuptial flight) নির্গত হয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে সঙ্গমে (Copulation) লিপ্ত হয়। শুক্রধানী (Spermatheca)-তে শুক্রাণু ভরে রানি চাকে ফিরে আসে ও প্রতিদিন প্রায় 2000 ডিম পাড়ে।

**2. ডিম্বাণু ও তার পরিস্ফুরণ** (Egg and its development)—(1) মৌমাছির ডিম দেখতে সাদা, উজ্জ্বল এবং স্পিন্ডিল (Spindle) আকৃতির। অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি অপুংজনি পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রী মৌমাছি সৃষ্টি হয়। (2) সদ্যোজাত শ্রমিক মৌমাছির গলবিলীয় গ্রন্থি (Pharyngeal gland) নিঃসৃত রসকে **রাজকীয় জেলি** (Royal jelly) বলে যা সমস্ত স্ত্রী লার্ভাকে প্রথম 2–3 দিন খাওয়ানো হয়। এরপরে প্রায় সমস্ত স্ত্রী লার্ভাকে পরাগমিশ্রিত মধু বা **মৌরুটি** (Bee bread) খাওয়ানো হয় এবং এই স্ত্রী লার্ভাগুলি কালক্রমে বন্ধ্যা স্ত্রী বা শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র **রানি প্রকোষ্ঠে** (Queen chamber) যে স্ত্রী লার্ভা থাকে তাদের সম্পূর্ণ লার্ভা দশায় রাজকীয় জেলি খাওয়ানো হয় এবং এই স্ত্রী লার্ভাগুলি কালক্রমে রানি মৌমাছিতে পরিণত হয়। (3) কয়েকবার খোলস বদলানোর পরে লার্ভাগুলি পিউপায় পরিণত হয় এবং পিউপার রূপান্তরের পরে সঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি সৃষ্টি হয়।
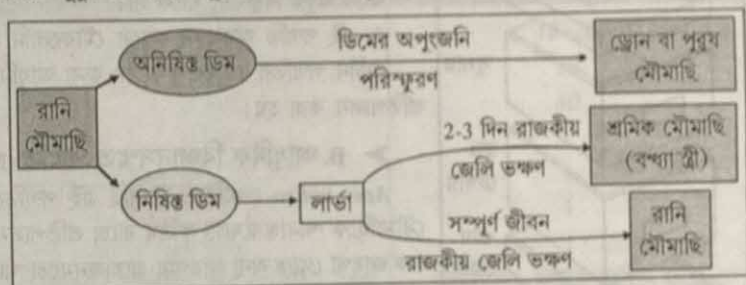
চিত্র 5.16 : বিভিন্ন জাতের মৌমাছি সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

## ➤ একটি মৌচাকের গঠন (Structure of a hive) :
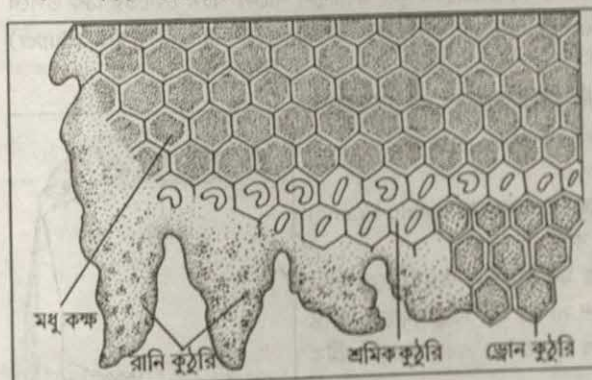
চিত্র 5.17 : মৌচাকের একটি অংশ।

(1) একটি মৌচাকে অসংখ্য ছোটো ছোটো ষড়ভুজাকৃতি কুঠুরি থাকে। শ্রমিক মৌমাছি **মোমগ্রন্থি** থেকে নিঃসৃত রসের সাহায্যে এই কুঠুরি এবং মৌচাক গঠন করে।

(2) মৌচাকের উপরের দিকের অংশে মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে তাই এই অংশের কুঠুরিগুলিকে **সঞ্চয়ী কুঠুরি** (Storage cell) বলে। মৌচাকের নীচের অংশে বিভিন্ন কুঠুরিতে অপরিণত দশা প্রতিপালিত হয় এবং এই অংশের কুঠুরিগুলিকে **পালন কুঠুরি** (Brood cell) বলে। শ্রমিক, পুরুষ বা ড্রোন ও রানি মৌমাছির পালন কুঠুরি ভিন্ন আয়তনের হয়।

## ▲ মৌমাছি প্রতিপালন পদ্ধতি (Rearing of Honey bee) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition) :** যে পদ্ধতির সাহায্যে মধু ও মোম সংগ্রহের জন্য মৌমাছির যত্ন নেওয়া হয় তাকে **মৌমাছি প্রতিপালন (Rearing of Honey bee)** বলে।

প্রধানত দুটি উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়, যেমন—প্রাকৃতিক দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি।

## ➤ A. প্রাকৃতিক দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতি (Natural, indigenous old method) :

প্রাকৃতিক পরিবেশে, যেমন—গাছের ডাল, পুরানো বাড়ির ছাদ, গাছের কোঠর ইত্যাদি স্থানে গঠিত মৌচাক খুঁজে বের করা হয়। এই মৌচাকের উপরের অংশে মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে এবং নীচের অংশে ডিম ও লার্ভা থাকে। উপযুক্ত সময়ে মৌচাক মধুপূর্ণ হলে মধু আহরণকারী মানুষ মৌচাকের উপরের মধু সঞ্চিত অংশ কেটে আনে ও সেই চাক নিংড়ে মধু সংগ্রহ করে। এরপর এই মধু শিশিতে ভরে বাজারজাত করা হয়।

### ● প্রাকৃতিক দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতির ত্রুটি (Demerits of Natural indigenous old method) :

চিত্র 5.18 : ল্যাংস্ট্রথের মডেল অনুযায়ী একটি মৌ-বাক্স।

1. এই পদ্ধতির ফলে মৌচাক বিনষ্ট হয় যা পুনর্গঠন করতে মৌমাছির অনেক দিন সময় লেগে যায়।
2. মধু আহরনের সময় কিছু মৌমাছি মারা যায়।
3. মৌচাক নিংড়ানোর সময় মৌচাকে থাকা কিছু ডিম ও লার্ভা নিষ্পেশিত হয়, ফলে মধুর বিশুদ্ধতা থাকে না।
4. এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মৌকলোনি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে।

প্রাচীন পদ্ধতির এইসব কুফলের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বাক্সে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়।

## ➤ B. আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Modern Scientific Method) :

*Apis indica* প্রজাতির মৌমাছি এই পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে মৌমাছিকে স্থানান্তরযোগ্য কৃত্রিম বাক্সে প্রতিপালন করা হয়। মৌচাক সমেত বাক্সগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রয়োজনমতো স্থানান্তর করা যায়। সাধারণত দুরকমের মুভেবল বাক্সে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়, যেমন—**নিউটন বাক্স** (Newton box) ও **ল্যাংস্ট্রথ বাক্স** (Langstroth box)। আবিষ্কারকদের নাম অনুযায়ী এই বাক্সের নামকরণ করা হয়েছে। মাপের সামান্য পরিবর্তন ছাড়া দুটি বাক্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য একই রকমের।

○ **মুভেবল বাক্সের বিভিন্ন অংশ**—(i) এই প্রকার বাক্সের নীচের অংশে একটি স্ট্যান্ড থাকে যার উপরে **বটম বোর্ড** অবস্থান করে।

(ii) বটম বোর্ডের উপর মৌচাকের মূল অংশগুলি থাকে। বটম বোর্ডের ঠিক উপরে **ব্রুড চেম্বার** (Brood chamber) থাকে যার উপরে একটি বা দুটি **সুপার** (Super) থাকে।

(iii) ব্রুড চেম্বারে মৌমাছির ডিম, লার্ভা, পিউপা ইত্যাদি থাকে ও এদের রক্ষণাবেক্ষনের কাজ চলে।

(iv) সুপারগুলিতে মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে।

(v) ব্রুড চেম্বার ও সুপারের মধ্যে 8-10টি করে **মুভেবল ফ্রেম** (Movable Frame) থাকে। ফ্রেমগুলির ফাঁকা অংশে মৌমাছি মৌচাক গঠন করে।

(vi) মধু সংগ্রহের জন্য সুপার থেকে ফ্রেমগুলি নিয়ে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের মধ্যে ঘূর্ণন করলে মধু কক্ষ থেকে মধু ছিটকে বেরিয়ে যন্ত্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়, কিন্তু মৌচাক বিনষ্ট হয় না। এরপর মধুহীন ফ্রেমগুলি মৌচাকের সুপারে রেখে দেওয়া হয় এবং এখানে শ্রমিক মৌমাছি পুনরায় মধু সঞ্চয় করে।

চিত্র 5.19 : ধূপন যন্ত্র।

### ● আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষের সুবিধা (Advantages of modern scientific method) :

1. এই পদ্ধতির সাহায্যে একই মৌচাকে একবছরে 5-6 বার মধু সংগ্রহ করা যায়।

2. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মধু নিষ্কাশন করা হয় বলে মৌচাক বিনষ্ট হয় না।
3. মৌমাছির সিল করা বিশুদ্ধ মধু পাওয়া যায়।
4. প্রয়োজনমতো অন্যস্থানে মৌচাক স্থানান্তরিত করা যায়।
5. একটি মৌচাক থেকে প্রয়োজনমতো অনেকগুলি চাক তৈরি করা যায়।

○ **মধুর উপাদান ও ব্যবহার (Composition and uses of honey) :**
ফুলের মকরন্দ গ্রন্থি (Nectar gland) নিঃসৃত মিষ্টি রসকে **মকরন্দ (Nectar)** বলে। শ্রমিক মৌমাছি ফুলের মকরন্দ রূপে বহন করে এনে মৌপ্রকোষ্ঠে বমি করে দেয় এবং এই ঘনীভূত মিষ্টি তরল পদার্থকে **মধু ( Honey )** বলে। ফুলের মকরন্দে 30–90% জল থাকে, অপরদিকে মধুতে মাত্র 18–20% জল থাকে। মকরন্দ ও মধুর বিভিন্ন উপাদানের তালিকা নীচে দেওয়া হল—

(a) **মকরন্দ ও মধুর উপাদান (Composition of Nectar and Honey)** [% শুষ্ক ওজন (% by weight)]

| উপাদান | মকরন্দ | মধু |
|---|---|---|
| 1. জল | 30–90 | 18–20 |
| 2. গ্লুকোজ | 5–30 | 35 |
| 3. ফ্রুক্টোজ | 5–30 | 40 |
| 4. সুক্রোজ | 5–70 | 2 |
| 5. শ্বেতসার | ....... | 1 |
| 6. খনিজ পদার্থ | ....... | 1 |
| 7. বিবিধ পদার্থ | 2 পর্যন্ত (শর্করা, প্রোটিন, অ্যারোম্যাটিক তৈল ও অম্ল।) | 1 (ভিটামিন, অ্যারোম্যাটিক তৈল প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড) |

(b) **মধুর ব্যবহার (Uses of Honey) :** অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সহজপাচ্য সুস্বাদু তরল খাদ্য হল মধু। মধুর প্রধান ব্যবহারগুলি নিম্নরূপ—

1. **খাদ্যগুণজনিত ব্যবহার**—মধু একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং বলদায়ক খাদ্য। 2 গ্রাম মধু থেকে প্রায় 67 kcal শক্তি পাওয়া যায়। মধুতে সরল শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদি থাকে এবং মধু খুবই সহজপাচ্য খাদ্য। মধু যে-কোনো বয়সের মানুষ যে-কোনো অবস্থায় (সুস্থ কিংবা রোগী) গ্রহণ করতে পারে।

2. **ভেষজগুণজনিত ব্যবহার**—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতে মধুর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধু সেবনে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডায়, সর্দি-কাশিতে মধু খুবই উপকারী খাদ্য হিসাবে কাজ করে। মধু সেবনে হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী থাকে এবং ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগ উপশম হয়।

3. **অন্যান্য ব্যবহার**—(i) পাউরুটি, কেক, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত করতে মধু ব্যবহৃত হয়। (ii) ফল ও বিভিন্ন খাদ্য সংরক্ষণে মধুর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। (iii) ওয়াইন (Wine) প্রস্তুত করতে মধু ব্যবহৃত হয়। (iv) সর্বোপরি পুজো ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মধু একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।

## ○ 5.6. রেশমচাষ (Sericulture) ○

রেশম মথ প্রতিপালন করে মানুষ রেশমতন্তু উৎপাদন করে যার থেকে মূল্যবান ও টেকসই রেশম বস্ত্র তৈরি হয়। চীনদেশে সর্বপ্রথম রেশম চাষের প্রচলন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব 2602 সালে চীনের রানি সি-লিংচি (Shi-Lingchi) সর্বপ্রথম রেশমমথের গুটি থেকে রেশম তন্তু উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করেন। কথিত আছে যে, রানি একদিন বাগানে সখীদের

সঙ্গে চা পান করছিলেন; এই সময় একটি গাছ থেকে একটি রেশম মথের গুটি চায়ের কাপে পড়ে যায়। ওই গুটিটিকে গরম চায়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি লক্ষ করেন যে, ওই গুটি থেকে এক ধরনের সোনালি রং-এর সুতো বা তন্তু বের হচ্ছে। রানি বাগান থেকে কয়েকটি গুটি সংগ্রহ করে অতি যত্নে প্রাসাদে রাখেন ও কয়েকদিন পরে ওই গুটিগুলি থেকে মথ বের হতে দেখেন। এর পর তিনি মথের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং রেশম মথের গুটি থেকে রেশম উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই সময় থেকে **রানি সি-লিংচিকে রেশমমথের দেবী** রূপে সম্মানিত করা হয়।

বর্তমানে চীন, জাপান, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইরান, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে রেশমচাষ করা হয়। রেশম উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার রেশমচাষ কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে করা হয়।

- **ভারতবর্ষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেশমচাষের গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষণাগার ঃ**

1. কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় রেশমচাষ গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষণাগার।
2. পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় রেশমচাষ গবেষণা কেন্দ্র।
3. ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে কেন্দ্রীয় তসর গবেষণা কেন্দ্র।
4. আসামের কেন্দ্রীয় এরি গবেষণাকেন্দ্র।
5. মাইশোরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষনাগার।

## ▲ রেশমচাষের সংজ্ঞা, এবং তুঁতগাছের প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্যসহ উদ্ভিদজগতে স্থান (Definition of Sericulture, and Types of Mulberry plant and its features with Systematic position) ঃ

❖ (a) **রেশমচাষের সংজ্ঞা (Definition of Sericulture) ঃ বিভিন্ন পোষক উদ্ভিদ, যেমন—তুঁত, অর্জুন, শাল, সোম, রেড়ি ইত্যাদি গাছের চাষ এবং তুঁতজাত বা অন্যান্য উদ্ভিদজাত রেশম মথের প্রতিপালন, রেশমকীটের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রেশমগুটি থেকে রেশম নিষ্কাশন করে ব্যবসায় নিয়োজিত করার পদ্ধতিকে রেশমচাষ (Sericulture) বলে।**

রেশমচাষ এখন একটি **কৃষিজাত শিল্পে** (Agro-industry) পরিণত হয়েছে, যার ফসল হল **সিল্ক** বা **রেশম**।

(b) **বিভিন্ন প্রকার তুঁতগাছ (Types of Mulberry plants)** ঃ তুঁত গাছ গভীর মূলযুক্ত, বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ যা একটি বড়ো ঝোপ অথবা বড়ো মাপের গাছের আকার ধারণ করে। বীজের সাহায্যে অথবা গ্রাফ্‌টিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই গাছের বংশ বিস্তার করানো যায়। দুধের মতো তরুক্ষীরের উপস্থিতি এই গাছের গোত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তুঁত গাছ প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান ট্রপিক্যাল দেশগুলিতে পাওয়া যায়। এই গাছের গণ হল মোরাস (Genus—*Morus*) যার অধীনে প্রায় 35টি বিভিন্ন প্রজাতি পাওয়া যায়। **মোরাস গণের অধীনে তিনটি প্রধান প্রজাতি আছে।**

(c) **বিভিন্ন প্রজাতির তুঁতগাছ ও তার বৈশিষ্ট্য (Different Species of Mulberry plant and its features) ঃ**

1. *Morus indica* (*মোরাস ইন্ডিকা*)—এই তুঁত গাছের পাতাগুলি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পাতার প্রান্তদেশ খাঁজকাটা (Serrate)।

2. *Morus alba* (*মোরাস অ্যালবা*)—এই তুঁত গাছের পাতাগুলি প্রশস্ত ও ডিম্বাকৃতি; পাতার প্রান্তদেশ খাঁজকাটা, পাতার গোড়ার দিকে তিনটি ছোটো ছোটো বেস্যাল পত্র পাওয়া যায়।

3. *Morus nigra* (*মোরাস নাইগ্রা*) —এই তুঁত গাছের পাতা *M. alba* প্রজাতির পাতার চেয়ে প্রশস্ত হয়, পাতাগুলি চামড়ার মতো দেখতে হয়, গর্ভদন্ড রোমযুক্ত এবং গোলাপি রঙের ফল দেখা যায়।

**চিত্র 5.20** ঃ তুঁত গাছের বিভিন্ন ধরনের পাতা।

(d) **উদ্ভিদ জগতে তুঁত গাছের স্থান (Systematic position of mulberry plant) ঃ**

বিভাগ—ফেনেরোগ্যামিয়া (Phenerogamia)
উপবিভাগ—অ্যাঞ্জিয়োস্পার্মি (Angiospermae)
শ্রেণি—দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon)
উপশ্রেণি—আর্কিক্ল্যামডি (Archichlamydae)
বর্গ—আরটিক্যালিস্ (Urticales)
গোত্র—মোরাসি (Moraceae)
গণ—*Morus* (*মোরাস*)

## সিল্ক বা রেশম Silk

রেশম চাষের উৎপাদিত বস্তু হল সিল্ক যা রাণীতন্তু রূপে ব্যাপকভাবে মানুষের পোষাক প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

### ▲ সিল্কের সংজ্ঞা ও তার রাসায়নিক উপাদান এবং রেশম ও রেশমমথের প্রকারভেদ (Definition of Silk and its Chemical Composition and Types of Silk and Silk moth) ঃ

❖ (a) **সিল্কের সংজ্ঞা (Definition of Silk) ঃ সেরিসিন ও ফাইব্রয়েন প্রোটিন নির্মিত যে তন্তু রেশম মথের লার্ভার পরিণত দশা বা পঞ্চম উপদশার (5th instar) রেশম গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় এবং লার্ভার বুনন যন্ত্র স্পিনারেটের মাধ্যমে বায়ুর সংস্পর্শে এসে কঠিন তন্তুরূপে পিউপার রেশমগুটি তৈরিতে অংশগ্রহণ করে তাকে রেশম বা সিল্ক বলে।**

(b) **রেশম তন্তুর রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition of silk) ঃ** রেশম তন্তু দু'ধরনের প্রোটিন সেরিসিন ও ফাইব্রোইন নিয়ে গঠিত হয়। এই তন্তুর কেন্দ্রে বা কোর অঞ্চলে **ফাইব্রোইন** (Fibroin) প্রোটিন থাকে যেটি তন্তুর 75-80% অংশ গঠন করে এবং যা দুটি পলিপেপটাইড দিয়ে তৈরি হয়। রেশমতন্তুর বহিরাবরণ **সেরিসিন** (Sericin) নামে আর একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় যেটি তন্তুর প্রায় 20-25% অংশ গঠন করে এবং এখানে তিন প্রকার সেরিসিন উপাদান (সেরিসিন-I, II, III) থাকে। রেশমতন্তুতে ফাইব্রোইন বর্ণহীন কিন্তু সেরিসিন বিভিন্ন বর্ণের হয়। রেশমমথের লার্ভা পোষক উদ্ভিদের পাতা থেকে এই দু'ধরনের প্রোটিন সংগ্রহ করে।

● **সেরিসিন ও ফাইব্রোইনের পার্থক্য (Difference between Sericin and Fibroin) ঃ**

| সেরিসিন | ফাইব্রোইন |
|---|---|
| 1. রেশমগ্রন্থির মধ্যাংশ থেকে ক্ষরিত হয়। | 1. রেশমগ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ থেকে ক্ষরিত হয়। |
| 2. সেরিসিনে রঞ্জক পদার্থ থাকে। | 2. ফাইব্রোইনে রঞ্জক পদার্থ থাকে না। |
| 3. গরমজলে দ্রবীভূত হয়। | 3. গরমজলে এমনকি অল্প ক্ষারেও দ্রবীভূত হয় না। |
| 4. জিলেটিন জাতীয় প্রোটিন। | 4. ফাইব্রাস জাতীয় প্রোটিন। |
| 5. দেশজ রেশম গুটিতে রেশমের শতকরা প্রায় 20 ভাগ অংশ গঠন করে। | 5. দেশজ রেশমগুটিতে রেশমের শতকরা প্রায় 80 ভাগ অংশ গঠন করে। |
| 6. সেরিসিনের রাসায়নিক সংকেত হল—$C_{30}H_{40}N_{10}O_{16}$ | 6. ফাইব্রোইনের রাসায়নিক সংকেত হল— $C_{30}H_{46}N_{10}O_{12}$ |

(c) **বিভিন্ন প্রকার রেশম ও রেশমমথ (Types of Silk and Silk worm) ঃ**

1. **তুঁতজাত রেশম (Mulberry silk) ঃ** *বোম্বিক্স মোরি* (*Bombyx mori*) এবং অন্যান্য তুঁতজাত প্রজাতির রেশমমথের গুটি থেকে যে রেশম পাওয়া যায় তাকে তুঁতজাত রেশম বলে। তুঁতজাত রেশমই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টমানের। এই প্রকার

রেশমমথের চাষ তুঁত গাছের উপর নির্ভর করে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, দার্জিলিং প্রভৃতি জেলায় এবং কর্ণাটক ও কাশ্মীরে এই প্রকার রেশমমথের চাষ ব্যাপক হারে হয়। একচক্রী তুঁতজাত মথের রেশম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের। এই প্রকার রেশমতন্তুর রং সাদা। বহুচক্রী তুঁতজাত মথের রেশমতন্তু হলদে রঙের। নীচে কয়েকটি তুঁতজাত রেশমমথের প্রজাতি উল্লেখ করা হল।

(i) *বোম্বিক্স মোরি* (*Bombyx mori*)

(ii) *বোম্বিক্স টেক্সটর* (*Bombyx textor*)

(iii) *বোম্বিক্স ফরচুনেটাক্স* (*Bombyx fortunatux*)

(iv) *বোম্বিক্স নিস্ট্রি* (*Bombyx nistri*)

2. **তসর (Tasar) ঃ** *অ্যানথেরেইয়া পাফিয়া* (*Antheraea paphia*) ও *অ্যানথেরেইয়া মিলিট্টা* (*Antheraea mylitta*) নামের রেশমমথের গুটি থেকে যে রেশমতন্তু পাওয়া যায় তাকে তসর বলে। অর্জুন, শাল, কুল, আসান প্রভৃতি উদ্ভিদে এই ধরনের রেশমমথের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূমে এবং কর্ণাটক, বিহার ও উড়িষ্যাতে এই ধরনের রেশমমথের চাষ হয়। তসর সিল্ক বিদেশে রপ্তানি করে বৎসরে প্রায় 2 কোটি টাকা উপার্জন করা হয়।

3. **এরি বা এন্ডি বা এরান্ডি (Eri, Endi or, Errandi) ঃ** *ফাইলোসেমিয়া রেসিন* (*Philosamia recini*) নামে রেশমমথের গুটি থেকে এরি বা এন্ডি রেশম পাওয়া যায়। এই ধরনের রেশমমথের শূককীটগুলি রেড়ি (Castor) গাছের পাতা খায়। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আসামে এই প্রকার রেশমচাষ হয়।

4. **মুগা (Muga) ঃ** *অ্যানথেরেইয়া আসামেনসিস* (*Antheraea assamensis*) নামে রেশমমথের গুটি থেকে মুগা সিল্ক পাওয়া যায়। সিনামন, ম্যাকিলাস প্রভৃতি উদ্ভিদে এই প্রকার রেশমমথের চাষ হয়। এই ধরনের সিল্ক খুবই নিকৃষ্ট মানের হয়। তাই এই সিল্ক বিদেশে রপ্তানি করা হয় না। এই ধরনের সিল্ক উৎপাদনে বৎসরে প্রায় 3 কোটি টাকা পাওয়া যায়।
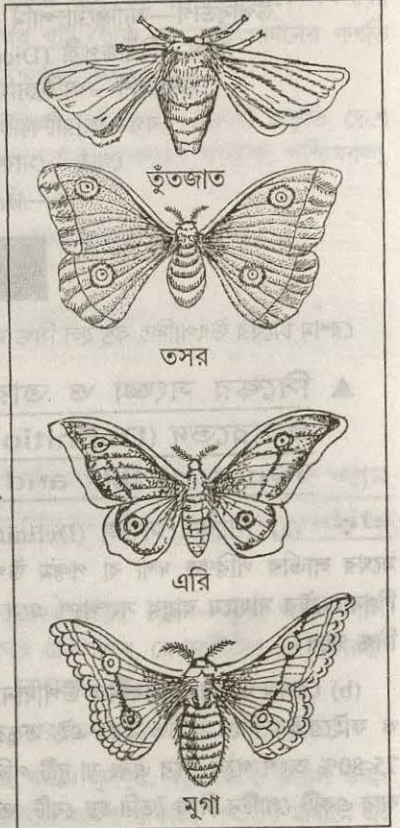
চিত্র 5.21 ঃ বিভিন্ন প্রকার রেশম মথ।

চার প্রকার রেশমের ভিতর তুঁত রেশম সর্বাধিক প্রচলিত এবং ব্যবহারযোগ্য রেশম। পরবর্তী অধ্যায়ে তুঁতজাত রেশমমথের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

### ● রেশম তন্তুতে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ (Different Pigments present in Silk fibres) ঃ

1. হলুদ রেশম তন্তুতে—ক্যারোটিনয়েড ও জ্যান্থোফিল রঞ্জক থাকে।
2. সবুজ রেশম তন্তুতে—ফ্লাভোনয়েড রঞ্জক পদার্থ থাকে।
3. সাদা রেশম তন্তুতে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না।

### ● রেশম তন্তুর উপযোগিতা (Importance of Silk) ঃ

1. রেশমতন্তু হালকা অথচ দৃঢ় এবং টেকসই।
2. রেশমতন্তু উজ্জ্বল রং ধারণ করে এবং এটি মসৃণ তন্তু।
3. এর কোমল স্পর্শানুভূতি এবং স্থিতিস্থাপকতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
4. রেশমের অল্প জলধারণ ক্ষমতা আছে।
5. রেশম তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী।
6. রেশম রপ্তানি যোগ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তন্তু।
7. রেশমকীট সহজে প্রতিপালনযোগ্য এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া রেশম প্রস্তুত করা যায়।

এই সব কারণে রেশম খুবই আকর্ষণীয় তন্তু এবং একে রানি তন্তু (Queen fibre) বলে।

● **বিভিন্ন প্রকার রেশম, রেশমমথ ও তাদের পোষক উদ্ভিদ (Different types of Silk and Silkworm with their host plants) ঃ**

| রেশমের প্রকার | রেশমমথের নাম | পোষক উদ্ভিদ |
|---|---|---|
| 1. তুঁত রেশম (Mulberry silk) | 1. তুঁত রেশম মথ (*Bombyx mori*) | 1. তুঁত গাছ (*Morus alba, Morus indica*) |
| 2. তসর রেশম (Tasar silk) | 2. তসর রেশমমথ (*Antheraea mylitta*) | 2. (i) আসান গাছ (*Terminalia tomentosa*)<br>(ii) অর্জুন গাছ (*Terminalia arjuna*) |
| 3. এরি বা এন্ডি বা এরান্ডি রেশম (Eri, Endi or Errandi silk) | 3. এরি রেশমমথ (*Philosamia recini*) | 3. (i) রেড়ি গাছ (*Recinus communis*)<br>(ii) কেসেরু গাছ (*Heteropanax fragrans*) |
| 4. মুগা রেশম (Muga silk) | 4. মুগা রেশমমথ (*Antheraea assamensis*) | 4. (i) সোম গাছ (*Machilus bombycina*)<br>(ii) সোয়ালু গাছ (*Litsaea polyantha*) |

● (a) **প্রাণীজগতে তুঁতজাত রেশমমথের স্থান (Systematic position of mulberry Silk Moth) ঃ**

পর্ব (Phylum)—সন্ধিপদ (Arthropoda)

উপপর্ব (Subphylum)—ম্যান্ডিবিউলেটা (Mandibulata)

শ্রেণি (Class)—ইনসেক্টা (Insecta)

উপশ্রেণি (Subclass)—টেরিগোটা (Pterygota)

বর্গ (Order)—লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera)

গোত্র (Family)—বম্বিসিডি (Bombycidae)

গণ (Genus)—*Bombyx* (*বম্বিক্স*)

প্রজাতি (Species)—*mori* (*মোরি*)

(b) **জীবনচক্রের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার তুঁতজাত রেশমমথ (Different types of mulberry silkmoth on the basis of the nature of life cycle) ঃ**

স্বাভাবিক পরিবেশে কোনো জাতের রেশমমথ বছরে মাত্র একবার, আবার কোনো জাতের রেশমমথ বছরে দু'বার এবং কোনো জাতের রেশমমথ বছরে দু'এর বেশিবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। জীবনচক্রের এই বৈশিষ্ট্যকে **ভোল্টিনিজম** (Voltinism) বলে এবং এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রেশমমথ তিন প্রকারের, যেমন—

1. **একচক্রী রেশমমথ** ( Univoltine silkmoth )— যে রেশমমথ বছরে মাত্র একবার (সাধারণত বসন্তকালে) জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে তাকে একচক্রী রেশমমথ বলে। এই জাতের রেশমমথের একটি গুটি থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (800-1200 মিটার) রেশম পাওয়া যায় এবং এই রেশম বেশ উন্নতমানের।

2. **দ্বিচক্রী রেশমমথ** ( Bivoltine silkmoth )— যে রেশমমথ বছরে দুবার (সাধারণত বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালে) জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে তাকে দ্বিচক্রী রেশমমথ বলে। এই জাতের রেশমমথের একটি গুটি থেকে একচক্রীর থেকে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ (600-800 মিটার) রেশম পাওয়া যায় এবং এই রেশম উন্নতমানের হয় না।

3. **বহুচক্রী রেশমমথ** ( Multivoltine silkmoth )— যে রেশমমথ বছরে বহুবার (6–8 বার) জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে তাকে বহুচক্রী রেশমমথ বলে। এই জাতের রেশমমথের একটি গুটি থেকে অনেক কম পরিমাণের (300-400 মিটার) রেশম পাওয়া যায় এবং এই রেশমের মান ভালো নয়।

(c) **তুঁতজাত রেশম মথের জীবন চক্র (Life cycle of Mulberry silk worm) ঃ**

তুঁতজাত রেশমমথের জীবনচক্র চারটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দশাগুলি যথাক্রমে **ডিম**, **শূককীট বা লার্ভা**, **মূককীট বা পুত্তলি বা পিউপা** এবং **পূর্ণাঙ্গ বা সমঙ্গ**।

➤ **1. ডিম (Egg) :** স্বাভাবিক পরিবেশে কোনো জাতের রেশমমথ বছরে মাত্র একবার, আবার কোনো জাতের রেশমমথ বছরে দু'বার এবং কোনো জাতের রেশমমথ বছরে দু'এর বেশিবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। জীবনচক্রের এই বৈশিষ্ট্যকে **ভোল্টিনিজম** (Voltinism) বলে। এই ধর্ম অনুযায়ী রেশমমথ তিন প্রকারের; যেমন—**একচক্রী** (Univoltine) রেশমমথ বৎসরে একবার (বসন্ত ঋতুতে), **দ্বিচক্রী** (Bivoltine) রেশমমথ বৎসরে দু'বার (বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে) এবং **বহুচক্রী** (Multivoltine) রেশমমথ বৎসরে বহুবার (6-8 বার) ডিম পাড়ে। পরিণত স্ত্রী মথ 24 ঘণ্টায় 400-500 টি ডিম পাড়ে। আঠালো ডিমগুলি তুঁত পাতায় আটকে যায়। ডিমগুলি দেখতে পোস্ত দানার মতো হয়। ডিমগুলি দুধের মতো সাদা বা গাঢ় হলুদ রং-এর হয়। এদের ডিম দু-প্রকারের হয়। যেমন—(i) **শীতঘুম ডিম** (Hibernating egg) এবং (ii) **সাধারণ ডিম** (Non-hibernating egg)।

(i) **শীতঘুম ডিম** (Hibernating egg) **:** এই প্রকার ডিমগুলিকে 38°F—40°F তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। এই সংরক্ষিত ডিমগুলি থেকে পরবর্তী বসন্ত ঋতুতে লার্ভা বের হয়। এই ধরনের ডিমগুলির পরিস্ফুরণের কোনো এক দশায় ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বৃদ্ধি ব্যাহত ভ্রূণগুলির এই দশাকে **ডায়াপজ** (Diapause) বলে। একচক্রী এবং দ্বিচক্রী রেশমমথের জীবনচক্রে ডিমের ভিতরে ভ্রূণের শীতঘুম দশা বা ডায়াপজ দশা পরিলক্ষিত হয়।
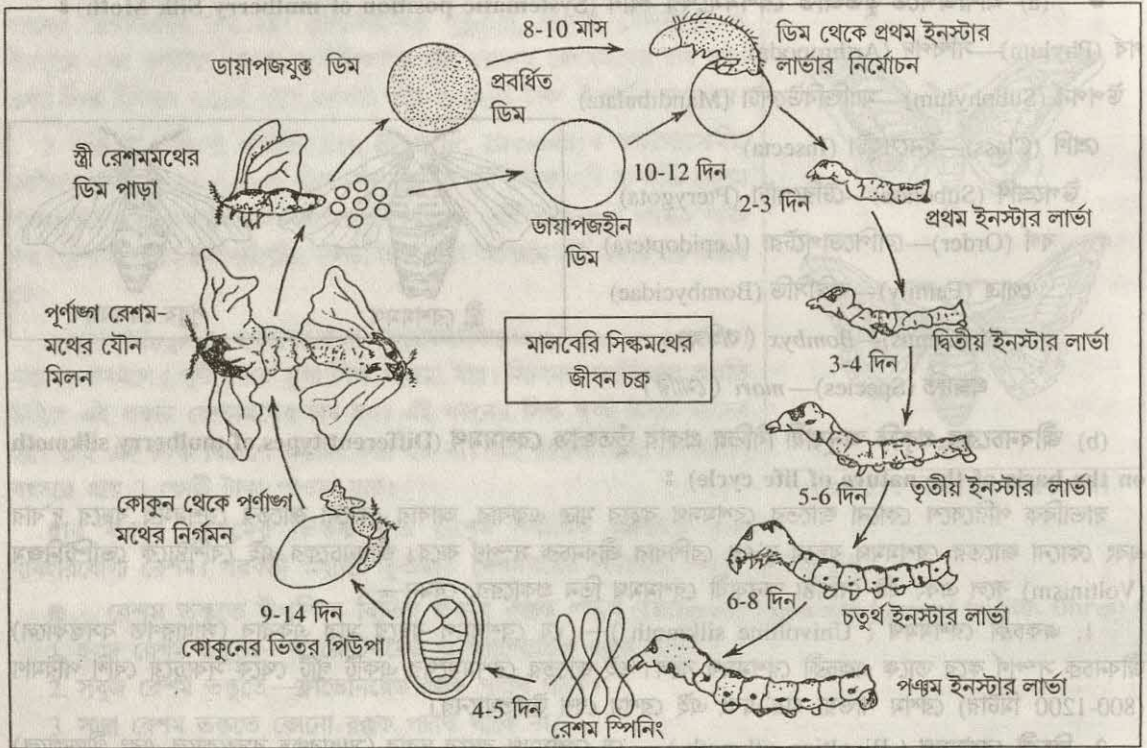
চিত্র 5.22 : তুঁতজাত রেশমমথের জীবনচক্র।

(ii) **সাধারণ ডিম** (Non-hibernating egg) **:** এই প্রকার ডিমগুলির ভ্রূণে ডায়াপজ দশা দেখা যায় না। 10-12 দিনের মধ্যে ডিমগুলি থেকে শূককীট বের হয়। বহুচক্রী রেশমমথের ডিমগুলি এই ধরনের হয়।

## ◻ শীতঘুম ডিমের কৃত্রিম পরিস্ফুরণ (Artificial Development of Hibernating egg) :

শীতঘুম ডিমের কৃত্রিম পরিস্ফুরণের জন্য ডিম পাড়ার 24 ঘণ্টা পরে HCl দ্রবণে (আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.064), 46°C তাপমাত্রায় 3-4 মিনিট ডিমগুলিকে রাখা হয়। এরপর ডিমগুলিকে জলে ধুয়ে নিতে হয় এবং 2% ফরম্যালিন দ্রবণে ডিমগুলি শোধন করে ঠান্ডা ঘরে (5°C) সংরক্ষণ করা হয়। অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে শীতঘুম ডিমের **ডায়াপজ পদার্থ** (Diapause substance) বিনষ্ট হয় এবং এই ডিম থেকে 10 দিনে লার্ভা নির্গত হয়।

## ● ডায়াপজ ও ভোল্টিনিজম্ (Diapause and Voltinism) ●

(i) **ডায়াপজের সংজ্ঞা—রেশমমথের যে ধর্মের ফলে ডিমের পরিস্ফুটনের সময় দীর্ঘতর হয় তাকে ডায়াপজ বলে।** ডায়াপজ ধর্মযুক্ত ডিমের পরিস্ফুটন 8-10 মাস পরে ঘটে।

(ii) **ভোল্টিনিজমের সংজ্ঞা—রেশমমথের যে ধর্মের ফলে তাদের জীবনচক্র বছরে একবার, দুবার বা বহুবার সম্পন্ন হয় তাকে ভোল্টিনিজম বলে।**

● **শীতঘুম ডিম ও সাধারণ ডিমের পার্থক্য (Difference between hibernating and non-hibernating egg) ঃ**

| শীতঘুম ডিম | সাধারণ ডিম |
|---|---|
| 1. এই ধরনের ডিম একচক্রী ও দ্বিচক্রী রেশমমথে দেখা যায়। | 1. এই ধরনের ডিম বহুচক্রী রেশমমথে দেখা যায়। |
| 2. ডিম পাড়ার দু'দিন পরেই এই ডিমগুলির পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। | 2. ডিম পাড়ার পর পরিস্ফুরণ বন্ধ হয় না। |
| 3. ডিম পাড়ার 8–10 মাস পর ডিমগুলি ফুটে লার্ভা বের হয়। | 3. ডিম পাড়ার 10-12 দিনের মধ্যে এই ডিমগুলি ফুটে লার্ভা বের হয়। |
| 4. এই ডিম থেকে উন্নত মানের সিল্ক উৎপাদন হয়। | 4. অনুন্নত মানের সিল্ক উৎপাদিত হয়। |

➤ **2. শূককীট বা লার্ভা (Silk worm or Larva) ঃ** ডিম থেকে সদ্য নির্গত লার্ভা চুলের মতো সরু এবং লম্বায় প্রায় 3 মি.মি. হয়। লার্ভার সমগ্রদেহটি রোমে আবৃত থাকে। রেশমমথের লার্ভাকে পলুও বলা হয়। লার্ভার দেহটি তিনটি অংশে বিভেদিত। অংশ তিনটি যথাক্রমে **মস্তক** (Head), **বক্ষ** (Thorax) এবং **উদর** (Abdomen)। লার্ভাগুলি স্বভাবে খুবই চঞ্চল। এরা কচি তুঁত পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ডিম থেকে নির্গত লার্ভার দেহ প্রথম 24 ঘণ্টায় 3 গুণ বৃদ্ধি পায়। রেশমমথের লার্ভা চারবার খোলস ত্যাগ করে। ডিম থেকে নির্গত লার্ভাকে **প্রথম ইন্‌স্টার লার্ভা** (First instar larva) বলে। প্রথম ইন্‌স্টার লার্ভাটি দ্রুত তুঁত পাতা খাওয়ার পর 3—4 দিন পরে খোলস ত্যাগ করে। এইভাবে খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি এবং খোলস ত্যাগ করার ভিত্তিতে **দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ** এবং **পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভা** সৃষ্টি হয়। এইভাবে **চারবার খোলস নির্মোচন (Moulting) এবং পাঁচটি ইন্‌স্টার অতিক্রম** করে পরিণত শূককীট অবস্থা প্রাপ্ত হতে বহুচক্রী রেশমমথের 22-23 দিন এবং একচক্রী এবং দ্বিচক্রী রেশমমথের 26-27 দিন সময় লাগে। চতুর্থ এবং পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভার যৌন চিহ্ন (Sexual marking) দেখে স্ত্রী এবং পুরুষ লার্ভা পৃথক করা হয়।

চিত্র 5.23 ঃ পরিণত পঞ্চম ইনস্টার লার্ভার চিত্ররূপ।
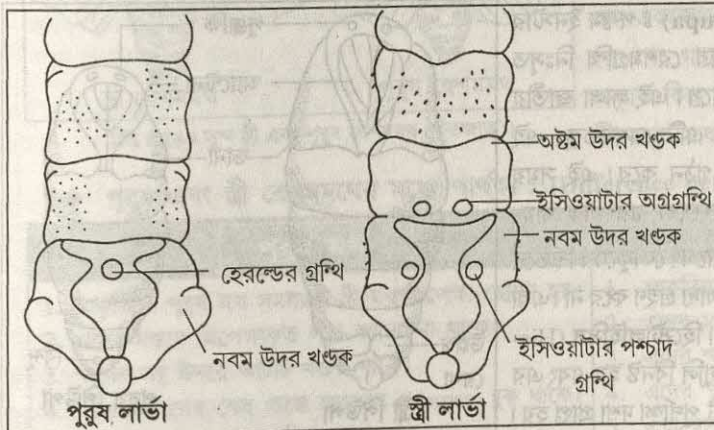
চিত্র 5.24 ঃ রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী লার্ভার পশ্চাৎ অংশের অঙ্কীয় দৃশ্য।

পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভা আর খোলস ত্যাগ করে না। এটি পরিণত লার্ভা দশা প্রাপ্ত হয়। পরিণত লার্ভার মাথা তিনটি খণ্ডক (একত্রে মিলিত হয়), বক্ষ তিনটি খণ্ডক এবং উদর দশটি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। পরিণত লার্ভার মাথার সামনে একজোড়া শক্ত চোয়াল, একজোড়া ম্যাক্সিলা, একজোড়া ওষ্ঠ, একজোড়া ম্যাক্সিলারি পালপ্ এবং একজোড়া লেবিয়াল পালপ্ থাকে। এদের মুখগহ্বরের সামনের দিকে বুনন যন্ত্র বা **স্পিনারেট** (Spinneret) থাকে। স্পিনারেটের মাধ্যমে রেশমগ্রন্থি থেকে সূত্রাকারে রেশম বের হয়। পরিণত লার্ভার বক্ষদেশের তিনটি খণ্ডকে একজোড়া করে মোট তিন জোড়া হুকযুক্ত ত্রি-সন্ধিল পদ থাকে। এই পদগুলি লার্ভার গমনে সহায়তা করে।
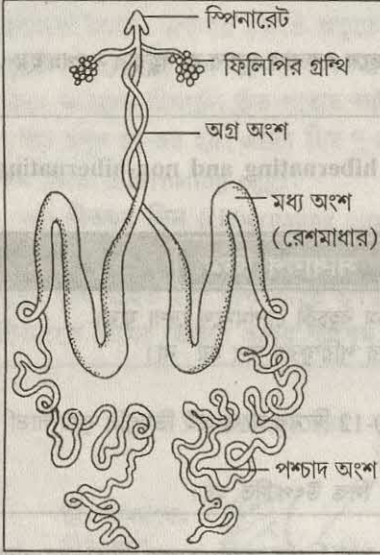
চিত্র 5.25 : রেশম গ্রন্থির বিভিন্ন অংশের গঠন।

◘ **রেশমগ্রন্থির গঠন ( Structure of Silk gland )** : পরিণত লার্ভার উদরের 4-8 দেহখণ্ডকের গহ্বরে একজোড়া রেশমগ্রন্থি ছড়িয়ে থাকে। রেশমগ্রন্থির বৃহৎ **মধ্যভাগকে রেশমাধার** (Silk reservoir) বলে। রেশমাধারের **পশ্চাদ্‌ভাগ** কুণ্ডলীকৃত এবং **সম্মুখভাগ** রেশমনালি যুক্ত। দুটি রেশমগ্রন্থির অগ্রভাগে রেশমনালিদুটি মিলিত হয়ে সাধারণ রেশমনালি গঠন করে। এই সাধারণ রেশমনালিটি **স্পিনারেটে** উন্মুক্ত হয়। রেশমগ্রন্থির কুণ্ডলীকৃত পশ্চাদ্‌ভাগ এবং বৃহৎ মধ্যভাগ থেকে যথাক্রমে ফাইব্রোইন এবং সেরিসিন নামে প্রোটিন ক্ষরিত হয়। রেশমমথের লার্ভার মুখবিবরে একজোড়া ক্ষুদ্র **ফিলিপ্পীর গ্রন্থি** (Glands of Filippi) বা **লায়োনেটের গ্রন্থি** (Lyonet's gland) থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রস রেশমতন্তুকে তৈলাক্ত এবং উজ্জ্বল করে।

● **রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী লার্ভার পার্থক্য (Difference between male and female larva of silkworm) :**

| পুরুষ লার্ভা | স্ত্রী লার্ভা |
|---|---|
| 1. পুরুষ লার্ভার উদরের অঙ্কীয় দেশে অষ্টম ও নবম খণ্ডকের সংযোগস্থলে দুধের মতো সাদা একটি হেরল্ডের গ্রন্থি (Herold's gland) থাকে। | 1. স্ত্রী লার্ভার উদরের অঙ্কীয় দেশে অষ্টম ও নবম খণ্ডকের প্রতিটিতে একজোড়া করে কুঁড়ির মতো যৌনচিহ্ন থাকে। অষ্টম খণ্ডকের এই কুঁড়িকে অগ্র ইসিওয়াটার গ্রন্থি (Anterior Ishiwata's gland) এবং নবম খণ্ডকের এই কুঁড়িকে পশ্চাৎ ইসিওয়াটার গ্রন্থি (Posterior Ishiwata's gland) বলে। |

➤ **3. মুককীট বা পুত্তলি বা পিউপা (Pupa)** : পঞ্চম ইনস্টার লার্ভা আটদিন তুঁত পাতা খাওয়ার পর এদের রেশমগ্রন্থি নিঃসৃত তরল স্পিনারেটের মাধ্যমে দেহের বাইরে আসে। এই লালা জাতীয় পদার্থ বায়ুর সংস্পর্শে তন্তুতে পরিণত হয়, এটি রেশমতন্তু। এই তন্তুগুলি লার্ভাকে ঘিরে **কোকুন** (Cocoon) গঠন করে। এই সময় লার্ভাটি কোকুনের মধ্যে প্রায় 60,000—3,00,000 বার পাক খায়।

কোকুন বা গুটি তৈরি হতে 3-4 দিন সময় লাগে। কোকুনের ভিতরে লার্ভাটি পিউপায় পরিণত হয়। পিউপা কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। এরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোকুনের মধ্যে অবস্থান করে। **হিস্টোলাইসিস** (Histolysis) পদ্ধতিতে পিউপার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গগুলি বিনষ্ট হয় এবং এর মধ্যে নূতন অঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়। ফলে পিউপাটি পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়। উল্লেখ করা যায় কোকুনে **জ্যান্থোফিল** (Xanthophil), **ক্যারোটিনয়েড**

চিত্র 5.26 : রেশমমথের স্ত্রী ও পুরুষ পিউপার চিত্ররূপ।

(Carotenoid) এবং ফ্ল্যাভোন (Flavone) নামে রঞ্জক পাওয়া যায়। এই রঞ্জকগুলি তুঁতগাছের পাতা থেকে লার্ভার রক্তে মেশে এবং সেখান থেকে রেশম গ্রন্থিতে প্রবেশ করে।

● **রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী পিউপার পার্থক্য (Difference between Male and Female pupa of silk-worm) :**

| পুরুষ পিউপা | স্ত্রী পিউপা |
|---|---|
| 1. পুরুষ পিউপা আকারে ছোটো এবং এদের উদরদেশ সরু। | 1. স্ত্রী পিউপা আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং এদের উদর দেশ চওড়া। |
| 2. অষ্টম উদরখণ্ডের অঙ্কীয়দেশে কোনো উল্লম্ব রেখা (Vertical line) দেখা যায় না। | 2. অষ্টম উদরখণ্ডের অঙ্কীয় দেশে একটি সুস্পষ্ট উল্লম্ব রেখা (Vertical line) দেখা যায়। |
| 3. নবম খণ্ডে একটি গোলাকার বিন্দু (Round spot) দেখা যায়। | 3. নবম খণ্ডে কোনো গোলাকার বিন্দু থাকে না। |

● **পুরুষ-মথের কোকুন ও স্ত্রী-মথের কোকুনের পার্থক্য : (Difference between Male cocoon and Female cocoon of silk moth) :**

| পুরুষ-মথের কোকুন | স্ত্রী-মথের কোকুন |
|---|---|
| 1. এটি ওজনে হালকা হয়। | 1. এটি ওজনে ভারী হয়। |
| 2. এতে সুতার পরিমাণ কম থাকে। | 2. এতে সুতার পরিমাণ বেশি থাকে। |

➤ **4. পূর্ণাঙ্গ বা সমাঙ্গ (Imago) :** প্রায় দশ দিন পিউপা দশা অতিক্রম হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ মথ কোকুন বা গুটি কেটে বের হয়ে আসে। স্ত্রী মথ অপেক্ষা পুরুষ মথ আগে কোকুন কেটে বের হয়। পূর্ণাঙ্গ মথের দেহ তিনটি অংশে বিভেদিত। অংশগুলি যথাক্রমে মস্তক, বক্ষ এবং উদর। এদের বক্ষের পৃষ্ঠদেশে দুইজোড়া ডানা এবং অঙ্কীয়দেশে তিনজোড়া উপাঙ্গ থাকে। এদের মস্তকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি এবং একজোড়া শুঙ্গ থাকে। পুরুষ মথের শুঙ্গ দুটি বেশি লম্বা হয় এবং গায়ের রং গোলাপি সাদা হয়। এদের পৌষ্টিকতন্ত্র অনুন্নত কিন্তু জননতন্ত্র উন্নত। উল্লেখ করা যায় রেশমমথের জীবনচক্র সাধারণত 6-8 সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।

চিত্র 5.27 : বিভিন্ন রেশমমথের গুটি।

চিত্র 5.28 : সুস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ রেশমমথ (তুঁতজাত)।

● **পুরুষ এবং স্ত্রী রেশমমথের মধ্যে পার্থক্য : (Difference between male and female silk moth) :**

| পুরুষ মথ | স্ত্রী মথ |
|---|---|
| 1. আকৃতিতে পুরুষ মথ সমবয়সী স্ত্রী মথ অপেক্ষা ছোটো হয়। | 1. আকৃতিতে স্ত্রী মথ সমবয়সী পুরুষ মথ অপেক্ষা বড়ো হয়। |
| 2. এদের মস্তকে অপেক্ষাকৃত লম্বা অ্যানটেনা থাকে। | 2. এদের মস্তকে অপেক্ষাকৃত ছোটো অ্যানটেনা থাকে। |
| 3. এদের সরু উদরে আটটি খণ্ডক থাকে। | 3. এদের স্ফীত উদরে সাতটি খণ্ডক থাকে। |
| 4. এদের উদরের শেষ প্রান্তে হারপেস (Herpes) হুক থাকে। | 4. এদের স্ফীত উদরের পশ্চাদ্‌ভাগে সংবেদনশীল রোম থাকে। |
| 5. এরা স্বভাবে চঞ্চল প্রকৃতির হয়। | 5. এরা স্বভাবে স্থির প্রকৃতির হয়। |

## ▲ রেশমমথের রোগের নাম, রোগসৃষ্টির কারণ, রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার (Diseases of silkworm, their causes, symptoms and prevention) :

রেশমকীটে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন জীবাণু, যেমন—ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও আদ্যপ্রাণী রেশমকীটের বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। রেশমকীটের উল্লেখযোগ্য রোগগুলির নাম—**কটারোগ বা পেব্রাইন** (Pebrine), **কালশিরা রোগ বা ফ্ল্যাচেরি** (Flacherie), **রসারোগ বা গ্রাসেরি** (Grasserie), **চুনাকাঠি রোগ বা মাস্কারডাইন** (Muscardine), **কোর্ট**
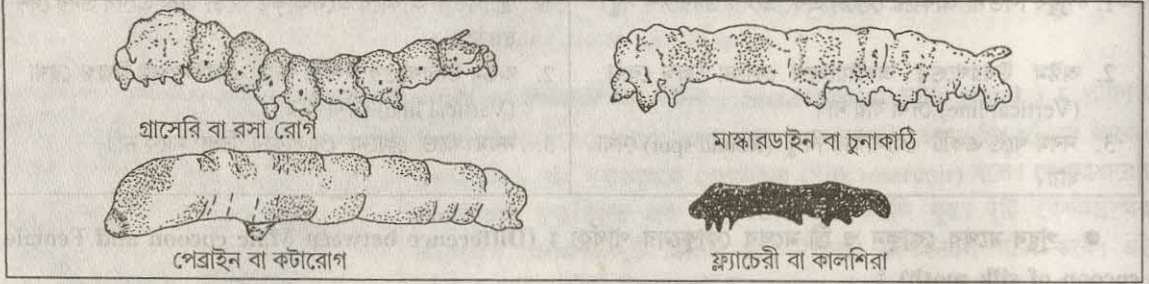
চিত্র 5.29 : বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির ফলে রেশমমথের লার্ভার দেহের বিভিন্ন প্রকার বিকৃতির চিত্ররূপ।

(Court) **রোগ, গ্যাট্টাইন** (Gattine) **রোগ ও উজিমাছি** নামে পেস্ট রেশমকীটের প্রভূত ক্ষতি করে। একটি ছকের মাধ্যমে রেশমকীটের বিভিন্ন রোগের নাম ও রোগের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যবস্থা দেওয়া হল।

| রেশমকীটের রোগ এবং রোগ সৃষ্টির কারণ | রোগের লক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|
| 1. **কটা রোগ বা পেব্রাইন** (Pebrine) : *নোসিমা বোম্বাইসিস (Nosema bombycis)* আদ্যপ্রাণী এই রোগ ঘটায়। | রেশম মথের এই রোগটি অত্যন্ত মারাত্মক। আক্রান্ত স্ত্রী মথের ডানাগুলি কুঞ্চিত হয় এবং এরা স্তূপাকারে ডিম পাড়ে। আদ্যপ্রাণীটির স্পোর স্ত্রী মথের মাধ্যমে পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয়। শূককীটগুলির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এরা খোলস ত্যাগ করে না। | আক্রান্ত স্ত্রী মথ এবং তার ডিম ও পলুগুলিকে বিনষ্ট করতে হয়। আক্রান্ত ডিমগুলি 47°C তাপমাত্রায় গরম করলে ডিমগুলির অভ্যন্তরস্থ আদ্য প্রাণী মারা যায়। |
| 2. **কালশিরা রোগ বা ফ্ল্যাচেরি** (Flacherie) : এটি ব্যাকটেরিয়া (যেমন — *ব্যাসিলাস প্রোডিজিওসাস (Bacillus prodigiosus)*) ঘটিত রোগ। বর্তমানে অনেকের ধারণা যে বিপাকীয় ত্রুটি এবং তুঁত পাতায় শর্করা এবং পটাশের অভাবে এই রোগ হয়। | এই রোগাক্রান্ত শূককীটের পৃষ্ঠদেশ এবং পরে সমগ্রদেহ নরম এবং কালো হয়ে যায়, পরে পচন ঘটে। | পলুকে সুস্থ পাতা খেতে দিতে হবে। সিক্ত ময়লা পাতা বর্জন করা দরকার। পালন ঘরে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা করতে হবে। পালন ঘরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখা দরকার। |
| 3. **রসা রোগ বা গ্রাসেরি** (Grasserie) : এটি বোরেলিনা (*Borrelina*) ভাইরাস ঘটিত রোগ। | এই রোগাক্রান্ত শূককীটের দেহ ফুলে যায়। শূককীট চঞ্চল হয় এবং এদের ত্বক হলুদ বর্ণের হয়। | আক্রান্ত পলুকে পৃথক করা একান্ত দরকার। পলুকে পুষ্ট পাতা খেতে দিতে হবে। পলুর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। |
| 4. **চুনাকাঠি রোগ বা মাস্কারডাইন** (Muscardine) : *বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা (Beauveria bassiana)* নামের ছত্রাক এই রোগের কারণ। | এই রোগাক্রান্ত শূককীটের দেহ শক্ত হয়ে সাদা চুনের কাঠির মতো দেখতে হয়। | 2% ফরমালিনের দ্রবণে পালন ঘর ধোওয়া উচিত। এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাযুক্ত রেশমকীট পালন করতে হবে। আক্রান্ত পলুকে পৃথক করে বিনষ্ট করতে হবে। |

| রেশমকীটের রোগ এবং রোগ সৃষ্টির কারণ | রোগের লক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|
| 5. **কোর্ট** (Court) বা **লালি** (Lali) বা **রাঙ্গি** (Rangi) **রোগ** ঃ এটি এক প্রকার অপুষ্টি জনিত রোগ, তুঁত পাতায় রসের অভাবে এই রোগ হয়। | এই রোগে আক্রান্ত লার্ভা পিউপায় পরিবর্তিত হলেও গুটি তৈরি করতে পারে না। ফলে ছোটো লালচে বা বাদামি বর্ণের পিউপাগুলি নগ্ন অবস্থান থাকে। | পলুকে পুষ্ট তুঁত পাতা খাওয়ানো উচিত। তুঁত গাছে সময়মতো সেচ দেওয়া একান্ত দরকার। |
| 6. **গ্যাটাইন** (Gattine) **রোগ** ঃ বিপাকীয় ত্রুটির ফলে লার্ভা এই রোগে আক্রান্ত হয়। | এই রোগে আক্রান্ত অপরিণত লার্ভার বৃদ্ধি বন্ধ হয়, ফলে এরা রুগ্ন হতে থাকে। এদের দেহ স্বচ্ছ হয়। | আক্রান্ত লার্ভা বা পলুকে পৃথক করা একান্ত দরকার। পালন ঘর সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। |

● **রেশমকীটের পেস্ট ঘটিত ক্ষতির প্রকৃতি ও তার প্রতিকার (Pest related damage of silk moth and their prevention) ঃ**

| রেশমকীটের পেস্টের নাম ও প্রকৃতি | ক্ষতির প্রকৃতি | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|
| **1.** পেস্ট (Pest) ঃ উজিমাছি (Uzi fly- *Trycolyga bombycis* ) সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণী। উজি মাছি | পলুঘরে ঢুকে এই মাছি পলু বা শূককীটের উপর ডিম পাড়ে। ডিম থেকে মাছির শূককীট বের হলে তারা পলুর পেশি খেতে থাকে। এর ফলে লার্ভা বিনষ্ট হয়। | পলুঘরে উজি মাছি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য দরজা-জানালাগুলিতে ঘন বুননের তার জাল লাগানো দরকার। |

## ▲ পশ্চিমবঙ্গে রেশমচাষ (Sericulture in West Bengal) ঃ

দার্জিলিং প্রভৃতি জেলাগুলিতে রেশমমথের চাষ হয়।
পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি জেলাগুলিতে রেশমমথের চাষ হয়। ধাপ দুটি যথাক্রমে তুঁত গাছের চাষ এবং তুঁতজাত রেশমকীটের প্রতিপালন।
রেশমচাষ প্রধানত দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপ দুটি যথাক্রমে তুঁত গাছের চাষ এবং তুঁতজাত রেশমকীটের প্রতিপালন।

1. **তুঁত গাছের চাষ (Cultivation of Mulberry plant)** ঃ রেশমমথের খাদ্য তুঁত গাছের পাতা, সেই কারণে
রেশমমথের চাষের আগে তুঁত গাছের চাষ করা দরকার। কাদা-দোআঁশ মাটি বা বেলে-দোআঁশ মাটি যুক্ত উঁচু জমিতে তুঁত
গাছের চাষ ভাল হয়। তুঁত চাষের জন্য উপযুক্ত বৃষ্টিপাত এবং সেচযুক্ত এলাকার প্রয়োজন।

তুঁতচাষ করার আগে লাঙল করে জমির মাটি তৈরি করা হয়। জমিতে হেক্টর পিছু 10 টন খামারের সার (Farmyard manure), 100 কেজি নাইট্রোজেন-ঘটিত সার, 80 কেজি ফসফরাস-ঘটিত সার এবং 50 কেজি পটাশ-ঘটিত সার প্রয়োগ করা দরকার। এইবার জমিতে তুঁতের শাখা কলমগুলি সারিবদ্ধভাবে বসানো হয়। যদিও তুঁত গাছ বীজ থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু দ্রুত তুঁত চাষ করবার জন্য তুঁত গাছের শাখাকলম বসানো হয়। দুটি তুঁত গাছের সারির মধ্যে $1\frac{1}{2}$ ফুট ফাঁক থাকা দরকার। আশ্বিন, কার্তিক (September-October) মাস তুঁত গাছ রোপনের উপযুক্ত সময়। তবে আষাঢ়-শ্রাবণেও তুঁত গাছ লাগানো হয়। গাছগুলির বয়স 6-9 মাস হলে তার পাতা রেশমকীটের লার্ভাকে দেওয়া হয়। তুঁত খেতে গ্রীষ্মকালে দুবার এবং শীতকালে দুবার সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। তুঁত পাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য বৎসরে তিনবার গাছ ছাঁটাই (Prunning)-এর প্রয়োজন হয়।

○ **তুঁত গাছের রোগ** (Disease of Mulberry plant) —তুঁত গাছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক-ঘটিত রোগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—**রুটরট** (Root-rot), **মাইল্ডিউ** (Mildew), **লিফ স্পট** (Leaf spot) প্রভৃতি ছত্রাক-ঘটিত রোগ তুঁত গাছে দেখা যায়। **সোনিয়া** (Shownia), **চিটিধরা** (Chittidhara), **টুক্‌রা** (Tukra) প্রভৃতি রোগও তুঁত গাছের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। **স্কেল ইনসেক্ট** (Scale insects), **ককচাপার গ্রাবস্‌** (Cockchaper grubs), **জ্যাসিড** (Jasside), **থ্রিপ্‌স** (Thrips) প্রভৃতি ক্ষতিকারক পতঙ্গও তুঁত গাছের ক্ষতি করে। তুঁত খেতে ইঁদুর এবং ছুঁচোর উপদ্রবও দেখা যায়। এরা জমির মধ্যে গর্ত করে তুঁত গাছের শিকড়গুলি কেটে দেয়।

○ **প্রতিকার ব্যবস্থা** (Preventive measure)—0·2% ডাইফোলেটান পাতায় স্প্রে করলে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে তুঁতগাছ রক্ষা পায়। ডাইথেন (Dithane), বোরাডক্স (Boradox) প্রভৃতি কীটনাশক ঔষধ চুন ও গন্ধক মিশ্রণে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করলে পতঙ্গ পেস্টের হাত থেকে তুঁত গাছ রক্ষা পায়।

2. **তুঁতজাত রেশমকীটের প্রতিপালন (Rearing of Mulberry silk worm)** : তুঁতজাত রেশমমথ একচক্রী (Univoltine), দ্বিচক্রী (Bi-voltine) বা বহুচক্রী (Multivoltine) হয়। একচক্রী, দ্বিচক্রী এবং বহুচক্রী রেশমমথ প্রতি বৎসরে যথাক্রমে একবার, দুবার এবং বহুবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। একচক্রী মথের রেশমতন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের হয়। এই প্রকার রেশম-তন্তুর বর্ণ সাদা হয়। বহুচক্রী মথের রেশমতন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের হয়। এই রেশমতন্তুর বর্ণ হলুদ হয়। একচক্রী মথের ডিম ফুটে শূককীট বের হতে 8-10 মাস সময় লাগে কিন্তু বহুচক্রী মথের ডিম থেকে 10-12 দিনের মধ্যে শূককীট বের হয়।

শীতপ্রধান অঞ্চলে একচক্রী রেশমমথের চাষ হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ একচক্রী রেশমমথের চাষ করা হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে বহুচক্রী রেশমমথের চাষ হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশমকীট প্রতিপালন করতে হলে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

(i) উন্নত পরিকল্পনা, (ii) আদর্শ প্রতিপালন গৃহ, (iii) প্রতিপালন গৃহ এবং সরঞ্জামের রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ, (iv) ডিম ফুটানো ব্যবস্থা, (v) প্রত্যক্ষ প্রতিপালন, (vi) পেস্ট এবং রোগ প্রতিরোধ। নীচে পর্যায়গুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

(i) **উন্নত পরিকল্পনা** (Improved planning)—রেশমকীট প্রতিপালনের আগে বিজ্ঞানভিত্তিক একটি সুপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। তুঁত পাতার প্রাপ্তি, রেশমকীট প্রতিপালনের স্থান, গৃহ, দরকারি যন্ত্রপাতি এবং লোকজনের উপর লক্ষ করে এই পরিকল্পনা করা দরকার। সাধারণত এক বিঘা জমিতে 16 ঘড়া রেশমকীট পালন করা যায়। 6′×4′ মাপের ডালা বা ট্রে সমন্বিত 16 টি তাককে এক **ঘড়া** বলা হয়। এই এক ঘড়া জায়গায় 200টি বহুচক্রী ডিম বা 20 gm. দ্বিচক্রী ডিম থেকে নির্গত শূককীট পালন করা যায়। রোগাক্রান্ত রেশম মথের ডিম পালন করা উচিত নয়। তুঁত পাতা সংরক্ষণ, প্রতিপালন, ডালা বা রিয়ারিং ট্রে, রেশমতন্তু গুটানো বা স্পিনিং ট্রে (Spinning tray), ফরমালিন (Formalin), ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) ইত্যাদি ব্যবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ রাখা দরকার।
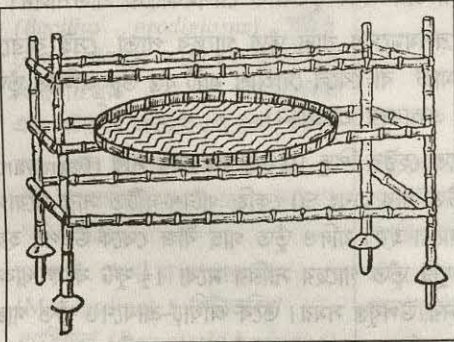
চিত্র 5.30 : সিল্ক মথের লার্ভা পালনের জন্য ডালা।

(ii) **আদর্শ প্রতিপালন গৃহ** (Ideal rearing room)—রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করা দরকার। গৃহটিকে দক্ষিণমুখী হতে হবে এবং এখানে পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা দরকার। গৃহটি 18′×15′ ফুট মাপের করা হয়। এর চারপাশে 6′ ফুট ঢাকা বারান্দা থাকে। ঘরটির দেওয়াল 2′ ফুট পুরু হয়। গৃহটির বেশ উঁচুতে পরপর দুটি ছাদ দেওয়া হয়। গৃহটির জানালাগুলিতে ঘন বুননের জাল লাগানো হয় যাতে করে তার মধ্যে মাছি বা পাখি প্রবেশ করতে না পারে। এই গৃহটির তাপমাত্রা 22°C-27°C-এর মধ্যে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 60%-90%-এর মধ্যে থাকা একান্ত দরকার।

(iii) **প্রতিপালন গৃহ ও সরঞ্জামের রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ** (Disinfection of rearing room and equipments)—প্রতিপালন গৃহটির মেঝে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলিকে একভাগ

4% ফরমালিন এবং 19 ভাগ জলের দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দেওয়া দরকার, তা ছাড়া দরজা জানালা বন্ধ করে ওই দ্রবণকে গৃহের মধ্যে ধূমায়িত করার ব্যবস্থা করলে গৃহটি রোগ জীবাণু মুক্ত হয়।

(iv) **ডিম ফুটানো** (Incubation)—উন্নত মানের রেশম গুটি পেতে হলে 24°C-26°C তাপমাত্রায় এবং 80%-85% আর্দ্রতায় ডিম ফুটানো দরকার। একচক্রী কিংবা দ্বিচক্রী রেশমমথের ডিমকে কয়েক দিন মজুত রাখা যায়। বহুচক্রী রেশমমথের ডিম থেকে 10-12 দিনে লার্ভা বের হয়।

(v) **প্রত্যক্ষ প্রতিপালন** (Direct rearing)—প্রতিপালনের জন্য রেশমলার্ভার বিভিন্ন পর্যায়গুলির জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। রেশমমথের পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভা অপেক্ষাকৃত অধিক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে।

প্রাথমিক অবস্থায় রেশম লার্ভাগুলিকে 25°C তাপমাত্রায় বাঁশের বাখারি নির্মিত গোলাকার বা চৌকোণা **ডালা** বা **ট্রেতে** রাখা হয়। এই সময় রেশম লার্ভাগুলিকে মিহি করে কাটা কচি তুঁত পাতা দৈনিক 6 ঘণ্টা অন্তর চারবার খাওয়ানো হয়। ডালাগুলি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে নজর রাখা একান্ত দরকার। তৃতীয় ইন্‌স্টার লার্ভাকে তুঁত পাতার বড়ো কুচি, চতুর্থ ইন্‌স্টার লার্ভাকে আরও বড়ো কুচি এবং পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভাকে সম্পূর্ণ পাতা দেওয়া যেতে পারে। গুটি তৈরির আগে পরিণত পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভাগুলিকে **চন্দ্রাকী** (চৌকোণা চালুনিতে 5-6 সেন্টিমিটার চওড়া বাঁশের বাখারিকে ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতো গোল করে বাঁধলে চন্দ্রাকী তৈরি হয়) বা খড় নির্মিত মাবুশির উপর স্থানান্তরিত করা হয়। চন্দ্রাকী বা মাবুশির উপর স্থানান্তরিত পরিণত লার্ভাগুলি নিজেদের দেহ থেকে স্পিনারেট যন্ত্রের মাধ্যমে রেশম বের করে গুটি তৈরি করে। সাধারণত একচক্রী বা দ্বিচক্রী **রেশম মথের গুটি 3-4 দিনে এবং বহুচক্রী রেশম মথের গুটি 2-3 দিনে সম্পূর্ণ হয়।**

চিত্র 5.31 : চন্দ্রাকীর মধ্যে রেশমমথের কোকুন গঠন।

**✪ রেশমমথের গুটি থেকে রেশমতন্তুর নিষ্কাশন (Extraction of silk fibres from the cocoon of Silkmoth) :** গরম জলে ফুটিয়ে বা ধূপন পদ্ধতিতে রেশমমথের গুটি থেকে রেশম নিষ্কাশন করা হয়। গরম জলে ফুটালে বা গরম বাষ্প প্রয়োগ করলে গুটির মধ্যে পিউপা মারা যায়। এরপর গরম জলের মধ্যে গুটি গুলিকে রেখে 5-14টি গুটির রেশমতন্তুকে একত্র করে সাবধানে চরকার সাহায্যে গুটানো হয়। গুটানো রেশমতন্তুকে **রিল্‌ড সিল্ক** (Reeled silk) বলা হয়। বেশি সংখ্যক গুটির রেশমতন্তুকে একত্র করে গুটালে তাকে **ডেনিয়ার** বলে। গুটানোর আগে যে রেশমতন্তু পরিত্যক্ত হয় তাকে **চশম** বলা হয়। পরিত্যক্ত রেশম গুটি থেকে প্রাপ্ত রেশমতন্তুকে **স্পান সিল্ক** (Spun silk) বলে। রেশমমথ যদি গুটি কেটে বের হয়ে আসে তবে ওই গুটি থেকে রিল্‌ড সিল্ক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের গুটিগুলিকে **লাটকোয়া** বলে। এই লাটকোয়া থেকে যে রেশমতন্তু সংগ্রহ করা হয় তাকে **মটকা** বলে। একচক্রী রেশমমথের গুটি থেকে অনেক বেশি রেশমতন্তু এবং বহুচক্রী রেশমমথের গুটি থেকে অনেক কম রেশমতন্তু সংগ্রহ করা যায়। একচক্রী রেশমমথের গুটি থেকে সংগৃহীত রেশমতন্তু সাদা রঙের এবং উৎকৃষ্ট মানের হয়।

**● ভারতবর্ষের কয়েকটি রেশমমথের জাত ও উৎপাদিত রেশমের দৈর্ঘ্য (Some races of Indian silk moth and the length of the silk fibre produced by them) :**

| রেশমের জাত | দ্বিচক্রী / বহুচক্রী | কোকুন-প্রতি রেশমতন্তুর দৈর্ঘ্য (মিটার) |
|---|---|---|
| 1. খাঁটি মাইশোর | বহুচক্রী | 411 |
| 2. নিস্তারী | বহুচক্রী | 269 |
| 3. ছোটোপলু | বহুচক্রী | 256 |
| 4. PCN, KA, KB | দ্বিচক্রী | 800-1000 |

➤ **রেশম শিল্প গঠনের সমস্যা (Problem of Silk Industry) ঃ**

(i) উন্নত জাতের তুঁতগাছ ও রেশম বীজের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব।

(ii) তুঁতগাছ ও রেশম কীটের রোগাক্রমণ।

(iii) রেশমমথের প্রজনন কেন্দ্রের অভাব।

(iv) উন্নত রিলিং মেসিন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের অভাব।

(v) রেশম বিক্রির জন্য দেশ-বিদেশে উন্নত ব্যবস্থার অভাব।

(vi) উন্নততর প্রযুক্তির পরিকাঠামো ও প্রয়োগের অভাব।

➤ **ভারতীয় অর্থনীতিতে রেশমচাষের গুরুত্ব ( Importance of Sericulture in Indian economy ) ঃ**

ভারতীয় অর্থনীতিতে রেশমচাষ বা রেশম শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় 22 লক্ষ কিলোগ্রাম (কর্ণাটকে প্রায় 18 লক্ষ কিলোগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 3 লক্ষ কিলোগ্রাম) রেশমতন্তু উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত রেশমতন্তুর মূল্য প্রায় 70 কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে 15 কোটি টাকার মতো রেশমতন্তু এবং রেশমতন্তুজাত পোশাক পরিচ্ছদ বিদেশে রপ্তানি হয়। রেশমচাষ বা রেশমশিল্পের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রায় 50 লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করছে। তা ছাড়া এই কুটির শিল্পের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত হচ্ছে।

➤ **ভারতবর্ষে রেশম উৎপাদন উন্নতি ও বৃদ্ধির উপায় (Methods for Improvement of Silk production in India) ঃ**

রেশমচাষ ভারতবর্ষের এক অর্থকরী শিল্প। এই বেকার সমস্যার দিনে বহু মানুষ এর সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। নিম্নলিখিত উপায়ে রেশমচাষের উন্নতি করা যায়।

1. **তুঁত গাছের চাষ** (Cultivation of Mulberry plants)—তুঁতজাত রেশমমথের পলুকে উৎকৃষ্ট মানের সতেজ তুঁত পাতা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পলু তুঁত পাতা খেয়ে নিজের ওজন 10,000 গুণ বৃদ্ধি করে। দেহের এইরূপ বৃদ্ধির জন্য পলুর ওজনের 30,000 গুণ তুঁত পাতা ভক্ষণ করে। সুতরাং উৎকৃষ্ট মানের এবং নীরোগ তুঁত গাছের চাষ করা একান্ত প্রয়োজন। দোআঁশ মাটি তুঁত গাছের চাষের জন্য প্রয়োজন। চাষযোগ্য পতিত জমিকে দরিদ্র চাষিভাইদের মধ্যে বণ্টনের সুব্যবস্থা করা দরকার। তুঁত চাষের জমিতে সময়মতো প্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা দরকার। চাষিভাইদের মধ্যে সুলভে ব্যাংকঋণ বা কৃষিঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

2. **চাষিভাইদের মধ্যে রেশমমথের ডিম সরবরাহ** (Supply of eggs of silk moth to farmers)—চাষিভাইদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে রেশমমথের উন্নত মানের নীরোগ নিষিক্ত ডিম্বাণু বা ডিম সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

3. **রেশমমথের প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন** (Establishment of breeding centre for silk moth)—রেশমমথের উৎকৃষ্ট মানের ডিম (নিষিক্ত ডিম্বাণু) উৎপাদনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রজননকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এই প্রজনন কেন্দ্রগুলিকে উন্নত বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত করা দরকার।

4. **গবেষণাগার স্থাপন** (Establishment of research centres)—উন্নত সংকর জাতের রেশমমথ উৎপাদনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করা দরকার। উল্লেখ করা যায় ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজ্যে এই ধরনের গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

5. **দ্বিচক্রী রেশম মথের প্রতিপালন** (Rearing of bivoltine silk moth)—রেশম উৎপাদনের দিক থেকে বিচার করলে **বহুচক্রী** (Multivoltine) রেশমমথ থেকে অধিক পরিমাণে রেশমতন্তু উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই ধরনের রেশমতন্তু নিকৃষ্ট মানের। **একচক্রী** (univoltine) রেশমমথ থেকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের রেশম উৎপাদিত হয়। কিন্তু বৎসরে এই ধরনের রেশম উৎপাদন খুবই সামান্য। তাই চাষিভাইদের মধ্যে দ্বিচক্রী রেশমমথের চাষের বৃদ্ধি ঘটানোর প্রেরণা দিতে হবে। দ্বিচক্রী রেশমমথের গুটি থেকে উৎপাদিত রেশমতন্তু বহুচক্রী রেশমমথের রেশমতন্তু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের।

6. **উপজাত পদার্থের বিক্রয়** (Selling of by-products)—রেশম শিল্পে উৎপাদিত কতকগুলি উপজাত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থ উপার্জিত হয়। যেমন অস্ত্রোপচারের পর সেলাইয়ের কার্যে রেশমতন্তু ব্যবহৃত হয়। পিউপা-তৈল এবং

মৃত পলু বা পিউপার দেহকে হাঁস-মুরগি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। রেশম কীটের মল এবং বর্জ্য পদার্থকে জমির সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

7. **খাদ্যে থাইরক্সিনের প্রয়োগ** (Application of thyroxine through food)—থাইরক্সিন হরমোন মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণে পলুর দেহের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এই পলুর রেশমগ্রন্থির আকারও বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের পলু থেকে অধিক পরিমাণে রেশমতন্তু উৎপাদিত হয়। উল্লেখ করা যায় থাইরক্সিন হরমোন প্রয়োগে স্ত্রী রেশমমথের দেহে ডিম্বাণু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

8. **পেস্ট ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা** (Preventive measure for pest and diseases)—নীরোগ এবং সুস্থ রেশমমথ বা পলু উৎপাদনের জন্য তাদের পেস্ট এবং রোগগুলিকে অচিরে ধ্বংস করা একান্ত দরকার। রেশমচাষ একটি জনপ্রিয় ও লাভজনক শিল্প। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর আরও উন্নতিসাধন প্রয়োজন। নিম্নলিখিত গবেষণামূলক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে উন্নততর রেশমচাষ করা যেতে পারে।

➤ **উন্নততর রেশমচাষের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different methods adopted for improved silk worm rearing) :**

1. বেশি পাতা পাওয়া যায় এমন এবং বেশি খাদ্যগুণ সম্পন্ন তুঁত গাছের চাষ করা প্রয়োজন।
2. রেশমন মথের আধুনিক পালন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।
3. নতুন বেশি উৎপাদনকারী জাতের রেশমমথের চাষ আবশ্যক।
4. রোগ প্রতিরোধে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
5. বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)-কে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এটি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারে—

(a) ফাইব্রয়েন জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে রেশমের পরিমান বৃদ্ধি করা যায়।

(b) রোগ প্রতিরোধী জিন প্রয়োগ করে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার কমানো যেতে পারে।

(c) ট্রান্সজেনিক (Transgenic) পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ করে রেশম মথকে বাঁচানো যায়।

(d) DNA প্রোব (Probe) কাজে লাগিয়ে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর DNA-কে চিহ্নিত করা ও বিনাশ করা যেতে পারে।

**● জেনে রাখো ●**

1. **সামাজিক পতঙ্গ কী** (What are social insects)?

● **সামাজিক পতঙ্গ**—যে পতঙ্গ প্রজাতি দলবন্ধ বা উপনিবেশ গঠন করে বসবাস করে এবং প্রত্যেকে শ্রমবন্টন করে একে অন্যের উপকার করে তাদের সামাজিক পতঙ্গ বলে। উদাহরণ—মৌমাছি, পিপঁড়ে, উঁইপোকা, ভীমরুল ইত্যাদি।

2. **মৌমাছির চাক থেকে কি কি পাওয়া যায়** (What products are obtained from bee hive ?)

● মৌমাছির চাক থেকে **মধু ও মৌ-মোম** পাওয়া যায়।

3. **মধু কী ? কীভাবে তৈরি হয় ?**

● (i) **মধু**—মৌচাক থেকে পাওয়া তাজা মধু হল চট্‌চটে, মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ও নিরোধক তরল। এটি 17% জল, 78% শর্করা (ফ্রুকটোজ, গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং ডেক্সট্রিন) খনিজ পদার্থ, Fe, Ca, Na, উৎসেচক এবং 4% অন্যান্য অজানা পদার্থ নিয়ে তৈরি।

(ii) **মধু তৈরির প্রক্রিয়া**—কর্মী মৌমাছি বিভিন্ন ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে। এগুলি তারা নিজেদের খাদ্যনালির ক্রপ বা হানি স্যাক-এ নিয়ে যায়। এখানে উৎসেচকের বিক্রিয়ার ফলে, এগুলি ডেক্সট্রোজ ও ল্যাভূলোজ নামে শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত পদার্থকে কর্মী মৌমাছি মৌচাকের মধু কক্ষে বমি করে। এই বমি করা তরল বস্তুই হল মধু।

4. **মৌ-মোম কী? এটি কীভাবে তৈরি হয়?**

● (i) **মৌ-মোম**—মৌ-মোম (Bee wax) কর্মী মৌমাছি থেকে নিঃসৃত প্রকৃতিজাত পদার্থ। মোম ফ্যাকাশে হলুদ বা হলদে-ধূসর রঙযুক্ত স্নেহপদার্থ। এই পদার্থ জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথারে (স্নেহ দ্রাবকে) দ্রবণীয়।

(ii) **মোমের উৎপাদন**—মৌমাছির বাসা বা মৌচাক মৌমাছির মোম দিয়ে তৈরি। কর্মী মৌমাছির উদরের শেষ চারটি খণ্ডকের অঙ্কীয় দেশে মোমগ্রন্থি (Wax gland) থাকে। ওই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে উদরের অঙ্কীয় দেশে জমা হয়। কর্মী মৌমাছিরা এই জমানো মোমকে মাপ মতো কেটে মৌচাকের কক্ষগুলি তৈরি করে।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. রেশমমথকে কেন অর্থকরী প্রাণী বলা হয় ?**

● রেশমমথের গুটি থেকে রেশমতন্তু তৈরি হয়। এই রেশমতন্তু থেকে বোনা রেশমবস্ত্র ও পোষাক বিক্রি করে মানুষ এবং দেশ অর্থ উপার্জন করে বলে রেশমমথকে অর্থকরী প্রাণী বলে।

**2. (ক) রেশম সুতা বা কোকুন কীভাবে রঙিন হয় ? (খ) কোকুনের স্বাভাবিক রং কী ?**

● (ক) রেশম সুতায় সেরিসিনে অর্থাৎ সুতার আবরণী অংশে ক্যারটিনয়েড ও ফ্ল্যাভোন জাতীয় রঞ্জক কণা থাকার ফলে রেশমের তন্তু বা সুতা রঙিন হয়। এই দুটি রঞ্জক কণা সিল্কমথের লার্ভার রক্তে থাকে এবং এগুলি রক্ত থেকে রেশমগ্রন্থিতে সৃষ্ট সেরিসিন প্রোটিনকে রঞ্জিত করে। সেরিসিন রেশমসূতার বাইরের দিকে থাকে বলে রেশম সূতা রঙিন হয়।
(খ) কোকুনের স্বাভাবিক রং সাধারণতঃ সাদা, হলদে, সোনালি অথবা হাল্‌কা হলদে হয়।

**3. রেশমের রাসায়নিক প্রকৃতি কী ?**

● রেশম সূতা দুইপ্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি একপ্রকার তন্তু। রেশমসূতার কেন্দ্রীয় অক্ষটি ফাইব্রোইন (fibroin) প্রোটিন এবং বাইরের আবরণীটি সেরিসিন (Sericin) প্রোটিন দিয়ে তৈরি। রেশম সূতায় 75 % - 80% ফাইব্রোইন এবং 20 - 25% সেরিসিন থাকে।

**4. রেশম বা সিল্ক্ কী ?**

● রেশমমথের পঞ্চম ইন্‌স্টার লার্ভার রেশমগ্রন্থির থেকে ক্ষরিত তরল পদার্থ স্পিনারেটের মাধ্যমে দেহের বাইরে এসে বাতাসের সংস্পর্শে শুকিয়ে যে সূক্ষ্ম, চকচকে, মসৃণ তন্তু কোকুন বা গুটি তৈরি করে তাকে রেশম বা সিল্ক বলে।

**5. (ক) রেশমগ্রন্থির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। (খ) এই অংশগুলির কাজ কী কী ?**

● (ক) রেশমমথের লাভার দেহগহ্বরে উপস্থিত প্রতিটি রেশমগ্রন্থি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম অংশটিকে **অগ্রাংশ** বলে এবং এটি নলাকৃতি। দ্বিতীয় অংশটিকে **মধ্যাংশ** বলে এবং এটি সবচেয়ে স্ফীত, নলাকার অংশ এবং একে রেশমাধার বলে। তৃতীয় অংশকে **পশ্চাৎঅংশ** বলে এবং এটি সরু ও কুণ্ডলাকৃতি হয়।
(খ) **অগ্রাংশের কাজ** ঃ রেশমগ্রন্থির মধ্যাংশ ও পশ্চাৎঅংশের ক্ষরিত পদার্থ বহন করে লার্ভার মুখে স্পিনারেটে নিয়ে যায়।
**মধ্যাংশের কাজ** ঃ রেশমগ্রন্থির এই অংশ থেকে রেশমতন্তুর সেরিসিন প্রোটিন ক্ষরিত হয়।
**পশ্চাৎঅংশের কাজ** ঃ রেশমগ্রন্থির এই অংশ থেকে রেশমতন্তুর ফাইব্রয়েন প্রোটিন ক্ষরিত হয়।

**6. রেশমের উজ্জ্বল্য কিসের উপর নির্ভরশীল ?**

● রেশমকীটের লার্ভার মুখবিবরের অবস্থিত লায়নেট বা ফিলিপ্পি গ্রন্থির ক্ষরিত পদার্থ রেশমতন্তুকে তৈলাক্ত ও উজ্জ্বল করে।

**7. ভোল্টিনিজম্ কাকে বলে ?**

● রেশমমথের যে ধর্মের ফলে কোনো রেশমমথ বছরে একবার, দু'বার বা বহুবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে তাকে ভোল্টিনিজম বলে।

**8. কোকুন কাকে বলে ?**

● রেশমমথের জীবনচক্রে লার্ভা থেকে পিউপা দশায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় লার্ভার রেশমগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ লার্ভার বাইরে একটি খোলক সৃষ্টি করে এবং লার্ভাটি পিউপাতে পরিণত হয়। পিউপার দেহের বাইরে এই খোলকটিকে কোকুন বলে।

**9. ডায়াপজ কাকে বলে ?**

● যে দশা বা অবস্থার জন্য রেশমমথের ডিমের পরিস্ফুটন হয় না তাকে ডায়াপজ বলে। ডায়াপজকে ডিমের ঘুমন্ত দশা বলে। এই দশার শেষে ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে ফলে ডিম থেকে লার্ভা নির্গত হয়। একচক্রী মথের ডায়াপজ দশা 8–10 মাস থাকে,

ফলে এদের বছরে একবারমাত্র জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। বহুচক্রী মথের ডায়াপজ দশা মাত্র 10–12 দিন, ফলে এই রেশমমথ বছরে 8–10 বার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে।

**10. (ক) মোলটিং (Moulting) কাকে বলে ?**

**(খ) রেশমমথের লার্ভার কয়বার মোলটিং হয় ?**

- (ক) রেশমমথের লার্ভার রূপান্তরের সময় লার্ভা তার দেহের বহিরাবরণে অবস্থিত কিউটিকল্ নির্মিত খোলস পরিত্যাগ করার ঘটনাকে মোলটিং বা খোলস ত্যাগ বলে। পুরনো খোলসের ভিতরে গঠিত নূতন খোলস এরপর লার্ভার দেহ আবৃত করে।

  (খ) রেশমমথ সর্বমোট চারবার খোলস ত্যাগ করে এবং পঞ্চম ইনস্টার বা উপদশায় নীত হয়।

**11. রেশমমথের জীবনচক্রে কী অপুংজনি ঘটে ?**

- রেশমমথের জীবনচক্রে অপুংজনি ঘটে না। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষ ও স্ত্রী রেশমমথ সৃষ্টি হয়।

**12. রেশমমথের লার্ভার কোন্ দেহখণ্ডকের ভিতর রেশমগ্রন্থি অবস্থান করে ?**

- রেশমমথের লার্ভার উদরের 4 – 8 দেহখণ্ডকের ভিতরে রেশমগ্রন্থি অবস্থান করে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :

1. টার্কির বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন কোন্ শাখার অন্তর্গত ?
2. জাপানি কোয়েলের বিজ্ঞানসম্মত নাম কী ?
3. একটি বুনো মুরগির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
4. বেশি ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাতকে কী বলে ?
5. মূলত মাংস জোগানকারী মুরগির জাতকে কী বলে ?
6. দুটি আমেরিকান মুরগি ব্রিডের নাম লেখো।
7. দুটি ইংলিশ মুরগি ব্রিডের নাম লেখো।
8. দুটি ভূমধ্যসাগরীয় মুরগি ব্রিডের নাম লেখো।
9. দুটি ভারতীয় মুরগি ব্রিডের নাম লেখো।
10. যে ব্রিডের মুরগি ডিমে 'তা' দেয় না তাকে কী বলে ?
11. মুরগির সিটার ব্রিডের দুটি উদাহরণ দাও।
12. পুরুষ ও স্ত্রী হাঁসকে কী বলে ?
13. দুটি ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের ব্রিডের নাম লেখো।
14. বাগদা চিংড়ির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
15. একটি মুক্তাঝিনুকের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
16. "মাদার অফ পার্ল" কাকে বলে ?
17. মুক্তার কেন্দ্রে অবস্থিত বহিরাগত বস্তুটিকে কী বলে ?
18. কাকে মুক্তাশিল্পের জনক বলা হয় ?
19. মুক্তাগঠনকারী স্বাদুজলের একটি ঝিনুকের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
20. মৌমাছির কোন্ প্রজাতিকে ভারতীয় মৌমাছি বলে ?
21. মৌচাক থেকে কী পাওয়া যায় ?
22. অনিষিক্ত ডিম থেকে কোন্ জাতের মৌমাছি সৃষ্টি হয় ?
23. শ্রমিক মৌমাছি ফুল থেকে কী সংগ্রহ করে ?
24. কাকে রেশমমথের দেবী বলা হয় ?

25. একটি তুঁত গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
26. রেশম তন্তুর বহিরাবরনে কোন্ প্রোটিন থাকে ?
27. সিল্কের প্রাকৃতিক বর্ণ কোন্ প্রোটিনের জন্য ঘটে ?
28. তসর মথের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
29. রেশমমথের ডিম কোন্ অবস্থায় থাকলে ডিমের পরিস্ফুটন অনেক পরে হয় ?
30. সিল্কমথের লার্ভার সিল্কবুননন যন্ত্রকে কী বলে ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick mark (✓) on correct answer) ঃ**

1. একটি দেশি মুরগি বছরে প্রায় 100টি □ / 200টি □ / 60টি □ / 250টি □ ডিম পাড়ে।
2. একটি সংকর জাতের মুরগি বছরে প্রায় 50টি □ / 100টি □ / 150টি □ / 260টি □ ডিম পাড়ে।
3. মুরগির একটি আমেরিকার ব্রিডের নাম হল—প্লাইমাউথ রক □ / সাসেক্স □ / ব্রামা □ / আসীল □।
4. ডিমে তা দেয় না এমন একটি মুরগি ব্রিডের নাম হল—ব্রামা □ / আসীল □ / অস্ট্রালপ □ / মিনর্কা □।
5. হাঁসের মাংস উৎপাদনকারী একটি ব্রিডের নাম হল—বালি □ / রানার □ / মাসকোভী □ / ম্যালার্ড □।
6. বাগদা চিংড়ির অন্য নামটি হল—হন্যে চিংড়ি □ / চাপড়া চিংড়ি □ / বাঘ চিংড়ি □ / চামনে চিংড়ি □।
7. অস্ট্রালপ এক প্রকার আমেরিকার ব্রিড □ / ইংলিশ ব্রিড □ / এশিয়ার ব্রিড □ / ভূমধ্যসাগরীয় ব্রিড □।
8. একটি ভারতীয় মুরগি ব্রিডের নাম হল—সাসেক্স □ / লেগহর্ণ □ / মিনর্কা □ / ঘঘাস □।
9. পুরুষ মৌমাছির ক্রোমোজোম সংখ্যা—ডিপ্লয়েড □ / হ্যাপ্লয়েড □ / ট্রিপ্লয়েড □ / টেট্রাপ্লয়েড □।
10. বক্সের মধ্যে পালক করা যায় এমন মৌমাছির প্রজাতি হল—*Apis dorsata* □ / *A indica* □ / *A florea* □ / *A mellifica* □।
11. তসর রেশমমথের পোষক উদ্ভিদ হল—তুঁত গাছ □ / মোম গাছ □ / রেড়ি গাছ □ / অর্জুন গাছ □।
12. রেশম মথের ডায়াপজহীন ডিম থেকে লার্ভা নির্গমনের সময় হল—10-12 দিন □ / 6-8 মাস □ / 10-12 মাস □ / 8-10 মাস □।
13. সবুজ রেশমতন্তুতে উপস্থিত রঞ্জক পদার্থের নাম—জ্যান্থোফিল □ / ক্যারোটিন □ / ফ্লাভোনয়েড □ / মেলানিন □।
14. হেরন্ডের গ্রন্থি পাওয়া যায়—পুরুষ পিউপায় □ / স্ত্রী পিউপায় □ / পুরুষ লার্ভায় □ / স্ত্রী লার্ভায় □।
15. সিল্ক মথের রসা রোগের কারণ হল—আদ্যপ্রাণী □ / ছত্রাক □ / ভাইরাস □ / ব্যাকটেরিয়া □।

**C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) ঃ**

1. হাঁস, মুরগি প্রতিপালন পদ্ধতিকে ——— বলে।
2. বেশি ডিম উৎপাদনকারী মুরগির ব্রিডকে ——— বলে।
3. বেশি মাংস উৎপাদনকারী মুরগির ব্রিডকে ——— বলে।
4. ডিম ও মাংস উভয়ই বেশি উৎপাদনকারী মুরগির ব্রিডকে ——— বলে।
5. হাঁসের একটি সৌখিন ব্রিডের নাম হল ——— ।
6. একটি ননপিনিড চিংড়ির উদাহরণ হল ——— ।
7. বাগদা চিংড়িকে অন্য কথায় ——— বলে।
8. মুক্তার কেন্দ্রে অবস্থিত বহিরাগত বস্তুটিকে ——— বলে।
9. ন্যাকার গ্রন্থি মুক্তাঝিনুকের ——— এ অবস্থিত।
10. শ্রমিক মৌমাছি ফুল থেকে ——— সংগ্রহ করে মৌচাকে জমায়।
11. বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছিকে ——— বলে।
12. রেশম মথের লার্ভা সর্বমোট ——— বার খোলস বদলায়।
13. রেশমমথের লার্ভার রেশম বুনন যন্ত্রটির নাম ———।
14. অরপিংটন একপ্রকার ——— ব্রিড।
15. একটি আদর্শ মৌকলোনিতে রাণীর সংখ্যা হল ———।
16. হেরন্ডের বাড ——— লার্ভায় থাকে।
17. মৌমাছি একপ্রকার ——— পতঙ্গ।
18. ইসিওটার গ্রন্থি ——— লার্ভায় দেখা যায়।
19. পেব্রাইন ——— ঘটিত রোগ।
20. চুনাকাঠি ——— ঘটিত রোগ।

**D. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) ঃ**

1. গ্যালাস গ্যালাস হল একপ্রকার লেইং ব্রিড। □
2. নিউ হ্যাম্পশায়ার হল একটি আমেরিকান ব্রিড। □
3. ভূমধ্যসাগরীয় একটি ব্রিড হল লেগহর্ণ। □
4. সিটার ব্রিড ডিমে তা দেয় না। □
5. রোড আইল্যান্ড রেড হল একপ্রকার ডুয়াল ব্রিড। □
6. বেশি ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের ব্রিড হল ভারতীয় রানার। □

7. বাগদা চিংড়ি একপ্রকার ননপিনিড চিংড়ি।
8. গলদা চিংড়িকে বাঘ চিংড়ি বলে।
9. মুক্তাঝিনুকের ন্যাকার গ্রন্থি খোলকের মধ্যে থাকে।
10. এপিস ইন্ডিকা একসঙ্গে 8-10টি সমান্তরাল মৌচাক গঠন করে।
11. মৌমাছি একপ্রকার সামাজিক প্রাণী।
12. নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়।
13. হলদে রেশমতন্তুতে ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক থাকে।
14. মুগা রেশমমথের লার্ভা তুঁত গাছের পাতা খায়।
15. শীতঘুম ডিম একচক্রী রেশমমথে দেখা যায়।
16. হেরল্ডের গ্রন্থি রেশমমথের স্ত্রী লার্ভায় থাকে।
17. ভাইরাসের আক্রমনে রেশমমথের পেব্রাইন রোগ হয়।
18. একটি মৌচাকে তিনটি রানি মৌমাছি থাকে।
19. মকরন্দ ও মধু একই বস্তুর দুটি নাম।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. টার্কি ও জাপানি কোয়েল পাখির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
2. মাংস উৎপাদনকারী ও ডিম উৎপাদনকারী মুরগিকে কী বলে ?
3. মুক্তা ঝিনুকের দুটি বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
4. একটি মৌচাকে ক'টি রানি, শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি থাকে ?
5. রাজকীয় জেলি শ্রমিক মৌমাছির কোন্ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এর কাজ কী ?
6. বিভিন্ন প্রকার তুঁত গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
7. রেশমমথের লার্ভার মুখে বুনন যন্ত্রের নাম লেখো। এর কাজ কী ?
8. পোলট্রি কাকে বলে ?
9. পিনিড ও ননপিনিড চিংড়ির একটি পার্থক্য লেখো।
10. পুরুষ মৌমাছির কাজ কী লেখো।
11. রাণী মৌমাছির কাজ কী লেখো।
12. পুরুষ মৌমাছি কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
13. রাণী মৌমাছি কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
14. ডায়াপজ কী ?
15. ভোল্টিনিজম কাকে বলে ?
16. মুক্তা কাকে বলে ?
17. রেশম কাকে বলে ?
18. টেবিল ব্রিড বলতে কী বোঝো ? উদাহরণ দাও।
19. সিটার ও ননসিটার ব্রিডের পার্থক্য লেখো।
20. গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
21. কালশিরা রোগের লক্ষণগুলি লেখো।
22. চুনাকাঠি রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Give answer to the following questions) :

1. অর্থকরী প্রাণীবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।
2. বিভিন্ন প্রকার পোলট্রি পাখির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।
3. বাগদা চিংড়িকে টাইগার প্রণ (Tiger prawn) বলে কেন ?
4. মুক্তা কীভাবে তৈরি হয় ?
5. ভারতীয় মৌমাছির (*Apis indica*) বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
6. শ্রমিক মৌমাছির কাজগুলি লিপিবদ্ধ করো।
7. মকরন্দ ও মধুর বিভিন্ন উপাদানের নাম লেখো।
8. রেশম কীভাবে তৈরি হয়।
9. রেশমমথের চুনাকাটি রোগ সৃষ্টিকারি জীবাণুর নাম ও এই রোগের লক্ষণগুলি বর্ণনা করো।
10. ডিপলিটার পদ্ধতি কাকে বলে ?
11. মুরগির ভারতীয় ব্রিডগুলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
12. প্লাইমাউথ রক ও মিনর্কা ব্রিডগুলির বৈশিষ্ট্য লেখো।
13. নিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির চাষ কীভাবে হয় ?
14. মুক্তা কীভাবে তৈরি হয় ?
15. শ্রমিক মৌমাছির কাজ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
16. একটি মৌচাকে শ্রমিক, রাণি ও পুরুষ মৌমাছি কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
17. মকরন্দ ও মধুর বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমান লেখো।
18. বিভিন্ন রেশমমথের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো এবং প্রত্যেকের একটি করে পোষক উদ্ভিদের নাম লেখো।
19. ফ্ল্যাচেরি ও গ্রাসেরি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা লেখো।
20. রেশমগুটি থেকে রেশমতন্তু নিষ্কাশন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

### B. টিকা লেখো (Write short notes) ঃ

1. পোলট্রি, 2. বুনো মুরগির ব্রিড, 3. ডিপ লিটার পদ্ধতি, 4. চিংড়ির প্রণোদিত প্রজনন, 5. রেশম তন্তুর রঞ্জক পদার্থ, 6. ডায়াপজ, 7. রেশম গ্রন্থি, 8. ভূমধ্যসাগরীয় পোলট্রি ব্রিড, 9. অধিক উৎপাদনকারী পোলট্রি ব্রিড, 10. সামাজিক পতঙ্গরূপে মৌমাছি।

### C. নিম্নলিখিতগুলির পার্থক্য লেখো (Distinguish between the followings) ঃ

1. লেয়ার ও ব্রয়লার ব্রিড, 2. সিটার ও ননসিটার ব্রিড, 3. শ্রমিক ও রানি মৌমাছি, 4. সেরিসিন ও ফাইব্রয়েন, 5. তসর ও মুগা রেশম, 6. শীতঘুম ডিম ও সাধারণ ডিম, 7. রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী লার্ভা, 8. রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী পিউপা, 9. পুরুষ ও স্ত্রী রেশম মথ, 10. পেব্রাইন ও মাস্কারডাইন।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) ঃ

1. পোলট্রি বলতে কী বোঝো ? পোলট্রি মুরগির বিভিন্ন ব্রিডগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করো। অধিক উৎপাদনকারী পোলট্রি ব্রিডগুলির নাম লেখো।
2. বাগদা চিংড়িচাষ সম্বন্ধে যা জান লেখো।
3. বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি সম্বন্ধে যা জান লেখো।
4. একটি মৌচাকের বিভিন্ন জাতের মৌমাছি সম্বন্ধে যা জান লেখো।
5. বিভিন্ন প্রকার রেশম মথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। তুঁতজাত রেশমমথের জীবনচক্র সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
6. কীভাবে মকরন্দ থেকে মধু তৈরি হয় ? মধুর উপযোগিতা কী ?
7. ভাসাবাধা ভেড়িতে চিংড়ির চাষ কীভাবে হয় তার বিবরণ দাও।
8. কৃত্রিম উপায়ে মুক্তাচাষ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
9. ভারতবর্ষে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়গুলি বর্ণনা করো।
10. তুঁতজাত রেশমমথের প্রতিপালন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

### B. নিম্নলিখিতগুলির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো (Draw the lebel diagram of the following) ঃ

1. একটি রেশম মথের লার্ভার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো এবং রেশমগ্রন্থির অবস্থান উল্লেখ করো।
2. রেশমমথের জীবনচক্রের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।
3. রেশমমথের পুরুষ ও স্ত্রী লার্ভার পশ্চাৎদেশের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো এবং পুরুষ ও স্ত্রী পিউপার চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো।
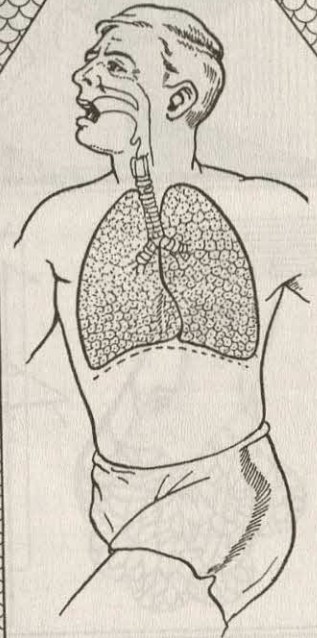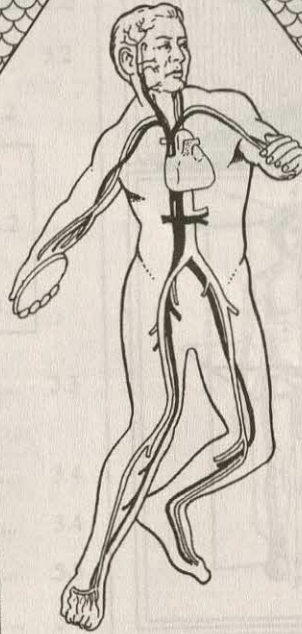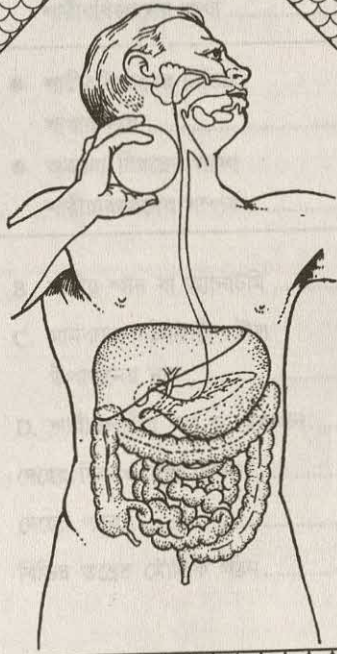
শারীরবিদ্যা
PHYSIOLOGY

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# অবতরণিকা
# [ INTRODUCTION ]

## ভূমিকা (Introduction) ঃ

শারীরবিজ্ঞান বা শারীরবৃত্ত বা ফিজিওলোজি (Physiology) কথাটি দুটি গ্রিক শব্দ *Physis* (ফাইসিস = প্রকৃতি) এবং *Logos* (*লোগস* = জ্ঞান) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক শব্দের সমার্থক ল্যাটিন শব্দ *ফিজিওলোজিয়া* (*Physiologia*) থেকে এসেছে ফিজিওলজি। ফরাসি চিকিৎসক **জাঁ ফ্রান্সিস্ ফারনেল** 1552 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। মানুষের দেহের মূল অংশ হল কঙ্কাল যার ওপর পেশি স্থাপিত হয়ে দেহের কাঠামো এবং বিশেষ আকার সৃষ্টি করে। আবার এই পেশির উপর ত্বক আচ্ছাদিত থেকে দেহের আবরণ বা বহিরাবরণ গঠন করে। সারা দেহের পেশির মধ্যে স্নায়ু এবং রক্তবাহের উপস্থিতি থাকে। কঙ্কাল তন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ বা যন্ত্র থাকে। একে আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ বলে। এই সব আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় তন্ত্র যা দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

ব্যবহারিক গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে মানুষের শারীরবিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা যায়। শারীরবিজ্ঞানের গণ্ডি তাই সুদূরপ্রসারী। ডাক্তার শল্যচিকিৎসক ইত্যাদি চিকিৎসকদের সর্বপ্রথম শারীরস্থান এবং এর পর শারীরবিজ্ঞান ভালোভাবে জানতে হয়, এর মূল কারণ দেহের অসুস্থ অবস্থা বা রোগব্যাধিকে সনাক্ত করার জন্য। অপরপক্ষে, শারীরবিজ্ঞান শ্রম, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ক্ষেতখামারে শ্রমবন্টন, শ্রম প্রয়োগবিদ্যা, পরিবেশ দূষণের প্রভাব প্রভৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠনপাঠনের মধ্যে সীমিত না থেকে **মৌলবিজ্ঞান** হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## ▲ A. শারীরবৃত্ত বা শারীরবিজ্ঞান (Physiology) ঃ

❖ **সংজ্ঞা (Definition) :** সুস্থ অবস্থায় জীবদেহের কোশ, কলা, অঙ্গ, তন্ত্র প্রভৃতির স্বাভাবিক গঠন ও তাদের যাবতীয় স্বাভাবিক জৈব ক্রিয়াকলাপ যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে শারীরবৃত্ত বা শারীরবিজ্ঞান (Physiology) বলে।

### শারীরবিজ্ঞানের শাখা (Branches of Physiology)

মানবিক শারীরবিজ্ঞান ছাড়াও ভাইরাস (একাধারে সজীব ও নির্জীব), ব্যাকটেরিয়া, একক কোশ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরিক কার্যকলাপকে বিস্তৃতভাবে জানার জন্য শারীরবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে।

**● শারীরবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নাম (Name of different branches of Physiology) ●**

| | |
|---|---|
| 1. ভাইরাস-সম্পর্কীয় শারীরবিজ্ঞান (Viral Physiology) | 4. উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান (Plant Physiology) |
| 2. ব্যাকটেরিয়া-বিষয়ক শারীরবিজ্ঞান (Bacterial Physiology) | 5. প্রাণী শারীরবিজ্ঞান (Animal Physiology) |
| 3. কোশভিত্তিক শারীরবিজ্ঞান (Cell Physiology) | 6. মানবিক শারীরবিজ্ঞান (Human Physiology) |

○ **ব্যবহারিক গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে মানুষের শারীরবিজ্ঞানকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যায়, যেমন—**

1. শ্রম শারীরবিজ্ঞান (Work Physiology)
2. ক্রীড়া শারীরবিজ্ঞান (Sports Physiology)
3. পুষ্টিবিষয়ক শারীরবিজ্ঞান (Nutritional Physiology)
4. স্নায়ুশারীরবিজ্ঞান (Neurophysiology)
5. স্নায়ুপেশি শারীরবিজ্ঞান (Nerve Muscle Physiology)
6. প্রজনন শারীরবিজ্ঞান (Reproductive Physiology)
7. পরিবেশীয় শারীরবিজ্ঞান (Environmental Physiology)
8. সামাজিক শারীরবিজ্ঞান (Social Physiology)

● **অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation of Physiolgy with other subject) ঃ**

শারীরবিজ্ঞান কোনো কোনো বিজ্ঞানশাখার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞান বিষয়ের সূত্রাদির প্রয়োগ ছাড়া শারীরবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না, যেমন—**পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, তাপগতিবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান** প্রভৃতির সূত্রগুলির প্রয়োগ শারীরবিজ্ঞানকে ভালোভাবে জানা ও বোঝার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিশেষত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের সম্পর্ক এমন একটি ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, **প্রাণপদার্থবিদ্যা** (Biophysics) ও **প্রাণরসায়ন** (Biochemistry) নামে বিজ্ঞানের দুটো শাখার উদ্ভব হয়েছে। একইভাবে **শারীরস্থান** (Anatomy), **কলাবিদ্যা** (Histology), **কোশবিদ্যা** (Cytology), **ভ্রূণবিদ্যা** (Embryology), **সাধারণ জীববিদ্যা** (Biology) প্রভৃতি বিষয় শারীরবিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত, কারণ শারীরস্থানিক, কলাস্থানিক ও আণুবীক্ষণিক বা পরমাণুবীক্ষণিক গঠনের ধারণা ব্যতিরেকে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নয়। মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও পরিণত শিশুতে রূপান্তর বিবর্তনবাদের সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটায়। বংশবিদ্যার সঙ্গেও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির সম্পর্ক সুনিবিড়। শারীরবিজ্ঞানের সঙ্গে যেসব বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে বা গড়ে উঠেছে সেগুলি পরের পাতায় বক্সের মধ্যে দেওয়া হল ঃ

▼ শারীরবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক ▼

| | |
|---|---|
| 1. শারীরস্থান (Anatomy) | 9. ভৌত নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) |
| 2. কলাবিদ্যা (Histology) | 10. প্রাণপদার্থবিদ্যা (Biophysics) |
| 3. কোশবিদ্যা (Cytology) | 11. প্রাণরসায়ন (Biochemistry) |
| 4. ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) | 12. তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) |
| 5. অণুজীববিদ্যা (Molecular Biology) | 13. জৈবযন্ত্রবিদ্যা (Bioengineering) |
| 6. জীবাণুবিদ্যা (Microbiology) | 14. জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা (Biotechnology) |
| 7. অনাক্রম্যতা (Immunity) | 15. জৈব পরিসংখ্যান (Biostatistics) |
| 8. বিবর্তনবাদ (Evolution) | 16. জৈব গণিতবিদ্যা (Biomathematics) |

মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ সুষ্ঠুভাবে জানতে হলে শরীরের অন্তর্গঠন জানা একান্ত প্রয়োজন।

## ▲ B. শারীরস্থান বা অ্যানাটমি (Anatomy) ঃ

(Anatomy গ্রিক শব্দ, *Ana* = above—ওপরে; *temno* = to cut—কাটা)।

❖ (a) **শারীর স্থানের সংজ্ঞা (Definition of Anatomy) ঃ যেসব পদ্ধতিতে শরীরের ব্যবচ্ছেদ করে দেহের গঠন এবং বিভিন্ন অংশের একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাকে শারীরস্থান বলে।**

(b) **মানবদেহে মূল কাঠামো (Basic plan of Human body) ঃ** অস্থি, তরুণাস্থি ও অস্থিসন্ধি, ত্বক বা চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে নির্মিত অন্তর্কঙ্কাল মানুষের দেহের মূলকাঠামো। এর উপর পেশি সংস্থাপিত হয়ে মানুষের দেহের নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখে। অন্তর্কঙ্কাল তন্ত্রের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক এবং আন্তর যন্ত্রিয় অঙ্গ, যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পৌষ্টিকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্রের অঙ্গাগুলি সুরক্ষিত থাকে। দেহের প্রতিটি অংশের মধ্যে রক্তবাহ, লসিকাবাহ, স্নায়ু ইত্যাদি থাকে। সাধারণভাবে বলতে হলে মানব দেহের মূল কাঠামো হল—অস্থি, তরুণাস্থি ও অস্থি সন্ধি নিয়ে গঠিত কঙ্কালতন্ত্র, পেশিতন্ত্র ও ত্বকীয় তন্ত্র। এদের ভালোভাবে জানতে হলে দেহকে ব্যবচ্ছেদ করা একান্ত প্রয়োজন। একে শারীরস্থান বা অ্যানাটমি বলে।

**চিত্র 1 ঃ** মানুষের কঙ্কালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থি।

(c) **শারীর স্থানের প্রকারভেদ (Types) ঃ** মানব-শারীরস্থানকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(1) তন্ত্রসম্বন্ধীয় শারীরস্থান এবং (2) আঞ্চলিক শারীরস্থান।

● 1. **তন্ত্রসম্বন্ধীয় শারীরস্থান (Systematic anatomy) ঃ** সম্পূর্ণ দেহের বিষয় চিন্তা করে এক একটি তন্ত্র (System), যেমন—ধমনিতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রের পূর্ণ বর্ণনাকে **তন্ত্রসম্বন্ধীয় শারীরস্থান** বলে। কাজ অনুসারে দেহের বিভিন্ন তন্ত্র নিম্নলিখিত প্রকারের হয়।

(i) **ত্বকীয় তন্ত্র** (Integumentary system)—ত্বক, নখ, চুল বা কেশ নিয়ে গঠিত।

(ii) **চলন ও গমন তন্ত্র** (Locomotory system)—দেহের অস্থি, লিগামেন্ট ও টেন্ডন, অস্থি সন্ধি, পেশি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত তন্ত্র।

(iii) **আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ তন্ত্র** (Visceral system)—দেহের বিভিন্ন গহ্বরে যেমন—বক্ষ গহ্বর, উদর গহ্বর ও শ্রোণিগহ্বরে অবস্থিত বিভিন্ন রকমের আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গাসমূহ নিয়ে গঠিত তন্ত্র। দেহে কয়েকটি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গগুলি হল—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, অন্ত্র, প্লিহা, বৃক্ক, গবিনী, মূত্রাশয়, মূত্রনালি ইত্যাদি।
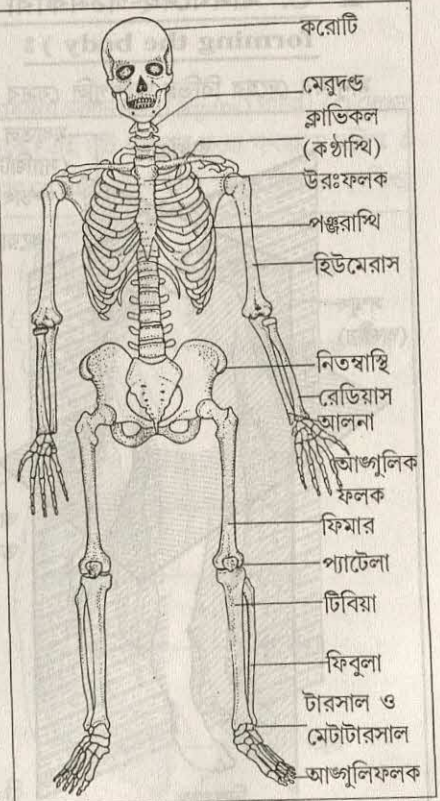
(iv) **রক্ত সংবহন তন্ত্র** (Blood circulatory system)—রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তবাহ (নালি) নিয়ে গঠিত।

(v) **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system)—মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, স্নায়ু ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

(vi) **রেচনতন্ত্র** (Excretory system)—বৃক্ক, গবিনী, মূত্রথলি বা মূত্রাশয় ও মূত্রনালি নিয়ে দেহের প্রধান রেচনতন্ত্র গঠিত হয়।

● 2. **আঞ্চলিক শারীরস্থান (Regional anatomy)** ঃ এক একটি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ, যেমন—হাত, পা, বুক ইত্যাদির বর্ণনাকে **আঞ্চলিক শারীরস্থান** বলে। বিজ্ঞানের এই শাখায় দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিভিন্ন তন্ত্রের অবস্থান, গঠন, কার্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। আঞ্চলিক শারীরস্থান অনুযায়ী মানুষের দেহকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যেমন—মস্তক এবং গ্রীবা, ধড় বা দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপাঙ্গ।

(i) **মস্তক এবং গ্রীবা** (The Head and Neck)—এই দুটি অংশ মাথার খুলির মধ্যে থাকে বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র অঙ্গসমূহ ও বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয় (Special sense organs)। গ্রীবা দেহের সংযুক্তকারী ছোটো অংশ যা মস্তককে দেহকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

(ii) **ধড় বা দেহকাণ্ড** (The Trunk)—দেহের এই অংশটি বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ। দেহকাণ্ডের মধ্যে প্রায় সব আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গগুলি থাকে। **মধ্যচ্ছদা** নামে প্রধানত অনৈচ্ছিক পেশি নির্মিত পর্দা দেহকাণ্ডকে দুটি অংশে বিভক্ত করে, যেমন—ঊর্ধ্বাংশ **বক্ষ** (Chest) এবং নিম্নাংশ **উদর** (Abdomen) এবং উদরের নীচের অংশ **শ্রোণি অঞ্চল** (Pelvic region)।

(iii) **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপাঙ্গ** (The Limbs)—মানুষের দু'জোড়া অঙ্গ। যেমন—ঊর্ধ্বাঙ্গ (Upper limb) এবং নিম্নাঙ্গ (Lower limb) থাকে। **ঊর্ধ্বাঙ্গ**—প্রতিটি ঊর্ধ্বাঙ্গ বাহু (Arm), পুরোবাহু (Fore arm) ও করতল (Palm) নিয়ে গঠিত। **নিম্নাঙ্গ**—প্রতিটি নিম্নাঙ্গ উরুদেশ (Thigh), জঙ্ঘা (Leg) এবং পদতল (Foot) নিয়ে গঠিত।

## ▲ C. মানবদেহ-গঠনকারী মৌল উপাদানের নাম ( Name of the main elements forming the body ) ঃ

মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেসব মৌল উপাদান দিয়ে গঠিত হয়, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল হল ঃ কার্বন—18%, হাইড্রোজেন—10%, অক্সিজেন—65%, নাইট্রোজেন—3%, সালফার—0·25%, ফসফরাস 1%, ক্যালশিয়াম— 1·25%, সোডিয়াম—0·15%, পটাশিয়াম—0·35%, ম্যাগনেসিয়াম—0·05%, লৌহ—0·004% ইত্যাদি।
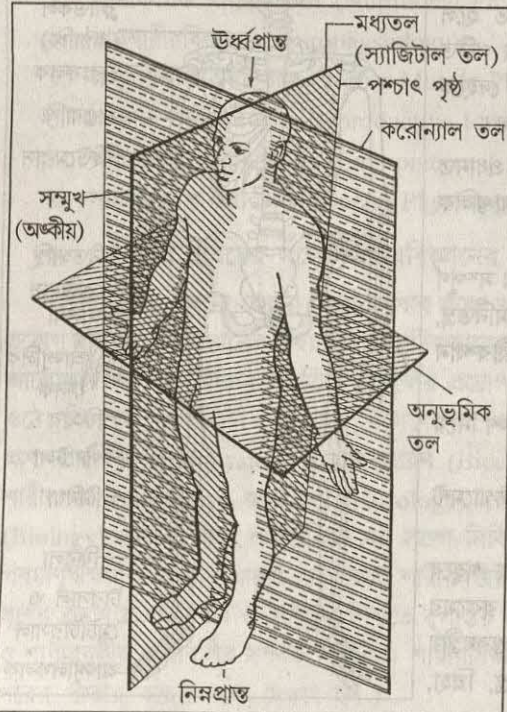
এছাড়াও দেহে অন্যান্য মৌল যেমন—ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, মলিবডিনাম, ক্লোরিন, ফ্লুওরিন, আয়োডিন ইত্যাদি স্বল্প পরিমাণে থাকে।

চিত্র 2 ঃ মানবদেহের বিভিন্ন তল।

## ▲ D. শারীরস্থানীয় তল ও অবস্থান (Anatomical planes and position) ঃ

একজন মানুষ তার মাথা, চোখের দৃষ্টি ও দেহকে সামনের দিকে রেখে নাককে দেহের মধ্যরেখায় স্থাপন করে হাত দুটি দেহের দু'পাশে সোজাভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় ও হাতের চেটোকে সামনের দিকে খোলা রেখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে মানুষের **'শারীরস্থানীয় অবস্থান'** বলে। এই অবস্থায় দেহকে কতকগুলি কাল্পনিক **রেখা বা তল** (Planes) দিয়ে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় (চিত্র 1.1), যেমন—

(i) **মিডিয়ান্ বা স্যাজিটাল তল (Median or Sagittal plane)**—এটি উল্লম্ব তল যা শরীরের মধ্যরেখা বরাবর গিয়ে দেহকে দুটি অর্ধাংশে অর্থাৎ ডান অংশ ও বাম অংশে বিভক্ত করে।

(ii) **করোন্যাল তল (Coronal plane)**—এটি মিডিয়ান্ তলের সমকোণী উল্লম্ব তল। করোটিস্থ ফ্রন্টাল ও প্যারাইটাল অস্থির সংযোগস্থানের মাঝ বরাবর এই তল গিয়ে মানুষের শরীরকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশে ভাগ করে।

(iii) **অনুভূমিক বা অনুপ্রস্থ তল (Transverse or Horizontal plane)**—এই তল নাভির মধ্য দিয়ে যায় এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্নাংশে ভাগ করে।

## ▲ দেহের দিক ও মুখ্য বিভাগ (Directions and Main divisions of the body) ঃ

(a) দেহের উপরিভাগ থেকে বিবেচনা করলে যা দেহের উপরিভাগের নিকটবর্তী থাকে তাকে **উপরিগত** (Superficial) এবং দূরবর্তী অংশগুলিকে **গভীর** (Deeper) অঙ্গ বলা হয়। শরীরের সম্মুখভাগের যন্ত্রগুলিকে **অগ্র** (Anterior) বা **অঙ্কীয়** (Ventral) এবং পশ্চাৎভাগের যন্ত্রগুলিকে **পশ্চাৎ** বা **পৃষ্ঠীয়** (Posterior or Dorsal) যন্ত্র বলা হয়।

(b) মানুষের দেহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—**মস্তক** (Head), ধড় বা **মধ্যশরীর** (Trunk) ও **অঙ্গ** (Limbs)। করোটি (Skull) এবং মুখমণ্ডল (Face) নিয়ে **মাথা** বা **মস্তক** গঠিত। করোটির মধ্যে মস্তিষ্ক (Brain) সুরক্ষিত থাকে ও মুখমণ্ডলে নাক, জিভ, কান, চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি থাকে। মস্তক গ্রীবা দিয়ে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ধড় মানুষের দেহের সবথেকে বড়ো অংশ যাকে **মধ্যচ্ছদা** নামে অনৈচ্ছিক পেশি ও কণ্ডরা দিয়ে তৈরি গম্বুজাকৃতি পর্দা দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। উপরের অংশটিকে **বুক বা বক্ষ** (Thorax) এবং নীচের অংশটিকে **পেট বা উদর** (Abdomen) বলে। উদরের নীচের অংশকে **শ্রোণি অঞ্চল** (Pelvic region) বলে।

একজোড়া **ঊর্ধ্বাঙ্গ** ও একজোড়া **নিম্নাঙ্গ** নিয়ে মানুষের **উপাঙ্গ** গঠিত। প্রতিটি ঊর্ধ্বাঙ্গ উপরিবাহু, পুরোবাহু ও করতল এবং প্রতিটি নিম্নাঙ্গ উরু, জঙ্ঘা, পা বা পদতল নিয়ে গঠিত।

## ▲ দেহের গহ্বর (Cavities of the body) ঃ

মানুষের দেহের গঠন নিরেট নয়। এটি গহ্বরযুক্ত যার মধ্যে দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গাসমূহ (Organs) থাকে। (a) দেহের পৃষ্ঠদেশে **করোটি গহ্বর** (Cranial cavity) ও **সুষুম্না গহ্বর** (Spinal cavity) থাকে। এই দুটি গহ্বরের মধ্যে যথাক্রমে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থাকে। (b) দেহের অঙ্কীয় দেশে মধ্যচ্ছদার উপরে **বক্ষগহ্বর** (Thoracic cavity) থাকে। এই গহ্বরে প্রধানত হৃৎপিণ্ড,
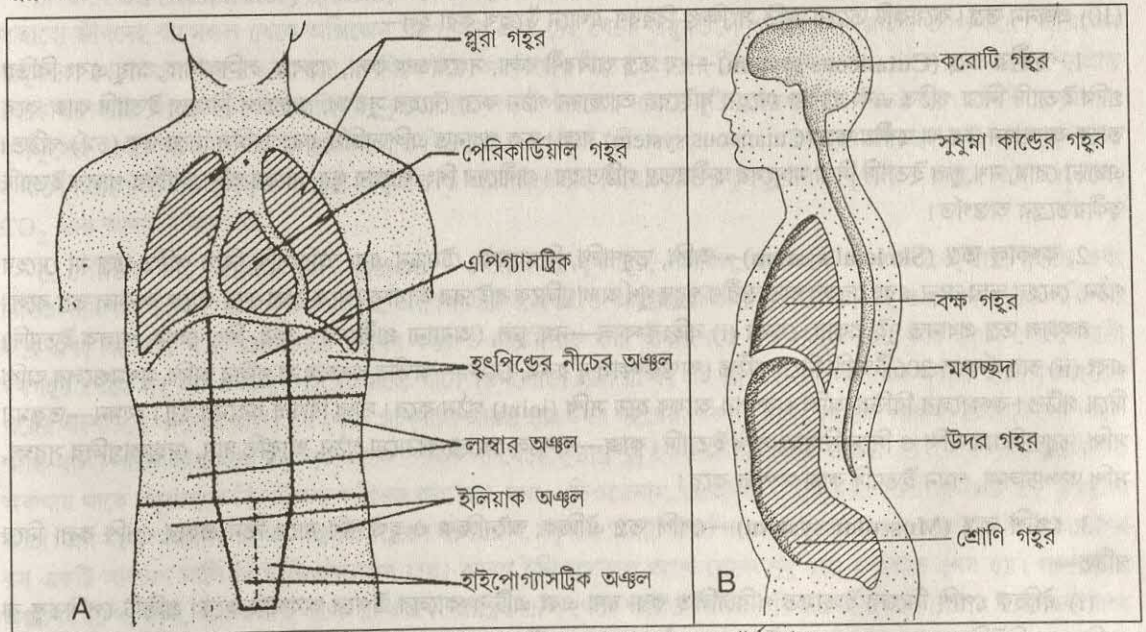
চিত্র 1.2. ঃ দেহের গহ্বর ঃ A—সম্মুখ এবং B—পার্শ্ব দৃশ্য।

ফুসফুস, শ্বাসনালি এবং গ্রাসনালি থাকে। মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে **উদর-গহ্বর** (Abdominal cavity) আছে। এই গহ্বরে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্রের বেশির ভাগ, ডিম্বাশয়, যকৃৎ, প্লিহা, বৃক্ক, মহাধমনি, অধরা মহাশিরা, জরায়ু (স্ত্রীলোকের), অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি থাকে। উদর গহ্বরের তলদেশকে **শ্রোণি গহ্বর** (Pelvic cavity) বলে। এই গহ্বরের মধ্যে মূত্রথলি, প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গ ইত্যাদি থাকে।

**● পেরিটোনিয়াম (Peritoneum) ●**

উদর গহ্বরের ভিতরের প্রাচীর তন্তুময় কলা দিয়ে তৈরি যা সেরাস ঝিল্লি আবৃত থাকে তাকে **প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম** (Parietal peritoneum) বলে। উদর গহ্বরের প্রতিটি অঙ্গের উপরিতলও একই তন্তুময় কলা দিয়ে তৈরি সেরাস ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে। একে **ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম** (Visceral peritoneum) বলে। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থানকে **পেরিটোনিয়াল গহ্বর** (Peritoneal cavity) বলে।

## ▲ বিভিন্ন তন্ত্রের মৌলিক গঠন (Elementary anatomy of the different systems) :

দেহে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন **কলা** (Tissue), যেমন—আবরণী কলা, সংযোজক বা যোগ কলা, পেশিকলা এবং স্নায়ুকলা একত্রিত হয়ে যে অংশ গঠন করে তাকে **আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ বা যন্ত্র** (Visceral organ) বলে। উদাহরণ—পাকস্থলী, বৃক্ক, ফুসফুস, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদি। আবার অন্যান্য বিশেষ কাজ সম্পন্ন করবার জন্য কতকগুলি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রয়োজন হয়। এই রকম বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের সমষ্টি মিলিত হয়ে এক একটি **তন্ত্র** (System) গঠন করে।

মানুষের দেহ নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান তন্ত্র নিয়ে গঠিত, যথা—(1) **ত্বকীয় তন্ত্র**, (2) **কঙ্কাল তন্ত্র**, (3) **পেশি তন্ত্র**, (4) **সংবহন তন্ত্র**, (5) **শ্বসন তন্ত্র**, (6) **পৌষ্টিক তন্ত্র**, (7) **রেচন তন্ত্র**, (8) **স্নায়ু তন্ত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ**, (9) **অন্তঃক্ষরা বা অন্তর্নিঃস্রাবী গ্রন্থি তন্ত্র** এবং (10) **প্রজনন তন্ত্র**। কয়েকটি তন্ত্রের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হল—

1. **ত্বকীয় তন্ত্র (Cutaneous system)**—যে তন্ত্র আবরণী কলা, সংযোজক কলা, রক্তবাহ, লসিকাবাহ, স্নায়ু এবং বিভিন্ন গ্রন্থি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত এবং প্রাণীর দেহের বাইরের আচ্ছাদন গঠন করে দেহের সুরক্ষা, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ করে তাকে **আচ্ছাদন তন্ত্র বা ত্বকীয় তন্ত্র** (Cutaneous system) বলে। ত্বক প্রধানত এপিডার্মিস এবং ডার্মিস নিয়ে ত্বক (চর্ম) গঠিত। এছাড়া রোম, নখ, চুল ইত্যাদি নিয়ে মানুষের ত্বকীয়তন্ত্র গঠিত হয়। প্রাণীদের শিং, পায়ের খুর, মাছের আঁশ, পাখির পালক ইত্যাদি ত্বকীয়তন্ত্রের অন্তর্গত।

2. **কঙ্কাল তন্ত্র (Skeletal system)**—অস্থি, তরুণাস্থি, লিগামেন্ট, টেনডন এবং অস্থিসন্ধি নিয়ে গঠিত তন্ত্র যা দেহের গঠন, দেহের ভার বহন এবং দেহের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তাকে কঙ্কাল তন্ত্র বলে।

কঙ্কাল তন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার, যেমন (i) বহিঃকঙ্কাল—নখ, চুল, (অন্যান্য প্রাণীদের—ক্ষুর, শিং, লোম, পালক ইত্যাদি) এবং (ii) অন্তর্কঙ্কাল 206টিঅস্থি নিয়ে গঠিত। অন্তর্কঙ্কাল দু'রকম, যেমন—অক্ষীয় কঙ্কাল যা খুলির অস্থি, মুখমণ্ডলের অস্থি দিয়ে গঠিত। কঙ্কালের বিভিন্ন অস্থি পরস্পর আবদ্ধ হয়ে **সন্ধি** (joint) গঠন করে। সন্ধি বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন—তন্তুময় সন্ধি, তরুণাস্থিময় সন্ধি ও সিনোভিয়াল সন্ধি ইত্যাদি। **কাজ**—কঙ্কাল দেহের কাঠামো গঠন, আকৃতি দান, দেহাঙ্গগুলির সুরক্ষা, সন্ধি অঙ্গচালনা, গমন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে।

3. **পেশি তন্ত্র (Muscular system)**—পেশি তন্ত্র ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশি নামে তিন প্রকার পেশি কলা নিয়ে গঠিত—

(i) ঐচ্ছিক পেশি নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করা যায় এবং এটি কঙ্কালের উপরে অবস্থান করে। প্রতিটি পেশিতন্তু বা পেশিকোশ নিউক্লিয়াসযুক্ত নলাকার ও উভয়প্রান্ত ছুঁচালো হয়। এটি সারকোলেমা নামে একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে।

পেশি তন্তুর মধ্যে সারকোপ্লাজম ও এর মধ্যে মায়োফাইব্রিল নামে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। প্রত্যেক মায়োফাইব্রিলে কালো ও সাদা ডোরাকাটা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে এই পেশিকে সরেখ পেশিও বলে। **কাজ**—দেহের ঐচ্ছিক বিচলন ঘটায়।

(ii) **অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশি**—ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না। ওই প্রকার পেশির মায়োফাইব্রিলে ডোরা দাগ থাকে না। প্রতিটি পেশিতন্তুর কেন্দ্রে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। **কাজ**—দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গগুলি (Visceral organs) এই পেশি দিয়ে গঠিত। যা এদের কার্যাবলিকে অনৈচ্ছিকভাবে পরিচালিত করে।

(iii) **হৃৎপেশি**—হৃৎপেশি এক প্রকারের বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক সরেখ পেশি যা শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয়। এই প্রকার পেশি হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটায়।

4. **সংবহনতন্ত্র (Circulatory system)**—সংবহনতন্ত্র রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তবাহ (ধমনি ও শিরা) এবং লসিকাবাহ লসিকাগ্রন্থি ও লসিকা নিয়ে গঠিত।

● **হৃদ্-বাহতন্ত্র (Cardio-vascular system)** : (i) **রক্ত**—রক্ত একটি জটিল তরল যোজক কলা যা 55% প্লাজমা ও 45% রক্ত কোশ নিয়ে গঠিত। রক্তকোশ তিন প্রকারের হয়, যেমন—**লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা** এবং **অণুচক্রিকা**।

(ii) **হৃৎপিণ্ড**—এটি রক্ত সংবহনতন্ত্রে পাম্পের মতো কাজ করে। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি দিয়ে তৈরি ও বক্ষগহ্বরে অবস্থান করে। এর চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে অলিন্দ এবং নীচের দুটিকে নিলয় বলে। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে ছিদ্র থাকে তা অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা দিয়ে আবদ্ধ থাকে। এছাড়া নিলয় থেকে উৎপন্ন ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনির উৎপত্তি জায়গায় সেমিলুনার কপাটিকা থাকে। কপাটিকাগুলির জন্য হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত-সংবহন একমুখী হয়।

(iii) **রক্তবাহ**—যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড থেকে বের হয় তাকে **ধমনি** বলে এবং যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ডে যায় তাকে **শিরা** বলে।

● **লসিকা তন্ত্র (Lymphatic system)** : এটি সংবহন তন্ত্রের অন্তর্গত। সূক্ষ্ম একমুখী বন্ধ লসিকা জালক, লসিকা নালি, লসিকা নোড ও লসিকা নিয়ে গঠিত। দেহের কলাকোশের ফাঁকে ফাঁকে থাকা লসিকা জালকগুলি মিলে নালি গঠন করে। নালির মাঝে মাঝে প্রচুর লসিকা নোড বা গ্রন্থি থাকে। কলারস থেকে স্বচ্ছ ঈষৎ হরিদ্রাভ, মৃদু ক্ষারীয় তরল লসিকা উৎপন্ন হয় যা লসিকা নালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

5. **শ্বসন তন্ত্র (Respiratory system)**—শ্বসনতন্ত্র নাসাবিবর, গলবিল, শ্বাসনালি এবং ফুসফুস নিয়ে গঠিত। ওই তন্ত্রের সাহায্যে জীবদেহ বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে নাসাবিবরে এবং পরে গলবিলে যায়। গলবিলের নীচের অংশের ঠিক সামনে স্বরযন্ত্র থাকে। স্বরযন্ত্রের শেষপ্রান্ত থেকে শ্বাসনালি আরম্ভ হয়। শ্বাসনালি কিছুদূর এগিয়ে পঞ্চম পাঁজরের সামনে দুটি ক্লোমশাখাতে বিভক্ত হয়। প্রতিটি ক্লোমশাখা ফুসফুসের মধ্যে যায় এবং বহু উপক্লোমশাখায় বিভক্ত হয়। ফুসফুস দুটি স্পঞ্জের মতো বক্ষগহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে থাকে। প্রতিটি ফুসফুস অসংখ্য বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত। ফুসফুসের বায়ুথলি ও রক্তের মধ্যে $O_2$ এবং $CO_2$ -এর আদান-প্রদান ঘটে।

6. **পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system)**—পৌষ্টিকতন্ত্র মুখগহ্বর, গলবিল, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র এবং বিভিন্ন পরিপাক গ্রন্থি (যেমন—লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি, যকৃৎ ও আন্ত্রিক গ্রন্থি) নিয়ে গঠিত। এই তন্ত্র খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করে এবং পরিপাক করা খাদ্যকণাকে শোষণ করে ও অপরিপাক করা খাদ্যাংশকে দেহ থেকে বের করে দেয়। পৌষ্টিকনালি মুখগহ্বর থেকে শুরু হয় এবং মুখগহ্বরের মধ্যে থাকে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে লালারস ক্ষরিত হয়। মুখগহ্বরের পরের অংশটিকে গলবিল বলে। এর থেকে গ্রাসনালি আরম্ভ হয়ে উদর গহ্বরের পাকস্থলীতে শেষ হয়। পাকস্থলী একটি পেশিবহুল স্ফীত থলি। পাকস্থলীর মধ্যে বহু ভাঁজ থাকে। পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র শুরু হয়। এটি নলাকার, প্রায় 6-10 মিটার লম্বা, কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা—ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ডিওডেনামটি 'C' অক্ষরের মতো। এর মধ্যে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির মস্তকটি থাকে। লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে নির্গত যথাক্রমে লালা, পিত্ত, অগ্ন্যাশয় রস একটি সাধারণ নালি দিয়ে ডিওডেনামে যায়। বৃহদন্ত্র ইলিওসেকাল অংশ থেকে শুরু হয়ে মলাশয়ে শেষ হয়। লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি, যকৃৎ, পাকস্থলীর পাচক গ্রন্থি এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন পরিপাককারী রসে যে সব উৎসেচক থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যকে পাচিত করে।

7. **রেচন তন্ত্র (Excretory system)**—বৃক্ক, গবিনী, মূত্রাশয় ও মূত্রনালি নিয়ে মানুষের রেচনতন্ত্র গঠিত। এর মধ্যে প্রধান অঙ্গ হল বৃক্ক, কারণ দেহের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থের প্রায় 75 শতাংশ এর সাহায্যে দেহ থেকে নির্গত হয়। একে মূত্রতন্ত্র বলে। উদর গহ্বরের পেছনের অংশে মেরুদণ্ডের উভয় দিকে দুটি গাঢ় ধূসর রঙের শিম বীজের আকৃতির মতো বৃক্ক থাকে। দুটি বৃক্ক থেকে 35 সেন্টিমিটার লম্বা দুটি নলাকৃতি গবিনী উৎপন্ন হয়ে মূত্রস্থলীতে যায়। মূত্রস্থলী থেকে মূত্রনালির মধ্য দিয়ে মূত্র দেহ থেকে বের হয়।

8. **স্নায়ু এবং ইন্দ্রিয়তন্ত্র (Nervous system and special sensenses) ঃ**

(a) **স্নায়ুতন্ত্র**—প্রধানত মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও প্রান্তস্থ স্নায়ু নিয়ে গঠিত। যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজগুলির সমতা বজায় রাখে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্র দু'প্রকার, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড) এবং প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র (করোটি-সুষুম্না স্নায়ু ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু বা সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক)। মস্তিষ্ক কিংবা সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন ভরাট নয়। এদের মধ্যে প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর দেখা যায়। সমগ্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তিনটি আবরক ঝিল্লি বা মেনিনজেস দিয়ে ঢাকা থাকে।

(b) **বিশেষ ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক ও জিহ্বা** এই চারটি বিশেষ ইন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত।

(i) **চোখ**—এটি গোলাকার এবং তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত, যেমন—স্ক্লেরা, কোরয়েড ও রেটিনা। স্ক্লেরার সামনের $\frac{1}{6}$ অংশকে কর্নিয়া এবং কোরয়েডের সামনের অঞ্চলকে কনীনিকা বলে। কনীনিকার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটিকে **তারারন্ধ্র** বলে। তারারন্ধ্রের পেছনে স্বচ্ছ উভোত্তল লেন্স থাকে। কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি কর্নিয়া, তারারন্ধ্র ও লেন্সের ভেতর দিয়ে অক্ষিপটে যায় এবং পরে অক্ষিপটের উপর সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই অনুভূতি দৃষ্টিবহ স্নায়ুপথের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়, ফলে আমরা দেখতে পাই।

(ii) **কান**—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ নিয়ে কান গঠিত। বহিঃকর্ণ কর্ণছত্র, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে গঠিত। মধ্যকর্ণ প্রধানত তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি এবং অন্তঃকর্ণ কক্লিয়া নিয়ে গঠিত। কক্লিয়ার মধ্যে অর্গান অফ কর্টি নামে গ্রাহক যন্ত্র থাকে যা শুনতে সাহায্য করে।

(iii) **জিহ্বা**—জিভের উপরিতলটি দেখতে উঁচু নীচু, এগুলিকে প্যাপিলি বলে। এই প্যাপিলার মধ্যে স্বাদ গ্রাহক থাকে। স্বাদ গ্রাহক খাদ্য বস্তুর স্বাদ আস্বাদনে অংশ নেয়।

(iv) **নাক**—নাসাবিবরে ঘ্রাণঝিল্লি নামে ঘ্রাণ গ্রাহক থাকে। ঘ্রাণ গ্রাহক কোনো বস্তুর ঘ্রাণ সংবেদনে অংশ নেয়।

9. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)**—বিভিন্ন প্রকার অনাল গ্রন্থি, যেমন—পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহানস, থাইমাস, পিনিয়াল বডি, ডিম্বাশয় এবং শুক্রাশয় দিয়ে গঠিত। এই সব গ্রন্থি থেকে যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয় তাদের **হরমোন** বলে। এই হরমোনগুলি কোনোপ্রকার নালি ছাড়াই সরাসরি রক্তে যায় ও দেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।

10. **প্রজননতন্ত্র (Reproductive system)**—প্রজননতন্ত্র দু' রকম,

(i) **পুংজননতন্ত্র**—এটি প্রধানত শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস, শুক্রনালি, শুক্রথলি, প্রস্টেট গ্রন্থি এবং পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে শুক্রাশয়কে মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড বলে, কারণ এর থেকে শুক্রাণু (গ্যামেট) উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন নামে হরমোন ক্ষরিত হয়। শুক্রাশয় ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগুলিকে গৌণ যৌনাঙ্গ বলে।

(ii) **স্ত্রীজননতন্ত্র**—এটি ডিম্বাশয়, ফ্যালোপিয়ান নালি, জরায়ু, যোনি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ডিম্বাশয়কে মুখ্য যৌনাঙ্গ এবং অন্যগুলিকে গৌণ যৌনাঙ্গ বলে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু (গ্যামেট) উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয়।

---

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ

▲ পুষ্টি ▲



▲ I. জৈব রসায়ন ▲



▲ II. বিপাক ▲



# মানবদেহে বস্তু এবং শক্তির সংরক্ষণ
## [ CONSERVATION OF MATTER AND ENERGY IN THE HUMAN SYSTEM ]

### ➧ ভূমিকা (Introduction) ঃ

খাদ্য ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। কারণ জীবদেহের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত শক্তির উৎস হল **খাদ্য** (Food)। খাদ্য থেকে পাওয়া এই শক্তি স্থৈতিক শক্তি হিসাবে খাদ্যে সঞ্চিত থাকে। অধিকাংশ সবুজ উদ্ভিদ নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করে। প্রাণীরা উদ্ভিদের মতো নিজদেহে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এই কারণে তাদের বাইরে থেকে তৈরি খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। দেহে খাদ্যের চাহিদা যেভাবেই মিটুক না কেন, সেই খাদ্য জারিত হলে তবেই খাদ্যে আবদ্ধ স্থৈতিকশক্তি গতিশক্তি হিসাবে মুক্ত হয়। এই গতিশক্তিই জীবের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। সুতরাং পুষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যের মাধ্যমে দেহে স্থৈতিকশক্তি তৈরি করা।

দেহের বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ ও শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন উপাদান যা আমরা বাইরের জগত থেকে সংগ্রহ করি তা সাধারণত বৃহদাকার অংশ হিসাবে থাকে। খাদ্যের এইসব বড়ো বড়ো আকারের অংশগুলিকে যান্ত্রিক ও ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার অণুতে পরিণত করা হয়। কোনো কারণে এইসব বড়ে বড়ো খাদ্য কণাগুলিকে ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত না করতে পারলে তারা দেহ উপযোগী হতে পারে না বা দেহ এগুলিকে গ্রহণ করতে পারবে না। খাদ্যনিহিত খনিজ পদার্থ, ভিটামিনকে খাদ্য থেকে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করে দেহের পক্ষে উপযোগী করে তুলতে হয়।

# ▲ পুষ্টি NUTRITION ▲

❖ (a) **পুষ্টির সংজ্ঞা (Definition of Nutrition) ঃ** যে পদ্ধতিতে জীব তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার খাদ্য উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যকীয় শক্তির চাহিদা পূরণ করে এবং দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলিকে অক্ষুণ্ণ রাখে তাকে পুষ্টি বা পরিপোষণ বলে।

পুষ্টির জন্য মানুষ পরিবেশ থেকে নানা রকম জৈব ও অজৈব উপাদান গ্রহণ করে। **মানুষের দেহে মৌলিক কার্য সম্পাদনে সাহায্যকারী এইসব জৈব ও অজৈব উপাদানকে পরিপোষক (Nutrients) বলা হয়।**

পরিবেশে থেকে সংগৃহীত যেসব জৈব এবং অজৈব উপাদান জীবের মৌলিক কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে তাদের পরিপোষক বলে।

● **পরিপোষক এবং খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Nutrients and Food) ঃ**

| বৈশিষ্ট্য | পরিপোষক | খাদ্য |
|---|---|---|
| 1. শক্তি উৎপাদন | পরিপোষক (আহার্য বস্তু) শক্তি উৎপন্ন করে না। | খাদ্য হল আহার্য বস্তু যা দেহে শক্তি উৎপন্ন করে। |
| 2. উদাহরণ | ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল। | কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিন। |
| 3. পরিপাক | পরিপোষকের পরিপাক প্রয়োজন হয় না। | খাদ্যবস্তুর পরিপাক হওয়া প্রয়োজন। |
| 4. কাজ | প্রধান কাজ হল দেহ-সংরক্ষণের কাজ। | পুষ্টি, পরিপোষণ ও দেহসংরক্ষণ কাজে অংশ নেয়। |

## ✪ 1.1. খাদ্যের মূল উপাদান এবং তাদের পুষ্টিগত তাৎপর্য ✪ (Basic constituents of food and their nutritional significance)

### ▲ খাদ্য (FOOD)

#### ➤ খাদ্যের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, খাদ্যের মূল উপাদান ও তাদের তাৎপর্য (Definition, Types, Basic constituents and Significance of Food) ঃ

❖ (a) **খাদ্যের সংজ্ঞা (Definition of Food) ঃ** যেসব আহার্য জৈববস্তু গ্রহণ করলে জীবদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয় এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাদের খাদ্য বলে।

(b) **খাদ্যের প্রকারভেদ (Types and food) ঃ**

জীবদেহে খাদ্যের কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্যকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—
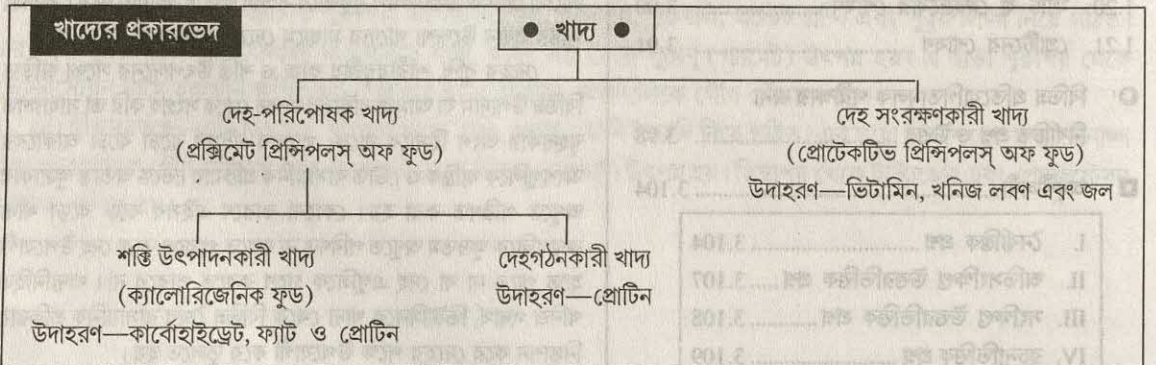
1. **দেহ-পরিপোষক খাদ্য** (Proximate principles of food)— দেহ-পরিপোষক খাদ্যকে **মুখ্য খাদ্য** (Primary food) বলে। এই প্রকার খাদ্য প্রধানত দু'প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (ক্যালোরিজেনিক খাদ্য)**— এই প্রকার খাদ্যের সম্পূর্ণ জারণের ফলে দেহে জৈব শক্তি (ATP) উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জৈব শক্তি দেহের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। **উদাহরণ**— কার্বোহাইড্রেট; ফ্যাট এবং প্রোটিন। 1 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট সম্পূর্ণ জারিত হলে দেহে 4·0 Kcal, 1 গ্রাম ফ্যাট সম্পূর্ণ জারিত হলে প্রায় 9·3 Kcal এবং 1 গ্রাম প্রোটিন জারিত হলে প্রায় 4·1 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়।

(ii) **দেহগঠনকারী খাদ্য (Body building food)**— এই প্রকার খাদ্য দেহগঠনে সাহায্য করে। **উদাহরণ**— প্রোটিন।

2. **দেহ-সংরক্ষণকারী খাদ্য** (Protective principles of food)— যেসব খাদ্য খেলে দেহ রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায় তাদের **দেহ-সংরক্ষণকারী খাদ্য** বলে। **উদাহরণ— ভিটামিন, খনিজ লবণ** এবং **জল**।

[ এখানে মনে রাখা প্রয়োজন—যেসব আহার্যবস্তু (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট) তাপশক্তি উৎপন্ন করে তাদের খাদ্য বলে। এই অর্থে ভিটামিন খাদ্য নয়। ]

**(c) খাদ্যের উপাদান (Constituents of food) ঃ**

1. **মুখ্য খাদ্য উপাদান**—বিপাকের ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, যেমন— কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট।
2. **গৌণ খাদ্য উপাদান**—মুখ্য খাদ্যবস্তুর বিপাকে সাহায্য করে, যেমন—ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং জল।

**(d) খাদ্যের মূল উপাদানের (কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন) তাৎপর্য [Significance of basic food (Carbohydrate, fat and protein)] ঃ**

### (i) কার্বোহাইড্রেটের (গ্লুকোজের) তাৎপর্য (Significance of carbohydrate–Glucose) ঃ

1. **শক্তির উৎস** (Source of energy)— প্রতিদিন বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য দেহে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা প্রধানত কার্বোহাইড্রেটের (গ্লুকোজের) বিপাকের ফলে উৎপন্ন ক্যালোরি (শক্তি) থেকে পাওয়া যায়। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট 4·0 কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন করে।

**● কয়েকটি কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাদ্যের মূল উপাদানের তালিকা (Chart of a basic constituents of Carbohydrate-rich food) ঃ**

| খাদ্য | কার্বোহাইড্রেট (gm%) | ফ্যাট (gm%) | প্রোটিন (gm%) | খনিজ লবণ (gm%) |
|---|---|---|---|---|
| সিদ্ধ চাল (কলে ছাঁটা) | 79·0 | 0·4 | 6·4 | 0·7 |
| আটা | 69·0 | 1·7 | 12·1 | 2·7 |
| ময়দা | 73·9 | 0·9 | 11·0 | 0·6 |
| আলু | 22·6 | 0·1 | 1·6 | 0·6 |

2. **রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণ** (Maintenance of blood sugar)— স্বাভাবিক রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। 100 মি.লি. রক্তে 80–120 গ্রাম গ্লুকোজ থাকে কোনো কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমান কমে গেলে (হাইপোগ্লাইসিমিয়া), যকৃতে জমানো গ্লাইকোজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। এই গ্লুকোজ যকৃৎ থেকে রক্তে যায়। আবার কোনো কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি (হাইপারগ্লাইসিমিয়া) হলে, রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ পেশি ও যকৃতে জমা হয়। এইভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় ও স্বাভাবিক শর্করার মাত্রা বজায় থাকে।
3. **সঞ্চয়** (Storage)—গ্লুকোজ যকৃতে ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত থাকে। দেহে প্রায় 500-700 গ্রাম গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত থাকে।
4. **ল্যাকটোজের সংশ্লেষণ** (Synthesis of lactose)— মাতৃদেহের স্তনগ্রন্থি রক্ত থেকে গ্লুকোজ গ্রহণ করে তাকে গ্যালাকটোজে পরিণত করে। এর পর গ্যালাকটোজ গ্লুকোজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ল্যাকটোজে (দুধের শর্করায়) পরিণত হয়।
5. **স্নেহ দ্রব্যের সংশ্লেষণ** (Synthesis of fat)— বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটে পরিণত হয়।

6. **প্রোটিনের সংশ্লেষণ** (Synthesis of protein)—যকৃতে অ্যামাইনেশন এবং ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। উদাহরণ—পাইরুভিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামাইনো মূলক ($-NH_2$) যুক্ত হলে অ্যালানিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।
7. **হেক্সোস-ফসফেট-এর সংশ্লেষণ** (Synthesis of hexose-phosphate)— গ্লুকোজ একটি 6-কার্বনযুক্ত শর্করা (Hexose sugar)। অন্ত্র থেকে গ্লুকোজ শোষণের সময় বা বৃক্কনালি থেকে পুনঃশোষণের সময় বা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সময় গ্লুকোজ-ফসফেট যৌগ উৎপন্ন হয়। এই যৌগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌগ, কারণ, এই অবস্থায় হেক্সোজ শর্করা পেশি, যকৃৎ এবং অন্ত্রে থাকে।

### (ii) স্নেহজাতীয় পদার্থের তাৎপর্য (Significance of Fat) :

● কয়েকটি ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্যের মূল উপাদানের তালিকা **(Chart of a basic constituents of Fatty food)** :

| খাদ্য | ফ্যাট (gm%) | কার্বোহাইড্রেট (gm%) | প্রোটিন (gm%) | খনিজ পদার্থ (gm%) |
|---|---|---|---|---|
| ঘি | 100.0 | — | — | — |
| মাখন | 81·0 | — | — | 2·5 |
| মায়ের দুধ | 3·6 | 6·8 | 1·8 | 0·25 |
| গোরুর দুধ | 4·1 | 4·4 | 3·3 | 0·8 |
| মোষের দুধ | 8·8 | 5·0 | 4·3 | 0·8 |

1. স্নেহ পদার্থের জারণে তাপ উৎপন্ন হয় বা শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।
2. স্নেহপদার্থে দ্রাব্য ভিটামিনগুলি (A, D, E, K) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়।
3. স্নেহপদার্থ সঞ্চয়ী খাদ্যরূপে দেহের বিভিন্ন স্থানে জমা থাকে।
4. স্নেহ পদার্থ তাপের কুপরিবাহী হিসাবে কাজ করে। ত্বকের অধস্ত্বকীয় (Subcutaneous) স্নেহপদার্থ দেহের তাপ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করে।
5. দেহের কলাকোশে বিপাকের ফলে স্নেহপদার্থ থেকে জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়। এক গ্রাম স্নেহ পদার্থ সম্পূর্ণ জারিত হলে প্রায় 9·3 কিলোক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়।
6. ফ্যাট Packing tissue বা মোড়ক কলা হিসেবে কাজ করে। দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের উপর জমা থেকে সেগুলিকে দেহের সঠিক স্থানে রাখে এবং এদের আঘাত (ঘর্ষণ) থেকে রক্ষা করে।

### (iii) প্রোটিনের তাৎপর্য (Significance of Protein) :

প্রোটিন পাচিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং এই অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন উৎপন্ন করে ও বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশ নেয়।

1. **দেহের বৃদ্ধি ও সুরক্ষা**—দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রধানত প্রোটিন দায়ী। এই সব প্রয়োজনীয় প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হয়।
2. **দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ**—দেহের বিদীর্ণ কলাকোশের মেরামতি প্রধানত প্রোটিনের (অ্যামাইনো অ্যাসিডের) সাহায্যে ঘটে।
3. **প্রোটোপ্লাজমের সংশ্লেষণ**—প্রতিটি সজীব কোশের প্রোটোপ্লাজম অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রস্তুত হয়।
4. **প্লাজমা প্রোটিনের সংশ্লেষণ**—যকৃৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি প্লাজমা প্রোটিন উৎপন্ন করে।

● কয়েকটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের মূল উপাদানের তালিকা **(Chart of a basic constituents of protein riched food)** :

| খাদ্য | | প্রোটিন (gm%) | কার্বোহাইড্রেট (gm%) | ফ্যাট (gm%) | খনিজ পদার্থ (gm%) |
|---|---|---|---|---|---|
| দুধ : | মায়ের | 1·2—1·8 | 4·4 | 3·6 | 0·8 |
| | গোরুর | 3·3 | 5·0 | 4·1 | 0·8 |
| মাছ : | রুই | 16·6 | 4·4 | 1·4 | 0·9 |
| | ইলিশ | 21·8 | 2·9 | 19·4 | 2·2 |
| | চিংড়ি | 19·1 | 4·2 | 1·0 | 1·3 |
| মাংস : | পাঁঠা | 21·4 | — | 3·6 | 1·1 |
| | মুরগি | 25·9 | — | 0·6 | 1·3 |
| ডিম : | মুরগি | 13·5 | — | 13·3 | 1·0 |
| | হাঁস | 13·3 | 0·8 | 13·7 | 1·0 |
| ডাল : | মশুর | 25·1 | 59·0 | 0·7 | 2·1 |
| | মুগ | 24·5 | 59·9 | 1·2 | 3·5 |
| | ছোলা | 20·8 | 59·8 | 5·6 | 2·7 |
| সয়াবিন : | | 43·2 | 20·9 | 19·5 | 4·6 |

5. **হরমোনের সংশ্লেষণ**—দেহের অধিকাংশ হরমোন প্রোটিন জাতীয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকোশ এই সব হরমোন সংশ্লেষণ করে।
6. **দুগ্ধ প্রোটিনের সংশ্লেষণ**—অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে মাতৃস্তন দুধের প্রোটিন (ল্যাক্টোঅ্যালবুমিন ও ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন) সংশ্লেষণ করে।
7. **উৎসেচকের সংশ্লেষণ**—প্রতিটি উৎসেচক প্রোটিন জাতীয় যা কোশের সাইটোপ্লাজমে প্রধানত রক্তস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে তৈরি হয়।
8. **পিত্ত অম্লের সংশ্লেষণ**—রক্তের গ্লাইসিন ও সিসটিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যকৃৎ যথাক্রমে গ্লাইকোকোলিক ও টৌরোকোলিক নামে দু-রকমের পিত্ত অম্ল সংশ্লেষণ করে।
9. **অ্যান্টিবডির সংশ্লেষণ**—প্লাজমার গামাগ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডির মতো কাজ করে। এটি অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়। γ-গ্লোবিউলিন দেহের সুরক্ষায় অংশ নেয়।
10. **মেলানিনের সংশ্লেষণ**—দেহত্বক, কেশ ইত্যাদি বর্ণের জন্য দায়ী **মেলানিন** নামে রঞ্জক কণা **টাইরোসিন** নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হয়।
11. **রোডোপসিনের উৎপাদন**—চক্ষুগোলকের রেটিনা স্তরে অবস্থিত রড্ ও কোন্ কোশস্থিত রোডোপসিন ও স্কোটোপসিন নামে রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটিন জাতীয় আলোক সংবেদী রঞ্জককণা) অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়।
12. **ইউরিয়া সংশ্লেষণ** (Urea synthesis)—ইউরিয়া একটি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যপদার্থ (Non-protein nitrogenous substance সংক্ষেপে NPN)। যকৃতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের $NH_2$-মূলকের সঙ্গে $CO_2$-এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইউরিয়া সংশ্লেষিত হয়।
13. **কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের সংশ্লেষণ**— নাইট্রোজেনবিহীন ভগ্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড ডি-অ্যামাইনেশন ও ট্রান্স-অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের সংশ্লেষণ ঘটায়।

➤ **মূল খাদ্যের প্রতিদিনের চাহিদা [Daily requirement of basic food] ঃ**

1. **প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা** ঃ একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা তার দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্য 1 গ্রাম। অর্থাৎ একজন লোকের দৈহিক ওজন যদি 62 kg হয় তাহলে তার প্রতিদিনের খাদ্যে 62 গ্রাম প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী বা দুগ্ধপ্রদানকারী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রোটিনের চাহিদা অধিক হয়, এক্ষেত্রে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 2-3 গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন হয়। প্রতি 1 গ্রাম প্রোটিন থেকে 4·1 কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

2. **স্নেহজাতীয় পদার্থের দৈনিক চাহিদা** ঃ ফ্যাটের চাহিদা প্রোটিনের চাহিদার সমান। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহের প্রতি Kg-ওজনের জন্য 1 গ্রাম ফ্যাট প্রয়োজন। এক গ্রাম ফ্যাট সম্পূর্ণ জারিত হলে 9·3 কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন করে।

3. **কার্বোহাইড্রেটের দৈনিক চাহিদা** ঃ একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের সুষম খাদ্যে প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণের অনুপাত **1 ঃ 1 ঃ 4** অর্থাৎ প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য 1 গ্রাম প্রোটিন, 1 গ্রাম ফ্যাট এবং 4 গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট সম্পূর্ণ জারিত হলে 4·0 কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

## ⚙ 1.2. মৌল বিপাকীয় হার (Basal Metabolic Rate or B. M. R.) ⚙

**প্রাণীদেহে সম্ভাব্য ন্যূনতম বিপাক ক্রিয়াকে মৌলবিপাক (Basal metabolism) বলে।** মৌলবিপাকজনিত জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম শক্তি শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডের পরিচালন, শ্বাসকার্যে প্রয়োজনীয় পেশিসঞ্চালন, মূত্র উৎপাদন, দেহের তাপনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়। স্বাভাবিক চাপ, উষ্ণতা ও আর্দ্রতার মধ্যে সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্থিতাবস্থায় (আধঘণ্টা শায়িত অথচ জাগ্রত অবস্থায়) কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় শক্তিই হল তার মৌলবিপাকের পরিমাণ।

❖ (a) **মৌল বিপাকীয় হারের সংজ্ঞা (Definition of B.M.R.) ঃ খাদ্যগ্রহণের 12-14 ঘণ্টা পরে আরামদায়ক পরিবেশে (20°C—25°C) সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক স্থিতাবস্থায় দেহের অপরিহার্য শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য যে হারে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে মৌল বিপাকীয় হার (Basal metabolic rate সংক্ষেপে B.M.R.) বলে।**

(b) **স্বাভাবিক বি. এম. আর. (Normal B.M.R.) ঃ**

- একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক পুরুষের গড় B. M. R. = **40 কিলোক্যালোরি / প্রতি ঘণ্টায় / প্রতি বর্গ মিটার দেহতলের জন্য।**
- একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের গড় B.M.R. = **37 কিলোক্যালোরি / প্রতি ঘণ্টায় / প্রতি বর্গমিটার দেহতলের জন্য।**

**• দেহতল নির্ণয় (Determination of Body surface) •**

একজন ব্যক্তির দেহতল নিম্নলিখিত সূত্র থেকে নির্ণয় করা যাবে—

$S = 0 \cdot 0071 \times W^{0 \cdot 425} \times H^{0 \cdot 725}$ [ S = body surface (দেহতল)—বর্গমিটারে; W = body weight (দেহের ওজন)—কিলোগ্রামে এবং H = height (দেহে উচ্চতা)—সেন্টিমিটারে]। একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষের যার দেহের উচ্চতা 183 cm এবং ওজন 75 Kgm তাহলে তার দেহতলের আয়তন প্রায় 1·9 বর্গ মিটারের সমান হবে।

(c) **মৌল বিপাকীয় হার নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ (Factors controlling BMR) ঃ**

1. **বয়স**—শিশুদের মৌল বিপাকীয় হার বা B.M.R. বয়স্ক লোকের অপেক্ষা বেশি হয়, কারণ শিশুদের দেহের ওজনের তুলনায় দেহতলের ক্ষেত্রফল বেশি।
2. **লিঙ্গভেদ**— দেহতল এবং বিপাক ক্রিয়া বেশি বলে পুরুষ লোকের বি. এম. আর. স্ত্রীলোকের তুলনায় বেশি হয়।
3. **পুষ্টি**—দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে B.M.R. কমে যায়।
4. **দেহতলের ক্ষেত্রফল**—B.M.R. দেহতলের সঙ্গে সমানুপাতিক।
5. **আবহাওয়া**— শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকেদের B.M.R. উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের B.M.R. অপেক্ষা বেশি হয়।
6. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (হরমোন)**—সম্মুখস্থ পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনসমূহ B.M.R.-কে বাড়ায়। **থাইরয়েড গ্রন্থির** অত্যধিক সক্রিয়তা (Hyperthyroidism or Hyperfunction) অবস্থায় B. M. R. 20-40 শতাংশ বেড়ে যায় আবার থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে গেলে (Hypofunction) B. M. R. 20-40 শতাংশ কমে যায়। দেখা গেছে 1 মিলিগ্রাম **থাইরক্সিন** দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করালে দেহে 1000 ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় ফলে দেহে B. M. R. বাড়ে। অগ্র পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত **TSH** থাইরয়েড গ্রন্থির মাধ্যমে B. M. R.-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা অংশ থেকে ক্ষরিত **অ্যাড্রিনালিন** (এপিনেফ্রিন) এবং **নরঅ্যাড্রিনালিন** (নরএপিনেফ্রিন) স্বাভাবিকের চেয়ে 20 শতাংশ B. M. R. বাড়ায়। অন্যান্য হরমোন দেহের বিপাক ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দেহে তাপ ও B. M. R.-কে বাড়ায়।
7. **জ্বর**—জ্বরের সময় B. M. R. বাড়ে। দেহের তাপ এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে B. M. R. প্রায় 12 শতাংশ বাড়ে।
8. **গর্ভাবস্থা**— গর্ভাবস্থার ছয় মাসের পর থেকে B. M. R. বাড়ে। এর কারণ গর্ভবতী মায়ের B. M. R. ভ্রূণের এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মায়ের B. M. R.-এর সমষ্টি।
9. **অভ্যাস**—নিশ্চলভাবে জীবনযাপন করা (Sedentary life) লোকদের চেয়ে খেলোয়াড়দের এবং **অধিক পরিশ্রমকারী লোকের** B. M. R. বেশি হয়। এর কারণ পরিশ্রমকালে পেশিতে (দেহে) বিপাকক্রিয়া বাড়ে।
10. **সিমপ্যাথেটিকো-অ্যাড্রিনাল উত্তেজনা**—কোনো কারণে যখন স্বয়ংক্রিয় তন্ত্রের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপিত হয়, যেমন—আবেগ, উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ, অত্যধিক শীতল পরিবেশের সম্মুখীন হয় তখন সিম্প্যাথেটিক এবং অ্যাড্রিনাল মেডালা গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন (এপিনেফ্রিন) নিঃসৃত হয় যা B. M. R.-কে উদ্দীপিত করে।

(d) **B.M.R.-এর নির্ণয় (Determination of B. M. R.)** ঃ B.M.R. বা বেসাল মেটাবোলিক রেট প্রধানত **বেনেডিক্ট-রথ যন্ত্রের** (Benedict's-Roth apparatus) সাহায্যে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

**• খাদ্যের তাপমান (Calorific value of Food) •**

❖ **সংজ্ঞা ঃ প্রতিগ্রাম খাদ্যের জারণে যে পরিমাণ তাপশক্তি (ক্যালোরি) পাওয়া যায় তাকে সেই খাদ্যের তাপমান বলে।**
উদাহরণ—প্রতিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট—4·1 Kcal, ফ্যাট—9·3 Kcal এবং প্রোটিন—4·0 Kcal

## ❂ 1.3. শ্বসন অনুপাত (Respiratory Quotient বা R.Q.) ❂

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ** কোনো জীবের বা কোশের একক সময়ে **$CO_2$** নির্গমন ও **$O_2$** গ্রহণের ঘনমানের অনুপাতকে (ভাগফলকে) **শ্বসন অনুপাত বা শ্বসন হার (Respiratory quotient,** সংক্ষেপে **R. Q.)** বলে।

$$\therefore \quad R.Q. = \frac{\text{একক সময়ে } CO_2 \text{ নির্গমনের পরিমাণ}}{\text{একক সময়ে } O_2 \text{ গ্রহণের পরিমাণ}} = \frac{CO_2}{O_2}$$

[ মিশ্র খাদ্য (কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন) গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থলোকের R. Q.-এর মান—0·85]

(b) **শ্বসন বস্তুর R.Q.-এর মান ঃ** গ্লুকোজ = 1, ফ্যাট = 0·7, প্রোটিন = 0·8 এবং জৈব অ্যাসিড = একের বেশি।

(c) **বিভিন্ন শ্বসন বস্তুর R.Q.-মানের ব্যাখ্যা ঃ** গ্লুকোজ, স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন এবং জৈব অ্যাসিড প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত জৈব পদার্থ। এর মধ্যে জৈব অ্যাসিডে অক্সিজেনের পরিমাণ কার্বনের থেকে বেশি থাকে। গ্লুকোজে কার্বনের পরিমাণ অক্সিজেনের সমান থাকে। তাই এ দুটি অক্সিজেন সমৃধ ($O_2$-rich) যৌগ নামে পরিচিত। প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থে অক্সিজেন তুলনামূলক কম থাকে বলে এদের অক্সিজেন হ্রাসযুক্ত ($O_2$-poor) যৌগ বলে। $O_2$ পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জৈব পদার্থের R.Q. বিভিন্ন প্রকারের হয়।

1. **গ্লুকোজের ক্ষেত্রে—R.Q. = 1·0**

   $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ শক্তি ; $\quad \therefore R.Q. = 6CO_2 / 6O_2 = 1{\cdot}0$
   
   ( গ্লুকোজ )
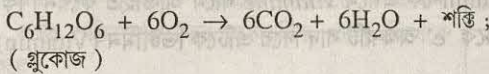
2. **প্রোটিনের ( অ্যামাইনো অ্যাসিডের ) ক্ষেত্রে — R.Q. = 0·8**

   $2C_3H_7O_2N + 6O_2 \rightarrow (NH_2)_2CO + 5CO_2 + 5H_2O +$ শক্তি ; $\quad \therefore R.Q. = 5CO_2 / 6O_2 = 0{\cdot}83$
   
   ( অ্যালানিন)

3. **ফ্যাটের ক্ষেত্রে — R.Q. = 0·7**

   $2(C_{51}H_{98}O_6) + 145\,O_2 \rightarrow 102\,CO_2 + 98\,H_2O +$ শক্তি $\quad \therefore R.Q. = \frac{102\,CO_2}{145\,O_2} = 0{\cdot}7$
   
   (ট্রাইপামিটিন)
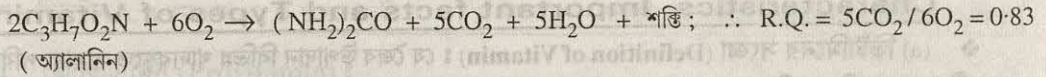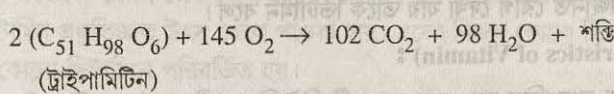
4. **জৈব অ্যাসিড, যেমন অক্সালিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে — R.Q. = 4·0**

   $2(COOH)_2 + O_2 \rightarrow 4CO_2 + 3H_2O +$ শক্তি $\quad \therefore R.Q. = 4\,CO_2 / 1O_2 = 4{\cdot}0$
   
   ( অক্সালিক অ্যাসিড )
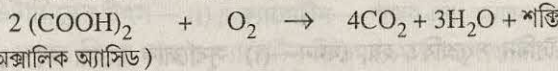
(d) **R.Q. এর তাৎপর্য (Significance of R.Q.) ঃ** R.Q. বা শ্বসন অনুপাত হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে $CO_2$-এর নির্গমন ও $O_2$-এর গ্রহণের পরিমাণের আনুপাতিক হার। শ্বসন কাজে R.Q.-এর নিম্নলিখিত তাৎপর্য বা গুরুত্ব দেখা যায়, যেমন—

1. **স্বাভাবিক খাদ্যবস্তুর জারণ প্রকৃতি**—শ্বসনের সময় কোশে কী ধরনের খাদ্যবস্তু (শ্বসনবস্তু) জারিত হচ্ছে তা বোঝা যায়। **উদাহরণ**—(i) কোশের মধ্যে গ্লুকোজের (বেশি অক্সিজেনযুক্ত যৌগ) জারণে উৎপন্ন $CO_2$ ও ব্যবহৃত $O_2$-এর পরিমাণ সমান বলে **R.Q. এক** হবে। তবে প্রোটিন ও ফ্যাটের (কম অক্সিজেনযুক্ত যৌগের) জারণের জন্য বেশি $O_2$-এর প্রয়োজন হয় কিন্তু কম $CO_2$ নির্গত হয় এবং এর ফলে **R.Q. কম** হবে।

2. **দেহে কয়েকটি অস্বাভাবিক অবস্থায়**— (i) দেহে $CO_2$-এর পরিমাণ কমে গেলে **অ্যালকালোসিস** (Alkalosis) অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন এই অবস্থায় R.Q. কম হয়। (ii) দেহে বেশি $CO_2$ উৎপন্ন হলে তা $H_2O$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে **অ্যাসিডোসিস** (Acidosis) অবস্থার সৃষ্টি করে এই অবস্থায় দেহ থেকে বেশি পরিমাণ $CO_2$ নির্গত হয় ফলে **RQ** বাড়ে।

   (iii) **মধুমেহ রোগে—R.Q. কম হয়** কারণ রক্তের গ্লুকোজ কলাকোশে কম ঢোকে। তাই কোশে গ্লুকোজের অভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় কোশে বেশি ফ্যাট জারিত হয় বলে বেশি $O_2$ -এর প্রয়োজন হয়, ফলে R.Q. কম হয়।

   (iv) **বি. এম. আর. (B.M.R.) নির্ণয়ে**— শ্বসন অনুপাত মৌল বিপাকীয় হার নির্ণয়ে সহায়তা করে।

(v) খাদ্যতালিকায় খাদ্যবস্তুর অনুপাত নির্ণয়ে সহায়তা করে।

(e) **R.Q.-নির্ণয়কারী যন্ত্র ঃ ডগলাস ব্যাগ, টিসোট স্পিরোমিটার** (Tissot Spirometer)-এর সাহায্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাপ করে যে-কোনো মানুষের R.Q. নির্ণয় করা যায়।

## ◎ 1.4. ভিটামিন (VITAMIN) ◎

চিত্র 1.1 ঃ ক্যাসমির ফাঙ্ক।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের উপর পরীক্ষা করে জানা গেছে যে সঠিক পুষ্টির জন্য শুধু কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এবং জল ছাড়াও আরও কিছু পুষ্টি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে। একটি ঘটনা থেকে লক্ষ করা হয়েছিল যে সমুদ্রযাত্রাকারী নাবিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অভাবজনিত রোগ দেখা যায়। খাদ্যে টাটকা শাকসবজি, দুধ, মাংস ইত্যাদি সরবরাহ করলে এই জাতীয় রোগ নিরাময় করা সম্ভব। **বিজ্ঞানী ক্যাসিমির ফাঙ্ক** (Casimer Funk) 1912 খ্রিস্টাব্দে ভিটামিনের নাম প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি ঢেকিছাঁটা চালের উপরের পাতলা খোসা থেকে একপ্রকার জৈবপদার্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, যা দিয়ে বেরিবেরি নিরাময় করতে সক্ষম হন। যেহেতু পদার্থটি অত্যন্ত অপরিহার্য এবং রাসায়নিক প্রকৃতিতে অ্যামাইনো জাতীয় তাই ফাঙ্ক এই জাতীয় পদার্থের নাম দেন ভিটামিন। তিনি অবশ্য প্রচলিত শব্দ Vitamin-কে প্রথমে *Vitamine* নামে অভিহিত করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে *Vitamine* শব্দ থেকে 'e' অক্ষরটি বাদ দিয়ে এটিকে **ভিটামিন** (Vitamin) করা হয়।

### ▲ ভিটামিনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং প্রকারভেদ (Definition, Characteristics, Important facts and Types of Vitamin) ঃ

❖ (a) **ভিটামিনের সংজ্ঞা (Definition of Vitamin) ঃ যে জৈব উপাদান বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে সামান্য পরিমাণে থাকে ও যা জীবের স্বাভাবিক পুষ্টিতে সহায়তা করে কিন্তু দেহগঠনের উপাদান অথবা শক্তির উৎস হিসাবে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না অথচ উপাদানটির অভাবে দেহে নির্দিষ্ট অভাবজনিত রোগ দেখা যায় তাকে ভিটামিন বলে।**

(b) **ভিটামিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Vitamin) ঃ**

1. **বিস্তার**—সমস্ত ভিটামিনই উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত হয়। অল্প কয়েকটি ভিটামিন প্রাণীদেহে সংশ্লেষিত হয়। সব খাদ্যে কোনো-না-কোনো ভিটামিন থাকে।
2. **দেহে সংশ্লেষ**—প্রাণীদেহে কয়েকটি ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়, যেমন—(i) সূর্যালোক ত্বকের সংস্পর্শে ভিটামিন-D উৎপন্ন করে। (ii) ভিটামিন A অল্প পরিমাণে দেহে তৈরি হয়। (iii) ইঁদুরের দেহে ভিটামিন-C উৎপন্ন হয় এবং (iv) পৌষ্টিক তন্ত্রে কোনো কোনো জীবাণু ভিটামিন B-Complex তৈরি করে।
3. **প্রাত্যহিক চাহিদা**—অল্প গাঢ়ত্বে ভিটামিন ভালো কাজ করে বলে প্রাত্যহিক খাদ্যে ভিটামিনের প্রয়োজন খুবই অল্প, সাধারণ কাজে থাকা একজন মানুষের সুষম খাদ্যই ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করে।
4. **সঞ্চয়**—অল্পমাত্রায় ভিটামিন দেহে সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ ও ত্বকের নীচের দিকের কলায় ফ্যাটদ্রাব্য ভিটামিনগুলি থাকে এবং ভিটামিন-C অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সে থাকে।
5. **পরিণতি**— বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পর ভিটামিন আংশিক নষ্ট হয় এবং আংশিক দেহ থেকে নির্গত হয়।
6. **দ্রাব্যতা**—কিছু ভিটামিন (বি-কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন-C) জলে এবং কিছু (ভিটামিন ADEK ) ফ্যাটে (ফ্যাট দ্রাবকে যেমন—অ্যালকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদিতে) দ্রবণীয়।
7. **প্রয়োজনীয়তা**—ভিটামিন জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হলেও সব ভিটামিন সব প্রাণীর জন্য প্রয়োজন হয় না।
8. **বিপাক কাজে অংশগ্রহণ**—অধিকাংশ ভিটামিন বিপাক ক্রিয়ায় উৎসেচকের সঙ্গে সহ-উৎসেচক হিসাবে কাজ করে।

(c) **ভিটামিন সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য তথ্য (Important Facts in relation to Vitamin) ঃ**

### ➤ I. অ্যান্টিভিটামিন (Antivitamin) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা—যেসব জৈব যৌগের রাসায়নিক গঠন কোনো-না-কোনো ভিটামিনের মতোই হয় এবং যারা ভিটামিনের কাজে বাধা দেয় অথবা ভিটামিনকে বিনষ্ট করে কিংবা নিষ্ক্রিয় করে ফলে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় তাদের অ্যান্টিভিটামিন বলে।**

2. **অ্যান্টিভিটামিনের উদাহরণ**—(i) **পাইরিথিয়ামিন** (Pyrithiamine), **অক্সিথিয়ামিন** (Oxythiamine), **ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড** (Chlorogenic acid), **পাইরোক্যাটেচিন** (Pyrocatechins), **ক্যাফেয়িক অ্যাসিড** (Caffeic acid) প্রভৃতি ভিটামিন $B_1$ (থিয়ামিন)-এর অ্যান্টিভিটামিন। (ii) **গ্যালাকটোফ্লাভিন** (Galactoflavin) এবং **ডাই-ইথাইল রাইবোফ্লেভিন** (Diethyl riboflavin)—ভিটামিন $B_2$ (রাইবোফ্লাভিন)-এর অ্যান্টিভিটামিন। (iii) **আইসোনায়াজিড** (Isoniazid), **সাইক্লোসেরিন** (Cycloserine)—ভিটামিন $B_6$ (পাইরিডক্সিন)-এর অ্যান্টিভিটামিন। (iv) **অ্যাভিডিন** (Avidin)—ভিটামিন H (বায়োটিন)-এর অ্যান্টিভিটামিন। (v) **অ্যামাইনোপটেরিন** (Amynopterin)—ভিটামিন M (ফোলিক অ্যাসিড)-এর অ্যান্টিভিটামিন।

● **ভিটামিন এবং অ্যান্টিভিটামিনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Vitamin and Antivitamin) ঃ**

| ভিটামিন | অ্যান্টিভিটামিন |
|---|---|
| 1. শারীরবৃত্তীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ভিটামিন একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে কাজ করে। | 1. অ্যান্টিভিটামিন একপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণকারী ভিটামিনের কাজকে বাধা দেয় অথবা নিষ্ক্রিয় করে বা বিনষ্ট করে। |
| 2. এটি জৈবিক ভাবে সক্রিয়। | 2. এটি জৈবিক ভাবে নিষ্ক্রিয়। |
| 3. উদাহরণ—ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স, C, D, E, K প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ—থায়ামিনেজ, পাইরিথায়ামিন, অ্যাভিডিন প্রভৃতি। |

### ➤ II. প্রোভিটামিন (Provitamin) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা—যেসব জৈব যৌগ থেকে ভিটামিন উৎপন্ন হয় তাদের প্রোভিটামিন বলে।**

প্রোভিটামিন প্রকৃতিজাত উৎস থেকে পাওয়া যায়। এদের নিজস্ব কোনো ভিটামিন গুণ নেই কিন্তু খাদ্যের সঙ্গে দেহে গিয়ে কোনো-না-কোনো ভিটামিনে পরিবর্তিত হয়।

2. **প্রোভিটামিনের উদাহরণ — β-ক্যারোটিন, 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল এবং আরগোস্টেরল।**

3. **প্রোভিটামিনের উৎস**— (i) **β-ক্যারোটিন**— গাজর এবং অন্যান্য হলুদ রঙের সবজিতে এবং ফলমূলে β–ক্যারোটিন থাকে। যকৃতে কিংবা অন্ত্রে β-ক্যারোটিন ভিটামন-A-তে রূপান্তরিত হয়।

(ii) **7- ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল**— 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল প্রাণীর ত্বকের এপিডার্মিস স্তরে থাকে যা সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে ভিটামিন-D-তে পরিণত হয়।

(iii) **আরগোস্টেরল**—উদ্ভিদ উৎস থেকে পাওয়া তেলে থাকে যা সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে আরগোস্টেরল ভিটামিন-D-তে রূপান্তরিত হয়।

● **প্রোভিটামিন এবং অ্যান্টিভিটামিনের পার্থক্য (Difference between Provitamin and Antivitamin) ঃ**

| প্রোভিটামিন | অ্যান্টিভিটামিন |
|---|---|
| 1. যেসব জৈব যৌগ থেকে দেহে ভিটামিন সংশ্লেষিত হয় তাদের প্রোভিটামিন বলে। | 1. যেসব জৈব যৌগ ভিটামিনের কাজকে বাধা দেয় অথবা বিনষ্ট করে, তাদের অ্যান্টিভিটামিন বলে। |
| 2. প্রোভিটামিনের রাসায়নিক গঠন ভিটামিনের মতো হতে পারে ও নাও হতে পারে। | 2. অ্যান্টিভিটামিনের রাসায়নিক গঠন কোনো-না-কোনো ভিটামিনের মতো হয়। |
| 3. প্রোভিটামিনের উদাহরণ—β-ক্যারোটিন, 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল, আরগোস্টেরল ইত্যাদি। | 3. অ্যান্টিভিটামিনের উদাহরণ—পাইরিথায়ামিন, থায়ামিনেজ অ্যাভিডিন ইত্যাদি। |

## III. হাইপোভিটামিনোসিস (Hypovitaminosis) ঃ

1. সংজ্ঞা—খাদ্যসামগ্রীতে ভিটামিন থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট ভিটামিনের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম
লে দেহে সেই ভিটামিনের কতকগুলি অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যাবে, সেই অবস্থাকে হাইপোভিটামিনোসিস বলে।
দাহরণ—ভিটামিন-A-র আংশিক অভাবে চোখের কর্ণিয়াতে অস্বচ্ছতা দেখা যায়।

## IV. হাইপারভিটামিনোসিস (Hypervitaminosis) ঃ

1. সংজ্ঞা—বহুদিন ধরে প্রতিদিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কোনো ভিটামিন খেলে দেহের মধ্যে যেসব অপক্রিয়া
স্বাভাবিক অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় তাকে হাইপারভিটামিনোসিস বলে।
হাইপারভিটামিনোসিসের জন্য দায়ী ভিটামিন— জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (যেমন— ভিটামিন-C এবং ভিটামিন-B-
x) বেশি খেলে কিংবা দেহে বেশি সঞ্চিত হলে এগুলি মূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু স্নেহ দ্রাবকে দ্রবণীয়
যেমন— ভিটামিন-A বা ভিটামিন-D প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেলে দেহে বিষক্রিয়া বা অপক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
হাইপারভিটামিনোসিসের উপসর্গ — (i) অধিক ভিটামিন A (রেটিনল) গ্রহণে— ক্ষুধামান্দ্য, মাথা ব্যথা, বমি বমি
পড়া, চোখের ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণগুলি দেখা যায়। (ii) অধিক ভিটামিন-D (ক্যালসিফেরল) গ্রহণে— দৈহিক ওজন হ্রাস,
তা, ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব প্রভৃতি উপসর্গগুলি দেখা যায়। (iii) অধিক ভিটামিন-C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)
কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিরূপ
দেখা যায় না কারণ অতিরিক্ত
-C মূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে
য়।

## V. মানব দেহে ষিত ভিটামিন (Vitamin esised in the body) ঃ

াভাবিক পুষ্টির জন্য বিভিন্ন
নের প্রয়োজন হয়। সাধারণত
ইরে থেকে খাদ্যের মাধ্যমেই
রতে হয়। তবে কোনো কোনো
ন দেহে সংশ্লেষিত হয়।

ভিটামিন-A— গাজর
তে β-কেরোটিন নামে
মিন থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মা
ও যকৃতে ভিটামিন-A
ত হয়।

ভিটামিন-D— ত্বকে
র্সে 7 - ডিহাইড্রোকোস্টেরল
দ্ভিদের তেলে আরগোস্টেরল
কমের প্রোভিটামিন থাকে।
কের অতিবেগুনি রশ্মির
তে এগুলি ভিটামিন-D-তে
য়।

চিত্র 1.2 ঃ বিভিন্ন ভিটামিনের কয়েকটি উৎস।

(iii) অন্ত্রে বসবাসকারী মিথোজীবী জীবাণু **ভিটামিন-K এবং ভিটামিন-$B_{12}$** সংশ্লেষ করে।

## ➤ VI. অ্যাভিটামিনোসিস (Avitaminosis) ঃ

❖ **সংজ্ঞা— ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং ত্রুটিপূর্ণ রান্নার ফলে আমাদের দেহে ভিটামিনের যে অভাব দেখা যায় তাকে অ্যাভিটামিনোসিস বলে।** এই অবস্থায় দেহে নানা রকম রোগ দেখা যায়। ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগকে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ বলে।

(d) **ভিটামিনের প্রকারভেদ (Types of Vitamins) ঃ**

দ্রাব্যতা অনুযায়ী ভিটামিনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—(i) স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন—ভিটামিন-A, D, E এবং K। (ii) জলে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন—B-কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন-C।

## ▲ স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat Soluble Vitamins)

যে সব ভিটামিন জলে অদ্রবণীয় কিন্তু স্নেহ পদার্থে (এছাড়া স্নেহদ্রাবকে অর্থাৎ ইথার, ক্লোরোফর্ম, অ্যালকোহলে) দ্রবীভূত হয় তাকে স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। ভিটামিন-**A, D, E** এবং **K** এই শ্রেণির অন্তর্গত। স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি সাধারণত রান্নার সময় নষ্ট হয় না।

### ➤ I. ভিটামিন-A (Vitamin -A) — রেটিনল (*অ্যান্টিজেরোফথেলমিক ফ্যাক্টর—(Antixerophthalmic factor)* ঃ

ভিটামিন-A চোখের জেরোপ্থ্যালমিয়া নামে রোগ প্রতিরোধকারী ভিটামিন নামে পরিচিত। বিটা-ক্যারোটিন (β-carotene) নামে প্রোভিটামিন থেকে যকৃৎ ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লিতে ভিটামিন-A সংশ্লেষিত হয়। ক্যারোটিনেজ (Carotenase) এন্‌জাইম এই সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

1. **উৎস (Sources) ঃ** (i) **প্রাণীজ** — দুধ, মাখন, ডিম, মাছ (সামুদ্রিক মাছ) যেমন—কড্ ফিস ও হ্যালিব্যাট মাছের যকৃতের তেল ইত্যাদি। (ii) **উদ্ভিজ্জ** — হলুদ রঙের ফল—আম, টম্যাটো, গাজর, পেঁপে, কুমড়ো, শাক ইত্যাদি।

2. **কার্যাবলি (Functions) ঃ** (1) দেহবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। (2) চোখের রেটিনাতে আলোকসংবেদী রঞ্জককণা (Photosensitive pigments) রোডোপ্সিন (Rhodopsin) নামে রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণে সাহায্য করে। এই রঞ্জককণা আবছা আলোকে দেখতে সহায়তা করে। (3) জিভ, গলবিল, শ্বাসনালি, লালাগ্রন্থি প্রভৃতির আচ্ছাদনী কলার স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও সজীবতাকে বজায় রাখে। (4) জীবাণু সংক্রমণে বাধা দেয়। (5) স্নায়ুকোশের পুষ্টি ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। (6) অস্থির স্বাভাবিক আকৃতি ও বৃদ্ধির কাজে অস্থিকোশের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। (7) কার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

**চিত্র 1.3** ঃ রাতকানা মানুষ।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) ঃ**

(i) **চোখের রোগ** (Eye diseases) — ভিটামিন-A-এর অভাবে মানুষ **রাতকানা** (Night blindness) বা **নিক্টালপিয়া** (Nyctalopia) হয়। কারণ, ভিটামিন-A-এর অভাবে চোখের রেটিনার রড কোশের **রোডোপ্সিন** নামে আলোকসংবেদী রঞ্জক পদার্থের উৎপাদন ব্যাহত হয় বলে দৃষ্টিশক্তিও ব্যাহত হয়। এছাড়া অক্ষিগোলক **রক্তবর্ণ** ধারণ করে, **শুষ্ক** হয় এবং **উজ্জ্বলতা হারিয়ে** ফেলে, একে **জেরোপ্থ্যালমিয়া** (Xerophthalmia) বলে। এই অবস্থায় চোখে সবসময় **বিটট্ স্পট** (Bitot's spot), কর্নিয়া নষ্ট হয় ও চোখে **ছানি** (Keratomalacia) পড়ে। চোখের **অশ্রু গ্রন্থি নষ্ট** হয়।

(ii) **দেহবৃদ্ধি** (Body growth)— ভিটামিন-A-এর অভাবে **দেহবৃদ্ধি ব্যাহত** হয়।

(iii) **ত্বকের রোগ** (Skin disease) — মানুষের ত্বক মোটা, শুষ্ক ও খসখসে হয়। সিবেসিয়াস গ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি ক্ষয় হয় এবং লোমকূপ কেরাটিন দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় ফলে ত্বক ব্যাঙের ত্বকের মতো গুটিকাযুক্ত ও অমসৃণ হয়।

(iv) **পৌষ্টিকনালির ওপর ক্রিয়া** (Effect on alimentary canal)— আবরণীকলা ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।

(v) **বৃক্ক ও মূত্রনালির** আবরণীকলা নষ্ট হয়ে পড়ে এবং **বৃক্কীয় পাথর** (Kidney stone) সৃষ্টি হয়।

(vi) **সংক্রামিত ব্যাধি** (Infectious disease)— **আবরণীকলা** নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ওই সব অঞ্চলে জীবাণু সংক্রমণে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, ফলে সহজেই তারা সংক্রামিত হয়।

(vii) **স্নায়ুতন্ত্রের** ক্ষয়বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে **প্রজনন** ক্ষমতা ত্রুটিপূর্ণ হয়।

(viii) করোটি ও মেরুদণ্ডের কোনো কোনো অংশে **অস্থির** অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে। এই কারণে স্নায়ুতন্ত্রের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

4. **দৈহিক চাহিদা (Daily requirement) :** (i) বাড়ন্ত শিশু, বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভাবস্থা ও শিশু মায়ের স্তন থেকে দুধ খাওয়ার সময় ভিটামিন-A এর চাহিদা 6000 থেকে 8000 আই. ইউ. (I. U.– International unit) ভিটামিন প্রয়োজন। (ii) বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ 5000 আই. ইউ. (I. U.)।

5. **অধিক ভিটামিন-A-এর ফলে অপক্রিয়া (Ill effects due to hypervitaminosis of vitamin-A) :** স্বাভাবিক দৈনিক প্রয়োজন অপেক্ষা মানুষ ভিটামিন-A বেশি খেলে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তাকে ভিটামিন-A-এর হাইপারভিটামিনোসিস অবস্থা বলে। এর ফলে দেহে কয়েকটি উপসর্গ দেখা যায়, যেমন—(i) বমি বমি ভাব, (ii) ঘুম ঘুম ভাব বা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, (iii) দেহের ওজন কমে যাওয়া, (iv) চুল পড়া, (v) চোখে ক্ষত, (vi) রক্তক্ষরণ, (vii) যৌন গ্রন্থির স্বল্পসক্রিয়তা, (viii) অস্থি থেকে ক্যালশিয়ামের অবক্ষয় ফলে অস্থি ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ে।
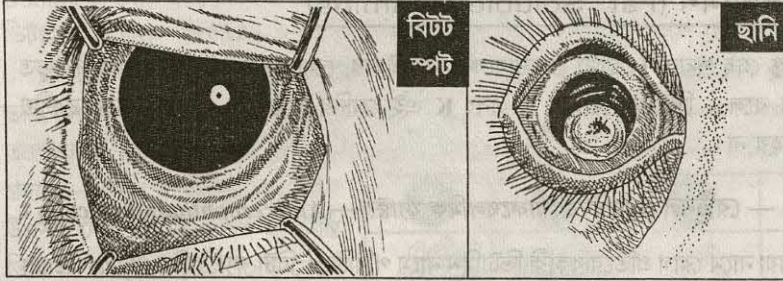
**চিত্র 1.4 :** ভিটামিন A-এর অভাবে চোখের বিটট স্পট এবং কেরাটোম্যালাসিয়া রোগ।

## ➤ II. ভিটামিন-D (Vitamin-D) — ক্যালসিফেরোল (*অ্যান্টির‍্যাকিটিক ফ্যাক্টর—Antirachitic factor*) :

ভিটামিন-D 'রিকেট' (Ricket) প্রতিরোধ করে বলে এটি রিকেট প্রতিরোধকারী বা অ্যান্টিরিকেট জৈব পদার্থ নামে পরিচিত। প্রায় 6 প্রকারের ভিটামিন-D-এর সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ভিটামিন-$D_2$ বা ক্যাল্‌সিফেরোল (Calciferol) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1. **উৎস (Sources) :** (i) **প্রাণীজ**— প্রধান উৎস কড্‌ ও হ্যালিবাট নামে সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তেল। এছাড়া ডিম, দুধ, মাখন প্রভৃতিতেও ভিটামিন-D পাওয়া যায়।

(ii) **উদ্ভিজ্জ**— উদ্ভিদ উৎস থেকে পাওয়া তেলে এই ভিটামিন খুবই কম পরিমাণে থাকে।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** ভিটামিন D-এর প্রধান কাজ—

(i) ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস শোষণে অংশ নেয়।

(ii) ভিটামিন D সরাসরি অস্থিকোশের উপর ক্রিয়া করে অস্থিগঠনে অংশগ্রহণ ও দাঁতের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(iii) কলাস্থিত ফসফোলিপিড থেকে ফসফোরিক অ্যাসিডের নিষ্কাশন ঘটিয়ে ক্যালশিয়ামের সংযুক্তিতে সহায়তা করে।

(iv) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** ভিটামিন-D-এর অভাবে মলের মাধ্যমে বেশ কিছু পরিমাণ ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, এই কারণে রক্তে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কমে গিয়ে শিশু ও বয়স্কলোকের যথাক্রমে **রিকেট** ও **ওস্‌টিওম্যালাসিয়া** রোগ হতে দেখা যায়।
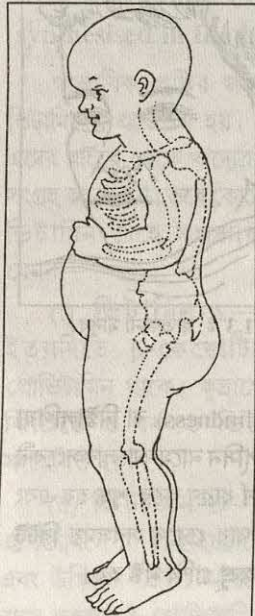
**চিত্র 1.5 :** রিকেট অবস্থায় হাতের প্রধানত পায়ের অস্থির বক্রতা, কদাকার বক্ষপিঞ্জর ইত্যাদির চিত্ররূপ।

## • রিকেট ও অস্টিওম্যালাসিয়া •

1. **রিকেট (Ricket) :** ভিটামিন D-এর অভাবে উৎপন্ন রোগের উপসর্গে অস্থি কোমল থাকে, ফলে দেহভারে দীর্ঘাস্থিগুলি বেঁকে যায়। ত্রুটিপূর্ণ অস্থির উপস্থিতির জন্য কদাকার ও বাঁকানো বক্ষপিঞ্জর, কদাকার শ্রোণিচক্র, মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং পার্শ্বদেশীয় অস্থির নমনীয়তা দেখা যায়। রিকেট সাধারণত **6 থেকে 18 মাসের শিশুদের** মধ্যে দেখা যায়।

2. **ওস্‌টিওম্যালসিয়া (Osteomalacia) :** ভিটামিন-D-এর অভাবে মলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও ফসফেট নির্গত হয়। প্লাজমায় ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমে যায় বলে অস্থিতে এর সংযোজন কমে যায় ফলে ওস্‌টিওম্যালাসিয়া রোগ হয়। ওস্‌টিওম্যালাসিয়া প্রধানত **প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থা** অথবা **শিশুরা তাদের স্তনের দুধ পানের সময়** দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** নবজাত শিশু, গর্ভবতী ও স্তনের দুধ প্রদানকারী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দৈনিক 400 I.U. ভিটামিন-D প্রয়োজন।

5. **অধিক ভিটামিন-D-এর ফলে অপক্রিয়া (Ill effects due to hypervitaminosis of Vitamin-D) :** স্বাভাবিক দৈনিক চাহিদা অপেক্ষা মানুষ ভিটামিন-D বেশি খেলে দেহে কয়েক প্রকার অস্বাভাবিকতা (লক্ষণ) দেখা যায়, যেমন—

(i) পৌষ্টিক নালির ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে অধিক পরিমাণ ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হয়ে রক্তে এদের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, দেহের বিভিন্ন স্থানের ধমনিতে ক্যালশিয়াম জমা হতে দেখা যায়।

(ii) দেহের ওজন কমে যায়।

(iii) মাথাধরা, বমি বমি ভাব, তন্দ্রাচ্ছন্নতা ইত্যাদি দেখা যায়।

### ➤ III. ভিটামিন-E (Vitamin-E) — টোকোফেরোল (*অ্যান্টিস্টেরিলিটিক ফ্যাক্টর—Antisterilitic factor*) :

বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধকারী ভিটামিন হিসাবে কাজ করে বলে ভিটামিন E বন্ধ্যাত্বরোধকারী ভিটামিন নামে পরিচিত। ভিটামিন E-এর অপর নাম **টোকোফেরোল** (Tocopherol, *Tocos* = child birth, *pheros* = to bear, *ol* = alcohol)।

1. **উৎস (Sources) :** (i) **প্রাণীজ**—যকৃতে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন-E পাওয়া যায়।

(ii) **উদ্ভিজ্জ**—শাকসবজি হল এই ভিটামিনের প্রধান উৎস। বিশেষ করে গম, সয়াবিন, শস্য ইত্যাদিতে এই ভিটামিনকে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** (i) স্বাভাবিক প্রজননক্রিয়ায় ভিটামিন-E গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। (ii) দেহের অপ্রয়োজনীয় জারণক্রিয়ায় বাধাদান করে। (iii) মাংসপেশির স্বাভাবিক সক্রিয়তায় সহয়তা করে। (iv) গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। (v) স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তনালির মধ্যে সমতা বজায় রাখে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** ভিটামিন-E-এর অভাবজনিত লক্ষণ প্রধানত বিভিন্ন প্রাণীদেহে লক্ষ করা গেছে, যেমন —

(i) স্ত্রী-ইঁদুরের জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপিত হলেও পরে ভ্রূণটি বিনষ্ট হয়ে যায়।

(ii) পুরুষ ইঁদুরের শুক্রাশয় শীর্ণ হয় এবং শুক্রাণু সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** প্রতিদিন 15 থেকে 20 মিলিগ্রাম।

➤ IV. ভিটামিন-K (Vitamin-K) — ন্যাপথোকুইনিন (*অ্যান্টিহিমোরেজিক ফ্যাক্টর—Antihaemorrhagic factor*) :

ভিটামিন-K রক্তক্ষরণ প্রতিরোধকারী ভিটামিন হিসাবে পরিচিত। একাধিক ভিটামিন-K-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ন্যাপথোকুইনোন (Napthoquinone) থেকে ভিটামিন-K উৎপন্ন হয়। সবুজ উদ্ভিদ এবং ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-K-এর সংশ্লেষণ ঘটায়।

1. **উৎস (Sources) : উদ্ভিজ্জ**—ভিটামিন-K-এর প্রধান উৎস শাকসবজি, বিশেষ করে বাঁধাকপি, শাক, টম্যাটো, সয়াবিন ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** ভিটামিন-K যকৃতে প্রোথ্রোমবিন নামে প্লাজমোপ্রোটিন (একপ্রকার রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর)-এর উৎপাদনে সাহায্য করে। প্রোথ্রোমবিন **রক্তের স্বাভাবিক তঞ্চনে** সহায়তা করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** ভিটামিন-K-এর অভাবে রক্ততঞ্চন ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং রক্তক্ষরণ ঘটে।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** প্রতিদিন 5 মিলিগ্রাম ভিটামিন-K প্রয়োজন।

## ▲ জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water soluble vitamins)

জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন হল **বি-কমপ্লেক্স (B-complex)** এবং **ভিটামিন-C**। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অনেকগুলো ভিটামিনের সমষ্টি বিশেষ। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন তাপসহনকারী; রান্নার সময় এই ভিটামিন সাধারণত নষ্ট হয় না। কোনো কোনো ভিটামিন অবশ্য অংশত বিনষ্ট হয়। কিছু পরিমাণ ভিটামিন সরাসরি সূর্যালোকে বিনষ্ট হয়। এই প্রকার ভিটামিন সাধারণভাবে কেলাস পদার্থের হয়।

➤ **I. ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex) :**

● **ভিটামিনে B-কমপ্লেক্সের নাম (Name of B-Complex Vitamins) :** B-কমপ্লেক্সের অন্তর্গত 12টি ভিটামিনকে একটি গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে তাই তাদেরকে একত্রে ভিটামিন **B-Complex** বলে। এদের নাম হল—(i) থায়ামিন ($B_1$), (ii) রাইবোফ্লাভিন ($B_2$), (iii) প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ($B_3$), (iv) নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড, (v) পাইরিডক্সিন ($B_6$), (vi) ফোলিক অ্যাসিড (vitamin M), (vii) সায়ানোকোবালামিন ($B_{12}$), (viii) বায়োটিন (vitamin H), (ix) প্যারাঅ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিড, (x) লিপোইক অ্যাসিড, (xi) কোলিন ($B_4$) এবং (xii) ইনোসিটল।

● (a) **থায়ামিন (Thiamine) — ভিটামিন-$B_1$** [ *অ্যান্টিনিউরেটিক ফ্যাক্টর বা অ্যান্টিবেরিবেরি পদার্থ (Antiberiberi substance)*] :

1. **উৎস (Sources) :** (i) **প্রাণীজ**—থায়ামিনের পরিমাণ খুবই কম। ডিমের হলুদ অংশে সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়।

(ii) **উদ্ভিজ্জ**—শস্যজাতীয় খাদ্য, ডাল, ঢেঁকিছাটা চাল, বাদাম, ঈস্ট, সবুজ শাকসবজি যেমন—বিট, শালগম, ফুলকপি, নাসপাতি, বরবটি, মটর ইত্যাদিতে $B_1$ ভিটামিন থাকে।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** (i) থায়ামিন-পাইরোফসফেট (TPP) রূপে কারবোক্সিলেজ উৎসেচকের সহ উৎসেচক রূপে কাজ করে ও $Mg^{++}$ আয়নের সহযোগিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে $CO_2$ এর নিষ্ক্রমণ ঘটায়।

(ii) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন সংশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত উৎসেচকের কাজে সাহায্য করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** থায়ামিনের অভাবে বেরিবেরি (Beriberi) রোগ হয়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** প্রতিদিন প্রায় 1·8 গ্রাম থায়ামিন প্রয়োজন। এই চাহিদা বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে সমানুপাতিক।
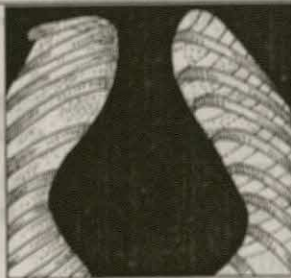
চিত্র 1.6 : ভিটামিন $B_1$-(থায়ামিন) অভাবজনিত রোগের দুটি উপসর্গের চিত্ররূপ।

## • বেরিবেরি (Beriberi) •

বেরিবেরি হল ভিটামিন B-এর অভাবজনিত রোগ। বেরিবেরি দুই প্রকারের—শুষ্ক বেরিবেরি ও আর্দ্র বেরিবেরি।

1. **শুষ্ক বেরিবেরি**— এতে প্রান্তীয় স্নায়ু ও স্নায়ুরজ্জু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক রক্তসঞ্চয়জনিত বিকলদশার (Hypertophy) লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অর্থাৎ দ্রুত অথচ মৃদু হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট, পা ফুলে ওঠা ইত্যাদি।
2. **আর্দ্র বেরিবেরি**—এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো হল, পা ফুলে ওঠা ইডিমা, ক্ষুধামান্দ্য, পৌষ্টিকনালির টান কমে যাওয়া, রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিড ও পাইরুভিক অ্যাসিডের আধিক্য, প্রান্তীয় স্নায়ুপ্রদাহ (Polyneuritis) এবং হাত-পায়ের দুর্বলতা ও অসংলগ্নতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা প্রভৃতি।
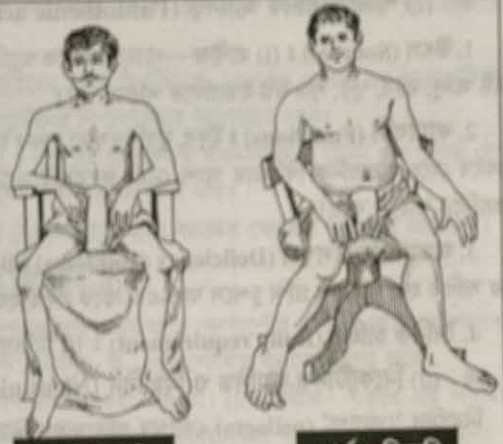
### (b) রাইবোফ্লেভিন (Riboflavin) অথবা ল্যাক্টোফ্লাভিন — ভিটামিন-$B_2$ :

1. **উৎস (Sources) :** (i) **প্রাণীজ**— দুধ, ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক, পেশি ইত্যাদি। (ii) **উদ্ভিজ্জ**— সব রকম শস্য ও সবুজ শাকপাতা প্রভৃতিতে রাইবোফ্লেভিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিনের সংশ্লেষণ সম্ভবপর।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** (i) রাইবোফ্লেভিন দেহবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (ii) প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। (iii) যেসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) সহ উৎসেচক FMN হিসাবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে জারণ-বিজারণ পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং হাইড্রোজেনের বাহক হিসাবে কাজ করে। (v) সহ উৎসেচক FAD হিসাবে বিভিন্ন অক্সিডেজ এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত থেকে কলাকোশের বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** (i) রাইবোফ্লেভিনের অভাবে স্নায়ুতন্ত্র, ত্বক, চোখ ইত্যাদি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ii) দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। (iii) ঠোঁট ফুলে যায় ও ঠোঁটের দুদিকে ফেটে যায় ও ঘা হয়, একে চেইলোসিস

চিত্র 1.7 : রাইবোফ্লেভিন (Vitamin-$B_2$) অভাবজনিত কয়েকটি রোগ।

(Cheilosis) বলে। মুখগহ্বরের কৌণিক শ্লেষ্মাঝিল্লির প্রদাহ (Angular stomatitis) (iv) জিভে ঘা ও প্রদাহ হয়, একে **গ্লোসিটিস** (Glossitis) বলে। (v) **কর্ণিয়াতে রক্তজালকের সৃষ্টি**, চোখে ছানি পড়া, **আলো অসহ্য ঠেকা ফটোফোবিয়া** (Photophobia) ঘটে। এছাড়া ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হওয়া, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) ঃ** প্রতিদিন 1·5 থেকে 1·8 মিলিগ্রাম রাইবোফ্লেভিনের প্রয়োজন।

### (c) প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic acid)— ভিটামিন-$B_3$ ঃ

1. **উৎস (Sources) ঃ** (i) **প্রাণীজ**—প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড দুধ, মাংস, ডিমের কুসুম, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি। (ii) **উদ্ভিজ্জ** — মিষ্টি আলু, মটর, গুড়, শুষ্ক ঈষ্ট ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions) ঃ** ইঁদুর, মুরগির ছানা, শূকর ইত্যাদির জন্য এটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সহ উৎসেচক-COA হিসাবে দেহে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। কার্বোহাইড্রেটের, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরলের সংশ্লেষণ ও বিপাকক্রিয়া ইত্যাদিতে সাহায্য করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) ঃ** $B_3$ ভিটামিনের অভাবে মুরগির বাচ্চার যকৃৎ বড়ো হয়, স্নায়ুরজ্জুর ক্ষয় সাধিত হয়, থাইমাস গ্রন্থি চুপসে যায় এবং ত্বকে প্রদাহ হয়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) ঃ** 10 মিলিগ্রামের মতো।

### (d) নিকোটিনিক অ্যাসিড ও নিয়াসিন (Nicotinic acid and Niacin) ঃ

নিয়াসিন 'পেলাগ্রা' (pellagra) রোগের প্রতিরোধক ভিটামিন বা **পেলাগ্রা প্রিভেন্টিভ ফ্যাক্টর (Pellagra preventive factor** সংক্ষেপে **P-P ফ্যাক্টর** ) নামে পরিচিত।

1. **উৎস (Sources) ঃ** (i) **উদ্ভিজ্জ** — নানাপ্রকার শাকসবজি, শস্য, ডাল, ঈস্ট, টম্যাটো, বরবটি, মটর ইত্যাদি।
(ii) **প্রাণীজ** — মাছ, মাংস, দুধ, যকৃৎ ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions) ঃ** (i) নিকোটিনিক অ্যাসিড কলাকোশের বিপাকক্রিয়া ও জারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। (ii) কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের সংশ্লেষণে সাহায্য করে, (iii) পেলাগ্রার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে এবং (iv) দু'ধরনের উৎসেচকের সঙ্গে এই ভিটামিন সম্পর্কযুক্ত। সহ-উৎসেচক NAD এবং NADP হিসাবে এই ভিটামিন উৎসেচক ডিহাইড্রোজিনেজের (Dehydrogenase) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

**● পেলেগ্রা প্রিভেনটিভ ফ্যাক্টর (Pellagra preventive Factor—P-P ফ্যাক্টর) ●**

চিত্র 1.8 ঃ পেলেগ্রা।

মানুষের ক্ষেত্রে নিকেটিক অ্যাসিড বা নিয়াসিনের অভাবে পেলেগ্রা নামে রোগ হয়, যার প্রধান লক্ষণগুলি হল—

(1) ত্বকের পরিবর্তন—দেহের যে অংশ উন্মুক্ত থাকে (যেমন হাত) সেখানের চামড়া মোটা, খসখসে, কালচে লাল বর্ণের ও শুষ্ক ও মোটা খসখস হয়ে বিকৃতি লাভ করে।

(2) পাক-তন্ত্রীয় পরিবর্তন—গ্লোসিটিস (জীভ মোটা ও লাল বর্ণের) হয়, স্টোমাটিটিস, ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলীতে অস্বাভাবিকতা, উদরাময় (ডাইরিয়া) ,ডিমেনেশিয়া ইত্যাদি ঘটে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) ঃ** ত্বকে লালচে দাগ, ক্ষত, প্রদাহ, কাঠিন্য ও খসখসে ভাব দেখা যায়। এছাড়া পেটের পীড়া, দুর্বলতা, মানসিক বিকলতা, মুখের ঘা ও রক্তিম ভাব, জিভ ফুলে ওঠা ও লাল হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) ঃ** বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে 12 থেকে 18 মিলিগ্রাম এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে খানিকটা কম ভিটামিন প্রতিদিন প্রয়োজন হয়।

### (e) পাইরিডক্সিন (Pyridoxine) বা ভিটামিন-$B_6$ :

1. **উৎস (Sources) :** (i) **উদ্ভিজ্জ** — নানাপ্রকার শস্য, শাকপাতা, ঈস্ট প্রভৃতিতে পিরাইডোক্সিন পাওয়া যায়। (ii) **প্রাণীজ** — যকৃৎ, ডিম, মাংস, বৃক্ক ইত্যাদি।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** এই ভিটামিন নিম্নস্তরের প্রাণীদের পক্ষে অপরিহার্য। মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। সম্ভবত এটি কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** ইঁদুর ও কুকুরের দেহবৃদ্ধি ও প্রজননক্ষমতা যেমন হ্রাস পেতে দেখা যায় তেমনি স্নায়বিক ক্ষয়, ক্রোধ-প্রবণতা, মানসিক চাঞ্চল্য, নিম্নাঙ্গে ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** শিশুর ক্ষেত্রে 0·3 মিলিগ্রাম এবং বয়স্কের ক্ষেত্রে 2 মিলিগ্রাম প্রয়োজন।

### (f) সায়ানোকোবালামিন (Cyanocobalamin) বা ভিটামিন-$B_{12}$ :

ভিটামিন-$B_{12}$-এ খনিজ পদার্থ কোবাল্ট (Cobalt) দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোবাল্টের পরিমাণ প্রায় 4·5 শতাংশ। পাকস্থলীয় রসে অবস্থিত উপাদান (Intrinsic factor) অন্ত্র থেকে ভিটামিন- $B_{12}$-কে শোষিত করতে সাহায্য করে।

1. **উৎস (Sources) :** (i) **উদ্ভিজ্জ**—ভিটামিন-$B_{12}$ শাকসবজিতে পাওয়া যায় না। (ii) **প্রাণীজ**—যকৃতে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ডিম, মাংস, বৃক্ক ইত্যাদিতে থাকে। পৌষ্টিক নালির কোলনে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা $B_{12}$ সংশ্লেষিত হয়।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** এই ভিটামিন (i) লোহিতকণিকার উৎপাদনে সাহায্য করে। (ii) অস্থিমজ্জায় প্রভাব বিস্তার করে শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। (iii) রক্তে শর্করার সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। (iv) সহ-উৎসেচক-এ (CoA) হিসাবে কাজ করে। (v) নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। (vi) স্নায়ুতন্ত্রের কোনো কোনো অংশের ক্রিয়া অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে। (vii) কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের বিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** ভিটামিন-$B_{12}$-এর অভাবে রক্তাল্পতা পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া (Pernicious anaemia) হয়। রক্ত-শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। ইঁদুর, শূকর ইত্যাদি প্রাণীর দেহের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ক্রোধপ্রবণতার লক্ষণ দেখা দেয়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** সম্ভবত অতি সামান্য পরিমাণ ভিটামিন $B_{12}$-এর প্রয়োজন হয়।

### (g) ফলিক অ্যাসিড (Folic acid) বা ভিটামিন M :

1. **উৎস (Sources) :** (i) **উদ্ভিজ্জ** — বরবটি, কচি শাকপাতা ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। (ii) **প্রাণীজ**— ঈস্ট, যকৃৎ ও সয়াবিনে ফলিক অ্যাসিডের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** (i) ফলিক অ্যাসিড নিউক্লিয়াসের DNA সংশ্লেষে সাহায্য করে। (ii) লোহিতকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। (iii) রক্তাল্পতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। (iv) বিজারিত অবস্থায় সহ-উৎসেচক হিসাবে কাজ করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** মানুষের ক্ষেত্রে মেগ্যালোব্লাস্ট রক্তাল্পতা দেখা দেয়। বানর ও ইঁদুরের দেহের বৃদ্ধি হ্রাস, রক্তাল্পতা, শ্বেতকণিকার সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) :** 50 মাইক্রোগ্রামের মতো।

### (h) বায়োটিন (Biotin) :

বায়োটিনকে আগে **ভিটামিন-H বা ডিমের সাদা অংশে ক্ষতি প্রতিরোধক শর্ত (Anti egg white injury factor)** বলা হত।

1. **উৎস (Sources) :** বায়োটিন ঈস্ট, বৃক্ক, যকৃৎ, ফুলকপি, মটরশুঁটিতে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions) :** (i) বায়োটিন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। (ii) কুকুর ও ইঁদুরের **চর্ম-প্রদাহ** (Dermatitis) প্রতিরোধে এটি সহায়ক ভিটামিন।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms) :** (i) বায়োটিনের অভাবে মানুষের দেহে এক বিশেষ ধরনের ত্বকপ্রদাহ এবং রক্তস্থিত কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। (ii) কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীতে ত্বকে প্রদাহ দেখা যায়।

4. দৈনিক চাহিদা (Daily requirement) ঃ প্রতিদিন 150 থেকে 400 মাইক্রোগ্রাম।

➤ **II. ভিটামিন-C (Vitamin-C) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড Ascorbic acid বা** *অ্যান্টিস্করব্যুটিক্ ফ্যাক্টর (Anti-scorbutic factor)*] ঃ

ভিটামিন-C অ্যাসিড প্রকৃতির হয়। এই ভিটামিন **স্কার্ভি প্রতিরোধকারী ভিটামিন** (অ্যান্টিস্করব্যুটিক ফ্যাক্টর বা ভিটামিন) নামে পরিচিত। ভিটামিন-C অতি সহজেই 100° ডিগ্রি সেলসিয়াসে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়।
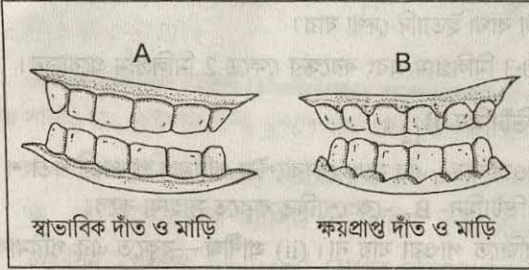
**চিত্র 1.9** ঃ ভিটাভিন-C-এর গুরুত্ব ঃ A-স্বাভাবিক দাঁত ও মাড়ি, B-ভিটামিন C-এর অভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত ও মাড়ি।

1. **উৎস (Sources)** ঃ (i) **উদ্ভিজ্জ**— ভিটামিন-C আনারস, টম্যাটো, কমলালেবু, পাতিলেবু, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং বাঁধাকপি, কাঁচা লংকা, শাক, বরবটি, শাকসবজি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(ii) **প্রাণীজ** — খুবই সামান্য পরিমাণে থাকে। দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতিতে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions)** ঃ (i) কয়েক প্রকার উৎসেচক যেমন তামাযুক্ত টাইরোসিনেজ ও ডোপামিন β হাইড্রোক্সিলেজ এবং লোহাযুক্ত হাইড্রোক্সিলেজ, যেমন—প্রোলিন হাইড্রোক্সিলেজ, লাইসিন হাইড্রোক্সিলেজ, অ্যাসপারটেট β-হাইড্রক্সিলেজ ইত্যাদি উৎসেচকের সহউৎসেচক হিসেবে ভিটামিন-C কাজ করে।

(ii) ভিটামিন-C কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ভিটামিন-C-এর অভাবে অগ্ন্যাশয়ে ইন্‌সুলিন হরমোনের (Insulin) উৎপাদন কমে যায়।

(iii) ভিটামিন-C সম্ভবত **হাইড্রোজেন-বাহক** হিসাবে কলাকোশে **জারণ-বিজারণ বিভব** (Oxidation-reduction potential) নিয়ন্ত্রণ করে।

(iv) এই ভিটামিন ফলিক অ্যাসিডকে (folic acid) ফলিনিক অ্যাসিডে (folinic acid) রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

(v) লোহিতকণিকা উৎপাদনে উদ্দীপিত করে।

(vi) অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত, ত্বক ও যোগকলার কোশমধ্যস্থ পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।

(vii) অস্থির প্রোটিন-ম্যাট্রিক্সের বিকাশ এবং ক্যালশিয়াম ও ফসফেটের উপস্থাপনে সাহায্য করে।

(viii) ক্ষত নিরাময়ে অংশ নেয় এবং

(ix) ফাইব্রোব্লাস্ট (fibroblast), ওস্‌টিওব্লাস্ট (osteoblast) প্রভৃতি সাংগঠনিক কোশের কাজে সাহায্য করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms)** ঃ ভিটামিন-C-এর অভাবে **'স্কার্ভি'** রোগ দেখা যায়।

4. **দৈনিক চাহিদা (Daily requirement)** ঃ প্রতিদিন 30 মিলিগ্রাম। গর্ভাবস্থায়, মায়ের স্তনদুধ পানের সময়কালে এবং বয়ঃসন্ধিকালে প্রায় 70 মিলিগ্রাম ভিটামিন-C প্রয়োজন হয়।

- **ভিটামিন P (সাইট্রিন—Citrin বা বায়োফ্লাভোনয়েড—Bioflavonoid)** ঃ

1. **উৎস (Sources)** ঃ উদ্ভিজ উৎস হল এইপ্রকার ভিটামিনের প্রধান উৎস। সম্ভবত ভিটামিন-C-এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় টক জাতীয় ফল থেকে পাওয়া যায়।

2. **কার্যাবলি (Functions)** ঃ রক্তজালকের ভঙ্গুরতা কমায়, ফলে রক্তজালক থেকে রক্তের ক্ষরণকে রোধ করে।

3. **অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency symptoms)** ঃ ভিটামিন P-এর সঠিক অভাবজনিত রোগ সম্বন্ধে এখনও সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তবে স্কার্ভি রোগে রক্তক্ষরণ সম্ভবত ভিটামিন-P (সাইট্রিন)-এর অভাবে হয় বলে ধারণা করা হয়।

● বিভিন্ন ভিটামিনের সাধারণ ও রাসায়নিক নাম, উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত রোগের তালিকা (**Table for different Vitamins with their General and Chemical names, Sources, Functions and Deficiency symptoms**) ঃ

| ভিটামিন (রাসায়নিক নাম) | উৎস | কাজ | অভাবজনিত রোগ |
|---|---|---|---|
| ➤ ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat soluble vitamins) | | | |
| **ভিটামিন-A** (রেটিনল) *অ্যান্টিজেরেপ্-থ্যালমিক ফ্যাক্টর* | (i) **উদ্ভিজ্জ**—গাজর টম্যাটো, কুমড়ো, পালংশাক, মটরশুঁটি, হলুদ রঙের ফল ইত্যাদি। (ii) **প্রাণীজ**—হ্যালিবাট ও কড্ মাছের যকৃৎ নিঃসৃত তেল, দুধ, ডিম, মাখন, চিজ ইত্যাদি। | (i) চোখে রোডোপসিন নামে আলোক সুবেদী রঞ্জক কণা উৎপন্ন করে। (ii) দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (iii) আবরণী, স্নায়ু ও পেশি কলাকে পুষ্ট রাখে। | (i) **রাতকানা**—রাতের অন্ধকারে বা আবছা আলোকে দেখতে পায় না। (ii) **জেরোফথ্যালামিয়া**—চোখের কর্ণিয়া শুকিয়ে যায়, লাল হয়, ফলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। |
| **ভিটামিন-D** (ক্যালসিফেরল) *অ্যান্টিরিকেটিক ফ্যাক্টর* | (i) **উদ্ভিজ্জ**—বনস্পতি ঘি ও উদ্ভিজ্জ তেলে অল্প পাওয়া যায়। (ii) **প্রাণীজ**—হ্যালিবাট ও কড মাছের যকৃৎ-তেল, মাখন, দুধ, ডিমের কুসুম, চিজ ইত্যাদি। | (i) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের শোষণে সাহায্য করে। (ii) অস্থি ও দাঁতের গঠন ও তাদের পুষ্টিতে অংশ নেয়। (iii) দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। | (i) **রিকেট**—শিশুর পায়ের অস্থি নরম হয় ফলে দেহের ভারে বেঁকে যায়। (ii) **অস্টিওম্যালাসিয়া**—বড়োদের হাড় শক্ত হয় না ফলে বেঁকে যায়। (iii) শিশুদের দাঁতের ক্ষয় ঘটে। |
| **ভিটামিন-E** (টোকোফেরল) *অ্যান্টিস্টেরিলিটিক ফ্যাক্টর* | (i) **উদ্ভিজ্জ**—সবুজ শাকসবজি ও সয়াবিন, তুলো, ইত্যাদি বীজের তেল। (ii) **প্রাণীজ**—ডিম, দুধ, মাছ ও মাংস ইত্যাদি। | (i) গর্ভধান ও সন্তান প্রসবকে নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) জনন অঙ্গ এবং ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। | (i) **বন্ধ্যাত্ব** — পুরুষ ইঁদুরের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। (ii) স্ত্রী ইঁদুরের মাতৃগর্ভে (জরায়ুতে) ভ্রূণের অকাল মৃত্যু হয় ফলে অকাল প্রসব ঘটে। |
| **ভিটামিন-K** (ফাইলোকুইন) *অ্যান্টিহিমোরেজিক ফ্যাক্টর* | (i) **উদ্ভিজ্জ**—সবুজ শাকসবজি, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি। (ii) **প্রাণীজ** — সামুদ্রিক মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। | (i) যকৃতে প্রোথ্রম্বিনের উৎপাদন করে। (ii) রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে। | **রক্তপাত**—সামান্য ক্ষতস্থান থেকেও প্রচুর রক্ত ক্ষরণ ঘটে। |
| ➤ জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water soluble vitamins) | | | |
| **ভিটামিন-B কমপ্লেক্স** | | | |
| **ভিটামিন-$B_1$** (থিয়ামিন) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—ঢেঁকিছাটা চাল, দানাশস্যের খোসা, অঙ্কুরিত গম, ছোলা, বিভিন্ন প্রকার ডালে থাকে। (ii) **প্রাণীজ**—ডিমের কুসুম। | (i) কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সাহায্য করে। (ii) কলাকোশে ও মস্তিষ্কে শর্করার জারণে সাহায্য করে। | **বেরিবেরি রোগ** — স্নায়ুর অপজনন ঘটে, হাত-পা ফোলে, পক্ষাঘাতজনিত ঘটনা দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার হ্রাস পায়। |

| ভিটামিন (রাসায়নিক নাম) | উৎস | কাজ | অভাবজনিত রোগ |
|---|---|---|---|
| ভিটামিন-$B_2$ (রাইবোফ্লাভিন) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—চাল ও গমের কুঁড়া, সবজি। (ii) **প্রাণীজ**—মাছ, ডিম, দুধ প্রভৃতি। | (i) বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। (ii) দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। | (i) **চেইলোসিস**—ঠোঁটের কোণে ঘা, ফেটে যায়, ফুলে যায়। (ii) **গ্লোসিটিস**—জিভে ঘা হয়। |
| ভিটামিন-$B_3$ (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—সবুজ শাকসবজি। (ii) **প্রাণীজ** — দুধ। | (i) সহ উৎসেচক হিসাবে বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। | (i) চর্মরোগ হয়। (ii) অন্ত্রে ঘা হয়। |
| **নিকোটিনিক অ্যাসিড** বা **(নিয়াসিন)** | (i) **উদ্ভিজ্জ**—চালের কুঁড়া, সবুজ শাকসবজি, ডাল—মশুর, মুগ, অড়হর, বরবটি, মটর ইত্যাদিতে থাকে। (ii) **প্রাণীজ**—মাংস, মাছ, যকৃৎ। | (i) দেহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (ii) বিপাক ও কলাকোশে জারণে অংশ নেয়। (iii) পেলেগ্রা রোগের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। | **পেলেগ্রা রোগ**—এই রোগের যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তাকে **3'D'** (আদ্যক্ষর) হিসাবে প্রকাশ করা যায়, যেমন--ডার্মাটিটিস (চর্মরোগ), ডাইঅ্যারিয়া (উদরাময়) এবং ডিমেন্‌শিয়া (মানসিক দুর্বলতা)। |
| ভিটামিন-$B_6$ (পাইরিডক্সিন) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—সবুজ শাকসবজি, অঙ্কুরিত শস্য। (ii) **প্রাণীজ**—দুধ, ডিম, মাছ, মাংস। | (i) প্রোটিন বিপাকে অংশ নেয়। (ii) সহ উৎসেচক হিসাবে কাজ করে। | (i) দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। (ii) রক্তাল্পতা, নিদ্রাল্পতা, স্নায়ু দৌর্বল্য ইত্যাদি দেখা যায়। |
| ভিটামিন-$B_{12}$ (সায়ানোকোবলা-মাইন) | (i) **উদ্ভিজ্জ** — স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামে ছত্রাকে পাওয়া যায়। (ii) **প্রাণীজ**—ডিম, দুধ, মাংস, যকৃৎ। | (i) রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদনে সাহায্য করে। (ii) স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিকতা এবং কার্য ক্ষমতাকে বজায় রাখে। | (i) রক্তাল্পতা দেখা যায়। (ii) মুখ ও জিভে প্রদাহ হয়। |
| ভিটামিন-M (ফলিক অ্যাসিড) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—সবুজ শাকসবজি, ব্যাঙের ছাতা। (ii) **প্রাণীজ**— যকৃৎ , বৃক্ক। | (i) বিপাক ক্রিয়ায় সহ উৎসেচক হিসাবে কাজ করে। (ii) R.B.C উৎপাদনে অংশ নেয়। | (i) রক্তাল্পতা দেখা যায়। (ii) দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। |
| ভিটামিন-C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড) | (i) **উদ্ভিজ্জ**—লেবু, পেঁপে, কাঁচা-লংকা, আমলকী, টম্যাটো, পেয়ারা, আনারস ইত্যাদিতে থাকে। এছাড়া অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, শাক, কচু, মূলো, ধনে পাতা, সজনে শাকে থাকে। (ii) **প্রাণীজ** — কম থাকে। | (i) কোশের জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। (ii) কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশ নেয়। (iii) R.B.C.-এর উৎপাদনে ও পরিণতিতে সাহায্য করে। | **স্কার্ভি রোগ** — এই রোগে রক্তজালক ক্ষণভঙ্গুর ফলে দেহের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত হতে দেখা যায়। দাঁতের মাড়ির ক্ষয় হয়ে বিকৃত হয়, মাড়ি থেকে রক্তপাত ঘটে। |

## ◎ 1.5. প্রোটিনের জৈব মূল্য এবং পুষ্টিমূল্য ◎
## (Biological and Nutritional value of Protein)

1. **প্রোটিনের জৈব মূল্য (Biological value of Protein) ঃ** প্রোটিনে কতটা অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে তার উপরে প্রোটিনের জৈবমূল্য নির্ভর করে। প্রথম শ্রেণি অর্থাৎ প্রাণীজ প্রোটিনের জৈবমূল্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রাণীজ প্রোটিনে (দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে) প্রায় সবকটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে প্রোটিনের জৈবমূল্য নির্ণয় করা যায়।

$$\text{প্রোটিনের জৈবমূল্য} = \frac{\text{দেহের আবদ্ধ নাইট্রোজেন}}{\text{খাদ্যের শোষিত নাইট্রোজেন}} \times 100$$

2. **প্রোটিনের পুষ্টিগত মূল্য (Nutritional value of Protein) ঃ** যে-কোনো প্রোটিনের পুষ্টিগত মূল্য তার পাচ্যতা এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রকারভেদের উপর নির্ভরশীল। যেমন—

(i) **প্রোটিনের পাচ্যতা** (Digestibility of Protein)—কোনো প্রোটিন খাদ্যের আহার্য নাইট্রোজেনের শতকরা যে অংশ দেহের মধ্যে শোষিত হয় তাকে সেই খাদ্য প্রোটিনের লঘুপাচ্যতা বলে। উদাহরণ—কোনো প্রোটিন খাদ্যের 20 gm নাইট্রোজেনের 19 গ্রামই যদি দেহের মধ্যে শোষিত হয়, তাহলে তার লঘুপাচ্যতা শতকরা ($^{19}/_{20} \times 100$) বা 95 ভাগ হবে। প্রাণীজ প্রোটিনের লঘুপাচ্যতা অনেক বেশি।

(ii) **অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রকারভেদ**—প্রোটিনের পুষ্টিগত মূল্য অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে প্রোটিনে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড যত বেশি থাকে প্রোটিনের পাচ্যতাও তত বেশি হয়।

● **প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য নির্ণয় (Determination of Nutritive value of Protein) ঃ** প্রোটিনের পুষ্টিমুল্য প্রধানত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন—

(a) **প্রোটিন দক্ষতা অনুপাত** (Protein Efficiency Ratio সংক্ষেপে **PER**) $= \frac{\text{দেহের ওজনের বৃদ্ধি (গ্রাম)}}{\text{গৃহীত প্রোটিনের পরিমাণ (গ্রাম)}} \times 100$

বর্তমানে প্রাণীর বৃদ্ধি অন্য একটি পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেটি হল—আপেক্ষিক প্রোটিন মূল্য (Relative Protein Value সংক্ষেপে RPV)। এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনের সাহায্যে বৃদ্ধির তুলনা করে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রকাশ করা হয়।

(b) **মোট প্রোটিনের ব্যবহার (Net Protein Utilisation or NPU)** $= \frac{\text{প্রোটিনের পাচ্যতা সহগ} \times \text{প্রোটিনের জৈবিক মূল্য}}{100}$

(i) **প্রোটিনের পাচ্যতা সহগ** (Digestibility coefficient of Protein)

$$= \frac{\text{গৃহীত খাদ্যের নাইট্রোজেন} - \text{পরিপাকের ফলে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন}}{\text{গৃহীত খাদ্যের নাইট্রোজেন}} \times 100$$

পরিপাকের ফলে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন = গৃহীত খাদ্যের নাইট্রোজেন – দেহমধ্যবর্তী মলের নাইট্রোজেন

(ii) **প্রোটিনের জৈব মূল্য** (Biological value of Protein) = পাচিত নাইট্রোজেন – বিপাকে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন × 100

(c) **নেট প্রোটিন অনুপাত (Net Protein Ratio or NPR) ঃ**

$$\text{নেট প্রোটিন অনুপাত (NPR)} = \frac{\text{পরীক্ষাধীন দলের ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম)} + \text{নিয়ন্ত্রক দলের ওজন হ্রাস (গ্রাম)}}{\text{গৃহীত প্রোটিন (গ্রাম)}}$$

### ▲ নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা (Nitrogen balance) ঃ

জীবদেহে প্রোটিনই নাইট্রোজেনের উৎস। খাদ্যে উপস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ও দেহ থেকে রেচিত নাইট্রোজেনের (মূত্র ও মলের মোট নাইট্রোজেনের) পরিমাণ নির্ণয় করে জীবদেহের প্রতিদিনের নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ যাচাই করা হয়।

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যখন খাদ্যে গৃহীত নাইট্রোজেনের এবং বর্জনের পরিমাণ সমান হয় তখন সেই অবস্থাকে নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা (Nitrogen balance) বলে।**

(b) **প্রকারভেদ ঃ** সাধারণত সুষম খাদ্যগ্রহণকারী পূর্ণ বয়স্ক লোকের নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা দেখা যায়। একে দুভাবে প্রকাশ করা হয়, যেমন—

(i) **ধনাত্মক নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা** (Positive nitrogen balance)—যখন গৃহীত নাইট্রোজেনের পরিমাণ রেচিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ থেকে বেশি হয় তখন তাকে **ধনাত্মক নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা** বা **নাইট্রোজেন অর্জন** (Nitrogen gain) বলে। সুষমখাদ্য গ্রহণকারী সকল অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে এই অবস্থা লক্ষ করা যায়।

(ii) **ঋণাত্মক নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা** (Negative nitrogen balance)—যখন প্রথম শ্রেণির প্রোটিন উপযুক্ত পরিমাণে গৃহীত না হয় তখন রেচিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ খাদ্যে গৃহীত নাইট্রোজেন থেকে অধিক হয়। একে **ঋণাত্মক নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা** বা **নাইট্রোজেনহানি** (Nitrogen loss) বলে।

● **প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা ঃ** একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা তার দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্য 1 গ্রাম। অর্থাৎ একজন লোকের দৈহিক ওজন যদি 62 kg হয় তাহলে তার প্রতিদিনের খাদ্যে 62 গ্রাম প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী বা দুগ্ধপ্রদানকারী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রোটিনের চাহিদা অধিক হয় অর্থাৎ প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 2-3 গ্রাম প্রয়োজন হয়। প্রতি 1 গ্রাম প্রোটিন থেকে 4·1 কিলোক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

## ▲ I. জৈব রসায়ন (BIOCHEMISTRY) ▲

## ◎ 1.6. কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) ◎

### ▲ কার্বোহাইড্রেটের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিন্যাস এবং ধর্ম (Definition, Classification and Properties of Carbohydrates)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ যাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত জলের (2 : 1) অনুপাতে থাকে তাকে কার্বোহাইড্রেট বলে।**

কার্বন ও জলের সহযোগে গঠিত বলে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রেটেড কার্বন বা **জল অঙ্গার** (Hydrated carbon) বলা হয়। কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক সংকেত—$C_n(H_2O)_n$।

(b) **উদাহরণসহ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Carbohydrate with example) ঃ**
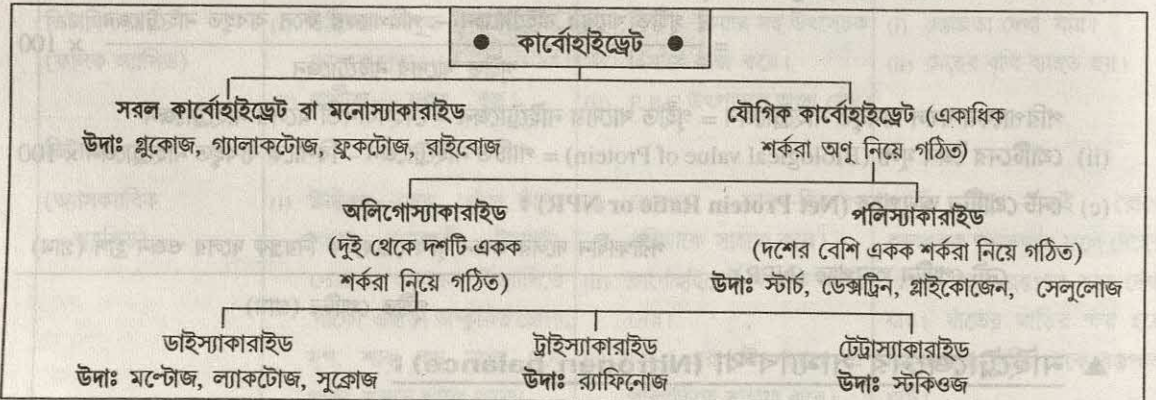
সরল শর্করার একক বা অণুর সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়, যথা—**সরল কার্বোহাইড্রেট এবং যৌগিক কার্বোহাইড্রেট।**

○ **ব্যতিক্রম ঃ** র‍্যামনোজ (**Rhamnose**) এই রকম কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_5$। এতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (2 : 1) হিসাবে থাকে না। আবার কয়েক রকম জৈব পদার্থ আছে যা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে তৈরি এবং এতে যদিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলের অনুপাতে থাকে, তবুও এই রকমের জৈব বস্তু প্রকৃতিতে কার্বোহাইড্রেট নয়, **উদাহরণ**—অ্যাসিটিক অ্যাসিড ($C_2H_4O_2$), ল্যাকটিক অ্যাসিড ($C_3H_6O_3$) প্রভৃতি।

এই কারণে **কার্বোহাইড্রেটকে বহু হাইড্রোক্সিলযুক্ত অ্যালডিহাইড (– CHO)** বা **কিটোন (C = O) যুক্ত জৈব যৌগ** বলে।

## ▲ A. সরল কার্বোহাইড্রেট বা মনোস্যাকারাইড (Simple Carbohydrates) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা ঃ যে কার্বোহাইড্রেট একটিমাত্র শর্করার অণু দিয়ে গঠিত হয় তাকে সরল শর্করা বা মনোস্যাকারাইড বলে।** (Monosaccharide; গ্রিক—*Monos* = এক; *Sakkharon* = শর্করা)

2. **উদাহরণ ঃ** গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ, ম্যানোজ, রাইবোজ ইত্যাদি।

| গ্লুকোজ | ফ্রুকটোজ | গ্যালাকটোজ | ম্যানোজ |
|---|---|---|---|
| CHO<br>HCOH<br>HOCH<br>HCOH<br>HCOH<br>$CH_2OH$ | $CH_2OH$<br>CO<br>HOCH<br>HCOH<br>HCOH<br>$CH_2OH$ | CHO<br>HCOH<br>HOCH<br>HOCH<br>HCOH<br>$CH_2OH$ | CHO<br>HOCH<br>HOCH<br>HCOH<br>HCOH<br>$CH_2OH$ |

3. **মনোস্যাকারাইডের প্রকারভেদ ঃ** মনোস্যাকারাইডকে আবার দুভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়, যেমন—

(i) **কার্বন পরমাণু সংখ্যার** উপস্থিতির উপরে নির্ভর করে মনোস্যাকারাইডকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যেমন—মোনোজ (Monose = $C_1$), ডাইওজ (Diose = $C_2$), ট্রাইওজ (Triose = $C_3$), টেট্রোজ (Tetrose = $C_4$), পেনটোজ (Pentose = $C_5$), হেক্সোজ (Hexose = $C_6$), হেপটোজ (Heptose = $C_7$)। এই সকল মনোস্যাকারাইডে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7টি করে কার্বন পরমাণু থাকে।

(ii) **বিজারণ গ্রুপের** উপস্থিতির উপরে নির্ভর করে মনোস্যাকারাইডকে **আলডোজ** (Aldose) এবং **কিটোজ** (Ketose) শর্করা হিসাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। গ্লুকোজের প্রথম কার্বনে **অ্যালডিহাইড** (–CHO) ও ফ্রুকটোজের দ্বিতীয় কার্বনে **কিটো** (C = O) গ্রুপ থাকে বলে গ্লুকোজকে **অ্যালডোজ হেক্সোজ শর্করা** ও ফ্রুকটোজকে **কিটোজ হেক্সোজ শর্করা** বলে। তাই গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ বিজারণধর্মী শর্করার (Reducing sugar) অন্তর্গত।

### ● বিজারণধর্মী এবং অবিজারণধর্মী শর্করা ●

1. **বিজারণধর্মী শর্করা**—যেসব শর্করাতে অ্যালডিহাইড (– CHO) কিংবা কিটো (C=O) নামে বিজারণধর্মী মূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে, ফলে বেনেডিক্ট বিকারককে বিজারিত করতে পারে, তাদের **বিজারণধর্মী শর্করা** (Reducing sugar) বলে। **উদাহরণ**— গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, মলটোজ এবং ল্যাকটোজ।
2. **অবিজারণধর্মী শর্করা**—যেসব শর্করাতে বিজারণ মূলকগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে না ফলে তারা বেনেডিক্ট বিকারককে বিজারিত করতে পারে না তাদের **অবিজারণধর্মী শর্করা** বলে। **উদাহরণ**—সুক্রোজ, শ্বেতসার এবং গ্লাইকোজেন।

মনোস্যাকারাইডের মধ্যে সর্বাধিক শারীরবৃত্তীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্করা হল গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ। এদের রাসায়নিক সংকেত (Chemical formula) একই প্রকার অর্থাৎ $C_6H_{12}O_6$। কিন্তু একই রকম সংকেত হলেও প্রতিটি মনোস্যাকারাইডের মধ্যে অক্সিজেন (= O) ও হাইড্রোজেন (–H) পরমাণুগুলির সজ্জাবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

পরমাণুগুলি বিভিন্ন প্রকার মনোস্যাকারাইডে বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকে ফলে এদের নামকরণ ভিন্ন হয়েছে। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোস্যাকারাইড হল—গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ।

1. **গ্লুকোজ**—গ্লুকোজ শারীরবৃত্তীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একক শর্করা বা মনোস্যাকারাইড। এটি ছয়টি কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত এবং প্রথম কার্বনে —CHO (অ্যালডিহাইড) মূলক থাকে বলে গ্লুকোজ **হেক্সোজ-অ্যালডোজ** নামেও পরিচিত। —CHO মূলকটি বিজারণধর্মী হওয়ার ফলে গ্লুকোজকে **বিজারণধর্মী শর্করা** (Reducing sugar) বলে। **গ্লুকোজকে দ্রাক্ষাশর্করা** বলা হয়। কারণ এটি আঙুরে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য শর্করাতে যেমন ল্যাকটোজ, মলটোজ, সুক্রোজ, শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়।

2. **ফ্রুকটোজ**—গ্লুকোজের মতো এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ছয় কার্বনযুক্ত শর্করা। ফ্রুকটোজের দ্বিতীয় কার্বনে বিজারণধর্মী C=O (কিটো) মূলক থাকে বলে ফ্রুকটোজকে **হেক্সোজ-কিটো বিজারণধর্মী একক শর্করা** বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ফলে পাওয়া যায় বলে এটি 'Fruit sugar' নামেও পরিচিত। এছাড়া সুক্রোজে ফ্রুকটোজ গ্লুকোজের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

● **গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Glucose and Fructose) ঃ**

| গ্লুকোজ | ফ্রুকটোজ |
|---|---|
| 1. গ্লুকোজ হেক্সোজ-অ্যালডোজ একক শর্করা। | 1. ফ্রুকটোজ কিটো-হেক্সোজ একক শর্করা। |
| 2. আঙুরে এবং মানুষের রক্তে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। | 2. বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ফলে পাওয়া যায়। মানুষের রক্তে পাওয়া যায় না। |

3. **গ্যালাকটোজ**— গ্যালাকটোজ একটি ছয় কার্বনযুক্ত বিজারণধর্মী মনোস্যাকারাইড। গ্লুকোজের মতো এটিও অ্যালডিহাইড মূলক যুক্ত তাই এটি অ্যালডোজ শর্করা। প্রাণীর স্তন গ্রন্থি রক্তের গ্লুকোজকে গ্যালাকটোজে পরিণত করে। স্তনগ্রন্থিতে এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু গ্যালাকটোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (বন্ড) দিয়ে যুক্ত হয়ে এক অণু ল্যাকটোজ (দুধের শর্করা) তৈরি করে।

● **গ্লুকোজ ও সুক্রোজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Glucose and Sucrose) ঃ**

| গ্লুকোজ | সুক্রোজ |
|---|---|
| 1. গ্লুকোজ মনোস্যাকারাইড (একক শর্করা)। | 1. সুক্রোজ ডাইস্যাকারাইড (দ্বি শর্করা)। |
| 2. গ্লুকোজ বিজারণধর্মী শর্করা। | 2. সুক্রোজ অবিজারণধর্মী শর্করা। |
| 3. মানুষের দেহে (রক্তে) পাওয়া যায়। | 3. মানুষের দেহে (রক্তে) পাওয়া যায় না। |
| 4. আঙুর থেকে পাওয়া যায় (দ্রাক্ষা শর্করা), এছাড়া ফলমুল, চাল, গম ইত্যাদি থেকেও পাওয়া যায়। | 4. কেবলমাত্র ইক্ষু থেকে পাওয়া যায় (ইক্ষুশর্করা)। এই কারণে সুক্রোজ চিনি ও গুড়ে পাওয়া যায়। |

● **ল্যাকটোজ এবং সুক্রোজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Lactose and Sucrose) ঃ**

| ল্যাকটোজ | সুক্রোজ |
|---|---|
| 1. ল্যাকটোজ বিজারণধর্মী দ্বিশর্করা বা ডাইস্যাকারাইড। | 1. সুক্রোজ অবিজারণধর্মী দ্বিশর্করা বা ডাইস্যাকারাইড। |
| 2. গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ নিয়ে ল্যাকটোজ গঠিত। | 2. গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ নিয়ে সুক্রোজ গঠিত। |
| 3. এই শর্করা দুধে পাওয়া যায় (দুগ্ধ শর্করা)। | 3. এই শর্করা আখের রসে পাওয়া যায় (ইক্ষু শর্করা)। |

## ▲ B. যৌগিক কার্বোহাইড্রেট (Compound Carbohydrates) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা ঃ একাধিক সরল শর্করা বা মনোস্যাকারাইড পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (Glycosidic bond) দিয়ে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে যৌগিক কার্বোহাইড্রেট বলে।**

2. **প্রকারভেদ ঃ** যৌগিক শর্করা দু-প্রকারের হয়, যেমন—সরল যৌগিক শর্করা (Simple compound Carbohydrates) বা অলিগোস্যাকারাইড এবং জটিল যৌগিক শর্করা (Complex compound Carbohydrates) বা পলিস্যাকারাইড।

➤ (a) **অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides; *Oligo* = few, কতিপয়) ঃ**

❖ (i) **সংজ্ঞা—দুই থেকে দশটি মনোস্যাকারাইড অণু পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে আবদ্ধ হয়ে যে শর্করা গঠন করে তাকে অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharide) বা সরল যৌগিক শর্করা বলে।**

(ii) **উদাহরণ**—ডাইস্যাকারাইড, ট্রাইস্যাকারাইড, টেট্রাস্যাকারাইড ইত্যাদি।

1. **ডাইস্যাকারাইড** (Disaccharide; *Di* = দুই)—দুটি মনোস্যাকারাইড α-1, 4 অথবা α-1, 2 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে ডাইস্যাকারাইড বা দ্বি-শর্করা গঠন করে। এই বন্ধনীটি তৈরি হওয়ার সময় এক অণু জল অপসারিত হয়, তাই ডাইস্যাকারাইডের রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{12}O_6)–H_2O$।

**উদাহরণ**— (i) দুগ্ধশর্করা বা ল্যাকটোজ (Lactose) = গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ।
(ii) বার্লিশর্করা বা মল্টোজ (Maltose) = গ্লুকোজ + গ্লুকোজ।
(iii) ইক্ষুশর্করা বা সুক্রোজ (Sucrose) = গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ।
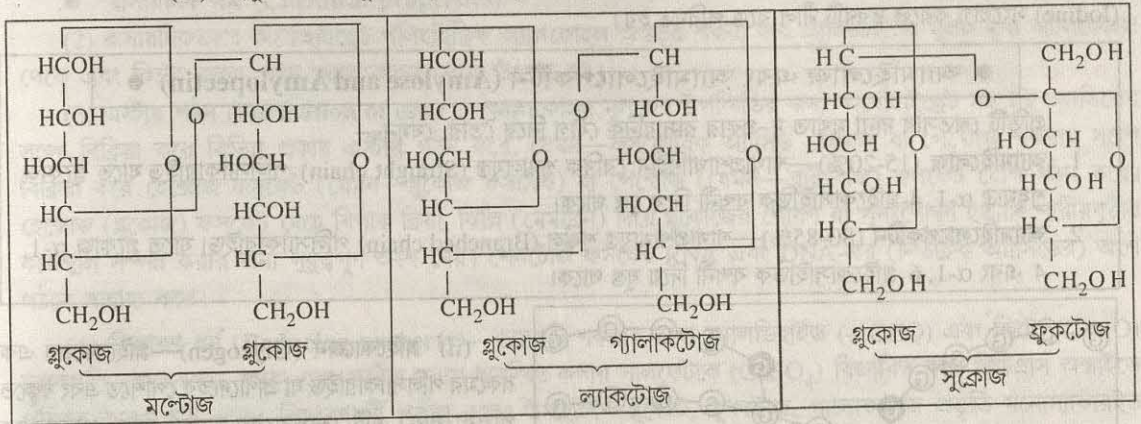
2. **ট্রাইস্যাকারাইড** (Trisaccharide; *Tri* = তিন)—তিনটি মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে ট্রাইস্যাকারাইড গঠিত হয়। উদাহরণ—**র‍্যাফিনোজ** (Ruffinose)—বিট, তুলো বীজ ও ছত্রাকে এই শর্করা পাওয়া যায়।

3. **টেট্রাস্যাকারাইড** (Tetrasaccharide ; *Tetra* = চার) — চারটি মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে টেট্রাস্যাকারাইড গঠিত হয়। উদাহরণ—**স্করোডোজ** (Scorodose), পেঁয়াজ ও রসুন ইত্যাদিতে এটি পাওয়া যায়।

➤ (b) **পলিস্যাকারাইড [Polysaccharides;** Gr. *Poly* = বহু; $(C_6H_{10}O_5]_n$ ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা ঃ দশটির অধিক মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে যে শর্করা গঠন করে তাকে বহুশর্করা বা পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide) বলে।**

পলিস্যাকারাইডে কার্বোহাইড্রেটে মনোস্যাকারাইডগুলি α-1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে পর পর যুক্ত হয়ে রৈখিক শৃঙ্খলযুক্ত বহুশর্করা বা পলিস্যাকারাইড (যেমন, অ্যামাইলোজ) গঠন করে, অথবা α-1, 4 এবং α-1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে শাখাপ্রশাখাযুক্ত পলিস্যাকারাইড (যেমন, অ্যামাইলোপেক্‌টিন) উৎপন্ন করে।

**● গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (Glycosidic bonds) ●**

1. **α-1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী**—এই বন্ধনী দিয়ে একটি গ্লুকোজের অণুর প্রথম কার্বন $(C_1)$ অন্য একটি গ্লুকোজ অণুর চতুর্থ কার্বনের $(C_4)$ সঙ্গে যুক্ত থাকে।
2. **α-1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী**—এই প্রকার বন্ধনী দিয়ে একটি গ্লুকোজ অণুর প্রথম কার্বন $(C_1)$ অন্য একটি গ্লুকোজ অণুর ষষ্ঠ কার্বনের $(C_6)$ সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই দুই প্রকার গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ডেক্সট্রিন ইত্যাদি পলিস্যাকারাইড অণু গঠিত হয়।

2. **পলিস্যাকারাইডের প্রকারভেদ :** পলিস্যাকারাইড দু-রকমের হতে পারে, যেমন—হোমোগ্লাইক্যান এবং হেটেরোগ্লাইক্যান।

(i) **হোমোগ্লাইক্যান** (Homoglycan)—যে সব পলিস্যাকারাইড একই প্রকার শর্করা নিয়ে গঠিত হয় তাদের **সমরূপ বহুশর্করা** বা **হোমোগ্লাইকন** বলে। **উদাহরণ**—শ্বেতসার (স্টার্চ), গ্লাইকোজেন, ডেক্সট্রিন, সেলুলোজ, কাইটিন ইত্যাদি।

(ii) **হেটেরোগ্লাইক্যান** (Heteroglycan)—যেসব পলিস্যাকারাইড দুই বা তার অধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মনোস্যাকারাইড (একক শর্করা) নিয়ে গঠিত হয় তাদের **বিষমরূপ বহুশর্করা** বা **হেটেরোগ্লাইক্যান** বলে। **উদাহরণ**—হেপারিন, কেরাটিন সালফেট, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid) প্রভৃতি মিউকোপলিস্যাকারাইড।

3. **পলিস্যাকারাইডের উদাহরণ**—শ্বেতসার বা স্টার্চ, ডেক্সট্রিন, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ ইত্যাদি। পলিস্যাকারাইড ভাঙলে অর্থাৎ জলবিশ্লেষিত (Hydrolysis) হলে সাধারণত গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

(i) **শ্বেতসার বা স্টার্চ** (Starch)—এটি প্রকৃতিজাত প্রধান এবং শারীরবৃত্তীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্বোহাইড্রেট। চাল, গম, আলু, দানা শস্য, বীজ ইত্যাদি উদ্ভিদজাত খাদ্যদ্রব্যের কোশের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকার, গোলাকার, চ্যাপটা কঠিন দানারূপে ছড়িয়ে থাকে। শ্বেতসার ঠান্ডা জলে অদ্রবণীয় কিন্তু উষ্ণ বা গরম জলে দ্রবণীয়। স্টার্চ দ্রবণে আয়োডিন (Iodine) সংযোগ করলে দ্রবণটি নীল রঙে পরিণত হয়।

### ● অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন (Amylose and Amylopectin) ●

প্রতিটি শ্বেতসার দানা মুখ্যত দু-প্রকার রাসায়নিক যৌগ নিয়ে তৈরি, যেমন—

1. **অ্যামাইলোজ** (15-20%)—শাখাপ্রশাখাবিহীন রৈখিক শৃঙ্খলযুক্ত (Straight chain) পলিস্যাকারাইড যাতে গ্লুকোজ শুধুমাত্র α-1, 4-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে।
2. **অ্যামাইলোপেকটিন** (80-85%)—শাখাপ্রশাখাযুক্ত শৃঙ্খল (Branched chain) পলিস্যাকারাইড। যাতে গ্লুকোজ α-1, 4 এবং α-1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে।
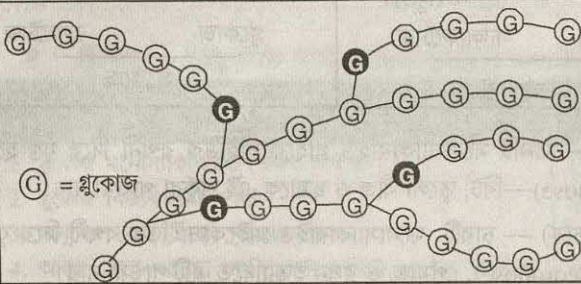
গ্লাইকোজেনের গঠন : সাদা বলগুলি G—α-1, 4 বন্ড এবং কালো বলগুলি G —α-1 : 6 বন্ড দিয়ে যুক্ত।

(ii) **গ্লাইকোজেন** (Glycogen)—গ্লাইকোজেন এক রকমের পুলিস্যাকারাইড যা প্রাণীদেহের পেশিতে এবং যকৃতে পাওয়া যায়। এটি শ্বেতসারের মতো, কিন্তু শ্বেতসারের তুলনায় কম পরিমাণ গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত এবং অধিক শাখাপ্রশাখাযুক্ত হয়। গ্লাইকোজেন জলে দ্রবণীয়। প্রাণীদেহে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়, তাই গ্লাইকোজেনকে **প্রাণীজ শ্বেতসার** (Animal starch) বলে। গ্লাইকোজেন দ্রবণে আয়োডিন সংযোগ করলে তা লালচে-বাদামি রঙে পরিণত হয়।

### ● শ্বেতসার ও গ্লাইকোজেনের পার্থক্য (Difference between Starch and Glycogen) :

| শ্বেতসার (স্টার্চ) | গ্লাইকোজেন |
|---|---|
| 1. উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয়ী অঙ্গ থেকে (চাল, গম, আলু) পাওয়া পলিস্যাকারাইড। | 1. প্রাণীদেহে যকৃত ও পেশি থেকে পাওয়া পলিস্যাকারাইড। |
| 2. এটি দু-প্রকার—অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন। অ্যামাইলোজে শুধুমাত্র α-1, 4-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত, কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনে গড়ে 30টি α-1, 4-বন্ধনীর পর একটি করে α-1, 6-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী থাকে, তাই স্টার্চ কম শাখাপ্রশাখাযুক্ত হয়। | 2. গ্লাইকোজেনের প্রকারভেদ নেই। গ্লাইকোজেনে 10টি α-1, 4-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী পর একটি করে α-1, 6-গ্লাইকো-সাইডিক বন্ধনী থাকে। এই কারণে গ্লাইকোজেন বেশি শাখাপ্রশাখা যুক্ত হয়। |
| 3. স্টার্চ ঠান্ডা জলে অদ্রবণীয়। | 3. গ্লাইকোজেন জলে দ্রবণীয়। |
| 4. আয়োডিনের সংস্পর্শে গাঢ় নীল রং ধারণ করে। | 4. আয়োডিনের সংস্পর্শে লালচে বাদামি রং ধারণ করে। |

(iii) **ইনুলিন** (Inulin) **ঃ** ইনুলিন একপ্রকার যৌগ শর্করা যা স্ফীতকন্দ, ডালিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলে এবং পেঁয়াজ, রসুনে পাওয়া যায়। আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ইনুলিন থেকে ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।

(iv) **ডেক্সট্রিন** (Dextrin)—ডেক্সট্রিন একপ্রকার পলিস্যাকারাইড প্রকৃতিজাত নয় (অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না)। শ্বেতসার বা গ্লাইকোজেন পরিপাকের ফলে এটি তৈরি হয়। তাই ডেক্সট্রিনকে **লব্ধ কার্বোহাইড্রেট** (Derived carbohydrate) বলে।

(v) **সেলুলোজ** (Cellulose)—এটি জলে অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড যা বহু গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত। উদ্ভিদ কোশের কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। এই কারণে বিভিন্ন শাকসবজিতে সেলুলোজ পাওয়া যায়।

## ▲ কার্বোহাইড্রেটের ধর্ম (Properties of Carbohydrate)

(1) **ভৌত ধর্ম (Physical properties)**—কার্বোহাইড্রেটের বর্ণবিহীন কেলাসিত ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত জৈব যৌগ।

● রাসায়নিক ধর্ম **(Chemical properties)**—

(2) রাসায়নিকভাবে কার্বোহাইড্রেট **পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল** অন্তর্ভুক্ত শর্করা যার অ্যালডিহাইড মূলক মুখ্য অ্যালকোহল থেকে এবং কিটো মূলক গৌণ অ্যালকোহল থেকে উৎপন্ন হয়।

(3) **এস্টার গঠন (Formation of ester)**—অ্যালকোহল মূলকের উপস্থিতির জন্য কার্বোহাইড্রেট সহজেই অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন প্রকার **এস্টার** গঠন করে, যেমন—ফসফোরিক অ্যাসিড হেক্সোজ বা পেন্টোজ শর্করার সঙ্গে বিক্রিয়া করে হেক্সোজ ফসফেট (যেমন—গ্লুকোজ ফসফেট) বা পেন্টোজ (যেমন—রাইবোজ) ফসফেট যৌগ গঠন করে। হেক্সোজ (গ্লুকোজ) ফসফেট দেহে বিপাক ক্রিয়া, ঝিল্লি (মেমব্রেন) দিয়ে গ্লুকোজের শোষণ বা পুনঃশোষণ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। পেনটোজ ফসফেট RNA এবং DNA-এর (নিউক্লিক অ্যাসিডের) অংশ গঠনে সাহায্য করে।

(4) **বিজারণ ধর্ম (Reducing property)**—কয়েকটি শর্করার মধ্যে অ্যালডিহাইড (– CHO) এবং কিটো (C = O) মূলকগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং ক্ষারীয় দ্রবণে অবস্থিত কপার সালফেটকে ($CuSO_4$) বিজারিত করে কিউপ্রাস অক্সাইডে পরিণত করে। তাই এদের **বিজারণধর্মী শর্করা** বলে। উদাহরণ—গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ প্রভৃতি মনোস্যাকারইড এবং ল্যাকটোজ ও মলটোজ নামে ডাইস্যাকারাইড বিজারণধর্মী শর্করা।

(5) **আইসোমারিজম (Isomerism)**—যেসব রাসায়নিক পদার্থের স্থূল সংকেত একই প্রকারের হয় ও একই মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম ও কাঠামো পৃথক তাদের **আইসোমার** বলে। যেমন—গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজের রাসায়নিক সংকেত একই প্রকার অর্থাৎ $C_6H_{12}O_6$। ওই দুটি শর্করা একই প্রকার মৌলিক উপাদান—কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এই দু'প্রকার শর্করাতে অপ্রতিসম কার্বন পরমাণুর উপস্থিতির জন্য এই প্রকার আইসোমার সৃষ্টি হয়।

(6) **আলোক ঘূর্ণন (Optical rotation)**—সরল শর্করার দ্রবণকে পোলারিমিটারের নলে রেখে তার মধ্য দিয়ে সমবর্তিত আলো (Polarised light) পাঠালে তা ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বা বিপরীত দিকে আবর্তিত হবে। সমবর্তিত আলোক যখন ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বা ডান দিকে আবর্তিত হয়, তখন তাকে **দক্ষিণাবর্ত** বা **ডেক্সট্রোরোটেটারি** (Dextrorotatory) এবং যখন বিপরীত বা বাম দিকে আবর্তিত হয় তাদের **বামাবর্ত** বা **লেভোরোটেটারি** (Levoratatory) বলা হয়। দক্ষিণাবর্তকে যোগ চিহ্ন (+) এবং বামাবর্তকে বিয়োগ (–) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ—D(+) গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত শর্করা এবং L(–) ফ্রুকটোজ বামাবর্ত শর্করা।

(7) **ঘনীভবন (Condensation)**—সরল শর্করা ঘনীভূত হয়ে বৃহৎ অণুযুক্ত শর্করা গঠন করে। **উদাহরণ**—গ্লুকোজ অণুগুলি ঘনীভূত হয়ে পলিস্যাকারাইড গঠন করে।

(8) **মিউটারোটেশন (Mutarotation)**—সদ্য প্রস্তুতিকৃত শর্করার দ্রবণকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে তার মধ্যে আলোক ঘূর্ণনের পরিবর্তন দেখা যায়। পড়ে থাকা শর্করা দ্রবণের আলোক ঘূর্ণনের এই পরিবর্তনকে **মিউটোরোটেশন** (Mutarotation) বলে। সরল শর্করা দুটি অবস্থায় থাকতে পারে, যেমন **শৃঙ্খলাকার** এবং **বলয়াকার**। গ্লুকোজের আলোক ঘূর্ণনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গ্লুকোজের সদ্য প্রস্তুত দ্রবণের মধ্যে দিয়ে আলোক ঘূর্ণন প্রথমে + 112·2° দেখা যায়। এই গ্লুকোজ দ্রবণকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে তার আলোক ঘূর্ণন কমে গিয়ে + 52·7° হয়। এই প্রক্রিয়াকে **পরিবর্তিত ঘূর্ণন** (Mutarotation) বলে। গ্লুকোজ দু-রকম অবস্থায় থাকে, যেমন—$\alpha$ এবং $\beta$ গ্লুকোজ। $\alpha$-গ্লুকোজের আলোক ঘূর্ণন + 112·2° এবং $\beta$-গ্লুকোজের আলোক ঘূর্ণন + 18·7°।

(9) **শর্করা-অম্ল গঠন (Formation of sugar acids)**— অ্যালডোজ শর্করার (গ্লুকোজের) অ্যালডিহাইড মূলক হাইপোব্রোমস অ্যাসিড (HOBr) দিয়ে জারিত হয়ে কার্বোক্সিল বর্গে (—COOH) পরিণত হয়, এর ফলে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোরনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

(10) **শর্করার বলয়াকার গঠন (Formation Ring structure of sugars)**— শর্করার শুধু সরল শৃঙ্খল কাঠামো হিসাবে অবস্থান করে না, কয়েকটি শর্করা, যেমন— গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ দ্রবণে **বলয় বা রিং** (Ring) গঠন করতে পারে।

গ্লুকোজের রিং গঠন
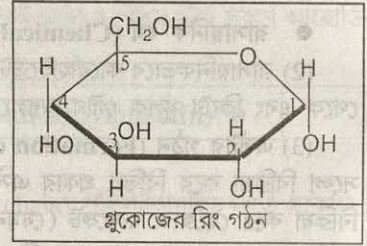
(11) **ওসাজোন উৎপাদন (Osazone formation)**— সবরকম বিজারণধর্মী শর্করাকে ফেনাইলহাইড্রাজিন এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেটের মিশ্রণের সঙ্গে মেশালে **ওসাজেন** যৌগ উৎপন্ন হয় যাকে কেলাসিত অবস্থায় দেখা যায়। কেলাসগুলিতে গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই কেলাসের প্রকৃতি দেখে বিভিন্ন প্রকার শর্করাকে সনাক্ত করা যায়।

(12) **কোহল সন্ধান (Fermentation)**— ঈস্ট বা অন্য কোনো অণুজীব শর্করাকে ফার্মেন্টেশন (সন্ধান) পদ্ধতির সাহায্যে কোহল তৈরি করে।

## 1.7. লিপিড (Lipid)

### ▲ লিপিডের সংজ্ঞা, রাসায়নিক গঠন, শ্রেণিবিন্যাস এবং ধর্ম (Definition, Chemical structure, Classification and Properties of Lipid)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত ফ্যাটি অ্যাসিড নামে জৈব অ্যাসিড এবং গ্লিসেরল নামে অ্যালকোহল পরস্পর বিক্রিয়া করে যে এস্টার তৈরি হয় তাকে লিপিড (Lipid) বলে।**

(b) **রাসায়নিক গঠন (Chemical structure)** ঃ তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ও এক অণু গ্লিসেরল এস্টার বন্ধনী (Ester linkages) দিয়ে যুক্ত হয়ে এক অণু **লিপিড বা ট্রাইগ্লিসেরাইড** (ফ্যাট) গঠন করে। লিপিড অণুতে হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম থাকে, এই কারণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কর্বোহাইড্রেটের মতো জলের ($H_2O$) অনুপাতে থাকে না।

[ **এস্টার**(Ester)—জৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের বিক্রিয়ার ফলে যে জৈব লবণ বিশেষ উৎপন্ন হয় তাকে **এস্টার** বলে। ]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $CH_2OH$ | | $C_{15}H_{31}COOH$ | | $C_{15}H_{31}COOCH_2$ |
| $CHOH$ | + | $C_{15}H_{31}COOH$ | $\xrightleftharpoons{\text{লাইপেজ}}$ | $C_{15}H_{31}COOCH$ + $3H_2O$ |
| $CH_2OH$ | | $C_{15}H_{31}COOH$ | | $C_{15}H_{31}COOCH_2$ জল |
| 1-অণু গ্লিসেরল (অ্যালকোহল) | | 3-অণু পামিটিক অ্যাসিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) | | পামিটিন (লিপিড বা ট্রাইগ্লিসেরাইড) |
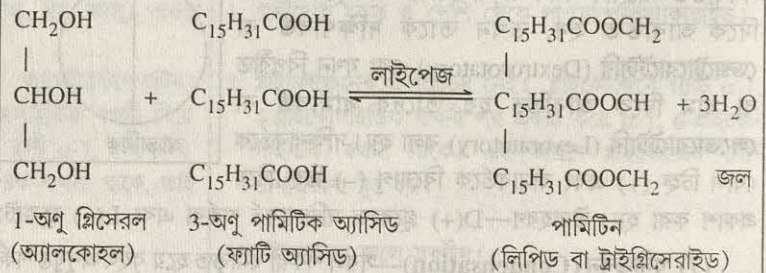
## ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে জৈব অ্যাসিড জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ফ্যাট দ্রাবকে (**fat-solvent**) যেমন—ফুটন্ত অ্যালকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেঞ্জিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয় তাকে ফ্যাটি অ্যাসিড বলে।

প্রকৃতিতে প্রায় 100 রকমের ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রায় প্রতিটি প্রকৃতিজাত ফ্যাটি অ্যাসিড জোড় সংখ্যক কার্বন একটি দীর্ঘ রৈখিক শৃঙ্খল বা চেন নিয়ে গঠিত। চেনের শীর্ষের বাম প্রান্তে একটি মিথাইল ($CH_3$) মূলক ও ডান প্রান্তে একটি কার্বোক্সিল (–COOH) মূলক থাকে। যেমন—

$$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–COOH$$
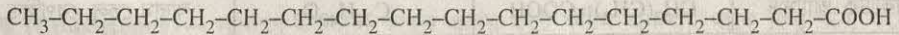
( পামিটিক অ্যাসিড 16টি কার্বনযুক্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংকেত )

(b) **ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রকারভেদ (Types of Fatty acid) :** ফ্যাটি অ্যাসিডকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়—

1. **ফ্যাটি অ্যাসিডে কার্বনের সংখ্যার উপস্থিতি অনুযায়ী**—ফ্যাটি অ্যাসিডকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—

(i) স্বল্প (দশের কম) কার্বনযুক্ত **নিম্নতর ফ্যাটি অ্যাসিড** (Lower fatty acids)।

(ii) অধিক (দশের বেশি) কার্বনযুক্ত **উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিড** (Higher fatty acids)।

যেমন—ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড (6টি কার্বন) এবং স্টিয়ারিক অ্যাসিড (18টি কার্বন) নিয়ে গঠিত।

2. **ফ্যাটি অ্যাসিডে এস্টার বন্ধনীর প্রকৃতি অনুযায়ী**—এস্টার বন্ধনীর প্রকৃতি অনুযায়ী দুই প্রকার—

(i) যেসব ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন পরমাণু পরস্পর **একযোজী বন্ধনী** (Single bonds) দিয়ে যুক্ত থাকে তাদের **সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Saturated fatty acids) বলে। **উদাহরণ—পামিটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, বিউটিরিক অ্যাসিড ইত্যাদি।**

(ii) যেসব ফ্যাটি অ্যাসিডের দুটি কার্বন **দ্বিযোজী বন্ধনী** (Double bonds) দিয়ে যুক্ত থাকে তাদের **অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড** (Unsaturated fatty acids) বলে। **উদাহরণ—লিনোলেনিক অ্যাসিড, লিনোলেয়িক অ্যাসিড এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড।** এই সব অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিকেও **অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড** (Essential fatty acid) বলে।

### ● অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড (Essential Fatty Acids) ●

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে ফ্যাটি অ্যাসিড জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রয়োজন কিন্তু দেহে সংশ্লেষিত হয় না, ফলে খাদ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয় তাদের অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড বলে।**

(b) **উদাহরণ :** লিনোলেনিক অ্যাসিড, লিনোলেয়িক অ্যাসিড এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড নামে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।

$$CH_3–(CH_2)_4–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH = CH–CH_2–CH =CH–(CH_2)_3–COOH$$
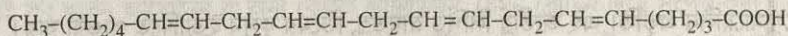
(অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংকেত — 20টি কার্বন এবং 4টি দ্বিযোজী বন্ধনীযুক্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।)

1. **অ্যালকোহল (Alcohol) :** হাইড্রোকার্বন অণুর এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু –OH (হাইড্রোক্সিল) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকে **অ্যালকোহল** বলে।

2. **গ্লিসেরল (Glycerol) : গ্লিসেরল হল তিনটি হাইড্রোক্সিল মূলক যুক্ত অ্যালকোহল।**

$CH_2$—OH
|
CH—OH
|
$CH_2$—OH

গ্লিসেরল

তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে এক অণু গ্লিসেরল যুক্ত হয়ে এবং এক অণু জল অপসারিত করে যে এস্টার উৎপন্ন করে তাকে **ট্রাইগ্লিসেরাইড** (Triglyceride) বা **ফ্যাট** (True fat) বলে। একটি বা দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড এক অণু গ্লিসেরলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে **মোনোগ্লিসেরাইড** বা **ডাইগ্লিসেরাইড** উৎপন্ন করে।
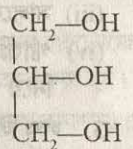
- **A. কয়েকটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড (A few Saturated Fatty Acids) ঃ**

| সাধারণ নাম | গঠন ও সংকেত | আণবিক সংকেত | উৎস |
|---|---|---|---|
| 1. বিউটিরিক অ্যাসিড | $CH_3(CH_2)_2COOH$ | $C_4H_{18}O_2$ | মাখন |
| 2. ক্যাপরোইক অ্যাসিড | $CH_3(CH_2)_4COOH$ | $C_6H_{12}O_2$ | মাখন, নারকেল ও পাম বাদাম তেল। |
| 3. পামিটিক অ্যাসিড | $CH_3(CH_2)_{14}COOH$ | $C_{16}H_{32}O_2$ | উদ্ভিজ্জ তেল এবং প্রাণীজ ফ্যাট। |
| 4. স্টিয়ারিক অ্যাসিড | $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ | $C_{18}H_{36}O_2$ | উদ্ভিজ্জ তেল এবং প্রাণীজ ফ্যাট। |
| 5. অ্যারকিডিক অ্যাসিড | $CH_3(CH_2)_{18}COOH$ | $C_{20}H_{40}O_2$ | বাদাম তেল, রেপসিড তেল, মাখন। |

- **B. কয়েকটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড (A few Unsaturated Fatty Acids) ঃ**

| সাধারণ নাম | আণবিক সংকেত | দ্বিযোজী বন্ধনীর সংখ্যা | উৎস |
|---|---|---|---|
| 1. ওলেইক অ্যাসিড | $C_{18}H_{34}O_2$ | 1 | উদ্ভিজ্জ তেল ও প্রাণীজ ফ্যাট। |
| 2. ইরুসিক অ্যাসিড | $C_{20}H_{38}O_2$ | 1 | সরষের তেল। |
| 3. লিনোলেয়িক অ্যাসিড | $C_{18}H_{32}O_2$ | 2 | উদ্ভিজ্জ তেল ও প্রাণীজ তেল। |
| 4. লিনোলেনিক অ্যাসিড | $C_{18}H_{30}O_2$ | 3 | মসিনার তেল। |
| 5. অ্যারকিডোনিক অ্যাসিড | $C_{20}H_{32}O_2$ | 4 | মাছের যকৃতের তেল, ফসফোলিপিড। |

(b) **লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Lipids) ঃ** লিপিড প্রধানত তিন রকমের হয়, যেমন—

1. **সরল লিপিড** (Simple lipid) ঃ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল (অ্যালকোহল) এস্টার বন্ধনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরল লিপিড গঠন করে। **উদাহরণ**—স্নেহপদার্থ বা (ফ্যাট—Fat) তেল ও মৌচাকের মোম (Bee's wax)।

• লিপিড •

| সরল লিপিড | যৌগ লিপিড | লব্ধ লিপিড |
|---|---|---|
| উদা ঃ 1. ফ্যাট | উদা ঃ 1. ফসফোলিপিড | উদা ঃ 1. স্টেরয়েড |
| 2. মোম | 2. গ্লাইকোলিপিড | 2. টারপিন |
| 3. তেল | 3. সালফোলিপিড | 3. ক্যারটিনয়েড |
| | 4. গ্যাংলিওমাইড | |

2. **যৌগ লিপিড** (Compound lipid) ঃ সরল লিপিডের সঙ্গে অন্য কোনো রাসায়নিক বস্তুর সংযোগ ঘটলে, যে যৌগ সৃষ্টি হয় তাকে যৌগ লিপিড বলা হয়। **উদাহরণ**—

(i) **ফসফোলিপিড** (Phospholipid)—লিপিড + ফসফোরিক অ্যাসিড + নাইট্রোজেনযুক্ত বেস। **উদাহরণ**—লেসিথিন, সেফালিন (কেফালিন), স্ফিংগোমায়েলিন প্রভৃতি। এই জাতীয় লিপিড স্নায়ুতন্ত্র, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

(ii) **গ্লাইকোলিপিড** (Glycolipid)—এটি শর্করাযুক্ত লিপিড। **উদাহরণ**—স্নায়ুর মায়েলিন আবরণী ও মস্তিষ্কের শ্বেত বস্তুতে পাওয়া যায়।

(iii) **সালফোলিপিড** (Sulpholipid)—এটি সালফারযুক্ত লিপিড। **উদাহরণ**—মস্তিষ্ক, শুক্রাণু, বৃক্ক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

(iv) **গ্যাংগ্লিওসাইড** (Ganglioside)—এটি ফ্যাটি অ্যাসিড, ছয় কার্বনযুক্ত কার্বোহাইড্রেট, সিয়ালিক অ্যাসিড ও হেক্সোসামাইন নিয়ে গঠিত। **উদাহরণ**—স্নায়ু, লোহিত কণিকা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

3. **লব্ধ লিপিড** (Derived lipid) ঃ **সরল বা যৌগ লিপিড বিশ্লেষিত হয়ে যে লিপিড জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে লব্ধ লিপিড বলে।** উদাহরণ—(i) স্টেরয়েড, (ii) টারপিন, (iii) ক্যারটিনয়েড ইত্যাদি।

**তেল (Oil) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ স্বাভাবিক কক্ষ-উষ্ণতায় যে ফ্যাট তরল অবস্থায় থাকে তাকে তেল বলে।**

(b) অধিকাংশ ফ্যাট ও তেল মিশ্র ট্রাইগ্লিসেরাইড জাতীয়, কারণ এটি একই রকমের পরিবর্তে দুটি কিংবা তিনটি ভিন্ন প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে গঠিত হয়।

(c) **উদাহরণ**—সরষের তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল, রেপসিড তেল, সয়াবিন তেল প্রভৃতি।

(c) **লিপিড বা ফ্যাটের ধর্ম (Properties of Lipid or Fat) ঃ**

● **1. ফ্যাট বা লিপিডের কয়েকটি ভৌত ধর্ম (Some physical properties of Fats or lipids) ঃ**

1. **দ্রাব্যতা (Solubility)**— ফ্যাট জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ফ্যাট দ্রাবকে (Fat solvent) যেমন— ক্লোরোফর্ম, পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজিন, অ্যাসিটোন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, উত্তপ্ত অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয়।

2. **ঘনত্ব (Consistency)**— সাধারণ উষ্ণতায়, কয়েক প্রকার ফ্যাট কঠিন অবস্থায় থাকে কিন্তু অন্য কয়েকটি তরল অবস্থায় থাকে। অসংপৃক্ত ফ্যাট সাধারণত তরল অবস্থায় থাকে। এই প্রকার তরল যা স্বাভাবিক তাপে তরল অবস্থায় থাকে তাকে **তেল** (Oil) বলে।

3. **গলনাঙ্ক (Melting point)**— বিভিন্ন ফ্যাটের গলনাঙ্ক বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—মানবদেহের ফ্যাটের গলনাঙ্ক 17°C, ফ্যাট 49·5°C ইত্যাদি ফ্যাটের ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনের সংখ্যা, ফ্যাটি অ্যাসিডের সংপৃক্ত এবং অসংপৃক্ত প্রকৃতির উপর গলনাঙ্ক নির্ভর করে। মানুষের দেহের তাপ 37°C। এই কারণে দেহে ফ্যাট তরল অবস্থায় থাকে।

4. **আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)**— জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে ফ্যাটের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হয় অর্থাৎ 1·0-এর চেয়ে কম হয়। কঠিন ফ্যাট তরল ফ্যাটের অপেক্ষা হালকা হয়।

● **ফ্যাটের (লিপিডের) কয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক ধর্ম (Some special chemical properties of Fats or Lipids) ঃ**

5. **রাসায়নিক ধর্ম**—ফ্যাট বর্ণহীন এবং প্রশমিত প্রকৃতির হয়, তবে ফ্যাটকে বাতাসের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ রেখে দিলে আংশিক আর্দ্র বিশ্লেষিত ও জারিত হয়ে অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয় ফলে বর্ণহীন ফ্যাট সামান্য হরিদ্রাভ বর্ণে পরিণত হয়।

6. **সাবানিভবন (স্যাপোনিফিকেশন—Saponification)**—ফ্যাটকে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH or KOH) দ্রবণে ফোটালে ফ্যাটি অ্যাসিড লবণ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এই বস্তুকে সাবান বলে এবং সাবান তৈরি করা পদ্ধতিকে **সাবানিভবন বা স্যাপোনিফিকেশন** বলে।

❖ (i) **সাবানিভবন সংখ্যার সংজ্ঞা (Definition of Saponification number) ঃ এক গ্রাম ফ্যাটের আর্দ্রবিশ্লেষণ থেকে উৎপন্ন মোট ফ্যাটি অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম KOH-এর প্রয়োজন হয় তাকে স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যা বলা হয়।**

(ii) **তাৎপর্য**—স্যাপোনিফিকেশন সংখ্যার দ্বারা কোনো ফ্যাটে যত সংখ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তাদের গড় আণবিক ওজন নির্ণয় করা যায়।

7. **আয়োডিন সংখ্যা (Iodine number)**— কার্বনের যোজ্যতা (Valency) চার। যেসব ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনের যোজ্যতা অসংপৃক্ত থাকে; সেই সব কার্বন আয়োডিন বা অন্য কোনো হ্যালোজেন, যেমন ব্রোমিন দিয়ে সংপৃক্ত করা যায়।

❖ (i) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রতি 100 গ্রাম অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত ফ্যাট যত গ্রাম আয়োডিন নিয়ে সংপৃক্ত হয় তাকে আয়োডিন সংখ্যা বলে।**

(ii) **তাৎপর্য**—আয়োডিনের সংখ্যা কোনো ফ্যাটের অসংপৃক্তির পরিমাণ জানা যায়।

8. **হাইড্রোজিনেশান (Hydrogenation)**— অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন—সস্তা দামের তেলের) সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযুক্তি ঘটিয়ে বনস্পতি ঘি তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিকেল ধাতুর মিহি গুঁড়োকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

9. **জারণ (Oxidation)**— ফ্যাটি অ্যাসিডকে, প্রধানত অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে বাতাসে কিছুক্ষণ খোলা অবস্থায় রেখে দিলে তা সহজেই জারিত হয়ে অ্যালডিহাইড এবং কিটোনে পরিণত হয়। এই সব বস্তু থেকে **রেজিন** নামে বস্তু উৎপন্ন হয়।

10. **র‍্যানসিডিটি (Rancidity)**— পরিবেশের তাপ বৃদ্ধি ঘটলে (যেমন—গ্রীষ্মকালে) এবং অনেক দিন ধরে রাখলে ফ্যাট আংশিক আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড নির্গত করে। এই পদ্ধতিতে ফ্যাটের জারণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, ফলে ফ্যাটের স্বাদ এবং গন্ধের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। **র‍্যান্সিড ফ্যাটকে** সাধারণত পচে যাওয়া ফ্যাট বলে।

• লিপিড এবং পলিস্যাকারাইডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Lipid and Polysaccharides) :

| লিপিড | পলিস্যাকারাইড |
|---|---|
| 1. কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এতে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। | 1. কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এতে $O_2$-এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তা ছাড়া পলিস্যাকারাইডের একক মনোস্যাকারাইডে হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) জলের অনুপাতে (2 : 1) হিসেবে থাকে। |
| 2. এক অণু লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরল নামে দুটি একক বা অণু নিয়ে গঠিত বা এস্টার বন্ধনী দিয়ে যুক্ত। | 2. এক অণু পলিস্যাকারাইড দশের বেশি একক শর্করা বা মনোস্যাকারাইড নিয়ে গঠিত যা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে। |
| 3. সব লিপিডই জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু স্নেহদ্রাবকে দ্রবণীয়। | 3. কোনো কোনো পলিস্যাকারাইড (শ্বেতসার) জলে অদ্রবণীয়, আবার কতকগুলি (গ্লাইকোজেন) জলে দ্রবণীয়। |
| 4. লিপিড উদ্ভিদে তেল হিসেবে এবং প্রাণীদেহে মেদ (চর্বি) হিসেবে জমা থাকে। | 4. পলিস্যাকারাইড এটি উদ্ভিদদেহে শ্বেতসার এবং প্রাণীদেহে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে। |

• ফ্যাট এবং তেলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Fat and Oil) :

| ফ্যাট | তেল |
|---|---|
| 1. ট্রাইগ্লিসারাইড যা সাধারণত 20°C জমাট অবস্থায় থাকে তাকে ফ্যাট বলে। | 1. ট্রাইগ্লিসারাইড যা 20°C তরল অবস্থায় থাকে তাকে তেল বলে। |
| 2. এতে বহুকার্বনযুক্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। | 2. এতে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। |
| 3. উৎস—সাধারণত প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া যায়। | 3. উৎস—সাধারণত উদ্ভিদ উৎস থেকে পাওয়া যায়। |

## ❂ 1.8. প্রোটিন (Protein)

### ▲ প্রোটিনের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিন্যাস ও ধর্ম (Definition, Classification and Properties of Protein)

প্রোটিন কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N) নিয়ে গঠিত জটিল জৈব যৌগ পদার্থ। কখনো-কখনো প্রোটিনে সালফার (S) ও ফসফরাস (P) থাকে। এইসব C, H, O এবং N পরমাণুর সজ্জাবিন্যাসের ফলে প্রায় কুড়ি (20) প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু গঠিত হয়। প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামাইনো ($-NH_2$) নামে ক্ষারীয় মূলক ও একটি কার্বোক্সিল (–COOH) নামে অ্যাসিড মূলক থাকে। কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পেপটাইড বন্ধনী (Peptide bond, —CO-NH) দিয়ে যুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠন করে। তাই অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিন অণুর একক বলা হয়। প্রোটিন (গ্রিক শব্দ *Protos* = প্রাথমিক বা আদি) হল দেহের প্রাথমিক অত্যাবশ্যক উপাদান।

$$CH_3-\underset{NH_2}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH \quad \text{অথবা} \quad CH_3-CH-(NH_2)-COOH$$

(অ্যালানিন—একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন)
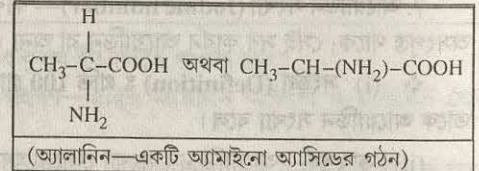
কোনো কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডে অ্যামাইনো মূলকের ($-NH_2$) পরিবর্তে **ইমিনো (–NH)** মূলক থাকে। তাই এদের **ইমিনো অ্যাসিড** (Imino acid) বলে। উদাহরণ—প্রোলিন এবং হাইড্রোক্সিপ্রোলিন।

❖ (a) **প্রোটিনের সংজ্ঞা (Definition of Protein) : কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের একক (Monomeric units or monomers) পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে যে জৈব যৌগ (পলিমার—Polymers) গঠন করে তাকে প্রোটিন বলে।**

প্রোটিনকে তিন ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন—সরল প্রোটিন, সংযুক্ত বা কন্‌জুগেটেড প্রোটিন এবং লব্ধ বা ডিরাইভড্ প্রোটিন।

(b) প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস ঃ (Classification of Proteins) ঃ

### ➤ A. সরল প্রোটিন (Simple protein) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে প্রোটিন অ-মিশ্র অর্থাৎ শুধু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে সরল প্রোটিন বলে।**

(b) **উদাহরণ ঃ** 1. **প্রোটামিন** (Protamine) —স্যালমোন (Salmon) এবং হেরিং (Herring) মাছের শুক্রাণুতে প্রোটামিন জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়। এটি উত্তাপে তঞ্চিত হয় না। এটি তীব্র ক্ষারীয় ও জলে দ্রবণীয়।

2. **হিস্টোন** (Histone)—হিস্টোন রক্তের হিমোগ্লোবিন ও থাইমাস গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার প্রোটিন ক্ষারীয় ও জলে দ্রবণীয় সরল প্রোটিন। লবণের উপস্থিতিতে এটি উত্তাপে তঞ্চিত হয়।

3. **অ্যালবুমিন** (Albumin)—ডিমের সাদা অংশ (Egg albumin), প্লাজমার সিরাম-অ্যালবুমিন, দুধের ল্যাকটো-অ্যালবুমিন ইত্যাদি অ্যালবুমিন জাতীয় সরল প্রোটিন। এই প্রকার প্রোটিন জলে দ্রবণীয় এবং উত্তাপে এটি তঞ্চিত হয়।

4. **গ্লোবিউলিন** (Globulin)—ডিমের পীতাভ ওভোগ্লোবিউলিন, প্লাজমার সিরাম গ্লোবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি এই জাতীয় প্রোটিন। এই প্রোটিন পাতিত জলে অদ্রবণীয় এবং উত্তাপে তঞ্চিত হয়।

5. **গ্লুটেলিন** (Glutelin)—চাল, গম ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রোটিন অ্যাসিড ও ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়।

**• প্রোটিন •**

| সরল প্রোটিন (শুধু অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত) | সংযুক্ত প্রোটিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড + অপ্রোটিন পদার্থ নিয়ে গঠিত) | লব্ধ প্রোটিন (পরিপাকের ফলে উৎপন্ন হয়) |
|---|---|---|
| 1. প্রোটামিন | 1. নিউক্লিওপ্রোটিন | 1. প্রোটিআন |
| 2. হিস্টোন | 2. ফসফোপ্রোটিন | 2. মেটাপ্রোটিন |
| 3. অ্যালবুমিন | 3. ক্রোমোপ্রোটিন | 3. প্রোটিওস |
| 4. গ্লোবিউলিন | 4. গ্লাইকোপ্রোটিন | 4. পেপটোন |
| 5. গ্লুটেলিন | 5. লাইপোপ্রোটিন | 5. পেপ্টাইড |
| 6. স্ক্লেরোপ্রোটিন | 6. মেটালোপ্রোটিন | |
| 7. গ্লিয়াডিন | | |

6. **স্ক্লেরোপ্রোটিন** (Scleroprotein)—কেশ, নখ, শিং, ক্ষুর ইত্যাদির কেরাটিন এবং তরুণাস্থি, অস্থিবন্ধনীর ইলাস্টিন ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই প্রোটিন জলে অদ্রবণীয়।

7. **গ্লিয়াডিন** (Gliadin)—বার্লি, গম, ভুট্টা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

### ➤ B. সংযুক্ত বা কন্‌জুগেটেড প্রোটিন (Conjugated protein) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ সরল প্রোটিন কোনো অ-প্রোটিন (Nonprotein) রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকে যুক্ত বা যৌগ প্রোটিন বলা হয়।**

1. **নিউক্লিওপ্রোটিন** (Nucleoprotein)—প্রোটিনের সঙ্গে নিউক্লিক (Nucleic) অ্যাসিড যুক্ত হয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন গঠিত হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড হল একপ্রকার অপ্রোটিন অংশ যা ফসফোরিক অ্যাসিড, রাইবোজ বা ডিঅক্সিরাইবোজ নামে পেনটোজ শর্করা এবং পিউরিন বা পিরিমিডিন নামে নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত। **উদাহরণ**—নিউক্লিওপ্রোটিন কোশের নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়।

2. **ফসফোপ্রোটিন** (Phosphoprotein)—প্রোটিনের সঙ্গে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে এই প্রোটিন তৈরি হয়। **উদাহরণ**—ডিমের কুসুমের অবস্থিত ভাইটেলিন এবং দুধের কেসিনোজেন।

3. **ক্রোমোপ্রোটিন** (Chromoprotein)—প্রোটিন এবং অপর একটি রঞ্জক পদার্থ সমন্বয়ে ক্রোমোপ্রোটিন গঠিত হয়। **উদাহরণ**—রক্তের হিমোগ্লোবিন, রেটিনার রোডোপসিন, সাইটোক্রম ইত্যাদি।

4. **গ্লাইকোপ্রোটিন** (Glycoprotein)—কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে প্রোটিন যুক্ত হয়ে এটি গঠন করে। কার্বোহাইড্রেট জটিল মিউকোপলিস্যাকারাইড (Mucopolysaccharide) হিসাবে এই প্রোটিনে থাকে। **উদাহরণ**— শ্লেষ্মাঝিল্লি ও অন্যান্য গ্রন্থির শ্লেষ্মায় (মিউকাস) গ্লাইকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

5. **লাইপোপ্রোটিন** (Lipoprotein)–ফসফোলিপিডের সঙ্গে প্রোটিনের সংযুক্তিতে এটি তৈরি হয়। **উদাহরণ**— দুধ, ডিম, কোশের নিউক্লিয়াস, প্লাজমা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

6. **মেটালোপ্রোটিন** (Metalloprotein)—লোহা, তামা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে প্রোটিন যুক্ত হয়ে মেটালোপ্রোটিন গঠন করে। উদাহরণ— বিভিন্ন এনজাইমে মেটালোনোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

### ➤ C. লব্ধ বা ডিরাইভড্ প্রোটিন (Derived Protein) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ ভৌত বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অথবা প্রোটিনের পরিপাকের সময় সরল বা কন্‌জুগেটেড প্রোটিন ক্রমশ বিশ্লিষ্ট হয়ে যে প্রোটিন উৎপন্ন করে তাকে ডিরাইভড্ বা লব্ধ প্রোটিন বলে।**

(b) **উদাহরণ**—প্রোটিআন (Protean), মেটাপ্রোটিন (Metaprotein), প্রোটিওস (Proteose), পেপ্‌টোন (Peptone) ও পেপটাইড (Peptide)।

### ❂ অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acids) ঃ

❖ (a) **অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংজ্ঞা— যে জৈব অ্যাসিড প্রোটিন অণুর গঠনগত একক হিসাবে কমপক্ষে একটি অ্যামাইনো ($-NH_2$) এবং একটি কার্বোক্সিল $-COOH$) মূলক নিয়ে গঠিত হয় তাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে।**

(b) **প্রকৃতিজাত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা**—বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণে প্রায় 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। একটি ইমিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

প্রোটিন অণুতে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি রাসায়নিক যোজকের (Chemical bond) সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। এই যোজক **পেপটাইড বন্ধনী** (CO-NH) নামে পরিচিত। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের $-NH_2$ মূলক পরবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডের $-COOH$ মূলকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং এক অণু $H_2O$ অপসারণের মাধ্যমে **পেপটাইড বন্ধনী** গঠন করে।

$$H_2N-\overset{R_1}{\underset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH \;+\; H-\overset{H}{N}-\overset{R_2}{\underset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$$

অ্যামাইনো অ্যাসিড$_1$ অ্যামাইনো অ্যাসিড$_2$

$\rightarrow H_2O$

$$H_2N-\overset{R_1}{\underset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{H}{N}-\overset{R_2}{\underset{H}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$$

পেপটাইড বন্ধনী

(c) **অ্যামাইনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিন্যাস** ঃ অ্যামাইনো মূলক ($-NH_2$) কিংবা কার্বোক্সিল মূলকের ($-COOH$) সংখ্যার উপস্থিতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রধানত বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন—

(i) **প্রশমিত অ্যামাইনো অ্যাসিড (মোনোঅ্যামাইনো মোনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড)**—এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রশমিত কারণ এগুলি একটি অ্যামাইনো (ক্ষারীয়) মূলক এবং একটি কার্বোক্সিল (অ্যাসিড) মূলক নিয়ে গঠিত হয়। **উদাহরণ**—ভ্যালিন, সেরিন, গ্লাইসিন, অ্যালানিন, থ্রিওনিন, আইসোলিউসিন এবং লিউসিন (7টি অ্যামাইনো অ্যাসিড)।

(ii) **অম্লজাতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (মনোঅ্যামাইনো ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড)**— এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডে একটি অ্যামাইনো মূলক এবং দুটি কার্বোক্সিল মূলক থাকে। এই কারণে এই প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি অম্লধর্মীয় হয়। **উদাহরণ**—অ্যাসপারটিক অ্যাসিড এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড (2টি অ্যামাইনো অ্যাসিড)।

(iii) **ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (ডাই অ্যামাইনো মনোকার্বক্সিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড)**—এই রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড একটি কার্বোক্সিল মূলক এবং দুটি অ্যামাইনো মূলক নিয়ে গঠিত। এই কারণে এই প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি ক্ষারধর্মী হয়। **উদাহরণ**—লাইসিন, হাইড্রোক্সিলাইসিন এবং আরজিনিন (3টি অ্যামাইনো অ্যাসিড)।

(iv) **সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড**—এই প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডে সালফার (S) থাকে। **উদাহরণ**—সিস্টিন এবং মিথিওনিন (2টি অ্যামাইনো অ্যাসিড)।

(v) **অ্যারোমেটিক ও হেটেরোসাইক্লিক্ অ্যামাইনো অ্যাসিড**—ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন, ট্রিপটোফেন, হিস্টিডিন, প্রোলিন, হাইড্রোক্সিপ্রোলিন (6টি অ্যামাইনো অ্যাসিড)।
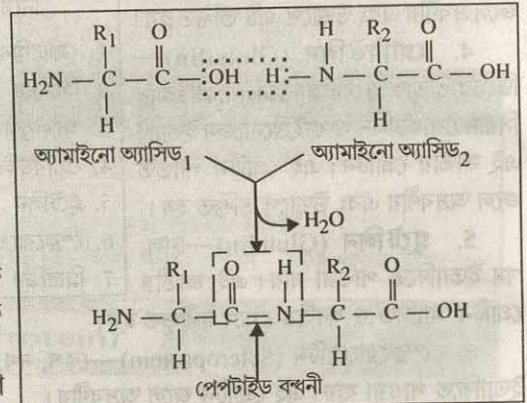
#### ● ইমিনো অ্যাসিড (Imino Acid) ●

ইমিনো অ্যাসিড একপ্রকার জৈব অ্যাসিড যাতে বাইভেলেন্ট ইমিনো মূলক ($C=NH$) থাকে।
কখনো-কখনো ইমিনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যবর্তী লব্ধ পদার্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।
**উদাহরণ**—প্রোলিন এবং হাইড্রোক্সিপ্রোলিন। এদের অ্যামাইনো গ্রুপের ($-NH_2$) পরিবর্তে ইমিনো গ্রুপ ($-NH$) গ্রুপ থাকে।

(c) প্রোটিনের ধর্ম (Properties of Protein)

প্রোটিনের প্রকৃতি শুধু যে প্রোটিনের একক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা এবং প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে তাই নয়, তারা (প্রোটিন) অন্যান্য ফ্যাক্টর, যেমন— বিভিন্ন প্রোটিনের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, তাদের শারীরবৃত্তীয় ধর্মের প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে। নীচে কয়েকটি সাধারণ ও বিশেষ ধর্মগুলি উল্লেখ করা হল।

1. **ভৌত ধর্ম (Physical properties)** : সাধারণত কিছু কিছু প্রোটিন কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে বেশির ভাগ প্রোটিন **কোলোয়েড** প্রকৃতির যা কোলোয়েডের প্রতিটি ধর্ম প্রদর্শন করে। প্রোটিন জলে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবীভূত হয়।

2. **প্রোটিনের অম্ল ও ক্ষারীয় ধর্ম (Acid and Alkali properties of proteins)** : প্রোটিন বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড একক নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে অন্তত একটি **অ্যামাইনো মূলক** ($-NH_2$) নামে ক্ষারীয় মূলক এবং একটি **কার্বোক্সিল মূলক** (—COOH) নামে অ্যাসিড মূলক থাকে। এই প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রশমিত **অ্যাম্ফোটেরিক** (Amphoteric) অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। কোনো কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডে দুটি অ্যামাইনো মূলক বা দুটি কার্বোক্সিল মূলক থাকে। এগুলি যথাক্রমে ক্ষারীয় এবং অম্লজাতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড গঠন করে। আবার এই প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডযুক্ত প্রোটিন যথাক্রমে ক্ষারীয় এবং অম্লজাতীয় প্রোটিন তৈরি করে। এছাড়া প্রোটিন দ্রবণের দ্রাবকের pH-এর উপর প্রোটিনের অ্যাসিড ও অ্যালক্যালি প্রকৃতিও নির্ভর করে।

**• জুইটার আয়ন (Zwitter ions) •**

কেলাসিত অবস্থায় অ্যামাইনো অ্যাসিডের $—NH_2$ মূলক এবং —COOH মূলক দুটি আয়নিত (Ionised) অবস্থায় থাকে এবং প্রতিটি প্রোটিন অণুতে কমপক্ষে একটি অ্যামাইনো মূলক এবং একটি কার্বোক্সিল মূলক থাকে। প্রোটিন তাই উভধর্মী পদার্থ (Amphoteric substance)। দেখা গেছে প্রোটিন **বাইপোলার আয়ন** (Bipolar ions) বা **জুইটার আয়ন** গঠন করে। এই অবস্থায় —COOH মূলকের $H^+$ আয়ন $NH_2$ মূলক স্থানান্তরিত হয়।

3. **সমতড়িৎ বিন্দু (Isoelectric point)**— একটি নির্দিষ্ট pH-এ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন পরস্পর সমান থাকে। এই অবস্থায় প্রোটিন তড়িৎক্ষেত্রে গতিশীল হয় না। এই নির্দিষ্ট pH বিন্দুকে প্রোটিনের **সমতড়িৎ বিন্দু** (Isoelectric point) বলা হয়। সমতড়িৎ বিন্দু বিভিন্ন প্রোটিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। একটি নির্দিষ্ট সমতড়িৎ বিন্দুতে প্রোটিন অধঃক্ষিপ্ত হয়।

4. **ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis)**— একটি তড়িৎক্ষেত্রে প্রোটিন অণুর ধনাত্মক (Anode) বা ঋণাত্মক (Cathode) মেরুর দিকে বিচলনকে **ইলেকট্রোফোরেসিস** বলে। এই প্রকার বিচলন ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তড়িৎক্ষেত্রে এজাতীয় চলন পরিমাপ করে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিনকে সনাক্তকরণ সম্ভবপর।

5. **প্রোটিনের গুণ পরিবর্তন (Denaturation of Protein)**— কয়েকটি প্রণালী যেমন—উষ্ণতা ও ঠান্ডা, অ্যাসিড ও অ্যালকালি, কয়েকটি জৈব দ্রাবক (ইউরিয়া, অ্যাসিটোন), বিকিরণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, দ্রুত ঝাঁকানি ইত্যাদি কারণগুলি প্রোটিন অণুর মৌলিক গঠনের পরিবর্তন ঘটায়। এই অবস্থায় কখনো-কখনো প্রোটিন অণু ভেঙে ছোটো ছোটো উপাদানে পরিবর্তিত হয়। আবার কখনো-কখনো প্রোটিনের কয়েকটি ধর্মকেও বিনষ্ট করে। এই সব প্রণালীর মাধ্যমে প্রোটিনের স্বাভাবিক গুণের (গঠন ও ধর্মের) পরিবর্তন ঘটে।

6. **ব্যাপিতকরণ (Diffusibility)**— বেশির ভাগ প্রোটিনের আণবিক ওজন অধিক হয়, যার দ্রাবক আসক্ত বা ইমালসয়েড প্রকৃতির দ্রবণ তৈরি করে যা কোশের মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে পারে না।

7. **তঞ্চন (Coagulation)**— বেশির ভাগ প্রোটিন তাপে (Heat) এবং অ্যাসিড দ্বারা তঞ্চিত হয়। তঞ্চনের ফলে তঞ্চিত প্রোটিনের অন্তঃআণবিক পরিবর্তন ঘটে।

8. **অধঃক্ষেপণ (Precipitation)**— প্রোটিনকে বিভিন্ন ভাবে অধঃক্ষিপ্ত করা যায়। সমতড়িৎ অধঃক্ষেপণ সম্বন্ধে আগে আলোচিত হয়েছে। অধঃক্ষেপণের সময় বিভিন্ন প্রোটিন অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে বড়ো অণু তৈরি করে যা দ্রবণের মধ্যে থিতিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় অধঃক্ষিপ্ত প্রোটিন অণুর মধ্যে (অন্তঃআণবিক) কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

**◘ অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রোটিন সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য (Some important facts about Amino acid and Protein) :**

● 1. **অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Essential Amino Acids) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা**—যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, নাইট্রোজেন সাম্য, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য একান্ত প্রয়োজন কিন্তু এগুলি দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না ফলে বাইরে থেকে এদের খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় **তাদের অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে।**

(b) **উদাহরণ**—অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সংখ্যায় ৪টি। এদের নাম হল—(i) ভ্যালিন, (ii) আইসোলিউসিন, (iii) লিউসিন, (iv) লাইসিন, (v) ফেনাইল অ্যালানিন, (vi) মিথিওনিন, (vii) থ্রিওনিন এবং (viii) ট্রিপ্‌টোফ্যান।

● 2. **অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (Non-essential Amino Acid) :**

(a) মানুষের দেহে 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এর মধ্যে আটটিকে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বাকি 12টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে **অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড** বলে।

(b) **অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের গুরুত্ব**—(i) এরা অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহে সংশ্লেষিত করে। (ii) খাদ্যে এই সব অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সরবরাহ কম হলে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা বেড়ে যায় এবং দেহে সংশ্লেষণধর্মী বিক্রিয়া কমে যায়।

● 3. **কিটোজেনিক এবং গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড (Ketogenic and Glucogenic Amino acids) :**

(i) **কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Ketogenic amino acids)— দেহের প্রয়োজনে যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাট এবং কিটোন বডি নামে জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে তাদের **কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড** বলে। **উদাহরণ**—লিউসিন, আইসোলিউসিন প্রভৃতি।

(ii) **গ্লুকোজেনিক বা অ্যান্টিকিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Glucogenic amino acid Or, Antiketogenic amino acids)— যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োজনে যকৃতে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, নিওগ্লুকোজেনেসিস এবং অন্যান্য জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ এবং গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষ ঘটায় তাদের **গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বা অ্যান্টিকিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড** বলে। **উদাহরণ**— অ্যালানিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

● 4. **সম্পূর্ণ প্রোটিন এবং অসম্পূর্ণ প্রোটিন অথবা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন (Complete protein and Incomplete protein Or, First class protein and Second class protein) :**

(i) **সম্পূর্ণ প্রোটিন (Complete or Adequate protein)**—প্রধানত প্রাণীজ প্রোটিনকে **প্রথম শ্রেণির প্রোটিন** বলে। এই ধরনের প্রোটিনের জৈব মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ এই ধরনের প্রোটিন পরিমাণ মতো খেলে এরা একসঙ্গে দেহবৃদ্ধি এবং বয়স্কদের নাইট্রোজেন সাম্য ও দৈহিক ওজন বজায় রাখতে পারে। প্রথম শ্রেণির প্রোটিনকে তাই সম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। **উদাহরণ**—মাংস, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

(ii) **অসম্পূর্ণ প্রোটিন (Incomplete or Inadequate protein)**—বেশির ভাগ উদ্ভিদ প্রোটিনকে সাধারণত **দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন** বলে। কারণ এতে একটি বা একাধিক অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড অনুপস্থিত থাকে অথবা থাকলেও তাদের পরিমাণ সঠিক থাকে না। এই কারণে এরা দেহের নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখতে পারে না। তাই দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিনকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। **উদাহরণ**—প্রধানত প্রাণীজ প্রোটিন, যেমন—গমের গ্লিয়াডিন, সোয়াবিনের লেগুমেলিন প্রভৃতি।

● **কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Carbohydrate, Protein and Fat) :**

| কার্বোহাইড্রেট | ফ্যাট | প্রোটিন |
|---|---|---|
| 1. কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ। | 1. কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ। | 1. কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত জৈব যৌগ। |
| 2. হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1 হিসেবে থাকে। | 2. হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন জলের অনুপাতে অর্থাৎ 2 : 1 হিসেবে থাকে না। | 2. প্রোটিনে কার্বন ও হাইড্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম থাকে। |

| কার্বোহাইড্রেট | ফ্যাট | প্রোটিন |
|---|---|---|
| 3. প্রধান কাজ—তাপশক্তি উৎপাদন। | 3. প্রধান কাজ—তাপশক্তি উৎপাদন | 3. প্রধান কাজ—দেহবৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতিপূরণ। |
| 4. উদ্ভিদদেহে শ্বেতসার এবং প্রাণীদেহে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে। | 4. উদ্ভিদদেহে তেলরূপে এবং প্রাণীদেহে মেদরূপে জমা থাকে। | 4. দেহে জমা থাকে না কিন্তু হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদি সংশ্লেষ করে। |
| 5. এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে 4·0 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়। | 5. এক গ্রাম ফ্যাট থেকে 9·3 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়। | 5. এক গ্রাম প্রোটিন থেকে 4·1 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়। |

## ■ কয়েকটি সাধারণ ভারতীয় খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান ■

[প্রতি 100 গ্রাম ভোজ্য (edible) খাদ্যে প্রাপ্ত পরিমাণ]

[ *Source : Nutritive Value of Indian Foods by Gopalan, Ramashastri and Balasubramaniam* ]

| খাদ্যের নাম | জলীয় অংশ (গ্রাম) | প্রোটিন (গ্রাম) | স্নেহ পদার্থ (গ্রাম) | কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম) | খনিজ পদার্থ (গ্রাম) | তাপশক্তি (কিলো ক্যালোরি) | ক্যালশিয়াম (মিলি. গ্রাম) | লৌহ (মিলিগ্রাম) | ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম) | থায়ামিন (মিলিগ্রাম) | রাইবোফ্লেভিন (মিলিগ্রাম) | নিয়াসিন (মিলিগ্রাম) | ভিটামিন-সি (মি.গ্রা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **দানা শস্য ঃ** | | | | | | | | | | | | | |
| চাল—সিদ্ধ, ঢেঁকিছাঁটা | 12·6 | 8·6 | 0·6 | 77·4 | 0·9 | 349 | 10 | 2·8 | 9 | 0·27 | 0·12 | 4·0 | 0 |
| আতপ ঢেঁকিছাঁটা | 13·3 | 7·5 | 1·0 | 76·7 | 0·9 | 346 | 10 | 3·2 | 2 | 0·21 | 0·16 | 3·9 | 0 |
| সিদ্ধ কলেছাঁটা | 13·3 | 6·4 | 0·4 | 79·0 | 0·7 | 346 | 9 | 4·0 | 0 | 0·21 | 0·05 | 3·8 | 0 |
| আতপ কলেছাঁটা | 13·7 | 6·8 | 0· | 78·2 | 0·6 | 345 | 10 | 3·1 | 0 | 0·06 | 0·06 | 1·9 | 0 |
| গম— আটা | 12·2 | 12·1 | 1·7 | 69·4 | 2·7 | 341 | 48 | 11·5 | 29 | 0·49 | 0·29 | 4·3 | 0 |
| ময়দা | 13·3 | 11·0 | 0·9 | 73·9 | 0·6 | 348 | 23 | 2·5 | 25 | 0·12 | 0·07 | 2·4 | 0 |
| ভুট্টা | 14·9 | 11·1 | 3·6 | 66·2 | 1·5 | 342 | 10 | 2·0 | 90 | 0·42 | 0·10 | 1·8 | 0 |
| **ডাল ঃ** মশুর | 12·4 | 25·1 | 0·7 | 59·0 | 2·1 | 343 | 69 | 4·8 | 270 | 0·45 | 0·20 | 2·6 | 0 |
| মুগ | 10·1 | 24·5 | 1·2 | 59·9 | 3·5 | 348 | 75 | 8·5 | 49 | 0·72 | 0·15 | 2·0 | 0 |
| ছোলা | 9·9 | 20·8 | 5·6 | 59·8 | 2·7 | 372 | 56 | 9·1 | 129 | 0·48 | 0·18 | 2·4 | 1 |
| মটর | 16·0 | 19·7 | 1·1 | 56·5 | 2·2 | 315 | 75 | 5·1 | 39 | 0·47 | 0·19 | 3·4 | 0 |
| **শাক ঃ** পালং | 92·1 | 2·0 | 0·7 | 2·9 | 1·7 | 26 | 73 | 10·9 | 5,580 | 0·03 | 0·26 | 0·5 | 28 |
| মুলো | 90·8 | 3·8 | 0·4 | 2·4 | 1·6 | 28 | 265 | 3·6 | 5,295 | 0·18 | 0·47 | 0·8 | 81 |
| কচু (সবুজ) | 82·7 | 3·9 | 1·5 | 6·8 | 2·2 | 56 | 227 | 10·0 | 10,278 | 0·22 | 0·26 | 1·1 | 12 |
| ধনেপাতা | 86·3 | 3·3 | 0·6 | 6·3 | 2·3 | 44 | 184 | 18·5 | 6,918 | 0·05 | 0·06 | 0·8 | 135 |
| কলমি | 90·3 | 2·9 | 0·4 | 3·1 | 2·1 | 28 | 110 | 3·9 | 1,980 | 0·05 | 0·13 | 0·6 | 137 |
| বাঁধাকপি | 91·3 | 1·8 | 0·1 | 4·6 | 0·6 | 27 | 39 | 0·8 | 1,200 | 0·06 | 0·09 | 0·4 | 124 |
| **কন্দ ও মূল ঃ** | | | | | | | | | | | | | |
| মিষ্টি আলু | 68·5 | 1·2 | 0·3 | 28·2 | 1·0 | 120 | 46 | 0·8 | 6 | 0·08 | 0·04 | 0·7 | 24 |
| গাজর | 86·0 | 0·9 | 0·2 | 10·6 | 1·1 | 48 | 80 | 2·2 | 1,890 | 0·04 | 0·02 | 0·6 | 3 |
| বীট | 87·7 | 1·7 | 0·1 | 8·8 | 0·8 | 43 | 18 | 1·0 | 0 | 0·04 | 0·09 | 0·4 | 10 |
| কচু | 73·1 | 3·0 | 0·1 | 21·1 | 1·7 | 97 | 40 | 1·7 | 24 | 0·09 | 0·06 | 0·4 | 0 |
| আলু | 74·7 | 1·6 | 0·1 | 22·6 | 0·6 | 97 | 10 | 0·7 | 24 | 0·10 | 0·01 | 1·2 | 17 |
| মুলো (লাল) | 90·8 | 0·6 | 0·3 | 6·8 | 0·9 | 32 | 50 | 0·5 | 3 | 0·06 | 0·02 | 0·4 | 17 |
| পিঁয়াজ | 86·6 | 1·1 | 0·1 | 11·1 | 0·4 | 50 | 47 | 0·7 | 0 | 0·08 | 0·01 | 0·4 | 11 |

| খাদ্যের নাম | জলীয় অংশ (গ্রাম) | প্রোটিন (গ্রাম) | স্নেহ পদার্থ (গ্রাম) | কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম) | খনিজ পদার্থ (গ্রাম) | তাপশক্তি (কিলো ক্যালোরি) | ক্যালশিয়াম (মিলি. গ্রাম) | লৌহ (মিলিগ্রাম) | ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম) | থায়ামিন (মিলিগ্রাম) | রাইবোফ্লেভিন (মিলিগ্রাম) | নিয়াসিন (মিলিগ্রাম) | ভিটামিন-সি (মি.গ্রা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **অন্যান্য সবজি :** | | | | | | | | | | | | | |
| চালকুমড়ো | 96·5 | 0·4 | 0·1 | 1·9 | 0·3 | 10 | 30 | 0·8 | 0 | 0·06 | 0·01 | 0·4 | 1 |
| কুমড়া | 92·6 | 1·4 | 0·1 | 4·6 | 0·6 | 25 | 10 | 0·7 | 50 | 0·06 | 0·04 | 0·5 | 2 |
| বেগুন | 92·7 | 1·4 | 0·3 | 4·0 | 0·3 | 24 | 18 | 0·9 | 74 | 0·04 | 0·11 | 0·9 | 12 |
| ফুলকপি | 90·8 | 2·6 | 0·4 | 4·0 | 1·0 | 30 | 33 | 1·5 | 30 | 0·04 | 0·1 | 1 | 56 |
| ঢেঁড়স | 89·6 | 1·9 | 0·2 | 6·4 | 0·7 | 35 | 66 | 1·5 | 52 | 0·07 | 0·1 | 0·6 | 13 |
| পেঁপে | 92·0 | 0·7 | 0·2 | 5·7 | 0·5 | 27 | 28 | 0·9 | 0 | 0·01 | 0·01 | 0·1 | 12 |
| কাঁচা কলা | 83·2 | 1·4 | 0·2 | 14·0 | 0·5 | 64 | 10 | 0·6 | 30 | 0·05 | 0·02 | 0·03 | 24 |
| কাঁচা মটরশুঁটি | 72·1 | 7·2 | 0·1 | 15·9 | 0·8 | 93 | 20 | 1·5 | 83 | 0·25 | 0·01 | 0·08 | 9 |
| **ফলমূল :** | | | | | | | | | | | | | |
| আপেল | 84·6 | 0·2 | 0·5 | 13·4 | 0·3 | 59 | 10 | 1·0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| আঙুর | 82·2 | 0·6 | 0·4 | 13·1 | 0·9 | 58 | 2 | 0·5 | 3 | 0·04 | 0·03 | 0·2 | 1 |
| কলা, পাকা | 70·1 | 1·2 | 0·3 | 27·2 | 0·8 | 116 | 17 | 0·9 | 78 | 0·05 | 0·08 | 0·5 | 7 |
| পেয়ারা | 81·7 | 0·9 | 0·3 | 11·2 | 0·7 | 51 | 10 | 1·4 | 0 | 0·03 | 0·03 | 0·4 | 212 |
| আম | 81·0 | 0·6 | 0·4 | 16·9 | 0·4 | 74 | 14 | 1·3 | 2743 | 0·08 | 0·09 | 0·9 | 16 |
| তরমুজ | 95·8 | 0·2 | 0·2 | 3·3 | 0·3 | 16 | 11 | 7·9 | 0 | 0·02 | 0·04 | 0·1 | 1 |
| পাকা পেঁপে | 90·8 | 0·6 | 0·1 | 7·2 | 0·5 | 32 | 17 | 0·5 | 666 | 0·04 | 0·25 | 0·2 | 57 |
| কমলালেবু | 87·6 | 0·7 | 0·2 | 10·9 | 0·3 | 48 | 26 | 0·3 | 1104 | 0·06 (রস) | 0·02(রস) | 0·4 (রস) | 64 |
| আনারস | 87·8 | 0·4 | 0·1 | 10·8 | 0·4 | 46 | 20 | 1·2 | 18 | 0·2 | 0·12 | 0·1 | 39 |
| পাতিলেবু | 85·0 | 1·0 | 0·9 | 11·1 | 0·3 | 57 | 70 | 2·3 | 0 | 0·2(রস) | 0·01(রস) | 0·1 (রস) | 39 |
| **মাছ :** রুই | 76·7 | 16·6 | 1·4 | 4·4 | 0·9 | 97 | 650 | 1·0 | — | 0·05 | 0·07 | 0·7 | 22 |
| কই | 70·7 | 14·8 | 8·8 | 4·4 | 2·0 | 156 | 410 | 1·4 | — | — | — | 0·8 | 32 |
| ইলিশ | 53·7 | 21·8 | 19·4 | 2·9 | 2·2 | 273 | 180 | 2·1 | — | — | — | 2·8 | 24 |
| মাগুর | 78·5 | 15·0 | 1·0 | 4·2 | 1·3 | 86 | 210 | 0·4 | — | — | — | 0·5 | 11 |
| চিংড়ি | 77·4 | 19·1 | 1·0 | 0·8 | 1·7 | 89 | 323 | 5·3 | 0 | 0·01 | 0·01 | 4·8 | — |
| **মাংস :** মুরগি | 72·2 | 25·9 | 0·6 | — | 1·3 | 109 | 25 | — | — | — | 0·14 | — | — |
| পাঠা | 74·2 | 21·4 | 3·6 | — | 1·1 | 118 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| **ডিম :** হাঁস | 71·0 | 13·5 | 13·7 | 0·8 | 1·0 | 181 | 70 | 3·0 | 450* | 0·12 | 0·26 | 0·2 | — |
| মুরগি | 73·7 | 13·3 | 13·3 | — | 1·0 | 173 | 60 | 2·1 | 600* | 0·10 | 0·40 | 0·1 | 0 |
| **দুগ্ধ ও দুগ্ধদ্রব্য :** | | | | | | | | | | | | | |
| গোদুগ্ধ | 87·5 | 3·2 | 4·1 | 4·4 | 0·8 | 67 | 120 | 0·2 | 174* | 0·05 | 0·19 | 0·1 | 2 |
| মহিষদুগ্ধ | 81·0 | 4·3 | 8·8 | 5·0 | 0·8 | 117 | 210 | 0·2 | 160 | 0·04 | 0·10 | 0·1 | 1 |
| মাখন | 19·0 | — | 81·0 | — | 2·5 | 729 | — | — | 3200 | — | — | — | — |
| ঘি (গোরুর দুধের) | — | — | 100 | — | — | 900 | — | — | 2000 | — | — | — | — |

* = ক্যারোটিন ছাড়া 1200 I.U. ভিটামিন এ আছে। + = ভিটামিন এছাড়া 6 মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন আছে। এক I.U. = 0·3 মাইক্রোগ্রাম রেটিনল

## ▲ II. বিপাক (METABOLISM) ▲

❖ (a) **বিপাকের সংজ্ঞা (Definition of Metabolism) ঃ দেহকোশের মধ্যে বিভিন্ন জৈব বস্তুর যেসব রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকে বিপাক বলে।**

(b) **বিপাকের প্রকারভেদ (Types of Metabolism) ঃ** বিপাক ক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— **উপচিতি বা অ্যানাবলিজম্** (Anabolism) এবং **অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম্** (Catabolism)।

1. **উপচিতি**—কোশের মধ্যে গঠনমূলক রাসায়নিক পরিবর্তনকে উপচিতি বা অ্যানাবলিজম্ বলে। এই পদ্ধতিতে প্রাণীদেহে সরল জৈব পদার্থ জটিল জৈব পদার্থে পরিণত হয়, যেমন—গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেনে পরিণত হওয়া।

2. **অপচিতি**—কোশের মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক (Break down) রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাকে অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম্ বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোশের বিভিন্ন জটিল জৈব পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে সরল জৈব অথবা অজৈব পদার্থে পরিণত হয়, ফলে শক্তিমুক্ত হয় ও একপ্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেমন—পেশির গ্লাইকোজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও শক্তিতে (ATP) পরিণত হয়।
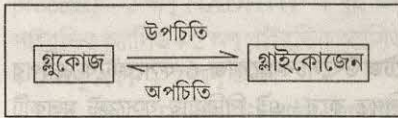
● **উপচিতি এবং অপচিতি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Anabolic and Catabolic processes) ঃ**

| উপচিতি | অপচিতি |
|---|---|
| 1. এটি একপ্রকার গঠনমূলক প্রক্রিয়া। | 1. এটি একপ্রকার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। |
| 2. এই প্রক্রিয়ায় জীবের বৃদ্ধি ঘটে ফলে শুষ্ক দেহের ওজন বাড়ে। | 2. এই প্রক্রিয়ায় জীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় বা কমে যায় ফলে শুষ্ক দেহের ওজন কমে। |
| 3. উপচিতি প্রক্রিয়ায় জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়। | 3. অপচিতি প্রক্রিয়ায় জৈব শক্তি নির্গত হয়। |
| 4. সরল বস্তু থেকে জটিল বস্তু উৎপন্ন হয়। | 4. জটিল বস্তু ভেঙে গিয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয়। |
| 5. **উদাহরণ**—গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়া, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি। | 5. **উদাহরণ**— গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া, শ্বসন প্রভৃতি। |

## ◎ 1.9. কার্বোহাইড্রেটের বিপাক (Metabolism of Carbohydrate) ◎

ক্ষুদ্রান্ত্রে কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকজাত গ্লুকোজ প্রধানত হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে শোষিত হয়ে যকৃতে যায়। গ্লুকোজ ব্যতীত অন্যান্য মনোস্যাকারাইড যেমন ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদিও শোষিত হয় কিন্তু এরা যকৃতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। নিম্নলিখিত ভাবে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ গ্লুকোজ দেহে কার্য করে।

### ◎ গ্লাইকোজেন (Glycogen) ঃ

গ্লাইকোজেন একটি শাখাবহুল পলিস্যাকারাইড যার মধ্যে গ্লুকোজ অণুগুলি $\alpha$-1 ঃ 4 ও $\alpha$-1 ঃ 6 গ্লুকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ এই প্রকার বন্ধনী দিয়ে একটি গ্লুকোজের প্রথম কার্বন ($C_1$) অণু অন্য আর একটি গ্লুকোজের চতুর্থ কার্বন ($C_4$) কিংবা ষষ্ঠ কার্বন ($C_6$) অণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

যকৃৎ ও পেশিতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়ে সঞ্চিত থাকে। যকৃতে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসেরল প্রভৃতি অকার্বোহাইড্রেট (Non-carbohydrate) পদার্থ থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয়। পরে এই গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে সঞ্চিত থাকে। দেহে মোট **500-700 গ্রাম** গ্লাইকোজেন এভাবে সঞ্চিত থাকে।

### ➤ I. গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis— Gr. *Glykys*, sweet; *genesis*, production) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে পদ্ধতিতে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হয় তাকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis) বলে।**

(b) **বিক্রিয়াস্থল ঃ যকৃৎ ও পেশিতে** গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(c) **বিক্রিয়ার সময় ঃ** গ্লাইকোজেনেসিস একটি গঠনমূলক পদ্ধতি। **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** (Hyperglycemia) অবস্থায় অর্থাৎ রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ বেড়ে গেলে অথবা বেশি পরিমাণে শর্করা (গ্লুকোজ) খেলে যকৃৎ বা ঐচ্ছিক পেশি এই অতিরিক্ত শর্করাকে (গ্লুকোজ) গ্রহণ করে তাকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে এবং সঞ্চিত করে।

গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ার ছক
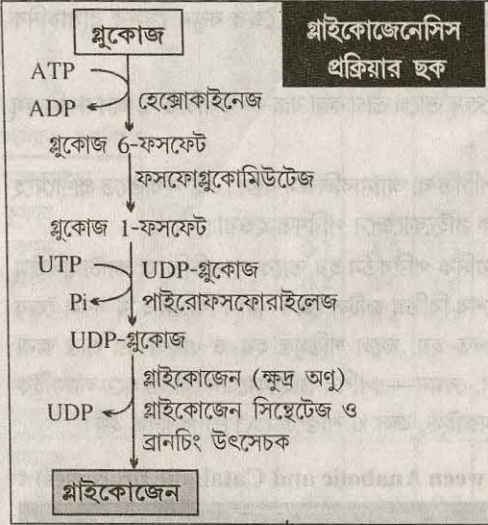
(d) **বিক্রিয়ার ধাপ ঃ** (1) **হেক্সোকাইনেজ** উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজের ষষ্ঠ কার্বনটি প্রথমে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাই-ফসফেট)-এর প্রান্তীয় ফসফেট মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **গ্লুকোজ 6-ফসফেট**-এ পরিণত হয়। এর ফলে ATP অণুটি ADP (অ্যাডিনোসিন ডাই-ফসফেটে)-তে বূপান্তরিত হয়।

(2) **ফসফোগ্লুকোমিউটেজ** উৎসেচক গ্লুকোজ-6-ফসফেটকে এরপর **গ্লুকোজ 1 ফসফেট**-এ পরিণত করে। এই বিক্রিয়ায় ফসফেট মূলকটি গ্লুকোজের ষষ্ঠ কার্বন অণু থেকে প্রথম কার্বন অণুতে স্থানান্তরিত হয়।

(3) **UDP-গ্লুকোজ পাইরোফসফোরাইলেজ** উৎসেচকের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ-1 ফসফেটের সঙ্গে UTP (ইউরিডিন ট্রাই-ফসফেট) যুক্ত হয়ে **UDP-গ্লুকোজ (UDPG)** গঠন করে।

(4) **গ্লাইকোজেন সিন্থেটেজ ও ব্রানচিং** উৎসেচকের সাহায্যে UDPG অবশেষে বিশ্লিষ্ট হয়ে UDP এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন করে যা আগে থেকে উপস্থিত গ্লাইকোজেন অণুতে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে **গ্লাইকোজেনের অণু** ক্রমশ বড়ো হয়।

➤ **II. গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis— *Gr Glykys.* sweet ; *lysis,* loosing or breakdown) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে পদ্ধতিতে গ্লাইকোজেন বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয় তাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis) বলে।**

(b) **বিক্রিয়ার স্থল ঃ** গ্লাইকোজেনোলাইসিস একমাত্র **যকৃতে** হয়।

(c) **বিক্রিয়ার সময় ঃ** গ্লাইকোজেনোলাইসিস একটি ধ্বংসাত্মক বা ক্যাটাবলিক পদ্ধতি। হাইপোগ্লাইসিমিয়া (Hypoglycemia) অবস্থায় অর্থাৎ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে যায়।

(d) **বিক্রিয়ার ধাপ ঃ** (1) প্রথমে **ফসফোরাইলেজ** ও **ডিব্রান্‌চিং** উৎসেচকের সাহায্যে গ্লাইকোজেনের প্রান্তস্থ গ্লুকোজ অণু অজৈব ফসফেট (Pi)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে **গ্লুকোজ-1 ফসফেট** উৎপন্ন করে।

(2) এটি ফসফোগ্লুকোমিউটেজ উৎসেচক দিয়ে **গ্লুকোজ-6 ফসফেট**-এ রূপান্তরিত হয়।

(3) যকৃতের **গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ** উৎসেচক গ্লুকোজ-6 ফসফেটকে **গ্লুকোজ** ও **অজৈব ফসফেটে** পরিণত করে।

গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ার ছক
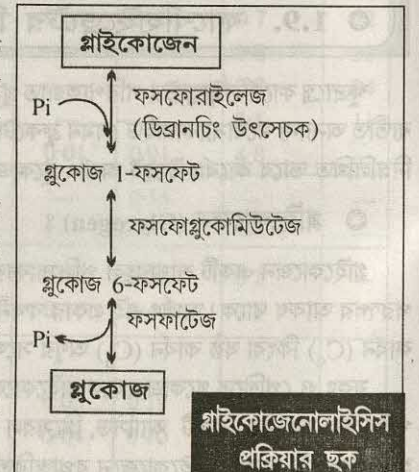
➤ **III. গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে পদ্ধতিতে গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজ পাইরুভিক অ্যাসিড বা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাকে গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) বলে।**

গ্লাইকোলাইসিস একটি ক্যাটাবলিক বা ধ্বংসাত্মক অবাত জারণ (Anaerobic oxidation)। এই পদ্ধতি যে পথ দিয়ে হয় তাকে **গ্লাইকোলাইটিক পথ** (Glycolytic path) বা আবিষ্কর্তাদের নামানুসারে একে **এম্বডেন মেয়ারহফ্ পার্নাস বিক্রিয়া পথ** (Embden Meyerhof Parnas pathway, সংক্ষেপে E M P) বলা হয়।

(b) **বিক্রিয়াস্থল** ঃ গ্লাইকোলাইসিস কোশের **সাইটোপ্লাজমে** সংঘটিত হয়।

(c) **গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শেষ বস্তুসমূহ** (End products of glycolysis process)—2 অণু $NADH+H^+$ + দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড + 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড + 2 অণু ATP + 2 অণু জল।

দুই অণু ATP-এর উৎপাদন **সাবস্ট্রেট ফসফোরাইলেশন** প্রক্রিয়ায় ঘটে।

➤ **IV. গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis— Gr. *Glykys*, sweet; *neos*, new, *genesis*, production ) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় অ-কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ যেমন গ্লিসেরল, অ্যামাইনো অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তাকে নিওগ্লুকোজেনেসিস বা গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে।**

(b) বিক্রিয়াস্থল ঃ যকৃত।

উপবাসকালে কিংবা মধুমেহ রোগে কার্বোহাইড্রেটের বিপাক ক্রিয়া বিঘ্নিত হলে যকৃতে নিওগ্লুকোজেনেসিস প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

➤ **V. ক্রেবস চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Krebs cycle or Citric acid cycle) ঃ**

1937 খ্রিস্টাব্দে এই চক্রের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী স্যার হ্যানস অ্যাড্‌লোফ ক্রেবস (Sir Hans Adlof Krebs)-এর নামানুসারে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রকে **ক্রেবস চক্র** (Krebs cycle) বলে।

❖ (a) **ক্রেবস চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Krebs cycle) ঃ কোশের মাইটোকনড্রিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎসেচক ও হাইড্রোজেন বাহকের উপস্থিতিতে যে চক্রাকার বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল কো-এ জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও বিজারিত হাইড্রোজেন বাহক উৎপন্ন করে তাকে ক্রেবস চক্র বলে।**

(b) **ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াস্থল (Site of Krebs Cycle)** ঃ ক্রেবস চক্রের সব বিক্রিয়াগুলি কোশের **মাইটোকনড্রিয়ায়** সম্পন্ন হয়।

(c) **ক্রেবস চক্রে উৎপাদিত বস্তুসমূহ (End products of Krebs Cycle)** ঃ প্রতিবার ক্রেবস চক্রের শেষে উৎপন্ন হয়—**2 অণু $CO_2$, 2 অণু $H_2O$, 3 অণু $NADH+H^+$, 1 অণু $FADH_2$** এবং **এক অণু ATP** ।

অর্থাৎ, প্রতি অণু গ্লুকোজ থেকে ক্রেবস্ চক্রে প্রক্রিয়া ঘটে **সাবস্ট্রেটের ফসফোরাইলেশন** 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ATP হল—গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দুটি ধাপে সাবস্ট্রেট ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া ঘটে, যেমন—(i) 1, 3
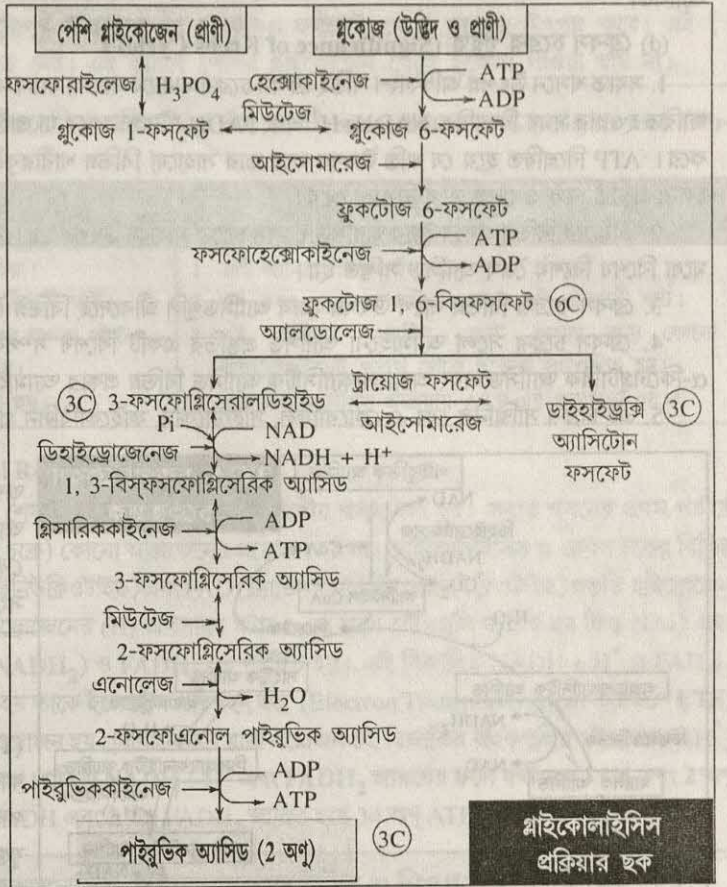
বিস্‌ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড থেকে 3 ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড এবং (ii) 2 ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড।

(d) **ক্রেবস চক্রের গুরুত্ব (Significance of Krebs Cycle) :**

1. সবাত শ্বসনে উৎপন্ন অধিকাংশ শক্তিই ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রতি অণু পাইরুভিক অ্যাসিড এই চক্রের মাধ্যমে জারিত হওয়ার সময় বিজারিত $NADH+H^+$ এবং $FADH_2$ উৎপন্ন করে যা প্রান্তীয় শ্বসনে জারিত হয়ে, 12 অণু ATP উৎপন্ন করে। ATP বিশ্লেষিত হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে তার সাহায্যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যেমন— ক্ষরণ, শোষণ, পরিবহন, চলন, প্রভৃতি চলে ও দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

2. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। ক্রেবস চক্রের অসম্পূর্ণ জারণের ফলেই কোশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জৈব অ্যাসিড সঞ্চিত হয়।

3. ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন ধাপে উৎপন্ন জৈব অ্যাসিডগুলি জীবদেহে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

4. ক্রেবস চক্রের সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রস্তুতির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন ধাপে উৎপন্ন α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড এবং অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

5. এই চক্রের সাক্সিনিল কো-এ ক্লোরোফিল, সাইটোক্রোম, ফাইকোবিলিন প্রভৃতি পাইরল যৌগের সংশ্লেষণ ঘটায়।

6. ক্রেবস চক্রের অন্তর্বর্তী যৌগ অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যার থেকে পিরিমিডিন এবং প্রাণীদেহে ইউরিয়া সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

TCA–চক্র বা ক্রেবস চক্রের ছক
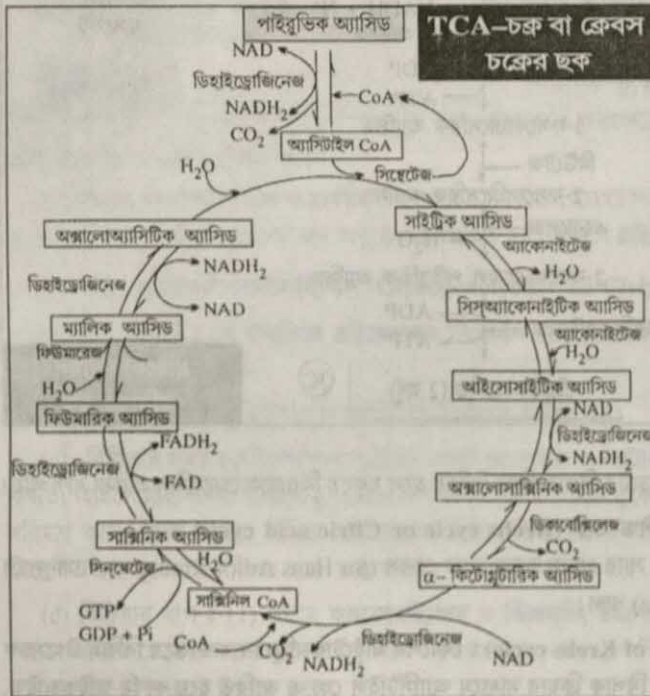
**• ক্রেবস বা TCA–চক্র •**

ক্রেবস চক্রকে ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র **(Tricarboxylic Acid Cycle)** বলা হয়, কারণ—ক্রেবস চক্রের প্রথম চারটি বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ **তিনটি করে কার্বক্সিল** (–COOH) মূলক যুক্ত হয়। এই পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান হল **সাইট্রিক অ্যাসিড**। এছাড়া সিস-অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড, আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড এবং অক্সালোসাক্সিনিক অ্যাসিডেও তিনটি করে কার্বক্সিল (–COOH) মূলক থাকে। তাই ক্রেবস চক্রকে **ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র** (Tricarboxylic acid cycle সংক্ষেপে TCA চক্র) বা প্রথম লব্ধ পদার্থ নামানুসারে একে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (Citric acid cycle) বলে।

• **গ্লাইকোজেনেসিস এবং গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য (Difference between Glycogenesis and Glycogenolysis) :**

| গ্লাইকোজেনেসিস | গ্লাইকোজেনোলাইসিস |
|---|---|
| 1. এই প্রক্রিয়াটি গঠনমূলক (উপচিতি) অ্যানাবলিক প্রক্রিয়া। | 1. এই প্রক্রিয়াটি ধ্বংসাত্মক (অপচিতি) ক্যাটাবলিক প্রক্রিয়া। |
| 2. এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। | 2. এই প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। |
| 3. হাইপারগ্লাইসিমিয়া অবস্থায় যকৃৎ এবং পেশিতে প্রক্রিয়াটি ঘটে। | 3. হাইপোগ্লাইসিমিয়া অবস্থায় শুধু যকৃতে প্রক্রিয়াটি ঘটে। |

**• পেশি-গ্লাইকোজেন থেকে সরাসরি গ্লুকোজ পাওয়া যায় না কেন ? •**

গ্লুকোজ-6 ফস্‌ফাটেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক যা গ্লুকোজ-6 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। এই উৎসেচকটি শুধু যকৃতে আছে, পেশিতে নেই। এই কারণে পেশির গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ পাওয়া যায় না।

**• গ্লাইকোলাইসিস এবং গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য (Difference between Glycolysis and Gluconeogenesis) :**

| গ্লাইকোলাইসিস | গ্লুকোনিওজেনেসিস |
|---|---|
| 1. এটি ক্যাটাবলিক অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। | 1. এটি অ্যানাবলিক অর্থাৎ গঠন মূলক প্রক্রিয়া। |
| 2. সাধারণ কোশের সাইটোপ্লাজমে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। | 2. শুধু যকৃৎ কোশের সাইটোপ্লাজমে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। |
| 3. এই প্রক্রিয়া গ্লুকোজ অথবা গ্লাইকোজেন অথবা স্টার্চ ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। | 3. এই প্রক্রিয়ায় প্রোটিন, ফ্যাট অথবা অন্য কোনো অকার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয়। |
| 4. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ATP উৎপন্ন হয়। | 4. গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ATP-এর প্রয়োজন হয়। |

### ➤ VI. প্রান্তীয় শ্বসন (Terminal Respiration)

**প্রান্তীয় শ্বসন** প্রক্রিয়াটি সবাত শ্বসনের শেষ পর্যায়। এই কারণে একে **প্রান্তীয় শ্বসন** বলা হয়। সবাত শ্বসনের প্রথম পর্যায়ে (গ্লাইকোলাইসিস) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে (ক্রেবস চক্রে) কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে NAD (নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) এবং FAD (ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) প্রভৃতি **হাইড্রোজেন বাহকের** সাহায্যে মধ্যবর্তী যৌগ থেকে হাইড্রোজেনের (H) অপসারণ ঘটায়। এর ফলে যৌগগুলি জারিত হয় কিন্তু NAD এবং FAD বিজারিত হয়ে **$NADH + H^+$ (বা $NADH_2$) ও $FADH_2$** তে পরিণত হয়। এই বিজারিত $NADH + H^+$ ও $FADH_2$ মাইটোকনড্রিয়ার যে তন্ত্রের মাধ্যমে জারিত হয় তাকে **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র** (Electron Transport System সংক্ষেপে ETS) বলে। জারণের সময় অক্সিজেন ($O_2$)-এর প্রয়োজন হয়। [এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজারিত বাহকগুলির হাইড্রোজেন ($H^+$) সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না]। **প্রতিটি $NADH + H^+$ এবং $FADH_2$ জারণের ফলে যথাক্রমে 3 অণু এবং 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়।** প্রান্তীয় শ্বসনে 10 অণু NADH এবং 2 অণু $FADH_2$ জারিত হয়ে 34 অণু ATP উৎপন্ন হয়।

**• গ্লাইকোলাইসিস, গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস ও নিওগ্লুকোজেনেসিস •**

1. **গ্লাইকোলাইসিস**—এটি একপ্রকার অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া যার ফলে গ্লুকোজ, গ্লাইকোজেন, শ্বেতসার ইত্যাদি কোশের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে ভেঙে গিয়ে পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।
2. **গ্লাইকোজেনেসিস** — এটি এক প্রকার গঠনমূলক প্রক্রিয়া যার ফলে গ্লুকোজ যকৃৎ ও পেশিতে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়।
3. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** — এটি একপ্রকার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া যার ফলে যকৃতে জমানো গ্লাইকোজেন বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে ভেঙে গিয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়।
4. **গ্লুকোনিওজেনেসিস**—এটি একপ্রকার গঠনমূলক প্রক্রিয়া যার ফলে যকৃতে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে অকার্বোহাইড্রেট উৎস থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয়।

## ○ 1.10. ফ্যাটের বিপাক (Metabolism of Fat) ○

### ▲ ফ্যাটের জারণ (Oxidation of fats) :

ফ্যাট বিশ্লিষ্ট হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত হয়। গ্লিসেরল কার্বোহাইড্রেটের মতো গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে জারিত হয়। কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড যকৃৎকোশের মাইটোকনড্রিয়াতে প্রধানত বিটা-জারণ (β-Oxidation) মাধ্যমেই জারিত হয়।

1. **গ্লিসেরলের বিপাক (Metabolism of Glycerol) ঃ** গ্লিসেরোকাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লিসেরল এক অণু ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রথমে α-গ্লিসেরোফসফেট উৎপন্ন করে। এর পরে ডিহাইড্রোজেনেজ ও NAD-র উপস্থিতিতে ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ট্রায়োজফসফেট আইসোমারেজ দ্বারা 3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইডে পরিণত হয়ে কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে (গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায়) পাইরুভিক অ্যাসিড বা গ্লুকোজে পরিণত হয়।
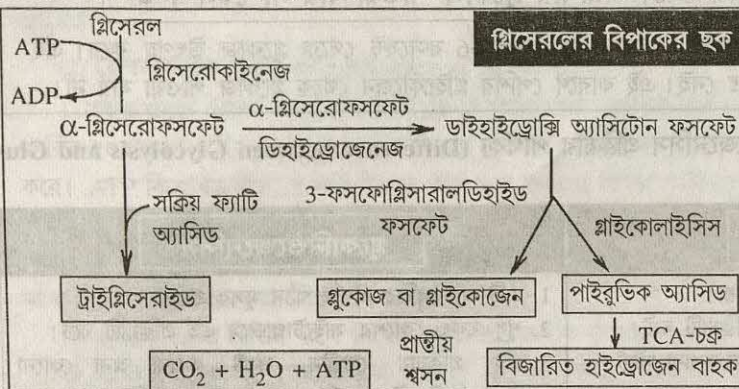
## ▲ ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ (Oxidation of Fatty acid) ঃ

ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ দুই প্রকারের হয়, যেমন—বিটা জারণ এবং ওমেগা জারণ।

### ➤ 1. ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা জারণ (β-Oxidation of Fatty acid) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা স্থানের কার্বনে অর্থাৎ কার্বোক্সিল (– COOH) গ্রুপ থেকে তৃতীয় কার্বনে জারণ প্রক্রিয়া ঘটে ফলে শেষ দুটি কার্বন এক অণু অ্যাসিটাইল কো-এ নামে দুটি কার্বনবিশিষ্ট একক উৎপন্ন করে মূল ফ্যাটি অ্যাসিড চেন থেকে নির্গত হয় তাকে ফ্যাটি অ্যাসিডের β-জারণ বলে।**

● ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক সংকেত এবং β-কার্বনের চিহ্নিতকরণ

$$\overset{\omega}{CH_3}–CH_2–CH_2........CH_2–CH_2–CH_2........\overset{\gamma}{CH_2}–\overset{\beta}{CH_2}–\overset{\alpha}{CH_2}–COOH$$
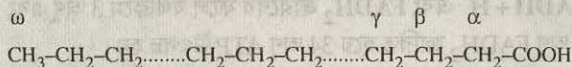
নুপ (Knoop) নামে একজন বিজ্ঞানী 1905 খ্রিস্টাব্দে ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ প্রথমে পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে, ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ β–কার্বন স্থানে ঘটে এর ফলে প্রতিবার মূল ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রান্ত থেকে দুটি কার্বন পরমাণু কমে যায়। দুটি কার্বন পরমাণু কম ফ্যাটি অ্যাসিড একইভাবে আবার জারিত হয়। এইভাবে জারণ প্রক্রিয়া চলে যতক্ষণ না ফ্যাটি অ্যাসিডের শেষ দুটি কার্বন অ্যাসিটাইল কো-এতে পরিণত হয়। এভাবে একটি ফ্যাটি অ্যাসিডের অণু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি **অ্যাসিটাইল কো-এ** নামে এককে পরিণত হয়। বিটা জারণ প্রক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল কো-এ ক্রেবস চক্র এবং প্রান্তীয় শ্বসনের মাধ্যমে জারিত হয়ে $CO_2$ এবং $H_2O$-এ রূপান্তরিত হয় এবং প্রচুর জৈবশক্তি যৌগ ATP উৎপন্ন করে।

(b) **β-জারণের বিক্রিয়া স্থান—মাইটোকনড্রিয়াতে।**

(c) **বিটা জারণের পদ্ধতি** (Process of β-oxidation)— β-জারণ ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি জটিল প্রক্রিয়া যা প্রধানত কয়েকটি (5টি) ধাপের মাধ্যমে ঘটে।

(i) **সক্রিয়করণ** (Activation)—প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড থায়োকাইনেজ, কোএন্‌জাইম-এ (HS-CoA), ATP, $Mg^{++}$ ইত্যাদির উপস্থিতিতে **সক্রিয় ফ্যাটি অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসাইল** কো-এতে রূপান্তরিত হয়।

$$R{-}CH_2{-}CH_2{-}CO\,\boxed{OH}+\boxed{H}\,S\,COA + ATP \xrightarrow[Mg^{2+}]{\text{থায়োকাইনেজ}} H_2O + R{-}CH_2{-}CH_2{-}COSCOA + AMP + PPi$$

(ফ্যাটি অ্যাসিড) (কো-এ) (ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ)
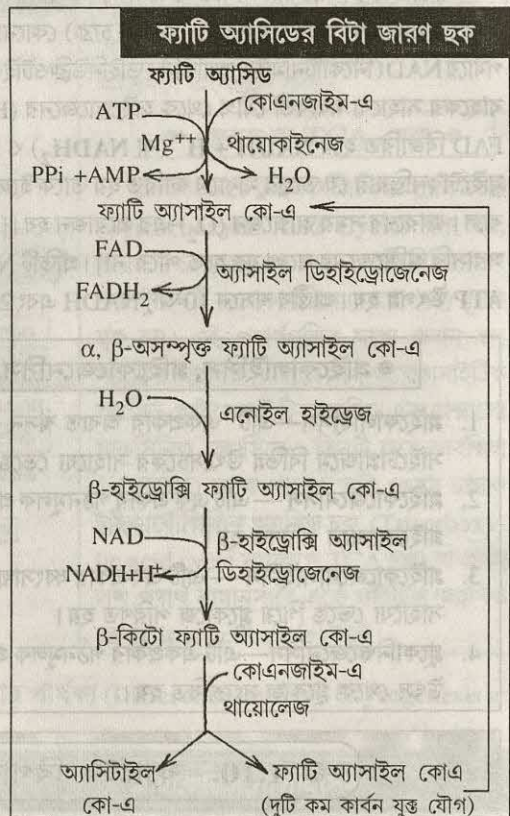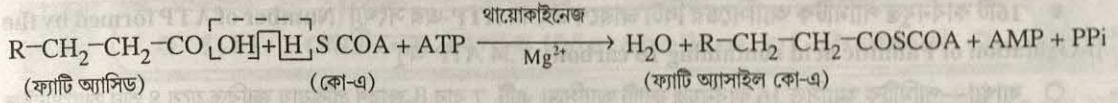
R = এটি ফ্যাটিঅ্যাসিডের প্রথম দিকের কার্বন অর্থাৎ $CH_3{-}CH_2$ ..... কে নির্দেশ করে।

(ii) **ডিহাইড্রোজিনেশন** (Dehydrogenation)—দ্বিতীয় ধাপের ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকএবং ফ্লেভোপ্রোটিন (FP)-নামে সহউৎসেচকের উপস্থিতিতে উৎপন্ন ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ জারিত হয়ে **α–β অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ** উৎপাদন করে।

$$R{-}CH_2{-}CH_2{-}COSCOA + FP \xrightarrow{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}} R{-}CH = CH{-}COSCOA + FPH_2$$

(ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ) (ফ্যাভোপ্রোটিন) (α–β অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ) (বিজারিত ফ্ল্যাভোপ্রোটিন)

$$FPH_2 \xrightarrow{ETS} FP + 2ATP \quad (ETS = \text{Electron transport system})$$
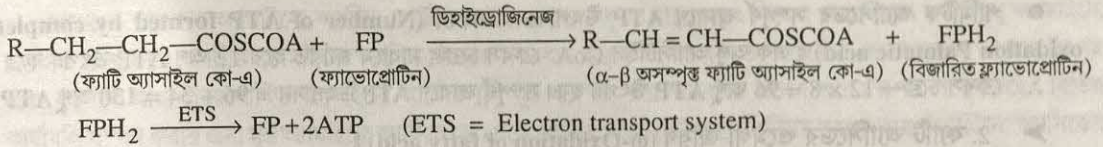
(iii) **হাইড্রোজেনেশন** (Hydrogenation)—তৃতীয় ধাপে ক্রোটোনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে উৎপন্ন α–β ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এর β কার্বনে **জল সংযোজন** ঘটিয়ে **β-হাইড্রোক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ** গঠন করে।

$$R{-}CH_2 = CH{-}COSCOA + HOH \xrightarrow{\text{ক্রোটোনেজ}} R{-}\overset{OH}{\overset{|}{C}H}{-}CH_2{-}COSCOA$$

(α–β অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ) (জল) (β–হাইড্রোক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ)
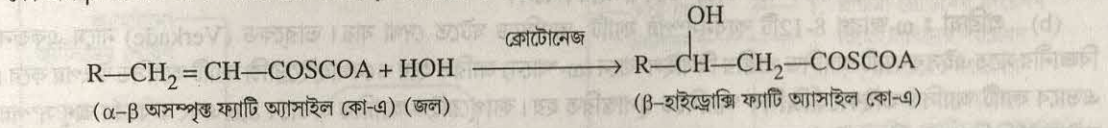
(iv) **ডিহাইড্রোজেনেশন** (Dehydrogenation)—এটি চতুর্থ ধাপ যাতে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক এবং $NAD^+$ (নিকোটিনামাইড এডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) নামে সহউৎসেচকের উপস্থিতিতে β-হাইড্রোক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ জারিত হয়ে **β-কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ** এবং $NADH + H^+$-তে পরিণত হয়।

$$R{-}\overset{OH}{\overset{|}{C}H}{-}CH_2{-}COSCOA + NAD^+ \xrightarrow{\text{ডিহাইড্রাজিনেজ}} R{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}CH_2{-}COSCOA + NADH + H^+$$

(β–হাইড্রোক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ) (β–কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ)

$$NADH + H^+ \xrightarrow{ETS} NAD^+ + 3ATP$$
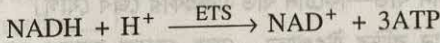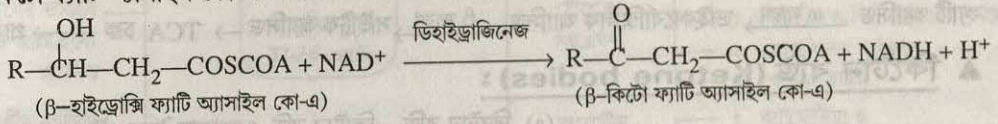
(v) **বিয়োজন** (Cleavage)—এটি পঞ্চম ও অন্তিম ধাপ। এই ধাপে β-কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এর প্রান্তীয় দুটি কার্বন বিচ্ছিন্ন হয়ে **অ্যাসিটাইল কো-এতে** পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় থায়োলেজ নামে উৎসেচক অংশগ্রহণ করে।

$$R{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}CH_2{-}COSCOA + HSCOA \xrightarrow{\text{থায়োলেজ}} R{-}CH{-}CO{-}COSCOA + CH_3COSCOA$$

(ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ দুটি কম কার্বনযুক্ত) অ্যাসিটাইল কো-এ
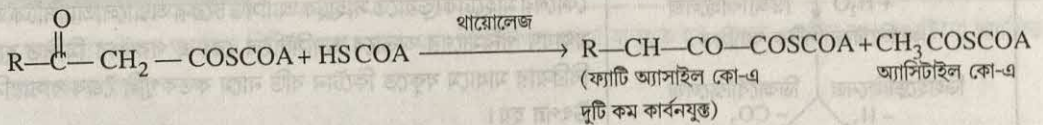
দুটি কম কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কো-এ আবার জারণ প্রক্রিয়ায় (দ্বিতীয় ধাপে) প্রবেশ করে এবং দুটি কার্বন হারিয়ে আবার এক অণু অ্যাসিটাইল কো-এ উৎপন্ন করে। এভাবে **16টি কার্বনযুক্ত পামিটিক অ্যাসিড** (এক প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিড) সাতবার জারিত হয়ে দু'কার্বন সমন্বিত **8 অণু অ্যাসিটাইল** কো-এ উৎপন্ন করে।

দেখা গেছে **জোড় সংখ্যক** কার্বনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত হলে **অ্যাসিটাইল CoA** উৎপন্ন করে। **বিজোড় সংখ্যক** কার্বনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণে **অ্যাসিটাইল কো-এ** এবং 1 অণু (শেষ তিনটি কার্বন দিয়ে) **প্রোপিওনিল CoA** উৎপন্ন হয়।

● **অ্যাসিটইল কো-এর পরিণতি (Fate of Acetyl CoA)**—অ্যাসিটাইল কো-এ পাইরুভিক অ্যাসিড (কার্বোহাইড্রেট), প্রোটিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড) এবং ফ্যাটের বিপাকের ফলে উৎপন্ন হয় এবং মূল পদার্থ (Key substance) হিসেবে কাজ করে। অ্যাসিটাইল কো-এ পরে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসনের মাধ্যমে জারিত হয়ে $CO_2$, $H_2O$ এবং ATP নামে জৈব শক্তি উৎপন্ন করে।

● **16টি কার্বনযুক্ত পামিটিক অ্যাসিডের বিটা জারণে উৎপন্ন ATP-এর সংখ্যা (Number of ATP formed by the β-Oxidation of Palmitic acid containing 16 carbon)** : 34 ATP অণু

○ ব্যাখ্যা—পামিটিক অ্যাসিড 16 কার্বনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি 7 বার β-জারণ প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে 8 অণু অ্যাসিটাইল Co-A উৎপন্ন করে। প্রতিবারে এক অণু $FPH_2$ এবং এক অণু $NADH + H^+$ জারিত হয়ে মোট 5 অণু ATP উৎপন্ন হয়।

∴ $7 \times 5 = 35$ অণু ATP উৎপন্ন হয়।

বিটা জারণের বিক্রিয়ার প্রারম্ভকালে 1 অণু ATP-এর প্রয়োজন হয়। এই কারণে $35 - 1 = 34$ **অণু ATP উৎপন্ন হয়।**

● **পামিটিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণে ATP উৎপাদনের সংখ্যা (Number of ATP formed by complete oxidation Palmatic acid)** : এক অণু অ্যাসিটাইল CoA ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়ে 12 অণু ATP উৎপন্ন করে।

∴ ক্রেবস চক্রে—$12 \times 8 = 96$ **অণু ATP** উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ জারণে ATP উৎপাদন = $96 + 34 = 130$ **অণু ATP**

➤ 2. **ফ্যাটি অ্যাসিডের ওমেগা-জারণ (ω-Oxidation of fatty acid) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা—ফ্যাটি অ্যাসিডের যে জারণ প্রক্রিয়াতে ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রথম কার্বনে অর্থাৎ মিথাইল ($CH_3$) মূলকের কার্বনে (ω-স্থানের কার্বনে) জারণ ঘটে তাকে ওমেগা-জারণ বলে।**

(b) **প্রক্রিয়া :** ω-জারণ 8-12টি কার্বনসম্পন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডে ঘটতে দেখা যায়। ভার্কেড (Verkade) নামে একজন বিজ্ঞানীর মতে এইসব ফ্যাটি অ্যাসিড প্রান্তীয় মিথাইল স্থানে (ω-স্থানে) জারিত হয়ে ওমেগাহাইড্রোক্সি ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড **ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডে** রূপান্তরিত হয়। ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড এভাবে 8,6 এবং 4 কার্বন অণু সম্পন্ন ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডে উৎপন্ন করে। একবার উৎপন্ন হলে পরবর্তী ধাপে ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড ওমেগা প্রান্তীয় কার্বোক্সিলের পরবর্তী বিটা (β) স্থানে পর্যায়ক্রমে বিটা জারণের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ওমেগা-জারণে NADH, $Fe^{++}$, $O_2$ এবং প্রোটিন ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড $\xrightarrow{\omega \text{ জারণ}}$ ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড $\xrightarrow{\beta \text{ জারণ}}$ সাইট্রিক অ্যাসিড → TCA চক্র ⟶ প্রান্তীয় শ্বসন

## ▲ কিটোন বডি (Ketone bodies) :
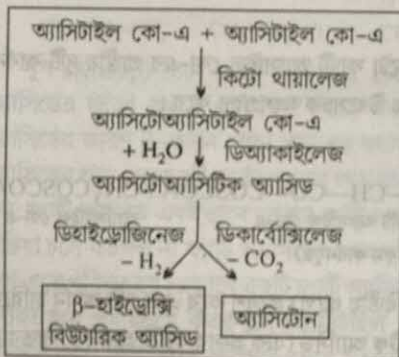
(a) **কিটোন বডি**—কিটোন বডি একপ্রকার জৈব যৌগ।

(b) **কিটোন বডির উৎপাদন**—দেহে কোনো কারণে **কার্বোহাইড্রেটের অভাব** দেখা দিলে, যেমন অনশন বা ডায়াবেটিস অবস্থায় কিংবা দেহে ফ্যাটি অ্যাসিড খুব বেশি জারণ প্রক্রিয়া ঘটলে প্রচুর অ্যাসিটাইল কো-এ উৎপন্ন হয়। কোশের মাইটোকন্ড্রিয়াতে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের যথাযথ পরিমাণের অভাবে অ্যাসিটাইল কো-এ পরস্পর মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে **যকৃতে** কিটোন বডি নামে কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

(c) **কিটোন বডির উৎপাদনের স্থান**—যকৃৎ।

(d) **কিটোন বডির উদাহরণ**—(i) **অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড**, (ii) **বিটা-হাইড্রোক্সি বিউটিরিক অ্যাসিড** এবং (iii) **অ্যাসিটোন।**

**● কিটোসিস, কিটোনেমিয়া ও কিটোনিউরিয়া ●**

1. **কিটোসিস** (Ketosis) **:** অনাহার, ডায়াবেটিস মেলিটাস বা অত্যধিক পেশি সঞ্চালনে ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ বেড়ে যায়,ফলে যকৃতে বেশি পরিমাণ কিটোন বডি উৎপন্ন হয়ে দেহের দেহ তরলে জমা হয়। এই অবস্থাকে কিটোসিস বলে।
2. **কিটোনেমিয়া** (Ketonemia) **:** যে অবস্থায় রক্তে কিটোন বডির স্বাভাবিক পরিমাণ বেড়ে যায় তাকে কিটোনেমিয়া বলে।
3. **কিটোনিউরিয়া** (Ketonuria) **:** রক্তে কিটোন বডির পরিমাণ বেশি হলে অর্থাৎ কিটোনেমিয়া অবস্থা হলে মূত্রে কিটোন বডি বের হয়, ওই অবস্থাকে কিটোনিউরিয়া বলে।

## ০ 1.11. প্রোটিনের বিপাক (Metabolism of Protein) ০

প্রোটিন অণু একটি জটিল নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব পদার্থ। পরিপাকের ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে প্রায় 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাদের মধ্যে আটটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে।

### ➤ A. অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাণ্ডার (Amino Acid pool) :

শোষণের পরে সব অ্যামাইনো অ্যাসিড পোর্টাল তন্ত্রের মাধ্যমে যকৃতে যায়। যকৃৎ নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রহণ করে অবশিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডকে রক্তে সরবরাহ করে। এছাড়া যকৃতে সংশ্লেষিত, কলাকোশের ভাঙনে উৎপন্ন এবং বৃক্কনালি দ্বারা পুনঃশোষিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি মুক্ত অবস্থায় রক্তে অনবরত প্রবেশ করে। অপর পক্ষে দেহের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড রক্ত থেকে বেরিয়ে আসে। এই রকম বিনিময় সত্ত্বেও রক্তে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (32–36 mg / 100 ml) বজায় থাকে। একে **অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার** বলা হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাণ্ডার
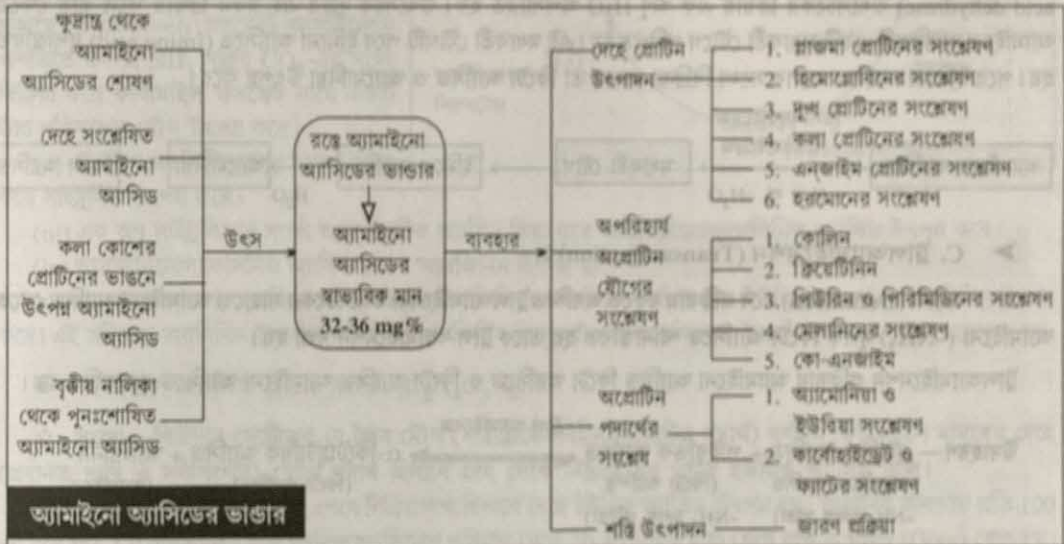
রক্ত থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন কলায় যায় এবং নিম্নলিখিত কার্যে ব্যবহৃত হয়। দেহে প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন ভাবে কাজ করে।

### ➤ B. ডি-অ্যামাইনেশন (Deamination) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে পদ্ধতিতে ডি-অ্যামাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো (—$NH_2$) মূলকের অপসারণ ঘটে তাকে ডি-অ্যামাইনেশন বলা হয়।

(b) **ডি-অ্যামাইনেশনের স্থান (Site of Deamination) :** ডি-অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়া যকৃতে সংঘটিত হয়।

(c) **ডি-অ্যামাইনেশনের প্রকারভেদ (Types of Deamination) :** ডি-অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়া দু'প্রকার, যেমন—জারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন এবং অজারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন।

1. **জারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন (অক্সিডেটিভ ডি-অ্যামাইনেশন—Oxidative Deamination) :**

❖ **সংজ্ঞা (Definition) :** যে প্রক্রিয়ায় L-অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজের (**L-amino acid oxidase**) সাহায্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন অপসারিত হয় এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডটি ইমিনো অ্যাসিডে (**Imino acid**) রূপান্তরিত হয় তাকে জারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন বলে।

এরপর ইমিনো অ্যাসিডটি এক অণু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক অণু অ্যামোনিয়া ও এক অণু কিটো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বাহকের সাহায্যে অপসারিত হাইড্রোজেন পরমাণু পরে সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে $H_2O_2$ উৎপন্ন করে যা পরে ক্যাটালেজ (Catalase) উৎসেচক দিয়ে জল ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়।

অ্যামাইনো অ্যাসিড —(−2H, L-অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ)→ ইমিনো অ্যাসিড —($H_2O$)→ কিটোঅ্যাসিড + অ্যামোনিয়া ($NH_3$)

2. অক্সারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন (নন-অক্সিডেটিভ ডি-অ্যামাইনেশন—Non-oxidative Deamination) :

◆ সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় সালফার ও হাইড্রক্সিল মূলকযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির $H_2S$ বা $H_2O$ অপসারণের মাধ্যমে বিপাক ক্রিয়া ঘটে তাকে অক্সারণধর্মী ডি-অ্যামাইনেশন বলে।

সালফার যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড-এর ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিসালফহাইড্রেজের বা ডিহাইড্রেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় এক অণু $H_2S$ অপসারিত হয়। আবার হাইড্রক্সিলমূলক যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিহাইড্রেজের (Amino acid dehydrase) উৎসেচকের ক্রিয়ায় এক অণু $H_2O$ অপসারিত হয়। উৎসেচক দুটির এই রকম ক্রিয়ার ফলে প্রতি ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিডটি একটি মধ্যবর্তী যৌগে পরিণত হয়। এই মধ্যবর্তী যৌগটি পরে ইমিনো অ্যাসিডে (Imino acid) রূপান্তরিত হয়। পরে ইমিনো অ্যাসিড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে তা কিটো অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।
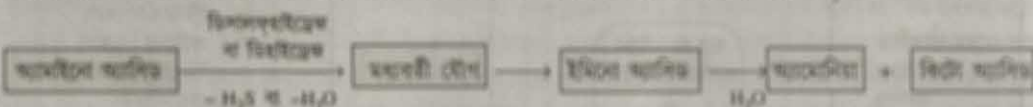
➤ C. ট্রান্সঅ্যামাইনেশন (Transamination) :

◆ সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় যকৃতে অবস্থিত ট্রান্সঅ্যামাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো ($-NH_2$) মূলক কিটো অ্যাসিডে স্থানান্তরিত হয় তাকে ট্রান্স-অ্যামাইনেশন বলা হয়।

ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যামাইনো অ্যাসিড কিটো অ্যাসিডে ও কিটো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ— গ্লুটামিক অ্যাসিড (অ্যামাইনো অ্যাসিড $-NH_2$ মূলক দাতা) + পাইরুভিক অ্যাসিড (কিটো অ্যাসিড $-NH_2$ মূলক গ্রহীতা) ⇌(ট্রান্স অ্যামাইনেজ) α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড (কিটো অ্যাসিড) + অ্যালানিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড)
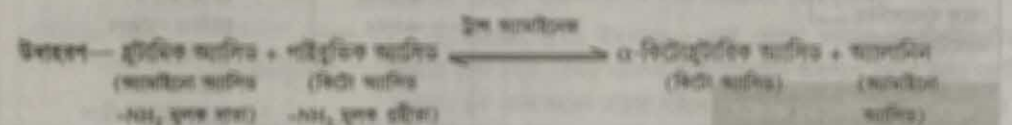
➤ D. ডি-কার্বক্সিলেশন (Decarboxylation) :

◆ সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় জৈব অ্যাসিড বিশেষত অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বক্সিলেজ (বা ডিকার্বক্সিলেজ) উৎসেচকের উপস্থিতিতে থেকে এক বা একাধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) উৎপন্ন করে তাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ প্রক্রিয়া বা ডিকার্বক্সিলেশন প্রক্রিয়া বলে।

কার্বক্সিলেজ উৎসেচক বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং ঈস্ট কোশে থাকে যা ডিকার্বক্সিলেশন প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের মতো কাজ করে।

উদাহরণ—(i) কিটোঅ্যাসিড—পাইরুভিক অ্যাসিডকে অ্যাসিটাইল কো-A পরিণত করে। (ii) যখন কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডকে বেরিয়াম হাইড্রক্সাইডের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয় তখন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়ে অ্যামাইন (Amine) উৎপন্ন হয়, যেমন—হিস্টিডিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেশন প্রক্রিয়ায় এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে হিস্টামাইনে পরিণত হয়। (iii) যেসব ব্যাকটেরিয়া পচন ঘটায় সেসব ব্যাকটেরিয়ার থেকে অবস্থিত কার্বক্সিলেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে প্রোটিনজাতির দ্রুতগতে বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিকার্বক্সিলেশন প্রক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামাইনস উৎপন্ন করে, যেমন—হিস্টামাইন, টাইরামাইন (যা টাইরোসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়।)

ইত্যাদি প্রক্রিয়া সংঘটিত করবার জন্য দেহে বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গাসমূহ একত্রিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র **(Alimentary system)** বা পাচনতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র **(Digestive system)** বলে।

(b) **পৌষ্টিকতন্ত্রের গঠন (Structure of Alimentary system) :** পৌষ্টিকনালি এবং আনুষঙ্গিক পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে পৌষ্টিকতন্ত্র গঠিত।

## ▲ A. পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal) :
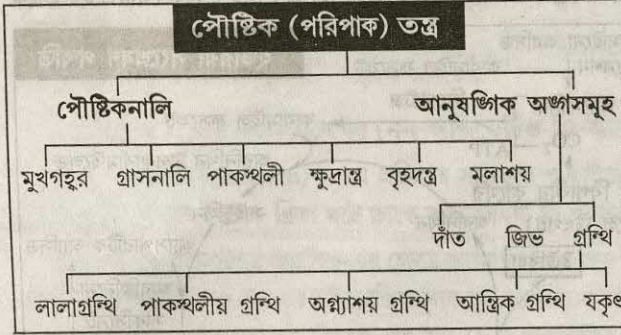
❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র সংযোগকারী যে নালিকা বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত হয়ে খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্যবস্তু বর্জন কাজগুলি সমাধা করে তাকে পৌষ্টিকনালি বলে।**

(b) **গঠন :** পৌষ্টিকনালি হল একটি নলাকার অংশ যা মুখগহ্বর, গলবিল, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, মলাশয় এবং মলনালি নিয়ে গঠিত। এই নালির মোট দৈর্ঘ্য 8-10 মিটার।

➤ 1. **মুখগহ্বর (Mouth cavity) :**

পৌষ্টিকনালি মুখগহ্বর থেকে শুরু। মুখগহ্বর একটি প্রশস্ত গহ্বর যার মধ্যে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি, মাড়ি, দাঁত এবং জিভ থাকে।

● (i) **লালাগ্রন্থি (Salivary gland)**—প্রতিপার্শ্বের তিনটি লালাগ্রন্থি যথাক্রমে **প্যারোটিড গ্রন্থি, সাব্‌ম্যান্ডিবিউলার গ্রন্থি** এবং **সাব্‌লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি**। **কাজ**—লালাগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত লালারস সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

● (ii) **দাঁত (Teeth)**—প্রাপ্তবয়স্ক লোকের উপরের চোয়ালে 16টি এবং নীচের চোয়ালে 16টি মোট 32টি স্থায়ী দাঁত থাকে। দাঁতগুলি চোয়ালের দাঁতের কোটরে প্রোথিত থাকে। প্রতিটি চোয়ালকে সমান দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত করা যায়। প্রতিটি চোয়ালের অর্ধাংশের শেষ দিক থেকে **তিনটি পেষক (মোলার**—Molar-M), **দুটি পুরঃপেষক (প্রি-মোলার**—Premolar-Pm), **একটি ছেদক বা শ্বাদন্ত (ক্যানাইন**—Canine-C) এবং সামনের দিকে দুটি **কৃন্তক (ইনসাইজর** —Incisor-I) দাঁত থাকে।

সুতরাং, মানুষের দুটি চোয়ালের অর্ধাংশে দাঁত গঠনের সংকেত সূত্র হল— $I\frac{2}{2}$, $C\frac{1}{1}$, $Pm\frac{2}{2}$, $M\frac{3}{3}$

চিত্র 1.10. : মানুষের পরিপাক গ্রন্থি এবং পৌষ্টিকনালির অবস্থান ও গঠন।

| বাম চোয়াল | মোলার | প্রিমোলার | ক্যানাইন | ইনসাইজর | ডান চোয়াল | মোলার | প্রিমোলার | ক্যানাইন | ইনসাইজর | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উপরের | 3 | 2 | 1 | 2 | উপরের | 3 | 2 | 1 | 2 | = 16 |
| নীচের | 3 | 2 | 1 | 2 | নীচের | 3 | 2 | 1 | 2 | = 16 |

● I. **দাঁতের গঠন ঃ** প্রতিটি দাঁত প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে তৈরি, যেমন—**চূড়া, গ্রীবা এবং দন্তমূল।** **চূড়া** (Crown)—এটি মাড়ির উপরের দাঁতের অংশ যা প্রধানত তিনটি উপাদান অর্থাৎ ডেন্টাইন, এনামেল এবং মজ্জা গহ্বর দিয়ে তৈরি।

(i) **ডেন্টাইন** (Dentine)—অস্থি সদৃশ পুরু অংশ। (ii) **এনামেল** (Enamel)—**দেহের সবথেকে শক্ত কঠিন পদার্থ** (কলা নয়) যা দাঁতের উপরিতলে থাকে। (iii) **মজ্জাগহ্বর** (Pulp cavity)—এটি দাঁতের কেন্দ্রীয় গহ্বর যার মধ্যে শিথিল যোগকলা, রক্তবাহ ও স্নায়ু থাকে। দাঁতের এই গহ্বরটি দন্তমূলের শেষভাগে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত থাকে। এই ছিদ্রটিকে **অগ্রচ্ছিদ্র** (Apical foramen) বলে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দন্তগহ্বরে রক্তবাহ এবং স্নায়ু যায়। দাঁতের গোড়ায় অস্থি সদৃশ **সিমেন্টাম** (Cementum) পদার্থ থাকে। এটি এনামেল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। **পেরিডেন্টাল লিগামেন্ট** (Periodental ligament) একরকমের তন্তুময় যোগকলা যা দাঁতের গোড়াকে মাড়ির গহ্বরের মধ্যে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ রাখে।
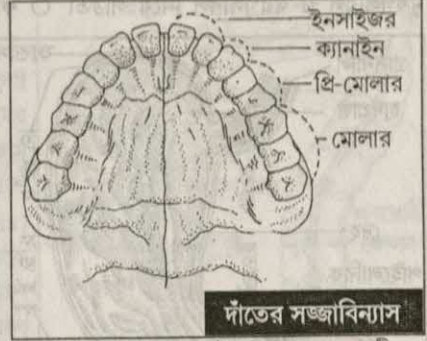
চিত্র 1.11. ঃ মানুষের উপরের চোয়ালে স্থায়ী দাঁতের সজ্জাবিন্যাসের চিত্ররূপ।

চিত্র 1.12. ঃ একটি দাঁতের কলাস্থানিক (আণুবীক্ষণিক) গঠন।

● II. **দাঁতের প্রকারভেদ**—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সব স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ মানুষের দুবার দাঁত ওঠে, যেমন—দুধে দাঁত, স্থায়ী দাত। **দুধে দাঁত** (Milk teeth) শিশু জন্ম হওয়ার পাঁচমাস পর মাড়ির উপরে বের হতে শুরু করে এবং ছয় বৎসর বয়সে অধিকাংশ শিশুদের 24টি দুধে দাঁত থাকে। এর মধ্যে 20টি দুধে দাঁত 7-11 বৎসরের মধ্যে পড়ে যায়। এই স্থানে বড়ো আকারের **স্থায়ী দাঁত** (Permanent teeth) বের হয়। মোলার দাঁত প্রধানত ছয় বৎসর, বারো বৎসর এবং শেষ মোলার আঠারো বৎসর বয়সে বের হয়। শেষ মোলার দাঁতকে **আক্কেল দাঁত** (Wisdom teeth) বলে।

○ **কাজ**—দাঁত শক্ত ও কঠিন খাদ্যবস্তুকে চিবিয়ে ছোটো ছোটো টুকরোতে পরিণত করে।

● (c) **জিভ বা জিহ্বা** (Tongue)—মুখগহ্বরের মধ্যে ঐচ্ছিক পেশি নির্মিত অঙ্গটিকে জিভ বলে। এর পেছনের অংশটি হাইয়েড অস্থির সঙ্গে গলবিলের দিকে যুক্ত থাকে। জিভের উপরিতলটি অমসৃণ এবং তাতে বহু উঁচু উঁচু অংশ থাকে তাদের জিভ পিড়কা (Lingual papilla) বলে। জিভপিড়কা তিন রকমের হয়, যেমন—**সুতাকৃতি** (Filiform), **ছত্রাককৃতি** (Fungiform) এবং **চক্রাকার পিড়কা (সারকামভেলেট**—Circumvallate)। শেষ দু'রকমের পিড়কার পাশের গায়ে **স্বাদকুঁড়ি** (টেস্ট বাড্—Taste bud) থাকে।

চিত্র 1.13. ঃ A-জিভের গঠন এবং B-জিভের উপরিতলের গঠন ও বিভিন্নপ্রকার পিড়কার পার্শ্বদেশে স্বাদকুঁড়ির অবস্থানের চিত্র।

○ **কাজ ঃ** (i) মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু প্রবেশের পর সেগুলি দাঁতের সাহায্যে চর্বিত হয় অর্থাৎ ছোটো ছোটো টুকুরাতে পরিণত হয়। জিভের স্বাদকুঁড়ি (Taste buds) খাদ্যবস্তুর টক, নোন্তা, মিষ্টি, ঝাল ইত্যাদি স্বাদ গ্রহণ করে।

(ii) মুখগহ্বরে চর্বিত খাদ্যবস্তু জিভের সাহায্যে লালাগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত লালারসের সঙ্গে মিশে যায়।

## ➤ 2. গলবিল (Pharynx) :

মুখগহ্বরের পরের অংশটিকে গলবিল বলে। এটি 13 সেন্টিমিটার প্রশস্ত ফানেলের মতো অংশ। গলবিল নাসাগলবিল, মুখগলবিল ও স্বরগলবিল নিয়ে গঠিত। ○ **কাজ**—মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তুকে গ্রাসনালিতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে।

চিত্র 1.14. : পাকস্থলীর শারীরস্থানিক গঠনের চিত্ররূপ।
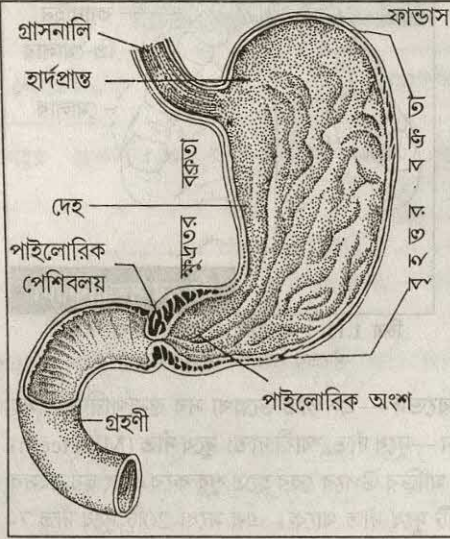
## ➤ 3. গ্রাসনালি (Oesophagus) :

23 থেকে 25 সেন্টিমিটার লম্বা পেশিবহুল গ্রাসনালি বা খাদ্যনালি যা গলবিলের নীচের অংশ থেকে শুরু হয়ে মধ্যচ্ছদা ভেদ করে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এটি শ্বাসনালির পৃষ্ঠ দেশে থাকে। ○ **কাজ**—গ্রাসনালির অপর নাম খাদ্যনালি কারণ গলবিল থেকে খাদ্যকে নালির ক্রমসংকোচন বিচলনের মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

## ➤ 4. পাকস্থলী (Stomach) :

পাকস্থলী পৌষ্টিকনালির সব থেকে ফোলানো থলির মতো অংশ। এর ঊর্ধ্বাংশ গ্রাসনালি ও নিম্নাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রহণীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি লম্বায় 25-30 সেন্টিমিটার ও চওড়ায় 8-13 সেন্টিমিটার হয়। এই পেশিবহুল স্ফীত থলি চারটি অংশে বিভক্ত, যেমন—**হার্দপ্রান্ত** (গ্রাসনালির সংলগ্ন অংশ), **ফান্ডাস** (উপরের অংশ), **বডি বা দেহ** (মধ্যাংশ) ও **পাইলোরাস** (নীচের ডিওডিনাম সংলগ্ন অংশ)। গ্রাসনালি ও পাকস্থলী এবং পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলে পেশিবলয় বা স্ফিংটার থাকে, এদের যথাক্রমে **হৃৎমুখী পেশিবলয়** এবং **পাইলোরিক পেশিবলয়** বলে। পাকস্থলীর ভিতরে অনেক শ্লৈষ্মিক ভাঁজ (Rugae) থাকে।

○ **কাজ : (i) যান্ত্রিক কাজ**—খাদ্যবস্তুকে গ্রহণ করে সাময়িকভাবে জমা রাখে ও পাকস্থলীর বিচলনের ফলে খাদ্যবস্তুকে পাচকরসের সঙ্গে সংমিশ্রণে অংশ নেয়।

(ii) **ক্ষরণ কাজ**—পাকস্থলীর অভ্যন্তরের ভাঁজে অবস্থিত গ্রন্থিকোশ থেকে নির্গত পরিপাক রস বা পাচক রস (Digestive juice) পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

(iii) **পরিপাক কাজ**— পাচকরসের বিভিন্ন উৎসেচক খাদ্যবস্তুর পরিপাক করে।

(iv) **শোষণ কাজ**—বিভিন্ন পদার্থ যেমন গ্লুকোজ, লবণ, জল, অ্যালকোহল, কোনো কোনো ঔষধ ইত্যাদি পাকস্থলীতে কিছুটা শোষিত হয়।

(v) **রেচন কাজ**—মরফিন, বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি পাকস্থলী থেকে নির্গত হয়।

## ➤ 5. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) :

ক্ষুদ্রান্ত্র অন্ত্রের প্রথম অংশ যা পাকস্থলী থেকে উৎপন্ন হয়ে বৃহদন্ত্রে সিকাম (Caecum) অংশে শেষ হয়। এটি 20 ফুট বা 610 সেন্টিমিটার লম্বা ও নাভিদেশে (উদর গহ্বরে) কুণ্ডলাকৃতি অবস্থায় থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র দিয়ে আবৃত থাকে এবং প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা—**গ্রহণী (ডিওডিনাম**—Duodenum), **মধ্য ক্ষুদ্রান্ত্র (জেজুনাম**—Jejunum) এবং **নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র (ইলিয়াম**—Ileum)। ডিওডিনামটি ইংরেজি 'C' অক্ষরের মতো অবস্থায় পাকস্থলীর নীচে থাকে। এর মধ্যে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির মাথাটি থাকে। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে নির্গত পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস যথাক্রমে পিত্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালির মধ্য দিয়ে ডিওডিনামে যায়।

চিত্র 1.15. : পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রের (একাংশের গঠন ও অবস্থান এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

○ **কাজ : (i) পরিপাক**—অগ্ন্যাশয় রস এবং আন্ত্রিক রসের বিভিন্ন প্রকারের উৎসেচকের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিপাক ক্রিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে ঘটে।

(ii) **শোষণ**—পরিপাকলব্ধ অধিকাংশ খাদ্যবস্তু, জল, লবণ ও ভিটামিন প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই-এর মাধ্যমেই শোষিত হয়।

(iii) **রেচন**—ক্ষুদ্রান্ত্র প্রতিবিষ, ভারী ধাতু, উপক্ষার ইত্যাদি পদার্থসমূহের নির্গমনে সহায়তা করে।

(iv) **জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ**—দেহে জলসাম্য বজায় রাখতে ক্ষুদ্রান্ত্র অংশগ্রহণ করে।

(v) **ক্ষরণ**—ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থি থেকে আন্ত্রিকরস ক্ষরিত হয়।

### ➤ 6. বৃহদন্ত্র (Large intestine) :

বৃহদন্ত্র লম্বায় 150 সেন্টিমিটার এবং ব্যাসে 6·3 সেন্টিমিটার। বৃহদন্ত্র ইলিওসেকাল অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে মলাশয়ে শেষ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের সঙ্গে বৃহদন্ত্রের যে অংশটি যুক্ত হয় ঠিক তার নীচে বৃহদন্ত্রের অংশকে **সিকাম** (Caecum) বলে। সিকাম থেকে একটি ক্ষুদ্রাকার আঙুলের মতো নলাকার অংশ নির্গত হয় তাকে **কীটোপাঙ্গ** বা **ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স** (Vermiform appendix) বলে। সিকামের পরবর্তী অংশ হল 150 সেন্টিমিটার দীর্ঘ **কোলন**। কোলনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—প্রথমাংশ যকৃতের কাছ বরাবর উর্ধ্বগামী অংশ যাকে **আরোহী (উর্ধ্বগামী) কোলন** (Ascending colon) বলে। দ্বিতীয়াংশ প্রথমটির সমকোণে আড়াআড়ি বিন্যস্ত থাকে, একে **অনুপ্রস্থ কোলন** (Transverse colon) এবং শেষাংশটি সোজাসুজি নীচে নেমে মলাশয়ে মিলিত হয়, একে **অবরোহী (নিম্নগামী) কোলন** (Descending colon) বলে। অবরোহী কোলন শ্রোণিগহ্বরে প্রবেশ করে **সিগময়েড কোলন** (Sigmoid colon) গঠন করে। বৃহদন্ত্রের পরের অংশ **মলাশয়** (Rectum) যা **পায়ুছিদ্রে** (Anus) উন্মুক্ত হয়। পায়ুছিদ্রকে বেস্টন করে দুটি **পেশিবলয়** (Sphincters) থাকে।

চিত্র 1.16. : বৃহদন্ত্রের গঠন।

○ **কাজ** : (i) **ক্ষরণ**—বৃহদন্ত্রে অবস্থিত **গোবলেট কোশ** শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে ফলে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

(ii) **শোষণ**—প্রধানত জল (63%—80%) বৃহদন্ত্র থেকে শোষিত হয়। এ ছাড়া সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, লবণ, জল ইত্যাদিও শোষিত হয়।

(iii) **মল সৃষ্টি**—বৃহদন্ত্রে প্রায় 135 গ্রাম আর্দ্র মল তৈরি হয়।

(iv) **রেচন**— প্রতিদিন স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন মল বৃহদন্ত্র ও মলাশয় মাধ্যমে দেহ থেকে বাইরে নির্গত হয়।

(v) **সংশ্লেষণ**— বৃহদন্ত্রে অবস্থানকারী ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-K এবং B-কম্‌প্লেক্সের ফোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

## ▲ B. পরিপাক গ্রন্থি (Digestive Glands) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব গ্রন্থির গ্রন্থিথলি বা গ্রন্থিকোশ বিভিন্ন উৎসেচকসমৃদ্ধ পাচকরস ক্ষরিত করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি (Digestive gland) বলে।**

(b) **উদাহরণ (Examples)** : লালাগ্রন্থি, পাকস্থলীয় গ্রন্থি, আন্ত্রিক গ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি।

● 1. **লালাগ্রন্থি (Salivary glands)** : মানুষের তিনজোড়া লালাগ্রন্থি আছে। এর মধ্যে একজোড়া **প্যারোটিড** (Parotid), একজোড়া **সাবম্যান্ডিবিউলার** (Sub-mandibular) এবং একজোড়া **সাবলিঙ্গুয়াল** (Sublingual) গ্রন্থি। সব থেকে বড়োপ্যারোটিড গ্রন্থি কর্ণছত্রের (পিনার) নীচে, সাবম্যান্ডিবিউলার গ্রন্থি নিম্নচোয়ালের পিছনের দিকে এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি জিভের নীচে থাকে। এই সব গ্রন্থি থেকে নালিসমূহ উৎপন্ন হয়ে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লালারস** (লালা—Saliva) এই সব নালির মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে আসে।

চিত্র 1.17. : মানুষের তিনপ্রকার লালাগ্রন্থির অবস্থানের চিত্ররূপ।

○ **কাজ**—লালাগ্রন্থি থেকে লালারস ক্ষরিত হয়। এই রস খাদ্যবস্তুকে ভিজিয়ে নরম করে, চিবোতে, গিলতে সাহায্য করে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করতে অংশ নেয়। এছাড়া কথা বলতে, ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস ইত্যাদি কাজ করে। (লালারসের কার্যাবলি এই অধ্যায়ে পরের দিকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।)

2. **পাকস্থলীয় গ্রন্থি (Gastric gland) ঃ** পাকস্থলীর শ্লেষ্মা স্তরে অবস্থিত গ্রন্থিকোশ।

○ **কাজ**—এইসব গ্রন্থিকোশ থেকে পাচক রস ক্ষরিত হয় (পৃষ্ঠা 3.64 দেখো)।
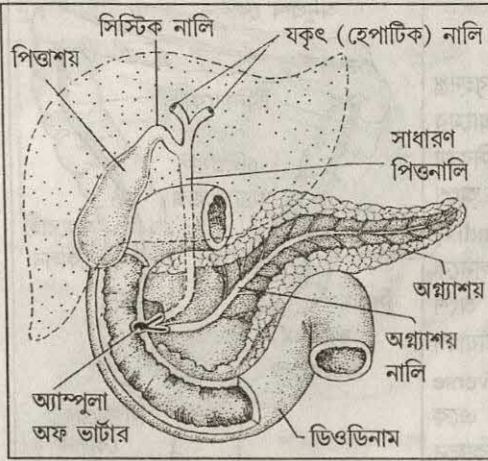
**চিত্র 1.18. ঃ** যকৃৎ, ডিওডিনাম এবং অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক।

3. **যকৃৎ (Liver) ঃ** যকৃৎ দেহের সব থেকে বড়ো গ্রন্থি যা উদর গহ্বরের ঊর্ধ্বাংশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে থাকে। এটি লালচে-বাদামি রঙের হয়। যকৃতের ঊর্ধ্বতল প্রধানত দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত হয়। বড়ো খণ্ডটি উদরগহ্বরে ডান পাশে ও ছোটো খণ্ডটি বাম পাশে থাকে। যকৃতের নিম্নতল লম্বা এবং অণু প্রস্থ খাঁজের মাধ্যমে চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়, যেমন ডান খণ্ড, বাম খণ্ড, কোয়াড্রেট খণ্ড এবং কডেট খণ্ড। ডান খণ্ডের নীচে বেলুনাকৃতি **পিত্তাশয় বা পিত্তথলি** (Gall bladder) থাকে। বিভিন্ন খণ্ড থেকে নির্গত **যকৃৎ নালি** (Hepatic ducts) এবং পিত্তাশয় থেকে নির্গত **পিত্তাশয় নালি** (Cystic duct) পরস্পর মিলিত হয়ে সাধারণ **পিত্তনালি** (Common bile duct) গঠন করে। এটি অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে আসা নালির সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে উন্মুক্ত হয়।

○ **কাজ ঃ** (i) **ক্ষরণ ঃ পিত্তরসের ক্ষরণ**—যকৃৎ গাঢ় হলদে নীল রঙের **পিত্তরস** বা **পিত্ত** (Bile) রস নিঃসৃত হয়।

(ii) **বিপাক**—কার্বোহাইড্রেটের বিপাক (গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লাইকোলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস, রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণ), প্রোটিনের বিপাক (প্লাজমা প্রোটিন, ইউরিয়া সংশ্লেষণ), ফ্যাটের বিপাক (ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ, ফ্যাট ও ফসফোলিপিডের উৎপাদন), হরমোনের বিপাক ইত্যাদি কাজে যকৃৎ অংশগ্রহণ করে।

(iii) **রেচন**—দেহে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ঔষধ, কোনো কোনো ভারী ধাতু প্রভৃতি পদার্থসমূহ যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরসের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়।

(iv) **রক্ত সম্পর্কীয়**—ভ্রূণ অবস্থায় R. B. C.-এর উৎপাদন, পূর্ণবয়স্ক R.B.C-এর বিনাশ, রক্তের সঞ্চয় স্থান, রক্তের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, প্রোথ্রমবিন নামে রক্ত-তঞ্চনকারী প্লাজমা প্রোটিনের উৎপাদন, যকৃতের মাস্টকোশ থেকে রক্ততঞ্চন বিরোধী হেপারিন উৎপাদন ইত্যাদি কার্যাবলি যকৃতে সংঘটিত হয়।

(v) **অন্যান্য**—ভিটামিনের সংশ্লেষণ ও সঞ্চয়, দেহ তাপ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা ও প্রশমন ইত্যাদি কার্যাবলি যকৃতের সাহায্যে হয়। বিভিন্ন রকমের বিষাক্ত পদার্থকে বিনাশ করে যকৃৎ দেহকে সুরক্ষিত রাখে।

4. **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreatic gland) ঃ** পাকস্থলীর নীচে এবং ডিওডিনামের দুটি বাহুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনিয়মিত পরিধি বিশিষ্ট অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিটি অবস্থিত। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যেমন—মস্তক, দেহ এবং পুচ্ছ। মস্তকটি গ্রহণীর 'C' অক্ষরের মতো খাঁজের মধ্যে থাকে। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন প্রধান নালিকে অগ্ন্যাশয় নালি বলে যা সাধারণ পিত্তনালির সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে উন্মুক্ত হয়।

○ **কাজ**—(i) **অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ**—অগ্ন্যাশয় কোশ থেকে অগ্ন্যাশয়-পাচকরস ক্ষরিত হয়। এই রসের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট বিশ্লেষণকারী উৎসেচকগুলি যথাক্রমে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিপাকে সাহায্য করে।

(ii) **হরমোন ক্ষরণ**—ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামে হরমোন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেট অফ ল্যাগারহ্যান্সের যথাক্রমে β-কোশ এবং α-কোশ থেকে নিঃসৃত হয়।

## ▲ পৌষ্টিকনালি এবং পরিপাক গ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন (Histological structure of the alimentary canal and Digestive glands)

(a) **পৌষ্টিকনালির আণুবীক্ষণিক গঠন ঃ** সমগ্র পৌষ্টিকনালি একটি নলের মতো অংশ। এর সাধারণ কলাস্থানিক গঠন প্রধানত চারিটি স্তর নিয়ে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে পর পর নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো থাকে।

(i) **সেরাস স্তর** (Serous layer)—এটি সবথেকে বাইরের পাতলা স্তর যা তন্তুময় যোগ কলা দিয়ে গঠিত। এই স্তরের উপরে

কখনো-কখনো অন্য একটি আঁইশাকার আবরণী কলা দিয়ে গঠিত পাতলা আবরণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একে **মেসোথেলিয়াম** (Mesothelium) বলে।

(ii) **পেশিস্তর** (Muscular layer)—এটি দ্বিতীয় স্তর যা সেরাস স্তরের ভিতরের দিকে থাকে। এটি সাধারণত মসৃণ (Unstriated) পেশি দিয়ে গঠিত। সাধারণত পেশি স্তরটি দুটি স্তরে পৃথকভাবে সজ্জিত থাকে, যেমন—বাইরের দিকে অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal) পেশিস্তর ও ভেতরের দিকে অনুপ্রস্থ বা বৃত্তাকার (Circular) পেশিস্তর।

(iii) **অধঃশ্লৈষ্মিক স্তর** (Submucous layer)—পেশিস্তরের পরবর্তী ভিতরের স্তরটি পুরু এবং শিথিলভাবে বিক্ষিপ্ত কোলাজেন তন্তু নামে সংযোজক বা যোগ কলা নিয়ে গঠিত। এই স্তরে রক্তবাহ, লসিকাবাহ, বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ও স্নায়ুজালক ইত্যাদি থাকে।

চিত্র 1.19. : পৌষ্টিকনালির প্রস্থচ্ছেদে দেখা সাধারণ কলাস্থানিক (আণুবীক্ষণিক) গঠন।

(iv) **শৈষ্মিক স্তর** (Mucous layer)—সবথেকে ভিতরের স্তর যা পৌষ্টিকনালির বিবরটিকে ঘিরে থাকে। এই স্তরের বিবর সন্নিহিত মুক্তপ্রাপ্ত আচ্ছাদক আবরণী কলা দিয়ে আবৃত থাকে। আবরণী কলার নীচে প্রচুর রক্তবাহ এবং গ্রন্থিযুক্ত সংযোজক কলা নিয়ে গঠিত কয়েকটি স্তর আছে। একে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (Lamina propria) বলে। অধিকাংশ গ্রন্থি শ্লেষ্মা বা মিউকাস (Mucous) ক্ষরণ করে। এছাড়া কিছু গ্রন্থি পরিপাক রস ক্ষরণ করে। এই স্তরের বাইরের দিকে একটি অনুদৈর্ঘ্য সজ্জিত পেশিস্তর থাকে। তাকে **শ্লৈষ্মিক পেশিস্তর** (Muscular mucosa) বলে।

(b) **পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের আণুবীক্ষণিক গঠন (Histological structure of different parts of the Alimentary canal) :**
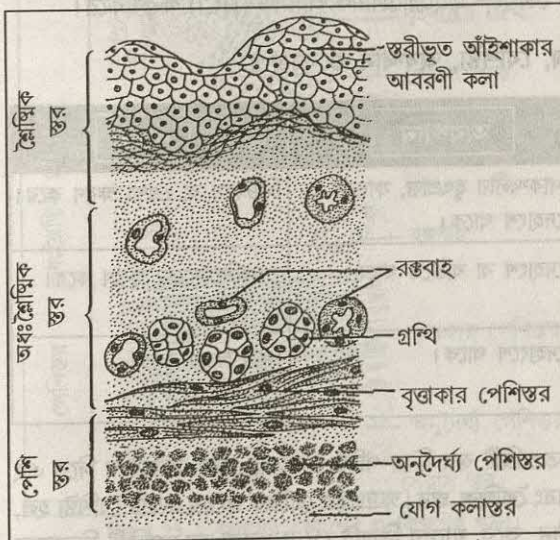
চিত্র 1.20. : গ্রাসনালির একাংশের আণুবীক্ষণিক গঠন।

1. **গ্রাসনালির আণুবীক্ষণিক গঠন**—বাইরে থেকে ভিতর দিকের স্তরগুলি নিম্নরূপ—

(i) **অ্যাডভেন্টিসিয়া স্তর,** (ii) **পেশিস্তর** (বহিস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার), (iii) **অধঃশ্লৈষ্মিক** বা **সাবমিউকাস** স্তর এবং (iv) **শ্লৈষ্মিক বা মিউকাস** স্তর। শ্লৈষ্মিক স্তরটি **আবরণী কলা** দিয়ে আবৃত থাকে। খাদ্যবস্তুর অনুপস্থিতিতে শ্লৈষ্মিক স্তরে অসংখ্য অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ দেখা যায়। অধঃশ্লৈষ্মিক স্তরে মিউকাস ক্ষরণকারী গ্রন্থি থাকে।

গ্রাসনালির প্রথমাংশের বহিস্থ অংশ অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তরটি ঐচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত, ফলে খাদ্য গলাধঃকরণের সময় খাদ্যনালির এই অংশ ইচ্ছামত সঞ্চালন করা যায়।

2. **পাকস্থলীর আণুবীক্ষণিক গঠন**—পৌষ্টিকনালির অন্যান্য অংশের মতো পাকস্থলীর প্রাচীর (i) **সেরাস স্তর** (বহিস্থ), (ii) **পেশিস্তর** (বহিস্থ অনুদৈর্ঘ্য, মধ্যস্থ বৃত্তাকার ও অন্তঃস্থ তির্যক), (iii) **অধঃশ্লৈষ্মিক স্তর** এবং (iv) **শ্লৈষ্মিক স্তর** (অন্তঃস্থ) নিয়ে গঠিত। শ্লৈষ্মিক স্তরের মুক্তপ্রান্ত স্তম্ভাকার **আবরণী কলা** দিয়ে আবৃত থাকে। খাদ্যবস্তুর অনুপস্থিতিতে পাকস্থলীর

শ্লেষ্মিক স্তরটিতে অনুদৈর্ঘ্য ভাঁজ থাকে, এদের **শ্লেষ্মিক ভাঁজ** (Rugae) বলে। ভাঁজের গোড়ায় শ্লেষ্মিক স্তরে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি থাকে।
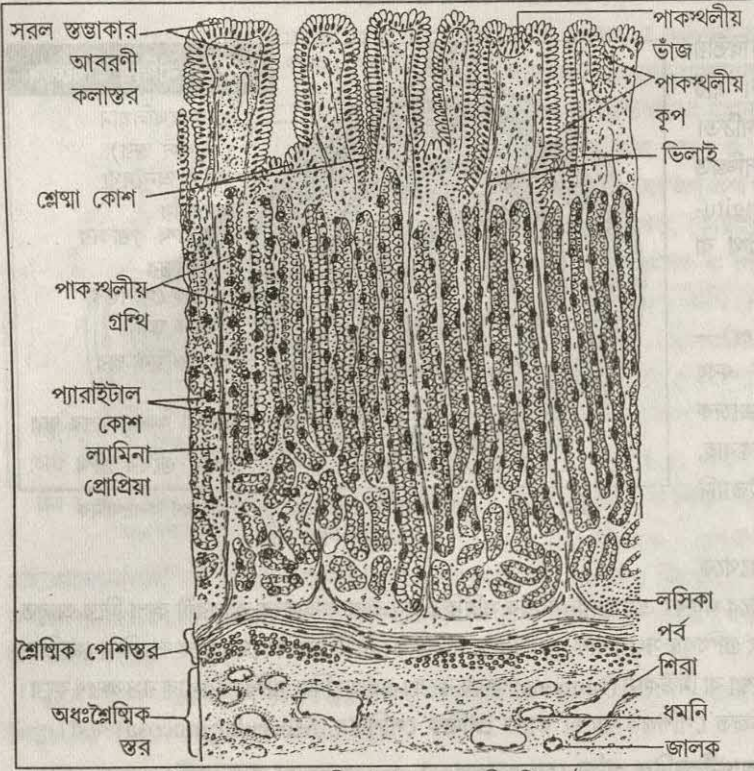
চিত্র 1.21. ঃ পাকস্থলীর একাংশের আণুবীক্ষণিক গঠন।

● **পাকস্থলীয় গ্রন্থি (Gastric glands)**—শ্লেষ্মিক স্তরে পাকস্থলীয় গ্রন্থিকোশ থাকে। পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশের অবস্থান অনুযায়ী পাকস্থলীর গ্রন্থিকোশ তিন প্রকারের হয়, যেমন—

1. **কার্ডিয়াক গ্রন্থি** ঃ পাকস্থলীর হার্দ-পেশিবলয়ের কাছে থাকে।

2. **পাইলোরিক গ্রন্থি** ঃ পাইলোরিক পেশিবলয় কাছে থাকে।

3. **ফ্যান্ডিক গ্রন্থি** ঃ হার্দ ও পাইলোরিক পেশিবলয় ছাড়া পাকস্থলীর বাকি অংশে ফ্যান্ডিক গ্রন্থি থাকে। ফ্যান্ডিক গ্রন্থিতে **শ্লেষ্মা কোশ** (Mucous cells), **পেপটিক কোশ** (Peptic cells) বা **প্রধান কোশ** (Chief cells) এবং **প্যারাইটাল কোশ** (Parietal cells) বা **অক্সিন্‌টিক কোশ** (Oxyntic cells) নামে তিন প্রকার কোশ থাকে।

○ **কাজ**—(i) শ্লেষ্মা কোশ—মিউকাস (শ্লেষ্মা), (ii) পেপটিক কোশ—পেপসিন নামে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এবং (iii) অক্সিনটিক কোশ— হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ক্ষরণ করে।

● **পাকস্থলীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষরণকারী গ্রন্থিকোশের নাম, বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও কাজ ঃ**

| নাম | বৈশিষ্ট্য | অবস্থান | কাজ |
|---|---|---|---|
| 1. মিউকাস কোশ বা শ্লেষ্মা কোশ | ঘনক্ষেত্রাকার কোশ | পাকস্থলীর হৃৎপ্রান্ত, ফান্ডাস ও দেহাংশ থাকে। | মিউকাস বা শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে। |
| 2. পেপটিক কোশ | জাইমোজেন দানাযুক্ত পিরামিড-আকৃতির কোশ | দেহাংশ বা বডিতে থাকে। | পেপসিনোজেন ক্ষরণ করে। |
| 3. প্যারাইটাল কোশ বা অক্সিনটিক কোশ | ডিম্বাকৃতি কোশ | দেহাংশে থাকে। | HCl ক্ষরণ করে। |

4. **ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine)** ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর প্রধানত চারিটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে এই স্তরগুলি হল যথাক্রমে **সেরাস স্তর, পেশিস্তর, অধঃশ্লৈষ্মিক স্তর** এবং **শ্লৈষ্মিক স্তর**। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তারা আঙুলের মতো কতকগুলি প্রবর্ধক অংশ (Processes) গঠন করে, যাদের **ভিলাই** (Villi) বলা হয়। প্রতিটি ভিলাসের অভ্যন্তরে রক্তজালকবেষ্টিত **ল্যাকটিয়েল** (Lacteal) নামে লসিকা প্রণালী থাকে। ভিলাই স্তম্ভাকার আবরণী কোশ দিয়ে আবৃত থাকে। কোশগুলি মুক্ত প্রান্তে **মাইক্রোভিলাই** (Micro-villi) নামে অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাকার সাইটোপ্লাজমের অংশ নিয়ে গঠিত প্রবর্ধক

অংশ থাকে। ভিলাই ও মাইক্রোভিলাইর জন্য শ্লৈষ্মিক স্তরের আবরণী তল বহুগুণ বেড়ে যায় ফলে খাদ্যবস্তুর শোষণ সহজ হয় ও শোষণের হার বাড়ে।

● **আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands) :** শ্লৈষ্মিক স্তরে অবস্থিত স্তম্ভাকার আবরণী কলা কোনো কোনো জায়গায় শ্লৈষ্মিক স্তরের ভিতরে প্রবেশ করে সরল নলাকার **আন্ত্রিক গ্রন্থি** বা **লিবারকুহনের ক্রিপ্টস** (Crypts of Lieberkuhn) গঠন করে। স্তম্ভাকার আবরণী কলা স্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে কতকগুলি স্বচ্ছ মিউসিনোজেন দানাযুক্ত এককোশী **গোব্‌লেট কোশ** (Goblet cells) সারিবদ্ধভাবে থাকে। এছাড়া ডিওডিনামের অধঃশ্লৈষ্মিক স্তরে বহু **ব্রুনারের গ্রন্থি** (Brunner's gland) থাকে।

○ **কাজ**— (i) আন্ত্রিক গ্রন্থি (ক্রিপ্টস অফ লিবারকুহন) আন্ত্রিক রস এবং (ii) ব্রুনারের গ্রন্থি শ্লেষ্মা নিঃসৃত করে।

চিত্র 1.22. : ক্ষুদ্রান্ত্রের একাংশের আণুবীক্ষণিক গঠন।

● **পেয়ার্স প্যাচ (Peyer's patch)** ●

ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের অধঃশ্লেষ্মা স্তরে কতকগুলি লসিকা কলা একসঙ্গে যে গুটিকার মতো অংশ গঠন করে তাকে **পেয়ার্স প্যাচ** বলে।
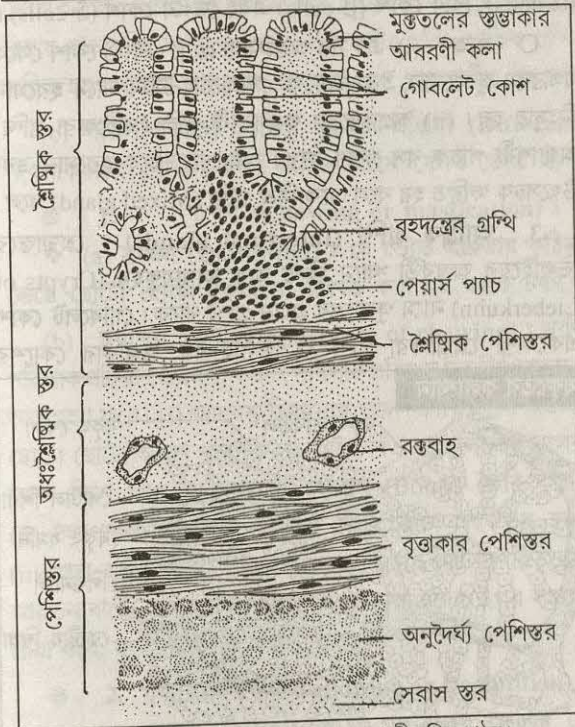
চিত্র 1.23. : বৃহদন্ত্রের একাংশের আণুবীক্ষণিক গঠন।

5. **বৃহদন্ত্র (Large intestine) :** সেরাস স্তর, পেশি স্তর, অধঃশ্লৈষ্মিক স্তর এবং শ্লৈষ্মিক স্তর—এই চারটি স্তর নিয়ে বৃহদন্ত্র গঠিত। বৃহদন্ত্রে ভিলাই থাকে না তবে শ্লৈষ্মিক স্তরে ভাঁজের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ভাঁজগুলি স্তম্ভাকার আবরণী কলা দিয়ে আবৃত থাকে। এই আবরণী কলাস্তরের মধ্যবর্তী স্থানে শ্লেষ্মা ক্ষরণকারী **গোবলেট কোশের** (Goblet cells) প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া অধঃশ্লৈষ্মিক স্তরে বহু লসিকা পর্ব (Lymph node) থাকে।

## ▲ C. পরিপাক গ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন (Histology of digestive glands) :

1. **লালা গ্রন্থি (Salivary gland) :** মুখগহ্বরের দু'পাশে তিনজোড়া লালা গ্রন্থি থাকে। প্রতিটি গ্রন্থি বহুসংখ্যক **ক্ষরণকারী থলি** নিয়ে গঠিত। এদের **অ্যালভিওলাই** (Alveoli) বা **অ্যাসিনি** (Acini) বলে। থলিগুলি ক্ষুদ্রাকার নালি দিয়ে যুক্ত। নালিগুলি ঘনকাকার আবরণী কোশ দিয়ে এবং গ্রন্থিগুলি গ্রন্থিময় আবরণী কোশ দিয়ে আবৃত থাকে। গ্রন্থি কোশগুলি তিন প্রকারের হয়, যেমন—সেরাস কোশ, মিউকাস কোশ এবং মিশ্র কোশ। যেসব থলি সেরাস কোশ দিয়ে আবৃত থাকে তাদের **সেরাস থলি** (Serous acini) বলে। যেসব থলি মিউকাস কোশ দিয়ে আবৃত থাকে তাদের **মিউকাস থলি** (Mucous acini) বলে এবং যে থলি সেরাস ও মিউকাস উভয় প্রকার কোশ দিয়ে আবৃত থাকে তাদের **মিশ্র থলি** (Mixed acini)

বলে। প্যারোটিড গ্রন্থিতে সেরাস কোশ, সাব-ম্যান্ডিবিউলার ও সাব-লিঙ্গুয়াল গ্রন্থিথলিতে সেরাস, মিউকাস এবং মিশ্র কোশ থাকে।

○ **কাজ**—সেরাস কোশ উৎসেচক(টায়ালিন) এবং মিউকাস কোশ শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে।

2. **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreatic gland)** : পাকস্থলীর নীচে ও ডিওডিনামের লুপের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। সমগ্র গ্রন্থিটি তন্তুময় কলা দিয়ে বহু লোব বা খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতিটি লোব বহু **ক্ষরণকারী থলি** (Secretory acini or alveoli) নিয়ে গঠিত। এই থলিগুলি সেরাস কোশ দিয়ে আবৃত। এই কোশ থেকে ক্ষরিত রস গ্রন্থির নালির মাধ্যমে এসে ডিওডিনামে প্রবেশ করে। ক্ষরণথলিগুলির অন্তর্বর্তী কোনো কোনো স্থানে পুঞ্জীভূত বহুকোণাকৃতি (Polyhedral) কোশ থাকে। তাদের **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপগ্রন্থি বা আইলেটস্ অফ্ ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islet of Langerhans) বলে, এদের মধ্যে কোনো নালির উপস্থিতি দেখা যায় না। ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপগ্রন্থির অন্তঃক্ষরা কোশগুলি তিন প্রকারের হয়, যেমন—**আলফা কোশ** (α-cells), **বিটা কোশ** (β-cells) এবং **ডেল্টা কোশ** (δ-cells)।

চিত্র 1.24. : লালাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন : A—গ্রন্থিথলির প্রস্থচ্ছেদ এবং B—একটি গ্রন্থিথলি ও একটি ক্ষরণকারী নালির প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির কলাস্থান

চিত্র 1.25. : অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির গ্রন্থিথলি এবং আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সের আণুবীক্ষণিক গঠন।

○ **কাজ**—(i) এই সব অন্তঃক্ষরা α, β এবং δ কোশ থেকে যথাক্রমে গ্লুকাগোন, ইনসুলিন ও সোমাটোস্টেটিন নামে **হরমোন** নিঃসৃত হয়। (ii) অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণকারী থলি (বহিঃক্ষরা গ্রন্থি) **অগ্ন্যাশয়ী পাচক রস** ক্ষরণ করে। অগ্ন্যাশয় থেকে হরমোন এবং উৎসেচক ক্ষরিত হয় বলে একে **মিশ্র গ্রন্থি** (Mixed gland) বলে।

3. **আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands)** : শ্লেষ্মাস্তরে ভিলাইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে **ক্রিপ্ট অফ্ লিবারকুহন** (Crypts of Lieberkuhn) নামে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রধান গ্রন্থি থাকে। **গোবলেট কোশ** এককোশী শ্লেষ্মাক্ষরা গ্রন্থি যা ভিলাই-এর স্তম্ভাকার কোশের অন্তর্বর্তী স্থানে সারিবদ্ধভাবে থাকে। অধঃশ্লেষ্মা স্তরে **ব্রুনার গ্রন্থি** (Brunner's glands) থাকে।

○ **কাজ**—(i) ক্রিপটস অফ্ লিবারকুহন থেকে আন্ত্রিক রস ক্ষরিত হয়। (ii) ব্রুনার গ্রন্থি ক্ষারীয় মিউকোয়েড বা শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে।

4. **যকৃৎ (Liver)** : যকৃৎ প্রধানত 4টি খণ্ডে বা লোবে বিভক্ত। প্রতিটি লোব আবার অসংখ্য লবিউলে বিভক্ত হয়। প্রতিটি লবিউলের কেন্দ্রে একটি **কেন্দ্রীয় শিরা** থাকে। এই কেন্দ্রীয় শিরা থেকে লবিউলের পরিধি পর্যন্ত বহু কোণাকৃতি (Polyhedral) দানাদার কোশগুলি সারি সারি হয়ে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো সজ্জিত থাকে।

চিত্র 1.26. : যকৃতের আণুবীক্ষণিক গঠন।

লবিউলের অন্তর্বর্তী স্থানে পোর্টাল শিরা, পিত্তনালি, হেপাটিক আর্টারি বা যকৃৎ ধমনি ইত্যাদি থাকে। প্রতিটি কোশ-সারির একদিকে **সায়নুসয়েড** ও অপরদিকে **পিত্তনালিকা** (Bile canliculi) থাকে। যকৃৎ কোশ থেকে ক্ষরিত পিত্ত পিত্তনালিকার মধ্য দিয়ে যকৃৎনালিতে যায় এবং সেখান থেকে পিত্তাশয়ের নালি দিয়ে পিত্তাশয়ে (Gall bladder) যায় ও সঞ্চিত থাকে। সায়নুসয়েডের গাত্রে কুফার কোশ (Kupffer Cell) নামক আগ্রাসী কোশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

○ **কাজ**—(i) পিত্তরস ক্ষরণ করে। (ii) অন্যান্য কাজ—দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো।

## ❂ 1.13. পরিপাক (Digestion) ❂

### ▲ পরিপাকের সংজ্ঞা, স্থান এবং ভৌত প্রক্রিয়া (Definition, Site and Physical processes)

❖ (a) **পরিপাকের সংজ্ঞা (Definition of digestion)** : পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন প্রকার পাচক রসে উপস্থিত বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জটিল অদ্রবণীয় খাদ্য কণাগুলি যে ভৌত জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে সরল দ্রবণীয় ও শোষণ উপযোগী উপাদানে রূপান্তরিত হয় তাকে পরিপাক বলে।

(b) **পরিপাকের স্থান (Site of digestion)** : পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে প্রধানত মুখগহ্বর, পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রীর পরিপাক ক্রিয়া ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়।

পৌষ্টিকনালি ছাড়াও অন্য কতকগুলি সহায়ক গ্রন্থি (Accessory glands) পরিপাক কাজে অংশগ্রহণ করে। পরিপাকের সময় খাদ্যবস্তুতে প্রথমে ভৌত এবং পরে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উৎসেচক বা এনজাইম দায়ী। পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই সকল উৎসেচক বিভিন্ন পরিপাককারী রসে থাকে। পরিপাক ক্রিয়ায় লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি, পাকস্থলীর গ্রন্থি, আন্ত্রিক গ্রন্থি এবং যকৃৎ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই সব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় যথাক্রমে **লালারস, অগ্ন্যাশয় রস, পাকস্থলীয় রস বা পাচক রস, আন্ত্রিক রস** এবং **পিত্ত**।

(c) **পরিপাককালে বিভিন্ন ভৌত প্রক্রিয়া (Different physical processes during digestion)** :খাদ্যবস্তুর পরিপাককালে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে যেসব ভৌত বা যান্ত্রিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয় তার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

#### 1. চর্বণ (Chewing or mastication) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে ভৌত প্রক্রিয়ায় কঠিন খাদ্যবস্তু দাঁতের (শিশু বা বৃদ্ধ অবস্থায় শক্ত মাড়ি) সাহায্যে ভেঙে ছোটো ছোটো টুকরাতে পরিণত করা হয় তাকে চর্বণ বলে।**

(b) **চর্বণের গুরুত্ব (Importance of chewing)** : চর্বণ পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ এবং পরিপাক প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিতভাবে অংশগ্রহণ করে। (i) খাদ্যবস্তু চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তুগুলি অত্যন্ত ছোটো ছোটো অংশে পরিণত হয়। এই চর্বিত বস্তুগুলি লালারসের সঙ্গে মিশে **পিণ্ড** বা **দলা** বা **বোলাস** (Bolus) তৈরি করে। (ii) দলাপাকানোর ফলে খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ সহজতর হয়। (iii) খাদ্য-বস্তুগুলি টুক রো টুকরো হওয়ায় এদের মোট উপরিতলের আয়তন বাড়ে বলে বেশি পরিমাণ উৎসেচক এদের উপর সহজে ক্রিয়া করে, ফলে পরিপাক সহজতর হয়।

চিত্র 2.27. : দলাপাকানো খাদ্যবস্তুর (খাদ্য পিণ্ডের) গলাধঃকরণের চিত্ররূপ।

#### 2. গলাধঃকরণ (Swallowing or Deglutition) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : গলবিলের পেশির যে ক্রিয়ায় খাদ্যপিণ্ড মুখগহ্বর থেকে গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে এবং গ্রাসনালির পেশির সংকোচনের ফলে পরে এই খাদ্য পাকস্থলীতে যায় তাকে গলাধঃকরণ বলে।**

(b) **প্রক্রিয়া (Process)** ঃ গলাধঃকরণ একটি প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া। জিভের ঐচ্ছিক পেশি সঞ্চালনের ফলে দাঁতের সাহায্যে চর্বিত ও লালারস দিয়ে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যবস্তু পিণ্ড (Bolus) আকার ধারণ করে। জিভের পেছন দিকের গলবিল ও জিভের সাহায্যেই কোমল টাকরার দিকে খাদ্য পিণ্ডটি নিক্ষিপ্ত হয় ফলে এইসব স্থান খাদ্যের সংস্পর্শে এসে উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা V, VII এবং IX করোটিক স্নায়ুর (অন্তর্বাহ স্নায়ু) মধ্য দিয়ে সুষুম্নাশীর্ষে (মেডালা অবলংগাটা) পৌঁছায়। মস্তিষ্কের এই অংশ থেকে IX, X এবং XII করোটিক স্নায়ু (বহির্বাহ স্নায়ু) মাধ্যমে স্নায়ুর আবেগ (Nerve impulse) গলবিল, কোমল টাকরা, শ্বাসরন্ধ্র, গ্রাসনালি প্রভৃতির পেশিতে প্রবেশ করে ও গলাধঃকরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াসমূহকে পরিচালিত (সংকুচিত ও প্রসারিত) করে।

**3. পৌষ্টিকনালির বিচলন (Movements of alimentary canal)** ঃ পৌষ্টিকনালির বিচলন গ্রাসনালি থেকে শুরু হয়। পৌষ্টিকনালির প্রধান কাজগুলি হল খাদ্যবস্তুর পরিবহন, বিভিন্ন পরিপাককারী রসের ক্ষরণ সংমিশ্রণ ও খাদ্যের সঙ্গে তাদের পরিপাক, শোষণ এবং মলত্যাগ। পৌষ্টিকনালির এই সব কাজগুলিকে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন রকম বিচলন (Movements) সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকার বিচলনের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রধানত দু-রকমের বিচলন লক্ষ করা যায়, যেমন—ক্রমসংকোচন এবং খণ্ডীভবন (Segmentation)। এই দু-রকম বিচলন খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়।

**চিত্র 1.28.** ঃ গ্রাসনালি বিচলনে খাদ্যবস্তুর পরিবহন ক্রিয়ার চিত্ররূপ।

(a) **ক্রমসংকোচন (Peristalis)**—ক্রমসংকোচন বিচলন চলমান সংকোচন ও প্রসারণের যৌথ ঘটনাবলি যা পৌষ্টিকনালি গাত্র দিয়ে তরঙ্গাকারে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। নালির যে স্থানে খাদ্যবস্তু থাকে তার আগে নালি প্রাচীরের পেশির সংকোচন ঘটে। এর কারণ এই স্থানের ক্ষুদ্রান্ত্র গায়ে কতকগুলি স্থানীয় স্নায়ুজালক (Local nerve plexus) উদ্দীপিত হয়ে এই প্রকার সংকোচন ঘটায়।

○ **কাজ**—খাদ্যবস্তুর পাচক রসের সঙ্গে সংমিশ্রণ এবং খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে। এছাড়া খাদ্যবস্তুকে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

(b) **ছান্দিক খণ্ডীভবন (Rhythmic segmentation)**— ক্রমসংকোচন বিচলন ছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্রে অন্য এক প্রকার বিচলন দেখা যায় যা ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রিয়ার ফলে (পেশিজাত) সংঘটিত হয়। এই প্রকার বিচলনে ক্ষুদ্রান্ত্রে নিয়মিত দূরত্বে সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। এর ফলে খাদ্যবস্তুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়। পরপর এভাবে সংকোচন ও প্রসারণ চলতে থাকায় চিবোনো খাদ্যবস্তু পাচকরসের সঙ্গে ভালোভাবে মিশ্রিত হয়। একে **ছান্দিক খণ্ডীভবন** বলে (চিত্র 1.29)।

**চিত্র 1.29.** ঃ A—ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্রমসংকোচন বিচলন (বাম) এবং B—খণ্ডীভবন বিচলনের চিত্ররূপ।

○ **কাজ**—ক্ষুদ্রান্ত্রে খণ্ডীভবন বিচলন মিনিটে 20 থেকে 30 বার ঘটে। এই বিচলনের ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের সংমিশ্রণ, খাদ্যের শোষণ প্রভৃতি কাজ সংঘটিত হয়।

● **পৌষ্টিকনালির অন্যান্য অংশের বিচলন**—ক্ষুদ্রান্ত্র গ্রাসনালি, পাকস্থলী, বৃহদন্ত্রে এমনকি ভিলাইয়ের বিচলন লক্ষ করা যায়। সম্ভবত ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীর থেকে ক্ষরিত **ভিলিকাইনিন** (Villikinine) নামে স্থানীয় হরমোনের প্রভাবে শ্লৈষ্মিক পেশিস্তরের ক্রিয়ার ফলে ভিলাইগুলির বিচলন (আন্দোলন) ঘটে থাকে। ভিলাইয়ের বিচলন খাদ্যের শোষণ পদ্ধতিকে উদ্দীপিত করে।

## ◎ 1.14. পরিপাককারী রসের উপাদান এবং কার্যাবলি ◎ (Composition and Functions of Digestive Juices)

### ▲ লালারস বা লালা (Salivary juice or saliva) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ** তিনজোড়া লালাগ্রন্থিস্থিত তিন প্রকার ক্ষরণকারী থলি (Secretory acini) থেকে সম্মিলিতভাবে সামান্য ঘোলাটে, চটচটে, ঈষৎ অম্লধর্মী যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে লালারস বা লালা বলে।

(b) **উৎপত্তিস্থল ঃ** লালাগ্রন্থির মিউকাস ও সেরাস গ্রন্থিকোশ থেকে লালার ক্ষরণ ঘটে। লালাগ্রন্থির সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থির গ্রন্থিকোশ থেকে সর্বাধিক প্রায় 70% লালা ক্ষরিত হয়।

(c) **মোট পরিমাণ ঃ** প্রতি 24 ঘণ্টায় 1,200-1,500 মিলিলিটার।

(d) **বৈশিষ্ট্য ঃ** কোশ ও মিউসিনযুক্ত ঘোলাটে চটচটে রস।

(e) **বিক্রিয়া ঃ** বিশ্রামরত অবস্থায় লালারস খানিকটা অম্লধর্মী। সক্রিয় ক্ষরণকালে লালারস ক্ষারীয় (8·0) হয়।

(f) **আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ** 1·002–1·012

(g) **লালারসের উপাদান (Composition of Saliva) ঃ**

1. জল—99·5 শতাংশ। এবং 2. **কঠিন পদার্থ**—0·5 শতাংশ। এটি নিম্ন প্রকারের হয়—

(i) **কোশীয় উপাদান ঃ** ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, বিভিন্ন ধরনের শ্বেতরক্ত কণিকা, আঁশাকার আবরণী কোশ প্রভৃতি।

(ii) **অজৈব লবণ ঃ** সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, আম্লিক ও ক্ষারীয় সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

(iii) **জৈব পদার্থ ঃ** (ক) **উৎসেচক** —**টায়ালিন বা সালাইভারী অ্যামাইলেজ** এবং **লাইসোজাইম** (Lysozyme)।

(খ) **অন্যান্য পদার্থ**—মিউসিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইউরিয়া প্রভৃতি। টায়ালিন নামে উৎসেচক ছাড়া লালারসে ক্যালিক্রেইন (Kallikrein), মলটেজ (Maltase), ফসফাটেজ, লাইপেজ ইত্যাদি উৎসেচক খুব সামান্য পরিমাণে থাকে বলে মনে করা হয়।

4. **গ্যাসীয় পদার্থ ঃ** স্বল্প পরিমাণ $O_2$, $CO_2$ এবং $N_2$ থাকে।

### ● লালারসের বিভিন্ন উপাদানের কাজ (Functions of different constituents of Saliva) ঃ

| উপাদান | কাজ |
|---|---|
| 1. জল | (i) মুখগহ্বরকে ভিজা রাখে ফলে কথা বলতে খাদ্য গিলতে সাহায্য করে।<br>(ii) মুখগহ্বরে এবং দাঁতের গোড়াতে জমে থাকা খাদ্য কণাকে ধুয়ে বের করে দেয়।<br>(iii) জলীয় লালা উত্তপ্ত ও উদ্দীপক পদার্থকে তরল করে ফলে শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।<br>(iv) উৎসেচকের বিক্রিয়ার জন্য তরল মাধ্যম গড়ে তোলে।<br>(v) দেহে জলের সাম্যতা বজায় রাখে। |

| উপাদান | কাজ |
|---|---|
| 2. অজৈব উপাদান | (i) NaCl-এর ক্লোরাইড (Cl) আয়ন লালারসের টায়ালিন উৎসেচকের সক্রিয়তাকে বাড়ায়।<br>(ii) লালার বাইকার্বোনেট এবং ফসফেট বাফারের মতো কাজ করে। |
| 3. জৈব উপাদান | (i) টায়ালিন স্টার্চকে পাচিত করে মলটোজে পরিণত করে।<br>(ii) লাইসোজাইম একরকম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী উৎসেচক যা খাদ্যবস্তুর সঙ্গে প্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।<br>(iii) মিউসিন লালারসকে পিচ্ছিল করে ফলে খাদ্যবস্তু গিলতে সহজ হয়। |

❂ **লালারসের কাজ (Functions of Saliva Or, Salivary juice) ঃ**

1. লালা মুখগহ্বরকে ভিজা রাখে ফলে কথা বলতে সাহায্য করে। এছাড়া লালারস শুকনো খাদ্যবস্তুকে ভিজিয়ে চিবোতে ও গিলতে সাহায্য করে।
2. অবিরাম লালাক্ষরণের ফলে মুখের ভিতরে বা দাঁতের গোড়ায় খাদ্যকণা সঞ্চিত হতে পারে না ফলে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না।
3. উত্তপ্ত ও উদ্দীপক পদার্থকে তরল করে ফলে শ্লেষ্মা ঝিল্লির ক্ষয়কে রোধ করে।
4. **পরিপাক**—লালারসের টায়ালিন উৎসেচক সেদ্ধ শ্বেতসারকে মল্টোজ ও মল্টোজ সদৃশ পদার্থে বিশ্লিষ্ট করে।
5. **রেচন**—আয়োডিন, থায়োসায়ানেট, ইউরিয়া, ভারী ধাতু (As, Bi, Pb, Hg), মাম্পস প্রভৃতি ভাইরাসের রেচনে লালারস অংশগ্রহণ করে।
6. **ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস**—লালারসের লাইসোজাইম উৎসেচক ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর পলিস্যাকারাইড দিয়ে তৈরি। এই আবরণীকে লাইসোজাইম (পলিস্যাকারাডেজ) ধ্বংস করে।
7. লালারসের বাইকার্বোনেট, ফসফেট ও মিউসিন **বাফার হিসাবে** কাজ করে।
8. দেহের **জলসাম্য** বজায় রাখতে লালারসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।
9. লালারস আস্বাদনের অনুভূতি জোগায়।
10. কোনো কোনো প্রাণীর (কুকুর, মেষ) লালারসের বাষ্পীভবন (জিভের উপরিতল থেকে, Panting) দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

## ▲ পাকস্থলীয় রস বা পাচক রস (Gastric juice) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক স্তরের গ্রন্থিকোশ অর্থাৎ শ্লেষ্মাকোশ, পেপটিক কোশ, অক্সিনটিক কোশ থেকে সম্মিলিতভাবে ঈষৎ হরিদ্রাভ ও তীব্র অম্লধর্মী যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে পাকস্থলীয় রস বা পাচকরস বলে।**

(b) **উৎস ঃ** পাকস্থলীর ভেতরে প্রাচীরের মিউকাস স্তরে **প্যারাইটাল কোশ** বা **অক্সিনটিক কোশ, পেপটিক কোশ** এবং **মিউকাস কোশ** প্রভৃতি নামে বিভিন্ন রকম গ্রন্থি কোশ থাকে। এই সব কোশসমূহ মিলিতভাবে পাকস্থলীয় রস বা গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ করে।

(c) **মোট পরিমাণ ঃ** প্রতি 24 ঘণ্টায়, 2,000–3,000 মিলিলিটার। প্রতিবার খাদ্য গ্রহণের সময় 500–1000 মিলিলিটার পাচক রস নিঃসৃত হয়। খাদ্যের প্রকৃতির উপর পাকস্থলীয় রসের ক্ষরণের পরিমাণ নির্ভর করে।

(d) **বিক্রিয়া ঃ** পাকস্থলীয় রস তীব্র অম্লধর্মী—pH-0·9—1·5 হয়। কারণ পাকস্থলীর রসে প্রায় 0·4 শতাংশ মুক্ত HCl ছাড়াও অন্যান্য জৈব অ্যাসিড থাকে।

(e) **আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ** 1·006–1·009.

(f) **পাকস্থলীয় রস বা পাচক রসের উপাদান (Composition of gastric juice) ঃ**

1. **জল**—99·45 শতাংশ। 2. **কঠিন পদার্থ**—0·55 শতাংশ—এটি নিম্ন প্রকারের হয় ঃ

(i) **অজৈব ঃ** সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, ক্যালশিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি (HCl একটি অজৈব তরল পদার্থ)।

(ii) **জৈব পদার্থ ঃ (ক) বিভিন্ন উৎসেচক— পেপ্‌সিন** (প্রধান প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক), **রেনিন** (Rennin) (মানুষের পাচক রসে নেই), এছাড়া **ক্যাথেপসিন, জিলাটিনেজ, গ্যাস্ট্রিসিন** প্রভৃতি প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলি (সামান্য পরিমাণে) এবং পাকস্থলীয় লাইপেজ থাকে।

(iii) **অন্যান্য জৈব পদার্থ—মিউসিন, ক্যাসেল বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান** (Castle's intrinsic factor)।

চিত্র 1.30. ঃ পাকস্থলীর অন্তঃস্থ প্রাচীরের শ্লেষ্মা স্তরের ভাঁজে বিভিন্ন পাচক রসের উপাদান-ক্ষরণকারী কোশের অবস্থানের চিত্ররূপ।

ক্ষরণের সময় **পেপসিন** পেপটিক কোশে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসাবে থাকে। HCl-এর হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় **পেপসিনে** রূপান্তরিত করে। pH 4·6 কিংবা এর কম pH-এ পেপসিন নিজে পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। **রেনিন** (Rennin) উৎসেচক বাছুরের পাকস্থলীয় রসে পাওয়া যায়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পাচক রসে রেনিন থাকে না, তবে শিশুর পাকস্থলীতে এর উপস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

**● পাকস্থলীয় পাচক রস ●** — **গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান**

- জল (99·45%)
- কঠিন পদার্থ (0·55%)
  - অজৈব পদার্থ (0·15%): NaCl, KCl, $CaCl_2$, $Mg_3(PO_4)_2$, HCl (0·4–0·5%)
  - জৈব পদার্থ (0·45%): (i) উৎসেচক— পেপসিন, কাইমোসিন, লাইপেজ, গ্যাস্ট্রিসিন, রেনিন (ii) মিউসিন (iii) ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসল

**● পাকস্থলীয় রসের বিভিন্ন উপাদানের কাজ (Functions of different constituents of Gastric juice) ঃ**

| উপাদান | কাজ |
|---|---|
| 1. জল | (i) জল পাকস্থলী রসকে তরল রাখে।<br>(ii) পাকস্থলী রসের বিভিন্ন উপাদানের এবং খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল সাহায্য করে। |
| 2. অজৈব উপাদান | (i) বিভিন্ন আয়ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এবং পাকস্থলীয় রসের বিভিন্ন উৎসেচকের সক্রিয়তাকে বাড়ায়।<br>(ii) রেনিনের সক্রিয়তার জন্য ক্যালশিয়ামের প্রয়োজন হয়।<br>(iii) HCl পাকস্থলী রসের pH নিয়ন্ত্রণ করে। HCl সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত করে। HCl নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। |
| 3. জৈব উপাদান | (i) পেপসিন প্রোটিনকে পাচিত করে পেপটোনে রূপান্তরিত করে।<br>(ii) গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ লিপিডকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত করে।<br>(iii) মিউসিন পাকস্থলীর মিউকাস ঝিল্লিকে HCl ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।<br>(iv) ক্যাসলের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর ভিটামিন $B_{12}$-এর শোষণে সাহায্য করে। |

❂ **পাচক রসের কাজ (Functions of Gastric juice) ঃ**

1. **প্রোটিনের পরিপাক** (Digestion of protein)— (i) **পেপ্‌সিন** পাচক রসের প্রধান প্রোটিওলাইটিক্ উৎসেচক যা প্রকৃতিজাত প্রোটিনের উপর বিক্রিয়া করে তাকে **পেপটোনে** পরিণত করে। (ii) **গ্যাস্ট্রিসিন** একটি দুর্বল প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক যা প্রোটিনের পরিপাকে কিছুটা সাহায্য করে। (iii) **রেনিন** দুধের দ্রবণীয় **কেসিনোজেনকে** অদ্রবণীয় ক্যালশিয়াম কেসিনেট হিসাবে তঞ্চিত করে। (iv) **জিলাটিনেজ** উৎসেচক জিলাটিন-প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।
2. **স্নেহ পদার্থের পরিপাক** (Digestion of fat) —**পাকস্থলীয় লাইপেজ** একটি দুর্বল ফ্যাট পরিপাককারী উৎসেচক যা সামান্য পরিমাণে দুধ, মাখন ও ডিমের কুসুমে অবস্থিত স্নেহ পদার্থকে পরিপাক করতে পারে।
3. **কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক** (Digestion of carbohydrate) —পাকস্থলী রসে কোনো কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক থাকে না। কিন্তু পাচকরসের HCl সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত করে।
4. **রেচন** (Excretory functions)— ভারী ধাতু (Bi, Pb ইত্যাদি), প্রতিবিষ, ওপিয়াম এবং অন্যান্য উপক্ষার ইত্যাদি পাচক রসের মাধ্যমে রেচিত হয়।
5. **সুরক্ষা** (Protective functions)— পাচকরসের মিউসিন পাকস্থলীর মিউকাস বা শ্লৈষ্মিক স্তরকে ক্ষতিকারক HCl থেকে রক্ষা করে।

   এছাড়া মিউসিন পেপসিন উৎসেচক পাকস্থলীকে স্বপাচনের (Autodigestion) হাত থেকে রক্ষা করে।
6. **পিচ্ছিলকরণ** (Lubricating functions)— পাচকরসস্থিত মিউসিন পিচ্ছিলকারী পদার্থ হিসাবে কাজ করে।
7. **HCl-এর কাজ** (Functions of HCl) — (i) HCl পচন রোধক বা অ্যান্টিসেপ্‌টিক (Antiseptic)-এর মতো কাজ করে। খাদ্যের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুকে HCl ধ্বংস করে।

(ii) HCl ইক্ষুশর্করাকে (সুক্রোজ) আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজে পরিণত করে।

(iii) HCl নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে।

(iv) HCl লৌহের শোষণকে উদ্দীপিত করে।

**● প্যারাইটাল এবং মিউকাস স্তরের প্রধান কোশ নষ্ট হলে রক্তাল্পতা হয় কেন ? ●**

1. **প্যারাইটাল কোশ** থেকে HCl ক্ষরিত হয়। HCl পাকস্থলী থেকে খাদ্যস্থিত লৌহের শোষণ ঘটায়। লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিনের হিম অংশের উৎপাদনে অংশ নেয়। প্যারাইটাল কোশ নষ্ট হলে HCl-এর ক্ষরণ কমে যায় যার ফলে লৌহের শোষণ ব্যাহত হয়। এর ফলে হিমোগ্লোবিনের অভাব হবে এবং এই সব কারণে রক্তাল্পতা দেখা দেবে।
2. **মিউকাস স্তরের প্রধান কোশ** থেকে ক্যাসেল বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান বা ক্যাসেলের ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর ক্ষরিত হয়। এই উপাদানটি ভিটামিন $B_{12}$ (সাইনোকোবালামাইনের) শোষণে সাহায্য করে। ভিটামিন $B_{12}$ রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদনে অংশ নেয়। তাই ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টরের অভাবে RBC উৎপন্ন হতে পারে না ফলে **রক্তাল্পতা** দেখা দেয়।

## ▲ অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic Juice) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ক্ষরণকারী থলি থেকে বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বল্প ঘনত্বযুক্ত ক্ষারীয় যে তরল নিঃসৃত হয় তাকে অগ্ন্যাশয় রস বলে।**

(b) **উৎস ঃ** অগ্ন্যাশয় রস অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির বহিঃক্ষরা গ্রন্থিকোশ থেকে ক্ষরিত হয়।

(c) **মোট পরিমাণ ঃ** প্রতি 24 ঘণ্টায় 1,500 মিলিলিটার। (প্রতিবার খাদ্য গ্রহণের সময় 500 মিলিলিটার)

(d) **বিক্রিয়া ঃ** অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় তরল পদার্থ (pH-8·0–8·3)।

(e) **আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ** 1·010–1·030

(f) **অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান ঃ**

1. জল—98·5 শতাংশ।
2. **কঠিন পদার্থ**—1·5 শতাংশ—এটি দু'প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **অজৈব পদার্থ ঃ** অগ্ন্যাশয় রসে অতিমাত্রায় সোডিয়াম ও পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট থাকে (এই কারণে pH ক্ষারীয় হয়)। এছাড়া অল্প পরিমাণে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও দস্তা থাকে।

(ii) **জৈব পদার্থ ঃ** অগ্ন্যাশয় রসের জৈব উপাদান প্রধানত বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক নিয়ে গঠিত। এরা নিম্নরূপ—

3. **কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক—প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ বা অ্যামাইলোপসিন।**
4. **প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক—ট্রিপসিন** (নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসাবে নিঃসৃত হয়), কাইমোট্রিপসিন (নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেন হিসাবে নিঃসৃত হয়), কার্বোক্সিপেপ্টাইডেজ, ইলাস্টেজ (নিষ্ক্রিয় প্রোকাবোক্সিডেজ এবং প্রোইলাস্টেজ হিসাবে নিঃসৃত হয়), কোলাজিনেজ, নিউক্লিয়েজ প্রভৃতি।
5. **ফ্যাট পরিপাককারী উৎসেচক**—অগ্ন্যাশয়ী প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ বা স্টিয়াপসিন (Steapsin), **কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ প্রভৃতি।**

(g) **অগ্ন্যাশয় রসের কাজ (Functions of Pancreatic Juice) ঃ**

1. **পরিপাক ক্রিয়া**— (i) অগ্ন্যাশয় রসের শক্তিশালী কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক **অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ** স্টার্চকে (শ্বেতসারকে) আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মলটোজে পরিণত করে।

(ii) **ট্রিপসিন** একটি শক্তিশালী প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক যা প্রোটিনকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

(iii) **কাইমোট্রিপসন** উৎসেচক দুধকে তঞ্চিত করে। অন্যান্য প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক যেমন নিউক্লিয়েজ, ইলাস্টেজ কোলাজিনেজ প্রভৃতি যথাক্রমে নিউক্লিক অ্যাসিড, ইলাস্টিন, কোলাজেন প্রোটিনকে পরিপাক করে।

(iv) অগ্ন্যাশয় লাইপেজ লিপিডকে (ফ্যাটকে) পাচিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত করে।

2. **প্রশমন ক্রিয়া**—অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারকীয় হওয়ার ফলে পাকস্থলী থেকে আসা তীব্র অম্লধর্মী খাদ্যবস্তুকে অর্থাৎ পাকমণ্ডকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

**● অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির সঙ্গে মলের সম্পর্ক ●**

স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকাংশ পরিমাণ শ্বেতসারের পরিপাক অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে ঘটে। অসুখে কিংবা অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি অস্বাভাবিক অবস্থায় অ্যামাইলেজ উৎসেচকের অভাব ঘটে, ফলে শ্বেতসারের পরিপাক ব্যাহত হয়। এই কারণে মলের বৃদ্ধি ঘটে।

## ▲ আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস্ এন্টেরিকাস্ (Intestinal juice or Succus entericus) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক স্তরে অবস্থিত আন্ত্রিক গ্রন্থিসমূহ থেকে মিউসিনযুক্ত তীব্র ক্ষারীয় হালকা হলুদ রঙের যে পাতলা তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে সাক্কাস এন্টেরিকাস বা আন্ত্রিক রস বলে।**

(b) **উৎস ঃ** ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস (শ্লেষ্মা) স্তরে অবস্থিত **ক্রিপটস্ অফ্ লিবারকুন** এবং **ব্রুনার গ্রন্থি** কোশের মিলিত ক্ষরণের ফলে আন্ত্রিক রস ক্ষরিত হয়।

(c) **মোট পরিমাণ ঃ** প্রতি 24 ঘণ্টায় 1,000–2,000 মিলিলিটার।

(d) **বিক্রিয়া ঃ** সামান্য ক্ষারীয় (pH 8·3)।

(e) **আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ** 1·010.

(f) **আন্ত্রিক রসের উপাদান (Composition of intestinal juice) ঃ**

1. জল—98·4 শতাংশ।
2. **কঠিন পদার্থ**—1·6 শতাংশ। এটি নিম্ন প্রকার ঃ

(i) **অজৈব পদার্থ ঃ** সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ক্লোরাইড, ফসফেট ও বাইকার্বোনেট লবণই প্রধান।

(ii) **জৈব পদার্থ ঃ** (1) এন্টোরোপেপটাইডেজ বা এন্টেরোকাইনেজ (সক্রিয়ক)।

(2) **উৎসেচক**—(i) **প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক**—ইরেপসিন, নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটাইডেজ, নিউক্লিওসাইডেজ, আরজিনেজ প্রভৃতি। (ii) **ফ্যাট পরিপাককারী উৎসেচক**—আন্ত্রিক লাইপেজ, (iii) **কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক**—অ্যামাইলেজ, α-ডেক্সট্রিনেজ, মল্টেজ, আইসোমল্টেজ, ল্যাক্টেজ ও সুক্রেজ।

(3) মিউসিন।
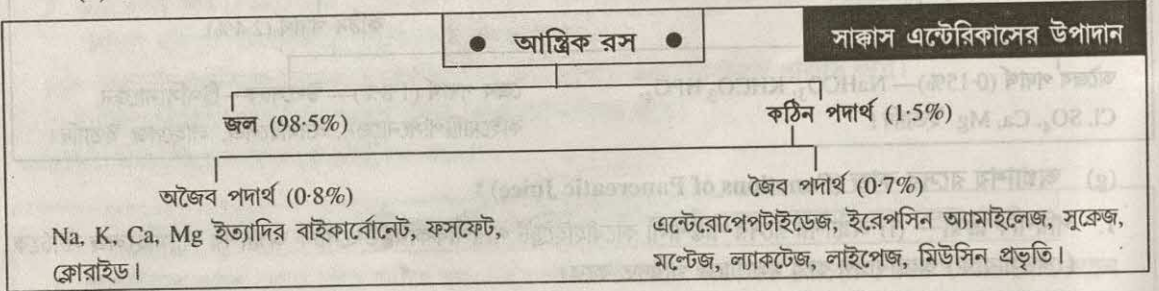
(g) **আন্ত্রিক রসের কাজ (Functions of Succus enterieus) ঃ**

1. **পরিপাক ক্রিয়া** (Digestive action)— এটি খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পরিপাককে সম্পূর্ণ করে।
2. **সক্রিয়করণ** (Activation)— আন্ত্রিকরসের এন্টোরোপেপটাইডেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় **ট্রিপসিনে** পরিণত করে প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে।
3. **সুরক্ষা** (Protection)— আন্ত্রিক রসের মিউসিন ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃস্থ তলকে ক্ষতিকারক খাদ্যবস্তু এবং প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক থেকে সুরক্ষিত রাখে।

## ▲ পিত্ত বা পিত্তরস (Bile) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ক্ষারধর্মী, সান্দ্র, হলদে-সবুজ রঙের তীব্র স্বাদযুক্ত, ক্ষরণজাত (Secretory) তথা রেচনজাত (Excretory) যে তরল পদার্থ যকৃৎ কোশ থেকে অনবরত নিঃসৃত হয় তাকে পিত্ত বা পিত্তরস বলে।**

(b) **পিত্তের উৎপত্তিস্থল (Site of formation of bile) ঃ** যকৃৎ কোশ থেকে সবসময় পিত্ত ক্ষরিত হয়। প্রথমে যকৃৎ কোশের মধ্যে সূক্ষ্ম পিত্ত বিন্দু দেখা যায়। এই বিন্দুগুলি একত্রিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **ক্যানালিকুলি** এবং **পিত্ত জালক** (Bile capillaries) মারফত যকৃৎ থেকে নির্গত হয়ে বাম ও ডান **যকৃত নালিতে** (Hepatic ducts) যায়। পরে এই দুটি নালি মিলিত হয়ে **সাধারণ যকৃৎ নালি** (Common hepatic duct) গঠন করে। এই নালি থেকে **সিস্টিক নালি** (Cystic duct) উৎপন্ন হয়ে পিত্ত থলিতে প্রবেশ

করে। পিত্ত এই সব নালির মধ্য দিয়ে এসে পিত্ত থলিতে প্রায় দশ গুণ গাঢ় অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ কোশ থেকে নিঃসৃত তাজা পিত্ত (Fresh bile) অনবরত উৎপন্ন হলেও, সাধারণ অবস্থায় সঞ্চিত পিত্ত (Stored bile) ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। **সাধারণ পিত্তনালি** (Common bile duct) এবং **অ্যামপুলা অফ ভার্টার** (Ampulla of varter) নামে ছিদ্রপথের মারফত মাঝে মাঝে খাদ্য গ্রহণের পরেই পিত্ত ডিওডিনামে যায়।

**চিত্র 1.31. ঃ** যকৃৎ, পিত্তাশয় ও পিত্তনালি, অগ্ন্যাশয় ও অগ্ন্যাশয় নালির চিত্ররূপ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

(c) **পিত্তের সঞ্চয় (Storage of bile) ঃ** যকৃতে উৎপন্ন হওয়ার পর পিত্ত সাময়িকভাবে পিত্তাশয়ে তুলনামূলকভাবে প্রায় 10 গুণ ঘন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। কারণ পিত্তাশয় বিশেষ ক্ষমতা বলে পিত্ত থেকে জল শোষণ করে এবং কিছু অজৈব লবণ নিঃসৃত করে। এর ফলে পিত্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। পিত্তাশয় গড়ে প্রায় 50 ml পিত্তকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

(1) **মোট পরিমাণ ঃ** প্রতি 24 ঘণ্টায় 500–1000 মিলিলিটার পিত্ত ক্ষরিত হয়।

(2) **বিক্রিয়া (Reaction) ঃ** পিত্তরস কিছুটা ক্ষারধর্মী (pH 7·6–8·6)।

(3) **বর্ণ (Colour) ঃ** মানুষের পিত্ত হরিদ্রাভ সবুজ রঙের হয়।

(4) **স্বাদ (Taste) ঃ** তিক্ত বা তেতো।

(5) **আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ঃ** 1·010–1·011

(d) **সদ্য নিঃসৃত পিত্তের উপাদান (Composition of fresh bile) ঃ**

1. **জল ঃ** 89–98 শতাংশ। 2. **কঠিন পদার্থ ঃ** 2–11 শতাংশ। এগুলি নিম্নপ্রকার—

(i) **অজৈব লবণ ঃ** সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড ও কার্বোনেট, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ইত্যাদি।

(ii) **জৈব পদার্থ ঃ**

(1) **পিত্তলবণ** (Bile salts)—**সোডিয়াম টোরোকোলেট এবং সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট।**

(2) **পিত্ত রঞ্জক কণা** (Bile pigments)—**বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন।**

(3) **অন্যান্য পদার্থ ও মিউসিন—কোলেস্টেরল, লেসিথিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড।**

(e) **পিত্তরসের কাজ (Functions of Bile) ঃ**

1. **পরিপাক**—কোনো উৎসেচক না থাকা সত্ত্বেও পিত্ত পরিপাক রস হিসাবে কাজ করে। পিত্তরসের পিত্তলবণ স্নেহপদার্থের অবদ্রব তৈরি করে লাইপেজ উৎসেচকের সক্রিয়করণের মাধ্যমে ফ্যাটের পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।
2. **শোষণ**—পিত্তলবণ ফ্যাট, লৌহ, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন A, D, E, K, প্রো-ভিটামিন, ক্যারোটিন প্রভৃতির শোষণে সাহায্য করে।
3. **রেচন**—দস্তা, তামা, পারদ ইত্যাদি ধাতু, প্রতিবিষ, পিত্তরঞ্জক কণা, কোলেস্টেরল ও লেসিথিন, ঔষধ ইত্যাদি পিত্তরসের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়।

### • পিত্তের উদ্দীপক বা ক্লোরোটিক ক্রিয়া (Chloretic action of Bile) •

**পিত্তের উদ্দীপক ক্রিয়া**—পিত্তরসের পিত্ত লবণ নিজে নিজের উদ্দীপক (Self stimulant) হিসেবে কাজ করে। এই ক্রিয়াকে ক্লোরেটিক বা উদ্দীপক ক্রিয়া বা কোলাগোগু (Cholagogue) বলে। **ক্লোরেটিক ক্রিয়ার ফলে** পিত্ত-লবণগুলি ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে যকৃতে যায় এবং যকৃতের কোশগুলিকে আবার পিত্ত-লবণ সহ পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।

4. **স্বউদ্দীপক ক্রিয়া** (Cholagogue action)—পিত্তের পিত্তলবণগুলি যকৃতে গিয়ে যকৃৎ-কোশগুলিকে আবার পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।
5. **রেচক বা ল্যাক্সিটিভ ক্রিয়া** (Laxitive action)—পিত্তলবণ অন্ত্রের ক্রমসংকোচন বিচলন ঘটিয়ে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণে এবং মল নির্গমনে সাহায্য করে।
6. **পাকস্থলীর অম্লত্ব প্রশমন** (Neutralization of the stomach acidity)—পিত্তরস (ক্ষারীয় রস) ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পাকস্থলীর ভিতরে এসে অ্যাসিডকে প্রশমিত করে ফলে পাকস্থলীর প্রাচীরের মিউকাস স্তরের ক্ষয়কে রোধ করে।

### • যকৃত নিঃসৃত (বা হেপাটিক নালি) পিত্ত এবং পিত্তাশয়ের (বা পিত্ত নালি) পিত্তের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bile of liver (or Hepatic duct) and Gall bladder (Bile duct) bile) ঃ

| | যকৃত নিঃসৃত পিত্ত | পিত্তাশয়ের পিত্ত |
|---|---|---|
| 1. প্রকৃতি (Nature) | সদ্যনিঃসৃত পিত্ত | সঞ্চিত পিত্ত |
| 2. গাঢ়ত্ব (Concentration) | স্বল্প ঘন | অধিক ঘন (10 গুণ) |
| 3. আপেক্ষিক গুরুত্ব | 1·010 | 1·040 |
| 4. pH | 7·7-8·6 | 6·8-7·6 |
| 5. উপাদান (Composition) | | |
| (a) জল | 98 % | 89 % |
| (b) কঠিন পদার্থ— | 2·0 % | 11 % |
| (i) অজৈব লবণ | 0·75% | 0·8 % |
| (ii) পিত্ত রঞ্জক কণা | 0·51% | 2·6 % |
| (iii) পিত্ত লবণ | 0·9 % | 6·0 % |
| (iv) মিউসিন | 0·11% | 0·28% |
| (v) মোট লিপিড | 2·25% | 0·34% |
| (প্রশমিত ফ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফোলিপিড এবং কোলেস্টেরল।) | | |

● **পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন প্রকার পাচক রসস্থিত বিভিন্ন উৎসেচকের সক্রিয়করণ (Activation of different Enzymes present in different digestive juices in the alimentary canal) :**

| পাচকরস | উৎসেচক | সক্রিয়করণ |
|---|---|---|
| 1. লালারস | টায়ালিন | (i) $Cl^-$ আয়ন দিয়ে সক্রিয় হয়। (ii) সামান্য অ্যাসিড মাধ্যমে (pH 6·0) সক্রিয় হয়। |
| 2. পাকস্থলী রস | পেপসিনোজেন | HCl (pH 6·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | পেপসিন | HCl (pH 2·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | রেনিন | HCl (pH 6·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | গ্যাসট্রিসিন | HCl (pH 3·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | ক্যাথেপসিন | HCl (pH 4·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | লাইপেজ | HCl (pH 4·0) দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| 3. অগ্ন্যাশয় রস | ট্রিপসিনোজেন | (i) ক্ষারীয় পরিবেশে সক্রিয়। (ii) আন্ত্রিক রসের এন্টেরোপেপটাইডেজ দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | ট্রিপসিন | এন্টেরোপেপ্‌টাইডেজ দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | কাইমোট্রিপসিন | এন্টেরোপেপ্‌টাইডেজ ও ট্রিপসিন দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | কার্বোক্সিপেপ্‌টাইডেজ | ট্রিপসিন দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| | অ্যামাইলেজ | (i) $Cl^-$ আয়ন এবং (ii) অনুকূল pH-6·7 ও অনুকূল তাপ 45°C দিয়ে সক্রিয় হয়। |
| 4. আন্ত্রিক রস | ইরেপসিন | ক্ষারীয় পরিবেশে (pH 8·0) সক্রিয় হয়। |

## ▲ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of Carbohydrate, Protein and Fat)

### ◎ 1.15. কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক (Digestion of carbohydrate) ◎

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত পাচক রসে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষণকারী উৎসেচকের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট বিশ্লিষ্ট হয়ে মনোস্যাকারাইডে (প্রধানত গ্লুকোজে) পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক বলে।

(b) **পরিপাক ক্রিয়া (Process of digestion) :** আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেট হল প্রধান খাদ্য। কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে **পলিস্যাকারাইড** (যেমন—স্টার্চ ও সেলুলোজ), **ডাইস্যাকারাইড** (যেমন—সুক্রোজ, ল্যাক্‌টোজ) এবং **মনোস্যাকারাইড** (যেমন—গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ) ইত্যাদি প্রধান। এই সব কার্বোহাইড্রেট ভাত, আলু, রুটি (স্টার্চ), দুধ (ল্যাকটোজ), ফলমূল (গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ) ইত্যাদিতে থাকে। এর মধ্যে সেলুলোজ এবং মনোস্যাকারাইডের পরিপাক ঘটে না।

**● সেলুলোজের গুরুত্ব (Importance of Cellulose) ●**

মানুষের পৌষ্টিকনালির পাচক রসে সেলুলোজ পরিপাককারী উৎসেচক না থাকায় সেলুলোজ পরিপাক হয় না। সেলুলোজ পাচিত না হলেও খাদ্যে এর উপস্থিতি প্রয়োজন। দুটি কারণে সেলুলোজের প্রয়োজন, যেমন—(i) এটি খাদ্যের পরিমাণকে বাড়ায় এবং (ii) ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলনকে উদ্দীপিত করে পরিপাক ক্রিয়াকে সাহায্য করে ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।

(c) **পরিপাকের স্থান (Site of digestion)** ঃ কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক পৌষ্টিক নালির মুখগহ্বরে আরম্ভ হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়।

1. **মুখগহ্বরে পরিপাক** ঃ খাদ্যবস্তুগুলি মুখগহ্বরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত শক্ত খাদ্যগুলিকে চিবিয়ে ভেঙে ছোটো ছোটো টুকরায় বিভক্ত করে। এই চর্বিত খাদ্যবস্তুগুলি লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নরম হয়। ফলে খাদ্যবস্তুর এই অবস্থা লালারসে টায়ালিন উৎসেচকের সঙ্গে সহজে মিশে যায়।

(i) **টায়ালিনের ক্রিয়াস্থল**—মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু লালারসস্থিত টায়ালিনের সংস্পর্শে এলেও টায়ালিনের ক্রিয়াকলাপ 15-20 মিনিট (HCl-এর গাঢ়ত্ব বাড়ার আগে) পর্যন্ত চলতে থাকে।

(ii) **টায়ালিনের ক্রিয়া**—টায়ালিন সামান্য অম্লধর্মী পরিবেশে এবং ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে সিদ্ধ শ্বেতসার ও স্টার্চের উপর কাজ করে। দেখা গেছে টায়ালিন শুধু α-1:4 গ্লুকোসাইডিক বন্ধনীর উপর কাজ করে তাকে ভাঙতে সক্ষম হয়। অতএব টায়ালিন শ্বেতসার এবং গ্লাইকোজেন অণুর কেন্দ্রস্থিত α-1:4 গ্লুকোসাইডিক বন্ধনীকে ভেঙে তাদের মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ এবং α-লিমিট ডেক্সট্রিনে (5-8 গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত যৌগ) পরিণত করে।

2. **পাকস্থলীতে পরিপাক** ঃ পাকস্থলীয় পাচক রসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী কোনো উৎসেচক নেই। তবে এই পাচক রসের HCl সুক্রোজ নামে ডাইস্যাকারাইডকে কিছুটা আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত করে।

3. **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক** ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে শ্বেতসার ও ডাইস্যাকারাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রধানত অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের উপর নির্ভর করে।

(i) **অগ্ন্যাশয় রসে অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ বা অ্যামাইলোপসিন** নামে একপ্রকার শক্তিশালী কার্বোহাইড্রেট পারিপাককারী উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচক শ্বেতসার ও ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে সামান্য ক্ষারীয় পরিবেশে এবং ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও α-লিমিটডেক্সট্রিনে (পাঁচটি গ্লুকোজ অণুবিশিষ্ট শর্করা) পরিণত করে। অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ (Pancreatic amylase) সিদ্ধ ও অসিদ্ধ (কাঁচা) স্টার্চের (শ্বেতসার) উপরে ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়।

(ii) **আন্ত্রিক রসে** বিভিন্ন প্রকার ডাইস্যাকারাইড পরিপাককারী উৎসেচকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেমন—**মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ** এবং **α-ডেক্সট্রিনেজ বা অলিগো-1 : 6** গ্লুকোসাইডেজ ও সামান্য পরিমাণ **অ্যামাইলেজ** থাকে।

**আন্ত্রিক রসের বিক্রিয়া**—মল্টেজ মল্টোজের উপর কাজ করে তাকে গ্লুকোজ অণুতে, সুক্রেজ সুক্রোজের উপর ক্রিয়া করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ অণুতে এবং ল্যাকটেজ ল্যাকটোজের উপর কাজ করে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ অণুতে পরিণত করে। অলিগো-1 : 6 গ্লুকোসাইডেজ বা α-ডেক্সট্রিনেজ এনজাইম α-লিমিট ডেক্সট্রিনস্থিত α-1 : 6 গ্লুকোসাইডিক বন্ধনীর উপর কাজ করে তাকে মল্টোট্রায়োজ ও মল্টোজে পরিণত করে। সাধারণত অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ বা অ্যামাইলোপসিন স্টার্চ ও ডেক্সট্রিনকে সম্পূর্ণভাবে
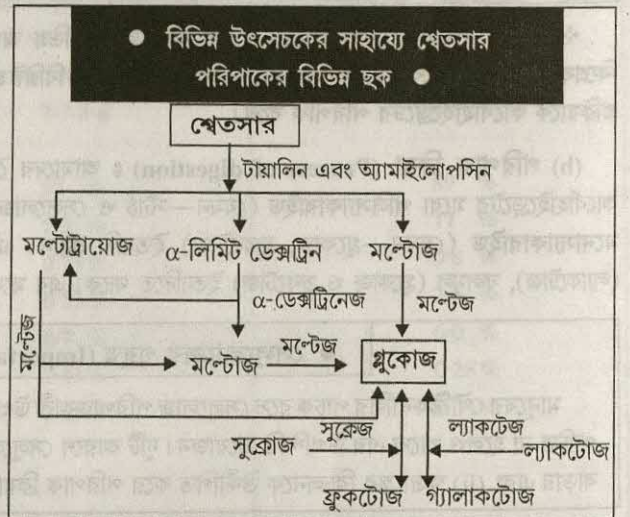
গ্লুকোজে পরিণত করে। কিন্তু যদি কিছু স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা আন্ত্রিক অ্যামাইলেজের ক্রিয়ার ফলে মল্টোজে রূপান্তরিত হয়। পরে মল্টোজ এদের গ্লুকোজে পরিণত করে।

(i) শ্বেতসার $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ + মল্টোট্রায়োজ + α-লিমিট ডেক্সট্রিন

(ii) α-লিমিট ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{\text{α-ডেক্সট্রিনেজ}}$ মল্টোট্রায়োজ + মল্টোজ

(iii) মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

(iv) সুক্রোজ $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ

(v) ল্যাকটোজ $\xrightarrow{\text{ল্যাকটেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

এভাবে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় সব রকমের খাদ্যবস্তু পাচিত হয়ে শোষণ উপযোগী মনোস্যাকারাইড (কার্বোহাইড্রেটের একক) প্রধানত গ্লুকোজে পরিণত হয়।

**● 4–6 মাস বয়সের শিশুদের শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না কেন ? ●**

অগ্ন্যাশয় রসের অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ একপ্রকার শক্তিশালী কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার), পরিপাককারী উৎসেচক। এই জাতীয় অ্যামাইলেজ শিশুদের 6 মাস বয়স পর্যন্ত অগ্ন্যাশয় রস থাকে না বলে এদের এই বয়স পর্যন্ত কোনো শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না।

**● কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের সংক্ষিপ্তসার (Summary of Digestion of Carbohydrates) ঃ**

| বিক্রিয়া স্থল এবং উৎসেচক | সাবস্ট্রেট | বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ |
|---|---|---|
| 1. মুখগহ্বর (লালারস)<br>টায়ালিন | শ্বেতসার | মল্টোজ |
| 2. পাকস্থলী (পাকস্থলীয় রস)<br>*HCl | সুক্রোজ | গ্লুকোজ এবং<br>ফ্রুক্টোজ |
| 3. ক্ষুদ্রান্ত্র (অগ্ন্যাশয়ী রস)<br>অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ | শ্বেতসার | মল্টোজ |
| 4. আন্ত্রিক রস<br>অলিগো-1 : 6 গ্লুকোসাইডেজেস | α-1 : 6 গ্লুকোসাইডিক<br>বন্ধনীযুক্ত কার্বোহাইড্রেট | মল্টোজ এবং<br>মল্টোট্রায়োজ |
| মল্টেজ | মল্টোজ | গ্লুকোজ |
| ল্যাকটেজ | ল্যাকটোজ | গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ |
| সুক্রেজ | সুক্রোজ | গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ |
| আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ | অবশিষ্ট শ্বেতসার | গ্লুকোজ |

* HCL উৎসেচক না হলেও পরিপাকে সাহায্য করে।

✪ সেদ্ধ আলু, ভাত, রুটি (পাউরুটি বা হাতে তৈরি রুটি) ইত্যাদির পরিপাক ঃ আলু, ভাত এবং রুটির প্রধান উপাদান শ্বেতসার। এই কারণে এদের পরিপাক শ্বেতসারের পরিপাকের মতো হয়।

## ◎ 1.16. ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of Fat) ◎

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**ঃ পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষরিত পাচক রসে ফ্যাট-বিশ্লেষণকারী (Lipolytic) লাইপেজ এনজাইম এবং পিত্তের পিত্ত-লবণের সাহায্যে ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত হয় তাকে ফ্যাটের পরিপাক বলে।

(b) **স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি (Mechanism of Digestion of Fat)** ঃ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নিউট্রাল ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল ইত্যাদি তেল, মাখন, ঘি, চর্বি প্রভৃতি খাদ্যে থাকে। বিভিন্ন প্রকার পাচক রসের লাইপেজ ফ্যাটকে (ট্রাইগ্লিসেরাইডকে) ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত করে।
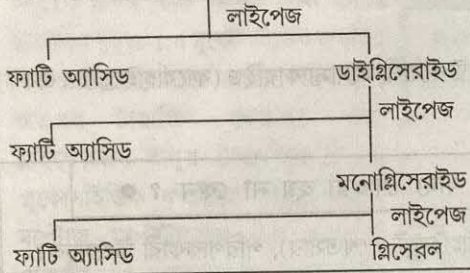
1. **পাকস্থলীতে পরিপাক**— স্নেহ পদার্থের পরিপাক প্রধানত পাকস্থলী থেকে আরম্ভ হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়। পাকস্থলীর পাচক রসে **পাকস্থলীয় লাইপেজ** (Gastric lipase) নামে দুর্বল ফ্যাট বিশ্লেষণকারী উৎসেচক সামান্য অম্ল পরিবেশে (pH 4–5) নিউট্রাল ফ্যাটকে বা ট্রাইগ্লিসেরাইডকে ফ্যাটের এককে অর্থাৎ তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ও এক অণু গ্লিসেরলে পরিণত করে।

প্রধানত মাখনের ট্রিব্যুটিরিন (Tributyrin) ফ্যাট, দুধ ও ডিমের কুসুমের অবদ্রব (Emulsified) ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থের উপর পাকস্থলীর লাইপেজের বিক্রিয়া সামান্য অম্ল পরিবেশে বেশি হয়। কিন্তু তীব্র অম্ল (pH 2–3) পরিবেশে লাইপেজ কাজ করতে পারে না।

2. **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক**— ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে পিত্ত লবণ (সোডিয়াম টরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট) খাদ্যস্থিত ফ্যাটকে অবদ্রবে (Emulsion) পরিণত করে, ফলে লাইপেজ উৎসেচক বেশি পরিমাণ স্নেহ (ফ্যাটের) খাদ্যের ফ্যাট কণিকার সংস্পর্শে আসে।

(i) **অগ্ন্যাশয় লাইপেজ** (Pancreatic lipase) উৎসেচকে **স্টিয়াপসিন** (Steapsin) বলে। সামান্য ক্ষারীয় পরিবেশে এই উৎসেচক ফ্যাটের (ট্রাইগ্লিসেরাইড) উপর বিক্রিয়া করে তাদের ডাইগ্লিসেরাইড, মনোগ্লিসেরাইড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত করে। প্রধানত অগ্ন্যাশয় লাইপেজের বিক্রিয়ার ফলেই ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসেরাইডের পরিপাক প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

(ii) আন্ত্রিক রসের **আন্ত্রিক লাইপেজ** ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসেরাইডের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফ্যাটের বা স্নেহ দ্রব্যের পরিপাক সম্পূর্ণ করে।

### ◎ লাইপেজ উৎসেচকের ক্রিয়া পদ্ধতি (Mechanism of action of Lipase) ঃ

পিত্তরসের **পিত্তলবণ** লাইপেজ উৎসেচকের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে। দেখা গেছে ট্রাইগ্লিসেরাইডে $\alpha$, $\alpha_1$ এবং $\beta$ কার্বনের সঙ্গে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার বন্ধনী (Ester bond) দিয়ে যুক্ত থাকে। লাইপেজ তাদের মধ্যে দুটিকে ($\alpha$ ও $\alpha_1$) সহজেই বিশ্লিষ্ট করে, কিন্তু $\beta$ কার্বনের সঙ্গে যুক্ত এস্টার বন্ধনীকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে না। আইসোমারেজ নামে অন্য একটি উৎসেচক প্রথমে এটিকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে। ফসফোলিপিড অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের ফসফোলাইপেজ
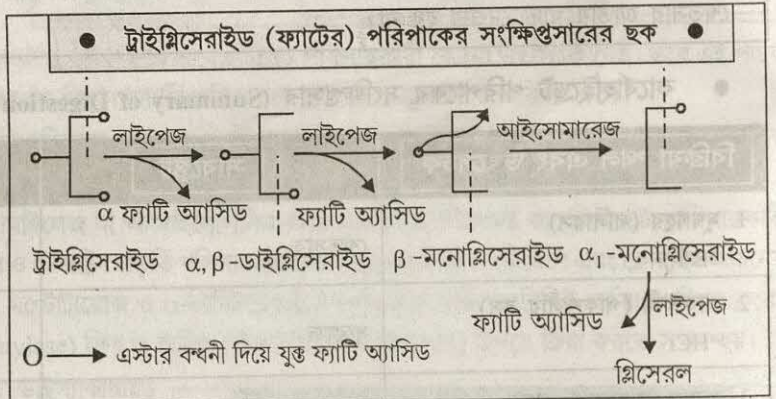
(লেসিথিনেজ) এন্জাইমগুলির β-মনোগ্লিসেরাইডকে $\alpha_1$-মনোগ্লিসেরাইডে রূপান্তরিত করে এবং পরে লাইপেজের সাহায্যে এবং কোলেস্টেরল এস্টার অগ্ন্যাশয়ের কোলেস্টেরল এস্টারেজের সাহায্যে পরিপাক হয়।

- **ফ্যাট পরিপাকের সংক্ষিপ্তসারের তালিকা (Table for summerised Fat digestion)**

| বিক্রিয়াস্থল (পাচক রস ও উৎসেচক) | সাবস্ট্রেট (স্নেহ জাতীয় খাদ্য) | লব্ধ পদার্থ |
|---|---|---|
| 1. **পাকস্থলী (পাকস্থলীর রস)** পাকস্থলীয় লাইপেজ | মাখন, দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদির ফ্যাট | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |
| 2. **যকৃৎ (পিত্ত)** পিত্তলবণ | ফ্যাট বা তেল | ফ্যাটের অবদ্রব তৈরি করে ও লাইপেজ উৎসেচকে সক্রিয় করে। |
| 3. **অগ্ন্যাশয়** অগ্ন্যাশয় লাইপেজ | ফ্যাট | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |
| 4. **ক্ষুদ্রান্ত্র** (আন্ত্রিক লাইপেজ) | ফ্যাট | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |

## 1.17. প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Protein)

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) :** পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত পাচক রসের প্রোটিন বিশ্লেষণকারী (Proteolytic) উৎসেচকের সাহায্যে বিভিন্ন রকম প্রোটিন যে প্রক্রিয়ায় ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে (প্রোটিনের একক) পরিণত হয় তাকে প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Protein) বলে।

**• এন্ডোপেপটাইডেজ এবং এক্সোপেপটাইডেজ •**

**প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—**

1. **এন্ডোপেপ্টাইডেজেস (Endopeptidases)**—প্রোটিন অণুর ভিতরের দিকের পেপটাইড বন্ধনীকে যে এনজাইম বিশ্লিষ্ট করে তাদের এন্ডোপেপ্টাইডেজেস বলে। উদাহরণ—পেপসিন, ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন।
2. **এক্সোপেপ্টাইডেজেস (Exopeptidases)**—যেসব উৎসেচক এন্ডোপেপ্টাইজের কাজের ফলে উদ্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর বাইরের দিকের পেপটাইড বন্ধনীকে বিশ্লিষ্ট করে তাদের এক্সোপেপ্টাইডেজেস বলে। উদাহরণ—কার্বোক্সিপেপ্টাইডেজ, অ্যামাইনোপেপ্টাইডেজ, ট্রাইপেপ্টাইডেজ এবং ডাইপেপ্টাইডেজ।

(b) **প্রোটিন খাদ্যের প্রকারভেদ (Types of protein food) :** আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ক্যাসিনোজেন (দুধে), কোলাজেন, নিউক্লিওপ্রোটিন ইত্যাদি প্রোটিন থাকে। এই সব প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী থেকে পাওয়া যায়।

(c) **প্রোটিনের পরিপাকের পদ্ধতি (Mechanism of Protein digestion) :**

প্রোটিনের পরিপাক পাকস্থলী থেকে আরম্ভ হয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়।

1. **মুখগহ্বরে প্রোটিনের পরিপাক :** প্রোটিনের পরিপাক মুখে হয় না কারণ লালাগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত লালারসে কোনো প্রোটিন-বিশ্লেষণকারী উৎসেচক থাকে না।

2. **পাকস্থলীতে পরিপাক :** পাকস্থলীর পাচকরসে HCl এবং নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন নামে দুই প্রকার প্রধান উপাদান থাকে। HCl-এর প্রভাবে নিষ্ক্রিয় পেপ্সিনোজেন সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়। প্রথমে HCl প্রোটিনের উপর বিক্রিয়া করে তাকে অ্যাসিড মেটাপ্রোটিনে রূপান্তরিত করে। পরে পেপসিন অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন অণুর ভেতরে কিছু কিছু পেপটাইড বন্ধনীকে বিশ্লিষ্ট করে

প্রথমে প্রোটিওজ ও শেষে পেপটোনে পরিণত করে। এছাড়া ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে পেপসিন ক্যাসিনোজেন (Caseinogen) নামে দুধের প্রোটিনকে ছানায় (তঞ্চনে) অর্থাৎ অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেটে (Calcium caseinate) পরিবর্তন করে। এরপর ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট পেপসিন উৎসেচক দিয়ে প্রোটিওজ ও পেপটোনে রূপান্তরিত হয়।

প্রোটিন $\xrightarrow{\text{HCl}}$ অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপ্‌টোন

শিশু স্তন্যপায়ী প্রাণীর (বাছুর, মহিষ ইত্যাদি) পাচক রসে দুধের ক্যাসিনোজেনকে ছানায় রূপান্তরিত করার জন্য রেনিন (Rennin) নামে একরকম উৎসেচক পাকস্থলীয় রসে থাকে বলে ধারণা করা যায়, তবে এই উৎসেচক পূর্ণবয়স্ক মানুষের পাকস্থলীয় রসে থাকে না।

পাকস্থলীর অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক রসের বিভিন্ন প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটিন পরিপাকের বিভিন্ন ধাপ।

3. **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ঃ** পাকস্থলী থেকে নির্গত পাকমণ্ডে (Chyme) অর্ধপাচিত প্রোটিন বা লব্ধ প্রোটিন এবং অপাচিত (অপরিবর্তিত) প্রকৃতিজাত প্রোটিন ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে যায়। এখানে এইসব প্রোটিন আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত আন্ত্রিক রস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত অগ্ন্যাশয় রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

(a) **অগ্ন্যাশয় রসের কাজ ঃ** অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রোকার্বোক্সিপেপটাইডেজ এবং প্রোইলাস্টেজ নামে প্রধানত চার প্রকার নিষ্ক্রিয় প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম থাকে। **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি** থেকে নির্গত নিষ্ক্রিয় **ট্রিপসিনোজেন** ডিওডিনামে এসে আন্ত্রিক রসের এন্টেরোকাইনেজ (**এন্টেরোপেপ্‌টাইডেজ**) এর সাহায্যে সক্রিয় **ট্রিপসিনে** পরিণত হয়। অগ্ন্যাশয় রসের কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রোকার্বোক্সিপেপ্‌টাইডেজ এবং প্রোইলাস্টেজ নামে নিষ্ক্রিয় উৎসেচকগুলি সক্রিয় ট্রিপসিনের সাহায্যে সক্রিয় কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপ্‌টাইডেজ এবং ইলাস্টেজ-এ পরিণত হয়।

(i) **ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিনের কাজ**—ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন দুটি এন্ডোপেপ্‌টাইডেজ উৎসেচক। এই দুটি উৎসেচক ক্ষারীয় মাধ্যমে প্রকৃতিজাত প্রোটিন এবং লব্ধ প্রোটিনের অর্থাৎ পেপটোনের কেন্দ্রীয় পেপ্‌টাইড বন্ধনীগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে। বিভিন্ন ধাপে প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যালকালি (ক্ষারীয়) মেটাপ্রোটিন, প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ, পেপ্‌টোন, পলিপেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে (50-60%) রূপান্তরিত হয়। এছাড়া **কাইমোট্রিপসিন** দুধের দ্রবণীয় কেসিনোজেনকে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কেসিনেটে পরিণত করে।

প্রোটিন $\xrightarrow[\text{পরিবেশ}]{\text{ক্ষারীয়}}$ অ্যালকালি মেটাপ্রোটিন $\xrightarrow[\text{কাইমোট্রিপসিন}]{\text{ট্রিপসিন}}$ প্রোটিওজ $\xrightarrow[\text{কাইমোট্রিপসিন}]{\text{ট্রিপসিন}}$ পেপ্‌টোন $\xrightarrow[\text{কাইমোট্রিপসিন}]{\text{ট্রিপ্‌সিন}}$ পলিপেপটাইড $\xrightarrow[\text{কাইমোট্রিপসিন}]{\text{ট্রিপ্‌সিন}}$ অ্যামাইনো অ্যাসিড
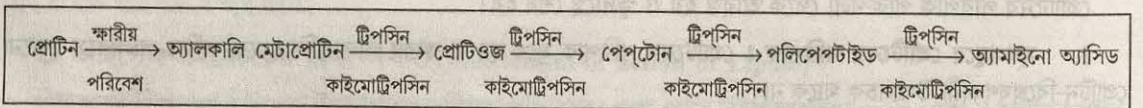
(ii) **ইলাস্টেজ ও কোলাজিনেজের কাজ**— অগ্ন্যাশয় রসের ইলাস্টেজ ও কোলাজিনেজ উৎসেচক দুটি যথাক্রমে ইলাস্টিন ও কোলাজেন নামে প্রোটিনকে বিশ্লিষ্ট করে (ভেঙে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুতে পরিণত করে।

(iii) **কার্বোক্সিপেপটাইডেজের কাজ**— অগ্ন্যাশয় রসের কার্বোক্সিপেপটাইডেজ উৎসেচক মুক্ত কার্বোক্সিল (–COOH) মূলক সম্পন্ন প্রান্তস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে পলিপেপটাইড থেকে আলাদা করে।

(iv) **অ্যামাইনোপেপ্‌টাইডেজের কাজ**—এই প্রকার উৎসেচক মুক্ত অ্যামাইনো ($-NH_2$) মূলক সম্পন্ন প্রান্তস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে পলিপেপটাইড থেকে আলাদা করে। এছাড়া **ডাইপেপটাইডেজ** ও **ট্রাইপেপডাইটেজ,** যথাক্রমে দুটি এবং তিনটি পেপটাইড বন্ধনীযুক্ত পলিপেপটাইডকে বিশ্লিষ্ট করে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

প্রোটিন অণুর উপরে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের এক্সোপেপটাইডেজ ও এন্ডোপেপটাইডেজের উৎসেচকের ক্রিয়াস্থল তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।
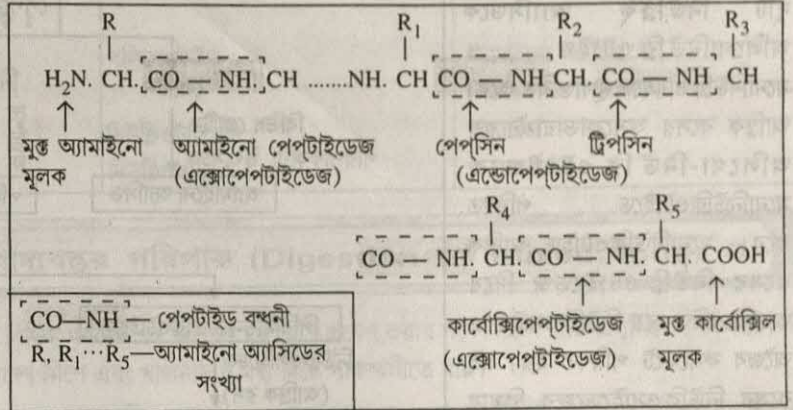
(b) **আন্ত্রিক রসের ক্রিয়াঃ** আন্ত্রিক রসের প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক **ইরেপসিন, নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটাইডেজ** ইত্যাদি থাকে। (i) **ইরেপসিন** একটি মিশ্র উৎসেচক, যেমন—অ্যামাইনোপেপ্‌টাইডেজেস ও ডাইপেপটাইডেজেস। ইরেপসিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পলিপেপ্‌টাইডের উপর কাজ করে তাদের অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

(ii) **নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটাইডেজ** ও **নিউক্লিসাইডেজ**—এই সব উৎসেচক নিউক্লিওপ্রোটিনে থাকা নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

**● পাকস্থলী এবং অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি নিজের পাচক রস দিয়ে স্বপাচিত হয় না কেন ? ●**

1. **পাকস্থলীর** প্রতিটি অংশের কলাকোশ প্রধানত প্রোটিন দিয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও পাচক রসের HCl কিংবা প্রোটিন পরিপাককারী পেপসিন উৎসেচক এই কলাকোশের উপর কোনো প্রকার কাজ করতে পারে না, কারণ—
   (i) পরিপাকের সময় পাকস্থলীর প্রাচীরের শ্লেষ্মা কোশগুলি ঘন চটচটে জেলির মতো শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে। পাকস্থলীর প্রাচীরের ভেতর স্তরের উপর এই শ্লেষ্মা একটি **পুরু ও পিচ্ছিল আস্তরণ** গড়ে তোলে। এর মধ্য দিয়ে HCl কিংবা পেপসিন যেতে পারে না বলে কোনো উৎসেচক তাদের মধ্যে কাজ করতে পারে না।
   (ii) পাচকরসে **অ্যান্টি পেপসিন** জৈব পদার্থ পেপসিনবিরোধী কাজ করে।
   (iii) পাকস্থলীর শ্লেষ্মাস্তরে প্রবাহিত রক্তে **$HCO_3^-$ আয়ন** HCl-কে কিছুটা প্রশমিত করে।
2. **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির** প্রতিটি অংশের কোশগুলির মুখ্য উপাদান হল প্রোটিন। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি নিঃসৃত প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলি (ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে বলে অগ্ন্যাশয় স্বপাচিত হতে পারে না।

## ✪ নিউক্লিওপ্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Nucleoprotein) ঃ

নিউক্লিওপ্রোটিন একপ্রকার সংযুক্ত প্রোটিন। নিউক্লিক অ্যাসিডের সঙ্গে সরল প্রোটিন (প্রধানত হিস্‌টোন ও প্রোটামিন) বিক্রিয়া করে নিউক্লিওপ্রোটিন উৎপন্ন হয়। প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক পেপ্‌সিন ও ট্রিপ্‌সিন দিয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়, ফলে প্রোটিন অংশ নিউক্লিক (Nucleic) অ্যাসিড থেকে মুক্ত হয়। প্রোটিন অংশ উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় পাচিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়।

অগ্ন্যাশয় রসের রাইবোনিউক্লিয়েজ ও ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক-দুটি নিউক্লিক অ্যাসিডকে অলিগোনিউক্লিওটাইড ও মনোনিউক্লিওটাইডে রূপান্তরিত করে। আন্ত্রিক রসের ফসফোডায়াস্টারেজ অলিগো-নিউক্লিওটাইডকে মনোনিউক্লিওটাইডে পরিণত করে। মনোনিউক্লিওটাইড আন্ত্রিক রসের নিউক্লিওটাইডেজ দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে নিউক্লিওসাইড ও অজৈব ফসফেটে পরিণত হয়। এই রসের নিউক্লিওসাইডেজের ক্রিয়ায় নিউক্লিওসাইড ও অজৈব ফসফেটের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে পিউরিন ও পেন্টোজ ফসফেট উৎপন্ন হয়।
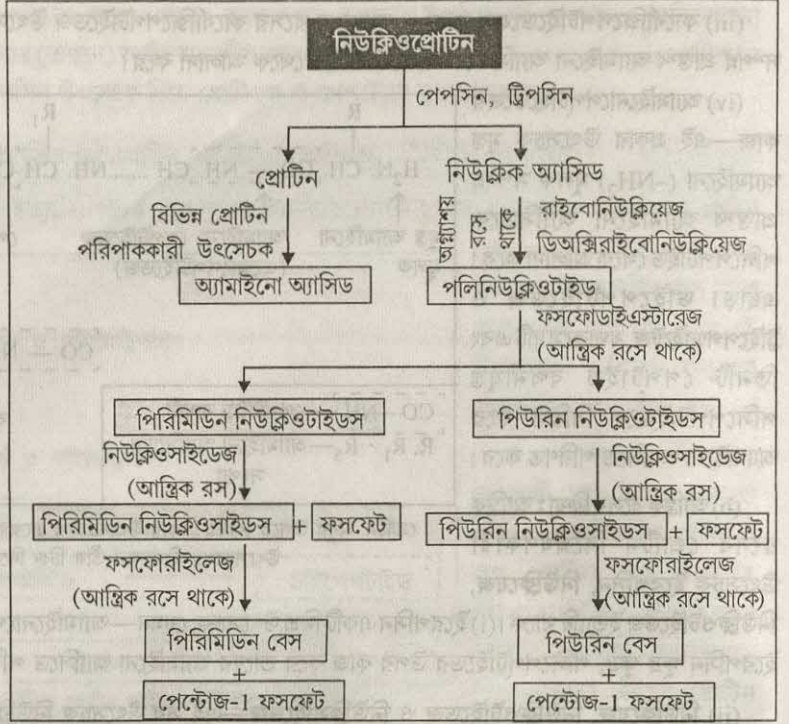
## ● প্রোটিন পরিপাকের সংক্ষিপ্তসার (Summary of Digestion of Protein) ●

| ক্রিয়াস্থল ও তার উৎসেচক | সাবস্ট্রেট (খাদ্যবস্তু) | লব্ধ পদার্থ |
|---|---|---|
| **A. পাকস্থলী (পাকস্থলীয় রস) :** | | |
| (i) পেপ্সিন | প্রোটিন | পেপটোন |
| (ii) জিলাটিনেজ | জিলাটিন | পেপটোন |
| (iii) রেনিন (শিশুদের) | কেসিনোজেন | কেসিন |
| **B. ক্ষুদ্রান্ত্র :** | | |
| (a) অগ্ন্যাশয় রসের উৎসেচক : | | |
| (i) ট্রিপসিন | প্রোটিন ও লব্ধ প্রোটিন | অ্যামাইনো অ্যাসিড, দুধের তঞ্চন |
| (ii) কাইমোট্রিপসিন | দুধের প্রোটিন মুক্ত অ্যামাইনো মূলকযুক্ত | |
| (iii) অ্যামাইনো পেপটাইডেজ | পলিপেপটাইড | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| (iv) কার্বোক্সিপেপ্টাইডেজ | মুক্ত কার্বোক্সিল মূলকযুক্ত পলিপেপটাইড | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| (v) রাইবোনিউক্লিয়েজ | RNA | নিউক্লিওটাইড |
| ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ | DNA | নিউক্লিওটাইড |
| (vi) কোলাজিনেজ | কোলাজেন | পেপটোন |
| (vii) ইলাস্টেজ | ইলাস্টেজ | পেপটোন |

| ক্রিয়াস্থল ও তার উৎসেচক | সাবস্ট্রেট (খাদ্যবস্তু) | লব্ধ পদার্থ |
|---|---|---|
| (b) **আন্ত্রিক রসের উৎসেচক ঃ** | | |
| ইরেপসিন | পলিপেপটাইড | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| নিউক্লিয়েজ | | পিউরিন ও পিরিমিডিন; |
| নিউক্লিওটাইডেজ | নিউক্লিওটাইডেজ | রাইবোজ |
| নিউক্লিওসাইডেজ | নিউক্লিওসাইড | ও ফসফেট |

## 1.18. মিশ্র খাদ্যবস্তুর পরিপাক (Digestion of Mixed food)

(a) **মুখগহ্বরে পরিপাক ঃ** বিভিন্ন ধরনের শক্ত খাদ্যবস্তু মুখগহ্বরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত এগুলিকে চর্বণ করে। এই চর্বিত খাদ্যবস্তুগুলি লালারসের সঙ্গে মিশে এবং খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে যায়।

(b) **পাকস্থলীতে পরিপাক ঃ** খাদ্যবস্তুগুলি পাকস্থলীতে ঢোকার পর 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত লালারসের টায়ালিনের কাজ চলতে থাকে ফলে টায়ালিন কিছু পরিমাণ সিদ্ধ স্টার্চ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটকে মল্টোজে রূপান্তরিত করে। কিন্তু পাকস্থলীর পাচক রসের HCl খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে ক্রমশ বেশি আম্লিক করে। এই অবস্থায় টায়ালিনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর বেশি অম্ল পরিবেশে HCl-এর প্রভাবে খাদ্যস্থিত কিছু পরিমাণ প্রোটিন **পেপ্‌সিন** নামে উৎসেচকের সাহায্যে **পেপ্‌টোনে** রূপান্তরিত হয়। এছাড়া পাকস্থলীর রসের **লাইপেজ** খুব সামান্য পরিমাণ ফ্যাটকে **ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে** পরিণত করে এবং HCl সুক্রোজকে আংশিকভাবে বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজে পরিণত করে।

পরিপাক ক্রিয়ার শেষে পাকস্থলীর খাদ্যবস্তুগুলি পাকস্থলীর বিচলনের ফলে **পাকমণ্ডে** (Chyme) পরিণত হয়। পাকমণ্ডে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে, যেমন—লালারস, অপরিপাক কার্বোহাইড্রেট, পরিপাকলব্ধ কার্বোহাইড্রেট বা মল্টোজ, সেলুলোজ, পাকস্থলীর রস, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল, ফ্যাট, অপরিপাক প্রোটিন, পরিপাকলব্ধ প্রোটিন বা পেপ্‌টোন ইত্যাদি। HCl-এর জন্য পাকমণ্ড তীব্র অম্লধর্মী (Acidic) হয় বলে একে **অম্ল পাকমণ্ড** (Acidic chyme) বলে।

(c) **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ঃ** পাকস্থলী থেকে এই পাকমণ্ড ডিওডিনামে এসে পৌঁছালে পিত্তাশয় থেকে পিত্ত বা পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে অগ্ন্যাশয়ী রস ও আন্ত্রিক ক্ষুদ্রান্ত্রের রসের সংস্পর্শে আসে।

1. **পিত্তরসের ক্রিয়া**—পিত্তের পিত্তলবণ ফ্যাটিকে **অবদ্রবতে** পরিণত করে, এছাড়া নিষ্ক্রিয় অগ্ন্যাশয়ী ও আন্ত্রিক লাইপেজকে **সক্রিয় লাইপেজে** পরিণত করে। এই সক্রিয় লাইপেজ সম্পূর্ণ ফ্যাটকে **ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে** পরিণত করে।

2. **অগ্ন্যাশয়ী রসের ক্রিয়া**—
   - (i) অগ্ন্যাশয়ী রসের অ্যামাইলেজ (অ্যামাইলোপসিন) কার্বোহাইড্রেটের স্টার্চকে **মল্টোজে** রূপান্তরিত করে।
   - (ii) এই রসের ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রোটিন ও পেপ্‌টোনের উপরে ক্রিয়া করে তাদের **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** পরিণত করে। এছাড়া কাইমোট্রিপসিন দুধের তঞ্চনে সহায়তা করে।
   - (iii) অগ্ন্যাশয়ী লাইপেজ লিপিড বা ফ্যাটকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে পরিণত করে।

3. **আন্ত্রিক রসের ক্রিয়া**—পিত্ত এবং অগ্ন্যাশয়ী রসের ক্রিয়ার পর খাদ্যবস্তুগুলি আন্ত্রিক পাচকরসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।
   - (i) আন্ত্রিক রসের মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাকটেজ উৎসেচকগুলি যথাক্রমে মল্টোজকে গ্লুকোজে, সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ এবং ল্যাকটোজকে গ্যালাকটোজ ও গ্লুকোজ অণুতে পরিণত করে। অ্যামাইলেজ অবশিষ্ট শ্বেতসারে অর্থাৎ যদি কিছু স্টার্চ পরিপাক না হয়ে থাকে তার উপর ক্রিয়া করে এবং একে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে।
   - (ii) ইরেপসিন ও নিউক্লিওটাইডেজ ইত্যাদি প্রোটিন এন্‌জাইমগুলি পরিপাকলব্ধ প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের উপরে ক্রিয়া করে এদের অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
   - (iii) লাইপেজ এনজাইম অবশিষ্ট ফ্যাটকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলে রূপান্তরিত করে।

## ❁ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যবস্তুর পরিপাকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ❁
## [ Brief description of a few important food stuff ]

### ➤ A. দুধের পরিপাক (Digestion of Milk) ঃ

(a) **দুধের উপাদান**—(i) কার্বোহাইড্রেট (ল্যাক্টোজ), (ii) প্রোটিন (ল্যাক্টোঅ্যালবুমিন, ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন এবং কেসিনোজেন) এবং (iii) ফ্যাট (প্রশমিত ফ্যাট, মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, লেসিথিন) হল দুধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যাদের পরিপাক প্রয়োজন।

(b) **দুধের বিভিন্ন উপাদানের পরিপাক ঃ**

(i) **ল্যাকটোজ** নামে দুধের শর্করার আন্ত্রিক রসের **ল্যাকটেজ** নামে উৎসেচকের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে **গ্লুকোজ** এবং **গ্যালাকটোজে** (মনোস্যাকারাইডে) রূপান্তরিত হয়।

(ii) **ল্যাকটোঅ্যালবুমিন** এবং **ল্যাকটোগ্লোবিউলিনের** নামে দুধের দু-রকমের প্রোটিন পাকস্থলীয় রসের **পেপসিন** এবং অগ্ন্যাশয় রসের **ট্রিপসিন** নামে প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকের সাহায্যে পাচিত হয়ে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** পরিণত হয়।

(iii) **কেসিনোজেনের** দুধের অন্য একক রকমের দ্রবণীয় প্রোটিন। পাকস্থলীয় রসের HCl এবং অগ্ন্যাশয় রসের **কাইমোট্রিপসিন** $Ca^{++}$-এর উপস্থিতিতে দ্রবণীয় কেসিনোজেনকে **অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কেসিনেটে** (ছানায়) পরিণত করে। পরে এই অদ্রবণীয় কেসিনেট পেপসিন ও ট্রিপসিনের সাহায্যে পাচিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়।

(iv) **প্রশমিত ফ্যাট** পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় এবং আন্ত্রিক রসের **লাইপেজ** উৎসেচকগুলির সাহায্যে ভেঙে **ফ্যাটি অ্যাসিড** এবং **গ্লিসেরলে** পরিণত করে।

(v) **লেসিথিন** একধরনের ফসফোলিপিড যা অগ্ন্যাশয় রসের লেসিথিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে পাচিত হয়।

### ➤ B. মাখন ও চিনি মাখানো একটি টোস্টের পরিপাক (Digestion of Toast with Butter and Sugar) ঃ

(a) **উপাদান ঃ** (i) **মাখন**—এটি ট্রিব্যুটিরিন নামে সম্পৃক্ত ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ দিয়ে তৈরি। (ii) **চিনি**—এটি ডাইস্যাকারাইড (সুক্রোজ) যা গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ নিয়ে তৈরি। (iii) **সেঁকা পাউরুটি (টোস্ট)**—শ্বেতসার দিয়ে পাউরুটি প্রস্তুত করা হয়।

(b) **পরিপাক ক্রিয়া ঃ** (i) **মাখনের পরিপাক**— পাকস্থলীর রস, অগ্ন্যাশয় রস এবং আন্ত্রিক রসের লাইপেজ মাখনের স্নেহপদার্থকে বিশ্লেষিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে পরিণত করে।

(ii) **চিনির পরিপাক**— পাকস্থলীর রসের HCl চিনি অর্থাৎ সুক্রোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ উৎপন্ন করে। এছাড়া আন্ত্রিক রসের সুক্রেজ সুক্রোজকে বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ উৎপন্ন করে।

(iii) **টোস্টের পরিপাক**— সেঁকা পাউরুটির অর্থাৎ সেদ্ধ শ্বেতসার লালারসের অ্যামাইলেজ (টায়ালিন) এবং অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলেজের সাহায্যে প্রথমে মলটোজে পরিণত হয়। আন্ত্রিক রসের মলটেজ উৎসেচক মলটোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

### ➤ C. পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে সিদ্ধ ডিমের পরিপাক (Digestion of boiled Egg in different parts of alimentary canal) ঃ

(a) **ডিমের উপাদান ঃ সিদ্ধ ডিমের পরিপাক**—সিদ্ধ ডিমে যেসব পরিপাকযোগ্য উপাদান থাকে সেগুলি হল—(i) **প্রোটিন**—ডিমের সাদা অংশে অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন এবং কুসুমে ফসফোপ্রোটিন থাকে। (ii) **ফ্যাট**— ডিমের কুসুমে সূক্ষ্ম অবদ্রব স্নেহ কণা (Emulsion fat), ফসফোলিপিড (লেসিথিন ও কেফালিন), কোলেস্টেরল প্রভৃতি থাকে। (iii) **গ্লাইকোজেন**—হাঁসের ডিমের কুসুমে (0·8 mg%) থাকে।

(b) **পরিপাক ঃ** ডিমের এই সব উপাদানের পরিপাক মুখগহ্বরে শুরু হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়।

1. **মুখগহ্বরে পরিপাক**— লালারসের টায়ালিন ডিমের গ্লাইকোজেনকে পাকস্থলীতে মলটোজে পরিণত হয়।

2. **পাকস্থলীতে পরিপাক**— পাকস্থলীর পাচক রসে HCl, প্রোটিন পরিপাককারী পেপসিন এবং লিপিড পরিপাককারী লাইপেজ উৎসেচক থাকে। (i) **পেপসিনের ক্রিয়া**—HCl-এর উপস্থিতিতে পেপসিন কিছু প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

(ii) **লাইপেজের ক্রিয়া**—লাইপেজ অবদ্রব বা ইমালসিফাইড স্নেহ পদার্থকে বিশ্লেষিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে পরিণত করে।

3. **ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক**—ডিমের বিভিন্ন আংশিক পাচিত বা অপাচিত উপাদানগুলি পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে ঢুকলে, তা অগ্ন্যাশয় রস এবং আন্ত্রিক রসের বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে পাচিত হয়। (i) **অগ্ন্যাশয় রসের বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়া** ঃ (a) **ট্রিপসিনের ক্রিয়া**—ডিমের প্রোটিন এবং পাকস্থলীতে ডিমের আংশিক পাচিত প্রোটিনকে (পেপটোন) সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। (b) **লাইপেজের ক্রিয়া**—ডিমে অবস্থিত ফসফোলিপিড (লেসিথিন ও কোলিন) ফসফোলাইপেজ উৎসেচক এবং কোলেস্টেরল এস্টারেজ উৎসেচকের সাহায্যে পাচিত হয়।

### ● কাইম, কাইল, কাইমোসিন, অ্যামাইলোপসিন এবং স্টিয়াপসিন ●

1. **কাইম**—পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তুর আংশিক পরিপাকের ফলে উৎপন্ন মন্ডের মতো আংশিক তরল যা অর্ধপাচিত ও অপাচিত আহার্য বস্তুসমূহ প্রোটিন, ফ্যাট এবং পাকস্থলীয় রস নিয়ে গঠিত হয় তাকে **পাকমণ্ড বা কাইম** (Chyme) বলে। HCl থাকে বলে এটি তীব্র অম্ল জাতীয় হয়, তাই এটি Acid Chyme নামেও পরিচিত।
2. **কাইল**—ফ্যাটের পরিপাকের সময় দুধের মতো সাদা রঙের স্নেহ কণাযুক্ত লসিকা যা ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের ল্যাকটিয়েলে থাকে তাকে **কাইল** (Chyle) বলে।
3. **কাইমোসিন**—পাকস্থলীয় রসে (গ্যাস্ট্রিক জুসে) অবস্থিত দুগ্ধ তঞ্চনকারী উৎসেচককে **কাইমোসিন** বলে। এটি রেনিন (Rennin) নামেও পরিচিত। এই রকম উৎসেচক শিশু প্রাণীদের পাকস্থলীয় রসে থাকে তবে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পাচক রসে এর উপস্থিতি জানা যায়নি।
4. **অ্যামাইলোপসিন**—এটি অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ যা সিদ্ধ ও কাঁচা শ্বেতসারকে পরিপাক করে মল্টোজে পরিণত করে।
5. **স্টিয়াপসিন**—এটি অগ্ন্যাশয় লাইপেজ যা ফ্যাটকে বিশ্লিষ্ট করে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে পরিণত করে।

### ➤ D. একখণ্ড ফ্যাটবিহীন মাংসের পরিপাক (Digestion of Fatless meat) ঃ

(i) **ফ্যাটবিহীন মাংসের উপাদান**—একখণ্ড তাজা ফ্যাটবিহীন মাংসে প্রোটিন থাকে।

(ii) **প্রোটিনের পরিপাক**— প্রোটিনের পরিপাক পাকস্থলীয় রসের পেপসিন, অগ্ন্যাশয় রসের ট্রিপসিন এবং আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই তিন ধরনের প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** পরিণত করে।

**● পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট পরিপাকের সংক্ষিপ্তসার (Summary of digestion of Carbohydrate, Protein and Fat in presence of different enzymes in different parts of Alimentary Canal) ঃ**

| পরিপাক স্থল (পাচক রস) | উৎসেচকের নাম (Enzymes) | বিক্রিয়ক (খাদ্যবস্তু) (Substrates) | বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (Products) |
|---|---|---|---|
| মুখগহ্বর (লালারস) | টায়ালিন | শ্বেতসার বা স্টার্চ | মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ আইসোমল্টোজ ও α-লিমিট ডেক্সট্রিন |
| পাকস্থলী (পাকস্থলীয় রস বা পাচক রস) | HCl<br>পেপসিন<br>লাইপেজ | সুক্রোজ<br>প্রোটিন<br>ফ্যাট | গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ<br>পেপটোন<br>ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসেরল |
| ক্ষুদ্রান্ত্র (অগ্ন্যাশয়ী রস) | অ্যামাইলেজ | শ্বেতসার ও ডেক্সট্রিন | মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও α-লিমিট ডেক্সট্রিন |

| পরিপাক স্থল (পাচক রস) | উৎসেচকের নাম (Enzyme) | বিক্রিয়ক (খাদ্যবস্তু) (Substrate) | বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (Products) |
|---|---|---|---|
| | ট্রিপসিন | প্রোটিন, পেপটোন | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| | কাইমোট্রিপসিন | প্রোটিওস | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| | কার্বোক্সিপেপটাইডেজ | | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| | নিউক্লিয়েজ | নিউক্লিক অ্যাসিড | নিউক্লিওটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| | লাইপেজ | স্নেহ পদার্থ | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |
| ক্ষুদ্রান্ত্র (আন্ত্রিক রস) | α-ডেক্সট্রিনেজ | লিমিট ডেক্সট্রিন | মল্টোট্রায়োজ ও মল্টোজ |
| | মল্টেজ | মল্টোজ | গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ |
| | সুক্রেজ | সুক্রোজ | গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ |
| | ল্যাকটেজ | ল্যাকটোজ | গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ |
| | ইরেপসিন | ডাইপেপটাই | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| | নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিয়টাইডেজ নিউক্লিয়সাইডেজ | নিউক্লিয় অ্যাসিড নিউক্লিয়টাইড নিউক্লিয়সাইড | পিউরিন, পিরিমিডিন রাইবোজ |
| | লাইপেজ | ফ্যাট | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল |
| যকৃৎ (পিত্ত) | পিত্তলবণ | ফ্যাট | লাইপেজের সক্রিয়তাকে বৃদ্ধি করে |

## ▲ কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং প্রোটিনের শোষণ (Absorption of Carbohydrate, Lipid and Protein)

❖ (a) **শোষণের সংজ্ঞা (Definition of absorption) :** যে প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিপাকজাত খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য সরল বস্তুসমূহ যেমন জল, খনিজ লবণ ও ভিটামিন অন্ত্রের আবরণী কোশের মধ্য দিয়ে লসিকাবাহ অথবা রক্তপ্রবাহে যায় তাকে শোষণ বলে।

(b) **শোষণের স্থল (Site of absorption) :** (i) ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রতিটি অংশ অর্থাৎ গ্রহণী বা **ডিওডিনাম** (Duodenum), মধ্য ক্ষুদ্রান্ত্র বা **জেজুনাম** (Jejunum) এবং নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র বা **ইলিয়াম** (Ileum) শোষণের প্রধান স্থল হিসাবে বিবেচিত হয়।

(ii) কিছু পদার্থ যেমন ঔষধ, অ্যালকোহল ইত্যাদি **গ্রাসনালি** এবং **পাকস্থলীর** মিউকাস স্তরের মধ্য দিয়ে শোষিত হয়।

(iii) **বৃহদন্ত্র** থেকে জলের শোষণ ঘটে।

(c) **শোষণের পথ (Pathway of absorption) :** শোষণ প্রক্রিয়া মূলত ব্যাপন, অভিস্রবণ, পৃষ্ঠলগ্নতা, পরিবহন প্রভৃতি ভৌত প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে। শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই-এর মধ্য দিয়ে এই সব ভৌত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিপাককারী খাদ্যবস্তুগুলি শোষিত হয়ে প্রধানত পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে যায়। সামান্য পরিমাণে লসিকা নালিতেও যায়। এরপর শোষিত পদার্থগুলি দেহের সব জায়গায় পরিবাহিত হয়।

## ❂ 1.19. কার্বোহাইড্রেটের শোষণ (Absorption of Carbohydrate) ❂

পরিপাকের শেষে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রতিটি কার্বোহাইড্রেট **একক শর্করা (মনোস্যাকারাইড)** অর্থাৎ গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ, জাইলোজ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই সব একক শর্করা জেজুনাম অংশের ভিলাইয়ের প্রাচীর কোশস্তরের মধ্য দিয়ে শোষিত হয়।

**কার্বোহাইড্রেটে শোষণ পদ্ধতি (Mechanism of absorption of carbohydrate) :** রাইবোজ অর্থাৎ পাঁচ কার্বনযুক্ত মনোস্যাকারাইড, জাইলোজ, আরবিনোজ ও ছয় কার্বনযুক্ত ম্যানোজ পরিপাকের সময় জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে ব্যাপন প্রক্রিয়াতে শোষিত হয়। গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ, ফ্রুকটোজ ইত্যাদি মনোস্যাকারাইড সক্রিয় শোষণ (Active absorption) পদ্ধতিতে শোষিত হয়। এই পদ্ধতিতে গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজের শোষণের হার সমান নয়। গ্যালাকটোজের শোষণ হার সবথেকে বেশি এবং ফ্রুকটোজের শোষণ হার সবথেকে কম।

চিত্র 1.32. : শোষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিরা এবং লসিকাবাহের চিত্ররূপ।

1. **গ্লুকোজের শোষণ** (Absorption of Glucose)—ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই-এর স্তম্ভকার কোশগুলির মুক্ত প্রান্তের ঝিল্লিতে এক প্রকার **বাহক** (Carrier) পদার্থ থাকে (চিত্র 1.32)। এই বাহক পদার্থ মাধ্যমেই গ্লুকোজের সক্রিয় শোষণ ঘটে। এই বাহকটি যখন কোশঝিল্লির বিবর সন্নিহিত প্রান্তে থাকে তখন এর সঙ্গে **গ্লুকোজ ও সোডিয়াম আয়ন** ($Na^+$) পৃথক স্থানে যুক্ত হয়ে **সোডিয়াম-গ্লুকোজ-বাহক** নামে এক-প্রকার যৌগ গঠন করে। এই যৌগটি কোশঝিল্লির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঝিল্লির সাইটোপ্লাজম সন্নিহিত পৃষ্ঠে এসে সোডিয়াম ও গ্লুকোজকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সরবরাহ করে এবং বাহকটি নিজে মুক্ত অবস্থায় ঝিল্লিতে থেকে যায়। কোশের সাইটোপ্লাজমে সোডিয়াম আয়নের প্রবেশ **সোডিয়াম পাম্প পদ্ধতির** সাহায্যে ঘটে। সোডিয়ামের এই কাজের জন্য ATP-এর প্রয়োজন হয়। ATP-এর ব্যবহারের জন্যই এই পদ্ধতিকে সক্রিয় শোষণ বলে। একই পদ্ধতিতে সাইটোপ্লাজম থেকে কোশঝিল্লি অতিক্রম করে পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে এবং হেপাটিক পোর্টাল শিরার মধ্য দিয়ে যকৃতে যায়।

চিত্র 1.33. : গ্লুকোজ শোষণ প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ।

2. **গ্যাল্যাকটোজের শোষণ** (Absorption of Galactose)—গ্লুকোজের মতো একই রকম **বাহক** পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

3. **ফ্রুকটোজের শোষণ** (Absorption of Fructose)—অন্ত্রে ফ্রুকটোজের শোষণ একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে ঘটে কারণ এই প্রক্রিয়ায় ATP-এর প্রয়োজন হয় না। ফ্রুকটোজও একটি সুনির্দিষ্ট বাহকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয়।

4. **সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মল্টোজের শোষণ** (Absorption of Sucrose, Lactose and Maltose)—এই সব ডাইস্যাকারাইডগুলি অল্প পরিমাণে ব্যাপন পদ্ধতিতে মধ্য ও নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয়। কিন্তু শোষণের পর কোশঝিল্লিতে সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মল্টোজ উৎসেচকগুলির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে মনোস্যাকারাইডে পরিণত হয়।

## ❂ 1.20. ফ্যাট বা স্নেহ দ্রব্যের শোষণ (Absorption of Fat) ❂

ফ্যাট বা স্নেহ দ্রব্যের শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে অর্থাৎ ডিওডিনাম ও কিছুটা জেজুনামে হয়। ফ্যাটের শোষণ একটি জটিল পদ্ধতি। ফ্যাটের শোষণ পদ্ধতির বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

(a) **লাইপোলাইটিক প্রকল্প (Lipolytic hypothesis)** ঃ বিভিন্ন পাচকরসে অবস্থিত লাইপেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্যাট গ্লিসেরল ও অদ্রবণীয় ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় ও পৃথক পৃথক ভাবে শোষিত হয়। অদ্রবণীয় ফ্যাটি অ্যাসিড পিত্ত লবণের সঙ্গে দ্রবণীয় **ফ্যাটি অ্যাসিড পিত্তলবণ জটিল** (Fatty acid-bile salt complex) উৎপন্ন করে। এছাড়া পিত্তলবণ ভিলাইস্থিত আবরণী কোশের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে, ফলে এই জটিল পদার্থটির শোষণ সহজতর হয়। শোষিত হওয়ার পরে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসেরলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসেরাইড (লিপিড) উৎপন্ন করে। এরপর এটি লসিকা প্রবাহে প্রবেশ করে এবং পরে এই লসিকা **শ্বেতরসে** বা **কাইলে** (Chyle) রূপান্তরিত হয়।
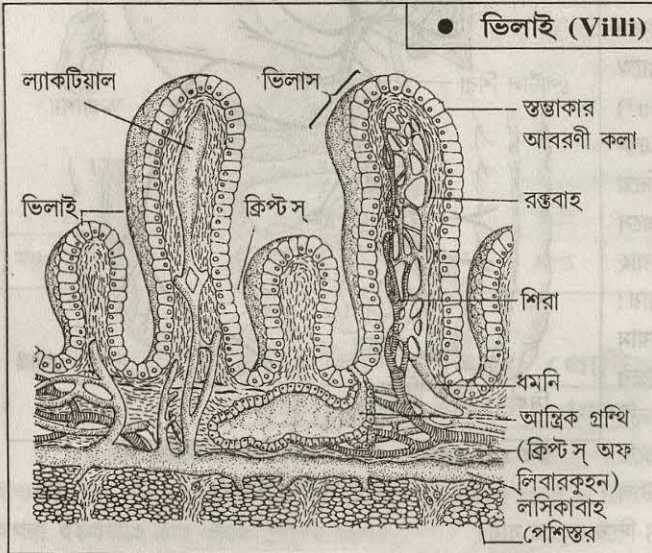
### ● ভিলাই (Villi) ●

ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইকে (একবচনে ভিলাস—Villus) **শোষণের একক** বলা হয়। প্রতিটি ভিলাস ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাস্তর থেকে উদ্‌গত অঙ্গুলি সদৃশ প্রবর্ধক অংশ যা স্তম্ভাকার আবরণী কোশ দিয়ে আবৃত থাকে। কোশের মুক্তপ্রান্তে মাইক্রোভিলাইয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্তম্ভাকার কোশস্তরের মধ্যে মধ্যে এককোশী শ্লেষ্মাক্ষরা স্বচ্ছ গোবলেট কোশ থাকে। এই কোশ থেকে শ্লেষ্মা (mucous) ক্ষরিত হয়। কেন্দ্রস্থলে **ল্যাকটিয়েল** (Lacteal) নামক বন্ধপ্রান্ত মোটা লসিকানালি রক্তজালক আবৃত অবস্থায় থাকে।

(b) **ফ্রেজারের বিভাজন প্রকল্প (Partition hypothesis of Frazer)** ঃ এই মতবাদ অনুসারে মোট ফ্যাটের 30 শতাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশ্লেষিত হয়, বাকি 70 শতাংশ অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকে। এই 30% বিশ্লেষিত ফ্যাট মনোগ্লিসেরাইড বা ডাইগ্লিসেরাইড প্রস্তুত করে। এই মনো ও ডাইগ্লিসেরাইড এবং পিত্তলবণ বাকি 70% ফ্যাটের অদ্রবণীকরণে (Emulsification) সাহায্য করে। বিশ্লেষিত অংশের হ্রস্বতর ফ্যাটি অ্যাসিড (Short chain fatty acid) পোর্টালতন্ত্রের মাধ্যমে শোষিত হয়। অবিশ্লেষিত এবং আংশিক বিশ্লেষিত ফ্যাটি অ্যাসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইস্থিত কেন্দ্রীয় ল্যাকটিয়েলের (Central lacteal) মাধ্যমে লসিকা প্রবাহে প্রবেশ করে। এর পর বক্ষ লসিকা নালি (Thoracic duct) দিয়ে রক্তপ্রবাহে পৌঁছায়।

(c) **আধুনিক মতবাদ (Modern concept)** ঃ খাদ্যের বিভিন্ন রকমের ফ্যাট (ট্রাইগ্লিসেরাইড)-এর 25% লাইপেজ এবং আইসোমারেজ উৎসেচক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়ে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। উৎপন্ন গ্লিসেরল শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে যায়। বাকি ফ্যাট মনোগ্লিসেরাইড, ডাইগ্লিসেরাইড (সামান্য পরিমাণ) এবং ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। β-মনোগ্লিসেরাইড, বিভিন্ন বড়ো অণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, সামান্য পরিমাণ α-মনোগ্লিসেরাইড, সম্ভবত কিছু পরিমাণ ডাইগ্লিসেরাইড এবং খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ তন্ত্রের ক্ষারীয় পরিবেশে পিত্ত লবণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **মাইসেলি** (Micelle) নামে অতি ক্ষুদ্র **স্নেহ কণিকা** (40-200°A ব্যাস) গঠন করে। এই কণাগুলি ক্ষুদ্রান্ত্র গায়ের বুরুশ প্রান্তযুক্ত (মাইক্রোভিলাইযুক্ত) কোশের মধ্যে দিয়ে শোষিত হয়। শোষিত হওয়ার আগে পিত্ত লবণ মাইসেলি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এর পরে পৃথকভাবে শোষিত হয়।

কোশের মধ্যে α-মনোগ্লিসেরাইড বিশ্লেষিত হয়ে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। গ্লিসেরল ATP এবং **গ্লিসেরোকাইনেজ** এনজাইমের প্রভাবে α-গ্লিসেরোফসফেট উৎপন্ন করে। এটি আবার ফ্যাট উৎপন্ন করতে অংশ নেয়। লাইপেজ এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন সংখ্যা দশের কম হলে তা সরাসরি পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে। দশের অধিক কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড **থায়োকাইনেজ** ATP-এর প্রভাবে অ্যাসাইল কো-এতে পরিবর্তিত হয়ে ট্রাইগ্লিসেরাইড গঠিত করে। β-মনোগ্লিসেরাইড অ্যাসাইল কো-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েও ট্রাইগ্লিসেরাইড উৎপন্ন করে। এই সকল পুনর্নির্মিত ট্রাইগ্লিসেরাইড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল এবং অল্প পরিমাণে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ কণিকা সৃষ্টি করে। এদের **কাইলোমাইক্রন** (Chylomicron) বলে। এটি কোশঝিল্লি ভেদ করে ভিলাই মধ্যস্থিত ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে ও পরে ওই স্থান থেকে রক্তে যায়।

### • কাইলোমাইক্রন এবং মাইসেলি (Chylomicron and Micelle) •

1. **কাইলোমাইক্রন ঃ** রাসায়নিক প্রকৃতির হিসাবে কাইলোমাইক্রন ট্রাইগ্লিসেরাইড, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড এবং প্রোটিন নিয়ে গঠিত সূক্ষ্ম কণা যা তৈরি হওয়ার পর ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই দিয়ে শোষিত হয়ে ল্যাকটিয়েলে যায়। **তাৎপর্য**—কাইলোমাইক্রন কলাস্থান এবং লসিকানালির মধ্যে উন্মুক্ত প্রণালীর সাহায্যে লসিকাবাহে যায়।
2. **মাইসেলি ঃ** মাইসেলি হল দ্রবণীয় সূক্ষ্ম স্নেহ জাতীয় কণা (Amphipathic molecule)। মনোগ্লিসেরাইড, কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে এটি গঠিত হয়। **তাৎপর্য**—মাইসেলি গঠিত হওয়ার পর ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের উপরের কোশ স্তর দিয়ে নিষ্ক্রিয় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়।

## ◎ 1.21. প্রোটিনের শোষণ (Absorption of Protein) ◎

পরিপাকের ফলে প্রোটিন **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** (প্রোটিনের এককে) পরিণত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রধানত সক্রিয় অবস্থায় এবং কোশঝিল্লিস্থিত উপযুক্ত বাহকের উপস্থিতিতে শোষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য পৃথক পৃথক বাহক পদার্থ আছে। ভিটামিন $B_6$, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম আয়ন এদের শোষণে সাহায্য করে। D-অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া কিছু কিছু লব্ধ প্রোটিন যেমন প্রোটিওজ, পেপ্টোন, পলিপেপটাইড ইত্যাদি সরাসরি শোষিত হয়। শোষণের পর অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অন্যান্য প্রোটিনের অংশ পোর্টাল শিরা মারফত যকৃতে যায়।
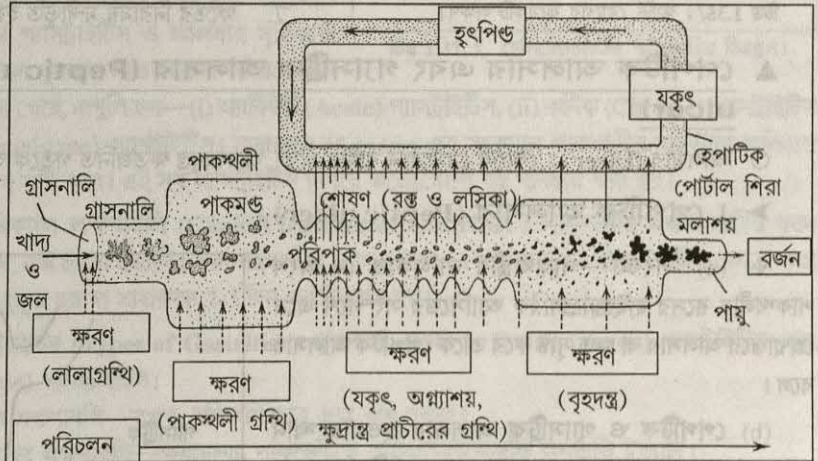
চিত্র 1.34. ঃ মানবদেহে ক্ষরণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচিত খাদ্যের বর্জনের চিত্ররূপ।

### • প্রোটিনঘটিত অ্যালার্জি •

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু প্রোটিন সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইস্থিত আবরণী কোশে **পিনোসাইটোসিস** (Pinocytosis) প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে এই কোশ থেকে সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণ— ডিম, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি খাওয়ার ফলে কোনো কোনো লোকের দেহে যে **অ্যালার্জির** (Allergy) উপসর্গের প্রকাশ ঘটে তা খুব সম্ভবত এই সব খাদ্যস্থিত কোনো কোনো প্রোটিনের জন্য হয়ে থাকে।

## ◎ D. পাক-তন্ত্রের ক্লিনিক্যাল অবস্থা (Clinical condition of G. I. system) ◎

### ▲ স্কার্ভি (Scurvy)

❖ (a) **সংজ্ঞা :** ভিটামিন-C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)-এর অভাবজনিত যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে স্কার্ভি বলে।
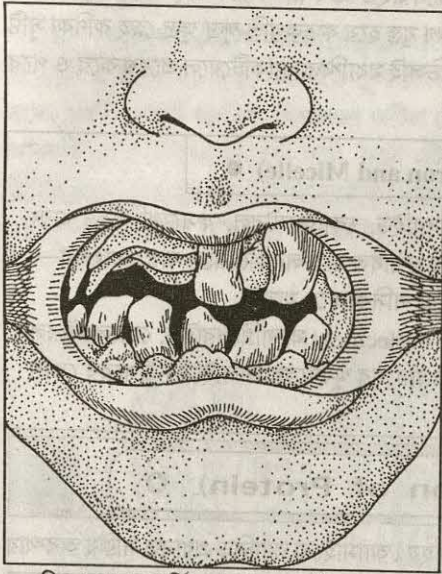
চিত্র 1.35. : স্কার্ভি রোগের কয়েকটি লক্ষণ।

(b) **লক্ষণ (Symptoms) :** স্কার্ভি রোগের লক্ষণগুলি হল—

1. পৌষ্টিকনালির শুরুর অংশের অর্থাৎ মুখের দাঁতগুলি কদাকার রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় মাড়ি স্পঞ্জি ও ছিদ্রযুক্ত হয়, এর থেকে প্রায়ই রক্তক্ষরণ ঘটে।
2. এছাড়া দেহের অস্থির মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। অস্থিতে লবণের যথাযথ উপস্থাপন ব্যাহত হয় বলে দীর্ঘাস্থির ঘনত্ব কমে যায়। অস্থির ভঙ্গুরতা বেড়ে যায়। দাঁতেও একই রকম পরিবর্তন দেখা যায়। মাড়ি স্পঞ্জী ও ছিদ্রযুক্ত হয়।
3. রক্তজালক ক্ষণভঙ্গুর হয়, মাড়ি অন্ত্র, বৃক্ক ও ত্বকের নীচে রক্তপাত ঘটে।
4. রক্তপাতের জন্য লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে যায় ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।
5. রক্তের তঞ্চন-প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।
6. জীবাণু সংক্রমণের সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়।
7. ক্ষতের নিরাময় মন্দীভূত হয়।

### ▲ পেপটিক আলসার এবং গ্যাসট্রিক আলসার (Peptic ulcer and Gastric ulcer)

○ **আলসার (Ulcer) :** কোনো মেমব্রেনে বাটির মতো আকারযুক্ত ক্ষতজনিত গর্তকে আলসার বলে।

#### ➤ I. পেপটিক আলসার (Peptic ulcer) :

❖ (a) **সংজ্ঞা—পাকঅন্ত্রীয় নালিকার যে অংশ পাকস্থলীয় রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে শ্লেষ্মাস্তরে আলসার বা ক্ষত সৃষ্টি করে তাকে পেপটিক আলসার বলে।**

(b) **পেপটিক ও গ্যাসট্রিক আলসার হওয়ার স্থান (Site of peptic and gastric ulcers) :** পেপটিক আলসার বলতে গ্যাসট্রিক ও ডিওডিনাল আলসারকেও বোঝায়। **পেপটিক আলসার** প্রধানত গ্রাসনালির (ইসোফেগাসের) নিম্নাংশে হতে দেখা যায়। কিন্তু **গ্যাসট্রিক্ আলসার** (Gastric ulcer) প্রধানত পাকস্থলীর ক্ষুদ্রতর বক্রতার দিকে হতে দেখা যায়। এছাড়া ডিওডিনামের প্রথম অংশে আলসার দেখা যায়। এই অবস্থাকে **ডিওডিনাল আলসার** (Duodenal ulcer) বলে।

চিত্র 1.36. : পেপটিক আলসারের অবস্থানের চিত্ররূপ।

(c) **কারণ (Cause) :** (i) ডিওডিনাল আলসার হওয়ার

মুখ্য কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সমৃদ্ধ পাকস্থলীয় রসের অধিক ক্ষরণ। (ii) গ্যাসট্রিক আলসার হওয়ার প্রধান কারণ পাকস্থলী থেকে কম পরিমাণে শ্লেষ্মা (মিউকাস) ক্ষরণ। কারণ পাকস্থলীর অন্তঃস্থ প্রাচীর মোটা শ্লেষ্মা স্তর দিয়ে আবৃত থাকে। এই শ্লেষ্মা (মিউকাস) স্তর থাকার জন্য HCl সহজে পাকস্থলীতে আলসার ঘটাতে পারে না। (iii) নার্ভীয় ফ্যাক্টর, যেমন— আবেগ, চিন্তা, ভয়, উদ্‌বিগ্ন ইত্যাদি কারণগুলি ভেগাস নার্ভকে উদ্দীপিত করে অ্যাসিড (HCl) এবং পেপসিন (এনজাইম) ক্ষরণকে বাড়িয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। (iv) এছাড়া অধিক ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল, কফি ইত্যাদির পান অ্যাস্‌পিরিন জাতীয় যন্ত্রণা উপশমকারী (Pain killer) ঔষধ গ্রহণ ইত্যাদি আলসার হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়ায়।

(d) **লক্ষণ (Symptom)** : আলসারের প্রধান লক্ষণগুলি হল—ক্ষত বা আলসার স্থানটি ছিদ্রযুক্ত (Perforations), ক্ষয়করণ (Erosion) এবং পাকস্থলী বা ডিওডিনামের প্রাচীরস্থিত আলসার থেকে ক্ষয়কর পদার্থ নির্গমন। এই ছিদ্র দিয়ে ব্যাকটেরিয়া বা পাচিত খাদ্য পেরিটোনিয়াম গহ্বরের মধ্যে যায়।

### ➤ II. গ্যাসট্রাইটিস (Gastritis) :

(a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে অস্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলীর মিউকাস মেমব্রেন স্ফীতি জ্বালা ও আরক্তভাব অবস্থায় (প্রদাহ) পরিণত হয় তাকে গ্যাসট্রাইটিস বলে।**

(b) **কারণ (Cause)** : কয়েকটি কারণের জন্য গ্যাসট্রাইটিস হতে পারে, এর প্রধান কয়েকটি কারণ হল—(i) ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন অধবিষ (Toxin) রক্তের মাধ্যমে পাকস্থলীতে যায় ও গ্যাসট্রাইটিস রোগে আক্রান্ত করে। (ii) কয়েক রকমের ড্রাগ, সংক্রমিত খাদ্য বা অ্যালকোহল যা সরাসরি পাকস্থলীর মিউকাস মেমব্রেনকে উদ্দীপিত করে। (iii) অ্যালার্জি উৎপন্নকারী কয়েক প্রকার খাদ্যবস্তু গ্যাসট্রাইটাস রোগ হতে সাহায্য করে। 2005 খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার দুজন বিজ্ঞানী *হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি* (*Helicobactor pylori*) নামে গ্যাসট্রাইটিস ও আলসার সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিন ধরনের গ্যাসট্রাইটিস সম্বন্ধে জানা গেছে, এগুলি হল—(i) অ্যাকিউট (Acute) গ্যাসট্রাইটিস, (ii) ক্রনিক (Chronic) গ্যাসট্রাইটিস এবং (iii) বিশেষ ধরনের (Special type) গ্যাসট্রাইটিস। সাধারণত *H. pylori*-এর সংক্রমণে পাকস্থলীর **অ্যানট্রাম** ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। এই সব গ্যাসট্রাইটিস নির্ণয়ে এন্ডোস্কোপি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
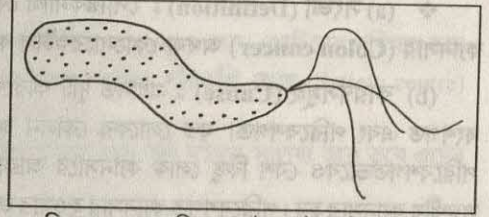
চিত্র 1.37. : হেলিকোব্যাকটর পাইলোরির চিত্ররূপ।

(c) **গ্যাসট্রাইটিসের ক্লিনিক্যাল লক্ষণাবলি (Clinical features of Gastritis)** : পাকস্থলীর অন্তস্থ প্রাচীর ফুলে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্ষুদামান্দ, বমি হওয়া ইত্যাদি। আলসারজাতীয় রোগ থেকে এর পার্থক্য হল—গ্যাসট্রাইটিস ক্ষেত্রে সমগ্র উপরের পেটে সবসময় ব্যথা অনুভূত হয় যা সাধারণত 2-3 দিন পর উপশম হয়।

(d) **গ্যাসট্রাইটিসের প্রকারভেদ (Types of Gastritis)** : দু'প্রকার, যেমন— সাধারণ (Acute) গ্যাসট্রাইটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী বা বহুপুরাতন (Chronic) গ্যাসট্রাইটিস।

(1) সাধারণ গ্যাসট্রাইটিসের লক্ষণাবলি—যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া।

(2) বহুপুরাতন গ্যাসট্রাইটিসের লক্ষণাবলি—ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলীতে অস্বাভাবিক অস্বস্তি অনুভূতি ইত্যাদি।

## ▲ যকৃতের সিরোসিস (Cirrohosis of Liver)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যকৃতের পচনরূপ রোগাক্রান্ত অবস্থায় স্বাভাবিক যকৃতের প্যারানকাইমা কোশ (যকৃৎ কোশ) তন্তুময় যোগ কলাতে পরিবর্তিত হয়ে কঠিন হয়ে যায় তাকে যকৃতের সিরোসিস (Cirrohosis of Liver) বলে।**

(b) **কারণ (Cause)** : (i) **মদাসক্ত** (Alcoholism)—যেসব লোক নিয়মিত প্রচুর পরিমাণ মদ পান করে তাদের যকৃৎ সিরোসিস রোগ হয়। (ii) **হেপাটাইটিস** (Hepatitis)—যে ব্যক্তি বিভিন্ন সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ফলে হেপাটাইটিস নামে যকৃতের প্রদাহজনিত রোগ হয় তাদের বেলায় যকৃতের সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (iii) **অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ**— কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা যকৃতের কোশগুলিকে ধ্বংস করে, ফলে যকৃতের সিরোসিস ঘটে।

(c) **লক্ষণ (Symptom)** ঃ পুরাতন যকৃৎ সিরোসিস রোগে আক্রান্ত লোকের যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ দেখা যায়, তার মধ্যে কয়েকটি হল— যকৃতের কাঠিন্য, যকৃতের বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে যকৃতের স্বাভাবিক কাজগুলি বিঘ্নিত হয়। এর ফলে ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, অপুষ্টি, রক্তের প্লাজমায় সিরাম অ্যালবুমিনের পরিমাণের হ্রাস, সিরাম অ্যালবুমিনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ইডিমা এবং দেহে সোডিয়াম আয়নকে ধরে রাখা, বিলিরুবিন রঞ্জক কণার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

## ▲ কোলন ক্যানসার (Colon Cancer)

বৃহদন্ত্র চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। বৃহদন্ত্রের সিকার অংশ (প্রথমাংশ) থেকে উৎপন্ন নলাকার অংশটি **উর্ধ্বগামী কোলন, অনুপ্রস্থ কোলন, নিম্নগামী কোলন** এবং **সিগময়েড কোলন** নিয়ে গঠিত হয়েছে। সিগময়েড কোলন থেকে মলাশয় বা রেকটাম উৎপন্ন হয় (চিত্র নং 1.17 দেখো)। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোলনের এইসব অংশে ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এই প্রকার কোলন ক্যানসার পুরুষ ও স্ত্রী সমহারে আক্রান্ত হতে পারে। ক্যানসারকে সাধারণভাবে মাইটোসিস কোশ বিভাজন ও কোশের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী জিনের মিউটেশন কিংবা অন্য কোনো অস্বাভাবিক সক্রিয়করণের ফলে উৎপন্ন তীব্র প্যাথোক্লিনিকাল (Patho-clinical) অবস্থা বলা হয়। অস্বাভাবিক জিনগুলিকে বলা হয় **অনকোজিন** (Oncogene) যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় কোশে অবস্থিত অ্যান্টিঅনকোজিন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোনো কারণে অ্যান্টিঅনকোজিন নিষ্ক্রিয় হলে ক্যানসার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ **পৌষ্টিকনালি কোলনের যে-কোনো অংশে অথবা মলাশয়ে ক্যানসার হলে তাকে কোলন ক্যানসার (Colon cancer) অথবা কোলোরেকটাল ক্যানসার (Colorectal cancer) বলে।**

(b) **কারণসমূহ (Cause)** ঃ প্রধানত দুটি কারণের জন্য কোলনে ক্যানসার হতে পারে। এ দুটি কারণ হল **জিনগত** বা **বংশগত** এবং **পরিবেশগত**। যত লোকের কোলন ক্যানসার হয় তার মধ্যে প্রায় 50 শতাংশ বংশগত কারণের জন্য হয়। পরিবেশগতভাবেও বেশ কিছু লোক ক্যানসারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এক বা একাধিক জিনের মিউটেশনের ফলে জিন সম্বন্ধীয় ক্যানসার হয়। পরিবেশগত ক্যানসার হওয়ার জন্য কারণগুলির মধ্যে প্রধান কারণটি হল খাদ্যজনিত কারণসমূহ, যেমন— ফ্যাট সমৃদ্ধ সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য, অতিরিক্ত মাংস (প্রধানত লাল মাংস) খেলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবুজ শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি তন্তুময় খাদ্য (Dietary fibre) খেলে কোলন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনাকে অনেকটা কমিয়ে দেয়, কারণ সবুজ শাকসবজিতে গ্লুকোসিনোলেট, ফ্লেভোনয়েডস নামে অ্যান্টিকারসিনোজেন নামে পদার্থ থাকে। এছাড়া যথাযথ কায়িক পরিশ্রম না করা, ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়া, স্থূলতা, ধূমপান ও মদ্যপান ইত্যাদি কয়েকটি কারণে কোলন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোলনের অন্তঃপ্রাচীরে কতকগুলি পলিপ গঠিত হয় যা কোলন বিষম (ম্যালিগন্যান্ট) নয়, কিন্তু বহুদিন ধরে ক্ষতিকর অবস্থায় থাকার পর ম্যালিগন্যান্ট অবস্থায় (ক্যানসারে) রূপান্তরিত হয়। ক্যানসারের এই টিউমারগুলির বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থর এবং 6-8 বছরে মাত্র 6 সেমি. মতো বড়ো হয়। পরিণত অবস্থায় টিউমারগুলি গোলাকার, উঁচু এবং ক্ষতযুক্ত হয়। এর ফলে মলের প্রকৃতি এবং মল নির্গমনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

কখনো-কখনো আলসারজনিত কোলাইটিস অনেক দিন স্থায়ী হলে এর থেকেও কোলনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(c) **প্রতিকার (Prevention)** ঃ তন্তুযুক্ত খাদ্য, রেটিনোয়েডস, ক্যালশিয়াম, সেলেনিয়াম প্রভৃতি খাদ্যবস্তু মলাশয়ের ক্যানসার হওয়াকে কিছুটা প্রতিরোধ করে।

(d) **লক্ষণ (Symptom)** ঃ মলের প্রকৃতি এবং মল নির্গমনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আমাশা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের ব্যথা, পেশির যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ (খিল), মলাশয় থেকে রক্তপাত (কাঁচারক্ত বা তঞ্চিত রক্ত) প্রভৃতি হতে দেখা যায়। এই প্রকার মলের সঙ্গে মিশ্রিত তঞ্চিত রক্তকে জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা করে, সিগময়েডস্কোপি বা কোলোনস্কোপি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা বেরিয়াম নামে তরল ধাতুকে পায়ুর মাধ্যমে ইনজেকশন (এনেমা) সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে মলাশয়ের এই ক্যানসার রোগ নির্ণয় করা যায়। এন্ডোস্কোপির সাহায্যে এই রোগকে চিকিৎসা করা সম্ভবপর হয় না বলে, শল্যচিকিৎসার (surgery) সাহায্যে আক্রান্ত অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়।

## ▲ মেদবৃদ্ধি (ওবেসিটি—Obesity)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ দেহে অত্যধিক মেদ (ফ্যাট) সঞ্চয়ের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে দেহের ওজন অনুমোদনযোগ্য (আকাঙ্ক্ষিত) মানের থেকে দশ শতাংশ থেকে কুড়ি শতাংশ ওজন বেড়ে যায় তাকে মেদবৃদ্ধি বা ওবেসিটি বলে।**

(b) **মেদ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ (Cause of Obesity) ঃ** (i) দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য ক্যালোরির (প্রায় প্রতিদিন 2500 ক্যালোরি) প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালোরি খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করলে দেহে ফ্যাটের সঞ্চয় ঘটে এবং এই অবস্থায় কায়িক শ্রমহীন জীবনযাপন করলে দেহে মেদ বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) কয়েকটি মানসিক কারণ, যেমন— হতাশা, ক্ষোভ, ব্যর্থতা, লোভ কিংবা পারিবারিক খাদ্যাভ্যাস দেহে মেদ বৃদ্ধি ঘটায়।

(iii) মস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাসের একটি অংশ খাদ্য গ্রহণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এই অংশটিকে উদ্দীপিত করলে প্রাণী বা মানুষ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। একে **হাইপারফ্যাজিয়া** (Hyperphagia) বলে। মানুষ তার স্বাভাবিক ক্যালোরি প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা বেশি খাদ্য খেলে দেহ মোটা (স্থূল—Obese) হয়ে যাবে। খাদ্য গ্রহণ কেন্দ্রের টিউমার কিংবা ট্রোমার ফলে কিছু কিছু মেদ বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

(iv) বর্তমানে দেখা গেছে মেদ বৃদ্ধির জন্য জিন বিশেষ ভূমিকা নেয়। কিছু লোক মোটা হওয়া জিন উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এই প্রকার জিন পাওয়া লোকের বিপাকীয় হার কম হয় ফলে এদের মেদ বৃদ্ধি ঘটতে দেখা দেয়। কারণ তারা যা কিছু খাক না কেন তাদের কলাকোশে এদের জারণ অত্যন্ত মন্থর ভাবে ঘটায়।

(v) আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হল—অ্যাডিপোসাইট দ্বারা উৎপন্ন **অ্যাডিপসিন** (Adipsin) নামে প্রোটিনের পরিমাণ কমে গেলে মেদ বৃদ্ধি ঘটে। মনে করা হয় যে অ্যাডিপসিনের অভাব হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত **পরিতৃপ্তি কেন্দ্র** (Satiety centre) খাদ্যগ্রহণের অনীহাকে কমিয়ে দেয় ফলে মানুষ প্রচুর পরিমাণ খাদ্য খেয়ে মোটা হয়।

(vi) থাইরয়েড বা অগ্রপিটুইটারি নামে অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলির অস্বাভাবিক অবস্থা মেদ বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

(c) **মেদ বৃদ্ধির শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Obesity) ঃ** মেদ বৃদ্ধি দু'প্রকারের হয়, যেমন—হাইপারট্রোফিক মেদবৃদ্ধি এবং হাইপারপ্লাস্টিক মেদবৃদ্ধি।

1. **হাইপারট্রোফিক মেদবৃদ্ধি (Hypertrophic or Adult-set obesity)**— অ্যাডিপোসাইটে মেদ (ফ্যাট)-এর পরিমাণ বাড়ে কিন্তু মেদ কোশের সংখ্যা বাড়ে না। এই প্রকার লোক 20-40 বৎসর বয়স পর্যন্ত রোগা বা স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখে, এর পর থেকে দেহের ওজন বাড়তে শুরু করে। ক্যালোরি গ্রহণ এবং এর ব্যবহারের মধ্যে গরমিলের ফলে এটি ঘটে।

2. **হাইপারপ্লাস্টিক মেদবৃদ্ধি (Hyperplastic or Lifelong obesity)**—এই প্রকার মেদবৃদ্ধিতে দেহে ফ্যাট কোশের সংখ্যা এবং ফ্যাটের পরিমাণ দুটিই বাড়ে। এই প্রকার মোটা হওয়ার প্রবণতা শিশুদের মধ্যে দেখা যায় এবং বয়ঃসন্ধিকালের স্বল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ দেহের ওজন বেড়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পর মেদ কলার বা অ্যাডিপোজ কলার মেদকোশের সারা জীবন ধরেই একই প্রকার থাকে।

(d) **মেদবৃদ্ধিতে শারীরবৃত্তীয় অস্বাভাবিক অবস্থা (Patho-physiological conditions of obesity) ঃ** মেদবৃদ্ধি হৃৎপিণ্ড রক্তবাহ তন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রের ওপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়, করোনারি ধমনিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ফলে রক্তচাপ বাড়ে, করোনারি ধমনিতে থ্রমবোসিস এবং হার্ট অ্যাটাক ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া সেরিব্রাল স্ট্রোক, ফুসফুসে সংক্রমণ, মধুমেহ রোগ ইত্যাদিও হতে দেখা যায়।

(e) **চিকিৎসা (Treatment) ঃ** একবার মেদবৃদ্ধি শুরু হলে তাকে কমিয়ে স্বাভাবিক ওজন ফিরে আনা বেশ কঠিন ব্যাপার। কঠোর ভাবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মেদ কমানো সম্ভব নয়। এই অবস্থায় খাদ্যের পরিমাণ এবং অধিক ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য খাওয়া কমাতে হবে। পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যালোরির ব্যয় বাড়াতে হবে।

## ▲ অনশন ও উপবাস (Starvation and Fasting)

মানুষের দেহ বহির্জগত বা দেহের ভিতরে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার পীড়নের বিরুধে লড়ার ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে আছে। এই ক্ষমতার ফলেই মানুষ তার দেহকে বিভিন্ন প্রকার পীড়ন থেকে রক্ষা করে। দীর্ঘদিন অপুষ্টি অথবা কম পরিমাণ বা সম্পূর্ণ খাদ্যের

অভাব এক প্রকার পীড়ন অবস্থা যা একজন মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যুদ্ধ, বন্যা, সুনামি, আগ্নেয়গিরি অথবা খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবস্থায় খাদ্যের অভাবে একজন লোক বা মানব সমাজ বিভিন্ন সময়কাল পর্যন্ত উপবাস বা অনশন অবস্থায় থাকে ফলে দেহে বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

■ **অনশন (Starvation)** ঃ মানুষের দেহে খাদ্যের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি অনুসারে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে যথাক্রমে খাদ্য সারাংশের শোষণ ঘটে বা শোষণ বন্ধ থাকে। এই দুটি অবস্থাকে শোষণ পর্যায় (Absorptive state) এবং শোষণোত্তর পর্যায় (Post absorptive state) বলে। শোষণোত্ত পর্যায় যদি সাময়িকভাবে প্রলম্বিত হয় সেই অবস্থাকে **অনশন** বলা হয়। এই অবস্থাতে দেহে সঞ্চিত পুষ্টি থেকে দেহ শক্তি লাভ করে। স্বাভাবিক খাদ্যের সম্পূর্ণ শোষণ শেষ হতে গড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

❖ (a) **অনশন বা উপবাসের সংজ্ঞা (Definition of Starvation and Fasting) ঃ দেহের যে অবস্থায় অপর্যাপ্ত পুষ্টির গ্রহণ অথবা খাদ্যবস্তুর ত্রুটিপূর্ণ পরিপাক ও শোষণ অথবা গৃহীত পুষ্টির বিপাক ক্রিয়ার ত্রুটির ফলে গ্লাইকোজেন, ফ্যাট এবং প্রোটিন হিসেবে দেহে সঞ্চিত জৈব শক্তির ক্ষয় ঘটে তাকে উপবাস বা অনশন বলে।**

(b) **অনশনে বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় পরিবর্তন (Metabolic changes during starvation)** ঃ অনশন বা উপবাস অবস্থায় দেহে যেসব পরিবর্তনগুলি ঘটে তার মধ্যে মুখ্য পরিবর্তন হল বিপাকীয় পরিবর্তন। এই বিপাকীয় পরিবর্তনগুলি প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ঘটে।

1. **প্রথম পর্যায়** (First stage)— এই পর্যায় উপবাস বা অনশনের প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় দেহ শক্তির প্রয়োজনে দেহে (যকৃৎ এবং কঙ্কাল পেশিতে) সঞ্চিত গ্লাইকোজেন (মুখ্য শক্তি যোগানকারী জৈব যৌগ বা বহুশর্করা) ভাঙে। দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন একটি নির্দিষ্টি পরিমাণে (মোট প্রায় 500-700 গ্রাম) থাকে। তাই উপবাসকালীন অবস্থার 24 ঘণ্টা থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে বিপাকীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত সঞ্চিত **গ্লাইকোজেন নিঃশেষিত** হয়ে যায়। এই কারণে অনশনের প্রথম পর্যায়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। এই অবস্থাকে **হাইপোগ্লাইসিমিয়া** (Hypoglycemia) বলে।

2. **দ্বিতীয় পর্যায়** (Second stage)— সঞ্চিত গ্লাইকোজেন শেষ হওয়ার ফলে দেহে অবস্থিত **সঞ্চিত ফ্যাট** (Depot fat)-এর **ফ্যাটি অ্যাসিডের** ভাঙনের হার ক্রমশ বাড়তে থাকে। অধিক পরিমাণ ফ্যাটি অ্যাসিড ভাঙার ফলে **কিটোন** বডির উৎপাদনও ক্রমশ বাড়ে। ফলে রক্তে ও মূত্রে কিটোন বডির পরিমাণ বাড়ে। এই তিনটি অবস্থাকে **কিটোসিস, কিটোনিমিয়া** এবং **কিটোনিউরিয়া** অবস্থার সৃষ্টি। কিটোসিস অবস্থায় রক্তে pH কমে যায় অর্থাৎ রক্ত অম্লধর্মী (Acidosis) হয় (স্বাভাবিক রক্তের pH-7·2)। দেখা গেছে **অনশনের পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে দেহের বেশিরভাগ সঞ্চিত ফ্যাট ব্যবহৃত হয়ে যায়** এবং তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়।

3. **তৃতীয় পর্যায়** (Third stage)— যখন ফ্যাটের অপচিতি শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই অবস্থায় যকৃৎ, কঙ্কাল ও হৃৎপেশি এবং বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চিত প্রোটিন দ্রুত ভেঙে গিয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। প্রোটিনের ভাঙনের ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। যকৃতে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। দেখা গেছে প্রোটিনের অপচিতির ফলে প্রোটিনের স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে প্রায় অর্ধাংশ পরিমাণে কমে যায়। এই অবস্থা সৃষ্টি হলে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

● **শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন (Physiological changes)** ঃ

(i) অনশনের ফলে সম্পূর্ণ দেহ বা দেহের প্রতিটি অঙ্গের গঠনগত এবং কার্যগত পরিবর্তন ঘটে। তীব্র অনশনে দেহের গঠন কঙ্কালসার হয়ে যায়।

(ii) অন্য একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হল—দেহ সঞ্চিত ফ্যাটের অবক্ষয়ের ফলে দেহের ওজন কমে যায়।

(iii) হৃৎপেশিস্থিত প্রোটিনের অপচিতির ফলে হৃৎপিণ্ডের আকৃতি অংশত ছোটো হয়। হার্দ উৎপাদ কমে যায়।

(iv) রক্তের পরিমাণ, রক্তকণিকা এবং প্লাজমার অনুপাত, সিরাম অ্যালবুমিন এবং লিম্ফোসাইটের সংখ্যা কমে যায়।

(v) ফুসফুসের পরিমাণ এবং শ্বাসক্রিয়ায় জড়িত পেশিগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ফলে ফুসফুসের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

(vi) বৃক্কের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়—বৃক্কীয় সংবহনের হ্রাস, পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া হ্রাস ফলে মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

(vii) অন্যান্য পরিবর্তন—বিপাকীয় হার, যকৃতের কার্যাবলি, অনাক্রম্যতা তন্ত্র, ক্ষতস্থানের উপসম, জনন প্রক্রিয়া ইত্যাদির হ্রাস ঘটে।

## পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে কয়েকটি রোগ A few Diseases in the Alimentary canal

### A. লালা সংক্রান্ত রোগ (Diseases related to the Saliva) :

1. **জেরোস্টোমিয়া** (Xerostomia)—এই রোগ বিভিন্ন কারণে (দুশ্চিন্তা, X রশ্মি, ভিটামিনের অভাবে) লালা ক্ষরণ কমে গেলে বা বন্ধ হলে মুখ শুকিয়ে যায়। এর ফলে খাবার চিবোনো যায় না, কথা বলা ইত্যাদি কষ্টকর হয়।
2. **সিয়ালোরিয়া** (Sialorrhoea)—এটি জিভে ঘা, পার্কিনসনিজম, দাঁতে ক্ষয় ও মাড়িতে ঘা প্রভৃতি কারণে লালাক্ষরণের আধিক্যজনিত রোগ।
3. **দন্তপাথরী** (Tartar)—মুখ হাঁ করে থাকলে লালা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেলে প্যারাটিন হরমোনের প্রভাবে নীচের পাটি দাঁতের গোড়ায় ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লবণ জমা হয়ে দন্তপাথরী রোগ হয়।
4. **লালাপাথরী** (Salivary calculus)—লালা ক্ষারকীয় হলে লালাগ্রন্থিতে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লবণ জমা হয়ে ছোটো ছোটো পাথর তৈরি করে যা লালা নালিপথ বন্ধ করে দেয় ফলে এই রোগ হয়।
5. **দন্তক্ষত** (Dental caries)—এই রোগে দাঁতের গোড়ায় খাবারের টুকরো জমে থাকলে তাকে ব্যাকটেরিয়া সন্ধান পদ্ধতিতে ভেঙে অ্যাসিড তৈরি করে, সেই অ্যাসিড দাঁতের এনামেলকে গলিয়ে তাতে গর্ত তৈরি করে।
6. **জিভছাতলা** (Fur বা Sordes)—জ্বর হলে লালা কম ক্ষরিত হয় এর জন্য মুখ শুকিয়ে যায় ফলে ব্যাকটেরিয়া এবং পচা খাবারের টুকরো ভিভের উপর যে প্রলেপ তৈরি করে তা এই রোগ সৃষ্টি করে।
7. **মুখ খত** (Oral sepsis)—জ্বরে লালা কম ক্ষরিত হলে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যায় ফলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে মুখের ভেতরে ক্ষত তৈরি হয় একেই মুখ খত বলে।
8. **মামপস** (Mumps)— *প্যারামিক্সো* ভাইরাসের সংক্রমণে প্যারোটিড লালাগ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ ঘটে।

### B. পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগ (Diseases related to the Stomach) :

9. **অ্যানোরেক্সিয়া** (Anorexia)—পাকস্থলীর অস্বাভাবিকতায় খাবারে অরুচি রোগ হলে তাকে অ্যানোরেক্সিয়া বলে।
10. **বমি বমি ভাব** (নসিয়া—Nausea)—পাকস্থলীর অস্বাভাবিকতায় বা অন্য কারণে বমি বমি ভাবকে নসিয়া বলে।
11. **বমি** (Vomiting)—পাকস্থলীতে অস্বস্তিকর কারণে বিপরীত ক্রমসংকোচন বিচলন (পেরিস্টালিসের—Peristalsis) জন্য পাকস্থলী বস্তুর গ্রাসনালি ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসাকে বমি বলে।
12. **বুক জ্বালা** (Heart burn)—পাকস্থলীতে বেশি HCl ক্ষরিত হবার জন্য এবং হার্দ পেশিবলয়ের প্রসারতাজনিত কারণে গ্রাসনালিতে পাকস্থলী রস উঠে আসে ফলে বুকের কাছে যে জ্বালাভাব বোধ হয় তাকে বুক জ্বালা বা হার্টবার্ন বলে।
13. **পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া** (Pernicious anaemia)—অক্সিনটিক কোশ বিনষ্ট হলে ক্যাসেলের ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর ক্ষরিত হয় না, ফলে ভিটামিন-$B_{12}$ শোষণ না হবার জন্য রক্তাল্পতা ঘটে।

### C. ক্ষুদ্রান্ত্রের রোগ (Diseases in the Small Intestine) :

14. **ডিওডিনাল আলসার** (Duodenal Ulcer)—গ্রহণীতে আম্লিক খাদ্য প্রবেশ করবার জন্য যখন গ্রহণী প্রাচীরে ক্ষত সৃষ্টি হয় তখন সেই রোগকে ডিওডিনাল আলসার বলে।
15. **প্যানক্রিয়াটাইটিস** (Pancreatitis)—বিভিন্ন কারণে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ ঘটলে সেই রোগকে প্যানক্রিয়াটাইটিস বলে। এই রোগে পেটে ব্যথা, বমি ভাব প্রভৃতি হয়।
16. **প্যানক্রিওলিথ** (Pancreolith)—অগ্ন্যাশয়ের অ্যাসাইনাস বা নালিতে পাথর হওয়াজনিত রোগকে প্যানক্রিওলিথ বলে।
17. **সিস্টিক ফাইব্রোসিস** (Cystic fibrosis)—অগ্ন্যাশয়ের তন্তুময় যোগকলা বা স্নেহকলা তৈরি হবার জন্য অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ বন্ধ হয়। এই রোগ বংশগত।
18. **স্টিয়াটোরিয়া** (Steatorrhea)—অগ্ন্যাশয় থেকে লাইপেজ উৎসেচক ক্ষরণ বন্ধ হলে অন্ত্রে স্নেহের পাচন ঘটে না, ফলে মল অতিরিক্ত স্নেহযুক্ত হয়। এই রোগকে স্টিয়াটোরিয়া বলে।
19. **ক্রিয়াটোরিয়া** (Creatorrhea)—অগ্ন্যাশয়ের প্রোটিন পাচক উৎসেচক ক্ষরণ বন্ধ হলে মলে নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই রোগকে ক্রিয়াটোরিয়া বলে।

20. **সিলোসিস** (Psilosis or spruce)—আন্ত্রিক প্রদাহজনিত রোগ যাতে খাদ্য শোষিত হয় না।
21. **সিলিয়াক রোগ** (Celiac disease)—আন্ত্রিক আবরণী কোশের ধ্বংসে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পাচন ও বিশোষণ ঘটে না। এই রোগকে সিলিয়াক রোগ বলে।
22. **কোলেলিথিয়েসিস** (Cholelithiasis of Gall bladder)—পিত্তথলিতে পিত্তলবণ বা পিত্তরঞ্জক জমাট বেঁধে যে পাথুরে আকৃতির দানা তৈরি হয় তাকে কোলেলিথিয়েসিস বা পিত্তপাথুরি বলে।
23. **কোলেসিস্টাইটিস** (Cholecystitis)—সংক্রমণ হেতু পিত্তথলির প্রদাহকে কোলেসিস্টাইটিস বলে।

● **D. বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন রোগ (Diseases of Large Intestine) ঃ**

24. **অ্যাপেনডিসাইটিস** (Appendicitis)—সংক্রমণজনিত কারণে অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহজনিত রোগকে অ্যাপেনডিসাইটিস বলে।
25. **কোলাইটিস** (Collitis)—কোনো কারণে কোলনের প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটলে সেই রোগকে কোলাইটিস বলে। আমাশয়জনিত কারণে ঘটলে তাকে অ্যামিবিক কোলাইটিস বলে। **প্রকার**—ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ঘটলে তাকে সংক্রামক কোলাইটিস বলে। ক্ষতজনিত কারণে ঘটলে তাকে আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ইডিওপ্যাথিক প্রোটোকোলাইটিস বলে। শ্লেষ্মাধিক্য কারণে ঘটলে তাকে মিউকাসকোলাইটিস বা স্প্যাসটিক কোলাইটিস বলে।
26. **মেগাকোলন** (Megacolon)—এই রোগে অরবেক প্রেক্সাস-এর অনুপস্থিতিতে কোলনে মল জমে থাকে।
27. **হেমোরয়েড বা পাইলস্** (Hamorrhoids or Piles)—এটি পায়ুনালির ভেরিকোজ শিরার স্ফীতিজনিত রোগ।
28. **এনাল ফিসার** (Anal fissure)—এটি পাইলসের জন্য পায়ুছিদ্র পথ ছিন্ন হওয়াজনিত রোগ।
29. **এনাল ফিস্চুলা** (Anal Fistula)—এই রোগে পায়ুনালির প্রাচীরে ক্ষতজনিত সৃষ্ট ছিদ্র বাইরে বেরিয়ে আসে।
30. **কোলোপ্রক্টাইটিস** (Coloproctitis)—এটি কোলন ও মলাশয় প্রাচীরের প্রদাহজনিত রোগ।
31. **কোলোপটোসিস** (Coloptosis)—এটি কোলনের নীচের দিকে নেমে আসা জনিত রোগ।
32. **কোলন স্ট্যাসিস বা আটোনিয়া কনসটিপেসন** (Colon stasis or Atonia Constipation)—কোলনের সংকোচন-প্রসারণ ব্যাহত হওয়াজনিত কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ।
33. **প্রকটাইটিস** (Proctitis)—মলাশয় এবং পায়ুনালি প্রাচীরের প্রদাহজনিত রোগ।
34. **জন্ডিস** (Jaundice or icterus)—রঞ্জককণা রক্তে পিত্ত বিলিরুবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ 0.5-1.0 মিলিগ্রাম শতাংশ থেকে বেড়ে 2 মিলিগ্রাম শতাংশ হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে জন্ডিস বলে। জন্ডিস প্রধানত তিন প্রকার—

    (i) **বাধাজনিত জন্ডিস** (Obstructive Jaundice)—সাধারণ পিত্তনালির ভেতর পিত্তপাথর জমা হবার ফলে ব্যাস সরু হওয়ার জন্য যকৃৎ পিত্ত গ্রহণীতে না পৌঁছে যকৃতে পিত্তনালি পথে রক্তে ফিরে আসে। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। একেই বাধাজনিত জন্ডিস বলে।

    (ii) **রক্তকণিকা ধ্বংসজনিত জন্ডিস** (Haemolytic Jaundice)—কোনো কারণে লোহিত কণিকা যদি বিদীর্ণ হয় (যেমন ম্যালেরিয়া রোগে হয়) তবে বিলিরুবিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাকে রক্তকণিকা ধ্বংসজনিত জন্ডিস বলে।

    (iii) **সংক্রমণজনিত জন্ডিস** (Infective Jaundice)—হেপাটাইটিস-বি জীবাণুর সংক্রমণে যকৃতের হেপাটোসাইট কোশ রক্ত থেকে বিলিরুবিন রঞ্জক কণা শোষিত করতে না পারায় রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে সংক্রমণ জন্ডিস ঘটায়।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. অপুষ্টি এবং উনপুষ্টি কাকে বলে ?**

● (ক) **অপুষ্টি**—মানুষের দেহে যদি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি, প্রোটিন, ভিটামিন বা খনিজ পদার্থের অভাব ঘটে, তাহলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **অপুষ্টি** (Malnutrition) বলে।

(খ) **উনপুষ্টি**—যে আহার্য বস্তুতে সব রকম পরিপোষক থাকে কিন্তু পুষ্টি মাত্রানুযায়ী থাকে না ফলে সঠিক পুষ্টি হয় না তাকে **উনপুষ্টি** (Under nutrition) বলে।

**2. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাটকে এক কথায় কী বলে ?**

● দেহ-পরিপোষক খাদ্য / জটিল জৈব যৌগ।

**3. ভিটামিন কি এক প্রকার খাদ্য ? উত্তরের স্বপক্ষে কারণগুলি উল্লেখ করো।**

● ভিটামিন খাদ্য নয়, কারণ—ভিটামিন পাচিত হয় না এবং এর থেকে সরাসরি শক্তি উৎপন্ন হয় না।

**4. নবজাতক কতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খেতে পারে ?**

● 4–6 মাস পর্যন্ত।

**5. মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। দুটি কারণ বলো।**

● (i) শিশু মায়ের স্তন থেকে সরাসরি গ্রহণ করে বলে এটি জীবাণুমুক্ত থাকে। (ii) মায়ের দুধ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। (iii) মায়ের দুধ শিশুর দেহে সহজে অনাক্রম্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

**6. পেশিতে ও যকৃতে শক্তি কী অবস্থায় সঞ্চিত থাকে ?**

● গ্লাইকোজেন হিসাবে।

**7. মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাকের উৎসেচকগুলির নাম করো।**

● (ক) কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক—লালার টায়ালিন, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলেজ। (খ) প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক—পাচক রসের পেপসিন, অগ্ন্যাশয় রসের টাইরোসিন এবং আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন। (গ) স্নেহপদার্থ পরিপাককারী উৎসেচক—লাইপেজ (লালারস, পাচক রস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস)।

**8. কোন্ পরিপাক রসে উৎসেচক থাকে না ?**

● পিত্ত নামে পাচক রসে উৎসেচক থাকে না।

**9. (ক) লালা কী ? (খ) এর উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করো। (গ) প্রতিদিন কী পরিমাণ লালা নিঃসৃত হয় ? (ঘ) লালারসের ক্ষরণে সর্বাধিক সাহায্যকারী লালাগ্রন্থি কোন্‌টি ?**

● (ক) লালা বা লালারস এক রকমের ঘোলাটে চটচটে সামান্য অম্লধর্মী বা প্রশমিত বা সামান্য ক্ষারীয় পরিপাককারী রস।

(খ) মুখগহ্বরে অবস্থিত **তিনজোড়া লালাগ্রন্থি** লালা (Saliva) নিঃসৃত করে।

(গ) প্রতিদিন 1,200 – 1,500 ml।

(ঘ) সাবম্যান্ডিবুলার।

**10. লালারসের তিনটি প্রয়োজনীয় উৎসেচকের নাম করো।**

● টায়ালিন, লাইসোজাইম (খুব সামান্য) ও মলটেজ।

**11. (ক) লালারসের ব্যাকটেরিয়াঘাতী কোনো কাজ আছে কি ? (খ) যদি থাকে কীভাবে তা সংঘটিত হয় উল্লেখ করো।**

● (ক) আছে। (খ) লালারসের লাইসোজাইম নামে ব্যাকটেরিয়াঘাতী উৎসেচক আছে যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

**12. (ক) পেপসিনোজেন এবং পেপসিন কী ? (খ) পেপসিনোজেন কীভাবে পেপসিনে রূপান্তরিত হয় তা লেখো।**

● (ক) **পেপসিনোজেন এবং পেপসিন**—(i) **পেপসিনোজেন**—এটি একটি নিষ্ক্রিয় প্রো-এনজাইম যা বিশ্রামরত অবস্থায় পেপটিক কোশে **জাইমোজেন দানা** হিসেবে জমা থাকে। (ii) **পেপসিন**—সক্রিয় প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক। (খ) পেপটিক কোশের ক্ষরণ কালে HCl-এর হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত করে। pH 4·6 কিংবা এর কম pH-এ পেপসিন নিজে পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে।

**13. (ক) ক্যাসেল-বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান কী ? (খ) এর অভাবে দেহে কী কী পরিবর্তন ঘটে ?**

● (ক) **ক্যাসেল-বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান**—পাকস্থলীর প্রাচীরকোশের শ্লেষ্মাঝিল্লির প্রধান কোশ থেকে যে মিউকোপ্রোটিন

জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে **ক্যাসেল-বর্ণিত অভ্যন্তরীণ উপাদান বা ক্যাসেলের ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর** (Castle's intrinsic factor) বলে। এটি ভিটামিন $B_{12}$ (সায়ানোকোবালামাইন)-এর শোষণে সাহায্য করে।

(খ) রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়।

**14. (i) Crypts of Liberkuhn কী ? (ii) এর কাজ কী ?**

● (i) তন্ত্রের (ক্ষুদ্রান্ত্রের) শ্লেষ্মা স্তরের গ্রন্থি। (ii) আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ ঘটায়।

**15. পাকস্থলী নিঃসৃত প্রোটিন জারক উৎসেচকের নাম করো। অ্যাসিড কাইম কী ?**

● প্রোটিন পরিপাককারী পাচক রসের উৎসেচকের নাম হল—পেপসিন, গ্যাস্ট্রিসিন, ক্যাথেপ্সিন, জিলটিনেজ প্রভৃতি। **অ্যাসিড কাইম**—পাকস্থলীয় রসের বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক এবং HCl নানা ধরনের খাদ্যবস্তুকে আংশিকভাবে পাচিত করে। এইভাবে আংশিক পাচিত এবং অপাচিত খাদ্যবস্তু, উৎসেচক ও HCl পাকস্থলীয় রসের সঙ্গে মিশে একটি অর্ধতরল অম্লজাতীয় মণ্ডের মতো পদার্থ তৈরি করে। এই মণ্ডের মতো পদার্থকে **আম্লিক পাকমণ্ড বা অ্যাসিড কাইম** (Acid chyme) বলে।

**16. চার পাঁচমাস বয়সের আগে শিশুদের শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো হয় না কেন ?**

● চার পাঁচ মাস বয়সের আগে শিশুদের অগ্ন্যাশয় রসে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ নামে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক থাকে না। অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ অন্যান্য রসে উপস্থিত অ্যামাইলেজের চেয়ে বেশি কার্যক্ষম। এই কারণে শিশুদের শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যবস্তু খাওয়ানো হয় না।

**17. (ক) এন্টেরোকাইনেজ বা এন্টেরোপেপটাইডেজ কী ? (খ) এর কাজ বর্ণনা করো।**

● (ক) **এন্টেরোকাইনেজ বা এন্টেরোপেপটাইডেজ**—এন্টেরোকাইনেজ আন্ত্রিক রসের একধরনের উৎসেচক যা প্রধানত সক্রিয়ক হিসেবে কাজ করে।

(খ) **এন্টেরোকাইনেজের কাজ**—ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আসা অগ্ন্যাশয় রসের নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে এন্টেরোকাইনেজ সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত করে।

**18. অ্যামাইলোপসিন এবং স্টিয়াপসিন কী ?**

● (a) **অ্যামাইলোপসিন**—অগ্ন্যাশয় রসের অ্যামাইলেজের (কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক) অন্য নাম **অ্যামাইলোপসিন** (Amylopsin)।

(b) **স্টিয়াপসিন**—অগ্ন্যাশয় রসের লাইপেজ উৎসেচকের অন্য নাম **স্টিয়াপসিন** (Steapsin)।

**19. ট্রিপসিন ও ট্রিপসিনোজেন কি আলাদা, না একই জিনিস ? অথবা, ট্রিপসিন ও ট্রিপসিনোজেনের পার্থক্য কী ?**

● **ট্রিপসিন ও ট্রিপসিনোজেন**—ট্রিপসিন সক্রিয় এবং ট্রিপসিনোজেন নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাটিক উৎসেচক যা অগ্ন্যাশয় রসে থাকে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিকোশ থেকে নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন (প্রো-এনজাইম) ক্ষরিত হয়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় নালি দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রহণীতে ঢুকলে আন্ত্রিক রসের এন্টেরোপেপটাইডেজ নামে উৎসেচক (সক্রিয়ক) নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত করে। অর্থাৎ, ট্রিপসিনোজেন ট্রিপসিনের অগ্রদূত।

**20. রাসায়নিক পাচন কী ?**

● **রাসায়নিক পাচন**—প্রাণীদেহের পৌষ্টিকনালিতে জল ও বিভিন্ন ধরনের পাচক রসের অজৈব এবং জৈব রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তুর যে আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে তাকে **রাসায়নিক পাচন** (Chemical digestion) বলে।

**21. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিনের অবর্তমানে প্রোটিন (আমিষ জাতীয় খাদ্য) কীভাবে হজম করা যায় ?**

● **প্রোটিনের হজম ক্রিয়া**—পৌষ্টিকনালির পাকস্থলীয় রসের HCl, পেপসিন, রেনিন, জিলাটিনেজ, ক্যাথেপ্সিন নামে বহু প্রোটিন পরিপাক উৎসেচক থাকে। এর মধ্যে HCl এবং পেপসিন হল প্রধান উপাদান যা প্রোটিনের পরিপাকে বিশেষভাবে অংশ নেয়। এই দুটির অভাবে পাকস্থলীতে প্রোটিনের পরিপাক হতে পারে না। তবে অগ্ন্যাশয় রসে ও আন্ত্রিক রসে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক থাকে। এগুলি হল—(i) অগ্ন্যাশয়ী রসের—**ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামাইনোপেপটাইডেড, ইলাস্টজ, কোলাজিনেজ** প্রভৃতি। ট্রিপসিন একটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক। এটি প্রকৃতিজাত প্রোটিন এবং লব্ধ প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে তাদের অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অগ্ন্যাশয় রসের অন্যান্য প্রোটিওলাইটিক উৎসেচকগুলিও বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনকে (ইলাস্টিক, কোলাজেন প্রভৃতি) পরিপাক করে। (ii) আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন ও নিউক্লিয়েজ প্রভৃতি উৎসেচক লব্ধ প্রোটিন ও নিউক্লিওপ্রোটিনকে পরিপাক করে। অতএব HCl ও পেপসিন অবর্তমানে প্রোটিন (আমিষ জাতীয় খাদ্য) হজম করা যায়।

**22. লিথোজেনিক পিত্ত কী ?**

● যে পিত্ত রসে বেশি পরিমাণ পিত্তলবণ বা কোলেস্টরল থাকে এবং গল স্টোন (Gall stone) তৈরি করতে সাহায্য করে তাকে লিথোজেনিক পিত্ত (Lithogenic Bile) বলে।

**23. (ক) চর্বিজাতীয় খাদ্যের (fatty meal) প্রতি পিত্তস্থলীর সংবেদন কী প্রকার ? (খ) এই সংবেদন সৃষ্টির মূলে যে হরমোন কাজ করে তার নাম দাও।**

● (ক) চর্বিজাতীয় খাদ্য পিত্তথলির সংকোচন ঘটিয়ে এতে সঞ্চিত পিত্তকে নির্গত করে।
(খ) হরমোনের নাম—সিক্রেটিন অথবা কোলেসিস্টোকাইনিন।

**24. পিত্ত কীভাবে ফ্যাটের (স্নেহ পদার্থের) পরিপাকে সাহায্য করে ?**

● পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ সোডিয়াম টোরোকোলেট এবং সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট স্নেহ পদার্থের পরিপাকে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে—(i) ওই দুটি পিত্তলবণ সেই কণাকে ভেঙে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় (অর্থাৎ বা ইমালসিফিকেশন অবস্থায়) পরিণত করে। এই কারণে স্নেহ কণার মোট উপরিতলের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে অধিক পরিমাণ লাইপেজ কাজ করতে পারে। (ii) পিত্ত লবণ লাইপেজ উৎসেচককে সক্রিয় করে।

**25. (ক) পিত্ত লবণ কী ? (খ) কোথায় উৎপন্ন হয় ? (গ) পিত্ত লবণের কাজ বর্ণনা করো।**

● (ক) পিত্ত লবণ—(i) সোডিয়ামে টোরোকোলেট এবং (ii) সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট।
(খ) যকৃতে উৎপন্ন হয়।
(গ) কাজ—(i) স্নেহ পদার্থের পরিপাক, (ii) স্নেহ পদার্থ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিন ADEK-এর শোষণে সাহায্য করে। (iii) পিত্ত কোলেরেটিক ক্রিয়া করে। (iv) কার্যাবলি পৃষ্ঠা নং 3·76-এর পিত্তের কাজ দেখো।

**26. পাচিত হলে সৃষ্ট বস্তু কী হবে ?—(i) ইক্ষু শর্করা, (ii) মলটোজ, (iii) গ্লাইকোজেন ও (iv) স্টার্চ।**

● (i) গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ, (ii) গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ, (iii) গ্লুকোজ এবং (iv) গ্লুকোজ।

**27. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাটের আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কী উৎপন্ন করে ?**

● **উৎপন্ন দ্রব্য**—(i) কার্বোহাইড্রেট—গ্লুকোজ, (ii) প্রোটিন—অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং (iii) ফ্যাট—ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল।

**28. প্রাতঃরাশে তুমি নিম্নোক্ত খাদ্যগুলি গ্রহণ করেছ—(i) মাখন সহযোগে সেঁকা পাউরুটি, (ii) একটি সেদ্ধ ডিম, (iii) একটি মাছ ভাজা, (iv) কয়েকটি আঙুর তোমার পরিপাকতন্ত্রে এই খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে অন্ত্রে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের শোষণের পূর্ব পর্যন্ত পরিণাম বর্ণনা করো।**

● (i) **মাখন**—পাকস্থলীয় **লাইপেজ** সামান্য অম্ল পরিবেশে কিছুটা মাখনকে **ফ্যাটি অ্যাসিডে** এবং **গ্লিসেরলে** পরিণত করে। পিত্তরসের **পিত্ত-লবণ** বাকি ফ্যাটকে ছোটো ছোটো কণিকায় ভেঙে অবদ্রবে পরিণত করে। এই স্নেহ কণিকাগুলি **অগ্ন্যাশয় লাইপেজ** এবং **আন্ত্রিক লাইপেজ** দিয়ে বিশ্লেষিত হয়ে **ফ্যাটি অ্যাসিড** এবং **গ্লিসেরলে** পরিণত হয়।

(ii) **সেঁকা পাউরুটি**—এটির প্রধান উপাদান হল সেদ্ধ শ্বেতসার। লালারসের **টায়ালিন** কিছুটা শ্বেতসারকে **মলটোজে** পরিণত করে। **অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ** একে সম্পূর্ণরূপে পাচিত করে **মলটোজে** পরিণত করে। আন্ত্রিক রসের **মলটোজ** মলটোজকে **গ্লুকোজে** পরিণত করে।

(iii) **সেদ্ধ ডিম**—এর প্রধান উপাদান হল প্রোটিন (অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফসফো-প্রোটিন), ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল। অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ও ফসফোপ্রোটিন পাকস্থলীয় রসের পেপসিন, অগ্ন্যাশয় রসের ট্রিপসিন

এবং আন্ত্রিক রসের **ইরেপসিন** নামে প্রোটিওলাইটিক উৎসেচকসমূহের সাহায্যে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** রূপান্তরিত হয়। পাকস্থলীয়, অগ্ন্যাশয় এবং আন্ত্রিক রসের **লাইপেজ** উৎসেচকের সাহায্যে ফ্যাট পাচিত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে রূপান্তরিত হয়। কোলেস্টেরল অগ্ন্যাশয় রসের **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** দিয়ে পাচিত হয়।

(iv) **মাছ ভাজা**—এর প্রধান খাদ্য উপাদান হল প্রোটিন ও সামান্য চর্বি (ফ্যাট)। ফ্যাটের ও প্রোটিনের পরিপাক মাখনের ফ্যাটের এবং ডিমের প্রোটিনের পরিপাকের সঙ্গে একযোগে সংঘটিত হয়।

(v) **আঙুর**—এর প্রধান উপাদান হল গ্লুকোজ এবং কিছুটা সেলুলোজ। গ্লুকোজ হল মনোস্যাকারাইড, এর পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। সেলুলোজ মানুষের পৌষ্টিকনালিতে পাচিত হয় না।

**29. (ক) অ্যামাইনোপেপ্‌টাইডেজ কী ? (খ) ডাইপেপটাইডেজ এবং আরজিনেজ-এর কার্য বর্ণনা করো।**

● (ক) **অ্যামাইনোপেপ্‌টাইডেজ**—এক ধরনের এক্সোপেপ্‌টাইডেজ জাতীয় প্রোটিওলাইটিক অর্থাৎ প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক। এই উৎসেচক প্রোটিন অণু থেকে মুক্ত অ্যামাইনো গ্রুপযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডটিকে আলাদা করে।

(খ) **ডাইপেপ্‌টাইডেজ**—এটি এক ধরনের এক্সোপেপ্‌টাইডেজ যা তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে অবস্থিত দুটি পেপটাইড বন্ধনীকে বিশ্লেষিত করে তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

(গ) **আরজিনেজ**—এটি ইউরিয়া উৎপাদনের ক্রেব্‌স হেন্সলেট চক্রের অংশগ্রহণকারী একটি উৎসেচক। এই উৎসেচক আরজিনিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপর ক্রিয়া করে ইউরিয়া উৎপন্ন করে।

**30. জীবতন্ত্রে কী করে জারণ সম্পাদিত হয় ?**

● **জীবতন্ত্রে জারণ ক্রিয়া**—ডিহাইড্রোজিনেশন অর্থাৎ কোনো মৌল বা যৌগ থেকে হাইড্রোজেনের অপসারণের ফলে জীবতন্ত্রে জারণ সম্পাদিত হয়।

**31. (ক) গ্লুকোজ কী ? (খ) শোষণের (বিশোষণের) পর গ্লুকোজ কীভাবে যকৃতে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় ?**

● (ক) **গ্লুকোজ**—একটি ছয় পরমাণু কার্বনযুক্ত শর্করা। এই শর্করাতে মুক্ত অ্যালডিহাইড (– CHO) নামে বিজারণধর্মী মূলক থাকে। এই কারণে গ্লুকোজকে **হেক্সোজঅ্যালডোজ শর্করা** বলে। গ্লুকোজ বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, গম, চাল, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। প্রাণীদের (মানুষের) রক্তে গ্লুকোজ থাকে।

(খ) **গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণ**—(i) গ্লুকোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে গিয়ে প্রথমে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে জমা থাকে। (ii) এ ছাড়া পেশি রক্ত থেকে গ্লুকোজ নিয়ে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে।

**32. টি সি. এ. চক্রে অবস্থিত ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডগুলির নাম করো।**

● **ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের নাম**—(i) সাইট্রিক অ্যাসিড, (ii) সিস্‌-অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড, (iii) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড এবং (iv) অক্সালো-সাকসিনিক অ্যাসিড।

**33. মানুষের পরিণত লোহিত কণিকা ক্রেবসের সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র পরিচালিত করতে পারে না কেন ?**

● ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াস্থল হল মাইটোকন্ড্রিয়া। মানুষের পরিণত লোহিত কণিকায় মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না বলে, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র পরিচালিত করতে পারে না।

**34. (ক) রক্ত শর্করা বলতে কী বোঝায় ? (খ) একজন লোকের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কত ? (গ) স্বাভাবিক অবস্থায় মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না কেন ?**

● (ক) **রক্ত-শর্করা**—রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজকে **রক্ত-শর্করা** (Blood Sugar) বলে।

(খ) **রক্ত-শর্করার স্বাভাবিক মান**—স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml রক্তে শর্করার (গ্লুকোজের) পরিমাণ **80–120mg** হয়।

(গ) **স্বাভাবিক মূত্রে গ্লুকোজের অনুপস্থিতির কারণ**—স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের প্লাজমায় গ্লুকোজের পরিমাণ 80–120 mg থাকে। এই রক্ত যখন নেফ্রনের গ্লোমেরুলাসের মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয় তখন রক্তের প্লাজমাস্থিত গ্লুকোজ পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় বাওম্যান ক্যাপসুলে যায়। পরিস্রুত এই গ্লুকোজ এর পর বৃক্কনালির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় নালিকা কোশের পুনঃশোষণের মাধ্যমে সমস্ত গ্লুকোজ আবার রক্তে ফিরে আসে। এই কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না।

**35. হাইপারগ্লাইসিমিয়া এবং হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলতে কী বোঝো ?**

● (i) **হাইপারগ্লাইসিমিয়া**— কোনো কারণে রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি 12 ঘণ্টা উপবাস থাকার পরও প্রতি 100 ml রক্তে 120 mg থেকে বেশি হয় তখন তাকে **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** (Hyperglycemia) বলে।

(ii) **হাইপোগ্লাইসিমিয়া**—রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে অর্থাৎ 12 ঘণ্টা উপবাসের পরে প্রতি 100 ml রক্তে 50–70 mg হলে তাকে **হাইপোগ্লাইসিমিয়া** (Hypoglycemia) বলা হয়।

**36. মিসেল কী ?**

● পিত্তের পিত্ত লবণের প্রধানত দুটি অংশ আছে, যেমন—জলে দ্রবণীয় কার্বোক্সিল অংশ এবং স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় স্টেবল অংশ। স্নেহ পদার্থের দানাগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করলে পিত্ত লবণের অণুগুলি স্নেহ পদার্থে দানাগুলির উপর জমা হয়। পিত্ত লবণের কার্বোক্সিল অংশ উপরে এবং স্টেরল অংশ স্নেহপদার্থে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পিত্তলবণ ও স্নেহ কণা সহযোগে গঠিত, 3-10 mm ব্যাস বিশিষ্ট এই কণাগুলিকে **মিসেল** বলে।

**37. (ক) যেসব হরমোন রক্তের শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নাম করো।**
**(খ) যে হরমোনটি রক্ত শর্করা কমায় তার নাম করো। ওই হরমোন কোথা থেকে ক্ষরিত হয় ?**

● (ক) দেহের বিভিন্ন হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—ইনসুলিন, থাইরক্সিন, অ্যাড্রিনালিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড, গ্লুকাগণ প্রভৃতি।

(খ) (i) **রক্ত শর্করা হ্রাসকারী হরমোনের নাম—ইনসুলিন** (Insulin)।

(ii) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের β-কোশ থেকে ইনসুলিন ক্ষরিত হয়।

**38. বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব ও মধুমেহ রোগীর প্রস্রাবের পার্থক্য কীভাবে করা যায় ?**

● **বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব ও মধুমেহ রোগীর প্রস্রাবের পার্থক্য ঃ**

| বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব | মধুমেহ রোগীর প্রস্রাব |
|---|---|
| 1. এই রোগীর প্রস্রাবে গ্লুকোজ থাকে না। | 1. এই রোগীর প্রস্রাবে গ্লুকোজ থাকে। |
| 2. মূত্রের পরিমাণ বেশি হয়। | 2. মূত্রের পরিমাণ বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের তুলনায় কম হয়। |
| 3. এই মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হয়। | 3. এই মূত্রে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি হয়। |
| 4. অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোনের (ADH) অভাবে এই রোগ হয়। | 4. ইনসুলিন হরমোনের অভাবে এই রোগ হয়। |

**39. একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম করো যা প্রায়ই প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু করে।**

● মিথিওনিন।

**40. প্রোটিনের অভাবজনিত নিম্নলিখিত দুটি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করো। (ক) কোয়াশিওরকর কী ? (খ) ম্যারাস্‌মাস কী ?**

● খাদ্যে প্রোটিন এবং প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব দেখা দিলে যথাক্রমে কোয়াশিওরকর এবং ম্যারাস্‌মাস নামে **অপুষ্টিজনিত রোগ** হয়।

(ক) **কোয়াশিওরকর**—খাদ্যে কেবল প্রোটিনের প্রধানত **প্রাণীজ প্রোটিনের অভাব ঘটলে এবং সেই সঙ্গে ক্যালোরির অভাব না থাকলে শিশুদের** শোথপ্রধান যে অপুষ্টি রোগ দেখা দেয় তাকে **কোয়াশিওরকর** (Kowashiorkor) বলা হয়। **রোগের উপসর্গ**—শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজনের হয়, চামড়া এবং চুল বিবর্ণ হয়ে ওঠে, পা বা অন্যান্য স্থানের কলায় জল জমে রসস্ফীতি (Oedema) ঘটে, রক্তাল্পতা, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে।

(খ) **ম্যারাস্‌মাস—খাদ্যে প্রোটিন এবং দেহে ক্যালোরির অভাব ঘটলে কলাকোশে** ক্রমশ যে ক্ষয়জনিত অপুষ্টি দেখা দেয় তাকে **ম্যারাস্‌মাস** (Marasmus) বলে। **রোগের উপসর্গ**—পেশি ও দেহ অতিশীর্ণ হয়, অস্থি চর্মসার হয়ে ওঠে, রক্তাল্পতা দেখা যায় ইত্যাদি।

## ০ অনুশীলনী ০

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions)ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word)ঃ

1. যেসব পরিপোষক থেকে দেহ শক্তি তৈরি করে তাকে কী বলে ?
2. যে খাদ্য দেহ গঠনে সাহায্য করে তার নাম কী ?
3. রক্তে অবস্থিত প্রধান একক শর্করা কোন্‌টি ?
4. পেশিতে এবং যকৃতে সঞ্চিত মোট গ্লাইকোজেনের পরিমাণ কত ?
5. দেহের বিদীর্ণ কলাকোশের মেরামতিতে খাদ্যের কোন্ উপাদানটি সাহায্য করে ?
6. একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের দৈনিক চাহিদা কত ?
7. এক সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গড় মৌল বিপাকীয় হার কত ?
8. নির্দিষ্ট সময় শ্বসনে উদ্‌গত $CO_2$ ও গৃহীত $O_2$-এর অনুপাতকে কী বলে ?
9. স্বল্প পরিমাণে যে বিশেষ পরিপূরক খাদ্যোপাদান আহার্য বস্তুতে থেকে জীবের জৈবনিক ক্রিয়াকলাপকে ভালোভাবে পরিচালনা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে তাকে কী বলে ?
10. যেসব ভিটামিন ফ্যাটে দ্রবণীয় সেগুলি কী কী ?
11. ভিটামিন A-এর অভাবে চোখের প্রধান দুটি রোগ কী কী ?
12. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড কী ?
13. সাইনোকোবালামিন কী ধরনের ভিটামিন ?
14. ভিটামিন C-এর অভাবে কী ধরনের রোগ হয় ?
15. খাদ্যে নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং বর্জনের পরিমাণ সমান হলে সেই অবস্থাকে কী বলে ?
16. যেসব মনোস্যাকারাইডে মুক্ত —CHO এবং C = O গ্রুপ থাকে তাদের কী বলে ?
17. যেসব পলিস্যাকারাইডে দুই বা তার অধিক ভিন্ন ভিন্ন একক শর্করা থাকে তাকে কী বলে ?
18. সদ্য প্রস্তুত শর্করা দ্রবণ মধ্যে আলোক অতিক্রম করার সময় আলোক ঘূর্ণনের যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে কী বলে ?
19. প্রোটিনের গঠনগত এককের নাম কী ?
20. যে অ্যামাইনো অ্যাসিডে সালফার থাকে তার একটি উদাহরণ দাও।
21. যে বন্ধনী দিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠন করে তার নাম কী ?
22. যেসব ফ্যাটি অ্যাসিডের শৃঙ্খলে দ্বিযোজী বন্ধনীর উপস্থিতি দেখা যায় তাদের কী বলে ?
23. ফ্যাটকে KOH দ্রবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটালে কী প্রস্তুত হবে ?
24. লালারসে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচকটির নাম কী ?
25. পেপসিন এবং ট্রিপসিন নামে দুটি প্রোটিওলাইটিক উৎসেচকের মধ্যে কোন্‌টি বেশি শক্তিশালী ?
26. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসে যে লাইপোলাইটিক উৎসেচকের উপস্থিতি দেখা যায় তার অন্য নাম কী ?
27. শোষণের গঠনগত একককে কী বলে ?
28. পাকস্থলী ও গ্রাসনালির সংযোগস্থলের আলসারকে কী বলে ?
29. অনশন ও উপবাস আরম্ভকালে কোন্ বস্তু থেকে দেহ শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য শক্তি লাভ করে ?
30. কোলন ক্যানসার প্রতিকারের জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় ?

#### B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer)ঃ

1. একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক পুরুষের গড় BMR—10 K Cal ☐ / 20 K cal ☐ / 30 K cal ☐ / 40 Kcal ☐.
2. কোন্‌টির শ্বসন অনুপাত (R. Q.) সবথেকে বেশি—গ্লুকোজ ☐ / ম্যালিক অ্যাসিড ☐ / ফ্যাটি অ্যাসিড ☐ / অ্যামাইনো অ্যাসিড ☐।
3. প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ্ ফুড বলতে কী বোঝায় ?—যে খাদ্য দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ☐ / যে খাদ্য দেহে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে ☐ / যে খাদ্য দেহের সুরক্ষায় অংশ নেয় ☐ / যে খাদ্য খেলে দেহে রক্তের পরিমাণ বাড়ে ☐।
4. কোন্ ভিটামিনের বিভাগগুলি জলে দ্রবণীয়—ভিটামিন ADEK ☐ / ভিটামিন B কমপ্লেক্স ☐ / সব ভিটামিন ☐ / কোনোটিই নয় ☐।
5. মানুষের দেহে যে ভিটামিনে সংশ্লেষ সম্ভব তা হল—ভিটামিন A ☐ / ভিটামিন D ☐ / ভিটামিন C ☐ / ভিটামিন K ☐।
6. বেশিরভাগ ভিটামিন কাজ করে—সক্রিয় শোষণের সহায়ক হিসাবে ☐ / অস্থি গঠনে ☐ / কোশপর্দা মধ্য দিয়ে অণুর পরিবহণে ☐ / কো-এনজাইম হিসেবে ☐।
7. নিম্নলিখিত খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টি দেহকে শক্তি যোগান দেয়—কার্বোহাইড্রেট ☐ / ভিটামিন ☐ / জল ☐ / খনিজ লবণ ☐।

8. একগ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জারণে কত ক্যালোরি তাপ সৃষ্টি হয় ?—4·0 K cal □ / 9·3 K cal □ / 4·6 K cal □ / 5·1 K cal □.
9. এক গ্রাম ফ্যাট কোশে জারিত হলে কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে ?—4·1 K cal □ / 9·3 K cal □ / 4·6 K cal □ / 5·1 Kcal □.
10. একগ্রাম প্রোটিনে ক্যালোরি উৎপাদনের মান হল—9·3 K cal □ / 1·4 K cal □ / 4·1 K cal □ / 100 K cal □.
11. একক শর্করাকে বলে—মনোস্যাকারাইড □ / অলিগোস্যাকারাইড □ / ডাই স্যাকারাইড □ / পলিস্যাকারাইড □।
12. সমরূপ বহুশর্করা—গ্লুকোজ □ / ফ্রুকটোজ □ / গ্যালাকটোজ □ / শ্বেতসার □।
13. কোন্ ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয় ?—ভিটামিন-A □ / ভিটামিন-B □ / ভিটামিন-C □ / ভিটামিন-B কমপ্লেক্স □।
14. কোন্ ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয় ?—ভিটামিন-A □ / ভিটামিন-B □ / ভিটামিন-C □ / ভিটামিন-D □।
15. শ্বসন বস্তু যদি প্রোটিন হয় তাহলে তার R.Q.-এর মান হবে—1·0 / 2·0 / 0·7 / 0·8 ।
16. টায়ালিন কী ?—একপ্রকার পাচক রস □ / প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক □ / শ্বেতসার পাচককারী উৎসেচক □ / ফ্যাট পরিপাককারী উৎসেচক □।
17. সরল লিপিডের উদাহরণ হল—স্টেরল □ / ট্রাইগ্লিসেরাইড □ / ফসফোলিপিড □ / কোলেস্টেরল □।
18. একটি সরল প্রোটিনের উদাহরণ হল—স্ক্লেরোপ্রোটিন □ / লাইপোপ্রোটিন □ / ক্রোমোপ্রোটিন □ / লম্ব প্রোটিন □।
19. অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা—8 □ / 10 □ / 12 □ / 20 □।
20. একটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের উদাহরণ হল—বিউটিরিক অ্যাসিড □ / পামিটিক অ্যাসিড □ / স্টিয়ারিক অ্যাসিড □ / অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড □।
21. গ্লাইকোজেনোলাইসিস হল একটি প্রক্রিয়া যাতে—গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ হয় □ / গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয় □ / গ্লুকোজ ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় □ / বিভিন্ন অকার্বোহাইড্রেট উৎস থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় □।
22. গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া ঘটে—পেশিতে □ / যকৃতে □ / পেশি ও যকৃতে □ / কোনোটাতেই নয় □।
23. ফ্যাটি অ্যাসিডের কোন্ কার্বনে বিটা (β) জারণ ঘটে ?—ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রথম কার্বনে □ / শেষের কার্বোক্সিল মূলকের কার্বনে □ / কার্বোক্সিল মূলক থেকে প্রথম কার্বনে □ / কার্বোক্সিল মূলক থেকে দ্বিতীয় কার্বনে □।
24. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া গ্লুকোজ জারিত হয়ে উৎপন্ন করে—অ্যাসিটাইল কো-এ □ / পাইরুভিক অ্যাসিড □ / ল্যাকটিক অ্যাসিড □ / কোনোটিই নয় □।
25. বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনকে বিশ্লেষিত করলে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তার সংখ্যা—20টি □ / 120টি □ / 220টি □/ 320টি □।
26. নিকোটিনিক অ্যাসিড হল একটি—তামাক পাতা থেকে পাওয়া এক প্রকার বস্তু □ / এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড □ / এক ধরনের হরমোন □ / এক প্রকার ভিটামিন □।
27. টায়ালিন থাকে—লালা রসে □ / পাচক রসে □ / অগ্ন্যাশয় রসে □ / আন্ত্রিক রসে □।
28. ট্রিপসিন নামে প্রোটিনপরিপাককারী উৎসেচক থাকে—লালারসে □ / পাচক রসে □ / অগ্ন্যাশয় রসে □ / আন্ত্রিক রসে □।
29. যে প্রক্রিয়া পেশিতে গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয় তাকে বলে—গ্লাইকোলাইসিস □ / গ্লাইকোজেনোলাইসিস □ / গ্লাইকোজেনেসিস □ / নিওগ্লুকোজেনেসিস □।
30. মানুষের দেহে সবথেকে বড়ো গ্রন্থি হল—যকৃৎ □ / অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি □ / আন্ত্রিক গ্রন্থি □ / পিটুইটারি গ্রন্থি □।
31. অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সৃষ্টি হয়—জনডিস □ / যকৃতের সিরোসিস □ / স্কার্ভি □ / মেদ বৃদ্ধি □।
32. পাচিত খাদ্য পৌষ্টিকনালির প্রধানত কোন্ অংশ দিয়ে শোষিত হয় ?—মুখগহ্বর □ / পাকস্থলী □ / ক্ষুদ্রান্ত্র □ / বৃহদন্ত্র □।
33. পেপটিক আলসারের প্রধান স্থান হল—গ্রাসনালি □ / পাকস্থলি □ / ক্ষুদ্রান্ত্র □ / বৃহদন্ত্র □।
34. কিটোনিউরিয়া অবস্থায় নিম্নলিখিত কিটো বডির মধ্যে কোন্‌টি মূত্রে থাকে ?—অ্যাসিটোন □ / β-হাইড্রোক্সি বিউটিরিক অ্যাসিড □ / অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড □ / সব কটিই থাকে □।
35. কোন্ উপাদান বেশি খেলে মানুষের দেহ মেদবহুল হয় ?—কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন □ / ফ্যাট ও প্রোটিন □ / কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট □ / শুধু ফ্যাট □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. যে খাদ্য খেলে দেহে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তাকে ——— খাদ্য বলে।
2. ——— খাদ্য খেলে দেহ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়।
3. ভিটামিন ———এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
4. ভিটামিন ———এর অভাবে স্কার্ভি হয়।
5. সূর্যালোকের উপস্থিতিতে দেহে B-কমপ্লেক্সের ——— উপস্থিত প্রোভিটামিন থেকে ভিটামিন-D তৈরি হয়।
6. ভিটামিন ——— অভাবে বেরিবেরি রোগ হয় ?
7. টকজাতীয় ফলে ভিটামিন ——— থাকে।
8. ——— একধরনের পলিস্যাকারাইড যা অনেকগুলি গ্লুকোজ নিয়ে গঠিত এবং মানুষের যকৃতে পাওয়া যায়।
9. ——— হল প্রাণীজ শ্বেতসার কারণ এটি প্রাণীর যকৃৎ ও পেশিতে পাওয়া যায়।
10. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এক প্রকার ———।

11. মানুষের পরিপাককারী প্রতিটি রসে অবস্থিত ——— প্রোটিন জাতীয়।
12. ——— পাকস্থলীতে অবস্থিত একপ্রকার প্রধান প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক।
13. লালারসে অবস্থিত শ্বেতসার পরিপাককারী উৎসেচকের নাম হল ———।
14. স্নেহজাতীয় খাদ্য ——— উৎসেচকের সাহায্যে পাচিত হয়।
15. ——— নামে উৎসেচক ফ্যাটের উপর বিক্রিয়া করে ——— ও ———তে পরিণত করে।
16. ——— প্রোটিনকে ভেঙে পেপটোনে পরিণত করে।
17. পৌষ্টিকনালির ক্ষুদ্রান্ত্রে ——— নামে যে আঙুলের মতো অংশ থাকে তাকে শোষণের একক বলে।
18. শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকের পর শোষিত হয় ——— হিসেবে।
19. গ্লাইকোজেনের বিশ্লেষণকে ——— বলে।
20. মূত্রে অ্যাসিটোন পাওয়া গেলে সেই মূত্রকে ——— বলে।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে— পেশি দেখা যায় (ঐচ্ছিক / অনৈচ্ছিক / হৃদ / উভয় ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক)।
2. গোবলেট কোশ একটি— (নার্ভ কোশ / স্কোয়ামাস আবরণী কলা কোশ / যোগ কলা / কলাম্‌নার আবরণী কলা কোশ / পেশি কোশ)।
3. একক শর্করাকে— বলে। (মনোস্যাকারাইড / ডাইস্যাকারাইড / পলিস্যাকারাইড/ অলিগোস্যাকারাইড)।
4. ল্যাক্টোজকে— বলে। (ইক্ষুশর্করা / দুগ্ধ শর্করা / বার্লি শর্করা)।
5. অ্যামাইনো অ্যাসিড— (প্রোটিনের একক / ফ্যাটের একক / কার্বোহাইড্রেটের একক)।
6. ট্রাইস্যাকারাইডের—উদাহরণ। (সুক্রোজ / স্করোডোজ / র‍্যাফিনোজ / গাইকোজেন)।
7. গ্লাইকোজেন এক প্রকার—কার্বোহাইড্রেট। (মনোস্যাকারাইড / ডাইস্যাকারাইড / পলিস্যাকারাইড)।
8. সরল প্রোটিনের উদাহরণ—(অ্যালবুমিন / নিউক্লিওপ্রোটিন / মেটালো প্রোটিন)।
9. দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যবর্তী বন্ধনীকে বলে—(গ্লুকোসাইডিক বন্ধনী / পেপটাইড বন্ধনী)।
10. টায়ালিন থাকে—(লালাতে / পাকস্থলীতে / ক্ষুদ্রান্ত্রে / অগ্ন্যাশয়ে)।
11. — দ্বারা টায়ালিন ক্ষরিত হয় (ঘর্মগ্রন্থি / শুক্রাশয় / অবসন্ন পেশি / লালাগ্রন্থি / কর্ণপটহ)।
12. পেপ্‌সিনোজেন একটি — (সক্রিয় এন্‌জাইম / নিষ্ক্রিয় এন্‌জাইম / কোনো এনজাইম নয়)।
13. ট্রিপ্‌সিনোজেন একটি — (কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম / প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম / ফ্যাট পরিপাককারী এন্‌জাইম)।
14. যে প্রক্রিয়া দ্বারা গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয় তাকে — বলে। (গ্লাইকোলাইসিস / গ্লাইকোজেনোলাইসিস / গ্লাইকোজেনেসিস)।
15. ক্রেবের চক্রটি অনুষ্ঠিত হয় —। (সাইটোপ্লাজমে / নিউক্লিয়াসে / মাইটোকনড্রিয়াতে / গলগি বডিতে)।
16. একজন সুস্থ স্বাভাবিক লোকের প্রতি 100 মিঃ লিঃ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ (মিলিগ্রামে) —। (80—120) / (120—140) / (60—80)।
17. বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনকে বিশ্লেষিত করলে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা —। (20 / 120 / 210 / 200)।
18. নিকোটিনিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি —। (তামাক পাতার একটি প্রতিবিষ / এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড / একটি ভিটামিন / একটি হরমোন)।
19. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি —। (অ্যামাইনো অ্যাসিড / ভিটামিন / ফ্যাটি অ্যাসিড / হরমোন)।
20. অ্যামাইনোপেপটাইডেজ একটি —। (অ্যামাইনো অ্যাসিড / উৎসেচক / ভিটামিন)।
21. অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা —। ( 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 21)।
22. একজন 55 kg. ওজনবিশিষ্ট স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা — গ্রাম। ( 25 / 55 / 110 / 160 / 226)।
23. মানুষের পক্ষে — একটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড। (আর্জিনিন / হিস্টিডিন / গ্লুটামিক অ্যাসিড / থ্রিওনিন / অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)।
24. অনশন অবস্থায় প্রথম জারিত বস্তুটি হল —। (গ্লাইকোজেন / ফ্যাট / প্রোটিন / জল)।

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. পুষ্টির জন্য পরিবেশ থেকে জীবদেহে গৃহীত উপাদানগুলিকে একত্রে পরিপোষক বলে। ☐
2. পরিপোষণের জন্য ভক্ষণযোগ্য আহার্যবস্তু সামগ্রীকে খাদ্য বলে, যেমন—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ। ☐
3. দেহ-সংরক্ষণের জন্য গৃহীত বস্তুসামগ্রীগুলো শক্তিপ্রদায়ী নয় বলে এগুলো খাদ্য নয়, যেমন—ভিটামিন, খনিজপদার্থ ও জল। ☐
4. জলের অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও ফরম্যালডিহাইড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট নয়। ☐
5. যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটে অ্যালডিহাইড (—CHO) মূলক বা কিটো (C = O) মূলক আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং সহজেই ক্ষারীয় কপার (সালফেট) যুক্ত দ্রবণকে বিজারণে সক্ষম হয় তাদের বিজারণক্ষম শর্করা (reducing sugar) বলে। ☐
6. যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটে অ্যালডিহাইড বর্গ ও কিটোন বর্গ পরস্পর যুক্ত থাকে এবং কপারযুক্ত ক্ষারীয় দ্রবণকে বিজারণে অক্ষম হয় তাদের বিজারণ-অক্ষম শর্করা বলে। যথা—সুক্রোজ। ☐

7. দু অণু একক শর্করা যুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে অর্থাৎ ডাইস্যাকারাইডকে ওলিগোস্যাকারাইড বলে।
8. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের তাপনমূল্য যথাক্রমে 1.0, 4.0, 9.3 K cal।
9. আহার্য যৌগ স্নেহপদার্থকে ট্রাইগ্লিসেরাইডস বলে।
10. ডেক্সট্রিন একপ্রকার প্রকৃতিজাত কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের দেহে স্বাভাবিক ভাবে পাচিত হয়।
11. স্টেরলস বা স্টেরয়েডস স্নেহপদার্থ নয়। কারণ এদের ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলেও ক্ষারীয় আর্দ্রবিশ্লেষণে সাবান (soap)-এ পরিণত হয় না।
12. দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে।
13. গ্লাইসিন একটি সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড।
14. অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড ও লিনোলেয়িক অ্যাসিড-এরা অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড।
15. প্রোটিন এবং ক্যালোরির অভাবে সৃষ্ট রোগের নাম কাওয়াশিয়রকর।
16. ভিটামিন-A, ভিটামিন-D ও ভিটামিন-K মানবদেহে সংশ্লেষিত হয়।
17. অভেডিন ও বিটা ক্যারোটিন যথাক্রমে প্রোভিটামিন ও অ্যান্টিভিটামিন।
18. ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে রাতকাণা রোগ হয়।
19. ভিটামিন $B_{12}$-এর অভাবে পারনিসিয়াস বা ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হয়।
20. ভিটামিন $B_1$-এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
21. ভিটামিন C-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।
22. ভিটামিন P-এর অভাবে স্কার্ভিরোগে রক্তপাত ঘটায়।
23. ক্যালসিয়ামের অভাবে সব বয়সের লোকের রিকেট রোগ হয়।
24. ক্রেবস চক্রে এক অণু পাইরুভিক অ্যাসিড জারিত হয়ে 12 অণু ATP তৈরি করে।
25. এক অণু গ্লুকোজ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া জারিত হয়ে একঅণু পাইরুভিক উৎপন্ন করে।
26. পাকস্থলীতে পেপসিন প্রোটিনকে বিশ্লিষ্ট করে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
27. রেনিন বয়স্ক লোকের পাকরসে থাকে যা দুধের ক্যাসিনোজেনকে ছানায় পরিণত করে।
28. লালাগ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত সাবম্যান্ডিবুলা গ্রন্থি সব চাইতে বেশি লালারস ক্ষরণ করে।
29. পাকস্থলীর রসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী উৎসেচক সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত করে।
30. লালারসের কার্বোহাইড্রেট বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকের নাম স্যালিভারী অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন।
31. অগ্ন্যাশয় রসের অপর নাম সাক্কাসএন্টেরিকাস্।
32. সোডিয়াম গ্লাইকোলেট ও সোডিয়াম টরোকোলেট দুটিকে পিত্তরঞ্জক বলে।
33. বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন দুটিকে পিত্তলবণ বলে।
34. পিত্তাশয়ের পিত্ত যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্ত অপেক্ষা কম গাঢ়।
35. খাদ্যমণ্ড অন্ননালির ক্রমিক সংকোচন প্রক্রিয়ায় পাকস্থলিতে পৌঁছায়।
36. পাকস্থলীর অক্সিনটিক কোশ এবং পেপটিক কোশ থেকে উৎসেচক এবং প্যারাইটাল কোশ থেকে HCl নিঃসৃত হয়।
37. পাকস্থলীর মধ্যে আংশিক পরিপাক ও অর্ধতরল অবস্থাকে পাকমণ্ড (chyme) বলে।
38. মানুষের স্থায়ী দাঁতের সূত্রটি হল $I\frac{2}{2},\ C\frac{1}{1},\ Pm\frac{2}{2},\ M\frac{3}{3}$ ।
39. ব্রুনার গ্রন্থি ও লিবারকুহন গ্রন্থি ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীর শ্লেষ্মাস্তরে থাকে এবং যথাক্রমে শ্লেষ্মা বা মিউকাস এবং উৎসেচক ক্ষরিত করে।
40. অগ্ন্যাশয় ক্ষরিত প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজের অপর নাম স্টিয়াপসিন।
41. নিউক্লিয়েজ নিউক্লিক অ্যাসিড আর্দ্রবিশ্লেষণে পলিনিউক্লিয়টাইড ও নিউক্লিয়টাইডে পরিণত হয়।
42. বেশি কার্বোহাইড্রেট এবং কম ফ্যাটজাতীয় খাদ্য খেলে দেহে কিটোন বডি তৈরি হয়।
43. ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, সামান্য প্রোটিন সহযোগে কাইলোমাইক্রন উৎপন্ন হয়।
44. গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে।
45. ইউরিয়া একটি অপ্রোটিন নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ যা মানুষের বৃক্কে উৎপন্ন হয়ে মূত্রের মাধ্যমে রেচিত হয়।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. B. M. R. বলতে কী বোঝো ? 2. কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে ? 3. গ্লুকোজ কী ? 4. কার্বোহাইড্রেটের একককে কী বলে ? 5. প্রোটিনের একককে কী বলে ? 6. অ্যামাইনো অ্যাসিড কী ? 7. সংযুক্ত প্রোটিন কাকে বলে ? 8. লব্ধ প্রোটিন কী ? 9. ফ্যাটি অ্যাসিড কী ? 10. লিবারকুহনের ক্রিপ্ট কাকে বলে ? 11. ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপগ্রন্থি কাকে বলে ? এর থেকে কী কী হরমোন নিঃসৃত হয় ? 12. টায়ানি, পেপসিনোজেন, ট্রিপসিনোজেন এবং ইরেপসিন কাকে বলে ? 13. এন্টেরোকাইনেজ কী ? 14. পাকমণ্ড কাকে বলে ? 15. গ্লাইকোলাইসিস কী ? গ্লুকোনিওজেনেসিস কী ? 16. কিটোন বডি কাকে বলে ? 17. ইউরিয়া কী ও দেহের কোথায় উৎপন্ন হয়। 18. ফ্যাটি অ্যাসিডের

β- কার্বনের সঠিক অবস্থান নির্দেশ করো। 19. বিলিরুবিন কী ? 20. সোডিয়াম টোরোকোলেট কী ? 21. ইউরিয়া কী ? দেহের কোন্ স্থানে এটি উৎপন্ন হয় ? 22. যে চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া সংশ্লেষিত হয় তার নাম কী ? 23. স্কার্ভি কী ? এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ উল্লেখ করো। 24. হাইপারট্রোপিক মেদবৃদ্ধি কী ? 25. অনশনে দেহে কিটোসিস ঘটনা ঘটে কেন ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. খাদ্য কাকে বলে ? খাদ্য কয় প্রকার ও কী কী ?
2. B. M. R. কী ? স্বাভাবিক B. M. R.-এর হার উল্লেখ করো।
3. শ্বসন অনুপাত কাকে বলে ? বিভিন্ন শ্বসন বস্তুর মান নির্ণয় করো।
4. ভিটামিনের সংজ্ঞা শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে যা জানো লেখো। রাতকানা, স্কার্ভি, বেরিবেরি এবং রিকেট কোন্ ভিটামিনের অভাবে হয় ?
5. প্রোভিটামিন এবং অ্যান্টিভিটামিন বলতে কী বোঝো ?
6. যৌগিক শর্করা বলতে কী বোঝো ? চারটি পলিস্যাকারাইডের নাম করো।
7. যৌগিক লিপিড বলতে কী বোঝো ? উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
8. বিজারণক্ষম শর্করা কাকে বলে এবং কেন বলে ?
9. লিপিড কী ? এর শ্রেণিবিন্যাস করো।
10. তোমার পৌষ্টিকতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের নাম করো।
11. ভিলাই কী ? পৌষ্টিকতন্ত্রের কোন্ অংশে ভিলাই থাকে ?
12. লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থিকোশের নাম লেখো যার থেকে বিভিন্ন প্রকার রস (Juice) ক্ষরিত হয়।
13. রক্ত তঞ্চনকারী ভিটামিনের নাম করো। লালারস এবং অগ্ন্যাশয় রসের কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষণকারী উৎসেচকের নাম করো। অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত দুটি হরমোনের নাম করো।
14. লালাগ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করো।
15. মানুষের পাকস্থলী থেকে ক্ষরিত রসের স্বাভাবিক উপাদানগুলি কী কী লেখো।
16. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
17. লালারস, অগ্ন্যাশয় রস, পাকস্থলীর রস এবং আন্ত্রিক রসস্থিত বিভিন্ন এনজাইমের নাম করো।
18. পাকস্থলীর রস কী ? প্রোটিন খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলী রসের দুটি উপাদানের নাম করো।
19. মানুষের পাকস্থলীর ক্ষরিত রসের স্বাভাবিক উপাদানগুলো কী কী ?
20. মানুষের অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত রসের স্বাভাবিক উপাদানগুলো কী কী ?
21. মানবদেহে লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, পিত্তনালি, পাকস্থলী, গ্রহণী এবং বৃহদন্ত্রের অঙ্গসংস্থানিক একটি চিত্রসহযোগে দেখাও।
22. কুফার কোশ কাকে বলে ? এদের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
23. যকৃৎনালি থেকে সংগৃহীত পিত্ত এবং পিত্তথলি থেকে সংগৃহীত পিত্ত পৃথক্ কেন ?
24. শ্বেতসার পরিপাকে টায়ালিনের ভূমিকা কী ?
25. মানুষের পাকস্থলীতে কার্বোহাইড্রেটের পরিণতি বর্ণনা করো।
26. সেলুলোজ কী ? মানবদেহে সেলুলোজ পাচিত না হলেও এটি কেন দেহের পক্ষে একটি অপরিহার্য খাদ্যবস্তু হিসাবে গণ্য হয় উল্লেখ করো।
27. মানুষের পৌষ্টিকনালিতে প্রোটিন খাদ্য পরিপাকের উৎসেচকগুলির নাম করো।
28. পেপসিনোজেন কী ও কীভাবে সক্রিয় হয়, এর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
29. ট্রিপসিনোজেন এনজাইমের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
30. এন্ডোপেপটাইডেজ ও এক্সোপেপটাইডের অন্তর্গত বিভিন্ন এনজাইমের নাম করো।
31. পেপসিন ও ট্রিপসিন এনজাইমদ্বয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
32. নিউক্লিও প্রোটিন কী ? এটি পৌষ্টিকনালির মধ্যে কীভাবে পাচিত হয় লেখো।
33. মানুষের পৌষ্টিকনালিতে দুধের পরিপাক ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় ?
34. একটি ছকের মাধ্যমে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিপাক বর্ণনা করো।
35. ফ্যাট পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজ ব্যতীত পৌষ্টিকতন্ত্রের অন্য একটি উপাদান ফ্যাট পরিপাকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে তার নাম কী ? কীভাবে এটি পরিপাকে সহায়তা করে ?
36. চর্বি জাতীয় খাদ্যের পাচনক্রিয়া উদ্ভূত দ্রব্যগুলি কী ? পৌষ্টিকনালির কোন্ অংশে চর্বি জাতীয় খাদ্যের পাচনক্রিয়া উদ্ভূত দ্রব্যগুলি শোষিত হয় ?
37. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটের অন্তিম পরিপাকজাত বস্তুগুলির নাম লেখো। এই সব পদার্থগুলির মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকজাত পদার্থের শোষণ বর্ণনা করো।
38. গ্লুকোজ কী ? শোষণের পর গ্লুকোজ কীভাবে যকৃৎ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় ?
39. বিপাক কাকে বলে ? উপচিতি এবং অপচিতি কাকে বলে ?
40. গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া কী ? এই প্রক্রিয়া দেহের কোন্ স্থানে সংঘটিত হয় ?

41. নিওগ্লুকোজেনেসিস কী ?
42. নিওগ্লুকোজেনেসিস প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝো ?
43. প্রকৃতিতে কয় প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় ? এদের মধ্যে কটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অন্তর্গত ও কী কী ?
44. ডি-অ্যামাইনেশন এবং ট্রান্স-অ্যামাইনেশন বলতে কী বোঝো ?
45. গ্লিসারল কী ? এটি কীভাবে দেহে ব্যবহৃত হয় তার বর্ণনা দাও।
46. অনশন অবস্থায় যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তার উল্লেখ করো।
47. অনশন বা দীর্ঘ উপবাসে দেহে কী কী পরিবর্তন ঘটে ?
48. মেদ বৃদ্ধি কী ? মেদবৃদ্ধি হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো।

### B. পার্থক্য নির্দেশ করো (Distinguish between the following) :

1. প্রধান খাদ্য ও সহায়ক খাদ্য। 2. মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড। 3. ফস্‌ফোপ্রোটিন ও ফসফোলিপিড। 4. পেপটাইড বন্ধনী ও গ্লুকোসাইডিক বন্ধনী। 5. পেপসিনোজেন ও ট্রিপসিনোজেন। 6. গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিস। 7. ডি-অ্যামাইনেশন ও ট্রান্স-অ্যামাইনেশন। 8. অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড।

### C. টিকা লেখো (Write short notes on) :

1. হাইপার ভিটামিনোসিস; 2. ক্যালসিফেরোল; 3. নাইট্রোজেন সাম্য; 4. ওলিগোস্যাকারাইড; 5. বিজারণধর্মী শর্করা; 6. অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড; 7. অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড; 8. জুইটার আয়ন; 9. আয়োডিন সংখ্যা; 10. স্যাপোনিফিকেশন; 11. গ্লুকোনিওজেনেসিস 12. ডি-কার্বোক্সিলেশন; 13. ট্রান্স অ্যামাইনেশন; 14. ফ্যাটি অ্যাসিডের ω-জারণ; 15. পাকস্থলীয় রস; 16. কাইম; 17. পেপটিক আলসার; 18. উপবাস ও অনশন; 19. মেদ বৃদ্ধি; 20. যকৃতের সিরোসিস।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. মৌল বিপাকীয় হার বলতে কী বোঝো ? যেসব কারণগুলি মৌল বিপাকীয় হারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উল্লেখ করো।
2. কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে ? এর শ্রেণিবিন্যাস উদাহরণসহ লেখো। এদের ধর্মগুলি উল্লেখ করো।
3. প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস করো। কাদের প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলে ? এদের এভাবে বলা হয় কেন ? প্রোটিনের সাধারণ কার্য বিবৃত করো।
4. মানুষের যকৃতের একটি উপখণ্ডকের আণুবীক্ষণিক গঠনের চিহ্নিত চিত্র আঁকো। যকৃত অপসারণ করলে মানুষ কি জীবিত থাকতে পারে ? পিত্ত কী ও এর কার্য উল্লেখ করো।
5. পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
6. পৌষ্টিকনালির প্রাচীরগাত্রে অবস্থানকারী বিভিন্ন প্রকার পরিপাক গ্রন্থির নাম করো এবং এই সব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন প্রকার রসের নাম করো।
7. লালাগ্রন্থি মানবদেহে কোন্ স্থানে থাকে ? এর আণুবীক্ষণিক গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
8. মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রের আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করো।
9. অগ্ন্যাশয় কী ? এর গঠন ও কার্য সম্বন্ধে লেখো।
10. লালারসের উপাদান ও কার্যাবলি বর্ণনা করো।
11. পাচকরস কী ? এর উৎপত্তিস্থল, উপাদান ও কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
12. পিত্ত কী ? এটি কোথা থেকে ক্ষরিত হয় ? এর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বর্ণনা করো।
13. সাকাস এন্টেরিকাস কী ? এর উপাদান ও কার্যাবলি বর্ণনা করো।
14. পিত্ত কী ? যকৃৎনালির উপাদান এবং সাধারণ পিত্তনালির পিত্তের উপাদান কেন আলাদা হয় ? কীভাবে পিত্ত স্নেহ পদার্থের পরিপাকে সাহায্য করে ? অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত বিভিন্ন এনজাইমের নাম করো এবং তাদের কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।
15. পিত্তরসের বিভিন্ন উপাদানের নাম লেখো। এর তিনটি বিশেষ কার্য সম্বন্ধে (যে-কোনো 3টি) লেখো।
16. পরিপাক কাকে বলে ? কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক বর্ণনা করো।
17. তোমার পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন উৎসেচক সাহায্যে কীভাবে একটি সিদ্ধ আলুর (শ্বেতসার) কীভাবে পাচিত হয় ?
18. মানবদেহে যকৃৎ পিত্তনালি, অগ্ন্যাশয় ও গ্রহণীর অঙ্গসংস্থানিক সম্বন্ধে একটি চিত্র সহযোগে দেখাও।
19. পাচক রসে বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইমগুলির নাম করো এবং তাদের প্রভাবে কার্বোহাইড্রেট কীভাবে পাচিত হয় ?
20. মানুষের পৌষ্টিকনালিতে প্রোটিন-খাদ্য পরিপাকের উৎসেচকগুলির নাম করো। "একান্তর আবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড" বলতে তুমি কী বোঝো এবং সেগুলি কী কী ?
21. গ্লুকোজ ও সুক্রোজ কী ? স্টার্চের পাচন ও শোষণ কীভাবে হয় ?
22. পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটিন কীভাবে পরিপাক হয় তা বর্ণনা করো।

ার পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে কীভাবে সিদ্ধ ডিম বা ফ্যাটবিহীন বিভিন্ন একখণ্ড মাংস উৎসেচকের সাহায্যে পাচিত হয় তার বর্ণনা

াক কী ? লিপিডের পরিপাক ও শোষণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

ার শরীরে স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক কীভাবে হয় ?

ষ্টকনালির বিভিন্ন অংশে উৎসেচকের ক্রিয়ার শ্বেতসার কীভাবে পাচিত হয় তার বর্ণনা দাও।

ার পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে, কীভাবে একখণ্ড মাখন পরিপাক হয় তা বর্ণনা করো।

জাতীয় (স্নেহপদার্থ) খাদ্যের পাচন ক্রিয়া উদ্ভূত দ্রব্যগুলি কী ? তোমার শরীরে স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক কীভাবে হয় ? পৌষ্টিকনালির
্ অংশে চর্বিজাতীয় পাচন ক্রিয়া উদ্ভূত দ্রব্যগুলি শোষিত হয় ?

খণ্ড ফ্যাটিবিহীন মাংস নানারূপ উৎসেচকের সাহায্যে পরিপাক হওয়ার পর কীভাবে তোমার শরীরে শোষিত হয় তা বর্ণনা করো।

খাদ্যবস্তু অর্থাৎ যে খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে তার পরিপাক সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

ষণ কাকে বলে? কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের শোষণ কীভাবে হয় ?

ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে স্নেহ পদার্থের শোষণের সময় মাইসেলি এবং কাইলোমাইক্রোন-এর উৎপাদন এবং পরিণতি বর্ণনা করো। (b) ফ্যাটি
সিডের β-জারণ বলিতে কী বোঝো ? এর বিক্রিয়া লব্ধ পদার্থ কী ?

াক কাকে বলে। বিশ্লেষণের পর গ্লুকোজ কীরূপে যকৃতে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় ?

কোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া কাকে বলে ? এদের বর্ণনা করো।

কোলাইসিস প্রক্রিয়া ছকের সাহায্যে বর্ণনা করো।

ইট্রিক অ্যাসিড চক্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

ামাইনো অ্যাসিড কী ? দেহে কয়প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ? অ্যামাইনো অ্যাসিডপুল কাকে বলে ? অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রধান
ান কার্যাবলি বর্ণনা করো।

রিয়া কী ? যে চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় তার নাম করো। এই চক্রের বিভিন্ন ধাপগুলি বর্ণনা করো।

ইট্রোজেন সাম্য কাকে বলে ?

টা-জারণ কাকে বলে ? বিটা-জারণের বিভিন্ন ধাপের আলোচনা করো।

কৃতের সিরোসিস বলতে কী বোঝো ? কী কী কারণে যকৃতে সিরোসিস হতে পারে ? এর কয়েকটি উপসর্গ উল্লেখ করো।

লিকোব্যাকটর পাইলোরি নামে ব্যাকটেরিয়া দেহে কী রোগ ঘটায় ? এই ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর দেহে যেসব পরিবর্তন ঘটায় তাদের
ম্বন্ধে আলোচনা করো।

ালন ক্যানসার কী ? কেন হয় ? এর কয়েকটি উপসর্গ উল্লেখ করো। এই প্রকার ক্যানসার কীভাবে প্রতিকার করা যায় ?

**র অঙ্কনভিত্তিক প্রশ্ন (Draw and label the following)ঃ**

ৌষ্টিকনালি তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এঁকে চিহ্নিত করো।

কটি দাঁতের চিহ্নিত চিত্র আঁকো।

কটি পাকস্থলী এঁকে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

---

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

## অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# রক্ত এবং দেহরস
# [BLOOD AND THE BODY FLUID]

## ➧ ভূমিকা (Introduction) ঃ

মানুষের দেহের ওজনের দুই তৃতীয়াংশ প্রায় (70%) হল জল। এই জলে বিভিন্ন প্রকার ধনাত্মক আয়ন, যেমন—পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি এবং ঋণাত্মক আয়ন, যেমন—ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট ইত্যাদি এবং প্রোটিন দ্রবীভূত থাকে। জল এবং জলে অবস্থিত এই সব পদার্থগুলি দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। জলের অভাবে দেহের ওজন যখন দশ থেকে কুড়ি শতাংশ কমে যায় তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **জলাভাব** (ডিহাইড্রেশন) বলে। দেহের সমস্ত কলাকোশের বাইরে এবং ভেতরে তরল পদার্থ থাকে বলে প্রতিটি কলাকোশ **দেহ তরলে** ডুবে থাকে। রক্ত, লসিকা, মস্তিষ্ক মেরুরস, চোখের অ্যাকুয়াস হিউমার এবং ভিট্রিয়াস হিউমার, সন্ধিস্থলীয় তরল ইত্যাদি দেহ তরলের উদাহরণ।

**রক্ত** এক বিশেষ ধরনের তরল যোগকলা কারণ রক্তের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য যোগকলার সঙ্গে মিল আছে। তবে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোনো রক্তকোশই আদর্শ কোশ নয় কারণ একটি আদর্শ কোশের মতো রক্ত কোশে সব রকমের কোশীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন—প্রায় কোনো কোশীয় অঙ্গাণু থাকে না, তাই রক্তের কণিকাগুলিকে **সাকার উপাদান** বলে। দেহে রক্ত ছাড়া **লসিকা** নামে একপ্রকার পরিবর্তিত কলারস থাকে যা লসিকাবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেহের যেসব স্থানে রক্ত পৌছাতে পারে না সেইসব স্থানে লসিকা কলাকোশে অক্সিজেন, পুষ্টি ইত্যাদি সরবরাহ করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া লসিকা দেহের সব অংশে থাকে।

## ❂ 2.1. রক্ত (Blood) ❂

### ▲ রক্তের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং কার্যাবলি (Definition, Characteristic features, composition and functions of Blood) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** লাল রঙের অস্বচ্ছ, সান্দ্র, সামান্য ক্ষারীয় যে বিশেষ ধরনের কোমল তরল যোগকলা হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে রক্ত বলে।

(b) **রক্তের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Some characteristic features of Human blood) :**

1. **রক্তকে যোগকলা বলার যথার্থতা (যুক্তি) :** স্বাভাবিক যোগকলার সঙ্গে তুলনা করে নিম্নলিখিত কারণের জন্য রক্তকে তরল যোগকলা বলা হয় —

| সাধারণ যোগকলা | রক্ত যোগকলা |
|---|---|
| 1. ভ্রূণ অবস্থায় যোগকলার ভ্রূণের মেসোডার্ম স্তর থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. রক্তও মেসোডার্ম স্তর থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 2. যোগকলায় কোশের পরিমাণ আন্তরকোশীয় তরলের পরিমাণ থেকে কম হয়। | 2. রক্তেও রক্তকণিকা (রক্তকোশের) পরিমাণ (45%) যা প্লাজমা (আন্তরকোশীয়) তরলের পরিমাণের (55%) চেয়ে কম হয়। |
| 3. যোগকলায় কোশগুলি আন্তরকোশীয় পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। | 3. রক্তের রক্তকণিকাগুলিও (R. B. C, W. B. C ও অণুচক্রিকা) প্লাজমার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। |
| 4. যোগকলায় কোনো ভিত্তি পর্দা নেই। | 4. রক্তেও কোনো ভিত্তি পর্দা নেই। |
| 5. যোগকলা দেহের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত রাখে। | 5. রক্তসংবহনের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে কিংবা দেহের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত রাখে। |

2. **রক্তের অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা** (Acid-base balance of Blood) **: মানুষের স্বাভাবিক রক্তের pH 7·4** অর্থাৎ রক্ত সামান্য ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। যে ব্যবস্থাপনায় রক্তের এই pH বজায় থাকে তাকেই রক্তের **অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা** বলে। এই ব্যবস্থাপনা রক্তের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ, যেমন — হিমোগ্লোবিন, বাইকার্বোনেট, ফসফেট ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সব পদার্থকে **রক্তের বাফার** বলে।

3. **রক্তের বাফার** (Buffer of Blood) **:** মৃদু অম্ল ও তীব্র ক্ষারক অথবা তীব্র অম্ল ও মৃদু ক্ষারক মিশ্রণ যা বাইরে থেকে অম্ল বা ক্ষার মেশালেও যারা দ্রবণের pH-কে পরিবর্তিত হতে দেয় না তাকে **বাফার** বলে। **রক্তের বাফার** পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান হল—(i) প্লাজমাস্থিত কার্বোনিক অ্যাসিড ও বাইকার্বোনেটের মিশ্রণে প্রস্তুত **বাইকার্বোনেট বাফার** (ii) লোহিত কণিকাস্থিত **হিমোগ্লোবিন** বাফার এবং (iii) রক্তে অবস্থিত **প্রোটিন** এবং **ফসফেট** বাফার।

4. **রক্তের সান্দ্রতা (**Viscosity of Blood**) :** রক্তের সান্দ্রতা (গাঢ়ত্ব) জলের থেকে পাঁচগুণ বেশি। নিম্নলিখিত উপাদানগুলি (কারণসমূহ) রক্তের সান্দ্রতা বজায় রাখে— (i) রক্তে RBC-র সংখ্যা এবং প্লাজমায় প্রোটিনের (গ্লোবিউলিনের) পরিমাণ বাড়লে বা কমলে, (ii) রক্তে ক্যালসিয়াম ও গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে, (iii) রক্তের উষ্ণতা কমলে বা বাড়লে, (iv) রক্তবাহের (রক্তনালির) লুমেনের ব্যাস কমে গেলে, (v) রক্তে $CO_2$-এর পরিমাণ বাড়লে বা কমলে (অর্থাৎ অ্যাসিডোসিস বা অ্যালকালি অবস্থায়) ইত্যাদি রক্তের সান্দ্রতা পরিবর্তিত হয়।

5. **রক্তের পরিমাণ** (Blood volume) **:** একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে মোট রক্তের পরিমাণ **5 লিটার**। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রক্তের পরিমাণ **4·5 লিটার**। কারণ এদের RBC-এর সংখ্যা কম হয়। রক্তের মোট পরিমাণকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়।

(i) **দেহের ওজন অনুযায়ী — গড়ে 90 ml** প্রতি কেজি দেহের ওজনের জন্য।

(ii) **দেহতল অনুযায়ী — গড়ে 3·3 লিটার** প্রতি বর্গ মিটার দেহতলের জন্য।

**রক্তদান শিবিরে তুমি 250 ml রক্ত দান করলে তোমার শরীরের মোট রক্তের শতকরা কত ভাগ রক্ত দেওয়া হবে ?**

একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে মোট 5000 ml (5 লিটার) রক্ত থাকে।

এর থেকে যদি 250 ml রক্ত দেওয়া হয় তাহলে মোট রক্তের শতকরা $\frac{250}{5000} \times 100 = 5\%$ রক্ত দেওয়া হবে।

6. **রক্তের বিক্রিয়া (Reaction of blood) ঃ** মানুষের রক্ত সামান্য ক্ষারীয়—pH 7·4।

7. **রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ঃ** 1·053-1·057।

8. **রক্তের হিমাটোক্রিট ভ্যালু** ( Hematocrite value of blood ) ঃ হিমাটোক্রিট (**অংশাঙ্কিত উইনট্রব টিউব**) নামে পরীক্ষানলে রক্ততঞ্চনরোধক পদার্থযুক্ত (সোডিয়াম অক্সালেট) রক্ত নিয়ে কেন্দ্রাতিগ (Centrifuge) যন্ত্রের সাহায্যে 30 মিনিট ধরে প্রতি মিনিটে প্রায় 3000 বার আবর্তিত হতে দিলে রক্তকণিকাগুলি পরীক্ষানলের নীচে জমে যায়। এর ফলে রক্তের নমুনাটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, যেমন—নীচের 45% লাল নিবিড় অংশ (প্রধানত লোহিত রক্তকণিকা) এবং উপরের 55% হলুদ রঙের জলীয় অংশ ( প্লাজমা)। এই অনুপাতে অর্থাৎ 45 ঃ 55 = রক্তকণিকা ঃ প্লাজমাকে **হিমাটোক্রিট ভ্যালু** (Hematocrit value) বলে।

(একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ বাঙালির দেহতলের আয়তন গড়ে প্রায় 1·6 $m^2$ এর সমান হয়)।
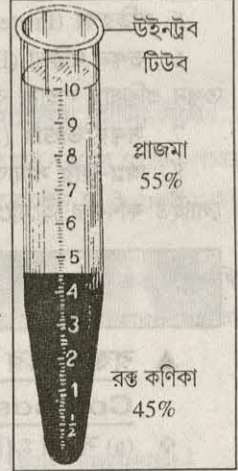
চিত্র ঃ 2.1 ঃ প্লাজমা ও রক্তকণিকার অনুপাত।

(c) **রক্তের উপাদান (Composition of blood) ঃ**

রক্ত প্রধানত দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যেমন—**রক্তরস বা প্লাজমা** (Plasma—55%) এবং **রক্তকোশ বা রক্তকণিকা** (Blood corpuscles—45%)।
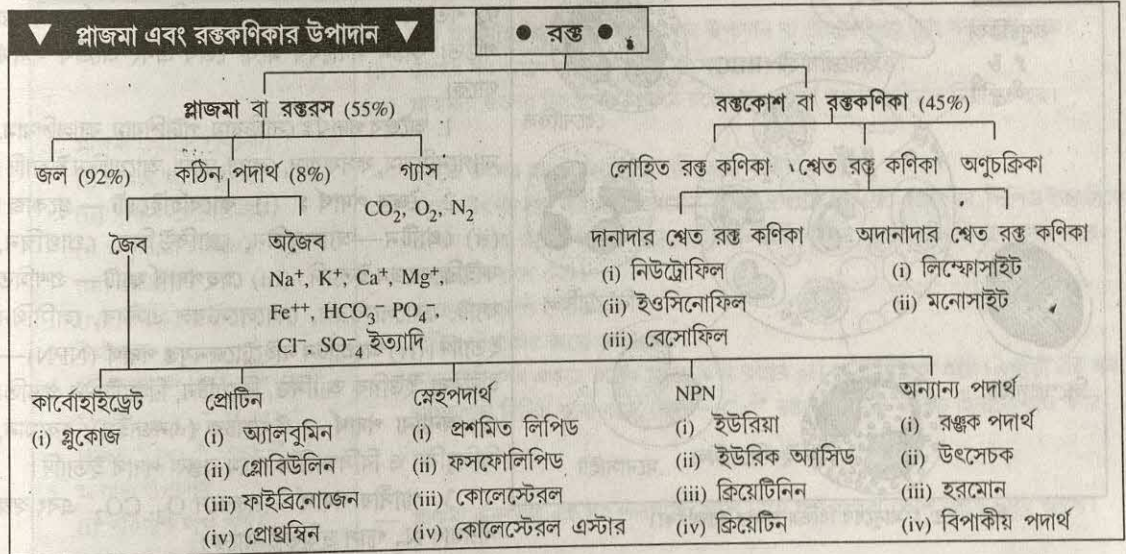
(d) **রক্তের কার্যাবলি (Functions of Blood) :**

1. **পুষ্টির পরিবহন** (Transport of nutrient)—অন্ত্রনালি দিয়ে শোষিত খাদ্যবস্তু রক্তের রক্তরসের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কোশে পরিবাহিত হয়।

2. **গ্যাসের পরিবহন** (Transport of gases)—রক্তের হিমোগ্লোবিন ও রক্তরস **অক্সিজেনকে** ফুসফুস থেকে কলাকোশে এবং কলাকোশে উৎপাদিত **কার্বন ডাইঅক্সাইডকে** ফুসফুসে পরিবাহিত করে।

3. **বর্জ্য পদার্থের পরিবহন** (Transport of waste products)—দেহকোশের বিপাকীয় বর্জ্যপদার্থগুলি, যেমন—ইউরিয়া, $CO_2$, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রধানত রক্তরসের মাধ্যমে ফুসফুস, বৃক্ক, ত্বক ইত্যাদিতে যায় এবং এই স্থান থেকে এই পদার্থগুলি দেহের বাইরে নির্গত হয়।

4. **হরমোন ও ভিটামিনের পরিবহন** (Transport of hormones and vitamins)—হরমোন, ভিটামিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলিকে রক্তরস উৎপত্তিস্থল থেকে বিভিন্ন স্থানে বহন করে।

5. **প্রতিরক্ষা** (Protection)—রক্তের শ্বেতকণিকা দেহকে জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

6. **তঞ্চন প্রক্রিয়া** (Blood coagulation)—রক্তকোশের অণুচক্রিকা এবং রক্তরসের প্রোথ্রমবিন ও ফাইব্রিনোজেন রক্তের তঞ্চন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ বাধা পায়।

7. **সঞ্চয় ভাণ্ডার** (Storage)—রক্তরস দেহের প্রোটিনের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে।

8. **অম্ল-ক্ষার সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of Acid-base balance)—**দেহে রক্ত একটি নির্দিষ্ট** pH বজায় রাখে। লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন, প্লাজমার বাইকার্বোনেট, ফসফেট ইত্যাদি রক্তের বাফার যা দেহে অম্লক্ষার নিয়ন্ত্রণ করে।

## 2.2. রক্তরস (প্লাজমা—Plasma)

### ▲ রক্তরসের (প্লাজমার) সংজ্ঞা, উপাদান এবং কার্যাবলি (Definition, Composition and Functions of Plasma) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : (Definition) : হালকা হলুদ রঙের আন্তরকোশীয় তরল পদার্থ যার মধ্যে রক্তকণিকাগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে তাকে রক্তরস (প্লাজমা—Plasma) বলে।**
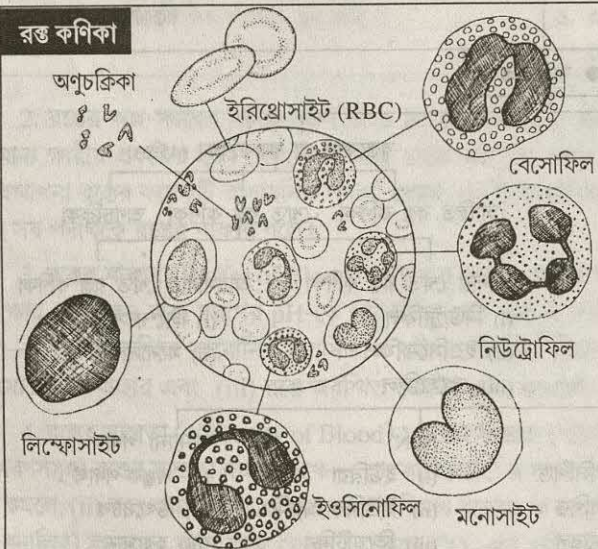
চিত্র 2.2 : মানুষের বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা।

(b) **উপাদান ( Composition )** : রক্তরস 91–92 শতাংশ জল এবং 8 শতাংশ কঠিন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব এবং অজৈব পদার্থ থাকে।

1. **অজৈব পদার্থ** : সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, তামা, আয়োডিন ইত্যাদি।

2. **জৈব পদার্থ** : (i) **কার্বোহাইড্রেট** — গ্লুকোজ। (ii) **প্রোটিন**—অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি। (iii) **স্নেহপদার্থ ফ্যাট**— প্রশমিত ফ্যাট, কোলেস্টেরল, কোলেস্টেরল এস্টার, লেসিথিন ইত্যাদি। (iv) **অপ্রোটিন নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ** (NPN)—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি। (v) **অন্যান্য পদার্থ**— উৎসেচক (এন্‌জাইম), হরমোন, বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন নামে রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি।

3. **গ্যাসীয় পদার্থ**— রক্তরসে $O_2$, $CO_2$ এবং স্বল্প পরিমাণ $N_2$ গ্যাস দ্রবীভূত থাকে।

(c) **প্লাজমার (রক্তরসের) কাজ (Functions of Plasma) :**

1. **রক্ততঞ্চন**— প্লাজমার ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন নামে দু'প্রকার প্রোটিন রক্ততঞ্চনে অংশগ্রহণ করে।
2. **রক্তের সান্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ**—প্লাজমার বিভিন্ন প্রোটিন রক্তের সান্দ্রতা বজায় রাখে। এই সান্দ্রতা রক্তের চাপকে (Blood pressure) নিয়ন্ত্রণ করে।
3. **রক্তের কোলডীয় অভিস্রবণ চাপ**—প্লাজমার (রক্তরসের) বিভিন্ন রকম প্রোটিন প্রধানত অ্যালবুমিন রক্তের কোলডীয় অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখে। এই চাপ রক্ত ও কলাকোশের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর আদানপ্রদানে সাহায্য করে।

4. **প্রোটিনের সঞ্চয় ভাণ্ডার**—রক্তরস (প্লাজমা) বিভিন্ন রকম প্রোটিনের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।
5. **পরিবহন**—পুষ্টি, হরমোন, উৎসেচক, রঞ্জক পদার্থ, রেচন পদার্থ, গ্যাসীয় পদার্থ ইত্যাদি প্লাজমার সাহায্যে দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবাহিত হয়।
6. **দেহে উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ**—দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে প্লাজমা অংশগ্রহণ করে।
7. **দেহে জল সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ**—দেহে জলের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে প্লাজমা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
8. **দেহে অম্ল ক্ষার নিয়ন্ত্রণ**—প্লাজমার প্রোটিন দেহে অম্ল-ক্ষার নিয়ন্ত্রণ করে।

### ✪ প্লাজমা প্রোটিন (Plasma protein) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ রক্তের আন্তরকোশীয় তরলে (প্লাজমায়) যেসব প্রোটিন পাওয়া যায় তাদের প্লাজমা প্রোটিন বলে।**

(b) **বিভিন্ন প্রকার প্লাজমা প্রোটিন ঃ** প্লাজমায় প্রধানত মোট **7·0 gm%** প্রোটিন আছে। এতে চার ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়, যেমন— (i) **অ্যালবুমিন** (4·8 gm%), (ii) **গ্লোবিউলিন** (2·3 gm%), (iii) **ফাইব্রিনোজেন** (0·3 gm%) এবং (iv) **প্রোথ্রম্বিন** (0·004 gm %)।

(c) **উৎস ঃ যকৃৎ** থেকে সব রকম প্লাজমা প্রোটিন, যেমন—অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন সংশ্লেষিত হয়। প্লাজমার গ্লোবিউলিন প্রোটিন দেহের অন্যান্য স্থান থেকে, যেমন—লসিকা গ্রন্থি, R. E. তন্ত্র, সাধারণ দেহকোশ থেকেও উৎপন্ন হয়।

(d) **কাজ ঃ** (প্লাজমা প্রোটিনের কাজ—1, 2, 3, 4 এবং 8 নম্বরগুলির মতো হবে)।

● **রক্তরসের উপাদানসমূহ এবং তাদের কার্যাবলি (Constituents of Plasma and their functions) ঃ**

| উপাদান | উপাদানের কাজ |
|---|---|
| 1. জল (Water) | (i) জল প্লাজমার (এবং লসিকার) প্রধান উপাদান যা দেহকোশকে জল সরবরাহ করে।<br>(ii) দেহের সব অংশে জলে দ্রবীভূত বস্তুসমূহকে পরিবাহিত করে।<br>(iii) প্লাজমায় জলের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তের চাপ এবং রক্তের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। |
| 2. প্লাজমা প্রোটিন (7-9%) | |
| (i) সিরাম অ্যালবুমিন | — যকৃতে উৎপন্ন হয়, ক্যালশিয়াম পরিবহনে সাহায্য করে। |
| (ii) সিরাম গ্লোবিউলিন (α ও γ-গ্লোবিউলিন) | — যকৃতে উৎপন্ন হয়, থাইরক্সিন হরমোন, ফ্যাটে দ্রবণীয় ADEK- ভিটামিন, লিপিড ইত্যাদিকে আবদ্ধ করে ও পরিবহনে সাহায্য করে। γ–গ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডি হিসাবে কাজ করে। |
| (iii) প্রোথ্রম্বিন | — রক্ততঞ্চনে অংশ নেয়। |
| (iv) ফাইব্রিনোজেন | — রক্ততঞ্চনে অংশ নেয়। |
| 3. উৎসেচক | — বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। |
| 4. খনিজ আয়ন $Na^+$, $K^+$, $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, $HCO_3^-$, $H_2PO_4^-$, $HPO_4^-$, $PO_4^{3-}$, $SO_4^{2+}$ | — আয়নগুলি সব একত্রে রক্তের গাঢ়ত্ব এবং রক্তের pH মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এই সব আয়নগুলি বিভিন্ন কাজ করে, যেমন—$Ca^{2+}$ রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। |
| 5. অন্যান্য উপাদান | |
| (i) পরিপাক লব্ধ পদার্থ, যেমন—গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসেরল, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি | — প্লাজমা অনবরত এই সব পদার্থকে কোশে নিয়ে যায় অথবা কোশ থেকে নিয়ে আসে। |
| (ii) রেচন পদার্থ | — ইউরিয়া (রেচন পদার্থ) প্লাজমার মাধ্যমে বৃক্কে যায় ও মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে রেচিত হয়। |
| (iii) হরমোন | — ইনসুলিন, যৌন হরমোন, STH ইত্যাদিকে নিঃসৃত স্থান থেকে দেহের অন্যান্য স্থানে নিয়ে যায়। |

## ❂ সিরাম (Serum) ঃ

❖ সংজ্ঞা (Definition)—রক্ত জমাট বাঁধার পর, জমাট (তঞ্চিত) রক্ত থেকে ফ্যাকাশে হলুদ রঙের স্বচ্ছ রস বের হয় তাকে সিরাম (Serum) বলে।

প্রকৃতপক্ষে ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন ছাড়া ( যা রক্ততঞ্চন কাজে ব্যবহৃত হয় ) সিরামের বাকি উপাদান প্লাজমার মতো। সিরামে গ্লোবিউলিন অনাক্রম্যতা প্রদানকারী প্রোটিন হিসাবে কাজ করে।

● **প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Plasma and Serum) ঃ**

| প্লাজমা (রক্তরস) | সিরাম |
|---|---|
| 1. রক্ত থেকে রক্ত কণিকাকে বাদ দিলে রক্তে যে তরল পদার্থ থাকে তাকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে। | 1. প্লাজমা তঞ্চিত হওয়ার পর ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন নামে দু'রকম প্রোটিন বাদে যে তরল পাওয়া যায় তাকে সিরাম বলে। |
| 2. প্লাজমায় অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন নামে চার প্রকার প্রোটিন থাকে। | 2. সিরামে অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন নামে দু'প্রকার প্রোটিন থাকে। কারণ ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন রক্ত তঞ্চনে ব্যবহৃত হয়। |
| 3. উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় তঞ্চিত করা যায়। | 3. একে তঞ্চিত করা যায় না। |

# ▼ রক্তকণিকা (Blood Corpuscles) ▼

রক্তের কোশীয় উপাদান অর্থাৎ রক্তকণিকা তিন প্রকার, যেমন— **লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা**। এই কণিকাগুলিকে **সাকার উপাদান** (Formed elements) বলে।

## ❂ রক্তের সাকার উপাদান (Formed elements of Blood) ঃ

রক্তের তিনপ্রকার রক্তকণিকার নির্দিষ্ট আকার আছে কিন্তু এইসব কোশ বা কণিকাতে আদর্শ কোশের মতো বিভিন্ন প্রকার কোশীয় অঙ্গাণু (এন্ডোপ্লাজমিক জালক, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডি প্রভৃতি) নেই, অর্থাৎ এরা আদর্শ কোশের মতো সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় না। এই কারণে R.B.C., W. B. C. ও অণুচক্রিকা প্রকৃত অর্থে খাঁটি কোশ নয়, তাই এদের সাকার উপাদান বলে।

**● প্রাণীদেহের সব থেকে কঠিন ও নরম কলা এবং ক্ষুদ্র ও বড়ো রক্তকণিকা ●**

1. **প্রাণীদেহে সবচেয়ে কঠিন কলা**— (i) অস্থিকলা (দেহে কঠিনতম বস্তু—দাঁতের এনামেল) ও (ii) **নরম কলা**— রক্ত।
2. ছোটো-বড়ো রক্তকণিকা— (i) ছোটো রক্তকণিকা—অণুচক্রিকা ও (ii) বড়ো রক্তকণিকা— WBC-এর মনোসাইট।

# ❂ 2.3. ইরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা ❂ (Erythrocyte or Red Blood Corpuscle—RBC)

## ▲ লোহিত রক্তকণিকার সংজ্ঞা, গঠন, উপাদান, মোট সংখ্যা, উৎপত্তি, জীবনকাল, পরিণতি এবং কাজ (Definition, Structure, Composition, Total count, Life span, Fate and Functions of Red blood cell)

❖ (a) **সংজ্ঞা ( Definition ) ঃ** মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের যেসব কোশের সংখ্যা বেশি হয় ও আকৃতিতে গোলাকার অথবা ডিম্বাকার এবং হিমোগ্লোবিন রঞ্জকযুক্ত হয় তাকে লোহিত রক্তকণিকা (Red blood corpuscles) সংক্ষেপে RBC বা ইরিথ্রোসাইট (Erythrocyte) বলে।

(b) **গঠন (Structure)** ঃ মানুষ সহ প্রায় সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার (উটের ডিম্বাকার), উভাবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন, হিমোগ্লোবিনযুক্ত পাতলা চাকতির মতো হয়। লোহিত রক্তকণিকার **ব্যাস** 7·2 μm এবং **বেধ** 2·2 μm হয়।

● **গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা**—নিউক্লিয়াস না থাকায় লোহিত কণিকায় আকৃতি দ্বি-অবতল হয় অর্থাৎ কেন্দ্রাংশটি পাতলা এবং পরিধি দিকের অংশটি মোটা হয়। এই কারণে লোহিত কণিকার তলীয় আয়তন বেশ কিছুটা বেড়ে যায়, ফলে লোহিত কণিকা বেশি পরিমাণ গ্যাসের সংস্পর্শে আসে এবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন সংযোজন ও বিয়োজন দ্রুত হয়।

চিত্র 2.3 ঃ মানুষের লোহিত রক্তকণিকা ঃ (A)-সম্মুখ দৃশ্য, (B & C)-পার্শ্ব দৃশ্য এবং (D)-লোহিত রক্তকণিকার রুলো গঠন।

**● স্ফেরোসাইটোসিস (Spherocytosis) ●**

নিউক্লিয়াস থাকে না বলে দ্বি-অবতল মানুষের লোহিত কণিকার স্বাভাবিক গঠন। যখন এই গঠনের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ লোহিত কণিকা দ্বি-অবতল থাকে না এবং গ্লোবের মতো আকার ধারণ করে, তখন লোহিত কণিকার এই অবস্থাকে **স্ফেরোসাইটোসিস** বলে।

(c) **RBC-এর রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition of RBC)** ঃ

চিত্র 2.4 ঃ স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা R.B.C.।

(1) **জল** ঃ 60–70 %।

(2) **কঠিন পদার্থ** ঃ 30–40 %। কঠিন পদার্থ বিভিন্ন প্রকারের হয়, কয়েকটি উপাদান হল—

(i) **অজৈব বস্তু**—পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট, ফসফেট প্রভৃতি।

(ii) **জৈব পদার্থ**—হিমোগ্লোবিন, প্রোটিন, গ্লুকোজ, ফ্যাট, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইউরিয়া ইত্যাদি।

(d) **লোহিত রক্তকণিকার মোট সংখ্যা (Total count (TC) of RBC)** ঃ লোহিত রক্তকণিকার মোট সংখ্যা **হিমোসাইটোমিটার** নামে (পুরা নাম—Improved Neubauer Haemocytometer) যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

(i) সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক **পুরুষের** প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে—লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা **50 লক্ষ** বা **5 মিলিয়ন**।

(ii) সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক **স্ত্রীলোকের** প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে—লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা **45 লক্ষ** বা **4·5 মিলিয়ন**।

(e) **লোহিত রক্তকণিকার উৎপত্তি (Origin of RBC)** ঃ

1. **উৎপত্তি (Origin)** ঃ লোহিত রক্তকণিকার উৎপত্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে হয়—

(i) **ভ্রূণাবস্থার শুরুতে**—লোহিত কণিকা ভ্রূণের **ভ্যাসকুলোসা অঞ্চলে** তৈরি হয়।

(ii) **ভ্রূণাবস্থার শেষে**—লোহিত কণিকার উৎপত্তি **যকৃৎ**, **প্লিহা** এবং **অস্থিমজ্জায়**।

(iii) **জন্মের পর**—**লোহিত অস্থিমজ্জা** থেকে ইরিথ্রোজেনেসিস বা ইরিথ্রোপোয়েসিস প্রক্রিয়ায় RBC উৎপন্ন হয়।

(f) **লোহিত কণিকার জীবনকাল (Life span of RBC)** ঃ মানুষের লোহিত রক্তকণিকার আয়ু **120 দিন**।

(g) **লোহিত রক্তকণিকার পরিণতি (Fate of RBC)** : বার্ধক্য দশায় লোহিত কণিকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে ও ক্ষণভঙ্গুর হয়। এই অবস্থায় RBC-কে **পয়কিলোসাইট** (Poikilocyte) বলে। ক্ষণভঙ্গুর হওয়ার ফলে সূক্ষ্ম রক্তজালকের মধ্য দিয়ে সংবাহিত হওয়ার সময় সামান্য চাপে ভেঙে যায়। এই ভগ্নাংশগুলি প্লিহা এবং যকৃতের আগ্রাসন কোশের সাহায্যে রক্ত থেকে অপসারিত হয়। এরপর লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে **হিম** এবং **গ্লোবিনে** (প্রোটিন অংশে) পরিণত হয়। গ্লোবিন দেহে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। হিমের অংশটি **ফেরিটিন** এবং **হিমোসিডেরিন** হিসেবে দেহে জমা হয়। হিমের হিমোসিডেরিন অংশ বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ যেমন—**বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন, স্টারকোবিলিনোজেন** (মলের রঞ্জক কণা), **ইউরোবিলিনোজেন** (মূত্রের রঞ্জক কণা) ইত্যাদি উৎপন্ন করে।

(h) **লোহিত রক্তকণিকার কাজ [Functions of red blood corpuscle (RBC)]** :

1. লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ $O_2$ এবং $CO_2$ গ্যাসের পরিবহন।
2. লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা বজায় রাখে।
3. লোহিত রক্তকণিকা রক্তের সান্দ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
4. লোহিত রক্তকণিকার বিনাশের সময় লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন রকম রঞ্জক পদার্থ, যেমন—**বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন** উৎপন্ন করে।
5. লোহিত কণিকার ঝিল্লির উপরে A-অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং B-অ্যাগ্লুটিনোজেন নামে অ্যান্টিজেন থাকে যা রক্তের শ্রেণিবিভাগে সাহায্য করে।

## ❂ 2.4. হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) ❂

### ▲ হিমোগ্লোবিনের সংজ্ঞা, গঠন, পরিমাণ, প্রকারভেদ ও কাজ (Definition, Structure, Amount, Types and Functions of Haemoglobin)

❖ (a) **হিমোগ্লোবিনের সংজ্ঞা (Definition of haemoglobin)** : **যে লৌহঘটিত ক্রোমোপ্রোটিন জাতীয় শ্বাসরঞ্জক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের লোহিত কণিকায় এবং কোনো কোনো অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্লাজমায় দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তাকে হিমোগ্লোবিন বলে।**

(b) **রাসায়নিক গঠন (Chemistry of haemoglobin)** : মানুষের হিমোগ্লোবিন 4% হিম নামে লৌহঘটিত পদার্থ এবং 96% গ্লোবিন নামে সরল প্রোটিন নিয়ে তৈরি।

(c) **হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ (Amount of haemoglobin)** :

(i) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের 100 মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ **14·5 gm** ।

(ii) স্ত্রীলোকের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সামান্য কম হয় (প্রায় **13·5 gm**), কারণ স্ত্রীলোকের রক্তে RBC-এর সংখ্যা কম।

● **হিমোগ্লোবিন পরিমাপক যন্ত্রের নাম**—যে যন্ত্রের সাহায্যে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তার নাম—**সালি বর্ণিত হিমোগ্লোবিনোমিটার** ( Sahli's Haemoglobinometer )।

**● হিমোগ্লোবিন পরিমাণ নির্ধারণ ও তার $O_2$ ধারণ ক্ষমতা ●**

1. **স্বাভাবিক লোকের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ধারণ করার ক্ষমতা কত ?**
   একগ্রাম হিমোগ্লোবিন 1·34 ml অক্সিজেন ধারণ করে।
   স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষের প্রতি 100 ml রক্তে 14·5 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।
   অতএব, প্রতি 100 ml রক্তে $1 \cdot 34 \times 14 \cdot 5 =$ **19·43 ml** $O_2$ ধারণ করবে।
2. **বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে যদি দেখা যায় তা স্বাভাবিকের 70%, তবে প্রতি 100 মিলিমিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রকৃত পরিমাণ কত হবে ?**
   প্রতি 100 ml স্বাভাবিক রক্তে 14·5 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।
   100 ml প্রদত্ত রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যদি 70% হয়।
   ∴ প্রদত্ত 100 ml রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রকৃত পরিমাণ $= \frac{14 \cdot 5}{100} \times 70 = 10 \cdot 15$ gm

(d) **হিমোগ্লোবিনের প্রকারভেদ (Types of Haemoglobin)**—মানুষের স্বাভাবিক রক্তে সাধারণত দু'ধরনের হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায়, যেমন—(i) **বয়স্থ হিমোগ্লোবিন** (Adult haemoglobin, সংক্ষেপে HbA)—বয়স্ক লোকের রক্তে পাওয়া যায়। এবং (ii) **ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন** (Foetal haemoglobin, সংক্ষেপে HbF)—ভ্রূণের রক্তে পাওয়া যায়।

(e) **হিমোগ্লোবিনের কাজ (Functions of Haemoglobin) :**

1. **অক্সিজেনের পরিবহন**—ফুসফুসে $O_2$-এর সঙ্গে হিমোগ্লোবিন যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** নামে একটি উভয়মুখী শিথিল যৌগ তৈরি করে। এই যৌগ রক্তে পরিবাহিত হয়ে বিভিন্ন স্থানের কলাকোশে $O_2$ সরবরাহ করে।
2. **কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিবহন**—কলাকোশে উৎপন্ন মুক্ত $CO_2$ হিমোগ্লোবিন সঙ্গে যুক্ত হয়ে **কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন** নামে যৌগ গঠন করে। এই যৌগ ফুসফুসে যায় ও $CO_2$ নির্গত করে।
3. **রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ**—হিমোগ্লোবিন থেকে দেহের বিভিন্ন রকম রঞ্জক পদার্থ, যেমন—বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন স্টারকোবিলিনোজেন (মলের রঞ্জক কণা), ইউরোবিলিনোজেন (মূত্রের রঞ্জক কণা) প্রভৃতি তৈরি হয়।
4. **অম্ল-ক্ষার সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ**—হিমোগ্লোবিন বাফারের মতো কাজ করে এবং দেহে অম্ল-ক্ষার সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

**● হিমোগ্লোবিন কেন লোহিত কণিকায় থাকে ? প্লাজমায় থাকলে কী ঘটবে ? ●**

1. **হিমোগ্লোবিন লোহিত কণিকায় থাকার কারণ**—অস্থিমজ্জায় হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ লোহিত কণিকার মধ্যে ঘটে। হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন উপাদান, যেমন—লৌহ, ভিটামিন ইত্যাদি অস্থিমজ্জায় থাকে। ফলে অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা এবং তার মধ্যে হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ ঘটে।
2. **হিমোগ্লোবিন লোহিত কণিকাতে না থেকে প্লাজমাতে থাকলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা দেবে—**
   (i) রক্তের সান্দ্রতা বেড়ে যাবে। প্লাজমার অভিস্রবণ চাপ বেড়ে যাবে, ফলে রক্তজালকের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ও মূত্র উৎপাদন ব্যাহত হবে।
   (ii) গ্লোমেরুলার রক্তজালকের ছিদ্র দিয়ে পরিস্রুত হয়ে হিমোগ্লোবিন মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে।
   (iii) মূত্র দিয়ে বেরিয়ে গেলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাবে, ফলে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যাবে।

## ◎ 2.5. শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscle - WBC) ◎

### ▲ শ্বেত রক্তকণিকার সংজ্ঞা, গঠন, সংখ্যা, জীবনকাল, শ্রেণিবিন্যাস এবং কাজ (Definition, Structure, Number, Life span, Classification and Functions of WBC)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** রক্তের নিউক্লিয়াসযুক্ত, তুলনামূলকভাবে বড়ো অনিয়তাকার বর্ণহীন রক্তকণিকাকে শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) বা লিউকোসাইট (Leucocyte) বলে।

(b) **গঠন (Structure) :** শ্বেত রক্তকণিকার আয়তন প্রধানত অনিয়ত গোলাকার অথবা গোলাকার হয়। সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত বা দানাবিহীন হয়, এতে নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না এই কারণে এটি বর্ণহীন হয়। শ্বেত কণিকার ব্যাস 8-18 μm হয়।

(c) **সংখ্যা (Number) :** প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা 6000–8000। শ্বেতকণিকার সংখ্যা লোহিত রক্ত-কণিকার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হয় (এদের অনুপাত অর্থাৎ WBC : RBC = 1 : 700)।

(d) **জীবনকাল (Life span) :** শ্বেত রক্তকণিকার আয়ু কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন (1-15 দিন) হয়।

(e) **শ্রেণিবিন্যাস (Classification) :** সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি এবং রঞ্জকের প্রতি শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমীয় দানার আসক্তি, নিউক্লিয়াসে লোবের সংখ্যা, কোশের আয়তন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে শ্বেতকণিকাকে

প্রথমে দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— **দানাদার শ্বেতকণিকা বা গ্র্যানুলোসাইট** এবং **অদানাদার শ্বেতকণিকা বা আগ্র্যানুলোসাইট। দানাদার শ্বেতকণিকা তিন প্রকারের** হয়, যেমন— নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল এবং অদানাদার শ্বেতকণিকা দুই প্রকার, যথা— লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট।

চিত্র 2.5 : ছবিসহ রক্তকণিকার শ্রেণিবিন্যাস।

1. **নিউট্রোফিল (Neutrophil) :**

| | |
|---|---|
| ❑ **গঠন**—নিউট্রোফিল দানাদার লিউকোসাইট বা শ্বেতকণিকা, কারণ এর সাইটোপ্লাজমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা সমান ভাবে ছড়ানো থাকে। নিউক্লিয়াসটি 2-7 লোবযুক্ত হয়। পরিণত অবস্থায় লোবের সংখ্যা বাড়ে। দানাগুলি প্রশমিত রঞ্জকে রঞ্জিত হয় বলে এই রকম শ্বেতকণিকাকে **নিউট্রোফিল** (Neutrophil) বলে (চিত্র 2.5 দেখো)। নিউট্রোফিলে লোব তৈরি হওয়ার আগের অবস্থাকে **স্ট্যাব কোশ** (Stab cell) বলে। | (i) **আয়তন**— 10–12 μm (মাইক্রোমিটার) ব্যাসযুক্ত।<br>(ii) **সংখ্যা**— মোট শ্বেতকণিকার 60–70%।<br>(iii) **উৎপত্তি**— লোহিত অস্থি মজ্জা।<br>(iv) **জীবনকাল**— 10-14 দিন।<br>(v) **কাজ— আগ্রাসন**। এই প্রক্রিয়ায় নিউট্রোফিল জীবাণুকে গ্রাস করে ধ্বংস করে। |

2. **ইওসিনোফিল (Eosinophil) :**

| | |
|---|---|
| ❑ **গঠন**—ইওসিনোফিল দানাদার শ্বেতকণিকা, কারণ এর সাইটোপ্লাজমে মোটা দানা ছড়ানো থাকে। নিউক্লিয়াসটি 2-3 লোব বা লতিযুক্ত হয়। দানাগুলি অম্লজাতীয় ইওসিন দিয়ে রঞ্জিত হয় বলে এই রকম শ্বেতকণিকাকে **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) বলে (চিত্র 2.5 দেখো)। | (i) **আয়তন**—10–12 μm ব্যাসযুক্ত।<br>(ii) **সংখ্যা**—মোট শ্বেতকণিকার 2–4%।<br>(iii) **উৎপত্তি**—লোহিত অস্থি মজ্জা।<br>(iv) **জীবনকাল**—8-12 দিন।<br>(v) **কাজ**—ইওসিনোফিল **অ্যালার্জির উপসর্গ** দমন (অ্যান্টি অ্যালার্জিক) করে। |

3. **বেসোফিল (Basophil) :**

| | |
|---|---|
| ❑ **গঠন**—বেসোফিল দানাদার শ্বেতকণিকা, কারণ এর সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আয়তনের বড়ো বড়ো (মোটা) দানা ছড়ানো থাকে। নিউক্লিয়াসটি দ্বিলোবযুক্ত বা বৃক্কাকার হয়। দানাগুলি বেসিক অর্থাৎ ক্ষারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয় বলে এই রকম শ্বেতকণিকাকে **বেসোফিল** (Basophil) বলে (চিত্র 2.5 দেখো)। | (i) **আয়তন**—8–10 μm ব্যাসযুক্ত।<br>(ii) **সংখ্যা**—মোট শ্বেতকণিকার 0–1%।<br>(iii) **উৎপত্তি**—লোহিত অস্থি মজ্জা।<br>(iv) **জীবনকাল**—12-15 দিন।<br>(v) **কাজ**—বেসোফিল **হেপারিন** নামে রক্ততঞ্চনরোধকারী পদার্থ উৎপন্ন করে। |

4. **লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) ঃ**

| | |
|---|---|
| ❑ **গঠন**—লিম্ফোসাইট অদানাদার (দানাবিহীন) শ্বেতকণিকা, কারণ এদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না। নিউক্লিয়াসটি বড়ো এবং সাধারণত গোলাকার হয়। লিম্ফোসাইট দু'রকমের হয়, যেমন—**ছোটো লিম্ফোসাইট** (Small lymphocyte) এবং **বড়ো লিম্ফোসাইট** (Large lymphocyte) (চিত্র 2.5 দেখো)। | (i) **আয়তন**—ছোটো লিম্ফোসাইট 8 μm এবং বড়ো লিম্ফোসাইট 10–12 μm ব্যাসযুক্ত।<br>(ii) **সংখ্যা**—মোট শ্বেতকণিকার 25%।<br>(iii) **উৎপত্তি**—প্লিহা এবং লসিকা গ্রন্থি।<br>(iv) **জীবনকাল**—1-3 দিন।<br>(v) **কাজ**—অ্যান্টিবডি তৈরি করে দেহে প্রবেশকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে। |

5. **মনোসাইট (Monocyte) ঃ**

| | |
|---|---|
| ❑ **গঠন**—মনোসাইট অদানাদার শ্বেতকণিকা, কারণ এর সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না। সাইটোপ্লাজম ঘসা কাচের মতো অস্বচ্ছ হয়। নিউক্লিয়াসটি সাধারণত বৃক্কাকৃতি হয়। **মনোসাইট** (Monocyte) রক্তকণিকার সব থেকে বড়ো কণিকা (চিত্র 2.5 দেখো)। | (i) **আয়তন**—10–18 μm ব্যাসযুক্ত।<br>(ii) **সংখ্যা**—মোট শ্বেতকণিকার 2–5%।<br>(iii) **উৎপত্তি**—প্লিহা ও অস্থি মজ্জা।<br>(iv) **জীবনকাল**—2-4 দিন।<br>(v) **কাজ**—**আগ্রাসন** পদ্ধতিতে রক্তে প্রবেশকারী জীবাণুকে গ্রাস করে। |

● **অদানাদার (অ্যাগ্রানুলোসাইট) ও দানাদার (গ্র্যানুলোসাইট) শ্বেত রক্তকণিকার পার্থক্য (Difference between Granulocyte and Agranulocyte) ঃ**

| অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত রক্তকণিকা | গ্র্যানুলোসাইট শ্বেত রক্তকণিকা |
|---|---|
| 1. এই প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না। | 1. এই প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে। |
| 2. এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত দু' প্রকার, যেমন— লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। | 2. এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা তিন প্রকার, যেমন— ইউসিনোফিল, বেসোফিল এবং নিউট্রোফিল। |
| 3. অদানাদার শ্বেতকণিকাগুলি লোহিত অস্থিমজ্জা এবং লসিকাগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। | 3. দানাদার শ্বেতকণিকাগুলি লোহিত অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 4. এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াসে লোব বা খণ্ড থাকে না। | 4. এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াস একাধিক খণ্ড বা লোববিশিষ্ট হয়। |

● **শ্বেতকণিকার শতকরা (পার্থক্য সূচক) গণনা (Differential Count or DC of WBC) ঃ**

❖ (i) **পার্থক্য সূচক গণনার সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় রক্তের বিভিন্ন রকমের শ্বেতকণিকার শতকরা সংখ্যা গণনা করা হয় তাকে পার্থক্যসূচক গণনা (Differential Count সংক্ষেপে DC) বলে।**

(ii) **পার্থক্য সূচক গণনার পদ্ধতি ঃ** লিশম্যান (Leishmann) রঞ্জক দিয়ে রঞ্জিত একটি স্লাইডের উপর রক্তের প্রলেপকে (Blood film) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চশক্তি অভিলক্ষ্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করে এবং 100টি শ্বেতকণিকার সংখ্যা গণনা করে শ্বেত রক্তকণিকার শতকরা হিসাব পাওয়া যায়।

(iii) **শ্বেতকণিকার সংখ্যা ঃ**

1. নিউট্রোফিলের সংখ্যা — 60–70 শতাংশ।
2. ইওসিনোফিলের সংখ্যা — 2–4 শতাংশ।
3. বেসোফিলের সংখ্যা — 0–1 শতাংশ।
4. লিম্ফোসাইটের সংখ্যা — 25–30 শতাংশ।
5. মনোসাইটের সংখ্যা — 5–10 শতাংশ।

(f) **শ্বেতকণিকা বা WBC-এর কাজ (Functions of WBC) ঃ**

1. **ফ্যাগোসাইটোসিস** (Phagocytosis)—**নিউট্রোফিল** এবং **মোনোসাইট** শ্বেত রক্তকণিকাগুলি আগ্রাসন পদ্ধতিতে বিজাতীয় পদার্থ ও ব্যাকটেরিয়াকে আত্মসাৎ করে এবং তাদের পাচিত করে।
2. **অ্যান্টিবডি উৎপাদন** (Formation of antibody)—**লিম্ফোসাইট** অ্যান্টিবডি নামে একপ্রকার প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়।
3. **ফাইব্রোব্লাস্ট উৎপাদন** (Synthesis of fibroblast)—**লিম্ফোসাইট** প্রদাহ (area of inflammation) অঞ্চলে ফাইব্রোব্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে দেহের ক্ষয়পূরণের কাজ করে।
4. **হেপারিন ক্ষরণ** (Secretion of heparin)—**বেসোফিল** হেপারিন ক্ষরণ করে রক্তনালির ভিতরে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না।
5. **অ্যালার্জিবিরোধী কাজ** (Anti-allergic action)—**ইওসিনোফিল** মধ্যস্থ হিস্টামিন দেহকে অ্যালার্জির হাত থেকে রক্ষা করে।

● **মানুষের লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্য (Difference between human Red and White blood Corpuscles) ঃ**

| লোহিত রক্তকণিকা | শ্বেত রক্তকণিকা |
|---|---|
| 1. দ্বি-অবতল, গোলাকার নিউক্লিয়াসবিহীন রক্তকণিকা। | 1. অ্যামিবা-সদৃশ বা অনিয়তাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত রক্তকণিকা। |
| 2. সংখ্যায় বেশি থাকে। | 2. সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম থাকে। |
| 3. হিমোগ্লোবিন থাকে বলে এর রং লাল হয়। | 3. হিমোগ্লোবিন থাকে না বলে বর্ণহীন হয়। |
| 4. এর কোনো প্রকারভেদ নেই। | 4. এটি পাঁচ প্রকারের হয়। |
| 5. গ্যাসীয় আদানপ্রদান লোহিত কণিকার প্রধান কাজ। | 5. সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং দেহের প্রতিরক্ষা শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ। |

## ❂ 2.6. অণুচক্রিকা (Platelet) ❂

### ▲ অণুচক্রিকার সংজ্ঞা, গঠন, সংখ্যা, উৎপত্তি, জীবনকাল, পরিণতি এবং কাজ (Definition, Structure, Number, Origin, Life span, Fate and Functions of Thrombocyte)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ রক্তে সব থেকে ছোটো নিউক্লিয়াসবিহীন কণিকা যা রক্ততঞ্চনে অংশ নেয় তাকে অণুচক্রিকা (Platelets) বা থ্রমবোসাইট (Thrombocyte) বলে।**

(b) **গঠন (Structure) ঃ** অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন গোলাকার বা ডিম্বাকার দ্বি-অবতল ছোটো চাকতির মতো রক্তের সাকার উপাদান। প্রতিটি অণুচক্রিকার প্রায় 2·5μm ব্যাসসম্পন্ন হয়। এদের সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় 2·5 লক্ষের মতো।

(c) **সংখ্যা (Number) ঃ** প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা— 2·5–5 লক্ষ।

(d) **উৎপত্তি (Origin) ঃ** অণুচক্রিকা অস্থিমজ্জার **মেগাক্যারিওসাইট** নামে একপ্রকার ক্ষণপদযুক্ত, দৈত্যাকৃতি কোশ থেকে উৎপন্ন হয়। এই কোশের ক্ষণপদগুলি ভেঙে গিয়ে অণুচক্রিকা তৈরি হয়।

(e) **জীবনকাল (Life span) ঃ** অণুচক্রিকার গড় আয়ু তিন দিন।

(f) **পরিণতি (Fate) ঃ** জীবনকালের শেষে প্লিহা এবং অন্যান্য আগ্রাসন কোশে অণুচক্রিকাগুলি বিনষ্ট হয়।

(g) **কার্যাবলি (Functions) :** (i) **রক্ততঞ্চন**— রক্তক্ষরণের সময় অণুচক্রিকা ভেঙে গিয়ে থ্রমবোপ্লাস্টিন নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ তঞ্চনকারী উপাদান উৎপন্ন করে যা রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে।

(ii) **মেরামতি** — রক্তজালকের ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকাগুলি অন্তরাবরণী গায়ে এঁটে মেরামতি কাজে সাহায্য করে।

(iii) বিনষ্ট অণুচক্রিকা থেকে হিস্টামিন, 5-হাইড্রোক্সিট্রিপটামিন জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়।

- **লিম্ফোসাইট ও থ্রমবোসাইটের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Lymphocyte and Thrombocyte) :**

| লিম্ফোসাইট | থ্রমবোসাইট |
|---|---|
| 1. শ্বেত রক্তকণিকার অন্তর্গত এক ধরনের রক্তকণিকা। | 1. অণুচক্রিকা হল রক্তের প্রধান তিন রকম কণিকার অন্যতম রক্তকণিকা। |
| 2. এর আকৃতি অনিয়তাকার হয়। | 2. এর আকৃতি ডিম্বাকার বা মাকুর মতো হয়। |
| 3. এটি নিউক্লিয়াসযুক্ত রক্তকণিকা। | 3. এটি নিউক্লিয়াসবিহীন রক্তকণিকা। |
| 4. অ্যান্টিবডি গঠন করে অনাক্রম্যতা রক্ষা করে। | 4. থ্রমবোপ্লাস্টিন তৈরি করে রক্ততঞ্চনে সহায়তা করে। |

## 2.7. রক্ততঞ্চন (Coagulation of Blood)

### ▲ রক্ততঞ্চনের সংজ্ঞা, পদ্ধতি, ফ্যাক্টর, মতবাদ এবং তঞ্চনরোধক পদার্থ (Definition, Mechanism, Clotting factors, Theories of coagulation and Anti-coagulation substances)

❖ (a) **রক্ততঞ্চনের সংজ্ঞা (Definition of Blood coagulation) :** **যে ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহের ক্ষত স্থান থেকে নির্গত তরল রক্ত কিছু সময়ের মধ্যে অর্ধকঠিন জেলির মতো পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাকে রক্ততঞ্চন বলে।**

(b) **রক্ততঞ্চন পদ্ধতি (Mechanism of Blood coagulation) :**

(i) **ভৌত প্রক্রিয়া**—ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গমনের সময় ক্ষতস্থানে **ফাইব্রিন** উৎপন্ন হয়। ফাইব্রিন হল সূক্ষ্ম তন্তুর মতো অংশ যা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি তন্তুজাল গঠন করে। এই তন্তুজালের মধ্য দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়ার সময় লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকাগুলি আটকে পড়ে ক্রমশ জমাট বেঁধে যায়, ফলে রক্ত বাইরে বেরোতে পারে না। এভাবেই রক্ত তঞ্চিত হয়।

রক্তনালির (রক্তবাহের) বাইরের রক্ত-জমাট পদ্ধতিকে **রক্ততঞ্চন** এবং রক্তবাহের ভিতরে রক্ত জমাট পদ্ধতিকে **থ্রমবোসিস** (Thrombosis) বলে।

(ii) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**—রক্ততঞ্চনের জন্য দায়ী 13টি বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় উপাদান বা ফ্যাক্টর (Factors)। এর মধ্যে **থ্রমবোপ্লাস্টিন** নামে কেবলমাত্র একটি ফ্যাক্টর রক্তে থাকে না, আর বাদ বাকি 12টি ফ্যাক্টর প্লাজমায় থাকে। দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে সেই অংশের বিনষ্ট কলাকোশ থেকে এবং ভগ্ন অণুচক্রিকা থেকে **থ্রমবোপ্লাস্টিন** উৎপন্ন হয়। থ্রমবোপ্লাস্টিন ক্যালশিয়াম ($Ca^{++}$) আয়নের উপস্থিতিতে প্রোথ্রম্বিনকে সক্রিয় **থ্রম্বিনে** রূপান্তরিত করে। পরে এই থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে **ফাইব্রিনে** রূপান্তরিত করে রক্তের তঞ্চন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
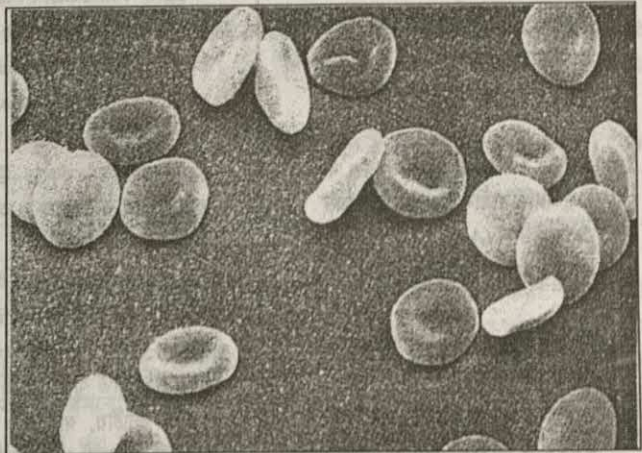
চিত্র 2.6 : রক্ততঞ্চনের সময় RBC, WBC (বড়ো কাঁটাওয়ালা কোশ) এবং কিছু ছোটো ছোটো অণুচক্রিকা তন্তুময় জালকের আটকে পড়া অবস্থা।

(c) **রক্ততঞ্চনের জন্য দায়ী বিভিন্ন উপাদান বা ফ্যাক্টর (Factors responsible for blood coagulation) ঃ** ফ্যাক্টরগুলি সংখ্যায় 13 টি, যেমন—(1) ফ্যাক্টর I বা ফাইব্রিনোজেন, (2) ফ্যাক্টর II বা প্রোথ্রম্বিন, (3) ফ্যাক্টর III বা থ্রমবোপ্লাস্টিন, (4) ফ্যাক্টর IV বা ক্যালশিয়াম আয়ন, (5) ফ্যাক্টর V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর, (6) ফ্যাক্টর VI বা অ্যাক্‌সিলেরিন, (7) ফ্যাক্টর VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর, (8) ফ্যাক্টর VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর, (9) ফ্যাক্টর IX বা খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর, (10) ফ্যাক্টর X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর, (11) ফ্যাক্টর XI বা প্লাজমা থ্রমবোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট, (12) ফ্যাক্টর XII বা হ্যাগ্‌ম্যান ফ্যাক্টর এবং (13) ফ্যাক্টর XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজার ফ্যাক্টর।
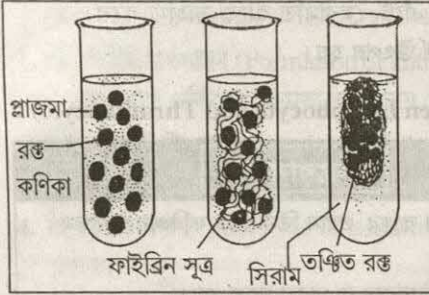
চিত্র 2.7 ঃ ভৌত প্রক্রিয়ায় রক্ততঞ্চনের সরল চিত্ররূপ।

এই সব ফ্যাক্টরগুলি সাধারণ প্রবহমান রক্তে নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু রক্ততঞ্চনের সময় সক্রিয় হয়। ফ্যাক্টর I, II, XII, XIII ছাড়া অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলি থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।

1. **স্বাভাবিক রক্তে**—ফাইব্রিনোজেন + প্রোথ্রম্বিন + $Ca^{++}$ ⟶ রক্ত তঞ্চিত হয় না।
   **কারণ**— স্বাভাবিক রক্তে থ্রমবোপ্লাস্টিন থাকে না।
2. **ক্ষতস্থানে রক্ততঞ্চন**—ক্ষতস্থানে থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয়, ফলে রক্তের তঞ্চন ঘটে।
   **কারণ**—ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত কয়েকটি পর্যায়ে ঘটে।

(i) বিদীর্ণ কলাকোশ কিংবা ভগ্ন অণুচক্রিকা —(প্লাজমার তঞ্চনকারী উপাদান)⟶ থ্রমবোপ্লাস্টিন

(ii) প্রোথ্রম্বিন —(থ্রমবোপ্লাস্টিন + $Ca^{++}$)⟶ থ্রম্বিন; (iii) ফাইব্রিনোজেন —(থ্রম্বিন)⟶ ফাইব্রিন (তঞ্চনপিণ্ড)

- **রক্ততঞ্চনকারী 13টি ফ্যাক্টর (13 Clotting factors of Blood) ঃ**

| ফ্যাক্টর | রাসায়নিক প্রকৃতি এবং তঞ্চনের ভূমিকা |
|---|---|
| 1. ফ্যাক্টর I বা ফাইব্রিনোজেন | প্রোটিন জাতীয়, প্লাজমায় থাকে, যকৃতে সংশ্লেষিত হয় এবং তঞ্চনের সময় ফাইব্রিনোজেন ফাইব্রিনে পরিণত হয়। |
| 2. ফ্যাক্টর II বা প্রোথ্রম্বিন | প্রোটিন জাতীয়, প্লাজমায় থাকে, যকৃতে ভিটামিন K-র সাহায্যে সংশ্লেষিত হয় এবং তঞ্চনের সময় প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিনে পরিণত হয়। |
| 3. ফ্যাক্টর III বা প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর বা থ্রমবোপ্লাস্টিন | প্রোটিন জাতীয়, প্রবাহমান রক্তে থাকে না, তঞ্চনের সময় বিদীর্ণ কলাকোশ অথবা ভগ্ন অণুচক্রিকা থেকে বিভিন্ন রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টরের উপস্থিতিতে উৎপন্ন হয়। |
| 4. ফ্যাক্টর IV বা ক্যালশিয়াম আয়ন | স্বাভাবিক রক্তের প্লাজমায় থাকে। রক্ততঞ্চনের সময় প্রথম ও শেষ ধাপ ছাড়া প্রতিটি ধাপে $Ca^{2+}$-এর প্রয়োজন হয়। |
| 5. ফ্যাক্টর V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাক্সিলারিন বা অ্যাক্সিলারেট গ্লোবিউলিন (AcG) | প্রোটিন জাতীয়, যকৃতে উৎপন্ন হয়, প্লাজমায় থাকে, সাশ্রয়ী এবং পরাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে, তঞ্চনের সময় এটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়ে যায়। |
| 6. ফ্যাক্টর VI বা অ্যাক্‌সিলারিন | সম্ভবত এটি প্রোঅ্যাকিলারিনের সক্রিয়করণের উৎপাদিত লব্ধ পদার্থ, স্বাভাবিক প্লাজমায় এর উপস্থিতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা নেই। |
| 7. ফ্যাক্টর VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন | প্রোটিন জাতীয়, যকৃতে উৎপন্ন হয়, ভিটামিন K-এর অনুপস্থিতে এর উৎপাদন হ্রাস ঘটে, কলাজাত বা পরাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদনে অংশ নেয়। |
| 8. ফ্যাক্টর VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর-A (AHF) অ্যান্টি হিমোফিলিক গ্লোবিন (AHB) | প্রোটিন জাতীয়, স্বাভাবিক অবস্থায় প্লাজমায় থাকে, কিন্তু তঞ্চনের সময় অদৃশ্য হয়ে যায়, সাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে, এই ফ্যাক্টরের অভাবে হিমোফিলিয়া-A নামে রোগ হয়। |

| ফ্যাক্টর | রাসায়নিক প্রকৃতি এবং তঞ্চনের ভূমিকা |
|---|---|
| 9. ফ্যাক্টর IX বা খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর বা প্লাজমা থ্রমবোপ্লাস্টিন এন্টিসিডেন্ট (PTA) বা প্লেটলেট কো-ফ্যাক্টর II বা অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর-B (AHF-B) | প্রোটিনজাতীয়, যকৃতে উৎপন্ন হয়, এই ফ্যাক্টরটি খ্রিস্টমাস নামে রোগীর প্লাজমায় পাওয়া গিয়েছিল (তাই খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর নামে পরিচিত), সাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে, এর অভাবে **হিমোফিলিয়া-B** রোগ হয়। |
| 10. ফ্যাক্টর X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর বা পাওয়ার ফ্যাক্টর বা থ্রমবোকাইজেন | এই ফ্যাক্টরটির বৈশিষ্ট্য অনেকটা ফ্যাক্টর VIII-এর মতো, প্রোটিন জাতীয় এবং যকৃতে তৈরি হয়। |
| 11. ফ্যাক্টর XI বা প্লাজমা থ্রমবোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট (PTA) বা অ্যান্টি-হিমোফিলিক ফ্যাক্টর-C | প্লাজমায় অবস্থিত এই প্রোটিন জাতীয় ফ্যাক্টর থ্রম্বিন উৎপাদনে সাহায্য করে, এর অভাবে **হিমোফিলিয়া C** রোগ হয়। |
| 12. ফ্যাক্টর XII বা হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর বা কনটাক্ট ফ্যাক্টর বা গ্লাস ফ্যাক্টর | প্লাজমায় অবস্থিত এই প্রোটিনজাতীয় নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর অমসৃণ তলের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয় এবং রক্তবাহের ভেদ্যতা ও প্রসারণ ক্ষমতাকে বৃধি করে। |
| 13. ফ্যাক্টর XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর (FSF) বা ফাইব্রিনেজ বা ল্যাক লোরান্ড ফ্যাক্টর (LLF) | প্রোটিনজাতীয় এই ফ্যাক্টর সক্রিয় অবস্থায় $Ca^{2+}$-এর উপস্থিতিতে কোমল ফাইব্রিন তঞ্চনপিণ্ডকে কঠিন তন্তুময় অবস্থায় পরিণত করে। |

### ◘ রক্ততঞ্চন পদ্ধতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা (Modern concept about coagulation of blood) :

রক্ততঞ্চন একটি **এনজাইম সক্রিয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া**। আধুনিক ধারণা অনুসারে রক্ততঞ্চন তিনটি পর্যায়ে ঘটে—

উপরে উল্লিখিত রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে $Ca^{2+}$ ছাড়া প্রায় সব কটি ফ্যাক্টর প্রোটিন জাতীয় এবং এগুলির মধ্যে ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন প্লাজমায় থাকে, প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর স্বাভাবিক প্রবহমান রক্তে থাকে না এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলি প্লাজমার সিরামে থাকে। এছাড়া ফ্যাক্টর VI-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও স্পষ্টভাবে ধারণা পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের তঞ্চনকারী ফ্যাক্টরগুলি ($Ca^{2+}$ ব্যতীত) নিষ্ক্রিয় থাকে। কোনো কারণে দেহের কোনো স্থানে রক্তবাহ (রক্তনালি) কেটে গেলে এই নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টরগুলি $Ca^{2+}$ এবং কলার ফ্যাক্টর (Tissue factors)-এর উপস্থিতিতে সক্রিয় হয়। প্রথমে কয়েকটি ফ্যাক্টর বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতিতে সক্রিয় হয়ে প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটরে (থ্রমবোপ্লাসটিনে) পরিণত হয়। এটি রক্ততঞ্চনের প্রথম ধাপ বা পর্যায়। এরপর এই সক্রিয়ক প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর প্রোথ্রম্বিনকে সক্রিয় করে অর্থাৎ **থ্রম্বিনে** পরিণত করে। এটি রক্ততঞ্চনের দ্বিতীয় পর্যায়। এরপর নিষ্ক্রিয় ফাইব্রিনোজেন সক্রিয় হয়ে **ফাইব্রিনে** রূপান্তরিত হয়। এটি রক্ততঞ্চনের তৃতীয় পর্যায়।

1. **প্রথম পর্যায় : প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর (সক্রিয়ক) বা থ্রমবোপ্লাস্টিনের উৎপাদন (Formation of prothrombin activator or Thromboplastin)**—প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর (সক্রিয়ক)-এর উৎপাদন দুটি পথের মাধ্যমে ঘটে, যেমন—**অন্তঃস্থ বা সাশ্রয়ী পথ** এবং **বহিস্থ বা পরাশ্রয়ী পথ**।

(a) **সাশ্রয়ী পথ (Intrinsic pathway)**— এই পথে প্রোথ্রম্বিন অ্যাক্টিভেটর বা সাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপাদন হতে 4-5 মিনিট সময় লাগে। এই পর্যায়টি শুরু হয় নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর-XII-এর সক্রিয়করণের মাধ্যমে। বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত রক্তনালির অন্তরাবরণীর (এন্ডোথেলিয়ামের) নীচে অবস্থিত কোলাজেন তন্তুর সংস্পর্শে রক্ত এলে এই নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর XII সক্রিয় XII-এ রূপান্তরিত হয়। সক্রিয় XII ফ্যাক্টর XI-কে সক্রিয় করে তোলে। পরের ধাপে সক্রিয় ফ্যাক্ট XI নিষ্ক্রিয় XI কে সক্রিয় করে। এরপর ফ্যাক্টর VIII এবং অণুচক্রিকার উপস্থিতিতে সক্রিয় IX ফ্যাক্টর X-কে সক্রিয় করে। সক্রিয় ফ্যাক্টর X, ফ্যাক্টর V, $Ca^{2+}$ এবং অণুচক্রিকার উপস্থিতিতে সক্রিয় **থ্রমবোপ্লাস্টিন (সাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন)** উৎপন্ন হয়।

ভগ্ন অণুচক্রিকা বা বিদীর্ণ কলাকোশ $\xrightarrow{\text{তঞ্চনকারী ফ্যাক্টর ও } Ca^{++}}$ থ্রমবোপ্লাস্টিন

(b) **পরাশ্রয়ী পথ (Extrinsic pathway)**—এই পথ দিয়ে থ্রমবোপ্লাস্টিন হতে খুব কম সময় প্রায় 12 সেকেন্ড সময় লাগে। বিদীর্ণ কলাকোশের উপাদান নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টরকে VII-কে প্রথমে সক্রিয় করে, পরে এই সক্রিয় ফ্যাক্টর VII নিষ্ক্রিয় ফ্যাক্টর X-কে সক্রিয় করে যা সক্রিয় ফ্যাক্টর V ও $Ca^{2+}$ উপস্থিতিতে পরাশ্রয়ী থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয়।

2. **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ থ্রম্বিন উৎপাদন**—(থ্রম্বিন উৎপাদন হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে)। স্বাভাবিক প্লাজমাতে প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন এবং $Ca^{2+}$ এই তিনটি উপাদান থাকে, কিন্তু থ্রমবোপ্লাস্টিনের অনুপস্থিতিতে এরা তঞ্চন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। প্রথম পর্যায়ে উৎপন্ন সক্রিয় থ্রমবোপ্লাস্টিন উৎসেচকের মতো ক্রিয়া করে $Ca^{2+}$ উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিনকে সক্রিয় থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে।

$$\text{প্রোথ্রম্বিন} \xrightarrow{\text{থ্রমবোপ্লাস্টিন, } Ca^{2+}} \text{থ্রম্বিন}$$
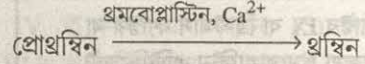
3. **তৃতীয় পর্যায় ঃ ফাইব্রিন উৎপাদন**— ফাইব্রিন উৎপাদন হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। থ্রম্বিন উৎপন্ন হওয়ার পর এটি ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে। ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে রূপান্তরের সময় থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনের 4টি ফাইব্রিনো পেপটাইড যোজক বিচ্ছিন্ন করে এবং প্রথমে **ফাইব্রিন মনোমার** গঠন করে। ফাইব্রিন মনোমার পরস্পর সংযুক্ত হয়ে **ফাইব্রিন পলিমার** গঠন করে।

থ্রম্বিন একই সঙ্গে ফ্যাক্টর XIII-কে $Ca^{++}$ আয়নের উপস্থিতিতে সক্রিয় XIII ফ্যাক্টরে পরিণত করে। সক্রিয় XIII ফ্যাক্টর $Ca^{++}$ সহায়তায় দ্রবণীয় ফাইব্রিন পলিমারকে **অদ্রবণীয় ফাইব্রিন** পলিমারে পরিণত করে। অদ্রবণীয় ফাইব্রিন তন্তু যে তন্তুজাল গঠন করে, রক্তকণিকাগুলি তার মধ্যে আটকে পড়ে **তঞ্চনপিণ্ড** (Clot) সৃষ্টি করে।
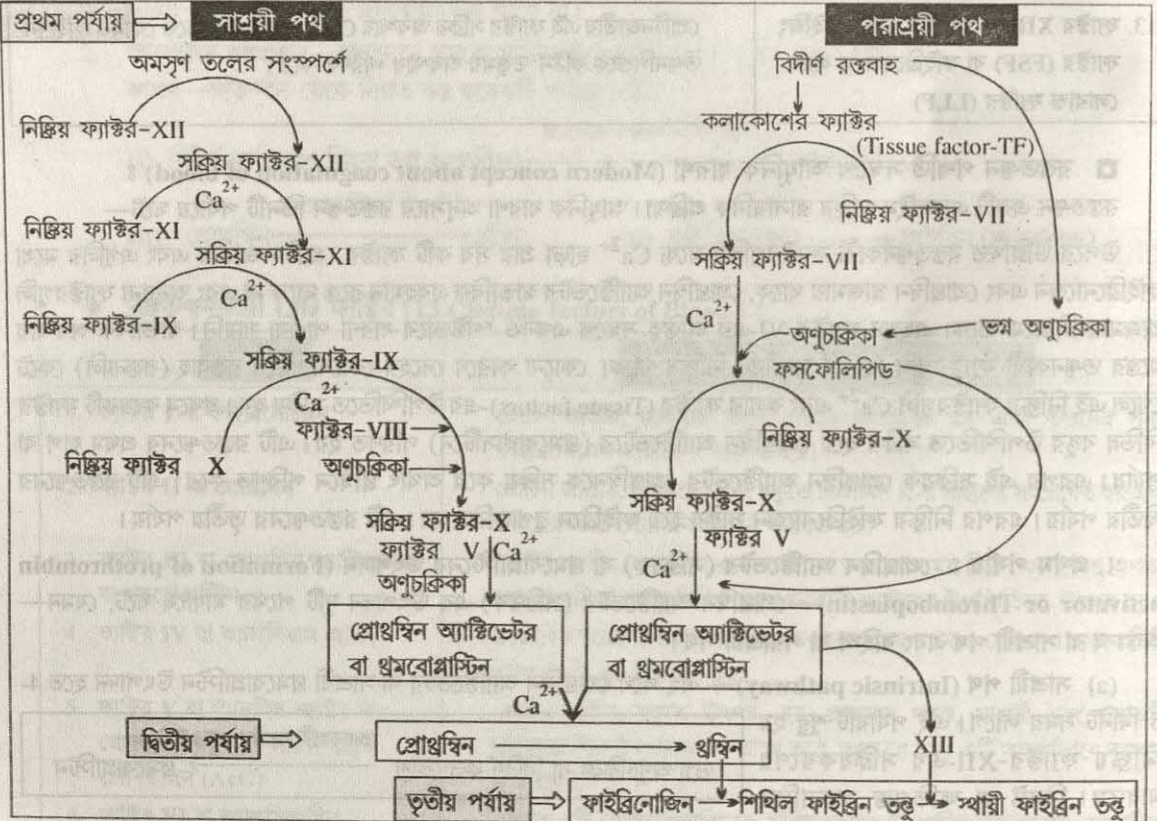
চিত্র 2.8 ঃ রক্ততঞ্চনকালে থ্রোমবোপ্লাস্টিন, থ্রম্বিন এবং ফ্রাইবিন উৎপাদনের ছক।

**● জ্যান্ত টেস্ট টিউব (Living Test Tube) ●**

ঘোড়ার জুগুলার নামে একটি শিরার দু'দিকে সুতো দিয়ে বেঁধে মূল শিরা থেকে কেটে আলাদা করলেও দেখা যাবে যে শিরার ভিতর রক্ত তঞ্চিত হয় না। রক্ত সম্বলিত এই শিরাকে জ্যান্ত টেস্ট টিউব বলে। এই পরীক্ষাটিকে **জ্যান্ত পরীক্ষণ নলের পরীক্ষা** (Living test tube experiment) বলা হয়।

## ▲ রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ (Anticoagulant substance of Blood) :

❖ (a) **রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থের সংজ্ঞা :** যেসব পদার্থ রক্ততঞ্চনে বাধা দেয় তাদের রক্ত তঞ্চনরোধক পদার্থ (অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট —**Anticoagulant**) বলে।

(b) **রক্ততঞ্চনরোধক পদার্থের উদাহরণ :** (i) সোডিয়াম সাইট্রেট, (ii) সোডিয়াম অক্সালেট এবং (iii) হেপারিন। (iv) এছাড়া হিরুডিন, পটাশিয়াম অক্সালেট, কোনো কোনো সাপের বিষ, অ্যাসপিরিন, প্রোটামিন, পেপটোন ইত্যাদি রক্ত তঞ্চনরোধক পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয়।

(c) **রক্ততঞ্চনরোধক পদার্থের বিক্রিয়া :**

(i) **সোডিয়াম সাইট্রেট তঞ্চনবিরোধী ক্রিয়া**— এই রক্ততঞ্চনরোধক রাসায়নিক পদার্থটি প্লাজমাস্থিত $Ca^{++}$ আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **ক্যালশিয়াম সাইট্রেট** যৌগ গঠন করে। এই কারণে মুক্ত $Ca^{++}$-এর অভাব ঘটে। $Ca^{++}$-এর অনুপস্থিতিতে রক্ত তঞ্চিত হতে পারে না।

(ii) **সোডিয়াম অক্সালেটের তঞ্চন বিরোধী ক্রিয়া**— একইভাবে **সোডিয়াম অক্সালেট** ক্যালশিয়াম আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালশিয়াম অক্সালেট তৈরি করে যার ফলে রক্ত তঞ্চিত হতে পারে না।

○ (i) **অক্সালেটযুক্ত নমুনা** রক্তকে পুনঃতঞ্চিত করতে হলে ওই রক্তে কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত $Ca^{++}$ যুক্ত করতে হবে। অতিরিক্ত $Ca^{++}$ আয়নের উপস্থিতিতে রক্ত আবার তঞ্চিত হবে।

অথবা, (ii) অক্সালেটযুক্ত রক্তের নমুনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঝাঁকালে ক্যালশিয়াম অক্সালেট যৌগ থেকে ক্যালশিয়াম আলাদা হয়ে যায়, ফলে ওই রক্ত আবার তঞ্চিত হয়।

● **হেপারিন (Heparin) : ❖ (i) সংজ্ঞা— যে রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ যকৃৎ, ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গ ও বেসোফিল শ্বেতকণিকা থেকে উৎপন্ন হয় তাকে হেপারিন বলে।**

(ii) **হেপারিনের উৎস**— হেপারিন মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় যৌগ কার্বোহাইড্রেট। হেপাটিক (যকৃৎ) কোশ থেকে ক্ষরিত হয় বলে এটি হেপারিন নামে পরিচিত। এছাড়া এটি অ্যারিওলার কলার মাস্ট কোশ এবং বেসোফিল শ্বেতকণিকা থেকেও ক্ষরিত হয়।

(iii) **হেপারিনের ক্রিয়া—হেপারিন** (Heparin) প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিন হতে দেয় না, ফলে ফাইব্রিনোজেন ফাইব্রিনে (তঞ্চনপিন্ড) রূপান্তরিত হতে পারে না। এই কারণে হেপারিনযুক্ত রক্ত তঞ্চিত হয় না।

## ✪ ব্লাড ব্যাংক (Blood Bank) :

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) : বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা হয় তাকে ব্লাড ব্যাংক (Blood Bank) বলে।**

● (b) **ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা (Procedure for Preservation of blood in Blood Bank) :** ব্লাড ব্যাংকে **সোডিয়াম সাইট্রেট** (Na-citrate) নামে রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ সহযোগে ডেক্সট্রোজ দ্রবণে +4°C উষ্ণতায় সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতি সংরক্ষিত রক্তকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ রাখা সম্ভবপর। এর কারণ সংরক্ষিত রক্তের লোহিত কণিকাগুলি স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকার মতোই বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এই কারণে বেশিদিন সংরক্ষিত পুরোনো রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ স্বাভাবিক রক্তকণিকার পরিমাণ থেকে অনেক কম হয়। এই বিষয়টি মনে রেখে সমগ্র রক্ত ব্যতীত প্লাজমা কিংবা সিরাম অথবা রক্ত কণিকাগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত করা যায়। এই সব পৃথক করে রাখা রক্তের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে দেহের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকাল **হিমায়িত প্লাজমার** ব্যবহার প্রচলন অধিক দেখা যায়। সম্পূর্ণ রক্ত থেকে প্লাজমাকে আলাদা করে এবং প্লাজমা থেকে জলীয় অংশ নিষ্কাশিত করে – 20°C উষ্ণতায় রাখলে তাকে হিমায়িত প্লাজমা বলে। এই ধরনের হিমায়িত প্লাজমার বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে কয়েক বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হয়। রোগীর প্রয়োজনে হিমায়িত প্লাজমাকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় রাখলে ব্যবহার উপযোগী হয়ে যায়। এভাবে **শুষ্ক প্লাজমা** (Dry plasma)-কে ব্যবহারের আগে প্রয়োজন মতো জলে মিশিয়ে তাকে জলীয় প্লাজমায় পরিবর্তিত করা যায়।

## ◎ 2.8. রক্তের গ্রুপ (Blood group) ◎

### ▲ মানুষের রক্তের ABO তন্ত্র ও তার নির্ণয় (ABO system of Man and its determination)

ভিয়েনার প্রখ্যাত চিকিৎসক **কার্ল ল্যান্ডস্টিনার** (Karl Landsteiner 1901) সর্বপ্রথম মানুষের দেহে রক্তের সঞ্চারণের (Transfusion) ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির ভিত্তিতে রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ করেন লোহিত কণিকার কোশপর্দার উপরে A এবং B নামে দু'রকম মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (Agglutinogen) বা **অ্যান্টিজেন** (Antigen) পদার্থ এবং প্লাজমায় α বা **Anti-A** এবং β বা **anti-B** নামে দু'রকম প্রোটিনজাতীয় **অ্যাগ্লুটিনিন** (Agglutinine) বা **অ্যান্টিবডি** (Antibody) থাকে। এই অ্যাগ্লুটিনোজেনের (অ্যান্টিজেন) উপস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষের রক্তকে **A, B, AB** এবং **O** নামে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। এইরকম রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে সাধারণভাবে **ABO গ্রুপ** বা **ABO-তন্ত্র** বলে।
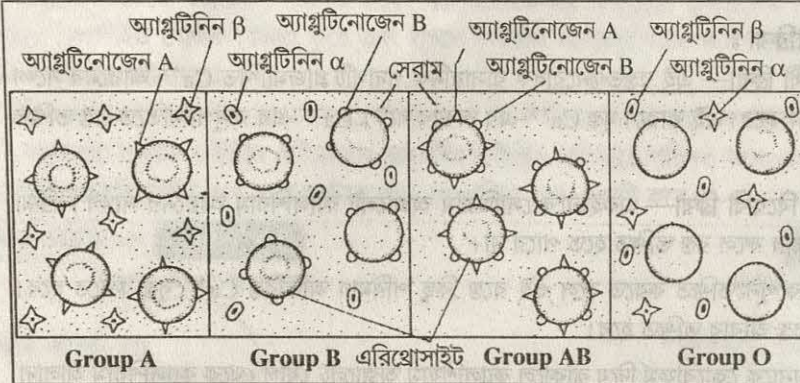
**চিত্র 2.9 :** লোহিত কণিকার উপরিতলে অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং প্লাজমায় অ্যাগ্লুটিনিনের উপস্থিতি অনুযায়ী রক্তের গ্রুপের চিত্ররূপ।

(1) **A-গ্রুপ (42%)** : এই গ্রুপ রক্তের লোহিত কণিকার গায়ে **A অ্যাগ্লুটিনোজেন** এবং প্লাজমায় **β–অ্যাগ্লুটিনিন** থাকে।

(2) **B-গ্রুপ (9%)** : এই গ্রুপ রক্তের লোহিত কণিকার গায়ে **B অ্যাগ্লুটিনোজেন** এবং প্লাজমায় **α–অ্যাগ্লুটিনিন** থাকে।

(3) **AB-গ্রুপ (3%)** : এই গ্রুপ রক্তের লোহিত কণিকার গায়ে **A** এবং **B অ্যাগ্লুটিনোজেন** থাকে কিন্তু প্লাজমায় কোনো **অ্যাগ্লুটিনিন** থাকে না।

(4) **O-গ্রুপ (46%)** : এই গ্রুপ রক্তের লোহিত কণিকার গায়ে কোনো **অ্যাগ্লুটিনোজেন** থাকে না কিন্তু প্লাজমায় α ও β দু'রকম **অ্যাগ্লুটিনিন** থাকে।

#### ◎ ABO-রক্তের শ্রেণি (গ্রুপ) নির্ণয় (Determination of ABO-Blood group) :

রক্ত সঞ্চারণের জন্য রক্তের শ্রেণি নির্ণয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন। দু'রকমের অ্যান্টিসিরাম (অ্যান্টিসিরাম A এবং অ্যান্টিসিরাম B) দিয়ে এর রক্তের শ্রেণি নির্ণয় করা হয়।

**চিত্র 2.10 :** রক্তের শ্রেণিনির্ণয়ের পদ্ধতি।

● **প্রণালী (Procedure)** : (i) দু'প্রকার অ্যান্টিসিরা, যেমন—অ্যান্টিসিরাম A (α-অ্যাগ্লুটিনিনযুক্ত সিরাম) এবং অ্যান্টিসিরাম B (β-অ্যাগ্লুটিনিনযুক্ত সিরাম) সংগ্রহ করে রাখা হল।

(ii) যে ব্যক্তির রক্তের শ্রেণি নির্ণয় করা হবে তার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেই নমুনা রক্তের সঙ্গে 3·8% সোডিয়াম সাইট্রেট দ্রবণ মেশানো হল।

(iii) একটি স্লাইডের ওপর একধারে এক ফোঁটা অ্যান্টিসিরাম A অন্য ধারে এক ফোঁটা অ্যান্টিসিরাম B নেওয়া হল।

(iv) অ্যান্টিসিরামের ওপর নমুনা রক্তের দ্রবণ নিয়ে ভালোভাবে মেশানো হল।

● **পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল (Observation and Result)** —(চিত্র 2.10 দেখ) ঃ

1. যদি অ্যান্টিসিরাম A-র সংস্পর্শে নমুনা রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে সেই রক্ত A শ্রেণির রক্ত।
2. যদি অ্যান্টিসিরাম B-র সংস্পর্শে নমুনা রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে তা B শ্রেণির রক্ত।
3. যদি অ্যান্টিসিরাম A এবং অ্যান্টিসিরাম B-র সংস্পর্শে দুটি নমুনা রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে তা AB শ্রেণির রক্ত।
4. যদি অ্যান্টিসিরাম A এবং B-র সংস্পর্শে দুটি নমুনা রক্ত জমাট না বাঁধে তাহলে তা O শ্রেণির রক্ত।

● **বিভিন্ন গ্রুপের রক্তে অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিনের প্রকারভেদ (Types of Agglutinogen and Agglutinine) ঃ**

| রক্তের শ্রেণি (%) | অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) | অ্যাগ্লুটিনিন (অ্যান্টিবডি) |
|---|---|---|
| A (42%) | A | (Anti B) অর্থাৎ β (বিটা) |
| B (9%) | B | (Anti A) অর্থাৎ α(আলফা) |
| AB (3%) | A এবং B | কোনো প্রকার অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না। |
| O (46%) | কোনো প্রকার অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে না | α (anti A) এবং β (anti B) |

## ▲ Rh-ফ্যাক্টর ও তার গুরুত্ব (Rh-factor and its Importance) ঃ

1940 খ্রিস্টাব্দে **কার্লস ল্যান্ডস্টিনার** এবং **উইনার** ( Karl Landsteiner and Wiener ) প্রথম Rh-ফ্যাক্টর আবিষ্কার করেন। এই দুজন বিজ্ঞানী ভারতীয় প্রজাতির রেসাস হনুমানের *(Rhesus macacus)* রক্তে একপ্রকার অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন। এই রক্তকে খরগোসের দেহে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের সিরামে এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হন। একে এঁরা **অ্যান্টি-Rh** নামে অভিহিত করেন। রেসাস বানরের নাম অনুসারে এই রকম রক্তের অ্যান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর (Rhessus factor) বা সংক্ষেপে **Rh-ফ্যাক্টর** বলে। রেসাস বানরের লোহিত কণিকা এইধরনের **অ্যাগ্লুটিনোজেন** অধিকাংশ (প্রায় 85%) লোকের রক্তে আছে। এর অনুরূপ কোনো অ্যাগ্লুটিনিন নেই।

**Rh-ফ্যাক্টরের গুরুত্ব (Significance of Rh-factor)**—যেসব লোকের **Rh-ফ্যাক্টর** রয়েছে তাদের **Rh-পজিটিভ** ( Rh +ve ) বলে। শতকরা 85 জন লোকের রক্তে Rh-ফ্যাক্টর পাওয়া যায়। যাদের Rh-ফ্যাক্টর নেই তাদের **Rh-নেগেটিভ** (Rh –ve) বলে। Rh +ve বিশিষ্ট লোকের রক্ত Rh –ve বিশিষ্ট লোকের দেহে প্রবেশ করালে প্রথমে কোনো অসুস্থতা দেখা যাবে না, কিন্তু এই লোকটির রক্তে **Rh-বিরোধী** বা **অ্যান্টি–Rh** (Anti-Rh) ফ্যাক্টর তৈরি হবে যা পরবর্তী সময়ে এই লোকের দেহে Rh +ve রক্ত আবার প্রবেশ করালে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি বিশ্লিষ্ট হবে।

### ● ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis foetalis) ●

Rh-ফ্যাক্টর বংশগতি সূত্রে পেয়ে থাকে। পিতামাতার মধ্যে একজন Rh +ve এবং অন্যজন Rh –ve হলে ভ্রূণের রক্ত সাধারণত Rh +ve হবে। ধরা যাক পিতা যদি Rh +ve এবং মাতা Rh –ve হয়, তাহলে ভ্রূণ Rh +ve হতে পারে। ভ্রূণের Rh +ve রক্ত প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে মায়ের রক্তে গিয়ে মায়ের রক্তের Rh-ve এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে **Rh -বিরোধী (Anti-Rh)** ফ্যাক্টর তৈরি করবে। এই Rh -বিরোধী ফ্যাক্টর (অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি) ভ্রূণের রক্তে ফিরে এসে আংশিক অ্যাগ্লুটিনেশান ঘটাবে অর্থাৎ ভ্রূণের কিছু কিছু লোহিত কণিকাগুলি একসঙ্গে জড় হয়ে ভেঙে যাবে। এর ফলে ভ্রূণে (সন্তানে) এক ধরনের রক্তাল্পতা দেখা যায়, এই অবস্থাকে **ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** বলে। প্রথম সন্তান হওয়ার অল্পসময়ের মধ্যে মায়ের দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে অ্যাগ্লুটিনেশান প্রক্রিয়া তীব্র হবে ফলে সন্তানটির (ভ্রূণটির) মৃত্যু ঘটবে।

- **রক্তদাতা বা রক্তগ্রহীতার যোগ্যতা (Ability of blood donor and blood receipient)**

| রক্তের বিভাগ | রক্তদান করা যাবে | রক্ত গ্রহণ করতে পারে |
|---|---|---|
| A | A এবং AB | O এবং A |
| B | B এবং AB | O এবং B |
| AB | AB | A, B, AB এবং O |
| O | A, B, AB, O | O |

∴ A, B = সর্বজনীন দাতা; O = সর্বজনীন গ্রহীতা

**3. রক্তের শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য (Significance of blood group) :**

(i) **রক্ত সঞ্চারণ**—কোনো রক্তকে দান অথবা গ্রহণ করার আগে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের শ্রেণি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানার প্রয়োজন হয়।

(ii) **ব্যক্তির সনাক্তকরণ**—ফোরেনসিক মেডিসিন (Forensic medicine) রক্তের শ্রেণি নির্ণয়ের সাহায্যে দোষী ও নির্দোষ ব্যক্তির সনাক্তকরণ করা সম্ভবপর।

(iii) **মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক**—বিবর্তনের পথে বিভিন্ন জাতের মানুষ এবং আদি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্তের শ্রেণি বিভাগ দিয়ে জানা যায়।

(iv) **পিতৃত্বপরীক্ষা** (Paternity test)—কোনো সন্তানের পিতৃত্ব ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিলে MN শ্রেণির রক্ত পরীক্ষা করে সঠিক পিতৃত্ব নির্ণয় করা যায়।

(v) **রোগ নির্ণয়** (Diagnosis of diseases)—কয়েকটি রোগ নির্দিষ্ট শ্রেণির রক্তের সঙ্গে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। তাই রক্তের শ্রেণিবিভাগ রোগের নির্ণয়ে সাহায্য করে, যেমন—O শ্রেণির ব্যক্তিরা পেপটিক আলসার রোগে ভোগেন। আবার A শ্রেণির ব্যক্তিরা রক্তাল্পতা রোগে ভোগেন এবং এদের পাকস্থলীর ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

## 2.9. রক্ত সঞ্চারণ (Blood transfusion)

| দাতার গ্রুপ | লোহিত রক্ত কণিকায় অবস্থিত এন্টিজেন | গ্রহীতার সেরামে অবস্থিত এন্টিবডি | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | O | এন্টি A(α) | এন্টি B(β) | এন্টি A(α) এন্টি B(β) |
| O | O | − | − | − | − |
| A | A | − | + | − | + |
| B | B | − | − | + | + |
| AB | AB | − | + | + | + |

চিত্র 2.11. : ABO শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের রক্তদান কালে অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন) ও অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন)-এর বিক্রিয়ার চিত্ররূপ।

❖(a) **সংজ্ঞা (Definition) :** রক্তপাত, রক্তাল্পতা, শল্যচিকিৎসা প্রভৃতি কারণে কোনো ব্যক্তির দেহে রক্তের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে সেই অভাব পূরণ করার জন্য যে ব্যবস্থায় অন্য লোকের গ্রহণযোগ্য ম্যাচিং রক্ত (Matching blood) শিরার মাধ্যমে গ্রহীতার দেহে দেওয়া হয় তাকে রক্ত সঞ্চারণ (Blood transfusion) বলে।

(b) **রক্ত সঞ্চারণের গুরুত্ব (Importance of blood transfusion) :** বিভিন্ন কারণে, যেমন—রক্তপাত, রক্তাল্পতা, আঘাত ও দুর্ঘটনা, শল্যচিকিৎসা, কোলগ্যাস (CO গ্যাস)-এর বিষক্রিয়ায়, সাপে কাটা, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য কয়েক প্রকার রক্তজনিত ত্রুটি ইত্যাদি অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন হয়। এইসব অবস্থায় দাতার দেহ থেকে সরাসরি তাজা রক্ত অথবা ব্লাড-ব্যাংকে সংরক্ষিত রক্তকে শিরার মাধ্যমে (Intravenous) গ্রহীতার দেহে প্রবেশ করানো হয়।

(c) **সার্বজনীন দাতা এবং সার্বজনীন গ্রহীতা (Universal donor and Universal recipient) :**

দাতার (যে রক্ত দিচ্ছে) রক্তের অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং গ্রহীতা (যে রক্ত নিচ্ছে) রক্তের অ্যাগ্লুটিনিনের প্রকৃতি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। কারণ মনে রাখতে হবে রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতার অ্যাগ্লুটিনোজেনের সঙ্গে গ্রহীতা অ্যাগ্লুটিনিনের বিক্রিয়া ঘটে।

(i) উপরের বিক্রিয়া (চিত্র 2.11 দেখো) থেকে দেখা যাচ্ছে **O শ্রেণিভুক্ত রক্তকে সার্বজনীন দাতা** বলা হয়। **কারণ**—O শ্রেণিভুক্ত রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে না বলে এই রক্ত সব শ্রেণিভুক্ত (A, B এবং AB শ্রেণির) রক্তের গ্রহীতাকে কোনো বিক্রিয়া ছাড়া দেওয়া যেতে পারে।

(ii) আবার **AB শ্রেণির রক্তকে সার্বজনীন গ্রহীতা** বলে। কারণ—AB শ্রেণিভুক্ত রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না বলে যে-কোনো শ্রেণিভুক্ত লোকের (দাতার) রক্ত এরা (AB শ্রেণির লোকেরা) কোনো বিক্রিয়া ছাড়া নিতে পারে।

**● সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতার আধুনিক ব্যাখ্যা ●**

রক্ত সঞ্চারণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অত্যন্ত সংকটকালীন বা জরুরি অবস্থায় যখন সমশ্রেণির রক্ত পাওয়া যেত না তখন এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল চিকিৎসকেরা এই প্রথা বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ—সার্বজনীন রক্ত (O-শ্রেণির রক্ত) যখন অধিক পরিমাণ দেওয়া হয় তখন সমস্যা সৃষ্টি হয়। 'O' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির সিরামে α ও β অ্যাগ্লুটিনিন (অ্যান্টিবডি) গ্রহীতার RBC স্থিত A অথবা B অথবা AB অ্যাগ্লুটিনোজেনের (অ্যান্টিজেনের) সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাবে। একইভাবে 'AB' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি অপর কোনো শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি থেকে বেশি পরিমাণ রক্ত গ্রহণ করলে দাতার সিরামে অবস্থিত অ্যাগ্লুটিনিন গ্রহীতার অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাগ্লুটিনিশেন অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ঘটাতে পারে। এই কারণের জন্য **আজকাল বাস্তবক্ষেত্রে সার্বজনীন দাতা বা সার্বজনীন গ্রহীতা মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।**

**● সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Universal donor and Universal recipient) :**

| সার্বজনীন দাতা | সার্বজনীন গ্রহীতা |
| --- | --- |
| 1. যে লোক সবরকম রক্ত-শ্রেণিভুক্ত লোককে (গ্রহীতাকে) রক্তদানে সমর্থ, কিন্তু কেবলমাত্র নিজ রক্ত শ্রেণিভুক্ত লোক থেকে রক্ত গ্রহণ করে তাকে সার্বজনীন দাতা বলে। | 1. যে লোক সব রকম রক্ত-শ্রেণিভুক্ত লোক (দাতা) থেকে রক্ত গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু কেবলমাত্র নিজ রক্ত শ্রেণিভুক্ত লোককে রক্তদানে সমর্থ তাকে সার্বজনীন গ্রহীতা বলে। |
| 2. এদের রক্তের লোহিতকণিকার কোশপর্দাতে কোনো রকমের অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে না। | 2. এদের রক্তের লোহিতকণিকার কোশপর্দাতে A এবং B অ্যাগ্লুটিনোজেন দুইই থাকে। |
| 3. এদের প্লাজমায় দু'রকম অ্যাগ্লুটিনিন থাকে। | 3. এদের প্লাজমায় কোনো রকম অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না। |
| 4. O-শ্রেণির রক্ত এই গ্রুপের অন্তর্গত। | 4. AB-শ্রেণির রক্ত এই গ্রুপের অন্তর্গত। |

**● রক্ত সঞ্চারণকালে সতর্কতা (Precautions of Blood Transfusion) :** রক্ত সঞ্চারণকালে কতকগুলি সতর্কতা নেওয়া হয়, যেমন—(i) রক্ত দানের সময় দাতার রক্তের অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং গ্রহীতার অ্যাগ্লুটিনিন্-এর প্রকৃতি কী তা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। রক্তের গ্রুপ অমিল হলে অর্থাৎ ম্যাচিং না হলে বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে, যেমন— A-অ্যাগ্লুটিনোজেন α-অ্যাগ্লুটিনিনের সঙ্গে এবং B-অ্যাগ্লুটিনোজেন β-অ্যাগ্লুটিনিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লোহিত কণিকাগুলিকে জমাট বেঁধে দেয়। একে অ্যাগ্লুটিনিউশন (Agglutinution) বলে (চিত্র 2.11-এর + চিহ্ন দেখো)। (ii) রক্তের Rh-factor নির্ণয় করা প্রয়োজন। (iii) রক্তে AIDS ভাইরাস, জন্ডিস, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের জীবাণুর উপস্থিতি পরীক্ষা করা উচিত।

**● রক্তসঞ্চারণে বিপত্তি (Hazards of blood transfusion) :** রক্তদানের সময় দাতার অ্যাগ্লুটিনোজেনের (Agglutinogen) প্রকৃতি এবং গ্রহীতার অ্যাগ্লুটিনিনের (Agglutinine) প্রকৃতি দুটি কীরকম তা জানা প্রয়োজন। ধরা যাক অ্যাগ্লুটিনোজেন যদি A হয় এবং গ্রহীতার অ্যাগ্লুটিনিন যদি anti-A (অর্থাৎ α) হয় তাহলে লোহিত কণিকাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জমাট বাঁধতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **অ্যাগ্লুটিনিশন** (Agglutinition) বলে। এই প্রকার অমিল রক্ত সঞ্চারণের ফলে রক্তাল্পতা বা অন্যান্য উপসর্গ হতে দেখা যায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। তবে দাতার অ্যাগ্লুটিনিন গ্রহীতা অ্যাগ্লুটিনোজেনের অনুরূপ হলে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না কারণ দাতার রক্তের তুলনায় গ্রহীতার রক্তের পরিমাণে এত বেশি থাকে যে দাতার অ্যাগ্লুটিনিন গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ লঘু হয়ে পড়বে। লোহিতকণিকাগুলি জমাট বাঁধার সম্ভাবনা কম থাকবে।

1. **হিমোলাইসিস** (Haemolysis)—অমিল রক্ত (Mismatched blood) কোনো মানুষের (গ্রহীতার) দেহে, সঞ্চারিত করলে রক্ত সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীভূত (Agglutination) হয়ে বিদীর্ণ হয়। RBC-এর বিদীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াকে **হিমোলাইসিস** বলে। এই প্রক্রিয়া বহু দিন ধরে চলতে থাকলে রক্তে মুক্ত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেড়ে দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের কার্যাবলিকে ব্যাহত করবে। মূত্র দিয়ে মুক্ত হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে যাবে। এই অবস্থাকে **হিমাটুরিয়া** বলে।

2. **জন্ডিস** (Jaundice)— যখন অমিল রক্তের সঞ্চারণ কম কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চলে তখন হিমোলাইসিস প্রক্রিয়া মন্থর হয়। এই অবস্থায় দেহের R.E. কোশ (আগ্রাসন কোশ) নির্গত হিমোগ্লোবিনকে ভেঙে বিলিরুবিন উৎপন্ন করবে ফলে বিলিরুবিন থেকে বিলিভার্ডিন তৈরি হয়। এই বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন হল পিত্তরঞ্জক কণা যা জন্ডিস হবার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

3. **অ্যাকিউট বৃক্কের বৈকল্য** (Acute kidney failure)— অত্যধিক পরিমাণ হিমোলাইসিস হলে, রক্তে মুক্ত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব বেড়ে যায় ফলে বৃক্কের কাজ ব্যাহত হয়। এই মুক্ত হিমোগ্লোবিন বৃক্কের নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান করপাসল দিয়ে পরিস্রাবিত হয়ে বৃক্ক নালিকা দিয়ে যায়। এই অংশ থেকে পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জলের মাধ্যমে হিমোগ্লোবিনের কিছুটা অংশ পুনঃশোষিত হয় বাকিটা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে বৃক্কনালিকার লুমেন (ফাঁকা অংশ)-কে বন্ধ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নেফ্রনের এই প্রতিবন্ধকতার ফলে প্রথমে **বৃক্কের বৈকল্য** (Kidney failure) এবং পরে **হৃৎপিণ্ডের বৈকল্য** (Cardiac failure) হতে দেখা যায়।

4. **জ্বরসৃষ্টিকারী ক্রিয়া (পাইরোজেনিক এফেক্ট** —Pyrogenic effect)—অ্যাগ্লুটিনিশন প্রক্রিয়ার জন্য দেহে জ্বর জ্বর ভাব ঘটে বা জ্বর হয়, ফলে দেহের উষ্ণতা বেড়ে যায়। এর কারণ দাতার রক্তে অবস্থিত কোনো অ্যালার্জিজনিত বস্তু বা পাইরোজেন (জ্বরসৃষ্টিকারী বস্তু) গ্রহীতার দেহে প্রবেশ করার ফলে ঘটে। এই অবস্থায় দেহে শীত শীত ভাব, হাতের চেটোতে ও পায়ের পাতায় সামান্য ঘর্মক্ষরণ দেখা যায়।

5. **অন্যান্য পরিবর্তন** (Other changes)—(i) রক্ততঞ্চন বিরোধী পদার্থ (সোডিয়াম সাইট্রেট বা সোডিয়াম অক্সালেট) যুক্ত তরল রক্তে মুক্ত $Ca^{2+}$ থাকে না, ফলে দেহে $Ca^{2+}$-এর অভাব জনিত উপসর্গগুলি দেখা যায়, যেমন—স্নায়ু পেশির সংযোগ স্থানের সক্রিয়তা হ্রাস, সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse)-এর পরিবহনে ত্রুটি, কঙ্কাল পেশি ও হৃৎপেশির সক্রিয়তা (সংকোচন ক্ষমতা) ত্রুটিপূর্ণ হয়। রোগী টিটানাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

## ❂ 2.10. লসিকা (Lymph) ❂

### ▲ লসিকার সংজ্ঞা, উপাদান, উৎপাদন এবং কার্যাবলি (Definition, Composition, Formation and Functions of Lymph) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition )—লসিকাগ্রন্থি ও লসিকানালির মধ্যে যে স্বচ্ছ, ঈষৎ হলুদ রঙের ক্ষারীয় পরিবর্তিত তরল পদার্থ বা রূপান্তরিত কলারস (Modified tissue fluid) থাকে তাকে লসিকা বলে।**

(b) **উপাদান (Composition)**—মানুষের দেহে লসিকার মোট পরিমাণ 1-2 লিটার। লসিকা প্রধানত অকোশীয় পদার্থ, জল (95%) এবং কঠিন পদার্থ (5%) যেমন জৈব (প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ইউরিয়া, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি) এবং অজৈব পদার্থ (Cl, Ca, P প্রভৃতি) নিয়ে গঠিত। কোশীয় পদার্থ হল লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের দেহে লসিকা নিম্নলিখিত উপাদান নিয়ে গঠিত।

● **লসিকা এবং রক্তরসের প্লাজমার উপাদানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between the Compositions of Lymph and Plasma) :**

| লসিকার উপাদান | প্লাজমার উপাদান |
|---|---|
| 1. লসিকার কোশীয় উপাদান হল লিম্ফোসাইট। কখনো-কখনো এতে মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজেস থাকে। স্থান বিশেষে কখনো-কখনো খুব সামান্য সংখ্যায় গ্র্যানুলোসাইট ও প্লাজমা কোশ দেখতে পাওয়া যায়। | 1. সম্পূর্ণ রক্ত থেকে কোশীয় উপাদানকে বাদ দিলে প্লাজমা পাওয়া যায়, তাই এতে কোনো কোশীয় উপাদান থাকে না। |
| 2. লসিকায় 2-5 % প্রোটিন থাকে, অর্থাৎ কম পরিমাণে থাকে। | 2. প্লাজমায় 8-9 % প্রোটিন থাকে, অর্থাৎ বেশি পরিমাণে থাকে। |
| 3. লসিকাতে ক্লোরাইড, গ্লুকোজ ইত্যাদি বেশি থাকে। | 3. প্লাজমায় ক্লোরাইড, গ্লুকোজ ইত্যাদি তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। |

(c) **লসিকার উৎপাদন (Formation of Lymph) :** লসিকা কলারস থেকে তৈরি হয়, কারণ যেসব অবস্থায় রক্তজালক থেকে কলাস্থানে তরলের বিনিময় বাড়ে সেই সব অবস্থাতে লসিকার উৎপাদন ও প্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। দেখা গেছে রক্তজালক অপেক্ষা লসিকা জালক অধিকতর ভেদ্য। এই কারণে প্রোটিন বা কলারসের উপাদানসমূহ যেমন সহজেই প্রবেশ করে আবার লসিকা থেকে প্রোটিন রক্তবাহে ফিরে যায়। এছাড়া বন্ধ লসিকা জালক কলাস্থানের অপরাপর কোলয়েড পদার্থ বা অন্যান্য পদার্থকে শোষিত করে। এভাবে লসিকা উৎপন্ন হয়। লসিকার উৎপাদনে রক্তজালক বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যেমন— লসিকার ভেদ্যতা, অভিস্রাবণ চাপ, রক্তের চাপ, পরিস্রাবণের জন্য এর পরিস্রাবণ তলের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

চিত্র 2.12. : কলাকোশের মধ্যে রক্তজালক এবং বন্ধ লসিকাবাহের বিন্যাস এবং লসিকা উৎপাদনের চিত্ররূপ।

(d) **লসিকার কার্যাবলি (Functions of Lymph)**—(i) দেহের যেসব স্থানে (যেমন—ত্বকের এপিডার্মিসে) রক্তের সরবরাহ থাকে না সেই সব স্থানের কলাকোশকে লসিকা পুষ্টি জোগায়। (ii) ক্ষুদ্রান্ত্রের ল্যাকটিয়াল নামে লসিকানালির লসিকা **ফ্যাটের শোষণে** অংশ নেয়। (iii) দেহে কলারসের এক-দশমাংশ লসিকার মাধ্যমে অপসারিত হয়। (iv) শরীরের তরলের বা **দেহরসের পুনর্বণ্টন** লসিকার মাধ্যমে হয়। (v) লসিকার প্রবাহমান শ্বেতকণিকা (মনোসাইট) লসিকায় প্রবিষ্ট রোগজীবাণুকে সরাসরি ধ্বংস করে দেহের **প্রতিরক্ষামূলক কাজ** করে।

● **রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Blood and Lymph) :**

| রক্ত | লসিকা |
|---|---|
| 1. এক ধরনের লাল রঙের তরল যোগকলা। | 1. এক ধরনের হলুদ রঙের পরিবর্তিত কলারস। |
| 2. রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং রক্তজালকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। | 2. লসিকা প্রধানত লসিকা গ্রন্থি ও লসিকাবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। |
| 3. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণে রক্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। | 3. লসিকাবাহের সংকোচনে লসিকা দেহে সঞ্চালিত হয়। |
| 4. রক্তে লোহিত কণিকা এবং অণুচক্রিকা থাকে। | 4. লসিকায় লোহিত কণিকা এবং অণুচক্রিকা থাকে না। |

| রক্ত | লসিকা |
|---|---|
| 5. রক্তে পাঁচ ধরনের শ্বেতকণিকা থাকে, যেমন— নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল, লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট। | 5. লসিকায় এক ধরনের শ্বেতকণিকা থাকে, যেমন— লিম্ফোসাইট (কখনো-কখনো মনোসাইটের উপস্থিতি দেখা যায়)। |
| 6. রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে। | 6. লসিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে না। |
| 7. $O_2$ এবং $CO_2$ পরিবহন একটি অন্যতম প্রধান কাজ। | 7. গ্যাসীয় পরিবহনে অংশ নেয় না। |

● **প্লাজমা, সিরাম এবং লসিকার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Plasma, Serum and Lymph) :**

| প্লাজমা | সিরাম | লসিকা |
|---|---|---|
| 1. রক্তের তরল অংশ। | 1. রক্ততঞ্চনের পর তঞ্চনপিণ্ড থেকে নিঃসৃত তরল। | 1. কলারস থেকে উৎপন্ন পরিবর্তিত তরল। |
| 2. লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা থাকে। | 2. কোনো রক্তকণিকা থাকে না। | 2. প্রধানত লিম্ফোসাইট কখনো-কখনো মনোসাইট থাকে। |
| 3. ফাইব্রিনোজেন থাকে। | 3. ফাইব্রিনোজেন একেবারেই থাকে না। | 3. সামান্য পরিমাণ ফাইব্রিনোজেন থাকে। |
| 4. হৃৎপিণ্ড রক্তবাহের মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়। | 4. প্লাজমার মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়। | 4. লসিকা গ্রন্থি ও লসিকাবাহের মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়। |

## ❂ 2.11. কলারস (Tissue Fluid) ❂

### ▲ কলারসের সংজ্ঞা, উৎপাদন এবং কাজ (Definition, Formation and Functions of Tissue fluid) :

❖ (a) **কলারসের সংজ্ঞা (Definition of Tissue fluid) : যে তরল কলাকোশের ফাঁকা স্থান থেকে কলার অভ্যন্তরীণ এবং কোশের বাইরের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি জোগায় তাকে কলারস বলে।**

(b) **কলারসের উৎপাদন (Formation of tissue fluid) :** কলারস প্রধানত দুটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন— রক্তজালক থেকে এবং কলাকোশের নিজস্ব সক্রিয়তা থেকে।

(1) **রক্তজালক থেকে**—(i) এটি প্রথম এবং প্রধান উৎস। কয়েকটি ভৌত কারণ যেমন—(i) উদ্‌স্থৈতিক চাপ। (ii) রক্তজালকের ভেদ্যতা, (iii) রক্তজালকের রক্ত এবং কলারসের মধ্যে চাপ-পার্থক্য, (iv) রক্ত ও কলারসের কোলয়েডীয় অভিস্রবণ চাপের পার্থক্য।
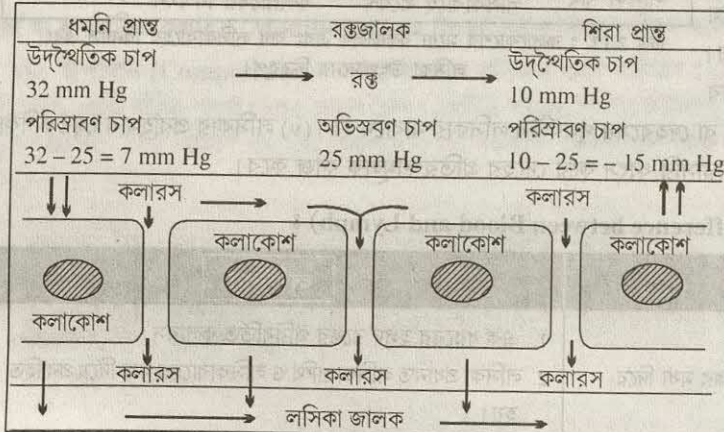
যেসব কারণগুলি রক্তজালকের ভেদ্যতাকে বাড়ায় সেই সব কারণগুলি কলারসের উৎপাদনের হারকেও বাড়ায়। রক্তের চাপ এবং অভিস্রবণ চাপ ধমনির প্রান্ত দিকের রক্তজালকে প্রায় 32 mm Hg সমান। রক্তজালকের যে প্রান্ত থেকে শিরা উৎপন্ন হয়, সেখানে রক্তের চাপ 10 mm Hg সমান। কিন্তু কোলয়েডীয় অভিস্রবণ চাপ দুদিকে একই থাকে (গড়ে 25 mm Hg)। ধমনি প্রান্তে কলারসের দিকে নীট পরিস্রাবণ চাপ দুটি চাপের (উদ্‌স্থৈতিক চাপ এবং পরিস্রাবণ-চাপের) পার্থক্যের (32–25) সমান হয়, অর্থাৎ 7 mmHg-র সমান হয়। শিরা প্রান্তে রক্তের চাপ কিংবা উদ্‌স্থৈতিক চাপ (Hydrostatic pressure) কমে যাওয়ার ফলে বিপরীত দিকে অর্থাৎ কলারস থেকে রক্তজালকের দিকে পরিস্রাবণ চাপ –15 mmHg-র সমান হয়।

(2) **কলাকোশের নিজের সক্রিয়তা**— কলারসের উৎপাদনের হার কলাকোশে বিপাকক্রিয়া ক্রিয়ার হারের উপর নির্ভর করে, যেমন—বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে বিপাকলব্ধ পদার্থ ও জল বেশি উৎপন্ন হয় যা কলারসে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়।

(c) **কলারসের কাজ (Functions of Tissue fluid) :** (i) কলারস কলাকোশকে $O_2$ ও পুষ্টি সরবরাহ করে। (ii) কলাকোশের বিপাকজাত পদার্থকে কলারস দেহ থেকে নির্গত করে। (iii) লসিকার উৎপাদনে সাহায্য করে। (iv) রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটলে কলারস রক্তের পরিমাণের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

### ● শোথ বা ইডিমা (Oedema) ●

কলাস্থানে অধিক পরিমাণ তরল পদার্থ জমে যাওয়ার ফলে স্থানটি ফুলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **ইডিমা** বলে। লসিকাবাহের প্রতিবন্ধকতার ফলে ইডিমা হয়। লসিকাবাহ বন্ধ হওয়ার সাধারণ কারণ হল **ফাইলেরিয়া** (Filaria) রোগ। এই রোগ ***উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি*** নামে পরজীবীর আক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। লসিকাবাহের প্রতিবন্ধকতার ফলে কিংবা রক্তজালকে রক্তচাপ বেড়ে গেলে পরিস্রাবণ হার বেড়ে যায়, এই কারণে কলাস্থানে অধিক পরিমাণ জল সঞ্চিত হয়ে সেই জায়গায়টি ফুলে যায় এবং শক্ত হয়। এই অবস্থাকে **ইডিমা** (Oedema) বলে।

● **লসিকা ও কলারসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Lymph and Tissue fluid) :**

| লসিকা | কলারস |
|---|---|
| 1. লসিকা কলারস থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. কলারস প্লাজমা থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 2. লসিকানালিতে লসিকা থাকে। | 2. কোশের অন্তর্বর্তী স্থানে কলারস থাকে। |
| 3. এতে প্রোটিন থাকে। | 3. এতে প্রোটিন থাকে না। |
| 4. লসিকাতে শ্বেতকণিকা থাকে। | 4. কলারসে শ্বেতকণিকা থাকে না। |

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

### ❂ লোহিত রক্তকণিকা সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর (Some questions and answers about red blood corpuscles) :

**1.মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় কি কখনও নিউক্লিয়াস থাকে না ?**

● অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকার উৎপাদন বিভিন্ন দশার মধ্য দিয়ে ঘটে। উৎপন্ন হওয়ার সময় বিভিন্ন দশায় **অপরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস** থাকে। লোহিত কণিকা পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয়াসটি ক্রমশ ছোটো হয়ে শেষে অবলুপ্ত হয়। এই কারণে রক্তসংবহনে **পরিণত লোহিত কণিকায়** নিউক্লিয়াস থাকে না।

**2. মানুষের পরিণত লোহিত কণিকায় TCA চক্র কেন হয় না ?**

● ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) বা ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (Tri-Carboxylic acid cycle) মাইটোকন্ড্রিয়াতে সম্পন্ন হয়। যেহেতু মানুষের পরিণত লোহিত কণিকায় **মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না** (অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকার উৎপন্ন ও পরিস্ফুরণের সময় মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে) সেই জন্য পরিণত লোহিত কণিকা ক্রেবস চক্র বা ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (চক্র TCA) বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র হতে পারে না।

**3. অস্থিমজ্জায় লোহিতকণিকা উৎপন্ন হতে কত সময় লাগে ?**

● লোহিত কণিকা উৎপন্ন হতে মোট সময় লাগে **9 দিন**। প্রোইরিথ্রোব্লাস্ট থেকে রেটিকুলোসাইট হতে 7 দিন সময় লাগে। আবার রেটিকুলোসাইট থেকে পরিণত লোহিত কণিকায় রূপান্তর হতে আরও 2 দিন সময় লাগে।

**4. ইরিথ্রোপোয়েটিন কী ? (অথবা, RBC-এর সংখ্যা বাড়াতে বৃক্কের ভূমিকা কী ?)**

● ইরিথ্রোপোয়েটিন একরকমের গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় হরমোন। দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে অথবা রক্তাল্পতা হলে অথবা রক্তে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বা কোবাল্ট লবণের পরিমাণ বেড়ে গেলে বৃক্ক থেকে ইরিথ্রোপোয়েটিনের ক্ষরণ

বেড়ে যায়। **কাজ** — ইরিথ্রোপোয়েটিন বৃক্কে উৎপন্ন হয়ে রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে অস্থি মজ্জায় যায় এবং লাল অস্থিমজ্জাকে লোহিত কণিকার উৎপাদনে উদ্দীপিত করে।

5. **সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় RBC-এর সংখ্যা বাড়ে কেন ?**

● সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় $O_2$-এর অভাব ঘটে ফলে বৃক্ক থেকে ইরিথ্রোপোয়েটিন নামে হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোন রক্ত দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অস্থিমজ্জায় যায় এবং অস্থিমজ্জাকে উদ্দীপিত করে RBC-এর উৎপাদনকে বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য রক্তে RBC-এর সংখ্যা বাড়ে।

6. **ইরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন (থিতানো) হার (E.S.R.) কী ?**

● (a) **ই. এস. আর. (Erythrocyte Sedimentation Rate, সংক্ষেপে E. S. R.)** — স্বাভাবিক রক্তে বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা প্লাজমায় ভাসমান অবস্থায় থাকে। একটি টেস্ট টিউবে কিছু পরিমাণ রক্ততঞ্চনরোধক পদার্থ (সোডিয়াম অক্সালেট) মেশানো রক্তের নমুনা নিয়ে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিলে দেখা যাবে রক্তকণিকাগুলি তাদের নিজেদের ভারে নীচের দিকে নেমে আসে অর্থাৎ থিতিয়ে পড়ে। **যে হারে রক্তকণিকাগুলি প্রধানত লোহিত রক্তকণিকাগুলি থিতিয়ে পড়ে তাকে লোহিত কণিকার থিতানো হার বা ইরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন** রেট, সংক্ষেপে ই. এস. আর. **(E.S.R.)** বলে।

(b) **স্বাভাবিক E.S.R.** (উইনট্রব পদ্ধতি অনুযায়ী) ঃ

(i) একজন স্বাভাবিক **পুরুষের (E.S.R.)** — ঘণ্টায় 0·0–6·5 mm

(ii) একজন স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের **E.S.R.** — ঘণ্টায় 0·0–15·0 mm.

(iii) একটি **শিশুর E.S.R.** — ঘণ্টায় 0·0–5·0 mm.

(c) **E. S. R. হারের পরিবর্তন**— (i) **স্বাভাবিক অবস্থা**— পেশিসঞ্চালন (ব্যায়াম), গর্ভাবস্থা, খাবারের পর E.S.R. পরিবর্তিত হয়। (ii) **অস্বাভাবিক অবস্থা**—পাণ্ডুরোগ (জন্ডিস), রক্তাল্পতা, যক্ষ্মারোগ, অ্যালার্জি প্রভৃতি অবস্থায়ও E.S.R. পরিবর্তিত হয়।

7. **পুঞ্জীভূত কোশ আয়তন (বা PCV) বলতে কী বোঝো ?**

● **পুঞ্জীভূত কোশ আয়তন**—তঞ্চন পদার্থযুক্ত রক্তকে একটি পরীক্ষানলে নিয়ে স্থিরভাবে রেখে দিলে অথবা কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রের সাহায্যে কিছুক্ষণ ধরে আবর্তন করালে দেখা যাবে যে, পরীক্ষানলের নীচে রক্তকণিকাগুলি জমা (পুঞ্জীভূত) হয়েছে। এই পরিমাণ জমা কোশকে **পুঞ্জীভূত কোশ আয়তন** (Packed Cell Volume, সংক্ষেপে PCV) বলে। এর স্বাভাবিক পরিমাণ 45% ।

8. **লোহিত রক্তকণিকার রাউলেউক্স গঠন বলতে কী বোঝো ?**

● **রাউলেউক্স গঠন** (Rouleaux formation)—রাউলেউক্স গঠন লোহিত রক্তকণিকার একটি ভৌত বিশেষত্ব। E. S. R. পরীক্ষার সময় অধঃক্ষেপিত লোহিত কণিকাগুলি একটির উপর আর একটি স্থাপিত হয়ে টাকার থাকের মতো লোহিত কণিকা যে স্তম্ভ তৈরি করে তাকে **রাউলেউক্স গঠন** বলে। রক্তের প্লাজমায় ফাইব্রিনোজেন, গামা গ্লোবিউলিনের পরিমাণ বাড়ার কারণে রাউলেক্স গঠনের প্রবণতা বাড়ে।

9. **পলিসাইথেমিয়া কাকে বলে ?**

● **পলিসাইথেমিয়া** (Polycythemia)—লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে 6·5 মিলিয়ন হলে তাকে **পলিসাইথেমিয়া** বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশি উচ্চতায় অর্থাৎ পাহাড়ে বসবাসকারী লোকদের $O_2$-এর অভাব ঘটলে **পলিসাইথেমিয়া** দেখা যায়।

10. **হিমোলাইসিস এবং হিমোরেজ বলতে কী বোঝো ?**

● (i) **হিমোলাইসিস** (Haemolysis)—যে প্রক্রিয়ায় লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হয়ে হিমোগ্লোবিন নির্গত করে তাকে **হিমোলাইসিস** বলে। উদাহরণ—একটি লোহিত কণিকাকে লঘুসারক দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে অন্তঃঅভিস্রবণ ঘটে অর্থাৎ বাইরের দ্রবণ থেকে জল কণিকার মধ্যে যায়। এর ফলে কণিকাটি ফেঁপে ওঠে এবং অবশেষে ফেটে গিয়ে হিমোগ্লোবিন নির্গত করে অর্থাৎ হিমোলাইসিস ঘটে। এই অবস্থায় লোহিত কণিকাকে **হিমোলাইসাড লোহিত কণিকা** বলে।

(ii) হিমোরেজ বা রক্তপাত (Haemorrhage)—যে প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন রক্তনালি থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় তাকে রক্তপাত বা হিমোরেজ বলে।

11. **রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া কাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার রক্তাল্পতা সম্বন্ধে আলোচনা করো।**

● (a) সংজ্ঞা ঃ রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে গেলে তাকে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া (Anaemia) বলে।

(b) প্রকারভেদ ঃ রক্তে লোহিত কণিকা কমার ফলে বিভিন্ন ধরনের রক্তাল্পতা দেখা হয়—(i) **পারনিসিয়াস রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া** (Pernicious anaemia)—অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকার উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে দেহে পারনিসিয়াস রক্তাল্পতা দেখা যায়। (ii) **এপ্লাস্টিক রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া** (Aplastic anaemia) —অস্থিমজ্জা ত্রুটিপূর্ণ হলে (বৃক্করোগে, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে) স্বাভাবিক লোহিত কণিকার উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া দেখা যায়। (iii) **সিকল সেল রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া** (Sickle cell anaemia)—লোহিত কণিকার বিনাশ (সিফিলিস, ম্যালেরিয়া রোগে) বেড়ে গেলে এই ধরনের রক্তাল্পতা দেখা যায়। এই অবস্থায় লোহিত কণিকাগুলি কাস্তের (Sickle) মতো দেখতে হয়। (iv) **ননক্রোমিক রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া** (Nonchromic anaemia)—অত্যধিক রক্তপাতে দেহে লোহার ঘাটতি দেখা যায়, ফলে ননক্রোমিক রক্তাল্পতা দেখা যায়।

12. **থ্যালাসেমিয়া কাকে বলে ?**

● **থ্যালাসেমিয়া** (Thalassemia) ঃ এটি একটি বংশগত রোগ। এই রোগে হিমোগ্লোবিনের গঠন ত্রুটিপূর্ণ হয়, এর ফলে লোহিত কণিকাগুলি ছোটো হয় ও কম দিন বাঁচে। থ্যালাসেমিয়াকে **কুলি বা মেডেটেরিয়ান রক্তাল্পতা** বলে।

## ✪ শ্বেত রক্তকণিকা সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর (Some questions and answers in relation to WBC)

13. **T-লিম্ফোসাইট এবং B-লিম্ফোসাইট কী ? এগুলি কী কী কাজ করে ?**

● (a) **T-লিম্ফোসাইট (T-Lymphocyte)**— লিম্ফোসাইটের পূর্বসূরিরা (Precursors) কুসুমথলিতে উৎপন্ন হয়ে ভ্রূণদেহে সঞ্চালিত হয়। এদের মধ্যে যেসব কোশ ভ্রূণের থাইমাসে (Thymus) যায় ও বেড়ে ওঠে তাদের **T-লিম্ফোসাইট** বলে। থাইমাস থেকে বেরিয়ে এসে এটি **অস্থিমজ্জায় ও লসিকা গ্রন্থির** বহিস্থরের বাইরে বসতি স্থাপন করে।

**কাজ**—T-লিম্ফোসাইট **কোশভিত্তিক** (Cellular immunity) **অনাক্রম্যতার** জন্য দায়ী।

(b) **B–লিম্ফোসাইট (B-Lymphocyte)**—এই রকম লিম্ফোসাইট থাইমাসের পরিবর্তে পাখির পায়ুর (Cloaca) কাছে অবস্থিত ফেব্রিসিয়াস বারসা (*Bursa of Fabricius*) নামে লসিকা পিণ্ডতে বেড়ে উঠে এবং পরে স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের যকৃৎ ও প্লিহাতে যায় ও পরিণত হয়। এরপর যকৃৎ ও প্লিহাতে থাকার পর লসিকা গ্রন্থির বহিঃস্তরে ও জনন কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করে।

**কাজ**—B-লিম্ফোসাইট **রসনির্ভর অনাক্রম্যতার** ( Humoral immunity ) জন্য দায়ী।

14. **B-কোশ এবং T-কোশের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।**

● **B-কোশ এবং T-কোশের মধ্যে পার্থক্য (Difference between B-Lymphocyte and T-Lymphocyte) ঃ**

| B-কোশ (B- লিম্ফোসাইট) | T-কোশ (T- লিম্ফোসাইট) |
|---|---|
| 1. অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হওয়ার পর থাইমাস গ্রন্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে না। | 1. অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হওয়ার পর থাইমাস গ্রন্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। |
| 2. এর থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। | 2. এরা সরাসরি ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী প্রাণী এবং কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়াকে বাধা দেয়। |
| 3. অস্বাভাবিক মিউট্যান্ট কোশ অথবা ব্যাকটেরিয়া যেগুলি কোশের মধ্যে থাকে, তাদের উপর ক্রিয়া করতে অক্ষম। | 3. অস্বাভাবিক মিউট্যান্ট কোশের (ক্যানসারজনিত কোশের) উপর কাজ করতে সক্ষম। |

15. **শ্বেত রক্তকণিকার আগ্রাসন—ডায়াপেডেসিস এবং পরিপাক ক্রিয়া কাকে বলে ?**

● (a) ডায়াপেডেসিস—দেহের কোনো অংশ ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হলে শ্বেত রক্তকণিকাগুলি প্রধানত নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট রক্তনালি থেকে বেরিয়ে এসে আক্রান্ত অঞ্চলে জড়ো হয়। নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস (**Phagocytosis**) পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুগুলিকে গ্রাস করে। এটি একটি সক্রিয় পদ্ধতি যা **ডায়াপেডেসিস** (Diapedesis) নামে পরিচিত।

**চিত্র 2.13 :** শ্বেতকণিকার ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু মুক্ত করার চিত্ররূপ।

(b) **পরিপাক ক্রিয়া** (Digestive function)—নিউট্রোফিল **ট্রিপসিন** এবং মনোসাইট ও লিম্ফোসাইট **পেপসিন** নামে প্রোটিন পরিপাক উৎসেচকগুলি সংশ্লেষণ করে। এই দুটি উৎসেচকের সহায়তায় গ্রাস করা মৃতকোশ ও ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদিকে পাচিত করে অপসারণযোগ্য করে তোলে। এই সব উৎসেচকের উপস্থিতিতে প্রদাহ অঞ্চলের মৃতকোশগুলি তরল হয়ে **পুঁজের** (Pus) সৃষ্টি করে।

16. **শ্বেত রক্তকণিকার অ্যালার্জিবিরোধী ক্রিয়া বলতে কী বোঝো?**

● **শ্বেত রক্তকণিকা অ্যালার্জিবিরোধী ক্রিয়া (Anti-allergy action of W. B. C.)**—অ্যালার্জিবিরোধী ক্রিয়া **ইওসিনোফিল** শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ। **হিস্টামিন** নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ দেহের অ্যালার্জি অবস্থা সৃষ্টি করে। দেহে যে জায়গায় এই হিস্টামিন সংশ্লেষিত হয় সেই জায়গায় ইওসিনোফিল শ্বেতকণিকাগুলি জড়ো হয়ে **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ** (Antigen-Antibody complex) গঠন করে যা হিস্টামিনকে নিষ্ক্রিয় করে। এভাবে ইওসিনোফিল অ্যালার্জির হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

17. **TC, DC এবং AC বলতে কী বোঝো ?**

● (a) **TC**-এর সম্পূর্ণ নাম হল **Total Count** বা **সামগ্রিক গণনা**। রক্তের লোহিত কণিকার এবং শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা গণনা করাকে **সামগ্রিক গণনা** বলে। **হিমোসাইটোমিটার** (সম্পূর্ণ নাম— Improved Neubauer haemocytometer) নামে যন্ত্রের সাহায্যে এই গণনা করা হয়।

(b) **DC**-এর সম্পূর্ণ নাম হল **Differential Count** বা **পার্থক্যসূচক শতকরা গণনা**। রক্তে বিভিন্ন রকমের শ্বেতকণিকার শতকরা সংখ্যা গণনা করাকে পার্থক্যসূচক গণনা বলে। এটি রক্তের প্রলেপকে ( Blood film ) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চশক্তি অভিলক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে গণনা করা হয়।

(c) **AC**-এর সম্পূর্ণ নাম হল **Arneath Count** বা **আরনেথ গণনা**। শ্বেত রক্তকণিকার নিউট্রোফিলের নিউক্লিয়াস বিভিন্ন লোবযুক্ত (2–7) হয়। এই লোবের সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম লোবযুক্ত নিউট্রোফিলের শতকরা সংখ্যার গণনাকে **আরনেথ কাউন্ট** বলে।

18. **ইওসিনোফিলিয়া, লিউকোপেনিয়া, লিউকোসাইটোসিস এবং লিউকোমিয়া বলতে কী বোঝো ?**

● (a) **ইউসিনোফিলিয়া**—রক্তে ও কলাকোশে ইউসিনোফিলের সংখ্যা 2–4%। এই সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে বেড়ে গেলে তাকে **ইওসিনোফিলিয়া** (Eosinophilia) বলে। দেহে **অ্যালার্জি অবস্থায়** কিংবা গোলকৃমি বা চ্যাপটা কৃমির আক্রমণ বেড়ে গেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(b) **লিউকোপেনিয়া**— প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা 4,000-এর চেয়ে কম হলে সেই অবস্থাকে **লিউকোপেনিয়া** (Leukopenia) বলে।

(c) **লিউকোসাইটোসিস**— প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার অর্থাৎ লিউকোসাইটিস-এর সংখ্যা 11,000-এর বেশি হলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (Leukocytosis) বলে।

(d) **লিউকোমিয়া**— রেটিকুলা এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের অসুখের ফলে রক্তে যখন **অপরিণত শ্বেতকণিকার** সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় তখন তাকে **লিউকেমিয়া** (Leukemia) বা **ব্লাড ক্যানসার** বলে।

## ❂ অণুচক্রিকা সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর (Some questions and answers about platelets)

19. হোমিওস্ট্যাসিস ও তার নিয়ন্ত্রণে অণুচক্রিকার ভূমিকা কী ?

- (a) **হোমিওস্ট্যাসিস**—যে পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেহের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থাকে বজায় রাখা হয় তাকে **হোমিওস্ট্যাসিস** (Homeostasis) বলে। দেহের ভেতরে বা বাইরের উদ্দীপনায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্রগুলির স্বয়ংক্রিয় ভাবে সামঞ্জস্য সাধন করে যতটা সম্ভব পরিবর্তন ঘটিয়ে হোমিওস্ট্যাসিস পদ্ধতি বজায় রাখা হয়।

(b) **হোমিওস্ট্যাসিস প্রক্রিয়ায় অণুচক্রিকার ভূমিকা**—অণুচক্রিকা থেকে হিস্টামিন এবং 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন জাতীয় পদার্থ মুক্ত হয়। এছাড়া অণুচক্রিকা ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তকে তঞ্চিত করে। এরা রক্ততঞ্চন এবং রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তের স্থিতিশীল প্রক্রিয়া বা হোমিওস্ট্যাসিস প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

20. **রক্তপাত বন্ধে অণুচক্রিকার ভূমিকা সম্বন্ধে যা জানো বিশদভাবে লেখো।**

- অণুচক্রিকা প্রধানত দু'ভাবে রক্তপাত বন্ধ করতে সাহায্য করে, যেমন—(i) **অণুচক্রিকা-ছিপির গঠন**— রক্তনালির ক্ষতস্থানের তলের সংস্পর্শে এলে অণুচক্রিকাগুলি ফুলে গিয়ে একটি অনিয়মিত পদার্থ গঠন করে। এই পদার্থ চট্‌চটে হয়, ফলে অণুচক্রিকাগুলি দলবদ্ধভাবে **ছিপি** বা **প্লাগ** ( Platelet plug )-এর মতো অংশ সৃষ্টি করে এবং রক্তনালির ক্ষতস্থানটিকে বন্ধ করে দেয়। এই কারণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। (ii) **রক্ততঞ্চন**— অণুচক্রিকা এক রকমের গুরুত্বপূর্ণ রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর। রক্তনালির যে স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সেই স্থানের সংস্পর্শে (অমসৃণ তলের সংস্পর্শে) এসে ভেঙে গিয়ে থ্রমবোপ্লাস্টিন নামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর উৎপন্ন করে। এই থ্রমবোপ্লাস্টিন রক্তের তঞ্চন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে। (iii) **পারপিউরা (Purpura) ঃ** রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ খুব কমে গেলে ত্বকের ও মিউকাস পর্দার নীচে রক্তক্ষরণ ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ বাড়ে অর্থাৎ রক্তক্ষরণ সময় বাড়বে। এই রকম অসুখকে **পারপিউরা** (Purpura) বলে।

## ❂ রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ( Some questions and answers about coagulation of Blood )

21. হিমোফিলিয়া কী ?

- **হিমোফিলিয়া (Haemophilia) ঃ** একটি বংশগত রোগ। এই রোগটি সচরাচর পুরুষের মধ্যে দেখা গেলেও স্ত্রীদেহ থেকে সন্তান-সন্ততির দেহে যায়। এই রোগে রক্তের তঞ্চন কাল (Coagulation time) অস্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘায়িত হয়। এই কারণে সামান্য আঘাতের ফলে উৎপন্ন ক্ষতস্থান থেকে বেশি রক্তক্ষরণ ঘটে এই কারণে একে **ব্লিডার ডিজিস** (Bleeder's disease) বলে।

**ফ্যাক্টর VIII** বা **অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর** হিমোফিলিয়ার রোগের জন্য প্রধানত দায়ী। এছাড়া অন্যান্য ফ্যাক্টরের (যথা— V, VII, IX প্রভৃতি ) ঘাটতিতেও ওই রোগের প্রবণতা দেখা দেয়।

22. **রক্ততঞ্চনে ভিটামিন K, ফাইব্রিনোজেন ও ক্যালশিয়ামের ভূমিকা উল্লেখ করো।**

- (i) **ভিটামিন K-এর ভূমিকা**— যকৃতে প্রোথ্রম্বিন উৎপাদনে ভিটামিন K অংশগ্রহণ করে রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে। ভিটামিন K-এর অভাবে প্রোথ্রম্বিনের উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই কারণে ভিটামিন K-কে অ্যান্টিহিমোরেজিক ফ্যাক্টর (Antihaemorrhagic factor) বলে।

(ii) **ফ্রাইব্রিনোজেনের ভূমিকা**— ফাইব্রিনোজেন প্লাজমার দ্রবণীয় প্রোটিন যা রক্ততঞ্চনের সময় অদ্রবণীয় ফাইব্রিন তন্তুজালকে পরিণত হয়ে রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে।

(iii) **ক্যালশিয়ামের ভূমিকা**— রক্ততঞ্চন একটি এনজাইম সক্রিয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ঘটে। প্রতিটি ধাপে রক্তে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় এনজাইম সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। প্রথম ও শেষ ধাপ ছাড়া প্রতিটি ধাপে $Ca^{++}$ প্রয়োজন হয়।

23. রক্ততঞ্চন কাল এবং রক্তমোক্ষম কাল বলতে কী বোঝো ?

● (i) **রক্ততঞ্চন কাল** (Coagulation time—CT)—দেহ থেকে নির্গত রক্ত তঞ্চিত হতে যে সময় নেয় তাকে **রক্ততঞ্চন কাল** বলে। বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে রক্ততঞ্চন কাল এক নয়। তবে মানুষের ক্ষেত্রে রক্ততঞ্চন কাল প্রায় **3–8** মিনিট হয়।

(ii) **রক্তমোক্ষম কাল** ( Bleeding time—BT)—প্রথম রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে রক্তপাত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কে **রক্তমোক্ষম কাল** বলে। মানুষের স্বাভাবিক রক্তমোক্ষম কাল 1–4 মিনিট। (a) রক্তবাহের স্থিতিস্থাপকতা কমে গিয়ে শক্ত অমসৃণ হলে, (b) রক্তনালির মধ্যে রক্তের প্রবাহের গতি কম হলে, (c) রক্তনালির অন্তরাবরণীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে, (d) অণুচক্রিকা ও ফাইব্রিনোজেনের পরিমাণ বাড়লে রক্তনালির ভিতরে রক্তজমাট বেঁধে তঞ্চন পিণ্ড (Thrombosis) সৃষ্টি করে।

24. সুস্থ অবস্থায় রক্তনালির মধ্যে প্রবাহমান রক্ত জমাট বাঁধে না কেন ?

● নিম্নলিখিত কারণের জন্য রক্তনালির মধ্যে প্রবাহমান রক্ত জমাট বাঁধে না।

(i) **থ্রমবোপ্লাস্টিনের অনুপস্থিতি—থ্রমবোপ্লাস্টিন** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর (Factor - III) যা অমসৃণ তলের সংস্পর্শে অণুচক্রিকা ভেঙে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বাভাবিক রক্তবাহের **অর্ন্তগাত্র (এন্ডোথেলিয়াম)** মসৃণ হওয়ায় অণুচক্রিকাগুলি ভাঙতে পারে না, ফলে থ্রমবোপ্লাস্টিনের উৎপাদন ঘটে না।

(ii) **হেপারিনের উপস্থিতি**—বেসোফিল শ্বেতকণিকা, যকৃৎ কোশ, অ্যারিওলার কলার মাস্ট কোশ প্রভৃতি থেকে **হেপারিন** নামে তঞ্চনরোধক পদার্থ ক্ষরিত হয়। হেপারিন থ্রম্বিন এবং ফাইব্রিনোজেনের বিক্রিয়ায় বাধা দেয়, ফলে রক্ততঞ্চন বিঘ্নিত হয়।

(iii) ফ্রাইব্রিনের অ্যান্টিথ্রম্বিন ক্রিয়া আছে, যা রক্ততঞ্চনে বাধা দেয়।

(iv) রক্তবাহের ভিতরে প্রবাহমান রক্তের গতি রক্ততঞ্চনের সহায়ক নয়।

25. রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পদার্থ বলতে কী বোঝো ?

● **(a) অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের সংজ্ঞা—যেসব পদার্থ রক্ততঞ্চনে বাধা দেয় তাদের তঞ্চনরোধক পদার্থ বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট (Anticoagulant)** বলে।

(b) **তঞ্চনরোধক পদার্থের উদাহরণ**—(i) সোডিয়াম সাইট্রেট, (ii) সোডিয়াম অক্সালেট এবং (iii) হেপারিন। (এছাড়া হিরুডিন, পটাশিয়াম অক্সালেট, কোনো কোনো সাপের বিষ, প্রোটামিন, পেপটোন) ইত্যাদি তঞ্চনরোধক পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয়।

(c) **তঞ্চনরোধক পদার্থের বিক্রিয়া—(i) সোডিয়াম সাইট্রেট ও সোডিয়াম অক্সালেটের তঞ্চনবিরোধী ক্রিয়া**— এই দুটি রক্ততঞ্চনরোধক রাসায়নিক পদার্থ প্লাজমাস্থিত $Ca^{++}$ আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে **ক্যালশিয়াম সাইট্রেট** এবং **ক্যালশিয়াম অক্সালেট** যৌগ গঠন করে। এই কারণে মুক্ত $Ca^{++}$-এর অভাব ঘটে। $Ca^{++}$-এর অনুপস্থিতিতে রক্ত তঞ্চিত হতে পারে না।

26. অক্সালেটযুক্ত নমুনা রক্তকে কীভাবে পুনঃতঞ্চন করা হয় ?

● (i) তঞ্চনরোধক পদার্থযুক্ত রক্তকে তঞ্চিত করতে হলে ওই রক্তে কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত $Ca^{++}$ যুক্ত করতে হবে। অতিরিক্ত $Ca^{++}$ আয়নের উপস্থিতিতে রক্ত আবার তঞ্চিত হবে। অথবা, (ii) অক্সালেটেডযুক্ত রক্তের নমুনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঝাঁকলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট যৌগ থেকে ক্যালশিয়াম আলাদা হয়ে যায়, ফলে ওই রক্ত আবার তঞ্চিত হয়।

27. থ্রমবোসিস কথার অর্থ কী ?

● **থ্রমবোসিস**—রক্তবাহের মধ্যে রক্তের তঞ্চন প্রক্রিয়াকে (Intravasenla clotting of blood) থ্রমবোসিস (Thrombosis) বলে। এটি দেহে যে-কোনো স্থানে হতে পারে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ থ্রমবোসিসের উদাহরণ হল—(i) **সেরিব্রাল থ্রমবোসিস**—মস্তিষ্ক ধমনির মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে। (ii) **করোনারি থ্রমবোসিস**—হৃৎপিণ্ডের পেশিমধ্যস্থ করোনারি ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধে।

28. **ব্লাড ব্যাংক সর্বাধিক ব্যবহৃত তঞ্চনরোধক পদার্থের নাম উল্লেখ করো।**

- সোডিয়াম অক্সালেট এবং সোডিয়াম সাইট্রেট দুটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ। অক্সালেট একটি বিষাক্ত পদার্থ। এটি ক্যালশিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালশিয়াম অক্সালেট যৌগ উৎপন্ন করে যা রক্তে অধঃক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ক্যালশিয়াম সাইট্রেট মেশানোর ফলে উৎপন্ন ক্যালশিয়াম সাইট্রেট যৌগ দেহের পক্ষে বিষাক্ত নয় এবং রক্তরসেও দ্রাব্য। এই কারণে **ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণে সাইট্রেটকে প্রধান তঞ্চনরোধক পদার্থ বলে গণ্য করা হয়।**

29. **হেপারিন কী ? দেহের বিভিন্ন অংশের নাম করো যেখান থেকে হেপারিন উৎপন্ন হয়। হেপারিন কীভাবে রক্তের তঞ্চনকে বাধা দেয় ?**

- (i) **সংজ্ঞা—হেপারিন** (Heparin) একধরনের **তঞ্চনরোধক পদার্থ।** (ii) **উৎস**—এটি মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় যৌগ-কার্বোহাইড্রেট। হেপাটিক (যকৃৎ) কোশ থেকে ক্ষরিত হয় বলে এটি হেপারিন নামে পরিচিত। এছাড়া এটি অ্যারিওলার কলার মাস্ট কোশ এবং বেসোফিল শ্বেতকণিকা থেকেও ক্ষরিত হয়।

(iii) **হেপারিনের ক্রিয়া—হেপারিন** (Heparin) প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিন হতে দেয় না, ফলে ফাইব্রিনোজেন ফাইব্রিনে (তঞ্চন পিণ্ড) রূপান্তরিত হতে পারে না। এই কারণে হেপারিনযুক্ত রক্ত তঞ্চিত হয় না।

30. **M এবং N ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝো? এর গুরুত্ব কী ?**

- (i) ABO শ্রেণি এবং Rh ফ্যাক্টর ছাড়া আরও তিন ধরনের শ্রেণির উপস্থিতি দেখা যায়, যেমন M শ্রেণি, N শ্রেণি এবং MN শ্রেণি। M ও N নামে অ্যাগ্লুটিনোজেন এর জন্য দায়ী। এইপ্রকার অ্যাগ্লুটিনোজেনের অনুরূপ অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না।

  (ii) **গুরুত্ব**—পিতৃত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানে M ও N গুরুত্ব বেশি।

31. **ফাইব্রিনোলাইসিস কাকে বলে ?**

- যে প্রক্রিয়ায় অর্ধকঠিন তঞ্চিত রক্তপিণ্ডে অবস্থিত ফাইব্রিন তন্তুগুলি ভেঙে তরলে পরিণত করে তাকে ফাইব্রিনোলাইসিস বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রক্রিয়া হতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। রজঃচক্রের নির্গত তরল রক্ত জরায়ুতে প্রথমে তঞ্চিত হয় কিন্তু জরায়ু থেকে নির্গত **প্লাজমিন** নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ তঞ্চিত রক্তকে ফাইব্রিনোলাইসিস প্রক্রিয়া আবার তরল করে দেয়।

## ❂ লসিকা সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর (Some important questions and answers about Lymph)

32. **লসিকা কী ? এটা কি তঞ্চিত হয় ?**

- রক্তের মতো লসিকাও তঞ্চিত হয়। **কারণ**— লসিকার মধ্যে ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন ও অন্যান্য তঞ্চনকারী উপাদান থাকে। এর ফলে লসিকার তঞ্চন ঘটে। তঞ্চন প্রক্রিয়া খুবই ধীর গতিতে ঘটে, তবে লসিকায় গঠিত তঞ্চনপিণ্ড রক্তের তঞ্চনপিণ্ডের চেয়ে বেশি নরম হয়।

33. **কখনো-কখনো লসিকার রঙের পরিবর্তন ঘটে—কেন ?**

- উপবাস অবস্থায় কিংবা খাদ্যগ্রহণের 10-12 ঘণ্টার পর লসিকার রং স্বচ্ছ বর্ণহীন হয়। কিন্তু বেশি ফ্যাটযুক্ত খাদ্য খেলে থোরাসিক নালির লসিকা **সাদা** দেখায়। **কারণ— ফ্যাটের সূক্ষ্ম কণাগুলি** ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে শোষিত হয়ে লসিকাবাহে (ল্যাকটিয়েলে) যায়। এই কারণে খাদ্যগ্রহণের পর ফ্যাট কণা (কাইলোমাইক্রন) ও কিছুটা প্রোটিনের জন্য স্বচ্ছ লসিকার রঙের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ সাদা হয়।

34. **লসিকার একমুখী প্রবাহের কারণ কী ?**

- লসিকাবাহের মধ্যে কপাটিকা থাকার ফলে লসিকার প্রবাহ সবসময় একমুখী হয়।

35. **লসিকাবাহের প্রতিবন্ধকতার ফলে দেহে কী কী পরিবর্তন ঘটে ?**

- পায়ের লসিকাবাহ কোনো কারণে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গায় লসিকা সংবহন বন্ধ হয়ে যাবে। এই কারণে সেই জায়গায় জল জমে ফুলে যায়, এই অবস্থাকে **ইডিমা** (Oedema) বলে।

36. দেহ প্রতিরক্ষায় লসিকার ভূমিকা উল্লেখ করো।

○ দেহের প্রতিরক্ষায় লসিকার ভূমিকা নিম্নরূপ—(i) লসিকা যখন লসিকা গ্রন্থির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন বহিরাগত প্রোটিন, ব্যাকটেরিয়া, টক্সিক পদার্থ ( প্রতিবিষ ) অর্থাৎ বিজাতীয় বস্তুসমূহ **পরিস্রুত** হয়ে দেহ থেকে অপসারিত হয়। (ii) লসিকাস্থিত লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট শ্বেত কণিকাগুলি **ফ্যাগোসাইটোসিস** পদ্ধতিতে রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। (iii) লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে রোগের আক্রমণের হাত থেকে প্রতিহত করে।

37. কলাকোশের সাংগঠনিক অখণ্ডতা বলতে কী বোঝো ?

- হৃৎপিণ্ডের পেশির লসিকানালি বেঁধে দিলে হৃৎপেশির ক্ষয় হতে থাকে। একই ভাবে বৃক্কের লসিকানালি বেঁধে দিলে বৃক্কের ক্ষতি হয়। সুতরাং লসিকা বিভিন্ন কলাকোশের গঠনগত অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে।

38. শোথ কাকে বলে ? দেহে বিভিন্ন প্রকার শোথের সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

- (i) **শোথ**—কলাস্থানে অধিক পরিমাণ তরল পদার্থ জমে স্থানটি ফুলে যাওয়াকে শোথ বা **ইডিমা** বলে।
  (ii) **শোথের শ্রেণিবিন্যাস**—বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—(i) অপুষ্টিজনিত শোথ (ii) প্রদাহজনিত শোথ, (iii) লসিকাবাহের প্রতিবন্ধকতাজনিত শোথ (iv) শিরাতে যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাজনিত শোথ, (v) হৃদ্‌শোথ (কার্ডিয়াক ইডিমা), (vi) বৃক্কের রোগজনিত শোথ।

39. হিমোস্টাসিস কাকে বলে ?

- **হিমোস্টাসিস**—কোনো কারণে রক্তপাত হলে, রক্তস্থিত অণুচক্রিকা বিনষ্ট হয় ফলে অণুচক্রিকা থেকে সেরোটোনিন (Serotonin) নামে এক প্রকার রসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় যা রক্তবাহকে সংকুচিত করে এবং রক্তের তঞ্চনে অংশ নেয়। অণুচক্রিকার এইপ্রকার রক্ততঞ্চন এবং রক্তক্ষরণ-বিরোধী প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে **হিমোস্টাসিস** (Haemostasis) বলে।

40. হোমিওস্টাসিস কথার অর্থ কী ?

- **হোমিওস্টাসিস**—রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র ও সমস্ত কলাকোশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, জলের ভারসাম্য, অম্লক্ষারের ভারসাম্য এবং দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে যে সমন্বয় স্থাপন করে তাকে সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা **হোমিওস্টাসিস** (Homeostasis) বলে।

41. হিমোপোয়েটিক কলা বলতে কী বোঝো ?

- রক্তকণিকা যে কলা থেকে সৃষ্টি হয় তাকে হিমোপোয়েটিক কলা বলে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. মানুষের দেহে যে তরল কলার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু সব অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাকে কী বলে ?
2. তরল রক্ত কী ধরনের কলা ?
3. রক্তের ধাত্রকে কী বলে ?
4. মানুষের লোহিত কণিকাগুলি দ্বিঅবতল হওয়ার কারণ বলো।
5. রক্তে প্লাজমা এবং রক্তকণিকার অনুপাতকে কী বলে ?
6. রক্তরসে অবস্থিত কোন্ দুটি প্রোটিন রক্ত তঞ্চনে অংশ নেয় ?
7. সিরাম কি রক্তের অংশ ?
8. রক্ততঞ্চনের পর তঞ্চন পিণ্ড থেকে যে ফ্যাকাশে হলুদ রঙের তরল বেরিয়ে আসে তাকে কী বলে ?
9. ফাইব্রিনোজেন কী এবং রক্ততঞ্চনের সময় এটির পরিণতি কী ?
10. রক্তে প্রধানত যে দুধরনের শ্বেতকণিকা দেখা যায় তাদের নাম করো।
11. শ্বেত রক্ত কণিকার গ্র্যানুলোসাইট কয় প্রকার হয় ?
12. শ্বেত রক্ত কণিকার অ্যাগ্র্যানুলোসাইট কত রকমের হয় ?

13. ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট এবং বৃহৎ লিম্ফোসাইটের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পরিণত ?
14. কোন্ কোন্ শ্বেত রক্ত কণিকার মধ্যে আগ্রাসন কাজ লক্ষ করা যায় ?
15. শ্বেত রক্ত কণিকার কোন্‌টি দেহের অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে ?
16. মানুষের লোহিত রক্তকণিকার স্বাভাবিক জীবনকাল কত ?
17. থ্রম্বোসাইট কী এবং এটির প্রধান কাজ কী ?
18. সোডিয়াম অক্সালেট নামে রক্ত তঞ্চনরোধকারী পদার্থটি রক্ততঞ্চনে কীভাবে বাধা দেয় ?
19. একজন স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত ?
20. মানুষের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যার স্বাভাবিক অনুপাত কত ?
21. অ্যান্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন রক্তের কোন্ অংশে থাকে ?
22. অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন রক্তের কোন্ কোন্ অংশে থাকে ?
23. যদি কোনো রক্তে কোনো অ্যাগ্লুটিনোজেন না থাকে তাহলে সেই রক্ত কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ?
24. রক্তের ABO তন্ত্র বলতে কী বোঝো ?
25. AB-শ্রেণির রক্তে অবস্থিত অ্যান্টিবডির নাম করো।
26. শোথ বা ইডিমা কাকে বলে ?
27. লসিকাবাহের তরলকে কী বলে ?
28. হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি পছন্দ করে যে গ্যাসটিকে তার নাম লেখো।
29. সেরামজাত কোন্ ধরনের প্রোটিন অনাক্রম্যতা প্রদান করে ?
30. মানুষের রক্তের স্বাভাবিক pH কত ?
31. একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের রক্তের পরিমাণ কত ?
32. যে যন্ত্র দিয়ে লোহিতকণিকা এবং শ্বেতকণিকার গণনা করা হয় তার নাম লেখো।
33. রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে কী ঘটবে ?
34. লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কমে গেলে সেই অবস্থাকে কী বলে ?
35. রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা কমে গেলে তাকে কী বলা হয় ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

1. রক্তের উপাদানগুলির মধ্যে 55% হল—হিমোগ্লোবিন ☐ / লোহিত রক্তকণিকা ☐ / শ্বেত রক্তকণিকা ☐ / রক্তরস ☐।
2. রক্ত হল—বিশেষ ধরনের তরল ☐ / বিশেষ ধরনের তরল যোগ কলা ☐ / আবরণী ও যোগ কলার সংমিশ্রণ ☐ / এদের মধ্যে কোনোটিই নয় ।
3. রক্তের উপাদান হল—প্লাজমা + RBC ☐ / প্লাজমা + RBC + WBC ☐ / প্লাজমা + RBC + WBC + অণুচক্রিকা ☐ / প্লাজমা + অস্থিমজ্জার কোশ ☐।
4. রক্তের বিক্রিয়া হল—আম্লিক ☐ / ক্ষারীয় ☐ / প্রশমিত ☐ / পরিবর্তনশীল ☐।
5. রক্তে রক্তকণিকা এবং প্লাজমার অনুপাত—60 : 40 শতাংশ ☐ / 40 : 60 শতাংশ ☐ / 55 : 45 শতাংশ ☐ / 45 : 55 শতাংশ ☐
6. প্রাপ্তবয়স্ক লোকের লোহিত কণিকার মোট সংখ্যা—5 মিলিয়ন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ☐ / 50 মিলিয়ন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ☐ / 45 মিলিয়ন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ☐ / 4·5 মিলিয়ন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ☐।
7. কোন্ প্রাণীর রক্তে পরিণত RBC-তে নিউক্লিয়াস থাকে না ?—পাখি ☐ / মানুষ ☐ / সোনা ব্যাং ☐ / সরীসৃপ ☐।
8. রক্ত তঞ্চিত হওয়ার দায়ী—রক্তরস (প্লাজমা) এবং লোহিত কণিকা ☐ / প্লাজমা এবং শ্বেতকণিকা ☐ / প্লাজমা এবং অণুচক্রিকা ☐ / উপরের কোনোটিই নয় ☐।
9. একজন স্ত্রীলোকের 100 ml রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ—18 gm ☐ / 14 gm ☐ / 12 gm ☐ / 10 gm ☐।
10. নিম্নলিখিতের মধ্যে কোন্‌টি RBC-এর কাজ নয়?—আগ্রাসন ☐ / রক্তে গ্যাসের পরিবহন ☐ / রক্তের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি ☐ / রক্তে হিমোগ্লোবিন ধারণ করা ☐।
11. যে প্রক্রিয়ায় অস্থি মজ্জা থেকে RBC-এর উৎপাদন ঘটে তাকে বলে—হিমোলাইসিস ☐ / ইরিথ্রোপোয়েসিস ☐ / ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ☐/ হিমাটোক্রিট ☐।
12. অস্থিমজ্জার মূল উপাদান হল—অ্যারিওলার কলা এবং রক্তবাহ ☐ / অ্যাডিপোজ কলা এবং ফাইব্রোব্লাস্ট ☐ / অ্যাডিপোজ কলা, অ্যারিওলার কলা ও রক্ত ☐ / অ্যারিওলার কলা ও অ্যাডিপোজ কলা ☐।
13. বয়স্ক লোকের লোহিত রক্ত কণিকার উৎপত্তিস্থল হল—অস্থি মজ্জা ☐ / প্লিহা ☐ / যকৃৎ ☐ / থাইমাস গ্রন্থি ☐।
14. রক্তের কোন্ উপাদান অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে ?—ইরিথ্রোসাইট ☐ / থ্রম্বোসাইট ☐ / মনোসাইট ☐ / লিম্ফোসাইট ☐।
15. RBC-এর জীবন কাল—120 দিন ☐ / 100 দিন ☐ / 20 দিন ☐ / 10 দিন ☐।
16. শ্বেতরক্ত কণিকার মধ্যে কোন্‌টি অধিক সংখ্যায় থাকে ?—বেসোফিল ☐ / নিউট্রোফিল ☐ / ইওসিনোফিল ☐ / মনোসাইট ☐।

17. RBC দেহের যে অঙ্গে সঞ্চিত থাকে তার নাম—অস্থি মজ্জা □ / যকৃৎ □ / প্লিহা □ / উপরের প্রতিটি অঙ্গে □।
18. শ্বেতকণিকার কোন্ কোশটি দানাদার শ্বেতকণিকা নয় ?—লিম্ফোসাইট □ / নিউট্রোফিল □ / বেসোফিল □ / ইওসিনোফিল □।
19. মানুষের সব থেকে বড়ো রক্ত কণিকাটির নাম—লোহিত রক্ত কণিকা □ / মনোসাইট □ / বেসোফিল □ / বৃহৎ লিম্ফোসাইট □।
20. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি দেহের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয় ?—নিউট্রোফিল □ / লিম্ফোসাইট □ / ম্যাক্রোফাজেস □/ সবকটিই □।
21. হেপারিন কোন্ কোশ থেকে উৎপন্ন হয় না ?—যকৃৎ কোশ □ / প্লাজমা কোশ □ / রক্ত কোশ □ / প্লিহার কোশ □।
22. রক্ত তঞ্চনের সময় ফাইব্রিন উৎপাদনের উৎস হল—থ্রম্বোকাইনেজ □ / প্রোথ্রমবিন □ / যকৃৎ □ / ফাইব্রিনোজেন □।
23. ব্লাড ব্যাংকে সঞ্চিত রক্ত যাতে তঞ্চিত না হতে পারে তাতে যে রাসায়নিক পদার্থটি মেশানো হয় তা হল—হেপারিন □ / পটাশিয়াম সাইট্রেট □ / সোডিয়াম সাইট্রেট □ / সোডিয়াম নাইট্রেট □।
24. একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতি 100 ml রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ—5 গ্রাম □ / 15 গ্রাম □ / 25 গ্রাম □ / 50 গ্রাম □।
25. সিরাম তঞ্চিত হয় না কারণ এতে—ফাইব্রিনোজেন নেই □ / অ্যালবুমিন নেই □ / হেপারিন থাকে □ / গ্লাইকোজেন নেই □।
26. রক্তে লিউকোসাইট কমে গেলে তাকে বলে—লিউকোপেনিয়া □ / লিউকোমিয়া □ / হাইপোলিউকোসাইট □ / লিউকোসাইটোসিস □।
27. কলাস্থানের প্রোটিনের প্রত্যাবর্তনের জন্য দায়ী কলারস □ / কলাকোশ □ / রক্তরস □ / লসিকা □।
28. লসিকা কী ?—আবরণী কলার আন্তঃকোশীয় তরল □ / পরবর্তী কলারস □ / রক্ত থেকে নির্গত রক্তরস □ / কোনোটিই নয় □।
29. লসিকা উৎপত্তির সঠিক স্থানটির নাম হল—কলারস থেকে □ / রক্তরস থেকে □ / রক্ত থেকে □ / সিরাম থেকে □।
30. যে লোকের রক্তে উভয় প্রকার অ্যাগ্লুটিনোজেন (অ্যান্টিজেন) থাকে তাকে বলে—A গ্রুপ □ / B গ্রুপ □ / AB গ্রুপ □ / O গ্রুপ □।
31. লসিকা রক্তে ফিরে আসে—কলারসের মাধ্যমে □ / শিরার মাধ্যমে □ / ধমনির মাধ্যমে □ / রক্তজালকের মাধ্যমে □।
32. রক্তবাহের মধ্যে রক্ত জমাট প্রক্রিয়াকে বলে—রক্ততঞ্চন □ / থ্রম্বোসিস □ / অধঃক্ষেপন □ / পৃষ্ঠলগ্নতা □।
33. অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না—রক্তে O গ্রুপ □ / AB গ্রুপ □ / A গ্রুপ □ / B গ্রুপ □।
34. রক্ততঞ্চনে বাধাদানকারী হেপারিন নিঃসৃত হয় যে শ্বেতকণিকা থেকে তার নাম হল—মনোসাইট □ / নিউট্রোফিল □ / বেসোফিল □ / ইওসিনোফিল □।
35. রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে গেলে কী হবে—সাইনোসিস □ / থ্রম্বোসিস □ / হিমোলাইসিস □ / পারফুরা □।
36. রক্তের রাসায়নিক বিক্রিয়া হল—অম্ল □ / ক্ষার □ / প্রশমিত □ / কোনোটিই নয় □।
37. কোন্‌টি অধিকতর পরিণত—দুটি লোব বিশিষ্ট নিউট্রোফিল □ / তিনটি লোব বিশিষ্ট নিউট্রোফিল □ / চারটি লোব বিশিষ্ট নিউট্রোফিল □ / পাঁচটি লোব বিশিষ্ট নিউট্রোফিল □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. রক্ত একপ্রকার ——— কলা।
2. রক্ত প্রধানত ——— শতাংশ জল এবং ——— শতাংশ কঠিন পদার্থ নিয়ে গঠিত।
3. রক্তে রক্তকণিকাগুলিকে ——— উপাদান বলে।
4. রক্তে সব থেকে বড়ো রক্তকণিকার নাম ——— এবং ছোটো কণিকার নাম হল ———।
5. একজন স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক লোকের দেহে মোট ——— লিটার রক্ত থাকে।
6. হিমোগ্লোবিন প্রধানত ——— গ্যাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।
7. দ্বি-অবতল ও গোলাকার, নিউক্লিয়াসবিহীন রক্তকণিকার নাম ———।
8. যে ব্যক্তির দেহে ——— শ্রেণির রক্ত থাকে তাকে সর্বজনীন দাতা বলে।
9. লোহিতকণিকার উপরিতলে ——— এবং রক্তরসে ——— থাকে।
10. রক্ততঞ্চনের জন্য আবশ্যিক ধাতুটি হল ———।
11. লসিকা হল ——— কলারস যা লসিকাবাহের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
12. শ্বেত রক্তকণিকার ——— এবং ——— প্রধান কাজ হল ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করা।
13. লোহিত রক্তকণিকার মোট আয়ুষ্কাল ——— দিন।
14. মানুষের রক্তের ——— লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু ——— লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।
15. থ্রম্বোসাইট রক্তের একধরনের ——— যার মুখ্য কাজ হল রক্তকে ——— করা।
16. ল্যান্ডস্টেইনার এবং উইনার ভারতীয় হনুমানের রক্ত খরগোসের দেহে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের সিরামে ——— নামে একপ্রকার অ্যান্টিবডির উপস্থিতি দেখতে পান।
17. ABO রক্তগ্রুপের উদ্ভাবকের নাম ———।
18. রক্তের লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকার মোট সংখ্যা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম ———।
19. যদি একটি পায়ের লসিকাবাহ বন্ধ হয় তাহলে ——— দেখা দেবে।
20. ছোটো লিম্ফোসাইট বড়ো লিম্ফোসাইট অপেক্ষা ——— পরিণত।

### D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. মানুষের রক্তে বিভিন্ন ধরনের শ্বেতকণিকার মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক শ্বেতকণিকার নাম ———। (নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, লিম্ফোসাইট বা মনোসাইট)।
2. অক্সিজেন বহনকালে হিমোগ্লোবিন জারিত ———। (হয় না / হয়)
3. লোহিত রক্তকণিকাগুলির পৃষ্ঠটানের মাধ্যমে পরস্পর স্তরীভূত হওয়ার ঘটনাকে ——— বলে। (জড় হওয়া / তঞ্চিত হওয়া / রাউলেক্স গঠন)
4. ত্রিস্তরী আবরণী দিয়ে লোহিত রক্তকণিকা আবৃত থাকে তার রাসায়নিক গঠন ———। (লিপিড-প্রোটিন-লিপিড / প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন)
5. লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে বেড়ে গেলে তাকে ——— বলে। (অলিগোসাইথেমিয়া / ইরিথ্রেমিয়া / পলিসাইথেমিয়া)
6. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের 100 মিলি লিটার রক্তে ——— গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। (5 / 10 / 15 / 20 / 50 / 100)
7. স্বাভাবিক রক্তে ——— না থাকায় প্রবাহমান রক্ত রক্তনালির ভিতরে তঞ্চিত হতে পারে না। (হেপারিন / থ্রমবোপ্লাস্টিন / ফাইব্রিন $Ca^{2+}$)
8. প্লাজমায় ফ্যাক্টর VIII-এর অভাবে ——— রোগ হয়। (পারফুরা / লিউকোপেনিয়া / থ্রম্বোসিস / হিমোফিলিয়া)
9. লসিকা উৎপাদন ——— থেকে হয়। (সম্পূর্ণ রক্ত থেকে / প্লাজমা থেকে / কলারস থেকে)
10. A-শ্রেণির রক্তে ——— অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) থাকে। ( $\alpha$ / $\beta$ / $\alpha$ ও $\beta$ /o)

### E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. রক্তে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকাকে আদর্শ কোশ বলে। ☐
2. রক্তের ঈষৎ অম্লধর্মী অস্বচ্ছ হলুদ রঙের ধাত্র থাকে তাকে রক্তরস বলে। ☐
3. যে তরল কলার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু সমস্ত দেহে পরিবাহিত হয় তাকে সংবহন কলা বলে। ☐
4. সিরামে অ্যালবুমিন, সিরাম গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন এবং প্রোথ্রম্বিন নামে চার প্রকার প্রোটিন থাকে। ☐
5. স্তন্যপায়ীর লোহিতকণিকা দ্বিঅবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন হয়। ☐
6. রক্তে রক্তরসের পরিমাণ 45% এবং রক্তকণিকার পরিমাণ 55%। ☐
7. রক্ততঞ্চনের পর যে তরল তঞ্চনাপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে তাকে রক্তরস বলে। ☐
8. রক্তের সাকার উপাদানের নাম রক্তরস এবং সিরাম। ☐
9. লোহিত রক্তকণিকাতে হিমোগ্লোবিন নামে লৌহঘটিত শ্বাস রঞ্জক কণা থাকে। ☐
10. সব রকম শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আকৃতির দানা থাকে। ☐
11. মানুষের রক্তে সবথেকে বড়ো রক্তকণিকাটির নাম হল বড়ো (বৃহৎ) লিম্ফোসাইট। ☐
12. মানুষের রক্তের অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডিকে যথাক্রমে অ্যাগ্লুটিনিন এবং অ্যাগ্লুটিনোজেন বলে। ☐
13. ব্লাডব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণে সোডিয়াম সাইট্রেট হল শ্রেয় তঞ্চনরোধক রাসায়নিক পদার্থ। ☐
14. যে হারে তঞ্চনরোধক পদার্থ মিশ্রিত রক্তে লোহিত কণিকাগুলি থিতিয়ে পড়ে তাকে হিমাট্রোটিক ভ্যালু বলে। ☐
15. রক্তরসে (প্লাজমায়) একমাত্র গামাগ্লোবিউলিনই অ্যান্টিবডি হিসাবে কাজ করে। ☐
16. রক্তের থ্রম্বোসাইটকে অণুচক্রিকা বলে, এর গড় আয়ু 3-4 দিন। ☐
17. লোহিত রক্তকণিকার আয়ু 210 দিন। ☐
18. শ্বেত রক্তকণিকায় ইওসিনোফিল শ্বেত রক্তকণিকা নিউট্রোফিল শ্বেত রক্তকণিকা থেকে সংখ্যায় অধিক। ☐
19. AB গ্রুপের রক্তযুক্ত লোককে সার্বজনীন দাতা বলে। কারণ এই শ্রেণি রক্ত সকলকে দেওয়া যেতে পারে। ☐
20. লসিকা হল অন্যতম সংবহন কলা। ☐
21. কলারস কলাকোশকে পুষ্টি এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে। ☐

## II. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. রক্ততঞ্চনের ভৌত প্রক্রিয়া উল্লেখ করো। 2. রক্ততঞ্চনের জন্য দায়ী I, II, III এবং VIII ফ্যাক্টরের নাম করো। 3. হিমোফিলিয়া কী ? একটি ফ্যাক্টরের নাম করো যার অভাবে এই রোগ হয়। 4. তঞ্চনবিরোধী পদার্থ কাকে বলে ? এর একটি উদাহরণ দাও। ব্লাড ব্যাংকে যে রক্ততঞ্চনরোধকারী রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হয় তার নাম করো। 5. হেপারিন কী ? এর উৎস সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 6. অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং অ্যাগ্লুটিন বলতে কী বোঝো ? 7. ABO গ্রুপ কাকে বলে ? সর্বপ্রথম কে এবং কত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেছিলেন। 8. Rh ফ্যাক্টর কাকে বলে ? যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Rh-ফ্যাক্টর প্রাণীর দেহে দেখেছিলেন তাদের নাম করো। 9. $Rh^+$ এবং অ্যান্টি Rh বলতে কী বোঝায় ? 10. কী কী কারণে দেহে রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজনীয়তা হয় ? 11. মানুষের রক্তে বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার নাম লেখো। তার মধ্যে কোন্‌টি দেহের সুরক্ষায় সাহায্য করে। 12. দুটি প্লাজমা প্রোটিনের নাম করো যা যকৃতে সংশ্লেষিত হয় ? 13. লসিকা কী ? এর উপাদান সম্বন্ধে লেখো। 14. ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণের জন্য সাইট্রেটকে শ্রেয় তঞ্চন-রোধক হিসাবে গণ্য করা হয় কেন ? 15. দেহের প্রতিরক্ষা কাজে কীভাবে লসিকা অংশগ্রহণ করে তা বর্ণনা করো। 16. জ্যান্ত টেস্টটিউব বলতে কী বোঝায় ? 17. ডায়াপেডেসিস কী ? 18. রক্ত কী ? রক্ত লাল দেখায় কেন ? রক্তের একটি বাফারের নাম করো। 19. স্ফোরোসাইটোসিস বলতে কী বোঝো ? 20. সবথেকে ছোটো এবং সবথেকে বড়ো রক্তকণিকার নাম কী ? 21. রক্তবাহের মধ্যে প্রবাহমান রক্ত তঞ্চিত হয় না কেন ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. রক্তে যে তিন প্রকার রক্ত কণিকা থাকে তাদের প্রতিটির একটি করে কাজ উল্লেখ করো। 2. রক্তে চারটি পরিবহনের কাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো। 3. থ্রমবোপ্লাস্টিন কী ? দুটি উৎসের নাম করো যেখান থেকে থ্রমবোপ্লাস্টিন তৈরি হয়। 4. রক্তবাহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান রক্ত কী কী কারণে তঞ্চিত হতে পারে না। 5. A, B, AB এবং O গ্রুপ রক্তে অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিনের উপস্থিতি উল্লেখ করো। 6. ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কী বোঝো ? 7. রক্ত সঞ্চারণের সংজ্ঞা বলো। রক্তের সঞ্চারণের সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতার উল্লেখ করো। 8. লসিকার দেহের প্রতিরক্ষা কাজ বর্ণনা করো। 9. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহের অভ্যন্তরে রক্ত তঞ্চিত হয় না কেন ? 10. রক্তের শ্রেণিবিভাজন কী ? প্রধান শ্রেণিগুলির নাম করো। 11. এক রক্তদান শিবিরে তুমি যদি 200 মিলিলিটার রক্তদান করো, তাহলে তোমার শরীরে মোট রক্তের শতকরা কতভাগ রক্ত দেওয়া হবে ? 12. (a) অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস অবস্থায় যখন রক্তবাহের মধ্যে রক্ত তঞ্চিত হয় তাকে কী বলে ? (b) অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলতে কী বোঝো ? (c) তিনটি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের পদার্থের নাম করো। 13. কীভাবে সোডিয়াম অক্সালেট নামে তঞ্চনবিরোধী পদার্থ মিশ্রিত রক্তের নমুনাকে আবার তঞ্চিত করা যায় ? 14. লসিকা কী ? এটি দেহে কীভাবে তৈরি হয়। 15. অক্সিজেনের অভাবে (হাইপোক্সিয়) রক্তে RBC সংখ্যা বাড়ার কারণ কী ? 16. রক্ততঞ্চনের সময় থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনের দুটি উৎসসহ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করো। 17. অণুচক্রিকা কী ? এটি রক্ততঞ্চনে কীভাবে সাহায্য করে। 18. হিমোগ্লোবিন RBC না থেকে প্লাজমায় থাকলে দেহে কী কী পরিবর্তন ঘটত ?

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. সাধারণ যোগকলা এবং রক্তযোগকলার মধ্যে দুটি করে পার্থক্য লেখো।
2. সার্বজনীন দাতা এবং সার্বজনীন গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।
3. লসিকার উপাদান এবং প্লাজমার উপাদানের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
4. সিরাম এবং প্লাজমার মধ্যে পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।
5. শ্বেত রক্তকণিকার নিউট্রোফিল এবং লিম্ফোসাইটের পার্থক্যগুলি লেখো।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. হিমোগ্লোবিন, 2. সিরাম, 3. অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, 4. হিমোফিলিয়া, 5. ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস এবং 6. সাশ্রয়ী থ্রম্বোপ্লাস্টিক।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type Questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. (a) রক্ত কী ? (b) মানবদেহে রক্তের বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী ? (c) রক্তের প্রধান কাজগুলি বর্ণনা করো।
2. (a) রক্ততঞ্চন কী ? (b) রক্ততঞ্চনের প্রক্রিয়ার আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
3. (a) থ্রমবোপ্লাস্টিন কী ? (b) একটি দেহে কীভাবে তৈরি হয় তা বিশদভাবে বর্ণনা করো।
4. (a) অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর কাকে বলে ? (b) দুটি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরের নাম করো।
5. রক্ততঞ্চনের আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
6. (a) রক্তের সঞ্চারণ বলতে কী বোঝো ? (b) রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো। রক্ত সঞ্চারণকালে কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত ?
7. (a) ABO তন্ত্র কাকে বলে ? (b) রক্তের শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য কী ?
8. (a) লসিকা কী ? (b) লসিকার উপাদান বিভিন্ন কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
9. (a) হিমোগ্লোবিন কী ? (b) এর প্রকারভেদ এবং কাজগুলি আলোচনা করো। (c) দেহে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ কত ? (d) দেহে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে কী রোগ হয় ?
10. (a) তঞ্চনরোধক দুটি পদার্থের নাম করো। (b) এই দুটি পদার্থের কার্যরীতি উল্লেখ করো।
11. (a) লসিকা কী ? (b) যদি একটি পায়ের লসিকাবাহ বন্ধ হয় তাহলে কী হবে ?
12. (a) লসিকা কীভাবে কলারস থেকে উৎপন্ন হয় ? (b) লসিকা তঞ্চিত হতে পারে ? যুক্তিসহ তোমার উত্তর সমর্থন করো।
13. (a) সার্বজনীন দাতা ও গ্রহীতা বলতে কী বোঝো ? (b) সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতা—এই মতবাদ কী গ্রহণযোগ্য, ব্যাখ্যা করো।

### B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো :

1. রক্ততঞ্চনে সাশ্রয়ী পথ এবং পরাশ্রয়ী পথের লেখচিত্র দাও। 2. বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকা এঁকে চিহ্নিত করো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# হৃদ্‌বাহতন্ত্র
# [ CARDIO VASCULAR SYSTEM ]

## ➧ ভূমিকা (Introduction) ঃ

মানুষের দেহের রক্ত এবং লসিকাকে একসঙ্গে **সংবহন কলা** বলে। দেহে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ দেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায় তাকে **সংবহন** বলে। যেসব অঙ্গের মাধ্যমে সংবহন ঘটে তাদের **সংবহন অঙ্গ** বলে। **রক্ত, হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ ও তার শাখাপ্রশাখা এবং লসিকা, লসিকা গ্রন্থি, লসিকাবাহ ইত্যাদি সংবহন অঙ্গগুলি নিয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে একত্রে সংবহনতন্ত্র বলে।** সংবহনতন্ত্র দুই প্রকার, যেমন—রক্তসংবহনতন্ত্র এবং লসিকা সংবহনতন্ত্র। প্রথমটি রক্ত, রক্তবাহ (ধমনি, শিরা ও রক্তজালক নিয়ে গঠিত) এবং হৃৎপিণ্ড নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় তন্ত্রটি লসিকা, লসিকা গ্রন্থি এবং লসিকাবাহ নিয়ে গঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক **উইলিয়ম হার্ভে** 1616 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্তের সংবহন আবিষ্কার করেন। হার্ভে দেখেছিলেন যে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত একরকম রক্তবাহ (ধমনি) দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে যায় এবং অপর একপ্রকার রক্তবাহ (শিরা) দিয়ে এই স্থানে ফিরে আসে।

**সংবহনতন্ত্র** হল মানুষের দেহের একটি বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পরিপাকলব্ধ খাদ্যবস্তু, গ্যাসীয় বস্তু, বিভিন্ন ক্ষরণ ও রেচনজাত বস্তুসমূহ, বিপাকীয় বস্তুসমূহ দেহগঠন বা বর্জনের প্রয়োজনে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়।
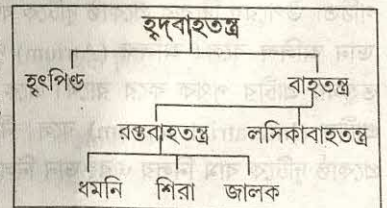
## ◎ 3.1. মানুষের হৃদ্‌বাহতন্ত্র (Cardiovascular system) ◎

❖ হৃদ্‌বাহতন্ত্রের সংজ্ঞা (**Definition of Cardiovascular system**) ঃ জীবদেহে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু, গ্যাসীয় বস্তু, হরমোন, বিভিন্ন রেচন পদার্থ ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ড এবং রক্তবাহ মিলিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে হৃদ্‌বাহতন্ত্র বলে।

### ▲ মানুষের হৃৎপিণ্ড—সংজ্ঞা এবং শারীরস্থান অন্তর্গঠন (Human Heart—Definition and Anatomy and Internal structure) ঃ

❖ (a) **হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা (Definition of Heart)** ঃ **পেশিবহুল লালচে বাদামি রঙের ত্রিকোণাকৃতি পাম্পের মতো যন্ত্র যা বক্ষগহ্বরের দুটি ফুসফুসের মধ্যস্থলে ও উরঃফলকের নীচে দেহের মধ্যরেখার সামান্য বামে থাকে তাকে হৃৎপিণ্ড (Heart) বলে।**
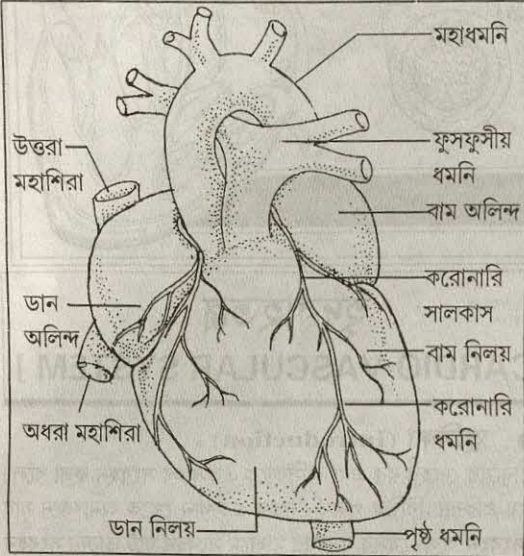
চিত্র 3.1 ঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের বহির্গঠনের চিত্ররূপ।

(b) **হৃৎপিণ্ডের শারীরস্থান (Anatomy of Heart)** ঃ মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরের মধ্যরেখা বরাবর সামান্য বাঁ দিকে অবস্থান করে। এর দুদিকে দুটি ফুসফুস থাকে। হৃৎপিণ্ডের আকৃতি অনেকটা নাসপাতির মতো এবং আয়তনে সেই ব্যক্তির মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো। হৃৎপিণ্ডের মূলদেশ (Base) অর্থাৎ উপরের দিক প্রসারিত ও নীচের দিক অর্থাৎ শীর্ষদেশ (Apex) শাঙ্কব আকৃতির হয়। এটি নীচের দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরের মাঝখানে থাকে। হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য 12–13 cm., প্রস্থ 9–10 cm.। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন 300–330 gm এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এর ওজন 200–240 gm। হৃৎপিণ্ডের বহিঃতলে (outer surface) দুটি খাঁজের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেমন—(i) **করোনারি সালকাস** (Coronary sulcus) নামে একটি আড়াআড়ি খাঁজ যা অলিন্দ এবং নিলয় অংশ দুটিকে বিভক্ত করে। (ii) **আন্তঃনিলয় খাঁজ** (Interventricular groove) যা সম্পূর্ণ নিলয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে। সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি **পেরিকার্ডিয়াম** (Pericardium) নামে দ্বিস্তর তন্তুময় পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই পর্দার মাঝে যে ফাঁকা স্থান থাকে তা **পেরিকার্ডিয়াল তরল** (Pericardial fluid) দিয়ে পূর্ণ থাকে। পেরিকার্ডিয়াম হৃৎপিণ্ডকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

(c) **হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন (Internal structure of Heart)** ঃ মানুষের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। উপরের দিকের প্রকোষ্ঠ দুটিকে **বাম অলিন্দ** ও **ডান অলিন্দ** বলে। অলিন্দ (Atrium) দুটিকে একটি তন্তুময় প্রাচীর পৃথক করে রাখে। একে **আন্তঅলিন্দ প্রাচীর** (Interatrial septum) বলে। নীচের দিকের প্রকোষ্ঠ দুটিকে **বাম নিলয়** এবং **ডান নিলয়** বলে। এই

চিত্র 3.2 ঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠনের চিত্ররূপ

দুটি নিলয়ের (Ventricle) মধ্যবর্তী প্রাচীরকে **আন্তনিলয় প্রাচীর** (Interventricular septum) বলা হয়। এই প্রাচীরটির নীচের তিন-চতুর্থাংশ পেশিকলা নিয়ে গঠিত। দুটি নিলয়ের প্রাচীর দুটি অলিন্দের প্রাচীর থেকে বেশি মোটা। হৃৎপিণ্ডের অলিন্দের অন্তর্গাত্র মসৃণ হয় কিন্তু নিলয়ের অন্তর্গাত্র পীড়কার মতো বহু খাঁজযুক্ত হয়। এই খাঁজযুক্ত প্রাচীর যে হৃৎপেশি দিয়ে গঠিত থাকে তাকে **পীড়কাপেশি** (Papillary muscle) বলে। পীড়কাপেশির মুক্তপ্রান্ত কণ্ডরা তন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই কণ্ডরাকে **কর্ডি টেন্ডিনি** (Chordae tendineae) বলে। কণ্ডরা তন্তুগুলি অলিন্দ-নিলয় মধ্যস্থ কপাটিকার মুক্তপ্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

ডান অলিন্দে **উত্তরা (ঊর্ধ্ব) মহাশিরা** এবং **অধরা (নিম্ন) মহাশিরা** এবং **করোনারি সাইন্যাস** উন্মুক্ত হয়। ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের সঙ্গে অলিন্দ-নিলয়ের ছিদ্রপথ দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। এই ছিদ্রপথে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (ভাল্‌ব) থাকে। ডান নিলয় থেকে **ফুসফুসীয় ধমনি** নির্গত হয়। বাম অলিন্দে চারটি **ফুসফুসীয় শিরা** প্রবেশ করে। বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের সঙ্গে অলিন্দ-নিলয়ের ছিদ্রপথ দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। এই ছিদ্রপথে **বাইকাসপিড কপাটিকা** থাকে। বাম নিলয় থেকে **মহাধমনি** উৎপন্ন হয়।

চিত্র 3.3. : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়াম গঠনের চিত্ররূপ।

## ➤ হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর (Walls of Heart) :

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত। (i) **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium)—এটি হৃৎপিণ্ডের সবথেকে ভিতরের স্তর যার একস্তর চ্যাপটা আঁশাকার অন্তরাবরণী (Endothelium) কলা নিয়ে গঠিত। এর নীচে যোগকলা বিন্যস্ত থাকে। (ii) **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium)—এই স্তরটি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মোটা মধ্যস্তর যা প্রধানত শাখাযুক্ত **অনৈচ্ছিক সরেখ হৃৎপেশিকলা** নিয়ে গঠিত। এই স্তরটি অলিন্দের তুলনায় নিলয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা হয়, কারণ এই প্রকোষ্ঠকে উচ্চ ধমনি চাপের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। বাম নিলয়ে এটি সবথেকে মোটা। (iii) **এপিকার্ডিয়াম** (Epicardium)—এই স্তরটি সবথেকে বাইরের স্তর যা **যোগকলা** নিয়ে গঠিত।

### • পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium) •

পেরিকার্ডিয়াম একটি দ্বিস্তর তন্তুময় পর্দা নিয়ে গঠিত থলি যার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটি থাকে। পেরিকার্ডিয়াম থলির বাইরের স্তরটিকে **প্যারাইটাল স্তর** এবং যে স্তরটি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে থাকে সেই স্তরটিকে **ভিসেরাল স্তর** বলে। এই দুটি স্তরের মধ্যবর্তী স্থানটিকে বলে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** যা **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইডে** পূর্ণ থাকে। এই পর্দার উপরের অংশ হৃৎপিণ্ডের মূলদেশের বৃহৎ রক্তনালিগুলি তন্তুময় পর্দার সঙ্গে এবং নীচের অংশ মধ্যচ্ছদার কেন্দ্রীয় অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ● **কাজ**—পেরিকার্ডিয়াম হৃৎপিণ্ডকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

## ➤ হৃৎপিণ্ডের ছিদ্র (Aperturs of Heart) :

(i) বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় এবং ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়মধ্যবর্তী স্থানে যোগাযোগকারী ছিদ্রগুলি—এদের **অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (Atrio-ventricular apertures) বলে।

(ii) ডান অলিন্দে তিনটি ছিদ্র একটি ছিদ্র দিয়ে মস্তিষ্ক (মাথা), বাহু প্রভৃতি ঊর্ধ্বাংশ থেকে আসা **উত্তরা (ঊর্ধ্ব) মহাশিরা** (Superior venacava) প্রবেশ করে। অন্যটি দিয়ে উদর, পা প্রভৃতি নিম্নাংশ থেকে আসা **অধরা (নিম্ন) মহাশিরা** (Inferior venacava) প্রবেশ করে। তৃতীয় ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র পথটির মধ্য দিয়ে হৃৎপেশি থেকে শিরারক্ত বহনকারী শিরা **করোনারি সাইনাস** (Coronary sinus) প্রবেশ করে।

(iii) বাম অলিন্দের ছিদ্র— অলিন্দনিলয় ছিদ্র ছাড়া অন্য চারটি ছিদ্রপথ থাকে। এদের মধ্য দিয়ে ধমনি রক্ত বহনকারী 4টি **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary veins) উন্মুক্ত হয়।

(iv) ডান নিলয়ে একটি ছিদ্র—এই ছিদ্র থেকে শিরারক্ত বহনকারী **ফুসফুসীয় ধমনি** (Pulmonary artery) উৎপন্ন হয়।

(v) বাম নিলয়স্থিত ছিদ্র—এই ছিদ্র দিয়ে **মহাধমনি** (Aorta) নামে একটি মোটা ধমনি উৎপন্ন হয়।

## ➤ হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (Valves of Heart) :

❖ (a) সংজ্ঞা : হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের সংযোগস্থলে এন্ডোমেট্রিয়াম ভাঁজ হয়ে যে অংশ গঠন করে এবং যা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহকে সবসময় একমুখী করে তাকে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বলে।
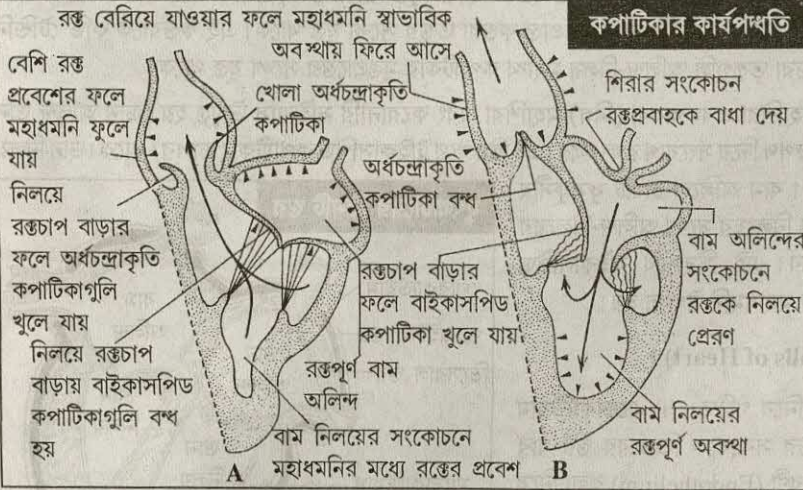
চিত্র 3.4. : বামদিকের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসহ ছিদ্র—হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণের সময় কপাটিকার খোলা-বন্ধের চিত্ররূপ।

(b) **প্রকারভেদ :** হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে বিভিন্ন প্রকারের কপাটিকা বা ভালভের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়—(i) অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে যে কপাটিকাগুলি থাকে তাদের সাধারণভাবে **অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা** (Atrioventricular valve সংক্ষেপে A. V. valve) বলে, কিন্তু এগুলি অন্য নামেও পরিচিত, যেমন—যে কপাটিকা ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের ছিদ্রপথে থাকে তাকে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (Tricuspid valve) বলে। (ii) কপাটিকা বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় ছিদ্রপথে থাকে তাকে **বাইকাসপিড কপাটিকা** (Bicuspid valve) বা **মিট্রাল কপাটিকা** (Mitral valve) বলা হয়। (iii) ফুসফুসীয় ধমনি এবং মহাধমনির উৎপত্তিস্থানে **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** বা **সেমিলুনার কপাটিকা** (Semilunar valve) থাকে। (iv) অধরা মহাশিরা ও অলিন্দ ছিদ্রপথে **ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা** (Eustachian valve)। (v) করোনারি সাইনাস ছিদ্রপথে **থেবেসিয়ান কপাটিকা** (Thebesian valve) নামে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। উত্তরা মহাশিরা এবং ফুসফুসীয় শিরার মিলিত স্থানে কোনো কপাটিকা থাকে না।

চিত্র 3.5 : হৃৎপিণ্ডের বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা।

### ● হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা নাম, গঠন, অবস্থান ও কাজ (Name, Structure, Location and Functions of Valves of Heart) :

| নাম | গঠন | অবস্থান ও কাজ |
|---|---|---|
| 1. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা | ত্রিপত্র কপাটিকা (তিনটি ত্রিভুজাকৃতি সুচালো কপাটিকা নিয়ে গঠিত)। | **অবস্থান**—ডান অলিন্দ-নিলয় সংযোগস্থলে থাকে।<br>**কাজ**—ডান নিলয় থেকে ডান অলিন্দে রক্তের প্রবাহকে বাধা দেয়। |
| 2. বাইকাসপিড কপাটিকা (মিট্রাল কপাটিকা) | দ্বিপত্র কপাটিকা (দুটি ত্রিভুজাকৃতি সুচালো কপাটিকা নিয়ে গঠিত)। | **অবস্থান**—বাম অলিন্দ-নিলয় সংযোগস্থলে থাকে।<br>**কাজ**—বাম নিলয় থেকে বাম অলিন্দে রক্তের প্রবেশকে বাধা দেয়। |
| 3. অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা (সেমিলুনার কপাটিকা) | একটি করে ত্রিমুখ অর্ধচন্দ্র আকৃতির কপাটিকা নিয়ে গঠিত। | **অবস্থান**—ডান নিলয় ও ফুসফুসীয় ধমনির এবং বাম নিলয় ও মহাধমনির সংযোগস্থলে থাকে।<br>**কাজ**—ফুসফুসীয় ধমনি এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে নিলয়ে আসতে বাধা দেয়। |

| নাম | গঠন | অবস্থান ও কাজ |
|---|---|---|
| 4. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা | অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঠনের কপাটিকা নিয়ে গঠিত। | অবস্থান—শিশু অবস্থায় অধরা মহাশিরার ছিদ্রপথে থাকে। কাজ—ডান অলিন্দ থেকে রক্তকে অধরা মহাশিরাতে প্রবেশে বাধা দেয়। |
| 5. থেবেসিয়ান | অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঠনের কপাটিকা নিয়ে গঠিত। | অবস্থান—করোনারি সাইনাস ছিদ্রপথের মুখে থাকে। কাজ—রক্তকে করোনারি সাইনাস থেকে অলিন্দে ফিরে আসতে বাধা দেয়। |

## ✪ 3.2. হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোজী কলা (Special Junctional tissues of the Heart) ✪

### ▲ হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোজী কলার সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Definition and types of special junctional tissues of Heart) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যেসব বিশেষ ধরনের পরিবর্তিত পেশিকলা হৃৎস্পন্দনের আবেগের (Cardiac Impulse) উৎপত্তি ও তার বিস্তারে অংশগ্রহণ করে তাদের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোজী (Special junctional tissue) কলা বলে।**

(b) **প্রকারভেদ** ঃ বিশেষ সংযোজী কলা প্রধানত পাঁচ প্রকার, যেমন—

1. **সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড (Sinoatrial node)** সংক্ষেপে **S. A. node**—ডান অলিন্দে যে স্থানে উত্তরা মহাশিরা প্রবেশ করে সেই স্থানে S. A. নোড থাকে। ● **কাজ**—S. A. নোড প্রতি মিনিটে 70-80টি হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করে যা হৃৎপিণ্ডকে প্রতি মিনিটে 70-80 বার (গড়ে 72 বার) স্পন্দিত করে। এই কারণে S.A. নোডকে হৃৎপিণ্ডের **পেস মেকার** (Pace maker) বা **ছন্দনিয়ামক** বলা হয়।

2. **অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrioventricular node** সংক্ষেপে **A. V. node)** —ডান অলিন্দের পেছনের অংশে (আন্তঅলিন্দ প্রাচীরের নীচের দিকে) যে অংশে করোনারি সাইনাস উন্মুক্ত হয় সেই স্থানের কাছাকাছি অংশে এটি থাকে। ● **কাজ**—এটি প্রতি মিনিটে 40-60 বার গড়ে 50 হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করতে পারে। A. V. নোড **সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক** (Reserved pacemaker) নামে পরিচিত।

3. **হিজের তন্তুগুচ্ছ (Bundle of His)—হিজের** তন্তুগুচ্ছ A. V. নোড থেকে উৎপন্ন হয় এবং অলিন্দ-নিলয় মধ্যবর্তী প্রাচীর অতিক্রম করে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। তন্তুগুচ্ছগুলি নিলয়মধ্যস্থ প্রাচীরের দু-পাশ দিয়ে **ডান ও বাম গুচ্ছ** হয়ে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হয়। ● **কাজ**—এটি প্রতি মিনিটে 36 বার হৃৎস্পন্দনের আবেগ সৃষ্টি করে এবং তাকে পরিবাহিত করে।

চিত্র 3.6. ঃ হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত SA নোড, AV নোড, বান্ডেল অফ্ হিজ, পাককিন্‌জি তন্তুসমূহের চিত্র।

4. **পারকিন্‌জি তন্তু (Purkinje fibres)**—হিজের তন্তুগুচ্ছগুলি হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হয় তাদের পারকিন্‌জি তন্তু বলা হয়। প্রতিটি শাখাতন্তু নিলয় পেশিতে প্রবেশ করে। ● **কাজ**—পারকিন্‌জি তন্তু মিনিটে 30-35টি স্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করে। এই তন্তু দিয়ে হৃৎস্পন্দনের আবেগ নিলয়ের প্রতিটি পেশি তন্তুতে যায়।

5. **আন্তরনোডীয় তন্তু (Internodal fibres)**—আন্তরনোডীয় তন্তু সংখ্যায় তিন জোড়া, যেমন—সম্মুখগামী, মধ্যগামী এবং পশ্চাৎগামী তন্তুসমূহ। এই সব তন্তুগুলি S. A. নোড এবং A. V. নোডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং হৃৎস্পন্দনের আবেগ পরিবহন করে।

6. **ব্যাকমেনের গুচ্ছ** বা **বান্ডেল (Bachmann's bundle)**—ব্যাকমেনের গুচ্ছ হল অন্য একটি তন্তু গুচ্ছ যা S. A. নোড

থেকে উৎপন্ন হয়ে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এটি পারকিন্‌জি তন্তুর মতো তন্তু নিয়ে গঠিত যা বাম অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে।

● **কাজ**—হৃৎস্পন্দন আবেগের বিস্তারে সাহায্য করে।

## 3.3. হৃৎপেশির ধর্ম (Properties of heart Muscle)

1. **উত্তেজিতা (Excitability)**—উত্তেজিতা প্রতিটি জীবন্ত জীব বা কোশের একটি বিশেষ ধর্ম। হৃৎপেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে পেশি সেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয় ও সংকুচিত হয়।

2. **সংকোচনশীলতা (Contractility)**—সংকোচনশীলতা পেশির একটি প্রধান ধর্ম যা অন্য কোনো কলায় দেখা যায় না। পেশির মায়োফাইব্রিলে অ্যাকটিন ও মায়োসিন নামে পেশি সংকোচী (contractile) উপাদান, ATP এবং $Ca^{++}$ আয়নের উপস্থিতিতে **অ্যাকটিন মায়োসিন-ADP যৌগ** গঠন করে। এই যৌগই পেশি সংকোচনের একটি রাসায়নিক যৌগ।

3. **পরিবাহিতা (Conductivity)**—হৃৎপিণ্ডের সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড সংক্ষেপে S.A. নোডে যে **হৃৎআবেগ** সৃষ্টি হয় তা ইন্টারনোডাল তন্তুগুচ্ছের মাধ্যমে ও অলিন্দ পেশি হয়ে A.V. নোডে আসে। A.V. নোড থেকে এই হৃৎস্পন্দনের আবেগ (Cardiac impulse) হিজের তন্তুগুচ্ছ এবং পারকিন্‌জি তন্তুর শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের সমগ্র নিলয় পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে। হৃৎপেশির পরিবহনের পথ নিম্নরূপ—

S.A. নোড —(অলিন্দ পেশি / অন্তরনোডীয় তন্তু)→ A.V. নোড —(হিজের তন্তুগুচ্ছ / পারকিঞ্জি তন্তু)→ নিলয় পেশি
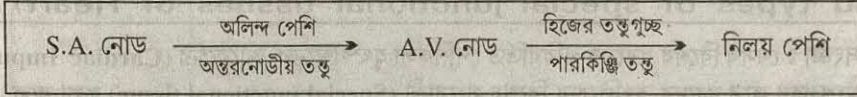
4. **ছন্দময়তা (Rhythmicity)**—ছন্দময়তা হৃৎপেশির একটি বিশেষ ধর্ম, যার ফলে হৃৎপেশি সবসময় নির্দিষ্ট ছন্দে স্পন্দিত হয়। হৃৎপেশির সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে S.A. নোড) বিশেষ ধরনের কলা যা **ছন্দ নিয়ামক বা পেসমেকার** নামে পরিচিত। এটি স্পন্দন-প্রবাহ (impulse) সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডের ছন্দময়তা নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে S.A. নোডের ছন্দময়তা সব থেকে বেশি। S.A. নোড প্রতি মিনিটে 70-80 বার স্পন্দন-প্রবাহের আবেগ সৃষ্টি করে। A.V. নোডে 40-60 বার এবং নিলয়পেশিতে 20-40 বার এই প্রবাহের আবেগ সৃষ্টি করে। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের কোনো-না-কোনো অংশ হৃৎপিণ্ডের আবেগ উৎপন্ন করে।

5. **নিঃসাড়কাল (Refractory period)**—প্রথম উদ্দীপনা প্রয়োগের পরবর্তী যে সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দীপনা হৃৎপেশিতে সাড়া জাগাতে পারে না, সেই সময়কালকে হৃৎপেশির নিঃসাড়কাল বলে। **হৃৎপেশির নিঃসাড়কাল দীর্ঘ, তাই হৃৎপেশি কখনও অবসন্ন বা অসাড় (Fatigue) হয় না।**

6. **সিঁড়িক্রম ঘটনা (Staircase phenomenon)**—স্ট্যানিয়াসের বন্ধনী প্রস্তুত করে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের S.A. নোড, A.V. নোডের কাজ বন্ধ রেখে নিষ্ক্রিয় হৃৎপিণ্ডের নিলয়পেশিকে আবিষ্ট তড়িৎ দিয়ে উদ্দীপিত করলে হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি (4-5 টি) সংকোচন তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বাড়ে, এরপর আর বাড়ে না। এ জাতীয় পরিবর্তনকে **সিঁড়িক্রম ঘটনা** বা **স্টেয়ারকেস ফেনোমেনন** (ঘটনাবলি) বলে।

7. **পূর্ণ** অথবা **ব্যর্থ সাড়া (All or None response)**—একটি নিষ্ক্রিয় হৃৎপেশি তন্তুকে তড়িৎ উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে তড়িৎপ্রবাহ যখন ন্যূনতম ক্রিয়ামাত্রায় (যথোপযুক্ত অবস্থায়) পৌঁছায়, একমাত্র তখনই পেশিকোশটি অর্থাৎ পেশিতন্তুটি সংকুচিত হয়। তড়িৎপ্রবাহ ক্রমান্বয়ে বাড়ালেও পেশিতন্তুর সংকোচনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় না।

## 3.4. হৃৎস্পন্দন আবেগের উৎপত্তি এবং পরিবহন (Origin and Propagation of Cardiac impulse)

### ➤ 1. হৃৎস্পন্দন আবেগের উৎপত্তি (Origin of Cardiac impulse) :

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণ ছন্দে ছন্দে ঘটে কারণ হৃৎপেশির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল **ছন্দবদ্ধতা** বা **ছন্দময়তা** (Rhythmicity)। হৃৎপেশির এই ছন্দময়তার হার নির্ভর করে তাদের নিজস্ব আবেগ উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেখা গেছে প্রধানত হৃৎপিণ্ডের **বিশেষ সংযোজী কলাগুলি** হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করে। আবেগ উৎপাদন হার হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশে, যেমন—সংযোজী কলা এবং হৃৎপেশিকলা (অলিন্দের পেশি এবং নিলয়ের পেশি) প্রতি মিনিটে বিভিন্ন হারে হয়।

এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। দেখা গেছে মানব দেহের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (সংক্ষেপে S.A. নোড) থেকে যে হারে হৃৎস্পন্দন-আবেগ উৎপন্ন হয়, সেই হারে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ (প্রতি মিনিটে 70-80 বার গড়ে 72 বার হৃৎস্পন্দন) ঘটে। এই কারণে **S.A. নোডকে ছন্দনিয়ামক (পেসমেকার—Pacemaker)** বলে। হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত **অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার নোডও** (A.V. Node) স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে। কোনো কারণে S.A. নোড বিকল হয়ে গেলে A.V. নোড হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে স্পন্দন হার কমে গিয়ে প্রতিমিনিটে 50 বার হয়। এই কারণে **A.V. নোডকে সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক** (Reserved pacemaker) বলে। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য সংযোজী কলাগুলিও কমবেশি হৃৎস্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে।

চিত্র 3.7. ঃ ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্টেনিয়াসের বন্ধনীর অবস্থানের চিত্ররূপ।

● **হৃৎস্পন্দন আবেগের উৎপত্তির সাক্ষ্য (Evidence of Origin of cardiac impulse)** ঃ কুনোব্যাঙের ওপর পরীক্ষা করে Keith and Flank নামে দুজন বিজ্ঞানী S.A. নোড এবং A.V. নোডের ছন্দময়তা কাজ সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। কুনোব্যাঙে S.A. নোডের পরিবর্তে **সাইনাস ভেনোসাস** ছন্দনিয়ামক হিসাবে কাজ করে। তাই তারা সাইনাস ভেনোসাস এবং অলিন্দের সংযোগস্থলে সুতো দিয়ে বেঁধে দেন অর্থাৎ একটি বন্ধনী প্রয়োগ করে ভেনাস সাইনাসকে হৃৎপিণ্ডের বাকি অংশ থেকে ক্রিয়াগতভাবে পৃথক করেন। এই বেঁধে দেওয়া অবস্থাকে **প্রথম স্টেনিয়াসের বন্ধনী** (First stanius ligature) বলা হয়। এই প্রকার বাঁধনের ফলে সাইনাস ভেনোসাস একইভাবে স্পন্দিত হতে থাকে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বাকি অংশ সাইনাস ভেনোসাসের চেয়ে কম হারে স্পন্দিত হয়। এরপর এই অবস্থায় অলিন্দ এবং নিলয়ের সংযোগস্থলে যে অলিন্দ নিলয় খাঁজ আছে সেখানে অন্য এক টুকরো সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে অর্থাৎ **দ্বিতীয় স্টেনিয়াসের বন্ধনী** (Second stainus ligature) প্রয়োগ করলে দেখা যায়, নিলয়টি অনেকক্ষণ পরে পরে স্পন্দিত হয়। এই অবস্থায় নিলয়ের স্পন্দনের হার আগের চেয়ে অনেক কম হয়। এই পরীক্ষা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে—সাইনাস ভেনাস (মানুষের ক্ষেত্রে S.A. নোড) **যে হারে (ছন্দে) স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে, হৃৎপিণ্ডের বাকি অংশ তাকে অনুসরণ করে।** সাইনাস ভেনোসাসের অবর্তমানে A.V. নোড থেকে তুলনামূলকভাবে কম হারে হৃৎস্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে। A.V. নোডের অনুপস্থিতিতে নিলয় পেশি নিজে স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে।

● **হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপাদনের হার (Rate of production of Cardiac impulse)** ঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিমিনিটে আবেগ উৎপাদনের হার বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন—(i) **S. A. নোড**—70 থেকে 80 বার (গড়ে 72 বার)। (ii) **A. V. নোড**—40 থেকে 60 বার (গড়ে 50 বার)। (iii) **হিজের বান্ডেল**—গড়ে 36 বার। (iv) **পারকিন্‌জি তন্তু**— 30 থেকে 35 বার। (v) **অলিন্দ পেশি**—60 বার এবং (vi) **নিলয় পেশি**—20 থেকে 40 বার।

### ➤ 2. হৃৎস্পন্দন আবেগের পরিবহন (Propagation of Cardiac impulse) ঃ

**পরিবাহিতা** হৃৎপেশির অন্যতম একটি বিশেষ ধর্ম। হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডকে ছন্দনিয়ামক বলে, কারণ এই নোড থেকে যে হারে আবেগ উৎপন্ন হয় সেই একই হারে হৃৎস্পন্দন ঘটে। S.A. নোড থেকে প্রতি মিনিটে গড়ে 72 বার যে স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন হয় তা প্রথমে নোডের মধ্য দিয়ে খুব মন্থর গতিতে এবং পরে **অলিন্দ পেশির** মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে ও শেষে A.V. নোডে পৌঁছায়। এছাড়া **আন্তনোডাল তন্তু** দিয়েও A.V. নোডে অতি দ্রুত (1·0m/sec) যায়। এভাবে S.A. নোডে উৎপন্ন হৃৎস্পন্দনের আবেগ A.V. নোডে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে S.A. নোডের উপস্থিতিতে A.V. নোড প্রতি মিনিটে 72 বার উদ্দীপিত হয় এবং সমহারে স্পন্দন আবেগ উৎপন্ন করে। (A.V. নোডের নিজস্ব স্পন্দন হার প্রতি মিনিটে 50 বার)।

A. V. নোড থেকে হৃৎস্পন্দন আবেগ হিজের বান্ডেলের মধ্য দিয়ে যায়। হিজের বান্ডেলের তন্তুগুলি আন্তঃনিলয় প্রাচীরের উপরের দিকে দুটি শাখাগুচ্ছতে বিভক্ত হয়ে বাম শাখা ও ডান শাখায় গঠন করে। বাম শাখাটি আন্তঃনিলয় প্রাচীর ভেদ করে বাম নিলয়ে যায়। এই দুটি শাখার মধ্য দিয়ে হৃৎস্পন্দনের আবেগ হৃৎপিণ্ডের অগ্র ভাগে (Apex of the heart) যায়। সেখান থেকে **পারকিন্‌জি তন্তুর** মাধ্যমে সমগ্র নিলয় পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে।

● **হৃৎস্পন্দন আবেগের পরিবহনের হার (Rate of Propagation of Cardiac impulse)** ঃ স্পন্দন প্রবাহের

হার (মিটার/সেকেন্ড) ঃ (1) অলিন্দ পেশি—1·0 (m/sec), (2) S. A. নোড—0·05 (m/sec), (3) হিজের বান্ডেল—1·0 (m/sec), (4) A. V. নোড—0·05 (m/sec), (5) পারকিন্‌জি তন্তু—4·0 (m/sec), (6) নিলয় পেশি—0·1 (m/sec).

## ◎ 3.5. রক্তবাহ (Blood Vessels) ◎

### ▲ রক্তবাহের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও তাদের গঠন (Definition, Types and Structure of Blood vessels ঃ

❖ (a) **রক্তবাহের সংজ্ঞা ঃ হৃৎস্পন্দনের ফলে রক্ত যে নালিপথ দিয়ে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয় তাকে রক্তবাহ বলে।**

(b) **রক্তবাহের প্রকারভেদ** ঃ রক্তবাহ প্রধানত তিন প্রকারের যথা—ধমনি, শিরা ও রক্তজালক।

### ▲ A. ধমনি (Artery) ঃ

❖ (i) **সংজ্ঞা — যে সব রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বহন করে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে তাকে ধমনি বলে।**

➤ ধমনিতন্ত্র (**Arterial system**)—বাম নিলয় থেকে যে বৃহৎ ধমনি নির্গত হয় তাকে **মহাধমনি** (Aorta) বলে। ধমনি (ব্যতিক্রম ফুসফুসীয় ধমনি) সবসময় অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত (ধমনি রক্ত) দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে। **শাখা**—প্রথমে মহাধমনি বা অ্যাওর্টা থেকে অনেক শাখা উৎপন্ন হয় যাকে **ধমনি** (Artery) বলে। প্রতিটি ধমনি আবার বিভক্ত হয়ে **ধমনিকা** বা **উপধমনি** (**আর্টেরিওল**—Arterioles) গঠন করে। এগুলি আবার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখায় বিভক্ত হয়ে **জালক** (Capillaries)-এ পরিণত হয়। রক্তজালকের গড় ব্যাস প্রায় 7·5 μm এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 0·3 মিলিমিটার সমান হয়। সমস্ত ধমনি ও তার শাখা-প্রশাখাগুলিকে একত্রে **ধমনিতন্ত্র** বলে। ধমনিগুলি শরীরের অপেক্ষাকৃত ভেতরের অংশে থাকে।
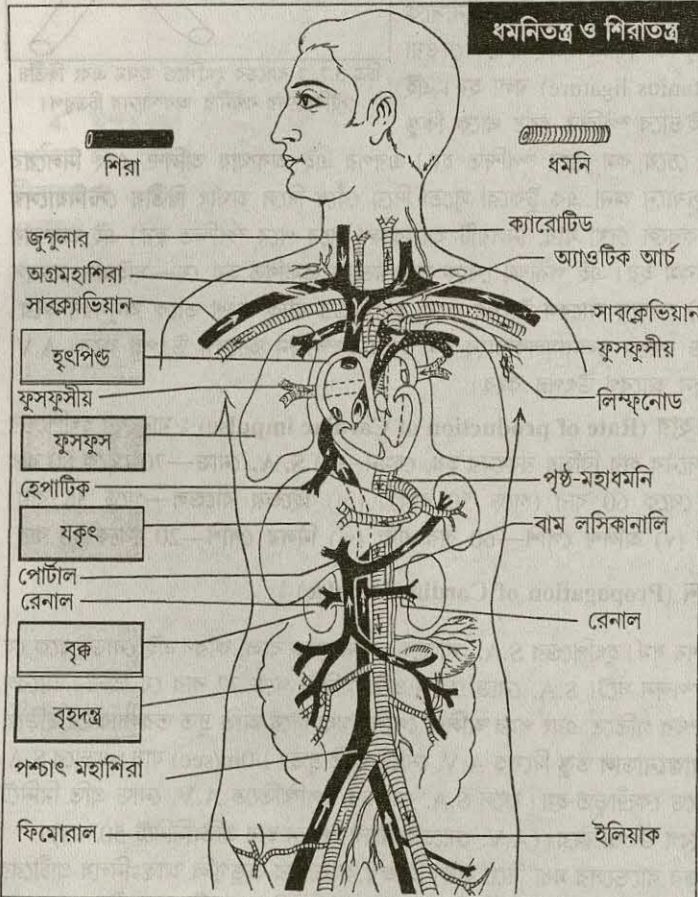
চিত্র 3.8. ঃ মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ধমনি ও শিরার অবস্থান।

(ii) **ধমনির আণুবীক্ষণিক গঠন** ঃ প্রতিটি ধমনি তিনটি কোশস্তর নিয়ে গঠিত, যেমন—(ক) প্রশস্ত **বহিঃস্তর**—তন্তুময় যোগ কলা দিয়ে গঠিত যাকে **তন্তুময় স্তর বা টিউনিকা অ্যাড্‌ভেনটিসিয়া** (Tunica adventitia) বলে। (খ) অধিক প্রশস্ত **মধ্যস্তর**—পেশি কলা দিয়ে গঠিত যাকে **পেশিস্তর বা টিউনিকা মিডিয়া** (Tunica media) বলে। (গ) **অন্তঃস্তর**—আঁশাকার আবরণী কলা দিয়ে গঠিত **এন্ডোথেলিয়াম স্তর** বা **টিউনিকা ইন্টেরনা** (Tunica interna) বলে। পেশিস্তরের বাইরে এবং ভেতরে **স্থিতিস্থাপক ঝিল্লির** (Elastic membrane) স্তরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় (চিত্র 3.10 দেখো)। ধমনির বিবরটি সরু এবং এতে কপাটিকা থাকে না। উচ্চ রক্তচাপের জন্য এবং কপাটিকা না থাকার জন্য ধমনিতে রক্তের প্রবাহ অতি দ্রুত গতিতে হয়।

## ▲ B. শিরা (Vein) ঃ

❖ (i) **সংজ্ঞা—যে সকল রক্তবাহ দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে তাকে শিরা বলে।**

⊛ **শিরাতন্ত্র (Venous system)**—জালকের শেষ প্রান্তগুলি মিলিত হয়ে প্রথমে ক্ষুদ্র ও সরু **উপশিরা** (Venules) গঠন করে। পরে কতকগুলি উপশিরা একত্রিত হয়ে **শিরাতে** পরিণত হয়। সবশেষে এই শিরাগুলি মিলিত হয়ে **উত্তরা মহাশিরা** বা **অধরা মহাশিরা** (Superior vena cava or Inferior vena cava) নামে দুটি বৃহৎ শিরাতে পরিণত হয়ে হৃৎপিণ্ডে বাম অলিন্দে উন্মুক্ত হয়। দেহের সব শিরা ও উপশিরাগুলিকে একসঙ্গে **শিরাতন্ত্র** বলে। শিরা শরীরের বহিরাংশে অর্থাৎ ত্বকের নীচে বিন্যস্ত থাকে।

চিত্র 3.9 ঃ শিরার মধ্যে কপাটিকার অবস্থান

(ii) **শিরার আণুবীক্ষণিক গঠন**—শিরার প্রাচীর ধমনির প্রাচীরের তুলনায় কম মোটা হয়। এর প্রাচীর ধমনির মতো তিনটি স্তর দিয়েই গঠিত হয়। শিরার গায়ের পেশিস্তর পাতলা হয়। এর ফলে শিরার বিবর সমব্যাসসম্পন্ন ধমনির তুলনায় অধিক প্রশস্ত শিরাতে স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে না বলে রক্ত বের হয়ে গেলে এটি সহজেই চুপসে যায়। উদর অঞ্চলে এবং নিম্নাঙ্গে অবস্থিত শিরাগুলিতে **কপাটিকা** (Valves) থাকে। (চিত্র 3.9 দেখো)।

শিরাতে রক্তচাপ কম থাকে বলে এতে রক্তপ্রবাহ মন্থর হয়। দেহে শিরাসংলগ্ন পেশির সক্রিয় সংকোচন ও কপাটিকার উপস্থিতি হৃৎপিণ্ডের দিকে একমুখী রক্ত প্রবাহকে সাহায্য করে।

## ▲ C. রক্তজালক (Blood capillaries) ঃ

❖ (i) **সংজ্ঞা—উপধমনি (আর্টেরিওলগুলি) ক্রমবিভাজিত হয়ে এককোশস্তর এন্ডোথেলিয়াম যুক্ত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহ গঠন করে তাদের রক্তজালক বলে।**
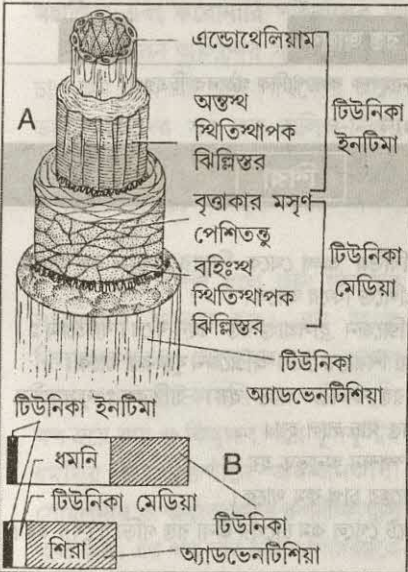
চিত্র 3.10. ঃ A-ধমনি প্রাচীরের আণুবীক্ষনিক গঠন, B-ধমনি ও শিরার বিভিন্ন স্তরের তুলনামূলক স্থূলতার চিত্ররূপ।

রক্তজালক ধমনিতন্ত্রের উপধমনি থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্ষুদ্র উপশিরাতে মিলিত হয়। প্রতিটি রক্তজালকের গড় ব্যাস প্রায় 7·5 μm এবং লম্বায় গড়ে 0·3 মিলিমিটারের মতো হয়।

(ii) **রক্তজালকের আণুবীক্ষণিক গঠন**—রক্তজালকের প্রাচীর কেবলমাত্র টিউনিকা ইনটিমা নামে পরিচিত একটিমাত্র স্তর অর্থাৎ অন্তরাবরণী কলাস্তর বা **এন্ডোথেলিয়াম** (Endothelium) দিয়ে গঠিত। এর ফলে ধমনি প্রান্তের জালকের মধ্য দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন প্রকার পদার্থ, যেমন—গ্যাস, লবণ, শর্করা, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি ক্ষুদ্র অণুগুলি সহজে বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক পদ্ধতিতে জালক সংলগ্ন কলারসের মধ্যে প্রবেশ করে। জালকশিরা প্রান্তে রক্তের চাপ কলারসের চাপ অপেক্ষা কম হয়। এর ফলে বিভিন্নপ্রকার বর্জ্য পদার্থ কলারস থেকে রক্তে প্রবেশ করে।

● **রক্তবাহের কাজ (Functions of Blood vessels)** ঃ 1. **ধমনির কাজ**—অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কলাকোশের রক্তজালকে প্রবেশ করে। 2. **রক্তজালকের কাজ**—এক কোশস্তর বিশিষ্ট জালকের রক্তের সঙ্গে কলাকোশের কলারসের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান ঘটে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মাধ্যমে রক্তজালকের মধ্যে এসে পৌঁছালে রক্তের চাপ মূল ধমনির রক্ত চাপের চেয়ে অনেকটা কমে যায়। মানবদেহে রক্তজালকের রক্তের চাপ প্রায় 35 mm. Hg. সমান হয়। এই চাপের ফলে রক্তজালকের জলীয় তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়ে আন্তঃকোশীয় কলার তরলে প্রবেশ করে। কোশের ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত তরল পদার্থ **কলারস (টিসু ফ্লুইড**–Tissue fluid) নামে পরিচিত। কলার কলারস থেকে কলাকোশ প্রয়োজনীয় পদার্থ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ

করে ও কলাকোশের বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ প্রথমে কলারসে এবং পরে রক্তে চলে আসে। দেখা গেছে যে ধমনিজালক থেকে শিরাজালক অংশে রক্তের চাপ অনেক কম হয় (প্রায় 15 mm. Hg.)। এই কারণে টিসু ফ্লুইডের বেশ কিছু জলীয় পদার্থ আবার শিরাজালকে ফিরে আসে। 3. **শিরার কাজ**—কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কলাকোশ থেকে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে যায়।

## ● শিরার প্রকারভেদ (Types of Vein) ●

1. **সিস্টেমিক শিরা (Systemic Vein)**—দেহের শিরাজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে যে শিরা সরাসরি হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে তাকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। **উদাহরণ**—উত্তরা ও অধরা মহাশিরা।
2. **পোর্টাল শিরা (Portal Vein)**—দেহের একটি অঙ্গের শিরাজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ না করে দেহের কোনো অঙ্গে আবার জালক সৃষ্টি করে তাকে **পোর্টাল শিরা** বলে। **উদাহরণ**—হেপাটিক পোর্টাল শিরা (যকৃতে), রেনাল পোর্টাল শিরা (মাছ ও উভচর প্রাণীর বৃক্কে) এবং হাইপোথ্যালামিকো হাইপোফাইসিয়াল শিরা (মস্তিষ্কে)।
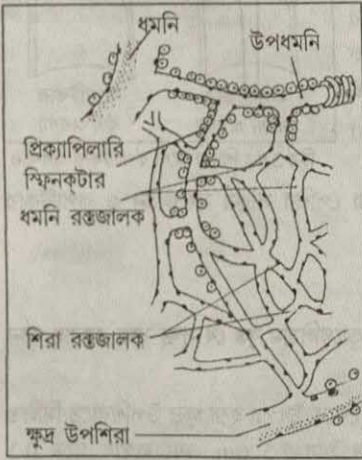
চিত্র 3.11. ঃ রক্তজালকের শারীরস্থানিক গঠন।

চিত্র 3.12. ঃ রক্তবাহের তুলনামূলক কলাস্থানিক গঠনের চিত্ররূপ।

### ● ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Artery and Vein) ঃ

| ধমনি | শিরা |
|---|---|
| **● কার্যগত পার্থক্য ঃ** | |
| 1. হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বা অংশে যায়। | 1. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে শিরার মাধ্যমে রক্ত বাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। |
| 2. ধমনি অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে। ব্যতিক্রম ঃ ফুসফুসীয় ধমনিতে কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত থাকে। | 2. শিরা অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত বহন করে। ব্যতিক্রম ঃ ফুসফুসীয় শিরাতে বেশি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত থাকে। |
| 3. ধমনির রক্ত গাঢ় লাল রঙের হয়। ব্যতিক্রম ঃ ফুসফুসীয় ধমনির রক্ত কালচে লাল হয়। | 3. শিরার রক্ত কালচে লাল হয়। ব্যতিক্রম ঃ ফুসফুসীয় শিরার রক্ত গাঢ় লাল হয়। |
| 4. ধমনিতে স্পন্দন অনুভূত হয়। | 4. শিরাতে স্পন্দন অনুভূত হয় না। |
| 5. ধমনিতে রক্তের চাপ বেশি থাকে। | 5. শিরায় রক্তের চাপ কম থাকে। |
| 6. ধমনি কেটে গেলে অধিক চাপের জন্য রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বের হয়। | 6. শিরা কেটে গেলে কম চাপের জন্য রক্ত গড়িয়ে বের হয়। |
| **● কলাস্থানিক গঠনের পার্থক্য ঃ** | |
| 7. ধমনির প্রাচীর তিনটি তুলনামূলক মোটা স্তর নিয়ে গঠিত এবং এতে স্থিতিস্থাপক কলাস্তর থাকে। | 7. শিরার প্রাচীরও তিনটি তুলনামূলকভাবে পাতলা স্তর নিয়ে গঠিত এবং এতে স্থিতিস্থাপক কলাস্তর নেই। |
| 8. ধমনির মধ্যস্থিত গহ্বরটির (লুমেনের) ব্যাস ছোটো হয়। | 8. শিরার মধ্যস্থিত গহ্বরটির (লুমেনের) ব্যাস বড়ো হয়। |
| 9. ধমনিতে কপাটিকা থাকে না। | 9. শিরাতে কপাটিকা থাকে। |
| 10. ধমনির প্রাচীর মসৃণ হয়। | 10. শিরার প্রাচীর অমসৃণ হয়। |

● **ফুসফুসীয় ধমনি এবং ফুসফুসীয় শিরার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Pulmonary Artery and Pulmonary Vein) ঃ**

| ফুসফুসীয় ধমনি | ফুসফুসীয় শিরা |
|---|---|
| 1. ডান নিলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুসফুসীয় রক্তজালকে শেষ হয়। | 1. ফুসফুসীয় জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে বামনিলয়ে শেষ হয়। |
| 2. হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এর সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকে। | 2. হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এর সংযোগস্থলে কোনো কপাটিকা থাকে না। |
| 3. এর প্রাচীর মোটা ও স্থিতিস্থাপক হয়। | 3. এর প্রাচীর পাতলা ও স্থিতিস্থাপক নয়। |
| 4. এর মাধ্যমে শিরা-রক্ত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি $CO_2$ এবং কম $O_2$ -যুক্ত রক্ত নিলয় থেকে ফুসফুসে যায়। | 4. এর মাধ্যমে ধমনি-রক্ত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি $O_2$ এবং কম $CO_2$-যুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে অলিন্দে যায়। |
| 5. এর মধ্যে রক্তচাপ বেশি। | 5. এর মধ্যে রক্তচাপ কম। |

## ❂ 3.6. মানব হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তের সংবহন ❂ (Circulation of blood through Human heart)

হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের মতো কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের কাজের জন্য সংবহনতন্ত্রে রক্ত গতিশীল থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে 70 থেকে 80 বার সংঘটিত হয়। **হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ফলে হৃৎস্পন্দন** (Heart beat) হয়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে **সিস্টোল** (Systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (Diastole) বলা হয়। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত নিম্নলিখিতভাবে সঞ্চালিত হয়।

1. দেহ ও মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড থেকে শিরারক্ত অর্থাৎ কম $O_2$ ও বেশি $CO_2$ যুক্ত রক্ত যথাক্রমে **অধরা মহাশিরা, উত্তরা মহাশিরা** এবং **করোনারি সাইনাসের** মাধ্যমে ডান অলিন্দে যায়।

2. ডান অলিন্দের সংকোচনের সময় নিলয় প্রসারিত থাকে। এর ফলে অলিন্দমধ্যস্থ চাপ বেশি হয় এবং নিলয়মধ্যস্থ চাপ কম হয়। এই চাপ পার্থক্যের জন্যে ডান অলিন্দের সব রক্ত অলিন্দ-নিলয় মধ্যবর্তী ছিদ্রপথের **ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলিকে উন্মুক্ত করে দক্ষিণ নিলয়ে যায়।**

3. রক্তে পূর্ণ হলে ডান নিলয়ের সংকোচন আরম্ভ হয়। এর ফলে নিলয়মধ্যস্থ চাপ বেড়ে যায়। চাপ বাড়ার ফলে প্রথমে ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় ও কিছুক্ষণ পরে ফুসফুসীয় ধমনির উৎপত্তিস্থানে অবস্থানকারী **সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি** খুলে যায়। এর পর ডান নিলয় শিরারক্তকে জোরে ফুসফুসীয় ধমনির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

4. এই শিরারক্ত ফুসফুসে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিমাণ $O_2$ যুক্ত এবং $CO_2$ বিযুক্ত হয়ে ধমনিরক্তে অর্থাৎ বেশি
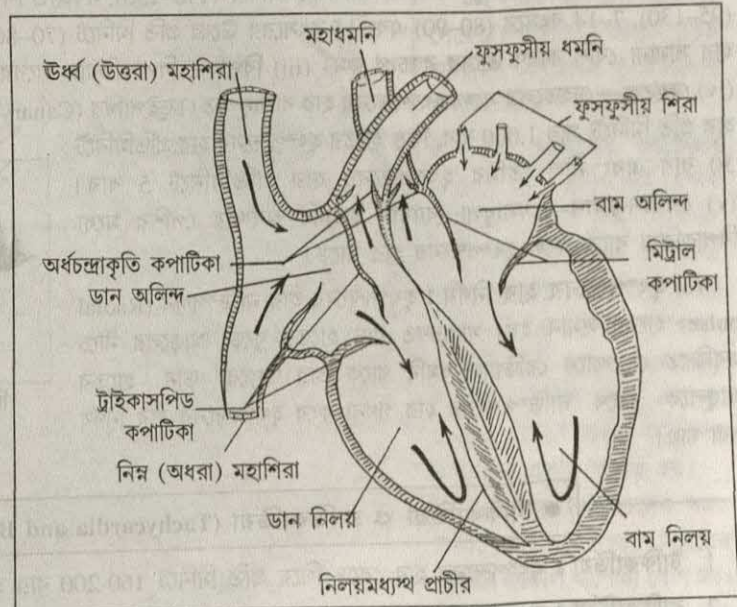
চিত্র 3.13. ঃ হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তসংবহনের গতিপথ তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

$O_2$-যুক্ত ও কম পরিমাণ $CO_2$-যুক্ত রক্তে পরিণত হয়। শিরারক্ত ধমনিরক্তে পরিণত হওয়ার পর প্রতি পাশের ফুসফুস থেকে দুটি করে ফুসফুসীয় শিরার মধ্যে দিয়ে রক্ত বাম অলিন্দে যায়।
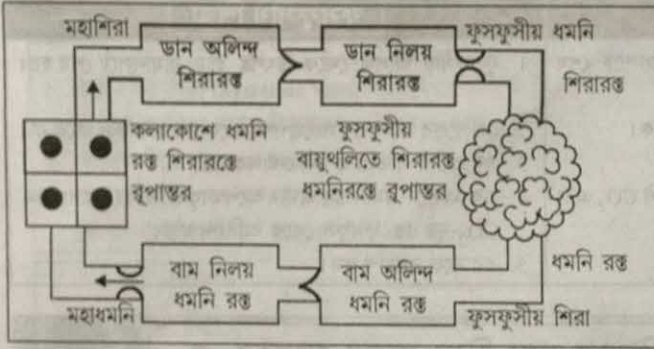
চিত্র 3.14. : ছকের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের সংবহনের গতিপথের চিত্ররূপ।

5. ডান অলিন্দ যে সময় সংকুচিত হয় ঠিক সেই সময় বাম অলিন্দেরও সংকোচন ঘটে এবং একই সময়ে বাম নিলয়ের প্রসারণ ঘটে। অলিন্দের সংকোচনের ফলে বাম অলিন্দমধ্যস্থ চাপ বাড়ে এবং প্রসারণের জন্য বাম নিলয়ের চাপ কমে। এই চাপ পার্থক্যের জন্য অলিন্দের রক্ত অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথের **মিট্রাল (মাইট্রাল) কপাটিকাগুলি (বাইকাসপিড্ কপাটিকাগুলিকে)** খুলে বাম নিলয়ে যায়।

6. এর পর নিলয়েরও সংকোচন হয় ফলে নিলয়মধ্যস্থ চাপ বাড়ে। এই বেশি চাপ মহাধমনির উৎপত্তি স্থানে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলিকে খুলে বাম নিলয়ের রক্তকে মহাধমনির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

7. মহাধমনি থেকে রক্ত ধমনি, উপধমনি ও রক্তজালকের মাধ্যমে দেহের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

## ▲ হৃৎস্পন্দন (Heart rate) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (Systole) এবং প্রসারণ (Diastole)-কে একত্রে হৃৎস্পন্দন বলে।**

(b) **হৃৎস্পন্দনের স্বাভাবিক হার ও তার নিয়ন্ত্রণ :** একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোকের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে 70-80 বার, গড়ে 72 বার। স্ত্রীলোকের এই হার সামান্য বেশি হয়।

(c) **নিয়ন্ত্রণের কারণ :** হৃৎস্পন্দনের হার প্রধানত নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভরশীল।

(i) **বয়স**—ভ্রূণাবস্থায় হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে (140–150), নবজাত শিশু (130-140), দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে (95–130), 7–14 বৎসরে (80–90) এবং 15 বৎসরের ঊর্ধ্বে প্রতি মিনিটে (70–80)। (ii) **লিঙ্গ**—স্ত্রীলোকের হৃৎস্পন্দনের হার সামান্য বেশি কারণ তাদের রক্তচাপ কম। (iii) **বিপাক**—বিপাকক্রিয়ার হারের সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের হার সমানুপাতিক। (iv) **দেহতল**—দেহতলের সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের হার ব্যস্তানুপাত। চড়ুইপাখির (Canary bird) মতো ছোটো পাখির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় 1,000 বার, কিন্তু হাতির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতিমিনিটে 30 বার এবং নীল তিমির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতিমিনিটে 5 বার। (v) **পেশিসঞ্চালন**—খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি অবস্থায় পেশির মধ্যে বিপাকক্রিয়া বাড়ে ফলে হৃৎস্পন্দনের হার বাড়ে।

(d) **হৃৎস্পন্দনের হার নির্ণয় :** হৃৎস্পন্দনের হার নাড়িস্পন্দন (Radial pulse) হারের সমান হয়। সাধারণত বাম হাতের বুড়ো আঙুলের নীচে কব্জিতে যে স্থানে **রেডিয়াল ধমনি** থাকে তার উপরে ডান হাতের আঙুলকে রেখে নাড়িস্পন্দনের হার গণনা করে হৃৎস্পন্দনের হার নির্ণয় করা যায়।
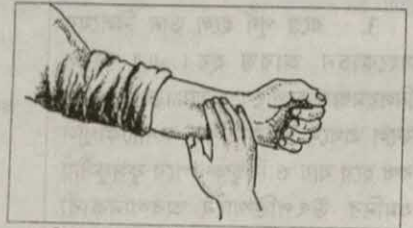
চিত্র 3.15. : নাড়িস্পন্দন নির্ণয়ের পদ্ধতি।

**• টাকিকার্ডিয়া ও ব্রাডিকার্ডিয়া (Tachycardia and Bradycardia) •**

1. **টাকিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে গিয়ে প্রতি মিনিটে 160-200 বার হলে তাকে টাকিকার্ডিয়া বলে।
2. **ব্রাডিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার কমে গিয়ে 60 বা তার কম হলে তাকে ব্রাডিকার্ডিয়া বলে।

## ○ 3.7. হৃৎচক্র (Cardiac cycle) ○

### ▲ হৃৎচক্রের সংজ্ঞা, সময়কাল এবং বিভিন্ন দশা এবং ঘটনাসমূহ (Definition, time and different phases and events of Cardio cycle) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ** প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে যেসব পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেইসব পরিবর্তন পরবর্তী স্পন্দনেও ঘটে; স্পন্দন থেকে স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের এই চক্রাকার পরিবর্তনসমূহকে হৃৎচক্র (Cardiac cycle) বলে।

(b) **হৃৎচক্রের সময়কাল (Duration of Cardiac cycle) ঃ** একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের হৃৎস্পন্দনের স্বাভাবিক হার প্রতি মিনিটে 70-80 বার (ধরা যাক গড়ে 75 বার)। অর্থাৎ 75 বার হৃৎস্পন্দন হতে সময় লাগে 1 মিনিট বা 60 সেকেন্ড।

∴ 1 বার হৃৎস্পন্দন হতে সময় লাগে— $\frac{60}{75} = 0{\cdot}8$ সেকেন্ড।

[ কিন্তু বায়োলজিকাল গড় 72 অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় বেশিরভাগ পূর্ণ বয়স্ক লোকের হৃৎস্পন্দনের হার 72 বার। ]

(c) **হৃৎচক্রের দশা এবং ঘটনাসমূহ (Phases and Events of Cardiac cycle) ঃ**

চিত্র 3.16. ঃ হৃৎচক্রের সময় অলিন্দ-নিলয়ের বিভিন্ন দশা এবং ঘটনাবলির চিত্র।
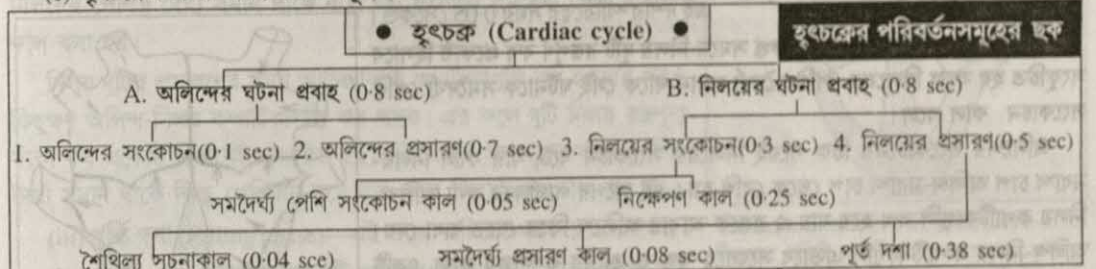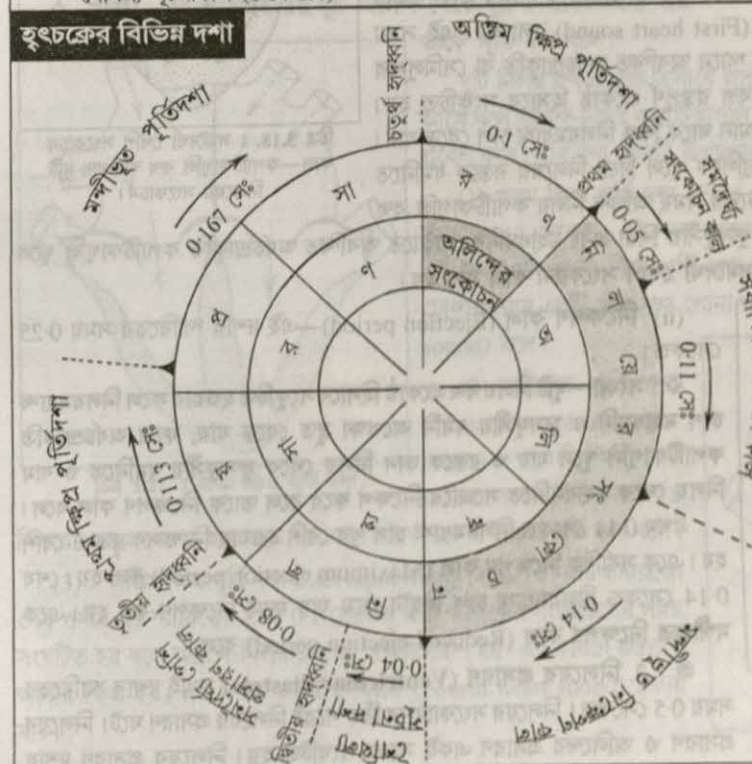
#### ➤ A. অলিন্দের ঘটনাপ্রবাহ (Atrial events) ঃ

এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·8 সেকেন্ড। অলিন্দের ঘটনা - প্রবাহ অলিন্দের সংকোচন ও অলিন্দের প্রসারণ সমন্বয়ে গঠিত।

● 1. **অলিন্দের সংকোচন (Atrial systole)**—এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·1 সেকেন্ড। অলিন্দের সংকোচন হৃৎচক্রের প্রথম দশা। ডান অলিন্দ ও উত্তরা মহাশিরার উৎপত্তিস্থলে হৃৎস্পন্দন উৎপন্নকারী (Pace maker) সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড্ (S. A. node) থাকার ফলে অলিন্দের সংকোচন প্রথমে আরম্ভ হয়।

অলিন্দের সংকোচনের সময় অলিন্দের ভিতরে রক্তচাপ নিলয়ের ভিতরে রক্তচাপ অপেক্ষা বেশি হয়। এর ফলে অলিন্দ থেকে রক্ত অলিন্দ-নিলয় মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে

চিত্র 3.17. : অলিন্দের সংকোচন—অলিন্দ-নিলয় মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ দিয়ে রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ।

অবস্থিত ডান দিকের ট্রাইকাসপিড্ ও বাম দিকের বাইকাসপিড্ কপাটিকাগুলিকে উন্মুক্ত করে নিলয়ের মধ্যে যায়।

● 2. **অলিন্দের প্রসারণ** (Atrial diastole)— এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·7 সেকেন্ড। অলিন্দের সংকোচনের পরে অলিন্দের প্রসারণ ঘটে।

### ➤ B. নিলয়ের ঘটনাপ্রবাহ (Ventricular events) ঃ

এই দশার স্থায়িত্ব কাল 0·8 সেকেন্ড। নিলয়ের ঘটনাপ্রবাহ প্রধানত নিলয়ের সংকোচন ও নিলয়ের প্রসারণের সমন্বয়ে গঠিত।

● 1. **নিলয়ের সংকোচন** (Ventricular systole)— এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·3 সেকেন্ড। এই দশা অলিন্দের সংকোচনের ঠিক পরেই আরম্ভ হয়। নিলয়ের সংকোচনের সময় নিম্নলিখিত ঘটনাবলি লক্ষ করা যায়।

(i) **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল** (Isometric contraction period)— এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·05 সেকেন্ড।
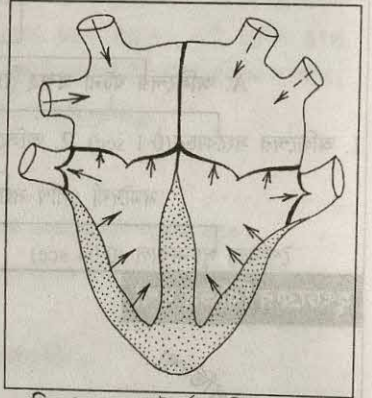
চিত্র 3.18. : সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল—কপাটিকাগুলি বন্ধ অবস্থায় দুটি নিলয়ের সংকোচন।

❖ **সংজ্ঞা—হৃৎচক্রের যে সংক্ষিপ্ত সময়ে নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে সংকুচিত হয় ফলে নিলয়ের পেশির দৈর্ঘ্য সমান থাকে সেই ঘটনাকে সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল বলে।**

অলিন্দের সংকোচনের ঠিক পরেই নিলয়ের সংকোচন ঘটে, যার ফলে নিলয়-মধ্যস্থ চাপ অলিন্দ-মধ্যস্থ চাপ থেকে বেশি হয়। এই চাপের পার্থক্যের জন্য অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় ও রক্তকে আবার অলিন্দে ফিরে যেতে বাধা দেয়। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি এভাবে সজোরে বন্ধ ও তাদের কম্পনের ফলে একটি শব্দ শোনা যায়। একে **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** (First heart sound) বলা হয়। এই সময় মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির উৎপত্তি স্থানে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা সেমিলুনার কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকায় নিলয় দুটি বন্ধ রক্তপূর্ণ প্রকোষ্ঠ হিসাবে সংকুচিত হয়। সংকোচনের সময় নিলয় পেশির দৈর্ঘ্য সমান থাকে কিন্তু নিলয়মধ্যস্থ চাপ বেড়ে যায়। এই বর্ধিত চাপ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলিকে খুলে দিয়ে নিলয়ের রক্তকে ধমনিতে নিক্ষেপ করে। অতএব নিলয়ের সংকোচনের সময় অলিন্দ নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর (0·05 সে) ফুসফুসীয় শিরা এবং মহাধমনির গোড়াতে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায়। এই দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকালকে **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল বলা হয়।**

চিত্র 3.19. : নিক্ষেপণ কাল—বর্ধিত নিলয়মধ্যস্থ চাপ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা উন্মুক্ত করে রক্তকে সজোরে নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনিতে নিক্ষিপ্ত করে।

(ii) **নিক্ষেপণ কাল** (Ejection period)—এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·25 সেকেন্ড।

❖ **সংজ্ঞা—দুটি নিলয় বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে সংকুচিত হওয়ার ফলে নিলয়মধ্যস্থ চাপ মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনি অপেক্ষা দ্রুত বেড়ে যায়, ফলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায় ও রক্তকে ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনিতে ও বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে সজোরে নিক্ষেপ করে বলে তাকে নিক্ষেপণ কাল বলে।**

প্রথম 0·11 সেকেন্ড নিলয়মধ্যস্থ চাপ খুব বেশি হওয়ায় নিক্ষেপণ দ্রুত ও বেশি হয়। একে সর্বাধিক **নিক্ষেপণ কাল** (Maximum ejection period) বলা হয়। শেষ 0·14 সেকেন্ড নিলয়মধ্যস্থ চাপ কিছুটা কমে যায় ফলে নিক্ষেপণ কম হয়। একে **মন্দীভূত নিক্ষেপণ কাল** (Reduced ejection period) বলে।

● 2. **নিলয়ের প্রসারণ (Ventricular diastole)** ঃ এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·5 সেকেন্ড। নিলয়ের সংকোচনের ঠিক পরেই নিলয়ের প্রসারণ ঘটে। নিলয়ের প্রসারণ ও অলিন্দের প্রসারণ একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। নিলয়ের প্রসারণ দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলি লক্ষ করা যায়।

(i) **শৈথিল্য সূচনাকাল** (Protodiastolic period)—স্থায়িত্বের সময় 0·04 সেকেন্ড।

❖ **সংজ্ঞা—নিলয়ের প্রসারণ শুরু এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলির বন্ধ হওয়া অন্তর্বর্তী সময়কে শৈথিল্য সূচনা কাল বা প্রোটোডায়াস্টোলিক কাল (Protodiastolic period) বলে।**

নিলয় দুটির প্রসারণ শুরু হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই নিলয়মধ্যস্থ চাপ ধমনিচাপের নীচে নেমে আসে। এই কারণে রক্ত ধমনি থেকে ফিরে আসতে চায় ফলে মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির উৎপত্তিস্থলে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে যে শব্দ শোনা যায় তাকে **দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (Second heart sound) বলা হয়।

চিত্র 3.20. ঃ সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণ কাল—নিলয়ের প্রতিটি কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং এই অবস্থায় নিলয় দুটির প্রসারণ ঘটে।

(ii) **সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণ কাল** (Isometric relaxation period)—এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·08 সেকেন্ড।

❖ **সংজ্ঞা—নিলয়ের প্রসারণের সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার মুহূর্ত থেকে অলিন্দ নিলয় কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত নিলয়ের পেশির দৈর্ঘ্য সমান থাকে বলে এই ঘটনাকে সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণ কাল বলা হয়।**

নিলয় দুটির প্রসারণের সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে। এর ফলে দুটি নিলয় রক্তশূন্য ফাঁকা বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবেই প্রসারিত হয়। এই প্রকার প্রসারণের সময় পেশির দৈর্ঘ্য সমান থাকে কিন্তু পেশিটান কমে যায় ফলে নিলয়মধ্যস্থ চাপ কম হয়।

(iii) **পূর্তি দশা** (Filling phase)—এই দশার স্থায়িত্বের সময় 0·38 সেকেন্ড।

❖ **সংজ্ঞা—যে প্রক্রিয়ায় রক্ত দুটি অলিন্দ থেকে দুটি নিলয়ের মধ্যে যায় তাকে পূর্তি দশা বলে।**

চিত্র 3.21. ঃ প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা।

দুটি নিলয় বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে প্রসারণের ফলে নিলয়মধ্যস্থ চাপ দ্রুত কমে আসে বলে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হয় এবং রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করে। পূর্তি দশা তিনটি উপদশায় সংঘটিত হয়।

(1) **প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (First rapid filling phase)—এর স্থায়িত্বের সময় 0·113 সেকেন্ড। এই সময় রক্তের প্রবেশের পরিমাণ ও ক্ষিপ্রতা বেশি হয়। এই জন্য একে **প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** বলে। অলিন্দ থেকে নিলয়ের মধ্যে রক্ত ঢোকার সময় একটি ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়, একে **তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (Third heart sound) বলে।

(2) **মন্দীভূত পূর্তি দশা** (Slow inflow phase or diastasis)—পরবর্তী সময়ে প্রায় 0·167 সেকেন্ড দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিলয়ের রক্ত প্রবেশের হার কমে যায় বলে এই দশাকে **মন্দীভূত পূর্তি দশা** বলে।

চিত্র 3.22. ঃ মন্দীভূত পূর্তি দশা।

(3) **অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (Last rapid filling phase) ঃ নিলয় প্রসারণের শেষ পর্যায় এর স্থায়িত্বের সময় 0·1 সেকেন্ড এবং অলিন্দের সংকোচনের সময় সংঘটিত হয় বলে অলিন্দ-নিলয় চাপের পার্থক্য বেশি হয়। এই কারণে রক্তপূর্তি আবার ক্ষিপ্র হয়। এই দশায় **চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি** (Fourth heart sound) শোনা যায়।

- **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল এবং সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকালের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Isometric contraction period and Isometric relaxation period :**

| সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল | সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল |
|---|---|
| 1. নিলয়ের সংকোচনের সময় এটি ঘটে। | 1. নিলয়ের প্রসারণের সময় এটি ঘটে। |
| 2. সমদৈর্ঘ্য পেশির সংকোচনকালের স্থায়িত্ব কাল 0.05 সেকেন্ড। | 2. সমদৈর্ঘ্য পেশির প্রসারণকালের স্থায়িত্ব কাল 0.08 সেকেন্ড। |
| 3. নিলয় দুটি বন্ধ রক্তপূর্ণ প্রকোষ্ঠ হিসেবে সংকুচিত হয়। | 3. নিলয় দুটি বন্ধ রক্তশূন্য প্রকোষ্ঠ হিসেবে প্রসারিত হয়। |
| 4. এই দশায় আন্তঃনিলয় চাপ বাড়ে। | 4. এই দশায় আন্তঃনিলয় চাপ কমে। |
| 5. পেশি সংকোচনকালের শুরুতে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। | 5. এই পেশি প্রসারণকালের শুরুতে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। |

## ▲ হৃৎচক্রের সংক্ষিপ্তসার (Summary of Cardiac cycle) :

❖ (a) **হৃৎচক্রের সংজ্ঞা :** প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তনগুলি পরবর্তী স্পন্দনেও লক্ষ করা যায়, স্পন্দন থেকে স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের এই চক্রবৎ পরিবর্তনগুলিকে **হৃৎচক্র (Cardiac cycle)** বলে।

(b) **হৃৎচক্রের ঘটনাপ্রবাহ :** প্রধানত 4টি দশায় ঘটে—

1. **অলিন্দের সংকোচন** (0.1 সেকেন্ড)—ডান অলিন্দে S.A. নোড নামে পেসমেকার থাকার ফলে অলিন্দের সংকোচন প্রথমে শুরু হয়।

2. **অলিন্দের প্রসারণ** (0.7 সেকেন্ড)—অলিন্দের সংকোচনের পর অলিন্দের প্রসারণ ঘটে।

3. **নিলয়ের সংকোচন** (0.3 সেকেন্ড)—(i) অলিন্দের সংকোচনের ঠিক পরেই নিলয়ের সংকোচনও শুরু হয়। শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** শোনা যায়। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কিছুসময়ের পর অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায়। এই সময় নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসেবে সংকুচিত হয়। এই প্রকার সংকোচন অবস্থার সময়কে **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল** (0.05 সেকেন্ড) বলে। (ii) পেশির সংকোচনের সময় নিলয় মধ্যস্থ চাপ দ্রুত বেড়ে যায়, ফলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায় ও নিলয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। একে **নিক্ষেপণ কাল** (0.25 সেকেন্ড) বলে। প্রথমে রক্তের নিক্ষেপণ সর্বাধিক এবং পরে মন্দীভূত হয়। এই দুটি সময়কে যথাক্রমে **সর্বাধিক নিক্ষেপণ কাল** (0.11 সেকেন্ড) এবং **মন্দীভূত নিক্ষেপণ কাল** (0.14 সেকেন্ড) বলে।

4. **নিলয়ের প্রসারণ** (0.5 সেকেন্ড)—(i) নিলয়ের সংকোচনের পর নিলয়ের প্রসারণ ঘটে। প্রসারণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হয়। এর ফলে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। এই সময়ের ব্যবধান কালকে **শৈথিল্য সূচনাকাল** বা **প্রটোডায়াস্টোলিক কাল** (0.04 সেকেন্ড) বলে। এর পর নিলয় দুটি বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসেবে প্রসারিত হয়। একে **সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল** (0.03 সেকেন্ড) বলে। (ii) নিলয়ের প্রসারণের ফলে আন্তঃনিলয় চাপ দ্রুত কমে যায়, ফলে রক্ত অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলিকে খুলে নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। একে **পূর্তি দশা** (0.38 সেকেন্ড) বলে। প্রথমে রক্তের প্রবেশের গতিবেগ বেশি হওয়ায় একে **প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (0.113 সেকেন্ড) বলে। এই দশার শুরুতে **তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** শোনা যায়। এর পর রক্ত ঢোকার গতিবেগ কিছুক্ষণ মন্দীভূত থাকে, এই অবস্থাকে **মন্দীভূত পূর্তি দশা** (0.167 সেকেন্ড) বলে। সবশেষে নিলয়ের মধ্যে রক্ত ঢোকার ক্ষিপ্রতা আবার বেড়ে যায়। এই সময়কে **অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (0.1 সেকেন্ড) বলে। এই দশায় **চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি** শোনা যায়। নিলয়ের প্রসারণ এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আবার নিলয়ের সংকোচন শুরু হয়। এভাবেই হৃৎচক্র আবর্তিত হয়।

- **হৃৎচক্রের বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলির তালিকা (Table of different summarise events of cardiac cycle) :**

| হৃৎচক্রের ঘটনাবলি (স্থিতিকাল) অন্তঃস্থ চাপ | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা ও (ii) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা | (i) রক্তপ্রবাহ এবং (ii) হৃদ্‌ধ্বনি |
|---|---|---|
| অলিন্দ সংকোচন (Atrial systole) (0.1 সেকেন্ড)<br>অলিন্দ-মধ্যস্থ চাপ বাড়ে | (i) ডান অলিন্দ নিলয়ের ছিদ্রপথে অবস্থিত ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলি এবং বাম অলিন্দ-নিলয়ে ছিদ্রপথে অবস্থিত বাইকাসপিড কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হয়।<br>(ii) ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনির উৎস-মুখে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে। | (i) ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে শিরা রক্ত কম $O_2$ এবং বেশি $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে ধমনি রক্ত কম $CO_2$ ও বেশি $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে।<br>(ii) অলিন্দের সংকোচনকালে কোনো হৃদ্‌ধ্বনি হয় না। |

| হৃৎচক্রের ঘটনাবলি (স্থিতিকাল) অভ্যন্তরীণ চাপ | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা ও (ii) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা | (i) রক্তপ্রবাহ এবং (ii) হৃদ্‌ধ্বনি |
|---|---|---|
| অলিন্দ প্রসারণ (Atrial diastole) (0·7 সেকেন্ড)<br>অলিন্দ-মধ্যাস্থ চাপ কমে। | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে।<br>(ii) অলিন্দ-প্রসারণের সময়কাল পর্যন্ত নিলয়-সংকোচন চলে বলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা খোলা থাকে। | (i) দেহের ঊর্ধ্বাংশ থেকে ঊর্ধ্ব মহাশিরা, নিম্নাংশ থেকে নিম্ন মহাশিরা এবং হৃৎপিণ্ড থেকে করোনারি সাইনাস দিয়ে শিরা রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে এবং ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে ধমনি রক্ত বাম অলিন্দে যায়।<br>(ii) অলিন্দের প্রসারণকালে হৃদ্‌ধ্বনি হয়না। |
| নিলয় সংকোচন (Ventricular systole) ( 0·3 সেকেন্ড )<br>নিলয়-মধ্যাস্থ চাপ বাড়ে | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি হঠাৎ সজোরে এবং সশব্দে বন্ধ হয় ফলে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয়।<br>(ii) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধের 0·05 সেকেন্ড পরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায়। এই দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়কে সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল বলে। | (i) রক্ত ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম নিক্ষেপণকালের সময় রক্ত দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত হয় বলে একে সর্বাধিক নিক্ষেপণ কাল এবং পরে রক্ত মন্থর গতিতে নিক্ষিপ্ত হয় বলে একে মন্দীভূত নিক্ষেপণকাল বলে।<br>(ii) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি সৃষ্টি হয়। |
| নিলয় প্রসারণ (Ventricular diastole) (0·5 সেকেন্ড)<br>নিলয়-মধ্যাস্থ চাপ কমে | (i) নিলয় প্রসারণের সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার 0·08 সেকেন্ড পরে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হয় এবং এই অন্তর্বর্তীকালকে সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল বলে।<br>(ii) নিলয় প্রসারণ শুরু ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হবার অন্তর্বর্তীকালকে শৈথিল্য সূচনা কাল বলে। ধমনি মধ্যাস্থ রক্তকে বিপরীত মুখে নিলয়ে প্রবেশে বাধা বন্ধ হয়। | (i) এই দশায় দুটি অলিন্দ থেকে দুটি নিলয়ে রক্ত সবেগে প্রবেশ করে। রক্তপূর্তির প্রথম ভাগে নিলয়ে রক্ত প্রবল বেগে প্রবেশ করে। একে প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা বলে।<br>(ii) প্রথম ও অন্তিম পূর্তিদশাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এরপর রক্ত নিলয়ে মন্থর গতিতে প্রবেশ করে, একে মন্দীভূত পূর্তিদশা বলে। হৃৎচক্রের একেবারে শেষ সময়ে নিলয়ে রক্ত আবার দ্রুত প্রবেশ করে। একে অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা বলে। |

## ○ 3.8. হৃদ্‌ধ্বনি (Heart sound) ○

### ▲ হৃদ্‌ধ্বনির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and types of Heart sound) :

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) :** হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশায় যেসব শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাদের হৃদ্‌ধ্বনি (Heart sound) বলে।

⊡ **(b) হৃদ্‌ধ্বনির প্রকারভেদ (Types of heart sound) :** হৃদ্‌ধ্বনি চার প্রকার, যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) নামক যন্ত্র দিয়ে শোনা যায়। অন্য দুটি শব্দ অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ স্টেথোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায় না। প্রথম এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান 0·34 সেকেন্ড।

1. **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** (First heart sound) : ❖ **সংজ্ঞা (Definition)**— নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে L-U-B-B শব্দের মতো সামান্য অস্পষ্ট ও দীর্ঘ যে শব্দ বা ধ্বনি হৃৎপিণ্ডে সৃষ্টি হয় তাকে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি বলে। এর স্থায়িত্বের সময় 0·14–0·2 সেকেন্ড। ○ **কারণ**—নিলয়ের সংকোচনের সময় অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি হঠাৎ সজোরে বন্ধ হওয়া এবং কপাটিকাগুলির কম্পনের ফলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। ● **তাৎপর্য**—প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি নিলয়ের সংকোচনের সূত্রপাত ও হৃৎপেশির কার্যক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

● **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল এবং সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকালের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Isometric contraction period and Isometric relaxation period** ঃ

| সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল | সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল |
|---|---|
| 1. নিলয়ের সংকোচনের সময় এটি ঘটে। | 1. নিলয়ের প্রসারণের সময় এটি ঘটে। |
| 2. সমদৈর্ঘ্য পেশির সংকোচনকালের স্থায়িত্ব কাল 0·05 সেকেন্ড। | 2. সমদৈর্ঘ্য পেশির প্রসারণকালের স্থায়িত্ব কাল 0·08 সেকেন্ড। |
| 3. নিলয় দুটি বন্ধ রক্তপূর্ণ প্রকোষ্ঠ হিসেবে সংকুচিত হয়। | 3. নিলয় দুটি বন্ধ রক্তশূন্য প্রকোষ্ঠ হিসেবে প্রসারিত হয়। |
| 4. এই দশায় আন্তঃনিলয় চাপ বাড়ে। | 4. এই দশায় আন্তঃনিলয় চাপ কমে। |
| 5. পেশি সংকোচনকালের শুরুতে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। | 5. এই পেশি প্রসারণকালের শুরুতে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। |

## ▲ হৃৎচক্রের সংক্ষিপ্তসার (Summary of Cardiac cycle)ঃ

❖ (a) **হৃৎচক্রের সংজ্ঞা ঃ প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তনগুলি পরবর্তী স্পন্দনেও লক্ষ করা যায়, স্পন্দন থেকে স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের এই চক্রবৎ পরিবর্তনগুলিকে হৃৎচক্র (Cardiac cycle) বলে।**

(b) **হৃৎচক্রের ঘটনাপ্রবাহ** ঃ প্রধানত 4টি দশায় ঘটে—

1. **অলিন্দের সংকোচন** (0·1 সেকেন্ড)—ডান অলিন্দে S.A. নোড নামে পেসমেকার থাকার ফলে অলিন্দের সংকোচন প্রথমে শুরু হয়।

2. **অলিন্দের প্রসারণ** (0·7 সেকেন্ড)—অলিন্দের সংকোচনের পর অলিন্দের প্রসারণ ঘটে।

3. **নিলয়ের সংকোচন** (0·3 সেকেন্ড)—(i) অলিন্দের সংকোচনের ঠিক পরেই নিলয়ের সংকোচনও শুরু হয়। শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি শোনা** যায়। অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হওয়ার কিছুসময়ের পর অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায়। এই সময় নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসেবে সংকুচিত হয়। এই প্রকার সংকোচন অবস্থার সময়কে **সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল** (0·05 সেকেন্ড) বলে। (ii) পেশির সংকোচনের সময় নিলয় মধ্যস্থ চাপ দ্রুত বেড়ে যায়, ফলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায় ও নিলয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। একে **নিক্ষেপণ কাল** (0·25 সেকেন্ড) বলে। প্রথমে রক্তের নিক্ষেপণ সর্বাধিক এবং পরে মন্দীভূত হয়। এই দুটি সময়কে যথাক্রমে **সর্বাধিক নিক্ষেপণ কাল** (0·11 সেকেন্ড) এবং **মন্দীভূত নিক্ষেপণ কাল** (0·14 সেকেন্ড) বলে।

4. **নিলয়ের প্রসারণ** (0·5 সেকেন্ড)—(i) নিলয়ের সংকোচনের পর নিলয়ের প্রসারণ ঘটে। প্রসারণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হয়। এর ফলে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। এই সময়ের ব্যবধান কালকে **শৈথিল্য সূচনাকাল** বা **প্রটোডায়াস্টোলিক কাল** (0·04 সেকেন্ড) বলে। এর পর নিলয় দুটি বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসেবে প্রসারিত হয়। একে **সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল** (0·03 সেকেন্ড) বলে। (ii) নিলয়ের প্রসারণের ফলে আন্তঃনিলয় চাপ দ্রুত কমে যায়, ফলে রক্ত অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলিকে খুলে নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। একে **পূর্তি দশা** (0·38 সেকেণ্ড) বলে। প্রথমে রক্তের প্রবেশের গতিবেগ বেশি হওয়ায় একে **প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (0·113 সেকেণ্ড) বলে। এই দশার শুরুতে **তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** শোনা যায়। এর পর রক্ত ঢোকার গতিবেগ কিছুক্ষণ মন্দীভূত থাকে, এই অবস্থাকে **মন্দীভূত পূর্তি দশা** (0·167 সেকেণ্ড) বলে। সবশেষে নিলয়ের মধ্যে রক্ত ঢোকার ক্ষিপ্রতা আবার বেড়ে যায়। এই সময়কে **অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তি দশা** (0·1 সেকেণ্ড) বলে। এই দশায় **চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি** শোনা যায়। নিলয়ের প্রসারণ এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আবার নিলয়ের সংকোচন শুরু হয়। এভাবেই হৃৎচক্র আবর্তিত হয়।

● **হৃৎচক্রের বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলির তালিকা (Table of different summarise events of cardiac cycle)** ঃ

| হৃৎচক্রের ঘটনাবলি (স্থিতিকাল) অভ্যন্তরীণ চাপ | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা ও (ii) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা | (i) রক্তপ্রবাহ এবং (ii) হৃদ্‌ধ্বনি |
|---|---|---|
| অলিন্দ সংকোচন (Atrial systole) (0·1 সেকেন্ড)<br><br>অলিন্দ-মধ্যস্থ চাপ বাড়ে | (i) ডান অলিন্দ নিলয়ের ছিদ্রপথে অবস্থিত ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলি এবং বাম অলিন্দ-নিলয়ে ছিদ্রপথে অবস্থিত বাইকাসপিড কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হয়।<br>(ii) ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনির উৎস-মুখে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে। | (i) ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে শিরা রক্ত কম $O_2$ এবং বেশি $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে ধমনি রক্ত কম $CO_2$ ও বেশি $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে।<br>(ii) অলিন্দের সংকোচনকালে কোনো হৃদ্‌ধ্বনি হয় না। |

| হৃৎচক্রের ঘটনাবলি (স্থিতিকাল) অভ্যন্তরীণ চাপ | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা ও (ii) অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা | (i) রক্তপ্রবাহ এবং (ii) হৃদ্‌ধ্বনি |
|---|---|---|
| অলিন্দ প্রসারণ (Atrial diastole) (0·7 সেকেন্ড) অলিন্দ-মধ্যস্থ চাপ কমে। | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে। (ii) অলিন্দ-প্রসারণের সময়কাল পর্যন্ত নিলয়-সংকোচন চলে বলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা খোলা থাকে। | (i) দেহের ঊর্ধ্বাংশ থেকে ঊর্ধ্ব মহাশিরা, নিম্নাংশ থেকে নিম্ন মহাশিরা এবং হৃৎপিণ্ড থেকে করোনারি সাইনাস দিয়ে শিরা রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে এবং ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে ধমনি রক্ত বাম অলিন্দে যায়। (ii) অলিন্দের প্রসারণকালে হৃদ্‌ধ্বনি হয়না। |
| নিলয় সংকোচন (Ventricular systole) ( 0·3 সেকেন্ড ) নিলয়-মধ্যস্থ চাপ বাড়ে | (i) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি হঠাৎ সজোরে এবং সশব্দে বন্ধ হয় ফলে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয়। (ii) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধের 0·05 সেকেন্ড পরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি খুলে যায়। এই দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়কে সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল বলে। | (i) রক্ত ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম নিক্ষেপণকালের সময় রক্ত দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত হয় বলে একে সর্বাধিক নিক্ষেপণ কাল এবং পরে রক্ত মন্থর গতিতে নিক্ষিপ্ত হয় বলে একে মন্দীভূত নিক্ষেপণকাল বলে। (ii) অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি সৃষ্ট হয়। |
| নিলয় প্রসারণ (Ventricular diastole) (0·5 সেকেন্ড) নিলয়-মধ্যস্থ চাপ কমে | (i) নিলয় প্রসারণের সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার 0·08 সেকেন্ড পরে অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি উন্মুক্ত হয় এবং এই অন্তর্বর্তীকালকে সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণকাল বলে। (ii) নিলয় প্রসারণ শুরু ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হবার অন্তর্বর্তীকালকে শৈথিল্য সূচনা কাল বলে। ধমনি মধ্যস্থ রক্তকে বিপরীত মুখে নিলয়ে প্রবেশে বাধা বন্ধ হয়। | (i) এই দশায় দুটি অলিন্দ থেকে দুটি নিলয়ে রক্ত সবেগে প্রবেশ করে। রক্তপূর্তির প্রথম ভাগে নিলয়ে রক্ত প্রবল বেগে প্রবেশ করে। একে প্রথম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা বলে। (ii) প্রথম ও অন্তিম পূর্তিদশাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এরপর রক্ত নিলয়ে মন্থর গতিতে প্রবেশ করে, একে মন্দীভূত পূর্তিদশা বলে। হৃৎচক্রের একেবারে শেষ সময়ে নিলয়ে রক্ত আবার দ্রুত প্রবেশ করে। একে অন্তিম ক্ষিপ্র পূর্তিদশা বলে। |

## ✪ 3.8. হৃদ্‌ধ্বনি (Heart sound) ✪

### ▲ হৃদ্‌ধ্বনির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and types of Heart sound) :

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) : হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশায় যেসব শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাদের হৃদ্‌ধ্বনি (Heart sound) বলে।**

⊡ **(b) হৃদ্‌ধ্বনির প্রকারভেদ (Types of heart sound) :** হৃদ্‌ধ্বনি চার প্রকার, যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) নামক যন্ত্র দিয়ে শোনা যায়। অন্য দুটি শব্দ অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ স্টেথোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায় না। প্রথম এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান 0·34 সেকেন্ড।

1. **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** (First heart sound) **:** ❖ **সংজ্ঞা (Definition)— নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে L-U-B-B শব্দের মতো সামান্য অস্পষ্ট ও দীর্ঘ যে শব্দ বা ধ্বনি হৃৎপিণ্ডে সৃষ্টি হয় তাকে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি বলে।** এর স্থায়িত্বের সময় 0·14–0·2 সেকেন্ড। ○ **কারণ**—নিলয়ের সংকোচনের সময় অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি হঠাৎ সজোরে বন্ধ হওয়া এবং কপাটিকাগুলির কম্পনের ফলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। ● **তাৎপর্য**—প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি নিলয়ের সংকোচনের সূত্রপাত ও হৃৎপেশির কার্যক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

2. **দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (Second heart sound) ঃ ❖ **সংজ্ঞা— নিলয়ের প্রসারণের প্রথম দিকে DUP শব্দের মতো তীক্ষ্ণ ও হ্রস্ব যে ধ্বনি হৃৎপিণ্ডে সৃষ্টি হয় তাকে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি বলে।** এর স্থায়িত্বের সময় 0·08–0·14 সেকেন্ড। ○ **কারণ**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি সজোরে বন্ধ হওয়ার ফলে এই ধ্বনি শোনা যায়। ● **তাৎপর্য**—দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি প্রধানত নিলয়ের সংকোচনের শেষ ও প্রসারণের শুরু এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলির বন্ধ হওয়ার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

3. **তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (Third heart sound) ঃ ❖ **সংজ্ঞা— যে হৃদ্‌ধ্বনির প্রকৃতি খুবই অস্পষ্ট ও হ্রস্ব হয় এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির পরে ঘটে তাকে তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি বলে।** ○ **কারণ**—নিলয় প্রসারণের সময় অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি খুলে যাওয়ার ফলে রক্ত সজোরে এই পথ দিয়ে অতিক্রম করে, এবং নিলয়ের গায়ে ধাক্কা দেওয়ার ফলেই ওই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। ● **তাৎপর্য**—নিলয়ে রক্ত প্রবেশের সূচনা করে।

4. **চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি** (Fourth heart sound) ঃ ❖ **সংজ্ঞা—যে হৃদ্‌ধ্বনি অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট এবং তৃতীয় ধ্বনির পর ঘটে তাকে চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি বলে।** ○ **কারণ**—অলিন্দের সংকোচনের ফলে নিলয়ের দিকে প্রবাহিত রক্ত এই ধ্বনি সৃষ্টি হয় ও তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনির পরে শোনা যায়। ● **তাৎপর্য**—রক্তপূর্তির সমাপ্তি নির্দেশ করে।

● **হৃৎচক্রের হৃদ্‌ধ্বনির উদ্ভব দশা ও কারণ (Phases and Causes of Heart Sounds) ঃ**

| হৃদ্‌ধ্বনি | কখন হয় | কেন হয় (কারণ) |
|---|---|---|
| 1. **প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি** (সামান্য অস্পষ্ট ও দীর্ঘ) | নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে এটি ঘটে। | নিলয় পেশির সংকোচনে নিলয়-মধ্যস্থ চাপ বেড়ে যায়, ফলে এই চাপ অলিন্দ-নিলয় কপাটিকাগুলি জোরে বন্ধ করে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি উৎপন্ন করে। |
| 2. **দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও হ্রস্ব) | নিলয়ের প্রসারণকালের প্রোটোডায়াস্টলিক পিরিয়ডের শেষে এটি ঘটে। | নিলয় পেশির প্রসারণে আন্তঃনিলয় চাপের হ্রাস ঘটে, ফলে ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনির রক্ত নিলয় দুটিতে ফিরে আসার সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি জোরে বন্ধ হয়ে দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি উৎপন্ন করে। |
| 3. **তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি** (অত্যন্ত ক্ষীণ) | নিলয় প্রসারণের মাঝামাঝি দশায় অর্থাৎ রক্তপূর্তিদশায় এটি ঘটে। | নিলয়ের পেশি প্রসারণের ফলে আন্তঃনিলয়ের চাপ খুব কমে যায়, ফলে অলিন্দ থেকে অতি দ্রুত বেগে রক্ত নিলয়ে ঢোকার ফলে তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। |
| 4. **চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি** (অত্যন্ত ক্ষীণ) | নিলয় প্রসারণের অন্তিম দশায় এটি ঘটে। | হৃৎচক্রের অন্তিম দশায় অলিন্দ থেকে নিলয়ে রক্ত দ্রুত যাওয়ার ফলে চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়। |

**● ফোনোকার্ডিওগ্রাফ এবং ফোনোকার্ডিওগ্রাম ●**

স্টেথোস্কোপ (Stethoscope)-এর সাহায্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি সহজেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি বিশেষত শেষ হৃদ্‌ধ্বনি একেবারে শোনা যায় না। **ফোনোকার্ডিওগ্রাফ** (Phonocardiograph) নামে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদ্‌ধ্বনির লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই লেখচিত্রকে **ফোনোকার্ডিওগ্রাম** (Phonocardiogram) বলে। এই লেখচিত্রের সাহায্যে হৃদ্‌ধ্বনি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে হৃদ্‌ধ্বনির প্রকৃতি জানা যায়।

## ❂ 3.9. হার্দ-উৎপাদ (Cardiac output) ❂

### ▲ হার্দ-উৎপাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কারণসমূহ এবং নির্ণয় (Definition, types factors and determination of Cardiac output) ঃ

❖ **(a) হার্দ-উৎপাদের সংজ্ঞা (Definition of Cardiac output) ঃ হৃৎপিণ্ডের প্রতি সংকোচনে প্রতিটি নিলয় থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সংবহনতন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হয় তাকে হার্দ-উৎপাদ বলে।**

◘ **(b) হার্দ-উৎপাদের প্রকারভেদ (Types of Cardiac output) ঃ** হার্দ উৎপাদকে দু'ভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা—

1. **ঘাত পরিমাণ** (Stroke volume)—প্রতি সংকোচনে প্রতিটি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত নির্গত হয় তাকে ঘাত পরিমাণ বলে। এর গড় পরিমাণ **70 মিলিলিটার**।

2. **মিনিট পরিমাণ** (Minute volume)—প্রতি মিনিটে প্রতিটি নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত নির্গত হয় তাকে **মিনিট পরিমাণ** বলে। মিনিট পরিমাণ = হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার × ঘাত পরিমাণ। অর্থাৎ যদি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার প্রতি মিনিটে 72 হয়, এবং ঘাত পরিমাণ 70 মিলিলিটার হয়, তাহলে মিনিট পরিমাণ = **72 × 70 মিলি = 5040 মিলি** বা প্রায় **5 লিটার**।

● **হৃৎসূচক বা হৃৎসংকেত (Cardiac index) :** ❖ **সংজ্ঞা— বাম নিলয় থেকে প্রতি মিনিটে দেহের বহির্ভাগের প্রতি বর্গমিটার দেহতলের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত নিলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় তাকে হৃৎসংকেত বলে**। এর গড় পরিমাণ 3·3 লিটার।

● প্রতি সংকোচনে (ঘাতে) বাম নিলয় থেকে যে পরিমাণ রক্ত প্রতি বর্গমিটার দেহতলের জন্য নিক্ষিপ্ত হয় তাকে **ঘাতপরিমাণ সংকেত** (Stroke index) বলে।

☐ **হার্দ-উৎপাদ নিয়ন্ত্রণের শর্তসমূহ (Factors maintaining cardiac output) :** স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন শর্ত হার্দ উৎপাদকে নিয়ন্ত্রণ করে এগুলি হল—

1. **শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন** (Venous return)—যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত দুটি মহাশিরার মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে, তাকে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন বলে। হৃৎপিণ্ডে যত বেশি রক্ত প্রবেশ করবে তত বেশি রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে নিক্ষিপ্ত হবে। যেসব শর্ত শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হার্দ-উৎপাদেরও পরিবর্তন ঘটায়। শর্তগুলি হল— নিশ্বাসপ্রশ্বাস, পেশিসঞ্চালন, রক্তজালক ও উপশিরার মধ্যে রক্তচাপের পার্থক্য, উপধমনি ও উপশিরার টান ইত্যাদি।

2. **হৃৎপেশি কর্মক্ষমতা** (Myocardial efficiency)—হৃৎপেশির কর্মক্ষমতার উপর হৃৎপেশির সংকোচন নির্ভর করে। পেশিসংকোচন বল বেশি হলে হার্দ-উৎপাদও বেশি হবে। পেশিসংকোচন ক্ষমতা কতকগুলি কারণের উপর নির্ভরশীল, যেমন—(i) হৃৎপেশির প্রাথমিক দৈর্ঘ্য (Initial length of cardiac muscle), (ii) হৃৎপেশির পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ (Supply of nutrition and oxygen) এবং (iii) হৃৎপেশির প্রসারণ বিরতির দৈর্ঘ্য (Length of diastolic pause)।

**● স্টারলিং সূত্র (Starling law) ●**

এই সূত্র স্টারলিং নামে একজন বিজ্ঞানীর বর্ণিত সূত্র। হৃৎপিণ্ডের পেশিকোশের (পেশিতন্তুর) সংকোচন সম্পর্কে তিনি এই সূত্রে বলেছেন যে, হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হওয়ার আগে হৃৎপেশি তন্তুর দৈর্ঘ্য (কার্যকরী সীমার মধ্যে) যত বেশি হবে সংকোচন বল তত বাড়বে। **অর্থাৎ হৃৎপেশির সংকোচনের বল হৃৎপেশিতন্তুর প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল**।

3. **হৃৎস্পন্দনের হার** (Frequency of heart rate)—হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে গেলে প্রতি স্পন্দনের সময় শিরারক্তের পরিমাণ কমে যায়, ফলে ঘাত পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু মিনিট পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে অত্যধিক হৃৎস্পন্দনে মিনিট পরিমাণও কমে যায়।

4. **ধমনি রক্তচাপের মাত্রা** (Arterial blood pressure level)—রক্তচাপ প্রধানত রক্তবাহের **প্রান্তীয় বাধার** (Peripheral resistance) উপরেই নির্ভর করে। এই বাধা যদি অধিক হয় তাহলে রক্তচাপেরও বৃদ্ধি ঘটবে, ফলে এর ফলাফল হার্দ উৎপাদের উপরেও প্রতিফলিত হবে।

5. **অন্যান্য শর্তসমূহ** (Other factors)—উপরের শর্ত ছাড়া অন্যান্য শর্ত হার্দ-উৎপাদকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন—বয়স, লিঙ্গ, উত্তেজনা, উষ্ণতা, দেহভঙ্গি, পেশিসঞ্চালন, রক্তাল্পতা, জ্বর ইত্যাদি।

**চিত্র 3.23.** : ডগলাস ব্যাগের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণের পদ্ধতি।

➤ **হার্দ-উৎপাদ নির্ণয়ের পদ্ধতি (Method of determination of cardiac output) :** মানুষের দেহে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে হার্দ-উৎপাদ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই কারণে **পরোক্ষ পদ্ধতি** ব্যবহার করে হার্দ উৎপাদ নির্ণয় করা সহজ। ফিক্ নামে একজন বিজ্ঞানী এই পরোক্ষ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সহজ ধারণা দেন।

◘ **ফিক্‌স প্রিন্সিপল্** (Fick's Principle) : 1870 খ্রিস্টাব্দে **অ্যাডলফ ফিক্** নামে একজন জার্মানবিজ্ঞানী এই পদ্ধতি

আবিষ্কার করেন। তাঁর মতানুসারে, যদি প্রতি মিনিটে অক্সিজেন ($O_2$) গ্রহণের পরিমাণ এবং ধমনি ও শিরারক্তের মোট ($O_2$) পরিমাণ জানা থাকে তাহলে নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে হার্দ-উৎপাদ নির্ণয় করা যায় ঃ

$$\text{হার্দ-উৎপাদ} = \frac{\text{মোট অক্সিজেন গ্রহণ}}{\text{ধমনি ও শিরারক্তের অক্সিজেনের অন্তরফল}} \times 100$$

ধরা যাক,

100 মিলিলিটার শিরারক্তে $O_2$ পরিমাণ = 15 মিলি
100 " ধমনি রক্তে $O_2$ পরিমাণ = 19 মিলি

ধমনি রক্ত ও শিরারক্তের $O_2$ অন্তরফল = 4 মিলি
প্রতি মিনিটে মোট $O_2$ গ্রহণের পরিমাণ = 200 মিলি

অতএব, প্রতি 100 মিলি শিরারক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় (19–15) বা 4 মিলি অক্সিজেন গ্রহণ করে ধমনিরক্তে পরিণত হয়। স্পাইরোমিটার (Spirometer) বা ডগলাস ব্যাগ (Douglas bag)-এর সাহায্যে ফুসফুসের $O_2$ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। দেখা গেছে প্রতি মিনিটে মোট অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ 200 মিলি।

সুতরাং, ফিক্সের সূত্র অনুযায়ী হার্দ-উৎপাদ = $\frac{200 \times 100}{4}$ = 5000 ml = 5 **লিটার** (Litre)

## ❂ 3.10. রক্তচাপ (Blood Pressure—BP) ❂

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রবাহমান রক্ত রক্তবাহের প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ প্রদান করে তাকে রক্তচাপ বলে।** (তরল পদার্থপূর্ণ কোনো নলের ভিতরে তার গতিপথের সমকোণে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে পার্শ্বচাপ বলে।)

◘ (b) **রক্তচাপের প্রকারভেদ (Different types of blood pressure)** ঃ রক্তচাপকে চারভাবে প্রকাশ করা যায়—

1. সিস্টোলিক প্রেসার (Systolic Pressure, SP) ঃ❖ **সংজ্ঞা—হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের সংকোচনকালীন সর্বাধিক রক্তচাপকে সিস্টোলিক প্রেসার বা নিলয় সংকোচী চাপ বলে।** পূর্ণবয়স্ক পুরুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ 120 মিলিমিটার পারদ চাপের সমান (± 15 mm Hg) হয়।

2. ডায়াস্টোলিক প্রেসার (Diastolic Pressure, DP) ঃ ❖ **সংজ্ঞা—হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের প্রসারণকালীন সর্বনিম্ন রক্তচাপকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বা নিলয় প্রসারী চাপ বলে।** পূর্ণবয়স্ক পুরুষের স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ 80 mm Hg।

3. **পালস্ প্রেসার** (Pulse Pressure, PP) ঃ ❖ **সংজ্ঞা—সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের অন্তরফলকে পালস্ প্রেসার বা স্পন্দন চাপ বলা হয়।** একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের স্পন্দন চাপের স্বাভাবিক মান (120–80) 40 mm Hg।

4. **গড় রক্তচাপ বা মিন প্রেসার** (Mean Pressure, MP) ঃ ❖ **সংজ্ঞা—সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের গড় মানকে মিন প্রেসার বা গড় চাপ বলা হয়।** গড় চাপের স্বাভাবিক মান 100 mm Hg।

● **সংকোচনকালীন, সম্প্রসারণকালীন এবং স্পন্দনিক রক্তচাপের পার্থক্য (Difference between Systolic, Diastolic and Pulse pressure) ঃ**

| সংকোচনকালীন রক্তচাপ (সিস্টোলিক প্রেসার) | সম্প্রসারণকালীন রক্তচাপ (ডায়াস্টোলিক প্রেসার) | স্পন্দন রক্তচাপ (পালস প্রেসার) |
|---|---|---|
| 1. এটি নিলয়ের সংকোচনকালীন সর্বাধিক চাপ। | 1. এটি নিলয়ের প্রসারণকালীন সর্বনিম্ন চাপ। | 1. এটি সংকোচনকালীন চাপ ও প্রসারকালীন চাপের অন্তরফল। |
| 2. চাপের স্বাভাবিক মান—120 mm Hg। | 2. চাপের স্বাভাবিক মান—80 mm Hg। | 2. চাপের স্বাভাবিক মান—40 mm Hg। |
| 3. এই চাপ হৃৎপেশির কার্যক্ষমতা নির্দেশ করে। | 3. এই চাপ দেহের প্রান্তীয় বাধার প্রকৃতি নির্দেশ করে। | 3. এই চাপ হার্দ-উৎপাদের অবস্থা নির্দেশ করে। |

○ **বিভিন্ন চাপের স্বাভাবিক অনুপাত (Normal ratio between different types of blood pressure) ঃ** একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক এবং পালস্ প্রেসারের স্বাভাবিক অনুপাত 3 : 2 : 1, অর্থাৎ সিস্টোলিক প্রেসার 120 হলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার 80 এবং পালস্ প্রেসার 40 মিলিমিটার পারদ চাপের সমান হবে।

◘ (c) **স্বাভাবিক রক্তচাপ (Normal blood pressure) ঃ** $B.P = \frac{SP}{DP} = \frac{120}{80}$ mm Hg (রক্তচাপকে এভাবে প্রকাশ করা যায়)

● **অস্বাভাবিক রক্তচাপ (Abnormal blood pressure) ঃ** (i) সিস্টোলিক প্রেসার 150 mm Hg এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার 90 mm Hg-এর বেশি হলে তাকে **ঊর্ধ্ব রক্তচাপ বা হাইপারটেন্‌সন** (High blood pressure বা Hypertension) বলে। (ii) সিস্টোলিক প্রেসার 100 mm Hg ও ডায়াস্টোলিক প্রেসার 50 mm Hg-এর কম হলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেন্‌সন** (Low blood pressure বা Hypotension) বলা হয়।

চিত্র 3.24. ঃ রক্তনালির বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক রক্তচাপের মান।

● **রক্তবাহের (নালির) বিভিন্ন স্থানের স্বাভাবিক রক্তচাপ (Normal blood pressure at different parts of the blood vessels) ঃ**

(i) **ধমনি চাপ** (Arterial pressure)— প্রবাহমান রক্ত ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ প্রদান করে তাকে **ধমনি চাপ বা আর্টেরিয়াল প্রেসার** বলে। সিস্টোলিক ধমনির চাপের স্বাভাবিক মান **120 mm Hg** চাপের সমান হয়।

(ii) **শিরা চাপ** (Venous pressure)—শিরার প্রাচীরে প্রবাহমান রক্ত যে পার্শ্বচাপ প্রদান করে তাকে **শিরা চাপ বা ভেনাস প্রেসার** বলে। এর পরিমাণ প্রায় **10–12 mm Hg** চাপের সমান হয়। মহাশিরায় এই চাপ আরও কমে গিয়ে **4 mm Hg** সমান হয়।

(iii) **জালক চাপ** (Capillary pressure)—রক্তজালকের মধ্যে প্রবাহমান রক্ত যে চাপ প্রদান করে তাকে **জালক চাপ** বা **ক্যাপিলারি প্রেসার** বলে। জালকের ধমনি প্রান্তে এই চাপ প্রায় **30 mm Hg** চাপের সমান এবং শিরা প্রান্তে প্রায় **16 mm Hg** চাপের সমান হয়।

### ❂ ক্যাজুয়াল রক্তচাপ ও বেসাল রক্তচাপ ❂

1. **ক্যাজুয়াল রক্তচাপ**—সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মানুষ যে রক্তচাপ পাওয়া যায়, বিশেষ করে মানুষ যখন স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় থাকে, তাকে **ক্যাজুয়াল রক্তচাপ** (Casual blood pressure) বলে।
2. **বেসাল রক্তচাপ**—সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামরত অবস্থায়, খাদ্যগ্রহণের 10-12 ঘণ্টার পর একজন মানুষের ধমনিতে যে রক্তচাপ পাওয়া যায় তাকে **মৌল রক্তচাপ বা বেসাল রক্তচাপ** (Basal blood pressure) বলে। ক্যাজুয়াল রক্তচাপ বেসাল রক্তচাপের থেকে সবসময় বেশি হয়।

◘ (d) **শারীরবৃত্তীয় কারণে রক্তচাপের পরিবর্তন (Change of blood pressure due to physiological state) ঃ**

(i) **বয়স (Age)**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ বাড়ে। শিশু অবস্থায় রক্তচাপের মান 90/60, চার বৎসর বয়সে 100 / 65, বয়ঃসন্ধিকালে 120/80 এবং বৃদ্ধ বয়সে 140-150/90 mm Hg হয়।

(ii) **লিঙ্গ (Sex)**—সমবয়স্ক স্ত্রীলোকের রক্তচাপ একই বয়সের পুরুষের তুলনায় কিছুটা (SP এবং DP প্রায় 5 mm Hg) কম হয়।

(iii) **শারীরিক গঠন** (Body build)—স্থূল লোকের রক্তচাপ সামান্য বেশি হয়।

(iv) **অন্যান্য কারণসমূহ** (Other physiological factors)—পেশি সঞ্চালন, উত্তেজনা, আবেগ প্রভৃতি কারণসমূহ রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটায়।

### ➤ (e) ধমনির রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ (Factors controlling arterial blood pressure) ঃ

1. **হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা** (Cardiac efficiency)—হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা হৃৎপেশির সংকোচন ও প্রসারণের উপর নির্ভর করে। **হৃৎপেশির সফল সংকোচন** (Efficient contraction of heart muscle) রক্তপ্রবাহ, হার্দ-উৎপাদ ও রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ প্রতিটি সফল সংকোচন নিলয়ের রক্তকে মহাধমনিতে নিক্ষেপ করে এবং **তাড়ন বল** (Driving force) উৎপন্ন করে।

2. **হার্দ-উৎপাদ** (Cardiac output)—হৃৎপিণ্ডের প্রতি সংকোচনে প্রতিটি নিলয় যে পরিমাণ রক্তকে সংবহনতন্ত্রে নিক্ষেপ করে তাকে হার্দ-উৎপাদ বলে। হার্দ-উৎপাদ বাড়লে বা কমলে রক্তচাপ যথাক্রমে বাড়বে কিংবা কমবে।

3. **প্রান্তীয় বাধা** (Peripheral resistance)—রক্ত রক্তবাহের মধ্য দিয়ে দেহের প্রান্তদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় যে বাধার সম্মুখীন হয় তাকে **প্রান্তীয় বাধা** বলে। প্রান্তীয় বাধা বাড়লে রক্তের চাপও বাড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় বাধা প্রধানত উপধমনিতে (Arterioles) বেশি হয়। প্রান্তীয় বাধা প্রধানত রক্তের সান্দ্রতা, রক্তের প্রবাহ, উপধমনির স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তবাহের অভ্যন্তরীণ ব্যাসের উপর নির্ভর করে।

4. **রক্তের সান্দ্রতা** (Viscosity of blood)—রক্তের সান্দ্রতার পরিবর্তনে ডায়াস্টোলিক প্রেসার পরিবর্তিত হয়।

5. **রক্তের পরিমাণ** (Blood volume)—রক্তের পরিমাণের উপর রক্তচাপ নির্ভর করে। রক্তের পরিমাণ বেড়ে গেলে ধমনির প্রাচীরে অধিক চাপ পড়ে ফলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক উভয় চাপ বেড়ে যায়।

6. **ধমনিগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity of arterial wall)—স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক প্রেসারে রক্তনালি প্রসারিত হয় কিন্তু ধমনির প্রাচীরে স্থিতিস্থাপক কলার উপস্থিতির জন্য ধমনির প্রাচীর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ধমনির গায়ের এই স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য ধমনিতে রক্তপ্রবাহ স্পন্দনশীল (Pulsatile) হয়, রক্তজালক ও শিরাতে রক্তপ্রবাহ ধারাবাহিক হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনিগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় অর্থাৎ শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বাড়ে।

7. **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system)—স্নায়ুতন্ত্র তার **ভ্যাসোমোটর তন্ত্রের** মাধ্যমে উপধমনির প্রাচীরের অভ্যন্তরীণ ব্যাসের তারতম্য ঘটিয়ে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপধমনির ব্যাস বাড়লে কিংবা কমলে রক্তচাপ যথাক্রমে কমে বা বাড়ে।

8. **হরমোন** (Hormone)—অ্যাড্রেনালিন, ভেসোপ্রেসিন ইত্যাদি রক্তনালিকে সংকুচিত করে রক্তচাপকে বাড়ায়।

9. **এনজাইম** (Enzyme)—অক্সিজেনের অভাবে কিংবা বৃক্কীয় ধমনিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বৃক্ক **রেনিন** (Renin) নামে একপ্রকার এনজাইম উৎপন্ন করে। রেনিন প্লাজমায় অ্যান্‌জিওটেন্‌সিন—II নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। এই পদার্থটি রক্তনালিকে সংকুচিত করে রক্তের চাপকে বাড়ায়।

চিত্র 3.25. ঃ রক্তচাপ মাপক যন্ত্র।

### ◘ (f) রক্তচাপের কার্যাবলি (Functions of blood pressure) ঃ

1. রক্তচাপ রক্তনালির মধ্যে রক্তের প্রবাহকে বজায় রাখে।

2. রক্তজালকের পরিস্রাবণের (Filtration) প্রয়োজনীয় পরিস্রাবণ চাপের জোগান দেয়। মূত্র উৎপাদন, কলারস ও লসিকার উৎপাদন এবং সরবরাহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এই পরিস্রাবণ চাপের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

### ◘ (g) রক্তচাপের গুরুত্ব (Significance of blood pressure) ঃ

1. **সংকোচনকালীন চাপ বা সিস্‌টোলিক প্রেসার**—(i) হৃৎপিণ্ডের পেশির সংকোচন বল সম্বন্ধে অনুমান করতে পারা যায়। (ii) রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে রক্তচাপের মাত্রা নির্ভর করে। রক্তের পরিমাণ বাড়লে সিস্টোলিক চাপও বাড়ে।

2. **প্রসারণকালীন চাপ বা ডায়াস্টোলিক প্রেসার**—প্রসারী চাপ প্রান্তীয় বাধার প্রকৃতি নির্ণয় করে। ডায়াস্টোলিক চাপের মাধ্যমে রক্ত পাম্প করতে হৃৎপিণ্ডকে কতটা শক্তি ক্ষয় করতে হয় তার সম্বন্ধে জানা যায়। হৃৎপিণ্ডের বেশি কাজ করার জন্য ডায়াস্টোলিক চাপ বেশি হয়।

3. **স্পন্দন চাপ বা পালস প্রেসার**—এই চাপ থেকে হার্দ-উৎপাদের অবস্থা সম্বন্ধীয় বিষয় অনুমান করা যায়।

4. **গাঢ় চাপ বা মিন প্রেসার**—এই চাপ থেকে দেহের সর্বত্র কী চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তা জানা যায়।

■ (h) **রক্তচাপের পরিমাপন (Measurement of Blood pressure)** ঃ মানুষের রক্তচাপ 3টি পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়—1. **শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতি**, 2. **নাড়িস্পন্দন পদ্ধতি**, 3. **দোলন পদ্ধতি**।

◖ 1. **শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতি (Auscultatory method)** ঃ উপরে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতিটির ব্যবহার অধিক। এই পদ্ধতিতে যেসব যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয় তাদের নাম **স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার** (Sphygmomanometer) এবং **বক্ষবীক্ষণ যন্ত্র** বা **স্টেথোস্কোপ** (Stethoscope)।

● **প্রণালী (Procedure)** —(i) একজন ব্যক্তি বা রোগীকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে যন্ত্রটিকে তার হৃৎপিণ্ডের সমতলে রাখা হল এবং যন্ত্রের বাহুবন্ধ বা কাফ (Cuff) দিয়ে ঊর্ধ্ব বাহুর কনুই সন্ধির সামান্য ওপরে বেঁধে নেওয়া হয়।

(ii) এর পর স্টেথোস্কোপের বক্ষ অংশটি (Chest piece) বাহুবন্ধের নীচে এবং **ব্রাকিয়াল ধমনির** উপরে স্থাপন করা হল ও ইয়ার পিস দুটিকে রক্তচাপ নির্ণয়কারীর দু'কানে লাগিয়ে রাখা হল।

(iii) এর পর যন্ত্রের বায়ুপাম্পের সাহায্যে বাহুবন্ধের ভিতরে বায়ুচাপকে প্রায় 200 mm Hg চাপের সমান বাড়ানো হয়। উচ্চ বায়ুচাপ ব্রাকিয়াল ধমনিকে সংকুচিত করে ফলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

**চিত্র 3.26.** ঃ স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার ও স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি।

(iv) এর পর পাম্পের স্ক্রুটি আলগা করে বাহুবন্ধনীর বায়ুচাপকে ধীরে ধীরে মুক্ত করলে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি শোনা যায়। স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটারের পারদ-স্তম্ভ নীচে নামার সময় **যে স্থানে প্রথম ধ্বনি শোনা যায় তা সিস্টোলিক চাপের সমান হয়**। এভাবে ম্যানোমিটারে নীচের দিকে আরও নামার সময় বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দ শোনা যায় এবং শেষে কিছুদূর নেমে যাওয়ার পর ধ্বনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়। ম্যানোমিটারের পারদ স্তম্ভের **যে স্থানে ধ্বনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয় তা ডায়াস্টোলিক চাপের সমান**।

## ✪ 3.11. হৃদ্‌বাহের সাধারণ রোগের কারণসমূহ ✪ (Causes of Common Cardiovascular Diseases)

### ▲ A. খাদ্যবস্তুর কারণে হৃদ্‌বাহের রোগ (Cardiovascular disease due to Dietary Factors) ঃ

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য হল—কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং জল। দেহের চাহিদা অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিমাণে আহার্য্য খাদ্যবস্তু দেহের কোনো ক্ষতি করে না, তবে এই সব খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হলে অর্থাৎ স্বাভাবিক চাহিদা থেকে কম হলে বা বেশি হলে সমগ্র দেহে বিশেষত হৃৎপিণ্ডে ও সংবহনতন্ত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এরফলে **রক্তবাহজনিত রোগ** বা (Cardiovascular disease—**CVD**) দেখা দেয়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে হৃৎপেশির পুষ্টি অস্থিপেশির পুষ্টি থেকে অনেকটা আলাদা। হৃৎপেশি প্রধানত ফ্যাটি অ্যাসিডকে পুষ্টি হিসাবে ব্যবহার করে।

পুষ্টি হিসাবে এরপর ল্যাকটিক অ্যাসিড ও গ্লুকোজের স্থান। দেখা গেছে প্রতি 100 গ্রাম হৃৎপেশি যেখানে প্রতি ঘণ্টায় 200 মিলিগ্রাম ল্যাকটিক অ্যাসিডের ব্যবহার করে সেখানে মাত্র 70 মিলিগ্রাম গ্লুকোজ অস্থিপেশি একই কাজে ব্যবহার করে, অর্থাৎ হৃৎপেশির বিপাকক্রিয়ায় গ্লুকোজের চেয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডকে সমধিক পছন্দ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে হৃৎপেশি প্রধানত ফ্যাটি অ্যাসিডকে সব থেকে বেশি ব্যবহার করে। তবে খাদ্যে ফ্যাটজাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিমাণ অধিক হলে দেহে অনেক কুফল লক্ষ করা হয়। অধিক পরিমাণ সম্পৃক্ত ফ্যাট, যেমন—চর্বি, মাখন, লাল মাংস, এছাড়া অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত ডিমের কুসুম ইত্যাদি, অধিক পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত (অধিক ক্যালোরিযুক্ত) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে দেহে প্রচুর পরিমাণ কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয় ফলে **অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস** (Atherosclerosis) নামে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ফ্যাট (লিপিড) রক্তবাহের অন্তঃস্থ প্রাচীরে জমা হয়ে রক্তবাহের লুমেনকে (ফাঁকা অংশকে) সরু ও অমসৃণ করে। **করোনারি রক্তবাহ সংক্রান্ত হৃদ্‌রোগ** (Coronary arterial disease সংক্ষেপে CAD) প্রধানত অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস রোগের জন্য হয়। অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিসের ফলে অণুচক্রিকাগুলি অমসৃণ তলের সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায় বলে রক্তবাহের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। একে **থ্রম্বোসিস** বলে, যেমন—করোনারি **থ্রম্বোসিস**, সেরিব্রাল **থ্রম্বোসিস** ইত্যাদি। করোনারি রক্তবাহের রক্তসংবহনের ত্রুটির ফলে (কম হলে) **অ্যানজিনা পেক্‌টোরিস** (Angina pectoris) নামে হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এই অবস্থায় হৃৎপেশি তাদের ব্যবহারের যথাযথ প্রয়োজনমতো $O_2$ ও পুষ্টি পায় না ফলে পেশির অধিক সক্রিয়তায় বুকে ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভূত হয়। হৃৎপেশিতে রক্তপ্রবাহ যথেষ্ট কমে গেলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে পেশিতে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অপরিবর্তনযোগ্য হয়, এর ফলে হৃৎপেশির অবক্ষয় দেখা যায়। একে **মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন** (Myocardial infraction) বলে। এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পেশিগুলি তখন হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনে সাহায্য করে না।

### ▲ B. ধূমপানের ফলে হৃদ্‌বাহের রোগ (Cardiovascular disease due to smoking) :

**শুকনো তামাক পাতাকে কুচিয়ে বিশেষ ধরনের পাতা বা কাগজ মুড়িয়ে বিড়ি বা সিগারেট বানিয়ে তাকে আগুনে পোড়ালে তার থেকে নির্গত ধোঁয়াকে সেবন করলে তাকে ধূমপান বলে।** এই ধোঁয়াতে প্রায় 33 প্রকার উপাদান থাকে। ধোঁয়ার প্রতিটি উপাদান দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল **নিকোটিন** যা মানুষের দেহে তথা হৃৎপিণ্ডের উপর প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে ফলে **রক্তবাহ-হ্রাসজনিত হৃদ্‌রোগ** দেখা দেয়।

- **রক্তবাহ-হ্রাসজনিত হৃদ্‌রোগ (Ischemic heart diseases)**—ধূমপান ও রক্তপ্রবাহ-হ্রাসজনিত হৃদ্‌রোগ ও মৃত্যু এই দুয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক পাওয়া যায়। (i) 45-55 বৎসর বয়স্ক ধূমপায়ী, যারা দিনে 15টি বা তার বেশি সিগারেট খান, তাদের হৃদ্‌রোগের প্রাবল্য বেশি। পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও জানা গেছে **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (Angina pectoris) বা বুকে হৃৎপিণ্ডের ব্যথা ও **ইসচেমিক হৃদ্‌রোগের** সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক রয়েছে। (ii) প্রথমত, ধূমপান অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে **ক্যাটেকোলামিন এপিনেফ্রিন** এবং **নর এপিনেফ্রিনের ক্ষরণকে** বাড়িয়ে দেয়, যা অণুচক্রিকায় অসঞ্জন (Adhesiveness) বৃদ্ধি করে **থ্রম্বোসিসের** ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া প্লাজমায় মুক্ত ফ্যাটি-অ্যাসিডের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে অ্যাথেরোমা উৎপাদন উদ্দীপিত হয়। ধূমপানে হৃৎপিণ্ডে **স্পন্দনবিকার** (Arrhythmia) দেখা যায় যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। (iii) ধূমপায়ীদের অত্যধিক ক্যাটেকোলামিনের ক্ষরণে **ট্যাকিকারডিয়া** (হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি) ও খানিকটা **রক্তচাপ-বৃদ্ধিও** লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তন সম্মিলিতভাবে হৃৎপিণ্ডে রক্তপ্রবাহকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করে। তা ছাড়া **ইসচেমিক হৃদ্‌রোগ, অ্যাথেরোসক্লোরোসিস** ও **হার্ট অ্যাটাক** (Heart attack) হওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়।

### ▲ C. পীড়নের ফলে হৃদ্‌বাহের রোগ (Cardiovascular disease due to stress) :

❖ **পীড়নের সংজ্ঞা : দেহে যে-কোনো একপ্রকার উদ্দীপনা বা বিভিন্ন উদ্দীপনা বারে বারে প্রয়োগের ফলে জীবের হোমিওস্টেসিস অবস্থার (সমস্থিতিক প্রবণতা) যে পরিবর্তন ঘটে তাকে পীড়ন (Stress) বলে।**

হোমিওস্টাসিস হল জীবদেহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্থিতি বজায় রাখার প্রবণতা যা জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলি শুধুমাত্র বাইরের পরিবেশের উপরে নির্ভর করে না, দেহের অভ্যন্তরের তরল পরিবেশের উপরেও বেশির ভাগ নির্ভর করে।

এই অভ্যন্তরে তরলের সঙ্গে কলাকোশের পুষ্টি, গ্যাস, বর্জ্যপদার্থের বিনিময় ঘটে। যার ফলে জীবদেহে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির (যতটুকুই তারা পরিবর্তিত হোক না কেন) একমাত্র লক্ষ হল অন্তঃস্থ পরিবেশে জীবনের অবস্থাকে স্থিতিশীল রাখা। একেই হোমিওস্টাসিস বলে। পীড়ন অবস্থায় হোমিওস্টাসিসের বিচ্যুতি ঘটে ফলে দেহের বিভিন্ন তন্ত্রে তথা রক্তসংবহন তন্ত্রে এর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ, মানসিক চিন্তা প্রভৃতি **পীড়ন উদ্রেককারী অবস্থা** (Stressors) নামে পরিচিত।

মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাসকে পীড়ন** কেন্দ্র বলে। হাইপোথ্যালামাস স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত কারণ এটি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। পীড়ন উদ্রেককারী কারণগুলি হাইপোথ্যালামাসের মাধ্যমে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে। এর ফলে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর প্রান্ত থেকে এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা অংশ থেকে প্রচুর পরিমাণ অ্যাড্রিনালিন নামে হরমোন ক্ষরিত করে। অ্যাড্রিনালিন—(i) হৃৎস্পন্দনের বল ও হারকে বাড়ায় এবং হার্দ-উৎপাদ বৃদ্ধি করে। (ii) অ্যাড্রিনালিন ত্বকের এবং ফুসফুসে অবস্থিত রক্তজালকগুলিকে সংকুচিত করে (কিন্তু কঙ্কাল পেশি এবং মস্তিষ্কে অবস্থিত রক্তবাহকে প্রসারিত করে) এর ফলে আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। (iii) প্লিহার সংকোচন ঘটে ফলে প্লিহাতে সঞ্চিত RBC সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে ফলে রক্তের পরিমাণ বাড়ে।

## ▲ D. মধুমেহ রোগের ফলে হৃদ্‌বাহের রোগ (Cardiovascular disease due to diabetes mellitus) :

❖ **মধুমেহ-এর সংজ্ঞা (Definition of diabetes mellitus) : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে 180 mg%-এর বেশি হলে মূত্রের মাধ্যমে গ্লুকোজ যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা বহুমূত্র বলে।**

মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হলে পেশিকোশে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। এই অবস্থা দেহে শক্তির চাহিদা মেটাতে দেহে সঞ্চিত ফ্যাটের বিপাক ক্রিয়া বাড়ে। এই কারণে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ে। রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তবাহের অন্তঃস্থ প্রাচীরে জমা হয়ে অ্যাথেরোসক্লোরোসিস নামে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে এই অবস্থায় রক্তবাহের অন্তঃস্থ প্রাচীর শক্ত এবং অমসৃণ হয়ে যায়। এর ফলে রক্তে চাপ বাড়ে (Hypertension)। এছাড়া অমসৃণ তলের সংস্পর্শে রক্তের অণুচক্রিকা এলে সেগুলি ভেঙে থ্রম্বোসিস (Intravascular clotting of blood) হতে দেখা যায়।

## ▲ E. মদ্যাসক্তের ফলে হৃদ্‌বাহের রোগ (Cardiovascular disease due to Alcoholism) :

❖ **মদ্যাসক্তের সংজ্ঞা (Definition of Alcoholism) : প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল (মদ) পান করে যদি কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহলের উপর নির্ভর বা অ্যালকোহলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং এই কুঅভ্যাস থেকে সহজে বেরোতে না পারে, সেই অবস্থাকে মদ্যাসক্ত বলে।**

● **হৃৎপিণ্ডের উপর মদের প্রভাব**—নিয়মিত অ্যালকোহল পান করলে দেহকোশে বিক্রিয়ার সময় উপজাত উত্তাপ তাড়াতাড়ি নির্গত হওয়ার জন্য রক্তবাহী নালিকাগুলিকে প্রসারিত করে। অনবরত এই প্রসারণের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অ্যালকোহল যকৃতে লিপিডের সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। অধিক লিপিড সংশ্লেষের ফলে রক্তে লিপিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই লিপিড থেকে কোলেস্টেরলের উৎপাদন ও রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য **অ্যাথরোসক্লোরোসিস** হতে দেখা যায়। এর ফলে রক্তের চাপ বাড়ে এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হতে পারে। তীব্র মদ্যাশক্তে **হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ** (Cardiac failure) হতে পারে।

## ▲ F. নিলব্যাধি বা সায়ানোসিস-এর (ব্লু বেবি) ফলে হৃদ্‌বাহতন্ত্রের রোগ (Cardiovascular disease due to Cyanosis / Blue baby) :

❖ **নিলব্যাধির সংজ্ঞা (Definition of Cynosis) : রক্তে অত্যধিক বিজারিত হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির ফলে দেহে যে অস্বাভাবিক (Clinical) অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার ফলে শিশুদের দেহের ত্বক বা শ্লেষ্মাঝিল্লি ও নখের নীচে (Nail beds) নীলাভ বর্ণ ধারণ করে তাকে সায়ানোসিস বা নিলশিশু (ব্লু বেবি–Blue baby) বলে।**

এই নীল বর্ণ দু-বছর কম বয়সের শিশুদের দেখা যায়। এতে দেহের বিভিন্ন স্থানে হয় যেমন—ঠোঁট, নাক, জিভ, হাত, পা, কান প্রভৃতি স্থানে হতে পারে।

○ **কারণ (Causes)**—নীলব্যাধির জন্য দায়ী মুখ্য কারণগুলি হল রক্তে অত্যধিক **বিজারিত হিমোগ্লোবিনের** উপস্থিতি। হৃৎপিণ্ডের **চারটি ত্রুটি একত্রে (Tetralogy of Fallot)** নীলব্যাধির জন্য দায়ী, এগুলি হল—

(i) **নিলয় মধ্যস্থ প্রাচীরের ত্রুটি**—দেখা গেছে কোনো কোনো শিশুদের নিলয় প্রাচীরে ছিদ্র থেকে যায় যার ফলে ডান নিলয়ের শিরারক্ত (বেশি $CO_2$ ও কম $O_2$ যুক্ত রক্ত) ফুসফুসে না গিয়ে সরাসরি ছিদ্রের মাধ্যমে বাম নিলয়ে চলে যায়। এই কারণে শিরারক্ত (বিজারিত রক্ত) জারিত হতে পারে না।

(ii) **মহাধমনি উৎপত্তির জন্মগত ত্রুটি**—এই ত্রুটিতে দেখা গেছে মহাধমনি যা সাধারণত বাম নিলয় থেকে উৎপন্ন না হয়ে দুটি নিলয় থেকেই (মাঝে অন্তনিলয় প্রাচীরের ঠিক উপর থেকে) উৎপন্ন হয়।

(iii) **সেমিলুনার কপাটিকার সংকীর্ণ ভবন** (Stenosis of semilunar valves)—ফুসফুসীয় ধমনির মূলদেশে অবস্থিত সেমিলুনার (অর্ধচন্দ্রাকৃতি) কপাটিকাগুলি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে আংশিক রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে যেতে পারে না।

(iv) **ডান নিলয়টি অধিক পেশিযুক্ত ও আকারে বড়ো হয়ে যাওয়া**—এর ফলে ফুসফুসে রক্ত ভালোভাবে যেতে পারে না ফলে নিলব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

○ **এছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হল**—ফুসফুসের রোগ, শ্বাসনালি ও ক্লোমশাখার প্রতিবন্ধকতা কার্বন মনোক্সাইড (CO)-এর বিষক্রিয়া, শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। অধিকাংশ শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগের বয়সে এই চারটি ত্রুটি (Tetrology fallot)-কে ওপেন হার্ট সার্জারি করিয়ে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। তবে সারা জীবন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়।

## ▲ G. হৃৎবাহতন্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি অতিরিক্ত রোগ (Some more diseases related to cardiovascular system) :

1. **আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি** (Arterial insufficiency)—ধমনিতে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ হ্রাসজনিত রোগ।
2. **আর্টেরিওসক্লেরোসিস** (Arteriosclerosis)—ধমনি প্রাচীরের স্থূলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হওয়া জনিত রোগ।
3. **অ্যাওরটিক রিগারজিটেশন** (Aortic regurgitation)—মহাধমনি থেকে রক্তের নিলয়ে ফিরে আসা জনিত রোগ।
4. **অ্যাওরটিক স্টেনোসিস** (Aortic stenosis)—জন্মগত কারণে মহাধমনি ছিদ্র ছোটো হওয়া বা কপাটিকার অসম্পূর্ণ উন্মুক্ত হওয়াজনিত রোগ।
5. **অ্যাওরটা পালমোনারী ফেনিসট্রেশন** (Aorta-Pulmonary fenistration)—জন্মগত কারণে মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির যুক্ত হয়ে অধিক অক্সিজেনযুক্ত ও কম অক্সিজেনযুক্ত রক্তের মিশ্রণ ঘটাজনিত রোগ।
6. **অ্যাট্রিয়াল ফেলিওর** (Atrial failure)—অলিন্দে রক্ত কম যাওয়ার ফলে নিলয়েরও কম ভর্তি হওয়াজনিত রোগ।
7. **অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন** (Atrial fibrilation)—অলিন্দের অনিয়ত দ্রুত সংকোচনের ফলে নিলয়ের অনিয়ত সংকোচন ঘটাজনিত রোগ।
8. **অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার** (Atrial flatter)—অলিন্দের নিয়ত দ্রুত সংকোচন হওয়া সত্ত্বেও নিলয়ের সংকোচন হার একই থাকাজনিত রোগ।
9. **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ব্লক** (Atrio-ventricular block)—এ ভি নোড থেকে উৎপন্ন উদ্দীপনার মন্থর পরিবহন জনিত রোগ।
10. **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (Angina pectoris)—হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হওয়ার জন্য বুকের ব্যথার বাঁ হাতে প্রবাহিত হওয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ।
11. **কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট** (Cardiac arrest)—হঠাৎ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হওয়াজনিত রোগ।
12. **কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া** (Cardiac arythmia)—অলিন্দ বা নিলয়ের অস্বাভাবিক সংকোচনহারজনিত রোগ।

13. **কার্ডিয়াক ডিকমপেনসেশন** (Cardiac decompensation)—হৃদ উৎপাদ কমে যাওয়ার ফলে দেহের সব জায়গায় সমানভাবে রক্ত না পৌঁছানোজনিত রোগ।
14. **কার্ডিয়াক (হার্ট) ফেলিওর** [Cardiac (Heart) failure]—দেহের চাহিদা অনুযায়ী হৃদ উৎপাদের পরিমাণ না হওয়া জনিত রোগ।
15. **কার্ডিয়াক ইনসাফিসিয়েন্সি** (Cardiac insuficiency)—হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ করবার অক্ষমতাজনিত রোগ।
16. **কার্ডিয়াক মারমার বা হার্ট মারমার** (Cardiac murmur)—হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক কাজ সৃষ্টিজনিত রোগ।
17. **কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর** (Congestive heart failure)—যে-কোনো কারণে দেহজ সংবহনে রক্তের স্বল্পতা হেতু ফুসফুসীয় সংবহনে রক্তের আধিক্যজনিত রোগ।
18. **করোনারি অক্লুশন** (Coronary occlusion)—করোনারি ধমনি বন্ধ হওয়াজনিত রোগ।
19. **করোনারি থ্রম্বোসিস** (Coronary thrombosis)—করোনারি ধমনিতে রক্ত তঞ্চিত হওয়াজনিত রোগ।
20. **ডেক্সট্রোকার্ডিয়া** (Dextrocardia)—জন্মগত বুকের ডানদিকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।
21. **হার্ট ব্লক** (Heart block)—হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়া অথবা উদ্দীপনা পরিবহনের ত্রুটিজনিত রোগ।
22. **আর্বোরাইজেশন ব্লক** (Arborization block)—পারকিনজি তন্তুর উদ্দীপনা সংবহন ত্রুটিজনিত রোগ।
23. **হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন** (Heart attack or myocardial infraction)—হৃদ্‌পেশি অকেজো হবার জন্য হৃদ্‌পেশির নির্দিষ্ট স্থানে রক্ত সংবহন না হওয়াজনিত রোগ।
24. **ইস্চেমিক হার্ট ডিজিজ** (Ischemic heart disease)—হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেন সরবরাহের বিঘ্নতা হেতু বুকে ব্যথা।
25. **মিট্রাল রিগারজিটেশন** (Mitral regurgition)—মিট্রাল কপাটিকাগুলির ত্রুটির ফলে বাম নিলয়ের সংকোচনকালে বাম অলিন্দে রক্তের পুনঃপ্রবেশজনিত রোগ হয়।
26. **মিট্রাল ভালব স্টেনোসিস** (Mitral valve stenosis)—মিট্রাল কপাটিকাগুলির সংযুক্তির ফলে বাধা সৃষ্টিজনিত রোগ।
27. **পেরিকার্ডিয়াটিস** (Pericardiatis)—হৃদ্‌ধরাঝিল্লির প্রদাহজনিত রোগ।
28. **রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ** (Rheumatic heart disease)—রিউম্যাটিক জ্বরের জন্য হৃদ্‌পেশি ও কপাটিকার কাজ নষ্ট হওয়াজনিত রোগ।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. মায়োজেনিক এবং নিউরোজেনিক হৃৎপিণ্ড বলতে কী বোঝো ?**

● (i) হৃৎপিণ্ডের উদ্দীপনা যখন হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেই উৎপন্ন তখন তাকে মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড (Myogenic heart) বলে।

(ii) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের উদ্দীপনা যখন স্নায়ুর মাধ্যমে পৌঁছায় ও তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে নিউরোজেনিক হৃৎপিণ্ড (Neurogenic heart) বলে।

**2. রক্তসংবহন কে আবিষ্কার করেছিলেন ?**

● 1616 খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক (শারীরবিদ) উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) মানুষের দেহে সর্বপ্রথম রক্তের সংবহন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

**3. হৃৎপেশির সংকোচনে কী পরিবর্তন ঘটবে—(ক) যখন হৃৎপিণ্ডের ভেগাস (প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক) স্নায়ু সরবরাহকে উত্তেজিত করা হয়। (খ) যখন হৃৎপিণ্ডের স্বতন্ত্র (সিম্‌প্যাথেটিক) স্নায়ু সরবরাহকে উত্তেজিত করা হয়।**

● (ক) ভেগাস স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে (i) হৃৎস্পন্দনে হার কমে যায়, (ii) হৃৎপিণ্ডের মধ্যে হৃৎস্পন্দন প্রবাহের

পরিবহনের গতি হ্রাস পায়, (iii) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বল কমে যায় এবং (iv) হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(খ) স্বতন্ত্র স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে (i) হৃৎস্পন্দনের হারের বৃদ্ধি হয়, (ii) হৃৎপিণ্ডের মধ্যে হৃৎস্পন্দন প্রবাহের পরিবহনের গতি বেড়ে যায়, (iii) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বল বেড়ে যায় এবং (iv) হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

**4. ভেগাস এস্কেপ বলতে কী বোঝো ?**

- ভেগাস হল দশম করোটিক স্নায়ু যা হৃৎপিণ্ডের বাধাদানকারী স্নায়ু হিসাবে পরিচিত। কারণ এই স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে হৃৎপিণ্ডের প্রায় সব রকমের ধর্ম কমে যায়। ভেগাস স্নায়ুকে বার বার একটানা উদ্দীপিত করলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্রমশ কমে গিয়ে শেষে ডায়াস্টল অবস্থায় হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। ভেগাসের এই উদ্দীপনা চলার সময় কখনো-কখনো স্নায়ুর বাধাদানকারী আবেগ (Impulse) থেকে হৃৎপিণ্ড মুক্ত (Escape) হয়ে আবার একবার কিংবা দুবার সংকোচন ঘটে। একে ভেগাস এস্কেপ (Vagus escape) বলে।

**5. মানুষের রক্তপ্রবাহ স্পন্দনশীল ও ধারাবাহিক হওয়ার কারণ কী ?**

- (i) স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক প্রেসারে রক্তনালি প্রসারিত হয় কিন্তু ধমনির গায়ে স্থিতিস্থাপক কলা থাকার জন্য এটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ধমনি-গাত্রের এই স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য ধমনিতে রক্তপ্রবাহ স্পন্দনশীল (Pulsatile) হয়। (ii) ধমনি, রক্তজালক, শিরা এবং মহাশিরার রক্তচাপের পার্থক্যের ফলে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রমান্বয়ে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত-সংবহনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

**6. (ক) একটি বড়ো আয়তনের প্রাণী এবং একটি ছোটো আয়তনের প্রাণীর হৃৎস্পন্দন হারের কি কোনো পার্থক্য দেখা যায়?**

**(খ) যদি কোনো পার্থক্য থাকে তাহলে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।**

- (ক) বড়ো আয়তনের প্রাণীর তুলনায় ছোটো আয়তনের প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের হার বেশি হয়। **উদাহরণ**—(i) হাতির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে 25 বার। (ii) একটি খরগোসের হৃৎস্পন্দন হার প্রতি মিনিটে 250 বার। (iii) খরগোস থেকে আরও ছোটো নেংটি ইঁদুরের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় 1000 বার।

  (খ) **ব্যাখ্যা**—ছোটো আকৃতিসম্পন্ন প্রাণীর হৃৎস্পন্দন হার বড়ো আকৃতিসম্পন্ন প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের হারের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণ হল—

  (i) **হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের উপরিতলের দূরত্ব**—এই দূরত্ব যত বাড়বে হৃৎপিণ্ডে শিরারক্তের ফিরে আসার সময় তত বেশি হবে। শিরারক্তের ফিরে আসা যত দেরি হবে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ এবং সংকোচনের হার অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন হারও তত কমে যাবে। ছোটো আকারের প্রাণীর হৃৎপিণ্ড এবং দেহতলের দূরত্ব কম হয়। এই কারণে এই সব প্রাণীতে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত দ্রুত হয়, ফলে হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যায়।

  (ii) **বিপাক ক্রিয়া**—ছোটো আয়তনের প্রাণীরা বড়ো আয়তনের প্রাণীর চেয়ে বেশি চঞ্চল ও সক্রিয় হয়, ফলে তাদের দেহকোশের বিপাক ক্রিয়া বেশি হয়। বেশি বিপাক ক্রিয়ার ফলে হৃৎস্পন্দন হার বাড়ে।

**7. (ক) মানুষের দেহে রক্তসংবহন সময় কাল বলতে কী বোঝায় ?**

**(খ) বাহু থেকে হৃৎপিণ্ডে সংবহন কাল কত ?**

- (ক) দেহের কোনো একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অংশ থেকে অন্য কোনো অঙ্গ বা অংশতে রক্ত প্রবাহিত হতে যে সময় লাগে তাকে সংবহন সময় (Circulation time) বলে।

  (খ) বাহু থেকে হৃৎপিণ্ডে সংবহন কাল—25 সেকেন্ড।

**8. আমাদের শরীরে রক্তসংবহন নিয়ন্ত্রণের কারণসমূহ লেখো।**

- **কারণসমূহ** — (i) হৃৎপিণ্ডের পাম্প করার ক্ষমতা, (ii) ধমনির স্থিতিস্থাপকতা, (iii) পেশি সঞ্চালন, (iv) রক্তবাহের বিভিন্ন অংশের রক্তের চাপ পার্থক্য এবং (v) শ্বাসক্রিয়া।

**9. (ক) হার্ট ব্লক বলতে কী বোঝায় ?**
**(খ) বিভিন্ন প্রকার হার্ট ব্লকের নাম ও কারণ উল্লেখ করো।**

● (ক) সাইনাস ও অ্যাট্রিয়াল নোডের স্পন্দন প্রবাহের উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে কিংবা অলিন্দ থেকে নিলয়ের মধ্যে হৃৎস্পন্দন প্রবাহের পরিবহন ব্যাহত হলে হৃৎপিণ্ডের যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **হৃৎপিণ্ডের অবরোধ বা হার্ট ব্লক** (Heart block) বলে।

(খ) বিভিন্ন ধরনের হার্ট ব্লক—হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত বিশেষ ধরনের কলা, যেমন—S.A. নোড বা A.V. নোড বা হিজের তন্তুগুচ্ছ কিংবা পারকেনজি তন্তুর ত্রুটিপূর্ণ গঠন ও কার্যাবলি অনুযায়ী হার্ট ব্লক চার ধরনের হয়, যথা—(i) সাইনো এট্রিয়াল হার্ট ব্লক, (ii) এট্রিওভেন্ট্রিকুলার হার্ট ব্লক, (iii) দক্ষিণ এবং বাম বান্ডিল ব্লক এবং (iv) আর্বোরাইজেশন ব্লক।

**10. ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ কী ?**

● যে যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম লেখচিত্র লিপিবন্ধ করা হয় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ (Electrocardiograph) বলে।

**11. ECG কী ?**

● ECG-এর পুরা নাম হল **ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম**। হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তা হৃৎপিণ্ডের সব অংশে এবং হৃৎপিণ্ডের চারপাশের কলাকোশে এমনকি সারা দেহে বিস্তার লাভ করে। হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দেহাংশে উপযুক্ত তড়িদ্দ্বার (Electrodes) সংযোগের ফলে সুগ্রাহী গ্যালভানোমিটারের মাধ্যমে তড়িৎ-বিভব ধরা পড়ে। এই তড়িৎ-বিভবকে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লিপিবন্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram), সংক্ষেপে ECG বলে। একটি ECG লেখচিত্র P, Q, R, S এবং T নামে কতকগুলি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত। P তরঙ্গটি অলিন্দের সক্রিয়তার ফলে এবং Q, R, S T নিলয়ের সক্রিয়তার ফলে উৎপন্ন হয়।
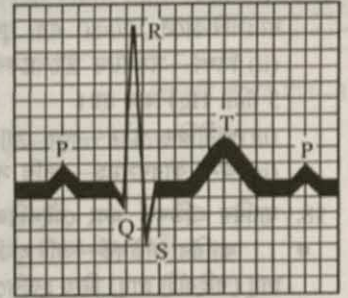
**চিত্র 3.27. :** মানুষের ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের চিত্ররূপ।

**12. হৃদ্ অবরোধ কাকে বলে ? বিভিন্ন ধরনের হৃদ্ অবরোধের নাম করো।**

● (i) S.A. নোডের স্পন্দন আবেগ উৎপাদ ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা উৎপন্ন স্পন্দন আবেগের পরিবহন সঠিক না হয় তাহলে এই ত্রুটিকে হৃদ অবরোধ (Heart block) বলা হয়। এই অবরোধ সৃষ্টির উৎসস্থল বিভিন্ন প্রকার সংযোজী কলা, যেমন—S.V. নোড, A.V. নোড, হিজের তন্তুগুচ্ছ অথবা পারকিনজি তন্তু।

(ii) **অবরোধের প্রকারভেদ**—চার প্রকার, যেমন—(ক) সাইনো এট্রিয়াল হৃদ্ অবরোধ, (খ) এট্রিওভেন্ট্রিকুলার হৃদ্ অবরোধ, (গ) ডান বা বাম বান্ডিল শাখা অবরোধ এবং (ঘ) আর্বোরাইজেশন অবরোধ।

**13. হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপেশি অসাড় বা অবসাদ (ক্লান্তি) হয় না কেন ?**

● তিনটি কারণের জন্য হৃৎপেশি বা হৃৎপিণ্ড অবসাদ হয় না—

(i) হৃৎপেশির নিঃসাড় কাল দীর্ঘস্থায়ী, ফলে এই সময়ের মধ্যে বারে বারে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলেও হৃৎপেশিকে বারে বারে উদ্দীপিত করা যায় না, এই কারণে হৃৎপেশির অবসাদ ঘটে না।

(ii) ল্যাকটিক অ্যাসিড—এটি কঙ্কাল পেশির অসাড় হওয়া অন্যতম কারণ। হৃৎপেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় না।

(iii) হৃৎপেশিতে বেশি মাত্রায় মায়োগ্লোবিন নামে প্রোটিন থাকে যা হৃৎপেশিকে $O_2$ সরবরাহ করে।

**14. সম্পূর্ণ ডায়াস্টোলিক কাল বলতে কী বোঝো ?**

● **সম্পূর্ণ ডায়াস্টোলিক কাল**—হৃৎচক্রের যে সময় দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয় একই সঙ্গে ডায়াস্টোলিক অর্থাৎ প্রসারণ অবস্থায় থাকে তাকে সম্পূর্ণ ডায়াস্টোলিক কাল (Total diastolic period) বলে। এই সময়টি নিলয়ের প্রসারণ দশা থেকে শুরু হয়ে অলিন্দের সংকোচন দশা শুরু পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

**15. অ্যাপেক্স বিট বা হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাত কাকে বলে ?**

- হৃৎপিণ্ডে নিলয়ের কোণাকৃতি মূল অংশটিকে হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ বা অ্যাপেক্স (Apex) বলে। হৃৎপিণ্ডের নিলয় দুটি যখন সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হয় তখন অ্যাওর্টা (মহাধমনি) রক্তপূর্ণ হয়ে ফুলে যায়। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডটি সামনের দিকে ঘুরে গিয়ে বুকের সামান্য বাম পাশে (অর্থাৎ মধ্য অক্ষরেখার 1·3 cm দূরত্বে ও পঞ্চম আন্তঃপঞ্জরাস্থি অঞ্চলে) হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগটি জোরে ধাক্কা দেয়। একে হৃৎপিণ্ডের **অগ্রঘাত** বা **অ্যাপেক্স বিট** (Apex beat) বলে। প্রথম হৃদ্ধ্বনির সময় হৃৎপিণ্ডের অগ্রঘাতটি অনুভূত হয়।

**16. একজন ব্যক্তির যদি সংকোচী চাপ 125 mm Hg এবং স্পন্দন চাপ 45 mm Hg হয় তাহলে ওই ব্যক্তির প্রসারী চাপ কত হবে তা নির্ণয় করো।**

- সংকোচী চাপ (SP) – প্রসারী চাপ (DP) = স্পন্দন চাপ (PP)
  প্রসারী চাপ = সংকোচী চাপ – স্পন্দন চাপ = 125 – 45 = 80 mm Hg

**17. শারীরবৃত্তীয় কারণে রক্তচাপের যে পরিবর্তন ঘটে তা উল্লেখ করো।**

- **রক্তচাপের পরিবর্তনকারী কারণসমূহ ঃ**
  (i) **বয়স**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ বাড়ে। শিশু অবস্থায় রক্তচাপ 90/60, চার বছর বয়সে 100/65, বয়ঃসন্ধিকালে 120/80 এবং বৃদ্ধ বয়সে 140-150/90 mm Hg হয়।
  (ii) **লিঙ্গ**—সমবয়স্ক স্ত্রীলোকের রক্তচাপ একই বয়সের পুরুষের তুলনায় কিছুটা (উভয় রক্তচাপ—SP/DP, প্রায় 5 mm Hg) কম হয়।
  (iii) **শারীরিক গঠন**—স্থূল লোকের রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত সামান্য বেশি হয়।
  (iv) **অন্য কারণসমূহ**—পেশি সঞ্চালন, উত্তেজনা, আবেগ প্রভৃতি কারণগুলি রক্তচাপ বাড়ায়।

**18. ম্যারির প্রতিবর্ত এবং বেইনব্রিজ প্রতিবর্ত (Marey's reflex and Bainbridge reflex, বলতে কী বোঝো ?**

- 1. **ম্যারির প্রতিবর্ত**—এটি হৃৎপিণ্ড বাধাদানকারী প্রতিবর্ত যা সাইনো-অ্যাওর্টিক স্নায়ু (অন্তর্বাহী স্নায়ু) এবং ভেগাস স্নায়ু (বহির্বাহী স্নায়ু) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং রক্তের চাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে গেলে এই প্রতিবর্ত চাপের মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের হার কমে যায় ফলে রক্তের চাপও কমে যায়।
  2. **বেইনব্রিজ প্রতিবর্ত**—এটি হৃৎপিণ্ড উদ্দীপনকারী প্রতিবর্ত যা ভেনাস প্রতিবর্ত নামে পরিচিত। কোনো কারণে হৃৎস্পন্দনের হার কমে গেলে স্বাভাবিক শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের জন্য ডান অলিন্দ ও মহাশিরা দুটি রক্তপূর্ণ হয়ে ফুলে যায় এর ফলে ডান অলিন্দ থেকে উৎপন্ন অন্তর্বাহী (ভেগাস স্নায়ু) হৃৎপিণ্ড বাধাদানকারী কেন্দ্রকে বাধা দিয়ে হৃৎস্পন্দন হারকে বাড়ায়।

**19. চাপস্পন্দন (Pressure pulse) কী ?**

- **চাপস্পন্দন**—বাম নিলয়ের সংকোচনে রক্ত উৎক্ষেপণের ফলে মহাধমনির মূল অংশটি ফুলে যায় আবার নিলয়ের প্রসারণের সময় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ও স্বাভাবিক লম্বা অবস্থায় পরিণত হয়। এভাবে ফুলে যাওয়া ও লম্বাটে হওয়ার ফলে মহাধমনিতে যে চাপজনিত তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে **তরঙ্গায়িত নাড়ি** বা **চাপস্পন্দন** বলে। এইপ্রকার সৃষ্ট তরঙ্গের গতিবেগ রক্তপ্রবাহের গতিবেগ থেকে প্রায় 6 গুণ অধিক হয় এবং প্রতিটি অংশে ধমনির প্রাচীর দিয়ে পরিবাহিত হয়।

**20. পাল্স বা নাড়ি পাল্স কী ?**

- **নাড়ি—বাম নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণের সঙ্গে সমতা রেখে প্রবাহিত রক্তের চাপে ধমনির প্রসারণ ও সংকোচনকে নাড়ি বলে।** এই ছান্দিক প্রসারণ আঙুলের ডগা ধমনিতে রেখে অনুভব করা হয়। প্রসারণের সময় ধমনি আঙুলের অগ্রাংশ স্পর্শ করে। সাধারণত কবজিতে বুড়ো আঙুলের দিকের

**চিত্র 3.28.** ঃ নিলয়ের সংকোচন ও প্রসারণের সময় মহাধমনির অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাপস্পন্দনের উৎপত্তি

র‍্যাডিয়াল ধমনি (Radial artery) অথবা গলার দুপাশের ক্যারোটিড ধমনি (Carotid artery)তে নাড়ি স্পন্দন বা পাল্‌স অনুভব করা হয়। এদের যথাক্রমে র‍্যাডিয়াল পাল্‌স (Radial pulse) এবং ক্যারোটিড পাল্‌স (Carotid pulse) বলে। পাল্‌স ডাজিয়নস স্ফীগমোগ্রাফ (Dudgeons Sphygmograph) দিয়েও মাপা হয়।

21. **শিরা নাড়ি কী ?**

- শিরাতে রক্তপ্রবাহের সময় যে স্পন্দন তৈরি হয় তাকে শিরা নাড়ি বলে। ফ্লেবোগ্রাম (Phlebogram)-এর সাহায্যে এটি মাপা হয়।

22. **নাড়ি ঘাত কী ?**

- হৃদ্‌পিণ্ডের বাম নিলয়ের সংকোচন বা ঘাতের সঙ্গে তাল রেখে নাড়ির প্রসারণ এবং আঙুলের শীর্ষ স্পর্শ করাকে নাড়ি ঘাত বলে। নাড়ি ঘাত মিনিটে 60-80 বার হয়। গড়ে 72 বার।

23. **নাড়ি ঘাটতি কী ?**

- নাড়ি ঘাটতি—নাড়ি ঘাতের সংখ্যা এবং হৃদ্‌ঘাতের সংখ্যার পার্থক্যকে নাড়ি ঘাটতি বলে। হৃদ্‌ঘাত মিনিটে 72 বার হলে নাড়ি ঘাত যদি 66 বার অনুভব করা হয় তবে নাড়ি ঘাটতি 6 হবে। নাড়ি ঘাটতির কারণ সংকোচন চাপের অসম্পূর্ণতা।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. হৃৎপিণ্ড যে পেশি দিয়ে গঠিত তাকে কী বলা হয় ?
2. একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ডের ওজন কত ?
3. হৃৎপিণ্ডের বহিঃতলে একটি আড়াআড়ি খাঁজ থাকে যা অলিন্দ এবং নিলয়কে দুটি অংশে বিভক্ত করে তার নাম কী ?
4. দুটি অলিন্দের মধ্যে যে তন্তুময় প্রাচীরটি থাকে তার নাম কী ?
5. এপিকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়াম হৃৎপিণ্ডের কোন্ অংশে থাকে ?
6. মায়োকার্ডিয়াম স্তরটি অলিন্দ তুলনায় নিলয়ে মোটা হয় কেন ?
7. যে কপাটিকাগুলি ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে থাকে তাকে কী বলে ?
8. মহাধমনির উৎপন্ন অংশে যে কপাটিকা থাকে তা কী ধরনের কপাটিকা ?
9. হৃৎপিণ্ডের যে বিশেষ সংযোজী কলা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দময়তাকে বজায় রাখে তার নাম কী ?
10. যে বিশেষ সংযোজী কলার উদ্দীপনার ফলে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দময়তার পরিবর্তে মিনিটে 50 বার ঘটে তার নাম কী ?
11. হৃৎপেশি বা হৃৎপিণ্ডের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম কোন্‌টি ?
12. কুনো ব্যাঙের কোন্ অংশকে বেঁধে দিলে তাকে প্রথম স্টেনিয়াসের বন্ধনী বলা হবে ?
13. S.A. নোড থেকে প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করে ?
14. স্পন্দন থেকে স্পন্দনে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেসব পরিবর্তনগুলি চক্রাকারে ঘটে তাকে কী বলে ?
15. হৃৎচক্রে শুরুতে অলিন্দের সংকোচন সর্বপ্রথম ঘটে কেন ?
16. হৃৎপিণ্ডের নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ বন্ধ প্রকোষ্ঠ হিসাবে সংকুচিত হয়, এর ফলে পেশির দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে তাকে কী বলে ?
17. যে ঘটনায় হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে রক্ত ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনি সজোরে বেরিয়ে যায় তাকে কী বলে ?
18. সম্পূর্ণ ডায়াস্টলিক কাল কাকে বলে ?
19. হৃৎচক্রে নিলয়ের প্রসারণ শুরু ও সেমিলুনার কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়া অন্তর্বর্তী সময়কে কী বলে ?
20. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি কখন হয় ?
21. দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির তাৎপর্য কী ?
22. হৃৎপিণ্ডের প্রতি সংকোচনে প্রতিটি নিলয় থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সংবহন তন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হয় তার মান কত ?
23. হৃৎসংকেত বা হৃৎসূচক কাকে বলে ?
24. যে সূত্র (বা নীতি) দিয়ে হার্দ উৎপাদন নির্ণয় করা হয় তার নাম কী ?

25. একজন স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক লোকের সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক এবং পাল্স প্রেসারের স্বাভাবিক অনুপাত কত ?
26. স্ফীগমোম্যানোমিটার এবং স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে কী বলে ?
27. রক্তবাহের এন্ডোথেলিয়ামে প্রাচীরে জমা হওয়ার ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে ?
28. সিগারেটের ধোঁয়াতে যে বিভিন্ন প্রকার উপাদান থাকে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নাম কী ?
29. প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে বেশি মাত্রায় মদ পান করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেই অবস্থাকে কী বলে ?
30. বিজারিত হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতিতে দেহের ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লি নীলাভ বর্ণ ধারণ করলে তাকে কী বলে ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

1. কোন্ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম মানুষের দেহে রক্তসংবহন আবিষ্কার করেন ?—জে. সি. বোস □ / উইলিয়াম হার্ভে □ / স্টারলিং □ / এ. ভেসেলিয়াস □।
2. **হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর কী দিয়ে তৈরি ?**—মায়োকার্ডিয়াম □ / এপিকার্ডিয়াম □ / এন্ডোকার্ডিয়াম □ / এর কোনোটিই নয় □।
3. **স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড হল**—নিউরোজেনিক □ / মায়োজেনিক □ / ডাইজেনিক □ / আডাইজেনিক □।
4. **হৃৎপিণ্ডের ছন্দনিয়ামকের কাজ হল**—হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন করে □ / হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের নিয়ন্ত্রণ □ / হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার পরিচালনা □ / হৃৎধ্বনির উৎপাদন □।
5. **হৃৎপিণ্ডের ছন্দনিয়ামক (পেসমেকার)-এর নাম**—A.V. নোড □ / বান্ডিল অব হিজ □ / S.A. নোড □ / পারকিনজি তন্তু □।
6. **বান্ডিল অব্ হিজ হৃৎপিণ্ডের যে অংশ পাওয়া যায় তার নাম হল**—মহাধমনির মূলদেশ □ / ডান অলিন্দ □ / নিলয় □ / বাম অলিন্দ □।
7. **হৃৎপিণ্ডের যে কক্ষের প্রাচীরটি সব থেকে বেশি স্থূল তার নাম**—ডান অলিন্দ □ / বাম নিলয় □ / ডান নিলয় □ / বাম অলিন্দ □।
8. **ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মধ্যে অবস্থিত কপাটিকার নাম হল**—মিট্রাল ভাল্‌ব □ / ট্রাইকাস্‌পিড ভাল্‌ব □ / থেবেসিয়ান ভাল্‌ব □ / সেমিলুনার ভাল্‌ব □।
9. **ট্রাইকাসপিড হৃৎপিণ্ডের কোন্ অংশে থাকে ?**—সাইনাস ভেনোসাস এবং বাম অলিন্দ □ / বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় □ / ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় □ / নিলয় এবং মহাধমনি □।
10. **মিট্রাল / বাইকাসপিড ভালব যে দুটির মধ্যবর্তীস্থানে থাকে তার নাম হল**—বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় □ / বাম অলিন্দ এবং ডান নিলয় □ / ডান অলিন্দ এবং বাম নিলয় □ / ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয় □।
11. **হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের সংকোচনের ফলে কী ঘটে ?**—ফুসফুসে রক্তের প্রবেশ □ / হৃৎপিণ্ডে রক্তের প্রবেশ □ / হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত মহাধমনিতে যায় □ / বাম অলিন্দ থেকে রক্ত বাম নিলয়ে যায় □।
12. **ডান নিলয় সংকোচনের ফলে রক্ত দেহের কোন্ অঙ্গে প্রবেশ করে ?**—পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনিতে □ / ফুসফুসীয় ধমনিতে □ / ফুসফুসীয় শিরাতে □ / করোনারি ধমনিতে □।
13. **হৃৎস্পন্দনের উৎপত্তি স্থান কোথায় ?**—বাম অলিন্দ □ / ডান নিলয় □ / S. A. নোড □ / A. V. নোড □।
14. **প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের হার কত বার ঘটে ?**—60-70 বার □ / 70-80 বার □ / 80-90 বার □ / 85-90 বার □।
15. **হার্দ উৎপাদের স্বাভাবিক মান**—অলিন্দের পরিমাণ × নিলয়ের পরিমাণ □ / ঘাত পরিমাণ × হৃৎস্পন্দনের হার □ / প্রতি ঘাতে যে পরিমাণ রক্ত সংবহন তন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হয় □ / ঘাত পরিমাণ + হৃৎস্পন্দনের হার □।
16. **হার্দ উৎপাদ হল**—প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডে রক্তের প্রবেশ □ / প্রতি সেকেন্ডে নিলয় থেকে রক্তের নির্গমন □ / প্রতি মিনিটে প্রতি নিলয় থেকে রক্ত নির্গমন □ / প্রতি ঘণ্টায় বাম নিলয় থেকে রক্তের নির্গমন □।
17. **হার্দ উৎপাদনের ঘাত পরিমাণ হল**—7 ml □ / 70 ml □ / 700 ml □ / 5000 ml □।
18. **প্রতি মিনিটে স্বাভাবিক অবস্থায় হার্দ উৎপাদের পরিমাণ কত ?**—2 লিটার □ / 5 লিটার □ / 10 লিটার □ / 20 লিটার □।
19. **সাধারণভাবে অ্যাসকালটেটরী পদ্ধতিতে যে যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ নির্ণয় করা যায় তার নাম হল**—ECG □ / স্টেথোস্কোপ □ / স্ফিগমোমেনোমিটার □ / স্টেথোস্কোপ এবং স্ফিগমোমেনোমিটার □।
20. **স্পন্দন হার পরিমাপ করা হয়**—রক্তজালক থেকে □ / শিরা থেকে □ / ধমনি থেকে □ / নার্ভ থেকে □।
21. **পালস্ প্রেসার (স্পন্দন চাপ)কে বলা হয়**—সংকোচী চাপ □ / প্রসারণ চাপ □ / সংকোচী চাপ এবং প্রসারণ চাপের পার্থক্য □ / মহাধমনির চাপ □।
22. **একজন স্বাভাবিক লোকের স্বাভাবিক সিস্টোলিক (সংকোচী) চাপ**—100 mm of Hg □ / 120 mm of Hg □ / 140 mm of Hg □ / 80 mm of Hg □।
23. **একজন স্বাভাবিক লোকের স্বাভাবিক সিস্টোলিক / ডায়াস্টোলিক রক্ত চাপ কত ?**—80/120 mm Hg □ / 120/80 mm Hg □ /40/50 mm Hg □ / 50/80 mm Hg □

24. **হৃৎচক্রের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাবলি হল**—অলিন্দের সংকোচন → নিলয়ের সংকোচন → সম্মিলিত প্রসারণ □ / অলিন্দের প্রসারণ → অলিন্দের সংকোচন → নিলয়ের প্রসারণ □ / অলিন্দের সংকোচন→ অলিন্দের প্রসারণ এবং নিলয়ের সংকোচন→নিলয়ের প্রসারণ □ / এর মধ্যে কোনোটিই নয় □।
25. **স্বাভাবিক হৃৎচক্রের সময়কাল**—8·0 sec □ / 0·8 sec □ / 1·8 sec □ / 8·1 sec □
26. **সমদৈর্ঘ্য সংকোচনকাল কখন ঘটে?**—রক্তপূর্ণ অলিন্দের সংকোচনের সময় □ / রক্তশূন্য বন্ধ নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে □ / রক্তপূর্ণ বন্ধ নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে □ / দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়ের সম্মিলিত সংকোচনের সময় □।
27. **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি থাকে**—বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের ছিদ্রপথে □ / ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের ছিদ্রপথে □ / মহাধমনির উৎপত্তিস্থলে □ / ফুসফুসীয় শিরা ও বাম অলিন্দের সংযোগস্থলে □।
28. **L-U-B-B হৃদ্‌ধ্বনি হয়**—ফুসফুসীয় ধমনিস্থিত সেমিলুনার ভাল্‌বগুলি বন্ধের ফলে □ / অ্যাওর্টিক সেমিলুনার ভাল্‌বগুলি বন্ধের ফলে □ / দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়ের মধ্যে অবস্থিত কপাটিকাগুলি বন্ধের ফলে □ / থেবেসিয়ান কপাটিকাগুলি বন্ধের ফলে □।
29. **প্রদত্ত তালিকা থেকে সঠিক উত্তর দাও**—LUBB শব্দ—নিলয়ের সংকোচন শুরুতে AV কপাটিকাগুলি হঠাৎ বন্ধ হওয়ার ফলে ঘটে □ / DUP শব্দ—নিলয়ের সংকোচনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি হঠাৎ খুলে যাওয়ার ফলে ঘটে □ / তৃতীয় হৃৎধ্বনি নিলয় থেকে রক্ত মহাধমনিতে প্রবেশের ফলে উৎপন্ন হয় □ / চতুর্থ হৃৎধ্বনি নিলয়ের সংকোচনের প্রারম্ভকালে রক্ত অলিন্দ থেকে মহাধমনি এবং ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশের ফলে □।
30. **ট্যাকিকর্ডিয়া হল**—হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি □ / হৃৎস্পন্দনের হারের হ্রাস □ / হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা □ / স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blanks) :

1. হৃৎপিণ্ডের ——— নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি উৎপন্ন হয়েছে।
2. বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের ছিদ্রপথে ——— কপাটিকা থাকে।
3. প্রাণীদের সংবহন ——— এবং ——— মাধ্যমে ঘটে।
4. মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে অবস্থিত S.A. নোডকে ——— বলে।
5. স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার গড়ে ——— বার।
6. ফুসফুসীয় শিরা ——— রক্ত বহন করে।
7. ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত ——— কপাটিকাগুলি রক্তপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।
8. ——— নোডকে সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক বা রিজার্ভ পেসমেকার বলে।
9. ——— ধমনি কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত (শিরা রক্ত) বহন করে।
10. শিরার প্রাচীর ধমনির প্রাচীরের মতো তিনটি তুলনামূলকভাবে একই প্রকার পাতলা স্তর নিয়ে গঠিত হলেও ——— কলাস্তরটি থাকে না।
11. হৃৎপেশি থেকে উৎপন্ন যে শিরা ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয় তাকে ——— বলে।
12. স্বাভাবিক হৃৎচক্রে একটি হৃৎস্পন্দনের বিভিন্ন ঘটনাবলি হতে সময় লাগে ——— সেকেন্ড।
13. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কালে কপাটিকাগুলি ——— অবস্থায় দুটি নিলয়ের সংকোচন ঘটে।
14. নিলয়ের সংকোচনে বর্ধিত নিলয়মধ্যস্থ চাপ ——— কপাটিকাগুলিকে উন্মুক্ত করে রক্তকে সজোরে ধমনিতে নিক্ষিপ্ত করে।
15. নিলয়ের প্রসারণ শুরু এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়কে ——— কাল বলে।
16. রক্তে অত্যধিক বিজারিত হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি ঘটলে দেহে যে ব্যাধি দেখা যায় তাকে ——— বলে।
17. দুটি নিলয়ের সংকোচনের ফলে অলিন্দ নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে ——— হৃদ্‌ধ্বনি শোনা যায়।
18. প্রবাহমান রক্ত রক্তবাহের উপর যে ——— চাপ সৃষ্টি করে তাকে ——— বলে।
19. রক্তচাপ মাপার জন্য দুটি যন্ত্রের প্রয়োজন, একটির নাম স্টেথোস্কোপ অন্যটির নাম হল ———।
20. রক্তবাহ অন্তঃস্থ প্রাচীরে ——— জমা হলে রক্তবাহের লুমেন ক্রমশ সরু হয়ে যায় ——— নামে পরিচিত।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের হার হল গড়ে—। (72 / 18 / 86 )
2. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলে—। (সিসস্টোল / ডায়াস্টোল)
3. ফুসফুসীয় শিরা বহন করে—। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত / অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত)
4. বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে যে কপাটিকা থাকে তাকে—বলে। (বাইকাসপিড কপাটিকা / ট্রাইকাসপিড কপাটিকা)
5. অলিন্দ সংকোচনের কালের সময়—। (0·1 / 0·7 / 0·5 / 0·3 সেকেন্ড)
6. অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হবার ফলে— হয়। (প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি / দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি / তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি)
7. স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের পেস-মেকারের নাম—। (S. A. নোড / A. V. নোড / হিজের তন্তুগুচ্ছ)

8. সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক প্রেসারের অন্তরফলক — বলে। (প্রেসার পালস / মিন প্রেসার / পালস প্রেসার)
9. মানুষের রক্তচাপ যে যন্ত্র সাহায্যে মাপা হয় তার নাম—। (হিমোমিটার / স্ফিগ্‌মোগ্রাফ / স্ফিগমোম্যানোমিটার / হিমোসাইটোমিটার)
10. রক্তসংবহনতন্ত্রের প্রান্তীয় বাধা বৃদ্ধি পেলে রক্তচাপ—। (কমে যায় / বেড়ে যায় / অপরিবর্তিত থাকে)
11. অলিন্দের সংকোচন কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিলয়ের — ঘটে। (সংকোচন / প্রসারণ)
12. হৃৎপিণ্ডের উপরের দ্বিস্তরীয় থলি বা হৃৎপিণ্ডটিকে আবৃত করে রাখে তাকে ——— বলে। (পেরিকার্ডিয়াম / এপিকার্ডিয়াম / এন্ডোকার্ডিয়াম / মায়োকার্ডিয়াম)
13. মানুষের হৃৎপিণ্ডে পেসমেকারের নাম ———। (S.A. নোড / A.V. নোড / সাইনাস ভেনোসাস / ব্যাকমেনের তন্তুগুচ্ছ)
14. যে রক্তবাহের মধ্য দিয়ে শিরারক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায় তাকে ——— বলে। (ফুসফুসীয় শিরা / ফুসফুসীয় ধমনি / করোনারি রক্তবাহ / মহাধমনি)
15. মানবদেহে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি ——— কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে শোনা যায়। (মিট্রাল / সেমিলুনার / থেবেসিয়ান)

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. অলিন্দের অন্তঃস্থপ্রাচীর নিলয়ের প্রাচীর থেকে অধিক মোটা হয়। ☐
2. হৃৎপেশির বিশেষ ধর্ম হল ছন্দময়তা। ☐
3. হৃৎপেশির গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল এটি শাখাপ্রশাখাযুক্ত দুমুখ সূচালো মসৃণ পেশি। ☐
4. পেরিকার্ডিয়াম দিয়ে হৃৎপিণ্ডের মূল অংশটি গঠিত। ☐
5. হৃৎপিণ্ডের নিঃসাড়কাল স্বল্প সময়ের জন্য হয় বলে হৃৎপেশি কখনো অসাড় হয় না। ☐
6. স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের হার বিভিন্ন প্রকার স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ☐
7. সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডকে ছন্দনিয়ামক এবং অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোডকে সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক বলে। ☐
8. শিরাতে কপাটিকা থাকে যা রক্তকে একদিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। ☐
9. হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ গহ্বর যে আবরণী কলাস্তর দিয়ে আচ্ছাদিত তাকে মায়োকার্ডিয়াম বলে। ☐
10. হৃৎপিণ্ডের নিলয় গহ্বরে উদ্‌গত যে কৌণিক পেশিস্তরের সঙ্গে লেগে থাকে তাকে কর্ডিটেনডিনি বলে। ☐
11. করোনারি ধমনির ব্যাস ছোটো হওয়ায় হৃৎপেশিতে রক্ত কম যায় ফলে হৃৎপেশি যে বেদনা অনুভূত হয় তাকে অ্যানজিনা পেকটোরিস বলে। ☐
12. বাম অলিন্দ ও নিলয়ে ছিদ্রপথে যে কপাটিকাগুলি থাকে তাকে মিট্রাল কপাটিকা বলে। ☐
13. হৃৎচক্রে বিভিন্ন পর্যায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে পরপর ঘটে—অলিন্দের সংকোচন → অলিন্দের প্রসারণ → নিলয়ের সংকোচন → নিলয়ের প্রসারণ। ☐
14. ফুসফুসীয় ধমনি অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। ☐
15. নিলয়ের সংকোচন কালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে দ্বিতীয় হৃৎধ্বনি শোনা যায়। ☐
16. হৃৎপিণ্ডের সংকোচী চাপ (সিস্টোলিক চাপ) এবং প্রসারী চাপ (ডায়াস্টোলিক চাপ)-এর অন্তরফলকে গড় চাপ বলে। ☐
17. অ্যানজাইনা পেকটোরিস একপ্রকার প্রোটিন যা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হারকে বৃদ্ধি করে। ☐
18. প্রসারী চাপ প্রান্তীয় বাধার প্রকৃতি নির্ণয় করে, এছাড়া এই চাপের মাধ্যমে রক্ত পাম্প করতে হৃৎপিণ্ডকে কতটা ক্ষয় করতে হয় তার সম্বন্ধে জানা যায়। ☐
19. রক্তের চাপ মাপার জন্য স্টেথোস্কোপের বক্ষবীক্ষণ অংশ বা চেস্ট পিসটি রেডিয়াল ধমনির উপর রাখা হয়। ☐
20. নিলয়ের সংকোচনের শুরুতে যে ধ্বনি শোনা যায় তার প্রকৃতি L-U-B-B। ☐
21. তৃতীয় হৃৎধ্বনি প্রধানত অলিন্দ নিলয় কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে ঘটে। ☐
22. যে প্রক্রিয়ায় রক্ত দুটি অলিন্দ থেকে দুটি নিলয়ের মধ্যে অতি দ্রুত যায় তাকে নিক্ষেপণ কাল বলে। ☐
23. প্রতি মিনিটে দেহের বহির্ভাগের প্রতি বর্গমিটার দেহতলের জন্য প্রায় 5 লিটার রক্ত নিলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। ☐
24. প্রতি মিনিটে হার্দ উৎপাদের পরিমাণ যা হবে ফুসফুসীয় রক্তের প্রবাহের পরিমাণও তাই (সমান) হবে। ☐
25. সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোনো সময় (স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক স্থিতাবস্থায়) কোনো লোকের যে রক্তচাপ পাওয়া যায় তাকে বেসাল রক্তচাপ বলে। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. সংবহনতন্ত্র কী ? 2. পীড়কা পেশি কী ? 3. পেরিকার্ডিয়ামের অবস্থান ও কাজ লেখো। 4. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা কী ও কোথায় থাকে ?

5. থেবেসিয়ান কপাটিকা কী ? 6. হৃৎপেশিতে অবস্থিত দুটি সংকোচী উপাদানের নাম করো। 7. হৃৎপেশির ছন্দময়তা বলতে কী বোঝো ? 8. পূর্ণ ব্যর্থ সূত্র কী ? 9. S. A. নোডকে পেসমেকার বলে কেন ? 10. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি কেন হয় ? 11. শৈথিল্য সূচনা কাল কাকে বলে ? 12. সংকোচী চাপ কী ? 13. স্পন্দন চাপ কাকে বলে ? 14. বয়স্কলোকের রক্তচাপ বাড়ার একটি মুখ্য কারণ উল্লেখ করো। 13. হার্দ উৎপাদন বলতে কী বোঝো ? 14. হৃৎপিণ্ডের গতিসম্পন্ন বলতে কী বোঝো ? স্বাভাবিক বিশ্রামরত অবস্থায় এই হার কত ? 15. S. A. নোডকে হৃৎপিণ্ডের ছন্দনিয়ামক বলে কেন ? 16. মানুষের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত চারটি কপাটিকার নাম করো। 17. হৃৎপিণ্ডের ঘাত ও মিনিট পরিমাণ কাকে বলে ? 18. চিকিৎসা ক্ষেত্রে রক্তচাপ পরিমাপ করার যন্ত্রটির নাম করো এবং তা কোন্ রক্তবাহ থেকে নির্ণয় করা হয় ? 19. হৃৎসূচক কী ? এর স্বাভাবিক মান কত ? 20. হৃৎপেশি চারটি ধর্মের নাম উল্লেখ করো। 21. যদি একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি তার 200 ml রক্ত দান করে, তবে সেই ব্যক্তি তার দেহের সম্পূর্ণ রক্তের কতভাগ রক্ত দিলেন ? 22. টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া কাকে বলে ? 23. রক্তচাপের সংজ্ঞা লেখো। স্বাভাবিক লোকের রক্তচাপ কত ? 24. পালস প্রেসার কী ? 25. যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে মানুষের রক্তচাপ পরিমাপ করা হয় তার নাম করো। 26. হৃৎস্পন্দনের ট্রাকিকার্ডিয়া ও ব্রাডিকার্ডিয়া কাকে বলে ? 27. ঘাত পরিমাণ কী ? ঘাতসূচক কাকে বলে ? 28. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা কোথায় আছে ? এটিকে এমন বলে কেন ? 29. স্টারলিং সূত্র কী ? 30. সিস্টেমিক শিরা এবং পোর্টাল শিরা কাদের বলে ? 31. প্রান্তীয় বাধা কাকে বলে ? এর সঙ্গে রক্তের চাপের সম্পর্ক কী ? 32. হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোজী কলার নাম করো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. কপাটিকা কী ? এটি কীভাবে তৈরি হয় ? দুটি মাইট্রাল কপাটিকা কোথায় থাকে ?
2. S. A. নোড কী ? এটির অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
3. এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম ও এপিকার্ডিয়াম বলতে কী বোঝো ?
4. পেসমেকার কী ? আলোচনা করো।
5. A.V. নোডকে ছন্দনিয়ামক বলে কেন?
6. পেরিকার্ডিয়াম কী ? এর কাজ কী ?
7. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন কাল বলতে কী বোঝো ?
8. সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণ কাল কী?
9. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি কখন হয় ?
10. শিরারক্তের প্রত্যাবর্তন কীভাবে হার্দ-উৎপাদকে নিয়ন্ত্রণ করে ?
11. ফিকের নীতি কী উল্লেখ করো। একজন মানুষের দেহে ধমনি রক্তে ও শিরারক্তে $O_2$-এর পরিমাণ যথাক্রমে 15 ml এবং 20 ml। তার প্রতি মিনিটে $O_2$ গ্রহণের পরিমাণ 250 ml হলে তার হার্দ-উৎপাদের পরিমাণ কত ?
12. ব্লুবেবি কাকে বলে ?
13. হৃৎচক্র কী ? হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশায় হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের রক্তচাপের পরিবর্তন হয় তাদের বর্ণনা দাও।
14. হৃদ্‌ধ্বনি কী ? কয় প্রকার হৃদ্‌ধ্বনির অস্তিত্ব জানা আছে লেখো।
15. একজন পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত ? রক্তজালক ও শিরাতে রক্তচাপ কত?

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ধমনি ও শিরা। 2. ফুসফুসীয় ধমনি ও ফুসফুসীয় শিরা। 3. সমদৈর্ঘ্য পেশিসংকোচন কাল এবং সমদৈর্ঘ্য পেশি প্রসারণ কাল। 4. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি এবং দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি। 5. সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ। 6. বেসাল রক্ত চাপ এবং ক্যাজুয়াল রক্তচাপ। 7. ধমনি ও শিরার কলাস্থানিক গঠন।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. মাইট্রাল কপাটিকা। 2. হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার। 3. নিঃসাড় কাল। 4. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনকাল। 5. প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি। 6. ধূমপানে হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব। 7. হাইপোটেনশন এবং হাইপারটেনশন। 8. স্টারলিং-এর নীতি কী ? 9. ব্লু বেবি। 10. হৃদ্‌বাহের উপর ধূমপানের প্রভাব।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. নিম্নলিখিত হৃৎপেশির প্রধান প্রধান ধর্মগুলি আলোচনা করো। (a) ছন্দময়তা, (b) সংকোচনশীলতা, (c) নিঃসাড়কাল এবং (d) পূর্ণ ব্যর্থ সূত্র কাকে বলে ?
2. হৃৎপিণ্ডে হৃৎস্পন্দনের আবেগের উৎপত্তি ও পরিবহন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
3. মানুষের হৃৎপিণ্ডের এর অভ্যন্তরে রক্তসংবহন কীভাবে হয় বর্ণনা করো।

4. চিত্রসহ হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন বর্ণনা করো।
5. চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে হৃৎচক্রের সময় রক্ত সংবহনের পথ বর্ণনা করো।
6. রক্তসংবহনতন্ত্র কে আবিষ্কার করেছিলেন ? হৃৎচক্র কাকে বলে ? বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎচক্রের বিভিন্ন ঘটনার স্থায়িত্বকালসহ বর্ণনা করো।
7. হৃৎচক্র কাকে বলে ? হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো।
8. হৃৎচক্র বলতে কী বোঝো ? অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ হবার পর হতে শুরু করে হৃৎচক্রে নিলয়ের অবশিষ্ট ঘটনাবলির বর্ণনা লেখো।
9. 'হৃৎচক্রে চারবার হৃৎপিণ্ডের শব্দ হয়'। প্রতিটি শব্দের উদ্ভব দশা এবং শব্দের কারণ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করো।
10. রক্তচাপ কাকে বলে ? স্বাভাবিক রক্তচাপ কত ? রক্তচাপ মাপক যন্ত্রটির নাম লেখো।
11. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
12. রক্তচাপ কী ? তোমার বন্ধুর রক্তচাপ কীভাবে পরিমাপ করবে আলোচনা করো।
13. পালস প্রেসার কাকে বলে ? একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ওই প্রেসার কত ? এই চাপের তাৎপর্য কী ?
14. হার্দ-উৎপাদ ও হার্দ-সূচক-এর সংজ্ঞা লেখো। ফিক্-বর্ণিত মূলনীতি কী ?
15. (a) প্রান্তীয় বাধা বলতে কী বোঝো ? (b) এর উপর প্রভাবকারী শর্তসমূহ উল্লেখ করো। (c) শিরা রক্তের প্রত্যাবর্তন হার্দ-উৎপাদকে কীভাবে প্রভাবিত করে।
16. (a) হৃৎচক্রে চারবার হৃৎপিণ্ডের শব্দ কীভাবে হয়। (b) প্রতিটি শব্দের কারণ এবং তাৎপর্য উল্লেখ করো। (c) পালস্-প্রেসার কাকে বলে ?
17. (a) মানুষের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত কপাটিকাগুলি কীভাবে তৈরি হয় ? হৃৎপিণ্ডে কী কী কপাটিকা আছে এবং তারা কোথায় অবস্থিত লেখো। (c) কপাটিকার প্রধান কাজ কী ?
18. (a) হৃৎচক্র কাকে বলে ? (b) হৃৎচক্রের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনগুলি বর্ণনা করো।
19. সংজ্ঞা লেখো—(a) রক্ত চাপ, (b) ক্যাজুয়াল চাপ, (c) হৃৎচক্র, (d) পেসমেকার, (e) হৃদ্ সংকেত এবং (f) হৃদ্ধ্বনি।
20. (a) আমাদের শরীরে রক্ত একই দিকে প্রবাহিত হওয়ার কারণগুলি কী কী ? (b) হৃৎপেশির চারটি ধর্ম বর্ণনা করো।
21. (a) হৃৎচক্রের প্রতিটি দশার স্থিতিকাল কত ? (b) হৃৎসংকোচনের হার স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়লে বা কমলে হৃৎচক্রের স্থিতিকালের কী কী পরিবর্তন ঘটবে ? (c) হৃৎপিণ্ডের মিনিট পরিমাণ বলতে কী বোঝো ?
22. (a) মানুষের হার্দ উৎপাদের পরিমাণ কত ? (b) ঘাত পরিমাণ কী ? (c) যে পদ্ধতিতে মানুষের হার্দ উৎপাদন নির্ণয় করা হয়, তার নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করো। (d) মানুষের ট্রাকিকার্ডিয়া এবং ব্রাডিকার্ডিয়া কাকে বলে ?

## B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the following) ঃ

1. হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ। 2. ধমনি ও শিরার প্রস্থচ্ছেদ। 3. হৃৎপিণ্ডের শারীরস্থানিক গঠন। 4. হৃৎচক্র।

## অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# শ্বাসতন্ত্র
# [ RESPIRATORY SYSTEM ]

### ভূমিকা (Introduction) ঃ

প্রতিটি জীবে শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। জীবের প্রতিটি কোশের চাহিদামতো অক্সিজেনের সরবরাহ পূরণ করার জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে **শ্বসন পথের** (Respiratory tract) মাধ্যমে ফুসফুসে যায় ও পরে ফুসফুস থেকে রক্তের মাধ্যমে কলাকোশে যায়। কোশে খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং সেখানে থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এইসব কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দেহে যে তন্ত্র বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে তাকে শ্বাসতন্ত্র বলে। শ্বাসতন্ত্রের প্রধান কাজ হল অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্জন যা **শ্বসন** নামে পরিচিত। শ্বাসতন্ত্র যেসব অঙ্গ নিয়ে গঠিত তাদের **শ্বাসঅঙ্গ** বলে।

শ্বসন দু'প্রকারের হয়, যেমন—বহিস্থ শ্বসন (External respiration) এবং অন্তস্থ শ্বসন (Internal respiration)। বহিস্থ শ্বসনে বায়ুমণ্ডলের বায়ু থেকে অক্সিজেন শ্বসনাঙ্গ ও বায়ুথলির মাধ্যমে ফুসফুসীয় রক্তজালকের মাধ্যমে রক্তে যায় এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসের বায়ু থলি এবং শ্বসনাঙ্গের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এই কারণে বহিস্থ শ্বসনকে **শ্বাসক্রিয়া** (Respiration বা Breathing) বলে। এই শ্বসন প্রক্রিয়া শ্বাস ক্রিয়ার ফলে অন্তস্থ শ্বসন ঘটে। অন্তস্থ শ্বসনকে কলাকোশীয় শ্বসন (Tissue respiration) বলে। এইপ্রকার শ্বসন প্রক্রিয়ায় কলাকোশ ATP নামে জৈব শক্তি উৎপন্ন হয় যা দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

## ☼ 4.1. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System) ☼

❖ **শ্বাসতন্ত্রের সংজ্ঞা : জীবদেহ এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় সংঘটিত করবার জন্য বিভিন্ন অঙ্গসমূহ (শ্বাসঅঙ্গ) একত্রিত হয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে শ্বাসতন্ত্র বা শ্বসনতন্ত্র বলে।**
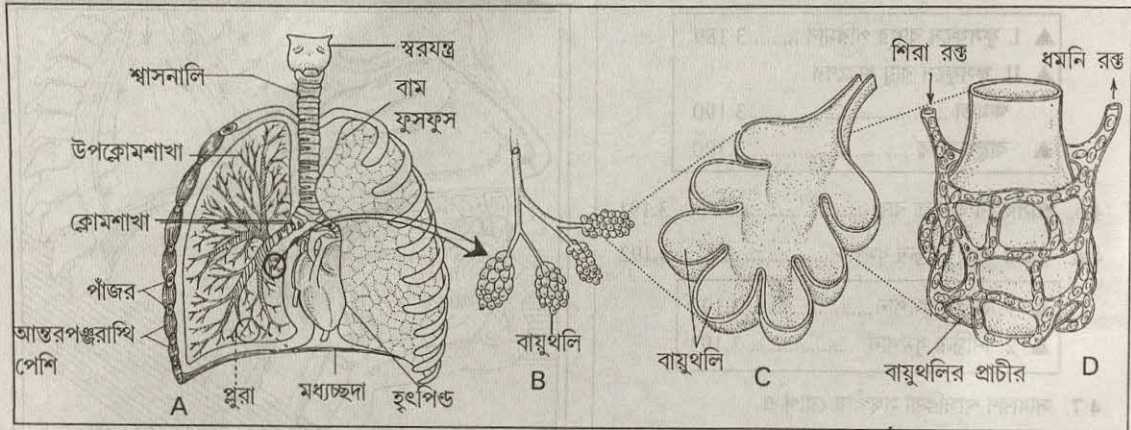
চিত্র 4.1. : A-মানবদেহে ফুসফুসের অবস্থান, B- বায়ুথলি C-বায়ুথলির বিবর্ধিত চিত্র এবং D-বায়ুথলিকে ঘিরে রক্তজালকের চিত্ররূপ।

## ☼ শ্বসন পথ (Respiratory Tract) ☼

### ▲ শ্বসনপথের সংজ্ঞা ও গঠন (Definition and Structure of Respiratory Organs) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : শ্বাসতন্ত্রের যে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় তাকে শ্বসনপথ বলে।**

(b) **গঠন (Structure) :** শ্বসনতন্ত্র বিভিন্ন **শ্বাসঅঙ্গ,** যেমন—নাসাবিবর, গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, দুটি মুখ্য ক্লোমশাখা, বহু উপক্লোমশাখা এবং ফুসফুস নিয়ে গঠিত।

চিত্র 4.2. : শ্বসনতন্ত্রে জড়িত বায়ুপরিবহনকারী অংশ এবং গলবিলের অবস্থানের চিত্ররূপ।

1. **নাসাবিবর** (Nasal cavity)—নাসাবিবরের সামনের দিকে দুটি **বহিঃনাসারন্ধ্র** এবং পেছনদিকে **নাসাগলবিল** (Nasopharynx) থাকে। বিবরটি ত্রিকোণাকৃতি গহ্বর যাকে একটি পাতলা তরুণাস্থি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। নাসাবিবরে লোম ও শ্লেষ্মা থাকে যা বায়ু থেকে ধূলিকণাকে মুক্ত করে পরিষ্কৃত বায়ুকে শ্বাসনালিতে পাঠায়।

2. **গলবিল** (Pharynx)—গলবিল পেশি ও তন্তু নিয়ে গঠিত একটি প্রকোষ্ঠ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 13 সেন্টিমিটার হয়। এটি নাসাগলবিল থেকে আরম্ভ হয়ে মুখগলবিলে শেষ হয়। মুখগলবিল শ্বসনতন্ত্র ও পৌষ্টিকতন্ত্র দুইয়েরই সাধারণ অংশ হিসাবে কাজ করে। গলবিল (ফ্যারিনক্স) প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—নাসাগলবিল (ন্যাসোফেরিনক্স—Nasopharynx), মুখগলবিল (ওরোফ্যারিনক্স—Oropharynx) এবং স্বরযন্ত্রীয় গলবিল (ল্যারিংগো ফ্যারিনক্স—Laryngopharynx)।

3. **স্বরযন্ত্র** (Larynx)—মুখগলবিল ও শ্বাসনালির মধ্যবর্তী ফোলানো অংশকে স্বরযন্ত্র বলে। এটি লম্বায় প্রায় 4 cm হয় এবং প্রধানত নয়টি তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত, যেমন—**এপিগ্লোটিস তরুণাস্থি** (একটি), **থাইরয়েড তরুণাস্থি** (একটি), গোলাকার **ক্রিকয়েড তরুণাস্থি** (একটি), **কিউনিফর্ম তরুণাস্থি** (দুটি), **কর্নিকুলেট তরুণাস্থি** (দুটি) এবং **আর্টিনয়েড তরুণাস্থি** (দুটি)। এইসব তরুণাস্থি বিভিন্ন আকৃতির হয় এবং এগুলি তাদের সংযোগকারী লিগামেন্ট (Ligaments) এবং পেশি নিয়ে একত্রে স্বরযন্ত্র গঠিত করে। মুখগলবিল ও স্বরযন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি ছিদ্র আছে, একে **স্বররন্ধ্র** বা **গ্লোটিস** (Glottis) বলে। গ্লোটিসের মুখটি তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি জিভের মতো দেখতে **এপিগ্লোটিসের** (Epiglottis) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। ছিদ্রটির দু'পাশে পর্দার মতো **স্বরতন্ত্রী** (Vocal cord)-গুলি এরিটিনয়েড তরুণাস্থি থেকে থাইরয়েড তরুণাস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বরতন্ত্রের পর্দাগুলির কম্পনের ফলেই কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরযন্ত্রের তরুণাস্থি কণ্ঠের সম্মুখে কৌণিকভাবে বেড়ে ওঠে। একে **কণ্ঠ** বা **কণ্ঠমণি** (Adam's apple) বলে।
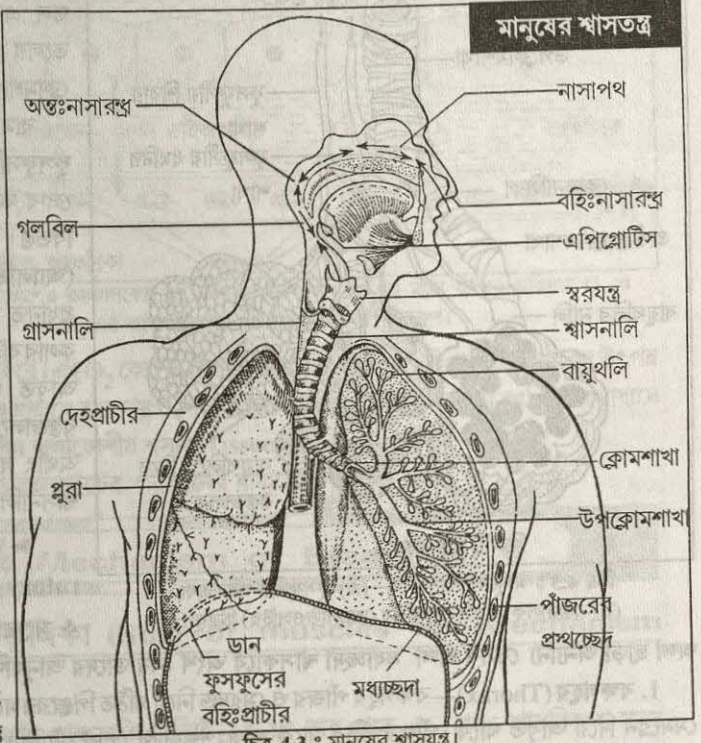
চিত্র 4.3 : মানুষের শ্বাসযন্ত্র।

4. **শ্বাসনালি** (Trachea)—স্বরযন্ত্রের শেষ প্রান্ত থেকে শ্বাসনালি আরম্ভ হয়। এটি প্রায় 12 সেন্টিমিটার লম্বা এবং 2·5 সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত হয় এবং কতকগুলি (প্রায় 15-18টি) টুকরো টুকরো বলয়াকার তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত। এই তরুণাস্থিগুলি তন্তুময় কলা দিয়ে আবদ্ধ থাকে (চিত্র 4.2)।
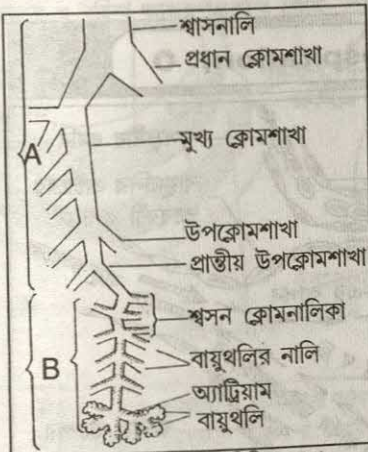
চিত্র 4.4. : শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, (A) বায়ু পরিবহনকারী অংশ এবং (B) বায়ু বিনিময়কারী (আদানপ্রদানকারী) অংশ।

5. **ক্লোমশাখা (ব্রকাংশ**—Bronchus) : পঞ্চম পাঁজরের বা পর্শুকার সামনের দিকে শ্বাসনালিটি দুটি **ক্লোমশাখা** ( **ব্রকাংশ**—Bronchus, Pl.-Bronchi)-তে বিভক্ত হয়। ডান দিকের ক্লোমশাখাটি বামদিকের ক্লোমশাখার চেয়ে সামান্য ছোটো। ক্লোমশাখা দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং নলাকার। ডান ক্লোমশাখার দৈর্ঘ্য 2.5 cm হয় এবং 6-8টি তরুণাস্থি বলয় নিয়ে গঠিত। বাম ক্লোমশাখার দৈর্ঘ্য 5 cm হয় এবং 9-12টি তরুণাস্থি বলয় নিয়ে গঠিত। ডান দিকের ক্লোমশাখাটি ঊর্ধ্বাংশ, মধ্যাংশ ও নিম্নাংশ ভাবে বিভক্ত হয়ে **উপক্লোমশাখা (ব্রংকিওল**—Bronchioles)-তে পরিণত হয়। ফুসফুসের মধ্যে বামদিকের ক্লোমশাখাটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্লোমনালিকায় পরিণত হয়। ফুসফুসীয় ধমনি ও ক্লোমশাখা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে প্রতিটি ক্লোমনালিকা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে **প্রান্তীয় উপক্লোমশাখা** (Terminal bronchioles), **শ্বসন উপক্লোমশাখা** (Respiratory bronchioles) এবং **বায়ুথলীয় নালি** (Alveolar duct) গঠন করে। এই নালির অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে স্ফীত হয়, একে **অ্যাট্রিয়াম** (Atrium) বলে। প্রতিটি অ্যাট্রিয়ামকে ঘিরে বহু **বায়ুথলি** (**অ্যালভিওলাই**—Alveoli) থাকে (চিত্র 4.3)।

6. **ফুসফুস** (Lungs)—ফুসফুস দুটি স্পঞ্জের মতো, পিরামিড আকারের, মধ্যচ্ছদার উপরে ও হৃৎপিণ্ডের দু-পাশে থাকে। বক্ষগহ্বরের বামদিকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থানের ফলে, বামদিকের ফুসফুসটি ডান দিকের ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়।

প্রতিটি ফুসফুস শঙ্কু আকৃতির যার উপরের দিক সংকীর্ণ এবং নীচের দিক প্রশস্ত। এর বাইরের উত্তল, অর্ধচন্দ্রাকার এবং ভেতরের তলগুলিকে যথাক্রমে কস্টাল তল, **ডায়াফ্রামাটিক তল** এবং **মেডিয়াস্টিনাল তল** বলে। মেডিয়াস্টিনাল তলের হাইলাম নামে ত্রিকোণাকৃতি অংশের মধ্য দিয়ে ক্লোমশাখা, রক্তবাহ লসিকাবাহ এবং স্নায়ু প্রবেশ করে।
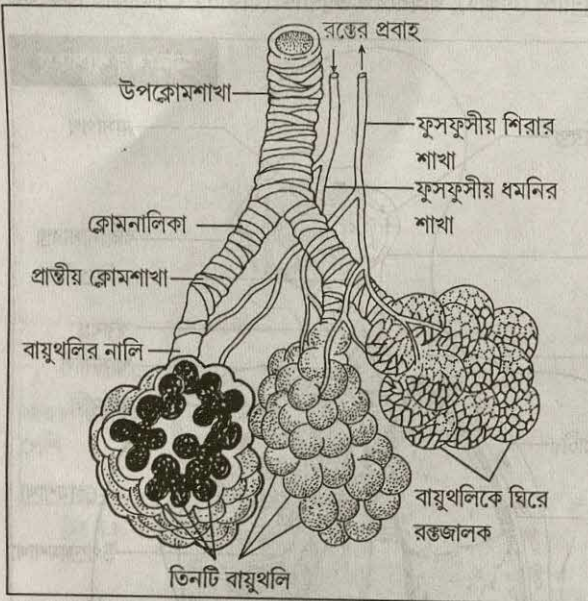
চিত্র 4.5 : মানুষের শ্বাসঅঙ্গ—(A)-ফুসফুসীয় গঠন এবং (B)-রক্তজালক আবৃত বায়ুথলির (অ্যালভিওলাইর) চিত্ররূপ।

বাম দিকের ফুসফুসটি দুটি লোব এবং ডান দিকের ফুসফুসটি তিনটি লোব বা খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। প্রতিটি লোব অনেকগুলি ছোটো ছোটো অংশে বা **লোবিউলে** বিভক্ত। আবার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ অসংখ্য **বায়ুথলি (অ্যালভিওলাই**— Alveoli) নিয়ে গঠিত। বায়ুথলিগুলি প্রধানত আঁশাকার আবরণী কলা দিয়ে তৈরি। আবরণী কলার বাইরের দিকটা ফুসফুসীয় রক্তজালক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকে। ফুসফুসীয় বায়ুথলি এবং ফুসফুসীয় রক্তজালকের মধ্যে $O_2$ এবং $CO_2$-এর আদানপ্রদান হয় অর্থাৎ বহিস্থ শ্বাসক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফুসফুসের মধ্যে শ্বাসনালির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলি থাকে।

➤ **আনুষঙ্গিক শ্বাসঅঙ্গ (Associated respiratory organs) :**

❖ **সংজ্ঞা : বায়ু পরিবহনকারী অংশ এবং বায়ু বিনিময়কারী অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য যেসব অঙ্গ মধ্যচ্ছদা শ্বাসকার্যে অংশ নেয় তাদের আনুষঙ্গিক শ্বাসঅঙ্গ বলে।** যেমন—বক্ষগহ্বর।

1. **বক্ষগহ্বর** (Thorax)—বক্ষগহ্বর পাঁজর ও মেরুদণ্ড নিয়ে গঠিত পিঞ্জরের মতো অংশ। এটির অন্তঃস্থ গাত্র প্লুরা নামে দ্বিস্তরীয় মেমব্রেন দিয়ে আবৃত থাকে। পাঁজরগুলির মাঝে **আন্তঃপঞ্জরাস্থি পেশি** (ঐচ্ছিক পেশি) থাকে যা শ্বাসক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে।

2. **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm)—মধ্যচ্ছদা প্রধানত অনৈচ্ছিক পেশি ও কেন্দ্রীয় অংশের সামান্য অংশ টেন্ডন নিয়ে গঠিত **মোটা গম্বুজাকৃতি মেমব্রেন** যা বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরে মধ্যবর্তী স্থানে থাকে ও শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

## ✪ 4.2. শ্বসনের প্রকারভেদ (Types of Respiration) ✪

শ্বসন দুই প্রকার, যেমন—**বহিস্থ শ্বসন** এবং **অন্তঃস্থ শ্বসন**।

1. **বহিস্থ শ্বসন** (External respiration) **:** ❖ **সংজ্ঞা—বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসীয় বায়ু এবং ফুসফুসীয় বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসীয় রক্তজালকের রক্তের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময়কে বহিস্থ শ্বসন বলে।**

চিত্র 4.6. : ফুসফুসীয় বায়ুথলি এবং রক্তজালকের মধ্যে গ্যাসের আদানপ্রদানের (বহিঃস্থ শ্বসনের) চিত্ররূপ।

কোশের বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড শিরারক্তের মাধ্যমে ফুসফুসের ফুসফুসীয় রক্তজালকে পৌঁছায়। প্রশ্বাস ও নিশ্বাস ক্রিয়ার সময় ফুসফুসীয় রক্তজালক ও ফুসফুসীয় বায়ুথলির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও

অক্সিজেনের বিনিময় ঘটে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় $CO_2$ রক্ত থেকে ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে এবং $O_2$ ফুসফুসীয় বায়ুথলি থেকে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে।

চিত্র 4.7. : কলাকোশের রক্তজালকের রক্ত, কলারস এবং কলাকোশের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় $O_2$ ও $CO_2$-এর আদানপ্রদানের (অন্তঃস্থ শ্বসনের) চিত্ররূপ।

2. **অন্তঃস্থ শ্বসন** (Internal respiration) : ❖ সংজ্ঞা— **কলাকোশ কলারস ও রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ($O_2$) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ($CO_2$) বিনিময়কে অন্তঃস্থ শ্বসন বলে।**

ফুসফুস থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন ধমনিরক্তে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কলাকোশে যায় এবং কলাকোশে $O_2$ সরবরাহ করে। এই $O_2$ কোশের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড যা কলাকোশ থেকে কলারসের মাধ্যমে রক্তে যায় ও শিরারক্তের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে আবার ফুসফুসে পৌঁছায়। এইসব কারণে **অন্তস্থ শ্বসন কলাকোশীয় শ্বসন** (Tissue respiration) **নামে পরিচিত।**

অন্তঃস্থ এবং বহিস্থ শ্বসন অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিবহনের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

## ❂ 4.3. শ্বাসক্রিয়া পদ্ধতি (Mechanism of Breathing) ❂

### ▲ শ্বসন পদ্ধতিতে পেশির ভূমিকা (Role of muscles for Mechanism of Breathing) :

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক **শ্বাসক্রিয়ার হার প্রতি মিনিটে 12–18 বার গড়ে 16 বার**। শ্বাসক্রিয়ার সময় শ্বাসক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন মুখ্য শ্বাসঅঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক শ্বাসঅঙ্গের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন **শ্বাসগ্রহণ** বা **প্রশ্বাস** এবং **শ্বাসত্যাগ** বা **নিশ্বাসের** সময় হয়ে থাকে। দেহে কিছু **স্নায়ু** এবং **পেশি** শ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র 4.8. : A-শ্বাসকার্যের জন্য দায়ী আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশির অবস্থান এবং B-ওই পেশির সংকোচনে পাঁজর ও উরঃফলকের স্থান পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

- **স্নায়ু**—(i) **ইন্টারকস্টাল স্নায়ু**, (ii) **ফ্রেনিক স্নায়ু** ও (iii) **ভেগাস স্নায়ু**।
- **পেশি**—(i) **বহিস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশি** ও (ii) **মধ্যচ্ছদার পেশি**।

শ্বাসপ্রক্রিয়ার সময় এই দু'প্রকার পেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রশ্বাস ক্রিয়ায় বিভিন্ন পেশির সংকোচন এবং নিশ্বাস প্রক্রিয়ায় এইসব পেশির প্রসারণ ঘটে। **শ্বাস কার্যে জড়িত পেশির সংকোচনে বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয় ফলে ফুসফুস দুটিও প্রসারিত** হয়। প্রসারণের ফলে প্রথমে অন্তঃবক্ষীয় চাপ এবং পরে অন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে যায় বলে বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। অপরপক্ষে পেশির প্রসারণের ফলে **বক্ষগহ্বরের সংকোচন** ঘটে যা দুটি ফুসফুসকে সংকুচিত করে। এই কারণে আন্তঃবক্ষীয় চাপ ও অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বেড়ে যায় ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

## ● প্লুরা (Pleura) ●

বক্ষগহ্বরস্থিত প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা নামে দুটি স্তর নিয়ে তৈরি আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। দুটি স্তরের একটি স্তর ফুসফুসের প্রাচীরের সঙ্গে লেগে থাকে। তাকে **ভিসেরাল প্লুরা** (Visceral pleura) বলে। অপর স্তরটি বক্ষপ্রাচীরের সঙ্গে লেগে থাকে। একে **প্যারাইটাল প্লুরা** (Parietal pleura) বলে। এই দুটি প্লুরার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে **প্লুরা গহ্বর** বলে যা একপ্রকার কোশবহিস্থ তরল (প্লুরাল তরল) পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্থানের চাপ অর্থাৎ অন্তপ্লুরা চাপ (প্লুরা মধ্যস্থ চাপ) বায়ুর সাধারণ চাপ (760 mm Hg) অপেক্ষা কম হয় অর্থাৎ প্রায়—2·5 mm Hg কম হয়। **কাজ**—(i) যান্ত্রিক আঘাত থেকে হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা করে। (ii) ফুসফুসকে প্রসারিত হতে সাহায্য করে।
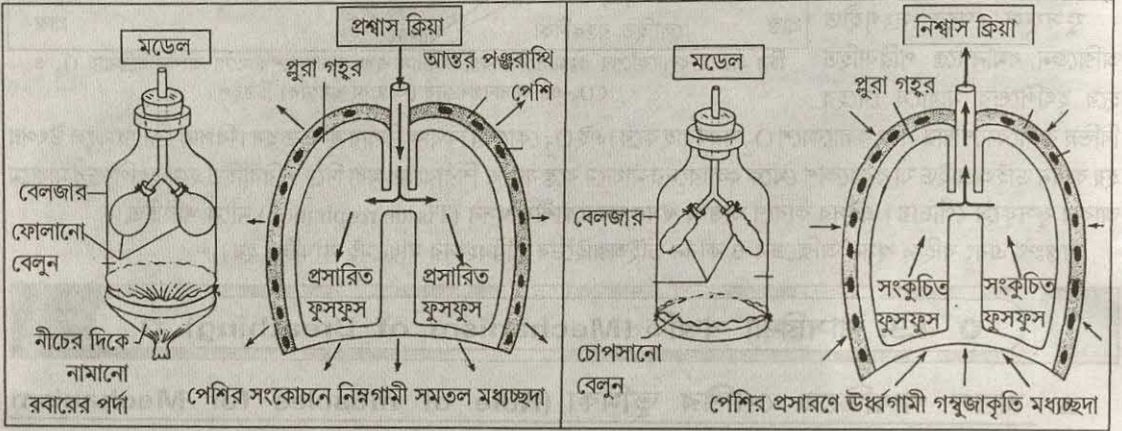
চিত্র 4.9. : মডেল এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রশ্বাস ও নিশ্বাস ক্রিয়ার চিত্ররূপ।

● **(a) প্রশ্বাস কার্য (Inspiration) :** প্রশ্বাস কার্য একটি **সক্রিয় পদ্ধতি**। কারণ প্রশ্বাস ক্রিয়া জৈবশক্তির (ATP) উপস্থিতিতে ঘটে। প্রশ্বাস কাজের সময় বক্ষগহ্বরের প্রসারণ ঘটে, এর জন্য বক্ষগহ্বরের উল্লম্ব, অগ্রপশ্চাৎ ও তির্যক ব্যাস বেড়ে যায়। মস্তিষ্কে অবস্থিত শ্বাসকেন্দ্র থেকে স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) ইন্টারকস্টাল স্নায়ু এবং ফ্রেনিক স্নায়ুর মাধ্যমে যথাক্রমে **বহিস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশি** (External intercoastal muscle) এবং **মধ্যচ্ছদার পেশিতে** (Diaphragm muscle) যায় এবং এদের সংকোচন ঘটায়। দুটি পাঁজরের মধ্যস্থিত বহির্ভাগের পেশিকে বহিস্থ-আন্তর পঞ্জরাস্থি পেশি বলে। পেশির সংকোচনের জন্য জৈবশক্তির প্রয়োজন। এই পেশির সক্রিয় সংকোচনের ফলে পাঁজরগুলি (Ribs) উরঃফলকের (Sternum) সঙ্গে উপর দিকে ও সামনের দিকে গতিশীল হয়। এই কারণে বক্ষগহ্বর সামনের দিকে প্রসারিত হয়। এর ফলে বক্ষগহ্বরের **অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাস** বাড়ে। মধ্যচ্ছদার পেশির সংকোচনের ফলে গম্বুজাকৃতি মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নেমে যায়। এর ফলে উদর গহ্বরের স্থানটি হ্রাস পায় কিন্তু বক্ষগহ্বরের **লম্বব্যাস** বাড়ে।

চিত্র 4.10. : প্রশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা পেশির অবস্থান এবং পাঁজরের বিচলনের চিত্ররূপ।

প্রশ্বাসের সময় বক্ষগহ্বরের প্রসারণের ফলে বক্ষ প্রাচীর সংলগ্ন প্লুরার প্যারাইটাল স্তরটি দূরে সরে যায়। প্লুরাগহ্বরের অন্তর্বর্তী স্থানটির আয়তন

বাড়ে ও এর মধ্যের চাপ অর্থাৎ **অন্তঃপ্লুরা** (Intrapleural) **চাপ** বা **অন্তঃবক্ষগহ্বরের চাপ** (Intrathoracic pressure) – 2·5 mm Hg কমে গিয়ে –5 mm Hg চাপের সমান হয়। এই ঋণাত্মক চাপ প্লুরার ভিসেরাল প্রাচীর স্তরটিকেও প্যারাইটাল প্রাচীর স্তরের দিকে টেনে আনে। ফুসফুসও ভিসেরাল স্তরকে অনুসরণ করে, ফলে ফুসফুসটি ফুলে যায়। দেখা গেছে যেসব অংশ পাঁজর, উরঃফলক ও মধ্যচ্ছদার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ ফুসফুসের যেসব অংশ দেহের গতিশীল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে তারা সরাসরি এভাবে প্রসারিত হয়। প্রসারণের ফলে ফুসফুসের ভেতরের চাপ, **অন্তঃফুসফুসীয় চাপের** (Intrapulmonary pressure) পরিবর্তন ঘটে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুসের বায়ুথলির চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের (760 mm Hg) সমান হয়। এই কারণে **অন্তঃফুসফুসীয় চাপকে '0' mm Hg চাপ** বলে। ফুসফুসের প্রসারণের ফলে ফুসফুস মধ্যস্থ চাপ বা অন্তঃফুসফুসীয় (Intrapulmonary) চাপ স্বাভাবিক বায়ু চাপের ('0' mm Hg) অপেক্ষা –2 mm থেকে –5 mm Hg-তে নেমে আসে। ফলে বায়ুমণ্ডল (উচ্চ বায়ুর চাপ) থেকে বায়ু ফুসফুসের (কম বায়ুর চাপ) মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ নিশ্বাস ক্রিয়া ঘটে।

● (b) **নিশ্বাসকার্য (Expiration) :** নিশ্বাস কার্য একটি **নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি**। প্রশ্বাস কাজের সঙ্গে জড়িত পেশিসমূহের সংকোচন সম্পূর্ণ হলে, এই পেশিগুলি এদের স্থিতিশক্তির সহায়তায় এবং স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। উরঃফলক ও পাঁজরগুলি নীচে ও ভিতরের দিকে নেমে আসে। মধ্যচ্ছদা পেশির শ্লথনের (Relaxation) জন্য বক্ষগহ্বরের দিকে উঠে আসে। এর ফলে বক্ষগহ্বরের স্থান কমে গিয়ে বক্ষমধ্যস্থ (প্লুরামধ্যস্থ) চাপ বাড়ে। ফুসফুসও তার স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ফুসফুসের বায়ুথলির মধ্যস্থ চাপ (অন্তঃফুসফুসীয় চাপ—Intrapulmonary pressure) বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অপেক্ষা + 3 থেকে + 4 mm Hg চাপের বেশি হয়, ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু বেরিয়ে আসে।
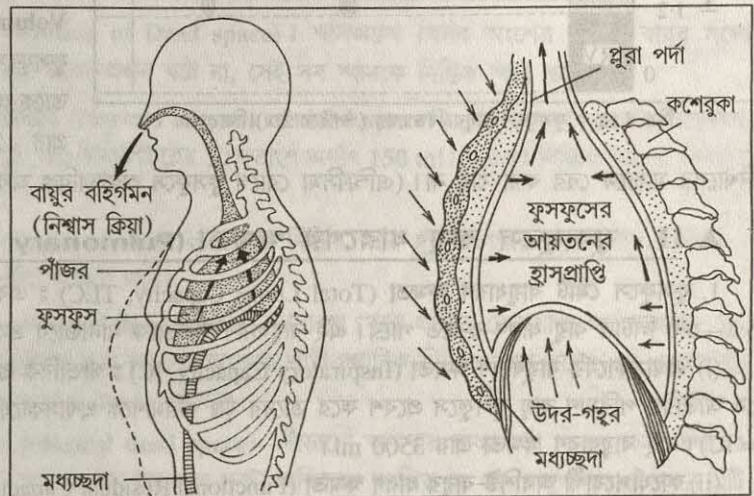
চিত্র 4.11. : নিশ্বাসের সময় পেশি এবং পাঁজরের চিত্ররূপ।

বলপূর্বক নিশ্বাসকার্যের সময় ফুসফুসের ভেতরের চাপ বায়ুর স্বাভাবিক চাপ থেকে +10 থেকে +40 mm Hg চাপের সমান হয়।

## ◎ 4.4. ফুসফুসের বায়ুর কয়েকটি বিভাগ ◎ (Some Compartments of Pulmonary volumes)

### ▲ I. ফুসফুসে বায়ুর পরিমাণ (Volume of air in Lungs) :

● **ফুসফুসে মোট বায়ু ধারণের পরিমাণ (Total Lungs Capacity, TLC)** = 5-6 লিটার।

1. **প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ (Tidal Volume, TV)**—বিশ্রামরত অবস্থায় স্বাভাবিক প্রশ্বাস বা নিশ্বাস সময়ে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে যায় বা বেরিয়ে আসে তাকে **প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ** বলা হয়। প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ 500 ml।

2. **প্রশ্বাসকার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ (Inspiratory Reserve Volume, IRV)**—প্রবাহী বায়ুর পরিমাণের

উপর অধিকতর গভীর প্রশ্বাসের ফলে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে যায় তাকে **প্রশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত-বায়ুর পরিমাণ** বলে। এর পরিমাণ প্রায় 3000 ml।
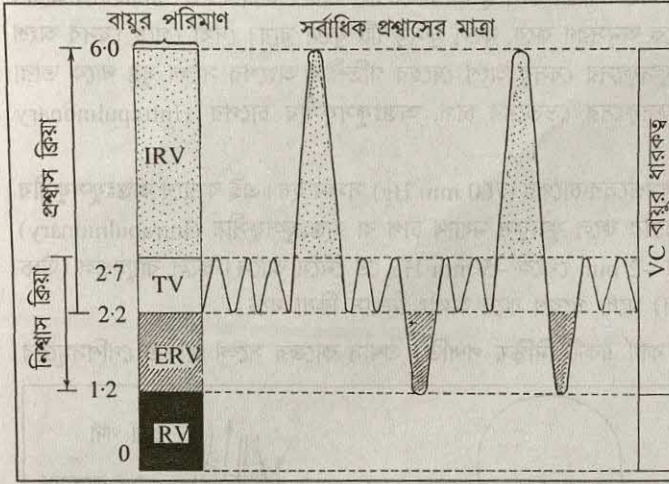
চিত্র 4.12. ঃ ফুসফুসে বায়ুর বিভাগের (স্পাইরোগ্রাম) চিত্ররূপ।

3. **নিশ্বাসকার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ (Expiratory Reserve Volume, ERV)**—প্রবাহী বায়ুর পরিমাণের পর অধিকতর বলপূর্বক নিশ্বাসে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয় তাকে নিশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ বলে। এর পরিমাণ প্রায় 1000 ml। (হাঁপানিতে ERV-র পরিমাণ কমে যায়।)

4. **অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ (Residual Volume, RV)**—বলপূর্বক নিশ্বাসের পরেও ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু সব সময় থেকে যায় তাকে অবশিষ্ট-বায়ুর পরিমাণ বলে। এর পরিমাণ প্রায় 1200 ml। এই পরিমাণ বায়ুকে কখনই নিশ্বাসের মাধ্যমে বের করা যায় না। (এম্ফিসিমা রোগে ফুসফুসে অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে RV বেড়ে যায়।)

## ▲ II. ফুসফুসে বায়ু ধারণের ক্ষমতা (Pulmonary Capacity) ঃ

1. **ফুসফুসে মোট বায়ুধারণ ক্ষমতা** (Total Lungs Capacity, TLC) ঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুস মোট 5·5—6·0 লিটার বায়ু ধারণ করতে পারে। এই বায়ুধারণ ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রকাশ করা যায়।

(i) **প্রশ্বাসকার্যের বায়ুধারণ ক্ষমতা** (Inspiratory Capacity, IC) ঃ স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর গভীরতম প্রশ্বাসের সাহায্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে তাদের যুক্ত পরিমাণকে প্রশ্বাসকার্যের বায়ুধারণ ক্ষমতা বলে (TV + IRV = IC)। এই বায়ুধারণ ক্ষমতা প্রায় 3500 ml।

(ii) **কার্যোপযোগী অবশিষ্ট-বায়ুর ধারণ ক্ষমতা** (Functional Residual Capacity, FRC)—স্বাভাবিক নিশ্বাসের পর যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে অবশিষ্ট থাকে তাকে কার্যোপযোগী অবশিষ্ট-বায়ুর ক্ষমতা বলে। এই অবশিষ্ট-বায়ুর পরিমাণ এবং নিশ্বাসকার্যের অতিরিক্ত-বায়ুর পরিমাণের যুক্ত ফল (ERV + RV = FRC) অর্থাৎ 1200 + 1000 = 2200 ml।

2. **বায়ুধারকত্ব** (Vital Capacity, VC) ঃ

(a) **সংজ্ঞা ঃ গভীরতম প্রশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা বলপ্রয়োগে নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু দুটি ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে বায়ুধারকত্ব বা ভাইটাল ক্যাপাসিটি বলে।**

(b) **স্বাভাবিক মান ঃ** প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরমাণ (IC + ERV) = 4500 ml এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে সামান্য কম।

(c) **বায়ুধারকত্বের পরিবর্তনের জন্য দায়ী শর্তসমূহ ঃ** বয়স (Age), লিঙ্গ (Sex), দেহ তল (Body surface), দেহভঙ্গি (Posture), রোগ (Diseases) প্রভৃতি।

**ফুসফুসজনিত রোগ, যেমন**—নিউমোনিয়া, হাপানি, প্লুরোসিস, অ্যাম্ফিসিমা নামে রোগে বায়ুধারকত্ব কমে যায়। অত্যধিক ধূমপায়ীদের অপেক্ষা স্বাভাবিক লোকের বায়ুধারকত্ব কম হয়।

## ▲ বায়ুধারকত্ব (Vital Capacity, VC) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ গভীরতম প্রশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা বলপ্রয়োগে নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু দুটি ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে বায়ুধারকত্ব (Vital Capacity, VC) বলে।**

⊡ (b) **স্বাভাবিক মান :** প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষের এর পরিমাণ (TV+IRV+ERV) = (500+3000+1000) = 4500 ml এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে সামান্য কম।

⊡ (c) **বায়ুধারকত্বের পরিবর্তনের জন্য দায়ী শর্তসমূহ :** বয়স (Age), লিঙ্গ (Sex), দেহ তল (Body surface), দেহভঙ্গি (Posture), রোগ (Diseases) প্রভৃতি। **ফুসফুসজনিত রোগ, যেমন**—নিওমোনিয়া, হাঁপানি, প্লুরোসিস, অ্যাম্ফিসিমা নামে রোগে বায়ুধারকত্ব কমে যায়। অত্যধিক ধূমপায়ীদের অপেক্ষা স্বাভাবিক লোকের বায়ুধারকত্ব কম হয়।

## ❂ 4.5. শ্বাসকার্যে জড়িত বায়ু (Respiratory Air) ❂

### ▲ A. শারীরবৃত্তীয় ও শারীরস্থানীয় নিষ্ক্রিয় স্থান এবং তার তাৎপর্য (Physiological and Anatomical Dead space and its Significance)

❖ (a) **নিষ্ক্রিয় বায়ুর সংজ্ঞা (Definition of Dead space) :** শ্বাসঅঙ্গে যেসব অংশের আবদ্ধ বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসীয় রক্তজালকের রক্তের মধ্যে কোনো আদানপ্রদান ঘটে না, সেই সব স্থানকে নিষ্ক্রিয় স্থান বলে।

(b) **নিষ্ক্রিয় স্থানের স্বাভাবিক পরিমাণ (Normal amount of dead space) :** বিশ্রামকালে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের নিষ্ক্রিয় বায়ুর পরিমাণ প্রবাহী বায়ুর 500 মিলিলিটারের 30 শতাংশ অর্থাৎ **150 ml**। অতএব নিষ্ক্রিয় স্থানের আয়তন হল **150 ml**।

(c) **নিষ্ক্রিয় স্থানের প্রকারভেদ (Types of dead space) :** নিষ্ক্রিয় স্থান দুই প্রকারের হতে পারে, যেমন—শারীরস্থানিক নিষ্ক্রিয় স্থান এবং শারীরবৃত্তীয় নিষ্ক্রিয় স্থান।

1. **শারীরস্থানিক নিষ্ক্রিয় স্থান (Anatomical dead space)**—নাসারন্ধ্র থেকে প্রান্তীয় ক্লোমশাখা পর্যন্ত আবদ্ধ বায়ু যা গ্যাসের ($O_2$ এবং $CO_2$-এর) ব্যাপনে অংশ নেয় না সেই অংশকে **শারীরস্থানিক নিষ্ক্রিয় স্থান** বলে। এর ভেতরকার বায়ুকে **শারীরস্থানিক নিষ্ক্রিয় বায়ু** (Anatomical dead air) বলে।

2. **শারীরবৃত্তীয় নিষ্ক্রিয় স্থান (Physiological dead space)**—দাঁড়ানো অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য উপরের বায়ুথলিতে নীচের বায়ুথলির তুলনায় রক্ত সরবরাহ কম হয় ফলে সবটা অক্সিজেন ব্যাপিত হয় না। বায়ুথলির যে স্থানে এটি ঘটে তাকে শারীরবৃত্তীয় নিষ্ক্রিয় স্থান বলে এবং যে বায়ু ব্যাপনে অংশ নিতে পারে না তাকে **শারীরবৃত্তীয় নিষ্ক্রিয় বায়ু** (Physiological dead air) বলে। এর পরিমাণ প্রায় **100 ml**। শারীরস্থানিক নিষ্ক্রিয় বায়ু ও শারীরবৃত্তীয় নিষ্ক্রিয় বায়ু মোট পরিমাণ **150 ml + 100 ml = 250 ml** যা প্রবাহী বায়ু (500 ml)-এর পরিমাণের অর্ধেক।

(d) **তাৎপর্য (Significance) :** প্রশ্বাসের প্রবাহী বায়ুর প্রায় 70 শতাংশ বায়ু রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময়ের জন্য ফুসফুসীয় বায়ুথলিতে যায়। বাকি 30 শতাংশ নাসারন্ধ্র, নাসাগলবিল, শ্বাসনালি, ক্লোমশাখা, উপক্লোমশাখা এবং প্রান্তীয় (Terminal) ক্লোমশাখা অংশে আবদ্ধ থাকে। এইসব অংশের বায়ু ফুসফুসীয় রক্তজালকের রক্তের মধ্যে গ্যাসীয় আদানপ্রদান ঘটে না বলে এই পরিমাণ বায়ুকে **নিষ্ক্রিয় বায়ু পরিমাণ** (Dead space) বলা হয়।

### ▲ B. প্রশ্বাসবায়ু, নিশ্বাসবায়ু এবং বায়ুথলির বায়ুর উপাদান (Composition of Inspired, Expired and Alveolar air)

● 1. **প্রশ্বাসবায়ু (Inspiratory air) :**

❖ **সংজ্ঞা—প্রশ্বাসের সময় বায়ুমণ্ডল থেকে যে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্বাসবায়ু বলে।**

প্রশ্বাসবায়ুর উপাদান ও চাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের উপাদান ও তাদের আংশিক চাপের সমান। জলীয় বাষ্প প্রশ্বাসবায়ুকে সামান্য আর্দ্র রাখে। প্রশ্বাসবায়ুতে নিশ্বাসবায়ু অপেক্ষা বেশি পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। দেহ প্রশ্বাসবায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

● 2. নিশ্বাসবায়ু (Expiratory air) ঃ

❖ সংজ্ঞা—নিশ্বাসের সময় যে বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় তাকে নিশ্বাসবায়ু বলে। নিশ্বাসবায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রশ্বাসবায়ুর চেয়ে বেশি থাকে।

● বিশ্রামরত অবস্থায় বায়ুর উপাদান ও পরিমাণ ●
(Composition and Amount of air in resting condition)

| গ্যাসের নাম | প্রশ্বাসবায়ু | নিশ্বাস বায়ু | বায়ুথলির বায়ু |
|---|---|---|---|
| | পরিমাণ শতকরা (আংশিক চাপ) | পরিমাণ শতকরা (আংশিক চাপ) | পরিমাণ শতকরা (আংশিক চাপ) |
| অক্সিজেন | 20·94 (158·25 mm Hg) | 16·4 (116·2 mm Hg) | 14·2 (101·2 mm Hg) |
| কার্বন ডাইঅক্সাইড | 0·04 (0·3 mm Hg) | 4·0 (28·5 mm Hg) | 5·5 (40·0 mm Hg) |
| নাইট্রোজেন | 79·02 (596·45 mm Hg) | 79·6 (568·3 mm Hg) | 80·3 (571·8 mm Hg) |
| জলীয় বাষ্প | 10·5 (5·0 mm Hg) | 6·2 (47·0 mm Hg) | 6·2 (47·3 mm Hg) |

● 3. বায়ুথলির বায়ু (Alveolar air) ঃ

❖ সংজ্ঞা—ফুসফুসের গভীরতম অংশে অর্থাৎ ফুসফুসের বায়ুথলি ও বায়ুথলির নালি ও শ্বসন ক্রোমনালিকাতে থাকে এবং ফুসফুসীয় রক্তজালকের রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটায় তাকে বায়ুথলির বায়ু বলে।

অতএব বায়ুথলির বায়ু বলতে শুধুমাত্র শারীরস্থানীয় বায়ুথলির বায়ুকেই বোঝোয় না। বায়ুথলির বায়ুর পরিমাণ প্রবাহী বায়ুর (500 মিলি) মোট পরিমাণের 70 শতাংশ অর্থাৎ 350 মিলি।

● **নিশ্বাস বায়ু ও প্রশ্বাস বায়ুর উপাদানের তুলনা (Comparision of constituents of Inspiratory air and expiratory air) ঃ**

| নিশ্বাসবায়ু | প্রশ্বাসবায়ু |
|---|---|
| 1. যে বায়ু নিশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় তাকে নিশ্বাসবায়ু বলে। | 1. যে বায়ু বায়ুমণ্ডল থেকে প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহের মধ্যে নেওয়া হয় তাকে প্রশ্বাসবায়ু বলে। |
| 2. উপাদান—এই বায়ুতে প্রশ্বাসবায়ুর চেয়ে $O_2$-এর পরিমাণ (16·4%) কম এবং $CO_2$-এর পরিমাণ (4·0%) বেশি থাকে। | 2. উপাদান— এই বায়ুতে নিশ্বাসবায়ুর চেয়ে $O_2$-এর পরিমাণ (20·94%) বেশি এবং $CO_2$-এর পরিমাণ (0·04%) কম থাকে। |

## ❂ 4.6. সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ধূমপান (Active and Passive Smoking) ❂

### ▲ 1. সক্রিয় ধূমপান (Active Smoking)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—একজন ধূমপায়ী যে অবস্থায় জ্বলন্ত সিগারেট, চুরুট বা বিড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ দিয়ে টেনে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করায় তাকে সক্রিয় ধূমপান বা প্রধান প্রবাহী ধোঁয়া গ্রহণ বলে।**

(b) **সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকারক উপাদানগুলির প্রভাব (Effects of harmful constituents of cigarette smoke)**—সক্রিয় ধূমপানে প্রধান প্রবাহী ধোঁয়া (Main stream smoke) মুখের মাধ্যমে সরাসরি ফুসফুসে যায়। এর মধ্যে কিছুটা মুখের বা নাকের মাধ্যমে বের করে দেয় কিন্তু বেশির ভাগ অংশ ফুসফুসে থেকে যায়। এই প্রকার ধোঁয়ায় প্রায় 33 রকম যৌগের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। তামাক ও তামাক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির উপর উপাদানের মাত্রার তারতম্য ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়াতে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রধান উপাদানটি হল **নিকোটিন**। এছাড়া কার্বন মনোক্সাইডসহ অন্যান্য ক্যানসার সৃষ্টিকারী (কারসিনোজেন উপাদানগুলি—Carcinogenic substances) থাকে।

## ▲ 2. নিষ্ক্রিয় ধূমপান (Passive Smoking)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—ধূমপানের সময় ধোঁয়ার যে অংশ সন্নিহিত পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে এবং সেই ধোঁয়া যখন অনৈচ্ছিকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে নিষ্ক্রিয় ধূমপান বা পরিবেশগত ধূমপান (Environmental smoking) বলে।**

(b) **ব্যাখ্যা (Explanation)**—সক্রিয় ধূমপানের ফলে ধূমপায়ীর নাক-মুখ থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং জ্বলন্ত সিগারেট, বিড়ি, চুরুট থেকে আসা ধোঁয়ার সংমিশ্রণে তৈরি হয় **'নিষ্ক্রিয়পায়ী ধোঁয়া'** (Passive smoke)। এই নিষ্ক্রিয়পায়ী ধোঁয়া মানুষের খুবই ক্ষতিকারক। কারণ ঃ **প্রথমত**—নিষ্ক্রিয় ধূমপানের ধোঁয়া প্রধান প্রবাহী ধোঁয়ার (সক্রিয় ধূমপান—Active smoke) পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে কারণ নিষ্ক্রিয় ধূমপায়ীরা এই প্রকার ধোঁয়াকে নিশ্বাস ক্রিয়ায় নির্গত করে না ফলে ফুসফুসে থেকে যায়। **দ্বিতীয়ত**—এই ধরনের ধোঁয়ায় বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ বেশি মাত্রায় থাকে। **তৃতীয়ত**—এই ধোঁয়া **অপরিশোধিত** (Unfiltered) থাকে। এইসব কারণে একজন স্বাভাবিক ধূমপায়ীর থেকে নিষ্ক্রিয় ধূমপায়ীরাও ধূমপানের অধিক ক্ষতিকারক প্রভাবে আক্রান্ত হয়, যেমন—হৃৎপিণ্ডে **করোনারি আর্টারি সংক্রান্ত রোগ** (Coronary Arterial Disease—CAD), **অ্যানজাইনা পেক্টোরিস** (Angina pectoris) বা হৃৎপিণ্ডের ব্যথা ইত্যাদি হয়।

● **সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ধূমপানে দেহের উপর ক্রিয়া (Effect of active and passive smoking on body) ঃ**

1. **ক্যানসার উৎপাদনে ধূমপানের প্রভাব** (Effect of tobacco on Cancer production) —সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যানসার উৎপাদক, ক্যানসার-উদ্দীপক, ক্যারসিনোজেন উৎপন্নকারী পদার্থ, কো-ক্যারসিনোজেন, মিউটাজেন প্রভৃতি পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এইসব পদার্থগুলি মানুষের মুখ, শ্বাসনালি, গ্রাসনালি ও ফুসফুসে ক্যানসার হতে সাহায্য করে।

2. **ফুসফুসের উপর ধূমপানের ক্রিয়া** (Effect of smoking on Lungs)—ধূমপান ফুসফুসে যেসব রোগের সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রধান —

(i) **শ্বাসনালির প্রদাহ (ব্রংকাইটিস**—Bronchitis)—ধূমপান থেকে **ব্রংকাইটিস** বা শ্বাসনালিতে প্রদাহ ও কাশির উদ্ভব হয়। ব্রংকাইটিসের একটি বিশেষত্ব হল শ্বাসনালিকা পর্যায়ক্রমিক সংকীর্ণ হয়ে হাই ওঠে ফলে **হাঁফানি** বা **শ্বাসকষ্টের** উদ্ভব হতে পারে।

(ii) **ফুসফুসের অতিস্ফীতি (এম্ফিসিমা**—Emphysema) — ধূমপানের ফলে শ্বসন নালিকাগুলি বায়ুপথ সমূহের সরু হয়ে যায়, এর ফলে একে **এমফিসিমা** বলে। জটিল এমফিসিমা অবস্থায় ফুসফুসে যেসব পরিবর্তন আসে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় না।

(iii) **উদ্‌গারী কাশি** (Smokers cough) —প্রচণ্ড কাশি ও কেশে কেশে ফুসফুস থেকে শ্লেষ্মাকে তুলে আনার নাম **উদ্‌গারি কাশি**। ধূমপায়ীদের মধ্যে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। (অন্যান্য পরিবর্তন—উচ্চমাধ্যমিক প্রথম খণ্ড 12নং অধ্যায় দেখো)।

3. **রক্তবাহ-হ্রাসজনিত হৃদ্‌রোগ** (Ischemic heart diseases) —পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও জানা গেছে **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** বা বুকে হৃৎপিণ্ডের ব্যথা ও **ইসচেমিক হৃদ্‌রোগের** সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক রয়েছে। (ii) ধূমপান অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে **ক্যাটেকোলামিন ক্ষরণ** বাড়িয়ে দেয়, যা অণুচক্রিকায় অসঞ্জন (Adhesiveness) বৃদ্ধি করে **থ্রমবোসিসের** ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের **স্পন্দনবিকার** (arrhythmia) দেখা যায় যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। (iii) ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যাটেকোলামিনের অত্যধিক ক্ষরণে ট্যাকিকারডিয়া (হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি) ও খানিকটা রক্তচাপ-বৃদ্ধিও লক্ষ করা যায়।

4. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on central nervous system)—সামান্য পরিমাণে মাথা ঝিমঝিম, কম্পন, অনিদ্রা ও কখনো-কখনো স্নায়ুশূল (Neuralgia) দেখা যায়।

5. **পৌষ্টিকনালির উপর প্রভাব** (Effect on gastrointestinal disorder)—ধূমপান পাকস্থলী বা ডিওডিনামে ঘা (ulcer) ইত্যাদির জন্য দায়ী না হলেও সম্ভবত এদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

6. **গর্ভাবস্থার উপর প্রভাব** (Effect of smoking on pregnancy)—গর্ভাবস্থায় যেসব মায়েরা ধূমপান করেন তাঁদের শিশু জন্মের সময় কম ওজনের হয় এবং তাদের গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়।

7. **যৌনজীবনের উপর ধূমপানের প্রভাব** (Effect on reproductive system)—ধূমপানের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে মাসিক যৌন চক্র বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ মেনাপেজ তাড়াতাড়ি ঘটে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু উৎপাদন ব্যাহত হয়।

8. **অন্যান্য পরিবর্তন** (Other changes)— (i) ক্ষুধামান্দ্য, দাঁতের ক্ষয়, গলা ও জিহ্বার প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। (ii) কিছু কিছু ধূমপায়ীর দৃষ্টিশক্তিও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। (iii) ধূমপান ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা অল্পদিনের মধ্যে হ্রাস ঘটায়। (iv) ধূমপান রক্তনালির সংকোচনের মাধ্যমে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। প্রায়ই বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঝিমঝিম ইত্যাদি উপসর্গ উৎপন্ন করে। নিকোটিনের সক্রিয়তা অনেকটা অ্যাডরেন্যালিনের মতো।

## ✪ 4.7. সাধারণ শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধীয় রোগ ও তাদের কারণসমূহ ✪ (Common Respiratory diseases and their causes)

### ▲ 1. হাঁপানি (অ্যাজমা—Asthma)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ শ্বাসতন্ত্রের ক্লোমশাখা এবং উপক্লোমশাখার প্রাচীরের মসৃণ পেশির প্রদাহ এবং হঠাৎ সংকোচন (Spasm) ঘটার ফলে দেহের (প্রধানত) শ্বাসজনিত অঙ্গগুলির এবং শারীরিক যেসব উপসর্গ (অস্বস্তিকর ও কষ্টদায়ক শ্বাসক্রিয়া—শ্বাসকষ্টজনিত টান, দমকা কাশি ইত্যাদি) ঘটতে দেখা যায় তাকে হাঁপানি (অ্যাজমা—**Asthma) **রোগ বলে।**

**হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট একপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিকর রোগ যা শ্বাসক্রিয়া প্রধানত নিশ্বাস ক্রিয়ার সময় ঘটে।** এর কারণ শ্বাসনালির ক্লোমশাখা এবং ক্লোমনালির শ্লেষ্মাস্তর থেকে বেশি পরিমাণ শ্লেষ্মার (মিউকাসের) ক্ষরণ ঘটে। অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মার ক্ষরণের ফলে ক্লোমশাখা ও ক্লোমনালিকাগুলি শ্লেষ্মা দিয়ে ভরতি হয়ে যায়। এই কারণে ফুসফুসের বায়ুথলিগুলি বায়ু দিয়ে ভরতি থাকায় স্বাভাবিক প্রশ্বাস-নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

(b) **হাঁপানির কারণ (Causes of Asthma) ঃ** হাঁপানির প্রধান কারণ হচ্ছে অ্যালার্জি। প্রশ্বাসের সময় অর্থাৎ বিশেষ কোনো খাবারের মাধ্যমে দেহে অ্যালার্জি উৎপন্নকারী পদার্থ **অ্যালারজেন** (Allergen) নামে বিজাতীয় পদার্থ প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের উপক্লোমশাখা (ব্রংকিওল) বিভিন্ন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাই কোনো বিজাতীয় পদার্থ শ্বাসতন্ত্রের বায়ুপরিবহনকারী নালির যেকোনো অংশের সংস্পর্শে এলে হাঁপানি রোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। হাঁপানি বংশগত রোগ। যাদের বংশে টনসিল প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি থাকে তাদের বংশধরদের হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অধিক হয়। পরিবেশের দুষণও এই রোগের জন্য দায়ী, যেমন—ধূলো, কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়া, বিভিন্ন কলকারখানাজাত দূষক পদার্থ ইত্যাদি। ধূমপানে এই রোগ বাড়ে। হাঁপানি বিছানা ও বালিশে জমে থাকা ধূলো, বিভিন্ন ফুলের রেণু, পোষা প্রাণী বা পাখির লোম ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে।

(c) **উপসর্গ (Symptoms)**— ক্লেশদায়ক শ্বসন (Dyspnoea), অনিয়মিত তীব্র কাশি, সাঁই সাঁই শব্দ, কষ্টদায়ক শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস বর্জন, শ্লেষ্মা মিশ্রিত থুথু বা লালা (Sputum), বক্ষগহ্বরের সংকোচনের অনুভূতি ইত্যাদি হাঁপানি রোগের বিশেষ কয়েকটি উপসর্গ।

(d) **নিবারণ ও আরোগ্য (Prevention and Cure)**— হাঁপানি প্রধানত একপ্রকার অ্যালার্জি জনিত রোগ। এই কারণে কোনো বিজাতীয় বস্তু কিংবা অন্য কোনো **অ্যালার্জেন** (যে বস্তু অ্যালার্জি ঘটায়) ইত্যাদিকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

(e) **চিকিৎসা (Treatment)**— হাঁপানি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজনে কয়েক প্রকার ব্রোঙ্কডায়ালেটার (Bronchodialater)—ম্যালবিউটামল ইনহেলার ওষুধ যা শ্বাসনালির ক্লোমশাখার প্রসারণ ঘটায়। এছাড়া প্রদাহ জনিত হাঁপানির জন্য প্রয়োজন স্টেরয়েড ইনহেলার। এই দুইপ্রকার ইনহেলার মুখের মাধ্যমে নেওয়া হয়। ইনহেলার ওষুধ ব্যবহারে সাময়িকভাবে শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক ও সহজ হয়।

### ▲ 2. যক্ষ্মা (Tuberculosis—TB)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ** *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* **(*Mycobacterium tuberculosis*) নামে ব্যাকটেরিয়া দেহে যে সংক্রামিত রোগ উৎপন্ন করে তাকে যক্ষ্মা (সংক্ষেপে TB) বলে।**

(b) **যক্ষ্মার কারণ (Causes of Tuberculosis) ঃ** 1882 খ্রিস্টাব্দে রবার্ট কচ (Robert Kotch) নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* নামে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করেন। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের

বিভিন্ন তন্ত্রে, প্রধানত ফুসফুসে যক্ষ্মা রোগের **গুটিকাকার মতো ক্ষত বা টিউবারকল্** (Tubercle) সৃষ্টি করে। এছাড়া এই ব্যাকটেরিয়া বৃক্ক, অন্ত্র, অস্থি ইত্যাদিকেও আক্রান্ত করে। ফুসফুসীয় সংক্রমণ প্রশ্বাসবায়ুর মাধ্যমে *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* দেহে প্রবেশ করে, আবার নিশ্বাসবায়ুর মাধ্যমে রোগী দেহ থেকে নির্গত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়াগুলি ফুসফুসের বায়ুথলিতে ম্যাক্রোফাজ কোশের সাহায্যে গৃহীত হয়ে ফুসফুসের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাকটেরিয়া ফুসফুসের যে অংশকে (প্রধানত বায়ুথলিকে) আক্রমণ করে সেই অংশের কলাকোশগুলিকে ধ্বংস করে এবং তাকে তন্তুময় যোগকলায় পরিণত করে। বুকের X-ray চিত্রে এই অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। যেহেতু এই প্রকার যোগকলা অস্থিতিস্থাপক এবং পুরু হয়। ফুসফুসের আক্রান্ত অংশটি নিশ্বাসের পর পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে না বলে বেশ কিছু পরিমাণ বায়ু বায়ুথলিতে থেকে যায়। আজকাল যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমশ বাড়ছে।

(c) **উপসর্গ (Symptoms)** ঃ যক্ষ্মার নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান উপসর্গ দেখা যায়—দীর্ঘদিন ধরে কাশি, কাশির সঙ্গে রক্ত, বুকে ব্যথা, দেহের ওজন হ্রাস ইত্যাদি।

(d) **প্রতিকার (Remedy)** ঃ মুখগহ্বর থেকে লালা মিশ্রিত থুতু (Sputum) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলিকে সহজে বিনষ্ট করা যায় না তবে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলি সহজেই মরে যায়। অনেক রকম ঔষধ যেমন— আইসোনিয়াজিড (Isoniazid) এবং রিফামপিন (Rifampin) যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধকারী ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্রাম, সূর্যালোক এবং সুষম খাদ্য ইত্যাদি এই রোগ চিকিৎসায় বিশেষ প্রয়োজন।

(e) **অনাক্রম্যতাকরণ (Immunisation)** ঃ **ক্যালমেট** (Calmette) এবং **গুয়েরিন** (Guerin) নামে দুজন ফরাসি বিজ্ঞানী 1906 খ্রিস্টাব্দে *মাইকোব্যাকটিরিয়াম বোভিস* (*M. bovis*) থেকে টিউবারকুলোসিস প্রতিরোধী ভ্যাকসিন তৈরি করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তেরো বছর পর **BCG** (Bacelle Calmette Guierin) নামে ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়। শিশুদের জন্মের পর বা ছয় সপ্তাহান্তে DPT ও পোলিও ভ্যাকসিনের সঙ্গে BCG টিকা দেওয়া হয়। BCG টিকা সাধারণত 15-20 বছর পর্যন্ত দেহে অনাক্রম্যতা বজায় রাখে।

## ▲ 3. ফুসফুসের ক্যানসার (Lung Cancer or Lung Carcinoma)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে অস্বাভাবিক অবস্থায় ক্যানসার উদ্দীপক, মিউটাজেন, কারসিনোজেন বা কো-কারসিনোজেন ইত্যাদি পদার্থের উপস্থিতিতে অনেকগুলি রোগের সমন্বয়ে শ্বাসঅঙ্গের বিভিন্ন কোশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত কোশবিভাজনের ফলে ফুসফুসে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে ফুসফুসের ক্যানসার (Lung cancer) বলে।**

(b) **ব্যাখ্যা (Explanation)** ঃ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে উত্তেজক পদার্থ (Irritating substances) প্রশ্বাসবায়ুর মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। ধোঁয়া (ধূমপানের ধোঁয়া) সহ প্রায় অন্যান্য দূষক পদার্থ শ্বাসনালি ও ক্লোমনালিকা (Bronchial tubes) দিয়ে উভয় ফুসফুসে যায়। এই সব দূষক পদার্থকে **পীড়ন পদার্থ** বা **উত্তেজিত পদার্থ** বলে। শ্বাসনালির ক্লোমশাখার ভিতরের প্রাচীর আবরণী কলারসস্তর দিয়ে গঠিত। কলাস্তরের উপরের কোশগুলি এই প্রকার উত্তেজিত পদার্থে সাড়া দেয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে ক্লোমনালিকা (Bronchial tube)-এর প্রাচীর তিন প্রকার কোশ দিয়ে গঠিত, যেমন (i) রোমযুক্ত স্তম্ভাকার আবরণী কোশ, (ii) গোবলেট কোশ স্তম্ভাকার কোশের অন্তর্বর্তী স্থানে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকে। গোবলেট কোশ থেকে শ্লেষ্মা (মিউকাস) ক্ষরিত হয়। (iii) পাদদেশের কোশ (Basal cells)। এই তিন প্রকার আবরণী কোশ ভিত্তিপর্দার উপরে সাজানো থাকে। স্তম্ভাকার কোশের মুক্তপ্রান্ত ক্লোমনালিকার লুমেনের দিকে থাকে। পাদদেশের কোশ লুমেনে উন্মুক্ত হয় না, তবে এই প্রকার কোশগুলি বিভাজিত হয়ে স্তম্ভাকার রোমশ আবরণী কোশস্তর গঠন করে।

(c) **ক্যানসার হওয়ার কারণ (Cause of Cancer)** ঃ ঘ্রাণের মাধ্যমে বিভিন্ন দূষক পদার্থ এবং প্রধানত ধূমপানের 99·7% ধোঁয়া শ্বাসনালি দিয়ে উপক্লোমশাখায় প্রবেশ করে ফলে উপক্লোমশাখার আবরণী কলাস্তরের গোবলেট কোশকে উদ্দীপিত করে তাদের সংখ্যা ও আকৃতিকে বাড়ায় ফলে এদের থেকে শ্লেষ্মার ক্ষরণের পরিমাণ বাড়ে। একই প্রকার উদ্দীপনা উপক্লোমশোখার পাদদেশের কোশগুলিকেও উদ্দীপিত করে, ফলে এই কোশগুলি আকৃতিতে বড়ো হয়ে উপরের দিকে গিয়ে স্তম্ভাকার এবং গোবলেট কোশের জায়গাগুলি দখল করে। সদ্যোজাত এই কোশগুলি এরপর প্রায় 20টি স্তরে সজ্জিত হয়ে অবস্থান করে। এই

অবস্থায় পীড়নদায়ক উদ্দীপনা (যেমন সিগারেটের ধোঁয়া) যদি অপসারিত করে নেওয়া হয়, তাহলে উপক্লোমশাখার পরিবর্তিত কলাস্তর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। পীড়নদায়ক উদ্দীপনা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে শ্লেষ্মার ক্ষরণের পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং স্তম্ভাকার আবরণী কোশগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে ফলে কোশের রোমগুলির বিচলন মন্থর হয়ে যাবে।

শ্লেষ্মার ক্ষরণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভাকার আবরণী কোশগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে কোশের রোমগুলির বিচলনকে বিনষ্ট করে। এই অবস্থায় ক্ষরিত শ্লেষ্মা গলার দিকে উঠতে পারে না ফলে উপক্লোমশাখার মধ্যে আটকে পড়ে। এই অবস্থায় ঘড় ঘড় শব্দের কাশি হয় যা **ধূমপানজনিত কাশি** (Smoker's cough) নামে পরিচিত। এছাড়া বিভিন্ন দূষণজনিত উদ্দীপনা ফুসফুসের বায়ুথলির আবরণী কোশগুলি খুব ধীরে ধীরে ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে মোটা ও অস্থিতিস্থাপক যোগকলায় রূপান্তরিত হয়। শ্বেতকণিকা এবং ম্যাক্রোফাজ (আগ্রাসন) কোশ থেকে উৎপন্ন প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক বায়ুথলির কোশগুলিকে বিনষ্ট করে। উপক্লোমশাখার মধ্যে যে শ্লেষ্মা আবন্ধ থাকে তা বায়ুথলির মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে সহস্রাধিক বায়ুথলিগুলি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এই কারণে $O_2$ ও $CO_2$ গ্যাসের আদানপ্রদানের জন্য ব্যাপন তলের আয়তন কমে যায় ফলে প্রশ্বাসক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও বায়ুথলিগুলি বায়ুতে পূর্ণ থাকে। এই অবস্থাকে **এম্ফিসিমা** (Emphysema) বলে। যদি পীড়ন জাতীয় উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে, তাহলে এম্ফিসিমা অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। উপক্লোমশাখার প্রাচীরে অবস্থানকারী পাদদেশের (Basal cells) কোশগুলির আরও বিভাজিত হয়ে ভিত্তিপর্দার মাধ্যমে ভেঙে যাবে। এই অবস্থা থেকে *ব্রঙ্কোজেনিক কারসিনোমা* বা *ল্যাং কারসিনোমা* **(ক্যানসার) পর্যায় শুরু হয়**। এরপর স্তম্ভাকার ও গোব্লেট কোশগুলি অদৃশ্য হয়ে যেসব ফাঁকাস্থান উৎপন্ন করে সেগুলিকে **আঁশাকার ক্যানসার কোশ** (Squamous cancer cells) অধিকার করে। পরে ম্যালিগন্যান্টের কোশ ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে একটি ফুসফুসের সমগ্র অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং একপাশের ক্লোমনালিকাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। যদি এই প্রতিবন্ধকতা ক্লোমশাখায় সৃষ্টি হয়, তাহলে খুব অল্প পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করবে। এছাড়া দেহে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া শ্লেষ্মার ক্ষরণকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেবে। শেষে রোগী এম্ফিসিমা, কারসিনোমা ইত্যাদি রোগে কষ্ট পায়।

(d) **ক্যানসারের লক্ষণ (Symptoms of Cancer)** ঃ শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী কাশি ও তার সঙ্গে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা (কফ) নির্গমন (Haemoptysis–coughing out of blood), বারে বারে শ্বাসনালিতে প্রদাহের ফলে স্বরভঙ্গ, প্রায়ই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়।

(e) **ক্যানসারের চিকিৎসা (Treatment of Cancer)** ঃ থুথুতে কোশের প্রকৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায় এছাড়া CT স্ক্যান, X-রে ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়। রোগ নির্ণয়ের পর ক্যানসার চিকিৎসার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি নেওয়া হয়, যেমন—

1. **রেডিওথেরাপি**—বিকিরণের মাধ্যমে ক্যানসারের কোশগুলিকে ধ্বংস করা যায়।
2. **কমোথেরাপি**—রাসায়নিক ওষুধ (ক্যানসার প্রতিরোধী) প্রয়োগ করে ক্যানসার কোশগুলির বিভাজন রোধ করা যায়।
3. **শল্যচিকিৎসা**—ফুসফুসের আক্রান্ত অংশ কেটে বাদ দিয়ে (Labectomy) অথবা আক্রান্ত ফুসফুসটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে (Pneumonectomy) ক্যানসার থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।

## ▲ 4. অক্সিজেনের অভাব (Hypoxia or Anoxia) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রা থেকে কমে গেলে তাকে অক্সিজেনের অভাব বা হাইপোক্সিয়া বা অ্যানোক্সিয়া বলে।**

**রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে তাকে অ্যানোক্সিমিয়া (Anoximia) বলে।**

(b) **অক্সিজেন অভাবের প্রকারভেদ (Types of Hypoxia)** ঃ অক্সিজেনের অভাব বা হাইপোক্সিয়া চার প্রকার—

1. **অক্সিজেন অভাবজনিত অ্যানোক্সিয়া (Hypoxic hypoxia) ঃ যে অবস্থায় ধমনি রক্তে অক্সিজেনের চাপ কম থাকে ফলে অক্সিজেনের অভাব দেখা যায় তাকে অ্যানোক্সিক অ্যানোক্সিয়া বা ধমনিজনিত অ্যানোক্সিয়া (Atrial hypoxia) বলে।**

● **কারণ**—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় বা ফুসফুসের অস্বাভাবিক অবস্থায় ধমনি রক্তে অক্সিজেন কম থাকার ফলে রক্তের হিমোগ্লোবিন $O_2$-এর সঙ্গে সংপৃক্ত হতে পারে না, ফলে দেহের বিভিন্ন কলাকোশ কম পরিমাণ অক্সিজেন পায়, যেমন—(i) প্রশ্বাসবায়ুতে কম পরিমাণ $O_2$-এর উপস্থিতি। (ii) স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে CO, NO, মিথেন

ইত্যাদির অন্যান্য গ্যাসের সংমিশ্রণ। (iii) শ্বাসনালি, ক্লোমশাখা, ক্লোমনালির প্রতিবন্ধকতা (ফুসফুসে প্রদাহ, এম্ফিসিমা, হাঁপানি রোগ)। (iv) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় হৃদ্‌রোগ (হৃৎপিণ্ডের বাম এবং ডান দিকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রভৃতি) কারণগুলি এই প্রকার অক্সিজেনের অভাব ঘটায়।

2. **রক্তাল্পতাজনিত অক্সিজেনের অভাব (Anemic hypoxia) : যে অবস্থায় রক্তে স্বাভাবিক (কার্যকরী) হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিবহন ক্ষমতা কমে যায় তাকে রক্তাল্পতাজনিত অক্সিজেনের অভাব বলে।**

● **কারণ**—(i) রক্তাল্পতা। (ii) কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, সালফোনামাইড প্রভৃতি দূষণজনিত গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে স্থায়ী যৌগ গঠন করে। তাই হিমোগ্লোবিন যথাযথ পরিমাণ অক্সিজেন বহন করতে পারে না।

3. **শ্লথগতিজ অক্সিজেনের অভাব (Stagnant Anoxia) : যে অবস্থায় রক্তপ্রবাহের গতি মন্থর হয়ে দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় তাকে শ্লথগতিজ অক্সিজেনের অভাব বলে।**

● **কারণ**—এইপ্রকার অক্সিজেনের অভাবে রক্তের সংবহনের গতি কম হলেও ধমনি রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ এবং চাপ স্বাভাবিক থাকে। (i) হৃদ্‌রোগ, (ii) শল্যচিকিৎসাজাত অভিঘাত (Surgical shock), (iii) হৃৎপিণ্ডে শিরারক্তের প্রত্যাবর্তনের ত্রুটি। (iv) রক্তপাত ইত্যাদি অবস্থায় রক্তের প্রবাহের গতি কমে যায় ফলে রক্ত সংবহনের গতি কম হওয়ায় কলাকোশ নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন পায় না।

4. **কলাকোশজনিত অক্সিজেনের অভাব (Histotoxic Anoxia) : সায়ানাইড, নারকোটিক ড্রাগ (চেতনানাশক ঔষধ) ইত্যাদির বিষক্রিয়ার প্রভাবে যখন কলাকোশ রক্তের অক্সিজেনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে দেয় না তখন তাকে কলাকোশজনিত অক্সিজেনের অভাব বলে।** এইপ্রকার অক্সিজেনের অভাবে দেহে স্বাভাবিক পরিমাণ রক্ত এবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংপৃক্তি, রক্তসংবহনের গতি স্বাভাবিক থাকে।

## ▲ 5. শ্বসনবিরতি (অ্যাপনিয়া—Apnoea)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : শ্বাসক্রিয়ায় (নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায়) সাময়িক বিরতিকে শ্বসনবিরতি বলা হয়।**

(b) **কারণ (Causes)** : সাময়িক শ্বসনবিরতি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্যবস্তুর গলাধঃকরণের সময়, হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে গেলে, ভেগাস (দশম করোটি স্নায়ুর) স্নায়ুর সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতে উদ্দীপনা-প্রয়োগ বা অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন ইত্যাদি কারণে সাময়িক শ্বসনবিরতি প্রতিবর্তের মাধ্যমে ঘটে। কোনো কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় বর্ধিত শ্বাসক্রিয়া ও শ্বসনবিরতির পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। একে পর্যায়ক্রমিক শ্বসন (Periodic breathing) বলে।

## ▲ 6. বর্ধিত শ্বসন (হাইপারপ্নিয়া—Hyperpnoea)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : শ্বাসক্রিয়ার (নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার) হারের বৃদ্ধিকে বর্ধিত শ্বসন বলা হয়।**

(b) **কারণ (Causes)** : বর্ধিত শ্বসনে অক্সিজেনের গ্রহণ বা কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত শ্বসনের জন্য দায়ী কারণগুলি হল—(i) পেশির সঞ্চালন, (ii) রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য, (iii) অক্সিজেনের অভাব, (iv) মানসিক আবেগ অবস্থায় শ্বাসকেন্দ্রের উপর গুরুমস্তিষ্কের প্রভাব, (v) শ্বাসকেন্দ্রের উপর হাইপোথ্যালামাসের প্রভাব, (vi) ত্বকে যন্ত্রণা, উত্তাপ, ঠান্ডা ইত্যাদি উদ্দীপনা থেকে উদ্ভূত প্রতিবর্ত, (vii) রক্তের চাপ কমে গেলে (viii) রক্তে $H^+$ আয়নের তীব্রতা বেড়ে গেলে ইত্যাদির শ্বাসক্রিয়া বেড়ে যায় অর্থাৎ বর্ধিত শ্বসন ঘটে।

## ▲ 7. ক্লেশদায়ক শ্বসন (ডিসপ্নিয়া—Dysponea)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : শ্বাসক্রিয়া যখন অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হয় তখন তাকে ক্লেশদায়ক শ্বসন বলা হয়।**

(b) **কারণ (Causes)** : ফুসফুসীয় বায়ুচলন স্বাভাবিকের চেয়ে যখন 4 থেকে 5 গুণ বেড়ে যায় তখন ক্লেশদায়ক বা যন্ত্রণাদায়ক শ্বসন ঘটে। যেসব কারণ (উদ্দীপক) শ্বাসকেন্দ্রকে বারে বারে উদ্দীপিত করে সেইসব কারণগুলি প্রধানত ক্লেশদায়ক শ্বসনের জন্য দায়ী। কারণগুলি হল— (i) রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। (ii) রক্তে $H^+$ আয়নের

তীব্রতার বৃদ্ধি। (iii) অক্সিজেনের অভাব। (iv) আন্তরযন্ত্র বা দেহের অন্যান্য অংশ থেকে অথবা গুরুমস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বর্ধিত স্নায়ু-উদ্দীপনা ইত্যাদি।

(c) **কখন ঘটে** ঃ যেসব অস্বাভাবিক (অসুস্থ) অবস্থার ফলে ক্লেশদায়ক শ্বসন ঘটে সেগুলি হল—(i) ফুসফুসের শোথ, রক্তাধিক্য, প্রদাহ ইত্যাদি পীড়াজনিত রোগ, ফুসফুসের প্রসারণক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস। (ii) হাঁপানি রোগ, স্বরযন্ত্র ও ক্লোমশাখায় প্রতিবন্ধকতা। (iii) পোলিওমায়ালিটিস রোগে আক্রান্ত শিশুদের, মধ্যচ্ছদা ও আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশির পক্ষাঘাত। (iv) কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় প্রশ্বাসবায়ুতে গ্যাসীয় চাপের হ্রাস। (v) রক্তাল্পতা। (vi) রক্তাধিক্যজনিত হৃদ্‌রোগ (Congestive heart failure)। (vii) রক্তে অম্লাধিক্য (অ্যাসিডোসিস)। (viii) কোনো কারণে দেহে বিপাকক্রিয়া বেড়ে গেলে। (ix) মানসিক আবেগজনিত বিকৃতি, মৃগীরোগ, মস্তিষ্কে প্রদাহ, স্নায়বিক দুর্বলতা, গুরুমস্তিষ্কের টিউমার ও রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। এই সব অবস্থায় শ্বাসক্রিয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়।

## ▲ 8. শ্বাসরোধ (অ্যাসফিক্সিয়া—Asphyxia) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ দেহের (রক্তের) এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যথাযথভাবে অবাধ বায়ু চলাচল না হলে এবং এই অবস্থা কিছুক্ষণ ধরে চলতে দিলে দেহে $CO_2$-এর আধিক্য এবং $O_2$-এর অভাব ঘটবে ফলে প্রাণীদেহে যেসব বিকারদশার উদ্ভব হবে ও শেষে প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে সেইসব ঘটনাবলিকে সম্মিলিতভাবে শ্বাসরোধ (Suffocation) বা অ্যাসফিক্সিয়া (Asphyxia) বলে।**

(b) **কারণ (Causes)** ঃ (i) রক্তে $CO_2$-এর পরিমাণের বৃদ্ধি ও $O_2$-এর পরিমাণ হ্রাস এবং (ii) অবাধ বায়ু চলাচলে প্রতিবন্ধকতা।

(c) **উপসর্গসমূহ (Symptoms)** ঃ শ্বাসরোধে তিনটি দশায় দেহে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়, যেমন—(i) প্রথম দশায় শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতা বৃদ্ধি ঘটে, কারণ রক্তে অধিক $CO_2$-এর উপস্থিতি ঘটে। (ii) দ্বিতীয় দশায় প্রতিবার গভীর প্রশ্বাসের সময় সমগ্র দেহ কাঁপতে থাকে। এছাড়া হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি, চোখের তারারন্ধ্রের সংকোচন ইত্যাদি দেখা যায়। (iii) তৃতীয় দশা হল শ্বাসরোধের শেষ দশা। এই দশায় প্রাণীর প্রতিবার প্রশ্বাস ক্রিয়ায় খিঁচুনিসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টান টানভাবে প্রসারিত হয়। মুখের মাধ্যমে জোরে ও গভীরভাবে প্রশ্বাস নিতে চেষ্টা করে এবং শেষে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এসব হবার প্রধান কারণ $O_2$-এর অভাব।

## ▲ 9. কেশিয়ন পীড়া (Cassion disease) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ কেশিয়ন হল উচ্চবায়ুপূর্ণ স্টীল দিয়ে তৈরি জলভেদ্য বক্ষ যার মধ্যে ডুবুরি রেখে জলের নীচে কাজ করার জন্য রাখা হয় এবং কাজ করার পর হঠাৎ উচ্চবায়ু থেকে স্বাভাবিক বায়ুতে ফিরে আসার ফলে তাদের দেহে যেসব সম্মিলিত পরিবর্তন বা উপসর্গগুলি দেখা যায় তাকে কেশিয়ন পীড়া (Caisson disease) বলে।**

(b) **কারণ (Cause)** ঃ কেশিয়নের মধ্যে বায়ু ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, ফলে বায়ুর চাপ প্রায় 8 গুণ অধিক হয়। এই অধিক উচ্চচাপ বায়ু ডুবুরি (Driver)কে রেখে জলের তলায় কাজ করানের সময় বায়ু থেকে কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অধিক পরিমাণ অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দেহে প্রবেশ করে রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কাজের পর স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলে উঠে এলে, রক্তে অতিরিক্ত দ্রবীভূত গ্যাসসমূহ বুদ্‌বুদের আকারে রক্ত থেকে নির্গত হতে চেষ্টা করে। এর মধ্যে $CO_2$ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের বুদ্‌বুদ রক্তে থেকে যায়। $O_2$ বুদ্‌বুদ পরে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোশে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নাইট্রোজেনের বুদ্‌বুদগুলি ভেঙে গিয়ে ফেনায় পরিণত হয় যা রক্তজালকের সূক্ষ্ম রক্তনালিকাগুলিকে অবরুদ্ধ করে। এছাড়া নাইট্রোজেন স্নায়ুতন্ত্রের উপর কুপ্রভাব ঘটিয়ে বিভিন্ন উপসর্গগুলি ঘটায়।

(c) **উপসর্গসমূহ (Symptoms)** ঃ (i) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফলে হাত-পা গুটিয়ে রাখার প্রবণতা। (ii) অন্যান্য উপসর্গ—মৃদু হৃৎস্পন্দন, পক্ষাঘাত, চেতনালোপ, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

## ▲ 10. পর্বত পীড়া (Mountain sickness) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : পর্বতের উপর প্রায় 18,000 ফুটের অধিক উচ্চতায় বসবাস করলে দেহে যেসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন বা পীড়া লক্ষ করা যায় তাকে পর্বত পীড়া বলে।**

(b) **কারণ (Cause) :** পর্বতের অধিক উচ্চতায় $O_2$-এর অভাব (হাইপোক্সিয়া) ঘটার ফলে পর্বতপীড়া ঘটে।

(c) **উপসর্গ (Symptoms) :** যখন একজন ব্যক্তি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় পৌঁছায় তখন সেই ব্যক্তি 8–24 ঘণ্টার মধ্যে পর্বতপীড়ায় আক্রান্ত হয় ফলে বিভিন্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই লক্ষণগুলি 4–8 দিন স্থায়ী থেকে আবহসহিষ্ণুতার ফলে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। পর্বত পীড়ার প্রধান কয়েকটি উপসর্গ হল— (i) কষ্টদায়ক শ্বসন (Dyspnea), (ii) বমি বমি ভাব (Nausea), (iii) হাঁপানি, (iv) বুকে ব্যথা (Chest pain), (v) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার বৃদ্ধি, (vi) অনিদ্রা, (vii) ক্ষুধামান্দ্য (Anorexia), (viii) দেহের ওজন হ্রাস, (ix) দুর্বলতা ও মাথা ধরা, (x) দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে চেতনালোপ পেতে পারে।

## ▲ 11. আবহসহিষ্ণুতা (Acclimatization) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় নতুন জলবায়ুতে নিজেকে উপযোগী করে তোলার জন্য মানুষের দেহে যেসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তাকে আবহসহিষ্ণুতা বলা হয়।**

(b) **কারণ (Cause) :** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় (14,000 ফুট) স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যায়। দেখা গেছে 14,000 ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ (760 mm Hg) থেকে প্রায় 50 শতাংশ অর্থাৎ 380 mm Hg সমান হয়। এর ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় অর্থাৎ হাইপোক্সিয়া হয়। হাইপোক্সিয়ার ফলে দেহে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

(c) **আবহসহিষ্ণুতার শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন :** পর্বতারোহণের সময় পরিবর্তন দেখা যায় যা দেহকে পরিবেশের উপযোগী করে তোলে। এজাতীয় পরিবর্তন মাঝারি ধরনের উচ্চতা (10,000-14,000 ফুট) ও শুধুমাত্র ধীর গতিতে পর্বত আরোহণের সময় ঘটতে দেখা যায়। আবহসহিষ্ণুতায় দেহে দু'ধরনের (তাৎক্ষণিক এবং বিলম্বিত) পরিবর্তনসমূহ লক্ষ করা যায় :

● 1. **তাৎক্ষণিক পরিবর্তন** (Immediate changes)— শ্বাসক্রিয়া, রক্ত, রক্তসংবহন এবং বৃক্কে আশু পরিবর্তন ঘটে।

(i) **শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন**—অধিক উচ্চতায় $O_2$-এর পরিমাণ কমে শ্বাসকেন্দ্র উদ্দীপিত করে-ফুসফুসীয় বায়ুচলন ও ফুসফুসের আয়তনকে বাড়ায়। ফুসফুসের বায়ুচলাচলের বৃদ্ধিতে অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

(ii) **রক্তের পরিবর্তন**—রক্তের পরিমাণ ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ে ফলে রক্তের $O_2$-ধারণক্ষমতা বাড়ে। $O_2$ কমে গেলে প্লিহার সংকোচন ঘটে, ফলে প্লিহাতে সঞ্চিত রক্ত সংবহনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং রক্তের পরিমাণকে বাড়ায়।

(iii) **রক্তসংবহনতন্ত্রের পরিবর্তন**—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহার, মিনিট পরিমাণ, রক্তচাপের বৃদ্ধি মস্তিষ্কে বাহনিয়ামক কেন্দ্রের সক্রিয়তা বাড়ার ফলে রক্তবাহের সংকোচন ঘটে। তা ছাড়া রক্তের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

(iv) **রেচনতন্ত্রের পরিবর্তন**—মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অ্যামোনিয়া-লবণের পরিমাণ কমে যায়।

● 2. **বিলম্বিত পরিবর্তন** (Delayed changes) : বিলম্বিত পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান পরিবর্তন হল—

(i) **অস্থিমজ্জায় পরিবর্তন**—এই পরিবর্তনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। $O_2$-এর অভাবে বৃক্ক থেকে ইরিথ্রোপেয়েটিন নামে একপ্রকার জৈবরাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যা বৃক্ক থেকে রক্তের মাধ্যমে অস্থি মজ্জায় যায়। অস্থিমজ্জার লোহিতমজ্জা থেকে লোহিতকণিকার উৎপাদন ঘটে। এর ফলে রক্তে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। প্রতি ঘনমিলিমিটারে লোহিতকণিকার সংখ্যা 6 থেকে 8 মিলিয়ন (60-80 লক্ষ) পর্যন্ত বৃদ্ধি (Polycythemia) পায়। রক্তসংবহনে অনেক অপরিণত লোহিতকণিকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

(ii) বেশি দিন অধিক উচ্চতায় বসবাস করলে ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব (Vital capacity) বাড়ে।

## ▲ শ্বাসতন্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি অতিরিক্ত রোগ (Some more diseases related to Respiratory system) :

1. **প্লুরিসি** (Pleurisy)—যে অবস্থায় প্লুরা পর্দার প্রদাহ ঘটে সেই অবস্থাতে যে রোগ হয় তাকে প্লুরিসি বলে।
2. **প্লুরোনিউমোনিয়া** (Pleuropneumonia)—সংক্রমণের ফলে ফুসফুস সহ প্লুরার প্রদাহ ঘটলে তাকে প্লুরোনিউমোনিয়া বলে।
3. **নিউমোকোনিওসিস** (Pneumoconosis)—ফুসফুসে 0·5 মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত ধূলিকণা প্রবেশ করবার জন্য যে রোগ হয় তাকে নিউমোকোনিওসিস বলে।
4. **অ্যানথ্রাকোসিস** (Anthracosis)—ফুসফুসে কয়লার কণা প্রবেশের জন্য যে রোগ হয় তাকে অ্যানথ্রাকোসিস বলে।
5. **সিলিকোসিস** (Silicosis)—কোনো কারণে ফুসফুসে সিলিকন কণার প্রবেশ ঘটলে যে রোগ হয় তাকে সিলিকোসিস বলে।
6. **অ্যাসবেসটোসিস** (Asbestosis)—অ্যাসবেসটসের সূক্ষ্ম কণা ফুসফুসে প্রবেশ করলে যে রোগ হয় তাকে অ্যাসবেসটোসিস বলে।
7. **হিমোথোরাক্স** (Hemothorax)—কোনো কারণে প্লুরা গহ্বরে রক্ত জমে যাওয়ার ফলে যে রোগ হয় তাকে হিমোথোরাক্স বলে।
8. **হাইড্রোথোরাক্স** (Hydrothorax)—অতিরিক্ত সেরাস তরল প্লুরা গহ্বরে জমা হওয়ার ফলে যে রোগ হয় তাকে হাইড্রোথোরাক্স বলে।
9. **প্লুরাল এফিউশন** (Pleural effusion)—প্লুরাথলিতে অতিরিক্ত তরল জমা হবার ফলে জ্বর, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গজনিত রোগ হলে তাকে প্লুরাল এফিউশন বলে।
10. **নিউমোসিস্টোসিস** (Pneumocystosis)—*Pneumocystis carinii* নামে পরজীবী দ্বারা সংক্রমিত ফুসফুসের যে রোগে জ্বর, কাশি, নীল চর্ম প্রভৃতি হয় তাকে নিউমোসিস্টোসিস বলে।
11. **নিউমোনিয়া** (Pneumonia)—*Diplococcus pneumoniae* নামে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ফুসফুসের শ্লেষ্মা জমা হয়ে যে প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত হয় তাকে নিউমোনিয়া বলে।
12. **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া** (Bronchopneumonia)—এই রোগ ক্লোমশাখা থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুসফুসের উভয় বায়ুস্থলীই আক্রান্ত হয়।
13. **নিউমোনাইটিস** (Pneumonitis)—ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে বায়ুস্থলী প্রাচীরের প্রদাহজনিত রোগকে নিউমোনাইটিস বলে।
14. **ব্রঙ্কাইটিস** (Bronchitis)—ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে শ্বাসনালি ও ক্লোমশাখার শ্লেষ্মাপর্দার প্রদাহজনিত রোগকে ব্রঙ্কাইটিস বলে।
15. **ব্রঙ্কোস্প্যাজম** (Bronchospasm)—যেকোনো কারণে ক্লোমশাখা ও উপক্লোমশাখার মসৃণ পেশি সংকোচনে শাখাগুলো সরু হয়ে যায় ফলে কষ্টকর শ্বাসকার্য ঘটে।
16. **কষ্টকর শ্বাসকার্যের লক্ষণ** (Respiratory distress syndrome—RDS)—এই রোগে ভূমিষ্ঠ শিশুদের সারফেকট্যান্টের অভাবে ফুসফুস প্রসারিত হয় না।
17. **ইমফিসেমা** (Empysema)—দীর্ঘদিন হাঁপানিতে ভোগবার জন্য বায়ুস্থলীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হেতু প্রসারণ এবং গ্যাসীয় বিনিময়স্থানের হ্রাসপ্রাপ্তিজনিত পীড়া।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. শ্বাসকেন্দ্র কী ? এদের নাম করো এবং মস্তিষ্ককাণ্ডে এদের অবস্থান বিবৃত করো।**

● মস্তিষ্কের যে অংশ শ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে শ্বাসকেন্দ্র বলে। এটি প্রধানত দু'রকমের, যেমন—মেডুলারি কেন্দ্র এবং পনটাইন কেন্দ্র। প্রতিটি আবার দু'রকমের হয়, যথা— (i) মস্তিষ্কের মেডালা অবলংগাটাস্থিত মেডুলারি

কেন্দ্র—এটি **প্রশ্বাস** কেন্দ্র এবং **নিশ্বাস** কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। এই দুটি কেন্দ্র প্রশ্বাস ও নিশ্বাস কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) মস্তিষ্কে পনসে অবস্থিত **পনটাইন কেন্দ্র**—এটি অ্যাপনিউস্টিক কেন্দ্র এবং **নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র** নিয়ে গঠিত। এই দুটি পনটাইন কেন্দ্র মেডুলাস্থিত কেন্দ্রের প্রশ্বাস ও নিশ্বাস কেন্দ্র দুটির কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**2. একজন মানুষের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার গতি (হার) কত ?**

● **স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার গতি**—সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলে শ্বাসক্রিয়ার গতি প্রতি মিনিটে 14–18 (গড়ে 16) বার।

**3. (ক) হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত কী ? (খ) এটি দেহে কীভাবে কাজ করে ?**

● (ক) **হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত**—এটি একপ্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। হেরিং এবং ব্রুয়ার নামে দুজন বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নাম হেরিং-ব্রুয়ার প্রতিবর্ত হয়েছে। সাধারণ প্রতিবর্তের মতো এটিও পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন— (i) গ্রাহক (বায়ুথলির গায়ে অবস্থিত), (ii) অন্তর্বাহী স্নায়ু (ভেগাস স্নায়ু), (iii) কেন্দ্র (মেডুলা অবলংগাটাস্থিত প্রশ্বাস-নিশ্বাস কেন্দ্র), (iv) বহির্বাহী স্নায়ু (ইন্টারকস্টাল স্নায়ু) এবং (v) ক্রিয়াস্থান—প্রশ্বাস কাজে জড়িত পেশি।

(খ) **কার্যপদ্ধতি**—প্রশ্বাসকালে বায়ুথলি প্রসারিত হলে বায়ুথলির প্রাচীরের গ্রাহকগুলি (টান গ্রাহক) উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ুআবেগ উৎপন্ন করে। ওই স্নায়ুআবেগ ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে শ্বাসকেন্দ্রে যায় ও প্রশ্বাস কেন্দ্রটির কাজকে বাধা দেয়, ফলে প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে নিশ্বাস কার্য শুরু হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে প্রশ্বাস এবং নিশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ শ্বাসক্রিয়া ঘটে।

**4. নিউমোথোরাক্স কী ?**

● **নিউমোথোরাক্স**—স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুসের মধ্যে সবসময় কম-বেশি বায়ু থাকে। বলপূর্বক নিঃশ্বাস নিলেও কিংবা সর্বাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফুসফুসকে কখনই বায়ুশূন্য করা যায় না। অর্থাৎ বলপূর্বক নিশ্বাস ক্রিয়ার শেষেও ফুসফুস কিছুটা ফোলানো অবস্থায় থাকে। অবশ্য প্লুরা গহ্বরকে বায়ুতে উন্মুক্ত করলে অর্থাৎ বক্ষপ্রাচীরটিকে ফুটো করলে ফুসফুস চুপসে যায়। এই চুপসে যাওয়া অবস্থাকে নিউমোথোরাক্স (Pneumothorax) বলে।

**5. (ক) শ্বাসক্রিয়ায় জড়িত প্রধান পেশি কোন্‌টি ? (খ) এই প্রকার পেশির সঠিক অবস্থান একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও।**

● শ্বাসক্রিয়ায় জড়িত প্রধান ও মুখ্য পেশিটি হল—আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশি। এটি দুই প্রকার অন্তস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশি এবং বহিস্থ আন্তর পঞ্জরাটি পেশি। এইসব পেশির অবস্থানের চিত্ররূপ পাশে দেওয়া হল।

চিত্র 4.13. : আন্তর পঞ্জরাস্থির পেশির অবস্থানের চিত্ররূপ।

**6. (ক) অন্তঃফুসফুসীয় চাপ এবং অন্তঃবক্ষীয় চাপ বলতে কী বোঝায়? (খ) এই দু'ধরনের চাপ কীভাবে শ্বাসক্রিয়ায় অংশ নেয় ?**

● (ক) **অন্তঃফুসফুসীয় চাপ**—ফুসফুসের ভেতরের চাপকে অন্তঃফুসফুসীয় চাপ (Intrapulmonary) বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের (760 mm Hg) সমান থাকে। এই কারণে অন্তঃফুসফুসীয় চাপকে 'O' চাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রশ্বাসক্রিয়া হওয়ার ঠিক আগে ফুসফুস দুটি ফুলে যাওয়ার ফলে অন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে গিয়ে – 2 থেকে – 6 mm Hg সমান হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের উচ্চচাপ থেকে বায়ু ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে।

(খ) **অন্তঃপ্লুরা চাপ বা অন্তঃবক্ষীয় চাপ**—এই চাপ প্লুরা-মধ্যস্থ চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় 2·5 mm of Hg সমান থাকে। প্রশ্বাসকালে বক্ষগহ্বরের প্রসারণের ফলে অন্তঃপ্লুরা চাপ বা অন্তঃবক্ষীয় চাপ (Intrathoracic pressure) কমে গিয়ে – 4 mm Hg সমান হয়। অন্তঃপ্লুরা চাপ কমে যাওয়ার ফলে ফুসফুসটির স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণ ঘটে।

**7. ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুথলির বায়ুপ্রবাহের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।**

| ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ | বায়ুথলির বায়ুপ্রবাহ |
|---|---|
| 1. শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগকে ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ বলে। | 1. ফুসফুস ও বায়ুথলির মধ্যে গ্যাসীয় আদানপ্রদানকে বায়ুথলির বায়ুপ্রবাহ বলে। |
| 2. শ্বাসপেশির সংকোচন ও প্রসারণ এবং বক্ষগহ্বরের ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ প্রক্রিয়াটি ঘটে। | 2. ফুসফুসীয় বায়ুর চাপ এবং বায়ুথলির বায়ুর চাপের তারতম্যের ফলেই বায়ুথলির বায়ুপ্রবাহ প্রক্রিয়াটি ঘটে। |

**8. (ক) স্বাভাবিক প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পেশির নাম উল্লেখ করো।**
**(খ) প্রশ্বাস কাজের জড়িত স্নায়ুগুলির নাম করো।**

- (ক) স্বাভাবিক প্রশ্বাস কাজে অংশগ্রহণকারী পেশি ও স্নায়ুর নাম ঃ পেশির নাম—(i) বহিস্থ আন্তর পঞ্জিরাস্থি পেশি ও (ii) মধ্যচ্ছদা পেশি।
  (খ) স্নায়ুর নাম—(i) ইন্টারকস্টাল স্নায়ু (ii) ফ্রেনিক স্নায়ু ও (iii) ভেগাস স্নায়ু।

**9. (ক) আমরা যদি একটি লম্বা নলের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তা কি সহজসাধ্য ? কেন ?**
**(খ) নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুতে শতকরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কত ?**
**(গ) আমাদের শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কাজ কী ?**

- (ক) লম্বা নলের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ সহজসাধ্য হবে না। প্রধান কারণ দুটি — (i) লম্বা নলের মধ্য দিয়ে বাতাস যাওয়া ও আসার সময় বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হবে এবং এই বাধা অতিক্রম করতে ফুসফুসীয় ও শ্বাসক্রিয়া জড়িত পেশিকে বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে। (ii) নলটি লম্বা হওয়ায় ডেড স্পেসের পরিমাণ বেশি হবে। এই কারণে প্রশ্বাসকালে ব্যক্তি কম $O_2$ পাবে, ফলে তাকে বেশি অক্সিজেন পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
  (খ) নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুতে $CO_2$-এর পরিমাণ —
  (i) নিশ্বাস বায়ুতে $CO_2$-এর শতকরা পরিমাণ — 4·0 ml।
  (ii) প্রশ্বাস বায়ুতে $CO_2$-এর শতকরা পরিমাণ — 0·04 ml।
  (গ) $CO_2$-এর কাজ— (i) কার্বন ডাইঅক্সাইড $H_2CO_3$ এবং $NaHCO_3$ তৈরির মাধ্যমে দেহে বাইকার্বোনেট বাফারতন্ত্র গঠন করে। (ii) এই বাফার বৃক্কের সহায়তায় অম্লক্ষারের সমতা বজায় রাখে। (iii) $CO_2$ শ্বাসকেন্দ্রের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

**10. আমরা শ্বাস বন্ধ করে মাত্র 40–50 সেকেন্ড রাখতে পারি কেন ?**

- আমরা শ্বাস বন্ধ করে 40-50 সেকেন্ড ধরে রাখতে পারি। এর বেশি নয়, কারণ এর বেশি সময় শ্বাসক্রিয়াকে ধরে রাখলে রক্তে $CO_2$-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। রক্তে $CO_2$-এর পরিমাণ বাড়লে তা শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। এর ফলে শ্বাসক্রিয়া আর ধরে রাখা যায় না।

**11. (ক) এক গ্রাম হিমোগ্লোবিন কত পরিমাণ অক্সিজেন পরিবাহিত করে ?**
**(খ) এক অণু হিমোগ্লোবিন দ্বারা কত অণু পরিমাণ অক্সিজেন পরিবাহিত হয় ?**

- (ক) এক গ্রাম হিমোগ্লোবিন 1·34 ml অক্সিজেন পরিবহন করে।
  (খ) এক অণু হিমোগ্লোবিন 4 অণু অক্সিজেন ($4O_2$) পরিবহন করে।

**12. প্রতি 100 ml (i) ধমনি-রক্তে ও শিরা-রক্তে কত পরিমাণ অক্সিজেন থাকে ?**

- (i) 100 ml ধমনি-রক্তে প্রায় 10–20 ml অক্সিজেন থাকে।
  (ii) 100 ml শিরা-রক্তে প্রায় 14–15 ml অক্সিজেন থাকে।

**13. প্রতি 100 মিলিলিটার ধমনি-রক্ত কত পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করে তা ব্যাখ্যা করো।**

- স্বাভাবিক চাপ উষ্ণতায় প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিন সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন দিয়ে সম্পৃক্ত হলে প্রায় 1·34 ml অক্সিজেন সঙ্গে যুক্ত হবে। দেখা গেছে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষের প্রতি 100 ml রক্তে প্রায় 15 gm হিমোগ্লোবিন থাকে। অতএব 100 ml ধমনি-রক্ত 1·34 x 15 = 20 ml অক্সিজেন পরিবহন করতে সক্ষম।

**14. কী কারণে রক্তরসের (প্লাজমা) চেয়ে লোহিত রক্তকণিকার বেশি পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয় ?**

- লোহিত কণিকায় বাইকার্বোনেট যৌগের উৎপাদন বেশি হয়। কারণ এতে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ নামে উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচক $CO_2$-কে দ্রুত $H_2O$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

**15. রক্তে অবস্থিত কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ নামে উৎসেচকের গুরুত্ব কী ?**

- **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের গুরুত্ব**—কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ একধরনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচক যা লোহিত কণিকায় থাকে। এই উৎসেচকের উপস্থিতিতে $CO_2$ অতি দ্রুত (প্রায় 1–2 সেকেন্ড) $H_2O$ সঙ্গে বিক্রিয়া করে $H_2CO_3$ (কার্বনিক অ্যাসিড) উৎপন্ন করে। $H_2CO_3$ রক্তে বাইকার্বনেট যৌগে উৎপন্ন করে $CO_2$-এর পরিবহনে অংশ নেয়। লোহিত কণিকার বাইরে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকে অনুপস্থিতিতে এই বিক্রিয়া হতে প্রায় 30 মিনিট সময় লাগে।

**16. (ক) আবহসহিষ্ণুতা (Acclimatisation) বলতে কী বোঝায় ? (খ) 10,000 ফুট উচ্চস্থানে প্রশ্বাসবায়ুতে শতকরা অক্সিজেনের পরিমাণ কত ? (গ) 10,000 ফুট উচ্চস্থানে নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন ?**

- (ক) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশি উচ্চতায় নতুন জলবায়ুতে নিজেকে উপযোগী করে তোলার জন্য মানুষের দেহে যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তাকে **আবহসহিষ্ণুতা** বলে।

  **(খ) আবহসহিষ্ণুতার পরিবর্তন**—(i) শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতা বাড়ে, (ii) হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি, হার্দ-উৎপাদের মিনিটে পরিমাণের বৃদ্ধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, (iii) ক্ষারীয় মূত্রের রেচন, (iv) রক্তের (R.B.C.) পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

  **উদাহরণ**—10,000 ফুট উচ্চস্থানে প্রশ্বাস বায়ুতে শতকরা $O_2$-এর পরিমাণ—14·5% (সমুদ্রপৃষ্ঠে—20·94 বা 21·00%)।

  (গ) 10,000 ফুট উচ্চতায় বায়ুতে $O_2$-এর আংশিক চাপও কম হয়, ফলে বায়ুমণ্ডলে $O_2$-এর আংশিক চাপও কম হয়। এই কারণে দেহে অক্সিজেন কম ঢোকে। ফলে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। অক্সিজেনের অভাব হলে শ্বাসক্রিয়া ক্রমশ বেড়ে যায়। এই কারণে নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

**17. (ক) পর্বতপীড়া কী ? (খ) এতে কী কী পরিবর্তন দেখা যায় ?**

- **(ক)** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশি উচ্চতায় (18,000 ফুট বা তার বেশি) পর্বতে উঠে বাস করলে মানুষের দেহে যেসব অসুস্থতা বা পীড়া দেখা যায় তাদের একত্রে পর্বতপীড়া বলে।

  **(খ) পরিবর্তন**—(i) কষ্টদায়ক শ্বাসক্রিয়া, (ii) বমি বমি ভাব, (iii) হৃৎস্পন্দন হার ও নাড়িস্পন্দন হারের বৃদ্ধি, (iv) মাথায় ও বুকে ব্যথা, (v) হাঁপানি, (vi) রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

**18. কেশিয়ন-পীড়া (Cassion disease) কাকে বলে ?**

- **কেশিয়ন-পীড়া : 1. সংজ্ঞা**—কেশিয়ন-পীড়া হল বায়ু উচ্চচাপজনিত পীড়া (Compressed air sickness)। কেশিয়ন হল উচ্চ বায়ুপূর্ণ বিশেষভাবে স্টিল দিয়ে তৈরি জলাভেদ্য কক্ষ। আগে ডুবুরিদের জলের নীচে কাজের জন্য এই কক্ষ ব্যবহৃত হত। কাজের পর হঠাৎ যদি এই উচ্চ বায়ুচাপ কক্ষ থেকে স্বাভাবিক বায়ুতে ফিরে আসে তাহলে দেহে যেসব সম্মিলিত পরিবর্তন বা উপসর্গগুলি দেখা যায় তাকে **কেশিয়ন-পীড়া** বলে।

  2. **উপসর্গসমূহ**—(i) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ফলে হাত-পা গুটিয়ে রাখার প্রবণতা। (ii) **অন্যান্য উপসর্গ**—মৃদু হৃৎস্পন্দন, পক্ষাঘাত, চেতনালোপ, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

**19. কেইনি-স্টোকস শ্বসন বা ক্রমশ্বসন (Cheyne-stokes breathing or Periodic breathing) কাকে বলে ?**

- যখন শ্বাসক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে হয় অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে বর্ধিত শ্বসন এবং বিরতি, এভাবে ঘটতে দেখা যায় তাকে **ক্রমশ্বসন** বা **কেইনি-স্টোকস শ্বসন** (Cheyne-stokes breathing) বলে। **উদাহরণ**—সুস্থ শিশু এবং ঘুমন্ত বয়স্ক লোকের কেইন-স্টোকস শ্বসন দেখা যায়। মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ রোগে (মেনিনজাইটিস) ওই প্রকার শ্বসন দেখা যায়।

**20. (ক) স্পাইরোগ্রাম কী ? (খ) স্পাইরোগ্রাম যন্ত্রের ব্যবহার উল্লেখ করো।**

- (ক) **স্পাইরোগ্রাম ঃ** ফুসফুসের বিভিন্ন বিভাগের বায়ুধারণের ক্ষমতাকে যে লেখচিত্র সাহায্যে প্রকাশ করা যায় তাকে **স্পাইরোগ্রাম** ( Spirogram ) বলে।

  (খ) **স্পাইরোগ্রাম যন্ত্রের ব্যবহার ঃ** শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ বিচলনের লেখচিত্র আঁকার যন্ত্রকে **স্পাইরোগ্রাম যন্ত্র** বা **স্পাইরোগ্রাফ** ( Spirograph ) বলে। এই যন্ত্রে নিশ্বাসবায়ু ও প্রশ্বাসবায়ুর গ্রহণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

**21. স্পাইরোমিটার বলতে কী বোঝো ?**

- **স্পাইরোমিটার ঃ** যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুধারকত্ব কিংবা নিশ্বাসপ্রশ্বাস বায়ুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তাকে **স্পাইরোমিটার** (Spirometer) বলে।

**22. অ্যালকালি রিজার্ভ কাকে বলে ?**

- প্রতি 100 ml রক্তে সবসময় 48 ml কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইকার্বোনেট যৌগ হিসেবে থাকে। এই কারণে একে অ্যালকালি রিজার্ভ বলে।

**23. নিশ্বাসবায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুথলীয় বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় কেন ?**

- যে বায়ু ফুসফুসের বায়ুথলিতে থাকে তাকে বায়ুথলীয় বায়ু ( Alveolar air ) বলে। এতে অক্সিজেনের পরিমাণ 14·2 শতাংশ থাকে। আবার বায়ু পরিবহনকারী নালির মধ্যে যে বায়ু আবদ্ধ থাকে তাকে **নিষ্ক্রিয় বায়ু** বলে যাতে 20·4 ml $O_2$ থাকে। নিশ্বাস কালে অপেক্ষাকৃত কম ( 14·2 শতাংশ ) $O_2$ -যুক্ত বায়ুথলীয় বায়ু বের হওয়ার সময় নিষ্ক্রিয় বায়ুর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি ( 20·94 শতাংশ ) $O_2$-যুক্ত বায়ুর সঙ্গে মিশে যায়, ফলে বায়ুথলীয় বায়ুতে $O_2$-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ $O_2$-এর পরিমাণ 16·4 শতাংশ হয়।

**24. নিশ্বাসবায়ুতে বায়ুথলীয় বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ কম হয় কেন ?**

- শ্বাসক্রিয়ায় বায়ুথলীয় বায়ু থেকে অনবরত অক্সিজেন রক্তে ঢোকে কিন্তু জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে বের হয়ে বায়ুথলীতে যায়। এই কারণে প্রশ্বাসবায়ুর তুলনায় বায়ুথলীয় বায়ুতে $O_2$-এর পরিমাণ অনেক কম কিন্তু $CO_2$ এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

  নিশ্বাস প্রক্রিয়ার সময় বায়ুথলীর প্রায় 350 ml বায়ুর সঙ্গে 150 ml অপরিবর্তিত নিষ্ক্রিয় বায়ু ( যাতে বায়ুথলীয় বায়ুর চেয়ে কম $CO_2$ থাকে ) একত্রে মিশে নিশ্বাসবায়ু তৈরি করে। এই কারণে নিশ্বাসবায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কম হয়।

**25. রক্তে কী কী অবস্থায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবাহিত হয় ?**

- **অক্সিজেনের পরিবহন ঃ** 1. অক্সিজেনের পরিবহন দু'ভাবে হয়; (i) **ভৌত দ্রবণ হিসেবে**— প্লাজমায় এবং (ii) রাসায়নিক যৌগ হিসেবে অর্থাৎ **অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে**—লোহিত রক্তকণিকা।

  2. **কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিবহন ঃ** কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবহন তিন ভাবে হয়, (i) **ভৌত দ্রবণ হিসেবে**—প্লাজমায়, (ii) **বাইকার্বোনেট হিসেবে**—লোহিত রক্ত কণিকায় $KHCO_3$ এবং প্লাজমায় $NaHCO_3$ এবং (iii) **কার্বামিনো যৌগ হিসেবে**— লোহিত কণিকায় **কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন** এবং প্লাজমায় **কার্বামিনো প্রোটিন** হিসেবে।

**26. খুব বেশি খাবার খেলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন ?**

- খুবি বেশি খাবার খেলে খাদ্যপূর্ণ পাকস্থলীটির আয়তন খুব বেড়ে যায়। এর ফলে স্বাভাবিক শ্বাসগ্রহণের সময় মধ্যচ্ছদাটি নীচে নামতে পারে না অর্থাৎ আন্তঃবক্ষীয় চাপ ও আন্তঃফুসফুসীয় চাপ হ্রাস হয় না। এর ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া হয় না। মধ্যচ্ছদাটিকে নীচে নামাতে বেশি বল লাগে। ওই বল প্রয়োগের জন্য শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

**27. আমাদের শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কাজ কী ?**

- **$CO_2$-এর কার্যাবলি ঃ** (i) কার্বন ডাইঅক্সাইড $H_2CO_3$ এবং $NaHCO_3$ তৈরির মাধ্যমে দেহে বাইকার্বোনেট বাফারতন্ত্র গঠন করে। (ii) এই বাফার বৃক্কের সহায়তায় অম্লক্ষারের সমতা বজায় রাখে। (iii) $CO_2$ শ্বাসকেন্দ্রের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. শ্বসন পথের শুরুর অংশকে কী বলে ?
2. শ্বাসতন্ত্রের যে পথের মাধ্যমে বায়ু পরিবাহিত হয় তাকে কী বলে ?
3. শ্বাসতন্ত্রের যে অংশের মাধ্যমে বায়ুর আদানপ্রদান ঘটে তাকে কী বলে ?
4. শ্বসন পথের প্রথমাংশের প্রকোষ্ঠ যা শ্বসনতন্ত্র ও পৌষ্টিকতন্ত্রের সাধারণ অংশ হিসেবে কাজ করে এবং পেশি ও তন্তু নিয়ে তৈরি তার নাম কী?
5. বক্ষ গহ্বরের পঞ্চম পাঁজরের কাছে শ্বাসনালি বিভক্ত হয়ে যে অংশ গঠন করে তার নাম কী ?
6. বায়ুপরিবহনকারী অংশ এবং বায়ু বিনিময়কারী অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য যেসব অঙ্গ শ্বাসকার্যে অংশ নেয় তাদের নাম কী ?
7. প্লুরা কী শ্বাস অঙ্গ না শ্বাস অঙ্গ নয় ?
8. অন্তস্থ শ্বসন ফুসফুসে ঘটে না কলা কোশে ঘটে ?
9. প্রশ্বাস কার্য সক্রিয় পদ্ধতি না নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি ?
10. যে স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে মধ্যচ্ছদায় প্রবেশ করে তার নাম কী ?
11. যে স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশিতে যায় তাকে কী বলে ?
12. যে ফাঁকা স্থান প্লুরার দুটি স্থানের অন্তর্বর্তী স্থানে থাকে তাকে কী বলে ?
13. যে ফাঁকা স্থান ফুসফুসের মধ্যে থাকে তাকে কী বলে ?
14. শ্বাসঅঙ্গের যেসব স্থানে আবদ্ধ বায়ু রক্তের সঙ্গে কোনো রকম আদান প্রদান ঘটাতে পারে না সেই বায়ুর নাম কী ?
15. স্বাভাবিক অবস্থায় যে বায়ু ফুসফুসের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তের মধ্যে $O_2$ এবং $CO_2$-এর আদান প্রদান ঘটায় তাকে কী বলে ?
16. যে বায়ু দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে কী বায়ু বলে ?
17. যে বায়ু আমরা বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে ফুসফুসে নিয়ে যায় সেই বায়ুর নাম কী ?
18. কোন্ বায়ুতে বেশি অক্সিজেন থাকে ?
19. স্বাভাবিক প্রশ্বাস এবং নিশ্বাস প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ বায়ু দেহে যথাক্রমে প্রবেশ করে বা নির্গত হয় তাকে কী বলে ?
20. স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর বলপূর্বক প্রশ্বাসের ফলে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে কী বলে ?
21. বলপূর্বক নিশ্বাসের ফলে অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ যে বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয় তাকে কী বলে ?
22. বলপূর্বক নিশ্বাসের পরও ফুসফুসে সব সময় যে বায়ু থেকে যায় তাকে কী বলে ?
23. একজন স্বাভাবিক যুবক স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর বলপূর্বক প্রশ্বাসের ফলে যে মোট বায়ু ধারণ করে তাকে কী বলে ?
24. একজন ইচ্ছাকৃতভাবে জ্বলন্ত সিগারেট ধোঁয়াকে মুখে টেনে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করালে তাকে কী ধরনের ধূমপায়ী বলা হবে ?
25. *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলাম* নামে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে দেহে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই রোগের নাম কী ?
26. দেহে কোনো কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে সেই অবস্থাকে কী বলে ?
27. শ্বসনবিরতি এবং বর্ধিত শ্বসন পর্যায়ক্রমে ঘটলে তাকে কী বলে ?
28. শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি যখন অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হয় তখন তাকে কী বলে ?
29. পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের ধোঁয়া যখন সরাসরি নাকের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে কী বলে ?
30. ক্লোমশাখা ও উপক্লোমশাখার সংকোচনজনিত রোগের নাম কী ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

1. শ্বসন পথের কোন্ অংশের মধ্য দিয়ে বায়ুর আদান প্রদান ঘটে না—ফুসফুস ☐ / শ্বসন উপক্লোমশাখা ☐ / বায়ুথলীয় নালি ☐ / ক্লোমশাখা ☐।
2. মানুষের ফুসফুসের উপর যে আবরণটি থাকে তাকে বলে—প্লুরা ☐ / পেরিকনড্রিয়াম ☐ / পেরিকার্ডিয়াম ☐ / পেরিটোনিয়াম ☐।
3. শ্বাসনালি (ট্রাকিয়া) স্বরযন্ত্রের শেষ প্রান্ত থেকে আরম্ভ হয় এবং কয়েকটি তরুণাস্থি নির্মিত 'U' আকৃতি বলয় নিয়ে গঠিত যার সংখ্যা হল—10-15টি ☐ / 15-18টি ☐ / 18-22টি ☐ / 25-30টি ☐।
4. ডান ক্লোমশাখার দৈর্ঘ্য—0·5 cm ☐ / 1·5 cm ☐ / 2·5 cm ☐ / 5 cm ☐।
5. বাম ক্লোমশাখার দৈর্ঘ্য—0·5 cm ☐ / 2·5 cm ☐ / 3·5 cm ☐ / 5 cm ☐।
6. যে প্রান্তীয় শেষ নালিটি সামান্য ফুলে গিয়ে বায়ু থলির মধ্যে প্রবেশ করে তার নাম হল—উপক্লোমশাখা ☐ / ক্লোমশাখা ☐ / অ্যাট্রিয়াম ☐ / বায়ুথলির নালি ☐।

7. ডান দিকের ফুসফুসের লোমের সংখ্যা—একটি □ / দুটি □ / তিনটি □ / অসংখ্য □।
8. নিম্নলিখিত অঙ্গাণু শ্বসনপথ গঠন করে—শ্বাসনালি → ফুসফুস → স্বরযন্ত্র → গলবিল □ / নাসিকা → স্বরযন্ত্র → গলবিল → □ / ক্লোম শাখা → বায়ুথলি → উপক্লোমশাখা □ / নাসিকা → গলবিল → স্বরযন্ত্র → শ্বাসনালি → ক্লোমশাখা → উপক্লোমশাখা → বায়ুথলি □ / নাক → মুখ → ফুসফুস □।
9. মানুষের শ্বাসক্রিয়া নিম্নলিখিত কোন্ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ?—প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং নিশ্বাস ক্রিয়া □ / অ্যাসপিরেশন বা শ্বাসগ্রহণ □ / বহিস্থ ও অন্তস্থ শ্বসন এবং নিশ্বাস ক্রিয়া □ / এর মধ্যে কোনোটাই নয় □।
10. শ্বাসক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র □ / সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র □ / প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র □ / স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র □ ।
11. নিম্নলিখিতের মধ্যে কোন্‌টি শ্বাসনালিকে কোলাপ্স হতে দেয় না ?—পেশি □ / মধ্যচ্ছদা □ / পাঁজর অস্থি □ / শ্বাসনালিস্থিত তরুণাস্থি বলয় □।
12. একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতিমিনিটে শ্বাসক্রিয়ার হার—10-12 বার □ / 12-18 বার □ / 20-25 বার □ / 25-30 বার □।
13. বায়ুথলি এবং রক্তবাহের মধ্যে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আদানপ্রদান ঘটে তা হল—সক্রিয় পরিবহন প্রক্রিয়ায় □ / অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় □ / সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় □ / ঝিল্লি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় □।
14. প্রশ্বাসবায়ু এবং নিশ্বাসবায়ুতে অক্সিজেনের আংশিক চাপ যথাক্রমে—158 এবং 116 mm Hg □ / 158 এবং 40 mm Hg □ / 100 এবং 95 mm Hg □ / 40 এবং 95 mm Hg □
15. মানুষের প্রশ্বাসবায়ু এবং নিশ্বাসবায়ুতে $CO_2$-এর আংশিক চাপ যথাক্রমে—0·3 এবং 40 mm Hg □ / 0·3 এবং 28·5 mm Hg □ / 40 এবং 46 mm Hg □ / 40 এবং 0·3 mm Hg □
16. মানুষের প্রশ্বাস এবং নিশ্বাস বায়ুতে $CO_2$-এর পরিমাণ যথাক্রমে— 0·03% এবং 5·3% □ / 0·4% এবং 5·0% □ / 0·04% এবং 4·0% □ / 0·03% এবং 4·0% □
17. বায়ুথলির বায়ুতে $O_2$ এবং $CO_2$ পরিমাণ যথাক্রমে—19·8% এবং 4·6% □ / 46% এবং 4% □ / 21% এবং 4% □ / 14·2% এবং 5·5% □
18. অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ প্রধানত শ্বাসতন্ত্রে কোথায় পাওয়া যায় ?—বায়ুথলিতে □ / উপক্লোমশাখায় □ / নাসারন্ধ্রে □ / ক্লোমশাখায় □
19. নিষ্ক্রিয় বায়ু কোথায় থাকে ?—বায়ুথলিতে + উপক্লোমশাখায় □ / নাসারন্ধ্রে + গলবিল + শ্বাসনালি ক্লোমশাখায় + উপক্লোম শাখায় □ / শ্বাসনালি □ / শ্বাসতন্ত্রের বাইরের বায়ুতে □।
20. স্বাভাবিক প্রশ্বাস ও নিশ্বাসে কত পরিমাণ বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করি?—0·5 লিটার □ / 1·5 লিটার □ / 2·5 লিটার □ / 5·5 লিটার □।
21. বলপূর্বক নিশ্বাসের পরেও ফুসফুসে যে 1·2 লিটার বায়ু থেকে যায় তাকে বলে—প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ □ / প্রশ্বাস কাজের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ □ / অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ □ / নিশ্বাস কাজের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ □।
22. ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা—1000–2000 ml □ / 2000–4000 ml □ / 4000–4500 ml □ / 5500–6000 ml □
23. গভীরতম প্রশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা বল- প্রয়োগে নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু দুটি ফুসফুস থেকে বের হয় তাকে বলে—ফুসফুসে মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা □ / প্রশ্বাস কাজের বায়ু ধারণ ক্ষমতা □ / কার্যোপযোগী অবশিষ্ট বায়ুর ধারণ ক্ষমতা □ / বায়ুধারকত্ব □।
24. বায়ু ধারকত্ব বা ভাইটাল ক্যাপাসিটির পরিমাণ—5500 ml □ / 4500 ml □ / 3500 ml □ / 2500 ml □
25. নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টির পরিমাণ সবথেকে কম হয় ?—টাইডাল ভল্যুম (প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ) □ / প্রশ্বাসকার্যের অতিরিক্ত পরিমাণ □ / নিশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত পরিমাণ □ / অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ □।
26. ফুসফুসের ভাইটাল ক্যাপাসিটি; VC— = IRV + ERV + TV □ / IRV + ERV + TV – RV □ / IRV + ERV + TV + RV □ / IRV + ERV □ /
27. বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ফুসফুসীয় বায়ু বিনিময়কে বলে—অন্তস্থ শ্বসন □/ বহিস্থ শ্বসন □।
28. প্রশ্বাসবায়ুতে $O_2$-এর পরিমাণ—16·4 □/ 20·94 □/ 14·2 □।
29. মানুষের নিশ্বাস বায়ুতে শতকরা— অক্সিজেন থাকতে পারে (2·09 □/ 10·9 □/ 16·9 □/ 20·9 □/ 79·1 □)।
30. নিশ্বাসবায়ুতে $CO_2$-এর পরিমাণ — 0·04 □/ 4·5 □/ 5·5 □।
31. একজন সুস্থলোক স্বাভাবিক প্রশ্বাস ও নিশ্বাস কালে যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ বা বর্জন করে তাকে বলে — (TV □/ IC □/ IRV □/ RV □/ VC □)।
32. যে বায়ু শ্বসনে অংশগ্রহণ করে না তাকে বলে প্রবাহী বায়ু □/ নিষ্ক্রিয় বায়ু □/ অবশিষ্ট বায়ু □।
33. গভীরতম প্রশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা বল প্রয়োগে নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু সজোরে বাইরে যায় তাকে বলে — প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ □/ অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ □/ বায়ুর ধারকত্ব □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. মানুষের শ্বাসতন্ত্রের শ্বসন পথ বায়ু পরিবহন অঙ্গ এবং বায়ু ——— অঙ্গ নিয়ে গঠিত।
2. মুখ গলবিল ও শ্বাসনালির মধ্যবর্তী ফোলানো অংশকে ——— বলে।
3. স্বরযন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি ছিদ্র আছে তাকে ——— বলে।
4. গ্লোটিস নামে ছিদ্রের মুখটি তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি জিভের আকৃতি যে ঢাকনাটি থাকে তার নাম ———।
5. যে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুথলীয় বায়ু এবং ফুসফুসীয় রক্তজালকের রক্তের সঙ্গে বায়ুর আদানপ্রদান ঘটে তাকে ——— বলে।
6. প্রশ্বাস ক্রিয়া একটি ——— পদ্ধতি।
7. মানুষের মস্তিষ্ক যে স্নায়ুর মাধ্যমে বহিস্থ আন্তরপঞ্জরাস্থি পেশির সংকোচন ঘটায় তার নাম হল ——— স্নায়ু।
8. মধ্যচ্ছদার পেশির সংকোচন এবং প্রসারণ যে স্নায়ুর সাহায্যে ঘটে তার নাম হল ——— স্নায়ু।
9. স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার যে পরিমাণ বায়ু দেহে প্রবেশ করে বা বেরিয়ে যায় তাকে ——— বায়ুর পরিমাণ বলে।
10. স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগের পর যে অতিরিক্ত বায়ু বলপূর্বক নিশ্বাসের মাধ্যমে নির্গত করা হয় তাকে নিশ্বাস কাজের ——— বায়ুর পরিমাণ বলে।
11. প্রশ্বাসের সময় কিছু বায়ু ফুসফুসে যায় ও কিছু বায়ু শ্বাসনালি, ক্লোমশাখা, উপক্লোমশাখায় থেকে যায় তাকে ——— বায়ু বলে।
12. বায়ু থলির বায়ু অপেক্ষা নিশ্বাস বায়ু অধিক পরিমাণ ——— থাকে।
13. নিষ্ক্রিয় ধূমপান অপেক্ষা সক্রিয় ধূমপানে ——— পরিমাণ ধোঁয়া ফুসফুসে যায়।
14. BCG পুরো নাম হল Bacelle ——— এবং Guierin।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. শ্বাসনালিতে তরুণাস্থি বলয়ের সংখ্যা ———টি। (8-10 / 10-12 / 14-16 / 16-20)।
2. শ্বাসক্রিয়ার এককের নাম হল ———। (ফুসফুস / ক্লোমশাখা / ডায়াফ্রাম / বায়ুথলি)।
3. প্লুরা একটি প্রাচীর যা ফুসফুসকে ঘিরে থাকে এবং ——— স্তর নিয়ে গঠিত। (একটি / দুটি / তিনটি)।
4. প্রতিমিনিটে শ্বাসক্রিয়া ——— বার ঘটে। (10 / 16 / 20 / 24)।
5. বায়ু থলিতে ——— শতাংশ অক্সিজেন থাকে। (16.4 / 20.94 / 5.5 / 24)।
6. 100 ml প্রশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ——— ml। (5.5 / 2.5 / 0.4 / 4.0)।
7. বিশ্রামরত অবস্থায় আন্তবক্ষীয় চাপের পরিমাণ ——— mm of Hg সমান। (0 / – 2.5 / – 4 / –10)।
8. দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে তাকে ——— বলে (হাসপোক্সিয়া / অ্যাসফিক্সিয়া / ডিসপ্নিয়া / হাইপোপ্নিয়া)।

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. ল্যারিংক্স একটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশ যেখানে শ্বাসনালি শেষ এবং ক্লোমশাখা উৎপন্ন হয়। ☐
2. শ্বাসনালি থেকে বাতাস বেরিয়ে গেলে চুপসে যায় কারণ এটি 'U' আকৃতির তরুণাস্থি বলয় নিয়ে তৈরি। ☐
3. ফুসফুসের চারদিকে একটি পাতলা, স্বচ্ছ, দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণ থাকে যা প্লুরা নামে পরিচিত। ☐
4. ডান ফুসফুসে একটি সুস্পষ্ট খাঁজ আছে যার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটি থাকে তাকে হৃদ খাঁজ বলে। ☐
5. শ্বাস কাজের সময় বক্ষগহ্বরের পাঁজরের যে বিচলন ঘটে তা বহিস্থ আন্তর পাঁজরের পেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ঘটে। ☐
6. শ্বাস ক্রিয়ার প্রশ্বাস ও নিশ্বাস ক্রিয়া দুটিই সক্রিয় পদ্ধতি। ☐
7. প্রশ্বাস কালে দেহ থেকে যে বায়ু নির্গত হয় তাতে কম পরিমাণ অক্সিজেন এবং বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থাকে। ☐
8. স্বাভাবিক নিশ্বাসের পর ফুসফুসে যে বায়ু অবশিষ্ট থাকে এর পরিমাণ 2.2 লিটার। ☐
9. স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর বলপূর্বক প্রশ্বাসের ফলে যে অধিক পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্বাস ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু বলে ? ☐
10. স্বাভাবিক বিশ্রামরত অবস্থায় আন্তফুসফুসীয় চাপ 'O' কিন্তু প্রশ্বাসের সময় এই চাপ কমে গিয়ে – 2mm থেকে – 5 mm Hg সমান হয়। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. শ্বাসতন্ত্র কী ?
2. বায়ু পরিবহনকারী দুটি অঙ্গের নাম করো।
3. স্বরযন্ত্র কাকে বলে ?
4. কণ্ঠমণি কী ?
5. শ্বাসক্রিয়া আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলি কী কী ?
6. বহিস্থ পঞ্জরাস্থি শ্বসন কী ? এটি কীভাবে শ্বাস কাজে সাহায্য করে ?
7. বহিস্থ শ্বসন কী ?
8. অন্তঃস্থ শ্বসন কাকে বলে ?
9. অন্তঃফুসফুসীয় চাপ 'O'-এর ব্যাখ্যা করো।

10. প্রশ্বাস ক্রিয়াকে সক্রিয় পদ্ধতি বলে কেন ?
11. প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ কী ?
12. একজন মানুষের প্রবাহী বায়ুর পরিমাণ 450 ml এবং প্রশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ 2500 ml, তাহলে প্রশ্বাসকার্যের বায়ুর ধারণ ক্ষমতা কত ?
13. বায়ু ধারকত্ব-এর সংজ্ঞা লেখো।
14. সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে প্রশ্বাস বায়ুতে $O_2$ এবং $CO_2$-এর পরিমাণ কত ?
15. হাঁপানি হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করো।
16. BCG-র পুরো নাম কী?
17. যক্ষ্মা ভাইরাসজনিত রোগ না ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ? এই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার নাম করো।
18. ধূমপানজনিত কাশি বলতে কী বোঝো?
19. এম্ফিসিমা কী ?
20. হাইপোক্সিয়া কী ?
21. অ্যানোক্সিমিয়া কী ?
22. শ্বসন বিরতি কাকে বলে ?
23. পর্বতপীড়া কী ?
24. আবহসহিষ্ণুতা কী ?
25. ফুসফুসের বায়ুর বিভাগ বলতে কী বোঝো ?
26. ফুসফুসের বায়ু প্রবাহ এবং বায়ুথলির বায়ুপ্রবাহের মধ্যে পার্থক্য কী ?
27. প্রশ্বাস পেশি এবং স্নায়ুর কাজ কী কী ?
28. অধিকতর উচ্চতায় (i) শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয় কেন ? (ii) লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কেন ?
29. প্লুরা কাকে বলে ? শ্বাস কাজে এর ভূমিকা উল্লেক করো।
30. ভাইটাল ক্যাপাসিটির সংজ্ঞা লেখো।
31. আবহসহিষ্ণুতার বিলম্ব পরিবর্তনে রক্তে RBC-এর পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটার কারণ উল্লেখ করো।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. প্লুরা কাকে বলে ?
2. আনুষঙ্গিক শ্বসন অঙ্গ কাকে বলে ? এদের নাম উল্লেখ করো।
3. শ্বাসকেন্দ্র, শ্বাসক্রিয়ায় জড়িত পেশি ও স্নায়ুগুলির নাম করো।
4. অন্তঃবক্ষীয় চাপ এবং অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বলতে কী বোঝো?
5. নিশ্বাসবায়ু, প্রশ্বাসবায়ু এবং বায়ুথলীয় বায়ু কাকে বলে ?
6. নিষ্ক্রিয় বায়ু কাকে বলে ? এর স্বাভাবিক পরিমাণ কত ?
7. বায়ুধারকত্ব কী ? বায়ুধারকত্বের জন্য দায়ী কারণগুলির নাম উল্লেখ করো।
8. নিশ্বাস কার্যের বায়ুধারণ ক্ষমতা এবং প্রশ্বাস কার্যের বায়ুধারণ ক্ষমতা বলতে কী বোঝো ?
9. একটি ছকের মাধ্যমে বায়ুথলীর বায়ু নিশ্বাসবায়ু ও প্রশ্বাসবায়ুর উপাদান উল্লেখ করো।
10. নিশ্বাসবায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুথলির বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি কেন ?
11. প্রশ্বাসবায়ুর তুলনায় বায়ুথলির বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয় কেন ?
12. শ্বাসনালি কেন কলাপসিবল নয় ? বায়ুথলির বায়ুর উপাদানগুলি লেখো।
13. বায়ু ধারকত্ব কাকে বলে ? এক সুস্থ স্বাভাবিক লোকের এর মান কত ? ধূমপায়ীদের বায়ু ধারকত্ব কমে যায় কেন ? ভাইটাল ক্যাপাসিটি যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তার নাম করো।
14. (a) শতকরা (%) অক্সিজেনের পরিমাণ কত—1. প্রশ্বাস বায়ুতে—(i) সমুদ্র তীরে, (ii) 10,000 ফুট উচ্চতায়। 2. নিশ্বাস বায়ুতে এবং 3. বায়ু থলির বায়ুতে।
    (b) 100 ml—1. ধমনি রক্তে, 2. শিরা রক্তে কত পরিমাণ অক্সিজেন থাকে ?
    (c) 10,000 ফুট উচ্চতায় নিশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় কেন ?
15. বায়ু থলির বায়ুতে ও নিশ্বাস বায়ুতে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন থাকে ? কোনো পার্থক্য আছে কি ? কেন ? মানুষের ফুসফুসের বায়ুর চাপ কত?
16. নিষ্ক্রিয় ধূমপায়ী অধিক ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয় কেন ?
17. একগ্রাম হিমোগ্লোবিন কত পরিমাণ $O_2$ পরিবাহিত করে ? একগ্রাম হিমোগ্লোবিন অণুর পরিমাণ $O_2$ পরিবাহিত হয় ?
18. হাইপেক্সিয়া কী ? বিভিন্ন প্রকার হাইপেক্সিয়া হওয়ার মূল কারণগুলি উল্লেখ করো।

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. বহিস্থ শ্বসন এবং অন্তস্থ শ্বসন। 2. শ্বাসক্রিয়া এবং নিশ্বাস ক্রিয়া। 3. প্রশ্বাস বায়ু এবং নিশ্বাস বায়ু। 4. প্রশ্বাস বায়ু এবং বায়ুথলির বায়ু। 5. নিশ্বাস বায়ু এবং বায়ু থলির বায়ু। 6. ফুসফুসীয় বায়ু প্রবাহ এবং বায়ুথলির বায়ু প্রবাহ।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. বায়ুপরিবহনকারী অঙ্গ। 2. বহিস্থ শ্বসন। 3. অন্তস্থ শ্বসন। 4. প্লুরা। 5. বায়ুধারকত্ব। 6. নিষ্ক্রিয় ধূমপান। 7. হাঁপানি। 8. হাইপোক্সিয়া। 9. পর্বত পীড়া। 10. আবহসহিষ্ণুতার আশু পরিবর্তন।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. শ্বাসতন্ত্র কাকে বলে ? শ্বাসতন্ত্র যেসব অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় তাদের নাম লেখো।
2. বায়ুপরিবহনকারী অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
3. বায়ুবিনিময় অঙ্গ বলতে কী বোঝো ? এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করো।
4. শ্বসনের সংজ্ঞা লেখো। শ্বসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
5. প্রশ্বাস কাকে বলে ? এর সঙ্গে জড়িত পেশির নাম উল্লেখ করে তাদের কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
6. সক্রিয় ধূমপান এবং নিষ্ক্রিয় ধূমপানের সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে আলোচনা করো।
7. মানুষের ফুসফুসের বিভাগ কী কী ? এদের স্বাভাবিক পরিমাণগুলি উল্লেখ করো।
8. বায়ুথলির বায়ু কাকে বলে? প্রশ্বাসবায়ু, নিশ্বাস এবং বায়ুথলির বায়ুর উপাদানগত পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।
9. প্রবাহী বায়ু পরিমাণ, অবশেষ বায়ু পরিমাণ, বায়ুধারকত্ব ও নিষ্ক্রিয় বায়ু পরিমাণ সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।
10. প্রশ্বাস কার্যের বায়ুধারণ ক্ষমতা ও প্রশ্বাস কার্যের অতিরিক্ত বায়ুর পরিমাণ বলতে কী বোঝায়? মানুষের ক্ষেত্রে এদের স্বাভাবিক পরিমাণ উল্লেখ করো।
11. স্বাভাবিক ও বলপুর্বক নিশ্বাস কাজের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।
12. (a) বায়ু ধারকত্ব কাকে বলে ? (b) স্পাইরোমিটার যন্ত্রের ব্যবহার উল্লেখ করো। (c) নিষ্ক্রিয় বায়ু কাকে বলে এবং এর পরিমাণ কত ?
13. (a) বায়ুথলির বায়ুতে ও নিশ্বাস বায়ুতে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন থাকে ? (b) কোনো পার্থক্য আছে কী ? কেন ? (c) মানুষের ফুসফুসে বায়ুর চাপ কত ?
14. (a) ফুসফুসের বায়ুর বিভাগ বলতে কী বোঝো ? (b) ফুসফুসের মোট বায়ু ধারণ ক্ষমতা কত ? (c) প্রশ্বাস বায়ু ও বায়ুথলির বায়ুর অক্সিজেন শতকরা পরিমাণ কত ?
15. (a) আবহসহিষ্ণুতা কাকে বলে ? (b) এর কারণ কী ? আবহসহিষ্ণুতার জন্য দেহে যেসব আশু পরিবর্তন ঘটছে তাদের নিয়ে আলোচনা করো।
16. (a) পর্বত পীড়া কাকে বলে ? (b) এই পীড়া হওয়ার কারণগুলি ও তাদের সৃষ্ট উপসর্গগুলি আলোচনা করো।
17. কেইসিনের পীড়া সম্বন্ধে আলোচনা করো।
18. (a) হাঁপানি রোগের সংজ্ঞা, কারণ উপসর্গগুলি উল্লেখ করো। (b) এই রোগের প্রধান চিকিৎসা সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
19. (a) ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার কারণ বর্ণনা করো। (b) ফুসফুস ক্যানসারের লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।
20. আবহসহিষ্ণুতা কাকে বলে ? এর ফলে দেহে কী কী পরিবর্তন ঘটে।
21. পর্বতপীড়া কী ? এর কারণ এবং বিভিন্ন উপসর্গগুলি আলোচনা করো।
22. উচ্চচাপজনীত পীড়া কাকে বলে। এর সম্বন্ধে যা জানো তার বিবরণ দাও।
23. ক্লেশদায়ক শ্বসনের সংজ্ঞা, কারণ ও কী কী কারণে ঘটে, তার একটি বিবরণ দাও।
24. যক্ষ্মা রোগের ব্যাকটেরিয়ার নাম কী ? যক্ষ্মা রোগের কারণগুলি উল্লেখ করো।
25. ফুসফুসের ক্যানসার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।

---

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# পেশি এবং স্নায়ু—উত্তেজক কলা
# [ MUSCLE AND NERVE—EXCITABLE TISSUES ]

**ভূমিকা (Introduction) ঃ পেশি ঃ** বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **স্যাকেনোভ**-এর মতে মস্তিষ্ক ক্রিয়ার যে সীমাহীন বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তার পরিণতি হয় কয়েকটি মাত্র ঘটনায়, এবং তার মধ্যে একটি হল পেশির ক্রিয়া বা পেশি সংকোচন ও প্রসারণ। **শেরিংটন** নামে অন্য একজন বিজ্ঞানী অস্থিপেশির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের প্রধানত মস্তিষ্কের সম্পর্কের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। শেরিংটনের মতে **পেশি এবং স্নায়ু দুটি উত্তেজক কলার** (Excitable tissues) **সমন্বয়ে গঠিত**। কারণ দুটিতে উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বা এক্সাইটেবিলিটি (Excitability) ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। এই দুই প্রকার কলাকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে তারা সেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। এই কারণে শেরিংটনের মতে মস্তিষ্ক বিভিন্ন স্নায়ুর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেশির সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্নায়ুর মধ্যে উদ্দীপনা (স্নায়ু আবেগ—Nerve impulse) পেশিতে এসে পেশিকে উত্তেজিত করে, ফলে পেশির সংকোচন ঘটে। অতএব উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া জীবের একটি বিশেষ ধর্ম। পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন প্রকার উদ্দীপনা যেমন—স্পর্শ, চাপ, তাপ (উষ্ণতা, ঠান্ডা), যন্ত্রণা, আলো, শব্দ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি গ্রহণের জন্য প্রাণীদেহে **গ্রাহক** (রিসেপটর) নামে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে। এইসব গ্রাহক থেকে উৎপন্ন সংবেদন (Sensation) স্নায়ু কোশ থেকে স্নায়ুকোশে **সাইন্যাপসের** মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়। এরপর মস্তিষ্ক থেকে আবার সংবেদন ফিরে এসে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রধানত অন্য একটি উত্তেজক কলায় অর্থাৎ পেশিতে যায়। এর ফলে পেশি উদ্দীপিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার পেশির ধর্ম প্রদর্শন করে।

## 5.1. পেশি (Muscles)

❖ **পেশিতন্ত্রের সংজ্ঞা ঃ** শারীরসংস্থানের যে শাখায় দেহের যাবতীয় পেশি এবং তাদের গঠন ও কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে পেশিতন্ত্র (**Muscular system**) বলা হয়।

### ▲ পেশির সংজ্ঞা, উৎপত্তি, কাজ এবং প্রকারভেদ (Definition, Origin, Function and Types of different Muscles)

❖ **(a) পেশির সংজ্ঞা (Definition of Muscle) ঃ** মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন অসংখ্য সূক্ষ্ম, সরু ও লম্বা মায়োফাইব্রিলযুক্ত পেশিকোশ নিয়ে গঠিত সংকোচনশীল কলাকে পেশি বলে।

(b) **পেশির উৎপত্তি (Origin of Muscles) ঃ মায়োব্লাস্ট** (Myoblast) কোশ থেকে পেশি উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**—(i) **ভ্রূণের** মেসোডার্ম থেকে দেহের মাথার (Head) অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জন্য ঐচ্ছিক পেশির উৎপত্তি ঘটে। (ii) **মেসেনকাইম কোশ** থেকে মাথার (মস্তকের) পেশি উৎপন্ন হয়।

(c) **পেশির কাজ (Functions of muscular tissue) ঃ** (i) প্রাণীদেহের আকৃতি এবং দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের গঠন ও তাদের সুরক্ষায় অংশ নেয়। (ii) উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পেশির সংকোচন ঘটিয়ে দেহের যাবতীয় কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) **পেশির প্রকারভেদ অথবা শ্রেণিবিন্যাস (Types or Classification of Muscular tissue) ঃ**

অতএব পেশি তিন প্রকার, যেমন—

1. কঙ্কাল (অস্থি) পেশি— সরেখ ও ঐচ্ছিক।
2. আন্তরযন্ত্রীয় পেশি— মসৃণ ও অনৈচ্ছিক।
3. হৃৎপেশি— সরেখ ও অনৈচ্ছিক।

### ▲ 1. সরেখ বা কঙ্কাল বা ঐচ্ছিক পেশি (Striated or Skeletal or Voluntary muscle)

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে পেশির পেশিতন্তুতে কালো-সাদা রেখা বা দাগ থাকে ও যা দেহকঙ্কালের (অস্থির) উপর থাকে এবং ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয় তাকে সরেখ পেশি বা কঙ্কাল পেশি বা অস্থি পেশি অথবা ঐচ্ছিক পেশি বলে।**

(b) **ঐচ্ছিক পেশির অবস্থান (Occurrence of Voluntary muscle) ঃ** ঐচ্ছিক পেশির নিয়ন্ত্রণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন। মানুষের দেহে ঐচ্ছিক (অস্থি) পেশির মোট ওজন দৈহিক ওজনের প্রায় 40–45 শতাংশ। এই প্রকার পেশি **কঙ্কালের উপর** অবস্থান করে এবং অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে ঐচ্ছিক পেশির অন্য নাম **কঙ্কাল পেশি** বা **অস্থি পেশি** (Skeletal muscle)। এই পেশিতে অসংখ্য আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি কালো-সাদা দাগ থাকে বলে এই পেশিকে **চিহ্নিত** বা **সরেখ** পেশি বলে।

(c) **ঐচ্ছিক পেশির গঠন** (**Structure of voluntary muscle**) ঃ ঐচ্ছিক পেশি বহু **পেশিকোশ** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি পেশিকোশ (পেশিতন্তু) লম্বা এবং বেলনাকার। এই রকম 12–20টি পেশিতন্তু একত্রিত হয়ে **পেশিতন্তুগুচ্ছ** বা **ফ্যাসিকিউলাস** (Fasciculus) গঠন করে। বহু ফ্যাসিকুলাস নিয়ে **পেশি** গঠিত হয়। ফ্যাসিকুলাসের প্রতিটি পেশিকোশের চারদিকে একটি পাতলা অ্যারিওলা কলার আবরণ থাকে তাকে **এন্ডোমাইসিয়াম** (Endomysium) বলে। অনেকগুলি পেশিকোশ নিয়ে গঠিত প্রতিটি পেশিতন্তুগুচ্ছকে ঘিরে যে যোগ কলার আবরণ থাকে তাকে **পেরিমাইসিয়াম** (Perimysium) বলে। আবার কতকগুলি পেরিমাইসিয়ামযুক্ত পেশিতন্তু গুচ্ছকে আবৃত করে একেবারে বাইরের যে আবরণীটি থাকে তাকে **এপিমাইসিয়াম** (Epimysium) বলে।
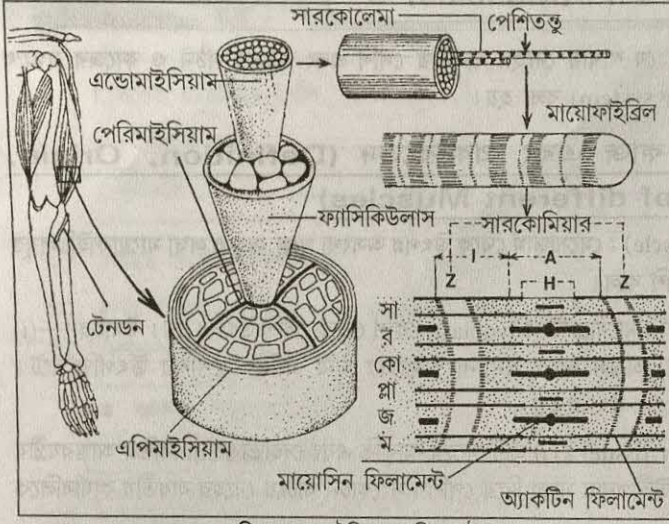
চিত্র 5.1. ঃ ঐচ্ছিক পেশির গঠন।

● **একটি সরেখ বা ঐচ্ছিক পেশি কোশের (পেশিতন্তুর) গঠন** (**Structure of a Striated or Voluntary Muscle cell / Muscle fibre**) ঃ অসংখ্য সমান্তরালভাবে **বেলনাকার পেশিতন্তুর (পেশিকোশ)** সমন্বয়ে সজ্জিত ঐচ্ছিক বা সরেখ পেশি গঠিত হয়। প্রতিটি বেলনাকার (নলাকার) পেশিতন্তুর প্রান্ত দুটি সূঁচালো হয়। পেশিতন্তু লম্বায় 3-4 cm ও প্রস্থে প্রায় 10-100 μm ব্যাস সম্পন্ন হয়। প্রতিটি পেশিকোশের পর্দা বা মেমব্রেনকে **সারকোলেমা** বলে। এর নীচে **বহু ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস** থাকে। **সারকোলেমা** পাতলা, স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম পর্দা যা প্রতিটি পেশিকোশকে ঢেকে রাখে। সারকোলেমা আবরণীর বা পর্দার মধ্যে **সারকোপ্লাজম** নামে সাইটোপ্লাজম থাকে। নিউক্লিয়াসের এবং মায়োফাইব্রিলের চারপাশে সারকোপ্লাজমের পরিমাণ বেশি হয়। সারকোপ্লাজমে অসংখ্য **মাইটোকনড্রিয়া, সারকোপ্লাজমীয় জালক,** গলগি বস্তু প্রভৃতি থাকে।
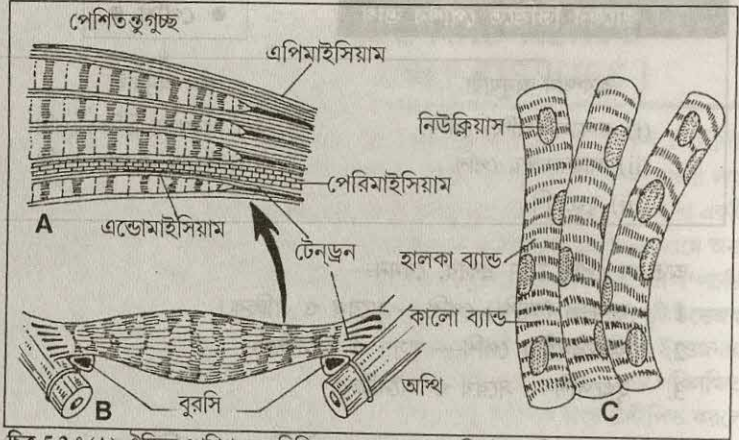
চিত্র 5.2 ঃ (A) ঐচ্ছিক পেশিগুচ্ছের বিভিন্ন আবরণ, (B) পেশি-টেন্ডন দিয়ে অস্থি-সংযোগের চিত্ররূপ এবং (C) তিনটি চিহ্নিত নলাকার ঐচ্ছিক পেশির গঠন।

○ **মায়োফাইব্রিলের আণুবীক্ষণিক গঠন** (**Microscopic structure of Myofibrils**) ঃ

1. **মায়োফাইব্রিল (Myofibril)**—❖ **সংজ্ঞা ঃ প্রতিটি পেশিতন্তুর (পেশিকোশের) সারকোপ্লাজমে সাজানো যে অসংখ্য উপতন্তু পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে তাকে মায়োফাইব্রিল বলে।** প্রতিটি মায়োফাইব্রিলে পর্যায়ক্রমিকভাবে উচ্চ প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট (গাঢ়) ও নিম্ন প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট (হালকা) অঞ্চল দেখা যায়। গাঢ় অঞ্চলকে **A-band** এবং হালকা অঞ্চলকে **I-band** বলে। A-ব্যান্ডের মাঝামাঝি স্থানে একটি নিম্ন প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট অঞ্চল আছে। তাকে **H-অঞ্চল** (H-Zone) বলে (H-শব্দটি জার্মান শব্দ *Helle* থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'উজ্জ্বল')। I-ব্যান্ডের মাঝামাঝি স্থানে একটি উচ্চ প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট অংশ আছে। একে **Z-ডিস্ক** (Z-disc) বলে। প্রতিটি মায়োফাইব্রিলে পর পর বিন্যস্ত দুটি Z-ডিস্ক মধ্যবর্তী অংশকে **সারকোমিয়ার** (Sarcomere) বলা হয়। মায়োফাইব্রিলে মোটা ও পাতলা দু'প্রকার প্রোটিন ফিলামেন্ট বা **মায়োফিলামেন্ট** থাকে।

2. **মায়োফিলামেন্ট (Myofilament)**—মায়োফিলামেন্ট দু'প্রকার, এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত **মোটা ফিলামেন্টকে মায়োসিন** (Myosin) **ফিলামেন্ট** এবং অপর পাতলা ফিলামেন্টকে **অ্যাকটিন** (Actin) **ফিলামেন্ট** বলে। A-ব্যান্ডের প্রস্থচ্ছেদে
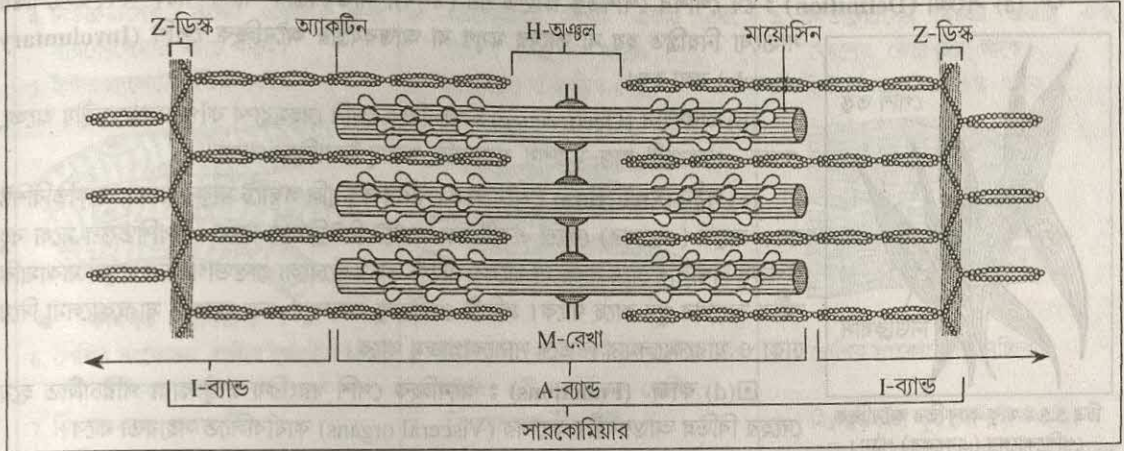
চিত্র 5.3 : মোটা মায়োসিন এবং পাতলা অ্যাকটিন ফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি সরেখ পেশিতে অবস্থিত সারকোমিয়ারের চিত্ররূপ।

দেখা যায় প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেন্টকে 6টি অ্যাকটিন ফিলামেন্ট পরিবৃত করে থাকে। প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেন্ট থেকে কতকগুলি **তির্যক বন্ধনী (ক্রশ ব্রিজ**—Cross bridge) নির্গত হয়ে অ্যাকটিন ফিলামেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

ঐচ্ছিক পেশিকোশের কোশআবরণী বা সারকোলেমা থেকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে **T-নালিকা** (T-tubules) নামে নলাকার অংশ সারকোলেমার সমকোণে সারকোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে। T-টিবিউলগুলি Z-ডিস্কের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সারকোপ্লাজমস্থিত সরু অ্যাকটিন ও মোটা মায়োসিন ফিলামেন্ট দুটি অতি সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে গঠিত জালক **সারকোপ্লাজমীয় জালক** (Sarcoplasmic reticulum) দিয়ে ঘেরা থাকে। মায়োসিন ফিলামেন্ট **মায়োসিন** নামে প্রোটিন ও অ্যাকটিন ফিলামেন্ট **অ্যাকটিন, ট্রপোমায়োসিন** এবং **ট্রপোনিনি** নামে তিন রকমের প্রোটিন নিয়ে গঠিত।
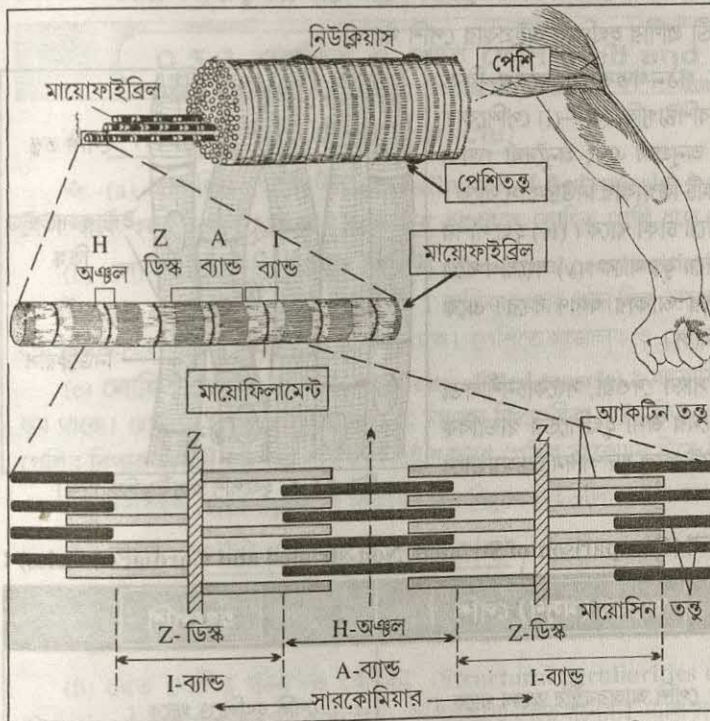
চিত্র 5.4 : মায়োফিলামেন্টে I-ব্যান্ড ও A-ব্যান্ডের এবং অ্যাকটিন ও মায়োসিনের বিন্যাসের চিত্ররূপ।

(d) **ঐচ্ছিক পেশির কাজ (Functions of Voluntary muscle) :** (i) ঐচ্ছিক পেশি কঙ্কালের উপরে থেকে দেহের গঠনে এবং দেহের আকৃতি দানে সাহায্য করে। (ii) ঐচ্ছিক পেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহের বিভিন্ন অংশের, যেমন—হাত-পায়ের বিচলন এবং গমন কাজে সাহায্য করে।

## ▲ 2. অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে পেশির পেশিতন্তু চিহ্নিত নয় (মসৃণ), আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে থাকে এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় না তাদের মসৃণ বা আন্তরযন্ত্রীয় অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বলা হয়।**

চিত্র 5.5 : মাকু আকৃতির অনৈচ্ছিক পেশিকোশের (এককের) গঠন।

(b) **অবস্থান (Occurrence) :** অনৈচ্ছিক পেশি দেহমধ্যস্থ ফাঁপা আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে, যেমন—পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, শ্বাসনালি, জরায়ু ইত্যাদিতে থাকে।

(c) **গঠন (Structure) :** অনৈচ্ছিক পেশির তন্তুগুলি লম্বাটে মাকুর মতো আকৃতিবিশিষ্ট হয়। তন্তুর (কোশের) কেন্দ্রে একটি স্বল্প লম্বাটে নিউক্লিয়াস থাকে। পেশিতন্তুর মধ্যে বহু উপতন্তু লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে। প্রতিটি তন্তুর ছুঁচোলো প্রান্তভাগ অন্য তন্তুর মাঝামাঝি স্ফীত অংশের খুব কাছে থাকে। প্রতিটি পেশিতন্তু অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট সারকোলেমা দিয়ে ঢাকা ও সারকোলেমার ভিতরে সারকোপ্লাজম থাকে।

⊡(d) **কাজ (Functions) :** অনৈচ্ছিক পেশি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের (Visceral organs) কার্যাবলিতে সহায়তা করে।

## ▲ 3. হৃৎপেশি (Heart muscle or Cardiac muscle)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে সরেখ অনৈচ্ছিক পেশি নিয়ে হৃৎপিণ্ড গঠিত হয় তাকে হৃৎপেশি বলে।**

(b) **অবস্থান (Occurrence) :** মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে এইপ্রকার পেশি থাকে।

(c) **গঠন (Structure) :** হৃৎপেশি গঠনগতভাবে **সরেখ** কিন্তু কার্যগতভাবে **অনৈচ্ছিক**। হৃৎপেশির গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(i) পেশিকোশ বা পেশিতন্তুগুলি লম্বায় ছোটো, বেলনাকার অনুপ্রস্থ এবং অনুদৈর্ঘ্য ডোরা ডোরা দাগযুক্ত হয়। (ii) কোশের কেন্দ্রস্থলে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। (iii) পেশিতন্তু পাতলা অস্পষ্ট সারকোলেমা দিয়ে ঢাকা থাকে। (iv) হৃৎপেশির পেশিতন্তুগুলি সাইটোপ্লাজমীয় প্রবর্ধক (শাখা) দিয়ে যুক্ত থাকে। (v) সংযোগস্থলে কোশপর্দা অনুপ্রস্থে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে চাকতির আকার ধারণ করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (Intercalated disc) বলে।
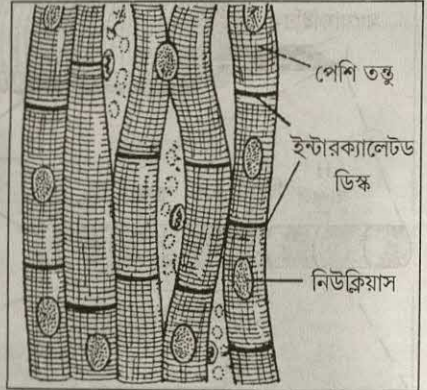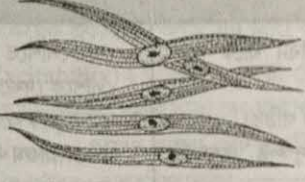
চিত্র 5.6 : হৃৎপেশি আণুবীক্ষণিক গঠন।

(d) **কাজ (Functions) :** উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, সংকোচনশীলতা এবং ছন্দময়তা হৃৎপেশির বিশেষ ধর্ম। এই ধর্মের জন্য হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দময় (Rhythmical) সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে ফলে হৃদ্স্পন্দন ছন্দময়ভাবে ঘটে।

● **সরেখ, অরেখ এবং হৃৎপেশির তুলনা (Comparison of Striated, Non-striated and Cardiac muscles) :**

| সরেখ (চিহ্নিত) পেশি | অরেখ (মসৃণ) পেশি | হৃৎপেশি |
|---|---|---|
| ● অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য :<br>1. পেশি অস্থিসংলগ্ন হয়ে থাকে। | 1. পেশি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে থাকে। | 1. পেশি হৃৎপিণ্ডে থাকে। |
| ● গঠনগত বৈশিষ্ট্য :<br>2. পেশিতন্তু লম্বা, বেলনাকার ও শাখা-বিহীন। | 2. পেশিতন্তু লম্বা, মাকু আকৃতি বিশিষ্ট ও শাখাবিহীন। | 2. পেশিতন্তু ছোটো, বেলনাকার ও শাখাযুক্ত। |
| 3. পেশিতন্তুর অনুপ্রস্থে গাঢ় ও হালকা রেখা দেখা যায়। | 3. পেশিতন্তুতে কোনো অনুপ্রস্থ রেখা দেখা যায় না। | 3. পেশিতন্তুতে অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্যে অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। |

| সরেখ (চিহ্নিত) পেশি | অরেখ (মসৃণ) পেশি | হৃৎপেশি |
|---|---|---|
| 4. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একাধিক এবং সারকোলেমার নীচে থাকে। | 4. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং কোশের কেন্দ্রস্থলে থাকে। | 4. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং কোশের কেন্দ্রস্থলে থাকে। |
| 5. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক নেই। | 5. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক নেই। | 5. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে। |
|  |  |  |
| ● কার্যগত বৈশিষ্ট্য : | | |
| 6. পেশির সংকোচন প্রাণীর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ এটি ঐচ্ছিক পেশি। | 6. পেশির সংকোচন প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয় অর্থাৎ এটি অনৈচ্ছিক পেশি। | 6. পেশির সংকোচন অনৈচ্ছিক। |
| 7. নিঃসাড়কাল ক্ষণস্থায়ী। | 7. নিঃসাড়কাল দীর্ঘস্থায়ী। | 7. নিঃসাড়কাল খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী। |
| 8. পেশির সংকোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবন্ধ নয়। | 8. পেশির সংকোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবন্ধ। | 8. পেশির সংকোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবন্ধ (বিশেষ ধর্ম ) ভাবে ঘটে। |
| 9. এই পেশিতে অবসাদ সহজেই ঘটে। | 9. এই পেশিতে অবসাদ সহজে ঘটে না। | 9. এই পেশিতে অবসাদ কখনই ঘটে না। |

## ◎ 5.2. লোহিত ও শ্বেত পেশি (Red and White muscles) ◎

### ▲ লোহিত পেশি (Red muscle)

❖ (a) **লোহিত পেশির সংজ্ঞা (Definition of Red muscle) :** যেসব কঙ্কাল পেশিতে মায়োগ্লোবিন (প্রোটিন) বেশি থাকে ফলে দেখতে গাঢ় লাল রঙের হয় তাদেরকে লোহিত পেশি বলে।

(b) **লোহিত পেশির গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural peculiarities of Red muscle) :** লোহিত পেশিতে দাগগুলি অস্পষ্ট থাকে, মায়োফাইব্রিলগুলি লম্বাটে হয়, T-নালিকা তন্ত্রের গঠন নিম্ন মানের হয়। মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ বেশি থাকে বলে পেশিতে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন সঞ্চিত থাকে। পেশিতে রক্তজালক ও পেশিতন্তুর প্রাচুর্যতা লক্ষ করা যায়।

(c) **লোহিত পেশির সক্রিয়তা (Activity of Red muscle) :** মায়োসিন ফিলামেন্টে ATP-ase উৎসেচকের সক্রিয়তা কম থাকে। লোহিত পেশিতে সবাত শ্বসনের মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া ঘটে। কিন্তু ATP-ase উৎসেচক কম থাকার ফলে এই প্রকার পেশির বিপাক ক্রিয়ায় কম শক্তি ব্যয় হয়। এই ধরনের পেশির সংকোচন ধীরে ধীরে হয় এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলে।

(d) **উদাহরণ (Examples) :** মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে দেহভঙ্গি বজায় রাখতে লোহিত পেশির প্রয়োজন হয়।

### ▲ শ্বেত পেশি (White muscle)

❖ (a) **শ্বেত পেশির সংজ্ঞা (Definition of White muscle) : যেসব কঙ্কাল পেশিতে (ঐচ্ছিক পেশিতে) মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে, ফলে দেখতে ফ্যাকাশে রঙের হয় তাদেরকে ধূসর পেশি বা শ্বেত পেশি বলে।**

(b) **শ্বেত পেশির গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Structural peculiarities of white muscle) :** শ্বেত পেশিতে দাগগুলি (Striations) অধিক স্পষ্টভাবে দেখা যায়। পেশিতন্তুতে উন্নতমানের T-নালিকার গঠন দেখা যায়। এতে মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে বলে কম পরিমাণ অক্সিজেন সঞ্চিত থাকে। পেশিতে রক্তজালক কম থাকে। স্নায়ু সংযোগের অপ্রাচুর্যতা লক্ষ করা যায়।

(c) **শ্বেত পেশির সক্রিয়তা (Activity of white muscle) :** মায়োসিন ফিলামেন্টে ATP-ase (Adenosin tri-phosphatase) উৎসেচকের সক্রিয়তা বেশি হয়। শ্বেত পেশিতে সবাত শ্বসনের মাধ্যমে বিপাক ক্রিয়া ঘটে এবং প্রবল পেশিসঞ্চালনের সময় অক্সিজেন ঘাটতি ($O_2$-debt) অল্পসময়ের জন্য সহ্য করতে পারে। শ্বেত পেশির সংকোচন খুব তাড়াতাড়ি এবং স্বল্প সময় ঘটে।

(d) **উদাহরণ (Examples)**—হাতের ঊর্ধ্ব বাহুর পেশি কিংবা কাঁধের পেশি। হাতের বা কাঁধের পেশি সবসময় সক্রিয় থাকে না, কিন্তু দেহের কয়েকটি প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য অত্যধিক সক্রিয় হয়। কোনো ভারী জিনিস তোলার সময়, কিংবা জোরে ক্রিকেট বল ছোঁড়ার সময় অথবা পা দিয়ে ফুটবল মারার সময় এই সব স্থানের পেশি অধিক সক্রিয় হয়।

● **লোহিত পেশি এবং শ্বেত পেশির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Red muscle and White muscle) ঃ**

| লোহিত পেশি | শ্বেত পেশি |
|---|---|
| 1. লোহিত পেশিতে বেশি পরিমাণ মায়োগ্লোবিন থাকে বলে দেখতে গাঢ় রঙের হয়। | 1. শ্বেত পেশিতে খুব কম পরিমাণ মায়োগ্লোবিন থাকে বলে পেশিকে দেখতে হালকা বা ধূসর রঙের হয়। |
| 2. ছোটো ছোটো পেশিতন্তু নিয়ে লোহিত পেশি গঠিত। | 2. তুলনামূলক বড়ো আকারের পেশিতন্তু নিয়ে শ্বেত পেশি গঠিত। |
| 3. সারকোপ্লাজম অস্বচ্ছ, দানাযুক্ত এবং সুস্পষ্ট লম্বালম্বি ডোরাযুক্ত হয়। | 3. সারকোপ্লাজম পরিমাণে কম এবং অর্ধস্বচ্ছ কিন্তু সুস্পষ্ট অনুপ্রস্থ ডোরা যুক্ত হয়। |
| 4. লোহিত পেশি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়, সংকোচন দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু ধীরে ধীরে অসাড় হয়। | 4. পাণ্ডুর পেশি দ্রুত গতিবিধির জন্য দায়ী। সংকোচন ক্ষমতা লোহিত পেশি থেকে বেশি হয় এবং দ্রুত অসাড় হয়। |
| 5. উদাহরণ—গলার পেশি, পিঠের লম্বা আকৃতির পেশি ইত্যাদি। | 5. উদাহরণ —চোখের বহিঃস্থ অকুলার পেশি, জিভের পেশি, ঠোঁট, হাতের ঊর্ধ্ব বাহুর (বাইসেপ) পেশি, কাঁধের পেশি ইত্যাদি। |

## ✪ 5.3. মন্থর এবং দ্রুত পেশিতন্তু ✪
## (Slow and Fast twitch muscle fibres)

পেশির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল সংকোচনশীলতা অর্থাৎ পেশির সংকোচন করার ক্ষমতা। ঐচ্ছিক পেশির সংকোচন প্রসারণের ফলে দেহের বিচলন ঘটে। কঙ্কাল পেশির সংকোচনের গতির হার দেহের প্রয়োজন অনুসারেই ঘটে, তবে এই হার পেশিতে থাকা ATP-কতটা দ্রুত ভাঙছে তার উপরেও নির্ভর করে। দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কঙ্কাল পেশি (পেশিতন্তু) যদিও মিশ্র ধরনের, তবুও তাদের কাজ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কঙ্কাল পেশিকে নিম্নলিখিত দু'ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়, যেমন—

❑ **1. মন্থর আক্ষেপ পেশিতন্তু [Slow twitch (tonic) muscle fibre]** ঃ এই ধরনের পেশিতন্তুতে অধিক পরিমাণ মায়োগ্লোবিন (এক প্রকার সংযুক্ত প্রোটিন), বহু সংখ্যক মাইটোকনড্রিয়া, অধিক সংখ্যক রক্তজালকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বেশি পরিমাণ মায়োগ্লোবিন ও সাইটোক্রোম রঞ্জক কণা আছে বলে, পেশির রং গাঢ় লাল (লোহিত) বর্ণের হয়। পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর 5 μm ব্যাস সম্পূর্ণ ছোটো ছোটো স্নায়ুতন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। এই তন্তুতে বিপাক ক্রিয়া অধিক হয় বলে বেশি সংখ্যক ATP সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ATP-কে অত্যন্ত মন্থরভাবে ভাঙে বলে কম জৈব শক্তি ব্যয়িত হয়, এই কারণে পেশির সংকোচনের হার মন্থর হয়। পেশিতন্তুগুলি অবসাদ (Fatigue) প্রতিরোধক্ষম হয়। ● **অবস্থান**—দেহের গভীর অংশে প্রধানত যে পেশির অনেকক্ষণ ধরে সংকোচন ক্ষমতা আছে সেই সব পেশি, যেমন— গ্রীবা, পৃষ্ঠ (পিঠ) এবং পায়ের (দেহভঙ্গি বজায় রাখার জন্য) মন্থর আক্ষেপ পেশিতন্তুর উদাহরণ। ● **কাজ**—মন্থর আক্ষেপ তন্তু দেহভঙ্গি বজায় রাখার জন্য একনাগাড়ে সংকুচিত হতে পারে।

❑ **দ্রুত আক্ষেপ পেশিতন্তু [Fast twitch (tonic) muscle fibre]** ঃ এই ধরনের পেশিতন্তুতে কম পরিমাণ মায়োগ্লোবিন-প্রোটিন, কম সংখ্যক মাইটোকনড্রিয়া এবং তুলনামূলক কম রক্তজালক থাকে, কিন্তু সারকোপ্লাজমীয় জালক ও গ্লাইকোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। মায়োগ্লোবিনের ও সাইটোক্রোম রঞ্জক কণার পরিমাণ কম থাকায় পেশিতন্তুগুলিকে দেখতে ফ্যাকাশে বা সাদা হয়। পেশিতন্তু একটি বা দুটি বৃহৎ (10-20 μ ব্যাসসম্পন্ন) স্নায়ুতন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। এরা অবাত শ্বসনের মাধ্যমে ATP উৎপন্ন করে বলে সবসময় অবিচ্ছিন্নভাবে যথেষ্ট পরিমাণ ATP থেকে জৈব শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। এই প্রকার পেশি সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে এই প্রকার পেশিতন্তু ATP-কে অতি দ্রুত ভাঙতে পারে বলে পেশিতন্তুর সংকোচন গতি অত্যন্ত দ্রুত (মন্থর তন্তুর চেয়ে তিনগুণ বেশি) হয়। ● **অবস্থান**—দেহের উপরিতলের কাছাকাছি থাকে, যেমন—হাতের বাহুর

(Arms) পেশি। ● **কাজ**—বাহুর পেশি সব সময় সক্রিয় থাকে না। কোনো কিছু ভারী জিনিস তুলতে কিংবা কোনো কিছু জোরে নিক্ষিপ্ত করার সময় এই প্রকার পেশি সক্রিয় হয়।

## ◎ 5.4. পেশির ধর্ম (Properties of Muscle) ◎

➤ কঙ্কাল পেশি বা ঐচ্ছিক পেশিতে কয়েক প্রকার ধর্ম আছে এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলি হল—

1. **উত্তেজিতা (এক্সাইটেবিলিটি—Excitability)** : উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া সব **জীবন্ত কোশের একটি বিশেষ ধর্ম**। পেশি জীবন্ত কোশ নিয়ে গঠিত হয়। তাই সঠিক উদ্দীপনায় পেশির সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে, একে **উত্তেজিতা** বলা হয়। পেশিতে সরাসরি যথোপযুক্ত উদ্দীপক (Threshold stimulus) প্রয়োগ করলে পেশিতন্তুটি উদ্দীপিত হয় ফলে সংকুচিত হয়।

● **কারণ** (Cause)—পেশির পেশিঝিল্লির বাইরে কোশবহিস্থ তরল পদার্থ (Extracellular fluid) এবং ভেতরে কোশমধ্যস্থ তরল পদার্থ (Intracellular fluid) থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুই প্রকার তরল পদার্থে বিভিন্ন প্রকার আয়নের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। দেখা গেছে কোশ-মধ্যস্থ তরল পদার্থে পটাশিয়াম ($K^+$) আয়নের পরিমাণ এবং কোশবহিস্থ তরল পদার্থে সোডিয়াম ($Na^+$) আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়া বিশ্রামরত অবস্থায় সারকোলেমা বা পেশিঝিল্লির বহির্দেশ ধনাত্মক (Positive) এবং অন্তর্দেশ ঋণাত্মক (Negative) হয়। ঝিল্লির উভয়পাশে আয়নের অসম বণ্টন এবং বিপরীত আধানের উপস্থিতির জন্য পেশিতে একপ্রকার **বিভব পার্থক্য** গড়ে ওঠে। বিশ্রাম অবস্থায় এই বিভবপার্থক্যকে **স্থিতিবিভব** (Resting potential) বা **ঝিল্লি বিভব** (Membrane potential) বলে। পেশিতে এই বিভব পার্থক্য প্রায় – 90 mV হয়।
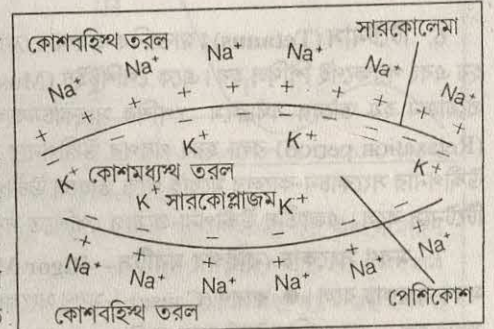
চিত্র 5.7. : পেশিকোশের মেমব্রেনের বাইরে এবং ভেতরের তরলের বিভিন্ন প্রকার আয়নের উপস্থিতির চিত্ররূপ।

পেশিতে উদ্দীপনা প্রয়োগে পেশি ঝিল্লির $Na^+$ আয়নের ভেদ্যতা বেড়ে যায় ফলে $Na^+$ আয়ন বাইরে থেকে ভিতরে যায় এবং $K^+$ আয়ন ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এর ফলে পেশির স্থিতিবিভব **ক্রিয়াবিভব** (Action potential)-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ এটাই পেশির **উত্তেজক ক্ষমতা** বা **উত্তেজিতার** কারণ।

2. **সংকোচনশীলতা (কনট্রাকটিলিটি—Contractility)** : সংকোচনশীলতা **পেশিকলার সহজাত ধর্ম**। এই প্রকার ধর্ম অন্য কোনো কলায় লক্ষ করা যায় না। পেশির মধ্যে **পাতলা অ্যাকটিন** (Actin) ও **মোটা মায়োসিন** (Myosin) নামে দু-ধরনের প্রোটিন জাতীয় **সংকোচী উপাদান** (Contractile elements) বা **সংকোচী ফিলামেন্ট** থাকে যা পেশিকে সংকুচিত করে।

● **কারণ** (Cause)—একটি পেশিকে উদ্দীপিত করলে পেশির সারকোপ্লাজমীয় জালক থেকে $Ca^{++}$ আয়ন নির্গত হয়। এই $Ca^{++}$ অ্যাকটিন ফিলামেন্টে অবস্থিত সংকোচনে বাধাদানকারী ট্রোপনিনকে নিষ্ক্রিয় করে। এর ফলে মায়োসিন এবং ATP সহজেই অ্যাকটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় ও **অ্যাক্‌টিনোমায়োসিন-ATP যৌগ** (Actinomyosin-ATP complex) গঠন করে। এর পর $Ca^{++}$ আয়ন মায়োসিন যৌগের ATP-কে বিশ্লিষ্ট করে শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি পেশির সংকোচন ঘটায়। পেশির সংকোচনের সময় মায়োসিন ফিলামেন্টের ক্রসব্রিজ সন্নিহিত অ্যাকটিন ফিলামেন্টের ক্রিয়াস্থানের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে এর A-ব্যান্ডের উপর দিয়ে I ব্যান্ডকে টেনে নেয়। এই অবস্থায় H অঞ্চলের দৈর্ঘ্য কমে যায় এবং পর পর বিন্যস্ত দুটি 'Z'-ডিস্ক পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়, ফলে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমে যায়। এইভাবেই পেশি সংকুচিত হয়।

3. **পূর্ণ বা ব্যর্থ সূত্র (All or none law)** : একটি পেশিতন্তুকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে পেশিতন্তুটি যদি সংকুচিত হয় তাহলে সেই **সংকোচন সম্পূর্ণ এবং সর্বাধিক হবে**। (উদ্দীপকের শক্তি বাড়ালেও এই সংকোচনের মাত্রা আর বাড়বে না)। কিন্তু যথোপযুক্ত উদ্দীপক যদি দুর্বলতর হয়, তাহলে সেই উদ্দীপক পেশি তন্তুকে **উদ্দীপিত করতে ব্যর্থ হবে** অর্থাৎ আদৌ সংকুচিত করতে পারবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সূত্র একটি পেশিতন্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ পেশির (বহু পেশিতন্তু নিয়ে গঠিত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

4. **নিঃসাড় কাল (Refractory period) :** একবার উদ্দীপিত হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য পেশি দ্বিতীয়বার উদ্দীপিত হয় না। এই সময়কে পেশি নিঃসাড় কাল বলা হয়। কঙ্কাল পেশির নিঃসাড় কাল প্রায় 1/200 থেকে 1/500 সেকেন্ড স্থায়ী হয়। দেখা গেছে নিঃসাড় কাল পেশিসংকোচনের **লীন কাল** (Latent period)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

5. **সংকলন (Summation) :** দুর্বল উদ্দীপককে অধঃমাত্রিক (Subliminal) উদ্দীপক বলা হয়। এই প্রকার অধঃমাত্রিক উদ্দীপককে একবার প্রয়োগ করলে পেশি তাতে সাড়া দেয় না। তবে এই প্রকার অধঃমাত্রিক কম শক্তির উদ্দীপককে একস্থানে একই সময় বারে বারে প্রয়োগ করলে সেইসব অধঃমাত্রিক উদ্দীপক সংযোজিত হয়ে পেশিকে উদ্দীপিত করে ফলে পেশি সেইসব উদ্দীপনায় সাড়া দেয়।

● **কারণ** (Cause)—প্রতিটি উদ্দীপকের প্রভাবে পেশিতন্তুর ভেতরে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। ওইরকম পর পর অনেকগুলি অধঃমাত্রিক উদ্দীপক সংযোজিত হলে পরিবর্তনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ফলে পেশিটি সংকুচিত হয়।

6. **টিটেনাস (Tetanus) :** স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে তা প্রথমে সংকুচিত হয় এবং পরক্ষণেই শিথিল হয়। একে **পেশিটুইচ** (Muscle twitch) বলে। পেশির সংকোচন ও শৈথিল্যের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন হয় তাদের যথাক্রমে পেশির সংকোচনকাল (Contraction period) এবং পেশির শৈথিল্যকাল বা প্রসারণকাল (Relaxation period) বলা হয়। পরপর উদ্দীপনার কম্পাঙ্ক (Frequency) যদি দ্রুত হয় যাতে পরবর্তী উদ্দীপনা পূর্ববর্তী উদ্দীপনার সংকোচন-কালের মধ্যেই পড়ে তাহলে উদ্দীপনা প্রয়োগের সমগ্র সময়কাল জুড়ে পেশি সংকুচিত অবস্থায় থাকে, একে **টিটেনাস** বলে। এজাতীয় উদ্দীপনা-প্রয়োগ পেশিতে সর্বাধিক টান উৎপন্ন হয়।

7. **মরণ সংকোচ (রাইগর মরটিস—Rigor Mortis) :** মৃত্যুর পরে পেশিতে যে দৃঢ়তা বা কাঠিন্যদশা দেখা যায় তাকে **মরণ সংকোচ** বলে। ● **কারণ** (Cause)—মরণ সংকোচন অবস্থায় পেশির মধ্যে কয়েক রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। যার মধ্যে প্রধান হল— (i) পেশির দৈর্ঘ্য কমে মোটা ও শক্ত হয়, (ii) পেশি অস্বচ্ছ ও অধিক সান্দ্র হয়, (iii) পেশি অধিক অম্লধর্মী (pH-5·8) হয়, (iv) পেশি থেকে গ্লাইকোজেন অদৃশ্য হয়। মৃত্যুর পর ATP-এর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ATP-এর অভাবে অ্যাকটিন ও মায়োসিনের মধ্যে একটি স্থায়ী যৌগ তৈরি হয় যা মরণ সংকোচনের পরিবর্তন ঘটায়।

8. **পরিবাহিতা (Conductivity) :** পেশির কোনো একটি স্থানকে উদ্দীপিত করলে সেই স্থানে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এই উদ্দীপনা পেশির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। এটি পেশির পরিবহন ক্ষমতার ফলে ঘটে। একে পরিবাহিতা বলে।

● **কারণ** (Cause)—উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে উদ্দীপিত স্থানের ঝিল্লির বহির্দেশ ঋণাত্মক এবং অন্তর্দেশ ধনাত্মক হয়। ঝিল্লির মধ্যে $Na^+$ আয়নের ভেদ্যতা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার ফলেই এই পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত এবং অপরিবর্তিত স্থানের মধ্যে **সংকোচন তরঙ্গ** (বিসমবর্তন তরঙ্গ—depolarisation waves) সৃষ্টি হয় যা পেশির উভয়দিকে পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর পরিবাহিত হয়। উষ্ণশোণিত (Warm blood) প্রাণীর ঐচ্ছিক পেশির পরিবাহিতা প্রতি সেকেন্ডে 6–12 মিটারের হয়।
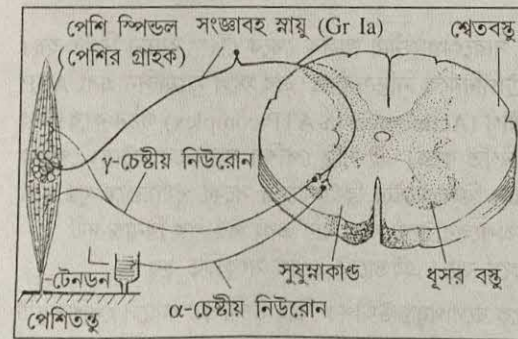
চিত্র 5.8. : পেশিটান প্রতিবর্তের চিত্ররূপ।

9. **প্রসারণক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা (Extensibility and Elasticity) :** পেশির দু'প্রান্তকে টানলে তা কিছুটা প্রসারিত হয় এবং টানকে মুক্ত করলে পেশি আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে যায়। এই পরিবর্তনকে **প্রসারণ ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা** বলে।

● **কারণ** (Cause)—পেশিকোশের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত স্থিতিস্থাপক তন্তু এই ধর্মের জন্য দায়ী।

10. **অসাড়তা (Fatigue) :** একটি পেশিকে বারবার উদ্দীপিত করলে পেশিসংকোচন ক্ষমতা ও বল ক্রমশ কমে যায় ও পেশির শৈথিল্য (Relaxation) বিলম্বিত হতে থাকে। শেষে পেশির উত্তেজন-ক্ষমতা বা উত্তেজিতা ও সংকোচনশীলতা সাময়িকভাবে লোপ পায়। একে **অবসাদ বা অসাড়তা** বলে।

● **কারণ** (Cause)—একটি পেশিকে স্বল্প সময় ব্যবধানে বারে বারে উদ্দীপিত করলে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ওই অবস্থায় পেশিস্থিত গ্লাইকোজেন TCA চক্রে জারিত হওয়ার পরিবর্তে **ল্যাকটিক অ্যাসিড**-এ রূপান্তর হয়ে পেশির মধ্যে সঞ্চিত হয়। ফলে জৈব শক্তির (ATP-এর) উৎপাদন ব্যাহত হয়, এছাড়া অন্যান্য বিপাকীয় পদার্থের সঞ্চয় অসাড়তার কারণ।

11. **সংকলন (Summation) ঃ** দুর্বল উদ্দীপককে অধঃমাত্রিক (Subliminal) উদ্দীপক বলা হয়। এই প্রকার উদ্দীপক একবার প্রয়োগে পেশি সাড়া দেয় না। তবে এরকম অধঃমাত্রিক (কম শক্তির) উদ্দীপক একস্থানে একই সময় প্রয়োগ করলে সেইসব অধঃমাত্রিক উদ্দীপক সংযোজিত হয়ে পেশিকে উদ্দীপিত করে ফলে পেশি সাড়া দেয়।

## ● পেশির উত্তেজিতা ও সংকোচনশীলতা ধর্মের প্রমাণ ●
## (Evidence of properties of Excitability and contractility of muscle)

পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে তা উত্তেজিত হয়ে সংকুচিত হয়। পেশির সংকোচনের পর প্রসারণ ঘটে। পেশির এই সংকোচন-প্রসারণ কাইমোগ্রাফ নামে যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান ধূমায়িত ড্রামে লিপিবন্ধ করলে যে লেখচিত্র (কার্ভ) পাওয়া যায় তাকে **সরল পেশি লেখচিত্র** (Simple muscle curve) বলে।

রেখাচিত্রটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—লীন কাল (Lalent period $P_1$–$P_2$), পেশির সংকোচন কাল ($P_2$–$P_3$), পেশির প্রসারণ কাল ($P_3$–$P_4$) এবং সংকোচনের উচ্চতা (H)।

পেশির এই প্রকার ধর্মগুলি জানার জন্য সাধারণত ব্যাঙের পশ্চাৎপদের সায়াটিক স্নায়ু সংযোগকারী গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশির প্রয়োজন হয়। স্নায়ুর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে উদ্দীপিত করলে পেশিতে যে সংকোচন প্রসারণ ঘটে তা ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপরে অবস্থিত ধূমায়িত কালো রঙের কাগজের উপরে সরল লেখচিত্র হিসেবে রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ড কঙ্কাল পেশির কয়েকটি ধর্ম নির্দেশ করে। সরল লেখচিত্রের বিভিন্ন সময়-কাল জানার জন্য প্রয়োজনে সুরশলাকারের কম্পনের রেখাচিত্র। লেখচিত্রে নীচে নিয়ে পেশির সরল লেখচিত্রের বিভিন্ন দশার সময় জানা যায়, যেমন—

1. **লীন কাল** (Latent period)—পেশিতে উদ্দীপনা প্রয়োগ ও পেশির সংকোচন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কাল।
2. **সংকোচনকাল** (Contraction period)—পেশির সংকোচন শুরু থেকে সর্বোচ্চ সংকোচন পর্যন্ত সময়কাল।
3. **প্রসারণকাল** (Relaxation period)—সর্বোচ্চ সংকোচন থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসা সময়কাল।
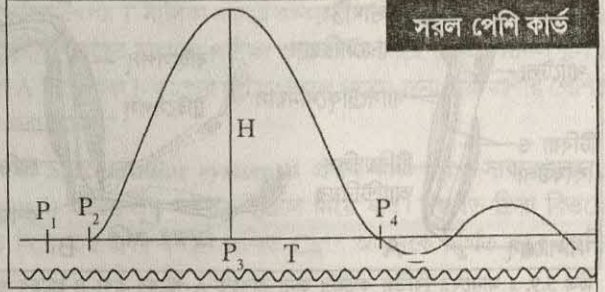
## ✪ কঙ্কাল পেশির ধর্মসম্বন্ধীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Some Facts in relation to properties of Skeletal muscle) ঃ

1. **টিটানি কী (What is Tetany) ? ঃ** পেশির টিটানাস ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি রোগের নাম হল **টিটানি** বা **ধনুষ্টংকার**। এই রোগটি প্রধানত প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার ফলে ঘটে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল—পেশিতে সকম্পন টান, পরে অবিরাম ক্রমসংকোচন ও অবশেষে খিচুনি ঘটে।

● **কারণ**—ক্যালশিয়াম আয়ন স্নায়ু উদ্দীপনায় বাধাদানকারী আয়ন। কোনো কারণে $Ca^{++}$-এর পরিমাণ কমে গেলে স্নায়ু উদ্দীপক সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নগুলি অবিরাম স্নায়ু উদ্দীপনা তৈরি করে পেশির অবিরাম সংকোচন (টিটানি) ঘটায়।

2. **ক্রোনেক্সি ও রিওবেস (Chronaxie and Rheobase) ঃ** উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন কলাকোশে বিভিন্ন প্রকার হয়। এজন্য দুটি কারণ দায়ী, যেমন—(i) **ক্রোনেক্সি**—উদ্দীপনার স্থিতিকাল (Duration of stimulus)। ক্রোনেক্সি কোনো কলার উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার প্রকৃত পরিমাপ হিসাবে কাজ করে। (ii) **রিওবেস**—উদ্দীপনার ন্যূনতম শক্তি (Minimum strength of stimulus)। রিওবেস হল এমন ন্যূনতম গাল্‌ভনিক তড়িৎপ্রবাহ (Minimum galvanic current) যাকে পেশি কিংবা অন্য কোনো কলার মধ্যে অনির্দিষ্টকাল প্রবাহিত হতে দিলে কলাটি (পেশি বা স্নায়ু) উত্তেজিত হয়।

3. **ইলেকট্রোমায়োগ্রাফ (EMG) ঃ** ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি নামে যন্ত্রের সাহায্যে দেহের পেশিতে সৃষ্ট তড়িৎবিভবের লিপিবন্ধ রেখচিত্রকে **ইলেকট্রোমায়োগ্রাম** (Electromyogram) সংক্ষেপে **EMG** বলে।

● **তাৎপর্য**—(i) EMG থেকে পেশিক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। (ii) এর সাহায্যে স্নায়ুপেশিগত রোগ সম্বন্ধে জানা যায়।

4. **সংকোচক পেশি ও প্রসারক পেশি (Flexor and Extensor muscles) :**

(a) **সংকোচক পেশি**—যে পেশির সংকোচনের ফলে কোনো অস্থিসন্ধির কৌণিক দূরত্ব কমে যায় তাকে **সংকোচক** বা **ফ্লেক্সর পেশি** (Flexor muscle) বলে। উদাহরণ—বাহুর **বাইসেপস ব্রাকি** এবং পায়ের **বাইসেপস ফিমোরিস**। প্রথমটির সংকোচনে কনুই সন্ধিতে ভাঁজ হয়, শেষের পেশির সংকোচনে হাঁটুর সন্ধিতে ভাঁজ হয়।

চিত্র 5.9. : মানুষের বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত A-পায়ের এবং B-হাতের গুরুত্বপূর্ণ অস্থি ও পেশির অবস্থান এবং তাদের সংকোচনে হাত-পায়ের বিচলনের চিত্ররূপ।

(b) **প্রসারক পেশি**—যে পেশির সংকোচনের ফলে কোনো অস্থিসন্ধির কৌণিক দূরত্ব বেড়ে যায় অর্থাৎ দুটি অস্থি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় তাকে **প্রসারক পেশি** (Extensor muscle) বলে। উদাহরণ—বাহুর **ট্রাইসেপস ব্রাকি** কনুই সন্ধির প্রসারণ ঘটায়, পায়ের **কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস** জানু সন্ধির প্রসারণ ঘটায়, পায়ের কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস জানু সন্ধির প্রসারণ ঘটায়।

## ◎ 5.5. সারকোটিবিউলার তন্ত্র এবং পেশি সংকোচন পদ্ধতি ◎ (Sarcotubular system and Mechanism of muscle contraction)

### ▲ A. সারকোটিবিউলার তন্ত্র (Sarcotubular system)

❖ (a) **সারকোটিবিউলার তন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Sarcotubular system) :** পেশিতন্তুর মায়োফাইব্রিলগুলি সাধারণ কোশে অবস্থিত এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের মতো বিশেষ ধরনের পর্দাময় জালক, সারকোপ্লাজমীয় জালক দিয়ে আবৃত হয় এবং জালকগুলি পর্দাযুক্ত নালিকা নিয়ে গঠিত হয়ে যে অবিচ্ছিন্ন তন্ত্র গঠন করে তাকে সারকোটিবিউলার তন্ত্র বলে।

(b) **সারকোটিবিউলার তন্ত্রের গঠন (Structure of Sarcotubular system) :**

1. সারকোটিবিউলার তন্ত্রটি পেশিতন্তুর সারকোপ্লাজমার সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি মায়োফাইব্রিলের চারদিকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে থাকে। মায়োফাইব্রিলের দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বালম্বি ভাবে অবস্থানকারী সারকোটিবিউলের নির্দিষ্ট ব্যবধান থেকে আড়াআড়িভাবে অধিক ব্যাসসম্পন্ন একজোড়া আড়াআড়ি বা **তির্যক নালিকা** নির্গত হয়। এগুলিকে **প্রান্তীয় সিস্টারনি** (Terminal cisternae) বা **সারকোপ্লাজমীয় জালকের থলি**
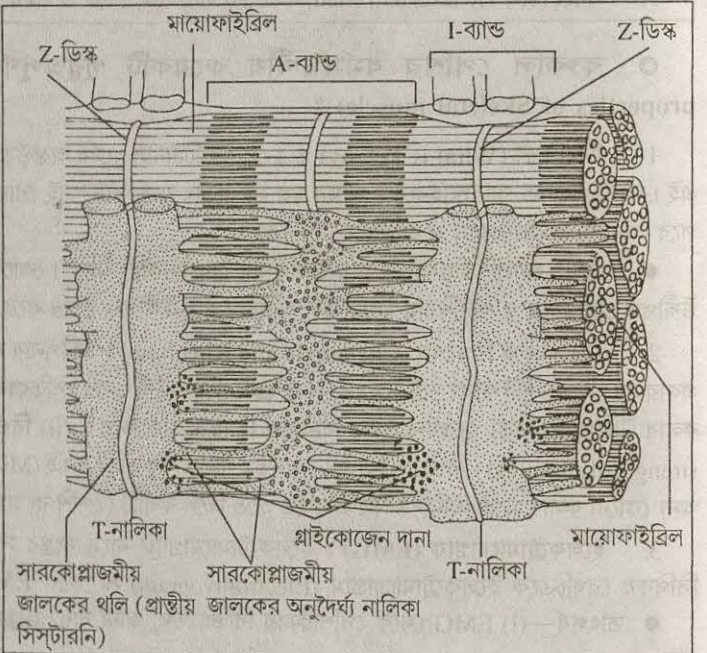
চিত্র 5.10. : সারকোপ্লাজমীয় জালক এবং T-তন্ত্রের পরাণুবীক্ষণিক গঠনের চিত্ররূপ।

(Vesicle of sarcoplasmic reticulum) বলে। এই প্রকার সিস্টারনির (জালকের থলির) মধ্যে ক্যালশিয়াম আয়ন ($Ca^{++}$) থাকে।

2. পেশিতন্তুর সারকোলেমা ভাঁজ হয়ে Z-রেখার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সারকোপ্লাজমার মধ্যে 'T' অক্ষরের মতো **T-নালিকা** (T-tubule) গঠন করে। একটি নালিকার লুমেন (অন্তস্থ ফাঁকা অংশ) অন্য একটি নালিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি তন্ত্র গঠন করে যা **T-তন্ত্র (T-system)** নামে পরিচিত। T-নালিকাগুলির পেশিতন্তু বাইরে অবস্থিত সারকোলেমা থেকে উৎপন্ন হয়, তাই তারা বহিস্থ তরলের সঙ্গে কোশ মধ্যস্থ তরলের (সারকোপ্লাজমের) মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

3. একজোড়া প্রান্তীয় সিসটারনির সঙ্গে সারকোলেমা থেকে উৎপন্ন T-নালিকা একত্রে কঙ্কাল পেশির **ত্রিনল বা ট্রায়েড** (Triad of skeletal muscle) গঠন করে। ব্যাঙের পেশিকে পরাণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই ত্রিনলগুলি Z-লাইনের চারপাশে থাকে। মানবদেহের পেশিতে ত্রিনলগুলি A-ব্যান্ড এবং I-ব্যান্ডের সংযোগস্থলে থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর পেশিতে প্রতিটি সারকোমিয়ারে দুটি করে ত্রিনলের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

(c) **সারকোটিবিউলার তন্ত্রের কাজ (Function of Sarcotubular system)** ঃ প্রধান কাজ হল—সারকোলেমাতে উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন ক্রিয়া বিভবকে (Action potential) অত্যন্ত দ্রুত মায়োফাইব্রিলে নিয়ে যায়। সম্ভবত ক্রিয়া বিভবের বিসমবর্তনকে (Depolarisation) প্রান্তীয় সিসটারনিতে নিয়ে যায় এবং এখানে সঞ্চিত $Ca^{++}$ আয়নকে নির্গত করে **পেশির সংকোচনে** সাহায্য করে।

## ▲ B. পেশি সংকোচন পদ্ধতি (Mechanism of muscle contraction)

● সংকোচনশীলতা (পেশির সংকোচন) পেশির একটি বিশেষ ধর্ম যা অন্য কোনো কলাতে দেখতে পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ পেশিতে **অ্যাকটিন** ও **মায়োসিন** নামে দু'রকমের সংকোচন উপাদান (Contractile elements) এবং সারকোটিবিউলার তন্ত্র থাকে যা পেশিকে সংকুচিত করতে সাহায্য করে। পেশিকে উদ্দীপিত করলে পেশির সংকোচন ঘটে।

চিত্র 5.11. ঃ পেশির সংকোচনের সময় অ্যাকটিন ও মায়োসিন ফিলামেন্টগুলির অবস্থান এবং সারমিয়ারের দৈর্ঘ্য হ্রাসের চিত্ররূপ।

1. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড) থেকে স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ু ও পেশির সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে পেশিতে যায় ও পেশিকে উদ্দীপিত করে। স্নায়ু আবেগ স্নায়ু পেশি সংযোগস্থল অতিক্রম করে পেশিতন্তুর পর্দা অর্থাৎ সারকোলেমার মধ্য দিয়ে পেশির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সারকোলেমা উদ্দীপিত হয়ে সমবর্তন (Polarised) অবস্থা থেকে বিসমবর্তন (Depolarised) অবস্থায় পরিণত হয়।

2. এই বিসমবর্তন তরঙ্গ পেশির T-নালিকা দিয়ে সারকোপ্লাজমায় যায় এবং সারকোপ্লাজমীয় জালকের গায়ে অবস্থিত ক্যালশিয়াম আয়নকে ($Ca^{++}$) সারকোপ্লাজমে নির্গত করে। ক্যালশিয়াম আয়ন অ্যাকটিন ফিলামেন্টে অবস্থিত পেশিসংকোচনে বাধাদানকারী **ট্রোপনিনকে** নিষ্ক্রিয় করে। এর ফলে মায়োসিন ও ATP সহজেই অ্যাকটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে **অ্যাক্টিনো-মায়োসিন-ADP যৌগ** (Actino-Myosin ADP complex) গঠন করে।

3. এরপর $Ca^{++}$ আয়ন মায়োসিনস্থিত ATP-ase উৎসেচককে সক্রিয় করে। সক্রিয় ATP-ase পরে ATP-কে বিশ্লিষ্ট করে **জৈবশক্তি** উৎপন্ন করে। এই জৈবশক্তি দুটি অ্যাকটিন ফিলামেন্টের মধ্যে **ইলেকট্রোস্টাটিক চার্জ** (Electrostatic charge) উৎপন্ন করে যা দুটি অ্যাকটিন ফিলামেন্টকে পরস্পর কাছে চলে আসতে সাহায্য করে। পেশির সংকোচনের সময় মায়োসিন ফিলামেন্টের ক্রসবিজ সন্নিহিত অ্যাকটিন ফিলামেন্টের ক্রিয়াস্থানের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে এর A-ব্যান্ডের কেন্দ্রটিকে টেনে নেয়। এই সময় মায়োফাইব্রিলের I ব্যান্ড ও H অঞ্চলের দৈর্ঘ্য কমে যায় এবং পর পর বিন্যস্ত দুটি 'Z'-রেখা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়, ফলে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমে যায়। এইভাবেই পেশি সংকুচিত হয়। এই কারণে পেশির দৈর্ঘ্য কমে অর্থাৎ **পেশির সংকোচন** ঘটে।
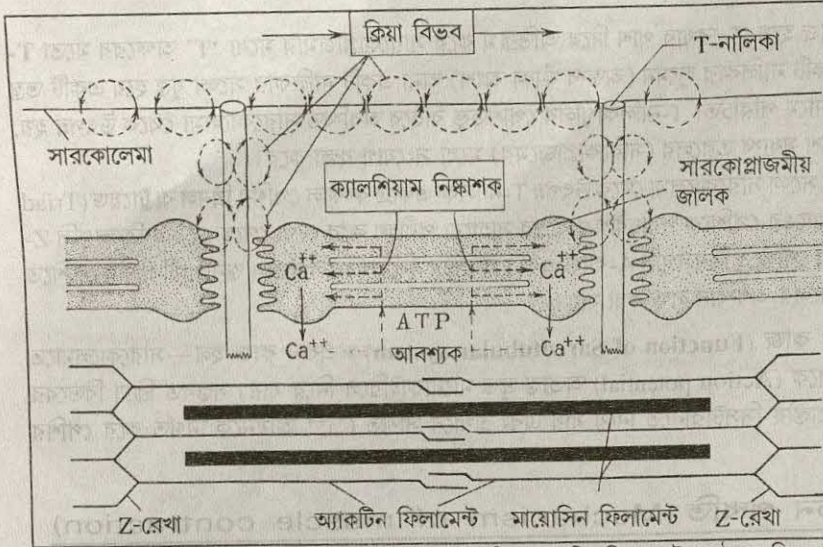
চিত্র 5.12. : পেশিকোশ বা পেশিতন্তুর সারকোমিয়ারে মায়োসিন অ্যাকটিন ফিলামেন্টের গঠনের চিত্ররূপ।

## ▲ সংকোচনের স্লাইডিং-ফিলামেন্ট তত্ত্ব / ক্রশ ব্রীজ তত্ত্ব (Theory of Sliding filament of Cross bridge of Contraction)

1954 খ্রিস্টাব্দে H. E. Huxley, J. Hanson, A. F. Huxley এবং R. Niedergerke নামে বিজ্ঞানীরা **'পেশি সংকোচনের ফিলামেন্টের গড়িয়ে চলন মতবাদ বা স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি' (Sliding-Filament theory)** প্রস্তাব করেন। বর্তমানে এই তত্ত্ব কিছুটা পরিবর্তিত রূপে **'ক্রশ ব্রীজ তত্ত্ব' (Cross bridge theory)** বা **র‍্যাচিট তত্ত্ব (Rachet theory)** নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল সমটান পেশি সংকোচনের সময় মায়োসিন ফিলামেন্টের তির্যক বন্ধনী বা ক্রশ ব্রীজ-এর সাহায্যে দু'পাশের অ্যাকটিন ফিলামেন্টে মসৃণভাবে গড়িয়ে এগোয় (Smooth sliding of action over myosin) ফলে

● ক্রশ ব্রীজ (Cross bridges) ●
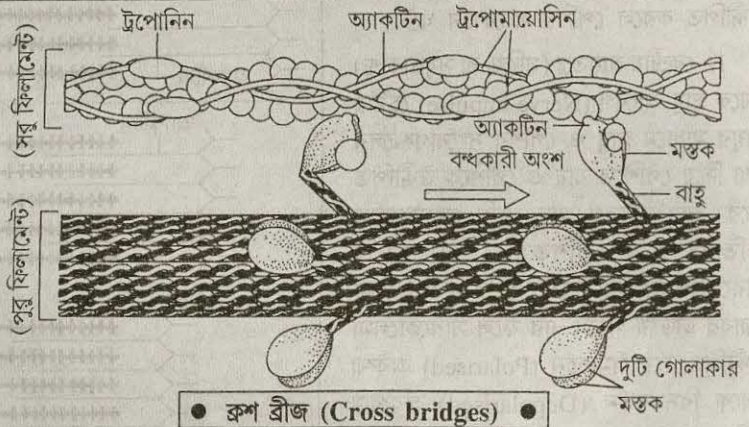
❖ (a) **সংজ্ঞা**—মায়োসিন থেকে অ্যাকটিনের দিকে যে অসংখ্য আড়াআড়ি সংযোগকারী অংশ প্রসারিত থাকে তাকে ক্রশ ব্রীজ বলে।

(b) **গঠন**—ক্রশ ব্রীজগুলি মায়োসিনে প্রোটিন অংশ যা মায়োসিন ফিলামেন্টের অক্ষ থেকে বাহুর মতো অংশ প্রসারিত হয় এবং গোলাকার মস্তক মতো অংশে শেষ হয়। একটি মায়োসিন প্রোটিনের দুটি গোলাকার মস্তক আছে যা ক্রশ ব্রিজ হিসেবে কাজ করে। সারকোমিয়ারের উভয় পাশে মায়োসিন মস্তকগুলি বিন্যাস বিপরীতমুখী ফলে তারা অ্যাকটিনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে ক্রশ ব্রীজ গঠন করে প্রতি পাশের অ্যাকটিনকে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়।

দুটি Z-লাইন কাছাকাছি চলে আসে, কাছাকাছি চলে আসে অর্থাৎ পেশির দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটে। যখন একটি পেশির সংকোচন ঘটে তখন পেশির প্রতিটি তন্তুর দৈর্ঘ্য কমে যায়। পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ার ফলে মায়োফাইব্রিলের দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটে। দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটার কারণ দুটি পাশাপাশি Z-ডিস্কের অন্তর্বর্তী স্থানের দূরত্ব কমে যায় ফলে একটি পেশিতন্তুর প্রতিটি সারকোমিয়ারের দূরত্ব কমে যায়। তবে সারকোমিয়ারের মোটা A ব্যান্ডের অথবা পাতলা I ব্যান্ডের দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। প্রতিটি পাতলা I ব্যান্ডের অন্তর্বর্তী স্থানের অর্থাৎ H অঞ্চলের দূরত্ব কমে যায় ফলে সারকোমিয়ার বা পেশিতন্তুর সমগ্র দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটে।
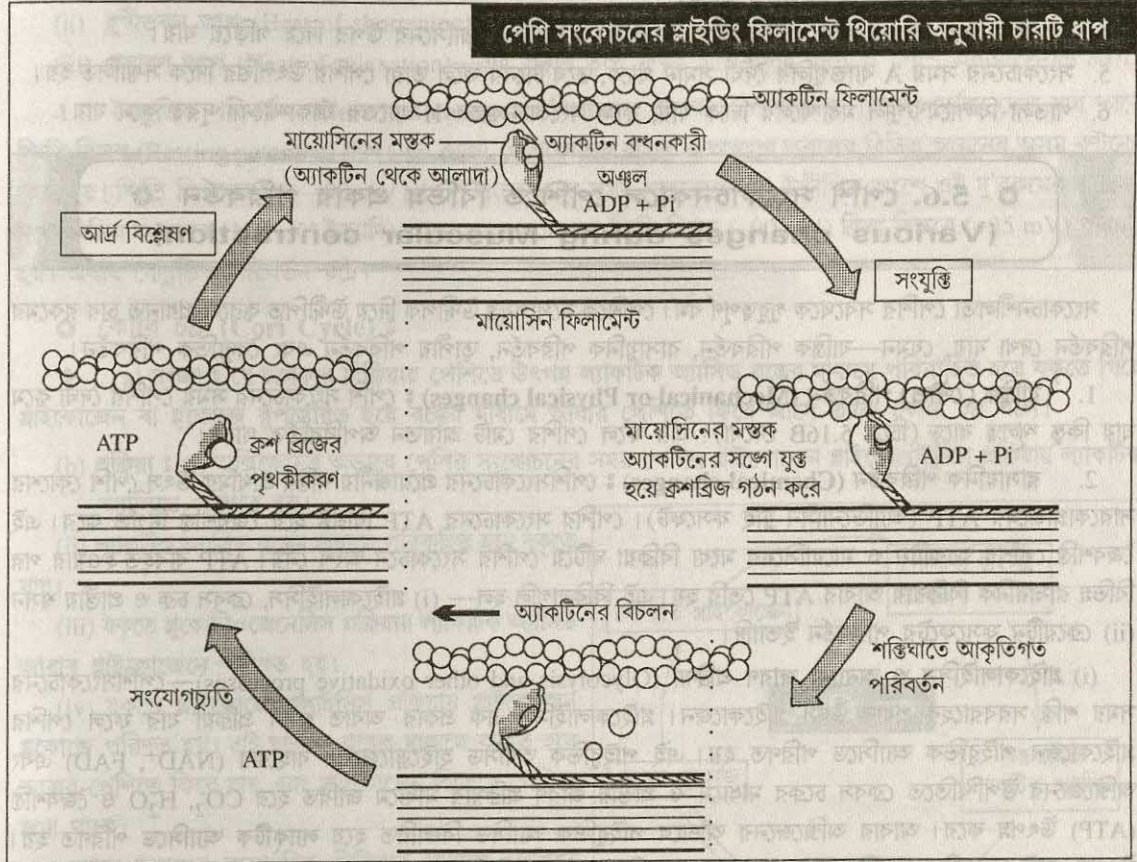
চিত্র 5.13. ঃ পেশির সংকোচনের সময় ক্রশব্রিজ অ্যাকটিনকে মায়োসিনের দিকে গড়িয়ে চলনের (স্লাইডিংয়ের) চিত্ররূপ।

বিশ্রামরত অবস্থায় স্থির পেশিতে মায়োসিন মস্তকগুলি অ্যাকটিনের সঙ্গে লেগে থাকে না। ক্রশব্রিজের প্রতিটি মায়োসিনের গোলাকার মস্তকে **ATP বন্ধনকারী অঞ্চল** (ATP binding site) এবং **অ্যাকটিন বন্ধনকারী অঞ্চল** (Actin binding site) সংলগ্নভাবে অবস্থান করে। গোলাকার মস্তকগুলি মায়োসিন ATP-ase উৎসেচকের মতো কাজ করে ও ATP-কে ভেঙে ADP এবং জৈবশক্তি (~p) সম্পন্ন ফসফেটে বিশ্লিষ্ট করে। এই জৈবশক্তি ফসফেট অ্যাকটিনের সঙ্গে মায়োসিনের মস্তককে যুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়। জৈবশক্তি ব্যবহারের পরে ফসফেট অজৈব ফসফেটে (Pi) পরিণত হয়ে যায়। একবার ক্রশব্রিজগুলি অ্যাকটিনের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার পর Pi নির্গত হয়ে যায়। এর ফলে মায়োসিন প্রোটিনের আকৃতিগত পরিবর্তন হয় এবং একটি **শক্তি ঘাত** (Power stroke) সংঘটিত হয় যার কারণে পাতলা ফিলামেন্টগুলি (অ্যাকটিন ফিলামেন্টগুলি) A-ব্যান্ডের কেন্দ্রের দিকে টানের ফলে সরে আসে (চিত্রে ডট লাইনগুলি দেখো)। এর পর ADP মুক্ত হয় এবং শক্তি ঘাতের পর ক্রশ ব্রীজের মস্তকের সঙ্গে নতুন ATP যুক্ত হয়। শক্তি ঘাতের শেষে অ্যাকটিন থেকে ক্রশ ব্রিজগুলিকে ভাঙার জন্য ADP-র নির্গমন এবং নতুন ATP সংযুক্তির প্রয়োজন। এরপর মায়োসিন ATP-ase উৎসেচক আবার নতুন ATP-কে বিশ্লিষ্ট করবে এবং পূর্ববর্তী চক্রের মতো সক্রিয় হবে।

- **স্লাইডিং ফিলামেন্ট তত্ত্বের সারসংক্ষেপ (Summary of sliding filament theory) ঃ**

1. পেশিতন্তু এবং তার ভিতরের সব মায়োফাইব্রিলগুলি তাদের চলনের ফলে পেশির সন্নিবেশ (Insertion) থেকে উৎপত্তি প্রান্তের (Origin) কাছে চলে আসে।
2. দুটি Z-ডিস্কের মধ্যে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য হ্রাসের ফলে মায়োফাইব্রিলগুলির দৈর্ঘ্য কমে যায়।
3. মায়োফিলামেন্টগুলি গড়ানো (Sliding) গতির ফলে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কম হয় কিন্তু মায়োসিন ও অ্যাকটিন ফিলামেন্টগুলির দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে।
4. মায়োসিন ক্রশ ব্রিজের শক্তি ঘাতের ফলে অ্যাকটিন তন্তুগুলি মায়োসিনের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।
5. সংকোচনের সময় A ব্যান্ডগুলির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, তবে টানের ফলে তারা পেশির উৎপত্তির দিকে সঞ্চালিত হয়।
6. পাতলা ফিলামেন্টগুলি মধ্যস্থলের দিকে যায়, ফলে সংকোচনকালে H-ব্যান্ডের ফাঁকাস্থানের দূরত্ব কমে যায়।

## ◎ 5.6. পেশি সংকোচনকালে পেশিতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন ◎ (Various changes during Muscular contraction)

সংকোচনশীলতা পেশির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে প্রধানত চার রকমের পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন—যান্ত্রিক পরিবর্তন, রাসায়নিক পরিবর্তন, তাপীয় পরিবর্তন এবং বৈদ্যুতিক পরিবর্তন।

1. **যান্ত্রিক (ভৌত) পরিবর্তন (Mechanical or Physical changes) ঃ** পেশি সংকোচনের সময় পেশির দৈর্ঘ্য কমে যায় কিন্তু স্থূলত্ব বাড়ে (চিত্রে 5.16B দেখো)। এর ফলে পেশির মোট আয়তন অপরিবর্তিত থাকে।

2. **রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical changes) ঃ** পেশিসংকোচনের প্রয়োজনীয় শক্তির প্রাথমিক উৎস পেশি কোশের সারকোপ্লাজমের ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট)। পেশির সংকোচনের ATP বিশ্লিষ্ট হয়ে জৈবশক্তি নির্গত করে। এই জৈবশক্তি পেশির অ্যাকটিন ও মায়োসিনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে পেশির সংকোচনে অংশ নেয়। ATP-ব্যবহৃত হওয়ার পর বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আবার ATP তৈরি হয়। এই বিক্রিয়াগুলি হল— (i) গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন (ii) ক্রেয়েটিন ফসফেটের পরিবর্তন ইত্যাদি।

(i) **গ্লাইকোলাইসিস ও অন্যান্য জারণ প্রক্রিয়া** (Glycolysis and other oxidative processes)—পেশিসংকোচনের সময় শক্তি সরবরাহের প্রধান উৎস গ্লাইকোজেন। গ্লাইকোলাইসিস এক প্রকার অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া যার ফলে পেশির গ্লাইকোজেন পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই পাইরুভিক অ্যাসিড হাইড্রোজেনের বাহকের ($NAD^+$, FAD) এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে ও প্রান্তীয় জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জারিত হয়ে $CO_2$, $H_2O$ ও জৈবশক্তি (ATP) উৎপন্ন করে। আবার অক্সিজেনের অভাবে পাইরুভিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে **ল্যাকটিক অ্যাসিডে** পরিণত হয়। **উৎপন্ন মোট ল্যাকটিক অ্যাসিডের এক-পঞ্চমাংশ** অক্সিজেনের উপস্থিতিতে TCA চক্র (ক্রেবস চক্র) এবং প্রান্তীয় জারণ (Terminal oxidation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জারিত হয়ে $CO_2$ এবং $H_2O$ পরিণত হয় এবং ATP নামে জৈবশক্তি উৎপন্ন করে। **বাকি চার-পঞ্চমাংশ** ল্যাকটিক অ্যাসিড **কোরি চক্রের** (Cori cycle) মাধ্যমে যকৃতে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়।

গ্লাইকোলাইসিস এবং TCA ও প্রান্তীয় শ্বসনে গ্লাইকোজেনের প্রতিটি গ্লুকোজ অণু জারিত হয়ে 39 অণু ATP তৈরি করে। প্রতিটি ATP অণুর প্রান্তীয় অণু বিচ্ছিন্ন (বিশ্লিষ্ট) হয়ে প্রায় 8,000–12,000 ক্যালোরি জৈব শক্তি উৎপন্ন করে। ATP ভেঙে প্রথমে ADP হয়, পরে এই ADP আবার বিশ্লিষ্ট হয়ে AMP (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) এবং আবার 8,000—12,000 ক্যালোরি জৈব শক্তি উৎপন্ন করে। এই জৈব শক্তি পেশির সংকোচনে সাহায্য করে।

(ii) **ক্রেয়েটিনিন ফসফেট (ফসফাজেন)-এর পরিবর্তন**—ক্রিয়েটিন ফসফেট (Cr~P) পেশির অন্য একটি উচ্চ জৈব শক্তিসম্পন্ন যৌগ যা অন্যান্য কোশের তুলনায় পেশিকোশে বেশি থাকে। পেশি সংকোচনে ATP শক্তি সরবরাহ করে ADP-তে পরিণত হয়। ADP-কে দ্রুত ATP-তে পরিণত করার জন্য ক্রিয়েটিন ফসফটে (Cr~P) বিশেষভাবে অংশ নেয়। (ATP $\rightarrow$ ADP + ~ P ; ADP + Cr~P (ক্রিয়েটিন ফসফেট) $\rightarrow$ ATP + Cr (ক্রিয়েটিন)। '~' — এটি হল জৈব শক্তির বন্ড।

(iii) **pH-এর পরিবর্তন (Changes of pH)**—স্বাভাবিক পেশি সংকোচনের শুরুতে উভয় অ্যাসিড এবং অ্যালকালি (ক্ষার) জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় বলে পেশির বিক্রিয়া সামান্য ক্ষারীয় থাকে অর্থাৎ pH 7·3 হয়। কিন্তু পেশির সংকোচন দীর্ঘস্থায়ী হলে বেশি পরিমাণ ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ফলে পেশির বিক্রিয়া অ্যাসিড বা অম্লধর্মী হয়।

3. **তাপীয় পরিবর্তন (Thermal change) :** পেশিসংকোচনের সময় ATP থেকে মুক্ত শক্তির একাংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ. ভি. হিল (A.V. Hill) নামে বিজ্ঞানী এই তাপ উৎপাদনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন, যেমন—

(i) **সক্রিয় তাপ** (Heat of activation)—পেশি সংকোচন হওয়ার শুরুতে উৎপন্ন তাপ।

(ii) **হ্রস্বীভবন তাপ** (Heat of shortening)—পেশির সংকোচনকালে উৎপন্ন তাপ।

(iii) **প্রসারণ তাপ** (Heat of relaxation)—এই প্রকার তাপ মন্থর গতিসম্পন্ন তাপ ও পেশি প্রসারণকালীন তাপ।

4. **বৈদ্যুতিক পরিবর্তন (Electrical change) :** বিশ্রামরত অবস্থায় পেশিতে যে বিভব পার্থক্য দেখা যায় তাকে **স্থিতি বিভব** (Resting potential) বলে। এর কারণ পেশিকোশের বহিস্থ ও অন্তঃস্থ তরলের বিভিন্ন আয়নের অসম বণ্টনের ফলে হয়। স্থিতি বিভবের মান – 90 mV। পেশি সংকোচনের সময় সারকোলেমার উদ্দীপিত অংশে ওই দু'রকমের তরলের মধ্যে বিভিন্ন আয়নের ($Na^+$, $K^+$ ইত্যাদি) আদানপ্রদান ঘটে বলে স্থিতি বিভব (–90 mV) **ক্রিয়া বিভবে** (+35 mV) পরিণত হয়। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটে।

## ✪ কোরি চক্র (Cori Cycle) :

❖ **(a) সংজ্ঞা : যে চক্রাকার বিক্রিয়ায় পেশিতে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে যকৃতে গিয়ে গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে আবার পেশিতে ফিরে আসে তাকে কোরি চক্র বলে।**

(b) **প্রক্রিয়া :** (i) অক্সিজেনের অভাবে পেশির সংকোচনের সময় পেশির গ্লাইকোজেন **গ্লাইকোলাইসিস** প্রক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

(ii) ল্যাকটিক অ্যাসিড রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে যকৃতে যায়।

**(iii) যকৃতে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিড আবার গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়।**

(iv) যকৃতে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে আবার পেশিতে ফিরে যায় এবং গ্লাইকোজেন হিসেবে পেশিতে জমা থাকে।

চিত্র 5.14. : কোরি চক্র।

এভাবে চক্রাকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পেশিতে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড যকৃতে গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। পরে যকৃতে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে পেশিতে যায় এবং সেখানে আবার গ্লাইকোজেন হিসেবে থাকে ও পরে গ্লুকোজ ও ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই চক্রাকার বিক্রিয়াকে **কোরি চক্র** (Cori cycle) বলে।

# ✪ 5.7. সমদৈর্ঘ্য ও সমটান পেশি সংকোচন ✪ (Isometric and Isotonic Muscle Contraction)

✪ **পেশি সংকোচনের প্রকারভেদ (Types of muscular contractions) :** পেশির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের (Components) উপস্থিতির ফলে দু'প্রকারের সমদৈর্ঘ্য ও সমটান পেশি সংকোচন সংঘটিত হয়।

### ▲ A. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন (Isometric muscle contraction)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** পেশির যে সংকোচনে পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় সমান (অপরিবর্তিত) থাকে কিন্তু পেশিটান (Muscle tone) বাড়ে তাকে সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন বলে।

(b) **কারণ (Cause) :** পেশিতে অবস্থিত সংকোচী উপাদান পেশির সংকোচন ঘটায় তবে প্রধানত কতকগুলি সক্রিয়ভাবে বিস্তৃত স্থিতিস্থাপক উপাদান (Elastic components) সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনের মূল কারণ। সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনের সময় যে শক্তিক্ষয় ঘটে তার প্রায় সবটাই পেশির তাপ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

(c) **বৈশিষ্ট্য (Characters)**—সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনে—(i) পেশি টান বাড়ে। (ii) লীন কাল (Latent period) বাড়ে। (iii) সংকোচন এবং প্রসারণ কাল (সময়) বাড়ে। (iv) কম তাপ উৎপন্ন হয়। (v) কোনো বাহ্যিক কাজ হয় না।

(d) **উদাহরণ (Examples)**— (i) দৈনন্দিন জীবনে সমদৈর্ঘ্য পেশি সমসংকোচন প্রধানত অভিকর্ষের বিরুদ্ধে দেহভঙ্গি বজায় রাখে। (ii) ভারী সুটকেসের হাতল ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় বহন করার সময় বাহুর পেশির সমদৈর্ঘ্য সংকোচন ঘটে। (iii) হাতে একটি বল (অথবা ভারী কিছু) নিয়ে হাত বাঁক করলে বাইসেপস পেশির সংকোচন হয় না কিন্তু পেশিতে টান টান ভাব দেখা যায়।
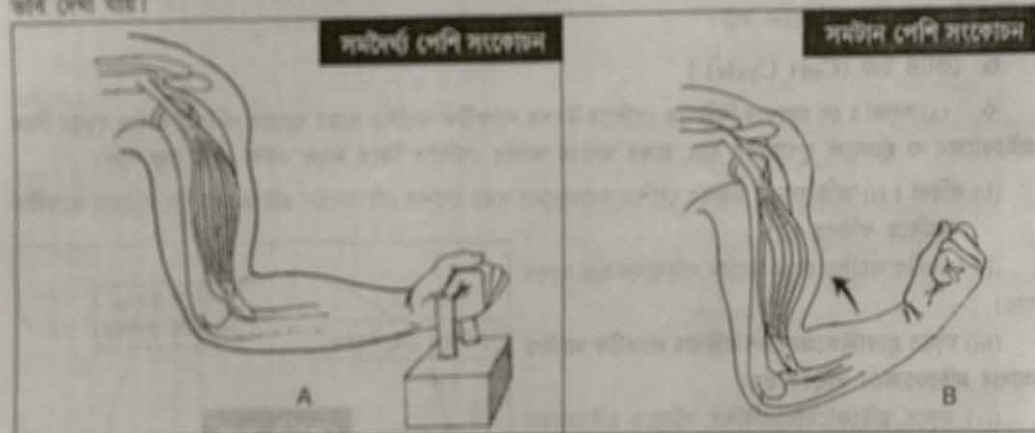
চিত্র 3.18 : A-সমদৈর্ঘ্য সংকোচন এবং B-সমটান পেশি সংকোচনের চিত্ররূপ।

### ▲ B. সমটান পেশি সংকোচন (Isotonic muscle contraction) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** পেশির যে সংকোচনে পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য কমে যায় ও স্থূলতা বাড়ে কিন্তু আয়তন এবং পেশিটান সমান থাকে (অথবা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে) তাকে সমটান পেশি সংকোচন বলে।

(b) **কারণ (Cause) :** পেশিস্থিত সংকোচী উপাদান (Contractile component) অ্যাকটিন ও মায়োসিন সমটান পেশি সংকোচনের জন্য প্রধানত দায়ী। এই প্রকার সংকোচনে স্থিতিস্থাপক উপাদান অপরিবর্তিত থাকে ফলে পেশির মধ্যে টান একই প্রকার থাকে। সমটান পেশি সংকোচনের সময় যে শক্তি ক্ষয় ঘটে তার প্রায় 30 শতাংশ যান্ত্রিক কাজে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য কমাতে এবং বাকি 70 শতাংশ পেশিতে তাপ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

(c) **বৈশিষ্ট্য (Characters) :** (i) পেশিটান অপরিবর্তিত থাকে। (ii) লীন কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। (iii) সংকোচন ও প্রসারণ কাল কমে যায়। (iv) বেশি তাপ উৎপন্ন হয়। (v) এই প্রকার সংকোচনে বাহ্যিক কাজ হয়।

(d) **উদাহরণ (Examples)**—চলাফেরা, হাঁটা ইত্যাদির সময় অধিকাংশ পেশির সংকোচন এই প্রকৃতির। এছাড়া অল্প ভারী বস্তুকে তুলে ধরার জন্য বাহুর বাইসেপস পেশি সংকোচন সমটান পেশি সংকোচনের অন্তর্গত।

• সমদৈর্ঘ্য এবং সমটান পেশি সংকোচনের পার্থক্য (Difference between Isometric and Isotonic muscle contraction) :

| সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন | সমটান পেশি সংকোচন |
| --- | --- |
| 1. পেশি সংকোচনের সময় পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু শক্ত হয়। | 1. পেশি সংকোচনের সময় পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য কমে যায় ও মোটা হয়। |
| 2. পেশিতন্তুতে পেশিটান বাড়ে। | 2. পেশিতন্তুতে পেশিটান সমান থাকে। |
| 3. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন উদ্দীপকের শক্তির (Strength of stimulation) উপর নির্ভর করে। | 3. সমটান পেশি সংকোচনে পেশিটান বোঝার (Load) পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
| 4. পেশিতে অবস্থিত কতকগুলি সারিবদ্ধভাবে স্থিত স্থিতিস্থাপক উপাদান এই রকম সংকোচনের জন্য দায়ী। | 4. পেশিতে অবস্থিত সংকোচী উপাদান (অ্যাকটিন ও মায়োসিন) এই রকম সংকোচনের জন্য দায়ী। |
| 5. সংকোচনের সময় পেশিতে ব্যয়িত শক্তির সবটাই তাপ উৎপাদন করে। | 5. সংকোচনের সময় পেশিতে ব্যয়িত শক্তির 70 শতাংশ তাপ উৎপাদনে এবং 30 শতাংশ পেশির দৈর্ঘ্য হ্রাসে ব্যবহৃত হয়। |

## 1. স্নায়ু (নার্ভ—NERVES)

স্নায়ুকোশ বা নিউরোন এবং নিউরোগ্লিয়া কোশ নিয়ে গঠিত হয় স্নায়ুতন্ত্র। এই তন্ত্র প্রাণীদেহের যাবতীয় তন্ত্রের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, ফলে পরিবেশের পরিবর্তন সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অপরিবর্তিত রাখে।

## ○ 5.8. নিউরোন (Neurone) ○

### ▲ নিউরোনের সংজ্ঞা, গঠন এবং প্রকারভেদ (Definition, Structure and Types of Neurone) :

❖ (a) **নিউরোনের সংজ্ঞা (Definition of neurone) : স্নায়ুকোশ বা নিউরোন স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক একক।**

▣ (b) **নিউরোনের গঠন (Structure of neurone)** : অসংখ্য স্নায়ুকোশ এবং নিউরোগ্লিয়া নামে অবলম্বনকারী কোশের সমন্বয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। প্রতিটি নিউরোন বা স্নায়ুকোশ কোশদেহ এবং প্রলম্বিত অংশ দুটি নিয়ে গঠিত।

1. **কোশদেহ (Cell body or Perikaryon)** : কোশদেহকে সোমা (Soma) বলে। এর আকৃতি ত্রিভুজাকার, গোলাকার, তারার মতো বা দুমুখ সূচালো ইত্যাদি আকারের হয়। কোশদেহের **কোশঝিল্লি** লাইপোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত। কোশঝিল্লি ডেনড্রাইটস ও অ্যাক্সনে সম্প্রসারিত হয়। স্নায়ুকোশের সাইটোপ্লাজমকে **নিউরোপ্লাজম** বলে। এতে নিস্‌ল্ কণা, মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, রাইবোজোম, নিউরোফাইব্রিল, অন্তঃকোশ জালক ইত্যাদি সজীব বস্তুগুলি থাকে। নিস্‌ল্ কণা কোশের সাইটোপ্লাজমে এবং ডেনড্রাইটে থাকে, অ্যাক্সনে থাকে না। নিউরোফাইব্রিল কোশ থেকে ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সনে যায় এবং তাদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় এবং নবজাত শিশুদের স্নায়ুকোশে সেন্ট্রিওল দেখা যায়। কোশদেহের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকৃতি গোলাকার বা ডিম্বাকার **নিউক্লিয়াস** দেখা যায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ধূসর বস্তুর মধ্যে এবং গ্যাংগ্লিয়ার মধ্যে কোশদেহ থাকে।

2. **প্রলম্বিত অংশ (Processes)** : কোশদেহ থেকে যে শাখাপ্রশাখা বের হয়, তাদের প্রলম্বিত অংশ (স্নায়ুতন্তু) বলে। অতএব স্নায়ুতন্তু দু'রকমের হয়, যেমন—ডেনড্রনস বা ডেনড্রাইটস এবং অ্যাক্সন।

(ক) ডেনড্রনস বা ডেনড্রাইটস (Dendrons or Dendrites)—ডেনড্রনস সাধারণত নিউরোনে ছোটো ছোটো **শাখা-প্রশাখাযুক্ত অন্তর্বাহী শাখা**। গলগি বডি ছাড়া কোশদেহের সকল অঙ্গাণু (organelles) ডেনড্রনে রয়েছে। **কাজ**—ডেনড্রনস বহিঃপরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোশদেহের মধ্যে পাঠায়।

(খ) **অ্যাক্সন** (Axon)—অ্যাক্সন লম্বা তন্তু, সংখ্যায় একটি এবং স্নায়ুকোশের **বহির্বাহী শাখা** গঠন করে। **কাজ**—অ্যাক্সন উদ্দীপনাকে কোশদেহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

• নিউরোপ্লাজম
• কোশঝিল্লি
• নিজল কণা
• মাইটোকন্ড্রিয়া
• নিউরোফাইব্রিল
• অ্যাক্সন হিলোক
• অ্যাক্সোপ্লাজম
• অ্যাক্সোলেমা
• মায়েলিন আবরণী (মেডুলারি আবরণী)
• নিউরোলেমা (স্বোয়ান আবরণী)
• অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত (নিউরোনের সঙ্গে সাইন্যাপস বা পেশির সঙ্গে স্নায়ুপেশি সংযোগস্থল গঠন করে)
• নিউক্লিয়াস
• কোশদেহ
(i) ডেনড্রাইট থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করে অ্যাক্সনে পাঠায়।
(ii) নিউরোনের অপজনন ও পুনর্জননে সাহায্য করে।
• ডেনড্রন ঃ
(i) অন্তর্বাহী শাখা যা কোশদেহের দিকে স্নায়ু প্রবাহকে নিয়ে যায়।
(ii) কোনো কোনো ডেনড্রাইট গ্রাহকে রূপান্তরিত হয়।
• গলগি বডি
• স্বোয়ান কোশ
• অ্যাক্সন—শাখাবিহীন সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রলম্বিত অংশ।
(i) কোশদেহ থেকে স্নায়ু আবেগ নিয়ে যায়।
(ii) পরবর্তী নিউরোনে বা পেশি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়।
• নোড্ অফ র‍্যানভিয়ার (মায়েলিন আবরণী থাকে না বলে সংকুচিত দেখায়)
(i) স্নায়ু আবেগের দ্রুত পরিবহনে সাহায্য করে।
(ii) নিউরোনের শাখার উৎপত্তি স্থান হিসাবে কাজ করে।

চিত্র 5.16. ঃ একটি নিউরোনের বিভিন্ন অংশ এবং তাদের কয়েকটি মুখ্য কাজ।

❂ **নার্ভ (Nerve) ঃ** বহুসংখ্যক স্নায়ুকোশের অ্যাক্সন বা ডেনড্রাইটস একত্রে গুচ্ছিত হয়ে একটি **স্নায়ু** বা **নার্ভ** (Nerve) গঠিত হয়। গঠন অনুসারে স্নায়ুকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—মেডুলেটেড বা মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু এবং নন্‌মেডুলেটেড বা মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তু।

(1) **মেডুলেটেড বা মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু (Medullated or Myelinated nerve fibre)**—মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—অ্যাক্সিস্ সিলিন্ডার, মেডুলারি আবরণী বা মায়েলিন আবরণী এবং স্নায়ুঝিল্লি বা নিউরোলেমা বা স্বোয়ানের আবরণী।

(i) **অ্যাক্সিস্ সিলিন্ডার** (Axis cylinder)—স্নায়ুতন্তুর কেন্দ্রীয় অক্ষটিকে অ্যাক্সিস্ সিলিন্ডার বা **অক্ষতন্তু** বলে। অক্ষতন্তুর মধ্যে সাইটোপ্লাজমকে অ্যাক্সোপ্লাজম (Axoplasm) বলে। কোশদেহের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে অ্যাক্সোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কোশদেহের যে অংশ থেকে প্রশস্থ অ্যাক্সন বের হয় তাকে **অ্যাক্সন হিলক** (Axon hillock) বলে। অ্যাক্সন হিলকে নিজল দানা থাকে না। অ্যাক্সিস্ সিলিন্ডার **অ্যাক্সোলেমা** (Axolemma) নামে একটি পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে।
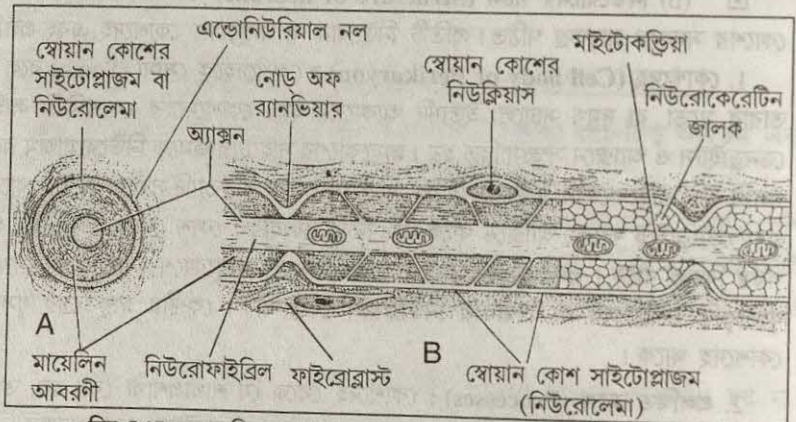
চিত্র 5.17. ঃ মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তুর প্রস্থচ্ছেদ (A) এবং লম্বচ্ছেদের (B) চিত্ররূপ।

(ii) **মায়েলিন আবরণী** (Myelin sheath)—কোনো কোনো নিউরোনের অ্যাক্সনের অ্যাক্সন হিলক, নোড অফ র‍্যানভিয়ার এবং অ্যাক্সনের শেষ প্রান্ত ছাড়া অন্য সব স্থান **মায়েলিন আবরণী** বা **মেডুলারি আবরণী** দিয়ে আবৃত থাকে। মায়েলিন আবরণী লিপিড ও প্রোটিন অর্থাৎ লাইপোপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত মোটা শ্বেত

আবরণ। নিয়মিত ব্যবধানে মেডুলেটেড স্নায়ুতন্তুতে মাঝে মাঝে মেডুলারি আবরণী বা মায়েলিন আবরণী বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে বহিস্থ নিউরোলেমা আবরণী অ্যাক্সনের সংস্পর্শে আসে। এই কারণে স্নায়ুতন্তুর মায়েলিন আবরণীবিহীন স্থানটি অন্য স্থান অপেক্ষা সামান্য সংকুচিত দেখায়। একে **র‍্যানভিয়ারের পর্ব** বা **নোড্ অফ র‍্যানভিয়ার** (Node of Ranvier) বলে। কেবল এই স্থান থেকে স্নায়ুতন্তুর শাখাপ্রশাখার উৎপত্তি হয়। এছাড়া র‍্যানভিয়ারের পর্ব স্নায়ুতন্তুতে স্নায়ু আবেগের (Nerve impulse) উৎপাদনে এবং পরিবহনে অংশগ্রহণ করে। **কাজ**—(ক) মায়েলিন আবরণী স্নায়ুতন্তুর ইনসুলেটারের মতো কাজ করে। (খ) উদ্দীপককে অন্যান্য স্নায়ুতন্তুতে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়।

চিত্র 5.18. : মায়েলিন স্নায়ুতন্তুর চিত্ররূপ।

● **মায়েলিন তন্তুর অবস্থান**—উৎপত্তির পর নিউরোনের কোশদেহ ও তার কিছু অংশ এবং নিউরোনের প্রান্তদেশ ধূসর বস্তুর মধ্যে থাকে। এই অংশগুলি ছাড়া নিউরোনের অধিকাংশ অংশ মায়েলিন আবরণযুক্ত হয়। **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিটি প্রিগ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুতন্তু মায়েলিনযুক্ত হয়।**

(2) **নন্‌মেডুলেটেড স্নায়ুতন্তু বা মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তু** (Non-medullated or Amyelinated nerve fibre) ঃ এই প্রকার তন্তু প্রধানত দুটি অংশ দিয়ে গঠিত—অ্যাক্সিস্ সিলিন্ডার এবং নিউরোলেমা। এই স্নায়ুতন্তুতে মেডুলারি বা মায়েলিন আবরণী থাকে না। এই কারণে নন্‌মেডুলেটেড স্নায়ুতন্তু মেডুলেটেড স্নায়ুতন্তুর চেয়ে সরু হয়।

● **ননমেডুলেটেড স্নায়ুর অবস্থান**—স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্তুর প্রতিটি পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ু এবং 'C' শ্রেণির স্নায়ুতন্তু যার ব্যাস $1\mu m$ অপেক্ষা কম হয় তারা সকলেই মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তু যা ধূসর বস্তুতে থাকে।

(iii) **নিউরোলেমা** (Neurolemma)—প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতন্তুতে নিউক্লিয়াসযুক্ত আরও একটি দ্বিতীয় আবরণী থাকে। তাকে **নিউরোলেমা বা শ্বোয়ানের আবরণী** বলে। এই আবরণীটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুতন্তুতে থাকে না। মায়েলিন আবরণী ও নিউরোলেমার মধ্যে যে চ্যাপটা নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশ দেখা যায়, তাকে **শ্বোয়ান কোশ** বলা হয়। এটি মায়েলিন আবরণী উৎপন্ন করে। **কাজ**—নিউরোলেমার প্রধান কাজ হল ঃ (i) স্নায়ুতন্তুকে রক্ষা করা। (ii) স্নায়ুতন্তুর পুনর্জননে সাহায্য করা।

⊡ (c) **নিউরোনের প্রকারভেদ (Types of neurones)** ঃ নিউরোনের কোশদেহ থেকে সৃষ্ট অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের সংখ্যা অনুসারে নিউরোনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়।

(1) **মেরুবিহীন নিউরোন (অ্যাপোলার**—Apolar neurone)—কোনো প্রলম্বিত অংশ নেই অর্থাৎ শুধু কোশ দেহ নিয়ে গঠিত।

(2) **একমেরু নিউরোন ( ইউনিপোলার**—Unipolar neurone)—একটিমাত্র প্রলম্বিত অংশ অর্থাৎ অ্যাক্সন নিয়ে গঠিত।

(3) **ভ্রান্ত একমেরু নিউরোন (সিউডোইউনিপোলার**—Pseudounipolar neurone)— কোশদহের একটি অংশ থেকে অ্যাক্সন ও ড্রেনড্রাইট নির্গত হয় বলে নিউরোনটি 'T' আকৃতির হয়।

(4) **দ্বিমেরু নিউরোন (বাইপোলার**—Bipolar neurone)—মাকুর মতো দেখতে হয়। কোশদেহের এক মেরু (প্রান্ত) থেকে ডেনড্রাইট এবং এর বিপরীত মেরু থেকে অ্যাক্সন বের হয়।

(5) **বহুমেরু নিউরোন (মালটিপোলার**—Multipolar neurone)—একটি অ্যাক্সন ও কোশদেহের বহু অংশ ( মেরু) থেকে একাধিক ডেনড্রাইট নির্গত হয়।

চিত্র 5.19 ঃ নিউরোনের প্রকারভেদ ঃ (A) অ্যাপোলার, (B) ইউনিপোলার, (C) সিউডোইউনিপেলার, (D) বাইপোলার, (E) মালটিপোলার।

## ✪ 5.9. নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia) ✪

### ▲ নিউরোগ্লিয়ার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং কাজ (Definition, Types and Functions of Neuroglia) :

❖ (a) সংজ্ঞা (Definition) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোশ যা বিশেষ যোগকলার মতো কাজ করে এবং স্নায়ুকোশের অবলম্বনে অংশগ্রহণ করে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে।
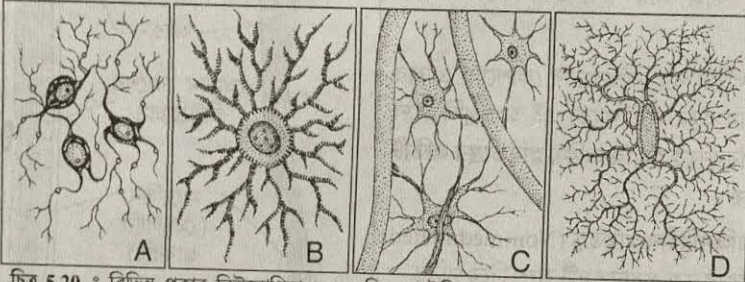
চিত্র 5.20. : বিভিন্ন প্রকার নিউরোগ্লিয়া : A-অলিগোডেট্রগ্লিয়া, B-প্রোটোপ্লাজমীয় অ্যাস্ট্রোসাইট, C-তন্তুময় অ্যাস্ট্রোসাইট এবং D-মাইক্রোগ্লিয়া।

(b) প্রকারভেদ (Types of Neuroglia) : আকার, আয়তন ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরোগ্লিয়া কোশকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— (i) তারা আকৃতির কোশ বা **অ্যাস্ট্রোসাইট** (Astrocytes) (ii) স্বল্প শাখাযুক্ত কোশ বা **অলিগোডেন্ড্রোসাইট** (Oligodendrocytes) এবং (iii) **মাইক্রোগ্লিয়া** (Microglia)। তারা আকৃতির কোশগুলি দেখতে তারার মতো; স্বল্পশাখা কোশে প্রলম্বিত অংশ কম থাকে এবং মাইক্রোগ্লিয়া বা অণুকোশগুলি দেখতে ক্ষুদ্রাকার হয়।

(c) **কাজ** : অবলম্বন, আবরণ এবং আগ্রাসন (Phagocytosis) এদের প্রধান কাজ। এ ব্যতীত স্নায়ুকোশ বিনষ্ট হলে নিউরোগ্লিয়া এই স্থান দখল করে।

#### ✪ স্নায়ুকোশের বিভাজন হয় না কেন? ✪

বর্তমানে জানা গেছে যে ভ্রূণ অবস্থায় এবং নবজাত শিশুর অপরিণত নিউরোনের কোশদেহে সেন্ট্রোজোম বর্তমান থাকে কিন্তু এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায়নি। পরিণত নিউরোনের কোশদেহে সেন্ট্রোজোম থাকে না, ফলে স্নায়ুকোশের (Neurone) বিভাজন সম্ভব হয় না। শিশুর জন্মের পর স্নায়ুকোশের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু নিউরোনের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে। সদ্যোজাত শিশুর স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুকোশের সংখ্যা এবং পূর্ণবয়স্ক লোকের স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকোশের সংখ্যা একই থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্নায়ুকোশের অর্থাৎ নিউরোনের আয়তন বাড়ে, ফলে সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধি ঘটে।

### ➤ স্নায়ু বা নার্ভ (Nerve) :

আমরা খালি চোখে সাদা রঙের যে স্নায়ু দেখি তা বহু সূক্ষ্ম দীর্ঘাকৃতিসম্পন্ন ডেনড্রন বা বহু অ্যাক্সন তন্তুর (স্নায়ুতন্তুর) বহু গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ বা স্নায়ু কিছু সংখ্যক স্নায়ুতন্তু, রক্তবাহ এবং সংযোজক (যোগ) কলা নিয়ে গঠিত হয়। সংযোজক কলা তিন প্রকারের আবরণ গঠন করে। স্নায়ুতন্তুর প্রতিটি গুচ্ছকে **ফিউনিকুলাস** (Funiculus) বলে। এর মধ্যে অবস্থিত তন্তুগুলিকে ঘিরে যে পাতলা যোগকলার আবরণ থাকে তাকে **এন্ডোনিউরিয়াম** (Endoneurium) বলে। কিন্তু প্রতিটি গুচ্ছতে যে

চিত্র 5.21. : একটি স্নায়ুর বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

সংযোজক কলার আবরণ থাকে তাকে **পেরিনিউরিয়াম** (Perineurium) বলে। সমগ্র স্নায়ুকে যে দৃঢ় সংযোজক কলা ঢেকে রাখে তাকে **এপিনিউরিয়াম** (Epineurium) বলে।

## ❂ 5.10. গ্রাহক (Receptor) ❂

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : বিশেষভাবে গঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organ), যা স্নায়ুকোশের সংজ্ঞাবহ প্রান্তগুলি** (Sensory endings) **মুক্ত অবস্থায় বা ক্যাপসুল দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ অথবা পরিবেশের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনে স্নায়ুআবেগ (Nerve impulse) উৎপন্ন করে তাকে গ্রাহক (রিসেপ্টর—Receptor) বলে।**

এই প্রান্তগুলি (গ্রাহকগুলি) অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় সংবেদন (Sensation), যেমন—পেশি টান, যন্ত্রণা, স্পর্শ, উষ্ণতা, ঘ্রাণ, আলোক ইত্যাদি দ্বারা উদ্দীপিত হয়।

চিত্র 5.22. : ত্বকের এপিডার্মিস স্তরে অবস্থিত বিভিন্নপ্রকার গ্রাহক বা রিসেপ্টর।

(b) **কাজের ভিত্তিতে গ্রাহকের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Receptor according to function) :** সংবেদন-এর কাজের ভিত্তিতে গ্রাহককে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(A) **বহির্দেশীয় গ্রাহক** এবং (B) **অন্তর্দেশীয় গ্রাহক**।
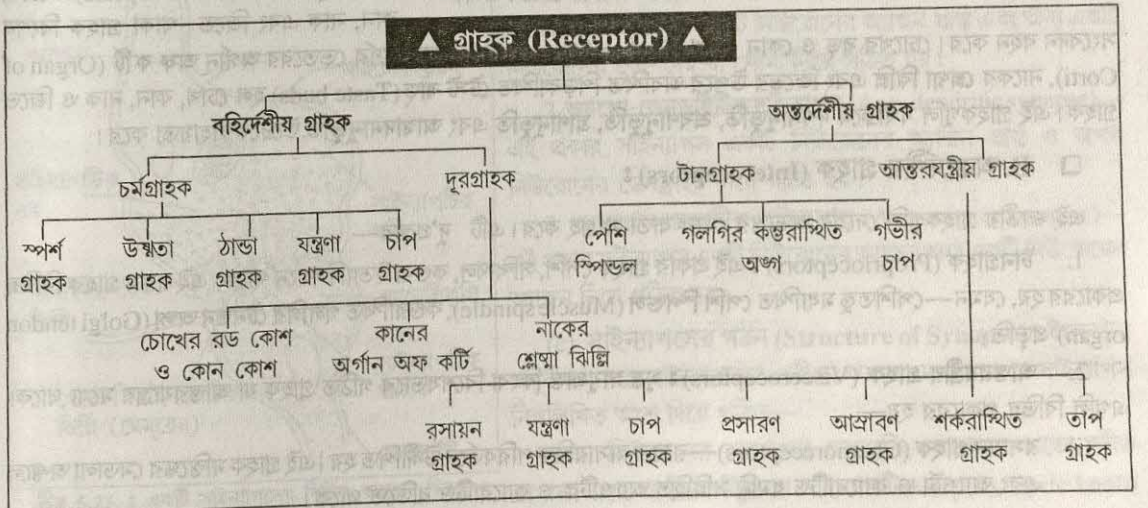
## ❑ A. বহির্দেশীয় গ্রাহক (Exteroceptors) :

বহির্দেশীয় গ্রাহক সন্নিহিত বহির্জগতের পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এরা দু'রকমের হয়, চর্মগ্রাহক এবং দূরগ্রাহক।

1. **চর্মগ্রাহক** (Cutaneous receptors) : এই জাতীয় গ্রাহক দেহত্বকের অন্তস্ত্বকে থাকে। এই গ্রাহকগুলি সন্নিহিত বহির্জগতের পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়ে চর্ম বা ত্বকে সংবেদন উৎপন্ন করে। এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **মেইজ্নারের করপাসল** (Meissener's corpuscles) ও **মার্কেলের চাক্তি** (Merkel's disc)— **স্পর্শানুভূতির** জন্য দায়ী এই গ্রাহকগুলি ত্বকের অন্তস্ত্বকে থাকে।

চিত্র 5.23. : বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক A—মেইজনারের করপাসল, B—প্যাসিনিয়ান করপাসল, C—ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি, D—রুফিনির প্রান্তস্থান, E—গলগি ম্যাজনীর প্রান্তঅঙ্গ, F—নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত, G—এন্ডপ্লেট, H—মার্কেলের চাকতি এবং I—গলগির টেনডন অঙ্গ।

(ii) **রুফিনির প্রান্ত স্থান** (End organ of Ruffini) ও **গলগি-ম্যাজনীর অঙ্গ** (Organs of Golgi Mazzoni)—**উষ্ণতা সংবেদন** উদ্রেককারী গ্রাহক অন্তস্ত্বকে থাকে।

(iii) **ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি** (End bulb of Krause)—গোলাকৃতি এবং **ঠান্ডা সংবেদন** উদ্রেককারী গ্রাহক অন্তস্ত্বকে থাকে।

(iv) **নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত** (Free nerve ending)— এই প্রকার গ্রাহক নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত দিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক ছাড়া সমস্ত দেহে এরা বিস্তৃত হয়ে থাকে। এগুলি **যন্ত্রণানুভূতির** জন্য দায়ী গ্রাহক।

(v) **প্যাসিনিয়ান করপাসল** (Pacinian corpuscle)—গ্রাহকগুলি পেঁয়াজের মতো আকৃতির স্তরবিন্যাসযুক্ত এবং চাপ সংবেদন উদ্রেককারী গ্রাহক অধস্ত্বকে থাকে।

(vi) **অন্যান্য রিসেপটর**—স্পর্শ ও যন্ত্রণা উদ্রেককারী গ্রাহকের সম্মিলিত সক্রিয়তা থেকে সুড়সুড়ি ও চুলকানি (Tickling and itching) অনুভূতির প্রকাশ পায়।

2. **দূরগ্রাহক** (Teloreceptors) : চোখ, কান, নাক এবং জিভে থাকা গ্রাহক বিশেষ সংবেদন বহন করে। চোখের **রড্ ও কোন কোশ** (Rod and Cone cells), অন্তঃকর্ণের ভেতরের **অর্গান অফ কর্টি** (Organ of Corti), নাকের **শ্লেষ্মা ঝিল্লি** এবং জিভের উপরে অবস্থিত পিড়কাস্থিত **টেস্ট বাড্** (Taste buds) হল চোখ, কান, নাক ও জিভে গ্রাহক। এই গ্রাহকগুলি যথাক্রমে **দর্শনানুভূতি, শ্রবণানুভূতি, ঘ্রাণানুভূতি** এবং **আস্বাদনানুভূতি** উদ্রেকে সহায়তা করে।

## ❑ B. অন্তর্দেশীয় গ্রাহক (Interoceptors) :

এই জাতীয় গ্রাহকগুলি দেহের অভ্যন্তর থেকে বার্তা সংগ্রহ করে। এটি দু'প্রকার—

1. **টানগ্রাহক** (Proprioceptors) : এই প্রকার গ্রাহক পেশি, সন্ধিস্থল, কণ্ডরা ইত্যাদি স্থানে থাকে। এই রকম গ্রাহক বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—পেশিতন্তু মধ্যস্থিত **পেশি স্পিন্ডল** (Muscle spindle), কণ্ডরাস্থিত **গলগির টেনডন অঙ্গ** (Golgi tendon organ) প্রভৃতি।

2. **আন্তরযন্ত্রীয় গ্রাহক** (Visceroceptors) : মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত কিংবা বিশেষভাবে গঠিত গ্রাহক যা আন্তরযন্ত্রের মধ্যে থাকে। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়—

(i) **রসায়ন গ্রাহক** (Chemoreceptors)—রক্তের রাসায়নিক পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এই গ্রাহক মস্তিষ্কের মেডালা অঞ্চলে এবং অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি সন্নিহিত অ্যাওর্টিক ও ক্যারোটিড বডিতে থাকে।

(ii) **যন্ত্রণা গ্রাহক** (Pain receptors)—প্রায় প্রতিটি আন্তরযন্ত্রের মধ্যে থাকে।
(iii) **চাপ গ্রাহক** (Pressoreceptors)—হৃৎপিণ্ড, ক্যারোটিড সাইনাস, অ্যাওর্টা ইত্যাদি স্থানে থাকে।
(iv) **প্রসারণ গ্রাহক** (Stretch receptors)—এটি প্রসারণে উদ্দীপিত হয় এবং ফাঁপা আন্তরযন্ত্রের ও ফুসফুসের প্রাচীরে থাকে।
(v) **আস্রাবণ গ্রাহক** (Osmoreceptors)—এই প্রকার গ্রাহক মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস এবং মেডালাতে থাকে।
(vi) **শর্করাস্থিত গ্রাহক** (Glucostatic receptors)—হাইপোথ্যালামাসে থাকে যা রক্তে শর্করার মাত্রা তারতম্যে উদ্দীপিত হয়।
(vii) **তাপ গ্রাহক** (Thermoreceptors)—হাইপোথ্যালামাসে এটি অবস্থিত এবং দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

## 5.11. প্রান্তসন্নিকর্ষ (সাইন্যাপস—Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য স্নায়ু নিয়ে গঠিত। এই স্নায়ুগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে পর পর সজ্জিত হয়ে স্নায়ুপথ বা প্রতিবর্ত চাপ গঠন করে। এই স্নায়ুগুলি পর পর সাজানো থাকলেও তাদের মধ্যে কোনো সাইটোপ্লাজমীয় (নিউরোপ্লাজমীয়) যোগাযোগ থাকে না অর্থাৎ নিউরোনগুলি কেউ কারও সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে না, ফলে দুটি নিউরোনের সংযোগস্থলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** **স্নায়ুতন্ত্রের সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরোন শেষ হয় এবং অপর আর একটি নিউরোন আরম্ভ হয় তাকে প্রান্তসন্নিকর্ষ বা সাইন্যাপস** (Synapse) **বলে।**
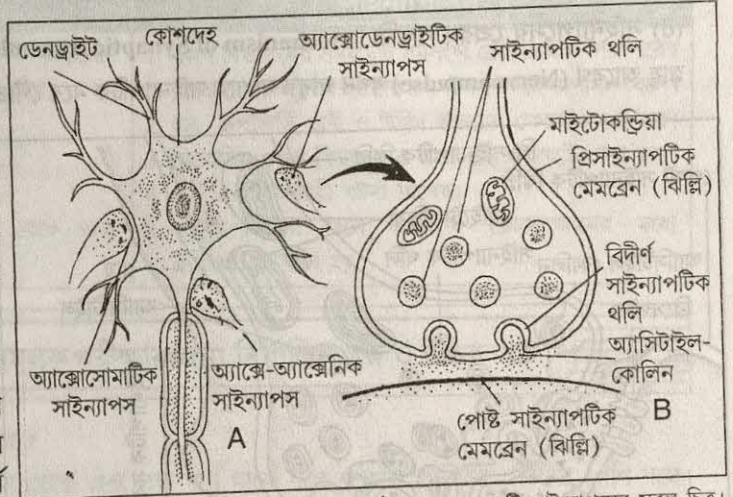
চিত্র 5.24. : A-বিভিন্ন প্রকার সাইন্যাপসের গঠন এবং B-একটি সাইন্যাপসের সরল চিত্র।

(b) **সাইন্যাপসের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Synapse) :** গঠনের দিক দিয়ে সাইন্যাপস প্রধানত তিন প্রকারের হয়।

1. **অ্যাক্সো-সোমাটিক সাইন্যাপস** (Axo-somatic synapse)—এই প্রকার সাইন্যাপস একটি নিউরোনের অ্যাক্সন প্রান্ত এবং অন্য একটি নিউরোনের কোশদেহ বা সোমা নিয়ে গঠিত হয়।

2. **অ্যাক্সো-ডেনড্রাইটিক সাইন্যাপস** (Axo-dendritic synapse)—এই প্রকার সাইন্যাপস একটি নিউরোনের অ্যাক্সন প্রান্ত ও অপর নিউরোনের ডেনড্রাইট নিয়ে গঠিত হয়।

3. **অ্যাক্সো-অ্যাক্সোনিক সাইন্যাপস** (Axo-axonic synapse)—এই প্রকার সাইন্যাপস একটি নিউরোনের অ্যাক্সন অন্য একটি নিউরোনের অ্যাক্সন নিয়ে গঠিত হয়।

(c) **সাইন্যাপসের গঠন (Structure of Synapse) :** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাইন্যাপসকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সাইন্যাপস নিম্নলিখিত অংশ দিয়ে গঠিত—

প্রথম নিউরোনের অ্যাক্সনের প্রান্তগুলি বোতামের মতো স্ফীত দেখায়। একে **প্রান্তীয় স্ফীতি** বা **সাইন্যাপটিক নব্** (Synaptic knob)

অ্যাক্সন
মাইটোকন্ড্রিয়ন
সাইন্যাপটিক নব
সাইন্যাপটিক থলি
প্রিসাইন্যাপটিক ঝিল্লি
ক্যানেলিকুলি
সাব সাইন্যাপটিক জালক
পোস্ট-প্রিসাইন্যাপটিক ঝিল্লি (মেমব্রেন)
ডেনড্রাইট

চিত্র 5.25. : একটি সাইন্যাপসের বিভিন্ন অংশের চিত্র।

বলে। এই স্ফীত অংশটি পরবর্তী নিউরোনের (কোশদেহ বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের) নিকট সান্নিধ্যে থাকে। এই স্ফীত অংশ এবং পরবর্তী নিউরোনের মধ্যে 200 Å সমান যে ফাঁকা স্থানটি থাকে তাকে **সাইন্যাপটিক্ ক্লেফট** (Synaptic cleft) বলে। সাইন্যাপটিক নব্ ও কোশদেহ পৃথক পৃথকভাবে অক্ষত ঝিল্লি (মেমব্রেন) দিয়ে আবৃত থাকে। সাইন্যাপটিক নবের ঝিল্লিকে **প্রি-সাইন্যাপটিক ঝিল্লি** (Pre-synaptic membrane) এবং পরবর্তী অংশের যথা—কোশদেহের ঝিল্লিকে **সাব-সাইন্যাপটিকবা পোস্ট-সাইন্যাপটিক ঝিল্লি** (Post-synaptic membrane) বলে। সাইন্যাপটিক নবের মধ্যে বহু সংখ্যক **মাইটোকনড্রিয়া** এবং অসংখ্য গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **সাইন্যাপটিক থলি** (Synaptic vesicles) থাকে। ওই থলিগুলি **অ্যাসিটাইলকোলিন** (Acetylcholine) নামে রাসায়নিক **প্রেরক পদার্থ** (Transmitter substance) দিয়ে পূর্ণ থাকে।

উপরোক্ত অংশগুলি ছাড়া গুরুমস্তিষ্কের সাইন্যাপসের সাইন্যাপটিক ক্লেফটের প্রায় 50 Å ব্যাসযুক্ত কয়েকটি সমান্তরাল সূক্ষ্ম **প্রণালিকা বা ক্যানেলিকুলি** (Canaliculi) প্রি এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক ঝিল্লিকে যুক্ত রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পোস্ট-সাইন্যাপটিক ঝিল্লির নীচে একপ্রকার জাল (Web) দেখা যায়। এদের **সাব-সাইন্যাপটিক জালক** (Sub-synaptic webs) বলে।

(d) **সাইন্যাপসের প্রেরণ পদ্ধতি (Mechanism of Synaptic transmission) ঃ**

স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) যখন স্নায়ুর মাধ্যমে সাইন্যাপটিক নবে পৌঁছায় তখন প্রি-সাইন্যাপটিক ঝিল্লির (মেমব্রেন) ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কোশ বহিস্থ তরল পদার্থ থেকে $Na^+$, $Ca^{++}$ প্রভৃতি আয়নগুলি সাইন্যাপটিক নবের মধ্যে যায়। ক্যালশিয়াম আয়নের প্রভাবে সাইন্যাপটিক থলিগুলি প্রিসাইন্যাপটিক ঝিল্লির গায়ে জুড়ে যায়। এই অবস্থায় থলিসহ ঝিল্লি ফেটে এক্সোসাইটোসিস্ পদ্ধতিতে সাইন্যাপটিক থলি থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন সাইন্যাপটিক ক্লেফট-এ নির্গত করে। এরপর অ্যাসিটাইলকোলিন পোস্ট-সাইন্যাপটিক ঝিল্লিতে অবস্থিত রিসেপটরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **অ্যাসিটাইলকোলিন-রিসেপটর যৌগ** (Acetylcholine-receptor complex) গঠন করে। ওই যৌগটি পোস্ট-সাইন্যাপটিক ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভেদ্যতা বাড়ায়। ফলে এই ঝিল্লির কোশ বহিস্থ তরল পদার্থ থেকে $Na^+$ আয়ন ঝিল্লির মধ্যে প্রবেশ করে এবং $K^+$ আয়ন কোশ মধ্যস্থ তরল থেকে ঝিল্লির বাইরে বেরিয়ে আসে। এর ফলে তড়িৎ বিভব (Electrical potential) উৎপন্ন হয় যা পোস্ট-সাইন্যাপটিক ঝিল্লির এই অংশটিকে উদ্দীপিত করে। পরে এই উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরোনের মধ্য দিয়ে নিউরোনের সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর অগ্রসর হয়।

চিত্র 5.26. ঃ সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগের পরিবহন পদ্ধতি।

উদ্দীপনার চলে যাওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে (0·5 মিলিসেকেন্ড) **অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ** উৎসেচক দিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিনকে বিনষ্ট করে। এই কারণে সাইন্যাপসের এই উদ্দীপিত অংশটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

(e) **সাইন্যাপসের বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলি (Characteristics or Functions of Synapse) ঃ সাইন্যাপসের** চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—1. **একমুখী পরিবহন** (One way conduction)—সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে উদ্দীপনার পরিবহন সব সময় একমুখী হয়, অর্থাৎ প্রথম নিউরোনের অ্যাক্সন প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় নিউরোনে বিভিন্ন অংশ দিয়ে পরিবাহিত হয়।

2. **সাইন্যাপসের বিলম্ব** (Synaptic delay)—সাইন্যাপসের প্রি-সাইন্যাপটিক নিউরোন প্রান্ত থেকে পোস্ট-সাইন্যাপটিক নিউরোনে স্নায়ু আবেগের পরিবহনে যে স্বল্প (প্রায় 0·5 মিলিসেকেন্ড) সময় লাগে তাকে **সাইন্যাপটিক বিলম্ব** বলে।

3. **সাইন্যাপটিক অবসাদ** (Synaptic fatigue)—প্রি-সাইন্যাপটিক নিউরোনকে বার বার দ্রুত উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে পোস্ট-সাইন্যাপটিক (পরবর্তী) নিউরোনে উদ্দীপনা তৈরি ক্রমশ কমতে থাকে এবং শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় একে **অবসাদ** বলে। এর কারণ প্রি-সাইন্যাপটিক স্নায়ু প্রান্তে অ্যাসিটাইলকোলিনের ক্ষরণ ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসে।

4. **প্রতিরোধ** (Inhibition)—যে সক্রিয় পদ্ধতি দেহের কোনো অংশের সক্রিয়তাকে বাধাদান করে কিংবা আগের সক্রিয় অবস্থাকে অবদমিত করে তাকে **প্রতিরোধ** (Inhibition) বলে। প্রতিরোধ সাইন্যাপসে ঘটে, যেমন—(i) উদ্দীপকধর্মী প্রেরক পদার্থের বদলে কোনো নিউরোনের পোস্ট-সাইন্যাপটিক প্রান্ত থেকে যদি প্রতিরোধধর্মী প্রেরক পদার্থ ক্ষরিত হয় তাহলে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠে তাকে **পোস্ট-সাইন্যাপটিক অবরোধ** বলে।

● **সাইন্যাপস ও সাইন্যাপসিসের পার্থক্য (Differences between Synapse and Synapsis) :**

| সাইন্যাপস | সাইন্যাপসিস |
|---|---|
| 1. একটি নিউরোন শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরোন আরম্ভ হয়, সেই সংযোগস্থলটিকে সাইন্যাপস বলে। | 1. কোশ বিভাজনের সময় দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম পরস্পরের কাছে এসে জোটবদ্ধ হওয়ার ক্রমঘটনাকে সাইন্যাপসিস বলে। |
| 2. এর উপস্থিতি কেবল প্রাণীতেই দেখা যায়। | 2. এর উপস্থিতি প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। |
| 3. এটি স্নায়ুতন্ত্রে দেখা যায়। | 3. মিয়োসিস কোশ বিভাজনের সময় এই অবস্থাটি দেখা যায়। |
| 4. এটি একটি স্থায়ী গঠন বিশেষ। | 4. এটি একটি অস্থায়ী ঘটনা বিশেষ। |
| 5. সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে একটি নিউরোন থেকে অন্য একটি নিউরোনে স্নায়ু আবেগ অতিক্রম করে। | 5. সাইন্যাপসিসের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রসিংওভার সম্ভব হয়। |

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

1. **কঙ্কাল পেশিকে চিহ্নিত পেশি বলে কেন ?**

● কঙ্কাল পেশিতন্তুতে কালো-সাদা ডোরা ডোরা এবং লম্বা দাগ থাকে বলে কঙ্কাল পেশিকে চিহ্নিত পেশি বলে।

2. **পেশি সংকুচিত হয় কিন্তু স্নায়ু সংকুচিত হয় না কেন ?**

● পেশির অ্যাকটিন বা মায়োসিন নামে সংকোচী উপাদান থাকে বলে পেশি সংকুচিত হয়। নার্ভ বা স্নায়ুতে এই রকম কোনো সংকোচী উপাদান থাকে না বলে স্নায়ু সংকুচিত হয় না।

3. **পেশিকলার বিভিন্ন আবরণীগুলির সচিত্র চিত্র এঁকে এর বর্ণনা করো।**

● পেশির আবরণী : (i) **এপিমাইসিয়াম**—প্রতিটি পেশি কতকগুলি পেশিতন্তুগুচ্ছ নিয়ে গঠিত। এই পেশিগুচ্ছের চার দিকের বেষ্টনকারী তন্তুময় যোগ কলা আবরণীকে এপিমাইসিয়াম বলে। (ii) **পেরিমাইসিয়াম**—প্রতিটি পেশি তন্তুগুচ্ছ ফ্যাসিকুলাস নামে পরিচিত। একে যে তন্তুময় যোগকলার আবরণটি আবৃত করে রাখে তাকে পেরিমাইসিয়াম বলে। (iii) **এন্ডোমাইসিয়াম**—প্রতিটি পেশিতন্তু যে তন্তুময় যোগকলা দিয়ে আবৃত থাকে তাকে **এন্ডোমাইসিয়াম** বলে।

4. **পেশি টুইচ (Muscle Twitch) কাকে বলে ?**

● স্বাভাবিক অবস্থায় যদি কোনো পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে মাত্র একবার উদ্দীপিত করা হয় তাহলে তা প্রথমে সংকুচিত হয়ে পরক্ষণেই শিথিল হয়। একে পেশি টুইচ বলে।

5. **পেশির সমটান ও সমদৈর্ঘ্য সংকোচনের কোন্‌টিতে বেশি উত্তাপের সৃষ্টি হয় ?**

● আইসোমেট্রিক বা সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচনে বেশি উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

6. **পেশির সংকোচী উপাদান (Contractile elements) ও সংকোচী একক (Contractile Unit of Muscle) কী?**

● (i) পেশিতন্তুস্থ অ্যাকটিন এবং মায়োসিন নামে দুটি প্রোটিন তন্তুর সাহায্যে পেশির সংকোচন হয় বলে অ্যাকটিন এবং মায়োসিনকে পেশির সংকোচী উপাদান বলা হয়।
(ii) সারকোমিয়ার (Sarcomere)-কে পেশির সংকোচী একক বলে।

7. **ট্রেপি বা সিঁড়িক্রম (স্টিয়ারকেস) ঘটনা কাকে বলে ?**

● যদি কোনো ঐচ্ছিক পেশিতে পরপর কয়েকটি উদ্দীপনা দেওয়া হয় তবে 4-5 টি পেশির সংকোচন বল পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায় এবং পরে সমান থাকে। এই ঘটনাকে ট্রেপি বা স্টিয়ারকেস ঘটনা বলে।

8. **পেশির সংকোচী উপাদানের সরল চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো।**

●
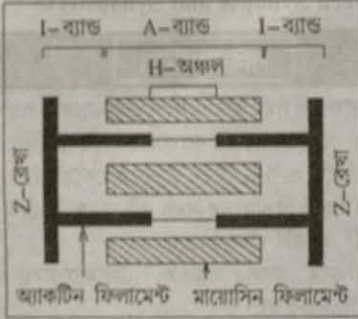
চিত্র 5.27. : পেশি সংকোচী উপাদানের চিত্র।

9. **রিওবেস এবং ক্রোনেক্সি বলতে কী বোঝায় ?**

● উদ্দীপনার স্থিতিকালকে ক্রোনেক্সি এবং শক্তিকে রিওবেস নামে চিহ্নিত করা হয়। উদ্দীপনা প্রকৃতি যদি বৈদ্যুতিক হয় তাহলে ক্রোনেক্সি ও রিওবেসকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়—
(ক) **রিওবেস** (Rheobase) হল ন্যূনতম শক্তির গ্যালভানিক তড়িৎ যাকে পেশি কিংবা স্নায়ুতে বা অন্য কোনো কলার মধ্যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে প্রয়োগ করলে পেশিটি (কিংবা অন্য কোনো কলা) তাতে সাড়া দেয় অর্থাৎ উত্তেজিত হয়।
(খ) **ক্রোনেক্সি** (Chronaxie) রিওবেসের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্যালভানিক তড়িৎ যে ন্যূনতম সময়ের জন্য প্রয়োগ করলে পেশিটি (অথবা অন্য কোনো কলা) তাতে সাড়া দেয় তাকে ক্রোনেক্সি বলে।

10. **(ক) মরণ সংকোচ কাকে বলে ? (খ) মরণ সংকোচ পেশিতে কী কী পরিবর্তন দেখা যায় ?**

● (ক) মৃত্যুর পর পেশিতে যে দৃঢ়তা বা কাঠিন্য দেখা দেয় তাকে মরণ সংকোচ বলে। ATP-এর অভাবে অ্যাকটিন ও মায়োসিন ফিলামেন্টে চিরস্থায়ী সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায় বলে মরণ সংকোচ দেখা দেয়।
(খ) মরণ সংকোচ পেশিতে যে পরিবর্তনগুলি দেখা যায় তা হল—(i) পেশির দৈর্ঘ্য হ্রাস ও স্থূলতা বৃদ্ধি, (ii) পেশি অস্বচ্ছ হয় ও সান্দ্রতার বৃদ্ধি ঘটে, (iii) পেশিতে অম্লের (অ্যাসিডের) পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে pH 5, 8 হয়, (iv) গ্লাইকোজেন অদৃশ্য হওয়া ও উদ্দীপন ধর্মের বিলোপ ঘটে।

11. **ক্যালশিয়াম সংকোচ কী ?**

● পেশিকোশে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে পেশি শক্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ বেশি ক্যালশিয়াম অ্যাকটিন ও মায়োসিনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটায়, ফলে এগুলি সংকুচিত অবস্থায় থেকে যায়। এই কারণে পেশি শক্ত হয়ে পড়ে।

12. **অস্থি পেশিতন্তুতে নিউক্লিয়াসগুলি কোশের ধারে থাকে কেন ?**

● অস্থি পেশিতন্তুর সারকোপ্লাজমায় ও সারকোলেমার নীচে এবং ধারে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে। কারণ— মায়োব্লাস্টের মধ্যে মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি হয় যা এর কেন্দ্রস্থলে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। পরে পেশির ক্রমবৃদ্ধির ফলে ফাইব্রিলের সংখ্যা ও আয়তনে বাড়ে। এর ফলে নিউক্লিয়াসগুলিকে কেন্দ্রস্থল থেকে ঠেলে নিয়ে কোশের ধারে সারকোলেমার নীচে স্থানান্তরিত করে।

13. **হৃৎপেশি অবশ হয় না কেন ?**

● ঐচ্ছিক পেশির মতো হৃৎপেশিকে বারে বারে উদ্দীপিত করলেও অসাড় বা অবশ হয় না কারণ—
(i) হৃৎপেশির দীর্ঘ নিঃসাড় কাল (যা হৃৎপিণ্ডের সম্পূর্ণ সংকোচন কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে)।
(ii) হৃৎপিণ্ডের প্রায় প্রতিটি পেশিতন্তু প্রচুর পরিমাণে $O_2$ ও পুষ্টি সংগ্রহ করে বলে হৃৎপেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করতে পারে না ফলে পেশির অসাড়তা দেখা যায় না।

14. **স্থিতি বিভব বা ঝিল্লি বিভব কী ?**

● যে-কোনো কোশের মেমব্রেনের উভয় পার্শ্বে দু'প্রকার তরল থাকে। তাকে কোশ বহিস্থ তরল (বাইরে থাকে) এবং কোশ মধ্যস্থ তরল (কোশের ভেতরে থাকে) বলে। এই তরলে বিভিন্ন রকমের আয়নের ($Na^+$, $K^+$, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$,

Cl⁻, $HCO_3^-$) প্রভৃতি আয়ন থাকে তবে এই সব আয়নের গাঢ়ত্ব বিভিন্ন প্রকারের হয়। বিশ্রামরত অবস্থায় ঝিল্লির দু'পাশে আয়নের অসম বণ্টনের ফলে ঝিল্লির দু'পাশে যে বিভব পার্থক্য গড়ে ওঠে তাকে **স্থিতি বিভব** (Resting potential) বা **ঝিল্লি বিভব** (Membrane potential) বলে। স্নায়ুর স্থিতি বিভব –70 mv (পেশিতে –90 mv)।

15. **একটি স্নায়ুর ক্রিয়া বিভব বলতে কী বোঝো ?**

- **ক্রিয়া বিভব**—বিশ্রামরত অবস্থায় স্নায়ু বা পেশির মধ্যে যে বিভব পার্থক্য দেখা যায় তাকে স্থিতি বিভব বলে। এই স্নায়ু বা পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে ঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় ফলে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আয়নের আদানপ্রদান ঘটে। এর ফলে স্থিতি বিভব পরিবর্তিত হয়ে **ক্রিয়া বিভবে** রূপান্তরিত হয়।

16. **পেশি সংকুচিত হয়, কিন্তু নার্ভ সংকুচিত হয় না—ব্যাখ্যা করো।**

- অ্যাকটিন ও মায়োসিন নামে দু'প্রকার প্রোটিন ফিলামেন্ট পেশিতে অবস্থিত মায়োফাইব্রিলে এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যারা উদ্দীপনা পাওয়ামাত্র একে অন্যের ভিতরে প্রবেশ করে সংকুচিত হয়। পক্ষান্তরে নার্ভের নিউরোফাইব্রিলে অনুরূপ বিন্যাস (অ্যাক্টিন ও মায়োসিন ফিলামেন্ট) থাকে না বলে নার্ভ সংকুচিত হয় না।

17. **নিউরোহরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

- (ক) **নিউরোহরমোন**—যেসব হরমোন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত নিউরোসিক্রেটারি কোশ থেকে ক্ষরিত হয় তাদের নিউরোহরমোন বলে। **উদাহরণ** : অক্সিটোসিন এবং ভেসোপ্রেসিন।

  (খ) **নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ**—যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুর প্রান্ত (অ্যাক্সনের প্রান্ত) থেকে নিঃসৃত হয় এবং স্নায়ু আবেগের পরিবহনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ বলে। **উদাহরণ** : অ্যাসিটাইলকোলিন এবং অ্যাড্রিনালিন। এই দুই প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যথাক্রমে কোলিনার্জিক এবং অ্যাড্রিন্যারজিক স্নায়ু প্রান্ত থেকে ক্ষরিত হয়।

18. **গ্রাহকের সাধারণ সরল শ্রেণিবিন্যাস করো (Classification of general Receptor in simple form) :**
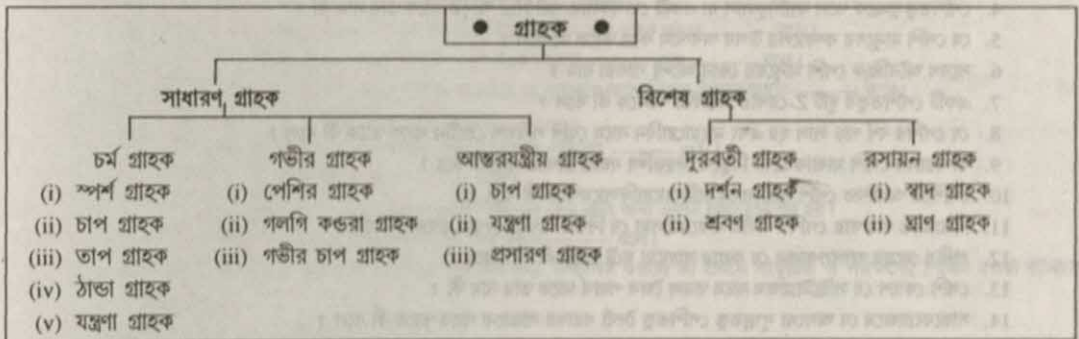
19. (a) **নিউরোমাসকুলার জাংশন (স্নায়ুপেশি সংযোগ স্থান) কাকে বলে ?** (b) **এর গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।**

- (a) চেষ্টীয় স্নায়ু পেশির যে স্থানে মিলিত হয়ে যে গঠনগত এবং কার্যগত একক (সংযোগ স্থান) গঠন করে তাকে স্নায়ুপেশির সংযোগস্থান (Neuromuscular junction) বলে।

  (b) একটি চেষ্টীয় নিউরোন (বহির্বাহী নিউরোন) পেশিতে প্রবেশের আগে তার অ্যাক্সনটি মায়েলিন আবরণীবিহীন হয়। অ্যাক্সন প্রান্তের শাখার কোশ অংশগুলি ফুলে গিয়ে পেশির মধ্যে প্রবেশ করে। এই ফোলা অংশকে সোলফুট বলে। সোলফুট বহু ছোটো ছোটো থলি, সাইন্যাপটিক থলি এবং মাইটোকনড্রিয়া থাকে।

**চিত্র 5.28.** : লম্বচ্ছেদে স্নায়ুপেশির সংযোগস্থলের চিত্ররূপ।

থলিগুলিতে অ্যাসিটাইলকোলিন নামে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ থাকে। প্রতিটি সোলফুট পেশির মেমব্রেন দিয়ে গঠিত ভাঁজের মধ্যে থাকে। পেশি পর্দার এই ভাঁজকে সাইন্যাপটিক গাটার বলে। সোলফুট এবং সাইন্যাপটিক গাটারের মধ্যে সামান্য ফাঁক স্থানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একে সাইন্যাপটিক ক্লেফট বলে।

### ✪ চেষ্টীয় বিন্দু, চেষ্টীয় একক এবং চেষ্টীয় প্রান্ত ফলক ✪
**(Motor point, Motor unit and Motor end plate)**

1. চেষ্টীয় বিন্দু—পেশির যে অংশে চেষ্টীয় স্নায়ু ঢোকে তাকে **চেষ্টীয় বিন্দু** বলে।
2. **চেষ্টীয় একক** —পেশির কার্যক্ষম একককে **চেষ্টীয় একক** যা একটি চেষ্টীয় নিউরোনের অ্যাক্সন, শাখাপ্রশাখা এবং এদের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি পেশিতন্তু নিয়ে গঠিত।
3. **চেষ্টীয় প্রান্তফলক**—চেষ্টীয় স্নায়ু পেশির যে স্থানে ঢোকে ও ফলকের মতো অংশ গঠন করে তাকে **প্রান্তফলক** বলে। চেষ্টীয় স্নায়ুর অ্যাক্সনের প্রান্ত ও প্রান্তফলকের মাধ্যমে স্নায়ু আবেগ পেশিতে যায়।

## ০ অনুশীলনী ০

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. পেশি কোশকে পেশিতন্তু বলে কেন ?
2. যে পেশি অনুপ্রস্থে রেখাঙ্কিত এবং যার নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন তাকে কী বলে ?
3. পৌষ্টিকনালি, রক্তবাহ, মূত্রাশয় প্রভৃতির প্রাচীরে কী ধরনের পেশি থাকে ?
4. পেশিতন্তুগুচ্ছকে বলে ফ্যাসিকুলাস যা একটি যোগকলার পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম কী ?
5. যে পেশি মানুষের কঙ্কালের উপর অবস্থান করে তাকে কী বলে ?
6. সরেখ অনৈচ্ছিক পেশি মানুষের কোন্ অঙ্গে পাওয়া যায় ?
7. একটি পেশিতন্তুর দুটি Z-রেখার অন্তর্বর্তী স্থানকে কী বলে ?
8. যে পেশির বর্ণ গাঢ় লাল হয় এবং মায়োগ্লোবিন নামে বেশি পরিমাণ প্রোটিন থাকে তাকে কী বলে ?
9. কী ধরনের পেশি মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে দেহভঙ্গি বজায় রাখতে সাহায্য করে ?
10. পেশিতে অবস্থিত পেশি সংকোচনে দায়ী মায়োফিলামেন্টকে কী বলে ?
11. বিশ্রামরত অবস্থায় পেশির পর্দার সারকোলেমা যে বিভব পার্থক্য দেখায় তাকে কী বলে ?
12. প্রাণীর দেহের অঙ্গসঞ্চালন যে কলার সাহায্যে ঘটে তাকে কী কলা বলে ?
13. পেশি কোশে যে সাইটোপ্লাজম নামে তরল জৈব পদার্থ থাকে তার নাম কী ?
14. সারকোপ্লাজমে যে অসংখ্য সূক্ষ্মতন্তু পেশিতন্তু দৈর্ঘ্য বরাবর সাজানো থাকে তাকে কী বলে ?
15. মায়োসিন থেকে অ্যাকটিনের দিকে অসংখ্য আড়াআড়ি যে সংযোগ প্রসারিত থাকে তাকে কী বলে ?
16. একটি পেশিকে উদ্দীপনা প্রয়োগ ও সংকোচন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কালকে কী বলে ?
17. কয়েকজন বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুযায়ী যখন পেশি সংকোচনের সময় সূক্ষ্ম ফিলামেন্ট পুরু ফিলামেন্টের উপর দিয়ে চলে যায় সেই মতবাদ কী নামে পরিচিত ?
18. অস্থিপেশি কোশের সারকোপ্লাজমে মায়োফাইব্রিলগুলি পর্দাবেষ্টিত নলাকার জালকের মতো নালিকা দিয়ে আবৃত থাকে তাকে কী বলে ?
19. প্রাণীর মৃত্যুর পর পেশি দৃঢ়তা কাঠিন্যপ্রাপ্তিকে কী বলে ?
20. কোন্ পেশিকে বারবার উদ্দীপিত করলে পেশির সংকোচন ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে শেষে পেশি সেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না অর্থাৎ সংকুচিত হতে না পারা ধর্মকে কী বলে ?
21. T নালিকা তির্যক পেশি নালিকা এবং তার উভয় পার্শ্বস্থ নিয়ে যে অংশ গঠিত হয় তাকে কী বলে ?
22. দুটি নিউরোনে সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরোনের অ্যাক্সন শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরোনের কোশদেহ শুরু হয় তাকে কী বলে ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

1. মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশির মোট ওজন দেহের ওজনের—40-45% □ / 30-40% □ / 25-30% □ / 20-25% □।
2. কঙ্কাল পেশিতন্তুতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা—একটি □ / দুটি □/ বহু সংখ্যক □ / কোনোটিই নয় □।

3. ঐচ্ছিক পেশিকলার প্রতিটি গুচ্ছের চারপাশে যে যোগকলার আবরণ থাকে তার নাম—এপিমাইসিয়াম ☐ / পেরিমাইসিয়াম ☐ / এন্ডোমাইসিয়াম ☐ / সারকোলেমা ☐।
4. প্রতিটি পেশিতন্তু যে স্বচ্ছ পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে তাকে বলে—প্লাজমালেমা ☐ / প্লাজমাপর্দা ☐ / সারকোলেমা ☐ / নিউরোলেমা ☐।
5. স্ট্যানিয়াসের বন্ধনী প্রস্তুত করে হৃৎপিণ্ডের নিলয় পেশিকে আবিষ্ট তড়িৎ দিয়ে উদ্দীপিত করলে হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি (4-5টি) সংকোচন ক্রমান্বয়ে বাড়ে পরে সমান থাকে, একে বলে—নিঃসাড় কাল ☐ / অসাড়তা ☐ / সিঁড়িক্রম ঘটনা ☐ / টিটানাস ☐।
6. পেশি সংকোচনের জন্য যে জৈবশক্তি প্রয়োজন হয় তা যে উচ্চ জৈবশক্তিসম্পন্ন যৌগ থেকে উৎপন্ন হয় তার নাম হল—UTP ☐ / ATP ☐/ Phosphagen ☐ / ADP ☐।
7. মায়োফাইব্রিল বিন্যস্ত দুটি Z-রেখার মধ্যবর্তী অংশকে বলে— সারকোমিয়ার ☐/ সারকোলেমা ☐।
8. প্রতিটি মায়োফাইব্রিলের উচ্চ প্রতিসরাংক বিশিষ্ট যে কালো অঞ্চল থাকে তাকে বলে— A-band ☐ / I-band ☐/ H-Zone ☐/ Z-line ☐।
9. একবার উদ্দীপিত হওয়ার কিছু সময়ের জন্যে দ্বিতীয়বার উদ্দীপিত হয় না, তাকে বলে— নিঃসাড় কাল ☐/ পূর্ণ ব্যর্থ সূত্র ☐/ অসাড়তা ☐।
10. যে সংকোচনে পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং স্থূলতা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে—সমদৈর্ঘ্য সংকোচন ☐/ সমটান সংকোচন ☐।
11. যে সংকোচনে পেশিতে ব্যয়িত শক্তির সবটাই তাপ উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাকে বলে— সমটান সংকোচন ☐ / সমদৈর্ঘ্য সংকোচন ☐।
12. যে পেশি ব্যক্তি ইচ্ছাধীন তার নাম হল— কঙ্কাল পেশি ☐/ হৃৎপেশি ☐/ আন্তরযন্ত্রীয় পেশি ☐।
13. দেহের উপরিতলে ত্বককে স্পর্শ করলে যে গ্রাহকটি উদ্দীপিত হয় তার নাম হল — প্যাসিনিয়ান করপাসল ☐/ নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত ☐/ ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি ☐/ মেইজনারের করপাসল ☐।
14. মায়োফাইব্রিলের A-ব্যান্ড গঠন করে—অ্যাকটিন ফিলামেন্ট ☐ / মায়োসিন ফিলামেন্ট ☐ / ট্রোপোনিন ☐ / ট্রোপোমায়োসিন ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. যে কলা সংকোচনশীল এবং পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে ——— কলা বলে।
2. মানবদেহে অস্থিপেশির মোট ওজন দেহের ওজনের ——— শতাংশ।
3. লম্বাটে পেশিতন্তুর মধ্যে যে তরল পদার্থ (ধাত্র) থাকে তাকে ——— বলে।
4. পেশিকোশের যে মেমব্রেন (পর্দা) দিয়ে ঘেরা থাকে তাকে ——— বলে।
5. কঙ্কাল পেশি স্বেচ্ছায় সংকোচনশীল বলে এর অপর নাম ——— পেশি।
6. প্রতিটি পেশিকোশের সারকোপ্লাজমে যে অসংখ্য সমান্তরাল প্রোটিন তন্তু থাকে তাকে ——— বলে।
7. পেশির মায়োফাইব্রিলের মধ্যে যে সংকোচী ফিলামেন্ট থাকে তাদের ——— এবং ——— বলে।
8. ঐচ্ছিক পেশিকোশের সারকোলেমা থেকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে যে নলাকার অংশ নির্গত হয়েছে তাকে ——— বলে।
9. হৃৎপেশি গঠনগতভাবে সরেখ পেশি কিন্তু কার্যগতভাবে ———।
10. বিশ্রামরত অবস্থায় পেশিতে যে বিভব পার্থক্য দেখা যায় তার পরিমাণ ——— mV।
11. পেশিতন্তুর দুটি Z-রেখা অন্তর্বর্তী অংশকে ——— বলে।
12. ——— হল দুটি স্নায়ুর সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরোন শেষ এবং অন্য একটি নিউরোন শুরু হয়।
13. মৃত্যুর পরে পেশিতে যে দৃঢ়তা বা কাঠিন্যদশা দেখা যায় তাকে ——— বলে।
14. স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে তা প্রথমে সংকুচিত ও পরক্ষণেই শিথিল হওয়া ঘটনাকে ——— বলে।
15. EMG-এর পুরো নাম ———।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answer to fill in the blanks) :

1. কঙ্কাল ছাড়া একটি স্থান হল ——— যেখানে কঙ্কাল পেশি থাকে। (মধ্যচ্ছদা / জিভ / মধ্যকর্ণ / চোখ)।
2. পেশিতন্তুর ধাত্রকে ——— বলে। (সাইটোপ্লাজম / নিউরোপ্লাজম / প্রোটোপ্লাজম / মায়োপ্লাজম)।
3. প্রতিটি তন্তুর উচ্চ প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট গাঢ় অঞ্চলকে ——— বলে। (A-ব্যান্ড / I-ব্যান্ড / H-অঞ্চল / Z-রেখা)।
4. অস্থি পেশিতন্তুকে ঘিরে অ্যারিওলার কলার যে পাতলা আবরণী থাকে তাকে ——— বলে। (ফ্যাসিকুলাস্ / এপিমাইসিয়াম / পেরিমাইসিয়াম/ এন্ডোমাইসিয়াম)।
5. পেশিতন্তুর মধ্যে সারকোপ্লাজমের মধ্যে যে সমান্তরালভাবে অবস্থিত অংশকে ——— বলে। (মায়োফিলামেন্ট / মায়োফাইব্রিল / অ্যাকটিন ও মায়োসিন / ট্রোপোনিন ও ট্রোপোমায়োসিন)।
6. ত্বকের ডার্মিস অঞ্চলে যে স্পর্শগ্রাহক আছে তার নাম হল ———। (রুফিনির প্রান্তস্থান / ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি / মেইজনারের করপাসল / প্যাসিনিয়ান করপাসল)।
7. যন্ত্রণানুভূতির জন্য দায়ী গ্রাহকের নাম হল ———। (প্যাসিনিয়ান করপাসল / নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত / গলগি-ম্যাজনীর অঙ্গ / পেশি স্পিন্ডল)।
8. যে সংযোগস্থানে একটি নিউরোনের অ্যাক্সন প্রান্ত অন্য একটি নিউরোনের কোশদেহ সঙ্গে সাইন্যাপস গঠন করে তাকে বলে ———। (অ্যাক্স-অ্যাক্সেনি / অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক / অ্যাক্সোসোমাটিক)।

9. স্নায়ুতন্তুর প্রতিটি গুচ্ছে অবস্থিত তন্তুগুলিকে ঘিরে ——— নামে পাতলা যোগকলার আবরণ থাকে। (ফিউনিকুলাস / এন্ডোনিউরিয়াম / পেরিনিউরিয়াম / এপিনিউরিয়াম)।
10. পেশির যে সংকোচনে পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে তাকে ——— পেশি সংকোচন বলে। (সমদৈর্ঘ্য / সমটান / সমমান)।

### E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. অস্থিসংলগ্ন যে সমস্ত পেশি ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত অঙ্গের চলন-গমনে অংশ নেয় তাকে কঙ্কাল পেশি বলে। ☐
2. সংকোচনশীলতা এবং ছন্দময়তা অস্থিপেশির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। ☐
3. পূর্ণ বা ব্যর্থ সূত্র সম্পূর্ণ পেশিতে এবং সবরকম পেশিতে দেখা যায়। ☐
4. পেশিসংকোচনের সময় পেশির দৈর্ঘ্য হ্রাস, স্থূলতা বৃদ্ধি, কিন্তু আয়তন ও পেশিটান অপরিবর্তিত থাকলে তাকে সমটান পেশি সংকোচন বলা হবে। ☐
5. পেশিকোশের মায়োফাইব্রিলের অ্যাকটিন এবং মায়োসিন ফিলামেন্টের অন্তর্বর্তী স্থানকে সারকোমিয়ার বলে। ☐
6. একক উদ্দীপনার ফলে পেশি যে সাড়া দেয় তাকে পেশি টুইচ বলে। ☐
7. পেশিতন্তুর মায়োফাইব্রিল অনুতন্তুর A-ব্যান্ড মধ্যস্থ অংশটি 'H'-অঞ্চল বলে। ☐
8. H অঞ্চল মধ্যস্থিত গাঢ় রেখাটিকে Z-রেখা বলে। ☐
9. মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার পর পেশি শিথিল হয়ে পড়ে ফলে উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে না, পেশির সাইটোপ্লাজম সান্দ্র হয় তবে পেশিতে গ্লাইকোজেনের সঞ্চয় অপরিবর্তিত থাকে, এই অবস্থাকে মরণ সংকোচ বলে। ☐
10. মার্কেলে চাকতি একপ্রকার গ্রাহক যা যন্ত্রণা উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়। ☐
11. কোনো কোনো সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে অ্যাড্রিনালিন কিন্তু অধিকাংশ সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন নিঃসৃত হয়। ☐
12. সাইন্যাপসের অন্য নাম স্নায়ু পেশি সংযোগস্থল। ☐
13. হৃৎপেশি কোনো কোনো স্থানে অত্যন্ত নিবিড় অবস্থায় থাকার ফলে তাদের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় যে সংযোগ দেখা যায় তাকে সিনসাইটিয়াম বলে। ☐
14. সাইন্যাপসের উপস্থিতির ফলে স্নায়ু আবেগের প্রবাহ কখনো-কখনো ডেনড্রাইট থেকে অ্যাক্সনের দিকে প্রবাহিত হয়। ☐
15. প্রিসাইন্যাপটিক এবং পোস্টসাইন্যাপটিক মেমব্রেন দুটির মধ্যে যে ফাঁকা স্থান থাকে তাকে সাইন্যাপটিক ক্লেফট বলে। ☐

## II. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

**(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)**

1. পেশিতে যে দুটি সংকোচী উপাদান থাকে তাদের নাম করো।
2. অনৈচ্ছিক পেশিতে অনুপ্রস্থ রেখা থাকে না কেন ?
3. মায়োফাইব্রিল কাকে বলে ?
4. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক কোন্ পেশিতে থাকে ?
5. বিভিন্ন পেশিতে নিউক্লিয়াসের অবস্থান সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
6. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন বলতে কী বোঝো ?
7. পূর্ণ ব্যর্থসূত্র বলতে কী বোঝো ?
8. পেশিটুইচ বলতে কী বোঝো ?
9. লিন কাল কাকে বলে ?
10. সাইন্যাপসের একমুখী পরিবহন বলতে কী বোঝো ?
11. অ্যাক্সোসোমাটিক সাইন্যাপস কাকে বলে ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. পেশি-কঙ্কাল তন্ত্র যে সকল উপাদান দিয়ে গঠিত হয় তাদের নাম উল্লেখ করো।
2. উদাহরণসহ পেশিকলার শ্রেণিবিন্যাস করো।
3. পেশিতন্তু বা পেশিকোশস্থিত একটি মায়োফাইব্রিলের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করো।
4. অ্যাকটিন ও মায়োসিন কী? এদের অবস্থান ও গঠন বর্ণনা করো।
5. পেশির উত্তেজন ক্ষমতা বলতে কী বোঝো ?
6. পেশির পরিবাহিতা এবং নিঃসাড় কাল বলতে কী বোঝায়?
7. পূর্ণ বা ব্যর্থ সূত্র এবং টিটানাস বলতে কী বোঝো?
8. অবসাদ কাকে বলে ? অবসাদের কারণ কী ?
9. ঐচ্ছিক পেশির বিভিন্ন প্রকার সংকোচনের নাম করো। টিটানাস কাকে বলে ?
10. অবসাদ বা অসাড়তা কাকে বলে ? ঐচ্ছিক পেশিতে অসাড়তা হয় কেন ?
11. মরণ সংকোচ বলতে কী বোঝো ?
12. পেশি সংকোচনে অ্যাকটিন এবং মায়োসিনের ভূমিকা উল্লেখ করো।
13. সাইন্যাপসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি উল্লেখ করো।
14. ত্বক গ্রাহক কাকে বলে ? তিনটি ত্বকগ্রাহক অঙ্গের নাম লেখো ও কার্যকারিতা বর্ণনা করো।

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ঐচ্ছিক পেশি এবং অনৈচ্ছিক পেশি। 2. ঐচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি। 3. হৃৎপেশি এবং অনৈচ্ছিক পেশি। 4. সাইন্যাপস এবং সাইন্যাপসিস। 5. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন এবং সমটান পেশি সংকোচন।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. সারকোমিয়ার। 2. মায়োফাইব্রিল। 3. মায়োফিলামেন্ট। 4. সারকোপ্লাজমীয় জালক। 5. ক্রশ ব্রিজ। 6. মন্থর আক্ষেপ তত্ত্ব। 7. লোহিত পেশি। 8. পূর্ণ ব্যর্থ সূত্র। 9. মরণ সংকোচ। 10. EMG। 11. স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি। 12. কোরি চক্র। 13. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন। 14. নিউরোগ্লিয়া। 15. সাইন্যাপস।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) স্নায়ু এবং পেশি-উত্তেজক কলা বলতে কী বোঝো ? (b) মানবদেহে এই তন্ত্র কী কী উপাদান দিয়ে গঠিত হয় ? (c) পেশিকলার বিভিন্ন আবরণীগুলির সচিত্র বর্ণনা করো।
2. (a) পেশিতন্ত্র কী ? (b) এর বিষয়ে যা জানো লেখো।
3. (a) পেশিকলা কাকে বলে ? (b) এটি কয় প্রকার ? (c) ঐচ্ছিক পেশির আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করো।
4. (a) ঐচ্ছিক পেশিকে কঙ্কাল পেশি বলে কেন ? (b) এর সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
5. (a) কঙ্কাল পেশিকে কেন ঐচ্ছিক পেশি বা চিহ্নিত পেশি বলে? (b) এই প্রকার পেশির সংকোচন পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
6. (a) সংকোচী উপাদান কী ? (b) ঐচ্ছিক পেশির সংকোচন কয় প্রকার এবং কী কী ? (c) এদের চিত্রসহ বর্ণনা করো।
7. পেশির সংকোচন পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
8. শ্বেত পেশি এবং লোহিত পেশির গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করো।
9. (a) সারকোটিবিউলার তন্ত্র কাকে বলে ? (b) এদের গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
10. সমদৈর্ঘ্য পেশি সংকোচন এবং সমটান পেশি সংকোচনের সম্বন্ধে যা জানো বিশদভাবে বর্ণনা করো।
11. (a) পেশিকলার শ্রেণিবিন্যাস করো। পেশির সমটান সংকোচন ও সমমাপ সংকোচনের কী কী পরিবর্তন ঘটে ? (b) স্নায়ুপেশি সংযোগস্থল বা নিউরোমাসকুলার জাংশন কাকে বলে ?
12. (a) কঙ্কাল পেশিকে চিহ্নিত পেশি বলে কেন ? (b) পেশি সংকুচিত হয় কিন্তু স্নায়ু সংকুচিত হয় না কেন ?
13. (a) গ্রাহক কী ? (b) মেইজনার কণিকা ও পেসিনিয়ান কণিকা বলতে কী বোঝো ? (c) এদের অবস্থান কোথায় ?
14. (a) সাইন্যাপস কাকে বলে ? (b) সাইন্যাপস কত রকমের হয় এবং কী কী ? (c) একটি সাইন্যাপসের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করো।
15. (a) প্রান্তসন্নিকর্ষ কাকে বলে ? (b) এর মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগের প্রেরণ ব্যবস্থা বর্ণনা করো।

### B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the following diagram) :

1. একটি অস্থি পেশির সংকোচন-প্রসারণের সরল চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো এবং তার প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করো।
2. একটি সাইন্যাপসের চিহ্নিত চিত্র আঁকো।
3. পেশির সংকোচী উপাদানের চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো।
4. অস্থিপেশি তন্তুর চিত্র আঁকো।

---

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# স্নায়ুতন্ত্র [ NERVOUS SYSTEM ]

## ➧ সূচনা (Introduction) ঃ

স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে পঠন-পাঠনকে **স্নায়ু শারীরবিদ্যা** বলে। স্নায়ুতন্ত্র মানুষের দেহে চেতনা জাগায় এবং প্রাণীদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া এই তন্ত্র অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য (প্রায় 10 মিলিয়নের বেশি) নিউরোন বা স্নায়ুকোশ এবং এর প্রায় তিন গুণের বেশি নিউরোগ্লিয়া দিয়ে গঠিত। নিউরোগ্লিয়াগুলিকে অবলম্বনকারী বা সহায়ক কোশ বলে। এগুলি স্নায়ুকোশের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। দেহের ভেতরের অথবা বাইরের পরিবেশে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার নির্ধারণ করা ও সেইসব পরিবর্তনে সাড়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রেরণ করা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণে স্নায়ুতন্ত্রকে দেহের **সমন্বয় কারক** বলা হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে পরিবেশ উত্তপ্ত হলে স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘর্ম নিঃসৃত হয় ফলে দেহকে উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে রক্ষা করে। এখানে উত্তপ্ত পরিবেশকে দেহের **উদ্দীপক** বলে এবং স্নায়ুতন্ত্র ঘর্মগ্রন্থিকে সমন্বয়করণ এবং ঘর্মক্ষরণকে **সাড়া দেওয়া** বলে। পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন রকম উদ্দীপনা, যেমন—স্পর্শ, তাপ, বেদনা, চাপ, আলো, শব্দ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক বা রিসেপটর থাকে। রিসেপটরগুলি পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ (নার্ভ ইমপালস) উৎপন্ন করে। এই স্নায়ু আবেগ পরিবহনের জন্য দেহে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু থাকে। স্নায়ুতন্তু দিয়ে স্নায়ু আবেগ উৎপত্তিস্থান থেকে মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্ক এই স্নায়ু আবেগকে বিশ্লেষণ করে যথাযথ কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

## ✪ 6.1. স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা, কাজ ও শ্রেণিবিন্যাস ✪
## (Definition, Functions and Classification of Nervous system)

❖ (a) **স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Nervous System) ঃ যে তন্ত্র উদ্দীপনা গ্রহণ, পরিবহন এবং উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে জীবদেহের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলির শারীরবৃত্তীয় কাজের দ্রুত সংযোগ, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের সাহায্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্যে সমতা রক্ষায় জীবদেহের ব্যবহারিক প্রকৃতির বিকাশ ঘটায় তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।**

স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধীয় পঠন-পাঠনকেই স্নায়ুশারীরবিদ্যা বা নিউরোফিজিওলজি (Neurophysiology) বলে।
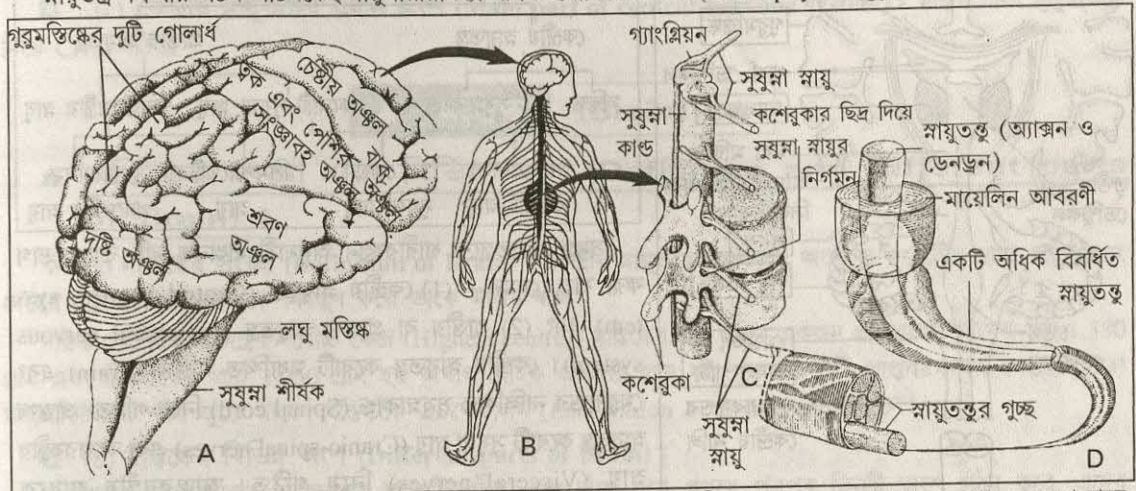
চিত্র 6.1. ঃ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র। A-মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষ অংশ, B-মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, C-সুষুম্নাকাণ্ডের অবস্থান ও সুষুম্না স্নায়ুর উৎপত্তি এবং D-একটি স্নায়ুর গঠনের চিত্ররূপ।

◘ (b) **স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Nervous system) ঃ**

1. জ্ঞানেন্দ্রিয় বা সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহিঃপরিবেশ থেকে উদ্দীপনা বা স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) গ্রহণ করা এবং গৃহীত অনুভূতি বা স্নায়ু আবেগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পাঠানো, বিশ্লেষণ এবং নির্দিষ্ট অঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য নির্দেশ পাঠানো স্নায়ুতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক কাজ। অন্তর্বাহী বা সংজ্ঞাবাহ স্নায়ু (Sensory nerve) ও বহির্বাহী বা চেষ্টীয় স্নায়ুর (Motor nerve) সহযোগিতায় স্নায়ুতন্ত্রের এই ধরনের কাজ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

2. প্রাণীদেহের বিভিন্ন কোশ, কলা, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলির কাজের মধ্যে সংযোগরক্ষা এবং সমন্বয় আনতে স্নায়ুতন্ত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্নায়ুতন্ত্র হরমোনের সহযোগিতায় প্রাণীদেহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কোশ এবং কলা, বিভিন্ন যন্ত্র ও তন্ত্রগুলির কাজের সমন্বয়, ভারসাম্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।
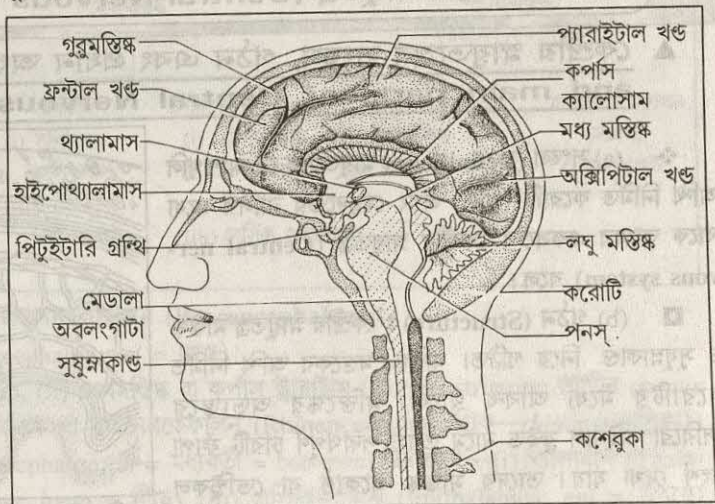
চিত্র 6.2 ঃ খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ডের অবস্থানের চিত্ররূপ।

3. স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন, দেহের আন্তরযন্ত্রীয় বা পেশি-কঙ্কাল-অস্থিসন্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাজের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন হয়।

4. প্রাণীদেহের অন্তঃপরিবেশের পরিবর্তন এবং এর ভারসাম্য রক্ষা, বিভিন্ন গ্রন্থিগুলির রস নিঃসরণ প্রভৃতি কাজকেস্নায়ুতন্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করে।

5. প্রয়োজনে স্নায়ুতন্ত্র বাধাদানকারক (Inhibitor) হিসেবে, বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

**(c) স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Nervous system) :**
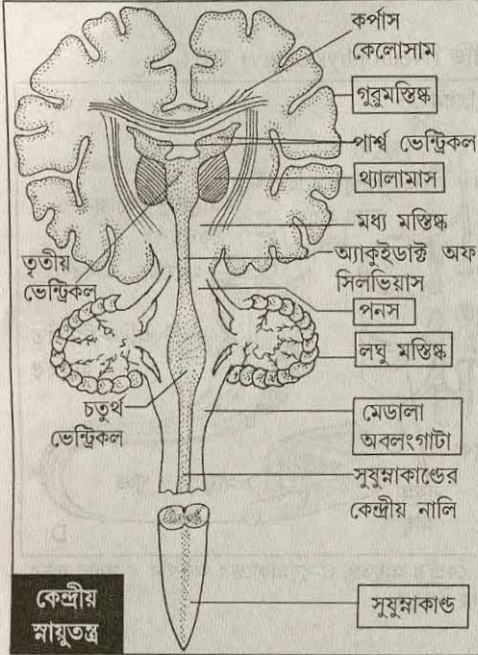
চিত্র 6.3. : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের করোনাল ছেদের চিত্ররূপ।

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে শারীরস্থান অনুযায়ী প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— (1) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) এবং (2) প্রান্তীয় বা প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র করোটি মধ্যস্থিত মস্তিষ্ক (Brain) এবং মেরুদণ্ডের নালিস্থিত সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) নিয়ে গঠিত। প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র করোটি সুষুম্না স্নায়ু (Cranio-spinal nerves) এবং আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ু (Visceral nerves) নিয়ে গঠিত। আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুকে সিম্প্যাথেটিক (Sympathetic) এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক (Parasympathetic) স্নায়ুতে ভাগ করা যায়। করোটি সুষুম্না স্নায়ু 12 জোড়া করোটি এবং 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত হয়।

## 6.2. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System—C.N.S)

### কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা, গঠন এবং প্রধান অংশ (Definition, Structure and main parts of Central Nervous System)

**(a) সংজ্ঞা (Definition) : স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশগুলি অস্থি নির্মিত করোটি (খুলি) এবং মেরুদণ্ডের নালির মধ্যে থাকে তাদের একসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) বলে।**

**(b) গঠন (Structure) :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক, মস্তকের অস্থি নির্মিত করোটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নামে তরল পদার্থপূর্ণ চারটি ফাঁপা অংশ দেখা যায়। তাদের **মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকল** (Ventricle) বলে। প্রকোষ্ঠগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে

চিত্র 6.4. : মস্তিষ্কের ডুরা, আরাকনয়েড এবং পায়া মেটারের অবস্থানের চিত্ররূপ।

যুক্ত থাকে। সুষুম্নাকাণ্ড মেরুদণ্ডের ভেতরে নিউর্যাল ক্যানালের মধ্যে থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলেও **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (CSF) পূর্ণ ফাঁকা স্থান থাকে। তাকে **কেন্দ্রীয় নালি** বলে। সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডটি তিনটি তন্তুময় **আবরক ঝিল্লি** বা **মেনিনজেস** (Meninges) দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের মেনিনজেসকে **ডুরা মেটার** (Dura mater) বলে। এটি অস্থিসংলগ্ন থাকে। এর পরের (মাঝের) মেনিনজেসকে **অ্যারাক্নয়েড মেটার** (Arachnoid mater) বলে এবং ভিতরের মেনিনজেসকে **পায়া মেটার** (Pia mater) বলে। এটি মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরিতলে লেগে থাকে। পায়া মেটার ও অ্যারাক্নয়েডের মধ্যবর্তী অংশকে **সাব-অ্যারাক্নয়েড স্পেস** (Sub-arachnoid space) বলে। এই ফাঁক অংশটিও একপ্রকার বর্ণহীন ও ক্ষারীয় পরিবর্তিত তরল কলারস দিয়ে পূর্ণ থাকে। ওই তরল পদার্থটিকেও **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (Cerebrospinal fluid) বা সংক্ষেপে CSF বলে। সুষুম্নাকাণ্ডটিও এই তিন প্রকার আবরক ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে।

◘ (c) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ (Main part of central nervous system) :** মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে CNS গঠিত।

## ▲ মস্তিষ্ক (Brain) ▲

### ▲ মস্তিষ্কের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন অংশ (Definition and Different parts of Brain) :

❖ (a) **মস্তিষ্কের সংজ্ঞা (Definition of Brain) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্ববৃহৎ অংশ যা করোটির মধ্যে থাকে এবং দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বলে।**

মস্তিষ্ক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র (Highest centre)। মস্তিষ্কের **গড় ওজন** একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রায় 1,380 গ্রাম এবং স্ত্রীলোকের প্রায় 1,250 গ্রাম হয় অর্থাৎ দৈহিক ওজনের প্রায় দুই শতাংশ। এটি প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 1,500 ঘনসেন্টিমিটার স্থান জুড়ে থাকে। মস্তিষ্ককে *এনকেফালন* (*Encephalon or Enkephalon*) বলে।

◘ (b) **মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ (Different parts of Brain) :**

ভ্রূণাবস্থায় সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রভাগের অংশটি স্ফীত এবং ভাঁজ হয়ে প্রথমে পরপর তিনটি অংশ গঠন করে, এদের পুরোমস্তিষ্ক (Forebrain), মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain) এবং পরাঙমস্তিষ্ক (Hindbrain) বলে। বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে মস্তিষ্কটি আরও পরিণত হয়ে প্রধানত পাঁচটি ভাগে এবং বহু উপভাগে বিভক্ত হয়।
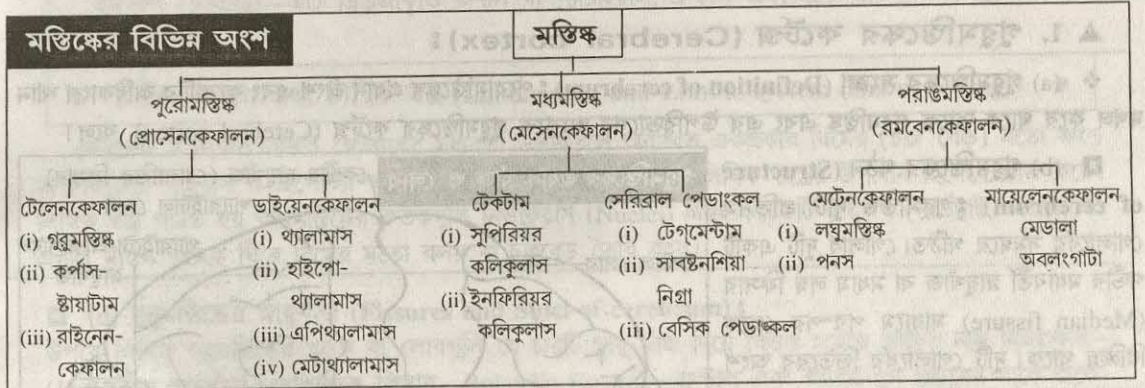
● **A. পুরোমস্তিষ্ক (Fore brain) বা প্রোসেনকেফালন (Procencephalon) :**

1. **প্রান্তমস্তিষ্ক** বা **টেলেনকেফালন** (Telencephalon; *tel* = প্রান্ত)।

**উদাহরণ**—(i) গুরুমস্তিষ্ক (Cerebral cortex), (ii) **রেখমস্তিষ্ক** বা **কর্পাস স্ট্রায়াটাম** (Corpus striatum; ল্যাটিন *corpus* = দেহ, *striata* = সরুরেখা) এবং (iii) **নাসামস্তিষ্ক** বা রাইনেনকেফালন (Rhinencephalon; গ্রিক—*rhinons*=নাসিকা)।

2. **আন্তরমস্তিষ্ক** বা **ডায়েনকেফালন** (Diencephalon; *di* = মধ্যবর্তী = between) **উদাহরণ**—(i) থ্যালামাস (Thalamus) (ii) হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus; *hypo* = নীচে) (iii) এপিথ্যালামাস (Epithalamus; *epi* = উপরে) (iv) মেটাথ্যালামাস (Metathalamus; *meta* = পরবর্তী)।

**B. মধ্যমস্তিষ্ক (Mid brain) বা মেসেনকেফালন (Mesencephalon; *mes* = middle, মধ্য) ঃ**

**উদাহরণ**—1. **টেকটাম** (Tectum; *tectum* = ছাদ)। (i) ঊর্ধ্ব স্নায়ুস্ফীতি বা সুপিরিওর কলিকুলাস (Superior colliculus; *colliculus* = ক্ষুদ্রস্ফীতি)। (ii) অধঃস্নায়ুস্ফীতি বা ইনফিরিওর কলিকুলাস (Inferior colliculus)।

2. **গুরুমস্তিষ্কীয় স্নায়ুদণ্ড বা সেরিব্রাল পেডাংকল** (Cerebral peduncle)।

**উদাহরণ**—(i) টেগমেন্টাম (*Tegmentum* = ত্বক)। (ii) সাবস্ট্যানশিয়া নিগ্রা (Substantia nigra ; *Substance* = বস্তু; *nigra* = কৃষ্ণবর্ণ)। (iii) মৌল স্নায়ুদণ্ড বা বেসিক পেডাংকুলি (*Basic pedunculi*)।

চিত্র 6.5. ঃ মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে লম্বচ্ছেদে দেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের চিত্ররূপ।

**C. পরাঙমস্তিষ্ক বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hind brain) বা রমবেনকেফালন (Rhombencephalon)।**

1. **পরাঙমস্তিষ্ক বা মেটেনকেফালন** (Metencephalon ; *met* = পরবর্তী)
   **উদাহরণ**—(i) লঘুমস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম (Cerebellum) এবং (ii) পন্‌স (Pons)।
2. **সুষুন্নামস্তিষ্ক বা মায়েলেনকেফালন** (Myelencephalon)।
   **উদাহরণ**—(i) সুষুন্নাশীর্ষক বা মেডালা অবলংগাটা (Medulla oblongata)।

## 6.3. মস্তিষ্ক—এর প্রধান পাঁচটি অংশ (Brain—Its five major parts)

❖ **মস্তিষ্কের সংজ্ঞা (Definition of Brain) ঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো অংশ যা করোটির (মাথার খুলির) মধ্যে থাকে এবং দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বলে।**

### ▲ 1. গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স (Cerebral cortex) ঃ

❖ (a) **গুরুমস্তিষ্কের সংজ্ঞা (Definition of cerebrum) ঃ পুরোমস্তিষ্কের প্রধান অংশ এবং করোটির অধিকাংশ স্থান দখল করে থাকে তাকে গুরুমস্তিষ্ক এবং এর উপরিভাগের অংশকে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স** (Cerebral cortex) **বলে।**

◻ (b) **গুরুমস্তিষ্কের গঠন (Structure of cerebrum)** ঃ গুরুমস্তিষ্ক দুটি প্রতিসম গোলার্ধের সমন্বয়ে গঠিত। গোলার্ধ দুটি একটি গভীর মধ্যবর্তী স্নায়ুখাঁজ বা মধ্যম লম্ব ফিসার (Median fissure) মাধ্যমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। দুটি গোলার্ধের ভিতরের অংশ **করপাস ক্যালোসাম** (Corpus callosum) নামে প্রশস্ত স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত থাকে। গুরুমস্তিষ্কের উপরের অংশকে কর্টেক্স বলে যার মোট ক্ষেত্রফল করোটির অন্তঃস্থ তলের ক্ষেত্রফলের প্রায় তিনগুণ **যা প্রধানত ধূসরবস্তু (Gray matter)** নিয়ে গঠিত **সেরিব্রাল কর্টেক্স**

চিত্র 6.6. ঃ গুরুমস্তিষ্কের বাম গোলার্ধের পার্শ্ব দৃশ্যে বিভিন্ন সালকাস, ফিসার, গাইরাস এবং লোবের চিত্ররূপ।

(Cerebral cortex)-এর বহু স্থানে ভাঁজ হয়ে উঁচু-নীচু অবস্থায় থাকে। উঁচু (কনভলিউশানস—Convolutions) স্থানগুলিকে **গাইরাস** বা **জাইরাস** (Gyrus, Pl. Gyri) এবং নীচু স্থানগুলিকে **স্নায়ুখাঁজ** বা **ফিসার** (Fissures = অগভীর খাঁজ) এবং **সালকাস** (Sulcus = গভীর খাঁজ, বহুবচনে = Sulci) বলে। গুরুমস্তিষ্কের নীচের স্তর বা ভিতরের অংশ **শ্বেত বস্তু** (White matter) নিয়ে গঠিত। গুরুমস্তিষ্কের প্রতিটি গোলার্ধের উপরিতল বা **সেরিব্রাল কর্টেক্স** পাঁচটি লোবে বিভক্ত।

◘ (c) **গুরুমস্তিষ্কের লোব (Lobes of cerebrum) :** গুরুমস্তিষ্কের প্রতিটি গোলার্ধ চারটি প্রধান বড়ো স্নায়ু খাঁজ নিয়ে চারটি লোবে বা খণ্ডকে বিভক্ত হয়। করোটি-অস্থির অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গুরুমস্তিষ্কের চারটি লোবের উপরিতলকে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত করা হয়, যেমন—

1. **সম্মুখ খণ্ডক** (ফ্রন্টাল লোব—Frontal lobe)—গুরুমস্তিষ্কের একেবারে সামনের দিকের (কপালের দিকে) থাকে। এটি চেষ্টীয় অঞ্চল, প্রাক্‌চেষ্টীয় অঞ্চল, প্রাক্ সম্মুখস্থ অঞ্চল এবং ব্রোকাস অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

2. **ঊর্ধ্বখণ্ডক** (প্যারাইটাল লোব—Parietal lobe)—গুরুমস্তিষ্কের ঊর্ধ্বভাগের অংশ যা তালুতে (উপরের মাঝামাঝি অংশে) থাকে। এটি সংজ্ঞাবহ অঞ্চল ও সংজ্ঞাবহ সহযোগী অঞ্চলে অবস্থিত।

3. **পার্শ্ব খণ্ডক** (টেম্পোরাল লোব—Temporal lobe)—গুরুমস্তিষ্কের দু'পাশের কানের ঠিক উপরে থাকে। এতে মুখ্য শ্রবণ অঞ্চল (শ্রুতি কেন্দ্র) অবস্থিত।

4. **পশ্চাৎ খণ্ডক** (অক্সিপিটাল লোব—Occipital lobe)—গুরুমস্তিষ্কের একেবারে পেছনের অংশ যা লঘুমস্তিষ্কের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে দর্শন অঞ্চল (দৃষ্টি কেন্দ্র) অবস্থিত।

চিত্র 6.7. : গুরুমস্তিষ্কের বাম গোলার্ধের পার্শ্ব দৃশ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যকরী কেন্দ্রের অবস্থানের চিত্ররূপ।

এছাড়া গুরুমস্তিষ্কের ভেতরে (গভীরে) অন্য একটি লোবের উপস্থিতি থাকে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, সেটি হল—

5. **ইনসুলা** (Insula)—এটি ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল যা প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল এবং টেম্পোরাল এবং গুরুমস্তিষ্কের পার্শ্ব খাঁজের মধ্যে থাকে।

● **লিম্বিক অঞ্চল এবং লিম্বিক তন্ত্র [Limbic area and Limbic system (*limbus* = ring)]** ●

সেরিব্রাল কর্টেক্সের প্রতিটি গোলার্ধের মধ্যবর্তী উপরিতলে অবস্থিত একপ্রকার রিমের (চক্র বেড়) মতো অংশ যা সিঙ্গুলেট গাইরাস ও হিপোক্যাম্পাস নামে অংশ নিয়ে গঠিত। এটি লিম্বিক তন্ত্রের উপাদান হিসেবে কাজ করে। লিম্বিক তন্ত্র গঠিত হয় অগ্রমস্তিষ্কের কতকগুলি নিউক্লিয়াস (Nuclei) এবং কয়েকটি স্নায়ুপথ (নার্ভট্রাক্ট) সহযোগে। এগুলি মস্তিষ্ক দণ্ডকে ঘিরে রিমের মতো বলয় বা চক্রবেড় তৈরি করে।

◘ (d) **গুরুমস্তিষ্কের স্নায়ুখাঁজ (Fissures and Sulci of cerebrum) :**

উপরে লিখিত গুরুমস্তিষ্কের খণ্ডক বা লোবগুলি যে চারটি স্নায়ু খাঁজ দিয়ে বিভক্ত হয়েছে তাদের নাম নিম্নপ্রকার—

(1) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুখাঁজ (রোলান্ডিক ফিসার**—Rolandic fissure)—ফ্রন্টাল এবং প্যারাটাইল লোবের মাঝে থাকে।

(2) **গুরুমস্তিষ্কীয় পার্শ্বস্নায়ু খাঁজ (সিলভিয়ান ফিসার**—Sylvian fissure)—ফ্রন্টাল এবং টেম্পোরাল লোবের মাঝে থাকে।

(3) **প্যারাইটো-অক্সিপিটাল স্নায়ুখাঁজ** (Parieto-occipital sulcus)—প্যারাটাইল ও অক্সিপিটাল লোবের মাঝে থাকে।

(4) **ক্যালোসোমার্জিনাল স্নায়ুখাঁজ** (Callosomarginal fissure)—টেম্পোরাল লোব ও ইনসুলা অঞ্চলের লোবের মাঝে থাকে।

বিজ্ঞানী **ব্রাডম্যান** গুরুমস্তিষ্কের প্রতিটি লোবের বিভিন্ন উঁচু ভাঁজকে অর্থাৎ জাইরাসকে 1, 2, 3, 4, 5, 6...ইত্যাদি নানা সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করেছেন।

**(e) গুরুমস্তিষ্কের আণুবীক্ষণিক গঠন (Histological structure of cerebrum) :** গুরুমস্তিষ্কের উপরের স্তর **ধূসর বস্তু** (Gray matter) এবং নীচের স্তর **শ্বেতবস্তু** (White matter) নিয়ে গঠিত। ধূসর বস্তু—প্রধানত স্নায়ুতন্তু, নিউরোগ্লিয়া এবং পাঁচ প্রকার স্নায়ুকোশের সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদানগুলি ছয়টি স্তরে সজ্জিত থাকে। শ্বেতবস্তু প্রধানত মায়েলিন স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। গুরুমস্তিষ্কে কোশের মোট সংখ্যা **প্রায় $7 \times 10^9$ এবং স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা প্রায় 2000 লক্ষের বেশি।**

প্রত্যেকটি গোলার্ধের অভ্যন্তরে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডপূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। তাদের **পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ** (Lateral ventricles) বলে। প্রতিটি লোবের ধূসর বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন কার্যকরী কেন্দ্র থাকে, যেমন—দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ, বাক্, সাধারণ সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় কেন্দ্র ইত্যাদি। এই সব কেন্দ্রসমূহকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

**(f) গুরুমস্তিষ্কের কার্যাবলি (Functions of Cerebrum) :**

1. গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন সংজ্ঞাবহ কেন্দ্রগুলি অর্থাৎ **দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ ও সাধারণ সংজ্ঞাবহ** কেন্দ্রগুলি যথাক্রমে চোখ, কান, জিভ, নাক ও ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে আসা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে গ্রহণ করে এবং তাদের বিশ্লেষণ করে।
2. তাপ, চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা, কম্পন প্রভৃতির অনুভূতিকে **সংজ্ঞাবহ অঞ্চল** (Sensory area) সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে।
3. **চেষ্টীয় অঞ্চল** (Motor area) দেহের সমস্ত ঐচ্ছিক পেশিগুলির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।
4. গুরুমস্তিষ্কের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ দেহের অনুভূতি, বুদ্ধি, বিবেচনা, সংকল্প (will), স্মরণশক্তি ইত্যাদিরও কেন্দ্রস্থল।
5. প্রি-মোটর অঞ্চলের নীচে যে **বাক্ অঞ্চল** (Brocas area) থাকে তা কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় পেশিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
6. সংজ্ঞাবহ অঞ্চলের নীচের স্বাদ কেন্দ্র স্বাদ আস্বাদনে সাহায্য করে।

- **গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন লোবের কার্যাবলি (Functions of different lobes of cerebrum)**

| লোব | কার্যাবলি |
|---|---|
| 1. ফ্রন্টাল | এতে **চেষ্টীয় কেন্দ্র** থাকে যা অস্থিপেশির ঐচ্ছিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়া ব্যক্তিত্ব, উন্নত মেধা, যেমন—মনঃসংযোগ, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, মন সংযোগ বা বাচনিক সংযোগ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন করে। |
| 2. প্যারাইটাল | এতে **সংজ্ঞাবহ কেন্দ্র** থাকে যা ত্বক ও পেশির সংবেদন, বাক্ শব্দ বোঝা এবং এর সাহায্যে চিন্তা ও আবেগ ব্যক্ত করা, আকৃতি ও গঠন ইত্যাদি কাজ করে। |
| 3. টেম্পোরাল | এতে **শ্রবণ কেন্দ্র** থাকে যা শোনা শব্দকে ব্যাখ্যা করা, শোনা ও দেখার অভিজ্ঞতার স্মৃতি সঞ্চয় রাখে। |
| 4. অক্সিপিটাল | এটি **দর্শন** কেন্দ্র যা দর্শন অনুভূতি এবং সঠিক দৃষ্টির জন্য চোখের বিভিন্ন সঞ্চালনে অংশ নেয়। |
| 5. ইনস্যুলা | গুরুমস্তিষ্কের এই কেন্দ্রটি স্মৃতি এবং অন্যান্য গুরুমস্তিষ্কের কার্যাবলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখে। |

## ▲ 2. থ্যালামাস (Thalamus) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দু'দিকে গুরুমস্তিষ্কের নীচে ও মধ্যমস্তিষ্কের উপরের শ্বেতবস্তুর মধ্যে যে দুটি ধূসর রঙের ডিম্বাকার অংশের মতো দেখা যায় তাদের থ্যালামাস বলে।**

**(b) গঠন :** প্রতিটি থ্যালামাসের (চিত্র 6.8) দৈর্ঘ্য প্রায় 4 সেন্টিমিটার। এটি কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) নিয়ে গঠিত। এই সব কেন্দ্র সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা অন্তর্বাহ (সংজ্ঞাবহ) স্নায়ু দিয়ে যুক্ত। আবার এই সব কেন্দ্র থেকে বহির্বাহ (চেষ্টীয়) স্নায়ুতন্তু বের হয়ে প্রধানত গুরুমস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

**(c) থ্যালামাসের কার্যাবলি (Functions of thalamus) :**

1. **রিলে কেন্দ্র** (Relay station)—থ্যালামাসকে প্রধানত প্রেরক কেন্দ্র বা রিলে ষ্টেশন বলা হয় কারণ দেহ থেকে আসা সবরকম সংজ্ঞাবহ প্রথমে স্নায়ুপ্রবাহ থ্যালামাস হয়ে পরে গুরুমস্তিষ্কে যায়।

2. **স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র** (Centre for crude sensation)—থ্যালামাস স্থূল অনুভূতির (চাপ, স্থূল স্পর্শ, যন্ত্রণা) কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও আন্তরযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

3. **ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণ** (Personality and behaviour)—গুরুমস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের মাধ্যমে থ্যালামাস ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।

4. **সচেতনকারী প্রতিক্রিয়া** (Alerting reactions)—থ্যালামাস নিদ্রিত প্রাণীকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে তাকে সতর্ক ও সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

5. **মানসিক আবেগের প্রতিক্রিয়া** (Emotional reactions)—ক্রোধ, পীড়ন প্রভৃতি মানসিক আবেগের প্রতিক্রিয়া থ্যালামাসের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

চিত্র 6.8. : থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, পনস এবং মেডালা অবলাংগাটার অবস্থানের চিত্ররূপ।

## ● হাইপোথ্যালামস (Hypothalamus) ঃ

(a) **হাইপোথ্যালামাসের গঠন (Structure of hypothalamus) ঃ** তৃতীয় মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ ও থ্যালামাসের তলদেশে হাইপোথ্যালামাস থাকে (চিত্র 6.8)। পুরো মস্তিষ্কের শ্বেতবস্তুর মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ধূসর বস্তু বা নিউক্লিয়াস (স্নায়ুকেন্দ্র) নিয়ে হাইপোথ্যালামাস গঠিত। হাইপোথ্যালামাসের নীচে পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থান করে। অন্যান্য কেন্দ্রের মতো মস্তিষ্কে এই অংশটিও অন্যান্য অংশের সঙ্গে অন্তর্বাহ ও বহির্বাহ স্নায়ুতন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে।

### (b) হাইপোথ্যালামাসের কার্যাবলি (Functions of hypothalamus) ঃ

1. **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of autonomic nervous system)— হাইপোথ্যালামাস স্বয়ংক্রিয় **স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র** হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ হাইপোথ্যালামাস **সিম্‌প্যাথেটিক** ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

2. **দেহতাপের নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of body temperature)—হাইপোথ্যালামাসে **তাপক্ষয় কেন্দ্র** (Heat loss centre) এবং **তাপ উৎপাদনকারী কেন্দ্র** (Heat gain centre) নামে দু'প্রকার কেন্দ্র আছে যাদের মাধ্যমে দেহতাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

3. **মানসিক আবেগের কেন্দ্র** (Centre for emotion)—উত্তেজনা, আবেগ, উদ্‌বেগ, ভয় প্রভৃতি মানসিক আবেগের জন্য হাইপোথ্যালামাস প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

4. **অগ্র পিটুইটারির উপর ক্রিয়া** (Effects on anterior pituitary)— হাইপোথ্যালামাসে ছয় প্রকার **রিলিজিং ফ্যাক্টর হরমোন** নামে নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে। সম্মুখস্থ পিটুইটারি থেকে পৃথক ভাবে ছয় রকমের ট্রপিক হরমোন ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

5. **পশ্চাৎ পিটুইটারির উপর ক্রিয়া** (Effects on posterior pituitary)— হাইপোথ্যালামাস ভ্যাসোপ্রেসিন এবং অক্সিটোসিন নামে দু'রকমের নিউরোহরমোন ক্ষরণ করে। এই হরমোন পরে স্নায়ুকোশের (নিউরোনের) মাধ্যমে পশ্চাৎ পিটুইটারিতে সঞ্চিত হয় ও দেহের বিভিন্ন কাজ করে।

6. **অন্যান্য কার্যাবলি**—হাইপোথ্যালামাস বিভিন্ন তন্ত্রের উপর কাজ করে, যেমন— সংবহনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র প্রভৃতি। এছাড়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, খাদ্যগ্রহণ, নিদ্রা, যৌন আচরণ ইত্যাদি কাজে হাইপোথ্যালামাস অংশগ্রহণ করে।

## ▲ 3. পন্‌স (Pons) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে অংশটি লঘুমস্তিষ্কের সামনে ও সুষুম্নাশীর্ষকের উপরে অবস্থান করে তাকে পন্‌স বলে।**

পন্‌স প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। সম্মুখাংশকে **ব্যাসিলার অংশ** (Basilar portion) এবং পশ্চাৎ অংশকে **টেগমেন্টাম** (Tegmentum) বলে। ব্যাসিলার অংশ **পন্টাইন নিউক্লিয়াস** (Pontine nucleus) নামে কিছু বিক্ষিপ্ত স্নায়ু কোশপুঞ্জের এবং বিভিন্ন নিম্নগামী স্নায়ুপথের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পন্‌সে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম করোটি স্নায়ুর স্নায়ুকেন্দ্রগুলি

থাকে। এ সব স্নায়ুকেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ট্রাইজেমিন্যাল (V) অ্যাবডুসেনস (VI) ফেসিয়াল (VII) এবং অ্যাকুস্টিক (VIII) করোটি স্নায়ু উৎপন্ন হয়। এছাড়া পনসে শ্বাসকেন্দ্রের (Respiratory centre) একাংশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

### ◘ (b) পন্‌সের কার্যাবলি (Functions of Pons) :

1. পন্‌সে থাকা শ্বাসকেন্দ্রগুলি স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

2. পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম করোটি স্নায়ুর উৎসস্থল পন্‌সের কয়েকটি করোটি স্নায়ুকেন্দ্র থেকে এই সব স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয়।

3. পন্‌স রিলে স্টেশন বা প্রেরক স্থান হিসাবে কার্য করে। গুরুমস্তিষ্ক থেকে আসা চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তু পন্‌টাইন নিউক্লিয়াসে শেষ হয় এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় একটি স্নায়ুকোশ বের হয়ে লঘুমস্তিষ্কে যায়।

## ▲ 4. লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম—Cerebellum) :

❖ (a) সংজ্ঞা : পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা পনস ও সুষুম্নাশীর্ষকের পেছনে ও গুরুমস্তিষ্কের নীচে থাকে যা দুটি সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত ও ভার্মিস (Vermis) নামে যোজক দিয়ে যুক্ত তাকে লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম) বলে।

চিত্র 6.9. : লঘুমস্তিষ্কের অবস্থান ও গঠনের চিত্ররূপ।

### ◘ (b) 1. লঘুমস্তিষ্কের বহির্গঠন (External structure of Cerebellum) :

লঘুমস্তিষ্ক পরাঙ্‌মস্তিষ্কের (পশ্চাৎ মস্তিষ্কের) সর্ববৃহৎ অংশ। এই অংশটি পনস, সুষুম্নাশীর্ষক এবং চতুর্থ ভেন্ট্রিকলের পেছনে ও গুরুমস্তিষ্কের নীচে থাকে।

লঘুমস্তিষ্ক দুটি সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত। ভার্মিস (Vermis) নামক যোজক এই দুটি গোলার্ধকে যুক্ত করে। লঘুমস্তিষ্কটি তিনটি পেডাঙ্কল (ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধঃপেডাঙ্কল নামে তন্তুগুচ্ছ দিয়ে মস্তিষ্ক কাণ্ডের (Brain stem) পেছন দিকে যুক্ত থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের লঘুমস্তিষ্কের গড় ওজন প্রায় 150 গ্রাম। প্রতিটি লঘুমস্তিষ্কের গোলার্ধ মুখ্য স্নায়ুখাঁজ (Primary fissure), অনুপ্রস্থ স্নায়ুখাঁজ (Horizontal fissure), প্রি-পিরামিডাল ও পোস্ট-পিরামিডাল স্নায়ুখাঁজ (Pre & post pyramidal fissures) প্রভৃতি খাঁজ দিয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ক্রমবিবর্তনের ভিত্তিতে লঘুমস্তিষ্ককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) **আদি লঘুমস্তিষ্ক বা আর্কিসেরিবেলাম** (Archicerebellum)—লঘুমস্তিষ্কের নডিউল (Nodule), ফ্লোকুলি (Flocculi), পেডাঙ্কল (Peduncles) এবং লিঙ্গুলা (Lingula) অংশ নিয়ে এটি গঠিত।

(ii) **প্রাচীন লঘুমস্তিষ্ক বা পেলিওসেরিবেলাম** (Paleocerebellum)—এটি সেরিবেলামের **সেন্ট্রাল লবিউল** (Central lobules), **কালমেন** (Culmen), **উভুলা** (Uvula), **পিরামিড** (Pyramid) প্রভৃতি নিয়ে এই অংশ গঠিত।
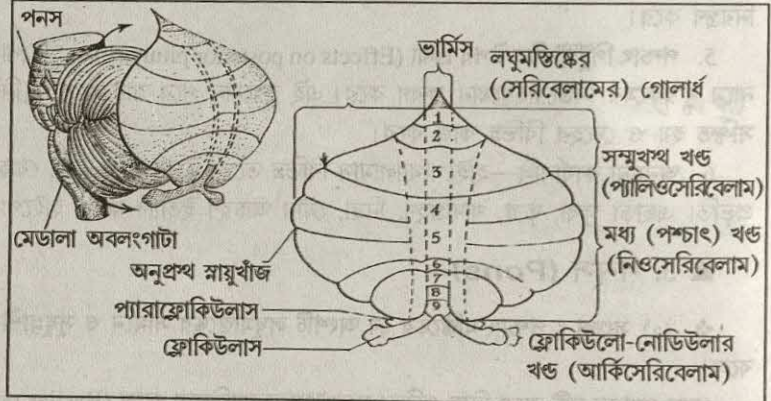
চিত্র 6.10. : মস্তিষ্কে লঘুমস্তিষ্কের অবস্থান এবং এর বিভিন্ন ভাগ : 1—লিঙ্গুলা, 2—সেন্ট্রাল লিবিউল, 3—কালমেন, 4—ডেকলিভ, 5—ফোলিয়াম, 6—টিউবার, 7—পিরামিড, 8—উভুলা এবং 9—নিডউল।

(iii) **নব লঘুমস্তিষ্ক বা নিওসেরিবেলাম** (Neocerebellum)—নিওসেরিবেলাম লঘুমস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ। পিরামিড এবং উভুলা ছাড়া সেরিবেলামের সমস্ত পশ্চাৎখণ্ড (Posterior lobe) সমন্বয়ে গঠিত।

◘ (b) 2. **লঘুমস্তিষ্কের কলাস্থানিক গঠন (Histological of cerebellum) :** গুরুমস্তিষ্কের মতো লঘুমস্তিষ্কের উপরের দিক ধূসর বস্তু ও নীচের দিক শ্বেতবস্তু নিয়ে গঠিত। উপরের স্তরকে কর্টেক্স বলে। এটি বহু ভাঁজযুক্ত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার স্নায়ুকোশের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোশগুলি তিনটি স্তরে সাজানো থাকে, যেমন—বহিঃস্থ **আণবিক স্তর** (Molecular layer), মধ্যস্থ কলসাকার **পারকিন্‌জি কোশস্তর** (Purkinje cells layer) ও অন্তঃস্থ **দানাদার স্তর** (Granular layer)। শ্বেতবস্তু স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। কর্টেক্সের ধূসর বস্তুর নীচে শ্বেতবস্তু থাকে। শ্বেতবস্তু স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। শ্বেতবস্তুর মধ্যে চার জোড়া বিচ্ছিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকে।

চিত্র 6.11. : লঘুমস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং লঘুমস্তিষ্কের শ্বেতবস্তুস্থিত চারজোড়া নিউক্লিয়াসের অবস্থানের চিত্ররূপ।

● **লঘুমস্তিষ্কের নিউক্লিয়াস (Nucleus of cerebellum) :** (i) **নিউক্লিয়াস ফ্যাসটিজি** (Nucleus fastigii), (ii) **নিউক্লিয়াস গ্লোবোসাস** (Nucleus globosus), (iii) **নিউক্লিয়াস এমবোলিফর্মিস** (Nucleus emboliformis), (iv) **নিউক্লিয়াস ডেন্‌টেটাস** (Nucleus dentatus)।

◘ **লঘুমস্তিষ্কের কার্যাবলি (Functions of cerebellum) :**

1. দেহের বিভিন্ন অংশ এবং গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে লঘুমস্তিষ্ক স্নায়ু দিয়ে যুক্ত থাকে বলে লঘুমস্তিষ্ক দেহের বিভিন্ন কাজের নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।
2. ঐচ্ছিক চলাফেরাকে (Voluntary movement) নিয়ন্ত্রণ করে।
3. লঘুমস্তিষ্ক ঐচ্ছিক পেশিক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে দেহের **পেশিটান** (Muscle tone) নিয়ন্ত্রণ করে।
4. লঘুমস্তিষ্ক পেশিটানের মাধ্যমে **দেহের ভারসাম্য** (Equilibrium) ও **দেহভঙ্গি** (Posture)-কে নিয়ন্ত্রণ করে।
5. লঘুমস্তিষ্ক অংশ চলাফেরার দিক (Direction of movement) নির্ধারণ করে।

● **গুরুমস্তিষ্ক এবং লঘুমস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cerebrum and Cerebellum) :**

| গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম) | লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম) |
|---|---|
| 1. অগ্রমস্তিষ্কের সবচেয়ে বড়ো অংশ। | 1. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড়ো অংশ। |
| 2. এটি মস্তিষ্ক কাণ্ডের উপরে অবস্থিত। | 2. এটি মস্তিষ্ককাণ্ডের পেছনে অবস্থিত। |
| 3. এটি মোটামুটি ডিম্বাকার। | 3. এটি মোটামুটি গোলাকার। |
| 4. দুটি গোলার্ধ কর্পাস ক্যালোসাম নামে চওড়া তন্তুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত থাকে। | 4. দুটি গোলার্ধ ভারমিস নামে অংশ দিয়ে যুক্ত থাকে। |
| 5. **কাজ**—বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। | 5. **কাজ**— পেশিটান, দেহভঙ্গি, দেহের ভারসাম্য ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। |

## ▲ 5. সুষুম্নাশীর্ষক (মেডালা অবলংগাটা—Medulla oblongata) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : পন্‌সের নিম্নাংশ থেকে আরম্ভ হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত শঙ্কুসদৃশ অংশকে সুষুম্নাশীর্ষক (মেডালা অবলংগাটা) বলে।**

**(b) সুষুম্না শীর্ষকের গঠন (Structure of Medulla oblongata) :** পন্‌সের নিম্নাংশ থেকে আরম্ভ হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে সুষুম্নাশীর্ষক বা মেডালা অবলংগাটা বলে। এটি শাঙ্কব আকৃতির ও দৈর্ঘ্যে প্রায় 3 সেন্টিমিটার ও প্রস্থে 2 সেন্টিমিটার (সব থেকে মোটা অঞ্চল) হয়। এর অঙ্কীয় এবং পৃষ্ঠীয় স্থানে দুটি মধ্যখাঁজ (Median fissures)-এর উপস্থিতির জন্য দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত হয়। অঙ্কীয় মধ্য খাঁজের দু'পাশে দুটি স্ফীত অংশ দেখা যায়। এদের **পিরামিড** (Pyramid) বলে। এর উপরের দিক অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়ে পন্‌সের সঙ্গে এবং নীচের দিক অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। সুষুম্নাশীর্ষক ভিতরের অংশ শ্বেতবস্তু দিয়ে গঠিত। শ্বেতবস্তুতে স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোশ মিলিত হয়ে স্নায়ুজালক (Reticular formation) গঠন করে। শ্বেতবস্তুর স্নায়ুজালকের ফাঁকে ফাঁকে সুষুম্নাশীর্ষকে ধূসর বস্তু (স্নায়ুকোশপুঞ্জগুলি) দ্বীপের মতো ছড়িয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য স্নায়ুকোশপুঞ্জগুলির মধ্যে **নিউক্লিয়াস গ্রাসিলিস, নিউক্লিয়াস কিউনিয়েটাস, অলিভারী নিউক্লিয়াস, শ্বাসকেন্দ্র, হার্দ নিবারক কেন্দ্র, ভ্যাসোমোটর কেন্দ্র, আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিবর্ত কেন্দ্র** (Visceral reflex centre) প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া এর মধ্যে নবম, দশম ও একাদশ করোটি স্নায়ুর স্নায়ুকেন্দ্র থাকে। এই সব কেন্দ্রগুলি থেকে যথাক্রমে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (IX), ভেগাস (X) এবং হাইপোগ্লোস্যাল (XI) করোটি স্নায়ু উৎপন্ন হয়।

**(c) সুষুম্নাশীর্ষকের (মেডালা অবলংগাটা) কার্যাবলি (Functions of Medulla oblongata) :**

1. স্নায়ুজালকের মধ্যে বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রগুলি শ্বাসক্রিয়া, হৃৎস্পন্দনের হার, হার্দ উৎপাদ, রক্তচাপ ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
2. সুষুম্নাশীর্ষের লালাকেন্দ্র (Salivary centre)-লালাগ্রন্থি থেকে লালাক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
3. সুষুম্নাশীর্ষক নবম, দশম, একাদশ করোটি স্নায়ুর উৎসস্থল।
4. আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিবর্ত কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## 6.4. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল এবং C.S.F. (Ventricles of Brain and C.S.F.)

### A. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল (Ventricle of brain)

মস্তিষ্ক কিংবা সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন নিরেট বা ভরাট নয়। এগুলি ফাঁপা, মস্তিষ্কের ফাঁপা স্থানটিকে **প্রকোষ্ঠ (ভেন্ট্রিকল—Ventricle)** এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা স্থানটিকে **কেন্দ্রীয় নালি** (Central canal) বলে। ওই দুটি ফাঁপা স্থান **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে** (Cerebrospinal fluid সংক্ষেপে CSF) পূর্ণ থাকে।

অগ্র মস্তিষ্ক
প্রথম ও দ্বিতীয় (পার্শ্ব) ভেন্ট্রিকল
ফোরামেন অফ মনরো
মধ্যমস্তিষ্ক
তৃতীয় ভেন্ট্রিকল
অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস
পশ্চাৎ মস্তিষ্ক
চতুর্থ ভেন্ট্রিকল
সুষুম্না কাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি
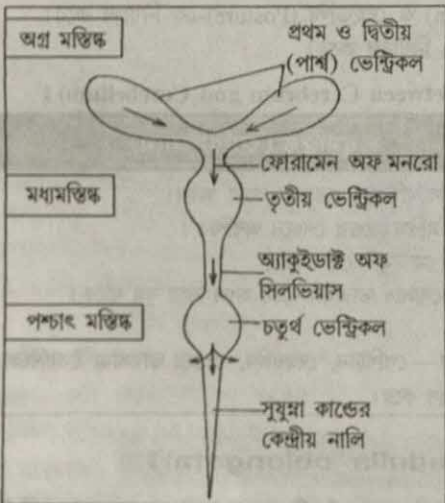
**চিত্র 6.12. :** মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও সুষুম্না কাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালির চিত্ররূপ।

❖ **(a) মস্তিষ্ক গহ্বরের সংজ্ঞা (Definition of Ventricle) :** **মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক মেরুরস (Cerebrospinal fluid) দিয়ে পূর্ণ গহ্বরকে মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকল বলে।**

**(b) গঠন (Structure) :** মস্তিষ্কে প্রধানত চারটি ভেন্ট্রিকল আছে, যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। প্রতিটি ভেন্ট্রিকল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকলকে **পার্শ্বীয় মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠ** (Lateral ventricles) বলা হয়। পাশের দুটি প্রকোষ্ঠ গুরুমস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধে থাকে। এই দুটি প্রকোষ্ঠ **ফোরামেন অফ মনরো** (Foramen of Monro) নামে রন্ধ্র দিয়ে মধ্যমস্তিষ্কের **তৃতীয় মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠের** সঙ্গে যুক্ত থাকে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ **সিলভিয়াসের স্নায়ুনালি (অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস** Aqueduct of Sylvius) বা **ইটার** (Iter) নামে সংকীর্ণ নালি দিয়ে সুষুম্নাশীর্ষকের চতুর্থ মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠ সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালিতে মিলিত হয়।

## B. মস্তিষ্ক মেরুরস (সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড – C.S.F.)

❖ (a) **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের সংজ্ঞা (Definition of Cerebrospinal Fluid) :** মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে (ভেন্ট্রিকল) সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেসে, সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালির ভেতরে যে **বর্ণহীন, স্বচ্ছ, সামান্য ক্ষারীয় পরিবর্তিত কলারস** থাকে তাকে **মস্তিষ্ক মেরুরস বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, সংক্ষেপে C. S. F. বলে।**

(b) **C.S.F.-এর উৎপাদিত স্থান (Site of formation of C. S. F.) :** মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রধানত দুটি পাশের প্রকোষ্ঠে কোরয়েড প্লেক্সাস নামে যে রক্তজালক পিণ্ড থাকে তাদের থেকে মস্তিষ্ক মেরুরস উৎপন্ন (ক্ষরিত) হয়।

(c) **উপাদান (Composition of C.S.F.) :** একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে মস্তিষ্ক মেরুরসের পরিমাণ **150 ml**। এই রসের উপাদান অনেকটা রক্তের প্লাজমার মতো। এটি **জল** (99·13%) এবং **কঠিন পদার্থ** (0·87%) নিয়ে গঠিত। কঠিন পদার্থ—কোশীয় পদার্থ (লিম্ফোসাইট) এবং দুই প্রকার অকোশীয় পদার্থ, যেমন—জৈব পদার্থ (গ্লুকোজ, প্রোটিন, ক্রিয়েটিন, ইউরিয়া ইত্যাদি) এবং অজৈব পদার্থ ($Na^+$, $K^+$, $Mg^{++}$, $Ca^{++}$, $HCO_3^-$, $Cl^-$) নিয়ে গঠিত।

(d) **C.S.F.-এর কাজ (Functions of C. S. F.) :** (1) C. S. F. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে থাকার ফলে নরম গদির মতো কাজ করে, ফলে বাইরের আঘাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। (2) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকোশকে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। (3) স্নায়ুকোশের বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থের রেচনে সাহায্য করে। (4) মস্তিষ্কে যান্ত্রিক চাপের সমতা রক্ষা করে।

## ❂ 6.5. সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) ❂

### ▲ সুষুম্নাকাণ্ডের সংজ্ঞা, অবস্থান, গঠন এবং কার্যাবলি (Definition, Location, Structure and Functions of Spinal Cord)

❖ (a) **সুষুম্নাকাণ্ডের সংজ্ঞা (Definition of Spinal cord) :** মেরুদণ্ডের নালির মধ্যে আলগাভাবে অবস্থিত এবং ফোরামেন ম্যাগনাম থেকে শুরু হয়ে প্রথম কটিদেশীয় কশেরুকার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ স্তম্ভের মতো অংশ গঠন করে তাকে সুষুম্নাকাণ্ড বলে।
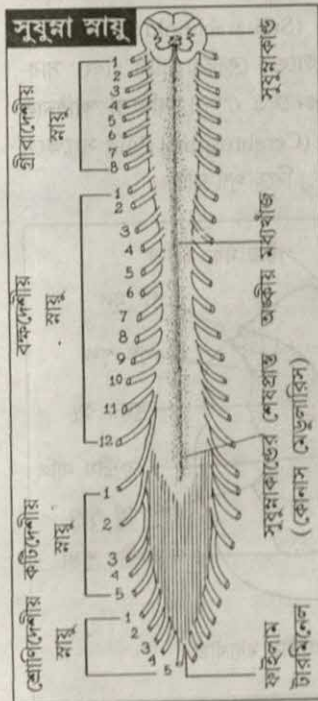
চিত্র 6.14. : মানুষের সুষুম্নাকাণ্ড।

◘ (b) **সুষুম্নাকাণ্ডের অবস্থান (Location of Spinal Cord) :** সুষুম্নাকাণ্ডটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত এবং নিম্নকেন্দ্র (Lower centre) নামে পরিচিত। এটি মস্তিষ্কের মেডালার শেষভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে করোটির ফোরামেন ম্যাগনাম নামে ছিদ্র (Foramen of Monro)-এর মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির নিউরাল ক্যানালের মধ্য দিয়ে প্রথম লাম্বার কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

চিত্র 6.13. : মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্নাকাণ্ডের অবস্থানের চিত্ররূপ।

◘ (c) **সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন (Structure of Spinal cord) :**

1. **সুষুম্নাকাণ্ডের শারীরস্থান** (Anatomy of the Spinal Cord) **:** সুষুম্নাকাণ্ড মেরুদণ্ডের নালির (Vertebral canal) মধ্যে থাকে এবং মেরুদণ্ডের প্রথম লাম্বার খণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য 45 সেমি ও প্রস্থ 1·25 সেমি হয়। এর গড় ওজন প্রায় 30 গ্রাম হয়। নীচের অংশটি ক্রমশ সরু হয়ে যে অংশ গঠন করে তা **কোনাস মেডুলারিস** (Conus medullaries)

নামে পরিচিত হয়। কোনাস মেডুলারিস অগ্রভাগ থেকে দড়ির মতো স্নায়ুকলাবিহীন তন্তু নীচের দিকে ঝুলতে থাকে। একে **ফাইলাম টার্মিনেল** (Filum terminale) বলে। সুষুম্নাকাণ্ডটি দেখতে অনেকটা চোঙের মতো কিন্তু অঙ্কীয় ও পৃষ্ঠতল কিছুটা চাপা। এছাড়া সুষুম্নাকাণ্ডের গ্রীবা ও কটি অঞ্চলের কিছুটা স্ফীত হয়, এদের যথাক্রমে গ্রীবা অঞ্চলীয় স্ফীতি এবং কটি অঞ্চলীয় স্ফীতি বলে। সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় দেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি গভীর খাঁজ আছে যাকে **অঙ্কীয় মধ্যখাঁজ** (Anterior median fissure) বলে। পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি অল্প খাঁজ থাকে তাকে **পৃষ্ঠীয় মধ্যখাঁজ** (Posterior median fissure) বলে। এই খাঁজসংলগ্ন একটি প্রাচীর থাকে তাকে **পৃষ্ঠীয় মধ্যপ্রাচীর** (Posterior median septum) বলে।

2. **সুষুম্না খণ্ড (Spinal segments)** ঃ সুষুম্নাকাণ্ডকে বাইরের দিক থেকে দেখলে কোনো খণ্ডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না বা গঠনগত ভাবে এটি বিভক্ত নয়। কিন্তু ক্রিয়াগতভাবে 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ুর উৎপত্তির ভিত্তিতে একে 31 খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, যেমন—৪টি **গ্রীবাদেশীয়** (Cervical), 12টি **বক্ষদেশীয়** (Thoracic), 5টি **কটিদেশীয়** (Lumber), 5টি **ত্রিকাস্থীয়** (Sacral) ও 1টি **অনুত্রিকাস্থীয়** (Coccygeal) অর্থাৎ **মোট 31টি খণ্ড** নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত 31টি খণ্ড থেকে 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves) নির্গত হয়।
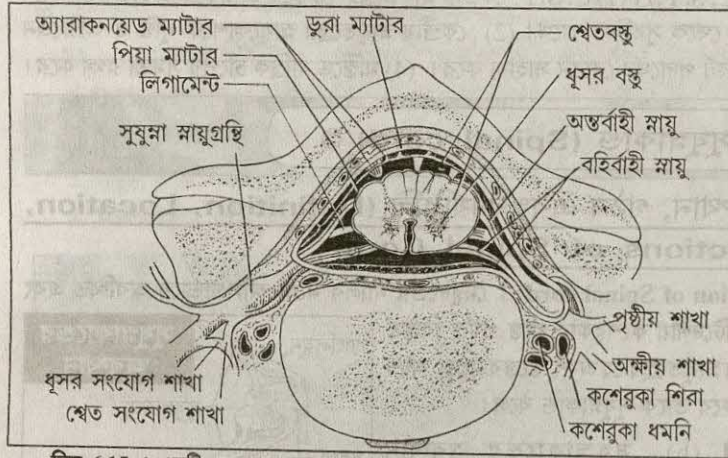
**চিত্র 6.15.** ঃ একটি মেরুদণ্ডসহ সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ দেখা ধূসর বস্তু, শ্বেতবস্তু ও তিনপ্রকার আবরণ (মেনিন্‌জেস)।

3. **সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণ (Covering of the Spinal cord)**—মস্তিষ্কের মতো সুষুম্নাকাণ্ডটিও তিনটি তন্তুময় **আবরক ঝিল্লি বা মেনিনজেস** (Meninges) দিয়ে ঘেরা থাকে। এই আবরক ঝিল্লিগুলি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যথাক্রমে **ডুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার** থাকে। পায়া ও অ্যারাকনয়েডের মধ্যবর্তী স্থানকে সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস (Sub-arachnoid space) বলে। সুষুম্নাকাণ্ডে কেন্দ্রীয় নালি এবং সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস **সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড** (Cerebrospinal fluid সংক্ষেপে C.S.F.) দিয়ে পূর্ণ থাকে।

4. **সুষুম্নাকাণ্ডের আণুবীক্ষণিক বা কলাস্থানিক গঠন (Histological structure of spinal cord)**—সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত অংশ দেখা যায়। সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রে একটি গহ্বর থাকে, তাকে **কেন্দ্রীয় নালি বা সেন্ট্রাল ক্যানাল** (Central canal) বলা হয়। এটি **সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফ্লুইড** (C.S.F.) দিয়ে ভরতি থাকে। সেন্ট্রাল ক্যানাল H-আকৃতি-বিশিষ্ট **ধূসর বস্তু** (Gray matter) দিয়ে ঘেরা থাকে। ধূসর বস্তুর বাইরের দিকে **শ্বেতবস্তু** (White matter) থাকে। ধূসর বস্তুর সম্মুখ বা অঙ্কীয় শীর্ষভাগকে সম্মুখ বা **অঙ্কীয় শৃঙ্গ** (Anterior or ventral horn) পার্শ্বভাগকে **পার্শ্ব শৃঙ্গ** (Lateral horn) এবং পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠভাগকে **পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠ শৃঙ্গ** (Posterior or dorsal horn) বলে।
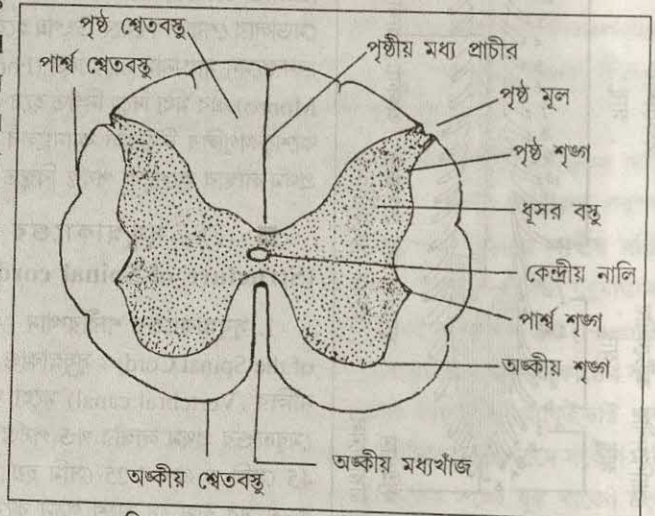
চিত্র 6.16. ঃ সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের চিত্ররূপ।

সপ্তম গ্রীবাদেশীয় সুষুম্না খণ্ডক থেকে শুরু করে তৃতীয় কটিদেশীয় খণ্ডক পর্যন্ত সুষুম্না খণ্ডকসমূহের পশ্চাৎ শৃঙ্গের গোড়ার দিকে কিছু স্নায়ুকোশ সম্মিলিতভাবে **ক্লার্কের স্তম্ভ** (Clarke's column) গঠন করে।

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতিটি খণ্ডকের প্রতি অর্ধাংশে ধূসর বস্তুর বাইরে যে শ্বেতবস্তু দেখা যায় তাকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—পৃষ্ঠীয় মূলের নিকটবর্তী শ্বেতবস্তুকে পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠ শ্বেতস্তম্ভ (Dorsal white column), অঙ্কীয় মূলের নিকটবর্তী শ্বেতবস্তুকে সম্মুখ বা অঙ্কীয় শ্বেতস্তম্ভ (Ventral white column) এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী শ্বেতবস্তুকে পার্শ্ব শ্বেতস্তম্ভ (Lateral white column) বলে। শ্বেতবস্তু প্রধানত মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত কিন্তু ধূসর বস্তু মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তুর প্রান্তভাগ এবং স্নায়ুকোশের কোশদেহ নিয়ে গঠিত।

● **ধূসর বস্তু ও শ্বেতবস্তুর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gray matter and White matter) :**

| ধূসর বস্তু | শ্বেতবস্তু |
|---|---|
| 1. মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর (Gray) রঙের অংশ গঠন করে। | 1. মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের হালকা ও প্রায় সাদা রঙের অংশ গঠন করে। |
| 2. ধূসর বস্তু প্রধানত স্নায়ুকোশের কোশদেহ, নিউরোগ্লিয়া এবং সামান্য পরিমাণ মায়েলিনহীন স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। | 2. শ্বেতবস্তু প্রধানত স্নায়ুতন্তু (মায়েলিনেটেড তন্তু) এবং সামান্য পরিমাণ স্নায়ুকোশের কোশদেহ নিয়ে গঠিত। |
| 3. মস্তিষ্কের উপরের স্তরে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রভাগে এটি থাকে। | 3. মস্তিষ্কের কেন্দ্রে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরের স্তরে এটি থাকে। |

◘ (d) **সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান কার্যাবলি (Major functions of spinal cord) :** মানুষের দেহে নিম্নলিখিত কাজগুলি করে—

1. **প্রতিবর্ত কেন্দ্র হিসাবে কাজ**—বিভিন্ন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে সুষম্নাকাণ্ড কাজ করে।
2. **সংযোগ রক্ষা**—সুষুম্নাকাণ্ডের শ্বেতবস্তু দিয়ে যাতায়াতকারী ঊর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী স্নায়ুতন্তুগুচ্ছগুলির (Nerve tracts) মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড দেহের প্রায় সমস্ত অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ রক্ষা করে।
3. **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র**—সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষদেশীয় এবং প্রথম তিনটি কটিদেশীয় খণ্ডগুলি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ ত্রিকাস্থীয় খণ্ডক প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।
4. **পেশিটান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র**—সুষুম্নাকাণ্ড পেশির পেশিটান ও রক্তবাহের অভ্যন্তরীণ ব্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## ◎ 6.6. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system) ◎

### ▲ প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং শ্রেণিবিন্যাস (Definition and Classification of Peripheral nervous system)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব স্নায়ুতন্তু (সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয়) দেহের বিভিন্ন অংশকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ (প্রান্তস্থ) স্থাপন করে তাকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।**

◘ (b) **শ্রেণিবিন্যাস :** প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুই প্রকার—করোটিক-সুষুম্না এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু।

1. **করোটি-সুষুম্না স্নায়ু (Cranio-Spinal nerves) :** 43 জোড়া স্নায়ু নিয়ে করোটি-সুষুম্না স্নায়ু গঠিত। এর মধ্যে 12 জোড়া করোটি স্নায়ু (Cranial nerves) এবং 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves)। এই স্নায়ুগুলি সংজ্ঞাবহ (Sensory) বা অন্তর্বাহী (Afferent), চেষ্টীয় (Motor) বা বহির্বাহী (Efferent) এবং কোনো কোনো স্নায়ু মিশ্র (Mixed) প্রকৃতির হয়। এই সব স্নায়ুগুলির সাহায্যে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সংবাদ আসে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংবাদ চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে যায়। করোটি ও সুষুম্না স্নায়ুর মধ্যে কোনো গঠনগত পার্থক্য নেই।

## ◎ 6.7. সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves) ◎

### ▲ সুষুম্না স্নায়ুর সংজ্ঞা, সংখ্যা ও অবস্থান, গঠন এবং কার্যাবলি (Definition, Number and Situation and Functions of Spinal nerve) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে সব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃকশেরুকা ছিদ্র (Intervertebral foramen) দিয়ে নির্গত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে শেষ হয় তাকে সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) বলে।

◘ (b) **সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা এবং অবস্থান :** মানবদেহে 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু অবস্থিত। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ক্রিয়াগত ভাবে অথবা সুষুম্না স্নায়ুর উৎপত্তির ভিত্তিতে সুষুম্নাকাণ্ডকে 31 খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ড থেকে এক জোড়া এবং মোট 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে—

8 জোড়া **গ্রীবাদেশীয় বা সারভিক্যাল স্নায়ু** (Cervical nerves),
12 জোড়া **বক্ষদেশীয় বা থোরাসিক স্নায়ু** (Thoracic nerves),
5 জোড়া **কটিদেশীয় বা লাম্বার স্নায়ু** (Lumber nerves),
5 জোড়া **ত্রিকাস্থীয় বা স্যাক্রাল স্নায়ু** (Sacral nerves) এবং
1 জোড়া **অণুত্রিকস্থিয় বা কক্সিজিয়াল স্নায়ু** (Coccygeal nerves)।
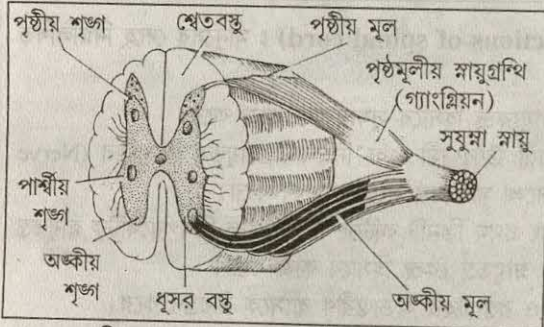
◘ (c) **সুষুম্না স্নায়ুর গঠন :** প্রতিটি সুষুম্না স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠীয় (Dorsal) এবং অঙ্কীয় (Ventral)—এই দুটি মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পৃষ্ঠীয় মূল (Dorsal root) থেকে **সংজ্ঞাবহ** (Sensory) বা **অন্তর্বাহী** (Afferent) নিউরোন এবং অঙ্কীয় মূল (Ventral root) থেকে **চেষ্টীয়** (Motor) বা **বহির্বাহী** (Efferent) নিউরোন উৎপন্ন হয়েছে। এই দুটি মূল থেকে নির্গত অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী (সংজ্ঞাবহ এবং চেষ্টীয়) স্নায়ুতন্তু একত্রিত হয়ে সুষুম্না স্নায়ু গঠন করে। গঠিত হওয়ার পর দুটি কশেরুকার (Vertebrae) মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি সুষুম্না স্নায়ু **মিশ্র স্নায়ু** (Mixed nerves)। পৃষ্ঠীয় মূলে সংজ্ঞাবহ স্নায়ুকোশের কোশদেহ সম্মিলিতভাবে যে স্নায়ুগ্রন্থি গঠন করে তাদের **পৃষ্ঠমূলীয় স্নায়ুগ্রন্থি** বা **গ্যাংগ্লিয়া** (Posterior root ganglia) বলে। সুষুম্না স্নায়ুগুলি ত্বক, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে প্রবেশ করে।

চিত্র 6.17. : সুষুম্না স্নায়ুর গঠনের চিত্ররূপ।

◘ (d) **সুষুম্না স্নায়ুর কার্যাবলি (Functions of Spinal nerve) :**

1. সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতন্তুগুলি দেহের বিভিন্ন স্থানের গ্রাহক থেকে স্নায়ু আবেগকে (Nerve impulse) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে এসে অনুভূতি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাহায্য করে।
2. চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তুগুলি স্নায়ু আবেগকে স্নায়ুতন্ত্র থেকে পরিবাহিত করে বিভিন্ন পেশি ও গ্রন্থিতে সরবরাহ করে ও তাদের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে।
3. সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজগুলির কিছুটা সুষুম্না স্নায়ুর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

## ◎ 6.8. করোটি স্নায়ু (Cranial nerves) ◎

### ▲ করোটি স্নায়ুর সংজ্ঞা, সংখ্যা, প্রকারভেদ (Definition, Number and Type of Cranial nerves) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যেসব সংজ্ঞাবহ বা চেষ্টীয় স্নায়ুসমূহ করোটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে এবং

**দেহের কয়েকটি অংশ প্রধানত মুখমণ্ডলের অংশ ও দেহের কিছু কিছু আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের সঙ্গে মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক দণ্ডকে যুক্ত করে তাদের করোটি স্নায়ু (ক্রেনিয়াল নার্ভ—Cranial nerve) বলে।**

◘ (b) **স্নায়ুর সংখ্যা ঃ** করোটি স্নায়ু **সংখ্যায় 12 জোড়া**— I–অলফ্যাক্টরি (Olfactory), II–অপটিক (Optic), III–অকিউলোমোটর (Occulomotor), IV–ট্রোক্লিয়ার (Trochlear), V–ট্রাইজেমিন্যাল (Trigeminal), VI–অ্যাবডুসেন্স (Abducens), VII–ফেসিয়াল (Facial), VIII–অডিটরি বা অ্যাকুষ্টিক (Auditory or Acoustic), IX-গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glossopharyngeal), X–ভেগাস্ (Vagus), XI–স্পাইনাল এক্সেসরি (Spinal accessory) এবং XII–হাইপোগ্লসাল (Hypoglossal) স্নায়ু। এই স্নায়ুগুলির মধ্যে কতকগুলি শুধু সংজ্ঞাবহ স্নায়ু, কতকগুলি চেষ্টীয় স্নায়ু আবার কিছু মিশ্র স্নায়ু।

◘ (c) **করোটি স্নায়ুর প্রকারভেদ (Type of Cranial nerves) ঃ**

**● সংজ্ঞাবহ, চেষ্টীয় এবং মিশ্র স্নায়ু (Sensory, Motor and Mixed Nerves) ●**

1. **সংজ্ঞাবহ (Sensory) স্নায়ু**—যে স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ু আবেগ (Impulse) দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যায় তাকে অন্তর্বাহী বা সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলে।
2. **চেষ্টীয় (Motor) স্নায়ু**—যে স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ু আবেগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যায় তাকে বহিঃর্বাহী বা চেষ্টীয় স্নায়ু বলে।
3. **মিশ্র (Mixed) স্নায়ু**—যে স্নায়ুর মধ্যে সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় উভয় স্নায়ু তন্তু থাকে তাকে মিশ্র স্নায়ু বলে।

### ➤ করোটি স্নায়ুর উৎপত্তি, বিস্তার ও কাজ (Origin, Distribution and Functions of Cranial nerves) ঃ

**I. অলফ্যাক্টরি স্নায়ু** (সংজ্ঞাবহ) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—নাকের শ্লেষ্মাঝিল্লি থেকে উৎপন্ন হয়ে অলফ্যাক্টরি বাল্ব নাসামস্তিষ্কে যায়। ● **কাজ**—ঘ্রাণের অনুভূতি বহন করে।

**II. অপটিক স্নায়ু** (সংজ্ঞাবহ) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—চোখের রেটিনা (Retina) থেকে উৎপন্ন হয়ে গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিটাল খণ্ডে শেষ হয়। ● **কাজ**—রেটিনা থেকে দর্শনানুভূতি বহন করে।

**III. অকিউলোমোটর স্নায়ু** (চেষ্টীয়) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—মধ্যমস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে চক্ষুগোলকের রেকটাস পেশি, সিলিয়ারি পেশি ইত্যাদিতে সরবরাহ করে। ● **কাজ**—সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ও চেষ্টীয় স্নায়ু চক্ষুগোলকের সঞ্চালন, তারারন্ধ্রের সংকোচন ঘটায়।

**IV. ট্রোক্লিয়ার স্নায়ু** (চেষ্টীয়) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—মধ্যমস্তিষ্ক চতুর্থ করোটি নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়ে চক্ষু-গোলকের সুপিরিয়র ও অবলিক রেক্টাস পেশিসমূহকে সরবরাহ করে। ● **কাজ**—চক্ষুগোলকের সঞ্চালনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**V. ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু** (মিশ্র) ঃ **সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ঃ উৎপত্তি ও বিস্তার**—(i) চোখের রেটিনা, সিলিয়ারি বডি, অশ্রুগ্রন্থি, নাসাবিবরের একাংশের শ্লেষ্মাঝিল্লি, মুখমণ্ডল, কপাল, মাড়ি, দাঁত, চর্বণ পেশি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়ে মধ্যমস্তিষ্কে যায়।

● **কাজ**—এই সব অংশ থেকে সংবেদন মস্তিষ্কে যায়। (ii) **চেষ্টীয় স্নায়ু**—মধ্যমস্তিষ্ক শেষ হয় এবং পন্‌সের উপরের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে কানের পিনা, মুখের নীচের মাড়িতে শেষ হয়। ● **কাজ**—মুখমণ্ডলের সংবেদনশীলতা, চর্বণ, পেশির সঞ্চালন ইত্যাদি।
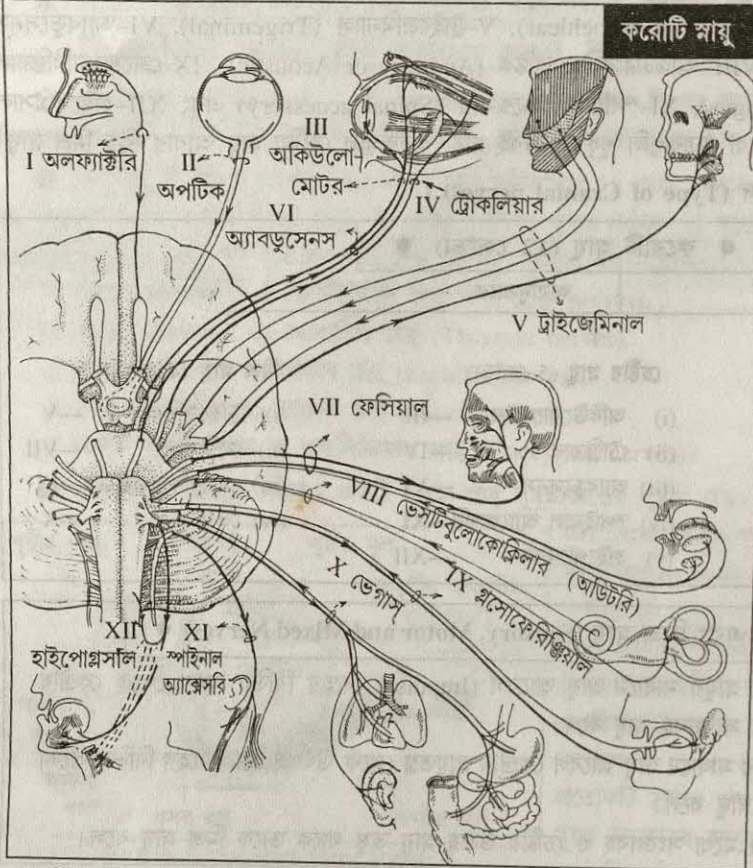
চিত্র 6.18. ঃ মানবদেহে এক দিকের 12টি করোটি স্নায়ুর উৎপত্তিস্থল এবং বিস্তৃতি।

**VI. অ্যাবডুসেন্‌স স্নায়ু** (চেষ্টীয়) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—M পন্‌সের পৃষ্ঠাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখের রেক্টাস পেশিতে যায়। ● **কাজ**—চক্ষুগোলকের সঞ্চালন।

**VII. ফেসিয়াল স্নায়ু** (মিশ্র) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**—(i) **সংজ্ঞাবাহ স্নায়ু** ঃ জিভের দুই-তৃতীয়াংশ ও তালু থেকে উৎপন্ন হয়ে সুষুম্নাশীর্ষকের উর্ধ্বাংশে শেষ হয়। ● **কাজ**—স্বাদ অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে। (ii) **চেষ্টীয় স্নায়ু**—সুষুম্নাশীর্ষকের ওই অংশ থেকে নির্গত হয়ে মুখমণ্ডলের পেশি, অশ্রুগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি ইত্যাদিতে সরবরাহ করে। ● **কাজ**—স্বাদগ্রহণ, মুখের অভিব্যক্তি (Facial expression), অশ্রুক্ষরণ, লালারস ক্ষরণ ইত্যাদি কাজ করে।

**VIII. অডিটরি স্নায়ু** (সংজ্ঞাবহ) ঃ সংখ্যায় দুটি— **ভেস্টিবুলার** এবং **কক্‌লিয়ার**। **উৎপত্তি ও বিস্তার**—প্রথমটি ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাসে অবস্থিত ভেস্টিবুলার গ্যাংগ্লিয়া এবং কক্‌লিয়ার স্নায়ু কক্‌লিয়াস্থিত স্পাইরাল গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে সুষুম্নাশীর্ষকের পাশে যায়। ● **কাজ**—ভেস্টিবুলার স্নায়ু দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং কক্‌লিয়ার স্নায়ু শ্রবণে সাহায্য করে।

**IX. গ্লোসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু (মিশ্র)** ঃ (i) **সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ঃ উৎপত্তি ও বিস্তার**—জিভ, টনসিল, গলবিল, ক্যারোটিড সাইনাস্ ও ক্যারোটিড বডি থেকে উৎপন্ন হয়ে সুষুম্নাশীর্ষকে শেষ হয়। **কাজ**—স্বাদগ্রহণ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) **চেষ্টীয় স্নায়ু ঃ বিন্যাস**—সুষুম্নাশীর্ষক থেকে উৎপন্ন হয়ে গলবিলের পেশি, প্যারোটিড গ্রন্থিতে শেষ হয়। ● **কাজ**—তালু ও গলবিলের পেশির সঞ্চালন এবং প্যারোটিড গ্রন্থি থেকে লালারসের ক্ষরণ ইত্যাদির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**X. ভেগাস্ স্নায়ু** (মিশ্র) ঃ **উৎপত্তি ও বিস্তার**— (i) **সংজ্ঞাবহ স্নায়ু** ঃ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ট্রেকিয়া, গলবিল, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, পিত্তাশয় ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়ে সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত ডরসাল্ নিউক্লিয়াসে শেষ হয়। ● **কাজ**—(i) সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র থেকে সংবেদন (Sensation) বহন করে। (ii) **চেষ্টীয় স্নায়ু** ঃ ডরসাল নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পৌষ্টিকনালি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ইত্যাদিতে সরবরাহ করে। ● **কাজ**—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলীর ক্রমসংকোচন, গ্রন্থির রসক্ষরণ ইত্যাদি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি স্নায়ু (চেষ্টীয়) ঃ উৎপত্তি ও বিস্তার**—সংখ্যায় দুটি, যথা—**ক্র্যানিয়াল** (Cranial) ও **স্পাইনাল**

(Spinal)। এদের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে সুষুম্নাশীর্ষক ও সুষুম্নাকাণ্ডের গ্রীবা অংশ। ● কাজ—গ্রীবা, গলবিল, স্বরযন্ত্রের পেশির সঞ্চালন।

**XII. হাইপোগ্লসাল স্নায়ু (চেষ্টীয়) ঃ উৎপত্তি ও বিস্তার**—সুষুম্নাশীর্ষক থেকে উৎপন্ন হয়। ● **কাজ**—এই স্নায়ু জিভ ও স্বরযন্ত্রের পেশির সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে।

**● করোটি স্নায়ুর নাম, প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিস্তৃতি (স্নায়ুসংযোগ) এবং কার্যাবলি ●**

| স্নায়ুর নাম (প্রকৃতি) | উৎপত্তি | বিস্তৃতি এবং স্নায়ুসংযোগ | কাজ |
|---|---|---|---|
| I. **অলফ্যাক্টরি** (Olfactory) (সংজ্ঞাবহ) | নাসিকাস বা নাকের শ্লেষ্মাঝিল্লি থেকে উৎপন্ন হয়। | অলফ্যাক্টরি বাল্ব এবং নাসা-মস্তিষ্কতে শেষ হয়। | ঘ্রাণানুভূতি বহন করে। |
| II. **অপটিক** (Optic) (সংজ্ঞাবহ) | চক্ষুর রেটিনা থেকে উৎপন্ন হয়। | ল্যাটেরাল জেনিকুলেট বডি এবং গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিট্যাল লোবে শেষ হয়। | দর্শনানুভূতি বহন করে। |
| III. **অকিউলোমোটর** (Occulomotor) (চেষ্টীয়) | মধ্যমস্তিষ্কের III-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | চক্ষুগোলকের রেক্টাস পেশি, সিলিয়ারি পেশি, ঊর্ধ্ব-চক্ষুপল্লব উত্তোলনকারী পেশি এবং তারারন্ধ্রের সংকোচক পেশিতে শেষ হয়। | চক্ষুগোলকের বিচলন, লেন্সের পরিবর্তন ও তারারন্ধ্রের সংকোচন ঘটায়। |
| IV. **ট্রোক্লিয়ার** (Trochlear) (চেষ্টীয়) | মধ্যমস্তিষ্কের IV-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | চক্ষুগোলকের ঊর্ধ্ব তীর্যক পেশিতে শেষ হয়। | চক্ষুগোলকের বিচলন ঘটায়। |
| V. **ট্রাইজেমিনাল** (Trigeminal) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ**—রেটিনা, সিলিয়ারি বডি, কনীনিকা, অশ্রুগ্রন্থি, কপাল, নাক, মাড়ি, দাঁত, চর্বণ পেশি, জিভের শ্লেষ্মা ঝিল্লির সম্মুখাংশ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) পন্‌সে শেষ হয়। | (a) মুখমণ্ডলের ও মস্তকের ত্বক ও মুখের শ্লেষ্মাঝিল্লি থেকে যন্ত্রণা স্পর্শ এবং চাপের অনুভূতি বহন করে। |
| | (b) **চেষ্টীয়**—পন্‌স-এর পঞ্চম করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (b) বহিঃকর্ণের কর্ণছিদ্র, মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ দাঁত ও মাড়ি, নীচের চোয়ালে শেষ হয়। | (b) চোয়াল পেশির বিচলন ঘটায়। |
| VI. **অ্যাবডুসেন্‌স** (Abducens) (চেষ্টীয়) | পন্‌সস্থিত VI-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | চক্ষুগোলকের পার্শ্ব রেক্টাস পেশিতে শেষ হয়। | চক্ষুগোলকের পার্শ্ব বিচলন ঘটায়। |
| VII. **ফেসিয়াল** (Facial) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ**—জিভের সম্মুখ ভাগের দুই-তৃতীয়াংশ, বহিঃ ও মধ্য কর্ণ এবং কানের পেছনের পেশি থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) প্রধানত সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্বীয় অঞ্চলের মাধ্যমে থ্যালামাস ও গুরুমস্তিষ্কে শেষ হয়। | (a) আস্বাদনের অনুভূতি এবং মুখমণ্ডলের পেশি থেকে অনুভূতি বহন করে। |
| | (b) **চেষ্টীয়**— পনস্‌-এ অবস্থিত VII-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (b) সাবম্যাক্সিলারি ও সাব-লিঙ্গুয়াল লালা গ্রন্থি, অশ্রু গ্রন্থি, মুখমণ্ডলের পেশিতে শেষ হয়। | (b) লালা ও অশ্রুর ক্ষরণ এবং মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশে অংশগ্রহণ করে। |

| স্নায়ুর নাম (প্রকৃতি) | উৎপত্তি | বিস্তৃতি এবং স্নায়ুসংযোগ | কাজ |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII. অডিটরি (Auditory) বা ভেস্টিবুলো কক্‌লিয়ার নার্ভ (Vestibulo cochlear nerve) (সংজ্ঞাবহ) | দুইপ্রকার ঃ<br>(i) **ভেস্টিবুলার নার্ভ**—(Vestibular nerve) —এটি অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(ii) **কক্লিয়ার নার্ভ** (Cochlear nerve)—এটি অন্তঃকর্ণের কক্লিয়াস্থিত স্পাইরাল গ্যাংগ্লিয়া বা স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। | (i) ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস এবং লঘুমস্তিষ্কে শেষ হয়।<br>(ii) ইনফিরওর কলিকুলাস, মেডিয়াল জেনিকুলেট বডি, কক্লিয়ার নিউক্লিয়াস, গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে শেষ হয়। | (i) দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।<br>(ii) শ্রবণ অনুভূতি বহন করে। |
| IX. গ্লোসোফেরিন্‌জিয়াল (Glossopharyn-geal) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ**—জিভের পেছন অংশের এক-তৃতীয়াংশ, গলবিলের শ্লেষ্মা ঝিল্লি, ক্যারোটিড বডি ও ক্যারোটিড সাইনাস থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(b) **চেষ্টীয়**—প্রধানত সুষুম্না-শীর্ষকের IX-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্বদেশস্থিত নিউক্লিয়াসে শেষ হয়।<br>(b) গলবিলের পেশি, প্যারোটিড (লালা) গ্রন্থিতে শেষ হয়। | (a) আস্বাদনের ও পেশিটানের অনুভূতি বহন করে।<br>(b) গলাধঃকরণ এবং লালার ক্ষরণ ঘটায়। |
| X. ভেগাস (Vagus) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ** — গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, ফুসফুস, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিত্তাশয়, অ্যাওটিক বডি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(b) **চেষ্টীয়** — সুষুম্নাশীর্ষকের ডরসাল (X-করোটি) নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) প্রধানত সুষুম্নাশীর্ষকের ডরসাল নিউক্লিয়াসে (X-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াসে) শেষ হয়।<br>(b) স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, আরোহী কোলন ইত্যাদির পেশি, হৃৎপিণ্ড, প্লিহা, বৃক্ক এবং পাকস্থলীর ও অগ্ন্যাশয়ী গ্রন্থি, যকৃৎ ইত্যাদিতে শেষ হয়। | (a) দেহের ওই সব আন্তরযন্ত্র থেকে এবং ত্বকে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি বহন করে।<br>(b) গলাধঃকরণ, শব্দসৃষ্টি, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। |
| XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (Spinal accesory) (চেষ্টীয়) | এই স্নায়ুটি দুটি স্থান থেকে উৎপন্ন হয় ঃ<br>(i) এই স্নায়ুর করোটিগত অংশ সুষুম্না শীর্ষক থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(ii) সুষুম্নাগত অংশটি সুষুম্না-কাণ্ডের সারভিক্যাল (গ্রীবা) অঞ্চলের প্রথম পাঁচটি খণ্ডক থেকে উৎপন্ন হয়। | গ্রীবা এবং স্কন্ধের পেশি সমূহতে শেষ হয়। | মস্তক ও কাঁধের বিচলন ঘটায়। |
| XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal) (চেষ্টীয়) | সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত XII-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | জিভের পেশিতে শেষ হয়। | জিভের বিচলন ঘটায়। |

## ◎ 6.9. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত চাপ ◎ (Reflex action and Reflec arc)

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাহক বহির্জগতের উদ্দীপনা যেমন স্পর্শ, আলো, চাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি কিংবা দেহাভ্যন্তরের অবস্থার যেমন—পেশি টান, রক্তচাপ, আন্তরযন্ত্রীয় কার্য ইত্যাদির পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা **অন্তর্বাহ** বা **সংজ্ঞাবহ** স্নায়ুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (সুষুম্নাকাণ্ড বা মস্তিষ্ক কাণ্ডে) যায়। পরে এই উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে **বহির্বাহ** বা **চেষ্টীয় স্নায়ুর** মাধ্যমে কারক বা ক্রিয়াস্থানে প্রবেশ করে এবং দেহে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যেমন—পেশির চলন, গ্রন্থির ক্ষরণ ইত্যাদি। বিজ্ঞানী **শেরিংটন** (Sherrington) সর্বপ্রথম এই প্রকার ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) নামে অভিহিত করেন।

### ▲ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) ▲

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাহক বহির্জগতের উদ্দীপনা কিংবা দেহাভ্যন্তরের অবস্থার পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড বা মস্তিষ্ককাণ্ডে যায়। পরে এই উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে যায় এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

### ▲ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা, উদাহরণ, প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্য (Definition, Examples, Types and Characteristic features of Reflex action) :

❖ (a) **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Reflex action) : দেহের কোনো অংশের গ্রাহককে উদ্দীপিত করলে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনৈচ্ছিক চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।**

◻ (b) **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ (Some examples of reflex action) :**

1. দেহের কোনো অংশ অজ্ঞাতে হঠাৎ কোনো গরম বা উত্তপ্ত বস্তুতে ছোয়া লাগলে দেহের সেই অংশটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তপ্ত বস্তুটি থেকে দূরে সরে যায়।

2. চোখে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো পড়লে চোখের পাতা অনৈচ্ছিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে চোখে বেশি আলো যেতে পারে না।

3. অন্যমনস্ক থাকা অবস্থায় দেহের কোনো অংশে মশা কামড়ালে আমরা সেইস্থানে অজ্ঞাতেই হাত দিয়ে আঘাত করি, উদ্দেশ্য মশা তাড়ানো।

চিত্র 6.19. : মনোসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপের চিত্ররূপ।

4. জানুক্ষেপ বা হাঁটুর ঝাকুনির প্রতিবর্ত—হাঁটুর সন্ধিস্থলের টেন্ডনের উপর মৃদু আঘাতে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাঁটুর ঝাঁকুনি ঘটে।

◻ (c) **প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Types of reflex action) :** বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী প্যাভ্লোভ (Pavlov) দুই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উল্লেখ করেছিলেন। সহজাত বা অভ্যাস নিরপেক্ষ বা অনপেক্ষ প্রতিবর্ত এবং অভ্যাস-নির্ভর বা অভ্যাস-সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

● **I. সহজাত বা অভ্যাস নিরপেক্ষ বা অনপেক্ষ প্রতিবর্ত (Inborn or Unconditioned reflex) :**

❖ **সংজ্ঞা—যে প্রতিবর্ত সহজাত অর্থাৎ জন্মের সময় থেকে থাকে এবং অভ্যাস বা অনভ্যাসের ফলে পরিবর্তিত হয় না তাকে সহজাত প্রতিবর্ত বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে।**

| স্নায়ুর নাম (প্রকৃতি) | উৎপত্তি | বিস্তৃতি এবং স্নায়ুসংযোগ | কাজ |
|---|---|---|---|
| VIII. অডিটরি (Auditory) বা ভেস্টিবুলো কক্‌লিয়ার নার্ভ (Vestibulo cochlear nerve) (সংজ্ঞাবহ) | দুইপ্রকার ঃ<br>(i) **ভেস্টিবুলার নার্ভ**—(Vestibular nerve) —এটি অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(ii) **কক্লিয়ার নার্ভ** (Cochlear nerve)—এটি অন্তঃকর্ণের কক্লিয়াস্থিত স্পাইরাল গ্যাংগ্লিয়া বা স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। | (i) ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস এবং লঘুমস্তিষ্কে শেষ হয়।<br>(ii) ইনফিরওর কলিকুলাস, মেডিয়াল জেনিকুলেট বডি, কক্লিয়ার নিউক্লিয়াস, গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে শেষ হয়। | (i) দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।<br>(ii) শ্রবণ অনুভূতি বহন করে। |
| IX. গ্লোসোফেরিন্‌জিয়াল (Glossopharyn-geal) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ**—জিভের পেছন অংশের এক-তৃতীয়াংশ, গলবিলের শ্লেষ্মা ঝিল্লি, ক্যারোটিড বডি ও ক্যারোটিড সাইনাস থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(b) **চেষ্টীয়**—প্রধানত সুষুম্না-শীর্ষকের IX-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্বদেশস্থিত নিউক্লিয়াসে শেষ হয়।<br>(b) গলবিলের পেশি, প্যারোটিড (লালা) গ্রন্থিতে শেষ হয়। | (a) আস্বাদনের ও পেশিটানের অনুভূতি বহন করে।<br>(b) গলাধঃকরণ এবং লালার ক্ষরণ ঘটায়। |
| X. ভেগাস (Vagus) (মিশ্র) | (a) **সংজ্ঞাবহ**—গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, ফুসফুস, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিত্তাশয়, অ্যাওর্টিক বডি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(b) **চেষ্টীয়** — সুষুম্নাশীর্ষকের ডরসাল (X-করোটি) নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | (a) প্রধানত সুষুম্নাশীর্ষকের ডরসাল নিউক্লিয়াসে (X-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াসে) শেষ হয়।<br>(b) স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, আরোহী কোলন ইত্যাদির পেশি, হৃৎপিণ্ড, প্লিহা, বৃক্ক এবং পাকস্থলীর ও অগ্ন্যাশয়ী গ্রন্থি, যকৃৎ ইত্যাদিতে শেষ হয়। | (a) দেহের ওই সব আন্তরযন্ত্র থেকে এবং ত্বকে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি বহন করে।<br>(b) গলাধঃকরণ, শব্দসৃষ্টি, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। |
| XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (Spinal accesory) (চেষ্টীয়) | এই স্নায়ুটি দুটি স্থান থেকে উৎপন্ন হয় ঃ<br>(i) এই স্নায়ুর করোটিগত অংশ সুষুম্না শীর্ষক থেকে উৎপন্ন হয়।<br>(ii) সুষুম্নাগত অংশটি সুষুম্না-কাণ্ডের সারভিক্যাল (গ্রীবা) অঞ্চলের প্রথম পাঁচটি খণ্ডক থেকে উৎপন্ন হয়। | গ্রীবা এবং স্কন্ধের পেশি সমূহতে শেষ হয়। | মস্তক ও কাঁধের বিচলন ঘটায়। |
| XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal) (চেষ্টীয়) | সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত XII-করোটি স্নায়ুর নিউক্লিয়াস থেকে উৎপন্ন হয়। | জিভের পেশিতে শেষ হয়। | জিভের বিচলন ঘটায়। |

## ❂ 6.9. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত চাপ ❂ (Reflex action and Reflec arc)

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাহক বহির্জগতের উদ্দীপনা যেমন স্পর্শ, আলো, চাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি কিংবা দেহাভ্যন্তরের অবস্থার যেমন—পেশি টান, রক্তচাপ, আন্তরযন্ত্রীয় কার্য ইত্যাদির পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা **অন্তর্বাহ** বা **সংজ্ঞাবহ** স্নায়ুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (সুষুম্নাকাণ্ড বা মস্তিষ্ক কাণ্ডে) যায়। পরে এই উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে **বহির্বাহ** বা **চেষ্টীয় স্নায়ুর** মাধ্যমে কারক বা ক্রিয়াস্থানে প্রবেশ করে এবং দেহে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যেমন—পেশির চলন, গ্রন্থির ক্ষরণ ইত্যাদি। বিজ্ঞানী **শেরিংটন** (Sherrington) সর্বপ্রথম এই প্রকার ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) নামে অভিহিত করেন।

### ▲ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) ▲

দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাহক বহির্জগতের উদ্দীপনা কিংবা দেহাভ্যন্তরের অবস্থার পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড বা মস্তিষ্ককাণ্ডে যায়। পরে এই উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে যায় এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

### ▲ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা, উদাহরণ, প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্য (Definition, Examples, Types and Characteristic features of Reflex action):

❖ (a) **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Reflex action) :** **দেহের কোনো অংশের গ্রাহককে উদ্দীপিত করলে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনৈচ্ছিক চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।**

◘ (b) **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ (Some examples of reflex action) :**

1. দেহের কোনো অংশ অজ্ঞাতে হঠাৎ কোনো গরম বা উত্তপ্ত বস্তুতে ছোয়া লাগলে দেহের সেই অংশটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তপ্ত বস্তুটি থেকে দূরে সরে যায়।

2. চোখে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো পড়লে চোখের পাতা অনৈচ্ছিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে চোখে বেশি আলো যেতে পারে না।

3. অন্যমনস্ক থাকা অবস্থায় দেহের কোনো অংশে মশা কামড়ালে আমরা সেইস্থানে অজ্ঞাতেই হাত দিয়ে আঘাত করি, উদ্দেশ্য মশা তাড়ানো।

চিত্র 6.19. : মনোসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপের চিত্ররূপ।

4. জানুক্ষেপ বা হাঁটুর ঝাকুনির প্রতিবর্ত—হাঁটুর সন্ধিস্থলের টেন্ডনের উপর মৃদু আঘাতে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাঁটুর ঝাঁকুনি ঘটে।

◘ (c) **প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Types of reflex action) :** বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী **প্যাভ্লোভ** (Pavlov) দুই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উল্লেখ করেছিলেন। সহজাত বা অভ্যাস নিরপেক্ষ বা অনপেক্ষ প্রতিবর্ত এবং অভ্যাস-নির্ভর বা অভ্যাস-সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

● **I. সহজাত বা অভ্যাস নিরপেক্ষ বা অনপেক্ষ প্রতিবর্ত (Inborn or Unconditioned reflex) :**

❖ **সংজ্ঞা—যে প্রতিবর্ত সহজাত অর্থাৎ জন্মের সময় থেকে থাকে এবং অভ্যাস বা অনভ্যাসের ফলে পরিবর্তিত হয় না তাকে সহজাত প্রতিবর্ত বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে।**

দেহের বিভিন্ন স্থানে গ্রাহকের অবস্থানের উপর নির্ভর করে সহজাত প্রতিবর্ত তিন প্রকারের হয়, যেমন—

1. **উপরিগত প্রতিবর্ত** (Superficial reflex)—এই প্রকার প্রতিবর্তের গ্রাহকগুলি দেহের উপরিভাগে অর্থাৎ দেহত্বক বা মিউকাস ঝিল্লিতে থাকে। **উদাহরণ**—হঠাৎ উজ্জ্বল আলোক চোখে পড়লে তারারন্ধ্রের সংকোচন ঘটে। একে তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত (Pupillary reflex) বলে।

চিত্র 6.20. : প্যাভলভের অভ্যাস নির্ভর প্রতিবর্তের পরীক্ষা

2. **গভীর প্রতিবর্ত** (Deep reflex)—এই প্রকার প্রতিবর্তের গ্রাহকগুলি দেহের ভেতরে থাকে। **উদাহরণ**—উরুর উপর উরু রেখে সামনের ঝুলন্ত পায়ের মালাইচাকি সংলগ্ন টেন্ডনকে মৃদু আঘাত করলে কোয়াড্রিসেপ্‌স্ ফিমোরিস (Quadriceps femoris) নামে পেশির সংকোচন হয়, ফলে পায়ের উৎক্ষেপণ ঘটে। একে **হাঁটু ঝাকুনি প্রতিবর্ত** (Knee-jerk reflex) বলে।

3. **আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল প্রতিবর্ত** (Visceral reflex)—এই প্রতিবর্তের গ্রাহকগুলি আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের মধ্যে থাকে। এই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের যাবতীয় কার্যাবলি এই জাতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রতিবর্তগুলি হল **(উদাহরণ)**—শ্বসন কার্য সম্বন্ধীয় প্রতিবর্ত, পরিপাক সম্বন্ধীয় প্রতিবর্ত, সংবহনতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রতিবর্ত ইত্যাদি।

### ● II. অভ্যাসনির্ভর বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned or Acquired reflex) :

❖ **সংজ্ঞা—যে প্রতিবর্ত সহজাত নয় অর্থাৎ জন্মের সময় থেকে থাকে না, ক্রমাগত অভ্যাসে উৎপন্ন হয় এবং অনেকদিন অনভ্যাসের ফলে পরিবর্তিত হয় তাকে অভ্যাস নির্ভর প্রতিবর্ত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে।**

○ **উদাহরণ**—বিজ্ঞানী প্যাভলোভ একটি কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে ওই জাতীয় প্রতিবর্তের সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা জানি শুধু খাবার খেলে বা চিবোলে লালাগ্রন্থি থেকে লালারসের (Saliva) ক্ষরণ ঘটে। এটি একটি সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া। কিন্তু প্যাভলোভ দেখেছিলেন যে একটা কুকুরকে কিছুদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যবস্তু দেওয়ার ঠিক আগে যদি একটা ঘণ্টা বাজানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছুদিন এই প্রকার পরীক্ষার পর খাবার না দিয়েও কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালে কুকুরের লালাগ্রন্থি থেকে লালার ক্ষরণ ঘটে। এখানে শব্দ থেকে সৃষ্ট প্রতিবর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। এই পরীক্ষা থেকে প্যাভলভ দুটি সিদ্ধান্তে আসেন—(i) খাদ্যগ্রহণে লালারসের ক্ষরণ হল **সহজাত প্রতিবর্ত** এবং (ii) ঘণ্টাধ্বনিজনিত লালারসের ক্ষরণ হল **অভ্যাসনির্ভর প্রতিবর্ত**।

### ● সহজাত প্রতিবর্ত এবং স্বোপার্জিত (অভ্যাসনির্ভর) প্রতিবর্তের পার্থক্য (Difference between Unconditioned and Conditioned reflex) :

| সহজাত প্রতিবর্ত | স্বোপার্জিত প্রতিবর্ত |
|---|---|
| 1. এই প্রতিবর্ত জন্মগত, অর্থাৎ জন্মের সময় থেকে থাকে। | 1. এই প্রতিবর্ত জন্মের পর অভ্যাসের ফলে তৈরি হয়। |
| 2. প্রতিবর্তের স্নায়ুপথ স্থায়ী, কখনোই পরিবর্তন করা যায় না। | 2. স্নায়ুপথ অস্থায়ী, অভ্যাসের ফলে পরিবর্তন করা যায়। |
| 3. এই প্রতিবর্তের জন্য কোনো পূর্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। | 3. এই প্রতিবর্ত পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। |
| 4. বংশপরম্পরায় এই প্রতিবর্ত সন্তানের মধ্যে যায়। | 4. বংশপরম্পরায় এই প্রতিবর্ত নির্ভরশীল নয়। |
| 5. উদাহরণ—খাদ্যগ্রহণে লালারসের ক্ষরণ। | 5. উদাহরণ— হাঁটা, কথা বলা, কোনো জিনিস শেখা প্রভৃতি। |

# ▲ প্রতিবর্ত চাপ (Reflex arc) ▲

## ▲ প্রতিবর্ত চাপের সংজ্ঞা, গঠন এবং প্রকারভেদ (Definition, Structure and Types of Reflex arc):

❖ (a) **প্রতিবর্ত চাপের সংজ্ঞা : যে নির্দিষ্ট স্নায়ুপথের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে প্রতিবর্ত চাপ (Reflex arc) বলে।**

◘ (b) **প্রতিবর্ত চাপের গঠন :** প্রতিবর্ত চাপ প্রধানত পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত যেমন—গ্রাহক, অন্তর্বাহী স্নায়ুকোশ, স্নায়ুকেন্দ্র, বহির্বাহী স্নায়ুকোশ এবং ক্রিয়াস্থান বা কারক।

1. **গ্রাহক (রিসেপটর—**Receptors)—গ্রাহক একটি বিশেষভাবে গঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organs) সংজ্ঞাবহ স্নায়ুকোশের প্রান্তগুলি আবদ্ধ বা মুক্ত অবস্থায় থেকে গঠিত হয়। ● **কাজ**—গ্রাহকগুলি বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়।

2. **অন্তর্বাহী স্নায়ুকোশ** (Afferent neurone)—এটি সংজ্ঞাবাহ নিউরোন যা প্রতিবর্ত চাপে **অন্তর্বাহী শাখা** গঠন করে। নিউরোনের ডেনড্রাইটগুলি দেহের প্রান্তভাগে গ্রাহক তৈরি করে। এই নিউরোনের কোশদেহ পৃষ্ঠমূলীয় স্নায়ুগ্রন্থি (গ্যাংগ্লিয়ন)-তে থাকে। অ্যাক্সন সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর বস্তুতে শেষ হয়। ● **কাজ**—অন্তর্বাহী নিউরোন গ্রাহক থেকে সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনাকে স্নায়ুকেন্দ্রের দিকে পরিবাহিত করে। অন্তর্বাহ স্নায়ুতন্তু **সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতন্তু** (Sensory nerve) নামেও পরিচিত।
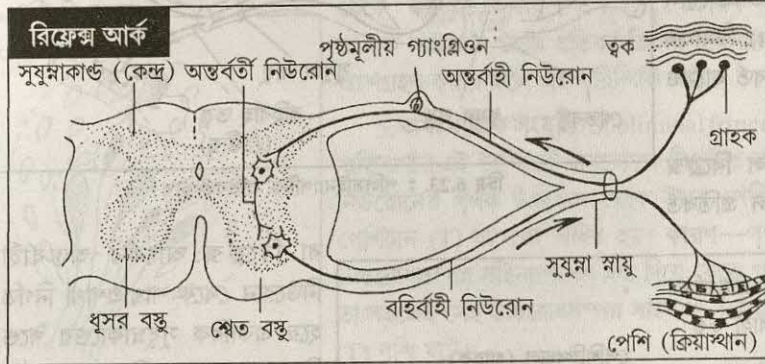
চিত্র 6.21. : একটি আদর্শ (ডাইসাইন্যাপটিক) প্রতিবর্ত চাপ।

3. **স্নায়ুকেন্দ্র** (Centre)—প্রধানত সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর বস্তু প্রতিবর্ত চাপের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। ● **কাজ**—স্নায়ুকেন্দ্রে অন্তর্বাহ নিউরোন বহির্বাহ স্নায়ুকোশের সঙ্গে সোজাসুজি কিংবা **অন্তর্বর্তী নিউরোনের** (Internuncial neurone) মধ্য দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে। ধূসর বস্তুতে অন্তর্বাহী স্নায়ু, অন্তর্বর্তী স্নায়ু এবং বহির্বাহী স্নায়ুর মধ্যে **সাইন্যাপস** (Synapse) গঠিত হয়।

4. **বহির্বাহী নিউরোন** (Efferent neurone)—বহির্বাহী নিউরোন প্রতিবর্ত চাপের **বহির্বাহী শাখা** গঠন করে। এই শাখা সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় ধূসর বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। ● **কাজ**—এই শাখা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উদ্দীপনাকে ক্রিয়াস্থানের দিকে পরিবাহিত করে। বহির্বাহ স্নায়ুতন্তু **চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তু** (Motor nerve) নামে পরিচিত।

5. **কারক** (Effector)—দেহের যে অংশ বহির্বাহী স্নায়ুতন্তু দিয়ে পরিচালিত হয় তাকে **কারক** বা **ক্রিয়াস্থান** বলে। সাধারণত পেশি, গ্রন্থি প্রভৃতি কারক বা ক্রিয়াস্থান হিসাবে কাজ করে।

◘ **প্রতিবর্ত চাপের প্রকারভেদ (Types of Reflex arc) :** রিফ্লেক্স আর্ক পাঁচ প্রকার। এই প্রকারভেদ সাইন্যাপস কিংবা নিউরোনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

1. **মনোসাইন্যাপটিক্ রিফ্লেক্স আর্ক** (Monosynaptic reflex arc)—দুটি স্নায়ুকোশ বা নিউরোন অর্থাৎ একটি অন্তর্বাহী ও একটি বহির্বাহী নিউরোনের মধ্যে **একটি সাইন্যাপস** নিয়ে এই প্রকার প্রতিবর্ত চাপ গঠিত। **উদাহরণ**—জানুক্ষেপ বা হাঁটু ঝাকুনি প্রতিবর্ত)। (চিত্র 6.22 দেখো)

**চিত্র 6.22.** ঃ মনোসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপ।

2. **ডাইসাইন্যাপটিক্ রিফ্লেক্স আর্ক** (Disynaptic reflex arc)—তিনটি নিউরোন অর্থাৎ একটি অন্তর্বাহী, একটি বহির্বাহী ও একটি অন্তর্বর্তী নিউরোনের মধ্যে অবস্থিত দুটি সাইন্যাপস নিয়ে এই প্রকার প্রতিবর্ত চাপ গঠিত (চিত্র 6.21দেখো)।

3. **পলিসাইন্যাপটিক্ রিফ্লেক্স আর্ক** (Polysynaptic reflex arc)—দুয়ের অধিক সাইন্যাপস্ এবং তিনের অধিক নিউরোন নিয়ে গঠিত প্রতিবর্ত চাপ (চিত্র 6.23 দেখো)।

মনো, ডাই ও পলিসাইন্যাপটিক প্রতিবর্তনগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের একই খণ্ডকে (Segment) সীমাবদ্ধ থাকে বলে এগুলিকে সেগমেন্টাল প্রতিবর্ত নামেও পরিচিত।

**চিত্র 6.23.** ঃ পলিসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপ।
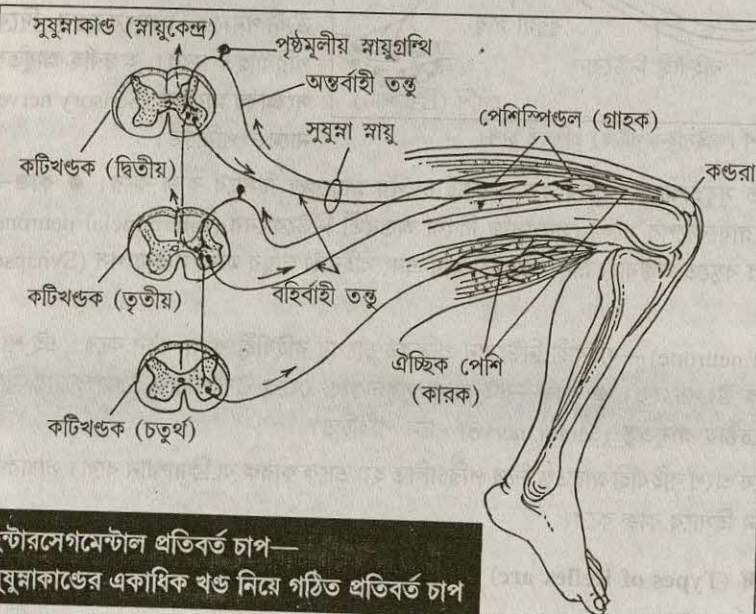
4. **জটিল প্রতিবর্ত চাপ বা জটিল রিফ্লেক্স আর্ক** (Complex reflex arc)—জটিল প্রতিবর্ত বা রিফ্লেক্স আর্কের অন্তর্বাহী নিউরোন থেকে শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়ে একাধিক সুষুম্নাকাণ্ডের খণ্ডে গিয়ে পৃথকভাবে প্রতিবর্ত চাপ গঠন করে। এটি **ইন্টারসেগমেন্টাল প্রতিবর্ত চাপ** (Intersegmental reflex arc) নামেও পরিচিত।

ইন্টারসেগমেন্টাল প্রতিবর্ত চাপ—
সুষুম্নাকাণ্ডের একাধিক খণ্ড নিয়ে গঠিত প্রতিবর্ত চাপ

**চিত্র 6.24.** ঃ জটিল প্রতিবর্ত চাপ।

5. **আসাইন্যাপটিক্ রিফ্লেক্স আর্ক** (Asynaptic reflex arc)—একই স্নায়ু তন্তুর (অ্যাক্সনের) শাখা প্রতিবর্তের অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী শাখা গঠন করে। এই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাইন্যাপস্ থাকে না। এই কারণে একে **আসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপ** (অ্যাক্সন রিফ্লেক্স আর্ক—Axon reflex arc) বলে।

## ➤ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য
## (Some general characteristic features of Reflex action)

1. **বিকেন্দ্রীকরণ** (Irradiation)—সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার তীব্রতার উপর পেশির প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। দুর্বল উদ্দীপনায় প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া স্বল্প সংখ্যক পেশিতে যায়, ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার তীব্রতা কম হয় কিন্তু শক্তিশালী উদ্দীপনায়, এই প্রতিক্রিয়া দেহাঙ্গের বিভিন্ন পেশিতেও ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। **কারণ**—শক্তিশালী উদ্দীপনা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর বহু শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ব্যাপকতা বেশ বেড়ে যায়।

2. **বিলম্ব** (Delay)—উদ্দীপনা প্রয়োগের পর প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হতে যে সময় লাগে তাকে বিলম্ব বলে। **কারণ**—প্রতিবর্ত চাপের মধ্য দিয়ে এবং সাইন্যাপস ও স্নায়ু-পেশির সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগের (Nerve impulse) পরিবহনের ফলে বিলম্ব ঘটে।

চিত্র 6.25. : অবরোধ।

3. **সংযোজন** (Summation)—দুর্বল উদ্দীপক অধঃমাত্রিক (Subliminal) হয়, যা প্রতিবর্ত ক্রিয়া করতে অক্ষম। কিন্তু এই ধরনের কিছু সংখ্যক অধঃমাত্রিক উদ্দীপককে একত্রে প্রয়োগ করলে প্রতিবর্তের মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম হয়। **কারণ**—দুর্বল প্রকৃতির উদ্দীপনা সংযোজিত অর্থাৎ একত্রিত হয়ে প্রতিবর্ত ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়।

4. **অবরোধ** (Occlusion)— দুটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ু (a এবং b) একত্রে উদ্দীপিত করলে যে পেশিটান (T) উদ্ভব হয় তা পৃথকভাবে উদ্দীপিত হতে উৎপন্ন পেশিটানের $(t_1 + t_1)$ সমষ্টি থেকে কম হয় অর্থাৎ $T < t_1 + t_2$। **কারণ**—কিছু সংখ্যক নিউরোন উভয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাধারণভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে এই পরিস্থিতি ঘটে।
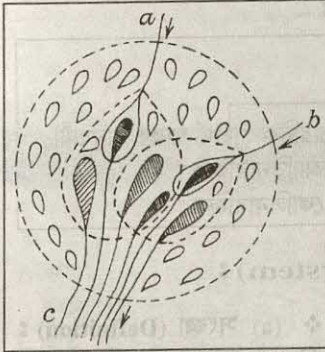
চিত্র 6.26. : অধঃমাত্রিক সংযুক্তি।
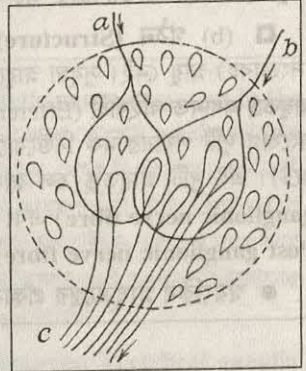
5. **অধঃমাত্রিক সংযুক্তি** (Subliminal fringe)—প্রতিবর্তের এই বৈশিষ্ট্যটি অবরোধের বিপরীত অর্থাৎ $T > t_1 + t_2$। এখানে দুটি সংজ্ঞাবহ নিউরোনের পৃথক্ উদ্দীপনা থেকে উদ্ভব পেশিটান $(t_1 + t_2)$ প্রযুক্ত উদ্দীপনায় উদ্ভূত পেশিটান (T) অপেক্ষা অধিক হয়। **কারণ**—পৃথকভাবে প্রযুক্ত উদ্দীপনার একটি অংশ উচ্চরোধসম্পন্ন সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না, তবে দুটি উদ্দীপনা একত্রে দিলে তা সহজেই সেই উচ্চরোধসম্পন্ন সাইন্যাপস্‌কে অতিক্রম করতে পারে, ফলে পেশিটানের (T) বৃদ্ধি ঘটে।

6. **প্রতিরোধ** (Inhibition)—একটি উদ্দীপনা অপর একটি উদ্দীপনায় বাধাদান করলে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। সংজ্ঞাবহ স্নায়ুমধ্য দিয়ে প্রবাহিত উদ্দীপনা সংকোচক পেশির (Flexor muscle) কাজকে যেমন উদ্দীপিত করে, তেমনি প্রসারক পেশির (Extensor muscle) কাজকে বাধা দেয়। **কারণ**—অন্তর্বর্তী স্নায়ুর কোশীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি ঘটে।

7. **অসাড়তা** (Fatigue) — একটি নির্দিষ্ট প্রতিবর্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বারে বারে ঘটতে দিলে পেশির প্রতিক্রিয়া পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায় এবং এক সময় তা লোপ পায়। একে **অসাড়তা** বা **অবসাদ** বলে। **কারণ**—প্রতিবর্ত চাপে অবস্থিত সাইন্যাপস এবং ক্রিয়া স্থানের পেশি-স্নায়ুর সংযোগস্থল থেকে ক্ষরিত অ্যাসিটাইলকোলিন নিঃশেষিত হওয়ায় পেশিতে অবসাদ ঘটে।

8. **ব্যতিহার স্নায়ুসংযোগ** (Reciprocal innervation) — কোনো কোনো প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় একপ্রকার পেশি সংকুচিত হলে অন্য প্রকার পেশি প্রসারিত হয়, যেমন— হাত-পায়ের বাইসেপস্ (Extensors) পেশির সংকোচনকালে ওই একই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রভাবে ট্রাইসেপস্ (Flexors) পেশির প্রসারণ হবে।

9. **সুগম সঞ্চালন** (Facilitation)—একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো প্রতিবর্তকে পর পর সংঘটিত হতে দিলে প্রথম কয়েকটি ধাপে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়। একে সুগম সঞ্চালন বলে। **কারণ**—বারে বারে উদ্দীপনার ফলে উচ্চরোধ (High resistance) সম্পন্ন সাইন্যাপস ক্রমশ কার্যকরী হয় ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বাড়ে।

10. **বিভাজন** (Fractionation) — একটি পেশি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে যতখানি সংকুচিত হয় তার অপেক্ষা অনেক বেশি সংকুচিত হবে যদি ওই পেশির চেষ্টীয় স্নায়ুতে অথবা সরাসরি পেশিতে উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়। **কারণ**—উদ্দীপনার একাংশ প্রতিবর্ত অতিক্রম করার সময় কিছুটা নষ্ট হয়।

## ◎ 6.10. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System–ANS) ◎

### ▲ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা, গঠন এবং প্রকারভেদ (Definition, Structure and Types of Autonomic nervous system) :

❖ (a) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Autonomic nervous system) :** যেসব চেষ্টীয় প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র দেহের আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের ক্রিয়াকলাপকে স্বয়ংভাবে (স্বাধীনভাবে) নিয়ন্ত্রণ করে তাকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।

◘ (b) **গঠন (Structure) :** এখানে উল্লেখ করা যায় যে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্য কোনো আলাদা অন্তর্বাহী (সংজ্ঞাবহ) স্নায়ু নেই। সুষুম্না স্নায়ুতে বর্ণিত অন্তর্বাহী স্নায়ু এই তন্ত্রেরও অন্তর্বাহী স্নায়ু হিসাবে কাজ করে। অতএব **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত বহির্বাহী** (Efferent) বা **চেষ্টীয়** (Motor) **স্নায়ু নিয়ে গঠিত**। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রের সঙ্গে ক্রিয়াস্থানের সংযোগ দুটি পর্যায়ক্রমিক নিউরোনের স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে ঘটে (সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্রের একটি নিউরোনের স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে ঘটে)। এই দুটি স্নায়ুতন্তু হল স্নায়ুগ্রন্থির আগের স্নায়ুতন্তু **প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু (প্রি-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুতন্তু—Pre-ganglionic nerve fibre)** এবং স্নায়ুগ্রন্থির পরের স্নায়ুতন্তু **পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু (পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুতন্তু — Post ganglionic nerve fibre)**।

● **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Autonomic nervous system) :**

### ▲ A. সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic Nervous System) :

চিত্র 6.27. : সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত প্রি ও পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্তুসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাংগ্লিওনের অবস্থানের চিত্ররূপ।
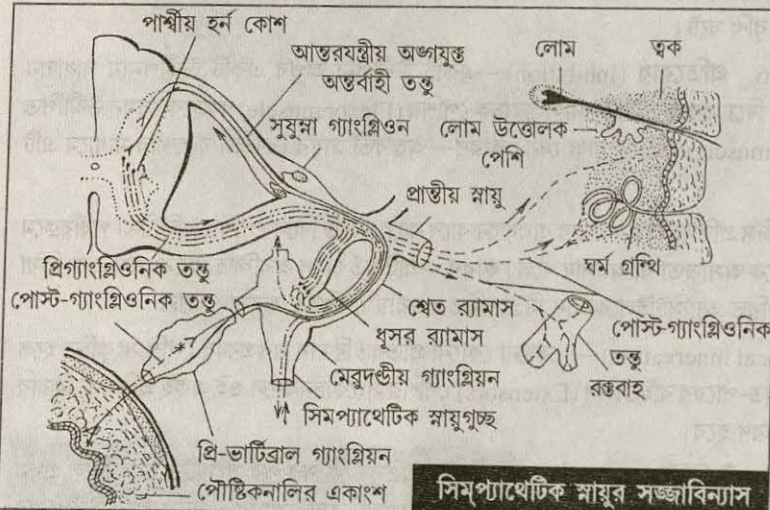
❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশের স্নায়ুগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের থোরাসিক এবং লাম্বার খণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে আলাদা যে তন্ত্র গঠন করে দেহের বিস্তৃত অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র বলে।

(b) **উৎপত্তি (Origin) :** সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের **প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু (প্রি-গ্যাংগ্লিওনিক নার্ভ)** সুষুম্নাকাণ্ডের সমস্ত বক্ষদেশীয় অর্থাৎ থোরাসিক অঞ্চল ($T_1$–$T_{12}$) এবং প্রথম তিনটি কটিদেশীয় অর্থাৎ লাম্বার অঞ্চলের ($L_1$–$L_3$)-এর পার্শ্ব শৃঙ্গ কোশ থেকে উৎপন্ন হয়। এই

স্নায়ুতন্তুগুলি সুষুম্না কাণ্ডের অঙ্কমূল থেকে নির্গত হয়ে **সিম্প্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়াতে** (Sympathetic ganglia) যায়। উৎপত্তি অনুযায়ী সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে তাই **থোরাকোলাম্বার স্নায়ুতন্ত্র** (Thoracolumbar nervous system) বলা হয়। এই গ্যাংগ্লিয়া থেকে পরে **পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক নার্ভ** উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে শেষ হয়।

**● সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগ্রন্থি বা গ্যাংগ্লিয়া (Ganglia of sympathetic nervous system) ●**

গ্যাংগ্লিয়া তিন প্রকারের হয়—

(i) **সিম্প্যাথেটিক চেন্ গ্যাংগ্লিয়া** (Sympathetic chain ganglia) বা **মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থি** বা **প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংগ্লিয়া** (Paravertebral ganglia)।

(ii) **প্রাক্-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থি** বা **প্রিভার্টিব্রাল গ্যাংগ্লিয়া** (Prevertebral ganglia)।

(iii) **প্রান্তীয় স্নায়ুগ্রন্থি** বা **টার্মিনাল গ্যাংগ্লিয়া** (Terminal ganglia)।

(c) **সুষুম্নাকাণ্ডে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস (Arrangement of sympathetic nervous system in the spinal cord)** ঃ অন্তর্বাহী স্নায়ুকোশ (নিউরোন) সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠমূলে প্রবেশ করে পার্শ্বীয় হর্নকোশে শেষ হয়। পার্শ্বীয় হর্নকোশ থেকে প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু নামে অন্য একটি স্নায়ুকোশ উৎপন্ন হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় মূল থেকে নির্গত হয়। পরে এটি সম্মুখস্থ মিশ্র সুষুম্না স্নায়ুর মাধ্যমে গ্যাংগ্লিয়াতে প্রবেশ করে। এইসব স্নায়ুতন্তু পাতলা মায়েলিন আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে বলে একে **শ্বেতস্নায়ু শাখা** বা **হোয়াইট র‍্যামাস** (White ramus) বলে। মেরুদণ্ডীয় গ্যাংগ্লিয়া থেকে পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু নামে অন্য একটি স্নায়ুকোশ (নিউরোন) নির্গত হয়ে আবার সুষুম্না স্নায়ুর সঙ্গে মেশে এবং বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রে যায়। এই জাতীয় নিউরোনের তন্তুগুলি মায়েলিন আবরণীবিহীন হয় বলে একে **ধূসর স্নায়ু শাখা** বা **গ্রে র‍্যামাস** (Gray ramus) বলে।

**● মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থি এবং প্রাক্-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থির পার্থক্য (Difference between Vertebral ganglia and Paravertebral ganglia) ঃ**

| মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থি (গ্যাংগ্লিয়া) | প্রাক্-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগ্রন্থি (গ্যাংগ্লিয়া) |
|---|---|
| 1. মেরুদণ্ডের দু'পাশে অবস্থান করে। | 1. বক্ষ, উদর এবং শ্রোণিদেশের মহাধমনি ও তার শাখার কাছে অবস্থান করে। |
| 2. পরস্পর স্নায়ুর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মেরুদণ্ডের দু'পাশে শৃঙ্খলাকারে সাজানো থাকে। | 2. স্নায়ুগ্রন্থিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। |
| 3. প্রতি পাশে স্নায়ুগ্রন্থির সংখ্যা প্রায় 22টি। | 3. স্নায়ুগ্রন্থির সংখ্যা মাত্র 3টি। |

(d) **সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Sympathetic Nervous system)** ঃ সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে নিম্নলিখিত কাজগুলি দেখা যায়,

(1) তারারন্ধ্রের প্রসারণ ঘটে। (2) হৃৎস্পন্দনের হার বাড়ে। (3) রক্তবাহ ও পেশির রক্তবাহকে প্রসারিত করে। (4) ব্রঙ্কিওলগুলিকে প্রসারিত করে। (5) পাকস্থলীর গ্রন্থি, লালাগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ক্ষরণকে কমিয়ে দেয়। (6) যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজে পরিণত করে ও এই গ্লুকোজ রক্তে গিয়ে রক্ত-শর্করার পরিমাণকে বাড়ায়। (7) পৌষ্টিক-নালির (ক্ষুদ্রান্ত্রের) ক্রমসংকোচন বিচলনকে কমিয়ে দেয়। (8) মূত্রাশয়কে প্রসারিত করে।

## ▲ B. প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু তন্ত্র (Parasympathetic Nervous System) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে যে অংশের স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক দণ্ড** (Brain stem) **থেকে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের স্যাকরাল খণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে এবং যা দেহের সীমিত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে তাকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র বলে।**

(b) **উৎপত্তি (Origin)**—প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু মস্তিষ্ককাণ্ডে (Brain stem) অবস্থিত বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র এবং সুষুম্নাকাণ্ডের স্যাকরাল অংশ থেকে উৎপন্ন স্নায়ু কোশ বা নিউরোনের সমন্বয়ে গঠিত। তাই এই স্নায়ুতন্ত্রকে **ক্রেনিওস্যাকরাল** (Craniosacral) স্নায়ুতন্ত্রও বলা হয়।

প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের প্রি-গ্যাংগ্লিওনিক নার্ভ বা প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু লম্বায় বড়ো হয়। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত হয়ে আন্তরযন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থিত স্নায়ুগ্রন্থিতে শেষ হয়। অন্য একটি ছোটো স্নায়ু পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক নার্ভ বা পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তরযন্ত্রে শেষ হয়। প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের করোটিগত অংশ প্রধানত অকিউলোমোটর, ফেসিয়াল, গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল এবং ভেগাস্ স্নায়ু নিয়ে গঠিত। অবশিষ্ট স্নায়ুতন্তুসমূহ সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্যাকরাল ($S_2$—$S_4$) খণ্ডকের পার্শ্বশৃঙ্গ কোশ থেকে নির্গত হয়।

**● প্যারাসিম্প্যাথেটিক (পরাসমবেদী) স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত করোটি স্নায়ু ●**

(i) তৃতীয় করোটি স্নায়ু—অকিউলোমোটোর স্নায়ু (III Cranial nerve—Occulomotor nerve)।
(ii) সপ্তম করোটি স্নায়ু—ফেসিয়াল স্নায়ু (VII Cranial nerve—Facial nerve)।
(iii) নবম করোটি স্নায়ু—গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (IX Cranial nerve—Glossopharyngeal nerve)।
(iv) দশম করোটি স্নায়ু—ভেগাস স্নায়ু (X Cranial nerve—Vagus nerve)।

(c) **প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Parasympathetic nervous system) :**

চিত্র 6.28. : স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের উৎপত্তি এবং স্নায়ু সংযোগের চিত্ররূপ।
A—সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু : (a) প্রি-গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ু, (b) পোস্টগ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ু।
B—প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু : (a) প্রি ও (b) পোস্টগ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ু।
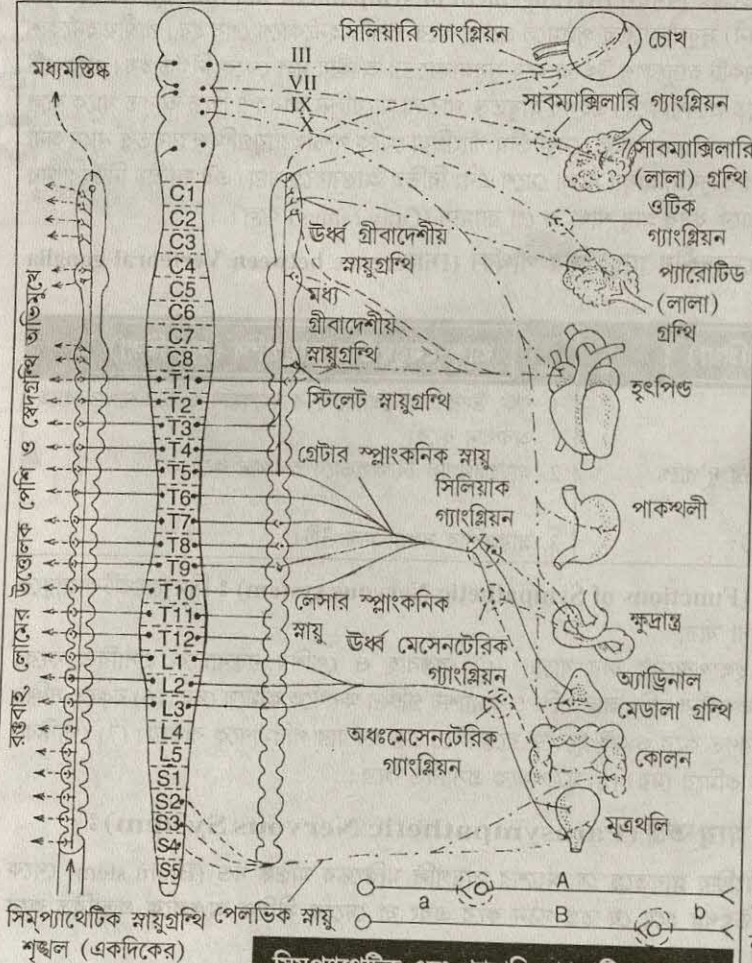
প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের বিপরীত কাজ করে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে নিম্নলিখিত কাজগুলি দেখা যায়—

(1) তারারন্ধ্রের সংকোচন ঘটে। (2) হৃৎস্পন্দনের হার কমে। (3) করোনারি ও পেশির রক্তনালিকে সংকুচিত করে। (4) ব্রঙ্কিওলগুলিকে সংকুচিত করে। (5) পাকস্থলীর গ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ক্ষরণকে বাড়ায়। (6) যকৃৎ থেকে পিত্তরসের ক্ষরণকে বাড়ায়। (7) ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্রমসংকোচন বিচলনকে বাড়িয়ে দেয়। (8) মূত্রাশয়কে সংকুচিত করে।

**● স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র সাধারণভাবে দেহের বিস্তৃত অঞ্চল প্রভাবিত করে যদিও পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের অধিকতর সীমিত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে।**

1. **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের বিস্তৃত প্রভাব—**

(i) স্বতন্ত্র স্নায়ু বহু শাখান্বিত হয়ে দেহের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত থাকে।

(ii) এই শাখার পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক নার্ভের প্রান্ত থেকে ক্ষরিত নিউরোট্রান্সমিটার নরঅ্যাড্রিন্যালিন সহজে নিষ্ক্রিয় হয় না। প্রধানত এই দুটি কারণেই দেহে স্বতন্ত্র বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে।

2. পরাস্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সীমিত প্রভাব—

(i) পরাস্বতন্ত্র স্নায়ু বেশি শাখান্বিত নয় এবং নির্দিষ্ট অঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

(ii) এই প্রকার স্নায়ুর প্রান্ত থেকে ক্ষরিত নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাসিটাইলকোলিন সহজেই ধ্বংস হয়। প্রধানত এই দুটি কারণে পরাস্বতন্ত্র বা প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক প্রভাব বিস্তৃত নয় অর্থাৎ সীমিত হয়।

**● স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর পরস্পরবিরোধী কয়েকটির প্রধান কার্যের সংক্ষিপ্তসার ●**

| আন্তরযন্ত্রীয় অংশ | সিম্‌প্যাথেটিকের ক্রিয়া | প্যারাসিম্‌প্যাথেটিকের ক্রিয়া |
|---|---|---|
| 1. কনীনিকা | তারারন্ধ্রের (Pupil) প্রসারণ | তারারন্ধ্রের সংকোচন |
| 2. অশ্রুগ্রন্থি | অশ্রু ক্ষরণে কোনো প্রভাব নেই | অশ্রু ক্ষরণে সাহায্য করে |
| 3. লালাগ্রন্থি | লালা ক্ষরণের পরিমাণ কম হয় ও লালাকে ঘন করে | লালাক্ষরণের পরিমাণ বাড়ে ও লালাকে তরল করে |
| 4. ঘর্মগ্রন্থি | ঘর্ম ক্ষরণে সাহায্য করে | ঘর্ম ক্ষরণে সাহায্য করে না |
| 5. ব্রংকাই | বিবরকে প্রসারিত করে | বিবরকে সংকুচিত করে |
| 6. হৃৎপিণ্ড | S.A. নোডকে উদ্দীপিত করে<br>A.V. নোডের পরিবহনকে বাড়ায়<br>হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে | S.A. নোডের উদ্দীপনাকে কম করে<br>A.V. নোডে পরিবহনকে কম করে<br>হৃৎস্পন্দনের হার হ্রাস করে |
| 7. পৌষ্টিকনালি | বিচলন ও গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ কম হয় | বিচলন ও গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ বেশি হয় |
| 8. যৌনাঙ্গ | শুক্রনালির সংকোচন, শুক্রথলি, প্রস্টেট গ্রন্থি, জরায়ুথলির রক্তবাহের সংকোচন ঘটায় | রক্তবাহ প্রসারণ ও লিঙ্গের উত্তোলন (Erection) কাজে অংশ নেয় |
| 9. মূত্রথলি | মূত্রথলি পেশির প্রসারণ | মূত্রথলি পেশির সংকোচন |
| 10. অ্যাড্রিনাল মেডালা | ক্ষরণে সাহায্য করে | কোনো কাজ করে না |
| 11. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি | কোনো কাজ করে না | হরমোনের ক্ষরণ ঘটায় |
| 12. প্লিহা | সংকুচিত করে | কোনো কাজ নেই |
| 13. যকৃৎ | গ্লাইকোজেনোলাইসিস | কোনো কাজ নেই |
| 14. পিত্তাশয় | প্রসারণ | সংকোচন |
| 15. পাকস্থলী | ক্ষরণ ও বিচলন বাড়ায় | ক্ষরণ ও বিচলন কমায় |
| 16. রক্তশর্করা | রক্তে শর্করার পরিমাণকে বাড়ায় | রক্তে শর্করার পরিমাণকে কমায় |

**● সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র ও প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের পার্থক্য (Difference between Sympathetic and Parasympathetic Nervous system) :**

| সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র | প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র |
|---|---|
| 1. এটি সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষদেশীয় ও কটিদেশীয় খণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়। | 1. এটি মস্তিষ্কদণ্ড ও সুষুম্নাকাণ্ডের ত্রিকাস্থীয় খণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়। |
| 2. এই তন্ত্রের স্নায়ুগ্রন্থিগুলি সাধারণত প্রতিটি কশেরুকার খুব কাছে ও দু'পাশে চেনের মতো সাজানো থাকে। | 2. স্নায়ুগ্রন্থিগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের খুব দূরে ও ক্রিয়াস্থানের অর্থাৎ আন্তরযন্ত্রের খুব কাছে থাকে। |
| 3. প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং পশ্চাৎ স্নায়ু গ্রন্থিজ তন্তুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড়ো হয়। | 3. প্রাক্-স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুতন্তু লম্বায় অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ তন্তুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়। |

| সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র | প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র |
|---|---|
| 4. প্রাক্ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুপ্রান্ত অ্যাসিটাইলকোলিন ও পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুপ্রান্ত (ঘর্মগ্রন্থি ছাড়া) অ্যাড্রিনালিন নামে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। | 4. প্রাক্ ও পশ্চাৎ স্নায়ুগ্রন্থিজ স্নায়ুপ্রান্তগুলি অ্যাসিটাইলকোলিন নামে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। |
| 5. এটি দেহের বিস্তৃত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। | 5. এটি দেহের সীমিত অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। |

● **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Central nervous system and Peripheral nervous system) :**

| কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র | প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র |
|---|---|
| 1. মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। | 1. করোটি স্নায়ু, সুষুম্না স্নায়ু এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। |
| 2. অস্থি নির্মিত কাঠামো অর্থাৎ করোটি এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে যথাক্রমে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ড থাকে। | 2. অস্থি-কাঠামোর বাইরে প্রান্তীয় স্নায়ুগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে। |
| 3. তিনটি আবরক অর্থাৎ মেনিন্জেস দিয়ে এই স্নায়ুতন্ত্র আবৃত থাকে। | 3. নিউরোলেমা দিয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি আবৃত থাকে। |
| 4. এই স্নায়ুতন্ত্র সংজ্ঞাবহ বা চেষ্টীয় উদ্দীপনা উৎপন্ন করে। | 4. সংজ্ঞাবহ অথবা চেষ্টীয় উদ্দীপনা বহন করে। |

## ✪ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ✪

**1. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ?**

● যে তন্ত্র মানুষের চেতনা জাগায় এবং পরিবেশ ও দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র বলে।

**2. (ক) C. S. F. কথাটির পুরো নাম কী ? (খ) এটি দেহের কোথায় কীভাবে উৎপন্ন হয় ?**

● (ক) C. S. F.-এর পুরো নাম সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড।

(খ) মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রধানত দুটি পার্শ্ব লোবে অবস্থিত থাকে এবং কোরয়েড প্লেক্সাস নামে রক্তজালক পিণ্ড থেকে ক্ষরণ প্রক্রিয়ায় সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড উৎপন্ন হয়।

**3. কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতে মায়োলিন শীথ কীভাবে তৈরি হয় ?**

● 1. অলিগোডেন্ড্রোসাইট কোশপর্দা পরিবৃত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে মায়োলিন আবরণী তৈরি হয়। 2. স্বোয়ান কোশপর্দা পরিবৃত হয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে মায়োলিন আবরণী তৈরি হয়।

**4. প্রান্তীয় অমায়েলিন স্নায়ুতে স্নায়ুঝিল্লি থাকে কি ?**

● প্রান্তীয় অমায়েলিন স্নায়ুতে স্নায়ুঝিল্লি থাকে।

**5. অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে দেহে যে বিভিন্ন প্রকার নিউরোন পাওয়া যায় তাদের সরল চিহ্নিত চিত্র আঁকো। স্বোয়ান আবরণী এবং স্বোয়ান কোশ কাকে বলে ?**

● (ক) চিত্র 6.29 দেখে আঁকো। অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরোনের প্রকারভেদ।
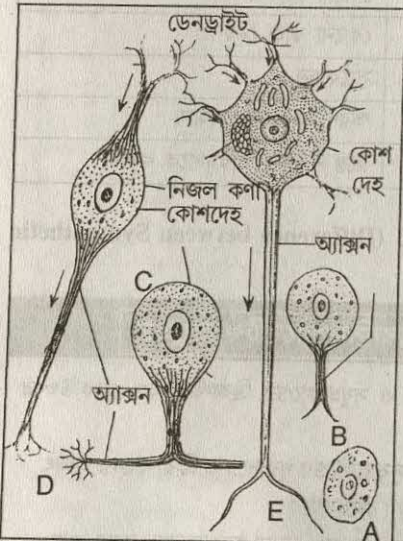
চিত্র 6.29. : A—অপোলার, B—ইউনিপোলার, C—ছদ্ম-ইউনিপোলার, D—বাইপোলার এবং E—মালটিপোলার।

(খ) কোনো কোনো নিউরোনের (মেডুলারি আবরণীবিহীন) অ্যাক্সন ঝিল্লির অর্থাৎ অ্যাক্সোলেমার বাইরে এবং কোনো কোনো মেডুলেটেড নিউরোনের বাইরে অন্য আর একটি যে আবরণী থাকে তাকে **নিউরোলেমা বা শ্বোয়ান আবরণী বা শ্বোয়ান কোশ** বলে।

**6. মানবদেহের একটি সরল মস্তিষ্ক এঁকে তার গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি অংশকে চিহ্নিত করো।**

● পাশের চিত্র 6.30 দেখে আঁকো এবং চিহ্নিত করো।

চিত্র 6.30. : মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান তিনটি অংশ।

**7. সাইন্যাপস এবং স্নায়ুপেশি সংযোগস্থলে কী রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় ?**

● (ক) সাইন্যাপস থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন নিঃসৃত হয়।

(খ) স্নায়ুপেশি সংযোগস্থল থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন এবং এপিনেফ্রিন (অ্যাড্রিনালিন) নিঃসৃত হয়।

**8. ধূসর বস্তু ও শ্বেতবস্তু বলতে কী বোঝো ? এদের গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো। স্নায়ুতন্ত্রে এগুলি কোথায় থাকে ?**

● (ক) **ধূসর বস্তু :** মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের যেসব পদার্থের উপস্থিতিতে ধূসর রঙের হয় তাকে ধূসর বস্তু বলে। (i) **গঠন**—ধূসর বস্তু প্রধানত স্নায়ুকোশের কোশদেহ, নিউরোগ্লিয়া এবং স্বল্প পরিমাণ স্নায়ুতন্তু নিয়ে গঠিত। (ii) **অবস্থান**—এটি মস্তিষ্কের উপরিতলে এবং সুষুম্না কাণ্ডের কেন্দ্রাংশে থাকে।

(খ) **শ্বেত বস্তু :** মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের যে বস্তুর উপস্থিতিতে হালকা সাদা রঙের হয় তাকে শ্বেতবস্তু বলে। (i) **গঠন**—শ্বেতবস্তু প্রধানত মায়েলিনেটেড তন্তু এবং সামান্য পরিমাণ স্নায়ুকোশের কোশদেহ নিয়ে গঠিত। (ii) **অবস্থান**—শ্বেতবস্তু মস্তিষ্কের কেন্দ্রে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরের স্তরে থাকে।

**9. গুরুমস্তিষ্কের উপরিতলের আয়তন করোটি মধ্যস্থ স্থানের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, এটি কীভাবে করোটির মধ্যে থাকে ?**

● গুরুমস্তিষ্কের উপরিতলের মোট ক্ষেত্রফল করোটির অন্তঃস্থ তলের ক্ষেত্রফলের প্রায় তিনগুণ। এর ফলে গুরুমস্তিষ্কের উপরিভাগে অবস্থিত ধূসর বস্তু বহু স্থানে ভাঁজ হয়ে উঁচুনীচু অবস্থায় থাকে। উঁচু স্থানকে জাইরাস বা গাইরাস (Gyrus) এবং নীচু স্থানকে স্নায়ুখাঁজ বা ফিসার (Fissure = অগভীর খাঁজ) বা সালকাস (Sulcus = গভীর খাঁজ, বহুবচনে Sulci) বলে।

**10. জাইরি, ফিসার ও সালসি বলতে কী বোঝায় ? কোথায় পাওয়া যায় ?**

● (ক) জাইরি, ফিসার ও সালসি—উপরের প্রশ্নের (নং 9) উত্তরটি দেখো।

(খ) **অবস্থান**—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রধানত গুরুমস্তিষ্ক এবং লঘুমস্তিষ্ক থাকে।

**11. (ক) স্নায়ু গ্রন্থি বা গ্যাংগ্লিয়ন কাকে বলে ? (খ) তোমার দেহে উপস্থিত গ্যাংগ্লিয়ারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (গ) একটি গ্যাংগ্লিয়ার চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো।**

চিত্র 6.31. : স্নায়ুগ্রন্থি বা গ্যাংগ্লিয়ন।

● (ক) মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ডের বাইরে কয়েকটি স্নায়ুকোশ মিলিত হয়ে যে সামান্য স্ফীত অংশ গঠন করে তাকে গ্যাংগ্লিয়ন বলে।

(খ) মানুষের দেহে প্রধানত দু'রকমের গ্যাংগ্লিয়ার থাকে।

(i) **সোমাটিক গ্যাংগ্লিয়া**—এই প্রকার স্নায়ুগ্রন্থি বা গ্যাংগ্লিয়া সুষুম্না স্নায়ুর পৃষ্ঠমূলে এবং করোটি স্নায়ুতে থাকে।

(ii) **স্বয়ংক্রিয় গ্যাংগ্লিয়া**—এই প্রকার গ্যাংগ্লিয়া প্রি-গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ু এবং পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ুর অন্তর্বর্তী স্থানে থাকে।

**12. E E G কী ? মস্তিষ্কে দু'প্রকার তরঙ্গের নাম লেখো।**

- (ক) E E G-এর পুরা নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম। এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গুরুমস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন তড়িৎ বিভব তরঙ্গের লিপিবদ্ধ লেখচিত্রকে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম বলে।
  (খ) মস্তিষ্কে প্রধানত চার প্রকার তরঙ্গ পাওয়া যায়, যেমন— $\alpha$ তরঙ্গ, $\beta$ তরঙ্গ, $\delta$ তরঙ্গ এবং $\gamma$ তরঙ্গ ।

**13. সোমাটিক গ্যাংগ্লিয়া এবং অটোনোমিক গ্যাংগ্লিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।**

| সোমাটিক গ্যাংগ্লিয়া | অটোনোমিক গ্যাংগ্লিয়া |
|---|---|
| 1. এই প্রকার গ্যাংগ্লিয়া কোশদেহ নিয়ে তৈরি। | 1. এই প্রকার গ্যাংগ্লিয়া নিউরোনের প্রান্ত ও কোশদেহ নিয়ে তৈরি। |
| 2. এতে কোনো সাইন্যাপস গঠিত হয় না। | 2. এতে সাইন্যাপস গঠিত হয়। |
| 3. গ্যাংগ্লিয়নে অবস্থিত কোশদেহ থেকে সংজ্ঞাবহ নিউরোন নির্গত হয়। | 3. গ্যাংগ্লিয়নে অবস্থিত কোশদেহ থেকে চেষ্টীয় নিউরোন নির্গত হয়। |

**14. বেসাল গ্যাংগ্লিয়া কাকে বলে ?**

- সেরিব্রাল বা গুরুমস্তিষ্কের নীচে ও শ্বেতবস্তুর মধ্যে কতকগুলি যে ধূসর অংশ দ্বীপের মতো ছড়ানো থাকে এবং যা দেহের ঐচ্ছিক, প্রতিবর্ত, সমন্বয়সাধক এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের বেসাল গ্যাংগ্লিয়া বলে। কর্পাস স্ট্রায়েটাম, ক্লাসট্রাম, সাবস্টেনশিয়া নিগ্রা, অ্যামিগ্ডলয়েড স্নায়ুকেন্দ্র ইত্যাদি অংশ নিয়ে বেসাল গ্যাংগ্লিয়া গঠিত।

**15. স্থিতি বিভব বা ঝিল্লি বিভব কী ?**

- যে-কোনো কোশের মেমব্রেনের উভয় পার্শ্বে দু'প্রকার তরল থাকে। কোশের বাইরের তরলকে কোশবহিস্থ তরল এবং কোশের ভেতরের তরলকে কোশমধ্যস্থ তরল বলে। এই তরলে বিভিন্ন রকমের আয়ন ($Na^+$, $K^+$, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$, $Cl^-$, $HCO_3^-$) থাকে, তবে এই সব আয়নের গাঢ়ত্ব বিভিন্ন প্রকারের হয়। বিশ্রামরত অবস্থায় ঝিল্লির দু'পাশে আয়নের অসম বন্টনের ফলে ঝিল্লির দু'পাশে যে বিভব পার্থক্য গড়ে ওঠে তাকে **স্থিতি বিভব** (Resting potential) বা **ঝিল্লি বিভব** (Membrane potential) বলে। স্নায়ুর স্থিতি বিভব –70 mv (পেশিতে –90 mv)।

**16. একটি স্নায়ুর ক্রিয়া বিভব বলতে কী বোঝো ?**

- **ক্রিয়া বিভব**—বিশ্রামরত অবস্থায় স্নায়ু বা পেশির মধ্যে যে বিভব পার্থক্য দেখা যায় তাকে স্থিতি বিভব বলে। এই স্নায়ু বা পেশিকে যথোপযুক্ত উদ্দীপক দিয়ে উদ্দীপিত করলে অভেদ ঝিল্লি ভেদ্য হয়, ফলে ঝিল্লি মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আয়নের ($Na^+$, $K^+$ প্রভৃতির) আদানপ্রদান ঘটে ফলে স্থিতি বিভব পরিবর্তিত হয়ে **ক্রিয়া বিভবে** রূপান্তরিত হয়।

**17. (ক) থ্যালামাস কাকে বলে ? (খ) এর দুটি কাজ লেখো।**

- (ক) মস্তিষ্কে তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দু'দিকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ (পার্শ্ব প্রকোষ্ঠের) নীচে সব থেকে বড়ো ডিম্বাকৃতি ধূসর পদার্থের স্নায়ুপুঞ্জকে থ্যালামাস বলে।
  (খ) **কাজ**—(i) থ্যালামাস প্রেরকস্থান বা রিলে স্টেশন (Relay station) হিসাবে কাজ করে। (ii) থ্যালামাস স্থূল অনুভূতির (চাপ, স্থূল স্পর্শ, যন্ত্রণার অনুভূতির) কেন্দ্র, মানসিক আবেগের কেন্দ্র এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

**18. অ্যাড্রিনারজিক ও কোলিনারজিক স্নায়ু বলতে কী বোঝো ?**

- (i) **অ্যাড্রিনারজিক স্নায়ু**—যে স্নায়ুর প্রান্ত থেকে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয় তাকে অ্যাড্রিনারজিক স্নায়ু বলে। উদাহরণ—সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুপ্রান্ত (ব্যতিক্রম—ঘর্ম গ্রন্থি)।
  (ii) **কোলিনারজিক স্নায়ু**—যে স্নায়ুর প্রান্ত থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন ক্ষরিত হয় তাকে কোলিনারজিক স্নায়ু বলে। উদাহরণ—প্রতিটি প্রি এবং পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুর (ব্যতিক্রম—ঘর্মগ্রন্থি) প্রান্ত থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন ক্ষরিত হয়।

**19. সরল প্রতিবর্ত এবং জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে ?**

● (i) যে প্রতিবর্ত ক্রিয়া শুধুমাত্র সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের **সরল প্রতিবর্ত** ক্রিয়া বলে। উদাহরণ—সুস্বাদু খাদ্য খেলে লালারসের ক্ষরণ। (ii) যে প্রতিবর্ত নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্কের (মস্তিষ্ক দণ্ডের) প্রয়োজন হয় তাদের **জটিল প্রতিবর্ত** ক্রিয়া বলে। উদাহরণ—হাঁটা, শিক্ষা ইত্যাদি।

**20. লাম্বার পাংচার কাকে বলে ?**

● কশেরুকার তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সাব-অ্যারাক্নয়েড স্পেসে লাম্বারে ফুটো (পাংচার) করে সূচ ঢুকিয়ে C S F সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে লাম্বার পাংচার বলে।

**21. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল এবং হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।**

| মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল | হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল |
|---|---|
| 1. মস্তিষ্কের ভেতরের সম্পূর্ণ ফাঁপা প্রকোষ্ঠ। | 1. হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ফাঁপা প্রকোষ্ঠ। |
| 2. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলের সংখ্যা চারটি। | 2. হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকলের সংখ্যা দুটি। |
| 3. চারটি ভেন্ট্রিকলের প্রতিটির সঙ্গে অন্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। | 3. প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে না। |
| 4. এর ভেতরের প্রাচীর রোমশ আবরণী কলা দিয়ে ঢাকা থাকে। | 4. এর ভেতরের প্রাচীর এন্ডোকার্ডিয়াম নামে আঁশাকার আবরণী কলা দিয়ে ঢাকা থাকে। |
| 5. সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফ্লুইড নামে তরল প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকলে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন ভেন্ট্রিকলে সংবাহিত হয়। | 5. দেহের বিভিন্ন অংশে তৈরি রক্ত ভেন্ট্রিকলে যায় এবং ভেন্ট্রিকল এই রক্তকে পাম্প করে সংবহনতন্ত্রে পাঠায়। |

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির এককথায় উত্তর দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. যে তন্ত্র মানুষের চেতনা জাগায় এবং পরিবেশ ও দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাকে কী বলে ?
2. স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত তাকে কী বলে ?
3. যেসব স্নায়ুতন্তু (সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয়) দেহের বিভিন্ন অংশকে স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রাখে তাকে কী বলে ?
4. মস্তিষ্কের সবথেকে বড়ো অংশটির নাম কী ?
5. গুরুমস্তিষ্কে যেসব অঞ্চলে সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা যায় তাদের কী বলে ?
6. গুরুমস্তিষ্কের যে অংশ দেহের বিভিন্ন পেশির সংকোচন প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলা হয় ?
7. গুরুমস্তিষ্কে দুটি গোলার্ধ যে প্রশস্ত স্নায়ুতন্তুর গুচ্ছ নিয়ে যুক্ত থাকে তাকে কী বলে ?
8. মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দুদিকে গুরুমস্তিষ্কের নীচে ও মধ্যমস্তিষ্কের উপরের শ্বেতবস্তুর মধ্যে যে দুটি ধূসর রঙের ডিম্বাকার অংশের মতো দেখা যায় তাদের কী বলে ?
9. দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা বহনকারী স্নায়ু প্রথমে থ্যালামাসে এবং পরে গুরুমস্তিষ্কে যায়—এই প্রকার সজ্জাবিন্যাসের ফলে থ্যালামাসকে কী বলে ?
10. তৃতীয় প্রকোষ্ঠ ও থ্যালামাসের তলদেশে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কোন্‌টি ?
11. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে অংশটি লঘুমস্তিষ্কের সামনে ও সুষুম্নাশীর্ষকের উপরে থাকে তার নাম কী ?
12. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা মস্তিষ্কের পনস এবং মেডুলা অবলংগাটার পেছনে থাকে তাকে কী বলে ?
13. মস্তিষ্কের যে অংশ দেহের দেহভঙ্গি ও দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে তাকে কী বলে ?
14. মানুষের মস্তিষ্ক নিরেট না ফাঁপা ?
15. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল যে তরল দিয়ে পূর্ণ থাকে তার নাম কী ?
16. গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ যে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে কী বলে ?
17. মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এবং মস্তিষ্কের বাইরে যে ক্ষারীয় পরিবর্তিত কলারস থাকে তার নাম কী ?

18. সুষুম্নাকাণ্ডের নীচের অংশটি ক্রমশ সরু হয়ে যে অংশ গঠন করে তাকে কী বলে ?
19. কোনাস মেডুলারিস অগ্রভাগ থেকে দড়ির মতো স্নায়ুকলাবিহীন যে তন্তুগুলি নীচের দিকে ঝুলতে থাকে তাকে কী বলে ?
20. যে স্নায়ুপথের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কী বলে ?
21. সংজ্ঞাবহ উদ্দীপকের প্রভাবে পেশি বা গ্রন্থিতে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে ?
22. যে প্রতিবর্ত সুষুম্নাকাণ্ডের একই খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে কী বলে ?
23. যে প্রতিবর্ত শিশুর জন্ম থেকে থাকে না বারে বারে অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয় তাকে কী বলে ?
24. হাঁটু ঝাকুনি বা জানুক্ষেপ প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া ?
25. যে সকল চেষ্টীয় প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র দেহের আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।
26. উৎপত্তিগতভাবে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে কী বলে ?
27. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলির উৎপত্তি অনুযায়ী নাম কী ?
28. কোলিনার্জিক স্নায়ু কাকে বলে ?
29. যেসব স্নায়ু প্রান্ত থেকে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয় তাকে কী বলে ?
30. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি ঘটবে ?

## B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :

1. মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে CSF পূর্ণ যে প্রকোষ্ঠ থাকে তার সংখ্যা—একটি □/ দুটি □ / তিনটি □/ চারটি □/ পাঁচটি □।
2. থ্যালামাসের একটি কাজ হল—দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা □/ পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করা □ / প্রেরক স্থান হিসাবে পরিগণিত হওয়া □।
3. পিটুইটারি গ্রন্থির নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের নাম— গুরুমস্তিষ্ক □/ লঘুমস্তিষ্ক □/ হাইপোথ্যালামাস □/ কর্পাস স্ট্রায়াটাম □।
4. পূর্ণবয়স্ক লোকের সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য—15 মিমি. □/ 45 সেমি. □/ 45 মিটার হয় □।
5. মানুষের সুষুম্নাকাণ্ড—31 খণ্ড □/ 32 খণ্ড □/ 33 খণ্ড □ দ্বারা গঠিত।
6. মানবদেহে সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা— 31 জোড়া □/ 34 জোড়া □/ 44 জোড়া □/ 43 জোড়া □।
7. মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ক্র্যানিয়েল নার্ভের সংখ্যা—। 12 শত □/ 12 হাজার □ / 12 লক্ষ □/ 12 জোড়া □/ মাত্র 12 টি □।
8. অষ্টম ক্র্যানিয়াল নার্ভ হল —অপটিক □/ অকুলোমটর □/ ভেগাস □/ অডিটর □ / অ্যাবডুমেনস □।
9. সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে রক্তচাপ—কমে □/ বাড়ে □/ অপরিবর্তিত থাকে □।
10. উৎপত্তিগত ভাবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে বলে—থোরাসিকো লাম্বার স্নায়ু □/ ক্রেনিওস্যাকরাল স্নায়ু □।
11. দশম করোটি স্নায়ু অর্থাৎ ভেগাস একটি — সংজ্ঞাবহ স্নায়ু □ / চেষ্টীয় স্নায়ু □ / মিশ্র স্নায়ু □।
12. অষ্টম করোটি স্নায়ু একটি—সংজ্ঞাবহ স্নায়ু □/ চেষ্টীয় স্নায়ু □/ মিশ্র স্নায়ু □।
13. আলোক প্রতিবর্ত—উপরিগত □/ গভীর □/ ভিসেরাল (আন্তরযন্ত্রীয়) □ প্রতিবর্তের উদাহরণ।
14. দুটি নিউরোন দ্বারা গঠিত প্রতিবর্ত চাপকে বলে—ডাইসাইন্যাপটিক □/ মনোসাইন্যাপটিক □/ আসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপ □।
15. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানগুলি হল—মস্তিষ্ক ও করোটি স্নায়ু □/ সুষুম্নাকাণ্ড ও সুষুম্না স্নায়ু □/ করোটি স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়ু □/ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড □।
16. স্বতঃস্ফূর্ত স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ?—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র □/ প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র □/ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র □/ সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্র □।
17. শ্বেতবস্তু কী দিয়ে গঠিত হয় ?—স্নায়ুকোশ □/ স্নায়ুতন্তু □/ এপেনডাইমাল কোশ □/ কোনোটিই নয় □।
18. ধূসর বস্তু কী দিয়ে গঠিত হয় ?—এপেনডাইমাল কোশ □/ স্নায়ুকোশ □/ স্নায়ুতন্তু □/ নিজল্ দানা □।
19. মস্তিষ্কের সব থেকে বাইরের আবরণীকে কী বলে ?—পায়াম্যাটার □/ ডুরাম্যাটার □/ করোয়েড □/ অ্যারাকনয়েড □।
20. প্রতিটি গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধ কোন্ কোন্ অঞ্চলে (লোবে) বিভক্ত হয় ?—ফ্রন্টাল ও প্যারাইটাল লোব □/ প্যারাইটাল, টেম্পোরাল ও অক্সিপিটাল লোব □/ ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল ও টেম্পোরাল লোব □/ ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিটাল লোব এবং লিম্বিক অঞ্চল □।
21. গুরুমস্তিষ্ক কোন্ কাজের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে ?—চিন্তা □/ স্বাদ □/ গন্ধ □/ সবগুলোই □।
22. সেরিব্রাম মস্তিষ্কের কোন্ অংশে থাকে ?—মস্তিষ্কের নীচের দিকে □/ মস্তিষ্কের প্রসারিত অংশ □/ মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ অংশ □/ কোনোটিই নয় □।
23. দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের অংশটি হল—ফ্রন্টাল লোব □/ প্যারাইটাল লোব □/ টেম্পোরাল লোব □/ অক্সিপিটাল লোব □।
24. লঘুমস্তিষ্কের প্রধান কাজ হল—ভারসাম্য রক্ষা করা □/ দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখা □/ শ্রবণে সাহায্য করা □/ বাক্ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা □।
25. অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াসের অপর নাম হল—অ্যাকোয়াস কক্ষ □/ কেন্দ্রীয় নালিকা □/ ফোরামেন অফ মনরো □/ ইটার □।
26. মস্তিষ্কের তৃতীয় নিলয় ও চতুর্থ নিলয় কার দ্বারা সংযুক্ত থাকে ?—ফোরামেন অফ মনরো □/ নিউর‍্যাল ক্যানাল □/ ইটার □/ কোনোটিই নয় □।

27. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যে তরলপদার্থ থাকে তাকে কী বলে ?—সেরিব্রাল ফ্লুইড □/ সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড □/ স্পাইন্যাল ফ্লুইড □/ কলারস □।
28. সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডের প্রধান কাজ হল—মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে পুষ্টি জোগান দেওয়া □/ বাহ্যিক আঘাত থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা □/ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আর্দ্র রাখা □/ উপরের সবগুলি □।
29. হাইপোথ্যালামাস কোন্ কাজে সহায়তা করে ?—ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে □/ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কেন্দ্র □/ দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে □/ উপরের সবগুলি □।
30. প্রতিবর্ত চাপ কীভাবে সৃষ্টি হয় ?—মস্তিষ্ক — সুষুম্নাকাণ্ড — পেশি □/ গ্রাহক — সুষুম্নাকাণ্ড — পেশি □/ পেশি — গ্রাহক — মস্তিষ্ক □/ পেশি — সুষুম্নাকাণ্ড — গ্রাহক □।
31. সাইন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ুর আবেগ প্রেরণ কীভাবে ঘটে ?—একমুখী □/ দ্বিমুখী □/ বহুমুখী □/ কোনোটিই নয় □।
32. মানুষের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চলটি হল—ত্বক □/ ডায়েনকেফালন □/ হাইপোথ্যালামাস □/ পিটুইটারি □।
33. সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন অংশের নাম নীচ থেকে উপরের দিকে হল—থোরাসিক → সারভাইক্যাল → লাম্বার → স্যাক্রাল □/ স্যাক্রাল → থোরাসিক → সারভাইক্যাল → লাম্বার □/ স্যাক্রাল → লাম্বার → থোরাসিক → সারভাইক্যাল □/ কোনোটিই নয় □।
34. মানুষের করোটি স্নায়ুর সংখ্যা হল—10 জোড়া □/ 14 জোড়া □/ 8 জোড়া □/ 12 জোড়া □।
35. প্রথম করোটি স্নায়ুর নাম হল—অডিটরি □/ অপটিক □/ অলফ্যাক্টরি □/ ট্রাইজেমিন্যাল □।
36. সংজ্ঞাবহ করোটি স্নায়ুর সংখ্যা হল—3 □/ 5 □/ 4 □/ 2 □
37. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দেহের ভেতরে কী নিয়ন্ত্রণ করে ?—প্রতিবর্ত ক্রিয়া □/ সংজ্ঞাবহ অঙ্গ □/ অভ্যন্তরীণ অঙ্গ □/ কঙ্কাল পেশি □।
38. প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র কোন্ অঙ্গাগুলির কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় ?—হৃৎপিণ্ড, অ্যাড্রিন্যাল ও স্বেদগ্রন্থি □/ ল্যাক্রিম্যাল ও স্বেদগ্রন্থি □/ হৃৎপিণ্ড, অগ্ন্যাশয় ও ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থি □/ অন্ত্র, কনীনিকা ও মূত্রাশয় □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুকোশ এবং ——— নামে অবলম্বনকারী কোশ নিয়ে গঠিত।
2. দেহের বাইরে এবং ভেতরের পরিবেশের মারাত্মক পরিবর্তন সত্ত্বেও দেহের বিভিন্ন কাজের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে বলে স্নায়ুতন্ত্রকে দেহের ——— বলে।
3. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক এবং ——— নিয়ে গঠিত।
4. মস্তিষ্কের CSF পূর্ণ প্রকোষ্ঠকে ——— বলে।
5. স্নায়ুতন্ত্রের সর্ববৃহৎ অংশ যা করোটির মধ্যে থাকে তাকে ——— বলে।
6. ——— হল প্রশস্ত স্নায়ুগুচ্ছ যা গুরুমস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
7. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে অংশটি লঘুমস্তিষ্কের সামনে ও সুষুম্নাশীর্ষকের উপরে থাকে তাকে ——— বলে।
8. ——— হল পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ যা পনস ও সুষুম্না শীর্ষকের পেছনে থাকে।
9. সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা স্থানটিকে ——— বলে।
10. মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরে যে তিনটি আবরক থাকে তাকে ——— বলে।
11. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র 12 জোড়া করোটি স্নায়ু এবং ——— জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।
12. যে প্রতিবর্ত জন্মের সময় থেকে থাকে তাকে ——— প্রতিবর্ত বলে।
13. সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের ——— খণ্ড এবং ——— খণ্ড থেকে নির্গত হয়েছে।
14. প্রতিবর্ত ক্রিয়া যে স্নায়ুপথের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে ——— বলে।
15. প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে তারারন্ধ্রের ——— ঘটে।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answer to fill in the blanks) :

1. একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মস্তিষ্কের গড় ওজন ——— গ্রাম। (870 / 980 / 1380 / 1500)।
2. গুরুমস্তিষ্কের প্রতি গোলার্ধে যে লোবে দৃষ্টিকেন্দ্র থাকে তার নাম ———। (ফ্রন্টাল লোব / প্যারাইটাল লোব / অক্সিপিটাল লোব / টেম্পোরাল লোব)।
3. প্রাপ্তবয়স্ক লোকের লঘুমস্তিষ্কের ওজন ——— গ্রাম। (450 / 350 / 250 / 150)।
4. মস্তিষ্কের ——— দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। (গুরুমস্তিষ্ক / লঘুমস্তিষ্ক / মধ্যমস্তিষ্ক / রেখমস্তিষ্ক)।
5. মানব মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠের (ভেন্টিকলের) সংখ্যা ———টি। (2টি / 3টি / 4টি / 5টি)।
6. একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের CSF-এর পরিমাণ ———। (100 ml / 150 ml / 250 ml / 500 ml)।
7. মানবদেহে সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা ——— জোড়া। (30 / 31 / 32 / 33)।
8. মানুষের 43 জোড়া প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্বর মধ্যে করোটি স্নায়ুর সংখ্যা ——— জোড়া। (10 / 12 / 14 / 16)।
9. দশম করোটি স্নায়ুর নাম ——— স্নায়ু। (হাইপোগ্লোসাল / অডিটরি / ভেগাস / গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল)।

10. ——— হল মেনিনজেসের একেবারে বাইরের স্তর। (পায়মেটার / ডুরামেটার / অ্যারাকনয়েড মেটার / গ্রেমেটার)
11. প্যাভলভ যে প্রতিবর্তের পরীক্ষা করেন তার নাম হল ——— প্রতিবর্ত। (সাধারণ / অভ্যাস নির্ভর / ডাইসাইন্যাপটিক / হাঁটু ঝাকুনি)।
12. যে স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দিকে স্নায়ু আবেগ বহন করে তাকে বলে ——— স্নায়ু। (সংজ্ঞাবহ / চেষ্টীয় / মিশ্র)।
13. মানবদেহে মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা ———। (দুটি / তিনটি / চারটি / পাঁচটি)।
14. স্বাভাবিক উচ্চতাসম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক লোকের সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য ———। (45 সেমি / 35 সেমি / 25 সেমি / 15 সেমি)।
15. প্রতিটি সুষুম্না স্নায়ু ——— জাতীয়। (সংজ্ঞাবহ / চেষ্টীয় / মিশ্র)।

### E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হল মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, করোটি সুষুম্না স্নায়ু। ☐
2. ফোরামেন অফ মনরো নামে বিবরে মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ☐
3. সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পায়ামেটার, অ্যারকনয়েড মেটার এবং ডুরা মেটার নামে তিনটি তন্তুময় আবরক দিয়ে আবৃত থাকে। ☐
4. মস্তিষ্কের বাইরের দিকে ধূসর বস্তু এবং ভিতরের দিকে শ্বেতবস্তু থাকে। ☐
5. মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ মস্তিষ্ক মেরু রস নামে পরিবর্তিত কলা রস দিয়ে পূর্ণ থাকে। ☐
6. ফ্রন্টাল লোবে চেষ্টীয় অঞ্চল থাকে যা অস্থি পেশির কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ☐
7. গুরুমস্তিষ্কে অক্সিপিটাল লোব দর্শন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ☐
8. থ্যালামাসের প্রধান কাজ হল দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করা। ☐
9. হাইপোথ্যালামাস স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ☐
10. লঘুমস্তিষ্কের প্রধান কাজ বুদ্ধি, বিবেচনা, সংকল্প, মনঃসংযোগ, পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ☐
11. অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস মস্তিষ্কের চতুর্থ প্রকোষ্ঠের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয়নালিকে যুক্ত রাখে। ☐
12. সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান কাজটি হল প্রতিবর্ত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। ☐
13. প্রান্তীয় স্নায়ু 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু এবং 12 জোড়া করোটি স্নায়ু মোট 43 জোড়া স্নায়ু নিয়ে গঠিত। ☐
14. প্রতিটি সুষুম্না স্নায়ু চেষ্টীয়। ☐
15. যে স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু আবেগ দেহের প্রান্তভাগে যায় তাকে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলে। ☐
16. সংজ্ঞাবহ করোটি স্নায়ুর সংখ্যা পাঁচটি। ☐
17. মিশ্র করোটি স্নায়ুর সংখ্যা চারটি। ☐
18. তৃতীয় করোটি স্নায়ুর নাম অপটিক স্নায়ু। ☐
19. সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার ফলে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনৈচ্ছিক কাজ দেহে সংঘটিত হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। ☐
20. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. প্রতিবর্ত ক্রিয়া কয় প্রকার ও কী কী ?
2. প্রতিবর্ত চাপ কী ?
3. গুরুমস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠগুলির নাম কী ?
4. মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠ যে তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে কী বলে ?
5. গুরুমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের কোন্ ভাগের অন্তর্গত ?
6. লঘুমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের কোন্ ভাগের অন্তর্গত ?
7. তোমার মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশটির নাম কী ?
8. গুরুমস্তিষ্কের প্রতিটি গোলার্ধের বিভিন্ন অংশের নাম কী ?
9. পনস্ থেকে কোন্ কোন্ করোটি স্নায়ু উৎপন্ন হয়েছে ?
10. যাবতীয় স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র কোন্‌টি ?
11. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র কোথায় থাকে ?
12. দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ?
13. সুষুম্নাকাণ্ড কোন্ অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ?
14. সুষুম্নাকাণ্ডের শেষ প্রান্তের অংশটির নাম কী ?
15. তোমার দেহে কয় জোড়া প্রান্তীয় স্নায়ু আছে?
16. সুষুম্না স্নায়ুকে মিশ্র স্নায়ু বলা হয় কেন ?
17. তোমার দেহে করোটি স্নায়ুর সংখ্যা কত ?
18. ভেগাস কী প্রকার স্নায়ু ?
19. সহজাত প্রতিবর্ত কাকে বলে ?
20. অভ্যাসনির্ভর প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ? এর শ্রেণিবিন্যাস করো।
2. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করো।
3. মানুষের গুরুমস্তিষ্কের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
4. রেখমস্তিষ্কের কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

5. থ্যালামাস কাকে বলে ? থ্যালামাসের কার্যাবলি লেখো।
6. পন্‌সের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
7. সুষুম্নাশীর্ষক মস্তিষ্কের কোন্ ভাগের অন্তর্গত ? এর প্রধান কার্যাবলির বিবরণ দাও।
8. সুষুম্নাকাণ্ড কোথায় থাকে ? এর প্রস্থচ্ছেদের চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো।
9. সুষুম্নাকাণ্ডকে ক্রিয়াগতভাবে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী ?
10. তোমার দেহে সুষুম্না স্নায়ুর মোট সংখ্যা কত ? এদের গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
11. করোটি স্নায়ু কাকে বলে ? এদের সংখ্যা কত এবং কী কী ?
12. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কোন্ তন্ত্রের অন্তর্গত ? এর শ্রেণিবিন্যাস করো।
13. রিফ্লেক্স অ্যাক্সন কাকে বলে ?
14. সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কী তা উল্লেখ করো।

### B. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) ঃ

1. গুরুমস্তিষ্ক এবং লঘুমস্তিষ্ক। 2. হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল এবং মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল। 3. ধূসর বস্তু এবং শ্বেতবস্তু। 4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। 5. করোটি স্নায়ু এবং সুষুম্না স্নায়ু। 6. সহজাত প্রতিবর্ত এবং স্বোপার্জিত প্রতিবর্ত। 7. মেরুদণ্ডীয় গ্যাংগ্লিয়া এবং প্রাক-মেরুদণ্ডীয় গ্যাংগ্লিয়া। 8. সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র এবং প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র। 9. সোমাটিক গ্যাংগ্লিয়া এবং স্বয়ংক্রিয় গ্যাংগ্লিয়া।

### C. টিকা লেখো (Write Short notes) ঃ

1. CSF, 2. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল, 3. থ্যালামাস, 4. সুষুম্নাস্নায়ু 5. সিম্‌প্যাথেটিক নার্ভ, 6. প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক নার্ভ।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) ঃ

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) ঃ

1. (a) স্নায়ুতন্ত্রকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় ? (b) প্রতিটি ভাগের সম্বন্ধে যা জানো বিশদভাবে লেখো।
2. (a) স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ? (b) মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস করো ও একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।
3. (a) গুরুমস্তিষ্কের লোব এবং লোবে অবস্থিত স্নায়ুখাঁজের নাম করো। (b) তোমার গুরুমস্তিষ্কের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
4. সেরিব্রাল কর্টেক্সের গঠন ও কাজের বর্ণনা করো।
5. (a) থ্যালামাস মস্তিষ্কের কোন্ ভাগের অন্তর্গত ? (b) এর গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
6. (a) লঘুমস্তিষ্কের গঠন বর্ণনা করো। (b) তোমার দেহে লঘুমস্তিষ্ক যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
7. সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষদেশীয় খণ্ডাংশের প্রস্থচ্ছেদে দেখা আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
8. (a) সুষুম্নাস্নায়ু বলতে কী বোঝো ? (b) এর সংখ্যা, গঠন এবং কার্যাবলি আলোচনা করো।
9. (a) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ? (b) এটি মানুষের শরীরে কী কী কাজে লাগে তা বর্ণনা করো।
10. (a) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ? (b) এই স্নায়ুতন্ত্রের যে-কোনো একটি উপবিভাগের বর্ণনা দাও।
11. মানুষের শরীরের সমবেদী (সিমপ্যাথেটিক) নার্ভতন্তু-র কাজ কী কী তা বর্ণনা করো।
12. (a) প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে ? (b) উপযুক্ত চিত্রসহ প্রতিবর্ত চাপের বর্ণনা করো।
13. (a) সহজাত প্রতিবর্ত ও স্বোপার্জিত প্রতিবর্ত কাকে বলে ? (b) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার যে-কোনো তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দাও।
14. সহজাত প্রতিবর্ত ও অভ্যাসনির্ভর প্রতিবর্তের মধ্যে কী পার্থক্য লক্ষ করে তার বর্ণনা দাও।
15. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। প্রতিবর্ত চাপ (Reflex arc) কী কী প্রকারের হয় ?
16. (a) মস্তিষ্ক মেরুরস কাকে বলে ? (b) এর উপাদান এবং কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
17. প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে কী বোঝো ? আলোচনা করো।
18. (a) প্রতিবর্ত চাপ কাকে বলে ? (b) একটি ডাইসাইন্যাপ্‌টিক প্রতিবর্তের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা করো।
19. (a) মস্তিষ্ক মেরুরস কী ? (b) মস্তিষ্ক মেরুরস কোথায় তৈরি হয় ? (c) এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলো।
20. (a) শ্বেতবস্তু ও ধূসর বস্তু বলতে কী বোঝো ? (b) স্নায়ুতন্ত্রে এদের অবস্থান সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করো। (c) মেনিনজেস কাকে বলে ?

### B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the following) ঃ

1. এক গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধ এঁকে বিভিন্ন লোবের চিহ্নিত চিত্র আঁকো। 2. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি সরল চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো। 3. একটি ডাইসাইন্যাপটিক প্রতিবর্ত চাপ এঁকে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করো। 4. সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র
# [ ENDOCRINE SYSTEM ]

## ➧ ভূমিকা (Introduction) ঃ

বিবর্তনের ফলে বহুকোশী উচ্চতর জীবের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এদের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সেগুলির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহে একপ্রকার দেহকলা থেকে অপর দেহকলায় সংবাদ প্রেরণের জন্য দু'রকমের ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হল **স্নায়ুজ ব্যবস্থা**— যা দিয়ে দেহের এক স্থানের সংবাদ **অতি দ্রুত** (বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো) অপর স্থানে পৌঁছায় এবং এতে বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়টি হল **রক্তবাহিত রাসায়নিক ব্যবস্থা**—যাতে কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থি থেকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থসমূহ রক্তে ক্ষরিত হয়ে সারা দেহে বাহিত হয় এবং নির্দিষ্ট কলাকোশ সমূহের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

হরমোন শব্দটি *'Hormaein'* গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে এবং এর অর্থ হল উদ্দীপিত বা জাগ্রত বা সক্রিয় করা। পরে বিজ্ঞানী **স্যার ই. স্যারপে শ্যেফার** (Sir E. Sharpey Schafer) বলেন যে, সব রক্ত বাহিত **রাসায়নিক দূত** (Chemical messenger)-গুলিকে **হরমোন** বলা যুক্তিসংগত নয় কারণ এরা সবক্ষেত্রে উদ্দীপকধর্মী ক্রিয়া করে না এবং নানা ক্ষেত্রে অবরোধধর্মী বা নিষ্ক্রিয়কারী বস্তু (Inhibitory or Inactivating agent) হিসাবেও কাজ করে। তিনি সমস্ত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক বস্তুগুলির জন্য **অটাকয়েড** (Autacoid = Self produced drug) নাম প্রস্তাব করেন এবং এদের মধ্যে উদ্দীপকধর্মী বস্তুগুলিকে **হরমোন** ও অবরোধধর্মী বস্তুগুলিকে **ক্যালোন** (Chalone) নাম দেন। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সুপ্রযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও এখনও উদ্দীপক ও অবরোধক উভয় প্রকার বস্তুকেই হরমোন বলা হয়।

## 7.1. হরমোন (Hormones)

### • হরমোনের আবিষ্কর্তা ও প্রথম আবিষ্কৃত হরমোনের নাম •

1902 খ্রিস্টাব্দে **বেলিস ও স্টারলিং** (Bayliss and Starling) নামে দুজন ইংরেজ বিজ্ঞানী এজাতীয় রক্তবাহিত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক পদার্থ সম্বন্ধে পরীক্ষার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপিত করেন। তাঁরা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে পাকস্থলী থেকে অম্ল মিশ্রিত আংশিক পাচিত খাদ্যবস্তু ডিওডিনামে প্রবেশ করলে ডিওডিনামে শ্লেষ্মাস্তর থেকে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ রক্তে ক্ষরিত হয়, যা সংবহনের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ে এসে অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। 1905 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **স্টারলিং** এই রাসায়নিক বস্তুটির নাম দেন— **সিক্রিটিন** (Secretin অর্থাৎ যা ক্ষরণ করায়) এবং এই জাতীয় রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক বস্তুগুলিকে **'হরমোন'** নামে চিহ্নিত করেন। **সুতরাং 'সিক্রিটিন'ই প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন।**

আগে ধারণা ছিল যে প্রাণীদেহে হরমোন ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ঘটে এবং হরমোনসমূহের ক্রিয়া স্নায়ুর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু পরে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেছে যে, স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনসমূহের ক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এই দুটির সমন্বয়ের ফলেই দেহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকে। বিভিন্ন হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে স্নায়ুতন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, আবার হরমোনসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি হরমোন ক্ষরণও করে।

### • অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের এবং উদ্ভিদের হরমোন •

1. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো বিভিন্ন **অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের** মধ্যেও হরমোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি নিউরোসিক্রিশন (Neurosecretion) কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের স্নায়ুতন্ত্র থেকে হরমোনগুলি ক্ষরিত হয়।
2. প্রাণীদের মতো **উদ্ভিদদেহেও** হরমোন পাওয়া গেছে, যেমন—অক্সিন, জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন ইত্যাদি। উদ্ভিদে স্নায়ুতন্ত্র থাকে না বলে হরমোনগুলিই একমাত্র অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধক হিসাবে কার্য করে।

## ▲ হরমোনের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিন্যাস এবং বৈশিষ্ট্য (Definition, Classification and Characteristics of Hormone) :

❖ (a) **হরমোনের সংজ্ঞা (Definition of Hormone) : যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ প্রাণীদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে বা কোশসমূহ থেকে নিঃসৃত হয়ে নির্দিষ্ট উপায়ে দেহ তরলের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সাধারণত উৎপত্তিস্থান থেকে দূরে সীমিত বা বিস্তৃত অঞ্চলের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে।**

(b) **হরমোনের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Hormone) :** রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে প্রাণী হরমোনকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

1. **পলিপেপটাইড (প্রোটিন) হরমোন**—বহু অ্যামাইনো অ্যাসিড পরস্পর পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড (প্রোটিন) জাতীয় হরমোন তৈরি করে। **উদাহরণ**— ইনসুলিন, STH, ACTH, ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন।
2. **সংযুক্ত প্রোটিন হরমোন**—এইসব হরমোন **গ্লাইকোপ্রোটিন** জাতীয় বস্তু। **উদাহরণ**— TSH, FSH, LH ইত্যাদি।
3. **অ্যামাইন হরমোন**—এই জাতীয় হরমোন টাইরোসিন এবং ট্রিপটোফ্যান নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**—থাইরয়েড হরমোন (থাইরক্সিন, ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন) ও ক্যাটাকোলামাইন (এপিনেফ্রিন ও নরএপিনেফ্রিন), পিনিয়াল গ্রন্থির হরমোন (মেলাটোনিন)।
4. **স্টেরয়েড হরমোন**—কতকগুলি হরমোন স্টেরয়েড (লব্ধ ফ্যাট) জাতীয় যা কোলেস্টেরল থেকে উৎপন্ন হয়। **উদাহরণ**—অ্যাড্রিনাল কর্টিকয়েড হরমোন এবং যৌন হরমোন—টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন।
5. **ফ্যাটি অ্যাসিড লব্ধ হরমোন**—প্রোস্টাগ্লানডিন নামে দেহের বিভিন্ন কলাকোশ থেকে উৎপন্ন একপ্রকার হরমোন।

(c) **প্রাণী হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Animal hormone) :**

(i) হরমোন একপ্রকার জটিল জৈব যৌগ যা একটি নির্দিষ্ট কোশ বা কোশপুঞ্জ কিংবা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়।

(ii) হরমোন অতি সহজেই কোশঝিল্লি বা রক্তনালির ভিতরের অন্তরাবরণী কলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।
(iii) হরমোন খুব স্বল্প মাত্রায় কাজ করে। প্রয়োজনের তুলনায় কম অথবা বেশি ক্ষরিত হলে জীবদেহে অস্বাভাবিকতা ঘটায়।
(iv) হরমোন যে গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয় সাময়িকভাবে সেই গ্রন্থিতেই জমা থাকে।
(v) হরমোন ধীরগতিতে কাজ করে এবং ধীর গতিতে বিনষ্ট হয়।
(vi) অধিকাংশ হরমোন উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে। কিন্তু স্থানীয় হরমোন উৎপত্তিস্থলেই ক্রিয়াশীল।
(vii) জীবদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলে হরমোনকে জীবদেহের **রাসায়নিক সমন্বয় সাধক** (Chemical co-ordinator) বলে।
(viii) কাজ শেষ হলে হরমোন বিনষ্ট হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।
(ix) কোনো একটি বিশেষ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ ক্রিয়া পরোক্ষভাবে অন্য গ্রন্থির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকে **ফিড ব্যাক** (Feed back) পদ্ধতি বলে।

## ❂ 7.2. হরমোন ক্রিয়ার মৌলিক ধারণা ❂
## (Elementary idea of Hormone action)

হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রধানত তিন প্রকারের হয়, যেমন—প্রোটিন হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন এবং অ্যামাইন হরমোন। দেহে এদের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিম্নপ্রকারের হয়।

❑ **1. প্রোটিন হরমোনের ক্রিয়া (Action of Protein hormones) :** (i) **বিপাকীয় কাজ**— হরমোন কোশের রাসায়নিক পরিবর্তনের হারকে উদ্দীপিত বা হ্রাস করে কোশের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন (সংশ্লেষণ) বা ভাঙন (বিশ্লেষণ) ঘটায়, **যেমন**— ইনসুলিন গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে। অন্যদিকে দেহের প্রায় অন্য সব হরমোন গ্লাইকোজেনকে বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজে পরিণত করে। এছাড়া দেহে খনিজ লবণের বিপাকের জন্য বিভিন্ন হরমোন দায়ী, যেমন—প্যারাথোরমোন ও থাইরোক্যালসিটোনিন ক্যালশিয়ামের বিপাকে, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের মিনের‍্যালোকর্টিকয়েড NaCl, $PO_4$ ইত্যাদি বিপাকে অংশ নেয়। (ii) **বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ**—মানুষের কতকগুলি হরমোন সমগ্র দেহের কিংবা দেহের কোনো-না-কোনো অংশের বৃদ্ধি এবং পরিস্ফুরণ ঘটায়, **উদাহরণ**—STH এবং যৌন হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি ঘটায়।

❑ **2. স্টেরয়েড হরমোনের ক্রিয়া (Action of Steroid hormones) :** (i) **প্রাণীর ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ**— কতকগুলি হরমোন, যেমন—অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের **স্টেরয়েড হরমোন** মানুষের (প্রাণীর) ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যাড্রিনালিন প্রাণীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) **স্টেরয়েড হরমোন, যেমন**—ইস্টোজেন, প্রজেস্টেরন এবং টেস্টোস্টেরন স্টেরয়েড জাতীয় হরমোনগুলি **প্রজনন কাজে** অংশ নেয়।

❑ **3. অ্যামাইন হরমোনের ক্রিয়া (Action of Amine hormones) :** এই প্রকার হরমোনগুলি সাধারণত টাইরোসিন এবং ট্রিপটোফ্যান নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপাদিত হয়, যেমন—টাইরোসিন থেকে থাইরক্সিন এবং ট্রাইআয়োডো-থাইরোনিন নামে থাইরয়েড হরমোন এবং ট্রিপটোফ্যান থেকে এপিনেফ্রিন এবং নরএপিনেফ্রিন নামে হরমোন উৎপন্ন হয়। **থাইরয়েড হরমোন**— দেহে শক্তি উৎপন্ন করে, দেহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, মানসিক আবেগের জন্য দায়ী। এছাড়া ব্যাঙাচিকে ব্যাঙে রূপান্তরে (Metamorphosis) সাহায্য করে। এপিনেফ্রিন এবং নরএপিনেফ্রিন—দেহের আপৎকালীন হরমোন নামে পরিচিত।

### ➤ হরমোনের কার্য পদ্ধতি (Mechanism of functions of Hormones) :

হরমোন যে অঙ্গে কাজ করে তাকে **পোষক গ্রন্থি** বা **লক্ষ্য-অঙ্গ** (Target organ) বলে। প্রতিটি হরমোনের জন্য তার লক্ষ্য-অঙ্গের কলাকোশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওই নির্দিষ্ট কলাকোশে তিন ভাবে ক্রিয়া করে।

1. **কোশঝিল্লির ভেদ্যতার উপর ক্রিয়া**—কোনো কোনো হরমোন টারগেট-কোশের (Target cell) ঝিল্লির ভেদ্যতা বাড়িয়ে তার কাজ সম্পন্ন করে। **উদাহরণ**—(i) **ইনসুলিন** গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য কোশঝিল্লির ভেদ্যতাকে বাড়ায়। (ii) **ADH** বৃক্কনালির অন্তঃগাত্রস্থিত আবরণী কলাকোশের ঝিল্লির ভেদ্যতাকে বাড়িয়ে জলের পুনঃশোষণে সাহায্য করে।

2. **কোশীয় সাইক্লিক AMP (Cellular Cyclic AMP)-এর ক্রিয়া**—প্রোটিন, পলিপেপটাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড-জাতীয় হরমোনগুলি টারগেট-কোশের (পোষক কোশের) ঝিল্লিতে অবস্থিত নির্দিষ্ট গ্রাহকের সঙ্গে আবদ্ধ হয়। ফলে ওই

কোশঝিল্লির **অ্যাডিনিল সাইক্লেজ** (Adenyl cyclase) নামে উৎসেচকটি সক্রিয় হয়। এই সক্রিয় উৎসেচক ATP-কে বিশ্লেষিত করে **সাইক্লিক অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট** (Cyclic-AMP) নামে যৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগটি এরপর কোশের ভিতরে বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়াকে বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে হরমোনের কার্য সম্পন্ন করে। এই কারণে হরমোনকে **'প্রথম রাসায়নিক বার্তাবহ'** (First chemical messenger) এবং সাইক্লিক (Cyclic) AMP-কে **'দ্বিতীয় রাসায়নিক বার্তাবহ'** (Second chemical messenger) বলে।

3. **জিন-ঘটিত ক্রিয়া**—কোনো কোনো হরমোন টারগেট-অঙ্গের কলাকোশের নিউক্লিয়াসের মধ্যে গিয়ে নির্দিষ্ট জিনকে প্রভাবিত করে ও এর মাধ্যমে প্রোটিনের (প্রধানত উৎসেচকের) সংশ্লেষণ ঘটায়। এর ফলে এই হরমোনগুলির কাজ সম্পন্ন হয়। **উদাহরণ**—স্টেরয়েড-জাতীয় হরমোন।

## 7.3. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland)

### ▲ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং বৈশিষ্ট্য (Definition, Examples and Characteristic features of Endocrine glands) :

ক্ষরণ পদ্ধতি এবং গ্রন্থিতে নালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুযায়ী গ্রন্থিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা— **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড, বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড** এবং **মিশ্র গ্রন্থি**।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব নালিবিহীন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তরল (হরমোন) ভৌত প্রক্রিয়ায় সরাসরি রক্তে মিশ্রিত হয়, সেই গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা অনাল গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলে।**

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির গ্রন্থিকোশ থেকে নিঃসৃত হরমোন সরাসরি রক্তের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্রিয়াস্থান পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়।

(b) **উদাহরণ (Examples) :** অগ্র ও পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, থাইমাস, পিনিয়াল বডি, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেট্‌স অফ ল্যাংগারহ্যানস প্রভৃতি।

(c) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Endocrine gland) :**

(i) পশ্চাৎ পিটুইটারি ছাড়া প্রায় বাকি সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সুসংবদ্ধ কোশপুঞ্জ নিয়ে গঠিত।
(ii) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নালিবিহীন হয়। এই ধরনের গ্রন্থি নিঃসৃত তরল ব্যাপন বা অন্য কোনো ভৌত প্রক্রিয়ায় রক্তে যায়।
(iii) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোশঝিল্লি ও রক্তবাহের প্রাচীর খুবই পাতলা হয়, ফলে হরমোন সহজেই সরাসরি রক্তে যেতে পারে।
(iv) কোনো কোনো গ্রন্থি যেমন— অগ্ন্যাশয়, শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় অন্তঃক্ষরা এবং বহিঃক্ষরা হিসাবে কাজ করে।
(v) কোনো কোনো গ্রন্থির স্থায়িত্বকাল সাময়িক হয়, যেমন—থাইমাস (ভ্রূণ অবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত)।

### ❂ বহিঃক্ষরা, অন্তঃক্ষরা ও মিশ্র গ্রন্থি (Exocrine, Endocrine and Mixed glands) ❂

ক্ষরণ পদ্ধতি এবং গ্রন্থিতে নালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুযায়ী গ্রন্থিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (Exocrine gland) : যেসব গ্রন্থি নালিযুক্ত হয় তাদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা সনাল গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড** বলে। এদের নিঃসৃত পদার্থ **উৎসেচক, রস বা জুস** (Juice) বা অন্যান্য নামে যেমন ঘাম, দুধ, সেবাম নামে পরিচিত। গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এই সব তরল **গ্রন্থিনালি** ও **ক্ষরণনালির** মাধ্যমে ক্রিয়াস্থানে পৌঁছায়। **উদাহরণ**—লালাগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, যকৃৎ প্রভৃতি।
2. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine gland ; *Endo* = অন্তঃস্থ, *Crinos* = ক্ষরণ) : যেসব গ্রন্থি নালিবিহীন হয় তাদের **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বা **অনাল গ্রন্থি** বা **এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড** বলে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থ **হরমোন** (Hormone) নামে পরিচিত। হরমোন গ্রন্থিকোশ থেকে ক্ষরিত হয়ে **সরাসরি রক্তের মধ্যে যায়**। রক্ত হরমোনকে তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াস্থান পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। **উদাহরণ**—থাইরয়েড গ্রন্থি, পিটুইটারি গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি প্রভৃতি।
3. **মিশ্র গ্রন্থি** (Mixed gland) : যেসব গ্রন্থি **বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** কোশ নিয়ে গঠিত হয় তাদের **মিশ্র গ্রন্থি** বলে। মিশ্র গ্রন্থি থেকে দু'প্রকার তরল **রস** এবং **হরমোন** নিঃসৃত হয়। **উদাহরণ**—অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি। এছাড়া শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়কেও মিশ্রগ্রন্থি বলে মনে করা হয়, কারণ এগুলি জনন কোশ উৎপাদন এবং হরমোন ক্ষরণ করে।

■ **মানুষের দেহে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান (Location of different Endocrine Glands in human body) ঃ**
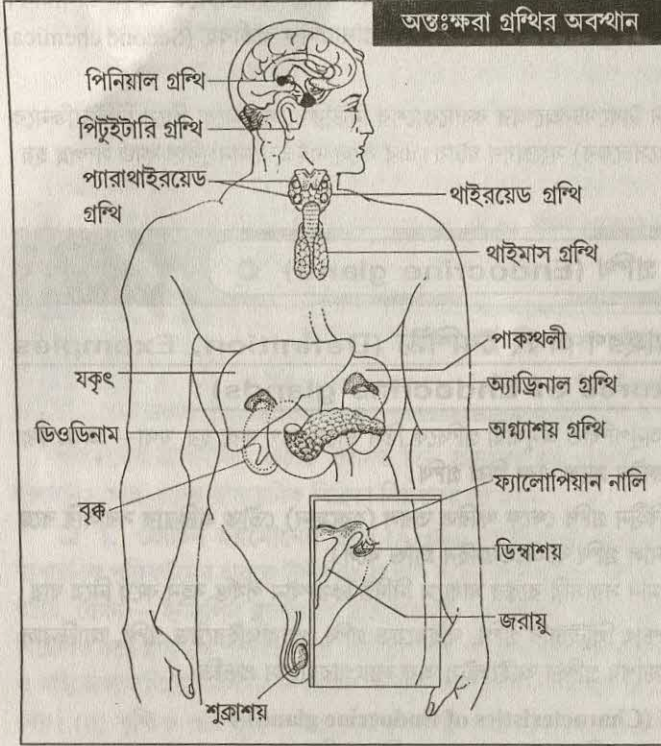
চিত্র 7.1 ঃ মানুষের দেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের গ্রন্থির অবস্থানের চিত্ররূপ।

1. **পিটুইটারি গ্রন্থি (হাইপোফাইসিস)**—মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের তলদেশে **স্ফেনয়েড** অস্থির **সেলা টারসিকা** নামে অস্থিগহ্বরে থাকে।
2. **পিনিয়াল গ্রন্থি (এপিফাইসিস)**—মস্তিষ্কের করপাস ক্যালোসামের পেছনে, মস্তিষ্কের তৃতীয় নিলয়ের ছাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
3. **থাইমাস গ্রন্থি**—থাইরয়েড গ্রন্থির নীচে এবং শ্বাসনালির সামনে দ্বিলোবযুক্ত ফ্লাস্কের মতো দেখতে এই অস্থায়ী গ্রন্থিটি থাকে।
4. **থাইরয়েড গ্রন্থি**—শ্বাসনালির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের দু'পাশে থাইরয়েডের দুটি পার্শ্ব লোব থাকে।
5. **প্যারাথাইরয়েড**—থাইরয়েড গ্রন্থির প্রতিলোবের পিছনের অংশের উপরে ও নীচে অংশিক বা সম্পূর্ণ ডোবানো অবস্থায় একটি করে দুটি অর্থাৎ মোট দু'জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে।
6. **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি**—উদরগহ্বরে প্রতিটি **বৃক্কের উপরের** মেরুতে টুপির মতো অবস্থান করে। এর বাইরের অংশকে **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** এবং কেন্দ্রীয় অংশকে **অ্যাড্রিনাল মেডালা** বলে।
7. **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি**— পাকস্থলীর নীচে এবং ডিওডিনামের 'C' অক্ষরের লুপের অন্তর্বর্তী স্থানে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থাকে।
8. **শুক্রাশয়**—পুরুষের দেহের বাইরে দুটি উরুমূলের সংযোগস্থলে স্ক্রোটাম নামে থলির মধ্যে অবস্থান করে।
9. **ডিম্বাশয়**— স্ত্রীলোকের দেহের শ্রোণিগহ্বরের দু'পাশে দুটি মোটামুটি ডিম্বাকার ডিম্বাশয় অবস্থান করে।

● **মূল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ ছাড়াও দেহের অন্যান্য স্থান অথবা আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন ধরনের হরমোন ঃ**

| আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ | আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ থেকে ক্ষরিত হরমোন |
|---|---|
| 1. হৃৎপিণ্ড | —এট্রিয়াল নেট্রিইউরেটিক ফ্যাক্টর বা এট্রিয়াল নেট্রিউরেটিক হরমোন (Atrial natriuretic hormone) |
| 2. বৃক্ক | —রেনিন (Renin) এবং এরিথ্রোপয়েটিন (Erythropoietin) নামে হরমোন উৎপন্ন করে |
| 3. যকৃৎ | —সোমাটোমেডিন (Somatomedin) |
| 4. পাকস্থলী | —গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) |
| 5. ক্ষুদ্রান্ত্র | —সিক্রেটিন এবং কোলেসিস্টোকাইনিন-প্যানক্রিওজাইমিন (Secretin and CCk-PZ) |
| 6. লালাগ্রন্থি | —ব্রাডিকাইনিন (Bradykinin) |
| 7. ত্বক | —1, 25 ডাইহাইড্রোক্সি কোলেক্যালসিফেরোল (1, 25 Dihydroxycholecalciferol) |
| 8. মেদকলা | —লেপটিন (Leptin) |

## ⊙ 7.4. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary glands of man) ⊙

### ▲ পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান এবং গঠন (Location and Structure of Pituitary gland) :

(a) **অবস্থান** (Location) : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের (3rd Ventricle) তলদেশে **স্ফেনয়েড অস্থি** দিয়ে গঠিত **সেলা টারসিকা** (Sella turcica) নামে যে অস্থিগহ্বর গঠিত রয়েছে সেই গহ্বরের মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিটি **ইন্‌ফান্ডিবুলাম** নামে একটি ক্ষুদ্র বৃন্ত (Stalk) দিয়ে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের নীচের অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে পিটুইটারিকে **হাইপোফাইসিস** (Hypophysis) বলে।

চিত্র 7.2 : মস্তিষ্কে পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান এবং বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

(b) **গঠন** (Structure) : পিটুইটারি বা **হাইপোফাইসিস** গ্রন্থিটি একটি মটরের দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এর স্বাভাবিক ওজন প্রায় 0·5 গ্রাম হয়। শারীরস্থানের ভিত্তিতে (Anatomically) পিটুইটারিকে প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যেমন— **অগ্র পিটুইটারি** (Anterior pituitary) এবং **পশ্চাৎ পিটুইটারি** (Posterior pituitary)। উৎপত্তিগতভাবেও পিটুইটারিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়, যেমন— **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** (Adenohypophysis) এবং **নিউরোহাইপোফাইসিস** (Neurohypophysis)।

অগ্র পিটুইটারি বা **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** অংশটি গ্রন্থিময় অংশ যা ভ্রূণের মুখগহ্বর থেকে উৎপন্ন হয় ও সাধারণত গ্রন্থিময় কলাকোশ নিয়ে গঠিত। পশ্চাৎ পিটুইটারি বা **নিউরোহাইপোফাইসিস** অংশটি মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়। **মধ্য পিটুইটারি** (Intermediate pituitary) মানুষের শৈশব অবস্থায় সক্রিয় থাকলেও পরিণত বয়সে অগ্র ও পশ্চাৎ পিটুইটারি মধ্যবর্তী স্থানে একটি পাতলা ফিতার মতো অংশে পরিণত হয় এবং এর কোনো কার্যক্ষম থাকে না। পরিস্ফুরণের সময় এই অংশের কোশগুলি অগ্রপিটুইটারির কোশসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় ফলে পরিণত অবস্থায় পৃথক অংশ হিসেবে দেখা যায় না।

চিত্র 7.3 : পিটুইটারি গ্রন্থির পার্স ডিস্ট্যালিসের কলাস্থানিক গঠনের চিত্ররূপ।

### I. অগ্র পিটুইটারি (Anterior Pituitary)

1. **অগ্র পিটুইটারির শারীরস্থান** (**Anatomy of anterior pituitary**) : অগ্র পিটুইটারি প্রধানত বড়ো ও গোলাকার **পার্স ডিস্ট্যালিস** (Pars distalis) এবং নলাকার **পার্স টিউবার‍্যালিস** (Pars tuberalis) নিয়ে গঠিত। পার্স ডিস্ট্যালিস, মধ্য পিটুইটারি এবং পার্স টিউবার‍্যালিস সম্মিলিত ভাবে গ্রন্থিময় পিটুইটারি (অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস) গঠন করে।

2. **অগ্র পিটুইটারির কলাস্থানিক** (**Histological structure**) : পার্সডিস্টালিস হল অগ্রপিটুইটারির প্রধান অংশ কারণ এই অংশ থেকে বিভিন্ন প্রকার ট্রফিক হরমোন ক্ষরিত হয়। রঞ্জিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অগ্রপিটুইটারিতে দু'প্রকার কোশ দেখা যায়, যেমন—ক্রোমোফোব কোশ (50%) এবং ক্রোমোফিল কোশ (50%)। 1. **ক্রোমোফোব কোশ**—এগুলি অদানাদার, অনিঃস্রাবী, রঞ্জক-অনাসক্ত এবং সংরক্ষিত কোশ। 2. **ক্রোমোফিল কোশ**—এই কোশগুলি রঞ্জক-আসক্ত যার উপর নির্ভর করে এদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—অম্লাসক্ত (বা $\alpha$) কোশ এবং ক্ষারসক্ত (বা $\beta$) কোশ।
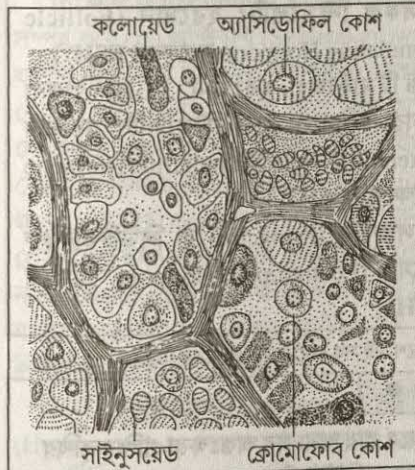
(1) **অম্লাসক্ত কোশ** (35%)—এই প্রকার কোশগুলি অম্লজাতীয় রঞ্জক দ্রবণে রঞ্জিত হয়। এই কারণে এদের অ্যাসিডোফিল কোশ বা আলফা কোশ বলে। এগুলি আবার দুটি ভাগে ভাগ হয়েছে, যেমন—**সোমাটোট্রোফিক কোশ** যা STH ক্ষরণ করে এবং **ল্যাকটোট্রোফিক কোশ** যা প্রোলাকটিন ক্ষরণ করে।

(2) **ক্ষারাসক্ত কোশ** (15%)—এইপ্রকার কোশগুলি ক্ষারজাতীয় রঞ্জন দ্রবণে রঞ্জিত হয়। এগুলি প্রধানত তিন প্রকার, যেমন—(i) **থাইরোট্রফিক কোশ** যা TSH ক্ষরণ করে, (ii) **অ্যাড্রিনোকোট্রফিক কোশ** যা ACTH ক্ষরণ করে এবং (iii) **গোনাডোট্রফিক কোশ** যা FSH ও LH ক্ষরণ করে।

**● হাইপোফাইসিস এবং এপিফাইসিস (Hypophysis & Epiphysis) ●**

1. **হাইপোফাইসিস (পিটুইটারি গ্রন্থি)**— মস্তিষ্কের তলদেশে (নীচে) থাকে বলে এটিকে হাইপোফাইসিস বলা হয়।
2. **এপিফাইসিস (পিনিয়াল গ্রন্থি)**—মস্তিষ্কের উপরিভাগে তৃতীয় নিলয়ের ছাদে থাকে বলে এটিকে এপিফাইসিস বলা হয়।

## ○ অগ্র পিটুইটারি বা অ্যাডিনোহাইপোফাইসিসের হরমোন (Hormones of Anterior Pituitary or Adenohypophysis) ঃ অগ্র পিটুইটারির (অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস) গ্রন্থিময় অংশ যার থেকে **ট্রফিক হরমোন** ক্ষরিত হয়।

### ◎ ট্রফিক হরমোন (Trophic Hormone) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যেসব হরমোন একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (প্রধানত অগ্র পিটুইটারি) থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের অন্য কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থির বৃদ্ধি ও হরমোন নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে তাকে উদ্দীপক হরমোন বা ট্রফিক হরমোন বলে।**
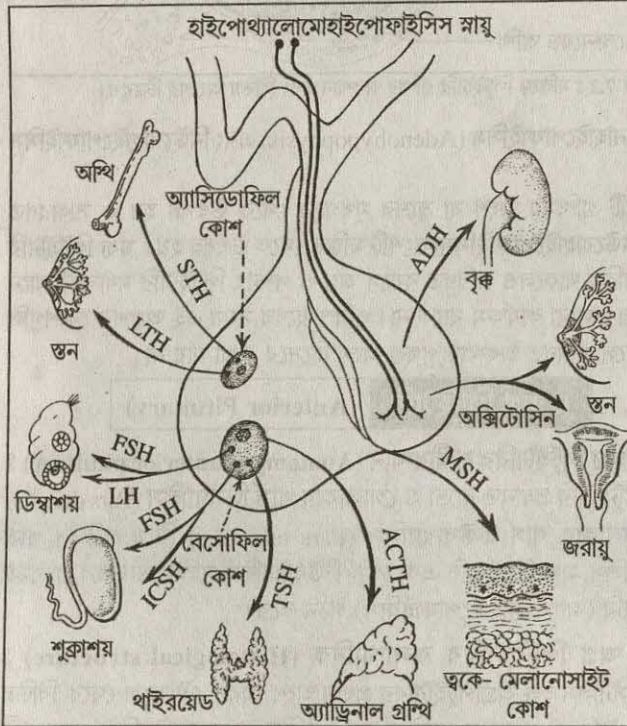
**○ বিভিন্ন প্রকার ট্রফিক হরমোন ○**

1. **বৃদ্ধি পোষক হরমোন বা সোমাটোট্রফিন বা সোমাটট্রোফিক হরমোন** (Somatotrophic Hormones সংক্ষেপে **STH**)।
2. **থাইরোট্রফিন বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন** (Thyroid Stimulating Hormone সংক্ষেপে **TSH**)।
3. **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিন বা অ্যাড্রিনোকর্টি-কোট্রোফিক হরমোন** (Adreno- corticotrophic Hormone সংক্ষেপে **ACTH**)।
4. **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (Follicle Stimulating Hormone সংক্ষেপে **FSH**)।
5. **লিউটিনাইজিং হরমোন (LH)** অথবা **ইন্টারস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন** (Interstitial Cell Stimulating Hormone সংক্ষেপে **ICSH**।
6. **প্রোলাক্টিন** (Prolactin) **বা লিউটিওট্রফিক হরমোন** (Leutotrophic Hormone সংক্ষেপে **LTH**)।

চিত্র 7.4 ঃ পিটুইটারি নিঃসৃত বিভিন্ন প্রকার ট্রফিক হরমোন এবং দেহের বিভিন্ন অংশে এই সব হরমোনের প্রভাবের চিত্ররূপ।

**● মাস্টার গ্ল্যান্ড (Master gland) ●**

**অগ্র পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত ছয় প্রকার ট্রফিক হরমোন মানুষ ও প্রাণীদেহে প্রায় অন্য সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্রিয়াকলাপে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে বলে সম্মুখস্থ পিটুইটারিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের 'মাস্টার গ্ল্যান্ড' বা 'প্রভু গ্রন্থি' বলে।**

● **টারগেট গ্রন্থি (Target gland) :**

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : ট্রফিক হরমোন যে গ্রন্থির ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে তাকে টারগেট গ্রন্থি (Target gland)** বলে।

একটি নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রন্থির উপরে একটিমাত্র ট্রফিক হরমোন ক্রিয়া করে, যেমন—TSH শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থির উপরে, ACTH অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলে ক্রিয়া করে ও তাদের বৃদ্ধি ও সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## ◎ স্থানীয় হরমোন (Local hormone) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা গ্রন্থিকোশ থেকে উৎপন্ন হয়ে উৎপত্তিস্থলেই বা উৎপত্তিস্থলের কাছে ক্রিয়াশীল হয় তাদের স্থানীয় হরমোন বলে।**

(b) **উদাহরণ :** (i) **সিক্রেটিন**—ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামের শ্লেষ্মাস্তর থেকে ক্ষরিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর কাজ করে। (ii) **গ্যাস্ট্রিন**—পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশের শ্লেষ্মাস্তর থেকে ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলীর উপর কাজ করে।

● **স্থানীয় ও ট্রফিক হরমোনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Local and Trophic hormones) :**

| স্থানীয় হরমোন | ট্রফিক হরমোন |
|---|---|
| 1. এই প্রকার হরমোন অন্তঃক্ষরা প্রকৃতির গ্রন্থিকোশ থেকে ক্ষরিত হয়। | 1. এই প্রকার হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। |
| 2. স্থানীয় হরমোনের ক্রিয়াস্থল উৎপত্তিস্থলের কাছে অথবা তার আশেপাশে। | 2. ট্রফিক হরমোনের ক্রিয়াস্থল উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী স্থানের কোশ অথবা গ্রন্থিতে। |
| 3. উদাহরণ—গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন প্রভৃতি। | 3. উদাহরণ —বৃদ্ধি হরমোন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, গোনাডোট্রফিক হরমোন প্রভৃতি। |

## ◎ ট্রফিক হরমোনের কাজ এবং অস্বাভাবিক ক্ষরণে রোগসমূহ (Functions of Trophic hormones and diseases due to their abnormal secretion) :

### ▲ 1. সোমাটোট্রফিক হরমোন (Somatotrophic Hormone বা STH):

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : প্রোটিন জাতীয় যে হরমোন অগ্র পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত হয়ে দেহকোশের তথা সমগ্র দেহের বৃদ্ধি ঘটায় তাকে সোমাটোট্রফিক হরমোন বলে।**

(b) **কাজ (Functions) :** STH দেহের নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে। (i) **অস্থিবৃদ্ধি** (Skeletal growth)—দেহের লম্বা অস্থির অগ্রভাগে অবস্থিত তরুণাস্থি কোশের বহুবিভাজন ও কোশের বৃদ্ধি ঘটিয়ে অস্থির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। (ii) **সাধারণ দেহবৃদ্ধি**—দেহের পেশিকলা, যকৃৎ, বৃক্ক, থাইমাস গ্রন্থি ইত্যাদির দেহাঙ্গের বৃদ্ধিতে STH অংশগ্রহণ করে। (iii) **বিপাকের উপর প্রভাব**— STH প্রোটিন সংশ্লেষণকারী হরমোন, কারণ এটি দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। দেহে প্রোটিনের সংশ্লেষণের ফলে মূত্রে নাইট্রোজেনের রেচন কমে যায়। STH রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। STH দেহের সঞ্চিত ফ্যাটকে কম করে ও প্লাজমায় লিপিডের পরিমাণকে বাড়ায়।

(c) **রোগসমূহ (Diseases) : STH-এর স্বল্প ক্ষরণ** (Hyposecretion) কিংবা **অতিক্ষরণ** (Hypersecretion)—দেহে বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়; যেমন—বামনত্ব, জায়গান্টিজম্ এবং অ্যাক্রোমেগালি।

চিত্র 7.5 : STH-এর অস্বাভাবিক ক্ষরণে দেহের বিভিন্ন পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

❑ 1. বামনত্ব (ডোয়ার্ফিজম্ —Dwarfism) :

❖ (a) **সংজ্ঞা—শিশু অবস্থায় সম্মুখস্থ পিটুইটারি থেকে STH ক্ষরণ কম হলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে তাকে বামনত্ব বা ডোয়ার্ফিজম বলে।**

(b) **বামনত্বের বৈশিষ্ট্য**—(i) দেহের উচ্চতা 3-4 ফুটের বেশি হয় না। (ii) গোঁফ-দাড়ির আবির্ভাব ঘটে না। (iii) দেহ অস্বাভাবিক মেদবহুল হয়। (iv) মুখমণ্ডল থলথলে বা ফোলা ফোলা হয়।

❑ 2. অতিকায়ত্ব ( জাইগান্টিজম্—Gigantism) :

**চিত্র 7.6 :** অ্যাক্রোমেগালি

❖ (a) **সংজ্ঞা—শিশু অবস্থায় পিটুইটারি থেকে STH যদি বেশি ক্ষরিত হয় তা হলে দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে তাকে অতিকায়ত্ব বা জাইগান্টিজম বলে।**

(b) **অতিকায়ত্বের বৈশিষ্ট্য**—(i) দেহের অস্থি অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে মানুষের উচ্চতা 7-8 ফুট হয়। (ii) রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

❑ 3. অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : প্রাপ্তবয়স্ক লোকের STH-এর ক্ষরণ বেড়ে গেলে মুখমণ্ডলের নীচের চোয়াল, হাত-পা ইত্যাদি লম্বায় বেড়ে যায়, চামড়া মোটা হয়, দেহের ভিতরের আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটে দেহের যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাক্রোমেগালি বলে।**

(b) **অ্যাক্রোমেগালির বৈশিষ্ট্য**—(i) চোয়াল অস্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, হাত-পা ও এদের আঙুলের অস্থির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে। মেরুদণ্ডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মানুষ কুঁজো হয়ে যায়। বিভিন্ন অস্থিগুলি লম্বায় বাড়ার সঙ্গে মোটা হয়ে যায়। (ii) হাত, পা, মাথা, কপাল, তালু, নাক, ঠোঁট ইত্যাদির চামড়ার নীচে সাবকিউটিনিয়াস কলার পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে মুখ ও দেহের বিভিন্ন স্থানের চামড়া মোটা হয় ও কুঁচকে যায়। এইসব অবস্থার ফলে মানুষকে অনেকটা গরিলার মতো দেখা যায়।

▲ **2. থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (Thyroid Stimulating Hormone or TSH or Thyrotrophin) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : জলে দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় যে হরমোন অগ্র পিটুইটারির পার্স ডিস্টালিস থেকে ক্ষরিত হয়ে থাইরয়েড গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন বা TSH বলে।**

(b) **কাজ :** TSH প্রধানত থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং তার সক্রিয়তাকে (থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণকে) নিয়ন্ত্রণ করে।

(c) **রোগ (Disease) :** TSH-এর বেশি ক্ষরণে থাইরয়েড গ্রন্থিটি ফুলে গিয়ে **গলগণ্ড বা গয়টার** (Goitre) হয়।

▲ **3. অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন (Adrenocorticotrophic Hormone or ACTH or Adrenocorticotrophin) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : পলিপেপটাইড জাতীয় যে হরমোন অগ্র পিটুইটারির পার্স ডিস্টালিস অংশ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন বা ACTH বলে।**

(b) **কাজ (Functions) :** এই হরমোনটি অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের (জোনা ফ্যাসিকুলেটা ও জোনা রেটিকুলারিস অঞ্চলের) বৃদ্ধি ঘটায় এবং এই অংশ দুটি থেকে হরমোনের (গ্লুকোকর্টিকয়েড ও যৌন স্টেরয়েড) ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(c) **রোগ (Disease) :** অগ্র পিটুইটারি থেকে ACTH-এর ক্ষরণ বেড়ে গেলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স উদ্দীপিত হয় অথবা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে টিউমার হলে কর্টিসোল হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায় ফলে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের **কুশিং সিনড্রোম (Cushing syndrome)** নামে একপ্রকার রোগ দেখা যায়।

1. **পুরুষের দেহে**— (i) মুখমণ্ডল, গলা, নিতম্ব প্রভৃতি অংশে খুব বেশি চর্বি জমা হয়। (ii) হাত, পা, মুখমণ্ডলের চামড়ায় কালচে দাগ পড়ে। (iii) চুলের অধিক বৃদ্ধি ঘটে। (iv) রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি, রক্তচাপের বৃদ্ধি, রক্ত-শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা যায়। 2. **স্ত্রীলোকের দেহে**—পুরুষোচিত লক্ষণ প্রকাশ পায়, গোঁফ-দাড়ি হয় এবং বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

## ▲ (4+5). গোনাডোট্রফিন বা গোনাডোট্রফিক হরমোন (Gonadotrophic Hormone GTH or Gonadotrophin)ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় যে হরমোন সম্মুখস্থ পিটুইটারির পার্স ডিস্টালিস অংশ থেকে নিঃসৃত হয় এবং গোনাডের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে গোনাডোট্রফিক হরমোন বলে।**

(b) **GTH-এর প্রকারভেদ ঃ** দু'প্রকার, যথা—**ফলিক্‌ল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)** এবং **লিউটিনাইজিং হরমোন (LH)**।

**I. ফলিক্‌ল স্টিমুলেটিং হরমোনের কাজ (Functions of Follicle Stimulating Hormone or FSH)** — স্ত্রী এবং পুরুষের দেহে FSH নিম্নলিখিত কাজ করে। 1. **স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে** — (i) FSH ডিম্বাশয়ের উপর ক্রিয়া করে আদি ডিম্বথলিকে পরিণত ডিম্বথলি অর্থাৎ **গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে** পরিণত করে। (ii) গ্র্যাফিয়ান ফলিকল থেকে **ইস্ট্রোজেন** নামে হরমোনের ক্ষরণে সাহায্য করে। (iii) LH-এর সহযোগিতায় FSH গ্র্যাফিয়ান ফলিকল থেকে **ডিম্বাণু নিঃসরণে** (Ovulation) সহায়তা করে। 2. **পুরুষের ক্ষেত্রে** — FSH শুক্রোৎপাদক নালিকার (সেমিনিফেরাশ টিবিউলের) বৃদ্ধি ঘটিয়ে **শুক্রাণু উৎপাদনে** সাহায্য করে।

**II. লিউটিনাইজিং হরমোনের কাজ (Functions of Luteinising Hormone or LH)**—স্ত্রী এবং পুরুষের দেহে LH নিম্নলিখিত কাজ করে। 1. **স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে**—(i) FSH-এর সাহায্যে LH গ্র্যাফিয়ান ফলিকলকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণু নিঃসরণ ঘটায়। এর পর বিদীর্ণ ফলিকলকে কর্পাস লিউটিয়াম-এ রূপান্তরিত করে। (ii) LH ডিম্বাশয়ে **কর্পাস লিউটিয়ামের বৃদ্ধিতে** এবং স্থায়িত্বতে সাহায্য করে। (iii) কর্পাস লিউটিয়াম থেকে **প্রোজেস্টেরোন** নামে হরমোন ক্ষরণে সাহায্য করে। 2. **পুরুষের ক্ষেত্রে**—LH বা ICSH-এর প্রভাবে শুক্রাশয়ের লিডিগের আন্তর কোশ **টেস্টোস্টেরন** নামে হরমোন নিঃসৃত করে।

**● মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulating Hormone বা MSH) ●**

**সংজ্ঞা**—**পিটুইটারির পার্স ইন্টারমেডিয়া (Pars intermedia) থেকে যে হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন সংক্ষেপে MSH বলে।** উৎপত্তি অনুযায়ী MSH-কে **ইন্টারমেডিন** (Intermedin)-ও বলে।

**রাসায়নিক গঠন**—ইন্টারমেডিন প্রোটিন জাতীয় হরমোন।

**কাজ**—মানুষের ক্ষেত্রে MSH নিঃসৃত হয় না। (i) মাছ ও উভচর প্রাণীদের ত্বকে **মেলানোসাইট** নামে কোশ থাকে। MSH-এর সাহায্যে মেলানোসাইট কোশগুলিতে **মেলানিন** (Melanin) নামে রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষিত হয়। (ii) এছাড়া এই হরমোন মাছ ও উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে মেলানোফোর কোশের মেলানিন দানাগুলিকে (Melanin granules) ডিস্‌পার্সাল প্রক্রিয়ায় উদ্দীপিত করে এই সব প্রাণীর ত্বকের রংকে নিয়ন্ত্রিত করে।

## ▲ 6. লিউটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Hormone বা LTH) বা প্রোলাক্‌টিন (Prolactin)ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ প্রোটিন জাতীয় যে হরমোন সম্মুখস্থ পিটুইটারির পার্স ডিস্টালিস অংশ থেকে ক্ষরিত হয় তাকে প্রোল্যাকটিন বলে।**

(b) **কাজ ঃ** (i) LTH বা প্রোলাক্‌টিন গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্তনগ্রন্থির পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। (ii) প্রসবের পর মাতৃস্তন থেকে দুধের ক্ষরণে সাহায্য করে। (iii) এই হরমোন পাখিদের ক্রপ মিল্ক (Crop milk) উৎপন্ন করতে সাহায্য করে।

## II. পশ্চাৎ পিটুইটারি (Posterior Pituitary)

(a) **গঠন (Structure) ঃ** পিটুইটারি গ্রন্থির স্নায়ুজ অংশ **পশ্চাৎ পিটুইটারি বা নিউরোহাইপোফাইসিস** নামে পরিচিত। ভ্রূণ অবস্থায় এটি মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—(i) বৃহৎ অংশ **পার্স নার্ভোসা** (Pars nervosa), এবং (ii) পিটুইটারির দণ্ডের মতো অংশ হল **ইনফান্ডিবুলাম** যা পিটুইটারিকে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে যুক্ত করে। পার্স নার্ভোসা হল পশ্চাৎ পিটুইটারির প্রধান অংশ কারণ এখান থেকে নিউরোহরমোন নির্গত হয়।

● **নিউরোহরমোন (Neurohormone) :** ❖ **সংজ্ঞা—যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিউরোসিক্রেটারি কোশে উৎপন্ন হয় তাদের নিউরোহরমোন বলে।** এই হরমোন স্নায়ুর অ্যাক্সনের মাধ্যমে বাহিত হয়ে স্নায়ুর প্রান্তদেশে এসে পশ্চাৎ পিটুইটারি পার্সনার্ভোসাতে সঞ্চিত থাকে। উদ্দীপনার ফলে এই স্থান থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এই রাসায়নিক পদার্থ (হরমোন) শেষে রক্তে প্রবেশ করে ও বাহিত হয়ে দূরবর্তী কলা কোশের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। **উদাহরণ**—মানুষের ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন।

● **নিউরোসিক্রেটারি কোশ (Neurosecretory cell) :** ❖ **সংজ্ঞা—স্নায়ুতন্ত্রের যেসব স্নায়ুকোশ বা নিউরোন থেকে হরমোন উৎপন্ন হয় সেই সব স্নায়ুকোশকে একত্রে নিউরোসিক্রেটারি কোশ বলে।** হাইপোথ্যালামাস, অ্যাড্রিনাল মেডালা এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে এই রকম নিউরোসিক্রেটারি কোশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যা **নিউরোহরমোন** ক্ষরণ করে।

● **হরমোন এবং নিউরোহরমোনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Hormone and Neurohormone) :**

| হরমোন | নিউরোহরমোন |
|---|---|
| 1. হরমোন দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা গ্রন্থিকোশ থেকে ক্ষরিত হয়। | 1. নিউরোহরমোন মস্তিষ্কে অবস্থিত নিউরোসিক্রেটারি কোশ নামে স্নায়ুকোশ থেকে ক্ষরিত হয়। |
| 2. উৎসস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে সরাসরি রক্তে যায়। | 2. উৎসস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রথমে পিটুইটারিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয় এবং পরে রক্তে যায়। |
| 3. উদাহরণ— থাইরক্সিন, অ্যাড্রিন্যালিন, ইনসুলিন ইত্যাদি। | 3. উদাহরণ— ভেসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদি। |

## ▲ পশ্চাৎ পিটুইটারির বিভিন্ন হরমোন ও উৎস, কার্যাবলি এবং রোগসংক্রান্ত অসুস্থতা :

○ **পশ্চাৎ পিটুইটারির হরমোন (Hormones of Posterior Pituitary) :** **ভেসোপ্রেসিন বা অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন** সংক্ষেপে **ADH** এবং **অক্সিটোসিন** । এই হরমোন দুটি পশ্চাৎ পিটুইটারির পার্স নার্ভোসা থেকে নির্গত হলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাসের নিউরোসিক্রেটারি কোশসমূহ** থেকে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হওয়ার পর নিউরোনের মাধ্যমে বাহিত হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারির পার্স নার্ভোসা অংশে সঞ্চিত থাকে।

### 1. ভেসোপ্রেসিন (Vasopressin or ADH) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : প্রোটিন (অক্টাপেপটাইড) জাতীয় যে নিউরোহরমোন হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারির মাধ্যমে এসে এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে মসৃণ পেশির উপর ক্রিয়া করে ও বৃক্কের বৃক্কীয় নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ভেসোপ্রেসিন বলে।**

(b) **উৎস (Source) :** ভেসোপ্রেসিন হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাওপটি এবং প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউরোসিক্রেটারি কোশ থেকে ক্ষরিত হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারির পার্স নার্ভোসা অংশে সঞ্চিত থাকে।

(c) **ভেসোপ্রেসিনের কার্যাবলি (Functions of Vasopressin) :**

1. **অ্যান্টিডাইউরেটিক কাজ** (Antidiuretic function)—স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় মাত্রায় ভেসোপ্রেসিন (**অ্যান্টিডায়ুরেটিক হরমোন**—Antidiuretic Hormone সংক্ষেপে ADH)-এর মতো কাজ করে। কারণ এই হরমোন বৃক্কের দূরবর্তী নালিকার এবং সংগ্রাহক নালিকার কোশঝিল্লির জলের ভেদ্যতা বাড়িয়ে জলের পুনঃশোষণকে বাড়ায়। এর ফলে মূত্রে জলের পরিমাণ কমে যায় বলে মূত্র গাঢ় হয়। এই কারণের জন্য ভেসোপ্রেসিনকে **রেচনবিরোধী হরমোন** বলে।

(d) **অস্বাভাবিক অবস্থা (Abnormal condition) : ADH**-এর অনুপস্থিতিতে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণ জল (দৈনিক প্রায় 20 লিটার) মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়ে যায়। এই অবস্থাকে **বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** (Diabetes insipidus) বলে।

2. **রক্তসংবহনের উপর প্রভাব**— অধিক মাত্রায় ভেসোপ্রেসিন রক্তবাহকে সংকুচিত করে ফলে রক্তচাপ বাড়ে।

3. **অনৈচ্ছিক পেশির উপর প্রভাব** (Effect on involuntary muscle)—প্রায় সমস্ত অনৈচ্ছিক পেশিকে (হৃৎপেশি ও জরায়ুর পেশি বাদে) ভেসোপ্রেসিন উদ্দীপিত ও সংকুচিত করে।

● **ভেসোপ্রেসিনের স্বাভাবিক এবং অধঃক্রিয়াজনিত কাজ (Normal and Hypofunctions of Vasopressin) :**

| স্বাভাবিক কাজ | অধঃক্রিয়াজনিত কাজ |
|---|---|
| (i) বৃক্কনালির দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণ ঘটিয়ে দেহের প্রয়োজন অনুসারে মূত্রের রেচনকে নিয়ন্ত্রণ করে। | (i) ADH-এর অভাবে বৃক্ক নালিকার দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণ হতে পারে না, ফলে প্রচুর জল মূত্র হিসেবে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থাকে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** বলে। |
| (ii) রক্তবাহককে সংকুচিত করে, ফলে রক্তচাপ বাড়ে। | (ii) রক্তচাপ কমে যায়। |
| (iii) পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রনালি, মূত্রথলি প্রভৃতি অংশে পেশির সংকোচন ঘটায়। | (iii) পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রনালি, মূত্রথলি প্রভৃতির স্বাভাবিক কাজ প্রয়োজন অনুসারে কিছুটা কম হয়। |

## 2. অক্সিটোসিন (Oxytocin) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : প্রোটিন জাতীয় (অক্টাপেপটাইড) যে নিউরোহরমোন হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারি এবং রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে জরায়ু পেশিকে উদ্দীপিত করে তাকে অক্সিটোসিন বলে।**

(b) **উৎস (Source) :** অক্সিটোসিন হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাঅপটিক এবং প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউরোসিক্রেটরি কোশ থেকে ক্ষরিত হয়ে পশ্চাৎ পিটুইটারির পার্স নার্ভোসাতে সঞ্চিত থাকে।

(c) **অক্সিটোসিনের কার্যাবলি (Functions of Oxytocin) :**

1. **জরায়ুর উপর প্রভাব** (Effect on uterus)—গর্ভাবস্থার শেষদিকে অর্থাৎ সন্তান প্রসবের আগে এই হরমোনটি অত্যধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়ে জরায়ুকে সংকুচিত করে ফলে সন্তান প্রসবে সাহায্য করে।

2. **স্তনগ্রন্থির উপর প্রভাব** (Effect on mammary gland)—শিশুর মাতৃস্তন পানকালে অক্সিটোসিন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে স্তনের স্তনগ্রন্থির সংকোচন ঘটিয়ে স্তন গ্রন্থিতে সঞ্চিত দুধকে নির্গত (Milk ejection) করে।

3. **শুক্রাণুর পরিবহনের উপর প্রভাব** (Effect on sperm transport)—সঙ্গমের সময় যোনিপথ থেকে জরায়ুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর পরিবহনে সাহায্য করে।

(d) **অস্বাভাবিক অবস্থা (Abnormal condition) :** (i) অক্সিটোসিনের অভাবে জরায়ু পেশির সংকোচন ব্যাহত হয়, ফলে সন্তান প্রসবে বাধা দেয়। (ii) শিশু মায়ের স্তন থেকে দুধ পানের সময় স্তনগ্রন্থি থেকে দুধের নির্গমন হয় না।

● **অক্সিটোসিনের স্বাভাবিক এবং অধঃক্রিয়াজনিত কাজ (Normal and Hypofunctions of Oxytocin) :**

| স্বাভাবিক কাজ | অধঃক্রিয়াজনিত কাজ |
|---|---|
| (i) অক্সিটোসিন গর্ভাবস্থায় জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, জরায়ু পেশিকে সংকুচিত করে, ফলে সন্তান প্রসব সহজ হয়। | (i) অক্সিটোসিনের অভাবে জরায়ু পেশির সংকোচন ব্যাহত হয়, ফলে সন্তান প্রসব বাধাপ্রাপ্ত হয়। |
| (ii) অক্সিটোসিন স্তনগ্রন্থিকে সংকুচিত করে, স্তনগ্রন্থিতে সঞ্চিত দুধকে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। | (ii) শিশু মায়ের স্তনের দুধ পানকালে স্তনগ্রন্থি থেকে দুধের নির্গমন ( Ejection of milk ) বাধাপ্রাপ্ত হয়। |
| (iii) স্ত্রীলোকের জননপথে শুক্রাণুর পরিবহনে সাহায্য করে। ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে অর্থাৎ নিষিক্ত হতে পারে। | (iii) শুক্রাণুর পরিবহন ব্যাহত হওয়ায় নিষেক সহজতর হয় না। |

❂ **প্রাণীর সমগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত নয়টি হরমোনের নাম :** 1. অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন—STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH। 2. মধ্য পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন—MSH. 3. পশ্চাৎ পিটুইটারি—ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন।

**• রিলিজিং হরমোন বা রিলিজিং ফ্যাক্টর •**

হাইপোথ্যালামাস থেকে **রিলিজিং হরমোন** (Releasing hormone সংক্ষেপে **RH**) বা **রিলিজিং ফ্যাক্টর** (Releasing factor, সংক্ষেপে **RF**) নামে বিভিন্ন প্রকার নিউরোহরমোন নিঃসৃত করে যা রক্তের মাধ্যমে অগ্র পিটুইটারির মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন প্রকার ট্রফিক হরমোন ক্ষরণে অংশ নেয়। এইসব রিলিজিং ফ্যাক্টরগুলি হল—

**SRF** (Somatotrophin releasing factor), **TRF** (Thyrotrophin releasing factor), **CRF** (Corticotrophin releasing factor) **FSH RF** (Follicle Stimulating Hormone releasing factor), **LRF** (Lutenising releasing factor) এবং **PRF** (Prolactin releasing factor)। এই সকল রিলিজিং ফ্যাক্টর সম্মুখস্থ পিটুইটারি থেকে যথাক্রমে STH, TSH, ACTH, FSH, LH এবং প্রোলাক্টিন হরমোনের ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## ০ 7.5. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) ০

### ▲ থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান ও বহির্গঠন এবং কার্যাবলি (Location & Structure and Functions of Thyroid gland) :

● (a) **অবস্থান এবং গঠন (Location and structure) :** মানুষের দেহে, কণ্ঠের নীচে এবং শ্বাসনালির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের দু'পাশে থাইরয়েড গ্রন্থির দুটি পার্শ্বলোব থাকে। প্রতিটি লোবের আকৃতি প্রায় ডিম্বাকার এবং তারা তন্তুময় কলা দিয়ে গঠিত ক্যাপসুল দিয়ে আবৃত থাকে। পার্শ্বলোব দুটি **ইসথ্মাস** (Isthmus) নামে একটি অনুভূমিক যোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমগ্র থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ওজন 25–40 গ্রাম হয়।

➤ **আণুবীক্ষণিক গঠন (Microscopic structure) :** (i) প্রতিটি লোব অসংখ্য অনিয়তাকার বা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **ফলিকল** (Follicles) দিয়ে গঠিত। (ii) প্রতিটি থাইরয়েড ফলিকল একটি দানাদার **ঘনকাকার আবরণী কলার স্তর** দিয়ে আবৃত থাকে। (iii) প্রতিটি ফলিকল **থাইরোগ্লোবিউলিন** নামে এক রকমের প্রোটিনযুক্ত **কোলয়েড পদার্থ** (Colloid) দিয়ে পূর্ণ থাকে। (iv) ঘনকাকার কোশের মাঝে মাঝে স্বল্প সংখ্যক বহু মাইটোকন্ড্রিয়াযুক্ত **প্যারাফলিকুলার কোশ** (Parafollicular cells) থাকে।
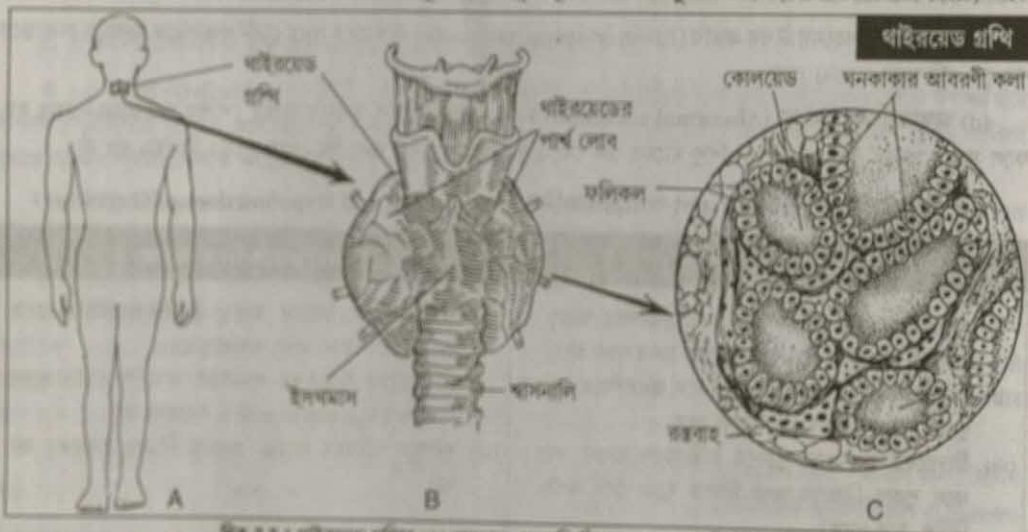
চিত্র 7.7 : থাইরয়েড গ্রন্থির (A) অবস্থান, (B) বহির্গঠন এবং (C) আণুবীক্ষণিক গঠন।

● (b) **থাইরয়েড হরমোনের নাম (Name of thyroid hormones) :**

(i) **থাইরক্সিন** (Thyroxine or Tetraiodothyronine–$T_4$) (ii) **ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন** (Triiodothyronine—$T_3$) এবং (iii) **থাইরোক্যালসিটোনিন** (Thyrocalcitonin)।

থাইরয়েড গ্রন্থির গ্রন্থিথলি বা ফলিকলের ঘনকাকার কোশ থেকে $T_3$ ও $T_4$ এবং অধিক মাইটোকনড্রিয়াযুক্ত প্যারাফলিকুলার কোশ থেকে **থাইরোক্যালসিটোনিন** হরমোন ক্ষরিত হয়।

● (c) **থাইরয়েড গ্রন্থির / হরমোনের কার্যাবলি (Functions of Thyroid gland) :**

**ট্রাইআয়োডো-থাইরোনিন** ($T_3$) তুলনামূলকভাবে **থাইরক্সিন** (টেট্রাআয়োডোথাইরোনিন—$T_4$) থেকে অধিক শক্তিশালী। এই দু'প্রকার হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়ে দেহে নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

1. **মৌলবিপাকীয় হারের উপর প্রভাব** (Effect on BMR)— থাইরয়েড হরমোনকে **ক্যালোরিজেনিক** (Calorigenic) বা শক্তি উৎপাদনকারী হরমোন বলে। কারণ এই হরমোন দেহকোশে $O_2$-এর ব্যবহারকে বাড়িয়ে অধিক তাপ উৎপন্ন করে, ফলে মৌল বিপাকীয় হারের (BMR) বৃদ্ধি ঘটে।

2. **বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on metabolism)—(i) অন্ত্রে গ্লুকোজের শোষণ, যকৃতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। (ii) স্বল্প পরিমাণ থাইরক্সিন দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে ; কিন্তু অধিক পরিমাণে এই হরমোন প্রোটিনকে বিশ্লিষ্ট করে। (iii) থাইরক্সিন দেহে ফ্যাটের সঞ্চয় হ্রাস করে।

3. **হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব** (Effect on heart)— থাইরয়েড হরমোন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হারকে বাড়ায়।

4. **রক্তকণিকার উপর প্রভাব** (Effect on blood corpuscles)— থাইরয়েড হরমোন লোহিত কণিকার ক্রমবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। এই হরমোনের অভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

5. **তাপনিয়ন্ত্রণের উপর প্রভাব** (Effect on heat regulation)—শীতল আবহাওয়ায় থাইরয়েড গ্রন্থি অধিক পরিমাণে হরমোন নিঃসৃত যা কোশের বিপাক ক্রিয়াকে বৃদ্ধি করে দেহের তাপ উৎপাদনকে বাড়ায়।

6. **স্তনগ্রন্থির উপর প্রভাব** (Effect on mammary gland)—শিশু মাতৃস্তন থেকে দুধ পান করার সময় দুধের ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায় এবং ক্ষরণকে বজায় রাখে। এছাড়া দুধে ফ্যাটের পরিমাণকে বাড়ায়।

7. **দেহবৃদ্ধির উপর প্রভাব** (Effect on body growth)—দেহের অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি, যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা এবং মানসিক (Mental) বিকাশে থাইরক্সিন অংশগ্রহণ করে।

8. **শ্বাসক্রিয়ার উপর প্রভাব** (Effect on respiration)—থাইরয়েড হরমোন দেহে বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, অক্সিজেনের ব্যবহার এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, ফলে শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

9. **পৌষ্টিকনালির উপর প্রভাব** (Effect on elimentary canal)—খাদ্যবস্তুর শোষণ, জারক রসের ক্ষরণ, পৌষ্টিকনালির বিচলন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধি করে।

10. **অন্যান্য কাজ** (Other functions)—ব্যাঙাচির ব্যাঙে **রূপান্তর** (Metamorphosis), থাইরয়েড গ্রন্থি অংশগ্রহণ করে।

● (d) **অধিক অথবা কম পরিমাণ থাইরক্সিন নিঃসরণে (অধিক ও স্বল্প সক্রিয়তার) প্রভাব (Effects of Hyper and Hyposecretion of Thyroid Hormones) :**

**➤ থাইরয়েড গ্রন্থির অধিক ক্ষরণ বা অতিসক্রিয়তা (Hypersecretion or Hyperactivities of thyroid or Hyperthyroidism) :** থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে অধিক থাইরক্সিন হরমোন নিঃসৃত হলে অথবা **অতিসক্রিয়তায়** গ্রেভস্ ডিজিজ বা এক্সোপ্থ্যালমিক গয়টার রোগ হয়।

চিত্র 7.8 : থাইরয়েড হরমোনের অধিকক্ষরণজনিত-এক্সোপথ্যালমিক গয়টার।

❑ **গ্রেভস্ ডিজিজ বা এক্সোপথ্যালমিক গয়টার (Graves' disease or Exopthalmic goitre) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**—থাইরয়েড হরমোনের বেশি ক্ষরণের ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে গেভস্ ডিজিজ বা স্ফীতনেত্র গলগণ্ড **(Exophthalmic goitre)** বলে।

(b) **গ্রেভস্ ডিজিজের উপসর্গ :** (i) এই রোগে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে ও চোখ দুটি ঠেলে বাইরের দিকে চলে আসে। চোখের পাতার ওঠা-নামা কম হয়। (ii) দেহে রক্তনালি প্রসারিত হয় যার ফলে দেহত্বক ঘর্মাক্ত, ভেজা ভেজা, নরম ও রক্তাভ হয়। (iii) রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। (iv) দেহের ওজন কমে যায়। (v) মানসিক অবস্থা আবেগপ্রবণ ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়। (vi) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার ও হার্দ-উৎপাদ বেড়ে যায়। (vii) ঘন ঘন প্রস্রাব হয় ও মূত্রের পরিমাণও বাড়ে।

➤ **থাইরয়েড গ্রন্থির কম ক্ষরণ বা স্বল্প সক্রিয়তা (Hypofunction or Hyposecretion of thyroid gland or Hypothyroidism) :** থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কম পরিমাণ থাইরক্সিন ক্ষরিত হলে প্রধানত দু'রকমের গোলোযোগ দেখা যায়, শিশুদের ক্ষেত্রে **ক্রেটিনিজম** এবং প্রাপ্তবয়স্কদের **মিক্সিডিমা** বলে।

1. **ক্রেটিনিজম (Cretinism) :** ❖ (a) **সংজ্ঞা—শিশুদের থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণ কমে গেলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ক্রেটিনিজম (Cretinism) বলে।**
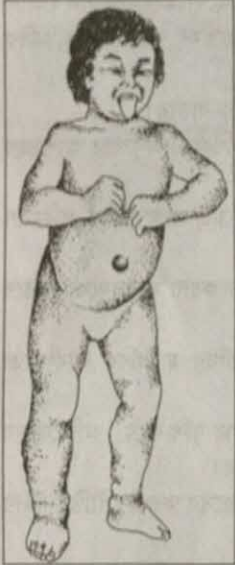
চিত্র 7.9 : ক্রেটিনিজম

(b) **ক্রেটিনিজমের উপসর্গ**—এই রোগের প্রধান কয়েকটি উপসর্গ হল—(i) এই রোগে শিশুদের ক্রমবৃদ্ধি (Mile stone—বৃদ্ধির ধাপগুলি) ব্যাহত হয়। (ii) এদের দেহের কঙ্কালের বৃদ্ধি, যৌন বৃদ্ধি, মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ইত্যাদি ঘটে না ফলে দেহের গঠন বিকৃত হয়। শিশুটি বোকা প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন (Idiotic appearance) হয়। (iii) দেহের গড়ন খর্বাকৃতি এবং দেহত্বক মোটা ও খসখসে হয়। পেট মোটা হয় ও ফুলে যায়, নাভির বহিঃস্ফীতি ঘটে। (iv) শিশুর পেশি দুর্বল হয়। শিশুর মুখমণ্ডল ফুলে যায়, জিভ প্রসারিত হয়, মুখ থেকে লাল ঝরতে থাকে। (v) BMR এবং দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। এই সব উপসর্গ এই রোগের বিশেষ কিছু বহিঃলক্ষণ।

চিত্র 7.10 : মিক্সিডিমা

2. **মিক্সিডিমা (Myxedema) :** ❖ (a) **সংজ্ঞা—প্রাপ্তবয়স্ক লোকের থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে গেলে দেহে যেসব উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে, সম্মিলিতভাবে তাকে মিক্সিডিমা বা গাল বর্ণিত রোগ (Gull's disease) বলে।**

(b) **মিক্সিডিমার উপসর্গ**—(i) এই রোগে বয়স্কদের মোঙ্গোলীয় মুখাকৃতিবিশিষ্ট ফোলা ফোলা দেখতে হয়। (ii) দেহের চামড়া মোটা, সামান্য হলুদ রঙের ও খসখসে হয়। দেহের নানা স্থানের, যেমন—মস্তক, ভ্রু, বগল ইত্যাদি স্থান থেকে চুল উঠে যায়। (iii) হৃৎস্পন্দন হার, হার্দ-উৎপাদ, দৈহিক উষ্ণতা ইত্যাদি কমে যায়। দেহের বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক চর্বি জমে। যৌনগ্রন্থির ক্ষয় ও মানসিক ভারসাম্যের অভাব ও অবক্ষয়, পুরুষত্বহানি, রজঃস্রাবের নিবৃত্তি দেখা দেয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

চিত্র 7.11. : সরল গলগণ্ড

● **সরল গলগণ্ড (Simple goitre) :** ❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—দেহে আয়োডিনের পরিমাণ কম হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে যে অবস্থা সৃষ্টি করে তাকে সরল গলগণ্ড বলে।**

(b) **উপসর্গ**—সাধারণত থাইরক্সিন হরমোন কম অথবা বেশি পরিমাণ নিঃসৃত হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশিত হয় তা গলগণ্ডের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। এখানে শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থিটি ফুলে যাওয়ার ফলে আশেপাশের অন্যান্য অঙ্গগুলির উপর চাপ পড়ে। সেই কারণে চাপের ফলে কিছু লক্ষণ (Pressure symptoms) প্রকাশিত হয়। সাধারণত যেসব স্থানে (পার্বত্যদেশে) পানীয় জলে বা খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে সেই সব স্থানের লোকদের সরল প্রকৃতির গলগণ্ড দেখা যায়।

(c) **গলগণ্ড হওয়ার কারণ**—আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড হরমোন ($T_3$ এবং $T_4$) তৈরি হতে পারে না। এই কারণে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের অভাব ঘটে যা পিটুইটারি থেকে TSH-এর ক্ষরণ বাড়িয়ে থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে। উদ্দীপনার ফলে গ্রন্থিটি ফুলে যায় ও **আয়োডিনের অভাবজনিত অবস্থা** (Iodine deficiency state) বা **গলগণ্ড** রোগ হয়।

● **ডোয়ার্ফিজিম এবং ক্রেটিনিজমের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (পার্থক্য) (Similarities and dissimilarities between Dwarfism and Cretinism) :**

| ডোয়ার্ফিজিম | ক্রেটিনিজম |
|---|---|
| ○ সাদৃশ্য : | |
| 1. শিশুদের দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায় ফলে উচ্চতা কমে যায়। | 1. শিশুদের দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায় ফলে উচ্চতা কমে যায়। |
| ○ বৈসাদৃশ্য : | |
| 2. মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না এবং জনন অঙ্গের বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে। | 2. মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং জনন অঙ্গ অপরিণত অবস্থায় থাকে। |
| 3. BMR স্বাভাবিক থাকে। | 3. BMR কমে যায়। |
| 4. রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। | 4. রক্তে শর্করার (গ্লুকোজের) পরিমাণ কমে যায়। |

❂ **থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocalcitonin) :** ❖ (a) **সংজ্ঞা**—**প্রোটিন জাতীয় যে হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থির প্যারাফলিকুলার কোশ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে থাইরোক্যালসিটোনিন বলে।**

(b) **কাজ**—থাইরোক্যালসিটোনিন হরমোন রক্তে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ হ্রাস করে। (প্যারাথর্মোন বিরোধী কাজ)।

## ❂ 7.6. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland) ❂

### ▲ প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান, ক্ষরিত হরমোন, কার্যাবলি এবং অসুস্থতা (Location, Secreted Hormone, Functions and Disorders) :

(a) **অবস্থান ও গঠন (Location and Structure) :** অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি দু'জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি দুটি থাইরয়েড গ্রন্থির লোবের পেছনে উপরিতলে উপর-নীচ ভাবে লেগে থাকে। ● **কলাস্থান**—প্রতিটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিতে দু'প্রকার কোশের সমাবেশ লক্ষ করা যায়, যেমন—**প্রধান কোশ** এবং **অক্সিফিল কোশ**। প্রধান কোশ তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় বেশি থাকে এবং এই প্রকার কোশ থেকে প্যারাথর্মোন নিঃসৃত হয়।

(b) **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন : প্যারাথর্মোন (Parathormone–সংক্ষেপে PTH)।**

(c) **প্যারাথর্মোন (PTH)-এর কাজ (Functions of Parathormone) :** প্যারাথর্মোন প্রোটিন জাতীয় হরমোন। এর প্রধান কাজ হল—

1. প্যারাথর্মোন রক্তের ক্যালশিয়াম আয়নের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে।

2. এই হরমোন অস্থি থেকে ক্যালশিয়াম ও ফসফেটের অপসারণ ঘটায়।

3. অন্ত্র থেকে ক্যালশিয়ামের শোষণকে বৃদ্ধি করে।

4. বৃক্কনালি থেকে ক্যালশিয়ামের পুনঃশোষণকে বৃদ্ধি করে।

এই সব কাজের ফলে সামগ্রিকভাবে রক্তে ক্যালশিয়াম আয়নের পরিমাণ বাড়ে।
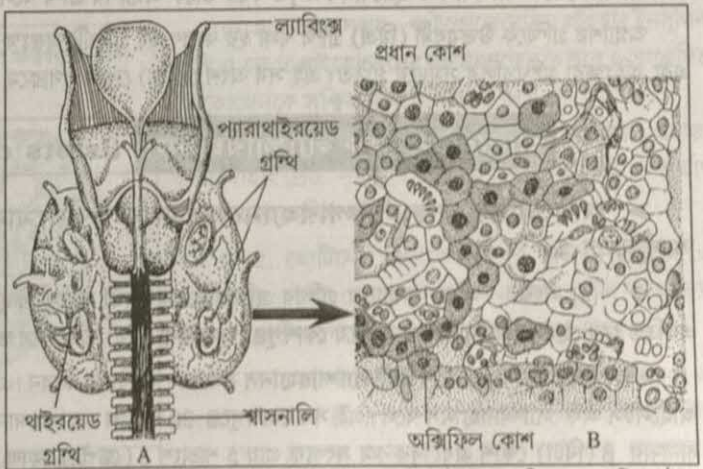
চিত্র 7.12 : A-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান, B-প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কলাস্থানিক গঠন।

(d) **প্যারাথর্মোনের স্বল্পক্ষরণে গলযোগ (Disorders of hyposecretion of parathormone) :**

□ **টিট্যানি (Tetany) : ❖ সংজ্ঞা—প্যারাথরমোনের স্বল্প ক্ষরণে $Ca^{2+}$, $Na^{+}$ ও $K^{+}$ আয়নগুলির স্থিতাবস্থা বিনষ্ট হয় এবং ঐচ্ছিক পেশির ক্রমাগত সংকোচনের ফলে খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, লালাঝরা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে টিট্যানি বলে।**
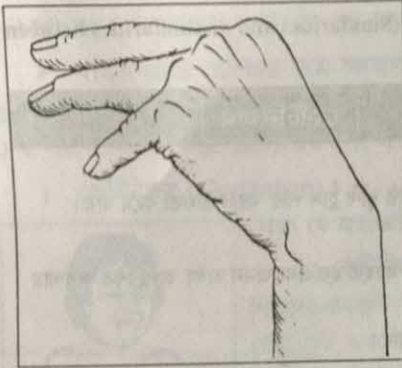
চিত্র 7.13 : হাইপোক্যালসিমিক টিট্যানি (ট্রাউসিয়াসের লক্ষণ)-এর চিত্ররূপ।

রক্তে প্যারাথর্মোন হরমোনের পরিমাণ কমে গেলে রক্তে ক্যালশিয়াম আয়নের ($Ca^{2+}$ হল স্নায়ু বাধাদানকারী আয়ন) পরিমাণ কমে যায়, $Ca^{2+}$ কমে যাওয়ায় স্নায়ু উদ্দীপনকারী আয়নগুলির ($Na^{+}$ ও $K^{+}$) সক্রিয়তা বাড়ে যা ঐচ্ছিক পেশিকে ক্রমাগত উদ্দীপিত করে অবিরাম পেশির সংকোচন ঘটার ফলে খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, লালাঝরা প্রভৃতি রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যা টিট্যানি নামে পরিচিত। মানুষের টিট্যানি বা ধনুষ্টংকার রোগের কয়েকটি উপসর্গ হল— (1) **চোভসটেক-এর লক্ষণ** (Chvostek's sign)—মুখমণ্ডলের একপাশের পেশির দ্রুত সংকোচন ঘটে। ফেসিয়াল স্নায়ুর (সপ্তম করোটি স্নায়ুর) উদ্দীপনার ফলে এটি ঘটে। (2) **ট্রাউসিয়াস-এর লক্ষণ** (Trousseau's sign)—দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গের (Upper extremity) পেশির খিঁচুনি (Spasm) ঘটে। এর ফলে হাতের কব্জি ও বুড়ো আঙুল বেঁকে যায় এবং অন্যান্য আঙুলগুলি টান টান হয়ে সোজা থাকে।

➤ **প্যারাথর্মোনের অধিক ক্ষরণে গলযোগ (Disorders of hypersecretion of parathormone) :** প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে বেশি প্যারাথর্মোন ক্ষরিত হলে, নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা যায়—(1) অস্থি থেকে ক্যালশিয়াম নিষ্কাশন শুরু হয়, ফলে **ফন্ রেকিং-হাউসেন্স** নামে ভঙ্গুর অস্থি রোগ হয়। (2) প্লাজমায় সিরাম ক্যালশিয়ামের আধিক্য এবং ফসফেট-এর মাত্রা হ্রাস এবং **স্টাইটিস ফাইব্রোসা সিস্টিকা** রোগ ও মূত্র থলিতে **পাথর সৃষ্টি** (Kidney stone) হতে দেখা যায়।

## ❂ 7.7. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreas gland) ❂

### ❂ অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreas) :

**❖ সংজ্ঞা—পাকস্থলীর নীচে এবং ডিয়োডিনামের দুটি বাহুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত অনিয়ত পরিধিবিশিষ্ট যে লম্বাকৃতি মিশ্র গ্রন্থিটি থেকে পাচকরস ও হরমোন নিঃসৃত করে তাকে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি বলে।**

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিকে **উভয়ধর্মী (মিশ্র) গ্রন্থি** বলা হয় কারণ এই গ্রন্থিটি অন্তঃক্ষরা আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস গ্রন্থিকোশ এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থিথলির সমন্বয়ে গঠিত। এই সব অংশ (গ্রন্থি) থেকে যথাক্রমে হরমোন ও পরিপাক রস ক্ষরিত হয়।

## আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস (Islets of Langerhans)

### ➤ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের সংজ্ঞা, হরমোন, কার্যাবলি এবং রোগসংক্রান্ত অসুস্থতা :

❖ (a) **সংজ্ঞা—সমগ্র অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির গ্রন্থিথলির মধ্যবর্তী স্থানে কিছু সংখ্যক (প্রায় 1–2%) কোশ স্থানে স্থানে একত্রিত হয়ে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো যে কোশপুঞ্জ (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি) গঠন করে তাকে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস বলে।**

ওই ধরনের কোশপুঞ্জকে বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গারহ্যানস সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই জন্যে এদের **ল্যাঙ্গারহ্যানসের দ্বীপগ্রন্থি** বা **আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস** বলে। এই সব কোশপুঞ্জে 20 শতাংশ অম্লাসক্ত দানাদার **α (আলফা) কোশ**, 75 শতাংশ ক্ষারযুক্ত দানাদার **β (বিটা) কোশ** এবং খুব কম সংখ্যক প্রায় 5 শতাংশ **δ (ডেল্টা) কোশ** নিয়ে গঠিত। এছাড়া খুব সামান্য পরিমাণ F কোশের উপস্থিতি দেখা যায়।

চিত্র 7.14 : A-অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির অবস্থান এবং B-আণুবীক্ষণিক গঠনের চিত্ররূপ।

(b) **আইলেটস নিঃসৃত হরমোন :** (i) আলফা কোশ—**গ্লুকাগোন,** (ii) বিটা কোশ—**ইনসুলিন,** (iii) ডেল্টা কোশ—**সোমাটোস্ট্যাটিন** এবং (iv) F কোশ—**অগ্ন্যাশয়ী পলিপেপটাইড** নামে হরমোন ক্ষরিত করে।

(c) **কার্যাবলি**—ইনসুলিন, গ্লুকাগোন এবং সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোনের সাহায্যে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস দেহে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে।

## ▲ I. ইনসুলিন (Insulin) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের β (বিটা) কোশ থেকে যে মধুমেহ বিরোধী প্রোটিন জাতীয় হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে ইনসুলিন (Insulin) বলে।**

○ ব্যানটিং (Banting) এবং বেস্ট সর্বপ্রথম ইনসুলিন হরমোন আবিষ্কার করেন।

(b) **ইনসুলিনের কার্যাবলি (Functions of Insulin) :** কার্বোহাইড্রেট বিপাকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করা ইনসুলিনের মুখ্য কাজ। এছাড়া প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের বিপাকেও অংশগ্রহণ করে।

● 1. **কার্বোহাইড্রেটের বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on metabolism of Carbohydrate) : ইনসুলিন হরমোনকে মধুমেহরোগবিরোধী হরমোন (Antidiabetogenic hormone) বলা হয়, কারণ ইনসুলিন নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণকে কমিয়ে দেয়।

(i) **গ্লুকোজের ভেদ্যতা**—ইনসুলিন কোশঝিল্লির মধ্য দিয়ে **গ্লুকোজের প্রবেশকে** বাড়ায়।

(ii) **গ্লুকোজের জারণ**—ইনসুলিন কোশের সাইটোপ্লাজমের হেক্সোকাইনেজ উৎসেচকের সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে কোশের মধ্যে **গ্লুকোজের জারণকে** বাড়ায়।

চিত্র 7.15 : অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির কয়েকটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থিথলি এবং কেন্দ্রাংশে অবস্থিত আইলেট্স অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের α ও β কোশ।

(iii) **গ্লুকোজের সঞ্চয়**—গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ইনসুলিন পেশি ও যকৃতে **গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণকে** বৃদ্ধি করে ও সংশ্লেষিত গ্লাইকোজেনকে **সঞ্চিত** রাখতে সাহায্য করে।

(iv) অন্ত্র থেকে **গ্লুকোজের শোষণকে** বাধা দেয়। এছাড়া অকার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষণে অর্থাৎ **গ্লুকোনিওজেনেসিস** প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়।

● 2. **প্রোটিনের বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on metabolism of Protein) : ইনসুলিন দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণকে বাড়ায়। প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষণে বাধা দেয়।

● 3. **স্নেহ পদার্থের বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on metabolism of Fat) : ইনসুলিন স্নেহ পদার্থের জারণে বাধা দেয় এবং গ্লুকোজ ও ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে স্নেহদ্রব্যের উৎপাদন এবং যকৃৎ ও চর্বি কোশে এদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে।

## ▲ II. গ্লুকাগন (Glucagon) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের α (আলফা) কোশ থেকে যে ইনসুলিনের কার্য-বিরোধী প্রোটিন জাতীয় হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে গ্লুকাগন (Glucagon) বলে।**

(b) **গ্লুকাগনের কার্যাবলি (Functions of Glucagon) ঃ** গ্লুকাগন ইনসুলিনবিরোধী ক্রিয়া করে, যেমন—(i) যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে বিশ্লিষ্ট করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে বাড়ায়। (ii) অ্যামাইনো অ্যাসিডকে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত করে। (iii) স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণে অংশ নেয়।

## ▲ III. সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে পলিপেপটাইড জাতীয় পদার্থ (হরমোন) অগ্ন্যাশয়ের δ (ডেলটা) কোশ, হাইপোথ্যালামাস এবং চোখের রেটিনা থেকেও ক্ষরিত হয় তাকে সোমাটোস্ট্যাটিন বলে।**

(b) **কাজ** — (i) অগ্ন্যাশয় কোশ থেকে উৎপন্ন সোমাটোস্ট্যাটিন ইনসুলিন ও গ্লুকাগন ক্ষরণে বাধা দেয়। (ii) হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন সোমাটোস্ট্যাটিন দেহের বৃদ্ধিরোধকারী হরমোন (Growth inhibiting hormone, GIH) হিসাবে কাজ করে।

**● সোমাটোমেডিন (Somatomedin) ●**

1. **সংজ্ঞা**—একপ্রকার পলিপেপটাইড জাতীয় বৃদ্ধিপোষক ফ্যাক্টর যা STH-এর প্রভাবের যকৃতে উৎপন্ন হয়।
2. **কাজ**—সোমাটোমেডিন অস্থির উপরে অবস্থিত এপিফাইসিয়াল তরুণাস্থি কোশের বিভাজন ঘটিয়ে অস্থির বৃদ্ধি ঘটায়।

## ➤ ইনসুলিনের অভাবজনিত রোগ (Disease due to lack of Insulin) ঃ

### ☐ ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus; *mellitus*—sweet) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—যে রোগের ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে মূত্রের মাধ্যমে গ্লুকোজযুক্ত প্রচুর জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায় সেই রোগকে মধুমেহ (ডায়াবেটিস মেলিটাস) বলে।**

(b) **মধুমেহ (ডায়াবেটিস) হওয়ার কারণ—ইনসুলিনের** অনুপস্থিতিতে অথবা অভাবে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কলাকোশে ঢুকতে পারে না অথবা ঢুকলেও সঠিকভাবে জারিত হয় না, ফলে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ ক্রিয়া ঘটে না। এছাড়া ইনসুলিনের অভাবে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অকার্বোহাইড্রেট থেকে যকৃতে গ্লুকোজের সংশ্লেষণ বেড়ে যায়। এইসব কারণে **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** অর্থাৎ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় মূত্র দিয়ে গ্লুকোজ দেহ থেকে রেচিত হয়। একে **গ্লাইকোসুরিয়া** (glycosuria) বলে। **স্বাভাবিক অবস্থায়** প্রতি 100 ml রক্তে প্রায় **80-120 mg** গ্লুকোজ থাকে। কোনো কারণে গ্লুকোজের পরিমাণ 100 ml রক্তে 180 mg বা তার বেশি হয় তখন 180 mg-এর অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থাকে **গ্লাইকোসুরিয়া** বলে। **এই দুটি অস্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ হাইপারগ্লাইসিমিয়া এবং গ্লাইকোসুরিয়া একত্রে ঘটলে, সেই অবস্থাকে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus) বলা হয়।**

● **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ও ডায়াবেটিস মেলিটাসের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Diabetes Insipidus and Diabetes Mellitus) ঃ**

| ডায়াবেটিস ইন্‌সিপিডাস (বহুমূত্র) | ডায়াবেটিস মেলিটাস (মধুমেহ) |
|---|---|
| 1. বহুমূত্র রোগে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। | 1. মধুমেহ রোগে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি হয়। এই অবস্থাকে হাইপারগ্লাইসিমিয়া বলে। |
| 2. মূত্রের মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণে জল দেহ থেকে বের হয়। এই অবস্থাকে পলিউরিয়া বলে। | 2. মূত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ বের হয়। এই মূত্রকে গ্লাইকোসুরিয়া বলে। |
| 3. বহুমূত্র রোগ পশ্চাৎ পিটুইটারির ADH (অ্যান্টিডাই-ইউরেটিক হরমোন)-এর অভাবে ঘটে। | 3. মধুমেহ রোগ প্রধানত অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ইনসুলিন হরমোনের অভাবে ঘটে। |

(c) **মধুমেহ রোগের উপসর্গ**—(i) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি—**হাইপারগ্লাইসিমিয়া**, (ii) মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি — **গ্লাইকোসুরিয়া**, (iii) মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি—**পলিউরিয়া**, (iv) অত্যধিক জল তৃষ্ণার অনুভূতি—**পলিডিপসিয়া**, (v) কিটোন বডি সংশ্লেষণ বৃদ্ধি—**কিটোসিস** ইত্যাদি উপসর্গগুলি দেখা যায়।

## 7.8. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বৃক্কের উপরের অগ্রাংশে (উপরের মেরু - Upper pole) অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি টুপির মতো থাকে বলে একে **সুপ্রারেনাল গ্রন্থি** (Suprarenal gland)-ও বলে। প্রতিটি গ্রন্থিতে দুটি অংশ থাকে। পরিধির অংশকে **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** (Adrenal cortex) এবং কেন্দ্রভাগের অংশকে **অ্যাড্রিনাল মেডালা** (Adrenal medulla) বলে।

### ▲ I. অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (Adrenal cortex) :

**➤ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের গঠন, হরমোন, কার্যাবলি এবং সংশ্লিষ্ট রোগসমূহ (Structure, Function and Diseases of Adrenal Cortical hormones) :**

(a) **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের গঠন :** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু এবং প্রচুর লিপিড দানাযুক্ত বহুসংখ্যক বহুভুজাকৃতি (Polyhedral) কোশ নিয়ে গঠিত। এই কোশগুলি তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে। (i) বাইরের দিকের স্তরকে **জোনা গ্লোমেরুলোসা** (Zona glomerulosa), (ii) মধ্যবর্তী স্তরকে **জোনা ফ্যাসিকুলেটা** (Zona fasciculata) এবং (iii) ভিতরের জালকাকার স্তরকে **জোনা রেটিকুলারিস** (Zona reticularis) বলা হয়। এই সব স্তর থেকে বহু স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন ক্ষরিত হয়।
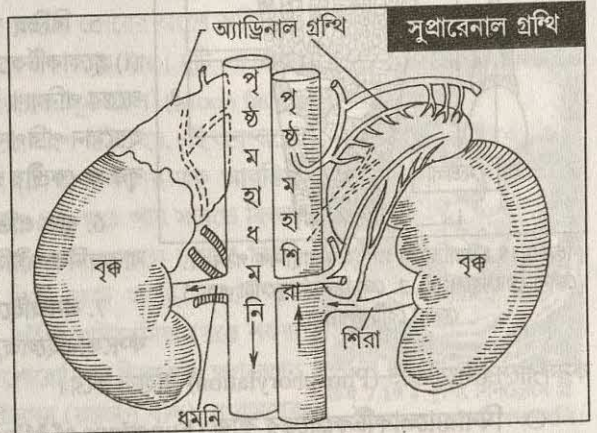
চিত্র 7.16 : অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবস্থান।

(b) **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের হরমোন :** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স গ্রন্থি থেকে অনেকগুলি স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরিত হয় এদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— **গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনার‍্যালোকর্টিকয়েড এবং যৌনস্টেরয়েড বা সেক্সস্টেরয়েড।**

চিত্র 7.17 : অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির চিত্ররূপ।

1. **গ্লুকোকর্টিকয়েড** (Glucocorticoids)—**কর্টিসল** (Cortisol), **কর্টিসোন** (Cortisone) এবং **কর্টিকোস্টেরন** (Corticosterone) নামে হরমোন গ্লুকোকর্টিকয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

2. **মিনার‍্যালোকর্টিকয়েড** (Mineralocorticoids)—এই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল—**অ্যালডোস্টেরন** (Aldosterone) এবং **ডিঅক্সিকর্টিকোস্টেরন** (Deoxycorticosterone)।

3. **যৌন স্টেরয়েড (সেক্স স্টেরয়েড**—Sex steroid)—**অ্যান্ড্রোজেন** (Androgen), **ইস্ট্রোজেন** (Estrogen) এবং **প্রজেস্টেরন** (Progesterone)।

**➤ (a) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের কাজ (Functions of Adrenal cortex) :** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড হরমোন (গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড এবং যৌন স্টেরয়েড) নিম্নলিখিত কাজ করে।

(c) **গ্লুকোকর্টিকয়েডের কাজ (Functions of Glucocorticoids) :**

1. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on carbohydrate metabolism)—গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোনগুলি কার্বোহাইড্রেট বিপাকে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই হরমোন যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনের সংশ্লেষণের বৃদ্ধি ঘটায়, কলা

কোশে গ্লুকোজের জারণ প্রক্রিয়াকে হ্রাস করে এবং ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে গ্লুকোজের শোষণকে বৃদ্ধি করে। এছাড়া প্রোটিন ইত্যাদিকে গ্লুকোজে পরিণত করতে সাহায্য করে। এই সব কাজের ফলে রক্ত-শর্করা বেড়ে যায়।
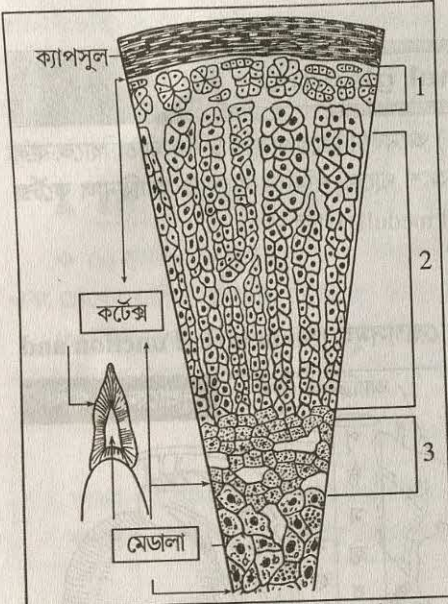
চিত্র 7.18 : অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কলাস্থানিক গঠন। 1. জোনা গ্লোমেরুলোসা, 2. জোনা ফ্যাসিকুলেটা এবং 3. জোনা রেটিকুলারিস।

2. **প্রোটিন বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on Protein metabolism)— গ্লুকোকর্টিকয়েড কলাকোশে প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে ফলে মূত্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের রেচন বেড়ে যায়।

3. **স্নেহ পদার্থের বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on Fat metabolism)— অন্ত্র থেকে স্নেহ পদার্থের শোষণ বৃদ্ধি করে। কার্বোহাইড্রেট থেকে স্নেহপদার্থে সংশ্লেষণ হ্রাস করে এবং সঞ্চয়স্থল থেকে স্নেহ পদার্থের অপসারণ ঘটায়।

4. **মৌল বিপাকীয় হারের উপর প্রভাব** (Effect on B.M.R.)— গ্লুকোকর্টিকয়েড মৌল বিপাকীয় হারকে কোনো-না-কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনের অভাবে মৌল বিপাকীয় হার প্রায় 25 শতাংশ হ্রাস পায়।

5. **বিভিন্ন তন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on different systems)— (i) গ্লুকোকর্টিকয়েড **রক্তের** ইওসিনোফিল ও লিম্ফোসাইটের সংখ্যা হ্রাস করে। রক্তের পরিমাণ, উপাদান ও রক্তচাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত পেশির দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। (iii) **বৃক্ক** ও **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের** উপর গ্লুকোকর্টিকয়েড অংশগ্রহণ করে।

6. **বাত প্রতিরোধ :** কর্টিসোন নামে গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন অস্থি-সন্ধির বাতজনিত স্ফীতি (Arthritis) নিরাময় করে।

7. **এনজাইমের উপর প্রভাব** (Effect on enzyme) —গ্লুকোকর্টিকয়েড ফসফোরাইলেজ, ফসফাটেজ প্রভৃতি এন্‌জাইমের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফসফরাসের সংযুক্তিতে (Phosphorylation) সাহায্য করে।

○ **মিনার‍্যালোকর্টিকয়েডের কাজ (Functions of Mineralocorticoids) :**

8. **খনিজ পদার্থের বিপাকের উপর প্রভাব**— মিনার‍্যালোকর্টিকয়েড বৃক্কের রেচন নালিকা থেকে NaCl এবং বাইকার্বোনেটের পুনঃশোষণ ক্রিয়াকে বৃদ্ধি করে। অপরপক্ষে পটাশিয়াম ও ফসফরাসের পুনঃশোষণ ক্রিয়াকে হ্রাস করে। এভাবে রক্তে ওই সব খনিজ পদার্থের স্বাভাবিক পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

9. **জলের সাম্যাবস্থার নিয়ন্ত্রণ**—বৃক্কনালি থেকে জলের পুনঃশোষণকে বৃদ্ধি করে দেহে জলের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

10. **পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা**—নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়নের (Stress) বিরুদ্ধে ওই হরমোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

○ **যৌন স্টেরয়েডের কাজ (Functions of Sex steroids) :**

11. এই হরমোন যৌন গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং যৌন লক্ষণ পরিস্ফুরণে সহায়তা করে।

## ➤ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের স্বল্প ও অধিক সক্রিয়তাজনিত গলযোগ এবং রোগ (Disorders and Diseases due to Hypo and Hyper activities of Adrenal cortex] :

1. **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের স্বল্প সক্রিয়তা (Hypoactivities of Adrenal cortex) :** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের স্বল্প সক্রিয়তা ঘটলে কর্টিকয়েড (গ্লুকোকর্টিকয়েড) হরমোনের উৎপাদন হ্রাস পায় ফলে **এডিসনস বর্ণিত রোগ** দেখা যায়।

■ **এডিসোনের ব্যাধি (Addison's disease) :**

❖ **সংজ্ঞা— অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের ক্ষয়জনিত যে রোগ 30-50 বৎসর বয়স্ক লোকের প্রধানত পুরুষের মধ্যেই অধিক দেখা যায় তাকে অ্যাডিসোন বর্ণিত রোগ বা অ্যাডিসোনের ব্যাধি (Addison's disease) বলে।**

**থোমাস অ্যাডিসোন** (Thomas Addison) 1855 খ্রিস্টাব্দে এই ব্যাধির বিবরণ দেন। তার নামানুসারে এই রোগের নাম **অ্যাডিসোনের ব্যাধি** বলা হয়। এডিসোন ব্যাধির উপসর্গগুলি হল—

(i) দেহত্বক (প্রধানত সূর্যালোকে উন্মুক্ত অঞ্চল) ব্রোঞ্জের মতো বাদামি কালচে বর্ণের হয়। (ii) দেহ ওজনের হ্রাস, মানসিক উদ্যমহীনতা, ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া দেহের ওজনের হ্রাস এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায় যার ফলে পেশিতে দুর্বলতা দেখা যায়। (iii) হৃৎস্পন্দন হার ও রক্তচাপ কমে যায়, মৌল বিপাকীয় হার কমে যায়, যৌন ক্রিয়াকলাপ হ্রাস ইত্যাদি ঘটে। (iv) মূত্রে লবণ ও জলের পরিমাণ বাড়ে, এর ফলে রক্তের পরিমাণ এবং সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। (v) রক্ত-জালকের ভেদ্যতা বৃদ্ধির ফলে জল রক্ত থেকে রক্তজালক অতিক্রম করে কলা রসে প্রবেশ করে, ফলে **ইডিমা** সৃষ্টি হয়। (vi) বৃক্কের কার্যাবলি ব্যাহত হয় ফলে দেহে নাইট্রোজেন সংরক্ষণ ঘটে যা রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণকে বাড়ায় একে **ইউরিমিয়া** বলে।

## ➤ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সে অধিক সক্রিয়তা (Hyperactivities of Adrenal cortex) ঃ

1. **কুশিং সিনড্রোম (Cushing's syndrome) ঃ** কর্টেক্সের অধিক সক্রিয়তার ফলে কুশিং সিন্ড্রোম ঘটে। গ্লুকোকর্টিকয়েড (প্রধানত কর্টিসল ও কর্টিসোন হরমোন)-এর অধিক ক্ষরণের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। **কুশিং সিনড্রোমের উপসর্গ হল—**

চিত্র 7.19 ঃ কুশিং সিনড্রোমে স্ত্রী লোকের দেহে কয়েকটি লক্ষণাবলি।

(i) দেহে ফ্যাটের ত্রুটিপূর্ণ স্থানান্তরণ হওয়ায় বুকে এবং পেটের ওপরের অংশে অতিরিক্ত ফ্যাট সঞ্চিত হয় এবং পেটের ওপরের ত্বকে কাটা কাটা চিহ্ন লক্ষ করা যায়। দুটি পা মাকু আকৃতির (Spindly legs) হয়। মুখমণ্ডল ফুলে যায়। এই অবস্থাকে 'মুন-ফেস' (Moon face) বলে। দেহের পেছনে ওপরের ফ্যাটের সঞ্চয়ের ফলে কুঁজোর মতো অংশ গঠিত হয়, এই অবস্থাকে (Buffalo hump) বলে। (ii) মুখমণ্ডলের ত্বক আরক্তিম (Flushed skin) দেখা যায়। (iii) ক্ষত স্থান সারতে বিলম্ব হয়। রোগীর গায়ে সামান্য চোট লাগলে চামড়া বিবর্ণ (কালশিটে) হয়ে পড়ে, কিন্তু কেটে বা ছিঁড়ে যায় না। (iv) **অন্যান্য পরিবর্তন**—হাইপারগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা পরিমাণের বৃদ্ধি), ওস্টিওপোরোসিস (ছিদ্রযুক্ত ও ক্ষণভঙ্গুর অস্থি) দুর্বলতা, হাইপারটেনসন (রক্তচাপ বৃদ্ধি), সংক্রমণের প্রতি অধিক সংবেদনশীল, পীড়ন বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ব্যবস্থার হ্রাস ইত্যাদি। রক্তে অসুস্থতা, হাঁপানি, আরথ্রাইটিস (অস্থি সন্ধির প্রদাহ) ইত্যাদি অসুখের চিকিৎসার সময় অধিক স্টেরয়েড যেমন—প্রিডনিসোন (Prednisone) ব্যবহৃত হলে কুশিং সিনড্রোম হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

চিত্র 7.20 ঃ অ্যাড্রিনোজেনিটাল সিনড্রোম

2. **অ্যাড্রিনোজেনিটাল সিনড্রোম (Adrenogenital syndrome) ঃ** যে অবস্থায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের অধিক সক্রিয়তার ফলে যখন অধিক অ্যান্ড্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হয়, তখন দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **অ্যাড্রিনোজেনিটাল সিনড্রোম** বলে। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স অঞ্চলে টিউমার হলে এই অবস্থা হতে পারে। ভ্রূণ অবস্থায় বাড়ন্ত শিশুদের বা প্রাপ্তবয়স্কদের এই রোগ হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক **স্ত্রীলোকের** পুরুষালীভাব, গাঢ় কণ্ঠস্বর পুরুষের মতো বুকে, দেহে, জংঘা ও হাত-পা-তে লোম দেখা যায়। মাতৃস্তন শুকিয়ে যায়। মাথায় টাক, ভগাঙ্কুরে বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটে। **পুরুষের** ক্ষেত্রে পরিবর্তন তেমন স্পষ্ট নয়।

⊙ **উপসর্গ**—এই রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গগুলি হল আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ এবং গৌণ যৌন বিশেষত্বের মধ্যে অস্বাভাবিকতা। ভ্রূণাবস্থায় অ্যানড্রোজেনের অতিক্ষরণের ফলে স্ত্রী ও পুরুষোচিত উভয় প্রকার যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ একই দেহে প্রকাশ পায়।

## ▲ II. অ্যাড্রিনাল মেডালা (Adrenal medulla)

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অন্তঃস্থ (কেন্দ্রীয়) অংশকে অ্যাড্রিনাল মেডালা বলে।**

❖ (b) **গঠন ঃ** অ্যাড্রিনাল মেডালা অনিয়মিত বহুভুজাকৃতি দানাদার কোশের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোশগুলিকে **ক্রোমাফিন**

(Chromaffin) কোশ বলে। এছাড়া গাঢ় নিউক্লিয়াস এবং স্বল্প সাইটোপ্লাজমযুক্ত ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইটের মতো কোশ থাকে। একে সিমপথোগোনিয়া বলে।

(c) **অ্যাড্রিনাল মেডালা নিঃসৃত হরমোন :** ক্রোমাফিন কোশগুলি দু'প্রকার প্রোটিন জাতীয় হরমোন নিঃসৃত করে, যেমন — (i) **অ্যাড্রিনালিন** বা **এপিনেফ্রিন** এবং ডোপামিন (ii) **নর-অ্যাড্রিনালিন বা নর-এপিনেফ্রিন**। এদের একত্রে **ক্যাটেকোলামাইনস্** (Catacholamines) বলে। ক্যাটেকোলামাইনস অ্যাড্রিনাল মেডালাতে টাইরোসিন এবং ফিনাইল-অ্যালানিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়। এর কারণ এই হরমোনগুলি ক্যাটেকল (Catechols) গোষ্ঠীভুক্ত যৌগ।

**➤ অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন-এর কার্যাবলি (Functions of Adrenaline or Epinephrine) :**

1. **হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব** (Effect on heart)—হৃৎস্পন্দনের হার, হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্ষমতা, হার্দ-উৎপাদ (Cardiac output) ইত্যাদিকে বাড়ায়।

2. **রক্তবাহের উপর প্রভাব** (Effect on blood vessels)—করোনারি, যকৃৎ ও অস্থিপেশির রক্তবাহ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের রক্তবাহকে সংকুচিত করে।

3. **রক্ত চাপের উপর প্রভাব** (Effect on blood pressure)— হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি এবং রক্তবাহের সংকোচন ঘটিয়ে রক্তের চাপকে বাড়ায়।

4. **শ্বাসতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on respiration)—অ্যাড্রিনালিন উপক্লোমশাখাকে প্রসারিত করে শ্বাসক্রিয়ার হার ও গভীরতাকে বাড়ায়।

5. **কঙ্কাল পেশির উপরে প্রভাব** (Effect on skeletal muscle)—অ্যাড্রিনালিনের প্রভাবে অস্থিপেশির উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও সংকুচিত হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পেশির অসাড়তাকে হ্রাস করে এবং পেশিটানকে বাড়িয়ে দেয়।

6. **অনৈচ্ছিক পেশির উপর প্রভাব** (Effect on smooth muscle)— পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতির অনৈচ্ছিক পেশিকে প্রসারিত করে। অপরপক্ষে গবিনী, মূত্রাশয়ের পেশিবলয়, পিত্তাশয় প্রভৃতি স্থানের অনৈচ্ছিক পেশি এই হরমোনের প্রভাবে সংকুচিত হয়।

7. **দেহত্বক এবং দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের উপর প্রভাব** (Effect on skin and regulation of body temperature)— এপিনেফ্রিন ত্বকের লোমের মূলের পেশির সংকোচন ঘটিয়ে লোম খাড়া হতে সাহায্য করে। ত্বকের রক্তবাহকে সংকুচিত করে রক্তসংবহনকে হ্রাস করে ফলে দেহ থেকে তাপক্ষয়কে রোধ করে। এ ছাড়া অ্যাড্রিনালিন মৌলবিপাকীয় হারকে বৃদ্ধি করে দেহে তাপ উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

8. **বিপাকের উপর প্রভাব** (Effect on metabolism)—অ্যাড্রিনালিন যকৃৎ ও পেশির গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়।

9. **রেচনতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on excretory system)—এই হরমোন নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তজালকের সংকোচন ঘটিয়ে মূত্র উৎপাদন হ্রাস করে।

10. **স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect of nervous system)—অ্যাড্রিনালিন মানসিক, স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এই হরমোনের প্রভাবে প্রাণীদেহে আতঙ্ক ও ভীতিভাবের অনুভূতি জাগ্রত হয়।

**➤ নর-অ্যাড্রিনালিন বা নর-এপিনেফ্রিনের কার্যাবলি**—নর-অ্যাড্রিনালিনের সক্রিয়তা প্রায়ই অ্যাড্রিনালিনের মতো কিন্তু ফলাফলের তীব্রতা ও প্রকৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কখনো-কখনো নর-অ্যাড্রিনালিন অ্যাড্রিনালিনের বিপরীত ক্রিয়াও করে।

**● অ্যাড্রিনালিন এবং নর-অ্যাড্রিনালিনের কয়েকটি বিপরীত ক্রিয়া ●**

| তন্ত্রের উপর ক্রিয়া | অ্যাড্রিনালিন | নর-অ্যাড্রিনালিন |
|---|---|---|
| 1. হৃৎস্পন্দনের হার | বাড়ায় | কমায় |
| 2. হার্দ-উৎপাদ | বাড়ায় | সামান্য |
| 3. রক্তচাপ | বাড়ায় | বাড়ায় |
| 4. রক্তনালির পেশি | প্রসারিত করে | সংকুচিত করে |
| 5. শ্বাসক্রিয়া | উদ্দীপিত করে | উদ্দীপিত করে |
| 6. বিপাক ক্রিয়া | বেশি হয় | কোনো ভূমিকা নেই |

**● ক্যাননের আক্রমণ-পলায়ন প্রতিক্রিয়া (Fight and Flight reactions of Cannons) অথবা আপৎকালীন হরমোন (Hormone of Emergency) ●**

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিনকে (এপিনেফ্রিনকে) আপৎকালীন হরমোন বলে। কারণ দেহের কয়েকটি জরুরি অবস্থায় অর্থাৎ **সংকটকালীন অবস্থায়** যেমন ভয়, রাগ, মানসিক আবেগের অবস্থায় এই হরমোন ক্ষরিত হয়। এই সব অবস্থায় এপিনেফ্রিন প্রাণীদেহে হৃৎস্পন্দনের হার, রক্তপ্রবাহের গতির বৃদ্ধি, তারারন্ধ্রের প্রসারণ, ত্বকের লোম খাড়া হওয়া এবং অধিক ঘর্ম ক্ষরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি শ্বাসক্রিয়ার হার, রক্তচাপ ইত্যাদি বেড়ে প্রাণীকে সংকট অবস্থার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

সংকটকালীন অবস্থায় মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির চিত্র।

## ✪ 7.9. প্লাসেন্টা (Placenta) ✪

### ➤ প্লাসেন্টার সংজ্ঞা, গঠন ও কার্যাবলি (Definition, Structure and Functions of Placenta) :

❖ (a) **প্লাসেন্টার সংজ্ঞা (Definition of Placenta) :** ক্রমবর্ধমান কোশসমষ্টিযুক্ত ভ্রূণ জরায়ুতে পৌঁছানোর চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বর্ধনশীল অন্তর্জরায়ু স্তরে (এন্ডোমেট্রিয়ামে) দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে ভ্রূণের ও অন্তর্জরায়ু স্তরের কতকগুলি কলা মিলিত হয়ে যে চ্যাপটাকৃতি কেকের মতো অস্থায়ী বিশেষ পরিবর্তিত অঙ্গ তৈরি করে তাকে অমরা (প্লাসেন্টা) বলে।

(b) **প্লাসেন্টার গঠন (Structure of Placenta) :** প্লাসেন্টা প্রধানত দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত, যেমন—(i) **মাতৃজ অংশ** (Maternal part)—এটি প্রধান অন্তর্জরায়ু স্তরে বৃহদাকৃতি রক্তপূর্ণ সাইনাস (স্ফীত রক্তবাহ) নিয়ে গঠিত। (ii) **ভ্রূণজ অংশ** (Foetal part)—এটি প্রধানত ছোটো ছোটো ভিলাই মতো অংশ যা নিষিক্ত ডিম্বাণু অন্তর্জরায়ু স্তরে রোপিত হওয়ার পর গঠিত হয়। এগুলিকে কোরিওনিক ভিলাই বলে যা এন্ডোমেট্রিয়ামের সাইনাসের রক্তের মধ্যে ডুবে থাকে।

(c) **প্লাসেন্টার কাজ (Functions of placenta) :**

1. **পুষ্টির সরবরাহ**—মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে যায়।

2. **গ্যাসের আদানপ্রদান**—মায়ের রক্ত থেকে $O_2$ ভ্রূণের রক্তে আবার ভ্রূণের রক্ত থেকে $CO_2$ মায়ের রক্তে যায়। এভাবে $O_2$ ও $CO_2$-এর আদানপ্রদান প্লাসেন্টার মাধ্যমে ঘটে।

3. **বর্জ্য পদার্থে রেচন**—ভ্রূণে উৎপন্ন বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলি প্লাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের রক্তে যায় ও সেখান থেকে ওই বর্জ্য পদার্থগুলি মায়ের মূত্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত (রেচিত) হয়।

4. **সঞ্চয়**—গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে প্লাসেন্টা গ্লাইকোজেন, ফ্যাট, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, লৌহ প্রভৃতিকে সঞ্চিত রাখে।

5. **হরমোন**—প্লাসেন্টা বিভিন্ন প্রকার হরমোন, যেমন—HCG (হিউম্যান কেরিওনিক গোনাডোট্রফিন), ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন ইত্যাদি ক্ষরণ করে।
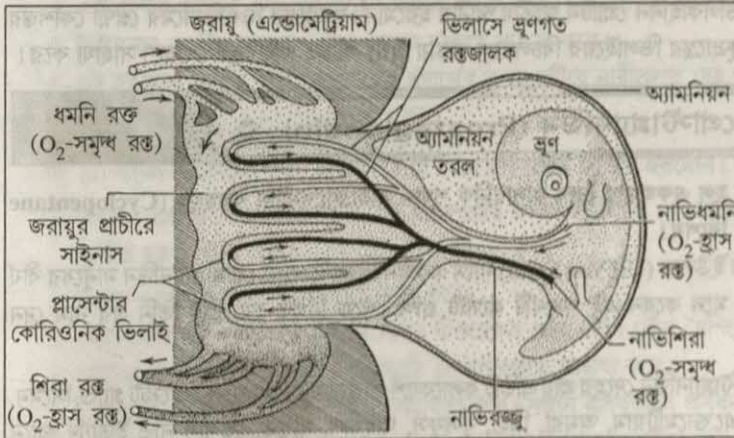
চিত্র 7.21. : প্লাসেন্টার গঠন।

**• সাময়িক বা পর্যায়বৃত্ত বা পৌনঃপুনিক গ্রন্থি কী ? (What is Periodic or Recurrent gland ?) •**

যে গ্রন্থি দেহে স্থায়ীভাবে থাকে না, বারে বারে উৎপন্ন হয় এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত থেকে আবার বিনষ্ট হয়ে যায় তাদের সাময়িক বা পর্যায়বৃত্ত এবং পৌনঃপুনিক গ্রন্থি বলে। যেমন—ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকল ও কর্পাস লুটিয়াম এবং প্লাসেন্টা ইত্যাদি।

## ○ 7.10. পাকঅন্ত্রীয় হরমোন (Gastrointestinal Hormones) ○

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : পৌষ্টিকনালির পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্তর থেকে যেসব স্থানীয় হরমোন নিঃসৃত হয় তাদের একত্রে পাকঅন্ত্রীয় (Gastrointestinal) হরমোন বলে।**

1. **গ্যাসট্রিন (Gastrin) :** পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশের মিউকাস মেমব্রেন G-কোশগুলি থেকে গ্যাসট্রিন নামে পলিপেপটাইড জাতীয় স্থানীয় (Local) হরমোন নিঃসৃত হয়। পলিপেপটাইড জাতীয় হরমোন ক্ষরণের পর রক্তে যায়, আবার রক্তের মাধ্যমে পাকস্থলীতে ফিরে এসে তার কাজগুলি সম্পন্ন করে। কাজের পর বৃক্কে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে গ্যাসট্রিন বিনষ্ট হয়।

• **কাজ**—(i) গ্যাসট্রিন পাচকরস (Gastric juice) ক্ষরণে সাহায্য করে। (ii) পাচক রসে পেপসিন উৎসেচক ও HCl পরিমাণকে বাড়ায়। (iii) পাকস্থলীর বিচলনকে উদ্দীপিত করে।

2. **সিক্রেটিন (Secretin) :** ডিওডিনামের (Duodenum) শ্লেষ্মা ঝিল্লি বা মিউকাস মেমব্রেন থেকে সিক্রেটিন নামে প্রোটিন জাতীয় স্থানীয় হরমোন নিঃসৃত হয়।

• **কাজ**—খাদ্য ডিওডিনামে ঢোকার পর সিক্রেটিন ডিওডিনাম থেকে রক্তে যায়। এরপর এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপিত করে ও অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juice) ক্ষরণে সাহায্য করে।

3. **কোলেসিস্টোকাইনিন-প্যানক্রিয়জাইম (Cholecystokinin Pancreozyme** সংক্ষেপে **CCK-PZ) :** পূর্বে ধারণা ছিল যে কোলেসিস্টোকাইনিন এবং প্যানক্রিয়জাইম দুটি পৃথক হরমোন। এই দু'প্রকার হরমোনের প্রথমটি পিত্তথলির সংকোচন এবং দ্বিতীয়টি অগ্ন্যাশয় থেকে উৎসেচক ক্ষরণে সাহায্য করে। বর্তমানে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে এই দুটি হরমোন একই প্রকার এবং একসঙ্গে বিভিন্ন কাজ করে। প্রধানত চর্বি জাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করার পর ডিওডিনামের মিউকাস মেমব্রেন I-কোশ থেকেCCK-PZ হরমোন রক্তে নিঃসৃত হয়।

• **কাজ**—(i) CCK-PZ প্রধানত পিত্তথলিকে (Gall bladder) সংকুচিত করে ফলে পিত্তথলির সঞ্চিত পিত্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করাতে সাহায্যে করে। (ii) এই হরমোন অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম ক্ষরণেও সাহায্য করে। (iii) পৌস্টিকনালির বিচলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

4. **ভিলিকাইনিন (Villikinin) :** ভিলিকাইনিন প্রোটিন জাতীয় স্থানীয় হরমোন। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামের শ্লেষ্মা কোশস্তর থেকে নিঃসৃত হয়। • **কাজ**—(i) এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের বিচলনকে বাড়ায়। (ii) পাচিত খাদ্যবস্তুর শোষণে সাহায্য করে।

## ○ 7.11. প্রোস্টাগ্ল্যানডিন (Prostaglandin) ○

❖ (a) **সংজ্ঞা : প্রোস্টাগ্ল্যানডিন হল একপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ সাইক্লোপেনটান বলয়যুক্ত (Cyclopentane ring) 20 টি কার্বনসম্পন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড বিশেষ।**

1930 খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের উলফ্ ভন ইউলার (Ulf Von Euler) নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম প্রোস্টাগ্ল্যানডিন মানুষের বীর্য (Semen) থেকে আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন এই পদার্থটি **প্রস্টেট গ্রন্থি** থেকে নির্গত হয়, তাই তিনি এর নাম দেন প্রোস্টাগ্ল্যানডিন।

(b) **উৎস :** বর্তমানে জানা গেছে প্রোস্টাগ্ল্যানডিন দেহের প্রায় প্রতিটি কলাকোশে পাওয়া যায়, যেমন— প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, সিমেন, সেমিনাল ভেসিকল, রজোস্রাব, জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম, অমরা, কিডনি, ফুসফুস, থাইমাস, মস্তিষ্ক, ভেগাস নার্ভ ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

(c) **কাজ :** (1) জনন কাজ, লিপিডের সংশ্লেষণ, পাকস্থলীর রসের ক্ষরণ ইত্যাদি কার্যাবলিতে প্রোস্টাগ্ল্যানডিন বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। (2) কিছু প্রোস্টাগ্ল্যানডিন রক্তনালির প্রসারণ ঘটায় এবং অপর কিছু রক্তনালির সংকোচন ঘটায়। (3) স্নায়ুতন্ত্রে এটি স্নায়ুজ প্রেরক হিসাবে কাজ করে। (4) এটি শুক্রাণুর পরিবহনে সাহায্য করে। সন্তান প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন-প্রসারণকে বাড়িয়ে ভ্রূণের ও প্লাসেন্টার নির্গমনে অংশ নেয়। (5) পাকস্থলী থেকে পাচক রসের ক্ষরণে বাধা দেয়। (6) সন্তান প্রসবের সময় জরায়ুকে সংকুচিত করে সন্তান প্রসবে সাহায্য করে।

## 7.12. যৌন হরমোন (Sex hormones)

### I. টেস্টোস্টেরন (Testosterone) :

❖ (a) **সংজ্ঞা**—**শুক্রাশয়ের লিডিগ কোশ ক্ষরিত স্টেরয়েড জাতীয় পুং যৌন হরমোনকে টেস্টোস্টেরন বলে।**

(b) **উৎস**—(i) টেস্টোস্টেরন শুক্রাশয়ের **লিডিগের আন্তরকোশ** এবং (ii) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি কর্টেক্স অঞ্চল থেকে ক্ষরিত হয়।

(c) **কাজ**—টেস্টোস্টেরন নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে,

1. বয়ঃসন্ধিকালে মুখ্য ও আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায়।
2. শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস টিবিউলে শুক্রাণু উৎপাদনে সাহায্য করে।
3. দেহের পেশি এবং অস্থির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেহের সার্বিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
4. লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদনে অংশ নেয়।
5. টেস্টোস্টেরন মৌল বিপাকীয় হার (BMR)-কে বাড়ায়।

### II. ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) :

❖ (a) **সংজ্ঞা**—ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ক্ষরিত স্টেরয়েড জাতীয় স্ত্রী যৌন হরমোনকে ইস্ট্রোজেন বলে।

(b) **উৎস**—(i) ইস্ট্রোজেন প্রধানত ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ক্ষরিত হয়, (ii) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চল এবং (iii) প্লাসেন্টা থেকেও ক্ষরিত হয়।

(c) **কাজ**—ইস্ট্রোজেন নিম্নলিখিত কাজগুলি করে—

1. বয়ঃসন্ধিকালে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে ডিম্বাশয় অর্থাৎ মুখ্য-যৌনাঙ্গ ও জরায়ু, যোনি, ফ্যালোপিয়ান নালি ইত্যাদি গৌণ যৌনাঙ্গের এবং স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে।
2. এই হরমোন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (Secondary sex characters) পরিস্ফুরণ বা বিকাশ ঘটায়।
3. ইস্ট্রোজেন দেহাস্থির এবং পেশির বৃদ্ধি ঘটিয়ে সম্পূর্ণ দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।
4. এটি প্রাণীর ঋতুচক্র এবং স্ত্রীলোকের মাসিক যৌনচক্রকে (Menstrual cycle) নিয়ন্ত্রণ করে।
5. ইস্ট্রোজেন প্রোটিন সংশ্লেষণ করে দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
6. ওই হরমোন দেহের ত্বকের নীচে স্নেহ পদার্থের সঞ্চয় ঘটিয়ে নারীসুলভ দেহ গঠনে সাহায্য করে।

### III. প্রোজেস্টেরন (Progesterone) :

❖ (a) **সংজ্ঞা**—**প্রোজেস্টেরন একপ্রকার স্ত্রী যৌন স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন।**

(b) **উৎস**—প্রোজেস্টেরন প্রধানত— (i) ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম, (ii) প্লাসেন্টা এবং (iii) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত হয়।

(c) **কাজ**—প্রোজেস্টেরন নিম্নলিখিত কাজ করে।

1. ইস্ট্রোজেনের উপস্থিতিতে প্রোজেস্টেরন স্ত্রীলোকের দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশে সাহায্য করে।
2. প্রোজেস্টেরন নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে রোপণ করতে সাহায্য করে।
3. প্রোজেস্টেরন ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে সহায়তা করে। সন্তান প্রসবকালে প্রসবনালি প্রসারিত করে।
4. গর্ভাবস্থায় প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন হরমোন সহযোগিতায় স্তনের গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দুগ্ধ প্রদানকারী স্তনে পরিণত করে।

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর

**1. নিউরোএন্ডোক্রিন-অ্যাক্সিসের মাধ্যমে প্রাণী কীভাবে দেহের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে ?**

- স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণীর দেহের যাবতীয় কার্যাবলি দুটি তন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন—

1. **দ্রুত নিয়ন্ত্রক তন্ত্র** (Rapid control system)— এই তন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, স্নায়ু এবং স্নায়ুপথ নিয়ে গঠিত। এই তন্ত্রের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

2. **মন্থর নিয়ন্ত্রক তন্ত্র** (Slow control system)— এই তন্ত্র অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। এই তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (হরমোনের) মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কাজকে মন্থরভাবে পরিচালিত করে।

এই তন্ত্র দুটি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠিত করে **নিউরো-এন্ডোক্রিন অ্যাক্সিস** (যেমন—**হাইপোথ্যালামিকো-হাইপোফাইসিয়াল অ্যাক্সিস**) যা প্রাণীর দেহের যাবতীয় কাজের সাম্যাবস্থা (Functional balance) এবং সমন্বয় ব্যবস্থা (Co-ordinated function) বজায় রাখে।

**2. স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা করো।**

- স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য **(Similarities and dissimilarities between Nervous system and Endocrine system) :**

| স্নায়ুতন্ত্র | অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র |
|---|---|
| **সাদৃশ্য (Similarity)** | |
| 1. প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ও তন্ত্রের কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সম্পন্ন হয়। | 1. প্রাণীদেহে বিভিন্ন অঙ্গের ও তন্ত্রের বিভিন্ন কাজের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র দিয়ে সম্পন্ন হয়। |
| 2. দেহের বিভিন্ন কাজ স্নায়ু প্রান্ত থেকে নিঃসৃত নিউরোট্রান্সমিটার রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। | 2. দেহের বিভিন্ন কাজ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ (হরমোন)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে। |
| **বৈসাদৃশ্য (Dissimilarity)** | |
| 1. স্নায়ু প্রান্ত থেকে নির্গত (ক্ষরিত) অ্যাসিটাইলকোলিন এবং অ্যাড্রিনালিন নামে নিউরোহিউমার রাসায়নিক পদার্থগুলি ক্ষরণ স্থানেই কাজ করে। | 1. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন রক্তের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে ক্ষরণ স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে কাজ করে। (ব্যতিক্রম কিছু স্থানীয় হরমোন) |
| 2. স্নায়ুতন্ত্র অতি দ্রুত ও স্বল্পস্থায়ী হয়, এর কারণ স্নায়ুপ্রান্ত থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ দ্রুত বিনষ্ট হয়। | 2. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (নিঃসৃত হরমোনের মাধ্যমে) ক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন ও তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়। |

**3. স্নায়ু এবং হরমোনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো।**

- স্নায়ু এবং হরমোনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য **(Similarities and dissimilarities between Nerve and Hormone) :**

| স্নায়ু | হরমোন |
|---|---|
| **সাদৃশ্য** | |
| 1. নার্ভ (স্নায়ু) জীবদেহের (প্রাণীর) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। | 1. হরমোন জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। |

| স্নায়ু | হরমোন |
|---|---|
| ○ বৈসাদৃশ্য | |
| 1. স্নায়ু শুধু প্রাণীদেহে জৈব সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করে। | 1. হরমোন জীবদেহে (প্রাণী ও উদ্ভিদ) রাসায়নিক সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করে। |
| 2. দেহে স্নায়ু অতিদ্রুত কাজ করে যা স্বল্পস্থায়ী হয়। | 2. জীবদেহে হরমোনের ক্রিয়া শ্লথগতিতে চলে ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। |
| 3. এর কার্যক্ষেত্র সীমিত অর্থাৎ উদ্দীপিত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। | 3. এর কার্যক্ষেত্র ব্যাপক। |
| 4. ক্রিয়ার পর স্নায়ুর গঠনগত অথবা কার্যগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। | 4. ক্রিয়ার পর হরমোন বিনষ্ট হয়। |

4. **নিউরোহিউমার কী?**

- নিউরোহিউমার একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা স্নায়ুর প্রান্তীয় প্রান্ত থেকে ক্ষরিত হয়। অ্যাসিটাইলকোলিন এবং অ্যাড্রিনালিন দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিউরোহিউমার। অ্যাসিটাইলকোলিন সাইন্যাপস (দুটি স্নায়ুর সংযোগস্থল) এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর (পোস্টগ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ুর) প্রান্তভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। অ্যাড্রিন্যালিন সাধারণত সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর (পোস্টগ্যাংগ্লিওনিক) প্রান্ত অংশে থেকে ক্ষরিত হয়।

5. **হরমোন এবং নিউরোহরমোনের পার্থক্য লেখো।**

- হরমোনের এবং নিউরোহরমোনের মধ্যে পার্থক্য (**Difference between Hormones and Neurohormones**):

| হরমোন | নিউরোহরমোন |
|---|---|
| 1. হরমোন দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা গ্রন্থিকোশ থেকে ক্ষরিত হয়। | 1. নিউরোহরমোন মস্তিষ্কে অবস্থিত নিউরোসিক্রেটারি কোশ নামে স্নায়ুকোশ থেকে ক্ষরিত হয়। |
| 2. উৎসস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে সরাসরি রক্তে যায়। | 2. উৎসস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রথমে পিটুইটারিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয় এবং পরে রক্তে যায়। |
| 3. উদাহরণ— থাইরক্সিন, অ্যাড্রিন্যালিন, ইনসুলিন ইত্যাদি। | 3. উদাহরণ— ভেসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদি। |

6. **রেনিন (Renin) কী?**

- রেনিন একপ্রকার হরমোন যা বৃক্কের জাক্সটাগ্লোমেরুলাস অ্যাপারাটাসের লেসিস কোশ থেকে ক্ষরিত হয়। কাজ— নিষ্ক্রিয় অ্যান্‌জিওটেনসিনোজেনকে সক্রিয় অ্যান্‌জিওটেন্‌সিনে রূপান্তরিত করে। অ্যানজিওটেনসিন রক্তবাহকে সংকুচিত করে রক্তের চাপকে বাড়ায়। এছাড়া অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন হরমোন ক্ষরণে সাহায্য করে।

7. **অগ্র পিটুইটারিতে অবস্থিত কোশগুলির রঞ্জন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ওই কোশগুলি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলির নাম করো।**

- অগ্র পিটুইটারি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত যেমন—পার্স টিউবেরেলিস এবং পার্স ডিস্ট্যালিস। পার্স ডিস্ট্যালিস অগ্রপিটুইটারির প্রধান অংশ যা প্রধানত দু'রকমের কোশ নিয়ে গঠিত যেমন ক্রোমোফোব কোশ (50%) এবং ক্রোমোফিল কোশ (50%)। এই ক্রোমোফিল কোশগুলি থেকে হরমোন ক্ষরিত হয়। রঞ্জক দ্রবণে রঞ্জিতকরণ অনুযায়ী ক্রোমোফিল কোশ দু'প্রকারের হয়, যথা— (i) **অ্যাসিডোফিল কোশ বা আলফা কোশ** (35%) —অম্লজাতীয় রঞ্জক দ্রবণে রঞ্জিত হয়। (ii) **বেসোফিল কোশ বা বিটা কোশ** (15%)—ক্ষারীয় রঞ্জক দ্রবণে রঞ্জিত হয়।

(ii) (ক) আলফা কোশ আবার দু'প্রকার—সোমাটোট্রফিক কোশ—STH ক্ষরণ করে। ল্যাক্টোট্রফিক কোশ—প্রোলকটিন ক্ষরিত হয়। (খ) বেসোফিল কোশ প্রধানত তিন প্রকার—থাইরোট্রফিক কোশ—TSH ক্ষরণ করে, কর্টিকোট্রফিক কোশ—ACTH ক্ষরণ করে এবং গোনাডোট্রফিক কোশ—FSH এবং LH ক্ষরণ করে।

**8. MSH কী ? এর উৎস এবং কাজ লেখো।**

● MSH-এর সম্পূর্ণ নাম মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন। এটি একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় হরমোন যা কোনো কোনো প্রাণীদের (মাছ, উভচর, সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীদের) পিটুইটারির মধ্যখণ্ড থেকে ক্ষরিত হয়। **কাজ**—MSH-এর প্রভাবে প্রাণীদের দেহত্বকে মেলানোসাইট কোশের সাইটোপ্লাজমে কালো রঙের মেলানিন কণা সংশ্লেষিত হয়, ফলে ত্বকের রং কালো হয়।

**9. ইন্টারমেডিন কী ?**

● মাছ, উভচর, সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীদের পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যখণ্ড থেকে যে হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে ইন্টারমেডিন বলে। এর অন্য নাম মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulating Hormone—MSH)।

**10. মানবদেহে ক্ষুদ্রতম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিটির নাম লেখো। এই ক্ষরিত হরমোনটির নাম লেখো।**

● (i) পিনিয়াল গ্রন্থি বা এপিফাইসিস দেহের সব থেকে ছোটো (ক্ষুদ্র) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি।
(ii) মেলাটোনিন—পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন।

**11. মানব দেহের কোন্ কোন্ হরমোন দেহের ক্যালশিয়ামের বিপাকে অংশ নেয় ?**

● (i) পারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত প্যারাথোর্মোন—এটি রক্তে ক্যালশিয়ামের পরিমাণকে বাড়ায়। (ii) থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরোক্যালসিটোনিন হরমোন রক্তে ক্যালশিয়ামের পরিমাণকে কমিয়ে দেয়। এছাড়া এন্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন ইত্যাদি যৌন হরমোন ক্যালশিয়ামের বিপাকে সাহায্য করে।

**12. যেসব হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণকে বাড়ায় এবং কমায় তাদের নাম করো।**

● (i) রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধিকারী হরমোন—দেহের প্রায় সব হরমোনই রক্তে শর্করা অর্থাৎ গ্লুকোজের পরিমাণকে বাড়ায়, যেমন—STH, ACTH, TSH, ভেসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন, থাইরয়েড হরমোন, অ্যাড্রিনালিন, অ্যাড্রিনাল কর্টিক্যাল হরমোন, গ্লুকাগন, যৌন স্টেরয়েড প্রভৃতি।
(ii) রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাসকারী হরমোন—ইনসুলিন। এটি একটিমাত্র হরমোন যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে হ্রাস করে।

**13. (ক) রক্তে স্বাভাবিক শর্করার পরিমাণ কত ?**
**(খ) দুটি কলার নাম লেখো যেখানে গ্লুকোজের প্রবেশের জন্য ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় ?**

● (ক) রক্তে স্বাভাবিক শর্করার পরিমাণ— প্রতি 100 ml রক্তে 80-120 mg গ্লুকোজ থাকে।
(খ) কলার নাম—পেশি কলা এবং যকৃতের আবরণী কলা।

**14. ইনসুলিনকে অ্যান্টিডাইবেটোজেনিক এবং অ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোন বলে কেন ?**

● (a) ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে কমিয়ে মধুমেহ বা ডায়াবেটিক রোগ নিরাময় করে। এছাড়া ইনসুলিন ফ্যাটের জারণকে বাধা দেয় ফলে কিটোন বডির উৎপাদনে বাধা দেয়। এই কারণে ইনসুলিনকে অ্যান্টিডাইবেটোজেনিক এবং অ্যান্টিকিটোজেনিক হরমোন বলে।

**15. প্যারাফলিউলার কোশ কী ? এর কাজ কী ?**

● থাইরয়েড গ্রন্থিস্থিত ফলিকলের উপরে অবস্থিত ঘনক্ষেত্রাকার প্রধান কোশের মাঝে মাঝে কতকগুলি মাইটোকন্ড্রিয়াযুক্ত কোশ থাকে। এদের প্যারাফলিকিউলার কোশ বলে। **কাজ**—প্যারাফলিকিউলার কোশ থেকে থাইরোক্যালসিটোনিন নামে হরমোন ক্ষরিত হয়।

**16. পাহাড়ে বসবাসকারীদের গয়টার বেশি হয় কেন ?**

● পাহাড়ের মাটিতে সাধারণত আয়োডিনের অভাব থাকে ফলে এই মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য পদার্থে আয়োডিনের অভাব দেখা যায়। এই আয়োডিনের অভাবের জন্য গয়টার হয়।

**17. ভিটামিন D-এর মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম করো।**

● প্যারাথর্মোন।

**18. DOPA-এর পুরো নাম কী ?**

- DOPA-এর পুরো নাম — ডাইহাইড্রক্সিফিনাইলঅ্যালানিন (Dihydroxyphenylalanine)।

**19. (ক) কোন্ অনাল গ্রন্থির অসুখে মৌল-বিপাক হার কমে ? (খ) কোন্ অনাল গ্রন্থির অসুখে মৌল বিপাক হার বাড়ে ?**

- (i) মৌল-বিপাক হারের হ্রাসজনিত অসুখ—(i) থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্পসক্রিয়তার ফলে মিক্সিডিমা এবং ক্রেটিনিজিম্ অসুখে অথবা (ii) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্সের স্বল্প সক্রিয়তার ফলে অ্যাডিসন রোগ (Addission disease) নামে যে সব অসুখ হয় তাতে B.M.R. কমে যায়। (ii) মৌল বিপাকীয় হারের বৃদ্ধিজনিত অসুখ—থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তায় গ্রেভের পীড়া অথবা অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অতিসক্রিয়তার ফলে কুশিং রোগ নামে যেসব অসুখ হয় তাতে BMR বাড়ে।

**20. প্লাসেন্টা (অমরা) থেকে ক্ষরিত দুটি হরমোনের নাম করো।**

- প্লাসেন্টা নিঃসৃত হরমোন—(i) হিউম্যান কেরিওনিক গোনাডোট্রোপিক হরমোন (Human Chorionic Gonadotropic Hormone সংক্ষেপে HCG), (ii) ইস্ট্রোজেন, (iii) প্রোজেস্টেরন, (iv) রিলাক্সিন প্রভৃতি।

**21. (ক) প্রধান জননাঙ্গগুলির নিঃসৃত উপচিতিমূলক হরমোনগুলি কী কী ? (খ) এদের উপচিতিমূলক বলার কারণ কী ? (গ) এরা প্রধান জননাঙ্গগুলির যে নির্দিষ্ট কোশগুলি থেকে নিঃসৃত হয় তাদের নাম করো।**

- (ক) উপচিতিমূলক হরমোনের নাম—(i) পুরুষের শুক্রাশয় থেকে—এন্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) ও (ii) স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন।

  (খ) **উপচিতি বলার কারণ** এই হরমোনগুলি প্রোটিন গঠনকারী হরমোন। এছাড়া এরা দেহের অস্থির গঠনে এবং দেহের যাবতীয় মুখ্য ও গৌণ যৌনাঙ্গের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দেহের ওজন বাড়ায়। এইসব কারণের জন্য শুক্রাশয়ের টেস্টোস্টেরন ও ডিম্বাশয়ের ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনকে উপচিতিমূলক হরমোন বলে।

  (গ) উপচিতিমূলক হরমোন ক্ষরিত কোশের নাম : (i) লিডিগের আন্তর কোশ — শুক্রাশয়ে থাকে ও টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে। (ii) গ্রাফিয়ান ফলিকুলে অবস্থিত মেমব্রেনা গ্রানুলোসাম কিংবা এন্টেরনা নামক কোশ থেকে ইস্ট্রোজেন এবং কর্পাস লুটিয়ামের লুটিন নামে কোশ থেকে প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয়।

**22. এট্রিটিক ডিম্বথলি (Atretic follicle) কী ?**

- যে গ্রাফিয়ান ফলিকল বা পরিণত ডিম্বথলি বিদীর্ণ হয় না অর্থাৎ ওভুলিশন (Ovulation) ঘটে না এবং ডিম্বাণুটি ডিম্বথলিতে থাকার অবস্থায় মারা যায় এবং তার অপজনন ঘটে ও মৃত ডিম্বাণুর স্থানে অন্য কোশ দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়, এই অবস্থায় এই ডিম্বথলিকে **এট্রিটিক ডিম্বথলি বা এট্রিটিক ফলিকল** বলে।

**23. (a) থাইমোসিন কী ? (b) এটি দেহে কী কাজ করে ?**

- (a) শ্বাসনালির সামনে থাইরয়েড গ্রন্থির নীচে থাইমাস নামে গ্রন্থি থাকে। থাইমাস গ্রন্থি থেকে যে পলিপেপটাইড জাতীয় হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে **থাইমোসিন** (Thymosin) বা **থিয়ামিন** (Thiamin) বলে।

  (b) **কাজ** — (i) থাইমোসিন ভ্রূণাবস্থায় এবং জন্মের কিছুদিন পর পর্যন্ত লিম্ফোসাইট নামে শ্বেত কণিকা উৎপন্ন করে। (ii) থাইমোসিন স্নায়ুপেশির সংযোগস্থলের সক্রিয়তাকে হ্রাস করে। (iii) এই হরমোনের প্রভাবে দেহাস্থিতে খনিজ লবণের সঞ্চয় বাড়ে।

**24. ক্ষণস্থায়ী গ্রন্থি কী ? উদাহরণসহ উল্লেখ করো।**

- যে গ্রন্থি সাময়িক বা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকে এবং তারপর বিনষ্ট হয়ে যায় তাকে **ক্ষণস্থায়ী গ্রন্থি** বলে। উদাহরণ—**থাইমাস গ্রন্থি**। এই গ্রন্থিটি শিশু অবস্থায় দেহে বর্তমান থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালের সময় অথবা কিছুটা পর গ্রন্থিটির বিলুপ্তি ঘটে।

24. উৎসেচক এবং হরমোনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।

- উৎসেচক এবং হরমোনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Enzymes and Hormones) :

| উৎসেচক | হরমোন |
|---|---|
| 1. উৎসেচক প্রাণীদেহের প্রতিটি সজীব কোশে সংশ্লেষিত হয়। | 1. হরমোন কোনো কোনো নির্দিষ্ট সজীব কোশ কিংবা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকোশে সংশ্লেষিত হয়। |
| 2. যে কোশে উৎপন্ন হয় সেই কোশের বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। | 2. যে কোশে উৎপন্ন হয় সেই কোশের বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। |
| 3. বহিঃক্ষরা গ্রন্থিকোশ থেকে নিঃসৃত উৎসেচকযুক্ত রস নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বাইরে গ্রন্থির নিকটবর্তী কোনো স্থানে কাজ করে। | 3. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকোশে উৎপন্ন হরমোন সরাসরি রক্তে যায় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে গ্রন্থি থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে কাজ করে। তবে স্থানীয় হরমোনের কার্যাবলি উৎপত্তিস্থলের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকে। |
| 4. প্রতিটি উৎসেচক প্রোটিন জাতীয়। | 4. হরমোন প্রোটিন অথবা স্টেরয়েড জাতীয়। |
| 5. উৎসেচক জৈব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। | 5. হরমোন রাসায়নিক বার্তাবহ রূপে কাজ করে। |
| 6. বিক্রিয়ার গতি দ্রুত হয়। | 6. বিক্রিয়ার গতি মন্থর হয়। |
| 7. জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে ঘটে। | 7. জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পরোক্ষভাবে ঘটে। |
| 8. উৎসেচক বিক্রিয়ার পর বিনষ্ট হয় না। | 8. হরমোন বিক্রিয়ার পর বিনষ্ট হয়। |
| 9. উদাহরণ—অ্যামাইলেজ ও পেপসিন। | 9. উদাহরণ— অক্সিন ও থাইরক্সিন। |

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. জীবদেহের অনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত যে রাসায়নিক যৌগ দেহের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলে ?
2. যে হরমোন উৎস সংলগ্ন অংশে কাজ করে তার নাম কী ?
3. যে হরমোন অন্য গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং তাদের ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কী বলে ?
4. মানবদেহে এমন একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে যা দেহের কয়েকটি মাত্র গ্রন্থি বাদে অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কী বলে ?
5. মানুষে বৃদ্ধিপোষক যে হরমোন পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত হয় তার নাম কী ?
6. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন যার অভাবে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস নামে রোগ হয় তাকে কী বলে ?
7. যে হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে কমায় তার নাম কী ?
8. আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের কোশ থেকে ক্ষরিত একটি হরমোনের নাম করো যাকে ইনসুলিনবিরোধী হরমোন বলে।
9. যে হরমোন হাইপোথ্যালামাসের নিউরোসিক্রেটরি কোশ থেকে ক্ষরিত হয় তাকে কী বলে ?
10. STH-এর পুরো নাম কী ?
11. ACTH-এর পুরো নাম কী ?
12. TSH-এর পুরো নাম কী ?
13. অগ্র পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন যা ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলি (ফলিকলকে) উদ্দীপিত করে তার সংক্ষিপ্ত নাম কী ?
14. পশ্চাৎ পিটুইটারি নির্গত হরমোন যা বৃক্ক নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণে অংশ নেয় তার সংক্ষিপ্ত নাম বলো।
15. অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থির কোন্ অঞ্চলে ACTH তার প্রভাব বিস্তারে অক্ষম ?
16. শিশুরা মায়ের স্তনের দুধ পান করার সময় দেহের কোন্ হরমোনটি বিশেষভাবে অংশ নেয় ফলে স্তন থেকে দুধের নির্গমন ঘটে ?
17. থাইরয়েড হরমোনকে শক্তি উৎপাদনকারী হরমোন বলে কেন ?
18. কোন্ হরমোন দেহে ক্যালশিয়ামের পরিমাণকে কমিয়ে দেয় ?
19. মধুমেহ রোগ হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে এবং মূত্রে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, এই ঘটনাগুলিকে কী বলে ?
20. অ্যাড্রিনাল মেডালা নিঃসৃত এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন এবং ডোপামাইনকে একত্রে কী বলে ?

21. প্লাসেন্টা (অমরা) থেকে নিঃসৃত হরমোনের নাম করো যা অগ্রপিটুইটারি থেকে একই প্রকার রাসায়নিক গঠনযুক্ত হরমোন নিঃসৃত হয়।
22. CCK-PZ-এর প্রধান একটি কাজ কী ?
23. যেসব হরমোন পৌষ্টিকনালির শ্লেষ্মা (মিউকাস) ঝিল্লি থেকে ক্ষরিত হয় তাদের সাধারণভাবে কী বলে ?
24. পাকস্থলীর মিউকাস স্তর থেকে নিঃসৃত স্থানীয় হরমোনের নাম কী ?

## B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :

1. প্রাণী হরমোন ক্ষরিত হয়—অনাল গ্রন্থি ☐ / সনাল গ্রন্থি ☐ থেকে।
2. মানুষের এন্ডোক্রিন গ্রন্থিতন্ত্রের মাস্টার গ্রন্থির নাম—থাইরয়েড গ্রন্থি ☐ / সম্মুখস্থ পিটুইটারি ☐ / পশ্চাৎ পিটুইটারি ☐ ।
3. মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম—STH ☐ / TSH ☐ / ACTH ☐ / LH ☐ / FSH ☐।
4. যে হরমোন মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরণে (Secretion) সহায়তা করে তার নাম— সোমাটোট্রোফিক হরমোন ☐ / মেলানোফোর স্টিমুলেটিং হরমোন ☐ / প্রোলাকটিন ☐।
5. অ্যাড্রিনালগ্রন্থির অবস্থান—উদর ☐ / গলবিল ☐ / মস্তিষ্কের ভিতরে ☐ / বৃক্কের উপরে ☐।
6. ক্রেটিনিজম নামক রোগ হয় শিশুদের থাইরয়েড গ্রন্থির—স্বল্প সক্রিয়তায় ☐ / অতিসক্রিয়তায় ☐।
7. রক্তের ক্যালশিয়ামের পরিমাণকে যে হরমোন হ্রাস করে তার নাম—প্যারাথরমোন ☐ / থাইরোক্যালসিটোনিন ☐ / থাইরক্সিন ☐ / STH ☐।
8. রক্তে গ্লুকোজ পরিমাণ হ্রাসকারী হরমোনকে—গ্লুকোকর্টিকয়েড ☐ / গ্লুকাগন ☐ / ইনসুলিন ☐ বলে।
9. অ্যাড্রিনাল হরমোন নিঃসরণকারী গ্রন্থি—অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স ☐ / অ্যাড্রিনাল মেডালা ☐।
10. ইনসুলিন আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের— α-কোশ ☐ / β-কোশ ☐ / δ-কোশ ☐ থেকে নিঃসৃত হয়।
11. দুগ্ধ ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে যে হরমোনটি সেটি হল—প্রোজেস্টেরন ☐ / অক্সিটোসিন ☐ / প্রোল্যাকটিন ☐ / L. H. ☐
12. ইনসুলিন যে কোশ থেকে ক্ষরিত হয় তা হল—δ-কোশ ☐ / β-কোশ ☐ / α-কোশ ☐ / কোনোটিই নয় ☐
13. ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ করে যে হরমোনটি সেটি হল—প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ☐ / থাইমাস গ্রন্থি ☐ / পিটুইটারি গ্রন্থি ☐ / অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ☐।
14. কিছু কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার এবং হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার কারণ—থাইরক্সিন ☐ / অ্যাড্রেনালিন ☐ / গ্যাস্ট্রিন ☐ / সিক্রেটিন ☐।
15. জরুরি অবস্থায় নিম্নলিখিত কোন্ হরমোনটি প্রয়োজন ? অ্যাড্রেনালিন ☐ / থাইরক্সিন ☐ / অ্যালডোস্টেরন ☐ / ক্যালসিটোনিন ☐।
16. যেখান থেকে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয় সেটি হল—লিডিগ কোশ ☐ / সারটোলি কোশ ☐ / স্পারমাটিড ☐ / শুক্রাণু ☐।
17. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্ জোড়া কথাটির মধ্যে মিল নেই ? হাইপারথাইরইডিজম্—ক্রেটিনিজম্ ☐ / হাইপারকর্টিসোলিজম্—ক্রেটিনিজম ☐ / হাইপোথাইরইডিজম্—মিক্সিডিমা ☐ / হাইপারকর্টিসোলিজম্—কিউসিং এর সিনড্রোম ☐।
18. রক্তে গ্লুকোজ হ্রাসকারী হরমোন হল—থাইমোসিন ☐ / ইনসুলিন ☐ / থাইরক্সিন ☐ / অ্যাড্রিনালিন ☐।
19. প্রাণীর চর্মবর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনটির নাম হল—সোমাটোট্রপিক ☐ / প্রোল্যাক্টিন ☐ / মেলাটোনিন ☐ / কর্টিকোট্রপিন ☐।
20. পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত হরমোন হল—গ্যাস্ট্রিন ☐ / রেনিন ☐ / সিক্রেটিন ☐ / ভিলিকাইনিন ☐।
21. সিক্রেটিন কোন্ উপাদানের ক্ষরণ উদ্দীপ্ত করে ? লালারস ☐ / গ্যাস্ট্রিক রস ☐ / পিত্ত ☐ / অগ্ন্যাশয় রস ☐।
22. হরমোন শব্দটি প্রথমে কে ব্যবহার করেন? মিয়াসে ☐ / বেলিস ও স্টারলিং ☐ / হার্ডি ☐ / চার্লস ডারউইন ☐।
23. নিম্নলিখিত হরমোনের মধ্যে কোন্টি আপৎকালীন হরমোন হিসেবে পরিচিত? থাইরক্সিন ☐ / অ্যাড্রিনালিন ☐ / ইনসুলিন ☐ / ক্যালসিটোনিন ☐।
24. অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়—হাইপোথ্যালামাস থেকে ☐ / পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ☐ / অগ্রপিটুইটারি থেকে ☐ / গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিটাল লোব থেকে ☐।
25. কোন্টি স্টেরয়েড হরমোন ?—অ্যাড্রিনালিন ☐ / অক্সিটোসিন ☐ / অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রোফিন ☐ / ইস্ট্রোজেন ☐।
26. কোন্টি গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় হরমোন—FSH ☐ / অ্যাড্রিনালিন ☐ / রিলাক্সিন ☐ / প্রোস্টাগ্লান্ডিন ☐।
27. পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে নির্গত হরমোনটি হল—LTH ☐ / ADH ☐ / PTH ☐ / MSH ☐।
28. গোনাডোট্রপিক হরমোন যে গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় তার নাম হল—ডিম্বাশয় ☐ / শুক্রাশয় ☐ / পিটুইটারি ☐ / গোনাড ☐।
29. থাইরক্সিন নামে হরমোনের জন্য যে অজৈব উপাদানটি প্রয়োজন হয়, সেটি হল—আয়োডিন ☐ / ক্যালশিয়াম ☐ / ম্যাগনেশিয়াম ☐ / আয়রন ☐।
30. আয়োডিনের অভাবে যে হরমোনটি দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না সেটি হল—এপিনেফ্রিন ☐ / থাইরক্সিন ☐ / ক্যালসিটোনিন ☐ / প্যারাথার্মোন ☐।
31. নিম্নলিখিত হরমোনের মধ্যে কোন্টি মিনারেলো কর্টিকয়েড ?—কর্টিসল ☐ / ইস্ট্রোজেন ☐ / ডোপামাইন ☐ / অ্যালডোস্টেরন ☐।
32. ক্যাটিকোলামাইন নামে হরমোন ক্ষরিত হয় যে গ্রন্থি থেকে তার নাম হল—অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স ☐ / অ্যাড্রিনাল মেডালা ☐ / থাইরয়েড ☐ / প্যারাথাইরয়েড ☐।

33. নিম্নলিখিত হরমোনের মধ্যে কোন্ পাকতন্ত্রীয় হরমোন নয় ?—ভিলিকাইনিন ☐ / গ্যাসট্রিন ☐ / সিক্রেটিন ☐ / মেলাটোনিন ☐।
34. হরমোন আবিষ্কার করেন—ফাঙ্ক ☐ / বেস্ট ☐ / স্টারলিং ☐ / অ্যাডিসন ☐।
35. অ্যান্ড্রোজেন ক্ষরণ হয় যে দুটি উৎস থেকে তাদের নাম হল—শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় ☐ / শুক্রাশয় এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ☐ / ডিম্বাশয় এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ☐ / ডিম্বাশয় এবং অ্যাড্রিনাল মেডালা ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. হরমোন কথাটি প্রথম প্রবর্তন করেন ———।
2. যে গ্রন্থির রস নিঃসৃত হওয়ার পর সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে তাকে ——— গ্রন্থি বলে।
3. স্নায়ু দ্বারা ক্ষরিত হরমোনকে ——— বলে।
4. দেহের বৃদ্ধির জন্য দায়ী বৃদ্ধিকারক হরমোমনের নাম হল ———।
5. স্তনগ্রন্থি দুধের ক্ষরণের জন্য দায়ী হরমোনকে ——— বলে।
6. পূর্ণবয়স্ক মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে অধিক পরিমাণ STH ক্ষরিত হলে যে রোগ হয় তাকে ——— বলে।
7. ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলির বৃদ্ধি ——— দ্বারা সংঘটিত হয়।
8. ——— হরমোনের অভাবে মধুমেহ রোগ হয়।
9. STH -এর পুরো নাম ——— ——— হরমোন বলে।
10. নিউরোহিউমার একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ, একটির নাম হল এপিনেফ্রিন অন্যটির নাম হল ———।
11. জীবদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলে হরমোনকে জীবদেহের রাসায়নিক ——— বলে।
12. যে রোগে রক্তে শর্করা বেড়ে গিয়ে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে ——— বলে।
13. একটি ট্রফিক হরমোন যে নির্দিষ্ট গ্রন্থির উপর কাজ করে তাকে ——— গ্রন্থি বলে।
14. অগ্রপিটুইটারির যে অংশ থেকে ছয় প্রকার ট্রফিক হরমোন ক্ষরিত হয় তাকে ——— বলে।
15. ভেসোপ্রেসিনের উৎপত্তিস্থলের নাম হল ———।
16. প্যারাফলিকুলার কোশ থেকে ——— নামে হরমোন ক্ষরিত হয়।
17. খাদ্যে ——— অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়।
18. শিশুদের থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে গেলে ——— নামে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।
19. ——— হরমোনকে সংকটকালীন হরমোন বলে।
20. সিক্রেটিন ———এর শ্লেষ্মা ঝিল্লি থেকে ক্ষরিত হয়।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম হরমোন আবিষ্কার করেন তার নাম হল ———। (বেলিস / স্টারলিং / বেলিস ও স্টারলিং / স্কোফার)।
2. সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হরমোনের নাম ———। (সাইটোকাইনিন / অক্সিন / থাইরক্সিন / সিক্রেটিন)।
3. ——— হল দুগ্ধ নিঃসরণকারী হরমোন যা পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত হয়। (প্রোলাকটিন / অক্সিটোসিন / ভেসোপ্রেসিন / গোনাডোট্রোফিন)।
4. ——— হল মুখ্য হরমোন যার অভাবে মধুমেহ রোগ হয়। (থাইরক্সিন / STH / ইনসুলিন / গ্লুকাগন)।
5. ——— হরমোন হল একপ্রকার হরমোন যা একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়ে দেহের অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে (লোকাল / ট্রপিক / আদর্শ / জরুরিকালীন)।
6. কোনো হরমোন যদি উৎপত্তিস্থলে তার কার্যকারিতা প্রকাশ করে, তবে সেই হরমোনকে ——— বলে। (নিউরোহরমোন / ট্রপিক হরমোন / লোকাল হরমোন / রিলিজিং হরমোন)।
7. দেহে পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান ———। (মস্তিষ্কের উপরের অংশে / মস্তিষ্কের তলদেশে / মস্তিষ্কের শ্বেতবস্তুতে)।
8. বয়স্ক লোকের পিটুইটারি থেকে ——— এর ক্ষরণ বেড়ে গেলে অ্যাক্রোমেগালী রোগ হয়। (STH / TSH / ACTH / FSH)।
9. আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস দ্বীপগ্রন্থির ——— থেকে গ্লুকাগন নামে হরমোন নিঃসৃত হয়। (α-কোশ / β-কোশ / δ-কোশ / γ-কোশ)।
10. গ্লুকোজের বিপাককে উদ্দীপিত করে গ্লুকোজের পরিমাণকে কমানো ——— এর প্রধান কাজ। (ইনসুলিনের / গ্লুকাগনের / এপিনেফ্রিনের / গ্লুকোকর্টিকয়েডের)।
11. ব্যাঙাচিকে ব্যাঙে রূপান্তর করতে ——— হরমোন অংশ গ্রহণ করে। (থাইরক্সিন / ফেরোমোন / STH / প্যারাথরমোন)।
12. যে হরমোন রক্তে ক্যালশিয়ামের পরিমাণকে বাড়ায় সেটি হল ———। (প্যারাথর্মোন / থাইরোক্যালসিটোনিন / মিনারেলোকর্টিকয়েড / ইস্ট্রোজেন)।
13. যে গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয় না তাদের বলে ———। (অনাল গ্রন্থি / সনাল গ্রন্থি / মিশ্র গ্রন্থি / অস্থায়ী গ্রন্থি)।
14. পাকস্থলীর মিউকাস স্তর (শ্লেষ্মা ঝিল্লি) থেকে ——— নামে হরমোন নিঃসৃত হয়। (সিক্রেটিন / কোলেসিস্টোকাইনিন/গ্যাস্ট্রিন/ভিলিকাইনিন)।
15. অ্যালডোস্টেরন একটি স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন যে গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় তার নাম ———। (ডিম্বাশয় / শুক্রাশয় / অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স / অ্যাড্রিনাল মেডালা)।

### E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. বিশেষ ধরনের কোশ বা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ নালি ছাড়া রক্তে প্রবেশ করে তাকে হরমোন বলে। ☐
2. সাধারণত একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন অন্য গ্রন্থি-নিঃসৃত হরমোন দিয়ে প্রভাবিত হয় না। ☐
3. হরমোন জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ☐
4. পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের তলদেশে মুক্ত এবং ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ☐
5. থাইরক্সিন মানুষের দেহে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে BMR বাড়ায়। ☐
6. পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে সরাসরি কোনো হরমোন নিঃসৃত করে না। ☐
7. অগ্র পিটুইটারির বৈকল্যে শৈশব-বামনত্ব, প্রাপ্ত বয়স্কে মিক্সিডিমা, গলগণ্ড, বিস্ফোরিত অক্ষিগোলক প্রভৃতি রোগ হয়। ☐
8. অ্যাড্রিনাল মেডালা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন আপতকালীন হরমোন নামে পরিচিত। ☐
9. পিটুইটারি থেকে নয় প্রকার হরমোন ক্ষরিত হয়। ☐
10. মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে খণ্ডাংশ থেকে ইন্টারমেডিন বা MSH নিঃসৃত হয়। ☐
11. থাইরয়েড গ্রন্থি সংখ্যা দুটি যা শ্বাসনালির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের পাশে পৃথকভাবে থাকে। ☐
12. পেষ্টাগ্ল্যাডিন এক ধরনের পাকস্থলীয় হরমোন। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. হরমোন কথাটি কোন্ শব্দ থেকে এসেছে ?
2. হরমোনের নাম সর্বপ্রথম কোন্ বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন ?
3. সর্বপ্রথম যে হরমোনটির কথা জানা গেছে তার নাম কী ?
4. প্রাণীদেহের রাসায়নিক সমন্বয়কারী কে ?
5. রাসায়নিক বার্তাবহ বলতে কী বোঝ ?
6. হরমোন এবং স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটি ঐক্যের উল্লেখ করো।
7. বহিঃক্ষরা এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে একটি গঠনগত পার্থক্য উল্লেখ করো।
8. মানুষের দেহে একটি অন্তঃক্ষরা ও একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থির নাম করো যা একটি গ্রন্থির মধ্যে থাকে।
9. পিটুইটারি গ্রন্থি কোথায় থাকে ?
10. STH-এর সম্পূর্ণ নাম করো।
11. ACTH-এর সম্পূর্ণ নাম করো।
12. গোনাডাল হরমোন এবং গোনাডোট্রোফিক হরমোনের একটি পার্থক্য নির্দেশ করো।
13. TSH কোন্ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ? এর পুরোনো নাম কী ?
14. বামনত্ব হয় কেন ?
15. ক্রেটিনিজম কী ?
16. ADH কী ?
17. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির α, β এবং δ কোশ থেকে কী কী হরমোন ক্ষরিত হয়?
18. গ্যাসট্রিন কী ?
19. সিক্রেটিন কী ?
20. প্রোস্টাগ্ল্যাডিন কী ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. 'হরমোন' কথাটি কোন্ শব্দ থেকে উদ্ভূত ? সর্বপ্রথম কে এই শব্দকে ব্যবহার করেন ?
2. সম্মুখস্থ পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলির নাম করো। নিঃসৃত হরমোনগুলিকে ট্রফিক হরমোন বলা হয় কেন ?
3. শিশুদের পিটুইটারি থেকে STH-এর স্বল্পক্ষরণ কিংবা অধিক ক্ষরণ হলে যেসব রোগ হয় তাদের নাম কী ?
4. অ্যাক্রোমেগালি কী ? কোন্ হরমোন এর জন্য দায়ী ?
5. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস কী ? কোন্ হরমোন এর জন্য দায়ী ?
6. থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তায় যে রোগ হয় তার নাম কী ? এই রোগের উপসর্গগুলির নাম করো।
7. অগ্ন্যাশয়কে উভধর্মী গ্রন্থি বলা হয় কেন ?
8. আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস থেকে কী কী হরমোন নিঃসৃত হয় ?
9. ইনসুলিন কী ? এর উৎপত্তি এবং একটি প্রধান কাজ লেখো।
10. মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগের কারণ কী ?
11. গ্লুকাগন কোথা থেকে বা কোন্ কোশ থেকে নিঃসৃত হয় ? এর কাজ কী ?
12. পৌষ্টিকনালির মিউকাস ঝিল্লি থেকে ক্ষরিত হরমোনের নাম ও কাজ বর্ণনা করো।
13. সিক্রেটিন কোথায় পাওয়া যায় ও এর কাজ কী ?
14. দেহে ক্যালশিয়াম ও ফসফেট বিপাকে প্যারাথাইরয়েড হরমোনের প্রভাব উল্লেখ করো।
15. ইনসুলিনের রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করো।
16. কর্টিসল হরমোন কোন্ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ? কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে এর ভূমিকা উল্লেখ করো।
17. শিশু অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণ কমে গেলে কী রোগ হয় ? এর দুটি উপসর্গ উল্লেখ করো।

18. মানুষের দেহে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি স্বল্পক্ষরণে এবং অধিক ক্ষরণে কী কী রোগ হয় ? তাদের দুটি করে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ সম্বন্ধে লেখো।
19. কুশিং সিনড্রোম কী ? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ?
20. কয়েকটি যৌন স্টেরয়েড হরমোনের নাম করো যা যৌনগ্রন্থি ছাড়া অন্য গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। স্ত্রী লোকের দেহে কী অ্যান্ড্রোজেন হরমোন পাওয়া যায় ? যদি পাওয়া যায় তার উৎসের নাম করো।

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. বামনত্ব ডোয়ার্ফিজিম এবং ক্রেটিনিজম। 2. ভেসোপ্রেসিনের স্বাভাবিক কাজ এবং অধঃজনিত কাজ। 3. অক্সিটোসিনের স্বাভাবিক কাজ এবং অধঃজনিত কাজ। 4. ডায়াবেটিস ইন্‌সিপিডাস এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস। 5. এন্ড্রোজেন এবং ইস্ট্রোজেন। 6. হরমোন এবং নিউরোহরমোন। 7. হরমোন এবং স্নায়ু। 8. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্র।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. অন্তক্ষরা গ্রন্থি এবং উদাহরণসহ তার প্রকারভেদ। 2. STH। 3. ACTH। 4. GTH। 5. অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক হরমোন। 6. $T_3$ এবং $T_4$। 7. থাইরোক্যালসিটোনিন। 8. অ্যাক্রোমগালি। 9. গলগণ্ড। 10. গ্রেভ বর্ণিত রোগ। 11. প্যারাথোর্মোন। 12. টিটানি। 13. ইনসুলিন। 14. ডায়াবেটিস মেলিটাস। 15. গ্লুকাগান। 16. এডিসোনের ব্যাধি। 17. প্লাসেন্টা। 18. গ্যাস্ট্রিন। 19. CCK-PZ। 20. পোস্টাগ্ল্যানডিন।

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) হরমোন কাকে বলে ? (b) হরমোনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ?
2. (a) হরমোন, ট্রফিক হরমোন, স্থানীয় হরমোনের ব্যাখ্যা করো। (b) হরমোনের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
3. (a) গ্রন্থি কী ? (b) মানুষের পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে কেন ? (c) এই সব গ্রন্থির অবস্থান চিত্রসহ দেখাও। এইসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের নাম লেখো।
4. (a) অন্তক্ষরা গ্রন্থিসমূহের মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থিকে 'মাষ্টার গ্রন্থি' বা প্রধান গ্রন্থি বলা হয় কেন ? (b) এটি কোথায় থাকে ? এর থেকে নিঃসৃত যে-কোনো চারটি হরমোনের নাম ও কাজ উল্লেখ করো।
5. (a) হাইপোফাইসিস কী ? (b) এর অবস্থান ও গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
6. (a) হরমোন কাকে বলে ? (b) মানবদেহে যে-কোনো তিনটি হরমোনের কার্যকারিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
7. সম্মুখস্থ পিটুইটারি থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় তাদের নাম উল্লেখ করো এবং একটি কার্যাবলি লেখো।
8. (a) STH-এর পুরো নাম কী ? (b) STH কোথা থেকে নিঃসৃত হয় ? (c) STH-এর মূল কাজগুলি কী কী ?
9. নিউরোহাইপোফাইসিস কাকে বলে ? এর থেকে যেসব হরমোন ক্ষরিত হয় তাদের নাম ও কার্যাবলি লেখো।
10. (a) গোনাডোট্রোফিন কী ? (b) এর কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো। (c) গোনাডাল হরমোনের সঙ্গে গোনাডোট্রোফিন হরমোনের পার্থক্য কী ?
11. (a) থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যেসব হরমোন নিঃসৃত হয় তাদের নাম কী ? (b) এদের কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (c) গ্রেভস রোগ কী ?
12. থাইরক্সিনের উৎপত্তি এবং কার্যাবলি বর্ণনা করো।
13. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবস্থান এবং গঠনের বর্ণনা দাও।
14. অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোনের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো।
15. অ্যাড্রিনাল মেডালা থেকে নিঃসৃত হরমোনের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো।
16. মানবদেহের অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির অবস্থান উল্লেখ করে ল্যাংগারহ্যান্‌স দ্বীপগ্রন্থির কলাস্থানিক গঠন ও তা থেকে নিঃসৃত প্রধান হরমোনের কার্যবলি বর্ণনা করো।
17. (a) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের তিনটি স্তরের নাম ও গঠন বর্ণনা করো। (b) এই স্তর থেকে ক্ষরিত হরমোনের নামগুলি উল্লেখ করো।
18. (a) তোমার দেহে থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় আছ তা উল্লেখ করো। (b) থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একটি হরমোনের নাম করো। (c) প্যারাফলিকুলার কোশের সঙ্গে থাইরয়েড গ্রন্থি কী সম্পর্ক আছ তা উল্লেখ করো।
19. (a) $T_3$ এবং $T_4$ বলতে কী বোঝো ? (b) এই দুটি কোথায় পাওয়া যায় ? (c) এদের কার্যাবলি উল্লেখ করো।
20. (a) যৌন হরমোন কাকে বলে ? (b) পুংযৌন হরমোন এবং স্ত্রী যৌন হরমোনর উৎস এবং কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

### B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the following) :

1. মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থানের চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো। 2. মানুষের পিটুইটারি এঁকে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো। 3. থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান, শারীরস্থানিক গঠন এঁকে চিহ্নিত করো। 4. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কলাস্থানিক গঠন এঁকে চিহ্নিত করো। 5. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি এবং এর সঙ্গে একটি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের চিত্র একে α এবং β কোশের অবস্থান চিহ্নিত করো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি :



# রেচনতন্ত্র
# [ EXCRETORY SYSTEM ]

### ➧ ভূমিকা (Introduction) :

দেহকোশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ ঘটছে, এর ফলে দেহে তাপ উৎপাদন, পেশিতে শক্তির উৎপাদ, দেহবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়াগুলি অনবরত সংঘটিত হয়। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীদের বিপাকের ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলিকে **রেচন পদার্থ** বা **বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ** বলে। প্রাণীরা অন্যান্য খাদ্যসহ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। প্রোটিনের অপচিতির ফলে **অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, হিপিউরিক অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইন্ডিকান, ইউরোক্রোম, ইউরোবিলিনোজেন** প্রভৃতি নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এছাড়া প্রায় সব রকমের খাদ্যবস্তুর বিপাক ক্রিয়ায় **কার্বন ডাইঅক্সাইড** উৎপন্ন হয়। এর সঙ্গে সালফার যৌগ, ল্যাকটিক অ্যাসিড, কার্বোনিক অ্যাসিড, কিটোন বস্তু (অ্যাসিটোন ও অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, খুব সামান্য গ্লুকোজ, ফেনল, যৌন হরমোন ইত্যাদি **অনাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ** ও জল উৎপন্ন হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে নির্গত হয়। দেহে উৎপন্ন জল মূত্র, ঘাম, নিঃশ্বাস ক্রিয়া এবং রস ক্ষরণের মধ্য দিয়ে রেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে **নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থের অপসারণই হল প্রাণীদের রেচন প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।** প্রাণীজগতে বিভিন্ন প্রকার **রেচন অঙ্গ** দেখা যায়। মানুষের দেহে যে বিভিন্ন প্রকার রেচন অঙ্গ আছে, তার মধ্যে একজোড়া বৃক্ক প্রধান রেচন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। এছাড়া আরও অনেক রকমের সহায়ক রেচন অঙ্গ আছে।

## 8.1. রেচন তন্ত্র (Excretory system)

❖ (a) **রেচনতন্ত্রের সংজ্ঞা :** জীবদেহে জৈবনিক এবং বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন যে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক (বর্জ্য) পদার্থসমূহ যেসব রেচন অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয় সেই সব অঙ্গসমূহ নিয়ে গঠিত তন্ত্রকে রেচনতন্ত্র বলে।

● (b) **মানবদেহের বিভিন্ন রেচন অঙ্গ (Different excretory organs in the human body) :**

1. **বৃক্ক** (Kidney) — মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ যার মাধ্যমে দেহের প্রায় 70–75% বর্জ্য পদার্থ রেচিত হয়।
2. **ফুসফুস** (Lungs) — এর মাধ্যমে প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সামান্য জলীয় বাষ্প দেহ থেকে রেচিত হয়।
3. **ত্বক বা চর্ম** (Skin) — ত্বক প্রধানত ঘর্মের মাধ্যমে দেহ থেকে কিছু অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্গত করে।
4. **যকৃৎ** (Liver) — পিত্তের মাধ্যমে বিভিন্ন রেচন পদার্থ পৌষ্টিকনালির মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত করে।

## 8.2. মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্র (Urinary system)

### ▲ মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্রের সংজ্ঞা, গঠন এবং কার্যাবলি (Definition, structure and functions of Urinary system) :

❖ (a) **মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Urinary system) : জীবদেহে জৈবনিক ক্রিয়ায় এবং বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক (বর্জ্য) পদার্থসমূহ যে অঙ্গসমূহের সাহায্যে মূত্র উৎপন্ন হয় এবং যেসব অঙ্গের সাহায্যে উৎপন্ন মূত্র দেহ থেকে নির্গত হয় তাদের নিয়ে গঠিত তন্ত্রকে মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্র বলে।**

বৃক্কীয় শিরা
বৃক্কীয় ধমনি
বাম বৃক্ক
মহাধমনি
মহাশিরা
গবিনী
মূত্রথলি
মূত্রনালি

চিত্র 8.1. : মানুষের মূত্র উৎপাদনকারী তন্ত্র (রেচনতন্ত্র)।

মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্রের অন্তর্গত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল **বৃক্ক** যা দিয়ে দেহের প্রায় **75 শতাংশ** বর্জ্যপদার্থগুলি যেমন—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, NaCl, জল ইত্যাদি মূত্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। এই কারণে বৃক্ককে মুখ্য রেচন অঙ্গ বলে। বৃক্ক মূত্র সৃষ্টি করে বলে বৃক্কসম্বন্ধীয় রেচনতন্ত্রকে **বৃক্কীয় তন্ত্র** (Renal system) বা **মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্র** (Urinary system) বলে।

➤ (b) **মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্রের গঠন (Structure of Urinary system) :** মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্র রেচন তন্ত্রের প্রধান তন্ত্র, দুটি বৃক্ক, দুটি গবিনী, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি।

1. **বৃক্কের বহির্গঠন** (External structure of Kidney)—**শিম বীজের আকৃতিবিশিষ্ট গাঢ় লালচে-বাদামি রঙের দুটি অঙ্গ যা মূত্র উৎপাদন করে তাকে বৃক্ক বলে।** উদরগহ্বরের পেছন দিকে মেরুদণ্ডের দু'দিকে ও পঞ্জরাস্থির ঠিক নীচে দুটি বৃক্ক থাকে। প্রতিটি বৃক্ক প্রায় 11 সেন্টিমিটার লম্বা, 5 সেন্টিমিটার চওড়া এবং 3 সেন্টিমিটার মতো পুরু হয়। ডান দিকের বৃক্কটি বামদিকের বৃক্ক থেকে অপেক্ষাকৃত ছোটো। প্রতিটি বৃক্কের চারপাশে চারটি তল আছে, এদের যথাক্রমে সামনের তল, পেছনের তল, পাশের তল এবং মাঝের তল বলে। প্রতিটি বৃক্কের ওজন পুরুষের 150 গ্রাম এবং স্ত্রীলোকের 135 গ্রাম। বৃক্কের মধ্যভাগে একটি গহ্বর থাকে যার মধ্য দিয়ে বৃক্কীয় শিরা ও গবিনী নির্গত হয় এবং বৃক্কীয় ধমনি বৃক্কের মধ্যে প্রবেশ করে। একে **বৃক্কীয় নাভি (হাইলাম—**Hilum) বলে।

চিত্র 8.2. : মানুষের বৃক্কের শারীরস্থানিক গঠন।

● **কাজ**—মূত্র উৎপাদন বৃক্কের প্রধান কাজ।

2. **গবিনী** (Ureter) — বৃক্কে উৎপন্ন মূত্র যে নালিপথে বাহিত হয়ে মূত্রথলিতে যায় তাকে গবিনী বলে। প্রতিটি বৃক্কের গহ্বরে যে স্থান থেকে গবিনী উৎপন্ন হয়েছে তাকে **বৃক্কীয় শ্রোণি** (Renal pelvis) বা **বৃক্কীয় সাইনাস** (Renal sinus) বলে। বৃক্কীয় শ্রোণি থেকে 35 সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি নলাকৃতি গবিনী উৎপন্ন হয়ে মূত্রথলির পেছন ও পাশের দিক থেকে তির্যকভাবে প্রবেশ করে।

চিত্র 8.3. : বৃক্কের প্রস্থচ্ছেদে বৃক্কের অভ্যন্তরীণ গঠনের চিত্র।

● **কাজ**—বৃক্কের উৎপন্ন মূত্র মূত্রথলিতে নিয়ে যায়।

3. **মূত্রথলি** (Urinary bladder)—মানবদেহের শ্রোণিগহ্বরে যে পেশিবহুল থলিতে মূত্র সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয় তাকে **মূত্রথলি** বলে। পেশি দিয়ে তৈরি এই মূত্রথলি উদরের নিম্নাংশে অবস্থিত একটি ফাঁপা থলি বিশেষ। এটি ফাঁপা ত্রিকোণাঞ্চল ( ট্রাইগন – Trigone) এবং ডেট্রুসর নামে অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে তৈরি দেহ নিয়ে গঠিত। দুটি গবিনী মূত্রথলির ত্রিকোণাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে মূত্রনালি নির্গত হয়। মূত্রথলি ভেতরের প্রাচীর ভাঁজ হয়ে থাকে। এই ভাঁজগুলি পরিবর্তনসূচক আবরণী কলা দিয়ে আবৃত থাকে। এই কলা মূত্রথলি মূত্রের পুনঃশোষণ (রক্তে প্রত্যাবর্তনে) বাধা দেয়।

● **কাজ**— দুটি বৃক্কে প্রস্তুত মূত্র গবিনীর মাধ্যমে এসে মূত্রথলিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে।

4. **মূত্রনালি** (Urethra)—মূত্রথলি থেকে যে নালিপথে মূত্র দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় তাকে মূত্রনালি বলে। পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের মূত্রনালির দৈর্ঘ্য এবং অবস্থানের পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষের মূত্রনালির দৈর্ঘ্য প্রায় **20 সেমি.** হয় যা পুরুষ লিঙ্গের (Penis) মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে নির্গত হয়। স্ত্রীলোকের মূত্রনালির দৈর্ঘ্য অনেক ছোটো হয় অর্থাৎ প্রায় **4 সেমি.** সমান হয় এবং যোনির জননছিদ্রের (Vaginal orifice) উপরে আলাদাভাবে উন্মুক্ত হয়। মূত্রনালির মধ্যে দুটি স্থানে পেশি দিয়ে তৈরি **পেশিবলয় (স্ফিংটার**—Sphincter) দেখা যায়। মূত্রথলি ও মূত্রনালির সংযোগস্থলে **অনৈচ্ছিক পেশি নির্মিত** একটি পেশিবলয় দেখা যায়, তাকে **অন্তঃস্থ পেশিবলয়** বলে। **ঐচ্ছিক পেশিনির্মিত** অন্য একটি পেশিবলয় মূত্রনালির দূরবর্তী অংশে থাকে, তাকে **বহিস্থ পেশিবলয়** বলে। এই রকমের পেশিবলয় মূত্র নির্গমনকে নাভীয় প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র 8.4 : পুরুষের মূত্রনালির অবস্থানের চিত্ররূপ।

● **কাজ**—মূত্রনালি দিয়ে মূত্র মূত্রথলি থেকে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

➤ (c) **মূত্রসৃষ্টিকারী তন্ত্রের কার্যাবলি (Functions of Urinary system) :**

1. **বর্জ্য পদার্থ অপসারণ**—বৃক্ক বা মূত্র তন্ত্রের সাহায্যে দেহের ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থসমূহ প্রধানত NaCl ও প্রোটিন বিপাকের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, যেমন—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি এবং অনাইট্রোজেন পদার্থসমূহকে **মূত্রের মাধ্যমে** দেহ থেকে নির্গত হয়।

2. **দেহে জলের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ**—দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত জলের বেশির ভাগ এই তন্ত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়ে দেহে **জলের সাম্যাবস্থা** বজায় রাখে।

3. **দেহরসের স্বাভাবিক হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ**—দেহরসের বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎ-বিশ্লেষ্য বা **ইলেকট্রোলাইট** (Electrolyte) এবং স্বাভাবিক হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব বজায় রাখা এই তন্ত্রের অন্যতম প্রধান কাজ।

4. **ঔষধ ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের নিষ্ক্রমণ**—দেহে যেসব দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয় বা প্রবেশ করে, ভেষজ পদার্থ (Drugs) ইত্যাদিকে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে এই তন্ত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।
5. **রক্তের বিভিন্ন উপাদানের গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ**—বৃক্কের নেফ্রনের পছন্দ মতো পুনঃশোষণের মাধ্যমে এই তন্ত্রটি রক্তের কোনো কোনো উপাদানের সঠিক গাঢ়ত্ব বজায় রাখে।
6. **রক্ত ও কলাকোশের অভিস্রবণ চাপের নিয়ন্ত্রণ**—রেচনতন্ত্র রক্তের ও কলাকোশের মধ্যে অভিস্রবণ চাপ বজায় রাখে।
7. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ**—বৃক্ক থেকে ক্ষরিত রেনিন (Renin) নামে উৎসেচক রক্তবাহকে সংকুচিত করে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

## বৃক্কের গঠন ও কার্যাবলি (Structure and Functions of Kidney)

### I. বৃক্কের অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ গঠন (Location and Internal structure of kidney) ঃ

চিত্র 8.5. ঃ মানুষের দেহে বৃক্কের অবস্থান।

(a) **অবস্থান** (Location)—মানবদেহে একজোড়া বৃক্ক উদর গহ্বরের সামান্য নীচে এবং পিঠের দিকের প্রাচীরের কাছে মেরুদণ্ডের দু'দিকে দ্বাদশ বক্ষদেশীয় কশেরুকার ($T_{12}$) অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে তৃতীয় কটিদেশীয় কশেরুকা ($L_3$) পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ডান বৃক্ক বাম বৃক্ক অপেক্ষা সামান্য নীচে থাকে (চিত্র 8.5 দেখো)।

(b) **বৃক্কের অভ্যন্তরীণ গঠন** (Internal structure of kidney) ঃ একটি বৃক্কের লম্বচ্ছেদ পরীক্ষা করলে দেখা যায়—(i) গবিনীর ঊর্ধ্বাংশটি বৃক্কের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রসারিত হয়। একে **বৃক্কীয় শ্রোণি** বা **বৃক্কীয় সাইনাস** বলে। (ii) বৃক্কীয় শ্রোণি বিভক্ত হয়ে 2–3টি প্রধান ভাগ বা বৃতিতে অর্থাৎ **মেজর ক্যালিক্স**-এ বিভক্ত হয়। প্রধান বৃতি আবার বিভক্ত হয়ে 7–13টি শাখা বৃতি বা **মাইনর ক্যালিক্স** গঠন করে। (iii) বৃক্কের ভিতরের অংশ দুটি ভাগে বিভক্ত, বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক গাঢ় অংশকে বহিঃস্তর বা **কর্টেক্স** এবং ভিতরের অপেক্ষাকৃত স্বল্প গাঢ় অংশকে অন্তঃস্তর বা **মেডালা** বলে। (iv) বৃক্কমধ্যে বহিঃস্তরের কিছু কিছু অংশ অন্তঃস্তরের গভীরে প্রবেশ করে স্তম্ভাকৃতি ধারণ করেছে। এদের **বৃক্কীয় স্তম্ভ** (Renal column) বলে। বহিঃস্তরের এই রকম বিন্যাসের ফলে বৃক্কের অন্তঃস্তরটি কতকগুলি (8–18টি) গম্বুজাকৃতি অংশের মতো দেখা যায়, এদের **পিরামিড** (Pyramid) বলে। পিরামিডের প্রশস্ত অংশ বহিঃস্তরের দিকে এবং অপেক্ষাকৃত সরু অংশ বৃক্কীয় শ্রোণির (Pelvis) দিকে থাকে। পিরামিডের এই সরু অংশকে **পিড়কা বা প্যাপিলা** বলে। সাধারণত 2–3টি পিরামিডের শীর্ষাঞ্চলের মিলনের ফলে পিড়কা গঠিত হয়। প্রতিটি পিড়কাপ্রান্তে 10–25টি ছিদ্র থাকে। অনেকগুলি সংগ্রাহক নালি একত্রিত হয়ে **বেলিনির নালি** (Duct of Bellini) নামে যে নালি গঠন করে সেটাই এই ছিদ্রে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র 8.6 ঃ লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত বৃক্কের বিভিন্ন অংশ।

প্রতিটি বৃক্ক অসংখ্য **নেফ্রন** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি নেফ্রন ম্যালপিজিয়ান করপাসল ও বৃক্কীয় নালিকা নিয়ে গঠিত। বৃক্কের কর্টেক্স ম্যালপিজিয়ান করপাসল এবং বৃক্কীয় নালিকা (Renal tubules) নিয়ে গঠিত। এই ম্যালপিজিয়ান করপাসল এবং বৃক্কীয় নালিকাকে একত্রে **নেফ্রন** বলে।

### II. বৃক্কের কার্যাবলি (Functions of Kidney) ঃ

1. **মূত্র উৎপাদন** বৃক্কের মুখ্য কাজ।
2. প্রোটিনের বিপাকলব্ধ নাইট্রোজেন ও সালফারযুক্ত পদার্থসমূহ, প্রতিবিষ, ওষুধ ইত্যাদিকে বৃক্ক মূত্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

3. বৃক্ক মূত্রে জলের রেচনের মাধ্যমে দেহে জলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এর ফলে রক্তের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে।
4. বৃক্ক দেহরসের $H^+$ আয়নের গাঢ়ত্ব এবং তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে।
5. বৃক্কে অ্যামোনিয়া, অজৈব ফসফেট ও হিপ্পিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি রেচন পদার্থ উৎপন্ন হয়।
6. অক্সিজেনের অভাবে বৃক্ক এরিথ্রোপোয়েটিন নামে হরমোন ক্ষরিত করে যা অস্থিমজ্জায় RBC উৎপাদনে সাহায্য করে।

## ❂ 8.3. নেফ্রন (Nephron) ❂

### ▲ সংজ্ঞা, সংখ্যা, প্রকারভেদ এবং নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের গঠন ও তাদের কার্যাবলি (Definition, Number, Types, Structure and Functions of different parts of Nephron) :

❖ (a) **নেফ্রনের সংজ্ঞা (Definition of Nephron) : ম্যালপিজিয়ান করপাসল ও নালিকা সমন্বয়ে গঠিত বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে।**

➤ (b) **নেফ্রনের সংখ্যা (Numbers of Nephron) :** প্রতিটি বৃক্কে প্রায় 10 লক্ষ নেফ্রন আছে। ( মানুষের দুটি বৃক্কের সব নেফ্রন পরপর জুড়ে দিলে তার দৈর্ঘ্য প্রায় 40 মাইল হবে। )

➤ (c) **নেফ্রনের প্রকারভেদ (Types of Nephron) :** বৃক্কের কর্টেক্স বা বহিঃস্তর দুটি ভাগে বিভক্ত। বহিস্থ দুই-তৃতীয়াংশকে **সুপারফিসিয়াল কর্টেক্স** এবং অন্তস্থ এক-তৃতীয়াংশকে (যা মেডালার ঠিক উপরে থাকে) **জ্যাক্স্টামেডুলারি কর্টেক্স** বলে। কর্টেক্সে নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান করপাসলের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নেফ্রনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

1. **সুপারফিসিয়াল কর্টিকল নেফ্রন** (Superficial cortical nephrones–85%)—এই প্রকার নেফ্রন ছোটো আকৃতির হয় যা বৃক্কের সুপারফিসিয়াল কর্টেক্সে থাকে। **কাজ**—স্বাভাবিক অবস্থায় সুপারফিসিয়াল নেফ্রন মূত্র উৎপাদন করে।

2. **জ্যাক্স্টামেডুলারি কর্টিকল নেফ্রন** (Juxtamedullary cortical nephrones–15%)—এই প্রকার নেফ্রন তুলনামূলক বড়ো আকারের হয়, যা মেডালার ঠিক উপরে কর্টেক্সে থাকে। **কাজ—জরুরি অবস্থায়** বা **পীড়ন অবস্থায়** জ্যাক্স্টামেডুলারি কর্টিকল নেফ্রন মূত্র উৎপাদন করে।

চিত্র 8.7. : একটি নেফ্রনের সরল চিত্ররূপ।

➤ (d) **নেফ্রনের গঠন (Structure of Nephron) :** প্রতিটি নেফ্রন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—ম্যালপিজিয়ান করপাসল এবং বৃক্কীয় নালিকা।
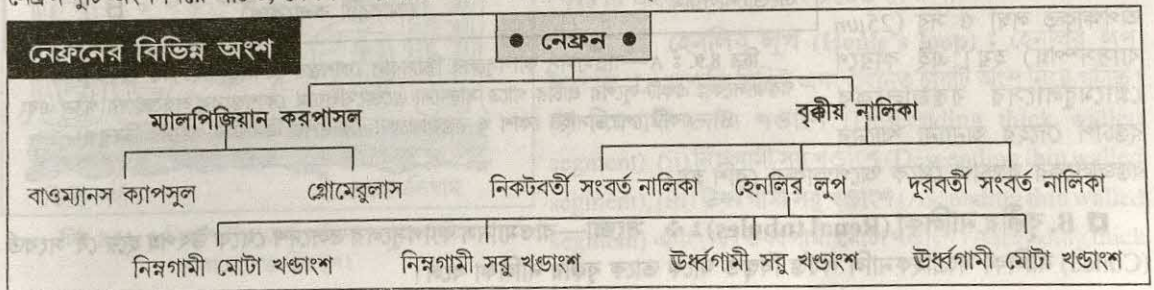
**■ A. ম্যালপিজিয়ান করপাসল (Malpighian corpuscle)** ঃ এটি সাধারণত বৃক্কের কর্টেক্সে দেখতে পাওয়া যায়। এর ব্যাস প্রায় 200 $\mu m$ সমান হয়। এটি দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত, যেমন—**বাওম্যানস ক্যাপসুল** এবং **গ্লোমেরুলাস**।

● 1. **বাওম্যানস ক্যাপসুল (Bowman's capsule)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা—নেফ্রনের ফানেলের মতো দেখতে বদ্ধ স্ফীত প্রান্ত যার মধ্যে গ্লোমেরুলাস নামে রক্তজালকের গুচ্ছ থাকে তাকে বাওম্যানস ক্যাপসুল বলে।**
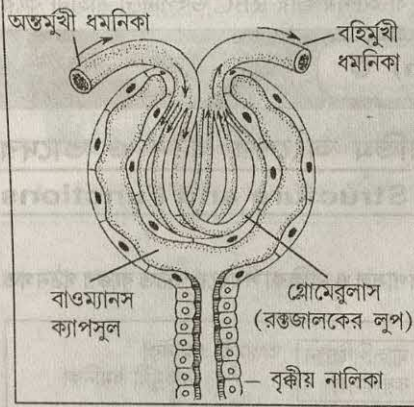
চিত্র 8.8. ঃ ম্যালপিজিয়ান করপাসল গঠনের চিত্ররূপ।

● **আণুবীক্ষণিক গঠন**— বাওম্যানস ক্যাপসুল দুটি প্রাচীর নিয়ে গঠিত। প্রতিটি প্রাচীর আবরণী কোশস্তর দিয়ে আবৃত থাকে। ভেতরের প্রাচীরের কোশস্তরকে **ভিসেরাল স্তর** (Visceral layer) এবং বাইরের প্রাচীরের কোশস্তরকে **প্যারাইট্যাল স্তর** (Perietal layer) বলে। ভিসেরাল কোশস্তর একস্তরবিশিষ্ট চ্যাপটা আবরণী কলা নিয়ে গঠিত। ভিসেরাল স্তরের কোশগুলি দেখতে কিছুটা অ্যামিবার মতো (চিত্র 8.9B)। এদের **পোডোসাইট** (Podocyte) কোশ বলে। এই কোশ থেকে নির্গত ক্ষণপদের অংশকে **পেডিসেল** (Pedicels) বলে। এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ভিত্তি ঝিল্লির উপর বিন্যস্ত থাকে কিন্তু কোশের মূল দেহটির সঙ্গে ভিত্তি পর্দার কিছুটা ব্যবধানে থাকে। এই সব কারণে যে ফাঁকা স্থানগুলি সৃষ্টি হয় তাকে **কোশান্তর ছিদ্র** বা **পরিস্রাবণ ছিদ্র** (Filtering pores) বলে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্যারাইটাল স্তর একস্তর কোশবিশিষ্ট আচ্ছাদক আবরণী কলা দিয়ে গঠিত। এই স্তরটি বৃক্ক নালিকার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত থাকে।

● 2. **গ্লোমেরুলাস (Glomerulus)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা—বাওম্যানস ক্যাপসুল দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত লুপের মতো রক্তজালকের গুচ্ছকে গ্লোমেরুলাস বলে।**

● **আণুবীক্ষণিক গঠন**— বৃক্কীয় ধমনি থেকে সৃষ্টি ছোটো ও প্রশস্ত **অন্তর্বাহী (অন্তর্মুখী) ধমনিকা** (Afferent arteriole) বাওম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং প্রায় 50টি লুপের (Loops) মতো রক্তজালকে বিভক্ত হয়ে জালক পিণ্ড (Tuft) সৃষ্টি করে। এই রক্তজালকের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগসূত্র নেই। বিভক্ত রক্তজালকগুলি আবার মিলিত হয়ে সরু **বহির্বাহী (বহির্মুখী) ধমনিকা** (Efferent arteriole) গঠন করে। অন্তর্বাহী ধমনিকা দৈর্ঘ্যে ছোটো এবং প্রশস্ত (50$\mu$m ব্যাসসম্পন্ন) হয়, কিন্তু বহির্বাহী ধমনিকাগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু (25$\mu m$ ব্যাসসম্পন্ন) হয়। এই কারণে গ্লোমেরুলাসের রক্তজালকের রক্তচাপ দেহের অন্যান্য স্থানের রক্তজালকের রক্তচাপ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

চিত্র 8.9. ঃ A—বাওম্যানস ক্যাপসুলের ভিসেরাল কোশস্তর (পোডোসাইট) ও গ্লোমেরুলাস রক্তজালকের একটি লুপের প্রাচীর গাত্রে সাজানো এন্ডোথেলিয়াম কোশস্তরের লম্বচ্ছেদের গঠন এবং B—একটি পোডোসাইট কোশ ও রক্তজালকের একাংশের ত্রিমাত্রিক গঠনের চিত্ররূপ।

**■ B. বৃক্কীয় নালিকা (Renal tubules)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা—বাওম্যানস ক্যাপসুলের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে যে সংবর্ত (Coiled) নালিকা সংগ্রাহকনালি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে বৃক্কীয় নালিকা বলে।**

বাওম্যান্‌স ক্যাপসুলের নীচের অংশ থেকে বৃক্কীয় নালিকা উৎপন্ন হয়। নালিকার উৎপত্তিস্থলের খুব সামান্য অংশ একটু সংকুচিত অবস্থায় থাকে তাকে গ্রীবা (Neck) বলে। এর পর থেকে বৃক্কীয় নালিকা আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি বৃক্কীয় নালিকা 3 cm দীর্ঘ এবং 20–60$\mu m$ ব্যাসযুক্ত হয়। বৃক্কীয় নালিকা প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত যেমন— **নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা, হেনলির লুপ** এবং **দূরসংবর্ত নালিকা**।

**❂ বৃক্কীয় নালিকার বিভিন্ন রকমের কোশ ❂**

(i) **ঘনতলীয় ঘনকাকার আবরণী কোশ**—সংবর্ত রেচন নালিকায় অন্তঃস্থ প্রাচীরে থাকে।
(ii) **স্বল্প উচ্চতা চ্যাপটাকৃতি কোশ**—হেনলির লুপে থাকে।
(iii) **স্তম্ভাকার আবরণী কোশ**—সংগ্রাহক নালিকায় থাকে।

চিত্র 8.10. ঃ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন কলাকোশের গঠনের চিত্ররূপ।

● 1. **নিকটবর্তী সংবর্ত (পরসংবর্ত) নালিকা (প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল—Proximal convoluted tubule) ঃ** বৃক্কীয় নালিকার প্রথমাংশ নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা যা গ্লোমেরিউলাসের কাছে থাকে। এই নালিকাটি অধিক কুণ্ডলী বা প্যাঁচানো হয় বলে একে **নিকটবর্তী বা পরসংবর্ত নালিকা** বলা হয়। বৃক্কনালিকার এই অংশটির দৈর্ঘ্য প্রায় 14 মিলিমিটার, বহির্ব্যাস প্রায় 55 $\mu m$ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাস প্রায় 15–20 $\mu m$ ব্যাসসম্পন্ন হয়। প্রথম রেচন নালিকার শেষপ্রান্ত সোজা হয়ে মেডালাতে প্রবেশ করে এবং হেনলির লুপের নিম্নগামী মোটা খণ্ডাংশ গঠন করে।

● **আণুবীক্ষণিক গঠন**—নালিকার অন্তঃপ্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট ঘনকাকার আবরণী কোশস্তর নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোশের নীচের দিকে রডের মতো এবং মুক্তপ্রান্ত বুরুশের মতো দেখা যায়। কারণ মুক্তপ্রান্তে বহু **মাইক্রোভিলাই** নামে অঙ্গুলি সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়। কোশের **মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি** এর ভিত্তিঝিল্লি দিকের সাইটোপ্লাজমে লম্বালম্বিভাব সজ্জিত থাকে (চিত্র 8.11) বলে কোশগুলির তলদেশ দণ্ডাকার দেখা যায়। এই কারণে সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কোশগুলিকে **ব্রাশ বর্ডার** (বুরুশের প্রান্তের মতো) এবং **রডেড** দেখা যায়।
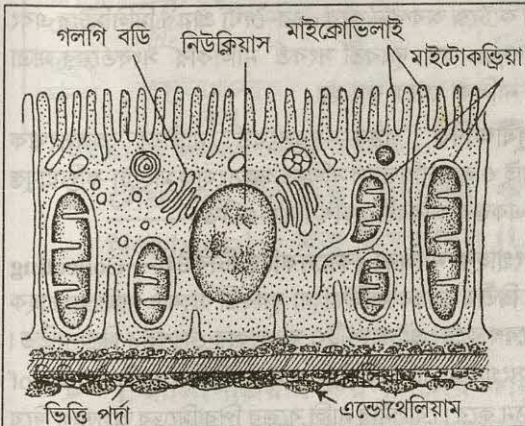
চিত্র 8.11. ঃ নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকার অন্তঃপ্রাচীরে কলাকোশের চিত্ররূপ।

● 2. **হেনলির লুপ (Henle's loop) ঃ** হেনলির লুপ ইংরেজি 'U' আকৃতি বিশিষ্ট এবং প্রধানত চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। (i) **নিম্নগামী মোটা খণ্ডাংশ** (Descending thick walled segment) (ii) **নিম্নগামী সরু খণ্ডাংশ** (Descending thin walled segment), (iii) **ঊর্ধ্বগামী সরু খণ্ডাংশ** (Ascending thin walled segment) এবং (iv) **ঊর্ধ্বগামী মোটা খণ্ডাংশ** (Ascending thick

walled segment)। নিম্নগামী অংশ পরসংবর্ত নালিকার শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে বৃক্কের মেডালার ভিতরে প্রবেশ করে। পরে ঊর্ধ্বগামী অংশটি নিম্নগামী অংশ থেকে আরম্ভ হয়ে আবার বৃক্কের কর্টেক্সে ফিরে আসে।

চিত্র 8.12. ঃ হেনলির লুপের প্রাচীরের চ্যাপটাকৃতি কোশের চিত্ররূপ।

● **আণুবীক্ষণিক গঠন**—হেনলির লুপের মোটা অংশ দুটি অর্থাৎ নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী মোটা খণ্ডাংশ দুটির প্রাচীর গাত্র ঘনকাকার আবরণী কলার কোশ দিয়ে আবৃত থাকে। হেনলি লুপের নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী অংশ সরু হয় এবং বাহু দুটি **চ্যাপটাকৃতি** আবরণী কলার কোশ দিয়ে ঘেরা থাকে। আবৃত (চিত্র 8.12) ঘনকাকার এবং চ্যাপটাকৃতি আবরণী কলাকোশে কম সংখ্যা ও ছোটো ছোটো মাইক্রোভিলাই এবং কম সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

**● হেনলির লুপ-এর বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ ●**

(a) **বিভিন্ন অংশ**—হেনলির লুপ চারটি অংশে বিভক্ত, যেমন — (i) নিম্নগামী পুরু খণ্ডাংশ, (ii) নিম্নগামী সরু খণ্ডাংশ, (iii) ঊর্ধ্বগামী সরু খণ্ডাংশ এবং (iv) ঊর্ধ্বগামী পুরু খণ্ডাংশ।

(b) **বিভিন্ন অংশের কাজ**—(i) **নিম্নগামী পুরু খণ্ডাংশ**—নিকটবর্তী সংবর্ত মোটা নালিকার মতো ঘনকাকার কোশস্তর দিয়ে আবৃত অংশটি **জল শোষণ** করে। (ii) **নিম্নগামী পাতলা খণ্ডাংশ**—চ্যাপটাকৃতি আবরণী কোশস্তর দিয়ে আবৃত সরু অংশটি **NaCl শোষণ** করে। (iii) **ঊর্ধ্বগামী পাতলা খণ্ডাংশ**—চ্যাপটাকৃতি আবরণী কোশস্তর দিয়ে আবৃত সরু অংশটি **ক্লোরাইড শোষণ** করে। (iv) **ঊর্ধ্বগামী পুরু খণ্ডাংশ**—ঘনকাকার কোশস্তর দিয়ে আবৃত মোটা অংশটি **ক্লোরাইড শোষণ** করে।

চিত্র 8.13. ঃ হেনলির লুপ।

● **3. দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা (ডিস্টাল কন্‌ভলিউটেড টিবিউল—Distal convoluted tubule)** ঃ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা রেচন নালিকার দ্বিতীয় অংশ। এটি হেনলির লুপের ঊর্ধ্বগামী অংশ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই অংশ প্রথম নালিকার মতো বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 5 মিলিমিটার এবং ব্যাস 20–50$\mu m$ হয়। দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার সংবর্তনের মাত্রা পরাসংবর্ত নালিকা থেকে কম হয়।

চিত্র 8.14 ঃ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার অন্তঃপ্রাচীরের কলাকোশের চিত্ররূপ।

● **আণুবীক্ষণিক গঠন**—দূরসংবর্ত নালিকা অল্পসংখ্যক মাইক্রোভিলাই ও লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত স্বল্পসংখ্যক মাইটো-কন্ড্রিয়াযুক্ত ঘনাকাকার একস্তর আবরণী কোশ নিয়ে গঠিত।

● **সংগ্রাহক নালিকা কোলেকটিং টিবিউল—Collecting tubule)** ঃ দ্বিতীয় রেচন নালিকা বা দূরবর্তী সংবর্ত নালি সংগ্রাহক নালিকায় প্রবেশ করে। এই অংশটিও ঘনকাকার কোশস্তর দিয়ে গঠিত। বহুসংখ্যক সংগ্রাহক নালি মিলিত হয়ে **বেলিনীর নালি** (Duct of Bellini) গঠন করে। বেলিনীর নালি বৃক্কের পিরামিডের অগ্রভাগ দিয়ে বৃক্কীয় শ্রোণির বিবরে উন্মুক্ত হয়।

বৃক্কের প্রতিটি গ্লোমেরুলাস রক্তজালক থেকে বহির্মুখী ধমনি নির্গত হয়ে দ্বিতীয় **জালক বা পেরিটিবিউলার** জালক (Peritubular capillaries) সৃষ্টি করে। এই জালক প্রথম এবং দ্বিতীয় রেচন নালিকা ও হেনলির লুপের চারপাশে ঘিরে থাকে। এর রক্তজালক থেকে রক্ত শিরার মাধ্যমে বৃক্ক থেকে ফিরে আসে (চিত্র 8.15 দেখো)।

চিত্র 8.15. : পেরিটিউবিউলার জালকের চিত্ররূপ।

## ✪ গ্লোমেরুলাস সন্নিহিত যন্ত্র (জাক্স্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস) (Juxta-glomerular Aparatus) :

❖ সংজ্ঞা : **দূরসংবর্ত নালিকা প্রথমাংশ, গ্লোমেরুলাস এবং অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ধমনিকা পরস্পর কাছাকাছি এসে যে জটিল অংশ গঠন করে তাকে জাক্স্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস বলে।** দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার এবং অন্তর্মুখী কোশগুলি পরিবর্তিত হয়। দূরবর্তী সংবর্তী নালিকার গায়ে যে পরিবর্তিত কোশগুলি থাকে তাদের **ম্যাকুলা ডেনসা** (Macula densa) বলে। অন্তর্মুখী ধমনিকার গায়ে যে পরিবর্তিত কোশগুলি থাকে তাদের **জাক্স্টাগ্লোমেরুলার কোশ** (Juxtaglomerular cells) বলে। এছাড়া অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ধমনিকা দুটি এবং দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা নিয়ে সৃষ্ট কোণাকৃতি স্থানে যে ঘনসন্নিবিষ্ট কোশসমূহ দেখতে পাওয়া যায় তাদের **পল্‌কিসেন বা ল্যাসিস কোশ** (Polkissen or Lacis cells) বলে। **ম্যাকুলা ডেনসা, জাক্স্টাগ্লোমেরুলার কোশ এবং লাসিস কোশ একত্রে গ্লোমেরুলাস-সন্নিহিত যন্ত্র বা জাক্স্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস (Juxtaglomerular apparatus) নামক অংশ গঠন করে।**

চিত্র 8.16. : জাক্স্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস।

● **কাজ**—জাক্স্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস **রেনিন** (Renin) এবং **ইরিথ্রোপোয়েটিন** নামে হরমোন উৎপন্ন করে। রেনিন রক্তচাপ ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চল থেকে অ্যালডোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। ইরিথ্রোপোয়েটিন অক্সিজেনের অভাবে বৃক্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে অস্থিমজ্জায় যায় এবং RBC উৎপাদনে অংশ নেয়।

## ▲ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের কাজ (Functions of different parts of Nephron)—মূত্র উৎপাদন (Urine formation)

নেফ্রনের একমাত্র কাজ হল **মূত্র উৎপাদন** করা। নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রকমের কাজ সম্পন্ন করে অর্থাৎ ম্যালপিজিয়ান করপাসলে পরাপরিস্রাবণ এবং বৃক্কীয় নালিকার পুনঃশোষণ, ক্ষরণ ও নতুন পদার্থের উৎপাদন করে মূত্র প্রস্তুত করে।

### ➤ I. ম্যালপিজিয়ান করপাসলের কাজ (Functions of Malpighian corpuscle) :

গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ম্যালপিজিয়ান করপাসল একটি **পরিস্রাবক যন্ত্র** যা ছাকনির মতো কাজ করে। এই ছাকনিতে যে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া পরিস্রাবণ ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ঘটে তাকে **পরাপরিস্রাবণ** (Ultrafiltration) বলা হয়।

## • নেফ্রনের পরিস্রাবণ ঝিল্লি (Filtering membrane of Nephron) •

বাওম্যানস ক্যাপসুলের **ভিসেরাল কলাস্তর**, গ্লোমেরুলাস রক্তজালকের **অন্তরাবরণী** বা **এন্ডোথেলিয়ামের কলাস্তর** এবং এদের মধ্যবর্তী **ভিত্তিঝিল্লি** নিয়ে **পরিস্রাবণ ঝিল্লি** গঠিত হয়। এই ঝিল্লির মধ্য দিয়ে পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

❖ (a) **পরাপরিস্রাবণের সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রবণের কেলাস পদার্থকে কোলয়েড পদার্থ থেকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথক করা হয় তাকে পরাপরিস্রাবণ বলে।**
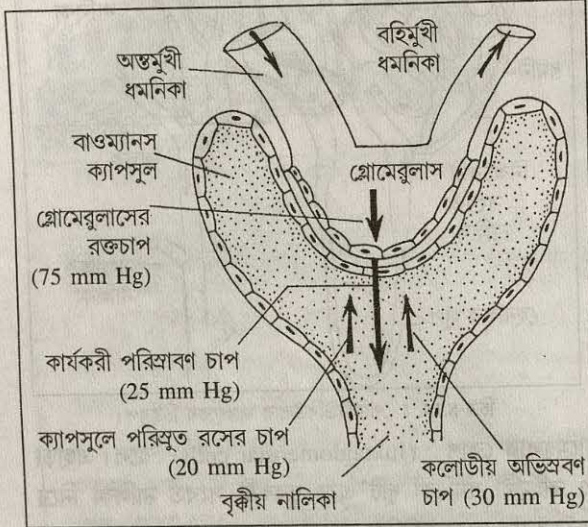
**চিত্র 8.17.** ঃ ম্যালপিজিয়ান করপাসলে পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় মূত্র উৎপাদনের চিত্ররূপ।

(b) **পরাপরিস্রাবণের প্রক্রিয়া ঃ** পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় প্লাজমার প্রোটিন (কোলয়েড পদার্থ) ছাড়া প্লাজমার প্রায় অন্য সকল উপাদানই (কেলাস পদার্থ—Crystalloid substances) পরিস্রুত হয়ে বাওম্যানস ক্যাপসুলের মধ্যে যায়। একে **ক্যাপসুলার পরিস্রুত** (Capsular filtrate) বলে। ক্যাপসুলার পরিস্রুতের pH রক্তের প্লাজমার pH-এর সমান অর্থাৎ 7·4 অর্থাৎ ক্ষারীয় হয়।

পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া তিন রকম চাপের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে একটি চাপ পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় **সাহায্যকারী চাপ** (Favouring pressure)। একে **গ্লোমেরুলাসের রক্তজালকের রক্তচাপ** (Glomerular Capillary Pressure, GCP) বলে। এই চাপ 75 mm Hg চাপের সমান হয়। এই চাপ অন্য স্থানের রক্তজালকের চাপের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ গ্লোমেরুলার অন্তর্মুখী উপধমনি সরাসরি বৃহৎ ধমনি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এছাড়া এর ব্যাস ($50\mu m$) বহির্মুখী উপধমনি ব্যাস ($25\mu m$) অপেক্ষা বেশি। অন্য দুটি চাপ সাধারণত পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় **বাধাদানকারী চাপ** হিসাবে গণ্য হয়। এই দুটি চাপ হল রক্তস্থিত প্রোটিনের **কলোডীয় অভিস্রবণ চাপ** (Colloidal Osmotic Pressure, COP) যা 30 mm Hg সমান হয় এবং **বাওম্যানস ক্যাপসুলের পরিস্রুত রসের চাপ বা উদ্‌স্থৈতিক চাপ** (Capsular Hydrostatic Pressure CHP) যা 20 mm Hg সমান হয়।

শেষ দুটি চাপের সমষ্টি গ্লোমেরুলাসস্থিত রক্তের চাপ থেকে বাদ দিলে যে চাপের মাত্রা পাওয়া যায়, তাকে **কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ** (Effective Filtration Pressure, EFP) বলে। এই চাপ ম্যালপিজিয়ান করপাসলে মূত্র উৎপাদনে অংশ নেয়।

❑ **কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ বা EFP** = GCP – (COP + CHP) = 75 – (30 + 20) = **25 mm Hg** চাপের সমান।

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে প্রতি মিনিটে বৃক্কের মধ্য দিয়ে **1,200–1,300 মিলিলিটার রক্ত** বা **770 মিলিলিটার প্লাজমা** অতিক্রম করার সময় গ্লোমেরুলাসে প্রায় **125 মিলিলিটার** পরিস্রুত তরল উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রতি 24 ঘণ্টায় প্রায় গড়ে **170 লিটার** তরল পরিস্রাবিত হয়ে বাওম্যান ক্যাপসুলে যায়। একে **ক্যাপসুলার পরিস্রুত** বলে।

### ➤ II. বৃক্কীয় নালিকার কাজ (Functions of Renal tubule) ঃ

বৃক্কীয় নালিকার পুনঃশোষণ, নালিকার ক্ষরণ এবং নতুন পদার্থের উৎপাদন ইত্যাদির কার্যাবলির সাহায্যে ক্যাপসুলার পরিস্রুত থেকে স্বাভাবিক মূত্র উৎপন্ন হয়।

1. **নালিকার পুনঃশোষণ** (Tubular reabsorption)— গ্লোমেরুলাসের (বাওম্যানস ক্যাপসুল) পরিস্রুত তরল বৃক্কীয় নালিকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবার সময় দেহের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তুগুলির পুনঃশোষণ ঘটে। পুনঃশোষণ দুই প্রকার—

(a) **সক্রিয় পুনঃশোষণ** (Active reabsorption)—গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, $SO^{2}_{4}{}^{-}$, $PO^{3}_{4}{}^{-}$, $Na^{+}$, $K^{+}$, ভিটামিন-সি, কিটোন বডি প্রভৃতি পরসংবর্ত নালিকার অংশ থেকে সক্রিয় পদ্ধতিতে শোষিত হয়। গ্লুকোজ বাহকের মাধ্যমে পুনঃশোষিত হয়।

(b) **নিষ্ক্রিয় পুনঃশোষণ** (Passive reabsorption)—জল এবং ইউরিয়া নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে শোষিত হয়।

বাওম্যানস ক্যাপসুল থেকে আসা পরিস্রুত তরলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জল বৃক্কের পরসংবর্ত নালির প্রথম অর্ধাংশ থেকে শোষিত হয়। এটি একটি **বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া** (Obligatory process)। দূরসংবর্ত নালিকা থেকে জল পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে নির্গত অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন (ADH)-এর প্রভাবে পুনঃশোষিত হয়। একে **ফ্যাকালটেটিভ প্রক্রিয়া** (Facultative process) বলে।

2. **নালিকার ক্ষরণ** (Tubular secretion)—বৃক্কীয় নালিকার ক্ষরণ একটি সক্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে বৃক্কের নালিকার লুমেনের গাত্রের কোশ রক্তের কোনো কোনো পদার্থকে বৃক্কের নালিকা পথে (Lumen) ক্ষরিত করে। ক্ষরিত পদার্থগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ফেনোল রেড, ক্রিয়েটিনিন, স্টেরয়েড প্রভৃতি। এ ছাড়া বৃক্কীয় নালিকার যেসব অংশে $Na^+$ আয়নের পুনঃশোষণ ঘটে সেই সব অংশের কোশসমূহ সোডিয়াম আয়নের বিনিময়ে পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়নের ক্ষরণ ঘটায়।

3. **নতুন পদার্থের উৎপাদন** (Formation of new substances) — বৃক্কীয় নালিকার কোশগুলি কিছু কিছু নতুন পদার্থ উৎপাদন করে, যেমন— অ্যামোনিয়া, হিপাপিউরিক অ্যাসিড এবং অজৈব ফসফেট।

### ❂ বৃক্ক নালিকার বিভিন্ন অংশের কাজ (Individual function of different parts of the renal tubule) ঃ

1. **দূরসংবর্তী সংবর্ত নালিকার কাজ**— বৃক্কনালিকার এই অংশটির প্রধান কাজ হল পুনঃশোষণ। প্রায় অধিকাংশ পদার্থের বেশির ভাগ অংশ নালিকার এই অংশ থেকে ব্যাপন, অভিস্রবণ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে শোষিত হয়। যেমন—জল (70–72%), গ্লুকোজ (প্রায় 2/3-এর অংশ), $Na^+$ (80%) অ্যামাইনো অ্যাসিড, NaCl, $HCO_3$, ফসফেট, ইউরিয়া (45%) ইত্যাদি। বিভিন্ন বস্তু (জল ও লবণ সমানভাবে) পুনঃশোষিত হওয়ার ফলে **তরলের ঘনত্ব (অসমোলালিটি-Osmolality) প্লাজমার ঘনত্বের সমান** থাকে।

**চিত্র 8.18.** ঃ বৃক্ক নালিকা থেকে বিভিন্ন পদার্থের পুনঃশোষণ এবং ক্ষরণের ফলে নালিকার বিভিন্ন অংশে সমসারক, অতিসারক এবং লঘুসারক মূত্রের উৎপাদনের চিত্ররূপ।

2. **হেনলির লুপের কাজ**—হেনলি লুপের প্রধান কাজ হল জল সংরক্ষণ করা। হেনলি লুপের দৈর্ঘ্য যত বড়ো হবে, তত ঘন মূত্র তৈরি হবে। হেনলির লুপের নিম্নগামী বাহু জলের এবং অনেক দ্রাবের সাপেক্ষে ভেদ্য ঊর্ধ্বগামী বাহুর উভয় অংশই জলের পক্ষে অভেদ্য কিন্তু $Na^+$, NaCl, $K^+$ এবং অন্যান্য আয়ন পুনঃশোষণ করে। এই কারণে ঊর্ধ্বগামী বাহুস্থিত তরল যথেষ্ট **লঘু অবস্থায়** পরিণত হয় বলে এই অংশের তরলের ঘনত্ব বাড়ে।

3. **দূরবর্তী রেচন নালিকা এবং সংগ্রাহক নালিকার কাজ**— নেফ্রনের এই দুটি অংশে জল এবং লবণের সঠিক পুনঃশোষণের মাত্রা সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেহের অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ (Osmoregulation) এবং রক্তে pH নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন হয়। জল ও লবণের পুনঃশোষণের ফলে মূত্রের চূড়ান্ত ঘনত্ব বজায় থাকে। এই দুটি অংশে জলের পুনঃশোষণ পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে নির্গত অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোনের (ADH) উপর নির্ভর করে।

### ● থ্রেশহোল্ড, লো-থ্রেশহোল্ড এবং নন-থ্রেশহোল্ড পদার্থসমূহ ●

1. **থ্রেশহোল্ড পদার্থ** (Threshold substances)— গ্লোমেরুলাস পরিস্রুতে যেসব পদার্থ বৃক্কীয় নালিকা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে আসে তাদের থ্রেশহোল্ড পদার্থ বলে। **উদাহরণ**—গ্লুকোজ, পটাশিয়াম প্রভৃতি।
2. **লো-থ্রেশহোল্ড পদার্থ** (Low threshold substances)—গ্লোমেরুলাস পরিস্রুতের যেসব পদার্থ বৃক্কীয় নালিকা দিয়ে আংশিকভাবে পুনঃশোষিত হয় তাদের লো থ্রেশহোল্ড পদার্থ বলে। **উদাহরণ**—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ফসফেট ইত্যাদি।
3. **নন-থ্রেশহোল্ড পদার্থ** (Non threshold substances)—গ্লোমেরুলাস পরিস্রুতে যেসব পদার্থ বৃক্ক নালিকা দিয়ে একেবারেই পুনঃশোষিত হয় না তাদের নন-থ্রেশহোল্ড পদার্থ বলে। **উদাহরণ**—ক্রিয়েটিন, সালফেট ইত্যাদি।

### ❂ মূত্র উৎপাদনে সাহায্যকারী নেফ্রনের বিশেষ গঠনগত বৈশিষ্ট্য (Some special structural characteristic features of nephron for formation of Urine) ঃ

1. অন্তর্মুখী ধমনিকার ব্যাস বহির্মুখী ধমনিকার ব্যাস থেকে বেশি হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে রক্ত চাপ বেশি হয়।
2. অন্তর্মুখী ধমনিকার পেশিস্তর স্থিতিস্থাপক, তাই ধমনিকার ব্যাস কমিয়ে বা বাড়িয়ে গ্লোমেরুলাসে রক্তপ্রবাহকে কমানো বা বাড়ানো যায়।
3. ল্যাসিস কোশ সংকোচনশীল হবার জন্য গ্লোমেরুলাসে রক্তবাহের ব্যাস কমিয়ে রক্তচাপ বাড়ানো যায়।
4. বাওম্যানস ক্যাপসুলের পোডোসাইট কোশের মাঝে মাঝে ছিদ্র (পরিস্রাবক ছিদ্র) থাকায় পরিস্রাবণ সহজেই ঘটে।
5. গ্লোমেরুলাসের এন্ডোথেলিয়াম ছিদ্রযুক্ত হয়, ফলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া পরিস্রাবণ ঝিল্লির মাধ্যমে সহজেই ঘটে।
6. বাওম্যানস ক্যাপসুলের গহ্বর প্রসারিত হওয়ায় পরিস্রুত তরলের সঞ্চয় ঘটে। এই তরলের উদস্থৈতিক চাপ কার্যকরী পরিস্রাবক চাপ নিয়ন্ত্রিত করে।
7. পেরিটিবিউলার রক্ত জালক, বৃক্কীয় নালিকাকে জড়িয়ে থাকে বলে পুনঃবিশোষণ সহজ হয়।

**● মূত্র উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief description of urine formation) ●**

| নেফ্রনের অংশ | কাজ | বস্তু |
|---|---|---|
| 1. গ্লোমেরুলাস | পরাপরিস্রাবণ | — রক্তের প্লাজমা (প্রোটিন ছাড়া) |
| 2. বাওম্যান ক্যাপসুল | সঞ্চয় | — রক্তের পরিস্রুত তরল |
| 3. নিকটবর্তী সংবর্তন নালিকা | সক্রিয় শোষণ | — $Na^+$ (70%), (সম্পূর্ণ), গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফসফেট, $K^+$ |
| | নিষ্ক্রিয় শোষণ | — $Cl^-$, $HCO^-{}_3$, $NaHCO_3$, জল, (H) ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড (10%) |
| | সক্রিয় ক্ষরণ | — $H^+$ |
| 4. হেনলি লুপ ঃ নিম্নগামী মোটা অংশ | — | — |
| সরু অংশ | নিষ্ক্রিয় শোষণ | — জল |
| উর্ধ্বগামী সরু অংশ | সক্রিয় শোষণ | — $N_2^+$, $Cl^-$, ইউরিয়া |
| মোটা অংশ | সক্রিয় শোষণ | — $N_2^+$, $Cl^-$ |
| 5. দূরবর্তী সংবর্তন নালিকা | সক্রিয় শোষণ | — $N_2^+$, $H_2O$ (HOH) |
| | নিষ্ক্রিয় ক্ষরণ | — $K^+$, $NH_3$ |
| | সক্রিয় ক্ষরণ | — $H^+$ |
| 6. সংগ্রাহক নালিকা | সক্রিয় শোষণ (অ্যালডোস্টেরন) | — $K^+$ |

8. বহির্মুখী বৃক্কীয় ধমনিকা **ভাসা রেকটা** তৈরি করে হেনলি লুপের সমান্তরালে থাকায় বৃক্কীয় নালিকা তরল থেকে পুনঃশোষণ সহজ হয়।
9. নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা কুণ্ডলিত থাকায় এবং নালিকার প্রাচীরে মাইক্রোভিলাই যুক্ত ঘনকাকার আবরণী কলাকোশ থাকায় শোষণ তল অধিক থাকে।
10. দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা কুণ্ডলিত হওয়ার জন্য পুনঃশোষণ সহজ হয়।

## ❂ 8.4. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes insipidus) ❂

(a) ❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ পশ্চাৎ পিটুইটারিকে কেটে বাদ দিলে অথবা হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি স্নায়ুগুচ্ছে ক্ষত সৃষ্টি হলে অথবা অন্য কোনো কারণে ADH ক্ষরণ ব্যাহত হলে যে অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে (এমনকি 20 লিটার) জল মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায় তাকে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes insipidus) বলে।**

(b) **উপসর্গ** ঃ (i) **পলিডিপসিয়া** (Polydepsia)—অধিক পরিমাণে জল পান। (ii) **পলিইউরিয়া** (Poly urea)—বেশি পরিমাণে তরল মূত্র নির্গমন। (iii) **নক্‌চুরিয়া** (Nocturia)—মূত্র ত্যাগ (প্রস্রাব)-এর জন্য রাত্রে বারে বারে ঘুম ভাঙা।

(c) **ব্যাখ্যা (Explanation)** ঃ দূরবর্তী রেচন নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকায় জলের ও অভিস্রবণ চাপের পরিবর্তন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্য দিয়ে নির্গত **অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক হরমোন** (Antidiuretic

Hormone সংক্ষেপে **ADH**)-এর উপর নির্ভর করে। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় রেচন নালিকার এই দুটি অংশ জল-অভেদ্য থাকে, তাই জলের পুনঃশোষণ ঘটতে পারে না। দূরবর্ত এবং সংগ্রাহক নালিকার প্রাচীরের কোশগুলির জলের ভেদ্যতাকে ADH বাড়িয়ে দেয়। ফলে জলের পুনঃশোষণ ঘটে। মানুষ এবং বানরের শুধু সংগ্রাহক নালিকার উপর কাজ করে, অন্যান্য প্রাণীতে দূরসংবর্তী রেচন নালিকার উপর কাজ করে জলের ভেদ্যতাকে বাড়ায়। এর ফলে জলের পুনঃশোষণ ঘটে। ADH-এর ক্ষরণ কম বা বেশি হলে রেচিত মূত্রের পরিমাণ যথাক্রমে বেশি অথবা কম হয়। হাইপোথ্যালামাস বা পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ADH-এর ক্ষরণের পরিমাণ কয়েকটি কারণ, যেমন—রক্তের সান্দ্রতা (রক্তে জলের পরিমাণের তারতম্য), অভিস্রবণ চাপ, চাপ গ্রাহক, যন্ত্রণা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

(d) **উদাহরণ (Examples)** : 1. গ্রীষ্মকালে দেহকে ঠান্ডা রাখার জন্য অত্যধিক ঘর্ম ক্ষরণ ঘটে। এর ফলে দেহে অর্থাৎ রক্তে জলের পরিমাণ কমে যায়। এছাড়া অত্যধিক রক্তপাত, আমাশয় ও উদরাময় ইত্যাদি অবস্থায় দেহ থেকে অধিক পরিমাণ জল বেরিয়ে যায় ফলে জলের পরিমাণ কমে গিয়ে রক্ত অধিক সান্দ্রতাসম্পন্ন হয়। এই সান্দ্র রক্ত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় হাইপোথ্যালামাসের কয়েকটি নিউক্লিয়াসে (সুপ্রাওপটি এবং প্যারাভেন্ট্রিক্যুলার নিউক্লিয়াসে) অবস্থিত অস্রাবণ গ্রাহককে (Osmoreceptors) উদ্দীপিত করে ADH-এর ক্ষরণ ঘটায়। ADH এরপর হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি স্নায়ু পথের মাধ্যমে পশ্চাৎ পিটুইটারিতে যায়। পশ্চাৎপিটুইটারি থেকে ADH রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে বৃক্কের মধ্যে যায় এবং বৃক্কনালিকার দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা উদ্দীপিত হয়ে জলের পুনঃশোষণ ঘটায় ফলে মূত্রের (জলের) পরিমাণ কমে যায়।

2. কোনো কারণে দেহে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে, যেমন অত্যধিক জল পান করলে, কিংবা ঘর্ম ক্ষরণ না হলে (যেমন শীতকালে) ইত্যাদি অবস্থায় রক্তের সান্দ্রতা কমে যায় যা হাইপোথ্যালামাসকে উদ্দীপিত করতে পারে না ফলে ADH-এর ক্ষরণ কমে যায়। ADH-এর অভাবে দূরসংবর্ত নালিকা ও সংগ্রাহক নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণ ঘটতে পারে না, ফলে প্রচুর পরিমাণ জল মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে রেচিত হয়।

## ❂ 8.5. মূত্র (Urine) ❂

### ▲ মূত্রের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক উপাদান ( Normal and abnormal Composition of Urine)

❖ (a) **মূত্রের সংজ্ঞা (Definition of Urine)** : **নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের সক্রিয়তার ফলে দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক অথবা অপ্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি স্বল্প অম্লধর্মী ও সামান্য হলুদ বা বর্ণহীন যে তরল গবিনী দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সাময়িকভাবে মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয় এবং পরে মূত্রনালি দিয়ে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে মূত্র বলে।**

➤ (b) **মূত্রের পরিমাণ ও বাহ্য বৈশিষ্ট্য (Amount and Physical character of Urine)** :

1. **পরিমাণ**—গড়ে 1500 মিলিলিটার (600–2500 মিলিলিটার)।
2. **আপেক্ষিক গুরুত্ব** — 1·002–1·035।
3. **পি এইচ** (pH)—4·0–8·0 (গড়ে pH 6·0 অর্থাৎ সামান্য অম্লধর্মী)।
4. **বর্ণ**—ঈষৎ হরিদ্রাভ কিন্তু তরল মূত্র বর্ণহীন হয়।
5. **গন্ধ**—অ্যামোনিয়া থাকার জন্য উগ্র গন্ধযুক্ত হয়।
6. **গাদ** (Sediments) — সদ্য নির্গত স্বাভাবিক মূত্র পরিষ্কার হয়।

### ▲ A. মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান (Normal constituents of urine) :

● **I. জৈব পদার্থ (Organic constituents)** : প্রতি 24 ঘণ্টায় নির্গত মূত্রে বিভিন্ন উপাদান এবং পরিমাণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

1. **ইউরিয়া** (Urea, 25–30 গ্রাম)—এর পরিমাণ প্রতি 24 ঘণ্টায় নিঃসারক মূত্রে অবস্থিত মোট কঠিন পদার্থের অর্ধেক। যকৃতে প্রোটিনের বিপাক ক্রিয়ার ফলে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়।
2. **অ্যামোনিয়া** (Ammonia, 0·7 গ্রাম)—সদ্য নির্গত মূত্রে অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া থাকে। উপবাস কিংবা মধুমেহ রোগ ইত্যাদিতে এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

3. **ইউরিক অ্যাসিড** (Uric Acid, 0·7 গ্রাম)—এটি পিউরিনের বিপাক ক্রিয়ার ফলে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।
4. **ক্রিয়েটিনিন্** (Creatinine, 1·2–1·7 গ্রাম)—দেহে ক্রিয়েটিনিন্ থেকে ক্রিয়েটিন (Creatine) উৎপন্ন হয়। মূত্রে ক্রিয়েটিন-এর পরিমাণ 60-150 মিলিগ্রাম।
5. **অক্সালিক অ্যাসিড** (Oxalic acid, 10–30 মিলিগ্রাম)।
6. **অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Amino acid, 150–200 মিলিগ্রাম)।
7. **অন্যান্য জৈব পদার্থ**—হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড (0·7 গ্রাম), অ্যালনটয়েন (30 মিলিগ্রাম), ইন্ডিক্যান (5·25 মিলিগ্রাম), ভিটামিন, হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি মূত্রে পাওয়া যায়।

● **II. অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) :**

1. **ক্লোরাইড** (Chloride, 15 গ্রাম)—এটি মূত্রের প্রধান অজৈব কঠিন পদার্থ। অধিকাংশ ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড হিসাবে নির্গত হয়। এছাড়া মুক্ত ক্লোরাইডও (6–9 গ্রাম) মূত্রে পাওয়া যায়।
2. **সালফেট** (Sulphate, 0·8–1·4 গ্রাম)—এটি সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।
3. **ফসফেট** (Phosphate, 0·8–1·3 গ্রাম)—মূত্রে ফসফেট সাধারণত সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট হিসাবেই থাকে।
4. **খনিজ পদার্থ** (Minerals)—প্রধানত সোডিয়াম (4·5 গ্রাম), পটাশিয়াম (2·5–3·0 গ্রাম) অল্প পরিমাণে ক্যালশিয়াম (0·1–0·3 গ্রাম) ও ম্যাগনেসিয়াম (0·1–0·2 গ্রাম) মূত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া আয়োডিন, আরসেনিক ইত্যাদিও সময় সময় মূত্রে পাওয়া যায়।

● **প্রতি 24 ঘণ্টায় মূত্রের স্বাভাবিক জৈব এবং অজৈব উপাদানের স্বাভাবিক পরিমাণসহ নামের তালিকা :**

| জৈব (Organic) | | | অজৈব (Inorganic) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. নাইট্রোজেন | 25–30 | গ্রাম | 1. ক্লোরাইড | 6–9 গ্রাম |
| 2. ইউরিয়া | 25–30 | গ্রাম | 2. সোডিয়াম ক্লোরাইড | 10–15 গ্রাম |
| 3. অ্যামোনিয়া | 0·7 | গ্রাম | 3. ফসফেট | 0·8–1·3 গ্রাম |
| 4. ক্রিয়েটিনিন্ | 1·4 | গ্রাম | 4. সালফেট | 0·8–1·4 গ্রাম |
| 5. ক্রিয়েটিন | 0·06 | গ্রাম | 5. পটাশিয়াম | 2·5–3·0 গ্রাম |
| 6. ইউরিক অ্যাসিড | 0·7 | গ্রাম | 6. সোডিয়াম | 4·0–5·0 গ্রাম |
| 7. অক্সালিক অ্যাসিড | 0·02 | গ্রাম | 7. ক্যালশিয়াম | 0·1–0·3 গ্রাম |
| 8. হিপপিউরিক অ্যাসিড | 0·7 | গ্রাম | 8. ম্যাগনেসিয়াম | 0·1–0·2 গ্রাম |
| 9. ভিটামিন | 0·7 | গ্রাম | 9. আয়োডিন | 50–250 মাইকোগ্রাম |
| 10. হরমোন, এনজাইম অ্যালনটয়েন অল্প পরিমাণে থাকে। | | | 10. সিসা ও আরসেনিক | 50 মাইকোগ্রাম |

## ▲ B. মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদান (Abnormal constituents of urine):

উপরোক্ত উপাদান ছাড়া বিভিন্ন অবস্থায় (রোগে) যেসব অস্বাভাবিক উপাদান মূত্রে নির্গত হয় তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

1. **গ্লুকোজ** (Glucose)—স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 24 ঘণ্টায় খুব সামান্য অর্থাৎ প্রায় 40 মিলিগ্রাম গ্লুকোজ মূত্রে নির্গত হয়। কোনো কারণে রক্তশর্করার পরিমাণ বেড়ে 180 mg বা তার বেশি (হাইপারগ্লাইসিমিয়া) হয় তখন রক্ত অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্র দিয়ে নির্গত হয়। এই অবস্থায় মূত্রকে **গ্লাইকোসুরিয়া** (Glycosuria) বলে। এটি মধুমেহ (Diabetes *mellitus*)-এ আক্রান্ত লোকের দেখা যায়।
2. **প্রোটিন** (Protein)—সাধারণত প্রতি 24 ঘণ্টায় 20–80 মিলিগ্রাম প্রোটিন মূত্র দিয়ে নির্গত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় 20 গ্রাম প্রোটিন মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়। এই অবস্থাকে **প্রোটিনিউরিয়া** (Proteinuria) বলে। স্বাভাবিক প্লাজমায় সব থেকে ছোটো প্রোটিন অণু হল অ্যালবুমিন। অস্বাভাবিক মূত্রে প্রধানত এই অ্যালবুমিন বেরিয়ে

যায়। অ্যালবুমিনযুক্ত এই প্রকার মূত্রকে **অ্যালবুমুনেরিয়া** (Albumuneria) বলে। গ্লোমেরুলাস রক্তজালকের পরিস্রাবণ ঝিল্লির ছিদ্রের আয়তন বেড়ে গেলে মূত্রের মাধ্যমে অ্যালবুমিন (প্রোটিন) মূত্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটি **নেফ্রিটাইস** (Nephritis) রোগে আক্রান্ত লোকের দেখা যায়।

3. **কিটোন বডি** (Ketone bodies)—সাধারণ অবস্থায় প্রতিদিন 13–15 মিলিগ্রাম কিটোন বডি মূত্রে নির্গত হয়। অনশনে কিংবা কার্বোহাইড্রেট বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হলে বা **অধিক পরিমাণে ফ্যাট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ** করলে বেশি পরিমাণে কিটোন বডি (অ্যাসিটোন) মূত্র দিয়ে নির্গত হয়। এই অবস্থাকে **কিটোনিউরিয়া** (Ketonuria) বলে।

4. **রক্ত** (Blood)—স্বাভাবিক মূত্রে রক্ত নির্গত হয় না। কিন্তু তীব্র নেফ্রাইটিস, কঠিন সংক্রামক রোগ, মূত্র নির্গমনপথের অথবা বৃক্কের ক্ষত বা আঘাত প্রভৃতি অবস্থায় মূত্রের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়।

5. **রঞ্জক পদার্থ** (Pigments)—ইউরোক্রোমোজেন, বিলিরুবিন, পোরফাইরিন, মেলানিন ইত্যাদি রঞ্জক পদার্থ মূত্রে নির্গত হয়। জন্ডিস (Jaundice) রোগে মূত্রে যথেষ্ট পরিমাণ বিলিরুবিন নামে পিত্তরঞ্জক পদার্থ থাকে।

**● রক্তরস, গ্লোমেরুলার পরিস্রাবক তরল ও মূত্রের বিভিন্ন বস্তুর শতকরা হিসাব ●**

| বিভিন্ন বস্তু | প্লাজমা | গ্লোমেরুলার পরিস্রুত তরল | মূত্র |
|---|---|---|---|
| গ্লুকোজ | 0·10 | 0·10 | – |
| ইউরিয়া | 0·03 | 0·03 | 2·0 |
| ইউরিক অ্যাসিড | 0·004 | 0·004 | 0·05 |
| ক্রিয়াটিনিন | 0·001 | 0·001 | 0·075 |
| প্রোটিন | 8 | – | – |
| অ্যামাইনো অ্যাসিড | 0·05 | 0·05 | – |
| অজৈব ধনাত্মক আয়ন | 0·9 | 0·9 | 0·9–3·6 |
| $Na^+$ | 0·32 | 0·32 | 0·35 |
| $K^+$ | 0·02 | 0·02 | 0·15 |
| $Mg^{2+}$ | 0·0025 | 0·0025 | 0·01 |
| $Cl^-$ | 0·37 | 0·37 | 0·60 |
| $PO_4^{3+}$ | 0·009 | 0·009 | 0·27 |
| $SO_4^{2-}$ | 0·002 | 0·002 | 0·18 |
| $NH_4^+$ | 0·0001 | 0·0001 | 0·04 |

## ✪ মূত্র রেচন সম্বন্ধীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Some facts about Excretion of urine) ঃ

### ● I. বৃক্কীয় নালিকার উপর প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি হরমোনের নাম ও কাজ ঃ

1. **ADH**—হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্য দিয়ে নির্গত অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক হরমোন (ADH) নেফ্রনের দূরবর্তী নালিকার উপর ক্রিয়া করে জলের পুনঃশোষণ ঘটায়।

2. **অ্যালডোস্টেরন**—অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন নামে স্টেরয়েড হরমোন (মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন) বৃক্ক নালিকা থেকে জল, NaCl, বাইকার্বোনেট ইত্যাদির পুনঃশোষণকে বাড়ায় এবং পটাশিয়াম ও ফসফেটের পুনঃশোষণকে কমায়।

3. **প্যারাথোরমোন** — প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত প্যারাথোরমোন বৃক্ক নালিকা থেকে ক্যালশিয়ামের পুনঃশোষণ এবং ফসফেটের রেচনকে বাড়ায়।

### ● II. মূত্র উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি শর্ত (Some factors effecting Urine formation)ঃ

1. **জলগ্রহণ** (Water intake)—বেশি করে জল পান করলে মূত্রের উৎপাদন বেড়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 50 ml মূত্রের উৎপাদন ঘটে, কিন্তু অধিক জলপানে 15-20 মিনিট পরই লঘুমূত্রের উৎপাদন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় মূত্রের পরিমাণ 130 ml হয়।

2. **স্যালাইন ইন্‌জেকশন** (Saline injection)—শিরার মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণ সেলাইন (লবণ দ্রবণ) ইনজেকশন করলে কয়েক মিনিট পরই লঘুমূত্রের উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় মূত্রের উৎপাদন সর্বাধিক হয়। এরপর ধীরে ধীরে কমে যায়।

3. **বেশি বা কম লবণ গ্রহণ** (Intake of excess or less salts)—24 গ্রাম NaCl-এর গ্রহণে ঘণ্টায় 120 ml মূত্রের উৎপাদন ঘটে। মূত্রে Nacl-এর পরিমাণ 3–12 ঘণ্টায় বেড়ে সর্বাধিক 3·4% হয়। NaCl কম খেলে, প্লাজমায় তথা মূত্রে NaCl-এর পরিমাণ কমে যায়।

4. **জলাভাব** (Water deprivation)—বয়স্ক মানুষের জলাভাবে প্রথমে বিশেষ পরিবর্তন দেখা না গেলেও গ্লোমেরুলেসায় পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া প্রায় 20 শতাংশ কমে যায় ফলে মূত্রের পরিমাণও ঘন্টায় 30-40 মিলিলিটার কমে যায়।

5. **ব্যায়াম** (Excercise)—ব্যায়াম করার সময় পেশির সঞ্চালন ঘটে, ফলে ঘর্মক্ষরণ ঘটে। রক্তে জলাভাব দেখা যায়। এই কারণে মূত্রের রেচনের পরিমাণ কমে যায়।

## ● III. মূত্র নিষ্কাশন প্রণালী (Urination or Micturition) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মূত্রথলি থেকে সঞ্চিত মূত্র দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে মূত্র ত্যাগ প্রণালী (Micturition) বা মূত্রের নিষ্কাশন (Urination) বলে।**

(b) **মূত্র নিষ্কাশন প্রক্রিয়া (Process of Micturition) ঃ** বৃক্কে প্রতিমিনিটে প্রায় 1 ml মূত্র তৈরি হয়। এই মূত্র বৃক্ক থেকে গবিনীর মধ্য দিয়ে এসে মূত্রাশয়ে (মূত্রথলিতে) সাময়িকভাব জমা হয়। ক্রমশ জমা হতে হতে যখন মূত্রের পরিমাণ 300–400 ml হয় তখন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগ্রত হয় যা ঐচ্ছিকভাবে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে কিন্তু মূত্রের পরিমাণ যখন 700–800 ml হয় তখন মূত্রাশয়ের পেশি তীব্রভাবে সংকুচিত হয় ফলে মূত্রাশয়ের জমানো মূত্র মূত্রনালির মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে বের হয়। মূত্র ত্যাগ প্রণালী ছয়টি প্রতিবর্ত ক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ছয়টি প্রতিবর্তকে **ব্যারিংটন প্রতিবর্ত** ( Barington reflex ) বলে।

## ❂ মূত্রের নাইট্রোজেন এবং অনাইট্রোজেন জাতীয় জৈব পদার্থ ❂
## (Nitrogen and Non-nitrogenous organic substances)

● 1. **নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব বস্তু (Nitrogenous organic substances)**— ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড। এগুলিকে ননপ্রোটিন নাইট্রোজেন জাতীয় বস্তু (Non Protein Nitrogenous substances–NPN) বলা হয় কারণ এই প্রকার জৈব পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু এগুলি প্রোটিন নয়।

**কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ নাইট্রোজেন জৈব পদার্থের উদাহরণ (Examples of some Nitrogenous organic substances)ঃ**

(i) **ইউরিয়া**—খাদ্যবস্তুর বিপাকক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। প্রতিদিন NPN ঘন্টায় প্রায় 25-35 গ্রাম মূত্রে নির্গত হয়। 25-30 গ্রাম রক্তে অবস্থিত ইউরিয়া গ্লোমেরিউলাসে পরিস্রুত হয়ে প্রায় অর্ধাংশ রেচননালিকার বিভিন্ন অংশ থেকে পুনঃশোষিত হয়। বাকি অংশ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। প্রোটিন বেশি খেলে অথবা প্রোটিনের অপচিতি বেশি হলে, ডায়াবেটিস রোগ হলে (বেশি প্রোটিন ভাঙে) ফলে রক্তে ও মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। মূত্রে কম পরিমাণে ইউরিয়া রেচিত হলে রক্তে এর পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় **ইউরিমিয়া** ঘটে। এর ফলে রোগীর দেহে বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়, এমন কি মৃত্যু ঘটতে পারে।

(ii) **ইউরিক অ্যাসিড**—এই জৈব পদার্থ পিউরিনের বিপাক ক্রিয়ার সময় যকৃতে উৎপন্ন হয়। এটি গ্লোমেরুলাসে পরিস্রুত হয়, নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকায় পুনঃশোষিত হয় এবং এখান থেকে ক্ষরণও হয়। মূত্রে যে ইউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় তা প্রধানত ক্ষরিত ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিড কম পরিমাণে নির্গত হলে রক্তে এর পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় অস্থি সন্ধিতে ও অন্যান্য স্থানে ইউরিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়ে **বাত রোগ বা গাউট** (Gout) উৎপন্ন করতে পারে।

(iii) **অ্যামোনিয়া**—বৃক্ক নালিকা প্রধানত দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার কোশে ডিঅ্যামাইনেজ উৎসেচক থাকে যা গ্লুটামিন (Glutamine) নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে **অ্যামোনিয়া** উৎপন্ন করে। এই অ্যামোনিয়া বৃক্ক নালিকা দিয়ে বেরিয়ে যায়। অম্লক্ষার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এই অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়।

(iv) **হিপপিউরিক অ্যাসিড**—বেনজয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid) যুক্ত খাদ্য খেলে যকৃতে গ্লাইসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **হিপপিউরিক অ্যাসিড** গঠন করে। এটি নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকার কোশ থেকে ক্ষরিত হয়।

(v) **ক্রিয়েটিন ও ক্রিয়েটিনিন**—পেশিতে অবস্থিত উচ্চ জৈবশক্তি সম্পন্ন যৌগ ক্রিয়েটিন ফসফেট (Creatine phosphate)-এর বিপাকের ফলে **ক্রিয়েটিন** ও **ক্রিয়েটিনিন** (Creatine and Creatinine) উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে যে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রুত হয়ে মূত্রে নির্গত হয়। কারণ এটি পুনঃশোষিত বা ক্ষরিত হয় না।

● 2. **অনাইট্রোজেন জাতীয় বস্তু (Non-Nitrogenous substances)**—সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক্ অ্যাসিড, সালফারের যৌগ, সামান্য পরিমাণ গ্লুকোজ ও কিটোন বডিস্।

**IV. কয়েকটি রোগে বিভিন্ন অস্বাভাবিক মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদানের নাম (Abnormal Constituents of Abnormal Urine in few deseases ) ঃ**

| অস্বাভাবিক মূত্র | অস্বাভাবিক উপাদান | রোগের নাম |
|---|---|---|
| 1. গ্লাইকোসুরিয়া | 1. মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি দেখা যায়। | ডায়াবেটিস মেলিটাস |
| 2. প্রোটিনিউরিয়া | 2. মূত্রে প্রোটিনের উপস্থিতি দেখা যায়। | নেফ্রাইটিস |
| 3. কিটোনিউরিয়া | 3. মূত্রে কিটোন বডির উপস্থিতি দেখা যায়। | কিটোসিস |
| 4. হিমাটুরিয়া | 4. মূত্রে রক্তের উপস্থিতি দেখা যায়। | মূত্র-সংক্রান্ত আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের সংক্রমণ। |

## 8.6. সহায়ক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory organs)

### 1. ত্বকের গঠন এবং এর রেচন কাজ (Structure of skin and its excretory function)

(a) **ত্বকের গঠন ( Structure of Skin ) ঃ** শরীরের সমগ্র উপরিভাগ চর্ম বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এই ত্বক দেহের বিভিন্ন কাজ করে। এর অন্যতম প্রধান কাজ হল রেচন-কাজ। ত্বক ঘামের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থগুলিকে দেহ থেকে বের করে দেয়। ত্বক বহিস্ত্বক এবং অন্তস্ত্বক নিয়ে গঠিত। 1. **বহিস্ত্বক বা এপিডার্মিস** (Epidermis)—এটি হল ত্বকের উপরিভাগের স্তর যা প্রধানত আবরণী কলা নিয়ে গঠিত। 2. **অন্তস্ত্বক বা ডার্মিস** (Dermis)—এটি হল বহিস্ত্বকের নীচে অন্তস্ত্বক বা ডার্মিস। এটি প্রধানত যোগ কলা নিয়ে গঠিত। এছাড়া মেলানোফোর, স্থিতিস্থাপক তন্তু, প্যাপিলা, রক্তজালক ও লসিকাবাহ, স্নায়ুপ্রান্ত, কেশথলি বা হেয়ার ফলিকল (Hair follicle), **চর্বিগ্রন্থি বা সেবেসিয়াস গ্ল্যান্ড** (Sebaceous gland), **স্বেদগ্রন্থি** বা **ঘর্মগ্রন্থি** (Sweat gland), মসৃণ পেশিতন্তু ইত্যাদির সমাবেশ লক্ষ করা যায়।
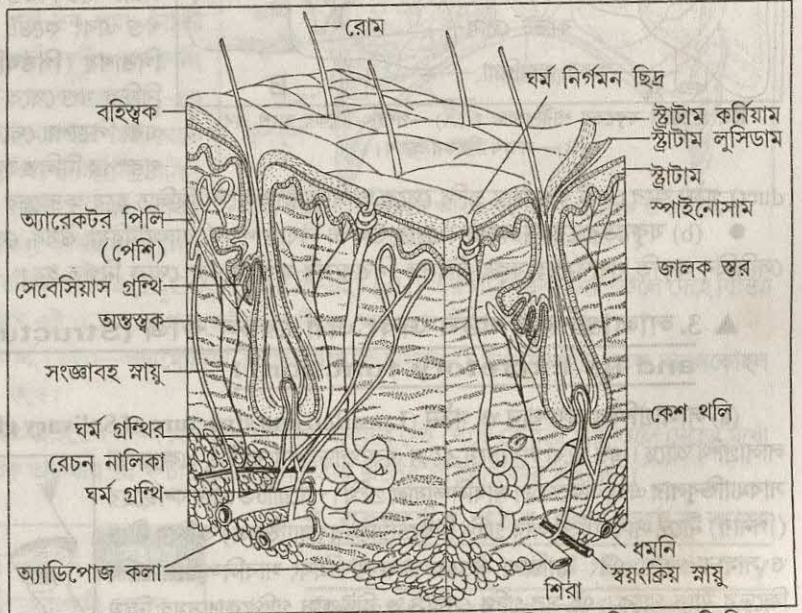
চিত্র 8.19. ঃ ত্বকের অন্তস্ত্বকে অবস্থিত ঘর্ম ক্ষরণে ও তাপ নিয়ন্ত্রণে জড়িত কয়েকটি বিশেষ অংশের অবস্থান এবং সরল চিত্ররূপ

(b) **ত্বকের রেচন কাজ (Excretory function of Skin) ঃ** ত্বকের রেচন প্রধানত **ঘর্মগ্রন্থি** এবং কিছুটা **সেবেসিয়াস** গ্রন্থির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এই দু'প্রকার গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে **ঘর্ম** (Sweat) এবং **সিবাম** (Sebum) নামে তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়। ঘর্মের মাধ্যমে জল, NaCl, ইউরিয়া এবং অন্যান্য বিপাকীয় পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। সিবামের মাধ্যমে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এস্টার, গ্লিসারল ইত্যাদি দেহ থেকে নির্গত (রেচিত) হয়।

দেহে অম্লের (Acid) পরিমাণ বাড়লে ঘর্মের মাধ্যমে অধিক অম্ল নির্গত হয়ে অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়।

**● সেবেসিয়াস গ্রন্থি এবং সেবাম (Sebaceous gland and sebum) ●**

❂ 1. সেবেসিয়াস গ্রন্থি : ❖ (a) সংজ্ঞা : ছোটো ছোটো নাসপাতির মতো যে গ্রন্থি কেশথলির (Hair follicle) সঙ্গে লেগে থাকে তাকে সেবেসিয়াস গ্রন্থি বলে।
এই গ্রন্থি থেকে খুব ছোটো ও সরু সরু নালি কেশথলিতে উন্মুক্ত হয়।
(b) **সেবেসিয়াস গ্রন্থির কাজ** : সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে **সেবাম** ক্ষরিত হয়।

❂ 2. সেবাম (Sebum) : ❖ (a) **সংজ্ঞা—দেহত্বকের অন্তস্ত্বকের সেবেসিয়াম গ্রন্থি বা চর্বিগ্রন্থি থেকে যে তৈলাক্ত তরল ক্ষরিত হয় তাকে সেবাম** (Sebum) **বলে।**
(b) **সেবামের কাজ**—(i) সেবাম ত্বকের তৈলাক্ত ভাব বজায় রাখে, এর ফলে ত্বকটি ভেজা, নরম এবং মসৃণ থাকে। এই সব কারণে ত্বককে শুষ্কতা, ছড়ে যাওয়া ও ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। (ii) দেহে জীবাণুর প্রবেশে বাধা দেয়।

## ▲ 2. যকৃতের গঠন এবং এর রেচন কাজ (Structure of Liver and its Excretory function) :

(a) **যকৃতের গঠন** (Structure of Liver)—যকৃৎ দেহের সব থেকে বড়ো গ্রন্থি যা উদরগহ্বরের ঊর্ধ্বাংশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে থাকে। এটি লালচে-বাদামি রঙের হয়। যকৃতের ঊর্ধ্বতল প্রধানত দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত হয়। বড়ো খণ্ডটি উদরগহ্বরের ডান পাশে ও ছোটো খণ্ডটি বাম পাশে থাকে। যকৃতের নিম্নতল লম্বা এবং প্রস্থ খাঁজের মাধ্যমে চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়, যেমন ডান খণ্ড, বাম খণ্ড, কোয়াড্রেট খণ্ড এবং কডেট খণ্ড। ডান খণ্ডের নীচে বেলুনাকৃতি **পিত্তাশয় (পিত্তথলি**—Gall bladder) থাকে। যকৃতের বিভিন্ন খণ্ড থেকে নির্গত **যকৃৎ নালি** (Hepatic ducts) এবং পিত্তাশয় থেকে নির্গত **পিত্তাশয় নালি** (Cystic duct) পরস্পর মিলিত হয়ে **সাধারণ পিত্তনালি** (Common bile duct) গঠন করে। এটি অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে আসা নালির সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রহণীতে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র 8.20. : যকৃতের শারীরস্থান : (A)—পশ্চাৎ দিকের অংশ এবং (B)—সম্মুখ দিকের অংশ।

● (b) **যকৃতের রেচন কাজ**—দেহে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ঔষধ, কোনো কোনো ভারী ধাতু, কোলেস্টেরল, লেসিথিন প্রভৃতি পদার্থসমূহ যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরসের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়।

## ▲ 3. লালাগ্রন্থির গঠন এবং এর রেচন কাজ (Structure of Salivary Glands and its Excretory function) :

(a) **লালাগ্রন্থির অবস্থান ও গঠন** (**Location and structure of Salivary gland**)—মানুষের মুখগহ্বরে তিনজোড়া লালাগ্রন্থি আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো একজোড়া **প্যারোটিড**, একজোড়া **সাবম্যান্ডিবুলার** এবং একজোড়া **সাবলিঙ্গুয়াল** গ্রন্থি। প্যারোটিড গ্রন্থি কর্ণছত্রের (পিনার) নীচে, সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি নিম্নচোয়ালের (ম্যান্ডিবুল) অস্থির নীচে ও সামান্য পাশে এবং ম্যাক্সিলা দাঁতের তলদেশে এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি জিভের নীচে থাকে। এই সব গ্রন্থি সেরাস ও মিউকাস গ্রন্থিকোশসমূহ নিয়ে গঠিত যার থেকে নালিসমূহ উৎপন্ন হয়ে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লালারস** এই সব নালির মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে আসে।

● (b) **লালাগ্রন্থির রেচন কাজ**—লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ রেচিত হয়, যেমন—(i) ইউরিয়া, (ii) থায়োসাইনেট, (iii) কিছু কিছু ওষুধ (ড্রাগ), যেমন—আয়োডাইড, (iv) অ্যালকালোয়েড, যেমন—মরফিন, (v) অ্যান্টিবডি যেমন—পেনিসিলিন,

চিত্র 8.21. : লালা গ্রন্থির অবস্থান।

স্ট্রেপটোমায়োসিন, (vi) কোনো কোনো ভারী ধাতু, যেমন—Hg, Pb, Bi, As ইত্যাদি। এছাড়া লালার মাধ্যমে ক্ষতিকর অণুজীব যেমন—হাইড্রোফোবিয়ার (জলাতঙ্কের) ভাইরাস, পলিওমায়েলিটিস ভাইরাস, মাম্‌স ভাইরাস ইত্যাদি।

## ▲ 4. ফুসফুসের গঠন ও এর রেচন কাজ (Structure and its Excretory function of Lungs) :

1. **ফুসফুসের গঠন (Structure of Lungs)**—এই খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ফুসফুসের গঠন ও বিভিন্ন কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে— এখানে ফুসফুসের রেচন কাজগুলির উল্লেখ করা হল।

2. **ফুসফুসের রেচন কাজ (Excretory functions of Lungs) :** (i) বিশ্রামরত অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক সুস্থ লোকের দেহ থেকে ঘণ্টায় প্রায় 18 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

চিত্র 8.22. : রক্তজালক আবৃত বায়ুথলি (বাঁ দিকে উপরে) এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

(i) প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে কলাকোশ রক্ত থেকে অক্সিজেন ($O_2$) গ্রহণ করে এবং কোশের বিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বিপাক প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) কলাকোশ থেকে রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং সেখান থেকে নিঃশ্বাস ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে বেরিয়ে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইডকে দেহের বর্জ্য পদার্থ হিসেবে গণ্য করা হলেও রক্তে সব সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ $CO_2$ থাকে যা দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি প্রধানত শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। তবে রক্তে $CO_2$-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে সঠিক পরিমাণে নির্গত না হলে রক্তে অম্লাধিক্য বা অ্যাসিডোসিস (Acidosis) দেখা দিতে পারে। কারণ বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড ($H_2O+CO_2=H_2CO_3$) তৈরি করে। কার্বনিক অ্যাসিড ($H_2CO_3$) দেহের পি-এইচ (pH)-এর পরিবর্তন ঘটায়। ফলে দেহে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ফুসফুস এই ($CO_2$) অপ্রয়োজনীয় বস্তুটিকে বের করে দিতে সাহায্য করে।

(ii) ফুসফুস দেহ থেকে উদ্‌বায়ী পদার্থ, যেমন—**অ্যামোনিয়া, কিটোন বডি** (অ্যাসিটোন), **অপ্রয়োজনীয় তেল, অ্যালকোহল** প্রভৃতিকে নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে নির্গত করে।

(iii) নিঃশ্বাস কাজের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে কিছু **জল** বাষ্পীয় আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে দেহের মধ্যে **জলীয় অংশের সমতা রক্ষা** হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় 24 ঘণ্টায় এভাবে পরিত্যক্ত জলের পরিমাণ প্রায় 400 ml।

## ▲ 5. বৃহদন্ত্রের গঠন এবং রেচন কাজ (Structure and Excretory function of Large intestine) :

পৌষ্টিকনালির বৃহদন্ত্র রেচন কাজে কিছুটা অংশগ্রহণ করে, যেমন— (i) অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু যা পরিপাক হয় না, (ii) কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং বর্জ্য পদার্থ এবং (iii) কিছু কিছু ভারী ধাতু, যথা—বিসমাথ (Bi), পারদ (Hg), আর্সেনিক (As) ইত্যাদি পৌষ্টিকনালির বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে মল হিসেবে নিষ্ক্রান্ত হয়।

চিত্র 8.23. : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে **মল রেচন পদার্থ নয়, কারণ মল কোশের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় না।** পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে অপাচিত খাদ্য মলে রূপান্তরিত হয়।

- **ক্ষরণ পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থের পার্থক্য (Difference between Secretory and Excretory Products) :**

| ক্ষরণ পদার্থ | বর্জ্য পদার্থ |
|---|---|
| 1. কোশের বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যা কোশের পুষ্টিতে ব্যবহৃত না হলেও অন্যভাবে কাজে লাগে তাকে ক্ষরণ পদার্থ বলে। | 1. কোশের বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহকে বর্জ্য পদার্থ বলে যা প্রাণীদের কোনো কাজে লাগে না। উদ্ভিদে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ প্রাণীর কাজে লাগে। |
| 2. উদাহরণ—হরমোন, উৎসেচক। | 2. উদাহরণ—ইউরিয়া, $CO_2$। |

**● সেরুমেন (Cerumen) ●**

❖ **সংজ্ঞা : বহিঃকর্ণের কর্ণকুহরের চর্মে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত মোমজাতীয় পদার্থকে সেরুমেন বা কানের খোল বলে।**

## ◎ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ◎

**1. মানুষের দেহে প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা কত ?**

● প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ।

**2. বৃক্কের কোন্ অংশে সবচেয়ে বেশি গ্লোমেরুলাস থাকে এবং কোন্ অংশে গ্লোমেরুলাস থাকে না ?**

● (i) বৃক্কের কর্টেক্সে গ্লোমেরুলাস থাকে। সুপারফিসিয়াল অংশ অর্থাৎ কর্টেক্সের উপরিভাগে সব থেকে বেশি গ্লোমেরুলাস থাকে। (ii) বৃক্কের মেডুলা অংশে গ্লোমেরুলাস থাকে না।

চিত্র 8.24. : পোডোসাইট কোশের গঠন।

**3. (ক) পোডোসাইট কী ? (খ) দেহে এর গুরুত্ব উল্লেখ করো।**

● (ক) বাওম্যানস ক্যাপসুলের গ্লোমেরুলাসের জালকগুচ্ছ দিকের প্রাচীরের গাত্র সংলগ্ন কিছুটা অ্যামিবার মতো দেখতে যে কোশগুলি থাকে তাদের পোডোসাইট (Podocyte) কোশ বলে।

(খ) **গুরুত্ব**—এই কোশ থেকে নির্গত বাহুর মতো অংশকে পেডিসেল (Pedicels) বলে। এগুলি আলাদা আলাদাভাবে ভিত্তি ঝিল্লির উপর বিন্যস্ত থাকে বলে কোশের মূল দেহটির সঙ্গে ভিত্তি ঝিল্লির কিছু ব্যবধান থাকে। এর ফলে যে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হয় তাকে কোশান্তর ছিদ্র বা পরিস্রাবণ ছিদ্র (Filtering pores) বলে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

**4. পরিস্রাবণ ঝিল্লি গঠন এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।**

● যে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া ঘটে তাকে পরিস্রাবণ ঝিল্লি বলে। বৃক্কের ম্যালপিজিয়ান করপাসলে এই প্রকার ঝিল্লির মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণ (পরাপরিস্রাবণ) প্রক্রিয়া ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় গ্লোমেরুলাসের রক্তের প্লাজমা পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় পরিস্রুত হয়। এটি প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—(i) রক্তজালকের অত্যন্ত পাতলা অন্তরাবরণী স্তর (Endothelium), (ii) বাওম্যানস ক্যাপসুলের চ্যাপটা ও পাতলা ভিসেরাল আবরণী স্তর এবং (iii) এই দুটির মাঝে থাকে ভিত্তিপর্দা।

**5. ডাক্ট অফ বেলিনী বা বেলিনীর নালি কাকে বলে ?**

● বিভিন্ন নেফ্রন থেকে আসা কতকগুলি সংগ্রাহক নালি পরস্পর মিলে যে নালি গঠন করে তাদের বেলিনীর নালি (Duct of Bellini) বলে। এই নালি বৃক্কের বৃক্কীয় পিরামিডের আগায় অবস্থিত ছিদ্রে উন্মুক্ত হয়।

**6. বাধ্যতামূলক পুনঃশোষণ বা অবলিগ্যাটোরি পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া এবং ফ্যাকালটেটিভ পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?**

● (ক) বাওম্যানস ক্যাপসুল থেকে আসা পরিস্রুত তরলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জল বৃক্কের পরাসংবর্ত নালিকার প্রথম অর্ধাংশ থেকে শোষিত হয়। একে বাধ্যতামূলক পুনঃশোষণ (Obligatory reabsorption) বলে।
(খ) দূরসংবর্ত নালিকা থেকে জল পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে নির্গত অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)-এর প্রভাবে পুনঃশোষিত হয়। একে ফ্যাকালটেটিভ পুনঃশোষণ (Facultative reabsorption) বলে।

**7. ম্যাকুলা ডেনসা কী ?**

● জ্যাক্সটাগ্লোমেরুলাসের অ্যাপারাটাস নামে বৃক্কের নেফ্রনের একটি অংশে আছে। এই অংশটি দূরসংবর্ত নালি এবং গ্লোমেরুলাসের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ধমনিকা নিয়ে গঠিত। দূরসংবর্ত নালির অন্তঃস্থ গাত্রে একরকম পরিবর্তিত স্তম্ভাকার কোশ থাকে তাকে ম্যাকুলা ডেনসা (Macula densa) বলে।

**8. ল্যাসিস কোশ কী ? কোথায় থাকে ?**

● ল্যাসিস কোশ এক ধরনের পরিবর্তিত আবরণী কোশগুচ্ছ। বৃক্কের নেফ্রনে অবস্থিত জ্যাক্সটাগ্লোমেরুলাস অ্যাপারাটাসের ত্রিভুজাকৃতি ফাঁকা স্থানে থাকে। ল্যাসিস কোশ (Lacis cell) পলকিসন কোশ নামে পরিচিত।

**9. রেনিন কী ? এর কাজ কী ?**

● রেনিন (Renin) একপ্রকার হরমোন যা বৃক্কের অন্তর্মুখী ধমনিকার প্রাচীরের জ্যাক্সটাগ্লোমেরুলাস কোশ থেকে ক্ষরিত হয়। **কাজ**—রেনিন প্লাজমা প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে অ্যানজিওটেনসিন-I নামে নিষ্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন করে। প্লাজমা উৎসেচক এই পদার্থের উপর ক্রিয়া করে সক্রিয় অ্যানজিওটেনসিন-II উৎপন্ন করে। এটি রক্তবাহক সংকুচিত করে রক্তের চাপকে বাড়ায়।

**10. একজন স্বাভাবিক লোকের প্রতিদিনের জল-অর্জন এবং জল-বর্জন প্রায় 2600 $cm^3$ । একটি সরল চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করো যার সাহায্যে জল-অর্জন ও জল-বর্জন ক্রিয়াদুটি ঘটে।**

● চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল—

**11. আমাদের শরীরে উভয় বৃক্কের ভেতর দিয়ে প্রতি মিনিটে কত পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়?**

● দুটি বৃক্কের মধ্য দিয়ে প্রতি মিনিটে 1200–1300 ml-রক্ত (770 ml-প্লাজমা) প্রবাহিত হয়।

**12. একজন সুস্থ ব্যক্তির দৈনিক মূত্রের গড় পরিমাণ উল্লেখ করো।**

● প্রতি 24 ঘণ্টায় গড়ে 1·5 লিটার (1500 ml)।

**13. মিশ্র খাদ্য গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্কলোকের মূত্রের pH কত?**

● pH—গড়ে 6·0
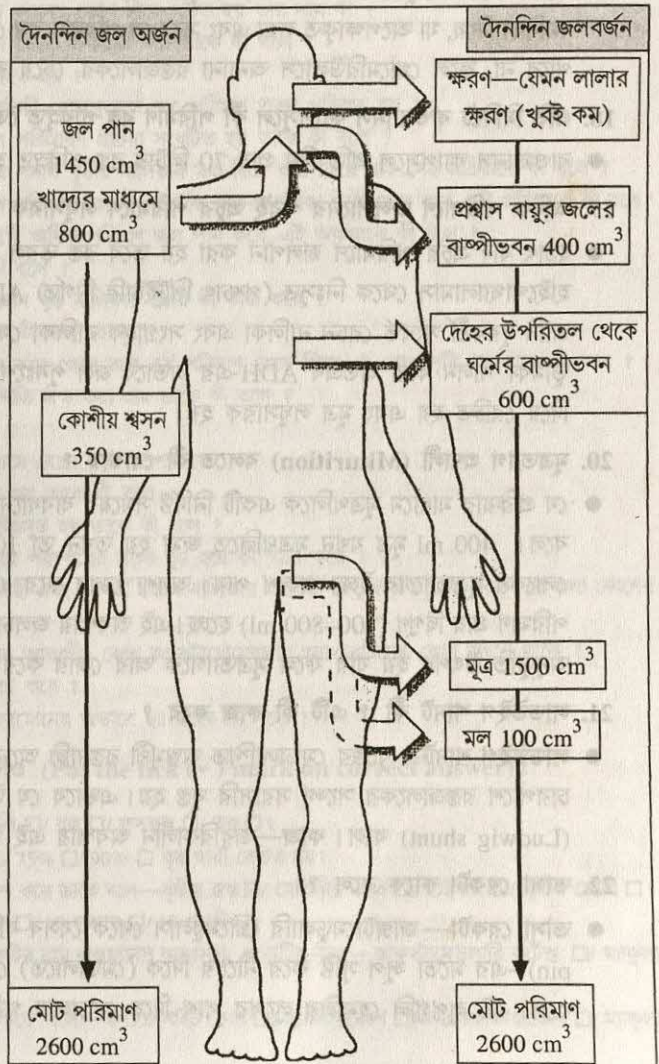
**14. প্রস্রাব অম্লধর্মী কেন ?**

● বৃক্কীয় নালিকা থেকে বাইকার্বোনেটের পুনঃ-শোষণ হয়। এছাড়া মূত্রে বিভিন্ন রকম অম্লধর্মী পদার্থ, যেমন হিপপিউরিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট থাকে বলে প্রস্রাব বা মূত্র অম্লধর্মী হয়।

**15. স্বাভাবিক মূত্রের বর্ণ হালকা হলুদ হয় কেন ?**

● মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির জন্য মূত্র ফ্যাকাশে হলুদ রঙের হয়। এছাড়া সামান্য পরিমাণে ইউরোবিলিন ও হিমাটোপরফাইরিন-ও থাকে।

**16. স্বাভাবিক মূত্রে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ কোন্‌গুলি ?**

● ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ও ক্রিয়েটিনিন। এছাড়া সামান্য পরিমাণে ক্রিয়েটিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

**17. গ্লোমেরিউলাসের রক্তজালকের রক্তচাপ অন্যান্য স্থানের রক্তজালকের রক্তচাপ অপেক্ষা বেশি কেন ?**

● গ্লোমেরুলাস বাওম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত একপ্রকারের রক্তজালকের গুচ্ছ বিশেষ। এই রক্তজালকে রক্ত প্রবেশ করে অন্তর্মুখী ধমনিকা দিয়ে, যা ক্ষুদ্র এবং প্রশস্ত। অপরপক্ষে এই রক্তজালক থেকে রক্ত নির্গত হয় বহির্মুখী ধমনিকা দিয়ে, যা অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং সরু। যে পরিমাণ রক্ত যে বেগে রক্তজালকে প্রবেশ করে সেই বেগে বেরোতে পারে না, ফলে গ্লোমেরিউলাসে অন্যান্য রক্তজালকের চেয়ে রক্তচাপ বেশি হয়।

**18. প্রতি মিনিটে বাওম্যানস ক্যাপসুলে কী পরিমাণ রক্ত পরিস্রুত তৈরি হয় এবং তা থেকে কী পরিমাণ মূত্র উৎপন্ন হয়?**

● বাওম্যানস ক্যাপসুলে প্রতি দিন প্রায় 70 লিটার রক্ত পরিস্রুত হয় এবং তা থেকে প্রায় 1·5 লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়।

**19. অধিক পরিমাণে জলপানের পরই প্রচুর পরিমাণে লঘুসারক মূত্র রেচিত হয়—কেন ? ব্যাখ্যা করো।**

● হঠাৎ যদি প্রচুর পরিমাণে জলপান করা হয় তবে রক্ত তরল হয় ও রক্তের অভিস্রাবণ চাপ কমে যায়। এর ফলে হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত (পশ্চাৎ পিটুইটারি নির্গত) ADH-এর ক্ষরণ ব্যাহত হয় কিংবা কমে যায়। আমরা জানি দূরবর্তী সংবর্ত রেচন নালিকা এবং সংগ্রাহক নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণে ADH হরমোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে অতএব ADH-এর অভাবে জল পুনঃশোষিত হতে পারে না। ফলে প্রচুর পরিমাণে জল মূত্র দিয়ে রেচিত হয় এবং মূত্র লঘুসারক হয়।

**20. মূত্রত্যাগ প্রণালী (Miturition) বলতে কী বোঝায় ?**

● যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূত্রথলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণভাবে মূত্রশূন্য করা হয় তাকে মূত্রত্যাগ প্রণালী বলে। 400 ml মূত্র যখন মূত্রথলিতে জমা হয় তখন তা 10-15 cm জলচাপের সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় বয়স্ক লোকের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অবশ্য জোর করে এই ইচ্ছাকে থামিয়ে রাখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ (700–800 ml) হচ্ছে। এই অবস্থায় জলচাপ প্রায় 100 cm-এ বেড়ে যায়। এই সময় যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি উৎপন্ন হয় যার ফলে মূত্রত্যাগকে আর জোর করে বধ রাখা যায় না।

**21. লাডউইগ শানট কী ? এটি কী কাজ করে ?**

● **লাডউইগ শানট**— বৃক্কের মেডালাস্থিত অন্তর্মুখী রক্তনালি অনেক সময় গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ না করে রেচননালিকার চারপাশে রক্তজালকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। এভাবে যে উপপথ (Bypass) তৈরি হয় তাকে লাডউইগ শানট (Ludwig shunt) বলে। **কাজ**—জরুরিকালীন অবস্থায় এই উপপথের গুরুত্ব খুব বেশি।

**22. ভাসা রেকটা কাকে বলে ?**

● **ভাসা রেকটা**— জাক্সটামেডুলারি গ্লোমেরুলাস থেকে যেসব বহির্মুখী উপধমনি নির্গত হয় তারা চুলের কাঁটা (Hair-pin) -এর মতো লুপ সৃষ্টি করে নীচের দিকে (মেডালাতে) নেমে আসে। এই প্রকার রক্তনালিগুলিকে ভাসা রেকটা বলে। এই লুপগুলি হেনলির লুপের পাশ দিয়ে মেডালার গভীরে প্রবেশ করে।

## ০ অনুশীলনী ০

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :

1. প্রোটিনের বিপাক ক্রিয়ায় অপচিতির ফলে যে সব বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন হয় তাদের একত্রে কী বলে ?
2. মূত্র উৎপাদন সহায়ককারী অঙ্গাণুগুলি মিলিত হয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে কী বলে ?
3. বৃক্কের হাইলাম অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে মূত্রাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম কী ?
4. পেশিময় থলি যা দেহের শ্রোণি গহ্বরে থাকে এবং যার মধ্যে সাময়িকভাবে মূত্র জমা থাকে তাকে কী বলে ?
5. বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত এককের নাম কী ?
6. একটি নেফ্রনের দুটি অংশের মধ্যে কোন্ অংশটি শুধু বৃক্কের কর্টেক্সে থাকে ?
7. ম্যালপিজিয়ান করপাসল কী কী অংশ নিয়ে গঠিত ?
8. গ্লোমেরুলার রক্ত জালক গঠন করার সময় অন্তর্বাহী ধমনিকাটির অন্তঃস্থ গহ্বর মোটা এবং বহির্বাহী ধমনিকাটির অন্তঃস্থ গহ্বর সরু হওয়ার ফলে কী লাভ হয় ?
9. বাওম্যানস ক্যাপসুলের অন্তঃস্থ প্রাচীর যে বিশেষ ধরনের কোশ নিয়ে গঠিত হয় তার নাম কী ?
10. ম্যালপিজিয়ান কর্পাসলে মূত্র উৎপাদনের জন্য যে ভৌত প্রক্রিয়াটি ঘটে তাকে কী বলে ?
11. প্রতি মিনিটে দুটি বৃক্কের মধ্য দিয়ে কত রক্ত প্রবাহিত হয় ?
12. স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে বৃক্কে অবস্থিত প্রতিটি গ্লোমেরুলাসে কত পরিমাণ তরল পরিস্রুত হয় ?
13. যে চাপের উপস্থিতিতে ম্যালপিজিয়ান করপাসলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে কী বলে ?
14. গ্লোমেরুলাসের পরিস্রুত থেকে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ বৃক্কীয় নালিকার মধ্য দিয়ে রক্তে ফিরে যায় সেই প্রক্রিয়াকে কী বলে ?
15. বৃক্ক নালিকার লুমেনের প্রাচীরে অবস্থিত কোশ যে প্রক্রিয়ায় কোনো পদার্থকে বৃক্কের নালিকা পথে যোগ করে সেই প্রক্রিয়াকে কী বলে?
16. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগে আক্রান্ত হলে রোগী অধিক পরিমাণ জল পান করে, এই অবস্থাকে কী বলে ?
17. বারে বারে প্রচুর পরিমাণ লঘু প্রস্রাব হওয়াকে কী বলে ?
18. হাইপোথ্যালামাস থেকে ADH নামে নিউরোহরমোন বৃক্ক নালিকার উপর কী কাজ করে ?
19. মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি দেখা দিলে সেই মূত্রকে কী বলা হয় ?
20. মূত্রের মাধ্যমে রক্তস্থিত ইউরিক অ্যাসিডের রেচন কমে গেলে রক্তে এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে ?
21. নেফ্রাইটিস রোগ হলে মূত্রে যে জৈব বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাকে কী বলে ?
22. হিমাটুরিয়া কী ?
23. ত্বকে অবস্থিত একটি গ্রন্থির নাম করো যার মাধ্যমে রেচন কাজ সম্পন্ন হয়।
24. সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে যে তৈলাক্ত তরল ক্ষরিত হয় তাকে কী বলে।
25. সিবাম নামে যে তৈলাক্ত পদার্থ যে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় তাকে কী বলে ?
26. বিভিন্ন নেফ্রন থেকে আসা সংগ্রাহক নালি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গো যুক্ত হয়ে কী গঠন করে ?
27. জ্যাক্সটাগ্লোমেরুলাস অ্যাপারাটাসের অন্তর্বাহী, বহির্বাহী এবং দূরবর্তী রেচন নালিকার মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি ফাঁকা স্থানে যে কলা কোশের সমাবেশ লক্ষ করা যায় তাকে কী বলে ?
28. ম্যাকুলা ডেনসা নামে লম্বাটে (পরিবর্তিত স্তম্ভাকার আবরণী) কোশ জ্যাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটসের কোন্ অংশে থাকে ?
29. যকৃতে কী ভাবে মানুষের দেহে রেচন কাজ সম্পন্ন করে ?
30. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র রোগটি যে হরমোনের অভাবে হয় তাকে কী বলে ?

#### B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :

1. মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গের নাম—পৌষ্টিকনালি □/ বৃক্ক □/ ফুসফুস □/ ত্বক □।
2. মানবদেহে মোট বর্জ্য পদার্থের—25% □/ 50% □/ 75% □/ 90% □ বৃক্ক দ্বারা রেচিত হয়।
3. গবিনীর প্রসারিত ঊর্ধ্বাংশ যা বৃক্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে বলে—বৃক্কীয় স্তম্ভ □/ বেলিনীর নালি □/ হাইলাম □/ বৃক্কীয় শ্রোণি □।
4. প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা—20 লক্ষ □/ 10 লক্ষ □/ 10 হাজার □/ 10 কোটি □।
5. ম্যালপিজিয়ান করপাসল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, একটির নাম বাওম্যানস ক্যাপসুল, অন্যটির নাম— জাক্সটামেডুলারি কর্টেক্স □/ ম্যাকুলা ডেনসা □/ গ্লোমেরুলাস □/ বৃক্কনালিকা □।
6. বাওম্যানস্ ক্যাপসুলের ভিসেরাল স্তরের আবরণী কলাকে বলে— পোডোসাইট কোশ □/ ল্যাসিস কোশ □/ ঘনক্ষেত্রাকার কোশ □/ ম্যাকুলা ডেনসা □।

7. প্রতি মিনিটে বাওম্যানস ক্যাপসুল দ্বারা পরিস্রুত তরলের গড় পরিমাণ— 1·7 লিটার □/ 17 লিটার □/ 170 লিটার □।
8: গ্লুকোজ মূত্রের একটি—স্বাভাবিক উপাদান □/ অস্বাভাবিক উপাদান □/ অপ্রয়োজনীয় উপাদান □/ অপরিহার্য উপাদান □।
9. মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হল—ত্বক □/ ফুসফুস □/ বৃক্ক □/ ক্ষুদ্রান্ত্র □।
10. নিম্নলিখিত অঙ্গের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে না ?—ক্ষুদ্রান্ত্র □/ ঘর্মগ্রন্থি □/ বৃক্ক □/ ফুসফুস □।
11. একটি গ্রন্থির নাম করো যা রেচন কাজে জড়িত নয়—যকৃৎ □/ লালাগ্রন্থি □/ সেবেসিয়াস গ্রন্থি □/ স্তনগ্রন্থি □।
12. মানুষের দেহে কোন্‌টি সহায়ক রেচন অঙ্গ ?—যকৃৎ □/ পাকস্থলী □/ ক্ষুদ্রান্ত্র □/ হৃৎপিণ্ড □।
13. মানুষের বৃক্ক কী ধরনের ?— প্রোনেফ্রস □/ মেসোনেফ্রস □/ মেটানেফ্রস □/ অপিসথোনেফ্রস □।
14. একটি বৃক্কের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায়— 6 cm × 3 cm × 2 cm □/ 11 cm × 5 cm × 3 cm □/ 13 cm × 6·5 cm × 4·5 cm □/ 16 cm × 8 cm × 4 cm □।
15. একটি বৃক্কের ওজন প্রায়— 5-10 gm □/ 100-200 gm □/ 200-275 gm □/ 280-300 gm □।
16. বৃক্কের প্রধান ও মূল কাজ হল—নিষ্ক্রিয় পুনঃশোষণ □/ পরাপরিস্রাবণ □/ ক্যাপসুলার দ্রবণের নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ □/ মূত্রের উৎপাদন □।
17. একটি বৃক্কের অবতল অংশ যার মধ্য দিয়ে বৃক্কীয় ধমনি প্রবেশ করে এবং বৃক্কীয় শিরা এবং গবিনী নির্গত হয় তাকে বলে—কর্টেক্স □/ মেডালা □/ হাইলাম □/ পেলভিস □।
18. বৃক্কের কার্যগত এককের নাম হল— ইউরিনিফেরাস ডাক্ট □/ নেফ্রন □/ কর্টেক্স ও মেডালা □/ পিরামিড □।
19. প্রতিটি বৃক্কের আকৃতি—শিমের বীজের মতো □/ ডিম্বাকার □/ অনিয়তাকার □/ উপবৃত্তাকার □।
20. নেফ্রন কী এবং এটি কয় প্রকারের হয় ?—বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত একক যা প্রধানত দুই প্রকারের হয় □/ বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত একক যা এক প্রকারের হয় □/ রেচন তন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার কোনো প্রকারভেদ নেই □/ স্নায়ু তন্ত্রের গঠনগত এবং কার্যগত একক যা দুই প্রকারের হয় □।
21. নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস বৃক্কের যে অংশে পাওয়া যায় সেটি হল—কর্টেক্স □/ মেডালা □/ কর্টেক্স + মেডালা □/ পিরামিড □।
22. হেনলির লুপ থাকে—বৃক্কের কর্টেক্সে □/ বৃক্কের মেডালাতে □/ বৃক্কের পেলভিস অঞ্চলে □/ পিরামিড অঞ্চলে □।
23. ম্যালপিজিয়ান করপাসলে বিভিন্ন অংশের নাম কী—বাওম্যানস ক্যাপসুল + সংগ্রাহক নালিকা □/ গ্লোমেরুলার জালক + বৃক্ক নালিকার গ্রীবাংশ □/ বাওম্যানস ক্যাপসুল + গ্লোমেরুলার রক্তজালক □/ বাওম্যানস ক্যাপসুল + গ্লোমেরুলার রক্তজালক + পেরিটিবিউলার জালক □।
24. বাওম্যানস ক্যাপসুলের গঠন হল—একটি নিরেট কাপের মতো অংশ যার মধ্যে গ্লোমেরুলাস থাকে □/ ফাঁপা অংশ যা বহিস্থ ও অন্তস্থ নামে দুটি প্রাচীর নিয়ে গঠিত □/ একটি প্রাচীর নিয়ে গঠিত ফাঁপা অংশ □/ উপরের কোনোটিই নয় □।
25. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না ?—জল □/ গ্লুকোজ □/ প্লাজমা প্রোটিন □/ ইউরিয়া □।
26. ম্যালপিজিয়ান করপাসলে মূত্র উৎপাদনের কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপের মধ্যে কোন্‌টি পরিস্রাবণ সাহায্যকারী চাপ ?— গ্লোমেরুলার কেপিলারী প্রেসার (GCP) □/ কোলয়ীড অসমোটিক প্রেসার (COP) □/ ক্যাপসুলার হাইড্রোস্টাটিক প্রেসার (CHP) □/ COP + CHP □।
27. গ্লোমেরুলাসে কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ (Effective filtration pressure—EFP) মান হল— + 75 mm Hg □/ + 50 mm Hg □/ + 25 mm Hg □/ – 10 mm Hg □।
28. প্রতিমিনিটে দুটি বৃক্কের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ রক্ত সংবাহিত হয় তা হল —500-1000 ml □/ 1200-1300 ml □/ 1700-2000 ml □/ 2000-2500 ml □।
29. প্রতিমিনিটে যে পরিমাণ রক্ত পরিস্রুত হয় তার পরিমাণ —25 ml □/ 125 ml □/ 300 ml □/ 500 ml □।
30. বৃক্কনালিকার কোন্ অংশে ব্রাশ বর্ডার (বুরুশের প্রান্তের মতো) এবং রডেড ঘনকাকার আবরণী কলা দেখতে পাওয়া যায় ?—নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকাতে □/ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকাতে □/ হেনলির লুপের সরু নিম্নগামী খণ্ডাংশ □/ হেনলির লুপে ঊর্ধ্বগামী পুরু খণ্ডাংশ □।
31. স্বাভাবিক অবস্থায় বৃক্ক নালিকার যে অংশে জলের ভেদ্যতা অত্যন্ত বেশি সেই স্থানটি হল—সংগ্রাহক নালিকা □/ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা □/ হেনলির লুপ □/ নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা □।
32. হেনলির লুপের উর্ধ্বগামী বাহু— $Na^+$ প্রতিভেদ্য □/ জলের প্রতি অভেদ্য □/ $Na^+$ প্রতিভেদ্য + জলের প্রতি অভেদ্য □/ জলের প্রতি ভেদ্য কিন্তু $Na^+$ প্রতি অভেদ্য □।
33. হেনলির লুপ থেকে যে পদার্থটি শোষিত হয় তা হল—পটাশিয়াম □/ গ্লুকোজ □/ জল □/ ইউরিয়া □।
34. সংগ্রাহক নালিকা থেকে কোন্ হরমোন জলের পুনঃশোষণে সাহায্য করে ?— রেনিন (Renin) □/ অ্যান্‌জিওটেনসিন □/ অ্যালডোস্টেরন □/ ভেসোপ্রেসিন □।
35. নেফ্রনে জলের অধিকাংশ পরিমাণ পুনঃশোষিত হয়—নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা □/ হেনলির লুপ □/ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা □/ সংগ্রাহক নালিকা □।
36. ম্যাকুলা ডেনসা থাকে—নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকাতে □/ দূরবর্তী সংবর্ত নালিকাতে □/ হেনলির লুপে □/ সংগ্রাহক নালিকাতে □।

37. রেনিন (Renin) ক্ষরিত হয়—বৃক্কের উপরিভাগে অবস্থিত নেফ্রন থেকে □ / সংগ্রাহক নালিকা থেকে □ / বৃক্কের পেলভিস অঞ্চল থেকে □ / জকস্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে □।
38. রেচিত মূত্রের পরিমাণ নিম্নলিখিত কোন্ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ?— অ্যালডোস্টেরন □ / অ্যালডোস্টেরন এবং ADH □ / অ্যালডোস্টেরন + ADH + টেস্টোস্টেরন □ / ADH □।
39. স্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ বস্তুটি বৃক্ক নালিকা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুনঃশোষিত হয় ?—ইউরিয়া □ / ইউরিক অ্যাসিড □ / সোডিয়াম ক্লোরাইড □ / গ্লুকোজ □।
40. গ্লুকোজের সম্পূর্ণ পুনঃশোষিত হয়—নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা দিয়ে □ / হেনলির লুপ দিয়ে □ / দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা দিয়ে □ / সংগ্রাহক নালিকা দিয়ে □।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. মানুষের বৃক্ক হল ——— রেচন অঙ্গ।
2. ফুসফুস, যকৃৎ, লালাগ্রন্থি এবং ঘর্মগ্রন্থি মানুষের ——— রেচন অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়।
3. বৃক্কের মাধ্যমে প্রধানত ——— শতাংশ বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।
4. প্রতিটি বৃক্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ——— ও ——— সেন্টিমিটার হয়।
5. বৃক্কের হাইলাম অংশ থেকে মূত্রবহনকারী ——— নির্গত হয়।
6. মূত্রথলির ভেতরে যে ত্রিকোণাকৃতি ফাঁপা স্থান থাকে তাকে ——— বলে।
7. ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ——— যুক্ত বর্জ্য পদার্থ বলে।
8. সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিডকে ——— যুক্ত বর্জ্য পদার্থ বলে।
9. ADH-এর অভাবে যে রোগ হয় তাকে ——— রোগ বলে।
10. ম্যালপিজিয়ান করপাসলে ——— প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লাজমা পরিস্রুত হয়।
11. স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিদিন প্রায় ——— মিলিলিটার মূত্র দেহ থেকে নির্গত হয়।
12. ত্বকে অবস্থিত রেচন অঙ্গ হল ———, যার মাধ্যমে দেহ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ জল বেরিয়ে যায়।
13. বৃক্ক নালিকায় প্রধানত তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূত্র তৈরি হয় এর মধ্যে একটি হল ——— এবং অন্য দুটি হল নালিকার ক্ষরণ এবং নতুন পদার্থের উৎপাদন।
14. বৃক্কে আঘাত বা প্রদাহ জনিত বা মূত্রনালিতে ক্ষত হওয়ার কারণে মূত্রে রক্ত বেরোলে তাকে ——— বলে।
15. 24 ঘণ্টায় সংগৃহীত মিশ্র মূত্রে গড় pH ——— হয়।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answer to fill in the blank) :

1. ——— হল একটি নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ। ( ইউরিয়া / NaCl / কিটোন বডিস / ল্যাকটিক অ্যাসিড )
2. মানবদেহের বৃক্কের মাধ্যমে প্রায় ——— রেচন বস্তু দেহ থেকে নির্গত হয়। ( 100 % / 75% / 50% / 25% )
3. স্বাভাবিক বয়স্ক পুরুষের প্রতিটি বৃক্কের গড় ওজন ——— গ্রাম। ( 75–100 / 100–140 / 140–170 / 170–200 )
4. একজন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের প্রতিটি বৃক্কের ওজন ———। (50–100 গ্রাম / 100–150 গ্রাম / 150–180 গ্রাম / 180–250 গ্রাম)
5. নেফ্রনের নালিকার গড় দৈর্ঘ্য হল ———। ( 1 cm / 2 cm / 3 cm / 10 cm )
6. বৃক্কের যে অংশ দিয়ে বৃক্কীয় ধমনি প্রবেশ করে এবং বৃক্কীয় শিরা ও গবিনী নির্গত হয় তাকে ——— বলে। ( কর্টেক্স / মেডালা / হাইলাম / পিরামিড )
7. মানুষের দুটি বৃক্কের সব নেফ্রনকে পরপর যোগ করলে তার দৈর্ঘ্য ——— মাইল হবে। ( 10 / 20 / 30 / 40 )
8. বৃক্কের ——— অংশে গ্লোমেরুলাস থাকে না। ( কর্টেক্স / মেডালা / পিরামিড / পেলভিস)
9. ম্যাকুলা ডেনসা থাকে ———। (নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকাতে / দূরবর্তী সংবর্ত নালিকাতে / হেনলির লুপে / সংগ্রাহক নালিকাতে)
10. স্বাভাবিক অবস্থায় নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা থেকে ——— সম্পূর্ণভাবে পুনঃশোষিত হয়। ( গ্লুকোজ / সোডিয়াম / ইউরিয়া / জল )
11. নেফ্রনের ——— অংশ জলের অভেদ্য। (নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা / হেনলির লুপ / দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা / ডাক্ট অফ বেলিনি)
12. নেফ্রনের বাওম্যান ক্যাপসুলের অন্তঃস্থ প্রাচীরের আবরণীর কোশকে ——— বলে। (প্যারাইটাল কোশ / ল্যাসিস কোশ / পোডোসাইট কোশ / গোবলেট কোশ )
13. সংগ্রাহক নালিকাগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে যে নালি গঠন করে তাকে ——— বলে। ( ডাক্ট অফ বেলিনি / রেচন নালি / হেনলি লুপের নালি )
14. রেনিন এবং এরিথ্রোপেয়েটিন ক্ষরণকারী আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের নাম ———। ( ফুসফুস / ঘর্মগ্রন্থি / যকৃৎ / বৃক্ক )
15. ——— রেচন অঙ্গ নয়। ( ত্বক / যকৃৎ / ফুসফুস / অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি )

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. মানবদেহের একজোড়া বৃক্ক দেহের শ্রোণি (পেলভিক) অঞ্চলে মেরুদণ্ডের কটিদেশীয় (লম্বার) কশেরুকার দু'পাশে থাকে।
2. পুরুষের প্রতিটি শিমের বীজের আকৃতির লালচে বাদামি রঙের যার গড় ওজন 150 গ্রাম।
3. গ্লোমেরুলার সন্নিহিত যন্ত্রে দূরবর্তী সংবর্ত নালির প্রাচীরে যে পরিবর্তিত কোশগুলি থাকে তাকে ম্যাকুলা ডেনসা বলে।
4. ম্যালপিজিয়ান করপাসলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় প্লাজমাস্থিত কলোয়েড এবং কেলাসিত পদার্থগুলি আলাদা হয় তাকে অতিস্রবণ প্রক্রিয়া বলে।
5. প্রতিদিন অতিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্লাজমা থেকে প্রায় 1.5 লিটার জল বেরিয়ে আসে ও মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।
6. গ্লোমেরুলার পরিস্রুতে অবস্থিত যে সব পদার্থ বৃক্কীয় নালিকার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে ফিরে আসে তাকে থ্রেশহোল্ড পদার্থ বলে।
7. মূত্রে অ্যাসিটোন নির্গত হলে তাকে অ্যাসিটোনুরিয়া বলে।
8. নেফ্রনের পরিস্রাবণ ঝিল্লি রক্তজালকের অন্তরাবরণী ভিত্তিঝিল্লি এবং বাওম্যান ক্যাপসুলের ভিসেরাল স্তর নিয়ে গঠিত।
9. বৃক্কের মেডালাতে যে গ্লোমেরুলাস থাকে তাকে জাক্সাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস বলে।
10. বৃক্ক নালিকা থেকে গ্লুকোজের পুনঃশোষণ একটি সক্রিয় পদ্ধতি।
11. যে প্রক্রিয়ায় বৃক্কের পরিস্রাবণ ঝিল্লির মধ্য দিয়ে কোলয়েড পদার্থ এবং কেলাস পদার্থগুলিকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আলাদা করা যায় তাকে পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া বলে।
12. পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়া যে সব চাপের উপস্থিতিতে ঘটে তাকে কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ বলে।
13. বাওম্যানস ক্যাপসুল থেকে আসা পরিস্রুত তরলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জল বৃক্কে পরসংবর্ত নালিকার প্রথম অর্ধাংশ থেকে শোষিত হয় যে প্রক্রিয়া তাকে ফ্যাকালটেটিভ প্রক্রিয়া বলে।
14. হেনলি লুপের প্রধান কাজ হল অতিরিক্ত জলের পুনঃশোষণ।
15. অ্যামোনিয়া, হিপিউরিক অ্যাসিড এবং অজৈব ফসফেট বৃক্কনালিকার কোশগুলির উৎপাদিত পদার্থসমূহ।

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. তোমার দেহে অবস্থিত চারটি রেচন অঙ্গের নাম করো।
2. বৃক্ককে কেন প্রধান রেচন অঙ্গ বলে ?
3. ফুসফুস দিয়ে দুটি রেচিত পদার্থের নাম করো।
4. মেজর ক্যালিক্স ও মাইনর ক্যালিক্স বলতে কী বোঝো ?
5. বৃক্কে অবস্থিত দু'প্রকার নেফ্রনের নাম করো। এর মধ্যে কোন্‌টি পীড়ন অবস্থায় কার্যকরী হয় ?
6. বৃক্কের কোন্ অংশে ম্যালপিজিয়ান করপাসল থাকে ? এটির বিভিন্ন অংশের নাম লেখো।
7. হেনলির লুপ কী ? এর বিভিন্ন অংশের নাম করো।
8. EFP কী ? ব্যাখ্যা করো।
9. যকৃতের রেচন পদার্থ কীভাবে দেহ থেকে নির্গত হয় ? দুটি রেচন পদার্থের নাম করো।
10. লালাগ্রন্থি রেচন কাজে কীভাবে অংশ নেয় ?
11. বৃক্কের হাইলাস অংশ কাকে বলে ?
12. বৃক্কের লম্বচ্ছেদে বাহিরের দিকে যে গাঢ় এবং স্বল্প গাঢ় দেখা যায়, তাদের কী বলে ?
13. মানুষের বৃক্কের গড় ওজন কত ?
14. কেন বৃক্ককে মানুষের মুখ্য রেচন অঙ্গ বলে ?
15. বৃক্কের কোন্ অংশে গ্লোমেরুলাস থাকে না ?
16. নেফ্রন কাকে বলে ? এটি কোথায় পাওয়া যায় ?
17. মানুষের প্রতিটি বৃক্কে কত নেফ্রন থাকে।
18. বৃক্কে কত রকমের নেফ্রন আছে কোন্ নেফ্রনটি স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে না কিন্তু জরুরিকালীন অবস্থায় কার্যকরী হয়।
19. সংবর্ত নালিকাটি তুলনামূলক অধিক প্যাঁচানো হওয়া মূত্র উৎপাদনে কী সুবিধা হয় ?
20. ম্যালপিজিয়ান করপাসলের প্রধান কাজ কী ?
21. বৃক্কে উৎপন্ন তরল রেচন পদার্থ কোথায় সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং কীভাবে এখানে যায় ?

22. মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থগুলির নাম কী ?
23. মূত্রের দুটি অস্বাভাবিক উপাদানের নাম করো।
24. দুটি হরমোনের নাম করো যা মূত্র উৎপাদনে অংশ নেয়।
25. স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের কত পরিমাণ মূত্র দেহ থেকে রেচিত করে।

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. নেফ্রন কাকে বলে ? এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখো।
2. ম্যালপিজিয়ান করপাসল কাকে বলে ? বৃক্কে এর অবস্থান উল্লেখ করো।
3. পরিস্রাবণ ঝিল্লি বলতে কী বোঝায়? এর কাজ কী ?
4. প্রক্সিমাল কন্‌ভলিউটেড টিবিউল মধ্যস্থিত কোশের মুক্তপ্রান্ত বুরুশের মতো দেখায় কেন ? মূত্র উৎপাদনে এর ভূমিকা উল্লেখ করো।
5. গ্লোমেরুলাস রক্তজালকের রক্তচাপ অন্যান্য স্থানের রক্তজালকের রক্তচাপ অপেক্ষা অধিক হয় কেন ?
6. কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ বলতে কী বোঝায় ? এই চাপের স্বাভাবিক মান উল্লেখ করো।
7. বৃক্কীয় নালিকার বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করো। কোন্ কোন্ অবস্থায় নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নালিকা থেকে জলের পুনঃশোষণ ঘটে ?
8. নিকটবর্তী সংবর্ত নালির গাত্রের আবরক কোশের গঠন বর্ণনা করো। এতে কী সুবিধা হয় ?
9. দূরবর্তী সংবর্ত নালির গাত্রস্থিত আবরক কোশের গঠন বর্ণনা করো।
10. মূত্রের স্বাভাবিক জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলি কী কী ? এর মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি সবথেকে বেশি জৈব এবং অজৈব পদার্থ ?
11. মূত্র উৎপাদনে ADH-এর ভূমিকা বর্ণনা করো।
12. একজন সুস্থ ব্যক্তির দৈনিক মূত্রের গড় পরিমাণ উল্লেখ করো। স্বাভাবিক মূত্রে প্রোটিন ও গ্লুকোজ পাওয়া যায় না কেন ?
13. রেচন ক্রিয়ায় ত্বকের ভূমিকা লেখো।
14. মানবদেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত এবং নাইট্রোজেন-বিহীন রেচন বস্তুগুলির নাম লেখো। ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত রেচন বস্তুগুলির নাম লেখো। সেরুমেন কী ?
15. বহিঃক্ষরা এবং অ্যাপোক্রাইন ঘর্মগ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য কী ?
16. ঘর্ম এবং সেবাম-এর মধ্যে কী কী পার্থক্য ?
17. কর্ণমল বা সেরুমেন কাকে বলে ?
18. সেবাম কাকে বলে? এর উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করো।

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ম্যালপিজিয়ান করপাসল এবং বৃক্কীয় নালিকা ।
2. মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান এবং অস্বাভাবিক উপাদান।
3. ক্ষরণ পদার্থ এবং বর্জ্য পদার্থ।
4. ডায়াবেটিস মেলিটাস-এর মূত্র এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের মূত্র।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. রেচন তন্ত্রের মুখ্য রেচন অঙ্গ।
2. ম্যালপিজিয়ান করপাসল।
3. জাকস্টাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস।
4. বৃক্কীয় নালিকা।
5. হেনলির লুপ।
6. ম্যালপিজিয়ান করপাসলে মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া।
7. থ্রেশহোল্ড এবং নন্‌থ্রেশহোল্ড পদার্থ।
8. মূত্র নিষ্কাশন প্রক্রিয়া।
9. লালা গ্রন্থির রেচন কাজ।
10. বিভিন্ন রোগে মূত্রের অস্বাভাবিক উপাদান।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) রেচনতন্ত্র কাকে বলে ? (b) মানুষের বিভিন্ন রেচনতন্ত্রের নাম করো। (c) মানুষের কয়েকটি প্রধান রেচন পদার্থের নাম করো।
2. বৃক্ক কী ? মানবদেহে বৃক্কের অবস্থান উল্লেখ করো এবং বৃক্কের একটি চিত্র এঁকে তার শারীরস্থান বর্ণনা করো।
3. চিত্রসহ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
4. নেফ্রনের গঠন-সংক্রান্ত বিশিষ্টতা কীভাবে প্রস্রাব উৎপাদন করতে সাহায্য করে তা আলোচনা করো।
5. হেনলির লুপ চারটি অংশে বিভেদিত; চারটি অংশের নাম লেখো। এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ লেখো।
6. বৃক্কের একক কী ? একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় প্রতিদিন কী পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করেন ? বৃক্ক দ্বারা কীভাবে মূত্র উৎপাদিত হয় ?
7. (a) গ্লোমেরুলাস কাকে বলে ? (b) গ্লোমেরুলাসের সঙ্গে বাওম্যান ক্যাপসুলের সম্বন্ধ কী ? (c) পরাপরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় বাওম্যান ক্যাপসুলে কীভাবে মূত্র উৎপন্ন হয়।
8. (a) গ্লোমেরুলাসের পরিস্রুত রস বলতে কী বোঝায় ? (b) টিবিউলে পুনঃশোষণ কাকে বলে ?
9. (a) মূত্র কী ? (b) বৃক্ক নালিকায় কীভাবে মূত্র প্রস্তুত হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
10. (a) মূত্র কী ? (b) এর পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য এবং অস্বাভাবিক উপাদান সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
11. মূত্রের স্বাভাবিক উপাদানগুলি বর্ণনা করো।
12. (a) বৃক্ক ছাড়া মানবদেহে অন্যান্য রেচন অঙ্গ কী কী ? (b) এদের মধ্যে যে-কোনো একটি অঙ্গের ভূমিকা উল্লেখ করো।
13. (a) মূত্র কী ? (b) মূত্র উৎপন্ন হওয়ার পরে যে স্থানে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে তার নাম করো। (c) এই অঙ্গটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো।
14. (a) মূত্র কোথায় উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চিত হয় ? (b) মূত্রথলিতে কত পরিমাণ মূত্র সঞ্চিত হতে পারে ? মূত্র ত্যাগ প্রণালী সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
15. ফুসফুসের মাধ্যমে কীভাবে রেচন ক্রিয়া ঘটে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
16. (a) বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন অংশ আঁকো। (b) এইসব অংশ কীভাবে রেচন কাজে অংশ নেয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
17. (a) ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস কাকে বলে ? (b) রেচনের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক আছে তা আলোচনা করো।
18. মূত্রে অবস্থিত নাইট্রোজেন যুক্ত বস্তু এবং অনাইট্রোজেন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করো।
19. ত্বকের গঠন ও রেচন কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

### B. চিহ্নিত চিত্র আঁকো (Draw labelled diagram) :

1. চিহ্নিত চিত্র আঁকো। 2. ম্যালপিজিয়ান কর্পাসনের চিহ্নিত চিত্র আঁকো। 3. হেনলি লুপের বিভিন্ন অংশ এঁকে চিহ্নিত করো। 4. জাক্স্টাগ্লোমেরুলার আপারাটাসের চিহ্নিত চিত্র আঁকো।

---

# ত্বক এবং দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ
# [ SKIN AND BODY TEMPERATURE REGULATION ]

## অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



### ➧ সূচনা (Introduction) ঃ

দেহত্বক (চর্ম) মানুষের দেহকে তার পরিবেশ থেকে আলাদা করে রাখে। এছাড়া দেহত্বকে অন্য একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য কাজ অন্তঃস্থ দেহঅঙ্গাসমূহকে সংরক্ষণ করা এবং দেহে জীবাণু সংক্রমণে বাধাদান করা। দেহত্বকের সবথেকে উপরের স্তরটি কেরাটিনযুক্ত হয় বলে এটি ত্বকের অন্যান্য স্তর থেকে পুরু এবং সামান্য কঠিন হয়। এই স্তরে মেলানিন নামে সঞ্চিত রঞ্জক কণা দেহকে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ত্বক থেকে উৎপন্ন রোম বা কেশ, নখ ইত্যাদি উপাঙ্গ (Appendages) দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। ত্বক কয়েকটি বস্তু, যেমন—গ্লুকোজ, জল, লবণ, ফ্যাট ইত্যাদির সঞ্চয় স্থান হিসাবে কাজ করে। ইন্দ্রিয়স্থান হিসাবেও ত্বক কাজ করে। ত্বকের অন্য আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেহ উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করা। ত্বকের ভেতর দিকের অংশকে অধস্ত্বক বলে। এইসব স্থানে চর্বি জমা থাকে একে অধঃত্বকীয় ফ্যাট বলে। এই ফ্যাট তাপের অন্তরক বা অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। স্ত্রী লোকের এই জাতীয় চর্বি (ফ্যাট)-র পরিমাণ পুরুষের তুলনায় বেশি বলে তাপের অপরিবাহীতা তাদের দেহে বেশি। এছাড়া ত্বকের ডার্মিস স্তরে রক্তনালি এবং ঘর্মগ্রন্থি বিভিন্ন আবহ উষ্ণতায় যথাযথভাবে সাড়া দেয়। রক্তবাহগুলি তাদের সংকোচন প্রসারণ ধর্মের মাধ্যমে দেহের উষ্ণতা ক্ষয় যথাক্রমে কমায় বা বাড়ায়। ঘর্মগ্রন্থি ঘর্মের ক্ষরণের মাধ্যমে দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে।

**ঘর্ম** হল দেহত্বকের ডার্মিস স্তরের ঘর্মগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তরল পদার্থ যা দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত করে।

# ❂ 9.1. ত্বক বা চর্ম (Skin) ❂

## ▲ ত্বকের গঠন এবং কার্যাবলি (Structure and Functions of Skin) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে তন্ত্র প্রাণী দেহের বাইরে আচ্ছাদন গঠন করে বাহ্যিক আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ করে তাকে ত্বকীয় তন্ত্র বলে।**

ত্বকীয় তন্ত্র প্রধানত চর্ম বা ত্বক এবং ত্বকীয় উপাঙ্গ, যেমন—রোম ও নখ নিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশে ত্বকের স্থূলত্ব বিভিন্ন প্রকারের হয়।

(b) **ত্বকের (চর্মের) গঠন (Structure of skin) :** মানবদেহের ত্বক সাধারণত দুটি স্তর, যেমন—বহিস্ত্বক এবং অন্তস্ত্বক নিয়ে গঠিত।

● **A. বহিস্ত্বক (এপিডার্মিস—Epidermis) : ত্বকের বর্হিভাগে যে রক্তবাহ ছাড়া বর্জিত স্তর থাকে, তাকে বহিস্ত্বক বা এপিডার্মিস বলে।** রক্তবাহ থাকে না বলে এই স্তরটি কেটে গেলে রক্তক্ষরণ হয় না। রক্তবাহবিহীন এই স্তরটি লসিকার মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এই স্তরটি বিভিন্ন প্রকার কোশ নিয়ে গঠিত। কোশের আকৃতির উপর নির্ভর করে এপিডার্মিসকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে কোশের স্তরগুলি নিম্নপ্রকারের হয়।

1. **কঠিন স্তর (স্ট্রাটাম কর্নিয়াম**—Stratum corneum)— সবথেকে বাইরের (প্রথম) স্তর যা কয়েক সারি ঠাসা **কেরাটিন** (Keratin) নামে প্রোটিনযুক্ত ও নিউক্লিয়াসবিহীন চ্যাপটা আঁশাকার মৃত আবরণী কলাকোশ দিয়ে গঠিত।
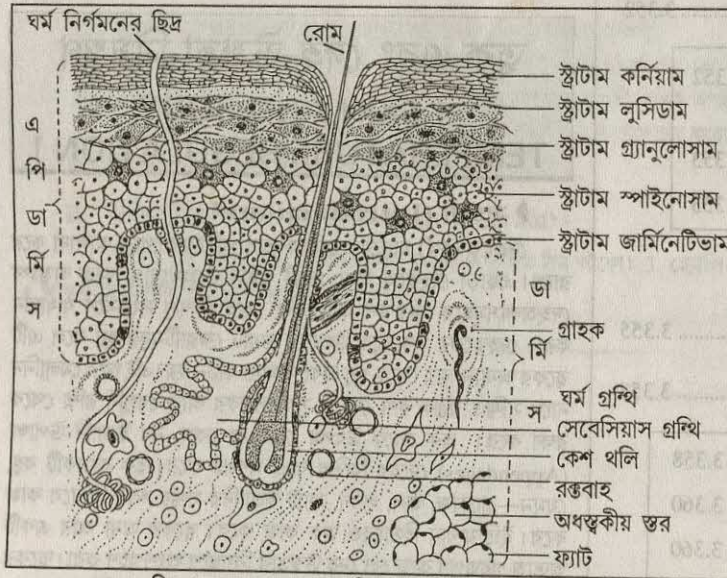
চিত্র 9.1. : ত্বকের কলাস্থানিক (আণুবীক্ষণিক) গঠন।

2. **স্বচ্ছ স্তর (স্ট্রাটাম লুসিডাম**—Stratum lucidum)— বহিস্ত্বকের দ্বিতীয় স্তর যা অস্পষ্ট বহিঃরেখাযুক্ত পাতলা কোশ দিয়ে গঠিত। কোশের সাইটোপ্লাজমে **ইলেইডিন** (Eleidin) নামে দানা থাকে।

3. **দানাদার স্তর (স্ট্রাটাম গ্র্যানুলোসাম**—Stratum granulosum)—এই স্তরটি বহিস্ত্বকের তৃতীয় স্তর যা চ্যাপটা, বহুভুজাকৃতি, **কেরাটোহায়ালিন** (Keratohyaline) নামে দানাযুক্ত কোশগুলি তিন চারটি স্তরে সজ্জিত থাকে।

4. **কণ্টক কোশ স্তর (স্ট্রাটাম স্পাইনোসাম**—Stratum spinosum)— স্তম্ভাকার কোশস্তরের উপরের দিকের কোশগুলির গায়ে কাঁটার মতো উপবৃদ্ধি দেখা যায়, এদের **কণ্টককোশ** (Prickle cell) বলে।

5. **বিভাজনক্ষম কোশ স্তর (স্ট্রাটাম জার্মিনেটিভাম**—Stratum germinativum)— বহিস্ত্বকের সব থেকে নীচের (চতুর্থ) স্তর। এই স্তরের সব থেকে নীচের অংশটি এক সারি কোশ নিয়ে গঠিত। নীচের স্তরের কোশগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন কোশ উৎপন্ন করে। এই স্তরের ভিতরের দিকে কিছু কোশ **মেলানিন** (Melanin) নামে রঞ্জক কণাযুক্ত হয়। এদের **মেলানোব্লাস্ট** (Melanoblast) বলে।

● **B. অন্তস্ত্বক (ডার্মিস—Dermis)** ঃ অন্তস্ত্বক বা ডার্মিস বহিস্ত্বকের নীচে থাকে যা প্রধানত নিবিড় তন্তুময় যোগকলা নিয়ে গঠিত। এই স্তরে ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland), সেবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous gland), রক্তজালক, লসিকাবাহ, অনৈচ্ছিক পেশি, স্নায়ুপ্রান্ত, গ্রাহক (Receptors) ইত্যাদি থাকে। অন্তস্ত্বকের যোগ কলার তন্তুগুলির বিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে এই স্তর দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত যেমন—

(i) উপরের স্তরটিকে **পিড়কা স্তর (প্যাপিলারি স্তর**–Papillary layer) বলে। কারণ অন্তস্ত্বক এবং বহিস্ত্বক-সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় সমদূরত্বে বিন্যস্ত পিড়কাকৃতিসম্পন্ন বহু উদ্‌গত অংশ থাকে।

(ii) নীচের স্তরটিকে **জালক স্তর (রেটিকিউলার স্তর**–Reticular layer) বলে। কারণ যোগকলার তন্তুগুলি অন্তস্ত্বকের এই অংশে জালক গঠন করে।

অন্তস্ত্বকের নীচের অংশকে **অধস্ত্বকীয় স্তর** বা **সাবকিউটিনিয়াস স্তর** (Subcutaneous layer) বলে। এই স্তরটি প্রধানত শিথিল যোগকলা নিয়ে গঠিত। স্নেহপদার্থ সমৃদ্ধ **চর্বি কোশ** (Fat cells) এবং **কেশথলির** (Hair follicles) উপস্থিতি এই স্তরটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

### • ত্বকের উপরিতলের আয়তন ও স্থূলত্ব •

1. স্বাভাবিক বয়স্ক পুরুষের দেহের ত্বকের উপরিতলের আয়তন—**1·8 বর্গ মিটার**
2. স্বাভাবিক স্ত্রী লোকের দেহের ত্বকের উপরিতলের আয়তন—**1·2 বর্গ মিটার**
3. সাধারণ ত্বকের গড় স্থূলত্ব (Thickness)—**1–2 মিলিমিটার**
4. পদতল (পায়ের পাতার) ত্বকের স্থূলত্ব—**5·0 মিলিমিটার** (সব থেকে মোটা)
5. অক্ষিপল্লবের ত্বকের স্থূলত্ব— **0·5 মিলিমিটার** (সব থেকে পাতলা)

(c) **ত্বকের কার্যাবলি (Functions of Skin)** ঃ

1. **সুরক্ষা** (Protection)—ত্বক দেহের কোমল অংশকে (পেশিকে) ঢেকে রেখে বাইরের আঘাত, তাপ, জীবাণুর অনুপ্রবেশ ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের মেলানিন রঞ্জক (Pigment) সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশকে বাধা দেয় এবং দেহকে রক্ষা করে।
2. **দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of body temperature)—(a) পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ত্বক থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ ক্ষয় (Heat loss) হয়। (b) ত্বকের চর্বিকলা তাপ কুপরিবাহী পদার্থ যা দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। (c) ঘর্মগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ঘর্মের বাষ্পীভবনের ফলে দেহতাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।
3. **অনুভূতির মাধ্যম** (Medium of sensation)—পরিবেশ থেকে আসা উদ্দীপনা যেমন—স্পর্শ (Touch), উষ্ণতা (Heat), ঠান্ডা (Cold), যন্ত্রণা (Pain) ইত্যাদি ত্বকের গ্রাহকগুলি গ্রহণ করে এবং সংজ্ঞাবহ নিউরোনের মাধ্যমে সংবেদনগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পাঠায়।
4. **সংশ্লেষ** (Synthesis)—ত্বকের অধস্ত্বকীয় স্তরে যে চর্বিকলা (মেদ কলা) থাকে তাতে আরগোস্টেরল নামে লব্ধ স্নেহ পদার্থ থাকে। সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি এই পদার্থ থেকে ভিটামিন-D সংশ্লেষণ ঘটায়।
5. **ক্ষরণ** (Secretion)—ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে সেবাম ও ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘর্মক্ষরণ ঘটে।
6. **রেচন** (Excretion)—ঘর্মক্ষরণ ও বহিস্ত্বকের উপরিতলের কোশসমূহের বিচ্যুতির মাধ্যমে ত্বক রেচন কার্যে অংশগ্রহণ করে।
7. **শোষণ** (Absorption)—দেহত্বকের মধ্য দিয়ে জল অভেদ্য কিন্তু রাসায়নিক ও তৈলাক্তজাতীয় পদার্থ কিছুটা প্রবেশ করতে পারে।
8. **সঞ্চয় ভান্ডার** (Storage)—ত্বকের অন্তস্ত্বক এবং অধস্ত্বক চর্বি, গ্লুকোজ, জল, লবণ ইত্যাদি পদার্থ সঞ্চয় করে রাখে।

## 9.2. ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland)

### ▲ ঘর্মগ্রন্থির সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ (Definition and Types of Sweat gland) :

❖ (a) **ঘর্মগ্রন্থির সংজ্ঞা (Definition of Sweat gland) : ডার্মিস স্তরে অবস্থিত প্যাঁচানো নলাকার গ্রন্থি যার থেকে নালি উৎপন্ন হয়ে ত্বকের উপরিভাগে স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত হয় এবং যার থেকে ঘর্ম নামে তরল নির্গত হয় তাকে ঘর্মগ্রন্থি বলে।**

(b) **ঘর্মগ্রন্থির প্রকারভেদ (Types of Sweat gland) :** মানুষের দেহে প্রায় 20-30 লক্ষ ঘর্মগ্রন্থি আছে। আকার, আকৃতি এবং ক্ষরণ পদ্ধতি অনুযায়ী ঘর্মগ্রন্থি দুই প্রকার, যেমন—উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি এবং অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি।

#### ➤ 1. উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি (ইক্রাইন ঘর্মগ্রন্থি—Eccrine sweat gland) :
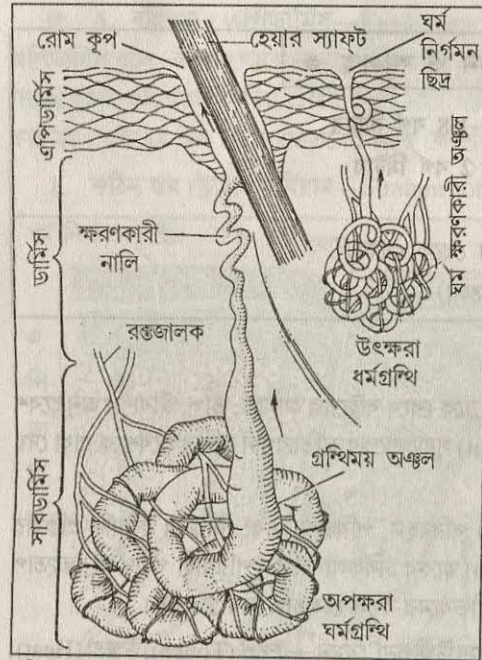
চিত্র 9.2. : অপক্ষরা এবং উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির অবস্থান ও শারীরস্থানিক গঠনের চিত্ররূপ।

(i) **গঠন**—উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি দেহের প্রধান ঘর্মগ্রন্থি। এই ধরনের ঘর্ম গ্রন্থিগুলি দেখতে শাখাবিহীন অত্যন্ত প্যাঁচানো নালিকার গুচ্ছের মতো। নালির মুক্তপ্রান্তটি অর্থাৎ গ্রন্থিনালির অংশটি ত্বককে ভেদ করে উপরিতলে আলাদা ভাবে উন্মুক্ত হয়। দেহে উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অধিক, তবে আকৃতিতে ছোটো হয়। এই ধরনের ঘর্মগ্রন্থির বৈশিষ্ট্য হল—এই গ্রন্থি গ্রন্থিময় অংশের আবরণী কোশগুলি ভিত্তি পর্দার উপরে অবস্থান করে এবং কোশের মধ্যে ক্ষরিত পদার্থ জমা রাখে। কোশের কোনো ক্ষতি না করেই কোশের বাইরে ঘর্ম নির্গত (ক্ষরিত) হয়। কোশের কোনো গঠনগত কিংবা উপাদানগত পরিবর্তন ঘটে না।

(ii) **উৎক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান**—দেহের উপরিতলের প্রায় সব জায়গায় এই গ্রন্থি থাকে, তবে এদের সংখ্যা মাথা, হাতের চেটো, পায়ের তলা বেশি পাওয়া যায়।

(iii) **উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত ঘর্মের প্রকৃতি**—NaCl, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, ভিটামিন-B এবং C ইত্যাদি অজৈব এবং জৈব পদার্থযুক্ত তরল ঘর্ম উৎক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত করে।

#### ➤ 2. অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি (অ্যাপোক্রাইন ঘর্মগ্রন্থি—Apocrine sweat gland) :

(i) **গঠন**—অপক্ষরা গ্রন্থির গঠন অনেকটা উৎক্ষরা গ্রন্থির মতো। এই ধরনের গ্রন্থি আকারে তুলনামূলক বড়ো হয় এবং সংখ্যায় কম থাকে। অপক্ষরা গ্রন্থি ত্বকের ডার্মিস স্তরে অবস্থিত কোশথলি থেকে উৎপন্ন হয় এবং গ্রন্থির গ্রন্থিনালি লোম কূপের মাধ্যমে ত্বকের উপরিতলে উন্মুক্ত হয়।

(ii) **অপক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান**—দেহের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে যেমন—বগল, শ্রোণি অঞ্চলে, স্তনের বোঁটা, যৌনাঙ্গের চারপাশে ইত্যাদি স্থানে এই গ্রন্থি থাকে। বয়ঃসন্ধিকালের আগে এই প্রকার ঘর্মগ্রন্থিগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের পরে এগুলি সক্রিয় হয়ে ঘর্ম ক্ষরিত করে।

(iii) **অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত ঘর্মের প্রকৃতি**—এই ঘর্মগ্রন্থিগুলি থেকে সামান্য সান্দ্র, সাদা ঘোলাটে, গন্ধহীন ঘর্ম ক্ষরিত হয়। কিন্তু এই প্রকার ঘর্মে কয়েকটি বিশেষ ধরনের উপাদানের (ইন্ডাক্সিল, উদ্‌বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে বিশেষ ধরনের তীব্র গন্ধ সৃষ্টি হয়। স্তনগ্রন্থি (Mammary gland) পরিবর্তিত অ্যাপোক্রাইন জাতীয় ঘর্মগ্রন্থি।

● উৎক্ষরা এবং অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির পার্থক্য (Difference between Eccrine and Apocrine sweat gland) :

| বৈশিষ্ট্য | ইক্রাইন (উৎক্ষরা) ঘর্মগ্রন্থি | অ্যাপোক্রাইন (অপক্ষরা) ঘর্মগ্রন্থি |
|---|---|---|
| 1. আকৃতি সংখ্যা | 1. এই গ্রন্থিগুলি আকৃতিতে ছোটো কিন্তু সংখ্যায় বেশি। | 1. আকৃতিতে বড়ো কিন্তু সংখ্যায় কম। |
| 2. অবস্থান | 2. এই প্রকার ঘর্মগ্রন্থি দেহের মুখ্য ঘর্মগ্রন্থি যা দেহের প্রায় সব জায়গায় থাকে। | 2. এই প্রকার ঘর্মগ্রন্থি দেহের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায়, যেমন— বগল, জননাঙ্গের উপর, স্তনের বোঁটা ইত্যাদিতে থাকে। |
| 3. উদ্দীপনা | 3. এই ঘর্মগ্রন্থি সব বয়সে দেহ তাপ বাড়ার ফলে উদ্দীপিত হয়। | 3. এই ঘর্মগ্রন্থি বয়ঃসন্ধিকালের পর দেহ তাপ বৃদ্ধিতে উদ্দীপিত হয় না। |
| 4. ঘামের প্রকৃতি | 4. লঘু তরল প্রকৃতির ঘর্ম ক্ষরণ করে। | 4. সামান্য গাঢ় সাদা ঘোলাটে ঘর্ম ক্ষরণ করে। |

## 9.3. ঘর্ম (Sweat)

### ▲ ঘর্মের সংজ্ঞা, মোট পরিমাণ, উপাদান, ক্ষরণের স্থান, কাজ, পদ্ধতি এবং প্রকারভেদ (Definition, Total amount, Composition, Site of secretion, Function, Mechanism and Types of sweat)

❖ (a) **ঘর্মের সংজ্ঞা (Definition of Sweat) :** ঘর্মগ্রন্থি থেকে সক্রিয়ভাবে ক্ষরিত তরলকে ঘর্ম বা ঘাম বলে।

(b) **ঘর্মক্ষরণের মোট পরিমাণ (Total amount of secretion of sweat) :** প্রতিদিন স্বাভাবিক আবহউষ্ণতায় গড়ে প্রায় 1000 ml ঘর্ম ক্ষরিত হয়।

● **ঘর্মক্ষরণের চরম উষ্ণতা (Critical temperature for sweating) :** একজন মানুষ পোশাকে আচ্ছাদিত অবস্থায় পরিবেশের উষ্ণতা যখন 29°C-এ (নগ্ন বা অনাবৃত অবস্থায় 31°C-এ) পৌঁছায় তখন ঘর্মক্ষরণ শুরু হয়। দেহের উষ্ণতা যখন কিছুটা বেড়ে যায় তখন ঘর্মক্ষরণ শুরু হয়।

● **ঘর্মের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) এবং pH :** আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·001–1·006 এবং pH–3·8–6·5।

(c) **ঘর্মের উপাদান :** (i) জল—99·2–99·7 শতাংশ এবং (ii) কঠিন পদার্থ—0·30–0·80 শতাংশ যা দুই প্রকার—

(1) **অজৈব পদার্থ**—সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, সালফেট ইত্যাদি।

(2) **জৈব পদার্থ**—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামোনিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন-B ও C ইত্যাদি।

| ● মানবের দেহনিঃসৃত ঘর্মের শতকরা উপাদান ● | |
|---|---|
| 1. **জল** | —99·221—99·724 |
| 2. **কঠিন পদার্থ** | —2·258—0·779 |
| (a) **অজৈব পদার্থ** 0·144—0·566 (mg%) | |
| (i) সোডিয়াম ক্লোরাইড | —0·2—0·5 |
| (ii) সোডিয়াম | —0·150 |
| (iii) ক্লোরিন | —0·050—0·356 |
| (iv) পটাশিয়াম | —0·017 |
| (v) সালফেট | —0·007 |
| (b) **জৈব পদার্থ** 0·03—0·29 (mg%) | |
| (i) ইউরিয়া | —0·03 |
| (ii) ল্যাকটিক অ্যাসিড | —0·07 |
| (iii) শর্করা | —0·004 |

(d) **দেহে ঘর্ম ক্ষরণের স্থান (Site of sweating in the body) :** দেখা গেছে গ্রীষ্মকালে মোট ঘর্মক্ষরণের 50 শতাংশ দেহ কাণ্ড থেকে, 25 শতাংশ দেহের নিম্নাঙ্গ থেকে এবং বাকিটা ঊর্ধ্বাংশ এবং মস্তক থেকে ঘটে। একবার যখন ঘর্মক্ষরণ শুরু হয় তখন তা দেহের সব অংশ থেকে একই সঙ্গে ঘটে। মানসিক অসুস্থ অবস্থায় ঘর্মক্ষরণের প্রধান স্থান হল হাত ও পা। উত্তপ্ত এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ঘর্মক্ষরণ উত্তপ্ত এবং শুষ্ক পরিবেশ অপেক্ষা বেশি ঘটে।

(e) **ঘর্মের কাজ (Functions of sweat) :**

1. **দেহ তাপ নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of body temperature)—ঘর্মগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ঘর্ম দেহের উপরিতল থেকে বাষ্পীভূত হয়ে দেহ উষ্ণতার (প্রায় 25%) হ্রাস ঘটায়।

2. **অম্ল-ক্ষার সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ** (Maintenance of acid-base balance)—ঘর্ম প্রধানত অম্লজাতীয়। কোনো কারণে দেহের কোনো অ্যাসিড, যেমন—কার্বোনিক অ্যাসিড ($CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$), ল্যাকটিক অ্যাসিড বা অন্য কোনো জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে তাকে অ্যাসিডোসিস বলে। এই অবস্থায় ঘর্মের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অ্যাসিড দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ফলে ঘর্মের প্রকৃতি অধিকতর আম্লিক হয়।

3. **জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ** (Maintenance of water balance)—ঘর্মের মাধ্যমে দেহ থেকে অতিরিক্ত জল নির্গত হয়ে দেহে জলের সাম্যতা বজায় থাকে।

4. **রেচন কাজ** (Excretory function)—ঘর্মের মাধ্যমে দেহ থেকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু যেমন জল, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ইত্যাদি দেহ থেকে রেচিত হয়।

(f) **ঘর্মক্ষরণের পদ্ধতি (Mechanism of sweating) :**

ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘর্মের ক্ষরণ একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা গ্রাহক (রিসেপটর), স্নায়ু (অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী) এবং উচ্চতর স্নায়ুর আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে।

কোনো কারণে পরিবেশের (আবহউষ্ণতা) অথবা দেহের উষ্ণতা বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাসের সামনের দিকের নিউক্লিয়াসগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি উদ্দীপিত হয়। দেহে উষ্ণতা বেড়ে গেলে অন্তস্ত্বক (ডার্মিস) অঞ্চলে অবস্থিত তাপ গ্রাহকগুলি (Hot receptors), যেমন—**রুফিনির প্রান্তস্থান** এবং **গলগি ম্যাজনীর প্রান্ত অঙ্গগুলি** উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) উৎপন্ন করে। এই স্নায়ু আবেগ ল্যাটেরাল স্পাইনোথ্যালমিক ট্র্যাক্টের (পার্শ্বদেশীয় সুষুম্না থ্যালামাসগামী সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু পথ—Sensory nerve path-এর) মাধ্যমে প্রথমে থ্যালামাসে যায়। থ্যালামাস থেকে স্নায়ু আবেগ এর পর হাইপোথ্যালামাসের অগ্রভাগে গিয়ে **প্রিওপটিক নিউক্লিয়াসকে** উদ্দীপিত করে। এছাড়া হাইপোথ্যালামাসের এই নিউক্লিয়াসটি সরাসরিও উদ্দীপিত হতে পারে, যেমন—পেশি সঞ্চালনের সময় দেহে যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তা সংবাহিত রক্তের উষ্ণতাকে বাড়ায়। এই উষ্ণরক্ত হাইপোথ্যালামাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় হাইপোথ্যালামাসের নিউক্লিয়াসগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপিত করে।
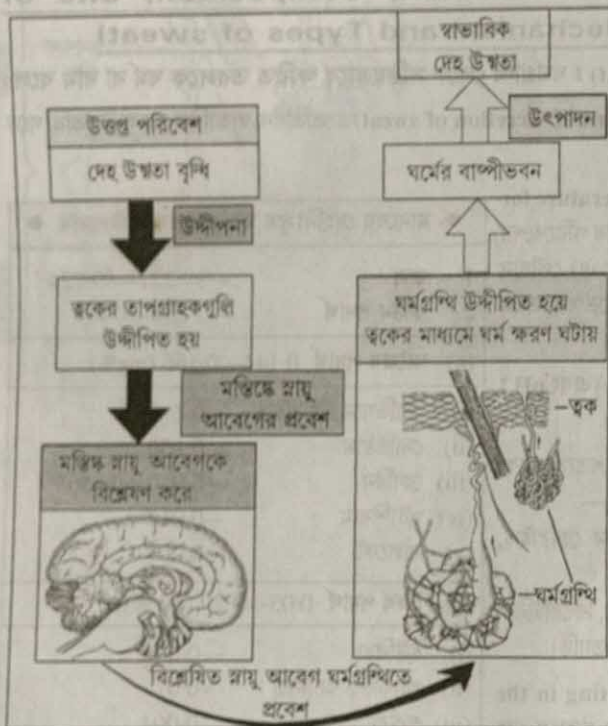
চিত্র 9.3. : ঘর্ম ক্ষরণ পদ্ধতির চিত্ররূপ।

এছাড়া **গরম** এবং **মশলাযুক্ত ঝাল খাবার খেলে** ঘর্মক্ষরণ ঘটে। মুখের তাপ এবং যন্ত্রণা গ্রাহকগুলি উদ্দীপিত হয়ে হাইপোথ্যালামাসের সামনের অঞ্চলকে উদ্দীপিত করে। হাইপোথ্যালামাসের অগ্রভাগের নিউক্লিয়াস থেকে স্নায়ুতন্তু এরপর মস্তিষ্ক কাণ্ড (Brain stem) এবং সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) মধ্য দিয়ে নেমে থোরাসিক (বক্ষ) এবং লাম্বার (Lumbar) খণ্ডাংশের পার্শ্বশৃঙ্গে (Lateral horn cell) এসে শেষ হয়। এখান থেকে প্রিগ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে গ্যাংগ্লিয়াতে শেষ হয়। এই গ্যাংগ্লিয়া থেকে **পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক স্নায়ু** নির্গত হয়ে দেহে বিভিন্ন স্থানের ঘর্মগ্রন্থিতে

শেষ হয়। যদিও এইসব স্নায়ু **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত** তবুও এদের প্রান্ত থেকে অ্যাড্রিনালিনের পরিবর্তে **অ্যাসিটাইলকোলিন** নামে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই কারণে এই ধরনের স্নায়ুকে **পোস্ট-গ্যাংগ্লিওনিক কোলিনারজিক সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্তু** (Post-ganglionic cholinergic sympathetic nerve fibre) বলে। কোনো কারণে এই ধরনের স্নায়ুতন্তু উদ্দীপিত হলে ঘর্মগ্রন্থির কুণ্ডলীকৃত অংশের গ্রন্থিকোশ থেকে ঘর্মক্ষরণ ঘটে।

**হিলটন** (Hilton) নামে একজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ করেন যে উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থিগুলি স্নায়ুতন্তুর উদ্দীপনায় যখন সক্রিয় হয় তখন তার ক্ষরণ পদার্থে **ব্র্যাডিকাইনিন উৎপাদনকারী উৎসেচক** (Bradykinin forming enzyme) থাকে। এই উৎসেচক গ্রন্থিনালির মাধ্যমে নির্গত হয়ে গ্রন্থির চারপাশের কলাকোশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে **ব্র্যাডিকাইনিন** (Bradykinin) নামে এক ধরনের পলিপেপটাইড জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। ব্র্যাডিকাইনিন একপ্রকার শক্তিশালী বাহপ্রসারক পদার্থ। উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি এবং গ্রন্থি চারপাশের ও ত্বকের রক্তবাহকে প্রসারিত করে। এর ফলে ঘর্মক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

### (g) ঘর্মক্ষরণের প্রকারভেদ (Different types of sweating) :

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ঘর্মক্ষরণের ঘটনাকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— **তাপীয় ঘর্মক্ষরণ, পেশি সঞ্চালনজাত ঘর্মক্ষরণ, আবেগজাত ঘর্মক্ষরণ** এবং **ভোজনকালীন ঘর্মক্ষরণ**।

1. **তাপীয় ঘর্মক্ষরণ (Thermal sweating) :** এই ধরনের ঘর্মক্ষরণ আবহউষ্ণতা অথবা দেহের উষ্ণতার (তাপের) বৃদ্ধিতে উদ্দীপিত হয় বলে একে **তাপীয় ঘর্মক্ষরণ** বলা হয়। তাপীয় ঘর্মক্ষরণই মানুষের দেহে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘর্মক্ষরণ।

2. **আবেগজাত ঘর্মক্ষরণ (Emotional sweating) :** মানসিক আবেগ, উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অবস্থাতে যখন দেহে ঘর্মক্ষরণ ঘটে তাকে **মানসিক ঘর্মক্ষরণ** বলে। এই প্রকার ঘর্মক্ষরণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে বিশেষ অংশে যেমন মুখমণ্ডলের কপালে (Fore head), গ্রীবা অংশে হাতের তালুতে (Palm), পদতলে (Sole) ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে ঘটে। দেখা গেছে অধিক আবেগপ্রবণ লোক কিংবা স্নায়বিকভাবে দুর্বলতাগ্রস্থ লোক শীতকালেও তাদের হাতের চেটোতে ঘাম হতে দেখা যায়। এই প্রকার ঘর্মক্ষরণে **হাইপোথ্যালামাস** এবং **গুরুমস্তিষ্কের প্রাক চেষ্টীয় অঞ্চল** (Premotor area) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

3. **পেশি সঞ্চালনজাত ঘর্মক্ষরণ (Exercise-induced sweating) :** এই ধরনের ঘর্মক্ষরণ অধিক পেশি সঞ্চালন কালে বা বেশি কায়িক শ্রম করলে দেখা যায় বলে একে **পেশিসঞ্চালনজাত ঘর্মক্ষরণ** বলে। এটি তাপীয় ঘর্মক্ষরণের অন্তর্গত, কারণ— পেশিসঞ্চালনের সময় অথবা কায়িক পরিশ্রম করলে দেহের পেশিকোশে বিপাক ক্রিয়া বেড়ে যায় ফলে দেহে তাপ উৎপাদন বাড়ে এবং ওই বর্ধিত দেহ-তাপ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘর্মক্ষরণ ঘটায়।

4. **ভোজনকালীন ঘর্মক্ষরণ (Gustatory sweating) :** অত্যন্ত ঝাল-মশলাযুক্ত খাদ্য অর্থাৎ বেশি লঙ্কা বা মশলাযুক্ত খাদ্য প্রধানত গরম অবস্থায় খেলে ঘর্মক্ষরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। মুখের ভেতরে তাপ ও যন্ত্রণা গ্রাহকগুলি উদ্দীপিত হয়ে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় এই প্রকার ঘর্মক্ষরণ ঘটাতে সাহায্য করে।

দেহের কয়েকটি অস্বাভাবিক অবস্থায়, যেমন—বমিবমি ভাব, বমি হওয়া, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়া (হাইপোগ্লাইসেমিয়া অবস্থা সৃষ্টি হওয়া) শ্বাসকষ্ট, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি অবস্থায় ঘর্মক্ষরণ হতে দেখা যায়।

### • ঘর্ম বা স্বেদ ও সেবামের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Sweat and Sebum) :

| ঘর্ম (স্বেদ) | সেবাম |
|---|---|
| 1. ত্বকের ঘর্ম বা (স্বেদ) গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত জলীয় পদার্থকে স্বেদ বলে। | 1. ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তৈলাক্ত পদার্থকে সেবাম বলে। |
| 2. এটির প্রধান উপাদান হল জল, অজৈব লবণ, ইউরিয়া ইত্যাদি। | 2. এটির প্রধান উপাদান হল—ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এস্টার, গ্লিসারল ইত্যাদি। |
| 3. ঘাম বাষ্পীভবনের মাধ্যমে দেহে জলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। | 3. সেবাম জলের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে না। |
| 4. ঘামের ক্ষরণে মাধ্যমে রেচন কার্য সম্পন্ন হয়। | 4. সেবাম দেহত্বককে তৈলাক্ত রাখে। |

## ❂ 9.4. বিদিত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ঘর্মক্ষরণ এবং অবিদিত (অতীন্দ্রিয়) বাষ্পীভবন ❂ (Sensible sweating and Insensible perspiration)

➤ **I. বিদিত ঘর্মক্ষরণ (Sensible sweating) ঃ**

❖ সংজ্ঞা—**ঘর্মগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ঘর্ম দেহত্বকের উপরিতল থেকে যে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞাতসারে ঘটে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাকে বিদিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘর্মক্ষরণ (Sensible sweating) বলে।**

➤ **II. অবিদিত বা অনুভূতিশূন্য বাষ্পীভবন (Insensible perspiration) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ দেহত্বকের উপরিতল ও শ্বসনপথ থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, সবরকম আবহউষ্ণতায় জলের যে অবিরাম বাষ্পমোচন ঘটে তাকে অতীন্দ্রিয় (অবিদিত) অনুভূতিশূন্য বাষ্পীভবন (Insensible perspiration) বলে।**

(b) **অবিদিত বাষ্পীভবনের স্বাভাবিক পরিমাণ (Normal amount of insensible perspiration) ঃ** অবিদিত ঘর্মক্ষরণের মাধ্যমে প্রতিদিন (প্রতি 24 ঘণ্টায়) **প্রায় 700–800 ml** জল দেহ থেকে নির্গত হয়। এর মধ্যে প্রায় **350 ml** ত্বকের উপরিতল থেকে অবিদিত ভাবে জলের নির্গমন ঘটে যা পরে বাষ্পীভূত হয়। বাকি **450 ml** ফুসফুস থেকে **নিশ্বাস বায়ুর** মাধ্যমে জলীয় বাষ্প আকারে দেহ থেকে নির্গত হয়।

(c) **অতীন্দ্রিয় বা অবিদিত ঘর্মক্ষরণের পদ্ধতি (Mechanism of Insensible perspiration) ঃ** আবহউষ্ণতা 28° C হলে দেহ থেকে ঘর্মক্ষরণ প্রক্রিয়া ঘটে না, তবুও দেহের উপরিতল থেকে অবিরাম জলের বাষ্পীভবন ঘটে। এই জল দেহের গভীর অংশে অর্থাৎ ত্বকের নীচে যে আর্দ্র কলাকোশ থাকে তার থেকে জলীয় অংশ ব্যাপন প্রক্রিয়া শুষ্ক ত্বকের উপরিতলে এসে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীভূত হয়। এভাবে প্রতি দিন প্রায় 350 মিলি. জল অনবরত বাষ্পীভূত হচ্ছে।

শ্বাসক্রিয়ার সময় দেহ থেকে নির্গত নিশ্বাস বায়ু আর্দ্র এবং উষ্ণ থাকে। নিশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে বলে নিশ্বাস বায়ু আর্দ্র হয়। এই কারণে নিশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে প্রতিদিন 450 মিলি. জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। অবিদিত বাষ্পীভবন এবং নিশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে দেহ থেকে অবিরাম জলের নির্গমন ঘটছে যা আমরা জানতে পারি না।

● **বিদিত ও অবিদিত ঘর্মক্ষরণের পার্থক্য (Difference between Sensible and Insensible perspirations) ঃ**

| বিদিত ঘর্মক্ষরণ (ঘর্মক্ষরণ) | অবিদিত ঘর্মক্ষরণ |
|---|---|
| 1. ঘর্মক্ষরণ একপ্রকার সক্রিয় পদ্ধতি যার ফলে ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘর্মক্ষরণ ঘটে। | 1. অবিদিত ঘর্মক্ষরণ এক প্রকার নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি যা ত্বকের নীচে অবস্থিত আর্দ্র কলাকোশ থেকে সরাসরি (কোশের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে) দেহত্বকের উপরিতলে আসে। |
| 2. এই প্রক্রিয়া দেহে সবসময় ঘটে না। | 2. এই প্রক্রিয়া দেহে সবসময় ঘটে। |
| 3. বিদিত ঘর্মক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। | 3. অবিদিত ঘর্মক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। |
| 4. যখন দেহে তাপ বাড়ে তখন এই ঘর্মক্ষরণ প্রক্রিয়া ঘটে। | 4. দেহতাপের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। |
| 5. এই ঘর্মক্ষরণ দেখা যায়, বোঝা যায় বা অনুভূত করা যায়। | 5. অবিদিত ঘর্মক্ষরণ দেখা যায় না কিংবা অনুভূত করা যায় না। |
| 6. বিদিত ঘর্মক্ষরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল এবং জলে দ্রবণীয় পদার্থসমূহ দেহ থেকে রেচিত হয়। | 6. অবিদিত ঘর্মক্ষরণের মাধ্যমে জল এবং দেহতাপ দেহ থেকে নির্গত হয়। |

❂ **দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ঘর্মগ্রন্থির বা ত্বকের ভূমিকা (Role of Sweat glands or Skin for the regulation of body temperature) ঃ**

মানুষের স্বাভাবিক দেহের উষ্ণতা 97°–98°F। কোনো কারণে দেহের উষ্ণতা বেড়ে গেলে দেহ ত্বকের **তাপগ্রাহকগুলি** উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ তৈরি করে যা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত তাপনিয়ন্ত্রক কেন্দ্রটিকে উদ্দীপিত করে। এই কেন্দ্রটি সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর মাধ্যমে ঘর্মগ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করে ফলে ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘামের ক্ষরণ

ঘটে। এই ঘাম ত্বকের উপরিতলে আসে এবং ওই স্থান থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শুকিয়ে যায়। বাষ্পীভবন হওয়ার সময় দেহ থেকে **লীনতাপ** নির্গত হয়, ফলে দেহের তাপ কমে যায় এবং দেহ ঠান্ডা হয়ে দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় থাকে।

## ◎ 9.5. দেহ-উষ্ণতা ও তার নিয়ন্ত্রণ ◎ (Body Temperature and its regulation)

❖ (a) **দেহতাপের সংজ্ঞা (Definition of Body temperature)** ঃ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপের প্রভাবে দেহে (দেহের গভীরে) যে নির্দিষ্ট তাপ বজায় থাকে তাকে দেহ-উষ্ণতা বলে।

(b) **স্বাভাবিক দেহ-উষ্ণতা (Normal Body temperature)** ঃ সাধারণত দেহের তাপমাত্রা দেহের বিভিন্ন অংশে **ডাক্তারি থার্মোমিটার** (Clinical thermometer)-এর সাহায্যে পরিমাপ করা হয়, যেমন—

(i) মুখভ্যন্তরে জিভের নীচে—(ডাক্তারি থার্মোমিটার 3–5 মিনিট সময় রেখে) —98·4° F বা 36·85°C

(ii) কুঁচকি বা বগলের নীচে—(ডাক্তারি থার্মোমিটার 3–5 মিনিট সময় রেখে) —97·4° F বা 36·30° C

(iii) পায়ুর মধ্যে (প্রাণীকে পরীক্ষার সময় মলদ্বারে ডাক্তারি থার্মোমিটারটি রেখে)—99·4° F বা 37·20° C

স্বাভাবিক অবস্থায় সারা দিনে 1·5°F-এর ওপর কখনো দেহতাপের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না।

(c) **দেহ-উষ্ণতার পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ (Factors responsible for variation of body temperature)** ঃ দেহ-উষ্ণতা যেসব কারণে পরিবর্তিত হয়, সেগুলি হল—

1. **দৈনন্দিন পরিবর্তন**—ভোরে সব থেকে কম এবং সন্ধ্যাবেলায় সবথেকে বেশি দেহ-উষ্ণতা দেখা যায়। সম্ভবত এজাতীয় পরিবর্তন (1-1·5° F) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশির সক্রিয়তার ফলে ঘটে।
2. **লিঙ্গভেদ**—মৌলবিপাকীয় হার তুলনামূলকভাবে কম বলে স্ত্রীলোকের দেহ-উষ্ণতা পুরুষের চেয়ে খানিকটা কম। এছাড়া মাসিক যৌন চক্রের ডিম্বাণু নিঃসরণের মুহূর্তে স্ত্রীলোকের দেহের তাপমাত্রা খানিকটা কমে যায়। তারপরই তাপমাত্রা যৌনচক্রের প্রথমার্ধের চেয়ে প্রায় 0·8°F বাড়ে এবং রজঃস্রাব না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই বজায় থাকে।
3. **বয়স**—চঞ্চল ও সক্রিয় শিশুদের দেহ-উষ্ণতা প্রাপ্তবয়স্কের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। আবার বৃদ্ধ বয়সে মৌলবিপাকীয় হারের হ্রাস ঘটে, এই কারণে দেহ-উষ্ণতা কমে যায়।
4. **ঠান্ডা**—দেহকে তীব্র ঠান্ডায় অনাবৃত করলে বায়ুতাপ 98°F-এর নীচে নেমে যায়।
5. **পেশিসঞ্চালন**—পেশিসঞ্চালনে দেহ-উষ্ণতা বেড়ে যায়। পেশিসঞ্চালন তীব্র হলে পায়ু উষ্ণতা 101°F-104°F পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।
6. **জ্বর**—জ্বরে দেহ-উষ্ণতা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে।
7. **আহার্য**—প্রোটিনজাতীয় খাদ্য দেহ-উষ্ণতাকে বাড়ায়। প্রোটিনের আপেক্ষিক উদ্দীপনক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।
8. **আবহাওয়া**—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাসবাসকারী মানুষের শীতপ্রধান অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের চেয়ে দেহ-উষ্ণতা তুলনামূলকভাবে 0·8°C বেশি থাকে। এছাড়া আর্দ্রতা, বায়ুচলাচল প্রভৃতি দেহ-উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটায়।

(d) **দেহ-উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ বা থার্মোট্যাক্সিস (Regulation of body Temperature or Thermotaxis)** ঃ

**মানুষ হল উষ্ণশোণিত (হোমিওথার্মিক**—Homeothermic) এবং **এন্ডোথার্মিক প্রাণী**। **কারণ**—মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (98°F—99°F বা 36·85—37·20°C) । বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও দেহ-উষ্ণতা কোনো রকম প্রভাবিত হয় না। স্বাভাবিক দেহ-উষ্ণতা বজায় রাখতে গেলে দেহের তাপউৎপাদন (Thermogenesis) ও তাপক্ষয়ের (Thermolysis) সমতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। দেহ-উষ্ণতা বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে **থার্মোট্যাক্সিস** (Thermotaxis) বলে।

(e) **দেহে তাপ উৎপাদন (Heat production in the body)** ঃ দেহে উষ্ণতা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **থার্মোজেনেসিস** (Thermogenesis) বলে। প্রধানত আহার্য বস্তুর বিপাক ক্রিয়া থেকেই দেহে তাপ উৎপাদন ঘটে। যকৃৎ, মাংশপেশি এবং দেহের অন্যান্য আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ তাপ উৎপাদনে বিশেষভাবে অংশ নেয়। মৌল বিপাকক্রিয়ার ফলে দেহে অনবরত যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেখানে যকৃতের অবদান সবচেয়ে বেশি। ঐচ্ছিক পেশিতে তাপ উৎপাদন পেশিসক্রিয়তার সমানুপাতিক। এছাড়া শীতকাঁপুনি, গরম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ প্রভৃতি কারণের জন্য দেহে তাপ কিছুটা বেড়ে যায়।

(f) **দেহে তাপক্ষয় (Heat loss in the body)** ঃ দেহে তাপক্ষয় প্রক্রিয়াকে **থার্মোলাইসিস** (Thermolysis) বলে। যেসব ভৌত প্রণালীসমূহের মাধ্যমে দেহ থেকে তাপক্ষয় সংঘটিত হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হল—দেহচর্ম থেকে বিকিরণ এবং পরিবহন ও পরিচলন। এছাড়া ঘর্মের বাষ্পীভবন ও অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন প্রশ্বাসবায়ুকে আর্দ্র ও উষ্ণীকরণ এবং মলমূত্র ত্যাগ।

| প্রণালীসমূহ | তাপক্ষয় (%) |
|---|---|
| 1. বিকিরণ এবং পরিবহন ও পরিচলন | 65 |
| 2. ত্বক দিয়ে জলের বাষ্পীভবন ও ফুসফুস থেকে $CO_2$-এর নির্গমনের সময় | 30 |
| 3. প্রশ্বাসবায়ুর উষ্ণীকরণ | 3 |
| 4. মলমূত্র ত্যাগ | 2 |
| | 100 |

(i) **বিকিরণ** (Radiation)—এই ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ থেকে প্রায় 50 শতাংশ তাপ ক্ষয় ঘটে। মানুষের দেহ থেকে 5-20 মাইক্রোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অবলোহিত রশ্মি (Infra red) বিকীর্ণ হয়। বিকিরণের মাধ্যমে দেহের তাপক্ষয় প্রধানত ত্বক উষ্ণতার ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া দেহের উপরিতলে তাপ যেহেতু রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে আসে, সেহেতু ত্বকউষ্ণতা ও রক্তপ্রবাহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

(ii) **পরিবহন ও পরিচলন** (Conduction and Convection)—এই দুটি ভৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের 15 শতাংশ তাপ নির্গত হয়। এই দুটো প্রক্রিয়া ত্বকউষ্ণতা, আবহ আর্দ্রতা, প্রান্তীয় বাহনিয়ামক ব্যবস্থা এবং পরিধেয় জামাকাপড়ের ওপর নির্ভর করে।

(iii) **দেহে বাষ্পীভবন** (Evaporation in the body)—প্রধানত দুটো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেমন—ঘর্মগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **ঘর্মের বাষ্পীভবন** এবং **অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন**। আবহউষ্ণতা 28°C-এর নীচে নামলে সাধারণত ঘর্মক্ষরণ হয় না। 29°C আবহউষ্ণতায় ঘর্মনিঃসরণ শুরু হয় এবং 35°C বা তারও অধিক আবহউষ্ণতায় নিঃসৃত ঘর্মের বাষ্পীভবন প্রধানত আবহআর্দ্রতার ওপর নির্ভরশীল। আবহআর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবন হ্রাস পায়। অতএব শুষ্ক ও অধিক উষ্ণ আবহাওয়া যতটা সহনীয়, আর্দ্র ও অধিক উষ্ণ আবহাওয়া ততটা সহনীয় নয়।

(iv) **মলমূত্রের মাধ্যমে** (Through Excreta) ঃ মল ও মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে প্রায় 2 শতাংশ দেহ তাপের ক্ষয় ঘটে।

## ❂ 9.6. হাইপোথ্যালামাস—দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা ❂ (Hypothalamus—Its role on regulation of body temperature)

➤ **হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ হাইপোথ্যালামাস হল স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র।**
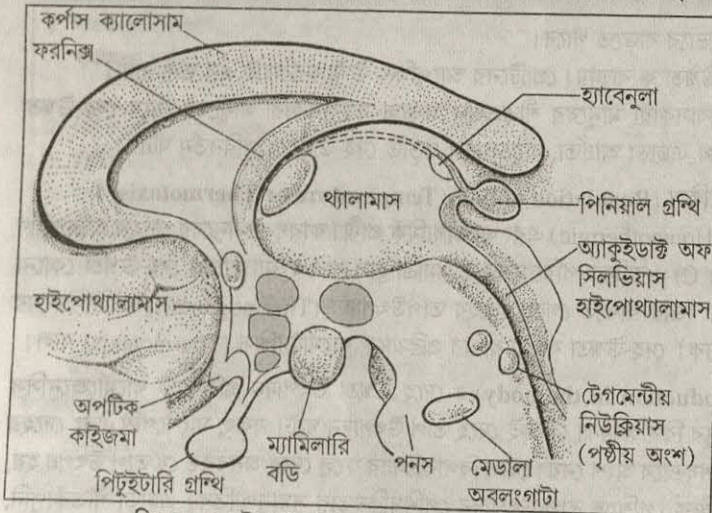
চিত্র 9.4. ঃ হাইপোথ্যালামাসের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ।

● (b) **হাইপোথ্যালামাসের গঠন (Structure of Hypothalamus)** ঃ হাইপোথ্যালামাস প্রধানত একগুচ্ছ ধূসর বস্তু (নিউক্লিয়াস) নিয়ে গঠিত। হাইপোথ্যালামাসের এই নিউক্লিয়াসকে প্রধানত তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—সম্মুখস্থ গ্রুপ (Anterior group), মধ্যাঞ্চলের গ্রুপ (Middle group) এবং পশ্চাৎ গ্রুপ (Posterior group)।

(c) **অবস্থান (Location)** ঃ হাইপোথ্যালামাস মস্তিষ্কের তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের নীচে ও পার্শ্বপ্রাচীরের ওপটিক কায়াজমার উপর থেকে ম্যামিলারি বডি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। হাইপোথ্যালামাসের পৃষ্ঠদেশে থ্যালামাস ও অঙ্কীয়দেশে পিটুইটারি থাকে।

(d) **হাইপোথ্যালামাসের কাজ (Functions of hypothalamus) :**

1. দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাস বিশেষ অংশ নেয়।

2. হাইপোথ্যালামাস যেহেতু স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ তাই এটি সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

3. অগ্র এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

4. ক্ষুধা, তৃষ্ণা, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

5. মানসিক আবেগ, উদ্‌বেগ, চাঞ্চল্য, হাসি, কান্না, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

6. মানুষের ব্যক্তিত্ব, যৌন আচরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

### ➤ দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা (Role of Hypothalamus for regulation of Body temperature) :

হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলি **তাপক্ষয়কারী কেন্দ্র** (Heat loss centre) এবং পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলি **তাপ উৎপাদনকারী কেন্দ্র** (Heat gain centre) হিসাবে পরিচিত। সম্মুখস্থ নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে **ঘর্ম ক্ষরণ, রক্তবাহের প্রসারণ** ইত্যাদি কয়েক প্রকার শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন দেখা যায়, যা দেহে তাপের ক্ষয় ঘটাতে সাহায্য করে। আবার পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে **দেহ কম্পন** (Shivering), **রক্তবাহের সংকোচন** ইত্যাদি কয়েক ধরনের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন দেখা যায়। দেহ কম্পনের ফলে পেশির সংকোচন প্রসারণ ক্রমান্বয়ে ঘটে ফলে পেশির গ্লাইকোজেন ভেঙে গিয়ে জৈব শক্তি (ATP) তৈরি হয় এবং এর থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। রক্তবাহ সংকোচনের ফলে দেহতাপের ক্ষয় কিছুটা কমে যায়। তাপউৎপাদন এবং তাপক্ষয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেহে স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় থাকে।

● **দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ এবং পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলির ভূমিকার পার্থক্য (Difference of role for the regulation of body temperature by the Anterior and Posterior group of Hypothalamic nucleus) :**

| হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াস | হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াস |
|---|---|
| 1. তাপ ক্ষয়কারী কেন্দ্র। | 1. তাপ উৎপাদনকারী কেন্দ্র। |
| 2. হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে—(i) ঘর্ম ক্ষরণ ও (ii) বাহপ্রসারণ ইত্যাদি ঘটে। | 2. হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে—(i) কাঁপুনি, (ii) বাহপ্রসারণ, (iii) লোম খাড়া, (iv) ছটফটানি ইত্যাদি ঘটে। |
| 3. সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে হাইপোথ্যালামাস থেকে কেটে বাদ দিলে— প্রাণী অধিক উষ্ণতায় সাড়া দিতে পারে না ফলে দেহের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। | 3. পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে হাইপোথ্যালামাস থেকে কেটে বাদ দিলে প্রাণী ঠান্ডা উদ্দীপনায় (শীতে) সাড়া দিতে পারবে না, ফলে দেহ ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যাবে। |

## ▲ দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Mechanism of regulation of body temperature) :

হাইপোথ্যালামাসের মাধ্যমে দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার** মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই প্রকার প্রতিবর্ত সাধারণ প্রতিবর্তের মতো প্রধান পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—**গ্রাহক, অন্তর্বর্তী স্নায়ু, স্নায়ুকেন্দ্র, বহির্বাহী স্নায়ু** এবং **ক্রিয়াস্থান**।

দেহের উপরিভাগে অর্থাৎ ত্বকের উপরিতলের ডার্মিস স্তরে বিভিন্ন প্রকার **তাপগ্রাহক** (Thermoreceptors) থাকে। এই গ্রাহকগুলি হল উষ্ণতা সংবেদন উদ্রেককারী গ্রাহক—**রুফিনির প্রান্তস্থান** ও **গলগি-ম্যাজনির অঙ্গ** এবং ঠান্ডা সংবেদন উদ্রেককারী গ্রাহক—**ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি**।

### ➤ 1. ঠান্ডা পরিবেশে দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ (Regulation of body temperature in cold environment) :

যখন পরিবেশের উষ্ণাতা (আবহউষ্ণতা) দেহ-উষ্ণতা থেকে কমে যায় তখন ত্বকে অবস্থিত ঠান্ডা গ্রাহক **ক্রাউজের প্রান্তস্ফীতি** উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ উৎপন্ন করে যা **স্পাইনোথ্যালমিক স্নায়ুপথের** মাধ্যমে কিছু অংশ গুরুমস্তিষ্কে যায় এবং বাকিটা হাইপোথ্যালামাসের প্রিঅপটিক নিউক্লিয়াসের ওপরে **পশ্চাৎ ভাগের নিউক্লিয়াসগুলিকে** (তাপ উৎপাদনকারী কেন্দ্রকে) উদ্দীপিত করে। উদ্দীপনার ফলে দেহের পেশির **কম্পন** ঘটে। কম্পনের ফলে পেশির ক্রমান্বয়ে সংকোচন-প্রসারণ ঘটে বলে পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গিয়ে ATP নামে জৈব শক্তি উৎপন্ন করে। এই জৈবশক্তির একটি বড়ো অংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া রক্তবাহের সংকোচন ঘটে বলে দেহ থেকে তাপ নির্গমনকে বাধা দেয় (অর্থাৎ তাপকে সংরক্ষিত করে)। এভাবে উষ্ণ ও ঠান্ডা পরিবেশ থেকে দেহকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় বজায় রাখতে হাইপোথ্যালামাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### ➤ 2. উষ্ণ (গরম) পরিবেশে দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ (Regulation of body temperature in hot environment) :

যখন পরিবেশের উষ্ণতা দেহের উষ্ণতা থেকে অধিক হয় তখন রুফিনির প্রান্তস্থান এবং গলগি-ম্যাজনির অঙ্গ নামে গ্রাহকগুলি উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ (Nerve impulse) উৎপন্ন করে। এই স্নায়ু আবেগ সুষুম্না-থ্যালামাস স্নায়ুপথ বা স্পাইনোথ্যালামিক ট্রাক্ট (অন্তর্বাহী) স্নায়ুপথের মাধ্যমে একাংশ **গুরুমস্তিষ্কে** যায়। বাকি অংশ হাইপোথ্যালামাসের প্রিঅপটিক (Preoptic) নামে অঞ্চলে যায় এবং সেখান থেকে **তাপনিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হাইপোথ্যালামাসে** পৌঁছায়। হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপে অবস্থিত নিউক্লিয়াসগুলিকে (তাপ ক্ষয়কারী কেন্দ্রকে) উদ্দীপিত করে। পরে এই উদ্দীপনা হাইপোথ্যালামাসের এই অংশ থেকে **বহির্বাহী (স্বয়ংক্রিয়) স্নায়ুর** মাধ্যমে দেহের প্রান্তভাগে এসে **ঘর্মগ্রন্থিগুলিকে** উদ্দীপিত করে এবং ঘর্মক্ষরণের পরিমাণকে বাড়ায়। এছাড়া
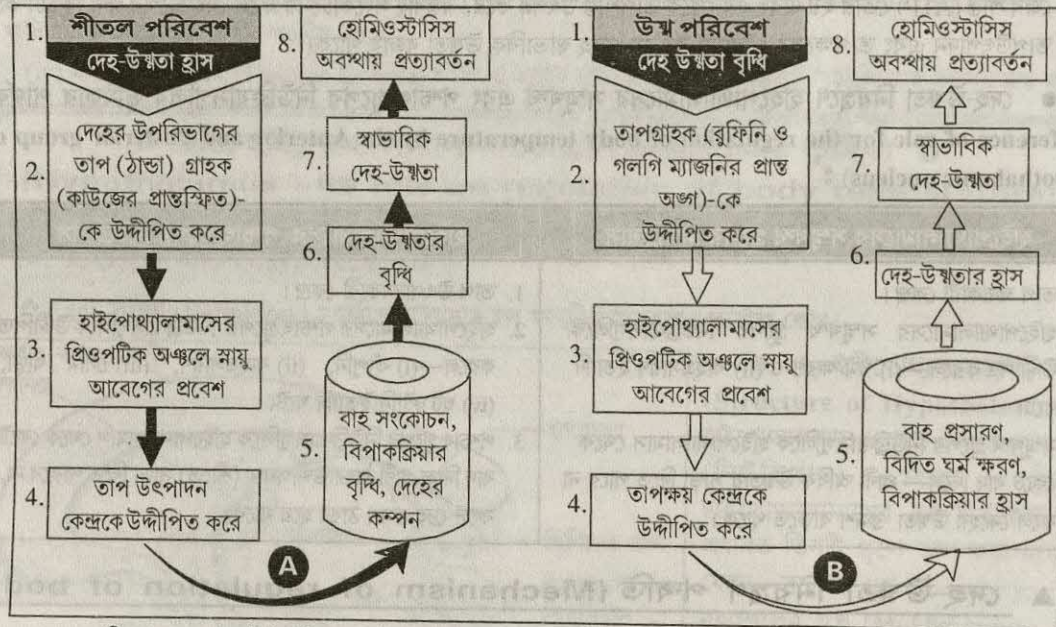
**চিত্র 9.5. :** দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা—A-কম দেহ-উষ্ণতায় হাইপোথ্যালামাসের সাড়া, B-বেশি দেহ-উষ্ণতায় হাইপোথ্যালামাসের সাড়া।

হাইপোথ্যালামাস থেকে উদ্দীপনা রক্তবাহের প্রসারণ ঘটায়। দেহত্বকের উপরিতল থেকে ঘর্ম বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে দেহ থেকে লীনতাপের অপসারিত হয়ে দেহ-উষ্ণতাকে কমিয়ে দেয়। রক্তবাহের প্রসারণের ফলে, রক্তের প্রবাহের গতি অনেকটা বেড়ে যায়। এই প্রবাহিত উষ্ণরক্ত থেকে তাপ বিভিন্ন ভৌত প্রক্রিয়ার (পরিবহন ও পরিচলন প্রক্রিয়ার) মাধ্যমে দেহের উপরিতলে (ত্বকের উপরিভাগে) আসে এবং সেখান থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই সব কারণে দেহের উষ্ণতা কমে যায়।

তাপগ্রাহকে উৎপন্ন উদ্দীপনার একটি অংশ গুরুমস্তিষ্কে যায় বলে আমরা তাপ সংবেদন বুঝতে পারি।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. ত্বকীয় তন্ত্র কাকে বলে ?**

● **ত্বকীয় তন্ত্র**—যে তন্ত্র প্রাণীর দেহের বাইরের আচ্ছাদন গঠন বাহ্যিক আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে, দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ করে তাকে ত্বকীয় তন্ত্র বলে। ত্বকীয় তন্ত্র প্রধানত ত্বক (চর্ম) নিয়ে গঠিত। এছাড়া রোম, নখ ইত্যাদিও এই তন্ত্রের অন্তর্গত।

**2. ত্বকীয় তন্ত্রের অন্তঃত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদানের নাম লেখো।**

● **অন্তঃত্বকের উপাদান**—অন্তঃত্বক বহিঃত্বকের (এপিডার্মিসের) নীচে থাকে। এর মধ্যে চুলের কাঁটার মতো রক্তজালকের লুপ, বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক (রিসেপটর), পেশিতন্তু, রোমগুলি, ঘর্মগ্রন্থি, লসিকাবাহ প্রভৃতি থাকে।

**3. কন্টক কোশ কী ? ত্বকের কোন্ স্তরে এগুলি থাকে ?**

● **কন্টক কোশ**—ত্বকে এপিডার্মিসের চতুর্থ স্তর কন্টক স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরটি বহুভুজাকৃতি কোশের সমন্বয়ে গঠিত। এদের কোশঝিল্লি অনিয়তভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং সূক্ষ্ম শাখা বা কাঁটা (Spine)-এর মতো বহির্উদ্‌গম উপরিতল থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকে। এই আকৃতির জন্য কোশগুলিকে কন্টক কোশ (Prickle cell) বলে।

**4. রৌদ্রস্নানের সময় ত্বকের গোলাপি হওয়া, তামাটে হওয়া ও ফোস্কা পড়ার কারণ কী ?**

● (i) **গোলাপি হওয়ার কারণ**—চামড়ার রঙের উপর সূর্যালোকের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। রৌদ্রস্নানের সময় তাপের এবং ত্বক-নিঃসৃত প্রোস্টাগ্লান্ডিনের প্রভাবে ত্বকীয় রক্তজালকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রসারিত হয়। এর ফলে ত্বকীয় রক্তজালকের মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায়। এই কারণে ত্বকের রং গোলাপি বা লাল হয়।

(ii) **তামাটে হওয়ার কারণ**—সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে চামড়ার মেলানোব্লাস্ট কোশ দিয়ে মেলানিন সংশ্লেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ত্বকের রং তামাটে হয়।

(iii) **ফোস্কা পড়ার কারণ**—দীর্ঘস্থায়ী প্রখর সূর্যালোকের প্রভাবে ত্বকের সজীব ও মৃত কোশ স্ফীত হয় এবং কলারস জমে যায়, ফলে ত্বকে ফোস্কা পড়ে।

**5. ত্বকীয় উপাঙ্গ বলতে কী বোঝো ? এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।**

● **ত্বকীয় উপাঙ্গ** (Appendages of the skin)—রোম (Hairs) এবং নখ (Nail) ত্বক থেকে উৎপন্ন অঙ্গকে ত্বকীয় উপাঙ্গ বলে। হাত ও পায়ের চেটো ও ঠোঁট ছাড়া দেহের প্রায় সব অংশ রোম দিয়ে ঢাকা থাকে। হাত ও পায়ের আঙুলের ডগায় কেরোটিন নামে একপ্রকার প্রোটিন (স্ক্লেরোপ্রোটিন) দিয়ে তৈরি শক্ত সামান্য বাঁকানো পাতার মতো অংশগুলিকে নখ বা নখর বলে।

**6. অ্যারাকটোর পিলি পেশি বলতে কী বোঝো ?**

● ত্বকের ডারমিস স্তরে দু-ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিতন্তু থাকে। একধরনের অনৈচ্ছিক পেশিতন্তু ডার্মিস স্তরের উপরের দিকে কেশথলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের অ্যারাকটোর পিলি পেশি (Arrector Pili muscle) বলে।

**কাজ**—অ্যারোকটোর পিলি পেশির সংকোচনে দেহের ত্বকের উপরে অবস্থিত লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এই কারণে এই প্রকার পেশিকে কোশোত্তোক পেশি বলে।

**7. মেলানোফোর কোশ কী ?**

● মেলানোফোর R. E. তন্ত্রের (Reticulo-endothelial system) হিস্টিওসাইট জাতীয় কোশ। এই কোশে মেলানিন নামে রঞ্জক কণার উপস্থিতি দেখা যায়। তবে টাইরোসিনেজ নামে উৎসেচকের অভাবে এই কোশগুলি নিজেরা মেলানিন উৎপাদন করতে পারে না। ফরসা লোক অপেক্ষা কালো চামড়া লোকের ত্বকে মেলানোফোর কোশ বেশি থাকে।

8. অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন বলতে কী বোঝো ? ব্যাখ্যা করো

● **অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন**—ত্বকের উপরিতল ও শ্বসনপথ থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে সবরকম আবহউষ্ণতায় জলের অবিরাম বাষ্পীভবনকে অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন বলে।

ব্যাখ্যা—শরীর থেকে যখন ঘাম বের হয় তখন বুঝতে পারি যে আমাদেরয় শরীর থেকে ঘামের সাথে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। একে বিদিত ঘর্মক্ষরণ বা ইন্দ্রিয়জ বাষ্পীভবন বলা হয়। কিন্তু যখন আমাদের শরীর থেকে কিছুটা জল বাইরে বেরিয়ে আসে যা আমরা বুঝতে পারি না একে বলে অতীন্দ্রিয় বাষ্পীভবন।

9. অনুষ্ণশোণিত প্রাণী এবং উষ্ণশাণিত প্রাণী বলতে কী বোঝো ?

● (ii) **অনুষ্ণশোণিত প্রাণী**—যেসব প্রাণীরা তাদের দেহ উষ্ণতা পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাদের অনুষ্ণশোণীত প্রাণী বলে। **উদাহরণ**—সরীসৃপ, ব্যাং ইত্যাদি।

(ii) **উষ্ণশোণীত প্রাণী**—যেসব প্রাণীরা তাদের পরিবেশের তাপমাত্রা পরিবর্তন সত্ত্বেও নিজেদের দেহে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে তাদের উষ্ণশোণিত প্রাণী বলে। **উদাহরণ**—মানুষ।

10. হাইপারপাইরেক্সিয়া কাকে বলে ?

● দেহের উষ্ণতা 41·2°C বা 106°F-এর বেশি হলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপারপাইরেক্সিয়া (Hyperpyrexia) বলে। হাইপারপাইরেক্সিয়ায় হৃদ্‌স্পন্দন হার ও শ্বাসপ্রশ্বাস হার বেড়ে যায়। অস্বাচ্ছন্দ্যতা সহ দুর্বলতা দেখা দেয়। হাতে-পায়ে অস্বস্তি, মাথা ধরা, মানসিক দুর্বলতা দেখা যায়। শেষে সংজ্ঞা লোপ পায়। দেহের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে 43°C বা 109°F-এর বেশি হলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

11. কেরাটিন কী ? ত্বকের কোন্ অংশে পাওয়া যায় ?

● **কেরাটিন (Keratin)**—এটি হল এক স্ক্লেরোপ্রোটিন (সরল প্রোটিন) যা ত্বক, নখ, চুল, পালক, শিং, খুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। ত্বকে উপরিতলের এপিডার্মিস স্তরে এটি পাওয়া যায়।

12. ইলেইডিন কী ?

● **ইলেইডিন (Eleidin)**—এটি হল একপ্রকার অর্ধতরল পদার্থ যা ত্বকের এপিডার্মিসের স্ট্রাটাম লুসিডাম স্তরের কোশে থাকে। ইলেইডিন সম্ভবত কেরাটিনের পূর্বসুরি পদার্থ।

13. কেরাটোহায়ালিন কী ?

● **কেরাটোহায়ালিন (Keratohyalin)**—এটি হল একটি জটিল পদার্থ যার থেকে ত্বকের এপিডার্মিস স্তরের উপরিভাগের স্ট্রাটাম কর্ণিয়ামস্থিত কেরাটিন-প্রোটিন উৎপন্ন হয়।

14. পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহত্বকে ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা কত ?

● পূর্ণবয়স্ক মানুষের ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা অনুমানিক 20-30 লক্ষ।

15. ঘামকে কেন একাধারে ক্ষরণ ও রেচন পদার্থ বলে ?

● ঘর্মগ্রন্থি সক্রিয়ভাবে যে তরল নিঃসৃত করে তাকে ঘর্ম বলে। ঘর্ম প্রধানত জল, খনিজ লবণ, ইউরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব পদার্থ নিয়ে গঠিত। ঘামে এইসব পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপাকজাত দূষিত পদার্থ থাকে। ঘামে অবস্থিত ইউরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপাকজাত পদার্থ যা ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে রেচিত হয়। তাই ঘাম হল একটি রেচন পদার্থ। অতএব ঘামকে একাধারে ক্ষরণ ও রেচন পদার্থ বলা হয়।

16. বাদামি চর্বি কী ?

● বাদামি চর্বি স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক বিশেষ ধরনের কলা যা দেহে তাপ উৎপাদনে অংশ নেয়। এই কলা প্রধানত গলায়, বুকে এবং প্রধান প্রধান রক্তনালির সংস্পর্শে থাকে যাতে তাপ দ্রুত প্রয়োজনীয় অঙ্গে যেমন—মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ধরনের কলা বিশেষভাবে উৎপন্ন ও সক্রিয় হয় সদ্যোজাত শিশুতে (মানব শিশু সমেত) এবং শীতসহিষ্ণু স্তন্যপায়ী প্রাণীতে। স্বয়ংক্রিয় ফার্নেসের মতো এই কলা শীতপীড়নে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং প্রচুর তাপ উৎপাদন করে।

**17. হাইপোথারমিয়া কী ?**

● **হাইপোথারমিয়া**—কোনো কারণে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা (37°C) থেকে কমে 30°C বা তার নীচে নেমে আসে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপোথারমিয়া বলে। এই তাপমাত্রায় হাইপোথারমিয়া অবস্থায় দেহকোশে উৎসেচকের সক্রিয়তা কমে যায় ফলে দেহের বিভিন্ন অংশের কলাকোশে বিপাক ক্রিয়া হার কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের হার এবং বল কমে যায়। শৈল চিকিৎসার সময় দেহের তাপকে কখনো-কখনো কমানো হয়।

**18. তাপীয় আক্ষেপ কাকে বলে ?**

● **তাপীয় আক্ষেপ**—দেহে তাপীয় ঘর্ম ক্ষরণের সময় প্রচুর পরিমাণ জল এবং লবণ (NaCl) ঘর্মের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই ক্ষয় যথাযথ পূরণ না হলে লবণ এবং জলের অভাবে দেহের পেশিতে যে যন্ত্রণাদায়ক সংকোচন হয় তাকে তাপীয় আক্ষেপ (হিট ক্রাম্প—Heat cramp) বলে।

**19. সর্দিগরমি কাকে বলে ?**

● **সর্দিগরমি**—যখন বাইরের পরিবেশের উষ্ণতা দেহের উষ্ণতা থেকে বেশি হয় তখন দেহ থেকে ঘামের ক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ফলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে দেহের তাপ ক্ষয় হয় না, আবার উষ্ণ পরিবেশ থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ দেহে প্রবেশ করে। এই সব কারণের জন্য দেহের উষ্ণতা প্রায় 43°C পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেহে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সর্দিগরমি (হিট স্ট্রোক—Heat stroke) বলে।

**20. অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশে অথবা শীতের সময় ঠান্ডা জলে স্নান করলে দেহে কাঁপুনি দেখা যায় কেন ?**

● **শীতকম্পন**—এটি একটি নার্ভীয় প্রক্রিয়া যা হাইপোথ্যালামাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠান্ডা জল কিংবা ঠান্ডা অনুভূতি উদ্রেককারী গ্রাহকগুলি (এন্ড বাল্‌ব অফ ক্রাউজ—End bulb of Krause) উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু আবেগ উৎপন্ন করে যা সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে হাইপোথ্যালামাসে যায় এবং হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করে। উদ্দীপনার ফলে দেহে পেশির সংকোচন-প্রসারণ ক্রমান্বয়ে (কম্পন) ঘটে। পেশির কম্পনের ফলে পেশিস্থিত গ্লাইকোজেন ভেঙে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় ফলে দেহের উষ্ণতা বাড়ে।

**21. দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ঘর্মগ্রন্থির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।**

● মানবদেহের স্বাভাবিক বা সাধারণ তাপমাত্রা 97°F – 98°F। যদি কোনো কারণে দেহের এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তবে মস্তিষ্কের তাপনিয়ন্ত্রক কেন্দ্র (হাইপোথ্যালামাস) উত্তেজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্নায়ুর মাধ্যমে ঘর্মগ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করে। ফলে ঘর্মগ্রন্থির ক্ষরণ আরম্ভ হয় অর্থাৎ অতিমাত্রায় ঘাম নিঃসরণ ঘটে। আবার চর্মে রক্তপ্রবাহের বৃদ্ধির ফলে পরিবহন (Conduction), পরিচলন (Convection) এবং বিকিরণের (Radiation) মাধ্যমে দেহ থেকে তাপমোচন ঘটে। ঘাম বাষ্পীভবন হওয়ার সময় দেহের লীনতাপ গ্রহণ করে ফলে দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং দেহ ঠান্ডা হয় ও দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ফিরে আসে।

**22. (a) উৎক্ষরা (Ecrine) গ্রন্থি কাকে বলে ?**
**(b) এদের অবস্থান উল্লেখ করো।**

● (a) **উৎক্ষরা গ্রন্থি**—মানুষের দেহে উৎক্ষরা গ্রন্থি একপ্রকার ঘর্মগ্রন্থি। এই গ্রন্থির ক্ষরিত পদার্থ ঘর্ম গ্রন্থিকোশে জমা হয় এবং কোশের কোনো ক্ষতি না করে ঘর্ম বাইরে নিঃসৃত হয়।

(b) **অবস্থান**—এই রকম ঘর্মগ্রন্থি মাথা, হাতের চেটো, পায়ের তলা ইত্যাদিতে থাকে।

**23. অপক্ষরা (Apocrine) গ্রন্থি বলতে কী বোঝো ? এদের অবস্থান উল্লেখ করো।**

● একপ্রকার ঘর্মগ্রন্থিকে অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি বা অপক্ষরা গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম। এই গ্রন্থি-নিঃসৃত ঘর্মে এক বিশেষ ধরনের গন্ধ আছে। বয়ঃসন্ধিকাল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থির সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বগল, স্তনের বোঁটা, শ্রোণি, যৌনাঙ্গের চারিপাশে, ওষ্ঠ প্রভৃতিতে অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির অবস্থান।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. ত্বকের উপরে যে স্তরটি থাকে তাকে কী বলে ?
2. এপিডার্মিসের সব থেকে অন্তঃস্থ স্তরকে কী বলে ?
3. ত্বকের যে স্তরে কন্টক কোশ পাওয়া যায় তার নাম কী ?
4. অন্তঃত্বকের যোগকলার বিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে কয়টি অংশে বিভক্ত করা হয় ?
5. ত্বকের যে স্তরে চর্বি কোশ সঞ্চিত থাকে তার নাম কী ?
6. রক্তবাহহীন এপিডার্মিস স্তরটি কীভাবে পুষ্টি পায় ?
7. হাতের চেটোতে যে ঘর্মগ্রন্থি পাওয়া যায় সেটি উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি না অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি ?
8. ত্বকে অবস্থিত কোন্ ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা অধিক ?
9. স্ত্রী লোকের স্তন যে পরিবর্তিত ঘর্মগ্রন্থি নিয়ে গঠিত তার নাম করো।
10. যে মুখ্য প্রক্রিয়ায় ঘর্ম দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম করো।
11. দেহতাপ উৎপাদনে হাইপোথ্যালামাসের কোন্ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলি দায়ী ?
12. হাইপোথ্যালামাসের কয়েকটি নিউক্লিয়াসকে উদ্দীপিত করলে কাঁপুনি হয়, তার ফলে দেহে কী পরিবর্তন ঘটে ?
13. সেবাম ত্বকের যে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় তার নাম কী ?
14. সেবাম কী ?
15. ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, সবরকম আবহাওয়ায় দেহত্বকে উপরিতল থেকে যে ঘর্মক্ষরণ ঘটে তাকে কী বলে ?
16. দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে যে ঘাম হয় তাকে কী বলে ?
17. গরম খাবার খেলে মুখের মধ্যে অবস্থিত গ্রাহক এবং নার্ভপ্রান্ত উত্তেজিত হয়ে যে ঘর্মক্ষরণ ঘটায় তাকে কী বলে ?
18. যদি দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে 30°C-32°C হয় সেই অবস্থাকে কী বলে ?
19. পরিবহন ও পরিচলন পদ্ধতিতে দেহতাপের কী পরিবর্তন ঘটে ?
20. হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে দেহউষ্ণতার কী পরিবর্তন ঘটে ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও (Put the tick (✓) mark on correct answer) :**

1. দেহের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে যেসব ঘর্মগ্রন্থি থাকে তাকে বলে—উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি □/ অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি □।
2. ঘর্মগ্রন্থিতে সরবরাহকারী স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর নাম কোলিনার্জিক সিমপ্যাথাটিক স্নায়ু □/ অ্যাড্রিনার্জিক সিমপ্যাথাটিক স্নায়ু □।
3. স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা—98·4° F □/ 97·4° F □/ 99·4° F □
4. হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াসকে—তাপ উৎপাদন কেন্দ্র □/ তাপক্ষয়কারী কেন্দ্র □ বলে।
5. অবিদিত ঘর্মক্ষরণের পরিমাণ—700-800 ml □/ 1700-1800 ml □
6. মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা—20-30 শত □ / 20-30 হাজার □ / 20-30 লক্ষ □ / 20-30 কোটি □।
7. একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন পরিবেশের স্বাভাবিক উষ্ণতায় দেহ থেকে যে পরিমাণ ঘর্ম ক্ষরিত হয় তা হল—10 ml □ / 100 ml □ / 1000 ml / □ 2000 ml □ ।
8. পরিবেশের উষ্ণতা 28° বা তার কম হলে যে ঘর্মক্ষরণ হয় তাকে বলে—বিদিত ঘর্মক্ষরণ □ / অবিদিত ঘর্মক্ষরণ □ / আবেগজনিত ঘর্মক্ষরণ □ / তাপীয় ক্ষরণ □।
9. হাইপোথ্যালামাসের অগ্রভাগে অবস্থিত নিউক্লিয়াসগুলিকে উদ্দীপিত করলে—দেহ ঠান্ডা হয়ে যায় □ / দেহের তাপ বেড়ে যায় □ / দেহে কোনো পরিবর্তন ঘটে না □ / দেহ অসাড় হয়ে পড়ে □।
10. স্বাভাবিক মানুষের মুখাভ্যন্তরে ডাক্তারি থার্মোমিটারে সাহায্যে তাপমাত্রা নিলে নিম্নলিখিতের উষ্ণতার মধ্যে কোন্‌টি হবে—36·85° C □ / 36·30° C □ / 37·20° C □ / 38·0° C □।
11. ত্বকে অবস্থিত রক্তবাহ সংকুচিত হলে—তাপক্ষয় কমে যাবে □ / তাপক্ষয় বেড়ে যাবে □ / কোনো পরিবর্তন হবে না □ / অত্যধিক ঘর্ম ক্ষরণ ঘটবে □।
12. দেহের উষ্ণতা যখন বেড়ে গিয়ে 99° F বা তার অধিক হয় সেই অবস্থাকে বলে—হাইপারথারমিয়া □ / হাইপোথারমিয়া □ / অপরিবর্তিত অবস্থা □।

13. উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থে ব্র্যাডিকাইনিন উৎপাদনকারী উৎসেচক থাকে যা ব্রাডিকাইনি নামে পলিপেপটাইডজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে, এটি বলেছেন—ডালটন ☐ / মিলটন ☐ / হিলটন ☐ / কার্লটন ☐।
14. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন স্বয়ংক্রিয় সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্তুর প্রান্ত থেকে নিঃসৃত হয়—অ্যাড্রিনালিন ☐ / অ্যাসিটাইল কোলিন ☐ / অ্যাসিটো-অ্যাড্রিনালিন জৈব তরল ☐ / প্রশমিত জলীয় অংশ ☐।
15. ঘামে জল ছাড়া প্রধান জৈব বস্তুটি হল—ইউরিয়া ☐ / অক্সালিক অ্যাসিড ☐ / ইউরিক অ্যাসিড ☐ / ল্যাকটিক অ্যাসিড ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. স্বাভাবিক অবস্থায় মুখাভ্যন্তরে দেহ-উষ্ণতা হল ——— °F।
2. যেসব প্রাণী পরিবেশে তাপের পরিবর্তন সত্ত্বেও দেহে একটি নির্দিষ্ট তাপ বজায় রাখে তাকে ——— প্রাণী বলে।
3. উৎক্ষরা গ্রন্থি থেকে সক্রিয়ভাবে ক্ষরিত তরলকে ——— বলে।
4. ঘর্মগ্রন্থিতে যে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্তু যুক্ত থাকে তাদের মুক্ত প্রান্ত থেকে ——— নিঃসৃত হয়।
5. মানসিক আবেগ, উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অবস্থাতে যখন দেহে ঘর্মক্ষরণ ঘটে তাকে ——— ঘর্মক্ষরণ বলে।
6. ——— একপ্রকার শক্তিশালী বাহপ্রসারক জৈব পদার্থ যা উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির চারপাশে থাকে।
7. অতীন্দ্রীয় ঘর্মক্ষরণের মাধ্যমে প্রায় ——— মিলি জল অনবরত ত্বকের উপরিতল থেকে বাষ্পীভূত হয়।
8. শ্বাসক্রিয়ার নিশ্বাসবায়ুর মাধ্যমে প্রতিদিন ——— ml জলীয় অংশ বাষ্প আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।
9. থার্মোলাইসিস হল তাপ ——— প্রক্রিয়া।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. মানুষের স্বাভাবিক দেহতাপ ———। (95-97°F / 97-98°F / 98-99°F / 99-100°F)।
2. মানুষের দেহত্বকের প্রধান উপাঙ্গটি হল ———। (ঘর্মগ্রন্থি / সেবেসিয়াস গ্রন্থি / নখ / শিং)।
3. ত্বকের বহিস্ত্বকে যে স্তরের কোশের কোশের সাইটোপ্লাজমে ইলেইডিন নামে দানা থাকে তার নাম ———। (কঠিন স্তর / স্বচ্ছস্তর / দানাদার স্তর / জননস্তর)।
4. সেবেসিয়াস গ্রন্থি ——— ক্ষরণ করে। (সেবাম / সেরুমেন / ঘর্ম / দুধ)।
5. অপক্ষরা গ্রন্থি দেহে বিশেষ স্থানে থাকে, তার মধ্যে একটি স্থানের নাম হল ———। (হাতের চেটো / কপাল / বগল / দেহকাণ্ডে)।
6. ঘর্ম ক্ষরণের চরম উষ্ণতা হল ———। (31°C / 37°C / 40°C / 42°C)।
7. দেহ উষ্ণতা কমে গেলে ত্বকের ডার্মিস অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাহকটি উদ্দীপিত হয়। (রুফিনের প্রান্তস্থান / ম্যাজনির প্রান্তস্থান / কাউজের প্রান্তস্ফীতি / পিসিনিয়ান করপাসল)।
8. যে প্রক্রিয়ায় দেহে তাপ উৎপন্ন হয় তাকে ——— বলে। (থারমোজেনেসিস / থারমোলাইসিস / থারমোট্যাক্সিস / এন্ডোথার্মিক)।
9. হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াস দেহে ———এর জন্য দায়ী। (তাপ নিয়ন্ত্রণ / তাপউৎপাদন / তাপক্ষয় / সব কিছুর)।
10. যে ঘর্মক্ষরণ দেখা যায় না এবং অনুভূত করা যায় না তাকে ——— বলে। (বিদিত ঘর্মক্ষরণ / ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘর্ম ক্ষরণ / অতিন্দ্রিয় ঘর্মক্ষরণ / সাধারণ ঘর্ম ক্ষরণ বলে)।

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি দেহের প্রধান গ্রন্থি যা দেহে প্রায় সব জায়গার অন্তস্ত্বকে পাওয়া যায়। ☐
2. প্রতিদিন ঘর্মগ্রন্থি থেকে প্রায় 1 লিটার ঘর্ম ক্ষরণ হয়। ☐
3. অপক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত ঘর্মে একপ্রকার বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। ☐
4. প্রকৃতপক্ষে ঘর্মগ্রন্থি দেহে কোনো রেচন কাজ করে না কিন্তু তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ☐
5. পেশিসঞ্চালনের দেহে অধিক $CO_2$ উৎপন্ন হয় বলে ঘর্মক্ষরণ ঘটে। ☐
6. বেশি ঝাল বা গরম কিছু খাওয়ার ফলে যে ঘর্মক্ষরণ ঘটে তাকে আবেগজাত ঘর্মক্ষরণ বলে। ☐
7. মানুষ তার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও গুরুমস্তিষ্কের সহযোগে দেহে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। ☐
8. হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াসগুলিকে তাপ ক্ষয় কেন্দ্র বলে। ☐
9. হাইপোথ্যালামাসের অগ্রভাগের নিউক্লিয়াসকে উদ্দীপিত করলে বাহসংকোচন, দেহের কাঁপুনি ও প্রাণীদেহে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। ☐
10. ত্বকের ডার্মিস স্তরে একপ্রকার অনৈচ্ছিক পেশি থাকে যা ডার্মিস স্তরের উপরের দিকে ও কোশথলি সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে ও এর সংকোচনে দেহের লোম খাড়া হয়। ☐

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. ঘর্ম দেহ-উষ্ণতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ? 2. তাপীয় ঘর্মক্ষরণ কী ? 3. ঝাল ও মশলাযুক্ত খাদ্য খেলে ঘর্মক্ষরণ কেন হয় ? 4. ঘর্মক্ষরণে ব্রাডিকাইনিনের ভূমিকা উল্লেখ করো। 5. দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কারণগুলি উল্লেখ করো। 6. ঘর্মগ্রন্থি দেহে কোথায় কোথায় বিস্তৃত থাকে ? 7. যে যে প্রক্রিয়ায় দেহে তাপক্ষয় ঘটে সেগুলির নাম করো। 8. এক স্বাভাবিক সুস্থ লোকের দেহ তাপ কত ? তা কীভাবে মাপা হয় ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির গঠন ও ক্ষরণ প্রকৃতি আলোচনা করো। 2. অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 3. ঘর্মক্ষরণে চরম উষ্ণতা বলতে কী বোঝো ? 4. আবেগজনিত ঘর্মক্ষরণ কাকে বলে ? 5. হাইপোথ্যালামাসের ঘর্মক্ষরণের ভূমিকা আলোচনা করো। 6. দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ঘর্মগ্রন্থির ভূমিকা উল্লেখ করো। 7. অতীন্দ্রিয় ঘর্মক্ষরণ কী ? কীভাবে এটি ঘটে ?

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. ঘর্ম এবং সেবাম। 2. বিদিত ঘর্মক্ষরণ এবং অবিদিত ঘর্মক্ষরণ। 3. ঘর্ম গ্রন্থি সেবিয়াস গ্রন্থি। 4. হাইপোথ্যালামাসের সম্মুখস্থ গ্রুপের নিউক্লিয়াস এবং হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাৎ গ্রুপের নিউক্লিয়াস।

### C. টিকা লেখো (Write short notes) :

1. দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র। 2. অতিন্দ্রীয় ঘর্মক্ষরণ। 3. ব্যাডিকাইনিন। 4. ঘর্মগ্রন্থি। 5. অপক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি। 6. ঘর্মক্ষরণের প্রকারভেদ। 7. ঘর্ম। 8. সেবেসিয়াস গ্রন্থি।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) ঘর্মগ্রন্থি কী ? (b) মানুষের দেহের বিভিন্ন প্রকার ঘর্মগ্রন্থির অবস্থান ও তাদের ঘর্মক্ষরণ পদ্ধতি আলোচনা করো।
2. (a) ঘর্মের সংজ্ঞা লেখো। (b) প্রতিদিন মোট ঘর্মক্ষরণের পরিমাণ উল্লেখ করো। ঘর্মের কাজ কী কী ?
3. (a) বিদিত এবং অবিদিত ঘর্মক্ষরণ বলতে কী বোঝো ? (b) অবিদিত ঘর্মক্ষরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
4. দেহ-উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা উল্লেখ করো।
5. ত্বকের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে লেখো।
6. দেহ উষ্ণতার পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো।
7. থার্মোজেনেসিস এবং থার্মোলাইসিস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে আলোচনা করো।
8. (a) উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থি কাকে বলে ? (b) উৎক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান এবং এর থেকে নিঃসৃত ঘর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
9. ঘর্মক্ষরণের প্রকারভেদ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

### B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the following) :

1. মানুষের ত্বকের আণুবীক্ষণিক গঠন এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো। 2. অপক্ষরা এবং উৎক্ষরা ঘর্মগ্রন্থির অবস্থান এবং শারীরস্থানিক গঠন আঁকো এবং এদের চিহ্নিত করো।

# জনন ও পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা
# [ REPRODUCTION AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY ]

## ● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



### ➧ সূচনা (Introduction) ঃ

বংশবিস্তারের জন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দেহের যেসব অংশের প্রয়োজন হয় তাদের **যৌনাঙ্গ** বলে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জনন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস, শুক্রনালি, শুক্রথলি, প্রস্টেট গ্রন্থি, কাউপারের গ্রন্থি, পেনিস ইত্যাদি নিয়ে পুং-জননতন্ত্র গঠিত। ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি বা ফ্যালোপিয়ান নালি, জরায়ু, যোনিপথ ইত্যাদি নিয়ে স্ত্রী-জননতন্ত্র গঠিত। পুরুষের শুক্রাশয় ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়কে **গোনাড** বা **মুখ্য যৌনাঙ্গ** বলে। এছাড়া অন্যান্য যৌনাঙ্গ গুলিকে **গৌণ** বা **আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ** বলা হয়। বয়ঃসন্ধিকালের পর শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় থেকে যথাক্রমে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু নামে **জননকোশ** বা **গ্যামেট** উৎপন্ন হয় এবং পুং-জনন ও স্ত্রী-জনন হরমোন ক্ষরিত হয়। এইসব হরমোন মানুষের দেহে বিভিন্ন প্রকার **যৌন বৈশিষ্ট্যের** আবির্ভাব ঘটায়।

স্ত্রীলোকের দেহে ডিম্বনালিতে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের (নিষেক) ফলে সৃষ্টি হয় জাইগোট। জাইগোট পরে বিভাজিত হয়ে **ভ্রূণ** উৎপন্ন করে। জরায়ুতে এই ভ্রূণ পরিণত হয়ে শিশুতে রূপান্তরিত হয়। এই শিশু নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার 280 দিন পর জরায়ু থেকে দেহের বাইরে ভূমিষ্ঠ হয়।

## ◎ 10.1. প্রজননতন্ত্র (Reproductive system) ◎

❖ (a) **প্রজননতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of reproductive system) : মানুষের বংশরক্ষা করার জন্য নিয়োজিত যৌনঅঙ্গসমূহ একত্রিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে প্রজননতন্ত্র বা জননতন্ত্র বলে।**

মানুষসহ অন্যান্য সব উচ্চতর প্রাণী যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে। এই প্রকারের প্রজনন ক্রিয়ায় পুরুষ ও স্ত্রী অংশগ্রহণ করে। মানবদেহে এই প্রজনন তন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে সক্রিয় হয়, একে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

### ➤ বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty or Adolescence) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে বয়সে পুরুষ ও মহিলার দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, মুখ্য যৌনাঙ্গের অন্তঃক্ষরণধর্মী কাজ এবং জনন কোশের উৎপাদন শুরু হয় সেই বয়সকে বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) বলে। অর্থাৎ জন্ম ধারণ ক্ষমতা যে বয়স থেকে শুরু হয় তাকেই বয়ঃসন্ধিকাল বলে।**

(b) **বয়ঃসন্ধিকালের বয়স (Age of puberty) :** (i) ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল—14-15 বছর এবং (ii) মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল—12-14 বছর।

(c) **বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন (Changes during puberty) :** তিন রকমের পরিবর্তন দেখা যায় যথা—

1. **শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন** (Physiological changes) : (i) **ছেলেদের**—দেহের বৃদ্ধি ঘটে, দেহ পেশিবহুল হয়, গলার স্বর ভেঙে যায় ও ভারী হয়, মুখমণ্ডলে গোঁফ ও দাড়ির আবির্ভাব হয়; দেহের বিভিন্ন স্থানে (যৌনাঙ্গের উপর, বগল, বুক প্রভৃতি স্থানে) লোম গজায়। (ii) **মেয়েদের**—দেহের বৃদ্ধি ও স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে। কণ্ঠস্বরের (মেয়েলি কণ্ঠস্বর) পরিবর্তন ইত্যাদি হয়।

2. **যৌনাঙ্গের পরিবর্তন** (Sexual changes) : (i) **ছেলেদের**—শুক্রাশয়, পেনিস, প্রোস্টেট গ্রন্থি, শুক্রথলি ইত্যাদি মুখ্য ও গৌণ যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ও সক্রিয়তা বাড়ে। শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। (ii) **মেয়েদের**—ডিম্বাশয়, যোনি, জরায়ু, ফ্যালোপিয়ান নালি ইত্যাদির বৃদ্ধি ও সক্রিয়তা বাড়ে। মাসিক যৌন চক্র (রজঃস্রাব) শুরু হয়। ডিম্বাণু উৎপাদন ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

3. **মানসিক পরিবর্তন** (Psychological changes) : পুরুষের পুরুষোচিত এবং স্ত্রীলোকের নারীসুলভ মনোভাব প্রকাশ পায়।

### ● গৌণ যৌন লক্ষণ (Secondary sex characters) ●

❖ 1. **সংজ্ঞা : মানুষের বয়ঃসন্ধিকালে যৌন হরমোনের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষের দেহে আকারগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ফলে যেসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেগুলিকে গৌণ যৌন লক্ষণ বলে।**

2. **পুরুষের মধ্যে গৌণ যৌন লক্ষণ**— পেশিবহুল দেহের গঠন, দেহের বৃদ্ধি, মুখমণ্ডলের গোঁফদাড়ির আবির্ভাব, দেহ ও বগলের লোম, শ্রোণিদেশে লোম, গাঢ় কণ্ঠস্বর ইত্যাদি পরিবর্তন বালক অবস্থা থেকে যুবাবস্থায় রূপান্তরিত করে। এই সব পরিবর্তনের পুরুষালি চেহারা এবং পুরুষালি মানসিকতা প্রকাশ পায়।

3. **স্ত্রীলোকের গৌণ যৌন লক্ষণ**— দেহে ত্বকের নীচে ফ্যাটের সঞ্চয় হয় বলে দেহ কোমল হয়। নিতম্ব, উরুদেশ প্রশস্ত হয়, স্তনের বৃদ্ধি, শ্রোণিদেশে কেশোদ্‌গম ইত্যাদি পরিবর্তন বালিকা অবস্থা থেকে যুবতি অবস্থায় রূপান্তরিত করে। এই সব পরিবর্তনের ফলে নারীসুলভ চেহারার বিকাশ ঘটে।

## ◎ 10.2. মুখ্য এবং গৌণ যৌনাঙ্গ ◎ (Primary and Secondary sex organs)

### ➤ মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড (Primary sex organs or Gonad) :

❖ (a) **মুখ্য যৌনাঙ্গের সংজ্ঞা—যেসব যৌনাঙ্গ জনন কোশ উৎপন্ন করে তাদের মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড বলে।**

(b) **মুখ্য যৌনাঙ্গের উদাহরণ :** (i) **পুরুষ**—শুক্রাশয়। এর থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

(ii) **স্ত্রী লোক**—ডিম্বাশয়। এর থেকে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।

## ➤ গৌণ যৌনাঙ্গ (Secondary sex organs) :

❖ (a) **গৌণ যৌনাঙ্গের সংজ্ঞা—মুখ্য যৌনাঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যান্য যৌনাঙ্গ যা দেহের প্রজনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের গৌণ যৌনাঙ্গ বলে।**

(b) **গৌণ যৌনাঙ্গের উদাহরণ :** 1. **পুরুষের**—এপিডিডাইমিস, শুক্রনালি, সেমিনাল ভেসিকল, প্রস্টেট গ্রন্থি, কাউপারের গ্রন্থি, পেনিস। 2. **স্ত্রীলোকের**—জরায়ু, ডিম্বনালি (ফ্যালোপিয়ান টিউব) ও যোনি ও বারথোলিন গ্রন্থি।

## ▲ পুরুষের মুখ্য এবং গৌণ যৌনাঙ্গ ▲
## Primary and Secondary sex organs of Male

চিত্র 10.1. : পুংজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং এদের সম্মুখস্থ ও পার্শ্বীয় গঠনের চিত্ররূপ।

● 1. **শুক্রাশয় (Testis)—** **শুক্রাশয় পুরুষের মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড।** ভ্রূণ দশায় শুক্রাশয় উদরগহ্বরে থাকে কিন্তু জন্ম হওয়ার প্রায় দু'মাস আগে এটি ক্রমশ নীচে নেমে আসে এবং **শুক্রাশয় থলি** (স্ক্রোটাম—Scrotum) নামে থলির মধ্যে থাকে। শুক্রাশয় থলি দেহের বাইরে পুংলিঙ্গের (Penis) গোড়ায় এবং দুটি উরুর সংযোগস্থলে থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় ডিম্বাকার, এটি ওজনে 10-20 গ্রাম হয় এবং দৃঢ় ঘন তন্তুময় আবরক বা শ্বেততন্তু বহিরাবরক বা **টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া** (Tunica albuginea) নামে দৃঢ় শ্বেততন্তুময় আবরক দিয়ে

চিত্র 10.2. : A-শুক্রাশয়ের অবস্থান এবং B-শুক্রাশয়ের অন্তস্থ গঠনের চিত্ররূপ।

আবৃত থাকে। টিউনিকা আলবুজিনিয়া থেকে উৎপন্ন **তন্তুময় প্রাচীর** বা **তন্তুপাটি** (Trabeculae) শুক্রাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে একে বহু পিরামিড সদৃশ লোবিউলে বিভক্ত করে। প্রতি লোবিউল 1-5টি কুণ্ডলীকৃত **শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা** বা **সেমিনিফেরাস টিবিউল** (Seminiferous tubules) এবং **স্ট্রোমা** (Stroma) নামে যোগ কলা দিয়ে পূর্ণ থাকে। প্রতিটি শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা ক্রমে ক্রমে সরু হয়ে **ঋজু নালিকা** (Straight tubules)-এ পরিণত হয়। ঋজু নালিকাগুলি পরস্পর জালকের মতো মিলিত হয়ে **জালক শুক্রাশয়** (Rete testis) গঠন করে। জালক শুক্রাশয়ের উপর অংশ থেকে 12টির মতো সূক্ষ্ম **বহির্মুখী নালিকা** (Efferent ducts) নির্গত হয়ে **এপিডিডাইমিস** নালিতে যায়।

● 2. **শুক্রথলি (Scrotum)**— ভ্রূণাবস্থায় শুক্রাশয় দুটি শিশুর উদরদেশে থাকে। কিন্তু গর্ভ অবস্থার আট মাসের সময় শুক্রাশয় দুটি **শুক্রাশয় থলি (স্ক্রোটাম**—Scrotum) নেমে আসে। শুক্রথলি একটি অনৈচ্ছিক পেশি নিয়ে গঠিত থলি বিশেষ। এই পেশি পরিবেশের উষ্ণতায় সাড়া দেয়, যেমন—ঠান্ডা উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে সংকুচিত হয় ফলে স্ক্রোটামটি আকারে ছোটো হয়ে যায়। এই কারণে শুক্রাশয় দুটি উপরের দিকে দেহের কাছাকাছি চলে যায়। উষ্ণ পরিবেশে শুক্রথলির পেশির প্রসারণ ঘটে, এর ফলে শুক্রাশয় দুটি দেহ থেকে দূরে সরে যায়। এই সব পরিবর্তনের জন্য শুক্রাশয়ের মধ্যে একটি অনুকূল উষ্ণতা বজায় থাকে ফলে শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে।

**● ক্রিপ্টরকিডিজম (Cryptorchidism) ●**

কোনো অস্বাভাবিক কারণে জন্মের পরেও যদি শুক্রাশয় স্ক্রোটাম থলিতে নেমে আসার পরিবর্তে উদরগহ্বরেই থেকে যায় সেই অবস্থাকে **ক্রিপ্টরকিডিজম** বলে। এই অবস্থায় **শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় না** ফলে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে বন্ধ্যাত্ব ঘটে। কিন্তু টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয় ফলে পুংযৌন লক্ষ্মণগুলি অপরিবর্তিত থাকে।

● 3. **এপিডিডাইমিস (Epididymis)**—এপিডিডাইমিস ছয় মিটার লম্বা প্রশস্ত নালি যা শুক্রাশয়ের পেছনের দিকে একপাক প্যাঁচানো থাকে। পরে এপিডিডাইমিস্ **শুক্রনালি** বা **ভাস ডেফারেন্স** (Vas deferens) হয়ে মলাশয়ের সামনে ও মূত্রনালির পেছনে থাকে। এই স্থানে অবস্থিত পেশি ও গ্রন্থি নির্মিত শুক্রথলি **সেমিনাল ভেসিকল্** (Seminal vesicle) থেকে আসা নালি এবং শুক্রনালি পরস্পর মিলে **নিক্ষেপণ নালি** (Ejaculatory duct) গঠন করে এবং মূত্রনালির প্রথমাংশে উন্মুক্ত হয়।

● 4. **আনুষঙ্গিক যৌন গ্রন্থি (Accessory Sex glands)** ঃ মূত্রনালি (Urethra) ও নিক্ষেপণ নালির সংযোগস্থলটি ঘিরে **প্রস্টেট গ্রন্থি** (Prostate gland) থাকে। এই গ্রন্থির সামান্য নীচে মটর আকৃতির **বাল্‌বোউরেথ্রাল** (Bulbourethral) বা **কাউপারের গ্রন্থি** (Cowper's) অবস্থিত। এই দুটি গ্রন্থি ছাড়া একটি করে **শুক্রথলি** (Seminal vesicle) থাকে।

(i) **প্রোস্টেট গ্রন্থি**—এটি হল একটি আনুষঙ্গিক যৌনগ্রন্থি যা মূত্রথলির নির্গমন স্থানের গোড়ায় মূত্রনালি বেষ্টন করে থাকে। কাজ—এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ মূত্রনালিকে পিচ্ছিল করে রাখে এবং ফলে শুক্র (বীর্য) স্খলন সহজ হয়।

(ii) **কাউপারের গ্রন্থি বা বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থি**—এটি সংখ্যায় দুটি আনুষঙ্গিক যৌন গ্রন্থি। এই দুটি গ্রন্থিকে দেখতে মটর দানার মতো যা প্রস্টেট গ্রন্থির নীচে থাকে ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকার সাহায্যে মূত্রনালিতে উন্মুক্ত থাকে। কাজ—এই গ্রন্থির ক্ষরণ যৌন সঙ্গমের সময় মূত্রনালিকে পিচ্ছিল করে।

(iii) **সেমিনাল ভেসিকল বা শুক্রথলি**—পুরুষের এই আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গটি মূত্রথলির গ্রীবার অঙ্কদেশের দুপাশে একটি করে শুক্রথলি থাকে। কাজ—শুক্রথলির মধ্যে শুক্রাণুগুলি অবস্থান করে।

● 5. **পেনিস (Penis)**— পেনিস নলাকার এবং স্পঞ্জের মতো উত্তোলক পেশি এবং রক্তজালক দিয়ে তৈরি পুং জননাঙ্গ। এর অগ্রভাগটি মুণ্ডাকার হয়, এটিকে **গ্লান্স পেনিস** (Glans penis) বলে। এটি **প্রিপিউস** নরম চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে।

## ✪ 10.3. শুক্রাশয় (Testis) ✪

### ▲ শুক্রাশয়ের কলাস্থানিক গঠন (Histological structure of Testis) ঃ

মানুষের প্রতিটি শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান উপাদানগুলি দেখা যায়।

● 1. **টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া** (Tunica albuginea)—প্রতিটি ডিম্বাকার শুক্রাশয় ঘন শ্বেততন্তুময় আবরক বা টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া দিয়ে আবৃত। এই আবরক থেকে উৎপন্ন তন্তুপাটি শুক্রাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এটিকে বহু পিরামিড সদৃশ খণ্ডে বা **লোবিউল** (Lobule)-এ বিভক্ত করে ( চিত্র 10.2B দেখো )।

● 2. **শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা** (সেমিনিফেরাস টিবিউল—Seminiferous tubule)—প্রতিটি শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা পাতলা **বেসমেন্ট মেমব্রেন** বা **ভিত্তিঝিল্লি** ও যোজক কলা দিয়ে আবৃত থাকে। প্রতিটি নালিকার ভিতরে 5টি কোশস্তর দেখা যায়। এই সব কোশস্তরের কোশকে **শুক্রাণু উৎপাদনকারী কোশ** (Sparmatogenic cells) বলে। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে এই শুক্রাণু উৎপাদনকারী কোশগুলি হল যথাক্রমে (চিত্র 10.4 দ্রষ্টব্য)—(i) **আদি শুক্রকোশ** (স্পার্মাটোগোনিয়া—Spermatogonia), (ii) **প্রাথমিক বা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** (Primary spermatocytes), (iii) **গৌণ বা সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** (Secondary spermatocytes), (iv) **স্পার্মাটিড** (Spermatid) এবং (v) **পরিণত শুক্রাণু** (স্পার্মাটোজোয়া—Spermatozoa)। ● কাজ—শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা থেকে শুক্রাণু (জনন কোশ) উৎপন্ন হয়।

চিত্র 10.3. : শুক্রাণু উৎপাদক নালিকায় শুক্রাণু উৎপাদনের চিত্ররূপ।

● 3. **সারটোলি কোশ** (Cells of Sertoli)—আদি শুক্রকোশ স্তরে অল্প সংখ্যক লম্বাকৃতি একপ্রকার কোশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এদের **সারটোলি কোশ** (Sertoli cell) বলে। এই কোশে সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্রতন্তু দীর্ঘাকৃতি মাইটোকন্ড্রিয়া, গ্লাইকোজেন ও স্নেহকণা ইত্যাদি থাকে। এই কোশ শুক্রাণুকে পুষ্টি জোগায়। উৎপন্ন হওয়ার পর শুক্রাণুগুলি তাদের মস্তকগুলিকে সারটোলি কোশের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পুষ্টি (গ্লাইকোজেন) লাভ করে। পুষ্টি সংগ্রহের পর আবার সারটোলি কোশ থেকে শুক্রাণু বেরিয়ে আসে এবং এই প্রক্রিয়াকে **স্পার্মিয়েশন** (Spermiation) বলে।
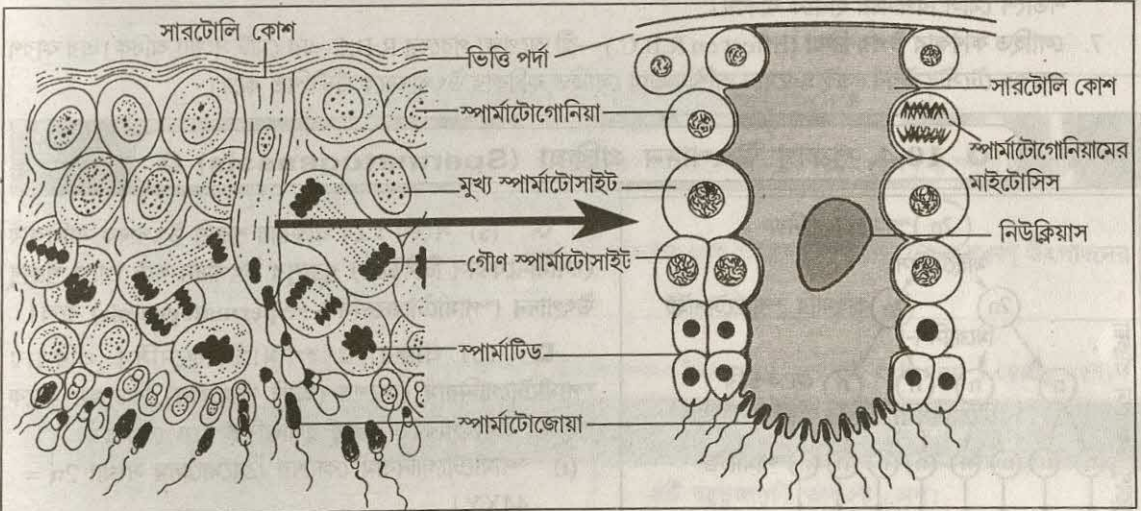
চিত্র 10.4 : A-শুক্রাণু উৎপাদনকারী কোশের বিন্যাস এবং B-একটি সরটোলি কোশের বিবর্ধিত চিত্ররূপ।

● 4. **লিডিগ-এর আন্তরকোশ** (Interstitial cells of Leydig) — সেমিনিফেরাস টিবিউলের অন্তর্বর্তী স্থানে **স্ট্রোমা** (Stroma) নামে যে যোজক কলা থাকে তার মধ্যে অসংখ্য বৃহদাকৃতি বহুভুজাকার কোশপুঞ্জের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। এদের **লিডিগ-এর আন্তরকোশ** বলে। ● **কাজ**—লিডিগের কোশগুলি টেস্টোস্টেরণ ক্ষরণ করে।

**শুক্রাশয়ের কার্যাবলি (Functions of Testis) :**

(i) **বহিঃক্ষরা কাজ—শুক্রাণুর উৎপাদন** শুক্রাশয়ের **বহিঃক্ষরা** কাজ।

(ii) **অন্তঃক্ষরা কাজ**—শুক্রাশয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হল লিডিগ-এর আন্তরকোশ থেকে **টেস্টোস্টেরন** ক্ষরণ।

## ▲ শুক্রাশয়ের হরমোন এবং তার কার্যাবলি (Testicular hormone and its functions) :

(a) **শুক্রাশয়ের হরমোন : টেস্টোস্টেরন** (Testosterone)।

টেস্টোস্টেরন একপ্রকার স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন যা লিডিগের আন্তর কোশ থেকে ক্ষরিত হয়।

(b) **টেস্টোস্টেরনের কাজ (Functions of Testosterone) :**

টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ শুক্রাশয়ের **অন্তঃক্ষরা কাজ** (Endocrine function)। পুরুষের দেহে এটি নিম্নলিখিত কাজ করে—

1. **বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন** (Puberty changes)—বয়ঃসন্ধিকালে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে পুরুষের শুক্রাশয়, পুংলিঙ্গ (Penis), শুক্রাশয় থলি প্রভৃতি যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে ও তাদের সক্রিয়তা বাড়ে।
2. **যৌন বৈশিষ্ট্যের উপর ক্রিয়া** (Effect on sex characters)—**যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ,** যেমন—গাঢ় কণ্ঠস্বর, গোঁফ-দাড়ির বিকাশ, দেহ পেশির স্থূলতা বৃদ্ধি, মেলানিন সঞ্চয়ের ফলে ত্বকের রং গাঢ় হয়, এছাড়া পুরুযোচিত যৌন ক্রিয়াকলাপ টেস্টোস্টেরন হরমোনের সাহায্যে ঘটে।
3. **শুক্রোৎপাদনের উপর ক্রিয়া** (Effect on sperm production)—টেস্টোস্টেরন শুক্রোৎপাদক নালিকাকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুর উৎপাদনে সাহায্য করে।
4. **দেহাস্থির বৃদ্ধি** (Effect on growth of bone)—এই হরমোন দেহে ক্যালসিয়াম ধারণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দেহাস্থির দৈর্ঘ্য বাড়াতে সাহায্য করে।
5. **প্রোটিন বিপাকের উপর ক্রিয়া** (Effect on protein metabolism)—প্রোটিন সংশ্লেষণ বৃদ্ধি করে দেহে প্রোটিন সঞ্চিত করে, ফলে নাইট্রোজেনের রেচন হ্রাস হয়।
6. **মৌলবিপাকীয় হারের উপর ক্রিয়া** (Effect on B.M.R.)—প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে টেস্টোস্টেরন দেহের প্রায় 30 শতাংশ মৌল বিপাকীয় হারকে বাড়ায়।
7. **লোহিত কণিকার উপর ক্রিয়া** (Effect on R.B.C.)—স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের R.B.C-এর মোট সংখ্যা অধিক। এর কারণ সম্ভবত টেস্টোস্টেরন। এই হরমোন অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকার উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে।

## ✪ 10.4. শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া (Spermatogenesis) ✪
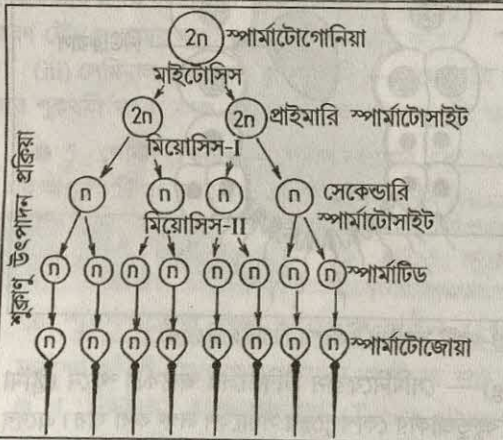
চিত্র 10.5. : শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ার পাঁচটি ধাপ।

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপাদক নালিকায় (সেমিনিফেরাস টিবিউলে) শুক্রাণুর উৎপাদন ঘটে তাকে শুক্রাণু উৎপাদন (স্পার্মাটোজেনেসিস—Spermatogenesis) বলে।**

**(b) প্রক্রিয়া :** স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় **স্পার্মাটোগোনিয়াম** কোশের **(আদি শুক্রকোশ)** বিভাজন থেকে শুরু হয় এবং পরিণত শুক্রাণু রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়।

(i) স্পার্মাটোগোনিয়াম কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n = 44XY।

(ii) **মাইটোসিস বিভাজনে** স্পার্মাটোগোনিয়াম কোশ বিভাজিত হয়ে **প্রাথমিক বা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (পরশুক্রাণু)** গঠিত করে। এই প্রকার কোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n থাকে অর্থাৎ 44XY থাকে।

(iii) প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট এরপর **প্রথম মিয়োসিস প্রক্রিয়ায়** বিভাজিত হয়ে দুটি **সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** গঠন করে। এর ফলে ওই কোশের প্রতিটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে n সংখ্যা হয়, অর্থাৎ 22X এবং 22Y হয়।

(iv) প্রতিটি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট **দ্বিতীয় মিয়োসিস প্রক্রিয়ায়** বিভাজিত হয়ে **স্পার্মাটিড** গঠন করে। এতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা একই থাকে অর্থাৎ 22X এবং 22Y।

(v) প্রতিটি স্পার্মাটিড পরিণত এবং পুষ্ট হয়ে **স্পার্মাটোজোয়াতে (শুক্রাণু)** রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি শুক্রাণুতে 22X কিংবা 22Y ক্রোমোজোম থাকে।

### (c) শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ার বিভিন্ন কারণসমূহ (Factors effecting Spermatogenesis) :

1. **হরমোন**—(i) অগ্র পিটুইটারির FSH এবং LH, (ii) শুক্রাশয়ের **টেস্টোস্টেরন** এবং (iii) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **যৌন স্টেরয়েড** ইত্যাদি হরমোন স্পার্মাটোজেনেসিসে অংশ নেয়।

2. **উষ্ণতা**—স্পার্মাটোজেনেসিস দেহতাপের 2-3°C কম তাপে ঘটে। দেহতাপ এই প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। শুক্রাশয় থলিতে (দেহের বাইরে স্ক্রোটামে) স্পার্মাটোজেনেসিসের জন্য অনুকূল উষ্ণতা পাওয়া যায়।

চিত্র 10.6. : স্পার্মাটোজেনিক (শুক্রাণু উৎপাদনকারী) কোশের ক্রমবিভাজন ও পরিণতির চিত্ররূপ।

3. **ভিটামিন**—ভিটামিন A, E, ও B-Complex-এর কোনো কোনো ভিটামিন এবং ভিটামিন C স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। ভিটামিন E-এর অভাবে পুরুষে বন্ধ্যাত্ব (Sterility) দেখা যায়।

4. **প্রোটিন**—প্রোটিন খাদ্য সেমিনিফেরাস টিবিউলের গঠনে সাহায্য করে, ফলে এর অভাবে শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**● স্পার্মাটোজেনেসিস এবং স্পার্মিওজেনেসিস ●**

1. **স্পার্মাটোজেনেসিস** (Spermatogenesis) : যে প্রক্রিয়ায় স্পারমাটোগোনিয়া থেকে শুক্রাণু বা স্পার্ম উৎপাদিত হয় তাকে শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া বা **স্পার্মাটোজেনেসিস** বলে।
2. **স্পার্মিয়োজেনেসিস** (Spermeogensis) : শুক্রাণু উৎপাদনের শেষ পর্যায়ে স্পার্মাটিড থেকে শুক্রাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **স্পার্মায়োজেনেসিস** বলে।

**● সারটোলি কোশ এবং লিডিগ কোশের পার্থক্য (Difference between Sertoli cell and Leydig cell) :**

| সারটোলি কোশ | লিডিগ কোশ |
|---|---|
| 1. এটি লম্বাকৃতি আবরণী কোশ। | 1. এটি বহুভুজাকৃতি আবরণী কোশ। |
| 2. এই কোশগুলি এককভাবে ভিত্তি পর্দা সংলগ্ন এবং স্পার্মাটোগোনিয়া কোশগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে থাকে। | 2. এই কোশগুলি একত্রিত হয়ে গুচ্ছাকারে সেমিনিফেরাস নালিকার অন্তর্বর্তী স্থানে থাকে । |
| 3. সেমিনিফেরাস নালিকার ভেতরে অবস্থান করে। | 3. সেমিনিফেরাস নালিকার বাইরে অবস্থান করে। |
| 4. সারটোলি কোশ থেকে শুক্রাণু পুষ্টি লাভ করে। | 4. লিডিগ কোশ থেকে টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয়। |
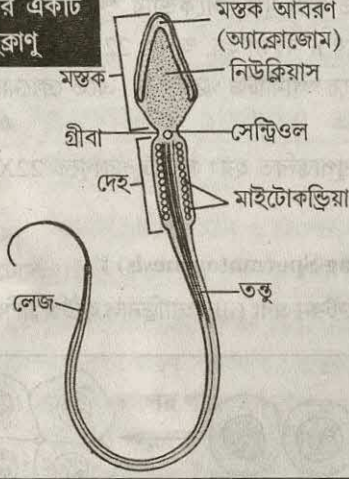
চিত্র 10.7. : এক পরিণত শুক্রাণুর গঠন।

## ◎ একটি পরিণত শুক্রাণু (শুক্রকোশ)-এর গঠন (Structure of a Sperm) :

পুং-জননকোশকে বা গ্যামেটকে **শুক্রকোশ** বা **শুক্রাণু** (Sperm) বলে। শুক্রাণু প্রধানত মস্তক, গ্রীবা, মধ্যভাগ বা দেহ ও লেজ নিয়ে গঠিত। মানুষের শুক্রাণুর **মস্তক** (মাথাটি) ডিম্বাকার, এতে নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসে DNA দিয়ে গঠিত ক্রোমোজোম থাকে। মস্তকের অগ্রভাগে টুপির মতো **অ্যাক্রোজোম** (Acrosome) থাকে। ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন ঝিল্লি বিনষ্টকারী উৎসেচক এই অ্যাক্রোজোমের মধ্যে থাকে। মস্তকের পরের অংশ **গ্রীবা**। এতে প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল থাকে। গ্রীবা থেকে কয়েকটি সূক্ষ্ম সংকোচনশীল তন্তু বা ফাইব্রিল শুক্রাণুর দেহ ও লেজের মধ্য দিয়ে নেমে গেছে। দেহ ও লেজের সংযোগস্থলে বলয়াকার সেন্ট্রিওল থাকে। দেহ এবং লেজের ফাইব্রিলকে ঘিরে মাইটোকন্ড্রিয়া দিয়ে গঠিত সর্পিল আচ্ছাদন থাকে। এই আচ্ছাদনটি লেজের শেষাংশে থাকে না।

## স্ত্রীলোকের মুখ্য এবং গৌণ যৌনাঙ্গ (Primary and Secondary sex organs of female)
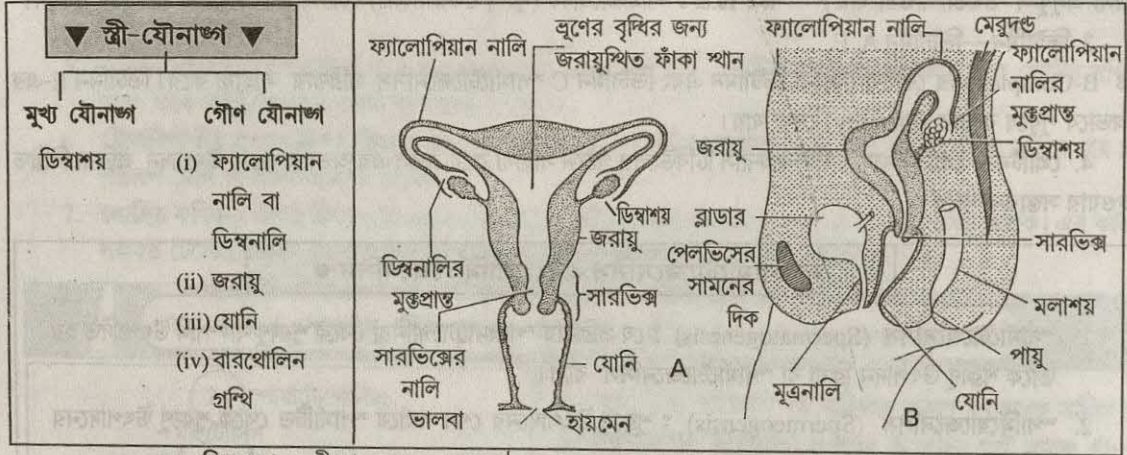
চিত্র 10.8. : স্ত্রীলোকের জননতন্ত্রের গঠন : A-জননতন্ত্রের সামনের দৃশ্য এবং B-পার্শ্ব দৃশ্য।

1. **ডিম্বাশয় (Ovary)—ডিম্বাকৃতি ডিম্বাশয় স্ত্রীর মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড**। এর সংখ্যা দুটি যা শ্রোণি গহ্বরে দুটি বৃক্কের নীচে জরায়ুর দু'পাশে **মেসোভেরিয়াম্ ঝিল্লির** সঙ্গে লেগে থাকে। প্রতিটি ডিম্বাকৃতি ডিম্বাশয় আয়তনে 3·5 × 2 × 1·4 ঘন সে.মি. এবং ওজনে 4·8 গ্রাম হয়। শ্রোণি গহ্বরের পেছনের প্রাচীরের দিকে সাসপেনসরি লিগামেন্ট দিয়ে আবদ্ধ হয়ে ফ্যালোপিয়ান নলের মুক্ত প্রান্ত থাকে। ডিম্বাশয় ধারক লিগামেন্ট (Ovarian ligament) জরায়ুর গায়ে যুক্ত থাকে।

2. **ফ্যালোপিয়ান নালি (Fallopian tube)**—এটি **ডিম্বনালি** (Oviduct) নামেও পরিচিত। এটি পেশিনির্মিত নলাকার অংশ যার চারটি অংশ আছে, যেমন **ইনফান্ডিবুলাম, অ্যাম্পুলা** (Ampulla), **ইথ্মাস** (Isthmus) এবং **জরায়ুর অংশ**। ইনফান্ডিবুলাম প্রান্তটি ফানেলের মতো প্রশস্ত ও আঙুলের মতো প্রবর্ধকযুক্ত দেখতে হয়। এদের **ফিমব্রি** (Fimbriae) বলে। ডিম্বনালি দুটির অন্য প্রান্তগুলি (জরায়ু অংশ) পেশিবহুল যা জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

3. **জরায়ু (Uterus)**—দুটি অংশে বিভক্ত যথা—**দেহ** (Body) ও **সারভিক্স** (Cervix)। সারভিক্স নালির মাধ্যমে সারভিক্স যোনিতে যুক্ত হয়। জরায়ুর দেহের উপরের অংশটি গম্বুজাকৃতি হয় এবং একে **ফান্ডাস** (Fundus) বলে। পরের অধিকাংশ শঙ্কু আকৃতির হয়।

4. **যোনি (Vagina)**—এটি শক্ত তন্তুময় এবং কিছুটা অনৈচ্ছিক পেশি নির্মিত প্রাচীর নিয়ে গঠিত নলাকার অংশ। এটি 7-10 সেন্টিমিটার দীর্ঘ যোনি মূত্রনালির পেছন দিয়ে এসে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। যোনি এবং মূত্রনালির উন্মুক্ত প্রান্তকে ঘিরে **লেবিয়া মেজোরা** (Labia majora) ও **লেবিয়া মাইনোরা** (Labia minora) নামে লম্বালম্বিভাবে ঠোঁটের মতো **ভালবা** (Valva) থাকে। যোনির সম্মুখভাগের অগ্র দেশে লুপ্তপ্রায় **ক্লিটোরিস** (Clitoris) থাকে।
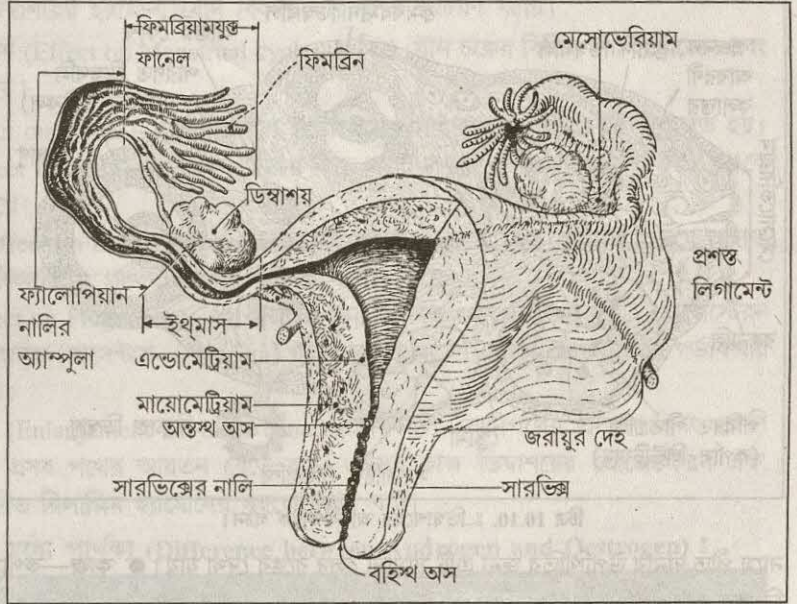
চিত্র 10.9. : স্ত্রীলোকের জননতন্ত্রের—ডিম্বাশয়, ফ্যালোপিয়ান নালি ও জরায়ুর অন্তর্গঠন।

● **জনন অঙ্গের কাজ (Functions of Sex organs) :**

1. **জনন কোশ উৎপাদন**—শুক্রাশয় থেকে **শুক্রাণু** এবং ডিম্বাশয় থেকে **ডিম্বাণু** নামে যৌন জনন কোশ বা গ্যামেট উৎপন্ন হয়। 2. **হরমোন ক্ষরণ**—শুক্রাশয় থেকে **টেস্টোস্টেরন** এবং ডিম্বাশয় থেকে **ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন ও রিলাক্সিন** নামে হরমোন ক্ষরিত হয়। 3. **পুরুষের শুক্রাশয় এবং অন্যান্য সহায়ক যৌন গ্রন্থি** (Accessory sex glands), যেমন—সেমিনাল ভেসিকল (দুটি), প্রোস্টেট গ্রন্থি (দুটি) এবং বাল্বোউরেথ্রাল গ্রন্থি (দুটি)—এই গ্রন্থিগুলি থেকে ক্ষরিত রস শুক্রাণুর সঙ্গে মিশে **শুক্ররস** বা **বীর্য** ( সিমেন-Semen ) বা **সেমিনাল ফ্লুইড** (Seminal fluid) নামে ঘন অর্ধতরল পদার্থ তৈরি করে। 4. **নিষেক ক্রিয়া**—শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন স্ত্রী দেহের ফ্যালোপিয়ান নালিতে ঘটে। 5. **ভ্রূণ গঠন**—স্ত্রীর জননাঙ্গে অর্থাৎ জরায়ুতে ভ্রূণের ও প্লাসেন্টার গঠন ঘটে।

## ✪ 10.5. ডিম্বাশয় (Ovary) ✪

### ▲ ডিম্বাশয়ের কলাস্থানিক গঠন (Histological structure of Ovary) :

(a) ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত অংশ দেখা যায়।

1. **প্রজনন কলা বা জারমিনাল এপিথেলিয়াম** (Germinal epithelium)—প্রতিটি ডিম্বাশয় একস্তর **ঘনকাকার** (Cubical) আবরণী কলা কোশের স্তর নিয়ে গঠিত। এই স্তরটি ডিম্বাশয়কে আবৃত করে রাখে। ● **কাজ**—এই স্তর থেকে গ্র্যাফিয়ান ফলিকল বা পরিণত ডিম্বথলি উৎপন্ন হয়।

2. **শ্বেততন্তু বহিরাবরক বা টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া** (Tunica albuginea)—এটি শ্বেততন্তু এবং স্বল্প কোশ নিয়ে গঠিত পরবর্তী পাতলা স্তর যা প্রজনন কলার নীচে থাকে।

3. **স্ট্রোমা** (Stroma)— স্ট্রোমা প্রধানত যোজক কলা নিয়ে গঠিত এবং টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এতে কিছু সংখ্যক দুমুখ সূচালো কোশ, অনৈচ্ছিক পেশি, রক্তবাহ, লসিকাবাহ, স্নায়ু ইত্যাদি থাকে। এছাড়া এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিম্বথলি ও পীতগ্রন্থি থাকে। ● **কাজ**—স্ট্রোমা এবং টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া ডিম্বাশয়ের কাঠামো গঠন করে। এর মধ্যে অবস্থিত রক্তবাহ ডিম্বাশয়কে পুষ্টি, অক্সিজেন প্রভৃতি সরবরাহ করে।

4. **ডিম্বথলি বা ফলিকল** (Follicles)—ফলিকল কলাকোশের ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো অংশ যা বিভিন্ন অবস্থায় ডিম্বাশয়ের স্ট্রোমার মধ্যে থাকে। তিন রকমের **ফলিকল** বা **ডিম্বথলি** দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—**আদি ডিম্বথলি** (Primordial follicle), **ক্রমবর্ধমান** বা **বাড়ন্ত ডিম্বথলি** (Growing follicle) এবং **পরিণত ডিম্বথলি** বা **গ্র্যাফিয়ান ফলিকল** (Graafian follicle)। ● **কাজ**—পরিণত ডিম্বথলি **ডিম্বাণু** উৎপন্ন করে ও **ইস্ট্রোজেন** হরমোন নিঃসৃত করে।

চিত্র 10.10. : ডিম্বাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন।

5. **পীতগ্রন্থি বা কর্পাস লিউটিয়াম** (Corpus Luteum)—কর্পাস লিউটিয়াম বিদীর্ণ গ্রাফিয়ান ফলিকলের পরিবর্তিত রূপ। বিদীর্ণ ডিম্বাণুশূন্য গ্র্যাফিয়ান ফলিকলটি পরবর্তীকালে **পীতগ্রন্থি** বা **কর্পাস লিউটিয়াম**-এ রূপান্তরিত হয়। কর্পাস লিউটিয়াম স্তম্ভের মতো বৃহদাকৃতি কোশপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত। কোশগুলিতে **লিউটিন** (Lutein) নামে পীত দানার উপস্থিতির জন্য এটি সামান্য হলুদ রঙের দেখা যায়। ● **কাজ**—কর্পাস লুটিয়াম **প্রোজেস্টেরন** নামে হরমোন নিঃসৃত করে।

6. **আন্তরকোশ বা ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ** (Interstitial cell) — আন্তরকোশগুলি লিপিডপূর্ণ বহুভুজাকৃতি আন্তরকোশ। এরা অবিদীর্ণ ফলিকল থেকে উৎপন্ন হয় ও স্ট্রোমার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। ● **কাজ**—সম্ভবত ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে।

## ▲ ডিম্বাশয়ের হরমোন এবং তার কার্যাবলি (Ovarian hormones and their functions) :

➤ (a) **ডিম্বাশয়ের হরমোন :** ডিম্বাশয় থেকে প্রধানত তিনপ্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়, যেমন—ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন।

(i) **ইস্ট্রোজেন**—এটি স্টেরয়েডজাতীয় হরমোন যা পরিণত ডিম্বথলির থিকা ইন্টারনা থেকে নিঃসৃত হয়।

(ii) **প্রোজেস্টেরন**—এটি স্টেরয়েডজাতীয় হরমোন যা কর্পাস লিউটিয়াম থেকে ক্ষরিত হয়।

(iii) **রিল্যাক্সিন**—এটি পলিপেপটাইডজাতীয় হরমোন যা গর্ভাবস্থায় সম্ভবত কর্পাস লিউটিয়াম থেকে নিঃসৃত হয়।

এছাড়া **অ্যান্ড্রোজেন** নামে অন্য একটি স্টেরয়েড হরমোন ডিম্বাশয়ে ইস্ট্রোজেন তৈরি হওয়ার সময় স্বল্পমাত্রায় পাওয়া যায়।

➤ (b) **ডিম্বাশয়ের কার্যাবলি (Functions of Ovary) :**

(i) **বহিঃক্ষরা কাজ** (Exocrine function) — ডিম্বাশয় থেকে **ডিম্বাণু** (Ovam) উৎপন্ন হয়। ডিম্বাণু উৎপাদন ডিম্বাশয়ের **বহিঃক্ষরা কাজ**।

(ii) **অন্তঃক্ষরা কাজ** (Endocrine function) — স্বাভাবিক অবস্থায় **ইস্ট্রোজেন** এবং **প্রোজেস্টেরন** হরমোন ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরিত হয়। এটি ডিম্বাশয়ের **অন্তঃক্ষরা কাজ**। ডিম্বাশয়ের অধিকাংশ কাজের জন্য ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দায়ী। এই সব হরমোন স্ত্রীলোকের বিভিন্ন প্রকার অন্তঃক্ষরা (Endocrine) কার্যাবলি নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন করে, যেমন—

### ● ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের কাজ (Functions of Oestrogen and Progesterone) :

1. **বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন** (Puberty changes)–বয়ঃসন্ধিকালে বালিকা অবস্থা থেকে যুবতি অবস্থায় আসার ফলে আনুষঙ্গিক (Accessory) যৌনাঙ্গসমূহের যেমন—ডিম্বাশয়, জরায়ু, যোনিপথ, ফ্যালোপিয়ান নালি ইত্যাদি যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা **ইস্ট্রোজেন** ও **প্রোজেস্টেরন হরমোনের** সাহায্যে ঘটে।

2. **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব** (Effect on Secondary sex characters)–**ইস্ট্রোজেনের** সাহায্যে নারীসুলভ চেহারার বিকাশ লাভ ঘটে, যেমন—দেহের বিভিন্ন স্থানে চর্বির সঞ্চয় ঘটে ফলে নিতম্ব ও উরুদেশ প্রশস্ত হয়ে ওঠে; স্তনগ্রন্থি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ডিম্বাশয়ের হরমোন, যৌন বিকাশ, নারীসুলভ আচরণ ঘটায়।
3. **মাসিক যৌন চক্রের উপর প্রভাব** (Effect on Menstrual cycle)–মাসিক যৌন চক্রের বিভিন্ন দশা **ইস্ট্রোজেন** এবং **প্রোজেস্টেরন** দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।
4. **দেহাস্থির উপর প্রভাব** (Effect on Bones)–বয়ঃসন্ধিকালে **ইস্ট্রোজেনের** সাহায্যে দেহাস্থির বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়।
5. **দেহত্বকের উপর প্রভাব** (Effect on Skin)–**ইস্ট্রোজেন** ত্বকের নীচে ফ্যাট সঞ্চয় ও রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে ত্বককে কোমল ও মসৃণ এবং উষ্ম রাখে।
6. **স্তনের বৃদ্ধির উপর প্রভাব** (Effect on Breast development)–**ইস্ট্রোজেন** স্তনের মধ্যে স্নেহদ্রব্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে। **প্রোজেস্টেরন** স্তনের গ্রন্থিলতি ও গ্রন্থিথলির পূর্ণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
7. **গর্ভাবস্থার উপর প্রভাব** (Effect on Pregnancy)–এই কাজটির জন্য প্রধানত **প্রোজেস্টেরন** দায়ী। প্রোজেস্টেরন জরায়ুতে ডিম্বাণু রোপণে এবং অমরা (প্লাসেন্টার—Placenta) গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া প্রোজেস্টেরন গর্ভাবস্থায় জরায়ুর সংকোচনকে বাধা দেয়।
8. **যোনি বা প্রসব পথের বৃদ্ধি** (Enlargement of birth canal)–প্রসবকালে যোনিপথের প্রসারণ এবং শ্রোণি লিগামেন্টের শৈথিল্যের ফলে প্রসব পথের আয়তন বেড়ে যায়। এইসব কাজ ডিম্বাশয়ের **প্রোজেস্টেরন** এবং গর্ভাবস্থায় প্লাসেন্টা থেকে ক্ষরিত **রিলাক্সিন** হরমোনের সহযোগিতায় ঘটে।

● **অ্যান্ড্রোজেন ও ইস্ট্রোজেনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Androgen and Oestrogen) :**

| অ্যান্ড্রোজেন | ইস্ট্রোজেন |
|---|---|
| 1. এটি পুং-যৌন হরমোন যা টেস্টোস্টেরন নামে পরিচিত। | 1. এটি স্ত্রী-যৌন হরমোন। |
| 2. শুক্রাশয় এবং অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে থেকে ক্ষরিত হয়। | 2. ডিম্বাশয়, প্লাসেন্টা এবং অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত হয়। |
| 3. 19টি কার্বন পরমাণুযুক্ত স্টেরয়েড হরমোন। | 3. 18টি কার্বন পরমাণুযুক্ত স্টেরয়েড হরমোন। |
| 4. **কাজ**—পুরুষের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি, যৌন বিকাশে ও পুরুষত্ব লাভে সাহায্য করে। | 4. **কাজ**—স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি, যৌন বিকাশে ও স্ত্রীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সাহায্য করে। |

## ➤ ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়াতে প্রতি মাসিক যৌনচক্রের 14 দিনে একটি পরিণত ডিম্বথলি (গ্র্যাফিয়ান ফলিকল) ফেটে গিয়ে ডিম্বাণু নির্গত হয় তাকে ডিম্বাণু নিঃসরণ বা ওভুলেশন বলে।**

(b) **পদ্ধতি :** বয়ঃসন্ধিকালের পর প্রতি মাসিক যৌন চক্রে 10-14 দিনের মধ্যে একটি অপরিণত ডিম্বথলি (Primordial follicle) পরিণত ডিম্বথলিতে (গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে) রূপান্তরিত হয়। পরিণত কালে ডিম্বথলির মধ্যে একটি ফাঁকা স্থান গঠিত হয় ও এটি ক্রমশ আয়তনে বাড়তেথাকে। এই ফাঁকা স্থানটিকে **আনট্রাম** (Antram) বলে। ফাঁকা স্থানটির আয়তন ক্রমশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে এক রকমের তরল (liquid) পদার্থ জমা হয়। এই তরলকে **লিকার ফলিকুলি** (Liquor folliculi) বলে। আনট্রামে তরল পদার্থ জমা হওয়াতে অন্তঃফলিকুলার (Intrafollicular) চাপ দ্রুত বাড়ে যা ডিম্বথলিটিকে ফাটিয়ে (বিদীর্ণ করে) **পরিণত ডিম্বাণু নির্গত** করে।

ডিম্বাণু নিঃসরণ পদ্ধতি অগ্রপিটুইটারির FSH এবং LH সরাসরি সাহায্য করে। এছাড়া ডিম্বাশয়ে ইস্ট্রোজেন হরমোন, কয়েকটি ভিটামিন (ভিটামিন—E, A, C ইত্যাদি) এবং সুষম খাদ্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

## ✪ 10.6. ডিম্বাণু উৎপাদন পদ্ধতি (Oogenesis) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা : ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে ডিম্বাণু উৎপাদন বা উজেনেসিস (Oogenesis) বলে।**

(b) **প্রক্রিয়া** ঃ (i) ডিম্বাশয়ের আদি ডিম্বথলির কেন্দ্রের কোশটি আস্তে আস্তে বেড়ে **আদি ডিম্বাণু** (Oogonium) গঠন করে। এটি ক্রমশ আরও বড়ো হয় এবং তার চারপাশের কোশস্তর থেকে আলাদা হয়ে **প্রাথমিক পরডিম্বাণু** বা **প্রাইমারি উসাইট** গঠন করে। এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n) অর্থাৎ 44XX।

চিত্র 10.11. ঃ উজেনেসিস বা ডিম্বাণু উৎপাদন ক্রিয়া।

(ii) **প্রাথমিক পরডিম্বাণু** মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় গৌণ **পরডিম্বাণু** নামে অর্ধপরিণত ডিম্বাণু এবং প্রথম **পোলার বডি** নামে ছোটো একটি কোশ উৎপন্ন করে। এই দু'প্রকার কোশের প্রতিটিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক (n) হয়ে যায়। অর্থাৎ 22X এবং 22X হয়।

(iii) এরপর LH প্রভাবে গ্র্যাফিয়ান ফলিকলটি ফেটে যায়। ফলে সেকেন্ডারি উসাইট এবং পোলার বডি **ফ্যালোপিয়ান নালির** মুক্ত প্রান্তে (মুখের) মধ্যে যায়।

(iv) সেকেন্ডারি উসাইট জোনা **পেলুসিডা** নামে একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দা ও তার বাইরে বিচ্ছিন্ন গ্রাণুলোসা কোশ নিয়ে গঠিত করোনা রেডিয়াটা নামে কোশস্তরে ঘেরা থাকে। এরপর এটি ফ্যালোপিয়ান নালির অ্যাম্পুলা নামে অংশে যায়।

(v) নালির এই অংশে শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন ঘটলে অর্থাৎ নিষেক হলে সেকেন্ডারি উসাইট আর একবার কোশবিভাজনের মাধ্যমে একটি **পরিণত ডিম্বাণু** (Mature ovum) ও **দ্বিতীয় পোলার বডি** গঠিত করে।

● **পুরুষ জনন কোশ এবং স্ত্রী জনন কোশের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Male gamete and Female gamete) ঃ**

| পুরুষ জনন কোশ (শুক্রাণু) | স্ত্রী জনন কোশ (ডিম্বাণু) |
|---|---|
| 1. শুক্রাশয়ে উৎপন্ন জনন কোশকে শুক্রাণু বলে। | 1. ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন জনন কোশকে ডিম্বাণু বলে। |
| 2. স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। | 2. উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। |
| 3. ব্যাঙাচির মতো দেখতে হয় এবং মস্তক, গ্রীবা ও লেজ নিয়ে গঠিত। | 3. মোটামুটি গোলাকৃতি। |
| 4. 22 + X অথবা 22 + Y ক্রোমোজোম থাকে। | 4. সর্বদাই 22 + X ক্রোমোজোম থাকে। |

## ▲ গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের গঠন (Structure of Graafian follicle) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতিমাসে যে-কোনো একটি ডিম্বাশয়ের অপরিণত ডিম্বথলি অগ্র পিটুইটারির FSH-এর উপস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়ে যে পরিণত ফলিকল উৎপন্ন হয় তাকে গ্র্যাফিয়ান ফলিকল বলে।**

(b) **গঠন**—গ্র্যাফিয়ান ফলিকল অনেকগুলি কোশ নিয়ে গঠিত। এর কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বড়ো ডিম্বাকার কোশকে **ডিম্বাণু** (Ovum) বলে। ডিম্বাণুকে ঘিরে কয়েকস্তর **গ্র্যানুলোসা কোশ** থাকে। এই কোশপুঞ্জের মধ্যে **লিকার ফলিকুলি** (Liquor folliculi) নামে তরলপূর্ণ একটি ফাঁকা স্থান থাকে। ফাঁকা স্থানটিকে **আনট্রাম** (Antrum) বলে। গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে **থেকা এক্সটারনা** (Theca externa) এবং **থেকা ইনটারনা** (Theca interna) নামে দুটি বহিস্থ আচ্ছাদনী কোশস্তর দিয়ে ঘেরা থাকে। গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের গঠনে পিটুইটারির FSH বিশেষভাবে অংশ নেয়।
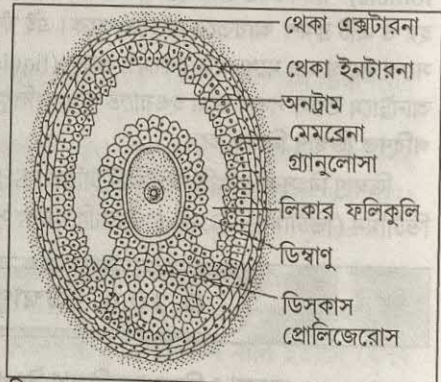
চিত্র 10.12. ঃ গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের গঠনের চিত্ররূপ।

(c) **কাজ**—গ্রাফিয়ান ফলিকল মানুষের দেহে দুটি কাজ করে—(i) গ্র্যাফিয়ান ফলিকল ডিম্বাণু (স্ত্রী জনন কোশ) উৎপন্ন করে। (ii) এর থেকে ইস্ট্রোজেন নামে যৌন স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরিত হয়।

**● অ্যাট্রেটিক ফলিকল (Atretic follicle) ●**

ডিম্বাশয়ে যে সব ডিম্বথলি (ফলিকল) পরিণত ফলিকলে অর্থাৎ গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে রূপান্তর হতে পারে না এবং সম্পূর্ণ পরিণত হওয়ার আগে তাদের বিনাশ ঘটে, তাকে **অ্যাট্রেটিক ফলিকল** বলে।

### ▲ কর্পাস লুটিয়াম (Corpus Luteum) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণের পরে, প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণকারী যে পীতকলা গঠিত হয়, তাকে কর্পাস লুটিয়াম বলে।**

(b) **গঠন :** বিদীর্ণ ডিম্বথলিটি একপ্রকার হলুদ রঙের দানাযুক্ত লিউটিন কোশ দিয়ে পূর্ণ হয়ে **কর্পাস লুটিয়াম** গঠন করে।

(c) **কাজ**—কর্পাস লুটিয়াম থেকে **প্রোজেস্টেরন হরমোন** ক্ষরিত হয়।

## ❂ 10.7. মাসিক যৌনচক্র বা রজঃচক্র (Menstrual cycle) ❂

❖ (a) **মাসিক যৌনচক্রের সংজ্ঞা (Definition of menstrual cycle) : স্ত্রীলোকের যৌন জীবনকালে প্রতি 28 দিন অন্তর জরায়ু, ডিম্বাশয় ও দেহের অন্যান্য যৌনাঙ্গে যেসব পরিবর্তন হয় এবং শেষ 3-5 দিন অন্তজরায়ুর (এন্ডোমেট্রিয়ামের) অবক্ষয়ের ফলে রক্তস্রাব (রজঃস্রাব) ঘটে তাকে মাসিক যৌনচক্র বা রজঃচক্র বলে।**

(b) **মাসিক যৌনচক্র কখন হয় না?**—(i) বয়ঃসন্ধিকালের আগে (12 বৎসরের আগে) (ii) গর্ভাবস্থায় এবং (iii) বেশি বয়সে অর্থাৎ 45-55 বৎসর বয়সে মাসিক যৌন চক্র বন্ধ থাকে একে **রজোনিবৃত্তি** (**মেনোপোজ**—Menopause) বলে।

(c) **মাসিক যৌনচক্রের রজঃস্রাব দশায় নির্গত রক্তের উপাদান (Composition of menstrual blood) :** (i) রক্ত (30-40 ml), (ii) স্তরীভূত এন্ডোমেট্রিয়াম (অন্তজরায়ুর আবরণী কলার স্তর), (iii) মিউকাস (শ্লেষ্মা), (iv) শ্বেত রক্তকণিকা এবং (v) একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণু।

(d) **মাসিক যৌনচক্রের প্রক্রিয়া (Process of menstrual cycle) :** স্ত্রীলোকের মাসিক যৌনচক্র একটি জটিল প্রক্রিয়া যা সম্পূর্ণভাবে অগ্রপিটুইটারি এবং ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন প্রকার হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি মাসিক যৌনচক্র বা রজঃচক্র চারটি দশায় বিভক্ত। এই দশাগুলি বিভিন্ন হরমোনের (FSH, LH, ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরণ) সাহায্যে দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রধানত জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন ঘটায় এবং শেষে অন্তজরায়ুর অবক্ষয় ঘটায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে **রক্তস্রাব বা রজঃস্রাবের শুরু হওয়ার দিনটিকে রজঃচক্রের প্রথম দিন হিসাবে ধরা হয়।**

প্লাজমিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা জরায়ু থেকে উৎপন্ন হয় তা জরায়ু মধ্যস্থ তঞ্চিত রক্তকে তরলীকৃত করে।

### ▲ মাসিক যৌনচক্রের প্রক্রিয়া (Process of menstrual cycle) :

মাসিক যৌনচক্র বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ঘটে এবং চারটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। এই পর্যায়গুলি হল—(1) বিশ্রামরত দশা এবং ক্রমবর্ধনশীল দশা, (2) ডিম্বাণু নিঃসরণ দশা, (3) প্রাক্‌রজঃস্রাবীয় দশা এবং (4) রজঃস্রাবীয় দশা। বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকের মতে রজঃস্রাবের প্রথম দিনটি হল মাসিক যৌন চক্রের প্রথম দিন।

#### ➤ A. নিরাময় দশা এবং ক্রমবর্ধনশীল দশা (Repairing phase and Proliferative phase) :

মাসিক যৌনচক্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী নিরাময় অবস্থা যৌনচক্রের প্রথম অবস্থা। এই অবস্থার পর ক্রমবর্ধনশীল দশা ঘটে।

● **স্থায়িত্বকাল (Duration)** ঃ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার পর থেকে যৌনচক্রের 13 দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

1. **জরায়ুর পরিবর্তন** (Changes in the uterus)—(i) পূর্ববর্তী মাসিক যৌনচক্রের ফলে জরায়ুর **এন্ডোমেট্রিয়ামে** যে ক্ষতর সৃষ্টি হয় তার মেরামতি ঘটে এবং আন্তজরায়ু স্তরের এন্ডোমেট্রিয়াম পুনর্গঠিত হয়। (ii) এর পর প্রথমে এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্রমবৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থরভাবে ঘটে। (iii) ক্রমবর্ধনশীল দশায় এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে, ফলে মিউকাস স্তরটি পুরু হয়। (iv) এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে এবং পরে এগুলি প্যাঁচানো হয়। (v) এই স্তরে বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত রক্তজালকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো রক্তবাহ সোজা হয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামের উপরিতলে প্রসারিত হয় এবং কোনো কোনো রক্তবাহের শাখা প্যাঁচানো হয়।

2. **ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন** (Changes in the ovary)—(i) পূর্ববর্তী যৌনচক্রে গঠিত করপাস লুটিয়ামের অপজনন শুরু হয়। (ii) যে কোনো একটি ডিম্বাশয়ে একটি অপরিণত ডিম্বথলি পরিণত ডিম্বথলিতে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে পরিণত হয়।
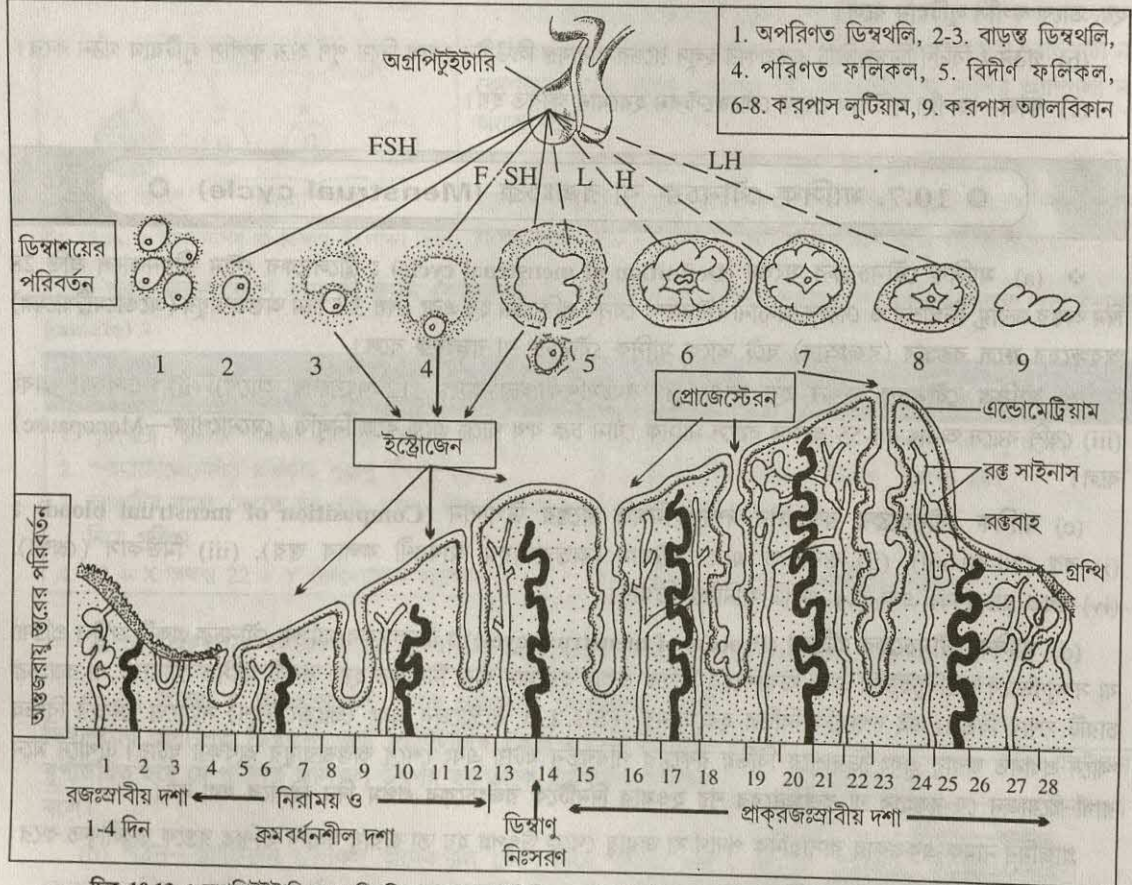
চিত্র 10.13. ঃ অগ্রপিটুইটারি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রজঃচক্রের বিভিন্ন দশায় ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর মধ্যে পরিবর্তনসমূহের চিত্ররূপ।

● **হরমোনের প্রভাব (Effect of hormone)** ঃ (i) যৌনচক্রের প্রারম্ভকালে অপজাত করপাস লুটিয়াম থেকে কম পরিমাণে প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়। (ii) এই কম পরিমাণ প্রোজেস্টেরন + ve ফিড ব্যাক পদ্ধতি (Feed back mechanism) দিয়ে অগ্রপিটুইটারিকে উদ্দীপিত করে FSH-এর ক্ষরণকে বাড়ায়। (iii) FSH অপরিণত ডিম্বথলিকে উদ্দীপিত করে পরিণত ডিম্বথলিতে (গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে) পরিণত করে। (iv) ডিম্বথলির পরিণতির ফলে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ক্ষরণ বাড়তে থাকে। এই ইস্ট্রোজেন জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরের ক্রমবর্ধনে সাহায্য করে।

### ➤ B. ডিম্বাণু নিঃসরণ দশা (Ovulatory phase) :

এই দশা ক্রমবর্ধনশীল দশার পর ঘটে এবং একটি পরিণত ডিম্বথলি থেকে একটি পরিণত ডিম্বাণু নির্গত হয়।

● **সময়কাল**—মাসিক যৌনচক্রের 14 (13–16) দিনে।

1. **জরায়ুর পরিবর্তন** (Changes in the uterus)—এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্রমবর্ধন, গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং রক্তবাহের প্রাচুর্যতা অব্যাহত থাকে।

2. **ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন** (Changes in the ovary)—গ্রাফিয়ান ফলিকলের মধ্যে আনট্রাম নামক যে ফাঁকা স্থান থাকে তাতে লিকার ফলিকুলি নামে তরল সঞ্চিত হয়। অধিক তরলের সঞ্চয়ের ফলে ফলিকলের মধ্যে আন্তফলিকুলার চাপ বাড়ে। এই চাপ ডিম্বথলিকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণু নির্গত করে।

● **হরমোনের প্রভাব (Effect of Hormones)** : (i) ক্রমবর্ধনশীল দশায় ( পূর্ববর্তী দশায়) ইস্ট্রোজেন ক্ষরণের পরিমাণ মাসিক যৌনচক্রের 13 দিনে অধিক হয়। এই অধিক পরিমাণ ইস্ট্রোজেন –ve ফিডব্যাক পদ্ধতি (Negative feedback mechanism)-এর মাধ্যমে অগ্রপিটুইটারিকে বাধা দেয়। (ii) বাধাদানের ফলে অগ্রপিটুইটারি থেকে কম পরিমাণ FSH ক্ষরিত হয়, ফলে ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলি কম উদ্দীপিত হয়। (iii) ডিম্বথলির কম উদ্দীপনার ফলে কম পরিমাণ ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয়। (iv) এই কম পরিমাণ ইস্ট্রোজেন আবার +ve ফিডব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে অগ্রপিটুইটারিকে উদ্দীপিত করে, ফলে LH-এর ক্ষরণ শুরু হয়। (v) LH-গ্রাফিয়ান ফলিকলকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণু নিঃসরণ ঘটায়।

### ➤ C. প্রাক্ রজঃস্রাবীয় দশা (Premenstrual phase) :

এই দশা ডিম্বাণু নিঃসরণ দশার পর এবং রজঃস্রাবীয় দশার পূর্বে ঘটে। এই দশাটি **ক্ষরণকারী দশা** (Secretory phase) হিসাবেও পরিচিত।

● **সময়কাল**—মাসিক যৌনচক্রের 15-27 দিন।

1. **জরায়ুতে পরিবর্তন** (Changes in the uterus) : (i) জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের আরও ক্রমবর্ধন ঘটে। (ii) এন্ডোমেট্রিয়ামের গ্রন্থিগুলি আরও প্যাঁচানো ও প্রসারিত হয়। (iii) রক্তজালকগুলি মিউকাস স্তরের ভিতরে আরও প্রসারিত হয়ে বহু সাইনাস ( Sinuses ) গঠন করে।

2. **ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন** (Changes in the ovary) : (i) বিদীর্ণ ফলিকল করপাস লুটিয়ামে পরিণত হয়। (ii) করপাস লুটিয়ামের বৃদ্ধি যৌনচক্রের 19 দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং এই পরিণত করপাস লুটিয়াম 27 দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

● **হরমোনের প্রভাব** (Effect of Hormones) : (i) অগ্রপিটুইটারির LH ডিম্বাশয়ের করপাস লুটিয়ামের বৃদ্ধিতে ও গঠনে সাহায্য করে। (ii) করপাস লুটিয়ামের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রোজেস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ বাড়তে থাকে । (iii) এই প্রোজেস্টেরন হরমোন এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধিতে এবং স্থায়িত্বতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রাক্রজঃস্রাবীয় দশায় সাহায্য করে।

### ➤ D. রজঃস্রাবীয় দশা (Menstrual phase) :

যৌনচক্রের এই দশায় এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরের অবক্ষয় ঘটে ফলে রজঃস্রাব ঘটে।

● **সময় এবং স্থায়িত্বকাল**—মাসিক যৌনচক্রের 28 দিনে রজঃস্রাবীয় দশা ঘটে এবং এই রজঃস্রাব 3-5 দিন স্থায়ী হয়।

1. **জরায়ুর পরিবর্তন** (Changes in the uterus) : (i) জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের মিউকাস কোশের অত্যন্ত বৃদ্ধির ফলে রক্তবাহগুলি চাপা পড়ে যায়। এই কারণে রক্তবাহ সংকুচিত হয় এবং রক্ত সংবহনে অভাব (ইশ্চিমিয়া—Ischaemia) দেখা দেয়। (ii) রক্তসংবহনের ত্রুটির ফলে $O_2$ এবং পুষ্টি সরবরাহ ব্যাহত হয়। এন্ডোমেট্রিয়ামের উপরিতলের কোশগুলি পুষ্টি ও $O_2$-এর অভাবে মারা যায়। (iii) এন্ডোমেট্রিয়ামের উপরিতলের এই মৃত কোশগুলি ভাঙতে শুরু করে এবং ভাঙনের ফলে রক্তবাহগুলিও ভেঙে যায় ফলে রক্তস্রাব ঘটে।

2. **ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন** (Changes in the ovary) : ডিম্বাশয়ে লুটিয়ামের অপজনন শুরু হয়।

● **রজঃস্রাবীয় দশায় হরমোনের প্রভাব (Effect of hormones on menstrual phase)** : (i) মাসিক যৌনচক্রের 27 দিনে প্রোজেস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটি –ve ফিডব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে অগ্রপিটুইটারিকে বাধা দেয়।

(ii) বাধাদানের ফলে অগ্রপিটুইটারি থেকে কম পরিমাণ LH ক্ষরিত হয়। (iii) LH-এর অভাবে করপাস লুটিয়াম উদ্দীপিত হতে পারে না ফলে প্রজেস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। প্রোজেস্টেরনের অভাবে এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরটি ভেঙে যায় ফলে রজঃস্রাব ঘটে।

## ❂ 10.8. ঋতুচক্র (এস্ট্রাস চক্র—Estrous Cycle) ❂

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী (প্রাইমেট) ছাড়া অন্য সবরকম স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৎসরে এক বা একাধিবার নির্দিষ্ট ঋতুতে (প্রজনন ঋতুতে—Breeding seasons) জরায়ু, যোনি ও অন্যান্য যৌনাঙ্গের নিয়মিত পরিবর্তন যে চক্রাকারে সংঘটিত হয়, যার ফলে যৌনাঙ্গ সক্রিয় হয়ে জননের জন্য উপযোগী হয়, তাকে ঋতুচক্র (এস্ট্রাসচক্র—Estrous Cycle) বলে।**

ঋতুচক্র প্রাণীর বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়। কোনো কোনো প্রাণীর সমগ্র প্রজনন ঋতুতে একবার ঋতুচক্র ঘটে আবার অন্য কোনো কোনো প্রাণীতে দুবার বা তার বেশি ঋতুচক্র হতে দেখা যায়। একবার হলে সেই প্রাণীকে **একঋতুচক্রী (মনোএস্ট্রাস**—Monoestrous) **প্রাণী** আর বহুবার হলে তাকে **বহুঋতুচক্রী (পলিএস্ট্রাস**—Polyestrous) **প্রাণী** বলে। উদাহরণ—কুক্কুরী—একঋতুচক্রী প্রাণী। বিড়াল, ইঁদুর, গিনিপিগ প্রভৃতি বহুঋতুচক্রী প্রাণী। বহুঋতুচক্রী প্রাণীতে ঋতুচক্র কয়েক দিন স্থায়ী হয়, যেমন—ইঁদুরে 4-5 দিন অন্তর অন্তর ঋতুচক্র ঘটে। এই সম্পূর্ণ ঋতুচক্রকে প্রধানত 4টি দশায় ভাগ করা যায়, যেমন—প্রাকঋতু দশা, পূর্ণঋতু দশা, উত্তরঋতু দশা এবং লুপ্তঋতু দশা।

চিত্র 10.14. ঃ ঋতুচক্রের বিভিন্ন দশায় ইঁদুরের যোনির লুমেন থেকে নেওয়া পদার্থের প্রলেপে অবস্থিত বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন কোশের উপস্থিতির পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

(b) **ঋতুচক্রের বিভিন্ন দশা (Different phases of Estrus cycle) ঃ**

1. **প্রাকঋতু দশা (প্রোএস্ট্রাস—Proestrous)**—প্রোএস্ট্রাস ঋতুচক্রে প্রথম দশা, এই দশায় ডিম্বথলি ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে। জরায়ুতে তরলপদার্থ জমা হওয়ার ফলে জরায়ু অধিক সংকোচনধর্মী হয়। যোনি প্রলেপে (Vaginal smear) নিউক্লিয়াসযুক্ত আবরণীকোশের প্রাধান্য দেখা যায়।

2. **পূর্ণঋতু দশা (এস্ট্রাস—Estrous)**—এই দশায় প্রাণীর যৌনকামনা বৃদ্ধি পায় তাই একে **উত্তাপ কাল** (Heat period) বলে। শুধুমাত্র এই সময়েই স্ত্রীপ্রাণী পুরুষপ্রাণীকে যৌন মিলনের জন্য গ্রহণ করে। হরমোনের প্রভাবে অন্তজরায়ুস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা হয়। যোনিপথের শ্লেষ্মাস্তরে বহুবিভাজনে নতুন কোশের আবির্ভাব ঘটে। এই দশায় ডিম্বাণুর নিঃসরণ (Ovulation) ঘটে। যোনির প্রলেপে শুধু কেরাটিনযুক্ত কঠিন নিউক্লিয়াস বিহীন কোশ গুচ্ছের উপস্থিত দেখা যায়।

3. **উত্তরঋতু দশা (মেটাএস্ট্রাস**—Metaestrus)—ডিম্বাশয়ে কর্পাস লুটিয়াম এবং ছোটো ছোটো ডিম্বথলির উপস্থিতি দেখা যায়। জরায়ুর রক্তনালির প্রাচুর্যতা ও সংকোচনধর্ম কমে যায়। যোনির প্রলেপে কয়েকটি কেরাটিনযুক্ত কঠিন কোশ সহ শ্বেত রক্তকণিকার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

4. **লুপ্তঋতু দশা (অ্যানাএসট্রাস**—Anaestrous)—এই দশায় কর্পাস লুটিয়াম বিলুপ্ত হয়। জরায়ুর আকৃতি ছোটো হয় ও রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। তবে তার সংকোচনধর্ম কিছুটা বজায় থাকে, যোনিপথের শ্লেষ্মাঝিল্লি পাতলা হয়। এই দশায় প্রাণী অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে এবং এই সময় যৌনকামনা বা প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। যোনির প্রলেপে শ্বেত রক্তকণিকা ছাড়া আর কোন কিছুই দেখা যায় না।

## ◎ 10.9. নিষেক এবং রোপণ (Fertilization and Implantation) ◎

### ▲ I. নিষেক (Fertilization) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে প্রক্রিয়ায় তরল মাধ্যমে ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন ঘটে তাকে নিষেক বলে।

(b) **নিষেকের স্থান (Site of Fertilization) :** ফ্যালোপিয়ান নালির শেষ উর্ধ্বাংশে অ্যাম্পুলা নামক অংশে নিষেক প্রক্রিয়া ঘটে।

(c) **নিষেকের প্রক্রিয়া (Process of Fertilization) :** নিষেক প্রধানত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

1. **নিষ্ক্রান্ত ডিম্বাণুর গঠন**—মাসিক যৌনচক্রের 14 দিনে ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) ঘটে। এর ফলে ডিম্বাশয় থেকে ফ্যালোপিয়ান নালির মধ্যে ডিম্বাণু নিক্ষিপ্ত হয়। এই ডিম্বাণুর উপরে একপ্রকার কোশপুঞ্জ নিয়ে গঠিত বিদীর্ণ কোশপ্রাচীর থাকে। একে **কোরোনা রেডিয়েটা** (Corona radiata) বলে। এটি ডিম্বাণুর **জোনা পেলুসিডা** (Zona pelucida) স্তরের উপরে থাকে। কোরোনা রেডিয়েটা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে সন্নিবেশিত থাকে। জোনা পেলুসিডার নীচে **ভাইটেলিন ঝিল্লি** (Vitelline membrane) থাকে। **নিষেক তরল মাধ্যমে সংগঠিত হয়।** নিষেকের সময় শুক্রাণু সক্রিয় ও ডিম্বাণু নিষ্ক্রিয় থাকে। ডিম্বাণু নিঃসরণে 6-7 ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে তা বিনষ্ট হয়। অপরদিকে স্ত্রীজনন তন্ত্রে অণুপ্রবিষ্ট শুক্রাণু 72 ঘণ্টা বেঁচে থাকলেও নিষিক্তকরণের ক্ষমতা প্রায় 48 ঘণ্টা স্থায়ী হয়। **মাসিক বা ঋতুচক্র বা** রজঃস্রাবের তৃতীয় সপ্তাহে নিষেক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।
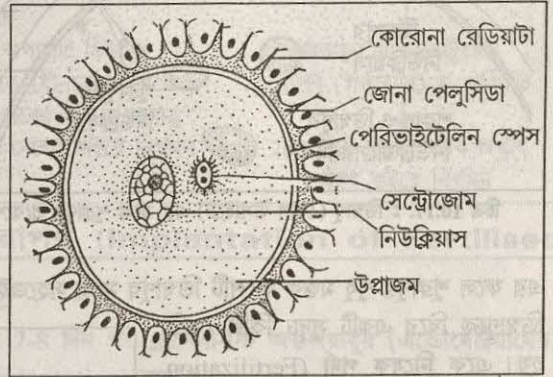
চিত্র 10.15. : একটি ডিম্বাণুর (গৌণ উসাইটের ) গঠন।
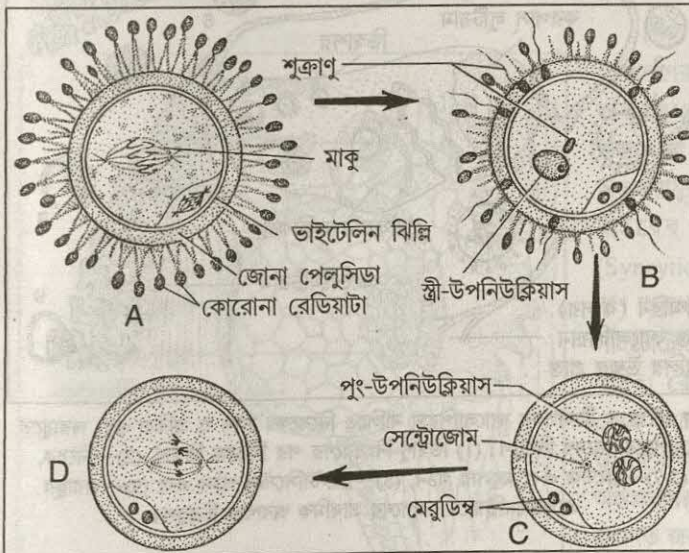
চিত্র 10.16. : নিষিক্তকরণের বিভিন্ন দশা : A—ডিম্বাশয় থেকে সদ্য নির্গত ডিম্বাণু, B—ডিম্বাণুর মধ্যে একটি পরিণত শুক্রাণুর প্রবেশ, C—পুং ও স্ত্রী-উপনিউক্লিয়াসের গঠন, D—দুটি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমগুলির মাকুর মধ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে অবস্থান।

2. **ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর প্রবেশ** (Entry of sperm within ovum) **:** যদিও একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে একটিমাত্র শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়, যৌন মিলনের সময়ে নির্গত বীর্যে (Semen) 2-5 কোটি শুক্রাণু থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কোরোনা রেডিয়েটাকে ভেদ করার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় তাতে প্রায় অধিকাংশ শুক্রাণু বিনষ্ট হয়। অবশেষে একটিমাত্র **শক্তিশালী শুক্রাণু** (Fit sperm) প্রাচীরকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিষেক ঘটায়।

শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোমে অবস্থিত **হায়ালুরোনিডেজ** (Hyaluronidase) উৎসেচক ডিম্বথলির কোশকে অর্থাৎ কোরোনা রেডিয়েটাকে (Corona radiata) বিদীর্ণ করে শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা স্তরকে স্পর্শ করে। শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ মাথার উপরিভাগে একটি **সাইটোপ্লাজমের টুপি বা মস্তক আবরণ** বা **অ্যাক্রোসোম** (Acrosome) থাকে। এই অ্যাক্রোসোম **অ্যাক্রোসিন** (Acrosin) নামে উৎসেচক নির্গত করে। শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডার সংস্পর্শে আসার পর মস্তক আবরণটি (অ্যাক্রোসোমটি) বিদীর্ণ হয় এবং এর থেকে অ্যাক্রোসিন উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এই উৎসেচক জোনা পেলুসিডার সীমিত অঞ্চলকে বিনষ্ট করে। প্রথমে জোনা পেলুসিডা অতিক্রম করে ও পরে শুক্রাণু ভাইটেলিন ঝিল্লির সংস্পর্শে আসে ও তাকেও বিনষ্ট করে। অ্যাক্রোজোমের সাহায্যে ঘটা এই প্রক্রিয়াকে **অ্যাক্রোজোম বিক্রিয়া** (Acrosome reaction) বলে।
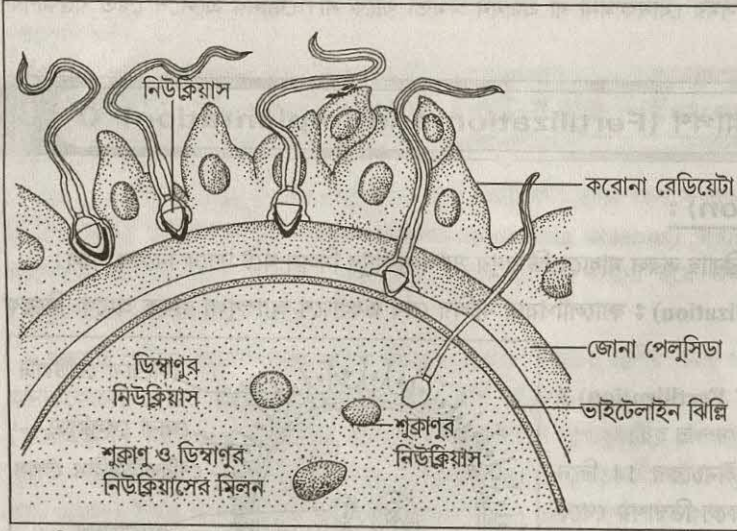
চিত্র 10.17. : ডিম্বাণু (গৌণ উসাইটে)-এর মধ্যে শুক্রাণুর প্রবেশের বিভিন্ন পর্যায়।

এর ফলে শুক্রাণুর শুধু মস্তক অংশটি ডিম্বাণুর মধ্যে সহজেই যায়। লেজের অংশটি বাইরে থেকে যায়। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুকে ঘিরে একটি সুদৃঢ় ঝিল্লি তৈরি হয়। একে **নিষেক পর্দা** (Fertilization membrane) বলে। এই পর্দা তৈরি হওয়ার পরে অন্য কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এই সময় ডিম্বাণুর দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন সম্পন্ন হয়। এরপর শুক্রাণু তার লাংগুলীয় চলনের সাহায্যে ভাইটেলিন ঝিল্লি ভেদ করে ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে। মস্তক বা নিউক্লিয়াস ছাড়া শুক্রাণুর অবশিষ্টাংশ ডিম্বাণু সাইটোপ্লাজমে (Ooplasm) দ্রবীভূত হয়ে যায়। শুক্রাণুর মস্তকটি থেকে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস বা **পুং-উপনিউক্লিয়াস** (Male pronucleus) গঠিত হয়। এই সময়ে ডিম্বাণু দ্বিতীয় মেরুডিম্ব নিক্ষেপ করে **পরিণত ডিম্বাণু** (Mature ovum) বা **স্ত্রী-উপনিউক্লিয়াসে** (Female pronucleus) রূপান্তরিত হয় এবং শুক্রাণু বিচ্যুত একটি সেন্ট্রোজোম দুটি উপনিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখা যায়। পরে এটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়। দুটি উপনিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি নবজাত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে। এর মধ্যে 23 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে যা, 23টি শুক্রাণু থেকে এবং 23টি ডিম্বাণু থেকে আসে। এই

চিত্র 10.18. : স্ত্রীলোকের ফ্যালোপিয়ান নালিতে নিষেকের স্থান ও প্রক্রিয়া এবং জরায়ুতে রোপণের স্থানের চিত্ররূপ। (1) ডিম্বাণু নিঃসরণের পর নিষ্ক্রান্ত ডিম্বাণু, (2)—নিষেক, (3-7)—ক্লিভেজ এবং মরুলার গঠন, (8)—ব্লাস্টোসিস্টের গঠন এবং (9)—জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে রোপণের প্রাথমিক অবস্থার চিত্ররূপ।

অবস্থাকে **জাইগোট** (Zygote) বলে। 23 জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়াকে **অটোজোম** (Autosome) এবং একজোড়াকে **যৌন ক্রোমোজোম** (Sex chromosome–XX বা XY) বলে।

3. **ফ্যালোপিয়ান নালিতে নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিবহন** (Transport of fertilized ovum in the fallopian tube) ঃ ফ্যালোপিয়ান নালির উর্ধ্বাংশে ডিম্বাণু নিষিক্ত হবার পর দ্রুতগতিতে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে একটি কোশপুঞ্জ গঠন করে। একে **মরুলা** (Morula) বলে। ফ্যালোপিয়ান নালিস্থিত সিলিয়ার চলন এবং ক্রমসংকোচনের ফলে মরুলা ক্রমশ জরায়ুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নালির নিষিক্ত স্থান থেকে জরায়ুতে যেতে প্রায় 72 ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ জরায়ুর অন্তঃস্থ শ্লেষ্মা স্তরটি অত্যন্ত বর্ধনশীল (Proliferative) দশায় থাকে।
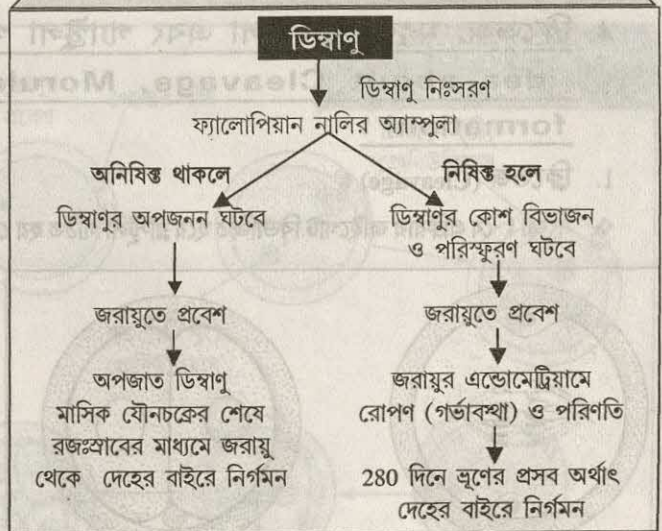
## ▲ II. জরায়ুগাত্রে নিষিক্ত ডিম্বাণুর রোপণ (Implantation of Fertilised Ovum in the Endometrium) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে প্রক্রিয়ায় নিষেকের 7-8 দিন পর ব্লাস্টোসিস্ট অন্তজরায়ুর (এন্ডোমেট্রিয়ামের) একটি পূর্বনির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রতিস্থাপিত হয় তাকে রোপণ (Implantation) বলে।**

জরায়ুগাত্রে রোপিত হওয়ার আগে ব্লাস্টোসিস্টটি 3-4 দিন মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই সময় জোনাপেলুসিডা স্তরের অপজনন ঘটে ফলে এই ব্লাস্টোসিস্ট অন্তজরায়ু স্তর থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে।
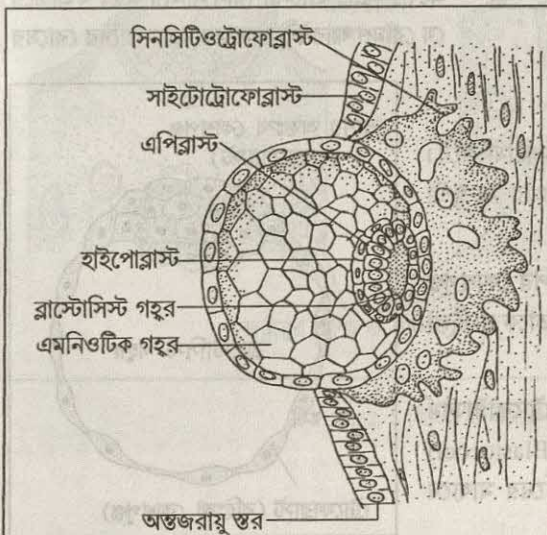
চিত্র 10.19. ঃ অন্তঃজরায়ু স্তর (এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের রোপণের চিত্ররূপ।

(b) **রোপণ পদ্ধতি** (Mechanism of Implantation) ঃ রোপণের সময় অন্তজরায়ু স্তরটি ডিম্বাণু নিঃসরণ দশার পরবর্তী অবস্থায় (Postovulatory phase) থাকে। যখন ব্লাস্টোসিস্ট অন্তজরায়ু স্তরে রোপিত হতে শুরু করে তখন ব্লাস্টোসিস্ট ও অন্তজরায়ুর সংযোগস্থলের কোশগুলি দুটি স্তরে বিভক্ত হয়। বাইরের স্তরটিকে বলে **সিনসিটিওট্রোফোব্লাস্ট** (Syncytiotrophoblast) যার বাইরে কোনো আবরণ থাকে না। অন্তঃস্থ সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল স্তরের প্রাচীরকে বলে **সাইটোট্রোফোব্লাস্ট** (Cytotrophoblast) যা সুস্পষ্ট কোশ নিয়ে গঠিত। রোপণের সময় সিনসিটিওট্রোফোব্লাস্ট কোশ আবরণ থেকে উৎসেচক ক্ষরিত হয় যা অন্তঃজরায়ু ব্লাস্টোসিস্টকে জরায়ু স্তরের মধ্যে প্রোথিত হতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্লাস্টোসিস্টটি অন্তঃজরায়ু স্তরের (এন্ডোমেট্রিয়ামের) মধ্যে সমাহিত হয়। প্রধানত জরায়ুর দেহ ও ফান্ডাস অংশের পেছন দিকে সমাহিত হয়ে রোপণ কাজ সম্পন্ন করে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই জরায়ু-প্লাসেন্টা সংবহন (Utero-placenta circulation) শুরু হয়।

## ❂ 10.10. পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা (Developmental Biology) ❂

### ▲ ক্লিভেজ, মরুলা, ব্লাস্টুলা এবং গ্যাস্ট্রুলা গঠনের সংক্ষিপ্ত ধারণা (A brief idea about Cleavage, Morula, Blastula and Gastrula formation) ঃ

1. **ক্লিভেজ (Cleavage) ঃ**

❖ **সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টুলা গঠিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ (Cleavage) বা সেগমেনটেশন (Segmentation) বলে।** ফ্যালোপিয়ান নালির মধ্যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যথাযথ মিলনের ফলে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে জাইগোট তৈরি করে। এর অল্প সময়ের পর জাইগোট অত্যন্ত দ্রুত মাইটোসিস কোশ বিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে থাকে।
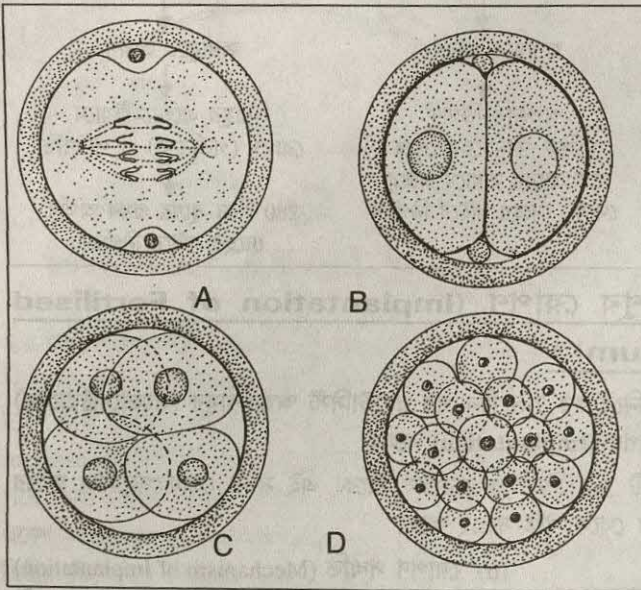
চিত্র 10.20. ঃ নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোশবিভাজনের দ্বারা মরুলা গঠন।
A-নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে ক্রোমোজোমের অবস্থান,
B দ্বি-কোশ ও C-চার কোশ অবস্থা, D—মরুলা।

2. **মরুলা (Morula) ঃ** ❖ **সংজ্ঞা— ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার কয়েকদিন পর কোশবিভাজন অর্থাৎ ক্লিভেজের মাধ্যমে যে কোশপুঞ্জ গঠিত হয় তাকে মরুলা বলে।**

মরুলা জাইগোটের প্রায় সম আকৃতি সম্পন্ন হয়। মাইটোসিস কোশবিভাজনের ফলে কোশপুঞ্জ অনেকটা তুঁতফলের থোকার মতো দেখা যায় বলে, এটির এই প্রকার নামকরণ করা হয়েছে। এরপর মরুলা ফ্যালোপিয়ান নালি থেকে জরায়ুর গহ্বরে প্রবেশ করে। ফ্যালোপিয়ান নালির অন্তঃস্থ প্রাচীরে যে রোমশ আবরণী কলাস্তর থাকে তাদের রোমের বিচলন এবং নালির পেশির ছন্দবদ্ধ সংকোচন মরুলার পরিবহনে সাহায্য করে। ডিম্বাণুর নিষেকের পর ফ্যালোপিয়ান নালি থেকে জরায়ুতে যেতে প্রায় 72 ঘণ্টা সময় লাগে।

3. **ব্লাস্টুলা (Blastula) ঃ** ❖ **সংজ্ঞা— মরুলা গঠনের পর কোশপুঞ্জ পরিবর্তিত হয়ে একটি যে ফাঁপা বলের মতো আকৃতি ধারণ করে তাকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বা ব্লাস্টোসিস্ট বলে।**

ব্লাস্টুলাতে ক্রম পরিবর্তনে **ট্রফোব্লাস্ট** (Trophoblast) বা **ট্রোফোক্টাডার্ম** (Trophoctaderm) নামে কোশস্তর আন্তঃকোশপুঞ্জ ও ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) নামে রসপূর্ণ অন্তঃগহ্বর তৈরি হয়। এরপর বিভিন্ন ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে ট্রোফোব্লাস্ট প্লাসেন্টা এবং ভ্রূণ গঠিত হয়।

চিত্র 10.21. ঃ ব্লাস্টোসিস্ট

4. **গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula) ঃ** ❖ **সংজ্ঞা—যে পদ্ধতির ফলে ব্লাস্টুলার**

**অবিভেদিত (Undifferentiated) কোশগুলি এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোশস্তরে বিভেদিত হয় তাকে গ্যাস্ট্রুলেশন বলে এবং গ্যাস্ট্রুলেশনের ফলে সৃষ্ট ভ্রূণকে গ্যাস্ট্রুলা বলে।**
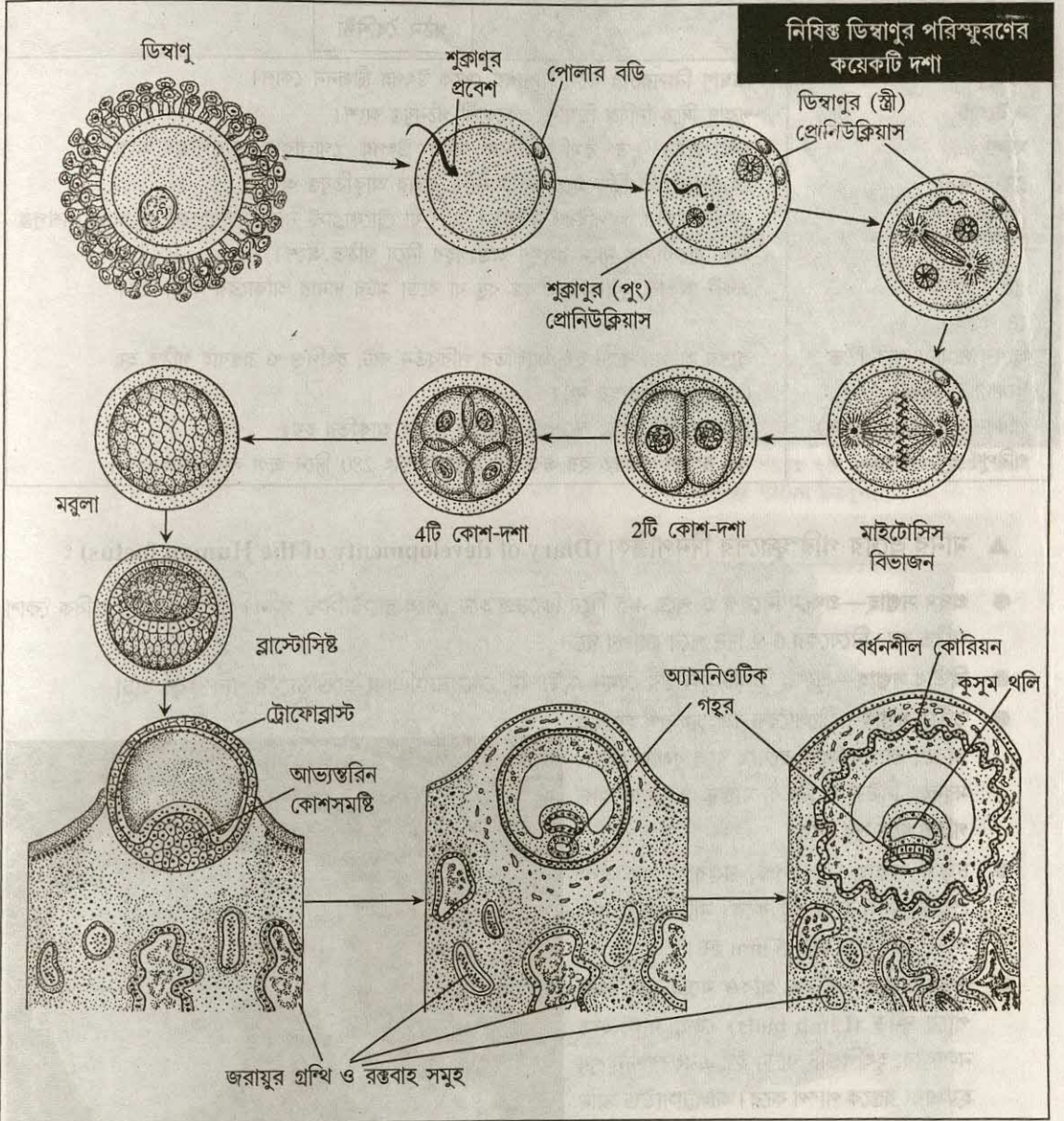
চিত্র 10.22. : নিষেক ও জরায়ুগাত্রে নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপণের চিত্ররূপ।

- **মানুষের ভ্রূণের গঠন বৈশিষ্ট্যসহ পরিস্ফুরনের বিভিন্ন ধাপ (Different stages of Development of Human Embryo) ঃ**

| পরিস্ফুরণের ধাপ | গঠন বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| ডিম্বাণু | ডিম্বাণু নিঃসরণের ফলে ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন স্ত্রীজনন কোশ। |
| জাইগোট | শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণু, এককোশী গঠনযুক্ত অংশ। |
| মরুলা | জাইগোটের দ্রুত ক্রমবিভাজনের ফলে উৎপন্ন গোলাকার কোশপুঞ্জের অংশ। |
| ব্লাস্টোসিস্ট | কোশপুঞ্জ পরিবর্তিত হয়ে একটি ফাঁপা বলের আকৃতিযুক্ত অংশ। |
| ট্রোফোব্লাস্ট | ব্লাস্টোসিস্টের ক্রমপরিবর্তনে গঠিত অংশ যা ট্রোফোব্লাস্ট নামে বহিরাবরণী ও অন্তঃকোশপুঞ্জ এবং ব্লাস্টোসিল নামে রসপূর্ণ অন্তঃগহ্বর নিয়ে গঠিত অংশ। |
| ভ্রূণের প্রথমাবস্থা (3 সপ্তাহ) | একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি জীবন্ত বস্তু যা বড়ো মটর দানার আকারের মতো হয়। |
| ভ্রূণের সামান্য পরিবর্তিত অবস্থা (5 সপ্তাহ) | ভ্রূণের আকার বড়ো হয়, আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহ গঠিত হয় (হাত-পা গঠিত হয় না)। |
| পরিণত অবস্থা (8 সপ্তাহ) | হাত-পা গঠিত হয়, অনেকটা মানুষের ভ্রূণের আকৃতির হয়। |
| পরিপূর্ণ ভ্রূণ (শিশুর) | ভ্রূণ সম্পূর্ণ পরিণত হয় এবং 40 সপ্তাহ অর্থাৎ 280 দিনে জন্ম লাভ করে। |

## ▲ মানব ভ্রূণের পরিস্ফুরণের দিনপঞ্জিকা (Diary of developmenty of the Human foetus) ঃ

- **প্রথম সপ্তাহ**—প্রথমে নিষেক ও পরে 4-5 দিনে ক্লিভেজ হয়ে শেষে ব্লাস্টোসিস্ট গঠন। প্রায় 100 টির অধিক কোশ গঠিত হয়। নিষেকের 6-9 দিন পরে রোপণ ঘটে।
- **দ্বিতীয় সপ্তাহ**—ভ্রূণের তিনটি মূল স্তর যেমন এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্মের পরিস্ফূরণ ঘটে।
- **তৃতীয় সপ্তাহ**—স্ত্রীলোকের রজঃচক্র বন্ধ হয়, এই কারণে তার গর্ভবস্থা হয়েছে বলে বুঝতে পারে। মেরুদণ্ড, নিউর‍্যাল টিউব, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড গঠিত হতে শুরু করে।
- **চতুর্থ সপ্তাহ**—হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ, রক্ত এবং পৌষ্টিকনালি হতে শুরু করে। নাভিরজ্জুর বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রূণ লম্বায় প্রায় 5 mm হয়।
- **পঞ্চম সপ্তাহ**—মস্তিষ্ক আরও বড়ো হয়, হাত-পায়ে কুঁড়ি (Limb buds) দেখা যায়, হাত নলাকার, হৃৎপিণ্ডটি বড়ো হয় এবং স্পন্দন শুরু হয় এবং রক্তকে পাম্প করে। আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান দিয়ে এই অবস্থার টের পাওয়া যায়। ভ্রূণ লম্বায় 8 mm হয়।

চিত্র 10.23. ঃ চতুর্থ সপ্তাহে মানব ভ্রূণ যার মাঝে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান দেখা যায়।

- **ষষ্ঠ সপ্তাহ**—চোখ এবং কান গঠন শুরু করে।
- **সপ্তম সপ্তাহ**—দেহের প্রায় সমস্ত প্রধান অঙ্গের পরিস্ফরুণ ঘটে। মুখমণ্ডল তৈরি হয়, চোখের স্থানটির বর্ণ গাঢ় হয়। মুখ, জিভ, হাত, পা ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রূণ লম্বায় 17 mm সমান হয়।

- **বারো সপ্তাহ**—ভ্রূণের প্রায় সব অঙ্গের, পেশি, অস্থি, পায়ের গোড়ালি, আঙুল ইত্যাদি সম্পূর্ণ বৃদ্ধি এবং যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ভ্রূণের বিচলন দেখা যায়। মাথা থেকে তলা পর্যন্ত ভ্রূণ লম্বায় প্রায় 56 mm হয়। এই সময় থেকে নারীর গর্ভাবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

চিত্র 10.24. ঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তাহে ভ্রূণে সুপষ্ট চোখ, কান প্রধান অঙ্গের গঠনের চিত্ররূপ।

- **কুড়ি সপ্তাহ**—মাথায় চুল, চোখের পাতা ও ভুরু, অঙ্গুলাঙ্ক (Finger prints) দেখা যায়, হাতপায়ের আঙুলের নখের আবির্ভাব ঘটে। হাতের মুঠো শক্ত হয়। 16-20 সপ্তাহে ভ্রূণ শিশুটি তার বিচলন উপলব্ধি করে। ভ্রূণ মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত লম্বায় 160 mm হয়।
- **চব্বিশ সপ্তাহ**—চোখের পাতা খোলে।
- **আঠাশ সপ্তাহ**—শিশু প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়া করে, স্পর্শ এবং তীব্র শব্দের প্রতি সাড়া দেয়। অ্যামনিওটিক তরলের পরিমাণ বাড়ে।
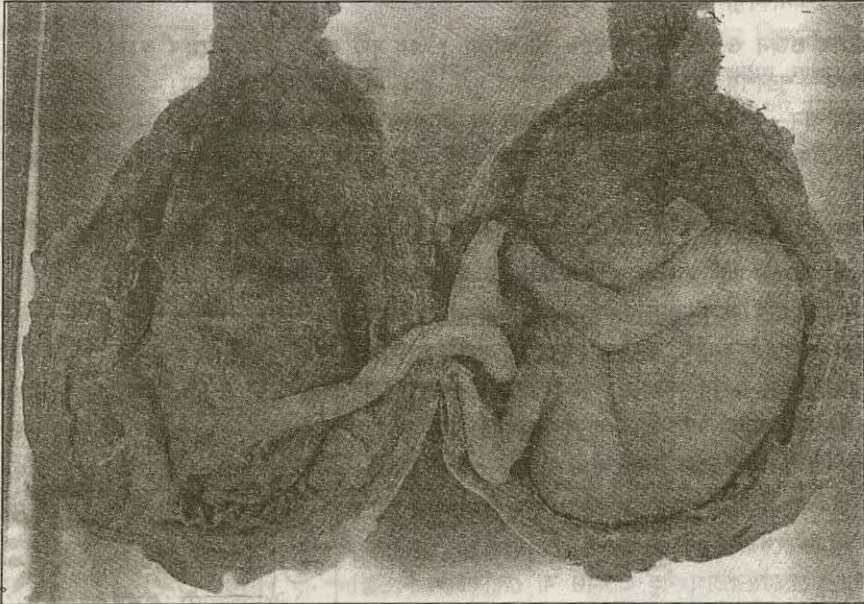
চিত্র 10.25. ঃ তিরিশ সপ্তাহ—পরিণত ভ্রূণ এবং মাতৃজরায়ুস্থিত প্লাসেন্টার নাভিরজ্জু দিয়ে যুক্ত চিত্ররূপ।

- **তিরিশ সপ্তাহ**—জন্ম গ্রহণের জন্য মাথা নীচের দিকে থাকে। শিশুটি মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত লম্বায় 250 mm সমান হয়।
- **চল্লিশ সপ্তাহ**—নিষেকের পর 280 দিনে (স্বাভাবিক 3 কেজি বা 7 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট) শিশু জন্মগ্রহন করে।

## ✪ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ✪

**1. প্রজনন বা জনন কাকে বলে ?**

● যে প্রক্রিয়ায় জীব পৃথিবীতে নিজ বংশধর সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়ে জীবনের ধারা অর্থাৎ প্রজাতির চিরস্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তাকেই প্রজনন বা জনন বলে।

**2. 'গোনাড' কথার অর্থ কী ?**

● যে গ্রন্থির মধ্যে যৌনজননের একক শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাকে **গোনাড** বলে। পুরুষের শুক্রাশয় ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়কে মুখ্য যৌনাঙ্গ বা গোনাড বলে।

**3. বয়ঃসন্ধি ও অকাল বয়ঃসন্ধি বলিতে কী বোঝো ?**

● কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করবার বয়সকে **বয়ঃসন্ধি** বলে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির সময় 14-15 বৎসর। মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির সময় 12-14 বৎসর। কিশোরদের ক্ষেত্রে 14-15 বছরের পূর্বে এবং কিশোরীদের ক্ষেত্রে 12-14 বছরের পূর্বে বয়ঃসন্ধির আগমনকে **অকাল বয়ঃসন্ধি** বলে।

**4. গৌণ যৌন লক্ষণ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।**

● বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের কতকগুলি যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন হয়, সমষ্টিগতভাবে সেইসব পরিবর্তনগুলিকে গৌণ যৌন লক্ষণ বলে। উদাহরণ—পুরুষের গৌণ যৌন লক্ষণ গোঁফ-দাড়ির বিকাশ, বগলে ও শ্রোণিদেশে লোমের বিকাশ, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, কাঁধ প্রশস্ত হওয়া, প্রাথমিক যৌনাঙ্গের এবং অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি প্রভৃতিকে বোঝায়। স্ত্রীলোকের গৌণ যৌন লক্ষণ—স্তনের বৃদ্ধি, বগল ও শ্রোণিদেশে লোমের বিকাশ, উরু ও নিতম্ব প্রশস্ত হওয়া ও প্রাথমিক যৌনাঙ্গগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া।

**5. শুক্রাশয়ের ওজন ও অবস্থান সম্বন্ধে কী জানো ? এর দুটি প্রধান কাজ উল্লেখ করো।**

● (i) **ওজন**—শুক্রাশয় ডিম্বাকৃতি এবং সংখ্যায় দুটি, প্রতিটির ওজন 10-20 গ্রাম।

(ii) **অবস্থান**—শুক্রাশয় দুটি বাইরে পেনিস বা লিঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত স্ক্রোটাম নামে থলির মধ্যে শুক্ররজ্জু বা স্পার্মাটিক কর্ড দিয়ে ঝুলে থাকে। ভ্রূণাবস্থায় এটি উদরে থাকে এবং জন্মের পূর্বে শুক্রাশয় থলিতে (Scrotum) নেমে আসে।

(iii) **কাজ** — শুক্রাণু উৎপাদন এবং টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ হল শুক্রাশয়ের প্রধান দুটি কাজ।

**6. শুক্র রজ্জু বলতে কী বোঝায় ?**

● ক্রিমাস্টার পেশি (Cremaster muscle) এবং যোগকলা আবরণে আবৃত শুক্রনালি, রক্তবাহ (শুক্রাশয়ী ধমনি ও শিরা) লসিকাবাহ এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত রজ্জু সদৃশ গঠন যা ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের মধ্য দিয়ে শুক্রাশয়কে স্ক্রোটাম থলিতে ঝুলিয়ে রাখে, তাকে **শুক্র রজ্জু** (Spermatic cord) বলে।

**7. শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা বা সেমিনিফেরাস টিউবিউল কী ? এরূপ নামকরণের কারণ কী ?**

● শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরভাগ বহু প্রকোষ্ঠ বা লোবিউলে বিভক্ত। এই প্রকোষ্ঠগুলিতে যে অসংখ্য নালিকা থাকে তাদের **শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা** বা **সেমিনিফেরাস টিউবিউল** বলে। প্রতিটি নালিকার দৈর্ঘ্য 70-80 সেন্টিমিটার ও ব্যাস 0·12-0·3 সেন্টিমিটার। প্রত্যেক শুক্রাশয়ে নালিকার সংখ্যা 400-600 টি। নালিকার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 200-400 মিটার সমান হয়। এই নালিকাগুলিতে বিভিন্ন প্রকার শুক্রাণু উৎপাদক কোশ পাঁচটি

চিত্র 10.26. : শুক্রাণু উৎপাদক নালিকার চিত্ররূপ।

স্তরে সাজানো থাকে। এই কোশস্তরগুলি হল স্পার্মাটোগোনিয় মুখ্য, স্পার্মাটোসাইট, গৌণ স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড এবং স্পার্মাটোজোয়া। এই নালিকাতে স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় বলে এদের নাম শুক্রাণু উৎপাদক নালি বা সেমিনিফেরাস টিবিউল।

**8. হাইড্রোসিলিক ফ্লুইড কাকে বলে ?**

● স্ক্রোটামের বাইরে থেকে ভিতরে শেষ আবরকটি টিউনিকা ভ্যাজাইন্যালিস। এই আবরকটি ভিসারাল স্তর ও প্যারাইটাল স্তর নিয়ে গঠিত । ভিসারাল স্তর ও প্যারাইটাল স্তর দুটির মাঝে অবস্থিত যে তরল বা ফ্লুইড থাকে তাকে হাইড্রোসিলিক ফ্লুইড বলে।

**9. টেসটিস বা শুক্রাশয়ের কয়টি আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে ? এদের নাম করো।**

● শুক্রাশয় তিনটি পুরু আবরণী পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে পর্দাগুলি নিম্নলিখিত নামে পরিচিত—(i) টিউনিকা ভ্যাজাইন্যালিস, (ii) টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া এবং (iii) টিউনিকা ভ্যাসকুলারিস।

**10. (a) সেমিনিফেরাস টিউবিউলের কোন্ কোন্ কোশস্তরে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন ঘটে ?**
**(b) স্পার্মাটিড বা অপরিণত শুক্রাণুর মধ্যে 22টি দেহ ক্রোমোজোম ও একটি X অথবা Y ক্রোমোজোম থাকে কেন?**

● (a) সেমিনিফেরাস টিউবিউল প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটে মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজন হয়ে থাকে।
(b) প্রাইমারি এবং গৌণ স্পার্মাটোসাইট থেকে অপরিণত শুক্রাণু বা স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়। এদের বিভাজন মিয়োসিস পদ্ধতিতে ঘটে এবং এইজন্য অপরিণত শুক্রাণু বা স্পার্মাটিডে 22টি দেহ ক্রোমোজোম এবং একটি করে X অথবা Y ক্রোমোজোম থাকে।

**11. সারটোলির কোশ বা পোষক কোশ বলতে কী বোঝো ?**

● শুক্রাশয়ে সেমিনিফেরাস টিউবিউল আদি শুক্রকোশ স্তরে মাইটোকন্ড্রিয়া, গ্লাইকোজেন ও ফ্যাটযুক্ত যে বৃহদাকৃতির সুদীর্ঘ কোশ ভিত্তিঝিল্লি থেকে নালিকার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, প্রখ্যাত ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ই. সারটোলির (E. Sertoli) নামানুসারে এই কোশগুলিকে **সারটোলি কোশ** বলে। বর্ধনশীল শুক্রাণু এই প্রকার কোশ থেকে পুষ্টিলাভ করে বলে এদের পোষক কোশও বলে।

**12. (a) লিডিগ কোশ বা ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ বলতে কী বোঝো ?**
**(b) লিডিগ কোশ কী হরমোন ক্ষরণ করে ?**

● (a) সেমিনিফেরাস টিউবিউল অন্তর্বর্তী স্থানে যোগকলার যে বহুকোণাকৃতি বিশেষ কোশ থাকে তাদের লিডিগ কোশ বা ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ বলে। কোশগুলির সাইটোপ্লাজমে হরিদ্রাভ দানা এবং স্নেহবিন্দু দেখা যায় এবং যৌবনে এই প্রকার কোশের সংখ্যা অধিক হয়। এই কোশগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিরূপেও কাজ করে।
(b) লিডিগ কোশ টেস্টোস্টেরন নামে হরমোন ক্ষরণ করে।

**13. স্পার্মিয়েশন বলতে কী বোঝো ?**

● শুক্রাণু সেমিনিফেরাস নালিতে উৎপন্ন হওয়ার পর পুষ্টি গ্রহণের জন্য সারটোলি কোশের মধ্যে শুক্রাণুগুলি তাদের মস্তক অংশটিকে ঢুকিয়ে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন (পুষ্টি) আহরণ করে। পুষ্টি সংগ্রহের পর শুক্রাণুগুলি তাদের মস্তক অংশগুলিকে বের করে নেয়। শুক্রাণুর এই নির্গমন প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণু নিঃসরণ** বা **স্পার্মিয়েশন** (Spermiation) বলে।

**14. (a) ডিম্বাশয় কাকে বলে ? (b) এর অবস্থান লেখো। (c) ডিম্বাশয়ের একটি আংশিক চিহ্নিত চিত্র আঁকো যাতে ডিম্বাশয়ে প্রতিটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।**

● (a) যে স্ত্রী-জনন অঙ্গ ডিম্বাণু অর্থাৎ স্ত্রী-গ্যামেট উৎপন্ন করে তাকে **ডিম্বাশয়** বলে।

**চিত্র 10.27.** ঃ ডিম্বাশয়ের চিত্র।

(b) ডিম্বাশয় দুটি শ্রোণিগহ্বরের পেছনে প্রাচীরের দিকে জরায়ুর উভয় দিকে পেরিটোনিয়াম উদরাবরক ঝিল্লির প্রশস্ত যোজক বন্ধনী, মেসোভেরিয়াম (Mesovarium) দিয়ে সঠিক স্থানে প্রলম্বিত থাকে।

**15. (a) একটি পরিণত ডিম্বাশয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজন কত ?**

**(b) স্ত্রীলোকের যৌনজীবনের শুরু ও শেষ কত বছরে হয় ?**

- (a) একটি পরিণত ডিম্বাশয়ের দৈর্ঘ্য 3 সেন্টিমিটার, প্রস্থ 1·5 সেন্টিমিটার, পুরু 1 সেন্টিমিটার এবং ওজন 5 গ্রাম।

(b) স্ত্রীলোকের যৌনজীবন সাধারণত 12-14 বৎসর বয়সে শুরু হয় এবং 45-48 বৎসরে শেষ হয়।

**16. মেনার্কি ও মেনোপোজ কাকে বলে ?**

- **মেনার্কি**— স্ত্রীলোকের বয়ঃসন্ধিকালে অর্থাৎ 12-15 বৎসর বয়সে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গোনাড্রোট্রোফিক হরমোনের প্রভাবে প্রথম রজঃস্রাব (Mens) হওয়াকে **মেনার্কি** বলে। মনোপোজ যে বয়সে রজঃস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় তাকে **মেনোপোজ** বলে। এই অবস্থা সাধারণত 45-48 বৎসরে ঘটে।

**17. প্রজনন কলা কাকে বলে ?**

- পরিণত ডিম্বাশয়ের সব থেকে বাইরের স্তর যে ঘনাকাকার আবরণী কলাস্তর দিয়ে আবৃত থাকে তাকে **জারমিন্যাল এপিথেলিয়াম** বা প্রজনন কলা বলে। এই কলাস্তর থেকে ডিম্বথলি বা ফলিকল উৎপন্ন হয়।

**18. (a) গ্র্যাফিয়ান ফলিকল কাকে বলে ? (b) ফলিকল কয়প্রকার ও কী কী ?**

- (a) ডিম্বাশয়ের স্ট্রোমার মধ্যে যে ফলিকল বা থলির মত অংশগুলি ছড়িয়ে অবস্থান করে তাদেরকে **ফলিকল** বলে। এই ফলিকলের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পরিণত ফলিকলকে গ্র্যাফিয়ান ফলিকল বলে।

(a) ডিম্বাশয়ে তিনপ্রকার ফলিকল থাকে, যেমন—(i) প্রাইমরডিয়াল ফলিকল বা অপরিণত ফলিকল, (ii) বাড়ন্ত ফলিকল এবং (iii) পরিণত ফলিকল বা গ্র্যাফিয়ান ফলিকল।

**19. বিদীর্ণ ডিম্বথলির পরিণতি কী হয় লেখো।**

- পরিণত ডিম্বথলি (ফলিকল) থেকে যখন ডিম্বাণুটি (ovum) নির্গত হয়ে বেরিয়ে যায় তখন তাকে বিদীর্ণ ডিম্বথলি বলে। ডিম্বাণু নিঃসরণের পর বিদীর্ণ ডিম্বথলিতে করপাস লিউটিয়াম বা পীতগ্রন্থির সৃষ্টি হয় এবং এটি একপ্রকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। এর থেকে প্রোজেস্টেরন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়।

**20. করপাস লিউটিয়ামকে গর্ভবস্থার গ্রন্থি বলে কেন ?**

- ডিম্বাণু নিঃসরণের পর যদি ফার্টিলাইজেশান এবং গর্ভাবস্থা সৃষ্টি হয় তবে করপাস লিউটিয়াম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 3-4 মাসে সব থেকে বড়ো হয়। গর্ভাবস্থার প্রায় 6 মাস থেকে করপাস লিউটিয়াম ক্রমশ বিনষ্ট হতে থাকে এবং গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে লুপ্ত হয়ে একটি দাগে পরিণত হয়। একেই গর্ভবস্থার করপাস লিউটিয়াম (Corpus luteum of Pregnancy) বলে।

**21. গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis) কাকে বলে ?**

- গ্যামেট বা জননকোশের উৎপাদনকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপাদন এবং উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু উৎপাদন হয়।

**22. প্রতিটি অপরিণত শুক্রাণু পুষ্ট হয়ে শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হওয়ার ধাপগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।**

- প্রাথমিক বা আদি শুক্রকোশ (স্পার্মাটোগোনিয়া) (2n) → প্রাথমিক পরশুক্রাণু (প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট) (2n) → গৌণ পরশুক্রাণু (সেকেন্ডারী স্পার্মাটোসাইট ) (n)→ অপরিণত শুক্রাণু (স্পারমাটিড) (n)→ পরিণত শুক্রাণু (স্পার্মাটোজোয়া)(n)।

**23. (a) শুক্রাণু সৃষ্টি হতে কত দিন সময় লাগে ? (b) শুক্রাণু কত দিন বেঁচে থাকে ?**

**(c) স্ত্রীজননাঙ্গে শুক্রাণুর আয়ুষ্কাল কত ?**

- (a) পরিণত শুক্রাণু সৃষ্টি হতে গড়ে সময় লাগে 74 দিন। (b) শুক্রাণু 60 দিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু নিষিক্ত করবার ক্ষমতা থাকে 30 দিন পর্যন্ত। (c) স্ত্রীজননাঙ্গে শুক্রাণু 72 ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকতে পারে না।

**24. পরিণত ডিম্বাণু উৎপাদন কী কী বিশেষ সর্তের উপর নির্ভরশীল ?**

● (i) অ্যান্টিরিয়ার পিট্যুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত FSH, LH ও LTH হর্মোন ডিম্বাণু উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। (ii) ভিটামিন A, E, C এবং B কমপ্লেক্সের কয়েকটি ভিটামিন ডিম্বাণু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। (iii) তাপমাত্রা এবং অন্যান্য অন্তঃক্ষরাগ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ডিম্বাণু উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকে।

**25. (a) প্রোনিউক্লিয়াস কী ? (b) জোনা পেলুসিডা কী ? (c) নিষেক হলে কী হয় ?**

● (a) পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের সম্পূর্ণ নিষেকের আগে ডিম্বাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তাকে **প্রোনিউক্লিয়াস** বলে। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে শুক্রাণুর মস্তক প্রবেশের পর ফুলে গিয়ে পুং উপ-নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে ডিম্বাণু স্ত্রী উপ-নিউক্লিয়াস গঠন করে।

(b) প্রায় গোলাকার পরিণত ডিম্বাণুর বাইরের আবরক ভাইটালাইন মেমব্রেনের থাকে, তার বাইরে আরও যে একটি পুরু বহিরাবরণ থাকে তাকে জোনা পেলুসিডা বলে।

(c) নিষেক হলে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি অর্থাৎ উপ-নিউক্লিয়াস দুটি একত্রে মিলিত হয়ে এক নবজাতক ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং এর মধ্যে 23 জোড়া (46) ক্রোমোজোম থাকে—একে জাইগোট (Zygote) বলে।

**26. বীর্য (Semen) কাকে বলে ?**

● যৌন মিলনের সময় এপিডিডাইমাসে সঞ্চিত স্পার্মাটোজোয়া বা শুক্রাণু (Sperm) এপিডিডাইমিস, সেমিন্যাল ভেসিকল, প্রস্টেট ও কাউপারস গ্ল্যান্ড প্রভৃতি রসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং যৌন সঙ্গমকালে পুরুষের পেনিস দিয়ে নির্গত হয় তাকে **বীর্য (Semen)** বলে।

**27. করোনা রেডিয়েটা কাকে বলে ?**

● ডিম্বাণু নিঃসৃত সেকেন্ডারি উসাইট (Secondary Oocyte) বা গৌণ পরডিম্বাণুর চারদিকে যে গ্র্যানুলোসা কোশপুঞ্জ দেখা যায় তাকে করোনা রেডিয়েটা বলে।

**28. (ক) হায়ালিউরোনিডেজ (Hyaluronidase) কী এবং কোথা থেকে নিঃসৃত হয় ?**
**(খ) স্পার্ম বা শুক্রাণু ওভাম বা ডিম্বাণুর জোনা পেলিউসিডা কখন স্পর্শ করতে সমর্থ হয় ?**

● (ক) হায়ালিউরোনিডেজ একপ্রকার এনজাইম বা উৎসেচক যা শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম থেকে নিঃসৃত হয়।

(খ) শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম থেকে নিঃসৃত হায়ালিউরোনিডেজ এনজাইম যখন হায়ালিউরোনিক অ্যাসিডকে বিনষ্ট করে তখন করোনা রেডিয়েটার কিছু কিছু কোশ মুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা স্পর্শ করে।

**29. ভাইটেলাইন পর্দা (Vitelline membrane) ও ফার্টিলাইজেশান পর্দা (Fertilization membrane) বলতে কী বোঝো ?**

● (ক) **ভাইটেলাইন পর্দা**—ওভাম বা ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের বহিরাংশে যে একটি পাতলা পর্দা দেখা যায় তাকে ভাইটেলাইন পর্দা বলে।

(খ) **ফার্টিলাইজেসান পর্দা**—ফার্টিলাইজেশান বা নিষেকের পরে ডিম্বাণুর যে অংশ দিয়ে শুক্রানু প্রবেশ করে, সেই অংশে যে পর্দার আবির্ভাব ঘটে তাকে ফার্টিলাইজেশান মেমব্রেন বলে।

**30. গবিনী ও জরায়ুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।**

●

| গবিনী | জরায়ু |
|---|---|
| গবিনী বা ইউরেটার কিডনি বা বৃক্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে মূত্রাশয়ে উন্মুক্ত একপ্রকার রেচননালি। | ফ্যালোপিয়ান টিউব বা ডিম্বনালির শেষে প্রসারিত যে অংশে এমব্রায়ো বা ভ্রূণ অবস্থান করে তাকে জরায়ু বা ইউটেরাস বলে। |

**31. মরুলা, ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্ট্রুলা কাকে বলে ?**

● (1) মরুলা ডিম্বাণু বা ওভাম নিষিক্ত হওয়ার পর কয়েকদিন পরপর কোশবিভাজন অর্থাৎ ক্লিভেজের মাধ্যমে বা

সংক্ষেপে জাইগোট বার বার বিভাজিত হয়ে যে কোশপুঞ্জ গঠন করে তাকে **মরুলা** বলে। এই মরুলা জাইগোটের প্রায় সমআকৃতিসম্পন্ন।

(2) ব্লাস্টুলা কোশপুঞ্জ বা মরুলা পরিবর্তিত হয়ে একস্তরবিশিষ্ট যে একটি ফাঁপা বলের আকৃতি ধারণ করে তাকে **ব্লাস্টুলা** বা **ব্লাস্টোসিস্ট** বলে। প্রসঙ্গত ব্লাস্টুলার কোশস্তরকে বলে ব্লাস্টোডার্ম এবং গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে।

(3) **গ্যাস্ট্রুলা**—ব্লাস্টুলার পরবর্তী তিন স্তরবিশিষ্ট দশাকে **গ্যাস্ট্রুলা** বলে। গ্যাস্ট্রুলার তিনটি স্তরের নাম হল—(i) এক্টোডার্ম, (ii) মেসোডার্ম এবং (iii) এন্ডোডার্ম।

**32. প্ল্যাসেন্টা (Placenta) কাকে বলে ? এর দুটি কাজ উল্লেখ করো।**

- ভ্রূণ জরায়ুতে রোপিত হবার পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আন্তঃজরায়ু স্তরের কিছু কোশ ও ক্রমবর্ধমান ট্রোফোব্লাস্ট কোশ একত্রে মিলিত হয়ে ভ্রূণ এবং মাতৃদেহের মধ্যে যে যোগসূত্রকারী অঙ্গ গঠন করে তাকে **প্ল্যাসেন্টা** বলে।

**কাজ**— (i) প্লাসেন্টা ভ্রূণকে মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি ও $O_2$ সরবরাহ করে। (ii) প্লাসেন্টা থেকে HCG, ইস্টোজেন, প্রোজেস্টেরন বিল্যাক্সিন নামে হরমোন ক্ষরিত হয়।

**33. পলিমেনোরিয়া (Polymenorrhoea) ও এপিমেনোরিয়া (Epimenorrhoea) বলতে কী বোঝো?**

- (a) কোনো স্ত্রীলোকের 2-3 সপ্তাহের নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্বাভাবিক রজঃস্রাবকে **পলিমেনোরিয়া** বলে। (b) কোনো স্ত্রীলোকের 2-3 সপ্তাহের নির্দিষ্ট ব্যবধানে অতিরিক্ত রজঃস্রাব হলে তাকে **এপিমেনোরিয়া** বলে।

**34. ডিসমেনোরিয়া (Dysmenorrhoea) ও অলিগোমেনোরিয়া (Oligomenorrhoea) কাকে বলে ?**

- (a) অসহ্য (incapacitating), যন্ত্রণাদায়ক (painful) রজঃস্রাবকে **ডিসমেনোরিয়া** বলে।

(b) কোনো স্ত্রীলোকের 2-3 দিনের মধ্যে অনিয়মিত এবং কম পরিমাণে রজঃস্রাব হলে তাকে **অলিগোমেনোরিয়া** বলে।

**35. মেনোরেজিয়া (Menorrhagia), মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis) ও মেট্রোরেজিয়া (Metrorrhagia) কাকে বলে ?**

- (a) কোনো স্ত্রীলোকের মাসিকের সময় যদি অতিরিক্ত রজঃস্রাব কিংবা অনেকসময় ধরে অথবা একইসঙ্গে অতিরিক্ত এবং অনেকসময় ধরে রজঃস্রাব হয় তবে তাকে **মেনোরেজিয়া** বলে।

(b) কোনো স্ত্রীলোকের মাসিক বা রজঃস্রাব যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে তবে ওই অবস্থাকে **মেনোট্যাক্সিস** বলে।

(c) কোনো স্ত্রীলোকের যদি রজঃচক্র বা মাসিকের মধ্যেই জরায়ু থেকে অনিয়মিত রক্তক্ষরণ হয় তবে ওই অবস্থাকে **মেট্রোরেজিয়া** বলে।

**36. ঋতুচক্র ও রজঃচক্রের মধ্যে পার্থক্য কী ?**

- (a) মানুষ এবং মনুষ্যতের প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে যৌন জীবন সক্রিয় হয়ে উঠলে স্ত্রীপ্রাণীর যৌনাঙ্গের এক কিংবা একাধিক নিয়মিত চক্রাকারে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাকেই **ঋতুচক্র** বলে।

(b) মনুষ্যত্বের প্রাণীর যৌনাঙ্গে নিয়মিত ব্যবধানে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে যৌনচক্র ঘটে তাকেই রজঃচক্র বা মাসিক **যৌনচক্র** বলে।

**37. IUCD ও IUD কী ?**

- IUCD = Intrauterine Contraceptive Device (ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস), যেমন— কপার T, লুপ।

IUD = Intrauterine Death (ইন্ট্রাইউটেরাইন ডেথ)

**38. HCG বলতে কী বোঝো? এর কয়েকটি কাজের উল্লেখ করো।**

- (a) HCG = Human Chorionic Gonadotrophin — হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন। এটি প্ল্যাসেন্টার কোরিওনিক ভিলাই থেকে নিঃসৃত একটি গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় হরমোন।

**কাজ**— (i) রজঃচক্রীয় করপাস লিউটিয়াম গর্ভকালীন করপাস লিউটিয়ামে পরিণত হয়। (ii) কর্পাস লিউটিয়ামের সক্রিয়তাকে দীর্ঘায়িত এবং বৃদ্ধি করা HCG-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

#### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :

1. যে নির্দিষ্ট বয়সে কোনো এক ব্যক্তি প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে তাকে কী বলে ?
2. পুরুষে পুরুষোচিত এবং নারীর নারীসুলভ মনোভাব যে সময় থেকে শুরু হয় তাকে কী বলে ?
3. মানুষের বংশরক্ষা করার জন্য নিয়োজিত যৌনাঙ্গসমূহ একত্রিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে কী বলে ?
4. যেসব যৌনাঙ্গ জনন কোশ উৎপন্ন করে তাদের কী বলে ?
5. মুখ্য যৌনাঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যান্য যৌনাঙ্গ যা দেহের প্রজনন কাজে অংশ গ্রহণ করে তাদের কী বলে ?
6. পুরুষের মুখ্য যৌনাঙ্গের নাম কী ?
7. স্ত্রীলোকের মুখ্য যৌনাঙ্গের নাম কী ?
8. শিশুর জন্মের পর যদি শুক্রাশয় দুটি শুক্রাশয় থলিতে নেমে না আসে তাহলে সেই অবস্থাকে কী বলে ?
9. বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কয়েক রকমের যে বাহ্যিক এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন দেখা যায় এদের কী বলে ?
10. জরায়ুর উভয়পাশে অবস্থিত যে পেশিবহুল, নলাকার অংশ যা প্রতিটি ডিম্বাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে কী বলে ?
11. স্ত্রীলোকের দেহের শ্রেণি অঞ্চলের ন্যাসপাতি আকৃতির, কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত পেশিবহুল অঙ্গ যা মূত্রথলি এবং মলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে তাকে কী বলে ?
12. শুক্রাশয়ের সবথেকে বাইরের আবরককে কী বলে ?
13. শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ায় আদি শুক্রকোশ কোন্ কোশবিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় ?
14. স্পার্মাটোজেনেসিসের যে প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্পার্মাটিড পরিণত হয়ে স্পার্মাটোজোয়াতে রূপান্তরিত হয় তাকে কী বলে ?
15. যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপাদক নালিকায় শুক্রাণুর উৎপাদন ঘটে তাকে কী বলে ?
16. একটি শুক্রাণু মস্তকের অগ্রভাগে টুপির মতো প্রোটোপ্লাজমের পাতলা আচ্ছাদন থাকে তাকে কী বলে ?
17. ডিম্বাশয়ের সবথেকে বাইরের স্তর যা ঘনকাকার আবরণী কলা নিয়ে গঠিত এবং ডিম্বথলি উৎপন্ন করে তাকে কী বলে ?
18. গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে পরিণত ডিম্বাণু বেরিয়ে আসার পর ফলিকলের যে অংশ পরিবর্তীত হয়ে যা তৈরি করে তাকে কী বলে ?
19. স্ট্রোমা কোশ ও অবিদীর্ণ ফলিকল কোশ থেকে সৃষ্ট বহুভুজাকৃতি লিপিড দানাপূর্ণ কোশ যা থেকে সম্ভবত ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে তার নাম কী ?
20. যে প্রক্রিয়াতে প্রতিমাসিক যৌনচক্রের 14 দিনে একটি পণিত ডিম্বথলি বিদীর্ণ হয়ে ডিম্বাণু নির্গত করে সেই প্রক্রিয়াকে কী বলে ?
22. ডিম্বাশয়ে জীবাণু উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলে ?
23. স্ত্রীলোকের প্রজননকালীন সময়ে প্রতি 28 দিন অন্তর ডিম্বাশয়, জরায়ু প্রভৃতি যৌনাঙ্গে যে সকল চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে এবং প্রথম 3-5 দিন জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরেযর অবক্ষয় ফলে যোনি পথের মাধ্যমে রক্তস্রাব ঘটে, এই ঘটনাগুলিকে একত্রে কী বলে ?
24. স্ত্রীলোকের 45-50 বছর বয়সের পর আর রজঃচক্র ঘটে না, এই অবস্থাকে কী বলে ?
25. পরিণত ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলনকে কী বলে ?

#### B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও [Put the tick (✓) mark on correct answer] :

1. **মুখ্য যৌনাঙ্গ কোন্‌টি ?**—সেমিনাল ভেসিকল ☐ যোনি ☐/ পেনিস এবং যোনি ☐/ শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় ☐।
2. **স্ত্রীলোকের যোনি কী ধরনের যৌনাঙ্গ ?**—মুখ্য যৌনাঙ্গ ☐/ সহায়ক যৌনাঙ্গ ☐/ গৌণ যৌনাঙ্গ ☐/ গোনড ☐।
3. **গৌণ যৌনাঙ্গ হল**—শুক্রাশয় ☐/ স্তন ☐/ দাড়ি ☐/ ফ্যালোপিয়ান নালি ☐।
4. **সহায়ক যৌন বৈশিষ্ট্য হল**—গোঁফ ☐/ স্তন ☐/ দাড়ি ☐/ সবগুলো ☐।
5. **মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল যে বয়সে ঘটে সেটি**—8-10 বছর ☐/ 11-14 বছর ☐/ 14-16 বছর ☐/ 18-20 বছর ☐।
6. **ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের সময় হল**—10-12 বছর ☐/ 12-14 বছর ☐/ 14-16 বছর ☐/ 16-18 বছর ☐।
7. **প্রতিটি শুক্রাশয়ের ওজন প্রায়**—10-15 gm ☐/ 15-20 gm ☐/ 40-60 gm ☐/ 75-100 gm ☐।
8. **পুরুষের দেহে শুক্রাশয় থাকে**—শ্রোণি অঞ্চলে ☐/ উদর অঞ্চলে ☐/ স্ক্রোটামের মধ্যে ☐/ পেরিটোনিয়ামের মধ্যে ☐।
9. **ক্রিপ্টোরকিডিজম হল**—স্ক্রোটামের মধ্যে শুক্রাশয়ের প্রবেশ না হওয়া ☐/ শুক্রাণুর পরিণতিতে বাধা ☐/ দেহ থেকে স্ক্রোটামকে কেটে বাদ দেওয়া ☐/ ভাস ডিফেরেন্সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ☐।

10. নিম্নলিখিত একটি মুখ্য কারণের জন্য দুটি শুক্রাশয় স্ক্রোটামের মধ্যে নেমে আসে, তা হল—শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য □ / নিষেকের জন্য □ / যৌনাঙ্গের পরিস্ফুরণের জন্য □ / আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের বৃদ্ধির জন্য □।
11. দেহের যে অংশে জনন কোশ বা গ্যামেট তৈরি করে তার নাম হল—টেট্রাড □ / ডায়াড □ / মোনাড □ / গোনাড □।
12. শুক্রাশয়ের লম্বচ্ছেদে যে নালিকার মতো অংশ দেখা যায় তাদের বলে—সেপ্টাম □ / শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা □ / স্ট্রোমা □ / এপিডিডাইমিস □।
13. প্রতিটি শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপাদক নালিকার সংখ্যা—100-200 টি □ / 300-500 টি □ / 600-800 টি □ / 800-1000 টি □।
14. প্রতিটি শুক্রাণু উৎপাদক নালিকা যে কোশস্তর দিয়ে সাজানো থাকে তাদের সংখ্যা—এক □ / তিন □ / পাঁচ □ / পাঁচের অধিক □।
15. সেমেনিফেরাস টিবিউল উন্মুক্ত হয়—এপিডিডাইমিস □ / ভাস এফেরেনসিয়া □ / ভাসা ডিফেরেনসিয়া □ / রেটিটেস্টিস □।
16. শুক্রাণু উৎপাদক নালিকার মধ্যে যে পুষ্টি সহায়ক কোশ থাকে সেটি হল—লিডিগের আন্তরকোশ □ / সারটোলি কোশ □ / অ্যাট্রিটিক ফলিকুলার কোশ □ / স্পার্মাটোগোনিয়াল কোশ □।
17. সারটোলি কোশের কাজ হল—শুক্রাণুকে পুষ্টি জোগায় □ / শুক্রাণু উৎপাদন করে □ / নিষেক প্রক্রিয়া ঘটায় □ / হরমোন সংশ্লেষিত করে □।
18. শুক্রাণুর উৎপাদন পর তাদের পরিণতিকে বলে—স্পার্মিয়োজেনেসিস □ / স্পার্মাটোজেনেসিস □ / স্পার্মাটোসাইটোজেনেসিস □ / গেমেটোজেনেসিস □।
19. একটি পরিণত শুক্রাণুতে কোন্‌টি থাকে না ?—নিউক্লিয়াস □ / মাইটোকনড্রিয়া □ / সেন্ট্রিওল □ / এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম □।
20. পুষ্টি সংগ্রহের পর সারটোলি কোশ থেকে শুক্রাণুর নির্গমনকে বলে—স্পার্মিয়েশন □ / স্পার্মিয়োজেনেসিস □ / স্পার্মাটোসাইটোজেনেসিস □ / স্পার্মাটোজেনেসিস □।
21. শুক্রাণুর বিচলন যার সাহায্যে ঘটে তা হল—মাথা □ / অ্যাক্রোজোম □ / মধ্য খণ্ড □ / লেজ □।
22. টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়—শুক্রাশয় থেকে □ / সরটোলি কোশ থেকে □ / পিটুইটারি থেকে □ / লিডিগ কোশ থেকে □।
23. লিডিগ কোশের অবস্থান ও ক্ষরণ বস্তুটি হল—যকৃৎ—কোলেস্টেরল □ / ডিম্বাশয়—ইস্ট্রোজেন □ / শুক্রাশয়—টেস্টোস্টেরন □ / অগ্ন্যাশয়—গ্লুকাগন □।
24. একটি ডিম্বাশয়কে যে ঘনকাকার কোশস্তর আবৃত করে রাখে তাকে বলে—প্রজনন কলা স্তর □ / ফলিকুলার এপিথেলিয়াম □ / টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া □ / ভাইটেলিন পর্দা □।
25. ডিম্বাশয়ের স্ট্রোমার মধ্যে যে বহুতলীয় কোশের সমাবেশ দেখা যায় তাদের বলে—সারটোলি কোশ □ / লিডিগের আন্তর কোশ □ / আন্তর কোশ □ / সাস্‌টেন্টাকিউলার কোশ □।
26. ডিম্বাশয়ের প্রজনন কলাস্তর থেকে যে থলির মতো অংশ উৎপন্ন তা পরে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়ে গড়ে—কর্পাস লুটিয়াম □ / বাড়ন্ত ফলিকল □ / গ্রাফিয়ান ফলিকল □ / কর্পাস স্ট্রায়াটাম □।
27. যে প্রক্রিয়ায় গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয়ে ডিম্বাণু নির্গত করে তাকে বলে—উজেনেসিস □ / স্পার্মিয়েশন □ / ওভিউলিশন □ / স্পার্মাটোজেনেসিস □।
28. ওভিউলিশন (ডিম্বাণু নিঃসরণ) ঘটে মাসিক যৌন চক্রের—7 দিনে □ / 14 দিনে □ / 21 দিনে □ / 28 দিনে □।
29. ডিম্বাণু নিঃসরণ পর বিদীর্ণ ফলিকল যা গঠন করে তাকে বলে—কর্পাস স্ট্রায়াটাম □ / কর্পাস ক্যালোসাম □ / কর্পাস লুটিয়াম □ / কর্পাস অ্যালবিকানস □।
30. গ্রাফিয়ান ফলিকলে থাকে—কর্পাস লুটিয়াম □ / কর্পাস অ্যালবিক্যানস □ / থিকা এক্সটেরনা এবং থেকা ইন্টেরনা □ / উজেনিয়াল কোশ □।
31. যে হরমোনের সাহায্যে স্ত্রীলোকের দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল—রিলাক্সিন □ / প্রোজেস্টেরন □ / ইস্ট্রোজেন □ / গোনাডোট্রফিক হরমোন □।
32. ডিম্বাশয়ের কোন্‌ অংশ থেকে ইস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয় ?—স্ট্রোমা □ / প্রজনন কলা □ / ডিম্বাণু □ / গ্রাফিয়ান ফলিকল □।
33. প্রোজেস্টেরন নিঃসৃত স্থান—কর্পরা লুটিয়াম □ / কর্পরা অ্যালবিকানস্‌ □ / কর্পরা ক্যালোসাম □ / কর্পরা স্ট্রায়াটাম □।
34. জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম / আন্তজরায়ু স্তরের ক্রমবর্ধনশীল দশার জন্য দায়ী— রিল্যাক্সিন + প্রোলাকটিন □ / FSH + ইস্ট্রোজেন □ / LH + ইস্ট্রোজেন □ / GTH + রিল্যাক্সিন □।
35. কর্পাস লিউটিয়াম ক্ষরণ করে—ইস্ট্রোজেন □ / প্রোজেস্টেরণ □ / LH এবং FSH □ / প্রোলাকটিন □।
36. মাসিক যৌন চক্র বা রজোঃচক্র কখন হয় ?—10-12 বছর □ / 12-14 বছর □ / 16-18 বছর □ / 45-50 বছর □।
37. মাসিক যৌন হয় না—বয়ঃসন্ধিকালের আগে □ / গর্ভাবস্থায় □ / রজস্রাব নিবৃত্ত কালে □ / উপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে □।
38. উজেনেসিস (ডিম্বাণু উৎপাদন ক্রিয়ায় ) মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোশবিভাজন শুধু নিম্নলিখিত গঠনের সময় ঘটে— উগোনিয়া □ / মুখ্য উসাইট □ / প্রথম পোলার বডি □ / দ্বিতীয় পোলার বডি □।

**39.** **শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ায় একটি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি একই প্রকার শুক্রাণু উৎপন্ন হয় কিন্তু ডিম্বাণু উৎপাদন ক্রিয়ায় একটি মুখ্য উসাইট থেকে তৈরি করে**—চারটি একই প্রকার ডিম্বাণু ☐ / তিনটি বড়ো ডিম্বাণু এবং একটি পোলার বডি ☐ / দুটি বড়ো ডিম্বাণু এবং দুটি পোলার বডি ☐ / একটি বড়ো ডিম্বাণু এবং 2-3 পোলার বডি ☐।

**40.** **পরিণত ডিম্বথলির কোশ যা গ্রাফিয়ান ফলিকলে অবস্থিত উসাইটকে ঘিরে রাখে তা হল**—জোনাপেলুসিডা ☐ / কোরোনা রেডিয়েটা ☐ / জোনা ভেসিকুলোসা ☐ / মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা ☐।

**41.** **ডিম্বাশয় থেকে উসাইড নির্গমনকে বলে**—জেসস্টেশন (গর্ভধারণ) ☐ / ওভুলেশন (ডিম্বাণু নির্গমন) ☐ / পারটুরিশন (সন্তান প্রসব) ☐ / ইনপ্লানটেশন (রোপন) ☐।

**42.** **মানুষের গৌণ ওসাইট অবস্থায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত ?**— 23 ☐ / 46 ☐ / 18 ☐ / 20 ☐

**43.** **মানুষের দেহে যে স্থানে নিষেক ঘটে সেটি হল**—ডিম্বাশয় ☐ / ফ্যালোপিয়ান নালি ☐ / ভাস ডিফারেনসিয়া ☐ / জরায়ু ☐

**44.** **ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে যে মেমব্রেন থাকে তাকে বলে**—ভাইটেলিন পর্দা ☐ / করোনা রেডিয়াটা ☐ / জোনাপেলুসিডা ☐ / নিষেক পর্দা ☐।

**45.** **ইস্ট্রাস চক্র ঘটে**—স্ত্রীলোকের ☐ / সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ☐ / প্রাইমেট ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ☐ / স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণীদের ☐।

**46.** **মনোইস্ট্রাস প্রাণী হল**—প্রতিমাসে একবার ডিম্বাণু নির্গমন ☐ / একটি ডিম্বাণু উৎপাদন করা ☐ / বছরে একবার প্রজনন ঋতু ঘটে ☐ / প্রতি মাসে একবার আন্তঃজরায়ুর ক্ষয় ☐।

**47.** **নিষেক প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর কোন্ অংশ ডিম্বাশয়ে প্রবেশ করে ?**—লেজ ☐ / অ্যাক্রোজোম ☐ / মস্তক ☐ / মস্তক, গ্রীবা এবং মধ্যাংশ ☐।

## C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :

1. বংশবিস্তার ও প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রক্রিয়াকে ——— বলে।
2. মুখ্য জনন অঙ্গকে ——— বলে।
3. ভ্রূণ অবস্থায় শুক্রাশয় দুটি ——— থাকে।
4. ———শ্রেণিগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরে জরায়ুর দুপাশে থাকে।
5. শুক্রাশয়ের মধ্যে যে অসংখ্য কুন্ডলিকৃত নালিকা থাকে তাকে ——— বলে।
6. ——— মিটার কুণ্ডলিকৃত নালিকা যা শুক্রাশয়ের পেছনের দিকে একপাক প্যাঁচানো থাকে ও পরে ভাসডিফারেন্স হয়ে মূত্রনালির পেছনে থাকে।
7. শুক্রাশয়ের লিডেগের আন্তরকোশ থেকে ——— নামে হরমোন ক্ষরিত হয়।
8. ডিম্বাশয়ে যে অংশ ডিম্বাণু উৎপন্ন করে তার নাম হল ———।
9. টেস্টোস্টেরণ হরমোনের রাসায়নিকগতভাবে ——— জাতীয়।
10. শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া দুটি পর্যায়ে ঘটে, একটি হল ——— এবং অন্য একটি হল ———।
11. স্পার্মাটোগোনিয়াতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ——— এবং শুক্রাণুতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ——— হয়।
12. সেমিনিফেরাস টিবিউলস্থিত যে কোষ সদ্য উৎপন্ন শুক্রাণুকে পুষ্টি যোগায় তাকে ——— কোশ বলে।
13. শুক্রাণু মাথার ওপরে অবস্থিত সাইটোপ্লাজম নির্মিত টুপিকে ——— বলে।
14. একটি পরিণত ডিম্বথলি (গ্র্যাফিয়ান ফলিকলে) অবস্থিত ফাঁকা স্থানের অংশটি ——— নামে পরিচিত।
15. ডিম্বাশয় থেকে ——— নামে একটি পলিপেপটাইডজাতীয় হরমোন নিঃসৃত হয়।
16. গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের ভেতরের ——— কোশস্তর থেকে ইস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয়।
17. ফ্যালোপিয়ান নালির ———তে নিষেক প্রক্রিয়া পুং ও স্ত্রী গেমেটের মিলন ঘটে।
18. রজঃচক্রের প্রথম দশা যা 3-5 দিন স্থায়ী থাকে তাকে ——— দশা বলে।
19. অন্তজরায়ুর স্তরকে ——— বলে, যার অবক্ষয়ের ফলে রজঃস্রাব (রক্তস্রাব) ঘটে।
20. ফেলোপিয়ান নালির অ্যাম্পুলা নামে অংশে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে ——— বলে।
21. নিষিক্ত ডিম্বাণু জাইগটের বিভাজনকে ——— বলে।
22. জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে দুই, চার ও বহুকোশ দশায় পরিণত হয়ে যে বহুকোশী অংশ গঠন করে তাকে ——— বলে।
23. যেসব প্রাণীর যৌনাঙ্গগুলি বছরে একবার সক্রিয় হয়ে উঠে তাকে ——— প্রাণী বলে।
24. ঋতুচক্রের ———দশায় স্ত্রী প্রাণী পুরুষ প্রাণীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।
25. নিষেকের প্রারম্ভকালে শুক্রাণুস্থিত ——— উৎসেচক ডিম্বথলির কোশকে বিদীর্ণ করে ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা স্তরকে স্পর্শ করে।
26. নিষেকের 7-8 দিন পর ব্লাস্টোসিস্ট অন্তজরায়ুর একটি পূর্বনির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রতিস্থাপিত হওয়াকে ——— বলে।

## D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :

1. পুরুষ মানুষের মুখ্য যৌনাঙ্গের নাম—(পেনিস / শুক্রাশয় থলি / শুক্রাশয়।)
2. শুক্রাশয়কে বলে—(গোনাড / গ্যামেট / আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ / সহায়ক যৌনাঙ্গ।)
3. স্ত্রীলোকের মুখ্য যৌনাঙ্গ—(যোনি / জরায়ু / ডিম্বাশয় / ফ্যালোপিয়ান নালি।)
4. বয়ঃসন্ধিকালের প্রাক্কালে শুক্রাশয়ের ওজন—(10-20 গ্রাম / 4-8 গ্রাম / 1-2 গ্রাম।)
5. সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটের সরাসরি বিভাজনের পর উৎপন্ন হয়— ( স্পার্মাটোজোয়া / স্পার্মাটিড / স্পার্মাটোগোনিয়া / উসাইট । )
6. পুরুষলোকের দেহে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় —(সারটোলি কোশে শুক্রোৎপাদক নালিকার বাইরে / শুক্রাণু উৎপাদক নালিকার অভ্যন্তরে।)
7. শুক্রোৎপাদক নালিকার ভেতরে কোশস্তরের সংখ্যা—(5টি / 4টি / 3টি / 2টি / অসংখ্য।)
8. টেস্টোস্টেরন — থেকে ক্ষরিত হয়। (কর্পাস লিউটিয়াম / লেডিগের আন্তর কোশ / সার্টোলি কোশ।)
9. পুরুষের গোঁফদাড়ির জন্য দায়ী হরমোনের নাম—(ইস্ট্রোজেন / প্রোজেস্টেরন / টেস্টোস্টেরন / গোনডোট্রোপিক হরমোন ।)
10. লিডিগের আন্তরকোশ পাওয়া যায়—(অগ্ন্যাশয়ে / ফুসফুসে / শুক্রাশয়ে / পিটুইটারিতে / ডিম্বাশয়ে / যকৃতে / কন্ডরায় বা টেনডনে।)
11. ডিম্বাণুর অবস্থান—দেখা যায় (ডিম্বথলিতে / পীতগ্রন্থিতে / সেমিনিফেরাস টিবিউলে।)
12. ডিম্বাণুর নিষেক সংঘটিত হবার স্থান—(ডিম্বাশয়ে / জরায়ুতে / যোনিতে / ফ্যালোপিয়ান নালির উর্ধ্বপ্রান্তে।)
13. একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে লাগে—(একটি শুক্রাণু / দুটি শুক্রাণু / সহস্রাধিক শুক্রাণু।)
14. নিষিক্ত ডিম্বাণু অর্থাৎ জাইগোটে ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে—(2টি / 22 জোড়া / 8টি / 23 জোড়া।)
15. সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটের সরাসরি বিভাজনে উৎপন্ন হয় —। (স্পার্মাটিড / স্পার্মাটোগোনিয়া / স্পার্মাটোজোয়া)
16. লিডিগ কোশ (Leydig cell) — পাওয়া যায়। (অগ্ন্যাশয়ে / ফুসফুসে / শুক্রাশয়ে / পিটুইটারিতে / ডিম্বাশয়ে / যকৃতে )
17. করপাস লিউটিয়াম — পাওয়া যায় (বৃক্কে / ফুসফুসে / জরায়ুতে / ডিম্বাশয়ে)
18. সারটোলি কোশ — পুষ্টি যোগায়। (হৃৎপেশিকে / শুক্রাণুকে / ডিম্বাণুকে / মস্তিষ্ক কোশকে )
19. করপাস লিউটিয়াম — পাওয়া যায়। (বৃক্কে / ফুসফুসে / জরায়ুতে / ডিম্বাশয়ে)
20. সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটের সরাসরি বিভাজনের পর উৎপন্ন হয়— (স্পার্মাটোজোয়া / স্পার্মাটিড / স্পার্মাটোগোনিয়া / উসাইট)
21. ওভিউলেশনের পরে ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন — অস্থায়ী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিরূপে কাজ করে এবং প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করে। (গ্র্যাফিয়ান ফলিকল / টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া / করপাস লুটিয়াম।)
22. টেস্টোস্টেরন — থেকে নিঃসৃত হয়। (পিরামিডাল কোশ / সারটোলি কোশ / লিডিগ কোশ / করপাস লুটিয়াম।)
23. সেমিনিফেরাস টিবিউল — দেখা যায়। (বৃক্কে / শুক্রাশয়ে / ফুসফুসে)

## E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :

1. মায়ের জরায়ুতে থাকার সময় শুক্রাশয় দুটি স্ক্রোটামের মধ্যে থাকে ☐
2. বালক-বালিকাদের বয়ঃসন্ধী কালের সময় যথাক্রমে 12–14 এবং 14–16 বছর। ☐
3. শুক্রাশয়ের একেবারে বাইরের আবরণকে বলে প্রজনন কলা স্তর বলে। ☐
4. টেস্টোস্টেরণ নামে পলিপেপটাইড জাতীয় যৌন হরমোন শুক্রাশয়ের লিডিগের আন্তর কোশ থেকে ক্ষরিত হয়। ☐
5. শুক্রাণু উৎপাদন শুক্রাশয়ের অন্তঃক্ষরা কাজ। ☐
6. সারটোলি কোশ শুক্রাণুকে পুষ্টি যোগায়। ☐
7. সেমিনিফেরাস টিবিউলের অন্তবর্তী এলাকায় সারটোলি কোশ থাকে যা অ্যান্ড্রোজেন নামে হরমোন ক্ষরণ করে। ☐
8. শুক্রথলিতে শুক্রাশয় থাকে বলে শুক্রাশয়ে নির্দিষ্ট তাপ বজায় থাকে। ☐
9. একজন বালিকার 12–14 বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিকাল প্রাপ্ত হয়। ☐
10. 70 বছর বয়সে একজন স্ত্রীলোকের রজঃনিবৃত্তি ঘটে। ☐
11. ইন্টারস্টিসিয়াল কোশ এবং সারটোলি কোশ যথাক্রমে শুক্রাণুকে পুষ্টি যোগায় এবং টেস্টেস্টেরণ হরমোন ক্ষরণ করে। ☐
12. যৌন মিলনের সময় পুংজননতন্ত্র থেকে একপ্রকার ক্ষারীয় অত্যন্ত ঘন দুধের মত যে সাদা রঙের অর্ধতরল পদার্থ নিক্ষিপ্ত হয় তাকে বীর্য বা সিমেন বলে। ☐
13. স্ত্রীলোকের প্রজননতন্ত্রে কোনো সহায়ককারী যৌনগ্রন্থি নেই। ☐
14. বয়ঃসন্ধিকালের পর প্রতি 28 দিন অন্তর যে যৌনচক্র ঘটে তাকে ঋতুচক্র বলে। ☐
15. ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গমনে পিটুইটারি গ্রন্থি FSH এবং LH দায়ী। ☐
16. শুক্রাণুর মস্তকের উপর (অগ্রভাগে) অ্যাক্রোসোম নামে সাইটোপ্লাজমীয় আবরণ থাকে। ☐

17. ডিম্বাশয় থেকে যখন ডিম্বাণু নির্গত হয়, তখন ডিম্বাণু চারপাশে যে দানাদার কোশপুঞ্জ আঠালো হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড দিয়ে সন্নিবেশ হয়ে করোনা রেডিয়াটা গঠন করে। ☐
18. একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করার পর শুক্রাণুর প্রবেশের অংশে যে পর্দা সৃষ্টি হয় তাকে নিষেক পর্দা বলে। ☐
19. শুক্রাণুর সম্পূর্ণ অংশটি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। ☐
20. ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ প্রধানত ডিম্বনালির শেষ উর্ধ্বাংশে ঘটে। ☐
21. যৌন সংগম কালে স্ত্রীলোকের যোনি পথে পুরুষের বীর্য বা সিমেনে অবস্থিত স্পার্মের প্রবেশকে স্পার্মিয়েশন বলে। ☐
22. গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয়ে ডিম্বাণুর নির্গমনকে ওভূলেশন বলে ? ☐

## ◢ II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. পুংগ্যামেট কী ?
2. স্ত্রী গ্যামেট কী ?
3. বয়ঃসন্ধিকাল কাকে বলে ?
4. সারটোলি কোশ কী ?
5. লিডিগের আন্তরকোশ কাকে বলে ?
6. শুক্রাণু উৎপাদনের কোন্ দশায় মাইটোসিস এবং মেয়োসিস কোশ বিভাজন ঘটে ?
7. স্পার্মিয়োজেনেসিস কাকে বলে ?
8. ডিম্বাণু নিঃসরণ বলতে কী বোঝো ?
9. শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়ের কোন্ কোন্ অংশ থেকে যৌন হরমোন ক্ষরিত হয় ?
10. মনোইস্ট্রাস এবং পলিইস্ট্রাস প্রাণী বলতে কী বোঝো ?
11. মরুলা কী ?
12. গ্যাস্ট্রুলা কী ?
13. শক্তিশালী শুক্রাণু (Fit sperm) কাকে বলে ?
14. নিষেক পর্দা কাকে বলে ?
15. ফ্যালোপিয়ান নালিতে নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিবহণ সম্বন্ধে লেখো।
16. পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ক্রোমোজোমের প্রকৃতি কী ? কী অবস্থায় কন্যা ও কী অবস্থায় পুত্র সন্তান হয় ?
17. মুখ্য উসাইটের বিভাজন প্রক্রিয়াটি মাইটোসিস না মায়োসিস ?
18. অটোজোম কাকে বলে ?
19. কোন হরমোন পুরুষের দেহ পেশিবহুল করে এবং কোন্ হরমোন নারীর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে।
20. কর্পাস লুটিয়াম রজঃচক্রের কোন্ দশায় গঠিত হয়। এর থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তার নাম করো।
21. শুক্রাশয়ের ঠিক কোন্ অংশে শুক্রাণু তৈরি হয় এবং কোন কোন কোশ উৎপন্ন শুক্রাণুটিকে পুষ্টি যোগায় ?
22. লিডিক কোশ কী ? এর প্রধান কাজটি উল্লেখ করো।
23. মাসিক যৌনচক্র কখন হয় না ?
24. পুরুষের গৌণ যৌন লক্ষণগুলি কী কী ?
25. গোনাডস এবং জনন কোশ কাকে বলে ?
26. ডিসমেনোরিয়া কাকে বলে ?
27. প্রোনিউক্লিয়াস কাকে বলে ?
28. নিষেক কাকে বলে ?
29. ফার্টিলাইজেশন পর্দা কাকে বলে ?
30. ঋতুচক্র কাকে বলে ?
31. অ্যাট্রিটিক ফলিকল কাকে বলে ?

## ◢ III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) ঃ

1. পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ কাকে বলে ?
2. শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়কে কেন মুখ্য যৌনাঙ্গ বলা হয় ?
3. সেমিনিফেরাস টিবিউলের আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
4. সারটোলি কোশ কাকে বলে ? এর কাজ কী ?
5. লিডিগের আন্তরকোশ কাকে বলে ? এর কাজ কী ?
6. শুক্রাশয় থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তার নাম কী ? এর কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।
7. পুং গ্যামেট বা জননকোশ কাকে বলে ? এর উৎপত্তিস্থল কোথায় ?
8. গ্র্যাফিয়ান ফলিকল কাকে বলে ? এর সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
9. উৎপত্তিস্থলের নাম উলেখ করে ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন হরমোনের নাম করো।
10. কর্পাস লিউটিয়াম বা পীতগ্রন্থি কাকে বলে ? এর গুরুত্ব কী ?
11. ঋতুচক্র এবং মাসিক যৌনচক্র কাকে বলে ?
12. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীলোকের দেহে যে-সকল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ করো।
13. ইস্ট্রোজেন কী ? এর উৎপত্তিস্থল এবং তিনটি কাজ উল্লেখ করো।
14. প্রোজেস্টেরন কী ? এর উৎপত্তি ও কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
15. নিষেক কী ? একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য শুক্রাণুর প্রয়োজন হয় কেন ?

16. মাসিক যৌনচক্রের কোন্ সময়ে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে ?
17. ডিম্বাণু নিঃসরণ কাকে বলে ?
18. কীভাবে শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে ?
19. নিষিক্ত ডিম্বাণুর রোপণ পদ্ধতি কাকে বলে ?
20. নিষেকের সময় ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণু কীভাবে প্রবেশ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
21. ফ্যালোপিয়ান নালিতে নিষিক্ত ডিম্বাণু কীভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যা দাও।
22. শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখো। শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়ার বিভিন্ন কারণগুলি উল্লেখ করো।
23. একটি শুক্রাণুর বর্ণনা করো।

**B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :**

1. অন্ড্রোজেন এবং ইস্ট্রোজেন। 2. পুংজনন কোশ এবং স্ত্রী জনন কোশ। 3. রজঃচক্র এবং ঋতুচক্র। 4. ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরণ। 5. সারটোলি কোশ এবং লিডিগ কোশ। 6. মরুলা এবং ব্লাস্টুলা। 7. স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উজেনেসিস। 8. রজঃচক্রের ক্রমবর্ধমান দশা এবং প্রাক্ রজঃস্রাবীয় দশা।

**C. টিকা লেখো (Write short notes) :**

1. বয়ঃসন্ধি কাল। 2. পুরুষের গৌণ যৌনাঙ্গ। 3. স্ত্রী গৌণ যৌনাঙ্গ। 4. জরায়ু। 5. শুক্রাশয়। 6. ডিম্বাশয়। 7. গ্র্যাফিয়ান ফলিকল। 8. শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া। 9. সারটোলি কোশ। 10. ডিম্বাণু নিঃসরণ। 11. টেস্টোস্টেরণ। 12. ইস্ট্রোজেন। 13. করপাস লুটিয়াম। 14. ক্লিভেজ। 15. ব্লাস্টুলা। 16. লিডিগের আন্তর কোশ। 17. নিষেক। 18. নিষিক্ত ডিম্বাণুর রোপন।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :**

1. শুক্রাশয়ের অবস্থান ও বহির্গঠন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
2. (a) পুরুষ লোকের গোনাডের নাম কী ? (b) এর আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
3. (a) মানুষের শুক্রাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন লেবেল চিত্রসহ বর্ণনা করো। (b) সংক্ষেপে শুক্রাশয়ের ক্রিয়া লেখো।
4. (a) চিত্রসহ ডিম্বাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করো। (b) ডিম্বাশয় থেকে কী কী হরমোন নিঃসৃত হয় ?
5. শুক্রাশয়ের বিভিন্ন কার্যাবলি বর্ণনা করো।
6. ডিম্বাশয়ের অবস্থান ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করো।
7. লেবেলসহ একটি ডিম্বাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন সম্বন্ধে লেখো।
8. (a) রজঃচক্র কাকে বলে ? (b) রজঃচক্রের বিভিন্ন দশার নাম উল্লেখ করো। (c) প্রতিটি দশায় ডিম্বাশয়ের পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করো।
9. (a) ডিম্বাশয় থেকে যে-সকল হরমোন ক্ষরিত হয় তাদের নাম কী ? (b) এইসব হরমোন দেহে অন্যকোনো অঙ্গ থেকে কী ক্ষরিত হয় ? (c) এই সকল হরমোনের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
10. (a) ওভুলেশন বা ডিম্বাণু নিঃসরণ কাকে বলে ? (b) বিদীর্ণ ডিম্বথলির পরিণতি কী হয় লেখো। (c) ইস্ট্রোজেনের কার্যাবলি লেখো।
11. সংক্ষেপে ডিম্বাণু উৎপাদন ক্রিয়া বর্ণনা করো।
12. (a) নিষেক কাকে বলে ? (b) নিষেক সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

**B. চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো (Draw and label the diagram) :**

1. শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের একটি চিহ্নিত চিত্র আঁকো। 2. ডিম্বাশয়ের চিহ্নিত চিত্র আঁকো। 3. একটি শুক্রাণুর সম্পূর্ণ চিত্র এঁকে চিহ্নিত করো। 4. গ্র্যাফিয়ান ফলিকলের সচিত্র চিত্র আঁকো। 5. একটি পরিণত শুক্রাণু এঁকে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

● অধ্যায়ের বিষয়সূচি ঃ



# অনাক্রম্যতাবিদ্যা
# [ IMMUNOLOGY ]

**➧ সূচনা (Introduction) ঃ এডওয়ার্ড জেনার** (Edward Jenner) নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার 1796 খ্রিস্টাব্দে গুটি বসন্ত (Small pox)-এর টিকা বা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম যে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন তাকে তিনি **অনাক্রম্যতা বিদ্যা** বা **ইমিউনোলজি** (Immunology) নামে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময় **লুইস পাস্তুর** কলেরা রোগে আক্রান্ত পাখির দেহ থেকে ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করে তাকে অন্য একটি স্বাভাবিক পাখির দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে পাখিটির মধ্যে ওই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি প্রমাণ করেন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আক্রমণকারী দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা **অনাক্রম্যতা** (Immunity) গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। পরবর্তী কালে একে **ইমিউন তন্ত্র** বা **অনাক্রম্য তন্ত্র** (Immune system) নামে বলা হয়েছে। অনাক্রম্যতা প্রধানত দুই প্রকার, যেমন—জন্মগত এবং অর্জিত অনাক্রম্যতা। জন্মগত অনাক্রম্যতা জন্ম থেকে থাকে কিন্তু অর্জিত অনাক্রম্যতা জন্মের পরে অর্জন করা হয়। বিজাতীয় জীবাণু বা অধঃবিষ (Toxin) দেহে প্রবেশ করার পর অর্জিত অনাক্রম্যতা তৈরি হয়। প্রতিটি জীবাণুতে বা অধঃবিষে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ থাকে যারা অর্জিত অনাক্রম্যতা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## ✪ 11.1. অনাক্রম্য তন্ত্র (ইমিউন সিস্টেম—Immune system) ✪

❖ (a) **অনাক্রম্য তন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Immune system) ঃ যে তন্ত্র দেহকে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য জীবদেহে বিভিন্ন কোশ ও অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে অনাক্রম্য তন্ত্র (Immune system) বলে।**

■ (b) **অনাক্রম্য তন্ত্রের অন্তর্গত কোশ এবং অঙ্গসমূহ (Cells and Organs belong to immune system) ঃ**

● **A. অনাক্রম্য তন্ত্রের কোশ (Cells of immune system) ঃ**

1. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte)— T লিম্ফোসাইট (T-Cells) ও B- লিম্ফোসাইট (B-Cells)

2. **নাল কোশ** (Null cell)—এক ধরনের লিম্ফোসাইট যা **কিলার কোশ** (Killer cell) বা **ন্যাচারাল কিলার সেল** (Natural killer cell সংক্ষেপে NK cell) নামে পরিচিত।

3. **মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটস** (Mononuclear phagocytes)—এই ধরনের কোশ দুই প্রকারের হয়, যেমন—**মনোসাইট** এবং **ম্যাক্রোফাজ**। (a) **মনোসাইট কোশ**—এটি হল রক্তে অবস্থিত একপ্রকার সাধারণ শ্বেত রক্তকণিকা। (b) **ম্যাক্রোফাজ কোশ**—এইপ্রকার কোশ বিভিন্ন ধরনের হয়, যথা—(i) যকৃতের কুফার কোশ (Kupffer cell), (ii) ফুসফুসের বায়ুথলির ম্যাক্রোফাজ (Alveolar macrophage), (iii) যোগকলার হিস্টিওসাইট কোশ (Histiocytes cells), (iv) অস্থির অস্টিওক্লাস্ট কোশ (Osteoclast), (v) বৃক্কের মেসানজিয়াল কোশ (Mesangial cell) এবং (vi) মস্তিষ্কের মাইক্রোগ্লিয়াল কোশ (Microglial cell)

4. **গ্রাণুলার লিউকোসাইট** (Granular leucocyte)—রক্তের নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

5. **মাস্ট কোশ** (Mast cell)—মাস্ট কোশ অ্যারিওলার যোগকলায় থাকে।

6. **ডেনড্রাইটিক কোশ** (Dendritic cells)—অনাক্রম্য তন্ত্র অন্তর্গত এই ধরনের কোশ দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকে, যেমন—ল্যাঙ্গারহ্যানস্ কোশ (Langerhan cells)—(i) ত্বকে এবং মিউকাস পর্দায় থাকে, (ii) ইন্টারডিজিটেটিং ডেনড্রাইটিক কোশ (Interdigitating dendritic cell)— থাইমাস গ্রন্থির মেডুলা অংশে থাকে এবং (iii) আন্তরকোশীয় ডেনড্রাইটিক কোশ (Interstitial dendritic cell)—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গে থাকে।

● **B. অনাক্রম্য তন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ (Organs of immune system)** ঃ অনাক্রম্য তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গ দুই প্রকার—

1. **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Primary lymphoid organs)—থাইমাস গ্রন্থি, অস্থিমজ্জা এবং লসিকা ও লসিকাবাহ নিয়ে গঠিত লসিকা তন্ত্র।

2. **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Secondary lymphoid organs)—লসিকা গ্রন্থি, প্লিহা, মিউকাস ঝিল্লি সংলগ্ন লিম্ফয়েড কলা।

❖ **অনাক্রম্যতা বিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Immunology) ঃ জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বহিরাগত কোনো বস্তুর অনুপ্রবেশের ফলে দেহে সৃস্ট প্রতিরোধী ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে অনাক্রম্যতা বিদ্যা বা ইম্যুনোলোজি বলে।**

## ✪ 11.2. অ্যান্টিজেন (Antigen—Ags) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে বিজাতীয় বস্তু অথবা অধবিষ মেরুদন্ডী প্রাণীর দেহে অনুপ্রবেশের ফলে একটি সমসংস্থ প্রোটিন ধর্মী বস্তু (অ্যান্টিবডি) সৃষ্টি হয় এবং বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে নবগঠিত বস্তুর আন্তঃক্রিয়া ঘটে, সেই বিজাতীয় বস্তুকে অ্যান্টিজেন (Antigen) বলে।**

উপরের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে অ্যান্টিজেনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন—(i) **অনাক্রম্যতাকরণ বা ইমিউনোজেনিসিটি** (Immunogenicity) অর্থাৎ নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির উৎপাদনের ক্ষমতা।

(ii) **বিক্রিয়া করার ক্ষমতা** (Reactivity) অর্থাৎ উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়া করার ক্ষমতা। যেসব অ্যান্টিজেনে এই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাদের **সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন** (Complete antigen) বলে।

(b) **অ্যান্টিজেনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Antigen) ঃ**

রাসায়নিকভাবে অধিকাংশ অ্যান্টিজেন **প্রোটিন জাতীয় পদার্থ,** যথা—নিউক্লিওপ্রোটিন (নিউক্লিক অ্যাসিড + প্রোটিন), লাইপোপ্রোটিন (লিপিড + প্রোটিন), গ্লাইকোপ্রোটিন (কার্বোহাইড্রেট + প্রোটিন)। আবার কোনো কোনো অ্যান্টিজেন বৃহদাকার **পলিস্যাকারাইড প্রকৃতির** হয়। সাধারণত অ্যান্টিজেনের আণবিক ওজন প্রায় 10,000 বা তার অধিক হয়।

**সমগ্র অণুজীব** (Microbs) যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে, আবার **অণুজীবের কয়েকটি উপাংশও** অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। **উদাহরণ**—ব্যাকটেরিয়ার কোনো অংশ, যেমন—ফ্লাজেলা, ক্যাপসুল এবং কোশপ্রাচীর অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যান্টিজেনধর্মী (Antigenic)। **ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অধিবিষ** (Bacterial toxins) তীব্র অ্যান্টিজেনধর্মী। অণুজীব ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, যেমন—ডিমের সাদা অংশ, ফুলের রেণু, অমিল রক্তকণিকা (Incompatible blood cells), কলাকোশের এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রতিস্থাপন (Transplantation) ইত্যাদি অ্যান্টিজেনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া (Reaction between Antigen and Antibody) ঃ**

অ্যান্টিজেনের সম্পূর্ণ অংশ থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না। অ্যান্টিজেনের উপরিতলে অবস্থিত নির্দিষ্ট অঞ্চলকে **অ্যান্টিজেনধর্মী নির্ধারক স্থান** (Antigenic determinant site) বলে। এই স্থানে অ্যান্টিজেনের নির্দিষ্ট রাসায়নিক মূলক (নির্ধারক স্থান) অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সংযুক্তি প্রধানত নির্ধারক স্থানের আকার ও আকৃতির উপর এবং অ্যান্টিবডির রাসায়নিক গঠনের প্রতি কতটা সংগতিপূর্ণ তার উপর নির্ভর করে। অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির সংযুক্তি বা বিক্রিয়া অনেকটা উৎসেচক (Enzyme) এবং বিক্রিয়ক (Sulphate)-এর অণুর তালা-চাবি (Lock and key) বিক্রিয়ার মতো হয়। অ্যান্টিজেনের উপরিতলে অবস্থিত অ্যান্টিজেনধর্মীর নির্ধারক স্থানের সংখ্যাকে **ভ্যালেনস** (Valence) বলে। বেশিরভাগ অ্যান্টিজেনে ভ্যালেন্সের সংখ্যা (নির্ধারক স্থান) একাধিক বা বহুভ্যালেন্ট (Multivalent) হয়। দেখা গেছে অ্যান্টিবডির উৎপাদনকে আবেসিত (উদ্দীপিত) করার জন্য একটি অ্যান্টিজেনে কমপক্ষে দুটি নির্ধারক স্থান (Bivalent) থাকা প্রয়োজন।

মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশের সঙ্গে মানুষকে মানিয়ে চলতে হয়। মানুষের চারপাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রকার অণুজীব এবং **বিজাতীয় পদার্থসমূহ** (Foreign substances) দেহে নানাভাবে ঢোকে, ফলে মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো বিপর্যস্ত করে তোলে। দেহে প্রবেশকারী জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দেহকে বিষাক্ত করে তোলে। তাই এই রকম রাসায়নিক পদার্থকে **অধিবিষ** বা **টক্সিন** (Toxin) বলে। অধিবিষ দেহে শ্বেতকণিকাকে উদ্দীপিত করে একপ্রকার প্রোটিন উৎপন্ন করে। এরপর অধিবিষের সঙ্গে প্রোটিন মিলিত হয়ে তাকে প্রশমিত করে, ফলে জীবাণুরা দেহে আর বিস্তার লাভ করতে পারে না। প্রোটিনকে তাই **প্রতিবিষ** (Antitoxin) বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিষ এক ধরনের অনাক্রম্য বস্তু (Immune body) যা অধিবিষের উপস্থিতিতে তৈরি হয়। এইজাতীয় অনাক্রম্য বস্তুকে **অ্যান্টিবডি** বলে। অ্যান্টিবডি তৈরি হতে যে বস্তুর প্রয়োজন তাকে অ্যান্টিজেন বলে। এখানে অধিবিষ হল অ্যান্টিজেন এবং প্রতিবিষ হল অ্যান্টিবডি।

বিভিন্ন কারণে অ্যান্টিজেন রাসায়নিকভাবে ভেঙে খন্ড খন্ড অবস্থায় পরিণত হয়। দেখা গেছে প্রতিটি খন্ডে একটি করে নির্ধারক স্থান থাকার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় খন্ডকটির আণবিক ওজন সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেনের আণবিক ওজনের (10,000) তুলনায় কমে প্রায় 200—1000 আণবিক ওজনসম্পন্ন হয়। দেহে এভাবে বিচ্ছিন্ন নির্ধারক স্থানযুক্ত খণ্ডাংশ মূল খন্ডাংশের প্রভাবে অ্যান্টিবডির সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো একটি পদার্থকে অ্যান্টিজেনধর্মী হতে হলে তার আণবিক ওজন অবশ্যই 8,000 বা বেশি হতে হবে। এই কারণে যখন প্রাণীর দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে এই সব খন্ডাংশ-অ্যান্টিজেনকে দেহে প্রবেশ করানো হয় তখন এদের অ্যান্টিবডি উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকে না। আবার আণবিক ওজন কম হলে তাদের সম্পূর্ণভাবে অ্যান্টিজেনের মতো কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। অ্যান্টিজেন যখন একটি নির্ধারক স্থানের ক্রিয়াশীলতা থাকে কিন্তু অনাক্রম্যতাকরণের ক্ষমতা (Immunogenicity) থাকে না তখন তাকে **আংশিক অ্যান্টিজেন** (Partial antigen) বা **হেপ্‌টেন** (Hapten) বলে। যদি একটি হেপ্‌টেন বৃহদাকার বাহক অণুর সঙ্গে মিলিত থাকে তাহলে এই যৌথ অণুতে যে দুটি নির্ধারক স্থান থাকে তা অনাক্রম্য অর্থাৎ সক্রিয় হয় এবং তাতে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে। **উদাহরণ**—কিছু কিছু স্বল্প আণবিক ওজনের ওষুধ, যেমন—পেনিসিলিন দেহে উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুটি নির্ধারিত স্থান

গঠন করে যার ফলে এটি অ্যান্টিজেনধর্মী হয়। এই প্রকার যৌগ থেকে যেসব অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তারা বিভিন্ন ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভূত অ্যালার্জি বিক্রিয়ার জন্য দায়ী।

অ্যান্টিজেন পদার্থগুলি সমসময় বিজাতীয় পদার্থ, তারা কোনোমতেই দেহের রাসায়নিক অংশ হতে পারে না।

## 11.3. অ্যান্টিবডি (Antibody—Abs)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে প্রোটিন জাতীয় বস্তু দেহে অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এবং তার প্রভাবে তৈরি হয় এবং নির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তঃক্রিয়া করে তাকে অ্যান্টিবডি বলে।**

উপরের সংজ্ঞাটি মূলত অ্যান্টিজেন সংজ্ঞার পরিপূরক। অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির সঠিক বিক্রিয়া শুধুমাত্র অ্যান্টিজেনধর্মী নির্ধারক স্থানের আকার এবং আকৃতির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু (তালা-চাবি অনুরূপতা) ওই বিক্রিয়া অ্যান্টিবডির অনুরূপ স্থানের উপরও নির্ভর করে । একটি অ্যান্টিজেনের মতো একটি অ্যান্টিবডিতেও একটি **ভ্যালেন্স** (Valance) থাকে, তবে বেশিরভাগ অ্যান্টিজেন **বহুভ্যালানটযুক্ত** হয়, কিন্তু অ্যান্টিবডিগুলি দ্বিভ্যালেন্ট বা বহুভ্যালেন্ট হয়। মানুষের অধিকাংশ অ্যান্টিবডিগুলি দ্বিভ্যালেন্ট প্রকৃতির হয়।

**(b) অ্যান্টিবডের প্রকারভেদ এবং এদের অবস্থান (Types of Antibodies and their Location) ঃ**

অ্যান্টিবডি গ্লোবিউলিন প্রোটিন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, তাই অ্যান্টিবডিগুলিকে **ইম্যুনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulins—Ig)** বলে। মানবদেহে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণির ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—IgG, IgA, IgM, IgD এবং IgE। প্রতিটির একটি সুস্পষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং নির্দিষ্ট জৈবক্রিয়া আছে।
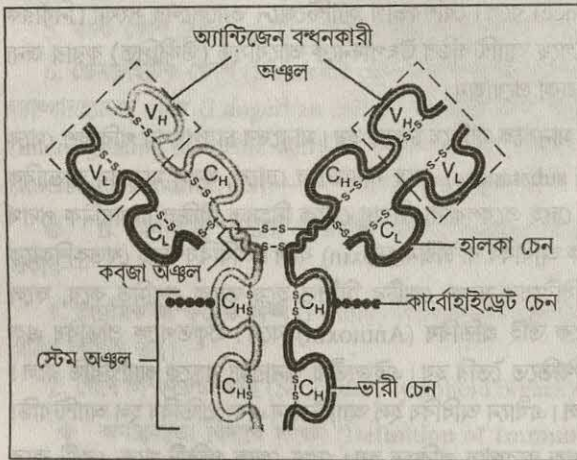
চিত্র 11.1 ঃ IgG-এর ভারী এবং হালকা চেনের চিত্ররূপ।

1. **IgG অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin G** সংক্ষেপে **IgG)**—রক্তে এই প্রকার অ্যান্টিবডির পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে। মানুষের রক্তে অবস্থিত মোট অ্যান্টিবডির 80 শতাংশ হল IgG। রক্ত ব্যতীত লসিকা এবং অন্ত্রেও IgG পাওয়া যায়। এই প্রকার অ্যান্টিবডি মনোমার (Monomer–one unit) হিসাবে থাকে। এই অ্যান্টিবডি দুটি হালকা চেন (L-chain) এবং দুটি ভারী চেন (H-chain) পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকে। হালকা চেন এবং ভারী চেনগুলি নির্দিষ্ট রীতিতে ভাঁজ হয়ে গ্লোবিউলার প্রোটিনের মতো রক্তের সিরামে থাকে।

● **ভূমিকা**—IgG হল একমাত্র অ্যান্টিবডি যা প্লাসেন্টাকে অতিক্রম করতে পারে ফলে সহজেই মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে যেতে পারে। এই কারণে একে **ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিও** বলে। IgG অ্যান্টিবডি ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ধ্বংসকারী ধর্মের অধিকারী হয় বলে দেহের প্রতিরক্ষার কাজে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। অ্যান্টিবডি জীবাণু এবং ফ্যাগোসাইট (আগ্রাসন) কোশের নির্দিষ্ট গ্রাহক অঞ্চলে আবদ্ধ হয়ে জীবাণুকে আগ্রাসন কোশের গ্রহণযোগ্য করে। এছাড়া অধিবিষ (Toxins)-এর প্রশমিতকরণ (Neutralization) এবং অনুপূরক তন্ত্রকে উদ্দীপিত করে দেহকে সুরক্ষিত রাখে।
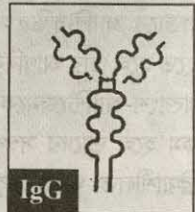
2. **IgA অ্যান্টিবডি (ImmunoglobulinA** সংক্ষেপে **IgA)**—রক্তে এই প্রকার অ্যান্টিবডির পরিমাণ মোট অ্যান্টিবডির পরিমাণের প্রায় 10–15 শতাংশ। এটা মনোমার (Monomer—one unit) এবং ডাইমার (Dimer—two units) হিসাবে থাকে।

পীড়ন অবস্থায় রক্তে এর পরিমাণ কমে যায়। লসিকাতেও এই প্রকার অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। এছাড়া প্রধানত ঘর্ম, অশ্রু, লালা, শ্লেষ্মা, দুধের ক্লোস্ট্রাম (clostrum– শিশুর জন্মের পর প্রথম ক্ষরিত মায়ের দুধ) ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষরণ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণ থাকে।

● **ভূমিকা**—IgA অনাবৃত দেহতলকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। IgA আবরণে আবৃত জীবাণু (coated microorganisms) -কে মিউকাস পর্দায় আবন্ধ হতে বাধা দেয়, এর ফলে জীবাণু (ব্যাক্‌টেরিয়া ও ভাইরাস) দেহের মধ্যে ঢুকতে পারে না।
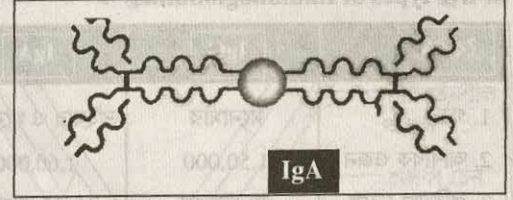
3. **IgM অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin M সংক্ষেপে IgM)**—রক্তে এই প্রকার অন্টিবডির পরিমাণ মোট অ্যান্টিবডির প্রায় 5–10 শতাংশ। এই ধরনের অ্যান্টিবডির আকার সব থেকে বড়ো হয়। এটি রক্তে পেন্টামার (Pentamer–five units) হিসাবে থাকে। রক্তবাহের মধ্যে আবন্ধ থেকে অ্যান্টিবডিগুলি রক্তের মাধ্যমে সংবাহিত হয়। এছাড়া লসিকা ও B-কোশের (B-lymphocyte) উপরিতলে থাকে। এরা অণুজীবের প্রতি অধিক ক্রিয়াশীল।
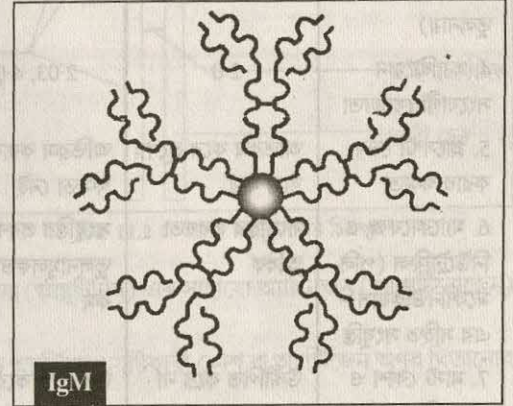
● **ভূমিকা**—ভ্রূণের দেহে IgM প্রথম সংশ্লেষিত হয়। রক্তের ABO -গ্রুপের স্বাভাবিক অ্যান্টি-A ও অ্যান্টি-B এবং জীবাণু প্রতিরোধে সংশ্লেষিত অ্যান্টিবডি হল এই শ্রেণির অ্যান্টিবডি। এই প্রকার অ্যান্টিবডি আগ্লুটিনেশন (Agglutination), কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন (Complement fixation), ব্যাক্‌টেরিওলাইসিস (Bacteriolysis) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষা (অনাক্রম্যতায়) সাহায্য করে।
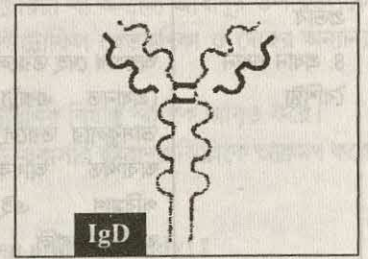
4. **IgD অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin D সংক্ষেপে IgD)** ঃ রক্তে এই প্রকার অ্যান্টিবডি (IgD) খুব কম পরিমাণে (প্রায় 0·2%) মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই প্রকার অ্যান্টিবডি মনোমার হিসাবে প্রধানত B-কোশের (B-লিম্ফোসাইটের) উপরিতলে সংলগ্ন থাকে।

● **ভূমিকা**—IgD অ্যান্টিবডি সম্ভবত B-লিম্ফোসাইটের পরিণতির শেষ দশাকে উদ্দীপিত করে এবং B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেন গ্রাহক হিসাবে কাজ করে।

5. **IgE অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin E সংক্ষেপে IgE)** ঃ রক্তে এই ধরনের অ্যান্টিবডির পরিমাণ খুবই কম, মাত্র 0·1 শতাংশ।

মনোমার অবস্থায় মাস্ট কোশ এবং শ্বেত রক্তকণিকার বেসোফিলের মেমব্রেনের উপর সংযুক্ত থাকে।
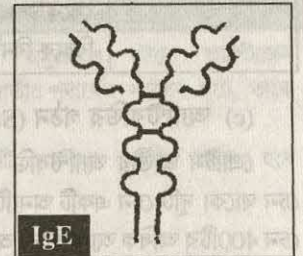
● **ভূমিকা**—IgE অ্যান্টিবডি যখন বিভিন্ন ড্রাগ (ভেষজ—drugs), পরাগরেণু, কয়েক প্রকার খাবার প্রভৃতি অ্যান্টিজেন প্রভৃতির সঙ্গে আবন্ধ হয়, তখন মাস্ট কোশ বা বেসোফিল শ্বেতকণিকা হিস্টামিন নামে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এর ফলে দেহে অ্যালার্জির (Allergy) উপসর্গ প্রকট হয়। IgE বিভিন্ন ভেষজ পদার্থ, পরাগরেণু প্রভৃতির উপস্থিতিতে সৃষ্ট অ্যালার্জির উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে।

● **পাঁচ প্রকার ইমিনোবিউলিনের তুলনামূলক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Few comparative characteristic features of five types of Immunoglobulins) :**

| বৈশিষ্ট্য | IgG | IgA | IgM | IgD | IgE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. গঠন | মনোমার | ডাইমার ও মনোমার | পেন্টামার | মনোমার | মনোমার |
| 2. আণবিক ওজন | 1,50,000 | 1,60,000 | 9,70,000 | 1,75,000 | 1,90,000 |
| 3. পরিমাণ (রক্তে মোট অ্যান্টিবডির তুলনায়) | 80 শতাংশ | 10-15 শতাংশ | 5-10 শতাংশ | 0·2 শতাংশ | 0·1 শতাংশ |
| 4. অ্যান্টিজেন সংযোগী যোজ্যতা | 2·0 | 2·03, 4·0 | 5·0 (10·0) | 2·0 | 2·0 |
| 5. প্লাসেন্টা ভেদ করার ক্ষমতা | অতিক্রম করে ভ্রূণের রক্তে যায় | অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই | অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই | অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই | অতিক্রম করতে পারে। |
| 6. ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল (পলি-মর্ফোনিউক্লিয়াস)-এর সহিত সংযুক্তি | সংযুক্তির প্রবণতা অধিক | সংযুক্তির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম | সংযুক্তি ঘটে না | সংযুক্তি ঘটে না | সংযুক্তি ঘটে না |
| 7. মাস্ট কোশ ও বেসোফিলের উপর প্রভাব | উদ্দীপিত করে না | উদ্দীপিত করে না | উদ্দীপিত করে না | উদ্দীপিত করে না | উদ্দীপিত করে |
| 8. প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য | অন্তঃস্থ দেহ তরলে (প্রধানত এক্সট্রা-ভাসকুলার তরলে) অবস্থিত অধিক পরিমাণ এই অ্যান্টিবডিগুলি জীবাণু ও জীবাণু থেকে উৎপন্ন অধি-বিষকে বিনষ্ট করে। | দেহের মিউকাস ক্ষরণে এই অ্যান্টিবডিগুলি বেশি পরিমাণে থাকে এবং দেহের বাহ্যিক তলের রক্ষায় সাহায্য করে। | ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণে কার্যকরী আগ্লুটিনেট হিসাবে এই অ্যান্টিবডি কাজ করে। | প্রধানত লিম্ফোসাইটের উপরিতলে থাকে এবং এর সক্রিয়তা খুব কম। | দেহের বাহ্যিক প্রতিরক্ষায় পরজীবীর আক্রমণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট নিয়োগ এবং অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশের জন্য দায়ী। |

**(c) অ্যান্টিবডির গঠন (Structure of Antibody) :**

প্রোটিন জাতীয় অ্যান্টিবডি পলিপেপ্‌টাইড চেন নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ অ্যান্টিবডিতে দুজোড়া (চারটি) পলিপেপ্‌টাইড চেন থাকে। দুটি চেন একটি অন্যটির মতো একপ্রকারের হয় এবং তাদের **ভারী চেন** (Heavy chains সংক্ষেপে **H**) বলে। প্রতিটি চেন 400টির অধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। অন্য দুটি চেনও একপ্রকারের হয়, এবং তাদের **হালকা চেন** (Light chain সংক্ষেপে **L**) বলে। প্রতিটি হালকা চেন 200টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। অ্যান্টিবডি দুটি অভিন্ন অর্ধাংশ **ডাইসালফাইড বন্ধনী** (S-S) দিয়ে যুক্ত থাকে। প্রতিটি অর্ধাংশ একটি ভারী চেন এবং একটি হালকা চেন নিয়ে গঠিত, এবং তারাও **ডাইসালফাইড বন্ধনী** (S-S) নিয়ে গঠিত। অ্যান্টিবডি অণুর আকৃতি মোটামুটি **"Y"** অক্ষরের মতো হয়। কখনো-কখনো এই আকৃতি **'T'** -এর মতোও দেখা যায়। ভারী এবং হালকা চেনের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট অঞ্চল দেখা যায়। ওই দুই প্রকার চেনের অগ্রভাগকে **পরিবর্তনশীল অঞ্চল** (Variable region—সংক্ষেপে **'V'**) বলে। এই অঞ্চলে অ্যান্টিজেন-বন্ধনকারী অঞ্চল (Antigen-binding region) থাকে যা বিভিন্ন অ্যান্টিবডিতে পরিবর্তনশীল অঞ্চলগুলি বিভিন্ন রকমের হয়। এই অঞ্চলের প্রকৃতি অনুযায়ী অ্যান্টিবডি একটি

নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে আবদ্ধ হয়। যেহেতু অধিকাংশ অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করার জন্য দুটি পরিবর্তনশীল অঞ্চল আছে তাই তারা **বাইভেলেন্ট** (Bivalent)। প্রতিটি পলিপেপ্‌টাইড বন্ধনীর অবশিষ্ট অংশকে **ধ্রুবক বা কনস্টান্ট অঞ্চল** (Constant region—সংক্ষেপে 'C') বলে। এই অঞ্চলটি একই শ্রেণির সব অ্যান্টিবডিতে সমান হয়, এবং অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার প্রকারভেদের জন্য দায়ী। তবে এই একটানা অঞ্চলটি এক শ্রেণির অ্যান্টিবডি অন্য প্রকার অ্যান্টিবডি থেকে পৃথক হয়।
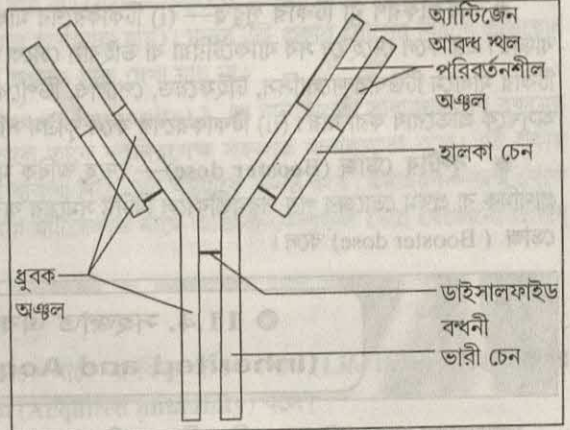
চিত্র 11.2 ঃ একটি অ্যান্টিবডির চিত্ররূপ।

(d) **অ্যান্টিবডির কাজ (Function of antibody) ঃ**

**নামের বিভিন্নতা**—অ্যান্টিবডিগুলি বিভিন্নভাবে তাদের কাজ করে। কাজের ভিত্তিতে এগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—

1. **ব্যাকটেরিওলাইসিন** (Bacteriolysin)—এই প্রকার অ্যান্টিবডি দেহে প্রবেশকারী জীবাণুর কোশকে ধ্বংস করে।

2. **প্রতিবিষ** (Antitoxin)— প্রতিবিষ অ্যান্টিবডির অধবিষকে প্রশমিত করে।

3. **স্তূপীভবন (অ্যাগ্লুটিনেশন**—Agglutination)—অ্যান্টিবডি বা (আগ্লুটিনিন)-এর সাহায্যে অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন) -এর দলবদ্ধ করবার পদ্ধতিকে অ্যাগ্লুটিনেশন বলে।

4. **অধঃক্ষেপণ ( প্রেসিপিটেশন**—Precipitation)—অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন সৃষ্টিকারী কোশ বা অ্যান্টিজেন অণুর থিতানোর প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে।

5. **অপসোনাইজেশন** (Opsonization)— পরিপূরক সংস্থার উৎসেচক ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য জীবাণুর উপরিতলকে আক্রমণ করে, ফলে তাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত জীবাণুকে রক্তের নিউট্রোফিল শ্বেতকণিকা ও দেহের অন্যান্য ম্যাক্রোফাজ (আগ্রাসন কোশ) আগ্রাসনের মাধ্যমে বিনষ্ট করতে সাহায্য করে।

6. **প্রশমন** (Neutralization)—প্রশমন প্রক্রিয়ায় অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর বিষাক্ত স্থানকে আবৃত করে।

7. **বিশ্লিষ্টকরণ (লাইসিস**—Lysis)—লাইসিস ক্ষেত্রে কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্ন করে ফেলে।

● **অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির পার্থক্য (Difference between Antigen and Antibody) ঃ**

| অ্যান্টিজেন | অ্যান্টিবডি |
|---|---|
| 1. যে সব বহিরাগত বস্তু প্রাণীদেহে অনুপ্রবেশের ফলে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষ ঘটে তাদের অ্যান্টিজেন বলে। | 1. প্রাণীদেহে অ্যান্টিজেনের অনুপ্রবেশ ঘটলে অ্যান্টিজেন নিষ্ক্রিয়কারী যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষ ঘটে, তাকে অ্যান্টিবডি বলে। |
| 2. রাসায়নিক প্রকৃতিতে এটি প্রোটিন বা জটিল কার্বোহাইড্রেট জাতীয় হয়। | 2. রাসায়নিক প্রকৃতিতে এটি সবসময় প্রোটিন জাতীয় হয়ে থাকে। |
| 3. দেহতরলে বা কোশপর্দায় দ্রবীভূত হয়ে থাকে। | 3. রক্তরসে দ্রবীভূত হয়। |
| 4. অ্যান্টিজেনের প্রভাবেই অ্যান্টিবডির সংশ্লেষ ঘটে। | 4. অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেনের সংশ্লেষ ঘটে না। |

## ❂ টিকা, টিকাকরণ এবং বুস্টার ডোজ (Vaccin, Vaccination and Booster dose) ঃ

❖ **1. টিকার সংজ্ঞা—এক প্রকার প্রচলিত বস্তু যার সাহায্যে জীবাণু বা জীবাণু থেকে তৈরি পদার্থ কৃত্রিমভাবে দেহে প্রবেশ করিয়ে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করা হয় তাকে টিকা (ভ্যাকসিন—Vaccin) বলে।** এই পদ্ধতিকে **টিকাকরণ** (Vaccination) বলে।

❖ **2. টিকাকরণের সংজ্ঞা—যে পদ্ধতিতে টিকা বা ভ্যাকসিন দেহে প্রবেশ (মুখের মাধ্যমে—পোলিও টিকা বা ইন্‌জেকশনের পদ্ধতির মাধ্যমে) করানো হয় তাকে টিকাকরণ (ভ্যাকসিনেশন—Vaccination) বলে।**

● **টিকাকরণ বা টিকার গুরুত্ব**— (i) টিকাকরণের মাধ্যমে দেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় যা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়। এর ফলে দেহে যে সব ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঢোকে তাদের ধ্বংস করা হয় বা তাদের প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করা হয়। টিকার মাধ্যমে টিউবারক্যুলোসিস, টাইফয়েড, পোলিও, ডিপ্‌থেরিয়া, টিটানাস, গুটি বসন্ত, হুপিং কাশি, হেপাটাইটিস্-B ইত্যাদি অসুখকে প্রতিরোধ করা যায়। (ii) **টিকাকরণের ফলে** কৃত্রিম সক্রিয় অনাক্রম্যতা উৎপন্ন হয়।

● **বুস্টার ডোজ (Booster dose)**— দেহে অধিক মাত্রায় কার্যকরী অ্যান্টিবডি অথবা অনাক্রম্যতা লাভ করার জন্য প্রাথমিক বা প্রথম ডোজের পর পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে non-living ভ্যাকসিন (টিকা) দেওয়ার পদ্ধতিকে **বুস্টার ডোজ** ( Booster dose) বলে।

## ❂ 11.4. সহজাত এবং অর্জিত অনাক্রম্যতা (Inherited and Acquired immunity) ❂

অনাকম্যতা হচ্ছে সেই সব শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো প্রাণী তার দেহে প্রবিষ্ট জীবাণু এবং জীবাণু নিঃসৃত অধিবিষ অথবা প্যাথোজনকে চিহ্নিত করতে পারে, অথবা তাদের প্রশমিত করতে পারে, কিংবা বর্জন বা বিপাকীয় পদ্ধতিতে তাদের বিনষ্ট করতে পারে। তবে নিজের দেহে কোনো ক্ষতি হতে দেয় না।

❖ (a) **অনাক্রম্যতার সংজ্ঞা (Definition of Immunity) : দেহে প্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ও তাদের অধিবিষ এবং বিজাতীয় প্রোটিন যারা দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তাদের বিরুধ্বে দেহে যেসব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে অনাক্রম্যতা (ইম্যুনিটি—Immunity) বলে।**

(b) **অনাক্রম্যতার প্রধান উদ্দেশ্য (Main purpose of immunity) :** প্রাণীদেহে অনাক্রম্যতার গুরুত্ব অনেক। এর মধ্যে তিনটি উল্লেখ করা হল—

1. অণুজীবদের (মাইক্রোঅরগানিজম—microorganism) বিরুধ্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।
2. দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোশদের প্রতিথাপন করে, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
3. পরিব্যক্ত কোশদের শনাক্তকরণ এবং ধ্বংস সাধন করে।

(c) **অনাক্রম্যতার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Immunity) :** অনাক্রম্যতাকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

### ➤ A. সহজাত বা বংশগত অনাক্রম্যতা (Innate or Inherited immunity) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : দেহের সাধারণ ও স্থায়ী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন অনাক্রম্যতা যা জন্মের সময় থেকে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাকে সহজাত (Innate) বা বংশগত (Inherited) অনাক্রম্যতা বলে।**
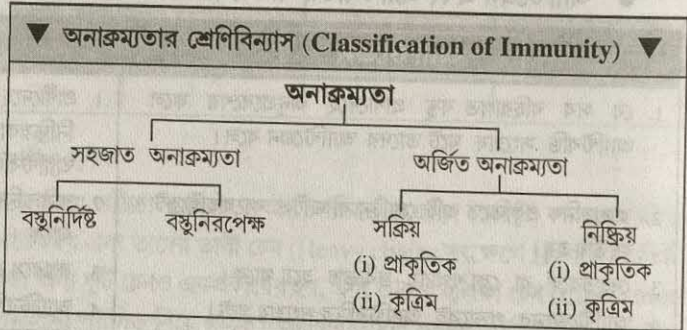
(b) **উদাহরণ**—বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি প্রতিরোধক ক্ষমতা, বিভিন্ন কলাকোশের প্রতিস্থাপন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

এইপ্রকার অনাক্রম্যতা দেহের বাইরের কোনো উদ্দীপনা অর্থাৎ পূর্বের কোনো সংক্রমণের আগে থেকেই দেহে বর্তমান থাকে। সহজাত অনাক্রম্যতা দুইপ্রকারের হয়, যেমন—বস্তু নির্দিষ্ট এবং বস্তুনিরপেক্ষ অনাক্রম্যতা।

(i) **বস্তুনির্দিষ্ট অনাক্রম্যতা (Specific Immunity) :** যে অনাক্রম্যতা শুধুমাত্র কোনো এক ধরনের জীবাণুকে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিরোধ করতে পারে তাকে সহজাত **বস্তুনির্দিষ্ট অনাক্রম্যতা** বলে। **উদাহরণ**—কোনো জাতি (Race) অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো একরকমের সংক্রমণ রোগে কখনোই আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। যেমন—কুকুরের 'ডিস্‌টেম্পার' রোগ (এটি এক প্রকার মারাত্মক রোগ যাতে প্রায় সমগ্র কুকুরের 50% এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়)। মানুষ এই প্রকার রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জন্মের থেকে লাভ করে, তাই এই রোগ মানুষের দেহে কখনও হতে দেখা যায় না।

(ii) **বস্তুনিরপেক্ষ সহজাত অনাক্রম্যতা (Non-specific innate immunity) :** যে অনাক্রম্যতা সাধারণত সব রকমের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহে স্বাভাবিক প্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাকে **বস্তুনিরপেক্ষ সহজাত অনাক্রম্যতা** বলে। এই প্রকার অনাক্রম্যতায় বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে পূর্বসম্পর্ক ছাড়া প্রতিরোধী ব্যবস্থা দিয়ে সেই বস্তুটিকে বিনষ্ট করে। **উদাহরণ**—জন্ম থেকে রক্তে উপস্থিত নিউট্রোফিল এবং মোনোসাইট শ্বেতকণিকা অথবা ম্যাক্রোফাজ নামে আগ্রাসী কোশগুলি দেহে যেকোনো জীবাণু প্রবেশের সাথে সাথে তাদের আগ্রাসন পদ্ধতিতে ধ্বংস করে।

### ➤ B. অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity) :

❖ **সংজ্ঞা : যে অনাক্রম্যতা সহজাত নয় অর্থাৎ জন্ম থেকে থাকে না কিন্তু জীবন দশায় (Life time) দেহে জীবাণুর প্রবেশের ফলে উৎপন্ন (অর্জিত) হয় তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity) বলে।**

প্রাণীদেহে পূর্ববর্তী সংক্রমণ অথবা বাইরের উৎস থেকে রেডিমেড অ্যান্টিবডি সরাসরি দেহে প্রবেশ করিয়ে অর্জিত অনাক্রম্যতা তৈরি করা যায়। **উদাহরণ**—(i) একজন ব্যক্তি যখন একবার হাম (Measles) রোগে আক্রান্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার হাম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। (ii) কিংবা একজন লোককে বিষধর সাপ কামড়ালে, তাকে 'অ্যান্টি-ভেনাম' ইন্‌জেকশন দিলে তার জীবন রক্ষা পায়। প্রথমটি সক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা এবং দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতার উদাহরণ।

● (a) **সক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা (Actively acquired immunity) : ❖ সংজ্ঞা : কোনো রোগ হওয়ার আগের সংক্রমণের ফলে কিংবা দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশের ফলে দেহে যে অনাক্রম্যতা তৈরি হয় তাকে সক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে।**

সক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা দু'প্রকারের হতে পারে, যেমন—

(i) **প্রাকৃতিক অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা** (Naturally acquired active immunity)—কোনো রোগের প্রভাবে দেহের ভিতরে যখন সেই রোগের জন্য যে প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি হয় তাকে **প্রাকৃতিক অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা** বলে। কোনো কোনো রোগে যেমন—বসন্ত কিংবা হাম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রোগীর দেহে ওই রোগের জীবাণু (অ্যান্টিজেন) নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এর ফলে ওই ব্যক্তি ভবিষ্যতে সেই রোগে আবার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বা হয় না।

(ii) **কৃত্রিম অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা** (Artificially acquired active immunity)— যখন দেহ টিকাকরণের মাধ্যমে অ্যান্টিজেন থেকে অনাক্রম্যতা উৎপন্ন করে তখন তাকে কৃত্রিম অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে।

প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে দেহে অ্যান্টিবডি এবং অনাক্রম্যভাবে সক্রিয় কোশ তৈরি করে। এই প্রকার সক্রিয় কোশগুলি পরবর্তীকালে কোনো কোনো সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে আচরণ করবে বা কাজ করবে তা তারা স্মৃতিতে ধরে রাখে।

● (b) **নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা (Passively acquired immunity) : ❖ সংজ্ঞা : দেহের নিজস্ব ক্ষমতা অথবা অবদান ছাড়া বাইরের উৎস থেকে কোনো বস্তুর মাধ্যমে নিজের দেহে সরাসরি অনাক্রম্যতা লাভ করে তাকে নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে।**

নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা আবার দুই প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **প্রাকৃতিক অর্জিত নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা** (Naturally acquired passive immunity)— জন্মগত কারণে মায়ের অনাক্রম্যতা সন্তান পেলে তাকে **প্রাকৃতিক নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা** বলে। শিশু মাতৃগর্ভে (জরায়ুতে) থাকাকালীন মাতৃদেহে তৈরি অ্যান্টিবডি (যেমন—বসন্ত) প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করলে শিশুর দেহে প্রাকৃতিক নিষ্ক্রিয় অজির্ত অনাক্রমতা তৈরি হয়। প্রাণীর প্রথম দিকের দুধে (যেমন গরুর বা মায়ের দুধ) কোলস্ট্রাম নামে একপ্রকার অ্যান্টিবডি গুণসম্পন্ন উপাদান থাকে। কোলস্ট্রামযুক্ত এই দুধ পান করলে শিশুর পৌষ্টিক নালি থেকে দুধে অবস্থিত অ্যান্টিবডিগুলি শোষিত হয়ে রক্তে পৌঁছায় এবং শিশুর দেহে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করে।

(ii) **কৃত্রিম অর্জিত নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা** (Artificially acquired passive immunity)—ঘোড়ার রক্তে কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর রক্তে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে জীবাণুকে দেহে প্রবেশ করিয়ে রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয় এবং এই অ্যান্টিবডিকে রোগীর দেহে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে দেহে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার অ্যান্টিবডি সর্পাঘাতে প্রয়োজন অ্যান্টিভেনাম কিংবা ডিপ্‌থেরিয়া রোগীর চিকিৎসার অ্যান্টিডিপথেরিয়া ওযুধ হিসাবে কাজ করে।

● **সক্রিয় অনাক্রম্যতা এবং নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার পার্থক্য (Difference between Active immunity and Passive immunity) ঃ**

| সক্রিয় অনাক্রম্যতা | নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা |
|---|---|
| 1. কোনো ব্যক্তির দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে তৈরি হয়। | 1. এই প্রকার নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা দেহের বাইরের থেকে গ্রহণ করে তৈরি হয়। |
| 2. অনাক্রম্যতা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু টিকা অ্যালার্জি ইত্যাদি অথবা সংক্রমণের ফলে এটির উৎপন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। | 2. দেহে সরাসরি অ্যান্টিবডির সরবরাহের ফলে উৎপন্ন হয়। |
| 3. এই প্রকার অনাক্রম্যতা দেহে বহু দিন ধরে কার্যকর থাকে এবং সুরক্ষাকাজে অংশগ্রহণ করে। | 3. সুরক্ষা কাজে স্বল্প সক্রিয় এবং পরবর্তী সংক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকতে পারে না। |

## ⚙ 11.5. রস নির্ভর অনাক্রম্যতা এবং কোশ মাধ্যম অনাক্রম্যতা (Humoral immunity and Cell mediated immunity) ⚙

সংক্রমণকারী পদার্থ যেমন—ব্যাকটেরিয়া, অধিবিষ, ভাইরাস ও বিজাতীয় কলাকোশের বিরুদ্ধে দেহকে সুরক্ষিত রাখে। দুটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অনাক্রম্যতা প্রতিক্রিয়া— একটি প্রতিক্রিয়া হল বিশেষ সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট যা বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ধ্বংস করে। একে **কোশভিত্তিক বা কোশমাধ্যম অনাক্রম্যতা** বলে। এটি বিশেষত ছত্রাক, পরজীবী, অন্তকোশীয় ভাইরাসের সংক্রমণ, কেনসার কোশ, বিজাতীয় কলার স্থাপন (Transplants) বিরুদ্ধে অধিক কার্যকরী। অন্য প্রতিক্রিয়াটি হল, দেহ সংবাহিত অ্যান্টিবডির উৎপাদন। এই প্রকার অ্যান্টিবডি দেহে প্রবেশকারী বস্তুকে আক্রমণ করে তাদের বিনষ্ট করে। একে **রক্তভিত্তিক অনাক্রম্যতা বা রস নির্ভর অনাক্রম্যতা** বলে। এই প্রকার অনাক্রম্যতা ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সক্রিয়।
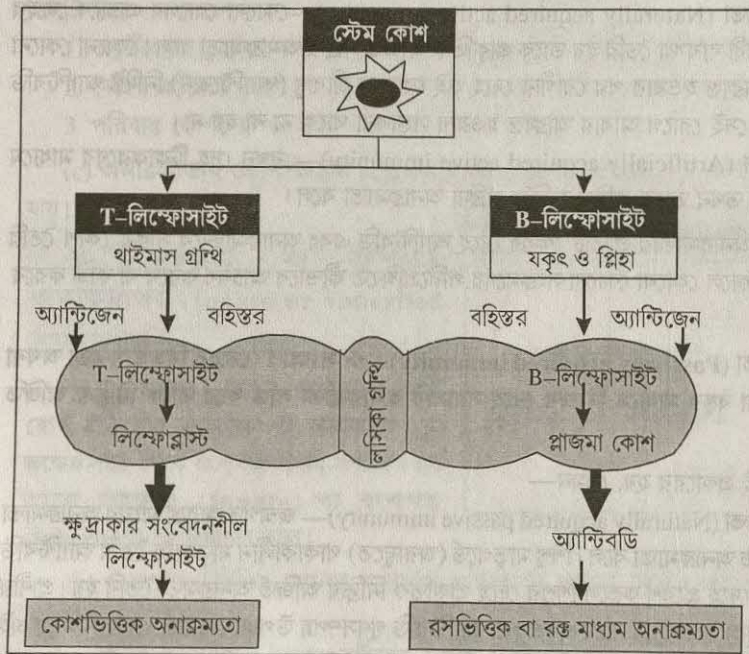
কোশমাধ্যম অনাক্রম্যতা এবং রস নির্ভর অনাক্রম্যতা হল দেহের লসিকা গ্রন্থি থেকে উদ্ভুত উৎপাদিত বস্তু। বেশিরভাগ লসিকা কলা লসিকা গ্রন্থিতে (বা লসিকা নোডে) থাকে, এছাড়া প্লিহা ও পৌষ্টিক নালিতেও থাকে, কিছু পরিমাণ অস্থি মজ্জাতেও থাকে।

## ➤ T-কোশ এবং B কোশ (T-cells and B-cells) :

মানুষের দেহে দু'ধরনের লিম্ফোসাইটের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেমন—T-লিম্ফোসাইট বা T-কোশ (T-cells) এবং B-লিম্ফোসাইট বা B-কোশ (B-cells)। এই দুই ধরনের লিম্ফোসাইট কোশ মাধ্যম এবং রস নির্ভর ভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী। আকৃতিগতভাবে খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও এই দুধরনের লিম্ফোসাইট প্রায় একই লসিকা কলা থেকে উৎপন্ন হয়। লিম্ফোসাইট দু' রকমের হয়, যেমন— T-লিম্ফোসাইট এবং B-লিম্ফোসাইট।

**1. T-লিম্ফোসাইট বা T-cell—T-কোশ** কোশভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী। দু'ধরনের লিম্ফোসাইট প্রাথমিক ভাবে ভ্রূণ অবস্থায় অস্থিমজ্জাস্থিত লিম্ফোসাইটের **স্টেম কোশ** থেকে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয়ে এর 50 শতাংশ প্রথমে **থাইমাস গ্রন্থিতে** (Thymus gland) বসবাস করার জন্য যায় ও সেখানে পরিবর্তিত হয়ে T-cell-এ রূপান্তরিত হয়।

**T- কোশের প্রকারভেদ :** T কোশ (T- লিম্ফোসাইট) দু-প্রকার, যথা—**ইফেকটর কোশ** (Effector cell) এবং **নিয়ন্ত্রণকারী কোশ** (Regulator cell) । ইফেকটর কোশ সাইটোটক্সিক T কোশ (Cytotoxic T-cell) সরাসরি শত্রু কোশকে ধ্বংস করে। নিয়ন্ত্রণকারী কোশ আবার দু প্রকার যেমন—সাহায্যকারী কোশ (হেলপার কোশ—Helper cell) এবং সাপ্রেসার T-কোশ (Supressor T cells)।

(i) **হেলপার T কোশ**—এটি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করার জন্য B লিম্ফোসাইটকে সাহায্য করে। অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করে প্রথমে T কোশের গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয়, এর ফলে কোশ থেকে T-হেলপার কোশ তৈরি হয়। এই কোশ পরবর্তী ধাপে লিম্ফোকাইনিনের মাধ্যমে B-কোশের অ্যান্টিবডি তৈরিতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

(ii) **সাপ্রেসর T কোশ**—এটি প্রাণীর কোশদের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে বিষ ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ একই প্রাণীর নিজস্ব অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া হতে বাধা দেয়।

**2. B-কোশ (B-cell)**—অস্থিমজ্জার লিম্ফোসাইট স্টেম কোশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অবশিষ্ট 50 শতাংশ কোশ দেহের অন্যান্য কয়েকটি অজ্ঞাত স্থানে সম্ভবত অস্থিমজ্জা, স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের যকৃৎ ও প্লিহাতে, ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত লসিকা গ্রন্থিতে যায় এবং B লিম্ফোসাইটে পরিণত হয়। B-লিম্ফোসাইট বলার কারণ— এই প্রকার কোশগুলি পাখির **ফেব্রিসিয়াসের বার্সা** (bursa of Fabricius) নামে লিম্ফয়েড কলা দিয়ে তৈরি এবং পৌষ্টিক নালির অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছোটো থলির মতো অংশে থাকে।

B-কোশ রক্ত অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে **প্লাজমা কোশ ও মেমোরি B কোশ** তৈরি করে। প্লাজমা কোশ অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। মেমোরি কোশগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় ও পরবর্তীকালে অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। T এবং B-লিম্ফোসাইটগুলি একই রকম দেখতে হলেও বিশেষ কলাকৌশল দিয়ে তাদের সনাক্ত করা যায়। এদের আরও বিশেষত্ব হল এরা লসিকা কলায় আলাদা আলাদা স্থানে বসতি স্থাপন করে, যেমন—লসিকা গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলে (বহিঃস্তর) এবং লসিকা গ্রন্থির কেন্দ্রাংশে জনন কেন্দ্রে (Germinal centre) B-লিম্ফোসাইট বসতি স্থাপন করে, অপরপক্ষে T-লিম্ফোসাইট বহিঃস্তরের বাইরে থাকে। এই দুধরনের লিম্ফোসাইট সমগ্র জীবনকাল পর্যন্ত দেহে থাকে। T-লিম্ফোসাইট পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে থাইমাসের থাইমোসিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

### ● T-লিম্ফোসাইট এবং B-লিম্ফোসাইট (T-Lymphocyte and B-Lymphocyte) ●

(a) **T-লিম্ফোসাইট**— লিম্ফোসাইটের পূর্বসূরিরা (Precursors) কুসুমথলিতে উৎপন্ন হয়ে ভ্রূণদেহে সঞ্চালিত হয়। এদের মধ্যে যে সব কোশ ভ্রূণের থাইমাস (Thymus) গ্রন্থিতে যায় ও বেড়ে ওঠে তাদের **T-লিম্ফোসাইট** বলে। থাইমাস গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে এসে এটি **অস্থিমজ্জায় ও লসিকা গ্রন্থির** বহিস্থরের বাইরে বসতি স্থাপন করে।
**কাজ** — T-লিম্ফোসাইট **কোশভিত্তিক** (Cellular immunity) **অনাক্রম্যতার** জন্য দায়ী।

(b) **B-লিম্ফোসাইট**— এই রকম লিম্ফোসাইট থাইমাসের পরিবর্তে পাখির পায়ুর (Cloaca) কাছে অবস্থিত ফেব্রিসিয়াস বারসা (*bursa of Fabricius*) নামে লসিকা পিণ্ডতে বেড়ে উঠে এবং পরে স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের যকৃৎ ও প্লিহাতে যায় ও পরিণত হয়। এরপর যকৃৎ ও প্লিহাতে থাকার পর লসিকা গ্রন্থির বহিঃস্তরে ও জনন কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করে।
**কাজ**— B-লিম্ফোসাইট **রসনির্ভর অনাক্রম্যতার** ( Humoral immunity ) জন্য দায়ী।

- **B-কোশ এবং T-কোশের মধ্যে পার্থক্য (Differences between B-Lymphocyte and T-Lymphocyte) :**

| B-কোশ (B- লিম্ফোসাইট) | T-কোশ (T- লিম্ফোসাইট) |
|---|---|
| 1. অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হওয়ার পর থাইমাস গ্রন্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে না। | 1. অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হওয়ার পর থাইমাস গ্রন্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। |
| 2. এর থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। | 2. এরা সরাসরি ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী প্রাণী এবং কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়াকে বাধা দেয়। |
| 3. অস্বাভাবিক মিউটেন্ট কোশ অথবা ব্যাকটেরিয়া যেগুলি কোশের মধ্যে থাকে, তাদের উপর ক্রিয়া করতে অক্ষম। | 3. অস্বাভাবিক মিউটেন্ট কোশের (কেনসার জনিত কোশের) উপর কাজ করতে সক্ষম। |

## ▲ I. রসনির্ভর অনাক্রম্যতা (Humoral immunity) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : যে অনাক্রম্যতা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে B লিম্ফোসাইটের সাহায্যে রক্তরস, কলারস ও লসিকাতে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে ঘটে তাকে রসনির্ভর অনাক্রম্যতা (Humoral immunity) বলে।**

রক্তমাধ্যম অনাক্রম্যতা B-কোশ (B-cell) বা B-লিম্ফোসাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনোরকম অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসার আগে B-লিম্ফোসাইট (B-কোশ) লসিকা কলাতে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ম্যাক্রোফাজের কোশ থেকে কোশে স্থানান্তরের মাধ্যমে অ্যান্টিজেন B-কোশে নিঃসৃত হয় ও সক্রিয় হয়। একই সঙ্গে অ্যান্টিজেনের দ্বারা সহায়ক T-কোশ সক্রিয়তা লাভ করে।

প্রথমে B-কোশ বিভেদিত হয়ে প্লাজমা কোশ উৎপন্ন করে। এই **প্লাজমা কোশ** (Plasma cell) থেকে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়ে লসিকা এবং রক্তের সংবহনের মাধ্যমে সংক্রামিত স্থানে পৌঁছায়। বিজাতীয় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে B-কোশ লসিকাগ্রন্থি, প্লিহা অথবা পৌষ্টিক নালিস্থিত লসিকার কলাকোশে সক্রিয় হয়ে অ্যান্টিবডিতে বিভেদিত হয় এবং প্লাজমা কোশ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিজেন B-কোশে অ্যান্টিবডিকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখে। এরপর অ্যান্টিজেনের কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে মানুষের শ্বেতকণিকার সহায়ক (Human leucocyte associated—HLA) অ্যান্টিজেনের সহযোগে B-কোশের উপরিতলে সজ্জিত থাকে। এই প্রকার অ্যান্টিজেন এবং HLA-অ্যান্টিজেনগুলিকে সহায়ক T-কোশে অবস্থিত গ্রাহক দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। T-কোশে কয়েকটি বস্তু তৈরি হয় তা থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবে B-কোশের বিভাজন ঘটায় এবং প্লাজমা কোশের **ক্লোন** (Clone) থেকে আলাদা করা যায়। প্লাজমা কোশ অ্যান্টিবডি নিঃসৃত করে। B-কোশ দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে ও বিভেদিত হয়ে উৎপাদিত প্লাজমাকোশগুলি ম্যাক্রোফাজেস নিঃসৃত **ইন্টারলিউকিন—1** (Interleukin) দ্বারা প্রভাবিত হয়। সক্রিয় B-কোশ যা প্লাজমা কোশে বিভেদিত হয় না, সেগুলি **স্মৃতি B-কোশ** (Memory B-cell) হিসাবে থাকে। এই স্মৃতি B-কোশ লসিকা কলায় বহুদিন পর্যন্ত থাকে এবং অ্যান্টিজেনের যদি পুনরাবির্ভাব ঘটে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয় ফলে দ্বিতীয়বার ওই রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুব কম থাকে বা হয় না।

## ▲ II. কোশ মাধ্যম অনাক্রম্যতা (Cell mediated Immunity) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : দেহে যে অনাক্রম্যতা টি-লিম্ফোসাইট (T-Lymphocyte) বা T-কোশ-এর সাহায্যে ঘটে তাকে কোশ মাধ্যম অনাক্রম্যতা (Cell mediated Immunity) বলে।**

T-লিম্ফোসাইটকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(i) সহায়ক T-কোশ বা হেলপার T-কোশ (Helper T-cell), (ii) বিধ্বংসী T-কোশ (কিলার T-কোশ) বা সাইটোটক্সিক T-কোশ (Cytotoxic T-cell) এবং (iii) দমনকারী T-কোশ (Supressor T-cell)।

1. **অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক T-কোশের ভূমিকা** (Role of Helper T-cell for the regulation of immunity)—T- লিম্ফোসাইটের বেশিরভাগ (প্রায় 75 শতাংশ) সহায়ক T-কোশ (Helper T-cell) অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার কোশ অনাক্রম্য ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। সহায়ক T-cell থেকে নিঃসৃত অ্যান্টিজেন ধ্বংসকারী প্রোটিনকে **লিম্ফোকাইনিন** (Lymphokinnine) বলে। লিম্ফোকাইনিন ম্যাক্রোফাজ এবং অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে। ভাইরাস ধ্বংসকারী লিম্ফোকাইনিন হল ইন্টারফেরন (Interferon)। T-কোশ থেকে নিঃসৃত লিম্ফোকাইনিন অভাবে সমগ্র অনাক্রমন ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যেমন—AIDS রোগে সহায়কT-cell বিনষ্ট হয়ে পড়ে বলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এই কারণে তখন কোনোরকমের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না।

2. **অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণে বিধ্বংসী কোশের ভূমিকা** (Role of killer cell for the regulation of immunity)—বিধ্বংসী কোশ (Killer cell) রোগজীবাণুকে সরাসরি ধ্বংস করতে সক্ষম, এমনকি একই সঙ্গে দেহের কিছু নিজস্ব কোশকেও তারা বিনষ্ট করতে পারে। কোশের ঝিল্লির উপরিতলের গ্রাহক রোগজীবাণুকে প্রোটিনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে এবং তাদের বিনষ্ট করে। বিধ্বংসী T- কোশ **পারফোরিন** নামে প্রোটিন নিঃসৃত করে যা কোশঝিল্লিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। পরে ওই ছিদ্র দিয়ে কলারসের তরল কোশে প্রবেশ করে। এছাড়া বিধ্বংসী T-কোশ সরাসরি আক্রমণকারী কোশে অধিবিষ (Toxin) উৎপন্ন করে যা কোশটিকে স্ফীত করে বিদীর্ণ করে। বিধ্বংসী T-কোশের অন্য একটি বিশেষত্ব হল যে কোশটিকে আক্রমণ করে তার ঝিল্লিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে ও তার মধ্যে অধিবিষ নিঃসৃত করে সেই কোশ থেকে সরে গিয়ে আরও বহু কোশকে এভাবে মেরে ফেলতে পারে। এই বিধ্বংসী কোশ (Killer cell) ক্যানসার কোশ, ট্রান্সপ্লান্ট কোশ এবং অন্যান্য কোশকেও বিনষ্ট করতে পারে।
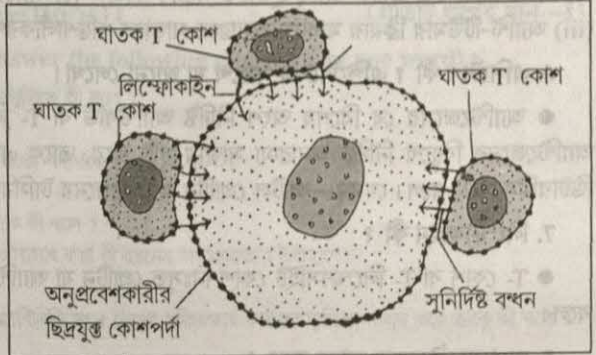
চিত্র 11.3 : দেহে অনুপ্রবেশকারী কোশকে সংবেদনশীল লিম্ফোসাইট বা ঘাতক T-কোশ দ্বারা সরাসরি আক্রমণ ও বিনাশ করার পদ্ধতি।

3. **অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণে দমনকারী T-কোশের ভূমিকা** (Role of supressor cell for regulation of immunity) : সহায়ক T-কোশ প্রথমে দমনকারী T-কোশকে সক্রিয় করে তোলে। সক্রিয় দমনকারী T-কোশ এরপর সহায়ক কোশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাজ সহায়ক কোশের সক্রিয়তাকে বেঁধে দেয়। এছাড়া এই কোশ সম্ভবত অনাক্রমণ সংস্থার ক্ষমতাকে এমনভাবে সীমাবন্ধ করে রাখে যাতে এই সংস্থা নিজ দেহের কলাকোশকে আক্রমণ না করতে পারে।

## ❂ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর ❂

**1. অ্যান্টিজেন কী ?**

● যে বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে তার প্রভাবে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে অন্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাকে **অ্যান্টিজেন** (Antigen) বলে।

**2. অ্যান্টিবডি কী ?**

● যে সুনির্দিষ্ট অনাক্রমণ বস্তু অ্যান্টিজেনের প্রভাবে তৈরি হয় তাকে **অ্যান্টিবডি** (Antibody) বলে।

**3. অধিবিষ বা টক্সিন কাকে বলে ?**

● প্রাণী তথা মানুষের দেহে কোন জীবাণুর সংক্রামণের ফলে জীবাণুদেহ থেকে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। যা দেহকে বিষাক্ত করে তোলে। সেই বিষাক্ত রাসায়নি পদার্থকে **অধিবিষ বা টক্সিন** (Toxin) বলে।

**4. অনাক্রম্য তন্ত্রে অধিবিষ ও প্রতিবিষের ভূমিকা কী ?**

● দেহে প্রবেশকারী জীবাণু নিঃসৃত নানাবিধ অধিবিষ বা টক্সিন-(Toxin) শ্বেত কণিকার দেহ থেকে একপ্রকার প্রোটিন নিঃসৃত করে যা অধিবিষের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাকে প্রশমিত করে। এর ফলে জীবাণু দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়াতে পারে না। প্রোটিনকে প্রতিবিষ (অ্যান্টিটক্সিন – Antitoxin) বলে। প্রতিবিষ প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের অনাক্রম্য বস্তু (Immune body) যা অধিবিষের প্রভাবে তৈরি হয়। এই জাতীয় অনাক্রম্য বস্তুকে প্রতিবস্তু (অ্যান্টিবডি—Antibody) বলে। অ্যান্টিবডির প্রস্তুতকরণে যে বস্তুটি সাহায্য করে তাকে অ্যান্টিজেন বলে। এই অবস্থায় অধিবিষ হল অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহের মধ্যে অ্যান্টিজেনের সক্রিয়তাকে বিনষ্ট করে। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে অ্যান্টিবডির সৃষ্টিকে অনাক্রম্য সাড়া (Immune response) বলে।

**5. অ্যাড্‌জুভ্যান্ট বলতে কী বোঝো ?**

● **অ্যাড্‌জুভ্যান্ট**—অনাক্রম্য সাড়ার তীব্রতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে পদার্থ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অথবা অ্যান্টিজেন ছাড়াই দেহে প্রবেশ করানো হয় তাকে অ্যাড্‌জুভ্যান্ট বলে। কাজ—(i) ম্যাক্রোফাজের সক্রিয়করণ, (ii) লিম্ফোসাইটের সক্রিয়করণ (iii) অ্যান্টি-টিউমার ক্রিয়ার মাধ্যমে অনাক্রম্য সাড়াকে শক্তিশালীকরণ।

**6. এপিটোপ কী ? এপিটোপের সমন্ধে যা জানো লেখো।**

● অ্যান্টিজেনের যে বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি বা T- লিম্ফোসাইটের গ্রাহক কর্তৃক চিহ্নিত ও আবদ্ধ হয়ে সেই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অনাক্রম্য সাজার সৃষ্টি করে, তাকে **এপিটোপ** বা **অ্যানিজেনধর্মী নির্ধারক স্থান** (অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট)) বলে। যেমন—জটিল প্রোটিন অ্যান্টিজেনের টার্সিয়ারী গঠনের অংশ বিশেষ।

**7. লিম্ফোকাইন কী ?**

● T- কোশ বা T- লিম্ফোসাইট কোশ নিঃসৃত প্রোটিন যা অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে তাকে লিম্ফোকাইন (Lymphokine) বলে।

**8. অপসোনাইজেশন কাকে বলে ?**

● অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেনকে আগ্রাসী কোশের কাছে উপাদেয় করে তুলবার পদ্ধতিকে **অপসোনাইজেশন** বলে। অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অ্যান্টিজেনের বাইরে একটি আবরণী সৃষ্টি করে যাতে তাকে আগ্রাসী কোশরা ভক্ষণ করতে পারে।

**9. ইন্টারফেরণ কী ? এর উদাহরণ এবং একটি প্রধান কাজ উল্লেখ করো।**

● **ইন্টারফেরণ**—ভাইরাস আক্রান্ত কোশ থেকে ক্ষরিত যে ক্ষুদ্র দ্রবণীয় প্রোটিন পাশের কোশগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ওই কোশগুলিকে ভাইরাসের প্রতিলিপিকরণ প্রতিরোধী অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপিত করে তাকে **ইন্টারফেরণ** (Interferon) বলে। **উদাহরণ**—প্রসঙ্গত কোনো প্রজাতির দেহে উৎপন্ন এই বস্তুটি একই প্রজাতির অন্যান্য প্রাণীর দেহে কার্যক্ষম হলেও অন্য প্রজাতির দেহে কোনো কাজ কারার ক্ষমতা দেখায় না। যেমন মুরগীর দেহে উৎপন্ন ইন্টারফেরণ অপর মুরগীর দেহে কার্যকরী হলে মানুষের দেহে কার্যকরী হয় না। **কাজ**—ইন্টারফেরণ যেসব রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে তার মধ্যে প্রধান হল—ভাইরাসজনিত চোখের অসুখ, হেপাটাইটিস, বৃক্কের অসুখ, ফুসফুস ও স্তনের ক্যান্সার, ম্যালিগেনেনসি ইত্যাদি।

**10. হেপটেন কাকে বলে ?**

● **হেপটেন**—বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, ধূলবালির রাসায়নিক উপাদান, নানা প্রকার শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ ত্বকের শুকনো আঁশের অপজাত পদার্থ, প্রাণীর খুস্কীজাত পদার্থ প্রভৃতিকে **হেপটেন** (Heptens) বলে। এদের আণবিক ওজন 8000 -এর নিচে, তাই এরা এককভাবে অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করতে পারে না, কিন্তু কোনো প্রোটিন বা বৃহদাকার অণুর সঙ্গে যুক্ত হলে অনাক্রমণ প্রতিক্রিয়া (Immune response) উৎপাদন করতে পারে।

**11. স্বঅনাক্রম্য রোগ কাকে বলে ?**

● **স্বঅনাক্রম্য রোগ**—কখন কখন নিজের দেহের কোশ অসহনীয় হওয়ার ফলে যে অনাক্রম্যতা দেখা যায় তাকে **স্বঅনাক্রম্যতা** বলে। এর ফলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে স্বঅনাক্রম্যতা রোগ (Auto immune desease) বলে। হাসিমোটা রোগে থাইরয়েড গ্রন্থি অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে, ফলে তা ধ্বংস হয় এবং **মিক্সিডিমা** রোগ দেখা দেয়।

**12. ম্যাক্রোফাজ কাকে বলে ? এর মুখ্য কাজটি উল্লেখ করো।**

● **ম্যাক্রোফাজ**—রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াম তন্ত্রের (R. E. system) অন্তর্গত বড়ো আকৃতির কোশকে **ম্যাক্রোফাজ** (Macrophage) বলে। এর অন্যতম প্রধান কাজ হল আগ্রাসন পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিজাতীয় পদার্থ বা জীবাণুকে আগ্রাসন পদ্ধতিতে ধ্বংস করে।

**13. ব্যাকটেরিওলাইসিন কাকে বলে ?**

● **ব্যাকটেরিওলাইসিন**—যে অ্যান্টিবডি বীজাণুর কোশকে ধ্বংস করে তাকে **ব্যাকটেরিওলাইসিন** (Bacteriolysin) বলে।

## ○ অনুশীলনী ○

### I. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—1)

**A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক কথায় দাও (Answer the following questions in one word) :**

1. যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে সেগুলিকে কী বলে ?
2. দেহে অধিবিষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত প্রোটিনের নাম কী ?
3. ধূলোবালি শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ, ত্বকের শুষ্ক আঁশের মতো পদার্থকে একত্রে কী বলে ?
4. এন্টিবডির স্বাভাবিক প্রকৃতিকে কী বলে ?
5. অণুপ্রবেশকারী জীবাণু যা সরাসরি দেহকে আক্রান্ত করে তাকে কী বলে ?
6. মনোসাইট, নিউট্রোফিল দ্বারা জীবাণু ও বিজাতীয় প্রোটিন আত্মসাৎ করা কী ধরনের অনাক্রম্যতার উদাহরণ।
7. কোশ নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা কার সক্রিয়তায় গড়ে ওঠে ?
8. নিজ দেহে অনুপ্রবিষ্ট বিজাতীয় অ্যান্টিজেনে দ্বারা উৎপন্ন অ্যান্টিবডি যখন দেহের প্রতিরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে কী বলে ?

**B. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে টিক চিহ্ন (✓) দাও [Put the tick (✓) mark on correct answer] :**

1. গুটি বসন্তের টিকা যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন তার নাম হল—লুইস পাস্তুর □/ এডওয়ার্ড জেনার □ যোসেফ প্রিস্টল □।
2. যে বিজাতীয় বস্তু মানুষের দেহে প্রবেশের ফলে একটি সমসংস্থ প্রোটিন তৈরি হয় তাকে বলে—অ্যান্টিবডি □ / অ্যান্টিজেন □।
3. যখন দেহে টিকাকরণের মাধ্যমে অ্যান্টিজেন থেকে অনাক্রম্যতা উৎপন্ন করে তখন তাকে বলে প্রাকৃতিক অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা □/ কৃত্রিম অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা □ / সহজাত অনাক্রম্যতা □।
4. মাতৃগর্ভে শিশু থাকাকালীন মাতৃদেহে তৈরি অ্যান্টিবডি শিশুর দেহে যায় তা হল—প্রাকৃতিক নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা □ / কৃত্রিম অর্জিত নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা □।
5. নীচের রোগগুলির মধ্যে কোনটি দেহে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতাকে নষ্ট করে দেয়—AIDS □ / সিফিলিস □ / গনোরিয়া □ / হেপাটাইটিস □।

**C. শূন্যস্থান পূরণ করো (Fill in the blank) :**

1. —— এর প্রভাবে প্রাণীদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।
2. বাতাসে ভাসমান ধূলোবালিকে অনাক্রমবিদ্যার ভাষায় —— বলে।
3. অ্যান্টিজেনের প্রভাবে প্রাণীদেহে —— তৈরি হয়।
4. ক্ষতিকর জীব ও পদার্থের বিরুদ্ধে দেহ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে —— বলে।
5. অ্যান্টিবডি হল গামাগ্লোবিউলিন যা —— নামে পরিচিত।
6. অ্যান্টিবডি প্রধানত —— প্রকার পেপটাইড নিয়ে গঠিত।

**D. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করো (Select the correct answers to fill in the blanks) :**

1. অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত যকৃতের কোশ হল —— । (নালকোশ / কুফার কোশ / মেসানজিয়াল কোশ / মাস্ট কোশ)।
2. অ্যান্টিবডির রাসায়নিক প্রকৃতি হল —— জাতীয়। (লিপিড/ প্রোটিন / কার্বোহাইড্রেট / গ্লাইকোজেন / প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট )।
3. যে ইমিনোগ্লোবিউলিন প্লাসেন্টা ভেদ করে তার নাম —— । ( IgA / IgD / IgG / IgM)।
4. অ্যান্টিবডির আকৃতি মুখ্যত অনেকটা ইংরাজি —— অক্ষরের মতো। ( X / Z / Y / T)
5. B- লিম্ফোসাইটেড উৎপত্তি স্থানের নাম হল —— । (যকৃৎ / পাকস্থলি / অস্থিমজ্জা)।
6. T-লিফোসাইট তৈরি হয় —— । (যকৃতে / প্লিহাতে / থাইমাসে)

**E. সঠিক বা ভুল লেখো (Write true or false) :**

1. অনাক্রম্যতা হল যেকোনো বিজাতীয় অণুজীব, অণুজীব নিঃসৃত অধিবিষ বা বিজাতীয় প্রোটিন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা □
2. অধিবিষ বা টক্সিন হল এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। □
3. প্রোটিন জাতীয় প্রতিবিষ বা অ্যান্টিটক্সিন প্রকৃত পক্ষে এক ধরণের অনাক্রম্য বস্তু যা অধিবিষের প্রভাবে প্রস্তুত হয়। □
4. কোনো মাধ্যম অনাক্রম্যতা B- কোশ B- লিম্ফোসাইটের সাহায্যে ঘটে। □
5. অ্যান্টিবডি (আগ্লুটিনিন)-এর সাহায্যে অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুনিনোজেন)-এর দলবদ্ধ পদ্ধতিকে আগ্লুটিনেশন বলে। □
6. যে অনাক্রম্যতা জন্ম থেকেই জিনের প্রভাবে জীবদেহে তৈরি হয় তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। □

## II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

(প্রতিটি প্রশ্নের মান—2)

1. অ্যান্টিজেনের প্রভাবে দেহে কী সৃষ্টি হয় ?
2. অ্যান্টিবডির রাসায়নিক প্রকৃতি কী ?
3. T-কোশের নামকরণ কেন এরূপ করা হয়েছে ?
4. B-কোশ এর নামকরণের যুক্তি বল ?
5. অনাক্রম্যতা কাকে বলে ?
6. রস নির্ভর অনাক্রম্যতা সংজ্ঞা লেখো।
7. কোশ নিয়ন্ত্রিত অনাক্রমতা কথাটির অর্থ কী ?
8. প্যাথোজেন কাকে বলে ?
9. ইমিউনোলোজি বলতে কী বোঝো ?
10. মানুষের দেহের সব থেকে বড়ো অ্যান্টিবডির নাম লেখো।
11. অধিবিষ কাকে বলে ?
12. অ্যারিওলা যোগ কলার কোন কোশ আগ্রাসন পদ্ধতিতে রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে ?
13. অ্যান্টিজেনধর্মী নির্ধারক স্থান কাকে বলে ?
14. ভ্যালেনস কাকে বলে ?
15. অধিবিষ বা টক্সিন কী ? দেহে কীভাবে তৈরি হয় ?
16. সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন হতে হলে যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেগুলি কী কী ?
17. প্রশমন বা নিউট্রালাইজেশন কাকে বলে ?

## III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—4)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer the following questions) :

1. অ্যান্টিবডির সংজ্ঞা দাও।
2. অ্যান্টিজেনের পরিবর্তনশীল স্থানের গুরুত্ব বলো।
3. অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির সুনির্দিষ্টতা বলতে কী বোঝো ?
4. অনাক্রম্য বিদ্যা কাকে বলে ? অনাক্রম্যতার সঙ্গে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির সম্পর্ক কী ?
5. হ্যাপটেনস কাকে বলে ? অ্যান্টিবডির প্রকৃতি কীরূপ ? ফ্যাগোসাইট হিসাবে কাজ করে এমন একটি শ্বেত রক্তকণিকার নাম করো।
6. অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির মধ্যে কী সম্বন্ধ দেখা যায় ? ইমিউনোগ্লোবিউলিন কী ?
7. সহজাত অনাক্রম্যতা কাকে বলে ? এটি দেহে কীভাবে গড়ে উঠে ?
8. বস্তু নির্দিষ্ট অনাক্রম্যতা কাকে বলে ?
9. বস্তু নিরপেক্ষ সহজাত অনাক্রম্যতা বলতে কী বোঝো ?
10. অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক T-কোশের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করো।
11. কিলার কোশ কাকে বলে ? অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রণে বিধ্বংসী কোশের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
12. টিকা, টিকাকরণ এবং বুস্টার ডোজ বলতে কী বোঝো ?

### B. পার্থক্য নিরূপণ করো (Distinguish between the following) :

1. T-কোশ এবং B-কোশ। 2. সক্রিয় অনাক্রম্যতা এবং নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা। 3. রস নির্ভর অনাক্রম্যতা এবং কোশ নির্ভর অনাক্রম্যতা। 4. সহজাত এবং অর্জিত অনাক্রম্যতা।

### C. টীকা লেখো (Write short notes) :

1. মেমোরী কোশ, 2. সহায়ক কোশ, 3. T-লিম্ফোসাইট, 4. B-লিম্ফোসাইট, 5. অ্যান্টিজেন, 6. অ্যান্টিবডি, 7. এপিটোপ, 8. হ্যাপটেন, 9. বংশগত অনাক্রম্যতা এবং 10. অর্জিত অনাক্রম্যতা। 11,. IgA এবং IgG।

## IV. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : (প্রতিটি প্রশ্নের মান—6)

### A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (Answer of the following questions) :

1. (a) অ্যান্টিজেন বলতে কী বোঝো ? (b) একটি অ্যান্টিজেন অণুর চিত্রসহ বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করো।
2. (a) অ্যান্টিবডি কাকে বলে ? (b) বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
3. সহজাত অনাক্রম্যতা কী ? এর বিভিন্ন প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করো।
4. কোশ মাধ্যম অনাক্রম্যতা ও সহজাত অনাক্রম্যতা উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
5. অর্জিত অনক্রম্যতার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করো।
6. T -কোশ এবং B-কোশের উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করো।
7. সহজাত অনাক্রমতা অর্থ কী ? এটি মানুষের দেহে কীভাবে গড়ে উঠে।
8. স্মৃতি কোশ কাকে বলে ? এই কোশের সঙ্গে দেহের অনাক্রমতার সম্পর্ক কী ?
9. (a) অনাক্রম্যতন্ত্রের সংজ্ঞা লেখো। (b) এই তন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন কোশ এবং অঙ্গসমূহ কী কী ?

10 রস নির্ভর অনাক্রম্যতা সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

# ❂ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সূচি ( Subject Index ) ❂

## ❂ উদ্ভিদবিদ্যা ❂

## ❂ প্রাণীবিদ্যা ❂

## ❂ শারীরবিদ্যা ❂

সারদা বুক হাউস
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩